756.3
·007/4
জয়ন্তী
২৭ বর্ষ
সং.খন্ড, ১-১২
বৈশাখ - চৈত্র
১৩৩৩

756.3
007/4

জয়ন্তী

CALCUTTA UNIVERSITY
754.3
.009/4

সূচীপত্র

জয়ন্তী বৈশাখ ১৩৬৯

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
উড়ো চিঠি		
কবিতা	বিনয় রায়	১
জর্নাল থেকে		
কবিতা — উদয়ভানু ভৌমিকের কয়েকটি কবিতার অনুবাদ	অনুবাদ করেছেন কমল গুহ	২
সাহিত্য সংখ্যায় সাহিত্য-স্রষ্টা-শ্রষ্টা-পাঠক সম্পর্কে মনের একটা পৃষ্ঠা		
আলোচনা	সমর বসু	৪
রবীন্দ্র উপন্যাসের নানা রূপ		
প্রবন্ধ	ডাঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়	৫
অনুভূতি		
কবিতা	সুবোধ সেনগুপ্ত	৯

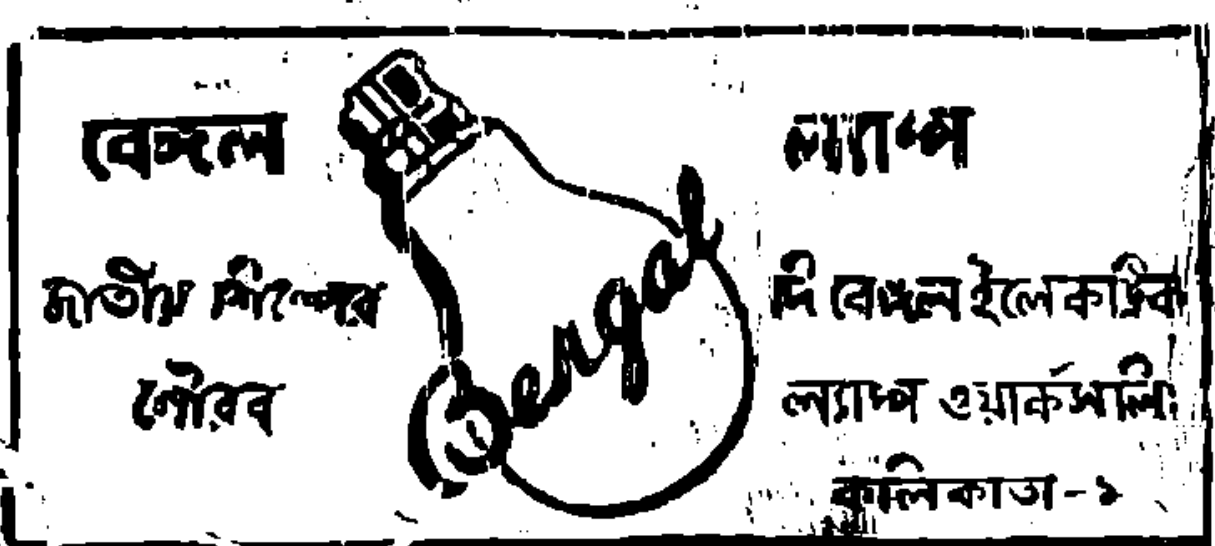

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
বিদ্রূপী বন্ধুর প্রতি কবিতা	শ্রীসাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ...	১১
নিন্দুক গান	নরেন্দ্র মিত্র	১১
গিরিব্রজাঞ্চলে ভ্রমণ-কাহিনী ...	সমর গুহ	১২
স্মরণে কবিতা	সঞ্জয় ভট্টাচার্য	১৭
রবীন্দ্রনাথের বঙ্কিম সমালোচনা প্রবন্ধ	ডাঃ হরপ্রসাদ মিত্র	১৮
প্রাচ্যের সংস্কৃতিদূত পার্লবাক প্রবন্ধ	সুশীলবিহারী ঘোষ	২২
কালপুরুষ উপন্যাস	মিহির মুখোপাধ্যায়	২৭
নিত্য ধর্ম ও ক্ষুদ্র ধর্ম প্রবন্ধ	কাজী আবদুল ওদুদ	৩৭
চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ প্রবন্ধ	শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন	৩৯
ফরাসী কবিতায় মালার্মে ও আধুনিক কাব্যের আরেক প্রযুক্তি প্রবন্ধ	অমৃতা বসু	৪১
অপরিনির্বাণ কবিতা ...	দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	৫০
স্মৃতি কবিতা	মৈত্রেয়ী দেবী	৫১
রবীন্দ্রনাথ কবিতা	সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত	
নববর্ষ কবিতা	শান্তিশীল দাশ	

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
জৈবিক		
গল্প	শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৭৪
সাহিত্যিকের দূত		
রসরচনা	পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	৫৭
রবীন্দ্রনাথ		
কবিতা	প্রভাকর মাঝি	৫৪
অশান্ত নেপাল		
প্রবন্ধ	দোলা চট্টোপাধ্যায়	৬৭
পুস্তক পরিচয়		৬২
শতবার্ষিকী গ্রন্থ পঞ্জী		
... ...	কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত	৬৫
গ্রহণ		
কবিতা	বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৭০
সম্পাদকীয়		৭৪

স্বীকৃতি

প্রচ্ছদপট বিশ্বভারতীর সৌজন্যে প্রাপ্ত। এজন্য আমরা আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

—জঃ সঃ

বৈদেশিক দেশের খবরের জন্য

১। উইকলী ওয়েষ্টবেংগল—সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কিত সংবাদপত্র। বার্ষিক ৬৲ টাকা; ষাণ্মাসিক ৩৲ টাকা।

২। কথাবার্তা—বাংলা সাপ্তাহিক। বার্ষিক ৬৲ টাকা, ষাণ্মাসিক ১·৫০ টাকা।

৩। বসুন্ধরা—বাংলা মাসিক পত্র। বার্ষিক ২৲ টাকা।

৪। ভ্রমিত বার্ত্তা—হিন্দি পাক্ষিক পত্রিক। বার্ষিক ১·৫০ টাকা; ষাণ্মাসিক ·৭৫ নঃ পয়সা।

৫। পশ্চিমবাংগালা—নেপালী ভাষায় সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। বার্ষিক ৬৲ টাকা; ষাণ্মাসিক ১·৫০ টাকা।

৬। মরেবী বংগাল—সচিত্র উর্দ্দু পাক্ষিক পত্রিকা। বার্ষিক ৩৲ টাকা; ষাণ্মাসিক ১·৫০ টাকা

বিঃ দ্রঃ—ক। টাকা অগ্রিম দেয়:

খ। সবগুলিতেই বিজ্ঞাপন দেওয়া যায়;

গ। বিজ্ঞাপন ভারতের সর্ব্ব প্রচেষ্টা চাই;

ঘ। ভি পি তাকে পত্রিকা পাঠানো হয় না।

অনুগ্রহপূর্বক

রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা

এই ঠিকানায় প্রচার অধিকর্তার নিকট লিখুন

7563
.009/4

জয়শ্রী

বৈশাখ ১৩৬৯ · ১ম সংখ্যা · ২০ বর্ষ

শুধু ভারতবর্ষ নয় জগতের নানা স্থান গতবছর রবীন্দ্র শতবার্ষিকী বৎসর হিসাবে পালন করেছে। আর রবীন্দ্রনাথের বাংলা, বিশেষ এই কলকাতা সহরের তো কথাই নেই, এমন সাংস্কৃতিক অথবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই, এমন অঞ্চল ও পল্লী নেই—যেখানে সাধ্যানুযায়ী আয়োজনে বাঙালী রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করেনি। রবীন্দ্রনাথের গান, নাটক আবৃত্তি ও জীবনদর্শনের আলোচনায় ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়েছে বাংলার আকাশ-বাতাস গত একবছর ধরে। হয়তো তারমধ্যে ঘটটা আবেগ ছিল, ততটা ছিল না প্রতিফুরনের প্রস্তুতি। যতটা ছিল অনুষ্ঠানের আড়ম্বর, ততটা ছিল না অনুসরণের সাধনা।

রবীন্দ্রনাথকে জানবার, বুঝবার, জানাবার, বোঝাবার, তাঁর সাহিত্যের দাক্ষিণ্যে প্রেরণা লাভ করবার প্রয়াস জয়শ্রী সাধ্যানুসারে করেছে, করবে। আজ এই সম্বৎসরপূর্তি উপলক্ষে তাঁকে আমাদের প্রণাম জানিয়ে আবার আমরা যাত্রা সুরু করলাম; এবং জয়শ্রীর বন্ধু, হিতৈষী, গ্রাহক, লেখক, পাঠক ও সহযোগীদের নূতন বছরের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে সাহিত্যকে জীবনের প্রেরণা হিসাবে গড়ে তোলবার অভিযানে সহযাত্রী হবার আহ্বান জানাচ্ছি।

১লা বৈশাখ, ১৩৬৯

উড়ো চিঠি

দিনেশ দাস

আছে, আছে, তারা আছে, আলো আছে,
নইলে কেমন ক'রে এত পথ হাঁটি আনমনে।
পথ চলি—কেবল একটি পথ—
যে-পথ চলেছে শুধু একটানা মনের গহনে।

সহসা হাওয়ায় এল তোমার একটি উড়ো চিঠি—
পত্রলেখা, তখনই আকাশে চাঁদ ওঠে :
জ্যোৎস্নার দুধে ভাসে ছায়া-ছায়া পথ—
বাঁকানো হাসির রেখা দিগন্তের ঠোঁটে।

তোমার একটি চিঠি কী করে বলতো,
মুছে নিল যত ছায়া রুমালের মত ?
কী ক'রে হঠাৎ
বের হ'য়ে এল এক কাগজের মত সাদা ধব্‌ধবে রাত।

পথ চলি :
কিসের আওয়াজ শুনি মাঠে ?
সময় ইঁদুর হ'য়ে কাগজের রাতটিকে
দাঁত দিয়ে কাটে।

জটিল অরণ্য-পথ বেয়ে বেয়ে চলেছি একাকী—
ঝোপের আড়াল থেকে বলে এক ঘুমতাড়া পাখি,
'এত রাতে পথ দিয়ে কে যায় ? কে যায় ?'
আমি বলি, "আমি হাঁটি—আরও কেউ হাঁটে যেন
পিছু পিছু আমার ছায়ায়।"

জর্ণাল থেকে : : উইলফ্রীড ওয়েন :

অনুবাদ : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

পাতাগুলি
অযুত কুহরে কানাকানি করে আলো-আলো গাছে সাড়া তুলি'
প্রাণগুলি
পাহাড়ে পাহাড়ে জেগে ওঠে ঐ লহরে লহরে প্রাণ বলি'।
পাখিরা সব
ভোরবেলা গায় রামকেলি সুর ভরা-উজান।
কবিরা সব
গেয়ে গেয়ে ওঠে চৈতালি ধান-কাটার গান।
মৌমাছিরা
পাতার ফুলের ঘনালো শিশির ঝরিয়ে যায়।
ঢেউয়ের দল
কাজল দীঘির জল ভেঙে জল চড়িয়ে যায়।
ঝলকানি :
কাঁপে সীমাহীন কারুবাজ কাঁপে শীতল জলে।
দেহের বাণী
সিক্ত মুকুর শিহরে কনকগগনতলে।
ও এর মাঠ
স্বর্ণারা ওকে ঘিরেছে সুরের সীমারেখায়
ও এক মেয়ে
আমায় ঘিরেছে, গরবিনী তাই হাসি ছড়ায়।
রৌদ্রতাপ
টিলায় চূড়ায় ঘোটানায় দোলে : সুকের আলা।
হৃদয় তার
আমার মর্ম কপোলের তলে জ্বলে উজালা।

বেয়ে চলে
দিশারী আগুন ঐ পাহাড়ের ক্রমগুলে,
নিশ্চলা
ধৃতির সাধনা ; দীর্ঘশ্বাস কুণ্ডলে।
থরোথরো
চিকন পাতার দীর্ঘ আতি, পাপ্‌ড়ি ঝরে,
তারাগুলি
লক্ষ তারার মঞ্জরীতখালে নীলাম্বরে ॥

● ● ● ●

সাহিত্য সংখ্যায়
সাহিত্য-সাহিত্যিক-পাঠক সম্পর্কে
মনের এক পৃষ্ঠা

সাহিত্য কর্মটিকে আমাদের দেশে খুব পবিত্র মনে করা হয়। সাহিত্যিকও যেন পুরোহিত বা আচার্য।

আমাদের দেশে একটা মেশিন চালু করার প্রথম দিন তার গায়ে গাঁদা ফুলের মালা ও সামনে তামার থালায় ফুলচন্দন দুর্বো ধান ইত্যাদি সাজিয়ে একটি আড়ম্বর করা হয়। আমরা কিছুই মনে করিনা।

ট্রামে দেখেছি ইয়োরোপীয় পোষাক পরা বাঙালী আট সাহেব লেজে চলেছেন, হঠাৎ কালিঘাট পুল এলেই মুখ কিরকম আড়ষ্ট হয়ে গিয়ে দুই হাত কপালে উঠে গেল। হাফ্ শার্ট পরা থাকলে চাপ্ মহলা ধরা তামার মাদুলির গোছাও বাইরে দেখা যায়। তিনি অফিস ফেরৎ হাত বিহেলে চৌরঙ্গী পুঁড়ায় নিবিষ্ট খানা খান হজম ওরাও। বাড়িতে সকাল সন্ধ্যা এদিকে হয়ত গীতা ও গায়ত্রী।

সভ্যব্রত বসু

জীবনের পোষাকি ও ব্যবহারিক দুটো দুই আলাদা দিক আমরা কেমন সহজে করে নিয়েছি। কেউ কিছু মনেও করি না, ধরিও না। কারণ সমাজে যা চলছে ও চলে আসছে তাই সত্য ও স্বাভাবিক, তা নিয়ে মনের প্রশ্নটাই অস্বাভাবিক।

সাহিত্যকে সামাজিক জীবনে একটা প্রয়োজন বলে মেনে নিলে অনেক গোল মিটে যায়। সাহিত্যের প্রয়োজনও সকলের নেই, যেমন বাজারের আরো অনেক জিনিষের। যে রোগী, ডাক্তার ও ওষুধের দরকার তারই। যে কাঁচা জীবনকে দু'হাত ভরে পেয়েছে সে সাহিত্যের মরা জগতে যেতে চাইবে কেন। হাসপাতাল খুব পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি হতে পারে কিন্তু সুস্থ স্বাস্থ্যবান মানুষের পক্ষে সে জায়গা সুখকর হবে না।

এ পর্যন্ত সাহিত্য বলতে যা আমরা পেয়েছি তা প্রায় সবই জীবনে যা না পেয়ে কেউ দেখেনি, বস্তু হিসেবে অস্তিত্বকে আড়াল করে তা কেউ মুখের সামনে তুলেও ধরে না। সাহিত্য এ পর্যন্ত বেশির ভাগই সমাজের বিরুদ্ধে সার্থ নিয়ে

উগ্র ও উষ্ণ প্রতিক্রিয়া। তাকে একধরণের ভীরুতা ও কাপুরুষতা বলা যায়। হয়ত 'আত্মরতি' কথাটাই ঠিক।

একটি একলা মানুষের জীবনও যদি তার যথাযথ ক্রম-পরিণতির সূত্র ধরে লক্ষ্য করা যায় তবে দেখা যাবে সাহিত্য যথানিয়মেই তার জীবনে প্রয়োজনের তালিকা থেকে একদিন বাতিল হয়ে গেল।

সাহিত্য ব্যক্তিজীবনের কিছুদূর পর্যন্ত হয়ত যষ্টি—তা হাঁটার না, হাঁটা শিখতে হয়তো খানিকটা সাহায্য করে।

০

আজ আমরা মুখে ঠিক স্বীকার না করলেও মনে মনে অনেকেই জানি যে অলৌকিক রূপকাহিনীর দিন শেষ হয়ে গেছে। জীবনে অনেক ঠকে ও ঠেকে জীবনকে চিনতে শিখে শৈশব ও কৈশোরের কাল আমরা পার হয়ে চলেছি। সাহিত্যের প্রতি স্বাভাবিক অনাকর্ষণ তাই সর্বত্র। সমাজে মেয়েদের যে দুর্দশা চিরকাল দেখে এসেছি, আজ আমাদের সাহিত্যিকরা সেই সুরে এসেছেন। এই দুর্বল অসহায়তার কথা তাঁরা সকলের চেয়ে বেশি জানেন, সেও তাঁদের আচরণে প্রকাশ। লেখকদের প্রতি যে রোমান্টিক এ্যাটিচুড্—মোহানুরাগ-প্রবণতা,—এই সেদিন পর্যন্ত, অর্থাৎ গতযুদ্ধের আগে পর্যন্তও সাধারণ মানুষের ছিল, তা আর নেই। কারণ জীবন মানুষকে চিন্তা করতে শিখিয়েছে,—এবং চিন্তা কল্পনার শত্রু: 'এ থিঙ্কার ইজ্ এ্যান্ এনিমি অব ফিকশান্'। জীবনের অভিজ্ঞতা মেকি ও আসলের বোধ মানুষের মনে এনে দেয়ই। অতি সরলও যেমন অচল মুদ্রা সম্পর্কে বাজারে হুঁশিয়ার, তেমনি সাহিত্য সম্পর্কে আজ সাধারণ পাঠকও।

০

সাহিত্যকে টিকে থাকতে হলে সেইজন্য আজ বিজ্ঞান-সম্মত, অর্থাৎ যথার্থভাবে জীবনসম্মত হতে হবে। নূতন যুগের এই মনোসত দাবী কিছুসংখ্যক শক্তিশালী নূতন সাহিত্যিকও যদি ধরতে না পারেন তবে দুঃখের কথা। জীবনের প্রকৃত চেহারা ও চরিত্র সাহিত্যে বিধৃত হওয়া চাই। জীবনে যেমন কোন মানুষ আর অপাংক্তেয় নয়, সাহিত্যেও তেমনি প্রতিটি মানুষ নিজেকে প্রতিফলিত দেখতে চাইছে।

সাহিত্যে এই সুদৃঢ় সর্বব্যাপী ভিত্তি নির্মাণের কাজ কোন দেশেই আজ চোখে পড়ছে না। হয়ত একটা তুমুল ভাঙচুরের দিন সত্যিই আসন্ন। এবং সেটি না হলে এই বৃহৎ ব্যাপক আয়োজনের দিকে মানুষের মনের সত্যকার আবেগ সৃষ্টি হতেও পারে না।

———

রবীন্দ্র উপন্যাসের নানা প্রসঙ্গ

ডাঃ রথীন্দ্রনাথ রায়

রবীন্দ্রনাথের ঔপন্যাসিক সত্তা সম্পর্কে সমালোচক মহলে বিতর্কের অবকাশ আছে। কারো কারো মতে রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্পলেখক হলেও উপন্যাসের ক্ষেত্রে তিনি সার্থক হতে পারেন নি। অনেকেই বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের উপন্যাস বিচার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের কথা বলেন যেন নিতান্তই পাদপূরণের উদ্দেশ্যে। কেউ কেউ আবার রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে কাব্যধর্মিতার আতিশয্য দেখতে পেয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বা শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের সঙ্গে রবীন্দ্র উপন্যাসের তেমন গূঢ় মিল খুঁজতে না পেরে আবার কেউ কেউ রবীন্দ্রনাথের ঔপন্যাসিক সত্তাকে নস্যাৎ করতে চান। রবীন্দ্রনাথের অন্য কোনো সৃষ্টিকে নিয়ে এমন বিরুদ্ধ আলোচনার উদ্ভব হয়নি। এর প্রধান কারণ সম্ভবত দুটি: বঙ্কিম-শরৎচন্দ্রের উপন্যাস-পাঠকের উপন্যাস সম্পর্কিত বিশিষ্ট সংস্কার; দ্বিতীয়তঃ উপন্যাস সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের অভিনব শিল্পাদর্শ ও নবীন প্রত্যয়।

কিশোর বয়সেই রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের প্রতি গভীর আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন। তাই তিনি অনেকবার বিষবৃক্ষের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রকৃত-পক্ষে সে যুগে বিষবৃক্ষই ছিল সামাজিক উপন্যাসের আদর্শ। 'চোখের বালি'তে কবি বিষবৃক্ষের সমস্যাকেই গ্রহণ করেছেন —অন্ততঃ বহিরঙ্গ বিচারে এই কথাই মনে হতে পারে। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে উপন্যাস রচনায় তিনি নূতন পদ্ধতির অনুসন্ধান করেছেন—যে পদ্ধতি ঘটনা-নির্ভর নয়। বঙ্কিম উপন্যাসের অনেকখানি প্লট-নির্ভর। তাই বঙ্কিমচন্দ্রকে প্লট রচনার জন্য যত্ন নিতে হয়েছে। পরিপাটি ও সুবিন্যস্ত প্লট ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে অগ্রসর হওয়া সম্ভব ছিল না। 'চোখের বালির' ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর ঔপন্যাসিক আদর্শের যে পরিচয় দিয়েছেন, তা প্রণিধানযোগ্য:

> আমরা একদা বঙ্গদর্শনে বিষবৃক্ষ উপন্যাসের রস-সম্ভোগ করিয়াছি। তখনকার দিনে সে রস ছিল নতুন। পরে সেই বঙ্গদর্শনকে নবপর্যায়ে টেনে আনা যেতে পারে কিন্তু সেই পালার পুনরাবৃত্তি হতে পারে না।—ঠিক করতে হল এবারকার গল্প বানাতে হবে এ-যুগের কারখানা-ঘরে। শয়তানের হাতে বিষবৃক্ষের চাষ তখনও হত এখনও হয়, তবে কিনা তার ক্ষেত্র আলাদা, অন্ততঃ গল্পের এলাকার মধ্যে। এখনকার ছবি খুব স্পষ্ট, সাজ সজ্জার অলংকারে তাকে আচ্ছন্ন করলে তাকে ঝাপসা করে দেওয়া হয়, তার আধুনিক স্বভাব হয় নষ্ট।

বিষবৃক্ষ যত খ্যাতনামা উপন্যাসই হোক না কেন, বঙ্কিমচন্দ্রের পদ্ধতি ও রবীন্দ্রনাথের পদ্ধতি যে এক নয়, এ কথা গোড়াতেই স্বীকার করা হয়েছে। কবি তাঁর নব যুগের বিষবৃক্ষকে তীক্ষ্ণ ও স্পষ্ট করতে চেয়েছেন—তাই সাজসজ্জার বাহুল্য দিয়ে তাকে আচ্ছন্ন করতে চান নি। এতো গেল বক্তব্যের কথা। কিন্তু বক্তব্য ছাড়া তাঁর অভিনব শিল্পপদ্ধতির কথাও বলেছেন:

> চোখের বালির গল্পকে ভিতর থেকে ধাক্কা দিয়ে দারুণ করে তুলেছে মায়ের ঈর্ষা। এই ঈর্ষা মহেন্দ্রের সেই রিপুকে কুৎসিত অবকাশ দিয়েছে যা সহজ অবস্থায় এমন করে দাঁত-নখ বের করত না। যেন পশুশালার

দরজা খুলে দেওয়া হল, বেরিয়ে পড়ল হিংস্র ঘটনাগুলো অসংবৃত হয়ে। সাহিত্যের নবপর্যায়ের পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনা পরম্পরার বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করে তাদের আঁতের কথা বের করে দেখানো। সেই পদ্ধতিই দেখা দিল চোখের বালিতে।

'চোখের বালিতে' বঙ্কিমচন্দ্রের পদাঙ্ক লক্ষণীয়, কিন্তু সে চিহ্ন তেমন স্পষ্ট নয় কারণ এখনকার পদ্ধতি স্বতন্ত্র। বিবরণের স্থান গ্রহণ করেছে বিশ্লেষণ। পরিণত বয়সে চোখের বালির দুর্বল পরিণতির কথা কবি স্বীকার করেছেন। কিন্তু শিল্প-পদ্ধতির অভিনবত্বকে অস্বীকার করা যায় না। মানুষের 'আঁতের কথা'কে তিনি তীক্ষ্ণ ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। কবির শেষ পর্যায়ের উপন্যাসগুলিতে বিবরণ নেইই, দু'একটি ধারালো মন্তব্যে বিবরণ অংশটিকে নির্মম সংক্ষিপ্ততার সীমাবদ্ধ করা হয়। মানুষের 'আঁতের কথা'ই সেখানে একমাত্র লক্ষ্য।

রবীন্দ্রনাথের চরিত্রচিন্তার বৈশিষ্ট্য তাঁর উপন্যাসের আর-একটি বিশিষ্ট কুললক্ষণ। বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত্রচিন্তার সঙ্গে এর মিল খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়, কারণ দু জনের পথই স্বতন্ত্র। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে অসাধারণ ও রোমাঞ্চকর ঘটনার অভাব নেই। পাঠকের গল্পপিপাসাকে তীব্রতর করার জন্য যে যে কৌশল অবলম্বন করা উচিত, বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে তা অনায়ত্ত ছিল না। তাই পিস্তল দিয়ে গুলি করা, আকস্মিক হত্যা-কাণ্ড, বিপদ সঙ্কুল পরিবেশে নদীতে ঝাঁপ দেওয়া প্রভৃতি অসাধারণ ঘটনা বঙ্কিম-উপন্যাসের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে পরিগণিত। তা ছাড়া অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃত উপকরণেরও সেখানে অভাব নেই। বিষবৃক্ষের মতো একখানি অসাধারণ সামাজিক উপন্যাসেরও সূত্রপাত ঘটেছে কুন্দনন্দিনীর স্বপ্ন-দর্শন প্রসঙ্গ থেকে। কিন্তু অসাধারণ ঘটনার পটভূমিকায় তাঁদের কার্যাবলী ও জীবনাচরণ রূপায়িত হলেও তাঁদের চিন্তা-চেতনায় ও মানসিকতায় সাধারণ মানুষের চেয়ে বড়ো নয়। আনন্দমঠের সন্ন্যাসী সম্প্রদায় বহু দুঃসাহসিক ও অসাধারণ কাজের স্রষ্টা, কিন্তু তারাও মনোজীবনের ঐশ্বর্যের দিক থেকে সাধারণ মানুষের ঊর্ধ্বে নয়।

এই খানেই বঙ্কিমের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি গুরুতর পার্থক্য আছে। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের ঘটনাপর্যায়ের মধ্যে বঙ্কিম-উপন্যাস সুলভ অসাধারণত্ব অনুপস্থিত। ঘুমিত ও সম্ভাবনাবাহী ঘটনার খোলো অসাধারণের রোমাঞ্চকর উপস্থিতি নেই। কিন্তু চরিত্রগুলি সাধারণ মনন-চিন্তনের অধিকারী নয়। শিক্ষা-দীক্ষা-রুচি-মনন সবদিক থেকেই তারা স্বতন্ত্র জগতের অধিবাসী। কিন্তু তার মানে নয় যে, রবীন্দ্রনাথ কোনো অ্যাভারেজ মানুষ আঁকেন নি। আশ্চর্য হতে হয় তখনই যখন দেখা যায় গোরার পাশে বিনয় আছে, শচীশের সঙ্গে আছে শ্রীবিলাস কিম্বা কুমুদিনীর পাশে মধুসূদন! উপন্যাসের কথারস রবীন্দ্রনাথের পরিণত শক্তিকে কোনোদিনই যেন দুর্বার আকর্ষণ টানে নি। রবীন্দ্রনাথকে প্রধানত চরিত্রই আকর্ষণ করেছে। চরিত্র বললেও হয়তো সবটা বলা হল না—ব্যক্তিত্ব বললে কথাটা আরো স্পষ্ট হয়। সেইটুকু প্রটকেই এখানে মেনে নেওয়া হয়েছে, যার পাকে পাকে চরিত্রগুলির ব্যক্তিত্ব রচিত হয়েছে।

রবীন্দ্রউপন্যাসের পটভূমি সম্পর্কে আর একটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। গল্পগুচ্ছের অধিকাংশেরই পটভূমি গ্রামীণ বাংলা। কিন্তু উপন্যাসগুলির পটভূমি প্রধানত নগর-জীবন। বাংলা উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম যথার্থ নাগরিক মনের অধিকারী। রবীন্দ্রনাথের নাগরিকতা ভারতচন্দ্র বা উনবিংশ শতাব্দীর নকশা রচয়িতাদের মতো বাহ্য-বিন্যাসেই নিঃশেষিত হয়নি। তাঁর নাগরিক মনন যেমন একদিকে সংহত স্বতন্ত্র সৌন্দর্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত, তেমনি নগর-জীবন ও তার বহির্ভূত গ্রামজীবনের কাঠামোর মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য ছিল,—সেখান থেকেও জীবন সঙ্কটের রূপ আবিষ্কৃত হয়েছে। চোখের বালি, গোরা, নৌকাডুবি প্রভৃতি উপন্যাসে কলকাতার শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মনোজ্ঞ ছবি আছে। হেমনলিনী

ও স্বচরিতার মধ্যে নূতন যুগের যে নায়িকার পরিচয় পাওয়া গেল, তা পরবর্তী উপন্যাসগুলির মধ্যে নানাবৈচিত্র্যে সম্পূর্ণ হয়ে উঠলো। মার্জিতরুচি ও সুবুদ্ধিবিলাসী চরিত্রগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাগরিকতার নূতন তাৎপর্য উদ্ঘাটিত হলো।

কিন্তু এই পটভূমিকা থেকে ক্ষয়িষ্ণু গ্রামীন জীবনের কাঠামো একেবারে বাদ পড়েছে এমন কথা বলা যায় না। গোরা, ঘরে-বাইরে ও যোগাযোগ উপন্যাস বিচার করলে দেখা যাবে যে পুরনো গ্রামীন জীবন ও কলোনীলালিত নাগরিক জীবনের মধ্যে যে ব্যবধান আছে, তা নায়ক-নায়িকার জীবনে অভিনব সঙ্কটের সৃষ্টি করেছে। যোগাযোগ উপন্যাসে কুমুদিনী ভেবেছে :

> এরই মধ্য থেকে কুমুদিনী এল কলকাতায়। এ যেন মস্ত একটা সমুদ্র কিন্তু কোথায় এক ফোঁটা পিপাসার জল? দেশে আকাশের বাতাসেরও একটা চেনা চেহারা ছিল··· কলকাতার এই সব অপরিচিত বাড়ির ছাদে দেয়ালে কঠিন আনম্র রেখার আঘাতে নানাখানা হয়ে সেই চিরদিনের আকাশ আলো তাকে বেগানা লোকের মতো কড়া চোখে দেখে। এখানকার দেবতাও তাকে একঘরে করেছে।

কুমুদিনীর ব্যক্তিগত সঙ্কটের দিক থেকে এই প্রসঙ্গ কম মূল্যবান নয়। কিন্তু সমগ্রভাবেও উপন্যাসটির মধ্যে একটি বৃহত্তর ভাবসঙ্কট আছে : জমিদারশাসিত ক্ষয়িষ্ণু গ্রামীন চেতনার সঙ্গে কলকাতা শহরের হঠাৎ-গজিয়ে-ওঠা বণিক বৃত্তির দ্বন্দ্ব। নাগরিক চেতনা ও গ্রামীন চেতনার দ্বন্দ্বকে কবি তাঁর প্রাগ্রসরা চরিত্রের মানদণ্ড হিসেবেই ব্যবহার করেছেন।

শরৎচন্দ্র একাধিক স্থানে চোখের বালির ঋণের কথা স্বীকার করেছেন। এমন কি শরৎচন্দ্রের অনেকগুলি নায়িকাই যে বিনোদিনীর ছায়ায় রচিত হয়েছে, একথা অস্বীকার করা যায়না। তবু এ কথা নিঃসংশয়েই বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথের মূল বক্তব্য শরৎচন্দ্রের পক্ষে অনায়ত্ত ছিল। প্রেম দরদ ও সহানুভূতিকে শরৎসাহিত্যের মূলমন্ত্র হিসেবে নির্দেশ করা হয়, তা-ই হয়েছে এখানে প্রধান বাধা। নিষিদ্ধ প্রেমের ছবি আঁকতে গিয়েও তিনি সহানুভূতিকেই একমাত্র পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বিনোদিনীর ব্যক্তিত্বকেই ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। নরনারীর সম্পর্ক চিত্রণেও শরৎচন্দ্র ব্যক্তিত্বের সংঘাতকে তুলে ধরেন নি। শরৎচন্দ্রের রচনারীতির মধ্যে এমন এক সহজ সাবলীল ভাব আছে, এমন একটি স্নিগ্ধ সৌকুমার্য আছে, যা সাধারণপাঠকের মনোহরণ করেছে। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস (বিশেষত শেষ দিকে) বাংলা দেশের সাধারণ পাঠক চিত্তকে স্পর্শ করতে পারেনি। সাধারণ পাঠকের গল্পলোলুপতার খোরাক জোটাননি রবীন্দ্রনাথ।

আসল কথা, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলির গল্প বলার বাহন নয়, তাঁর মননশীলতার বাহন। তাই বিশুদ্ধ গল্প রসিকেরা তাঁর উপন্যাসে পরিতৃপ্ত হবেন না। রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের বিশিষ্ট চিন্তাধারাগুলি উপন্যাসের আধারে আত্মপ্রকাশ করেছে। বাংলা সাহিত্যে তাই প্রথম বুদ্ধিধর্মী উপন্যাসের স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ। শরৎচন্দ্র মোটামুটি পুরাতনধারার মধ্যেই দৃষ্টি তাঁর নিবদ্ধ রেখেছেন, তাঁর বক্তব্যের মধ্যে এমন কোনো গভীর প্রত্যয় নেই, যা বঙ্কিমনির্দিষ্ট পথ অগ্রাহ্য করেছে। বিংশশতকের চতুর্থ দশকে শরৎচন্দ্রের প্রতিভায় যৌবন ক্লান্তির লক্ষণ পরিস্ফুট, তখনও রবীন্দ্রনাথের নূতন পরীক্ষা চলছে। যে কাল এখনো আসেনি তারও পাণ্ডুলিপি রচনা করেছেন।

অনুভূতি

নরেন্দ্র দেব

কত দেবতারে নিত্য পূজিয়া,
সত্যের সীমা পাইনি খুঁজিয়া ;
সহসা সেদিন আরাধ্য মোর
মূর্ত দেখেছি ভুবনে।
দেখেছি ধ্যানের বাঞ্ছিত ধন
রূপায়িত হ'ল জীবনে॥

দেখেছি একটি বুদ্বুদে যেন
বিকশিত সারা বিশ্ব।
তাইতো যাকিছু পূজার গর্ব
নিঃশেষে আজি নিঃস্ব॥

আত্ম-চেতনা হয়ত ফুটলো :
তিমিরান্ধতা তাই কি টুটলো ?
অবিশ্বাসের যুক্তিগুলোকে
প্রশ্রয় মিছে দেবনা।
তত্ত্ব বিচারে কুটিল তর্কে
আশ্রয় আর নেবনা॥

ফেলে যাওয়া ঘরে হয়ত' আবার
নব কলেবরে আসবো।
বিচিত্র এই জগতের রূপ
সবারেই ভালবাসবো।

বিপ্লবী বন্ধুর প্রতি

শ্রীসাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

জানি গো বন্ধু, জানি ভাল করে কোথায় মনের জ্বালা,
অমাবস্যার রাত্রি আঁধারে পূজার অর্ঘ ডালা
সাজাতে সাজাতে ঝড় এসে গেল, কে কোথায় গেল চলে
মেঘবিদীর্ণ বিদ্যুৎশিখা হঠাৎ উঠিল জ্বলে।
সে আলোকে শুধু দেখিতে পেলাম দুস্তর ব্যবধান
মনুষ্যত্ব পদাহত আর পৌরুষ হৃতমান।
যে দীপ শিখায় দেখিতাম পথ সে দীপ নির্বাপিত
সঙ্কট পথে সজাগ প্রহরী-আত্মনির্বাসিত।
হায়গো বন্ধু, মাতৃ পূজায় যদি ঘটে অপরাধ
সাধন মন্ত্রে অভিচারী এসে বাধায় বিসম্বাদ,
যদি লোভ তার কুৎসিত হয় অন্যায় ব্যবহারে
ক্ষমতার মোহ যদি অহরহ প্রমত্ত করে তারে,
স্বদেশ সেবার ভান করে যদি সেবা করে আপনার
অশুচি হইবে অঙ্গ তাহার, অশুদ্ধ উপচার।

দেশ জাতি আর ধর্মের নামে দোহাই দিব না ভাই
স্বখাদ সলিলে ডুবে মরি মোরা, অন্যের দোষ নাই।
কুটীল পথের বহু বিপত্তি, বাম দক্ষিণ মিছে
অলক্ষ্যে থাকি স্বার্থদানব কেবল টানিছে পিছে।

"মহান জাতির মহা ইতিহাস, আমরা তো উপাদান
মহামরণের উদাহরণের পুণ্য উপাখ্যান।
"যুগ হতে যুগে সেই মহিমার যারা ছিল অধিকারী
আজিকে স্বল্প জলের সফরী হবে ক্ষণ-সঞ্চারী ?

তর্কের ঝড়ে উড়াইয়া দিব বৃহৎ বনস্পতি
বাক্যের জালে রুধিয়া ফেলিব শুভকর্মের গতি ?
কারাশৃঙ্খল ভাঙ্গিনি আমরা শৃঙ্খল হারাইতে
বর্বরে সাজা দিইনি আমরা পাষণ্ডে কোল দিতে !
দেখেছিনু মোরা সোনার স্বপ্ন সোনার ফসলে ভরা
মোদের ভগিনী জননী তাইতো মৃত্যু-স্বয়ম্বরা।"

আজ মনে হয় এলাম কখন এ এক অন্তদেশে
চির পরিচিত স্বদেশী স্বজন বেড়ায় অন্য বেশে ;
অনেক কথার অর্থ বুঝি না, ব্যথা পাই মনে মনে
শুধাইলে তাই বলিনু তোমায় ক্ষমিও বন্ধুজনে।

ভিন্দুক

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

'লিখছেন নাকি দাদাই ? তাহলে যাই।'

ক্ষেত্রবাবু খোলা দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকে আমার টেবিলের দিকে একটু ঝুঁকি দিয়ে ছুপা পিছিয়ে গিয়ে বললেন 'লিখুন লিখুন।'

কিন্তু লেখা আজ আর সকালে হবেনা আমি বুঝতে পেরেছিলাম। রবিবারের সকালে অনেক আগন্তুক এসে খানিকক্ষণ ধরে গল্প করে গেলেন। আমিও না লেখার দিব্যি অজুহাত পেলাম। বাইরের কেউ এলে তাঁকে শুধু চা সিগারেট দিয়ে আপ্যায়ন করলেই আতিথেয়তা হয় না। তাঁর সঙ্গে খানিকটা 'কথা' বলা শিষ্টাচারের অপরিহার্য অঙ্গ। আমি লেখা ফেলে প্রত্যেকের কাছে সেই আচার নিষ্ঠার পরিচয় দিচ্ছিলাম। মাঝে মাঝে নিজের কাছ থেকে মানুষ পালিয়ে যেতে চায়। সদর দরজা দিয়ে পথ না পেলে খিড়কি দরজার আশ্রয় নেয়। খিড়কিপথই পলায়নের সর্বোত্তম পথ। কর্তব্যকে ফাঁকি দেওয়ার জন্যে এমন অসংখ্য পথ আমাদের মনের মধ্যে কাটা আছে। আমিও ভাবছিলাম আদর্শ লেখক হওয়া যখন এতই কঠিন সামর্থ্যের বাইরে তখন আদর্শ গৃহস্থ হওয়াই শ্রেয়ঃ। আলাপে ব্যবহারে আচারে আচরণে নিজের ছোট গণ্ডীটুকুর মধ্যে যদি সুজন সজ্জন বলে পরিচিত হওয়া যায় তাই বা কম কিসে। দেশ জোড়া খ্যাতির সম্ভাবনা যাদের নেই তাদের পাড়াজোড়া অখ্যাতির রটনা বন্ধ রাখতে পারলেই যথেষ্ট। তাই সেদিন বেলা আটটা থেকে একাগ্রচী

পর্যন্ত যিনিই আমার ঘরে আসছিলেন আমি তাঁকেই পাশের চেয়ারে বসতে দিয়ে তাঁর সঙ্গে সদালাপ শুরু করে দিচ্ছিলাম।

ক্ষেত্র দত্তও সেই মুক্ত আসনে বসে পড়ে বললেন 'আপনার অসুবিধে হবে না তো?'

'না না অসুবিধে কিসের! আপনি বসুন, নিশ্চিন্ত হয়ে বসুন।'

ক্ষেত্রবাবু বললেন, 'তাহলে আপনার গৃহলক্ষ্মীকে এক কাপ চায়ের কথা বলুন। আপনার বাড়ির চাটুকু বড় ভালো।'

আমি পরম আপ্যায়িত হলাম। আমি কি একটি গল্প লিখে এত সহজে মানুষকে খুশি করতে পারি! চেয়ারে বসেই অন্দরের দিকে তাকিয়ে হাঁক দিলাম 'ওহে দেড়কাপ চা করোতো।'

এই নিয়ে সকাল থেকে ষোল সতের কাপ হল। ভিতরের অপ্রসন্ন গুঞ্জন যাতে বাইরের ঘরে ভেসে না আসে আমি তাই গলা চড়িয়ে বললাম 'তারপর ক্ষেত্রবাবু খবর টবর কি বলুন! আছেন কেমন!'

ক্ষেত্রবাবু চেয়ারের ওপর তাঁর অপরিচ্ছন্ন পা দুটি তুলে বসে বললেন 'আর মশাই থাকব। আমরা কি মানুষ যে থাকব! কেউ কি আর আমাদের মানুষ বলে ভাবে!'

আমি চুপ করে রইলাম। এই অভিযোগ ক্ষেত্রবাবুর নতুন নয়। মানুষের কাছে মানুষের মত ব্যবহার পান না এ আক্ষেপ তাঁর কতদিনের। কিছু দিন আগে একটা হাই-স্কুলে কাজ করেছিলেন। হেডমাষ্টারের সঙ্গে ঝগড়াঝাটির ফলে সে কাজ যায়। তারপর ছিলেন কলেজ ষ্ট্রীটে একটি বইয়ের দোকানে সেলস্‌ম্যান। সেখানে ও প্রত্যাশার অনুরূপ বেতন কি মর্যাদা জোটেনি। তারপরে বুঝি কাজ করেছিলেন একটা প্রেসে। সেখানকার অনাচার ও সহ্য হয়নি। এখন আছেন বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীটে এক ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটরের অফিসে বুকিং ক্লার্কের সহকারী। সে অফিস ক্ষেত্রবাবুর যোগ্যক্ষেত্র হয়নি তা উনি নিজেই জানিয়েছেন। কথায় বার্তায় মনে হয় সেখানকার চাকরি আর চেয়ারটি ও ওঁর নড়ে উঠেছে।

অথচ ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চাশ পার হয়ে গেছে। বেশি বয়সে বিয়ে করেছেন বলে স্ত্রী এখনো তরুণী। ছেলে মেয়েরা শিশু। শুনেছি একটি শুধু কৈশোরে পা দিয়েছে। ক্ষেত্রবাবু বহির্বিশ্বের সমালোচনায় যত মুখর নিজের অন্তঃপুর সম্বন্ধে ঠিক সেই পরিমাণেই মৌন। তবু মাঝে মাঝে একেকদিন ঝাঁজ ফুটে বেরোয়। অন্তরের কথা অতর্কিতে বেরিয়ে আসে। মনে হয় গৃহেও খুব একটা শীতল ছায়ায় বাস করেন না ক্ষেত্রবাবু। তারুণ্যের তাপ অনেক সময়েই অসহ্য হয়ে ওঠে। তাই বেরিয়ে পড়েন। ছুটির দিন গুলি পাড়া-পড়শীদের বৈঠকখানায় কাটে।

আমি বললাম, 'যাকগে যেতে দিন।'

বুড়ী ঝি এক কাপ চা এনে ক্ষেত্রবাবুর সামনে রেখে গেল। কাপটি অক্ষত নয়। হাতলটি ভাঙা। আমি ধাতির করলে কী হবে। গৃহকর্ত্রী ক্ষেত্রবাবুর ওপর বিশেষ প্রসন্ন নন। ঝি অধিকতর অপ্রসন্ন। আমাকে প্রায়ই হিতোপদেশ দেয়, 'দাদাবাবু ওই লোকটিকে তুমি বড়ই আস্কারা দাও। যখন তখন এসে তোমার সময় নষ্ট করে। আর কেবল চা চা চা। আর চেহারার কী ছিরি। ঠিক একটা দাঁড়কাক।'

মহনার মার বয়স ষাট পেরিয়ে গেছে। কিন্তু কমবয়সী সুশ্রী চেহারার অতিথিদেরই সে বেশি পছন্দ করে।

ক্ষেত্রবাবু চায়ের কাপটির দিকে একবার তাকালেন। ঝি এর চা দেওয়ার ধরণটুকুও লক্ষ্য করলেন। তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'ওইতো মশাই আপনাদের এক বুলি। কেবল যেতে দিন যেতে দিন। যেন সকলেই এক সম্প্রতি হয়ে বসে আছেন। যেতে যেতে সবই যে যাচ্ছে।

(শেষাংশ ৬৯ পৃষ্ঠায়)

গিরিব্রজাঞ্চলে

সমর গুহ

• • • •

বাঁধান সোপান চত্বর। নৃপতি বিম্বিসার যখন রাজগুরু দর্শনে আসতেন, তাঁর রাজরথ তখন স্থাপন করা হতো এখানেই। এখান থেকে আমাত্য সহ তিনি পায়ে হেঁটে যেতেন বুদ্ধ-সন্দর্শনে। গৃধ্রকূটের কাছেই আছে আরেকটি চত্বরের ভগ্নাবশেষ। এখানে ছিল একটি বিশ্রামাগার। বিম্বিসার আমাত্যবর্গকে রেখে যেতেন এখানে। রাজবৈভব ও রাজ প্রভুত্ব-চিহ্ন বর্জন করে এখান থেকে তিনি একা যেতেন তথাগতের অনুশরণে হয়ে।

সেদিনের কথা ভাবতে ভাবতে উঠছি শিলাপথ বেয়ে। বেশি চড়াই নেই,—উঁচুও নয় খুব গৃধ্রকূটের পথ। চলতে চলতে বারবার মনে হচ্ছে, আর ভেবে বিস্মিত হয়ে যাচ্ছি—এই পথ দিয়েই একদিন বুদ্ধদেব যাতায়াত করতেন। কত পাথর কণায় এখনও বুঝি তাঁর পায়ের স্পর্শ অক্ষত, অনাহত হয়ে আছে। যদি কেউ দেখিয়ে দিত তেমনি একটি শিলা-রেণু যার গায়ে লেগে আছে তথাগতের পায়ের স্পর্শ! তীর্থজল ভেবে মাথায় করে নিয়ে যেতাম সেই শিলা-চূর্ণটুকু। কিন্তু সেই নিষ্কলুষ শিলারেণু আর পাওয়ার উপায় নেই। সেদিনের সেই পথের বুকে কংক্রিট ফেলে আধুনিক করে দেওয়া হয়েছে গৃধ্রকূটের রাস্তাটিকে।

ধীরে ধীরে গিয়ে উঠলাম গৃধ্রকূট শিখরে। পৌঁছতেই যেন কে এসে অতীতের আকাশ থেকে একটা দমকা হাওয়ার কোমল পর্শ দিয়ে গেল মনের আঙিনায়। এই সেই রাজগৃহের গৃধ্রকূট! ভারতের আধ্যাত্মিক সাধনার চিরন্তন ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় চিহ্ন। অনন্ত আলোর স্পর্শকামী মানব মনের এক শিলাময় তীর্থভূমি। নিরালা নৈসর্গিক পরিবেশে তেমনি অবিকৃত ভাবে স্থির হয়ে আছে গৃধ্রকূট। ইট পাথরের মন্দির ওঠে নি, মানব-গর্বের কাঞ্চন স্পর্শ পড়েনি। অশোক এসেছিলেন গৃধ্রকূট দর্শনে, তিনিও এই অকৃত্রিম শিলাতীর্থের গায়ে ইটের দাগ কেটে যান নি। প্রায় তেমনি আছে, যেমন ছিল আড়াই হাজার বছর আগে। শুধু একটি দুটি প্রাচীন বেদীর ভগ্নাবশেষ আছে। তার বেশি কিছু কাঞ্চন-গর্বের কলুষ-স্পর্শ লাগেনি গৃধ্রকূটে। শিলাময় গৃধ্রকূট আকাশের দিকে মুখ করে তেমনি নির্মুক্ত হয়ে রয়েছে যেমন ছিল তথাগতের সময়ে।

বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে গৃধ্রকূটের স্থান পরম ভাস্বর। বুদ্ধদেবের কাছে এই একান্ত নির্জন গিরিশিখরটি ছিল একান্ত প্রিয়। অনেক দিন, অনেকবার তিনি কাটিয়েছেন এই শিলাশ্রয়টিতে। বুদ্ধদেবের সঙ্গে ছিলেন তার প্রিয় শিষ্য আনন্দ এবং প্রধান শিষ্যদ্বয় সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ণ। এই গৃধ্রকূটের শিলাখণ্ডে উপবেশন করেই তিনি শুনিয়েছেন তাঁর অপৌরুষ বাণীর অশ্রুত সূত্র। আজো তা' অক্ষয় হয়ে আছে বৌদ্ধ শাস্ত্রে।

গৃধ্রকূটে বুদ্ধদেবের আকর্ষণ ছিল আরেক দিক দিয়ে। এই এই গৃধ্রকূট থেকে দক্ষিণ দিকে দৃষ্টিপাত করলে একটি গিরিবর্ত্মের মাঝ দিয়ে পঞ্চনা নদী পার হয়ে দূর আকাশে দেখা যায় একটি কালো শিলার-নিথর-তরঙ্গ-মালা। এই শিলা-তরঙ্গের মধ্যেই গৌতম আত্মস্থ হয়ে লাভ করেছিলেন অনন্ত আলোর অমৃত স্পর্শ। রাজকুমার গৌতম হয়েছিলেন তৃষ্ণা বিমুক্ত বুদ্ধ। গৃধ্রকূট থেকে দেখা যায় সেই গয়ার গিরিশ্রেণী। বুদ্ধদেব গৃধ্রকূট থেকে চেয়ে চেয়ে দেখতে ভাল বাসতেন গয়ার দূরবর্তী গিরিমালা।

একদিক দিয়ে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে গৃধ্রকূটের স্থান সর্বোত্তম। বুদ্ধের জীবন ইতিহাসে অনেক জায়গার উল্লেখ আছে,—যেখানে তিনি তপস্যা করেছেন, উপদেশ দিয়েছেন। বেণুবন, জেতবন, শ্রাবস্তী—কত স্থানের কথা জাতকের পাতায় গাথা রয়েছে। কিন্তু আজ অনেক অন্বেষণ করে সেই স্থানগুলিকে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে বটে কিন্তু এই জায়গাগুলিতে তথাগতের স্পর্শ-করা কোন একটি স্মারণিকও আজ অবশিষ্ট নেই। যে বিহার, স্তূপ, চৈত্য আজ খুঁজে পাওয়া গেছে তা' বুদ্ধদেবের পরবর্তী কালের রচনা। সেই

বোধিদ্রুমও নেই, তার হয়তো প্রশাখা আছে। গয়ার বুদ্ধ মন্দির তো হাজার বছর পরের তৈরী। সারনাথের বিহারও বুদ্ধদেবের অনেক পরবর্তী কালের। শ্রাবস্তীপুরে তো কিছুই অবশিষ্ট নেই। বুদ্ধের জন্মস্থান এবং কর্ম ও মৃত্যুস্থানে অশোক বা তার পরের যুগের কিছু কিছু স্মারণিক আজো আছে বটে কিন্তু বুদ্ধের সমসাময়িক এমন কোন তীর্থ-ভূমি নেই যা আছে গৃধ্রকূটে। বুদ্ধের চরণ-চিহ্নিত এই গৃধ্রকূট গিরিতীর্থ শুধু বুদ্ধ-ধর্মানুরাগীদের জন্য নয়,—সারা ভারতের সর্বপ্রাচীন ও পুণ্যময় তীর্থভূমি।

ধাপে ধাপে উঠছে উচ্চতম শিখরের দিকে, যে জ্যোতির বিন্দুটিতে ছিলেন তথাগত সেই দিকে। শিখরে পৌঁছবার আগেই ডানদিকে রয়েছে কয়েকটি গুহা। গুহা মানে বড় বড় পাথর খণ্ডে আবদ্ধ প্রাকৃতিক শিলাশ্রয়। এই গুহা কয়টিতে থাকতেন বুদ্ধশিষ্য সারিপুত্র, মৌদ্গল্যায়ন ও আনন্দ। আরও উপরে উঠলে দেখা যাবে একটু শিলাসমতল। এখানে বসে তথাগত ধর্মশরণার্থীদের উপদেশ দিতেন, সত্যধর্মের আলোচনা করতেন। বুদ্ধদেব যেদিনে এখানে উপবেশন করতেন, তখন কোন বাঁধান স্তূপ ছিল না। পরবর্তী কালে হয়তো অজাতশত্রু বা অশোক এখানে একটি বেদী বাঁধিয়ে দিয়েছিলেন। তার সুস্পষ্ট ভগ্নাবশেষ এখনো পড়ে আছে এই শিলাভূমিতে।

এই শিলা-অঙ্গন ছেড়ে আরও উঁচুতে রয়েছে একটি ছোট গিরিগুহা। গৃধ্রকূট শিখরের সর্বোচ্চে অবস্থিত এই গিরি-গুহাটি। এই গুহাটিই ছিল অমিতাভের শিলাশ্রম। কালের তরঙ্গাঘাতে স্থানে স্থানে এটি এখন জীর্ণ ও ভগ্ন। কিন্তু কী অপূর্ব মহিমায় আজো যেন তেমনি পুণ্যময় প্রকাশে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রকৃতির বুকে এই শিলা-সুন্দর গুহাটি,—চোখ বুজলে মনে হবে আজও যেন ওই শিলাশ্রয়ে পদ্মাসনে বসে আছেন তপোস্নিগ্ধ করুণাময় মহাপ্রাণ তথাগত!

যাত্রারা এসে দাঁড়ালেন বুদ্ধগুহার কাছে। কারো মুখে কথা নেই। কোন্ অজানা ইঙ্গিতে যেন সবাই মৌন। যেন কালের তরঙ্গ গুটিয়ে গুটিয়ে সরে যাচ্ছে পিছন দিকে। আর ফুটে উঠছে অগণিত অপরিচিত অগণিত মানুষের মুখ। কত দেশ দেশান্তর থেকে তীর্থকামীরা এসেছে এখানে। নিখিল ভুবনের দিক-দিগন্তর থেকে ধর্মশরণে 'অনন্ত-শরণা' হয়ে এসেছে কত দুঃখ-জর্জর নরনারী। এসেছিল তারা তৃষ্ণামুক্তির তপস্যায়,—তথাগতের করুণা স্পর্শের কামনায়। সেই কবে পোণে দু' হাজার বছর আগে,—সেদিনও এসেছিল কোন্ দূর দেশের এক পরিব্রাজক। কত মরু প্রান্তর পার হয়ে, কত তুষার মণ্ডিত গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে, দিনের পর দিন মাসের পর মাস অন্তহীন আশায় পথ বেয়ে বেয়ে এসেছিলেন বুদ্ধ-শরণে এক চীনা পরিব্রাজক। হুএন চাং। দু' চোখের জলে সেদিন ভাসিয়ে দিয়েছিলেন বুদ্ধগুহার পাদপীঠ। কী তাঁর কান্না। আর্ত বেদনায় তাঁর বুকের আবেগ যেন গলে গলে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছিল এক অপূর্ব আক্ষেপে। কেন তাঁর জন্ম হল না হাজার বছর আগে, কেন তিনি শুনতে পেলেন না তথাগতের অমৃতবাণী, কেন তিনি দু'চোখ ভরে দেখতে পেলেন না দিব্য-জ্যোতি অমিতাভকে। ভক্তের এই প্রেমাশ্রু,—মানব মনের কী অসীম গহনে এর উৎস! এমনি যুগে যুগে তথাগতের শরণে কত অশ্রুজল ঝরে পড়েছে এই গৃধ্রকূটের শিলাতীর্থে। বুঝি ওই অশ্রুজলের কণাগুলি বিন্দু বিন্দু মুক্তা হয়ে আজও ওই শিলা-খণ্ডগুলির অন্তর তলে স্নিগ্ধ বিভায় উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

কী বিস্ময়-প্রাণ এই মহামানব! ইতিহাসের সেই আদিযুগে শান্তি মৈত্রী ও সাম্যের কী দুর্জয় বিপ্লবের বাণী বহন করে এনেছিলেন তিনি। আর্য সভ্যতার আচার-ধর্ম, সংস্কারের বন্ধন তাঁর পথ রোধ করতে পারেনি। বর্ণ ধর্মকে তিনি স্বীকার করেন নি, তাঁর কাছে সব মানুষই সমান। পুরোহিতবাদকে তিনি গ্রাহ্য করেননি, বলেছেন—নিজের মুক্তি নিজেকেই সাধনা

করে অর্জন করতে হবে—অন্যের দানে, অন্যের তপস্যায় মুক্তি আসে না। যাগযজ্ঞ তাঁর মনকে স্পর্শ করে নি,—তিনি বলেছেন মুক্তির পথ হলো তৃষ্ণার বিসর্জন,—আসক্তিহীন মনের গহনেই দেখা দেয় অনাগতের অনুভূতি,—পরমানন্দের স্পর্শ।

ভক্তেরা তাঁকে সম্বোধন করেছে ভগবান তথাগত বলে। কিন্তু তিনি ভগবানের কথা একবারও বলেননি। মৌন তিনি ভগবান সম্বন্ধে। ভগবান নেই একথা বলেননি, আছে ভগবান এমন কথাও বলেননি। তিনি ভগবান সম্বন্ধে নিরুক্ত। যা বলেছেন তার অর্থ হলো:—অনির্বচনীয়কে কি নাম দিয়ে, বর্ণনা দিয়ে রূপের বন্ধনে বাঁধা যায়! অনির্বচনীয়ের পরিচয় শুধু পরম অনুভূতিতে।

বুদ্ধদেব তাই নীতি-ধর্মের কথা বলেছেন, তৃষ্ণামুক্তির কথা বলেছেন, যোগ-ক্ষেমের আলোচনা করেছেন, আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন, নির্বাণের ইঙ্গিত দিয়েছেন, কখনো ভগবানের কথা বলেননি। তিনি পথের সন্ধান দিয়েছেন, ডাক দিয়েছেন পথ-চলার—যাত্রাশেষের উপলব্ধিটুকু ছেড়ে দিয়েছেন পথিকের অনুভূতির কাছে। চলো! চলাই তোমায় নিয়ে যাবে চির অচলায়তনের দিব্য অঙ্গনে। এই বুদ্ধের কথা। তিনি পথ দেখিয়ে দিয়েছেন, পাথেয় সংগ্রহ করে দিয়েছেন—অন্তিমেরও ইঙ্গিত দিয়েছেন, কিন্তু যাত্রাশেষের পরিচয় দেন নি।

এই পরিচয় নিয়েই তো মারামারি! এক ভাষার কথা অন্য ভাষীরা বোঝে না, তবু বলে আমার ভাষাই সত্য। একবারও মনে হয় না—অন্তিমের স্বরূপকে যে কোন বর্ণের বন্ধনেই বাঁধা যায় না। বুদ্ধদেব কোন অক্ষম বর্ণের গাঁথুনি দিয়ে অব্যয়কে ব্যক্ত করতে চাননি।

বুদ্ধ-গুহার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছি, সেই কোন্ যুগে এমন মহাবিপ্লবীর আবির্ভাব হয়েছিল মানব সভ্যতায়। যেই যুগে তিনি বিলিয়েছিলেন শান্তি, মৈত্রী, ও মানব প্রেমের কী অপূর্ব বাণী। রাজকুমার হয়েও রাজতৃষ্ণাকে কী তুচ্ছ ভাবেই না বিসর্জন দিয়েছিলেন তিনি। প্রব্রজ্যা হয়েছিল তাঁর জীবন যাত্রা। মানব ইতিহাসের কোন কালে কোন মহাপুরুষের ডাকে এত রাজপুরুষ, রাজমহিষী, রাজকুমার, রাজকন্যা রাজ-ঐশ্বর্য ছেড়ে ভিক্ষুর জীবন গ্রহণ করেনি'—যেমন করেছিল বুদ্ধের ডাকে। কত মহারাজা, কত রাজমাতা, কত রাজতনয়, কত রাজকন্যা তথাগতের মহাপ্রেমের আমন্ত্রণে রাজ্য সাম্রাজ্যের প্রমত্ততা বর্জন করে, রূপ ও কাঞ্চনের তৃষ্ণা ত্যাগ করে দীন জীর্ণ চীবরাশ্রয়ী ভিক্ষাব্রতের জীবনে দীক্ষা নিয়েছিলেন মানব মনে এমন প্রচণ্ড বিপ্লবের ইতিহাস আর কোন কালেও ঘটেনি। ঊর্ধ্বগর্বে আকাশচুম্বী রাজপ্রাসাদগুলি আত্মনিবেদনের এক বিস্ময়কর আবেগে নিজেদের চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়ে রেণু রেণু হয়ে মিলিয়ে গিয়েছিল পথের ধূলায়।

মানব সভ্যতার ইতিহাসে বুদ্ধদেবের কাহিনী শুধু পরম বিস্ময়ে অবিস্মরণীয় নয়,—এই অবদানের গহনতাও অপরিমেয়। এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা, পূর্ব ইয়োরোপে—খৃষ্ট জন্মের অনেক আগে পৌঁচেছিল অমিতাভের অমিত তরঙ্গ। করুণাময় যীশু অনেক দিন পূর্বাঞ্চল পরিভ্রমণে এসেছিলেন এবং ভারতে এসে তিনি শান্তি ও মৈত্রীর দীক্ষা লাভ করেছিলেন—এমন কথাও অনেকে ব্যক্ত করেছেন। যীশুর বাণী যে বুদ্ধেরই বাণী,—শুধু ভাষা আর অভিব্যক্তি ছাড়া অন্তরের তরঙ্গে আর কোন ব্যবধানই নেই। এশিয়ার জীবন ও বাণী বুদ্ধময়। ইসলামে বুদ্ধের সাম্য, মৈত্রী ও সংঘশক্তির প্রেরণা সুস্পষ্ট।

অনেকে দুঃখ করে বলেন বুদ্ধের দেশ ভারতবর্ষই আজ বুদ্ধকে বিসর্জন দিয়েছে। তাদের আক্ষেপ ভারতবর্ষ বুদ্ধকে অবতারের আসন দিয়েছে, কিন্তু বর্জন করেছে বৌদ্ধ ধর্মকে। যারা শুধু নামের আয়নায় প্রাণের প্রতিফলন দেখে থাকেন, তারা এমনি ভুল করবেনই। ধর্মে নামের তকমা নেই, কিন্তু নামহীন হয়েই তথাগতের ভাবধারা ভারতের সমস্ত আত্মিক অনুভূতিতে সর্বময় অন্তঃশীলার মত পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। সম্প্রদায়ের নামে নেই বটে, কিন্তু বুদ্ধকে, তাঁর অমৃত বাণীকে অস্বীকার করে বুদ্ধোত্তর ভারতবর্ষকে স্বীকার করা সম্ভব নয়।

(ক্রমশঃ)

স্মরণে

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

একটি ফুলের মতো সুরভিত তোমার স্মরণ!
তুমি ছিলে ফাল্গুনের মন
খুশী দিয়ে ভরা।
আমি তার স্মৃতির পসরা
বহুদূর বয়ে আজ ভাবি,
দিয়েছিলে কবে যেন হৃদয়ের চাবী,
সে হৃদয় লুটেছি দুহাতে।
আজও ঘুম ভেঙে গেলে কোনো মধ্যরাতে
নিশ্বাসে তোমার গন্ধ পাই।
সব ব্যর্থতাই
ভরে যায় পূর্ণতার স্বাদে।
তোমাকে হারিয়ে তবে কেন মন কাঁদে,
কেন তবে এতো কথা বোনা?
তুমি ত হৃদয় ভরে আকাশ—আকাশময় সোনা।

রবীন্দ্রনাথের
বঙ্কিম-সমালোচনা

ডাঃ হরপ্রসাদ মিত্র

. . . . . .

বঙ্কিম-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতায় বলা হয়েছিল 'যাত্রীর মশাল চাই রাত্রির তিমির হানিবারে'। সে তাঁর পরিণত বয়সের কথা। তার অনেক আগে 'আধুনিক সাহিত্য' বইখানিতে তাঁর প্রসিদ্ধ 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধটি ছাপা হয়েছে। 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধটি ছাড়া 'কৃষ্ণচরিত্র' নামে আরও একটি প্রবন্ধ তাতে সংকলিত হয়েছে; তাতেও বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাগত নেতৃত্বের কথা আছে। উনিশ শতকের শেষার্ধের প্রথম দিকেই বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের যখন প্রথম আবির্ভাব ঘটে, তখন তাঁর সম্বন্ধে দেশের পাঠক-সম্প্রদায়ের আগ্রহ মোটেই উৎসাহজনক ছিল না। নানা বিরোধিতার মধ্য দিয়ে নিজের পথ তৈরী করে বঙ্কিমচন্দ্রকে এগিয়ে যেতে হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধের সূচনাতেই সেই বিশেষ সময়ের স্মরণ করেছেন। সেই সন্ধিকালে একদল লেখক তাঁর সম্বন্ধে বিস্তর বিরোধ পোষণ করতেন, আর সংকীর্ণ অন্য এক লেখকগোষ্ঠী তাঁর রচনারীতির অনুকরণের চেষ্টা করতেন। অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যে সে সময়ে প্রাচীন সংস্কার ও নূতন ভাবাদর্শের এক সংঘর্ষ উপস্থিত হয়েছিল। বঙ্কিম-সাহিত্য একদিকে যেমন সেই সংঘর্ষের অভিব্যক্তি, অন্যদিকে আবার নতুন পথ সন্ধান এবং পথ আবিষ্কারের বহুমুখী প্রয়াসও বটে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, বঙ্কিমের সঙ্গে তাঁদের যখন প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে, সে-সময়ে "সাহিত্য প্রকৃতি সম্বন্ধে কোনরূপ পূর্ব সংস্কার" তাঁদের মনে বদ্ধমূল হয়ে যায়নি এবং সেই নতুন কালের নতুন ভাবপ্রবাহ তাঁদের কাছে ছিল এক অপরিচিত অনভ্যস্ত ব্যাপার। এই কথাটি প্রকাশ করতে গিয়ে সমুচিত আবেগের সঙ্গেই তিনি জানিয়েছিলেন—'তখন বঙ্গসাহিত্যেরও যেমন প্রাতঃসন্ধ্যা উপস্থিত আমাদেরও সেইরূপ বয়ঃসন্ধিকাল। বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যে প্রভাতের সূর্যোদয় বিকাশ করিলেন, আমাদের হৃৎপদ্ম সেই প্রথম উদ্ঘাটিত হইল।"

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা সেকালের বাংলাসাহিত্যের আসরে অভূতপূর্ব বিচিত্রতা ঘটিয়েছিল। আমাদের তখনকার সাহিত্য লোকের সেই ভাবৈশ্বর্যের এবং রীতিগত সমারোহের কথাসূত্রে তিনি আষাঢ়ের প্রথম বর্ষা সমাগমের তুলনা দিয়েছিলেন। সেই ঘটনাকে 'নবসমাগমের মহোৎসব' বলা হয়েছিল। পরিণত বয়সে জীবনের সেই অতিক্রান্ত অধ্যায়ের কথা ভাবতে বসে স্বভাবতঃই কবির মনে বেদনা দেখা দিয়েছিল। পরিতাপের সঙ্গে তিনি বলেছিলেন, "সেদিন হৃদয়ে যে অপরিমেয় আশার সঞ্চার হইয়াছিল তাহা ফল লাভ করিতে পারি নাই। সে জীবনের বেগ আর নাই।" কিন্তু পর মুহূর্তেই নৈরাশ্য বর্জন করে তিনি পুনরায় বলেছিলেন—"কিন্তু এই নৈরাশ্য অনেকটা অমূলক। প্রথম সমাগমের প্রবল উচ্ছ্বাস কখনও স্থায়ী হইতে পারে না। সেই নব আনন্দ নবীন আশার স্মৃতির সহিত বর্তমানের তুলনা করাই অন্যায়। বিবাহের প্রথম দিনে যে রাগিণীতে বাঁশী বাজে সে রাগিণী চিরদিনের নয়।" এই কথার পরে তিনি আমাদের ইতিহাস-সচেতনতার দায়িত্ব সম্বন্ধে বড় তুলেছিলেন। বর্তমান তো অতীতেরই সম্প্রসারণ। যে জাতি অতীত সম্বন্ধে সমুচিত শ্রদ্ধাশীল নয়, সে জাতির পক্ষে ভবিষ্যতে পূর্ণ অধিকার লাভ করা কখনই সম্ভব নয়।

তিনি রামমোহনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন এবং তাঁকে "আমাদের বর্তমান বঙ্গদেশের নির্মাণকর্তা" বলে উল্লেখ করেন। রাজনীতি, বিদ্যাশিক্ষা, সমাজ, ভাষা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই আধুনিক বাংলার গোড়া পত্তন করে গেছেন রামমোহন। দেশের প্রাচীন শাস্ত্র অনুশীলনের দিকে উৎসাহ জাগিয়ে গেছেন তিনিই। সাধারণের অনধিগম্য বেদ-পুরাণতন্ত্রের সার উদ্ধার করে, সেই রামমোহনই আমাদের যথার্থ প্রগতির পথ প্রশস্ত করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের কথায়—"রামমোহন বঙ্গসাহিত্যকে গ্রানিট-স্তরের উপর স্থাপন করিয়া নিমজ্জনদশা হইতে উদ্ধৃত করিয়া তুলিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাহারই উপর প্রতিভার প্রবাহ ঢালিয়া স্তরবদ্ধ পলিমৃত্তিকা ক্ষেপণ করিয়া গিয়াছেন। আজ বাংলাভাষা কেবল দৃঢ় বাসযোগ্য নহে, উর্বরা শস্যশ্যামলা হইয়া উঠিয়াছে। বাসভূমি যথার্থ মাতৃভূমি হইয়াছে। এখন আমাদের মনের খাদ্য প্রায় ঘরের দ্বারেই ফলিয়া উঠিতেছে।"

বঙ্কিমচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথ সে কালের "শিক্ষিতশ্রেষ্ঠ" এবং "কর্মযোগী" বলে অভিহিত করেছেন। বঙ্কিম যে নিজের শিক্ষিতবর্গ বঙ্গভাষার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করেন নি, সে-কথা উল্লেখ করে বঙ্কিমের সাহিত্য সম্পর্কিত গুরুদায়িত্বভারের বিশ্লেষণ করেছেন তিনি। সেকালে বাংলাভাষা যে-অবস্থায় শিক্ষিত মানুষের সর্বপ্রকার ভাব প্রকাশের সম্ভবনা ছিল না। দ্বিতীয়তঃ এই ব্যাপক অবহেলার ফলে বাংলা-সাহিত্যের সাহিত্যিক ক্ষেত্রে তখন কোনো উচ্চ আদর্শও ছিল না। সেই দুরবস্থাতেই বঙ্কিমের মহত্ত্ব সংশয়াতীত স্বাক্ষর রেখে গেছে। নিজের মনের উন্নত আদর্শ সর্বদা সামনে রেখে, সুলভ খ্যাতিলাভের প্রলোভন সংবরণ করে, "অশ্রান্ত যত্নে অপ্রতিহত উদ্যমে দুর্গম পরিপূর্ণতার পথে" বঙ্কিম নিজের সাধনা পথে এগিয়ে নিয়েছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ববর্তী এবং তাঁর পরবর্তী বাংলাসাহিত্যের ব্যবধান সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ আর একটি অবিস্মরণীয় উপমা ব্যবহার করে লিখেছিলেন 'বঙ্গদর্শনের পূর্ববর্তী এবং তাহার পরবর্তী বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে যে উচ্চনীচতা তাহা অপরিমিত। দার্জিলিং হইতে যাঁহারা কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখরমালা দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন সেই অভ্রভেদী শৈলসম্রাটের উন্নতশিরশ্চি-সমুজ্জ্বল সুবারকিরীট চতুর্দিকের নিম্নস্থ গিরি পারিষদবর্গের কত ঊর্ধ্বে সমুত্থিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্তী বঙ্গসাহিত্য সেইরূপ আকস্মিক অভ্যুন্নতি লাভ করিয়াছে; একবার সেইটি নিরীক্ষণ এবং পরিমাণ করিয়া দেখিলেই বঙ্কিমের প্রতিভার প্রভূত বল সহজে অনুমান করা যাইবে।'

রচনা এবং সমালোচনা,—সাহিত্যের এই দুই দিকের দায়িত্বই তিনি একা গ্রহণ করেছিলেন। বঙ্কিমের এই দায়িত্ব-স্বীকৃতির কথা মনে রেখে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে কর্মযোগী বলে গেছেন। আর তাঁর এই কর্মকে বলেছেন 'দুষ্কর ব্রতানুষ্ঠান' তাঁর সাহসিকতার প্রসঙ্গ তিনি নানা বাক্যে নানা বিশেষণে ব্যক্ত করে গেছেন। বঙ্কিমের এই দায়িত্বনিষ্ঠার কথাপ্রসঙ্গেই তিনি বলেছিলেন যে বঙ্কিম 'অম্লান মুখে বীরদর্পে' নিজের পথে এগিয়ে গিয়েছিলেন। রচনা এবং সমালোচনা, সাহিত্যের এই দুটি পৃথক দিকের কথাই সাহিত্যে 'কর্মযোগী' এবং 'ধ্যানযোগী' কথা দুটির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের ঐ রচনা আর একভাবে ব্যক্ত হয়েছিল। একদিকে লেখক-মনের আত্মমগ্নতা এবং বহিঃপ্রকাশ,—অন্যদিকে চিন্তার বিচিত্র ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যবহারিক প্রয়োজন-চেতনার সাগ্রহ স্বীকৃতি এবং তজ্জনিত সমালোচনা ও সংগঠন, এই দুই কর্মেই বঙ্কিমচন্দ্র নিজের প্রতিভার পরিচয় দিয়ে গেছেন। 'কৃষ্ণচরিত্রে' তৎকালীন পতিত হিন্দুসমাজ ও বিকৃত হিন্দুধর্মের যে সমালোচনা আছে, রবীন্দ্রনাথ সেদিকটিতেও তাঁর তর্জনী প্রসারিত করে গেছেন। সেই সূত্রেই বঙ্কিমকে তিনি বলেছিলেন 'তেজস্বী প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি।" তিনি—এও বলেছিলেন যে বঙ্কিমের বাণী কেবল স্তুতিবাদিনী ছিল না,

খড়্গধারিণীও ছিল। এবং কৃষ্ণচরিত্রের গবেষণায় বঙ্কিমকে,—রবীন্দ্রনাথের কথার দুই শত্রুর মাঝখান দিয়ে পথ কেটে চলতে হয়েছে,—তারা অবতার মানেন না তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দেবত্ব আরোপের বিরোধী ছিলেন,—আর, যাঁরা শাস্ত্রের এবং লোকাচারের প্রতিটি ব্যাপার অভ্রান্ত বলে মনে করেন বঙ্কিমের বিদ্রোহী বুদ্ধির তাঁরাও খুব যে তারিফ করে গেছেন তাও নয়। মহত্তম মানব-সত্তার আদর্শ অনুসারে দেবতার রূপায়ণ তাঁদের মনোমত হয় নি। এই সূত্রেই সাহিত্য ক্ষেত্রে 'কল্পনা' এবং 'কাল্পনিকতা', এই দুটি লক্ষণের প্রভেদের কথা রবীন্দ্রনাথ জানিয়ে গেছেন। বঙ্কিম কাল্পনিকতার সেবক ছিলেন না', তিনি যথার্থ কল্পনাশক্তিরই অধিকারী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের এই দুটি নির্দেশনা এখানে পর পর তাঁরই লেখা থেকে উদ্ধৃত হোলো। প্রথমে ধ্যানযোগী এবং কর্মযোগী সম্বন্ধে তাঁর কথা :

"সাহিত্যের মধ্যেও দুই শ্রেণীর যোগী দেখা যায়, ধ্যানযোগী এবং কর্মযোগী। ধ্যানযোগী একান্তমনে বিরলে ভাবের চর্চা করেন, তাঁহার রচনাগুলি সংসারী লোকের পক্ষে যেন উপরি-পাওনা যেন ঘরালাভের মতো।

কিন্তু বঙ্কিম সাহিত্যে কর্মযোগী ছিলেন। তাঁহার প্রতিভা আপনাতে আপনি স্থিরভাবে পর্যাপ্ত ছিল না। সাহিত্যের যেখানে যাহা-কিছু অভাব ছিল সর্বত্রই তিনি আপনার বিপুল বল এবং আনন্দ লইয়া ধাবমান হইতেন। কী কাব্য, কী বিজ্ঞান, কী ইতিহাস, কী ধর্মতত্ত্ব—যেখানে যখনই তাঁহাকে আবশ্যক হইত সেখানে তখনই তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া দেখা দিতেন। নবীন বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে সকল বিষয়েই আদর্শ স্থাপন করিয়া যাওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। বিপন্ন বঙ্গভাষা আর্তস্বরে যেখানেই তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছে সেখানেই তিনি প্রসন্ন চতুর্ভুজ মূর্তিতে দর্শন দিয়াছেন।"

দ্বিতীয়তঃ 'কল্পনা' এবং 'কাল্পনিকতা' সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য :

"কল্পনা এবং কাল্পনিকতা দুইয়ের মধ্যে একটা প্রভেদ আছে। যথার্থ কল্পনা, যুক্তি সংযম এবং সত্যের দ্বারা সুনির্দিষ্ট আকারবদ্ধ—কাল্পনিকতার মধ্যে সত্যের ভান আছে মাত্র কিন্তু তাহা অদ্ভুত আতিশয্যে অসংগতরূপে স্ফীতকায়। তাহার মধ্যে যেটুকু আলোকের লেশ আছে ধূমের অংশ তাহার শতগুণ। যাহাদের ক্ষমতা অল্প, তাহারা সাহিত্যে প্রায় এই প্রধূমিত কাল্পনিকতার আশ্রয় লইয়া থাকে—কারণ, ইহা দেখিতে প্রকাণ্ড কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত লঘু। এক শ্রেণীর পাঠকেরা এইরূপ ভূরিপরিমাণ কৃত্রিম কাল্পনিকতার নৈপুণ্যে মুগ্ধ এবং অভিভূত হইয়া পড়েন এবং দুর্ভাগ্যক্রমে বাংলায় সেই শ্রেণীর পাঠক বিরল নহে।

এইরূপ অপরিমিত অসংগত কল্পনার দেশে বঙ্কিমের ন্যায় আদর্শ আমাদের পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান। 'কৃষ্ণ-চরিত্রে' উদ্দাম ভাবের আবেগে তাঁহার কল্পনা কোথাও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া ছুটিয়া যায় নাই। প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সর্বত্রই তিনি পদে পদে আত্মসংবরণপূর্বক যুক্তির সুনির্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিয়া চলিয়াছেন। যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে তাঁহার প্রতিভা প্রকাশ পাইয়াছে, যাহা লিখেন নাই তাহাতেও তাঁহার অল্প ক্ষমতা প্রকাশ পায় নাই।"

বঙ্কিমের শাস্ত্রানুসন্ধান সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সেই লেখাটিতেই বলা হয়েছে যে, তিনি দেশানুরাগের সাহায্যে শাস্ত্রের অন্তরে প্রবেশ করেছিলেন এবং সত্যানুরাগের সাহায্যে শাস্ত্রের অমূলক অংশ পরিত্যাগ করেছিলেন। তাঁর প্রতিভার এই বিশেষ প্রকৃতিটিই ছিল আতিশয্য এবং অসংগতি থেকে সর্ব-প্রকারে আত্মরক্ষার সামর্থ্য। এই সংযমগুণের কথা প্রবন্ধটির শেষ দিকে বঙ্কিমের হাস্যরসটির কথা-প্রসঙ্গেই বিশেষভাবে বলা হয়েছিল। বাংলায় হাস্যরসকে তিনিই প্রথম সাহিত্যের উচ্চশ্রেণীতে উন্নীত করেন। 'নির্মল শুভ্র সংযত হাস্য বঙ্কিমই

সর্বপ্রথমে বঙ্গ সাহিত্যে আনয়ন করেন'—রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যটি আজ সকলেরই পরিচিত। ঈশ্বর গুপ্ত-দীনবন্ধুর আমলে এই রুচিরক্ষা করা যে সহজ কাজ ছিল না, রবীন্দ্রনাথ সেকথাও স্মরণ করে গেছেন। ইতিহাসের সেই বিশেষ পর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে তাঁর যে মন্তব্য স্মরণীয় সন্দেহ নেই। তাঁর কথায়—'বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে ঈশ্বর গুপ্ত যখন সাহিত্যগুরু ছিলেন বঙ্কিম তখন তাঁহার শিষ্যশ্রেণীর মধ্যে গণ্য ছিলেন। সে-সময়কার সাহিত্য অন্য যে-কোনো প্রকার শিক্ষা দিতে সমর্থ হউক ঠিক সুরুচি শিক্ষার উপযোগী ছিল না। সে-সময়কার অসংযত বাক্‌যুদ্ধ এবং আন্দোলনের মধ্যে দীক্ষিত ও বর্ধিত হইয়া ইতরতার প্রতি বিদ্বেষ, সুরুচির প্রতি শ্রদ্ধা এবং শ্লীলতা সম্বন্ধে অক্ষুণ্ণ বেদনাবোধ রক্ষা করা কী যে আশ্চর্য ব্যাপার তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন। দীনবন্ধুও বঙ্কিমের সমসাময়িক এবং তাঁহার বান্ধব ছিলেন কিন্তু তাঁহার লেখায় অন্ত ক্ষমতা প্রকাশ হইলেও তাহাতে বঙ্কিমের প্রতিভার এই ব্রাহ্মণোচিত শুচিতা দেখা যায় না। তাঁহার রচনা হইতে ঈশ্বর গুপ্তের সময়ের ছাপ কালক্রমে ধৌত হইতে পারে নাই।'

'আধুনিক সাহিত্যে' বঙ্কিম-সম্পর্কিত দ্বিতীয় প্রবন্ধের নাম 'কৃষ্ণচরিত্র'। এবং তৃতীয়টি 'রাজসিংহ'। কৃষ্ণচরিত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন যে 'বঙ্গসমাজের 'উল্টারথের দিনে' এই কৃষ্ণচরিত্র রচিত হয়। অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথের কথায়—সমাজ ও ধর্মের মূল জাতীয় প্রকৃতির এমন গভীরতম দেশে অনুপ্রবিষ্ট যে তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে গেলে নানা দিক হইতে নানা গুরুতর বাধা আসিয়া পড়ে এবং পুরাতন অমঙ্গলের স্থলে নূতন অমঙ্গল মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়।' এমন স্থলে শঙ্কিতচিত্তে পুনরায় নিশ্চেষ্টতার অবলম্বন করিতে প্রবৃত্তি হয় এবং সেই নিশ্চেষ্টতার পথে প্রত্যাবর্তন করিবার সময় কিঞ্চিত অতিরিক্ত স্পর্ধার সহিত আস্ফালন করাও অস্বাভাবিক নহে—বুক ফুলাইয়া সর্বসাধারণকে বলিতে ইচ্ছা করে ইহা আমাদের হার নহে, জিত।" এই অবস্থার কথা বলতে গিয়ে 'উল্টারথের দিন' প্রয়োগটি ঘটেছিল। কৃষ্ণচরিত্রের প্রথম অনুচ্ছেদেই তিনি লিখেছিলেন— 'প্রবল ইংরেজি শিক্ষা পাইয়া আমরা যখন রাজনীতির সমালোচনা আরম্ভ করিয়া দিলাম, সমাজনীতি এবং ধর্মনীতিও সেই নিষ্ঠুর পরীক্ষার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হয় নাই। তখন ছাত্রমাত্রেরই মনে আমাদের সমাজ ও ধর্ম সম্বন্ধে একটা অসন্তোষ ও সংশয়ের উদ্রেক হইয়াছিল।' রবীন্দ্রনাথ নিজে যেখানে রাষ্ট্রচিন্তার কথা জানিয়েছেন সেখানে সমাজ এবং ধর্মের কথা অবিচ্ছেদ্য ভাবে দেখা দিয়েছে। এই কৃষ্ণচরিত্র প্রবন্ধে তাঁর এই বিশেষ দৃষ্টির কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা চোখে পড়ে। সেকালের অবস্থা মনে রেখে এখানে তিনি বলেছেন —"রাজতন্ত্র সম্বন্ধে আমাদের নিজের কর্তব্য অতি যৎসামান্য; কারণ, রাজত্বের অধিকার আমাদের হস্তে কিছুই নাই। এইজন্য পোলিটিকাল সমালোচনা এখনো অত্যন্ত তীব্র ও প্রবলভাবে চলিতেছে, তৎসম্বন্ধে কোনোপ্রকার দ্বিধা অথবা বাধা অনুভব করিবার কোনো কারণ ঘটে নাই। কিন্তু সমাজ ধর্মসম্বন্ধীয় কর্তব্য আমাদের নিজের হাতে। অতএব ধর্ম ও সমাজনীতি সম্বন্ধে বিচারে যাহা স্থির হয় কাজে তাহার প্রয়োগ না হইলে সেজন্য আপনাকে ছাড়া আর কাহাকেও দোষী করা যায় না।" সমাজ এবং ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনায় সেকালে আমাদের বিশেষ আগ্রহের কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি লিখেছিলেন— "সমাজ ও ধর্মের মূল জাতীয় প্রকৃতির এমন গভীরতম দেশে অনুপ্রবিষ্ট যে তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে গেলে নানা দিক হইতে নানা গুরুতর বাধা আসিয়া পড়ে এবং পুরাতন অমঙ্গলের স্থলে নূতন অমঙ্গল মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়।' কাজে-কাজেই সেদিকে উদাসীন থাকা সম্ভব নয়। কোনো না কোনো কৈফিয়ৎ বা ব্যাখ্যার কথা মানুষকে ভাবতেই হয়। ঊনবিংশ শতকে ইউরোপীয় ভাবাদর্শের সম্মুখীন হয়ে আমাদের বাঙালী সমাজকে সমাজ এবং ধর্মের ভাঙনের কথা এই কারণেই

বারবার ভাবতে হয়েছিল। একবার সমালোচনার উদ্যোগ, পর মুহূর্তেই নিস্পৃহতায় প্রত্যাবর্তন,—এই ছিল তখনকার অবস্থা। বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র যে কেবল জনতার ঘরে ঘরে মিলিয়ে যাওয়া নয়, তাতে দৃঢ়তাই 'প্রতিভার কণ্ঠে' নতুন এক সুর যে বেজে উঠেছিল, তাঁর এই প্রবন্ধে বঙ্কিম সম্পর্কে সে-কথা সুস্পষ্টভাবে সূচিত। তিনি দিখে গেছেন যে কৃষ্ণচরিত্রের 'সর্বশাস্ত্রানুশাসনের সমর্থন নাই, সর্বসাধারণের প্রতি অনুশাসন আছে।' কৃষ্ণচরিত্রে বঙ্কিম 'স্বাধীন মনুষ্যবুদ্ধির জয়পতাকা' উড়িয়ে ছিলেন। এই দিকটার ওপর বিশেষ জোর দিয়ে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন—'আমাদের মতে কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থের নায়ক কৃষ্ণ নহেন, তাহার প্রধান অধিনায়ক স্বাধীন বুদ্ধি, সচেষ্ট চিত্তবৃত্তি। প্রথমত বঙ্কিম বুঝাইয়াছেন, জড়ভাবে শাস্ত্রের অথবা লোকাচারের অনুবর্তী হইয়া আমরা পূজা করিব না, সতর্কতার সহিত আমাদের মনের উচ্চতম আদর্শের অনুবর্তী হইয়া পূজা করিব। তাহার পরে দেখাইয়াছেন, যাহা শাস্ত্র তাহাই বিশ্বাস্য নহে, যাঁহা বিশ্বাস্য তাহা শাস্ত্র। এই মূল ভাবটিই কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থের ভিতরকার অধ্যাত্মশক্তি, ইহাই সমস্ত গ্রন্থটিকে মহিমান্বিত করিয়া রাখিয়াছে।" কৃষ্ণচরিত্রের যথার্থ ইতিহাস অনুসন্ধানের প্রথম প্রয়াস বঙ্কিমের লেখাতেই দেখা গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'কোন্‌টা ইতিহাস তাহা স্থির করিবার পূর্বে কোন্‌টা ইতিহাস নহে তাহা নির্ণয় করা বিপুল পরিশ্রমের ও বিচক্ষণতার কাজ। আমাদের বিবেচনায় বর্তমান গ্রন্থে বঙ্কিম সেই ভাঙিবার কাজ অনেকটা পরিমাণে শেষ করিয়াছেন —গড়িবার কাজে ভালো করিয়া হস্তক্ষেপ করিবার অবসর পান নাই।' রবীন্দ্রনাথের বঙ্কিম-পর্যালোচনা এইভাবে এগিয়েছিল।

প্রাচ্যের সংস্কৃতি দূত পার্ল বাক

সুশীল বিহারী ঘোষ

রাডিয়ার্ড কিপলিং-এর

> East is East and West is West
> The twain shall never meet

এই সুপরিচিত উক্তিকে ভুল ও ব্যর্থ প্রতিপন্ন করবার জন্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্যজগতে মাঝে মাঝে কিছু সাহিত্যসাধক আসেন যাঁদের কাছে ভাষা, দেশ, বর্ণ কোনো কিছুই অন্তরায় হয়ে ওঠে না। 'সাহিত্য' শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থ হলো সহিতত্ব বা মিলন। কেবল মানুষে মানুষে মিলনের ছবি আঁকা নয়, দেশে দেশে কালে কালে সেই মিলনের মহা-মন্ত্রটি খুঁজে বের করার সাধনার ফলই নানা সাহিত্যসৃষ্টি। আজ থেকে প্রায় দুই যুগ আগে পাশ্চাত্যের সাহিত্য-দরবারে চীনদেশের বাণী যিনি নিয়ে এলেন, চীনের সুখদুঃখের সাধারণ ঘরোয়া কথা যিনি অতি সহজভাবে আন্তরিকতার সঙ্গে শোনালেন তাঁর নাম পার্ল বাক।

জন্ম ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার পশ্চিম ভার্জিনিয়ায়। বাবা আর মা দুজনেই চীন দেশে খৃষ্টান মিশনারীর কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ছোট বেলায় পার্লসিডেন্সীইকার চীনদেশে এলেন এবং জীবনের প্রারম্ভিক দিনগুলি তখানেই কাটান। বাড়িতে যে বুড়ি ধাইমার কাছে তাঁর শোওয়া-বসা ছিল, সে ছিল চীনা। চীনদেশের কতো না রূপকথা আর

লোককথা সে যাইয়া শোনাতো। পনেরো বছর বয়সে শাংহাইয়ের এক বোর্ডিং স্কুলে পার্লকে ভর্তি করা হলো। সে সব পুরানো দিনগুলির প্রসঙ্গে শ্রীমতী বাক বলেছেন যে আমি তখন পুরোপুরি চীনে হয়ে উঠেছিলাম। চীন যে আমার মাতৃভূমি নয় এ কথা ঘুণাক্ষরেও মনে পড়তো না, ('মাই লেডারেন ওয়ার্ল্ড')। বছর দুই পরে উচ্চশিক্ষার জন্য আমেরিকায় এলেন। কলেজের পাঠ শেষ করে আবার চীনে ফিরে গেলেন, এবার উদ্দেশ্য সেবা আর শিক্ষকতা। নানকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী অধ্যাপনা করলেন কিছুদিন। ডাঃ জন লসিং বাক নামে এক 'এগ্রিকালচারাল মিশনারীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয় এবং ২টি মেয়ে হয়। তাদের মধ্যে একজনের জীবন অস্বাভাবিক। দেহবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মনের বিকাশ হলো না একটুও। পার্ল বাক তাঁর আত্ম-জীবনীমূলক বই 'The child who never grew'-তে এই ব্যক্তিগত বেদনার কাহিনী মর্মস্পর্শী ভাবে বর্ণনা করেছেন। এই মেয়ের কাছ থেকে শ্রীমতী বাক শুধু দুঃখই পান নি, শিক্ষাও পেয়েছেন। মেয়ে তাঁর মনে জাগিয়েছে অবহেলিত নরনারীর প্রতি আন্তরিক মমতা, যার বাস্তব প্রকাশ তাঁর সাহিত্যকৃতিতে। শ্রীমতী বাকের দ্বিতীয় বিবাহ ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত প্রকাশক জন ডে কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট রিচার্ড জে ওয়াল্শের সঙ্গে। শ্রীমতী বাকের (প্রথম স্বামীর পদবী তিনি এখনও ব্যবহার করেন) সংসার স্বামী, দুটি মেয়ে আর চারটি পালিত সন্তান নিয়ে পরিপূর্ণ।

পার্ল বাকের সাহিত্য জীবন আরম্ভ হয়েছে তাঁর কিশোর বয়সেই। আর সকলের মতো বিভিন্ন পত্রিকায় নানা লেখার মধ্য দিয়ে তিনি হাত পাকিয়েছিলেন। প্রথম বই 'ইস্ট উইণ্ড, ওয়েস্ট উইণ্ড' বাজারে বেরোতে সমালোচকদের দুএকটী প্রশংসা পেলেও পাঠকসমাজে এমন কিছু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে নি। ১৯৩১ সালে এলো 'গুড আর্থ', এক অনন্য সৃষ্টি। পুলিৎজার পুরস্কার দেওয়া হলো এই উপন্যাসটিকে। প্রথম সাফল্যের সাত বছরের মধ্যেই নোবেল পুরস্কার মিললো। 'গুড আর্থে' আধুনিক চীনের যে কথা পার্ল বাক শুরু করেছিলেন পরের দুটি বই 'সন্স' ও 'এ হাউস ডিভাইডেড' এর মধ্যে তা শেষ হলো। চীনা পটভূমিকায় অনেকগুলি বই পরে লিখলেন তিনি—'দি কাই ওয়াইফ,' 'হাউস অব আর্থ,' 'দি প্রাদার,' 'ড্রাগন সীড' ইত্যাদি। প্রবাসী আমেরিকান পরিবারের জীবন-গ্রাহী ছবি আঁকলেন 'দি এক্সাইল', যেটি নিজের মায়ের কাহিনী আর 'ফাইটিং এঞ্জেল,' এটিতে তাঁর বাবার ছবি। শ্রীমতী বাকের কলম আজও থামে নি। দেশবিদেশের ক্যানভাসে নিত্যনূতন ছবি আঁকেন, তাতে তাঁর ক্লান্তি নেই।

পার্ল বাককে যখন নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় তখন মার্কিন সাহিত্যে ঔপন্যাসিক হেমিংওয়ের ফ্রেডারিক, কবি রবার্ট ফ্রস্ট, স্ত্রী-ঔপন্যাসিক উইলা সিবার্ট ক্যাথার জনপ্রিয়তার উচ্চ-শিখরে সমাসীন। শ্রীমতী বাকের নাম অপরিচিত না হলেও সুপরিচিত ছিলনা সে সময়ে। সুতরাং এক অপরিচিত লেখককে নোবেল পুরস্কার দেওয়ায় মার্কিন সাহিত্য মহলে বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু তবুও কেউই পুরস্কার দানের যাথার্থ্য প্রশ্ন তোলেন নি। শ্রীমতী বাকের আন্তর্জাতিকতা, পশ্চিমের কাছে চীনকে নূতন ভাবে ব্যাখ্যা ও আন্তরিকতাপূর্ণ সাহিত্য রচনার জন্যে তাঁকে সম্মানিত করা হয়। চীনদেশ কিছুকাল আগে পর্যন্ত পাশ্চাত্যবাসীর কাছে চিররহস্যময় ছিল। সেখানকার লোকেরা অলস, আফিংখোর—তাদের রাস্তায় যাদুকরের ভেল্কিবাজি, আর নানা উজ্জ্বল রঙের চীনের ড্রাগন, মোটামুটি এই ছিল চীনসম্বন্ধে পশ্চিমের ধারণা। শ্রীমতী বাকের আগে কয়েকজন পর্যটক তাঁদের ভ্রমণ বৃত্তান্তের মাধ্যমে চীনকে পশ্চিমের কাছে এনে দিয়েছিলেন, কিন্তু পশ্চিমের সবচেয়ে বড়ো ভিত্তি যে আন্তরিকতা, তা তাঁদের ছিল না। পার্ল বাক দূর থেকে চীনকে দেখেন নি, বা দুদিনের জন্যে বেড়াতে এসেও চীন দেখে যান নি। চীনের হাজার রহস্যময়তার প্রতি নিছক কৌতূহলের দৃষ্টি নিয়েও তিনি দেখেন নি। শ্রীমতী

বাকের প্রথম জীবন, প্রায় চল্লিশ বছর, কেটেছে চীনদেশের নানা প্রদেশে, দেশবাসীর হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করেছেন। সহানুভূতি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে চীনদেশের বাণীর মর্মোদ্ঘাটন করেছেন অর্থাৎ এক কথায় চীনের সঙ্গে সত্যকার আত্মীয়তা অর্জন করেছেন। এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকে বহুদিন ধরে-মুদি-হয়ে-বসে থাকা চীনের আকিংনেশা ধীরে ধীরে ছুটতে আরম্ভ করল, বাইরের জগতের জীবনকলতান তার কানে ঢুকলো সেই আধোঘুম আধোজাগা চীনকে বেঁচে ওঠার বাণী, মাথা তুলে দাঁড়ানোর মন্ত্র অপরিসীম দরদ আর আন্তরিক সহানুভূতির সঙ্গে পার্ল বাক শোনালেন। পশ্চিমের সামনে যে চীনকে তিনি তুলে ধরলেন তাতে প্রাচীন চীনের নানা আজগুবি কাহিনী নেই, ড্রাগনের নিঃশ্বাস নেই। অন্যান্য দেশের মতোই চীনের সাধারণ মানুষ খায় দায়, ভালোবাসে, বিয়ে করে, ছেলেমেয়েদের মানুষ করার স্বপ্ন দেখে, কখনও বা ঈশ্বরের আশীর্বাদে অবস্থা ফেরে, আবার কখনও বা বিধাতার অভিশাপে বন্যায় আর দুর্ভিক্ষে সব কিছু স্বপ্ন ভেঙে যায়, তখন বৌছেলেদের হাত ধরে রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করে বেড়ায়, আবার হয়তো ভাগ্যের চাকা ঘোরে, মা লক্ষ্মীর কৃপা আসে, তখন ভুঁইফোড় বড়লোকের মতো টাকাপয়সা অকারণে অপব্যয় করতে থাকে। চীনের নির্যাতিত সাধারণ মানুষের সহজ সরল ছকেবাঁধা জীবনযাত্রার এই কাহিনী তিনি শোনালেন। শ্রীমতী বাকের কৃতিত্ব কোন জীবনদর্শন প্রচারে নয়, সহানুভূতির তুলিতে সাধারণ কাহিনীকে অসাধারণ করে তোলাই তাঁর সাফল্যের গোপন কথা। চীনদেশের ঢোলা পায়জামা আর কুর্তা ছাড়িয়ে তিনি তাঁর চরিত্রগুলিকে কখনও বাকিনের প্যান্ট কোট হ্যাট টাই পরান নি। যা তিনি দুচোখ ভরে দেখেছেন তাকেই স্বভাবে চিত্রিত করেছেন। শিল্পী আর দর্শক হিসাবে এখানেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব।*

শ্রীমতী বাক কেবল সাহিত্যকৃতির দ্বারা দিয়ে প্রাচ্যের কথা পাশ্চাত্য সভায় বলেন নি। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা না পেলে অনুন্নত নির্যাতিত দেশগুলি লুপ্ত হয়ে যাবে, এ বিশ্বাস তাঁর আছে। তাই ঐ দেশগুলির সার্বিক স্বাধীনতার কথা বহুদিন ধরে তিনি দাবী করেছেন। তাঁকে কেন্দ্র করে বহু সংঘ সমিতি গড়ে উঠেছে যাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে প্রাচ্যপ্রতীচ্যের মিলন সাধন। বিভিন্ন দেশের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার জন্যে ১৯৪১ সালে তিনি 'East and West Association' প্রতিষ্ঠিত করেন। যাদের জন্ম আমেরিকায় অথচ দেহে এশীয় রক্ত, এমন সব অনাথ শিশুদের প্রতিপালনের জন্যে ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে Welcome House এর প্রতিষ্ঠা হয়। পাশ্চাত্যের কাছে প্রাচ্যের দূতস্বরূপ ছিলেন পার্ল বাক।

নিজের চোখে যা দেখেননি, যার সঙ্গে নিজের নিবিড় প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই, তা নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করতে শ্রীমতী বাকের মন চায় না। ভারতে আশ্রয়প্রাপ্ত তিব্বতী শরণার্থী নিয়ে একটি বই লেখার জন্যে সত্তর বছর বয়সে সুদূর মার্কিন মুলুক থেকে ভারতে তিনি এসেছিলেন। কেন? না, তিব্বতী শরণার্থীদের নিজের চোখে দেখবেন। তাদের মুখের কথা শুনবেন। তবেই তো তাদের ঠিকঠিক ভাবে তুলে ধরতে পারবেন তাঁর বইতে। এ ধরণের নিষ্ঠা, দুরূহ কর্তব্যবোধ আজকের জগতে এখনও আছে সেটা ভাবা যায় না। শ্রীমতী

(শেষাংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়)

* "Her writing career has demonstrated that a storyteller can lend his talent to the great issues of the day and still preserve a fastidious concern for the interests of art, restoring to propaganda the dignity of a passionate moral concern with ideas and profound human values." (James Gray 'On Second Thought.')

কালপুরুষ : উপন্যাস

মিহির মুখোপাধ্যায় ..... গতবারের পর .....

[চৌদ্দ]

দুপুরের রোদে রাসবিহারী এভিনিউর মোড়ে দাঁড়িয়েছিল দেবানী। আশ্বিনের প্রথম। বেশ গরম, একটুও বাতাস নেই। রাস্তার মোড়েও ভিড় কম। বাস স্টপে দু'একজন যারা ছিল, তারাও পরপর তিন লাইনের তিনটে বাসে চলে গেল, অথচ শান্তনুর নামগন্ধ নেই। আর পারবে না দেবানী। ছোট্ট হাত ঘড়ির কাঁটার দুটো বেজে ঝুড়ি। পুরো ঝুড়ি মিনিট এই রোদ্দুরের মধ্যে। পথ চলতি লোকগুলো আড়চোখে তাকিয়ে যাচ্ছে। একপাল ছেলে ওর গা ঘেঁষেই রাস্তা পার হল। রাস্তার ওপারে ঘুপি ফলের গাছটা রোদ্দুরে ঝিমিয়ে আছে। গাছের ছায়ায় অন্ধ ভিখিরিটা ট্রামের আশায় রয়েছে, ট্রাম এলেই আন্দাজে হাতড়ে হাতড়ে জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়াবে, তারপর চোখের সাদা মণি দুটো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একঘেয়ে সুরে টেনে টেনে বলবে—"অন্ধকে দয়া করুন।" মোটাসুটি পরিষ্কার জামা কাপড় পরা এই ভদ্র-চেহারার অন্ধটিকে দেবানী কয়েকবছর ধরে একরকম ভাবেই একজায়গায় দেখছে। স্কুলে যেতে আসতে রোজই দেখে। একবার তখন সবে কলকাতা এসেছে, কালিঘাট থেকে বৌদির সঙ্গে ফেরার পথে ট্রামের জানালা থেকে দুটো পয়সাও দিয়েছিল।

হঠাৎ চোখে পড়ল ছোড়দা রাস্তা পার হয়ে তার দিকেই আসছে। এখন সরে যাবার চেষ্টা করা বোকামি। শৈলেশ কাছাকাছি এসে বললো—"কিরে, তুই এখানে দাঁড়িয়ে আছিস কেন?"

—"বাসের জন্য।"—দেবানী ঢোক গিলল।

—"কোথায় গিয়েছিলি?"

—"বাবে স্কুল থেকে এলাম তো, আজ পুজোর ছুটি হয়ে গেল।" দেবানী সহজ হবার চেষ্টায় একটু হাসল।

শৈলেশ ওর বই-খাতার দিকে একবার তাকিয়ে কি যেন একটু ভেবে বললো—"আমাকে আনা আষ্টেক পয়সা দিতে পারিস্?"

দেবানী কোন কথা না বলে বইএর বগলটের ভাঁজ খুলে পুরো একটা টাকাই বার করে দিল। শৈলেশ বললো—"ভাঙিয়ে দিতে হবে তো।"

—"না ওটা তুমি নিয়ে যাও, আমার কাছে খুচরো তিন আনা আছে।"—দেবানীর জবাব শুনে শৈলেশ একটু ঘাবড়ে গেল, বোচ্‌কাল, বোনের এই দাক্ষিণ্যের কারণ ঠিক বুঝল না। কিন্তু আর বাজে কথায় সময় নষ্ট না করে আবার রাস্তার ওপারে ফিরে গেল, তাড়াতাড়ি একটা উল্টোদিকের বাসে চাপল। দেবানী হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। কিন্তু আর সে দাঁড়াবে না। কথা দিয়ে কথা রাখে না, এমন সৃষ্টি ছাড়া মানুষের জন্য আর অপেক্ষা করা যায় না। যথেষ্ট হয়েছে, আর কোনদিন কোথাও যাবে না সে। রাগ করে করুক। ওই যে একটা বাস আসছে। ড্রাইভারকে ইশারা করার জন্য

হাত দুলতেই পেছন থেকে চেনা গলার ডাক—"এই চলে যাচ্ছ নাকি।"

কেন যেন বুকের ভেতরটা ধক্ করে উঠ্‌ল। একটু পেছনে দাঁড়িয়ে হাসছে শান্তনু। আবার হাসছে, লজ্জাও করে না। দেবানী মুখ ঘুরিয়ে নিল।

শান্তনু কৈফিয়ৎ দেবার সুরে বলল—"টিকিট কেটে আনতে একটু দেরি হয়ে গেল, আমি আগের ট্রপে নেমে হেঁটে আসছিলাম. শৈলেশকে দেখে ওই বই এর দোকানটায় ঢুকেছিলাম।" দেবানী কোন জবাব দিল না। বাসটা চলে যেতেই রাস্তা পার হল। শান্তনু আবার বলল—"তুমি রাগ করেছ? রাগলে কিন্তু তোমাকে বেশ দেখায়।"—"থাক্ আর ন্যাকামি করতে হবে না।"—দেবানী চারপাশে একবার তাকাল, তারপর বলল—"চলুন ট্রামে উঠি।"

দু'জনে যখন সিনেমা হলের সামনে ট্রাম থেকে নামল, তিনটে বাজতে মিনিট পনের বাকি। এত আলো, ভিড়, হলে ঢুকেও দেবানীর কেমন ভয় ভয় করছিল। শান্তনুর কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই। হেসে হেসে বলছে—"শৈলেশকে দেখে বুঝতে লজ্জা করছিল, তোমার যদি আপত্তি না থাকত, তা'হলে ওর সামনেই ওকে ডেকে নিতাম, একসঙ্গেই সিনেমায় আসা যেত।"

—"থাক্, আর বাহাদুরীতে কাজ নেই।" দেবানী কোলের উপর বই-খাতা গুছিয়ে আঁচলটা টেনে ভাল করে বসল।

শান্তনু বলল—"কিন্তু এভাবে লুকোচুরি করে লাভ কি একদিনতো জানাজানি হবেই, আর সবাইকে জানিয়েই চলে আসতে হবে।"

দেবানী সামনের দিকে চোখ রেখে আস্তে আস্তে বলল—"কার চলে আসতে হবে?"

—"তুমি চলে আসবে আমার সঙ্গে।"

—"বয়ে গেছে আমার, মোটেই না।"

—"আচ্ছা দেখা যাবে, জোর করে নিয়ে যাব।"

—"ই , আচ্ছা চুপ করুন তো"—দেবানী শান্তনুর দিকে একটু হেলে ফিস্ ফিস্ করে বলল— ওই সামনের লোকটা মাঝে মাঝে ঘাড় ফিরিয়ে ড্যাবড্যাব করে তাকাচ্ছে।"

মাঝ বয়সী সেই লোকটিকে একটু লক্ষ্য করে হাসল শান্তনু—"তোমাকে সুন্দর দেখেছে বোধ হয়।"

—"যান আপনি ভারী ইয়ে"—

শান্তনু হাসিমুখে আবার বলল—"তুমি এতদিনেও আপনি বলার অভ্যেসটা ছাড়তে পারলে না।"

—"অভ্যেস কি একদিনে ছাড়া যায়।"

—"কবে ছাড়তে পারবে।"

—"যখন দরকার হবে।"

—"সে দরকারটা কবে হবে বলতে পারো।"

—"পরীক্ষার পর"—

—"ধ্যুত্! কার পরীক্ষার পর, তোমার না আমার।"

—"আর একটু আস্তে কথা বলুনতো।" দেবানী ভুরু কুঁচ্‌কে একবার চোখে চোখে তাকাল।

বাতি নিভল। নানা দেশের, নানা খবরের ছবি শুরু হয়েছে। দেবানী তখনো মাঝে মাঝে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে, ভয়ে ভয়ে। শেষ মুহূর্তে যারা হন্তদন্ত হয়ে ঢুকছে, টর্চের আলোয় টিকিটের নম্বর মিলিয়ে নিজের নিজের আসনে বসছে আধো অন্ধকারেও তাদের লক্ষ্য করছে সে। চেনা, ছোড়দার বন্ধুরতো অভাব নেই, কখন কার নজরে পড়ে যাবে কে জানে।

শান্তনু বলল—"তুমি অমন উস্‌খুস করছো কেন।"

—"কি জানি, কেমন যেন ভয় করছে।"

—"ভয় কিসের।" —শান্তনু ওর হাতটা নিজের মুঠোর মধ্যে তুলে নিল। এই ঘনিষ্ঠ অন্ধকারে প্রথম হাতের ছোঁয়ায় দেবানীর সমস্ত শরীর শির শির করে উঠ্‌ল। শান্তনুর আঙুল কি শক্ত, হাতের মুঠি কেমন ভারী, দেবানীর নরম হাত

সঙ্গমে যেন কেমন অসাড় হয়ে যেন গলে মিশে গেছে, আর বোধহয় ফিরিয়ে আনা যাবে না।

ফিস্‌ফিস্ করে বললো—"ছাড়ুন।"

—"না।" —শক্ত মুঠি আরো নিবিড় হ'ল।

ছবি শেষ হবার পর দু'জনে পাশাপাশি বাইরে এল। ফুটপাথের ভীড়ে একটু সময় দাঁড়াল। দেবানীর মনে নতুন খুশির আমেজ। প্রথম পরিচয়ের সঙ্কোচ একেবারে কেটে গেছে। দু'জনে আরো ঘনিষ্ঠ হয়েছে, আরো সহজ হয়েছে। এখন যেন সহজেই সে তুমি তুমি বলতে পারবে। শান্তনুর পাশে দাঁড়িয়ে থাকতেও ভাল লাগছিল।

ভবিষ্যতের ভাবনা নেই, বাড়ীর ভয় নেই। বাবা-মা, দাদা-বৌদি সকলের শাসনই যেন সে অনায়াসে উপেক্ষা করতে পারে। নতুন অনুভূতির আনন্দে ভরা এই বেপরোয়া ভাবটা কিন্তু বেশীক্ষণ থাকল না। রাস্তা পার হতে বাস-ষ্টপের কাছে এসে শান্তনু বললো —"শৈলেশও সিনেমা দেখতে এসেছিল।"

—"কই, কোথায়?" —দেবানীর কথার জবাবে আঙুল তুলে দেখাল —"ওই ট্রামে যাচ্ছে।"

ট্রামের পেছনে ক্লাশ কামরার হ্যাণ্ডেল ধরে দাঁড়িয়ে ছিল শৈলেশ্বর।

দেখতে দেখতে চোখের আড়াল হ'ল। সেদিকে একটু সময় তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করল দেবানী—"আমাদের দেখতে পেয়েছে?"

—"পরিষ্কার দেখেছে, আমরা যখন হলের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলুম, পাশ দিয়েই চলে গেল, তুমি লক্ষ্য করোনি।"

একটু সময় কি যেন ভেবে তাচ্ছিল্যের সুরে বললো দেবানী—"দেখুক গে, ছোড়দার কথা বাড়ীতে কেউ বিশ্বাস করে না।"

শান্তনু একটু হেসে বললো—"কিন্তু একটা নতুন রকমের কথা শুনলে অবিশ্বাস নাও করতে পারে।"

তারপর উদ্বেগের জন্যই হোক কিম্বা ইচ্ছে করেই হোক দেবানী সম্বোধনের রীতিটা বদলে বললো—"আমাকে তাড়াতাড়ি একটা বাসে তুলে দাও, যা ভীড়, তোমার আর সঙ্গে এসে কাজ নেই, আমি একাই যেতে পারব।"

বাড়ী ফিরে প্রথমটা একটু ভয়-ভয় করছিল, কিন্তু কি আশ্চর্য্য ছোড়দা বোধহয় কিছু বলেনি কিম্বা বলার সুযোগ হয়নি। স্কুল থেকে ফিরতে দেরী হবার একটা বানানো অজুহাত আগেই মা-বৌদিকে বলে রেখেছিল। সুতরাং সেদিক থেকে ভয়ের কিছু ছিল না।

এখন তাড়াতাড়ি কাপড় বদলে হাতমুখ ধুয়ে সেতার হাতে বাবার কাছে বসতে পারলেই আপাততঃ নিশ্চিন্ত।

রায়-মশাই নিজের ঘর ছেড়ে কোথাও যান না। এই শহরের ধুলো, ধোঁয়া, ভীড় অভ্যাসের আয়ত্বে আনার চেষ্টা করছেন। বিকেলের দিকে বিপিনকে সঙ্গে নিয়ে একটু সময় পার্কে গিয়ে বসেন। তারাচরণ বাবু, শ্রীনাথ কবিরাজ, কার্তিক দত্ত এসে আলাপ করে গেছেন। কিন্তু কেমন যেন জমেনি, আলাপ করে আরাম পান নি। এখানে বৈঠকখানা নেই। করাস পেতে, তাকিয়া ঠেস দিয়ে গড়গড়া না টানলে আরাম হয় না। এই শোবার ঘরের তক্তপোষের ওপর বসে কখনো কি আলাপ জমে। আর এদের কথাবার্তাও কেমন মামুলি ভদ্রতার সুরে বাঁধা। শ্রদ্ধা, বিনয়, সম্ভ্রম নেই।

থাকবে কি করে, এরাতো আর রায়-বাড়ীর ইতিহাস জানে না, রায়-কর্তাদের মান-মর্যাদার খবরও রাখে না। রায়-মশাই সব বোঝেন, সব বুঝেই এদের সঙ্গে সহজ হবার চেষ্টা করেন। কিন্তু কেন যেন পারেন না, ভালোও লাগে না।

সারা দিন রাতের মধ্যে সন্ধ্যাবেলা কিছুসময় দেবানীর সঙ্গে সঙ্গীত আলোচনা করেন। এইটুকুই যা আনন্দ। জীবনের প্রায় চল্লিশ বছর ধরে যা শিখেছেন, শুনেছেন, বুঝেছেন সব কিছুই মেয়ের কাছে উজাড় করে দিতে চান। দেবানী কিছু সময় বাজায়, অনেক সময় চুপ করে বাপের কথা শোনে, সব

কথা না বুঝলেও মাঝে মাঝে দু'একটা প্রশ্ন করে উৎসাহ দেয়।

রায়-মশাই বলেন—"শুধু বাজালেই হয় না মা, রাগ-রাগিনী চিনতে হয়, বুঝতে হয়, বিচার করতে হয়। সুর শুধু কানে শোনার নয়, শুধু রেওয়াজ করলেও হয় না, মন-প্রাণ দিয়ে অনুভব করতে হয়। প্রাচীন সঙ্গীত-শ্রষ্টারা রাগ-রাগিনীর মেল বন্ধন করে গেছেন। কোন্ রাগ, কোন্ মেল বা কোন্ ঠাটের কোথা থেকে উৎপত্তি, কার সঙ্গে কোথায় কতটা মিল সব খুটিনাটি বিচার করে বুঝতে হয়। তবেই তো সঙ্গীত সৃষ্টি করতে পারবে। ভাল শিল্পী হওয়া কি মুখের কথা। যেমন ধরো এখন সন্ধ্যা উৎরে গেছে, তুমি এ সময় শুদ্ধ কল্যাণ বাজাতে পারো।" বিপিন তামাক সেজে দিল, রায়-মশাই গড়গড়ার নল তুলে বারকয়েক টান দিয়ে আবার শুরু করেন—"কল্যাণ বা ইমন ঠাটের মধ্যম তীব্র, অন্য সব শুদ্ধ স্বর। এই ঠাটে রাগ-রাগিনীর সংখ্যা তের। যেমন, ইমন, ভূপালী, শুদ্ধ, কল্যাণ, চন্দ্রকান্ত, মালশ্রী, অযৎকল্যাণ, হিন্দোল, হাম্বীর, কেদার, কামোদ, শ্যাম, ছায়ানট, গৌড়সারঙ্গ। আহা, আজ যদি আলিবর্দী সাহেব বেঁচে থাকতেন, তোমাকে এই সব কটা বাজিয়ে শোনাতেন। আমি তো পারব না মা, সেতারের হাত আমার নষ্ট হয়ে গেছে। আমি শুধু মুখে বলতে পারি, বোঝাতে পারি। যেমন শুদ্ধ কল্যাণের রূপটা কি? এর বাদী গান্ধার, সম্বাদী ধৈবত। আর একরকম শুদ্ধ কল্যাণ আছে মধ্যম ছাড়া নিষাদও অল্প লাগে। এর সাধারণ চেহারা ইমন ভূপালীর মত, কিন্তু মন্দ্র সপ্তকে ভূপালীর চেয়ে বেশীবার যায়, দ্রুত তানে কখনো কখনো তীব্র মধ্যম একেবারেই ছেড়ে দেয়া হয়। এই রাগের সঙ্গে ভূপালীর তফাৎ বজায় রাখা কঠিন, সে জন্য তীব্র মধ্যম ও নিষাদের ব্যবহার দরকার। একটু বাজাও তো মা।" দেবানী সেতার তুলে নেয়। পাশের ঘরে নিবারণ মাষ্টারের ছেলেরা তারস্বরে নামতা মুখস্থ করছে, বৌদি সন্তুকে ঘুম পাড়াচ্ছে, সিঁড়ির কাছে মন্দাকিনী ঠাকরুণ কাকে যেন ধনুধনে গলায় গাল দিচ্ছেন, এই বিচিত্র কলরবের মধ্যে শুদ্ধ কল্যাণের সুর। মাঝে মাঝে স্পষ্ট হয়, মাঝে মাঝে হারিয়ে যায়।

রায়-মশাই কিন্তু চোখ বন্ধ করে বিভোর হয়ে থাকেন। কখনো মাথা নেড়ে বলেন—"এ জায়গাটা ঠিক হ'ল না মা, আবার বাজাও।"

বাজনা থামলে পর চোখ খুলে বলেন—"শুদ্ধ কল্যাণ, ভূপালী আর দেশকারের মধ্যে তফাৎ বোঝা কঠিন। কিছুদিন ভাল করে না শুনলে"—

আলোচনার মাঝপথে অনুরাধা এসে অনুযোগ করে—"বাবা, অনেক রাত হয়েছে, এবার ওকে ছেড়ে দিন, পড়তেও বসলো না, ঘরের কাজও কিছু করলো না, আমি কি একা সবদিক সামলাতে পারি।"

গানের আলোচনার সময় এক অনুরাধা ছাড়া অন্য কেউ এসে কথা বলতে ভরসা পায় না। সর্বেশ্বর রায় মনে মনে আহত হলেও চুপ করে থাকেন। দেবানী একবার বাপের মুখের দিকে তাকায়, একবার বৌদির দিকে, তারপর সেতারটা নামিয়ে রাখে, আঙুল থেকে মেজরাপ খুলে বলে—"এখন থাক বাবা, নটা বেজে গেছে।"

রায়-গিন্নীর কিন্তু ভাল লাগে না, গানের মাঝখানে অনুরাধার এই কথা বলার সাহস, আপত্তি করার অধিকার। বৌমা যেন আজকাল সব ব্যাপারেই নিজের মতামতটা জাহির করতে চায়। বিরক্তির সুরে বলেন—"তোমার কি কাজ আছে, আমাকে বলো না বৌমা, আমিও তো করতে পারি।"

"আপনি উঠে এলে খুকি-সন্তুর কাছে বসবে কে?" —অনুরাধা রান্নার খুপরিতে ঢুকেও কথার রেশ টানে—"পদ্ম-ঝি সন্ধ্যে বেলা এসে একবার বুড়ি ছুঁয়ে যায়, এদিকে রান্নার কাজ পড়ে থাকে। কতদিন বলেছি, সবসময়ের জন্য একটা লোক না রাখলে কি চলে"—

দেবানী তাড়াতাড়ি এসে বৌদিকে হাতে হাতে সাহায্য

করে। খাবার জায়গার পাশে কাঁসার গেলাস কটায় ঢপ গড়িয়ে ডাক দেয়—"বড়দা, মেজদা, ছোড়দা, খেতে এসো।" দেশের বাড়ীর মত পাঁচটা ঝি-চাকর রাখার ক্ষমতা আর নেই। ঘরের কাজ নিজেদেরই ভাগাভাগি করে করতে হয়। পদ্ম-ঝি সকাল বিকেল এসে ঠিকে কাজ করে দিয়ে যায়। দেবানীর স্কুল আছে, সেতার শেখার ক্লাশ আছে, বাড়ীতেও বাপের সামনে সেতার নিয়ে বসতে হয়। রান্না-গিন্নী বেশী নড়াচড়া করলে কোমরের ব্যাথাটা আবার চাড়িয়ে ওঠে। তবু নাতি-নাতনিকে সামলে দেবার কাজটা তিনিই করেন। বিপিনদা তো সেদিন এলো। বুড়ো মানুষ, এসব ঘরের কাজে সে সুবিধে পায় না। রান্না-মশাইর তামাক সাজা, জামা-জুতা ঠিক রাখার কাজেই এতকাল হাত পাকিয়েছে। সুতরাং সংসারের চাপটা অনুরাধার উপরেই বেশী পড়ে।

রাত্তিরে বিছানায় এলেও ওই কথাই বলে—"তোমাদের সংসারে খেটে খেটে আমার হাড় কালি হয়ে গেল, কেন সব-সময়ের জন্য একটা লোক রাখলে ক'টা টাকাই বা বেশী খরচা হয়।"

শান্তিস্বর পাশ-বালিশ আঁকড়ে দেয়ালের দিকে মুখ করে চোখ বুজে জবাব দেয়—"হবে, হবে, সব হবে, কটা দিন সবুর কর না।"

—"ছাই হবে, আমি মরলে পর হবে"—অনুরাধা খুকির কাঁথা বদলে দিতে দিতে বলে—"তুমি যা ব্যবস্থা করবে সে আমার জানা আছে, তিন বছর ধরে একফোঁটা জমির ব্যবস্থা করতে পারলে না, বাড়ী করা দূরে থাক্, আলো-বাতাস বন্ধ এই পোড়ো বাড়ীতে গরু-ভেড়ার মত মুখ বুজে আছি। একটা পয়সা জমে না, সামান্য পুঁজির টাকা ক'টা ভেঙে ভেঙে খাচ্ছো মাসের শেষে এখানে সেখানে ধার করে বেড়াও, এদিকে বাবা আবার বানীর বিয়ের জন্য তাড়া দিচ্ছেন।"

শান্তিস্বর জানে এসব কথার জবাব দিতে নেই, দিলেই কথার পিঠে কথা বাড়বে। রাত বোধ হয় বারোটা। পাশের ঘরে সুরেশ, বিপিনদা, বাবা। কার যেন নাক ডাকছে, বন্ধ দরজার এপাশ থেকেও অল্প অল্প শোনা যাচ্ছে।

তারপরের ঘরে দেবানীর ঘুম আসছে না। চোখ বুজে চুপ করে আছে।

রান্না-গিন্নী হাত-পাখা নেড়ে হাওয়া দিচ্ছেন। একটু একটু করে তন্দ্রার আমেজ আসছে, খাটের উপর ছোড়দা পাশ ফিরতেই মচ্‌মচ্‌ আওয়াজে সেটুকু ছুটে যাচ্ছে।

খাটের নিচে খুট্‌খুট্‌ শব্দ, নিশ্চই ইঁদুর। এ বাড়ীটায় ইঁদুর আর আরশোলার অভাব নেই। আচ্ছা ছোড়দা কিছু বলেনি কেন। বলার সুযোগ হয়নি, না কেউ বিশ্বাস করবে না জেনে বলেনি। হয়তো দেখতে পায়নি! কিন্তু শান্তনু যে বললো, স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে! শান্তনু আজ সাদা সার্ট আর প্যান্ট পরেছিল, কিন্তু ধুতি পাঞ্জাবীতেও চমৎকার দেখায়, আচ্ছা ও যদি চশমা পরে কেমন দেখাবে। ঘুম ঘুম আসছে।

এপাশের ছোটো ঘরের মাঝের দরজা খোলা থাকে। বিপিনদার নাক ডাকা একটু বন্ধ হয়েছে, কিন্তু টেবিলের উপর মেজদার টাইম পিসটার একঘেয়ে টিক্ টিক্ শব্দ।

বেশ ঘুম আসছে এবার, চোখের পাতা ভারী হয়ে আসে। সারাদিনের ছবিটা কেমন টুকরো টুকরো হয়ে ভেসে ওঠে, আবার মিলিয়ে যায়।

সিনেমা হলের সেই আলো, ভীড়, পাশে শান্তনু, কেমন যেন ঘুরের স্বপ্নের মত অস্পষ্ট। শান্তনু কেমন শক্ত করে হাত চেপে ধরেছিল—ভারী অসভ্য।

রান্না-গিন্নীরও বোধহয় তন্দ্রার মত এসেছিল। অভ্যাস মতোই হাত পাখা নাড়ছিলেন, শিথিল মুঠো থেকে পাখাটা খচমচ করে দেবানীর মুখের ওপর পড়লো।

আবার তন্দ্রা ছুটে যায়। টুকরো টুকরো কথা, দু'একটা ছবি। শুভ কল্যাণ আর তুপালীর তফাৎ বোঝা কঠিন। বাবা নিজের খেয়ালে কত কি বলে যান। সবটা বোঝা যায় না। না বুঝলেও থামিয়ে দিতে ভয় করে, কষ্ট হয়।

ঘরের কাজ না দেখ্‌লে বৌদি রাগ করে, কিন্তু বাবার কাছে বসলে বাবা খুব খুশী। আবার ঘুম আসছে। একতলায় কবিরাজ মশাইর কুকুরটা হঠাৎ ডেকে উঠ্‌ল। ছোড়দা আবার পাশ ফিরল। আস্তে আস্তে সমস্ত শরীর অসাড় হয়ে এলো। চোখের পাতা এখন যেন আর চেষ্টা করেও টেনে খোলা যাবে না।

ধীরে ধীরে ঘুমের আবেশ গভীর হয়ে নামে।

সমস্ত বারাক বাড়ীটা নিঃঝুম ঘুমের গভীরে ডুব দিয়েছে।

[পনের]

সুমিত্রার চিঠি এসেছে অফিসের ঠিকানায়, ছিল সুরেশের পাঞ্জাবীর পকেটে।

ধোপার বাড়ী জামা কাপড় দেয়ার সময় পকেটে কিছু আছে নাকি দেখ্‌তে গিয়ে চিঠিটা পেল দেবানী। খামের মুখ ছেড়া, উপরে যেজদার নাম, অফিসের ঠিকানা।

মেয়েলি ছাঁদে হাতের লেখা। একটু কৌতূহল হ'ল। সাধারণতঃ অন্যের চিঠি পড়ার অভ্যাস এ বাড়ীর কারো নেই, দেবানীরও ছিল না। কিন্তু পাকিস্তানের খাম, ভাক-টিকিট, তারওপর মেয়েলি হাতের লেখা, অফিসের ঠিকানা। কে লিখল চিঠিটা! সবটা না পড়লেও, শেষের নামটা পড়ার জন্য ভাঁজ খুলল। সম্বোধন সাধারণটা—সুরেশদা, কিন্তু শেষে—"ইতি তোমার সুমিত্রা।"

তোমার সুমিত্রা।—কথাটা দেবানীর কাছে কেমন যেন মনে হ'ল। পড়ে দেখার আর সাহস হ'ল না। মেজেতে একরাশ জামা কাপড়ের পাশে খোপার খাতা খুলে বসেছিল অনুরাধা। মুখ তুলে বল্‌লো—"কার চিঠি রে বানী!"

—"যেজদার, সুমিত্রাদি লিখেছে।"—দেবানী চিঠিটা এগিয়ে দিল।

অনুরাধাও চিঠিটা আর শেষের নামটা পড়ে মুখ টিপে একটু হেসে বললো—"অফিসের ঠিকানায় লেখা, শেষে আবার 'তোমার সুমিত্রা'।"

—"বৌদি, তুমি ভারী ইয়ে"—দেবানী লজ্জায় হাসি ছাপল।

কিছু সময় পরে স্নান করে এসে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ভেজাচুলে চিরুনী টানছিল সুরেশ্বর। অনুরাধা এসে বললো —ঠাকুরপো, তোমার চিঠি।

—"কই, কে দিয়েছে!"—সুরেশ্বর মুখ ফেরাল ভেবে-ছিল নতুন চিঠি, অনুরাধার হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে বললো —"ওঃ, কোথায় পেলে এটা!"

—"পাঞ্জাবীর পকেটে ছিল।"—অনুরাধা ভালমানুষের মত মুখ করে বললো,—"কে লিখেছে, ঠাকুরপো।"

সুরেশ্বর সহজ ভাবেই জবাব দিল—"সুমিত্রা।"

অনুরাধা একটু ভাবল, অকারণে আঁচলটা মুখের কাছে তুলে, আড়চোখে তাকিয়ে বললো—"অফিসের ঠিকানায় লিখল কেন!"

এই নিরীহ প্রশ্নের পেছনেই ঠাট্টার খোঁচা আসবে অনুমান করে আয়নার মধ্যে অনুরাধার মুখের ছায়ার দিকে চোখ রেখে সাবধানে জবাব দিল সুরেশ—"এ বাড়িতে নানা ঘরের চিঠি আসে, জানোইতো পিওন কোন্ ঘরে কার চিঠি ফেলে দিয়ে যায়, এ নিয়ে মাঝে মাঝে গণ্ডগোল হয়। সেইজন্যই"—

অনুরাধা নিশ্বাস ফেলে বল্‌লো—"আহা, কতদিন দেখিনা মেয়েটাকে, এই বয়সে এরকমটা হ'ল. খুব দেখ্‌তে ইচ্ছে করে, সঙ্গে করে নিয়ে এলেই পারতে।"

—"কি যে বলো, বৌদি, কোন মাথা-মুণ্ডু নেই, সঙ্গে করে নিয়ে আসবে কি, ওর বাবার অসুখ, তাকে ফেলে আসবে নাকি, আর ওই-বা আমার সঙ্গে আসবে কেন!"

—"আহা, আসবে নাই বা কেন, ছোটবেলা থেকে তোমাদের জানাশোনা, কত ভাব, ওর বাবাকে শুদ্ধু নিয়ে এলেই পারতে"—অনুরাধা আঁচল তুলে অন্যদিকে মুখ ফেরাল।

সুরেশের মনে হ'ল হাসি লুকুচ্ছে বোধহয়, বিরক্তির সুরে

বললো—"বাজে কথা বলো না, নটা বাজতে চললো, সেদিকে খেয়াল আছে, আমার ভাত বাড়ো গে যাও।"

অনুরাধা চলে যেতে যেতে রাগের ভান করে বললো—"আমার সঙ্গে তো খালি কাজের কথা, বৌদি, ভাত দাও, জল দাও, কাপড় দাও, যাকে কথা বলার লোক যখন আসবে তখন দেখবে"—

খেতে বসে বৌদিকে একটু খুশি করার জন্য বললো সুরেশ—"তোমার সেই ছিটের নমুনাটা দিয়ে দিও, আজ অফিস থেকে বড়বাজার যাব, ওখানে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।"

"থাক খুব হয়েছে, সাতদিন ধরে তুমি ছিটের নমুনা নিয়ে যাচ্ছ।" —অনুরাধা মুখ ঘুরিয়ে নিল। সুরেশের একটু হেসে বললো—"তুমি রাগ করছো কেন? সময় পাইনি তাই, তোমার কোন জিনিসটা না এনে দিই বলো! আজ সত্যি বড়বাজার যেতে হবে, চাটুয্যেদার সেই হুণ্ডি ভাঙাতে হবে যামিনী সা'র গদিতে যাব।"

কথাটা মিথ্যে নয়। রায়-মশাই এখানে আসার পর প্রায় মাস দুয়েক কেটে গেছে। দেবানীর স্কুলের পুজোর ছুটিও শেষ হয়ে এলো। রায়-বাড়ীর বাৎসরিক দুর্গোৎসব নমো নমো করে সেরে ভুবন চাটুয্যে আয়-ব্যয়ের হিসেব পাঠিয়েছেন। সেই সঙ্গে সুরেশের নামে একশো টাকার একটা হুণ্ডি। বড়বাজারে যামিনী সা'র গদী আছে সেখানে গিয়ে হুণ্ডি ভাঙাতে হবে। চাটুয্যে মশাই চিঠি লিখেও দেশের অবস্থা সবিস্তারে জানিয়েছেন। আদায় উশুল কিছু নেই। বিভিন্ন মহলের হিন্দু নায়েব আর তহশীলদারেরা পালাই পালাই করছে। অনেকে চলেও গেছে, যারা আছে তারাও আর আগের মত মুসলমান প্রজাদের ওপর চোখ রাঙাতে ভরসা পায় না। নতুন মুসলমান কর্মচারী না রাখলে বহালগুলো আর হাতে রাখা যাবে না। বিশ্বাসী লোক দরকার। কারণ যে যেদিক দিয়ে পারছে লুটেপুটে নিচ্ছে। ভুবন চাটুয্যে একা আর কদিক সামলাবেন।

রজনী সরকারের অবস্থার কোন উন্নতি হয় নি, বরং অবনতির দিকে। প্রভুনাথের দেশ থেকেও কেউ আসেনি। আগের মতোই নিজের মনে চুপচাপ থাকে, মাঝে মাঝে খাপ-ছাড়া কথা বলে, হেসে যায়। কালীচরণ আর যমুনা-ঝি তাকে দেখাশোনা করে। শ্রীমন্ত ঠাকুর কোনরকমে নীলমাধবের পুজো-আচ্চা, ভোগ-নৈবিদ্যের নিয়ম রক্ষা করে। এদিকে আবার নতুন উৎপাত শুরু করেছে মতিমিঞা আর হরনাথ ডাক্তার।

যেসব হিন্দু পরিবার চলে যাচ্ছে, তাদের ঘর-দোর-জমি জলের দরে কিনে নিচ্ছে। নিজেরাই খুশিমত দাম ঠিক করে তাদের নিতে বাধ্য করছে। তারপর টিনের ঘর ভেঙে টিন, খুঁটি, জানালা-কপাট চড়া দামে কেলা শহরে চালান দিচ্ছে।

সমস্ত চিঠিটা পড়ে রায়-মশাই যেন জ্বলে উঠেছিলেন, ইচ্ছে হচ্ছিল এক্ষুনি চলে যান, গিয়ে একবার ওদের সামনে দাঁড়াবেন, কার কতখানি সাহস একবার দেখে নেবেন। কিন্তু পাশপোর্ট চালু হয়ে গেছে। এখন আর হুট করে যাব বললেই যাওয়া যাবে না। তাছাড়া বাড়ীর কারো ইচ্ছে নেই, রায়-মশাই আবার দেশে ফিরে যান।

শান্তিময় অনেক কষ্টে বুঝিয়েছে। অঘ্রাণ মাসে খুকির মুখে ভাত হোক। ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর দেবানীর বিয়ের একটা ব্যবস্থা করি। তারপর না হয় একবার গিয়ে ঘুরে আসবেন।

আজ শনিবার। তাড়াতাড়ি অফিস ছুটির পর বড়বাজারে যাবে সুরেশ। সেখানে দেশের ব্যবসায়ী যামিনীর গদী আছে। সোজাসুজি মনি-অর্ডারে টাকা পাঠাবার ব্যবস্থা বন্ধ! তাই মোটা টাকা বাট্টা দিয়ে হুণ্ডি ভাঙাতে হবে। এইভাবে ওই দেশের লেনদেন চলে।

বৌদির ছিটের নমুনা পকেটে করে, দেবানীর হাত থেকে লবঙ্গ নিয়ে যখন সে বেরোল, তখন নটা বেজে পঁচিশ মিনিট।

কিছু আগে শান্তিস্বর আফিস চলে গেছে। সিঁড়ি দিয়ে কয়েকধাপ নামার পর পেছন থেকে ডাকল কেউ—"শুনুন।"

মুখ ফিরিয়ে দেখল ললিতা। একটু কুণ্ঠার সঙ্গে বলল—"আমাকে একখানা পোষ্টকার্ড এনে দেবেন।"

একটু অবাক হল সুরেশ, হেসে জবাব দিল—"এখন তো অফিস যাচ্ছি, আনব কি করে?"

—"অফিস থেকে ফেরার পথে নিয়ে আসবেন।"

—"আচ্ছা।"—আরো দুটো ধাপ নামল। পেছন থেকে আবার ডাকল ললিতা,

—"পয়সাটা নিয়ে যান।"

একটু হাসল সুরেশ—"পয়সাটা আপনার কাছেই থাক, আগে নিয়ে তো আসি, তারপর না হয় দেবেন।"

—"তাহলে ভুলে যাবেন কিন্তু।"

—"না, না, ভুলব না, মনে রাখার চেষ্টা করব, আর ভুলেই যদি যাই, তাহলে পয়সা দিলেও ভুলব, না দিলেও ভুলব।"

সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে যেতে ভাবল, অদ্ভুত মেয়ে তো পোষ্টকার্ড আনাবার আর লোক পেল না।

ললিতা একটু সময় দাঁড়িয়ে দেখল, তারপর ঘরে ফিরে আসতে কমলাও ওই কথা বলল—"দিদি পোষ্টকার্ড আনতে দেবার আর লোক পেলি না।"

ললিতার মুখ একটু লাল হল। একটু যেন থতমত খেয়ে বলল—"তুই বুঝি আড়ি পেতে সব শুনেছিস"—তারপর একটু বেপরোয়া ভাবে—"বেশ, আমার যাকে খুশি তাকে দিয়ে আনাব, তুই সব ব্যাপারে গিন্নীপনা করতে আসিস না।"

ভীড়ের মধ্যে বাসের হাণ্ডেল ধরে কাকুনি খেতে খেতে ভাবছিল সুরেশ্বর। ললিতা প্রায়ই ছুতো-নাতা করে আলাপের সুযোগ খুঁজে। দেবানীর কাছ থেকে একরকম জোর করে নিয়ে তার জামার বোতাম সেলাই করে দেয়। কখনো ঘরে তৈরী এটা-ওটা খাবার জিনিস দিয়ে যায়। এতদিন ব্যাপার গুলো ভাল করে চোখে পড়েনি। দুইবোনের বয়স কম হল না। ললিতার বোধহয় তেইশ চব্বিশ। বিয়ে হচ্ছে না। হবেই বা কি করে। বাপ বুড়ো, ভাল উপার্জন নেই। দেখতেও আহা মরি সুন্দরী নয়, লেখাপড়াও এমন কিছু শেখেনি যে চাকরী-বাকরি বা অন্য কিছু করবে। আমরা স্বাধীন হয়েছি, শিক্ষিত হচ্ছি, অথচ মেয়েদের সমস্যা সেই পুরনো দিনের মতই রয়ে গেল।

কার্তিক দত্তই বা কেমন মানুষ। রাজ্যের লোকের উপকার করে বেড়ান, রাজনীতি, সমাজনীতি নিয়ে হৈচৈ করেন, অথচ নিজের শালীটির কোন ব্যবস্থা করতে পারছেন না।

[ষোল]

কার্তিক, অঘ্রাণ, পৌষ মাস গেল। শহরের সামান্য শীতও যায় যায়। এ বছর শীত আর পড়লো কোথায়। মাঘের শুরুতে কয়েকটা দিন যা মনে হয়েছিল।

ভুবন চাটুয্যের পাঠানো একশ টাকা দিয়ে খুকির মুখে ভাত সারা হয়েছে। দেবানী স্কুলের টেষ্ট পরীক্ষায় পাশ করেছে, এবার ফাইনাল।

সামনে সরস্বতী পুজো। শক্তি সংঘের ছেলেরা, এ বাড়ীতে আসার পর থেকে প্রতি বছর সরস্বতী পুজো করে। এ বছরও তোড়জোড় করে চাঁদা তুলছে। শান্তিস্বর সংঘের সেক্রেটারী। সেই সূত্রে পুজো কমিটিরও কর্ণধার। এজন্য অনেক ঝামেলাও পোয়াতে হয়। পুজোর পর দশ-বিশটাকা যা ঘাটতি পরে, তার পকেট থেকে যায়।

শান্তিস্বর অন্যদিকে হিসেবী হলেও, এ ব্যাপারে একটু উদার। অনুরাধার মতে হুজুগে মেতে বেহিসেবী। কিন্তু বাইরে প্রভাব প্রতিপত্তি রাখতে গেলে এ ধরণের খরচ একটু আধটু করতেই হয়। কার্তিক দত্ত যেমন করেন। এ ঝাড়ী ছেড়ে গেলেও শক্তি সংঘের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ আছে।

সংঘের সভাপতি তিনি। নানা অনুষ্ঠানে মোটা টাকা চাঁদাও দেন। না হলে এপাড়ার ভাড়াটের ঘর থেকে মাথা পিছু আলাদা করে চাঁদা ধরেও পঞ্চাশ ষাট টাকার বেশী ওঠে না। তাতে কলোনীর রবীন্দ্র জয়ন্তী কিম্বা নেতাজী জন্মোৎসব করা চলে, সরস্বতী পুজো হয় না। তাই চেনা-শোনা বাইরের বন্ধু বান্ধবদের কাছে থেকেও একরকম জোর-জুলুম করেই চাঁদা আদায় করতে হয়। শান্তনুও সেই ফাঁদে পড়েছে। এ বাড়ীতে আগে তার বেশী আসা যাওয়া ছিল না।

গেল বছরও চাঁদা দেয়নি সে। তার আগের বছর কমলা বুঝি দুটো টাকা আদায় করে নিয়েছিল। ওরা এবছর চাঁদা ধরেছে দশটাকা।

—"তোমার জন্যই এ টাকাটা আমায় দিতে হ'ল।" —শান্তনুর কথা শুনে দেবানী জবাব দিল—"আহা, আমি যেন দিতে বলেছি, আমাকে দোষ দিচ্ছ কেন?"—"তোমার জন্যই তো এ বাড়ীতে ঘন ঘন আসি, বাধ্য হয়েই ছেলেগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা রাখতে হয়েছে নয়তো তোমার তিন দাদা কখন যে ওদের আমার পেছনে লেলিয়ে দেবে, যা সব ছেলে এক একটি।"

দেবানী হাসল—"তোমাকে আসতে কে বলেছে, না এলেই পারো।"

—"খুব একখানা কথা বললে যা হোক—" শান্তনুর গলায় যেন অভিমানে ভারী শোনায়—"কতদূর থেকে ছুটে ছুটে আসি, আর এলেই তুমি তাড়াবার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠো। কতদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হল বলোতো।"

দেবানী হাসতে হাসতে বললো—"আহা, অমনিতেই খোকাবাবুর রাগ হোল"—পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে—"না, সত্যি বলছি পরীক্ষার আগে আর তোমার সঙ্গে বেরোতে পারব না। আজ কত ছল-ছুতো করে বেরিয়েছি।"

দু'জনে রাস্তায় হাঁটছিল। শীতের বিকেল। রাস্তার পাশে রাধাচূড়া গাছের পাতায় নরম রোদ। হাইস্কুলের খোলামাঠে কয়েকটা কাক পাখা ধুতে নেমেছে।

একরকমের লালপাড় শাড়ী পরা একদল স্কুলের মেয়ে ওদের আগে আগে যাচ্ছিল। দেবানী কোথাও বসতে চায় না। সিনেমা, রেস্তোরা কিম্বা পার্কেও নয়। অগত্যা হাঁটতে হয়। হেঁটে হেঁটে কথা বলে দু'জনে। বড়রাস্তা, ট্রাম-রাস্তা ছেড়ে অচেনা গলি-গলি ঘুরে ঘুরে যতক্ষণ না কথা ফুরোয় ততক্ষণ শুধু পথ চলে আর চলে।

অথচ একটুও ক্লান্তি নেই, সময় যে কোন দিক দিয়ে কখন পালিয়ে যায় খেয়াল থাকে না। মাঝে মাঝে ট্রাম কিম্বা বাস স্টপে দাঁড়ায়।

পানের দোকান থেকে সিগারেট কেনে শান্তনু, দোকানের আয়নায় একপলক নিজের চেহারাটা দেখে নেয়, রুমাল দিয়ে মুখ মোছে, মিষ্টি মশলা দেয়া পান কিনে দেয় দেবানীকে। পানের রসে লাল ঠোঁট ভারী সুন্দর দেখায়।

কথাও কি আর ফুরুতে চায়। দু'জনে কত কথা ভেবে ভেবে আসে, কিন্তু কাছাকাছি এলেই সে সব ভুলে যায়, অন্য কথা মনে পড়ে। নানা ধরণের কথা। দু'জনের পড়াশোনা, শান্তনুর কলেজ, দেবানীর সেতার-শেখা, বাবা-মা, দাদা-বৌদি খুকি-সন্তু, মেজদা-ছোড়দা, ললিতা-কমলা, কাতিকদা কিম্বা তারাচরণ বাবু, শ্রীনাথ কবিরাজ কিম্বা বন্দাকিনী ঠাকরুণ—কারো কথাই বাদ পড়ে না। মাঝে মাঝে একটু মান-অভিমান মধুর কলহও। তারপর সময়ের অভাবে, বাড়ীর ভাবনায়, অন্যদিনের আশ্বাস নিয়ে ছাড়াছাড়ি হয়। ফিরে যেতে যেতে দু'জনেই ভাবে, কি ভুল, কি ভুল, সেই কথাটাতো বলা হ'ল না।

আচ্ছা, পরের দিন বলা যাবে। কিন্তু পরেরদিনও আর হয় না, সে কথাটা একেবারেই ভুলে যায়, অন্য অনেক নতুন কথা ভীড় করে আসে।

অভ্যাসের মতো শান্তনু বলছিল—"চলো না, কোথাও গিয়ে বসি, এভাবে আর কতক্ষণ ঘুরবো।"

—"না, কোথাও বসে কাজ নেই, আমি এখন বাড়ী যাব, শোনো যা বলছিলাম, পরীক্ষার আগে আর দেখা হবে না, সরস্বতী পুজোর দিন এসো, ঐদিন কথা বেশী বলতে না পারি, দেখাতো হবে।"—দেবানী একটু হেসে আবার বললো—"সে দিন সন্ধ্যার পর খিচুড়ি হবে, আমি নেতার বাজারো, শুনে যেও, কেমন চমৎকার বাজাই, গেলবারের চেয়ে এবার আরো ভাল বাজাব।"

শান্তনু হাসল—"গেলবারে আমি আসতে পারিনি, হোষ্টেলে নিজেদের পুজো হয়। এবার আবার চেষ্টা করব, তবে নিজের গুণপনা আর নিজের মুখে প্রচার করো না।"

—"আজ্ঞে না মশাই, এই প্রচারের যুগে যে যত বড় গলায় নিজের কথা বলতে পারে তারই নাম হয়।"—চোখে-মুখে হাসি ছড়িয়ে, মাথা দুলিয়ে, চিবুক নেড়ে, দেবানীর এই তর্ক করার ভঙ্গীটি ভারী চমৎকার।

আবার একটু হাসল শান্তনু—"বেশ কথা বলতে শিখেছ তো।"

—"তা শিখব না, আজ বাদে কাল কলেজে পড়ব যে"—

—"আচ্ছা, দেখা যাবে, বিয়ের সময় বড় বড় কথা কোথা থাকে, তখন বাবা-মা বলবে, ঘাড় গুজে তাই মেনে নিয়ে একপলা ঘোমটা টেনে হুড়হুড় করে বিয়ের পিঁড়িতে বসবে।"

দেবানী উদাস ভাবে বললো—"কি আর করব, বাবা মারতো অবাধ্য হওয়া যায় না।"

—"ইস, খুব ভালো মেয়ের মতো কথা বলছো দেখছি, তা'হলে আমাকে আর মিছিমিছি ঘোরাচ্ছ কেন?"

—"আমার খুশি আমি ঘোরাচ্ছি, ভাল মেয়েইতো, তোমার মতো মেয়েদের পেছনে তাড়া করে গিয়ে পায়ে পড়ে আলাপ করি না।"—দেবানী আঁচল দুলে হাসি লুকুলো।

শান্তনু হেসে বললো—"যা একখানা স্বভাব হচ্ছে দিন দিন, বাবা-মার আদর পেয়ে"—

দেবানী ধমকের সুরে—"এই আমার বাবা-মাকে কোন দোষ দেবে না, তিন ভাই-এর পর এক বোন আমি, আদরতো পাবই"—তারপর রাস্তার দিকে তাকিয়ে—"আর ঝগড়া করতে হবে না, ওই একটা বাস আসছে, এবার লক্ষ্মীছেলের মতো উঠে পড়ো।"

বাস-ষ্টপের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে শান্তনু জিজ্ঞেস করলো—"তুমি কি হেঁটেই যাবে?"

—"হ্যাঁ এইটুকুতো পথ"—দেবানী উত্তর দিল—"পার্কের পাশ দিয়ে বেশ হেঁটে হেঁটে চলে যাব।"

তারপর পার্কের পাশ দিয়ে হেঁটে হেঁটে বাড়ী ফিরল। তখন সবে সন্ধ্যা। সিঁড়ির সামনে শক্তিসংঘের কয়েকটি ছেলে গল্পগুজব করছিল।

সকাল-সন্ধ্যায় ওরা ঘরে ঘরে চাঁদার জন্য হানা দেয়। দেবানীকে পথ ছেড়ে দিল। রায় মশাই তখন নিজের খাটে চুপ করে বসেছিলেন। একটু আগে আহ্নিক শেষ করেছেন। অনুরাধার দেয়া লেবু-চিনির জল খেয়ে এখন চুপ করে ভাবছেন। শরীরটা ক'দিন ধরে ভাল নেই। থাকবে কি করে! এখানকার ধুলো, ধোঁয়া, ভীড় গোলমালে শরীর মন দুইই খারাপ করে। কথা বলার একটা লোক নেই। ছেলেরা সারাদিন যে যার ধান্দায় ঘোরে। রায়-গিন্নী, অনুরাধা, সংসারের কাজে ব্যস্ত। বিপিনও কেমন বোবা হয়ে গেছে। সারাদিন তাঁর খাটের পাশে বসে থাকে, হাত-পাখা নেড়ে হাওয়া দেয়, বিছানা-পত্তর পরিষ্কার করে, মাঝে মাঝে তামাক সেজে আনে। সকালে শালিখরের পেছন পেছন থলে হাতে বাজারে যায়। প্রথম কিছুদিন বিকেলে রায়-মশাইর সঙ্গে পার্কে গিয়ে বসতো। তাও আজকাল আর যায় না রায়-মশাই। এতলোক আশে-পাশে, হাজার মানুষের ভীড় ট্রামে-বাসে-রাস্তায়-পার্কে, অথচ একটাও চেনা মুখ সহজে চোখে

পড়ে না। নমস্কার দেওয়া দূরে থাকুক ডেকেও জিজ্ঞেস করে না কেউ। মানুষের ভীড়ের মধ্যে এমন নিরালা ভাবে হাঁটতে আরো খারাপ লাগে, তাই আজকাল বিকেলের দিকে বাইরে যাওয়াও ছেড়ে দিয়েছেন।

শুধু দেবানী এসে সন্ধ্যাবেলা কিছু সময় সেতার নিয়ে বসে, রাগ-রাগিনীর আলাপ শোনায়। ওইটুকুই যা সান্ত্বনা। তাও আজকাল আর বেশী সময় বসতে চায় না। সামনে পরীক্ষা, পড়াশোনার চাপ। এখন বসতে গেলে বিপিনই একমাত্র কাছের মানুষ। মাঝে মাঝে কাশীরাম দাসের মহাভারত খানা সুর করে পড়েন, বিপিন চুপচাপ শোনে আর হাওয়া দেয়। সন্তও সহজে ধারে কাছে আসতে চায় না। এখানে সঙ্গী-সাথী অনেক জুটেছে। মাঝে মাঝে মায়ের ধমক খেয়ে দুপুর বেলায় দাদুর মাথার কাছে বসে পাকাচুল তুলে দেয়। আগে রেট ছিল দশটা চুল তুললে একপয়সা পাবে। কিন্তু উঠে যাবার জন্য উসখুস করে বলে রেট বাড়ানো হয়েছে। এখন পাঁচটায় একপয়সা।

তাও চালাকি করে, ভীষণ চালাক হয়েছে।

রায়-মশাইর চোখে ঘুম জড়িয়ে এলেই, একটা চুল তিনবার তুলে হিসেবে গোঁজামিল দেয়।

সন্ধ্যা ঘন হয়ে আসে। জানালার মাথায় একফালি আকাশে অন্ধকার নামল। এখন হয়তো নীলমাধবের মন্দিরে সন্ধ্যার আরতি শুরু হয়েছে। মাধব ভট্টাচার্য হয়তো পঞ্চ-প্রদীপ ঘোরাচ্ছেন। রায়-মশাই যেন চোখ বুজে স্পষ্ট দেখতে পেলেন, প্রদীপের আলোয় নীলমাধবের সোনার বাঁশী চিকচিক করে, সোনার মুকুট, রাধার অলঙ্কার ঝলমল করে, পেছনের দেয়ালে সোনার সিংহাসনের অন্ধকার ছায়া, প্রদীপ ঘোরানোর সঙ্গে সঙ্গে এপাশে ওপাশে দুলতে থাকে।

সামনে শ্রীপঞ্চমী। পানশীতলার পুকুরের ওপাড়ে শিরিষ গাছের চূড়োয় সন্ধ্যাতারাটি স্পষ্ট হয়ে আছে। আর কি সেই দিন ফিরে পাবেন, আবার কি ফিরে যেতে পারবেন নীলমাধবের কাছে। রায়-মশাইর চোখের কোণে বোধহয় জল জমে এসেছিল, মেয়ের ডাক শুনে চট করে চোখ মুছে তাকালেন।

দেবানী ডাকল—"বাবা, ছেলেরা তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।"

—"কোন ছেলেরা!"—রায়-মশাই সোজা হয়ে উঠে বসলেন।

—"এই যে আমরা।"—তিন চারটি ছেলে হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়ল। সকলের সামনে শ্রীনাথ কবিরাজের পালোয়ান ছেলে। শৈলেশের বন্ধু-বান্ধব সব। সে ভেতরে আসেনি, বাপের মুখোমুখি সহজে আসতে চায় না।

বন্ধুদের সামনে দিয়ে কথাবার্তা শোনার জন্য দরজার আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে আছে। —"আমরা এসেছিলাম সরস্বতী পুজোর চাঁদা নিতে।"—কবিরাজ মশাইর ছেলে খাটের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

—"কি নাম তোমার!"

—"আজ্ঞে আমার নাম সুধীর।"

—"শুধু সুধীর কেন, উপাধি বল, বাবার নাম বল।"

—"আমার নাম সুধীরচন্দ্র সেন, বাবার নাম শ্রীনাথচন্দ্র সেন। আমাকে চেনেন না!"

"ও, কবিরাজ মশাইর ছেলে তুমি, তোমাদের অনেকেরই মুখ চিনি, সকলের নামতো জানি না।"

একটু সময় চুপচাপ। খানিকক্ষণ কি যেন ভেবে রায়-মশাই ধীরে ধীরে বললেন—"একটা কথা কি জানো বাবা, বারোয়ারী পুজোয় আমরা কোন দিন চাঁদা দিইনি। যতদিন সামর্থ্য ছিল, নিজেদের বাড়ীতে পুজো করেছি, গাঁয়ের সবাইকে ডেকে এনে প্রসাদ দিয়েছি। আর এখানকার বারোয়ারী পুজো মানেই পাঁচজনের ব্যাপার। শুদ্ধাচার বিচারের কোন বালাই থাকে না, ছোঁয়াছুঁয়ির কোন বাছ-

বিচার নেই, মুখ উদ্দেশ্য হ'ল পাঁচজনে মিলে একটু আমোদ-স্ফূর্তি করা, পূজোর অনুষ্ঠানতো গৌণ।"

কথার মধ্যে তাচ্ছিল্যের ভাবটা স্পষ্ট হয়ে উঠল—"এ সব ব্যাপারে কোন দিন চাঁদা দিইওনি, দেবার ইচ্ছেও নেই।"

—"সে কি, আপনি চাঁদা দেবেন না।"—চারজোড়া চোখের বিস্ময় রায়-মশাইকে যেন বিঁধে ফেলল।

—"দুটো মোড়া মিষ্টি খেতে দিতে পারো, তবে তোমাদের ওই চাঁদার খাতায় আর নামটা লিখো না।"

এমন অদ্ভুত কথা কখনো শোনেনি তারা।

কবিরাজ মশাইর ছেলে বোধহয় চটে গেল, একটু চড়া গলায় বললো—"আপনি আমাদের ভিক্ষে দিচ্ছেন নাকি!"

সর্বেশ্বর রায় বোধহয় এই জীবনে প্রথম তার ছেলের বয়সী কারো মুখ থেকে এমন চড়া গলার চোখা কথা শুনলেন। কিন্তু না, আর একবার শুনেছিলেন সেই বেনাপোল ষ্টেশনে। বিস্ময়ে তিনি বোকা হয়ে রইলেন।

দেবানী উদ্বেগের চোখে, শুকনো মুখে তাকিয়েছিল। দরজার আড়ালে শৈলেশর ভয়ে কাঁটা হয়েছিল।

রায়-গিন্নী পাশের ঘর থেকে সব শুনতে পেয়েছিল, তাড়াতাড়ি এঘরে এসে বললেন—"তোমরা সব এদিকে শুনে যাওতো, বাবা।"

ছেলেদের তিনি পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন।

দেবানী আর শৈলেশ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

(ক্রমশঃ)

খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই

গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.	
শ্রীগীতা	৬·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	৫·০০
ভারত-আত্মার বাণী	৫·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
কর্মবাণী	১·২৫
Soul of India Speaks	5·00
শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ. বি. টি.	
বিদ্যাসাগর	২·৫০
মানুষের মত মানুষ	·৬২
শিশু রামায়ণ	·৬২
শিশু মহাভারত	·৭৫

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.	
বাংলার ঋষি	৩·০০
বাংলার মনীষী	১·২৫
বাংলার বিদুষী	২·০০
বীরত্বে বাঙালী	১·৫০
ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৩·০০
রাজর্ষি রামমোহন	১·০০
রবীন্দ্রনাথ	১·০০
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১·২৫
আচার্য জগদীশচন্দ্র	১·৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০

॥ প্রতিটি বই বহুচিত্র শোভিত ॥

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী :: ১৫ কলেজ স্কোয়ার :: কলিকাতা—১২

নিত্যধর্ম ও ক্ষুদ্রধর্ম

কাজী আবদুল ওদুদ

'সতী' রবীন্দ্রনাথের খুব একটী শক্তিশালী কবিতা। যেমন গান্ধারীর আবেদন—এ তেমনি এই 'সতী' নাটিকাটিতে কবির ধর্ম বোধ এক অসাধারণ রূপ পেয়েছে।

একটি মারাঠি কাহিনী অবলম্বনে এটি লেখা, সেই কাহিনীটি এই :

বিনায়ক রাও-এর কন্যা অম্বাবাই-এর বিবাহের আয়োজন হয়েছে, সকলে বরের আগমনের প্রতীক্ষা করছে, এমন সময়ে মশাল জ্বালিয়ে বাজনা বাজিয়ে বহু শিবিকায় সদলবলে উপস্থিত হল বিজাপুর রাজসভার জনৈক মুসলমান সভাসদ এবং অম্বাবাইকে হরণ করে মুহূর্তে তারা অন্তর্হিত হলো। অম্বাবাই-এর বাগদত্ত বর জীবাজি এর পর সভায় উপস্থিত হয়ে বরে কেমন করে তার শিবিকা মশাল বর-পরিচ্ছদ সবই দস্যুদল কেড়ে নিয়েছে। সেই রাতে বিনায়ক রাও ও জীবাজি হোমাগ্নি স্পর্শ করে এই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, সেই দস্যুর রক্তপাতে এর প্রতিশোধ নেবেন।

বহুদিন পরে অম্বাবাই-এর সেই অপহারকের, সঙ্গে বিনায়করাও ও জীবাজির যুদ্ধক্ষেত্রে দেখা হোলো এবং যুদ্ধে সেই অপহারক ও জীবাজি দুই জনই নিহত হলো। সেই যুদ্ধক্ষেত্রেই বিনায়ক-রাও ও তাঁর স্ত্রী রমাবাই-এর সঙ্গে তাঁদের কন্যা অম্বাবাই-এরও দেখা হলো। এই তিন জনের কথাবার্তা, তাঁদের চিন্তা ও আচরণের ঘাত-প্রতিঘাত, এই কবিতাটির বিষয়। অম্বাবাই বিনায়ক রাওকে পিতা বলে সম্বোধন করলে। কিন্তু বিনায়ক রাও ক্রুদ্ধ হয়ে বল্লেন :

পিতা! আমি তোর পিতা! পাপীয়সী
স্বাতন্ত্র্যচারিণী। বন্ধনের গৃহে পশি
ছেদ্মবলে ছিলি বালা কুল কলঙ্কিনী
আমি তোর পিতা।

অম্বাবাই বল্লেন :

অন্যায় সমরে জিনি
বহুস্তে বধিলে তুমি, পতিরে আমার,
হায় পিতা, তবু তুমি পিতা! বিধবার—
অশ্রুপাতে পাছে লাগে যাহা অভিশাপ
তব শিরে, তাই আমি দুঃসহ সন্তাপ
রুদ্ধ করি রাখিয়াছি এ বক্ষ পঞ্জরে।
তুমি, পিতা, আমি কন্যা, বহুদিন পরে
হয়েছে সাক্ষাত দোঁহে সমর-অঙ্গনে
দারুণ নিশীথে। পিত, প্রণমি চরণে
পদধূলি তুলি শিরে লইব বিদায়—
আজ যদি নাহি পার ক্ষমিতে কন্যায়
আমি তবে ভিক্ষা মাগি বিধাতার ক্ষমা
তোমা লাগি পিতৃদেব।

অম্বাবাই-এর এই কথা বিনায়ক রাও এর হৃদয় স্পর্শ করলো, তিনি বল্লেন :

কোথা যাবি অম্বা
ধিক অশ্রু জল। ওরে দুর্ভাগিনী নারী
যে বুকে বাঁধিলি নীড় ধর্ম না বিচারি

সে তো বজ্রাহত দগ্ধ, যাবি কার কাছে
ইহকাল—পরকাল-হারা ?

অমাবাই বলে : পুত্র আছে—

বিনায়ক রাও তাকে বাধা দিয়ে বলেন :

থাক পুত্র। ফিরে আর চাসনে পশ্চাতে
পাতকের ভগ্নশেষ পানে। আজ রাতে
শোণিত তর্পণে তোর প্রায়শ্চিত্ত শেষ
যবনের গৃহে তোর নাহিক প্রবেশ
আর কভু। বল্ তবে কোথা যাবি আজ ?

পিতার এমন কঠোরতায় অমাবাই বলে : পিতা থেকে স্নেহময় যে মৃত্যু নেতো আছে, তার মুক্ত দ্বারে আশ্রয় প্রার্থনা করে কেউ ফিরে যায় না। অমাবাই-এর কথায় বিনায়ক রাওএর মন নরম হলো, তিনি বলেন :

মৃত্যু ? বৎসে হায়দুরুহ ! পরম পাবক
নির্মল উদার মৃত্যু—সকল পাতক
করে গ্রাস—সিন্ধু যথা সকল নদীর
সব পঙ্করাশি। সেই মৃত্যু সুগভীর
তোর মুক্তি পতি।

কিন্তু মৃত্যুর সময় তো তোর আসেনি। বরং চল সদ্য স্বজন আর সক্রোধ-সমাজ এদের পরিত্যাগ করে আমরা দূর তীর্থে-গিয়ে বাস করি।

যেথা গঙ্গাতীরে
নবীন নির্ম্মল বায়ু—স্বচ্ছ পুণ্য নীরে
তিন সন্ধ্যা স্নান করি নির্জন কুটিরে
শিব শিব শিব নাম জপি শান্ত মনে,
সুদূর মন্দির হতে সায়াহ্ন পবনে
শুনিয়া আরতি ধ্বনি,—এক দিন কবে
আসু সেবে মৃত্যু তোরে.লইবে নীরবে,
পতিত কুসুমে সরে পদ্ম ধুয়ে তার—
গঙ্গা যথা দেয় তারে পূজা উপহার
সাগরের পদে।

অমাবাই বলে আমার ছেলে আছে তার কি হবে।

বিনায়ক রাও বলেন :

তার কথা
দূর কর। অতীত-নির্মুক্ত-পবিত্রতা
ধৌত করে দিক তোরে। সদ্য শিশু-সম
আরবার আয় বৎসে পিতৃকোলে মম
বিস্মৃতি মাতার গর্ভ হতে। নব দেশে
নব তরঙ্গিনী তীরে, শুভ্র হাসি হেসে
নবীন কুটিরে মোর জ্বালাবি আলোক
কন্যার কল্যাণ করে।

অমাবাই বলে :

জলে পড়ি শোক
বিশ্ব হেরি ছায়াসম, তোমাদের কথা
দূর হতে আনে কানে ক্ষীণ অস্ফুটতা,
পশে না হৃদয় মাঝে। ছেড়ে যাও মোরে
ছেড়ে যাও। পতিরক্তসিক্ত স্নেহ-ডোরে
বেঁধো না আবার।

বিনায়করাও দুঃখিত হয়ে বলেন : কন্যা পিতার নয় সে তো সত্য কথা, যে ফুল শাখা থেকে পড়ে গেছে সে আর শাখায় ফিরে যায় না।

কিন্তু যে শুধাই তোরে কারে ক'স পতি
লজ্জাহীনা। কাড়ি নিল যে ম্লেচ্ছ দুর্মতি
জীবাজির প্রসারিত বরহস্ত হতে
বিবাহের রাত্রে তোরে বক্ষিয়া কপোতে
যেন যথা লয়ে যায় কপোত বধূরে।
আপনার ম্লেচ্ছ-নীড়ে – সে দুষ্ট দস্যুরে
পতি ক'স তুই। সে রাত্রি কি মনে পড়ে—
... ... সে দারুণ রাতে

হোমাগ্নি করিয়া স্পর্শ—জীবাজির সাথে
প্রতিজ্ঞা করিনু আমি—শস্যরক্ত গাতে
লব তার প্রতি-শোধ। বহুদিন পরে
হয়েছি সে পণমুক্ত। নিশীথ সমরে
জীবাজি ত্যজিয়া প্রাণ বীরের সদ্গতি
লভিয়াছে। রে বিধবা, সেই তোর পতি
দস্যু সে তো ধর্ম্মনাশী।

এতে অমাবাই অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে বলে :

ধিক্ পিতা ধিক্।
বধেছ পতিরে মোর—আরো মর্ম্মান্তিক
এই মিথ্যা বাক্যশেল। তব ধর্ম কাছে
পতিত হয়েছি, তবু মম ধর্ম আছে
সমুজ্জ্বল। পত্নী আমি নহি সেবা দাসী।
বরমাল্যে বরেছিনু তাঁরে ভালবাসি
শ্রদ্ধাভরে, ধরেছিনু পতির সন্তান
গর্ভে মোর, বলে করি নাই আত্মদান।
মনে আছে দুই পত্র এক দিন রাতে
পেয়েছিনু অন্তঃপুরে গুপ্তদূতী হাতে।
তুমি লিখেছিলে শুধু "হানো তারে ছুরি"
মাতা লিখেছিল, "পত্রে কিবা দিনু পুরি
করো তাহা পান।" যদি বলে পরাজিত
অসহায় সতীধর্ম কেহ কেড়ে নিত
তা'হলে কি এতদিন হত না পালন
তোমাদের সে আদেশ? হৃদয় অর্পণ
করেছিনু বীর পদে। যবন ব্রাহ্মণ
সে ভেদ কাহার ভেদ? ধর্মের সে নয়
অন্তরের অন্তর্যামী যেথা জেগে রয়—
সেথায় সমান মোহে। মাঝে মাঝে তবু
সংশয় উঠিত জাগি—কোন দিন কভু
নিগূঢ় ঘৃণায় যেন শিরায় অধীর
হানিত বিদ্যুত-কম্প—অবাধ্য শরীরে
সঙ্কোচে কুঞ্চিত হত; কিন্তু তারো পরে
সত্যের হয়েছে জয়ী; পূর্ণ ভক্তি ভরে
করেছি পতির পূজা, হয়েছি যবনী
পবিত্র অন্তরে; নহি পতিতা রমণী;
পরিতাপে অপমানে অবনত শিরে
মোর পতিধর্ম হতে নাহি যাব ফিরে
ধর্মান্তরে অপরাধী সম।

এমন আন্তরিক পরধর্ম প্রীতি জগতের সাহিত্যে কমই লাভ করেছে। বাংলা সাহিত্যে এ ক্ষেত্রে একটি উল্লেখ-যোগ্য রচনা হচ্ছে কবির অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অশ্রুমতী নাটক। বাদশাহ আকবরের পুত্র সেলিম ও রাণা প্রতাপের কন্যা অশ্রুমতী এদের পরস্পরের প্রতি অনুরাগ একান্ত হৃদয়গ্রাহী করে আঁকা হয়েছে তাতে। নাটকখানির বিরুদ্ধে সেদিন রাজস্থান থেকে প্রবল প্রতিবাদ উঠছিল। এই "সতী" অবশ্য অশ্রুমতীর চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী রচনা।

অমাবাইয়ের কথা শেষ না হতেই তার মাতা রমাবাইকে ছুটে আসতে দেখা গেল। তাঁকে দেখে বিস্মিত হয়ে অমাবাই বলে :

একী একী—
নিশীথের উল্কাসম এ কাহারে দেখি
ছুটে আসে মুক্ত কেশে
জননী আমার
কখনো যে দেখা হবে এ জনমে আর
দিন ভাবি নাই মনে। মাগো, মা জননী,
দেহ পদ ধূলি।

রমাবাই বলে উঠলেন।

ছুঁসনে যবনী
পাতকিনী।

অম্বাবাই বল্লেন :

কোন পাপ নাহি মোর দেহে
নিষ্পাপ তোমারি মতো।

রুমাবাই বল্লেন

যবনের দেহে
কার কাছে সমর্পিলি ধর্ম আপনার ?

অম্বাবাই বল্লে

পতি কাছে।

রুমাবাই বল্লে :

পতি ! ম্লেচ্ছ, পতি সে তোমার ?
জানিস কাহারে বলে পতি ! নষ্ট মতি,
ভ্রষ্টাচার ! রমণীর সে যে এক গতি
এক মাত্র ইষ্টদেব। ম্লেচ্ছ মুসলমান,
ব্রাহ্মণ কন্যার পতি ! দেবতা সমান !

অম্বাবাই বল্লে :

উচ্চ বিপ্রকুলে জন্মি তবুও যবনে
ঘৃণা করি নাই আমি, কায়বাক্যমনে
পূজিয়াছি পতি বলি, মোরে করে ঘৃণা
এমন সতী কে আছে ? নহি আমি হীনা
জননী তোমার চেয়ে—হবে মোর গতি
সতীস্বর্গ লোকে।

তখন রুমাবাইর বিস্ময়ের অবধি রইল না। তিনি কন্যাকে বল্লেন :

সতী তুমি।

অম্বাবাই বল্লে :

আমি সতী।

রুমাবাই বল্লেন :

জানিস মরিতে অসংকোচে ?

অম্বাবাই বল্লে :

জানি আমি।

রুমাবাই তখন বল্লেন :

তবে জাল চিতানল। ওই তোর স্বামী
পড়িয়া সমর ভূমে।

অম্বাবাই বল্লে :

জীবাজিকে আমার স্বামী বলছ !

রুমাবাই বল্লেন :

হাঁ জীবাজি।
বাগদত্ত পতি তোর। তারি ভস্মে আজি
ভস্ম মিলাইতে হবে। বিবাহ রাত্রির—
বিফল হোমাগ্নিশিখা শ্মশান ভূমির
ক্ষুব্ধিত চিতাগ্নিরূপে উঠেছে জাগিয়া
আজি রাতে সে রাত্রির অসমাপ্ত ক্রিয়া
হবে সমাপন।

এতক্ষণে বিনায়ক রাও এর ক্রোধ প্রশমিত হয়েছে। তিনি তাঁর কন্যার মনের নূতন ভাব পুরোপুরি বুঝতে পেরে বল্লেন :

যাও বৎস যাও ফিরে
তব পুত্র কাছে, তব শোকতপ্ত নীড়ে।
দারুণ কর্তব্য মোর নিষ্পন্ন করিয়া
করেছি পালন—যাও তুমি।

পত্নীর দিকে ফিরে বল্লেন :

বৃথা করিতেছ ক্ষোভ। যে নব শাখারে
আমাদের বৃক্ষ হতে কঠিন কুঠারে
ছিন্ন করি নিয়ে গেল বনান্তর ছায়ে
সেবা যদি বিশীর্ণা সে ধূলিত শুকায়ে
অগ্নিতে দিতাম তারে ; সে যে ফুলেফলে
নব প্রাণে বিকশিত, নব নব মূলে
নূতন মৃত্তিকা ছেয়ে। সেবা তার প্রীতি
সেবাকরে ধর্ম তার, সেবা করে রীতি

অন্তরের যোগ সূত্র ছিঁড়েছে যখন
তোমার নিরদপাশে নির্জীব বন্ধন
ধর্ম্মে বাঁধিছে না তারে বাঁধিতেছে বলে
ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও।

মনে কোন ক্ষোভ না রেখে কন্যাকে তিনি বলেন স্বধর্মনিষ্ঠা হতে, কেন না তিনি ব্রাহ্মণ, তিনি জানেন মানবজীবনের চরম লক্ষ্য এক, কিন্তু সেই লক্ষ্যে পৌঁছাবার পথ বহু—

যাও বৎস চলে
যাও তব গৃহকর্মে ফিরে—যাও তব
স্নেহ প্রীতি জড়িত সংসারে—অভিনব
ধর্মক্ষেত্র মাঝে।

পর ধর্ম প্রীতির কথা বলা অনেকটা সোজা, কিন্তু কাজে দেখানো সোজা নয় আদৌ বিশেষত এমন সঙ্কটাপন্ন ক্ষেত্রে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিনায়করাও সর্বান্তঃকরণে সেই পরধর্ম প্রীতি দেখালেন। পত্নীকে তিনি বলেন :

এস প্রিয়ে মোরা দোঁহে
চল যাই তীর্থধামে কাটি যাহা মোহে
সংসারের দুঃখ-সুখ চক্র আবর্তন
জাপ করি—

কিন্তু রমাবাই নারী, নিত্য ধর্মের কূটতা তিনি তেমন জানেন না যেমন জানেন লোক ধর্মের কথা। তা ছাড়া তাঁর কন্যার নামে অপযশ রটেছে, সে অপযশ কিসে ঘোচানো যায় সেই দিকেই তাঁর দৃষ্টি, তিনি বলেন :

তার আগে করিব ছেদন
আমার সংসার হতে পাপের অঙ্কুর
যতগুলি জন্মিয়াছে। করি যাব দূর
আমার স্বর্গের লক্ষ্য। কন্যার কুযশে
মাতার সতীত্বে যেন কলঙ্ক না পরশে।
অনলে অসার সব যে কলঙ্ক কালি
তুলিব উজ্জ্বল করি চিতানল জ্বালি।
সতী খ্যাতি রটাইব দুহিতার নামে
সতী মঠ উঠাইব এ শ্মশান ধামে
কন্যার ভস্মের পরে

তখন অমাবাই তার মাকে বুঝিয়ে বলে

ছাড়ো লোক লাজ
লোক খ্যাতি,—হে জননী এ নহে সমাজ
এ মহা শ্মশান ভূমি। হেথা পুণ্য পাপ
লোকের মুখের বাক্যে করিবেনা মাপ
সত্যেরে প্রত্যক্ষ করো মৃত্যুর আলোকে।
সতী আমি। ঘৃণা যদি করে মোরে লোকে
তবু সতী আমি। পরপুরুষের সনে
মাতা হয়ে বাঁধ যদি মৃত্যুর মিলনে
নির্দোষ কন্যারে—লোকে তোরে ধন্য করে
কিন্তু মাতা নিত্যকাল অপরাধী রবে
শ্মশানের অধীশ্বর পদে।

কিন্তু কোনো কথা বুঝবার মতো অবস্থা রমাবাই এর নয়। তাঁর এক মাত্র কথা তাঁর কন্যার কুযশ মুছে গিয়ে সুযশ রটুক। তিনি আদেশ করলেন

জ্বালো চিতা
সৈন্যগণ। ঘেরো আসি বর্শীনীরে।

অমাবাই নিরুপায় হয়ে পিতার শরণাপন্ন হলো। পিতা তাকে অভয় দিলেন। দুঃখিত হয়ে তিনি বলেন :

যেই হস্তে তোরে
বক্ষে বেঁধে রেখেছিনু কে জানিত ওরে
ধর্মেরে করিতে রক্ষা, দোষীরে দণ্ডিতে
সেই হস্তে এক দিন হইবে খণ্ডিতে
তোমারি সৌভাগ্য সূত্র হে বৎসে আমার।

কিন্তু তিনি তাঁর কর্তব্য স্থির করে ফেলেছিলেন, বলেন

কুলা আচার বিচার—
পুত্র সঙ্গে মোর সাথে আর মোর মেয়ে
আমার আপন ধন। সমাজের চেয়ে
হৃদয়ের নিত্যধর্ম সত্য চিরদিন।
পিতৃস্নেহ নির্বিচারে বিকার বিহীন
দেবতার দানসম,—আমার কন্যারে
সেই শুভ স্নেহ হতে কে বঞ্চিতে পারে
কোন শাস্ত্র, কোন লোক, কোন সমাজের
মিথ্যা বিধি তুচ্ছ ভয় ?

অমাবাই পিতার সঙ্গে চলে যাচ্ছিলো। কিন্তু রমাবাই বাধা দিয়ে বলেন :

রে পাপিষ্ঠে, ঐ দেখ তোর লাগি প্রাণ
যে দিয়েছে বনফুলে—তার প্রাণ দান
নিষ্ফল হবে না, তোরে লইবে সে সাথে
বরবেশে ধরি তোর মৃত্যুপুত হাতে
সুদূর স্বর্গ মাঝে।

সৈন্যদের তিনি আদেশ করলেন (অমাবাইকে যে তার ঘরে নেওয়া যাবে না সহজেই একথা তিনি বুঝিয়ে দিলেন)

শুন, যত আছ বীর
তোমরা সকলে ভক্ত কুল জীবাজির—
এই তাঁর বাসগৃহ বধূ—চিতানলে
দিলন ঘটায়ে দাও মিলিয়া সকলে
প্রভুকৃত্য শেষ করো।

সৈন্যগণ তখন চীৎকার করে উঠলো "ধন্য পুণ্যবতী" এবং অমাবাইকে জোর করে চিতায় তুলতে গেল।

বিনায়ক রাও বলেন :

ছাড় তোরা

সৈন্যগণ বলে :

যিনি এ নারীর পতি
তাঁর অভিলাষ মোরা করিব পূরণ

বিনায়করাও বলেন :

পতি এর স্বর্গবাসী যবন।

বিনায়ক রাও এর এমন কথা শুনে সেনাপতি বলে :

সৈন্যগণ,
বাঁধো বৃদ্ধ বিনায়কে।

তখন অমাবাই ঘাতককে বলে, পাপীয়সী, পিশাচিনী।

রমাবাই চীৎকার করে বলে :

মূঢ় তোরা কি করিস বসি।
বাজা বাদ্য কর্ জয় ধ্বনি।

সৈন্যগণ জয় ধ্বনি করে অমাবাইকে ধরে চিতায় তুললো।

রমাবাই বলেন :

বটী বিশ্বময়
সতী অমা।

তখন অমাবাই জগতির পতির কাছে নিবেদন করলে :

জাগো জাগো জাগো ধর্মরাজ
শ্মশানের অধীশ্বর জাগো তুমি আজ।
হেরো তব মহারাজ্যে করিছে উৎপাত
ক্ষুদ্র শত্রু—জাগো তারে করো বজ্রাঘাত
দেব দেব তব নিত্য ধর্মে করো জয়ী
ক্ষুদ্র ধর্ম হতে।

যেমন "বন্দী বীরে" তেমনি এই সতী কবিতায় অতি ঘোর নৃশংসতার চিত্র কবি এঁকেছেন—অবশ্য কর্তব্য বোধে বন্দীবীরে যেমন বিজয়ী মোগল পক্ষের বিচারকের নির্মম দর্পের চিত্র তিনি এঁকেছেন সতীতে তেমনি তিনি এঁকেছেন অমাবাই এর (এবং তাঁর নিজেরও) আপনার লোকদের ভ্রান্তিবহ বিচার মূঢ়তার চিত্র, কেন না তিনি সত্যদ্রষ্ট, তিনি জানেন ক্ষুদ্র দেশ-ধর্ম ও জাতি ধর্মের ঊর্ধ্বে স্থান হওয়া চাই নিত্য ধর্মের।

"তব নিত্য-ধর্মে কর জয়ী ক্ষুদ্র ধর্ম হতে"

কবির এক অপূর্ব প্রার্থনার ধ্বনি এই কাব্যে। রবীন্দ্রনাথের এই নিত্যধর্ম বোধ ও তার এমন অপূর্ব চিত্রণ জগতের সাহিত্যে এক শ্রেষ্ঠ কীর্তি—হয়তো বা অদ্বিতীয় কীর্তি।

চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ

শ্রীত্রিপুরা শঙ্কর সেন

ভারতবর্ষে সন্ন্যাসের দুইটি আদর্শ আছে, একটি ব্যষ্টি-মুক্তির আদর্শ, আর একটি সমষ্টি-মুক্তি বা মানব-কল্যাণের আদর্শ। দেশে কেহ প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছেন 'আত্মনো মোক্ষার্থং' আর কেহ করিয়াছেন 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'। অবশ্য যাহারা মুক্তিকামী বা মুমুক্ষু, তাঁহারাও পরোক্ষে বিশ্বের হিতসাধন করেন কিন্তু যাঁহারা জগতের কল্যাণকামী সন্ন্যাসী, তাঁহারাই বিশেষ ভাবে আমাদের বরেণ্য। কর্ম্ম-সন্ন্যাস ইঁহাদের আদর্শ নহে, কর্ম্মযোগই ইঁহাদের আদর্শ। ইঁহারাই দুরিদাতা, কেননা, ইঁহারা মানুষকে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ, 'অভয়' দান করিয়া থাকেন। ইঁহাদিগকে বক্ষে ধারণ করিয়াই জননী বসুন্ধরা ধন্যা হন। স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন এইরূপ একজন মানব-প্রেমিক সন্ন্যাসী। কিন্তু তাঁহার মধ্যে বিশ্বজনীন উদার প্রেমের সঙ্গে ক্ষুরধার বুদ্ধি ও তীক্ষ্ণ মনীষার এক অপূর্ব্ব সমন্বয় ঘটিয়াছিল। কিন্তু এ কথাও সত্য যে তাঁহার মধ্যে যদি প্রবল ধর্ম্মজিজ্ঞাসা জাগ্রত না হইত, তাহা হইলে তিনি সত্যকে উপলব্ধি করিতে পারিতেন না। জিজ্ঞাসু নরেন্দ্রনাথের জীবনে ধীরে ধীরে যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সান্নিধ্যলাভের ফলে, উহা স্বাভাবিক নিয়মেই ঘটিয়াছিল এবং নরেন্দ্রনাথ নবজন্ম লাভ করিয়াছিলেন স্বামী বিবেকানন্দরূপে। এই জন্য গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন, 'জিজ্ঞাসু জন ভাগ্যবান, কারণ, সেও আমার ভজনা করে'।

আমরা এখানে মনস্বী বিবেকানন্দের চিন্তাধারার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

ভগীরথ যেমন তপস্যার দ্বারা গঙ্গার পাবনী ধারাকে স্বর্গ হইতে মর্ত্যে আনয়ন করিয়াছিলেন, স্বামিজীও তেমনি বেদান্ত-দর্শনকে কঠিন তপোবন বা সন্ন্যাসীর আশ্রম হইতে গৃহস্থের গৃহ-প্রাঙ্গনে আনয়ন করিয়াছিলেন। বেদান্তদর্শনকে বিশেষ ভাবে আচার্য্য শঙ্করের প্রবর্ত্তিত অদ্বৈতবাদকে কি ভাবে ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করা যায়, স্বামিজী সেই শিক্ষাই আমাদিগকে দিয়াছিলেন। বেদান্তের বাণী কি? আমি নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত চৈতন্য স্বরূপ, আমার জন্ম নাই, মরা নাই, ব্যাধি নাই, মৃত্যু নাই, ইহাই বেদান্তের বাণী। 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম,' ইহাই বেদান্তের বাণী। স্বামিজী বলেন, বেদান্ত আমাদের আত্ম-প্রত্যয়কে জাগ্রত করিয়া আমাদিগকে জীবন সংগ্রামে জয়ী করে। বেদান্ত আমাদের আস্তিক্য-বুদ্ধিকে জাগ্রত করে। স্বামিজী বলিয়াছেন,—যে আপন আত্মার মহিমায় বিশ্বাস করে না, সেই তো নাস্তিক। আর যে নাস্তিক, সেই ভীরু। বেদান্ত আমাদিগকে সেই ধর্ম্মই শিক্ষা দেয়, যে ধর্ম্ম সম্পর্কে গীতার ভাষায় বলা যায়—'স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।'

দ্বিতীয়ত, স্বামিজী বেদান্তের মহাবাক্যকে শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়াছেন, তাই তিনি বলিয়াছেন, 'প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে পূর্ণতা আছে, তাহাকে পরিস্ফুট করিয়া তোলাই শিক্ষার আদর্শ'। 'Education is the manifestation of the perfection already in man'। বেদান্তের আত্মোকে

স্বামিজী ধর্মেরও নূতন সংজ্ঞা দিয়াছেন। 'আমাদের মধ্যে যে দেবত্ব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, উহার বিকাশ সাধনই ধর্ম'। 'Religion is the manifestation of the divinity already in man'। তাই স্বামিজী কাহাকেও নেতিমূলক শিক্ষা বা negative suggestion দিতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—প্রত্যেক মানুষকে শুনাইতে হইবে, তুমি নিরঞ্জন:, প্রত্যেককে বলিতে হইবে, ভাই, তুমি ভাল কিন্তু তোমাকে আরও ভাল হইতে হইবে।

তৃতীয়ত, কর্মযোগের একটা নূতন সূত্র স্বামিজী আমাদিগকে শিখাইয়াছেন। তিনি বলেন, আমরা বাস্তবিক পক্ষে জগতের কোন উপকারই করিতে পারি না। কিন্তু পরের কল্যাণ প্রচেষ্টায় আমাদের নিজেদের চিত্তশুদ্ধি হয়।

চতুর্থত, স্বামিজী দেশবিদেশের ইতিহাসের উপর নূতন আলোকপাত করিয়াছেন। তিনি দৃষ্টান্ত সহযোগে এই কথাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র যথাক্রমে পৃথিবী শাসন করে। তিনি যে তরুণ ভারতের স্বপ্ন দেখিয়াছেন, সেখানে শূদ্র প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি এই সাবধান-বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন ভারত যদি কখনও ধর্মকে বিসর্জন দেয় বা অন্ধভাবে অপর দেশের অনুসরণ করে, তবে তাহার ধ্বংস সুনিশ্চিত।

'বর্তমান ভারত' নামক পুস্তিকায় স্বামিজী ব্রাহ্মণ-প্রভুত্ব, ক্ষত্রিয়-শাসন, বৈশ্য রাজত্ব ও শূদ্র প্রাধান্যের গুণ ও দোষ সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার কোন কোন উক্তি পাঠ করিলে মনে হয়, তিনিও প্লেটো বা মূরের ন্যায় স্বপ্নদ্রষ্টা ছিলেন। এইরূপ একটি উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি।

'যদি এমন একটি রাষ্ট্র গঠন করিতে পারা যায়, যাহাতে ব্রাহ্মণত্বের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের সভ্যতা, বৈশ্যের সম্প্রদারণ-শক্তি এবং শূদ্রের সাম্যের আদর্শ—এই সবগুলি ঠিক ঠিক বজায় থাকিবে অথচ এদের দোষগুলি থাকিবে না, তাহা হইলে তাহা একটি আদর্শ রাষ্ট্র হইবে'। (স্বামী বিবেকানন্দ বাণী, পৃষ্ঠা ২১৮)

এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, স্বামিজীর স্বপ্ন-দর্শনের মূলে ছিল গভীর স্বদেশপ্রেম। আর এক হিসাবে মহাপুরুষ মাত্রেই তো স্বপ্নদ্রষ্টা। ভগবান বুদ্ধ স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তিনি মানুষমাত্রকেই নির্বাণ বা অমৃতত্বের সন্ধান দিবেন। ভগবান ঈশা স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তিনি পৃথিবীতে স্বর্গ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিবেন। রাজনীতির ক্ষেত্রে নেতাজী এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, যেখানে প্রত্যেকটি নরনারী স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইবে। বিধাতার সৃষ্টিতে একমাত্র মানুষই বোধ হয় স্বপ্ন দেখে, আবার যদিও একথা সত্য নয় যে, স্বপ্নদ্রষ্টামাত্রেই মহাপুরুষ, তথাপি লোকোত্তর পুরুষমাত্রেই যে স্বপ্নদ্রষ্টা, তাহাতে কোন সন্দেহ নেই।

পঞ্চমত:, স্বামিজী সমাজ-সংস্কারে বিশ্বাস করিতেন না, তিনি বিশ্বাস করিতেন মানুষের চরিত্র-মহিমায়। অবশ্য সমাজে যখন জঞ্জাল স্তূপীকৃত হইয়া উঠে, তখন সমাজ দেহে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয়। তাই বাংলাদেশের দুইজন মহাপুরুষ, রামমোহন ও বিদ্যাসাগর, অন্যান্য বহুবিধ কল্যাণ-কর্মের ন্যায় সমাজ-সংস্কারেও প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু স্বামিজী চাহিয়াছিলেন সমাজদেহে বিশুদ্ধ শোণিত প্রবাহিত করিতে। এই প্রসঙ্গে স্বামিজী একটি কথা বলিয়াছেন যাহা আমাদের প্রণিধানযোগ্য। কথাটি এই: যাঁহারা দেশের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধাবান নহেন, তাঁহারা সংস্কারের নামে দেশের কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই বেশী করিয়া থাকেন। তাই স্বামিজী বলিয়াছেন—

'আধুনিক সংস্কারকগণ প্রথমেই ভারতের ধর্মকে নষ্ট না করিয়া সংস্কারের আর কোন উপায় দেখিতে পান না। তাঁহারা উহার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে বিফলমনোরথ হইয়াছেন। ইহার কারণ কি? কারণ তাঁহাদের মধ্যে অতি

অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই তাঁহাদের নিজের ধর্ম উত্তমরূপে অধ্যয়ন ও আলোচনা করিয়াছেন—আর তাঁহাদের একজনও 'সকল ধর্মের প্রস্থিকে' বুঝিবার জন্য যে সাধনা প্রয়োজন, সেই সাধনার পথ দিয়া যান নাই'। (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী, পৃঃ ৪৬৫)

সমাজের আমূল পরিবর্তনের জন্য স্বামিজী চাহিয়াছিলেন 'একদল বলিষ্ঠ, দৃঢ়চিত্ত, মেধাবী যুবক যাহাদের মাংসপেশী হইবে লৌহ নির্মিত, স্নায়ু হইবে ইস্পাত নির্মিত এবং যাহাদের মধ্যে এমন একটি মন বাস করিবে যে মন সহস্র বাধা বিঘ্নেও বিচলিত হইবে না'। তিনি বলিয়াছেন—

'Neither money pays, nor name, nor fame, it is character that can cleave through the adamantine walls of difficulties.'

স্বামিজীর আবির্ভাব-শতাব্দী উপলক্ষ্যে যদি বাংলার অন্ততঃ একশত তরুণও তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয় ও তাঁহার বাণীর মধ্যে নবজন্ম লাভ করে, তবেই শতবার্ষিকী উৎসব সার্থক হইবে।

প্রাচ্যের সংস্কৃতি দূত পার্লবাক

(২৪ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

বাককে কলকাতার এক সম্বেলনে প্রশ্ন করা হয় যে, তিব্বতী শরণার্থী নিয়ে তিনি বই লিখবেন অথচ ভারতবিভাগের ফলে কোটি কোটি পূর্ববঙ্গের শরণার্থীদের উপলক্ষ্য করে তিনি কোন বই লিখছেন না কেন। মুক্তাবচ্ছ হাসি হেসে শ্রীমতী বাক উত্তর দিয়েছিলেন যে, পূর্ববঙ্গের শরণার্থীদের নিয়ে বই লেখার কোন অনুরোধ কেউ তাঁকে করে নি। এই দোষক্ষালনের জন্যে শ্রীমতী বাকের কাছে আমরা অনুরোধ জানাচ্ছি যে তাঁর দৃষ্টিতে পূর্ববঙ্গের হতভাগ্য ছিন্নমূল শরণার্থী যেন আশ্রয় পায় একদিন চীনের কৃষকদের তিনি বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিয়েছেন, এবার পূর্ববঙ্গের শরণার্থীরা তাঁর আন্তরিকতায় সান্ত্বনা পাক।

নূতন যুগের কবিকে আহ্বান করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন 'কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন।' শ্রীমতী পার্লবাক আধুনিক সাহিত্যসভায় সেই 'নূতন যুগের কবি' যিনি চীনের দুঃখনিরাশার কথা, আলো আশার বাণী প্রচার করেছেন নিঃস্বার্থ-ভাবে নিরলসভাবে। শ্রীমতী বাকের সাহিত্যকল্পলোকে আবর্জনা নেখানে, যেখানে শাদাকালোর দ্বন্দ্ব নেই, প্রচার ব্যবহারের ব্যবধান নেই। তিনি অখণ্ড মানবাত্মার লেখিকা।

ফরাসী কবিতায় মালার্মে ও আধুনিক কাব্যের আরেক প্রযুক্তি

অমুজ বসু

বাংলা দেশের আধুনিক কাব্যরীতির সঙ্গে ইংরাজী কাব্য ঐতিহ্যের অনেকখানি মিল। ব্যঞ্জনাগর্ভ এবং আবেগনির্ভর কাব্যই ভারতীয় আলঙ্কারিকদের অভিপ্রেত। ইংরাজ কবিরাও এই রকম কাব্যাদর্শে বিশ্বাসী। বক্রোক্তি-জীবী কাব্য সংস্কৃত সাহিত্যেও তেমন মেলে না, বাংলা সাহিত্যে তো বটেই। ইংরাজী সাহিত্যেও তথৈবচ। সেখানে পোপ-প্রমুখের ব্যঙ্গ-রসের কবিতার কদর অনেক কম ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ কীট্‌সের আবেগধর্মী কাব্যের চেয়ে।

কিন্তু ফরাসী কবিতার জাতই আলাদা, ফরাসী কবিতা গন্ধবর্তী, বুদ্ধি শাণিত ব্যঞ্জনাহীন ও স্বচ্ছ। এই জাতের কবিতা যে কি অনবদ্য এবং আকর্ষণীয় হতে পারে আমাদের বাঙালীদের পক্ষে তা অনুভব করা কঠিন। আবেগের প্যানপ্যানানি, হৃদয় নিয়ে কান্না ওরা সইতেই পারে না। তাই শ্লেষে-কৌতুকে, তীক্ষ্ণ বুদ্ধির চাতুর্যে, চিন্তার স্মিত কারুকার্যে ওরা কবিতাকে স্বাদু করতে চায়। আমরা যে অমন কবিতার মর্ম বুঝিনা তার সাক্ষ্য প্রমথ চৌধুরী। এই অসামান্য কবির কবিতাকে বাঙালী পাঠক হৃদয়ের গভীরে নেয়নি।

এড্‌গার এলান পো-র রচনা মূল ভাষায় পড়বার জন্য ফরাসী কবি তেফান মালার্মে (১৮৪২-৯৮) ইংরাজী ভাষা শিখেছিলেন। পরে ইংরাজী ভাষা শেখানোকেই তিনি তাঁর বৃত্তি হিসাবে নিয়েছিলেন। ইংরাজী কবিতার ইঙ্গিতময়তা আকৃষ্ট করেছিল এই তরুণ কবিকে। তিনি বুঝেছিলেন এই ব্যঞ্জনাধর্ম যদি স্বভাবতঃ স্বচ্ছ ফরাসী কবিতায় আনা যায় সে এক যুগান্তকারী ঘটনা হবে। আর তার ক্ষেত্রও প্রায় প্রস্তুত। বোদেলেয়রের হাতে ফরাসী কবিতা তখন সবে সাঙ্কেতিকতার দিকে ঝুঁকেছে।

এর আগে রোম্যান্টিক কবিদের হাতে ফরাসী কবিতা শিথিল ও লঘু হয়ে পড়েছিল। কারণ ফরাসী কবিতার মেজাজ রোমান্টিক আবেগ-প্রবণতার বিরোধী। তাই এই জাতের কবিতার গভীর রস ফরাসী ভাষায় দানা বেঁধে উঠতে পারেনি। নূতন এক কবিগোষ্ঠী দেখা দিলেন যারা এই ধরণের শিথিল বাক-বহুল পদ-রচনার বিরোধী ছিলেন। Le Parnasse contemporain নামক কাব্য সঙ্কলনের মাধ্যমে এঁদের পরিচয়। এঁদেরই বলা হয় 'পারনাসিয়ান'। পারনাসিয়ানরা ভাষাকে ব্যবহার করেছেন ভাস্করের শ্বেত। ফলে কবিতা হয়ে উঠল নিরঙ্গ, কঠিন, গাঢ় এবং নৈর্ব্যক্তিক। একটা প্রতিযোগিতাই ক্রমে গড়ে উঠল, কি ভাবে এবং কত দূর কবিতাকে সংহত করা চলে। কিউবার অধিবাসী একজন প্রখ্যাত পারনাসিয়ান কবি জে. এম. ড হেরেডিয়া (১৮৪২-১৯০৫) একটি আড়াই পৃষ্ঠাব্যাপী কবিতাকে তার চিত্রকল্প সমেত একটি সনেটের মধ্যে রূপ দিয়েছেন। পারনাসিয়ান গোষ্ঠীর নেতা ছিলেন বোদেলেয়র (১৮২১-৬৭)। অথচ তাঁরই হাতে পারনাসিয়ান আন্দোলন নষ্ট হয়ে রোম্যান্টিক আত্মকেন্দ্রিকতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়েছিল—এর থেকে ফরাসী কবিতার আধুনিকতার সূত্রপাত। তিনিই প্রথম কবি যিনি চৈতন্যের গভীরে মগ্ন হয়ে কবিতাতে স্বতন্ত্রর উন্মোচন করেছেন। মনের অন্তর্দ্বন্দ্ব, সমসাময়িক পাপ তাপ কুটিলতা,

বিষাদ আর ক্লান্তি, নিষ্প্রেম যৌন উত্তেজনার অন্তিম বিতৃষ্ণা ও গ্লানি, প্রেয়সীর নারকী রূপ, ঈশ্বর হারা বিশ্বাসী মানুষের আর্তনাদ তাঁর কবিতায় রূপ পেল।

ছন্দের এই দুঃসহ যন্ত্রণা ব্যক্ত করতে বোদেলেয়র কবিতাকে প্রতীক-ধর্মী করে তুলতে বাধ্য হয়েছেন। জীবনের বীভৎস বিষাদ ফুটিয়ে তুলেছেন ট্রেন, জাহাজ, বিদেশী বন্দর, বেশ্যালয় প্রভৃতি নবপরিচিত নাগরিক বস্তুর চিত্রকল্পে। তাঁর ভাষা নিরন্ধ্র, সংহত, গাঢ়-সংবদ্ধ, ছন্দে চিত্রকল্পে বিস্তারের স্থান তিক্ত অন্ধকার ছাড়া।

বোদেলেয়রের অনুগামীদের অন্যতম পল ভের্লেন (১৮৪৪-৯৬)। জীবনের তুচ্ছ অথচ মধুর মুহূর্তগুলির প্রতিচ্ছায়া স্বল্প সুনিপুণ শব্দ সম্পাতে এঁকেছেন ইনি। কিন্তু বোদেলেয়রের অনুকরণে ক্লান্তির মূর্ত চিত্র আঁকতে গিয়ে যখন পানসে ক্যাথলিকানার মিশাল দেন তখনই তার ফলাফল হয়েছে শোচনীয়। তবু ভের্লেনের কবিতার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ সঙ্গীত সুষমা। থিওফিল গতিয়ে-র সুরের ধ্বনি মূর্ছনাকে তিনি আরো এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। ইনিও গতিয়ের মত বর্ণময় রূপ সৃষ্টি করতে ভালবাসতেন, তাই সমালোচকেরা বলে থাকেন যদি এছমার ধানে-র ছবির সঙ্গে বোদেলেয়রের সাদৃশ্য থাকে, ভের্লেনের মৈকটা তবে প্রতিচ্ছায়া বাদী (Impressionists) দের। কিন্তু বাস্তবে চিত্র নয় তাঁর কবিতার নিকটতম প্রতিবেশী সঙ্গীত। সরাসরি বক্তব্যের চাইতে সুদূর মূর্ছনাকে বড় মনে করতেন তিনি। তাঁর কথায় De la musique avant toute chose! সবার উপরে গানই সত্য। গীতি-মূর্ছনার আবেশ, সূক্ষ্ম তীব্র বীড় টেনে তিনি কবিতাকে নূতন করে তুললেন।

মালার্মে স্বয়ং ছিলেন পারনাসিয়ান গোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত বোদেলেয়রের অনুগামী কবি। ভের্লেনের মত তিনিও কাব্য এবং সঙ্গীতের সমীকরণে বিশ্বাসী ছিলেন। সুতরাং তাঁর কবিতায় লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য দেখা দিল চারটি। পারনাসিয়ান কবিসুলভ ভাবসংহতি, ভের্লেনের অনুরূপ সঙ্গীতধর্মী ভাষা, ইংরেজী কাব্যসুলভ ইঙ্গিতময়তা এবং বোদেলেয়রের অনুরূপ সাঙ্কেতিক আত্মমুখিতা। মালার্মের কবিধর্মে এই কটি লক্ষণকেই আমরা এবার বিশদ ভাবে খুঁজবো।

সাহিত্য সৃষ্টির সূচনায় পারনাসিয়ান গোষ্ঠিভুক্ত হলেও অচিরেই তাঁর কাব্যরীতির স্বাতন্ত্র্য চেনা গেল। গোষ্ঠিভুক্ত অন্য কবিদের মত কবিতার ভাষাকে ভাস্করের মতো কুঁদে কুঁদে ইনিও গাঢ়বদ্ধ রূপ দিয়েছেন। প্রতিটি শিথিল শব্দ, দুর্বল পদবিন্যাস পরিহার করে তাঁকে নিরন্ধ্র কঠিন স্থির করে তুলেছেন। পাথরের কর্কশ মুখে কমনীয়তা ফুটিয়ে তোলাই ভাস্করের সাধনা, মালার্মে চেষ্টা করেছেন কঠিনের কাঠিন্যকেই ছন্দিত করে তুলতে। তাই তিনি নরম শব্দকে পিটিয়ে শক্ত করে নিয়েছেন, সোজাকে দিয়েছেন উল্টে। অন্যান্য পারনাসিয়ান কবির মতই ইনিও গ্রীস অল্পীল দেশি-বিদেশী, প্রচলিত অপ্রচলিত কোনো শব্দকেই অস-অচল মনে করেন নি। বরং শব্দের অপ্রচলিত প্রাথমিক অর্থ ব্যবহার করে, প্রথাবদ্ধ পদান্বয় ভেঙে, শব্দার্থের থেকে সঙ্গীতের দিকে বেশি লক্ষ রেখে ইনি কবিতার একদিকে যেমন ঘনত্ব আনলেন অন্যদিকে ফরাসী কবিতার স্বাভাবিক স্পষ্টতা নিবারণ করলেন।

পারনাসিয়ানরা কবিতার শিথিলতা দূর করতে গিয়ে কবিতার সূক্ষ্ম সংবেদনা হারিয়ে ফেলছিলেন। কবিতা তাঁদের হাতে হয়ে উঠছিল বস্তুমুখী স্থূল এবং বক্তব্য প্রধান। সবচেয়ে বড় কথা বাইরের প্রকরণের প্রাধান্য থাকায় কবিতা কৃত্রিম ও জড় হয়ে উঠেছিল। বোদেলেয়রের মতই মালার্মের কবিতা

ছিল আত্মমুখী ও কল্পনা। সংহত যুক্তির জগৎ থেকে মুক্তি দিয়ে মালার্মে প্রমাণ করলেন কবিতা এবং গদ্যের ক্ষেত্র আলাদা। এখানে চিন্তার চেয়ে রূপের মূল্য বেশি, রূপের চেয়েও ব্যঞ্জনার। রহস্যের নিবিড় আকর্ষণ এবং সূক্ষ্ম সংবেদনা তাঁর কবিতা ঘিরে এক মায়ালোক রচনা করল সঙ্গীত প্রবাহ তাতে এক গাঢ় মন্থর গতির সঞ্চার করল।

মালার্মে ভের্লেনের মতই বিশ্বাস করতেন কবিতায় শব্দ-সঙ্গীত অর্থাৎ শব্দের ধ্বনি এবং অস্ফুট ভাবানুষঙ্গ চিত্রার্চরিত ভাব এবং অর্থের চেয়ে বেশি মূল্যবান। তাঁর ভাষায় 'Poetry is written with words, not ideas'. কবিতা শব্দ দিয়েই রচিত হয় ভাব দিয়ে নয়। মালার্মের কবিতার সুরেলা শারণ্যের এমন এক আকর্ষণ আছে যে দুর্বোধ্যতা সত্ত্বেও সুরের আরোহ অবরোহের সাহায্যে তা এক জাতের মাদকতা সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে। মালার্মের অসামান্য জনপ্রিয়তার এটাই মুখ্য হেতু। তাঁর কবিতা ধ্বনি প্রতিষ্ঠ—অর্থ-প্রতিষ্ঠ নয়।

মাইকেল মধুসূদন যখন 'মেঘনাদ বধ কাব্য' লেখেন, নূতন অমিত্রাক্ষর ছন্দ পড়ার উপদেশ দিতে গিয়ে তিনি অবোধ পাঠকদের বলেছিলেন কানপেতে সুরটা শুনতে, কাব্যের অর্থ বোঝার আপাতত প্রয়োজন নেই। বাস্তবিক শব্দের সঙ্গীত সৃষ্টির যে অসামান্য ক্ষমতা মধুসূদনের ছিল তেমনটি বাংলা সাহিত্যে আর কারো নয়। ফরাসী সাহিত্যে মালার্মে সম্পর্কেও প্রায় সেই কথা বলা চলে। তাঁর কবিতায় অর্থ না বুঝলেও ক্ষতি নেই, কবিতার সুরই পাঠককে লক্ষ্যস্থানে পৌঁছে দেবে। এই লক্ষ্যস্থানটি কোথায়? তাঁর মতে, কবিতায় যে গান তিনি ফোটাতে চাইছেন তা এ পৃথিবীর নয়, অন্য এক অতীন্দ্রিয় লোকের,—সেই জগতের অনুভূতির ধ্বনি রূপ দেওয়া হয় কবিতায় আর ঠিকভাবে সেই রূপ দেওয়া সম্ভব হলে পাঠকের মনও সেই জগতে পৌঁছাতে পারে।

অন্তরের অনুভবকে রূপদিতে ভের্লেন যেমন সুর আর রঙের উপর সর্বৈব ভাবে নির্ভর করতেন মালার্মে অবশ্য ততখানি নন। মালার্মের কবিতায় ভাব এবং চিত্রকল্পের স্থানও অনেকখানি। কিন্তু অর্থের স্থিরতা থেকে, অর্থকে ঘিরে ভাবের গুঞ্জন, বর্ণনার চাইতে সঙ্কেত ও ব্যঞ্জনার মহত্তরতা তিনি মানতেন। তাই বক্তব্য উহ্য রেখে তার বদলে ফুটিয়ে তোলেন একটি বস্তুরূপ যার মধ্যে সেই বক্তব্যটা ধরা পড়বে। অন্তর-পটের ছবিটিকে তিনি কখনই স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তুলতে চান না। আসল বস্তুটির বদলে তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি বিচ্ছিন্ন অর্থগর্ভ অঙ্গের ইঙ্গিত মাত্র তুলে ধরেন এই অঙ্গগুলির অন্তর্গত সংযোগ সেতু আবিষ্কার করে এদের গেঁথে তোলা আর এর নিহিত ভাবটিকে বুঝে নেওয়া পাঠকের কল্পনা শক্তির কাজ।

বাক্যবিন্যাসের এ জাতের দুর্বোধ্যতা অবশ্য মালার্মের সঙ্কল্পকৃত নয়, ফরাসী কবিতার স্বভাবজ স্বচ্ছতা দূর করে ইংরাজী কবিতার মত তাকে ইঙ্গিত মুখর করে তুলতে বোধহয় এ ছাড়া উপায় ছিল না। ঠিক ইংরাজীর মতও নয়, কারণ আবেগ-প্রবণ কবিতা ফরাসী জাতের ধাতের বাইরে। তাই তাঁর হাতে, ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্রে যাকে বলা হয় 'ধ্বনি', সেই জাতের কাব্য এলো না। ভিন্ন এক জাতের সঙ্কেতধর্মী ব্যঞ্জনা গভীর কাব্যের জন্ম হলো। ভাষার স্পষ্টতা বর্ণনের গুণ হতে পারে, কবিতার নয়—এই তাঁর বিশ্বাস ছিল। তিনি তাই রূপক সৃষ্টির প্রয়োজনে 'এটি এর মত'—এই জাতের সোজাসুজি উপমার বিরোধী ছিলেন। তার বদলে উপমেয়ের স্থানে উপমান প্রয়োগ করলেন, নামের বদলে ব্যবহার করলেন গুণ, গুণকে প্রয়োগ করলেন বস্তুর মত। এই ভাবে এমন

এক স্বাভাবিক অর্থময়তার সৃষ্টি হলো যা শুধু কবির মনন রীতিতে অভ্যস্ত পাঠকই বুঝবে—অন্যের পক্ষে দুরূহ হলো। আবার কবিতার যুক্তি আশ্রয়ী পারম্পর্যও তিনি বর্জন করলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর স্পেনের প্রধান কবি গোঙ্গোরা যেমন কবিতার অন্তর্বর্তী যোজক স্বরগুলি ত্যাগ করে কবিতাকে সংহত এবং সঙ্কেতগূঢ় করে তুলতেন, সেই গোঙ্গোরিজম পদ্ধতিতে রচনা করায় তাঁরও কবিতার বুনোট গাঢ়বদ্ধ হয়ে উঠল।

মালার্মের বিশ্বাস ছিল বাস্তব জগৎ অনুভূতি গম্য, কিন্তু বুদ্ধির অগোচর। আর এই স্থূল বাস্তবের অন্তরালেই সেই শাশ্বত ভুবন রয়েছে যেখান থেকে উৎসারিত হচ্ছে সব শিল্প ও সঙ্গীত। অনুভূতির দ্বার দিয়ে এই বাস্তব জগৎকে স্পর্শ করতে হবে, ভেদ করতে হবে তবেই সেই উৎসে পৌঁছানো যাবে। এই জাগতিক বিষয় এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য থেকে যে অনুভূতির আভাস মিলছে তা প্রায় অলৌকিক। সুতরাং তাও কবিতার বিষয়। কিন্তু সেই অলৌকিকতার ব্যঞ্জনা আনতে হলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎকে আশ্রয় করতে হবে, তার বস্তু-রূপটুকুতে নয়, ভাব-রূপটুকুতেই। এই বিশ্বাসকে অবয়ব দেবার আয়াসে অনুভূতিলভ্য ঐ অনির্বচনীয় জগৎ সৃষ্টির প্রয়োজনে তিনি সঙ্গীত সূত্রে সংবদ্ধ চিত্রকল্প পরম্পরা এমন ভাবে উপস্থিত করলেন যে কোনো mood বা myth পাঠকের সচেতন জ্ঞানের কাছে নয়—অসংজ্ঞান মনের দ্বার উদ্ঘাটিত হবে।

বোদেলেয়রের হাতে যেমন প্রতীকী কবিতার সূচনা হয়েছিল তেমনি আত্মসমীক্ষারও সূত্রপাত হয়েছিল। বোদেলেয়রের নূতন মননত্ব গোটা ইউরোপের কবিতার গতি পালটে দিয়েছে কিন্তু মালার্মের চিত্রকল্পের গাঢ় সংবদ্ধতার প্রভাব বোধহয় আরো বেশি। বোদেলেয়র কবিকে দেখেছেন সৃষ্টিছাড়া এক বিদ্রোহী হিসাবে। সে একজন প্রয়োজনাতিরিক্ত মানুষ। অথচ সেই কেজো লোকের কাছে প্রমাণ করতে বসেছে যে কেজোদেরই কোনো দরকার নেই। বোদেলেয়রের মত এই শিল্প সর্বৈবতাবাদে মালার্মেও আস্থাশীল। তিনি মনে করেন, মানুষ এই ইন্দ্রিয়ের জগতে বন্দী, তবু এখনো কাব্যকলার অক্লান্ত তান্ত্রিক সাধনায় তারা সাময়িক মুক্তি পেতে পারে।

মালার্মের হাতে প্রতীকী কবিতা উজ্জ্বলতর সার্থকতার পথে এগিয়ে গেল। অবশ্যের ভারাবহতা, তার পাতায় পাতায় নিঃশব্দ সংহত বস্তুরাশি ফুটিয়ে তুলতে হলে মনের গাহস্থলো বর্ণনা করলে চলে না। মালার্মের রীতিই তাই ভিন্ন। কোনো বস্তুর নাম করলে কবিতার আনন্দের তিন চতুর্থাংশই নষ্ট হয়। অস্পষ্টতার মধ্য থেকে একটু একটু করে আবিষ্কারের যে আনন্দ তাই কাব্যের আনন্দ। সুতরাং বাস্তবকে নীচ বলে ঘৃণা করে তার ভারস্তূপ দূর করে দিতে হবে কাব্যের অঙ্গন থেকে।

মালার্মের কাব্যসঙ্গী যেমন ছিলেন ভের্লেন, তাঁর শিল্পসঙ্গী তেমনি ছিলেন মোনে এবং পল সেজান। তাই এঁদের শিল্প সৃষ্টির সঙ্গেও মালার্মের কাব্যের সাদৃশ্য রয়ে গেছে। ইম্প্রেশানিষ্ট ছবিতে রঙের উজ্জ্বলতা ছিল কিন্তু ক্লাসিকাল ছবির মত গভীরতা বা বেধ ছিল না। সেজানের ছবিতে বেধ এলো কিন্তু ক্লাসিকাল ছবির মত কালচে মেঁয়াটে হয়ে গেল না, আশ্চর্য আলোঝলমলে রইল। মালার্মের কবিতাতেও তেমনি শব্দের সঙ্গীতের সঙ্গে বর্ণাঢ্য চিত্রের আলপনা এবং উচ্চারণের গুরুলঘু ভার শক্তি মিশে রইল।

মালার্মের কবিতার প্রসঙ্গ ও প্রযুক্তির এই সব, নূতন সার্থক নিরীক্ষা ইউরোপের কবিতায় এক নূতন আন্দোলনের জন্ম দিয়েছে। তাঁর ধারণায় দীক্ষিত হয়ে পরবর্তী কবিরা

তাঁদের কাব্য চেতনাকে আরো তীক্ষ্ণ এবং শিল্পীমুখ করে নিয়েছেন।

বাংলাদেশের কবিরা বোধহয় আধুনিক কালেও স্বভাব কবিত্বে বিশ্বাস রাখেন। আবহমানের কাব্য ঐতিহ্য থেকে অনুশীলিত হয়ে উপকৃত হতে তাঁরা তাই নারাজ। নইলে আমরা যারা ফরাসী রীতির কবিতাকে গ্রহণ করতে পারিনি, অন্ততঃ মালার্মের রীতিকে গ্রহণ করে আমরা লাভবান হতে পারতাম। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এই পথে আমাদের অনেকখানি অগ্রসর করে দিয়েছিলেন, যদিও তাঁর পথ বহুলাংশে ভিন্ন ছিল সে সম্পর্কে পরে কখনো আলোচনার অভিলাষ রইল। আপাততঃ মালার্মে প্রবর্তিত রীতির প্রতি বাঙালী কবিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেই আমরা থামছি।

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের

উৎসর্গ

নূতন বাংলার সার্থক রূপরেখা। জন-জীবনের সহিত গভীর সংস্পর্শে কবিতাগুলি-সজীব ও মর্মস্পর্শী।

মূল্য—আড়াই টাকা

৭০ পাউণ্ড কাগজে পরিচ্ছন্ন ছাপা
উপহার দিবার উপযুক্ত

প্রকাশক
অনন্তা প্রকাশনী : ৭৯।৫ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড। কলিকাতা-১৪।

অপরিনির্বাণ

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

মাথার উপরে সেই রূঢ় রুষ্ট আলোর প্রতিভা
অফুরন্ত জ্বলছে, কেন ওই আলো নেবাতে পারোনা ?
সমস্ত জগৎ জুড়ে যেন শুধু ক্লান্তিহারা দিবা,
নিদ্রাহীন আরক্তনয়না।

নিদ্রাহীন, আর তার নিরলস কীর্তির মর্যাদা
অফুরন্ত জ্বলছে, আমি এমনকি আমিও মুহ্যমান—
অফুরন্ত জ্বলছি, কটি স্মরণরাঙানো জীর্ণ পাতা
হাওয়ায় অদৃশ্য উড়ে এল তার পর্বতপ্রমাণ
স্বয়ম্ভারে আর সেই তীব্র অফুরন্ত অগ্নিদাহে
আমাকে ঘিরে আমার চারদিকে সহসা
হাওয়া ঘন হয়ে এল—যেন তার আলোকবিভায়
সমস্ত জগৎ জুড়ে সবুজ শিথিল মদালসা
মধ্যাহ্ননিস্তব্ধতি নেমে এল—ধূধূ জ্যোৎস্নায় জ্যোৎস্নায়
সব আবছা হয়ে গেল—স্তম্ভ-সৌধ-মিনার প্রভৃতি
নিরলস কীর্তি, আর সেই অপরাধ মেঘচ্ছায়
আদিগন্তমণ্ডল ব্যাপ্ত মঞ্জরীমাতাল আম্রবীথি।

যেন শিয়রে আমার রূঢ়রাগরুষিতনয়না
বরবর্ণিনীর ছায়া, যদিও বাহিরে ক্ষুব্ধ দিবা
শ্বাপদের মত হিংস্র, আর তার দুর্বর বাসনা
মাথার উপরে সেই রূঢ় রুষ্ট আলোর প্রতিভা !

স্মৃতি

মৈত্রেয়ী দেবী

প্রেমের কবিতা পড়ি নির্জনে
প্রেম কি তা মনেও পড়েনা
চৈত্রের হাওয়া লাগা ফুলবনে
জ্যোৎস্না-গলান সুখ ঝরেনা
জানিনা বেপুথমগ্নী হর্ষে
রোমাঞ্চে কাঁপে কার দেহ মন
অলক্ষ্য চুম্বক স্পর্শে
মন্থিত কেন হয় যৌবন
জানিনা অমরাবতী কোথা হায়
অমর্ত্য সুধা নিয়ে পাত্রে
পথ হারা মানুষেরে নিয়ে যায়
তারাখচা স্বর্গের রাত্রে—
আমার এ চারিদিক ঘেরে যে
ছোট বড় কালো কালো চিহ্ন
চাওয়া পাওয়া পাক দিয়ে কেরে যে
স্বপন মাধুরী করে ছিন্ন
কত আশা নিরাশার আঁধারে
হায়াময় জীবনের প্রান্তে

কোথায় কি সুখে আছি বাঁধারে
আজও তা পারিনি ভালো জানতে
তবু সেই ছায়ামর অতলে
যেমন কয়লা-গাঁথা খনি
স্মৃতির হীরার আলো জ্বলে
গোপনে লুকানো কোনো মণি
ধাপে ধাপে নীচে নেমে গেলে
কূপ যেথা অন্ধকারে ঘন—
ছোট ছোট স্মৃতি দীপ-জ্বেলে
আছে সাদা মাণিক ছড়ানো।

রবীন্দ্রনাথ

সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত

এক আদি উৎস হতে চিরদিন মানব সন্তান
মর্ত্য পৃথিবীতে আসে ; যদিও বা বিভিন্ন শরীরে
এক ক্লান্ত নরলীলা সাঙ্গ করে অমের তিমিরে
মিশে যায়। যুগে যুগে সহস্রের তনু-মন-প্রাণ
সমর্পিত অক্ষয় নরকে। তাই তারা দানবী বিহারে
ধূলিতে আঁধির ঝড়, জলেতে অশান্ত ঢেউ তুলে
জড়বুদ্ধি অহঙ্কারে রোষবহ্নি ছড়ায় চুকুলে ;
রুধির-প্রদিগ্ধ ধরা নিরন্তর স্বজন-শিকারে।

সূর্যের প্রসাদে তবু পরিম্লান জীবযাত্রা শেষে
বৈকুণ্ঠের আলো নামে অরূপণ অজস্র সম্ভারে
কখনো বা বেদব্যাসে। বাল্মীকি কি সুচির হোমারে
রবীন্দ্রনাথের বিভা একই সূর্য ভাতি সর্বদেশে।
সহস্র হিরণ্য-দ্যুতি তমস্বিনী শতছিদ্র করে
রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে সংগীত অমৃতসুধা ঝরে।

নববর্ষ

শান্তশীল দাশ

বারে বারেই আস তুমি, বারে বারেই তোমার কাছে যাই,
অনেক কিছু পাবার আশায় তোমার পানে হাত দু'টি বাড়াই ;
ভাবি, আমার সে দুটি হাত দেবেই তুমি দেবেই দেবে ভ'রে,
তাই ছুটে যাই তোমার কাছে মনের মাঝে অনেক আশা করে।

অনেক আশা—মন্ত্রী হবার, লক্ষপতি হবার আশা নয়,
বাড়ী গাড়ীর মালিক হয়ে ইচ্ছামত নিত্য অপচয় ;
অনেক আশা—ছোট্ট আশা, গ্রাসাচ্ছাদন শ্রমের বিনিময়ে,
নিভৃতে বাস কুটীর মাঝে আপনজনের আনন্দে ভার বয়ে !

মিষ্টি মুখের মিষ্টি হাসি এদিক ওদিক দেখবো চারিধার,
অবসরের ছায়ায় বসে সহজ সুরে গুনগুনিয়ে আর
দু'চারটি গান—এই তো শুধু, এই আমাদের অনেকখানি আশা ;
এই আশাকেই বুকের মাঝে জড়িয়ে নিয়ে তোমার কাছে আসা।

পূর্ণ তুমি করবে না কি ? আনলে কী ধন কিছুই জানি না যে,
তবু আবার এলাম ছুটে, ওই যে তোমার পায়ের ধ্বনি বাজে।

জৈবিক

গল্প

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

[৫]

যে-সময়কার কথা বলছি, সেটা ১৮১৯ খৃষ্টাব্দ। দাসত্বপ্রথা নিবারণ আইন বিধিবদ্ধ হবার দশবছর আগেকার ঘটনাকাল। "লর্ড মরয়া বা মার্কুইস্ অব হেষ্টিংস্"-এর রাজত্ব চলছে সেই সময়। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে—দাক্ষিণাত্যের শেষ প্রতিরোধ-শক্তি—মারাঠাদল আত্মসমর্পণ করেছে। ছত্রপতি শিবাজীর সঙ্গে যে হিন্দু-রাজশক্তির অভ্যুত্থান হয়েছিল, প্রায় দেড়শো বছরের মধ্যেই তার সার্বভৌম ক্ষমতার বিলোপ-সাধন ঘটে গেছে। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে শেষবারের মতো মাথা তোলবার চেষ্টা করেছিল মারাঠারা; ইংরেজরা যাকে 'অসাধারণ কূটচক্রী ও কূটবুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তি' বলে বর্ণনা করে গেছেন, পেশোয়া বাজীরাও-র বিশ্বস্ত সেই সচিব 'ত্রিম্বকজী দাঙ্গলিয়া' পেশোয়াকে উস্কানি ক'রে শেষবারের মতো প্রবল যুদ্ধের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন ইংরেজ-সেনাপতি ক্যাপ্টেন ষ্টানটনের বিরুদ্ধে, কিন্তু জয়ী হতে পারেন নি। দাক্ষিণাত্যে ইংরেজদের বিপক্ষে এটাকেই শেষ যুদ্ধ বলা যায়।

কিন্তু, আমি যাদের কথা বলছি, তারা ছত্রপতি শিবাজীর নাম শোনেনি, শোনেনি লর্ড মরয়া বা হেষ্টিংসের নাম; না জানে তারা ক্যাপ্টেন ষ্টানটনকে, না জানে তেমনি বাজীরাও আর ত্রিম্বকজী দাঙ্গলিয়াকে। ত্রিম্বকজী দাঙ্গলিয়া আর পেশোয়া বাজীরাওয়ের মিলিত শক্তি যখন ক্যাপ্টেন ষ্টানটনের বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণায় মেতে উঠেছে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে, তখন দুজন অজ্ঞাত-নামা সাধারণ ইংরেজ উঠে এসেছে নীলগিরির এই স্নিগ্ধ প্রশান্ত উপত্যকায়,—আর, প্রস্তর-খণ্ড-দিয়ে-ঘেরা তার বাড়ীর সিংহদরজার সামনে দাঁড়িয়ে দূর থেকে বিস্মিত বিহ্বল দৃষ্টি মেলে সেই দুজন বিচিত্র আগন্তুককে লক্ষ্য করেছে টোডা-রাজা 'পার্থ-কাই' আর তার পার্শ্ববর্তীরা।

বিচিত্র আগন্তুকদ্বয় কাছে এসেছে, দরজার কাছের ঐ শোরানো পাথরটার ওপর বসে ভৃষ্ণার্ত হয়ে জলের পরিবর্তে দুধ খেয়ে গেছে। 'পার্থ-কাই' ভয় পেয়েছে কিন্তু তবু বলেছে,—আমার বাড়ী আমি দেবো না। দেবো না তোমাদের হাতে তুলে আমাদের এই উপত্যকা!

সেদিনও ওদের দুজনকে পথ দেখিয়ে এনেছিল, এই আজকের মতো, বাদাগাদেরই একটি লোক। সেদিনও আজকের মতো বাদাগাদের লোকটি ওদের কথা 'সাদা মানুষদের কোনক্রমে বুঝিয়ে দিচ্ছিল। 'সাদা মানুষ দুজন' পার্থকাইয়ের কথার তাৎপর্য বুঝে প্রতিবাদের সুরে বলেছিল,—না না, আমরা তোমাদের বাড়ী নিতে আসিনি। আমরা এসেছি শুধু তোমাদের দেখতে।

পার্থ-কাই বলেছিল,—এখানেও থাকতেও তোমাদের দেবো না। আমরা শান্ত নিরীহ জাত, কিন্তু দরকার হলে আমরাও রুখে দাঁড়াতে জানি। যে-মাটিতে

দাঁড়িয়ে আছি, সে মাটির এক কণাও তোমাদের আমি দেবো না।

সেদিনকার সেই শেষ মারাঠা-যুদ্ধে 'অবকলী দাজলিয়া' ও সম্ভবতঃ এমনি ক'রে ইংরেজ সেনাপতিদের মুখের ওপর বলেছিল,—যে-মাটিতে দাঁড়িয়ে আছি, সে মাটির এক কণাও তোমাদের আমি দেবো না!

সেদিনকার সেই রণাঙ্গনে 'অবকলী ও বাজী রাও'-এর মিলিত শক্তি ছিল—বিশহাজার সশস্ত্র সৈন্য,—আর, এই সামান্য সাধারণ টোডা-নৃপতির অধীনে স্ত্রীপুরুষ-বালক-বৃদ্ধ-নির্বিশেষে টোডা-জাতের সর্ব-শুদ্ধ লোকসংখ্যা এক হাজার ছিল কিনা, সন্দেহ! তা-ও তারা বিচ্ছিন্ন, অস্ত্রহীন,—শ্যামল উপত্যকায় মহিষ চরানো যাযাবর প্রকৃতির মানুষ!

'সাদা মানুষ দুজন' পার্থকাইয়ের কথার উত্তরে একটু হেসে উঠে দাঁড়িয়েছিল, বলেছিল,-আমরা থাকতেও আসিনি। রাজা মিছিমিছি এত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন।

'পার্থকাই'-এর পক্ষে বিশেষ কারণ ছিল এ-উত্তেজনার। 'সাদা মানুষ দুজন'-এর এই যে আবির্ভাব, এর ছয় বছর আগে এমনি দুজন 'সাদা মানুষ'কে এমনি করেই চর্মচক্ষে দেখেছিল 'পার্থকাই।' তারা দুজন বলেছিল, তারা এখানে থাকবে, তারা হটিয়ে দেবে পার্থকাইদের, তারা এখানে নিজেরা ঘর বাঁধবে। পাক্কল 'কোরি'র কাছে আছে এক অদ্ভুৎ পুতুল, সেটি পর্যন্ত তারা কেড়ে নেবার চেষ্টা করেছিল। সমবেত টোডার দল ক্ষেপে উঠেছিল সেদিন, তাদের সাবেক পাথরের অস্ত্র হাতে নিয়ে একসঙ্গে রুখে উঠেছিল তারা। তাদের সেই রণমূর্তি দেখে সেদিনকার 'সাদা মানুষ দুজন' আর দাঁড়ায়নি, যাদাগাদের লোকটিকে সঙ্গেনিয়ে পাহাড়ী পথ বেয়ে তরতর্ ক'রে নেবে গিয়েছিল পাহাড়ের নীচে।

ছয় বছর পরে আবার যখন এলো দুজন, সাদা মানুষ, তখন তাদের দেখে পার্থকাইয়ের মনে সেই পূর্ব-বিভীষিকা জেগে ওঠাই স্বাভাবিক। সে তাই সাদা মানুষদের কোনো কথাই শুনলো না, বললে,-চলে যাও, তোমাদের এখানে থাকতেও দেবো না। 'সাদা মানুষরা' বলেছিল,-যাচ্ছি চলে এখনই। কিন্তু, এতদূর উঠে এসে আমাদের তেষ্টা পেয়েছে একটু জলও দেবে না? টোডাদের বাড়ীর সামনে পাথরের ওপর পাথর বসিয়ে অনতি-উচ্চ একটা স্তম্ভের মতো তৈরী করে রাখা হয়, তার ওপরে দেবতাদের উদ্দেশে অর্ঘ সাজিয়ে দেওয়া হয়।

সেই প্রস্তর স্তম্ভের ঠিক নীচেই ছিল শোয়ানো করে একটা পাথর। পার্থকাই বললে-বোসো তোমরা ওখানে। তারপর জল নয়, দুধ এনে দেওয়া হয়েছিল ওদের। 'টু এল' বা গোয়াল ঘর থেকে একটা পাথরের পাত্রে খানিকটা দুধ নিয়ে এলো গোয়ান চেহারার একটি মানুষ, আর, সেই পাত্র হাতে নিয়ে সাদা মানুষদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো পার্থকাইয়ের তরুণী মেয়ে। অতিথি আপ্যায়নের যে প্রথা ছিল, সে-প্রথার কোনো ত্রুটি সেদিন অবশ্য রাখেনি পার্থকাই। 'সাদা মানুষ দুজন' অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল রাজকন্যার মুখের দিকে!

রাজকন্যা ফিরে এলো শূন্য পাত্র নিয়ে, অতিথিরাও চলে গেল। ধীরে ধীরে পাহাড়ের পথ ধরে নামতে নামতে এক-সময় তারা মিলিয়ে গেল তরুশ্রেণীর অন্তরালে।

পার্থকাইয়ের পার্শ্ববর্তী এক বুড়ো বললে,—এদের ছ'বছর আগে দুজন সাদামানুষ এসেছিল ত? তুই দেখেছিলি তাদের পার্থকাই। কিন্তু, তারও দশবছর আগে একজন সাদামানুষকে আমি দেখেছিলাম। এদিকে সে আসেনি, সোজা চলে গিয়েছিল মুকেতি পাহাড়ের দিকে।

পার্থকাই গম্ভীর মুখে বললে—আমি নিজে না দেখলেও শুনেছিলাম সে কথা। এরা ভালো লোক নয়, আমাদের তাড়িয়ে দিতে চায়।

যাঁর কথা এরা আলোচনা করছে তাঁর নাম ডাঃ বুকানন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে তিনিই প্রথম ইংরেজ, যিনি নীলগিরি আরোহণ

করেন। এঁকেই প্রথম ইয়োরোপীয় বলা যেতে পারত, যদি না আমরা জানতাম পর্তুগীজ পুরোহিত ফেরেইরি'র কথা। ইনি এসেছিলেন ১৬০২ খৃষ্টাব্দে! শুধু ইয়োরোপীয়ান বলে নয়, নীলগিরিতে প্রথম সভ্য মানুষের পদপাত হিসাবেও তাঁর আগমনকালটি ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে থাকবার যোগ্য। ১৬০২ সাল, মোগল সম্রাট আকবরের জীবদ্দশাকাল বলা চলে। দিল্লীর দরবারে প্রথম ইংরেজ-স্যার টমাস রো আসেন ১৬১৫ সালে—আর পর্তুগীজ 'ফেরেইরি' আসেন নীলগিরিতে উন্মুক্ত এবং অবারিত প্রকৃতির দরবারে, এই ঘটনার তেরো বছর আগে। ১৬০২ সালেই 'পাদ্রী ফেরেইরি' যীশুর একটি মূর্তি উপহার দিয়েছিলেন পাগল 'ফোরি'র ঠাকুর্দার বাবাকে। যে মূর্তিটাকে পাগল ফোরি আজও মাত্র একটা পুতুল বলেই জানে, এবং যে-মূর্তিটিকে সে সাত বছর আগে 'স্বর্গের মানুষদের হাতে, তাদের আগ্রহ সত্ত্বেও, তুলে দেয় নি। না তুলে দিলেও, 'স্বর্গের মানুষরা' পুতুলের পায়ের নীচেকার লেখাটি ভালোভাবেই পড়ে নিয়ে গিয়েছিল। সে-নামটিই হচ্ছে পাদ্রী ফেরেইরি'-র নাম। এবং পাগল ফোরি জানে না, তার ঠাকুর্দার বাবা পাদ্রীর নামটি জেনে রেখেছিলেন, আর, পরবর্তী কালে মুখে-মুখে 'ফেরেইরি' নামটি হয়ে যায় 'ফেরি'। এই 'ফেরি'ই 'ফোরি'তে পরিণত হ'য়ে দাঁড়িয়ে গেছে তার নিজের নামে। পাগল ফোরি শুধু পর্তুগীজ পুরোহিতের স্মৃতি উপহারই বহন করছে না, নিজের অজ্ঞাতে তার নামও বহন করে চলেছে! কিন্তু, থাক এখন পাদ্রী ফেরেইরির কথা। ফেরেইরি এসেছিলেন মাত্র পর্যটক হিসাবে, খ্রীষ্টধর্ম প্রচারক হিসাবেও নয়, কিম্বা, রাজ্যস্থাপনের গোপন দূত হিসাবেও নয়। সেদিক থেকে বরং ১৮০২ সালটাই তাৎপর্যপূর্ণ। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ সেনাপতি কর্ণেল ক্লোজ আর বাজী রাও-এর সঙ্গে 'বেসিনের সন্ধি' হয়েছে। যার শর্ত, কামান সমেত ছয় হাজার ইংরেজ সৈন্য রাখতে হবে পেশোয়াকে, এবং তাদের ভরণ-পোষণের জন্য দাক্ষিণাত্যে বছরে ছাব্বিশ লক্ষ টাকা আয়ের বেশ কিছু 'থান' ছেড়ে দিতে হবে, তারপরে, ইংরেজ নয় এমন কোনো ইয়োরোপবাসীকে চাকরী দেওয়া চলবে না, ইত্যাদি। এই ঐতিহাসিক 'সন্ধি'র সঙ্গেই ডাঃ বুকানন উঠে এলেন নীলগিরিতে। তাঁর পর্যবেক্ষণের ফল অচিরেই ফলেছিল। দশ বছর পরে তাঁরই পথ ধরে এলেন দুজন ইংরেজ—'কীজ আর ম্যাকমাহোন'। পার্থকাই এদের ব্যবহারেই ক্রুদ্ধ হয়েছিল, তার পুতুল নিতে চাওয়ার পাগল ফোরিএদেরই হাত থেকে পালিয়ে বেঁচেছিল। এদের ছয় বছর পরে আবার এলো দুজন ইংরেজ, যারা পার্থকাইয়ের দরজায় পার্থকাইয়ের কন্যার হাত থেকে দুধের পাত্র নিয়ে তাদের তৃষ্ণা নিবারণ করেছিল। এই দুজন চলে যাবার একটি বছর পর, অর্থাৎ ১৮১৯ সালে, যে-সময়কার কথা দিয়ে আমি এ আখ্যায়িকা শুরু করেছি, এলেন সদলবলে এক ইংরেজ, ইনি কৈম্বাটুরের তদানীন্তন রাজপ্রতিনিধি—'জন স্থলিভান।' পার্থকাইয়ের বাড়ীর সামনেকার প্রস্তর-স্তম্ভটির কাছেই সেই পোয়ানো পাথরটার ওপর কার্পেট বিছিয়ে দিয়েছে সাহেবের এক অনুচর। সেই কার্পেটের ওপরে বসে পার্থকাইয়ের সঙ্গে দোভাষীর সাহায্যে আলাপ-আলোচনা করছিলেন 'জন স্থলিভান।' এসেছেন তিনি বহুক্ষণ, তাঁর সঙ্গে কথা বলতে বলতে একসময় উঠে গিয়েছিল পার্থকাই উঠে তার জনকয়েক বিশ্বাসী লোকজনদের পাঠিয়ে দিয়েছেন বিভিন্ন গাঁয়ে, গাঁওবুড়োদের খবর দিতে। সে খবর পেয়েই সুক্কা ছুরে গিয়ে খোঁজ করছিল বিষুর। বিষুকে সে পেলো, তারপরে সেল দুজনে ফোরির কাছে। ফোরির কাছ থেকে সরাসরি হেঁটে এসেছে পার্থকাইয়ের কাছে, পার্থকাইয়ের বাড়ীর সামনেকার সেই প্রস্তর-স্তম্ভটির সামনে।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

রসরচনা

সাহিত্যিকের দুঃখ

পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

আপনি যদি একটি উপন্যাস অথবা নাটক হয়তো লিখে ফেললেন। ছাত্রজীবনে আপনার কলমের জোর ছিল। সহপাঠীদের প্রত্যাশা আর আপনার স্বপ্নের মুখে ছাই দিয়ে কিন্তু আপনাকে নামতে হয়েছিল ব্যবসায়ে অথবা কেরাণী-গিরিতে,—অভিভাবকদের তর্জনী-প্রভাবে সেই যে মা সরস্বতীকে 'সবুর' বললেন, তিনিও লক্ষ্মী মেয়েটির মতো 'লক্ষ্মণ-ধরো'র ধৈর্য নিয়ে হয়তো এতদিন অপেক্ষা করছিলেন। আজ, জীবনের আটঘাট গুছিয়ে, ফুর্সৎ পেয়েছেন আপনি; কী মনে ক'রে কলম তুলে নিয়েছিলেন: বেরিয়ে এল যদি একটি উপন্যাস অথবা নাটক।

বন্ধুরা বললেন, "ছেপে ফেল হে, বেড়ে কাটবে বইখানা।"

দুরাশা বই-কি। হাড়ি-মোড়া গেল ভল, তারাশঙ্কর-প্রেমেন্দ্র-অচিন্ত্য থেকে শুরু ক'রে অবধূত, শঙ্কর, বনফুল বৈরাগীদের নিয়েই হিমসিম খাচ্ছেন প্রকাশকেরা, আর আপনি কিনা, হুঁঃ—যদা বলে কত জল!

না, রোখ চেপে গেল আপনার। দু-তিনটে প্রকাশক-ভবন থেকে নিরাশ হ'য়ে ফিরে আপনি ব'সে ভাবছেন: কী করা যায়! বইটা ছাপাবেন যখন বলেইছেন, ছাপাতে হ'বেই।

সামান্য আশার আলো পেলেন। নতুন প্রকাশক 'জেনিথ্-ওমেগা'র বিজ্ঞাপন দেখলেন: "আমরা অবহেলিত তরুণ প্রতিভাবান সাহিত্যিকদের পাণ্ডুলিপি প্রকাশার্থে গ্রহণ করি। চিঠি লিখুন: পোঃ বক্স…"

ঘাঁ করে চিঠি লিখেও ফেললেন। যথা সময়ে জবাব এল। 'জেনিথ্-ওমেগা' আপনার বই ছাপতে বিশেষ আগ্রহী, তবে মুদ্রণ ও বিজ্ঞাপন বাবদ যা-কিছু সামান্য খরচ, তা' আপনাকেই বহন করতে হ'বে। ইংরেজীতে টাইপ করা চিঠি: নিচে স্বাক্ষর রয়েছে D. Tisa! আপনি ভেবে পেলেন না 'টিসা' বা 'তিসা' আবার কোন্ মুলুকের নাম রে বাবা! গাচোয়ালি? জাপানী? হটেন্‌টট্? বাক্!—হঠাৎ আপনি 'জেনিথ্-ওমেগা'র বিজ্ঞাপনের পাতা ওলটাতে ওলটাতে থেমে গেলেন: এঁদের বেশির ভাগ বই-ই যে অসিত দত্ত নামক ধুরন্ধর সাহিত্যিকের লেখা! অসিত দত্ত! Asit Dutta!

আপনার বোঝ ভাংলো। Asit Dutta-ই D. Tisa হ'তে পেরেছেন যখন, তখন আপনি লালমণি সরকার ('রূপার সুষমা' উপন্যাসের লেখক) যে রাতারাতি, বই ছাপা হ'লে প্রচ্ছদপটে অসিত দত্তে পরিণত হ'বেন না তার গ্যারান্টি কই?

অগত্যা আপনি আর ছাপতে দিলেন না আপনার যাদা উপন্যাসখানা।

ফলে, কে জানে, আমরা সত্যিই হারালাম কিনা সত্যিকারের ভাল একটা উপন্যাস পড়বার সুযোগ।

এ-ব্যাপার হামেশাই ঘটছে।

মার্কিণ মুলুকে কিন্তু সাহিত্যিকের দূত' (লিটারারি এজেন্ট) বাকাধারী একদল সৎ সাহিত্য-রসিক আছেন যাঁরা প্রকাশক আর সাহিত্যিকের মাঝে ঘটকালি করে বেড়ান; বেশ দু-পয়সা পান; এতেই তাঁদের জীবিকা নির্বাহ হয়। ধরুন, আপনি লালঘণি সরকার অজ্ঞাত অখ্যাত এক গ্রামে ব'সে লিখে ফেললেন 'অপার সুষমা' নামে খাসা উপন্যাসটা। দৈবক্রমে একজন 'সাহিত্যিকের দূত'-এর ঠিকানা পেয়ে গেলেন আপনি। তাকে চিঠি লিখলেন। তিনি পাণ্ডুলিপি পাঠাতে বললেন। পাঠালেন। প্রাপ্তি সংবাদ এল। প্রত্যেক 'সাহিত্যিকের দূত'-ই দশ-বারোটা প্রথম-দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রকাশকের সঙ্গে যুক্ত। আপনি হয়তো যে এজেন্টের কাছে পাণ্ডুলিপি দিলেন, তাঁর নাম ধরুন 'ক' বাবুর জানাশোনার মধ্যে তিনজন প্রকাশক হয়তো জানালেন যে তাঁদের হাতে অনেক বই জমে আছে; আপাতত তাঁরা নতুন পাণ্ডুলিপি নেবেন না। চতুর্থ একজন প্রকাশকের রুচি 'ক'-বাবুর জানা আছে; তিনি আপনার উপন্যাসটি যে নির্ঘাৎ নেবেন, তা-ও ক-বাবু জানেন; তাই 'ক'-বাবু সামান্য অদল-বদলের নির্দেশ সমেত আপনাকে পাণ্ডুলিপি ফেরত দিলেন। সংশোধন করিয়ে পাণ্ডুলিপি তিনি পেশ করলেন প্রকাশকের কাছে। চুক্তি হ'য়ে গেল। শুধু চুক্তিই নয়। আগাম টাকা তো পেলেনই, আরো অঙ্গীকার করলেন যে আপনার পরবর্তী দুটো বইও পাণ্ডুলিপি আকারে আগে তাঁদের দেবেন; যদি নেহাৎ তাঁদের পক্ষে কোনও অসুবিধা থাকে তো 'ক'-বাবু দায়ক্ষণ আপনি অন্য কোনও প্রকাশককে সে-বই দিতে পারবেন।

আপনি নিশ্চিন্ত মনে কলম তুলে নিলেন। নির্ভয়ে কলম চালাতে লাগলেন আপনি। মাস ছয়েক বাদে প্রকাশিত হ'ল আপনার প্রথম উপন্যাস। মাঝে মাঝে 'ক' বাবু নিজের তাগিদেই খোঁজ নেন, আর-কোনও বই আপনার তৈরী হ'ল কিনা!

এই 'সাহিত্যিকের দূত'-গোষ্ঠী যে লেখকদের কতদূর আশ্বস্ত করেছেন, তা' মার্কিণ মুলুকের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন যে কোনও সজ্জনকে জিজ্ঞেস করলেই জানা যায়। শুধু স্বদেশের লেখকই নয়, বিদেশী বইয়ের অনুবাদ সংগ্রহ করাও এঁদের কাজ। এবং প্রকাশকদের কাজও অনেক সহজ হ'য়ে গিয়েছে এই ভাবে। কারণ, আমেরিকার ধরুন খ্যাতনামা প্রায় সব প্রকাশ ভবনই নিউ ইয়র্কে স্থিত। বস্টনেও আছে অবশ্য গোটা-দুই ভাল প্রতিষ্ঠান। কিন্তু মার্কিণ লেখকেরা নিউ ইয়র্ক বা বস্টনে প্রায় থাকেনই না। হাল-ফ্যাশানের বীটনিক লেখকদের প্রিয় নিবাস হ'ল ক্যালিফর্নিয়া; আবার দক্ষিণ আমেরিকায়ও থাকেন একদল লেখক। অনেকে আবার বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ডেরা বাঁধেন। প্রকাশকের পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে উঠত এইসব লেখকদের হদিস রাখা। প্রকাশক আর লেখকে কদাচে দেখা-সাক্ষাতের আর দরই ওঠে না এই "সাহিত্য দূত"দের কল্যাণে। তাঁরা লেখকের ঘরে মাসী, প্রকাশকদেরও পিসী। মার্কিণ সাহিত্য-জগৎ আজ নিয়ন্ত্রণই করছেন এই লিটারারি এজেন্টরা। প্রকাশকদের রুচির মোড় ফেরাচ্ছেন, লেখককে নির্দেশ দিচ্ছেন প্রয়োজন অনুসারে, আর পাঠকও তৈরী হ'য়ে উঠছে তদনুযায়ী।

প্রকাশক যে-তারিখে পাণ্ডুলিপি গ্রহণ করবেন, ঠিক দিন ক্ষণ মিলিয়ে তার পাকা ছয় মাস বাদে বাজারে ছাড়া পাবে আপনার বই। সে-বিষয়ে নড়চড় নেই। আমেরিকার সাধারণতঃ বইয়ের মরশুম হচ্ছে শরৎ আর বসন্তকাল। প্রতি মরশুমেই প্রকাশকেরা তাঁদের নতুন বইয়ের ক্যাটালগ ছেপে বিলি ক'রে দেন সর্বত্র। আর বই বাজারে বার হবার আগেই চ'লে যায় খ্যাতনামা লেখক ও সমালোচকদের কাছে। ফলে ভালো কোনও সমালোচনা যদি ছুটে যায়, তা-ও বইয়ের

রবীন্দ্রনাথ

প্রভাকর মাঝি

যতই হোঁচট খেয়ে সময়ের সাঁকো হই পার
তোমাকে নূতন করে কবি আবিষ্কার।
হে অদৃশ্য যাদুকর বলো বলো মায়াবী অক্ষরে
শতভিষা নক্ষত্রের দ্যুতি নিয়ে
ডেকে কেন গেলে নাম ধরে!
আমি যে জীবন যুদ্ধে লুপ্ত-জ্যোতি ক্লান্ত পদাতিক,
সত্তাতার অব্যর্থ শিকার। প্রাংশুলভ্য শব্দমন্ত্র যত্
দ্বিতীয় ইন্দ্রিয়ে কেন করলে উচ্চারণ?
আলো জ্বললো। ঘুচলো সব দ্বিধা
ঝরাপাতা জীবনের আশ্চর্য অভিধা
চোখে পড়লো। এবং দিনের পৃষ্ঠপটে
বিবর্ণ রাত্রির এই মূক অভিনয়
হয়ে উঠলো সহসা বাঙ্ময়।

তারপর শান্ত সব। তর্ক আর ওরুলতা।
স্মৃতির মৌচাকে
কোনো বিশ্লেষণ নয়, বিশেষ্য বিস্ময় জেগে থাকে।
রবীন্দ্রনাথ তো ঐ বিস্ময়ের নাম।
হে জীবন-শিল্পী, বলো, কি দিই তোমাকে আজ,
প্রীতি না প্রণাম?

সঙ্গে ছাপা সম্ভব হয়। এবং সংবাদ-পত্রের সমালোচকেরা আগে থেকে বই পাবার ফলে সমালোচনা লিখে বসে থাকেন যে-তারিখে বই বার হ'বে, সেদিনই পত্র-পত্রিকায় ছাপা হ'বে তার সমালোচনা। তাই ভারি শৃঙ্খলাবদ্ধ হ'য়ে উঠেছে সেখানে প্রকাশনার ব্যাপারটা।

কোনও বই যদি কোনও 'বুক ক্লাব' (যেমন Book of the Month Club) থেকে নির্বাচিত হয়, তবে সঙ্গে সঙ্গে তা' অত্যন্ত জনপ্রিয় হ'য়ে ওঠে, বেস্ট সেলারে পরিণত হয়।

আমাদের দেশে কি এ-ব্যবস্থা হওয়া অসম্ভব?

অশান্ত নেপাল

ভোলা চট্টোপাধ্যায়

এ কথা অনস্বীকার্য যে, নেপালের রাজনীতিক পরিস্থিতি আজ এক বিশেষ সঙ্কটের সম্মুখীন। বিক্ষুব্ধ মানুষের রুদ্ধ রোষে এই বিচিত্র দেশের রাষ্ট্রজীবনে সেই সঙ্কটের ছায়া ক্রমেই গভীরতর হয়ে উঠছে। আর বৈচিত্র্যময় হিমালয়ের দিগদিগন্তে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে বিপর্যয়ের অশুভ পদধ্বনি। কিন্তু কেন এই সঙ্কট, এর হেতু কোথায়, তা অনুসন্ধান করতে হলে নেপালের নিকট-অতীতের রাজনীতির প্রতি একটু বিশ্লেষক দৃষ্টি নিক্ষেপ করা প্রয়োজন।

১৯৫১ সালে প্রায় ১ কোটি মানুষের দেশ নেপালে বহু যুগের সামন্ততান্ত্রিক স্বৈরাচারের অবসান ঘটেছিল সশস্ত্র গণ-বিপ্লবের মাধ্যমে। বিশ্বেশ্বর কৈরালার নেতৃত্বে নেপালী কংগ্রেস পরিচালিত সেই সংগ্রামে সেদিন সমর্থন জানিয়েছিল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বহু প্রগতিশীল মানুষ, বিশেষতঃ গণতান্ত্রিক সমাজবাদে বিশ্বাসী অগণিত ভারতবাসী। সেদিন প্রতিক্রিয়াশীল এই আশঙ্কা দিয়ে, কমিউনিষ্টরা সংগ্রামের বিরোধিতা করতে এতটুক ইতস্ততঃ করেনি।

সে যাই হোক, গণ-বিপ্লবের দীর্ঘ আট বছর পরে প্রাপ্ত-বয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নেপালে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে নেপালী কংগ্রেসকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়ে নেপালের দারিদ্র্য পীড়িত মানুষ প্রমাণ করল যে, অকৃতজ্ঞতা একান্তই তাদের স্বভাববিরুদ্ধ। ফলে, নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে নেপালী কংগ্রেস বিশ্বেশ্বর কৈরালার প্রধানমন্ত্রীত্বে নেপালের সর্বপ্রথম নির্বাচিত জনপ্রিয় গভর্নমেণ্ট গঠন করল। সেটা ১৯৫৯ সালের কথা।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা আবশ্যক যে, নির্বাচনের মাধ্যমে যথার্থ ক্ষমতা লাভের পরে নেপালী কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজব্যবস্থা রচনার প্রচেষ্টায় একনিষ্ঠভাবে আত্মনিয়োগ করে। জনজীবনের সীমাহীন দারিদ্রের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে সর্বপ্রথমে উঠিয়ে দেওয়া হয় বিরতা প্রথা অর্থাৎ খাজনাহীন জমিদারি ব্যবস্থা—যা নেপালের প্রধান সমস্যাগুলির অন্যতম। তা ছাড়া সর্বাঙ্গীন বৈষয়িক উন্নতির জন্য ভারতবর্ষ সহ অপর কয়েকটি বিদেশী রাষ্ট্রের সহায়তায় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চালু করা হয়। মোট কথা অল্প সময়ের মধ্যেই গভর্নমেণ্টের কার্যকলাপে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, শোষণহীন গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গঠনে নেপালী কংগ্রেস দৃঢ়সঙ্কল্প।

কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাকে বিংশশতাব্দীর শিল্প-সভ্যতার যোগ্য আধারে রূপান্তরের প্রয়াস নেপালের অতীতাচারী কায়েমী স্বার্থের একেবারেই মনঃপূত হল না। রাজা মহেন্দ্রের নেতৃত্বে কুচক্রী শোষকের নির্মম আঘাত শোষিতের শিরে নেমে এল নিষ্ঠুর অভিশাপরূপে। নবজাত গণতন্ত্রের সদ্যপ্রোথিত ব্রততীকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে দেওয়া হল কাঠমাণ্ডুর ঘুণাসক্তিত আবর্জনাস্তূপে। ১৯৬০ সালে ডিসেম্বরের ১৬ তারিখে হিমালয়ের সন্ধ্যাগ্রস্ত উপত্যকায় পুনরায় নেমে এল দীর্ঘ রাত্রির অন্তহীন অন্ধকার। নির্বাচিত

পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়া হল, কারাগারে নির্বাসিত হলেন প্রধান মন্ত্রী বিশ্বেশ্বর কৈরালা সহ অপর কয়জন মন্ত্রী। এবং রাজা মহেন্দ্র একচ্ছত্র রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকার করে নেপালকে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন প্রাক্-বিপ্লব যুগের স্বেচ্ছাচারের শ্বাস-রোধকারী পরিবেশে।

তখন থেকেই অন্তর্দ্বন্দ্বের ক্রমবর্ধমান তীব্রতায়-রাষ্ট্রের রাজনীতিক পরিস্থিতি বিপর্যস্ত। ক্রমে সেই অন্তর্দ্বন্দ্বের ঘূর্ণাবর্তে সমগ্র রাষ্ট্রজীবন এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছে যে, বর্তমানে নেপালের জনসংখ্যার একটা বড় অংশ রাষ্ট্রশক্তির সক্রিয় বিরুদ্ধাচরণে দৃঢ়সঙ্কল্প। শুধু তাই নয়, নেপালী কংগ্রেস পরিচালিত সশস্ত্র গেরিলাবাহিনী রাষ্ট্রযন্ত্রকে করে তুলেছে প্রায় বিকল।

এটা যে বিশেষ তাৎপর্যময়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কেননা, যখন ক্ষমতা গ্রহণকালে রাজা মহেন্দ্র প্রতিবাদের সকল উৎসকে নির্মমভাবে রুদ্ধ করে দিয়েছিলেন। সেদিন অতি দুঃসাহসীর কল্পনাতেও একথা মুহূর্তের জন্য স্থান পায়নি যে, রাজকীয় স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের সঙ্কল্প কোনদিন মূর্ত হয়ে উঠবে। কিন্তু তাই হয়েছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে নেপালী কংগ্রেস, দীর্ঘদিনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় দেশের অভ্যন্তরে ব্যাপক সশস্ত্র আন্দোলন গড়ে তুলেছে। এবারা প্রতিপন্ন হয় যে, রাজা মহেন্দ্রের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও নেপালী কংগ্রেস জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন থেকে বঞ্চিত হয়নি; এবং এই প্রতিরোধ আন্দোলন উদ্দেশ্যহীন অথবা বিশেষ কোন গোষ্ঠীস্বার্থ সাধনের হটকারী অভিযানও নয়।

উপরোক্ত পর্যালোচনা থেকে সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে, নেপালের বর্তমান রাজনৈতিক সঙ্কটের জন্যে অপরিসীম দুর্যোগের ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে। এবং সমস্ত বিষয়টি আরো জটিল হয়ে উঠেছে দুটি বিশেষ কারণে: প্রথমতঃ, নেপালী কমিউনিষ্টদের সশস্ত্র প্রতিরোধআন্দোলনে যোগদানের সিদ্ধান্ত; দ্বিতীয়তঃ—এটা আরো গুরুত্বপূর্ণ—নেপালের সঙ্গে প্রয়োজনাতিরিক্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের জন্য চীনা কমিউনিষ্টদের উদ্দেশ্যমূলক প্রচেষ্টা, যার অন্যতম দৃষ্টান্ত হচ্ছে রাজা মহেন্দ্রের সঙ্গে অনুষ্ঠিত চুক্তি। চুক্তির সর্তানুযায়ী চীনারা লাসা থেকে কাঠমাণ্ডু পর্যন্ত একটি স্থায়ী রাজপথ নির্মাণ করবে। কোন সন্দেহ নাই, এই রাজপথে বহুবিধ পণ্য পিকিং থেকে পৌঁছবে কাঠমাণ্ডুতে। এবং সেই সঙ্গে চীনা ড্রাগনের দুষ্কৃতি নিঃশ্বাসও। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে, জাগর-নিদ্রিত ব্যক্তি বাদে অপর কেউ নেপালের রাষ্ট্র-জীবনের বর্তমান সঙ্কটকে কাল্পনিক দুঃস্বপ্ন বলে উপহাস করবে না, করা উচিত ও নয়।

পুস্তকপরিচয়

'পুস্তক পরিচয়' বিভাগ পত্রিকার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। কিন্তু অনতিক্রম্য কারণে বেশ কিছুদিন যাবৎ নিয়মিতভাবে এ বিভাগকে চালু রাখা যায়নি। সম্প্রতি বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের সহযোগিতায় এই বিভাগটি আবার নিয়মিত প্রকাশ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সাহিত্যিক ও প্রকাশকদের এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সমালোচনার জন্য দু কপি বই প্রয়োজন। ভঃ সঃ।

শতাব্দী শতক। প্রেমেন্দ্র মিত্র ও কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত সম্পাদিত। প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরি। দাম ঃ ৭০০

এই কবিতা সংকলনটির পরিকল্পনায় অভিনবত্ব ছাড়াও অন্য আকর্ষণ রয়েছে। কবিদের সম্পাদিত গ্রন্থ নিছক ঐতিহাসিক মর্যাদার ঊর্ধ্বে এমন এক তাৎপর্য লাভ করে, যা পেশাদার সংকলকদের সহজলভ্য নয়। প্রেমেন্দ্র মিত্র বেশ কয়েক বছর আগে "প্রেম যুগে যুগে" নামক প্রেমের কবিতা সম্পাদন করেছিলেন এবং উক্ত গ্রন্থটি বাঙলা সাহিত্যের স্মরণীয় কবিতা সংকলন। সময়ের দিক দিয়ে "শতাব্দী শতকে"র পটভূমি "প্রেম যুগে যুগে"র মতো বিস্তৃত নয়। রবীন্দ্র জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষ্য ক'রে একশো বছরের একশোটি কবিতা সংকলিত হয়েছে "শতাব্দী শতকে।' মধুসূদন থেকে শুরু এবং শেষ হয়েছে অতি আধুনিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতায়—১৮৬১ থেকে ১৯৬১ খৃঃ পর্যন্ত এক শতাব্দীকালের বাঙলা কবিতার বিবর্তণের রূপ অনুসন্ধান উক্ত গ্রন্থের পরিকল্পনায় সুস্পষ্ট। গুরুত্ব এবং কৃতিত্ব নির্বিশেষে সম্পাদকদ্বয় প্রত্যেক কবির একটি করে কবিতা নির্বাচিত করেছেন। এই পদ্ধতি বিষয়ে হয়তো মতানৈক্য থাকতে পারে, কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে, "শতাব্দীশতকে' কবি বিশেষের চেয়ে কবিতার সামগ্রিক পরিবর্তণের ওপর বেশি মনোযোগ দেওয়া হয়েছে।

প্রত্যেক কবির একটি মাত্র কবিতা গ্রহণ করার সীমাবদ্ধতা বিষয়ে কবি, সম্পাদকেরা নিজেরাই সচেতন। তাঁরা ভূমিকাতে বলেছেন, "একটি মাত্র কবিতার মাধ্যমে কোনো কবির ব্যক্তিস্বরূপ কিংবা কবিতার চরিত্রলক্ষণ সর্বদা প্রকাশ পায় কিনা সন্দেহ। কোনো কবিতায় কারুকলার দিকে, কোনো কবিতায় বিষয়ের দিকে, গুরুত্ব আরোপিত হয়। তবু, যতোটা সম্ভব, এই গ্রন্থের অন্তর্গত কবিতাগুলো নির্বাচনের সময়, কবিব্যক্তিরই প্রতিনিধিস্থানীয় কবিতাগুলোকেই গ্রহণ করার চেষ্টা হয়েছে। • • • উনবিংশ শতকের কবিদের ক্ষেত্রে বহুল-প্রচলিত কবিতাকে বর্জন ক'রে অপেক্ষাকৃত স্বল্পপরিচিত অথচ উৎকৃষ্টতর কবিতা নির্বাচনের চেষ্টা হয়েছে। পক্ষান্তরে, বিংশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে শুরু ক'রে আজ পর্যন্ত যে-সব কবি বাঙলা কাব্যধারাকে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের ক্ষেত্রে বহুপঠিত কিন্তু উৎকৃষ্ট এবং স্বল্পপরিচিত কিন্তু উৎকৃষ্ট —এই উভয় ধরণের কবিতাই নির্বাচিত হয়েছে।" এই পরিকল্পনার প্রভাব রবীন্দ্রনাথের কবিতা নির্বাচনেও দেখতে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের "পরিশেষ" কাব্যগ্রন্থের অপেক্ষাকৃত স্বল্পপঠিত কিন্তু অসাধারণ "বিস্ময়" কবিতাটি অন্তর্ভুক্ত

হয়েছে। তবে মধুসূদন, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের কবিতাগুলি পাঠ্যপুস্তকের মহিমায় আবাল বৃদ্ধ-বনিতার পরিচিত!

কল্লোলের সমসাময়িক কবিদের কবিতা-নির্বাচন প্রসঙ্গে আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য রয়েছে। বাঙলা দেশে যে কয়টি কবিতা সংকলন প্রকাশিত হয়েছে, তাতে কল্লোলগোষ্ঠী বা সমসাময়িকদের প্রথম যুগের বা কয়েকটি বহু পরিচিত কবিতার প্রতিই পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ করা হয়ে থাকে। সংকলনের মাধ্যমেই যাদের কবিতা পাঠের অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধ, তারা উক্ত কবিদের পরবর্তীযুগের দৃষ্টিধারা বিষয়ে অনবহিত থাকেন। আলোচ্য সংকলনে সম্পাদকগণ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে যেমন পদাতিক, চিরকুটের কোনো কবিতা গ্রহণ না করে "ফুল ফুটুক না ফুটুক" অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এর ফলে পাঠকেরা কবিদের পরবর্তী রূপান্তরের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পান। নীলকণ্ঠ, মাটি ইত্যাদি আমাদের অতি-প্রিয় কবিতা এবং সেজন্যই আমরা চাইনা শুধু উক্ত কবিতাগুলিতেই প্রেমেন্দ্র মিত্র বা অমিয় চক্রবর্তীর পরিচয় সীমাবদ্ধ থাকুক।

অবশ্য এ বিতর্কের সর্বজনগ্রাহ্য মীমাংসা হওয়া দুরূহ; কোন্ দুরূহ সংকলনে অন্তর্ভুক্ত এবং অনুপস্থিত সমস্ত কবিদের বিষয়ে একমত হওয়া। তবে মতভেদ দ্বারা তো কোনো কিছুর মূল্য কমে যায় না। "শতাব্দী শতকে"র প্রধান মূল্য এইখানে যে এর মধ্যে একশো বছরের বাঙলা কবিতার ধারা-পরিবর্তনের চেহারাটি স্পষ্ট। এই একশো বছরের ইতিহাসে সম্পাদকদ্বয় নিজেরাও অংশভুক্ত হওয়াতে পাঠকের কাছে এর মূল্য আরো বেশি। পরিশেষে কবিতা-সম্পাদনায় তাঁদের নিষ্ঠা ও নিরপেক্ষতা বিষয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে একটা দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি: বহু কবির জন্ম মৃত্যু তারিখ পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের প্রয়োজন।

সুবীর রায়চৌধুরী

শতবার্ষিকী সম্ভার

রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী উৎসব-উদ্‌যাপনের একটি স্থায়ী ও গঠনমূলক দিক দেখা গেল রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত বিভিন্ন ও বিচিত্রগ্রন্থ প্রকাশে। আর একবার রবীন্দ্রনাথ এইরকম নিবিড়ভাবে আলোচিত হয়েছিলেন—সে তাঁর মৃত্যুর পরেই: তখনকার প্রকাশিত অনেক গ্রন্থই আজ রবীন্দ্র-গবেষণার সহায়ক, ঠিক একইভাবে বলা যায় অধুনাপ্রকাশিত গ্রন্থগুলি পরবর্তীকালের পাঠকের কাছে, বিশেষত মনোযোগী পাঠকের কাছে, কোন না কোনরকমভাবে উপকারী বন্ধুর কাজ করবে।

বর্তমানে অনেক তরুণ যুবকের কাছে রবীন্দ্রনাথ একটি স্মরণীয় নাম, এক বিস্ময়কর প্রতিভা, একজন সুমহান আদর্শবাদী মহিমময় ব্যক্তিস্বরূপ এমনই এক কালের যে-কাল এখন গতায়ু, নিশ্চিহ্ন—তবু এখনো অনেকে আছেন, এবং তাঁদের সংখ্যাও যদিও ক্রমে আসছে, যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে খুব নিকট থেকে দেখেছেন, ভারতবর্ষের একজন ক্লাসিক যুগের ধারাবাহী কবিকে দেখেছেন, তাঁর জীবনপ্রবাহের নিত্যনৈমিত্তিক অনেক ঘটনার মধ্যে বিশিষ্টতামণ্ডিত অনেক কিছুই নিরীক্ষণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের নিকটবর্তী সেই সব ব্যক্তিদের স্মৃতিকথার দুরের আমরা সেইরকম সারল্য দেখে চমৎকৃত হই যেরকম সারল্য আছে চৈতন্যদেবের সমসাময়িক পার্ষদদের চৈতন্যসম্পর্কিত প্রাণবন্ত কবিতাবলীতে। রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকীতে সেইসব মূল্যবান স্মৃতিকথাগুলি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। হয়ত তাদের অনেকগুলিই পূর্বলিখিত, কিন্তু পুনর্বার আহরণে এক অনির্দেশ্য সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে তাদের মধ্যে।

'রবীন্দ্রস্মৃতি' একটি চিত্তাকর্ষক সংকলন যাতে প্রধানত সংকলিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত স্মৃতিকথা। 'ছেলে-মেয়েদের জন্য রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এই সংকলনটি প্রকাশ করা হলো' বলেছেন সম্পাদক শ্রীবিশ্বনাথ দে; কিন্তু এই গ্রন্থ সাধারণ বয়স্ক পাঠকদেরও রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রযুগ সম্পর্কে

কৌতূহল চরিতার্থ করবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। রবীন্দ্র-যুগ ও রবীন্দ্র-জীবনের বিচিত্র দিকগুলি সম্পর্কে পূর্ব-আলোচিত কোন রচনার অংশবিশেষ উদ্ধার করে সম্পাদক যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। গুরুভার কোন রচনা না থাকায় এবং রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কেও সূত্রাকারে রচনাংশবিশেষ বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে সংকলিত হওয়ায় এই গ্রন্থের একটি হাল্কা আমেজ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 'জন' এর চোখে গুরুদেব কেমনভাবে যীশু বলে প্রতিভাত হয়েছিলেন শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের সেই লঘু কিন্তু বেদনাঙ্গ অভিজ্ঞতাটি কেমন আমাদের মনে থাকে, তেমনই মনে দাগ কাটে এক প্রত্যক্ষদর্শী। (হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়) ভাষায় রবীন্দ্রনাথের বাল্মীকির ভূমিকায় অভিনয়ের কথা।

হরপ্রসাদ মিত্র সম্পাদিত 'রবীন্দ্র-চর্চা' আর একটি উল্লেখ-যোগ্য সংকলন। এতে রবীন্দ্রসংগীতের সমস্ত দিকের, যেমন ছবির, আলোচনা না থাকলেও একটা রূপবন্ধের দিকে প্রচেষ্টা ছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় পত্রিকা-সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের একটি তথ্যনির্ভর ছবি দুটি বিভিন্ন প্রবন্ধের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। রবীন্দ্র-জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে এই পত্রিকা-গুলির কত বিচিত্র অবদান ছিল তার সম্যক পরিচয় আছে ঐ প্রবন্ধ দুটিতে (রবীন্দ্রনাথ ও সাময়িক পত্র—ভবতোষ দত্ত; 'সবুজপত্র,' 'কল্লোল' : রবীন্দ্রনাথ—অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়)। রবীন্দ্রনাথের লোকসাহিত্যে প্রেম সম্পর্কে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য। শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 'লিপিকা'র ছোটগল্প" একটি পুরনো প্রশ্নের নতুনভাবে আলোচনা করেছেন। 'লিপিকার' কতকগুলি রচনাকে, যেগুলি প্রথমদিকের গদ্যকবিতা নয়, ছোটগল্প হিসাবে স্বীকার করে নিতে তাঁর কোন দ্বিধা নেই, এবং একদা এদের কোন কোনটি সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করা হলেও (রবীন্দ্রনাথ, সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত), পৃথিবীর সাহিত্যের সঙ্গে তুলনামূলক বিচার করে এদের যোগ্যতা নিরূপণ করায় শ্রীগঙ্গোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ। রবীন্দ্রনাথের ছন্দ সম্পর্কে ছান্দসিক শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায় ও শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনের দুটি বিশিষ্ট রচনা এতে সংকলিত হয়েছে। শ্রীমুখোপাধ্যায়ের কথামত রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনা ও ছন্দসাধনা পরস্পরনির্ভর প্রতিভাবান কবিরই পরিচয় উদ্ঘাটন করে যার রচনায় অনিবার্যভাবে একটি রূপের আধারে একটি ভাব ফুটে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র ছন্দ বিভিন্ন সময়ে তাঁর ভাবের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীজড়িত হয়েছিল। গদ্যকবিতার ছন্দ আলোচনার বেলায় শ্রীমুখোপাধ্যায় কিন্তু 'লিপিকা'র কবিতাগুলির কথা বলেন নি। "তাঁহার (রবীন্দ্রনাথের) গদ্যকবিতার সার্থক অনুকরণ অদ্যাপি কেহই করেন নাই"—শ্রীমুখোপাধ্যায়ের এই উক্তি ইতিহাসসম্মত বলে মনে হয় না, কারণ রবীনাথের পরে অনেকেই সার্থক গদ্যকবিতা রচনা করেছেন। এছাড়া "বাস্তব জগতের যে একটা নিজস্ব অব্যক্ত সুর আছে, গদ্যকবিতায় তাহাই ধরিয়া রাখার চেষ্টা করা হয়,"—কথাতেও গদ্যকবিতার সংজ্ঞা দেওয়া হয় না: রবীন্দ্রনাথ কেন গদ্যকবিতা রচনা করলেন এসম্পর্কে শ্রীমুখোপাধ্যায় যা বলেছেন (পৃঃ ৬২, ২য় অনুচ্ছেদ) তা কষ্টকল্পিত; রবীন্দ্রনাথ নিজেই বহুভাবে বলে গেছেন কেন তিনি গদ্যকবিতা রচনা করলেন।

এইরকম বেশ কয়েকটি উপভোগ্য ও চিন্তাশীল প্রবন্ধের সংকলন এই গ্রন্থটি।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'রবীন্দ্রনাথ : উত্তরলক্ষ' আর একটি মূল্যবান গ্রন্থ। এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্পাদক বলেছেন: "যারা বয়সের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ এবং চিন্তার দিক থেকে শুধু বিংশ শতাব্দীর ধ্যান ও ধারণাকেই নিজেদের চেতনায় বহন করছেন, সেই উত্তর-কালের মানুষদের চোখে ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের চৈতন্যরূপটি উপস্থাপিত করাই এক্ষেত্রে আমার বর্তব্য বলে ধরে নিয়েছি।" প্রায় সমস্ত প্রবন্ধগুলিতেই বিভিন্ন ঘটনার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে একটি বিরাট প্রতিভার ব্যাখ্যা ও বিচার করেছেন লেখকবৃন্দ।

যেমন অন্নদাশঙ্কর রায় লিখেছেন, "দোতলা কিম্বা চারতলা, জমিদারী কিম্বা নাইট উপাধি তাঁর পক্ষে আকস্মিক। তিনি ছিলেন সৌন্দর্যযোগী, আজীবন যোগসাধনা করে গেছেন।" (রবীন্দ্রনাথে অপরাধ?) অমিয় চক্রবর্তীর রচনায় তেমনি ঘটনার বিশ্লেষণ আছে, এবং এই বিশ্লেষণের মধ্যেই একটি যুগ ও একটি প্রতিভার পরিচয় সবিশেষ ফুটে উঠেছে। সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ,' অরবিন্দ পোদ্দারের 'রবীন্দ্র বিউম্যানিজম' পাঠকের মনোযোগী দৃষ্টি আকর্ষণ করে বক্তব্যের নতুনত্বে। অতুলচন্দ্র গুপ্ত, মোহিত লাল মজুমদার, অন্নদাশঙ্কর রায়, নীহার রঞ্জন রায় প্রভৃতির প্রবন্ধ সুখপাঠ্য। প্রত্যেকটি রচনাই এই গ্রন্থে রবীন্দ্র সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকের বিচারে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

উল্লিখিত তিনটি বইয়েরই মুদ্রণ, প্রচ্ছদ আকর্ষণীয়।

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়।

(১) রবীন্দ্র-স্মৃতি—বিশ্বনাথ দে—ক্যালকাটা বুক হাউস

(২) রবীন্দ্র কথা—হরপ্রসাদ মিত্র—সুকুমার প্রকাশনী

(৩) রবীন্দ্রনাথ: ইন্দ্রপতন—নীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ইণ্ডিয়ানা.

প্রাপ্তি স্বীকার

শান্তির আকর—শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

দেবকন্যা—শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্বেত কপোত—শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতের শাক্ত সাধনা ও শক্তি সাহিত্য—শশিভূষণ দাশগুপ্ত

রবীন্দ্রনাথ—নলিনীকান্ত গুপ্ত

স্মৃতি কথা—সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্তা—নীরদবরণ

বিভাজিত বছরের রম্য রচনা 'জন্মান্তর' আগামী সংখ্যা থেকে ধারাবাহিক চলবে। —সঃ সঃ

শতবার্ষিকী গ্রন্থপঞ্জী

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে বাংলাদেশের লেখক, প্রকাশক ও পাঠকসমাজে যে অভূতপূর্ব জীবনচাঞ্চল্য ও আনন্দবেগ স্বতস্ফূর্ত মহিমায় উদ্ভাসিত হয়েছে তার প্রণাম রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিত অজস্র গ্রন্থাবলীতে উপস্থিত। এই উপলক্ষে রচিত ও সম্পাদিত ১৯১১ সালে প্রকাশিত বইয়ের একটি তালিকা প্রস্তুত থাকলে রবীন্দ্রসাহিত্যের অনুরাগী সাধারণ পাঠকের সুবিধা হতে পারে এই বিবেচনা থেকেই নিম্নলিখিত তালিকাটি প্রস্তুত করা হলো। বলা বাহুল্য, এই তালিকা সম্পূর্ণ না হওয়াই সম্ভব। হয়তো অনেক বই বর্তমান সঙ্কলনকর্তার নজরে আসেনি কিংবা অজ্ঞাত থেকে গেছে। তৎসত্ত্বেও এরূপ তালিকা-রচনার কিছু মূল্য রয়েছে এবং সাধারণ পাঠকের রবীন্দ্রপ্রতিভা সম্পর্কিত গ্রন্থ নির্বাচনের সহায়কও হতে পারে বিবেচনা করে এই শতবার্ষিকী গ্রন্থপঞ্জী সন্নিবেশিত হ'লো।

শতবার্ষিকী গ্রন্থগুলোর মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই সংকলন গ্রন্থের সংখ্যাধিক্য নজরে পড়ে। বোধ হয় তার একটি কারণ এই যে নতুন রচনা সংগ্রহ করার দায় থেকে সম্পাদক ও প্রকাশক এই পদ্ধতিতে অব্যাহতি পেয়ে থাকবেন। সুতরাং অনেক সংকলনকেই রবিপ্রতিভা সম্পর্কিত বিভিন্ন লেখকের অতি-পুরাতন রচনার সংগ্রহ বললে অত্যুক্তি হয় না। পুরাতন ও প্রবীন লেখকদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, কোনো-কোনো প্রাবন্ধিকের একটি মাত্র প্রবন্ধই অন্তত চার-পাঁচটি সংকলনগ্রন্থে স্থান পেয়েছে। অতুল গুপ্ত, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতির রচনা দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ্য। কতকগুলো প্রবন্ধ

একদলে গ্রন্থিত হলে সংকলনগ্রন্থ তৈরী হতে পারে বটে কিন্তু সম্পাদকের সাহিত্যবোধ, রুচিজ্ঞান ও শিল্পদৃষ্টির অভাবে এই ধরণের গ্রন্থ যে তাৎপর্যহীন হয়ে পড়ে তারও প্রমাণ কিছু কিছু সংকলনগ্রন্থের মধ্যে পাওয়া গেল। তবু, অনেক প্রকাশক ও সম্পাদক বাণিজ্যের পণ্যতরী শতবার্ষিকীর স্রোতের উজানে ভাসাবার জন্যে যেমন ধরীয়া হয়ে লেগেছিলেন তেমনি অন্য দিকে, সুস্থ ও উন্নত, মার্জিত রুচিবোধ এবং উচ্চিষ্ট শিল্পচিন্তার দিক থেকে সার্থকতর, এমন কি কোনো-কোনো ক্ষেত্রে নিখুঁত সংকলন গ্রন্থের প্রকাশও এই বছরেই সম্ভবপর হয়েছে। রবীন্দ্রচর্চার একনিষ্ঠ সাধক পুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত 'রবীন্দ্রায়ণ' সংকলন দুটি এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখ্য। এছাড়াও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য গোপাল হালদার সম্পাদিত 'রবীন্দ্রসৃষ্টি : শতবার্ষিকী প্রবন্ধ সংকলন', ডক্টর হরপ্রসাদ মিত্র সংকলিত 'রবীন্দ্রচর্চা', বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'রবীন্দ্রনাথ : উত্তরপক্ষ' দেবীপদ ভট্টাচার্য সংকলিত 'রবীন্দ্রনাথ' এবং পশ্চিমবঙ্গ রবীন্দ্রশতাব্দী জয়ন্তী সমিতি প্রকাশিত 'শতবার্ষিক জয়ন্তী উৎসর্গ'।

সংকলন গ্রন্থগুলোর পাশাপাশি বেশ কিছু নতুন বইও এই বছরে প্রকাশিত হয়েছে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবি-কথা', প্রবোধচন্দ্র সেনের 'ভারত পথিক রবীন্দ্রনাথ' এবং ডক্টর শশীভূষণ দাশগুপ্তর 'উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্র-মানস'। এ ছাড়া উল্লেখ্য ডক্টর অরবিন্দ পোদ্দারের 'রবীন্দ্র-মানস', মৈত্রেয়ী দেবীর 'বিশ্বসভায় রবীন্দ্রনাথ,' ডক্টর আশিস ওহদেদার প্রণীত 'সমালোচক রবীন্দ্রনাথ'। ছেলে-মেয়েদের উপযোগী রবীন্দ্রজীবনীর মধ্যে উল্লেখ্য 'এই যা দেখা' (লীলা মজুমদার), 'তরুণ রবি' (নয়নচন্দ্র মুখোপাধ্যায়)। ব্যক্তিগত স্মৃতিচিত্রণের দিক থেকে জসীম উদ্দীনের 'ঠাকুর বাড়ির আঙিনায়' ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করে। রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিত কাব্য সংকলনের মধ্যে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'কবিতীর্থ' প্রবীণ ও নবীন বিভিন্ন কবির স্বনির্বাচিত কবিতার সংকলন। এছাড়া আরো দুটি কাব্যসংকলন 'শতাব্দী শতক' এবং 'কবিপ্রণাম' পাঠকসমাজের মনোযোগের অপেক্ষা রাখে।

প্রসঙ্গত, গত এক বছরের মধ্যে প্রকাশিত কয়েকটি সাহিত্যপত্রের রবীন্দ্র শতবার্ষিকী সংখ্যারও একটি সম্মানীয় উল্লেখ থাকবে। বিশ্বভারতী পত্রিকার সপ্তদশ বর্ষের একখণ্ডে প্রকাশিত সংখ্যাটি সংগ্রহ ক'রে রাখবার মতো। 'নতুন সাহিত্য' 'উত্তরসূরী' 'পরিচয়' 'পূর্বপত্র' 'সংহিতা' রবীন্দ্রসমীক্ষার ক্ষেত্রে কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ পরিবেশন ক'রে সৎপাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সম্পাদিত পূর্ণবার্তা, রণজিৎকুমার সেন সম্পাদিত 'বাণীবিতান' বিশেষ সংকলনের কয়েকটি রচনা উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণারঞ্জন বসু সম্পাদিত 'মধুরাংশু' বার্ষিকীর রবীন্দ্রসংখ্যাও রচনায় ও অঙ্গসজ্জায় সুসমৃদ্ধ। সুপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্যপত্রের মধ্যে 'দেশ' 'প্রবাসী' এবং 'শনিবারের চিঠি' গত এক বছরে বেশ কিছু স্মরণীয় প্রবন্ধ ও আলোচনার সমাবেশ ঘটিয়েছেন, বলা বাহুল্য। আলোচ্য বছরে যে ক'টি পত্রপত্রিকা নতুন প্রকাশিত হতে শুরু করেছে তার মধ্যে বঙ্গসংস্কৃতির সম্মেলনের মুখপত্র (বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য সম্পাদিত) 'কালপুরুষ' সাপ্তাহিক পত্র 'অমৃত' এবং কবিতার ত্রৈমাসিক পত্র 'উচ্চারণ' (বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও অরুণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত) দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। প্রবাসী পত্রিকার ষষ্টবার্ষিকী বিপুলায়তন স্মারক-গ্রন্থটিও এই বছরের আকর্ষণ। এ বছর অপেক্ষাকৃত নবীন প্রবন্ধকারদের মধ্যে যাদের রবীন্দ্র প্রসঙ্গ ব্যক্তিগতভাবে আমার ভালো লেগেছে তাঁদের মধ্যে অজয়কুমার সিকদার, অরুণ ভট্টাচার্য, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীপদ ভট্টাচার্য, অরুণ মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ রায়, ভবতোষ দত্ত প্রভৃতি স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিতে পেরেছেন।

কয়েকজন প্রবীণ ও ক্ষমতাপন্ন লেখক রবীন্দ্র শতবার্ষিকী

উৎসবে একেবারেই নিষ্ক্রিয় রইলেন। অন্তত, বুদ্ধদেব বসু নীহাররঞ্জন রায় এবং অন্নদাশঙ্কর রায়ের কাছে নতুন রচনার প্রত্যাশা ছিল।

তবু সব দিক বিবেচনা ক'রে, রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উপলক্ষে যা পাওয়া গেল তার মূল্য অনেক। সাহিত্যের ছাত্রছাত্রী এবং সাহিত্যানুরাগী পাঠকসমাজ দীর্ঘকাল এই নতুন উপকরণ ও তথ্যসংগ্রহ থেকে উপকৃত হবেন এরূপ প্রত্যাশা অমূলক নয়।

গ্রন্থপঞ্জী

সৌখীন নাট্যকলার রবীন্দ্রনাথ। হেমেন্দ্রকুমার রায়। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং হাউস। ৩·৫০।

বাহির বিশ্বে রবীন্দ্রনাথ। শিশির সেনগুপ্ত ও জয়ন্ত চৌধুরী। ৩·৭৫। রীডার্স কর্ণার।

রবীন্দ্র-আলোকে রবীন্দ্র-পরিচয়। সুধীরচন্দ্র কর। ভারতী লাইব্রেরী। ৩·৫০

রবি-বাসরে রবীন্দ্রনাথ। সন্তোষকুমার দে। এক টাকা। বিচিত্রা প্রকাশনী।

রবীন্দ্র-অভিধান। ১ম খণ্ড। সোমেন্দ্রনাথ বসু। ৬·০০ ফ্যাও প্রাইভেট লিঃ।

রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার। সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার। র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব। ৩·০০

রবীন্দ্রনাথের উত্তর কাব্য। ডঃ শিশিরকুমার ঘোষ। জিজ্ঞাসা। ৮·০০

রবিচ্ছবি। প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত। পরিবেশক : জিজ্ঞাসা। দাম : ৬·০০

রবীন্দ্র-মনীষা। রবীন্দ্র-সমীক্ষা। ডক্টর অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। মূল্য যথাক্রমে ৫·০০ ও ৩·০০।

রবীন্দ্র-প্রতিভা। কানাই সামন্ত। দাম : ৫·০৬।

ঠাকুর বাড়ির আঙিনায় (স্মৃতিচিত্রণ) জসীমউদ্দীন। দাম : ৩·৭৫। গ্রন্থ প্রকাশ।

রবীন্দ্রনাথ : কালিম্পঙের দিনগুলি। শক্তিব্রত ঘোষ। দাম : ৩·০০। ক্লারিয়ন পাবলিকেশনস।

ভারতভাস্কর রবীন্দ্রনাথ। রণজিৎকুমার সেন। এ মুখার্জী এণ্ড কোং। ৫·০০।

রবীন্দ্র-বীক্ষা। সম্পাদনা : অধ্যাপক নীলরতন সেন। এসিয়া পাবলিশিং কোম্পানি। ১০·০০

শতবর্ষের শতগান। ১ম ও ২য় খণ্ড। সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত। বেঙ্গল পাবলিশার্স। মূল্য যথাক্রমে ১৫·০০ ও ১২·৫০।

রবীন্দ্রনাথ। শতবার্ষিকী প্রবন্ধ সংকলন। গোপাল হালদার সম্পাদিত। ন্যাশনাল বুক এজেন্সী। দাম : ৫·০০।

রবীন্দ্র-চর্চা। ডক্টর হরপ্রসাদ মিত্র সম্পাদিত। দাম : ৫·০০। সুরভী প্রকাশনী।

রবীন্দ্রায়ণ। ১ম ও ২য় খণ্ড। পুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত। মূল্য প্রতি খণ্ড দশ টাকা। বাক সাহিত্য।

শতাব্দী শতক। কাব্যসংকলন। সম্পাদনা : প্রেমেন্দ্র মিত্র ও কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত। প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী। ৪·০০

গীতবিতান পত্রিকা : সম্পাদক : প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত। পরিবেশক : জিজ্ঞাসা। ৮·০০।

রবীন্দ্রনাথ : উত্তর পক্ষ। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। ইণ্ডিয়ানা। চার টাকা।

রবীন্দ্র মানস। ডক্টর অরবিন্দ পোদ্দার। ইণ্ডিয়ানা। দাম চার টাকা।

এই যা দেখা। কিশোরদের উপযোগী রবীন্দ্র-জীবনী। লীলা মজুমদার। ত্রিবেণী প্রকাশন। তিন টাকা।

কবি-প্রণাম। রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিত প্রবীণ ও নবীন কবির কবিতাসংগ্রহ। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড্ পাবলিশিং কোং। ৫·০০। নতুন সংস্করণ।

ভারত পথিক রবীন্দ্রনাথ। প্রবোধচন্দ্র সেন। এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং।

শতাব্দীর সূর্য। শক্তিসাধন বসু। এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং। ৫·০০।

রবীন্দ্র-বিতান। প্রবন্ধ সংকলন। ডক্টর অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। এ মুখার্জি অ্যাণ্ড কোং। ৫·০০।

রবি-কথা। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড। ৩·৫০।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের নব-রাগ। সুখময় মুখোপাধ্যায়। অশোক পুস্তকালয়। ৫·০০।

রবীন্দ্রনাথ (কবি ও দার্শনিক)। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস। (সাহিত্য ও সমাজ)। ডঃ মনোরঞ্জন জানা। মূল্য যথাক্রমে ১২·৫০ ও ৮·০০। অশোক পুস্তকালয়।

রবীন্দ্র-স্মৃতি (সঙ্কলন)। ক্যালকাটা বুক হাউস। ৩·৫০।

রবীন্দ্র রচনাকোষ। ১ম খণ্ড। চিত্তরঞ্জন দেব ও বাসন্তী [illegible] ইতি সম্পাদিত। ক্যালকাটা পাবলিশার্স। ৬·৫০।

তরুণ রবি। কিশোর পাঠক-পাঠিকার উপযোগী রবীন্দ্র-আলেখ্য। নরনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস। ১·০০।

মুক্তিসাধনায় রবীন্দ্রনাথ। নগেন্দ্রকুমার গুহ রায়। ভারতী বুক ষ্টল। ৩·০০।

সমালোচক রবীন্দ্রনাথ: ডক্টর আদিত্য ওহদেদার। এভারেষ্ট বুক ষ্টল। ৭·০০।

রবীন্দ্রনাথ, সঙ্কলন। দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত। ইষ্টলাইট বুক হাউস। ১০·০০।

ক্লাসিক আলোকে রবীন্দ্রনাথ। প্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। সান্যাল এণ্ড কোম্পানী। ৬·০০।

শতবার্ষিক জয়ন্তী উৎসর্গ। সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি: চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য। পশ্চিমবঙ্গ রবীন্দ্রশতাব্দী জয়ন্তী সমিতি প্রকাশিত। বিভিন্ন লেখকের শ্রদ্ধার্ঘ। ৫·০০।

রবীন্দ্র-চরিত। বিজনবিহারী ভট্টাচার্য। প্রাঞ্জলিক রবীন্দ্র জীবনালেখ্য। ১·৫০। বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সমিতি।

প্রভাত রবি। বিজনবিহারী ভট্টাচার্য। গুপ্ত প্রকাশিকা। ৪·০০।

নাট্যকবিতায় রবীন্দ্রনাথ। হরনাথ পাল। ক্যালকাটা বুক হাউস। ২·৭৫।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস। তৃতীয় খণ্ড। নতুন সংস্করণ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যকর্মের বিশদ আলোচনা। ডক্টর সুকুমার সেন। ইষ্টার্ণ পাবলিশার্স। ১৫·০০

উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্রমানস। ডক্টর শশীভূষণ দাশগুপ্ত। ৭·৫০।

রবীন্দ্র শিশুসাহিত্য পরিক্রমা। যজ্ঞেশ্বর মিত্র। ৫·০০

রবীন্দ্র কাব্যভাষা। ডক্টর সুনন্দা দত্ত। ৭·৫০।

রবীন্দ্র-আলোকে রবীন্দ্র-পরিচয়। সুধীরচন্দ্র কর। ৩·০০।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের অভিধান। হীরেন্দ্রনাথ ঘোষ। ৩০।৬।১, মদন মিত্র লেন, কলিকাতা-৬। ৪·৫০।

মহামানবের সাগরতীরে। সংকলন। সম্পাদনা। জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ। নিখিল ভারত বঙ্গভাষা প্রসার সমিতি। ৪.০০।

রবীন্দ্র-প্রণাম। সংকলন। রমেন দাস সম্পাদিত। এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি। ৩·০০।

অনেক মানুষ একটি মন। রমেন দাস। এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি। ১·০০।

রবি-কাহিনী। নীরেন্দ্র গুপ্ত। আলোক ভারতী। ১·৫০

মহ-প্রণাম। পঁচিশটি কবিতার সংগ্রহ। বিভা সরকার। ১·২৫।

তোমায় কী দিয়ে বরণ করি। শান্তশীল দাস। সাহিত্যসদন। ১·২৫

বিশ্বসভায় রবীন্দ্রনাথ। মৈত্রেয়ী দেবী। প্রমুখ্। ৭·৫০

আলোর কবি রবীন্দ্রনাথ। সংকলন: প্রফুল্লচন্দ্র দাস। মনমোহন বুক শপ্। ৩·৭৫।

রবীন্দ্রনাথ। শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত। শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির। ৩·৫০।

নিন্দুক

(১২ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

মানুষের ভদ্রতা, মিষ্টতা, উদারতা কী বাকি আছে বলুন! কোন কোন ভাবে নিজের আখেরটি গুছিয়ে নিতে পারলেই হল। আর কী চাই! আর যদি কোন রকমে একটু নামটাম হয়ে গেল তাহলে তো কথাই নেই। সেই নামের সুযোগ নিয়ে কোন রকম অপকাণ্ড করতেই এঁরা পিছ পা হন না। ঢের দেখলাম মশাই ঢের দেখলাম। নামী লোকের সংস্পর্শে যেন আর না যেতে হয়।'

এর আগেও নামজাদা লোকের ওপর ক্ষেত্রবাবুর বিরাগ লক্ষ্য করেছি। বাইরের জীবনে পাঁচজনের কাছে যাঁদের সুখ্যাতি আছে বড় ডাক্তার উকিল অধ্যাপক লেখক সাংবাদিক রাজনৈতিক নেতা, কি কর্মী হিসাবে সকলের কাছে পরিচিত হয়েছেন ক্ষেত্রবাবুর মতে তাঁদের সবাইরই দুটো করে জীবন। একটা জীবন সামাজিক পোষাকী। আর একটা ব্যক্তিগত গোপন নেপথ্যলোকের। সেই পর্দার আড়ালে বড় মানুষরা নাকি ছোট মনের পরিচয় দিয়ে থাকেন। তাঁদের লোভের সীমা নেই, মিথ্যুকতার মাত্রা নেই। সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁরা রূঢ়, হৃদয় হীন, বিবেকহীনের মত ব্যবহার করেন। কিন্তু এই সাধারণ মানুষই হাততালি দিয়ে তাঁদের বড় করে তোলে, গলায় মালা পরায়। নিজেদের পিঠ কাঁধ মাথা এগিয়ে দেয় নাম করা বাকিরা অনায়াসে তার ওপর উঠে দাঁড়ান। যারা তাঁদের বড় করে তোলে তাঁদেরই লাথি মারেন।

এই লাঞ্ছিত জনসাধারণের প্রতিনিধিটি যে কে তা আমি ক্ষেত্রবাবুর সঙ্গে প্রথম পরিচয়েই বুঝতে পেরেছিলাম। হয়তো অনেকের কাছ থেকে আমার অনুরূপ ব্যবহার পাননি ক্ষেত্রবাবু সঙ্গে সেই ব্যক্তিগত জীবনের নৈরাশ্যও জড়িয়ে আছে। ভিতরের জ্বালাটা বেশি বলেই মুখ খুললে শুধু জলন্ত বাক্য বেরিয়ে পড়ে।

আর পাঁচজন যেমন ক্ষেত্রবাবুর কাছে অপ্রিয়, ক্ষেত্রবাবুও তেমনি পরিচিতদের কাছে প্রিয় নন।

একদিন পাড়ার ডাক্তার সুধীর নন্দীর সঙ্গে ওঁর সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল। সুধীর বাবু বলছিলেন 'ওই ঘুঁষ খুর-মুখটার কথা বলছেন? বলবেন না ওর কথা আর বলবেন না। ওষুধের দাম মাসের পর মাস বাকি রাখছে, তাগিদ দিলেই মহাভারত অশুদ্ধ। সম্মান ঘুরে যায়। আমার ডিসপেনসারি যেন চ্যারিটেবল ডিসপেনসারি। দানছত্র খুলে বসে আছি। তা ছাড়া কিনা নম্রতা বলে তো কোন বস্তু লোকটির মধ্যে নেই। সব যেন বাবি। গায়ের জোর। জন্মগত গায়ের জোর। জন্মগত অধিকার। তুমি ডাক্তার আমি রোগী। সুতরাং কেন বিনা পয়সায় চিকিৎসা করবেনা? কী রকম অকাট্য যুক্তি দেখুন।'

সুধীর বাবু হেসে উঠেছিলেন।

আর একদিন কাউন্সিলার অতুল চক্রবর্তীর সঙ্গে বাস স্টপে দাঁড়িয়ে ক্ষেত্রবাবুর সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল।

তিনি বললেন, ওই লোকটিতো প্রায়ই আপনার বাড়ি যাতায়াত করে দেখি।

আমি বললাম, 'হাঁ মাঝে মাঝে যান।'

অতুলবাবু বললেন, 'মোটেই আসল দেবেন না মশাই। এখন বিশ্বনিন্দুক আর দুটি নেই। আপনার চা সিগারেট খেয়ে বেরিয়ে এসে আপনারই নিন্দা করবে। বলবে চা টা ভালো ছিল না। আর বেছে বেছে সস্তা সিগারেট আপনি ওকে খাইয়েছেন। প্রায়ই তো আমার বাড়িতে যায়। গিয়ে জানেন, সব চেয়ে ভালো চেয়ারটিতে গিয়ে বসে। বসলে আর উঠতে চায়না। যত রাজ্যের পর চর্চা। অবশ্য এসব যাদের ভালো লাগে তেমন লোকের তো সংসারে অভাব নেই। তাঁরা এক কাপ চা দিয়ে কি একটি সিগারেট দিয়ে ওই সব কুৎসা শোনেন রেলিশও করেন। কত রকমের যে জীব আছে সংসারে।'

এই অতুলবাবু সম্বন্ধেও ক্ষেত্রবাবু আমাকে অনেক কথা বলেছেন। ইলেকশনের সময় পাড়ার ছেলেগুলিকে কী খাটানোই না খাটান এই ভদ্রলোক। তখন স্বভাব একেবারে কাদার মত নরম আর মুখে ভাই ভাই ছাড়া কথা নেই। তারপর একবার জন প্রতিনিধি হয়ে তক্তে উঠে বসতে পারলে আর ওঁদের পায় কে। একবার ক্ষেত্রবাবু বিশুকে নিয়ে গিয়েছিলেন ওঁর কাছে। সম্পর্কে ভাগ্নে হয়। কিছুদিন আগে বাপ মারা গেছে বেচারার। এক পাল ভাই বোন আছে ঘরে। ক্ষেত্রবাবু গিয়ে বললেন, 'অতুলবাবু এই ছেলে-টির জন্যে আপনাকে কিছু একটা ব্যবস্থা করে দিতে হবেই।' অতুলবাবু আমলই দিতে চাননা, চিনতেই পারেননা। শেষে ক্ষেত্রবাবু বললেন, 'মশাই ইলেকশনের আগে যারা আপনার জন্য জয়ঢাক পিটিয়ে বেরিয়েছে বিশু তাদের মধ্যে ছিল। আর-কারুর কোথা। ক্ষেপে একেবারে যাঁড়বৃত্তি হয়ে উঠলেন অতুলবাবু, 'ছিল তো ছিল। আমি কি তাদের পায়ে দানখত লিখে দিয়েছি? কর্পোরেশন কি আমার বাবার জমিদারী!'

ক্ষেত্রবাবু বললেন, 'ব্যবহারটা দেখুন একবার। এদিকে তো ডান হাতে যাঁ হাতে নিজের পকেট ভারি করে চলেছে।'

এমন সময় মা এসে তাগিদ দিয়ে বলল, 'বউদি রাগ করছেন। আপনি নাইতে যাবেন না! সকাল সকাল বেরোবেন বলেছিলেন।'

ইঙ্গিত পেয়ে ক্ষেত্রবাবু উঠে দাঁড়ালেন। হেসে বললেন, 'আপনার বোনটির এবার সত্যিই অসুবিধে হচ্ছে। চলি। আচ্ছা কল্যাণবাবু আপনারা মেয়েদের এত সুখ্যাতি করে বই লেখেন কেন! মেয়েরা বই বেশি পড়ে বলে!'

'তার মানে!'

ক্ষেত্রবাবু বললেন 'আপনাদের বই খুললেই দেখি পাতায় পাতায় মেয়েদের স্তব স্তুতি। ওঁরা অমুক অমুক। তাঁদের উদারতার সীমা নেই, দয়া মায়ার দেহ খানি গড়া সব একেবারে মাখনের মত নরম। কত কীই যে লেখেন আপনারা।'

হেসে বললাম, 'ঠিক লিখিনে!'

ক্ষেত্রবাবু বললেন 'নিজেই বুকে হাত দিয়ে বলুন। আসলে মেয়েদের মত এমন স্বার্থপর আর অসুদার জীব আর নেই। নিজের স্বামী আর ছেলে মেয়ে ছাড়া দুনিয়ার তারা আর কাউকে চেনে না। ওইটুকুই তাদের চৌহদ্দী। আর একটা জিনিস লক্ষ্য করেছেন!'

বুঝতে না পেরে বললাম 'কী বলুন তো!'

ক্ষেত্রবাবু বললেন 'যার যত নাম যশ তিনি তত স্ত্রীর বশ। পার্সোনালিটির বড়াই করে এমন অনেক মহাপুরুষকে দেখেছি মশাই। ঘরের গিন্নী উঠতে বললে ওঠেন বসতে বললে বসেন। মহা মহা বিখ্যাত ব্যক্তিরা বাড়িতে চাকর দারোয়ান কেন যে রাখেন বুঝতে পারিনে। বঁটি হাতে নিজের স্ত্রীটিকে দরজায় দাঁড় করিয়ে রাখলেই পারেন। Time is money এ কথা স্বামীরা যত না বোঝেন স্ত্রীরা তাঁদের গেষ্টদের চতুর্গুণ করে বুঝিয়ে দেন।'

আমি থামতে পারলাম না চট করে জবাব দিতেও পারলাম না। ক্ষেত্রবাবুর লক্ষ্যটা যেন বড় কাছাকাছি। ওঁর পরিহাসটা আমি অবশ্য গায়ে না মাখলেও পারি। আমার চাকর দারোয়ানও নেই গাড়ি বাড়িও নেই। তবু কোথায় যেন একটু খচ্ খচ্ করছে।

যেতে যেতে ফিরে তাকালেন ক্ষেত্রবাবু বললেন আরে ভালো কথা। আজ সন্ধ্যায় পাড়ায় যে তামাসার ব্যবস্থা আছে। যাচ্ছেন তো!'

ঠিক ধরতে পারলাম না। বললাম 'তামাসা মানে!'

ক্ষেত্রবাবু বললেন আরে আপনাদের ঐতিহাসিক মহা-গবেষক দাশগুপ্ত মশাই রাষ্ট্রীয় সম্মান পেলেন যে পাড়া থেকে তাঁকে সম্বর্ধনা করা হবে। জানেন না! হৈ হৈ রৈ রৈ ব্যাপার।'

এতক্ষণে বুঝতে পারলাম 'কালীভূষণ বাবু এক সময় এই পাড়াতেই থাকতেন। তাঁর গৌরবে আমরা সবাই গর্বিত।

সম্বর্ধনা কমিটির সদস্য হিসাবে আমিও আছি। যেতে হবে বইকি।'

বললাম, 'আপনি যাবেন না?'

'ক্ষেত্রবাবু বললেন, 'না গিয়ে পারি? বিনা পয়সায় এমন তামাসা দেখবার ভাগ্য বছরে কবার আসে বলুন? টিকিট করতে হল না কার্ড নিয়ে চাঁদা দিতে হল না।'

আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্যে বললাম, 'যাই-হোক ফণীবাবু এই পরিণত বয়সে যে স্বীকৃতিটুকু পেলেন—

ক্ষেত্রবাবু বললেন 'পাবেন না কেন? দিল্লীতে দৌড়া-দৌড়ি করবার পয়সা থাকলে মন্ত্রী উপমন্ত্রীদের সঙ্গে এই ক্ষেত্র-ভূতও এত দিনে মহাপদ্ম হয়ে যেত।'

আমি বললাম 'কিন্তু ওঁর ঊনবিংশ শতাব্দীর নব জাগরণের উপর ওঁর বইখানা—।'

ক্ষেত্রবাবু বললেন 'আপনারা সবাই দিনে যদি পড়ে পড়ে দিবানিদ্রা দেন উনি তখন অনেক জাগরণ লিখে ফেলবেন। কলম তো নয় একটি সিঁদ কাঠি। সেটি নিয়ে ছাপনাল লাইব্রেরীতে ঢোকেন আর বইয়ের পৃষ্ঠা সংখ্যা বাড়ে।'

কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। ক্ষেত্রবাবু যা জানেন তা নিশ্চিত করে জানেন। ওঁকে হারাবার মত আমার যুক্তির জোরও নেই গলার জোরও নেই।

ফণীবাবু সম্বন্ধে আরো অনেক অপ্রীতিকর মন্তব্য ক্ষেত্রবাবু শুনেও করেছেন। এই ইতিহাসের অধ্যাপক নাকি বেনামীতে একটি পাবলিশিং বিজনেস চালান। সেখানকার কর্মচারীরা সব চেয়ে কম মাইনে পায়। ওখানে এক সময় কিছু কাজ করে দিয়েছিলেন। আজ পর্যন্ত পুরো টাকা আদায় করতে পারেননি। ভদ্রলোক চিরকুমার। কিন্তু অনেক কুমারী ওঁর কাছে প্রশ্রয় পায়। কেউ কেউ নাকি চির কুমারী হয়ে রয়েছেন বাধ্য হয়ে। ব্যক্তিগত জীবনে ভদ্রলোক বড় ভাগ্য কহুল। সামনে যারা বিত্ত প্রতিপত্তিশালী তাঁদের কাছে জোড় হস্ত এবং আড়ালে আবডালে নতজানু। কিন্তু যারা দীন দরিদ্র অবস্থার বিপাকে বিপর্যস্ত তারা ওঁর কাছে পোকা মাকড়ের চেয়েও অধম।

পাড়ার হাইস্কুলে ফণীবাবুর সম্বর্ধনার ব্যবস্থা হয়েছে। আমার যেতে একটু দেরি হল। গিয়ে দেখি 'হল' ভর্তি। পাড়ার গণ্যমান্য অনেকেই এসেছেন। ডায়াসে সারি সারি চেয়ার পাতা। প্রেসিডেন্ট চীফ গেষ্টের পাশে সৌম্যদর্শন ফণীভূষণ স্মিত মুখে বসে আছেন। কয়েকটি ক্লাব আর পাঠাগারের পক্ষ থেকে তাঁকে মানপত্র আর ফুলের মালা দেওয়া হবে। বক্তার পর বক্তা উঠে ফণীবাবুর পাণ্ডিত্য নিষ্ঠা শিষ্টাচার সৌজন্যের সুখ্যাতি করতে লাগলেন।

লক্ষ করলাম ক্ষেত্রবাবুও এসেছেন। দ্বিতীয় সারিতে বসে তামাসাই দেখছেন বলে মনে হল। তাঁর মুখে কৌতুক একটু হাসি।

সভাপতি মাইকের সামনে মুখ নিয়ে বললেন 'আর কেউ কিছু বলবেন?'

ডায়াসের ওপর থেকে লক্ষ করলাম আট ন' বছরের একটি ছোট সুদর্শন ছেলে উঠে দাঁড়াল, 'আমি একটু আমি বলব।'

এতক্ষণ সে ক্ষেত্রবাবুর পাশে বসেছিল।

সভাপতি কৌতূহলী হয়ে বললেন, আচ্ছা এসো বলো এসে।'

কে এই ছেলেটি, সবাই বলাবলি করতে লাগলেন। স্কুলের হেডমাষ্টার বললেন, 'ক্ষেত্রবাবুর মেজো ছেলে ক্লাস ফাইবে পড়ে। খুব চৌ পটে। ভীষণ মিঠে। বোধ হয় বাপের মতই হবে বড় হলে।'

ছেলেটিকে কিছু বলতে দেওয়া সঙ্গত হবে কিনা কেউ কেউ ইতস্তত করতে লাগলেন। কে একজন বললেন 'নিজের কথাগুলিই বোধ হয় ক্ষেত্রবাবু ছেলের মুখ দিয়ে বলাবেন।'

কিন্তু প্রেসিডেন্ট অন্য পাড়ার মানুষ। তিনি তো এসব

জানেন না। তিনি সরল মনে বালক বক্সকে কিন্তু ইতিমধ্যেই অনুমতি দিয়ে ফেলেছেন।

ছেলেটি মাইকের সামনে এসে দাঁড়াল। পরনে হাফপ্যান্ট। গায়ে সাদা ছিটের একটা হাফসার্ট। বেশবাস আলাদা হলেও চেহারায় বাপের পরিচয় প্রকট।

মাইক তার মুখের কাছে নামিয়ে দেওয়া হল। প্রেসিডেন্ট বললেন, 'বলো তুমি বলো। কী নাম তোমার?'

ছেলেটি বলল, 'সিধু। সিদ্ধেশ্বর।'

'বেশ বেশ। বলো তাহলে।'

সিধু মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে উৎসাহ পেয়ে বলল 'জন্টিবাবু খুব ভালো মানুষ। উনি আমাকে সেবার দুটো কমলালেবু কিনে দিয়েছিলেন। আমার তখন জ্বর। লুকিয়ে খেলতে বেরিয়েছিলাম। একটা লেবুওয়ালা সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল। উনি দেখতে পেয়ে দুটো লেবু কিনে দিলেন। লেবু দুটো ভারি মিষ্টি ছিল।'

শ্রোতারা অনেকক্ষণ ধরে হাততালি দিলেন। ছেলেটি লজ্জিত মুখে তার বাবার পাশে এসে বসল। সভা শেষ হলে বাইরে ক্ষেত্রবাবুর সঙ্গে ফের দেখা হল। তিনি তার ছেলেকে নিয়ে বাড়ির দিকে যাচ্ছেন।

আমি বললাম, 'ক্ষেত্রবাবু, আপনার ছেলেতো বেশ বলেছে।'

ক্ষেত্রবাবুর চোখ দুটি ছল ছল করে উঠল। একটু চুপ করে থেকে ধরা গলায় বললেন, 'ওকে আশীর্বাদ করুন। ও যেন বাপকা বেটা না হয়। ও যেন চিরকাল এমনি বলতে পারে। পৃথিবীটা ওর কাছে যেন আজীবন কমলা লেবুর মতই মিষ্টি হয়।'

আজকের সঞ্চয়

মিতব্যয়ী আজকে বাঁচায় তার কালও বাঁচে।
অমিতব্যয়ী খরচ করে ফেলে আজ, খুইয়ে ফেলে কালও।

আগামীকালের সংস্থান

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ
হেড অফিস : ৪, ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

সেবায় প্রতীক

ব্যাঙ্ক-সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ হয়

UBP-45a-4J

প্রহণ

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কী দেখি চোখে তোর, কী দেখি চোখে তোর
ঘোর প্রলয় নাকি অশুভ তোলপাড় ?
নিজের করতলে ব'সিয়ে নখ আমি
ভাগ্য ফিরিয়েছি, পেয়েছি তোকে আমি
সে কী দারুণ ছ'লে যেতে রে, রাক্ষসী ?
অথবা শিখেছিস তুইও থিয়েটার।

অথবা শিখেছিস তুইও থিয়েটার
তাই ও' নীল চোখে ঘৃণ্য অমানিশা ?
নিজের ললাটের লিখন ছুরি দিয়ে
বিঁধেছি তোর সাথে ছিলো না যদি বিয়ে ;
সধবা তুই, তাই সিঁদুর পরিয়েছি
রক্তে সেকী শুধু বাড়াতে বিষমিশা !

রক্তে সেকী শুধু বাড়াতে বিষমিশা
একদা জ্যোতিষীর নিষেধ ভুলেছি।
কী আছে বুকে তোর, কী আছে বুকে তোর
কঠিন বিচ্ছেদ ? অথবা রাত ভোর
শুধুই স্বাকামীর অবাক অভিনয় ;
যা পেতে এ-বুকের দরজা খুলেছি ॥

সম্পাদকীয়

পরিণতিমুখী পাক-রাষ্ট্র সংঘর্ষ

রাষ্ট্র পুঞ্জ পরিষদে কাশ্মীর প্রশ্নে ভারতের বিরুদ্ধে হুমকি প্রদর্শন এবং পূর্ব বাংলার বিভিন্ন স্থানে সরকারী সংকেতে সংখ্যালঘু নিধনের উদ্দেশ্যে একপক্ষীয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূত্রপাত কোন প্রক্ষিপ্ত বা অসংলগ্ন ঘটনা নয়। রাজনীতির সঙ্গে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কার্যক্রম সংযুক্ত করে, প্রাক স্বাধীনতা যুগে মুসলীম লীগের নেতৃত্বে পাকিস্তানের আদর্শ ও আবেগ সৃষ্টি হয়েছিল। দেশভাগের ফলে পাকিস্তানী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরে রাষ্ট্রনীতি ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কার্যক্রম পর্যায়ে পর্যায়ে পারস্পরিক সংযোগে এমন ভাবে কার্যকরী করা হয়েছে যে ভারত বিদ্বেষ ও সংখ্যালঘু নিধনের পাকিস্তানী রাষ্ট্র সত্তার ভারসাম্য রক্ষার একটি প্রধান ও স্বতঃসিদ্ধ কূটনৈতিক পদ্ধতিতে পরিণত হয়েছে।

যখনই পাকিস্তানের আভ্যন্তরীন জীবনে নানা সমস্যার অস্থিরতা দেখা যায়, রাষ্ট্রীয় ব্যর্থতা জনগণের মনে রাষ্ট্র-বিরোধী গণবিক্ষোভের অস্ফুট বহ্নি ধূমায়িত করে তোলে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের দ্বন্দ্ব তীব্রতা লাভ করে, পূর্ব পাকিস্তানে গণ-আন্দোলন দেখা দেয় অর্থাৎ পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন রাজ-শক্তির শাসন ক্ষমতা অথবা সেই শক্তির প্রতি জনগণের আনুগত্য যখন শিথিল হয়ে পরে তখনই কাশ্মীর ও রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উদ্বেগ সৃষ্টি করে আভ্যন্তরীন সমস্যাকে পররাষ্ট্রীয় সমস্যায় পরিণত করতে প্রতিটি পাক সরকারকে অগ্রণী হতে দেখা গিয়েছে।

মহৎ আদর্শের প্রেরণায়, ত্যাগ ও সংগ্রামের পথে রাষ্ট্রসত্তা অর্জন না করার ফলে পাকিস্তানের অস্তিত্ব এখন এক অস্বাভাবিক আবর্তের ভিতর দিয়ে ঘন ঘন আবর্তিত হচ্ছে এবং বর্তমানে এই পরিবর্তন এখন এক চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে যে পাকিস্তানী মেজাজ সম্বন্ধে কোন যুক্তি-যুক্ত ভবিষ্যতবাণী করা এখন আর সম্ভব নয়। পাকিস্তানী প্রতিনিধি জাফরুল্লা রাষ্ট্রপুঞ্জ পরিষদে কাশ্মীর সীমান্তে বা অন্যক্ষেত্রে গুপ্ত সংঘাতের যে হুমকি দিয়েছেন অন্তঃসারের মত এবারে সে হুমকী ফেতাবী বা কূটনৈতিক ধাওয়াইবাজী নাও হতে পারে। এবারে যথার্থই একটা ফৌজী অ্যাডভেঞ্চারের পথে পদক্ষেপ করা আভ্যন্তরীন অস্থিরতাক্লিষ্ট বিব্রত আয়ুব খানের পক্ষে অসম্ভব নয়।

কাশ্মীর সমস্যা সৃষ্টি করেছিলেন মিঃ জিন্না। কিন্তু এই সমস্যা সমাধান করার বা সমস্যাটিকে গিলবার ক্ষমতা জিন্না-পরবর্তী আর কোন নেতার ছিল না। লিয়াকত আলীর পক্ষে জিন্নার পরে অনেক খানি দুঃসাহস দেখান সম্ভব ছিল। কিন্তু লিয়াকত আলী হত্যায় সে সম্ভাবনার যাচাই হয়নি। পাকিস্তানের পরবর্তী আর কোন সরকারের পক্ষে কাশ্মীর সমস্যা সমাধান করার ঝুঁকি নেওয়ার শক্তি ছিল না। কাশ্মীর সমস্যাকে এমনভাবে একটি জাতীয় সম্মান বা প্রেস্টিজের প্রশ্ন করে তোলা হয়েছে যে পাকিস্তানের ন্যায় রাষ্ট্রের কোন শিথিল পার্লামেন্টারী গণতান্ত্রিক দলের পক্ষেই ইচ্ছে থাকলেও পাক-ভারত মৈত্রী সঙ্গত সমাধান সূত্র সন্ধানের ক্ষমতা ছিল না। তাই, পাকিস্তানের প্রতিটি সরকার ক্ষমতা রক্ষার প্রয়োজনে কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে রাজনৈতিক খেলা

খেলেছে, কিন্তু সমস্যা মিটাবার যথার্থ প্রয়াস করতে সাহস করেনি।

অনেকের ধারণা ছিল পাকিস্তানের বর্তমান সামরিক কর্তৃত্ব,—যা' দল বা জনমতের উপরে নির্ভরশীল নয়,—কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব ও ঝুঁকি গ্রহণে অগ্রসর হবে। আয়ুবশাহীর প্রথম অবস্থায় এরূপ সংকেতও দেখা গিয়েছিল। কাশ্মীর সমস্যা সমাধানে আয়ুবশাহীর একচ্ছত্র সামরিক শাসনের সুযোগ নেওয়ার আগ্রহাতিশয্যে শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ নেহেরু-আয়ুব সংযোগের চেষ্টা করেছিলেন এবং শ্রীনেহেরুও খুব আশান্বিত বিশ্বাসে যুদ্ধবিরতি সীমারেখা বরাবর কিভাবে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করা যায় তার শেষ ফর্মুলা প্রায় প্রকাশ্যে নিক্ষেপ করেছিলেন। কিন্তু আয়ুব খান অনেকটা অগ্রসর হয়েও পাক রাজনীতির পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এই প্রস্তাবকে কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করতে সাহস পান নি।

দুর্নীতিগ্রস্ত ও ব্যবসাদারী রাজনীতিকদের কুকীর্তি রোধে সাময়িকভাবে সক্ষম হওয়ায় গোড়ায় আয়ুবশাহী জনপ্রিয় হয়েছিল। এখন শাসনকারী সামরিক বাহিনীতেই দুর্নীতি প্রবেশ করেছে এবং পাকিস্তানের রাজনীতি এক রাজনৈতিক ঘুর্ণিবাত্যার বিপর্যস্ত হওয়ার উপক্রম হয়েছে। স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতার বিরুদ্ধে একবার যদি জনআন্দোলন আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম হয় তা' হলে তার পরিণতি এক চরম পর্যায়ে গিয়ে উপস্থিত হয়। পশ্চিম পাকিস্তান ও আয়ুবশাহী বিরোধী পূর্ব বাংলার জন-আন্দোলন এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যার ফলে শুধু পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের মধ্যেই দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও অবিশ্বাসের আবহাওয়া সৃষ্টি হয়নি, সরকারী স্তরেও এই সন্দেহ ও অনাস্থা এক গুরুতর অবিশ্বাস ও অনির্ভরতার পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। অবিশ্বাসের মনস্তত্ত্ব সৃষ্টি হলে যা' হয় আজম খাঁর পরিবর্তন তার এক তাৎপর্যপূর্ণ সূচক। সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত নির্বাচন করেও বর্তমান নির্বাচনের ভিতর দিয়ে যে অভিমতের সুনিশ্চ নির্গত হয়েছে তার তাৎপর্যও সুদূরপ্রসারী।

একথা আজ সুস্পষ্ট যে পাকিস্তানী রাজনীতি একটি চরম পরিণতির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এই পরিণতি নাগীবের পরিবর্তে নাসেরের পথে' অর্থাৎ এক আয়ুবের পথে দ্বিতীয় আয়ুবের আবির্ভাবে অথবা ডিক্টেটরশীপের পরিবর্তে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের পুনঃ প্রতিষ্ঠার—যে দিক দিয়েই এই পরিবর্তন ঘটুক না কেন এই পরিবর্তন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সার্বভৌমিকতার সম্পর্কে এমন এক মৌলিক পরিবর্তন ঘটাবে যার ফলে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় রূপের এক আমূল পরিবর্তন ঘটবে।

এই আমূল পরিবর্তনের আশঙ্কায়ই আয়ুব খান আজ চরম ভাবে উদ্বিগ্ন। সাম্প্রদায়িক রাজ্য বা কাশ্মীর অথবা উভয় অস্ত্রই এক সঙ্গে প্রয়োগ করে পাকিস্তানের রাজনৈতিক সংকটের মনস্তত্ত্বকে ভারত ও হিন্দুবিদ্বেষী মনস্তত্ত্বে রূপান্তরিত করে বর্তমান শাসন ব্যবস্থাকে অক্ষুণ্ণ রাখা যায় কিনা সেই উদ্দেশ্যেই আয়ুবশাহীর সমস্ত রাজনীতি আজ পরিচালিত হচ্ছে। মাদ্রাজ ঘটনাকে অবলম্বন করে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, হিন্দু সমাজ ও ভারতবর্ষকে যে অশালীন, তিক্ত ও পদস্খলিত বিদ্বেষপূর্ণ ভাষায় আয়ুব খান রাওলপিণ্ডির ভাষণে আক্রমণ করেছেন এবং পূর্ব বাংলার গভর্নর যে জেহাদী বক্তব্যে রাজশাহীতে হিন্দুবিদ্বেষ প্রচার করেছেন তার তাৎপর্য যে রাষ্ট্রীয় সংকেত ও প্রয়োজনে হিন্দু সংখ্যালঘু নিধনের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সৃষ্টি করে পাক-ভারতের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার একটি 'চেইন রি-অ্যাকশন' সৃষ্টি করা তা' আজ যে কোন নির্বোধের কাছেও সুস্পষ্ট।

ভারতীয় এবং বিশেষ করে বাংলা দেশের প্রগতিশীল মানসিকতা নিশ্চয়ই আজ পাক সরকারের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সৃষ্টির রাজনৈতিক পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্যের কথা স্মরণে রেখে আয়ুব শাহীর চক্রান্তে ধরা দিয়ে আজ বিক্ষোভে

আক্রমণ ভারতেও সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে অগ্রসর হবে না। পাকিস্তান থেকে রাষ্ট্রীয় প্ররোচনায় অনুষ্ঠিত দাঙ্গার যত বেদনা-জনক সংবাদই আসুক না কেন, গভীর সংযমে ভারতীয় জনতাকে সাম্প্রদায়িক পরিবেশ শান্ত ও সংযত রাখতে হবে এবং পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চাপ দিতে হবে সরকারকে। পাকিস্তানে যা' ঘটছে তা' সরকারী দাঙ্গা নয়'—রাষ্ট্রীয় দাঙ্গা। এই দাঙ্গার প্রতিরোধ রাষ্ট্রীয় স্তরেই করতে হবে।

ভারত সরকারকে আরেক দিক দিয়ে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। যদি ভারত সরকার পাক্ ভারত সংঘাত সম্পর্কে আয়ুবখান ও জকরুল্লা খানের হুমকিকে গতানুগতিক পাক্ ডিপ্লিয়ের পুনরাবৃত্তি বলে মনে করে থাকেন তা' হলে ভুল করা হবে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মূলভিত্তি বিপন্ন হলে ডিকটেটররা যে কোন চরমপন্থী কার্যক্রম গ্রহণের আভ্যন্তরীণ ঝুঁকি গ্রহণে দ্বিধাবোধ করে না। শ্রীনেহেরু জকরুল্লার বক্তব্যকে হুমকির যুক্তি (argument of threat) বলেছেন। অনেক সংবাদ পত্র ও পর্যবেক্ষকরাও এই মন্তব্য করেছেন যে জকরুল্লার হুমকিও গতানুগতিক পাক্ রাজনীতির পুনরাবৃত্তি মাত্র। আমরা মনে করি এরূপ সিদ্ধান্ত ভারতের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর হতে পারে। পাকিস্তানের বর্তমান 'রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতি' আভ্যন্তরীণ সমস্যা, আয়ুবশাহীকর্তৃত্বের শিথিলতা এবং পাক্ সরকারের প্রকৃতির কথা বিবেচনা করলে আয়ুবশাহী হুমকীর যথার্থ তাৎপর্য নিরূপণ এবং তার ফলে যুদ্ধের দাবানল জ্বলে ওঠা অসম্ভব নয়। ভারতের পক্ষে পাকিস্তানী চক্রান্ত ও হুমকির মোকাবেলা করার জন্য ধৈর্য, সংযম, সতর্কতা ও প্রস্তুতি একান্ত প্রয়োজন।

মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার গলদ

জাতীয় অধ্যাপক পদের ন্যায় স্বাধীন ও সম্মানিত পদ-গ্রহণের প্রাক্কালে ডাঃ শিশিরকুমার মিত্রের ন্যায় মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের বিদায়ী অ্যাডমিনিস্ট্রেটারের পক্ষে প্রেস কনফারেন্সের মাধ্যমে বোর্ডের গুরুত্বপূর্ণ গলদ প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে যা' নবাগত বা বিদায়ী অন্য কোন অ্যাড-মিনিস্ট্রেটারের পক্ষে সম্ভব হতো না। নিজের অভিজ্ঞতাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংকটের সংকেত বলে মনে না করলে নিশ্চয়ই ডাঃ মিত্র নূতন পদমর্যাদার সুযোগ গ্রহণ করে অ্যাডমিনিস্ট্রেটারের পদ হ'তে বিদায়কালে প্রেসের সুযোগ গ্রহণ করতেন না।

মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড শিক্ষকদের বেতন জরুরী ও ধার নির্ধারণের একটি ধরাবাঁধা কার্যক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে বলে যে অভিযোগ করা হয়েছে তার তাৎপর্য হলো এই যে নামে মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড একটি স্বায়ত্ব শাসনশীল প্রতিষ্ঠান হলেও কার্যক্ষেত্রে ইহা শিক্ষাবিভাগের একটি আজ্ঞাধীন শাখা ব্যতীত আর কিছু নয়। শিক্ষাবিভাগের আত্মকেন্দ্রিক ও আধিপত্যপ্রিয় মনোভাবের অভিযোগ শুধু যে মাধ্যমিক বোর্ডের কর্তৃপক্ষ থেকেই উঠেছে তাই নয়, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ বিভিন্নক্ষেত্রে শিক্ষাবিভাগের অধিকর্তার এরূপ অতি-আত্মকেন্দ্রিক এবং কেন্দ্রানুগ আচরণের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে এবং বহুক্ষেত্রে অপ্রীতিকর ঘটনাও সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু শিক্ষাবিভাগের অধিকর্তার নিজের এবং তাঁর উপরে ডাঃ রায়ের বিশ্বাস যুক্ত হয়ে শিক্ষাবিভাগের কর্তৃত্বাভিমানকে এমন একটি পর্যায়ে এনে পৌঁছে দিয়েছে যে এই বিভাগ সম্বন্ধে সুখ্যাতির চেয়ে সমালোচনাই শোনা যায় বেশি।

ডাঃ মিত্রের অভিযোগ অনুযায়ী হয় মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড তুলে দিয়ে বোর্ডের দায়িত্ব শিক্ষা-বিভাগের নেওয়া উচিত, অথবা যথাসম্ভব ত্রুটি-মুক্ত করে শিক্ষা বিভাগকে স্বয়ং-কর্তৃত্বশীল প্রতিষ্ঠানরূপে পুনর্গঠিত করা উচিত। দ্বিতীয় পন্থা যে গণতান্ত্রিক শিক্ষা পদ্ধতির নীতি সম্মত এবং অনুসরণীয় সেকথা বলাই বাহুল্য। স্কুলের ছাত্রদের পক্ষে চারটি ভাষা শিক্ষার শিক্ষা-বিভাগীয় কর্মসূচী যে ছাত্রদের পক্ষে অকল্যাণকর

এবং ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে যে তিনটি ভাষাশিক্ষার নীতি প্রবর্তিত হয়েছে তাহাই যথেষ্ট, ডাঃ মিত্রের এই সিদ্ধান্তও সমর্থন-যোগ্য। মাতৃভাষা, ইংরেজী এবং অপর একটি ভাষা (হিন্দী) শিক্ষার সূত্রটিই যথার্থ বলে আমরা বিবেচনা করি। অথচ চার ভাষার ফর্মুলাকে কার্যকরী করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে শিক্ষাবিভাগ।

পরীক্ষা গ্রহণের নীতি, কর্তৃত্ব ও ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণের এবং শিক্ষক-শিক্ষণের যে পদ্ধতির কথা ডাঃ মিত্র উত্থাপন করেছেন তা'ও বিশেষভাবে বিবেচ্য। শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব এমন একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে যে অবিলম্বে এর একটি সুষ্ঠু সমাধানের সূত্র সন্ধান করা আবশ্যক।

ডাঃ মিত্রের ন্যায় একজন অভিজ্ঞ শিক্ষাব্রতীর মন্তব্য ও সুপারিশ সম্বন্ধে যথাযথভাবে বিবেচনা করার জন্য একটি কার্যকরী প্রচেষ্টা নিয়ে রাজ্য সরকার অগ্রসর হবেন বলে আমরা আশা করি।

করের বোঝা

সাধারণ নির্বাচনের অব্যবহিত পরেই কেন্দ্রীয় সরকার করের বোঝা বৃদ্ধি করতে অগ্রসর হয়েছেন। প্রথমত রেলের ভাড়া ও মাশুল বৃদ্ধি করে রেলওয়ে মন্ত্রী চলতি বছরে অতিরিক্ত ২১'২৩ কোটী টাকা আদায়ের ব্যবস্থা করেছেন। অতঃপর অর্থমন্ত্রী নূতন কর ও শুল্ক বসিয়ে বছরে ৭১'৭০ কোটি টাকা আদায়ের উদ্যোগ করেছেন। এই পরিমাণ অর্থের মধ্যে ৪৪'৫ কোটি টাকা অপ্রত্যক্ষ ও ২৭ কোটি টাকা প্রত্যক্ষ কর হিসাবে আদায় হবে। অবশ্য চলতি বছরের বাজেটের রাজস্ব খাতে যে ৬০ ৮০ কোটি টাকা ঘাটতি পড়েছিল, নূতন কর বসিয়ে সেটা পূরণ তো হবেই, রাজস্ব ও মূলধনী খাত মিলিয়ে যে প্রায় ১৪০ কোটি ঘাটতি ছিল, সেটা কমে দাঁড়াবে ৮৯'২০ কোটি টাকায়। এই পরিমাণ ঘাটতি ছাপাই মুদ্রা ছাপিয়ে পূরণ করা হবে। ১৯৬২-৬৩ সালের রাজস্ব বাজেটের আয়ের পরিমাণ ১৩২০'৮৭ কোটি টাকা এবং ব্যয়ের অঙ্ক ১৩৮১ ৬৪ কোটি টাকা।

তৃতীয় পরিকল্পনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে চলতি রাজস্ব থেকে ৪১০ কোটি টাকার ব্যবস্থা করতে হবে। পরিকল্পনার অর্থসঙ্গতি মেটাবার জন্য অতিরিক্ত কর সংগ্রহ করতে হবে ১১০০ কোটি টাকা! রাজ্য সরকারগুলিকেও চলতি রাজস্ব থেকে ১৪০ কোটি টাকা এই বাবদ সংগ্রহ করতে হবে এবং তাদের অতিরিক্ত কর আদায়ের দায়িত্বের পরিমাণ ৬১৯ কোটি টাকা। অর্থমন্ত্রী এই অতিরিক্ত কর আদায়ে গতবার এবং এবার এই দু' বছরই তৎপরতা দেখিয়েছেন। গতবার এই অর্থের পরিমাণ হবে প্রায় ৬০ কোটি টাকা, এবারও প্রায় ৭০ কোটি টাকা।

কিন্তু সাধারণ মানুষকেই এই করের বোঝা বেশী পরিমাণে বহন করতে হবে। এবারকার বাজেটের সেটাই ইঙ্গিত। দেশলাই, খোলা চা, তামাক, ঘোড়া বৃত্তি ইত্যাদির ওপর করের চাপ ইতিমধ্যেই সাধারণ মানুষকে স্পর্শ করেছে। তামাক ও সিগারেটের ওপর উৎপাদন শুল্ক বৃদ্ধি করে পুরো বছরে ৪ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত আদায় হবে। সুতো ও সুতী কাপড় বাবদ অতিরিক্ত ১২ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা আয় হবে। দেশলাই কাঠির ওপর শুল্ক বৃদ্ধির ফলে ১ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা এবং পশম, রেয়ন এবং কৃত্রিম রেশমজাত সুতার শুল্ক হ্রাস ও বস্ত্রের উপর শুল্ক বৃদ্ধি দ্বারা ১ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত আদায় হবে। অপরোক্ষ করের এই বোঝা জনসাধারণের উপর অনিবার্যভাবে বর্তাবে। অর্থমন্ত্রী তার বক্তৃতায় বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে এবারকার অপ্রত্যক্ষ করের ভার দরিদ্র সাধারণের উপর বর্তাবে না। কারণ "Excise duties on automobiles, refrigerators and air-conditioners will not hit the poor" অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে অর্থমন্ত্রী এ-তথ্য এড়িয়ে গেছেন যে

এই খাতগুলি থেকে আয় হবে মাত্র যথাক্রমে ১০৫০ লক্ষ টাকা, ৪০ লক্ষ টাকা ও ৩৫ লক্ষ টাকা। শুল্ক বাবদ মোট ৫২৪·০৮ কোটি টাকা আয়ের কতটুকু অংশ এই তিনখাতের আয়? বাজেটের করের বোঝার ফলে মূল্যবৃদ্ধি আরও ঊর্ধ্বগতি হবে, যার পরিণামে জনসাধারণের জীবনযান আরও নিম্নগামী হবে। মূল্যবৃদ্ধির চাপ ইতিমধ্যেই সুরু হয়েছে।

প্রত্যক্ষ করের মধ্যে বছরে পাঁচহাজার টাকার ঊর্ধ্বে আয়-সম্পন্ন ব্যক্তিদের আয়কর বৃদ্ধি পেয়েছে। তারফলে যথাবিত্ত ও নির্দিষ্ট বেতনের চাকুরেদের বোঝা বৃদ্ধি পাবে। কোম্পানি-গুলির ওপর ধার্য কর শতকরা ৪৫ ভাগ থেকে ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে সত্য কিন্তু প্রাইভেট সেক্টরে আয়ের আসল পরিমাণ নির্ধারণের সরকারী অক্ষমতার দরুণ কোম্পানীর আয়ের অর্ধেক টাক্স হিসাবে সরকারী তহবিলে অন্তর্ভুক্ত হবে এই নির্বোধ সিদ্ধান্তে কেউ করবে না। নির্দিষ্ট বেতনের বাইরে যারা উপার্জন করেন তাদের করফাঁকির পরিমাণ শতকরা ৭০ বললেও অত্যুক্তি হবে না। বাজেট-পরবর্তী শেয়ার বাজারের তেজীভাব দেখেই বোঝা যায় শতকরা পাঁচভাগ করবৃদ্ধি প্রাইভেট সেকটরকে হতাশ করে নাই। বাজেটের অর্থ বিন্যাসকে সামাজিক ন্যায় বিচারের জন্য সমবণ্টনমুখীন না করে শুধু উৎপাদনমুখীন রাখলে পুঁজিবাদের প্রসার অনিবার্য হয়ে পড়বে—ভারত সরকারের বাজেটে তারই ক্ষতচিহ্ন রয়ে গেছে। বাজেটে ব্যয় কর রদ করে অর্থমন্ত্রীর সেই প্রবণতা আরও প্রকট হয়ে পড়েছে। অর্থনীতিবিদ ক্যালডরের পরামর্শক্রমে পাঁচবছর পূর্বে এই কর ধার্য করা হয়েছিল। পুঁজিপতিদের গোপন সম্পদের কূল-কিনারা বার করার কোনো উপায় নেই। আয়কর দিয়ে তা ধরা ছোঁয়া যায় না; তাই ব্যয় করের আত্যন্তিক প্রয়োগের মধ্য দিয়ে সেই গোপন প্রদেশে উঁকি দেওয়া সম্ভব ছিল। বর্তমান অর্থমন্ত্রী পুঁজিপতিদের এই বিড়ম্বনা থেকে একেবারেই রেহাই দিলেন এবং সেই সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ওপর অবিশ্বাসের আঘাত হেনে প্রকাশ্যে পুঁজিবাদী প্রত্যয় ঘোষণা করলেন।

ভারত সরকারের ঋণের বোঝা

সরকারী ঋণের বোঝা ক্রমশ বৃদ্ধি হচ্ছে, একথা সুবিদিত। কিন্তু এই বোঝার পরিমাণ সর্বসাধারণের সব সময় জানার সুযোগ হয় না। বাজেট পরিবেশন উপলক্ষ্যে, সরকারী ইস্তাহারে কিম্বা লোকসভার প্রশ্নোত্তরে এ সংবাদ জানা যায়। সম্প্রতি এ সম্পর্কে কিছু কিছু সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। তাতে জানা যায় ভারত সরকারের ঋণের বোঝা ১৯৩৯ সনে ৯৪১·৭৭ কোটি টাকা ছিল। ১৯৬২-এর ৩১ শে মার্চ এর পরিমাণ ৫,২৭৯·৬১ কোটি টাকা দাঁড়ায় ১৯৬৩ সনের মার্চের শেষে দাঁড়াবে ৫,৯১৪·৭০ কোটি টাকায়। এর মধ্যে দেশের অভ্যন্তরে সংগৃহীত ঋণের পরিমাণ যথাক্রমে ৪৮৪·৮২, ৪১৬·০১ ও ৪,৩১২·৯, কোটি টাকা। অবশিষ্ট অংশ সবটাই বৈদেশিক ঋণ। ভারত সরকারের আরও কিছু টাকার দায়িত্ব রয়েছে। এই দায়িত্বের পরিমাণ গত মার্চের শেষে ১৮৩৪ কোটি টাকা দাঁড়িয়েছিল। আগামী বছর ৩১ শে মার্চ এই দায়িত্ব বৃদ্ধি পেয়ে ২০৮৩ কোটি টাকায় দাঁড়াবে। এর মধ্যে রয়েছে পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্কের সঞ্চয়, পোষ্ট অফিসের অন্যান্য টাকা, স্থায়ীস্থাল সেভিংস, স্থায়ীস্থাল প্ল্যান সেভিংস, ট্রেজারী সেভিংস ডিপজিট সার্টিফিকেট ও পি, এল ৪৮০-র সঞ্চিত টাকা। সর্বসাকুল্যে ঋণ ও অন্যান্য দায়িত্ব সহ ১৯৬২ সনের ৩১ শে মার্চ পর্যন্ত ভারত সরকার ৭০৮১.৬০ কোটি টাকার জন্য দায়ী। বৈদেশিক ঋণের মধ্যে ১৯৬১ সনের ৩১ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত মাত্র ৭১ ১১· লক্ষ টাকার আংশিক ঋণ পরিশোধ করা হয়েছে।

সাহিত্যিকদের সম্মান

বাংলাদেশে কবি ও সাহিত্যিকদের স্বীকৃতির জন্য

প্রশংসনীয় বেসরকারী উদ্যোগ সুরু হয়েছে। সম্প্রতি দক্ষিণ কলিকাতায় এই ধরণের একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে সাতজন খ্যাতিমান সাহিত্যিকদের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এদের মধ্যে আনন্দ বাজার পত্রিকার পক্ষ থেকে প্রফুল্লকুমার-স্মৃতি আনন্দ পুরস্কার পেয়েছেন কবি কুমুদ রঞ্জন মল্লিক। দেশ পত্রিকার পক্ষ থেকে সুরেশচন্দ্র-স্মৃতি আনন্দ পুরস্কার পেয়েছেন শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র। সরলাবালা সরকার-স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছেন শ্রীপুলিনবিহারী সেন, অমৃতবাজার পত্রিকা শিশির কুমার ঘোষ পুরস্কার পেয়েছেন ডাঃ বিধানবিহারী মজুমদার ও মতিলাল ঘোষ স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছেন শ্রীবিমল মিত্র। এদের প্রত্যেকেরই পুরস্কারের মূল্য ১০০০৲ টাকা। 'মৌচাক' ও 'উল্টোরথ' এর পক্ষ থেকে ৫০০৲ মূল্যের পুরস্কার পান শ্রীমতী সুখলতা রাও এবং কবি হরপ্রসাদ মিত্র। আমরা পুরস্কার প্রাপ্ত সাহিত্যিকদের এবং পুরস্কার ব্যবস্থাপক সংস্থাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি

পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় অনাবৃষ্টি ও শস্যহানির ফলে এখনই দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে। অথচ পশ্চিম দিনাজপুর একটি উদ্বৃত্ত জেলা এবং গোটা উত্তর বঙ্গের খাদ্য সরবরাহ করে থাকে। সব চাইতে আশ্চর্যের কথা ১৯৪৩ সনের দুর্ভিক্ষেও পশ্চিম দিনাজপুর জেলা দুর্ভিক্ষের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। একমাত্র ১৯২৯ সালে এই জেলায় বড় রকমের দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। ফসল উঠবার তিন মাসের মধ্যেই এই ধরণের একটি উদ্বৃত্ত জেলায় এরূপ সর্বনাশা পরিস্থিতি গোটা রাজ্যের পক্ষেই বিপদসূচিত করছে। এখনও পর্যন্ত এই অবস্থা প্রতিরোধের জন্য সরকারী প্রচেষ্টার কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না।

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষিতের সংখ্যা

১৯৬১ সালের লোকগণনা অনুযায়ী পশ্চিম বঙ্গে শিক্ষিতের সংখ্যা দশবছরে শতকরা মাত্র ৪ ভাগেরও বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৫১ সনে এই সংখ্যা ছিল শতকরা ২৪.৫৪, ১৯৬১ সালে শতকরা ২৯'১ জন। কলকাতায় শিক্ষিতের হার সব চাইতে বেড়েছে, এখানকার হার শতকরা ৫৮'৫জন। তার মধ্যে পুরুষ শতকরা ৬২'৮ ও নারী ৫১'৫ জন। হাওড়ায় শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা ৩৮'২ জন তাদের মধ্যে পুরুষ শতকরা ৪৭'৭ এবং নারী শতকরা ২২। হুগলীর সংখ্যা শতকরা ৩৪'৫, বর্ধমান শতকরা ২৯'৪, মেদিনীপুর শতকরা ২৭'১, বীরভূম-২২'২, বাঁকুড়া-২২'৯, পুরুলিয়া-১৮'৩ চব্বিশ-পরগণা-৩২'৬, নদীয়া-২৬'১, মুর্শিদাবাদ-১৫'৯, মালদহ-১৩'৬, পশ্চিম দিনাজপুর-১৬'৮, কুচবিহার-২১'১, জলপাইগুড়ি শতকরা ১৯'৩। দশবছরে শিক্ষিতের হার বৃদ্ধির পরিমাণ নৈরাশ্যব্যঞ্জক।

ভারত-নেপাল সম্পর্ক

নেপালের রাজা মহেন্দ্র ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী সুবর্ণ শমশের গত ১৮ই এপ্রিল থেকে কয়েক দিন ভারতবর্ষে অবস্থান করে প্রধান মন্ত্রী নেহেরুর সঙ্গে নেপাল-ভারত সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। এই সফরের প্রাক্কালে নেপাল সরকারের পক্ষ থেকে ভারত-বিরোধী প্রচার করে ভারত-নেপাল সম্পর্ককে আরও তিক্ত করে তুলবার চেষ্টা হয়। নেপালে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য রাজা মহেন্দ্রের বিরুদ্ধে নেপালী কংগ্রেস বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। ভারতীয় সীমান্ত থেকে এই বিদ্রোহ পরিচালিত হচ্ছে এবং পরোক্ষে ভারত সরকার বিদ্রোহীদের সমর্থন করছেন—মূখ্যত ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে নেপাল সরকারের এই অভিযোগ। অপর পক্ষে, চীন সরকারের সহিত নেপাল সরকারের ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠতা ভারতবর্ষের পক্ষে ঘোরতর বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯৫০ সালের নেপাল-ভারতচুক্তি অনুযায়ী এক দেশ অপর দেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়ে পরস্পর পরামর্শক্রমে

সিদ্ধান্ত গ্রহণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। লাল-কাঠমাণ্ডু সড়ক নির্মাণ পরিকল্পনায় ভারতবর্ষের নিরাপত্তা ও আর্থিত স্বার্থ জড়িত থাকা সত্ত্বেও এ-সম্পর্কে তার কোন মতামত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা নেপাল বোধ করে নাই।

নেহেরু-মহেন্দ্র বৈঠকে এই মৌলিক বিষয়গুলির যে কোনো মীমাংসা হয় নাই, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তবে রাজা মহেন্দ্রের পক্ষ থেকে নেপালী কংগ্রেসের নেতাদের ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়ন এবং নেপালে প্রেরণের যে দাবী উঠেছিল, নেহেরু তা দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখান করলেও ভারত সীমান্তের অভ্যন্তর থেকে নেপালের বিরুদ্ধে কোনো শত্রু অভিযান চলবে না এই প্রতিশ্রুতি রাজা মহেন্দ্র আদায় করে নিয়েছেন। নেপালের চীন মুখীন নীতি একদিকে যেমন ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির পরাজয় ঘোষণা করছে অপরদিকে দীর্ঘকালের জন্য ভারতবর্ষের নিরাপত্তা বিপন্ন করে রাখবে।

শোকাবহ দুর্ঘটনা

মাত্র ৩২ বছর বয়সে ভারতবর্ষে শিশুচিত্রের অন্যতম পরিচালক ও কুশলী আলোকশিল্পী শ্রীযুক্ত দাসগুপ্ত গত ৪ঠা মে মুর্শিদাবাদের পাঁচটুপি গ্রামে ভারতের ধনু চিত্রটীর জন্য আলোকচিত্র (বেদ ও নৈসর্গিক দুর্যোগের আলোকচিত্র) গ্রহণকালে অকস্মাৎ বজ্রপাতে প্রাণ হারান। স্মরণে থাকবে এই প্রতিভাবান আলোকশিল্পী এবছর প্রধানমন্ত্রীর স্বর্ণপদক-প্রাপ্ত শিশুচিত্র হটুগোল বিভাগের তিনি ছিলেন সহ পরিচালক। এই তরুণ শিল্পীর আকস্মিক মৃত্যুতে একটি প্রতিশ্রুতিময় জীবনের ওপর অকালে যবনিকাপাত হল। শিল্পীর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।

এই সকল পরস্পর-বিরোধী গুণের একত্র সমন্বয়ে প্রস্তুত

নিবে কালি শুকায় না,
কিন্তু কাগজে দ্রুত শুকায়।

রঙের যথেষ্ট গভীরতা, তবু
অবাধে লেখা এগিয়ে চলে।

লেখা ধুয়ে-মুছে যায় না,
অথচ কলম পরিষ্কার রাখে।

সুলেখা কালি

• • • অন্য কোন কারণে না হ'লেও অন্ততঃ এই কারণেই
সুলেখা আজ সর্বোচ্চ বিক্রয়ের গৌরব অর্জন করেছে • • •

সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ কলিকাতা • দিল্লী • বোম্বে • মাদ্রাজ

জয়শ্রী

জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৯ · ২য় সংখ্যা · ২৭ বর্ষ

বিবাহ ও পরিবারের ক্রমবিকাশ

—মর্গান-মার্ক্সীয় মতবাদের আলোচনা

—গতবারের পর

অনিলচন্দ্র রায়

চতুর্থ অধ্যায়

মাতৃতন্ত্র ও মাতৃক্রম

যৌথবিবাহকে প্রমাণ করিবার জন্য মর্গান-এঙ্গেলস্-এর দ্বিতীয় যুক্তি হইল এই যে মাতৃতান্ত্রিক গোষ্টি (clan) পৃথিবীতে সর্বত্রই পাওয়া যায় তাহারও একটা সুব্যাখ্যা করিতে হইলে এই পুনালুয়া বিবাহকে পূর্বস্তর বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। এঙ্গেলস্-এর মত এইরূপ: clanএর বা মাতৃতন্ত্রী গোষ্টীর আবিষ্কার মর্গানের দ্বিতীয় বৈপ্লবিক আবিষ্কার। যাকোকেন পৃথিবীতে যেমন মাতৃতন্ত্রের আবিষ্কার করিয়া সমাজতত্ত্বে নতুন পথ দেখাইয়াছেন, মর্গানও তেমনি এই clan বা গোষ্টীর আবিষ্কার করিয়া সমাজতত্ত্বের ক্ষেত্রে এক্ষেত্রসের মতে নতুন আলো ফেলিয়াছেন। মাতৃতন্ত্রী গোষ্টীর আবিষ্কারে পৃথিবীর সকল জাতির সব রকম সামাজিক প্রতিষ্ঠান বোঝার পক্ষে সহজ হইয়াছে। মাতৃতন্ত্রের সহিত গোষ্টির গূঢ় সম্বন্ধ। একটীকে ছাড়িয়া অন্যটীকে কল্পনা করা চলে না। ইরোকোয়া জাতির মধ্যে মর্গান এই গোষ্টিপ্রথার সন্ধান প্রথম পাইয়াছিলেন। 'রাষ্ট্র' নামক প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাবের পূর্বে এই প্রথাই সমাজজীবনের ভিত্তি ছিল। মাতৃতন্ত্রী গোষ্টিকে ভাঙিয়া ও ধ্বংস করিয়াই 'রাষ্ট্রের' আবির্ভাব ঘটিয়াছে।

বর্বর যুগে সব জাতির মধ্যেই এই মাতৃক্রমী গোষ্টী প্রথার রাজত্ব ছিল। ইরোকোয়া জাতির মধ্যে যে গোষ্টিপ্রথা মর্গান দেখিয়াছেন, সেই প্রথাই পৃথিবীতে একদিনে সভ্যতার উদ্ভবের পূর্ব পর্যন্ত সর্বব্যাপী ছিল। গ্রীক-রোমে, জার্মান জাতিতে, সর্বত্রই এই গোষ্টীপ্রথা একদিনে ছিল এবং এই ইরোকোয়া জাতিতে সেই প্রথা এখনো জীবিত রহিয়াছে। শুধু গ্রীকরোম ইত্যাদি জাতির মধ্যে পিতৃক্রমী গোষ্টিপ্রথার প্রচলন দেখি তাহা এই মাতৃক্রমী গোষ্টিপ্রথারই বিকৃতি বা পরবর্তী পরিণতি। মর্গান যে শব্দটী ব্যবহার করিয়াছেন তাহা হইল "gens" মর্গান এই শব্দটীকে "পিতৃক্রমী" এবং "মাতৃক্রমী" উভয় প্রকারের গোষ্টী বুঝাইতেই ব্যবহার করিয়াছেন।

গোষ্টী প্রথা সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাইবে এখন মাতৃতন্ত্র বা মাতৃক্রম সম্বন্ধে সাধারণভাবে কিছু আলোচনা করা হইতেছে। কারণ মর্গানের মতে আদিম এবং অদ্বিতীয় গোষ্টী প্রথাই হইল "মাতৃক্রমী" গোষ্টীপ্রথা।

মাতৃতন্ত্রকে মর্গান যৌথবিবাহের অবশ্যম্ভাবী সঙ্গী বলিয়া

ব্যাখ্যা করিয়াছেন। So that gynaecocracy seems to require for its creation descent in the family line—pp 359) যৌথ-বিবাহেরই সৃষ্টি ও ফল হইল মাতৃতন্ত্র ও মাতৃক্রম। যেখানে যেখানে যৌথ-বিবাহ থাকিবে সেখানেই মাতৃতান্ত্রিক প্রথা অনিবার্য্য। কেননা, যে সমাজে যৌথবিবাহই যৌন-জীবনের প্রচলিত পদ্ধতি, সেখানে পিতৃত্বের কোন ঠিকানা করা সম্ভব নয়। কিন্তু মাতৃত্ব সম্বন্ধে কোন সংশয়ের অবকাশ কোথাও নাই। কোন্ মাতার কোন্ সন্তান তাহার নিঃসন্দিগ্ধ স্থূল প্রমাণ সর্বত্রই রহিয়াছে। তাই মর্গানী মত অনুসারে মাতৃতন্ত্রকে ব্যাখ্যা করিতে হইলে যৌথ-বিবাহ স্বীকার করিতে হয়। মর্গানী ছকে যৌথবিবাহের সহিত মাতৃতন্ত্র অনিবার্যভাবে সম্পর্কিত। তাই মাতৃতন্ত্র পৃথিবীতে সকল সমাজেরই পূর্বতন স্তর। ইহার পরবর্তী স্তরে যৌথবিবাহের স্থলে আসিয়াছে ব্যক্তি বিবাহ (individual marriage) বা একবিবাহ। এক বিবাহে মাতৃতন্ত্র থাকিতে পারে না; ইহার অবশ্যসহচর হইল 'পিতৃতন্ত্র' (patriarchy)

মর্গানের মাতৃতন্ত্র ও পিতৃতন্ত্র সংক্রান্ত মত ইঁহার একরৈখিক বিবর্তনবাদের অঙ্গীভূত অংশ। এ সম্বন্ধে আধুনিক সমাজতন্ত্রের সহিত মর্গানী মতবাদের মৌলিক প্রভেদ রহিয়াছে। একরৈখিক বিবর্তন যেমন আজ বর্জিত তেমনি আজ অনিবার্য স্তর পর্যায় ও বাঁধাধরা বিবর্তনক্রমও প্রত্যাখ্যাত। সেই কারণে মাতৃতন্ত্র সম্বন্ধেও মর্গানী মতবাদ সঙ্গে সঙ্গেই অগ্রাহ্য হইয়া যায়। একটু বিস্তৃত আলোচনা করিতেছি।

বর্তমানে জগতের আদিম অসভ্য জাতিগুলির মধ্যে আধুনিক নৃতত্ত্ব স্তর স্তর করিয়া তথ্য সংগ্রহ করিয়াছে। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণে সমাজের নানা প্রতিষ্ঠান ও প্রথার প্রকৃত স্বরূপ অনেকাংশে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে দেখা যায় যে আদিম সমাজে মাতৃতন্ত্র (Matriarchy) ও পিতৃতন্ত্র (Patriarchy), মাতৃক্রম (Matriliny) ও পিতৃক্রম (Patriliny), মাতৃনাম ও পিতৃনাম ইত্যাদি বহুল প্রচলিত আছে। ইহা ছাড়া মাতৃনামী (Matrinymic) ও পিতৃনামী (Patrinymic), মাতৃস্থানী (Matrilocal) ও পিতৃস্থানী (Patrilocal) জাতিও রহিয়াছে। দেখা যাইতেছে যে মর্যাদা, বংশক্রম, বংশনাম ও বাসস্থান—এই চারটি বিষয় সম্বন্ধেই অসভ্য সমাজে পৃথক পৃথক ব্যবস্থা ও প্রথা রহিয়াছে। প্রশ্ন হইল এই যে এই চারটি বিষয়ের পরস্পরের সম্বন্ধ কি। যে জাতি মাতৃক্রমিক সেই জাতিই কি মাতৃতান্ত্রিক, মাতৃস্থানিক ও মাতৃনামিক হইবে? ইহাদের মধ্যে কি, কারণিক সম্বন্ধ রহিয়াছে? আধুনিক নৃতত্ত্ব বলিতেছে যে ইহাদের মধ্যে কোন অনিবার্য কারণিক সম্বন্ধ নাই। সেই কারণেই ইহাদের মধ্যে কোন অপরিবর্তনীয় ক্রমও থাকিতে পারে না।

মাতৃতন্ত্রের সহিত মাতৃক্রমের অনিবার্য সম্বন্ধ ধরিয়া লইয়াই মর্গানী মতবাদ গড়িয়া উঠিয়াছে। যেহেতু আদিতে পিতৃত্ব অজ্ঞাত ও মাতৃত্বই জ্ঞাত সেই হেতু মাতার বিপুল সম্মান ও মর্যাদা আদিম সমাজে অতি স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া ইঁহারা মনে করেন। যত আদিতে যাইব ততই দেখিব নারীর মর্যাদা অধিকতর সুপ্রতিষ্ঠিত। একটি অর্থনৈতিক কারণও মর্গানীরা দিয়াছেন; যৌথ গৃহস্থালী (communistic household) আদিম সমাজের প্রধান লক্ষণ; যৌথ গৃহস্থালীতে নারীই গৃহের অধিষ্ঠাত্রী এবং নারীর প্রভুত্ব ও ক্ষমতা সেখানে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। বাকোফেন সর্বপ্রথম এই মত প্রচার করেন। তার পরে মর্গান ও এঙ্গেলস এবং অধুনা ডাঃ ত্রিফল্ট্ প্রমুখ কেউ কেউ আদিম সমাজের এই নারীপ্রাধান্যকে স্বীকার করিয়া লইয়া সমাজব্যাখ্যা করিয়াছেন। এঙ্গেলসের কথা তুলিয়া দিতেছি: "Communistic housekeeping however means the supremacy of women in the house

just as the exclusive recognition of the female parent owing to the impossibility of recognising the male parent with certainty, means that the women, i, e, the mothers, are held in high respect," (পৃঃ ৫০) মাতৃতন্ত্র ও মাতৃক্রমের কারণিক সম্বন্ধ অস্বীকার বিজ্ঞানীরা অস্বীকার করিয়াছে। কোথাও ইহারা দুইটি একসঙ্গে বিদ্যমান নাই। প্রথম যুগের ভাসা-ভাসা ও অসম্পূর্ণ পর্যবেক্ষণে এই দুইয়ের প্রকৃত সম্বন্ধ ধরা পড়ে নাই। আধুনিক বিশ্লেষণে ইহা ধরা পড়িয়াছে। দেখা গিয়াছে, যে-জাতি মাতৃক্রমিক অর্থাৎ মায়ের বংশধারা বংশ নির্ধারণ করে, তাহাদের সমাজে মাতৃতন্ত্র বা মায়ের প্রাধান্য বা মাতৃ-শাসন নাই। বস্তুতঃ মাতৃতান্ত্রিক সমাজ খুব কমই দেখা যায়। নৃতত্ত্বের প্রথম যুগে মাতৃক্রমিক প্রথা আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিতেরা অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং মায়ের নামে বংশক্রম নির্ধারিত হইতে দেখিয়া মনে করিয়াছিলেন যে এই সব জাতিতে মায়ের স্থান ও মর্যাদা নিশ্চয়ই অতি উচ্চে। ইহার কারণ এই যে, ঐ সময়ে এই মাতৃক্রমিক সমাজের কল্পনাও কেহ করে নাই এবং বাইবেলের প্রভাব ও মেইন (Maine) প্রমুখ পণ্ডিতদের পিতৃতান্ত্রিক সমাজ সম্বন্ধে মতবাদই তখন আসর দখল করিয়াছিল। তখন বাকোফেন-কর্গানী মতবাদ সহজেই মাতৃক্রমকেই "মাতৃতন্ত্র" বা নারীপ্রাধান্য বলিয়া ভুল করিয়াছিল। আসলে মাতৃতন্ত্র ও মাতৃক্রম পৃথক।

মাতৃতন্ত্র পৃথিবীর অসংখ্য জাতির মধ্যে অতি অল্প কয়েকটি মাত্র জাতিতে কিছু কিছু দেখা গিয়াছে। আসামের খাসিয়া, জুনি (Zuno), ইরোকোয়া (Eroquois), সিরি (Seri) প্রভৃতি কয়েকটি জাতিতে মাতৃতন্ত্রের দেখা পাওয়া গিয়াছে। এই সামান্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত হইতেই মাতৃতন্ত্রকে একটি বিশ্বব্যাপী সার্বিক স্তর বলিয়া ধরা নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ বলিতেই হইবে। অধিকন্তু এই কয়টি জাতির মধ্যেও আবার নারী রাষ্ট্রপতি বা গোষ্ঠীপতি পাওয়া যায়না। এ ক্ষেত্রে ইহাই প্রমাণ হয় যে এখানেও মাতৃতান্ত্রিক অবস্থা উদ্ভব হইবার আগে নারীর সামাজিক স্থান উন্নত ছিল না। পূর্বেও গোষ্ঠীপতি বা রাষ্ট্রপতি পুরুষই ছিল। এখনও আছে। ইরোকোয়াদের মধ্যে অবশ্য নারীর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা খুব প্রবল; গোষ্ঠীপতি নির্বাচন ও বিতাড়ন দুই ব্যাপারেই নারীর হাত খুব স্পষ্ট। কিন্তু এখানেও ইরোকোয়া 'প্রধানদের পরিষদে' (League of Elders) কোনদিন কোন নারী স্থান পায় নাই। লক্ষ্য করিতে হইবে যে, ইরোকোয়া ব্যতীত অন্যত্র নারীর এই মর্যাদা কোথাও নাই। আফ্রিকার কোথাও কোথাও রাজার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্ঞীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, একথা ঠিক। কিন্তু একদিকে যেমন দেখি পুরুষক্রমিক গোষ্ঠীই (gentes) এখানে সমাজভিত্তি, তেমনি অন্যদিকে দেখি পুরুষের ক্ষমতা-ঐশ্বর্য এখানে নারীর চাইতে বহুগুণ বেশী। এলিজাবেথ, ভিক্টোরিয়া, রুশীয় রাণী ক্যাথারিন, রিজিয়া, দুর্গাবাঈ ইত্যাদি রাজ্ঞী-সাম্রাজ্ঞীদের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া যদি কেহ অনুমান করে যে ভারতে, ইংলণ্ডে, রুশদেশে গত পাঁচশত বৎসর যাবৎ নারীতন্ত্র বা মাতৃক্রম (matriarchate) চলিতেছে তবে তাহা হাস্যকর হইবে। তেমনি সামান্য কয়টি বিচ্ছিন্ন দৃষ্টান্ত হইতে পৃথিবীতে এককালে নারীতন্ত্র বা মাতৃতন্ত্রের প্রাধান্য ছিল বলিয়া সার্বিক সিদ্ধান্ত করিলেও অবাস্তব ও অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত করা হইবে।

আবার দেখা যায়, মাতৃক্রমিক সমাজে যদিও বংশপরম্পরা মা হইতেই সন্তানে প্রবর্তিত হয়, অনেকস্থলেই কিন্তু সম্পত্তিতে আনুষ্ঠানিক ও অন্যান্য অধিকার পুরুষের মারফৎ উত্তরপুরুষে বর্তাইয়া থাকে। মাতৃক্রমিক সমাজেও এই সব অধিকার অনেক ক্ষেত্রেই মা না করিয়া মায়ের কোন পুরুষ আত্মীয়—যথা, মায়ের ভাই—উদারক করিয়া থাকে। এসব ক্ষেত্রে মাতৃক্রমিক হইলেও মাতৃতান্ত্রিক নয়। মাতৃসত্ত্বও এই সব

সমাজপদ্ধতির প্রকৃত রূপ নয়। মাতৃক্রম, মাতৃতন্ত্র ও মাতৃসত্ব ইত্যাদি প্রথা আলাদা আলাদা সমাজপদ্ধতি। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে কখনো কখনো যেমন সম্বন্ধ দেখা যায়, তেমনি ইহাদের মধ্যে পার্থক্যেরও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে এমন কোন অঙ্গাঙ্গী ও অনিবার্য সম্বন্ধ নাই যাহাতে একটী থাকিলেই অন্যগুলিকেও থাকিতেই হইবে। মাতৃতন্ত্র বিশেষ করিয়া পৃথিবীতে অতি বিরল। ইহার অর্থসম্বন্ধেও মতদ্বৈধ আছে। অনেকে তাই 'মাতৃসত্ব' শব্দটাই মাতৃতন্ত্রের বদলে ব্যবহারের পক্ষপাতী। Dr Rumney তাই বলেন,—"There is great doubt that such a stage has ever been universal or been passed through by all societies where descent is through mother, property and ceremonial rites will go through her brother or her husband Even in such societies many disabilities attach to women. The headship of the clan is inherited through the mother but not by the mother, and passes from her brother to her son and from her son to her daughter's son. In many cases the women, instead of being subjected to her own husband, is subjected by her family. In view of these facts a matriarchate, or the rule of women, is highly problematical..." (p. 116)

দেখা যাইতেছে, মাতৃতন্ত্র, মাতৃসত্ব বা মাতৃক্রম একই সঙ্গে সর্বদা থাকে না। মাতৃতন্ত্রকে একটা সার্বিক স্তর এবং পূর্বতন স্তর বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। সহজ প্রাকৃতিক অবস্থায় মাতৃতন্ত্র গড়িয়া উঠিবার আরো বাধা রহিয়াছে। পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, আদিকালেও পুরুষের প্রাধান্য ও প্রাবল্য বিদ্যমান ছিল। শারীরিক শক্তিতে পুরুষ চিরকালই নারী হইতে বলবান। শারীর সংস্থান ও নানা জৈবিক কারণে দৈহিক অক্ষমতা পুরুষের চাইতে নারীর অধিক। মানুষ যখন প্রাকৃতিক অবস্থায় জীবনযাপন করিত, তখন সেই মানুষের সম্বল ছিল। বুদ্ধিবৃত্তি অস্ত্রশস্ত্র যন্ত্রপাতি ইত্যাদি যখন মানুষকে সমৃদ্ধ করে নাই, তখন দৈহিক শক্তিই মানুষের প্রধান নির্ভরস্থল, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সভ্যতার অগ্রগতির সহিত মানুষ আজ দেহকে ছাড়াইয়া মনের সাম্রাজ্য রচনা করিয়াছে। বুদ্ধি ও বিজ্ঞানই আজ সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু আদিম অবস্থায় দেহশক্তিই জীবনের অবলম্বন। তাই বনমানুষের মত আদিম মানুষেরও জীবনে পুরুষ-প্রাধান্য না হইয়া পারেনা। পত্নী ও সন্তানের উপর আদিম মানুষের অবাধ-আধিপত্য ছিল, ইহাই সর্বসম্মত মত। এমনকি মাতৃক্রম অনুসরণ করিয়া বংশ পরম্পরা নির্ধারিত হইলেও পরিবারে পুরুষের প্রাধান্য খর্ব হইত না। "A sharp distinction must really be recognised between the law of descent and the facts of authority." (N. W. Thomas) মিঃ টমাস তাঁহার 'Sex and Society' নামক গ্রন্থে এ সম্বন্ধে বলেন যে মাতৃক্রমিক স্তরের সৃষ্টি হইলে তাহার পূর্বেও পুরুষশক্তির অব্যাহত প্রভাব বিদ্যমান ছিল। তখনকালেও সামাজিক ইচ্ছাশক্তির ও বোধের বাহক ছিল পুরুষ। মাতৃক্রমিক সমাজেও এই "male force" বা পুরুষ শক্তি ছদ্মবেশে (veiled) বিদ্যমান ছিল। এই কারণেও পিতৃতন্ত্র বা পুরুষ-প্রাধান্য আদিম সমাজের স্বাভাবিক সমাজ পদ্ধতি বলিয়া স্বীকার করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। এখানে মাতৃতন্ত্র সম্বন্ধে রবার্ট ব্রিফল্টের (R. Briffault) মতামতের কিছু আলোচনা করা যাইতে পারে। ব্রিফল্ট এযুগে আবার নতুন করিয়া মাতৃতন্ত্রবাদকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ব্রিফল্ট মাতৃতন্ত্রও মাতৃক্রমকে প্রায় একই অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার মতে আদিম পরিবার মাতৃস্থানী (matrilocal) মাতৃক্রমিক এবং মাতৃতান্ত্রিক। আদিতে মানুষের সমাজে বা জীবনে পুরুষের প্রাধান্য তো দূরের কথা, পুরুষের কোন স্থানই ছিল না। পুরুষকেন্দ্রিক

বা পিতৃতান্ত্রিক পরিবার আদিম হইতেই পারে না। ব্রিফল্টের মত যে যুক্তিসহ নয় তাহা দেখান হইতেছে।

আদিতে পুরুষের দৈহিক শক্তির প্রাধান্য ব্রিফল্টও অস্বীকার করিতে পারেন নাই। পশুসমাজে পুরুষের দৈহিক শক্তির কথা বলিতে গিয়া তিনি বলেন :

"The physical advantage of the male which is so considerable a factor in the constitution of the human family, is irrelevant in the animal conditions of the animal family. The male is as a rule physically more powerful" (20) যদি পুরুষের দৈহিক বলবত্তা স্বীকৃত হয় তবে পুরুষ-প্রাধান্য কিছুটা হইবার সম্ভাবনা থাকেই। নিম্নস্তর শিকারীদের জীবনে যে পুরুষের স্বেচ্ছাতন্ত্র সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা প্রবল একথা তিনিও স্বীকার করেন : "The physical advantages of the men as hunters and fighters would in these conditions, be apt to establish a masculine despotism···" (69). ব্রিফল্ট আদিতে অবাধ-সংসর্গ ধরিয়া লইয়াছেন। 'অবাধ-সংসর্গ' স্তরে পিতা অজানা থাকার মাতৃক্রমই স্বাভাবিক সম্বন্ধ। কিন্তু এ অবস্থা যে বাস্তবে টিকিতেই পারেনা, ইহা যে একেবারেই অবাস্তব, তাহা নিজেই স্বীকার করিতেছেন ; কারণ এই ধরণের মানব-যূথ মাতৃ-ক্রমী থাকিতেই পারে না ; এই ধরণের সমাজ "would under human conditions, very soon tend to lose its maternal character and to become such a horde dominated by despotic masculine instincts as is pictured by the patriarchal theory of social origins" (69) এই পৌরুষিক বৃত্তির (masculine instincts) অস্তিত্ব আদি থেকেই রহিয়াছে। কাজেই আদিতেই এই বৃত্তির ক্রিয়ার ফলে পুরুষ-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা প্রধানিত হয়।

এখানে আদিকালে পুরুষশক্তির প্রভাবকে স্বীকার করা হইতেছে বলিয়া সেইযুগে পিতৃতান্ত্রিক পরিবারই একমাত্র পরিবার ছিল, একথা বলা হইতেছে না। পুরুষের দৈহিক শক্তির প্রাধান্য একটা গুরুতর factor বা শক্তি এখানে বলা হইতেছে। এই শক্তির প্রবল ক্রিয়ার ফলে সেই প্রাকৃত জীবনের স্তরে পিতৃকেন্দ্রী পরিবারই সাধারণ পদ্ধতি হইবার সম্ভাবনা রাখে। পিতৃতন্ত্রই স্বাভাবিক ও আদিম প্রতিষ্ঠান। কিন্তু অন্যান্য factor গুলির ক্রিয়াও আদিমকালেই বিদ্যমান ছিল। তাই আদিম কালেও কোথাও কোথাও মাতৃতন্ত্রও পাশাপাশি ছিল। সমাজ-জীবনে কোন প্রতিষ্ঠানই একটীমাত্র শক্তির সৃষ্টি নয়। ইতিহাসের বহুবাদী ব্যাখ্যাই বৈজ্ঞানিক। আদিকালে দেহশক্তি যেমন প্রাধান্য পাইয়াছে তেমনি আর্থিক শক্তি, যৌন-শক্তি, ভৌগলিক-শক্তি, মানস-শক্তি ইত্যাদিও পরিবার গঠনে কাজ করিয়াছে। এই সব কারণের সমবায়েই পরিবার রূপ গ্রহণ করিয়াছে। এই সব কারণের প্রায় সবগুলি কারণই পুরুষ-কেন্দ্রিক পরিবার গঠনের দিকে সহায়তা করিয়াছে। তাই পুরুষ-কেন্দ্রিক পরিবারই সাধারণ প্রথা। তবে নারীক্রমিক পরিবারও সঙ্গে সঙ্গেই ছিল। দেহশক্তিকে অপরশক্তি প্রতিরোধ করিতে পারে। যেখানে নারীর হাতে খাদ্যব্যবস্থা ও অর্থশক্তি সেখানে দৈহিক শক্তি সত্ত্বেও পুরুষের চাইতে নারীর প্রাধান্য কম হয় না। এমনকি বংশগণনার রীতি পুরুষ-ক্রমিক হইলেও পরিবারে নারীপ্রাধান্য থাকিতে পারে। নিবাস-প্রথারও (Residence) কম প্রভাব নয়। জনসংখ্যা বা নারী পুরুষের আনুপাতিক সংখ্যাও নারীর মর্যাদা এবং পরিবারের রূপকে ভাঙিয়া গড়িতে পারে। ধার্মিক আদিম জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। নারীর মর্যাদা ও স্থানও পরিবারে ইহার প্রভাবে নানা বিচিত্ররূপে প্রকাশ হইতে পারে। যেমন ক্রলী (Crawley) বলেন, নারী বা যৌন-ঘটিত ব্যাপারেও অসভ্য মন ধর্মভাব ও কুসংস্কার দ্বারা চালিত

হয়। "all actions and relations, all individual and social phenomena conditioned by sex, are likewise filled with a religious meaning····· " (9) পুরুষের দৈহিক শক্তি থাকুক, কিন্তু এই দুর্বোধ ধর্মভাব বা ম্যাজিকের প্রভাব এমন অপ্রত্যাশিত পথে আসিয়া এমন বিচিত্রভাবে দেহশক্তিকে প্রতিরোধ করিতে পারে যে পরিবারে পুরুষ-প্রাধান্য খর্ব হইয়া একাধিক ব্যাপারে নারীপ্রাধান্য স্থাপিত হইতে পারে। নানা শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতে তাই নানা বিচিত্র পদ্ধতিই সৃষ্টি হইতে পারে। এই কারণে কোন একটি অনিবার্য ক্রমপর্যায়, কোন একটি অপরিবর্তনীয় স্তর পারম্পর্যকে অনুসরণ করিয়া সমাজবিকাশ চলে নাই। এই কারণেই স্পেন্সারের Promiscuity (অর্থাৎ সংসর্গ)—Polyandry (বহুভর্তৃক বিবাহ)—Polygamy (বহু পত্নীক বিবাহ)—Monogamy (এক-বিবাহ) ক্রম যেমন ভুল; তেমনি ব্রিফল্টের Promiscuity—Matriarchy—Patriarchy-ক্রম এবং দর্খাইমের Promiscuity—Group Marriage (যৌথ-বিবাহ)—Pairing marriage (যুগ্মবিবাহ)—Monogamy (একবিবাহ) ক্রমও অবাস্তব। আবার হেনরী মেইন (Sir Henry Maine) পিতৃতন্ত্র আদিতম এবং অদ্বিতীয়তম স্তর বলিয়া যে-হক খাড়িয়াছেন তাহাও একদেশদর্শী। বৈজ্ঞানিক রীতি তাই এই ধরণের অনড় হক স্বীকার করে না। অবশ্য বিশ্লেষণ ও কার্যকারণ সন্ধান দ্বারা প্রত্যেকটী বিশেষ স্থানে ও কালে যে-সব শক্তিসমবায়ে যে-প্রকার প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে বিজ্ঞান তাহাকেই তাহার স্বকীয় মর্যাদায় স্বীকার করিবে। হকের খাতিরে কিছুই স্বীকার বা অস্বীকার করিবে না। মাতৃতন্ত্র বা পিতৃতন্ত্র কোনটাই ইতিহাসে অনিবার্যরূপে আদিতম বা একতম এবম্বা অনড়কার নৃতত্ত্ব হলপ করিয়া বলিতে পারিবে না। কোন্ প্রতিষ্ঠানের কী মর্যাদা তাহা সম্ভাবনা-বিধি বা Law of probability বা average এর আলোকে বিচার করিয়া নির্ধারণ করিবে। সেই দৃষ্টিতে পিতৃতন্ত্রই স্বাভাবিকভাবে সম্ভবতর সাধারণ প্রতিষ্ঠান হইলেও ইহারই সঙ্গে সঙ্গে মাতৃতন্ত্রেরও প্রতিষ্ঠা ছিল ইহাই সমাজ-বিজ্ঞান বলিবে।

এখানে ব্রিফল্টের উক্তি হইতেই দেখা গেল, আদিমকালে দেহশক্তি-প্রভাবেই পুরুষকেন্দ্রিক পরিবার সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা অধিকতর। 'মাতৃতন্ত্র' শব্দের অর্থ কি? মাতৃতন্ত্র বলিতে সাধারণতঃ নারীপ্রাধান্য বোঝায়। ব্রিফল্ট কিন্তু নারী-প্রাধান্য বলিতে কী বোঝেন তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারেন নাই। তাঁহার নিজের মতবাদের নাম তিনি দিয়াছেন; 'matriarchal theory of social origins" বা সমাজোৎপত্তির মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ। 'মাতৃতন্ত্র' শব্দের স্পষ্ট ব্যাখ্যা স্বভাবতই তাঁহার করা উচিত। মাতৃতন্ত্র মানে মাতৃশাসন বা নারী-রাজত্ব। কিন্তু এ অর্থে যে পৃথিবীতে কোথাও কোনদিন মাতৃতন্ত্র ব্যাপক প্রতিষ্ঠান হইতে পারে নাই তাহা মাতৃতন্ত্র-বাদীরা সকলেই স্বীকার করিবেন। ব্রিফল্টও। কোন বিশেষ অবস্থায় এইরূপ নারী-রাজত্ব কদাচিৎ হইলেও হইতে পারে। ("—something closely resembling gynaecocratic societies is possible and even probable—Briffault, 179) কিন্তু ইহা অতি বিরল। তাই ব্রিফল্ট বলিতেছেন, "But as Sir J. Frazer, justly maintins, such conditions are exceptional cultural curiosities of little significance for the general history of culture. (179)

'মাতৃতন্ত্র' শব্দের দ্বিতীয় অর্থ হইতে পারে—নারী-প্রাধান্য বা নারী প্রভাব। প্রাধান্য বা প্রভাবেরও তারতম্য হইতে পারে এবং নানা স্তরের ও পরিমাণের প্রভাবই পরিবারে সম্ভব হইতে পারে। প্রশ্ন হইতেছে, কোন্ স্তরের প্রভাবকে মাতৃতন্ত্র নাম দেওয়া চলিতে পারে? নারীর স্থান পরিবারে 'dominant' বা প্রবলতম হইলে হয়ত মাতৃতন্ত্র

বলা চলে: কিন্তু ব্রিফল্ট নিজেই বলেন, মাতৃতন্ত্রের মানে এই নয় "does not imply that their position was in any sense dominant. (186) কিন্তু domination বা প্রাধান্য বস্তুটীও অনির্দিষ্ট। ইহার কোন মাপ মান বা standard নাই। "whether domination is or is not exercised by the women in a matriarchally constituted society, is neither a character which can serve as a basis for scientific distinctions nor can easily be estimated·····The actual influence of women in any society varies, as one might expect, enormously in different cultures" (187) তাহা হইলে পিতৃতন্ত্র কাহাকে বলিতেছেন ব্রিফল্ট? তাঁহার মতে নারীর প্রভাব অন্ততঃ পিতৃতন্ত্রের চাইতে বেশি থাকিলেই তাহাকে মাতৃতন্ত্র বলা চলে। তাঁর মতে অসভ্যসমাজে নানা স্তরের নারী প্রভাব পাওয়া যায়। কোথাও আর্থিক কুলমর্যাদায় অত্যধিক মর্যাদা, কোথাও বা পুরুষের চাইতে সামান্যমাত্র বেশি মর্যাদা পাওয়া যায়। তবে অসভ্যসমাজে কোথাও পিতৃতন্ত্রী সমাজের মত নামমাত্র নারীমর্যাদা দেখা যায় না। কাজেই মাতৃতন্ত্র বলিতে পিতৃতন্ত্র নয়, শুধু এইটুকুই ব্রিফল্ট বোঝেন। "Whether the women do or donot enjoy power or influence in matriarchally constituted societies, their status is not, in these societies, defined by the specific disabilities which mark their position in a patriarchally constituted society." (187) মাতৃতন্ত্রের এই লক্ষণ বর্ণনা বা definition অত্যন্ত অস্পষ্ট ও নেতিবাচক এবং অবৈজ্ঞানিক।

পিতৃতন্ত্রী সমাজেও কি সর্বত্র নারীর প্রভাব ও মর্যাদা একই স্তরের? মোটেও নয়। রোমে, ভারতে, চীনে, আসিরিয়ায় এমন উঁচুস্তরের নারীমর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল যে ব্রিফল্ট-কল্পিত অনেক মাতৃতন্ত্রী সমাজেও তাহার তুলনা মিলিবে না। অথচ ইহারা পিতৃতন্ত্রী সমাজ। আসলে এই দুই প্রথাই এমন মিশ্রিত হইয়া আছে যে স্পষ্ট ছক বাঁধিতে গেলে মুস্কিল হইবে। ডা: ওয়েস্টারমার্ক তাই বলেন, 'Besides the paternal and meternal systems of descent are often so interwoven with each other among one and the same people, that it may equally well be referred to the one class as to the other." (656). ব্রিফল্ট নিজেও স্বীকার করিয়াছেন যে মাতৃতন্ত্রের definition দেওয়া বৈজ্ঞানিক রীতিতে চলে না। তবু তিনি কিন্তু মাতৃতন্ত্রকে সার্বিক স্তর বলিয়া ধরিয়া মাতৃতান্ত্রিক সমাজের ভিত্তিতেই আদিম সমাজের ছক গড়িয়াছেন।

মাতৃতন্ত্র বলিয়া কোন স্তর সার্বজনীন হইতে পারে নাই। সমাজবিকাশের ঐতিহাসিক অগ্রগতিতে মাতৃতন্ত্রের কোন নির্ধারিত স্থানও নির্দেশ করা চলে না। কোন সমাজকেই ঠিক ঠিক মাতৃতন্ত্রী বলা চলে না। আবার যে সমাজে মাতৃপ্রাধান্য কিছু আছে সেখানেও আবার পুরুষ-প্রাধান্য বিদ্যমান থাকতে পারে। আবার পুরুষতন্ত্রেও নারীপ্রাধান্য থাকা অসম্ভব নয়। ইহার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত অষ্ট্রেলিয়া, মেলানেশীয় ইত্যাদি। অষ্ট্রেলীয় ও মেলানেশীয়গণ পৃথিবীর অতি আদিম অবস্থার দৃষ্টান্ত। এখানে বিবাহও সাধারণতঃ পিতৃতান্ত্রিক এবং সমাজও পিতৃতান্ত্রিক। এখানে মাতৃতন্ত্রের বা মাতৃক্রমের প্রসার নাই মোটেও। সকল পর্যটক ও নৃতাত্ত্বিকই এ বিষয়ে একমত। অষ্ট্রেলিয়া-মেলানেশীয়ার মতো স্থানের প্রাচীনতর জাতিগুলিতে পিতৃতন্ত্র প্রচলিত রহিয়াছে, ইহাতে প্রমাণ হয় যে মাতৃতন্ত্র অনিবার্য বা আদিতম নয়। ব্রিফল্টকেও ইহা স্বীকার

করিতে হইয়াছে। কিন্তু তিনি এই অসুবিধাজনক বাস্তব তথ্যকে exception বা ব্যতিক্রম বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছেন। অষ্ট্রেলিয়ার পিতৃতন্ত্র কি করিয়া হইল? ব্রিফল্ট একটা কাল্পনিক ইতিহাস বানাইয়া ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার মতে অতি নিম্নস্তরে দীর্ঘকাল বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বাস করিবার জন্যই অষ্ট্রেলীয়দের মধ্যে পিতৃতন্ত্রের উদ্ভব হইয়াছে।

"But where a society has remained from time immemorial in a low state of culture, masculine dominance may become established even while the primitive matriarchal social organisation of that society remains unchanged" (205) ভৌগলিক অবস্থাই অষ্ট্রেলীয়দের এই বিচ্ছিন্ন জীবন এবং নিম্ন অস্বাভাবিক অবস্থার জন্য দায়ী। ব্রিফল্টের মতে, এরূপ দীর্ঘবিচ্ছিন্ন নিম্নস্তরের সমাজে দৈহিক শক্তির জোরে এবং নিছক বর্বরতার সহিত পিতৃতন্ত্র স্থাপিত হইতে পারে। অষ্ট্রেলিয়ারও তাই হইয়াছে।

"Masculine dominance may in course of time be established violently and by sheer brutality and also by the appropriation by men of those magic functions which in the lower stages of the culture, are chiefly exercised by the women. This is what appears to have taken place in Australia and in parts of Melanesia." (208-Briffault)

এই যুক্তি নিতান্ত কাল্পনিক। (ক) দীর্ঘ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পুরুষের এই দৈহিক জুলুম এবং নিষ্ঠুর বর্বরতা প্রয়োগ করিবার কারণ কি? বিচ্ছিন্ন জাতিগুলির জীবনে বরং সামাজিক পরিবর্তন ঘটাই দুষ্কর হইবে। দীর্ঘবিচ্ছিন্ন মানুষের সমাজ পুরাতন পরিচিত পথে অতি মন্থর গতিতেই চলিতে থাকে। সামাজিক গতিতত্ত্বের Law of inertia তো এই সব সমাজেই প্রবলভাবে বিদ্যমান। তাই এইসব জাতি stagnant বা স্থবগতি। এখানে violent ও brutal পরিবর্তনের তাকিদ আসিল কোথা হইতে? পুরুষেরা পূর্বে যদি বিদ্রোহী ও বলবন্ত না হইয়া থাকে তবে পরেই বা হইবে কেন? (খ) লক্ষ্যের বিষয় ব্রিফল্ট অষ্ট্রেলিয়ার আদিতে মাতৃতন্ত্র ছিল, ইহা ধরিয়া লইয়াই এই পরবর্তী স্তরপরিবর্তন বা পুরুষের উত্থানের কথা বলিতেছেন। কেন? যদি আদিতে অষ্ট্রেলিয়ায় মাতৃতন্ত্রই পূর্বাপর চলিয়া আসিয়া থাকে, তবে পুরুষেরা হঠাৎ এক বিশেষ মুহূর্তে বর্বর হইয়া দৈহিক ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে কেন? নারীরাই যদি সমাজে শক্তিশালিনী তাহাদের হাতেই যদি ম্যাজিক, টুকতাক ও দৈবশক্তির monopoly থাকিয়া থাকে তবে পুরুষরা এই ম্যাজিক ও তজ্জনিত বিপুল সামাজিক মর্যাদা কাড়িয়া লইতে সাহসী হইল কেন?

(গ) আর যদি কোন একস্থলে তাহা সম্ভব তবে আদিকালেও তো পুরুষের দৈহিক শ্রেষ্ঠতা ছিল। আদি হইতেই পুরুষের আধিকার স্বীকার করিতে আপত্তি কেন হইবে? আসলে পুরুষের দৈহিক বলবত্তা ব্রিফাল্টকে স্বীকার করিতেই হইতেছে। ওয়েষ্টারমার্কও "natural inferiority of women in qualities of body…" (657) র কথা বলিয়াছেন। পিতৃতন্ত্রের স্বাভাবিক কারণের উল্লেখ করিতে গিয়া Wundtও বলিয়াছেন "Its original source is the natural physical superiority of man…." (315)

আসলে কর্মূলাকে বাঁচাইতে হইবে, তাই অষ্ট্রেলিয়ার আদিম মাতৃতন্ত্র ধরিয়া লইতেই হইবে। ব্রিফল্ট এখানে মাতৃতন্ত্র সার্বজনীন ছিল একথার ভিত্তি বা প্রমাণ কি দিয়াছেন? সামান্য দু' একটি প্রথার বিকৃত ব্যাখ্যার উপরেই এই অনুমানের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। পূর্ব-মধ্য-অষ্ট্রেলিয়ার প্রতিবেশী উপজাতির মেয়েকে বিবাহ করিলে বরকে তিনবার

কাল কন্যার বাড়ি গিয়া বাস করিতে হয়। ব্রিফল্ট বলেন, এই কন্যাগৃহে বাস করিবার প্রথা হইতেই একটা মাতৃতন্ত্র ছিল ইহা অনুমান করা চলে। এরাণ্টা (Arunta) জাতির মধ্যে প্রথা আছে যে শিকারের একটা হিস্যা পত্নীর জ্ঞাতিবাড়ীতে যাইবে। এই শ্বশুর বাড়ীতে তত্ত্ব, ভেট পাঠাইবার প্রথা হইতেই স্পেন্সার ও গিলেন (Spencer & Gillen) এবং তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া, ব্রিফল্ট সিদ্ধান্ত করিলেন : একদা পুরুষ পত্নীর অধীনে জীবনযাপন করিত। পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ায় নারীর প্রাধান্য নাই কিন্তু বৃদ্ধাদের বড় সম্মান। অতএব ব্রিফল্টের মতে এখানেও আদিতে একদা মাতৃতন্ত্রই ছিল। এইভাবে তুচ্ছাতিতুচ্ছ প্রথার বনগড় কাঠামোর উপরেই বাস দেওয়া হইয়াছে যে অষ্ট্রেলিয়ার সমস্ত অজ্ঞাতপূর্ব ও দীর্ঘব্যাপী অতীতকাল ব্যাপিয়া মাতৃতন্ত্রের রাজত্ব ছিল।

(ঘ) আরেকটি লক্ষ্য করিবার বিষয়, ব্রিফল্ট এখানে brute force বা দৈহিক শক্তিদ্বারা পুরুষপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠার কথা বলিয়াছেন। এটাও একটা স্বীকৃতি যে দেহশক্তিদ্বারা পিতৃতন্ত্র স্থাপিত হয়। অবশ্য অষ্ট্রেলিয়ায় যাহা সম্ভব হইয়াও তো তাহা সম্ভব। আদিম কালে বলদৃপ্ত পুরুষের প্রাধান্য-স্থাপন যে খুবই সম্ভব তাহাই এখানে প্রত্যেকভাবে স্বীকৃত হইল। (ক্রমশঃ)

খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই

গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা	৬·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	৫·০০
ভারত-আত্মার বাণী	৫·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
কর্মবাণী	১·২৫
Soul of India Speaks	5·00

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ. বি. টি.

বিদ্যাসাগর	২·৫০
মানুষের মত মানুষ	·৬২
শিশু রামায়ণ	·৬২
শিশু মহাভারত	·৭৫

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

বাংলার ঋষি	৩·০০
বাংলার মনীষী	১·২৫
বাংলার বিদুষী	২·০০
বীরত্বে বাঙালী	১·৫০
ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৩·০০
রাজর্ষি রামমোহন	১·০০
রবীন্দ্রনাথ	১·০০
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১·২৫
আচার্য জগদীশচন্দ্র	১·৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০

॥ প্রতিটি বই বহুচিত্র শোভিত ॥

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী : : ১৫ কলেজ স্কোয়ার : : কলিকাতা—১২

নষ্ট প্রতিজ্ঞা

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

সমস্ত প্রতিজ্ঞা যেন বড় অনায়াসে ভুলে গেছি।
কে কবে চেয়েছে জল, কাকে আমি জল
এনে দেব বলেছি, আমার
কিছু মনে নেই। আমি দিনের ভিতরে শতবার
মানুষের ঘরে যাই, বৃক্ষের সংসারে যাই। গিয়ে বলি,
"তোমরা কেহ কি জল চেয়েছিলে?"
উত্তর মেলে না। কেহ হাসে,
কেহ আন্দোলিত হয় সন্ধ্যার হাওয়ায়।
সমস্ত প্রতিজ্ঞা যেন ভুলে গেছি বড় অনায়াসে।

সমস্ত প্রতিজ্ঞা যেন সমস্ত প্রতিজ্ঞা যেন···সবকিছু যেন
ভুলে গেছি বড় অনায়াসে।
কে কবে চেয়েছে প্রেম, কাকে আমি প্রেম
এনে দেব বলেছি, আমার
মনে নেই। তাই বারবার
মানুষের ঘরে যাই, বৃক্ষের সংসারে যাই। গিয়ে বলি,
"তোমরা কেহ কি প্রেম চেয়েছিলে?
কেউ চেয়েছিলে?"
উত্তর মেলে না। মানুষের।
যে যার আপন কাজে ফিরে যায়।
বৃক্ষের সংসারে বাজে ভয়াবহ কঠিন বিদ্রূপ
সন্ধ্যার হাওয়ায়।

কেন্দ্রীয় বাজেট

ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন

আজকাল যে কোন কেন্দ্রীয় বা রাজ্যের বাজেট সম্বন্ধে আলোচনা করতে হলে প্রথমে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আর্থিক বিধানগুলি মনে রাখতে হবে। ১৯৬২-৬৩ সাল তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার দ্বিতীয় বৎসর। তৃতীয় পরিকল্পনায় মোট যত টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে তার মধ্যে ১৭১০, কোটী টাকা নূতন কর বসিয়ে তোলার কথা বলা হয়েছিল। এই টাকাগুলির মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের অংশে পড়েছে ১১০০৲ কোটী টাকা। আর বাকী ৬১০৲ কোটী টাকা তুলবার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রাজ্য সরকারগুলির উপর। অর্থাৎ ১৯৬১-৬২ সাল থেকে পাঁচ বৎসরের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারকে নূতন কর বসিয়ে তুলতে হবে মোট ১১০০৲ কোটী টাকা ও রাজ্যসরকারগুলি তুলবে ৬১০৲ কোটী টাকার রাজস্ব। তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম বৎসরে অর্থাৎ গত বৎসরের বাজেটে কেন্দ্রীয় সরকার যে যে নূতন কর বসিয়েছিল সেগুলি থেকে পাঁচ বৎসরে প্রায় ৪৫০৲ কোটী টাকার রাজস্ব আদায় হবে বলে আশা করা যায়।

সুতরাং এই বৎসরের বাজেটেও যে নূতন কর ধার্য্য করা হবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। সরকারের হাত যে আবার সবারই পকেটে ঢুকবে—এ জানা ছিল। একমাত্র আলোচনার বিষয় ছিল যে কোন পথে বা কি ভাবে আমাদের কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের মঙ্গল হস্ত আমাদের পকেটের ভার কমাবে। আগের বৎসরের ন্যায় এবারও কেন্দ্রীয় সরকার উৎপাদনশুল্কের উপরেই বেশী নির্ভর করেছে। যে সমস্ত দ্রব্যের উপর উৎপাদন শুল্ক বসান ছিল তাদের কতকগুলির উপর করের হার বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। যেমন, তামাক ও সিগারেট, কাপড় ও সুতা কৃত্রিম রেশমবস্ত্র, দিয়াশালাই প্রভৃতি। এ ছাড়া নয়টি নূতন দ্রব্যের উপর উৎপাদনশুল্ক ধার্য্য করা হয়েছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে গ্রামোফোন, রেকর্ড প্লেয়ার, রেকর্ড, গ্রাইণ্ডার, ইলেকট্রিক তার, ভ্যাসলোপিলো জাতীয় রবারের জিনিস প্রভৃতি। নূতন ও পুরাতন উৎপাদনশুল্ক থেকে যে রাজস্ব আদায় হবে বলে আশা করা যায় তা নূতন করলব্ধ মোট রাজস্বের অর্দ্ধেকের একটু বেশী। উৎপাদনশুল্ক ছাড়া আমদানী দ্রব্যের উপরেও করের হার বাড়িয়ে দেওয়া হবে। ফলে দ্রব্যের উপর ধার্য্য করলব্ধ রাজস্বের পরিমাণ মোট নূতন রাজস্বের ১২ অংশ। বাকী ৩৮ অংশ রাজস্ব (মোট ২৭.২০ কোটী টাকা) আসবে কোম্পানীর মুনাফার উপর ধার্য্য করের হার, আয়কর ও সম্পত্তি করের হার বাড়িয়ে এবং মূলধনী লাভ-কর ধার্য্য করে। যৌথমূলধনী কোম্পানীগুলি প্রতি বৎসর যত লাভ করে তার উপর কেন্দ্রীয় সরকার শতকরা ৪০৲ টাকা হারে কর ধার্য্য করেছিল। বর্ত্তমান বৎসর থেকে ১ই করের হার শতকরা ৫০ ভাগ করা হয়েছে। অর্থাৎ কোম্পানী যত টাকা লাভ করে তার উপর কর ধার্য্য করা হচ্ছে টাকা প্রতি ৫০ নয়া পয়সা হিসাবে। আয়কর ও সম্পত্তি-করের হারও সামান্য বাড়ান হবে। আবার ১৯৫৬-৫৭ সালের বাজেটে যে ব্যয়কর বসান হয়েছিল তা এ-বৎসর থেকে তুলে দেওয়া হোল। মনে রাখা দরকার যে ব্যয়কর বসান হয়েছিল অনেকটা কেল্ড্রিজের অধ্যাপক ক্যাল্‌ডরের পরামর্শ অনুযায়ী। উদ্দেশ্য ছিল প্রধানত তিনটি,— এক, ধনীদের অত্যধিক বিলাসব্যসনে

অর্থব্যয় বন্ধ করা ; দ্বিতীয় মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়ান (ব্যয় কমলে সঞ্চয় বাড়বে) ; এবং তৃতীয়, ব্যয়করের হিসাব পরীক্ষা করে আয়করের ফাঁকি বন্ধ করা। কিন্তু যেকয় বৎসর এই কর বহাল করা হয়েছে তা থেকে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়নি। এই কর থেকে রাজস্ব পাওয়া গেছে সামান্যই। অথচ ধনীদের বিলাসব্যসনে ব্যয় যে কমেছে তার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। তৃতীয়ত, ব্যয়করের হিসাবের মধ্যে প্রচুর ফাঁকির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। কাজেই অনেক চিন্তার পর আমাদের অর্থমন্ত্রী এই কর তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

এই হোল বর্তমান বৎসরের বাজেটের নূতন ও পুরাতন করের প্রবর্তন ও পরিবর্তনের হিসাব। এ থেকে কয়েকটি বিষয়ের উপর স্বাভাবিক ভাবে দৃষ্টি যায়। প্রথমত, নূতন কর বসান ঠিক হবে কিনা এ বিষয়ে আলোচনা আমরা করতে চাই না। কারণ তৃতীয় পরিকল্পনা যদি কার্যকরী করতে হয় তবে নূতন কর ধার্য করে প্রয়োজনানুযায়ী রাজস্ব সংগ্রহ করতেই হবে। তবে প্রশ্ন এই যে কর ধার্য করার পদ্ধতি ঠিক হচ্ছে কি? আমরা সমাজতান্ত্রিক দেশ গড়ে তুলতে চাই যেখানে ধনী দরিদ্রের প্রভেদ বর্তমান থেকে অনেক কম হবে সন্দেহ নাই। এই বৎসরে এবং পূর্ব বৎসরে যে যে নূতন কর বসান হয়েছে তা থেকে পাঁচ বৎসরে মোট ১৪০৲ কোটি টাকার রাজস্ব আদায় হবে। এই করগুলি কি এমন ভাবে বসান হচ্ছে যে তার ফলে ধনী দরিদ্রের প্রভেদ কম হবে? অর্থাৎ এই রাজস্বের অধিকাংশই কি ধনীর পকেট থেকে আসবে? না গরীবের ঘাড়ে বেশী অংশ চাপান হচ্ছে?

অনেকেরই ধারণা যে উৎপাদন শুল্ক ও আমদানী শুল্কের উপর এত বেশী নির্ভরতার অবশ্যম্ভাবী ফল হচ্ছে ধনী ও দরিদ্রের আয়ের প্রভেদ বাড়িয়ে দেওয়া। উৎপাদন শুল্ক ও আমদানী শুল্ক হচ্ছে পরোক্ষ কর অর্থাৎ দ্রব্যের উপর ধার্য কর। এদের বোঝা গরীব ও মধ্যবিত্তের ঘাড়ে যতটা পড়ে ধনীর স্কন্ধে তা হয় না! দিয়াশলাই বা তামাকের উপর শুল্ক বসান হলে এদের দাম বেড়ে যাবে। যার মাসিক আয় হাজার টাকা সে হয়ত সিগারেট পুড়িয়ে মাসে ৬০৲ টাকা খরচ করত। আজ করের হার বৃদ্ধি ও দাম বৃদ্ধির ফলে তাকে হয়ত মাসে ৭২৲ টাকা খরচ করতে হচ্ছে। যে মধ্যবিত্ত মাসে ৩০০৲ টাকা আয় করে সে সিগারেট ও বিড়িতে ধর, মাসে ১৫৲ টাকা খরচ করত। আজ তাকে খরচ করতে হচ্ছে মাসে ১৮৲ টাকা! ধনীকে সিগারেট বাবদ কর দিতে হচ্ছে ১২৲ টাকা ও মধ্যবিত্তকে কর দিতে হচ্ছে ৩৲ টাকা। ধনীর পক্ষে ১২৲ টাকা দেওয়া এমন কিছু শক্ত ব্যাপার নয়। কিন্তু মধ্যবিত্তের সংসারে ৩৲ টাকার মূল্য অনেক বেশী। কাজেই ধরে নেওয়া হয় যে পরোক্ষ করে ধনীর সুবিধা যতটা হয়, গরীব ও মধ্যবিত্তদের পক্ষে তা নয়। অথচ গত চার পাঁচ বৎসরের বাজেটে নূতন রাজস্বের অধিকাংশই পরোক্ষ কর বসিয়ে তোলা হচ্ছে।

যারা এই মতের বিরুদ্ধে তারা দুইটি যুক্তি দেখিয়েছেন। প্রথমটি হচ্ছে এই যে আয়করের হার এত বেশী যে এর উপর আর বোঝা চাপান যায় না। তা ছাড়া ধনীকে সম্পত্তিকর ও ব্যয় কর দিতে হচ্ছে এবং মৃত্যুর পর মোটা হারে এস্টেট ডিউটি দিতে হচ্ছে। কাজেই ধনীদের স্কন্ধে আর বোঝা চাপান চলে না এবং চাপান হলে তাদের বাধ্য হয়ে সঞ্চয়ের পরিমাণ কমাতে হবে। সঞ্চয়ের পরিমাণ কমে গেলে নানাদিক থেকে লোকসান হবে। দ্বিতীয়ত, সব পরোক্ষ করের ফল একরকম নয়। বিলাস সামগ্রীর উপর উচ্চহারে উৎপাদন শুল্ক ও আমদানী শুল্ক বসালে করলব্ধ রাজস্ব ধনীদের পকেট থেকেই আসবে, গরীব মধ্যবিত্তের ক্ষতি হবে না। যেমন মোটর গাড়ী অথবা রেফ্রিজারেটারের উপর ধার্য কর। সুতরাং কোন কোন দ্রব্যের উপর পরোক্ষ কর বসান হয়েছে তা পরখ করে দেখতে হবে এটি কি বিলাস সামগ্রীর পর্যায়ে পড়ে, না

নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য যা সাধারণ লোক ও কিনতে বাধ্য হয়? দ্বিতীয় শ্রেণীর দ্রব্যের উপর শুল্ক বসান হলে অবশ্য গরীব ও মধ্যবিত্তকে বেশী পীড়ন করা হবে। প্রথম শ্রেণীর দ্রব্য সম্বন্ধে একথা নিশ্চিত বলা চলে না। আর তা ছাড়া দেশকে গড়ে তোলার কাজে ধনীকে নিশ্চয়, অনেক বেশী অংশ নিতে হবে, স্বার্থত্যাগ করতে হবে। কিন্তু তা বলে গরীব ও মধ্যবিত্তের গায়ে আঁচড়টি ও লাগবে না এমন কথা মনে করা সঙ্গত হবে না। তাদের কিছুটা স্বার্থত্যাগ করতে হবে।

দুইপক্ষের যুক্তির মধ্যে যে কিছু কিছু সত্য আছে তা অস্বীকার করা যায় না। একথা ঠিক যে আয়করের উচ্চ পর্যায়ে যারা পড়েন তাদের উপর বার্ষ করের হার এত বেশী যে এ আর বাড়ান উচিত হবে না। যারা আয়করের মধ্য পর্যায়ে পড়েন অর্থাৎ যাদের বার্ষিক আয় দশ থেকে কুড়ি হাজারের মধ্যে তাদের দেয় করের হার আর কিছুটা বাড়ান চলে। কিন্তু এথেকে খুব বেশী রাজস্ব আদায় হবে না। বরঞ্চ যারা Salaried People,—অর্থাৎ নির্দিষ্ট মাইনেতে চাকুরী করেন তাদের উপর করের হার কমালে অন্যায় হবে না। এরা তাদের আয়ের পরিমাণ লুকুতে পারে না ও আয়কর ফাঁকি দিতে পারে না। কিন্তু যারা ব্যবসায়ী অথবা বৃত্তিধারী বিশেষতঃ যাদের self employed persons বলা হয়—তারা আয়কর ফাঁকি দেওয়ার যথেষ্ট সুযোগ পায় এবং অধিকাংশ লোকই ফাঁকি দেয়। এবারকার বাজেটে এবিষয়ে একটু কৃপাবৃষ্টি করা হয়েছে। যারা আয়কর দেয় তাদের উপর বার্ষ আয়করের শতকরা ৫ অংশ অতিরিক্ত করও বসান হয়। নির্দিষ্ট বেতন ভোগী ব্যক্তিদের উপর এই অতিরিক্ত করের হার শত করা পাঁচ থেকে কমিয়ে আড়াই করা হয়েছে। যারা নির্দিষ্ট বেতন থেকে বৎসরে অনধিক দশ হাজার টাকা আয় করেন তাদের উপর অতিরিক্ত কর তুলে দেওয়া উচিত হবে। আর সঙ্গে সঙ্গে যারা ব্যবসায় বা কোন বৃত্তি থেকে অন্ততঃ ৫৫০০০৲ টাকা আয় করে তাদের উপর অতিরিক্ত করের হার বাড়িয়ে শতকরা ১৪ পারসেন্ট করলে রাজস্বের দিক দিয়েও লোকসান হবে না।

যাই হোক, মোটামুটি স্বীকার করতে হবে যে আয়করের হার বৃদ্ধি করার সুযোগ বিশেষ নাই। আয়করের দিক থেকে সব চেয়ে বড় সমস্যা হোল ফাঁকির পথ রুদ্ধ করা। শুধু আয়কর নয়, এক্সেস ডিউটি সম্বন্ধেও একথা বিশেষ ভাবে খাটে। এই দুইটি এবং সম্পত্তি করএত ব্যাপক ভাবে ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে যে সরকার আশানুরূপ রাজস্ব সংগ্রহ করতে পারছে না ফলে পরোক্ষ করের উপর নির্ভরতা বাড়ছে। ধনী ও দরিদ্রের প্রভেদ না কমে বরং বেড়ে চলেছে। প্রত্যক্ষ করের হার বাড়িয়ে এ দোষের নিরসন হবে না। এর জন্য প্রয়োজন প্রশাসনিক ব্যবস্থার উন্নতি ও ফাঁকি ধরা পেলে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা।

অথচ ব্যয়কর তুলে দেওয়া ঠিক হয়েছে কিনা বলা শক্ত। গোড়া থেকেই এই করের মধ্যে এত ফাঁকির সুযোগ রাখা হয়েছে যে এ থেকে বেশী রাজস্ব আদায় হওয়া সম্ভব নয়। অধ্যাপক কালডর এই করের প্রস্তাবক। তিনি এই কর যে ভাবে বসাতে বলেছিলেন এবং যেভাবে একে ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়েছিলেন, আমাদের অর্থমন্ত্রীরা তার অধিকাংশই পালন করেন নাই। করটি তুলে না দিয়ে এর ফাঁকির পথগুলি কি করে রুদ্ধ করা যায় এবং এ থেকে বেশী রাজস্ব কি ভাবে তোলা যায়—এই দিকেই বেশী করে নজর দেওয়া উচিৎ ছিল। এই করের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলা হয়েছে সন্দেহ নাই। কিন্তু এর গুণ গুলির কথা ভেবে দেখা উচিৎ ছিল এবং আরো কিছু দিন ভাল ভাবে পরীক্ষা না করে করটি তুলে দেওয়া সঙ্গত হয় নি।

আয়কর, সম্পত্তিকর ও উত্তরাধিকার কর, ফাঁকির জালে পড়ে প্রয়োজন মত রাজস্ব দিতে পারছে না। কাজেই বাধ্য হয়ে পরোক্ষ করের উপর বেশী চাপ দেওয়া হচ্ছে। বর্তমান

(শেষাংশ ১৪৯ পৃষ্ঠায়)

জৈবিক

বড়গল্প

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

'সাদা মানুষ' একজন নয়, সঙ্গে আরও দুজন। পাথরের ওপরে থালিটা বিছিয়ে যিনি বসেছেন, তিনি নিশ্চয়ই 'সাদা মানুষ'দের 'রাজা-টাজা' কেউ হবেন, কিন্তু বাকী দুজনও কম যান না। তাদের ভাবভঙ্গীতেও এমন একটা মর্য্যাদা ফুটে উঠ্‌ছে যা' দেখে মনটা আপনিই নুয়ে পড়তে চায়!

'সাদা-মানুষ'দের 'রাজা' কী যেন বললেন,—মুখ তুলে ওদের একজন কী-যেন উত্তর দিলেন। মুহূর্ত্তে সব দেখেশুনে যেন পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেছে। বিন্দুর প্রথমে মনে হচ্ছিল, জল-পিপাসায় গলা শুকিয়ে মানুষ যখন পাগলের মতো কর্ণার জল খোঁজে, আর মাঠের এধারে-ওধারে—সব যায়গাতেই কর্ণার জলের ছায়া দেখতে পায়, ঠিক তেমনি করছে তার অবস্থা। সে সত্যিই মানুষ দেখছে, না, মানুষের ছায়া দেখছে,—তা' ঠিক ভরসা করতে পারছিল না! তাদের জাতের লোকগুলি কিম্বা, পার্শ্ব-কাই নিজে, সব যেন ছায়ার মানুষ, আসল মানুষ নয়। তাদের দুজনকে দেখে তারা একবার নিস্পৃহ ভঙ্গীতে মুখ তুলে তাকালো মাত্র, আর কিছুই না। ছড়িয়ে-ছড়িয়ে ভাল করে সব এধারে ওধারে বসে আছে,—এখানে তিনজন, ওখানে চারজন, এমনিভাবে।

কিছুক্ষণ পরে বিন্দু যেন স্বপ্ন থেকে জেগে উঠলো, তারপরে 'সাদা-মানুষদের রাজা'র সামনে যে বাচ্চাটাকে কম্বল মুড়ে শুইয়ে রেখেছে, আর যাকে নিয়ে অন্য দুজন 'সাদা-মানুষ' কী-সব করছে, সেই বাচ্চাটার মুখের দিকে তাকাতে-তাকাতে বিন্দুর সম্বিৎ যেন হঠাৎই একসময় ফিরে এলো। ইচ্ছা হলো, সুজাকে কনুই দিয়ে ঠেলা দিয়ে জিজ্ঞাসা করে,—যা' দেখছি, ঠিক দেখছি ত?

কিন্তু না, বিন্দু তা করলো না। বিন্দুর ভয় হলো,—যদি সুজা উত্তরে বলে, না, যা দেখছ ঠিক দেখছ না, সব তোমার ভুল, টুয়ার বাচ্চা মেয়ে ও-বাচ্চাটা নয়।

এই সময় পাথরের পাত্রে জল নিয়ে সাদা মানুষদের কাছে—ঐ বাচ্চা মেয়েটার সামনে—পাত্রটা ঠক্ ক'রে নামিয়ে রাখলো পার্শ্ব-কাইয়ের মেয়ে। ভালো করে তাকিয়ে দেখলো বিন্দু, জলটা গরম।

'সাদা মানুষ'দের একজন 'বাদাগা অনুচর'—এর সাহায্যে মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলো অদ্ভুত একটা কথা। সাদা মানুষ বাদাগা-বুড়োকে কী যেন বললে। বাদাগা-বুড়ো বিন্দুদের ভাষায় মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলো—। জিজ্ঞাসা করলো,—'কেমন আছে?—কিন্তু, কথাটার মানে কী! কে—'কেমন আছে'! বাচ্চাটা, না, অন্য কেউ?

নিজের অজ্ঞাতসারেই—সামনের দিকে ছুটে গেল বিন্দু কিন্তু কে যেন উঠে দাঁড়িয়ে তাকে ধ'রে ফেললো, বললো—না-না, ওদিকে যেও না।

উত্তেজিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে বললো বিমু,—কী করছে ওরা বাচ্চাটাকে নিয়ে ?

—বাঁচাচ্ছে।

—কেন ! ম'রে গেছে নাকি ?

—মরারই সামিল। দেখছিস না, নড়ছে না চড়ছে না, চীৎকার ক'রে কাঁদছে না !

কে এক বুড়ো যেন বললে—চুপ চুপ—আঃ কথা নয়—সাদা মানুষরা রেগে যাবে। তোরা স'রে যা এখান থেকে।

বিমু যার সঙ্গে কথা বলছিল, তাকে হাত ধরে সরিয়ে আনলো। সরিয়ে আনলো যেখানে সে দাঁড়িয়েছিল ইতিপূর্বে, সেইখানে। তারা ফিরে আসতেই সুজার চেতনাও যেন ফিরে এলো। সে ফিস্‌ফিস্ করে বললে,—সত্যিই ও টুরার মেয়ে !'

—হ্যাঁ।

—টুরা কোথায় ?

—টু-এল্-এ।

বিমু পর্যন্ত চমকে উঠলো এ-কথায়। 'টু-এল'-এর অর্থ, গোয়ালঘর। গোয়ালঘরে মেয়েদের ঢোকবার নিয়ম নেই। তার ওপরে, স্বয়ং 'পার্থকাই'-এর গোয়ালঘর। সেখানে এ-ব্যাপার সংঘটিত হলো কী করে ?

লোকটি বললে—সাদা-মানুষরা জোর ক'রে গোয়ালে ঢুকিয়ে দিয়েছে টুরাকে। ওদের মনে পারবে কে ?

—পার্থকাই ?

—হ্যাঁ, পার্থকাই রুখে দাঁড়িয়েছিল প্রথমটায়। কিন্তু মেয়েটার অবস্থা দেখেই আর কিছু বলতে পারলো না।

—কে টুরা ?

—হ্যাঁ।

সুজা বললে,—হয়েছিল কি টুরার ?

—রক্তে ভেসে যাচ্ছে। ও কি বাঁচবে ?

অস্ফুট একটা চীৎকার ক'রে সুজা নীরব হয়ে গেল। তারপরে ওরা তিনজনেই বসে পড়লো পাথরের ওপর। পাথর আর পাথর—যাদুগাটার এধারে-ওধারে প্রচুর চটালো-চটালো পাথর প'ড়ে আছে। কতোগুলি অবশ্য ওঠানো যায় না, মাটির সঙ্গে গাঁথা। তেমনি একটা ভূপ্রোথিত পাথরকে ওরা আশ্রয় করলো। সুজা কোনো কথা বলতে পারছে না, সবটা মিলিয়ে কেমন যেন অদ্ভুত ভোজবাজীর মতো ঠেকছে তার কাছে। সে মুখ ফিরিয়ে বললে,—বিমু ?

—যা ?

সুজা বললে,—আজ বেশ গরম পড়েছে, না ?

হ্যাঁ, তা পড়েছে।

সুজা একটুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপরে আবার এক সময়ে বললে,—গরমজল দিয়ে করছে কি ঐ সাদা-মানুষটা ? শুধুই কি গরমজল ? শুধু ওরা তিনজন কেন, উপস্থিত সব কজন পাহাড়ী মানুষই উৎকণ্ঠায় উঠে দাঁড়ালো প্রায় একসঙ্গে। একজন সাদা মানুষ বাচ্চা-বুড়োর কাছ থেকে কী একটা চৌকো-মতন চেয়ে নিলো, সেটা খুলে ফেললো সাদা মানুষটা, কী একটা বার করলো, লম্বা-লম্বা দেখতে। বাঁশের চোঙা কী ? না-না, তা নয়। পাথরের লম্বা পাত্র কি ? হ্যাঁ, অনেকটা তাই বটে, কিন্তু সবটা নয়। সেই লম্বা পাত্রটা নিয়ে একজন সাদা মানুষ চলে গেল 'টু-এল'-এর মধ্যে, এবং কয়েক মুহূর্ত পরেই আবার ফিরে এলো। ফিরে এসে, অপর সাদামানুষটিকে সেটা দিতেই, সে সেটা নিয়ে বাচ্চার মুখের কাছে ধরলো। বাচ্চা কি খেতে পারলো ? ওরা সবাই ঘাড় উঁচু করে সেটা দেখবার চেষ্টা করলো, কিন্তু সঠিক বুঝতে পারলো না।

বিমু অস্ফুট কণ্ঠে বললে – করছে কি ওটা ?

সঙ্গের লোকটি বললে,—তুকতাক করছে আর কী ! জল-পড়া দিচ্ছে !

—বাঁচবে ?

—কে জানে !

—টুরা ?

—কে জানে। সাড়াশব্দ ত নেই!

ওরা তিনজন আবার বসে পড়লো। সব মিলিয়ে সব কিছু এখনো যেন বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে না! টুরা ত হারিয়ে গেছে। হঠাৎ নিজের মনে নিজেকেই প্রশ্ন করতে লাগল, আমি খুঁজলাম, পাথরের গায়ে রক্ত দেখলাম, একবার মনে হলো, বাঘে ধরেছে কী! আবার মনে হলো, কুরুম্বারা ধরে নি ত! ওপরের লোকগুলো ত কুরুম্বাদের দেখতে পেয়েই পালিয়ে দিয়েছিল কুরুম্বারা যদি ধরে থাকে, ত, এখানে, পার্বত্যাইয়ের কাছে ওরা এরই মধ্যে এসে পড়লো কী করে? হঠাৎ ভাবছে। ভাবছে,—টুরা তার বাচ্চাকে নিয়ে পাহাড়ের নীচে—জঙ্গলে—হারিয়ে গেল। এরা পাথর খুঁড়ছিল, এরা ভাবলো, পাথর দেখেই টুরা মারা গেছে। কিন্তু, বিষুর তা' মনে হলো না। বিষু ঘুরপথে নীচে নামলো। কতক্ষণ খোঁজাখুঁজি করলো, পেলো না। আমি একবার নীচের দিকে তাকাচ্ছি, একবার ওপরের দিকে। আমার মোষগুলোকে আমি অন্য দিকে চরাতে নিয়ে গেলাম। তারপরে তাদের ছেড়ে দিয়ে আবার চলে এলাম বনের ধারে। নীচের দিকে তাকিয়ে খুঁজতে লাগলাম বিষুকে। পেলাম না। ভাবলাম —ওকে বাঘে ধরলো নাকি? মনটা খারাপ হয়ে গেল, চলে এসে চুপচাপ বসে আছি, সামনে মোষগুলো চরছে, কোরির সঙ্গে দেখা। কোরির সঙ্গে কতক্ষণ কথা বললাম। আবোল তাবোল আজে-বাজে কথা, যার একটিও এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। কোরির কাছ থেকে ফিরে আসছি, গাঁয়ের একটি লোকের সঙ্গে দেখা। সে-ই বললে,—পার্ব-ত্যাইয়ের কাছ থেকে লোক এসেছে। গেলাম তার কাছে। সে বললে,—'সাদামানুষ এসেছে। তোমাদের কর্তাদের ডাকো। পার্বত্যাই ডাকছে।' সবই সে বললো, কিন্তু টুরার কথা বললো না কেন? হয়ত জানতো না। হয়ত, সাদামানুষ আসার উত্তেজনায় অন্যকিছু খেয়াল করেও দেখেনি। আর, তারপর আমি ছুটে এলাম আবার জঙ্গলের ধারে। কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করলাম। বিষুর নাম ধরে ডাকলাম, টুরার নাম ধরে ডাকলাম। এক সময় দেখলাম বিষুকে। ও উঠে এলো। জিজ্ঞাসা করলো, —টুরাকে পাওয়া গেছে নাকি? আমি কি সত্যিকথাটা জানতাম? জানতাম—কি, যাকে খুঁজে খুঁজে আমরা হয়রান হয়ে গেলাম, তাকে পাওয়া গেছে?

আপন চিন্তায় আপনি বিভোর হয়ে আছে হঠাৎ, বিষুর কণ্ঠস্বরে হঠাৎ সে তাই চমকে গেল। বিষু তখন জিজ্ঞাসা করছিল সঙ্গের লোকটিকে, - পাওয়া গেল কী ক'রে, টুরাকে!

লোকটি চুপিচুপি বললে, সে বড় ভয়ানক কথা!

—কেন? ভয়ানক কথা কেন?

—বলা যায় না!

লোকটি বললে,—যায়, কিন্তু শুনলে তোদের গায়ে কাঁটা দেবে।

হঠাৎ বললে,—বলোই না তুমি!

লোকটি ফিস্‌ফিস্ ক'রে—ভয়-করা গলায় বলতে শুরু করলো,—কুরুম্বারা যাদু জানে ত? যাদু ক'রে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিল টুরা আর টুরার মেয়েকে। ঘুম পাড়িয়ে ওদের নিয়ে যাচ্ছিল বনের মধ্য দিয়ে। এমন সময়, ঐ বনের পথ দিয়েই বন্যাপাদের নিয়ে পাহাড়ে উঠে এসেছিল ঐ সাদা-মানুষরা।

বিষু বাধা দিয়ে বললে—ঐ বনের পথ ধরে এই পাহাড়ে উঠে আসবার পথ কোথায়?

লোকটি বললে, - পথ আছে, বন্যাপারা হয়ত জানে, আমরা জানি না। কিম্বা, সাদামানুষরা যন্ত্রের দিয়ে পথ করে নিয়েছে, এমনও হতে পারে।

হঠাৎ বললে, বুঝলাম। কিন্তু, তারপর?

—তারপর? লোকটি আবার তেমনি গলা নিচু ক'রে ফিস্‌ফিসিয়ে বলতে লাগলো,—কুরুম্বারা দূর থেকে সাদামানুষ-দের দেখতে পেয়েই ওদের ফেলে একেবারে দে ছুট্। সাদা মানুষদের ভয় করবে না কে? সাদামানুষরা নাকি যন্ত্রের দিয়ে

পাথর পর্যন্ত কাটাতে পারে। যাই হোক, ততক্ষণে কুরুবাদের বাহু কেটে গেছে। মাটিতে পড়ে কাৎরাচ্ছে টুরা, তার মাথা থেকে রক্ত বেরুচ্ছে, পা থেকে রক্ত বেরুচ্ছে। আর তার পাশে বাচ্চাটা কঁকিয়ে কাঁদছে। সেইখান থেকে সাদামানুষরা ওদের তুলে নিয়ে এসেছে এখানে।

—পার্থকাই কী বলছে?

—কী আবার বলবে, চমকে উঠলো! বললে, আমাদের লোক হলেও ওদের আমরা বার করে দিয়েছি। ওদের তোমরা ফেলে দাও, ওরা মরে যাক।

—তারপর?

—সাদামানুষরা কথাটা শুনে ক্ষেপেই আগুন! জোর করে পার্থকাইয়ের ঘরেই নিয়ে যাচ্ছিল ওদের, মেয়েরা চেঁচামেচি করে উঠতেই, কী ভেবে যেন নিয়ে গেল 'টু-এস্' এর মধ্যে।

—এর পরে কী হবে?

—কীসের?

স্বজা বললে, ধরো, ওরা বেঁচে গেল। তখন?

লোকটি একটুক্ষণ কী যেন ভাবলো, তারপরে বললো,—টুরাকে নিয়ে পার্থকাই কী করবে জানি না, কিন্তু বাচ্চা-মেয়েটাকে রাখবে না।

প্রায় চীৎকারই করে উঠলো বিনু, রাখবেনা! তার মানে?

চার পাশের লোকগুলো ঐ যে দুজন-চারজনে ভাগ হয়ে চিত্রার্পিতের মতো বসে ছিল, তারা চমকে উঠলো ওর কথায়। উঠে মুখ ফিরিয়ে তাকাতে লাগলো ওর দিকে। তাদের মুখে-চোখে স্পষ্টই ফুটে উঠেছে অসীম বিরক্তি। নীরব ভিরস্কারে ওরা যেন প্রত্যেকেই বলতে চাইলো,—করছিস কী তোরা ওখানে? এমন অবস্থাতেও তোদের রঙ্গরস আসে? এদিকে, আমাদের সবারই বলে, জীবন-মরণ সমস্যা।

ততক্ষণ দূর-দূর থেকে দুজন-চারজন করে 'খাঁ-বুড়োরা' আসতে আরম্ভ করলো। তাদের যারা ডাকতে গিয়েছিল, তারাও আছে সঙ্গে।

তারাও এলো, আর নিঃশব্দে এ-ধার ও ধারে বসে পড়লো, ফিসফিস করে কথা বলা শুরু করলো, ওদের সবার জিজ্ঞাসাই বোধহয় এক। টুরা আর টুরার মেয়েকে নিয়ে কী হবে? ঐ সাদামানুষরাই বা কী চায়?

পার্থকাই তার ঘরের দাওয়ায় বসে আছে। মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, চুপ্‌সে গেছে। মানুষ মরে যাবার আগে যেমন তার চেহারা হয়ে যায়। রক্ত শুকে-নেওয়া পাঁশুটে চেহারা? ঠিক তেমনি দেখতে হয়েছে, এখন পার্থকাইকে।

বিনু সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে আবার তাকালো তাদের সঙ্গের লোকটির দিকে। আবার জিজ্ঞাসা করলে, এবারে ফিস্-ফিস্ করা গলার স্বরে,—রাখবে না?

—না।

—কী করবে?

—মুকেতি পাহাড়ের নীচে দেবতার কাছে দিয়ে আসবে।

কথাটা শুনে ওদের মধ্যে কারুরই কোনো প্রতিক্রিয়া ঘটবার নয়। আমরা বাঙ্‌লাদেশে সেই সময় মৃত পতির সেদিহান জলন্ত চিতায় জীবিত পত্নীকে জোর করে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে বা বেঁধে দিয়ে ঢাকঢোল পিটিয়ে মহাসমারোহে ফেরে ফেলছি, কারুর মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া ঘটছে না। তেমনি, ওরাও সেই সময় নবজাতা প্রথম কন্যাকে পাহাড়ের চূড়ায় দেবতার উদ্দেশে রেখে আসছে, কারুর মধ্যে সচরাচর কোনো প্রতিবাদ-বাণীই ফুটে উঠছে না! সেই মুখে, প্রথম-প্রতিবাদের স্বর উঠলো এক তরুণী মায়ের বক্ষ থেকে। সে তার শিশু-কন্যাটিকে সংস্কারের পায়ে নির্বিচারে বলি না দিয়ে প্রাণপণে ছুটে বেড়াতে লাগলো। একে বললে—আশ্রয় দাও, ওকে বললে—রক্ষা করো। কিন্তু কেউ আশ্রয় দিলো না, কেউ রক্ষা করলো না। যে সাহস করে শেষ পর্যন্ত রুখে দাঁড়ালো যে সাহস করে শেষ পর্যন্ত আশ্রয় দিলো, সে-ও তাকে রক্ষা

করতে পারলো না। মেয়েটি তখন একাই সব কিছুর বিরুদ্ধে গিয়ে দাঁড়ালো। কারুর ওপর নির্ভর আর না ক'রে শিশু-কন্যাকে নিয়ে গহীন অরণ্যের দিকে ছুটে গেল। ছুটে গেল সহস্র বিপদ আছে জেনেও। ছুটে গেল বন্য পশুর হাতে প্রাণ যেতে পারে জেনেও। ওপর থেকে পাথরের পর পাথর ছোঁড়া হয়েছে তাকে লক্ষ্য করে,—তবু, সে হার মানে নি, তবু সে ছুটে এসে বলেনি,—মাও তোমরা আমার মেয়েকে, যা খুশী করো, আমাকে বাঁচতে দাও! কীসের প্রেরণা এ?

কিন্তু হায়রে ভাগ্য! এতো ক'রেও পালাতে পারলো না। ঘটনাচক্রে আবার এসে পড়লো যেখান থেকে সে ছুটে পালিয়ে ছিল, ঠিক সেইখানে, সেই সংস্কার ঘেরা মোহান্ধ মানুষগুলোর কাছে। ওরা যে আবার ওর শিশুকন্যাটিকে ধরবে, ধরে দিয়ে আসবে বুকেতি পাহাড়ের চূড়ায়, এতে আর আশ্চার্য কি!

কিছুক্ষণ তারপরে কেটে গেল নিশ্চুপে। পার্থকাইয়ের বাড়ীর পিছনে নাতিবৃহৎ একটা খালের মতো ছিল। সেই খালের ওপারে আবার উঠেছে অনুচ্চ একটা পাহাড় তার অরণ্যানী নিয়ে। সেই অরণ্যে, একটি তরুর ওপরে আরেকটি তরু থাকে-থাকে সাজানো। সেইদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সুজার মনে হলো,—ওখানেও যেন একটা সভা বসেছে! সভায় বসে থাকা চিন্তাশীল মানুষগুলোর মতোই নিশ্চল নীরব হয়ে তাদের উপত্যকার দিকে তাকিয়ে আছে তরুশ্রেণী,—অভাবনীয় দৃশ্য দেখতে দেখতে সুকঠিন বিস্ময়ে ওরাও বুঝি স্তম্ভিত হয়ে গেছে!

দৃষ্টি সেখান থেকে ঘুরে এলো সুজার। সাদামানুষদের রাজার পায়ের কাছে নিশ্চল নিথর বসে আছে টুরার শ্বশুর আর স্বামী। কী যে ওদের মনোভাব বোঝা যাচ্ছে না। বাচ্চা মেয়েটিকে নিয়ে সাদামানুষটি কতো কী যে করছে, সেদিকে নিস্পৃহ চোখ মেলে দু-একবার তাকাচ্ছে মাত্র ওরা, কিন্তু তার আর বেশী কিছু নয়।

বেশ কিছু সময় কেটে গেল এইভাবে। ওপারের তরুসভা তাকিয়ে রইল, ঠাণ্ডা একটা হাওয়া এসে সবার খবর নিয়ে গেল যেন। কেউ কেউ গায়ের কম্বলটা ঠিক-ঠাক ক'রে নিলো। পার্থকাই ঠাণ্ডা লাগা গলায় একবার একটু কেশে উঠলো, কিন্তু তারপরে আবার সব চুপচাপ। হঠাৎ লোকগুলো যেন একসঙ্গে কথা থামিয়ে দিয়েছে, ফিস্‌ফিস্-কথা-বলার স্বরটুকুও আর শোনা যায় না!

সব মিলিয়ে সুজার যেন কেমন ভয় ভয় করতে লাগলো। তার মনে হলো, তার নিঃশ্বাস যেন হঠাৎ বন্ধ হয়ে আসছে। একটা দুঃসহ অস্থিরতা তার শরীর মনটাকে যেন সাপের মতো ছোবলের পর ছোবল দিয়ে তীব্র বিষে জ্বালিয়ে দিচ্ছে! এর থেকে কেউ কথা বলুক, ওরা কেউ মারামারি করুক, ওরা কেউ ওদের পাথরের সাবেকী অস্ত্র নিয়ে খুনোখুনি করুক। এমন কি, শিশু-মেয়েটিকে যদি মেরে ফেলতে হয়, ত, ওকে বাঁচিয়ে তোলবার থেকে ওর পাখীর মতো নরম গলায় শক্ত হাত রেখে ওকে তখ্‌খুনি ওরা শেষ ক'রে ফেলুক।

হঠাৎ বাঁশীর মতো তীক্ষ্ণ একটা শব্দে সচকিত হয়ে উঠলো ওরা। ওপারের তরু-সভায় একটা খুশীর হিল্লোল বয়ে গেল অতর্কিতে, বাতাস যেন সেই খুশীর খবর নিয়ে দূর দিগন্তে চলে গেল, ঘুরে-ঘুরে বনে-বনান্তে দেখতে দেখতে সাড়া প'ড়ে গেল। সবাই যেন তারা শির আন্দোলিত ক'রে বললে—আমরা খবর পেয়েছি! আমরা খবর পেয়েছি, সে জেগে উঠেছে!

টুরার স্বামী মুখ ফিরিয়ে তাকালো শিশুটির দিকে, শ্বশুরও তাকালো। কিন্তু মুহূর্ত মাত্র, তারপরেই শ্বশুর ছেলের হাতে হাত ছুঁইয়ে কী-যেন ইঙ্গিত করলো, ছেলে সঙ্গে সঙ্গে মুখ ফেরালো অন্যদিকে। শ্বশুর তাকিয়ে রইলো সাদামানুষদের রাজার মুখের দিকে।

ওদিকে পার্থকাই সোজা হয়ে বসেছিল। তার পিছনে দরজার কাছে এক মুহূর্তের জন্য এসে দাঁড়ালো তার

দেখে, শিশুটির দিকে একবার দৃষ্টিপাত ক'রেই ভিতরে গেল চলে।

বিমু ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে উত্তেজনায়। সুজার হাত-খানা সজোরে চেপে ধরে বললো,—বেঁচে উঠেছে টুরার মেয়ে। ঐ ত হাত-পা ছুঁড়ছে—ঐ ত বাঁশীর মতো সুরে কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে।

হয়ত বিমু ছুটেই চলে যেতো মেয়েটির কাছে, সুজা ওর হাতটা শক্ত ক'রে ধরে রইলো। আর ঠিক সেই সময় দেখা গেল, 'সাদাচামুখটি' কম্বলে জড়িয়ে বাচ্চাটাকে নিয়ে চলেছে 'টু-এল'-এর ভিতরে, টুরার কাছে।

—মায়ের কাছে নিয়ে যাচ্ছে!

—হাঁ।

তা-ও বেঁচে উঠেছে তা হলে!

—কে জানে!

সঙ্গের লোকটি বললে,—চুপ। ঐ দেখ, 'সাদাদের রাজা' উঠেছে।

—কেন?

লোকটি বললে,—গোল কোরো না। শুধু তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখ।

সুজারা তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখলো রাজা উঠে 'টু-এল'-এর দিকে গেল। টুরার স্বামী মুখ ঘুরিয়ে আবার ওদের দিকে তাকালো, টুরার শ্বশুর আবার ছেলের হাতে চাপ দিয়ে কী যেন ইঙ্গিত করলো, ছেলে মুখ ফিরিয়ে নিলো সঙ্গে সঙ্গে।

তারপরে দেখা গেল, সবাই যে-যার জায়গায় উঠে দাঁড়িয়েছে, দু-একজন গাঁয়ের মোড়ল এগিয়েও গেল পার্থকাইয়ের কাছে। একটা চাপা উত্তেজনার ভাব জেগে উঠলো যেন সবার মধ্যে, বিমুও আর থাকতে পারলো না, সুজাকে সঙ্গে নিয়ে কাছে গিয়ে দাঁড়ালো পার্থকাইয়ের। পার্থকাই তখন নিজের মনে বিড়বিড় ক'রে বলছে,—পাপ—সব পাপ—সব পাপ দেখেছে!

—কীসের পাপ?

প্রশ্ন শুনে অসহ্য দৃষ্টিতে পার্থকাই তাকালো বিমুর দিকে। যেন বলতে চাইলো,—কে হে ছোকরা তুমি, আমার মুখের ওপর কথা বলো?

ঠিক পাশেই দাঁড়িয়েছিল ওদের নিজেদের 'গাঁও-বুড়ো' সে এবার উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলো,—হাঁ বলতেই হবে তোমাকে,—কীসের পাপ?

পার্থ-কাই ঘুরে দাঁড়ালো বুড়োর দিকে, বললে,—টুরার মেয়েকে দেওয়া হলো না মুকেতি পাহাড়ে, পাপ নয় এটা? দেবতার রাগ বেড়ে যাচ্ছে, ছারখার হবো না আমরা? সব যাবে—সব যাবে ছাই হয়ে যাবে!

কথাটা সেই সংস্কার ঘেরা মানুষগুলোর পক্ষে সত্যিই ভয়ঙ্কর। তারা একে-একে সবাই এসে জড়ো হলো পার্থ-কাইয়ের কাছে। বললে,—তাহলে, কী এবার করা যায় রাজা?

রাজা বললে,—মেয়ে বেঁচে উঠেছে। চলো, ওকে এবার দিয়ে আসি আমরা।

—হাঁ, তা-ই চলো! সমস্বরে চীৎকার ক'রে উঠলো সবাই।

বিমু বললে,—মেয়ে ত এখন মায়ের কাছে। মায়ের কোল থেকে পারবে তোমরা ওকে ছাড়িয়ে আনতে?

এক মুহূর্ত চুপ ক'রে রইল সবাই। তারপরে, নীরবতা যে সর্বপ্রথম ভঙ্গ করলো, সে হচ্ছে টুরার শ্বশুর। সে বললে,—পারতেই হবে!

বিমু দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেল টুরার স্বামীর কাছে, চাপা অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বললে,—তুই কি বলিস? তুইও কি তাই বলবি? লোকটি মাথা নুঁকিয়ে ছিলো, এবার মুখ তুললো। সে মুখে কোনো ভাবের লেশমাত্র নেই, নিষ্প্রাণ এক পুতুল-মুখ যেন। বিমুর তাড়নায় সে কথা বললো। বললে,—বলবোনা কেন? সবাই যা বলছে, আমিও ত তাই বলবো।

বিষ্টু তেমনি চাপা আর উত্তেজিত কণ্ঠে বলতে লাগলো, —সবাই তোর মেয়েকে নিয়ে গিয়ে ঘুকেডি পাহাড়ে রেখে আসবে।

—আচ্ছা।

—তোর নিজের মেয়ে, যে এইমাত্র প্রাণ ফিরে পেয়ে কেঁদে কঁকিয়ে উঠলো।

গুলুল-মুখে এইবার যেন একটু বিস্ময়ের রেখা উঠলো জেগে, বললে,—না-না, আমার মেয়ে কেন হবে! ও-তো দেবতার দান প্রথম মেয়ে-সন্তান, দেবতার দান নয়?

বিষ্টু বললে—কিন্তু তোর বউয়ের কথা ভেবেছিস! সে মেয়েটাকে বাঁচাবার জন্য নিজের জীবন দিতে বসেছিল! মানুষের সইবারও একটা সীমা আছে, সে আর পারছে না, এবার তুই চেষ্টা কর।

—কীসের চেষ্টা!

—বাঁচাবার চেষ্টা। তোর নিজের মেয়েটাকেই।

চারিদিকের পাহাড়-চূড়াগুলোর দিকে একবার অসহায়ের মতো তাকালো গুলুল, তারপরে মুখ নামিয়ে বললে,—যাবো কোথায়?

বিষ্টু গলা নামিয়ে বললে,—তোর বউ যেখানে যাচ্ছিল।

মুহূর্তে শিউরে উঠে টুরার স্বামী বললে,—ঐ বনে! সর্বনাশ! ভূতপ্রেতরা আছে!

বিষ্টু বললে,—তবে আমার হাতে দে। আমি নিয়ে পালাই।

গুলুল-চোখে এবার যেন সামান্য একটু দীপ্তি দেখা গেল, বললে,—তোর ঘরও ওরা ভেঙে দিয়েছে।

—ঘর? বিষ্টু চাপা গলায় বললে,—ঘর আমি বানিয়ে নেবো, কিন্তু তাকে পাবে না।

—তোকে বাঘে খাবে।

—বাঘের সঙ্গে লড়াই করবো।

—বনের ধারে যদি থাকিস, হাতি আসবে।

—আসুক। হাতি তাড়াবো।

টুরার শ্বশুর ওদের থেকে একটু সরে গিয়ে হাত-পা নেড়ে তাদের 'পাঁও-মুড়োর সঙ্গে কী সব বলাবলি করছিল সেই জন্য ওদের চাপা গলার এই বাক্যালাপে ঠিক অনুধাবন করতে পারে নি। এতক্ষণ পরে কী-যেন একটা আন্দাজ ক'রে ওদের কাছে সরে এলো। বললে,—কী কথা হচ্ছে তোদের?

টুরার স্বামী বললে,—বাবা, মেয়েটাকে দিয়ে দাও না বিষ্টুর হাতে?

—কেন? ও নিয়ে যাবে ঘুকেডি পাহাড়ে?

বিষ্টু বললে,—না। ওর মা এতদূর পর্যন্ত আসলে রেখেছে, এবার আমি রাখবো।

—তার মানে।

বিষ্টু বললে,—ওকে আমি বাঁচাবো' ওকে আমি বড়ো ক'রে তুলবো!

টুরার শ্বশুর তোখদুটি বড়ো-বড়ো ক'রে তাকিয়ে রইল ওর দিকে, কিছুক্ষণ কোনো কথাই বলতে পারলো না। কথাটা শুনতে পেয়ে ওদের কাছে এগিয়ে এলো ওদের গাঁয়ের মোড়ল বা পাঁও-মুড়ো। রীতিমত রাগত কণ্ঠেই সে বললে,—তা আর নয়! যতো সব পাপের কথা! বিষ্টু হুঙ্কার দিয়ে উঠলো,—পাপের কথা কীরকম!

পাঁও মুড়োর দলবল অমনি ছুটে এলো ওদের কাছে, পাঁওমুড়োর দুপাশে এসে জড়ো হলো। বিষ্টু হচ্ছে আধা জংলী, ওকে বিশ্বাস নেই, হয়ত মোড়লের গায়েই হাত দিয়ে বসবে। সে'ক্ষেত্রে কেউ ছেড়ে কথা কবে না! খুনো মোষকে পোষ মানাবার ব্যাপারে যতো বড়োই ওস্তাদ হোক না বিষ্টু, ওকে তারা রেহাই দেবে না, টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলবে! পাঁওমুড়ো লোকগুলোকে হাত বাড়িয়ে একটু যেন শান্ত হতেই ইঙ্গিত করলো, তারপরে অপেক্ষাকৃত নিম্ন এবং ধীর কণ্ঠেই বিষ্টুকে বলতে লাগলো,—পার্বকাইকে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর। পাপ না হলে এ-রকম ব্যাপার ঘটে!

— কী ব্যাপার ?

বুড়ো বললে,—সাদা মানুষরা এলো কেন, পাপ যদি না ঘটবে ?

—সাদা মানুষরাও আগেই এসেছে।

বুড়ো বললে,—সে আসায় আর এ-আসায় অনেক তফাৎ আছে। এবার দলবল নিয়ে এসেছে, আর এসেছে কে ? না, 'সাদামানুষ'দের রাজা। সঙ্গে অস্ত্র-শস্ত্রও আছে। পার্থকাই কী বললে ? তোরা তখনো এসে পৌঁছস নি। ওরা এসেই ওদের 'অস্ত্র' দেখালো আকাশের দিকে মুখ ক'রে অস্ত্রটা টিপে দিলো, আর সঙ্গে সঙ্গে নাকি কান-ফাটানো ভীষণ এক শব্দ হলো, দূরের গাছগুলোতে পাখীরা উড়ে পালালো ভয় পেয়ে।

— তারপর ?

বুড়ো বললে,—আমাদের কেন ডেকেছে পার্থাই, জানিস ! ঐ সাদা মানুষ'গুলো এখানে থাকতে চায়, বাসা বাঁধতে চায় ! বিষু আর সুজার কাছে সংবাদটা নতুন, ওরা দুজনেই অস্ফুট একটা চীৎকার করে উঠলো। বুড়ো বললে মেয়েটাকে দেবতার কাছে দিয়ে আয়, দেখবি, দেবতা খুশী হবেন, সাদা মানুষগুলোও এখানে থাকতে না চেয়ে ধীরে ধীরে নীচে চ'লে যাবে।

বিষুর মতো মানুষও এবার স্তব্ধ হয়ে গেল। আর, সুজার মনে হলো, তার পায়ের কাছ থেকে শিরশির করে কীরকম ঠাণ্ডা একটা স্রোত যেন ক্রমশঃ ওপরের দিকে উঠে আসছে !

কথা বললে বিষুই প্রথম। বললে,—ওদের যদি আমরা থাকতে না দেই ? এটাত ওদের বাসস্থান নয় !

— না হলেও, জোর করে থাকবে। পারবি ওদের সঙ্গে ?

—কেন পারবো না !

বুড়ো বললে,— তোদের বন্দুক আর পাথর। আর, ওদের হাতে কী আছে দেখেছিলস ? দূর থেকে টিপকরে ছুঁড়বে। শব্দ হবে, আর তুই মাটিতে লুটিয়ে পড়বি।

না-না, ওদের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে কাজ নেই।

সুজা এবার কথা বললে। বললে,—মেয়েটাকে পাহাড়ে দিয়ে এলে ওরা চ'লে যাবে ?

—পার্থকাই ত তাই বলে।

সুজা একটুখন থেকে কী যেন ভাবতে লাগল, তারপর গভীর ধারালো গলায় বললে,—তাহলে, আমাকে দাও, আমি দিয়ে আসবো।

অস্ফুট বিষু আবার চীৎকার করে উঠলো, এই খবরদার !

চমকে উঠলো সবাই। সুজা বললে,—কীদের খবরদার ! তুই কি বলতে চাস, আমাদের বাসস্থান আমরা সাদামানুষদের ছেড়ে দিয়ে চলে যাবো ?

বিষু হুঙ্কার দিয়ে বললে,—না। আমাদের পাথর আর বল্লম দিয়েই আমরা যুদ্ধ করবো, তাতে বাঁচি, আর মরি, যাই হোক না কেন ! মেয়েটাকে বাঁচাতেই হবে, ওকে পাহাড়ে দিয়ে আসা চলবে না ! মেয়েটাকে ওর বাপের কাছেই দেওয়া হোক্।

ঠিক সেই সময়, সাদামানুষদের 'রাজা' ফিরে এলো বাচ্চাটাকে কোলে ক'রে। বাচ্চাটা তখনো কাঁদছে। 'রাজা' বাদাগাদের লোকটিকে কী যেন বললে, বাদাগাদের লোকটি এদের দিকে ফিরে এদের ভাষায় বলতে লাগলো,—বাচ্চাটা খিদেয় কাঁদছে, ওকে কেউ দুধ খাওয়াতে পারো ? ওর মা এখনো অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে !

পার্থকাই বললে,—ওকে আমাদের কারুর কোলে দাও। ওকে নিয়ে পাহাড়ে দিয়ে আসবে !

—কেন, পাহাড়ে কেন ?

পার্থকাই বললে,—আমাদের নিয়ম। ওকে দেবতা নিজেই সব দাবি। হয়ত ওর মা-ও বেঁচে উঠবে।

বাদাগাদের লোকটি সাদামানুষদের রাজাকে এ-সব কথা বুঝিয়ে বলতেই 'রাজা' একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন।

কী—যেন বললেন তাঁর অনুচরদের। একজন এগিয়ে এসে বাচ্চাকে কোলে নিয়ে খাটিয়ার উপর বসলো। অন্য একজন কী একটা জিনিষ খুলে একটা বাটিতে দুধই বুঝি ঢালতে লাগলো। সেই দুধ কাপড় ভিজিয়ে কাপড়ের টুকরোয় ভিজিয়ে-ভিজিয়ে খাওয়াতে লাগলো বাচ্চাটাকে। বাচ্চাটা কান্না থামিয়ে অধীর আগ্রহে খেতে লাগল সেই দুধ চুক্-চুক্ করে!

অন্য এক অনুচরের কাছ থেকে 'সাদামানুষদের রাজা' নিজের হাতে তুলে নিলে তাদের সেই অদ্ভুত অস্ত্র, তারপরে ওদের দিকে মুখ ফিরিয়ে ধমকের সুরে কী যেন বললে। বাদামাদের লোকটি রাজার কথা ওদের বুঝিয়ে বলতে লাগল, —মেয়েটাকে পাহাড়ে দেওয়া হবে না। যে পাহাড়ে ওকে নিয়ে আসতে চাইবে, তাকে সঙ্গে সঙ্গে মেরে ফেলা হবে এই অস্ত্র দিয়ে।

সমগ্র উপত্যকা যেন নিঃশ্বাসরোধ ক'রে শুনলো সেই 'সাদারাজা'র বজ্র-নির্ঘোষ! বনের বাঘ মানুষের ঘাড়ে কামড় দিয়ে, দেহের সমস্ত রক্ত শুষে নিলে মানুষটার চেহারা যেমন ফ্যাকাশে-সাদা-আর শুক্‌নো হয়ে যায়, ঠিক তেমনি বিবর্ণ আর বিশুষ্ক দেখাতে লাগলো উপত্যকার মানুষগুলোর চেহারা!

'সাদারাজা' আবার ধমক দিয়ে কী যেন বলে উঠলেন। বাদামাদের লোকটা সে কথা সঙ্গে সঙ্গেই ওদের শুনিয়ে দিলো, —কী হলো সব? চুপ ক'রে আছো কেন?

কোনো উত্তর নেই। শুধু আধা জংলী বিষ্ণু এগিয়ে গেল রাজার সামনে। বললে,—মেয়েটাকে আমার হাতে দাও? বাদামাদের লোকটির সাহায্যে 'রাজা' বাক্যালাপ শুরু করলেন ওর সঙ্গে। সেই রকম ধমকের সুরেই জিজ্ঞাসা করলেন,— কেন? মেয়েটাকে নিয়ে কি করবে? পাহাড়ে যাবে?

বিষ্ণু দৃঢ় অকম্পিত কণ্ঠে বললে,— না। ওকে বাঁচাবো, মানুষ ক'রে তুলবো।

রাজা প্রথমটায় বিশ্বাস করলেন না। তারপরে নানান্ বাক্যবিনিময়ের পর যখন স্থিরনিশ্চয় হলেন বিষ্ণুর সংকল্প-সম্পর্কে, তখন বললেন,- পারবে ওদের সঙ্গে লড়াই ক'রে মেয়েটাকে বাঁচিয়ে রাখতে?

পারবো।

—বোলো তাহলে এখানে। মেয়েটাকে তোমার হাতেই দিচ্ছি।

আবার একটা কোলাহল উঠলো চিত্রার্পিত লোকগুলোর মধ্যে। চিত্রের ছায়া মানুষগুলোর মধ্যে যেন হঠাৎ প্রাণ ফিরে এলো। তারা, বিশেষ ক'রে টুরার শ্বশুর, চীৎকার করে বললে,—চলে আয় বিষ্ণু। বাচ্চাটাকে ছুঁয়ে দিস না।

ক্রমশঃ চীৎকার এতো উগ্র কোলাহলে পর্যবসিত হলো, যে, সাদামানুষদের রাজা' তাঁর হাতের 'অস্ত্র'টা আকাশের দিকে উঠিয়ে আবার একটা কান-ফাটা শব্দ তুলে ভরিয়ে দিলেন সারা উপত্যকা! আর সঙ্গে সঙ্গে চুপ ক'রে গেল সমস্ত লোকগুলো। রাজা বললেন বাদামা দোভাষীটির মাধ্যমে,—শুনে রাখো, এই মেয়েটির যদি কোনো ক্ষতি করো তোমরা, তাহলে আর কাউকে আস্ত রাখবো না। মেয়েটির ভার আমি এই মানুষটির হাতে দিলাম। ওরও ক্ষতি করার চেষ্টা কেউ ক'রো না, সাবধান।

লোকগুলো ভয়ে, আতঙ্কে, বিস্ময়ে, নীরব হয়ে রইলো। কিছুক্ষণ পরে, পার্শ্বকাই কী যেন বললে ওদের লোকদের। সাদারাজা দোভাষীকে জিজ্ঞাসা করলে,—কী বলছে?

দোভাষীটি 'বাদামা' হলেও শহরের দিকে যাতায়াত ছিল তার। শহরবাসীদের মতো পোষাক পরতো, শহরবাসীদের ভাষা বলতো অনর্গল,যে-ভাষার নাম,—'তামিল' ভাষা। 'সাদা রাজা' এই তামিল ভাষা শিখছিলেন কিছু কিছু। দোভাষীর সঙ্গে তাঁর ভাষা চলছিল এই 'তামিল' ভাষাতেই, তাঁর নিজের ভাষায় নয়।

যাইহোক, 'সাদারাজা'র নির্দেশে ওদের কথাবার্তা শোনবার জন্য দোভাষী এগিয়ে এলো। কিন্তু ততক্ষণে ওদের

কথোপকথন শেষ হয়ে গেছে। অমন ঠাণ্ডাতেও পার্থকাইয়ের কপালে জমেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম। মুখের রেখাগুলো যেন মুহূর্তে আরও গভীর হয়ে গেছে। মানুষটি ধীরে ধীরে যখন এগিয়ে আসতে লাগলো 'সাদারাজা'র কাছে, তখন তার পা-দুটি পর্যন্ত থরথর ক'রে কাঁপছে।

—কী! কী বলতে চাও?

পার্থকাই তার নিজের পাথরের বাড়ীটার দিকে হাত বাড়িয়ে নির্দেশ করলো, তারপরে, কম্পিত কণ্ঠে কোনক্রমে বললে,—

—জেলুকো এ-মাবু।

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন তামিলভাষীকে,—কী বলছে?

বাদাগাটি বললে,—জেলুকোটা তোমরা নিয়ে নাও।

—মানে! দোভাষী বললে,—'ওটাকাল'টা তোমরা নিয়ে নাও।

'জেলুকো'র তামিল প্রতিশব্দ হচ্ছে 'ওটাকাল', যার অর্থ হচ্ছে,—পাথরের স্তূপ বা পাথরের খণ্ড।

কিন্তু ব্যাপারটা তখনো প্রাঞ্জল হয়ে উঠলো না 'সাদা রাজা' মিষ্টার সুলিভানের কাছে। "পাথরের স্তূপ বা খণ্ড নিয়ে নাও,"—তার অর্থটা কী?

দোভাষী বুঝিয়ে দিলে। টোডা-প্রধানদের বাড়ীর সামনে যে পাথরের খণ্ড বা স্তূপ থাকে, সেটি হচ্ছে, তার বাড়ীর প্রাণ-স্বরূপ বা প্রতীক-স্বরূপ। ওটাকে আত্মসাৎ করা মানে, বাড়ীটাকেই আত্মসাৎ করা। পার্থকাই 'সাদারাজা'কে তার বাড়ীটাই নিয়ে নিতে বলছে।

—কেন?

পার্থকাই ভগ্নকণ্ঠে কোনক্রমে বলতে লাগলো,—পাপ লেগেছে উপত্যকায়। বাচ্চা মেয়েটি যখন বেঁচেই উঠলো, আর তাকে যখন পাহাড়ে রেখে আসা গেল না,—তখন এখানকার কেউই আর বাঁচবে না। তোমরা নিয়ে নাও আমার বাড়ী, আমরা ঘুরে, আরও ঘুরে সরে যাবো।

এবং তাই হয়েছিল। ঘুপ্‌চু পেরিয়ে বিকেল, বিকেল পেরিয়ে সন্ধ্যা হয় হয়,—পার্থকাই, তার কন্যা, তার অনুচর, তার লোকজন সবাইকে নিয়ে ধীরে ধীরে চলে গেল তার ঘর-গুলোকে শূন্য ক'রে দিয়ে। চুপ্‌ তার টু-এল্‌-এর মধ্যে রুগ্ন অচেতন—মৃতপ্রায় প'ড়ে রইল টুরা। সাদা মানুষগুলো তাকে বাঁচিয়ে তোলবার চেষ্টা করছে আপ্রাণ। সেই ঘরে ঢোকবার উপায় নেই, তাই তার শিশু কন্যাটিকে কোলে করে প্যালিচার ওপর বসে রইলো বিষ্ণু।

বসে রইলো বটে, কিন্তু দূর দিগন্তে সমস্ত ধসটা যখন নামি নামি মিলিয়ে যাচ্ছে, তখন তার চোখদুটো যেন কাপসা হয়ে এলো। তারপরে, একসময়, টু-এল্‌ থেকে সেই সাদা-মানুষটি বেরিয়ে এলো, যে এতক্ষণ ধ'রে বাঁচাবার চেষ্টা করেছে টুরাকে। এসে কী যেন বললে প্রথমে সাদারাজাকে, তারপরে দোভাষীকে। দোভাষী বাদাগাটি কাছেই বসে ছিল বিষ্ণুর। সে ওকে কনুয়ের একটু ধাক্কা দিয়ে বললে,—চোখ মেলেছে টুরা। বেঁচে গেছে।

—বেঁচে গেছে!

—বেঁচে গেছে। মেয়েকে দাও, চাইছে তার মা।

সেই 'সাদা লোকটি' মেয়েটাকে ওর কাছ থেকে নিয়ে আবার 'টু-এল'-এর দিকে চলে গেল। বিষ্ণু উঠে দাঁড়ালো, বললে,—আমি যাবো?

—না। এখন না। —তবে?

—পরে যেও। একটু দাঁড়াও।

'সাদারাজা'র অনুচররা ততক্ষণে আলো-টালো জ্বালাতে শুরু করেছে। তারা পার্থকাইয়ের শূন্য ঘরে যাতায়াত করছে, যেন তাদের নিজের বাড়ী। সত্যিই তাহলে চলে গেল ঘর ছেড়ে, তাদের রাজা, পার্থকাই?

'সাদারাজা' তাকে কাছে ডাকলে। দোভাষীর সাহায্যে বললে—ভয় করো না! তোমরা তিনজনে এখানেই থাকবে। আমাদের রাজার এই বাড়ীতে?

'সাদারাজা' জানলে,—রাতের মতো টু-এল-এ গিয়ে থাকো। টু-এল ও ঁাকা। ঘোড়গুলোকে সব নিয়ে গেছে তারা।

—আর, এই বাড়ী-এই ঘর?

'সাদারাজা বললে,—আমরা থাকবো। আমাদের দিয়ে গেছে না? এখানে আমরা আরও ঘর-বাড়ী বানাবো, শহর তৈরী করবো। সুন্দর ব্যবসা এটি। কী, ভাবছো কী?

ঘোড়াটাই রাজার কথার প্রতিধ্বনি ক'রে বলে উঠলো,—কী, ভাবছিস কী? পার্থকাই বলে গেল না! 'লেজুকো এ-বাণ্ড? রাজা বললে,—কথাটার মানে কী যেন বললে তুমি?

—উঁটাকল। আমাদের ভাষায় দাঁড়ালো,—উঁটাকল। ছুটো ভাষার মিলিয়ে দাঁড়ায়,—উঁটাকল-এমাণ্ড।

'সাদারাজা' দূরে পাহাড়ের নিখর নিস্তব্ধ বনানীর দিকে স্থির-দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বললে,—এ' ব্যবসাটার নাম তাহলে থাক উঁটাকল-মাণ্ড।

(১৮১৯ খৃষ্টাব্দে মিঃ সুলিভান যে নাম সেদিন উচ্চারণ করেছিলেন, সেই নামই ধীরে ধীরে একদিন হয়ে দাঁড়ালো,—'উঁটাকল-মাণ্ড' থেকে 'উঁকল-মাণ্ড, তারপরে 'উঁকামণ্ড' —মার্কিণদেশের শ্রেষ্ঠ শৈলনিবাস।)

সে রাত্রে মেয়েকে কোলে নিয়ে তার জীবন ফিরে পেলো টুরা। বিষ্ণু বললে,—আর ভয় নেই। তোর মেয়েকে আর কেউ ধরতে পারবে না।

ঘুম ভেঙ্গে টুরা, বললে,—আমি কোথায়? এখানে কেমন ক'রে এলাম?

ওর শিয়রের কাছে ব'সে ধীরে ধীরে ওকে সমস্ত ঘটনাই একে একে বলে গেল বিষ্ণু। চুপচাপ সবকথাই শুনে গেল টুরা, কোনো প্রতিবাদ নয়, কোনো বিস্ময়-সূচক উক্তি নয়, কিছু নয়। শুধু একবার জিজ্ঞাসা করলে তার স্বামীর কথা।

—ভালোই আছে সে। —খবর? —সেও ভালো আছে?

টুরা বললে,—আমরা কী করবো? এখানে থাকবো?

—না। —তবে?

বিষ্ণু এগিয়ে এসে টুরার কানে-কানে কী যেন বলতে লাগলো। আর, সেই সব কথা শুনতে শুনতে নিজের অজ্ঞাতেই তার দুটি হাত গিয়ে শক্ত ক'রে জড়িয়ে ধরলো তার শিশু-কন্যাটিকে।

পরদিন, সকালে 'সাদাবাদুররা' এসে ওদের তিনজনকে আর দেখতে পেলো না। ঘর শূন্য। শুধু হাড়-কাঁপানো ঠাণ্ডা একটা হাওয়া এসে হায়-হায় ক'রে বেড়াচ্ছে।

(ক্রমশঃ)

ভ্রমণকাহিনী
ধারাবাহিক

গিরিব্রজাঞ্চলে

সমর গুহ

গৃধ্রকূট থেকে সামনের দিকে চাইলে সুন্দর দেখায় রাজ-গৃহের পূর্ণরূপটি। যেন পাথরে-খোদা একটি পুরনো শিলাপটের মত পড়ে আছে। না, পড়ে আছে বললে ঠিক হয় না। চারদিকের সমতল ভূমির মধ্যে গিরিমালার আড়াল দেওয়া রাজগৃহকে হঠাৎ দেখে মনে হয় যেন আকাশের দিকে মুখ করে ফুটে রয়েছে একটি শিলা-কমল। রাজগৃহের চারদিকের সাতটি পর্বত শ্রেণী যেন এই শিলা-কমলের সাতটি নিথর পল্লব। আর, তার মাঝখানে অবস্থিত নগরটি যেন এই শিলাপদ্মের বিস্তীর্ণ কোরক। সত্যি সুন্দর একটি ফুলের মত যেন ফুটে রয়েছে রাজগৃহ। দূরে দেখা যায় বঙ্কিম তরঙ্গিনী পঞ্চনা। সেইদিনে এই পঞ্চনার নাম ছিল সপিনী। দক্ষিণে দূরের দিকচক্রবালে একখণ্ড মাটি-ছোঁওয়া কালো মেঘের মত ভেসে আছে বরাবর গিরিমালা, তা ছাড়া আর সব দিকেই বিস্তীর্ণ সমতল, শুধু এই রাজগৃহের গিরিমালা ছাড়া। সাতটি গিরি পল্লবের মাঝে মাঝে আছে গিরিব্রজ। এই গিরিব্রজ দিয়েই ছিল নগরে যাতায়াতের পথ। একটি অশ্বও আত্মসহায় যেন কোন বিশিষ্ট একাকীত্বে গড়ে উঠেছিল প্রাচীন কালের রাজগৃহ।

গৃধ্রকূট থেকে ইতস্ততছড়ান দেখা যায় রাজগৃহের মৃত ইতিহাসের ভগ্নচিহ্নগুলি। ওই বিম্বিসারের কারাগৃহ, তার আগে রয়েছে জীবকারাম, দূরে বানগঙ্গা, তার পশ্চিমে সোন্ ভাণ্ডার ও জরাসন্ধের যজ্ঞভূমি, মাঝখানে মণিনাগের মন্দির, দক্ষিণ-পশ্চিমে পর্বতের পাদদেশে জপোষা প্রস্রবন। এ ছাড়াও রাজগৃহের দীর্ঘ ইতিহাসের আরও অনেক ভগ্ন চূর্ণ ছড়িয়ে পড়ে আছে চারদিকে। পর্বত ঘেরা রাজগৃহের পশ্চিমে নগরটিকে সম্প্রসারিত করা হয়েছিল। বুদ্ধকাহিনীতে তাই অন্তর-নগর ও বাইরের নগর অর্থাৎ রাজগৃহের দুটি নগররাজের উল্লেখ পাওয়া যায়। পর্বত ঘেরা নগর এখন ঐতিহাসিকস্থান বলে সুরক্ষিত। আধুনিক যে নগর তৈরী হয়েছে তার মধ্যে আছে কয়েকটি বিহার। ব্রহ্মী, চীনা, জাপানী ও শ্যামদেশীয় বৌদ্ধ-ভক্তেরা তৈরী করেছে। কিছু সাধারণের বাসগৃহও আছে।

একটা জীর্ণ কংকালের মত মুখ থুবড়ে পড়ে আছে আজ রাজগৃহ। কিন্তু একদিন অতুল রাজ-ঐশ্বর্যের বৈভবে ঝলমল করতো এই নগরটি। যত প্রাচীন নগরের উল্লেখ পাওয়া যায় আমাদের রামায়ণ মহাভারতে বা পুরাণে রাজগৃহ তারমধ্যে অন্যতম। আমাদের সভ্যতা সুরু হয়েছে অনেক আগে, অনেক কাহিনী আছে ভারতবর্ষের কিন্তু ইতিহাসের স্বাক্ষর আছে খুব কমই। আমাদের ইতিহাস তাই হয় কাহিনী, নয় কিম্বদন্তী অথবা পুরাণ। অলীক কল্পনা, অতিরঞ্জন আর দেবতাদের আনাগোনায় ইতিহাসের উপাদানগুলি এমন করে জট পাকিয়ে গেছে কাহিনীর মধ্যে যে, তার ভিতর থেকে ছেঁকে বেছে বাস্তব জীবনের কথাগুলো সঙ্কলন করে পুরাকীর্তির মালা গাথা এক দুরূহ কাজ। ভারতের সভ্যতা শুধু আর্য কাহিনীতেই শুরু নয়। তারও আগে ছিল দ্রাবিড়ীয় সভ্যতা এবং সেই সব জাতির কাহিনী আর্যরা যাদের নাম দিয়েছিল অনার্য বা অসুর

বলে নিদর্শনের সংজ্ঞা দিয়ে। প্রাচীন আর্য সভ্যতার পরিচয় আছে শুধু সাহিত্যে, কিন্তু সেই সভ্যতার ইঁট পাথরে গড়া কোন ভাঙ্গা দেউলের একটু চিহ্নও নেই।

শুধু হরপ্পা সভ্যতার মহেঞ্জোদারো আছে, হরপ্পা আছে। এই যে রাজগৃহ,—ভারতের প্রাচীন কীর্তির একমাত্র প্রাচীনতম নগরের যে জীর্ণ চিহ্নটি খুঁজে পাওয়া গেছে ভারত ইতিহাসের এই ভগ্নাবশেষটি ঠিক আর্যসভ্যতার স্মারণিক নয়। রাজগৃহ ছিল প্রাকার্য অসুর সভ্যতার কীর্তিস্তম্ভ। বহুযোর প্রাচীন রাজগৃহে আর্য সভ্যতার যে ঢেউ এসে পড়েছিল তার ফলে এখানে গড়ে উঠেছিল আর্য-অসুরের একটি মিশ্র জীবন। ভারত ইতিহাসের কবর খুঁড়ে খুঁড়ে প্রাচীন জীবনাক্ষরের যেটুকু অবশেষ পাওয়া গেছে তার মধ্যে মহেঞ্জোদারো প্রাচীনতম এবং তারপরেই প্রাচীনত্বের স্থান রাজগৃহের। কিন্তু হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর ভগ্নাবশেষ আছে, ইতিহাসের কোন পরিচয় নেই। প্রাচীন রাজগৃহের শুধু জীর্ণ স্মারক রয়েছে তাই নয়,—তার পুরা-জীবনের উপাদানও রয়েছে অনেকখানি।

রামায়ণ-মহাভারতের যুগে এই নগরটিকে রাজগৃহ নামেই অভিহিত করা হতো। পুরাণে আছে কুরুরাজ বসু এই নগরটি দখল করে এর নাম দেন বসুমতী। কৃষ্ণ-বিদ্বেষী জরাসন্ধের পূর্বপুরুষ বৃহদ্রথ এখানে এসে রাজধানী স্থাপন করেন বলে এর নাম হয় বার্হদ্রথপুর। জরাসন্ধের দুজন বংশধরের নাম ছিল বৃষভ ও কুশাগ্র। তাই বৃষভপুর ও কুশাগ্রপুর নামেও রাজগৃহের উল্লেখ আছে। চীনা পরিব্রাজকদের কেউ কেউ রাজগৃহকে রাজা বিম্বিসারের নামানুসারে বিম্বিসারপুর বলে আখ্যাত করেছেন।

প্রাকৃতিক গিরিমালার পরিবেষ্টিত এই নগরটি-গিরিব্রজ নামেও পরিচিত ছিল। ব্রজ শব্দের অর্থ দুর্গ। তাই গিরিব্রজ বলতে বুঝায় গিরিদুর্গ। সত্যি রাজগৃহ একটি দুর্ভেদ্য প্রাকৃতিক গিরিদুর্গ। সাতটি পর্বতমালা দিয়ে নগরটি বেষ্টিত। গিরিবর্ত-গুলিও সুগভীর শিলা-প্রাকারে সুরক্ষিত। প্রাচীন রাজগৃহে নগর দুয়ার ছিল চৌত্রিশটি। এই নগর দুয়ারে সর্বদা প্রহরী মোতায়েন থাকতো। রাত্রিতে অনেক রাজপুরুষদেরও নগরে প্রবেশ করতে দেওয়া হতো না। বিম্বিসার, কি তারও আগের যুগের পুরু ও সুদীর্ঘ শিলা প্রাচীরের অক্ষত অংশ আজো পড়ে রয়েছে রাজগৃহের অনেক স্থানে। বস্তুত, রাজগৃহ প্রাচীনতম ভারত ইতিহাসের এক মহার্ঘ স্মারণিক। সেদিনের এই রাজগৃহই একালে কথায় কথায় ডাকনাম পেয়েছে রাজগীর।

বিম্বিসারের কারাগৃহের দিকে চলছি। রাজা বিম্বিসারের রাজ্য-সাম্রাজ্যের আর কিছু চিহ্ন নেই, আছে শুধু এই কারাগৃহ টুকু। হতভাগ্য বিম্বিসারের অভিশপ্ত জীবনের এটিই যথার্থ স্মারণিক। একদিক দিয়ে এই কারাগৃহের ভগ্নাবশেষটির অস্তিত্ব যেমন সকরুণ, আরেকদিক দিয়ে তেমনি মহিমান্বিতও বটে।

টিপি খুঁড়ে বের করা হয়েছে বিম্বিসারের এই কারাগৃহটি। বৌদ্ধ শাস্ত্রের বিবরণ থেকে এবং এখানে যে লোহার তৈরী প্রাচীন হাতবেড়ী পাওয়া গেছে তাই থেকে নির্দেশ করা হয়েছে স্থানটিকে বিম্বিসারের কারাগৃহ বলে। কয়েকটি গৃহ ও প্রাচীরের ভগ্ন ভিতের সুস্পষ্ট রেখায় আজও পরিচয় পাওয়া যায় সেই প্রাচীন রাজগৃহের এই রাজ-কারাগারের।

রাজগৃহ ঠিক কে তৈরী করেছিল তার সুনির্দিষ্ট তারিখ নেই, নির্মাতার পরিচয়ও নেই। কিন্তু বিম্বিসারের রাজধানী রূপেই ভারতের ইতিহাসে রাজগৃহের পরিচিতি। পিছন দিকে খুঁজে খুঁজে ভারত ইতিহাসে রাজা ও রাজত্বের যেটুকু প্রামাণ্য কাহিনী পাওয়া গেছে তার মধ্যে বিম্বিসার এখনও বিশিষ্ট। বৈদিকযুগের নানা নগর ও সভ্যতার রীতি-নীতি ও প্রথার বর্ণনার পরে ভারত ইতিহাসের পাঠ শুরু হয়, প্রধানত মগধের রাজা বিম্বিসারের কাহিনী থেকে।

বিম্বিসার ছিলেন বুদ্ধের সমসাময়িক। বুদ্ধদেবের মহা-ভাগের সাত বছর আগে মৃত্যু ঘটে বিম্বিসারের। বিম্বিসার

ছিলেন সেযুগের পূর্ব ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ও প্রতাপশালী রাজা। মগধ এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বিস্তৃত ছিল বিম্বিসারের রাজত্ব। বিম্বিসারের রাজধানী এত সুরক্ষিত ছিল যে বৈশালী, অবন্তী বা অন্য-কোন দেশের রাজা বিম্বিসারের রাজধানী আক্রমণ করতে সাহস পায়নি। গিরিব্রজকে রাজধানীরূপে গড়ে তোলেন বলে এই নগরটি রাজগৃহ নামেও পরিচিত।

সেযুগে এমনি আরও রাজা ও ক্ষমতাধর্শী-রাজা অনেক ছিলেন। কিন্তু তাদের নাম সুদূর অতীতেই বিলীন হয়ে গেছে। বিম্বিসার সুখ্যাত হয়ে আছেন তাঁর বৌদ্ধভক্তির জন্য। বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা ও আত্মসমর্পণের জন্য বিম্বিসারকে রাজ্য, রাজ-শাসন, এমনকি নিজের প্রাণটুকুও বিসর্জন দিতে হয়েছিল। প্রাণ দিয়েও বিম্বিসার প্রাণময়ী হয়ে আছেন বুদ্ধ-শরণের জন্য।

সর্বপ্রথম বিম্বিসারই গৌতম ও বুদ্ধ উভয়কেই বরণ করে নেন তাঁর রাজগৃহে। গৃহ ত্যাগ করে গৌতম গিয়েছিলেন প্রথমে তপস্বী আলাড় কালাম ও উদ্রক রামপুত্রের কাছে। তাঁর মন সেখানে তৃপ্ত হয় নি। আবার তিনি সুরু করেন পদযাত্রা এবং ঘুরতে ঘুরতে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন রাজগৃহে। সন্ন্যাসীর ভিক্ষাব্রত তিনি সর্ব প্রথম গ্রহণ করেন এখানেই। একবেলা আহার গ্রহণের রীতিও বুদ্ধদেব রাজগৃহেই সুরু করেন। ভিক্ষায় ক্ষুন্নিবৃত্তির প্রয়াসে রাজকুমার গৌতমকে কম সংগ্রাম করতে হয়নি। রাজপরিবারের পরমান্নে অভ্যস্ত রসনাকে ভিক্ষান্নে পরিতৃপ্ত করার প্রয়াস তাঁর সহজে সফল হয়নি।

যেদিনে প্রথম ভিক্ষায় আহরণ করে রাজগৃহের এক বৃক্ষতলে গৌতম আহারে বসেছেন, তাঁর চোখ পড়ল সদ্য আহরিত কদর্য কুৎসিত, অপরিচ্ছন্ন ভিক্ষান্নের উপরে। গৌতমের স্বভাব-সিদ্ধ রাজ-রুচি বিদ্রোহ করে উঠলো সেই অখাদ্য ভিক্ষান্ন দেখে। বমনোদ্রেক হলো তাঁর। কিন্তু তিনি ভিতে ভিতে পিষে পিষে নিঃশেষ করে দিলেন রাজকুমার গৌতমের রাজরসনাকে। কয়েকদিন তিনি প্রায় অনাহারেই রইলেন, তবুও শেষপর্যন্ত তিনি সন্ন্যাসীর ভিক্ষান্নকেই করে তুললেন তাঁর ক্ষুন্নিবৃত্তির স্বাভাবিক অবলম্বন।

বিম্বিসার শুনলেন এক অপূর্ব সৌম্যদর্শন সন্ন্যাসীর ভিক্ষান্ন গ্রহণের কথা, দেখলেনও তিনি দূর থেকে। সুদীর্ঘ অবয়বে সুগঠিত তনু, নিলোৎপলের মত চোখ, করুণাস্নাত আর্ত দৃষ্টি—সব মিলিয়ে কেমন যেন একটি স্নিগ্ধ বিভায় মণ্ডিত এই সন্ন্যাসী। তিনি চর পাঠিয়ে শুনলেন গৌতমের রাজ পরিচয়ের কথা। শুনে বিস্মিত হয়ে গেলেন। পূর্ণ যৌবনে যে দুর্লভ রাজঐশ্বর্যকে এমন তৃণবৎ ছুড়ে ফেলে দিয়ে আসতে পারে সে সেই মহাপ্রাণ! তিনি নিজেই পাণ্ডব গুহায় গিয়ে সাক্ষাৎ করলেন গৌতমের সঙ্গে। অনুরোধ করলেন তাঁকে রাজগৃহে বাস করার জন্য। সত্য-সন্ধানীর গভীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে গৌতম বললেন, সত্যলাভের আগে তাঁর স্থিতি নেই কোথাও। শেষপর্যন্ত বিম্বিসারের একান্ত আবেদনে সাড়া দিয়ে গৌতম প্রতিশ্রুতি দিলেন যদি, সত্যলাভ সম্ভব হয় তবে তিনি আবার আসবেন এই রাজগৃহে।

গৌতম তাঁর কথা রেখেছিলেন। বোধিলাভের পরে ফিরে এসেছিলেন রাজগৃহে। শুধু ফিরে এসেছিলেন তাই নয়,—রাজগৃহকে করেছিলেন তাঁর ধর্মপ্রচারের প্রধান ক্ষেত্র। বিম্বিসারের আগ্রহ, আন্তরিকতা ও বৌদ্ধধর্মের প্রতি শ্রদ্ধার জন্যই বুদ্ধদেব রাজগৃহকে তাঁর ধর্মচর্চা ও প্রচারের মূলকেন্দ্র-রূপে গ্রহণ করেননি। এর একটি সমাজতাত্ত্বিক কারণও আছে। বৌদ্ধ ছিলেন বেদদ্রোহী ও বর্ণাশ্রম বিরোধী। রাজগৃহে এবং মগধ রাজ্যে আর্যসভ্যতার প্রভাব সম্প্রসারিত হলেও রাজগৃহের জীবনধর্মের, পুর-নাগরিকদের আচার পদ্ধতি ও মানসিকতার মূল ভিত্তি ছিল অনুন্নত সভ্যতার সংস্কার ও প্রকৃতি। তা ছাড়া জৈন ধর্মের কেন্দ্ররূপে রাজগৃহের পরিবেশ বৌদ্ধধর্ম প্রচারের অনুকূল ছিল। তাই বুদ্ধদেব বোধিলাভের পরে প্রথমে এসেছিলেন রাজগৃহে।

এখন যে জায়গাটিকে লোকেরা বলে ভেধিয়ান তারই আদি নাম ছিল বটীবন। গৌতম বুদ্ধত্ব লাভের পরে প্রথমে এখানেই এসেছিলেন।

সেই সৌম্যকান্তি প্রিয়দর্শন সন্ন্যাসী ফিরে এসেছেন শুনে বিম্বিসার অচিরেই বৌদ্ধ সকাশে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁর শান্ত পরিতৃপ্ত দিব্যজ্যোতি দেখে বিম্বিসার অনুভব করলেন যে গৌতমের যথার্থই বোধিলাভ হয়েছে। তিনি শ্রদ্ধাপ্লুত চিত্তে গ্রহণ করলেন বুদ্ধের শিষ্যত্ব। রাজগৃহে আমন্ত্রণ করে রাজ-গুরুকে ভিক্ষায় পরিবেশন করলেন। আহারান্তে স্বর্ণঝারি থেকে নিজ হাতে জল ঢেলে ধুইয়ে দিলেন রাজগুরুর কমল পলাশের মত কোমল হাত দুটি।

বিম্বিসারের শিষ্যত্ব গ্রহণের পরে রাজ-অমাত্য, শ্রেষ্ঠী অর্থাৎ রাজগৃহের উচ্চ বর্ণের অনেকেই বুদ্ধের কাছে দীক্ষা নিয়ে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। শিষ্যদের আগ্রহাতিশয্যে প্রায়ই বুদ্ধকে রাজন্যবর্গ অথবা ধনিকদের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করতে হতো। অথচ তথাগতের মূল বাণী ছিল সাম্য—বর্ণহীন সমাজে মানুষের সমমূল্য। কিন্তু সত্যি কি রাজগুরু বুদ্ধ ছিলেন করুণাঘন সাম্যের প্রসূতি?

ভিক্ষায় বেরিয়েছেন একদিন বুদ্ধদেব। তিনি ভিক্ষাপাত্র নিয়ে দাঁড়িয়েছেন এক দীন-দরিদ্রা দাসীর গৃহদুয়ারে। দাসী কী ভিক্ষা দেবে এই মহাভিক্ষুকে! তার সম্বল ছিল একখণ্ড শুকনো রুটি মাত্র। তাই দিল সে বুদ্ধকে। কিন্তু ভিক্ষাদানের পরেই একটা সন্দেহের খোঁচায় তার মন ক্ষীণ হয়ে উঠলো। বিম্বিসারের ন্যায় রাজপুরুষেরা যাঁর শিষ্য তিনি কি গ্রহণ করবেন দরিদ্রা দাসীর এই সামান্য শুষ্ক রুটির খণ্ড? বুদ্ধদেব বোধ হয় অনুভব করলেন সেকথা। তিনি আনন্দকে একটু জল আনতে বললেন। দাসীর গৃহের কাছেই চাঁবর বিছিয়ে বসলেন এক বৃক্ষের ছায়াতলে। জলে ভিজিয়ে সেই রুটি দিয়ে তিনি সেদিনের আহার সম্পন্ন করলেন। অন্তর্যামী চোখে দীন-দাসী অনুভব করলো,—বুদ্ধ শুধু রাজগুরু নয়, কাঙালেরও প্রভু। রাজ-অন্ন আর দাসীর অন্ন, সব অন্নই তাঁর কাছে সমান।

বৌদ্ধধর্মের অনেক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় রচিত হয়েছে রাজগৃহের বৌদ্ধ বিহারে। বুদ্ধদেবের প্রধান শিষ্য সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন রাজগৃহের নিকটবর্তী নালন্দার অধিবাসী ছিলেন। পণ্ডিত মহাকাশ্যপ, যাঁর নায়কত্বে বৌদ্ধ সূত্র গ্রন্থিত হয় তিনিও ছিলেন রাজগৃহের ব্রাহ্মণ। রাজগৃহেই প্রথম ধর্মসংগীতি অনুষ্ঠান হয়। বটীবন, বেণুবন, জীবকাম্রবন, সপ্তপর্ণগুহা, গৃধ্রকূট—বুদ্ধ কাহিনীতে এই নামগুলি সুখ্যাত হয়ে আছে। বেণুবন নামক বিম্বিসারের প্রিয় কাননটি তিনি দান করেছিলেন বুদ্ধদেবকে বিশ্রামের জন্য।

রাজমহিষী ক্ষেমার রূপগর্ব এবং এক ভিক্ষুর রূপস্পৃহার কিভাবে অবসান ঘটান বুদ্ধদেব তার একটি সুন্দর কাহিনী রচিত হয়েছে এই রাজগৃহে।

রাজমহিষী ক্ষেমা ছিলেন অনিন্দ্যসুন্দরী। ক্ষেমার 'স্নানচূর্ণে'র মূল্য সংগ্রহের জন্য কয়েকটি গ্রামের রাজস্ব নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন রাজা বিম্বিসার। স্নানচূর্ণ মানে প্রসাধন, সেই স্নানচূর্ণের প্রতি রূপগর্বিণী ক্ষেমার প্রচণ্ড লোভ ছিল। ক্ষেমাও বিম্বিসারের ন্যায় বুদ্ধদেবকে মনে প্রাণে শ্রদ্ধা করতেন, কিন্তু ভয়ে বুদ্ধদেবের সামনে যেতেন না। ক্ষেমা শুনেছিলেন, নারীরূপকে বুদ্ধদেব প্রায়ই অসার বলে আখ্যা দিতেন। কখনো বুদ্ধদেবের উপদেশ শুনতে গেলে সবার পিছনে গিয়ে বসতেন রাজ-প্রিয়া রূপসী ক্ষেমা। অন্তর্যামী অনুভব করেছিলেন ক্ষেমার সেই রূপ-তৃষ্ণার কথা।

রূপ তৃষ্ণা একটি ভিক্ষুচিত্তকেও একদিন বিকৃত করেছিল। শ্রীমতী নামে এক নগর-প্রিয়ার গৃহে সশিষ্য বুদ্ধদেব একদিন ভিক্ষায় গ্রহণে গিয়েছিলেন। লাবণ্যময়ী শ্রীমতীর অপরূপ অঙ্গকান্তি দেখে এক ভিক্ষু রূপমুগ্ধ হয়ে পড়ে। সেই মেয়ে,

সেই ভিক্ষুকে দেখে যেন সবাই নিস্তেজ হয়ে বসে থাকতো। রূপ তৃষ্ণায় বিমর্ষ ভিক্ষু বুদ্ধের দৃষ্টি এড়ায়নি। তিনি তখনই কোন তিরস্কার করেননি ভিক্ষুকে।

কিছুদিন পরে শোনা গেল নগরশ্রিয়া রূপলাবণ্যময়ী শ্রীমতীর মৃত্যু হয়েছে। শ্রীমতীর মৃতদেহ কয়েকদিন রেখে দেওয়ার জন্য নির্দেশ পাঠালেন বুদ্ধদেব তাঁর রাজ-শিষ্য বিম্বিসারকে। দিন কয়েক পরে রাজ-মহিষী ক্ষেমা এবং সেই রূপমুগ্ধ ভিক্ষুকে সঙ্গে নিয়ে বুদ্ধদেব ও বিম্বিসার গেলেন শ্রীমতীর গৃহে। গিয়ে দেখলেন, মূল্যবান ধাতুখচিত পালঙ্কের সুকোমল শয্যায় পড়ে আছে নগর-শ্রিয়ার বিকৃত গলিত অঙ্গ।

বুদ্ধদেব প্রশ্ন করলেন বিম্বিসারকে: রূপজীবা শ্রীমতী প্রতি রাত্রির জন্য কত কার্ষাপণ ধার্য করেছিল?

বিম্বিসার বললেন: পঞ্চাশ কার্ষাপণ।

বুদ্ধদেব আবার প্রশ্ন করলেন: এখন শ্রীমতীর জন্য কত কার্ষাপণ পাওয়া যাবে?

সবিস্ময়ে কিছুক্ষণ মৌন থেকে বিম্বিসার উত্তর করলেন: এক কপর্দকও নয়। এমনকি বুদ্ধদেব আদেশ না দিলে শ্রীমতীর মৃতদেহ সৎকারের জন্যও কেউ আসবে না।

এবারে সপ্রশ্ন নয়নে বুদ্ধদেব ফিরে তাকালেন রূপমুগ্ধ ভিক্ষুর দিকে এবং আরেকবার ক্ষেমার দিকে। ভিক্ষু অনুশোচনায় মাথা নত করলো,—রূপের এই পরিণতি দেখে রূপ তৃষ্ণা তার বিদায় নেয়। ক্ষেমা কিছু বললেন না। স্নানচূর্ণের প্রলেপে যে অলকগুচ্ছকে রমণীয় করে রচনা করেছিলেন তাই তিনি বুদ্ধের পায়ে উৎসর্গ করলেন। অঙ্গ-ভূষণ, রাজসজ্জা সব পরিত্যাগ করলেন। মুণ্ডিত শিরে চীবর ধারণ করে তিনি গ্রহণ করলেন ভিক্ষুধর্ম।

বিম্বিসারের কারাগারই তাঁর জন্মী-প্রাণের পতাকা। ধর্মের জন্য যে তিনি নিজেকে বলি দিয়েছেন তারই চিহ্ন অম্লান স্মারণিক হয়ে আছে ওই কারাগৃহের ভগ্নাবশেষে।

রাজা বুদ্ধের ভক্ত হলেও, রাজপুত্র ছিল বুদ্ধ-বিদ্বেষী। রাজকুমার অজাতশত্রু তখন এই-রাজ্যের রাজপ্রধান। দেবদত্ত সংযোগ স্থাপন করলো অজাতশত্রুর সঙ্গে। দেবদত্ত ছিল বুদ্ধের জ্ঞাতিভ্রাতা এবং বুদ্ধ শিষ্য। ইচ্ছে ছিল সে বৌদ্ধ সংঘের নায়কত্ব লাভ করে। মহাপণ্ডিত ও সংঘতচিত্ত সারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়ন এই পদলাভ করায় ঈর্ষায় জর্জরিত হয়ে বুদ্ধের প্রতি কোপান্বিত হয়ে ওঠে দেবদত্ত। অজাতশত্রুর সংযোগ স্থাপন করে বুদ্ধের প্রধান স্বত্ত্ব রাজশিষ্য বিম্বিসারকে হত্যা করে রাজসিংহাসন দখল করার জন্য উত্তেজিত করে সে অজাতশত্রুকে এবং নিজে প্রতিশ্রুতি দেয় স্বয়ং বুদ্ধকে হত্যা করার।

দেবদত্ত দুবার বুদ্ধকে হত্যা করার চেষ্টা করে। একবার গৃধ্রকূটে এক বড় পাথর গড়িয়ে ফেলে দেয় বুদ্ধের উপরে। দৈবক্রমে অল্প আহত হয়ে সে যাত্রায় বেঁচে যান বুদ্ধদেব। এ চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে আবার দেবদত্ত বুদ্ধ হত্যার দ্বিতীয় চেষ্টা করে। রাজপথে এক প্রমত্ত হাতিকে দেবদত্ত লেলিয়ে দেয় পদযাত্রী বুদ্ধদেবের প্রতি। কিন্তু অমিতাভের করুণাঘন চোখের দিকে চেয়ে হয়তো হাতিও বিস্মিত হয়ে যায়। বাড়িয়ে দেওয়ার পরিবর্তে সব হাতি শুড় লুটিয়ে দেয় বুদ্ধের চরণ তলে। এই ঘটনায় বুদ্ধদেবের দেব-মাহাত্ম্য আরও জ্যোতির্ময় হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

অজাতশত্রু কিন্তু রাজ অমাত্যদের সঙ্গে চক্রান্ত করে বন্দী করে পিতা বিম্বিসারকে এবং নিজে রাজগৃহের সিংহাসনে বসে পিতাকে আবদ্ধ করে রাখে রাজগৃহের কারাগারে। সেই থেকে বিম্বিসারের জীবনের শেষ আশ্রয় ছিল এই কারা-গৃহটি। বিম্বিসারের শুধু একটু সান্ত্বনা ছিল ওই গৃধ্রকূট। কারাগৃহের দুয়ার থেকে উন্মুক্ত আকাশের কোণে দেখা যেত গৃধ্রকূট। প্রভাতের সোনালী রোদে ছেয়ে যেত বুদ্ধদেবের শিলা-শিখরের আশ্রয়টি। সন্ধ্যার আগে গোধূলীর ম্লান আলোকে ধূম্রাভ-রক্তিম হয়ে উঠতো সেই বৌদ্ধবার

এক নদী আলো

রবীন্দ্র বিশ্বাস

যে শুধু যন্ত্রণা দেয়
যে শুধু আকর্ষণ দেয়
পিপাসা আকাশ ভরা
বাথার বিকীর্ণ মালা,—দেয়
মলিন আলোর ম্লান ছায়া
কী আশ্চর্য, তোমাকে দিয়েছে মুঠি ভরে
সেই শুধু মধুর লাবণ্য-দ্যুতি
নদীর মতন মনোহরা !!

তুমি কি তোমার ঘোর
নির্ভয়ে রেখেছো খোলা
যে কোনো বসন্তে চিরদিন !
তরঙ্গিত আকাশের আলোয় সমুদ্র দেখে
মুহূর্তের লক্ষ কল্প
নিষ্পলক তাকাতে পেরেছো !
দ্বিধা নয়, ভয় নয়, এখনকি নির্জনতা তাও
শ্রাবণের বিষণ্ণ দুপুরে
তুমি কি শোননি কোনোদিন !!

আমিতো তোমার মতো
দুঃসাহসী নই ! খুলিনি দরোজা !
শিশিরের মতো, না-না, শিউলির মতো
শুধুরা আমার ঘোরে বেদনা বিছিয়ে
ফিরে গেছে ! আমি তাই ভাবি—কোথায় সে গেলো !
তুমি তা'র সমুত্তর ! ···যা'রা
ফিরে গেছে অনিচ্ছায় এই ঘোরে বেদনা বিছিয়ে
বকুলের ঘ্রাণ হ'য়ে তা'রাই কি তোমার তোমাতে
হৃদয়াভিরাম আহা হ'য়েছে কী মনোহরা নদী !!

(গিরিব্রজাভিমুখে)

শিখরটি। জ্যোৎস্নাস্নাত রজনীতে স্থির আশীর্বাদের মত গৃধ্রকূট যেন হাত বাড়িয়ে দিত বিম্বিসারের প্রতি। গৃধ্রকূটের দিকে চেয়ে চেয়ে শান্তিলাভ করাই ছিল বন্দী রাজার শেষ তপস্যা।

শেষের দিনগুলিতে অনশনে রেখে অজাতশত্রু নিঃশেষ করে দেয় পিতা বিম্বিসারকে। শোনা যায় বিম্বিসারের মৃত্যুর আগে অজাতশত্রুর একটি পুত্র লাভ হয়। পুত্রস্নেহের এই অনাস্বাদিত অনুভূতিতে অজাতশত্রু চকিত হয়ে ওঠে। মনে পড়ে তার শৈশবের পিতৃস্নেহের কথা। অনুতপ্ত হয়ে পুত্র ছুটে যায় পিতাকে কারামুক্ত করার জন্য। কিন্তু গিয়ে দেখে দীপের শেষ শিখাটুকু তখন নিঃশেষ হয়ে গেছে। অনশন-ক্লিষ্ট কংকালসার বিম্বিসারের গৃধ্রকূটাভিমুখী দৃষ্টি স্থির ও নিস্পন্দ হয়ে দেহটি কঠিন হয়ে গেছে।

রাজারূপে বিম্বিসার অভিশপ্ত, কিন্তু ধর্মাত্মারূপে তিনি ধন্য। বিম্বিসারের কারাগৃহের ওই জীর্ণ-ভগ্ন পাথরগুলি আজো সেকথারই সাক্ষ্য বহন করে পড়ে আছে।

(ক্রমশঃ)

কালপুরুষ :

• উপন্যাস •

বিহির মুখোপাধ্যায় ..... গতবারের পর .....

[সতের]

আজ সরস্বতী পুজো। বারাক-বাড়ীর সামনে ফাঁকা জমিটায় পুজোর প্যাণ্ডেল তৈরী হয়েছে। জলদার জন্ত খানিকটা জায়গা ঢেকে দাদিয়ানা খাটানো হয়েছে। ছেলেরা একটা মাইক ভাড়া করে এনেছে, সঙ্গে একটা গ্রামোফোন আর কয়েকখানা হিন্দী-বাঙলা গানের রেকর্ড। আগের দিন রাত্তির থেকেই বাজাতে শুরু করেছে। ওই কখানা গানই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বাজাচ্ছে। পুরনো রেকর্ড, গানের কথা স্পষ্ট নয়, বীভৎস সুর বার হচ্ছে। কান ঝালাপালা করে দিল।

রায়-মশাই মনে মনে অস্থির হয়ে উঠেছেন, কিন্তু মুখে কিছু বলছেন না। বাড়ীর সকলের উৎসাহ, শান্তিশ্বর সেক্রেটারী। শৈলেশ, দত্ত আর দেবানীতো সকাল থেকে ওখানেই আছে। স্বরেশ্বর সাধারণতঃ এসব ছেলেমানুষী হৈচৈ-এর মধ্যে যায় না। কিন্তু সেও প্যাণ্ডেল তৈরী কিম্বা দাদিয়ানা খাটানোর সময়, পাশের বাড়ী থেকে ইলেকট্রিকের তার এনে লাগানো কিম্বা দেবদারু-পাতা দিয়ে গেট সাজাবার সময় ছেলেদের সঙ্গে সঙ্গে থেকেছে। সুতরাং রায়-মশাই কিছু বলেননি যতটা সম্ভব সহ্য করে থাকবেন ভেবেছিলেন। শুধু দেবানীকে একবার ডেকে জিজ্ঞেস করেছিলেন—"ওসব কোন দিশি গান বলোত মা, সারাজীবন বড় বড় ওস্তাদের পেছন পেছন ঘুরে নানা ঘরানার গান-বাজনা শুনেছি, কিন্তু এরকম উদ্ভট গানতো কখনো শুনিনি।"

বিপিন তামাক সেজে এনেছিল, মাথা চুলকে মুখ নিচু করে বলল—"আইজ্ঞা অইসব হইছে বোম্বাই গান।"

দেবানী খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল।

রায়-মশাই বিরক্ত মুখে বললেন—"হেসো না মা, কি যে রুচি হচ্ছে তোমাদের দিন দিন, ছিঃ ছিঃ, এতদিন সেতার শিখে, খাঁ-সাহেবের কাছে তালিম নিয়ে এখনো এইসব রুচিকে প্রশ্রয় দিচ্ছ।"

দেবানী হাসি থামিয়ে বললো—"বাঃ, আমাকে বকছো কেন, আমার কথায় কি হবে, বড়দা'কে ডেকে বলো, ছোড়দার বন্ধুদের বলো।"

—"আমার আর কাউকে কিছু বলে দরকার নেই, তোমাদের যার যা খুশি ক'রো।"—রায়-মশাই বিপিনের হাত থেকে গড়গড়ার নলটা নিয়ে তাকিয়া ঠেস দিয়ে আধশোয়া ভাবে বসে রইলেন।

দেবানী গিয়ে শান্তিশ্বরকে বোধহয় কিছু বললো, ছোড়দাকেও বললো। খানিকবাদে কিছু সময়ের জন্ত মাইক বন্ধ হ'লো।

পুরুতঠাকুর পুজোয় বসেছেন। পুজোর পর অঞ্জলি দেবে ছেলে-মেয়েরা। একটু বেলায় হাজির হ'ল শান্তনু। ধুতি, স্যাণ্ডেল, পাট-ভাঙা আদ্দির পাঞ্জাবী, বেশ দেখাচ্ছিল। প্রথমেই দেখা কমলার সঙ্গে। পুজো-মণ্ডপের একপাশে বসে চন্দন ঘষছিল। ঠোঁট উল্টে ঠাট্টার সুরে বললো—"সেজেগুজে রো-পাউডার মেখে এতক্ষণে এলেন বাবু, যাও উপরে যাও, বড়দি এসেছে।

—"তাই নাকি, কতক্ষণ"—তাড়াতাড়ি দোতালায় গেল শান্তনু।

কাত্তিক দত্ত আর মমতাদি এসেছেন, সঙ্গে চার বছরের মেয়ে টিকলু।

টিকলু দাদাকে রেখে ঝাঁপিয়ে কোলে এলো।

দত্তজাদি বললেন—"হারে তনু, দিদির বাড়ীতে ঘুলেও যাস্ না, বেঁচে আছি না মরেছি একবার খোঁজও নিস্ না।"

শান্তনু টিকলুকে আদর করতে করতে জবাব দিল—"কেন সেদিন যে গেলাম, বিজয়া দশমীর পরের দিন।"

দিদি গালে হাত দিলেন—"ওমা, সেতো কোন জন্মে, বিজয়া দশমী আর পয়লা বোশেখ ছাড়া বুঝি যাওয়া যায় না।"

কার্তিক দত্ত টিপ্পনী কাটলেন—"তোমার ভাই এখন লায়েক হয়েছে, মাঝে মাঝে পথে-ঘাটে দেখা হয়।"

শান্তনু সন্দেহের চোখে তাকাল। সেই একবার পুজোর আগে জামাইবাবুর সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয়েছিল, সঙ্গে ছিল দেবানী। সেকথা এখন ফাঁস করে দেবেন নাকি। বেশীক্ষণ আর দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপদ নয়। ভাগ্নীকে বললো—"চলরে টিকলু, আমরা বুকুস কিনে আনি।"

টিকলুর ভাষায় বুকুস মানে বিস্কুট। পেট্রোল-পাম্পের পাশের একটা দোকান থেকে বিস্কুট কিনে ফিরল। পুজো-মণ্ডপের সামনে দেবানীর সঙ্গে দেখা। বাসন্তী রঙের একখানা শাড়ী পরেছে, আঁচলটা কোমরে জড়ান, পিঠের ওপর ভেজা চুলে একটা গিট দেয়া, কপালে চন্দনের টিপ, চোখে কাজল।

চোখাচোখি হতেই একটু হাসল। কাছেই কমলা দাঁড়িয়েছিল, সুতরাং কেউই আর কথা বলার সাহস পেল না।

ভাগ্নীকে কোলে নিয়ে শান্তনু যেমন এসেছিল তেমনি পাশ কাটিয়ে সোজা দোতলার সিঁড়ির দিকে চলে গেল। সিঁড়ির কয়েকধাপ উঠেছে, এমন সময় তাড়াতাড়ি পেছন থেকে এসে তরতর করে উপরে উঠতে লাগল দেবানী।

শান্তনু একটু হেসে বললো—"ইস্, খুব ব্যস্ত দেখছি যে, ভাবখানা যেন কত কাজ করছো। আসলে করছো না কিছুই, শুধু একটা পোজ নিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছ।"

দেবানী বললো—"থাক খুব হয়েছে, আর কাজলামি করতে হবে না, এত বেলায় আসা হ'ল কেন?"

শান্তনু জবাব দিল—"আসতে আসতে দেরি হয়ে গেল।"

—"সন্ধে অব্দি থাকা হবেতো, না আবার হট্ করে চলে যাওয়া হবে।"

দু'জনে পাশাপাশি উঠছিল। শান্তনু বললো—"থেকে যাবার ইচ্ছে আছে।"

দেবানী আর দাঁড়াল না। হঠাৎ জিভ বার করে মুখখানা একটু নেড়ে ভেংচি কেটে নিজেদের ঘরে গিয়ে ঢুকল। শান্তনুও হাসিমুখে জেঠামশাইর ঘরের দিকে পা বাড়াল।

সন্ধ্যার পর কয়েকটা জোরালো আলো জ্বালিয়ে জলসার আসর সাজানো হ'ল। কয়েকটি গান, গোটা দুই আবৃত্তি, দেবানীর সেতার, সভাপতির ভাষণ, সবশেষে সংঘের ছেলেরা ছোট্ট একটি নাটকের অভিনয় করবে। থিয়েটারের ষ্টেজ সাজাবার জন্য এঘর-ওঘর থেকে রঙিন সিল্কের শাড়ি, ভাল সতরঞ্চী, নকসা আঁকা মাদুর যোগাড় করা হয়েছে।

পেছনে টানাবার জন্য ছেলেরা দু'টো সিনও ভাড়া করে এনেছে। একটা রাজসভা আর একটা বোধহয় বাগানের দৃশ্য, তাতে হরিণ, ময়ূর সবই আছে।

কার্তিক দত্ত, শ্রীনাথ কবিরাজ মহা উৎসাহে ছেলেদের তালিম দিচ্ছেন। শান্তিশ্বর এদিক-ওদিক তদারক করে বেড়াচ্ছে। সত্য বাড়ীটায় সকলেই খুশি।

কিন্তু রায়-মশাইর হয়েছে মহা-যন্ত্রণা। দুপুরে কিছু সময় চুপচাপ থাকার পর আবার বিকেল থেকে সুরু হয়েছে সেই উৎকট গান। তারপর সন্ধ্যা না হতেই মাঝে মাঝে বেঁড়ে গলায় কে যেন বলছে—"আমাদের অনুষ্ঠান এখুনি শুরু হবে, আপনারা আসুন।" ঘণ্টাখানেকের মধ্যে অন্ততঃ বার পঁচিশেক এই কথাটা শুনলেন তিনি। কি আপদ। এরা দেখছি পাগল না করে ছাড়বে না।

সর্বেশ্বর রায় অস্থির ভাবে খড়ম খটখট্ করে ঘরের মধ্যেই ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন।

এবার পাশের ঘরে উঁকি দিলেন। দেবানী খুব সেজেছে, বৌদির একখানা দামী শাড়ী। চোখে কাজল, লম্বা বেনীতে বেলফুলের মালা জড়ানো। সেতার নিয়ে কি যেন করছিল। রোজের মত আজও বোধহয় তার কাছে বসে বাজাতে চায়।

রায়-মশাই বললেন—"আজ কি সুবিধে হবে মা, সে গোলমাল, তুমি ওদের ওখানে থিয়েটার দেখতে যাবে না?"

দেবানী একটু হেসে জবাব দিল—"তুমি জানো না বাবা, আমি যে আজ ওদের ওখানে বাজাব।"

রায়-মশাই এক মুহূর্ত থমকে রইলেন, তারপর স্পষ্ট বিরক্তির সঙ্গে বললেন—"ওদের ওখানে বাজাবে কি, ওরা কেউ গান-বাজনার কিছু বোঝে নাকি, তুমি এতদিন যা শিখেছ তার কদর ওরা কি বুঝবে, না ওখানে গিয়ে বাজাতে হবে না, যেতে হয় যাও, চুপচাপ থিয়েটার দেখে এসো।"

নিজের ঘরে এসে খাটের ওপর গুম্ হয়ে বসে রইলেন। খানিকবাদে রায়-গিন্নী এলেন—"তুমি নাকি বাণীকে জলসায় যেতে বারণ করেছ, মেয়ে তো কাপড় ছেড়ে মুখভার করে বসে আছে।"

—"হ্যাঁ, বারণ করেছি" —রায়-মশাই কড়াস্বরে বললেন —"অতবড় মেয়ে বাইজীর মত সেজেগুজে ছেলে-ছোকরাদের সভায় গিয়ে সেতার বাজাবে, তোমাদের কি বুদ্ধি-শুদ্ধি লোপ পেয়েছে।"

—"ওরা কি যেমার কথা, তুমি অত খারাপ ভাবছ কেন? ও শান্তি, শুনে যা তোর বাপের কথা—" বকতে বকতে রায়-গিন্নী চলে গেলেন।

একটু পরে শান্তিধর এলো।

—"আমরা চেনা-জানা পাঁচজন রয়েছি যেখানে, এই বাড়ীরইতো সব জানা-শোনা ভদ্দরলোক" —নরম গলায় বাপকে বোঝায় সে—"সেখান তাদের সামনে গিয়ে বাজাতে দোষ কি, আর পাঁচজনে যদি না শুনলো ভালমন্দ কিছু না বললো, তাহলে এ বাজনা শিখে লাভ কি?"

রোজগার করা ছেলে, তার উপরে পেটে বিদ্যেও আছে। তার একটা মতামতের মূল্য বাপের কাছে অনেক বেশি।

কিছুক্ষণ ভেবে ধীরে ধীরে জবাব দিলেন রায়-মশাই—"তুমি যা ভাল বোঝ কর, বিদ্যের বোঝা যেয়ে সব দায়-দায়িত্ব তোমার, আমি আর কটা দিনই বা আছি, আর একটা কথা কি জানো, ওখানে ছেলে-ছোকরাদের ভীড়ই হবে বেশী, ওদের মধ্যে ক'জন রাগ-রাগিনীর কতটুকু বোঝে বলতে পারো, যদি জ্ঞানী গুণীদের আসরে গিয়ে বাজাত, সে ছিল আলাদা কথা।" একটু থেমে, কিছু ভেবে আবার বললেন—"তা তুমি যখন বলছো, তবে যাক্ বাজিয়ে আসুক।"

খুশি মনে আবার সাজ-গোজ করে সেতার হাতে দাদার সঙ্গে নিচে গেল দেবানী, মা-বৌদিকেও তাড়াতাড়ি খাবার জন্য তাড়া দিয়ে গেল। খানিকবাদে নাতনিকে দুধ খাইয়ে, ঘুম পাড়িয়ে, লালপাড় শাড়ি পরে, পানের ডিবে হাতে নিয়ে হাসি হাসি মুখে রায়-গিন্নীও গেলেন, সঙ্গে অনুরাধা। ঘরে শুধু বিপিন আর রায়-মশাই।

মাইকের আওয়াজে সরু-মোটা পাঁচমেশালী গলার গান শোনা গেল, বোধহয় উদ্বোধনী সঙ্গীত। জলসা শুরু হয়েছে।

সেদিকে কান দিলেন না রায়-মশাই। চোখে চশমা এঁটে, লণ্ঠনের আলোটা উসকে দিয়ে কাশীরাম দাসের মহাভারতখানা টেনে নিয়ে বললেন—"এই বিপিন শোন, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর রাজা যুধিষ্ঠির আত্মীয় স্বজনের শ্রাদ্ধাদি শেষ করে, তর্পণ করতে বসেছেন, এমন সময় কুন্তীদেবী এসে বললেন—

"জ্যেষ্ঠ সহোদর তব কর্ণ অঙ্গপতি।
তাহার তর্পণ কর ধর্ম নরপতি।

স্বর করে পড়ে যান তিনি। বিপিন শোনে আর তামাকের কল্কিতে ফুঁ দেয়। লণ্ঠনের ম্লান আলোয় দুজনের মন কালো ছায়া পুরনো দেয়ালটা অন্ধকার করে রাখে। ওদিকে

জলসার আসরে পর পর কয়েকখানা আধুনিক হিন্দী-বাংলা গান শেষ হ'ল। শান্তিস্বরের অফিসের এক গায়ক-বন্ধু খুব হাততালি পাচ্ছে।

তারপর একসঙ্গে সেতারের টুং টাং শুনে রায়-মশাই যেন সজাগ হয়ে উঠ্‌লেন।

বিপিন মড়েচড়ে বস্‌লো—"দিদিমণির সেতার মনে অয়, শোনতে যাবেন নাহি, কর্তা।"

—"হ্যাঃ, আমি যাব ওই ছোকরাদের মধ্যে, যা পড়ছি তাই শোন্।

আবার মহাভারতের পাতায় চোখ নামালেন, কিন্তু আর পড়া হ'ল না।

সেতারে তখন পুরিয়া কল্যাণের আলাপ শুরু হয়েছে। কোথাকার এক ছোকরা তবলা ধরেছে, মাইকে তার নামটাও জানানো হ'ল। আনমনেই বই বন্ধ করে সেদিকে কান পাতলেন রায়-মশাই। বেশ কিছু সময় আলাপ শুনলেন। তারপর সমের মুখে আসতেই ভুরু কুচ্‌কে মাথা নাড়লেন, ছোকরা ধরতে পারছে না। চশমাটা খুলে রাখলেন। এহে তাল কেটে ফেলছে, সঙ্গত ঠিক হচ্ছে না—একদম আনাড়ী।

এই বিদ্যে নিয়ে বাপু সভায় গিয়ে বসেছিস্ এমন চমৎকার সুরটা মাটি করে দিলি, ছি ছি বসে থাকা যায়। কানে তো আর তুলো দিয়ে বসা যায় না। মাইকের উদ্দাম আওয়াজ বোধহয় আধমাইল দূর থেকে শোনা যাচ্ছে। নাঃ, এরা তাঁকে পাগল করে দেবে। খাট থেকে নেমে অস্থির ভাবে পায়চারী করেন রায়-মশাই।

খড়মের খট্ খট্ শব্দ ঘরের এধার থেকে ওধারে যায়। দুয়ার পেরিয়ে বারান্দায় কিছুদূর তারপর আবার ফিরে আসে এধারে।

—"ও বিপিন, শুনছিস কিছু!"

একটু আগে রোজের মত একরত্তি আফিম খেয়ে বিপিনের ঝোঁঝর ঝিমুনি ধরেছিল। মাথাটা ঝুকে পড়েছিল সামনে। তাড়াতাড়ি সোজা হয়ে চোখ মুছে বল্‌লো—"হ, শোনতাছি, দিদিভাই বেশ বাজাইতাছে।"

—"ছাই শুনছিস, তুই, সো-মুখ্যু কোথাকার।"—রায়-মশাই জ্বলে উঠ্‌লেন—"এই নাকি সঙ্গত হচ্ছে। তবলার জন্য এমন চমৎকার সুরটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। মেয়েটার হাত খুলছে না, এই জন্যই আমি বারণ করেছিলুম। ও ছোঁড়া পারবে কেন, এতো আর সস্তা সিনেমার গান নয়। পাঁচজন ভদ্রলোকের সামনে—ছি ছি, কি কেলেঙ্কারী!"

তাঁকে সত্যিই এরা পাগল করে দেবে। বেতালা বাজনা শুনতে পারেন নি কোনদিন, সহ্য করেন নি কখনো। অনেক-দিন আগে রায়-বাড়ীতে এক ঠুংরীর আসরে এমনি ধারা কাণ্ড হয়েছিল। বিদেশী ওস্তাদের সঙ্গে এসেছিল এক শিল্প তবলচি। তাল কেটে ফেলেছিল পর পর দু'বার। ওস্তাদ গাইয়ে শিল্পের দোষ ঢাকার প্রাণপণ চেষ্টা করলেও রায়-মশাইকে ঠেকি দিতে পারেন নি। আজম খাঁ সাহেবও মিটিমিটি হেসেছিলেন। হাসিমুখে একবার তাকিয়েছিলেন রায়-মশাইর দিকে। তিনি তখন তবলচিকে আসর থেকে তুলে দিয়ে ওস্তাদের কাছে হাত জোড় করে বলেছিলেন—"ওস্তাদজী, আপনি একাই গান, সঙ্গতের আর দরকার নেই।"

খড়মের শব্দ ঘরের এধার থেকে ওধারে যায়, শেষে দুয়ার পার হয়ে বারান্দার খানিকটা গিয়ে আবার ফিরে আসে এধারে। ওপাশে নিবারণ মাষ্টার আর তারাচরণবাবুর ঘর অন্ধকার, সবাই জলসা শুনতে গেছে। বিপিন আবার ঝিমিয়ে পড়েছে। দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে, দুই হাঁটুর মাঝে মাথাটা একবার নেমে আসছে আবার খড়মের খট্‌খট্ শব্দ একটু যেন সজাগ হয়ে অতিকষ্টে মুখ তোলার চেষ্টা করছে। রায় মশাই আর ওকে ডাকলেন না। একবার সিঁড়ির কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। তারপর বিপিনের মনে হ'ল খড়মের খট্‌খট্ শব্দটা যেন সিঁড়ি ধরে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। নেশার কুয়াশাটা যেন ঘন হয়ে এসেছে, একবার খুব কাছে

চোখ তুলে তাকাবার চেষ্টা করল। ঘড়ঘড়ের শব্দ আর কানে আসছে না। বোধহয় ভাবল, যাক্ বাবা কর্তা আর ডাকবেননা, এবার একটু অবসর করে নিন্‌ই।

ওদিকে দেবানী তখন রাজসভার দৃশ্য পেছনে রেখে সেতার বাজাচ্ছিল। কেন বিরক্ত মুখে কোনরকমে বাজাচ্ছে! তাল সঙ্গত না হলে বাজিয়ে সুখ নেই। মাঝে মাঝে তাল কেটে যাচ্ছে। কিন্তু পুরোপুরি না বাজিয়ে মাঝখানে ছেড়ে দিতে পারে না। দাদার বন্ধুনি, মেজদার ঠাট্টা শুনতে হবে, শান্তনু মুখ টিপে হাসবে।

মা-বৌদি আর ছোড়দাও নিশ্চয় তাকিয়ে আছে তার দিকে। অবশ্য সামান্য ভুলচুকের দিকে বিশেষ কারো দৃষ্টি নেই। মোটামুটি অনুষ্ঠান হচ্ছে, ব্যারাক-বাড়ীর বাঁধাধরা জীবনে বছরের এই একটা দিন যে অন্যরকম—এতেই সবাই যেন খুশি। সর্বেশ্বর রায় আধো-অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে খটখট করে নামলেন, পেছনের উঠোন ঘুরে আসরের আলোর কাছে এলেন। কার্তিক দত্ত তাঁকে দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি উঠে এসে বললেন—"আসুন, আসুন।" শান্তিস্বরও এগিয়ে এলো।

কারোদিকে তাকালেন না তিনি। সোজা চেয়ের পাশে এসে দাঁড়ালেন।

রায়-গিন্নী, সুরেশ্বর, অনুরাধা উদ্বেগের চোখে তাকাল, রায়-মশাইর মেজাজ তাদের অজানা নয়। দেবানীর বাজনা বন্ধ হ'ল। শ্রোতারা চঞ্চল হয়ে উঠেছে, ফিস্‌ফিস্ গুঞ্জন শুরু হয়েছে। কার্তিক দত্ত একটু অপ্রতিভ মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। কি করা উচিত শান্তিস্বরও বুঝতে পারছে না। রায়-মশাই কিন্তু আশ্চর্য ঠাণ্ডা গলায় বললেন—"একটু সরে বসোত বাবা, আমি একহাত বাজাই।"

ছোকরা তবলচি একটু ইতি-উতি করে সসংকোচে আসন ছেড়ে দিল। কার্তিক দত্ত তার কানে কানে কি যেন বলে সরিয়ে দিলেন। ছেলেটি রুমাল বার করে ঘর্মাক্ত মুখ মুছতে মুছতে আসরের একপাশে একটা খালি চেয়ারে বসে মুখ নিচু করে রইল। দেবানী অবাক, বাবা এসে বাজাতে চেয়েছেন, আশ্চর্য, তাবাও যাচ্ছে না। আসরের গুনগুন শব্দটাও যেন স্তব্ধ হয়ে আছে।

রায়-মশাই কিন্তু এসব কিছুই দেখলেন না। বাঁয়া-তবলা কাছে টেনে সোজা হয়ে বসলেন। ছোট্ট হাতুড়ি নিয়ে বারকয়েক টুকটুক করে সুর বাঁধলেন।

তারপর দেবের দিকে চোখ তুলে বললেন—"বাজাও মা, আবার গোড়া থেকে সুরু করো!"

সুরের ঝংকারে তাল মিলিয়ে তবলার হাত নেচে উঠল। সেতারের পর্দায় দেবানীর কচি আঙুল ক্ষিপ্রস্বরে ওঠানামা করে। অন্তরা থেকে সঞ্চারী, তান আর বিস্তার। রায়-মশাই চোখ বন্ধ করে সাবধানে বাজাচ্ছেন।

যেন সেই রায় বাড়ীর নাচ ঘরের আসর। সামনে যেন বুড়ো আঙুল খাঁ সাহেব বসে আছেন। বুড়ো খুব হুঁশিয়ার লোক। সামান্য কিছু ভুল হলেই ঠিক ধরে ফেলবে আর কাঁচাপাকা দাড়িতে আঙুল ডুবিয়ে মিটিমিটি হাসবে। চোখ খুললেই যেন নাচঘরের খোলা জানালা দিয়ে দেখতে পাবেন, রায়-বাড়ীর পুকুরের পাশে স্বর্ণচাঁপা গাছের ফাঁকে রুপালার ঘোমটা পরা শ্রীপঞ্চমীর চাঁদ।

[আঠার]

সরস্বতী পুজোর পর কয়েকটা দিন রায়-মশাই কেমন চুপচাপ হয়ে গেলেন। কার্তিক দত্ত, তারাচরণবাবু, শ্রীনাথ কবিরাজ, সবাই তাঁর বাজনার প্রশংসা করে গেছেন। শক্তি সংঘের ছেলেরা সেদিনের সভায় যতটা বিরক্ত হয়েছিল, তাঁকে যতটা দায়িত্ব মনে করেছিল, তাদের সে বিরক্তি এখন অনুরক্তিতে পরিণত হয়েছে। শৈলেশের বাবার বাজনা সম্বন্ধে তারা উৎসাহিত। এমন একজন গুণী কি আছেন

তাদের বাড়ীতে একথা ভেবে মনে মনে যেন গর্বিত। রায়-গিন্নী, শান্তিস্বর, সুরেশ, বৈদেশ, অনুরাধা, দেবানী—ঘরের সবাই অবাক হয়েছে, খুশি হয়েছে।

কিন্তু মনে মনে স্বস্তি পাচ্ছেন না রায়-মশাই। কিছুতেই ভেবে পাচ্ছেন না, কি করে তিনি সেদিন ওদের মধ্যে গিয়ে বাজিয়ে এসেন। সেদিন যে কি খেয়াল হয়েছিল, মাথার মধ্যে কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। কি করে সিঁড়ি ধরে নামলেন, কেমন করে উঠোন পার হয়ে আসরের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। সেখানে কে কে ছিল, কাকে কি বলেছিলেন, কিছুই যেন তখন আর ভাল করে মনে আনতে পারছেন না।

শুধু একটি চিন্তাই তখন মাথার মধ্যে ছিল, এমন চমৎকার সুরটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, যেন একখানা সুন্দর শাড়িতে কেউ আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, যেন দেবানীর গায়ে বৌমার সেই চমৎকার শাড়িখানা। শুধু মনে হয়েছিল, তিনি কাছে থাকতে, তাঁর আদরের বাণী, রায়-বংশের মেয়ে, অজয় যার ছাত্রী, পাঁচজনের সামনে বাজাতে বসে ভুল করবে, অপদস্থ হবে, লজ্জা পাবে, সবাই ছি-ছি বলবে। আর কিছু মনে নেই। বাজনার পর দেবানীর হাত ধরে কি করে দোতলায় ফিরে এসেছিলেন, তখন কারা এসেছিল, কি কথা বলেছিল, কিছুই মনে নেই। শুধু শীতের রাতেও গায়ে ঘাম ছুটেছিল। সমস্ত শরীরে অবসাদ আর ক্লান্তি। আজকাল স্মৃতিশক্তিও কেমন দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। অকারণে বা সামান্য কারণে উত্তেজিত হয়ে ওঠেন মনে মনে অস্থির হয়ে পড়েন। উত্তেজনার পর, অস্থিরতার পর কেমন ক্লান্ত মনে হয়, অবসাদ-গ্রস্তের মত বিছানায় চুপ করে থাকেন। বাড়ীর সবাই তাই শুয়ে শুয়ে থাকে, সাবধানে কথা বলে। এক বিপিন ছাড়া তাঁর কাছাকাছি বেশীক্ষণ কেউ থাকে না। শান্তিস্বর ছাড়া অন্য কেউ তাঁকে সব কথা বোঝাতে পারে না। অনুরাধা আর দেবানী শুধু ফাই-ফরমাশ শোনে। প্রথমদিকে রায়-গিন্নী মাঝে মাঝে সংসারের কথা তুলে যে সব অনুযোগ-অভিযোগ করতেন, আজকাল তাও বন্ধ।

* * *

তারপর আরো কয়েকটা মাস কোনদিক দিয়ে কি করে যেন কেটে গেল। এ শহরের দিনগুলি যেন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালায়, সমস্ত শরীর-মন দিয়েও ধরে রাখা যায় না। চৈত্রমাসে লাটের কিস্তির আগে দেশে ফিরে যাবার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। শান্তিস্বর অনেক কষ্টে বুঝিয়েছে, সেই পুরনো যুক্তি, বাড়ীর পরীক্ষাটা হয়ে যাক, ওর বিয়ের একটা ব্যবস্থা করি, সম্ভবও এ বছর স্কুলে ভর্তি হবে।

রায়-মশাই আর জোর করেন নি। মেয়ের কথা বললে নাতি-নাতনির কথা ভাবলে তিনি দুর্বল হয়ে পড়েন। ক্লান্ত মনে চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাকেন, বিপিন পা টিপে দেয়, তামাক সেজে আনে, শুয়ে শুয়েই গড়গড়ায় নল টানেন, কিম্বা কখনো ঘরের মধ্যেই পায়চারী করেন। সেদিন খুশি হয়েছিলেন দেবানীর পাশের খবর পেয়ে। হোকনা থার্ড ডিভিশন, তবু পাশতো করেছে। রায়-বাড়ীর মেয়েরা কেউ কোনদিন স্কুলের শেষ পরীক্ষার পাশ করেনি, দেবানীই প্রথম। রায়-মশাই সাধারণতঃ মেয়েকে 'তুমি' বলেন, কোন সময় আনন্দের মুহূর্তে, আবেগের আতিশয্যে 'তুই' বলেন। সম্বোধনের রীতিটা বদলে গেলেই দেবানী বুঝতে পারে বাবার কাছে আবদার করার সময় হয়েছে।

মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিলেন, রায়-মশাই—"কি দেব তোকে বল দেখি মা, কি চাস্ তুই, ভাল একখানা শাড়ি না সেই যে বলেছিলি চুড়ি ভেঙে বালা গড়াবি।" দেবানী হেসে বলেছিল—"না বাবা, ও চাইনা, আমি আই-এ পড়ব, কলেজে ভর্তি হব।" রায়-মশাই আমতা আমতা করে জবাব দিয়েছিলেন—"সে তো ভাল কথা, আরো পড়তে চাস্, খুব ভাল কথা, বেশি শান্তিকে জিজ্ঞেস করে।"

শান্তিময়র এক কথায় সায় দিল না। রাজী হবে কি হবে না ভাব্‌ছিল। কলেজে পড়ার খরচা কম নয়। মেয়েদের লেখাপড়া কিছু হচ্ছে না, ওর পেছনে বরং খরচ করা উচিত, অন্ততঃ ম্যাট্রিকটা পাশ করা দরকার। তারপর সস্তা ভর্তি হয়েছে স্কুলে, একটু বেশী বয়সেই ভর্তি হ'ল। কি আর করা, চারদিকে যেরকম টানাটানি।

রায়-গিন্নী কিন্তু স্পষ্ট না করে দিলেন। আর পড়ে কি হবে। এবার বিয়ের ব্যবস্থা করো। কলেজের পরীক্ষায় পাশ দিলে, ছেলেও তেমনি খুঁজতে হবে। মেয়েদের লেখাপড়া শেখালে ঘরের কাজে আর মন দেয় না, দিনরাত বই মুখে দিয়ে বসে থাকে। ওদিকে আবার মস্ত বিদ্বান ছেলের জন্য একগাদা টাকা বার ক'রো। দেবানী কেঁদে কেটে হাট বাধালো। তা'হলে কেন পরীক্ষা দিলাম। খেটেখুটে পাশ করে কি লাভ হ'ল। আমি কলেজে ভর্তি হবই। তোমরা টাকা না দাও, আমার চুড়ি, কানপাশা বাঁধা রেখে ভর্তি হ'ব।

রায়-গিন্নী চটে গেলেন। মেয়ের কথা শোন, সোনার জিনিস বাঁধা রেখে কলেজে ভর্তি হবে। বাপের আস্কারা পেয়ে পেয়ে এতখানি সাহস হয়েছে। মুখে মুখে জবাব দেয়।

মেজদা শুধু দেবানীর পক্ষে। মাঝামাঝি একটা রফা করল সুরেশ্বর। কলেজে ভর্তি হতে চায় হোক না। বিয়ে বললেই তো আর দেয়া যাচ্ছে না। একটি ভাল ছেলে খুঁজে পেতে আনতেও তো সময় লাগে। একেবারে বসে থাকার চেয়ে পড়াশোনা করা ভাল। সময় থাকতে ভর্তিটা হয়ে যাক আমরাও এদিকে খোঁজ খবর করি। সুরেশ্বর সঙ্গে নিয়ে দেবানীকে ভর্তি করে দিল। মস্তবড় কলেজ। ভোরে মেয়ে-ক্লাশ, দুপুরে ছেলেদের। চারদিকে গিস্ গিস্ করছে মেয়ে। চেনা-শোনা দু'একজনের সঙ্গে দেখা। ওমা, তুইও এখানে ভর্তি হবি, ভালই হয়েছে। আর কে কে পাশ করেছে জানিস, ছন্দা? আরতি? উর্মিলা? তুই কি কি নিবি ভেবেছিস্, আমি ভাই লজিক নেব, শুনেছি কঠিন, তা'হোক এখন তো নিই পরে না হয় বদলে নেব। কেমন অদ্ভুত লাগছিল দেবানীর। নতুন নাম, নতুন বিদ্যা, নতুন পরিবেশ। কেরানী-বাবু চশমার ফাঁক দিয়ে চোখ তুললেন —"কি নাম রোল কত?"

কয়েক পাতা ছাপানো কাগজে পাশ-করা মেয়েদের নাম, রোল নাম্বার।

পাতার পর পাতা উল্টে যাচ্ছেন। দেবানীর বুক চিপ্‌চিপ করছিল, যদি নামটা খুঁজে না পাওয়া যায়, যদি এখানে ছাপা না হয়ে থাকে। হয়তো কেরানী বাবু এখুনি বলবেন —"কই না, এখানে তো নেই, নাম ছাপা হয়নি।"

কিন্তু কি আশ্চর্য, খুঁজে পাওয়া গেল। ওই তো ছাপার হরফে—দেবানী রায়। কেরানী বাবু নামের পাশে লাল পেনসিলের দাগ দিলেন, ভর্তির ফর্ম দিলেন। কলেজ থেকে বেরিয়ে আসার সময় সুরেশ্বর ভাবছিল অন্য কথা। এত মেয়ে পড়ছে, পড়ার সুযোগ পাচ্ছে, সুবিধার যদি এই সুযোগ থাকত, তা'হলে হয়তো নিজের পায়ে দাঁড়াবার একটা রাস্তা খুঁজে পেত।

ভোরের কলেজ, কলেজের সামনে ট্রাম থেকে নেমেই দেবানী অবাক। গেটের কাছে শান্তনু দাঁড়িয়ে আছে। শুকনো মুখ, কেমন চিন্তার চোখে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। চোখাচোখি হতেই কয়েক-পা এগিয়ে এল। কোন ভূমিকা না করে বললো—"আমার সঙ্গে চলো, কয়েকটা জরুরী কথা আছে।"

—"এখন যাব কি করে, আমার ক্লাশ আছে যে।"

—"আমি এত ভোরে কতদূর থেকে এলাম, আর তুমি একদিন ক্লাশ পালাতে পারবে না।" —"কিন্তু যাব কোথায়? এখন তো আর বাসায় ফিরতে পারব না, এই ক'ঘণ্টা তা'হলে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে হবে।"

শান্তনু একটু ভেবে জবাব দিল—"চলো চৌরঙ্গির দিকে যাই, ওই যে একটা ট্রাম আসছে।" হাত তুলে ট্রাম থামাল।

দু'জনে উঠ্‌ল। দেবানী আর একটি কথাও বল্‌তে পারল না। শান্তনু সামনে এলে কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে যায়। আগেও দু'তিনবার এমনি এসেছে, কিন্তু কলেজ ছুটির পর। দু'জনে কিছুক্ষণ পথে হেঁটে হেঁটে কথা বলেছে। কিন্তু এভাবে ক্লাশ পালিয়ে যেতে হয়নি।

এমন কি জরুরী কথা। এর মধ্যে এমন কি ঘটল, যার জন্য এই সাত সকালে ছুটে এল শান্তনু। অবশ্য গেল সাত-আট দিন বিশেষ কোন কথা হয়নি।

আগের দিন সন্ধ্যায় তারাচরণ বাবুর ঘরে একটু সময়ের জন্য দেখা হয়েছিল, ছাড়া ছাড়া দু'একটা কথা।

ট্রাম চলেছে। দু'পাশে ভবানীপুরের দোকান পাট। ডানধারে বহুবাবুর বাজার, একটা ছোট পার্ক, তারপর এলগিন রোডের মোড়। দেবানী লেডিজ্‌-সিটে বসেছিল, দুটো আসন সামনে শান্তনু। ট্রামে লোক বেশি নেই, চলেছেও বেশ জোরে।

বাপাশে নীল পর্দা-ঘেরা টেনিস-কোর্ট, একটা ক্লাব। সারকুলার রোডের মোড় ছাড়াল। একটা পুকুর, ওপারে গাছের ফাঁকে ফাঁকে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল।

একসার রেলিঙের পাশ দিয়ে ট্রাম চলেছে। রেলিঙ্‌-ঘেরা সবুজ মাঠে প্যারাম্বুলেটার ঠেলে ঠেলে ফুটফুটে বাচ্চাদের নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে কালো কালো আয়ার দল। ফাগুনের দুপুরের ভোরের নরম রোদ, হাল্কা ঠাণ্ডা বাতাস, বেশ লাগছিল।

এত ভোরে এদিকটায় এর আগে আসা হয়নি কোনদিন। জরুরী কথার ভাবনা না থাকলে, ক্লাশ পালাবার জন্য অস্বস্তি না হ'লে, এই অচেনা পাড়ার সুন্দর সকালটা হয়তো আরো ভাল লাগত। ডিক্টোর রোড কাছে আসতেই উঠে দাঁড়াল শান্তনু, চোখের ইশারায় নামতে বল্‌লো দেবানীকে।

ভোরের স্বর্গ পেছনে রেখে দু'জনে চল্‌লো ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের দিকে।

সামনে পাশাপাশি দু'জনের ছায়া। সময়টা শেষ শ্রাবণ। কাল রাতেও দু'এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। মাঠের ঘাস, গাছের পাতা কেমন ভেজা-ভেজা। দূরে পশ্চিমের আকাশে ধূসর মেঘ। আবার বৃষ্টি হওয়া অসম্ভব নয়।

দেবানী বল্‌লো—"এবারে তোমার জরুরী কথাটা বলো।"

শান্তনু তখনো গম্ভীর, কি যেন ভাবছিল, সামনের দিকে চোখ রেখে বল্‌লো—"কাল সন্ধেবেলা কমলার মুখে শুনলুম তোমার বিয়ের নাকি সব ঠিকঠাক, অথচ আগে যেদিন দেখা হয়েছিল, সেদিন কিছু বলোনি, কালও কিছু বল্‌লে না, আমি ভাবলুম"—

দেবানী চোখ বড় বড় করে তাকাল, তারপর হেসে ফেল্‌ল —"এই তোমার জরুরী কথা, এর জন্য এতটা পথ টেনে আন্‌লে, ধন্যি মানুষ তুমি।"

—"তোমার কাছে কথাটা জরুরী না হ'তে পারে, কিন্তু আমার কাছে—সে যাক্‌, আমি কাল সারারাত ঘুমুতে পারিনি।"

—"এমন পাগলামি ক'রো কেন, একটা কিছু হলে আমি নিশ্চয়ই খবর দিতুম।"

—"তা'হলে কথাটা ঠিক নয়।"—শান্তনু স্থির চোখে তাকাল।

—"কিছুটা ঠিক, কিছুটা ঠিক নয়।"—দেবানী আবার মিটিমিটি হাসছে। "কমলাদির মুখে কথাটা শুনে, তুমি কি ভাবলে তাতো বল্‌লেন না।"

শান্তনু এখন সহজভাবেই জবাব দিল—"ভাবলুম, তোমার হয়ত মোহ কেটে গেছে, মন বদ্‌লে ফেলেছ, বিয়েতে মত দিয়েছ।"

—"এতদিন আলাপের পর, আমার সম্বন্ধে এ কথা ভাবতে পারলে তুমি।"—দেবানী এবার গম্ভীর হ'ল, দুচোখে অভিমানের ছায়া।

শান্তনু তাড়াতাড়ি বল্‌লো—"আহা, রাগ করো কেন, একটুতেই রেগে যাও তুমি।"

—"থাক্, থাক খুব হয়েছে।"—দেবানী থমথমে মুখে সামনের দিকে তাকিয়ে হাঁটতে লাগল। দু'জনে একটু চুপচাপ।

শান্তনু আবার বললো—"কমলার খবরটা কতটা ঠিক, একটু খুলে বলো, শুনি।"

দেবানী এদিক-ওদিক তাকিয়ে জবাব দিল—"আর হাঁটতে পারছি না, কোথাও একটু বসতে পারলে হ'তো।

মেমোরিয়ালের গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকে গাছের ছায়ায় একটা বেঞ্চিতে বসল।

শান্তনু তাড়া দিল—"কই, খবরটা খুলে বলো।"

—"খুলে বলব আবার কি"—দেবানী মুখ নিচু করে খাতার মলাটে পেন্সিল দিয়ে হিজিবিজি কাটতে কাটতে জবাব দিল—"বিয়ের ঠিকঠাক কিছু হয়নি, কেন কমলাদি বলেনি, পরশুদিন আমাকে দেখতে এসেছিল, ছেলের বাবা, তার সঙ্গে আর একজন কে যেন"—

শান্তনু অবাক গলায় বললো—"এই খবরটা চেপে রেখেছিলে, তুমি তো আচ্ছা মেয়ে, আশ্চর্য, কমলাও কাল কিছু ভাঙলো না, তারপর, তোমাকে দেখে গেল তারা।"

—"যাঃ, দেখবে না কেন।"

—"তুমি দেখা দিলে, একটুও আপত্তি করলে না!"

—"কেন কথা বলছে, বাবা, মাসী, কেমন ছিল দেখা না দিয়ে উপায় কি, আপত্তি যা করার সে-তো আগেই করেছি এখনো করছি।"

—"কি বোকা!" শান্তনু একটু যেন অস্থির ভাবে বললো —"একবার দেখে পছন্দ করে গেলে, তারপর তোমাকে বাদ দিয়েই তারা কথাবার্তা ঠিক করতে পারবে। তখন আর তোমাকে দরকার কি, কিছুতে দেখা যেবে না, ওইখানেই তো তোমার জোর।"

—"কি যে বলো, তার মাথা-মণ্ডু নেই।"—দেবানী মুখ তুলে একটু হাসল—"পছন্দ হলেই সব হল নাকি, বিয়ে দিতে টাকা লাগে না, টাকা কোথায়।"

—"কেন, তোমরা তো বড়লোক, জমিদার।"

—"আজ্ঞে, জমিদারী থাকলেই হয় না মশাই, প্রজাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করতে হয়, তারপর পাকিস্তান থেকে এখানে টাকা আসবে কি করে, মাঝে মাঝে অনেক কিকির-ফন্দি করে দুএকশ টাকা যা আসে, তাতো সংসারেই খরচ হয়ে যায়। মোটমাট অত তাড়াতাড়ি আবার বিয়ে হচ্ছে না, তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।"

—"নিশ্চিন্ত আর থাকতে পারছি কই! তোমার বাবা-মা যেরকম তোড়জোড় লাগিয়েছেন। আমি কিন্তু ঠিক করে ফেলেছি, কি করব।"

—"কি ঠিক করেছে?"—দেবানী উৎসুক চোখে তাকাল।

—"দু' এক মাসের মধ্যেই আমরা রেজেস্ট্রী করে ফেলব, আমি একটা চাকরী নেব, ছোট একটা বাসা ঠিক করে তোমাকে নিয়ে যাব।"—শান্তনু এমন সহজভাবে কথাটা বললো, যেন এটা একটা সমস্যাই নয়, এতে ভাবনার কিছু নেই, ইচ্ছে করলে এখুনি হ'তে পারে।

সোজাসুজি কথাটা শুনে দেবানীর কেমন লজ্জা হ'ল। অন্যদিকে মুখ ফেরাল। ঘুরে একটা ট্রাম যাচ্ছে। দু'টো লোক একপাশ ছাপল তাড়িয়ে মাঠের দিকে নিয়ে চলেছে। আকাশে আরো মেঘ জমেছে। আবার বোধ হয় বৃষ্টি হবে। শান্তনু আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে দেবানীর একটা হাত মুঠোর মধ্যে তুলে নিল—"কি কথা বলছ না যে।"

দেবানী আস্তে আস্তে জবাব দিল—"হাত ছাড়, তোমার মাথা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে।"

"—মোটেই খারাপ হয় নি, আমি সব দিক ভেবেই বলছি।"

—"তাহ'লে পড়া ছেড়ে দেবে।"

—"তাতো দিতেই হবে, উপায় কি !"

—"আহা, উপায় কি, পড়া ছেড়ে খুব বাহাদুরী দেখানো হবে।"—দেবানী মুখ নাড়া দিল, তারপর আড় চোখে তাকিয়ে একটু হেসে বললো—"শেষে সেই আমাকেই খোঁটা দেবে, তোমার জন্য পড়া ছাড়লাম, চাকরী নিলাম, ছানো করলাম ত্যানো করলাম।"

—"সে পরের কথা পরে হবে।"—শান্তনু একটু সামনে ঝুঁকে মুখ আরো কাছে আনল।

দেবানী একটু পেছনে হেলে, চোখ পাকিয়ে, ভুরু কুচ্‌কে বললো—"এই, ওকি হচ্ছে, অসভ্য !"

শান্তনু অপ্রতিভের হাসি হাসল। একটু সময় চুপচাপ।

দেবানী আস্তে আস্তে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বললো—"আমি কিন্তু এত তাড়াতাড়ি এভাবে লুকিয়ে লুকিয়ে"—

—"লুকোচুরি করার ইচ্ছে আমারো নেই, দু'দিন পরে তো জানাজানি হবেই, ভেবেছি জামাইবাবুকে সব খুলে বলবো, তারকাছ থেকে বোধহয় সাহায্য পাওয়া যাবে।"—শান্তনু একটু থেমে বেপরোয়া ভঙ্গীতে বললো—"দরকার হলে, তোমার বাবাকে, দাদাকেও আমি সোজাসুজি বলতে পারি।"

—"এ মা, না না, তা করতে যেও না"—দেবানী লজ্জার হাসি হাসল। তারপর একটু ভেবে থেমে বললো—"আমাদের বাড়ীর কেউই মত দেবে না, তবে মেজদাকে একবার বলে দেখতে পারো। কার্তিকদা গিয়ে যদি বলেন, কিন্তু খুব গুছিয়ে সাবধানে বলতে হবে।

শান্তনু সায় দিল—"হ্যাঁ, সুরেনদা বোধহয় একটু উদার, তার সাহায্য না পেলে তোমার হয়তো কলেজে পড়াই হতো না।"

—"উদার না ছাতী, আসলে মেজদার নিজের একটা ব্যাপার আছে।"—দেবানী মুখে আঁচল চেপে হাসি চাপল।

—"কি ব্যাপার তা'তো জানি না।"—শান্তনু অবাক চোখে একটু হাসল।

—"সে আমি বলব না"—দেবানী কিছুতেই বলবে না, শান্তনুও না-ছোড়। শেষে অনেক সাধাসাধির পর মুখ খুললো।

"মেজদার ছোটবেলার এক বন্ধু ছিল। আমাদের পাশের কাকার ছেলে। অনেকদিন আগে মারা গেছে। তার ছোট বোন। আমি দিদি-দিদি ডাকি। আমাদের সঙ্গে খুব আনা-শোনা। বিয়ের একবছর পর বিধবা হয়েছে। শাশুড়ী ওর স্বামী-শ্বশুর খুন হয়েছে, বাড়ী-ঘরদোর সব পুড়িয়ে দিয়েছে। সুমিত্রাদি নাকি সারারাত খিড়কির পুকুরের জলে গলা অবধি ডুবিয়ে ছিল। এখন দেশের বাড়ীতে বাবার কাছে থাকে। মেজদা'র সঙ্গে খুব চিঠি লেখালিখি হয়। এমন ভুলো মন মেজদা'র, মাঝে মাঝে চিঠিগুলি জামার পকেটেই ফেলে রাখে। আমি দু'তিনখানা দেখেছিলাম, সুমিত্রাদি'র লেখা, খুব বড় নয়, তবে মেজদা'র একখানা চিঠি দেখেছি, বেশ কয়েকপাতা। বোধহয় ডাকে দিতে ভুলে গিয়েছিল। বৌদি সব খুঁজে খুঁজে বার করে। কি লেখা ছিল। তুমি ভারী অসভ্য, আমি সবটা পড়েছি নাকি, বৌদি পড়ছিল, আমি উঁকি দিয়ে একটু দেখেছি। না, খারাপ কিছু নয়। মেজদা অনেক উপদেশ দিয়েছিল। মেয়েদের লেখাপড়া শেখা উচিত, নিজেদের পায়ে দাঁড়ান দরকার, বিয়ের ব্যাপারে তাদের স্বাধীন মতামত দেয়া উচিত, আমাদের সমাজে অসবর্ণ বিয়ে চালু হওয়া উচিত, বিধবা বিয়ে হওয়া উচিত—এই সব বড় বড় কথা।"

সব শোনার পর শান্তনু বললো—"তোমার মুখে যেটুকু শুনলাম, তা'তে মনে হয়, সুরেনদা'র কাছ থেকে কিছু আশা করা যেতে পারে।"

—"কি জানি, কি হবে"—দেবানী ফাঁকা চোখে দূরে মাঠের দিকে তাকিয়ে রইল। এলোমেলো হাওয়ায় দেবানীর চুল উড়ছে, আঁচলটা উড়ে-উড়ে যাচ্ছে, টেনে সামলে নিচ্ছে।

—"আবার ভারী লজ্জা করবে, বাতিকদা'র কাছে আমি আর মুখ দেখাতে পারব না।" —"লজ্জা করলে চলবে কেন, যখন বাবা-মা, দাদা-বৌদি সবাইকে ছেড়ে আসতে হবে তখন আর লজ্জা করে লাভ কি।"

—"বাবাকে ছেড়ে আমি আসতে পারব না।"

—"তুমি আসবে কেন, তিনিই তোমাকে ছাড়বেন।"

—"ইস্' কক্ষনো না।"

—"দেখো তুমি, আমি তাঁকে যতটুকু দেখেছি, যেটুকু বুঝেছি, তাতে মনে হয়েছে, তাঁর কাছে মেয়ের চেয়ে বংশ-মর্যাদা অনেক বড়। বনেদী জমিদার বংশের মেজাজে অসবর্ণ বিয়ে তিনি সহ্য করবেন না, করতে পারবেন না।"

দেবানী তেমনি অন্যদিকে চোখ রেখে ধীরে ধীরে বললো —"সে ঠিক, বাবাকে আমিও জানি, ছোটবেলা ভীষণ ভয় করতাম, খুব কড়া ছিলেন, আজকাল কেমন ঠাণ্ডা হয়ে গেছেন, মনে মনে বিরক্ত হলেও কাউকে কিছু বলেন না, এইতো সেদিন"—হঠাৎ দমকা ঠাণ্ডা হাওয়ায় একরাশ ধুলো আর শুকনো পাতা উড়ে আসতেই দু'জনের খেয়াল হ'লো।

দেবানী চারপাশে তাকিয়ে বললো—"ইস্ কেমন অন্ধকার করে এলো, একুণি বৃষ্টি হবে, চলো উঠি এবার।"

দুজনে সেটের বাইরে এসে রাস্তায় দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি শুরু হ'ল।

—"এবা, একেবারে ভিজে গেলাম যে"—দেবানী তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়ে বইখাতা ঢাকল। একটা রিক্সা যাচ্ছিল। শান্তনু হাত তুলে ডাকল। সেটার কাছে যেতে যেতেই অনেকটা ভিজতে হল। সামনে পর্দা ফেলে পাশাপাশি বসে চোখে চোখে তাকিয়ে দুজনেই হেসে ফেলল।

দেবানী বললো—"কি কাণ্ড হ'লো বলতো, বাড়ী ফিরে কি বলব, তুমি আর আমার সঙ্গে এসো না, ট্রামে তুলে দিয়ে চলে যেও।"

আবার ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে ট্রামে উঠে বন্ধ জানালার নীল কাচের ভেতর দিয়ে একবার উঁকি দিল দেবানী, রিক্সায় বসে-থাকা শান্তনুকে দেখার চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুই দেখা গেল না। মুষলধারায় বৃষ্টি হচ্ছে। গাছ-পালা, বাড়ীঘর সব ঝাঁঝা ঝাঁঝা। ট্রাম চলতে শুরু করেছে।

শান্তনুর কথাটা তখনো মাথার মধ্যে ঘুরছিল। "তুমি আসবে কেন, তিনিই তোমাকে ছাড়বেন।"

বাবাকে ছেড়ে আসতে হবে। বাবা তাকে ত্যাগ করবেন। কেমন যেন অসম্ভব, অবাস্তব মনে হয়। কিন্তু আজম খাঁ সাহেব নাকি হিন্দু ছিলেন, বাবার বন্ধু ছিলেন, মুসলমানের মেয়ে নিকে করে মুসলমান হয়েছিলেন। কই বাবাতো তাকে ত্যাগ করেন নি। অসহায় অবস্থা থেকে, ভবঘুরে জীবন থেকে তুলে এনে আনন্দের সঙ্গে আশ্রয় দিয়েছিলেন; সমাদরের কোন ত্রুটি রাখেন নি, কোনদিন অবজ্ঞা-অবহেলা করেননি। তবে নিজের মেয়ের ব্যাপারে অন্যরকম হবেন কেন? বাবা-মা, দাদা-বৌদি, মেজদা-ছোড়দা —সবাই তাকে এককথায় ত্যাগ করবে! বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবে, কেউ আর মুখ দেখবে না?

না না, সে কি করে হয়। ভাব্‌তে ভাব্‌তে চোখ দুটো জ্বালা করে উঠল। জল গড়িয়ে নামার আগেই আঁচল তুলে মুছে ফেলল।

তারপর বই-এর ভেজা মলাটে হাত চেপে চুপ করে বসে রইল।

বাইরে তখন মাতাল বাতাস আর বৃষ্টি, গুরু গুরু করে মেঘ ডাকছিল। (ক্রমশঃ)

অবতরণ

মীরা বালসুব্রমনিয়ন

মিনতিকে আমি প্রথম দেখেছিলাম বাসস্টপের কাছের পানের দোকানটায়। তখনো কিন্তু জানতাম না যে ওই কেশবদার মেয়ে! কেশবদা আমাদের দূর সম্পর্কের পিসতুতো ভাই। মার্চেন্ট অফিসের কেরানী। অনেক বৌদি আর ছেলেমেয়েরা থাকতেন দেশে, পাকিস্তান হয়ে যাবার পর যাদবপুরে বাসা করেছেন। কিন্তু কলকাতায় বছর দুতিন ধরে এসেছি, কেশবদার ওখানে যাবার সময় করে উঠতে পারিনি। চিঠি পত্রে কুশল আদান প্রদান চলতো। হঠাৎ সেদিন ইচ্ছে হোল যাই ওদের ওখানে। হাতে কাজ ছিল না তাই তক্ষুণি রওনা হয়ে গেলাম।

বাসটা টালুরিয়া পর্যন্ত আসার আগেই কেপে বৃষ্টি এলো। ক্যালেণ্ডারের মতে শরৎকাল—তাই রেনকোট নিয়ে বেরুইনি। অগত্যা বাস থেকে নেমে মোড়ের একটা মনোহারী দোকানের বারান্দায় উঠে দাঁড়ালাম।

মনোহারী দোকানটার গা ঘেঁষেই একটা পানের দোকান। বড়ো আয়না আর রঙ্‌বেরঙের ক্যালেণ্ডারে ভর্তি। ওখানে দাঁড়িয়ে হাসাহাসি করছিল গুটি চারেক মেয়ে। কী ওদের আলোচ্য বস্তু জানতে পারিনি। কিন্তু ওরা যে ভাবে হাসতে হাসতে এ ওর গায়ে ঢলে পড়ছিল তাতে মনে হোল বিষয়বস্তুটা রসালো। কিন্তু একটু পরেই বুঝতে পারলাম রসের উৎসটা কোথায়। রাস্তার ওপাশেই চায়ের দোকান। গুটি কয়েক ছেলে চায়ের পেয়ালা নিয়ে বসেছে। হাসছে ওরাও।

মেয়েগুলির দিকে ফিরে তাকাতেই একটিকে চোখে পড়লো। লম্বা ছিপছিপে, শ্যামলা মেয়েটি, টিকালো নাক আর চকচকে চোখ। হলুদরঙের সস্তার ভয়েলের সঙ্গে সবুজ ছাপা ব্লাউজ। মুখে রঙের আভা আর ঠোঁটে কড়া লাল লিপষ্টিক। হাসতে হাসতে অদ্ভুত ভংগীতে দুলছিল ও, শরীরের প্রতিটি রেখাকে স্পষ্ট করে।

আমার ভেতরকার মাষ্টারী মনোবৃত্তিটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। কিন্তু জানতাম কিছু বলতে গেলে নিজেই অপমানিত হবো। অগত্যা মনোহারী দোকানের রঙ্‌-বেরঙের শিশি আর কৌটার দিকে চোখ ফেরালাম।

ভাগ্যি ভালো, বৃষ্টিটা ধরে এলো একটু পরেই, কেশবদার বাড়ীর নম্বরটা লিখেই এনেছিলাম—ছোট একটা ডোবার পাশে চুনবালি খসা একটা দোতলা বাড়ী। সদর দরজার কাছেই বসে হুঁকো টানছিলেন এক ভদ্রলোক। কেশবদার কথা ওঁকে জিজ্ঞেস করতেই বল্লেন—'একতলায় ডানদিকে।"

ওঁর কথা মত গিয়ে পৌঁছলাম এক ফালি বারান্দায়। কেউ ছিলনা সেখানে কিন্তু ঘরের মধ্যে বিশুদ্ধ পূর্ববংগীয় ভাষায় তর্জন গর্জন শোনা যাচ্ছিল। নিশ্চয়ই কেশবদার গলা—মনে হোল আমার। নাড়বার মত কড়া পেলাম না। অগত্যা কেশে নিজের উপস্থিতি জানাতে হোল।

বৌদিই প্রথমে বেরিয়ে এলেন—ছোট একটা বাচ্চা কোলে নিয়ে। আমায় দেখে অবাক হয়েছিলেন হয়তো খুব—তার পরই বলে উঠলেন—'ওমা। ছবিঠাকুরঝি যে। এতদিনে মনে পড়লো গরীব বৌদিকে।"

এধরণের অভিযোগ যে শুনতে হবে তা জানতাম—তাই

কথা না বাড়িয়ে টিপ করে প্রণাম করে বসলাম। "বেঁচে থাকো, সুখী হও, ভালো ঘরে বরে বিয়ে হোক—" আশীর্বাদ করলেন বৌদি। বল্লেন "এসো ঘরে এসো—"

ঘরটা বেশ বড়ো, কিন্তু জিনিষ পত্রে ঠাসা। এক কোণে তক্তাপোষের ওপর ক্ষণীকৃত বিছানা। ওরই ওপর কাৎ হয়েছিলেন কেশবদা,—আমায় দেখে উঠে বসলেন।

ঘরের ওপাশে রাখা বালতির উনুন, হাঁড়ি কুঁড়ি দেখে বুঝলাম রান্নার পাটও এখানেই সারা হয়।

"এই তো ঘর," বৌদি আক্ষেপ করে বল্লেন,—" কোথায় যে তোমায় বসাই—"

একটা মোড়া টেনে বসে বল্লাম—"ব্যস্ত হবেন না বৌদি, এইতো বসলাম। তারপর বলুন কেমন আছেন ?"

"আর ভাই কেমন আছি—আমারও ভাঙা কপাল—" দীর্ঘশ্বাস ফেল্লেন বৌদি। কেশবদা হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন তক্তপোষ। ঘড়িতে রোদানো শার্টটা নিয়ে গায়ে দিলেন।

"কোথাও যাচ্ছেন নাকি কেশবদা ?" জিজ্ঞেস করলাম আমি।

"না বিশেষ কোথাও না। এই একটু ঘুরে আসছি। বোস তুই—" বলে বেরিয়ে গেলেন উনি।

কেশবদা চলে যেতেই বৌদি এক অদ্ভুত মুখভংগী করে বল্লেন—"পালিয়ে গেল। বুঝলে তো ছবি ঠাকুরঝি। আমাকে কী সুখেই না রেখেছে সে কথা যদি নিজের কানে শুনতে হয়—সেই ভয়ে পালিয়ে গেল।"

আর তারপর বৌদি এক নাগাড়ে কথা বলে চল্লেন—ওদের সব দুঃখ দুর্দশার কাহিনী। এই তো একখানা ঘর—এরই ভাড়া চল্লিশ টাকা। এতেই আটটি ছেলে মেয়ে নিয়ে শোয়া বসা রান্না। রোজ কলতলায় লাইন দিয়ে চান করা। "জানোতো আজকালকার বাজার—কী করে চলে বলোতো—" আক্ষেপ করলেন বৌদি

মনে মনে সময় পেলে ওঁর সারা জীবনের অভাব অভিযোগের কথা শোনাবেন বৌদি। তাই বিষয়টা বদলাবার জন্য বল্লাম—"ছেলে মেয়েদের সবাইকে তো দেখছিনা—"

"এই তো, ছোটটি—" কোলের বাচ্চাটির দিকে স্নেহ দৃষ্টিপাত করলেন বৌদি। "আর সব এদিক ওদিক ঘুরছে হয়তো। আর মিনুকে মনে আছে তো ? আমার বড় মেয়ে মিনতি ? ও এবার স্কুল ফাইনাল দেবে। কোচিং ক্লাসে পড়ছে। নিজেই টিউশনী করে নিজের সব খরচ পত্তর চালায়—"।

"তাই নাকি ! ওইটুকু মেয়ে টিউশনী পেল !"

"পাবে না কেন ? আজকালকার বাজারে টিউশনীর ছড়াছড়ি—" বৌদি তাচ্ছিল্য ভরে বলেন। "মিনুই তো কতগুলো করছে। নিজের শাড়ী জামাও তো নিজেই করে। আমাকেও দেয় মাঝে মাঝে। যাক্ চা খাবে তো ? বোসো একটু।"

চায়ের কেটলীটা হাতে নিয়ে বৌদি কলতলায় গেলেন আর একটু পরেই ওঁর গলা শোনা গেল—"মিনু, ঘরে যা শীগগীর, দেখ কে এসেছে। সেই যে তোকে বলেছিলুম একদিন—তোর সেই ছবি পিসী !"

মেয়েটি ঘরে ঢুকলে আমি কিনুতু চমকে গিয়েছিলাম। বাস স্টপের সেই হলদে শাড়ী পরা মেয়েটি। এই কেশবদার মেয়ে মিনু ? খানিক আগে দেখা ওর বিশেষ ভাবে গা দোলানোর ভংগীটা মনে পড়ে গেল।

মিনু কিনুতু একটুও চমকালোনা। বেশ সহজ ভাবে এসে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলো। বললো—"আপনিই বুঝি ছবি পিসী, আপনাকেই তো বাস স্টপে একটু আগে দেখলাম।"

নিজেকে সামলে নিয়ে বল্লাম—"হ্যাঁ, তোমাকেও তো দেখলাম। তা অত মেয়েগুলি বুঝি তোমার বন্ধু ?"

"হ্যাঁ আমরা সব কোচিং ক্লাস থেকে ফিরছিলাম কী না—"

সেদিন এর বেশী আর কথা হয়নি মিনতির সংগে। কোনক্রমে এক কাপ চা খেয়ে তাড়াতাড়িই উঠে পড়েছিলাম আমি। ফেরার পথে বারে বারে মনে পড়ছিল বৌদিদের দেশের বাড়ীর কথা। বিরাট উঠোনে লালজাঙ্গিয়া পরে ছুটোছুটি করতো ছোট্ট গোলগাল বিনু। সেই বিনু আজ এত বড় হয়েছে। কিনুকে ও যেন শুধু বড়ই হয়নি—আরো কিছু হয়েছে। কিনু না, আমি এসব নিয়ে ভাববার কে?

এরপর আর মাস দুতিন কেশবদাদের কোন খোঁজ খবর নিইনি। মিনতির কথাটাও ধীরে ধীরে মনের গহনে তলিয়ে গেছে। হয়তো ভুলেই যেতাম একেবারে। কিনুকে হঠাৎ আবার দেখা হয়ে গেল ওর সাথে।

শীতের বিকেল বেলা, একটু তাড়াতাড়িই বেরিয়ে ছিলাম সেদিন। গোল পার্কের কাছে এসে বাসের জন্য দাঁড়াতে হোল। আমার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে দুতিনটে মেয়ে জটলা করছিল। ওদের কথার দু'এক টুকরো কানে ভেসে এলো—

"সত্যি বলছিস তোর হরেনদা আমাদের কোয়ালিটিতে আইসক্রীম খাওয়াবে!" একজনের প্রশ্ন।

"সত্যি নয়তো তোদের ডেকেছি কী জন্যে? এ কী তোদের সমীর আর রমেশ পেয়েছিস নাকি? যে জাঁক করে নিয়ে গিয়ে খাওয়াবে শেষে সাদুভেলীতে?" অপরার উত্তর।

প্রথম মেয়েটির ক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"এ কিনু তোর অন্যায় মিনতি—না হয় তোর হরেনদা একটু বড়োলোক, তা বলে—"

নামটা কানে যেতে চমকে উঠলাম। কেশবদার মেয়ে মিনতি নয়তো! আরো একটু সরে এসে লাম্প পোষ্টটার পেছনে নিজেকে আড়াল করে তাকালাম। হ্যাঁ কেশবদার মেয়েইতো।

অন্যায় জেনেও ওদের কথা শুনতে লাগলাম—নিজেকে লুকিয়ে রেখে। তৃতীয় মেয়েটি এতক্ষণে মুখ খুলেছে। "আর তড়পাস্‌নি মিনতি। সমীর আর রমেশ গরীব হতে পারে কিনুকে ওরা সিরিয়াস। তোর হরেনদার বৌ আছে চারটে ছেলেমেয়ে আছে, জানিস সেকথা?"

"তাতে কী!" ফুঁসে উঠলো মিনতি। "হরেনদা কত খরচ করে জানিস, কত জিনিষ দিয়েছে আমায়, পেলে তোরা বর্তে যেতি। আর বৌ ছেলেমেয়ে থাকলে বুঝি ভালোবাসতে নেই!"

অবাক হয়ে গেলাম মিনতির উত্তর শুনে। এমন বিদ্রোহের সুর মেয়েটা পেল কোথা থেকে? আর এতো শুধু বিদ্রোহ নয়—এতো জীবনের কাঙ্খনমূল্যে অসীম প্রত্যয়ের সুর।

বাসটা এসেপড়তেই ওরা উঠে পড়লো তাড়াহুড়ো করে। আমাকেও উঠতে হোল ঐ বাসেই। এবার আমায় দেখতে পেল মিনতি। একগাল হেসে জিজ্ঞেস করলে—"ছবি পিসী যে দেখতেই পাইনি এতক্ষণ।"

"তোমাদের পেছনেই দাঁড়িয়ে ছিলাম," সংক্ষিপ্ত জবাব দিলাম আমি।

মিনতির মুখটা একটু যেন ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো। কিনু তা ক্ষণিকের জন্যে। তার পরেই সামলে নিয়ে বললো—"আসেন না কেন ছবিপিসী? মা বলছিল আপনার কথা—"

"যাবো একদিন," —জবাবটাকে আরো সংক্ষিপ্ত করে বাইরের দিকে চেয়ে রইলাম।

এর কয়েকদিন পরই আবার দেখলাম মিনতিকে। দু'টার শোতে সিনেমা দেখে ফিরছিলাম বাসে। শীতের রাতের সাধারণ এভিজ্যঁ—কুয়াশায় ঢাকা। তার মাঝে টিম টিম করে জ্বলছে পথের আলোগুলো। একটা ষ্টপে নামার যাত্রী সংখ্যা ছিল বেশী, তাই বাসটা দাঁড়ালো কিছুক্ষণ।

আর তখনই দেখলাম মিনতিকে। শীতের রাতেও ফিনফিনে শাড়ী পরে শরীরের বাঁকিম রেখাগুলো স্পষ্ট করে তুলেছে। হাসছে প্রচুর আর হাসির দমকে ঢলে পড়ছে সাগের ভদ্রলোকটির গায়ে।

কয়েকটা মুহূর্ত। তবু ভদ্রলোকটির দিকে উৎসুক চোখে তাকালাম। এই কী মিনতির হরেনদা? কত বয়েস বোঝার উপায় নেই। কেমন যেন একটা ক্রুর, একটা ক্রুর ভাব লোকটির চোখে মুখে। বাসটা ছেড়ে দিল। কিনুর মিনতির ভবিষ্যৎ ভেবে শংকিত হয়ে উঠলাম আমি। একবার মনে হোল আমি কেন বলতে যাবো। আমি ওদের দূর সম্পর্কের আত্মীয় বই তো নই। কিনুর তারপরে আবার ভাবলাম হয়তো কেশবদা ওরা জানেন না মিনতির কার্যকলাপ। হয়তো এখনো যদি ওরা জানতে পারেন মিনতিকে শোধরানো যাবে।

এই আশা নিয়েই পরের রোববারে গেলাম ওদের বাড়ী। বারান্দায় পা দিয়েই শুনি বৌদির তর্জন গর্জন। একটু কেশে ঘরে ঢুকতে যাবো এমনি সময়ে বেরিয়ে এলেন কেশবদা। "ও ছবি যে—" বলে একটু অপ্রস্তুতের হাসি হেসে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেলেন উনি।

অপ্রস্তুত আমিও হয়েছিলাম। ঘরে ঢুকতেই চোখে পড়লো তক্তাপোষের ওপর কাঁথা মুড়ি দিয়ে শোয়ানো কোলের বাচ্চাটাকে। বৌদি বসে হাতপাখা নাড়ছিলেন। আমাকে দেখে ক্লান্ত স্বরে বল্লেন—"এই যে ছবি ঠাকুরঝি—এলো।"

বাচ্চাটার দিকে এগিয়ে বল্লাম—"ওর অসুখ বুঝি?"

"হ্যাঁ ভাই। ভীষণ জ্বর আজ দু'দিন ধরে। অথচ তোমার দাদার রকমখানা দেখ—ওষুধ আনবার নাম নেই। বলে কীনা ডাক্তার খানার আগের বিলই শোধ হয়নি এখনো। কিনুর তাই বলে অসুখ হলে বাচ্চাটা ওষুধ পাবে না!'

বৌদি এবার, কেঁদে ফেল্লেন। কত যে হতাশা আর তিক্ততা ছিল সেই কান্নার মধ্যে। বল্লেন—"পালিয়ে বেড়াচ্ছে, বুঝলে ছবিঠাকুরঝি? কিনুর কতদিন পালিয়ে বেড়াবে শুনি! রোগ হলে যদি ওষুধ না জোটাতে পারো তবে বাপ হয়েছিলে কেন!"

আমি বল্লাম—"আপনি উতলা হবেন না বৌদি—আমি যাচ্ছি ডাক্তার খানায়।"

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বৌদি বল্লেন—"আচ্ছা তাই কোরো। মিনু আসবে একুণি, ওকে নিয়ে ডাক্তার খানায় যেয়ো। ওষুধের দাম কত লাগবে তো জানিনা—কিনুর তোমার কাছ থেকে সাহায্য নিতে আমার লজ্জা নেই। আর ভিক্ষাবৃত্তি যখন ধরেইছি তখন আর ঢাক ঢাক গুড়গুড় কেন!

এরপরে আর বলি বলি করেও কিছুতেই বলতে পারলাম না মিনতির কথাটা। মনে হোল কী হবে আর এদের সমস্যার ভার বাড়িয়ে। না হয় আমিই ওকে কিছু বলবো।

মিনতি এলো একটু পরেই। সব শুনে ভুরু কোঁচকালো খানিকটা। তারপর বললো—"চলুন ছবিপিসী। ডাক্তার খানা এই মিনিট পনের'র পথ।"

পথে যেতে যেতে মিনতির দিকে তাকালাম। এই সকাল বেলার আলোতেও ওর মুখ খানা কী আশ্চর্য্য রকম কঠিন দেখাচ্ছে। অথচ কতই বা ওর বয়েস। মনে পড়লো এই বয়েসে পৃথিবীটা আমাদের কাছে কত রঙীন আর সুন্দর মনে হোত। চোখে ছিল কত স্বপ্ন। আর আজকের কিশোরী মিনতির চোখে স্বপ্নের ছিঁটেফোটাও দেখতে পেলাম না।

ওরদিকে চেয়ে বল্লাম—"মিনতি একদিন আমার ওখানে এসো। আসবে তো?"

কয়েক মুহূর্ত মিনতি আমার দিকে চেয়ে রইলো। ওর কী মনে হোল এটা আমার চ্যালেঞ্জ?

কিনুর চ্যালেঞ্জ হলেও তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত মিনতি।

আমার দিকে ফিরে বললো—"হ্যাঁ, যাবো, কাল বিকেলে আপনার সময় হবে তো ?"

এত সহজেই রাজী হবে ভাবিনি। বল্লাম—"নিশ্চয়ই হবে। এসো তুমি।"

পরদিন যখন মিনতি এলো তখন সন্ধ্যে হয় হয়। দেখলাম ও একখানা সাদা শাড়ী পরেছে। অন্যান্য বেশ বাসও একটু নম্র। মনটা খুসী হয়ে উঠলো।

ওকে প্রথমে আমার ফ্ল্যাটটা ঘুরে ঘুরে দেখালাম। উৎসুক চোখে সব কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল মিনতি। বসবার ঘরের দামী সোফাসেট, ফুলদানী, কিউরিও, ড্রেসিং-রুমের বড় আয়না-ওলা ড্রেসিং টেবিলটা—আলনায় রাখা আমার টাঙ্গাইল আর মুর্শিদাবাদী শাড়ী—সব কিছু। শোবার ঘরের স্প্রিং এর খাটটার ওপর একটুখানি বসে বললো—এটার ওপর ঘুমুতে ভারী আরাম লাগে না, ছবিপিসী ?"

মনে হোল ওর কঠিন মুখ খানার আড়াল দিয়ে ছেলে-মানুষ মনটা উঁকি দিচ্ছে। খুসী মনে বল্লাম—"থাকনা মিনু এখানে ক'দিন। রাতে দুজনে ঘুমুবো একসংগে।"

"আচ্ছা আসবো একদিন—"ঘাড় নাড়লো মিনতি।

ওকে নিয়ে এবার চায়ের টেবিলে গেলাম। মিনতি উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে—"টেবিলটা কী সুন্দর সাজিয়েছেন ছবি পিসী। ঠিক রেস্তোরাঁর মতো।"

চিপট থেকে চা ঢালতে ঢালতে জিজ্ঞেস করলাম—"তুমি বুঝি রেস্তোঁরায় খেতে খুব ভালোবাসো মিনতি ?"

সপ্রতিভ ভাবে জবাব দিল ও—"রেস্তোঁরায় খেতে কার না ভাল লাগে বলুন। বাড়ীতে তো ওসব খাবার চোখেই দেখতে পাইনে। আর বড়ো বড়ো রেস্তোঁরায় কী চমৎকার করে টেবিলগুলো সাজায়।"

একটু চুপ করে থেকে বল্লে—"আপনার ফ্ল্যাটটা আমার ভারী ভালো লেগেছে, ছবি পিসী। আমার টাকা হলে ঠিক এমনি করে বাড়ী সাজাবো।"

এমনি ভাবে নানা আলতো কথায় সময় কেটে যেতে লাগলো। দেখলাম কথা বলতে মিনতি ওস্তাদ,— হাসতেও। কিন্তু ওর হাসিটা এত স্নিগ্ধ মনে হচ্ছিল যে যা বলবো ভেবে ওকে ডেকেছিলাম তা বলি বলি করেও বলা হচ্ছিল না। শেষে মিনতি যখন—'আজ তাহলে আসি ছবিপিসী—' বলে ব্যাগ হাতে উঠে দাঁড়ালো তখন মনের সবটুকু সংকোচ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বল্লাম—"আচ্ছা মিনতি, তোমার হরেনদা কোথায় থাকেন ?"

মুহূর্তে ওর মুখখানা কঠিন হয়ে উঠলো—ব্যাগের ওপর হাতের মুঠোটা হয়ে উঠলো শক্ত। আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বললো—'ছবিপিসী, আমি আপনার ছাত্রী নই—'

ওর উত্তরটা একটা চাবুকের মতো এসে আমায় আঘাত করলো। দু'একটা মুহূর্ত কোন কথা বলতে পারলাম না আমি।

আমার অপমানিত মুখখানার দিকে এক পলক তাকিয়ে ও আবার বললো,—আশ্চর্য ধারালো গলায়—"আমি জানি ছবিপিসী, একথা জিজ্ঞেস করার জন্যই আমায় ডেকেছেন। তা আপনাকে নিরাশ করবোনা, শুনুন তাহলে। হরেনদা আমাদের পাড়ায়ই থাকেন,— খুব বড়ো বিজনেস ম্যান— অনেক টাকা—অনেক খরচ করেন আমার জন্যে। —আর —আর—হ্যাঁ আমি ওকে ভালোবাসি।'

কথাগুলো এক নিশ্বাসে বলে তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল ও। একবার ভাবলাম ডাকি—কিন্তু প্রবৃত্তি হোল না।

মিনতির কথা কেশবদাকে বলবো কী না এ নিয়ে দু'তিন দিন মনে মনে তোলপাড় করলাম। একবার মনে হোল মেয়েটাকে এ ভাবে ঘরে যেতে দেবো না। এই ছোট্ট মেয়েটির সব দোষ ত্রুটি ছাপিয়ে ওর তলোয়ারের মতো ধারালো ব্যক্তিত্বটি আমায় যেন টানছিল। এই তলোয়ারের ধার কী—শুধু জীবনের সবগুলি মূল্যবোধকেই খান খান করে দেবে।

জীবনের কুশ্রীতা, যন্ত্রণা দূর করতে এগিয়ে আসবে না?

কিন্তু তবু যেতে পারলাম না। মিনতির সেই শেষ মুহূর্তের উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টিটা মনে পড়ে গেল। সাবধানী মনটা বলে উঠলো—কী হবে মিথ্যে অপমান কুড়িয়ে। মিনতি আমার কে?

শেষ পর্য্যন্ত সাবধানী মনটারই জয় হোলো। ওদের ওখানে যাবোনা ঠিক করলাম। ঠিক এই সময়েই আবার কলেজের পরীক্ষা, খাতা দেখা এ সব নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। কাজের ভীড় যখন একটু কমলো তখন দেখি শারীরিক মাশুল দিতে হয়েছে অনেকটা। ডাক্তার বল্লেন—"কমপ্লিট রেষ্ট।" ছুটি নিয়ে চলে গেলাম দার্জিলিংএ।

সেখানে মাস দুই চমৎকার কাটলো। আমার মতো যারা বছরের পর বছর কোলকাতাতেই কাটিয়েছে— যাদের গতি-পথ শুধু ব্রাসবিহারী, চৌরংগী, কলেজ ষ্ট্রীট, আর কখনো সখনো শ্যামবাজার আর গড়িয়াতেই সীমিত, দার্জিলিং বাস তো তাদের কাছে স্বপ্নই বলা চলে। যখন ফিরে এলাম তখনো যেন আমার চোখ থেকে স্বপ্নের ঘোর কাটেনি। ব্রাসবিহারীর ফুটপাথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে মনে হোতো সামনের মোড় ঘুরলেই দেখতে পাবো আকাশে জেগে উঠেছে কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়ো।

বলা বাহুল্য মিনতির কথা আমার প্রায় মনেই ছিল না। আমার চার পাশেই অহরহ দেখতে পাচ্ছি কচি কচি মুখ। সেই কচি মুখের ভিড়েই যখন মিশে গেল মিনতির মুখ খানা। এমনি করেই বেশ কিছুদিন কেটে গেল। বর্ষা তখন যাই যাই করছে। কয়েকটা টুকিটাকি জিনিষ কিনতে গিয়েছিলাম গড়িয়া হাটের হকার্স কর্ণারে। হঠাৎ দেখি পাশের একটা দোকানে ব্লাউজ পর করছেন কেশবদা আর বৌদি।

এগিয়ে গিয়ে বল্লাম—'এই যে বৌদি কেমন আছেন—ভালোতো?"

আমায় দেখে দুজনেই কেমন যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। বৌদি একটু আমতা আমতা করে বল্লেন—'তা আছি একরকম—আমাদের আবার ভালো আর মন্দ—"

এত দিন পর ওদের দেখে ভালো লাগছিল খুব। বল্লাম—"আমার বাসা তো এই কাছেই—আসুন না আপনারা—'

কেশবদা মৃদু আপত্তি জানালেন। বৌদিও কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন—আমি বাধা দিয়ে বল্লাম—"কোন ওজর শুনছিনা আজ। যেতেই হবে, চলুন।"

অগত্যা ওরা রাজী হলেন। কেনাকাটা সেরে আমার ফ্ল্যাটের দিকে রওনা হলাম সবাই। কেশবদা চুপ করে ছিলেন। বৌদি নানা কথা বলে চলছিলেন।—জিনিষ পত্রের দাম ক্রমশঃ বাড়ছে—এবার বর্ষাটা কী ভীষণ ঝুলিয়েছে বাচ্চাদের অসুখ ইত্যাদি।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—"বাচ্চাদের কার কাছে রেখে এলেন বৌদি? মিনতির কাছে নাকি? মিনতির কী খবর?"

ওদের দুজনের মধ্যে কী যেন একটা চোখাচোখী হয়ে গেল। কেশবদা মুখটা ঘুরিয়ে নিলেন। বৌদি খানিক ইতস্ততঃ করে বল্লেন—'বলছি তোমাকে সব—সবাই যখন জানে আর ঢাকাঢুকি দিয়ে কী হবে।"

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম 'কী হয়েছে বৌদি!"

"বাড়ী চলো তোমার, বলবো 'খন।"

আমি আর প্রশ্ন করলাম না কিছু। কিন্তু মনটা উদ্গ্রীব হয়ে রইলো। বাড়ী এসেই ফ্ল্যাটটা ঘুরে ঘুরে দেখলেন ওরা। সব কিছুরই প্রশংসা করলেন বৌদি। —"আহা, কী ভাগ্যি করে জন্মেছ—" বারে বারে বল্লেন একথা।

ওদের চায়ের টেবিলে ডেকে এনে চা জলখাবার দিলাম। তারপর চেয়ারটা টেনে বৌদির পাশে বসে বল্লাম—'বৌদি এবার বলুন—কী হয়েছে!"

বৌদি খানিক চুপ করে রইলেন। তারপর বল্লেন—'কী আবার হবে, সেই হতভাগীর কথা জিজ্ঞেস করছিলে না? সে নেই।'

'মিনতি নেই!' আমার বুকের মধ্যে কে যেন হাতুড়ীর ঘা মারলো।—'নেই মানে!'

বৌদি কেঁদে ফেল্লেন। 'না ভাই, তা নয়—একেবারে যদি যেতো তবে তো বাঁচতাম। হতভাগী গিয়েছে আমাদের মুখে চুনকালী দিয়ে। গত এপ্রিল মাসে পাড়ার হরেন বলে একজনার সংগে পালিয়ে গেছে—'

মিনতি পালিয়ে গেছে? হরেনের সংগে! মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করে উঠলো। এতদূর নামতে পারলো মেয়েটা!

ওদের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলাম 'কোথায় গেছে, খোঁজ করেছিলেন আপনারা?'

"কী আর হবে খোঁজ করে—' বৌদি বল্লেন। ও মেয়েকে আর ঘরে নিতে পারবো কী? আর বাকীগুলোর বিয়ে দিতে হবে না!"

বল্লাম—তবু তো খোঁজ করতে পারতেন। থানায় খবর দিয়েছিলেন?'

কেশবদা এবার জবাব দিলেন—"ওসব হাঙ্গামায় কে যাবে বলো। কেলেংকারী তাতে বাড়বে বই কমবে না, সবাই জানে ও হরেনের সংগে গেছে। ও নিজেও লিখে রেখে গেছে একথা। আর পুলিশে খবর দিয়েই বা কী হবে! হরেনদের অনেক টাকা—ঘুষ দিয়ে সব ঠিক করে নেবে—"

"হরেনদের বাড়ীতে জিজ্ঞেস করেছিলেন?"

"তা আর করিনি? সবাই বলে হরেন বেড়াতে গেছে। কোথায় কেউ জানে না। অবশ্য ও ফিরেছে মাস খানেক হোল।"

"হরেন ফিরেছে? একা?"

"হ্যাঁ, একা। আমি গিয়েছিলাম—হাঁকিয়ে দিল। বললো নিজের মেয়েকে সামলাতে পারেন না পরকে দোষ দিতে আসেন কেন?"

"কিন্তু মিনতি কোথায়?"

"ওরেন নাকি জানে না—"

আমি আর থাকতে পারলাম না। দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠলাম—'স্কাউণ্ড্রেল—'

বৌদি বলে উঠলেন "ঠিক বলেছে ঠাকুরঝি—ও ব্যাটা ছাড়ে হাড়ে শয়তান—"

কেশবদা বল্লেন—"থামো। পরের ছেলেকে দোষ দিয়ে কী হবে! নিজের মেয়েকে দেখতে পারোনি? এ সবই তোমার কুশিক্ষার ফল, বুঝেছ?"

বৌদি কাঁদো কাঁদো স্বরে বল্লেন—'দেখলেতো ভাই ঠাকুরঝি—দিন রাত ওই সব বলছে। কিন্তু আমি কী করবো বলো এতগুলো বাচ্চা সামলে ঘর করার কাজ করে, এতো বড়ো মেয়ের ওপর খবরদারী করতে পারি আমি? নিজে কিছু দেখবে না শুনবে না—'

ইচ্ছে হোল এক ধমকে ওদের থামিয়ে দিই। কিন্তু বিশ্রী একটা তিক্ততায় মন ভরে গেল। কী করে বোঝাবো এদের—কী বলবো এদের—যারা কেলেংকারীর ভয়ে মেয়েটার খোঁজ পর্য্যন্ত করেনি?

বল্লাম "এখন আর দোষারোপ করে কী হবে—যা হবার তা হয়ে গিয়েছে। এখন দেখুন, খোঁজ পান কী না ওর। পেলে আমাকে জানাবেন—"

ওরা চলে গেলেও ওদের কথাই ভাবতে লাগলাম শুধু। আশ্চর্য্য কেশবদা আর বৌদি। এতটুকু দায়িত্বজ্ঞান নেই। আর মিনতি? সেই বা কী করে এতদূর অধঃপাতে গেল! একেবারে তো কচিখুকী নয়—এর ফল যে কী হতে পারে সে কথা কী একেবারেই ভাবেনি ও, এই মেয়েটাকেই একদিন ভালো লেগেছিল এ কথা ভাবতেও গা টা রী রী করে

উঠলো। প্রথমদিনে দেখা পানের দোকানে ওর পা দোলানোর ভংগীটা মনে পড়ে গেল। আজ মনে হোল যেন ওই টুকু ভংগীর মধ্যেই ফুটে উঠেছিল ওর চরিত্রের সবল কর্মঠতা ও সুন্দরতা।

ঠিক করলাম এর পর থেকে মিনতির কথা আর ভাববো না। একটু ও না। ওর কথা মনে হলে জোর করে মনের ভাবনা ঝেড়ে ফেলে দিতে চাইতাম। প্রথম ক'টা দিন পারিনি। কিন্তু ক্রমে ক্রমে পারলাম। সব ঘাই তো শুকিয়ে আসে একদিন।

একেবারেই হয়তো শুকিয়ে যেতো। কিন্তু মাস দুই কেটে যাবার পর হঠাৎ একদিন স্কুলের থেকে ফিরে দেখি সেটার বক্সে অচেনা হাতে ঠিকানা লেখা পুরু একখানা খাম। লেখাটা অচেনা বলে অবাক হইনি,—কত ছাত্রীই তো হরদম চিঠি লিখছে। কিন্তু এত মোটা খাম তাড়াতাড়া কাগজে ভরে চিঠি লিখলো কে?

চিঠিটা খুলে সম্বোধনটা পড়েই কিন্তু চমকে উঠলাম—। গোটা গোটা অক্ষরে লেখা—'ছবিপিসী—।" তাড়াতাড়ি শেষের পাতাটায় চোখ বুলিয়ে নিলাম। দেখি তলায় লেখা —'ইতি আপনার মিনতি।" মিনতি চিঠি লিখেছে? কী লিখেছে? ও কী অনুতপ্ত হয়েছে?

লম্বা চিঠি। তবু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই পড়তে লাগলাম। মিনতি লিখেছে—

"ছবি পিসী, শুনলাম আপনি আমার খোঁজ করে ছিলেন —আমার কথা জিজ্ঞেস করে ছিলেন। শুনে এতো আনন্দ হোলো। আমার কথা এখনো কেউ ভাবে এটা তো ভাবতেই পারিনি।

আপনি হয়তো অবাক হয়ে যাবেন হঠাৎ এ চিঠিটা পেয়ে। হঠাৎ কেন লিখছি, এর কারণ খুঁজতে বসবেন। কিন্তু মোটেই আপনার—ভাববেন না যেন জবাবদিহি করার জন্য এ চিঠি লেখা। জবাবদিহি আমি কারুর কাছে করিনি করবোও না।

তবু লিখছি—কারণ আপনি আমার কথা ভাবেন। আমার ভালো করতে চান। মেপে থাকতে কী ছিল জানিনা —কিন্তু কোলকাতা আসার পর ক্রমশঃ যতো বড়ো হলাম, দেখলাম কেউ আমার জন্য ভাবে না। বাবা ভাবেন নিজের কথা,— মা ভাবেন নিজের কথা, (হয় তো কোলের ভাই কিংবা বোনটার কথাও) ভাইবোন ভাবে ওদের নিজেদের কথা। অন্য সব আত্মীয় বা বন্ধুদের কথাই তো ছেড়েই দিলাম। আমিও তাই ভাবতাম আমার নিজেরই কথা। তাই হঠাৎ যখন দেখলাম আপনি আমার কথা ভাবেন তখন ভারী ভালো লেগেছিল। বিশ্বাস করুন, আপনার মনের মতো হতে পারলে খুব খুশী হতাম ছবিপিসী। কিন্তু কেন পারলাম না তা বলবো আজ।

আপনি কিন্তু ভাববেন না যেন আমি অনুতপ্ত হয়ে চিঠি লিখছি। যা করেছি তার জন্যে একটুও ক্ষোভ নেই আমার। বাড়ীতে কোনদিন ফিরতে পারবো না এ জন্যও কোন দুঃখ নেই আমার। বাড়ী কী কোনদিন আমার ছিল? ছিল একখানা ঘর যেখানে মা বাবা ভাই বোন সবার সংসে গাদাগাদি করে থাকতে হোত, শুতে হোত। যখন বড় হয়েছি সব বুঝতে শিখেছি তখনও। দিনের বেলাও কাটতো ওই ঘরেই যেখানে একটি মুহূর্তও একা থাকার উপায় ছিল না। আর একা থাকলেই বা কী? অভাবের কালো ছায়া তো নিত্য সংগী। এটা নেই, ওটা নেই শুধু নেই আর নেই। এরই মধ্যে বছর বছর ভাই বোনের সংখ্যা বেড়ে চললো। যেটুকুই বা ছিল আমাদের— ভাগ করে করে আর কিছুই রইলো না। কেউ কিন্তু দেখতো না যে আমি এখন বড়ো হয়েছি—আমার শাড়ী পরা দরকার। মাঝে মাঝে বেড়াতে যেতাম বন্ধুদের সংগে,— কখনো বা মা বাবার সংগে, রাসবিহারী,— গড়িয়াহাট, চৌরংগী। দেখতাম কত মেয়েরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, কী চমৎকার ওদের সাজপোষাক, কী স্বচ্ছন্দ ওদের চলা ফেরা। ছেলে বন্ধুকে

সঙ্গে নিয়ে কেমন গটগট করে ঢুকে যাচ্ছে সিনেমায়, রেস্তোরাঁয়। আমার মনে হোত আমিও কেন অমনি হবো না, আমি কেন ভাদি দেওয়া ফ্রক পরে এক কোনে একা চোরের মতো দাঁড়িয়ে থাকবো? তখনো ছিলাম বোকা। তাই মনে হোত হয়তো একদিন ঘুম ভেঙে দেখবো গত জীবনটা একটা স্বপ্ন, হয়তো দেখবো আমি একটা প্রাসাদে শুয়ে আছি, আমার পরণে ঝলমলে পোষাক। হয়তো ড্রয়িং রুমে আমার জন্য অপেক্ষা করছে মিঃ অমুকের বিলেত ফেরত ছেলেটি। কিন্তু ক্রমশঃ বুঝতে পারলাম যে স্বপ্ন আমাদের জীবনে শুধু স্বপ্নই তা কখনো সত্যি হয় না। বুঝতে পারলাম যে এই জীবনের সুখগুলির এক কণাও যদি পেতে চাই তবে আমাকেই তা আদায় করে নিতে হবে— আমাকেই ভাবতে হবে আমার কথা।

এমনি সময়ে পাড়ায় একটা টিউশনী পেলাম। কী করে, সে কথা আরেকদিন বলবো। রাত্রিবেলা পড়াতে যেতে হবে · ভাবলাম মা বাবা আপত্তি করবেন— কিন্তু আশ্চর্য, কেউ আপত্তি করলেন না। কিছুদিন পর নিলাম আরেকটা টিউশনী, তারপর আরো একটা। মাসের শেষে হাতে কড়কড়ে টাকা আসতে লাগলো, আর আমি দেখলাম যে এই ক'টা টাকার জোরেই আমি কত স্বাধীন হয়ে গেছি— আমায় কেউ কিছু বলে না। ভালো একখানা শাড়ী, স্নো, পাউডার মাসে দু'একদিন সিনেমা, বন্ধুদের নিয়ে দু'একদিন আইসক্রীম খাওয়া সবই হোল। প্রথম কয়েকটা মাস খুবই ভালো কেটেছিল, কিন্তু তারপরেই ক্রমশঃ দেখলাম যে রোজ রোজ এক শাড়ী পরতে একদম ভালো লাগে না,— শাড়ীর সাথে মিলিয়ে ব্লাউজ পরতে ইচ্ছে হয়— ইচ্ছে হয় সবগুলো সিনেমাই দেখি— ইচ্ছে হয় চুকি বড়ো বড়ো রেস্তোরাগুলিতে। এরকম ইচ্ছে হওয়া অন্যায় কীনা জানিনে কিন্তু যদি অন্যায় হয় তবে দোকানের শো'কেসে এত শাড়ীর বাহার কেন? পথে ঘাটে কেন এত রেস্তোরা? দেখলাম চৌরঙ্গী রাসবিহারীর মেয়েদের চেয়ে আমি অনেক অনেক পেছনে পড়ে আছি— হাজারটা টিউশনী করলেও আমি তাদের নাগাল পাবো না।

ঠিক এমনি সময়ে হরেনদার সঙ্গে আমার আলাপ হোলো —কী করে সেটা আর নাই বললুম। ও যে আমার কাছে কী চায় তা বুঝতে আমার দেরী হয়নি। তাই প্রথমটা ওকে এড়াতে চেয়েছিলুম। কিন্তু পরে ভাবলাম কেন ওকে ফেরাবো। সুখ যদি পেতে চাই আমি, তাহলে আমার তো দাম দিতেই হবে কিছু। না হয় ওকেই দিলাম একটু সঙ্গ— দিলাম একটু আস্কারা।

একদিন আপনাকে বলেছিলাম হরেনদাকে আমি ভালোবাসি। সেটা হয়তো সত্যি নয়। অন্তত। ভালোবাসা বলতে আপনারা যা বোঝেন সে অর্থে নয়। একদিনও আমার মনে হয়নি যে ওকে না পেলে আমি বাঁচবো না—ওকে না দেখলে মন খারাপ হয়নি। কিন্তু হরেনদা আমার অনেকগুলো ইচ্ছেই পূরণ করেছিল—আমার যে বন্ধুদের দেখেছেন আপনি, ইলা আর বিভা, ওরাও তো সুখের জন্যই সমীর আর সুরেশের সঙ্গে ঘোরে। শুধু সমীর আর সুরেশের সাধ্য নেই ওদের সাংগুভেলী ছাড়া অন্য কোথাও নিয়ে যায়। হরেনদা আমায় নিয়ে ঢুকতো মোকোবা, পাকীতে।

এত ঘোরাঘুরি করতাম ওর সঙ্গে, তবু পাড়ায় কেউ কিছু বলেনি। কারণ হরেনদা ওদের বিস্তর টাকা। আর তাছাড়া আমি চালাক হয়ে গেছি ততদিনে। পাড়ার কার হাড়ীতে কোথায় ফুটো আছে সব খবর রাখতাম। দেখতাম ফুটো একটা নয়, অনেকগুলো। যাক্ সে কথা। বলার কথা এই যে, মা বাবা একদিনও জানতে চাননি কোথায় যাই আমি,—শুধু টিউশনীর টাকায় কী করে হয় এত রকমারী, শাড়ী জামা, ফ্রক লিপষ্টিক। অবশ্য ওদেরই বা দোষ দেব কী করে। সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় অফিস থেকে ফিরেই বাবা ছুটতো টিউশনীতে। মার ছিল দিনরাত অসংখ্য কাজ—ছোটভাই

বোনদের অসুখ, বাবার জন্য ভাড়াটিয়াদের সঙ্গে খিটিমিটি। কাজেই আমি যা বলতাম তক্ষুণি মেনে নিত মা। যাচাই করা দূরে থাক ভেবিয়ে দেখারও শক্তি আর সময় ছিল না। বরক মাঝে মাঝে যখন মার জন্যে শাড়ী জামা নিয়ে আসতাম কী ভীষণ খুশী হোত মা। কত কিছুই সাধ ছিল মার—কোনটাই বা মেটাতে পেরেছে। তা ছাড়া অনেকদিক থেকেই মা ভীষণ ছেলে মানুষ রয়ে গেছে। অনেকদিন ধরে মার সাধ ছিল একটা শ্বেত পাথরের গ্লাস কিনবে। সেবার যখন আমি দুটো শ্বেত পাথরের গ্লাস আনলাম মা কী খুশীই না হয়েছিল।

এক একবার মনে হয় মা বাবা কী কিছুই বুঝতে পারে নি? হয়তো খানিকটা পেরেছিল। কিন্তু ভেবেছিল একটা জায়গায় এসে আমি নিশ্চয়ই থেমে যাবো।

কিন্তু আমি থামিনি। কেন থামবো বলুন? সুখ কী-শুধু কয়েকদিনের জন্য হলে চলে? না একটুখানিতে মন ভরে? আমি সুখ চাই—আরো সুখ চাই—অনেকদিন ধরে। তাই একদিন হরেনদার সঙ্গে চলে গেলাম। ওকে যেটুকু দেবার বাকী ছিল তাও দিয়েদিলাম। আর ও আমাকে নিয়ে গেল দার্জিলিং, ঘুমোরী, নৈনিতাল! যাবার সময় মা বাবা ভাই বোনদের জন্য যে কষ্ট একটু হয়নি তা নয়—কিন্তু জানতাম যে এখানে থেকে গেলে আরো বেশী কষ্ট হবে। হরেনদার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা যেন একটা সচল চাকার মতো, ওকে এক জায়গায় থামিয়ে রাখা অসম্ভব। আর আমার জগতটাও, আর রাসবিহারী, চৌরঙ্গীতে থেকে নেই—অনেক বড় হয়ে গেছে। তাই চলে গেলাম।

কেমন কেটেছে এই কটা মাস সেসব লিখে চিঠি বড় করতে চাইনা। হয়তো আপনি এর মধ্যেই অধৈর্য হয়ে উঠেছেন। যাক যে কথা বলছিলাম। হরেনদার সঙ্গে কথা ছিল ও আমায় একসেট যুক্তোর গয়না দেবে। দিয়েওছিল। কিন্তু সবার শেষে নৈনিতালে এসে আমার কী একটা খেয়াল হোলো—গয়নাগুলো যাচাই করতে গেলাম জহুরীর দোকানে। শুনলাম সবগুলো যুক্তোই ঝুটো। জিজ্ঞেস করায় হরেনদাও স্বীকার করলে।

আমার ভারী মন খারাপ হয়ে গেল। যুক্তোগুলো ঝুটো বলে নয়। এতদিন হরেনদার সঙ্গে দেওয়ানেওয়ার সর্তগুলো ছিল খুবই স্পষ্ট। কেউই কোন ভাণ করিনি—ঠকাতে চাইনি। কিন্তু সেদিন বুঝলাম যে হরেনদাও আমায় ঠকাতে পারে। হয়তো এর বেশী ওর সাধ্য নেই বলেই। কিন্তু আমিতো থামবো বলে আসিনি—আমাকে যে এগুতেই হবে।

এর ক'দিন পরই হরেনদা জানতে পারলো যে ওদের বিজনেসের অবস্থা খারাপ যাচ্ছে—ওর বাড়ী-ফেরা নিতান্ত দরকার। তাই ও ফিরতে চাইল। আমি জানতাম হরেনদা ফিরে গিয়ে অনায়াসে তার আগের জীবন শুরু করতে পারবে কেউ কোন প্রশ্ন করবে না।

কিন্তু আমার সে পথ বন্ধ হয়ে গেছে—আমাদের সমাজ তো এগোয়নি ততখানি। আর ফেরার ইচ্ছেও ছিল না আমার। তাই আবার নিজের ভাবনা ভাবতে বসলাম। বেশীদিন ভাবতে হোলনা অবশ্য। ওখানেই আলাপ হোল এক ভদ্রলোকের সঙ্গে—বম্বের বড় বিজনেসম্যান। ওর প্রাইভেট সেক্রেটারী করে আমায় বম্বে নিয়ে যেতে চাইলেন। সঙ্গে ছিলেন ওর বিজনেস সেক্রেটারী। আমাকে ইংগিতে বোঝালেন যে কাজ কিছুই নয়—শুধু মালিককে খুশী রাখা—এদিক ওদিক বেড়ানো ইত্যাদি। আমি রাজী হলুম—মাইনের অংকটা মোটা। হরেনদা ফিরে গেল।

আজ মাস তিনেক ধরে বম্বেতেই আছি। প্রথমটা সাহস হয়নি—তারপর গতমাসে মার নামে মণিঅর্ডার পাঠিয়ে ছিলাম একটা। ভেবেছিলাম চলতো ফেরত যাবে—কিন্তু যায়নি। উপরন্তু মার চিঠি এসেছে একটা। কেমন আছি জানতে চেয়েছেন। ওদের নানা কষ্ট—জিনিষপত্রের

দাম আরো চড়েছে। ওদের যেন ভুলে না যাই এইসব। তার পর মা লিখেছে আপনার কথা। আপনি আমার কথা জানতে চেয়েছেন।

হয়তো সবটুকু জানতে পেরে আপনিও আমায় ঘেন্না করবেন। কিন্তু একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন? ধরুন যদি আমি ভালো মেয়ে হয়ে থাকতাম তাহলে কী হোত? পড়াশোনায় ভালছিলাম না—হয়তো টেনেবুনে ম্যাট্রিকটা পাশ করতাম। তারপর হয় কর্পোরেশনের স্কুলে নয়তো কোন অফিসে চাকরী নিতে হোত। মাইনে কত হোত তাতো জানেনই আপনি। এর ওপর নিতাম টিউশনী। সকাল সন্ধ্যে হাড়ভাঙা খাটুনী খেটে যে খাবার খেতাম তাতে না হোত পুষ্টি, না হোত রসনার তৃপ্তি। অকালে বুড়িয়ে যেতাম, শরীর যেত চিমসে হয়ে। আর নিজের সংসার! কোনকালে হোত না। কিংবা যদি হোতই তাহলেও বা কী-রকম হোত? যাকে বিয়ে করতাম সেও হয়তো মাইনে পেত একশ' কী দেড়শ। তাই আমাকেও ছুটতে হোত কাজে। থাকতে হোত একটা ঘরেই গাদাগাদি করে। এই জীবনের সুখগুলোর কোনটারই স্বাদ পেতাম না—শুধু জন্ম হোত কতকগুলো অপোগণ্ডের। বড়ো হয়ে ওরাও ঘেন্না করতো আমাকে। ঘেন্না করতো তাদের জীবনকে।

তার চেয়ে এই ভালো। সুখ চেয়েছিলাম আমি,—সুখ পেয়েছি। যতদিন ছিনিয়ে নেবার শক্তি থাকবে সুখ পাবো। তারপর? তারপরের ভাবনা এখনি ভেবে কী হবে? যদি ভালো মেয়ে হতাম তাহলেই বা কী পেতাম? নিশ্চিন্ত সুখ, শান্তি? আমার মা বাবা কী পেয়েছিল? আমার চার-পাশের কেউ কী পেয়েছে? আর সুখই যদি না পেলাম তবে ভালোমেয়ে হবার অর্থ কী?

যাক্ চিঠিটা আর লম্বা করতে চাই না। আপনার অনেক সময় নষ্ট হোলো হয় তো। কেমন আছেন? সত্যি, সেদিন আপনার ওখানে সন্ধ্যেটা-ভারী চমৎকার কেটেছিল। কেন ডেকেছেন—জানতাম তবুও। এক এক সময় ভাবি আমার জীবনটা কেন আপনার মতো হোল না? তাহলে হয়তো লড়াই করে সুখ আদায় করতে হোত না। যাক্ আজ আসি। প্রণাম নেবেন। ইতি

আপনার মিনতি।"

ওর চিঠিখানা যখন শেষ করলাম তখন চারদিক অন্ধকার হয়ে এসেছে। মনে পড়লো ক' মাস আগেও একদিন এমনি সময়ে সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়েছিল মিনতি। উদ্ধত দৃষ্টি মেলে তাকিয়েছিল—তারপর নেমে গিয়েছিল তরতর করে। মনে হোল আজো যেন মিনতি নেমে চলেছে—আরো-আরো নীচে। কোথায় ওর নামার শেষ কে জানে! মনে হোল আমরাই যেন ওকে ঠেলে দিয়েছি। তাই কী ও ব্যঙ্গভরে আমাদের মুখের ওপর কতকগুলো প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে গেল? সে প্রশ্নের জবাব আজো পাইনি।

ওএষ্টমিন্‌ষ্টার অ্যাবি-তে

[যুদ্ধকালে এক মহিলার প্রার্থনা]

জন বেট্‌জেম্যান : অনুবাদ শচীন্দ্রনাথ বসু

হে দয়াময়, বোমা ফেল জার্মানদের উপর,
মেয়েদের বাঁচিয়ে দিয়ো তবে :
আর তা যদি সহজ না হয়
তো তোমার ভুল মার্জনা করে নেব আমরা।
কিন্তু, দয়াময়, আর যাই ঘটুক
আমার মাথায় কেউ যেন বোমা না ফেলে।

অখণ্ড রেখো এই সাম্রাজ্য,
নিজের হাতে চালিয়ো আমাদের সৈন্যদের ;
বীর কৃষ্ণাঙ্গরা এসেছে
দূর জামাইকা, হন্‌ডুরাস ও টোগোল্যাণ্ড থেকে—
সব হানাহানিতে বাঁচিয়ে রেখো তাদের,
এবং, তারও আগে, বাঁচিয়ে রেখো শ্বেতাঙ্গদের।

ভেবে দেখ এই মহাজাতির ঐতিহ্য—
বুটস বিপণীর বই, আমাদের পল্লীর গলিপথ,
বাক্‌স্বাধীনতা, ফ্রী পাস, শ্রেণীভেদ,
গণতন্ত্র আর ভাল নরকমা।
প্রভু, একটু বিশেষ দৃষ্টি রেখো
একশ উননব্বই নম্বর ক্যাডোগান স্কোয়ারের প্রতি।

যদিও, হে প্রিয়তম দেব, পাপী আমি
বড় অপরাধ করি নি কিছু কখনও ;
এখন থেকে সান্ধ্য প্রার্থনায়
আসব সময় পেলেই।
সুতরাং, প্রভু, আমার জন্ম রেখো ছুটো কড়ি
আর আমার শেয়ারগুলির দাম পড়তে দিয়ো না।

তোমার স্বর্গরাজ্যের জন্ম খেটে যাব আমি,
আমাদের ছেলেদের সাহায্য করব যুদ্ধ জিততে,
ভীরুদের পাঠাব সাদা পালক,
নাম লেখাব উইমেন্‌স আরমি কোর-এ।
তোমার সিংহাসনের বেদী ঘুরে দেব
'চির নিরাপদ' এলাকার মধ্যে।

অনেকটা ভাল লাগছে এখন,
তোমার কথা শুনে কী আরামই পাই
নেতাদের স্নেহরক্ষিত
এই পুণ্যভূমিতে দাঁড়িয়ে।
আচ্ছা, প্রিয়তম, আর দেরি করতে পারি না
নেমন্তন্নে যেতে হবে এক জায়গায়।

দুটি কবিতা

নীরদবরণ

[১]

কাপালিক, আঁধার কাননে নিশা জাগি,
কোন প্রতিমার কোন বেদিকা সম্মুখে
লেলিহান বাসনার উপচার ঢালি
রুদ্ধশ্বাস-উপাসনা ঘষিয়া ধনুকে
চলেছ একাকী ? বিষকুম্ভ-পয়োধরা
নাবণ্যির ধনুর্ভঙ্গ নয়ন-বহ্নিতে
দেখেছ কি ত্রিকালের স্বর্ণ-অক্ষরা
বাণীর বিধান ? উষ্ণ-রক্ত ধমনীতে
যে গতির ধরস্রোত নিত্য বহে যায়,
হে তান্ত্রিক, জান না কি তার পরবীথা
কল্পনার আত্মঘাতী যত পিপাসায়
ক্ষয়িষ্ণু রজনীর বিফল ধমিয়া
উঠিবে কালাগ্নি-কণা-বর্ষিত গরল :
জীবনের সুধাপাত্রে অমিত কমল ?

[১৯৩৭]

[২]

ফেলোনা বাধিত অশ্রু হে বীথি-সতিকা !
গগনের ঘর্ম্মরিত ঘূর্ণতি উলাসা
পন্থাহারা ক্ষুধীদের বিপদির খাদা
রচিবে না নবীনের অতন্দ্র-কণিকা
চুনির সম্পাতে ; নীহার-আরাবী-বালা
পরিবে কি বন্দিতার কলঙ্কিত পানি ?
কামনা ক্রন্দন গন্ধা-সুন্দরী সোপানী
নিরঞ্জন-স্মৃতি মাখা শুভ্র লিপি-মালা
কবু কি চাহিবে ?
নীরবে ঘুচিয়া রয়
রিক্ত-বেশা সতিকার কপিল নয়ান ;
নিশীথের স্বপ্নোত্থিত রচনা-বিহারী
অনিন্দিতা বরষার নিকষ-কালোর
লাজায় উৎপল বনে জীবন-বিতান :
উষার কপোল-লগ্না ঘুর নভ-চারী ।

[১৯৩৭]

বিশ্বাবর্ত

জেনেভা সম্মেলন

মনে পড়ে অধ্যাপক টোয়েনবীর একটা কথা : হয় আমরা যুদ্ধকে নিশ্চিহ্ন করবো নইলে যুদ্ধই আমাদের নিশ্চিহ্ন করবে। কিন্তু কি ভাবে এই যুদ্ধকে বিদায় করা যাবে? এই প্রশ্নেরই একটা উত্তর 'নিরস্ত্রীকরণ'। 'নিরস্ত্রীকরণ' মানেই শান্তি নয়, কিন্তু শান্তির জন্য একান্ত প্রয়োজন 'নিরস্ত্রীকরণ'।

কি ভাবে এই নিরস্ত্রীকরণ সম্পন্ন হবে তার জল্পনা-কল্পনার শেষ নেই কিন্তু নিরস্ত্রীকরণ এতদিনও এগিয়ে আসেনি। গত মার্চ মাস থেকে জেনেভায় আবার সতেরটি জাতির মধ্যে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন চলছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরস্ত্রীকরণ কমিশনের কাছে ১লা জুনের মধ্যে এই সম্মেলনের অগ্রগতি সম্বন্ধে একটা বিবরণী পেশ করার কথা; কিন্তু অগ্রগতির পরিবর্তে আমেরিকা ও রাশিয়ার প্রস্তাব ও পাল্টা প্রস্তাবের একটা মুষলধার খবরই ঘুরেফিরে আসছে। বৈঠকে যোগদানকারী আটটি নিরপেক্ষ রাষ্ট্র, ভারত, বর্মা, সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র, ইথিওপিয়া, নাইজেরিয়া, সুইডেন, মেক্সিকো ও ব্রাজিলের পক্ষথেকে একাধিক আপোষমূলক প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়েছে। কিন্তু লক্ষ্যে পৌঁছবার কোন সম্ভাবনাই দেখা যায়নি।

আণবিক অস্ত্রের পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ বন্ধ রাখা ও নিরস্ত্রীকরণ—এই দুই ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণের প্রশ্নে আগের মতই মতানৈক্য রয়েছে। আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণ সম্বন্ধে আমেরিকার প্রস্তাব রাশিয়া গ্রহণ করতে পারেনি। রাশিয়ার যুক্তি হলো, এতে গুপ্তচর বৃত্তিকেই প্রশ্রয় দেওয়া হবে। আমেরিকার ধারণা রাশিয়া ঐ যুক্তির আড়ালে গোপনতার বেড়াজালকেই আগের মত টিকিয়ে রাখতে চায়।

পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ পরীক্ষা

আধুনিক যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতিকে এরা যে ভয় করে না, তা নয় কিন্তু সেই ভয়াবহ পরিণতি অপেক্ষা পরস্পরকেই বেশী ভয় করে। ঐ ভয়ের প্রকাশ পেলো গত ২৪শে এপ্রিল, যখন প্রশান্ত মহাসাগরের খৃষ্টমাস দ্বীপের প্রশান্তি আবার নষ্ট হলো আমেরিকার পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণে। আপাতত মোট পঁচিশটি বিস্ফোরণের পরিকল্পনা রয়েছে, চলবে দুমাস ধরে। ইতিপূর্বে জেনেভায় রুশ প্রতিনিধি জোরিন জানিয়েছিলেন যে, আমেরিকা পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটালে রাশিয়া বসে থাকবে না।

বর্তমান অধ্যায়ে পারমাণবিক বিস্ফোরণ আরম্ভ করার আগে প্রেসিডেন্ট কেনেডি গত ২রা মার্চ বলেছিলেন, "সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন আমাদের থেকে এগিয়ে যাচ্ছে বা এগিয়ে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে, তখন আমরা কি নিষ্ক্রিয় থাকবো···?" ১৯৪৫ সালের ৬ই এবং ৯ই আগষ্ট যুক্তরাষ্ট্র যথাক্রমে হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে প্রথম আণবিক বোমা নিক্ষেপ করলো। জাপানের বিরুদ্ধে এই বোমা বর্ষণে ষ্ট্যালিনেরও সম্মতি ছিল এ কথা পরে জানা গেছে। এই দুই রাষ্ট্রের বোমা বর্ষণ ও তার জবাবের ইতিহাস নিম্নরূপ। ১৯৪৬ সালে প্রশান্ত মহাসাগরের বিকিনিতে আবার ঐ বোমা পরীক্ষা করলো মার্কিণ রাষ্ট্র। প্রথম সোভিয়েত আণবিক বিস্ফোরণ হলো ১৯৪৯ সালের ২৯শে আগষ্ট। যুক্তরাষ্ট্র প্রথম হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ ঘটালো ১৯৫২ সালের ১লা নভেম্বর। হাইড্রোজেন বোমার সোভিয়েত জবাব এলো ১৯৫৩ সালের ১২ই আগষ্ট। এর পরের মার্কিণ জবাব এলো ১৪ মেগাটন বোমা—১৯৫৪ সালের ১লা মার্চ। ১৯৫৮

সালের ৩১শে অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্র স্বেচ্ছায় পরীক্ষা বন্ধ ঘোষণা করলো। তিনদিন পর অনুরূপ ইচ্ছা ঘোষিত হলো রাশিয়ার পক্ষ থেকে—ফলে তিন বছরের বিরতি (moratorium)। কিন্তু বোঝা গেলো আবার সেই ভয়ানক পালা আসছে, ১৯৬১ সালের ২রা সেপ্টেম্বর রাশিয়া যখন ছ'মাসে ৪৮ মেগাটন বোমা শুদ্ধ ৫০টি বোমা বিস্ফোরণ ঘটালো। পরবর্তী moratorium বা বিরতি কবে কেউ জানে না। বাঘের পিঠে চড়ার চাইতে তার পিঠ থেকে নামা কঠিন।

সম্প্রতি "Balance sheet on Disarmament" শীর্ষক প্রবন্ধে নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের আগের পররাষ্ট্রদাতা জন্ জে ম্যাক-ক্লয় লিখছেন :

"The full disarmament process will take a long time to complete. Let us then not ask too much of the early phases of the resumed negotiations...The hope must be that the experience of past negotiations will induce all the parties concerned to understand better that they are tackling one of the most complex problems imaginable and their endeavour must be to unify all efforts towards its solution. The time needed is short within which to make real progress, it is not so short as to compel the final solution during the course of any one meeting." (Foreign Affairs—April, 1962.)

বার্লিন

বার্লিন সমস্যা সমাধানের জন্য রাশিয়া ও পাশ্চাত্য-শক্তি-বর্গের আলোচনা আজ পুরোনো ইতিহাস। সম্প্রতি ওয়াশিংটনে মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব ডীন রাস্ক ও ওয়াশিংটনস্থ সোভিয়েত দূত দোব্রিনিনের মধ্যে এ সমস্যা নিয়ে আলোচনা নাকি কিছুটা আশা জনক। পশ্চিম জার্মাণ সূত্রে বার্লিন সম্পর্কে পাশ্চাত্য পক্ষের প্রস্তাব প্রকাশিত হয়ে পড়ায় এবং ঐ প্রস্তাবের উপর পশ্চিম জার্মানীর চ্যান্সেলর আদেনুয়েরের বিরূপ সমালোচনায় মার্কিন কর্তৃপক্ষ অসন্তুষ্ট হলেও প্রকাশিত প্রস্তাবগুলির সত্যতা অস্বীকার করা হয়নি। এগুলির মধ্যে প্রধান প্রস্তাব হলো পশ্চিম বার্লিনের সহিত সংযোগ রক্ষার জন্য একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠন। পাশ্চাত্য চারটি দেশ, কম্যুনিষ্ট চারটী দেশ, পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানী এবং তিনটি নিরপেক্ষ দেশ—সুইজারল্যাণ্ড, সুইডেন ও অষ্ট্রীয়া—অর্থাৎ মোট তেরটি দেশ নিয়ে গঠিত হবে ঐ আন্তর্জাতিক সংস্থা। এছাড়া আরও কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব আছে, যথা—আটো ও ওয়ারশে-চুক্তি সংস্থার রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অনাক্রমণ চুক্তি যাতে ইউরোপীয় দেশগুলির সীমান্ত লঙ্ঘিত না হয়, পারমাণবিক অস্ত্রহীন রাষ্ট্রগুলিকে ঐ অস্ত্র না দেওয়া, এবং দুই জার্মানীর সমস্যাগুলির মীমাংসার জন্য একটি কমিটি গঠন। জানা যায় যে ঐ প্রস্তাবগুলির ভিত্তিতে উভয় পক্ষের মধ্যে আবার আলোচনা হবে। পশ্চিম জার্মানীর পররাষ্ট্র দপ্তর ঐ প্রস্তাবগুলির প্রতি তাদের সাধারণ সমর্থন জানিয়েছে। ব্রিটেনেরও ঐ প্রস্তাবগুলির উপর সমর্থন আছে বলে জানা গেছে।

লাওস

বর্তমান ঠাণ্ডাযুদ্ধ চলছে লাওসকে নিয়ে। ইতিপূর্বে লাওসে যুদ্ধ-বিরতির জন্য জেনেভায় যে চুক্তি হয়েছিল তা লঙ্ঘন করে গত বছর যে কম্যুনিষ্ট পাথেট লাও বাহিনী উত্তর লাওসে নাম কা ওয়াস্তে দখল করেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে লাওস সমস্যা আবার জটিল হয়ে উঠেছে। নাম কা ওয়াস্তে দখলের পরের সপ্তাহেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট কেনেডি আঠারো'শ মার্কিন নৌ-সেনাকে থাইল্যাণ্ডে অবতরণের নির্দেশ দিয়েছেন এবং ঐ অবতরণ সুরু হয়েছে। সিয়াটোর গোষ্ঠিভুক্ত অন্যান্য রাষ্ট্রগুলিও

এ ব্যাপারে প্রয়োজন হলে সাহায্য করতে প্রস্তুত। প্রেসিডেন্ট কেনেডির ঘোষণায় স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়েছে যে, লাওস এলাকায় কম্যুনিষ্ট সৈন্যরা থাই সীমান্ত লঙ্ঘন করলে যুদ্ধ আরম্ভ হবে।

জেনেভায় চৌদ্দটি রাষ্ট্রের বৈঠকে একটা সামরিকজোট-নিরপেক্ষ লাওস গঠনই লাওস সমস্যার সমাধান বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল। জেনেভা চুক্তি অনুযায়ী নিরপেক্ষ নেতা প্রিন্স সুভন্ন ফুমা, দক্ষিণপন্থী নেতা প্রিন্স বোন উম ও কম্যুনিষ্ট পাথেট লাও নেতা প্রিন্স সুভন্ন ভং সহ একটা সর্বদলীয় অস্থায়ী সরকার গঠন করার কথা ছিল। প্রতিরক্ষা ও স্বরাষ্ট্র দপ্তর নিজেদের হাতে রাখার জন্য দক্ষিণ-পন্থীদের জিদই ঐ কোয়ালিশন সরকার গঠনের বড় অন্তরায় হয়েছে। লাওসের দক্ষিণ-পন্থীদের উপর চাপ দেওয়ার জন্য প্রেসিডেন্ট কেনেডি গত ফেব্রুয়ারী মাস থেকে অর্থসাহায্য বন্ধ করেছেন। প্রেসিডেন্ট কেনেডির পক্ষথেকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে জেনেভা চুক্তি অনুযায়ী লাওস সরকার গঠন যতই বিলম্বিত হবে ঐ রাজ্যের সমস্যা ততই জটিলতর হয়ে উঠবে।

নাম যায় যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি সম্মেলনের দায়িত্ব নির্ধারণের জন্য ব্রিটেনের পক্ষ থেকে সেখানে সরজমিন তদন্তের প্রস্তাব করা হয়েছিল। কিন্তু রাশিয়া তাতে সম্মত হয়নি। অপর পক্ষে থাইল্যাণ্ডে মার্কিন সেনা পাঠানকে রাশিয়া "অবিবেচনা-প্রসূত" বলে মন্তব্য করেছে। কিন্তু ঐ সৈন্য পাঠানোর সংবাদে যতটা প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়ার আশংকা করা হয়েছিল তা হয়নি। যাই হোক লাওসের নিরপেক্ষ দলের নেতা সুভন্ন ফুমা শীঘ্রই লাওস সমস্যার একটা মিটমাটের আশা প্রকাশ করেছেন। তিনি সম্প্রতি লাওসে ফিরে গেছেন। অপর পক্ষে, দক্ষিণপন্থী নেতা বোন উম নাকি বলেছেন যে তাঁর দল অস্থায়ী সর্বদলীয় সরকারে প্রতিরক্ষা ও স্বরাষ্ট্র দপ্তর লাভের জন্য জিদ করবেন না। দেখা যাক এই বিলম্বিত শুভবুদ্ধি কি ফল প্রসব করে?

আলজেরিয়া

আলজেরিয়া ও কংগোতে—সম্প্রতি সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। আলজেরিয়া সমস্যা বহু পুরোনো। আলজেরিয়ার ফরাসী বাসিন্দাদের সংখ্যা দশ লাখ অর্থাৎ মোট জন সংখ্যার এক দশমাংশ। তাছাড়া সেখানে ফরাসীরা প্রচুর মূলধন বিনিয়োগ করেছে। বলা বাহুল্য ফরাসী সরকার আলজেরীয় জাতীয়তাবাদীদের ফরাসী বন্ধন মুক্তির প্রচেষ্টায় এতদিন যথাসাধ্য বাধা দিয়েছে এবং সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। এর ফলে ফরাসী অর্থনীতি ও রাজনীতিতে যথেষ্ট চাপ পড়েছে। যাই হোক, অবশেষে ফরাসী সরকারের শুভ বা বাস্তব বুদ্ধি দেখা দিয়েছে এবং সরকারের ও জাতীয়তাবাদী আলজেরিয়ানদের মধ্যে রাজনৈতিক মিটমাট ও যুদ্ধবিরতি চুক্তি হয়েছে। এই চুক্তি ফ্রান্সে গণ-ভোট দ্বারা বিপুল ভাবে সমর্থিত হয়েছে। এই চুক্তির পরবর্তী অধ্যায়ে আলজেরিয়াতে নয়জন মুসলমান ও তিনজন ইউরোপীয়ান নিয়ে একটা অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়েছে।

কিন্তু আলজেরিয়াস্থিত ঔপনিবেশিক মনোভাবাপন্ন সন্ত্রাসবাদী সংস্থা ও, এ, এস, এই মিটমাটকে বানচাল করে দিতে বদ্ধপরিকর। শান্তি চুক্তির পরবর্তী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে কম বেশী দু'হাজার লোক এই সন্ত্রাসবাদীদের বর্বরতার শিকার হয়েছে। অপর পক্ষে প্রত্যহ শত শত ফরাসী বাসিন্দা ফ্রান্স অভিমুখে ফিরে যাচ্ছে। ফরাসী সরকারও এই সন্ত্রাসবাদীদের দমনে তৎপর হয়েছেন। তাঁরা ভূতপূর্ব জেনারেলদ্বয় জুঁহা ও সালাঁকে গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হয়েছেন। জুঁহার বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডাদেশ ও সালাঁর বিরুদ্ধে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশ হয়েছে। ও, এ, এস,-এর বর্তমান নেতা ভূতপূর্ব জেনারেল পল গার্দি। তবে ও, এ, এস, যে শেষ পর্যন্ত বিফল হতে বাধ্য এটা সুনিশ্চিত। তবু ঔপনিবেশবাদের শেষ নৃশংস বলি কাম্বুজের নারী শিশু বৃদ্ধ সহ বহু অসামরিক আলজেরীয়কে আজও হতে হচ্ছে!

কংগো

আলজেরিয়ার মত কংগো সমস্যারও একটা সংকটজনক অধ্যায় শেষ হতে চলেছে বলে আশা করা যায়। কংগোতে সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের অনেক কাঠ-খড় পোড়ান হয়েছে। বর্তমানে সেখানে রাষ্ট্রপুঞ্জের পক্ষে রয়েছে ২০টী দেশ থেকে পাঠানো ১৭,৫০০ সৈন্য, ৩টী জেট বিমান বাহিনী এবং ১০ খানা যাত্রী ও মালবাহী বিমান। ভারতই পাঠিয়েছে সব চাইতে বেশী —অর্থাৎ ৬,৩০০ জন সৈন্য।

সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে এক সংবাদিক সম্মেলনে রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারী-জেনারেলের সামরিক পরামর্শদাতা ব্রিগেডিয়ার রিকে বলেন যে, কংগোতে গত দু'বছর ধরে রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরলস প্রচেষ্টা কয়েকটী উল্লেখযোগ্য ফললাভে সক্ষম হয়েছে, যথা—(ক) বৃহৎ শক্তিগুলিকে কংগোর বিবাদে জড়িয়ে পড়া থেকে বিরত রেখেছে; (খ) সেখানে আইন ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে পেরেছে; এবং (গ) যে গৃহযুদ্ধ বারবার আসন্ন মনে হচ্ছিল তা থামিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে। ব্রিগেডিয়ার রিকের মতে কংগোতে রাষ্ট্রপুঞ্জের তৎপরতার সংকটজনক অধ্যায় শেষ হয়েছে। শুভ সংবাদ!

ভারত-পাকিস্তান-চীন-নেপাল

কিন্তু কাশ্মীর সমস্যার কোন কূল কিনারা রাষ্ট্রপুঞ্জ এখনও পর্যন্তও করে উঠতে পারেনি। সাম্প্রতিক আলোচনা নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর প্রশ্ন পুরো একশোবার আলোচিত হলো। পাকিস্তানের তাগিদে বর্তমান আলোচনা সুরু হয়েছিল। কাশ্মীর প্রসঙ্গে পাকিস্তান প্রতিনিধি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আগের কথাগুলিরই পুনরাবৃত্তি করেছেন। কোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই ঐ আলোচনা অনির্দিষ্ট কালের জন্য মুলতুবী রাখা হয়। এর পর আবার ১৮ই ও ২৮শে মে এই দুই দিনই এই প্রসঙ্গে নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক হবার কথা ছিল। কিন্তু সেটা স্থগিত রাখা হয়েছে।

নিরাপত্তা পরিষদের সাম্প্রতিক বৈঠকে রাশিয়া আগের মতই পাক-প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছে। পশ্চিমী শক্তিগুলির কাছ থেকেও পাকিস্তান আশানুরূপ সমর্থন পায়নি। আমেরিকার কাগজগুলোতে পাক প্রতিনিধির বক্তৃতা প্রায় উপেক্ষিত হয়েছে। আসলে, কাশ্মীর সমস্যার সমাধানের চাইতে নিজের ঘর সামলানোর তাগিদে পাকিস্তান আবার নতুন করে ভারত-বিরোধিতা সুরু করেছে। পূর্ব-পাকিস্তানে আয়ুব-শাহীর বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ অব্যাহত রয়েছে। সংবাদে প্রকাশ, রাওলপিণ্ডিতে এক সাক্ষাৎকারে প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ বলেছেন যে, "পূর্ব-পাকিস্তান আমাকে হতবুদ্ধি করেছে"। পাক-শাসকবৃন্দের স্বার্থে কেবল যে কাশ্মীর নিয়ে হৈ চৈ সুরু হয়েছে তা নয়, এরই কারণে পাকিস্তানে আবার সরকারী ও বে-সরকারী প্রচারের ফলে জঘন্য সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা চাড়া দিয়ে উঠে সংখ্যালঘু উৎপীড়ন সুরু হয়েছে।

দেখা যাচ্ছে ভারতের বিরুদ্ধে শত্রুতায় পাকিস্তান ও চীন একজোট হয়েছে। কাশ্মীর সীমান্ত নিয়ে এরা এক সমঝোতায় পৌঁছবার চেষ্টা করছে। যা দেখা যাচ্ছে নেপালও এই ভারত-বিরোধী জোটের প্রতি অনুকূল।

একটী সংবাদে প্রকাশ, শীঘ্রই প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ এবং চীন থেকে লি-শাও-চি ও চু-এন-লাই নেপালে যাচ্ছেন। বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে এই নেপালযাত্রা যে গুরুত্বপূর্ণ সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই।

ভারতের প্রতি চীনের বিদ্বেষ ক্রমবর্দ্ধমান। ১৯৬১-৬২ সালের বহির্বিষয়ক দপ্তরের রিপোর্টে স্বীকার করা হয়েছে, চীন-ভারত সম্পর্ক এর আগে এত খারাপ কখনো হয়নি। সম্প্রতি লোকসভায় চীনের প্রশ্ন একাধিকবার উত্থাপিত হয়েছে। একটী প্রশ্নের উত্তরে বহির্বিষয়ক দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমতি লক্ষ্মী মেনন জানিয়েছেন, পিকিংস্থিত ভারতীয় দূতাবাসের কর্মচারীদের পিকিং থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে কোন জায়গায় যেতে হলে চীনা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমতি

নিতে হয়। গত বছর রবীন্দ্র-জন্ম-শতবার্ষিকী ও প্রজাতন্ত্র দিবস পালনে ঘুতাবাসের লোকেরা নানারূপ বাধার সম্মুখীন হয়েছে।

কয়েক দিন আগে চীনের সাথে আলোচনার ভিত্তি হিসাবে পাশক অঞ্চলে ভারতকে চীনের মানচিত্র অনুযায়ী সীমান্ত থেকে সৈন্য সরিয়ে নেওয়ার ও চীনকে ভারতের মানচিত্র অনুযায়ী সৈন্য সরিয়ে নেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু চীন ঐ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে।

যা সংবাদ আসছে তাতে প্রমাণ হয় চীনে বর্তমানে তীব্র খাদ্যাভাব ঘটেছে। প্রত্যহ হাজার হাজার ঘুঘুসু চীনার হংকংএ পালিয়ে যাবার খবর পাওয়া যাচ্ছে।

কম্যুনিষ্ট চীন গণতন্ত্রে বিশ্বাসী নয়। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভারতের অগ্রগতি চীনের পক্ষে শুধু সাধারণ দিক থেকেই অস্বস্তিকর নয়, আদর্শগত দিক থেকেও অবাঞ্ছনীয়। তাই একই সময়ে চীনের একটা সুযুখো বৈদেশিক নীতি দেখা যাচ্ছে। পাকিস্তান, নেপাল, বার্মা প্রভৃতি ভারতের ছোট ছোট প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির প্রতি চীননীতি অনুকূল, আর ভারতের সাথে বিরোধ জিইয়ে রাখতেই সে তৎপর। এই আবহাওয়ার ফলে ভারত প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধি করতে বাধ্য হচ্ছে এবং তার উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার অগ্রগতি অর্থাভাবে ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। অপর দিকে, ছোট ছোট দেশগুলির প্রতি চীনের ঐ নীতি তাদের চীনের প্রতি অনুকূল এবং ভারতের প্রতি প্রতিকূল করছে। এই নীতি চীন সাফল্যের সহিত অনুসরণ করে চলছে।" সম্প্রতি লোকসভায় ভারতের চীননীতি সম্পর্কে সদস্যদের প্রশ্নে নানা দিক দিয়ে আলোকপাত হওয়ায় তীব্র উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে—কিন্তু ভারত সরকার এ সম্পর্কে যথেষ্ট সজাগ হয়ে নীতির কোনো পরিবর্তন করেছেন বলে দেখা যাচ্ছে না।

২৭।১।৬২ শিশির কুমার ঘর

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

অমিয় চক্রবর্তী

"—কাব্যসৃষ্টির একটা দিক প্রত্যহ জীবনকে স্পর্শ করে, আরেক দিকে তার ভূমিকা নিত্য সূর্যালোকে অধিষ্ঠিত—আপনার কবিতায় এই দুই দিকেরই পরিচয় পেলাম।··· কবিতা উভচর এবং বহুচর—অতি সূক্ষ্ম সামঞ্জস্যেই তার প্রাণ। আপনার কবিতায় সেই প্রাণের সন্ধান পেয়েছি।··· পৃথিবীকে আপনি স্পষ্ট চোখে দেখেছেন—এ বড়ো আশ্চর্য দেখা। "

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

"···আমি আপনার কবিতার অনুরাগী ; এবং ইতিমধ্যে আপনার সহজ প্রতিভা যে অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিরন্তর পরিণতির দিকে এগোচ্ছে তা আমি বারংবার লক্ষ্য করেছি।···আমি এই রকম সচল মনীষার পক্ষপাতী, এবং হয়তো তাই আপনার লেখা আমাকে এতটা টানে।···আমার মতে আধুনিক বাঙালী কবিদের মধ্যে যারা ভবিষ্যতেও সাধুবাদ পাবেন, আপনি তাঁদের অন্যতম।···"

অন্নদাশঙ্কর রায়

"···আপনার কবিতাগুলিতে প্রকৃত কাব্যরসের স্বাদ পাওয়া যায়, আপনার মূল্যবোধও সুস্থ মানুষের। "

এই কবির নতুন কাব্যগ্রন্থ

১৫ই আষাঢ় প্রকাশিত হবে— **দিনযাপন** দাম দু' টাকা

পুস্তকপরিচয়

ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য

আলোচনা

শ্রীত্রিপুরা শঙ্কর সেন

ভারতবর্ষে শুধু 'বহু সাধকের বহু সাধনার ধারাই' মিলিত হয় নাই, এক জাতীয় সাধনারও বিচিত্র ধারা মিলিত হইয়াছে। মার্কিন দার্শনিক উইলিয়াম জেমস্ Varieties of Religious Consciousness নামক চিত্তাকর্ষক গ্রন্থ লিখিয়াছেন, কিন্তু ভারতীয় সাধনার বিচিত্র ধারার সন্ধান তিনি রাখিতেন না। শক্তিসাধনা ভারতীয় সাধনারই একটি প্রধান ধারা, ইহাকে অবলম্বন করিয়া ভারতের নানা প্রদেশে বিপুল সাহিত্যও গড়িয়া উঠিয়াছে, কিন্তু এই শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য সম্পর্কে এ যাবৎ কেহ ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে অথচ শ্রদ্ধাবনত চিত্তে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করেন নাই। সম্প্রতি মনস্বী লেখক ডাক্তার শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিয়া এ বিষয়ে একখানি প্রামাণ্য পুস্তক রচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 'বিষয়টির দুইটি দিক রহিয়াছে, একটি ঐতিহাসিক, অপরটি আধ্যাত্মিক। এই দুইটি দিককে আমি পরস্পরবিরোধী বলিয়া মনে করি না'। আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি, লেখকের মধ্যেও ঐতিহাসিক জিজ্ঞাসার সহিত শ্রদ্ধাবৃদ্ধির সমন্বয় ঘটিয়াছে।

লেখক প্রধানত বাংলা দেশের শাক্ত সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করিলেও 'শক্তিবাদ যে ভারতের জাতীয় মানসের একটি বৈশিষ্ট্যের দ্যোতক,' ইহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাই গ্রন্থখানিতে ওড়িয়া, মৈথিলী, অসমীয়া ও হিন্দী সাহিত্যের আলোচনা স্থান পাইয়াছে। দক্ষিণ ভারতের শাক্ত সাহিত্য সম্পর্কে ভবিষ্যতে আলোচনা করিবার সংকল্প তিনি গোপন করিয়াছেন।

শক্তিবাদের দার্শনিক ভিত্তি সম্পর্কে যাঁহাদের কৌতূহল আছে, তাঁহাদিগকে তিনি তাঁহার রচিত 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ —দর্শনে ও সাহিত্যে' পাঠ করিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন। আমাদের মনে হয়, লেখকের রচিত 'An Introduction to tantric Buddhism, ও Obscure Religious Cults' এই দুইখানিও আলোচ্য গ্রন্থের 'অনুপূরক'।

গ্রন্থের অনেক স্থলে লেখক নিরপেক্ষ বিচার বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বাস্তুতান্ত্রিক সমাজ হইতেই যে শক্তি পূজার প্রচলন হইয়াছে, এ মত নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয় নাই। অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন, বৈদিক রাত্রিসূক্তের রাত্রিদেবী অথবা ব্রাহ্মণ সাহিত্যের নির্ঋতি দেবী কিংবা মুণ্ডকোপনিষদের 'কালী' (অগ্নির একটি জিহ্বা) হইতেই যে কালীদেবীর উদ্ভব হইয়াছে, এমন কথা বলার মত কোন যুক্তি নাই।

গ্রন্থ-রচনায় লেখক যে বিপুল শ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তাহা প্রশংসনীয়। 'সংস্কৃত সাহিত্যে দেবী' অধ্যায়ে তিনি বহু কবির কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন, সংস্কৃত সাহিত্যে দেবী পার্ব্বতী মানবীতে রূপান্তরিতা হইয়াছেন। 'বৌদ্ধ দেবী' শীর্ষক অধ্যায়ে তিনি দেখাইয়াছেন, 'মূলে হিন্দু তন্ত্র ও বৌদ্ধ তন্ত্র বলিয়া কোনও জিনিষ নাই'। 'রামায়ণ-সাহিত্যে

দেবী' নামক অধ্যায়ে সীতার কাহিনী বেশ চিত্তাকর্ষক। বাংলা মঙ্গল কাব্যে দেবীর মানবীয় রূপান্তর এবং উহার সামাজিক পটভূমিকা সম্পর্কে লেখক বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

'বাংলা শাক্ত সাহিত্যের আলোচনায় আছে শাক্ত ও বৈষ্ণব পদাবলীর তুলনা, শাক্ত সাধন-সংগীত ও লীলা-সংগীতের পরিচয়, শাক্ত সাধনার তাৎপর্য প্রভৃতি। 'শাক্ত সাধক কবিগণের কালী সাধনার তাৎপর্য' অংশটি কিন্তু বিস্তৃততর ও অধিকতর বিশদ আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

চর্যাপদ ও শাক্ত পদাবলীর ভাষাগত সাদৃশ্য লেখক দেখাইয়াছেন। বহু উদ্ধৃতির সাহায্যে লেখক প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণের ন্যায় শাক্ত সাধকগণও রূপকের সাহায্যে সাধনতত্ত্বের বর্ণনা করিয়াছেন।

লেখক যেখানে রামপ্রসাদ দাস দত্তের একটি প্রসিদ্ধ গান—

'শ্মশান ভালবাসিস বলে শ্মশান করেছি হৃদি।
শ্মশানবাসিনী শ্যামা নাচবে বলে নিরবধি'।

উদ্ধৃত করিয়াছেন (পৃঃ ২২৩), সেখানে অনেকেরই মনে পড়িবে স্বামী বিবেকানন্দের একটি বিখ্যাত কবিতা 'নাচুক তাহাতে শ্যামা'। কবিতাটির শেষ পংক্তি এই—'চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা'।

গ্রন্থের নবম অধ্যায়ে বিদ্বান লেখক 'পরবর্তী কালের প্রসিদ্ধ শক্তি সাধকগণের সাধনা' সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীসত্যদেবের শক্তি সাধনার বৈশিষ্ট্য কোথায়, তাহাই লেখক প্রাঞ্জল ভাষায় আলোচনা করিয়াছেন। লেখক অন্যত্র রামাক্ষেপার উল্লেখ করিলেও (পৃঃ১৬) এই অধ্যায়ে তাঁহার সাধনার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ আলোচনা প্রাসঙ্গিক হইত।

পরবর্তী অধ্যায়ে লেখক মধুসূদন, নবীনচন্দ্র ও হেমচন্দ্রের শাক্ত সাহিত্য, স্বদেশী সঙ্গীতে শক্তিবাদ এবং বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথের শাক্ত প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের মহিলা কাব্য হইতেও একটি অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। 'দশমহাবিদ্যা' সম্পর্কে লেখক শ্রীসত্যদেবের শিষ্য সাধুসাধক শ্রীবিজয়কৃষ্ণের গ্রন্থ হইতে যে দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়াছেন, (পৃঃ ৩০৯-১০) উহা কিন্তু সাধারণ পাঠকের নিকট একেবারেই দুর্বোধ্য। তামিল কবি ভারতী, ওড়িয়া কবি মধুসূদন দাস ও হিন্দী কবি বালমুকুন্দ গুপ্তের রচিত স্বদেশী সঙ্গীত হইতে লেখক যে উদ্ধৃতি দিয়াছেন, উহা কৌতূহলোদ্দীপক। আমাদের মনে হয়, এবিষয়ে বিস্তৃততর আলোচনার অবকাশ আছে। এই প্রসঙ্গে আরও যে সকল কবির রচনা হইতে উদ্ধৃতি দেওয়া যায়, পরলোক গত শশাঙ্কমোহন সেন তাহাদের অন্যতম। কবি শশাঙ্কমোহনের চোখে স্বাধীনতা সংগ্রাম শক্তি সাধনারই এক বিশিষ্ট প্রকাশ। তিনি লিখিয়াছেন—

'আজি এই ভয়ঙ্করী উন্মাদিনী
বিশ্বোন্না যামিনী।
মেঘের নীলিম বুকে শিহরিছে
চপলা কামিনী।
আজি এ বিশাল বিশ্ব অন্ধকারে
তোমারে ধেয়ায়।
বিশ্বদেব ধ্যানমগ্ন লুটে পড়ে
কোকনদ পায়।
আবার দাঁড়াও আদি সশরীরে
অট্ট অট্ট হাসি,
সত্যযুগ কলিযুগ পাপ-পুণ্য
নিমেষে গবাসি।
মানবের হৃদয়ের গূঢ়তম
শ্রেষ্ঠতম গীতা।
অয়ি বরাভয়করে। অয়ি কালি।
অয়ি স্বাধীনতা'॥

এই প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি কথা বলিতে চাই। আমাদের মনে হয়, শাক্ত সাধনা যে মধুসূদনের কবি মানসকে প্রভাবিত

করিয়াছিল তাহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাই মেঘনাদবধ কাব্যের পঞ্চম সর্গে, যেখানে লক্ষ্মণ চণ্ডীর মেঘদের উদ্দেশ্যে কানন অভ্যে চলিয়াছেন। তিনি প্রথমে নানারূপ বিভীষিকা ও পরে প্রলোভনকে জয় করিয়াছিলেন। এখানে তিনি বীর সাধকের আদর্শ। এই অধ্যায়ে মেঘচন্দ্রের দশমহাবিদ্যা সম্পর্কে মনস্বী ভূদেবের বক্তব্য, নবীনচন্দ্র সেনের জাতীয় ভাবের উদ্দীপক 'শব-সাধন' কবিতার মর্মকথা প্রভৃতি সন্নিবিষ্ট হইলে আলোচনাটি পূর্ণাঙ্গ হইত, সন্দেহ নাই।

প্রত্যেক প্রদেশের শাক্ত সাহিত্যেই যে কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, সুপণ্ডিত লেখক উদ্ধৃতি সহযোগে তাহা আমাদিগকে দেখাইয়াছেন। এরূপ গবেষণামূলক গ্রন্থের একটি 'উপসংহার' থাকা উচিত ছিল যেখানে লেখক সূত্রাকারে তাঁহার বক্তব্য উপস্থাপিত করিতে পারেন।

পরিশেষে, শাক্ত সাহিত্য সম্পর্কে শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, তার জন উডরফ প্রভৃতি সুধিগণ যে সকল প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, উহাদের ও একটি সুবিস্তৃত ও পূর্ণাঙ্গ তালিকা 'গ্রন্থপঞ্জী'রূপে সন্নিবিষ্ট করা উচিত। 'অর্বাচীনের' প্রসঙ্গে লেখক পাদটীকায় শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। এই সঙ্গে বহু শক্তি সাধকের চরিতকার অতুলচন্দ্র চক্রবর্তীর গ্রন্থাদিও উল্লেখযোগ্য। শক্তিসাধকগণের চরিত-কথা সন্নিবিষ্ট হইলে গ্রন্থখানি আরও চিত্তাকর্ষক হইত।

'সাহিত্য আকাদামী' এই তত্ত্বসমৃদ্ধ ও তথ্যপূর্ণ গ্রন্থখানিকে স্বীকৃতি দান করিয়া যথার্থ গুণীজনের প্রতিই সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরাও মনস্বী লেখককে আমাদের অন্তরের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জানাই।•

• ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য—শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত, প্রকাশক—সাহিত্যসংসদ, ৩২/এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা—৯ মূল্য : ১৫·০০।

নীরদবরণের দুটি বই

১] **শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্তা**

প্রকাশক : শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী [১৯৬১]

পৃষ্ঠা সংখ্যা—৩৪৪। দাম : ৩·০০।

২] **Correspondence with Sri Aurobindo**

[Second Series]

প্রকাশক : ঐ ; [১৯৫৯]

পৃষ্ঠা সংখ্যা—২৯৩। দাম : ৩·০০।

অরবিন্দের রাজনীতিক জীবন ইতিহাসের পৃষ্ঠার নীচে ঢাকা আছে। গবেষক ও কিছু কিছু ছাত্র ছাড়া আর কারো সেদিকের পরিচয় বিশেষ জানা নেই। ভারতবর্ষে প্রথম সশস্ত্র বিপ্লবের প্রবর্তক ও নেতা তিনি ; কিন্তু সে-অধ্যায় এত দূর, এতই অতীত যে এর বেশি, এমনকি এইটুকুও বেশ পরিচ্ছন্নভাবে জানার দরকার দেশের তথাকথিত শিক্ষিত শ্রেণীও মনে করেন না। আধুনিককালে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সামনে অরবিন্দর কোনো পরিচয় বাস্তবিকই নেই। তাঁদের রচনায় ও আলোচনায় সে আভাস অন্তত এখনো পর্যন্ত পরিষ্কারভাবে পাওয়া যায়নি।

তারপর অরবিন্দর সুদীর্ঘ রহস্যময় অন্তর্ধান। ১৯১৪ থেকে ১৯২২ পর্যন্ত তাঁর পরিচয় কলমের মুখে কিছুকাল আবার পাওয়া গিয়েছিল কিন্তু 'আর্য'র প্রকাশ ও প্রচার বাঙলার সীমাবদ্ধ ছিল মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিশেষ শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ; সুতরাং এই সংক্ষিপ্তকালের ভিতর লেখা তাঁর এই যুগের সর্বোত্তম রচনাবলীও তখনকার মতো বৃহত্তর লোকসমাজের অগোচরে রইল।

১৯৩৯ বা তার পরে এই রচনাগুলি একে একে বই হয়ে বেরুতে থাকে। তাঁর যে-কোনো একটি ভারি বই, 'লাইফ ডিভাইন,' 'দি আইডিয়াল অব্ হিউম্যান ইউনিটি' 'দি হিউম্যান

সাইক্‌ল্,' বা 'দি সিম্বেলিস অব ইয়োগার জ্যাকেট একটু ওল্টালেই দেখা যাবে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মনিষীদের মনে তাঁর রচনা কিরকম আলোড়ন এনেছে। কিন্তু আমরা এখনও এসব বিষয়ে অবহিত নয়। এবং আবারো, অর্থাৎ অরবিন্দর ক্ষেত্রেও যদি সেই পুরনো ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে, অর্থাৎ আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে অন্যদেশের আবারো দেখিয়ে দিতে হয় যে আমাদের দেশ, আমাদের প্রতিভা, আমাদের সৃষ্টি কীর্তি সম্পদ সম্ভাবনা, আমরা বুঝিনা, অন্যরা সে রত্ন সর্বদাই আগে আবিষ্কার করে, আহরণ করে' সমৃদ্ধ হয়ে তারপর দয়া করে আমাদের প্রসাদ দিয়ে ধন্য করে তবে তার চেয়ে অপমানকর বেহাঁশ অবস্থার কথা ও ভাবা যায় না। তারপরে আমাদের জাতি হিসাবে বেঁচে থাকাও ত বিড়ম্বনা।

অরবিন্দর পরিচয় আবার এই বইগুলির ভিতরেই সীমাবদ্ধ নয়। বইগুলি তাঁর একেবারেই প্রথমদিকের রচনা, তাঁর নিজের ভাষায়, 'The intellectual side of my work for the world'—[স্মৃতি থেকে উদ্ধৃতি, হুবহু হবই হল না। স. ব]—কারণ তাঁর জীবন ও কর্মের আর একটি বিচিত্র অধ্যায় শেষ করে এবার আরো গভীর ও গহন ধ্যান-জগতে তিনি এর পরে নিজেকে সম্পূর্ণ আবৃত করে নিয়েছিলেন।

একটা বিষয় বা phenomenon হিসাবেও অরবিন্দ কত বিশাল : বলা যায়, অতল, সীমাহীন, অগাধ। মানবজাতির সামনে তাঁর জীবন প্রকাণ্ড বিস্ময় ও একটা মহাজিজ্ঞাসার মতো, তাঁর আর-সব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কীর্তি বাদ দিয়েও চিরদিন জেগে থাকতে পারে। অরবিন্দ-জীবন, অরবিন্দ-যোগ, অরবিন্দ-দর্শন, অরবিন্দ-সাহিত্য, এ সবের ব্যাপক, গভীর, বিপুল, বহুমুখগামী গবেষণার দিনও সুরু হতে হয়ত দেরী আছে এখনো। কিন্তু একথা নিশ্চিত যে তাঁর যুগ,—এখনো অলক্ষ্য হয়তো,—অনিবার্যভাবেই সুরু হয়ে গেছে,—এবং ক্রমশই তাঁর চিন্তা ও তাঁর প্রদর্শিত পথেই মানুষকে চলতেও হবে, কারণ তা ছাড়া পথ নেই।

এখন এই অসামান্য একটি প্রতিভা ও অদ্ভুতপূর্ব একটি ব্যক্তিত্ব এর পরে, অর্থাৎ ১৯২৬ এর পরে, লোকচক্ষুর আড়ালে কেমন করে ধীরে ধীরে পূর্ণ পরিণতির পথ ধরে মানোত্তীর্ণ রূপ ও চেতনায় বিকশিত হয়ে উঠল, আবার লোকচক্ষুর আড়ালে, ধীরে ধীরে নিভেও গেল, সেই মহারহস্যের কাহিনীও সবটুকুই ঢাকা আছে এখনো। অরবিন্দর পরিণত জীবনের এই দিকটি বলা যায় মহাসমুদ্রের মতো।

১৯২২এর পর প্রকৃতপক্ষে কেবল রচনার জন্য আর কোনো বই তিনি লেখেননি। সে স্পৃহাই তাঁর হয়নি। বই লেখা,—তাঁর ভাষায় book making,—তাঁর কাছে শিশুসুলভ, অবাঞ্ছিত, অপ্রয়োজনীয়, এমনকি পণ্ডশ্রম মনে হয়েছে। তাঁর কাল ১৯২৬এর পরে বাইরে থেকে কিছুই আর চোখে পড়েনি। সেইজন্যই মানুষ আরো সহজে তাঁর সম্বন্ধে বিভ্রান্ত ও পরে নিঃস্পৃহ থেকেছে। এইটুকুই মাত্র কল্পনা করা যায় যে একমাত্র জীবনকে নিয়েই তাঁর কাজ, সাধনা : তিনি জীবনের মূলে একেবারে অচেতন মাটির গভীরে নেমে গিয়ে সেখান থেকে সাধনার বলে সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করে তার উপর ইমারত গড়তে গড়তে উপরে উঠে এসেছেন। কল্পনার সীমা এইটুকুই। কারণ এর পরে জীবনকে সমগ্রভাবে কোথাও এনে তিনি দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন কিনা, অন্য কোনো বর্ণাঢ্য সম্ভাবনার দ্বার মানবজীবনের দিকে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন কিনা, এ কথা বলার ভার ভবিষ্যতের মানুষের : তারা হয়ত আমাদের আগতিক অস্তিত্বের অন্তরে তাঁর সাধনা, তাঁর কাজ, একদিন প্রত্যক্ষ করে অভিভূত হবে, এবং অরবিন্দকে আবিষ্কারও হয়ত সেইদিন প্রকৃত পক্ষে সুরু হবে।

(২)

১৯২৬এর পর তাঁর কোনো বই নেই,—এক 'সাবিত্রী' ছাড়া,—কিন্তু চিঠি অজস্র আছে। চিঠিগুলি থেকে তাঁকে জানা সহজ হয়, তাঁর দর্শন ও যোগ সম্বন্ধেও আরো অনেক সহজভাবে জানা যায়। অরবিন্দর ভাষা ইংরেজি,—আর সে

ইংরেজিও অসাধারণ : এ কালের শ্রেষ্ঠ ইংরেজি লেখকও ত তিনিই,—তিনি ছাড়া আর কে ?

এই চিঠিগুলির সংখ্যা যে কত তা ঠিক জানা নেই. তবে ইতিমধ্যেই মোটা চার ভলুম বই হয়ে বেরিয়েছে এবং এখনো যা জমা আছে তা বই হয়ে বেরুতে বহুদিন লাগবে। ১৯২৬এ তিনি যখন উপরের ঘরে নির্জনবাসে সরে গেছেন তখন থেকে এই চিঠিগুলির সূত্র। অজস্র প্রশ্ন এসেছে সাধনে, অজস্র ধারায় উত্তর প্রবাহিত হয়েছে বিপুল বন্যার বেগে। কতদিন এই উত্তর লিখতে লিখতে বিকেল থেকে পরদিন সকাল পর্যন্ত তাঁর কেটে গেছে। নীরদবরণের typescript সম্বন্ধে একটি ঈষৎ অধৈর্য জিজ্ঞাসার উত্তরে তাঁর নিজের ভাষাতেই এই চিঠিপর্বের একটু বেশ সুন্দর ছবি পাওয়া যায় :

> My dear sir, if you saw me nowadays with my nose to paper, from afternoon to morning, deciphering, deciphering, writing writing. writing, even the rocky heart of a disciple would be touched and you would not talk about typescripts and hibernation'

এই বইখানি তাঁর সঙ্গে নীরদবরণের নিজস্ব পত্রোত্তরের সঙ্কলন : এক হিসাবে সেইজন্যই অতি মনোজ্ঞ ও উপাদেয়, কারণ তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের সৌরভে বইখানি আপাদোড়া উজ্জ্বল হয়ে আছে। শিষ্যদের মধ্যে একমাত্র নীরদবরণই বোধহয় তাঁর প্রতি অসীমসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন এবং এই দুর্লভ অধিকার কৌতুকে স্নেহে অসীম সহিষ্ণুতায় প্রশ্রয়ে এবং স্বেচ্ছায় তাঁকেও স্বয়ং অরবিন্দই দিয়েছিলেন। সামান্য নমুনা থেকেই তা পরিষ্কার হবে। এবং একমাত্র নীরদবরণই বোধহয়, যাকে সহাস্যে 'সার' বলে অরবিন্দ সম্ভাষণ করতেন। নমুনাগুলির আগে চিঠি সম্পর্কে আর একটি কথা : অরবিন্দর রচনাবলীর ভাষা একরকম, চিঠিগুলির আর একরকম। তাঁর চিঠির প্রকৃতি বলা যায় কর্ণার মতো : উদ্দাম, অপর্যাপ্ত, অনর্গল। নীরদবরণের দুঃসাহসিক প্রকৃতি এবং অরবিন্দর স্নেহাসক্ত সহিষ্ণু সকৌতুক উত্তরগুলি. আর সবদিক বাদ দিয়েও কেবলমাত্র সাহিত্যের দিক থেকে দেখলেও, দ্বিতীয় কোনো বিশ্লেষণ ব্যবহার না করে বলা যায় 'অনবদ্য' :

> নীরদ : You won't say anything about the Supramental till it descends. It is this great mystry about it that makes us pin all our faith on it and the word Supermind goes from mouth to mouth. Ah, if we could have faint glimpses of it !
>
> শ্রীঃ: Not much utility in this mouth to mouth business.
>
> নীরদ : Your Supermind business baffles one's understanding and some of us are sceptic about it and some think it not worth while at present to bother about it.
>
> শ্রীঃ: Well, it may not be necessary to understand it but it is advisable not to misunderstand it. The scepticism is stupid, because how can one pronounce for or against something one does not know or understand at all ?

এক জায়গায় নীরদবরণ লিখছেন :

Guru,

> My head, my head
> And the damned fever—
> I am half dead ।

উত্তরে গুরু :

> ...Just think if you had been a Spaniard in Madrid or a German communist in a

concentration camp! Imagine that and then you will be quite cheerful with only a cold and headache. So

Throw off the cold
Damn the fever,
Be sprightly and bold
And live for ever.

এক-এক সময়ে এক-এক মূর্তিতে তিনি এক-এক জনের সামনে এসেছেন। কিন্তু নীরদবরণের সঙ্গে তাঁর এই মহান রহস্যপ্রিয়তা, এই প্রমাণ উপস্থিত না থাকলে, তাঁর সম্বন্ধে ভাবা নেহাৎই অসম্ভব দাঁড়াতো। উদ্ধৃতি একটু দীর্ঘ হবে কিন্তু কিছুই ক্ষতি নেই তাতে :

নীরদ : Will you make it clear to me what exactly the Brahman consciousness is?

শ্রীঅ: Eternal Jehovah! You don't even know what Brahman is! You will next be asking me what Yoga is or what life is or what body is or what mind is or what sadhana is! No, sir, I am not prepared to teach an infant class the A. B. C. of the elementary conceptions which are the basis of Yoga. There is Amal who does't know what consciousness is, even!

কিন্তু প্রশ্নকর্তা যে নীরদ! এইখানে চুপ করে গেলে ত হবে না! অতএব :

Brahman, sir, is the name given by Indian philosophy since the beginning of Time to the one Reality, eternal and infinite which is the self, the Divine, the All, the more than All, which would remain even if you and everybody and everything else in existence or imagining itself to be in existence vanished into blazes—even if the whole universe disappeared, Brahman would be safely there and nothing whatever lost. In fact, sir, you are Brahman and you are pretending to be Nirod; when Nishikanta is translating Amal's poetry into Bengali, it is really Brahman translating Brahman's Brahman into Brahman. When Amal asks me what consciousness is, it is really Brahman asking Brahman what Brahman is. There, sir, I hope you are satisfied now.

[৩]

চিঠির মতো তাঁর 'কথাবার্তা'ও অতি চমৎকার,—যদি তা কেবলমাত্র সাহিত্যের দিক দিয়েও ধরা যায়। বরং বলা যায় 'কথাবার্তা'র চমৎকারিত্ব আরো বেশি। চিঠিতে একটা সীমা ও আড়াল থাকে কিন্তু আলাপে তিনি একেবারে সামনে এসে দাঁড়ান, প্রাঞ্জল প্রখর তেজনাদীপ্ত অনর্গল ভাষায় অনুকরণীয় ভঙ্গীতে কথা বলেন,—বিস্ময়েরও বাধা ও সীমা সরে যায়। সবচেয়ে সুন্দর, আলাপে তাঁর নিজের মুখে নিজের বিষয়ে কথাগুলি। 'কথাবার্তা' বইটি বাঙলা,—অর্থাৎ ইংরেজি কথারই বাঙলা তর্জমা নীরদবরণ তাঁর ইংরেজী নোট থেকে করে দিয়েছেন,—কিন্তু ইংরেজি একটু না দিলে এ জিনিষ কি ঠিক ধারণা হবে না। এপ্রিল ৬২' সংখ্যার 'মাদার ইন্ডিয়া' থেকে নীরদবরণের ইংরেজি একটু লেখা 'কথাবার্তা'র নমুনা হিসাবে তুলে ধরা গেল। এইদিনের কথাবার্তার তারিখ, জানুয়ারী ৮, ১৯৩৯ : বিষয়, গান্ধিজীর অহিংসা, হিটলার, ইংরাজ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি :

শিষ্য : Gandhi writes that non-violence tried by some people in Germany has failed because it has not been so strong as to

generate sufficient heat to melt Hitler's heart.

শ্রীঅ: It would have to be a furnace in that case, the only way to melt his heart is to bomb it out of existence.—

The trouble with Gandhi is that he had to deal with only Englishmen. If he had been obliged to deal with Germans or Russians his non-violence would have had much less chance. The English people like to be at ease with their conscience. They have a certain self-esteem and they prize the esteem of the world also. Not that they are not sentimental; only they don't show it. The Russians and Germans are also sentimental but at the same time more cruel. Today a Russian may knock your head through the window-pane but tomorrow he may weep and embrace you. Englishmen also can be very cruel—for a time: they cant go on with a persistent brutality Hitler has cruelty in his blood.

নীরদ: Englishmen seem also to appreciate a man standing up to their violence.

শ্রীঅ: The only way to teach an Englishman a lesson when he is making a nuisance of himself is to give him a blow in the face. Then he becomes all right. There have been numbers of such cases.

কথাবার্তার পিছনে একটু ইতিহাস আছে। নভেম্বর ৩৮-এ পায়ে আঘাত লেগে অনেকদিন অরবিন্দ শয্যাশায়ী থাকেন। এইসময় চিঠিপত্তর বেশ থাকে, পরে প্রথমদিকের সান্ধ্যবৈঠক আবার ফিরে আসে। উপরে তাঁর ঘরে প্রতিদিন বিকালে এই আসর বসত: তিনি সাধারণত তাঁর বিদ্যালয় কয়েকজন বিশেষ অন্তরঙ্গ শিষ্য তাঁকে ঘিরে থাকতেন। এঁদের মধ্যে নীরদবরণ এবং এ. বি. পুরাণী, প্রতিদিনের কথাবার্তা ফিরে গিয়ে রাত্রে রেকর্ড করে রাখতেন। এগুলির উপযোগিতা সেদিন হয়ত এমনভাবে বোঝা যায়নি। আজ মনে হয়, এই রেকর্ডগুলি না থাকলে অপূরণীয় ক্ষতি থেকে যেত; কারণ এই যে আলাপচারী অরবিন্দের অপরূপ মূর্তির সঙ্গে জগতের পরিচয় হয়, তার কোনো সম্ভাবনাই থাকত না। নীরদবরণ যে কাজ সেদিন করেছেন তার মূল্য আজ ঠিক নির্ণয় করা যাবেনা, তার উপলব্ধি হবে পরে। ক্রমশ। অরবিন্দ যদি বলা যায় নিজেকে প্রকাশ করেছেন তাঁর রচনায়, তবে তাঁকে প্রকাশ করলেন নীরদবরণ প্রমুখ তাঁর কয়েকজন শ্রেষ্ঠ অন্তরঙ্গ শিষ্য। বুদ্ধ, সক্রেটিস, প্লেটো, যীশু, রামকৃষ্ণ, এঁদের কথাগুলি যেমন জগতে অমর হয়ে আছে তেমনি অরবিন্দর চিঠি ও কথাবার্তাও পৃথিবীতে চিরজীবী। তাঁর নামের সঙ্গে মানবচেতনার ইতিহাসে নীরদবরণ প্রমুখ তাঁর এই শিষ্যদের নামও চিরস্মরণীয় থাকবে।

ইংরেজি আলাপের বাঙলা তর্জমার একটা কারণ নীরদবরণ এই বলেছেন যে অরবিন্দর কথাবার্তা কিছু কিছু Evening talks বইতে শ্রী এ বি. পুরাণী আগে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তাতে কিছুই এসে যায় না। দুজন শিল্পীর হাতে একই মূর্তি কখনো অবিকল এক হয়ে ফুটতে পারেনা: তার দুই আলাদা রূপ, আলাদা স্বাদ, দুয়ের রচনার অবশ্যই থাকবে। নীরদবরণের ইংরেজি রচনা ধারাবাহিক ভাবে 'মাদার ইন্ডিয়া'য় অবশ্য প্রকাশিত হচ্ছে এবং সেগুলি পরে বই হতেও বাধা নেই। বাঙলা বই বৃহত্তর পাঠকসমাজের জন্য সেই কারণে উপরন্তু থাকলো।

নীরদবরণ প্রথমত কিন্তু ডাক্তার,—বলা যায় অনেকটা পথের দাবীর সব্যসাচীর ধরণে। বিলেত থেকে পাশ করে

এসে সবে পশার জমিয়ে বসেছেন এমনসময় ১৯৩১-এ একবার পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দ দর্শনে আসেন। এই বিরাট পুরুষের সান্নিধ্যে একবার এসে জন্মের মতো জাগতিক জীবন তাঁর কাছে তুচ্ছ হয়ে গেল: ১৯৩৩এ এসে স্থায়ীভাবে আশ্রমে সাধকের জীবন বরণ করে নিলেন। দেশের জন্য সর্বস্বত্যাগী ডাক্তারী একদিন জলাঞ্জলি গিয়েছিল, এঁর ডাক্তারীতে ইস্তফা মূলত অরবিন্দের কৃপায়। আশ্রমের জরুরী প্রয়োজনে এখনো মাঝে মাঝে অতীতের ডাঃ নীরদবরণকে স্টেথ্‌স্কোপ খুঁজে নিয়ে তাঁর কুটির ছেড়ে বের হয়ে আসতে হয় কিন্তু মূলত ইনি কবি, ইংরেজি সাহিত্যে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও কর্তৃত্বের অধিকারী,—আশ্রমের কলেজে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপনা বর্তমানে তাঁর অন্যতম প্রধান কর্তব্য। 'মাদার ইন্ডিয়া'র পাঠকমাত্রই তাঁর বেদবাণ বলশালী স্বচ্ছন্দ ইংরাজি ভাষার সঙ্গে সুপরিচিত আছেন। অরবিন্দ স্বয়ং তাঁর কাব্যরচনার মূল এবং পরিশেষে তাঁর সাহিত্যকর্মের একান্ত গুণগ্রাহী। সাহিত্য ও সাহিত্যিক, দর্শন ও দার্শনিক, জগত ও জীবন, মানবচরিত্র, রাজনীতি, ইতিহাস, প্রশাসনিক সমাজব্যবস্থা, ইত্যাদি বিষয়ে অরবিন্দের যে সমৃদ্ধ জ্ঞানগর্ভ অভিমতগুলি পাওয়া যায় তার জন্য কৃতিত্ব মূলত নীরদবরণ এবং দিলীপ রায়েরই।

অরবিন্দ ধ্যানী, গম্ভীর, সুদূর, শীতল, এইরকম একটি মূর্তিতেই তাঁকে আমরা সাধারণত কল্পনা করি, কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে শিষ্যদের সঙ্গে তিনি কত সহজ স্বাভাবিক ও অন্তরঙ্গ যে হতে পারেন, সে পরিচয় 'কথাবার্তা'র পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় পেয়ে পাঠক পুলকিত হবেন। আলোচনা ইতিমধ্যে দীর্ঘ হলেও সেদিকের সামান্য একটু পরিচয় এখানে রাখা চলে: কথাবার্তা, পৃঃ ২১৫ :

পুঃ নিষ্ঠা [অভারতীয় শিষ্যা] ও ভারতীয় জিনিষ দেখে মুগ্ধ। আমাদের মেয়েদের চালচলন তাঁর চোখে খুব সুন্দর লাগে। তিনি বলেন 'তোমরা বুঝবে না, কিন্তু আমি আমাদের পাশ্চাত্য মেয়েদের ভাল করে চিনি, তাদের বুঝি। তোমাদের মেয়েদের চলার ভঙ্গি দেখে মনে হয় তারা আজন্ম নর্তকী। কী সুন্দর ছন্দ।'

শ্রীঅঃ সত্যি কথা। মাথায় কলসী নিয়ে চলতে হয় বলে বোধহয়। তাতে টাল ঠিক রাখতে হয় কিনা।

পুঃ আমাদের মেয়েদের রঙিন শাড়ীও তাঁর খুব পছন্দ, বলেন যে তাদের রঙের বোধ আছে।

শ্রীঅঃ সেটাও সত্যি। আশা করি আধুনিকতার কবলে পড়ে তারা এসব জলাঞ্জলি দিচ্ছে না।

নীরদঃ কিন্তু শাড়ী দেখতে মনোরম হলেও কাজের বেলায় বড্ড অসুবিধাজনক।

শ্রীঅঃ কেন? রোমানেরা টোগা পরে পৃথিবী জয় করেনি? অনেক মেয়ে শাড়ী পরে শক্ত কাজ করে। অসুবিধা, সুবিধা, উপকারিতা ইত্যাদি বুলি যখন পেয়ে বসে, তখন সৌন্দর্যকে শ্মশানবাসী হতে হয়।...সৌন্দর্য যেন কিছু নয়।

নীরদ: আমার নিজের বেলায় দেখেছি যে সাহেবি পোষাকে কাজে একটা উৎসাহও বেশ পাওয়া যায়; ধুতি পরলেই মনে হয় একটু আরাম করি।

শ্রীঅঃ তবুও তার মত জঘন্য পোষাক আর নেই। আমি প্রচুর লোক দেখেছি যারা ধুতি পরে বেশ পরিশ্রমের কাজ করে।

পুঃ ভারতীয় মহিলারাও সাহেবি পোষাক পরছে!

শ্রীঅঃ ভারতীয় মেয়ের সাহেবি পোষাক! কদর্য!

কথাবার্তা প্রসঙ্গে ফোভের স্বর আর একটি কথা মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের স্বর কিছু কিছু রেকর্ড করা আছে, গান্ধিজীরও রেকর্ড আছে অনেক অরবিন্দর স্বর রেকর্ডে থাকলে, তা একটি সম্পদ হয়ে থাকত। কথাবার্তাগুলিরও হুবহু নয়; স্বয়ং নীরদবরণই কথাবার্তার ভূমিকায় বলেছেন, 'শ্রীঅরবিন্দের কথা হুবহু নোট করা অসম্ভব'—সব সম্ভবত নোট করাও

যায়নি,—সেইজন্য মনে হয়, এদের সৈনোগ্রাফি জানা থাকলে অরবিন্দর মুখের কথাগুলিও সম্পূর্ণ নিখুঁতরূপে পাওয়া যেতো।

'কথাবার্তা' ও 'কয়েদপনুডেল্' দুয়েই বিষয়বস্তু বহু বিস্তৃত, বিশেষত যোগের বহু জটিল ও সূক্ষ্ম বিষয়কে কেন্দ্র করে তা প্রসারিত হয়ে আছে। অরবিন্দর ধ্যানের জগতে প্রবেশ আমাদের সকলের,—অর্থাৎ অন্তর্জীবনের সঙ্গে যাদের অন্তরঙ্গতা কম,—হয়ত সুসাধ্য হবে না কিন্তু এই দুটি বই সহজেই যে কোনো মানুষকে এই যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের স্বাদ ও আনন্দ দিতে পারবে। অন্তত এই জন্যও বইগুলি সসম্মানে আমরা গ্রহণ করতে পারি।

কথাবার্তার কাল ১৩৩৮ থেকে ৫০; অর্থাৎ তাঁর জীবনের শেষ বারো বছর। এই বইর কথা যায় ৩. ২. ৩৯ পর্যন্ত। তাহলে ১৯৫০ পর্যন্ত আরো বহু কথা, বিশেষত বিশ্বের সমসাময়িক ঘটনা ও ব্যক্তিবর্গের বিষয়ে, নিশ্চয় তাঁতারে এখনো বহু পরিমাণে জমা হয়ে আছে। সানন্দ আগ্রহে আশা করা যায় যে সেগুলিও একে একে বই হয়ে বেরুবে।

সত্যব্রত বসু

প্রাপ্তি স্বীকার

বাঙলা সাহিত্যে মোহিতলাল—আলোহার উদ্দীন খান্
কাঞ্চন তৃষ্ণা—বিনত শর্মা
তিনশাড়ী—নীলিমা দাশগুপ্ত
ইরানীর প্রেম—"
তারাশংকর—ডাঃ হরপ্রসাদ মিত্র

কেন্দ্রীয় বাজেট

(৯৩ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

বাজেটেও নূতন রাজস্বের শতকরা ৩২ ভাগ আসবে পরোক্ষ কর থেকে। কিন্তু দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পাঁচ-বৎসরে ও গত বৎসরের তুলনায় এবারকার বাজেট একটু যে ভাল এ কথা স্বীকার করতে হবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে ভারত সরকার কর ধার্য করে মোট ৩১১৮ ৮৭ কোটি টাকা তুলেছিল। এর মধ্যে পরোক্ষকর থেকে তোলা হয়েছিল ২৩৪২৩০ কোটি টাকা— অর্থাৎ মোট কর লব্ধ রাজস্বের ৬৫ অংশ। গত বৎসরের বাজেটে মোট করলব্ধ রাজস্বের ৬৮'৬ অংশ পরোক্ষ কর থেকে তোলা হচ্ছেছে। কাজেই এ বৎসরের বাজেটে সেই তুলনায় মোট নূতন রাজস্বের ৩২ ভাগ পরোক্ষ কর বসিয়ে তোলা হবে। তা ছাড়া এ বৎসর যে কয়টি নূতন উৎপাদন শুল্ক বসান হয়েছে - এই সব দ্রব্যের কোনটিকেই নিত্যব্যবহার্য আবশ্যকীয় দ্রব্যের পর্যায়ে ফেলা যায় না। পুরাতন উৎপাদন শুল্কের মধ্যে একমাত্র তামাক ও দিয়াশলাই এর উপর ধার্য শুল্ক বৃদ্ধির ফলে গরীব মধ্যবিত্তদের কিছুটা অসুবিধা হতে পারে সন্দেহ নাই। কাপড়ের শুল্ককেও এই পর্যায়ে ফেলা উচিৎ হবে। তা ছাড়া অন্য শুল্কগুলির চাপ গরীব মধ্যবিত্তদের ঘাড়ে পড়বে না। কাজেই অন্তত এই বৎসরের বাজেট অন্যবারের তুলনায় একটু কম অসামাজ তান্ত্রিক বললে দোষ হবে না। পূর্বেকার বৎসরগুলিতে আরো খারাপ ছিল এইটুকুই সান্ত্বনা।

আসলে আয়কর প্রভৃতি প্রত্যক্ষ কর থেকে আরো বেশী রাজস্ব কি করে আদায় করা যায় এ বিষয়ে আমাদের বিশেষ করে আমাদের ভাবতে হবে। আয়কর ফাঁকিও যেমন প্রচুর দেওয়া হচ্ছে ধার্যকর আদায় বিষয়েও অনেক শৈথিল্য দেখা যায়। আর সারা ভারতে উত্তরাধিকার কর বাবদ মাত্র চার কোটির রাজস্ব আদায় হচ্ছে এও অতি দুঃখের বিষয়। করের হারের দিক থেকে আমরা কিছুমাত্র অনুন্নতি নই। এ ক্ষেত্রে আমরা অনেক উন্নত দেশের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারি। কিন্তু কর ফাঁকির ব্যাপারে আমরা অনেক উন্নত দেশ থেকেও উন্নততর। এবং সেই রন্ধ্র দিয়েই ধনীর ধনীত্ব বেড়ে চলেছে। প্রত্যেক বাজেট এই কথাটাই বিশেষ করে মনে করিয়ে দেয়।

'এমন ছেলেকে সামলাতে হলে আপনার কাজের আর অন্ত নেই ... বিশেষ করে ছেলেমেয়েদের যদি ফিটফাট রাখতে চান, তাহলে কাপড় কাচাটাতো লেগেই আছে।'

'সানলাইটে কাচি, তাই রক্ষে! তবু দেখে উঠছি সানলাইটের বেশার ফেনায় কাচাটা খুবই সহজ হলে। কেবল এমন ঘাঁটি সাবানেই এত ভাল কাপড় কাচা যায় আর তাও কোন ক্ষতি না করে।'

৪ ক ফ্লাট, ছবগুলি আলাদা, কথা লিখুন শ্রীমতী ওয়েলিংটন বলেন, 'কাপড় কাচায় সানলাইটের মতো এত ভাল সাবান আর হয় না।'

সানলাইট

কাপড়জামার সঠিক যত্ন নেয়!

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

সম্পাদকীয়

পশ্চিম বঙ্গের আর্থিক অবস্থা :

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার কোন দিকে পরিবর্তন হয়েছে ব্যবহারিক দৃষ্টিতে তা অনুধাবন করা গেলেও, এসম্পর্কে তথ্য-নির্ভর বিশ্লেষণ এ-যাবৎ পাওয়া যায় নাই। সম্প্রতি দুইটি সমীক্ষায় এদিককার কিছুটা সংবাদ পাওয়া গেছে, যদিও দুইটি সমীক্ষার ফল পরস্পর-বিরোধী।

পশ্চিম বঙ্গ সরকারের ষ্ট্যাটিস্টিক্যাল ব্যুরোর অনুসন্ধানে দেখা যায় ১৯৫১-৫২ সাল থেকে ১৯৫৫-৫৬ সালে পশ্চিম বঙ্গের আয়ের পরিমাণ ৭২৪·১৭ কোটি টাকা থেকে ৮৪৩·৪৭ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। প্রথম পরিকল্পনার শেষে পশ্চিম বঙ্গের মাথাপিছু বার্ষিক আয় ছিল ২৬২৲ টাকা। এই সময়ের মধ্যে সারা ভারতে মাথা পিছু আয় ছিল ২৬১৲ টাকা। ব্যুরোর রিপোর্টে দেখা যায়, ঐ সময়ের মধ্যে আসামে মাথা পিছু আয় ২৮১৲, অন্ধ্রে ২২৯৲, উত্তর প্রদেশে ২১২৲ মধ্য প্রদেশে ২১৮৲ ও কেরালায় ২৩৮৲ টাকা।

ঐ সময়ের মধ্যে পশ্চিম বঙ্গের ভূমিহীনদের সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের একটি অনুসন্ধানে এই রাজ্যের অর্থ নৈতিক অবস্থার একটি বিপরীত চিত্র পাওয়া গেছে। এই রিপোর্টে জানা যায় ১৯৫০-৫১ সালে এই রাজ্যে ভূমিহীন পরিবার সংখ্যা ছিল ১০,৭৮,০০০। ১৯৫৬-৫৭ সালে সে-সংখ্যা ১১,৬০,১০০তে দাঁড়ায়। অর্থাৎ শতকরা ৮·৯ বাড়ে। ঐ একই সময়ে ভূমিহীন কৃষকদের শতকরা হার ৪০·৭১ থেকে ৬০·৪১-এ বাড়ে। ভারত সরকারের রিপোর্টে ভূমিহীনদের কর্মসংস্থানের অবস্থাও নিরাশাব্যঞ্জক দেখা যায়। ১৯৫০-৫১ সালে একজন টিকা বয়স্ক পুরুষকর্মী গড়ে ২·২ দিন পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ পেয়েছে। ১৯৫৬-৫৭ সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ২২৭ দিনে। ১৯৫০-৫১ সালে নিজ উদ্যোগে (self-employed) ৪০ দিন কর্মসংস্থানের সুযোগ পেলেও ১৯৫৬-৫৭ সালে এই সংখ্যা ১৯৫১-৫৭ সালে ২৫-এ নেমে যায়। ১৯৫০-৫১ সালে এরা ৯৩ দিন বেকার থাকলেও ১৯৫৬-৫৭ সালে ১১৩ দিন বেকার ছিল। ১৯৫০-৫১ সালে টিকা দিনমজুরের মজুরী দৈনিক ১১১ নয়া পয়সা থেকে ১৯৫৬ সালে ১৪৩ নয়া পয়সায় নেমে যায়।

কৃষিজীবীদের পারিবারিক আয়ের পরিমাণ ১৯৫০-৫১ সালে ৩০৮ টাকা থেকে ১৯৫৬-৫৭ সালে ৩৫৭ ৩২ টাকায় বৃদ্ধি পেলেও এই শেষ বছরে ব্যয় হয় গড়ে ৭২৫ টাকা। এই অতিরিক্ত ব্যয় মূলধনী সম্পত্তি বিক্রয় করে মেটানো হয়েছে। ঋণগ্রস্ত কৃষিজীবী পরিবারের হার ১৯৫০-৫১ সালে শতকরা ৩৩ থেকে ১৯৫৬-৫৭ সালে শতকরা ৬৯-এ বৃদ্ধি পায়। পশ্চিম বঙ্গের কৃষকদের এই নিরাকরণ দারিদ্র্যের মধ্যে অনাহার রোধ করবার জন্যই সরকার বছর বছর চৌদ্দ বিলিতে প্রচুর অর্থব্যয় করতে বাধ্য হন। ১৯৫৮-৫৯ সালে এ-বাবদ সাইত্রিশ হাজার টাকা ব্যয় হলেও ১৯৫৫-৫৬ সালে তার পরিমাণ দাঁড়ায় ২ কোটি ৫৮ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা। ১৯৬০-৬১ সালে আরও বেড়ে ৪ কোটি ১৫ লক্ষ টাকায় দাঁড়িয়েছে। সুতরাং পশ্চিম বঙ্গের যদি কোথাও কোনো উন্নতি হয়ে থাকে এই রাজ্যের

কর্মিবীদের ভগ্নস্তূপের ওপর তার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। আর এরা পশ্চিম বঙ্গের জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ৬০ ভাগ।

মূল্যবৃদ্ধি কমিটি :

উটপাখীর মত বালুর নীচে মাথা গুঁজে পশ্চিম বঙ্গ সরকার এ-যাবৎ মূল্যবৃদ্ধি প্রসঙ্গটির পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিলেন। পশ্চিম বঙ্গের খাদ্যমন্ত্রী সংখ্যাতত্ত্বের ঠাস-বুনানী দিয়ে মূল্যবৃদ্ধির বাস্তব অবস্থাকে লঘু করবার জন্য সভা সমিতি বৈঠকে প্রসঙ্গত বলে উঠছিলেন। কিন্তু বেশী দিন তা আর সম্ভব হোলোনা। অবশেষে পশ্চিম বঙ্গ সরকারকে অত্যাবশ্যক নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদির ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধির গতিবৃত্তি দিয়ে তার কারণ অনুসন্ধান ও প্রতিকার নির্ধারণের জন্য একটি কমিটি গঠন করতে হয়েছে। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ডাঃ ভবতোষ দত্তকে সভাপতি করে কমিটি গঠিত হয়েছে এবং ১৯৬৬ সালের ৩১শে মের মধ্যে কমিটির রিপোর্ট দাখিল করতে বলা হয়েছে।

অত্যাবশ্যক নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদির মধ্যে কোন কোন পণ্য অন্তর্ভুক্ত হবে সে সম্পর্কে সরকারের পক্ষ থেকে কোনো বিবৃতি দেওয়া হয় নাই। সংবাদপত্রে প্রকাশ রাজ্যসরকারের একজন অফিসার নাকি বলেছেন খাদ্য ছাড়াও জ্বালানী, মাছ, মাংস, তরকারী ও মসলাও এর অন্তর্ভুক্ত হবে। বস্ত্র ও এই অনুসন্ধানের আওতায় আসবে কিনা তা বোঝা গেল না।

চালের দাম গত এপ্রিল থেকেই ঊর্ধগামী। ইতিমধ্যে কিলো প্রতি ৭০ নয়া পয়সা থেকে আশী নয়া পয়সা দাম যাওয়া আসা করছে। সংবাদপত্রের রিপোর্টে জানা যায় কোনো কোনো বাজারে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে মণপ্রতি পাঁচ-ছয় টাকা বেড়ে গেছে। মুরলীপুরের ১৭ই মের একটি রিপোর্টে জানা যায় মোহনপুর থানার কুসুম কুমারী দাসীর অনাহারে মৃত্যুও হয়েছে। ডাল—তেল—নুন—মশলা—সবজী, সব কিছুর দাম চালের মূল্যতন্ত্রকে অনুসরণ করে ঊর্ধগামী হচ্ছে।

মাছের বাজারের কাহিনী পুরানো হলেও মারাত্মক। বিলম্বে হলেও সরকারী মহল বাজারের অনুসন্ধানে জানা যায় কলিকাতা ও হাওড়ার ৩৫০ আড়তদার ও ১৪,০০০ খুচরা বিক্রেতা কলকাতা ও আশপাশের মাছের বাজার করায়ত্ত করে রেখেছে এবং এদের মধ্যে খুচরা বিক্রেতারাই নাকি দলবদ্ধভাবে মুনাফাবাজি করে কাটা মাছে মণ প্রতি ৬৫ থেকে ৮০ টাকা ও গোটা মাছে মণ প্রতি ৪০ থেকে ৬০ টাকা মুনাফা লুটছে। আড়তদাররা নাকি সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করে ৪৲ টাকা হারে লাভ রেখে খুচরা বিক্রেতাদের কাছে মাছ বিক্রি করছে, সরকার খুচরা বিক্রেতাদের গোটা মাছে মণপ্রতি ১০ থেকে ১২·৫০ টাকা ও কাটা মাছে মণ প্রতি ২০ টাকা লাভে বিক্রির জন্য সম্মত করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এদিকে জুলাই মাসে মাছের বাজারে চরম সংকট দেখা দেবে এবং সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকবে। কারণ এটা মাছের ডিম ফোটাবার সময়।

আমাদের প্রশ্ন হল মূল্যবৃদ্ধি কমিটি আগামী বছর যে মাসের মধ্যে রিপোর্ট দাখিল করার পরও তাদের সুপারিশ সম্বন্ধে সরকারী সিদ্ধান্ত গৃহীত হতে আরও কয়েক মাস অতিবাহিত হবে। এক বছরের ওপর এই সময়ের মধ্যে মূল্যবৃদ্ধিজর্জর পশ্চিম বঙ্গবাসী কি অদৃষ্টের ওপর ভর করে থাকবে? না সরকার নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য আইনের প্রয়োগে মুনাফা শিকারীদের অত্যাচার থেকে দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধিক্লিষ্ট দরিদ্র মানুষদের রক্ষা করতে অগ্রসর হবেন?

অমূল্য চন্দ্র সেন

বাংলাদেশে স্বদেশীযুগের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত যে কয়েকজন আত্মত্যাগী ও আদর্শবাদী মানুষ সাংবাদিকতাকে জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করে বাংলাদেশে সাংবাদিকদের মর্য্যাদাকর প্রতিষ্ঠাভূমির পত্তন করে গিয়েছিলেন, বিপ্লবী অমূল্য চন্দ্র সেন তাদের অন্যতম। গত ২১ শে মে ৭২ বছর বয়সে তিনি লোকান্তরিত হয়েছেন।

১৯২৫ সালে আনন্দবাজার পত্রিকায় যোগদান করে ১৯৩২ সালে তার বার্তাসম্পাদক হন এবং পরে হিন্দুস্থান ষ্ট্যান্ডার্ডের ও বার্তাসম্পাদকের [redacted] করেন। তারপর 'ভারত, যুগান্তর,' পুনরায় 'আনন্দ[redacted] 'লোক সেবকে' নিষ্ঠাবান সাংবাদিকের স্বাক্ষর রেখে কর্মিত ১৯৫৬ সালে সাংবাদিকতার দায়িত্ব থেকে অবসর গ্রহণ করেন। বার্তা-সাংবাদিকতায় অমূল্যচন্দ্র যে শুধু নিজের রজনীপ্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন তা নয়, তিনি সর্বদাই নূতন সাংবাদিকদের প্রেরণা যুগিয়ে শ্রদ্ধা ও প্রীতির পরিমণ্ডলের মধ্য দিয়ে এক একটি গোষ্ঠীও রচনা করেছেন। ১৯৩১ সালে 'জয়শ্রীর' প্রথম প্রকাশের সময় তাঁর সহৃদয় সাহায্য ও পরামর্শ আজ আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি এবং লোকান্তরিতের পরিবারবর্গের প্রতি আমাদের গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

বার্তাজীবী সম্মেলন

ভারতীয় বার্তাজীবী সঙ্ঘের দশম বার্ষিক সম্মেলন গত ২৬ শে মে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হল। সম্মেলনের উদ্বোধক আইন মন্ত্রী শ্রীঅশোক সেন, সভাপতি শ্রীঅন্নদার ব্যানার্জি ও অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীকেদার ঘোষ গণতন্ত্র ও স্বাধীন সংবাদপত্র ও এবং বার্তাজীবীদের সংহতি সংক্রান্ত কয়েকটি মৌলিক সমস্যার আলোচনা করেন। গণতন্ত্রে অনিবার্যরূপে স্বাধীন সংবাদপত্রের অস্তিত্ব স্বীকৃত হলেও, শক্তিশালী গোষ্ঠীর প্রভাবমুক্ত সংবাদপত্রের আয়োজন আজও সম্ভব হয় নাই। কোনো স্বিতস্বার্থ-নিরপেক্ষ সংবাদপত্র পরিচালনা সম্ভব কিনা এই প্রশ্নটি এখনও পরীক্ষাধীন। এই প্রশ্নের সুষীমাংসার সঙ্গে কোনো বহিঃপ্রভাবমুক্ত, স্বাধীনভাবে সাংবাদিকের দায়িত্ব পালনের প্রশ্নটিও জড়িত রয়েছে। সরকার, শিল্পপতি-ব্যবসায়ী, সংবাদপত্র মালিক ও সাংবাদিকদের সমবেত প্রচেষ্টা ও সচেতন পাঠক সাধারণের সমবেত সহযোগিতার ওপর এই জটিল অথচ গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাটির মীমাংসা নির্ভর করছে। আশাকরি বার্তাজী[redacted] সমস্যাগুলির আলোচনা সমাধানের [redacted]

পূর্ববাংলার ভাগ্যাহত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়

পূর্ব বঙ্গের সংখ্যালঘুদের উপরে অত্যাচার, অগ্নিদাহ, ধর্ষণ, লুণ্ঠন ও হত্যার বর্বর ও অমানুষিক আক্রমণের যে বিবরণ দিনের পরে দিন পশ্চিম বঙ্গের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে তার সামান্য অংশও সত্য বলে স্বীকৃতি হলেও অসহায় ও নিরপরাধ একটি সম্প্রদায়ের উপরে এরূপ নৃশংস আচরণ মানবতাধর্মী প্রতিটি বিবেককে প্রচণ্ডভাবে ক্ষুব্ধ করে তুলবে। পূর্ববাংলার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপরে যাদা হাঙ্গামার যে ঘটনাবলী প্রকাশিত হয়েছে সেই বিবরণ সম্বন্ধে পাক সরকার কর্তৃক তাত্ত্বিক কোন প্রতিবাদ প্রকাশিত না হওয়ায়, একথা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে সংখ্যালঘু নির্যাতনের সংবাদ অধিকাংশই সত্য।

এবারে পূর্ববাংলায় যে দাঙ্গা হাঙ্গামা ঘটেছে তার তাৎপর্য অত্যন্ত ভয়াবহ। পূর্ববাংলার মুসলীম জনতার স্বতঃস্ফূর্ত সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বা ভাবাতিশয্যে এই সংখ্যালঘু নির্যাতনের পট অনুষ্ঠিত হয়নি, পাক-ভারতের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামার কোন ব্যাপক আবর্তের ঢেউও পূর্ববাংলার সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়কে স্বাভাবিক ভাবে উদ্বুদ্ধ করে তোলেনি। পূর্ববাংলার সংখ্যালঘুরা অত্যাচারিত হয়েছে পাক সরকারের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের উদ্যোগ, ইংগিত ও নেতৃত্বে। পূর্ববাংলার বাংলাভাষী মুসলীম জনতা এই বর্বর সরকারী কাণ্ডে ব্যাপক ভাবে অংশগ্রহণ করেনি, সরকারী অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে অ-বাঙালী রিফ্যুজী মুসলীম জনতা। একথা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে মালদহের সীমাবদ্ধ ঘটনাকে কাজে লাগিয়ে পূর্ববাংলার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে সরকারী 'হোস্টেজ' বা জামীন রূপে ব্যবহার করে পূর্ববাংলার জন-আন্দোলনকে বিচ্যুত করার এবং কাশ্মীর সমস্যাকে উত্তপ্ত রাখার এক

রাজনৈতিক ট্যাকটিক্সরূপেই অবাঙালী মুসলীম লেজুড়দের উচ্চতম সরকারী প্রবক্তারা উত্তেজিত করে হিন্দুদের উপরে লেলিয়ে দিয়েছে।

মালদহের ঘটনা নিঃসন্দেহ দুঃখজনক এবং ভারতের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের পক্ষে লজ্জাকর। কিন্তু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার প্রচলিত অর্থে মালদহের ঘটনাকে সাম্প্রদায়িক ঘটনা বলা যায় না। মালদহের ঘটনা ঘটে জনৈক মুসলীম কর্তৃক একটি সাঁওতাল রমণীর শ্লীলতাহানীর প্রশ্ন নিয়ে। সাঁওতাল-প্রথা অনুযায়ী এই ঘটনার সামাজিক প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে স্থানীয় মুসলমানদের প্রতি সাঁওতালরা আক্রমণ চালায়। মালদহের ঘটনা হিন্দু-মুসলীম সাম্প্রদায়িক ঘটনা নয়, এটা সামাজিক সংঘাতের অভিব্যক্তি। কিন্তু স্থানীয় শাসকবর্গ মুসলীম সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা রক্ষার প্রাথমিক দায়িত্বের জন্য নিশ্চয়ই দায়ী। কিন্তু কোনক্রমেই মালদহের ঘটনাকে ঢালাওভাবে হিন্দু-মুসলীম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আখ্যা দেওয়া যায় না।

এবারের পূর্ববাংলার সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ভারত সরকারের সামনে একটি মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপিত করেছে। ভারত বিভাগের চুক্তি অনুযায়ী উভয় রাষ্ট্র সংখ্যালঘুদের সকল রকম স্বার্থ রক্ষা করতে বাধ্য। এই কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হওয়ার অর্থ ভারত-বিভাগের মূল ভিত্তিকে অস্বীকার করা। এ কথা ঠিক যে ভারতেও মাঝে মাঝে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘটে থাকে। কিন্তু এই অভিযোগ কেউ করতে পারবে না যে ভারতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে রাষ্ট্রীয় আইন, আদর্শ বা অধিকারের দিক দিয়ে পৃথক ও হীনাবস্থায় পর্যবসিত শ্রেণীরূপে গণ্য করা হয়েছে। সরকার বা প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি মিলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার উস্কানী দিয়েছে অথবা দাঙ্গাকারী জনতা বা সরকারী কর্মচারীকে কোন ক্ষেত্রে কর্তব্যচ্যুতির জন্য রেহাই দেওয়া হয়েছে এরূপ অভিযোগ করা সম্ভব নয়। অন্যান্য বারের দাঙ্গা-হাঙ্গামায় পাক সরকার পরোক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করলেও এবারে খোলাখুলিভাবে প্রত্যক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। তাই এবারের পূর্ব-বাংলার দাঙ্গার প্রকৃতি অত্যন্ত মারাত্মক ও গুরুতর বলে গণ্য হওয়া প্রয়োজন।

পূর্ব বাংলার সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িক ঘটনা সম্পূর্ণরূপে রাজনৈতিক এবং এই সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার প্রশ্নও রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় স্তরে হওয়া বাঞ্ছনীয়। ভারত সরকার কর্তৃক সমস্ত রকম কূটনৈতিক চাপ পাকিস্তান সরকারের উপরে আসা উচিত। ভারতীয় হাইকমিশনার যাতে সমস্ত ঘটনার সরেজমীনে তদন্ত করতে পারেন সেজন্য কঠোরতার সঙ্গে দাবী করা প্রয়োজন। যদি পাক সরকার সংখ্যালঘুদের জীবন, প্রাণ, ধর্ম, এবং ধন ও সম্পত্তি রক্ষায় অক্ষম হয় তা' হলে ভারত সরকার তাদের পবিত্র প্রতিশ্রুতি এবং ভারতীয় স্বাধীনতার রাষ্ট্রশক্তির মূল সূত্রের কথা বিস্মৃত হতে পারে না। সর্বপ্রকার কূটনৈতিক চাপ অগ্রাহ্য হলে ভারতের আকাশপথে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিমান চলাচলের অধিকার প্রত্যাহারের ব্যবস্থা গ্রহণ করার সম্ভাবনার কথা পাক সরকারকে জানিয়ে দেওয়া প্রয়োজন।

উদ্বাস্তু পুনর্বাসন বিভাগ তুলে দেওয়ার অজুহাতে এবং পূর্ববঙ্গাগত ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব গ্রহণ না করার পূর্ব বিজ্ঞপ্তির দোহাই দিয়ে, ভীত, সন্ত্রস্ত ও অত্যাচারিত যে সমস্ত সংখ্যালঘু পূর্ব বাংলা ছেড়ে ভারতে আসতে চায় তাদের যাইওেশন সার্টিফিকেট দান বন্ধ করে সীমান্ত অতিক্রমের পথ বন্ধ করা শুধু মানবিক দিক দিয়েই অন্যায় নয় ভারত ভাগের মৌলিক সূত্রের দিক দিয়েও অমার্জনীয়। যারা আসতে চায় তাদের আসবার সুযোগ না দেওয়া এবং এই হতভাগ্যেরদল যারা চৌদ্দ বছর দ্বিতীয় নাগরিকত্বের অমর্যাদা সহ্য করেও শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানে থাকার মত নিরাপত্তাবোধ খুঁজে পায়নি তাদের পথ রুদ্ধ করা ভারত সরকারের পক্ষে কলঙ্কজনক অপরাধ বলে গণ্য হবে।

অজয় মিত্র

অষ্ট্রিয়ায় ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের প্রথম সেক্রেটারী অজয় মিত্রের রহস্যজনক মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে বিভিন্ন মহল থেকে নানারূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। ভিয়েনার ভারতীয় দূতাবাসের সরকারী মহল থেকে অজয়মিত্রের মৃত্যুকে রোমান্টিক কারণে আত্মহত্যা আখ্যা দিয়ে কার্ড সেক্রেটারীর জীবনাবসানের শোচনীয় ঘটনাকে লঘু ও গুরুত্বহীন করার চেষ্টা করা হয়েছে বলে কয়েকটি মহল থেকে অভিযোগ করা হয়েছে। অথচ মিত্রের মৃত্যুকে আত্মহত্যা বলে প্রমাণ করার মত পারিপার্শ্বিক তথ্য ভিয়েনার এম্‌ব্যাসী উপস্থিত করতে পারেনি।

অজয় মিত্রের মৃত্যুর কারণ আত্মহত্যা না হওয়া এরূপ সন্দেহ যে গোড়াতে প্রকাশ করা হয়েছিল সম্প্রতি একটি ইংরেজী কাগজে সে প্রসঙ্গে অত্যন্ত চাঞ্চল্যকর সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এই কাগজটিতে বলা হয়েছে যে বিরাট প্রতিপত্তিশালী এক আন্তর্জাতীয় চোরা চালানীর দল সম্বন্ধে অজয় মিত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহে উদ্যোগী হন এবং নিজেকে বিপন্ন করেও এরূপ সংবাদ সংগ্রহে অনেকখানি অগ্রসর হন। উক্ত সংবাদ পত্রের মতে এই চোরা চালানকারীদের সঙ্গে ভারতের ভিতরে ও অতি উচ্চ প্রতিষ্ঠিত প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিরা জড়িত রয়েছেন। এই সংবাদে বলা হয়েছে যে, তরুণ অজয় মিত্র স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে এই ভিনরঙ্গের চাকে ঢিল ছুঁড়ে চোরা চালানকারীদের গুপ্ত পার্টির তথ্য ভারত সরকারের কাছে ফাঁস করার জন্য উদ্যোগী হন। এই সাহসী কূটনৈতিক কর্মচারী যদি এই কাজে সফল হতেন তা হলে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের উচ্চ মহলে এক তুমুল কাণ্ড ঘটে যেত বলে সেই সংবাদপত্রটি দাবী করে। এই চোরা চালানকারী চক্রই অজয় মিত্রের কার্যকলাপে সন্ত্রস্ত হয়ে তাকে হত্যা করে। সংবাদপত্রটির ইহাই সিদ্ধান্ত।

অজয়মিত্রের মৃত্যু হত্যা কি আত্মহত্যা সে সম্বন্ধে সন্দেহ নিরসনের জন্য এবং সম্প্রতি বিদেশী কাগজে এই তরুণ কূটনৈতিক কর্মচারী সম্বন্ধে যে চাঞ্চল্যকর সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তার সত্যতা যাচাই করার উদ্দেশে উচ্চ পর্যায়ের অনুসন্ধান করার জন্য শ্রীহরিবিষ্ণু কামাথ পার্লামেন্টে যে দাবী উত্থাপন করেন সরকারী কর্তৃপক্ষ তা' অগ্রাহ্য করেছেন। কিন্তু এরূপ একটি মর্মান্তিক বিষয়ে অত্যন্ত সংক্ষেপে সরকার পক্ষ থেকে যে বক্তব্য প্রকাশ করা হয়েছে তাতে একথা স্বীকার করা হয়েছে যে অজয় মিত্র সরকারকে মূল্যবান তথ্য প্রেরণ করতো। এই স্বীকৃতি সত্ত্বেও অজয় মিত্রের মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে একটি পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধান না-করা অত্যন্ত অন্যায় বলে আমরা মনে করি। শুধু একজন সরকারী কর্মচারীর মৃত্যু-প্রশ্ন নয়, এই মৃত্যুর ঘটনার সঙ্গে এমন গুরুতর অভিযোগ ও চক্রান্তের কথা উত্থাপিত হয়েছে যে, সে সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশ করা সরকারের অবশ্য কর্তব্য।

মেডিকেল কলেজের ছাত্র-ধর্মঘট ও বিশ্ববিদ্যালয়

মেডিকেল কলেজের ছাত্র ধর্মঘট ব্যাপারে যে অবাঞ্ছিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরিচয় দিয়ে ছাত্রদের উপরে নির্মম পুলিসী লাঠি চালাবার সুযোগ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ দিয়েছেন সম্প্রতিকালের মধ্যে সেরূপ অবিবেচনার নিদর্শন দেখা যায় না। মেডিকেল কলেজের ধর্মঘটি ছাত্রদের উপাচার্যকে ঘেরাও করা ও অশালীন ব্যবহারের ঘটনা, নিঃসন্দেহে নিন্দনীয় ও অত্যন্ত অবাঞ্ছনীয়। কিন্তু ছাত্রদের হাত থেকে উপাচার্যকে রক্ষা করার জন্য পুলিশের লাঠির সাহায্য নেওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল কিনা সেটাও বিশেষভাবে বিবেচ্য। উপাচার্য মহাশয় ঘেরাও থাকা অবস্থায় মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের কর্তৃপক্ষ,—যারা ছাত্রদের নিবৃত্ত করার জন্য স্বেচ্ছায় অগ্রসর হয়েছিলেন,—তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অস্বীকার করে উপাচার্য যে অবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন তা' হয়তো মন্ত্রী-উপমন্ত্রীদের ক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত না

হলেও, একজন শিক্ষাব্রতীর কাছ থেকে অবশ্যই প্রত্যাশিত ছিল না।

বিদ্যার্জনে ঔদাসীন্য এবং অনুশাসনহীনতার যে অভিযোগ ছাত্রদের উপরে করা হয় শিক্ষকগণও খুব কম ক্ষেত্রেই সেই অভিযোগের ক্ষেত্র থেকে নিজেদের বিমুক্ত রাখতে সমর্থ। সিলেবাস শেষ হয় না, বা অত্যন্ত তাড়াতাড়ি কুটিনপূর্ণ করার তাগিদে শেষ করা হয়, এরূপ অভিযোগ আজকাল শুধু মেডিকেল কলেজের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়,— —অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে এরূপ অভিযোগের পরিধি বহু বিস্তৃত।

মেডিকেল ছাত্রেরা কোর্স শেষ না হওয়ার যে প্রশ্নটি তুলেছিল সে প্রশ্নটিকে উদারতার সঙ্গে বিবেচনা করে ছাত্র ধর্মঘটের সমস্যাটি সমাধান করা অসম্ভব ছিল কিনা সে প্রশ্নের মীমাংসা হয়নি। সম্প্রতি মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের পরীক্ষা বন্ধ করে দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে তা' আরও ভ্রান্ত।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে ছাত্রদের অশোভন উচ্ছৃঙ্খল আচরণ সুনিশ্চিতভাবে নিন্দনীয়, পক্ষান্তরে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ এই ছাত্র ধর্মঘটের সমস্যাটিতে যেভাবে হস্তক্ষেপ করেছেন তাও মোটেই সুবিবেচনার পরিচায়ক নয় বলেই আমরা মনে করি। আমরা এ বিষয়ে নিরপেক্ষ তদন্ত দাবি করি।

আইখম্যান

যে-ব্যক্তি ইতিহাসের শীর্ষ খাতকের ভূমিকায় ১৯৩১ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত হিটলারী জার্মানীতে ষাট লক্ষ ইহুদী নর-নারী-শিশুকে অবর্ণনীয় অত্যাচারে হত্যা করেছে, অবশেষে তার জীবনের উপর যবনিকা পাত হয়েছে। এডলফ আইখম্যান ইসরাইলী বিচারের পর ইসরাইলের রেমলে বন্দীশালায় গত পয়লা জুন গভীর রাত্রে ফাঁসীর রজ্জুতে প্রাণ দিয়েছে। হিটলারী শাসনের পতনের পর নিখোঁজ আইখম্যানকে ১৯৬০এর ১১ই মে আর্জেন্টিনার বুয়েনস আয়ার্সে ইসরাইলী গুপ্তচরেরা মোটর কারখানার শ্রমিক রিকার্ডো ক্লিমেন্ট নামধারী ছদ্মবেশী-আইখম্যানকে গ্রেপ্তার করে গোপনে ইসরাইলে নিয়ে যায়। ১৯৬১ সালে এপ্রিল মাসে জেরুজালেমের জেলা কোর্টে আইখম্যানের যে বিচার শুরু হয়, সে-বছর ডিসেম্বরে তার পরিণতিতে তার প্রতি মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়। এই আদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টের আপীল গত ২৯শে মে নামঞ্জুর হলে ইসরাইলের রাষ্ট্রপ্রধানের নিকট প্রাণদণ্ড মকুবের জন্য আইখম্যান আবেদন করে। ফাঁসীর তিনদিন পূর্বে এই আবেদন অগ্রাহ্য হয়।

মৃত্যুদণ্ডের পূর্ব পর্যন্ত আইখম্যান অবিচলিত ছিল। যে জঘন্য অপরাধের দায়ে সভ্যতার ইতিহাসে আইখম্যান জল্লাদ রূপে চিহ্নিত হয়ে থাকবে, মৃত্যুর পূর্বেও সেজন্য তার কোনো অনুশোচনা দেখা যায় নাই। 'আমি নিমিত্ত মাত্র। হুকুম পালন করেছি' এই কৈফিয়ৎ দিয়ে বিচারের সময় আইখম্যান আত্মদোষ ক্ষালনের যে চেষ্টা করে ফাঁসীর পূর্ব-মুহূর্তেও তারই সুস্পষ্ট পুনরাবৃত্তি শোনা যায় তার শেষ উক্তিতে—লড়াই-এর অনুশাসন ও দেশের পতাকার প্রতি আনুগত্যই তাকে এই কার্যে নিযুক্ত করেছে এই তার যুক্তি। আন্তর্জাতিক আইনের বিচারে হয়তো আইখম্যানের গ্রেপ্তার, বিচার ও প্রাণদণ্ডাদেশ তর্কের অবসর থাকবে। বিশেষ করে ১৯৪৮ সনে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে যে অন্যায় অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং অনুষ্ঠানকারী রাষ্ট্রও যেখানে ইতিহাসের পাতা থেকে উৎসাদিত হয়েছে, সেক্ষেত্রে ইসরাইলের এক্তিয়ার ছিল কিনা, এই বিচার পরিচালনা করবার—এই বিতর্ক থেকে যাবে। কিন্তু আইনের ফাঁক ও ফাঁকি দিয়ে লাঞ্ছিত মানবতা সর্বক্ষেত্রে উপেক্ষিত হতে পারে না আইখম্যানের বিচার তারই একটি নিদর্শন হয়ে রইলো। ৩।৬।৬২

২০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থিত গোবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্দ্র মিত্র এডভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

জয়শ্রী

আষাঢ় ১৩৬৯ · ৩য় সংখ্যা · ২৭ বর্ষ

বিবাহ ও পরিবারের ক্রমবিকাশ

অনিলচন্দ্র রায়

মর্গান-মার্ক্সীয় মতবাদের আলোচনা

গতবারের পর

মাতৃতন্ত্র বা নারীপ্রাধান্য সাধারণতঃ মাতৃক্রম কিংবা মাতৃসত্ত্ব হইতে অনুমান করিয়া লওয়া হয়। 'মাতৃক্রম' মানে, মাকে ধরিয়া বংশক্রম নির্ধারণ করা। 'মাতৃসত্ত্ব' মানে, মার মারফৎ সম্পত্তির উত্তরাধিকার সংক্রমণ এবং মায়ের বা নারীদের সম্পত্তির মালিকানা সত্ত্ব। নারীর সম্পত্তির অধিকার বা মায়ের নামে বংশনির্ধারণ হইতেই মাতৃতন্ত্র বা নারীমর্যাদার আধিক্য কল্পনা করা সঙ্গত নয়, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই প্রথাগুলি পরস্পরের সহায়ক বা আনুষঙ্গিকও হইতে পারে কিন্তু ইহাদের পরস্পরের মধ্যে কোন কারণিক সম্বন্ধ বা অনিবার্য্য বন্ধন কিছু নাই। মাতৃক্রম বা মাতৃসত্ত্ব, হইতে মাতৃতন্ত্র প্রমাণ হয় না। কেন, পূর্বেই বলা হইয়াছে। ওয়েষ্টারমার্ক এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়া বলিতেছেন

I donot find that the prevalence of the one or the other line of descent conspicuously effects the husband's authority. Nothing of the kind has been noticed in Australia nor so far as I know, in India, where the paternal system among many of the aboriginal tribes is combined with great or even extraordinary rights on the part of the wife. Among the West African negroes the position of women is still to all appearances, no less honorable in tribes like the Ibos, among whom inheritance runs thro' males, than in tribes who admit inheritance thro' females only; and of Fulah, among whom succession goes from father to son. Mr Winwood Reade (Savages of Africa) observes that their women are the most tyrannical wives in Africa'....." (468).

দেখা যাইতেছে যে মাতৃক্রম ও মাতৃতন্ত্রের মধ্যে কোন কারণিক সম্বন্ধ নাই।

'মাতৃসত্ত্ব' বা 'mother-right' শব্দটীও ব্যবহৃত হয়। অতি আদিমকালে যখন মর্গানীদের মতে কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল না, তখন উত্তরাধিকারের প্রশ্নও আসে না, আধিক সত্ত্বের প্রশ্নও আসে না। এঙ্গেলস্‌-ও এই আপত্তির সমীচীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। তবু মোটামুটি অর্থ বুঝাইতে 'মাতৃসত্ত্ব'ই ব্যবহার করিয়াছেন। কোন সমাজকে 'মাতৃসত্ত্ব' বলিয়া আখ্যাত করায় অর্থসংকট ঘটিতে পারে।

কারণ সকল দিকেই সাধারণভাবে নারীর অধিকার পুরুষের চাইতে উচ্চতর হইলেই সে সমাজকে 'মাতৃসত্ত্ব' বলা চলে। কিন্তু এমন সমাজ বিরল। সকল সমাজই এদিকে মিশ্র-প্রকৃতির। কোন দিকে নারীর অধিকার থাকিলেও অন্যদিকে পুরুষের অধিকারও দেখা যায়। অবিমিশ্র নারীসত্ত্ব সমন্বিত অসভ্য সমাজ নাই। বিবাহ, যৌনজীবন, ধর্ম, ব্যাক্তিক, সম্পত্তি, উত্তরাধিকার, সন্তানের প্রতিঅধিকার, ইত্যাদি নানা-দিকে নারী পুরুষের অধিকার নানা ভাবে মিলিয়া মিশিয়া আছে। তাই সার্বজনীন ভাবে 'মাতৃসত্ত্ব' অবস্থা বলিয়া কোন সামাজিক স্তর হইতেই পারে না। Wundt এর ভাষায়:

"Mother-right is to be found at most in a limited sense, as applying to certain rights of the Kinship Community and connected with these at a later time, to the inheritance of property, mother-rule never occurs or at most is an abnormal & exceptional phenomenon having scarcely any connection with maternal descent as such" (315) মাতৃক্রম এবং মাতৃতন্ত্র দুইটি সম্পূর্ণ আলাদা সমাজপদ্ধতি। এদের একটী থাকিলেই যে সেই সমাজে আরেকটীও থাকিবেএমন কখনও নয়। ব্রিফল্ট ও একথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন:

".....no great difficulty is found in showing that a matriarchal constitution of society cannot be inferred from the practice of matrilineal reckoning of descent" (186)

ব্রিফল্টও মাতৃতন্ত্রকে ব্যাখ্যা করিতে গিয়া মাতৃস্থানিক প্রথার (matrilocal usage) উপরেই তাঁহার মতবাদ গড়িয়াছেন। তাঁহার মতে মাতৃস্থানী জাতি যারা তাদের মধ্যে মাতৃতন্ত্র উদ্ভব হইবেই। ব্রিফল্ট স্বীকার করিয়াছেন, মাতৃক্রম হইতে মাতৃতন্ত্রের উদ্ভব না-ও হইতে পারে। কিন্তু মাতৃস্থানিক প্রথা হইতে মাতৃতন্ত্রের জন্ম একেবারে অনিবার্য্য। স্বামীগৃহে না যাইয়া নারী যখন পিতৃগৃহে আত্মীয় স্বজনের মধ্যেই বাস করে, তখন নারীর মর্য্যাদা নিশ্চয়ই সন্দেহাতীত হইয়া ওঠে। এক্ষেত্রে বিবাহিতা নারী কখনো পরাধীন বা পদানত হইতে পারে না। তেমনি বর আসিয়া কন্যাগৃহে বাস করিলে স্বভাবতই কন্যার আত্মীয়স্বজনের আধিপত্যহেতু বরের প্রভাব খর্ব হইয়া পত্নীর প্রভাবই বৃদ্ধি হয়। তেমনি কন্যা স্বামীগৃহে বাস করিলে, স্বামীর ও স্বামীর আত্মীয় স্বজনের প্রাধান্যহেতু পরিবার ও পিতৃতান্ত্রিক, পিতৃনামী ইত্যাদি হইতে পারে। দেখা যায় নিবাস-প্রথা (Residence) পরিবারের স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিতে খুবই প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। লাউয়ীও বলেন; "Rules of residence exert an incalculable influence on the life of the family for physical propinquity affects not merely sexual love but all human sentiments. (66) ক্রোয়েবার (Kroeber) ও 'জুনি' (Zuni) জাতি সম্বন্ধে গবেষণায় মাতৃস্থানিক প্রথার গভীর প্রভাবকে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে মাতৃস্থানী হওয়ার দরুণ ইহারা মাতৃক্রমী হইয়াছে। পুয়েব্‌লো ইণ্ডিয়ানরা (Pueblo Indians) মাতৃস্থানী। তাই তাহাদের পরিবারে বাড়ীর ও গৃহস্থালীর মালিক মেয়েরা। দিদিমা, মা, মাসী, অনূঢ় মামা-দের লইয়া এদের পরিবার ও মামারাই কর্তা।

ব্রিফল্টের মতে, মাতৃস্থানী জাতি মাতৃতন্ত্রী হইবেই। ইহাতে অন্যথা হইতে পারে না। মাতৃস্থানী প্রথাই মাতৃতন্ত্রের বিশিষ্ট ও অনিবার্য্য লক্ষণ। যুদ্ধের সম্বন্ধ কারণিক। তাঁহার কথায়:

"of the various features of matriarchal order of society the practice of matri-local marriage is thus the most distinctive." (187).

মাতৃস্থানিকতার প্রভাব যে গুরুতর তাহা অবিসম্বাদ।

নৃতাত্ত্বিকরা ইহা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু ইহার প্রভাবকেও অতিরিক্ত বাড়াইয়া তুলিয়া সমাজ ব্যাখ্যা করিলে আতিশয্য দোষ ঘটিবে। কেবল একমাত্র নিবাসপ্রথা বা পত্নীগৃহবাস প্রথাকেই বেন্দ্র করিয়া পরিবারের স্বরূপকে বোঝা চলিবে না। বহু শক্তি ও কারণের সমবায়েই পরিবারের রূপায়ন ঘটে। মাতৃস্থান-বাস একটা গুরুতর কারণ হইলেও একমাত্র কারণ নয়। ইহা ভুলিলে চলিবে না। তাছাড়া এই নিবাস প্রথারই বা উৎপত্তির কারণ কি? কোন্ অবস্থা হইতে পিতৃবাস ও মাতৃবাস প্রথার উদ্ভব, কেন হইয়াছে? ব্রিফল্ট্ এপ্রশ্নের সন্তোষজনক আলোচনা করেন নাই। অথচ ইহাকেই একমাত্র কারণ ধরিয়া পরিবারের অন্যদিকগুলিকে—যথা, বংশক্রম, বর্ষ্যাত্রা, উত্তরাধিকার প্রভৃতিকে—শুধু এই কারণের "কার্য্য" (effect) বলিয়া মনে করিলে, বৈজ্ঞানিক ভ্রান্তি হইবে। বহুর মধ্যে একটি মাত্র factorকে অদ্বিতীয় কারণ ধরিলে একরৈখিক কার্য্যকারণবাদ বা irrev r-sible causality'র একদেশ দর্শিতা দোষ ঘটে। পারস্পারিক ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়াবাদের (Functional Interactionism) দৃষ্টিভূমি হইতে বিচার করিলে এই মতই অযৌক্তিক বলিয়া বিবেচিত হইবে। মাতৃস্থানিকতা (matrilocal usage) অনিবার্য্য কোন স্তর নয়, মাতৃস্থানী প্রথার মধ্যেও পিতৃপ্রাধান্য প্রচলিত দেখা যায়, মাতৃস্থানী জাতি হইলেই তাহারা মাতৃতন্ত্রী হইবে, এটা ভুলধারণা। বাসস্থানের প্রভাবকে অন্য factor বা শক্তিগুলি মিলিয়া নিষ্ক্রিয় করিয়া তুলিতে পারে। ওয়েষ্টার মার্কও বলেন—এই মাতৃবাস প্রথাকেই অতিরিক্ত গুরুত্বদান করিয়া পোঁড়ামী করিলে চলিবে না:

"But it should be noticed that neither his living with the family of his wife, nor even his dependence on her father, necessarily implies a total absence of marital power." (617) বহু দৃষ্টান্তসহ তিনি এবিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। যথা Yokut (ইয়োকুট) জাতির মধ্যে স্বামী পত্নীগৃহে বাস করিলেও স্বামী স্ত্রীর ওপরে জীবনমৃত্যুর অসম্বাদিত অধিকার খাটাইতে পারে। তেমনি টরেস্ প্রণালীর পশ্চিমের দ্বীপগুলিতে (Western Torres Strait) শ্বশ্রূগৃহবাসী বরের আপন পত্নীর ওপরে ষোল আনা অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আছে। পুয়েবলো ইণ্ডিয়ানরা যেমন মাতৃস্থানী, হপী (Hopa) জাতি তেমনি পিতৃস্থানী। আবার এমন অনেক জাতি আছে যাহারা এই দুয়ের মাঝামাঝি। হিদাৎসা'রা মাতৃক্রমী হইলেও মামার প্রভাব তেমন নাই। এস্কিমোদের মধ্যে পিতৃস্থানিকতাই ব্যাপক ভাবে মাতৃস্থানিকতাও আছে। নিবাসপ্রথা অন্যান্য কারণদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে বলিয়াই এই সব নানা রূপান্তর ঘটিয়া থাকে। জুনিরা মাতৃস্থানী বলিয়াছি। মাতৃক্রমীও। কিন্তু তাদের মধ্যে আবার এ প্রথাও আছে যে শ্বশুরবাড়ীর লোকেদের সহিত মতভেদ হইলে স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া বর পত্নীগৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসে। দারিদ্র্য হেতু পিতৃস্থানী জাতিও মাতৃস্থানীতে পরিণত হইয়া যাইতে পারে। ক্রোয়েবারের মতেও পুয়েবলো এলাকার মাতৃস্থানীদের মধ্যেও গুরুতর রূপান্তর ঘটিয়া মাতৃ-স্থানিত্বের বিকৃতি ঘটিয়া থাকে।

মাতৃস্থানী, পিতৃস্থানী বলিয়া স্পষ্ট বিভাগ করাও মুস্কিল। কারণ এই দুই প্রথা নানাভাবে পরস্পরের সহিত জড়িত হইয়া রহিয়াছে। উত্তর সাইবেরিয়ার কোরিয়াক্ (Koryak) জাতিতে বর কন্যার কাঁজ করিয়া দেয় বটে কিন্তু কন্যার বাড়ীতে গিয়া থাকে না। কন্যাকে নিজের বাড়ীতে আনে। য়ুকাঘির (Yukaghir) জাতিতে কিন্তু আবার বর কন্যার কাজ করিয়া দেয় এবং কন্যাগৃহেই বাস করে। আবার কোরিয়াক্‌রা শ্বশুরের ছেলে না হইলে শ্বশুরগৃহেই থাকে। এ সব নানা বিকৃতি বা deviation সর্ব্বদাই ঘটিতেছে।

ইহা ব্যতীত আর একটা বিষয়ও লক্ষ্য করিতে হইবে। সাময়িক কন্যা গৃহবাস দ্বারা মাতৃস্থানী হইতে পারে না।

সারাজীবন কন্যাগৃহে বর বাস করিলে তাহাকে মাতৃস্থানী বলা চলে। এদিক হইতে বিচার করিলে অনেক জাতি সত্যিকার মাতৃস্থানী নয়। তাই লাউরী সাবধান করিয়া দিয়াছেন :

But we must remember that it makes all the difference in the world whether the rule is followed throughout married life or only for a period at its commencement; whether the rule is nearly absolute or admits of modification'.....(70)

কাজেই ভাসা-ভাসা পর্যবেক্ষণ দ্বারা পরিবারের আসল প্রকৃতি বোঝাও দুষ্কর। একদেশদর্শী সিদ্ধান্ত হইবার আশঙ্কা থাকিয়া যায়। নানারকমের প্রথার মিশ্রণ থাকিলে কোন্‌টি যে আসল ও মৌলিক রূপ তাহা বাহির করা দুষ্কর। লাউরী বলেন "Demarcation is not nearly so definite as a bald statement of gross results would suggest." (69)

ব্রিফল্ট এই একদেশদর্শিতারই পরিচয় দিয়াছেন। কন্যাগৃহের সামান্য সংস্পর্শও যদি কোথাও দেখা যায়, অমনি ব্রিফল্ট তাহাকে survival বা পূর্বতন মাতৃস্থানিত্বের উদ্ভট বা অবশেষ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আসামের 'বোদো' (Bodo) ও ধীমল (Dhimal) জাতিতে বর কন্যাপণ না দিতে পারিলে কন্যাগৃহে যাইয়া কয়েক বছর খাটিয়া দেয়। (একে বোদোরা বলে 'গাবোই' ধীমলরা বলে 'ঘর জ্যা')। আলাবারে যৌপপরিবারের মধ্যে বরকন্যাকে একঘরে কয়েক মুহূর্ত বন্ধ করিয়া রাখা হয়। এ সবই তাঁহার মতে "relic of matrilocal marriage" (133). মেলানেশী ও পোলিনেশীয় দ্বীপবাসীরা পিতৃস্থানী কিন্তু মামার প্রাধান্য আছে এদের মধ্যে। অতএব এরা পূর্বে একদা মাতৃস্থানী ছিল ব্রিফল্টের মতে।

এই সব সামান্য ও সহজ প্রথাকে কষ্টসাধ্য ব্যাখ্যা করিয়া ব্রিফল্ট হাস্যকর করিয়া তুলিয়াছেন। টাকা দিতে না পারিলে পরিশ্রম দ্বারা শ্বশুরের ঋণ শোধ করা তো অতি-স্বাভাবিক প্রথা। কিছুদিন শ্বশুরগৃহে বাসও এমন কিছু দুরূহ ব্যাপার নয়। ইহাকে ব্যাখ্যা করিতে মাতৃস্থানী বিবাহের সার্বিক স্তর কল্পনা করিবার প্রয়োজন দেখিনা। কন্যাগৃহে বিবাহের ভোজ। ইহাতো মানুষের স্বাভাবিক স্নেহবৃত্তি হইতেই সহজে বোঝা যায়। মাতার পক্ষে সহজ মমতা-বশেইত বরকে ও বরপক্ষকে আপ্যায়িত করা স্বাভাবিক। কিন্তু ব্রিফল্ট তাহা মানিবেন কেন? তাঁহাকে খুটীনাটী সব কিছুরই ভিতরে মাতৃতন্ত্রের ছায়া খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। কাজেই কষ্টসাধ্য ব্যাখ্যাও চালাইতে হইবে।

মাতৃস্থানী প্রথার উদ্ভব হয় কেন? ব্রিফল্টের মতে, ইহাইত স্বাভাবিক। কেন না, নারীই বাসস্থানের ব্যবস্থা করে। নারীর সন্নিধিতেই পুরুষ আসিবে, ইহাই প্রকৃতির অভিপ্রায়। ইহা জৈবিক স্বভাবেরই ফল, তার মতে জীবজন্তুদের' মধ্যেও এই প্রথাই প্রচলিত। "The determination of the dwelling place by the female is.....the natural consequence of biological facts and is the rule among animals.....All animals may be said to be ...matrilocal in their habits. It is thence natural to infer that the habits of primitive humanity were the same."

মানুষও একদা জন্তুবৎ ছিল। পশুদের মধ্যেও স্ত্রী-জন্তুই গর্ত-খোঁড়ে, পুরুষ জন্তুর জন্য আশ্রয় নির্বাচন করে। আদি-মানুষও তাই নারীগৃহবাসের বিনিময়ে অর্থমূল্য বা কন্যাপণ (bride-price) দিয়া পুরুষ স্বাধীনতা অর্জন করিল। অর্থাৎ পিতৃনিবাস প্রথা প্রবর্তন করিল। ব্রিফল্টের এই মত। কিন্তু এখানে ব্রিফল্টের তথ্য

ও বাধ্যা দুইই একদেশী হইয়াছে। **প্রথমতঃ** মাতৃস্বত্বী প্রথার জৈবিক বা biological ব্যাখ্যায় গলদ রহিয়াছে। স্ত্রীই বাসস্থান নির্মাণ করে জীবরাজ্যে, একথার ভিত্তি নাই। পুরুষকে ব্রিফল্ট একেবারে বাদ দিতে চাহেন। জন্তুরাজ্যে সর্বত্রই কি স্ত্রী বাসা বানায়? গরিলা ও শিম্পাঞ্জীদের মধ্যে কি দেখি? স্ত্রী গর্ভবতী হইলে পুরুষই গাছের উপরে বাসা বাঁধে। সন্তান সেই বাসায় হয়। এবং পুরুষ গাছের নীচে থাকিয়া সারা রাত্রি পাহারা দেয়। ওয়েষ্টার মার্কের কথা তুলিয়া দিতেছি:

"When the female is pregnant, the male builds a rude nest in a tree, where she is delivered, and he spends the night crouching at the foot of the tree, protecting the female and their young ones who are in the nest above, from the nocturnal attacks of leopards. Passing from the highest monkeys to the savage barbarous races of men, we meet with the same phenomenon" (190)

মানুষের তো দূরের কথা, পাখিদের মধ্যেও সন্তান পালন ইত্যাদি জৈবিক ব্যাপার শুধু একতরফা নয়। পুরুষ-স্ত্রী দুয়েরই সহযোগ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রহিয়াছে। ওয়েষ্টারমার্ক বলেন: "In various animal species the young are cared for not only by the mother but by the father as well. This is the general rule among birds. Whilst the hatching of eggs and the chief part of rearing duties belong to the mother, the father acts as a protector and provides for food for the female" (189) শুধু পাখীদের বেলায় তেমন দরকার না হইলেও Primate দের বেলায় পিতৃসাহায্য অতি প্রয়োজন। কারণ সন্তান কম হয় এবং শৈশব দীর্ঘস্থায়ী। প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলেই উভয় পক্ষীয় সহযোগিতা সৃষ্টি হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ ব্রিফল্ট এখানে জন্তুজগতের সহিত মানুষের সাদৃশ্য টানিয়াছেন। (অন্যত্র জন্তুর সহিত মানুষের সাদৃশ্য সম্বন্ধে আপত্তি করিয়াছেন) যদি ধরিয়াও লওয়া হয় যে সব জন্তুর মধ্যেই স্ত্রীই বাসা বাঁধে, তবু মানুষের বেলায় এ সাদৃশ্য খাটিবে কেন? মানুষে উন্নততর বুদ্ধি এবং উচ্চতর সহযোগিতা আশা করা স্বাভাবিক। মানুষের সামাজিক বুদ্ধি যে প্রবলতর একথা নৃতত্ত্বসম্মত। মানুষের পরপ্রীতির বৃত্তি altruistic sentiments) অনেক বেশী। মানুষের ভাষা আছে, যন্ত্র-ব্যবহার আছে, মানুষ পরস্পরের সাহায্য চাওয়া ও দেওয়াতে সহযোগিতা করিতে পারে অনেক বেশী। এক্ষেত্রে সংজ্ঞাই matrilocal বলা অসঙ্গত।

তৃতীয়তঃ জৈবিক যুক্তিদ্বারা ব্রিফল্ট ইহাই প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে নারীই বেশী সক্রিয় (active)। তাঁহার মাতৃতান্ত্রিক সমাজোৎপত্তিবাদের ভিত্তিই স্থাপন করিয়াছেন নারীর এই সক্রিয় স্বভাবের উপরে। জৈবিক বা সামাজিক জীবনে নারীই সব কিছু করে, পুরুষ নিষ্ক্রিয় ও অপ্রয়োজন। কিন্তু জীবতত্ত্ব কি নির্দেশ দেয়? জীবতত্ত্ব বলে, পুরুষ স্বভাবতঃই সক্রিয় স্বভাব এবং নারীই নিষ্ক্রিয় ও গ্রহণশীলা। ডিম্বকোষ (Ovum) নিষ্ক্রিয় এবং শুক্রকোষ (Sperm) সদাসক্রিয়। ব্রিফল্ট এই শারীরতাত্ত্বিক ঘটনাকে বলেন "……Ovum assimilates the spermcell.." (47) কিন্তু ইহা বিকৃতব্যাখ্যা। Sperm ই বরং Ovum কে আত্মসাৎ করে। যেখানে দুয়ের মিলন, সেখানে আলংকারিক ভাষা প্রয়োগ ছলে এককে অপরের চাইতে গুরুত্বদান বিকৃত ব্যাখ্যা বই কিছু নয়। যৌনবৃত্তিতেও দেখি পুরুষের সক্রিয় ভূমিকা। courtships, যৌনদ্বন্দ্বে, সন্তান রক্ষণে সর্বত্রই দুইপক্ষের সহযোগিতা থাকিলেও পুরুষই সক্রিয়।

চতুর্থতঃ অষ্ট্রেলিয়ার অনেক সমরে বর কন্যাগৃহে সাময়িক

ভাবে কিছুদিন থাকে। ইহার কারণ নারীর কাল্পনিক প্রাধান্য বা নৈতিক বৈশিষ্ট্য নয়। মানুষের সাধারণ স্নেহবৃত্তি ও মমত্বই ইহার মূলে। কন্যাগৃহে বিবাহ অনুষ্ঠান হয়, তাহারও কারণ ইহাই। এই সর্বকালিক স্নেহবৃত্তিরই বশে বিবাহস্থান কন্যাগৃহে। ক্রশী বলেন কন্যাগৃহে বিবাহ হয়……

"… in order to satisfy certain universal feelings of human nature, stronger and more important than is an arbitrary system of kinship. In the first place, it is natural that the marriage should take place, as often it does both in primitive and in modern times, at the residence of the bride's parents Womanly and maternal feelings are not to be denied to the primitive mother of the race" (4 .2)

ব্রিফল্ট নিজেও বলেন, মাতৃস্নেহ জন্তুদের এবং মানুষের মধ্যে অতিপ্রবল। অসভ্য নারীর মাতৃস্নেহ যদি প্রবল হয় তবে কন্যার বিবাহ আপনগৃহে অনুষ্ঠিত হওয়া দাবি করিবে, ইহাও স্বাভাবিক। বর কন্যাকে আনিতে যাইবে ইহাই ও স্বাভাবিক। ইহা সভ্যমানুষের chivalry নয়, প্রাকৃতিক মানুষের সহজ এবং সরল tenderness এর বৃত্তি।

পঞ্চমত: মাতৃস্থানী প্রথা যদি জীবজন্তুর স্বভাবেই রহিয়াছে, তবে আদিম মানুষ অষ্ট্রেলীয়দের মধ্যে কেন মাতৃস্থানী প্রথা নাই? অষ্ট্রেলিয়ার কোথাও স্বামী গিয়া কন্যাগৃহে বাস করে না। মাতৃতন্ত্রবাদ ও যৌথবিবাহবাদের সমর্থক Spencer ও Gillen সাহেবরাও এখানে মাতৃস্থানিক প্রথা দেখেন নাই। ক্রশী ইহা উল্লেখ করিয়া বলেন, "In the 1st place, Messrs Spencer and Gillen assert that as far as they know it is not the custom in any Australian tribe, maternal or otherwise, for the husband to reside with his wife's people" (432)

যারা মাতৃক্রমী তাহাদের মধ্যেও মাতৃস্থানী প্রথা নাই কেন? অথচ ব্রিফল্ট দেখাইতে চাহেন যে পিতৃতন্ত্রীদেরও মধ্যে মাতৃতন্ত্রের বা মাতৃস্থানীয়ের survival রহিয়াছে। মাতৃক্রম যেখানে রাজত্ব করিতেছে সেখানে তো মাতৃস্থানী প্রথা কিছু বাঁচিয়া থাকা সহজ ছিল? ব্রিফল্ট বলেন, এমন নাই কিন্তু কোনদিন ছিল নিশ্চয়, কারণ শিকার করিয়া মাংসের অংশ Arunta দের মধ্যে শ্বশুরবাড়ী কেন তত্ত্ব পাঠাইবে?

আসলে মাতৃক্রম, মাতৃস্থানির এসবের মধ্যে কোনই অচ্ছেদ্য অনিবার্য সম্বন্ধ নাই। শুধু ফর্মুলা প্রমাণের অন্ধ গোঁড়ামীর বশবর্তী হইয়া ব্রিফল্ট এই সব কৃত্রিম ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

এককালে যে নারীপ্রাধান্য ছিল তার স্বপক্ষে ব্রিফল্ট আরো যুক্তি দিয়াছেন। বর্তমান কালেও অনেক জাতির মধ্যে নারীপ্রাধান্য পাওয়া যায়। পূর্বে এককালে নারীপ্রাধান্য সর্বব্যাপক না থাকিলে, পুরুষ-প্রাধান্যক যুগেও এতখানি নারী-প্রাধান্য টিকিয়া থাকিতে পারিত না। কারণ পূর্বে পুরুষ-প্রাধান্য ব্যাপকভাবে থাকিলে নারীতন্ত্র—যা একেবারে বিপরীত ব্যবস্থা—কিরূপে উদ্ভব হইবে? দুর্বলা নারীর পক্ষে বিদ্রোহ করা অসম্ভব। নারী হইল অদৃষ্টবাদী, নিষ্ক্রিয়স্বভাব ও বিদ্রোহবিমুখ।

"That impossibility depends (not so much … … … on her utter indisposition to do anything of the kind. A defiant and rebellious attitude is found in them only where they already occupy a position of considerable vantage and influence …However burdensome their position may be, it is accepted,

it may be lamented but it is set down to fate, not to injustice" (205)

এ যুক্তি ভিত্তিহীন। এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তরই জীবনের রীতি। পরিবর্তন ঘটে এবং তাহার পিছনে বস্তুবিশ্ব শক্তির ক্রিয়া বিদ্যমান থাকে। নারীতন্ত্র হইতে পরে যদি পুরুষতন্ত্র আসিতে পারে, তবে পুরুষতন্ত্র হইতেও বা নারীতন্ত্র হইতে পারিবে না কেন? একটা পরিবর্তন সম্ভব এবং অন্যটি অসম্ভব বলা অযৌক্তিক। এই প্রসঙ্গে ব্রিফল্ট নারী প্রকৃতির যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা প্রতিক্রিয়াশীল ও বিজ্ঞানবিরোধী। আর সমাজপদ্ধতির পরিবর্তন কি শুধু নরনারীর প্রকৃতির উপরেই নির্ভর করে? অন্যশক্তির ক্রিয়া নাই?

মাতৃস্থানী প্রথা হইতে বর্তমান কালের পিতৃস্থানী সমাজের কিরূপে উদ্ভব হইল? তাঁহার মতে, অর্থনৈতিক কারণে। পশুপালনযুগে ধনদৌলতের মালিক হইয়া পুরুষ মাতৃস্থানী নারীকে কন্যাপণ (bride-price) দিয়া স্বগৃহে আনিল। ইহা হইতেই পিতৃস্থানী প্রথার প্রবর্তন হইল। যুগ-যুগান্তর হইতে নারী মাতৃগৃহে বাস করে। সেখান হইতে ছিনাইয়া আনিবার জন্য পুরুষকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইয়াছে। প্রথম প্রথম এই ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইত শ্রমের দ্বারা (service), পরে কন্যা-পণ দ্বারা।

"Definite economic power was first placed in the hands of men by the d mestication of animals.···That power has commonly been used to buy off the claims of women and their families, to the allegiance and services of husband; women are purchased for cattle and patri-archal society, with ofcourse, pa'ri-local mrrriage, become inevitably established among pastoral peoples" (245)

কন্যাপণের ব্যাখ্যা দ্বারা প্রমাণ করিতে চান যে আদিকালে সর্বত্রই মাতৃস্থানী প্রথা ছিল। কিন্তু কন্যাপণ প্রথার কেন উৎপত্তি হইল? ওয়েষ্টারমার্ক প্রমাণ করিয়াছেন যে কন্যাপণ বাসস্থানে পরিবর্তনজনিত ক্ষতিপূরণ নয়। কন্যাকে হারাইবার অপূরণের ক্ষতির ক্ষতিপূরণ ইহা। কন্যাকে লালন-পালনে যে ব্যয় হইয়াছে, সেই ব্যয়ভারের বিনিময়ে এই কন্যাপণ রীতি প্রবর্তিত হইয়াছে। ব্রিফল্টের মতে নিম্নস্তরে শিকারের যুগেই নারীপ্রাধান্য ছিল। পশুপালনযুগে নারী দুর্গতি শুরু হইয়াছে। একথা স্পেন্সারও এই মত দিয়াছিলেন। কিন্তু ওয়েষ্টারমার্ক এই মতের খণ্ডনে বলেন :

"We must certainly not like Spencer conclude that where women are exchangeable for oxen or other beasts; they 'of course' are regarded as equally without personal rights. The bride-price is a compensation for the loss sustained in the giving up of the girl and a remuneration of the expenses incurred in her maintenances till the time of her marriage; it does not co ipso confer on the husband absolute rights over her" (632)

আদিযুগে নারীর স্থান সর্বোচ্চে ছিল নৃতত্ত্ব এমন কথাও বলে না। তাঁর মতে আদিম মানুষ বলবন্ত, অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর। "There was no check to the tyranny which the stronger sex exercised over the weaker" (Spencer) পরবর্তী গবেষণায় এই মত ভুল প্রতিপন্ন হইয়াছে। Spencer এবং Gillen বলেন, অষ্ট্রেলিয়ায় নারীর প্রতি ব্যবহার উন্নতপ্রণালীর ···" is generally well-treated and able to influence masculine decision regardless of all theory as to her inferiority or impurity (Native Tribes

of Central Australia.) গোধনের বদলে পশুপালন যুগে পুরুষ নারীকে স্বগৃহে আনিলে নারী দাসীর স্তরে নামিয়া যায় এই মতও স্পেন্সারের। ব্রিফল্ট অনেকটা এই মতই সমর্থন করেন। কিন্তু ওয়েষ্টারমার্কের মতই যুক্তিসঙ্গত। ডাঃ রুবনেও বলেন—পশুপালনযুগে পুরুষ গোধনের মূল্যে নারীকে স্বগৃহে আনিলে নারীর স্থান দাসীর স্তরে নামিয়া যায়, একথা Spencer বলিয়াছিলেন। ব্রিফল্টও তাই বলিতেছেন। কিন্তু পশুপালনযুগে কন্যাপণের বিনিময়ে পত্নী সংগ্রহের ফলে নারীর মর্যাদাহানি হইয়াছে ইহা স্বীকার করা চলে না। ওয়েষ্টারমার্কের উপরের উদ্ধৃতিতে দেখা গিয়াছে যে এই কারণে স্বামীর সর্বময় কর্তৃত্ব চলিত না। নারীকে দাসীর মত ক্রয় করা হয় না, শ্বশুরকুলের কন্যার অভাবজনিত ক্ষতির কিছু পূরণ করাই এই কন্যাপণের উদ্দেশ্য। কাজেই ইহাতে নারীরও অধিকার বা কর্তৃত্ব বজায় থাকে। অসভ্যজীবনে নর-নারীর মধ্যে শ্রমবিভাগের ব্যবস্থা ছিল। এই ব্যবস্থায় সর্বতোভাবেই নারীর মর্যাদা সুরক্ষিত ছিল। শিকার-যুগে যেমন নারী ফলমূল সংগ্রহ ও মাছধরার কাজ করিত, এবং কিছু কিছু কৃষিও করিত, পশুপালন যুগেও তেমনি চামড়ার পোষাক তৈয়ারী, সূতাকাটা, কাপড় বোনা ইত্যাদি দ্বারা আর্থিক ব্যবস্থায় অংশ নিত। মুরেলার লায়ারও কন্যাপণ প্রথাকে অনুভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, বাণিজ্য শুরু হইবার পরে ক্রয়-বিবাহ আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু ক্রয়বিবাহে বরং পত্নীর মর্যাদা আরো বাড়িয়া গিয়াছে, ইহাই তাঁহার মত। "Although marriage by purchase stamped woman as a piece of property, still it was advantageous to her social position (66). নারী এই প্রথায় আকাঙ্ক্ষিত ও বহুকাম্য সম্পদে পরিণত হইল। দেখা যাইতেছে ব্রিফল্টের বিপরীত মত মুরেলার লায়ার পোষণ করেন। পশুপালন যুগে নারী দুর্গতি সর্বব্যাপক হইল, এইমত নিতান্ত একদেশদর্শী। Hobhouse, Wheeler ও Ginsberg' র সিদ্ধান্ত ও এ সম্বন্ধে এ ধরণের এক-রৈখিক মতবাদের বিরোধী। অর্থনীতির প্রভাব রহিয়াছে ইহা সর্বসম্মত, কিন্তু প্রভাবের ধারা বহুবিধ হইতে পারে। একই ধরণের প্রভাব ও পরিণতি সৃষ্ট হইবে সকল অবস্থায় তাহা বলা চলে না। ইহাছাড়া মানসিক ও ধর্মের প্রভাব ইত্যাদি সর্বদা কাজ করিতেছে, এই সব নানা factor গুলি "disturbing causes" হইয়া অপ্রত্যাশিত পরিণতি ঘটাইতে পারে। তাই ডাঃ রুবনের সহিত একমত হইয়া বলা চলে: "nor does marriage by purchase, where women are exchangeable for cattle, imply that the woman is without personal rights" (103).

তাহা ছাড়াও অন্যদিক হইতে বিচার করিলেও এইরূপ একমুখী ধারায় পরিবার ও বিবাহের পরিণতি ঘটে নাই। একই কালে সমসাময়িক প্রথারূপে দান-বিবাহ (gift-marriage), বিনিময়-বিবাহ (exchange-marriage) ও বলবিবাহ (capture-marriage)' নিম্ন শিকারীদের মধ্যেও থাকিতে দেখা যায়। [বুশম্যানদের মধ্যে দান-বিবাহ, পিগমীদের দান ও বিনিময় বিবাহ: ফিলিপাইনে নেগ্রিটোদের মধ্যে দান-ক্রয়-বলপণ-বিবাহ আছে; অষ্ট্রেলিয়ায় দান-বিনিময়-বল বিবাহ আছে।]

কন্যাপণ আসিয়াছে, মাতৃস্থানী প্রথা হইতে এবং কন্যাপণ হইতে আসিয়াছে পিতৃস্থানী বিবাহ, এই নির্ধারিত সমাজক্রম ব্রিফল্টের মতে সার্বজনীন। এই single-track ক্রমবিকাশ যে ঘটে নাই তাহা উপরের আলোচনায় প্রমাণ হইয়াছে। সংক্ষেপে দেখা গেল:

(১) মাতৃস্থানী প্রথা সার্বিক প্রমাণ হয় নাই

(২) কন্যাপণ মাতৃস্থানী প্রথা হইতে উদ্ভূত হয় নাই,

(৩) ক্রয় বিবাহে বা কন্যাপণ-প্রথায় সর্বত্র নারীর দাসীত্ব ঘটিয়াছে, ইহা সত্য নয়

(৪) ক্রয়বিবাহ যে পশুপালনযুগের সৃষ্টি তাহা নয়, পূর্বেও প্রচলিত ছিল নিম্নস্তরেও প্রচলিত আছে।

অতএব ব্রিফল্ট কথিত একরৈখিক ধারা গ্রহণীয় নয়। ওয়েষ্টারমার্ক বলেন "We have no evidence that it (purchase marriage) is a stage through which every race has passed,……(323 & 383)

কন্যাপণ ও বরপণের উদ্ভব সম্বন্ধে ব্রিফল্ট বলেন, মাতৃস্থানী প্রথা হইতে দুইপথে এই দুই পদ্ধতির পৃথক পৃথক উদ্ভব হইয়াছে। যে জাতি মাতৃস্থানী প্রথা হইতে সোজা কৃষির স্তরে আসিয়াছে। তাহাদের মধ্যে বরপণ সৃষ্টি হইয়াছে। কৃষিপরায়ণ জাতিতে জমিই প্রধান সম্পত্তি আর তাহা নারীর মালিকী সম্পত্তি হওয়ায় পুরুষ বিবাহ দ্বারা সম্পত্তিসহ নারীকে পায়। এই সম্পত্তি হইতেই বরপণ প্রথা আসিয়াছে। এই ব্যাখ্যা অযৌক্তিক। যে সমাজে নারী কর্তৃত্ব বহাল, সেখানে সম্পত্তিশালিনী নারী dowry দিবে কেন? বরং কন্যা নারীকে লাভ করিতে পুরুষদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হেতু ধনী পুরুষই কন্যাপণে নারীগ্রহণ করিবে। মুয়েলার লায়ারের মতে। বরপণের উদ্ভব Pastoral স্তরে নয়। কন্যাপণ আদিম প্রথা। সভ্যতার উদ্ভব হওয়ার পরে মানবরুচি পিতারা কন্যাবিক্রয় প্রথার বর্বরতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া এই dowry র প্রথা সৃষ্টি করে। "The upper classes took the first step by renouncing the purchase price either wholly or in part and bestowing it upon the daughter ……" (128) ক্রয়বিবাহ হইতেই dowry marriage উৎপন্ন হইয়াছে।

Wundt বলেন: পূর্বে বল-বিবাহ হইতে বিনিময় বিবাহ মারফৎ দান-বিবাহ থেকেই কন্যাপণ দিয়া ক্রয়বিবাহ আসিয়াছে! Westermarck বলেন—Dowry বিবাহ বহু কারণে হইতে পারে। Return gift কিংবা গৃহস্থালীর সহদায়িত্ব বহন, ইত্যাদি উদ্দেশ্যও হইতে পারে।

যে সমাজ Pastoral, সেখানে পুরুষই গোধনের মালিক। এই Pastoral জাতি যখন কৃষিস্তরে আসিল তখন গোধনের মূল্যে পুরুষ নারী লাভ করিত। এই মূল্যই কন্যাপণ। এই ব্যাখ্যাও ভিত্তিহীন। Pastoral দেশেও সর্বত্র কন্যাপণ-প্রথা নাই। আর্যদের মধ্যে কন্যা প্রথা ঘৃণিত ছিল। 'আসুর বিবাহ' বলিয়া ক্রয়বিবাহ ভারতে নিন্দিত হইয়া আসিয়াছে। ভারতে বরপণ প্রথাও বহু প্রচলিত।

এই সব নানা মুনির বিভিন্ন মতেই প্রমাণ হয় যে কোন এক ধারায় এই সব সমাজ প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয় নাই। অন্ততঃ ক্রয়বিবাহ বা বরপণ প্রথার ব্যাখ্যা করিবার জন্য বিশ্বজনীন মাতৃস্থানী প্রথা কল্পনা করিবার কোন প্রয়োজন নাই। বর্তমান পিতৃতন্ত্র সমাজেও বরপণ ও কন্যাপণ দুই-ই প্রচলিত আছে। ইহার জন্য মাতৃস্থানী হইবার দরকার করে না। ক্ষতিপূরণ, স্নেহবৃত্তি, জনসংখ্যায় নরনারীর অনুপাত, ম্যাজিক, ধর্ম ইত্যাদি বহু factorএর ঘাতপ্রতিঘাত এই সব প্রথার মূলে থাকিতে পারে। মনগড়া স্তরপর্যায় অবলম্বন করিয়া কৃত্রিম ইতিহাস রচনার কোনই বৈজ্ঞানিক কারণ নাই। জ্ঞানের রাজ্যে আজও বহু ফাঁক রহিয়া গিয়াছে, কল্পনা দ্বারা তাহাকে পূর্ণ করিয়া লওয়ার অধিকার বিজ্ঞান অন্ততঃ স্বীকার করিবে না।

(ক্রমশঃ)

অসহ্য ভণ্ডামি

লীলা রায়

গত ১৬-১৯শে জুন ও পরবর্তী তারিখগুলিতে সদস্যদের উত্তেজিত প্রশ্নের উত্তরে লোকসভায় প্রথম প্রকাশ পায় যে ১৪-১৫শে জুন পূর্ব-পাকিস্তানের রাজসাহী জেলার প্রায় ছয় শত হিন্দু—প্রধানতঃ রাজবংশী ও সাঁওতাল,—রাত্রি তিনটায় সীমান্ত অতিক্রম করে মালদহ জেলায় উপস্থিত হয়েছে। সীমান্ত অতিক্রমের সময় পাক-সৈন্য অতর্কিত গুলি করে চার জনকে হত্যা করেছে এবং আরো সাত আট জন গুলিবিদ্ধ হয়েছে। ছয় শতের মধ্যে প্রায় তিন শত সীমান্ত অতিক্রম করে মালদহে আসতে সক্ষম হয়; অবশিষ্টরা পাক সৈন্য দ্বারা গ্রেপ্তার হয়।

প্রধানতঃ এই ঘটনাকে অবলম্বন করে সদস্যদের প্রশ্নের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী লোকসভায় যে সকল উক্তি করেছেন তার সারমর্ম হচ্ছে (১) পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের রক্ষাকরবার ক্ষমতা ভারতের নেই (২) পাকিস্তানে অবস্থিত ভারতীয় হাই কমিশনার অথবা সহকারি হাই কমিশনারের পক্ষে রাজসাহীর সংখ্যালঘুদের মত ব্যাপক সীমান্ত অতিক্রমের ঘটনা সম্বন্ধে যথা সময়ে সংবাদ সংগ্রহ করা সহজ নয়, এবং দ্রুত সংবাদ পাবার উপায় একেবারেই নেই (৩) যে সব সংখ্যালঘু আইনসম্মত নিদর্শন-পত্র ব্যতীত সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে এসেছে তারা, বিশেষতঃ, যারা রাত্রির অন্ধকারে এভাবে অভিযান করেছে এবং তার ধনুক ব্যবহার করেছে তারা বে-আইনী কাজ করেছে (৪) সীমান্ত অতিক্রমের হার সম্পর্কে পণ্ডিত নেহেরুর মতে হিন্দুরা অত্যাধিক সংখ্যায় আসছে সত্য নয় এবং দৈনিক সংখ্যায় ১০০০ আসছে এও ঠিক নয়, কত সংখ্যা আসছে তা ঢাকাস্থিত ডিপুটি হাই কমিশনারের পক্ষে জানা সম্ভব নয় যেহেতু সীমান্ত অতিক্রমের কাজটা রাত্রিতে ঘটছে (৫) পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের ভারতে আশ্রয় দান সম্পর্কে ভারত সরকারের নীতি কি লোকসভায় বারবার প্রশ্ন করেও কোনো উত্তর পাওয়া যায় নি (৬) বরং সমস্যাটার গুরুত্ব স্বীকার সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে দ্বিধাগ্রস্থ মন ও অনির্দ্দিষ্ট নীতির প্রমাণ পাওয়া গেছে। একবার সংখ্যা তালিকার উল্লেখ করে তিনি দেখাতে চেয়েছেন ভারত ও পাকিস্তানে দুদিককার সংখ্যালঘুদের যাওয়া আসার সংখ্যায় "এক্সচেঞ্জ" কিছু নেই। এই সংখ্যা সর্বদার মতই ভারত থেকে সীমান্ত অতিক্রমকারী মুসলমানদের মোট সংখ্যা থেকে ভারতে আগমনকারী হিন্দুর মোট সংখ্যা ৪০০০ এরও বেশী। হিন্দু মুসলমান, দুদিককার যাতায়াতের সংখ্যা হচ্ছে এরূপ। গত এপ্রিল-মে মাসে পাকিস্তান থেকে হিন্দু এসেছে ১২৮২৭ আর ভারত থেকে হিন্দু পাকিস্তানে গেছে ৮৪০৮। আর ভারত থেকে পাকিস্তানে মুসলমান গেছে ১৩০৫৩ কিন্তু ঐসময়ের মধ্যে ১১৭২০ মুসলমান পশ্চিমবঙ্গে

এসেছে। এতে পাকিস্তানের হাজার হাজার মুসলমান ভারত পরিত্যাগ করছে এই অভিযোগ অ-প্রমাণিত হয়েছে। (৬) পাকিস্তান থেকে আগমনেচ্ছু হিন্দুদের, মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট ইত্যাদি দেবার কি ব্যবস্থা করা হয়েছে এই উদ্বিগ্ন প্রশ্নের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী ১৯শে জুনের বিবৃতিতে বলেন—খুব কমসংখ্যক হিন্দুই আসছে এবং যারা আসছে তাদের আসা সম্পর্কে কোনো বাধানিষেধ আরোপিত হয়নি (৭) সদস্যরা যখন প্রশ্ন করেন মাইগ্রেসন সার্টিফিকেট ঢাকায় নয় উপদ্রুত অঞ্চল রাজসাহীতে দেবার কি ব্যবস্থা হয়েছে তখন প্রধানমন্ত্রী উত্তর দেন তিনি মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট দেয়া সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ব্যবস্থা জানেন না কিন্তু যদি আগমনেচ্ছু ব্যক্তিদের ঢাকায় ডিপুটী হাইকমিশনারের অফিসে গিয়ে মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট আনতে বলার পরও খুব কমসংখ্যক সংখ্যালঘু সে সুযোগ গ্রহণ করে, তবে সিদ্ধান্ত করা স্বাভাবিক যে সংখ্যালঘুদের ভারতে আসা সম্পর্কে আকাঙ্ক্ষার তেমন কোনো তীব্রতা নেই। (৮) পাকিস্তান প্রধানতঃ রাজসাহী থেকে হিন্দুদের মালদহ অঞ্চলে আসার কারণ কি তার উত্তরে প্রধানমন্ত্রী বলেন রাজসাহীতে "টেরিবেল থিংগস্" ঘটেছিল কিছুদিন পূর্বে। কিন্তু ঠিক ১৪-১৫ই জুনের রাত্রে কি ঘটে তিনি জানেন না, যার ফলে ৭জন পলায়নকারী হিন্দু, পাকিস্তানী পুলিসের গুলিতে মারা যায়, এবং ৪জন গুলিবিদ্ধ অবস্থায় মালদহের হাসপাতালে ভর্তি হয়। ১৬ই থেকে ১৯শে জুনের মধ্যে প্রায় ২৭০০ হিন্দু মালদহে এসেছে এই আগমনের কারণ হিসাবে পাকিস্তান সরকারের কৈফিয়ৎ প্রধানমন্ত্রী বিনা মন্তব্যে উল্লেখ করেন "এই ঘটনা সাম্প্রদায়িকতার-সম্পূর্ণ স্পর্শমুক্ত স্বাভাবিক সীমান্ত ঘটনা মাত্র।" এই কৈফিয়ৎ সম্বন্ধে প্রধানমন্ত্রীর কোন প্রতিক্রিয়া বোঝা যায়নি (৯) ইতিমধ্যে পরবর্তী সংবাদে দেখা যায় ভারত সরকার স্বীকার করেছেন যে এগার হাজারের মত হিন্দু ভারতে এসেছে রাজসাহীর ঘটনার পর এবং আরো হাজার হাজার মানুষ আসবার জন্য অধীর অপেক্ষা করছে। অন্তত কুড়ি হাজার মাইগ্রেশন সার্টিফিকেটের দরখাস্ত ডিপুটী হাই কমিশনারের দপ্তরে পড়েছে (১০) এদিকে পাকিস্তানে ভারতের বিরুদ্ধে, মালদহ, জব্বলপুর, আলিগড় এবং মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে মুসলমানদের উপর ব্যাপক অত্যাচারের মিথ্যা-কাহিনী প্রতিদিন ফলাও করে ঘোষিত হচ্ছে এমন কি আগরতলার এক সংবাদে প্রকাশ ব্রাহ্মণ বাড়িয়া মহকুমার হিন্দুদের উপর ভারত থেকে বহিষ্কৃত পাকিস্তানীদের জন্য তাদের ঘরবাড়ী ও ভূসম্পত্তির একাংশের মালিকানা ছাড়বার জন্য নোটিশ জারি করা হয়েছে (১১) অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গ আসাম ও আগরতলাতে পাকিস্তানী মুসলমানদের অনুপ্রবেশ অব্যাহত রয়েছে যারফলে লোকসভায় আসামের সদস্যরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে এর পর আসামকে মুসলমান-প্রধান অঞ্চল বলে পাকিস্তানের দাবী উত্থাপন করা একেবারেই বিচিত্র ও অসম্ভব নয় (১২) অন্যপক্ষে প্রচার যে, ভারতে আগমনেচ্ছু সহস্র সহস্র হিন্দুদের উদ্বিগ্ন অবস্থিতির কথা শুনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী দারুণ

শঙ্কিত হয়ে, পশ্চিম বঙ্গ সরকারের নিকট এক গোপন পত্র দিয়েছেন যাতে এই ভয় প্রকাশ করা হয়েছে যে, ঐ সব সহস্র সহস্র হিন্দুদের ভারতে আগমনের সকল বাধা উঠিয়ে নিলে 'উই উইল সিঙ্ক' অর্থাৎ ভারত ডুবে যাবে ফলে চিরদিনের জন্য ভারতের দ্বার হতভাগ্যদের জন্য বন্ধ হয়ে যাওয়াও আশ্চর্য নয়! গত ২৯শে জুনের মাজদিয়ার খবরে প্রকাশ বিনাপাসপোর্টে ইষ্ট-বেঙ্গল-মেল যোগে গেদেষ্টেশন আগত তিনজন হিন্দু যুবক ও সাতজন হিন্দু মহিলাকে জবরদস্তি ফেরৎ পাঠান হয় ঐ যুবক তিনটিকে প্রথমে কোমরে দড়ি ও হাতে হাত-কড়া দিয়ে বিচারের জন্য রাণাঘাটে আনা হয়। আর যে-পাকিস্তানে হিন্দুনারী-নিগ্রহ প্রতিদিনকার ঘটনা সেখানে ঐ ৭ জন মহিলাকে অনির্দিষ্ট ভাগ্যের উপর ভরসা করে ফেরৎ পাঠান হয়েছে। (১২) অপর পক্ষে যে সহস্র সহস্র পাকিস্তানী মুসলমান বে-আইনী ভাবে ভারতবর্ষে এসেছে—অনুমান এক আগরতলাতেই ৫০ হাজার অনুপ্রবেশকারী আছে—তাদের মধ্যে মাত্র ৫০০ জনকে ফেরৎ পাঠাতে না পাঠাতে কলকাতাস্থিত পাক ডিপুটী হাই কমিশনার আগা হিলালী প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে এই প্রতিশ্রুতি আদায় করেছেন যে, এই অনুপ্রবেশকারীদের ক্রত বহিষ্কার করার নীতি পরিত্যক্ত হবে এবং অতি ধীরে ধীরে এদের সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে (১৩) সর্বশেষ সংবাদ, গত ২৯ শে জুন রাত্রে হাওড়া ষ্টেসন থেকে মালদহের ১৩টী সাঁওতাল উদ্বাস্তু পরিবার, মোট ৬০ জন—দণ্ডকারণ্যে রওয়ানা হয়ে গেছে। আরো বহু সংখ্যক সাঁওতাল উদ্বাস্তু দণ্ডকারণ্যে যেতে রাজী ছিল কিন্তু দণ্ডকারণ্যে কোন রাক্ষস আছে রাজনৈতিক দলের এই প্রচারের ফলে তাদের হাতে জীবনযাবার আশঙ্কায় এই সরল সাঁওতাল উদ্বাস্তুরা বিক্ষুব্ধ ভাবে মালদহ ত্যাগ করে অজ্ঞাত স্থানে আত্মগোপন করেছে, সরকারি খবরদারিকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ করে। এবং ওদের পুনর্বাসনের জন্যে যে ব্যবস্থা হয়েছিল তা বানচাল হতে চলেছে।

এই হোলো পাকিস্তানে হিন্দুদের অবস্থা এবং সে সম্পর্কে ভারত সরকারের প্রতিক্রিয়া ও নীতির মোটামুটি একটা রূপ। এর মধ্য দিয়ে অন্য সমস্ত কিছুকে ছাপিয়ে একটী বস্তুই জ্বল জ্বল করছে, সে হচ্ছে বড় বড় কথার আড়ালে ভারত সরকারের দুর্বল অ-নৈতিক নীতি এবং পাকিস্তানের অনাবৃত কৌশলী 'ব্লাকমেইলের' নিকট বার বার আত্মসমর্পণ। এর মধ্যে পাশার ঘুঁটি হচ্ছে পাকিস্তানের হিন্দু। 'সেকুলারিজম', জাতীয় সংহতি, শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধ মীমাংসা, ইত্যাদি ইত্যাদি গালভরা কথার আড়ালে নিজেদের কৃতকর্মের দায়িত্ব অস্বীকার এবং পাকিস্তানের অসহায় হিন্দুদের চরম লাঞ্ছনা, নিগ্রহ, অমর্যাদাকর জীবনের আশঙ্কাময় পরিবেশে চিরদিনের জন্য নিক্ষিপ্ত করা। দেশকে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভাগ করে মুস্লিম লীগের নিকট সম্পূর্ণ আত্মদান করে পণ্ডিত নেহেরু যখন বলেন 'পাকিস্তানের হিন্দুদের রক্ষা করা আমাদের সম্ভব নয়,' তখন গভীর বেদনা, লজ্জা ও গ্লানির সঙ্গে মনে পড়ে আজ কমতালাভের

লোভে দেশকে দ্বিখণ্ডিত করে একমাত্র বাংলারই দেড় কোটি হিন্দুকে পাকিস্তানের সেই সাম্প্রদায়িকতার হাতে আহুতি দেবার সময় আমাদেরই নিকট কত বীরোচিত ভাবে বলেছিলেন 'পাকিস্তান যা চায় তা পেলে আর তারা গোলমাল করবে না, তখন আমরা হাজার উপায়ে তাদের উপর চাপ দিতে পারবো এবং আরো ভালভাবে সেখানকার হিন্দুদের রক্ষা করতে পারবো'। তারপর দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে দফায় দফায় অত্যাচারিত, নিগৃহীত পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুনারীপুরুষ ভারতে—বিশেষ পশ্চিম বঙ্গে—এসেছে আশ্রয় ও নিজেদের সম্মানরক্ষার আশায়। কিন্তু আজও প্রায় দেড় কোটির অবশিষ্ট ৯০ লক্ষ হিন্দু পাকিস্তানে রয়েছে। সংখ্যাটি কম নয়, পৃথিবীর বহু রাষ্ট্রের জনসংখ্যা এই সংখ্যার সমতুল বা কম। যারা এখানে এসেছে তাদের সম্পর্কে কি ব্যবস্থা করা হয়েছে, হচ্ছে, কোন অবস্থা থেকে আজ কোন অবস্থায় এসে এরা ধুকছে তার দীর্ঘ গ্লানিকর স্তরগুলি ব্যক্তিগতভাবে জানবার সুযোগ হয়েছে। এই হতভাগ্যদের পুনর্বাসন ও মানুষের মত পরিবেশে ফিরিয়ে আনার জন্য কি ব্যবস্থা হয়েছে তার পুনরুল্লেখ করে লাভ নেই। সে-সত্য আজ যে কোনো চক্ষুষ্মানের নিকট দিনের আলোরমতই স্পষ্ট। প্রশ্ন হচ্ছে ঐ ৯০ লক্ষের কি হবে? ভারত সরকার পারলে চিরতরে বন্ধ করে দেবেন সীমান্ত, সে বিষয় সন্দেহ নেই এবং নানাভাবে পাকিস্তানের তোষণ দ্বারা তাদের কৃতজ্ঞতা-

(শেষাংশ ২১১ পৃষ্ঠায়)

আবহ

মণিময় মুখোপাধ্যায়

হৃদয় বিস্তৃত এক কাব্যময় শিল্পের চারুরি
সবুজ বাকোর দেশে ঝলকিত সুনীল প্রান্তর,
উদ্দাম লেখনী চলে, সাদা মেঘে কালো বাদুচর,
উর্মিল আলোকে নাচে, সারা মন শান্ত নীলাম্বরী।

বিবর্তনের ক্ষুধা অবিশ্রান্ত যান্ত্রিক ঘর্ঘরে,
উন্মুক্ত গবাক্ষ পথে পর্দার বাহিরে নীলাকাশ
বিদ্যুৎবিন্যাসে লাল, করবীর উষ্ণ আকাঙ্ক্ষায়
অবশেষ রাতজাগা রজনীর চৈত্রের ঘর্ঘরে।

এখনো অপূর্ববেগ ঘননীল সাগরের জল,
চোখের গভীর মনি খুঁজে ফেরে প্রবালের দ্বীপ।
রাত্রির তারার মালা সাগরের হৃদয় নাচায়,
বাজায় অরণ্যপানে দিকে দিকে শর্বরী উজ্জ্বল।

তিনটি কবিতা

—লোকনাথ ভট্টাচার্য

এক : তীর

তীর ছুঁবে তীরবেগে, অদৃশ্য অদৃশ্যে। বিদ্ধ করতে নয়, বিদ্ধ করার নেই তো কেউ শূন্যে, আছে আনন্দ জমজমাট, আছে শুধু নিঃশব্দ গতি অসংখ্য তীরের।

নভুন ঘুমের সকালে লিখি এই কথা। পাখি ডাকে কাছে-দূরে। চা জুড়িয়ে যায়। আমার মনের মন্দিরে শঙ্খ বাজে।

দীর্ঘ নয়, দীর্ঘতা মূঢ়তা—সব বলার স্পর্ধা সে তো প্রার্থনা নয়। যে পূর্ণ পূর্ণে, সে পূর্ণ অংশেও, পূর্ণের সম্পূর্ণ অভাবেও।

কেনিয়ে বলবই বা কী—কী ক'রে দেখাব এই হৃদয়! সে যে চ'ড়ে ব'সে আছে অবাস্তবের উচ্চতম মিনারে, ধড়খড়ির আড়ালে। তরল প্রগলভ রক্ত জ'মে জ'মে হয়েছে গাঢ়তম ক্ষীর—এক মুঠো লাল তার ঘনীভূত এক ফোঁটা বেদনীতে।

সেই বেদনী লাগিয়ে তীরের ফলায় ছোটাব এবার—তোমাকে বিদ্ধ করতে নয়, তোমার ধরার জন্যে নয়, আমার ছোঁড়ারই জন্যে।

জানি তবু—এত কথা শরতের, হেমন্তের, বসন্তের। এত আলো আজকের সকালের। যেন উপচে পড়েছে।

তারাও কি তবে কার ঘনতম ক্ষীর, সাগর-সাগর রক্তের জমাট শুধু কয়েক ফোঁটা বেদনী? তা-ই লাগিয়ে তীরের ফলায় ছোঁড়া আজ সকালে, আমার চোখে-জানালায়, দূরে-কাছে পাখির ডাকায়?

চা জুড়িয়ে যায়—আসলে জুড়োয় না হয়তো অথবা।

মনের মন্দিরে শঙ্খ বাজে।

দুই : যে গাছ নাচছে

মুহূর্তের ধ্যান, মুহূর্তের শান্তি, সে আমার মুহূর্তের বেদনাও, সে-ই জাগায় আন্দোলন, চলার জীবনের নদী : যে গাছ নাচছে, অথচ নাচছে না।

একটি বিন্দুতে ধরা সমস্ত পৃথিবী, সমস্ত সমুদ্রের জল, সমস্ত মানুষের প্রেম। আর হতাশাও, সেই হতাশ, অনন্ত রাত্রির ঘা-হতাশ, ঘুম-না-নামা চোখে।

প্রশ্ন নয়, কেন এ সম্ভব হ'ল, কী ক'রে, কেনই বা এ সম্ভব হবে। স্পর্ধা যদি, তবে সে-স্পর্ধা আমার নয়—নয় বিন্দুর, পৃথিবীর, জলের, প্রেমের, রাত্রির—সে-স্পর্ধা তার এই সব নিমিত্ত যার।

তাই বার বার বললাম বিন্দু, বললাম যে-গাছ নাচছে অথচ নাচছে না—বললাম না পৃথিবী, বললাম না সমুদ্রের জল, মানুষের প্রেম। বললাম না হতাশাও। তাই বার বার যে হ'তে পারত স্পর্ধা এক নিঃসার নাটকের অবশ্যম্ভাবী শাস্তিক নট, সে হ'ল প্রার্থনা। সে আপাদ বেদনা, আপাদ শান্তি।

আর, তুমি বৃথাই রাগ করলে।

তিন : আজ এই আকাশ

আমি তোমায় বলব না আমায় গ্রহণ করতে - আমি তোমায় বলব না এই সূর্যাস্তকে গ্রহণ করতে, এই মধুরের কান্নাকে, আর এই আসন্ন স্তব্ধতা যা' আমার রাত্রির নিঃশব্দ নিষ্প্রভ ধারায় প্রস্তুতির চেতনাকে, তাকে।

আমি তোমায় বলব না তোমার দুঃখকে গ্রহণ করতে।

মন্দির নয়, চেয়েছি পথ। পথের শেষে মন্দির নয়, চেয়েছি পথের শেষে পথ। আমি তোমায় বলব না কী-আকুল বিপুল সে-ভয় আমার পাছে একদিন পথ নিঃশেষে শেষ হয়, কোথাও পৌঁছে দিতে নয়, আবার চলতে দিতে নয়, পাছে ঘুম নিঃঝুম নিরালায় নিবিড়ের নিস্তরঙ্গ আবেশ একটি শেষ যবনিকা টানে যাত্রার।

পাছে আর কাঁদে না মধুর, এমন ক'রে যায়ে না সূর্যাস্ত, পাছে আবার, আরো একবার বলতে আসতে না হয় "আমি তোমায় বলব না।"

না, আমি তোমায় বলব না সে-ভয়ের কথা, বলব না তাকে গ্রহণ করতে।

তোমার সকল গ্রহণের বাইরে যেমন ক'রে আছে তোমার দুঃখ, আছ তুমি নিজেই, তেমনি এই মধুর আছে, আছে আমার ভয়, পথ, প্রস্তুতি—আর আছ যে-তুমি একান্ত আমার অথচ তুমি চিনবে না যাকে।

—আজ এই আকাশ মন্ত্র, এই মন আমার হরিণ যেন তীর-বেঁধা ছুটেছে তীব্র বেগে।

বিধানচন্দ্র রায়

লোকান্তরিত বিধানচন্দ্র রায়ের সহিত রাজনৈতিক ও অন্যান্য নানা ক্ষেত্রে আমরা সহ-মত ছিলাম না, তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে যে কয়েকটী কথা বলতে চাই তার পরিপ্রেক্ষিতেই উপরের কথাটীর সার্থকতা। ভারতবর্ষে নানা দিক দিয়ে গণতন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে চিন্তাশীল দেশপ্রেমিকেরা এই সিদ্ধান্তে এসে উপনীত হয়েছেন। তাঁদের সিদ্ধান্তের প্রেমিস্ একনয় কিন্তু একটা বিষয়ে তাঁরা একমত যে ভারতীয় মানসিকতায় গণতন্ত্রের বুনিয়াদ শেকড় গাড়েনি। আমরাও অনেকাংশে এই সিদ্ধান্তের সহিত সহ-মত। একদিকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দলের জনসাধারণের মতামতকে সদম্ভ-উপেক্ষা ও দলীয় গণ্ডীর চককাটা মতামতের বাইরে বৃহত্তর জনমানসের সঙ্গে সম্পূর্ণ অ-সহযোগ ভারতবর্ষের মাটিতে গণতন্ত্রকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করবার দিকে দ্রুত অগ্রসর করে দিচ্ছে। যে দেশে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দল দলীয় গণ্ডীর বাইরের দেশ ও মানুষকে দেশ সেবার ক্ষেত্র থেকে বাইরে রাখতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ এবং নিজের দলকে দেশপ্রেমের ও সেবার পরীক্ষায় একমাত্র উত্তীর্ণ বলে গণ্য করতে অভ্যস্ত সেদেশের গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশঙ্কান্বিত হবার কারণ আছে বই কি? এই পরিপ্রেক্ষিতে আজ সানন্দ স্বীকৃতির সহিত বলতে কোনো বাধা নেই যে বিধানচন্দ্র রায় ব্যক্তিগতভাবে-এর ব্যতিক্রম রূপেই আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়েছিলেন। তাঁর মধ্যে একটি প্রশস্ততর দৃষ্টিভঙ্গী, বিরোধী মত ও দলের আন্তরিকতা ও দেশ প্রেমে বিশ্বাসী একটা উদার ব্যক্তিমনের পরিচয় আমরা পেয়েছি। বাঙ্গলার মত সমস্যা কণ্টকিত রাজ্যে, গত ১৪ বৎসর অনেক ঘটনা ঘটেছে যাতে বিধানচন্দ্র রায় দলমত নির্বিশেষে বাংলার সমস্ত দলকে একটি কেন্দ্রবিন্দুতে ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্তে আনতে পেরেছিলেন একাধিকবার। আসামের বাঙ্গালী বিতাড়নের চরম গ্লানিজনক মুহূর্তে তাঁর বলিষ্ঠ ও উদার নেতৃত্ব সমস্ত বাংলাকে যে নেতৃত্ব দিয়েছিল নিঃসন্দেহ সমগ্র জাতির বিশেষ বাংলার পক্ষে এক পরম গৌরবের মুহূর্ত। বাংলা বিভাগের পর পূর্ব পাকিস্তান থেকে যে লাঞ্ছিত, সর্বস্ব-বঞ্চিত ইতিহাসের বিস্মৃত, দুর্ভাগাদের নিছিল দফায় দফায় পশ্চিম বাংলার তটে আছড়ে পড়েছে তারা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে একটা সহৃদয় মমতাশীল বন্ধু, একটা বলিষ্ঠ আশ্রয় খুঁজে পেয়েছিল। উদ্বাস্তুদের নানা সমস্যা নিয়ে তাঁর সঙ্গে বহুবার বহুভাবে উপস্থিত হয়েছি, কখনো মীমাংসায় সন্তুষ্ট হয়েছি কখনো হতে পারেনি, কিন্তু তাঁর আন্তরিকতা, দরদ ও সাহসের পরিচয়ে নিঃসন্দেহ মুগ্ধ হয়েছি। দল-বহির্ভূতই শুধু নয় সকল দলের ব্যক্তিদের প্রতিই শ্রদ্ধা ও সহযোগিতার প্রসারিত হস্তই ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক বিধানচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ পরিচয়। ক্ষমতা অধিষ্ঠিত দলে একমাত্র এই মানসিকতা প্রসারেই ভারতে গণতন্ত্রের পথকে নির্বিঘ্ন ও অবারিত করতে পারে। বাংলায় তাঁর স্থানাভিষিক্তরা তাঁদের বিদেহী নেতার এই অবদানকে যদি অনুসরণ করেন তবে, বাংলার ও ভারতের মহৎ কল্যাণ হবে। এই কথা কয়টী বলে পরলোকগত নেতার স্মৃতির প্রতি আমাদের সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাই।

৪।৭।৬২

গিরিব্রজাঞ্চলে

সমর গুহ

গৃধ্রকূট পর্বতে যাবার রাস্তার বাঁ পাশেই সুরে জীবকাম্রবন বা জীবকারাম। এটি ছিল বিম্বিসারের চিকিৎসকের আম্রবন বা আবাস। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের রক্ষিত স্থানে কিছু পাথুরে দেয়ালের ভিত আছে। আম্রবন বা আরামের আর কোন চিহ্ন নেই। একটি আমগাছও নেই। তবুও স্থানটি খ্যাত হয়ে আছে জীবকের আম্রকানন নামে।

জীবক খুব পারদর্শী চিকিৎসক ছিলেন। তাঁর খ্যাতি ছিল সর্বদেশে। অবন্তী, কোশল ও কাশীর রাজপুরুষেরা বিম্বিসারকে অনুরোধ করে জীবককে নিয়ে যেতেন কঠিন কোন রোগের চিকিৎসার জন্যে। গিরিব্রজ তো এমনিতেই সুরক্ষিত রাজধানী ছিল, জীবকও ছিল রাজগৃহের সুরক্ষার আরেক কারণ। রাজগৃহের রাজ-চিকিৎসক জীবককে দিয়ে ভিন্নদেশের রাজাদের চিকিৎসা করার সুযোগ বিম্বিসার দিতেন বলে অন্য-রাজারা রাজগৃহের সঙ্গে বন্ধুত্ব রক্ষা করে চলতেন।

জীবকারাম আজও স্মরণীয় হয়ে আছে সুচিকিৎসক জীবকের সুখ্যাতির জন্য নয়। জীবক পারদর্শী চিকিৎসক ছিলেন একথা সত্য, কিন্তু চরক বা সুশ্রুতের মতো চিকিৎসা-শাস্ত্রী ছিলেন না। জীবক আজো বেঁচে আছেন তাঁর চিকিৎসা বিদ্যার জন্য নয়, বুদ্ধের করুণার জন্য। বুদ্ধকে তিনি দান করেছিলেন তাঁর আম্রবনটি। তিনি চিকিৎসকও ছিলেন বুদ্ধের। এই আম্রকাননে বুদ্ধ অনেকদিন বিশ্রাম গ্রহণ করেছেন।

বুদ্ধ রাজগৃহে এসে একবার অসুস্থ হয়ে পড়েন। বিম্বিসার গুরুর চিকিৎসার জন্য পাঠান জীবককে। জীবক ভাবল ঔষধ তৈরী করে ভাবতে আরম্ভ করেন,—কোন পাত্রে তুলে ধরবেন তিনি এই ঔষধ বুদ্ধের শ্রীমুখে? স্বর্ণ পাত্রে? বা অন্য কোন ধাতুর পাত্রে। তৃষ্ণামুক্ত সন্ন্যাসির মুখে কি ধাতুর পাত্রে তুলে ধরা যায় ঔষধ! ভাবলেন জীবক সেবদত্ত। শিলাপাত্রকে বড় কঠিন মনে হল জীবকের। তথাগতের ফুলের পাপড়ির মত কোমল ঠোঁট ছুঁইতে কঠিন শিলাপাত্র তুলে ধরা যায় না। সামনের একটি সরোবর থেকে নীল কমলের পল্লব তুলে নিয়ে এলেন জীবক। তার মধ্যে ঔষধ রেখে পান করালেন অমিতাভকে।

দেবদত্তের প্রস্তরাঘাতে বুদ্ধ আহত হলে তাঁকে মঞ্চশিবিকায় অর্থাৎ আজকের দিনের ষ্ট্রেচারে করে জীবকের আম্রকাননে নামিয়ে আনা হয়। জীবকের চিকিৎসাধীনেই তিনি এই আম্রকাননেই সুস্থ হয়ে ওঠেন।

জীবকের বুদ্ধ অনুরাগ ছিল প্রগাঢ়। একবার অবন্তীরাজ 'চণ্ড' প্রদ্যোতের চিকিৎসা করে জীবক অতি রমনীয় একটি দুর্লভ বস্ত্র পারিতোষিকরূপে লাভ করেন। রাজগৃহে ফিরে এসেই তিনি এই বস্ত্রটি দান করেন বুদ্ধকে। সন্ন্যাস গ্রহণের বিশবছর পরে বুদ্ধের এই প্রথম বস্ত্রদান গ্রহণ। এর আগে শ্মশানে এবং আবর্জনাস্তূপে পরিত্যক্ত জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড সংগ্রহ করে তাই জোড়া দিয়ে তৈরী করতেন ভিক্ষুর চীবর। এমনি চীবরই ছিল বুদ্ধদেবের অঙ্গবাস। আরেকবার তিনি কাশীরাজের চিকিৎসা করে অর্ধসহস্র মুদ্রা মূল্যের একটি কম্বল লাভ করেন।

এরূপ কম্বল সাধারণের গৃহে কল্পনা করাও ছিল কঠিন। জীবক এই কম্বলটিও এনে দান করেন বুদ্ধকে। জীবকের আন্তরিক ভক্তির আবেদনে এই দানগুলি বুদ্ধ গ্রহণ না করে পারেন নি।

জীবকের জন্য একবার নিয়ে আনন্দকে বুদ্ধের কাছে অনেক তিরস্কার পেতে হয়েছিল। একবার বুদ্ধদেব বায়ুশূলে আক্রান্ত হয়েছিলেন। জীবক বুদ্ধকে ত্রিকটু-ঘবাগু সেবনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু এই ত্রিকটু-ঘবাগু তৈরী করার জন্য প্রয়োজন তিল-তণ্ডুল-মুগ। কিন্তু সঞ্চয় না করে এসব পাওয়া যাবে কোথায়? আনন্দ বুদ্ধের অগোচরে তিল-তণ্ডুল-মুগ সংগ্রহ করলেন। ত্রিকটু-ঘবাগু সেবন করার পরে বুদ্ধ যখন শুনলেন যে এর উপাদানগুলি আগে থেকে সঞ্চয় করা হয়েছে, বুদ্ধ তখন তীব্র ভর্ৎসনা করে আনন্দকে বললেন: যে কোন আহার্য আগে থেকে সঞ্চয় করা সন্ন্যাসধর্মের বিরোধী।

জীবকের কৃতিত্বের স্বাক্ষর রয়েছে আরও একটি দিক দিয়ে। বিম্বিসারের মৃত্যুর পরে অজাতশত্রুও জীবককে রাজ চিকিৎসকরূপে গ্রহণ করে। জীবকই অজাতশত্রুর বুদ্ধ-বিদ্বেষ দূর করে তাকে বুদ্ধ শরণাগত করে তোলেন। পিতৃহত্যার অনুতাপে অজাতশত্রুর মন অত্যন্ত দগ্ধ হয়েছিল। জীবক অজাতশত্রুকে বুদ্ধের কাছে আত্মসমর্পণ করে শান্তিলাভের পরামর্শ দেন। এই জীবকারামেই বুদ্ধের সঙ্গে অজাতশত্রুর সাক্ষাৎ হয় এবং পিতৃহন্তা রাজা বুদ্ধের করুণা লাভ করেন।

জীবকারাম দেখে চললাম রাজগৃহের দিকে। আঁকাবাঁকা বন্ধুর পাথুরে পথ দিয়ে গাড়ি চলছে। এক সময়ে এগুলিই ছিল প্রাচীন রাজগৃহের পথ। গাড়ি এসে থামলো প্রাচীর ঘেরা স্থানে। এখানে নাকি জরাসন্ধের রথের চাকার চিহ্ন আছে। সত্যি, পাথরের বুকে দ্বিচক্রযানের যাতায়াতের গভীর দাগ রয়েছে। এই দাগ কিম্বদন্তী যুগের জরাসন্ধের রথের চাকার চিহ্ন না হলেও যে প্রাচীন যুগের দ্বি চক্রযান চলাচলের স্বাক্ষর সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু রথের চাকার চিহ্নের চেয়েও কতকগুলি রহস্যময় চিহ্ন রয়েছে এখানে। এগুলি এক-প্রকার প্রাচীন লিপি। বৃত্তাকারে লেখা রয়েছে বলে এর নাম দেওয়া হয়েছে শঙ্খলিপি। রাজগৃহের আরও কয়েকটি অঞ্চলে এরূপ শঙ্খলিপি দেখা যায়। ভারতের অন্য কয়েকটি স্থানেও এরূপ শঙ্খলিপি পাওয়া গেছে। কি যে কথা লুকিয়ে আছে এরূপ শঙ্খলিপি রহস্যাবরণে আজও তার সন্ধান করা সম্ভব হয় নি। কারণ, এখনও শঙ্খলিপিগুলি অনুদ্ধারিত রয়েছে।

আরও সামনে এগিয়ে গেলে পাওয়া যায় বানগঙ্গা। বানগঙ্গা আজ একটি আবদ্ধ জলাশয়ে পরিণত হয়েছে। কিন্তু বানগঙ্গার ধারে গেলে খুব কাছে থেকে দেখা যায় বিম্বিসার অজাতশত্রু যুগে রাজগৃহের নগর প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ। অনেক স্থানে বেশ অক্ষত রয়েছে এই প্রস্তর প্রাচীর। বড়বড় পাথরের উপর পাথর বসিয়ে বেশ প্রশস্ত ও উঁচু প্রাচীর তৈরী করা হয়েছিল। এই প্রাচীরের উপর দিয়ে নাকি রথ চালান সম্ভব ছিল। রথ না হলেও নগর প্রাচীরের উপর দিয়ে যে অশ্বচালান যেতো তা' অনুমান করা কষ্টকর নয়। প্রাচীরের মাঝে মাঝে আছে সোপানাকার চত্বর। সেগুলি ছিল প্রহরী কক্ষ।

রাজগৃহের এই নগর প্রাচীর ইতিহাসের এক অমূল্য নিদর্শন।

বানগঙ্গা দেখে পিছনে ফিরে এসে আবার অন্য রাস্তায় চললাম সোনা-ভাণ্ডারের দিকে। সরস্বতী পার হয়ে গিয়ে পৌঁছতে হবে সোনা-ভাণ্ডারে। যদি পাণ্ডা দিলে যায় পথে তা' হলে তো কথাই নেই। বিস্ময়ের স্বরমা পরিয়ে চোখ বিস্ফারিত করে বিম্বিসারের গুপ্তধনের কাহিনী শোনাবে যাত্রীদের। হাত নেড়ে নেড়ে বলবে, গুপ্তধনের কথা। বিম্বিসারের রাজভাণ্ডার নাকি এখনো লুকোনো রয়েছে ওই শিলাকোষে। গুপ্তধন প্রাপ্তির সংকেতও নাকি রয়েছে

ভাণ্ডারের দেয়ালে খোদা গুপ্তলিপির স্বাক্ষরে। যদি কেউ এই গুপ্তলিপি উদ্ধার করতে পারে, তবে গুপ্তধন প্রাপ্তি তার সুনিশ্চিত।

পাণ্ডাদের রসাল রহস্যের কিম্বদন্তী শুনতে বেশ ভাল লাগে। কিন্তু আসলে সোনাভাণ্ডার মোটেই বিম্বিসারের গুপ্তধনের গুপ্ত ইঙ্গিতে রোমাঞ্চিত নয়। যাকে আজ ভাণ্ডার বলা হয় সেগুলি ছিল এক সময়ে শিলা খোদিত গিরিগুহা। এরূপ শিলাগুহা তৈরী করা হয়েছিল জৈন সন্ন্যাসীদের বাস করার জন্য। আজকের এই সোনা-ভাণ্ডার নামের গুহা তৈরী করা হয়েছিল পাহাড় কেটে। এই গুহাটি দ্বি-কাক্ষিক এবং প্রথমে ছিল দ্বিতল। এখন উপরের তলাটি ধ্বসে ভেঙ্গে পড়ে গেছে। এই গুহায় জৈন দেবতাদের কয়েকটি মূর্তি খোদাই করা আছে আর আছে কিছু ব্রাহ্মীলিপির স্বাক্ষর। এই ব্রাহ্মীলিপি গুলিকেই পাণ্ডারা বলে গুপ্তধন লাভের গুপ্তলিপি। এই গুহা খুব সম্ভবত খৃষ্টীয় চার শতাব্দীতে তৈরী করা হয়েছিল।

সোনা ভাণ্ডারের কথা উঠতেই জৈন সন্ন্যাসীদের কথা এসে গেল। বস্তুত, রাজগৃহের কথা কিছু বলতে গেলে জৈন সন্ন্যাসীদের কথা উল্লেখ করতে হয় সবার আগে। জৈন ধর্মের ইতিহাস বুদ্ধদেবের ইতিহাসের চেয়েও প্রাচীন। বিশেষ করে রাজগৃহ মূলত জৈনদেরই তীর্থভূমি ছিল। জৈন ধর্ম-ক্ষেত্রে এসে বুদ্ধদেব তাঁর নিজের ধর্ম প্রচার করেন।

জৈনদের কথা অনেক আগেই বলা উচিত ছিল। কিন্তু অনেকটা ক্ষুব্ধ হয়েও মৌন রয়েছি জৈনধর্মের স্বারূপিক সম্বন্ধে। রাজগৃহের প্রাকৃতিক শোভা আর অনাড়ম্বর জনোরম তীর্থ-ভূমিকে কী বিকৃত করে তুলেছে আজকের জৈন শ্রেষ্ঠীরা।

জৈন তীর্থংকরেরা সংসারের সামান্য আভরণ বা আবরণ সম্বন্ধেও ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন। কৌপিনটুকুও তাঁরা ধারণ করতেন না। প্রকৃতির কোলে তাঁরা ছিলেন সম্পূর্ণ প্রাকৃত শিশুর। নিভৃত গিরিগুহা বা বন ছিল তাদের তপোভূমি। সেখানেই তাঁরা প্রকৃতির কোলে বাস করতেন। রাজগৃহের প্রতিটি পাহাড়ের সঙ্গে রয়েছে জৈন সন্ন্যাসীদের ঐতিহ্য। কত তপস্বী নির্জন পাহাড়ে সাধনায় মগ্ন হয়ে চিরকালের মত নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছেন। রাজগৃহের গিরিশিখরগুলি জৈন তীর্থংকরদের এক একটি স্মৃতিরূপে দাঁড়িয়ে আছে ঊর্দ্ধমুখী হয়ে।

কিন্তু কি ঘৃণ্য দৃষ্টি আজকের জৈনধর্মী কাঞ্চনগর্বী শ্রেষ্ঠীদের। জৈন তীর্থংকরদের পুণ্য পবিত্র প্রাকৃতিক তীর্থ-ভূমিগুলিকে ইয়া-ইয়া বিশাল ইট-পাথুরে মন্দিরের তোপর পরিয়ে কী বিকৃতই না করে রেখেছে। চেয়ে দেখুন রাজ-গৃহের চারদিকে—কী সুন্দর গিরিশ্রেণী! কিন্তু আজকের দিনের ওই ধনগর্বী ধূলাঙ্গ জৈন শ্রেষ্ঠীরা প্রতিটি গিরি-শিখরের শীর্ষে এক একটি মন্দির গড়িয়ে তাদের কাঞ্চন-গর্বের ধ্বজা উড়িয়ে রেখেছে। রাজগৃহের কত সুন্দর নগ্ন পল্লবা গিরি শ্রেণী, নীল আকাশ ছুঁয়ে কি বিচিত্র এদের ঐশ্বর্য! এর শিখরে শিখরে তরল সোনার দিব্য বিভার মত লেগে রয়েছে ধ্যানী-দিগম্বরদের পবিত্র স্মৃতি। নির্মুক্ত নির্লিপ্ত এই তপোভূমির কল্পনাই কি তীর্থংকরদের পরম প্রিয় নয়?

রাজগৃহের কোন জৈন মন্দিরে যাইনি আমি। কাঞ্চন-গর্বী জৈন অহমিকায় ওগুলি কলুষিত হয়ে রয়েছে। এই মন্দিরগুলি-পরম তপস্বী জৈনতীর্থংকরদের জীবন ধর্মের মূর্ত অসঙ্গতি। তা' ছাড়া প্রাচীনও নয় কোন মন্দির। মাত্র এই ইংরেজী যুগে বিস্তর অর্থ সঞ্চয় করে একজন শ্রেষ্ঠী এই মন্দিরগুলি স্ব স্ব শিখরে মহাপুণ্য সঞ্চয়ের অভিলাষী হয়েছেন। দিগম্বর তীর্থংকরদের স্মৃতি রক্ষার নামে শ্রেষ্ঠীকুল রচিত জৈন মন্দিরগুলি এক একটি মূর্তিমান অসামঞ্জস্যের ঘৃণ্যতম নিদর্শন।

গৃধ্রকূটকে যদি কোন বৌদ্ধ শ্রেষ্ঠী এমন বিকট ইট পাথরের বেড়ীদিয়ে মন্দিরাকারে তৈরী করতো, তা' হলে দূর থেকেই নমস্কার করে ফিরে আসতাম। অশোক এসেছিলেন, আরও

এসেছিলেন মৌর্য, গুপ্ত, ও পাল বংশের শ্রেষ্ঠ নৃপতিরা এই গৃধ্রকূট পরিদর্শনে। কিন্তু এই নৃপতিরা রাজপর্বের স্বাক্ষর রেখে যাননি গৃধ্রকূটের বুদ্ধ স্মৃতি মণ্ডিত পরম তীর্থভূমিতে, ধন্য অশোকের রুচি, ধন্য রাজন্যবর্গের ধর্মানুভূতি। কোন মন্দির তৈরী হয়নি গৃধ্রকূটে। আজও তেমনি আছে গৃধ্রকূট, যেমন ছিল তথাগতের তপোময় যুগে।

বুদ্ধদেবের ইতিহাসের চেয়েও কিন্তু রাজগৃহে জৈন ধর্মের ইতিহাসের সন্ধান করা যায় অনেক আগে থেকে। মহাবীর জৈনধর্মের চতুর্বিংশতিতম তীর্থংকর। তার আগের তেইশ জন তীর্থংকরের প্রত্যেকে তপস্যা করতে এসেছেন রাজগৃহের গিরিদ্বারে। বিংশতিতম তীর্থংকর মুনি সুব্রতের জন্মও তপোভূমি এই রাজগৃহ। তীর্থংকর মহাবীর তাঁর বত্রিশ বছরের প্রাব্রজ্য জীবনের প্রায় চৌদ্দ বছর কাটিয়েছেন এই রাজগৃহে অথবা তৎসংলগ্ন স্থানে। মহাবীরের এগারজন গণধর অর্থাৎ প্রধান শিষ্যদের প্রত্যেকে রাজগৃহের বিভিন্ন পাহাড়ে তপস্যা করে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

জৈন সন্ন্যাসীদের মত এমন কঠোর তপস্বী আর দেখা যায় না, কী ভিতিক্ষা, কী সংযম, কী কৃচ্ছ্রতা, জীবনটাকে নিঃস্বেষ করে দেওয়ার এমন নির্মম তপস্যা বোধ আর কোন ধর্মে দেখেনা। জৈন তপস্বীদের অনেকে প্রাণত্যাগ করেছেন অনশনব্রত গ্রহণ করে। কিন্তু এমন যে সর্বত্যাগের ধর্ম তার ইতিহাসও ধর্মবৈরিতার কলঙ্ক থেকে মুক্ত নয়। সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন ছিলেন প্রথমে জৈন ধর্মাবলম্বী। তাঁরা বুদ্ধের সান্নিধ্যে এসে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এজন্য তাঁদের জৈনধর্মাবলম্বীদের হাতে কম লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়নি। বুদ্ধ ও মহাবীর ছিলেন সমসাময়িক। কিন্তু তাঁদের জীবিত কালেই দুই ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে অনেক সংঘাত ঘটে। এই দ্বন্দ্ব এমন পর্যায়ে এসে যায় যে জৈনদের প্রভাবে বুদ্ধের প্রধান শিষ্য মৌদ্গল্যায়নকে হত্যা পর্যন্ত করা হয়। ধারা সত্যান্বেষী, সর্বত্যাগী তাঁদের অনুগামীরা ধর্মের নামে পৃথিবীতে যে কত কলঙ্কের কাহিনী সৃষ্টি করেছে মহাপণ্ডিত মৌদ্গল্যায়নের হত্যা তার এক সকরুণ স্বাক্ষর।

সোনভাণ্ডার থেকে কিছুদূর এগিয়েই জরাসন্ধের মল্লভূমি। রাজগৃহের পুরাকীর্তির সঙ্গে জরাসন্ধের নাম অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। মহাভারতে, নানাপুরাণে তাহাকে এক প্রবল প্রতাপান্বিত রাজা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। জরাসন্ধের ইতিহাস থাকলেও, কোন কীর্তি চিহ্নের সন্ধান পাওয়া যায়নি রাজগৃহে। জরাসন্ধের সঙ্গে যেসব কাহিনী জড়িত হয়েছে তার সবই কিংবদন্তী। তার নামে যে মল্লভূমি দেখান হয় সেটা ছিল আসলে বিম্বিসার বা অজাতশত্রুর তৈরী দুর্গপ্রাকারের প্রহরীকক্ষের ভিত। কিন্তু লোককথায় বলা হয় এখানেই ভীম-জরাসন্ধের মল্লযুদ্ধ হয়েছিল।

তিনি যে উত্তর-পূর্ব ভারতের এক প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাট ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। জরাসন্ধ ছিলেন অসুর সভ্যতার প্রতীক এবং শিবভক্ত। এই অসুর রাজা উত্তর ভারতের বহু রাজাকে বন্দী করে রাজগৃহের কারাগারে বন্দী করে গিরিব্রজের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর কাছে বলি দিতেন। অনেক নারীও বন্দী ছিল জরাসন্ধের কারাগারে।

কংস ছিলেন জরাসন্ধের ভগ্নিপতি। কংসবধ করার পরে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে জরাসন্ধের চিরবৈরিতা সুরু হয়। পুরাণের একমতে কংস বধের পরে ভগ্নিপতি হত্যাকারী শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে অভিযান করে জরাসন্ধ, কিন্তু পরাজিত হয়ে প্রত্যাবর্তন করে। কিন্তু পুরাণের আরেক কাহিনীতে জানা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধের হাতে বার বার নাস্তানাবুদ হন। শ্রীকৃষ্ণ সতেরবার পরাজিত হন তার কাছে এবং প্রতিবারই রণক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। এজন্য শ্রীকৃষ্ণের এক নাম হয় 'রণছোড়'। গুজরাটে আজও শ্রীকৃষ্ণের এক নাম রণছোড়লাল। তিনি বারবার পরাজিত হয়েও শেষ পর্যন্ত জরাসন্ধকে পরাজিত করতে সক্ষম হন এবং শত শত গোপিনী

ও বন্দী নারীদের মুক্ত করেন জরাসন্ধের কারাগার থেকে। এই মুক্ত নারীরাই শ্রীকৃষ্ণকে প্রিয় সম্বোধনে নামকরণ করে 'রণছোড় লাল'। অবশ্যি, এ কাহিনীও কিম্বদন্তীর অন্তর্ভুক্ত। জরাসন্ধ বধের মহাভারতীয় কাহিনীতে বলে উল্লেখ কৃষ্ণ ভীমের সাহায্যে বধ করেন জরাসন্ধকে। ব্রাহ্মণ বিদ্যার্থীর বেশে শ্রীকৃষ্ণ ও ভীম নগর প্রহরীর দৃষ্টি এড়িয়ে একসময়ে গিরিব্রজে প্রবেশ করেন। অবশ্যি, একথা ভেবে আশ্চর্য হতে হয় যে 'মহাশয়' ভীম কি করে ব্রাহ্মণের বেশে আত্মগোপন করলেন। যা হোক প্রহরীদের চোখে ধুলো দিয়ে ভীমসহ শ্রীকৃষ্ণ একেবারে জরাসন্ধের সকাশে গিয়ে হাজির হন এবং হাজির হয়েই ভীম জানান মল্লযুদ্ধের চ্যালেঞ্জ। সে যুগে প্রতিদ্বন্দ্বীর আহ্বান গ্রহণ করা ছিল পৌরুষের মাপকাঠি। তাই বিনাদ্বিধায় রাজী হয়ে গেল জরাসন্ধ ভীমের সঙ্গে মল্ল যুদ্ধে। গিরিব্রজের এই সম্রাট ছিল মস্ত মল্লবীর। তার তৈরী মল্লক্ষেত্রে সুরু হলো লড়াই। হুঁ হুঁ করে, একে ওকে বজ্র দিয়ে দিনের পর দিন চলল মল্লযুদ্ধ। বসে বিশ্রাম, আবার দিনে লড়াই। শেষে শ্রীকৃষ্ণের চতুর কারসাজি জরাসন্ধ জন্ম হলো ভীমের কাছে, প্রাণ গেল তার মল্লযুদ্ধে। জরাসন্ধ পুত্র সহদেবকে রাজা করে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ভীম ফিরে গেলেন ইন্দ্রপ্রস্থে। কিন্তু সহদেবও সহজে ছাড়েনি হস্তীনাপুরকে। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের অশ্ব রাজত্ব দিয়ে যাবার সময় বন্দী করে যুদ্ধ করে তবে বশ্যতা স্বীকার করেছিল সহদেব পাণ্ডবের।

মল্লভূমিটির ঐতিহাসিক মূল্য যাই হোক না কেন, বিষ্ণুপুরটিই বিচারের মল্লবীরদের কাছে জীবন্ত সত্য। এই মল্ল ক্ষেত্রের মাটি ছিল এক সময়ে হলুদে। জরাসন্ধ নাকি যাঁ ঢেলে ঢেলে এই মল্লক্ষেত্রটি তৈরী করেছিলেন। ফল হয়েছে এই যে এদেশের মল্লবীরেরা এই জরাসন্ধী মল্লভূমির মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে নিয়ে গিয়ে এমন করেছে যে হলদে মাটির একটুও আর এখন অবশিষ্ট নেই। (ক্রমশঃ)

খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই

গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা	৬·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	৫·০০
ভারত-আত্মার বাণী	৫·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
কর্মবাণী	১·২৫
Soul of India Speaks	5·00

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ. বি. টি.

বিদ্যাসাগর	২·৫০
মানুষের মত মানুষ	·৬২
শিশু রামায়ণ	·৬২
শিশু মহাভারত	·৭৫

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

বাংলার ঋষি	৩·০০
বাংলার মনীষী	১·২৫
বাংলার বিদুষী	২·০০
বীরত্বে বাঙালী	১·৫০
ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৩·০০
রাজর্ষি রামমোহন	১·০০
রবীন্দ্রনাথ	১·০০
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১·২৫
আচার্য জগদীশচন্দ্র	১·৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০

॥ প্রতিটি বই বহুচিত্র শোভিত ॥

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী : : ১৫ কলেজ স্কোয়ার : : কলিকাতা—১২

কালপুরুষ : উপন্যাস

মিহির মুখোপাধ্যায় ..... গতবারের পর .....

[উনত্রিশ]

ঢাকুরিয়া ষ্টেশনের কাছে, রেললাইন পার হয়ে, লাল সুরকির রাস্তায় কিছুদূর যাবার পর কার্তিক দত্তর নতুন বাড়ী।

চারধারে নারকেল-সুপুরী-আম-কাঁঠালের বন, পথের পাশে পানা-ভরা পুকুর, স্তাওলা ধরা ভাঙা ইটের দেয়াল, কাচ-ভাঙা ল্যাম্প-পোষ্ট, টালি-ছাওয়া মুদি দোকান, খেরস্ত-বাড়ীর উঠোন। বাঁশবাড়, কচু, আকন্দ আর আশশেওড়ার জোপ। মাঝে মাঝে গাছ পালার ফাঁকে ফাঁকে একতলা-দোতলা দালানও আছে, আশে পাশে অনেক নতুন দালানও উঠ্‌ছে, কিন্তু যেদিকে চাও সবুজ আর সবুজ। একেবারে পাড়াগাঁয়ের মত। চমৎকার জায়গাটি, শহরের ধুলো, ধোঁয়া, ভীড় কিছু নেই। প্রথম দিন দেখেই ভাল লেগেছিল শান্তনুর। আজ এই ভোরের রোদ্দুরে গাছ-গাছালির ছায়ায়, মাঝে মাঝে বৃষ্টির জল-কমা কাঁচা রাস্তায় যেতে যেতে আরো ভাল লাগল।

কার্তিক দত্তর একতলা বাড়ীর সামনে এসে হাত-ঘড়ি দেখল, সাতটা বাজতে মিনিট কয়েক বাকি। আস্তে আস্তে কড়া নাড়ল।

ভেতর থেকে সাড়া এলো—"কে!" জামাইবাবুর গলা। নাম না বলে শুধু আমি বললে চটে যান জামাইবাবু, একটু চটাবার জন্যই গলার আওয়াজ গোপন রাখার চেষ্টায় একটু চাপা সুরে জবাব দিল শান্তনু "আমি।"

—"আমি কে! নাম বলুন।"

আবার কড়া নেড়ে—"আমি, আমি।"

—"আমি, মানে কি! আচ্ছা মুস্কিল তো।"—জামাইবাবু খুব বিরক্ত হয়েছেন মনে হ'লো। দরজা খুলে শান্তনুর হাসিমুখ দেখে মুখের ভাব প্রসন্ন হ'ল। খুশি গলায় ডাকলেন—"ও তুমি, এসো এসো ভেতরে এসো, এত ভোরে, হঠাৎ কি মনে করে!"

ভেতরে ঢুকল শান্তনু। কার্তিক দত্ত গলার স্বর পাল্টে বললেন—"তোমাদের আর কাণ্ডজ্ঞান হ'ল না, নাম না বলে শুধু আমি বললে কিছু বোঝা যায় নাকি, সংসারে সকলেইতো আমি। বসো তোমার দিদিকে এককাপ চা দিতে বলি।"

—"না, না, দিদিকে এখন ডাকবেন না, আপনার সঙ্গে একটা গোপনীয় জরুরী কথা আছে, সেটা হয়ে থাক, তারপর দিদির সঙ্গে দেখা করব।"

—"ও বাবা, জরুরী এবং গোপনীয়, তা'হলেতো শুনতেই হচ্ছে, দরজা-জানালা সব বন্ধ করে দেব নাকি!"

শান্তনু একটু হেসে, পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে বললো—"আপনি সব ব্যাপারেই ঠাট্টা করেন, একবার একটু সিরিয়াস্‌লি নেবেন।"

—"আচ্ছা, এই আমি গম্ভীর হয়ে বসলাম।"—কার্তিক দত্ত তক্তপোষের ওপর আসন-পিঁড়ি হয়ে বসলেন, সামনে খবরের কাগজ, খালি চায়ের কাপে পোড়া সিগারেটের টুকরো। বাইরের বসবার ঘর। একটা পাশ জুড়ে ছোট তক্তা পোষের ওপর সতরঞ্চী পাতা। ওপাশে দুটো চেয়ার, একটা টেবিলের উপর এক বোঝা পুরনো খবরের কাগজ, দু'একখানা বই, পেতলের দুলদানীতে রঙীন কাগজের ফুল। নতুন চুনকাম করা দেয়ালে কোন দাগ নেই, ছবিও বেশি নেই, শুধু দুটো ক্যালেণ্ডার, একটায় বকুল গাছের নিচে রাধাকৃষ্ণ আর একটায় ঘোড়ার পিঠে সুভাষ বোস।

ভেতরের দিকে যাবার দরজায় আড়-করলা পর্দা ঝুলছে, জানালা কটাও একই রঙের পর্দা-ঢাকা, শান্তনু রাস্তার দিকের দরজাটা বন্ধ করে একটা চেয়ার টেনে ভক্তাপোষের কাছে বসল। একটু সময় কি যেন ভাবল, বোধ হয় সারাটা পথ যা ভাব্‌তে ভাব্‌তে এসেছে সেই কথাগুলিই আবার মনে মনে গুছিয়ে নিল, কিন্তু কি ভাবে শুরু করবে ঠিক ভেবে পেল না, প্রথমেই বলে ফেলল—"আমি শীলা পিরারই বিয়ে করব ঠিক করেছি।"

কাত্তিকবাবু হো হো করে হেসে উঠ্‌লেন—"এই কথা শোনার পরেও তুমি আমাকে গম্ভীর হয়ে থাকতে বলছ।"

শান্তনু তাড়াতাড়ি উঠে পেছনের দিকের দরজাটাও ভেজিয়ে দিয়ে এল, একটু বিব্রত-স্বরে বললো—"আঃ থামুন আগে সবটা শুনে নিন্।"

সবটা শোনার সময়ও কিন্তু কাত্তিকবাবু মৃদু মৃদু হাসছিলেন শান্তনুর কথা শেষ হলে বললেন—"এ ব্যাপারটার আঁচ আমি আগেই পেয়েছিলাম। সেই সেদিন তোমাদের দু'জনকে রাস্তায় দেখেই একটু সন্দেহ হয়েছিল, আমাকে হঠাৎ দেখে যেভাবে চম্‌কে উঠ্‌লে মনে হ'ল, তাড়াতাড়ি যেন এড়িয়ে গেলে, তারপর কমলার মুখেও কিছু কিছু শুনেছি, তুমি নাকি আজকাল ঘনঘন ও বাড়িতে যাচ্ছ।" কাত্তিক ধরু একটা সিগারেট ধরালেন। একটু চুপ থেকে শান্তনু বললো—"এখন যত তাড়াতাড়ি হোক রেজেষ্ট্রি করে ফেল্‌তে চাই, আপনি আমাকে সাহায্য করুন আর কেউ আমাদের সমর্থন না করুক অন্ততঃ আপনার কাছ থেকে সাহায্য পাব এ ভরসা আমাদের আছে।"

কাত্তিকবাবু একটু হাসলেন—"আমাদের বলছ কেন, দেবানীও কি আমার কথা বলেছে?"

—"হ্যাঁ, তাকে জিজ্ঞেস করেই আপনার কাছে এসেছি।"

—"ভাখো, একটা কথা ভাবা উচিত" কাত্তিকবাবু চায়ের কাপে সিগারেটের ছাই ফেলে একটু ভেবে নিয়ে বললেন—"এ বয়সে অনেকেরই এরকম হয়, খেলা খেলা করিয়ে যাও, ও বাড়িতে আর বেশী যেও না, পড়াশোনায় মন দাও, দেখবে আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে, না হলে অনর্থক একটা গোলমালের মধ্যে যেতে হবে, বুঝতেই পারছো তোমাদের কারো বাড়ীর অভিভাবকই মত দেবেন না, মাঝখান থেকে আমি বেচার দু'পক্ষের কাছে অপ্রিয় হবো, তাঁরা ভাববেন আমার বুদ্ধিতেই তোমরা এতখানি সাহস পেয়েছ।"

শান্তনু একটু কাল জামাইবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে ঠোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে বললো—"আপনি শেষে এই কথা বল্‌লেন, বড় আশা করে এসেছিলাম, সে যাক আমি তাহলে উঠি, তবে জেনে রাখুন, এ বিয়ে আমি করবই, কোন পক্ষের অভিভাবকই আটকাতে পারবে না।"

—"আরে যাচ্ছো কোথায়, বসো বসো।"—কাত্তিকবাবু তাড়াতাড়ি শান্তনুর হাত ধরে বসালেন—"তোমার দেখ্‌ছি সেই ছেলেবেলার মতো কথায় কথায় অভিমান করার স্বভাব আর গেল না, এ সব ব্যাপারে অত সেন্টিমেন্টাল হলে কী চলে, সব দিক ভেবে চিন্তে দেখ্‌তে হবে তো।"

—"ভাবাভাবির আর কি আছে, আমি কী রকম জেদী ছেলে আপনি তো জানেন, বাবা, জ্যাঠামশায়, দুজনের ইচ্ছে ছিল আমি আইন পড়ে উকিল হই, তাদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে সায়েন্স পড়েছি, বি, এস সি পাশ করেছি, মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছি, সব জেনেশুনে আমাকে আর অভিভাবকদের ভয় কি দেখাচ্ছেন।"

—"না, না, ভয় দেখাচ্ছি না, ভয় দেখাবার কথা নয়, তুমি তো আর কচি খোকা নও।"—

কাত্তিকবাবু শান্তনুর উত্তেজিত মুখের দিকে তাকিয়ে বারকয়েক সিগারেটে টান দিলেন, একটু হেসে বললেন—"তোমাকে এককাপ চা দিতে বলি।"

—"না, চা খেতে আমি আসিনি, আমাদের আলোচনাটা

আপদ শেষ হোক।"

—"আলোচনার আর কিছু নেই, তুমি যা করবে তাতো ঠিক করেই ফেলেছ, কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখেছ তোমার বাবা যদি পড়ার খরচা বন্ধ করে দেন।"

—"যদির কথা নয়, পড়ার খরচা বন্ধ করে দেবেনই"—শান্তনু বেশ ভেবে ভেবে প্রত্যেকটি কথার ওজন করে উত্তর দিল—"আমি পড়া ছেড়ে দিয়ে চাকরী নেব, হোস্টেলে আমার রুমমেট বিমলকান্তির বাবার ব্যবসা আছে, আমি সেখানে জয়েনাইজার হব। ওদের ল্যাবরেটরী গুডস্-এর দোকান, সায়েন্সের সব অপারেটাস বিক্রী করে, সায়েন্স গ্রাজুয়েট চায় ওরা।"

—"এতদূর ভেবে রেখেছ, বিয়ে তা'হলে করবেই"—কান্তিকবাবু হাসলেন—"তুমি যে দেখছি এ যুগের ভীষ্ম হে, সে বিয়ে না করার জন্য প্রতিজ্ঞা করেছিল, আর তুমি—"

—"সে আপনি যাই বলুন আর হাসুন, আমার কথার নড়চড় হবে না, বাবা-জেঠামশাই আমাকে তাড়িয়ে দিলেও আমি পেছু পা হব না।"—শান্তনুর জবাব শুনে কান্তিকবাবু একটু সামনে ঝুঁকে তার কাঁধে দুটো চাপড় দিয়ে বললেন—"জিতা রহো, ব্রাদার, ছেলে যা একখানা তৈরী হয়েছ, বংশের নাম রাখতে পারবে, বাপ-জেঠার মুখ উজ্জ্বল করবে।"

শান্তনু হেসে ফেললো—"আপনি সব সময়ই ঠাট্টা করেন, একটা কথাও সিরিয়াসলি নিলেন না।"

কান্তিকবাবু জবাব—"আমি সব কথাই সিরিয়াসলি নিয়েছি, তবে তোমার ওই পড়া ছেড়ে দেয়ার ইচ্ছেটা আমার ভাল লাগল না, যারা ডাক্তারি পড়তে পড়তে মাঝপথে ছেড়ে দেয়, তারা না হয় ডাক্তার, না হয় কম্পাউণ্ডার।"

—"কিন্তু আমার পক্ষে বিয়ের পর পড়াশোনা চালানো সম্ভব কি করে?"

—"তোমার তো আর মোটে এক বছর বাকি, এই একটা বছর সবুর কর না, এখুনি বিয়ে করতে বসছে কে, বাপীও আই. এ. পড়ছে, পড়ুক।"

—"আমার আপত্তি ছিল না, কিন্তু ওর বাবা-মা যারা যেরকম তোড়জোড় করে সম্বন্ধ খুঁজতে লেগেছে।"

কান্তিকবাবু একটু সময় ভাবলেন, শেষে ধীরে ধীরে বললেন—"শুধু তোড় জোড় করলেই হয় না, আজকালকার দিনে একটা মেয়ে বিয়ে দেওয়া অত সোজা কথা নয়। আচ্ছা তুমি সমস্ত ব্যাপারটা আমার উপর ছেড়ে দাও না, আমি ওদের সঙ্গে একটু আলাপ করে দেখি, শান্তি, সুরেশ দু'জনের সঙ্গেই কথা বলব। তুমি তাড়াতাড়ি কিছু করতে যেও না, একটা বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে।"—"শান্তিদা'র কাছে আগে কিছু বলবেন না"—শান্তনু সাবধান করে দিল "বরং ওর মেজদা'কে বলতে পারেন, কিন্তু একটু গুছিয়ে বলতে হবে।" কান্তিক দত্ত একটু হাসলেন—"ওর বাবা-মা, ওর মেজদা', এখন থেকেই বেশ ইনি উনি চালাচ্ছ দেখি।"

জবাবে শান্তনু শুধু হাসল। একটু সময় চুপ থেকে কান্তিকবাবু আবার বললেন—"আমার উপর সব ভার ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিত থাকতে পারো, আমি যখন বলবো, সব দিক ভেবেই বলবো।"

শান্তনু একটু লজ্জার হাসি হাসল, তারপর কোনদিন যা করে না তাই করল, চট করে জামাইবাবুর পায়ের ধুলো নিল—"তা' হলে তো আমি বেঁচে যাই। এই জন্যই চেনা-শোনা লোকের কাছে আপনার এত সুখ্যাতি শুনি।"

—"থাক্ থাক্ অত ভক্তি ভাল নয়, এরপর সুখ্যাতি আর কেউ করবে না, তোমার জন্য পুলিশ কেসে পড়ব, আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি। ভালো কথা, বাণীর বয়স হ'ল কত জানো, সেদিনের পুচ্‌কে মেয়ে প্রেম করে বেড়াচ্ছে, ভাবলেও হাসি পায়, তুমিই মেয়েটাকে বখালে।"

শান্তনু হাতের আঙুল মট্ মট্ করে বললো—"তা যা খুশি বলুন, কিন্তু ওর বয়সটাতো ঠিক জানি না, বোধহয় আঠারো চলছে, পুরো হয়নি।"

—"বয়সটা ভালো করে জেনে নিও, শেষ কালে খবরের-কাগজে আইন-আদালতের পাতায় ছাপা হবে নাবালিকা হরণের দায়ে অভিযুক্ত, কেলেঙ্কারীর আর কিছু বাকি থাকবে না।"

কার্তিক বসু আবার খোলা গলায় হো-হো করে হেসে উঠ্‌লেন, শান্তনুও হাসল। —"এত হাসি কিসের"—পেছনের দরজা ঠেলে মমতাদি উঁকি দিলেন—"ওরা, তনু, কখন এলি, আমি ভাই ভাব্‌ছি, দরজা বন্ধ করে এত গুজ্‌গুজ্‌ ফুস্‌ফুস কার সঙ্গে, আবার সেই ভোটাসুটির দল এলো নাকি, তা' হলেতো এতক্ষণে দশবার চায়ের ফরমাস হয়ে যে তো, তা তুই এত ভোরে এলি কেন রে, খবর সব ভালতো, বাড়ী থেকে চিঠিপত্তর এসেছে নাকি?"

—"না, না সে সব কিছু নয়, জামাইবাবুর সঙ্গে আমার একটু দরকার ছিল।—"শান্তনু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। কার্তিকবাবু বললেন "তোমার ভাই এর একটা গোপনীয় কথা শুনছিলাম"—

শান্তনু চোখ টিপে বারণ করল। মমতাদি কিন্তু সে কথায় কান দিয়েও গেলেন না, নিজের মৌকেই বল্‌লেন—"ওসব কথা-টথা এখন থাক্‌ তুই ভেতরে আয় দিকিনি, দু'খানা পরম পরম লুচি ভেজে দিই, এখানে চান-টান করে একেবারে ভাত খেয়ে যাবি কিন্তু, টিকলু, অ টিকলু, দেখে যা কে এসেছে।—"মেয়েকে ডাকতে ডাকতে ভেতরে চলে গেলেন। শান্তনু পেছনে যেতে যেতে জামাইবাবুর দিকে তাকিয়ে করুণ-মুখে একবার হাত জোড় করল, তারপর তাড়াতাড়ি পর্দা ঠেলে ওপাশে চলে গেল।

[কুড়ি]

সারাদিনের আকাশ পাড়ি দিয়ে শেষ দুপুরের সূর্য এখন পশ্চিমে এসেছে। রোজ এই সময় দক্ষিণ-মুখী জানালাটার কাছে এসে একবার দাঁড়ায় অনুরাধা, কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। রোজ এই সময় এই জানালার কাছে এসে দাঁড়ালে কেন যেন মনে পড়ে যায় বাপের বাড়ীর কথা। বাপের বাড়ীর গাঁয়ের নাম অভয়নীল।

মা বেঁচে নেই, বুড়ো বাপ, দাদা বৌদি আর তাদের ছেলে মেয়েরা এখনো রয়েছে সেখানে। শান্তিময় বলেছিল, এদিকে কিছু সুবিধে করতে পারলেই তাদের সবাইকে নিয়ে আসবে। কিন্তু কই করেকটা বছর হয়ে গেল, সুবিধে আর হ'ল কোথায়। পাশপোর্ট চালু হবার কিছু আগে রায়-মশাই এলেন!

তারপর পাশপোর্ট চালু হ'ল, দেবানী পাশ করল, কলেজে ভর্তি হ'ল। তারপর দেখ্‌তে দেখ্‌তে আরো একবছর ঘুরে এল। কোনদিকেই সুবিধে কিছু হ'ল না।

শান্তিময়, সুরেশ্বর একই নিয়মে চাকরী বজায় রেখে সংসার টেনে চলেছে। দু'জনের আয়ে ভাল ভাবে চলে না, দেশ থেকে আগে মাঝে মাঝে যে সামান্য টাকা আসতো তাও ধীরে ধীরে বন্ধ হয়েছে। দেবানীর বিয়ের কথা চলছিল দু'একজায়গায়, টাকার জন্য আটকে আছে।

রায়-মশাই ছেলেদের বলেছিলেন—"হয় তোরা কেউ যা, না হয় আমি একবার গিয়ে জায়গা-জমির, বাড়ী-ঘরের যা হোক একটা বন্দোবস্ত করে কিছু টাকা আদায় উশুল করে নিয়ে আসি, তারপর তোরা বাকীর, বিয়ের ব্যবস্থা কর।"

সেই কথাই স্থির হয়েছিল। কিন্তু সব আশা-ভরসা নষ্ট হ'ল ভুবন চাটুয্যের শেষ চিঠিতে। মাস দেড়েক আগে তিনি চিঠি লিখে জানালেন—"জমিদারী বিলোপ আইন পাশ হয়েছে। সরকার বাহাদুরের লোক এসে জমিদারী দখল নিয়েছে। মহালে মহালে কাছারী বাড়ীগুলি তালাবন্ধ করে দিয়েছে। এবার থেকে তারাই কাজকর্ম চালাবে, আদায় উশুল করবে, খাজনার টাকা সব সরকারের ঘরে জমা হবে। এমন কি নীলমাধবের মন্দিরও তালাবন্ধ করে গেছে। অনেক হাজার টাকার সোনারূপোর জিনিষ পত্তর রয়েছে, কেউ যদি লুটে পুটে নেয়। বোধহয় মতিশিক্ষা আর হরনাথ ডাক্তারের

কারসাজিতেই এই ব্যবস্থা হয়েছে। চিঠির শেষ কয়েক লাইনে আর একটা ছোট খবর ছিল—কয়েকদিন আগে পাগল প্রভুনাথ গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। তার দেশে কয়েকবার চিঠি দেয়া হয়েছিল, কিন্তু কেউ নিতে আসেনি, কোন খবরও দেয়নি। পুলিশের লোক এসে লাশ নিয়ে গেছে। শ্রীমন্ত ঠাকুর, যদুনা-ঝি, কালিচরণ, আসরাফ আলি—সবাইকে ডেকে ডেকে জেরা করেছে, কি সব লিখে নিয়েছে, সবাই ভয়ে অস্থির। ভুবন চাটুয্যেকে থানা অবধি যেতে হয়েছিল, একটা জবানবন্দীর মত দিতে হয়েছে। এদিকে সরকার মশাইর অবস্থাও খুব ভাল নয়, দিন-দিনই খারাপের দিকে যাচ্ছে। চাটুয্যে মশাই দারুণ দুশ্চিন্তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন, কি করবেন, কি করা উচিত, কিছুই ভেবে পাচ্ছেন না। দীর্ঘ চিঠি, সমস্তটা পড়ে শুনিয়েছিল শান্তিশ্বর। রায়-মশাই তক্তাপোষের ওপর সোজা হয়ে বসেছিলেন, চোখ-মুখ লাল, মাঝে মাঝে উত্তেজনায় কাঁপছিলেন। সবটা শোনার পর ছট্ ফট্ করে অস্থির ভাবে উঠে দাঁড়ালেন, তাড়াতাড়ি খড়ম পায়ে দিয়ে কোথায় যেন ছুটে যেতে চাইলেন, কিন্তু দরজার কাছে হঠাৎ হোচ্ট খেয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। দরজার নিচু চৌকাঠ মুহূর্তের মধ্যে চোখের সামনে দেয়াল হয়ে দাঁড়াল। দেবানী ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিল। চীৎকার শুনে অনুরাধা ছুটে এল, রায়-গিন্নী এলেন। ঘরের বিকেলের জলখাবারের কাছে বসেছিল, তাড়াতাড়ি উঠে এল। রায়-মশাই তখন অজ্ঞান হয়ে গেছেন। সবাই মিলে ধরাধরি করে বিছানায় এনে শোয়াল। শ্রীনাথ কবিরাজ, তারাচরণ বাবু, বলরাম ঘোষ, নিবারণ ভট্টাচার্য, ব্যারাক বাড়ীর এঘর ওঘর থেকে অনেকেই ছুটে এসেছিল।

পুরো একদিন পরে রায়-মশাইর জ্ঞান ফিরে এল। কিন্তু বিছানা ছেড়ে ওঠার ক্ষমতা আর রইল না, ডান-পা অসাড়, ডান হাতখানিও নাড়তে কষ্ট হয়। চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে অর্থহীন, কথা বলেন জড়িয়ে জড়িয়ে অস্পষ্ট, অসংলগ্ন।

ডাক্তার কবিরাজ সবাই এক কথায় রায় দিল—পক্ষাঘাত। শরীর মনে হঠাৎ আঘাত পেয়ে পক্ষাঘাত হয়েছে, এ জীবনে আর ভাল হবার আশা নেই।

তবে ওষুধ পত্তর সেবা-শুশ্রূষায় কিছুটা সুস্থ হতে পারেন।

এই পেছনের জলের মত টাকা খরচ হচ্ছে, অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয়নি। তবে আগের চেয়ে একটু ভাল বলতে হবে। প্রথম কয়েকদিনের মত আর চেনা মানুষ চিনতে ভুল করেন না। ডাকলে সাড়া দেন, চেঁচামেচি হলে শুনতে পান।

মাঝে মাঝে অসহায়ের মত দুর্বল গলায় দেবানী, অনুরাধা, কিম্বা বিপিনকে ডাকেন। অতবড় বলিষ্ঠ মানুষটা কেমন কুকড়ে ছোট হয়ে গেছেন, গৌরবর্ণ দেহশ্রী, কেমন রক্তহীন ফ্যাকাসে মনে হয়। অনুরাধা ভাবে, ভেবে আর কূল পায় না। শেষ-দুপুরে ভাত-ঘুম ভাঙার পর, এই জানালার কাছে দাঁড়ালে রাজ্যের ভাবনা এসে ভীড় করে। আসছে শ্রাবণে তার বিয়ের এগারো বছর হবে।

এই এগারো বছরে তার চোখের সামনেই অতবড় সমৃদ্ধ সংসার কেমন ছন্নছাড়া হয়ে গেল।—"বৌমা, কলে জল এল বুঝি—নাতনীকে কোলে নিয়ে রায়-গিন্নী এ ঘরে এলেন —"এই নাও, তোমার মেয়ে বাপু, কি দস্যি মেয়ে হয়েছে, আর কি বুদ্ধি সব বুঝতে পারে।'

খুকি এখন-দু'বছরের মেয়ে, ঝাঁপিয়ে মায়ের কোলে এল।

—"ভারী দুষ্টু মেয়ে হয়েছ তুমি।"—গাল টিপে আদর করে অনুরাধা।

তারপর আবার মেয়ে কোলে জানালার কাছে দাঁড়াল। সূর্য আরো নিচে নেমেছে, দূরে রেললাইনের ওধারে উঁচু অশ্বত্থ গাছের ঘন সবুজ পাতা দুলছে।

দেশের বাড়ীতে এই সময় একবার ছাদে যেত অনুরাধা। সঙ্গে থাকত দু'জন ঝি, বাসন্তী আর অনুনা। নানারকমের

মশলা, আচার, আমসত্ত্ব আর রোদে দেয়া শুকনো কাপড় তুলে আনতে হত। ছাদের আলসের দাঁড়ালে চোখে পড়তো একদিকে পানসীতলার পুকুর, বাজারের দোকানপাট, আরেকদিকে অনেকদূরে নারকেল সুপুরীর বন পেরিয়ে পাওব নদীর অস্পষ্ট জলরেখা। নদীর জল ঠিক দেখা যেত না, কিন্তু স্টিমারের ধোঁয়া, কালো চিমনী কিম্বা ধান বোঝাই মহাজনী নৌকোর শাদা পাল পরিষ্কার নজরে আসত।

বাসন্তী এখন কোথায় আছে কে জানে, যমুনা নাকি এখনো রায়-বাড়ীতেই আছে, মেজ ঠাকুরপো যদি তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসত, তা'হলে এখানে এই ঠিকে কাজের মানুষ পদ্ম-ঝির মুখ ঝামটা শুনতে হত না। একদিন একটু কাজ বেশি হলেই খালি গজ গজ করবে। ঠিকে ঝি দিয়ে এতবড় সংসারের কাজ চলে নাকি কখনো।

রায়-বাড়ীর পুরনো মানুষজনের মধ্যে আজকাল প্রভুনাথের কথাই অনেক সময় মনে পড়ে।

বিয়ের পর যতদিন মা বেঁচেছিলেন, বছরে একবার বাপের বাড়ী যেতো অনুরাধা। কিন্তু সাতদিন যেতে না যেতেই হলুদ রঙের পাগড়ী মাথায়, হাতে পাকা বাঁশের লাঠি প্রভুনাথ গিয়ে হাজির হত।

ভীষণ রেগে যেত অনুরাধা, কপালের ওপর ঘোমটা টেনে একটু চাপা গলায় ধমকাত—"তুমি এসেছ কেন, কে আসতে বলেছে, আমি এখন যাব না, মোটে সাতদিন হ'ল এসেছি, এখুনি যাব কেন।"

বাইরের বসবার ঘরে নড়বড়ে বেঞ্চীতে বসে পাগড়ী ঘুরিয়ে হাওয়া খেতে খেতে প্রভুনাথ হাসত—"হামার কি কসুর আছে, বহনা, হামার উপর গোসা হইলেন কেনো, কত্তাবাবু বোল্‌লেন পরভুনাথ এই চিঠ্‌ঠি বহনার পিত্তাজীকো পাস ভেজ দো, হামি উনকো চিঠ্‌ঠি লিয়ে এলাম।"

ঝাঁঝালো সুরে জবাব দিত অনুরাধা—"হ্যাঁ, চিঠি নিয়ে এলেই হ'ল কিনা, কিছুতে যাব না আমি, আরো একমাস থাকব এখানে।"

ঘুন্ ঘুন্ পা ফেলে ভেতরে চলে যেত।

দুপুরে দু'বাটি ছোলার ডাল দিয়ে তেরখানা আটার রুটি আর আধসের দুধ খেতো প্রভুনাথ। অনুরাধার-মা পাশে বসে দিতেন।

দু'বেলায় ছাব্বিশ খানা মোটা মোটা আটার রুটি, এক সের দুধ।

তোমার পেট কোথায়, বাবা! তারপর মেয়েকে ডেকে বলতেন—"হ্যারে, ছায়া তোর শ্বশুর এরকম লোক আর ক'জন রেখেছে, বারোমাস তিরিশদিন এই খোরাকি, তার উপর জামা কাপড়, মাসে মাসে নগদ মাইনে, তিনি জমিদার, ওঁর না হয় পোষাতে পারে, কিন্তু আমাদের তো পোষাবে না, ওকে তাড়াতাড়ি বিদেয় করে দে, করে যেতে চাস্ ওর হাতে চিঠি লিখে জানিয়ে দে।"

মায়ের চোখ মুখের সেই চেহারা মনে হলে আজও হাসি পায়।

এতদিন পরে সেই প্রভুনাথ সত্যি সত্যিই বিদেয় হ'ল।

রায়-বাড়ীর পুরনো মানুষ অনেকেই দেশভাগের পর নানা অজুহাতে ছেড়ে গেছে, কিন্তু কিসের আশায় পাগল হ'ল প্রভুনাথ, কে জানে কোন্ যন্ত্রনায় বিদেয় নেবার এমন সোজা রাস্তাটা বেছে নিল সে।

এখানে পানসীতলার পুকুর নেই, পাওব নদী নেই, আছে ওই রেল লাইন আর রেল লাইনের ওধারে ছুটো কারখানার চিমনী, যেখান থেকে মাঝে মাঝে ধোঁয়া উঠে পশ্চিমের আকাশটা ধোঁয়াটে করে রাখে।

শৈলেশ্বর বলেছিল, ও ছুটো নাকি ধানকলের চিমনী। শৈল ঠাকুরপো কিছুই করলো না, না শিখল লেখাপড়া, না হল চাকরী বাকরী, বছরের পর বছর যাচ্ছে বয়স বেড়ে যাচ্ছে, এখন কি আর পড়াশোনার মন বসে।

এই নিয়ে সংসারে এক অশান্তি। শান্তিস্বর মাঝে মাঝে রেগে গিয়ে বলে, ঘাড় ধরে তাড়িয়ে দেব, দূর করে দেব বাড়ি থেকে।

শৈলেশও পারত পক্ষে বড়দা' মেজদা'র ধার ঘেঁষে না। সারাদিন কোথায় থাকে কি করে কিছুই জানার উপায় নেই, শুধু দু'বেলা দুটো খাবার সঙ্গে সম্পর্ক।

বরং দেবানীই লেখাপড়ায় ভাল হয়েছে। ম্যাট্রিকটা যা হোক পাশ করল, কলেজেও একবছর হ'ল। এত অসুবিধার মধ্যেও গান বাজনার চর্চাটা বজায় রেখেছে। এখন রায়-কর্তাইর কাছে বসে সেতার বাজাচ্ছে দেবানী। সুরটা চেনে অনুরাধা, প্রায়ই দেবানীকে বাজাতে শোনে, এটা নাকি দুপুরের সুর, সুন্দর নাম—মধুমাধবী সারঙ্। ভোর বেলা কলেজে যায় দেবানী, কলেজ থেকে ফিরে ঘরের কাজকর্ম কিছু করে, তারপর দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পাট চুকলে বাপের কাছে গিয়ে বসে, কখনোই ছাওয়া দেয়, কখনো পায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়, তারপর রায়-কর্তাই নিজেই একসময় বলেন—"এখন একটু বাজাও না মা, কোন কাজ নেই ত এখন।"

দেবানী সেতারটা এনে খাটের একপাশে বসে বাজায়। রায়-কর্তাই চোখ বুজে তন্ময় হয়ে শোনেন, কিছু সময় পরে চোখের দু'পাশ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে নামে। দেবানী হঠাৎ বাজনা বন্ধ করে বলে—"তুমি আবার কাঁদছ বাবা, আমি তাহলে বাজাব না, রোজ রোজ বাজনা শুনে"—

আঁচল দিয়ে চোখের দু'পাশ মুছিয়ে দেয়। সর্বেশ্বর রায় কোন জবাব দেন না, মাথার পাশের খোলা জানালাটা দিয়ে ফাঁকা চোখে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকেন। দেবানী আজকাল আরো ভাল বাজায়। এ বছর আবার সরস্বতী পূজার সময় সেই সমস্যা। রায়-কর্তাই আর নিজে বাজাতে যান নি, পই পই করে বলে দিয়েছিলেন—"ভালো তবলচী না পেলে বানীকে তোমাদের জলসায় নিয়ে যেও না।" শান্তিস্বর খুঁজে খুঁজে এত নাম করা তবলাচি এনেছিলো, চমৎকার বাজিয়েছিল সে, রায়-কর্তাইও খুশি হয়েছিলেন।

পদ্ম-ঝির ডাক শুনে ভাবনা ভেঙে গেল—"কপাট ভেজিয়ে দাও গো বা।"

অনুরাধা তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে এসে বারান্দা আর রান্নাঘরের দিকে কপাট দুটো ভেজিয়ে দিল। পদ্ম-ঝি উনুনে আঁচ দিয়েছে, কপাট বন্ধ না রাখলে উনুনে ধরানো ধোঁয়া সব ঘরে এসে ঢুকবে।

সন্তু এসে ঘরে ঢুকল, স্কুল থেকে ফিরেছে। কাঁধে ঝোলানো বইএর ব্যাগটা ধপাস করে ঠাকুমার খাটের উপর ফেলে, প্রথম কথা বললো—"মা খিদে পেয়েছে।"—"আগে জামা-জুতো খোল, হাত মুখ ধুয়ে নে দাঁড়া আমি দিচ্ছি।" —অনুরাধা খুকিকে খাওড়ীর কাছে রেখে সন্তুর জামা-কাপড় ছাড়াতে গেল।

রায়-গিন্নী বিকেলের জল-খাবার আটার রুটি বেলছিলেন, পদ্ম-ঝিকে ডেকে বললেন—"পদ্ম, উনুনে আঁচ উঠ্‌লে খুকু সন্তুর দুধ গরম কর।"

দেবানী এখনো সেতার বাজাচ্ছে, কিন্তু আর বেশিক্ষণ নয়। বিকেলের সংসার শুরু হ'ল। এখন রাত দশটা অবধি এই চল্‌বে। একটু পরে সুরেশ্বর ফিরবে অফিস থেকে। কোনদিন এত আগে আসে না। সন্তু তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে দাঁড়াল। সুরেশ্বর শুকনো মুখে হাসল—"ঐ যাঃ তোর বিস্কুট তো আনতে ভুলে গেছি।"

—"আজ এত আগে এলে যে ঠাকুর-পো?"—অনুরাধার কথার জবাবে সুরেশ্বর শুকনো হাসিমুখেই বল্‌লে—"রেশন অফিসতো উঠে যাচ্ছে, আমরাও আজ নোটিশ পেলাম, আসছে মাস থেকে চাকরি বোধহয় খতম।"

সুরেশের হাসি আর কথা কেমন যেন অদ্ভুত স্বপ্নের মতো মনে হয়। উনুন ধরানো ধোঁয়া একটুও ঘরে আসেনি, কিন্তু তবুও যেন দম নিতে কষ্ট হয়।

রাজ-গিন্নী খুকিকে কোলে শুইয়ে ঝিনুকে করে দুধ খাওয়াচ্ছিলেন, হাতের ঝিনুক হাতেই থাকল, কেমন নির্বোধের মত তাকিয়ে রইলেন।

দুই ছেলের আগে কোনরকমে টেনেটুনে টিপটিপ করে সংসার চলে, একটা বাঁধা রোজগার হঠাৎ যদি বন্ধ হয়ে যায়, তা'হলে—

অনুরাধা আবার জিজ্ঞেস করল—"তোমাদের আগে কিছু বলেনি, ঠাকুরপো।"—"উড়োখবর শুনেছিলাম অনেকদিন আগেই, তবে তোমাদের আর বলিনি শুধু শুধু"—সুরেশ্বর একটু থেমে বাপের ঘরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল—"বাবাকে এখন এসব কথা কিছু বলতে যেও না।"

রাজ-মশাইর ঘরে তখনো সেতারের সুর। রাজ-গিন্নী হঠাৎ ভুরু কুঁচ্‌কে বিরক্তি চেপে বললেন—"অনেকক্ষণতো হয়ে গেল, বাবী এবার বাজনাটা বন্ধ করুক না।"

সুরেশ্বর ঘরে ঢুকতেই সেতার বন্ধ হ'ল। রাজ-মশাই রোজের মত চোখ বুজে তন্ময় হয়েছিলেন। চোখ খুলে বললেন—"হঠাৎ ছেড়ে দিলে কেন বাবা?"—"মেজদা এসেছে"—সেতারটা নামিয়ে রেখে দেবানী আঙুল থেকে মেজরাপ খুলে ফেলে।

ঘরের আরেকপাশে সুরেশের তক্তপোষ, বিছানা, একটা ছোট টেবিল, দেয়ালের গায়ে ব্রাকেটে তার জামা-কাপড়। সেদিকে একবার মুখ ফেরাবার চেষ্টা করেন রাজ-মশাই। তারপর যেন অসুখের মতই আবার বলেন—'বিকেল হয়ে এল, এবার একখানা মুলতান বাজালে হত না।'

দেবানী তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। কাঁচাপাকা চুলের ভেতর আঙুল ডুবিয়ে আদুতো ছেলে বলে—"এখন থাক বাবা, মেজদা' এসেছে, বড়দা'ও একটু পরে আসবে। তোমার শুধু খাবার সময় হ'ল। আমারো অনেক কাজ রয়েছে।"

রাজ-মশাই তখনো অবুঝ ছোট ছেলের মত তাকিয়ে থাকেন। কিছুইতো নেই, জীবনের সব যেন হারিয়ে গেছে, সব কিছু ফুরিয়ে গেছে, আছে শুধু এই গান শোনার আনন্দ-টুকু, সেতারের বিচিত্র সুর শোনার আগ্রহ। দেহ পঙ্গু হ'লেও প্রতিশক্তি পঙ্গু হয়নি। এজন্য ইষ্টদেবতা শ্যামসুন্দরের কাছে সর্বেশ্বর রায় মনে মনে কৃতজ্ঞ, কৃতজ্ঞ কাল-নিয়ন্তা মহাকালের-ঘরের কাছে। বন্ধু আসুক, ওঁর পাবেন না তিনি সহজভাবেই মেনে নেবেন তাকে। শুধু কামনা করেন চেতনা যেন লুপ্ত না হয়। দৃষ্টি, শ্রুতি আর অনুভূতি যেন প্রখর থাকে।

অনুরাধা ওষুধ নিয়ে এলো। রাজ-মশাইর মুখে ঢেলে দিল। তারপর একটু জল খেয়ে আবার চোখ বুজলেন তিনি। দেবানী বৌদির সঙ্গে হাতে হাতে চা করে দেয়, খাবার গুছিয়ে আনে: সুরেশ্বর মুখ বুজেই চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছিল। অন্যদিন এরকম হয় না। এ সময়টা ঘরের মানুষদের সঙ্গে একটু গল্প গুজব করে। আজ কি যেন হয়েছে। দেবানী ব্যাপারটা ঠিক আঁচ করতে পারে না। মা-বৌদিও চুপ করে আছেন! অনুরাধা একবার বলল—"আজ না তোমার কোথায় যাবার কথা আছে ঠাকুরঝি।"

দেবানী ফিস্ ফিস্ করে শুধোয়—"কি হয়েছে বৌদি? মেজদা' অত গম্ভীর কেন?"

—"বলব'খন পরে, এখন গা ধুয়ে এস, আমি চুলটা বেঁধে দিই।"—বৌদির ঠাণ্ডা জবাব আরো অবাক করে দিল।

দেবানীকে যেতে হবে গানের জলসায়। শান্তিনিকেতনের পরিচিত কোন এক নাম করা সঙ্ঘের বর্ষামঙ্গল উৎসব। সেখানে সেতার বাজাবে সে।

নামজাদা গাইয়ে-বাজিয়ে অনেকেই আসবেন। বিরাট আয়োজন। এখন থেকেই কেমন ভয়-ভয় করছে দেবানীর। —"পারবো'ত বৌদি?"—সামনে চোখ রেখেই জিজ্ঞেস করলো সে।

পেছনে ঝুলে খোঁপাটা এঁটে দিতে দিতে অনুরাধা উৎসাহ দেয়—"পারবে না কেন, তুমি তো আজকাল বেশ বাজাও,

এরপর কত ভাল ভাল জায়গায় তাকবে দেখো, রেডিওতেও বাজাবে!"

দেবানী খুব খুশি। এসব কথা শুনলে মনেও জোর আসে।

প্রথম দেখা সেই আট বছরের বাচ্চা এখন আঠারো বছরের মেয়ে। অনুরাধার চোখের সামনেই এত বড়টি হ'ল। ভাবতেও ভাল লাগে। সেই একমাথা কোঁকড়া চুল ছোট ফ্রক পড়া দেবানী। কিন্তু এই ভাললাগার মাধুর্যটুকু কি সব সময় বজায় থাকে, না বজায় রাখতে পারে অনুরাধা। অভাবের উত্তাপে মন যখন পুড়ে যায়, তখন এই ভাল লাগার স্মৃতিটুকু আর থাকে না। নিজের অজান্তেই মুখ থেকে অনেক কটু কথা বেরিয়ে আসে।

এই তো সেদিন বলেছিল—"দিনরাত সেতারটা নিয়ে আর পিড়িং পিড়িং করো না ঠাকুরঝি, তোমার আর কি ভর ভাবনা কিছু নেই, সেজে গুজে গায়ে হুঁ দিয়ে বেড়াও।" আর একদিন দুটো টাকা চেয়েছিল দেবানী, বোধ হয় স্কুলের মেয়েদের সঙ্গে সিনেমায় যাবে। আগের দিন শান্তিস্বরের কাছে বকুনি খেয়ে মনটা ছিল বিষিয়ে। তাই গায়ের ঝালটা মনদের উপর মিটিয়ে নিল—"টাকা আর কোথায়, বৌদির কাছে টাকার গাছ আছে না, বেহায়ার মত যখন-তখন চাইলেই হ'ল।" মনদের অবাক চোখের উপর কথার দুলো ছুড়ে দিয়েছিল অনুরাধা। টপ্‌টপ করে জল পড়েছিল, অনেকক্ষণ কাঁদতে হয়েছিল দেবানীকে, কেন কেঁদেছিল অনুরাধা আগের দিন রাত্তিরে শান্তিস্বরের কাছে বকুনি খেয়ে।

সিঁড়ির মুখে জুতোর শব্দ। শান্তিস্বর এলো। কাঁটায় কাঁটায় পৌনে দু'টো। ঘড়ি-ধরা মানুষ। হিসেবের এতটুকু এদিক-ওদিক হয় না। পাঁচটায় অফিস ছুটি, পথে আসতে লাগতো পঁয়তাল্লিশ মিনিট। অভাবের সংসারে শান্তিস্বরের নিয়মে সব রকম বাজে খরচা বন্ধ। এমন কি সময়েরও বাজে খরচা করার উপায় নেই।

অনুরাধা মাথার কাপড়টা টেনে দিলে। মেয়েকে কোলে নিয়ে হাত-পাখা নেড়ে হাওয়া খাচ্ছিল শান্তিস্বর। মেজভাই-এর কথা শুনে গুম হয়ে গেল।

—"তোদের কি আর কোথাও কাজ দেবে না, এতগুলো মানুষকে এভাবে এক কথায় ছাড়িয়ে দেবে।"

—"কলকাতার বাইরে কোথাও পাঠাবে, কিম্বা ষ্টেটবাসে চোকাবে, কতরকমই তো শুনছি, এখন পর্যন্ত কিছুই ঠিক নেই।" সুরেশ্বর কেমন ঠাণ্ডা গলায় ধীরে ধীরে জবাব দিল।

ঘরের বাতাসটা যেন ভারী হয়ে যায়। শুধু রায়-গিন্নী ইনিয়ে-বিনিয়ে বলছেন—"কি যে হবে, বাপু কিছুই বুঝতে পারছি না, ঘরের তো এই অবস্থা এখন যদি চাকরীটা যায়"—

সুরেশ্বর আবার বললো—"আমি ভাবছি কি দাদা, পাকিস্তানেই চলে যাই, এখানে এই অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে না থেকে, ওখানে গেলে যা হোক কিছু একটা করতে পারব বোধ হয়, পটুয়াখালির কাছারী-বাড়ীটা ভাড়া দিলে কিছু টাকা পাওয়া যেতে পারে, তারপর গাঁয়ের স্কুলটা এখনো যখন টিকে আছে, ওটাকে ভালভাবে চালাতে পারলেও মন্দ হবে না।"

দু'ভাই কিছুক্ষণ পরামর্শ হ'ল। বিভিন্ন মহালের কাছারী বাড়ীগুলির তিন খুঁটি বেচলে কিছু টাকা হবে। পটুয়াখালি শহরের কাছারী বাড়ীটা দোতলা দালান। সামনে অনেক-খানি জায়গা, ছোট ছোট কয়েকটা একতলা দালানে কয়েক-ঘর ভাড়াটে আছে। তাদের ভাড়ার টাকাটা নিয়মিত আদায় করে পাঠাতে পারলেও কিছু হবে।

শেষে শান্তিস্বর বললো—"যা ভেবেছিস মন্দ নয়, তুই যদি মাসে মাসে অন্ততঃ একশ টাকা পাঠাতে পারিস, তাহলে আমি এখানে একরকম চালিয়ে নিতে পারব, আর দেখিস ক্ষতিপূরণের টাকা যদি কিছু পাওয়া যায়, জমি-জমা নিয়ে নিল কিছু টাকা কি আর দেবে না, এখানকার গবরমেণ্ট তো দিচ্ছে।" কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অনুরাধাকে উদ্দেশ

করে শান্তিশ্বর আবার বললো—"কই বাঈজীকে একটু সাজিয়ে-গুছিয়ে দাও, আর তো সময় নেই, আটটার মধ্যে সেখানে পৌঁছনো দরকার।।"

রায়-গিন্নী কথাটা আগেই শুনেছিলেন বউ এর মুখে। এবার ছেলের কাছাকাছি এসে বললেন- "তুই এখন বাঈজীকে নিয়ে জলসায় যাবি নাকি?"

—"হ্যাঁ, কেন বলোত?" শান্তিশ্বর সোজাসুজি মায়ের মুখের দিকে তাকাল। এরকম একটা প্রশ্নই এতক্ষণ আশঙ্কা করছিল সে।

—"আমার তো বাপু ভাল মনে হচ্ছে না, অতবড় ছেলে, যখন-তখন যেখানে সেখানে হুটহাট নিয়ে যাওয়া, কর্তা শুনলে অনর্থ হবে।"

—"কেন বাবাকে না জানালেই হ'ল, আমি তাদের কথা দিয়ে এসেছি, এখন তো আর না বললে হবে না, আর তা' ছাড়া"—শান্তিশ্বর গলা খাটো করে বললো—"বড় বড় আর্টিষ্টরা আসবেন, মেলা টাকা দেবে তাদের, বাঈজীকেও কিছু টাকা দেবে বলেছে।"

ভেবেছিলাম টাকার কথা শুনতে মা হয়তো নরম হবেন কিন্তু ফল হ'ল উল্টো। রায়-গিন্নী যেন ঝলক করে জ্বলে উঠলেন—"ছিঃ, ছিঃ, বলিস্ কি তুই, টাকা দেবে কি, রায়-বাড়ীর মেয়ে বাঈজীর মত টাকা নিয়ে সেতার বাজাবে, ছিঃ, ছিঃ, ভেবেছে তুই ওখানে নিয়ে যাসনি, এই বলে দিলাম।"

এক মুহূর্ত থমকে থেমে শান্তিশ্বরও হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে —"আমি নিয়ে যাবোই, ওসব রায়-বাড়ীর কথা-টথা ছেড়ে দাও, সুরেশের চাকরীর এই অবস্থা, এ সময় কি করে দুটো টাকা ঘরে আসবে সেদিকে ভাববে, তা নয় কথায় কথায় জমিদারী দেমাক দেখানো।"

তারপর একটু দম দিয়ে আবার বললো -"তোমার আদরেই তো ছেলেটা উচ্ছন্নে গেছে, পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে এখন ইষ্টবেঙ্গল-মোহনবাগান আর থিয়েটার-বায়স্কোপ করে বেড়াচ্ছে। আমিও বলে রাখছি, একজনের রোজগারের ওপর এরকম বসে বসে খাওয়া আর চলবে না। আমার রক্তজল করা পয়সাটা অত সস্তা নয়। রায়-গিন্নী যেন বিমূঢ় হয়ে গেলেন, মুখে আর কথা এল না।

ছেলের রোজগার, ছেলের সংসার। ছেলে আর ছেলের বউ-এর মুখাপেক্ষী তিনি এই নির্মম সত্য কথাটা এতদিন মনে মনে ছিল, মুখোমুখি এই প্রথম। আগে ছেলেমেয়ে, ছেলের বউকে যখন-তখন বকে দিতেন, অনেক সময় রাগ করে বলতেন—"চলে যাব পাকিস্তানে, শ্বশুরের ভিটে কামড়ে পড়ে থাকব, কারো কথার ধার-ধারিনা আমি।"

জমিদারী হাত-ছাড়া হওয়ায়, তাঁর সেই জোর যেন অর্ধেক কমে গিয়েছিল। বাকিটুকু নিঃশেষ হয়েছে রায়-মশাইয়ের পঙ্গুতার জন্য। অসুস্থ স্বামী তাঁকে আরো অসহায় করে দিয়েছে।

অনুরাধা অপ্রস্তুতের মত একপাশে দাঁড়িয়েছিল। শাশুড়ীর মুখে বাঈজীর কথা শুনে কেন যেন বিশ্রী লাগে। গঙ্গাবাঈ এর কথা মনে হ'ল। সেই বিয়ের বছর গঙ্গাবাঈ শেষবারের মত রায়-বাড়ী এসেছিল গানের মুজরো নিয়ে।

একগা গয়না আর লাল বেনারসী পরা প্রৌঢ়া বাঈজীর সেই ঝলমলে চেহারা আজো যেন চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে আছে। দুপুরবেলা মেয়েদের আসরে মধুর গলায় চমৎকার ভজন গেয়ে শুনিয়েছিল। অনুরাধা নতুন বউ। সন্ধ্যার পর নাচঘরের আসর সে দেখেনি, বাড়ীর বৌ-ঝিরা দেখতো না। তাই তাদের করমায়েসী গান দুপুরের আসরেই জমতো। শ্বশুরের ডাক শুনে চমকে উঠল, দুর্বল গলায় জড়িয়ে জড়িয়ে ডাকছেন তিনি—"বউমা, ও বউমা।"

একরকম ছুটেই পাশের ঘরে গেল অনুরাধা—"আমায় ডাকছেন বাবা।"

—"হাঁ অনেকক্ষণ ধরেই তো ডাকছি মা, শুনতে পাওনি তা শান্তি অমন চেঁচাচ্ছে কেন, কার সঙ্গে ঝগড়া করছে?"

এইটুকু বলতেই হাঁফিয়ে পড়েন রায়-মশাই একটু ইতি-উতি করে একটা মিথ্যে কথাই বলতে হ'ল—"আপনার মাতি দুধের বাটিটা উল্টে দিয়েছে কি না, তাই বকাবকি করছে।"

—"ও বকে আর কি হবে এখন, দাদুভাইকে কেউ যেন কিছু বলে না, তুমি বারণ করে দাও।"—রায়-মশাই নিশ্চিন্তে চোখ বোজেন। রোজ এই সময় কবিরাজী ওষুধটা খাবার পর একটু তন্দ্রা আসে। কিছুটা সময় আচ্ছন্নের মত ঘুমিয়ে থাকেন।

দেবানী লাজগোজ করে নিল। রায়-গিন্নী কোথায় যেন মুখ লুকোলেন। অনুরাধাই তাকে দাঁড়িয়ে শুছিয়ে দিল। লণ্ঠনের ম্লান আলোতেই দেবানীকে চমৎকার দেখাচ্ছিল। শান্তিস্বর যেন মনের অস্থিরতা চাপা দেবার জন্যই একটার পর একটা সিগারেট টেনে চলেছে। ওদিকে রায়-মশাইর ঘর থেকে কোন সাড়াশব্দ নেই। একপাশে সুরেশ্বর নিজের খাটে চুপ করে শুয়ে আছে। বাইরের আলো নিভে এসেছে, ঘরের ভিতর ক্রমশই অন্ধকার ঘন হয়ে আসে। অনুরাধা এতক্ষণে একবার মুখ খুলল—"মাকে কথাগুলো না শোনালেই পারতে।"

শান্তিস্বর স্থির চোখে কিছুক্ষণ বউএর দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর ঠাণ্ডা গলায় বেশ জোর দিয়েই বলে—"আমি তাদের কথা দিয়ে এসেছি, ওকে নিয়ে যেতেই হবে।"

একটু থেমে সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে আবার বলে—তোমরা কেউই ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছ না। আজ যদি বাবী ভালভাবে বাজিয়ে আসতে পারে, তা'হলে একদিনেই ওর বেশ নাম হবে। তখন দেখো কতলোক ওকে বাড়ী এসে ডেকে নিয়ে যাবে। ও একাই তখন সংসারের চেহারা ফিরিয়ে দেবে।" সিগারেটের শেষটা ঝাড়িতে ফেলে জুতোর চেপে নিভিয়ে দিতে দিতে যেন নিজের মনেই বলে—"বাজনার চর্চাটা রাখতে হবে, আরো ভাল বাজাতে হবে, একবার নাম হয়ে গেলে এ লাইনে প্রচুর পয়সা।"

প্রচুর পয়সা, প্রচুর সম্মান। সুনাম আর ঐশ্বর্য। বড়দা তো ঠিক কথাই বলে, কি হবে পুরনো রায়-বাড়ীর কথা ভেবে। দেবানীর বুকটা যেন দুলে ওঠে, আশা আর আশঙ্কায় দুর দুর করে। অনুরাধাও ঠিক ওই কথাই ভাবে। এই শহরে, শহরের জীবনে বাঁচতে হলে পয়সা চাই, সম্মান চাই। নতুন জীবনের নিক্ষে মর্যাদাবোধের মাপকাঠি বদলে গেছে, বদলে যাচ্ছে। এগারো বছর আগে প্রথম দেখা সেই পুরনো রায়-বাড়ী আজ অনেক দূরে, অনেক পেছনে।

দেবানী গিয়ে রায়-মশাইর ঘরে ঢুকল। কোথাও বেরোবার আগে বাপকে একবার বলে যায়। ডাক দিল—"বাবা, বাবা,"

রায়-মশাই নিঃসাড়ে ঘুমিয়েছিলেন। প্রথমে শুনতে পাননি। তারপর গায়ে হাত দিতেই ঘুম ভেঙে গেল। চমকে উঠে বললেন—"হাঁ, মা, এই যে উঠেছি আমি, ভোর হয়ে গেল নাকি।"

একটু হেসে জবাব দিল সে—"না, বাবা এই তো সবে সন্ধ্যে হ'ল। তুমি এক্ষুনি ঘুমিয়ে পড়েছিলে। আমি একটু বেরুচ্ছি, তাই তোমাকে বলতে এলাম।"

—"কোথায় যাবে মা?' – শ্রান্ত স্বরের প্রশ্ন শুনে দেবানী এপাশে একবার মুখ ফেরাল। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে শান্তিস্বর চোখ টিপে সাবধান করল। একটু ভেবে মুখ নিচু করে বললো সে—"পাশের ঘরের লতাদি, কমলাদি—ওরা সব সিনেমায় যাচ্ছে কিনা, তাই তাদের সঙ্গে"—

—"আচ্ছা যাও মা, বেশি রাত করো না কিন্তু" —সর্বেশ্বর রায় আবার চোখ বুজলেন। জানতে পারলেন না কিছুই, জানার কোন উপায় নেই তাঁর। অনুরাধার মনটা কেমন বিষণ্ণ হয়ে যায়। শ্বশুরের গায়ে চাদরটা ভাল করে টেনে দিল। কপালটা মুছিয়ে দিল আঁচল দিয়ে। তারপর

আবার দক্ষিণমুখী জানালাটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। মোড়ের পাশের দোকানটা অবধি সমস্ত রাস্তাটা বেশ চোখে পড়ে। শান্তিময় একটু আগে আগে হেঁটে চলেছে, পেছনে সেতারটা হাতে নিয়ে দেবানী। ফিকে সবুজ রঙের শাড়ি, খোঁপায় একটা ফুল গুজেছে, এতদূর থেকে এখন আর স্পষ্ট দেখা যায় না। সন্ধ্যা ঘোর হয়ে এলো। রাস্তায় আলো জ্বলছে, আকাশে দু'একটা তারা, জলজলে সন্ধ্যা তারাটা স্পষ্ট হয়ে আছে। এই সময় হয়তো অন্তরমনে উটচাজ বাড়ীর তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়েছে বৌদি। রায়-বাড়ীর দেউড়ীতে বোধহয় টিমটিমে একটা লণ্ঠন জ্বলছে আর এই সন্ধ্যা তারাটাই উঠেছে নীলসাগরের মন্দিরের চূড়োয়।

ক্রমশঃ

গোধূলি-লগ্ন

ছোট গল্প

প্রলয় সেন

ঘুমভাঙাডেই সরমা দেখলেন দক্ষিণের জানালা গলে একফালি রোদ পায়ের কাছটায় ঝিক ঝিক করছে। তিনি হাত দিয়ে গায়ে জড়ানো সুজনীটা একপাশে সরিয়ে দিলেন। পুবে, বড়রাস্তাটা শীতের পীতাভ রোদে নিঃঝুম। রাস্তার ওপাশের পাহাড়টা গুটিসুটি মেরে পড়ে রয়েছে ঘননীল আকাশের নিচে। অল্প অল্প বাতাসে ঘোড়ানিম গাছের পাতাগুলো সিরসির করছে। গাছটার ডালপালার মধ্য দিয়ে গীর্জার চূড়োটা দেখা যাচ্ছে।

ঢং ঢং করে দেওয়াল ঘড়িতে দুটো বাজল। সরমা সেদিকে চোখ ফেরালেন। ছুটির দিন, জন্ সারাটা সকাল একটানা খাটতে হয়েছে। লছমীকে সঙ্গে নিয়ে ঘরদোর পরিষ্কার করেছেন। খাট, টেবিল, চেয়ার, আলমারী ঝাড়-পোছ করা হয়েছে। তারপর গেছেন রান্না ঘরে। গাঁটো করে কোমরে কাপড় গুঁজে রান্না করেছেন কত কি। বারোটা নাগাৎ দুটো মুখে দিয়ে বিছানায় পা এলিয়ে দিলেন। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন খেয়াল নেই। সরমা শিথিল হাতে শাড়ির আঁচলটা বুকে তুলে নিলেন। পা দুটো ভাঁজ করে শরীরটা গুটোলেন। তারপর উঠে বসলেন। পায়ে পায়ে চলে এলেন টেবিলের কাছে। হাত পা বাহুমূল এমনকি চোখের পাতা দুটো পর্যন্ত ভার ভার। টেবিলের ওপর জড়ো করা রয়েছে পরীক্ষার খাতা, খান কয়েক স্কুলপাঠ্য বই, চশমা ইত্যাদি। সরমা আলতো করে চশমাটা তুলে নিলেন। কাপড়ের আঁচল দিয়ে সেটাকে মুছে নিলেন ভাল করে। সিলিণ্ড্রিক্যাল চশমা, অস্বাভাবিক পুরু লেন্স। স্কুলের মেয়েদের পরিভাষায় এর নাম বড়দিদিবাণির টুলি।

সরমা চশমাটা নাকে পরিয়ে নিয়ে খেরোটা খুললেন।

দেরাজ ভর্তি একগাদা টুকিটাকি জিনিসপত্র। প্রথমেই চোখ পড়ল ভাইপো রবির জন্যে তৈরী সোকেটোরটায়। অনেক যত্নে বহুদিনের শ্রমে এটা তিনি তৈরী করেছেন। সোকেটোরের নীচে কয়েকটা মনিঅর্ডারের স্লিপ। ছোট ভাই তরুণ ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে। তাকে মাস মাস টাকা পাঠাতে হয়। রিটার্ন স্লিপগুলো সরাতেই বেরিয়ে পড়ল পোষ্ট অফিসের পাসবইটা। ছোট বোন কমলার বিয়ের জন্যে তিনি কিছু কিছু সঞ্চয় করছেন। একা অরুণের পক্ষে সব চালানো সম্ভব নয়। কলকাতায় তার মস্ত বড় সংসার; সে নিজে, বউ, দুটি ছেলেমেয়ে, বাড়ি ভাড়া, তাছাড়া তরুণ কমলা। সরমা ঠিক করেছেন স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা হয়ে গেলেই একটা ভালো পাত্র দেখে কমলার বিয়ে দিয়ে দেবেন। মেয়েদের বিষয়ে তিনি একটু গোঁড়া। তাঁর ধারণায় মেয়েদের জীবনে কাজ দুটি। এক যথাসীঘ্র বিয়ে হয়ে যাওয়া। দুই, স্বামীর ঘরে গিয়ে ছেলেপুলে নিয়ে ঘর সংসার করা। এছাড়া আর কিছু মহৎ কাজ মেয়েদের জীবনে করার আছে বলে তিনি বিশ্বাস করেন না। হয়ত মেয়েরাও এর বেশী কিছু চায়না।

দেওয়ালঘড়িটা টিক টিক করে বেজে চলেছে অনবরত। সরমা জিনিসগুলো সাজিয়ে দেরাজটা বন্ধ করে দিলেন। শীতের প্রলম্বিত রোদ তৎক্ষণে খাট ছাড়িয়ে মেঝের নেমে এসেছে। ঘোড়া নিম গাছের হাওয়া-সিরসির পাতার ছায়া লুটোপুটি খাচ্ছে মেঝে।

মাইজী—

সরমা চোখ ফেরালেন। লছমী এসে দাঁড়িয়েছে দরজা ঘেঁসে। সরমা লছমীর দিকে তাকিয়ে মনে মনে খুশী হলেন। লছমীর গায়ে একটা খয়েরী রঙের শাড়ি। ভাসাভাসা চোখ। কপালে একটা কাঁচপোকার টিপ। সরমা বললেন, যা উনুনটা ধরিয়ে তাড়াতাড়ি এক পান জল বসিয়ে দে। ও হয়ত এসেই চট বাথ করতে চাইবে।

সরমা 'ও' কথাটা একটু জোরে বলেই লজ্জা পেলেন। লছমী চলে গেলে তিনি খাটের কাছে এগিয়ে এলেন। জাজিমের তলা থেকে চিঠিটা বের করলেন। সকাল থেকে অনেকবার চিঠিটা পড়ে ফেলেছেন। তিনি চারদিকে একবার চোরা দৃষ্টি ফেলে চিঠিটা খুললেন। কল্যাণীয়া সরমা, সরমা মুচকি হাসলেন। 'কল্যাণীয়া' যেন কোন এক গুরুজন ঝক্তি চিঠি লিখছেন। 'অনেক যুগে তোমার কাছে চিঠি লিখছি।' অনেকদিন, হ্যাঁ, তাতো প্রায় পনের বছর হবেই। শেষ দেখা হয়েছিল একদিন সন্ধ্যায়, হগমার্কেটে। কৃষ্ণনাথ মার্কেটিং করতে এসেছিল। সঙ্গে ছিল বউ, তার কোলে একটি ছোট্ট মেয়ে।—'একটা কনট্রাকসনের কাজে খাড়গ্রাম যাচ্ছি শনিবার। একদিন তোমার কাকার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ওর কাছ থেকে জেনে নিয়েছিলাম যে তুমি ঘাটশীলা আছো। রবিবার তোমার ওখানে যাব। আশা করি থাকবে।' আশা করি কেন। কি বলতে চায় কৃষ্ণনাথ। তার চিঠি পেলেও কি সরমা থাকতেন না। অক্ষরগুলো সরু পিনের মতো তার চোখে বিঁধতে লাগল। এ যেন স্কুলের সেক্রেটারী হরিহরবাবুর চিঠি, ইউ আর রিকোয়েস্টেড টু অ্যাটেণ্ড দা মিটিং। আশ্চর্য, এতদিনে গুছিয়ে একটা চিঠি পর্যন্ত লিখতে শেখেনি কৃষ্ণনাথ। তার দেখা উচিত ছিল, রবিবার তোমার ওখানে যাচ্ছি, ওই সময় অবশ্যই তুমি বাড়িতে থাকবে। চিঠির অধোনামায় কয়েকটি গুটি গুটি অক্ষর, ইতি কৃষ্ণনাথ। সরমা ছোট্ট করে একটা নিঃশ্বাস ছাড়লেন। যাক, তবু শেষটা বজায় রেখেছে। অন্তত নিজের নাম স্বরণ করিয়ে দেবার জন্য ফলিয়ে লেখেনি, ইতি শ্রীকৃষ্ণনাথ বসু।

বাইরে সাইকেলের ঘন্টির আওয়াজ শোনা গেল। সরমা তাড়াতাড়ি চিঠিটা খামে পুরে জাজিমের তলায় রাখলেন। তারপর দরজার দিকে এগিয়ে এলেন। ব্রীজমোহন তৎক্ষণে সাইকেলটা বারান্দার খামে ঠেসান দিয়ে ঘরের দিকে এগিয়ে আসছে। তার পরণে খাকির সার্টপ্যান্ট। বুকে ঝোলানো

আয়তকার চকচকে একটা চাকতি। তাতে খোদাই করা রয়েছে, প্রেহানন্দ মিশনারী স্কুল ফর গার্লস। ব্রীজমোহন বলল, ডিনটের সময় আসতে বলেছিলেন বড়দিদিমণি। সরমা জবাব দিলেন, হু, তোকে একবার ট্রেশনে যেতে হবে। কাড়গ্রাম থেকে এক ভদ্রলোক আসবেন দাড়ে তিনটায় ট্রেণে।—বলতে বলতে সরমা হঠাৎ থমকিয়ে গেলেন। কৃষ্ণনাথের চেহারার কি বর্ণনা দেবেন তিনি। লম্বাচওড়া মানুষ, বিশাল চওড়া বুক, সুপুষ্ট লোমশ হাত, পুরো ছফুট লম্বা? মাজা সোনার মত টকটকে রঙ, চোয়ালের ঠিক নিচে একটা কাটা দাগ? ছোট বয়সে সিড়ি থেকে পড়ে কেটে গিয়েছিল। দাগটা তেঁতুল বিচ্ছির মত লম্বা, চেরাচেরা। হাসলে কাটা দাগটায় টান পড়ে। তখন ভারী সুন্দর দেখায়, মনে হয় একটা ফড়িং যেন ডানা মেলে উড়তে চাইছে। ব্রীজমোহনের দিকে চোখ পড়তেই তিনি সপ্রতিভ হলেন। বললেন, ভদ্রলোকের বয়স বছর পঞ্চাশেক হবে। আমার নাম করে বলবি, দিদিমণি পাঠিয়ে দিয়েছেন।

ব্রীজমোহন ঘন্টি বাজিয়ে চলে গেল। সরমা বারান্দার থামে পিঠ হেলিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। উঠানে একফালি রোদ, নরম এবং গাছের ছায়ায় চিত্রিত। সরমার বুকের ভেতরটা ভিজ ভিজ করে উঠলো। তিনি ছোট করে একটা হাই তুললেন।

পেয়ারা গাছের একটা শুকনো পাতা ঝরে পায়ের কাছে পড়তেই তিনি চমকে উঠলেন। চট করে কাপড়ের আঁচল দিয়ে কাঁধটা ঢেকে ঘরে চলে গেলেন। আলনা থেকে একটা শাড়ি তুলে নিয়ে বাথরুমে ঢুকলেন।

ভেতরে ঢুকে ভালো করে দরজা ভেজিয়ে দিলেন। একটানে হেয়ার পিনটা খুলে দিতেই একরাশ চুল কোমর ছাপিয়ে পিঠে ছড়িয়ে পড়লো। সরমা হাতের আঙুলগুলো বিস্তৃত করে চুলের মধ্যে মিশিয়ে দিতে লাগলেন। তারপর ব্যাগার থেকে চিরুনীটা টেনে নিয়ে চুল বাঁধলেন। আজ কুড়ি বছর ধরে একই ছাঁদে চুল বেঁধে আসছেন তিনি। সাদামাটা, বাহুল্যহীন। চুলের অযত্নের জন্য বান্ধবীদের কাছে কম কথা শুনতে হয়নি। যে বাঁধে সে চুলও বাঁধে। কিন্তু, যাকে আজ কুড়ি বছর ধরে, ইউনিভারসিটি থেকে বেরোতে না বেরোতেই বাবার মৃত্যুর পর সংসারের জোয়াল কাঁধে নিতে হয়েছিল তার কাছে এ যুক্তি নিতান্তই হাস্যকর। চুল বাঁধা কেন, একে একে সব কিছু তাকে ছাড়তে হয়েছিল। কেশচর্চা, গান, কবিতালেখা, এমনকি কৃষ্ণনাথের সঙ্গ পর্যন্ত।

সরমা চোখে মুখে আকস্মাতরে জল ছিটিয়ে আয়নার দিকে তাকালেন। সেই চোখ, সেই মুখে যৌবনের রূপরেখা। আশ্চর্য, এমনকি ঠোঁটের নিচের ছোট তিলটি পর্যন্ত। সরমা সেই ঘন আয়নার কাঁচে কি যেন খুঁজতে লাগলেন। একটা ধূসর ম্লান স্মৃতি, তাঁর ঠোঁটদুটো অকারণে কেঁপে কেঁপে উঠল।

মাইজী, মাইজী—বাইরে লছমীর চাপা গলার আওয়াজ।

কি?

বাবুসাব এসে গেছেন।

ঘরে নিয়ে বসা, আমি এক্ষুনি আসছি।

সরমা যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে এলেন বাথরুম থেকে। বাইরে বেরিয়েই দেখেন, কৃষ্ণনাথ উঠানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। কৃষ্ণনাথের শরীরের পিছনের অংশটা দেখা যাচ্ছে। গায়ে খাসরঙের একটা ফুলশার্ট, পরণে দামী কাপড়ের ফুলপ্যান্ট, মাথায় শোলার ছাট। সঙ্গে একটি আট দশ বছরের ছেলে।

সরমা বারান্দা থেকে নেমে উঠানে এসে কৃষ্ণনাথের সামনে দাঁড়িয়ে সহজভঙ্গীতে বললেন, একি বাইরে দাঁড়িয়ে কেন, ঘরে এসো।

কৃষ্ণনাথ চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিল। সে বললো, বাঃ চমৎকার জায়গাটিতো।

আগের তুলনায় চেহারায় তেমন কিছু বদলায়নি সে।

তেমি সতেজ দৃপ্ত ভঙ্গী। চিবুকের নিচের দাগটাও স্পষ্ট। তবে টিকালো নাকটা যেন একটু ভোঁতা, আর ভুরুতে ইতস্তত গোটাকয়েক পাকা চুল।

সরমা একটু হেসে পাশের ছেলেটিকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, কি নাম তোমার?

শ্রীবিদ্যুৎকুমার বসু,—ছেলেটি মিষ্টি গলায় বললো।

কৃষ্ণনাথ বলল, খোকন, মাসিমাকে প্রণাম কর।

বিদ্যুৎ মাথা নিচু করে প্রণাম করতে যেতেই সরমা ওকে দুহাতে জড়িয়ে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বললেন, বিদ্যুৎ, কোন ক্লাসে পড়?

ক্লাস ফোর।

ফোর! বাব্বা, তাহলে তো বেশ বড় হয়ে গেছ দেখছি।—বলেই সরমা কৃষ্ণনাথের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন।

কৃষ্ণনাথ বলল, আর বোলোনা, এ ছেলেকে নিয়ে হয়েছে এক ঝামেলা। কিছুতেই বাড়িতে থাকবে না। আমি যেখানে যাব ও ঠিক পিছু নেবে। এত করে বললো ওর মা—

ওরা বারান্দায় উঠে এল। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে সরমা বললেন, ভালই হল। তবু এই সুযোগে ওকে তো দেখতে পেলাম।

ঘরে ঢুকে কৃষ্ণনাথ ডেক চেয়ারটায় গা এলিয়ে দিল। বিদ্যুৎ ততক্ষণে সরমার বেষ্টনীমুক্ত হয়ে কোণানো কাঠের তেপায়ার রাখা রবীন্দ্রনাথের মাটির মূর্তিটার সামনে ঝুঁকে পড়ে দেখছে। সরমা টেবিলের কাছে এসে চশমাটা খুলে রাখতে রাখতে বললেন, হুটবাথ করবে?

হুটবাথ?—কৃষ্ণনাথ তার কথাটাকে যেন বিদ্রূপ করে বলে উঠল, নো, আই অ্যাম নট এন্ড ওল্ড ফাশার্ড ইয়েট। এই সামান্য শীতে সেঁদিয়ে যাবার মত অশক্ত হইনি এখনও।

সরমা খাটের পাশ থেকে গোল টেবিলটা টেনে ডেক-চেয়ারের সামনে এনে হেসে বললেন, অতটা বীরত্ব ভালো নয়। কার্তিকের ঠাণ্ডা বুকে বসে গেলে চট করে একটা কিছু হয়ে যেতে কতক্ষণ।

কৃষ্ণনাথ চেঁচিয়ে উঠল, এই খোকন, ওকি হচ্ছে, আচ্ছা ইম্পার্টিনেন্ট তো, অত নাড়ালে মূর্তিটা ভেঙে যাবে, এদিকে এস। ভারি দুরন্ত হয়েছে ছেলেটা।—

লক্ষ্মী ট্রেতে করে কিছু খাবার আর চা নিয়ে এল। সরমা তার হাত থেকে ট্রেটা তুলে নিয়ে গোল টেবিলে রাখল। তারপর একটা বেতের মোড়া টেনে নিয়ে বসে টিপট থেকে কাপে চা ঢালতে ঢালতে বললেন, ছোট বয়সে অমন দুরন্ত সকলেই হয়। তুমি দুরন্ত ছিলে না?

কৃষ্ণনাথ হাত বাড়িয়ে ট্রে থেকে একটা খাবার তুলে নিয়ে মুখে পুরে বলল, বাঃ, এসব রেঁধেছে কে, তুমি? ওঃ, কত-দিন বাদে মায়ের কাদিয়া খেলাম।

বিদ্যুৎ এসে সরমার গা ঘেঁসে দাঁড়াল। ওর হাতে একটা চপ তুলে দিয়ে সরমা বললেন, কেন, বাড়িতে এসব হয় না বুঝি?

আর বল কেন, বউ কি এ সব খেতে দেয়? খালে বেশী-গুরুপাকের জিনিস খেলে ব্লাডপ্রেসার বাড়বে।

সরমা মুচকি হাসলেন, ডাক্তার ঠিকই বলে। এ সব রোগে একটু বাচবিচার করে চলা উচিত বৈকি।

কৃষ্ণনাথ বলল, নিয়ম, ছোঃ! ইচ্ছেমত খেতে না পারলে বেঁচে থাকার কোনো মানে হয়? তোমরা মেয়েরা সব এক-জাতের।

সরমা হাসলেন। হাসতে শরীরের অবসাদ অনেক দূর হল। শীতের বিকেল, নিঝু নিঝু সূর্যের আলো। একটা পরিচিত আবছা অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে বাইরে, দূরের পাহাড়ে, ঘোড়ানিম গাছের মাথায়, বারান্দার ছিম ছিম মেঝেয়, ঘরে।

খাওয়া শেষ হলে সরমা বললেন, আলোটা জ্বালব?

কৃষ্ণনাথ বলল, না, থাক, চল বাইরেটা ঘুরে দেখে আসি থাক।

ওরা দুজন বাইরে চলে এল। কৃষ্ণনাথ সামনের বাগানটায় ঢুকে পড়ল। সরমা এলেন পিছু পিছু। রকমারী বরণডালা ফুল ফুটেছে বাগানে। সন্ধ্যার আবছায়ায় সেগুলি কেমন যেন ফ্যাকাশে, বর্ণহীন। রাস্তার পাশে সাঁই বাবলার পাতার ফাঁকে ফাঁকে কুয়াশা জমছে। তার ভিতর থেকে একটা পাখির ছানার অস্পষ্ট ক্ষীণ কান্না ভেসে আসছে।

কৃষ্ণনাথ বলল, ভালই আছো বলতে হবে। দিশনারী স্কুলের হেডমিস্ট্রেস। ভালো মাইনা পাচ্ছ নিশ্চয়ই, বেসিক কত?

তিনশ টাকা—সংক্ষেপে জবাব দিল সরমা।

এতবড় কোয়ার্টার, মোটা মাইনা। এতদিনে ওয়েলপ্লেসড হলে!

কৃষ্ণনাথের কথাগুলো সরমার কাছে সান্ত্বনার মতো মনে হল। ওয়েলপ্লেসড, ওয়েলপ্লেসড বলতে কি বোঝে কৃষ্ণনাথ। অর্থ, প্রতিপত্তি, সম্মান। ঝিমঝিম কুয়াশার চশমাটার কাচ দুটো ঝোঁয়াটে। সরমা নাক থেকে সেটা খসালেন।

কৃষ্ণনাথ একটানে একটা ডালিয়া ফুল ছিঁড়ে সেটার পাপড়িগুলো ছড়াতে ছড়াতে বলল, মেয়াতী মেয়েটাকে দেখলাম, ওকে, রান্নাবান্না করে দেয় বুঝি?

সরমা ছোট্ট করে একটা 'হুঁ' করলেন।

কৃষ্ণনাথ বলল, তোমার ভাইরা কোথায়?

—কলকাতায়।

—তোমার একটি ছোট বোন ছিল না?

—হ্যাঁ, এবার ফুল ফাইন্যাল দিচ্ছে।—ক্লান্ত, সরমা বড় ক্লান্ত।

—বড় ভাইটি কি করে?

—একটা মার্চেন্ট অফিসে চাকরী করে।—কথাগুলো যেন বুকচিরে বেরোল।

—ছোট ভাইটি চাকরী পায়নি এখনও?

—না, ও পড়ছে, যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজে।

—ওয়েল, ওয়েল, তাহলে সব মিলিয়ে ভালই আছো।

কৃষ্ণনাথের কথাগুলো সরমার কানে ছুঁচের মত বিঁধল। নির্বোধ, নিতান্তই নির্বোধ কৃষ্ণনাথ। একটা পুরোণো রেকর্ডের মত বেসুরো। আর তার শরীরটা এই আবছায়ায় কেমন যেন অস্পষ্ট। মনে হল যেন কে একটা ঘোয়াটে কাচের ওপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। টুং টুং করে ঘন্টি বাজল গেটের কাছটায়। ব্রীজমোহন এসেছে। কৃষ্ণনাথ সচকিত হয়ে বলল, বিদ্যুৎকে ডাকো তো। এক্ষুনি ফিরতে হবে। সাতটার ট্রেনটা যে করেই হোক ধরতে হবে। সকালে আবার অফিসে একটা জরুরী কাজ আছে।

কাজ আর কাজ। কৃষ্ণনাথের এ অনুযোগটা সরমার কাছে বিনতির মত মনে হল। রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ার, কাজ প্রচুর আছে বৈকি। সরমার মনে হল পালাতে চাইছে কৃষ্ণনাথ। দীর্ঘ পনের বছরের ব্যবধানের পর হঠাৎ এই অপ্রত্যাশিত সান্নিধ্য অসহ্য হয়ে উঠেছে তার কাছে। ভয়, সরমাকে? কেন! সরমার ঠোঁটের পাতা ভারি হয়ে এল। কপালের রেখাগুলি আরো ঘন হয়ে উঠল। একটা অবদমিত ক্রোধ সমস্ত শরীর পেচিয়ে ঘুলিয়ে ঠেলে বেরোতে চাইল। তথাপি সরমা নির্লিপ্ত নিস্তেজ। তথাপি তিনি মিষ্টি করে হাসলেন। হেসে হয়ত কৃষ্ণনাথকেই সান্ত্বনা দিতে চাইলেন, কেন ভয় কিসের, কাজ না ছাই, বল বউয়ের আদেশ আছে।

কৃষ্ণনাথ বিবর্ণ হেসে বললেন, বউয়ের আদেশ? তুমি এখনো আগেকার মত ছেলেমানুষ আছো দেখছি।

একটা বিশাল গাছের গুঁড়িকে করাত দিয়ে চেরাই করার সময় যেমন বিকট আওয়াজ হয় সরমার কাছে তার কথাগুলো তেমন নীরস লাগলো।

ব্রীজমোহন উঠোন থেকে হাঁক পাড়লো, বাবুসাব ট্রেনের সময় হয়ে গেছে। বিদ্যুৎ এতক্ষণ ঘরের মধ্যে ছোটাছুটি

করছিল। একলাফে উঠোনে নেমেই টুক করে সরমার পায়ে হাত দিয়ে বলল, "যাই মাসিমা"।

সরমা তাকে বুকে টেনে নিলেন। সস্নেহে চিবুক স্পর্শ করলেন। একটা নরম উষ্ণ পাখীর মত ছোট্ট শরীর। মাসিমা, মাসিমা। কথাটাতে সরমা শরীরী চেতনা দিয়ে অনুভব করতে চেষ্টা করলেন। তারপর কি ভেবে বললেন, 'একটু দাঁড়াও বিদ্যুৎ, আসছি।'

বলেই সরমা ছুটে ঘরে চলে গেলেন একটানে দেরাজটা খুললেন. রবির জন্যে তৈরী করা সোয়েটারটা বের করলেন। তারপরে দৌড়ে চলে এলেন বাইরে।

কৃষ্ণনাথ বলল, ওকি, আবার সোয়েটার কেন, তিন চার ঘণ্টার তো মামলা।

সরমা এতক্ষণে গলার স্বর যথাসম্ভব চড়িয়ে বলে উঠলেন, এনিয়ে তোমাকে খবরদারি করতে হবেনা। শীতের রাত, দুধের বাচ্চা, জ্বর হিম হয়ে যাবে না।

বলতে বলতে তিনি সোয়েটার সহযে বিদ্যুতের গায়ে পরিয়ে দিলেন।

ওরা তিনজন উঠান ছাড়িয়ে বড় রাস্তায় নেমে গেল। পাঁচিলটাকে বাঁপাশে রেখে। তারপর ঘোড়া নিমগাছের পাতায় ঢাকা ঘন কুয়াশায় হারিয়ে গেল।

সরমা পায়ে পায়ে শান্তাঘর উঠোন পেরিয়ে বারান্দায় উঠে এলেন। তারপর ঘরে। তাঁর মাথাটা ঝিম ঝিম করছিল। চোখের সামনে টেবিল। টেবিলে ডাঁই করা একরাশ পরীক্ষার খাতা, পাহাড়ের মত উঁচু। সাদাটে, বিষবাষ্পের থান কাপড়ের মত বিবর্ণ। ঘরের একপাশে আলনা। আলনা ভর্তি শাড়ি-শায়া-ব্লাউজ। একটা বিরাট আলমারী ভর্তি বই। মেঝেটা সাপের চামড়ার মত ঠাণ্ডা ঘরের সব বাতাস যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হল সরমার। তিনি প্রায় দৌড়ে দক্ষিণের কাচের শার্সি দুটো খুলে দিলেন। তারপর অবসন্ন শরীরটাকে এলিয়ে দিলেন বিছানায়।

দেওয়াল ঘড়িতে চং চং করে সাতটা বাজল। তিনি চমকে উঠে ফিরে তাকালেন। দেখলেন, ঘড়িটার পেণ্ডুলামটা দোল খাচ্ছে অনবরত। তাঁর মনে হল পেণ্ডুলামটা যেন একটা পাখি। আর তার চারদিকের ছোট্ট কাঠের আবরণটা যেন একটা খাঁচা। পাখিটা প্রাণপনে সেই কাঠের আবরণ ভেঙ্গ করে পালাতে চাচ্ছে পারছে না। শুধু থেকে থেকে একটা নিষ্ফল ধাতব আওয়াজ ঘুরছে, টিকটিক টিকটিক।

পাঠকের দৃষ্টিকোণ

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

নববর্ষের প্রবন্ধ-সাহিত্য

সাহিত্যপত্রের বৈশাখ সংখ্যাগুলো সাম্প্রতিক কালে বিশেষ সাহিত্যসংখ্যারূপে আত্মপ্রকাশ করে থাকে। আশ্বিনে যেমন বর্ষিতকলেবর বহুবিজ্ঞাপিত শারদীয় সংখ্যা, প্রতি বাংলা নববর্ষের প্রথম মাসে তেমনই সাহিত্য-সংখ্যা। আধুনিক সাহিত্যের পাঠকের খুশী হবার কারণ আছে। বছরে অন্তত দু'বার তারা সাহিত্যপত্রগুলোর রচনার ঐশ্বর্যের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পায়। নববর্ষসংখ্যা বা সাহিত্যসংখ্যাগুলোর একটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায় প্রবন্ধ সাহিত্যের পরিবেশনে। শারদ সংখ্যায় নানা পত্র-পত্রিকায় উপন্যাসের প্রাধান্য, বড়ো গল্পের প্রাধান্য। ঝোঁকটা কথা-সাহিত্যে, রোখটা মুনাফা শিকারের দিকে। প্রবন্ধও থাকে। কিন্তু তার স্থান তখন সঙ্কুচিত। সম্পূর্ণ উপন্যাস এবং ছোট-বড়ো অজস্র গল্পের চাপে প্রায় রুদ্ধশ্বাস। সুখের বিষয়, বৈশাখের সাহিত্য-সংখ্যা এই অবস্থার উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। সাহিত্য সংখ্যায় প্রবন্ধকে প্রাধান্য দিতে দেখা যায়। কোনো কোনো সাহিত্যপত্র তো এই সংখ্যাটিকে নিছক প্রবন্ধ সংকলনরূপেই প্রকাশ করে থাকেন। বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যে যাঁরা উৎসাহী তাদের মনের খোরাক মেলে। সাহিত্য সংখ্যার রেওয়াজ খুব বেশীদিনের নয়। কয়েক বছর আগে 'দেশ' পত্রিকা প্রথম সাহিত্য সংখ্যা প্রকাশ করেছিলেন। সংখ্যাটি ছিল বিভিন্ন ধরণের সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধের সংকলন। বাংলাদেশের উন্নিষ্ঠ পাঠকের শিক্ষিত মনের উপযোগী এই নতুন ধরণের সাহিত্য-সংখ্যাটি বিশেষ সমাদর লাভ করেছিল। তদবধি বাংলাদেশের অন্যান্য অনেক পত্রিকাই নিয়মিতভাবে সাহিত্য সংখ্যা প্রকাশ করছেন। এ প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখ্য : কিছুদিন আগে পর্যন্ত বাংলাদেশে নিছক প্রবন্ধ-সাহিত্যের কোনো পত্রিকার প্রকাশ কল্পনা করা সহজ ছিল না। সমৃদ্ধ পত্র-পরিচয় কিংবা তারও আগে ভারতী, সাধনা ইত্যাদি পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশের দিকে উপযুক্ত গুরুত্ব দেয়া হলেও ঐ পত্রপত্রিকাগুলোতে প্রবন্ধ ভিন্ন গল্প কি উপন্যাসেরও বিভাগগুলো সযত্নে রক্ষিত ছিল। একালে পাঠকের সংখ্যা যেমন অনেক বেড়েছে তেমনই প্রবন্ধ সাহিত্যে আগ্রহশীল পাঠকও রয়েছেন যাঁরা নিছক প্রবন্ধ পাঠেই পরিতৃপ্ত হতে ইচ্ছুক। সম্ভবত সে কারণেই একালে এমন পত্রিকা কল্পনা করা সম্ভব প্রবন্ধই যার একমাত্র পরিবেশিত বস্তু। কয়েকটি পত্রিকা, যেমন সমকালীন, উত্তরসূরী, বিশ্বভারতী পত্রিকা সাম্প্রতিককালে নিয়মিত ভাবে নিছক প্রবন্ধই পরিবেশন করে চলেছে। এই পত্রিকাগুলো রুচির দিক থেকে পরিচ্ছন্ন এবং গভীরতার দিক থেকে শিক্ষিত মনের উপযোগী। এরূপ পত্রিকার সংখ্যা ভবিষ্যতে আরো বাড়বে আশা করা যায়।

প্রবন্ধ : সাহিত্য-প্রবন্ধ পুস্তক

এ বছরের প্রবন্ধ-সাহিত্য বৈশাখের সাহিত্যসংখ্যা সমূহে অনেক ক্ষেত্রেই বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিবেচিত হতে পারে। গতানুগতিক স্থূলখিত প্রবন্ধ এই সময়কার পত্রপত্রিকায় নজরে পড়বে। কিন্তু যে সব রচনা নিছক পূর্ব-সূরীদের চিন্তাধারার পুনরাবৃত্তি নয় এবং ভিন্নতর দিক থেকে তাৎপর্যময় এরূপ

রচনাও রয়েছে। বাঙালী লেখক যে চিন্তা করছেন সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাস-গল্পে তার প্রমাণ ক্রমশই বিরল হয়ে পড়ছে। কিংবা উপন্যাস-গল্প সাহিত্যে আত্মনিয়োগ করতে হলেও যে লেখাপড়া করা দরকার, সাহিত্যচর্চা অব্যাহত রাখার প্রয়োজন এলত্য বাংলা উপন্যাসপাঠে হৃদয়ঙ্গম করা সহজ নয়। তার মানে অবশ্য এই নয় যে উপন্যাস-লেখক কিংবা গল্পকারদের মধ্যে শিক্ষিত লেখক নেই। শিক্ষিত লেখকের রচনার জনপ্রিয়তা তেমন নেই। দূর্জটিপ্রসাদ, অন্নদাশঙ্কর রায়, বুদ্ধদেব বসু দৃষ্টান্ত। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, দত্তোষকুমার ঘোষ, অমিয়ভূষণ মজুমদার, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, সুবোধ ঘোষ প্রভৃতির রচনায়ও মননশীলতার প্রাধান্য। কিন্তু তথাকথিত জনপ্রিয়তার মাপকাঠিতে বিচার করলে এঁদের কেউই নীহাররঞ্জন গুপ্ত, সমরেশ-র সমীপবর্তী হতে পারেননি। বস্তুত গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রে এখনকার দিনে সংঘর্ষ চলছে ইউ-এবং নন-ইউ-র (You and Non-You) মধ্যে এবং এই অন্তর্লীন সংঘর্ষের শেষ পরিণামের ওপর বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা অনেক পরিমাণে নির্ভর করছে।

অনুরূপ পটভূমিকায় যে-পাঠক গভীরভাবে সাহিত্য-বিষয়ে ভাবতে ইচ্ছুক প্রবন্ধ-সাহিত্য স্বাভাবিক ভাবেই তাকে আকর্ষণ করবে। প্রবন্ধ-সাহিত্যে বাঙালীর জাগ্রত চিন্তাবৃত্তির মৌলিকতা পরিস্ফুট তার প্রমাণও সাম্প্রতিক অনেক সাহিত্যপত্রে পাওয়া যাবে। এক ধরণের প্রবন্ধ অবশ্য একালেও লেখা হয় যাকে সাধু বাংলায় বলা হয় চর্বিত-চর্বন। কতকগুলো আপ্ত বাক্য এবং বাগাড়ম্বর সম্বলিত এই ধরণের নানা রচনা একথাই প্রমাণ করে যে এখন পর্যন্ত বাঙালী সমাজের একটি শিক্ষিত অংশ নবাচিন্তাধারার অনুবর্তী হতে অনিচ্ছুক কিংবা অপারগ। এবং বেশ কিছু সংখ্যক বাংলা ভাষায় প্রকাশিত পত্র পত্রিকায় এই ধরণের লেখা চোখে পড়ে। কিন্তু তারই পাশাপাশি রয়েছে স্বল্প সংখ্যক পরিচ্ছন্ন, গভীরতাসন্ধানী রচনা যার প্রকাশ বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের পক্ষে শুভলক্ষণ। গত দশ বছরের মধ্যে অনেক স্কীতকলেবর প্রবন্ধ-সাহিত্যের বই প্রকাশিত হয়েছে। স্কীতকলেবর হলেই সব বই সার্থক হবে একথাও বলা যায় না: এমন অনেক বই বাংলা ভাষায় রয়েছে যা স্বল্প পরিসরের মধ্যে সুলিখিত। রবীন্দ্রনাথের বই (সাহিত্য, আধুনিক সাহিত্য, লোক সাহিত্য, সাহিত্যের পথে ইত্যাদি) ছাড়াও রাজশেখর বসু, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, অন্নদাশঙ্কর রায়, অরবিন্দ পোদ্দার, বিষ্ণু দে এবং আরো কেউ-কেউ এই ধরণের প্রবন্ধ-গ্রন্থের জন্যে উল্লেখ্য। মূল্যবান জীবনীগ্রন্থ (রবীন্দ্র-জীবনী: প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কিংবা বিদ্যাসাগর: বিনয় ঘোষ এবং একটি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন দৃষ্টান্ত, যোগীন্দ্রনাথ বসুকৃত মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত) স্বাভাবিক কারণেই স্কীত-কলেবর হয়ে পড়ে। কিংবা জাতির বৃহত্তর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমিকায় লিখিত বৃহৎকলেবর গ্রন্থ (বাঙালীর ইতিহাস: নীহাররঞ্জন রায়। মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস: আশুতোষ ভট্টাচার্য।) অপ্রত্যাশিত নয়। কিন্তু সাহিত্য-চিন্তা বিষয়ক বই পরিমিত পরিসরের মধ্যে লেখা হলেই পাঠকের উপভোগ ও অনুধাবন ক্ষমতা পীড়িত না হয়ে আরও হতে পারে। এই ধরণের লেখা, অন্নদাশঙ্করের ভাষায়, extensive না হয়ে intensive হওয়া বাঞ্ছনীয়। একালে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'স্বগত' বিষ্ণু দে-র 'সাহিত্যের ভবিষ্যৎ' কিংবা রাজশেখর বসুর 'বিচিন্তা' এই ধরণের রচনার দৃষ্টান্ত বলা যেতে পারে।

নববর্ষের পত্র-পত্রি.।

বৈশাখ (১৩৮৯) নববর্ষের কয়েকটি পত্র-পত্রিকায় কিছু উল্লেখযোগ্য সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধের সন্ধান করতে গিয়ে যে-কোনো চিন্তাশীল পাঠকের মনে হতে পারে যে

অনেক খ্যাতিমান প্রাবন্ধিকও সম্প্রতি সময়াভাবের দরুণ রচনায় তেমন পরিপূর্ণ গভীরতা বহন করে আনতে পারছেন না। রবীন্দ্রনাথ একদা লিখেছিলেন :

'...আধুনিককালের মনের মধ্যেও তাড়া-হুড়ো, সময়েরও অভাব। জীবিকা জিনিসটা জীবনের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে। তাড়া-লাগানো ভিড়ের-ভিড়ের মধ্যেই মানুষের হু হু ক'রে কাজ, হড়মুড় ক'রে আমোদ-প্রমোদ।...মনের সঙ্গে মিল হোলো কিনা সে কথা ভাববার তাগিদ নেই, কেন না মন আছে অতি প্রকাণ্ড জীবিকা জগন্নাথের রথের দড়ি ভিড়ের লোকের সঙ্গে মিলে টানবার দিকে।'

আধুনিক কাব্য প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথকৃত আধুনিক জীবনের এই বর্ণনা এখনকার দিনেও বাস্তব। সুতরাং সাহিত্যচিন্তায় সমৃদ্ধ হয়েও অনেক প্রবন্ধরচনায় এই তাড়াহুড়োর ছাপ থেকে যায় এবং পাঠক সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত হতে পারেন না। তৎসত্ত্বেও নিম্নলিখিত প্রবন্ধাবলীর উল্লেখ করা অসমীচীন মনে হবে না।

বসুধারা। চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তেরশো আটষট্টি সালের বাংলা বইয়ের কথা', চিত্তরঞ্জন দেবের 'শাঁওতালী গানে ফুল আর ভালবাসা' এবং পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'সমকালীন উপন্যাস ও তার ভবিষ্যত' উল্লেখ্য। চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধে কয়েকটি অনুধাবনযোগ্য মন্তব্য করেছেন। 'ইংরেজী বিদায় নিয়ে একমাত্র বাংলাকেই শিক্ষার ও জীবনের ভাষা করবার আশা এখনও সুদূরপরাহত। শুধু যে সংখ্যা কম তা-ই নয়, বিষয়-বিশ্লেষণ থেকে দেখা যাবে মোট বইয়ের ষাট-পঁচাত্তরেরও অধিক হল সাহিত্যের বই। জাতি গঠনমূলক বইয়ের দৈন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বইয়ের সংখ্যা থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অথচ ক্ষুদ্রায়তন উন্নতিশীল রাজ্যে এ জাতীয় বইয়ের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। কারণ চাষবাসের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ জমি পাওয়া না গেলে শিল্পায়নের দ্বারাই জীবিকার্জনের ব্যবস্থা করতে হয়, এবং সেজন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বই অপরিহার্য। পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে শিল্পোন্নতি বাঁচবার একমাত্র উপায়। কিন্তু বাংলাভাষায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বই না থাকলে শিল্পের ক্ষেত্রে অগ্রগতি সম্ভব নয়।' শিল্পে যে-সব দেশ উন্নত, সেসব দেশে প্রকাশিত বইয়ের সঙ্গে তুলনায় জাতিগঠনমূলক বইয়ের প্রকাশের ক্ষেত্রে বাংলা দেশ অত্যন্ত পিছিয়ে রয়েছে একথার উল্লেখ করে লেখক বলেছেন : 'এই তুলনামূলক হিসাব থেকে প্রমাণিত হয়, বাংলা বইয়ের প্রকাশন-শিল্প এখনও প্রধানতঃ সাহিত্যের উপরই নির্ভরশীল। সুতরাং বাংলা বৃহত্তর জীবনের ভাষা হয়ে উঠতে পারেনি। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, মিস্ত্রী, ফিটারদের ইংরেজী বই থেকেই জ্ঞান লাভ করতে হয়। ইংরেজি জীবিকার্জনে সহায়তা করে বলেই তার প্রতি আমাদের এত আকর্ষণ। অর্থাৎ, বাংলা প্রয়োজনের ভাষা নয়। সুতরাং ইংরেজী দূর হবার সম্ভাবনা নেই।... এই দুরবস্থাচক্র থেকে উদ্ধারলাভ করবার একমাত্র উপায় বাংলা বই প্রকাশের ব্যাপক পরিকল্পনা এবং তাকে দ্রুত কার্যকরী করবার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা।' চিত্তরঞ্জন দেবের প্রবন্ধের বিষয় সুন্দর এবং এ জাতীয় লেখার চর্চাও তাঁর দীর্ঘকালের। কিন্তু অত্যন্ত সংক্ষেপিত হওয়ায় পাঠকের প্রত্যাশা পূরণ করে না। বরং নিখিল মৈত্র-র 'আদিবাসী উৎসব' আদিবাসীদের জীবনের একটি বিশেষ দিকের বর্ণনায় নতুনতর অভিজ্ঞতা সাধারণ পাঠকের কাছে উপস্থিত করে। পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের রচনা তথ্যের দিক থেকে তেমন নতুন না হলেও নতুন ভঙ্গিতে তিনি তাঁর বক্তব্য উপস্থিত করেছেন। বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী লিখিত রচনায় সঙ্গীতসেবী অমলকিশোর রায়চৌধুরীর সম্পর্কে কিছু বিস্তারিত তথ্য জানবার সুযোগ রয়েছে।

পরিচয়। এই পত্রিকাটি সূচনাকাল থেকেই চিন্তাশীল প্রবন্ধ সাহিত্য পরিবেশন করে এসেছে। এবছরের বৈশাখ সংখ্যায় গোপাল হালদারের 'স্বদেশী সমাজের সাধনা' এবং সুশোভন সরকারের 'টয়েনবির 'পুনর্বিচার' প্রথমেই উল্লেখ-

যোগ। স্বদেশী সমাজের সাধনায় রবীন্দ্রনাথের সাফল্যের উল্লেখ করেও গোপাল হালদারের বক্তব্য : 'পল্লীর শিল্প-চেতনাকে পরিতৃপ্ত করা ও পল্লীর মানুষের স্বাভাবিক সৃষ্টি প্রবণতাকে পরিপুষ্ট করাও প্রয়োজন।...কলে গড়া আনন্দ অনুষ্ঠানের দ্বারা স্রষ্টা তাদের সঙ্গে ভোক্তাদের "আদান-প্রদানের অবকাশ নেই।' এবং 'পল্লীর সংস্কৃতি সক্রিয় আনন্দের যোগাযোগকে যত সত্য করে তোলে তা অন্য কিছুতে হয় না। যাত্রা, কবি-গান, কথকতা, পাঁচালী প্রভৃতি পল্লীগ্রামে কি আর মানুষের সত্যিকারের দাবী মেটাতে পারে না? 'খালে' যাদের প্রায় জাতীয় সম্পদ, তারাও তো পুতুল-নাচের নব-নব ধারা উদ্ভাবিত করছে। আমাদের পুতুলনাচই কি কেবল লুপ্ত হবে! এদেশের নরনারীর সহজাত সৃষ্টি-ক্ষমতা কি পীতে-গানে-বাঁশীতে-বাদ্যনাট্য, আলপনায়, সূচীকর্মে মৃতিশিল্পে-পূজার পার্বণে, শত উৎসবে, শত উপলক্ষে মানুষের সেই আনন্দ অনুভূতিকে সজীব করতে পারে না? বাউল, ভাটিয়ালী, পল্লীগীতি—সেই পল্লীর জীবন্ত পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও—শহরের আবর্জনায় 'আর্ট' বলে গ্রাহ্য হচ্ছে।' পক্ষান্তরে "টয়েনবির 'পুনর্বিচার'" নামক প্রবন্ধে সুশোভন সরকার বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ টয়েনবির ঐতিহাসিক সবেষণার সার্বিক সাফল্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে তাঁর 'পুনর্বিচার'কে মহৎ ব্যতিক্রম বলে উল্লেখ করেছেন। '১৯২১ সালের মধ্যে তুলনীয় সভ্যতাগুলির একটা ছবি টয়েনবির কাছে স্পষ্টরূপ গ্রহণ করে; তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস দাঁড়ায় যে ইতিহাসচর্চার সার্থক-তম ক্ষেত্র হলো দেশ বা জাতি নয়, নানা দেশ সম্বলিত এক একটি সভ্যতার রূপরেখা নির্ধারণ। ১৯৩৪ থেকে ১৯৫৪ পর্যন্ত তিন পর্যায়ে তাঁর দশখণ্ড 'ইতিহাসের আলোচনা' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে; একাদশ খণ্ড 'মানচিত্রাবলী ও ঐতিহাসিক স্থান নির্দেশ' নামে প্রকাশ পায় ১৯৫৯-এ; আর গত বৎসর আলোচনা সম্পূর্ণ হলো 'পুনর্বিচার' নামক দ্বাদশ খণ্ডটিতে।... ঐতিহাসিক হিসাবে তাঁর তিনটি প্রধান মাহাত্ম্য চোখে পড়ে —ব্যাপক মানবিক দৃষ্টির প্রসার, অতীতকে আয়ত্তে আনার চেষ্টায় 'প্যাটার্ণ' বা ছকের সাহসী অনুসন্ধান করে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তার যাথার্থ্য পরীক্ষা এবং প্রচুর তথ্যের সহযোগে ইতিহাস সম্বন্ধে কৌতূহল সৃষ্টি। ওপগুলি অসামান্য বললে বোধহয় অত্যুক্তি হবে না। ফলে 'ইতিহাস আলোচনা' গ্রন্থটির ইতিহাস-রচনার রাজ্যে পীপলিথার মতন উজ্জ্বল হয়ে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।...' এছাড়া এবারের পরিচয়ে সরোজ আচার্যর বিপিনচন্দ্র পাল : "ভারতচিন্তার ভক্তিমার্গ ও যুক্তিমার্গ" এবং অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কাব্যনাটক প্রসঙ্গে' পাঠকের কৌতূহল অনেক পরিমাণে চরিতার্থ করে। কাব্যনাটক প্রসঙ্গে শুধুই বিদেশী সাহিত্যের আলোচনার বদলে আধুনিক বাংলা কাব্যনাটকের সম্ভাবনা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা থাকলে রচনাটি পূর্ণাঙ্গ হতে পারতো।

সমকালীন। 'সমকালীন' মাসিক পত্রটি সম্প্রতি প্রবন্ধ পত্রিকারূপেই প্রকাশিত হচ্ছে; বৈশাখ সংখ্যায় অমিত-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলা গদ্যে মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়' এবং রাখাল ভট্টাচার্যর 'মাতৃভাষা বনাম আন্তর্জাতিক ভাষা' দ্রষ্টব্য। রাখাল ভট্টাচার্যর প্রবন্ধটিতে নতুন প্রসঙ্গ নতুন ভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পাঠক নতুন করে ভাববে।

অলিবাবের চিঠি। উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ জগদীশ ভট্টাচার্যের 'রবীন্দ্রনাথ ও সনৎকুমার,' অমলেন্দু চৌধুরীর 'মানবতার বাস্তব মূল্য' এবং শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুনঃ সমীক্ষণের দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী।'

সাহিত্যের খবর। উল্লেখ্য : দ্বিজেন্দ্রলাল নাথের রবীন্দ্র-নাথের নাট্যপ্রতিভা' এবং অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'কাব্য-নাট্য'। শেষোক্ত রচনাটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হওয়ায় মনে হয় লেখকের বক্তব্য সম্পূর্ণতা লাভ করে নি। এ প্রসঙ্গে একটি ব্যক্তিগত দিকের উল্লেখ করছি, পাঠক মার্জনা করবেন। ১৯৪৬ সালে বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকায় আমার 'বাংলা কাব্য নাট্যের সম্ভাবনা' নামের একটি প্রবন্ধ-প্রকাশিত

হয়েছিল এবং ঐ একই বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ আমার সমালোচনা গ্রন্থ 'সময় ও সাহিত্য'তে পাওয়া যেতে পারে। বারো-চৌদ্দ বছর আগে যখন বিভিন্ন পত্রিকায় কাব্যনাট্য বিষয়ে লিখেছিলাম তখন অন্তত বাংলাভাষায় আর কোনো লেখকের রচনা আমার নজরে পড়েনি। এতদিন বাদে আবার কাব্যনাট্য রচনা এবং কাব্যনাটক বিষয়ে আলোচনার যে সূত্রপাত হয়েছে তা থেকে মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে সার্থক বাংলা কাব্যনাট্য কেউ-কেউ লিখতে পারবেন।

দেশ। বিশ্বভারতী পত্রিকা। অমৃত। এই তিনটি সুপ্রতিষ্ঠিত পত্রিকার মধ্যে 'দেশ' এবছর সাহিত্য-সংখ্যা না হয়ে 'রবীন্দ্র শতবর্ষপূর্তি ১৩৬৯' রূপে প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্র-সাহিত্য ও রবীন্দ্র-জীবনী সম্পর্কে গবেষণারত ছাত্র ও লেখকের পক্ষে এই সংখ্যাটি সমগ্রভাবেই মূল্যবান। বিশেষ করে পঠিতব্য বুদ্ধদেব বসুর 'রবীন্দ্রনাথ : বিশ্বকবি ও বাঙালি' এবং বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রচিত্রকলায় শিল্প-প্রেরণা'। রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তর 'শতবার্ষিকী বৎসরের রবীন্দ্রচর্চা' আলোচনায় ১৯৬১ সালের শতবার্ষিকী উৎসবের পটভূমিকায় প্রকাশিত নানা গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের আভাস পাওয়া গেল। বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধ গত বছর বাঙালী পাঠককে ভীষণভাবেই নাড়া দিয়েছিল। এ বছরের প্রবন্ধটিও পাঠককে ভাবায় সুক্ষ কিন্তু অভিভূত করবে। রবীন্দ্রনাথ, তাঁর বিবেচনায়, সাম্প্রতিক কালে প্রতীচ্যের কাছে বিস্মৃত ও মৃত এবং বাঙালীর কাছে "চিন্তাহীন ভাবালুতায় আজ আবৃত তিনি, এক বিগ্রহ, তাঁর মাতৃভূমির নব্যতম 'অবতার'।" বৈশাখ-আষাঢ় (১৩৬৯) বিশ্বভারতী পত্রিকাও এবছর রবীন্দ্রচর্চায় সমৃদ্ধ। কয়েকটি উল্লেখ-যোগ্য প্রবন্ধ : 'রবীন্দ্রনাথ ও বাঙলার জাতীয় জীবন' (শশিভূষণ দাশগুপ্ত), 'ঠাকুর পরিবারের আদিপর্ব ও সেকালের সমাজ' (বিনয় ঘোষ), 'রবীন্দ্রকাব্যে বিজ্ঞান' (বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য)। এছাড়া উল্লেখ্য 'বিংশ শতাব্দীর কাব্যসূচনা' (ভবতোষ দত্ত), 'রবীন্দ্রবিকাশে পরিচয় ও পরিবেশ' (কুমার সেন)। কিন্তু অন্যান্য লেখক যাঁদের নামোল্লেখ করা গেল না তাঁদের রচনাও পড়বার এবং অনুধাবন করবার উপকরণ প্রচুর একথা বলা বাহুল্য। 'অমৃত' পত্রিকার বার্ষিক সংখ্যায়ও প্রেমেন্দ্র মিত্র, লীলা মজুমদার, পরিমল গোস্বামী, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ মিত্র, ভবানী মুখোপাধ্যায় ও সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু সবগুলো লেখা সমান সমৃদ্ধ একথা বলা যায় না। হরপ্রসাদ মিত্রের 'বাংলা কবিতার সাম্প্রতিক আসর' প্রবন্ধটিতে তাড়াহুড়োর ছাপ স্পষ্ট। পড়ে হতাশ হতে হলো। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সাম্প্রতিক বাংলা ছোটগল্প' সুলিখিত। অন্যান্য রচনা চলনসই।

উত্তরসূরী। অরুণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত এই পরিচ্ছন্ন পত্রিকাটির প্রবন্ধ ও কবিতাই আকর্ষণ। গল্প কিংবা উপন্যাস না ছেপেও যে সাহিত্যপত্র প্রকাশ করা যায় এই পত্রিকাটি তার অন্যতম দৃষ্টান্ত। সমকালীন ও বিশ্বভারতী পত্রিকারও এই বিশেষত্ব, আগেই বলা হয়েছে। উত্তরসূরীর বর্তমান বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যায় অরুণ মুখোপাধ্যায়ের 'বিশুদ্ধ শিল্পের স্বভাব ও সমস্যা' এবং লোকনাথ ভট্টাচার্যর 'তিনজন ফরাসী কবি, যাঁরা আমাদেরও' চিন্তাশীলতায় সমৃদ্ধ। এছাড়া, অমিয়ভূষণ মজুমদার প্রকাশ করেছেন তাঁর 'সাহিত্যের ধারণা'। রোঁমা গ্যারীর 'অশিষ্টতা আচরণবোধ ও আধুনিক সভ্যতা', অনুবাদ হলেও (সৌম্যেন বন্দ্যোপাধ্যায়কৃত) চিত্তগ্রাহী। গ্যারী একজন সুপ্রতিষ্ঠ ফরাসী ঔপন্যাসিক এবং 'দি রুটস্ অব্ হেভন্' উপন্যাসের লেখকরূপে সম্মানিত। আলোচ্য প্রবন্ধে গ্যারী 'শিষ্টাচারিতার প্রতি শ্রদ্ধাবান হওয়ার যে হৃদয়স্পর্শী আবেদন করেছেন' তার প্রকাশ সময়োচিত হয়েছে, বলা বাহুল্য।

জয়শ্রী। বাংলাদেশে পরিচ্ছন্ন রুচির, মার্জিত চিন্তা-সমৃদ্ধ যে অল্প কয়েকটি সাহিত্যপত্র এখন পর্যন্ত সৎসাহিত্য

সৃষ্টির নবনব প্রয়াসকে যত্নের সঙ্গে লালন করছে চতুষ্পী পত্রিকা। শুধু তাদের অন্যতমই নয়, ত্রিশের বছরেরও অধিককাল ধরে প্রকাশিত এই পত্রিকাটি ইতিমধ্যেই এমন একটি ঐতিহ্যের সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে যা একান্তই তার নিজস্ব। এ বছরের বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত বিভিন্ন ধরণের রচনায়ও এই দিক থেকে উল্লেখযোগ্য স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ রায়ের 'রবীন্দ্র উপন্যাসের নানা প্রসঙ্গ', অমূল বসুর 'ফরাসী কবিতায় ঘনালোক ও আধুনিক কাব্যের প্রযুক্তি' 'হরপ্রসাদ মিত্রের 'রবীন্দ্রনাথের বঙ্কিম-সমালোচনা' সুনীল বিহারী ঘোষের 'প্রাচ্যের সংস্কৃতি দূত পার্লবাক' নিঃসন্দেহেই বর্তমান সাহিত্যসংখ্যার শ্রীবৃদ্ধি করেছে। এছাড়াও আলোচনা বিভাগে এমন কয়েকটি রচনা স্থান পেয়েছে যেগুলো সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ে যুগোপযোগী চিন্তাধারার পরিচয় বহন করছে। যে-সময়ে অনেক পুরাতন মাসিক-পত্রিকা তাদের শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যের গৌরব সত্ত্বেও সম্প্রতি স্বাদহীন বর্ণহীন গতানুগতিকতায় নিমজ্জিত ঠিক সেই সময়েই 'চতুষ্পী' এই সংখ্যাটি হাতে পেয়ে রুচিবান পাঠক সুখী হবে।

নববর্ষের পরিশিষ্ট

সবগুলো পত্রিকার উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধের সংখ্যা কম নয়। আধুনিক পাঠকেরও সময় কম, তাড়াহুড়োর মধ্যেই পড়া-শোনা। সুতরাং এমন কেউ যদি থাকেন যিনি নিজে একটু বসে নিয়ে পড়বেন এবং বাংলা সাময়িকপত্র থেকে উল্লেখযোগ্য ও তাৎপর্যময় রচনাগুলো চিহ্নিত করবেন তাহলে সাধারণভাবে পাঠকমাত্রেরই সুবিধে। 'পাঠকের দৃষ্টিকোণ' অংশটি এই দিক থেকে কিছুটা প্রয়োজনীয় মনে হতে পারে। পরবর্তী কোনো কোনো সংখ্যায় গল্প উপন্যাস, কবিতা কিংবা নাট্যসাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে মাঝে মাঝে কেউ কেউ আলোচনায় অগ্রসর হবেন আশাকরি এরূপ প্রত্যাশা একেবারে অপূর্ণ থাকবে না।

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

অমিয় চক্রবর্তী

"... কাব্যসৃষ্টির একটা দিক প্রত্যহ জীবনকে স্পর্শ করে, আরেক দিকে তার ভূমিকা নিত্য সূর্যালোকে অধিষ্ঠিত—আপনার কবিতায় এই দুই দিকেরই পরিচয় পেলাম।... কবিতা উভচর এবং বহুচর—অতি সূক্ষ্ম সামঞ্জস্যেই তার প্রাণ। আপনার কবিতায় সেই প্রাণের সন্ধান পেয়েছি।... পৃথিবীকে আপনি স্পষ্ট চোখে দেখেছেন—এ বড়ো আশ্চর্য দেখা।"

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

"...আমি আপনার কবিতার অনুরাগী; এবং ইতিমধ্যে আপনার সহজ প্রতিভা যে অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিরন্তর পরিণতির দিকে এগোচ্ছে তা আমি বারংবার লক্ষ্য করেছি।...আমি এই রকম সচল মনীষার পক্ষপাতী, এবং হয়তো তাই আপনার লেখা আমাকে এতটা টানে। আমার মতে আধুনিক বাঙালী কবিদের মধ্যে যাঁরা ভবিষ্যতেও সাধুবাদ পাবেন, আপনি তাঁদের অন্যতম।...

অন্নদাশঙ্কর রায়

"...আপনার কবিতাগুলিতে প্রকৃত কাব্যরসের স্বাদ পাওয়া যায়, আপনার মূল্যবোধও সুস্থ মানুষের।"

এই কবির নতুন কাব্যগ্রন্থ

১৫ই আষাঢ় প্রকাশিত হয়েছে **দিনলিপন** দাম দু'টাকা

খা লি চো খে

[মতামতের জন্য কেবলমাত্র লেখক দায়ী]

এই পর্যায়ের প্রবন্ধগুলি মূলতঃ বিভিন্ন বিষয়ে চিন্তাশীল ব্যক্তিদেরকে প্রকাশ। এখানে 'খালি চোখে' আজকে বর্তমান ভারতের কয়েকটি তীব্র সমস্যা সম্পর্কে বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ডাঃ সরোজেন্দ্রনাথ রায়ের সমালোচনা।

সম্পাদিকা : প্রভা

উড়ের লড়াই

আমাদের দেশে আমাদের প্রতিবেশী উড়িষ্যাদের সম্বন্ধে একটা গল্প প্রচলিত আছে তা হচ্ছে যে উড়িয়ারা যখন ঝগড়া আরম্ভ করে তখন পরস্পরকে অকথ্য গালাগালি করে, কিন্তু যে ক্ষেত্রে অন্যেরা এগিয়ে গিয়ে মারামারি করে সেক্ষেত্রে উড়িয়ারা মারিবি, মুই মারিকিরি পকড়াই দিব" বলতে বলতে আস্তিন গুটিয়ে পিছে হটতে থাকে। কথাটা কতখানি সত্য বা মিথ্যা বর্তমান ক্ষেত্রে তা আমাদের বিচার্য্য নয়। আমাদের বক্তব্য বিষয় হচ্ছে যে ভারতীয় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই উড়িয়ার লড়াই চলছে। আমাদের প্রধান মন্ত্রী মুখে একেবারে মহাবীর। সর্বদাই রণং দেহি ভাব। কিন্তু যখন রণের সময় আসে, তখন দেখা গুটিয়ে পিছোতে থাকেন। পাকিস্থান ভারতের সীমানায় হানা দিচ্ছে, ভারতীয় গ্রাম দখল করে বসে আছে, ভারতীয় এলাকা জলে ডুবিয়ে দিচ্ছে। প্রথম প্রথম মন্ত্রী মহাশয় "দেখে নিব" "দেখে নিব" বলে আস্ফালন করেন। তারপরই যখন বীরত্ব দেখাবার সময় আসে তখন এখন বক্তৃতা শুরু করেন যে শুনলে মনে হয়— একি জবাহরলাল নেহরুর কথা না আয়ুব খাঁর কথা? বেরুবাড়ী সম্বন্ধে তাঁর উক্তি আমরা এখনও ভুলিনি, সম্প্রতি জলপাইগুড়ি জেলায় দাইখাটা, কর্ণফুলি বাঁধ, ও পরিশেষে খালদহ ও পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের দুরবস্থা ও তাদের দেশত্যাগ সম্বন্ধে তাঁর যে সব সাফাই গান চলছে। তা নিতান্ত কাপুরুষোচিত উক্তি। ভারতের ন্যায় একটা গৌরবময় বিশাল দেশের প্রধান মন্ত্রীর উপযুক্ত নয়। অনেক সময় মনে হয় তিনি বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য উদাসীন। তিনি সেদিন লোকসভায় পূর্ব পাকিস্থানে হিন্দুদের দুরবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বলে বসলেন যে পূর্ব বঙ্গে এখনও বহু হিন্দুর বাস। তারা যদি সংঘবদ্ধ হয় তবে তারা সকল অত্যাচারের সম্মুখীন হতে পারে ও সসম্মানে সেখানে বাস করতে পারে। এটা যে কতখানি মিথ্যা মন্তব্য তা যাদের কিছুমাত্র কাণ্ডজ্ঞান আছে তারা বুঝতে পারে। পূর্ববঙ্গে বর্তমানে ৮০ বা ৯০ লক্ষ হিন্দু আছে, একথা সত্য। এই সংখ্যক হিন্দু বা এদের এক চতুর্থাংশ এমন কি এক দশমাংশও যদি এক জায়গায় বাস করত তবে আত্মরক্ষা সম্ভবপর হত। কিন্তু মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন না যে পূর্ববঙ্গে ১০।২০ গ্রাম মুসলমানের ঘন বসতির মধ্যে দুই একশ হিন্দু বাস করে, এবং এই মুসলমানেরা যখন উত্তেজিত হয় তখন এই অল্পসংখ্যক হিন্দুর আত্মরক্ষার কোন উপায় থাকে না। একথা যিনি জানেন না তাঁর পক্ষে নীরব থাকাই উচিত। জবাহর লালজী মূর্খ

নন। তিনি সব কথাই জানেন। আমার মনে হয় দায়িত্ব এড়াবার জন্যই তিনি এসব কথা বলে থাকেন। জ্ঞান পাপীদের ধর্মকথা কে শেখাবে?

চীন সম্বন্ধেও প্রধান মন্ত্রী মহাশয় উড়িয়ার লড়াই খেলেছেন। কিছুদিন ধরে খুব গরম গরম বক্তৃতা চলল। হুঁশিয়ার করে বলতে লাগলেন—সূচাগ্র ভূমি দিব না। এখন আবার তিনি চীনাদের মনোভাব বুঝতে আরম্ভ করেছেন ও চীনাদের হয়ে সাফাই গাইতে আরম্ভ করেছেন। উনি বুঝে ফেলেছেন যে চীনাদের মনে শান্তির ভাব বিরাজ করছে। তাঁর নিজের গরম কথা যেন শুধু মুখরক্ষার ব্যাপার, চীনাদেরও তাই। গরম কথা শুনে আসল মনোভাব বুঝা যায় না। শ্রীরাধিকার কপট ক্রোধ দেখে শ্রীকৃষ্ণ বুঝেছিলেন যে এ প্রেমেরই একটা উল্টা রূপ। শ্রীজবাহর ভাই শ্রীচৌয়েনের হাসি দেখে বুঝেছেন যে এও একটা প্রেমেরই লীলা খেলা। তিনি অসাধারণ মনোবিজ্ঞানী। যদি কোন মূর্খ ভাবে যে এও দায়িত্ব এড়াবার আর একটি কৌশল তবে তা নিতান্ত বিকৃত মনের পরিচয়। মোট কথা ভারতের কুরুক্ষেত্রে বর্তমানে তথাকথিত "উটের লড়াই" চলছে।

•দিল্লীতে পরমাণবিক যুদ্ধ বিরোধী মহাসভা।

গত ১৮ই জুন হতে ১৮ই জুন পর্যন্ত দিল্লীতে একটি পরমাণবিক যুদ্ধ বিরোধী সভার অধিবেশন হয়ে গেল। ভূতপূর্ব্ব রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ এই অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন। জুন মাসের দিল্লী। আঁধির ধূলায় বাতাস তারাক্রান্ত। সভাপতি মহাশয় হাঁপানীর রোগী। বিষয় গুরুতর। ভারতবর্ষ দরিদ্র দেশ। বিজ্ঞানে অতি অনগ্রসর। তাঁর এমন কোন বন্ধু নাই যে তার বেনামীতে দুএকটা হাউই ছোড়ে যেমন পাকিস্তানে আমেরিকা ছুড়েছিল রাশিয়াকে (ও কতকটা ভারতবর্ষকেও) ভয় দেখাবার জন্য। যাহোক বড় বড় বক্তার সমাবেশ হয়েছিল। আমেরিকার মার্কিন, জার্মানীর পাদ্রী নীমোলার, ফ্রান্সের পাদ্রী শিয়েরে, ইটালীর ডনিলো ডলচি প্রভৃতি। ভারতবর্ষের কয়েকজন বক্তা ছিলেন যথা—রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ, ভূতপূর্ব্ব বড়লাট রাজাগোপালাচারী, প্রধানমন্ত্রী জবাহরলাল, কৃপালনী, দেশমুখ, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব উপাচার্য্য ডি, কে, আর ডি, রাও প্রমুখ। দুজন কমবক্তাও এঁদের মধ্যে ছিলেন: বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের অধ্যক্ষ মন্ত্রভাষী কোঠারী ও দিল্লী স্কুল অব ইকনমিকসে অধ্যাপক বীরেন গাঙ্গুলী। ভারতবর্ষের হাউই নাই। কিন্তু জুন মাসের উত্তাপে সকল জিনিষ হাউইর মত ছুটেছিল। ভূতপূর্ব্ব রাষ্ট্রপতি ভারতকে একক নিরস্ত্রীকরণের পরামর্শ দিয়ে সভাপতির গুরুদায়িত্ব পালন করলেন। পাটলীপুত্রের "দেবানাং প্রিয় পিয়াদসী" অশোক যেন আবার এই বিংশ শতাব্দীতে সশরীরে দিল্লীতে দেখা দিলেন। বেশ হল। কিন্তু কথা হচ্ছে ভারতের নিরস্ত্রীকরণের অর্থ কি? থাকবার মধ্যেতো আছে কয়েকটা মর্চেপড়া তলোয়ার, ভাঙ্গা চাল ও বাঁশের লাঠি—দুয়েকটা ছুটো নৌকা। গান্ধীবাদীরা যখন শান্তির কথা বলেন তখন তাঁরা শান্তির অর্থ কি বোঝেন তা আমরা জানিনা। সকল শস্ত্রে শস্ত্রিমান রুশ ও আমেরিকা যখন শান্তির কথা বলেন তখন তা আমরা কতকটা বুঝতে পারি, কেননা একমাত্র শক্তিশালী বীরেরাই শান্তির কথা বলতে পারেন। দুর্ব্বল কাপুরুষদের মুখে শান্তির বাণী হাস্যজনক। ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ রাষ্ট্রপতি থাকবার সময়েই ভারতবর্ষ পৃথিবীর সর্ব্বত্র অস্ত্রের সন্ধানে ঘুরেছে। সম্পূর্ণ কৃতকার্য হয় নি। দুই প্রবল পরাক্রান্ত শক্তি ভারতবর্ষের বুক লক্ষ করে সঙ্গীন উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। দিল্লীর বক্তাগণ সেই নিদারুণ সত্যকে যেন দেখতেই পেলেন না। তাঁদের স্বপন-বিলাসী কল্পনা চলে গেল ইউরোপ আমেরিকার দিকে। তাঁরা কি ইতিহাসের মহাসত্যটীকেও ভুলে গেলেন? যে অশোকের পচা নকল তাঁরা করেছেন সেই অশোকের ইতিহাস আমাদের সাবধান করে দিচ্ছে। সম্রাট অশোক যখন 'যুদ্ধঘোষের

পরিবর্তে 'বন্ধুযোষ' প্রচার করতে লাগলেন তখনই ভারতের পশ্চিম সীমান্তে বাহ্লীক, শক ও হূনের দল ভারতের রত্নভাণ্ডার লুণ্ঠনের জন্য প্রস্তুত হতে লাগল। যেই অশোকের রাজ্যের অবসান হল সেই তারা দলে দলে ভারতের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সেই সব শক হূনের বংশধরগণ আবার ভারত লুণ্ঠনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। তাঁরা কি সে সত্য দেখেও দেখছেন না?

তাছাড়া পরমাণবিক অস্ত্রব্যবহারের বিরুদ্ধে অভিযান কতকটা বোঝা যায়। কিন্তু পরমাণবিক আবিষ্কারের বিরুদ্ধাচরণ করা কতখানি সমীচীন তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। যে উদ্দেশ্যেই পরমাণবিক গবেষণা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হোক, তার ফলে আমরা একটী বিরাট সম্ভাবনার সম্মুখীন হয়েছি। অদ্ভুত পূর্ব্বও কল্পনার অতীত সত্য সকল আমাদের অধিগত হচ্ছে। সৌরমণ্ডলের অপূর্ব্ব রহস্য সকল ক্রমেই উদ্ঘাটিত হচ্ছে। চন্দ্র সূর্য্য প্রতিবেশী হয়ে পড়ছে। পুরাতন পৃথিবীর জীর্ণ মানব নূতন আশায় উদ্বোধিত হয়ে উঠছে। শুধু তাই নয়। ধ্বংসাত্মক অস্ত্র যেমন রচিত হচ্ছে তার প্রতিষেধক অস্ত্রও আবিষ্কৃত হচ্ছে। জৈব বিজ্ঞানের অসাধারণ প্রগতি হচ্ছে। একদিকে মানুষ যেমন ধ্বংসের ভয়ে ভীত অপর দিকে তার আশারও শেষ নাই। এইরূপ একটি যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আমরা কতকগুলি প্রচারের শূন্য বোকবাক্যে মুগ্ধ হয়ে থাকতে পারিনা। শীতার দেশের লোকের শান্তির কথা বলবার সময় একটু সাবধান হওয়া উচিত। নিরর্থক ভাবপ্রবণতা অতি ক্ষুদ্র।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্রতা

কিছুদিন পূর্ব্বে কলকাতায় মেডিক্যাল ছাত্রগণ জোট বেঁধে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্যের কামরা ঘেরাও করে ও সাত ঘণ্টা তাঁকে সেই ঘরে আটক রাখে। তিনি নাকি তৃষ্ণায় কাতর হয়ে এক গ্লাস জল ভিক্ষা করেন। কিন্তু ছাত্রগণ জল সরবরাহ বন্ধ করে ও উপাচার্য্যমহাশয়ের টেলিফোনের তার কেটে দিয়ে বহির্জগতের সঙ্গে তাঁকে বিচ্ছিন্ন করে। এই অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য কোন কর্ম্মচারী কর্তৃক আহূত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিস আসে ও একটী অতি অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি সংঘটিত হয়। কারণ যাই হোক পুলিশ ছাত্রদের উপর লাঠি চালায় ও বহু ছাত্র গুরুতর ভাবে আহত হয় ও অনেক ছাত্র গ্রেপ্তার হয়। এই ঘটনাটী কোন পক্ষের পক্ষেই গৌরবজনক নয় ও অতিশয় ক্লেশদায়ক। ছাত্রদের দাবী যৎসামান্য। পরীক্ষার দিন পিছানোর জন্য দাবী। কারণ বই শেষ হয়নি। এইরূপ দাবী নাকি কয়েক বৎসর হতেই করা হচ্ছে ও কর্তৃপক্ষ নাকি প্রতি বৎসরই পরীক্ষার দিন পিছিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং এ ব্যাপারটী মেডিক্যাল ছাত্রদের একটি স্থায়ী দাবীর মধ্যে পরিণত হয়েছে। এই দাবী না মানতে পারলে ছাত্র ইউনিয়নগুলির ইজ্জত থাকেনা; সুতরাং এই পিছানোর ফলাফল কি হবে তা বর্ত্তব্য নয়। পিছানোটিই হল আসল বাহাদুরী। পিছালে যে ফল খারাপ হয় তাও পরে বোঝা গেল। যখন সত্যিই পিছিয়ে গেল তখন ছাত্রেরা পরীক্ষার তারিখ ঐগোবার জন্য ডাঃ রায়ের কাছে দরবার করতে লাগল ও শ্যামবাজারের চৌমাথায় দাঁড়িয়ে পথচারীদের সই নিতে লাগল। এইরূপে যা ক্লেশকর ছিল তা প্রহসনে পরিণত হল।

এই সম্পর্কে একটী প্রশ্ন উঠেছে: বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কেন পুলিশ ডাকলেন? এর দ্বারা ঐ পবিত্র প্রতিষ্ঠানের পবিত্রতা নষ্ট হল না কি? দেশ যখন বিদেশীর পদতলে ছিল তখন এমন ঘটনা ঘটলে সকলেই বিনা দ্বিধায় বলত যে বাঁ পবিত্রতা নষ্ট হয়েছে। কিন্তু পুলিশ এখন আমাদের ভৃত্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য থেকে পথের ভিখারী সকল ব্যক্তিই অত্যাচারীর হাত হতে বাঁচতে হলে পুলিশের শরণাপন্ন হবে। এটা তার জন্মগত অধিকার। যে-সরকার বিপদে তাকে রক্ষা করতে পারে না, সে সরকার নিতান্তই অবহেলার পাত্র। গুরু শিষ্যের মধুর সম্পর্কের কথাও এসব ক্ষেত্রে শোনা

যায়। যে শিষ্যেরা গুরুর প্রতি শ্রদ্ধাবান নয়, যারা দল বেঁধে তাঁকে অপমান করছে তারা কি শিষ্যের যোগ্য না গুরুর স্নেহের অধিকারী? শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম্। অপর পক্ষে যেখানে শ্রদ্ধা নাই সেখানে পাওয়া যায় অভিশাপ। যুদ্ধের ন্যায় প্রেমবিতরণ গুরুর কার্য নয়. গুরু প্রেম দিবে. কিন্তু আবশ্যক হলে শাসনও করবে। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র এই কথাই বলেছে।

তারপর বিদ্যালয় বা মন্দিরের পবিত্রতার অর্থ কি? এই পবিত্রবোধ কি শ্রদ্ধাভক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়? এই পবিত্রতা রক্ষার দায়িত্ব পুরোহিত ও উপাসক উভয়েরই। যদি উভয় পক্ষের দেবতার প্রতি ভক্তি না থাকে তবে সে পবিত্রতা কখনও রক্ষা করা সম্ভব হয় না। ছাত্রেরা যদি দল বেঁধে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে, কার্যে ও বাক্যে উপাচার্যকে অপমান করে, যদি তারা অসামাজিক কার্যে লিপ্ত হয়, তবে সে পবিত্রতা কে নষ্ট করল? যখন মসজিদে নমাজের পরিবর্তে উপাসকগণ লাঠি-সোটা নিয়ে সমাজসংস্কারের কার্যের জন্য সমবেত হয় তখন কি মসজিদের পবিত্রতা থাকে? যখন অন্তঃপুরের গুরুদ্বারে মাষ্টার তারা সিংহের দল দেশদ্রোহিতা বা অন্য প্রকারের ধ্বংসাত্মক কার্যের জন্য গুপ্তপরামর্শ করেন তখন কি আর তা মন্দির থাকে? সুতরাং আবার বলি মন্দির বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্রতা রক্ষার দায়িত্ব দুই পক্ষের। সে পবিত্রতা যখন নষ্ট হয় তখন তা আর মন্দির বা বিশ্ববিদ্যালয় থাকে না তখন শান্তিরক্ষার দায়িত্ব পুলিসের হাতে চলে যায়ই। আমরা সেই উদ্দেশ্যেই পুলিসকে বেতন দিই।

২৭।৬।৪২ সরোজেন্দ্র নাথ রায়

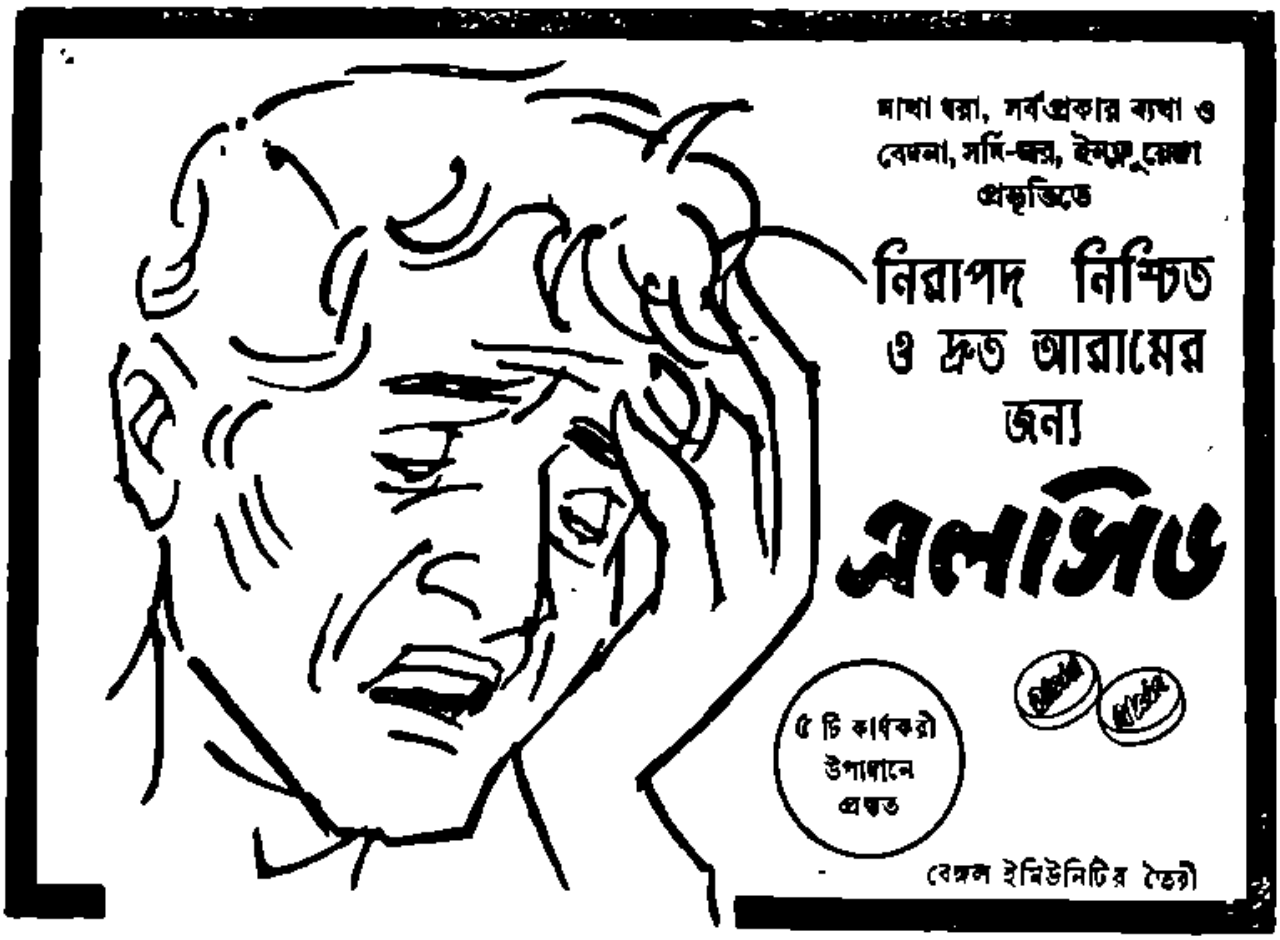

পুস্তকপরিচয়

রবীন্দ্রনাথ : শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত : শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির, কলিকাতা-১২

দাম : ৩·৫০

১৩৪৯ সালে শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্তের 'রবীন্দ্রনাথ' বইখানি প্রথম ছাপা হয় ; ১৩৫৮তে দ্বিতীয় বার ছাপতে হয় ; অতঃপর ১৩৬৮তে রবীন্দ্র-শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে এই পরিবর্ধিত সংস্করণ বেরিয়েছে। এই নতুন সংস্করণে মোট ষোলটি অধ্যায়ের বিষয়-সূচী এই : শিল্পী রবীন্দ্রনাথ ; রবীন্দ্রনাথ ও দুঃখবাদ ; রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিকতা—যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে মোট দুটি আলোচনা ; রবীন্দ্রনাথের ভাষা ; দূরের যাত্রী রবীন্দ্রনাথ : রবীন্দ্র-প্রতিভার ধারা ; অদ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথ ; রবীন্দ্রনাথ ও নটরাজ-অভিসার ; শেষের রবীন্দ্রনাথ ; বাংলা ও ইংরেজী রবীন্দ্রনাথ ; কবিপরিণতি ; রবীন্দ্রনাথের উত্তরপক্ষ ; রবীন্দ্রনাথে তুমি ও আমি ; রবীন্দ্রনাথের একপদী কবিতা ; এবং—রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দ।

এই ষোলটি প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যে উপলব্ধি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তা' ভাষায় প্রকাশ ক'রতে হ'লে বলতে হয় যে, নলিনীকান্ত খুঁজেছেন রবীন্দ্রনাথের 'অন্তর-পুরুষ রূপকার' ;—সত্য ও মঙ্গলকে তিনি সৌন্দর্যের সাধক হিসেবেই বরণ করে নিয়েছিলেন ;—'সাধজন্ত, সমন্বয়, হৃদয়পতি, প্রসন্নতা, নির্মলতা, প্রশান্তি'—এইসব বোধের মধ্যেই সৌন্দর্যবোধের অভিব্যক্তি ; তিনি দুঃখবাদী নন, উপনিষদের ঋষিবাক্যে তাঁর গভীর বিশ্বাস—আনন্দবাদী তিনি ; 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—উপনিষদের এই সর্বব্রহ্মবাদে তাঁর প্রত্যয় ছিল ; বিশ্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংমিশ্রণে তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ,—এই বিশেষ আগ্রহেই তিনি বিশিষ্টভাবে 'আধুনিক'—'দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি সেই দেশ সব খুঁজিয়া'—এই হোলো আধুনিকতার আদর্শ। পার্থিব ও অপার্থিব, দেহ ও আত্মা, ভাব ও রূপ সেই উপলব্ধিতে সম্মিলিত। সর্বপ্রাণবাদ বা ঐ ধরনের কোনো কথা দিয়ে তাঁর প্রাণ-বন্দনার ভাবটি ধরা যেতে পারে। তাঁর কথা—'ডুব দিয়ে এই প্রাণ-সাগরে—নিতেছি প্রাণ বক্ষ ভরে'। নলিনীকান্ত তাঁর মধ্যে দেখেছেন 'পুরাণী প্রজ্ঞা'র প্রকাশ,—যার ফলে সাম্প্রতিক ভাবুকের সঙ্গেও চিরন্তনকে তিনি মেলাতে পেরেছেন। ঈষৎ পার্শ্বিকতার আশ্রয় অবলম্বন করে লেখক বলেছেন—'রবীন্দ্রনাথ জ্ঞানের দিক দিয়ে হয়ত বৈশ্বাস্তিক,—কিন্তু অনুভবের, চিত্তরাগের, রসবৈদগ্ধের দিক দিয়ে হলেন—বলা যেতে পারে Pagan—মূর্তি-উপাসক। তাঁর অন্তশ্চেতনার এই ভাবটিই তাঁকে অতিমাত্রা থেকে রক্ষা করেছে—যতই তিনি গতিপন্থী হোন না, চঞ্চলের মধ্যে স্থানু যে রয়, তার সঙ্গে তাঁর নিত্যসংযোগ বজায় রেখেছে।' ইংরাজি 'Quest' শব্দটির প্রতিশব্দ 'আপৃহা'। সেই 'আপৃহা' কথাটি প্রয়োগ করে নলিনীকান্ত বলেছেন যে, রবীন্দ্রনাথের আপৃহা বিশ্লেষণ করে দেখলে একদিকে পাশ্চাত্য ভঙ্গির ঘুরাবেষণ, অন্যদিকে বেদান্তের অরূপ-সন্ধান—এই দুয়ের অপরূপ রসায়ন অনুভব করা যায়। শেলীর সঙ্গেও তাঁর মিল আছে,—বের্গসঁর 'elan vital' তত্ত্বের ও প্রতিধ্বনি আছে তাঁর কাব্যে,—আবার উপনিষদের অনুভূতিতেও তিনি নিমগ্নমনা। আদি-পর্বের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' থেকে 'বলাকা'র

—'নক্ষত্রের পাখার স্পন্দনে—চমকিছে অন্ধকার আলোর ক্রন্দনে'—এবং আরো পরের কাব্য-প্রবাহেও সেই আশ্চর্য দ্বন্দ্বাবেগ : স্বর্গাবেগ। উপনিষদের ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার,—বৈষ্ণব ভাবের প্রেমদর্বস্বতা,—বাউলের সহজপন্থা,—রবীন্দ্রভাব-পুরুষে ভারতবর্ষের এই বিচিত্র আশ্চর্য এসে মিলেছে। সেই দিকে নজর রেখেই নলিনীকান্ত রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-প্রেমের প্রসঙ্গ ধরেছেন,—তৎসূত্রে কালিদাসের 'ভাবস্থিরতায়' এগিয়ে গিয়ে মানবতা, যুক্তিবাদ, অনন্তবোধ,—এই তিনের অন্বয় দেখবার চেষ্টা করেছেন। মুক্তিদাতা মৃত্যুর কথা উঠেছে অতঃপর। রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত লাইনগুলি তুলে দিয়েছেন লেখক - 'তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি বিচিত্র ছলনাজালে, হে ছলনাময়ী।' আর্নল্ডের 'eternal note of sadness,'—শেক্‌স্‌পীয়রের 'And in this harsh world draw thy breath in pain'—এইসব ধ্বনি-প্রতিধ্বনি দেখা দিয়েছে অনিবার্য অনুষঙ্গজালে! তাঁর শেষ পর্বের অন্যতম শিল্পবাহন চিত্রাঙ্কণের কথা উঠেছে। চকিতে নলিনীকান্ত জানিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সৌন্দর্যের তিলোত্তমা, কিন্তু তাঁর ছবিতে 'বিকৃত ভাগ, বিকট ভঙ্গি, মিথ্যা কুহক, বিভীষিকা, ইত্যাদি বাইরের যে অনুরাগ,—তারই স্বরূপ প্রকাশ [পৃঃ ১১০]!

'রবীন্দ্রনাথে তুমি ও আমি' অধ্যায়ে 'ওঁ তৎ সৎ' মন্ত্রের আস্বাদন দেখা দিয়েছে রবীন্দ্র—কবি-ব্যক্তিত্বের বিশ্লেষণ অবলম্বন ক'রে। তাঁর 'অকূলের অধ্যাত্ত আবাস' ইত্যাদি উক্তি ধ'রে একালের পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক মত Existentialism এর [নলিনীকান্ত বঙ্গানুবাদ করেছেন—'ভক্তি-বাদ'] সাদৃশ্য দেখিয়েছেন [পৃঃ ১৪৩]। 'বাংলা ও ইংরেজী রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধটির খুবই সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু যে কারণেই হোক, গুপ্ত মশাই সংক্ষেপে ছেদ টেনেছেন। 'রবীন্দ্রনাথের ভাষা' এবং 'রবীন্দ্রনাথের উত্তরপক্ষ'ও সত্যিই অসম্পূর্ণ মনে হয়। 'রবীন্দ্রনাথের একপদী কবিতা' লেখাটি কৌতূহল-উদ্দীপক। 'রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দ' অতি-সংক্ষিপ্ত, রচনা বটে কিন্তু মূল্যবান।

এই শেষ লেখাটি আরো বিস্তৃত হয়নি ব'লে মনে বিশেষ অতৃপ্তি রয়ে গেল—কারণ, নলিনীকান্ত এ-লেখা যতো বাড়াতে পারতেন, সে-অধিকার সকলের থাকে না। শ্রীযুক্ত সুধাংশু বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই কিছুদিন আগে 'দুই কবি' লিখেছেন। তাতে আস্বাদনের দিকে সত্যি-কার আগ্রহ ছিল। নলিনীকান্তের এই ছোটো প্রবন্ধটিতেও তা আছে। শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর রবীন্দ্র জীবনীতে অরবিন্দ-রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ স্মরণ করেছেন। বিশ শতকের প্রথম দশক চলছিল তখন—সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৈনিক 'বেঙ্গলী', কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের সাপ্তাহিক 'হিতবাদী'—কৃষ্ণকুমার মিত্রের 'সঞ্জীবনী', —মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার সাপ্তাহিক 'নবশক্তি',—কুমুদিনী মিত্রের মাসিক 'সুপ্রভাত' ইত্যাদি নরমপন্থী-গরমপন্থী পত্রিকার সময় সেটা। সেই উত্তেজনার দিনে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ছিলেন। সাপ্তাহিক 'যুগান্তর' আর 'দৈনিক সন্ধ্যা' পত্রিকা ছিল। হরিদাস হালদার 'বন্দেমাতরম' বের ক'রেছিলেন [১ আগষ্ট ১৯০৬]। বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী আর হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষকে নিয়ে ঐ বছরের অক্টোবর থেকে এক সম্পাদক-সংঘ তৈরী হয়, 'বন্দেমাতরম' দৈনিক বের হয়। অরবিন্দ বরোদা থেকে কলকাতায় এসে জাতীয়-শিক্ষাপরিষদের কাজে [ইংরেজির অধ্যাপক] যোগ দিয়েছিলেন। ১৯০৭ এর মার্চ থেকে তিনি ঐ ইংরেজি দৈনিক 'বন্দেমাতরম' এর ভার নেন। সেই পত্রিকার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনা হয়। অরবিন্দের বিরুদ্ধে বিপিন পালকে সাক্ষী খাড়া করা হয়, কিন্তু তাতে অসম্মত হয়ে পাল ছ'মাস কারাবাস স্বীকার করেন। সেই সময়ে, ১৩১৪ সালের ৭ই ভাদ্র রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'নমস্কার' কবিতাটি লিখেছিলেন—'অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার'। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৩এ এপ্রিল প্রথম চৌধুরীকে লেখা এক

চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ নিজে হরিদাস হালদারের লেখা 'গোবর-গণেশের গবেষণা' বইখানির প্রশংসা করেন। সেটা ছিল 'সবুজপত্রের' আমল। রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' লেখা চলছে তখন। নলিনীকান্ত তাঁর এ-বইয়ে সে পর্ব সম্বন্ধে প্রায় নীরব। শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে সেকালের এই খবরটুকু তিনি দিয়েছেন যে ১৯১০ থেকে ১৯১৪ পর্যন্ত শ্রীঅরবিন্দের নির্জন সাধনার কাল. ১৯১৪ থেকে মাসিক 'আর্য' পত্রিকার মারে মারে, পাঁচ-বছর ধ'রে তিনি পার্থিব মানুষের দিব্য জীবন অভিমুখে উপনিষদ্ মতো উদ্ঘাটন করেন; Future poetryতে বিশ্বকাব্যের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার বিশ্লেষণ সূত্রে নবীন অধ্যাত্মচেতনার কবি হিসেবে তিনি রবীন্দ্রনাথের নাম উল্লেখ ক'রে গেছেন! ১৯১৪তে বিশ্বযুদ্ধ বেধে গেল; রবীন্দ্রনাথ তাতে দেখেছিলেন যুগসন্ধির সংকেত,—শ্রীঅরবিন্দ অনুভব করেছিলেন—'অতি-মানবের অবতরণ'-লক্ষণ!

অনেক দিন পরে, ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ-ভারত ভ্রমণসূত্রে রবীন্দ্রনাথ পণ্ডিচেরিতে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তখন এই লেখক নলিনীকান্ত তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার সুযোগ পান। শ্রীমাকে রবীন্দ্রনাথ আগেই চিনতেন—দেখা হয়েছিল জাপানে। একদা রবীন্দ্রনাথ—'মাকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন বিশ্বভারতীর কর্মভার গ্রহণ করতে'। সেই শ্রীমা ঘরকার রবীন্দ্রনাথকে খাগত জানিয়ে শ্রীঅরবিন্দের কাছে নিয়ে যান। ১৩৩৫ সালের শ্রাবণের 'প্রবাসী'তে রবীন্দ্রনাথের সে অভি-জ্ঞতার বৃত্তান্ত বেরিয়েছিল। তাতে রবীন্দ্রনাথ বলেন—'অতি অল্পক্ষণ ছিলুম। তারি মধ্যে মনে হল, তাঁর মধ্যে সহজ প্রেরণাশক্তি পুঞ্জিত। কোনো ঘর-গড়ার মতের উপদেবতার নৈবেদ্যরূপে সত্যের উপলব্ধিকে তিনি খিন্ন ও খর্ব করেননি। তাই তাঁর মুখশ্রীতে এমন সৌন্দর্যময় শান্তি। মধ্যযুগের খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীর কাছে দীক্ষা নিয়ে তিনি জীবনকে রিক্ত শুষ্ক করাকেই চরিতার্থতা বলেননি। আপনার মধ্যে তিনি পিতাপুত্রের এই বাণী অনুভব করেছেন, 'মুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি'। পরিপূর্ণ যোগে সকলেরই মধ্যে প্রবেশা-ধিকার আত্মার শ্রেষ্ঠ অধিকার।...অরবিন্দকে তাঁর যৌবনের মুখে যুক্ত আন্দোলনের মধ্যে যে উপস্থার আসনে দেখেছিলুম সেখানে তাঁকে জানিয়েছি—'অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার'। আজ তাঁকে দেখলুম তাঁর দ্বিতীয় উপস্থার আসনে, অপ্রমত্ত স্তব্ধতায়, আজও তাঁকে মনে মনে ব'লে এলুম, 'অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার'।' তখন 'যোগাযোগ' শেষ হয়েছে—'পথে-প্রবাসে' ভ্রমণকথা আর 'শেষের কবিতা' উপন্যাস দুই-ই তখন লেখা চলছিল।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের ভাবসাদৃশ্য সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার উপযোগিতা আছে। নলিনীকান্ত সেদিকে অগ্রসর হ'লে পাঠকের প্রত্যাশা পরিতৃপ্ত হবে। তবে, এও ঠিক যে ফরমাশ দিয়ে এ-ধরনের লেখা লেখানো যায় না! কোন্ লেখক কোন্ পরিচয় দিয়ে এ-আলোচনায় নামবেন, তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। সাক্ষাৎ সাহিত্য-ভোগের ক্ষেত্র থেকেই একটা কথা মনে জাগে। এই সূত্রে সেটা জানিয়ে রাখা সংগত। 'ঘরে বাইরে', 'গোরা' আর 'চতুরঙ্গ' একই পর্বের লেখা। রাজনীতিচিন্তা আর সমাজচিন্তার বিশেষত্ব আছে 'গোরা'র মধ্যে,—তেমনি 'ঘরে-বাইরে'তেও। 'চতুরঙ্গে' কিন্তু মনোভূমির অন্য অভিমুখিতাই প্রধান। তবু সে-আমলের ভারত-রাজনীতি, ভারত-সমাজ,—তখনকার আন্দোলন,—আর সেই ভূমিকায় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় বা অরবিন্দ ঘোষের মতন অঘটনঘটনপটু ব্যক্তিত্বের যোগসূত্র মনে রাখলে 'চতুরঙ্গের' শচীশ-কে কতকটা যেন চেনা-চেনা মনে হয়! অর্থাৎ,—সোজা কথায়—শচীশ যেন ব্রহ্মবান্ধবের কবিদৃষ্ট প্রতিরূপ - এবং অরবিন্দেরও! এ অনুমান অবান্তর নয় বলেই আমার বিশ্বাস। ধনঞ্জয় বৈরাগীকে গান্ধীজীর প্রতিরূপ এবং তাঁরই আদর্শের পূর্বঘোষণা বলা হয়েছে! কিন্তু ব্রহ্মবান্ধব এখনো কেবল মাত্র 'চার অধ্যায়'-এর সন্ন্যাসবাদ বিরোধিতার

সঙ্গেই জড়িত হয়ে আছেন। অরবিন্দ আর শ্রীঅরবিন্দ—দুই স্বতন্ত্র,—দুই অরবিন্দই রবীন্দ্র-সাহিত্য-পাঠকের চিন্তায় অল্প-পূর্ণ অনুষঙ্গে, কতকটা স্বীনভাবেই দেখা দিয়ে থাকেন। এ দিকটিতে অনতিবিলম্বে আলোকপাত প্রত্যাশিত।

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত গভীর বোধের মানুষ। তাঁর শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কিত নানা প্রবন্ধে সে পরিচয় সংলগ্নভাবে মুদ্রিত। তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ' সে আদর্শের ব্যতিক্রম নয়। 'কবি পরিণতি' প্রবন্ধে অরবিন্দের 'সাবিত্রী' কাব্যের কথা তুলেছেন তিনি। শেক্সপীয়র, ব্রেক, ক্লেস্, আর্থার র‍্যাঁবো ইত্যাদি বিদেশী কবিদের প্রথম দিকের লেখার সঙ্গে এঁদের পরিণত তুলনার চেষ্টা করেছেন তিনি। এবং সেই প্রয়াসের আবশ্যিকতা দেখিয়ে 'পূর্ব-রবীন্দ্রনাথ' আর 'উত্তর-রবীন্দ্রনাথ'—রবীন্দ্র-ব্যক্তিধারার এই দুই প্রান্ত বিচারে তিনি উদ্যোগী হয়েছেন। এই সূত্রে এই-সমালোচকের দ্বিতীয় নিবেদন জানাচ্ছি। তিনি বলতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বে ভাবোচ্ছ্বাস,—দ্বিতীয় পর্বে সে ভাবালুতার বদলে দেখা দিয়েছে নিবিড়তা [উদাহরণ — 'উর্বশী']. তৃতীয় পর্বে 'কবিচিত্তের পরিপূর্ণতা' [যেমন 'বলাকা'য়. 'পূরবী'তে],—চতুর্থ বা শেষ পর্বে পরম নিবৃত্তির সুর শোনা যায়। এই সূত্রেই তিনি শ্রীঅরবিন্দের 'সাবিত্রী' থেকে উদাহরণ তুলে বলেছেন যে, সেখানকার কবিচিত্তগতি ঊর্ধ্বে বা নিম্নে বা সমতলে গতি নয়,—সেখানে 'মানুষী বাক্ ছাড়িয়ে কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন দৈবী বাক্'।

এখন কথাটা এই যে, শ্রীঅরবিন্দের 'সাবিত্রী' 'দৈবী বাক্'—একথা আমাদের মাটির সংসারে বাস ক'রে মাঝে মাঝে উচ্চারিত হ'তে শুনি বটে, কিন্তু সসংকোচে স্বীকার ক'রছি—ও-কথার তাৎপর্য ঠিক বুঝি না! মানুষ মাটিতে বাঁধা, কিন্তু তার নজর তো শুধু মাটিতেই নয়; তার আকাশ আছে, সমুদ্র আছে, অনন্ত দেশ-কালের অশেষ স্বপ্ন অনন্ততা আছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় 'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে' আছে,—আবার, 'হর যেন মর্তের বন্ধন ক্ষয়'—এ কামনাও আছে। দুই-ই সত্য: দুই প্রান্তই প্রত্যক্ষীভূত! কিন্তু 'দৈবী বাক্' কি এই দু'প্রান্তের অতিশায়ী তৃতীয় কিছুর অভিব্যক্তি! নলিনীকান্ত বলেছেন—সেখানে 'কবি আর শুধু কবি নন, হয়ে উঠেছেন ঋষি।' দেশ-কালের অতিশায়ী সে-লোকের স্বরূপ-জিজ্ঞাসা দেখা দিয়েছিল 'সাবিত্রী' কাব্যে—

In the ending of time, in the sinking of space what shall survive ?

এবং এ-প্রশ্নের এই জবাব :

'Nothing ends' !

বোধ হয়, চিরকালের মতো কবির সঙ্গে দার্শনিকের এলাকা ভাগ হয়ে যাবার সীমানা সেটা! 'দৈবী বাক্' কি দার্শনিক মন্তব্য? সে কি কবিস্বভাবের বহির্ভূত কিছু? রবীন্দ্র-কাব্যে কি দৈবী মহিমার স্মারক অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষমা প্রজ্ঞার অভিব্যক্তি ঘটেনি? নলিনীকান্ত এই প্রশ্নটা গ্রহণ করলে উপকৃত হবো।

হরপ্রসাদ মিত্র

উপন্যাস

শ্বেত কপোত, দেবকন্যা ও শাস্তির স্বাক্ষর—শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিনখানি উপন্যাস। যথাক্রমে অভিজিৎ প্রকাশনী, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড ও করুণা প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা, চার টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা ও তিন টাকা।

বাংলা উপন্যাসের বিবেকী পাঠক এই মুহূর্তে বিপন্ন। উপন্যাসের আত্মাহীন প্রচ্ছদ ও প্রশ্ন যতো নয়নসুভগ, বোধ নামক ব্যাপারটি ততোই অনুপস্থিত। তরুণতম লেখককুল পক্ষান্তরে, আঙ্গিক প্রয়োজনে নিটোল কথাবস্তুকে প্রায়শই

বর্জন করতে উদ্যত। ফলত পাঠক দুই শিবিরের দোটানায় বিপর্যস্ত।

সচেতন লেখক শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম কৃতিত্ব, তিনি উপর্যুক্ত দুই শিবিরের যোজকপ্রতিম। এমন কথা বলি না, তাঁর গল্পের বক্তব্যবীর নিরবচ্ছিন্নরূপে অঙ্কিত্র, চিত্তহারী। একথা বলাও সংগত নয় যে তিনি আত্মার প্রয়োজনকে অনিবার্য বলে মানেন। বলা উচিত, তাঁর উপন্যাসের একটি বক্তব্য আছে।

সেই বক্তব্য কি শান্তি? আনন্দ? অথবা সুন্দর? শচীন্দ্রনাথ তাঁর প্রিয় একটি রূপকের সাহায্যে তাঁর বক্তব্যের অনেকখানিই আমাদের কাছে ধরিয়ে দিয়েছেন। শাদা পায়রা সেই নন্দিত রূপক :

১। রৌদ্র করোজ্জ্বল নীল আকাশটা যেন কোনো বিরাট দেবতা, তারি দিকে উড়ে চলেছে বিন্দুর মতো শ্বেত কপোত। (শ্বেত কপোত পৃঃ ১০৬)

২। রাত্রির হাতের তলায় কাঁপছে ভীরু শাদা পায়রা —সেই হাতের উপর পড়ল কুমারের হাত। (দেবকন্যা, পৃঃ ১৩৩)

এই শ্বেতপারাবত নিঃসন্দেহে গৃহীত সেই রূপক—শান্তির। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবো, শুধু প্রচলিত নৈর্ব্যক্তিক তাৎপর্যেই শচীন্দ্রনাথ তাঁর শিল্পরূপকটিকে ব্যবহার করেন নি। যদি তাঁর মৌলিক উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভুল না বুঝে থাকি, তবে তাঁর বক্তব্য অনেকটা এই রকম : একটি সাহসী পারাবত আকাশ থেকে আকাশে অপরিচ্ছন্নযান, সে সবদেশেই আছে, পাত্রে-পাত্রীতে সমানুস্যূত হয়ে রয়েছে, তাকে বিশেষ একটি আধারে সীমাবদ্ধ ক'রে পাবার উপায় নেই। সেই কারণেই, তাঁর চরিত্র প্রধানত পথিক, কখনো-বা সংস্কারমুক্ত অর্থে যাযাবর। সেই চরিত্রের চতুষ্পার্শ্বে নাগরিক সমাজের অভিঘাত থাকলেও তাকে সে তেমোটা মান্য করে না। বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠান তার কাছে কখনোই অত্যাবশ্যক নয়। এবং প্রেম তার কাছে ইন্দ্রিয়স্পৃষ্ট হয়েও অতীন্দ্রিয়ের অভিমুখী। বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় শচীন্দ্রনাথ কতোগুলি প্রোগ্রাম পালনের উদ্দেশ্যেই রচনাকর্মে আত্মনিয়োগ করেছেন : হয়তো সমাজ উন্নয়ন কিম্বা বর্ণভেদলোপই তাঁর কার্যসূচীর অন্যতম অঙ্গ। কিন্তু তার চেয়েও গভীরে তাঁর দৃষ্টি, মানবজন্মের সাফল্যে ও নিরন্তর অতিক্রান্তিতে। যেহেতু এই পায়রা খাঁচাকা নয়, তার ছেড়ে যেতে কষ্ট হয়। কিন্তু মানবী বা মানবের জন্যই তার নিষ্ক্রমণের পথটি প্রস্তুত করে দেয়।

এখানেই শচীন্দ্রনাথের সাফল্য ও ব্যর্থতা। তাঁর মাথার উপরে যদিও একটি আকাশ রয়েছে, পায়ের নিচে সত্যিকার একটি মাটি নেই। একদিকে তিনি যেন ভৌগলিক সীমান্ত বাড়িয়ে চলেন, অন্যদিকে ভৌম সংস্পর্শের অভাবে তাঁর চরিত্র তাতেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তিনি যে তাঁর চরিত্রকে শোচনীয়ভাবে অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত করেছেন তার রহস্য এখানেই। তাঁকে আধুনিক বলা যায় না এই রক্তমাংসের স্থানাগত বাস্তবতার অভাবে। আদর্শবিদ্ধ তাঁর নায়ক চরিত্র হয়তো একটি হীনঘানী প্রমুক্তি পেয়ে যায়, কিন্তু পাঠকের কাছে সেই মুক্তি-মার্গ সন্দেহ উদ্রেক করতে থাকে।

আসল কথা, শচীন্দ্রনাথ সন্ধানী শিল্পী। তাই তাঁর মন প্রাগাধুনিক রচনাপদ্ধতিতে সন্তুষ্ট নয়, আবার উগ্র আধুনিকতার আড়ম্বরেও শঙ্কিত। তিনি যে দুর্যোগ ঘনি অতিক্রম ক'রে বৃহত্তর পাঠকের অন্তরঙ্গতা লাভ করবেন সে বিষয়ে আমাদের সংশয় নেই। কিন্তু সেজন্য তাঁকে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়ে নিজস্ব পৌরভবনে ফিরতে হবে, কেন না 'the point of excursion is home'. তাঁর ফিরে-আসার পথেই আমরা তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্য অপেক্ষা করে থাকবো।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

শ্রদ্ধাঞ্জলির কবিতা

তেমায় কী দিয়ে বরণ করি—শান্তশীল দাশ।

প্রকাশক গোপাল চন্দ্র রায় সাহিত্যসদন, এ-১২৫ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা ১২। এক টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা।

সুন্দরকে অভ্যর্থনা করতে গিয়ে প্রথান সমস্যা, তাঁকে কী দিয়ে বরণ করতে হবে। রবীন্দ্রসংগীতে অভিব্যক্ত এই মনোরম দ্বিধা শান্তশীল দাশ রচিত পঁচিশটি কবিতায় ধরা দিয়েছে। কবিতাগুলি নিছক শতবর্ষোপচার নয়। তার চেয়েও অতিরিক্ত কিছু এই সংকলনে উপস্থিত। সেই উদ্বৃত্ত একটি ব্যক্তিগত, হৃদয়ী সৌরভ। রবীন্দ্রনাথ এই কবির জীবনে একান্ত ব্যক্তিগত একটি উপস্থিতি, যাঁর নাম কখনো-কখনো লুকিয়ে উচ্চারণ করার মতো :

নিঃশব্দে কখন তুমি এলে মোর শিয়রের কাছে।

স্বচ্ছ, সহজ এই কবির কথনবিন্যাস। কোথাও এতটুকু আড়ষ্টতা নেই। অথচ সূক্ষ্ম একটি মন আছে তাঁর। তিনি জানেন বৃদ্ধ আছে, গ্লানি আছে, আর মুহূর্তচর্যার অজস্র ক্লান্তি। সেই সঙ্গে একথাও তিনি নিবিড়ভাবে জানেন কোথাও একটি আলোক রেখা আছে, রবীন্দ্রনাথ সেই প্রতি-শ্রুতির নাম। তাই তাঁর শপথ :

ও-আলোর দ্যুতি নিয়ে রাঙাতেই হবে এ জীবন :
হে সূর্য, নিলাম এই পণ।

শান্তশীল দাশের কবিতা যেহেতু বিশ্বাসের দিকে উন্মুখ, তাঁর একজন পাঠক হিসেবে সেজন্যও তিনি আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন। সাম্প্রতিক কালে বিশ্বাস একটি লুপ্ত অনুষ্ঠানের মতোই, শুধুমাত্র স্মৃতিসঞ্চারী একটি প্রথার পর্যবসিত। সেই প্রথা রক্ষা করেও শান্তশীল দাশ একদিন মৌল কবিতা সৃষ্টি করতে পারবেন, এই বিশ্বাস পোষণ করি।

আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

(১১৯ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

অর্জন ও সন্তুষ্টি-সাধন করতে চেষ্টা করবেন। পাকিস্তানের সমস্ত অন্যায় আচরণ সহ্য করে যাবেন, কিন্তু কঠোর হবেন, নীতি আওড়াবেন পাকিস্তানের হিন্দুদের সম্পর্কে। আশ্চর্য মনে হয়, যথার্থ তথ্য জানবার প্রয়োজনীয়তা পর্যন্ত এঁরা মনে করেন না। শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু মালদহে পাকিস্তান-আগত সাঁওতালদের প্রশ্ন করে জানেন যে প্রায় মাস খানেক আগে পাকিস্তান সরকার তাদের তীরধনুক নিয়ে নিয়েছে—অথচ পণ্ডিত নেহেরু মন্তব্য করে বসলেন "it was wrong on their part to come out in the night & then use bow and arrows" ভারতে আসবার জন্য মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট নিতে ঢাকাস্থিত ডেপুটি হাই কমিশনারের অফিসে হিন্দুদের অস্বাভাবিক কিছু ভিড় হচ্ছে না দেখে পণ্ডিত নেহেরু মন্তব্য করলেন যে, অবস্থা এমন কিছু সঙ্গীন নিশ্চয়ই নয় কারণ ঢাকায় দলে দলে যাওয়ার মত তারা keen নয়। অদ্ভুত যুক্তি! পূর্বপাকিস্তানে উপদ্রুত-অঞ্চল থেকে হিন্দুদের বেরিয়ে আসবার ও নিরাপদে রাজসাহী থেকে কয়েক শত মাইল দূরে ঢাকায় যাবার সুযোগ কতটা, সে জানবার মত দায়িত্ববোধ প্রধানমন্ত্রী করেননি! অথচ পাকিস্তান সরকারের কূটকৌশলী উক্তির 'সাম্প্রদায়িকতার স্পর্শমুক্ত সাধারণ সীমান্ত ঘটনা' কথাও করে লোকসভায় উল্লেখ করার দ্বারা প্রধানমন্ত্রী একথাই হয়তো ভেবেছিলেন যে পাকিস্তানের এহেন সহজ সরল উক্তির একটা প্রভাব নিশ্চয়ই পড়বে সমস্তদের উপর!

পাকিস্তানের হিন্দুদের নিয়ে যে ভারত আর বিব্রত হতে চায় না সে বিষয় সন্দেহ যদি কারো থেকে থাকে এতদিন এবার সেটা সম্পূর্ণ দূর হওয়া উচিত। কিন্তু পাকিস্তান পাছে গোঁসা করে তারজন্য অনুপ্রবেশকারীদের বহিষ্কার অতি মন্থর গতিতে হবে কিন্তু হিন্দু-সীমান্ত অতিক্রমকারীদের বেলায় রেহাই নেই। আইন সম্পূর্ণ 'নিরপেক্ষ' ভাবে তাদের অতি দ্রুত বহিষ্কার করে দিতে উদ্যত থাকবে, কারণ আমরা সেকুলার ও নিরপেক্ষ। ভারত সরকারের নীতি অতি সুস্পষ্ট। ভারতের নাগরিকদের আজ কর্তব্য ভারত সরকারের উপর যত বেশী সম্ভব চাপ সৃষ্টি করে, যে সব হিন্দু পাকিস্তান থেকে ভারতে আসতে উন্মুখ তাদের আসবার ব্যবস্থা করা ও তাদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব নিতে ভারত সরকারকে বাধ্য করা। তাতে যদি সকলে ডুবে মরে তবে উপায় নেই। সেটা স্বধাত সলিল তো বটেই—কিন্তু এই স্বধাত সৃষ্টির ব্যাপারে আর যাদেরই হাত থাকুক পাকিস্তানের হিন্দুদের বিন্দুমাত্রও ছিলনা। তাদের মতামত নেবার কথা সেদিন কে আর ভেবেছে! এর ভেতরে জাতীয় সংহতি, অ-সাম্প্রদায়িকতা আশা করা সহজ, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে সম্ভব কি?

হায় পাকিস্তানের ভাগ্যহত হিন্দু!

———

বিশ্বপরিক্রমা

লাওস-সমাধান

অবশেষে অনেক টালবাহানার পর লাওসে গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটলো এবং একটী সর্বদলীয় মন্ত্রিসভা গঠিত হলো। উনিশ জন সদস্য বিশিষ্ট এই মন্ত্রীসভার প্রধান মন্ত্রী হলেন নিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী নেতা প্রিন্স সুভন্ন ফুমা। কম্যুনিষ্ট নেতা প্রিন্স সুভন্ন ভং এবং দক্ষিণ পন্থী নেতা জেনারেল ফুমি নোসাভান এই মন্ত্রিসভার দুজন সহকারী প্রধানমন্ত্রী। মন্ত্রিসভার সদস্যদের রাজা সবং বাথানার কাছে উপস্থিত করার সময় প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স সুভন্ন ফুমা এই প্রতিশ্রুতি দেন যে, যুদ্ধ-বিরতির চুক্তিকে কার্যে পরিণত করা এবং সমগ্র লাওসে পুনরায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করাই তাঁর মন্ত্রিসভার সর্ব-প্রধান কাজ। তিনি আরও প্রতিশ্রুতি দেন যে ঐ কোয়ালিশন সরকার লাওসের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বৈদেশিক হস্তক্ষেপ ঘটতে দেবেন না এবং লাওস থেকে সমস্ত বিদেশী সৈন্য অপসারণের দাবী করবেন।

বিগত ১২ই জুন প্রেন-অব-জার্সে মন্ত্রিসভার দপ্তর বণ্টন সম্পর্কে উপরোক্ত নেতৃত্বয়ের মধ্যে যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে তার সর্ত অনুযায়ী প্রিন্স সুভন্ন ফুমা প্রতিরক্ষা দপ্তরের ভার গ্রহণ করবেন এবং স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র দপ্তরগুলিও পরিচালনা করবেন তাঁরই দুই নিরপেক্ষ অনুগামী। কিন্তু এই গুরুত্ব-পূর্ণ দপ্তরগুলির সিদ্ধান্ত কম্যুনিষ্ট ও দক্ষিণপন্থী নেতৃদ্বয়ের মতের বিরুদ্ধে নেওয়া হবেনা। এক কথায়, এই দপ্তরগুলির ব্যাপারে ঐ দুই নেতার 'ভিটো' প্রয়োগের অধিকার রইল। এ' ছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও উত্তর ভিয়েৎমিন সৈন্য অপসারণ, উভয় পক্ষ কর্তৃক ধৃত বন্দীদের মুক্তিদান দক্ষিণ-পন্থী ও পাথেটলাও বাহিনীর একীকরণ প্রভৃতি অমীমাংসিত সমস্যাও রয়েছে।

একথাগুলো বলার অর্থ এই যে লাওস সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরুদ্বিগ্ন হওয়ার সময় এখনও আসেনি। কিন্তু একটাও স্বীকার্য যে লাওস সমস্যা, সমাধানের দিকেই এগোচ্ছে। লাওস রাজপুরুষদের মধ্যে মস্কোকোর সংবাদ ইতিপূর্বে যে ভাবে রাশিয়া ও আমেরিকার পক্ষ থেকে অভিনন্দিত হয়েছে সেটাও কম আশাপ্রদ নয়।

আফ্রিকার জাগরণ

অনুরূপভাবে, আলজেরিয়ার ঘটনা প্রবাহও ওখানকার সাম্প্রতিক বর্বরতার অবসানের ইংগিত দিচ্ছে। আলজেরিয়ার সন্ত্রাসবাদী সংস্থা ও, এ, এস-এর পাণ্ডারা এতদিনের অক্ষমতা-টুকু বুঝতে পারছেন। গত ১৭ই জুন, আলজেরিয় জাতীয়তা-বাদীদের ও ও, এ, এস এর মধ্যে একটী শান্তি চুক্তি হয়েছে। আলজেরিয়াতে নিরাপত্তা বাহিনীকে আক্রান্ত না হলে, গুলি চালাতে নিষেধ করে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং গত ১৭ই মার্চ আলজিয়ার্সে যে কারফিউ জারী করা হয়েছিল তিন মাস পর তা তুলে নেওয়া হয়েছে। আগামী ১লা জুলাই আলজেরিয়ার গণভোট গৃহীত হবে। আলজেরিয়া ফ্রান্সের অংগীভূত থাকবে অথবা স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হবে, এই গণভোটেই তা স্থির হবে।

প্রকৃত পক্ষে, আজ সমগ্র আফ্রিকা জুড়েই চলেছে এক বিরাট আন্দোলন। এই আন্দোলনগুলো হয়ত বিভিন্ন কিন্তু এদের লক্ষ্য এক : উপনিবেশিক আধা-উপনিবেশিক ও অর্দ্ধ-

মুক্ত দেশগুলিতে শ্বেত-প্রভুত্বের অবসান। গত কয়েক বছরে ঘানা (আরব সাধারণতন্ত্র), ঘানা, টিউনিসিয়া প্রভৃতি আফ্রিকার কয়েকটি দেশ ঐ অভীষ্ট লাভে সক্ষম হয়েছে। ঐ পথেই পা বাড়িয়েছে কংগো, সমস্ত বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও। এরই পার্শ্ববর্তী বেলজিয়াম অছিভুক্ত দুটী এলাকা—রুয়ান্ডা-উরুণ্ডি—স্বাধীনতা লাভ করবে আগামী ১লা জুলাই। আবার তারই পার্শ্ববর্তী ব্রাজ্য টাংগানিকা সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হবে আগামী ৯ই ডিসেম্বর।

অপর পক্ষে, পর্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এংগোলার স্বাধীনতা সংগ্রাম আজও চলছে। সংবাদে প্রকাশ কিছুদিন আগে পর্তুগীজ সরকার এংগোলায় প্রায় ৫০,০০০ সৈন্য পাঠিয়েছেন। এবং এখন সেখানে চলেছে মুখোশহীন পর্তুগীজ বর্বরতা। দার্শনিক প্রবর হেগেল বলেছিলেন, ইতিহাস আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে ইতিহাস কিছুই শেখায় না। বলাবাহুল্য, ক্ষমতান্ধ ডাঃ সালাজার তার সাম্রাজ্যবাদী গুরুভাইদের বিপর্যয়ের ইতিহাস থেকে শিক্ষা লাভে অনিচ্ছুক!

শ্বেতকায় প্রভুত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আরেকটী রূপ দেখতে পাওয়া যায় মধ্য আফ্রিকার রোডেশিয়া ও নিয়াসল্যাণ্ডে। সংখ্যা-লঘিষ্ঠ শ্বেতকায়দের স্বার্থরক্ষাকল্পে ১৯৫৩ সালে গঠিত হয় উত্তর ও দক্ষিণ রোডেশিয়া ও নিয়াসল্যাণ্ড নিয়ে একটি ফেডারেশন বা যুক্তরাষ্ট্র। এই যুক্তরাষ্ট্রে আইন সভায় ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে আফ্রিকানদের স্থান অনুল্লেখযোগ্য। সম্প্রতি এই যুক্তরাষ্ট্রের আইন সভায় যে নির্বাচন হয়ে গেলো তাতে প্রধানমন্ত্রী রয় ওয়েলনস্কির ইউনাইটেড ফেডারেল পার্টি ৫৯টী আসনের মধ্যে ৫৪টী আসন লাভ করেছে। ওয়েলনস্কি এই নির্বাচনী বিজয়কে তার বর্তমান যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির অনুকূলে জনমতের অভিব্যক্তি বলে দাবী করেছেন। আসলে জাতীয়তাবাদী কোন আফ্রিকান দল এই নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেনি। এমন কি ওয়েলনস্কির দলের বিরোধী শ্বেতাংগ দলগুলির মধ্যে শুধু রোডেসিয়ান রিপাব্লিক পার্টি ছাড়া আর কোন দল এই নির্বাচনে নিজেদের প্রার্থী দাঁড় করায়নি। এই হিসাবে প্রকৃত পক্ষে মাত্র ৪ লাখ লোকের মধ্যে খুব জোর ২৮,০০০ লোক (শতকরা ৩%) ওয়েলনস্কির পক্ষ সমর্থন করেছেন।

অপরদিকে, নিয়াসল্যাণ্ড ও রোডেসিয়ার ডাঃ হেস্টিংস-বাণ্ডা, কেনেথ কাউণ্ডা প্রভৃতি জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ ফেডারেশন একটী মৃতপ্রায় সংস্থা বলে ঘোষণা করেছেন। কিছুদিন আগে লাওসে অনুষ্ঠিত আফ্রিকার ১৯টী রাষ্ট্রের সম্মেলনে ঐ ফেডারেশন ভেংগে দেওয়ার দাবী করা হয়েছে। ব্যাপারটা রাষ্ট্রপুঞ্জের আগামী অধিবেশনে আলোচিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

পাকিস্তানের নব কলেবর

মুষ্টিমেয় ভোটদাতাদের ভোটের জোরে আয়ুবের নগ্ন শুধু স্যার রয় ওয়েলনস্কির একার নয়। মাত্র কয়েক হাজার ভোটদাতাদের ভোটে সম্প্রতি পাকিস্তানে বুনিয়াদী গণতন্ত্রী শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলো। গত ৮ই জুন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মহম্মদ আয়ুব খাঁ রাওল পিণ্ডিতে নূতন জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশনের প্রারম্ভে পাকিস্তানের ৪৪মাস দীর্ঘ সামরিক আইনের অবসান ঘোষণা করেন।

সামরিক আইনের অবসান ঘোষণা সত্ত্বেও বর্তমান সামরিক শাসক গোষ্ঠীর আধিপত্যের অবসান হবে এমন মনে করার কারণ নেই। সম্প্রতি রাজসাহী সীমান্তে অসহায় সাঁওতালদের উপর পাক-সৈন্যদের বেপরোয়া গুলিচালনা, সর্বপ্রকার ন্যায় ও নীতি উপেক্ষা করে বহুবিতর্কিত কর্ণফুলী বাঁধ প্রকল্প চালু করা এবং বেরুবাড়ীর দইখাত অঞ্চলে জবর দখল অংশ ছাড়তে পাক-অনিচ্ছা,—এগুলো পাকিস্তানের সামরিক আমলের মনোভাবের থেকে কোন পৃথক মনোভাবের পরিচায়ক নয়।

পাকিস্তানের নূতন শাসন-ব্যবস্থায় জনাব মহম্মদ আলী পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছেন। ইতিপূর্বে ইনি

ছ'বার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সামরিক চুক্তি সম্পাদনে ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া চুক্তি সংস্থার (সিয়াটো) পাকিস্তানকে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে ইনি মুখ্য অংশ গ্রহণ করেছিলেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রী হিসাবে তাঁর নেতৃত্বে আমীর নিয়োগ থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে পাকিস্তানের পশ্চিম-ঘেঁষা নীতি বাড়বে বই কমবে না।

সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর প্রসঙ্গে ইং-মার্কিন দেশগুলি তাদের পাকিস্তানী মিত্রের অনুকূলে আবার ভারত-বিরোধী চাল চেলেছেন। অবশ্য এতে কাশ্মীর প্রশ্নের কোন ইতরেতর হয়নি। আমেরিকার ইংগিতে আয়ার্ল্যাণ্ড নিরাপত্তা পরিষদে যে প্রস্তাব পেশ করেছিল রুশ প্রতিনিধি তার বিরুদ্ধে ভিটো প্রয়োগ করেন। অবশ্য কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের জন্য পাকিস্তান যে খুব আগ্রহশীল তা নয়। ভারতবর্ষের আজ বৈদেশিক অর্থ সাহায্যের বিশেষ প্রয়োজন। ঠিক এই সময় ভারত-মার্কিণ সম্পর্ক যতটা ব্যাহত হয় পাকিস্তান সরকার ততটাই খুশী। ভারত-বিরোধিতাই পাক-রাষ্ট্র নায়কদের প্রধান মূলধন।

২৪।৬।৬২ শিশির কুমার ধর।

এই সকল পরস্পর-বিরোধী গুণের একত্র সমন্বয়ে প্রস্তুত

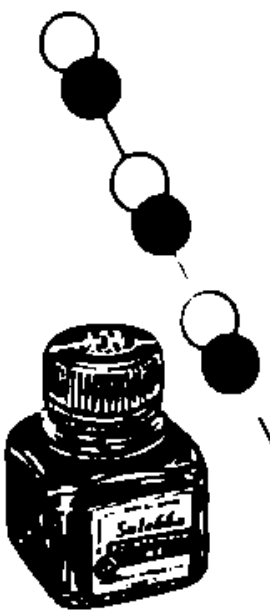

নিবে কালি শুকায় না,
কিন্তু কাগজে দ্রুত শুকায়।

রঙের যথেষ্ট গভীরতা, তবু
অবাধে লেখা এগিয়ে চলে।

লেখা ধুয়ে-মুছে যায় না;
অথচ কলম পরিষ্কার রাখে।

সুলেখা কালি

• • • অন্য কোন কারণে না হ'লেও অন্ততঃ এই কারণেই
সুলেখা আজ সর্বোচ্চ বিক্রয়ের গৌরব অর্জন করেছে • • •

সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ কলিকাতা • দিল্লী • বোম্বে • মাদ্রাজ

ছবি বিশ্বাস

বাঙলার সুবিখ্যাত অভিনেতা ও চিত্রতারকা ছবি বিশ্বাস বড়ই শোচনীয় ভাবে লোকান্তরিত হয়েছেন। তাঁর মৃত্যুতে বাঙালী সমাজে গভীর শোকের ছায়া পড়েছে। চিত্র ও নাট্য জগতে তিনি এমন একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিলেন যে তাঁর অভাব অপূরণীয় বলে মনে হচ্ছে। সামান্য অবস্থা হতে আরম্ভ করে নিজ শক্তি বলে তিনি বাঙলার শ্রেষ্ঠ নাট্যকার বলে পরিচিত হয়েছিলেন। তাঁর অভিনয়ের একটা সুচিহ্নিত রীতি বা শৈলী ছিল। তাঁর সংলাপ ও ভঙ্গীর মধ্যে আভিজাত্য ও সুবাজিত রুচির পরিচয় পাওয়া যেত। বাঙলার রঙ্গমঞ্চের তিনি যে ঘোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন একথা বললে কোন অতিশয়োক্তি করা হবে না। এই দুঃখ ও অভাবের দেশে যাঁরা বিশুদ্ধ আনন্দ দিয়ে আমাদের কিছুক্ষণের জন্য চোখ ভুলিয়ে রাখতে পারেন তাঁরা নমস্য। তাঁরা সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন করেন।

ভারত ও নিরাপত্তা পরিষদ

সম্প্রতি নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর সম্বন্ধে আর এক দফা অভিনয় হয়ে গেল। যুগান্ত ধরে এই অভিনয় চলবে বলে মনে হয়। কোথায় এর শেষ? সোভিয়েত ভিটো করে দিল আয়ারল্যাণ্ডের প্রস্তাব। কিন্তু আমেরিকা ও ব্রিটেন এইখানেই ছাড়বেনা। ভারত ও পাকিস্তান এখন গৌণ হয়ে রইল। দাবার ঘোড়ে মাত। এবার রাজায় রাজায় যুদ্ধ চলবে। আয়ারল্যাণ্ডের মত গোলামেরা হাত থেকে নেবে। অর্থাৎ সোজা কথার ব্যাপারটা সাধারণ পরিষদে আসবে। সেখানে ব্রিটেন, আমেরিকা ও তল্পীবাহী তাদের সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দিবে। সোভিয়েতের সেখানে ভিটো নাই। কাজেই ভারতের আবেদন নিবেদন অগ্রাহ্য হবে। ভারত অবশ্য কাশ্মীর ছাড়বেনা। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার মত এক ঘরে হয়ে থাকতে হবে। কোথাকার জল কোথা দিয়ে দাঁড়াবে কে জানে! এখন ভারতকে সকল অবস্থার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। পাকিস্তানের নেতাদের কেউ কেউ নাকি এই কথা বলে থাকেন যে "আমরা তো মরবই। তোমাদের নিয়ে মরব।" ভারত ক্রমে ক্রমে সোভিয়েতের পদলেহী হতে বাধ্য হচ্ছে। কমিউনিষ্ট ঘনীভূত দেশপ্রেমিকেরা সেই শুভ দিনের জন্য অপেক্ষা করে আছেন! উপায় কি? ব্রিটেন ও আমেরিকার চরণতলে পড়ে থেকেও তো কিছু মিলল না। শেষকালে আয়ারল্যাণ্ড ও আমাদের পিঠে ছুরি চালিয়ে দিল। ঘনা ও মিলরের মুখোসও আস্তে আস্তে খুলে যাবে। আমাদের আপনার বলে আর কেউ থাকবে না। হায় নেহেরু!

পাকিস্তানে 'বেসিক ডিমোক্র্যাসি'

অনেক জল্পনা কল্পনার পর এতদিনে পাকিস্তানে "বেসিক ডিমোক্র্যাসি" নামক একটি কাঠামের আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা হয়েছে। মুসলমানেরা বড় অহঙ্কার করে বলে যে ইসলাম ধর্ম্ম জগতে নিরাবিল সাম্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। সুলতান বাদশাদের ইতিহাস কিন্তু এই দাবীর সম্পূর্ণ বিপরীত কথাই

'যদি ভাবেন ওঁকে খুশী করা সহজ...'

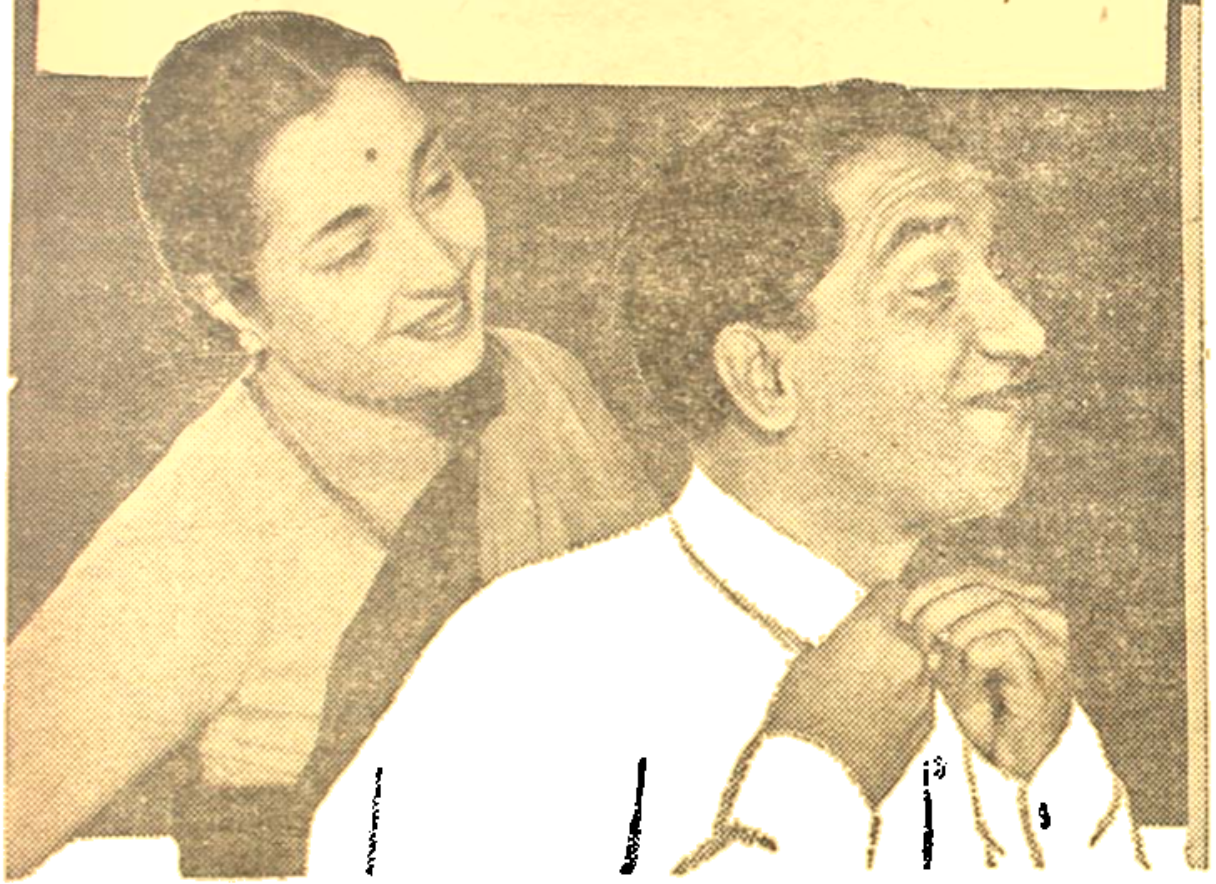

'...তবে নিশ্চয়ই আপনি ভুল করবেন'—বোম্বের শ্রীমতী আর. আর প্রভু বলেন। 'কাপড় জামার বেলাতেও কি উনি কম খুঁতখুঁতে ...!'
'এখন অবশ্য আমি ওঁর জামা কাপড় সবই সানলাইটে কাচি—প্রচুর ফেনা হয় বলে এতে কাচাও সহজ আর কাপড়ও ধবধবে ফরসা হয়।...উনিও খুশী!'
'কাপড় জামা যা-ই কাচি সবই ধবধবে আর ঝলমলে ফরসা—সানলাইট ছাড়া অন্য কোন সাবানই আমার চাই না'

পৃথিবীতে অতিশয়তা নেই, কেননা সানলাইটের মতো কাপড়ের এত ভাল যত্ন আর কোন সাবানই নিতে পারে না। আপনিও তা-ই করবেন।

সানলাইট

কাপড়জামার সাঠিক যত্ন নেয়!

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

L.39-X52 BG

প্রচার করে এসেছে। বর্তমান জগতে মুসলীম রাজ্যগুলিতে নিরঙ্কুশ সাম্য কোথায়ও নাই। ইন্দোনেশিয়াতে "গাইডেড ডিমোক্র্যাসি," পাকিস্তানে 'বেসিক ডিমোক্র্যাসি' ও অপরাপর রাজ্যে ক্রুর একনায়ক আমাদের অন্য শিক্ষাই দিচ্ছে। যা হৌক অবশেষে অনেক দরকসাকসির পর সেই দীর্ঘ অপেক্ষিত বস্তুটী পাকিস্তানে দেখা দিয়েছে। কিন্তু "যৌবন জলতরঙ্গ রুধিবে কে?" বেসিক ডিমোক্র্যাসি প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই পাকিস্তানে অসন্তোষের বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। আবেদনামক ঐরাবত ভাগিরথীর সে-তরঙ্গে ভেসে যাবার উপক্রম। হয় আবার মিলিটারী শাসন প্রবর্তন করতে হবে নয় বেসিকের বেসটীকে উড়িয়ে দিতে হবে।

টি, টি কে

যে মহাপুরুষ বর্তমান ভারতে টি, টি, কে বলে সমাদৃত তাঁর আসল নাম হচ্ছে টি, টি, কৃষ্ণমাচারী। ইনি ভারতগগনে আবার ধূমায়িত হয়ে উঠেছেন। ভারতগৌরব হরিদাস মুন্দ্রার সঙ্গে তাঁর নাম জড়িত হওয়ার জন্য ভারতের মন্ত্রীত্ব পদ ছেড়ে দিয়ে (বা দিতে বাধ্য হয়ে) তিনি এত দিন ঔত পেতে বসে ছিলেন। যত দুর্ঘ্যাত লোকের যিনি আশ্রয়দাতা নারায়ণ সেই মহাপ্রভু জবাহরলাল এতদিন তাঁর বিরহে কাতর ছিলেন। এখনে অবশ্য প্রকাশ্যতঃ তাঁকে কোন নির্দিষ্ট পোর্টফোলিওর ভার দেওয়া হয়নি। কিন্তু দেশ বিদেশের দৃষ্টান্ত থেকে অনুমান করা যায় যে এই পোর্টফোলিও-বিহীন মন্ত্রী তাঁর অন্যান্য সহকর্মীদের উপর আধিপত্য বিস্তার করবেন। অর্থ-ব্যয় সংক্রান্ত বিভাগগুলির অন্যে যোগরক্ষা করাই তাঁর কাজ। অর্থাৎ অর্থদপ্তর, কৃষি, লৌহউৎপাদন, রেল, আমদানী রপ্তানী ও অর্থনৈতিক সর্বপ্রকার দপ্তরের সঙ্গে তিনি যোগ রক্ষা করবেন। এর ফলে মনে হয় তিনি এই সকল দপ্তরের উপর প্রভূত অধিকার বিস্তার করতে সমর্থ হবেন। কৃষ্ণমাচারীর পূর্বে গোবিন্দবল্লভ পন্থ ও কৃষ্ণমেনন এই গৌরব লাভ করেন। পোর্টফোলিও না থাকলেও তাঁরা যে মন্ত্রীমণ্ডলীতে খুব শক্তিশালী ছিলেন এ কথা কারুর অবিদিত নয়। তাই মনে হয় নেহেরুজী টি, টি, কে, কেও অনুরূপ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করতে বদ্ধপরিকর। কিছুদিন পূর্বে মন্ত্রীসভায় তাঁর নিয়োগের গুজব রটার সঙ্গে সঙ্গে বোম্বাই শেয়ার বাজারে শেয়ারের দর কমে যায়। এর অর্থ যে কি আমরা তা বুঝতে অক্ষম। আমাদের তো মনে হয় যে টিটিকের সঙ্গে ভারতীয় বণিকদের যেরূপ গূঢ় সম্পর্ক তাতে শেয়ার মালিকদের সুবিধাই হবে।

চীনের সামরিক সমাবেশের উদ্দেশ্য কি?

সংবাদে প্রকাশিত হয়েছে যে চীন লাদাকে ট্যাংক ও অন্যান্য ভারী অস্ত্র-শস্ত্র এবং সেনাবাহিনীর সমাবেশ করেছে। একই সঙ্গে সুকিয়াঙ প্রদেশের পূর্বাঞ্চলে ফরমোজার বরাবর সমুদ্র তীরেও বিরাট সামরিক বাহিনী মোতায়েন করে আল চীন কুমর এবং অন্যান্য দ্বীপে বোমা বর্ষণ সুরু করেছে। এরূপ সামরিক সমাবেশ আত্মরক্ষা না আক্রমণাত্মক নীতির সংকেতবাহী এবং আক্রমণাত্মক হলে কোন সীমান্তে হামলা পরিচালিত হবে এখনও তার লক্ষ্য সুস্পষ্ট হয়নি। যাথাভাবে চীনের অভ্যন্তরে যে চরম দুরবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তার সুযোগে ফরমোজা চীন, মূল ভূখণ্ডে আক্রমণ চালাতে পারে বলে আশংকিত হয়ে চীন প্রতিরক্ষামূলক সামরিক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে, না,—লাদাক অঞ্চলে আক্রমণাত্মক কার্যক্রম গৃহীত হলে ফরমোজা যাতে চীনের পূর্ব প্রান্তে আক্রমণ চালাতে না পারে তার অগ্রিম সতর্কতার জন্যই পূর্ব প্রান্তে সামরিক সমাবেশ করা হয়েছে—এখনই সেকথা বলা সম্ভব নয়। চীনের সামরিক প্রস্তুতি ও সমাবেশের লক্ষ্য—লাদাক না ফরমোজা, অথবা চীনের আভ্যন্তরীণ আর্থিক দুরবস্থার সংকট থেকে জনমনকে বাহির্মুখী করা চীনের সামরিক উদ্যমের উদ্দেশ্য—সেসম্বন্ধে সতর্ক দৃষ্টি এবং পরিস্থিতির বাস্তব বিশ্লেষণ করা

আক্রমক। শাদকের চীন অধিকৃত এলাকা পুনর্দখলের উদ্দেশ্যে ভারত কোন সামরিক অভিযান পরিচালনা করবে,—এরূপ সম্ভাবনা প্রায় অবিশ্বাস্য। তাই, একই সঙ্গে প্রশান্ত মহাসাগরের প্রান্তে ফুকান প্রদেশে এবং শাদক অঞ্চলে সামরিক সমাবেশের উদ্দেশ্য কি সে সম্বন্ধে ভারত সরকারের সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

বিতাড়িত সাঁওতালদের দুরবস্থা

চরম দুর্ভোগ ও দুরবস্থা এবং অবর্ণনীয় অত্যাচার সহ্য করে এবং অনেক আত্মীয়বর্গের জীবন দুবৃত্ত হানাকারীদের হিংস্র কবলে সমর্পণ করে যে কয়েক হাজার সাঁওতাল পাকিস্তানের রাজশাহী সীমান্ত অতিক্রম করে মালদা জেলায় এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছে তা'দের পুনর্বাসন সম্বন্ধে ভারত সরকার যে দোদুল্যমান ইতস্ততঃতা এবং দীর্ঘসূত্রিতার মনোভাব দেখাচ্ছেন তা শুধু শোচনীয় নয়, চরমভাবে অদূরদর্শী। রাজ্যপাল বা মন্ত্রীদের সান্ত্বনা বাক্য বা সংবাদপত্রে বস্তুনিষ্ঠ প্রচারপত্র দ্বারা অবস্থার গুরুত্ব হ্রাস হবে না। পূর্ব বাংলার সংখ্যালঘুদের স্বাধীনতা, মানবিক ও রাজনৈতিক অধিকার রক্ষা তো দূরের কথা, তাদের জৈবিক নিরাপত্তা রক্ষা করার ব্যবস্থা গ্রহণও ভারত সরকারের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এমন কি ভারতে আগমনের পথও সংখ্যালঘুদের জন্য নানা বাধা নিষেধ জারী করে প্রায় কার্যতঃ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। লাঞ্ছিত, অত্যাচারিত ও বিতাড়িত হয়ে এখন যারা নিতান্ত প্রাণের দায়ে ভারতে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছে তাদের আশ্রয় দানে এবং পুনর্বাসনের দায়িত্ব গ্রহণে কেন্দ্রীয় সরকার যেরূপ অব্যবস্থা, অবধারিতচিত্ততা এবং ঔদাসীন্যমূলক মনোভাব প্রদর্শন করছেন তার পরিণতি অত্যন্ত মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে। রাজশাহী প্রত্যাগত উদ্বাস্তুদের প্রতি ভারত সরকারের আচরণের তীব্র প্রতিবাদ হওয়া প্রয়োজন।

সীমান্ত রক্ষীবাহিনী

আজ নদীয়া, কাল কাছাড়, পরশু ত্রিপুরা,—ভারতের এমনি বিভিন্ন সীমান্তে দিনের পর দিন পাকিস্তানী হামলা পর্যায়ক্রমে অব্যাহত রয়েছে। পাকিস্তানী হামলাকারীদের কার্যকলাপের ফলে প্রতিদিন সংবাদপত্রে যে খবর প্রকাশিত হয় তা' শুধু লজ্জাকরই নয়—একটি জাতির নৈতিক মনোবল ধ্বংসকারক। সব সময়ে খবর ছাপা হয় যে ভারতীয়েরা মার খায়, পালিয়ে আসে, আতঙ্কিত হয়, ধন সম্পত্তি বিসর্জন দেয়—পক্ষান্তরে এরূপ সংবাদ কদাচ প্রকাশিত হয় যে সীমান্তবর্তী ভারতীয়েরা হামলাকারীদের আচ্ছা করে ঠ্যাঙানী দিয়েছে, গ্রেপ্তার করে রেখেছে, বা চরম শিক্ষা দিয়ে ভারত সীমান্ত থেকে বিতাড়িত করে দিয়েছে। হামলাকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা ও প্রত্যাঘাত করার সাহসী ও শক্তিশালী মনোভাব সৃষ্টি করার জন্য আজ পশ্চিম বাংলা ও আসামের পাক সীমান্তবর্তী অঞ্চলে গ্রামবাসীদের দ্বারা উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র ও শিক্ষার ব্যবস্থা করে আঞ্চলিক সীমান্তরক্ষীবাহিনী গঠন করা একান্ত কর্তব্য বলে আমরা মনে করি। নিয়মিত পুলিশ ও সেনাবাহিনী দ্বারা পাকিস্তানী সীমান্ত হামলার প্রতিবিধান করা সম্ভব নয়,—এজন্য স্থানীয় জনগণের সাহায্যে সীমান্ত রক্ষীবাহিনী গঠন করার আশু কর্মসূচী গ্রহণ এক অনিবার্য ও আশু জাতীয় প্রয়োজন।

ভারতীয় গণতন্ত্র ও মন্ত্রীপোষণ

গান্ধী মূল অব পলিটিক্সের উদ্যোগে সম্প্রতি একটি আলোচনা বৈঠকে কংগ্রেস শাসনে মন্ত্রী-সম্প্রসারণ নীতির তীব্র সমালোচনা করা হয়। এই আলোচনায় দেখা যায় স্থায়ী ও প্রতিনিধিমূলক মন্ত্রীসভা গঠনের নামে যে ভাবে ভারতের কেন্দ্রে ও রাজ্যে মন্ত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং হচ্ছে তার তুলনা পৃথিবীর অন্যান্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে খুব কমই দেখা যায়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সদস্য সংখ্যা ৫৩ অর্থাৎ

প্রতি সাত জন কংগ্রেসী সদস্যের জন্য একজন করে মন্ত্রী বর্তমান। পাঞ্জাবে প্রতি তিনজন কংগ্রেসী সদস্যের জন্য একজন এবং পশ্চিম বাংলায় প্রতি পাঁচজন কংগ্রেসী সদস্যের জন্য একজন করে মন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছে। অন্যান্য প্রদেশের অবস্থাও অনুরূপ।

গান্ধী সেমিনারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাজনৈতিক, আর্থিক ও নৈতিক সবদিক দিয়ে এরূপ সীমাহীন মন্ত্রী-সম্প্রসারণ অযৌক্তিক ও অবাঞ্ছনীয়। এরূপ মন্ত্রী-সম্প্রসারণের নীতির পিছনে জাতীয় স্বার্থ বা গণতান্ত্রিক আদর্শ রক্ষার কোন যুক্তি নেই, কংগ্রেসের আভ্যন্তরীন দলাদলির কবল থেকে শাসন ক্ষমতায় কংগ্রেস কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য এরূপ অনির্দিষ্ট অপরিমিত সংখ্যায় মন্ত্রী গ্রহণ করা হয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে বিভিন্নগ্রুপের 'ব্ল্যাকমেল' বা ক্ষমতা প্রয়োগের সন্তুষ্ট করার প্রয়াসে কোন দলের আভ্যন্তরীন গ্রুপাদলি বন্ধ পায় না, বরং নতুন উচ্চাকাঙ্খী সৃষ্টি করে নতুন উপদলের আবির্ভাবে দলীয় সংগঠনের ভার-সাম্য আরও ব্যাহত হয়।

সেমিনারে আরও বলা হয় যে ভারতে প্রায় ২০০ শত অতিরিক্ত রাজ্য ও রাষ্ট্রমন্ত্রী নিয়োগের ফলে এবং তাদের জন্য অতিরিক্ত বেতন, বাড়ি, গাড়ী, টেলিফোন, অফিস, দপ্তর আসবাবপত্র রেল ও বিমান ভাড়া, এবং হাজার রকমের ব্যয় ভারের ফলে রাজস্বের উপরে অপ্রয়োজন চাপ পরে এবং এই চাপ শেষ পর্যন্ত অতিরিক্ত কর বা ডিফিসিট ফিনানসিংয়ের মাধ্যমে জনসাধারণকে বহন করতে হয়। নীতির দিক থেকে বিবেচনা করলেও ক্ষমতা করায়ত্ত রাখার জন্য এরূপ মন্ত্রী সম্প্রসারণের নীতি গণতন্ত্রের মূলে কুঠারাঘাত করে।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে মন্ত্রীপদ বা সেক্রেটারীর সংখ্যা সংবিধান অনুযায়ী সীমাবদ্ধ। অন্যান্য অনেক রাষ্ট্রেও মন্ত্রীর সংখ্যা নির্দিষ্ট। বৃটেনে মন্ত্রীর সংখ্যা সীমিত না হলেও শক্তিশালী বিরোধী দলের জন্য মন্ত্রীসম্প্রসারণ ক্ষমতার বদাচ অপব্যবহার করা হয়। ভারতের এরূপ বল্গাহীন মন্ত্রী-সম্প্রসারণ নীতির অপপ্রয়োগ প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে সেমিনার ভারতীয় সংবিধান সংশোধন করে কেন্দ্রে ও রাজ্যে মন্ত্রী সংখ্যা নির্দিষ্ট করার প্রস্তাব করেছে। এই প্রস্তাবটিকে আমরা যুক্তিযুক্ত বলে মনে করি।

কংগ্রেস ও শ্রমিক

পশ্চিম বঙ্গ জাতীয় ট্রেডইউনিয়ন কংগ্রেসের পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রমনীতির তীব্র সমালোচনা করে ভারতীয় জাতীয় ট্রেডইউনিয়ন কংগ্রেসের কলিকাতায় অনুষ্ঠিত দশম বার্ষিক অধিবেশনের স্মারকগ্রন্থে কংগ্রেসী শ্রমিকনেতা শ্রীকালী মুখার্জী এক প্রবন্ধ লিখেছেন। এই প্রবন্ধে বলা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে শ্রমিকদের মাথাপিছু আয় ভারতের অন্যান্য রাজ্য থেকে সবচাইতে কম। অথচ জীবনযাত্রার ব্যয় ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে চট শিল্পের শ্রমিকেরা ৭০ টাকা ৫১ নয়া পয়সা পায়। অথচ অন্ধ্রে এদের আয় ৮৭৲ টাকা। এ-ছাড়া সেখানে শ্রমিকরা মুনাফা বোনাস পায়। পশ্চিমবঙ্গে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে দেড়লক্ষ শ্রমিক রয়েছেন। এদের বেতন মাসিক ৭৫৲ মাত্র। বোম্বাইতে এদের ১১০৲ টাকা। দিল্লী, বোম্বাই বা আহমেদাবাদের শ্রমিক বস্ত্রশিল্পে নিম্নতম মজুরী পায় ১৩০ টাকা যেখানে পশ্চিম বাংলায় পায় মাত্র ৮৪ টাকা ৫০ নয়া পয়সা। ফলে গত পাঁচ বছরে পশ্চিম বঙ্গের শ্রমিকেরা সবচাইতে বেশী ধর্মঘট ও লক্ আউটে জড়িত হয়েছে।

জাতীয় ট্রেডইউনিয়নের পক্ষ থেকে প্রকাশ্যভাবে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের "শ্রমিক স্বার্থের প্রতিকূল শ্রমনীতির" তীব্র সমালোচনায় পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের শ্রমিক নেতৃত্ব ও প্রশাসনিক নেতৃত্বের বিরোধ প্রকট হয়ে উঠেছে। সমাজবাদে প্রত্যয় নিয়ে শ্রমিক সংগঠনে অগ্রসর হলে পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক আন্দোলনের পক্ষে এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য হয়ে পড়ে।

জাতীয় ট্রেডইউনিয়ন কংগ্রেসের নেতৃত্বের এই সংসাহস অভিনন্দনযোগ্য সন্দেহ নাই।

অধ্যাপক হ্যালডেনের পদত্যাগ

পৃথিবীর অন্যতম জীববিদ্যা বিশেষজ্ঞ ভারত প্রেমিক অধ্যাপক হ্যালডেনের বংশতত্ত্ব ও জীববিদ্যা গবেষণা সংস্থার পরিচালকের পদ ত্যাগ ভারতবর্ষের পক্ষে গভীর গ্লানিজনক এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার দিক থেকেও পরিতাপের। অধ্যাপক হ্যালডেনের সঙ্গে ভারত সরকারের মতবিরোধ নিয়েই এই শোচনীয় অবস্থার উদ্ভব হয়েছে। এই মতবিরোধ এমন কোনো মৌলিক সমস্যা নিয়ে নয় যে তার কোনো মীমাংসা অসম্ভব ছিল। অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর খুঁটিনাটি, সহজেই যাকে উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব ছিল, সে সম্পর্কে অমার্জনীয় সরকারী ঔদাসীন্য এই বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক অতিথিকে এই অবাঞ্ছনীয় পরিণতির দিকে ঠেলে দিয়েছে। আমরা মনে করি এজন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদপ্তর সম্পূর্ণরূপে দায়ী। উর্ধতন কোনো কর্তৃপক্ষ অধ্যাপকের সঙ্গে যোগাযোগ করে বিরোধ মীমাংসার চেষ্টা না করে, আমলা-সুলভ মনোভাব নিয়ে অধ্যাপকের সঙ্গে সংঘাতে অগ্রসর হয়েছেন।

এই বিশ্ববিশ্রুত জীববিদ্যার বিশেষজ্ঞ যে আন্তরিকতা ও সততা নিয়ে ভারতীয় নাগরিক হয়ে এ-দেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণার উৎকর্ষ সাধনে গভীর আগ্রহ নিয়ে ব্রতী হয়েছিলেন, অবহেলা ও অবিমৃষ্যকারিতার এবং ভারত সরকারের দূরদৃষ্টির অভাব সে-সম্ভাবনাকে নষ্ট করতে উদ্যত হয়েছে। এখনও সময় আছে তাদের ভুল সংশোধনের কথা দিয়ে অধ্যাপকের ক্ষোভের কারণ দূর করে তাঁর গবেষণার সুযোগ গ্রহণ করার। এবিষয়ে আমরা সরকারী মনোভাবের আমূল পরিবর্তন দাবী করি।

রাজর্ষি ট্যাণ্ডন

১লা জুলাই তারিখে এলাহাবাদে রাজর্ষি শ্রীপুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন লোকান্তরিত হয়েছেন। অসহযোগ আন্দোলন থেকে শুরু করে জাতীয় সংগ্রামের যারা পুরোধা ছিলেন, তাদের মধ্যে মাত্র কয়েকজন অবশিষ্ট রয়েছেন। পুরুষোত্তম-দাস ট্যাণ্ডন ছিলেন, সেই অবশিষ্টদের অন্যতম। এলাহাবাদ সহরকে কেন্দ্র করে তাঁর কর্মজীবন শুরু করে উত্তর প্রদেশের রাজনীতিতে তিনি দীর্ঘকাল প্রভূত প্রভাবের অধিকারী ছিলেন। ১৯৩৭ সালে উত্তর প্রদেশ বিধান সভায় স্পীকার নির্বাচিত হয়ে দল-মতের ঊর্ধে স্পীকারের স্থান নির্দেশে পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন যে আদর্শ স্থাপন করেছিলেন, স্পীকারের ভূমিকা সম্পর্কে তা নজীর হয়ে থাকে। দেশ-বিভাগের বিরুদ্ধে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন প্রতিবাদ জানিয়েও ইতিহাস রচনা করে গেছেন। তিনি ১৯৫০ সালে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়ে পর বৎসরই এই পদত্যাগ করেন। ভারত সরকারের পাকিস্তানের প্রতি অনুসৃতনীতি ও উদ্বাস্তু সমস্যা সংক্রান্ত মনোভাব এই বিরোধের কারণ ছিল।

সরল, অনাড়ম্বর জীবনযাপন ও নীতির প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠাবান জীবনে অনুসৃত এই দুই আদর্শ পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডনকে জনমানসে 'রাজর্ষি' রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

৩।৭।৬২

জৈবিক

আমরা দুঃখিত—অনিবার্য কারণে জৈবিক এবার প্রকাশিত হতে পারেনি।
শ্রাবণ সংখ্যায় জৈবিক শেষ হবে।

২০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থিত গোবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্দ্র মিত্র এডভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

জয়শ্রী

শ্রাবণ ১৩৬৯ · ৪র্থ সংখ্যা · ২১ বর্ষ

বিবাহ ও পরিবারের ক্রমবিকাশ

অনিলচন্দ্র রায়

মাতৃক্রম সম্বন্ধে এখানে কিছু আলোচনা করা যাক। মাতৃক্রমের উদ্ভব কেন হইল পৃথিবীতে? এই প্রশ্নের জবাব নানা পণ্ডিত নানাভাবে দিয়াছেন।

জর্মানী সম্প্রদায়ের মতে পূর্বতন অবাধসংসর্গ স্তর হইতেই ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। ম্যাক্‌লিনানও এ বিষয়ে জর্মানী মতের সমর্থক। যে অবস্থায় অবাধ যৌন উচ্ছৃঙ্খলতাই সমাজের বিধি, সেখানে পিতৃত্ব অজ্ঞাত থাকিবেই। কিন্তু মাতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। তাই মাতাকে ঘিরিয়াই বংশক্রম ইত্যাদি প্রবর্তিত হয়। বাকোফেন বলিবেন, ধর্মের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া নারী সে যুগে অসাধারণ শ্রেষ্ঠতার অধিকারিণী। এই প্রাধান্য হেতুই মাতৃক্রম প্রচলিত হইয়াছে।

ব্রিফল্ট বলেন, মাতৃস্থানী প্রথা হইতেই মাতৃক্রম আসিয়াছে। Wundt এর মতে এই মাতৃক্রমের উদ্ভব হইয়াছে পরবর্তি যুগে। আদিযুগে ব্যক্তিগত পরিবার প্রচলিত ছিল। কিন্তু পরের যুগে বয়োশ্রেণী এবং যৌন-শ্রেণীর বিভাগ প্রবর্তিত হয়। এবং এই যুগেই men's club নামক প্রথার উদ্ভব হয়। এই men's club হইতেই মাতৃক্রম উদ্ভূত হইয়াছে। এটা টোটেম-যুগের পরে। যুদ্ধ বিগ্রহ হেতু সন্তান নারীর হেফাজতে ন্যস্ত হয়। এতে পূর্ব-পরিবার বন্ধন শিথিল হইয়া মাতৃক্রম আসে: "Because of its tribal struggles—it is precisely the Totemic era that tends to loosen the family ties of the preceding age and as a result to allot the child to the mother." (17)

প্রবীনের দলে স্থান পাইবার আগে বালক ও শিশুরাও মাতা, তথা নারীদের সঙ্গেই বাস করে। এই কারণে জন্ম হইতেই বয়সবৃদ্ধি পর্যন্ত দীর্ঘকাল মায়ের সঙ্গে সন্তানের যোগ এত নিবিড় ও দীর্ঘস্থায়ী যে মায়ের নামে ও বংশক্রমে সন্তানের পরিচয় হওয়া খুব স্বাভাবিক।

"If we call to mind the close association of the youths & men of the kinship groups in the men's house, it will be, apparent that

মর্গান-মার্ক্সীয় মতবাদের আলোচনা

গতবারের পর

such conditions of social intercourse make for a particularly intimate bond between mother and children···This close association between mother and children is sufficient to account for the origin of maternal descent. (49 Wundt)

ওয়েষ্টরমার্ক এবং ক্রলী স্বাভাবিক বাৎসল্য এবং মাতৃপ্রেম হইতেই ইহার উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া মনে করেন। ক্রলীর কথায়:

"It is a method of tracing geneology, more convenient in polygamous societies and more natural in primitive times, when the close connection of mother and child during the early days of infancy emphasise the relation." (430—Crawley)

দেখা যাইতেছে মাতৃক্রমের উদ্ভব নানা প্রকারেই হইতে পারে বলিয়া পণ্ডিতেরা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে, নানা বিচিত্র কারণে ইহার জন্ম হইতেই পারে, বহুবাদী ব্যাখ্যার যুক্তিতেও ইহাই প্রতিপন্ন হয়। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে মাতৃক্রম একটা অনিবার্য স্তরও হইতে পারে না। মর্গানীরা অবাধসংসর্গ ও অজ্ঞাতপিতৃত্ব ধরিয়া লইয়া মাতৃক্রমকে একটা অনিবার্যস্তর করিয়া দাঁড় করাইয়াছে, কিন্তু উক্ত মত খণ্ডিত হওয়ায় এই স্তরক্রমও খণ্ডিত হইয়াছে।

তাই মাতৃক্রমের পাশাপাশি পিতৃক্রমও থাকা অতি স্বাভাবিক ও সম্ভব। পুরুষের দৈহিক বা আর্থিক প্রাধান্যহেতু যেমন কোথাও পিতৃক্রম প্রবর্তিত হইয়াছে, তেমনি মাতৃ-সম্পর্কের প্রাধান্যহেতু কিংবা কোন আর্থিক কারণে মাতৃক্রমও প্রচলিত হইয়াছে। তাই Wundt বলিয়াছেন যেমন Men's Club হইতে মাতৃক্রম জন্ম নিয়াছে, তেমনি আবার আদিতেই পিতৃক্রমও পুরুষ প্রাবল্যহেতু দেখা দিয়াছে— "Moreover the possibility also remain that among some tribes paternal descent prevailed from the very outset" (47 Spencer). যাকসিনান Wundt, Muller Lyer প্রভৃতিরা অনেকেই বলবিবাহকেই প্রাচীনতম বলেন। বলবিবাহ প্রাচীনতম হইলে পিতৃতন্ত্রও প্রাচীনতম। একথা ব্রিফল্টও স্বীকার করেন: It (marriage by capture) would bring about patriarchel marriage and complete masculine supremacy" (231) Briffl. ওয়েষ্টারমার্ক বলবিবাহকে সার্বিক স্তর বলিয়া স্বীকার করেন না। কিন্তু বহুল প্রচলন অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ব্রিফল্টও ইহাকে উড়াইয়া দিতে পারেন নাই। তাহাকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে যে "Notwithstanding the wide prevalence of such violence there exists no authentic example of this having been the general and habitual mode of obtaining wives" (232) বহুল প্রচলন স্বীকৃত হইতেছে। তাহা হইলে ইহাও প্রমাণ হয় যে বলবিবাহের আনুষঙ্গিক পিতৃতন্ত্রও আদিকাল হইতেই বহু প্রচলিত পদ্ধতিরূপে বিদ্যমান আছে। কিন্তু তাই বলিয়া মাতৃতন্ত্র বা পিতৃতন্ত্র কোনটিই সার্বিক বলিয়া বলার পক্ষপাতী আমরা নই। সামাজিক জীবনের এইসব প্রতিষ্ঠান নানা পরিস্থিতি ও কারণের সমবায়ে উদ্ভব হইয়া থাকে, বহুবাদী ব্যাখ্যা তাহাই বলে। আদিম কালেও মানুষ-সমাজে যে কোথাও মাতৃক্রম ছিল না, একথা জোর করিয়া বলা চলে না। পাশাপাশি পিতৃক্রমের সহিতই মাতৃক্রম আদিকালেই বিদ্যমান ছিল। স্থানীয় বিকৃতি ও সাময়িক পরিণতি হিসাবে পিতৃক্রমের ও পিতৃতন্ত্রের পাশেও কোনও অবস্থায় মাতৃক্রম বা মাতৃতন্ত্র গড়িয়া উঠিতে পারে। ইহা কিছুই অসম্ভব নয়। লৌহকঠিন ছকের বাঁধাবরা স্তর পর্যায় বিজ্ঞানবিরোধী কল্পনা। বর্তমান জগতের অসভ্য জাতিগুলির জীবন পর্যবেক্ষণ দ্বারা বৈজ্ঞানিকগণও এই সিদ্ধান্তেই আসিয়াছেন। যতগুলি

জাতির জীবন পরীক্ষা করা হইয়াছে তাহাতে দেখা যাইতেছে মাতৃক্রমিক ও পিতৃক্রমিক দুরকমের সমাজই পৃথিবীতে রহিয়াছে। অতি আদিমকালে মানুষের স্বাভাবিক জীবন যদি পুরুষ-কেন্দ্রিক পরিবার দ্বারাই গঠিত হইয়া থাকে, তবু বহুবিধ কারণে—স্থানকালপাত্রের বৈচিত্র্য বিশেষের জন্য—সেই যুগেও কোথাও কোথাও মাতৃকেন্দ্রিক পরিবার সৃষ্ট না হইবার কোন অনিবার্য হেতু কিছু নাই। কোন স্তরকেই অনড় অচল বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই! অর্থ নৈতিক কারণে পিতৃক্রমী জাতি মাতৃক্রমীতেও পরিণত হইতে পারে। যথা মাতৃমাসী 'হিদাৎসা' (Hidatsa) জাতি। ইহাদের মধ্যে পূজাপার্বণের জিনিষপত্র বা পূজাপদার্থগুলি পিতা থেকে পুত্রে বর্তায়; শ্রাদ্ধাদিতে অধিকার পিতার জ্ঞাতিদের। এদিকে আবার পিতৃমাসী 'থোঙ্গা' (Thonga) জাতির মধ্যে মামার অধিকার অতি প্রবল।

এইসব দৃষ্টান্তে ইহাই প্রমাণ হয় যে বংশক্রম, বংশনাম, বাসস্থান ও মর্যাদা ইত্যাদি কোনটিই অপরিবর্তনীয় কিছু নয়। মাতৃক্রম-পিতৃক্রম, ইত্যাদি প্রথার কোনটিই সমাজ-জীবনের কোন অনড় ও অনিবার্য স্তর নয়। যাহারা এইসব প্রথাকে অনিবার্য স্তরে বাঁধিয়া ছক সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহারা তথ্যের উপর নির্ভর করেন নাই। আধুনিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত তাই স্পষ্ট যে—মাতৃতন্ত্র ও মাতৃক্রমিক স্তরই পূর্বতন এবং বিবর্তনের একটা নির্দিষ্ট অবস্থায় উদ্ভব হইয়াছে বাকোফেন-জর্মানী এই মতবাদ ভিত্তিহীন। মাতৃক্রম সর্বদাই পিতৃক্রমের পূর্বে, ইহা ভুল। মাতৃক্রম বা মাতৃতন্ত্র পৃথিবীর সকল-জাতিরই অনিবার্য স্তর, এ মতও ভুল। তাহা ছাড়া মাতৃক্রমের সঙ্গে সঙ্গে মাতৃতন্ত্রও অনিবার্য সহচর, ইহাও ভিত্তিহীন। ওয়েষ্টারমার্ক এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে পিতৃত্বের অনিশ্চয়তা মাতৃক্রমের উৎপত্তির কারণ মোটেও নয়। পণ্ডিতপ্রবর ক্রলীও এ বিষয়ে বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—"The famous matriarchal theory was as exaggerated in its early forms as was the patriarchal. It is now coming to be recognised that it is simply the tracing of descent through the mother and giving the children her name, thus there are a few cases where inheritence of property has later come under the rule. .. It is not however doubtful paternity which causes maternal genealogy. Dr Westermarck has shown this and also that the hypothesis of primitive promiscuity is without any foundation whatever. ....He has also proved that, though common, maternal descent cannot have been either universally or generally a stage through which man has passed. Amongst the lowest tribes in the scale, those of Australia, paternal descent is nearly as common as maternal." (Pp. 430 Crawley)

ওয়েষ্টারমার্ককে অনুসরণ করিয়া ক্রলীও বলেন যে পিতৃত্বের অনিশ্চয়তার জন্য মাতৃক্রমের উদ্ভব হয় নাই। আদিম সমাজে মাতার সহিত শিশু সন্তানের ঘনিষ্ঠ ও নিগূঢ় সম্বন্ধ অতি প্রখর-ভাবে মানুষের চোখে পড়িত। নারীর জীবনের সহিত শিশুর জীবন এইরূপ অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত দেখিয়া অসভ্য মন গভীর ভাবে প্রভাবিত হইয়া যাইত। এই প্রভাবের দ্বারা অভিভূত হইয়া অসভ্যরা মাতার নামে শিশুর নামকরণ ও মাতার সহিত সন্তানের রক্তসম্পর্ককে প্রাধান্য দান করিয়াছে। তাই মাতৃক্রমের সৃষ্টি। ইহাও সর্বত্র সকল জাতিতে ঘটে নাই। অন্যান্য নানা সহায়ক বা বিরুদ্ধ কারণের উপরে এই প্রথার অস্তিত্ব নির্ভর করিয়াছে। পিতা

অজ্ঞাত থাকার জন্য মোটেও নয়, মাতার গুরুত্বকে জোর দিবার জন্য মাতৃক্রম প্রচলন হইয়াছে। পিতাও অসভ্যদের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত কোনকালেই নয়।

আধুনিক গবেষণায়ও মাতৃক্রমের অনিবার্য প্রাচীনত্ব খণ্ডিত হইয়াছে। দেখাগিয়াছে নিম্নস্তরের সমাজেই পিতৃক্রম বহু জাতিতে বিদ্যমান। আবার উন্নত স্তরে মাতৃক্রম প্রাধান্য পাইয়াছে। সামাজিক স্তর হিসাবে এইসব প্রথাকে কার্যকারণ শৃঙ্খলায় বাঁধিয়া ছক তৈয়ার করা যে বিজ্ঞানসম্মত নয় তাহা বিখ্যাত নৃতাত্ত্বিক-ত্রয়ী-গিন্সবার্গ (Ginsberg) হবহাউস্ (Hobhouse) ও হুইলার (Wheeler) কর্তৃক প্রমাণ হইয়াছে। ইহাদের গবেষণার ফল আদিমজাতিতন্ত্রের ("Simpler peoples") নামক পুস্তকে রহিয়াছে। এই পুস্তকে তথ্যাদিসহ প্রমাণ হইয়াছে যে নিম্নস্তরের শিকারীদের মধ্যে যতখানি মাতৃক্রম পাওয়া যায়, তথা কৃষিস্তরের উন্নত জাতিদের মধ্যেও প্রায় ততখানি মাতৃক্রমের প্রচলনই দেখা যায়। আবার উচ্চ শিকারীদের মধ্যে মাতৃক্রমের হ্রাস দেখা যায়। শিকারীদের মধ্যে নারীর মর্যাদা ও স্থান অতি নিম্নে; কিন্তু কৃষিজীবীদের মধ্যে নারীমর্যাদা বরং শিকারীদের চাইতে বেশী। এই সব গবেষণায় এঙ্গেলস্-মর্গানী ছকের বাঁধাধরা স্তরনির্দেশ খণ্ডিত হইতেছে। সমাজের বিভিন্ন সংগঠনস্তরের সহিত পরিবার ও বিবাহের বিভিন্ন স্তরের অচ্ছেদ্য কোন মৌহ-বন্ধন নাই। একটি স্তরের সহিত অন্য স্তরের যে একতরফা ক্রম-সম্বন্ধ (Sequence) মর্গান কল্পনা করিয়াছেন তাহারও কোন ভিত্তি নাই।

পিতৃগোত্র এবং মাতৃগোষ্ঠী (Gens & Clans)

বিবর্তনী সম্প্রদায়ের মতে, ভাইবোনবিবাহ একসময়ে বন্ধ হইল এবং পুনালুয়া পরিবারের উদ্ভব হইল। যৌথ-বিবাহ চল আছে বলিয়া পিতা অজ্ঞাত। কাজেই এই অবস্থায় মাতৃক্রমীগোষ্ঠীই সমাজের ভিত্তি হইয়াছে। পুনালুয়া পরিবারের মধ্য হইতেই এই মাতৃগোষ্ঠী নানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে। ইহার ফলে সমাজে নিকটাত্মীয়সঙ্গম বারিত হইয়া কল্যাণের কারণই ঘটিল। প্রথমে ভাইবোনে বিবাহ এবং ধীরে ধীরে মাতৃগোষ্ঠীভুক্ত অন্যান্য আত্মীয়দের সঙ্গেও বিবাহ নিষিদ্ধ হইল। এই মাতৃগোষ্ঠী পৃথিবীর সব বর্বর জাতিরই সমাজের ভিত্তি। এই মাতৃগোষ্ঠী 'arose directly out of it-- the gens which forms the basis of the social order of most, if not all, barbarian peoples of the earth." (Engels : p 40) পুনালুয়া যৌথবিবাহের প্রমাণস্বরূপে এই মাতৃক্রমী গোষ্ঠীর উল্লেখ করিয়াছেন, এঙ্গেলস্-মর্গান। মাতৃক্রমী গোষ্ঠীকে ব্যাখ্যা করিতে হইলে পূর্বের স্তরে পুনালুয়া বিবাহ ছিল, ইহা স্বীকার করিতে হয়। মাতৃক্রমী গোষ্ঠী সম্বন্ধে মর্গান-মার্ক্সবাদী মতবাদের মূলকথা হইল এই কয়টি :

ক) **গোষ্ঠী বিবাহ হইতেই মাতৃগোষ্ঠীর উৎপত্তি হইয়াছে** কারণ :

১) রক্তসম্পর্ককে কেন্দ্র করিয়াই প্রথমসমাজবন্ধন সৃষ্টি হইয়াছে, একই রক্তসম্পর্কের মধ্যে বিবাহ নিষেধ করিয়া দেওয়াতেই গোষ্ঠীর উদ্ভব হইয়াছে।

২) পিতা অজ্ঞাত

৩) গোষ্ঠীর উৎপত্তি এই (Segmentation) একই পদ্ধতিতে হইতে পারে

৪) হৈতসমাজই আদিতম সমাজ

খ) **মাতৃগোষ্ঠী পৃথিবীতে সার্বজনীন স্তর** : এককালে সব জাতিরই মধ্যে ইহা প্রচলিত ছিল এবং প্রত্যেকটি সমাজকেই এই স্তর পার হইয়া আসিতে হইয়াছে বা হইবে।

গ) **নিকটাত্মীয়-সঙ্গমের কুফল এড়াইয়া সমাজ-কল্যাণের ভিত্তি স্থাপনের জন্যই ইহার উদ্ভব।**

ঘ) **পিতৃক্রমী গোষ্ঠীও বর্তমান কালে পৃথিবীতে রহিয়াছে।** কিন্তু ইহা পরবর্তী কালের সৃষ্টি এবং অর্থ নৈতিক

কারণে ইহার উদ্ভব হইয়াছে। অর্থাৎ ব্যক্তিগত সম্পত্তি সন্তানে প্রবর্তন করিবার জন্য মাতৃক্রম হইতে পিতৃক্রমে সমাজকে পরিবর্তিত করা হইয়াছিল। ইহাতেই পিতৃগোষ্ঠী বা gens'র উদ্ভব।

এই চারটী মর্গানী সূত্রের সমালোচনা করিতেছি। মাতৃক্রম সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে, এখন মাতৃক্রমী গোষ্ঠীপ্রথা সম্বন্ধে মর্গান-বারীর মতবাদের বিশ্লেষণ করিয়া দেখানো হইয়াছে যে এই মতবাদ আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞান প্রত্যাখ্যান করিয়াছে।

(ক) যৌথবিবাহ হইতে নয়, আদিম পরিবার হইতেই গোষ্ঠীপ্রথার উদ্ভব হইয়াছে :

মর্গান আদিম কালে "অবাধ-সংসর্গ" স্তর এবং "সমশোনিত বিবাহ" স্তর, এই দুইটি পূর্ববর্তী সমাজ-স্তর ধরিয়া লইয়াই পরবর্তী স্তর "পুনালুয়া পরিবার" ও "মাতৃগোষ্ঠী" কল্পনা করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু 'অবাধ-সংসর্গ' স্তর বলিয়া কোন স্তর মানবসমাজ কোনদিনই অতিক্রম করে নাই, এবং সমশোনিত বিবাহ ও পরিবার বলিয়া কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠান কোন কালেই গড়িয়া ওঠে নাই, অধুনার সমাজবিজ্ঞান তাহা প্রমাণ করিয়াছে। এ বিষয়ে পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। এই কারণে সার্বজনীন মাতৃগোষ্ঠীর কল্পিত স্তরও ভিত্তিহীন হইয়া পড়িতেছে। মর্গান যে অনিবার্য স্তরপর্যায় বাঁধিয়া দিয়াছেন তাহাতে পূর্বস্তর না টিকিলে পরের স্তরও টিকিতে পারে না। তাহা ছাড়া একটা vicious circle ও সৃষ্টি হয় ইহাদের যুক্তিতে। মাতৃগোষ্ঠী একটা অনিবার্য স্তর কেন? মর্গানী বলেন, পূর্বে অবাধসংসর্গ ও যৌথবিবাহ ছিল, এই কারণে। আবার, অবাধসংসর্গ ও যৌথবিবাহ যে পূর্বে ছিল, তাহার প্রমাণ কি? মর্গানী জবাব দেন, পৃথিবীতে মাতৃগোষ্ঠী রহিয়াছে, তাই। এই যুক্তি-বিভ্রাটের কারণ হইল এই যে পূর্বে আগাগোড়া একটা ছক কল্পনা করিয়া পরে তথ্য সাজাইয়া সেই ছককে সমর্থন করিবার চেষ্টা ইহারা করিয়াছেন।

মাতৃগোষ্ঠী বা পিতৃগোত্রের স্বরূপ বিচার করিলে দেখা যায় যে পরিবারের সহিত গোষ্ঠীপ্রথার একদিক দিয়া একটা সাদৃশ্য রহিয়াছে। পরিবারেরই মত, গোষ্ঠীরও ভিত্তি আত্মীয়তা-বোধ। কিন্তু পরিবারের সহিত গোষ্ঠীর গুরুতর পার্থক্য রহিয়াছে। তাহা এই যে পরিবার দ্বৈতাত্মিক (bilateral) কিন্তু গোষ্ঠী একাত্মিক (unilateral) পরিবার পিতা ও মাতা দুইকে লইয়া। কিন্তু গোষ্ঠীর ভিত্তি হল পিতা ও পৈত্রিকসম্পর্ক নয়, মাতা ও মাতৃকসম্পর্ক। গোষ্ঠী এক পক্ষের আত্মীয়স্বজনকে লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। পিতা কিংবা মাতা একজনের বংশ দিয়া আত্মীয়তার বিশিষ্ট একটা পদ্ধতি সৃষ্টি করিয়া অপর পক্ষকে হিসাবের মধ্যে না আনিয়া গোষ্ঠীর গঠন করা হইয়াছে। পিতৃগোষ্ঠী যে জাতিতে প্রচলিত সেখানে জন্মমাত্রই প্রত্যেক শিশুই পিতার গোষ্ঠিতে গণ্য বলিয়া ধরা হইবে, পিতার গোত্রনাম ও বংশক্রম ধরিয়া বহুতর অনুষ্ঠান পালিত হইবে। তেমনি মাতৃগোষ্ঠীক জাতিতে সব শিশুই মাতৃগোষ্ঠিভুক্ত হইবে এবং মাতৃবংশের উপাধিধারণ করিবে। পিতৃক্রমী গোত্র কোন পিতৃপুরুষের পুরুষবংশধরদের লইয়া। তেমনি মাতৃগোষ্ঠী হইল কোন মহিলা পূর্ব-পুরুষের মহিলা বংশধরদের লইয়া এবং তাদের সন্তানদের লইয়া। গোষ্ঠীপ্রথার প্রধান নিয়ম হইল, স্বগোত্রীয়দের সহিত বিবাহ নিষেধ এবং এজন্য বহির্বিবাহ (Exogamy) গোষ্ঠীপ্রথার অবশ্য লক্ষণ।

পৃথিবীর সর্বত্রই অসভ্যদের মধ্যে পরিবার এবং গোষ্ঠী, দুই-ই দেখা যায়। প্রশ্ন হইতেছে, ইহাদের কোনটি পূর্বতর। মর্গানী মতে, একাত্মিক গোষ্ঠীই পূর্বতর, এবং দ্বৈতাত্মিক পরিবার উদ্ভব হইয়াছে অনেক পরে। একজনকে স্বীকার করিয়াই মানুষের প্রথম দল বাঁধা শুরু হইয়াছে। মাকে চিনিয়া ও মাকে ঘিরিয়াই অন্যান্য আত্মীয়কে মানুষ প্রথম

চিনিয়াছে। মায়ের সহিত রক্ত সম্পর্কই মানুষের প্রথম আত্মীয়তাজ্ঞানের ভিত্তি। তাই আগে মাতৃগোষ্ঠীর সৃষ্টি। একই আদি, একককে ছাড়াইয়া এবং একের থেকেই মানুষ 'দুইয়ে' আসিয়াছে।

মর্গানী এই মত আপাতদৃষ্টিতে স্বাভাবিক মনে হইলেও আধুনিক নৃতত্ত্ব ইহাকে স্বাভাবিক ও সম্ভব মনে করে না। নৃতত্ত্ব সিদ্ধান্ত করিয়াছে পিতামাতা দুইকে লইয়াই আদিম পরিবারের পত্তন হইয়াছিল। পিতা, মাতা ও সন্তান এই তিনকে লইয়াই প্রাকৃতিক পরিবার গড়িয়া উঠিয়াছে। কোন কৃত্রিম উপায়ে, বুদ্ধির সাহায্যে নয়। অতি স্বাভাবিকভাবে এবং সহজ মানবিক বৃত্তির প্রেরণায়। কোন বিশেষ সময়ে, বিশেষ অবস্থা হইতে নয়: চিরকালই পরিবার আছে, মানুষের যখন হইতে পৃথিবীতে আবির্ভাব হইয়াছে, পরিবারও সেই আদিম ক্ষণ হইতেই মানবজীবনের আদিম সঙ্গী। প্রশ্ন হইবে, তাহা হইলে 'গোষ্ঠীপ্রথা' সৃষ্টি হইল কেন এবং কবে! বিজ্ঞান বলে, গোষ্ঠীপ্রথাই পরবর্তিকালে গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহা বিশেষ অবস্থা ও কার্যকারণের ফল। স্থানকাল বিশেষে, পিতা কিংবা মাতা ইহাদের একজনের উপরে বিশেষ মর্যাদা আরোপ করাতেই কোথাও পিতৃক্রম, কোথাও বা মাতৃক্রম সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা শুধু গুরুত্ব আরোপের (emphasis) ফল, একজনের উপরে বিশেষ ও একটু বেশী জোর দেওয়া। কিন্তু একজনের উপর জোর দেওয়া মানে ইহা নয় যে অপরজনকে একেবারেই বাদ দেওয়া হয়। অপর পক্ষকে শুধু কোন কোন বিশেষ ব্যাপারে হিসাবের মধ্যে ধরা হয় না। এই মাত্র। অপর ব্যাপারের বেলায় তাহাকে স্বীকার করা হয়। পিতৃক্রমী গোষ্ঠীর শিশু মাকে চিনে না, জানেনা বা স্বীকার করেনা, তাহা কখনো নয়। শুধু উপাধি বা অন্য কোন কোন ব্যাপারের বেলায় মাকে ধরিয়া পরিচয় দান এবং কোন কোন অনুষ্ঠান পালন করে না। অন্যান্য অনেক বিষয়ে মা-ও গণ্য হয়।

স্বভাবতই মর্গানীরা প্রশ্ন উঠাইবেন, পরিবার ও গোষ্ঠী দুইই একই সঙ্গে একই সমাজে বিদ্যমান থাকে কি করিয়া? ইহারা একে অন্যের বিরোধী, কারণ একের উপরে জোর দিলে দুইয়ের উপরে জোর দেওয়া চলে না। পিতামাতা দুইকে স্বীকার এবং সঙ্গে সঙ্গে একককে অস্বীকার ইহা সম্ভব নয়। দার্শনীয় ডায়ালেকটিকবাদীরা বলিবেন, ইহাতে অবিরোধ ঘটিল। কিন্তু গোষ্ঠী ও পরিবারের স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞান থাকিলে এ আপত্তি যে ভিত্তিহীন তাহা বুঝিতে কষ্ট হইবে না। আসলে ব্যাপারটি অন্যরকম। স্বীকার ও অস্বীকার, এই দুইই একসঙ্গে চলিতে পারে, কারণ ইহাদের প্রয়োগ হইতেছে সমাজ-জীবনের ভিন্ন ভিন্ন দিকের উপরে। বর্তমান সমাজে আমরা কি করিয়া থাকি? আমরা মাকে চিনি, মর্যাদা দিই, কিন্তু তবু পারিবারিক নাম ইত্যাদি কতকগুলি বিশিষ্ট ব্যাপারে মায়ের দিককে হিসাবে আনিনা। তেমনি অসভ্যও দুইজনকেই স্বীকার করিয়াও একজনকে কোন বিষয়ে আমলে না-ও আনিতে পারে। "So primitive tribes may recognise both parents in a variety of ways, yet disregard either for specific purposes." (Lowie, p 110) অসভ্যরা পিতামাতা, দুইকেই জানে এবং নানা উপায়ে তাহার স্বীকৃতিকে প্রকাশও করে কিন্তু বংশগণনা কিংবা উপাধি, নেওয়ার বেলায় একজনকে বাদ দিতে বাধে না। বংশক্রম বা গোত্র-উপাধির বেলায় একতম জন্মদাতৃকে ধরিয়া সবকিছু নির্ধারণ করে। মর্গানীরা মনে করিয়াছেন, যেহেতু একজনকে অবলম্বন করিয়া বংশক্রমাদি ঠিক করে সেই হেতু অপর জন্মদাতৃকে চিনেই না। এঁদের মতে, অসভ্য শুধু মাতার সঙ্গে রক্তসম্পর্ককেই বুঝিতে পারে ও স্বীকার করে।

এখানে গোষ্ঠীব্যাপারে এই রক্ত সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। অসভ্য মনে করে, কোন এক পূর্বপুরুষের বংশধর বলিয়াই তাহারা এক গোষ্ঠীভুক্ত ও উপাধিধারী। কিন্তু ইহা হইতেই এ ধারণা করা ভুল হইবে যে গোষ্ঠী ষোলআনা কেবল

রক্ত সম্পর্কদ্বারাই সৃষ্টি হইয়াছে। গোষ্ঠীসম্পর্ক হইল প্রকৃত পক্ষে সামাজিক সম্পর্ক। বহুশক্তির প্রভাবে এই সামাজিক সম্পর্ক গড়িয়া ওঠে। শুধু রক্তই একমাত্র শক্তি বা factor নয়। রক্তসম্পর্ক তো আছেই কিন্তু নামকরণ প্রথা, নিবাসপ্রথা (residence) ভৌগলিক পরিস্থিতি ইত্যাদিরও প্রভাব কম নয়। নামও ঐক্যবোধ সৃষ্টি করে, এমনকি রক্ত সম্পর্ক না থাকিলেও এক বংশীয় বলিয়া মনে করিবার মত অবস্থা ও মনোভাব সৃষ্টি করিতে পারে। বাসস্থানের নৈকট্যও এই ঐক্যবোধকে ধারণ করিয়া রাখে। দূরদূরান্তে ছড়াইয়া পড়িলে বংশবন্ধন শিথিল হইয়া বিস্মৃতিতে লুপ্ত হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু নামপ্রভাব তখন ঐক্যকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারে। গোষ্ঠীগঠনের পিছনে নানা শক্তিই কাজ করিতেছে, মর্গান শুধু রক্তসম্পর্কদ্বারাই আদিমজীবন ঘোল আনা নিয়ন্ত্রিত হইত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু রক্তের গুরুত্বকে স্বীকার করিয়াও অধুনার নৃতত্ত্ব বলিতেছে যে পূর্ব যুগের বিবর্তনীরা রক্ত প্রভাবকে গুরুত্ব দিতে গিয়া অতিশয্য করিয়া ফেলিয়াছিলেন। ওয়েষ্টারমার্কের ভাষায়, It seems that the importance which savages attach to a common blood, has been much exaggerated" (205 p.)

রক্তসম্পর্কের এই একতরফা ব্যাখ্যা ভুল। অসভ্য সম্পর্কের একদিকের উপরে শুধু গুরুত্ব আরোপ করে, এই ধারণাও ভুল। নিউ সাউথ ওয়েলস্‌এ (New South Wales) কোন কোন জাতিতে কন্যা মামার গোষ্ঠীভুক্ত হয় কিন্তু পিতা হইতেই ভ্রাতা বলিয়া সবাই মনে করে, এদের কাছে মা হইল শুধু পালিকা। এই কারণে ওয়েষ্টারমার্ক বলেন, ..."there are ins ances in which clanbond is obviously not regarded as a blood-bond at all, in the strict sense of the term" (205) রক্ত বা বংশ সম্বন্ধে অসভ্যের মনের সংস্কার খুব প্রবল, একথা ঠিক। কিন্তু ইহা সংস্কার তাহাও মনে রাখা উচিত এবং এ সংস্কারও অতিশয্য-দুষ্ট ও প্রায়ই অবাস্তব। গোষ্ঠী বস্তুটি রক্তভিত্তিক নয়। দুরখীম (Durkheim) অষ্ট্রেলীয় গোষ্ঠী সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে এদের মধ্যে নামের প্রভাবই বেশী, রক্তের চাইতে। নামকে ভিত্তি করিয়াই প্রায়শঃ সমাজসম্পর্ক নির্দ্ধারিত হয়, গোষ্ঠী গড়িয়া ওঠে। গোষ্ঠী সভ্যেরা নিজেদের আত্মীয়তাবদ্ধ বলিয়া মনে করে। রক্ত সম্পর্কিত বলিয়াও মনে করে। কিন্তু তাই বলিয়া বাস্তবিক তাহারা রক্তসম্পর্কিত তাহা বলা চলে না। This relation does not come from the fact that they have definite blood connection with one another, they are relatives from the fact that they have the same name" (102, Durkheim)

(ক্রমশঃ

পরিকল্পনা ও বৈদেশিক সাহায্য

— — — — — — — — — — বীরেন ভট্টাচার্য — — — — — — — — —

দুই ধরণের পরিকল্পনার সাহায্যে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথা ভাবতে পারা যায়। এক ধরণের পরিকল্পনায় দেশের আভ্যন্তরীণ সম্পদকে যথাযথভাবে ব্যবহার করে দৈন্য মোচনের চেষ্টা করা হয়, তাতে জনগণের সংস্কার ও ত্যাগ-প্রেরণার উপর চাপ বেশী পড়ে। তাদের চিরাচরিত অনেক অভ্যাসের সমূলে সংস্কার করতে না পারলে পরিকল্পনার প্রথম অবস্থায় যে সব বাধা আসে, তাদের অতিক্রম করা যায় না। দ্বিতীয় ধরণের পরিকল্পনায় দেশীয় সম্পদের ব্যবহারকে ত্বরান্বিত করবার জন্যে কেবল নিজেদের প্রচেষ্টার উপর নির্ভর না করে গোড়ার দিকে বৈদেশিক মূলধনের উপর কিংবা বিদেশী কর্মীদের সাহায্যের উপর নির্ভর করা হয়। এতে প্রথম দিককার বাধাগুলি অপেক্ষাকৃত লঘু হয়ে আসে, কিন্তু পরে বিদেশি ঋণ পরিশোধ করবার জন্য বহুদিন জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানকে খাটো করে রাখতে হয়।

প্রথম ধরণের পরিকল্পনার জন্যে জনসাধারণকে যতটা ত্যাগ স্বীকার করতে হয়, গণতান্ত্রিক উপায়ে তাদের সেই পরিমাণে উদ্বুদ্ধ করা যায় কি না, তা নিয়ে অনেকবার প্রশ্ন তোলা হয়েছে! ডিক্টেটর-শাসিত দেশে জনসাধারণকে ত্যাগ স্বীকারে বাধ্য করে পরিকল্পনাকে স্ব-নির্ভর করে তোলা হয়ে থাকে। গণতন্ত্রী দেশে গণ-প্রতিনিধিরা জনতার সহনশীলতা নিয়ে এতটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে রাজী হবেন কি? জনতাকে নতুন অভ্যাস শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব তারা বহন করবেন, না প্রস্তুত সমস্যাকে একপাশে রেখে এমন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করবেন যার মধ্যে পরনির্ভরতার চিহ্ন সুস্পষ্ট? বলা বাহুল্য শেষোক্ত পথটাই সহজতর। সেই জন্য গণতন্ত্রী দেশেও পরিকল্পনা জনতার হৃদয় স্পর্শ করতে পারে এমন দৃষ্টান্ত বিরল। বাইরের সাহায্য এনে পরিকল্পনার কাজ চালানোগণ প্রতিনিধিদের কাছে অপেক্ষাকৃত কম কঠিন বলে, মনে হয়। এটা গণতন্ত্রের অন্যতম প্যারাডক্স (paradox)। গণতন্ত্রের বনিয়াদ সুদৃঢ় হলে হয়তো এরকম ঘটত না, তখন গণ-প্রতিনিধিরা সাধারণ্যে গিয়ে নিজেদের বক্তব্য জোরের সঙ্গে বলতে পারতেন এবং নিজেদের দাবি আদায় করে নিতে পারতেন। কিন্তু অধিকাংশ তথাকথিত গণতন্ত্রী দেশেই শাসকশ্রেণী জনতার সঙ্গে এতটা একাত্মভাবে মিশতে পারে না। সমাজে প্রচলিত নানা ধরণের বৈষম্যের জন্যই শাসক ও শাসিতের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস ও অসহযোগিতা দেখা দেয়, সেই ধোঁয়াটে আবহাওয়ায় পরিকল্পনার রূপ খানিকটা বিকৃত হতে বাধ্য। বৈদেশিক সাহায্যের উপর একান্ত নির্ভরতা এই বিকৃতির অন্যতম লক্ষণ।

পরিকল্পনার সাহায্য না নিয়ে যে-সব দেশ গত শতাব্দীতে কিংবা তারও আগে সমৃদ্ধির সোপানে আরোহণ করতে শিখেছিল, তাদের মধ্যেও অবশ্য অনেক দেশ বিদেশি পুঁজির উপর নির্ভর করেছে। আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, এদের প্রত্যেকেই কোনো না কোনো সময়ে বিদেশি পুঁজির সহায়তা গ্রহণ করেছে। কিন্তু পুঁজিবাদী আর্থিক বিকাশের রীতি এবং পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের নীতি সর্বাংশে এক হতে পারে না। এক দেশ থেকে অন্য দেশে পুঁজির রপ্তানী কেন হয়? ধনিকতন্ত্রের ইতিহাস অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে ধনিকশ্রেণীর মুনাফা-সন্ধানী মনোভাব যখন রাষ্ট্রের সক্রিয় সমর্থন পায়, তখনই বাইরের

দেশে পুঁজির বিস্তার ঘটে। পরিকল্পিত আর্থিক ব্যবস্থায় যদি আমরা মুনাফার নীতিকে সংকুচিত করব বলে সংকল্প করি, তা হলে বিদেশি পুঁজিবাদীদের নিকট থেকে সাহায্য পাওয়াও সহজ হবে না এবং গ্রহণ করাও অশোভন। পরিকল্পিত আর্থিক ব্যবস্থা যে-সব দেশ গ্রহণ করেছে তারা অবশ্য সাহায্য গ্রহণ করছে প্রধানতঃ বিদেশের সরকারের হাত থেকে। যদিও মূলতঃ এই সাহায্যের মূলে পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাবই প্রধান, তবু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাবিস্তারের অন্যতম উপায় হিসাবেও বৈদেশিক সাহায্যদানকে সব দেশেই আজকাল প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। Economic imperialism কথাটা হয়তো অতিশয়োক্তি, কিন্তু economic aid যে diplomacy-র অন্যতম অঙ্গ, এ বিষয়ে সকলেই পুরোমাত্রায় সচেতন। বিদেশের নিকট থেকে সাহায্য গ্রহণ করলেই বিদেশি রাষ্ট্র আমাদের উপর চেপে বসবে এ-ধারণা হয়তো ভ্রমাত্মক। কিন্তু উত্তমর্ণ দেশ অধমর্ণের নিকট থেকে অন্ততঃ সদিচ্ছার প্রতিদান পাবে এ আশা থাকা তাদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। এতে অধমর্ণ দেশের বৈদেশিক নীতি হয়তো তার কক্ষপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে না, কিন্তু তার স্বাধীনতা খানিকটা ক্ষিপ্ত হয় বলেই আমাদের ধারণা। দ্রুত পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে কোনো স্বনির্ভর দেশ যতটা সহজে নিজেকে পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, একান্ত পরমুখাপেক্ষী দেশ তা পারে না।

পরিকল্পনার লক্ষ্য যদি হয় দেশের আভ্যন্তরীণ সম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহার, তা হলে বৈদেশিক সাহায্যের প্রাচুর্য্য সেই লক্ষ্যকে অন্তত সাময়িকভাবে ব্যাহত করবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। পরিকল্পনার কর্ণধারগণ যদি বৈদেশিক সাহায্যকে বিনা দ্বিধায় শুভাগমন জানান, তাহলে পরিকল্পনাকে গণচেতনার উপর প্রভাব বিস্তার করতে বাধাই দেওয়া হবে। নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হতে জনসাধারণ বিশেষ কোনো সুযোগ পাবে না। গণতন্ত্রী দেশে গণতন্ত্রের আদর্শকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে যে-ধরণের আর্থিক পরিকল্পনার প্রয়োজন, তাতে প্রচুর বৈদেশিক সাহায্যের স্থান না থাকাই স্বাভাবিক। বিশেষ কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিদেশ থেকে কারিগরি সাহায্য নেওয়ার প্রয়োজন অবশ্য অনুভূত হতে পারে, কিন্তু দেশজ সম্পদকে প্রাধান্য দেওয়াতেই থাকবে সেই পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য। বলা বাহুল্য, বাস্তবে অধিকাংশ অনুন্নত দেশের পরিকল্পনাই এই নীতিকে অনুসরণ করে নি। তারা আর্থিক উন্নতির সহজতম পথটিকেই বেছে নিয়েছে, নিজেদের গণতান্ত্রিক দায়িত্ব পালনের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে তারা বিদেশি রাষ্ট্রের প্রভাববলয়ের মধ্যে প্রবেশ করেছে!

ভারতের তৃতীয় পরিকল্পনায় এই দুর্বলতার চিহ্ন সুস্পষ্ট। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বৈদেশিক সাহায্যের স্থান ছিল, কিন্তু তার উপর একান্ত নির্ভরতা ছিল না। তৃতীয় পরিকল্পনার মূল কাঠামোতে বৈদেশিক সাহায্য এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছে। একদিকে তৃতীয় পরিকল্পনার ব্যয়ের বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে, অন্য দিকে নিজস্ব সম্পদের পূর্ণতর ব্যবহারের জন্য যে ধরণের ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন তার উপর আগের চেয়েও কম জোর দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় সরকার যতটা বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করতে মনস্থ করেছেন, তার সামগ্রিক পরিমাণ প্রায় ৩২০০ কোটি টাকা। এর মধ্যে কিছু অংশ ব্যয়িত হবে পুরোণো বৈদেশিক ঋণ শোধ করার জন্যে, খানিকটা সাহায্য আসবে উদ্বৃত্ত খাদ্যের আকারে, বাকী প্রায় ২২০০ কোটি টাকা সরাসরি পরিকল্পনার কাজে লাগবে। পরিকল্পনার বিভিন্ন অংশে বিদেশি আমদানি-করা যন্ত্রপাতির প্রাধান্য লক্ষ্য করবার বিষয়। যে-ধরণের পরিকল্পনায় দেশের অবলম্বনহীন শ্রমিকসমাজকে বেশি করে কাজে লাগানো যেত, আমাদের পরিকল্পনা তার প্রায় বিপরীত। সংগঠন ও প্রচারের প্রয়োজনীয়তা যে-ধরণের

পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, আমাদের পরিকল্পনার কর্ণধারগণ তাকে এড়িয়ে গেছেন বলেই মনে হয়।

বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণের বিরুদ্ধে সচরাচর যে-সব যুক্তি দেওয়া হয়ে থাকে তার মধ্যে প্রধান যুক্তি : ঋণের বোঝা দেশের উপর ভারস্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে, ঋণ পরিশোধ করার সামর্থ্য হয়তো শেষ পর্যন্ত থাকবে না। উপরের আলোচনায় এ-যুক্তিকে কোনো প্রাধান্য দেওয়া হয় নি। বৈদেশিক সাহায্যে ঠিকমত এসে পৌঁছালে আমাদের বৈষয়িক উন্নতি হবে এবং ঋণ পরিশোধ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এতে কোনো সন্দেহ নাই। সুতরাং অনবরত বৈদেশিক সাহায্য নিয়ে ভারত-রাষ্ট্র বৈষয়িক দিক থেকে দেউলিয়া হয়ে দাঁড়াবে এমন আশঙ্কার কোনো ভিত্তি নেই। যদি দেউলিয়া আমাদের হতে হয়, তবে তা প্রধানত নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে। আমাদের পরিকল্পনায় যে-নীতি অনুসৃত হচ্ছে তাতে দেশের নৈতিক মেরুদণ্ড দুর্বল হচ্ছে, জনসাধারণকে তাদের দায়িত্ব বহন করবার জন্যে যথোচিত আহ্বান জানানো হচ্ছে না, দেশের আভ্যন্তরীণ সম্পদ অব্যবহৃত থেকে যাচ্ছে—বৈদেশিক সাহায্যের বিপক্ষে এই ধরণের যুক্তিই প্রবলতর। গণতন্ত্রের পরীক্ষায় যদি সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করা আমাদের অভীষ্ট হয়, তা হলে বৈদেশিক সাহায্যের এই প্রাধান্যকে আমাদের পরিকল্পনা থেকে বর্জন করাই বিধেয়।

খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই

গীতাচার্য জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা	৬·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	৫·০০
ভারত-আত্মার বাণী	৫·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
কর্মবাণী	১·২৫
Soul of India Speaks	5·00

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ. বি. টি.

বিদ্যাসাগর	২·৫০
মানুষের মত মানুষ	·৬২
শিশু রামায়ণ	·৬২
শিশু মহাভারত	·৭৫

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

বাংলার ঋষি	৩·০০
বাংলার মনীষী	১·২৫
বাংলার বিদুষী	২·০০
বীরত্বে বাঙালী	১·৫০
ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৩·০০
রাজর্ষি রামমোহন	১·০০
রবীন্দ্রনাথ	১·০০
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১·২৫
আচার্য জগদীশচন্দ্র	১·৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০

॥ প্রতিটি বই বহুচিত্র শোভিত ॥

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী : : ১৫ কলেজ স্কোয়ার : : কলিকাতা—১২

: প্রবন্ধ

উইলিয়াম ফকনার

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

গত ৬ই জুলাই আমেরিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক ও গল্পকার উইলিয়াম ফকনার পরলোকগমন করেছেন। স্বদেশে তিনি বেশী দিন যাবৎ স্বীকৃতি পাননি। ১৯৫০ সালে নোবেল পুরস্কার পাবার পর দেশের লোকের দৃষ্টি পড়েছিল তাঁর উপর। এর পূর্ব পর্যন্ত তিনি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন না।

ফকনারের প্রথম বই বের হয় ১৯২৪ সালে। এর পর দশ বছর পর্যন্ত তাঁর যে কখানি বই বেরিয়েছে তাদের বিক্রি মোটেই সন্তোষজনক ছিল না। একজন সাধারণ আমেরিকান ঔপন্যাসিকের বইও এত কম বিক্রি হয় না। একটি উপন্যাস যাতে অন্ততঃ দশ হাজার কপি বিক্রি হয় সেই উদ্দেশ্য নিয়ে ফকনার লিখলেন Sanctuary পাঠকদের আকর্ষণ করবার জন্য যা দরকার তা সবই ফকনার দিলেন এই কাহিনীতে। নারী ধর্ষণ, নর হত্যা, বেশ্যা পল্লী, গুণ্ডামি সবই রয়েছে 'স্যাংচুয়ারি-তে'। প্রকাশক পাণ্ডুলিপি পেয়ে চমকে উঠলেন। এ বই ছাপালে লেখা অনিশ্চিত। লেখককে অনেক অনুরোধ করে কিছু অদল-বদলের পর বই ছাপা হল।

এই ইতিহাস ফকনার নিজেই লিখেছেন 'স্যাংচুয়ারির' বডার্ণ লাইব্রেরি সংস্করণের ভূমিকায়। পরবর্তী কালে জন-প্রিয়তা লাভের এই আকাঙ্ক্ষা অনেকটা সফল হলেও হেমিংওয়েও বা কল্ডওয়েলের জনপ্রিয়তা তিনি লাভ করেননি। ফকনারের দুখানি বই আছে যাদের মাত্র ৩০০ ও ৩০০ কপি করে একবার ছাপা হয়েছিল। আবার ছাপাবার জন্য কোনো তাগিদ আসেনি।

ফকনার নিছক আমেরিকান ঔপন্যাসিক নন। তাঁর শিল্প-রীতির মধ্যে বিচিত্র মিশ্রণ দেখা যায়। রাশিয়ান ও ফরাসী ঔপন্যাসিক এবং এলিজাবেথীয় নাট্যকারদের ফকনারের উপন্যাসের এখানে-ওখানে চিনতে কষ্ট হয় না। তাছাড়া সবচেয়ে বড় কথা ফকনার 'ষ্ট্রীম অব কনসাসনেস' —এর রীতি অবলম্বন করায় তাঁর উপন্যাস সাধারণ পাঠকের নিকট প্রচুর সমাদর লাভ করবে এমন আশা করা যায় না।

ফকনারের প্রতিভা প্রথম স্বীকৃতি লাভ করে ফ্রান্স-এ। তাঁদ্রে মালরো 'স্যাংচুয়ারির' ফরাসী অনুবাদের ভূমিকা লিখেছেন। 'রিকোয়েম ফর এ নান'-এর ফরাসী নাট্যরূপ দিয়েছেন আলবেয়ার কাম্যু। সুতরাং ফকনারের খ্যাতি বিদেশ থেকে স্বদেশে এসেছে; দেশ থেকে বিদেশে যায় নি।

উইলিয়াম হ্যারিসন ফকনার (William Harrison Faulkner) মিসিসিপির অন্তর্গত নিউ আলবানিতে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ফকনার বানান বরাবরই ছিল Falkner; 'ইউ' ছিল না। কিন্তু ফকনারের প্রথম বই The Marble Faun (1924) মুদ্রণের সময় কম্পোজিটর ভুল করে 'ইউ' যোগ করে দেয়। ফকনার এই ভুল স্বীকার করে Faulkner বানান গ্রহণ করেন।

ফকনারের প্রপিতামহ ছিলেন মিসিসিপি অঞ্চলের খ্যাতিমান পুরুষ। তাঁর নামের সঙ্গে জড়িত ছিল নানা কিংবদন্তী। সিভিল ওয়ারে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে দুটি নরহত্যার অভিযোগ ছিল। মিঃস অবশ্য

থেকে হয়েছিলেন একটি রেল লাইনের মালিক এবং স্থানীয় রাজ্য বিধান সভার সদস্য। রেলপথের অংশীদারের গুলিতে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। ফকনারের ঠাকুর্দা ছিলেন ব্যাঙ্কার, আইনজীবী এবং রাজনীতির সহিত সংশ্লিষ্ট। কিন্তু ফকনারের বাবার আমলে পরিবারের দুর্দিন দেখা দিল। বাবার আয় ছিল সামান্য। স্কুলের পড়া শেষ হবার আগেই ফকনারকে ঠাকুর্দার ব্যাঙ্কে চাকরি নিতে হয়েছিল। স্কুলের পড়াশুনায় অবশ্য ফকনার ভালো ছিলেন না। পাঠ্যপুস্তক ছাড়া অন্যান্য বই পড়তেন প্রচুর, আর লিখতেন কবিতা।

ফকনারের রচনা সম্যক উপলব্ধির জন্য এই পারিবারিক পটভূমিকা জানা অত্যাবশ্যক। পরিবারের পূর্বপুরুষদের সমৃদ্ধির কিংবদন্তী এবং বর্তমানে দুর্দশা ফকনারকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল। তাই তাঁর প্রথম যুগের প্রায় সকল উপন্যাসেরই বিষয়বস্তু অভিজাত সমৃদ্ধিশালী পরিবারে ক্ষয়ের ইতিহাস। সার্টোরিস পরিবারের কাহিনী দিয়ে এই ধারার উপন্যাসের শুরু হয়েছে। Sartoris-এ কর্নেল সার্টোরিস ও বেয়ার্ড সার্টোরিসকে ফকনারের প্রপিতামহ ও ঠাকুর্দা হিসাবে সহজেই চেনা যায়।

প্রথম মহাযুদ্ধে যোগ দেবার জন্য ফকনার আবেদন করলেন। কিন্তু ইউনাইটেড স্টেটস সেনাবিভাগ তাঁর আবেদন মঞ্জুর করল না। তাঁর দৈহিক যোগ্যতার ঘাটতি ছিল। তিনি যোগ দিলেন ক্যানাডিয়ান সেনাবাহিনীতে। ১৯১৮ সালে যুদ্ধ থেকে ফিরে ফকনার বইয়ের দোকানে ও পোস্ট অফিসে চাকরি করেছেন; জুতোর মিস্ত্রির কাজ এবং ঘরজা জানালায় রং দেবার কাজও তাঁকে করতে হয়েছে। এরই মধ্যে কবিতা, রেখাচিত্র, গল্পের খসড়া ইত্যাদিও লিখছিলেন। কিন্তু কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হল তাঁর প্রথম বই। The Marble Faun (1924) কবিতাগুলিতে কোনো বৈশিষ্ট্য ছিল না। এক বন্ধু আর্থিক সাহায্য করায় এ বই প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছিল।

ফকনারের সাহিত্য সাধনার পথ প্রশস্ত হল শেরউড আণ্ডারসনের সঙ্গে পরিচয় হবার পর। আণ্ডারসনের সহায়তায় তাঁর প্রথম উপন্যাস 'সোলজার্স পে' বের হয় ১৯২৬ সালে। পর বৎসর বের হল তাঁর বিদ্রূপাত্মক উপন্যাস 'Mosquitoes.' ১৯২৯ সালে Sartoris প্রকাশিত হবার পর ফকনার ঔপন্যাসিক হিসাবে আপন স্থান খুঁজে পেলেন। এবং এই উপন্যাসের মধ্যেই পাওয়া যাবে ফকনারের সমগ্র রচনার মূল সূত্রটি। 'সার্টোরিস' লিখে ফকনার নিজের উপরে আস্থাবান হলেন, সিদ্ধান্ত করলেন-আর কোনো চাকরি নয়, লেখাই হবে তাঁর জীবিকা।

ফকনারের উপন্যাসের সংখ্যা প্রায় পঁচিশ। অধিকাংশ কাহিনী ইউনাইটেড স্টেট্স অব আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলের ক্রমাবনতির ইতিহাস অবলম্বন করে রচিত। মিসিসিপির-পরিবেশ তাঁর উপন্যাস পাঠকদের মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু সে অঞ্চলের খুঁটি-নাটি বিবরণ দিয়ে মিসিসিপির বাস্তব চিত্র তিনি পাঠকদের উপহার দেননি। তাঁর বর্ণনায় কল্পনার মিশ্রণ আছে যথেষ্ট পরিমাণে। টমাস হার্ডির সঙ্গে আঞ্চলিক ঔপন্যাসিক হিসাবে এখানে তাঁর পার্থক্য। অভিজাত পরিবারের ভাঙন, তাদের আর্থিক ও নৈতিক অবনতি এবং উত্তরাংশের ধনলিপ্সার আক্রমণে পর্যুদস্ত নরনারীর চিত্ত বিক্ষোভ ফকনারের উপন্যাসের বিষয়বস্তু। যদিও পল্লী অঞ্চলের কথা তিনি বলেছেন; তথাপি পল্লীর মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক দেহের সুখ, দুঃখ ও কামনাকে তিনি প্রাধান্য দেননি। প্রাধান্য লাভ করেছে তাদের মনের জগৎ। অবশ্য তাঁর পাত্র পাত্রীদের মধ্যে কামোন্মাদনা আছে; অহেতুক নিষ্ঠুরতাও কম নেই। হেমিংওয়ের রচনায়ও কামলিপ্সার অপ্রতুলতা নেই। সেখানে দেহ প্রধান। ফকনারের রচনায় মন প্রধান। মনের কুটিল অস্বাভাবিক দুর্বোধ্য আকাঙ্ক্ষার বেদনা, দৈহিক আনন্দ উপভোগের পথে বাধা সৃষ্টি করে। তাঁর অনেক চরিত্রই অস্বাভাবিক কামনার তাড়নায় পীড়িত।

'দি সাউণ্ড অ্যাণ্ড ফিউরি' কম্পসন বোনের প্রতি আকৃষ্ট : 'স্যাংচুয়ারিস' নায়ক পুরুষত্বহীন ! 'লাইট ইন অগাস্ট' তো ক্রীসমাস প্রায় মায়ের বয়সী প্রেমিকা গ্রহণ করেছে। এমনি আরো অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। ফকনারের প্রথম উপন্যাস 'সোলজার্স পে'-র মধ্যে অবক্ষয়বিলাসের যে লক্ষণ দেখা গিয়েছিল তা তাঁর প্রায় সকল উপন্যাসেই কম-বেশি পরিমাণে রয়েছে। এদিক থেকে তিনি হুইনবার্গ, বোদলেয়ার, পো প্রভৃতির সগোত্র।

ফকনারের উপন্যাসের অনেক চরিত্রই অবিস্মরণীয়। সমসাময়িক আর কোনো আমেরিকান লেখক এমন সমৃদ্ধ চরিত্রশালা সৃষ্টির কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন না। এদের মধ্যে কিছু টাইপ চরিত্রও পাওয়া যাবে। প্রধান হল 'সাটোরিস' টাইপ : অর্থাৎ, পতনোন্মুখ অভিজাত পরিবারের যারা প্রতিনিধি ; আর হল 'স্নোপে' টাইপ (দি হ্যামলেট)। স্নোপেসরা কর্মদক্ষ, চতুর, ব্যবসায়ী, অর্থগৃধ্নু এবং এদিয়ে আসা উত্তরাঞ্চলের প্রতীক। এ ছাড়া আরো কয়েক ধরণের টাইপ চরিত্র থাকা সত্ত্বেও তারা বিরক্তিকর হয় না। কারণ নতুন কাহিনীর ভিন্ন পরিবেশে তাদের উপস্থাপিত করা হয়েছে।

'দি সাউণ্ড অ্যাণ্ড ফিউরি' (১৯২৯) অনেকের মতে ফকনারের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। কম্পসন পরিবারের অবক্ষয়ের কাহিনী বলা হয়েছে এই উপন্যাসে। 'জীবন কিছু বলে না, মস্তিষ্কে ছাপ রেখে যায়'—এই তত্ত্বকে স্বীকার করে ফকনার ইম্প্রেসানিস্টিক রীতিতে কাহিনী পাঠকের নিকট উপস্থিত করেছেন। 'স্ট্রীম অব কনসাসনেস' পদ্ধতির প্রয়োগও কোথাও কোথাও দেখা যায়। নিঃসন্দেহে ফকনার এই রীতির জন্য হেনরি জেমস, জোসেফ কনরাড, জেম্‌স জয়েস, প্রিন্সেন ক্রেন প্রভৃতির নিকট ঋণী। দস্তয়েভস্কির 'দি ব্রাদার্স কারামাজোভ'-এর সঙ্গে কোথাও কোথাও সাদৃশ্য দেখা যায়।

'অ্যাজ আই লে ডাইং' (১৯৩০) 'স্ট্রীম অব কনসাসনেস' রীতির সকল প্রয়োগের চিহ্ন বহন করছে। এক চাষীর স্ত্রী অ্যাডি বুনড্রেনের মৃত্যু হয়েছে। তার শেষ ইচ্ছা ছিল, জেফারসনে পারিবারিক সমাধিক্ষেত্রে যেন তাকে কবর দেওয়া হয়। মৃতদেহ সেখানে নিয়ে যাওয়াকে কেন্দ্র করে গল্পের পনেরোটি চরিত্র বাইটি অধ্যায়ে কাহিনীর উন্মোচন করেছে।

ফকনারের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হল 'লাইট ইন অগাস্ট' (১৯৩২) ; স্যাংচুয়ারি (১৯৩১) ; অ্যাবসালোম, অ্যাবসালোম ! (১৯৩৬) ; দি হ্যামলেট (১৯৪০) ; ইন্ট্রুডার ইন দি ডাস্ট (১৯৪৮) ; এ ফেবল (১৯৪৯) ; এবং দি টাউন (১৯৫৭)। এই উপন্যাসের জন্য তিনি পুলিৎজার পুরস্কার পেয়েছেন। এ ছাড়া আছে তাঁর ছোট গল্পের সংগ্রহ।

ফকনারের রচনায় রাজনীতি প্রায় অনুপস্থিত। তিনি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে জীবনকে দেখেছেন। তাঁর সহানুভূতি সমাজের সকল স্তরের দুর্ভাগ্যপীড়িত নরনারীর উপর। যে-সব সমস্যার কথা তিনি ভেবেছেন তা নৈতিক ও ধার্মিক : নিছক রাজনৈতিক নয়।

ফকনারের রচনায় গভীরতা আছে, মানুষের প্রতি সহানুভূতিরও অভাব নেই। তথাপি তাঁর উপন্যাস আমাদের দেশে আশানুরূপ সমাদর লাভ করেনি। প্রথমতঃ আমেরিকান সমাজ ও ভূগোলের প্রভাব ফকনারের উপর বড় বেশী : দ্বিতীয়তঃ তাঁর ভাষারীতি সাধারণ পাঠকের পক্ষে অসুবিধাজনক। ইম্প্রেসানিস্টি-রীতির শৈলী তাঁর। তৃতীয়তঃ হেনরি জেমস, জয়েস প্রভৃতির মতো স্ট্রীম অব কনসাসনেসের পদ্ধতি অবলম্বন করায় পাঠকরা একটি সহজ সূত্রের আস্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়।

রোজপেরার কাপড়

সানলাইটে কেচে

কত ফরসা, ঝলমলে!

পরিষ্কার, ঝলমলে, ধব্‌ধবে ফরসা কাপড়।
সানলাইটে কাপড় কাচার এই গুণ!
সব কাপড়জামা বাড়ীতে সানলাইটে কাচুন···

সানলাইট—উৎকৃষ্ট ফেনার, খাঁটি সাবান

হিন্দুস্তান লিভারের তৈরী

গিরিব্রজাঞ্চলে

সমর গুহ

• • • •

গুহার প্রসিদ্ধি আরও গভীর। বুদ্ধ-নির্বাণের পরে এখানেই বসে ছিল প্রথম ধর্ম সম্মেলন। বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসে এই প্রথম সম্মেলন ধর্ম-সঙ্গীতি নামে পরিচিত। এই ধর্ম-সঙ্গীতি পরিচালনা করেন মহা ভিক্ষু কস্সপ এবং ভিক্ষু উপালি 'বিনয়' এবং আনন্দ 'সুত্ত' বর্ণনা করেন। কিভাবে বৌদ্ধ সংঘগুলি পরিচালিত হবে 'বিনয়' নামের শাস্ত্রে তার নীতি নির্ধারিত হয়। 'সুত্তে নির্দিষ্ট হয় বৌদ্ধ ধর্মে তত্ত্ব ও উপদেশ। আনন্দ ছিলেন বুদ্ধের প্রিয় শিষ্য এবং তাঁর সেবকরূপে তিনি সব সময়েই গুরুর সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। তাই বুদ্ধের বাণীগুলি স্মরণ করার যোগ্য অধিকারী ছিলেন আনন্দ।

বুদ্ধের বাণীগুলি সঙ্গে সঙ্গে কেউ কোনদিন লিখে রাখেনি। আজকের দিনের মত কাগজ কলম বা প্রেসের সাহায্য লাভ করা সেদিনে সম্ভব ছিল না। তাই স্মৃতিই ছিল বুদ্ধের বাণী ও উপদেশাবলীকে রক্ষা করার প্রধান উপায়। সেদিনে মনে রাখবার প্রয়োজন খুব বেশী ছিল বলে প্রাচীনকালে বিদ্যা অর্জন ও বিদ্যা পরিবেশনের প্রধান অবলম্বন ছিল স্মৃতি শক্তি। বুদ্ধের পরিনির্বাণের পরের বর্ষাতেই ধর্ম সঙ্গীতি আহবান করে মহাকাশ্যপ ভাবী ইতিহাসের এক গভীর শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে রয়েছেন।

ভিক্ষু বা সন্ন্যাসীরা বর্ষাকালে প্রব্রজ্যা বন্ধ রেখে কোন একস্থানে স্থির হয়ে জপ-তপে দিন কাটান। মহাকাশ্যপ ভাবেন বুদ্ধ নির্বাণের পরে বুদ্ধের উপদেশ এবং সংঘের বুদ্ধ নির্দিষ্ট নিয়মগুলি যদি যথাসময়ে সুসংবদ্ধ ও সুনির্দিষ্ট করে না রাখা হয় তা' হলে ভাবী কালে বুদ্ধের বাণীতে ভ্রান্তি ও বিকৃতিই শুধু দেখা দেবে তাই নয়,—অনেক প্রক্ষিপ্ত কথাও বুদ্ধের নামে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হবে। গুরুর বাক্যের ভাষ্য ও বিবরণ নিয়েই পরবর্তী কালে একই ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও গোষ্ঠী সৃষ্টি হয়। এজন্যই মহাকাশ্যপ প্রাচীন ভিক্ষুদের সম্মেলন আহবান করে বৌদ্ধধর্মের মূল শাস্ত্র দুটি রচনার ব্যবস্থা করেন। মহাকাশ্যপের বাস্তব ধর্মী মস্তিষ্কের অবদানেই বৌদ্ধ ধর্মের আদি কথা আজও তেমনি করে জানা যায় যেমনটি বলেছিলেন স্বয়ং বুদ্ধদেব।

সপ্তপর্ণী গুহার সামনের প্রাঙ্গণে একটি মণ্ডপ তৈরী করে দিয়েছিলেন রাজা অজাতশত্রু। সেই মণ্ডপেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল প্রথম ধর্মসঙ্গীতি। সপ্তপর্ণীগুহা এখন ভেঙে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। প্রাচীন গুহার পাদদেশে একটি বড় ভিতের পাথর আছে। পুরাকাররা মনে করেন এর উপরেই ধর্ম সম্মেলনের মণ্ডপ তৈরী হয়েছিল। এই ধর্ম সম্মেলনের স্মারকরূপে এখানে কয়েকটি স্তূপ ও চৈত্য নির্মিত হয়েছিল। চীনা পরিব্রাজকদের মধ্যে যারা এখানে এসেছিলেন তাঁদের বর্ণনার সেবধা আছে। কিন্তু আজ সেগুলির কোন চিহ্ন নেই।

পিপ্পল গুহা সপ্তপর্ণী গুহা থেকে অনেক নিচুতে অবস্থিত। পিপ্পল গুহারও কোন পৌরাণিক নিদর্শন বেঁচে নেই। পিপ্পল গুহার পশ্চিমে অনেকগুলি গুহা আছে। এখানে অনেক জৈন ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বাস করতেন।

এবার যাব রাজগৃহের উষ্ণ প্রস্রবণগুলি দেখতে। রাজগৃহ শুধু গিরিশ্রেণী দ্বারা বেষ্টিত বলেই একটি প্রধান রাজনগরে পরিণত হয়নি। প্রাচীন কালের সামরিক স্থানে দুর্ভেদ্য ছিল বলে রাজগৃহের খ্যাতি ছিল গিরিব্রজ নামে। প্রাকৃতিক শোভা ও সুরক্ষার সঙ্গতির সঙ্গে রাজগৃহের উষ্ণ প্রস্রবণগুলি রাজগৃহকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ নগররূপে গড়ে তুলবার পক্ষে ছিল আকর্ষণীয় উপাদান। নিরবচ্ছিন্ন প্রাকৃতিক জলের এমন উৎস রাজগৃহের জলাভাবই দূর করেনি, এই নগরটিকে মহত্বপূর্ণও করেছিল। এই উষ্ণ প্রস্রবণের জল খুব গরম নয়। এতে স্নান করা যায় এবং এখানকার খনিজ জল "নরম" বলে পান করাও যায়। এজল স্নায়ু উপাদেয় এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারীও বটে। তীর্থভূমি বলে সব কয়টি প্রস্রবণই কুণ্ড নামে খ্যাত।

কয়েকটি কুণ্ড আছে রাজগৃহে। মখদুম কুণ্ড, সূর্যকুণ্ড ও তপোদা। তপোদা অনেকগুলি কুণ্ডের সমষ্টি। অধুনা যে জাপানী মন্দিরটি তৈরী হয়েছে তার দক্ষিণ-পূর্বের বিপুল গিরির পাদদেশে রয়েছে মখদুম কুণ্ড ও সূর্য কুণ্ড। সূর্যকুণ্ড মখদুম কুণ্ড থেকে আরও দক্ষিণে। সূর্যকুণ্ডের ধারে কতগুলি মন্দির রয়েছে, কোন মন্দিরই প্রাচীন নয়। প্রাচীন মন্দিরের ভিতে তৈরী হয়েছে নতুন মন্দিরগুলি। সূর্যকুণ্ডের কাছে প্রাচীন দুর্গ প্রাকারের কয়েকটি প্রহরী কক্ষের ধ্বংসাবশেষ আছে। প্রাচীনকালের অনেক ইঁট পাথর ইতস্তত ছড়িয়ে আছে সূর্যকুণ্ডের চারপাশে।

সূর্যকুণ্ডের উত্তরে মখদুম কুণ্ড। মখদুম অর্থ সেবক। চৌদ্দ শতাব্দীর মাঝামাঝি শরফুদ্দিন নামে একজন মুসলীম সাধু এখানে এসে তপতপ করতেন। যে গুহাটিতে বুদ্ধের প্রতিদ্বন্দ্বী শিষ্য দেবদত্ত থাকতেন এবং যেখানে দেবদত্তের মৃত্যু হয়েছিল বলে চীনা ভ্রমণরা নির্দেশ করেছেন মুখদুমও থাকতেন সেই গুহায়। মুখদুম ছিলেন সুফী সম্প্রদায়ের ভক্তিপ্রবণ মুসলীম সাধু। বিহার শরীফে সাধু মখদুমের সমাধি রয়েছে।

যে গুহাটি আজ কাল মখদুম গুহা নামে পরিচিত সেই গুহাটি মাত্র ছয় শত বৎসরের আগেকার নাম। এর আগে এই গুহার নাম ছিল দেবদত্ত গুহা। কিন্তু দেবদত্তের বুদ্ধ-বিদ্বেষের জন্য তার প্রতি বিরাগ বশত হয়তো লোকেরা এই গুহাটির নামের কথা ভুলে গিয়েছিল। তাই সহজেই সাধু মখদুমের নামে এই গুহাটির নতুন ভাবে পরিচিত হয়েছে।

মখদুম গুহাটি কিন্তু একদিক দিয়ে মহত্বপূর্ণ। ভারত ইতিহাসের অন্তঃশীলা প্রবাহে বিচিত্র ভাবধারা ও অনুভূতির সমন্বয়ের সুরটি চিরকাল অব্যাহত রয়েছে। রাজগৃহ শুধু আজ জৈন, বৌদ্ধ ও হিন্দুদের তীর্থভূমি নয়—মুসলমানদেরও তীর্থভূমি, রাজগৃহে তাই হিন্দু বৌদ্ধদের মত দলে দলে মুসলমান তীর্থযাত্রীরা আসে। মখদুম কুণ্ডটি সকল ধর্মাবলম্বীরই পুণ্য-স্থান।

তপোদার অবস্থান বিপুল গিরিতে নয়, বৈভার গিরিতে। প্রাচীন রাজগৃহে ঢুকতেই পশ্চিমে অর্থাৎ ডান দিকের পাহাড়ের খানিকটা উঁচুতে রয়েছে তপোদা। এই তপোদার মাহাত্ম্যের কথা মহাভারতকারও উল্লেখ করেছেন। শুধু পাণ্ডবেরাই নয়, মহাভারত যুগের অনেক মহারথী এসেছেন এই তপোদা দর্শনে এবং তপোদার উষ্ণ প্রস্রবণে অবগাহনের আগ্রহে। রাজগৃহের কুণ্ডগুলির উষ্ণ বারিধারা যে তাই শত শত বছর ধরে একই ভাবে উৎসারিত হয়ে চলেছে তার ইংগিত মহাভারতেও পাওয়া যায়।

বেণুবন পার হয়ে সরস্বতীর উপর দিয়ে গিয়ে পৌঁছতে হয় তপোদায়। পথে অনেক ভগ্ন জীর্ণ ইঁট পাথর দেখা যায়। এখানে ছিল প্রাচীন বিহার ও মন্দির। কালের কোলে সেগুলি বিলুপ্ত হয়ে গেছে, শুধু পড়ে আছে কিছু চূর্ণ কংকাল। এখন যে মন্দির মসজিদগুলি দেখা যায়, তার সবই আধুনিক কালের। একটু লক্ষ্য করলে সরস্বতীর কিছু প্রাচীন কংক্রিটের চত্বর দেখা যায়। আজ এগুলি পাথরের মত সুদৃঢ় হয়ে গেছে।

তপোদায় আছে কয়েকটি কুণ্ড। সাতধারা ও ব্রহ্মকুণ্ড পাশাপাশি। এই ধারা কয়েকটির আশে পাশে আরও কয়েকটি উষ্ণ ধারা আছে। উষ্ণ ধারার উৎসগুলি আছে বটে, কিন্তু এই গিরি-নিস্তব্ধ ঝর্ণাগুলির শিলাসনে সৌন্দর্যের কিছুই অবশিষ্ট নেই। ইঁট-পাথরে গড়া স্থূলকায় সব মন্দিরের বেড়ীতে সাপটে বেঁধে এই 'গিরি-পরী হরিণী'দের একেবারে আষ্টেপৃষ্ঠে করে দিয়ে কুণ্ড নামে স্থবির করে রাখা হয়েছে। প্রকৃতির অঞ্চলীকে যেখানে এমনি ইঁট-পাথরের আড়ম্বরে মানুষ বিকৃত করে দেয় তার সকরুণ দৃশ্য দেখে মনটা এমন ভারী হয়ে উঠে।

সাত ধারায় আর ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করছি সন্ধ্যার অন্ধকারে

দিবাবসানের ফিকে ফিকে হাওয়ায় শীতল পরিবেশে কী আরাম যে এই উষ্ণ অবগাহনে! আঃ যদি শীতের দিন হোত!

সন্ধ্যার কিছুটা কালো ছায়া পড়লে ভালই হয়েছে। চোখ বুজে আমি দেখছি যেন ইট-পাথরের মন্দির আর চত্বর গুলি নেই,—নেই পাণ্ডাদের কাকলী কলরোল। যেন সেই দিনে ফিরে গেছি যেদিনে বৈভার গিরির বড় বড় শিলাখণ্ডের বক্ষ ভেদ করে ফুলে ফুলে বিপুল উচ্ছ্বাসে নির্মুক্ত ছন্দের মত বেরিয়ে আসতো বহ্নিতীর অন্তর্ধারা। চোখ বুজে, ভাবছি সেই মহাভারতের যুগে ভীম জরাসন্ধের মল্ল। রণ জয়ী ভীম ফিরে এসে হিম-শীতল এক শীতের সন্ধ্যায় এই তপোদার জলে অঙ্গ ধৌত করছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন অবগাহন রত ভীমের পাশে। আমি যেন বসেছিলাম তাঁদের পাশের ধারাটিতে। উষ্ণ ধারার পরম তৃপ্তিতে যেন ঘুম আসছে। কী মধুর কালোত্তীর্ণ স্বপ্ন।

কিন্তু না, স্তিমিত নয়নে স্বপ্ন সুখের অবগাহন বেশিক্ষণ চললো না। পাশে এসে লাগল বিশাল এক ধাক্কা। 'ইয়ে বাবু, আউর কিতনা দের লাগে গা?' চোখ মেলে দেখি, সত্যি সত্যি ভীম এসে গেলো নাকি!

জরাসন্ধের মল্লভূমি থেকে সারা গায়ে সদ্য সদ্য মাটি মেখে ভীমকায় এক পালোয়ান অপেক্ষা করছে গা ঘেঁষার জন্যে। তারই পালোয়ানী তাড়া। বাব্বা! নির্ঝরের এমন স্বপ্ন-ভঙ্গ বোধ হয় কবি গুরুও কল্পনা করতে পারেননি!

রাত কাটাবার জন্য ফিরে চলছি রেষ্ট হাউসে। পথের ধারে বেণুবন থেকে একটা ফুল তুলে নিলাম। সেদিনের বুদ্ধ-প্রিয় বেণুবন আজ নেই। সেখানে তৈরী হয়েছে একটি উদ্যান। না থাক সেই বেণুবন, কিন্তু সেদিনের বেণু-বনের মাটিটুকুতো আছে। আড়াই হাজার বছরের জল-বায়ু আর মানুষের ক্ষুধা বেণুবনের সবটুকু মাটি কেড়ে নিতে পারেনি! বুদ্ধদেবের বেণুবনের-মাটিতে-ফোটা ফুল! যেন তথাগতের স্নেহাশীষ আজও পাওয়া যায় বেণুবনের ফুলের সৌরভে!

রেষ্ট হাউসের খোলা অঙ্গনে শুয়ে আছি। উপরে নিবিড় রাত্রির কালো আকাশ। জল জল করছে তারাগুলি। পরিষ্কার আকাশে শত নীহারিকার ঘন আলোর নিঃসরণও দেখা যায়। নিবিড় অন্ধকারাচ্ছন্ন পুরানো রাজগৃহের গিরি-মালা ঘন প্রলেপ দিয়ে কালো করে রেখেছে সামনের দৃষ্টি-পথকে। তারই উপরদিয়ে সোনার আলো বিলিয়ে হেসে উঠেছে এক ফালি চিকণ চাঁদ! কী মধুর। কী রমনীয় এই চাঁদটুকু! নিশ্চুপ, নিস্তব্ধ চারিদিক। শুধু বাতাসের গায়ে গায়ে শোনা যায় নিশি বিলাসী ঝিঁ ঝিঁর মৃদু স্বরের ঐকতান। তারই মাঝে রাজগৃহের আকাশে উঠেছে ওই চাঁদ। মনে হলো যেন রাত্রির কালো পর্দায় দেবকালের সবটুকু ঢেকে দিয়ে কে যেন জ্বালিয়ে দিয়েছে ওই আকাশ প্রদীপটি। এই স্নিগ্ধ আলোর রশ্মিটুকু দিয়ে কি খুঁজে পাব রাজগৃহের সেই প্রাচীন দিনের গহন বন থেকে সেই করুণাঘন তথাগতের ওই হারানো মুখটি!

দু'চোখ ভরে এলো অন্তরের কিসের এক আবেগনে। মানুষ জন্মে, মরে যায়। অনন্তের অন্তহীন তরঙ্গে কি যে ছেলেখেলা বিশ্ববিধাতার! সীমা নেই, সংকেত নেই—চারি-দিকে সব কিছুই কূলকিনারাহীন। এই গভীর ঘন নৈরাশ্যের মধ্যে আশ্বাস শুধু ওই আলোটুকু,—অদিতাভের অস্পষ্ট অমৃত আলোর স্পর্শটুকু!

রাঙা আলোয় কখন ছেয়ে গেছে আকাশ। উষ্ণ স্পর্শে সবাই জেগে উঠলাম। চা খেয়ে বাকীটুকু দেখে নালন্দা পাওয়াপুরী হয়ে ফিরতে হবে। ওরই অবসরে সবাই মিলে আবার স্নান করে এলাম তপোদা থেকে। ফিরেই বেরিয়ে পড়লাম বৃদ্ধত্ব পাওয়ার জন্যে।

পুরানো রাজগৃহে ঢুকবার মুখে বেণুবনের আগে রয়েছে কয়েকটি স্তূপের ভগ্নাবশেষ, জাপানী মন্দিরের সামনেই যে স্তূপ তাকেই নির্দেশ করা হয়েছে বুদ্ধের আদি স্তূপ বলে। হিউ এন চাং লিখে গেছেন যে বুদ্ধের স্তূপের কাছেই ছিল আনন্দের স্তূপ। জীবনে যে শিষ্য বুদ্ধের পাশে পাশে ছায়ার মত সেবাব্রতী ছিলেন, মরণেও তাঁর স্তূপটি মহাভিক্ষুর পাশে রেখে এক মধুর অনুভূতির পরিচয় দিয়েছিল সেকালের বুদ্ধ-সংঘ। আনন্দের স্তূপটি যে কোথায় এখনও সুস্পষ্ট করে নির্দেশ করা সম্ভব হয়নি। অনেকে মনে করেন জাপানী মন্দিরের মধ্যে যে একটি স্তূপের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায় সেটাই বোধ হয় আনন্দের স্তূপ। কিন্তু আনন্দের স্তূপটি হারিয়ে গেলেও কোন ক্ষতি নেই। বুদ্ধের মধ্যে হারিয়ে গিয়ে যে আনন্দের পরমানন্দ ছিল তাঁর স্তূপটি না হয় বুদ্ধ স্তূপের স্মৃতির মধ্যেই হারিয়ে গেল।

বুদ্ধের মহানির্বাণের পরে রাজগৃহের কয়েকটি স্থানে তাঁর পূতাস্থি রক্ষা করা হয়েছিল। কিন্তু অনেক স্থানে এই পূতাস্থি অপহৃত হওয়ার ফলে মহাকাশ্যপ রাজা অজাতশত্রুকে এই পূতাস্থি রক্ষার ব্যবস্থার জন্য অনুরোধ করেন। অজাতশত্রুই এই পুণ্য পূতাস্থির উপরে স্তূপ তৈরী করেন।

অজাতশত্রুর পরে এই পূতাস্থির কথা প্রায় বিস্মৃতি লাভ করে। বুদ্ধ অনুরাগী অশোক রাজগৃহে এসে এই স্তূপগুলির সন্ধান করেন এবং বুদ্ধের পূতাস্থি ভারতের নানাস্থানে নিয়ে স্তূপ তৈরী করে সুরক্ষার ব্যবস্থা করেন। রাজগৃহেও অশোক কয়েকটি স্তূপ ও স্তম্ভ তৈরী করেছিলেন। পঞ্চম শতাব্দীতে হিউ এন চাং রাজগৃহে এসে পঞ্চাশ ফিট উঁচু একটি অশোক স্তম্ভ দেখেছিলেন। আজ সেটি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

প্রাচীন চৈত্য ও বিহারের সামান্যতম এখন অবশিষ্ট নেই। কিছু কিছু অ-খোদিত টিবি পড়ে আছে রাজগৃহের চারদিকে। প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে হয়তো আরও নতুন অনেক স্মারণিক পাওয়া যাবে। বেণুবনে যেতেও রাজগৃহের পুরান রাজপথের দুধারে অনেক ভাঙ্গাচোরা ইট পাথর ও স্তূপের অবশেষ দেখা যায়। এগুলি অতীতের চৈত্য ও বিহারের অস্থিচূর্ণের অবশেষ মাত্র।

তাড়াতাড়ি চা-খাওয়া শেষ করে গাড়ীতে উঠলাম। গাড়ী চলতে আরম্ভ করলো নালন্দার দিকে।

রেষ্ট হাউসের পাশেই রয়েছে একটি বিরাট টিপি। এই টিপিটি খনন করা হচ্ছে, অনেকখানি কাটা হয়েছে। অতি সন্তর্পণে, তীক্ষ্ণ সতর্কতার সঙ্গে খোঁড়া হচ্ছে টিপিটি। একটু পুরা কীর্তি, ইতিহাসের সামান্যতম অবশেষকেও অক্ষত উদ্ধার করার সযত্ন প্রয়াস প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের। এই খননোদ্যত টিপিটির দিকে চেয়ে এমন একটা 'সেনসেসন' বোধ করছিলাম। কি জানি কি বেরুবে এরূপ পরিত্যক্ত মাটির গর্ভ থেকে! কিন্তু তার চেয়ে বেশি ভাবছিলাম ওই মানব কীর্তির পরিণতি দেখে। কত আবেগে রচিত কীর্তির আজ ওই টিপি-ঢাকা পরিণতি!

ছোটো বাটো এবং বেশ বড় আরও অনেক টিপি পড়ে আছে পুরানো ও নতুন রাজগৃহের চারদিকে। তাই দেখে দেখে নতুন রাজগৃহের পাশ কাটিয়ে মোটর চলল।

নতুন রাজগৃহ তৈরী করেছিলেন বিম্বিসার পুত্র অজাতশত্রু। ইট-পাথরের দেয়াল দিয়ে ঘেরাও করে রচিত হয়েছিল নতুন নগর। আজো স্থানে স্থানে অক্ষত রয়েছে নব্যরাজগৃহের নগর প্রাচীর। কেন যে অজাতশত্রু নব্য নগরটিকে পুরান রাজগৃহের বাইরে তৈরী করেছিলেন তার সুস্পষ্ট কোন কারণ জানা যায়নি।

চলতে চলতে ভাবছি রাজগৃহের ইতিহাসের কথা। বিম্বিসারকে হত্যা করে অজাতশত্রু রাজা হয়েই অশান্তি ডেকে আনেন রাজগৃহে। অবন্তি, কাশী, বৈশালী—চারদিকে সব রাজ্যের সঙ্গে বনধরাক অজাতশত্রু শত্রুতা সুরু করে দেয়। অজাতশত্রুর বত্রিশ বছরের রাজত্বের মধ্যে ষোল বছর পর্যন্ত

অবন্তী রাজ্যের সঙ্গে লড়াই চলে। পিতৃহত্যার জন্য প্রতিবেশী নৃপতিরা অজাতশত্রুর প্রতি কেউ খুসি ছিলেন না, অজাতশত্রুর শত্রুরাজ্যগুলি সংঘবদ্ধ হয়ে তাকে বিব্রত করলেও 'মহাশিলাকণ্টক' ও 'রথমুষল' নামে উচ্চমানের অস্ত্রের শক্তিতে অজাতশত্রু বৈরী পক্ষকে পরাস্ত করতে সক্ষম হন। পুরান ও নতুন রাজগৃহের প্রাচীরগুলি প্রধানত অজাতশত্রু নির্মাণ করেন। ফা হিয়েন ও হিউ এন চাং পুরানো রাজগৃহের প্রাকারগুলির গঠনের বিশেষ উল্লেখ করেন। প্রায় পঁচিশ ত্রিশ মাইল দীর্ঘ ছিল এই প্রাকার এবং প্রাকারের প্রস্থ ছিল বিশ থেকে চব্বিশ ফিট। এই ঐতিহাসিক প্রাকারের অবশেষ আজো স্থানে স্থানে অক্ষত রয়েছে। এক মহেঞ্জোদারো ছাড়া প্রাচীন যুগের এরূপ নগর প্রাচীরের আর দ্বিতীয় নিদর্শন নেই।

বুদ্ধের অনুরাগী হওয়ার জন্য পিতাকে হত্যা করলেও, শেষ পর্যন্ত অজাতশত্রু বুদ্ধের শরণার্থী হয়েছিলেন। অজাতশত্রুর পুত্র উদায়ি মগধের অধিপতি হয়ে পাটলিপুত্র বা কুসুমপুরে নগর নির্মাণ করে রাজধানী রাজগৃহ থেকে স্থানান্তরিত করেন। উদায়ির পরে আরও তিনজন রাজা বোধহয় কখনো পাটলিপুত্র এবং কখনো রাজগৃহে রাজধানী স্থাপন করেন।

অজাতশত্রু পিতৃহত্যার যে অভিশাপ নিয়ে রাজগৃহের রাজশাসন সুরু করে ছিলেন সেই অভিশাপের প্রকোপ থেকে তিনি নিজে এবং তার পরবর্তী বংশধরেরা কেউ রেহাই পাননি। অনেকের মতে উদায়ি এবং তার পরবর্তী তিনজন বংশধরও পিতৃহত্যার কলঙ্কে রাজগৃহের রাজশাসন কলুষিত করেছিল। এ সময়ে কয়েকবার রাজগৃহ বহ্যাগারী ও অগ্নিদাহে ধ্বংস হয়ে যায়। রাজগৃহের অধিবাসীরা মনে করে যে অজাতশত্রু পরিবারের পিতৃহত্যার অভিশাপের জন্যই রাজগৃহের এই দুর্দশা। প্রজারা বিদ্রোহ করে অজাতশত্রুর বংশধরদের উৎখাত করে মগধের অধীন কাশীরাজ্যের নৃপতি শিশুনাগকে এনে মগধের সিংহাসনে বসায়। শিশুনাগ কিছু-দিন রাজগৃহে রাজধানী স্থাপন করে পরে পাটলিপুত্রে চলে যান।

শিশুনাগের সঙ্গে সঙ্গেই পিতৃহত্যার কলুষ-কলঙ্কিত রাজ-গৃহের রাজ-ঐশ্বর্য ও রাজ-নীতির অবসান ঘটে। পরবর্তী যুগে রাজগৃহের গুরুত্ব ছিল ধর্মস্থান রূপে,—রাজ-নগর রূপে নয়। তাও রাজগৃহ ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে শুধু কালের হাতে নয় মানুষের হাতেও। বুদ্ধ-বিদ্বেষী শশাঙ্ক এসে একবার রাজগৃহের বৌদ্ধ কীর্তি ধ্বংস করে দিয়ে যায়। বিদ্বেষ ও বিনাশের ঝড় নিয়ে শেষবারের মত আসে বক্তিয়ার খিলিজী। নালন্দা ধ্বংস করে রাজগৃহের সবকিছু ভেঙে চুরে বিনষ্ট করে দিয়ে যায়। তারপরে ধরার উপরে ধাক্কায় যা দেবার প্রয়োজন আর কোন পাঠান বা মোগল বোধ করেছে বলে জানা যায় না। পরবর্তী যুগে সামান্য অক্ষত পল্লী জীবনের মন্থরতা নিয়েই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেছে রাজগৃহের জীবন। এযুগে আবার বিগত কালের জীর্ণ ভগ্ন অস্থিপূর্ণগুলি খুঁজে খুঁজে বের করে রাজগৃহের হারান মহত্ত্বের স্মৃতিস্তম্ভ রচনার প্রয়াস চলছে। নতুন যুগের মানুষের দৃষ্টি পড়েছে প্রাচীন যুগের ভাঙা ঢেউলের প্রতি।

(ক্রমশঃ)

একটা বেজে গেছে

ভ্লাদিমির মায়াকভ্স্কী অনুবাদ : দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

একটা বেজে গেছে। তুমি নিশ্চয়ই শুয়েছ এতক্ষণে।
রজনীর মধ্য দিয়ে ছায়াপথ বয়ে যায় রক্ততরঙ্গিণী।
আমার ব্যস্ততা নেই; বৈদ্যুতিক বেতারে তোমাকে
জাগিয়ে বিব্রত করি সামান্য কারণও তার নেই।
তা ছাড়, ঘটনামত, গল্পেরও তো ছেদ পড়ে গেছে।
প্রেমের তরণী চূর্ণ হয়ে গেছে দৈনন্দিনের ভাঁটাজলে।
দুজনেই নিষ্ক্রমিত। বৃথা কেন অস্ত্যোন্তসজাত
যন্ত্রণা আঘাত দুঃখ ইত্যাদি লাঘবের ব্যস্ততা।
দেখ নিরবধি শান্তি ধরণী উজাড় করে রাজে।
তারার নজরানা দিয়ে রাত্রি মুড়ে দিয়েছে আকাশ।
এমন মুহূর্ত এই পরম মুহূর্ত শুধু উদ্গত হওয়ার
মহাকাল ইতিহাস বিশ্বচরাচরের সাক্ষাতে।

ভ্রান্তিলেখা নয়

অমলকান্তি ঘোষ

অনেক বানান ভুল, শব্দের মানে নেই, অনেক কাগজ অপচয়
হয় হোক, এ জীবন ভ্রান্তিলিখা নয়।.....

আমরা সবাই ভাবি, দুপুরের আগে সেই গ্রামে
ফিরে যাবো ; তারপরে নিবিড় আরামে
পথের ক্লান্তিটুকু ভুলে যাবো দ্বিপ্রহরেই।.....
অথচ অনেক লোক সকাল-দুপুর-সন্ধ্যা কাটায় পথেই।.....

কিংবা জলের মত কলসের তলে
চুপচাপ শুয়ে থাকি, অভাবিত কোন দুপলে
হঠাৎ ছলকে যাই ; তারপরে যেন এক চপল বাসুল
আলপনা আঁকে ঘরময়—
চিরকাল ভোল খাই, এজীবন ঠিক তাই, ঠিক তাই নয়

আপন মনের লেখা, অনেক সময়
কিছু ভুল হয় হোক, এত আর ভ্রান্তিলিখা নয়।

স্মৃতি

প্রবাস বসু

একটা অমুচ্চ ঝোপ, চৈত্রের পড়ে-আসা বেলা
কলকাতা থেকে দূর—দূর এই নদীটির নাম
কী যেন গিয়েছি ভুলে, ইস্কুল, মাষ্টারি, গ্রাম—
শুয়ে আছি একা একা, লাল নীল মাছেদের খেলা।

এখানে সংগী নেই, ইস্কুল-বাড়ীটার মত
নির্জনে দিন কাটে, দর্শন-জিজ্ঞাসায় মন
বাম হাতে মাথা রেখে ডুবে যায় যখন তখন,
যন্ত্রণায় মাঝে মাঝে কেঁদে ওঠে হৃদয়ের ক্ষত।

ট্রাম নেই, বাস নেই, অথচ চাকার ক্ষীণ ধ্বনি
মাঝে মাঝে পাই তবু, সন্ধ্যার এই নদীতীর
কখন সহর হয়, সহরের বুকের নিবিড়
পার্কের এক কোন, সুমিত্রা, তোমাকে ভুলি নি॥

নিঠুরা

মঞ্জুর গাঙ্গুলী

এলো না সে যে এখানে এলো না!
হৃদয় তাকে অনেক খুঁজে
আজো তো কাছে পেলো না।
কৃষ্ণচূড়া এ বৈশাখে
সবুজরঙা পাতার ফাঁকে
মুখ দেখালো পাখির ডাকে –
আমারই এই কাননতলে তো—
অথচ স্থাখো—এখন সে নেই
হৃদয় আমার ব্যাথায় জ্বলে গো।

দরোজা খুলে কখন থেকে দাঁড়িয়ে
ভেবেছি আমি আসবে সেতো
পাহাড় মাঠ ছাড়িয়ে।
অথচ সেই দিনের পরে
রাত্রি এসে নেমেছে ঘরে—
শূন্যমনে বাঁশীর স্বরে
কোথায় যাব হারিয়ে,
তখনো সেই নিঠুরা তার
দেবেনা হাত বাড়িয়ে।

সেকেলে ছড়া

পথচারী

(১)

শুষ্কং কাষ্ঠং—তাই বটে, তাই !
ফল্গুর ধারা চলে, দেখতে না পাই।
বারো মেসে হয় যদি শ্রাবণের বান,
সর্বংসহা,—তবু সয় কি সে দান ॥

(২)

রাতকানা সংসার, দিনকানা বিধি ;
সে শুভ-মিলনে হ'ল বিজ্ঞান-নিধি।
অজ্ঞান জেনে সার, ফেরি করে জ্ঞান,
মাটি-মার কোলে লাথি, চন্দ্রে প্রয়াণ ॥

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

অমিয় চক্রবর্তী

"... কাব্যসৃষ্টির একটা দিক প্রত্যহ জীবনকে স্পর্শ করে, আরেক দিকে তার ভূমিকা নিত্য স্বর্গালোকে অধিষ্ঠিত—আপনার কবিতায় এই দুই দিকেরই পরিচয় পেলাম।··· কবিতা উভচর এবং বহুচর—অতি সূক্ষ্ম সামঞ্জস্যেই তার প্রাণ। আপনার কবিতায় সেই প্রাণের সন্ধান পেয়েছি।··· পৃথিবীকে আপনি স্পষ্ট চোখে দেখেছেন—এ বড়ো আশ্চর্য দেখা।"

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

"...আমি আপনার কবিতার অনুরাগী ; এবং ইতিমধ্যে আপনার সহজ প্রতিভা যে অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিরন্তর পরিণতির দিকে এগোচ্ছে তা আমি বারংবার লক্ষ করেছি। ··আমি এই রকম সচল মনীষার পক্ষপাতী, এবং হয়তো তাই আপনার লেখা আমাকে এতটা টানে।···আমার মতে আধুনিক বাঙালী কবিদের মধ্যে যাঁরা ভবিষ্যতেও সাধুবাদ পাবেন, আপনি তাঁদের অন্যতম।···

অন্নদাশঙ্কর রায়

"...আপনার কবিতাগুলিতে প্রকৃত কাব্যরসের স্বাদ পাওয়া যায়, আপনার মূল্যবোধও সুস্থ মানুষের।"

এই কবির নতুন কাব্যগ্রন্থ

১৫ই আষাঢ় প্রকাশিত হয়েছে **দিনযাপন** দাম দু'টাকা

কালপুরুষ : উপন্যাস

মিহির মুখোপাধ্যায় ..... গতবারের পর .....

[একুশ]

কয়েকটা দিন পরের কথা। দেবানী ফিরছিল সেতার-শেখার ক্লাশ থেকে। পেট্রোল-পাম্পের মোড় অবধি এসে দেখ্‌ল শান্তনু আসছে উলটো দিক থেকে। বোধহয় জ্যেঠা-মশাইর ঘরে বসেছিল দেবানীর সঙ্গে দেখা করার আশায়।

আগে দেখা করত কলেজের গেটের সামনে। সেল গ্রীষ্মের ছুটির সময় সে সুবিধে ছিল না, তারপর দেবানী নিজেই নিষেধ করে দিয়েছে। ক্লাশের চেনা-শোনা মেয়েরা হাসাহাসি করে, অনেকেই চিনে ফেলেছে তাদের। আজকাল তাই সপ্তাহের তিনদিন সেতার-শেখার ক্লাশে যাবার সময় বাস-ষ্টপে অপেক্ষা করে শান্তনু। আজ যাবার সময় দেখা হয়নি' বেলগাছিয়া থেকে এসে পৌঁছুতে দেরি হয়ে গিয়েছিল। এখন কাছাকাছি এসে সেই কথাই বললো—"আসতে আসতে দেরি হয়ে গেল, কি আর করি, জ্যেঠামশাইর ঘরে কিছুক্ষণ বসেছিলাম, কল্যেন মশাইর সঙ্গেও একটু বক্‌-বক্‌ করলাম, সময় আর কাটে না, অথচ দেখা না করেও যেতে পারি না, কয়েকটা জরুরী কথা ছিল।"

দেবানী উত্তর দিল—"খুব করেছ, সাত-আট দিন টিকি দেখ্‌তে পাইনি কেন? কোথায় ছিলে?

—"টিকি না থাকলে দেখবে কোত্থেকে, সব খুলে বলছি, চলো পার্কে গিয়ে বসি।"

দেবানী বিপন্ন সুরে বললো—"এখন পার্কে গিয়ে বসব, সন্ধ্যে হয়ে এল যে"— —"কোথায় সন্ধ্যে হয়েছে, সন্ধ্যে হতে এখনো অন্ততঃ আধঘণ্টা দেরি, চলো চলো এখানে আর দেরি ক'রো না।"

দেবানী শেষ চেষ্টা করল—"এই সেতারটা নিয়ে আর হাঁটতে পারছি না আমি, এটা হাতে নিয়ে পার্কে যেতে লজ্জা করবে।"

—"দাও, ওটা আমার হাতে দাও।"

—"এবা, লোকে হাসবে যে"—

—"হাসুক। —শান্তনু সেতারটা নিতে নিতে বললো —"লোকের হাসাহাসির ধার ধারিনা আমি।"

দেবানী মুখ টিপে হাসল—"খুব সাহস হয়েছে দেখছি।"

—"সাহস হবার কিছু কারণ ঘটেছে বলেই হয়েছে, চলো যেতে যেতে সব বলছি।"

দুজনে আবার উল্টোপথে চলল। কিছুদূরে পার্কের গেট।

যেতে যেতে শান্তনু বললো - "তোমার মেজদা'র মতামতটা জানার অপেক্ষায় এ কদিন আসিনি, কাল জানতে পেরেছি। জামাইবাবু তাকে সব কথা খুলে বলেছেন, সুরেশদা' রাজী হয়েছেন।"

—"এ্যা, সাইরি"—দেবানীর নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে এল।

শান্তনু একটু হাসল—"সাইরি-ফাইরি বুঝি না, যা সত্যি তাই বললাম।"

দেবানী একটু কাছে সরে এসে উত্তেজনার সুরে বললো—"খুলে বলোনা ছাই, সব সময় ঠাট্টা ভালো লাগে না।"

—"বললাম তো রাজী হয়েছেন।"

- "আহা, মেজদা' কি বললো, তাই বলো না।"

- "দিন তিনেক আগে জামাইবাবু তার অফিসে গিয়ে ধীরেসুস্থে সব কথা গুছিয়ে বলেছেন, সুরেশদা' নাকি প্রথম

হয়ে সবটা শুনেছেন, শেষে ভেবে দেখার জন্য দু'দিন সময় নিয়েছিলেন, সেই দু'দিন শেষ হয়েছে গতকাল, জামাইবাবু আবার তাঁর অফিসে গিয়েছিলেন, অনেকক্ষণ, আলোচনার পর মোটামুটি রাজী হয়েছেন, ভাল কথা, উনি নাকি পাকিস্তানে চলে যাচ্ছেন।"

দেবানী সায় দিল—"হ্যাঁ, এখানের চাকরিতো আর থাকছে না।"

—"তাই বলে কোন চেষ্টা না করে সব ছেড়ে-ছুড়ে পাকিস্তানে গিয়ে থাকবেন।"

—শান্তনু যেন একটু অবাক হয়েছে।

—"আসল কথাটা আমি আর বউদি জানি।" —দেবানী একটু হাসল—"সেই যে বলেছিলাম, সেই সুমিত্রাদি' পাকিস্তানে যাবার জন্য চিঠি দিয়েছে। মেজদা' আগে থেকেই যাবার মতলব করেছিল, পাশপোর্ট যোগাড় করে রেখেছিল, এখন এই চাকরি যাবার ছুতোয় বড়দা কে রাজি করিয়েছে, ভিসার জন্য দরখাস্ত করেছে, কিছুদিনের মধ্যেই পেয়ে যাবে অসুখ না বলে বাবাও বোধহয় যেতেন।"

দু-জনে পার্কের ভেতর ঢুকে একটা কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচে ঘাসের উপর বসল।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। মাঠের বুকে আবছায়া অন্ধকার। পশ্চিমের মেঘে ম্লান গোধূলির আলো। রাস্তার আলো জ্বলছে। ঘুরে রেললাইনের ওপাশে গাছ-গাছালির মাথার ওপর দিয়ে হলুদ চাঁদ উঠ্‌ল। আজ কি তিথি জানা নেই, সামনে বোধহয় পূর্ণিমা।

শান্তনু বললো—"সুরেশদা' তাই বললেন পাকিস্তানে যাবার আগেই আমাদের জন্য যেটুকু করবার করে যেতে চান, এরপর কবে ফিরতে পারবেন কিছুই ঠিক নেই, বোধহয় এ মাসের শেষের দিকে চলে যাবেন, আমি তাই জামাইবাবুর সঙ্গে কথা বলে ঠিক করেছি, যাবার আগে আমাদের রেজিষ্ট্রি হবে, তোমার আপত্তি নেই তো।"

দেবানী মুখ নিচু করে নিঃশব্দে আঙুলে আঁচল জড়াতে লাগল।

শান্তনু আবার জিজ্ঞেস করলো—"কি, কথা বলছো না যে।"

—"কি আর বলব, তোমরা যখন ঠিক করেছ"—দেবানী মুখ নিচু করেই উত্তর দিল

—"তবে এত তাড়াতাড়ি"—

—"তোমার ওই এক কথা, তাড়াতাড়ি হ'ল কোথায়, জামাইবাবুর কথায় পুরো একটা বছর অপেক্ষা করলাম, একটার পর একটা বাধা আসছে, আবার কি হবে কে জানে।"—শান্তনুর কথা শুনে দেবানী মুখ তুলে একটু হাসল—"বাধা কিছুই হতো না, তুমি যদি পরীক্ষায় ফেল না করতে।"

শান্তনু সামনে পা ছড়িয়ে পেছনে হাতে ভর দিয়ে অন্যদিকে চোখ রেখে উদাসভাবে বললো—"কি আর করব, প্যাঙলামিতে আটকে গেলাম আবার ছ মাস পরে পরীক্ষা, ও আর আমার দ্বারা হবে না, একবার পড়াশোনা থেকে মন ছুটে গেলে"—একটু চুপ থেকে বললো—"আমি সেই চাকরিটাই নেব ভেবেছি।"

দেবানী উত্তর দিল—"হ্যাঁ, তারা এই এক বছর তোমার জন্য চাকরি নিয়ে বসে আছে কি না।"

—"তুমি জানো না, বিমলকান্তির বাবা আমাকে কতটা স্নেহ করেন, ওদের কতবড় ব্যবসা, এই সেদিনও শেয়ালদা'র কাছে একটা শো-রুম খুললো। আমি পড়া ছেড়ে চাকরি নেব তাতেই যা আপত্তি, তা একটু ধরাধরি করলে ঠিক হয়ে যাবে।"

—"যা ভাল বোঝ কর"—দেবানী আস্তে আস্তে বললো "আমি আজ মেজদা'র সামনে যাব কি করে তাই ভাবছি।"

—"কেন, সুরেশদা তো কয়েকদিন আগেই জেনেছেন, এ কদিন দেখা হয়নি তোমার সঙ্গে?"

—"তা হলেও আমি তো আজ জামালাম, কেমন যেন লজ্জা করছে।"

—"ওসব লজ্জা-টজ্জা ভুলে যাও, চিনেবাদাম খাবে নাকি, এই বাদাম—"

একটি ছেলে বাদাম নিয়ে যাচ্ছিল, শান্তনু ডেকে দু' ঠোঙা কিনল, দেবানীকে একটা দিয়ে বললো—"খাও।"

—"না আমি খাব না"—মাথা নাড়ল সে, তারপর একটু হেসে বললো—"তোমার এমন খাই-খাই স্বভাব কেন, যা পেলুক তুমি, রাস্তায় বেরোলেই এটা খাবে নাকি, ওটা খাবে নাকি।"

শান্তনুও হাসল—"আরে পার্কে এসে চিনেবাদাম কিম্বা ফুলুরি-মুড়ি খেতে হয়, যেখানের যা নিয়ম, যেমন সিনেমা দেখে বেরিয়ে একবার রেস্তোরাঁয় বসতে হয়, খেলার মাঠে গেলে ছাতা ভুলে ট্যাচাতে হয়, রেফারীকে গাল দিতে হয়, বুঝলে না যেখানকার যা—"

—"তুমি এ বছর খেলা দেখতে যাওনি?"—দেবানীর জিজ্ঞাসার জবাবে বললো

—"যাই যাবে মাঝে তবে নানারকম ভাবনা-চিন্তার মধ্যে থাকি, আগের মত মনমেজাজ কি আর আছে!" একটু ভেবে আবার বললো—"মনে আছে, এই খেলার মাঠ থেকে ফেরার পথেই বৈশেল বাস থেকে পড়ে গিয়েছিল, তারপর থেকেই তো তোমার সঙ্গে ভালভাবে আলাপ হ'ল।"

দেবানী হাসিমুখে উত্তর দিল—"মনে নেই আবার, খুব মনে আছে, তার কয়েকদিন আগেই তুমি আমার পেছন পেছন ধাওয়া করে বাস স্টপের কাছে গিয়ে আলাপ করলে উঃ কতদিন হয়ে গেল, দেখতে দেখতে দু'বছর।"

শান্তনু মাঠের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বললো—"হ্যাঁ দিনগুলি যে কি ভাবে পালিয়ে যাচ্ছে, হদিশ পাই না, সে যাক"—একটু নড়েচড়ে বললো কাজের কথা যা বলছি শোন, এ মাসের চব্বিশ তারিখ দিন ঠিক করেছি, যদি এর মধ্যে কোন কিছু না ঘটে, তবে ঐ দিন বেলা নটা-দশটার সময় এসে জামাইবাবু তোমাকে নিয়ে যাবেন, তাঁর বাসায় বসেই সব হবে, আমি থাকব সেখানে তোমার সেবাও থাকবেন।"

—"কার্তিকদা এসে নিয়ে যাবেন।" দেবানী উৎসুক চোখে তাকাল—"বাড়ীতে কি বলে যাব?"

—"সে যা বলার জামাইবাবুই বলবেন, তোমার কিছু ভাবতে হবে না।"—শান্তনু মুখের কাছে হাতঘড়িটা নিয়ে অল্প আলোয় দেখে বললো—"চলো উঠি এবার, সাতটা বেজে পঁচিশ।"

দেবানী এবার দেওয়ালটা হাতে নিল, যেতে যেতে বললো —"মমতাদি' সব শুনেছেন নাকি?"

—"না, এখনো জানে না, সময়মত জামাইবাবু তাকে খুলে বলবেন। আমার সঙ্গে এর মধ্যে আর দেখা নাও হ'তে পারে, তুমি সাবধানে থাকবে, কাউকে কিছু ঘুণাক্ষরেও বলবে না, ছোড়দি' কিম্বা কমলা যেন টের না পায়, ওদের বলা হবে পরে, তবে তোমার সেই কলেজের বন্ধু কল্যাণী না কি নাম, তাকে বলতে পারো, সে-তো ব্যাপারটা জানে, ঐদিন যদি যেতে চায় জামাইবাবুর বাসার ঠিকানা দিয়ে নেমন্তন্ন করো।"

দু'জনে পেট্রল পাম্পের কাছে গিয়ে ছাড়াছাড়ি হ'ল। শান্তনু গেল বাস ষ্টপের দিকে আর দেবানী আস্তে আস্তে বাসার দিকে।

অন্ধকার বাড়ীটা যেমন অচেনা রহস্যের মত মনে হয়।

শ্রীনাথ কবিরাজ বৈঠকখানায় বসে কার সঙ্গে যেন কথা বলছেন।

কবিরাজের কালো কুকুরটা পথের পাশে শুয়েছিল, দেবানীকে মুখ তুলে দেখল, মাটিতেই কয়েকবার লেজটা আছড়াল। শক্তিসংঘের ঘরে রোজের মত ছেলেদের আড্ডা। এপাশের রোয়াকে মন্দাকিনী ঠাকুরণ আহ্নিকে বসেছিলেন।

মালা জপতে জপতেই কি কথার উত্তরে কাকে যেন

বললেন—"আমি সে কথা বলেছি নাকি, একটুকরো সাবান কবে ফুরিয়ে গেছে, নোংরা কাপড় না কচ্‌লে"—

ছেলের বউএর সঙ্গে সব সময় খিটিমিটি লেগেই আছে। সিঁড়ির ধাপে উঠ্‌তে উঠ্‌তে দেবানী ভাবছিল দেরী হওয়ার জন্য বাড়ীতে বলার মত একটা অজুহাতের কথা।

প্রথমেই বৌদির সঙ্গে দেখা। সন্ধ্যার পর গা ধুয়ে এসে বারান্দার দড়িতে ভেজা কাপড় মেলে দিচ্ছিল। দেবানীকে দেখে বললো—"বেশ মেয়ে তুমি, এতক্ষণে এলে যা হোক, কটা বাজল খেয়াল আছে।" তারপর ঘরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল—"মা রানী এসেছে।"

রায়-গিন্নী পুজোর আসনে বসেছিলেন। পুজো হয়ে গেছে। এখন খুকি-সন্তুর হাতে প্রসাদী বাতাসা দিচ্ছিলেন। মুখ তুলে বললেন—"হ্যাঁরে এত দেরি হ'ল কেন? তোর বাপ সেই থেকে বলছে।"

দেবানী ঝিন্‌ঝিন্ স্বরে জবাব দিল—"কলেজের একটা মেয়ের সঙ্গে দেখা হ'ল"— ভালভাবে কথা শেষ না করেই সেতারটা আয়নাসহ রেখে তাড়াতাড়ি বাপের ঘরে গিয়ে ঢুকল। সর্বেশ্বর রায় চোখ বুজে শুয়েছিলেন, বিপিন শিয়রে বসে হাওয়া দিচ্ছিল। দেবানী তার হাত থেকে পাখাটা নিয়ে নিজেই বাতাস দিতে লাগল। বিপিন উঠে বাইরে গেল বোধ হয় একটা বিড়িতে টান দিতে।

দেবানীর হাতের চুনচুন শব্দেই হোক কিম্বা অন্য কিছু ভেবেই হোক, রায়-মশাই একটু পরে চোখ খুললেন, মেয়েকে দেখে বললেন—"কখন এলে মা, এত দেরি হ'ল কেন?"

—"হ্যাঁ, বাবা, একটু দেরি হয়ে গেল, তোমার কিছু চাই, জল দেবো?"

—সোজাসুজি দিখো কথাটা আর বললো না, বলতে পারল না।

রায়-মশাই আবার জিজ্ঞেস করলেন—"বিপিন কোথায়?"

—"এই তো, এই মাত্তর উঠে গেল, ডেকে দেব?"

—"না থাক।" —রায়-মশাই আবার চোখ বুজলেন। দেবানী বসে বসে হাওয়া দিতে লাগল, কিন্তু কান পেতে রইল সিঁড়ির শব্দের দিকে।

মেজদা' কখন টিউশনি থেকে ফিরবে, কি বলবে তাকে, কে জানে।

কেমন করে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথা বলবে সে। হয়তো এ দু'দিনের মতো কিছুই বলবে না, কিছুই হবে না, তবু কেমন যেন লজ্জা করছে।

ওপাশের ঘরে শান্তিশ্বর সন্তুকে ইংরেজী বানান শেখাচ্ছে। সামনের ঘরে রায়-গিন্নী খুকিকে দুধ খাওয়াচ্ছেন। বৌদি রান্নাঘরে ব্যস্ত।

এ ঘরটা আবছা-অন্ধকার! স্বরেশের টেবিলের উপর টাইম-পিসটার টিকটিক শব্দ। রাত প্রায় আটটা। দেবানী বসে বসে হাওয়া দেয়, কান পেতে রয়েছে, সিঁড়ির ধাপে কখন মেজদা'র স্যাণ্ডেলের শব্দ হবে।

[বাইশ]

শান্তমুর বলে দেয়া সেই চব্বিশ তারিখের বেলা দশটা নাগাদ কার্তিক দত্ত এসে হাজির। একটু আগে শান্তিশ্বর, স্বরেশ্বর অফিসে বেরিয়ে গেছে।

দেবানী আজ আর কলেজে যায়নি। বাড়ীতে পড়াশোনা করার অজুহাত দিয়ে পড়ার টেবিলে বসেছিল কিছুক্ষণ, এক অক্ষরও পড়া হয়নি। তারপর বাবার কাছে বসে তাকে হাওয়া দিয়েছে, ওষুধ খাইয়েছে, মাথা দুইয়ে দিয়েছে। মাঝে মাঝে মেজদার টাইম-পিসটার দিকে তাকাচ্ছিল। কার্তিকদা' কখন আসবেন, নাকি আসবেনই না। তা'হলে সেই মানুষটাকে তো একটা খবর দেয়া উচিত ছিল।

এক সময় উঠে গিয়ে সন্তুকে স্কুলের জামাপ্যাণ্ট পরিয়ে দিয়েছে, মেজদা'র অফিসের জামা কাপড় গুছিয়ে রেখেছে। এ ক'টাদিন মেজদা'র সঙ্গে ভাল করে কথা বলতে সাহস

পায়নি, চোখে চোখেও তাকায়নি। মেজদা' যখন যে কাজটা করতে বলেছে মুখ বুজে করেছে। অন্যদিন অবশ্য এ কাজগুলি বৌদিই করে। সে তো এ সময় বাড়ী থাকে না, সেই ভোরে উঠেই কলেজে চলে যায়। একটু আগে স্নান করে এসে দেখল ঘড়িতে দশটা বাজে। আবার বাবার কাছে বসে তাকে হাওয়া দিতে লাগল মাঝে মাঝে পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল হঠাৎ চমকে উঠল পাশের ঘরে কাতিকদা'র কথা শুনে। বুকের ভেতর টিপ্‌টিপ্‌ করতে লাগল। পাখাটা হাতে নিয়েই পাশের ঘরে এলো। কাতিক দত্ত তখন রায়-গিন্নীকে বোঝাচ্ছিলেন —"বুঝলেন মাসীমা, আমাদের পাড়ার আজ সন্ধ্যে বেলা মাধুরী স্মৃতি পাঠচক্রের মেয়েরা একটা থিয়েটার করবে, আমার বাসায় বলেই ওরা রিহার্সাল দেয়, বানীকে তাই নিয়ে যেতে চাই, মেয়েদের গানটানগুলো একটু দেখিয়ে দেবে, ওদের একটু সাহায্য হবে. আপনার কোন আপত্তি কিন্তু শুনব না।" রায়-গিন্নী কোন আপত্তি করলেন না। এই ব্যারাক-বাড়ীর সকলেই কাতিক দত্তকে ভালভাবে চেনে, ভালবাসে. বিশ্বাস করে।

দেবানীর বুক টিপ্‌টিপ্‌ করেনি। মুখ চোখের চেহারা শুকনো, গলা শুকিয়ে আসছিল। প্রথমে সবুজ সিল্কের শাড়িখানা পরল। তারপর কি ভেবে সেটা বদলে বৌদির পছন্দ করা একটা তাঁতের শাড়ি নিল। বিনুনী বাঁধল, পছন্দ হলো না, সবটা খুলে আবার আঁট করে খোপা বাঁধল, কাঁপা কাঁপা আঙুলে চোখে কাজল দিল, কপালে ছোট্ট একটা কুমকুমের টিপ্‌।"

তারপর গেল বাবার কাছে "আমি একটু কাতিকদা'র সঙ্গে যাচ্ছি বাবা।"

কথা কেমন আটকে আসছিল, এত কাছে থেকেও বাবার ঝাপ্‌সা-ভেজা মুখখানা কেমন অস্পষ্ট আর দূরের মনে হয়।

—"কোথায় যাচ্ছ, মা!" —রায়-মশাইর প্রশ্ন শুনে কাতিক দত্ত এগিয়ে এলেন, তারপর 'বুঝলেন মেশোমশাই' বলে শুরু করে রায়-গিন্নীর কাছে বলা সেই কথাগুলিই আবার আউড়ে গেলেন। দেবানী অন্যদিকে তাকিয়ে রইল। উঃ কাতিকদা' কি চালাক, শান্তনুর কথা মনে এল—"যা বলবার জামাইবাবুই বলবেন, তোমার কিছু ভাবতে হবে না।"

রায়-মশাই একটু সময় চুপ করে কি যেন ভেবে আস্তে আস্তেই বললেন —"ওকে আবার সেখানে নিয়ে বাজাতে হবে নাকি, মেধো যেন সেবারের মত তাল কানা তবলচীর সঙ্গে বসিয়ে দিও না।"

—"না, না, সে রকম কিছু হবে না আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, ওকে কিছু করতে হবে না, মেয়েরাই যা করার করবে, ও শুধু তাদের একটু—"

দেবানীর কেন যেন কান্না পাচ্ছিল, গলার কাছে কিছু একটা আটকে আছে মনে হ'ল। সবচেয়ে অবাক হ'ল ললিতা আর কমলা। "কখন থিয়েটার হবে, আমরাতো কিছু জানি না, আপনি তো বেশ মানুষ, আমাদের তো আগে কিছু বলেন নি।"

ললিতা জিজ্ঞেস করল—"আমাদের নিয়ে যাবেন না।"

কমলা ঠোঁট কাটল—"আমাদের নিয়ে লাভ কি হবে, আমরা গানও জানিনা, বাজনাও জানিনা, থিয়েটারও করতে পারিনা।"

কাতিকবাবু সিঁড়ি ধরে নামতে নামতে হাসিমুখে বললেন —"না, না, তোমাদেরও নিয়ে যাব, সন্ধ্যে বেলা আমি নিজে এসে নিয়ে যাব।"

—"থাক আপনাকে আর কষ্ট করে আসতে হবে না— কমলা ভারী গলায় বললো—"আপনার ভাগ্নি ভাল, বানীকে আজ বাড়ীতে পেলেন, ওতো অন্যদিন এসময় কলেজে থাকে।"

কথাটা শুনে দেবানীর বুকের ভেতরটা আর একবার টিপ্‌ টিপ্‌ করে উঠ্‌ল। কাতিকদা আসবে জেনে সে যে ইচ্ছে করেই কলেজে যায় নি, কমলাদি সেটা টের পেয়েছে

নাকি, কি জানি। এখন তাড়াতাড়ি একটায় নেমে চোখের আড়াল হতে পারলে বাঁচে।

একটু আগে কার্তিক দত্ত মুখ বুজে হন্ হন্ করে চলেছেন। বাস-ষ্টপের কাছে এসে প্রথম মুখ খুললেন—"কত যে মিথ্যে বলতে হল, একটা মিথ্যে ঢাকতে আরো পাঁচটা বলতে হল, সবচেয়ে খারাপ লাগছিল তোমার বাবার কাছে বলতে। বাপের বয়সী মানুষ তার অসুখ, ছিঃ ছিঃ কি অন্যায়ই যে করলাম।" একটু থেমে আবার বললেন—"কি আর করি, তমুকে ছোট ভাই এর মত দেখি, ছোটবেলা থেকে ওর সমস্ত আবদার শুনে এসেছি।"

দেবানী অন্যদিকে চোখ রেখে চুপ করে রইল। এসব কথার জবাব দিতে নেই, জবাব দেবারই বা কি আছে।

• • •

চাকুরিয়া কার্তিকদার বাড়ীর সামনে এসে প্রথমেই চোখে পড়ল, একখানা নতুন মডেলের বুইক গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। কালো রঙের, বেশ ঝকঝকে তকতকে গাড়ীখানা। কার গাড়ী, এখানে কেন? ভাবতে ভাবতেই কার্তিকদার পেছন পেছন ঘরে ঢুকল। বাইরের বসবার ঘর। তক্তাপোষের ওপর ধোপ দুরস্ত ধুতি-পাঞ্জাবী পরা দুটি অচেনা ছেলে। আর একপাশে একটি মাত্র চেয়ারে খবরের কাগজ সামনে ধরে দেবানী। সুরেশ্বর গম্ভীর চোখে তাকাল।

দেবানী তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নিল। কার্তিকদা বললেন—"এসো আলাপ করিয়ে দিই, এরা হচ্ছে তমুর কলেজের বন্ধু, বিমলকান্তি বসুরায়, সুদর্শন ভট্টাচার্য।" দুজনেই দাঁড়িয়ে নমস্কার দিল।

বিমলকান্তির নামটা আগে অনেকবার শুনেছে, নমস্কারের ভঙ্গিতে হাত তুলে একটু কৌতূহলের চোখে তাকাল দেবানী। বয়সে বড়, স্বাস্থ্যবান ছেলেটি, কেমন কাঠখোট্টা চেহারা, শান্তনুর মুখে শুনেছিল, রোজ সকাল বিকেল ডাম্বেল-মুগুর ভাঁজে, মস্ত বড়লোকের ছেলে। পাশের সুদর্শন ভট্টাচার্য, কিছু কৃশ, একটু রোগা, চোখে চশমা। দু'জনেই কেমন অপ্রতিভের মত হাসছিল।

কার্তিকদা বললেন—"যাও, ভেতরে যাও!"—তারপর একটু উঁচু গলায়—"কই গো কি করছ, বাণী এসেছে।"

দেবানী পর্দা সরিয়ে ভেতরে গেল। বারান্দায় মমতাদি' উবু হয়ে বসে একটা কাঠের পিঁড়িতে আলপনা দিচ্ছিলেন। আর একটা পিঁড়িতে আঁকার কাজ শেষ হয়েছে। টিকলু পাশে দাঁড়িয়ে মায়ের শিল্পকর্ম দেখছিল!

হাসিমুখে উঠে এলেন মমতাদি, তার হাসিমুখ দেখে আশ্বস্ত হল দেবানী আর লজ্জা লুকোবার জন্য তাড়াতাড়ি সামনে ঝুঁকে টিকলুকে আদর করতে লাগল।—"এসো ঘরে গিয়ে বসবে।"—মমতাদি হাত ধরে ঘরে নিয়ে বসালেন। পাশাপাশি দু'খানা ঘর। একটায় কার্তিকদা-মমতাদি থাকেন, আর একটা খালি। শুধু মেঝেলে পালঙ্ক গোছের একটা খাট পাতা রয়েছে, পুরনো জাজিমের ওপর নতুন তোষক, চাদর, বালিশ, মশারী। মাঝে মাঝে কার্তিকদার মা-বাবা এলে এই ঘরে থাকেন। তাঁরা এখন এখানে নেই, ধানবাদে না কোথায় বড় ছেলের কাছে আছেন। ঘরে ঢুকতে গিয়ে দরজার কাছে আবার জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়াল দেবানী শান্তনু স্নান করে এসে কাপড় পরছিল। গায়ে গেঞ্জী, মাথার ভেজা চুল এলোমেলো। কোঁচাটা কিছুতেই মনোমত হচ্ছে না। মাড়-দেয়া কড়া ইস্ত্রি করা কাপড় কেমন ঝুলে ঝুলে থাকছে। পাশেই খাটের ওপর সোনার বোতাম লাগানো পাট-ভাঙা আদ্দির পাঞ্জাবী।

মমতাদি বললেন—"তুই ওঘরটায় যাতো তনু, বাণী বসবে এখানে।"

একহাতে পাঞ্জাবী আর একহাতে অগোছাল কোঁচাটা ধরে বিছুটা আলুথালুভাবে বেরিয়ে গেল শান্তনু। দেবানী খাটের দিকে চোখ রেখে দাঁড়িয়েছিল। তারপর টিকলুকে

পাশে নিয়ে পালঙ্কের উপর বসল। নতুন বিছানা, বালিশ দেখে একটু যেন সুষ্ঠিত। কাত্তিকদা নিশ্চয়ই নিজের টাকা খরচ করে কিনে এনেছেন। কি দরকার ছিল এসব আনার। টিকলু চোখ বড় বড় করে একটা খবর দিল—"জানো, বানীমাসী, আজ সন্ধেবেলা তমুমামার ফিরে হবে, মা তাই ছবি আঁকছিল।"

মমতাদি খিলখিল করে হেসে বললেন—"দ্যাখ্রে, তোর বাণীমাসীকে নেমন্তন্ন করলি না, খুব করে মিষ্টি খাইয়ে দিস্।"

কাত্তিকদা'র 'কইগো' শুনে বাইরে গেলেন, বারান্দায় দাঁড়িয়ে কি যেন কথা হল। তারপর মমতাদি আবার এসে জিজ্ঞেস করলেন—"বাণী তুমি চান করে এসেছো?"

দেবানী মাথা হেলিয়ে বললো "হ্যাঁ।"

—"এই শাড়ীটা পরেই যাবে, না আর একটা শাড়ী দেব।"

—'না এটাই থাক।"

—'তা'হলে এসো চুলটা বেঁধে দিই, খোঁপাটা কেমন আঁট হয়ে আছে, নিজেই বেঁধেছ বুঝি, মুখখানাও মেজে গেছে।"

মমতাদি আয়না-চিরুণী, রুপোর ঝুমকো লাগানো চুলের কাঁটা, স্নো-পাউডারের কৌটো, আলতার শিশি নিয়ে এলেন। দু'জনে বারান্দার পেতে মেঝেতে বসলো। মমতাদি' পেছনে বসে যত্ন করে চুল বেঁধে দিতে দিতে আক্ষেপের সুরে বলতে লাগলেন—"এমন সুন্দর বউ হ'ল, বাবাও জানলেন না, কাকা-কাকিমাও খবর পেল না, আগে থেকে খবর দেবারও উপায় নেই, কি যে ছাই দেশের নিয়ম, এ বামুন, ও কায়েত, ওর ছোঁয়া এ খাবে না, এর মেয়ে ও নেবে না।"

দেবানী চুপ করে সামনের দিকে তাকিয়েছিল। সামনে খোলা দরজার ওপাশে বারান্দা, তারপর উঠোন। উঠোনের একপাশে একটা পেয়ারা গাছ। গাছের একটা ডাল আর এপাশে দালানের দেয়ালের গায়ে পোড়া একটা ইঁদারার মঞ্চে কাপড় শুকোবার লোহার তার লাগানো আছে। একটা খুব তুচ্ছ জিনিষ মনোযোগ দিয়ে দেখছিল সে। লোহার তারের উপর কয়েকটা মাছি উড়ে উড়ে বসছে, আবার উড়ে যাচ্ছে। বাড়ীতেও দেখেছে রাত্তির বেলা বারান্দার কাপড় শুকোবার তারের উপর মাছিগুলো কেমন লাল বেধে বসে থাকে।

মমতাদি' যত্ন করে চুল বেঁধে দিলেন, মুখে স্নো-পাউডার পায়ে আলতা দিলেন, কপালে টিপ আঁকলেন।

তারপর সেই কালো রঙের গাড়ীতে রওনা হল সবাই।

গাড়ীটা বিমলকান্তির বাবার। পেছনের সিটে কাত্তিক দত্তর একপাশে সুরেশ, আর একপাশে দেবানী। সুরেশর গম্ভীর মুখে বসেছিল, মাঝে মাঝে দু'একটা কথা বলছিল কাত্তিকদার সঙ্গে। দেবানী জড়সড় হয়ে মুখ নিচু করে আছে। সামনের সিটে তিনবন্ধু। ড্রাইভিং ধরে বিমলকান্তি, মাঝে সুদর্শন আর এপাশের জানালা ঘেঁষে শান্তনু! দরজার কাছে মেয়েকে পাশে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন মমতাদি। টিকলু খালি জিজ্ঞেস করছে—"ওরা কোথায় যাচ্ছে না, কখন আসবে, আর আসবে না?"

—"তোমার জন্য মিষ্টি আনতে যাচ্ছে, কেমন সন্দেশ আনবে দেখো, সন্ধেবেলা কত লোক আসবে, চলো আমরা তাড়াতাড়ি সেই ছবিটা এঁকে ফেলি, সেই যে পিঁড়ির উপর ফুল আঁকছিলাম, চলো, চলো।"

সদর দরজার খিল তুলে দিয়ে মমতাদি আবার এসে আলপনা আঁকার জন্য বসলেন। অনেক কাজ বাকি, একা একা এত কাজ করা যায় নাকি। ললিতা কিম্বা কমলা এসে একটু সুবিধে হত। পাশের বাড়ীর বৌটি সংসারের কাজ সেরে কখন আসবে কে জানে। ঠিকে-ঝি মদনের মাকে এ বেলা একটু আগে আসতে বলেছিল। তারোতো পাত্তা নেই। এসব মানুষের উপর ভরসা করে থাকাও যায় না।

* * *

ঘণ্টা দুই পরে আবার মোটরের হর্ন শুনে মমতাদি দরজা

খুলে দিলেন। কার্তিকদত্ত ঘরে ঢুকতে জিজ্ঞেস করলেন – "ভালোয় ভালোয় সব মিটল, কোন গোলমাল হয়নিতো।"

—"না, না গোলমাল হবে কেন, আরে ম্যারেজ-রেজিষ্ট্রার ভদ্রলোক আমাদের ছুপেশের খাবা খুব খাতির করলেন। তোমার এদিকে সব যোগাড় হয়েছেতো, বেলা দুটো বাজে, বিমল, সুদর্শনকে খেতে দাও।"

—"এইতো দিচ্ছি, মাছের ঝোলটা হলেই।"

—"তুমি একাই সব করছ নাকি?"

—"না ওদের বাড়ীর মেজবউ এসেছে, মদনের মাও এসে গেছে।"

চমৎকার ইলিশমাছের গন্ধ ছেড়েছে। পাশের বাড়ীর মেজবউ পাকা রাধুনী। জোরে জোরে দুইশ্বাস টেনে বাতাসে গন্ধ শুঁকে বিমলকান্তি বললো —"আঃ! দিদি, আর কিন্তু বেশীক্ষণ সহ্য হবে না, পেটের মধ্যে—"

—"ধ্যাৎ এই যে দিচ্ছি, ভাই, এক্ষুণি দিচ্ছি—"মমতাদি' তাড়াতাড়ি ভেতরে যাচ্ছিলেন। কার্তিকবাবু আবার ডেকে বললেন—"রানী, তমু, সুরেশকে কি দেবে, দুটো সন্দেশ দাও, আর চাব কেটে - দাড়াও আমিও হাত লাগাচ্ছি।" তারপর এদিকে ফিরে বললেন - "সুরেশ, তুমি বরং আমার খাটে একটু গড়িয়ে নাও।"

কিছু সময় পরে বারান্দার পাশাপাশি বিমল, সুদর্শন আর কার্তিকদত্ত খেতে বসলেন। সুরেশ্বর কার্তিকদা'র খাটে একটু গড়িয়ে নিচ্ছিল।

দেবানী পাশের ঘরে সেই মেজেতে পাতা মাদুরের উপর টিকলুকে কাছে নিয়ে বসেছিল, সামনে কয়েকখানা ছড়াছবির বই। টিকলু মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে একটার পর একটা ছড়া পড়ে চলেছে।

বসবার ঘরে তক্তাপোষের উপর শুয়েছিল শান্তনু। মমতাদি প্লেটে দুটো সন্দেশ আর কাচের গেলাসে চাবের জল নিয়ে এলেন।

শান্তনু উঠে বসল, একটু ইতস্তত: করে বললো —"ওরা কি খেলো?"

—"ওরা, কারা?"—মমতাদি' মুখ টিপে হাসলেন।

একটু আমতা আমতা করে জবাব দিল শান্তনু—"এই মানে সুরেশদা'—"

—"থাক্ বুঝেছি, সুরেশদা'র জন্ত ভাবনায় খাওয়া হচ্ছে না।" —মমতাদি' হাসিমুখে বললেন—"হ্যাঁ খেয়েছে ওরা, রানী কিছু খেতে চায়নি, ওর নাকি কিছু মুখে দিতেই ইচ্ছে করছে না, অনেক বলার পর চাবের জলটুকু খেয়েছে।"

ওদিকে কার্তিকদত্ত খেতে খেতে বললেন—"বিমল, গাড়ী নিয়ে আবার বেরুতে হবে। কালিঘাটে গিয়ে পুরুতঠাকুরকে আনতে হবে, আমি ওকে বলে রেখেছি, ফর্দ তৈরী করে রাখবেন, ওকে ওখান থেকে নিয়ে একেবারে জিনিস পত্তর যা কেনার কিনে আনব, বারবার আর ছুটোছুটি নয়।"

ঘরের ভেতরে বসে দেবানীও শুনতে পেল। মমতাদি' কি একটা কাজে ঘরে আসতেই সে নিচু গলায় বললো—"ওরা যদি কালিঘাট থেকে ফেরার পথে আমার এক বন্ধুকে নিয়ে আসে, খুব ভাল হয়, আমি তাকে আসতে বলেছিলাম, কিন্তু বাড়ী চিনে এখানে আসতে পারবে কিনা—"

—"বেশতো আমি বলছি ওদের—"

—"আমি একখানা চিঠিও লিখে দিচ্ছি—" কাগজ কলম নিয়ে কল্যাণীকে চিঠি লিখল দেবানী, চিঠির ওপর নাম-ঠিকানা লিখে দিল।

মমতাদি' চিঠিটা দিলেন বিমলকান্তির হাতে। পান চিবুতে চিবুতে সুদর্শন গিয়ে শান্তনুর পাশে বসল।

কার্তিকদত্ত আবার জামা-কাপড় পড়ে গাড়িতে উঠ্‌লেন।

বিমলকান্তি বেরোবার মুখে শান্তনুকে লক্ষ্য করে বললো —"খুব খাটিয়ে নিলি, আমার বিয়ের সময় এর শোধ তুলব।"

ওরা চলে যাবার পর সদর অন্দর দু'দিকের দরজা দু'টো ভেজিয়ে সুদর্শন সিগারেট বার করল, শান্তনুর দিকে এগিয়ে

দিল। নিঃশব্দে হাত বাড়িয়ে একটা নিল। দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসেছিল সে, মুখচোখের-চেহারা কেমন ক্লান্ত। সুদর্শন জিজ্ঞেস করল—"কিরে সোমত্ত মুখে অত ভাবছিস্ কি?"

শান্তনু ম্লান মুখে হাসল—"ভাবছি কত কথা, বাবা-মা জেঠামশাই—"

—"এখন আর ভেবে লাভ নেই, আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে"—সুদর্শন একটা কাঠি জেলে দুটো সিগারেট ধরাল, একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল—"তবে ভাই, তোর দিদি-জামাইবাবুকে হাজারবার সেলাম দিতে হয়, এরকম মানুষ হয় না, ওরা না থাকলে—"

শান্তনু দেয়ালের দিকে চোখ রেখে আস্তে আস্তে জবাব দিল—"আমার নিজের বোন নেই, থাকলেও এতটা করত কিনা কে জানে, বড়দি' যে আমার জেঠতুতো বোন অনেক বড় হয়ে জেনেছি।"

তারপর একটু নড়েচড়ে বসে সুদর্শনের দিকে মুখ ফিরিয়ে —"দেবানীকে কেমন দেখলি, কিছু বলসি নাতো, বল্ তোর মতামতটা শুনি।"

সুদর্শন একটু ভুরু কুচকে জবাব দিল—"কেন দেখতে তো ভালই, বেশ ধীরস্থির, আমার মনে হয় তুই সুখী হবি"—তারপর একটু হেসে বললো—"তুই যেদিন প্রথম বলেছিলি, তখন খুব একটা গুরুত্ব দিইনি, তোর স্বভাব যা জানি, ফার্স্ট ইয়ারে ষষ্ঠিকা বোসের পেছনে ঘুরলি, সেকেণ্ড ইয়ারে যমুনা ক্যাটারার্সের সঙ্গে ক'দিন মতামতি করলি, তারপর এও তোর তেমনি খেয়াল, থার্ড ইয়ারে উঠে এখানে যে একেবারে মাথা মুড়িয়ে বসবি, কি করে বুঝব।"

শান্তনু বেশ জোরে হেসে উঠল, হাসতে হাসতে বললো—"এসব কথা ওর কাছে বলে বাহাদুরি নিতে যাস্ না, আমি তা'হলে মুস্কিলে পড়ে যাব।"

সন্ধ্যে বেলা উঠানের একপাশে খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করে আলপনা আঁকা পিঁড়ি পাতা হ'ল। মঙ্গলঘট বসানো হ'ল।

পুরুতঠাকুর একপাশে শালগ্রাম শিলা রাখলেন। নারায়ণ সাক্ষী রেখে অসবর্ণ বিয়ে। ঠাকুরমশাই প্রথমে কিছুতেই রাজী হন।

বামুন-কায়েতের বিয়ে দিবে, তিন-আইনের অফিসে গিয়ে রেজেষ্ট্রারী করে নাও। আমাকে জড়াচ্ছ কেন বাপু, এসব অনাচারের মধ্যে আমি নেই, চৌদ্দপুরুষ নরকস্থ হবে, তার চেয়েও বড় কথা, জানাজানি হ'লে আমাকে আর যজমানী করে খেতে হবে না। কিন্তু কার্তিকদত্ত নাছোড়বান্দা।

কোত্থেকে কি সব বামেলা জুটিয়ে আনে। অনেক কালের চেনা লোক।

সেই দেশের বাড়ীর যজমান এরা। আবার বলছে নিজের আত্মীয়। স্ত্রীর খুড়তুতো ভাই। এঃ: বলছো কি তুমি, তারাচরণবাবুর ভাই-পো। পঞ্চাননঠাকুর প্রথমটা নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারেন নি।

কি সব কাণ্ড হচ্ছে আজকাল, ছেলে-ছোকরাদের মতিগতি বোঝা দায়। হবে না কেন, ডাক্তারী পড়লে ওরকমই হয়, জাত-বেজাতের ঘড়া ঘেটে ওদের আর কোন বাচ-বিচার থাকে নাকি। যজমানে' আমার আর কি, আমি তো নিমিত্ত মাত্র। ঠাকুর যা করাবেন, তাই করব, সবই ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা। তবে বাপু নগদ পঁচিশটে টাকা, একটি আধলা কমে হবে না, বাকি-বকেয়ার কারবার নেই, সামনা-সামনি চুকিয়ে নেব। একখানা নতুন কাপড়, গামছা, ধরুন, নতুন ছাতা, কিন্তু তুমি যাই বলো, এ বিয়েতে আমি অন্নগ্রহণ করতে পারবো না, তার বদলে দু'টি টাকা জল খেতে দিও তাহলেই হবে।

কার্তিকদত্ত সব সর্তেই রাজি। কোনরকমে ঠাকুর মশাইকে ঠেলেঠুলে গাড়ীতে তুলে সটান দমকল ভাঙারোডে। সেখান থেকে কেনাকাটা সব সেরে বাড়ী ফিরেছেন এই কিছু

ক্ষণ আগে। ফেরার পথে দেবানীর কলেজের বন্ধু কল্যাণী সেন আর তার একটি ছোট ভাইকেও নিয়ে এসেছেন।

কল্যাণীকে দেখে দেবানী খুশি হয়েছে, আশ্চর্য হয়েছে। সারাক্ষণ প্রায় টিনুর সঙ্গে কেটেছে। কথা বলার লোক নেই, যে যার কাছে ব্যস্ত। দুই বন্ধু কিছুক্ষণ এওতা নিয়ে কথা হ'ল।

মমতাদি একসময় এসে বললেন—"ওকে ভাই, তুমি একটু সাজিয়ে দাও, আমি বসতে পারব না, রাতের কাজ বাকি, বরং ও বাড়ীর মেজ বউকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।" কিছুসময় পরে বিয়ের অনুষ্ঠান শুরু হ'ল। নতুন কাপড় পরে শোলার টোপর মাথায় দিয়ে শান্তনু উঠোনের মধ্যে একখানা কল-চৌকির উপর দাঁড়াল।

কান্তিমন্ত, বিমলকান্তি, সুদর্শন পিঁড়ির উপর দেবানীকে তুলে চারপাশে ঘোরাতে লাগল। সাতপাক ঘোরাতে তিন জনেই ঘেমে অস্থির। বিয়ের পিঁড়িতে উঠ্‌লে মেয়েদের ওজন যেন বেড়ে যায়। দেবানী পানপাতায় মুখ ঢেকে ছিল।

শুভদৃষ্টির সময় কল্যাণী চাপা গলায় বললো—"এই রানী তাকা, ভাল করে তাকিয়ে তাখ্।"

পাশের বাড়ীর মেজবউ, মমতাদি, মদনের-মা উলু দিল। কল্যাণী একটা শাঁখ নিয়ে বাজাবার চেষ্টা করছিল।

বিমলকান্তি হাসিমুখে টিপ্পনী কাটল—"আপনার দ্বারা হবে না, শাঁখ বাজাতে বুকে জোর লাগে।"

শান্তনু আড়-চোখে তাকিয়ে একটু হাসল। বর-কনে মুখোমুখি বসেছে। একপাশে পুরুতঠাকুর আর একপাশে ওদের কাপড়-পরা খালি গা, চাদর কাঁধে সুরেশ্বর। বোনকে সম্প্রদান করবে। লোকজনের ভীড় বেশী নেই। বাড়াটা কেমন চুপচাপ মনে হ'ল। দেবানী ঘোমটা মাথায় মুখ নিচু করে কোলের উপর হাত রেখে বসেছিল। এ কেমন বিয়ে হচ্ছে, বাদ্যি নেই, বাজনা নেই। ছোট বেলায় দেখা কল্যাণীর বিয়ের কথা মনে হ'ল। কি আনন্দ, কি উৎসব।

পুরুতঠাকুরের কথা কানে এল—"কই হে, পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহের নাম লিখে দাও, একখানা কাগজে পরিষ্কার করে লিখে দাও।"

কিছু পরে দেবানীকে বললেন—"দেখি মা, তোমার হাত-খানা এগিয়ে দাও। হাতখানা তুলে নিয়ে আঙুলের অবস্থা দেখে বোধহয় একটু অবাক হলেন ঠাকুরমশাই, চশমার ফাঁক দিয়ে গোল গোল চোখে দেবানীর দিকে তাকালেন। কার্তিক দত্ত কাছে দাড়িয়েছিলেন, একটু হেসে বললেন—"কি দেখছেন ঠাকুরমশাই, আমাদের রানী খুব ভালো সেতার বাজায়, আঙুলে কি সব লাগিয়ে বাজাতে হয়তো, সেজন্য ওরকম হয়েছে।"

ঠাকুরমশাই হেঁ-হেঁ করে হাসলেন—"তা বেশ, বেশ, মা আমার রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী।"

দেবানীর মুখ আরো নিচু হ'লো। শান্তনু মাঝে মাঝে তাকাচ্ছিল, ঘোমটা মাথায় কেমন অদ্ভুত দেখাচ্ছে। যেন অচেনা অন্য মানুষ।

ঘণ্টা দু'একের মধ্যে সমস্ত অনুষ্ঠান শেষ হ'ল।

পুরনো জাজিম-পাতা মেঝেতে পালঙ্ক গোছের খাটের ওপর নতুন বিছানায় বাসর বসল। পাশের বাড়ী থেকে একটা হারমোনিয়ম যোগাড় করে আনা হ'ল। কল্যাণী গোটা তিনেক গান গাইলো। সুদর্শন বাজাতে জানে না, খালি গলায় দুটো রবীন্দ্র-সঙ্গীত শোনাল। বিমলকান্তি মাঝে মাঝে টিকা-টিপ্পনী কেটে সকলের মুখে হাসি ফোটাল। এমন কি মাথা নিচু করে বসে থাকা দেবানীও দু'একবার মুখ তুলে হাসল।

শান্তনু যেন সহজভাবেই সকলের সঙ্গে কথা বলছিল, হাসছিল। দেবানী কিন্তু বিষণ্ণ-মুখে চুপ করে ছিল। কেমন যেন স্বস্তি পাচ্ছিল না। সমস্ত ব্যাপারটাই তার কাছে অসম্ভব স্বপ্নের মত মনে হচ্ছিল। এই নাকি তার বিয়ে হ'ল।

ছোটবেলা থেকে রেনি-পিসীর মুখে, মায়ের মুখে, বৌদির মুখে যেমন শুনে এসেছে, কই তার সঙ্গে মিলল কোথায়? তার

বন্ধুদের মধ্যে আর কারো এরকম হয়েছে নাকি। স্কুলে পড়ার সময় অনিমার বিয়ে হ'ল আর এই সেদিন হ'ল ভারতীর। অনিমার অবশ্য ভালবাসার বিয়ে, কিন্তু তার বাবা-মা সকলেই এসেছিলেন। স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে দেবানীও গিয়েছিল। কত আনন্দ আয়োজন, আত্মীয়-স্বজনের ভীড়। আর তার বেলায় হ'ল যেন নিছক ছেলেমানুষী, পুতুল-খেলার বিয়ে। এই একটা অবাস্তব অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তার সোভান্তর হ'ল। সে আর এখন কুমারী নয়, বিবাহিতা।

দেবানী রায় নয়, দেবানী মিত্র। শান্তনু মিত্রের স্ত্রী, ভাবতেও কেমন অদ্ভুত লাগছিল।

মা-বৌদি বোধহয় ভাবছে, বাবা হয়তো এখন ঘুমিয়ে পড়েছেন, মেজদাও আজ সময়মত অফিস থেকে ফেরেনি। বড়দা' নিশ্চয়ই মনে মনে অস্থির হয়ে উঠেছে আর অস্থির হলেই বড়দা' ঠিক বাবার মত এঘর-ওঘর পায়চারী করে বেড়ায়।

কিম্বা যদি খুঁজতে বেরিয়ে থাকে আর খুঁজতে খুঁজতে যদি এখানে এসে হাজির হয়। বড়দা' নিশ্চয়ই জানে কাতিকদা'র বাড়ী এসেছি।

রাত এখন কটা বাজল। বোধহয় দশটা বেজে গেছে। বাইরের বারান্দায় নিমন্ত্রিতরা কজন খেতে বসেছে। পাশের বাড়ীর মেজবৌ, কল্যাণী, কল্যাণীর ভাই, সুদর্শন, বিমলকান্তি, সুরেশ্বর। পুরুতঠাকুর কিছুই খাবেন না।

অনেক সাধাসাধির পর ছটো সন্দেশ মুখে দিয়ে জল খেয়েছেন। এখন পোটলা-পুটলি বেঁধে, বসবার ঘরে বসে বিড়ি ফুকছেন। কথা হয়েছে, বিমলকান্তি তাকে মোটরে করে পৌঁছে দেবে।

মমতাদি সকলকে পরিবেশন করছিলেন, কাতিকদা' জল-নুন-লেবু এগিয়ে দিচ্ছেন, শান্তনু দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

দেবানী চারপাশে একবার তাকাল। বড় ক্লান্ত। ইচ্ছে হচ্ছে এক্ষুনি শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। খাটের ওপর একরাশ বকুল ফুল আর কয়েক গোছা রজনী গন্ধা, সারাগায়ে, বিছানায় কল্যাণী এলোমেলো ছিটিয়ে দিয়েছে,। শতেমুকেও ছাড়েনি। ওপাশে ছোট একটা সোল টেবিলের উপর খানকয়েক উপহারের বই, মাটির ধূপদানীতে ধূপকাঠি পুড়ছে। বিছানার একপাশে নতুন ফ্রকপরা টিকলু বেহুঁসে ঘুমুচ্ছে। গান শুনতে শুনতেই ঘুমিয়ে পড়েছে। দেবানী ওর মাথাটা আস্তে আস্তে বালিশের উপর তুলে দিল। নতুন বিছানার গন্ধ, ধূপের ধোঁয়া, ফুল আর এসেন্সের গন্ধ সমস্ত মিশে ঘরের বাতাসটা কেমন ভারী হয়ে আছে। নিমন্ত্রিতদের খাওয়ার পাট চুকল। পান চিবুতে চিবুতে সকলেই যাবার জন্য তৈরী। যাবার আগে সুরেশ্বর ঘরে ঢুকে দেবানীর সঙ্গে এই প্রথম কথা বললো—"আমি আছিরে বানী, কালকো পাকিস্থানে রওনা হব, আবার কবে দেখা হবে—" দেবানী তাড়াতাড়ি খাট থেকে নেমে এসে প্রণাম করল। তারপর সুরেশের হাতখানা আঁকড়ে ধরে, "তোমার সঙ্গে যাব, মেজদা" বলে ফুঁপিয়ে উঠল। সুরেশ্বর তার মাথায় হাত বুলিয়ে স্নেহের হাসি হেসে একটু ধরা গলায় বললো—"সে কি হয়রে পাগলী, কাঁদছিস কেন, এখানে কাতিকদা' আছেন, মমতাদি' আছেন, তোর ভয়টা কিসের, আমি মা-বৌদিকে সব কথা বুঝিয়ে বলে যাব।" আস্তে আস্তে হাত ছাড়িয়ে কাতিকদা'র সঙ্গে দু'একটা কথা বলতে বলতে বেরিয়ে এল সে। শান্তনুও পেছনে গেল এগিয়ে দিতে।

বিমলকান্তি তাকে কাল দুপুরের দিকে একবার ওদের "বঙ্গরায় কেম্পানীর" অফিসে যেতে বললো। বিমলকান্তির বাবার সঙ্গে দেখা হবে সেখানে। একটু পরে মোটরের শব্দ হ'ল। সমস্ত বাড়ীটা কেমন চুপচাপ হয়ে এল। বারান্দায় কাতিকদা' মমতাদি খেতে বসলেন। একটু দূরে ঘুম-ঘুম চোখের স্বপনকে নিয়ে স্বপনের-মাও বসল।

দেবানী টিকলুকে বুকে নিয়ে পাশের ঘরে রেখে আসার সময় মমতাদি' বললেন—"ওমা, মেয়ে বুঝি ওখানেই ঘুমিয়ে

পড়েছিল, ওর ব্লাউজটা খুলে দিও, রানী।" টিকলুকে শুইয়ে রেখে দেবানী আবার এঘরে এসে খাটের উপর বসল।

একটু পরে মমতাময়ীর কথা কানে এল—"তোরা এবার শুয়ে পড় তনু, অনেক রাত হয়েছে।"

শান্তনু বাইরের ঘরে বসে ছুটো সিগারেট শেষ করল। শোবার ঘরে এসে একটু ইতস্তত: করে দরজাটা ভেজিয়ে দিল তুলে দিল।

পাঞ্জাবীটা খুলে দেয়ালের পাশে ব্রাকেটের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখল। দেবানী মুখ নিচু করে খাটের উপর বসেছিল, এগিয়ে এসে দু'হাতে ওর মুখখানা তুলে ধরে বললো—"ছি, ছি, এখনো কাঁদছ তুমি, আজকের দিনে কেউ কাঁদে নাকি।"

হাত-পাখা তুলে নিয়ে মাথায় হাওয়া দিতে লাগল।

দেবানী কান্না-ভেজা মুখেই একটু হাসল, আঁচল তুলে মুখ মুছল, তারপর হাত বাড়িয়ে পাখাটা কেড়ে নিল।

শান্তনু ওর মাথায় কাপড় তুলে দিয়ে একটু দূরে সরে এসে তাকিয়ে দেখল, হাসিমুখে বললো—"বাঃ, বেশ দেখাচ্ছে কিন্তু।"

দেবানী ঠোঁটের কাছে আঙুল তুলে, ভুরু কুঁচকে, চাপা গলায় ধমক দিল—"আঃ, আস্তে কথা বলো, বারান্দায় দিদি রয়েছে না।"

শান্তনু এপাশে একটু সরে এসে সুইচ্ টিপে বাতিটা নিভিয়ে দিল।

মুহূর্তের মধ্যে ঘরের ভেতরে আবছা অন্ধকার ভরে উঠল। পাশের দোতলা বাড়ীর কোন জানালা থেকে একফালি আলো এসে পড়েছে। দুপুর বেঁায়া, নতুন বিছানার গন্ধ, বকুল, রজনীগন্ধা আর দেবানীর চুলের গন্ধ সমস্ত মিশে ঘরের বাতাসে যেন একটা নতুন নেশার আনন্দ ছড়িয়ে দিল।

(ক্রমশ:)

জৈবিক

বরপত্র

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৮১৯ খৃষ্টাব্দে যে ইংরাজ উচ্চকর্মচারীটি টোডা-রাজ্যের পাথরের বাড়ীটি প্রাপ্ত হন, তাঁর নাম জন স্থলিভান। উটকামণ্ড থেকে তিপাহমাইল দক্ষিণ-পূর্বে নীলগিরির পর্বতরাজির নীচে, কৈটুমার নামে যে নাতিবৃহৎ জনপদটি বিদ্যমান আছে তার 'কালেক্টার' ছিলেন এই স্থলিভান সাহেব। সকাল বেলা উঠে যখন সংবাদ পেলেন, অসুস্থ টোডা-রমণীটি তার শিশুকন্যা সমেত উধাও হয়েছে, সঙ্গে সেই বলিষ্ঠকায় টোডা যুবকটিও, —তখন তিনি খুব যে চঞ্চল হলেন বা উদ্বিগ্ন হলেন, এমন মনে হলো না। সঙ্গী ইংরাজ তরুণ ডাক্তারটি কিন্তু বিলক্ষণ আতঙ্কিত হয়েছিলেন।)

—স্যর, ওরা সদলবলে এসে আক্রমণ করবে না ত?

স্থলিভান আর একটু হাসলেন, বললেন,—না, সে চিন্তা নেই। ওরা শান্তিপ্রিয়।

– তা' বলে নিজের বাড়ী ছেড়ে দিয়ে চলে যায়?

স্থলিভানের ঠোঁটের কোণ থেকে হাসির রেখা তখনো মিলিয়ে যায়নি,—বললেন,—সংস্কার এমনিই হটে। আমার ভাগ্য সুপ্রসন্নই বলতে হবে। সৈন্যসামন্ত নিয়ে এসে ফিরে যেতে হলো না!

—দরকার হলে, তা-ও করতেন?

—করতাম বই কি!—স্থলিভান বলতে-বলতে উঠে দাঁড়ালেন, তারপরে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলেন। বললেন,—কী চমৎকার ব্যবস্থা! যে-মাসের ট্রপিক্যাল পরম বলে মনে হচ্ছে এখানে তোমার!

—না।

কালেক্টর আরও এগিয়ে এলেন কয়েক পা। একটু দূরেই খাদ, তার ওপারে ভোরের আলোয় ঝলমল করছে 'সিলভার ওক'-এর মসৃণ ছোট ছোট পাতাগুলো। যারা ছিল, তারা চলে গেছে,—ওদের আর যেন কোনো আগ্রহ নেই এই উপত্যকার দিকে। 'সাদা মানুষ'গুলোকে তারা যেন চেনে না, এমনি নির্বিকার ভঙ্গীতে তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সূর্যের আলো আর ঝিরঝিরে বাতাসের সঙ্গে পাতা কাঁপিয়ে খেলা করছে!

সেই দিকে অপলক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকবার পর স্থলিভান বললেন,—দেখছো তাকিয়ে নীচের দিকে? পাহাড়ের ঢেউ, আর উপত্যকা? আমি যেন মনে মনে 'ডেভনশায়ারের চাট্‌সুর্থ'-এ চলে গেছি!

তরুণ ডাক্তারটি বললে,—আমি ইয়র্কের লোক। আমার মনে হচ্ছিল, যেন ইয়র্কশায়ারের 'মুরস্'-এর সামনে দাঁড়িয়ে আছি। ভঙ্গীতে চাঞ্চল্য এনে স্থলিভান বললেন,—থাকতে হলে এসব যায়গাতেই থাকতে হয়।

ক্লাইমেট্ কীরকম মডারেট্ দেখেছো?

সঙ্গের অপর ইংরাজটি বললে,—আমি যতদূর বুঝছি, পঞ্চাশ থেকে ষাট ফার্ণহিটের বেশী উত্তাপ এখানে হবে না। ডাক্তার বললে,—আষাঢ়ের গোড়াবী বলছে, এখানকার আবহাওয়া সারাবছরই অনেকটা এই রকম থাকে। এখানে

শীতে বরফও পড়ে না, গরমকালে সূর্যের আলো এসে গা-ও পুড়িয়ে দেয় না।

স্থলিভান বললেন,—এখানে আমাদের নগর বসাতেই হবে। এই "পাথরের বাড়ী"টাকে সভিকার পাথর দিয়ে বড়ো ক'রে তৈরী করে নিতে হবে। আজই তার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হোক। আমি এর নাম দিলাম—"Stone House".

(উটকামণ্ডের সর্বপ্রথম গড়ে ওঠা বাড়ী—মিষ্টার স্থলিভানের সাধের 'ষ্টোন হাউস' আজও বেঁচে আছে, যদিও অনেক পরিবর্তিত অবস্থায়। মিষ্টার স্থলিভানের আত্মা এসে বাড়ীটাকে ঠিক চিনতে পারবে কিনা, সন্দেহ। তবুও লোকে বলে 'ষ্টোন হাউস'! এখন যেটা উটকামণ্ডের বাজার-হাট তারই মাথার ওপরে—বেশ কিছুটা উঁচুতে—এখনো দাঁড়িয়ে আছে মিঃ স্থলিভানের 'ষ্টোন হাউস'! এই বাড়ী তৈরী হতে শুরু হয়ে শেষ হয়েছিল ১৮২৩ সালে। দীর্ঘ চারটি বছর লেগেছিল বাড়ীটাকে তৈরী করে নিতে। বাড়ীটা যখন শেষ হলো, তখন কোথায় গেল টোডারাজা পার্থকাইয়ের সোলঘর আর টু-এস্? সব গুড়ো হয়ে—ধূলিসাৎ হয়ে—স্থান ক'রে দিয়েছে—নতুনের।)

এই চার বছরে পার্থকাইয়ের দলবল কেউ আসেনি ফিরে। টুরার শ্বশুর স্বামী আসে নি, আসেনি স্থজা, আসেনি বিমু। এমন কি পাসল কোরি-ও না।

(১৮২৩ সালে বাড়ীটা শেষ হলেও পাকাপাকি ভাবে ইংরাজরা বসবাস করতে আরম্ভ করে ১৮২৪ সালে। তার মানে, পার্থকাইরা চলে যাবার পাঁচ বছর পরে। লর্ড আমহার্ষ্ট এসেছেন কলকাতার গভর্নর-জেনারেল হয়ে—১৮২৩ সালের আগষ্ট মাসে। এসেই বর্মার সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেন যুদ্ধে। ১৮২৪ সালের অক্টোবরে রেঙ্গুনে রওনা হবার আদেশ-প্রাপ্ত ৪৭নং বেঙ্গল দেশীয় পদাতিক বাহিনী—বারাকপুরে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করে।)

মিষ্টার স্থলিভান তখন নিশ্চিন্ত মনে উটকামণ্ডের 'ষ্টোন হাউসে' বসে পার্বত্য নগরী গড়ে তোলার স্বপ্নে বিভোর। ভেভনশায়ারের এক সুদূর পল্লী যেন নতুন ক'রে রূপ নিয়ে জেগে উঠেছে—সুদূর ইণ্ডিয়ায়—উটকামণ্ডে। সেই তরুণ ডাক্তারটিকে ডেকে কাছে বসিয়ে গল্প করছিলেন স্থলিভান।

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলে,—এই পাঁচবছরে সেই অসুস্থ স্ত্রীলোক আর বাচ্চাটির কোনই খোঁজ করা হলো না?

—কী দরকার?

ডাক্তার বললে,—অসুৎ প্রাণশক্তি। এমন অবস্থায় বাচ্চা কোলে ক'রে পালাতে পারে?

স্থলিভান বললেন,—মানুষ মরিয়া হয়ে গেলে এম্‌নিই হয়।

—এখান থেকেও পালালো, ঘুরে গিয়ে যারা যায়নি ত?

স্থলিভান বললেন,—আমার ত তা মনে হয় না।

ডাক্তার বললো,—তারা স্থান পেয়েছিল কি সর্দারের কাছে?

—বলা শক্ত।

ডাক্তার আবার প্রশ্ন করলে,—বাচ্চাটা কেড়ে নিয়ে আবার পাহাড়ে দিয়ে আসেনিত ওরা?

স্থলিভান একটু ভেবে বললেন, এ'কথাটাও বলা শক্ত।

ডাক্তার একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন,—এই টোডারা এক অদ্ভুত জাত, নয় কি স্যার? এইসব ইণ্ডিয়ানদের চেহারার সঙ্গে পর্যন্ত মিল নেই!

স্থলিভান বললেন,—পাঁচ বছর ধরে এদের সম্পর্কে খোঁজ খবর নেবার চেষ্টা করছি। আসলে এরা Nomads, বাইবেলের ওল্ড্ টেষ্টামেণ্টে যে সব কাহিনী আছে সেইসব কাহিনীর পাত্রপাত্রীরা যেন হঠাৎ অতীতকাল থেকে বর্তমানে এসে রূপ পরিগ্রহ করেছে।

ডাক্তারটি উত্তেজিত হয়ে প্রশ্ন করলেন,—আপনি কি তাহলে সত্যিই বলতে চান, এরা ইণ্ডিয়ান নয়?

স্থলিভান বললেন, –নয়' বললে হাস্যকর শোনাবে, আর হ্যাঁ' বললেও সত্য বলা হবে না। বহু বাইরের মানুষ এসে ভারতবর্ষের জনমণ্ডলীতে মিশে গেছে, এরা বোধহয় আজও পুরোপুরি নিজেদের মিশ খাওয়াতে পারেনি। আমার কী মনে হয় জানো? ভারতবর্ষে এরিয়ানরা আসবার আগে দ্রাবিড়রা এসেছিল দু'ভাগে ভাগ হয়ে। তাদের মধ্যে একদল এসেছিল দক্ষিণ-পূর্ব ইয়োরোপ আর পশ্চিম এশিয়া থেকে, যাদের বলা হয় 'দীর্ঘকপাল সুষ্ঠদেহসারীর জাতি।" আমার মনে হয়, এই দলেও এক উপদল ছিল, যারা যাযাবর—Nomads, তারাই এই টোডাদের পূর্বপুরুষ। অবশ্য, এদের সম্বন্ধে আমাদের আরও জানতে হবে।

পাঁচ বছর আগে টুরা যে পালিয়েছিল তার শিশুকন্যাটিকে নিয়ে, তার সংবাদ জানবার জন্য কিন্তু স্থলিভানরা আগ্রহান্বিত ছিলেন না। পাঁচ বছরে ধীরে ধীরে পথ হয়েছে নীচ থেকে ওপরে, পাঁচ বছরে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে ইংরাজ রাজের উপনিবেশ। 'এই গড়ে ওঠা' নিয়েই মেতে উঠেছিল স্থলিভানরা, পার্থকাইয়ের খোঁজও তারা রাখেনি, সুজা-বিধুর খবরও না, টুরা ও টুরার মেয়েরও না।

মিষ্টার স্থলিভানের ডেভনশায়ার গ'ড়ে উঠেছে ধীরে ধীরে এই পাঁচ বছরে; আর পাঁচ বছরে শিশুকন্যাকে বুকে নিয়ে টুরারও কেটেছে প্রতিটি দিন, মাস, বছর। সেই যে পাঁচ বছর আগে রাত থাকতে থাকতে ওরা পালিয়ে এসেছিল 'সাদামানুষ'দের ঘর থেকে, তারপর ওদিকেই পা আর বাড়ায়নি। মাঝে-মাঝে সেই পালানোর দিনটা মনে পড়ে টুরার। মনে পড়ে, আর বুকের ভিতরটা আতঙ্কে থরথর ক'রে কাঁপতে থাকে।

আকাশে, পাহাড়ে ঠিক মাথায় একটা তারা জ্বলজ্বল করে জ্বলছিল। একটা কম্বলে সর্বাঙ্গ ঢেকে আরেকটা কম্বলে বাচ্চাটাকে আপাদোড়া মুড়ে নিঃশব্দচারিণী ছায়ার মতো বিধুর পিছনে হাঁটছিল টুরা। জোরে জোরে পা ফেলেই সে চলতে চায়, কিন্তু পারে না, মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ে। কিন্তু ফিসফিসে জিজ্ঞাসা করে বিধু, –

কী হলো?

—পারছি না।

বিধু এসে ওর হাত ধরে! তারপরে বলে—,মেয়েটাকে বরং আমার কাছে দে।

সঙ্গে সঙ্গে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দুটি হাতে সজোরে মেয়েটাকে চেপে ধরে বুকের ওপরে। আতঙ্কিত কণ্ঠে বলে ওঠে,—না,-না! ওর বুঝি বিশ্বাস হারিয়ে গেছে সবার ওপর থেকে। মেয়ের ব্যাপার নিয়ে ত্রিভুবনের কাউকে যেন আর ও বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না। মেয়েকে যদি ও সর্বক্ষণ দেহের সঙ্গে মিশিয়ে রাখতে পারতো, তাহলে বরং ভালো হতো, আশ্বস্ত হতে পারতো টুরা।

আরও কিছুদূর এগিয়ে যাবার পর ওরা দুজনেই থমকে দাঁড়ালো। পাহাড়ের মাথায় যে তারাটা এতক্ষণ ধরে ওদের ওপর সতর্ক প্রহরীর মতো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছিল, সে ডুবে গেছে। চারিদিকে অন্ধকার একটু যেন ফিকে হয়ে এসেছে। ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে হু-হু করে। আর, দূরের গাছগুলোর মাথায় ছোট ছোট পাতারা সব ঘুম ভাঙা শিশুর মতো চঞ্চল হয়ে উঠেছে!

বিধু বললে,—কোথায় যাবো, বল্ দেখি?

টুরা বললে,—জানি না। শুধু সাদামানুষ'দের কাছে যাস না, ওদের মতলব ভালো নয়, আমার মেয়েকে ওরা কেড়ে নেবে।

বিধু বললে,—পার্থকাই এই পথ ধ'রে আমাদের গাঁয়ের দিকেই গেছে। বোধ হয় আমাদের গাঁয়ের কাছেই কোথাও ঘর তৈরী করবে। যাবি ওদিকে?

অস্ফুট একটা আর্তনাদ করে উঠলো টুরা, বললে,—সর্বনাশ! আবার মেয়েকে মেরে ফেলবে ওরা!

বিষ্ণু বললে,—তবে আয়, আমরা খানিকটা নীচে নেমে যাই। জঙ্গলের ধারে ঘর বানিয়ে আমরা বাস করবো। টুরার আতঙ্ক তখনো যায় না। বললে,—হাতি আসে যদি? বাঘ আসে যদি? আমার মেয়েকে খেয়ে ফেলবে যে?

—কারুর সাধ্য নেই কেউ কিছু করে!—বিষ্ণুর হাতদুখানা শক্ত হয়ে ওঠলো। বলে—আমি আছি, ভয় কী তোর?

আর কোনো প্রতিবাদ করে না টুরা। ধীরে ধীরে ওর সঙ্গে কিছুটা নেমে আসে। একটা পছন্দ মতো বাসস্থা খুঁজে নিয়ে বসে পড়ে বিষ্ণু। বলে—জঙ্গলের কিনার পর্যন্ত যাওয়ার দরকার নেই। এখানেই ঘর বাঁধি। তুই বোস। আমি আমার বল্লম, দা, আর সব টুকিটাকী জিনিষ নিয়ে আসি। কোনো ভয় নেই।

বিষ্ণু যখন ফিরে এলো, তখন সূর্য উঠে গেছে। সোনার মতো সূর্য কিরণ ঝিলমিল করছে চারিদিকে। মেয়েকে কোলে করে এক দিকে বসে রইলো টুরা, আরেক দিকে একা একটি মানুষ বাঁশ কেটে, খড়কুটো দিয়ে ঘর তৈরী করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। কোনোরকমে একটা খুপরী বানিয়ে দিয়ে টুরাকে বিষ্ণু বললে,—ঘরে আয়। আমি বাবারের যোগাড় দেখি।

তারপর থেকে এই পাঁচ বছর ধরে অদ্ভুৎ এক ঘর-করার ইতিহাস গড়ে উঠেছে ওদের মধ্যে। ওরা ঘর বাঁধবার দিনকতকের মধ্যেই ওদের কথা জানতে পেরে সেদ পার্থ-কাইয়ের দলের লোকেরা। জানতে পারলো টুরার শ্বশুর, স্বামী আর সুজা। সুজাকে নিয়ে টুরার স্বামীই একদিন এসে দাঁড়ালো দরজার কাছে। বিষ্ণু তখন বাদাগাছের কাছে গেছে দুধ কিনতে।

ওদের 'টু-এল' বা সোয়াল ঘরের দিকে তাকিয়ে প্রথম প্রশ্নই ফুটলো টুরার স্বামীর মুখে,—কটা মোষ?

টুরার মেয়েকে বুকের ওপরে দুহাতে চেপে ধরেছে। বললে,—তিনটে।

—পেলো কোথায়?

সুজা বললে,—এ আবার বলবার মতো কথা নাকি? বিষ্ণু যে যুনো মোষ বশ করতে ওস্তাদ, এখবর কে না জানে? টুরার স্বামী তখনও প্রশ্ন করছে,—যুনো মোষ, না, চুরি করা মোষ?

ঘৃণায় দুটি ঠোঁটের প্রান্ত কুঞ্চিত হয়ে উঠলো টুরার বললে,—চুরি করা স্বভাব নয় বিষ্ণুর।

যেন মুহূর্তে গর্জে উঠলো টুরার স্বামী, বললে,—চুরি করা স্বভাব নয়! পরের বউ চুরি করে নিজের ঘরে রাখে কেন, সে? শান্ত লোকটি যে এমন করে জ্বলে উঠতে পারে, এ-বুঝি টুরা কোনোদিন কল্পনাও করেনি। সুজা পর্যন্ত চমকে উঠলো ওর কথায়। বললে,—বলছিস কী! বিষ্ণু নইলে টুরা থাকতো কোথায়?

—কেন, আমার ঘরে?

—নিতিস ওকে, তোর ঘরে?

টুরার স্বামী বললে,—নিশ্চয়।

টুরা উঠে দাঁড়ালো এই সময়, বললে,—আমি যাবো না। আমার মেয়েটাকে তুই মেরে ফেলবি।

টুরার স্বামী বললে,—ও মেয়ে আমাদের চোখে মরেই গেছে। ওকে আমরা আর কেউ ছোঁবো না। ওকে বিষ্ণুর কাছে রেখে তুই চলে আয় আমার ঘরে।

টুরা বললে,—তুই চলে যা। আমি কিছুতেই যাবো না। আমি তোর বউ না।

—কার বউ তবে?

টুরা দৃঢ়কণ্ঠে বললে,—আমি বিষ্ণুর বউ।

—কে বলেছে এ-কথা?

—আমি।

—তুই মেয়ে মানুষ, তোর কথায় ও হবে না! গাঁও বুড়ো যদি বলে, পার্থকাই যদি নিজে বলে, তবে হতে পারে।

টুরার দুই চোখে যেন আগুন জ্বলে উঠলো মুহূর্তে।

বললে,—আমি 'গাঁও-বুড়া' মানি না, 'পার্থকাই-ও' মানি না চলে যা তুই এখান থেকে!

সারা দেহটা যেন শিউরে উঠলো টুরার স্বামীর। প্রথমটায় সে কথাই বলতে পারলো না। তারপরে, গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে ধীর, শান্ত কণ্ঠে সে বললে,—বেশ। আমি ফিরে যাচ্ছি। কিন্তু 'পার্থকাই' এ-কথা শুনলে সহজে তোকে ছাড়বে না।

—কী করবে আমার!—টুরা বললে,—সোজা 'সাদা-মানুষ'দের কাছে চলে যাবো।

বিস্ময়ে বিস্ফারিত দুটি চোখ মেলে টুরার স্বামী দাঁড়িয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত। তারপরে, আর একটি কথাও বললে না, পিছন ফিরে ধীর পায়ে সে চলে গেল তার নিজের গাঁয়ের দিকে।

সুজা গেল না তার সঙ্গে। সে গুটি গুটি এগিয়ে এসে বসলো টুরার কাছে। টুরার মনে হলো, তার মেয়েকে তার কোল থেকে ছিনিয়ে নিতে আসছে না তো, সুজা? সে মেয়েকে বুকে নিয়েই কয়েক পা পিছিয়ে গেল।

সুজা বললে,—ঝগড়া কথাটা ঠিক হলো না। ওরা গোলমাল করতে পারে।

—ইস! কী করবে ওরা?

—তোর মেয়ের অনিষ্ট করতে পারে।

টুরা রুখে দাঁড়ালো, বললে,—তুই-ই বা কী করতে এসেছিস? পালা এখান থেকে।

সুজা বললে,—সাদা মানুষরা তোদের ছেড়ে দিলে?

—পালিয়ে এসেছি।

—পালাতে পারলি?

—বিষ্ণুকে জিজ্ঞাসা করিস।

সুজা চুপ ক'রে রইলো। তারপরে, হঠাৎ একসময় নীরবতা ভঙ্গ করলো সে, বললো,—কী নাম রেখেছিস, মেয়ের?

পিলুয়ানী।

—বাঁচাতে পারবি ওকে?

—খুব পারবো।

সুজা আবার স্তব্ধ হয়ে রইলো খানিকক্ষণ। তারপরে বললে,—কোস্কিকে একদিন নিয়ে আসবো। সে মেয়ের কপাল দেখে সব বলে দেবে। বাঁচবে কি মরবে, কপাল দেখে সব বলে দিতে পারে কোস্কি।

—খবরদার!—আবার রুখে উঠলো টুরা,—গাঁয়ের কোনো লোককে এখানে আনবি না। তুই-ই আসবি না। তোকেও বিশ্বাস নেই। বিষ্ণুর বল্লম আছে জানিস তো? বল্লম দিয়ে সবাইকে ফুঁড়ে ফেলবো।

সুজা ততক্ষণ উঠে দাঁড়িয়েছে, বললে,—তাহলে আমাদের জাতের কোনো নিয়ম কানুন মানবি না তুই?

—না। কোনো নিয়ম মানবো না। তুই যাবি কি না বল।

সুজা বললে,—আসুক বিষ্ণু। ওর সঙ্গে দেখা করে তারপরে চলে যাচ্ছি।

—কেন? দেখা করবি কেন ওর সঙ্গে?

—দরকার আছে।

—কী দরকার?

সুজা একটুক্ষণ থেমে থেকে তারপরে বললে,—দুটো মোষ দিক না টুরার স্বামী আর শ্বশুরকে। তারপরেই বাস, তুই বউ হয়ে গেলি বিষ্ণুর।

টুরা আবার জ্বলে উঠলো ওর কথায়, বললে,—আমি কার বউ হবো আর না হবো, তা নিয়ে তোর অতো মাথাব্যথা কেন?

—আমি তোদের ভালো চাই।

—কেন ভালো চাস?

—বন্ধু বলে।

—কীসের বন্ধু?

অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইলো সুজা। কথাটা সে যে ঠিক শুনেছে, এমন বহুক্ষণ পর্যন্ত তার বিশ্বাসই হলো না। তারপরে, অসংলগ্ন প্রলাপের মতো হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলো,—বিষ্টুকে তুই ভালবাসিস?

টুরা চীৎকার করে উঠলো,—দুনিয়ায় আমি কাউকে ভালোবাসি না, আমার এই পিসুরানী ছাড়া। বুঝেছিস? পালা এখান থেকে।

সুজা তবু যায় না। বলে,—আমার ঘরে এখন চারটে মোষ। আয় না তুই আমার ঘরে। তোর মেয়ের অনিষ্ট কেউ করতে পারবে না, কেউ ওকে ছুঁতে পারবে না পর্যন্ত, কথা দিচ্ছি। আসবি?

একটা পাথরের টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে ওর দিকে ছুঁড়ে দিলো টুরা। মাথাটা ঠিক সময়ে সরিয়ে না নিলে ওর মাথাটা হয়ত কেটে যেতো পাথর লেগে। কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে সুজা বললে,—এমন করে তাড়িয়ে দিচ্ছিস?

টুরা যেন তখন পাগল হয়ে গেছে। চীৎকার করে বলতে লাগলো,—তোদের বিশ্বাস করবো, আবার?

সুজা বললে,—বিষ্টুকেই বা বিশ্বাস করিস কী করে?

—কাউকে আমি বিশ্বাস করি না!—টুরা বলে উঠলো, —সে রকম বুঝলে এখান থেকেও পালাবো। আমার মেয়েকে আমি বাঁচিয়েছি, ওকে আমি বাঁচিয়ে রাখবোই।

দীর্ঘ এই পাঁচটি বছর ধরে, কোনোদিকে না তাকিয়ে, ছোট্ট পিসুরানীকে সত্যিই বড়ো করে তুলেছে টুরা। কাউকে আসতে দিতো না কাছে, কাউকে ছুঁতে দিতো না। মেয়েকে চোখে-চোখে রাখতো সব সময়। মেয়ে পাশ ফিরতে শিখলো, মেয়ে হামা দিতে শিখলো, মেয়ে যা পায় তাই নিয়ে মুখে পুরে দিতে শিখলো, তারপরে ক্রমে ক্রমে উঠে দাঁড়াতে শিখলো, হাঁটতে শিখলো, কথা বলতে শিখলো, হয়ে দাঁড়ালো পাঁচ বছরের ফুটফুটে মেয়েটি। ভয়ানক সুন্দর হয়েছে সে, ভয়ানক আদুরে। মাকে ছাড়া আরেকটি মানুষকে সে জানে, সে হচ্ছে,—বিষ্টু।

সুজা এত তাড়া খেয়েও আসা ছাড়েনি। বলতো,— পিসুরানী দেখছি তোরও চোখের মণি হয়ে উঠেছেরে, বিষ্টু।

বিষ্টু বলে,—হ্যাঁ, তা হয়ে উঠেছে।

সুজা বলে,—এবার ওর বিয়ের সম্বন্ধ কর।

বিষ্টু বলে,—আমি করবার কে? ওর বাপ, ঠাকুর্দা,— রয়েছে না?

সুজা অল্প একটু হাসলো, বললো,—তারা ওকে বংশের মেয়ে বলেই স্বীকার করে না।

বিষ্টু ওর চোখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলে উঠলো,— টুরার স্বামীর খবর কী রে?

—কী আবার খবর! খায় দায় মোষ চরায়—আছে একরকম। বাপের শরীর ভালো নয়। কোরির গাছের গুঁড়িতে আরও একটা দাগ শীগ্‌গিরই বাড়বে বলে মনে হয়।

বিষ্টু চিন্তিত ভঙ্গীতে বললে,—সেদিন দেখছিলাম টুরার স্বামীকে। ঐ দূরের টিলার ওপরে দাঁড়িয়ে এই দিকে তাকিয়ে আছে এক দৃষ্টে।

—আসে না?

—না।

ইতিমধ্যে টুরা ওদের কাছে এসে দাঁড়াতে কথাটা চাপা পড়ে যায়। সুজা উঠে দাঁড়ায় বলে,—আমি?

বিষ্টুর বদলে ওর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে উত্তর দেয় টুরা,— আসতেই বা বলে কে—যেতেই বা বলে কে? তাড়ালে ও যে যায় না, তার অতো ভব্যতা কেন বাবু? যাও না, কাজ নেই কর্ম নেই, খালি হুজুর-হুজুর ফুসুর-ফসুর।

অপ্রতিভ, লজ্জিত ভঙ্গিতে তাড়াতাড়ি গাঁয়ের দিকে পা চালায় সুজা। বিষ্টু সেদিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকবার পর বলে,—তাড়ালি ত?

খিল খিল করে হেসে ওঠে টুরা, কিছু বলে না। বিষ্টু

রাগ করে বলে,—কোনদিন তুই আমাকে ও তাড়াবি দেখছি। হাসি থামিয়ে ওর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে টুরা। মেয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে মায়ের কোলে। বলে—মা? আর আশ্চর্য কাণ্ড! মেয়েকে দুহাতে ঠেলে দিয়ে হন হন করে ঘরের ভিতরে চলে যায় টুরা।

অতর্কিত মনাদরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে পিলুবানী, আর তাকে শান্ত করতে করতে বিষু ভাবে ওর হলো কী! এই পাঁচ বছরে ওকে আমি একটুও চিনতে পারলাম না!

ঝড় আসবার আগে গাছপালা যেমন নিথর নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, বাতাস যেমন স্তব্ধ হয়ে যায়,—ঠিক তেমনি অদ্ভুত একটা অবস্তিতে কাটতে লাগলো বিষুর কয়েকটা দিন। করণীয় কাজ সে করে যাচ্ছে, কিন্তু মনে কোথায় একটা তীব্র অশান্তির কাঁটা ফুটে আছে নিরন্তর, যার জ্বালা থেকে এক মুহূর্তের জন্যও মুক্তি নেই!

একদিন ভোরে, পিলুবানীর কান্না শুনে হঠাৎ সে ধড়মড় করে জেগে উঠলো। ঘর থেকে বেরিয়ে এলো সঙ্গে সঙ্গে। ঘরের সামনে পিলুবানী বসে বসে কাঁদছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে তাকে তৎক্ষণাৎ কোলের কাছে টেনে নিয়ে বিষু জিজ্ঞাসা করলো কী হয়েছে রে?

—মা নেই।

বুকের ভিতরটা ধক করে উঠলো। অস্ফুট কণ্ঠে সে বললে,—মা নেই কী রে?

মনের সেই অব্যক্ত অবস্তির বুঝি এমনি করেই বহিঃপ্রকাশ ঘটলো একদিন। তন্ন তন্ন করে আশে পাশে খুঁজল বিষু। চিলায় উঠে, বনের ধারে গিয়ে বার বার ডাকতে লাগলো—টুরা টুরা!

গাছের মাথায় হাওয়া লেগে পাতারা সব উল্লাসে দুলছে। সাদা মেঘের ভেলায় ভেলায় ভোরের আলো ঝলমল করে উঠেছে,—পিলুবানীর কান্নার উত্তর কে দেবে? 'মা-মা' বলে সে এতো ডাকলো, মা এলো না। 'টুরা টুরা' বলে বিষু যতো ডাকলো, টুরা এলো না।

বহুক্ষণ পরে, সূর্য যখন মাথার ওপর, মেয়েটা যখন কেঁদে কেঁদে ঘরের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন সুজাই এলো খবরটা নিয়ে। টুরা গেছে স্বামীর কাছে। তার কাছেই থাকবে।

—তুই দেখলি?

—হ্যাঁ।

—কথা বললি?

—হ্যাঁ।

—কী বললে টুরা?

—টুরা বললে,-বিষুর কাছে মেয়ে থাকে থাক। আমি এখানেই থাকবো।-

বিষু আর বিলম্ব করলো না। পিলুবানীকে ঘুম থেকে উঠিয়ে কোলে নিয়ে গাঁয়ের দিকে চললো সুজার সঙ্গে। টুরার স্বামীর ঘরের ঠিক সামনেই বসে ছিল টুরা। তার সামনে নামিয়ে রাখলো পিলুবানীকে। মা মেয়েকে কোলে নিয়ে একটু আদর করেই ওর দিকে ঠেলে দিলো।

বিষু সবিস্ময়ে বললে,—তুই যাবি না?

—না।

—মেয়ে?

—বড়ো হয়েছে, তুই নিয়ে যা।

বিষু চীৎকার করে উঠলো—এ তুই কী করলি?

টুরা ছুটে ঘরের ভিতরে চলে গেল। আর, ঘরজামাই পথ আড়াল করে দাঁড়ালো টুরার স্বামী। বিষু বললো,—আমি ওকে চাই না। মেয়েকে নে তোর!

—না।

আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলো পিলুবানী, কিন্তু ঘরের ভিতর থেকে কোনো সাড়া এলো না। বিষু অবশেষে রাগ করে

মেয়েকে কোলে নিয়ে ফিরে এলো তার ঝুপড়ীতে ? তার মনে হতে লাগলো,—মানুষ এ-ও পারে ?

সেইদিন, সেই রাতটা কেটে গেল। মনটা একটু স্থির হতে, বিধু ভাবতে লাগলো,—একি হতে পারে ? ও নিশ্চয়ই ফিরে আসবে। যে-মেয়েকে এমন করে বাঁচালো, সে মেয়েকে ছেড়ে কতদিন দূরে থাকতে পারবে, মা ? ও ফিরে আসবেই।

কিন্তু, দিন যায়, মাস যায়,—মা আর এলো না। বাতাস তেমনি খেলা করে গাছের আলোয়, ভোরের সূর্য্য তেমনি রঙ বুলিয়ে দেয় মেঘের ভেলায়,—অথচ তার ঘরের আঙিনায় যেটা ঘটা উচিত, সেটা ঘটে না। সুজা মাঝে মাঝে আসে কিন্তু সে আসে না ! ততদিন মেয়েটাও শান্ত হয়ে গেছে। নিজের খেলাধুলো নিয়ে মেতে থাকে, কাঁদেও না, মায়ের নামও করে না।

সুজা আর বিধু সুকঠিন বিস্ময়েই এ-দৃশ্য দেখতে থাকে, আর ভাবতে থাকে। এ জৈবিক লীলা তাদের মতো যাযাবর মনের কাছেও এক নিদারুণ বিস্ময়ের বস্তু হয়ে দেখা দেয়। দূরের সিন্ধুভাবনী নদী কিন্তু তেমনি বয়ে যায়, আকাশে কিন্তু তেমনি মেঘ করে আসে, বাতাসে কিন্তু তেমনি স্নিগ্ধ আমেজ বইতে থাকে। উপত্যকা ঘিরে রাত্রি নেমে আসে, উপত্যকার অন্ধকার কেটে গিয়ে আবার ভোর হয়। এক অমোঘ নিয়মের রথচক্রে সব কিছু উচ্চনীচ গুঁড়িয়ে সমতল হয়ে যায়, সাবলীল হ'য়ে যায়। যা পড়ে থাকে, তা এক গভীর ক্ষতের ঘা। কিন্তু, সেও মিলিয়ে যেতে কতক্ষণ ?

শেষ

শচীন্দ্রনাথ বসু

জয়শ্রীর পাঠক পাঠিকাদের কাছে সুপরিচিত। গত কয়েক বছরে প্রকাশিত তাঁর গল্পগুলি সকলের প্রশংসা অর্জন করেছে। তাঁর স্বনির্বাচিত পনেরটি বড় ও ছোট গল্পের সংকলন প্রকাশিত হল 'শনিবারের সন্ধ্যায়', 'গল্পের শেষ' 'প্রমীলার প্রেম', 'অভয় রায়, কবি' ইত্যাদি স্থান পেয়েছে এই সংকলনে। বইয়ের নাম

শনিবারের সন্ধ্যায়

ভাল কাগজে, আর্টিক রূপে ছাপা। দাম ছয় টাকা

প্রকাশক

কার্যা কে, এল, মুখোপাধ্যায়

৬/১এ বাঞ্ছারাম অক্রুর লেন. কলিকাতা-১২

চা | রু | প্র | হ | র

কুমার লাল দাশগুপ্ত

প্রথম প্রহর

সকাল বেলা অনুরাগ আসে শ্রীমতীর বাড়ী। বসবার ঘরে কেউ নাই, একখানা চেয়ার টেনে সে বসে। ভিতরে কর্মব্যস্ত শ্রীমতীর সাড়া সে পায়, এঘর ওঘর ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ এক ঝাঁকে বসবার ঘরে ঢুকতেই অনুরাগকে দেখে শ্রীমতী থমকে দাঁড়ায়, বলে "কখন এলে অনু—ভাল আছ তো?" শ্রীমতীর শুভ্র কপালের উপর কালো চুলের গোছা এলোমেলো ভাবে এসে পড়েছে, অসংযত আঁচলের প্রান্ত মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে—হাতে তার এক গ্লাস জল। অনু শ্রীমতীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, কি বলতে গিয়ে আর বলা হয় না। শ্রীমতী আঁচল সংযত করে হেসে আবার বলে "চুপ করে বসে আছ কেন? ডাকোনি কেন?" অনু বলে "ডাকবো ভাবছি এমন সময় তুমিই এসে পড়লে।" শ্রীমতী বলে "একটু বোসো অনু, আমি তোমার জন্যে চা করে আনি। জানতো সকাল বেলা আমার কাজের অন্ত নাই।" ছুটে ভিতরে চলে যায় শ্রীমতী, আবার তার ব্যস্ত চলাফেরার সাড়া পায় অনু। অনুরাগ দেয়ালে টাঙানো রবীন্দ্রনাথের ছবির দিকে তাকিয়ে থাকে। মিনিটের পর মিনিট কেটে যায়, আবার হঠাৎ ঘরে ঢোকে শ্রীমতী, এবার তার হাতে এক পেয়ালা চা। টেবিলের উপর চায়ের পেয়ালা রেখে শ্রীমতী বলে "তুমি চা খাও, আমি তো এখন বসতে পারবোনা তোমার কাছে, রাগ কোরোনা!" অনু বলে "একটুখানি বসতে পারবে না? এক মিনিটের জন্যে!"

শ্রীমতী বলে "বসতে পারলে কি আর তোমাকে একা ফেলে এঘর ওঘর ছুটাছুটি করে বেড়াই! ভাইপো ভাইঝিরা স্কুলে যাবে তাদের চান করান হয়েছে, এবার খাইয়ে পোষাক পরিয়ে তৈরি করে রাখবো। স্কুলের গাড়ী এলেই চলে যাবে।" অনু চায়ের পেয়ালাটা হাতে তুলে নিয়ে আবার নামিয়ে রাখে। শ্রীমতী বলে "ওকি হচ্ছে, চা খাচ্ছ না যে! অনু বলে "একটা কথা ছিল বলবার।" শ্রীমতী হেসে বলে "এখন তো বলতে পারবোনা অনু।" ভিতর থেকে ডাক আসে "শিগীর।" "আসছি বৌদি" জবাব দেয় শ্রীমতী। অনুকে বলে "চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, খাও, আমি একটু পরে আসবো।" তারপরে তাড়াতাড়ি ভিতরে চলে যায় শ্রীমতী।

চায়ের পেয়ালা নিঃশেষ করে—অনু রবীন্দ্রনাথের ছবিটার দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে থাকে। ঘড়িতে বাজে ন'টা। হুড়মুড় করে ঘরে ঢোকে শ্রীমতী, বলে "রাগ কোরোনা অনু, সকাল বেলা আমার মরবার ফুরসৎ নাই। তোমাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখলাম।"

অনুরাগ শ্রীমতীর অনুতপ্ত মুখের দিকে তাকিয়ে বলে "একটু বোসো।" চেয়ার টেনে বসে শ্রীমতী। অনু বলে "এমন করে আর কতদিন চলবে?" ঘাড় নীচু করে হাসে শ্রীমতী, বলে "চলছে তো।" অনু বলে "আর চলছে না, এই ব্যবধানকে ঘোচাতে হবে।" শ্রীমতী বলে "এমন আর কি ব্যবধান, গৌর বাবুর লেন থেকে ইন্দ্রনাথের লেন—বেশীদূর নয়।" "তামাশা করো না শ্রীমতী" বলে অনু "তুমি হেসে আমার সব কথার পাশ কাটিয়ে যাও।" শ্রীমতী ঘাড় নেড়ে বলে "পাশ কাটাবো কেন, আমি তোমার সব কথাই মন দিয়ে শুনি।" অনুরাগ বলে "তাহলে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।" শ্রীমতী বলে "অঙ্কশাস্ত্রে আমার ব্যুৎপত্তি কম তা তো তুমি

জানই অসু, আঁক কষতে আমি প্রায়ই ভুল করি, বিশেষ করে ঐ আঁকগুলো যেমন ধরো দিল্লী থেকে কোলকাতা পৌঁছোতে একটা লোকের যদি একঘন্টা লাগে তাহলে গৌরবাবুর সেন থেকে ইন্দ্রনাথের সেনে পৌঁছোতে একটা লোকের কত সময় নেবে।" অসু গম্ভীর হয়ে বলে "আবার তোমার হেঁয়ালী শুরু হোলো।" শ্রীমতী উঠে দাঁড়ায়, বলে "না গো হেঁয়ালী নয়—সত্যিই হেঁয়ালী নয়।" অসু বলে "তাহলে!" শ্রীমতী বলে "তাহলে অনুমতি দাও, আমি ভিতরে যাই, কাজ তো শেষ হয়নি অসু।" পাশের ঘর থেকে ডাক আসে "পিসীমা।" শ্রীমতী অসুর কাঁধের উপর হাতখানা একমুহূর্ত রেখে ছুটে ভিতরে চলে যায়।

অনুরাগ চোখবুজে অনেকক্ষণ বসে থাকে, তারপরে উঠে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

দ্বিতীয় প্রহর

নিস্তব্ধ দুপুর। বসবার ঘরে সোফার এক কোনে কাত হয়ে পা দুটি তুলে বসে বই পড়ছে শ্রীমতী, কাঁধ আর বুকের উপর লুটিয়ে পড়েছে তার খোলা চুল। পর্দা ঠেলে ঘরে ঢোকে অনুরাগ, সাড়া পেয়ে মুখ তুলে চায় শ্রীমতী। অনুরাগকে দেখে পা দুটি নামিয়ে উঠে বসে বলে "এসো অসু।" অসু ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে, শ্রীমতী পাশে সোফার উপরে হাত রেখে বলে "বসো।" অসু বসে। শ্রীমতী অসুর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে "দুপুরের রোদে কোথায় গিয়েছিলে?" অসু বলে "যাইনি কোথাও, এখানে এলাম।" শ্রীমতী হেসে বলে "বাঁচলাম।" অসু বলে "আশাকরি এখন তুমি কাজে ব্যস্ত নেই।" শ্রীমতী হাতের বই দেখিয়ে হাসে। অসু মুখ গম্ভীর করে বলে "তাহলে উঠি।" বইখানা কোলের উপর ফেলে রেখে শ্রীমতী "বলে রাগ করোনা, অথচ মন নিয়ে বসলাম তোমার কথা শোনবার জন্যে—বলো।" অনুরাগ একটু চুপকরে থেকে বলে "আমি একটা কথা ভাবছিলাম।" শ্রীমতী উদ্‌গ্রীব হয়ে বলে "কি কথা?" অনুরাগ দেয়ালে টাঙানো রবীন্দ্রনাথের ছবির দিকে তাকিয়ে বলে "ভাবছিলাম টালীগঞ্জে একটা বাড়ী ভাড়া করবো।" শ্রীমতী বলে "বেশতো, টালীগঞ্জের আভিজাত্য আজকাল খুব বেড়েছে।" অসু বলে "বাড়ীটা সাজাবো একেবারে আধুনিক আসবাব দিয়ে।" শ্রীমতী বলে "তা তো সাজাতেই হবে।" অসু উৎসাহিত হয়ে বলে "নামকরা শিল্পীদের ভাল ভাল ছবি থাকবে প্রত্যেক দেয়ালে।" শ্রীমতী বলে "সুন্দর দেখতে হবে।" অসু আবেগের সঙ্গে বলে "সেই বাড়ীর ডেডলাটা হবে একান্ত তোমার।" শ্রীমতী একগোছা চুল আঙুলে জড়াতে জড়াতে বলে "তাই নাকি?" অসু বলে "হ্যাঁ। একটা ঘর হবে তোমার গ্রন্থাগার, থাকবে শ্রেষ্ঠ দেশী বিদেশী সাহিত্যিকদের গ্রন্থ। একটা হবে তোমার লেখাপড়া করবার ঘর। সেঘরে থাকবেনা বেশী আসবাব, জানালার ধারে থাকবে একখানা টেবিল আর একখানা চেয়ার, মেঝে থাকবে পুরু কারপেট মোড়া, আওয়াজ হবেনা চলাফেরাতে, একাগ্র চিত্তের মতই সেঘর হবে শুদ্ধ। একখানা হবে তোমার চা খাওয়ার ঘর, সে ঘরের টেবিল-চেয়ার আসবাব হবে হালকা সবুজ রংএর—কচি চা পাতার যেমন রং হয় সেই রকম। একটা ঘর হবে তোমার শোবার ঘর, সে ঘর সাজাবো আমার সমস্ত কবিত্ব আর কল্পনা শক্তি দিয়ে।" শ্রীমতী বলে "আরো একটা ঘর চাই।" অসু বলে "তুমি চাইলেই পাবে, কিন্তু কিসের জন্যে?" শ্রীমতী হেসে বলে "সেটা হবে আমার পোষাঘর। শুনেছ নিশ্চয়ই আগেকার রাণীদের একটা করে পোষাঘর থাকতো।" অসুর মুখ ভার হয়, বলে "আবার তামাসা শুরু করলে।" শ্রীমতী বলে "তামাসা কেন করবো, তুমি আমাকে রাণীর মতই রাখবার আয়োজন করতে চাও তাই একটু খুঁত ছিল দেখিয়ে দিলাম।" অসু বলে "অনুমতি দাও।" শ্রীমতী বলে কিসের

অনুমতি!" অনু বলে "আয়োজনের।" শ্রীমতী জবাব দেয়না, চুলের গোছা আঙুলে জড়ায়। অনু অধৈর্য হয়ে ওঠে, বলে "বলবে না কিছু!" এইবার মাথা তুলে হাসে শ্রীমতী, বলে "এক পেয়ালা চা করে আনি, আগে খেয়ে নাও- এত ঐশ্বর্যের কথা কল্পনা করতেও যথেষ্ট পরিশ্রম হয়।" অনু চুপকরে থাকে। শ্রীমতী বলে "রাগ করলে?" অনু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে "না।" কোলের উপর থেকে বইখানা তুলে নিয়ে শ্রীমতী বলে "তাহলে একটা কবিতা পড়ি শোনো—

বিধাতা যেদিন মোর মন
করিলা সৃজন
বহু কক্ষে ভাগ করা হর্ম্যের মতন,
শুধু তার বাহিরের ঘরে
প্রস্তুত রহিল সজ্জা নানা মতো অতিথির তরে;
নীরব নির্জন অন্তঃপুরে
তালা তার বন্ধ করি চাবিখানি ফেলি দিলা দূরে।
মাঝে মাঝে পায় এসে দাঁড়ায়েছে দ্বারে,
বলিয়াছে 'খুলে দাও'। উপায় জানিনা খুলিবারে।
বাহিরে আকাশ তাই বৃথায় আকুল করে হাওয়া
সেখানেই যত খেলা, যত মেলা, যত আসা যাওয়া।

অনু উঠে দাঁড়ায়। শ্রীমতী বলে "এখনই যাবে, আর একটু বসবে না?" অনু বলে "না, কাজ আছে।" শ্রীমতী বলে "কবিতাটা শেষ হয়নি কিন্তু।" অনু অন্যমনস্ক ভাবে বলে "আর একদিন শুনবো," তারপরে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

তৃতীয় প্রহর

সন্ধ্যা নেমে এসেছে, ছাতের উপর শ্রীমতী টবে বসান ফুলগাছে জল দিচ্ছে, মাথায় জড়ান আঁচল, খোলা চুল পিঠের উপর পড়েছে ছড়িয়ে। অনুরাগ এসে নিঃশব্দে দাঁড়ায় পিছনে, চেয়ে চেয়ে দেখে শ্রীমতীর সুন্দর গ্রীবা-ভঙ্গিটি, হাতোল শুভ্র পরিপুষ্ট দুটি বাহুর চঞ্চলতা। একবার ঘুরে দাঁড়াতেই শ্রীমতী দেখে অনুকে, চমকে উঠে প্রশ্ন করে "কতক্ষণ এসেছো।" অনুরাগ বলে "একটু আগে।" শ্রীমতী বলে "এসেছো যখন তখন কাজে সাহায্য কর আমাকে, দাও জলের বালতীটা এগিয়ে।" অনু বালতীটা এগিয়ে দেয়, শ্রীমতী একটা একটা করে জল ঢালে টবে। আধখানা ছাত জুড়ে ফুলে ফুলে ফুল বাগান, শ্রীমতী নিঃশব্দে ফুলগাছগুলির সেবা করে চলে, যেটা চলে পড়েছে সোজা করে বসায় সেটাকে, যেটা দুর্বল, বাড়তেনা সেটাকে কৃত্রিম শিশুর মতই যত্ন করে, গোড়া খুঁচিয়ে সার দেয়, শুকনো পাতা খুঁটে ফেলে। অনুরাগ বলে "তুমি ফুলগাছ ভালবাস, তাই না শ্রীমতী!" মুখ না তুলে শ্রীমতী বলে "খুব ভালবাসি, কেবল ফুলগাছ নয়, সব গাছই আমি ভালবাসি।" অনুরাগ বলে "আমি যে অন্যায় করেছি তার জন্যে ক্ষমা চাচ্ছি শ্রীমতী।" হাতের কাজ রেখে শ্রীমতী উঠে দাঁড়ায়, বলে "জানিনা তো কি অন্যায় করেছ তুমি!" অনু বলে "কাল তোমাকে ঐশ্বর্য অর্থ দিতে চেয়েছিলাম, সেইটে অপরাধের কাজ করেছি। এখন বুঝতে পারছি সোনারুপো, ইট কাঠ এবং আনুষঙ্গিক হৈ চৈ তোমার প্রকৃতিবিরুদ্ধ, তুমি ভালবাস সবুজ গাছপালা, ঘাসে ঢাকা মাঠ, জলভরা নদী তুমি ভালবাস নিস্তব্ধ দুপুরে ঘুঘুর ডাক।" একটু হেসে আবার কাজে মন দেয় শ্রীমতী। অনু বলে "নিভৃত পল্লীর বুকে বেণুবনের পাশে বাঁধবো আমাদের ঘর। কাছেই থাকবে দীঘি, তার কালো জলে ফুটবে পদ্ম, তুমি আর আমি আর রুক্ষচূড়ার ছায়াশীতল পথ দিয়ে যখন যাবে জল আনতে মুগ্ধ কোকিল তখন ডাকবে বকুল গাছে।" শ্রীমতী হঠাৎ বলে "বোসো এখানে।" কথার স্রোত আচমকা বন্ধ হয়ে যায় অনুরাগের, শ্রীমতীর আদেশ মত বসে সেখানে। শ্রীমতী বলে "সেদ্ধভিয়ার চারা বসাবো এই টব গুলোতে, তুমি মাটি

তৈরি করো, আমি গাছ বসাচ্ছি, তাড়াতাড়ি কাজ হয়ে যাবে।" অনু মাটি তৈরির কাজে মন দেয়। এক ফাঁকে সে প্রশ্ন করে "তুমি বেণুবন দেখেছ শ্রীমতী?" শ্রীমতী বলে "বেণুবন মানে বাঁশবন তো, দেখছি বৈকি, সাপ ব্যাং আর মশার আড্ডা।" কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অনু আবার বলে "তুমি দীঘির কালো জলে স্নান করতে ভালবাস শ্রীমতী?" শ্রীমতী বলে "আমি সাঁতার জানিনে—জল দেখলে ডরাই—কালো জল দেখলে মূর্ছা যাই।" আর কোন প্রশ্ন করে না অনু। মাটি তৈরি শেষ করে উঠে দাঁড়ায়। অনুর হাতে জল ঢেলে দিতে দিতে শ্রীমতী বলে "হাত ধুয়ে নাও, চলো নীচে গিয়ে চা খাবে, আজ তোমাকে খুব খাটিয়েছি।" অনু বলে "একটা কাজ আছে, যেতে হবে তাড়াতাড়ি—চা আর খাব না।" শ্রীমতী বলে "তা অসম্ভব, চা খেতেই হবে।"

নীচে নেমে আসে দুজনে। বসবার ঘরে গিয়ে বসে অনু, শ্রীমতী ছুটে যায় চা তৈরি করতে। কিছুক্ষণ পরে চায়ের পেয়ালা আর এক প্লেট খাবার এনে অনুর সামনে রেখে শ্রীমতী বসে কবিতার বই নিয়ে। পাতা উল্টে একটা কবিতা বার করে সে বলে "দুপুরে আধখানা কবিতা শুনে পালিয়ে গেলে, এখন শেষটুকু শোনো।" অনু বলে "উঠতে হবে তাড়াতাড়ি।" সে কথায় কান না দিয়ে পড়ে যায় শ্রীমতী—

দূরে চেয়ে থাকি একা
মনে করি যদি কভু পাই তার দেখা
যে পথিক একদিন গোধূলির শুভক্ষণে
লুকায়ে পেয়েছে চাবি শাল আর পলাশের বনে।
শুনিতে পেয়েছে যেন অনাদি কালের কোন বাণী,
সেই হতে খুঁজিতেছে বিরাম না জানি।
অবশেষে
মৌমাছির পরিচিত এ নিভৃত পথপ্রান্তে এসে
যাত্রা তার হবে অবসান,
খুলিবে সে গুপ্তদ্বার কেহ যার পায়নি সন্ধান।

পড়া শেষ করে শ্রীমতী বলে "কেমন লাগলো?" অনু বলে "সুন্দর—এখন তাহলে উঠি।" শ্রীমতী বলে "আর একটা শোনো। উঠে দাঁড়ায় অনুরাগ, বলে "আর একদিন।" চলে যায় অনু।

চতুর্থ প্রহর

তখনো ভোর হয়নি, পুবের আকাশ আরক্তিম হয়ে উঠেছে, গাছের ডালে দু'একটা পাখী ডাকাডাকি শুরু করেছে, পথে নাই পথিক, এমন সময় অনুরাগ আসে শ্রীমতীর বাড়ী। ফটক খুলে ছোট বাগান পার হয়ে বারান্দায় উঠতেই দেখে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে শ্রীমতী, স্নান শেষ করে ভিজে চুল ছড়িয়ে দিয়েছে পিঠের উপর। অনুকে দেখে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বাইরে আসে শ্রীমতী, আশ্চর্য হয়ে বলে "ভোর না হতে কোথায় চলেছ অনু?" অনু বলে "তোমার কাছে এসেছি।" শ্রীমতী বলে "এসো, ভিতরে এসো।" অনু বলে "না, ভিতরে যাব না, বাইরে এইখানে একটু বোসো, একটা কথা বলেই চলে যাব।" শ্রীমতী বসে, বলে "ঐ তো তোমার দোষ, এলেই বলো যাই যাই।" অনুও বসে, বলে "থাকা কঠিন, যাওয়া যে সহজ।" শ্রীমতী হেসে বলে "আমার ধারণা অন্যরকম, আমি বলি থাকাই সহজ, যাওয়া কঠিন।" অনু বলে "আমার আর তোমার মতে তাহলে মিল নাই।" সামনের গাছে একটা বোয়েল ডেকে ওঠে, দুজনে চুপ করে শোনে। হঠাৎ অনু বলে "আমি আজ, এক্ষুনি কোলকাতা ছেড়ে যাচ্ছি।" অবাক হয়ে শ্রীমতী বলে "সে কি কথা, আগে তো কিছু বলোনি।" "না" বলে অনু "আগে বলা সম্ভব ছিল না, এই কিছুক্ষণ হোলো ঠিক করেছি।" শ্রীমতী অনুরাগের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে "ব্যাপার কি বলতো?" কিছুক্ষণ চুপকরে থেকে অনু বলে "ভিক্ষা চেয়ে পেলাম না, দাবী করে পেলাম না, শেষ

পর্যন্ত বুঝলাম—ভিক্ষা চাইলেও পাওয়া যায় না, দাবী করলেও পাওয়া যায় না, আবার যা হয় তা আপনি আসে।" শ্রীমতী চুপ করে শোনে, অসু বলে যায় "কিন্তু দেওয়ার মালিক আমি, দিয়েছি যখন নিঃশেষ করে দি। যখন দিয়েই ফেল্লাম সব, পেলাম না কিছুই তখন ঘরে থাকবো কি নিয়ে—তাই পথে বার হয়েছি। যাকে ভালবাসি সে যখন ভালবাসার কথা শুনলো না তখন পথ চলতে চলতে পথিককে ডেকে বলবো—পথিক, শোনো শোনো, আমি শ্রীমতীকে ভালবাসি। সন্ধ্যা বেলা যখন খেয়াঘাটে পৌঁছব তখন নৌকার মাঝিকে ডেকে বলবো—ওগো মাঝি, শোনো, শোনো, আমি শ্রীমতীকে ভালবাসি।" শ্রীমতী এতক্ষণে কথা কয় বলে "কতদূর যাবে?" অসু বলে "যাব অনেকদূর, যাব দেশ হতে দেশান্তরে, যে জানে না আমার ভাষা তাকে ডেকে বলবো—"ওগো বিদেশী, শোনো শোনো, আমি শ্রীমতীকে ভালবাসি। কত পাহাড়ের পাশ দিয়ে। কত অরণ্যের ভিতর দিয়ে যাব, দুপুরে যখন ক্লান্ত হয়ে ঝরণার ধারে বহুয়া গাছের নীচে বসবো, সাঁওতাল পল্লী থেকে মেয়েরা আসবে জল নিতে, আমি তাদের ডেকে বলবো—"ওগো শোনো শোনো মেয়ে, আমি শ্রীমতীকে ভালবাসি।" শ্রীমতী হঠাৎ অসুর হাতের উপর হাত রাখে হাত—থেমে যায় অসু। শ্রীমতী বলে "তুমি তো অনেক ঘুরে যাবে পথের কিছু ঠিক নাই।" ঘাড় নেড়ে অনুরাগ বলে "না।" "তাহলে আমি একটা পথ বলেদি, সেই পথে যাও না কেন?" বলে শ্রীমতী। অসু একটু ভেবে বলে "তাই বলো, তোমার নির্দিষ্ট পথেই যাবো।" শ্রীমতী বলে "খুশী হলাম শুনে, পথ বলি শোনো, এখান থেকে বেরিয়ে যাবে বৌবাজারের মোড়ে, সেখান থেকে ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট ধরে যাবে দক্ষিণে, পৌঁছবে ধর্মতলা ষ্ট্রীটে। ধর্মতলা ষ্ট্রীট ধরে চলবে পশ্চিমে, যেও ধীরে ধীরে, বড় ভীড় সে পথে, একটু পরে পৌঁছবে—চৌরঙ্গী—চেন চৌরঙ্গী?" অবাক হয়ে অসু বলে "চিনি।" শ্রীমতী বলে "চৌরঙ্গীও এক অরণ্য, জনারণ্য, তার ভিতর দিয়ে চৌরঙ্গী রোড ধরে চলবে দক্ষিণে, সাগরের দিকে, পথে আসবে অনেক বাধা, সে সব অতিক্রম করে এগিয়ে যাবে, পৌঁছবে ভবানীপুর, তার পর কালিঘাট। কালিঘাটে যাবে ঘুরে, পাবে কোন রাস্তা বলতে পার?" অসু আশ্চর্য হয়ে বলে "পারি ইন্দ্রনাথের লেন।" শ্রীমতী বলে "এই আমার নির্দিষ্ট পথ, এই পথে যদি তুমি যাও তাহলে আমিও যাই তোমার সঙ্গে।" হাসে অনুরাগ বলে "আবার তামাশা শুরু করলে?" শ্রীমতী বলে "তামাশা করছিনে, সত্যিই যাব।" অভিভূত হয়ে পড়ে অসু, বলে "যাবে তুমি শ্রীমতী?" শ্রীমতী বলে "যাব, কিন্তু একটা কথা পথ চলতে চলতে পথিককে ডেকে বলতে পারবেনা—"শোনো শোনো পথিক, শ্রীমতীকে আমি ভালবাসি।" অসু বলে "তা আমি বলবই।" শ্রীমতী চুপকরে ভাবে, তারপরে বলে "ওটা পথে পথে না বলে এইখানে বসে যতখুশী বলে নাওনা না কেন?" অসু বলে "তোমার কানে?" শ্রীমতী বলে "হ্যাঁ।"

ভোর হয়ে গেছে ততক্ষণ দাদনের গাছে আবার দোয়েলটা ডাকে—দুজনে চুপকরে শোনে।

নন্দার সৌন্দর্য্যের গোপনকথা...

'ত্বক সৌন্দর্য্যের জন্য লাক্স-ই আমার পছন্দ'

রূপসী নন্দা তাঁর কুমারী নন্দা
লাক্স টয়লেট সাবান ব্যবহার করেন।
লাক্স মাখুন ... ত্বকের সেরেফ
ছোঁয়ায় পরশে ছেয়ে যাবে নতুন
আবেশ অনেক! লাক্স মাখুন ...
ত্বকের মধুর গন্ধ অপূর্বরূপ
চুম্বনেতে ভোলাবে! লাক্স মাখুন ...
সাতটি রামধনু রঙের ছোঁয়া থেকে
মিলন সাত রঙ নেয়ে নিন।
আপনার প্রিয় সাবানটিও পাবেন।
ত্বক সৌন্দর্য্যে সেরা নিন, লাক্স মাখুন।

চিত্রতারকাদের বিশুদ্ধ, কোমল
সৌন্দর্য্য-সাবান

রূপসী নন্দা বলেন– 'লাক্স সাবানটি চমৎকার আর রঙগুলিও কি সুন্দর!'

বিশ্বভারতী

চীন-ভারত সম্পর্ক

১৯৫৯ সালের শেষের দিকে ভারতীয় লোকসভায় একটী প্রস্তাব পাশ হয় : "This House having considered White Paper II on Indo-China relations laid on the table of the House on November 16 1959, and the recent developments on the frontier, and subsequent correspondence between the Governments of India and China laid on the table of the House on November 20, 1959, approves of and endorses the policy of the Government in this regard."

কিন্তু চীন সম্পর্কে ভারত সরকারের নীতিটা যে কি তা' অনুধাবন করা অনেক সময় শক্ত হয়ে পড়ে। গত ১৩ই জুনের এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধান মন্ত্রী নেহেরু বললেন, চীন একটা মীমাংসা চায়। পার্লামেণ্টে ও তিনি অনুরূপ আশার বাণী শোনালেন, যদিও বাইরে থেকে চীনের আপোষ-মূলক মনোভাবের কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। বরং চীন তার জবরদস্তির পরিচয়ই দিয়ে চলেছিল।

প্রধান মন্ত্রীর ঐ উক্তির পরও যে অবস্থার উন্নতি হয়েছে তা নয়। ১০ই জুলাই এর সংবাদে জানা যায় যে চীনারা লাদাক অঞ্চলে গালওয়ান নদীর উপত্যকায় একটি ভারতীয় পোষ্ট তিন দিক থেকে ঘিরে ধরেছিল। এমন কি তারা ঐ পোষ্টের প্রায় পনরো গজ দূরে হাজির হয়েছিল এবং তার পর সরে যায়। ভারত সরকারের গত ১৪ই জুলাইর প্রতিবাদ লিপিতে বলা হয়েছে যে, গত কয়েক মাসের মধ্যে চীনারা ভারতীয় এলাকায় তেরটী নতুন ঘাঁটী গড়েছে। এর পরের খবর হলো, গত ২১শে জুলাই চীনা সৈন্যরা লাদাক অঞ্চলে চিপ-চাপ নদীর ও পাংগিয়ং হ্রদের এলাকায় দুটো জায়গায় ভারতীয় জোয়ানদের উপর গুলী বর্ষণ করে। ঐ গুলীবর্ষণের সময় মেশিন গান ও মর্টার ব্যবহার হয়।

গত ২০শে জুলাই প্রধান মন্ত্রী নেহরু সাংবাদিকদের কাছে চীন ভারত সীমান্তের লাদাক পরিস্থিতিকে "অত্যন্ত গুরুতর" বলে স্বীকার করেন। তিনি দেশবাসীকে ঐ পরিস্থিতি সম্পর্কে সতর্ক থাকতেও বলেছেন। কিন্তু ঐ ২০শে জুলাই তারিখেই জেনেভায় আমাদের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী কৃষ্ণ মেননের যে উক্তি করেছেন সেটাও লক্ষ্য করবার মত। চীন-ভারত সীমান্ত প্রশ্নে ২০শে জুলাই জেনেভায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মেননের ভাষ্য হলো : "These are largely unoccupied areas. They have posts and we have posts. Sometimes they say we shoot first and sometimes we say they shoot first—actually they shoot first."

এর আগেও যেমন চেষ্টা করেছেন সীমান্তের অবস্থার গুরুত্ব অস্বীকার করতে। এবারও সেই একই চেষ্টা দেখতে পাওয়া যায়, যখন প্রধান মন্ত্রী পর্যন্ত মনে করেন যে পরিস্থিতিটা 'খুবই গুরুতর'। এখানে লক্ষণীয়, চীন সরকার ভারত সম্পর্কে তাদের কৌশলের ধাপে ধাপে একটা পরিবর্তন করেছেন। তারা এখন যে শুধু ভারতের অভিযোগগুলোকে অস্বীকার করে চলেছেন তা নয়; ভারতের বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগও করতে আরম্ভ করেছেন, হউক না কেন সে

অভিযোগগুলো নির্জলা মিথ্যা। চীন ভারত সম্পর্কের প্রশ্নে মেননের এবম্বিধ ভাষ্য চীনের বক্তব্যেরই সহায়ক হবে।

লোকসভায় প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের নেতা সুরেন্দ্রনাথ দ্বিবেদী এক সাম্প্রতিক বিবৃতিতে সীমান্তের গুরুতর পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকারের নীতির সুস্পষ্ট ঘোষণার দাবী জানিয়েছেন। ভারত সরকারের মনোভাবটা কি? কয়েক দিন আগে দিল্লীর একখানা দৈনিক পত্রিকার অংকিত কার্টুনে কয়েকটী কথা জুড়ে দেওয়া হয়েছে:

'Chinese remain in chip chap."

—"Let us remain chop chaap."

("চীনারা রয়েছে চিপ-চাপ-এ; আমরা থাকি চুপ-চাপ।") হয়ত ঐ কার্টুনে ভারত সরকারের সত্যিকার মনোভাবটা প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু একটা কথা জানা দরকার: চীনারা তাদের ১৯৫৪ সালের মানচিত্র অনুযায়ী যে বিরাট এলাকার দাবী করেছিল, আজ তারা তার অধিকাংশই নিয়ন্ত্রণ করছে। কিন্তু ১৯৫৪ সালের মানচিত্রও তাদের তৃপ্ত করেনি। সেটা পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হয়েছে ১৯৬০ সালে। জানিনা, সেটাকে তারা আবার পরিবর্দ্ধিত করার কথা ভাবছে কি না।

• • •

আলজেরিয়ার সংকট

গত ৩রা জুলাই ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট দ-গলের স্বাক্ষরিত সরকারী ঘোষণাপত্র প্রকাশের সাথে আলজেরিয়ায় ১৩২ বছরের ফরাসী শাসনের অবসান হলো। ফরাসী সরকারের পক্ষ থেকে আলজেরিয়ার অস্থায়ী সরকারের প্রেসিডেন্টের কাছে অনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা হয়েছে। কিন্তু দীর্ঘ সাড়ে সাত বছরের সীমাহীন দুঃখ ভোগ ও ত্যাগ স্বীকারের পরও আলজেরিয়াবাসীদের দুর্দিনের অবসান হলো না। সমগ্র আলজেরিয়াতে আজ গৃহযুদ্ধের আশংকা দেখা দিয়েছে। এর মূলে রয়েছে অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী ইউসুফ বেন খেদার সাথে উপ প্রধান মন্ত্রী আহম্মদ বেন বেল্লার বিরোধ। বেন বেল্লার সাম্প্রতিক বিবৃতিতেও এটা স্বীকৃত হয়েছে যে বিরোধটা নীতিগত নয়, নেতৃত্বগত। দেখা যাচ্ছে বেন বেল্লা অস্ত্রের সাহায্যেই বিরোধ মীমাংসার পথকেই বেছে নিচ্ছেন। সর্বশেষ সংবাদে জানা যায়, বেন বেল্লার সেনাবাহিনী আলজেরিয়ার তিন-চতুর্থাংশ এলাকা দখল করেছেন। কিন্তু ব্যাপারটা হয়ত এখানেই শেষ হবে না। গত ২৫শে জুলাই ফরাসী মন্ত্রিসভার এক অধিবেশনের পর ঘোষণা করা হয় যে, আলজেরিয়ার অবস্থার যদি অবনতি ঘটতে থাকে তবে ফরাসীদের রক্ষার জন্য ফ্রান্স হস্তক্ষেপ করবে। এখনো তিন লাখ ফরাসী সেনা আলজেরিয়ায় রয়েছে।

বলা হয়, বিপ্লব তার সন্তানকে গ্রাস করে। আলজেরিয়ার দুর্ভাগ্য যে, বিপ্লবকে গ্রাস করতে বসেছে তার সন্তানরাই। আশার কথা, আলজেরিয়ার প্রতি সহানুভূতিশীল টিউনিশিয়া, মরক্কো, আরব সাধারণতন্ত্র প্রভৃতি আরব রাষ্ট্রগুলি এক্ষেত্রে উদাসীন নয়। এই রাষ্ট্রগুলি আলজেরিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন করেছে এবং হয়ত বর্তমান পরিস্থিতির মোড় ঘোরাতে সক্ষম হবে।

নিরপেক্ষ রাষ্ট্র লাওস

গত ২৩শে জুলাই জেনেভায় লাওস সংক্রান্ত চুক্তিতে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলির স্বাক্ষর দানের সাথে নিরপেক্ষ লাওস রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হলো। ঐ আন্তর্জাতিক চুক্তিতে লাওসের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, ঐক্য ও আঞ্চলিক অখণ্ডতার মর্যাদা রক্ষার জন্য এবং লাওসের ঘরোয়া ব্যাপারে যাতে বাইরের হস্তক্ষেপ না ঘটে তা দেখবার জন্য প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

এই চুক্তির ফলে লাওস ও তার ১৫ লাখ অধিবাসী, সিয়াটোর রক্ষণাবেক্ষণ থেকে মুক্ত হলো। এখন থেকে লাওস আর কোন বৈদেশিক সামরিক জোটে যোগ দেবে

না। অনুরূপভাবে কয়েক বছর আগে অস্ট্রিয়াও একটি নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বলাবাহুল্য, আজ আন্তর্জাতিক শান্তি স্থাপনের দিক থেকে 'নিরপেক্ষ রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার কল্পনা একটি সম্ভাবনাময় ইংগিত।

নিরস্ত্রীকরণ ও বিশ্ব-শান্তি

জেনেভায় আরও একটি সম্মেলন চলছে, গত মার্চ মাস থেকে। এই সম্মেলনের লক্ষ্য, নিরস্ত্রীকরণ। এক্‌মাস স্থগিত থাকার পর ঐ সম্মেলনের বৈঠক আবার সুরু হয়েছে গত ১৬ই জুলাই থেকে। এই সম্মেলনের গতি অত্যন্ত মন্থর। কারণটা অবশ্য দুর্বোধ্য নয়।

ইতিমধ্যে মস্কোয় আরেকটি সর্বাত্মক নিরস্ত্রীকরণ ও বিশ্ব-শান্তি সম্মেলন হয়ে গেলো। এই সম্মেলনে পরমাণবিক বিস্ফোরণের নিন্দা করে প্রস্তাব পাশ হয়েছে। তাছাড়া ঐ সময় মস্কোতে ব্রিটিশ শান্তিবাদী নেতা ক্যানন জন কলিন্সের কাছে সোভিয়েত প্রধান মন্ত্রী ক্রুশ্চেভ আশা প্রকাশ করেছিলেন যে, আসামী বড়দিনের উপহার হিসাবে রাশিয়া ও আমেরিকা পারমাণবিক বিস্ফোরণ বন্ধের সংবাদ দিতে পারবে।

আমেরিকার বর্তমান পর্যায়ের পারমাণবিক বিস্ফোরণের পরীক্ষা— (যেটা সুরু হয়েছিল গত ২৫শে এপ্রিল থেকে)— সমাপ্তপ্রায়। সুতরাং আশাকরা যাচ্ছিল যে অন্ততপক্ষে আপাতত আবার নতুন করে ঐ বোমা বিস্ফোরণ শুরু হবে না। কিন্তু অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে আবার গত ২২শে জুলাই রাশিয়ার পক্ষ থেকে পারমাণবিক বিস্ফোরণের পরীক্ষা শুরু করা হবে বলে জানান হয়েছে।

রাশিয়ার পক্ষ থেকে যুক্তি দেওয়া হয়েছে, যে আণবিক অস্ত্রের ক্ষেত্রে তার শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে হবে। বলার কথা হলো, মস্কোয় অনুষ্ঠিত সাম্প্রতিক শান্তি সম্মেলনে ক্রুশ্চেভ আনবিক অস্ত্রের ক্ষেত্রে আমেরিকার শ্রেষ্ঠত্বের কথা সম্পূর্ণ অস্বীকারই করেছিলেন। অবশ্য গত ২৩শে জুলাইর এক ঘোষণায় প্রেসিডেন্ট কেনেডি জানিয়েছেন যে ঘটনার চাপে বাধ্য না হলে এবং নিরাপত্তা বিঘ্নিত না হলে আমেরিকা নূতন করে আর পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষার কাজ করবে না। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে, রুশ যুক্তি অবলম্বন করে আমেরিকা আবার পরীক্ষা শুরু করে বসে কিনা তা বলা শক্ত। শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার লড়াইতে কেউ পিছু হঠতে রাজী নয়। সুতরাং শেষ বোমা বিস্ফোরণের শেষ কবে এবং কিভাবে তা হয়ত স্বয়ং কেনেডী ক্রুশ্চভও আজ জানেন না। আমরা ক্ষমতাহীনরা শংকার সাথে আজ শুধু লক্ষ্য করতে পারি ঐ ক্ষমতাবানদের স্বার্থান্ধ অক্ষমতাটুকু।

শিশির কুমার বসু

২৭. ৭. ৬২

সন্ধ্যে উৎরে গেল অথচ এখনও তিনি কাজ থেকে ফেরেননি

যে কোন স্ত্রীরই তার স্বামীর জন্য চিন্তা হয় বৈকি! অথচ স্বামী বেচারীকে সমস্ত পরিবারের প্রাণস্পন্দনের যোগাড় করতে উদ্ভ্রান্ত ছুটতে হয়। অছাড়া ছেলেকে উচ্চশিক্ষা দেওয়ার কিম্বা মেয়েকে সুপাত্রস্থ করবার খরচ মেটাবার জন্য তাঁর কিছু অর্থ সঞ্চয় করবার বাসনাও হয়।

জীবন বীমার সাহায্যে এই কাজ অনেক সহজ হয়ে আসে এবং অভিরে সমস্ত দুশ্চিন্তা দূরীভূত হয়। জীবন বীমার একটি পলিসি গ্রহণ করলে বীমাকারী মাসে মাসে কিছু সঞ্চয় করতে বাধ্য হন এবং এই কারণেই ভবিষ্যতে তিনি যে কোন অবস্থারই সম্মুখীন হোন না কেন তাঁর ছেলেরা কলেজে শিক্ষার এবং মেয়ের বিবাহের যাবতীয় খরচের জন্য আলো চিন্তা করতে হয় না। জীবনবীমার পলিসির অর্থ যে কোন বয়স থেকেই উপায় পাওয়া সম্ভব।

সাধারণভাবে প্রত্যেক স্ত্রীরই উচিৎ তার স্বামীর জীবনবীমা সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করা এবং তাঁর দুশ্চিন্তার ভার লাঘব করা। যে কোন স্ত্রী তার নিজের সঞ্চিত অর্থ থেকে প্রিমিয়াম দিতে পারেন। স্বামী-স্ত্রী যুগ্মভাবে জীবন বীমার মাধ্যমে নিজেদের নিশ্চিন্ত ভবিষ্যত গড়ে তুলতে পারেন এবং অভাব ও দুর্ভাবনার হাত থেকে সন্তানদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পারেন।

জীবন বীমার

কোন বিকল্প নেই

AIP/LIC-CAH

পুস্তকপরিচয়

উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্রমানস, লেখক **শশিভূষণ দাশগুপ্ত**, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং, ৭·৫০ টাকা।

রবীন্দ্রনাথের উপর যে প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাধারার প্রভাব গভীর ছিল তা সাধারণ পাঠকেরও অজানা নয়। তাঁর গদ্য ও পদ্য রচনায় "পৃণ্ণস্য বিধে ", "তুমৈব সুখম্ ··", "যেনাহং নামৃতা স্যাম্···", "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ···", "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত···", "অসতো মা সদ্গময়···", ইত্যাদির ধ্বনি আমরা বারে বারে শুনেছি, যদিও অনেকেই হয়তো জানি না এগুলিকে উপনিষদের বাণী বলে। "পৃথিবীর ধূলা মধুময় হউক" এই কথাও উপনিষদেরই শিক্ষা। যাঁরা এই সব বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, যাঁদের সামবেদ একদা উদ্গীথে ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল সেই সব অরণ্যচারী ঋষিদের সহিত জীবনযাত্রার প্রতিও মুগ্ধ হয়ে পড়েছিল আবাল্য বেদ ও বেদান্তের রসে আপ্লুত রবীন্দ্রনাথের মন। 'রঘুবংশের' প্রথম সর্গে দিলীপের আশ্রম-জীবনের যে সুপ্রসিদ্ধ বর্ণনা আছে তার দ্বারা আমরা বর্তমান যুগের এই কবির কত রচনায় পাই! তাঁর কাব্য সাহিত্যের নানা বিচিত্র ধ্বনি, কিন্তু মনে হয় বারে বারে তিনি প্রতিভাত হয়েছেন ঔপনিষদিক ঋষিদের সগোত্র হয়ে। শত-বার্ষিকী উপলক্ষে শ্রীনেহেরু এক সভায় বলেছিলেন, "He was the last in the line of the ancient rishis।" আমার মনে হয় কথাটা রবীন্দ্রনাথের ভাল লাগত।

কিন্তু সেদিনের জীবনধারার এই চিত্র কি কিছুটা অতি-রঞ্জিত, কিছুটা idealized নয়? উপনিষদের (এবং অন্যান্য ধর্মের গ্রন্থাবলীর) সব কিছু আজকের দিনে গ্রহণযোগ্য নয়। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন বাণীর যা অর্থ করেছেন তাই কি সর্বদা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য ছিল, এমন প্রশ্নও নিশ্চয় অনেক পাঠকের মনে জেগেছে। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে লেখক এক জায়গায় বলছেন যে তিনি "অনেক ক্ষেত্রে নিজের প্রেরণাকে উপনিষদের বাণীর মধ্যে ছড়াইয়া দিয়া তাহাকে নূতন অর্থে ও ব্যঞ্জনায় গড়িয়া লইয়াছেন।" আবার এমন কথাও বলছেন যে রবীন্দ্রনাথ যদি উপনিষদের সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত নাও হতেন তা হলেও তাঁর "লেখায় এমন অনেক উপাদান পাইতে পারিতাম যাহাদের সঙ্গে উপনিষদের নিগূঢ় মিল আমাদিগকে আশ্চর্য করিয়া দিত।"

এই ধরণের অস্পষ্টতার ফলে বইখানি সাধারণ শ্রেণীর বহির্ভূত হয়েছে। আরো দু'পও উদ্ধৃতি: লেখক বলছেন রবীন্দ্রনাথ যদি তিন হাজার বছর আগে জন্মে তখনকার ভাষায় রচনা করে যেতেন, "তবে ইহার অনেক অংশকেই আমরা অবাধে দিব্যমন্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতাম, তাহার উপরে টীকা-ভাষ্য-অনুভাষ্য রচনা করিয়া বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ গড়িয়া তুলিবার চেষ্টাও করিতে পারিতাম।" এবং পরের পৃষ্ঠায়: "আরণ্যক উপনিষদের ঋষিগণ সকলেই সংসারত্যাগী বনবাসী ছিলেন না; তাঁহারা কৃষিকর্ম করিয়া গোপালন করিয়া গার্হস্থ্যজীবন যাপন করিতেন।"

সুতরাং দেখি লেখক শুধু পণ্ডিত নন, তাঁর দৃষ্টিও স্বচ্ছ। এই শ্রেণীর লেখক যদি রবীন্দ্র-অনুরাগী হন তো বই যে উপাদেয় হবে তা বলা বাহুল্য।

অধ্যাপক মহাশয় প্রচুর উদ্ধৃতির সাহায্যে বিভিন্ন ভাগে তাঁর বিষয়ের আলোচনা করেছেন, যথা উপনিষদের সঙ্গে

রবীন্দ্রনাথের মিশ, উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্র মানসের স্বাতন্ত্র্য, রবীন্দ্রনাথের মানবতাবোধ, অমরত্বের আদর্শ, মুক্তির আদর্শ, ঈশ্বরের মধ্যে দ্বন্দ্ববোধ, ইত্যাদি।

বইখানি ২৬৮ পৃষ্ঠা দীর্ঘ, কোনো কোনো অংশে, বিশেষত শেষের দিকে, উপনিষদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগ চোখে পড়ে না বলে কারো কারো মনে হতে পারে আয়তনে আরো ছোট হলে ক্ষতি ছিল না। উপনিষদের সূত্র ধরে লেখক রবীন্দ্র সাহিত্যের অনেকটা সাধারণ আলোচনাই করেছেন। কিন্তু পড়তে ভাল লাগে, সেটাই বড় কথা।

ইন্দ্রনাথ

তিন শাড়ী, লেখিকা **নীলিমা দাশগুপ্ত**, নয়া প্রকাশ, ৩ টাকা।

বইখানিকে মনোসমীক্ষণ ও মনোবিশ্লেষণের উপন্যাস বলে বর্ণনা করা হয়েছে। নায়ক মানস মানসিক রোগের চিকিৎসক, নায়িকা তিনটি—সুস্মিতা, রমা ও নীতা। শেষোক্তাটি ইংরেজ-শাসনা। এরা পরপর নায়কের জীবনে এসে বিভিন্ন কাহিনীর সৃষ্টি করেছে, কেউই তাকে সম্পূর্ণ করে পায় নি, কারণ, বইয়ের শেষের দিকে দেখি: "এ সব হৃদয়ঘটিত ব্যাপারকে ও কোনোদিনও খুব বেশী দাম দেয়নি, আজও দেবে না। প্রেম-প্রণয় এসব মানস নিজের কাছে নিছক সেন্টিমেন্ট ছাড়া আর কিছু নয় - না তাও না, একটা স্নায়ুবিক [?] ব্যারাম।" অথচ গল্পের আরম্ভে পুরী ও শিলঙে হানিমুন যাপন কালে তার উচ্ছ্বাসের একটু বাড়াবাড়িই দেখা গেল।

মানসের হাসপাতালকে আশ্রয় করে বিভিন্ন মানসিক রোগের অনেক case history উদ্ঘাটিত করা হয়েছে পৃথক গল্পের মত, রোগের উৎপত্তি ও চিকিৎসা সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হয়েছে। একটি বিবাহিত মহিলার রোগের কারণ তাঁর প্রেমিক রবি ঘোষ, তাঁকে ফেরা করতে করতে ডাক্তার যে ক্ষেপে গেলেন এটাও তাঁর চরিত্রের পরিপন্থী হয়েছে মনে হয়; তাঁর বিশ্বাস জানা ছিল চিকিৎসকের কাজ শুধু রোগ সারানো, পাপ পুণ্যের প্রশ্ন সেখানে অবান্তর।

গল্পের সূত্র এক জায়গায় জোড়া লাগানো গেল না। ৪০ পৃষ্ঠায় মনে হয় মানসের প্রথমা স্ত্রী সুস্মিতা হঠাৎ বুঝি অন্ধ হয়ে গেল, কিন্তু অনেক পরে কাহিনীতে আবার যখন সে দেখা দিল তখন মনে হয় সে পাগল হয়েছিল। দার্জিলিঙে এতদিন কোথায় ছিল সে? পরে মানসের ব্যবহার দেখেও তো মনে হয় না সে স্বামী-ত্যক্তা। সে বেঁচে থাকলেও মানসের দ্বিতীয়া স্ত্রী গ্রহণ কি করে ঘটল তাও স্পষ্ট নয়।

বইয়ের কয়েক জায়গায় সাইকো-অ্যানালিসিস কথাটা ব্যবহার হয়েছে, এবং মনে হয় মানস ঐ বিদ্যায় পারদর্শী। সাইকো-অ্যানালিসিস মানসিক চিকিৎসার একটি বিশেষ পদ্ধতি মাত্র, ফ্রয়েড যার প্রবর্তন করেছিলেন। ৯১ পৃষ্ঠায় চারতলা বাড়ির রূপক দিয়ে মানুষের মনের যে চিত্রটি আঁকা হয়েছে তা ফ্রয়েড-তত্ত্বের সঙ্গে মেলে না। সাইকিয়াট্রি কথাটা বরং আরো সাধারণ।

আয়োজন, সহসর, ভংগী, আকাঙ্খা, মনযোগ, ইত্যাদি অশুদ্ধি চোখে পড়ল; তাছাড়া আছে অনাবশ্যক ইংরেজির ব্যবহার, যেমন, "নক করে ঘরে ঢুকল।"

ইন্দ্রনাথ

কাঞ্চন তৃষ্ণা, লেখক **বিমল শর্মা**, চিনকো, ৩·৫০ টাকা।

উপন্যাসখানি বাংলাদেশের এক সংবাদপত্রের আপিসকে আশ্রয় করে রচিত। লেখক প্রথমেই বলে নিয়েছেন যে চরিত্রগুলির মধ্যে "শতকরা নিতান্তই আকস্মিক ও অনিচ্ছাকৃত।" তথাপি অনেকগুলি ব্যক্তিই পাঠকদের চেনা চেনা মনে হবে, যথা মালিক শচীন্দ্রনাথ, নির্ভীক সাংবাদিক ধ্রুবনীলেশ ঘোষ,

হবিবাবাদী সাহিত্যিক অভিজিৎ মিত্র, যদিও হয়তো তাঁদের সম্পূর্ণ বাস্তবিক ছবি আঁকবার চেষ্টা করা হয়নি। সংবাদপত্র আপিসের কলকব্জা, স্বার্থপ্রণোদিত নীতি, ইত্যাদির খবর জানতে অনেকের ভালই লাগবে। তা ছাড়া ডালপালায় আরো নানা রকম পাত্র পাত্রীর অবতারণা করা হয়েছে; এদের অনেকেই জড়িয়ে পড়ল সমাজের বিবিধ ব্যাধির কবলে; কোনো মেয়ে বৃদ্ধ স্বামী বিয়ে করে পাগল হয়ে গেল, কেউ আবার বিয়ের আশা নেই বলে ঘর ছাড়ল, কেউ মরল 'চিত্রতারকা' হবার লোভে। খবরের কাগজে প্রকাশিত কতগুলি সাম্প্রতিক ঘটনাকে আশ্রয় করেও নাটকীয় গল্প বানানো হয়েছে – কি করে পয়লার অভাবে মধ্যবিত্ত গৃহস্থ স্ত্রী ও সন্তানকে মেরে নিজে মরল, রিক্সাওলা ক্ষুধার্ত শিশুর মাথাটা থেঁতলে দিল দেয়ালের গায়ে আছাড় মেরে, ইত্যাদি।

এ ছাড়া আছে সমসাময়িক এটা সেটার সমালোচনা ও প্রতিবাদ, তাতে বইখানার documentary ভাবটা আরো বেড়েছে। কলকাতার সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য যে পরিকল্পনা তৈরি হচ্ছে তার বিরুদ্ধে মন্তব্য দেখা গেল এই রকম: "অতীতকে ধরে রাখবার romance ভয়ানক মূল্যবান। এঁদো গলির কলকাতা, কালীঘাটের কলকাতা, মিছিলের কলকাতা, দারিদ্র্য আর অনশনের কলকাতা বাঁচুক না, যদ্দিন বাঁচে!" কলকাতার নাগরিকরা শহরের বিবিধ ও ক্রমবর্ধমান সমস্যার সঙ্গে যুঝতে যুঝতেও ক'জনে এমন মত সমর্থন করবেন জানি না। অভিজিৎ মিত্র দেশের এক মহান ব্যক্তির 'কুৎসা' রটনা করেছেন বলে ছাত্রদের প্ররোচিত করা হচ্ছে তাঁর পৃষ্ঠপোষক পত্রিকার আপিসের কাঁচ ভেঙে দিতে, টেবিল চেয়ার গুঁড়িয়ে দিতে। ভারতীয় সংস্করণে গণতন্ত্রের এই চেহারা আমরা রোজই দেখছি। এদেশে মহান ব্যক্তিদের প্রতি অন্ধ ভক্তি না জানালেই, তাঁদের দেবতা না বানালেই অনেকের দৃষ্টিতে তা কুৎসা হয়ে দাঁড়ায়—অভিজিৎ মিত্রের বন্ধু না হয়েও একথা বলা চলে।

বুদ্ধিজীবী শব্দটার ভুল বানান বারে বারে চোখে ঠেকল।

ইন্দ্রনাথ

Island, by Aldous Huxley, Chatto & Windus, London 1962, 18sh.

এখন সব সম্ভ্রান্ত পত্রিকাতেই নিয়মিত পুস্তক-সমালোচনা প্রকাশিত হয়। অনেক সময়ে সমালোচকরা নিন্দা বা প্রশংসাসূচক মন্তব্য করেন, একই বই সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মতও দেখা যায় বিভিন্ন জায়গায়। সেগুলি পড়ে সন্দেহ জাগে মতামতের সার্থকতা সম্বন্ধে, কারণ তার অনেকখানিই লেখকের ব্যক্তিগত রুচি, সংস্কার, শিক্ষা ইত্যাদির উপর নির্ভর করে; তেমনি পাঠকরাও বই পড়ে নিজেরাই বিচার করে থাকেন। তাঁদের সাহায্য করা যায় লেখকের ও বইয়ের পরিচয় (সমালোচনা নয়) দিয়ে, বর্তমান নিবন্ধটি সদ্য-প্রকাশিত এক বিদেশী উপন্যাস সম্বন্ধে সেই রকম চেষ্টা মাত্র।

অল্ডাস হাক্সলি যখন লিখতে আরম্ভ করেন তখন তাঁর রচনার প্রধান উপাদান ছিল cynicism ও sex। Point Counter Point, Those Barren Leaves ইত্যাদি উপন্যাসের পাত্র পাত্রীরা অর্থহীন জীবন যাপনে ব্যস্ত, নিত্য নতুন উত্তেজনার অনুসন্ধানে ক্রমেই অধিকতর অসহিষ্ণু। এই ধরণের বই লিখে জীবন কাটালে লেখকের জনপ্রিয়তা হয়তো বাড়ত বই কমত না, কিন্তু যাঁরা তাঁর গভীর অধ্যয়ন ও পাণ্ডিত্যের ইঙ্গিত পেয়েছিলেন (হাক্সলি নিজেই স্বীকার করেছেন যে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় পাঠ্য হল Encyclopaedia Britannica), তাঁরা জানতেন এই কাজে তিনি বেশীদিন তৃপ্তি পাবেন না।

অন্বির অনুসন্ধানের ফলে এঁর রচনার মোড় ঘুরল Eyeless in Gaza উপন্যাসে, তারপর থেকে প্রবন্ধ-গ্রন্থের

ফাঁকে ফাঁকে তিনি আরও কয়েকটি দার্শনিক উপন্যাস রচনা করেছেন। এগুলিতে যে সার্থকতার সুর মেলে তার অনেকখানি এসেছে প্রাচ্য দর্শনের থেকে। লেখকের Perennial Philosophy বইখানার সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরা জানেন তিনি এদিকে কতখানি অনুরক্ত।

আলোচ্য বইখানি পূর্বের ধারা বজায় রেখেছে, তবে আজকের দ্রুতপরিবর্তনশীল জগতের সঙ্গে সুর মিলিয়ে অনেক নতুন কথাও বলেছে। তা ছাড়া আছে লেখকের অতি প্রিয় আর একটি বিষয়: দক্ষিণ আমেরিকায় কতগুলি cactus থেকে mescalin জাতীয় ভেষজ তৈরি হয়েছে, তা খেলে নাকি মানুষের তৃতীয় দৃষ্টি খুলে যায়, অতি সাধারণ বস্তু অসাধারণ রূপে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, অবাস্তব হয় বাস্তব। এই আশ্চর্য অভিজ্ঞতা ও আত্মার জগতে তার গভীর সার্থকতা সম্বন্ধে ইতিপূর্বেও হাক্সলি সবিস্তারে লিখেছেন Doors of Perception এবং Heaven and Hell বইতে।

এ বইয়ের কাহিনী অতি সামান্য, প্রায় বলা চলে বর্তমান জগতের বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে লেখকের মতামত গল্পের কাঠামোতে সাজানো। নায়ক এক ইংরেজ যুবক, জীবনে নানা তিক্ত অভিজ্ঞতার পর বিবেককে বিসর্জন দিয়েছে সে, সহজ পথ বেছে নিয়েছে আরও অনেকের মত। এক ধন-কুবেরের গুপ্তচর হয়ে সে এসে পৌঁছাল পূর্বাঞ্চলের পালা নামক দ্বীপে, উদ্দেশ্য সেখানকার তেলের খনি হস্তগত করা। এই দ্বীপটি যে কোথায় তা লেখক স্পষ্ট করে বলেননি, তবে মনে হয় ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার মাঝামাঝি: অধিবাসীরা বৌদ্ধ, অনেকেরই ভারতীয় নাম, রমা, লক্ষ্মী, সুশীলা, সরোজিনী, বিজয় ইত্যাদি। এই কাল্পনিক স্বর্গ বা utopia-য় সব সমস্যার যথাযোগ্য সমাধান করে মানুষ সত্যিকারের বাঁচা বাঁচতে শিখেছে; কি কি ব্যবস্থায় তা সম্ভব হল তারই বর্ণনায় কেটেছে বইয়ের অধিকাংশ। কিন্তু বিশ্বগ্রাসী লোভ, অন্ধসংস্কার, মেকী আদর্শবাদ এবং নিছক পাগলামির জন্যে পালা অতি ক্ষুদ্র দ্বীপ রাজ্য, শেষ পর্যন্ত সেও তলিয়ে গেল, তাকে 'উদ্ধার' করতে এল আধুনিক সভ্যতা ..জাতীয়তাবাদ ...একনায়কত্ব।

লেখকের ভাষা ও বক্তব্যের কিছু নমুনা: পালাবাসী বোঝাচ্ছে নায়ককে কি করে নিজের অনুন্নত দেশের সমস্যা মেটানো সম্ভব হয়েছে. "To begin with, we never allowed ourselves to produce more children than we could feed, clothe, house, and educate into something like full humanity. Not being over-populated, we have plenty. But although we have plenty, we have managed to resist the temptation that the West has now succumbed to—the temptation to over-consume"। বর্তমানে মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু অজ্ঞতা, যুদ্ধনীতি ও অবাধ প্রজনন, and the greatest of these is breeding No hope, not the slightest possibility of solving economic problems until *that's* under control. As population rushes up, prosperity goes down, discontent and rebellion, political ruthlessness and one-party rule, nationalism and bellicosity begin to rise"। অনুন্নত দেশের নেতারা কি করে নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনছে পশ্চিমের অন্ধ অনুকরণে সে সম্বন্ধে: "they want to throw their weight around; they want to have armies, they want to catch up with the motorized television-addicts of America and Europe ..The underdeveloped countries aren't committed. They don't *have* to follow your example. They're still free to take the road we've taken—the road of applied biology, the

road of fertility control and the limited production and selective industrialization which fertility control makes possible, the road that leads towards happiness from inside out, through health, through awareness, through a change in one's attitude towards the world; not towards the mirage of happiness from the outside in, through toys and pills and non-stop distractions"।

বলা বাহুল্য, প্রধানত যাঁরা গল্প উপন্যাসে অনুরক্ত এ বই তাঁদের জন্য নয়। কিন্তু এই পত্রিকার পাঠক পাঠিকাদের মধ্যে নিশ্চয় এমন অনেকে আছেন যাঁরা সমাজ-বিজ্ঞান ও দেশ গঠনের নানা সমস্যার প্রতি মনোযোগী। বিদগ্ধ লেখকের এই বইতে তাঁরা চিন্তার খোরাক অনেক পাবেন, সব বিষয়ে মতের মিল না হলেও।

ইন্দ্রনাথ

উত্তরাপথ : সমর গুহ, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলিকাতা-১২ ২য় সংস্করণ। দাম : ৩·০০ টাকা।

উত্তরাপথ নামে শ্রীযুক্ত সমর গুহ একখানি ভ্রমণ কাহিনী লিখেছেন। বইটি ভাল লাগল। এই ধরণের পুস্তক আরো লেখা হোক।

উল্লিখিত বইখানি সম্পর্কে প্রথমত : এই দুই লাইন স্বাক্ষরিত সমালোচনা লিখে নিশ্চিন্ত হলাম। প্রকৃত পক্ষে পাঠক এই কথাগুলো দেখলেই নিরাপদ বিবেচনায় লাইব্রেরির তাক থেকে পুস্তকখানি মনোনয়ন করে থাকেন। অবশ্য সমর গুহ মহাশয়ের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি আছে, তাঁর রচনাশৈলী বহুজন প্রশংসিত।

জানিনা উত্তরাপথ কি মোহন গানে আবালবৃদ্ধবনিতার মনোহরণ করে থাকে কতদিন কাল ধরে। 'দ্যান ইটার অফ্ কুমায়ুন' পড়ার পরে ভয়ে ওদিকে যাবার কথা ভাবা যায়! তারপরেও আছে 'দ্যান ইটার অফ্ রুদ্রপ্রয়াগ'। অতএব ভীরু মানুষের সাহস কোথায়?

পড়েছি জলধর সেনের 'হিমালয়,' বীভৎস লছমন ঝোলার বিবরণ। পড়েছি প্রবোধ কুমার সান্যালের 'মহাপ্রস্থানের পথে'র কণ্টকময় পথের বিচরণ। পড়েছি পুরাতন 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' পত্রিকায় 'বদরিকাশ্রমদর্শন', পড়েছি অনুরূপাদেবীর 'উত্তরাখণ্ডের পত্র'। সত্য বলতে কি, প্রলুব্ধ হইনি।

কিন্তু এই বইখানি পথে টানে যে। ভাষার মনোহারিত্ব, তথ্য সম্পর্কে সতর্কথনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, যা সাধারণতঃ দেখা যায় না। পাঠক বইখানির মধ্যে সাহিত্যপিপাসুমনের পিপাসানিবৃত্তি পাবেন, ওই সঙ্গে পর্যটক মনও তৃপ্ত হবে। পথিক হয়তো তাঁর ঝোলায় বইখানি নিয়ে যাত্রা করবেন।

বস্তুনিষ্ঠা আজকাল ভ্রমণকাহিনীর মধ্যে বিলীয়মান রেখায় অবসিতপ্রায়। লেখককে ধন্যবাদ, তিনি 'উত্তরাপথে' কথাশিল্পীর মোহ আরোপ করে সাধারণকে অলৌকিক রং এ রঞ্জিত করেননি। অধিক বিক্রয় হবে বলে এগ্রন্থটিকে তিনি রূপকথার রাজ্যে নিয়ে যাননি।

ভ্রমণকাহিনী কেবলমাত্র রাগ বা অনুরাগের ইতিহাস নয়। ভ্রমণকাহিনী সংবাদবহ না হলে সেখানে পাঠক কি পাবেন? হাল্কাচালের কোন রম্যরচনা ভ্রমণবৃত্তান্ত নয়, মধুরমিলন বা বিরহকথাও নয়। ভ্রমণ পথের নির্দ্দেশতত্ত্ব। নইলে তার জাত যায়। সেই পথের নির্দ্দেশতত্ত্ব পথেই মনকে টানে। পথের প্রতিটি বাঁকের নির্দ্দেশ দিয়ে থাকে। পর্যটক পথের তথ্য জানেন। ভ্রমণতত্ত্ব পথের নির্দ্দেশতত্ত্ব, পথের গাইড।

আলোচ্য ভ্রমণতত্ত্ব সেই অভীপ্সার পরিপূরক। ভৌগলিক সীমানা ও পরিবেশকে পরিস্ফুট করেছে বর্ণাঢ্য ভাষাসম্ভার।

সর্বত্রই একটি শিল্পীমন প্রাধান্য পেয়েছে। "শুধু একটি মাত্র কুসুম তুলে নিলাম। একটি নীলমণি, কোমল পল্লবে, সুনীল বর্ণ, কোরক হরিদ্রাভ, পরাগে ঘন কৃষ্ণচ্ছটা।" (পৃ: ২১)

লেখক উদাসী হিমালয়ের যাত্রী। দুর্ধারশীত বদরী-নারায়ণের পথের রূপ—উদাসীন পথ সাধু সন্তের পথ। শুনেছি সাময়িক ভাবেই সে পথ মানুষের মনে সন্ন্যাস আনে। পথের প্রতি কোণে লেখক দেখা পেয়েছেন সাধুসন্ন্যাসীর। তাঁদের কথা নিয়ে বহু সময় ব্যয়িত হয়েছে। মনে লেখকের নানা প্রশ্ন উঠেছে, তীর্থপথসুলভ দার্শনিকতা উদ্রেক হয়ে উঠেছে। কখনও সাধারণ বুলিই অসাধারণ ভাষা ভঙ্গিমায় তিনি আবৃত করেছেন, কখনও বা বিদ্যুত চমকের মত ক্ষিপ্র কোন বিশিষ্ট চিন্তা-লহরী সযত্ন রচিত দার্শনিকতার ফিকে পটভূমি আকীর্ণ করে ভেসে ওঠে—(পৃ: ১১৭ শেষ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) "এই অনির্বচনীয়ই যদি ভগবান, কি প্রয়োজন তবে আবার সেই নির্মম নির্বিকার ভগবানকে দিয়ে!"

প্রকৃতপক্ষে শেষ পৃষ্ঠা কয়েকটার ঈশ্বর চেতনা সর্বাপেক্ষা মূল্যবান অংশ। বেদান্ত দর্শন ও বিজ্ঞানের দ্বন্দ্বময় পটভূমিকায় দোদুল্যমান মানববুদ্ধির যে জিজ্ঞাসা সে তো চিরন্তন মানব-মনের শেষহীন জিজ্ঞাসা।

তবে কি দার্শনিক ভাববাহক বলে বইখানি ভাল লাগে! তাহলে তত্ত্বকথা হিসাবে সরল রচনা বলি কেন! সমগ্র ভাষ্যমান দিবারাত্রির পরিধি চেতনাটির জন্মদাতা। তাই বৃহৎ প্রকল্পকাহিনীর প্রয়োজন হয়েছিল। তত্ত্বের রস পরিপূর্ণ উপভোগের পরে আবার ভাবুকের চাহিদাও মিটে যায়। রবীন্দ্রদর্শনের সেতুবন্ধে লেখকের জিজ্ঞাসা জলধি উত্তীর্ণ হয়ে শান্ত অনুভূতির কেন্দ্রলীন হয়।

"সীমার মধ্যে অসীম তুমি যে বাজাও আপন সুর"—

শ্রীযুক্ত গুহ কিন্তু নীরস দর্শন অতীপ্সু নন, তাই বৈরাগ্য সাধনে যে তাঁর মুক্তি কাম্য নয় একথা তিনি স্পষ্ট ভাষণ করেছেন বহুবার। "বিচ্ছিন্ন সত্তার স্বতন্ত্র অনুভূতি" দিয়ে তিনি দেখেছেন নগাধিরাজ হিমালয়ের মোহিনীরূপ প্রথমে সীমার মধ্যে তিনি খুঁজেছেন অসীমকে—

"কোন অনুপম রূপসীর ললিত অঙ্গকে সুনীলাভ কল্পনে ছায়াময়ী করে তুলবার আগ্রহে শিল্পীর তুলি যদি চঞ্চল হয়ে ওঠে।" (পৃ ৩০) অবশ্য তার "পরে নির্মুক্তনীলিমায়" "উপমার কূল ভেঙে" দেন সহজে।

উক্ত মানসিকতার আরোপ দেখেছি উত্তর ভারতের তরুণ শিল্পী "সারথীর" মুখে শোনা তাঁর প্রেম কাহিনীর সুদীর্ঘ বিস্তারে। যাযাবরের 'বৃষ্টিপাতের' মত প্রবোধকুমার সান্যালের 'মহাপ্রস্থানের পথের' মত, একটি প্রেমকাহিনী এখানে পাই। "মহাপ্রস্থানের পথের নায়কের মত এই প্রেমোপাখ্যান পুস্তকের মর্মনিহিত অবিচ্ছেদ্য বস্তু নয়, এ নয় "বৃষ্টিপাতের" মত সর্বগ্রাসী। শ্রীনন্দার উপাখ্যান উত্তরাপথে প্রক্ষিপ্ত অংশ। কিন্তু কেন? একটি তরল প্রেমকাহিনীর Stunt দ্বারা অলকানন্দার তীরবাহী নগাধিরাজকে ভারাক্রান্ত করে না তুললে কি ক্ষতি হত? প্রকল্পকাহিনীর অঙ্গে অঙ্গে এযাবৎ প্রেম কাহিনীর নিরালম্ব অহেতুক বিস্তারকে আর কি বলতে পারি?

তবে প্রথম কথার মত শেষ কথাটিও বলে যাই। আর একবার বলি বইটি ভাল লাগল।

বাণী রায়

প্রাপ্তিস্বীকার

কবির্মনীষী—নলিনীকান্ত গুপ্ত

ভারত-আত্মা রবীন্দ্রনাথ—নরেশ চন্দ্র ঘোষ

চিকিৎসা বিদ্যার ইতিহাস—নরেশ চন্দ্র ঘোষ

নীল শহরের গলি—জগদীশ চন্দ্র দাশ

এক সমুদ্র দুটি মন—শান্তি ভূষণ রায়।

ব্যক্তিত্ব—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শনিবারের সন্ধ্যায়—শচীন্দ্রনাথ বসু

সম্পাদকীয়

কবি দ্বিজেন্দ্রলালের শতবার্ষিকী

কবি দ্বিজেন্দ্রলালের জন্মশতবর্ষী উপলক্ষে তাঁর জন্মস্থান কৃষ্ণনগরে একটি নাগরিক কমিটি গঠিত হয়েছে। কিন্তু উদ্যোক্তাদের এই শুভপ্রয়াসটি জেলা ভিত্তিকের চেয়ে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের তথা বাংলা-ভাষাভাষীদের ক্ষেত্রে বিস্তৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়। বাংলার জাতীয় জাগরণের ইতিহাসে দ্বিজেন্দ্রলালের গান, কাব্য ও নাটকের অবদান অনস্বীকার্য। দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশী গান এবং নাটকের মাধ্যমে তিনি বাংলার স্বদেশ প্রেমকে যেভাবে উদ্বুদ্ধ করেছেন সেকথা আজ আমাদের কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে তাঁর প্রতি জাতীয় শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা কর্তব্য।

বন্যা-তদন্ত কমিটির সুপারিশ

১৯৫৯ সালে পশ্চিম বাংলায় যে ভয়াবহ বন্যা হয়েছিল তার কারণ নির্ণয় ও বন্যা প্রতিকারের উপায় নির্ধারণের জন্য পশ্চিম বঙ্গ সরকার সর্দার জান সিংহ-এর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেছিলেন। জান সিং কমিটির রিপোর্ট তৈরী হয়েছে। এই রিপোর্টে জানা যায় ১৯৫৯ সালের বন্যায় পশ্চিম বাংলার ৬৩৫৮ বর্গমাইল অঞ্চলের ৫৪ লক্ষ অধিবাসী বন্যা কবলিত হয়েছিল। বন্যায় একশত জন প্রাণ হারায় এবং চার লক্ষ লোকের আশ্রয়ের প্রয়োজন হয়। তাছাড়া, আট হাজার গবাদি পশু বিনষ্ট হয়, চার লক্ষ আশী হাজার গৃহ ধ্বংস হয় এবং পনের লক্ষ একর জমির ফসল নষ্ট হয়। টাকার অঙ্কে কমিটির মতে মোট ক্ষতির পরিমাণ ৩৯ কোটি টাকা। বন্যা পীড়িতদের জন্য তিনকোটি টাকা সাহায্য দেওয়া হয়।

বন্যার স্থায়ী প্রতিকারের জন্য জান সিং কমিটি ১২২ কোটি টাকার একটি সামগ্রিক পরিকল্পনা রচনা করেছেন। কলকাতার প্লাবন-নিরোধের জন্য আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে ২২ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। পনের বছরের মধ্যে এই পরিকল্পনা রূপায়নের জন্য কমিটি জোর দিয়েছেন এবং এই উদ্দেশ্যে তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ক্রমান্বয়ে ১০ কোটি, ৩৯ কোটি, ৪৪ কোটি ও ২৯ কোটি টাকা ব্যয়ের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেছেন। জান সিং কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিম বঙ্গে তৃতীয় পরিকল্পনার আমলে বন্যা নিয়ন্ত্রণ খাতে বরাদ্দ ১ কোটি ৩ লক্ষ টাকা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। তাছাড়া, পশ্চিম বঙ্গের সীমাবদ্ধ ক্ষমতা বিবেচনা করে এই রাজ্যে বন্যা-নিরোধের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অবশ্যই এগিয়ে আসতে হবে। তা না হোলে বার বার বন্যার প্রকোপে পশ্চিমবঙ্গ চূড়ান্তভাবে বিপর্যস্ত হবে।

বিদ্যুৎ সংকটের পুনরাবৃত্তি

পশ্চিম বাংলায় পুনরায় বিদ্যুৎ সংকট দেখা দিয়েছে। গত বছর কলকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন, দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের দুর্গাপুর ও বোকারো তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দুর্গাপুর তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র—সর্বত্রই গোলযোগের ফলে চরম বিদ্যুৎ সংকট দেখা দিয়েছিল। চলতি উৎপাদনকেন্দ্রগুলিতে বিপর্যয় ছাড়াও বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে সরবরাহের ঘাটতি, নিয়ন্ত্রণের পথ বিঘ্নিত করে ব্যাপকতর আর্থিক-সংকটের ভূমিকা

রচনা করেছে। চাহিদার যোগানের জন্য নূতন নির্মীয়মান তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি ১৯৬৪ সালের পূর্বে উৎপাদন-ক্ষম হবে না। এই অবস্থায় বিদ্যুৎ-সংকটের তীব্রতা আরও দীর্ঘদিন পশ্চিমবঙ্গের শিল্প-প্রসারের পথে বিঘ্ন হয়ে থাকবে।

এই পরিস্থিতিতে ডি, ভি, সির তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি বার বার বিকল হয়ে অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি করছে। এমনিতেই কলকাতা-অঞ্চলে সদ্যসাময়িক ঘাটতির পরিমাণ ৩৫ থেকে ৪০ মেগাওয়াট। ২৩শে জুলাই এই ঘাটতির অঙ্ক ১০ থেকে ১৫ মেগাওয়াট অতিরিক্ত বিদ্যুৎ সামর্থ অনুযায়ী ডি, ভি, সি ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনকে সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দেবার পরদিনই ডি, ভি, সির দুর্গাপুর-অবস্থিত দুইটি কেন্দ্র অচল হয়ে যায়। ফলে ডি, ভি, সির সরবরাহ ১০১ মেগাওয়াট থেকে ৪০-১০ মেগাওয়াটে হ্রাস পেয়েছে, যার ফলে কলকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনও তাদের ৭৫ মেগাওয়াট পরিমিত সরবরাহ হ্রাস করতে বাধ্য হয়েছে। কলকাতার নাগরিক জীবন ও শিল্পোৎপাদনের ওপর এই বিপর্যয়ের প্রতিক্রিয়া সহজেই অনুমেয়।

ডি, ভি, সির পৌনঃপুনিক ব্যর্থতা সম্পর্কে সামগ্রিক হিসাব-নিকাশের সময় এসেছে। অচল কেন্দ্র দুইটি ১৯৬১ সালের মাঝামাঝি চালু হবার পর দশবার বিকল হয়েছে। এই কেন্দ্র দুইটির জন্য ব্যয় হয়েছে ১৯ কোটি টাকা। ডি, ভি, সি বন্যানিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। লাভের ব্যবসা বিদ্যুৎ উৎপাদনেও শোচনীয় ব্যর্থতা ডি, ভি, সির সমগ্র ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সংশয়ের সৃষ্টি করেছে। পশ্চিম বঙ্গ সরকারের রাজস্বের একটি বৃহৎ অংশ ডি, ভি সির জন্য বাহিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। সুতরাং অবিলম্বে ডি, ভি, সির সর্বাঙ্গীন পুনর্বিচারের অনিবার্য প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

কলকাতার বস্তী

কলেরা মহামারী কর্তৃপক্ষকে যত দ্রুত বস্তী-অঞ্চলে করে তোলে, আর কোনো অবস্থায় তা দেখা যায় না। অথচ, কলকাতায় সাত লক্ষ লোক বস্তীতে বাস করে। অর্থাৎ, প্রতি চারজন নাগরিকের মধ্যে একজন বস্তী-বাসী। বস্তীবাসী পরিবারগুলির মধ্যে শতকরা ৩৩টির বসবাসের জন্য একটি ঘর রয়েছে, শতকরা ১৭ ভাগের বাসোপযোগী মোটামুটি ব্যবস্থাও নাই। শতকরা ১২টি পরিবারের নিজস্ব কোনো পায়খানা নাই এবং প্রতি ১০০ পরিবারের জন্য শতকরা ৪টির একটি মাত্র পায়খানা আছে।

ড্রেন নাই, জল নাই, আলো নাই, বাতাস নাই—এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেবে, তা আর বিচিত্র কি! পানীয় জলের ব্যবস্থার জন্য বস্তীর মালিকের সম্মতি না পেলে, বস্তীতে নলকূপ খনন করা সম্ভব নয়। অথচ এযাবৎ আইনের পরিবর্তন সাধন করে, এই নিয়তম ব্যবস্থার প্রতিবন্ধকটুকু দূর করা হোলো না! এবারও তিনশত নলকূপ খননের প্রস্তাব বস্তীর-মালিকদের বাধার ফলে কাগজ-পত্রেই রয়ে গেছে।

কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট বস্তী-বাসীদের জন্য উত্তর কলকাতায় যে বাড়ী তৈরী করেছেন আজও তা খালি পড়ে আছে। কারণ কুড়িটাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা ভাড়া দিয়ে বস্তী-বাসীদের সেখানে বাস করার সঙ্গতি নাই। এই বাড়ী তৈরী করতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার যৌথভাবে মোট ব্যয়ের শতকরা ৬২½ টাকা অনুদান করেছেন। অবশিষ্ট শতকরা ৩৭½ টাকা কেন্দ্রীয় সরকার ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টকে ঋণ দিয়েছেন। সরকারের অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধি না করলে ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট ভাড়ার পরিমাণ হ্রাস করতে অপারগ। হিসাব করে দেখা গেছে একটি বস্তীবাসী পরিবার মাসিক ভাড়া দেয় বার টাকা মাত্র। বিকল্প বাসস্থানের সুযোগ না হওয়া পর্যন্ত বস্তীগুলির প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করে, স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থানে কেন পরিণত করা হবেনা, তার কৈফিয়ৎ কে দেবে।

চৈনিক সেনা পরিবেষ্টিত গালোয়ান

লালচীনকে তিব্বত গ্রাসের সুযোগ দিয়ে পঞ্চশীলের দার্শনিক প্রচারে ভারত যখন পরিতৃপ্ত, 'ভারত মিত্র' চীন তখন তিব্বত অতিক্রম করে নীরবে হিমালয় সীমান্তে গুপ্ত সামরিক ঘাঁটি তৈরী করে পঞ্চশীল অনুসরণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেনি, লাদক সীমান্তে ভারতের এক বিরাট অঞ্চল দখল করে, সিংকিয়াংয়ের সঙ্গে ভারতের উপর দিয়ে তিব্বতের যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন করেছে এবং অধিকৃত অঞ্চলে সামরিক ঘাঁটি সুদৃঢ় করে তুলেছে। চীনের পঞ্চশীল নীতি অনুসরণের 'ট্যাকটিক্যাল ম্যানোভার' সম্বন্ধে শ্রীনেহেরুর মনে যখন সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে তখন ভারতের পক্ষে লাদক পুনরুদ্ধার করা তো দূরের কথা, সীমান্ত সুরক্ষার সুব্যবস্থা করা পর্যন্ত কষ্টকর হয়ে পড়েছে। চৈনিক সেনা কর্তৃক গালোয়ান পরিবেষ্টন এবং ভারতীয় সেনাদের উপরে গুলিবর্ষণ ও তার ফলে দুইজন ভারতীয় সৈন্যের আহত হওয়ার সংবাদ তার নিদর্শন!

সম্প্রতি শ্রীনেহেরু লাদক পরিস্থিতিকে 'গুরুতর' বলে আখ্যা দিয়েছেন এবং ভারতীয়দের এ সম্বন্ধে সচেতন থাকার উপদেশ দিয়েছেন, কিন্তু লাদক পরিস্থিতির ঘটনাবলী সম্বন্ধে ভারতীয় জনতাকে ওয়াকিবহাল রাখার যথার্থ কোন চেষ্টাই করা হয়নি,—গালোয়ান এলাকায় যে গুলিবর্ষণ হয়েছে তাও চীনা অভিযোগের এবং সংবাদ প্রকাশের পরে ভারত সরকার কর্তৃক প্রচারিত হয়েছে। হিমালয় সীমান্তে ভারতীয় সুরক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধেই ভারতীয় জনতাকে শুধু অন্ধকারে রাখা হয়নি, একটি আক্রমণশীল রাষ্ট্রের সঙ্গে কূটনৈতিক আচরণেও ভারতের জাতীয় মর্যাদা বার বার বিড়ম্বিত হয়েছে। মঙ্গোলিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে ভারতের সেক্রেটারী জেনারেল আর. কে. নেহেরুর অযাচিতভাবে পিকিং পরিদর্শন এবং সম্প্রতি লাওস চুক্তির বার্তালাপের সুযোগে চীনা প্রতিনিধির সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ মেননের পানাহারের বৈঠকে 'সদালাপ' ভারতের দুর্বলতাকেই আক্রমণকারী চীনের কাছে স্পষ্ট করে তুলেছে। ভারত-চীন যুদ্ধ কাম্য নয়, কিন্তু ভারতীয় জাতীয় মর্যাদার বিনিময়ে সীমান্তের শান্তিরক্ষার সমস্ত দায়িত্ব শুধু ভারতকেই বহন করতে হবে, এরূপ পরিস্থিতিও বাঞ্ছনীয় নয়। ভারত সরকার ক্রমক্রমভাবে এই দ্বিতীয় পন্থাই অনুসরণ করে চলেছে। গালোয়ান তার সুস্পষ্ট সংকেত।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার

জনসংখ্যাতত্ত্ববিদ ডাঃ এস চন্দ্রশেখর কলকাতায় ভারতীয় জনসংখ্যাবৃদ্ধি সম্পর্কে কঠিন তথ্য প্রকাশ করে এই সমস্যার ভয়াবহতার ইসারা দিয়েছেন। ১৯৫১ সাল থেকে গত দশ বছরে ভারতবর্ষের জনসংখ্যা সাত কোটি সত্তর লক্ষ বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার শতকরা সাড়ে একুশ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং সেই একই সময়ে দেশে পরিকল্পনার বিভিন্ন খাতে অর্থব্যয় করা হলেও জনসাধারণের উন্নতি হয় নাই। মূলধন খাতের হিসাবে যেখানে এশীয় দেশগুলির মূলতম প্রয়োজনীয় ক্যালোরীর আনুমানিক হিসাব ২৫০০ ধরা হয়েছে, সেখানে ভারতে এই সংখ্যা মাত্র ১৭০০। ডাঃ চন্দ্রশেখরের মতে ভারতে প্রায় পাঁচকোটি লোক অপুষ্টির শিকার। এদেশে মাথাপিছু ব্যবহৃত বস্ত্রের পরিমাণ ষোল গজের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় তিনশ গজ অবস্থার বৈষম্যের সূচক।

ভারতবর্ষের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে অনুসরণ করছে। বর্তমান জনসংখ্যার দিক থেকে পৃথিবীতে ভারতের স্থান দ্বিতীয় এবং জমির পরিমাণের দিক থেকে সপ্তম। পৃথিবীর মোট জমির শতকরা ২·৪ জমির উপর ভারতবর্ষ পৃথিবীর প্রায় শতকরা ১৫ ভাগ জনসংখ্যা ধারণ করে আছে। উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রকৃতির অনন্তভাণ্ডারের ওপর বিজ্ঞানের পরিপূর্ণ প্রয়োগ এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের

ভিত্তিতে সমাজের কাঠামোর পুনর্গঠন সত্ত্বেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আত্যন্তিক থাকবে কিনা এই প্রশ্নের উপর অতিপ্রজতার সমস্যা একান্তভাবে নির্ভরশীল। উপরোক্ত সর্তে পৌঁছানো পর্যন্ত অতিপ্রজতা যে ভয়াবহ সমস্যা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। অবশ্য এই সর্তগুলিতে কোনোদিন উত্তরণ হবে কিনা সে বিষয়েও সংশয় রয়েছে।

দ্রাবিড় খাজাখান দলের আন্দোলন

মাদ্রাজ সরকারের বিরুদ্ধে ট্যাক্স-বৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলন পরিচালনাকালে দ্রাবিড় খাজাখান দলের প্রায় ৫,০০০ ব্যক্তি গ্রেপ্তার হয়েছে। অন্য প্রদেশে হলে এরূপ ট্যাক্স-বিরোধী আন্দোলন জনসাধারণের সমর্থন লাভ করতো কিন্তু দ্রাবিড় খাজাখান দল কর্তৃক এই আন্দোলন পরিচালিত হওয়ায়, ইহা এক উদ্বেগের কারণে পরিণত হয়েছে। এই দলটি বর্ণ বিদ্বেষের ধুয়া সৃষ্টি করে দ্রাবিড়িস্থানের নামে বিভক্ত ভারতের অঙ্গে আবার বিচ্ছেদের ছুরি চালিয়ে নতুন পাকিস্তান সৃষ্টি করতে চায়। এই বিচ্ছেদপন্থী দলটি এবারের নির্বাচনে মাদ্রাজ বিধান সভায় বিরোধী দলের শক্তি অর্জনে সক্ষম হয়েছে এবং এজন্যই বিষয়টি আরও বিপজ্জনক আকার ধারণ করেছে। একথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে দ্রাবিড়-বংশীয় জনতার একটি বড় অংশ দ্রাবিড়িস্থানের দাবীর প্রতি নিজেদের সমর্থন জ্ঞাপন করেছে। অবশ্যি, আশার কথা যে আন্ধ্র, কেরলা বা কর্ণাটকে দ্রাবিড় বংশীয় লোকের আধিক্য সত্ত্বেও দ্রাবিড়িস্থান প্রতিষ্ঠার আন্দোলন বিশেষ কোন রেখাপাত করতে পারেনি।

বিচ্ছেদ পন্থীদের কঠোর হস্তে দমন করতে হবে সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এই সমস্যাটির সমাধানের পদ্ধতি সম্বন্ধে কতগুলি মৌলিক প্রশ্নও জড়িত রয়েছে। ভারতের ইতিহাসে দ্রাবিড় সভ্যতার অবদান কতখানি সে সম্বন্ধে আজ মৌলিক গবেষণা হওয়া এবং ভারতীয় সভ্যতা যে দ্রাবিড় ও আর্য সভ্যতার মিশ্র অবদান সেই সত্যটির প্রচারে যথার্থ গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন। উত্তর ভারতের পক্ষে দক্ষিণ ভারতের সমস্যাবলী আরও সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করা দরকার। ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণান, যিনি দক্ষিণ ভারতের ঐতিহ্য সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল,—তিনি উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের সংহতির যথার্থ উপায় নির্ধারণে অধিকতর দায়িত্ব গ্রহণ করে দ্রাবিড় খাজাখানের সমস্যার মৌলিক সমাধানের পন্থা নির্দেশ করবেন,—এরূপ শুভ প্রয়াস দেশবাসী আশা করবে।

বিষাক্ত আটা ও ভেজাল ওষুধ

আমেরিকা থেকে দান হিসেবে প্রেরিত আটার রুটি খেয়ে কয়েক বছর আগে কেরলায় প্রায় একশ' জন লোক প্রাণ হারায় এবং মাদ্রাজেও অনুরূপ বিষক্রিয়ার ঘটনা ঘটে। পরে সেই আটা পরীক্ষা করে দেখা যায় যে পশু রক্ষার জন্য যে বীজাণু নাশক রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা হয়েছিল তা রূপান্তরিত হয়ে মারাত্মক সায়নাইড বিষ তৈরী হয়েছিল এবং এরূপ বিষের প্রক্রিয়ায় রুটি-ভক্ষণকারীদের মৃত্যু ঘটে।

সম্প্রতি আমেরিকান আটা ও ময়দা ভক্ষণে বালসা, রাণাঘাট ও আসানসোলে বহুলোক পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হয়েছে এবং আসানসোলের একটি স্কুলে ছাত্রেরা বহুসংখ্যায় আক্রান্ত হয়েছে এবং একজনের মৃত্যুও ঘটেছে। সম্প্রতি কেন্দ্র সরকারের নির্দ্দেশে আমেরিকা প্রেরিত, বিশেষ করে কেন্দ্রকারী মিশনারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রেরিত, গমজাত খাদ্যদ্রব্য আটক করার আদেশ জারী করা হয়েছে।

চার বছর পরে বিদেশ থেকে আমদানীকৃত খাদ্যে বিষক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি ঘটা সরকারের পক্ষে এক শোচনীয় অসর্তকতার পরিচয়। এরূপ গমজাত খাদ্য বাজারে বা কোন প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করার আগে কেমিক্যাল ও মেডিক্যাল পরীক্ষার একটি স্থায়ী ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন।

জয়শ্রী

ভাদ্র ১৩৬৯ · ৫ম সংখ্যা · ২৭ বর্ষ

বিবাহ ও পরিবারের ক্রমবিকাশ

অনিলচন্দ্র রায়

মর্গান-মার্ক্সীয় মতবাদের আলোচনা

গতবারের পর

এখানে টোটেমের কথাও আসে। অষ্ট্রেলীয় অসভ্যের কাছে গোষ্ঠী কেবল মানুষ লইয়া গঠিত নয়, জড়বস্তুও ইহার অন্তর্ভুক্ত। বস্তুজগৎও অসভ্যের আত্মীয়, জ্ঞাতি। বস্তু-জগতের সহিতও সে গূঢ় আত্মীয়তা বন্ধন বোধ করে! বস্তুও তাহার গোষ্ঠী-আত্মীয়। জীবজন্তু, গাছপালা, পাথর সবারই সহিত তাহার রক্তের সম্পর্ক, জ্ঞাতিত্বের বন্ধন। নৃতাত্ত্বিক ফিসনের (Fison) কথায়, এই "The South Australian savage looks upon the universe as the great tribe, to one of whose subdivisions he himself belongs; and all things, animate and inanimate, which belongs to his class, are parts of the body corporate whereof he himself is a part."

দেখা যাইতেছে যে বাস্তব রক্তসম্পর্কই গোষ্ঠীর ভিত্তি নয়। সমাজতাত্ত্বিক দুর্খীমও (Durkheim) বলেন, গোষ্ঠীর ভিত্তি টোটেম, রক্ত নয়। অষ্ট্রেলীয় অসভ্যসমাজ দুইটি 'পরাকুল' বা moeity তে বিভক্ত। এক একটি পরাকুল আবার অনেকগুলি কুল বা গোষ্ঠীতে বিভক্ত। এই সব গোষ্ঠীর এক একটীর সঙ্গে এক একটী টোটেম সংশ্লিষ্ট। গোষ্ঠীজীবন টোটেমকে কেন্দ্র করিয়াই সম্পূর্ণ রকমে চলে। গোষ্ঠীর সঙ্গে এই টোটেমের যোগ নিগূঢ় ও অচ্ছেদ্য। তাই দুর্খীম বলেন, "For the members of a single clan are not united to each other either by a common habitat or by common blood as they are not necessarily consanguineous.....Their unity comes solely from their having the same name and the same emblem, ..." (168) একই নাম, এক সামাজিক অনুষ্ঠান, ক্রিয়াকর্ম, বা টোটেমতত্ত্বে ('Totemic cult) অংশগ্রহণ করে বলিয়াই এই গোষ্ঠী ঐক্যের চেতনা সৃষ্টি হয়।

যাহাকে ফ্রেজার (Frazer) নাম দিয়াছেন "পরিকল্পী টোটেম" (Conceptional totem) তাহার প্রবৃত্তি

আলোচনা করিলেও রক্তপ্রভাব যে একমাত্র ভিত্তি নয় তাহা প্রমাণ হইবে! অষ্ট্রেলীয়ার এরাণ্টা (Arunta) জাতি পিতৃক্রমী। কিন্তু সন্তানের জন্মদাতা এদের মতে পিতাও নয়, মাতাও নয়। সন্তান হইল, ইহাদের মতে, কোন স্থানীয় প্রেতাত্মার অবতার। মাতার গর্ভে প্রবেশ করিয়া রূপ ধারণ করিয়াছে মাত্র। কাজেই এক্ষেত্রে সন্তানের টোটেম-নাম কিন্তু তাহার বংশ নাম হইতে পৃথক। ইহাতে স্পষ্ট হয় যে গোষ্ঠীর ও রক্তসম্পর্ক এক জিনিষ নয়। কারণ পিতার সঙ্গে রক্তসম্পর্ক যদি থাকিয়া থাকে তবে তাহা টোটেম আত্মার সঙ্গে। পিতামাতার যৌনসম্পর্ক এদের কাছে সন্তান প্রজননের কারণ নয়। যৌনসঙ্গম শুধু মাতাকে টোটেম আত্মাকে গর্ভে ধারণ করিবার যোগ্যতা দান করিয়া প্রস্তুত হইতে সাহায্য করে। এই তথ্য স্পেন্সার ও গিলেন (Spencer ও Gillen) বিবৃত করিয়াছেন। ডাঃ রেভারেরও মতে টোটেমের প্রভাব রক্তের প্রভাবের চাইতে প্রবল। "The totem bond is stronger than the bond of blood,..."

এ ছাড়া দত্তক গ্রহণ (adoption) প্রথাও অসভ্যদের মধ্যে বহু প্রচলিত। এই পদ্ধতিতে অন্যগোষ্ঠীর বা বংশের লোক স্বগোষ্ঠীতে অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হয়, এবং ইহারা গোত্রান্তরিত হইয়া নতুন গোষ্ঠীর অঙ্গীভূত হইয়া যায়। এখানেও রক্ত সম্বন্ধ ছাড়াই গোষ্ঠীসম্পর্ক সৃষ্টি হইয়াছে। ওয়েষ্টারমার্ক নিজেও ইহা অস্বীকার করিতে পারেন নাই। ম্যর্গান রক্তসম্পর্কের একটা ব্যতিক্রমরূপে ইহার গুরুত্বকে কমাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। "There was one way and but one, of adulterating gentile descent, namely, by the adoption of strangers in blood into the gens. This practice prevailed but the extent of it was small." (303). কিন্তু ইহার প্রচলন যে সামান্য নয় মোটেও, ইহার যে অসভ্যদের মধ্যে বহু বিস্তৃত প্রচলন রহিয়াছে, তাহা এ যুগের গবেষণায় বাহির হইয়াছে।

এই সব তথ্যদ্বারা প্রমাণ হয় যে রক্তসম্পর্কই গোষ্ঠী গঠনের একমাত্র ভিত্তি নয়। কিন্তু ম্যর্গান রক্তসম্পর্ক ছাড়া অন্যকিছুকে স্বীকার করেন না। তাঁহার চোখে যখনই মাতৃক্রমী গোষ্ঠী পড়িয়াছে তখনই তাঁহার মনে হইয়াছে অসভ্য মাতার সহিত রক্তসম্বন্ধই শুধু স্বীকার করে। শুধু তাই নয়, মায়ের সঙ্গে সম্বন্ধই শুধু অসভ্য জানে ও বোঝে। তাই মাতৃক্রমী গোষ্ঠীই তার কাছে আদিমতম।

কিন্তু গোষ্ঠীসম্বন্ধের সহিত রক্তসম্পর্ক জড়িত নয়। অসভ্য যখন পিতার নামে ও বংশদ্বারা নিজের পরিচয় দেয় তখন ইহার অর্থ এই নয় যে সে মাতাকে জানে না। অথবা মাতৃক্রমী যখন মাতৃবংশের উপাধিতে পরিচয় দেয় তখন পিতাকে তাহা জানে না। একের উপাধি ব্যবহার করে বলিয়া অপরের সহিত সম্পর্ক জানে না, এ ধারণা আমাদের সভ্যজনের আরোপ বই কিছু নয়। ওয়েষ্টারমার্ক এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলেন, "Kinship is based on a method of counting descent by means of names either through the father or through the mother but not through both at once. This however by no means implies that the other line is not recognised as a line of blood-relationship. The paternal system of descent is not necessarily associated with the idea that the mother has no share in parentage, nor is the maternal system necessarily associated with unconsciousness of the child's relation to its father." (205) Westermarck.

এই নাম ও বংশক্রমের পদ্ধতি দেখিয়া অসভ্যের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে এই ধারণা করিলে অবিচার করা হইবে। জন্মদাতা ও জন্মদাত্রী, উভয়েই অসভ্যের কাছে সম্পূর্ণ জ্ঞাত। কিন্তু

গোষ্ঠীব্যাপারে দুই দিকের সম্বন্ধ ব্যবহার করা হয় না। ইহা শুধু গোষ্ঠীব্যাপারেই। এই পার্থক্যটুকু ধরিতে না পারিলে গোষ্ঠীর প্রকৃতি সম্বন্ধে গুরুতর ভুল ধারণা থাকিয়া যাইবে। প্রথম যুগের বিবর্তনীদের এই সূক্ষ্ম পার্থক্যকে বাদদিয়া সরাসরি একটা গড়পড়তা সিদ্ধান্ত করিতে হইয়াছিল। তাই তাঁহাদের সিদ্ধান্তও একদেশদর্শী হইয়াছিল। পণ্ডিত প্রবর লাউয়ীও এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিতেছেন, "The other parents for sib purposes, counts for nothing, just as in European countries outside Spain, the mother is neglected as regards transmission of the family name" (105) পিতা মাতা দুইজনের নাম গ্রহণ করিলে যে নানারকম অসুবিধা হয় তাহা সহজবুদ্ধিতেও ধরা পড়ে। সরাসরি একই রকমের ধারণা ও সিদ্ধান্ত যদি সব অসভ্যসমাজ সম্বন্ধেই করা হয়, তাহাতে ইতিহাসকে সহজ করা যাইতে পারে কিন্তু ইতিহাসের সত্যব্যাখ্যা তাহাতে হয় না।

ইহার পরে বাস্তবজীবনের তথ্যগুলি বিচার করিলে কি দেখি? সব অসভ্য জাতিই যে দুই পিতামাতাকে জানে ইহাই তাহাতে প্রমাণ হয়। পরিবারের বন্ধন শুধু পিতামাতার যৌন-সম্বন্ধের বন্ধন নয়; নানাপ্রকার প্রয়োজন ও বৃত্তির জটীল সমবায় হইতে পরিবার গড়িয়া ওঠে। অর্থনৈতিক কারণ অর্থাৎ জীবিকার্জ্জনের তাগিদও ইহাতে আছে; স্বয়ংসম্পূর্ণ একটা অর্থনৈতিক লোকসমষ্টিই ত পরিবার। তেমনি সন্তানের সহিত পিতা ও মাতা দুয়েরই সম্পর্কে ভাবলোকের কিছুটা বর্ণপাত ঘটে অসভ্যেরও জীবনে, সন্দেহ নাই। সন্তানপ্রীতি শুধু জৈবিক নয়, sentimental সম্বন্ধের বন্ধনও বটে। এই বন্ধনের দ্বারাই শৈশব হইতেই সন্তান অসভ্য পিতাকেও চিনে, শুধু মাতাকেই নয়।

হোপী জাতি মাতৃনামী অর্থাৎ মাতৃবংশের উপাধি সন্তানে বর্ত্তায়। এদের ব্যক্তিগত নামটুকু কিন্তু পিতৃকুলের কোন আত্মীয়া দিয়া থাকে। ইহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে পিতৃবংশের স্বীকৃতি এই প্রথার দ্বারা দিয়া প্রকাশ হইতেছে। হিদাৎসাও মাতৃনামী কিন্তু অন্যান্য বহুব্যাপারেই পিতৃক্রম অনুসরণ করা হয়। আবার পিতৃনামী থোঙ্গা (Thonga) জাতিতে মামার প্রাধান্য খুব বেশী। ভাগ্নের বিয়েতে মামা কন্যাপণের অংশ দাবি করিতে পারে এবং ভাগ্নের জীবনে নানা আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মেও তার প্রধান অংশ থাকে। ভাগ্নেও তেমনি মামার সম্পত্তি ইত্যাদিতে দাবি দেয়। টরেস প্রণালী দ্বীপবাসী জাতিও পিতৃনামী কিন্তু ভাগ্নে মামার সম্পত্তি পায় ও যুদ্ধ কার্য্যে মামার হুকুমেই চলে। ইহাতে প্রমাণ হয় যে পিতা ও মাতা দুইয়েরই যথাযথ অংশ সব অনুষ্ঠানে ভাগ করা রহিয়াছে, এবং দুই পক্ষেরই মর্য্যাদা বিধিমত নির্দ্দিষ্ট আছে। অসভ্যরা এক বংশের উপাধি নেয় বলিয়া অন্য গোষ্ঠীকে জানেনা বা স্বীকার করে না, ইহা কাল্পনিক অনুমান মাত্র।

(২) মর্গানী মতবাদে অসভ্যের পিতৃত্ব অজ্ঞাত। এই কথার উপরে জোর দেওয়া হইয়াছে। এমন কি ইহারই উপরে ভিত্তি করিয়া মাতৃগোষ্ঠীর স্বরূপ ও বিকাশ নির্ধারণ করা হইয়াছে। ইহারই ভিত্তিতে সামাজিক ক্রমবিকাশের সম্পূর্ণ একটা ধাঁধা হইয়াছে। কিন্তু যদি ধরিয়াও লওয়া হয় যে পিতা অজ্ঞাত, তাহা হইলেই যে মাতৃক্রমিক বংশ গণনা হইবেই, এমন কোন কথা হইতে পারে না। "পিতৃত্ব" ব্যাপারটা একটা সামাজিক সংজ্ঞা ইহা শুধুই একটা জৈবিক সংজ্ঞা তাহা নয়। জৈবিক (biological) অর্থে 'পিতৃত্ব' এবং সামাজিক (sociological) অর্থে 'পিতৃত্ব'। এই দুইয়ে পার্থক্য আছে। শিশু স্বয়ং-ও কি আপন গর্ভধারিণী কে তাহা জানে? জানে না। জানার উপায় নাই। কারণ জৈবিক বা দৈহিক সম্পর্ক সম্বন্ধে শিশুর প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকে না। অথচ শিশু শৈশব হইতেই মাকে মা বলিয়া ধরিয়া লয়। ইহার কারণ প্রত্যক্ষ জ্ঞান নয়। ইহার কারণ সামাজিক।

সমাজই এই নির্দেশ দেয়। সমাজই মাতাকে চিনাইয়া তাহার সহিত সম্পর্ক নির্ধারণ করিয়া দেয়। আসলে মাতের সহিত পিতার সম্বন্ধও সেতারা সমাজকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত সামাজিক সম্বন্ধ। অবশ্য বলিতে পারা যায় যে সমাজের কিন্তু প্রকৃত মাতৃত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান আছে। আছে ঠিক এবং মাতৃত্ব যে সমাজে দৈহিক সম্পর্ককে কেন্দ্র করিয়াই সৃষ্ট হয় তাহাও ঠিক। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই জৈবিক সম্বন্ধ ষোল আনা কারণ নয়। মাতৃত্বও একটা সামাজিক সম্বন্ধ ও সংজ্ঞা। জৈবিক সম্বন্ধ ইহার একটা মৌলিক factor নিশ্চয়ই। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে নয়। দত্তকপুত্র গ্রহণের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। এখানে জৈবিক সম্বন্ধ ছাড়াই পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব সামাজিকভাবে নির্ধারিত হয়।

ইহা ছাড়া অসভ্যদের মধ্যে পিতৃত্ব নির্ধারণের জন্য কোথাও কোথাও নানাধরণের আনুষ্ঠানিক রীতি বা conventional rites ইত্যাদি আছে। যেমন নীলগিরি পাহাড়ের টোডাদের মধ্যে। এদের মধ্যে বহুভর্তৃক বিবাহ (polyandry) প্রচলিত। কয়েক ভাইয়ের এক স্ত্রী। স্ত্রী গর্ভবতী হইলে জ্যেষ্ঠ ভাই বসুর্বান নিয়া একরকমের অনুষ্ঠান করে এবং এই অনুষ্ঠানের বলে তাহারই আইনসঙ্গত পিতৃত্ব সাব্যস্ত হয়। যদি স্বামীরা সবাই অনাত্মীয় পুরুষ হয়, তবে তাহাদের মধ্যে যে-যে গর্ভাবস্থায় বসুর্বান অনুষ্ঠান করিবে সেই সন্তানের পিতা বলিয়া মানা হয়। সাধারণতঃ ১ম, ২য়, ও ৩য় সন্তান প্রথম পিতার এবং পরবর্তী গর্ভের সন্তানে অন্যের পিতৃত্ব স্বীকৃত হয়। এখানে পিতৃত্ব সম্বন্ধে জৈবিক অর্থে সন্দেহ থাকিলেও আইনের চোখে পিতৃত্ব সামাজিক প্রথা দ্বারাই সাব্যস্ত হয়। কাজেই পিতৃত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিলেই যে পিতৃত্ব নির্ধারণ করা প্রয়োজন বা সম্ভব হইবে না, তাহা ঠিক নয়। পিতৃত্ব একটা সামাজিক প্রয়োজন। এই প্রয়োজনবোধ অসভ্যেরও রহিয়াছে। তাই পিতৃত্ব জৈবিক ভাবে না হইলেও সামাজিক ভাবে একজন না একজনকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া ওঠে। কাজেই এ অবস্থায় পিতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইলে, মাতৃক্রমী সমাজ পড়িয়া উঠিবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই।

জৈবিক গর্ভায়ন এবং যৌনসঙ্গমের মধ্যে সম্পর্ক আছে, তাহা কোন কোন অসভ্য জানে না। একথা অনেক পণ্ডিত অষ্ট্রেলিয়া সম্বন্ধেও বলিয়াছেন। অথচ অষ্ট্রেলিয়ার নিম্নস্তরের জাতিরা তো পিতৃক্রমী। যাহাকে গর্ভক্রমী টোটেম বলা হয় তাহাতে সন্তানের জন্মে যৌন সঙ্গমের কোন কার্যকারিতা আছে বলিয়া অসভ্য বিশ্বাস করে না। যৌনসঙ্গম শুধু প্রেতাত্মার গর্ভে অবতরণের প্রস্তুতি মাত্র। পিতৃত্বের জৈবিক ভিত্তির কোন মূল্য ইহাদেরও কাছে নাই। কিন্তু ইহারা তবু পিতাকে 'পিতা' বলিয়া স্বীকার করিয়া সামাজিক মর্যাদা দেয়। অজ্ঞাতপিতৃত্ব সম্বন্ধে পণ্ডিত প্রবর যুণ্ড্‌ট্ (Wundt) ও আলোচনা করিয়া জর্মানী ভাষায় বলেন, "A closer acquaintance with the phenomena however, shows that this can scarcely be the case. Thus the idea of the Warramunga that it is the totem ancestor of a woman's husband and not those of any other man that pass over into her, clearly pre-supposes a state of marriage, as does the further fact that these same tribes reckon descent in the line of the father and not in that of the mother." (181)

ওয়ারামুঙ্গা জাতির এই প্রথা হইতে স্পষ্টভাবে প্রমাণ হইতেছে যে জৈবিক পিতৃত্ব অজানা থাকিলেও বংশ পিতৃক্রমী হইতে পারে। ইহারা যৌনসঙ্গমকে পিতৃত্বের কারণ জানেই করে না। অথচ এরা তো মাতৃক্রমী হইল না। প্রকৃত পক্ষে সূক্ষ্মবিচারে ইহা বোঝা যায় যে পিতৃত্ব আদিম জীবনেরও অবশ্য প্রয়োজনীয় সামাজিক সত্য। শুধু রক্তসম্পর্ক নয়। অন্যান্য নানা কারণেই গোষ্ঠীর বংশক্রম বা নামকরণ প্রথা নির্ধারিত হয়। ওয়ারামুঙ্গা রমণীর সন্তানরূপে আসিল কোন্

যুগের অজানা পিতৃপুরুষ কিন্তু স্বামীটী ঠিক আছে। আর স্বামীর পূর্বপুরুষ ব্যতীত অন্যের পূর্বপুরুষ কখনো সন্তানরূপে আবির্ভূত হইবে না। স্বামী-নির্ণয় কীরূপে হইল এ ক্ষেত্রে? স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে নানা ব্যাপার ও কারণের সম্ভবেত ফল এই স্বামী সম্বন্ধে বিশিষ্ট বোধটী। আবার ব্যাঙ্ক দ্বীপে কি দেখি? সেখানে টোটেম—পিতৃপুরুষকে গর্ভে গ্রহণ করিবার রীতিটী একটু ভিন্ন। স্ত্রী স্বামীর টোটেমজন্তুর মাংস খায় এবং এইরূপে সন্তান জন্ম হয় বলিয়া এরা মনে করে। এই সব দৃষ্টান্তে পিতৃত্ব অজ্ঞাত থাকার সহিত বংশ ক্রম বা উপাধি প্রথার কোন অনিবার্য সম্পর্ক নাই ইহাই প্রমাণ হয়।

ইহা ছাড়া আত্মীয়তা বাচক শব্দগুলি পরীক্ষা করিলেও দেখা যায় দুই পক্ষকেই অসভ্যরা সর্বদাই স্বীকার করে। একথা মর্গানও স্বীকার করিয়াছেন। 'Both paternal and maternal kindred are regularly recognised and that such a thing as taking the family name of one parent in no wise precludes important social relations with the kin of the other side." (62, Morgan)

পিতা কোন কালেই, কোন দেশেই অজ্ঞাত নয়। সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিবার পূর্বাপরই আছে। ইহার কারণ জৈবিক ও সামাজিক নানাবিধ। এই সব কারণের সমবায় হেতু সামাজিকভাবে নিরূপিত হইয়া পিতৃত্বও সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে চিরকালই বিদ্যমান। মাতৃক্রমীদের মধ্যেও যেমন পিতৃত্ব নির্দিষ্ট দেখিতে পাই, তেমনি পিতৃক্রমীদেরও মধ্যে মাতৃবংশের স্বীকৃতি পাই। মর্গানের এই যুক্তির কোন যৌক্তিক সমর্থন বা বাস্তব ভিত্তি নাই।

(৩) মর্গানের মতে, গোষ্ঠীর উৎপত্তি একটিমাত্র উৎস হইতে পারে। রক্তসম্পর্কই গোষ্ঠীর অস্তিত্বের ভিত্তি। মর্গানের এই একবাদী ব্যাখ্যার জন্য এক্ষেত্রেও তাহাদের সিদ্ধান্ত এক-দেশদর্শী হইয়া পড়িয়াছে। তাই ইহা বিজ্ঞানবিরোধীও। মর্গানী ছকে অনিবার্য নিয়ম প্রথম স্তর মাতৃক্রম এবং প্রথম গোষ্ঠী মাতৃক্রমী হইবেই। পৃথিবীর সর্বত্রই সব জাতিতেই এই প্রাকৃতিক ও সাধিক নিয়ম অনুসারে স্বতন্ত্রভাবে মাতৃ-গোষ্ঠীর উদ্ভব হইবে এবং হইয়াছে। এই ব্যাখ্যা আজ অচল। সমাজতত্ত্বে বিকীরণবাদ বা Diffusionist Theory কে আজ অস্বীকার করিবার উপায় নাই। মর্গানী মত বিকীরণবাদের বিরোধী। কিন্তু আশ্চর্য এই যে মর্গান কিন্তু গোষ্ঠীর উৎপত্তির বেলায় বিকীরণবাদের সাহায্যই নিয়াছেন। এখানে তাঁহার নিজের ছকের ব্যতিক্রম মর্গান নিজেই করিয়াছেন। গোষ্ঠীপ্রথা যে স্বতন্ত্রভাবে সব জাতিতে আবির্ভূত হয় নাই, ইহা যে কোন একটি বিশেষ ক্ষেত্রে বা জাতিতে উৎপন্ন হইয়া পরে ছড়াইয়াছে, তাহাই মর্গান বলেন। এই বিকীরণবাদ স্বীকার করিয়া মর্গান নিজের মতেরই খণ্ডন করিয়াছেন। যে অনিবার্য যৌন কারণের প্রভাবে অসভ্যজীবনে প্রত্যেক জাতিতে একই ধরনের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা আর থাকিতেছে না। স্বভাবগত কারণ ব্যতীতও বাইরে থেকে আরোপিত হইয়া এই গোষ্ঠীপ্রথা কোন জাতিতে স্থায়ী হইয়া যাইতে পারে। একথা স্বীকার করিলে পিতৃক্রম ও মাতৃক্রম এই দুইই তো এক জাতি হইতে অন্য জাতিতে কৃত্রিমভাবে নানা উপায়ে গৃহীত হইতে পারে। তাহা হইলে অনিবার্য মাতৃক্রম বলিয়া একটা সার্বিক স্তর মানুষের আদিম প্রকৃতির উপর আরোপ করা চলে না। বহুবাদী ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে হয়।

মর্গান তাঁহার ছকের বিরুদ্ধে এই বিকীরণবাদকে মানিলেন কেন? ইহার কারণ এই যে, গোষ্ঠী প্রথা তাঁহার কাছে এত দুর্বোধ্য মনে হইয়াছে যে সহজে ইহার আবিষ্কার হওয়া সম্ভব নয়। তাঁর কাছে গোষ্ঠী প্রথা এত বড় জটিল প্রথা এবং সূক্ষ্ম বুদ্ধির এতখানি পরিচায়ক যে বারবার ইহা ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে নূতন করিয়া সৃষ্ট হইতে পারে নাই। নিশ্চয়ই কোন প্রতিভাশালী জাতি একবার প্রথমে ইহা

আবিষ্কার করিয়াছিল। অপর জাতিরা ইহা শিখিয়া লইয়াছে। স্বাভাবিকভাবে, অতি সহজে, গোষ্ঠীপ্রথার আবিষ্কার একরকম অসম্ভব। মর্গান বলেন, "Instead of a natural and obvious conception, it was essentially abstruse, and as such, a product of high intelligence for the times in which it originated." (388) তাই তাঁর মতে একদা এশিয়া হইতে পুনালুয়া বিবাহ ও পরিবার প্রথমে পলিনেশীয়ায়, এবং পরে অন্যপথে আমেরিকায় আসিয়াছিল। পলিনেশীয়ায় যখন আসে, তখন পুনালুয়া পরিবার ছিল কিন্তু গোষ্ঠীপ্রথা জন্মায় নাই। অষ্ট্রেলিয়ায় পুনালুয়া পরিবার হইতে গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়, মর্গানের মতে। যারা এটা আবিষ্কার করে তারাই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করিল। এবং তাদের মারফতে পৃথিবীতে এ প্রথা ছড়াইয়া পড়িল। এক জাতির মধ্যে প্রথমে তাই ইহার উদ্ভব কল্পনা করিয়াছেন মর্গান। 'A consideration of this principal fact —seems to favour the hypothesis of a single origin of the organisation into gentes" (389) পুনালুয়া পরিবার হাওয়াই দ্বীপে হইল কিন্তু গোষ্ঠী সৃষ্টি করা ইহাদের বুদ্ধিতে কুলাইল না। "It then required an exercise of intelligence to turn this natural Punaluan group into an organisation restricted to mothers children and descendants in the female lines. (443) অষ্ট্রেলিয়ায় গোষ্ঠী হইল কিন্তু এঙ্গেলসের মতে, পুনালুয়া পরিবার হইল না। "The Australians have gentes but not yet the Punaluan family, instead they have a cruder form of group marriage" (Engels, 43p,) এখানে এঙ্গেলসের সঙ্গে মর্গানের মতানৈক্য দেখা যায়। মর্গান কিন্তু অষ্ট্রেলীয় "ব্রেকী"কে পুনালুয়া পরিবার বলিয়া চালাইতে চাহিয়াছেন। অথচ অষ্ট্রেলীয়ায় পুনালুয়া পরিবার মোটেই নাই। এখানে আরো আদিম যৌথ বিবাহ প্রথা রহিয়াছে অথচ গোষ্ঠীপ্রথা উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া এঙ্গেলস্ বলিতেছেন। তাহা হইলে এখানেও ত মর্গানী ছক এবং পরিবারের ক্রম খণ্ডিত হইতেছে। পুনালুয়ার চাইতে আদিম পদ্ধতির যৌথ-বিবাহ থাকিতে গোষ্ঠী কি করিয়া উদ্ভব হইবে?

এখন পূর্ব আলোচনায় আসা যাক্! হাওয়াই দ্বীপে যুক্তির অভাবে গোষ্ঠীর উদ্ভাবন হয় নাই। গোষ্ঠী উচ্চতর প্রতিভার সৃজন। অতএব ইহা সৃষ্ট হইতে পারে না। আত্মীয়পরিজন একত্রে থাকিবে, ইহাতে বিশেষত্ব কিছু নাই; অস্বাভাবিকও কিছু নাই। এই একত্রবাসপ্রথা পূর্বেও ছিল। কিন্তু গোষ্ঠী হইল একটা স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট বস্তু। "It takes a part and excludes the remainder." এটা খুব দুরূহ ও কঠিন ব্যাপার। অবাধ উচ্ছৃঙ্খলতা এবং জ্ঞাতি সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্টজনক। এই নিদারুণ প্রথার কবলে অসভ্যরা হাজার হাজার বছর ছিল। ইহা হইতে মুক্তি দিবার জন্য এই গোষ্ঠী প্রথার আবিষ্কার একটা অদ্ভুতপূর্ব প্রতিভার পরিচায়ক। এখানে দ্রষ্টব্য এই যে এঙ্গেলস্ কিন্তু ইহাকে এতটা দুরূহ মনে করেন না। তাঁর মতে গোষ্ঠী প্রথা অতি স্বাভাবিক ও সহজ। ["When we see that the development of the gens follows not only necessarily but also perfectly naturally from the Punalua family" (16) মর্গান গোষ্ঠীপ্রথাকে এতটা দুরূহ মনে করায় তাঁহার বিবর্তনী ছক ও ক্রমবিকাশের স্তর পর্যায় খণ্ডিত হইয়া যায়। এঙ্গেলস্ এই কারণে মর্গানী ছককে অব্যাহত রাখিবার জন্য মর্গানের মতকে স্বীকার না করিয়া এই বিবর্তনকে স্বাভাবিক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

কিন্তু একস্থানে একদা উৎপন্ন হইয়াছে, মর্গানের এই diffusionist মতবাদ বাস্তব তথ্যের বিচারে টিঁকে না। আমেরিকার সমাজ বিজ্ঞানীরা দেখাইয়াছেন যে এক উত্তর আমেরিকাতেই বহু স্বতন্ত্র, বিকীরণ ক্ষেত্র রহিয়াছে গোষ্ঠী

প্রথার। প্রত্যেকটী ক্ষেত্রেই স্বতন্ত্রভাবে গোষ্ঠী জন্মলাভ করিয়াছে। মিসিসিপি নদীর পূর্বতীরে ও দক্ষিণমণ্ডলে পিতৃনামী ও মাতৃনামী সকলেরই গোষ্ঠিপ্রথা রহিয়াছে। উত্তর পশ্চিম মণ্ডলে হিদাৎসা, মনন্, ক্রো, ইহারা তো মাতৃক্রমী। আবার ব্লাকফুট ও এল্‌গঙ্কীয়ান্ পিতৃক্রমী। উক্ত মণ্ডলের পূর্বদিকেই দুইটী স্বতন্ত্র উৎপত্তি-কেন্দ্র রহিয়াছে গোষ্ঠিপ্রথার। ইহাদের একই উৎপত্তি স্থান হইতে পারে না। উত্তর পশ্চিমের ভূমি জাতির মধ্যে ডাঃ কোয়েবার বিস্তৃত গবেষণা করিয়াছেন। ইহাদের গোষ্ঠিপ্রথা একটী স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট প্রথা। আবার উত্তর পশ্চিম উপকূলের Tlingit ও Taimahian জাতিদের সংগে অন্যদের সাদৃশ্য নাই এ বিষয়ে। সর্বত্রই স্বতন্ত্র উৎপত্তির প্রমাণ পাই। উত্তর আমেরিকার এই সব জাতির গোষ্ঠিপ্রথার তুলনামূলক বিচার করিয়া ডাঃ লাউরী প্রমাণ করিয়াছেন যে একই প্রকারে, পদ্ধতিতে বা একটী মাত্র কেন্দ্রে গোষ্ঠী প্রথার উদ্ভব হইয়াছে, এই মত ভিত্তিহীন। There is no escape from the conclusin that the sib evolved at least four times in North America & accordingly had a multiple origin in the world." (122) মর্গানের single origin বা ঐকিক উৎপত্তি অধ্যায় বিচারে খণ্ডিত হইয়াছে এবং multiple origin বা বহুভিত্তিক উৎপত্তির মতবাদই বিজ্ঞান সম্মত।

এখানে প্রশ্ন আসে, গোষ্ঠী পূর্বসমাজের দ্বন্দ্ব হইতে কীভাবে উৎপন্ন হইতে পারে? মর্গান এখানেও একবাদী। তাঁহার মতে সর্বত্রই segmentation বা বিখণ্ডায়ন দ্বারাই গোষ্ঠীগঠন সম্ভব হইয়াছে। যাহা একটী অখণ্ড গোষ্ঠী বা সংহতি ছিল, সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে একদিন তাহাকে দুইভাগে বিভক্ত হইতে হয়। এই ভাবে প্রত্যেক অখণ্ড undivided দলই কালক্রমে দুইটি কুলে বা পরাকুলে (moeity) বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইহারই নাম দ্বৈতসমাজ বা Dual Organisation. পৃথিবীর সর্বত্র সব জাতিতেই একদিন, মর্গানের মতে, এই দ্বৈত-সমাজ ছিল। ইহাই প্রাচীনতম সমাজব্যবস্থা। এখনো অষ্ট্রেলিয়ায় এই দ্বৈতসমাজ বিদ্যমান রহিয়াছে। এই দ্বৈত-সমাজ আরো বিখণ্ডিত হইয়া বহু গোষ্ঠীর জন্ম হইয়াছে।

কিন্তু গোষ্ঠীর উদ্ভব সম্বন্ধে এই মর্গানী মতও একদেশদর্শী। ক্রমবিভাগ দ্বারা এক হইতে বহু গোষ্ঠীর উদ্ভব হইতে পারে, একথা ঠিক। কিন্তু অন্য প্রক্রিয়ার দ্বারাও গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটিতে পারে, তাহাও সমাজ বিজ্ঞানীদের স্বীকৃত। কতকগুলি স্বতন্ত্র পরিবার বা দল একত্র হইয়াও বৃহত্তর গোষ্ঠী গঠন হইয়াছে। উভয়ক্ষেত্রেই ঐক্যের মধ্যে বৈশিষ্ট্য বা পার্থক্যের চেতনা বিদ্যমান থাকিয়া গোষ্ঠিপ্রথার জন্ম দিতে পারে। লাউরী বলেন: "There is no reason whatsoever why both divison of a unit and accretion of distinct units should not have occurred in different places and at different periods. (124) সংযোজন পদ্ধতিতে গোষ্ঠীগঠন হইতে পারে। বহু তথ্যবিচার করিয়া লাউরী এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন। কোন বিশেষ উপলক্ষে বহুজাতি এখনো একস্থানে আসিয়া একত্র হয়। ধীরে ধীরে এই প্রণালীতে একটা অন্তরঙ্গ ঐক্য সৃষ্টি হইয়া merger বা মিশ্রণদ্বারা বা সদৃশ রীতিনীতির সহযোগ দ্বারা এক হইয়া যাওয়া অসম্ভব নয়। খণ্ডায়ন দ্বারা পরাকুল (mocity) গঠিত হইলে বৃহত্তর সংহতির মধ্যে খণ্ডিত ছোট গোষ্ঠিগুলিতেও থাকিবে। কিন্তু এই সাদৃশ্য অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় না। ইরোকোয়াদের পরাকুল (mocity) একটা, বহির্বিবাহী ছিল, গোল্ডেনবাইজার বলেন। এখন কিন্তু শুধু ক্ষুদ্র গোষ্ঠিগুলিই বহির্বিবাহী। পরাকুল বা mocity সর্বদাই বহির্বিবাহী নয়। হিদাৎসাদের পরাকুল বিবাহের সহিত নিঃসম্পর্ক। আবার চৌতা পরাকুল অন্তর্বিবাহী (Endogamous). এই অন্তর্বিবাহী পরাকুল আবার বহির্বিবাহী পিতৃক্রমীগোষ্ঠিতে বিভক্ত। গোষ্ঠির ধর্ম ও লক্ষণ নানা গোষ্ঠিতে এত নানা বৈচিত্র ও বহুবিধ

রীতিতে পরস্পরবিসদৃশ যে স্বভাবতই সিদ্ধান্ত হয় যে গোষ্ঠীর উৎপত্তিও একটী মাত্র ধারায় হয় নাই, নানা পদ্ধতিতেই হইয়াছে। এ সম্বন্ধে ওয়েষ্টারমার্কও বলেন: The extension of the small family group may have taken place in two different ways, either by adhesion or by natural growth & cohesion. In other-words, new elements—whether other families or single idividuals—may have united with it from without or the child, instead of separating from parents, may have remained with them and increased the group by forming new families themselves. There could be little doubt that the latter was the normal mode of extension." (197)

ওয়েষ্টারমার্কের মতে আদিতে পরিবার ছিল। সেই পরিবারগুলি অবস্থাবিশেষে মিলিয়াছে কিংবা একই পরিবার বংশবৃদ্ধি হইয়া একটা গোষ্ঠী সৃজন করিয়াছে। গোষ্ঠী গঠিত হইলে যে পরিবার লুপ্ত হইয়া গেল তাহা নয়। গোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষুদ্রতর একক (limit) হিসাবে পরিবারও অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া গোষ্ঠীজীবনের দায়িত্ব পালন করিয়াছে। এখানেই মর্গানী মতের সহিত পার্থক্য। মর্গানী মতে পূর্বে পরিবার নাই। শুধু অবিচ্ছিন্ন, এক একটা বৃহৎ মানুষ-সমষ্টি ছিল মাতাকে কেন্দ্র করিয়া। কিন্তু এক সময়ে শুধু বোনদের রাখিয়া ভাইদের আলাদা করিয়া দেওয়া হইল; বোনেদের সন্তান সন্ততি লইয়া এক দল হইল, ইহাই গোষ্ঠী। এই দল-ভাগ একটা ab tract নীতিকে অনুসরণ করিয়া কৃত্রিমভাবে ও সচেতনভাবে সম্পাদিত হইল। এই বিভাগ পদ্ধতি কল্পনা করিয়া একটা অস্বাভাবিক পদ্ধতিকে মর্গান এমন একটা বহুব্যাপক প্রথার ভিত্তি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। মানুষের স্বাভাবিক স্নেহ বৃত্তির সহিতও ইহার বিরোধ। abstract নীতি ঠিক করিয়া কৃত্রিম বিভাগ করাও অস্বাভাবিক ও অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। ওয়েষ্টারমার্কের মতবাদই স্বাভাবিক ও যুক্তি সঙ্গত। ইহার মতে মানুষ আদিতে যূথবৃত্তিক ছিল না। মানুষ ক্ষুদ্র পরিবারে বাস করিত, বৃহৎ উপজাতিতে নয়। পরে খাদ্য প্রাচুর্যহেতু দল গঠনের সুবিধা হইল। বংশভাজী হবার পরে খাদ্যপ্রাচুর্যের সম্ভাবনা আরো বাড়িল। স্পেন্সারও বন্য জন্তুদের কথায় বলেন, শিকারের পশু ইতস্তত: ছড়ান থাকায় চুপে চুপে শিকার করিতে একাকীত্বই সুবিধা-জনক ছিল সেযুগে। অবশ্য কোথাও কোথাও প্রাচুর্যহেতু যূথগঠন সঙ্গে সঙ্গেই চলিয়াছে নিশ্চয়। কিন্তু সাধারণতঃ এক-পরিবারই সেযুগে প্রচলিত ছিল বেশী। পরে যূথবৃত্তি আবির্ভাব হইলে স্বভাবতই নিজের আত্মীয়স্বজনের সহিত একত্রবাসের প্রবণতা ও আকাঙ্খাই হইবে। "And he would be induced to do so not only for egoistic considerations but by an instinct which, owing to its usefulness, would gradually develop, practically within the limits of kinship —the gregarious instinct." (190) ধীরে ধীরে বহু কারণে এই যূথবৃত্তি জন্ম নেয়। সমস্বার্থবোধ, একত্র শত্রু নিরোধ, এক সঙ্গে উপভোগ, ভৌগলিক সান্নিধ্য ইত্যাদি দ্বারা এই বৃত্তি গড়িয়া ওঠে। কাজেই গোষ্ঠী গঠনের মূলেও শুধু একটী নয়, বহুবিধ শক্তির ক্রিয়া রহিয়াছে। মর্গানী মতে কেবল একটী মাত্র কারণের স্বীকৃতি হেতু একদেশ দর্শিতা ঘটিয়াছে।

লুবক্-ও এবিষয়ে মর্গানী মতের বিরোধী। তাঁরও মতে আদিম মানুষ পরিবারে বাস করিত। কদাচিৎ গুহা-গহ্বরে বিপদ আপদে একত্র হবার দরুণ কতগুলি পরিবার একত্র হইয়া যূথ গঠন করে। একই সময়ে যূথ ও পরিবার একই সঙ্গে বিদ্যমান ছিল। পরে ভৌগলিক এবং অন্য নানা কারণে এই যূথের মধ্যে বিভাগ হয়। এই যূথের মধ্যে পরবর্তিকালে টোটেম

অল্প উদ্ভব হয়। এবং ক্রমের মধ্যেই নানা টোটেমী ক্রিয়াকর্ম অনুসারে Totemic cult group টোটেমী দল সৃষ্টি হয়। এই সব দল কখনো আলাদা হইয়া যাইত, কখনো বা একত্র থাকিত। টোটেমী সূত্রে একত্র হইয়া এরা clan বা গোষ্ঠী গঠন করে। "By this time, the Totem unions must have become stronger so that members of a cult-group no longer separated but together with other similer groups formed a clan (162) Wundt

Wundt-র মতে কতগুলি সমূহ দল একত্র হইয়া গোষ্ঠী গঠন হইয়াছে। মর্গানী মতে দ্বৈত সমাজই পৃথিবীতে অদ্বিতীয় আদিমতম সমাজ তাহা খণ্ডিত হইল। অষ্ট্রেলীয় সমাজকেই তাই মর্গানীরা আদিম সমাজ বলিয়া মনে করেন। "Since the latter (Australian) is more archaic than any other known constitution of society" (436) Morgan. কিন্তু অষ্ট্রেলীয় সমাজ যে আদিমতম নয় তাহা বহু পণ্ডিতই মনে করেন। Wundt এর মতে "it has become evident that this organisation especially among the Australian tribes, is an extremely complicated one & points back to a along history involving many changes of custom" (49) Wundt. বরং সিলোনী ভেদ্দ, বাসরানী সেমাঙ্, ও সেনোই প্রভৃতি জাতি অনেক বেশী আদিম অবস্থায় আছে। ইহারা কিন্তু সবাই একবিবাহী এবং পরিবারই এদের সমাজের ভিত্তি। কাজেই দ্বৈত-সমাজ প্রাচীনতম বিধি, একথা স্বীকার করা চলে না।

লাউরীও মর্গানী মতের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাঁহারও মতে দ্বৈতসমাজ কখনই আদিমতম নয়। সমস্ত আফ্রিকার, বহু মার্কিণ এবং এশিয়া জাতিতে এই বহির্বিবাহী দ্বৈতসমাজের একান্ত অভাব। এই হেতু, হয়ত অষ্ট্রেলিয়ার বেলায় বলা চলে, এখানে দ্বৈতসমাজই প্রথম সৃষ্টি হইতে পারে। কিন্তু সারা পৃথিবী সম্বন্ধে একথা অনুমান করা চলে না। "Such concrete facts ..... lead us to reject the theory that moeities were necessarily or even frequently the most ancient representation of a sib organisation. (130)

মর্গানের উল্লিখিত পুনালুয়া পরিবার কিন্তু অষ্ট্রেলিয়ায় নাই। একথা এঙ্গেলস্‌ও স্বীকার করিয়াছেন। আবার হাওয়াইতে মর্গানের মতে পুনালুয়া পরিবার আছে কিন্তু গোষ্ঠী গড়িয়া ওঠে নাই। মর্গানের মতের খণ্ডন তো এই স্বীকৃতি হইতেই হয়।

তারপরে এঙ্গেলস্‌ মর্গানের পরবর্তী তথ্যসংগ্রহের—অর্থাৎ ফিসনের (Fison) সংগ্রহের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন—যৌথ বিবাহ সম্বন্ধে মর্গানের চাইতে অনেক বেশী জ্ঞান সুলভ হইয়াছে। পুনালুয়া ছাড়াও অন্যান্য রকমের যৌথবিবাহও পাওয়া গিয়াছে। এঙ্গেলস্‌ একথা কেন বলেন বোঝা দুষ্কর। কারণ Fison & Howitt-র বই 'Kamilaroi & Kurnai ("কামিলারোই ও কুর্নাই") ১৮৮০ সালে মর্গানলিখিত ভূমিকাসহ বাহির হইয়াছিল। মর্গান এই বইকে স্বমতের সমর্থক বলিয়া উৎসাহ প্রকাশও করিয়াছিলেন। কাজেই Fison-এর সংগ্রহ হইতে কোন নতুন জ্ঞান এঙ্গেলস্‌ পান নাই। অষ্ট্রেলিয়া সম্বন্ধে হাউইট্‌-এর পরবর্তী পুস্তক এঙ্গেলস্‌ দেখিয়া যান নাই। কিন্তু অষ্ট্রেলীয় সমাজের দ্বৈতসমাজ এবং যৌথবিবাহ তো মর্গানী ছকের সমর্থন করে না। বরং ছক ভাঙিয়া পড়ে। এঙ্গেলস্‌ এই অসুবিধা এড়াইয়া গিয়াছেন নানা কাল্পনিক অপব্যাখ্যা দ্বারা। অষ্ট্রেলীয় যৌথবিবাহ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাইবে, এখন শুধু এইটুকুই দেখান হইতেছে যে এই দ্বৈতসমাজ মর্গানী বর-কনেকে খণ্ডন করে।

দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ার মাউন্ট গ্যাম্বিয়ার (Mt Gambier) জাতির দুই পরাকুল বা mocity, ক্রোকী এবং কুমাইট

(Krokl & Kumite)। প্রত্যেকটী পরাকুলই বহির্বিবাহী ও মাতৃকুলী। প্রত্যেক কোকী পুরুষ প্রত্যেকটী কুমাইট কুলনার স্বামী বলিয়া গণ্য। তেমনি প্রত্যেক কুমাইট পুরুষ প্রত্যেক কোকী নারীর স্বামী। কোন বয়স বা সম্পর্কজনিত বাধানিষেধ কিছু নাই। এই ব্যবস্থার ফল কি হয়? ইহাতে পিতাকন্যার বিবাহের কোন বাধা থাকে না। কিন্তু ভাই-বোনে বিবাহ ইহাতে নিষিদ্ধ।

মর্গানী মতে, সমাজ ধীরে ধীরে ক্রমে অবাধসংগম হইতে সমশোনিত বিবাহে আসিবে। পরে পুনালুয়া বিবাহ। অর্থাৎ পিতাকন্যা বিবাহ বন্ধ হইবার বহু পরে ভাইবোন-বিবাহ নিষিদ্ধ হইতে পারে। ভাইবোন নিষেধের অনেক পরে মাতৃবংশের অন্যান্য আত্মীয় বিবাহ বন্ধ হয়। অষ্ট্রেলীয় সমাজে ভাইবোন বিবাহ নিষেধ হইয়া জ্ঞাতিবিবাহ পর্যন্ত নিষেধ হইয়া গিয়াছে কিন্তু পিতা-কন্যাবিবাহ কিন্তু বারণ হয় নাই। মর্গানী ছক অনুসারে ইহা হইতেই পারে না। মর্গান একস্থানে এই দৈতসমাজকে প্রায় অবাধসংগমীদের কাছাকাছি বলিয়া বলিয়াছেন। নির্বাধ যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে শুধুমাত্র একটি বিধি প্রবর্তিত হইয়াছে: "It will be noticed that this scheme of intermarriage is but a step from promiscuity because, it is tantamount to that, with the addition of a method (Morgan 53) এঙ্গেলস্‌ও এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলেন, "the organisation at a time when, inspite of the obscure impulse towards the restriction of in breeding, sexual inter-course between parent & children was still not felt to be particularly horrible—in which case the moeity system must have originated directly out of a state of promiscuity." 47 (Engels)

মর্গান-এঙ্গেলস্‌এর উক্তিতে বহু অসঙ্গতি দোষ রহিয়াছে।

(১) প্রথমতঃ পিতা-কন্যা নিষেধের আগে ভাই-বোন ও জ্ঞাতিবিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে, ইহাতে মর্গানী ছক অগ্রাহ্য হয়।

(২) অবাধ সংসর্গের কাছে বলিয়া দৈতসমাজে পিতা-কন্যার যৌনসংগম তেমন ঘৃণিত হয় নাই এখনো। কাজেই সমশোনিত পরিবারও এখন পর্যন্ত উদ্ভব হয় নাই। এদিকে পুনালুয়া পরিবার আসিয়াছে।

(৩) অচেতন একটা অন্ধ বৃত্তি কল্পনা করিয়াছেন মর্গানীয়া যাহার বশে জ্ঞাতিসঙ্গম (inbreeding) বর্জনের দিকে স্বাভাবিকভাবে অসভ্যজাতি অগ্রসর হয়। তাহাই যদি হয় তবে পিতা-কন্যা বিবাহ-বর্জনই পূর্বে হওয়া উচিত ছিল। কারণ মর্গানী মতানুসারে ভাইবোন বিবাহ আগে ঘৃণিত মনে হয় না।

(৪) মর্গানী মতে ভাইবোনবিবাহ শুধু নয়। দূর জ্ঞাতিবিবাহ বর্জন হইলে তবেই পুনালুয়ার মধ্য হইতে দীর্ঘদিন পরে গোষ্ঠীপ্রথার উদ্ভব হইতে পারে। অথচ এখানে মাতৃতন্ত্রী গোষ্ঠী রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে অথচ পিতাকন্যা বিবাহ চলিয়াছে।

(৫) এই দৈতসমাজের মর্গানী ব্যাখ্যায় দেখানো যে এখানে দূর সম্পর্কীয় দুই ভাইয়ের বা দুইবোনের ছেলে-মেয়েদের মধ্যেও বিবাহ নিষিদ্ধ কিন্তু এদিকে আপন পিসীর বা কাকার সঙ্গে বিবাহ চলিতে পারে। কাকার সহিত বিবাহ হইতে পারে কিন্তু খুড়তুত ভাইয়ের সঙ্গে হইতে পারে না। কাজেই নিকটাত্মীয়সঙ্গম বা Inbreeding ইহাতে বারণ হইতেছে না মোটেও। তাহা হইলে ইহা পুনালুয়া বিবাহের সহিত কোন সাদৃশ্য রাখেনা এবং নিকটাত্মীয় সঙ্গমের নীতিরও কোন নির্দিষ্ট বিধি পালন করে না। কাজেই inbreeding এর দোহাই দেওয়া এক্ষেত্রে অর্থহীন।

এই অসঙ্গতির ব্যাখ্যা করিতে না পারিয়া এঙ্গেলস্ নানা কল্পনার আশ্রয় নিয়াছেন। পুনালুয়া বিবাহের স্তরে পিতা-কন্যা বিবাহ হইলে মর্গানী ছক ভাঙিয়া পড়ে তাই এঙ্গেলস্

বলেন, আইনতঃ এই দৈতসমাজ ব্যবস্থায় পিতা-কন্যা বিবাহ প্রচলিত থাকা উচিত কিন্তু কার্যতঃ হয়তো এই বিবাহ হয়না। হয়তো ইতিপূর্বেই এই প্রথা নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এঙ্গেলসের ইহা অনুমান মাত্র। আর এই অনুমান মানিয়া লইলে দৈত-সমাজ এবং পরাকুল (mocity) প্রথার মর্গানী ব্যাখ্যা অচল হইয়া ওঠে। এঙ্গেলস্ বলেন, অষ্ট্রেলিয়ার কখনো কোনোদিন পিতা-কন্যার বিবাহ হইয়াছে এমন শোনাও যায় নাই। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে mocity-তে বিবাহপ্রথার অর্থ অন্য-রকম বুঝিতে হইবে। এই বিবাহ প্রথাকে যৌথ বিবাহ বলিয়া যেভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তাহা ভুল। এক কুলের পুরুষ অন্যকুলের সব নারীকেই বিবাহ করিতে পারে, ইহা হইল অধিকারের কথা। সব পুরুষের সহিত সব নারীর একসঙ্গে সত্যিসত্যি বিবাহ হইয়া যায় এবং ব্যক্তিনির্বিশেষে সকলের সহিত সকলের যৌথভাবে যৌন জীবন-যাপন চলে, এই ধরণের যৌথবিবাহ মোটেই ইহা নয়! "বিবাহ করিতে পারে" এবং "বিবাহ করে" ঠিক একই কথা নয়। ইহাকে নৃতত্ত্ববিদ ক্রলী (Crawley) বলিয়াছেন "marriageableness এই বিবাহ-যোগ্যতা ফিজি দ্বীপেও পাই কিন্তু কোথাও এই অধিকার কার্যতঃ খাটান হয় না। কিছু সম্বোধন প্রথা এবং কিছু দৈত-সমাজপ্রথা, এই দুই হইতে এই ভ্রান্তি নৃতাত্ত্বিকদের হইয়াছে যে বোধহয় ইহা কার্যতঃ যৌথভাবে সম্পাদিত বিবাহ। ক্রলীর মতে, দৈতসমাজ প্রবর্তনের সুবিধা এই যে সহজে এবং বিনা সংঘর্ষে বিবাহের কথা সুলভ হয়। বহির্বিবাহই আসল কথা। "From his (অসভ্য) point of view the ideal state of things would be that every tribe should be dual, so that wives could be obtained without friction or difficulty. (417)

ইহাছাড়া "কামিলারোই" (Kamilaroi) জাতি সম্বন্ধে বলিতে গিয়া এঙ্গেলস বলেন যে এদের মধ্যে ৮টা গোষ্ঠীর পরস্পরের বিবাহ সম্পর্ক অতিশয় জটীল হইয়া উঠিয়াছে। ইহার সহিত আবার মাতৃক্রমী গোষ্ঠিপ্রথা চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে কৃত্রিমভাবে। তাহাতে এ ব্যবস্থা আরো জটীল হইয়া উঠিয়াছে। যে সমাজব্যবস্থা সরল এবং আদিম তাহা এত জটীল হইল কি করিয়া? ইহাতেই প্রমাণ হয় যে অষ্ট্রেলীয় সমাজব্যবস্থা পরবর্তীকালের। তাহা ছাড়া এঙ্গেলস্ বলেন, গোষ্ঠিপ্রথা "grafted" হইয়াছে। কৃত্রিমভাবে graft করা সম্ভব হইলে অন্তর্নিহিত চারাগাছটীর এবং অনিবার্য ক্রম-পর্যায়ের কী গতি হইবে? তাহাতে তো মর্গানী-মার্কীয় ছক বাতিল হইয়া যায়।

উপরের আলোচনায় তিনটি কথা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে: (১) মর্গানী ছক মনগড়া (২) নিকটাত্মীয়সঙ্গম বর্জনের একটা অন্ধ ও দুর্নিবার instinct ইহারা স্বীকার করিয়া লইয়া তাহার উপরে সমস্ত ক্রমবিকাশকে দাঁড় করাইয়াছেন। এই instinct কল্পনা করিলেও মর্গানী ছক সমর্থিত হয় না। (৩) দৈতসমাজ বলিতেই যৌথবিবাহ বোঝা অন্যায়।

(ক্রমশঃ)

স্মৃতির ঝরোকা

সুনীল বসু

কুটে ফেলো ঐ সত্তির মাংস মজ্জা মেদ
পৃথিবীর নাড়ি-নক্ষত্রের দাগ লেগে থাকে কুষ্মাণ্ড পটলে।
পৃথিবীর তাপ জ্বালো কাষ্ঠখণ্ডে, গনগনে অঙ্গার চুল্লিতে
রান্না বাসনে, অস্থির ছাঁচে নাও পঞ্চভূত, কেশে পরমাণু দোলে।

কুটে ফেলো জলস্রোতের মীন, গলদাচিংড়ি রোহিত মৃগেল
পাতালের অন্ধিসন্ধি সব জানে, রক্তে মিশে গেল কত শস্য, মৎস্য, মেষ।
আমার প্রদীপ যবে পুড়ে পুড়ে হবে নিঃশেষ নিস্তেল
ভস্মমাখা এই দেহ দৃশ্য থেকে অকায় অদৃশ্যে হবে নিরুদ্দেশ।

সব দেখি বস্তুপিণ্ড, বৃত্তচাপ, নক্ষত্রের জালে ভাগ্যরেখা,
বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের লীলা কিছু বুঝি, কিছুবা বুঝি না,
আমি যাই মেলা করি, পৃথিবীর দশা নিয়ে তাকেই ফেরাই
গাছ মৎস্য শস্য কত খাদ্য গিলে তবে হব স্মৃতির-ঝরোকা।

শেষ ঘণ্টা

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

পাপের প্রসিদ্ধ রীতি মধ্যের প্রবাহে মিশে যায়
আর বিষ তরল আগুন, ক্ষিপ্তপ্রায়, গোলাকার···
বুকে কার বাসা আছে···বাগানবাড়ির সেই উদ্বৃত্ত মধুর
বিদেশী রাগিণী কোন, মহীয়সী কটি পপ্‌লার—
দস্যুতা মুখেশে ঢাকা, ছদ্মবেশে লোলচর্ম কার
তারুণ্যে উজ্জ্বল চয়, গলা কার বাঁশির সমান ;

অসুখে এখনো কেন ছুতি আছে···শরীরী প্রাকারে
কেন মনে হয় শেষ সান্ত্বনার স্পর্ধার ইংগিত,
তাকে সেই ধূলোভরা কেতাবের বিচ্ছিন্ন প্রচ্ছদ
খানদুই নামাবলী—লৌহবর্মে মজবুত সিন্দুক ;
তখন পাপের চিহ্ন বৃহৎ স্রোতের গায়ে গায়ে
শেষ বজরাটা কার ভিড়েছিল এপাশের বনে·····

সমস্ত উদ্বৃত্ত দিন শেষ হয়ে গেছে কবে ছুটির ঘণ্টায়
অবান্তর ফুলগুলি শুকনো টবে বদল—কঙ্কাল
এখন মধ্যাহ্ন মানে ব্যস্ততাই, গোধূলির রক্তিম চক্ষুতে
সব প্রতিশ্রুতি কালো ঘনভার রাত্রির শিকার
অক্ষম সময় কার—পাপের প্রতিষ্ঠা নেই আর,
নিকট উদ্যানে ঐ বিবিধ ফলের চাষ নিষ্ঠুর, নির্মম।

সার্কাস

প্রফুল্লকুমার দত্ত

আগুন নিয়ে খেলা করার সাধ
জলন্ত ; আর চাবুক হাতে একা
দশটা বাঘের খাঁচায় বিলম্বিত—
মৃত্যু-সুধা নিত্য চোখে ভাখা !

ভাড়াটে সব ভাঁড়ের চোখে জল,
হাসায় তবু অদ্ভুত নাচ নেচে ;
মানুষ-পশু একত্র সম্বল—
দর্শকেরা দর্শনী দেয় যেচে !

জীবনগুলো বিকোয় মাটির দামে :
চোখের কোণে হিংস্র আগুন জেলে
আমায় ডাকো গোপন কোনো নামে—
দিন যায় প্রাণান্ত খেলা খেলে !

আগুন নিয়মিত ! বাঘের দল
প্রেম-পিয়াসী, চাবুকে চঞ্চল ।

রূপক

নরেন্দ্র সেনগুপ্ত

আড়াল করে রাখতে গেলে, ভয়
আলোর দিকে ফিরিয়ে দেবে পিঠ ;
আয়না নিয়ে কতকালের মুখ
দেখবে তার মুখর ছায়া, আর
শোণিতধারা কাঁপবে শুধু শোণিতধারা ।

একদা এত ঘুমের দেশ, নদীর দেশ
আরব কোন স্বপ্ন এসে উথলে ওঠে জল ;
মুকুর ভাঙে শরীর রাঙে তমুরোহের তাপ
কাঁটার মত বুকেতে বেঁধে ; বুক
সাহসী ছুটি টিলার তবু লালন করে ভয় ।

আড়াল করে রাখতে গেলে, ভয়
আলোর কাছে ফিরিয়ে নেবে ফল
চিরদিনের পতাকা ওড়া সবুজ শিখা গাছে
হঠাৎ ঝড় গোপন বাহু দুটি মুছে নিলে ।

গাছের ডালে অবাক দেহ ঝুলিয়ে দেবে নারী ।

গিরিব্রজাঞ্চলে

সমর গুহ

• • • •

অন্যে হিউ এন চাং ছাড়া অন্যেরা খুব সামান্যই লিখেছেন নালন্দা সম্বন্ধে। নালন্দার নয় শত বছরের কতটুকুই বা জানা যায় এদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত থেকে। হিউ এন চাং এসেছিলেন পণ্ডিত শীলভদ্রের সময়ে। তাই যেদিনে শীলভদ্র ছিলেন নালন্দার প্রধানাচার্য, সেদিন ছাড়া আর বিশেষ কিছুই জানার উপায় নেই হিউ এন চাংয়ের লেখনী থেকে।

বুদ্ধদেব ও মহাবীর অনেকবার এসেছেন নালন্দা গ্রামে। একসময় মহাবীর ও বুদ্ধদেব দু'জনেই একই সময়ে এসেছিলেন এই গ্রামে। বুদ্ধ ও জৈন ধর্মাবলম্বীদের বহু দ্বন্দ্ব ও তর্ক-বিচার ঘটেছে এই খানে। বুদ্ধের প্রধান শিষ্য সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়নের জন্মস্থান নালন্দা। সারিপুত্রের পূতাস্থিও এখানেই সমাধি দেওয়া হয়। সারিপুত্রের স্তূপ বোধ হয় বর্তমান সারিচক গ্রামে ছিল। অশোক এক সময়ে সারিপুত্রের স্তূপে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করতে এসেছিলেন এবং একটি স্তূপ নির্মাণ করেছিলেন।

সারিপুত্রের স্তূপের কাছে একটি ছোট বিহার ছিল। এখানে বিদ্যাচর্চা হতো। তিব্বতী পণ্ডিত তারানাথ লিখেছেন যে এখানে শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ পণ্ডিত নাগার্জুন, আর্যদেব, অসঙ্গ, বসুবন্ধু ও দিঙনাগ শিক্ষালাভের জন্য আসেন। কিন্তু ফা হিয়ানের সময় পর্যন্ত এখানে কোন বড় বিহার গড়ে ওঠেনি। তাঁর ভ্রমণ বিবরণে নালন্দা মহাবিহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু উল্লেখ নেই। পাঁচ খৃষ্টাব্দে গুপ্ত বংশীয় রাজারা প্রথম নালন্দা প্রতিষ্ঠা করেন। হুনেরা এর পরে নালন্দার কিছু ক্ষতি সাধন করলেও মগধের রাজা বালাদিত্য নালন্দার পুনঃ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করেন। এর পরে বিভিন্ন রাজবংশের সহায়তায় নালন্দার শ্রীবৃদ্ধি ঘটে।

নালন্দার কথা ভেবে বিস্ময়ে সত্যি অভিভূত হয়ে যেতে হয়। জ্ঞানার্জনের এমন প্রয়াসের অতীত নির্দশন পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। হস্তিনাপুর ও পাটলিপুত্রকে যদি বলা যায় ভারতের প্রাচীন ও পরবর্তী যুগের রাজধানী, তা'হলে নালন্দাকে বলা যায় ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিক্ষার রাজধানী। একথা সত্যি যে বিভিন্ন যুগ ও বংশের মগধরাজগণের আনুকূল্যে নালন্দা পরিপুষ্ট হয়েছে কিন্তু মূলত নালন্দা ছিল সর্বভারতের শিক্ষা-কেন্দ্র। ভারত ও ভারতের বাইরের রাজারাও নালন্দাকে বিশেষভাবে সাহায্য করলেও নালন্দা বাস্তবিক ছিল স্বয়ং-শাসিত একটি শিক্ষাকেন্দ্র।

আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের যে অর্থ ও আদর্শ, নালন্দা যথার্থই ছিল তার প্রতীক। কোন বিশেষ রাজা, বা বিশেষ দেশের আধিপত্য ছিল না নালন্দায়। নালন্দার সর্বভারতীয় রূপটি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে এর প্রধানাচার্য বরণের ইতিহাসে। হিউ এন চাংয়ের সময় নালন্দার প্রধানাচার্য ছিলেন বাংলাদেশের বিক্রমপুর অঞ্চলের মহাপণ্ডিত শীলভদ্র। কিন্তু শীলভদ্রের আগে প্রধানাচার্য ছিলেন দক্ষিণ ভারতের কাঞ্চিপুর নিবাসী তার্কিক পণ্ডিত ধর্মপাল। বীরদেব, ধর্মকীর্তি, বুদ্ধকীর্তি—এঁরা যে কয়জন প্রধানাচার্যের নাম পাওয়া যায় তারা ছিলেন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসী। দেশ বা জাতি বিচার অথবা রাজ অনুগ্রহ বা অনুজ্ঞাবলে প্রধানাচার্য মনোনীত হতো না। যিনি জ্ঞানে, পাণ্ডিত্যে সর্বপ্রধান ছিলেন তাঁকেই পণ্ডিত সম্মেলন প্রধানাচার্যরূপে নির্বাচিত করতো।

নালন্দায় কয়েক বছর পরপর মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হতো। এই সম্মেলনে সারা ভারতবর্ষ থেকে সহস্র সহস্র পণ্ডিত ও জ্ঞানীর সমাবেশে ধর্ম ও বিদ্যাচর্চা ও বিচার অনুষ্ঠিত হতো। নালন্দায় যে শুধু বৌদ্ধশাস্ত্র পাঠ করা হতো তাই নয়,—বেদ, সাহিত্য, দর্শন, ব্যাকরণ, ছান্দ, অলঙ্কার, স্মৃতি, আয়ুর্বেদ, জ্যোতিষ, রসায়ন ইত্যাদি সে যুগের সমস্ত বিষয়ের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের দ্বারা শিক্ষার ব্যবস্থা হোত।

এখানে তিনটি বড় গ্রন্থাগার ছিল। গ্রন্থাগার তিনটির নাম ছিল রত্নসাগর, রত্নোদধি ও রত্নরঞ্জক। যে ঘর তিনটিতে গ্রন্থাগার ছিল সেই অংশটিকে একত্রে বলা হতো ধর্মগঞ্জ। গ্রন্থাগারকে 'রত্ন'নামে অভিহিত করার পিছনে একটি গভীর

মনের সংকেত পাওয়া যায়। পণ্ডিতদের কাছে কাঞ্চন নয়, —জ্ঞানই ছিল যথার্থ ধন। সেজন্য ভারতের জ্ঞানী ও পণ্ডিতদের কাছে পাটলিপুত্র নয় নালন্দাই ছিল প্রকৃত রাজধানী।

ঘুরে ঘুরে নালন্দার ভাঙ্গা ঢেউল,—অধ্যাপক ও বিদ্যার্থীদের গৃহ, ইটের তৈরী পালঙ্ক, বিদ্যাচর্চা ও তর্ক বিচারের আসন, পূজা ও ধর্মোপাসনার বিহার এবং বিভিন্ন যুগ ধরে যে পরপর নালন্দার কাঠাম রচিত হয়েছে তার সুস্পষ্ট চিহ্ন, বিরাট ও উঁচু বিহারের ভগ্নাবশেষ,—সব দেখতে দেখতে যেন মনের চোখে ভেসে ওঠে সেদিনের সেই জীবন্ত বিশ্ববিদ্যালয়টি। কিন্তু আমাকে সবচেয়ে মুগ্ধ করেছে দ্বার পণ্ডিতের কল্পনা।

তাঁরা ছিলেন দ্বার-রক্ষক নয়,—দ্বার-পণ্ডিত। এই দ্বার পণ্ডিতদের অনুমতি ব্যতীত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার লাভ করা কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না। ভারত ও ভারতের বাইরে থেকে হাজারে হাজারে বিদ্যার্থী আসতো নালন্দার শিক্ষালাভের জন্য। কিন্তু এলেই তারা শিক্ষালাভের অধিকার পেত না। জ্ঞানে ও আচরণে নালন্দার বিদ্যালাভের যোগ্যতা তাদের আছে কিনা তার পরীক্ষার পরে গ্রহণ করা হতো শিক্ষার্থী। এই পরীক্ষার ভার ছিল দ্বার-পণ্ডিতের। দূর-দূরান্ত থেকে শিক্ষার্থীরা এসে প্রথমে অভিধিশালায় দ্বার-পণ্ডিতের তত্ত্বাবধানে স্থান লাভ করতো। দ্বারপণ্ডিত অনেক দিন ধরে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা, দীক্ষা, আচরণ ও অভ্যাস এবং রুচি ও যোগ্যতার পরিচয় গ্রহণ করতেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশেচ্ছুদের সঙ্গে বিদ্যাচর্চার বিতর্কে অবতীর্ণ হতেন, ধীর ও দীর্ঘ পরীক্ষার পরে যোগ্য ও সুচরিত্র শিক্ষার্থীরা প্রবেশাধিকার লাভ করতো নালন্দায়! বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েও প্রবীণ পণ্ডিতগণের সঙ্গে তর্ক বিচারে প্রবৃত্ত হয়ে তাদের যোগ্যতার পরিচয় দিতে হতো।

হিউ এন চাং লিখেছেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা-অভিলাষীদের প্রবেশাধিকারের কঠোর পরীক্ষায় প্রতি দশ জনের মধ্যে ব্যর্থ হয়ে প্রায় সাত জনকেই ফিরে যেতে হতো। এরূপ সতর্ক মনোনয়ন পদ্ধতির জন্যই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় শুধু যে ভারতের শ্রেষ্ঠতম বিদ্যাকেন্দ্র ছিল তাই নয়, হাজার হাজার বিদ্যার্থীর সমাবেশেও এখানকার নিয়মশৃংখলা ও শিক্ষার্থীদের রুচি ও নীতি ছিল অত্যন্ত উচ্চমানের। একবার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের অনুমতি পেলে অন্ন বস্ত্র ও আবাসের সমস্ত দায়িত্ব ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পদ্ধতি ছিল প্রধানত তর্ক-বিচারের। মণ্ডলী গঠন করে বিভিন্ন ছাত্র এবং ছাত্র-শিক্ষকে তর্ক-বিচার হতো। আজকাল যাকে বলা হয় সিম্পোসিয়াম ক্লাস তাই ছিল শিক্ষা পদ্ধতির মূল ভিত্তি। পরীক্ষাও হতো তর্ক বিচারের মাধ্যমে। পরীক্ষা লাভের পরে সমাবর্তন উৎসবের মাধ্যমে উপাধি বিতরণ করা হতো। উপাধিগুলির নামকরণ কিরূপ ছিল হিউ এন চাংয়ের ক্ষেত্রে তার উল্লেখ করা যায়। দীর্ঘদিন বিদ্যালাভের পরে হিউ এন চাং উপাধি পেয়েছিলেন ধর্মাচার্য, মহাযানদেব, মোক্ষাচার্য ইত্যাদি।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্র শুধু ভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। চীন, তিব্বত, সিংহল, বার্মা, সুমাত্রা থেকে শিক্ষার্থীরা আসতো নালন্দায়। নালন্দা থেকে পণ্ডিত পরমার্থকে বিভিন্ন শাস্ত্র অনুবাদ করার জন্য চীনের রাজা নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন। সিংহল ও সুমাত্রাতেও নালন্দার অনেক পণ্ডিত প্রেরিত হয়েছিল। নালন্দার পণ্ডিত শান্তিরক্ষিত অষ্টম শতাব্দীতে গিয়েছিলেন তিব্বতে। সেখানেই তাঁর দেহাবসান ঘটে। নালন্দার পণ্ডিত পদ্মসম্ভবই তিব্বতে লামা ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন।

আধুনিক অবৈতনিক আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং সিম্পোসিয়ামের মাধ্যমে শিক্ষাদানের পদ্ধতি এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতীয় বহুমুখী শিক্ষার ব্যবস্থাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ আদর্শ বলে গণ্য করা হয়। এই আদর্শ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়

শুধু প্রতিষ্ঠা করেনি, এই আদর্শই ছিল নালন্দার ভিত্তি। উচ্চমানের যোগ্যতম বিদ্যার্থীদের জন্য নালন্দার আদর্শ অনুসরণ করে ভারতের প্রতি রাজ্যে ও কেন্দ্রে একটি করে কেন্দ্রীয় অবৈতনিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়?

নালন্দার পতন ঘটে চৌদ্দ শতাব্দীতে। অনেকটা বৌদ্ধতন্ত্রবাদ ঢোকার ফলে নয়শত বছর পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনে শিক্ষার মান হ্রাস পায় এবং অনৈতিক পদ্ধতিও প্রবেশ করে। এমনি সময় বক্তিয়ার খিলজীর আক্রমণে নালন্দা ধ্বংস হয়ে যায়। শত শত শিক্ষার্থীকে হত্যা করে বর্বর আক্রমণকারীরা। এই মানুষ হত্যার চেয়েও বেশী করে হত্যা করে জ্ঞানের ভাণ্ডারকে। নয় শতাব্দী ধরে শত শত পুঁথি সংগৃহীত হয়েছিল নালন্দার গ্রন্থাগারে। সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দেয় বক্তিয়ারের উন্মত্ত সেনানীরা। যে কয়জন মুষ্টিমেয় পণ্ডিত প্রাণে রক্ষা পেয়েছিল তাদের কেউ কেউ সিংহলে, কেউ নেপালে এবং কেউ তিব্বতে পালিয়ে যায়। আজকে তিব্বতী, নেপালী গ্রন্থাগার থেকেই ভারতের পুরানো দিনের 'জ্ঞান বিজ্ঞানের' ইতিহাস আবার উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

হিউ এন চাং লিখেছেন যে বুদ্ধের একটি আশী ফিট তাম্রমূর্তি ছিল। কিন্তু আজ তার কোন চিহ্ন নেই। হয়তো আক্রমণকারী দানবদের কাছে তথাগতের সেই মূর্তির মূল্য ধাতু-মূল্যের চেয়ে বেশি ছিল না। যেখানে মূর্তিটি ছিল সেখানে অতিউচ্চ প্রাকারের একটি মন্দির এখনও অভগ্ন অবস্থায় রয়েছে। নালন্দার মিউজিয়ামে রাজগৃহ ও নালন্দায় প্রাপ্ত মূর্তিগুলি রক্ষিত রয়েছে। রাজগৃহের পুরাকীর্তির মত এমন প্রাচীন ঐতিহাসিক সম্পদ বোধ হয় ভারতের আর কোন মিউজিয়ামে নেই; অবশ্য মহেঞ্জোদারোর স্মারকিগুলি ছাড়া। অতীতের সূক্ষ্ম ও সুন্দর মূর্তি ও পাত্রগুলি মনে কত অজস্র ভাবাবেগের সৃষ্টি করে। সেদিন ও আজকের জীবন, পরিবেশ ও পদ্ধতির—এক বিচিত্র পার্থক্যের চিত্র তুলে ধরে দর্শকের সামনে।

নালন্দায় যে শিলালিপি পাওয়া গেছে তার কয়েকটির সঙ্গে বর্তমান বাংলালিপির গভীর সাদৃশ্য দেখে মনে হয় সেদিনের নালন্দায় ব্যবহৃত লিপির সঙ্গে যেন বাংলালিপির একটি প্রত্যক্ষ সাদৃশ্য ছিল। সেদিনে মাগধি, মৈথিলি ও বাংলা লিপি ও ভাষা এক ছিল কিনা বা এদের মধ্যে পরস্পরের কি সংযোগ ও সমতা ছিল তার একটি তাৎপর্যপূর্ণ সংকেত রয়েছে নালন্দার শিলা-লিপিতে। নালন্দা শেষ পর্যায়ে বাংলার পালরাজাদের অধীনে ছিল। সে সময়েও হয়তো এরূপ শিলালিপি লেখা হতে পারে। বিদ্যাচর্চায় পালি ও সংস্কৃত ব্যবহৃত হতো নালন্দায়। কিন্তু সেযুগে জনসাধারণের ভাষা এবং বিদ্যার্থীদের পারস্পারিক আদান-প্রদানের ভাষা কি ছিল সে সম্বন্ধে গবেষণায় অনেক তথ্য পাওয়া সম্ভব নালন্দায়। আজ পূর্ব ভারতের যে ভাষাসত মানচিত্র গড়ে উঠেছে তার মূল্য কতখানি বা উৎস কোথায় তার অনেক তথ্যের সন্ধান হয়তো এরূপ গবেষণায় পাওয়া যেতে পারে।

আবার মোটরে উঠলাম। এবার যাব পাওয়াপুরীর দিকে। গাড়ি চলছে, আর অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম নালন্দার দিকে। মানব-মনের জ্ঞান-পিপাসার এক পরম কীর্তি এই নালন্দা। আলেকজেন্দ্রিয়ার বা এথেন্সে বা চীনে বিদ্যাচর্চার বড় বড় প্রতিষ্ঠান ছিল। সেখানে অনেক শিক্ষার্থীর সমাবেশ ছিল। জ্ঞান ও গবেষণার অনেক কীর্তি সেখানেও রচিত হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত বিশ্ববিদ্যালয় অর্থে নালন্দার ন্যায় জ্ঞানচর্চার এমন বৃহৎ ও মহৎ প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর আর কোথাও নেই! আন্তর্জাতীয় পণ্ডিত ও শিক্ষার্থীর সমাবেশে বিভিন্ন বিদ্যার উদার নির্মুক্ত ও সমন্বিত জ্ঞানচর্চার জন্য হাজার হাজার বিদ্যার্থীর আবাসিক

ও অবৈতনিক ব্যবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের এরূপ বাস্তব কীর্তিতে নালন্দার ঐতিহ্য অনন্য। আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্পনায়ও নালন্দার আদর্শ এখনো বহুলাংশে অনলস্ত রয়েছে। জ্ঞানের সাধনায় নালন্দা যথার্থই এক অপূর্ব কীর্তি।

তীক্ষ্ণ রোদে তপ্ত হয়ে চুকলাম গিয়ে পাওয়াপুরীতে। পাওয়াপুরী কোন পুরী অর্থাৎ নগর নয়,—একটি প্রাচীন গ্রাম মাত্র। এই পল্লীতে ঢুকবার পথেই রয়েছে, একটি বিরাট জৈন মন্দির! তেমনি বিশাল ইট-পাথরের স্থূল পদুজাকীর্ণ অট্টালিকা, তবে মূল মন্দিরটির বৈশিষ্ট আছে। একটা বিরাট সরোবরের মাঝখানে রচিত হয়েছে মন্দিরটির বিগ্রহ-পীঠ। সরোবর পদ্মবনে ছাওয়া। নীল পদ্মে মনোরম হয়েছে মন্দিরের পরিবেশ, বেশ পরিচ্ছন্ন মন্দিরের অঙ্গন। চতুরবিংশতি তীর্থংকরের জীবন, পরিচয় ও উপদেশ লেখা রয়েছে মন্দিরের গায়ে। দলে দলে লোক আসে এখানে এই মন্দিরটি দেখতে। মহাবীর অনেকবার এসে উপদেশ দিয়েছেন এখানে।

পাওয়াপুরীর প্রাচীন গ্রামের এক খোলা মাঠে একটি নতুন মন্দির তৈরী হচ্ছে, এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। এই মন্দিরটি সম্বন্ধে কল্পনা এবং এর ঐশ্বর্যের খ্যাতি সম্বন্ধে পাটনায় অনেক আলোচনা শুনেছি। তৈরী না হতেই খুব নাম ডাক সুরু হয়েছে মন্দিরটির। কারণ এই মন্দিরটি ভিত্ত থেকে শীর্ষ পর্য্যন্ত ঝকের পালকের মত ঝকঝকে শুভ্র শ্বেত পাথরে তৈরী হচ্ছে। রচনা প্রায় পূর্ণ হয়ে গেছে, সামান্য বাকী।

সঙ্গীদের অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করলেন মন্দিরটি দেখে। শ্বেত-পাথরের অনেক মূর্তিও তৈরী হচ্ছে, যেমন থাকে জৈন মন্দিরে। আমার মনে একটু রেখাও কাটেনি মন্দিরটি, বরং মনে হয়েছে সর্বাঙ্গ শ্বেতপাথরে গড়া এই মর্মর মন্দিরটি যেন রাজস্থানী শ্রেষ্ঠীদের কাঞ্চন-গর্বের আরেকটি স্থূল প্রদর্শনী।

খোলা প্রান্তর ছেড়ে গাড়ি প্রবেশ করলো এবার পাওয়াপুরীতে। নিতান্তই একটি সাধারণ পল্লী এই পাওয়াপুরী। বিহারের কিষাণদের মাটির দেয়াল-ঘেরা টালির অথবা খড়ের চালে তৈরী ঘরগুলি গায়ে গায়ে লেগে ঠাসা ঘুপচীতে গড়ে উঠেছে পাওয়াপুরী। কবি ছাড়া এদের কোন অবলম্বন নেই। কিন্তু জৈনদের পবিত্র তীর্থভূমি বলে এখানে তীর্থ যাত্রীদের যাতায়াতে পল্লীটি মুখর হয়ে থাকে। একসময়ে কথা হয়েছিল জৈন শ্রেষ্ঠীরা গোটা পল্লীটাই কিনে নেবে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত মন্দিরের চারদিকে কিষাণদের থাকতে দেওয়াকেই ধর্মসঙ্গত বলে মনে করে জৈন শ্রেষ্ঠীরা।

গায়ের অলি-গলি দিয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম মন্দিরের দুয়ারে। এই পাওয়াপুরীর মন্দির। পাওয়াপুরী, মানে বাবাপুরী। জৈনদের চতুর্বিংশতি তীর্থংকর বাবা মহাবীর এখানে দেহরক্ষা করেছেন। পাওয়াপুরীকে তাই জৈনদের সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ বলা যায়। পাওয়াপুরীর মন্দিরটিও তেমনি স্থলাঙ্গী। কিন্তু এই মন্দিরটির মাহাত্ম্য মন্দিরের বহিরাঙ্গের আর সব কিছুকেই ভুলিয়ে দেয়, মহাবীরের সমাধির কথা স্মরণ করে।

জৈন তীর্থংকর মহাবীর ছিলেন তপস্যা ও তিতিক্ষার এক পরম মূর্তি। কী কঠোর কৃচ্ছতার পথে দেহের স্থূলভাবকে অস্বীকার করে আত্মার সূক্ষ্ম অনুভূতির সন্ধানী হয়েছিলেন এঁরা! পরমাত্মার সন্ধানে নিজেদের নিঃশেষ করে দেবার এমন ঐতিহ্য আর কোন ধর্মে নেই, যেমন আছে জৈন ধর্মে। কত জৈন সন্ন্যাসী জীবনের শেষের দিনগুলি অনশন-উপবাসে তিলে তিলে কাটিয়ে সারা দেহকে ক্ষয় করে অন্তিম নিঃশ্বাস ফেলেছেন পরমারাধ্যের স্বপ্ন-সাধনায়।

মহাবীরের সমাধি স্তূপের দিকে চেয়ে চেয়ে নীরবে সবাই নমস্কার করলাম।

গাড়ি চলছে পাটলিপুত্রের দিকে। বিহার শরীফ পার হয়ে প্রাচীন কুসুমপুর বা পাটলিপুত্র, মানে আধুনিক পাটনা।

হস্তিনাপুরের পরেই ভারত-ইতিহাসে রাজধানী রূপে পাটলিপুত্রের খ্যাতি। কিন্তু আজ হস্তিনাপুর বা পাটলিপুত্রের পুরাকীর্তির কিছুই নেই। আধুনিক জীবন গ্রাস করে নিয়ে হস্তিনাপুরকে দিল্লীতে, আর পাটলিপুত্রকে রূপান্তরিত করেছে পাটনায়! তবুও কি যুধিষ্ঠিরের কোন চিহ্ন নেই দিল্লীতে। পাটনার জীবনেও অশোক বা সমুদ্র গুপ্ত নিশ্চিহ্ন।

কিন্তু রাজগৃহ বা নালন্দার! শুধু তো ইট-পাথরের জীর্ণ-জীর্ণ পুরাকীর্তির কংকালগুলি পড়ে আছে সেখানে! তবু কি আকর্ষণ সেই ভগ্ন-স্তূপের! রাজগৃহের রাজকীর্তির সামান্য ছোঁয়া আছে, কিন্তু নালন্দায় তা'ও নেই। রাজকীর্তি দর্শনের আকর্ষণে মানুষ রাজগৃহ-নালন্দায় যায় না,—যায় অমর প্রাণের অমৃত সাধনা আর কাঞ্চন-বিমুক্ত জ্ঞানের সাধনার তীর্থ-পীঠে অজস্রের শ্রদ্ধা জানাতে।

চলন্ত মোটরের গতিতে মনে এলো মানব সভ্যতার ক্রম-গতির কথা! মানব সভ্যতার প্রগতিতে কার অবদান বেশী? হস্তিনাপুর বা পাটলিপুত্রের? না, রাজগৃহ— নালন্দার? রাজকীর্তি, না আত্মার ঐশ্বর্য্য? কোনটি মহিমান্বিত আসনে এগিয়ে নিয়ে চলেছে মানব সভ্যতাকে? রাজপুরুষ কবরে আমি। কালপুরুষ শুধু হাসবে। আত্মার প্রাণলহরী পঙ্কিরা থাকবে নিরুত্তর, মৌন!

সমাপ্ত

খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই

গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা	৬·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	৫·০০
ভারত-আত্মার বাণী	৫·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
কর্মবাণী	১·২৫
Soul of India Speaks	5·00

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ. বি. টি.

বিদ্যাসাগর	২·৫০
মানুষের মত মানুষ	·৬২
শিশু রামায়ণ	·৬২
শিশু মহাভারত	·৭৫

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

বাংলার ঋষি	৩·০০
বাংলার মনীষী	১·২৫
বাংলার বিদুষী	২·০০
বীরত্বে বাঙালী	১·৫০
ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৩·০০
রাজর্ষি রামমোহন	১·০০
রবীন্দ্রনাথ	১·০০
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১·২৫
আচার্য জগদীশচন্দ্র	১·৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০

॥ প্রতিটি বই বহুচিত্র শোভিত ॥

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী : : ১৫ কলেজ স্কোয়ার : : কলিকাতা—১২

কালপুরুষ :

• উপন্যাস •

মিহির মুখোপাধ্যায় ..... গতবারের পর .....

তেইশ

পরের দিন। বেলা প্রায় বারোটা। টিকলুকে স্নান করাচ্ছিল দেবানী। সদর দরজায় কে যেন কড়া নাড়ল। এ সময় কে এলো আবার। কার্তিকদা অফিসে চলে গেছেন, শান্তনু গেছে বিমলকান্তির বাবার সঙ্গে দেখা করতে—যদি চাকরি হয়। সেখান থেকে আরো দু এক জায়গায় যেতে হবে। মনের মাও ভোরের কাজ সেরে চলে গেছে, আবার ওবেলা আসবে। বাড়ীতে শুধু তিনজন—মমতাদি, দেবানী, টিকলু। এসময় বিশেষ কারো আসার কথা নেই। দেবানী আটপৌরে শাড়ীর আঁচল কোমরে জড়িয়ে টিকলুকে একখানা পিড়ির উপর বসিয়ে গায়ে সাবান ঘষে দিচ্ছিল। দু'হাতে সাবানের ফেনা, আলগা খোঁপাটা ভেঙে পড়েছে পিঠের উপর। কপালে কয়েকফোঁটা ঘাম, মাঝে মাঝে কব্জির উল্টো পিঠে মুছে নিচ্ছিল। পায়ের কাছে শাড়ীর অনেকটা ভেজা। কাজের নেশায় একটু যেন অগোছালো, আলুথালু। মমতাদি রান্নার পাট সেরেছেন। এখন জল-কাদা দিয়ে উনুন লেপছিলেন। তিনজনের খাওয়া বাকি। টিকলু অবশ্য রোজের মত বাপের সঙ্গে বসে একবার খেয়ে নিয়েছে।

ঘন ঘন কড়া-নাড়ার শব্দ শুনে হাত ধুয়ে যেতে যেতে বললেন মমতাদি'—"যাচ্ছি গো যাচ্ছি।"

দেবানী উৎকর্ণ হয়ে রইল, মনে মনে অযথা উদ্বেগ, বাড়ীর কেউ এল নাকি। মমতাদি'র কথা কানে এল—"ওমা, আপনি, আসুন আসুন, কি ভাগ্যি আমার, ও বাণী, কে এসেছে দাখো।"

মমতাদি'র হাত ধরে অনুরাধা এসে বারান্দায় দাঁড়ালো। পেছনে ললিতা, কমলা, সবশেষে শৈলেশের মুখখানা একবার উঁকি দিলো।

দেবানীর হাতে শাখা, কপালে সিঁথিতে সিঁদুর। খবরটা জেনেই আসা যদিও, কিন্তু এই নতুন রূপ দেখে অনুরাধা, কমলা, ললিতা—তিনজনেই যেন অভিভূত।

দেবানী তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। কি করবে ভেবে না পেয়ে, ভয়, আনন্দ, বিস্ময় মেশা চোখে কয়েকমুহূর্ত স্থির হয়ে রইল। তারপর সাবানের হাত ধুয়ে বারান্দায় উঠে এসে দু'হাতে অনুরাধার গলা জড়িয়ে বললো—"রাগ করেছ, বৌদি।" ঠোঁট কাঁপছে, গলার স্বর ভাঙা ভাঙা।

অনুরাধা কোন কথা না বলে তখনো যেমন অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে ছিল। ডানহাতে ননদের কোমর জড়িয়ে আর একটু কাছে টেনে নিল। দেবানী তাঁর কাঁধের কাছে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কেঁপাতে লাগল।

ললিতা প্রথম কথা বললো—"চুপি-চুপি সব হ'ল। যার থেকে আমরা শুধু সৈ-মিষ্টির ভাগে বাদ পড়লাম। হারে দিদি, আমাদের কিন্তু খাওয়াতে হবে, কোন ছুতো শুনবো না। শুধু কোথায় গেল, এদিকে আসুক একবার পাজীটা, মজা দেখাচ্ছি।"

মমতাদি হেসে বললেন—"দাঁড়া, আমি আগে টিকলুর চানটা সেরে ফেলি, তারপর তোদের খাওয়াচ্ছি। বই না খাওয়াতে পারি, ঘরে সন্দেশ আছে তাই দেব। বাণী তোমার বৌদিকে ঘরে নিয়ে বসাও।"

ঘরে যেতে যেতে ললিতা বললো—"হ্যাঁ, বাসি সন্দেশ খেয়ে বিদেয় হ'তে আমাদের বয়ে গেছে, জামাইবাবু আসুক

আমরা না খেয়ে নড়ছি না।"

ললিতা যেন ব্যাপারটাকে সহজ করার জন্যই হাল্কা কথার সুতো খুঁজছে। টিকলুর সারাগায়ে সাবান মাখা। মাসীদের কাছে আসার জন্য ছট্‌ফট্ করছিল।

মমতাদি তার মাথায় জল ঢালতে ঢালতে বললেন—"কই, শৈলেশ বাইরের ঘরে বসে রইল কেন, ও শৈলেশ ভেতরে এসো। যাতো কমলা, শৈলেশকে ডেকে আন।" দেবানী বউদি'র হাত ধরে তাদের শোবার ঘরে এনে বসাল।

অনুরাধা চারপাশে তাকাল একবার। আগের রাতের উৎসবের চিহ্ন এখনো রয়েছে। বাসি রজনীগন্ধা, টেবিল-ঢাকা কাপড়ের উপর ধূপের ছাই ছড়ানো, পোড়া ধূপকাঠি। ললিতা উপহারের বই ক'খানা নেড়েচেড়ে দেখছিল। দেবানী চোখ-মুখ মুছে একটু সুস্থির হয়ে বউদির পাশে বসে রয়েছে। কমলা কিন্তু গম্ভীর। মনে মনে কেমন যেন জ্বালা, ঈর্ষার। কিন্তু তনুদা ভালবেসে বিয়ে করেছে বলে তার ঈর্ষা হবে কেন? হওয়াতো উচিত নয়। কিন্তু সব সময় মনের ধারণা উচিত-অনুচিতের নিয়ম মেনে চলে না, সবকথা ঠিকভাবে কারণ খুঁজে বোঝানোও যায় না। কেন যেন ভাল লাগছে না, মনে হচ্ছে দেবানী যেন ফাঁকি দিয়ে তার তনুদা'কে পর করে দিল, দূরে সরিয়ে নিল।

শৈলেশের কিন্তু অখুশী নয়। মমতাদি'র হাত থেকে একপ্লেট সন্দেশ নিয়ে, একগাল হেসে, একসঙ্গে দুটো মুখে দিয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে বললো—"আমি কিন্তু অনেক আগেই জানতাম, আমাদের ক্লাবের অনেকেই জানতো, শুধু আমার ভয়ে কেউ কিছু বলতো না।"

দেবানী লজ্জায় হাসিমুখে তাকাল। ছোড়দা'র সঙ্গে আর কোনদিন কথা কাটাকাটি করবে না সে। তার উপর একটুও রাগ নেই। আজ থেকে তাদের সব ঝগড়া মিটে গেল। মমতাদি বললেন—"তোমরা কার কাছে শুনেছ, সুরেশ বলেছে বুঝি?"

—"হ্যাঁ, তার কাছেই সব শুনলাম"—অনুরাধা আস্তে আস্তে সব খুলে বললো। সুরেশের সকাল থেকেই তার জিনিসপত্তর গোছাচ্ছিল। শেষ-দুপুরের গাড়ী।

শান্তিস্বর নটার সময় খেয়েদেয়ে অফিসে চলে গেল। বলে গেল, অফিস হয়ে সোজা ষ্টেশনে গিয়ে সুরেশের সঙ্গে দেখা করবে।

দাদা বেরিয়ে যাবার পর মাকে আর বউদিকে ডেকে নিয়ে চুপিচুপি সব কথা খুলে বলেছে সুরেশ। বউদিকে বলেছে দুপুর বেলা বাণীকে যেন দেখে আসে, সম্ভব হলে বাবার কাছে এসে দু'তিন ঘণ্টা যেন কাটিয়ে যায়, আগের মত যেন সেতার বাজিয়ে শোনায়। বাবাকে অন্ততঃ বোঝানো দরকার, কিছুই বদল হয়নি। আগে যেমন দেবানী তোরবেলা কলেজে যেত, দুপুরে এসে বাবার কাছে বসত, এখনো সেই নিয়মই বজায় আছে। ষ্টেশনে দাদার কাছে সব বলে যাবে সে। শান্তিস্বর যদি মেনে নেয়, তাহলে বাবার কাছে ব্যাপারটা গোপন রাখা সহজ হবে। বাবা যদি শুনতে পান, হার্টফেল করা অসম্ভব নয়।

ডাক্তার বলেছে, হার্টের অবস্থা এমনিতেই ভাল নয়, হার্টের পেশীতে পক্ষাঘাত হবার সম্ভাবনা।

মমতাদি আবার জিজ্ঞেস করলেন—"মাসীমা শুনে কি বললেন?"

—"মা গম্ভীর হয়েছিলেন, আসার সময় দেখলাম, বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাঁদছেন, আমি আর কিছু বলতে সাহস পেলাম না।"—বউদির কথা শুনে দেবানীর চোখে আবার জল এলো।

মমতাদি বললেন—"মেয়েও এদিকে কেঁদে সারা, কাল সারাদিন ভালই ছিল, রাত্তিরে সুরেশ চলে যাবার পর সেই যে মাঝে মাঝে কান্না শুরু করেছে, ওই জানো, আবার কাঁদে।"

অনুরাধা একটু ভেবে বললো—"তুমি যাবে ঠাকুরঝি, আমার সঙ্গে, বাবাকে দেখে আসবে।"

দেবানী একবথায় রাজী, পারলে যেন এক্ষুনি ছুটে যায়।

মমতাদি' বললেন—"তা'হলে ছুটি খেয়ে যাও, তুমি কি আবার চান করবে?"

দেবানী ঘাড় নাড়লো—"না আমার তো সেই কলেজ থেকে ফিরে সাড়ে দশটায় চান করার অভ্যেস। আজ একটু ভোরেই করেছি, আপনাদের টিউবওয়েলের জলটা বেশ ঠাণ্ডা, আবার বিকেলে গা ধোব।"—তারপর মুখ কাচুমাচু করে—"আমার কিন্তু কিছুই খেতে ইচ্ছে করছে না বড়দি, সত্যি বলছি।"

—"না না খেতে হবে, না খেলে পিত্তি পড়বে, আমি ভাত বেড়ে দিচ্ছি।"

দেবানীর মুখে 'বড়দি' ডাকটা বেশ লাগল, মমতাদি তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে গেলেন।

কিন্তু ভাতের থালার সামনে বসাই শুধু হ'ল, টিকলুর সঙ্গে বসে সামান্য কিছু মুখে দিয়ে উঠে পড়ল দেবানী।

চুলবাঁধার সময় অনুরাধা সাবধান করে দিল—"তোমার শাঁখা-সিঁদুর দেখলে বাবা কিন্তু টের পাবেন।"

দু'হাতের শাঁখা খুলে ফেলল দেবানী, একটু ইতস্তত করে বললো—সিঁদুরটাও মুছে ফেলি।" ভেজা গামছা দিয়ে ঘসে ঘসে কপালের সিঁদুর তুলতে লাগল।

মমতাদি বিরক্তির সুরে বললেন—"কপালে আজকাল অনেকেই সিঁদুরের ফোঁটা রাখে না, ওটা না-হয় নাই থাকলো, কিন্তু সিঁথির সিঁদুর মুছবে কেন, ওকি অলুক্ষুণে কথা! দাঁড়াও, আমি সিঁথি চেকে চুল বেঁধে দিচ্ছি।"

সিঁথির সিঁদুর মুছতে হ'ল না, মমতাদি সিঁদুর-মাখা সিঁথি চেকে পাশ দিয়ে নতুন সিঁথি কেটে কায়দা করে চুল বেঁধে দিলেন।

দেবানীর এই বেশ-বদলের সময়, কমলা পাশের ঘরে সরে গিয়ে ঠোঁট উল্টে বললো—"যতসব ঢঙ, কালে কালে কতই দেখব।"

ললিতা টিকলুকে ঘুম পাড়াচ্ছিল, মুখ ফিরিয়ে একটু হেসে বললো—"থাম দিকি, তোর ভাবী কুটুটে স্বভাব হয়েছে।"

অনুরাধা আর দেবানীকে নিয়ে শৈলেশ চলে গেল। ললিতা আর কমলা রইল জামাইবাবুর অপেক্ষায়। বেলা প্রায় তিনটে। সর্বেশ্বর রায় একটু আগে ঘুম থেকে জেগেছেন। বিপিন তামাক সেজে এনে গড়গড়ার নলটা হাতের কাছে রেখেছে। আজকাল আর তামাক-টানার খুব নেশা নেই। শুধু অভ্যাসের জন্য নলটা ঠোঁটের কাছে ঠেকিয়ে রাখেন, টান দেবার মত বুকে দমও বেশী নেই।

বিপিন তাই কম তামাক দিয়ে ছিলিম সেজে দেয়। অনেক সময় ওটা শুধু শুধুই পুড়ে যায়। রায়-মশাইর কান খুব সজাগ। কার পায়ের শব্দে চোখ ফেরালেন দেবানী ঘাটের পাশে দাঁড়িয়ে মুখে কেমন করুণ অপরাধীর হাসি।

রায়-মশাই হাসলেন না, জড়িয়ে জড়িয়ে থেমে থেমে বললেন—"এতক্ষণে এলে মা, আমি সারারাত ভেবে মরি।"

—"হ্যাঁ, বাবা ওরা কিছুতেই ছাড়তে চাইল না।"—দেবানী ইচ্ছে করেই পিতরের কাছে সরে এল, বাবার চোখের একটু আড়ালে, ঘাটের পাশে বসল।

হাত-পাখা তুলে নিয়ে হাওয়া দিতে লাগল।

বিপিন মেজেতে একটা মাদুর পেতে শুয়েছিল। দেবানীর কথা শুনে চোখ মেলে তাকাল। তারপর আবার পাশ ফিরে চোখ বুজল। একটু কাল তাকিয়ে রইল দেবানী। বিপিনদা' সব শুনেছে নাকি, ভাব দেখেতো কিছু বোঝা গেল না। খুকিকে কোলে নিয়ে অনুরাধা ঘরে এল, ঘাটের পাশে দাঁড়াল।

নাতনির দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন রায়-মশাই। খুকি-সন্তু খুব একটা কাছে আসে না। মালিশের গন্ধ, নানা-রকম ওষুধের আয়োজন। এই অসুস্থ পরিবেশে ওরা খুব স্বস্তি পায় না। কখনো কাছে এলে কেমন আড়ষ্ট হয়ে থাকে

ভয়ের চোখে তাকায়। খুকি এখন মায়ের গলা জড়িয়ে একটু অবাক চোখে তাকিয়ে রইল। সবে ঘুম থেকে উঠেছে চোখে মুখে আলস্যের ভাব।

রায়-মশাই দুর্বল গলায় বললেন—"কিরে, আমার কাছে আসবি?"

কাছে আসার কোন উৎসাহ দেখাল না, তেমনি চোখে তাকিয়ে রইল।

অনুরাধা বললো—"এই যে বাবা, আপনি সেই থেকে বানী বানী করছিলেন, এই তো বানী এসেছে।"

দেবানী তখনো হাওয়া দিচ্ছিল, সামনে ঝুঁকে বললো—"তুমি রাগ করেছ, বাবা?" —"না আমি তার কারো ওপর রাগ করিনা, তোমাদের যার যা খুসি ক'রো।"—এটা অভিমানের কথা। দেবানী মুখ ফিরিয়ে আঁচল তুলে চোখ মুছল, ইচ্ছে হচ্ছিল গলা ছেড়ে কাঁদে। অনুরাধা তাড়াতাড়ি বললো—"সেতারটা নিয়ে এসে ব'সোনা, ঠাকুরঝি, বাবাকে একটু বাজিয়ে শোনাও।"

দেবানী সেতার নিয়ে এলো, শিয়রের কাছে, রায়-মশাইর চোখের একটু আড়ালে বসে বাজাল কিছুক্ষণ, কিন্তু কেমন যেন জমলো না। ভালোও লাগছে না। একসময় নিজেই উঠে গিয়ে সেতারটা আবার জায়গামত রেখে এল।

রায়-মশাই ভাবলম্ব কিছুই বললেন না, আগাগোড়া চোখ বুজে চুপ করেই ছিলেন। আরো কিছুক্ষণ হাওয়া দিয়ে দেবানী একসময় উঠে গেল বৌদি'র কাছে। ইচ্ছে মায়ের সঙ্গে দেখা করে। অনুরাধা বিকেলের আয়োজনে হাত দিয়েছে। জলখাবারের রুটির জন্য জলদিয়ে আটা মাখছিল। ঘরের কোথাও রায়-গিন্নীকে না দেখে দেবানী জিজ্ঞেস করলো—"বৌদি, মা কোথায়?"

অনুরাধা মুখ নিচু করে আটা মাখতে মাখতেই জবাব দিল—"কি জানি, বোধ হয় একতলায় ঘোষ ঠাকুরার ঘরে গেছে। তারপর মুখ তুলে—"আজ আর কথা বলতে যেওনা, কয়েকটা দিন যাক, তোমার দাদা অফিস থেকে ফিরে আসুক, সব শোনার পর তার ভাবখানা কি হয় দেখি।"

একটু হেসে আবার বললো—"কাণ্ডখানা যা করেছ, মেজঠাকুরপো আমাকেই সব সামলাতে বলে গেছে। আমি কতদিন পই-পই করে বলেছি, ঠাকুরঝি, এসব ভালো নয়, ভালো নয়, তখন, না বৌদি, সে সব কিছু নয়, এমনি একটু রাস্তায় দেখা হয়েছিল। আমার কাছে লুকিয়ে কি লাভ হ'ল।"

দেবানী হাসতে পারল না, মুখ নিচু করে রইল। একটু পরে সন্তু ফিরল স্কুল থেকে। পিসিকে দেখে অবাক। কোথায় কি একটা গণ্ডগোল হয়েছে, বুঝতে পেরেছে, কিন্তু চালাক ছেলে মুখ ফুটে কিছুই বলবে না।

দেবানী তার জামা-প্যাণ্ট বদলে, হাত মুখ ধুইয়ে দিল। খাটে বসে মাথা আঁচড়ে দেবার সময় কিন্ কিন্ করে বললো সন্তু—"পিসিমনি, তুমি আর আমাদের এখানে থাকবে না?"

দেবানী ম্লানমুখে হাসল—"থাকবনা কেন রে, নিয়ে এলেই থাকব, তুই গিয়ে আমাকে নিয়ে আসিস্।"

কাজের ফাঁকে একসময় উঠে এসে দেবানীর কয়েকটা শাড়ী-সায়া-ব্লাউজ গুছিয়ে দিল অনুরাধা। বললো—"কয়েক-খানা নিয়ে যাও, যমতাদির কাপড় পরে আর কতদিন চালাবে।"

একটু সময় ঘরের এদিক-ওদিক টুকটাক কিছু কাজ করে আবার এসে বললো—"পাঁচটা প্রায় বাজে, তোমার দাদার অফিস থেকে ফেরার প্রায় সময় হ'ল, আজ হয়তো আগেও চলে আসতে পারে।"

বৌদি'র ইঙ্গিতটা বুঝল দেবানী, আস্তে আস্তে জবাব দিল—"আমি তা'হলে চলি এবার।" কথা বলতে গলা কেমন আটকে আসছিল।

অনুরাধা তাকে একটু হাসাবার জন্য চিবুক ধরে বললো—"অমন মুখ ভার করে থেকো না, কাল আবার এসো কেমন, লক্ষী মেয়ে।"

দেবানী একটু হেসে হাতখানা সরিয়ে দিয়ে বললো—"আমি এখনো কচিখুকি।"—"কচিখুকি নাতো কি, প্রথম এসে এতটুকু দেখেছি, মনে আছে, সাত কি আট বছর বয়েস, সন্তুর চেয়েও ছোট ছিলে।" অনুরাধা নিজের গুরুত্ব বোঝাবার জন্য প্রায়ই এই কথা বলে। দেবানী কিন্তু মানতে চায় না, অন্যদিন হ'লে তর্ক তুলতো। আজ আর কিছু বললো না। খবরের কাগজে জড়ানো কাপড়ের পোটলাটা নিয়ে শৈলেশ্বর আগে আগে চললো। সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে পেছন থেকে অনুরাধা বললো—"কাল কি শৈলঠাকুরপোকে পাঠিয়ে দেব।"

—"না থাক, ছোড়দা'কে আর কষ্ট করে যেতে হবে না, আমি একাই আসতে পারব।" সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় মনে হ'ল যেন চোরের মত চুপিচুপি পালিয়ে যাচ্ছে। নিবারণ মাষ্টারের বউ একবার উঁকি দিয়েছিল, চোখাচোখি হতেই মুখ ফিরিয়ে ঘরের মধ্যে চলে গেল। বারান্দার এক কোণে বসে করলা ভাজছিল পদ্ম-ঝি, মুখ তুলে এক পলক তাকিয়েই চোখ নামাল, হাসল কিনা কে জানে। সিঁড়ির শেষ ধাপে নামতেই বন্দাকিনী ঠাকরুণের নজরে পড়ে গেল—"ওমা, দেবানী কখন এলি, কাল সারারাত বুঝি খেটার করলি, আবার বেরোচ্ছিস নাকি, ধন্যি মেয়ে বাপু, আমাদের কালে এমন হ'লে"—

দেবানী কোন জবাব না দিয়ে তাড়াতাড়ি পাশ কাটাল। শ্রীনাথ কবিরাজের ঘরে কে যেন খুক্ খুক্ করে কাশল, হয়তো এমনিই, কিন্তু মনে হ'ল যেন তাকে লক্ষ্য করেই শক্তি সংঘের ঘরে কারা যেন আচমকা হেসে উঠ্‌ল। মনে হচ্ছে এবাড়ীর প্রতিটি দরজা-জানালার আশে-পাশে যেন একএক জোড়া চোখ তার এই চোরের মত চুপিচুপি পালিয়ে যাওয়া দেখছে।

দেবানী বাড়ী ফিরে আসার কিছুক্ষণ পরেই কার্তিকদা ফিরলেন। তার মুখচোখের চেহারা দেখে ললিতা আর হাসি-ঠাট্টা করার সাহস পেল না।

গুপু বললো—"আমরা সেই কখন থেকে তীর্থের কাকের মত বসে আছি।" জামাকাপড় ছেড়ে হাতমুখ ধুয়ে বাইরের ঘরের তক্তাপোষের ওপর বসে হাতপাখা নেড়ে হাওয়া খেতে খেতে কার্তিকবাবু হেসে বললেন—"কার সঙ্গে এসে তোমরা, আমি আর তোমাদের খবর দিতে পারিনি।"

—"থাক খুব হয়েছে।"—কমলা মুখ নাড়া দিল—"বাড়ীতে ডিরেক্টরের রিহার্সাল হচ্ছে, হেন-তেন পাঁচরকম মিথ্যে কথা বলার দরকার কি ছিল। কেন আমরা কি পুলিশে খবর দিতাম।"

কি কথা ভেবে কার্তিকবাবুর মুখ আবার কালো হয়ে গেল, তবু হাসি টেনে বললেন, "অসম্ভব নয়, তোমার যা মেজাজ নারী-পুলিশের দারোগা হ'লে মানাত।" তারপর উঁচু গলায় ডাকলেন—"রানী, একটা কথা শুনে যাও।"

চায়ের কাপ হাতে ঘরে ঢুকল দেবানী, মমতাদি'ও পেছন পেছন এলেন। কার্তিকদা বললেন—"শান্তিস্বর আজ আমার অফিসে গিয়েছিল, জানোত' আমি অন্ত প্রাণে বড়লি হয়ে গেছি। হেড্ অফিস থেকে শেয়ালদা' ষ্টেশনে গেছে, সেখানে সুরেশের মুখে সব কথা শুনে, শ্যামবাজারে আমার ওখানে গিয়ে হাজির। ওর মুখচোখের চেহারা দেখেই বুঝেছিলাম কিছু একটা বলবে। তাড়াতাড়ি অফিসের বাইরে নিয়ে এলাম, রাস্তায় নেমেই উঁচু গলায় বকতে শুরু করল, বদরাগী জানতাম, কিন্তু এমন কাণ্ডজ্ঞান শূন্য"—

চায়ের কাপে কয়েকবার চুমুক দিলেন। তারপর আবার বিষন্ন হাসিমুখে বললেন—"আমি নাকি বামুনের জাত মেরেছি আমার নামে পুলিশ কেস করবে, তবুকে জেলে দেবে, কত কি যে বললো, রাস্তায় ভীড় জমে যায় আর কি, অতিকষ্টে একটা রেঁস্তোরাঁয় নিয়ে বসালাম, অনেক বোঝাবার পর একটু নরম হ'ল, বাপের কথা ভেবেই এসব কিছু করবে না,

করতে পারবে না, তবে এ জীবনে আর বোনের মুখ দেখবে না, যা হয় তাকে ঘরে নিতে চাও নিতে পারো তবে তার চোখের সামনে নয়"—

নসিতা আর কমলা উৎসুক চোখে তাকিয়েছিল, মমতাদি আর দেবানী বিমর্ষ মুখ শুনছিল। সব শোনার পর শুকনো মুখে বললো দেবানী : "আমার জন্যই আপনার এই অপমান হ'ল।"

—"এসব ভেবে তুমি মন খারাপ ক'রো না, এরকম যে হবে, আমি আগেই জানতাম, তৈরী হয়েই ছিলাম। তুমি এখন টিকলুর পড়াটা একটু দেখিয়ে দাওতো, আমার আর সন্ধ্যেবেলা ওকে নিয়ে বসতে ইচ্ছে করে না। ও টিকলু, তোর বানীমাসীর কাছে পড়তে বসগে যা"—তারপর হাসতে হাসতে বললেন—"ভুল হ'ল, আরতো মাসী ডাকবি না, মাসী এখন মামী হয়েছে।"

দেবানী লজ্জার হাসি হেসে তাড়াতাড়ি ভেতরে চলে গেল।

কান্তিবাবু আবার সহজ মানুষ, হাসি মুখে বললেন—"কইলো, তোমার বোন দু'টিকে লুচি ভেজে খাও, না'হলে কমলার যা মুখ, ওর জন্য নারী পুলিশে একটা চাকরি খুঁজব ভাবছি।"

চব্বিশ

শেষ রাতে গ্রামের ষ্টেশনে যখন ট্রেনার ভিড়ল, নদীর পাড়ে নারকেল-সুপুরী গাছের মাথায় তখনো ঠাণ্ডা অন্ধকার। জোলো হাওয়ায় একটু শীত শীত করছিল। সার্চ-লাইটের আলোয় কালো জল, ছোট ছোট ঢেউ আর কচুরি পানার রাশি মাঝে মাঝে স্পষ্ট হচ্ছে। ঘড় ঘড় শব্দে নোঙর নামছিল। ট্রেনারের চাকার কাছ থেকে ঘস ঘস শব্দ হচ্ছিল, কালো ঢেউ পাক খেতে খেতে অজস্র ফেনায় ফেটে পড়ছে। দূরে খালের মুখ থেকে ছোট ছোট লঞ্চে জেলে কয়েকখানা এক ঝোটের ছই-ঢাকা নৌকো আসছিল। ঢেউএর মাথায় তারা যার কয়েক ওঠানামা করল। ট্রেনার যতই পাড়ের কাছে এগিয়ে যাচ্ছিল, আলোর পরিধি ততই ঘনিষ্ঠ আর সংক্ষিপ্ত হয়ে এলো।

ষ্টেশন অফিসের দো-চালা টিনের ঘরের বারান্দায় বসেছিল দু'চারজন, তাদের কেউ-কেউ চোখে হাত-চাপা দিয়ে উঠে দাঁড়াল। সার্চ লাইটের তীব্র আলো চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। কাঠ ক্লাশ ডেকের রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়েছিল সুরেশ্বর। ওদের একজনকে চিনতে পারল। ছোট লাঠি আর লণ্ঠন হাতে কালিচরণ। শেষ রাতে এই ট্রেনারের আলোয় অনেকদিন পরে কালিচরণকে দেখে এক অদ্ভুত আনন্দে মনটা ভরে উঠল। কত কালের পুরনো বিশ্বাসী লোক। রায়-বাড়ীর কেউ আসার কথা থাকলে, শীত হোক গ্রীষ্ম হোক, ঝড় হোক, জল হোক, কালিচরণ ঠিক ষ্টেশনে হাজিরা দেবে।

দড়িবাঁধা একটা লম্বা তক্তা পারে ফেলে দেয়া হ'ল, একজন খালাসী টলতে টলতে নেমে সেটাকে পাড়ের একটা পোক্ত জায়গায় শক্ততাবে লাগিয়ে দিল। তক্তার দু'ধারে দু'জন খালাসী একটা সরু বাঁশের দু'দিক ধরে দাঁড়াল। তারপর একের পর এক যাত্রীরা সেই বাঁশ ধরে ধরে তক্তার ওপর সাবধানে পা ফেলে ফেলে নামতে লাগল। নৌকো থেকে মাঝিরা ডাকছিল—"কেরায়া যাবেন নাহি, মানপাশা, আন্ডারিয়া, দুর্বল গ্রামপুর।"

বেশ লাগছিল শুনতে। পুরনো পরিচিত গাঁয়ের এই নামগুলির মধ্যে যেন কতকালের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের স্মৃতি।

কালিচরণ বিছানাটা কাঁধে নিল, সুটকেশ সুরেশের হাতে। দু'পাশে ঘন গাছ-পালার মাঝে মাটির সরু রাস্তায় যেতে যেতে চারদিক কেন জানি ফর্সা হয়ে এলো। বিশ্বাস বাড়ীর জরাজীর্ণ জনহীন, পুরনো দালানের পাশ দিয়ে পথ। দালানটা আর বিক্রী হয়নি। লোহার গরাদ, জানালা কপাটগুলি নাকি মতিমিঞা কিনে নিয়েছে। সামনে সেই বুড়ো জামগাছটা।

গাছটা ছিল বিশ্বাসদের, এখন সকলের। বহুদিন দুপুরে

ফুল পালিয়ে তারা এখানে জাম খেতে আসত। সুরেন এক-বার পেন্সিল-কাটা ছুরি দিয়ে গাছটার গায়ে তাদের সকলের নাম খুঁদে রেখেছিল। কালিচরণ আগে আগে যাচ্ছিল, সুরেশ্বর রাস্তা ছেড়ে কয়েক পা এগিয়ে গাছটার কাছে গেল। ডালপালা পড়ে, ছাল উঠে, সেই নামগুলো এখন কয়েকটা হিজিবিজি দাগ হয়ে আছে। একটু এগিয়ে যামিনী সাহার দোতলা টিনের ঘর। নারকেল সুপুরী আম কাঠালের বাগান ঘেরা বড় বাড়ী। গাঁয়ের হিন্দু গৃহস্থদের মধ্যে এরাই এখন সমৃদ্ধ। কলকাতায় এদের গদীতেই হুণ্ডির টাকা ভাঙাতে হয়।

তারপর একটা পুকুর। সামনে হেডমাষ্টার নিশিকান্ত বাবুর বাড়ী। পুকুরের পাড় ঘুরে, রাস্তাটা একটু বেঁকে দু'ভাগ হয়েছে। ডান দিকের সরু পথটা গেছে সরকার বাড়ীর দিকে। সুরেশ্বর সে পথে গেল না। সুদিদ্রা হয়তো এখনো ঘুম থেকে ওঠেনি। একেবারে হাতমুখ ধুয়ে এসে দেখা করবে ভাবল।

সামনেই আর একটা বাঁক ঘুরলেই রায়-বাড়ীর বড়-পুকুরের দক্ষিণ পাড়। উত্তরে বাঁধানো ঘাট, দোতলায় মাঝ-ঘরের বন্ধ জানালার পাশে নিঃসঙ্গ বুড়ো কাউগাছ, দেউড়ীর রঙ-চটা সিংহ মূর্তিটা তেমনি রয়েছে।

তখন রোদ উঠেছে, ঘাটের পাশে কর্ণ-চাপা গাছের চূড়োয়, দোতলার ছাদের কার্নিশে, ভাঙা নহবৎখানার গায়ে প্রথম রোদের আলো। দেউড়ী পেরিয়ে প্রভুনাথের ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় সুরেশ্বর একটু দাঁড়াল। ঘরটা তালা-বন্ধ। সেই যে পুলিশের লোকেরা এসে বন্ধ করে গেছে, আর বোধহয় খোলা হয়নি। নীলমাধবের মন্দিরেও দরজা বন্ধ। কাঠের নয়, লোহার গরাদ বসানো দরজা। কতকটা খাঁচার মত। রোয়াকে উঠে গরাদের পাশে দাঁড়ালে ভেতরটা বেশ দেখা যায়। সোনার সিংহাসনে কালোপাথরের নীল-মাধব, মাথায় সোনার চূড়ো, হাতে সোনার বাঁশী, বাহে রূপোর রাধা। গরাদে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল সুরেশ্বর। সিংহাসনের পাশে একটা লোহার সিন্দুক, বোধহয় পূজোর সময় সোনারূপোর বাসন-পত্তর ওর মধ্যেই রাখে।

গরাদের বাইরে দরজার সামনে আসন পাতা। মাধব ভট্চাজ এখানে বসেই বোধহয় ফুলজল ছিটিয়ে পূজো করেন, আরতির সময় পঞ্চপ্রদীপ ঘোরান।

ঘরের ভেতরে পায়রা আর চড়ুই এর দল খড়কুটো ফেলে বেশ ময়লা করেছে, ধুলো জমেছে। কিন্তু তালা না খুলে পরিষ্কার করার উপায় নেই।

সুবল চাটুয্যে এতদিন তালা খোলবার কোন ব্যবস্থা করতে পারেন নি। এবার সে নিজে যদি কিছু করতে পারে। জেলা শহরে গিয়ে নগেনবাবু উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে। সরকার বাহাদুরের লোক এভাবে এসে ঠাকুর দালানে তালাবন্ধ করে যাবে কেন? মতিবিবি আর হরনাথ ডাক্তার কিছু কলকাঠি নেড়েছে নিশ্চয়ই, ব্যাপারটা ভাল করে জেনে নিতে হবে।

ঘুম থেকে উঠে চোখ মুছতে মুছতে এলো অনু। আজকাল বোধহয় সে একটু বেলায় ওঠে। কাজের কোন তাড়া নেই। এতবড় বাড়ীতে একা থাকতে ভয় করে, তাই বুড়ো বাপ-মা, ভাই, ভাইএর বউ আর ভাই-পো ভাইঝিদের নিয়ে এসেছে।

একতলায় দু'খানা ঘরে তাদের সংসার।

দোতলায় রায়-মশাইর শোবার ঘরে কাঠের কারুকাজ করা সেকেলে পালঙ্কের ওপর সুরেশের বিছানা পাতা হল। ঘরটা যদুনা একটু ঝাটপাট দিয়ে রেখেছিল। তবু কিছু কিছু ময়লা জমে আছে, ঘরের আনাচে কানাচে মাকড়সার জাল পুরনো দেয়ালে মাঝে মাঝে কাটা দাগ। কিন্তু কোথায় যেন একটা নিশ্চিন্ত আরামের আনন্দ আছে।

ঘরের বিবর্ণ দেয়ালে, ছেড়া জালির-পাড়া পুরনো পালঙ্কের কারুকাজে, দক্ষিণের জানালার পাশে দড়িয়ে-ওঠা দুই ফুলের

ঝাড়, পাখীর ময়লা-জমা বারান্দায়, ছাদের কার্নিশে শিশু অশ্বত্থের পাতায়—কেমন পুরনো চেনা গন্ধের আমেজ, বহুকালের পরিচিত রঙের ছবি।

বারান্দায় এক বালতি তোলা জলে মুখ ধুচ্ছিল সুরেশ্বর। মুনা জিজ্ঞেস করল—"দাদা, চা বানামু?"

"—না, থাক"—সুরেশ্বর গামছায় মুখ মুছতে মুছতে বললো—"আমি বরং সুমিত্রাদের ওখানে গিয়ে চা খাব।"

বড় দালানে ঘড়িটায় টং-টং করে জলতরঙ্গের শব্দ হ'ল। ষোলো পৌণে ঘণ্টা বেজেছে! সপ্তাহে একদিন এসে ঘড়িটায় দম দিয়ে যান সুবন চাটুয্যে।

কতকালের পুরনো ঘড়ি, এখনো বেশ সময় দিচ্ছে।

একটু গড়িমসি করে, সুটকেশ খুলে ধুতি-পাঞ্জাবী বার করে, বাড়ীটার চারপাশে একবার এদিক-ওদিক ঘুরে, আস্তে আস্তে পা চালিয়ে সরকার-বাড়ীর গেটের কাছে এসে হাত-ঘড়িতে দেখল সুরেশ, সাতটা বাজার কয়েক মিনিট বাকী।

আগাছার জঙ্গলে ভরা ফুলবাগানে গরু বাঁধছিল আসরাফ আলি।

পাতাবাহারের বেড়ার পাশে মেজদাদাবাবুকে দেখে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে আদাব দিল। সুরেশ্বর দালানের রোয়াকে উঠে দেখল, ভেতর থেকে দরজা বন্ধ।

—"কিরে আসরাফ সুমিত্রা এখনো ঘুম থেকে ওঠেনি।"

—"আইজ্ঞা, ওঠ্ছেতো বোরে সরু বাথ্তে কইয়া, এই তো বাড়ীর মধ্যে গেলে।"

দালানের পাশে একটা বেলগাছ, তার নিচে আর একটা খোলা দরজা দিয়ে বাড়ীর ভেতরের উঠোনে যাওয়া যায়। আসরাফ্ সেইদিকে আঙুল দেখাল।

খিড়কির পুকুর থেকে চান করে ফিরছিল সুমিত্রা। একপিঠ খোলা চুল, পরণে সপ্‌সপে ভেজা কাপড়, বুকে গামছা, কাঁখে জলভরা পেতলের কলসী। হঠাৎ সুরেশদা'কে উঠোনে দেখে একটু থতমত খেল—"ওমা তুমি এত আগে এসে পড়বে ভাবিনি।"

সুরেশ্বর কোন কথা না বলে হাসিমুখে তাকিয়ে রইল। সুমিত্রা যেন একটু মোটা হয়েছে, সদ্য স্নান করে আসায়, মুখে-চোখে একটা স্নিগ্ধ প্রশান্ত ভাব। চিঠির ভাষার মত উদ্বেগ-আশঙ্কার কথা ছিল, মুখের চেহারায়, হাসিতে, তার কোন ছাপ নেই।

হাসিমুখে বললো—"কি দেখছ, অমন করে, একটু দাঁড়াও, আমি কাপড়টা বদলে আসি।" জলের কলসিটা রান্নাঘরের রোয়াকে রেখে, তাড়াতাড়ি দালানে ঢুকল। উঠোনের একপাশে একটা টগর ফুলের গাছ, তুলসী মঞ্চ।

রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর, ঢেঁকিঘর,। খিড়কির দোরের পাশে সেই বিলিতি আমড়ার গাছটা, গাছের নিচে নায়েব-কাকার সখের কুকুর টমি শুয়েছিল।

টমির আর আগের জৌলুষ নেই, বয়স হয়েছে, গায়ের লোম অনেক উঠে গেছে, গলার নিচের চামড়া ঝুলে পড়েছে। সাদা-কালোয় মেশানো লম্বা লম্বা কান-ভাঙ্গ-করা টমি কিন্তু দিশি কুকুর নয়।

পর্তুগালের এক জাতের শিকারী কুকুর আর সুন্দরবনের জংলী কুকুরের বর্ণসংকর। মহালে খাজনা আদায় করতে গিয়ে খেপুপাড়ার মদবস্তি থেকে টমির মাকে এনেছিলেন নায়েবকাকা। ও অঞ্চলে এই জাতের কুকুর মেলে। কয়েক শতাব্দী আগে, মুঘল আমলে, হাতিয়া-সন্দীপ থেকে শুরু করে, খেপুপাড়ার দক্ষিণে, গলাচিপা কুয়াকাটার আশেপাশে, সুন্দর-বনের নদী-নালার ধারে ধারে ছিল পর্তুগীজ জলদস্যুদের আড্ডা। তারা সঙ্গে এনেছিল তাদের দেশের শিকারী কুকুর। টমি সেই কুলীন কুকুরের বংশধর।

পায়ে পায়ে খিড়কির দুয়ার পেরিয়ে পুকুর পাড়ে এসে দাঁড়াল সুরেশ্বর।

বেশ বড় পুকুর। জলটা এখনো বেশ ভালই আছে মনে হ'ল। আগে অনেক পদ্মফুল ফুটত। তার কোন চিহ্ন নেই।

ওপারে পাশাপাশি দুটো নারকেল গাছ। বিষ্টুপদ আর রমেন ওখানে বসে পাল্লা দিয়ে মাছ ধরত। জায়গাটা এখন আকন্দ আর আশ্-শেওড়ার ঝোপ হয়ে আছে।

—"ও সুরেশদা' ওখানে কি করছ?" —শাদা ধোপের সরু কালো পাড় কাপড় পরে সুমিত্রা এসেছে। ঘাটের পাশে দাঁড়িয়ে মাথাটা একটু কাত করে ভেজা চুলের জল ঝরাতে লাগল।

—"পুকুরটা দেখছিলাম, একটাও পদ্মফুল দেখলাম না, আশ্চর্য।"

—"ও আর আজকাল ফোটে না, তুমি ভেতরে চলো, বাবা ঘুম থেকে উঠেছে।"

সুমিত্রার পেছন পেছন নারেবকাকার ঘরে ঢুকল।

সুমিত্রা তার ঘাটের পাশে দাঁড়িয়ে কানের কাছে মুখ নামিয়ে বললো—"বাবা, সুরেশদা' এসেছে।"

সরকার-মশাই ঘোলাটে চোখ মেলে তাকালেন, বিড়বিড় করে কি যেন বললেন, সুরেশ্বর ঠিক বুঝলো না।

সুমিত্রা আবার বললো—"না, না, ভুবনদা' নয়, সুরেশদা কলকাতা থেকে আসার কথা ছিল, কাল যে বললাম তোমাকে।"

এবার বোধহয় বুঝলেন, বিকৃত ঠোঁটে একটু হাসার চেষ্টা করলেন।

সুমিত্রা মুখ তুলে ইঙ্গিতে বোঝাল, কানেও আজকাল আর ভাল শুনতে পান না।

কাঠের চেয়ারটা টেনে ঘাটের পাশে বসল সুরেশ্বর। দু'হাতের মুঠোয় নারেবকাকার একখানা শুকনো হাত তুলে নিল। আগেরবার যা দেখে গিয়েছিল, তার চেয়ে অবস্থা অনেক খারাপ। শুকিয়ে দড়ির মত হয়ে গেছেন, ঘোলাটে চোখ বসে গেছে, দাঁত বোধহয় একটাও নেই, শুকনো মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। নিশ্বাস নেবার তালে তালে পাঁজর দুলে দুলে উঠ্‌ছে, পেটের কোচকান চামড়া ওঠানামা করে, মাঝে মাঝে গলার মধ্যে একটা অস্পষ্ট ঘড়ঘড় শব্দ। পুরনো স্মৃতির চিহ্নের মত চামড়ার নিচে মোটা মোটা হাড় ক'খানা শুধু চোখে পড়ে।

কেন যেন দেউড়ীর উপর জরাজীর্ণ রক্ত-চক্ষু সিংহটার কথা মনে হ'ল।

সুমিত্রা দরজা-জানালা খুলে দিল। বিছানাটা একটু ঝাড়ল, মশারীটা গুছিয়ে রেখে বাপের মুখ ধোয়াল। সুরেশ্বর চুপচাপ বসে বসে দেখছিল।

আলমারীর পাশে দুইয়ে দরজার কাছে একঘটি দুধ রেখে গিয়েছিল। সুমিত্রা সেটা নিয়ে ভেতরে গেল। কিছু সময় পরে এসে বাপকে একটু গরম দুধ খাওয়াল, সুরেশকে নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে চা-মুড়ি আর নারকেলের নাড়ু খেতে দিল।

সুরেশ্বর মেজেতে আসনে বসেছিল, সুমিত্রা সামনে বসে বলল—"সুরেশদা' যে ক'টা দিন আছ, আমার এখানেই খাবে কিন্তু, শ্রীমন্ত ঠাকুরতো কাজ ছেড়ে দিয়েছে, ওখানে আর কে রেঁধে দেবে।"

সুরেশ্বর একটু হাসল—"ক'টা দিনের তো কথা নয়, আমি এখানে পাকাপাকিই থাকব, তুমি আর ক'দিন খাওয়াবে।"

—"তার মানে?" —সুমিত্রা খুব অবাক হ'ল।

—"মানে আর কি, আমি এখানকার স্কুলে একটা মাষ্টারী জুটিয়ে নেব আর বাড়ী-ঘর-দোর দেখা শোনা করব।"

—"সে কি, কলকাতার চাকরী!"

—"ছাটাই হয়ে গেছি, হয়তো উপরওয়ালাদের খোশামোদ করলে, একটু ধরাধরি করলে টিকে থাকা যেত, কিন্তু আমার আর ভাল লাগল না, তাছাড়া তুমি তো আসতে লিখেছিলে, তাই চলে এলাম।"

সুমিত্রা যেন একটু অপ্রস্তুত হ'ল। হয়তো সুরেশের ভুল মনে হ'ল মুখখানা যেন একটু লাল হয়ে উঠ্‌ল, কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে খুশির গলায় বললো—"তুমি যদি এখানে থাকো, তাহলে তো বেঁচে যাই, কি যে ভয়ে ভয়ে থাকি,

দেখাশোনার লোক নেই, ভুবনদা' অবশ্য খোঁজ খবর নিয়ে যায় আর ওই আসরাফের উপর ভরসা।"

একটু চুপ থেকে সুরেশ্বর জিজ্ঞেস করল—"কাকাকে কি ওষুধ দিচ্ছ আজকাল?"

—"হোমিওপ্যাথি দিচ্ছি।"

এবার অবাক হ'ল সুরেশ—"হোমিওপ্যাথি কেন, হরনাথবাবু ছেড়ে দিয়েছেন?"—"সে অনেক কথা,"—সুমিত্রা আস্তে আস্তে বললো—"অনেকদিন থেকে বাবা মনে মনে চটেছিলেন, মতিমিঞার সঙ্গে যোগসাজস করে গাঁয়ের মধ্যে নানা উপদ্রব আরম্ভ করেছে। আগ্র এর ঘরদোর ভেঙে বিক্রী করছে, কাল ওর আমি কাঁঠালের গাছ কেটে নিচ্ছে, বাজারের মধ্যে দু'খানা দোকান ঘরের টিন খুঁটি খুলে নিয়ে বেঁচে দিল, সেগুলো নাকি তোমাদের এষ্টেটের জিনিস। ভুবনদা' এসে বাবাকে বললো, বাবা তখনো চুপ করেছিলেন, তারপর মাস তিনেক আগে পুলিশের লোক এসে নীলমাধবের মন্দিরে তালা দিয়ে গেল, উনি পরের দিন বাবাকে দেখতে এসে হেসে হেসে বললেন, নীলমাধবকে রাধাগঞ্জ থানায় পুরেছে, ভুবন চাটুয্যে কপাল চাপড়াচ্ছে, এতগুলি সোনা-রূপোর জিনিস হাতছাড়া হ'ল আহা এ দৃশ্য আপনি দেখতে পেলেন না। কি মানুষ বাপু, ঠাকুর-দেবতা নিয়ে এমন ঠাট্টা করেন, বাবা তক্ষুণি তাকে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে বললেন।"

সুরেশ্বর মনে মনে উত্তেজিত হলেও, বাইরে সে ভাবটা গোপন রেখে জিজ্ঞেস করল—"তারপর কি হ'ল?"

—"তারপর আর কি হবে, কুসুমের মামা উনি, সেই সুবাদে আমিও মামা ডাকি, নিজে তাঁর বাড়ী গিয়ে অনেক খোশামোদ করলাম, হাতে পায়ে ধরার মত করে বললাম, ডাক্তারবাবা, আপনি নিজে না যান, আমার হাতে ওষুধ দেবেন, আমি রোজ এসে নিয়ে যাব, কোন কথাই শুনলেন না, শেষে আসরাফকে পাঠিয়ে যানপাশার মহিম ডাক্তারকে আনালাম, উনি এসে হোমিওপ্যাথির ব্যবস্থা দিলেন, দু'দিন এসেছিলেন, চারটাকা করে ভিজিট দিয়েছি, নৌকো ভাড়া দিয়েছি, কি আর করব।"

সুরেশ্বর গুম হয়ে গুনল, জিজ্ঞেস করল—"ওরা যে এসব কাণ্ড করে, পুলিশের লোকেরা কিছু বলে না, কেউ তাদের খবর দেয় না।"

সুমিত্রা উত্তর দিল—"তারা কি বলবে, থানার দারোগা শুনেছি মতিমিঞার কথায় ওঠে বসে।"

বাইরের রোয়াকে কার পায়ের শব্দ হ'ল। ভুবন চাটুজ্যের গলা, সুমিত্রাকে ডাকছেন, তাড়াতাড়ি উঠে গেল সে। সুরেশও পেছনে পেছনে গেল।

—"এই যে কেমন আছো ভাই,—ভুবন চাটুয্যে একগাল হাসলেন,—"তারপর কলকাতার খবর সব ভালো'ত, কর্তা-বাবু কেমন আছেন?"

সুরেশ্বর ভালমন্দ সব খবর দিল। বাবার শরীর ভাল নয়, জানাল।

চাটুয্যে মশাই রুগ্নী সরকারের খাটের পাশে দাঁড়িয়ে ওষুধ পত্তর সম্বন্ধে সুমিত্রাকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করলেন, তারপর ঘরজার বাইরে এসে সুরেশ্বরকে বললেন—দেখ্‌লেতো সব অবস্থা, এখন কি যে করি, গাঁয়ে ভালো ডাক্তার নেই, ওষুধ পত্তরের ব্যবস্থা নেই, হরনাথ বদ্য দেখ্‌তে আসবে না, তার কাণ্ড-কারখানা কি আর বলবো, আমি তো কিছু বলতে ভরসা পাই না, সবই শুনতে পাবে আস্তে আস্তে, সে যাক্, এখন তোমার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হবে কি হবে।"

সুরেশ্বর কিছু বলার আগেই সুমিত্রা বললো—"সুরেনদা,' আমার এখানে খাবে।"—"সে তো খুব ভাল কথা, আমি তা'হলে যাই, বরং যমুনাকে পাঠিয়ে দিই, তোমার একটু সাহায্য হবে আর কালিচরণকে পাঠাই বাজারটা একটু ঘুরে আসুক। মাছ ডিম যা পায়—ভুবন চাটুজ্যে চলে গেলেন।

সুরেশ্বর আরো কিছু সময় নারেবকাকার পাশে বসে রইল। সুমিত্রা রান্নাঘরে ঢুকল, টুকটাক কাজ করে এদিকে

একবার আসতে বললো সুরেশ্বর—"তুমি, আমি এখন যাই, একেবারে চানটান করে ফিরব, দুপুরে লম্বা একটা ঘুম না দিলে শরীরটা ঠিক যাতে আসবে না।"

বকুলতলা বাঁয়ে রেখে ঘোষালদের পোড়ো ভিটে ছাড়িয়ে কয়েক পা যেতেই দেখল বিষ্টুপদ আসছে। পরণে খুঁজি, গায়ে আধময়লা ছেঁড়া সার্ট। দূর থেকে চোখাচোখি হতে দু'জনেই হাসল। কাছে আসতে দেখল বিষ্টু যেন আরো রোগা হয়েছে। মুখচোখ শুকনো, ক্লান্ত। একটু হেসে বললো—"বাজারে কালিচরণের সঙ্গে দেখা হ'ল, তার মুখে খবর পেয়েই এলাম"—"ভাল করেছিস, আমি বিকেলে তোর ওখানে যেতাম, তারপর কেমন আছিস বল, বাড়ীর সব ভালোত।"

—"এই আছি একরকম, ভাল নেই খুব"—বিষ্টুপদ একটু ইতস্তত করে বললো—"একটা কথা বলব, ভেবেছিলাম।"

—"বলনা, যেতে যেতেই শুনছি।"

দু'জনে পাশাপাশি হাটতে লাগলো। একটু সময় ভেবে বিষ্টুপদ বোধ হয় মনে মনে কথাটা গুছিয়ে নিল—"আমাদের পূর্বের ঘরখানা দেখেছিস্ তো, বেশ বড় টিনের ঘর, অবিশ্যি পুরনো হয়ে গেছে, অনেকদিন মেরামত হয় না, তা'হলেও এখনো বেশ পোক্ত আছে"—কথাটা শেষ না করেই থামল।

—"থামলি কেন?"—সুরেশের কথা শুনে বিষ্টুপদ বাটির দিকে চলতে চলতে শেষটুকু বললো—"হরনাথবাবু আর ধর্মিনিওয়া ঘরখানা কিনে নিতে চান, ওরা দাম বলেছেন একটাকা অথচ আমি অন্য জায়গায় বেচলে খুব কম করেও পঁচিশ ত্রিশ টাকা পাব, কিন্তু ওরা জোর করছেন' অন্য দু' একজন যারা কিনতে এসেছিল তাদের ভয় দেখিয়ে, ভাঙচি দিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছেন।"

সুন্দিত্রার মুখে কিছুটা শোনার পর থেকেই মনে মনে চটেছিল, এবার বিষ্টুপদর কথা শুনে সুরেশের মাথার মধ্যে যেন আগুন ধরে গেল, গরম গলায় বললো—"একি ধর্মের মুলুক পেয়েছে নাকি, চল্, আমি এক্ষুণি হরনাথবাবুর কাছে যাচ্ছি।"

বিষ্টু যেন আতঙ্কে উঠল—"না না, চট্ করে কিছু বলতে যাস না, আমি তা'হলে বিপদে পড়ে যাব।"

—"থাম তুই, কিসের বিপদ হবে, ভয়ে ভয়ে যুগ যুগে থাকিস্ বলেই ওদের সাহস বেড়ে গেছে, ওসব চালাকি আমি বার করে দেব।"—সুরেশ্বর হন্ হন্ করে এগিয়ে গেল। বিষ্টুপদ নিরুপায়ের মত পেছন পেছন চললো। "পপুলার ফার্মেসীর" কাছাকাছি গিয়ে বললো—"আমি এই বিন্দাদা'র দোকানে বসছি, তুই যা বলার বলে আয়।"

সুরেশ্বর একটু এগিয়ে হরনাথ সরকার ওষুধের দোকানে ঢুকল।

হরনাথবাবু চেয়ারে বসেছিলেন। সামনে টেবিলের ওপর ওষুধের ব্যাগ, স্টেথ্‌সকোপ, কিছু কাগজপত্র, দোয়াত-কলম আর এক বাণ্ডিল বিড়ি, একটা পানের ডিবেতে সেগুলো গুণে-গুণে তুলছিলেন, সুরেশকে দেখে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করলেন—"আরে, সুরেশ যে, এসো এসো, তুমি আসবে শুনেছিলাম, কিন্তু কবে আসবে ঠিক"—

সুরেশ্বর নমস্কার দিয়ে একটা চেয়ারে টেনে বসল।

—"তারপর কেমন আছ তোমরা, কলকাতার খবর কি, কর্তাবাবু এখন কেমন আছেন, আহা, ভাবলেও কষ্ট হয়, আমরা সবাই তাই বলাবলি করি, শেষ বয়সে বিদেশে গিয়ে এই অবস্থা হল, ওসব জায়গা কি ওদের সহ্য হয়, এখানে এতকাল একরকম ছিলেন, রাজার মত মানুষ"—তালুতে জিভ ঠেকিয়ে চুকচুক শব্দ করলেন।

কথার ধরণে সুরেশ্বর যেন একটু নরম হয়ে আসছিল, কিন্তু পরক্ষণেই সাবধান হ'ল। হরনাথ সরকারকে বেশী কথা বলতে দিলে আর উপায় নেই, মিষ্টিমিষ্টি কথা বলে সব গোলমাল করে দেবেন, নয়কে ছয় করে ছাড়বেন। এমন কি

শেষ পর্যন্ত বিষ্টুর সঙ্গে তারই কপড়া বাধিয়ে দিতে পারেন, কিছুই অসম্ভব নয়।

তবুও যতটা সম্ভব ঠাণ্ডাভাবেই শুরু করল সে—"আপনি কেমন আছেন?"

—"আছি কোনরকম, আমাদের আর থাকা না থাকা"—

—"সেবারে আপনি পটুয়াখালি যাবেন বলেছিলেন, গেলেন না বুঝি।"

—"না যাওয়া আর হল কই, আশপাশের পাঁচ-সাতখানা গাঁয়ের মধ্যে কোন ভাল ডাক্তার নেই, সবাই এসে ধরে বসলো, এতকাল রয়েছি এদের সঙ্গে, হাজার অসুবিধা হলেও এখন বেইমানি করে চলে যাওয়া"—বাঁকা হাসির মধ্যে কথাটা আর শেষ করলেন না। এ হাসির অর্থ বুঝল সুরেশ্বর, অবিচলিত ভাবে আবার বললো,

—"আপনি নায়েব-কাকার চিকিৎসার ভার ছেড়ে দিয়েছেন শুনলাম, আপনার কাছ থেকে কিন্তু এটা আশা করিনি।"

হরনাথ দত্ত এবার গম্ভীর হলেন—"ঠিকই শুনেছ, ওর চিকিৎসা আমি আর করতে পারব না, মাপ করো, নিজের মান-সম্মান বিসর্জন দিয়ে তো আর"—

—"না, না, তা নয়, আমি ওঁর চিকিৎসার জন্ত আপনাকে অনুরোধ করতে আসিনি, এসেছিলাম অন্ত একটা কথা বলতে" —একটু থেমে সুরেশ্বর সোজাসুজিই কথাটা বললো।

—"বিষ্টুপদর একখানা ঘর নাকি আপনারা কিনতে চান, কিন্তু যে দাম দিতে চাইছেন, ও তাতে বেচতে রাজি না, অথচ আপনারা নাকি জোর করে—

হরনাথ দত্ত এবার একটু নড়েচড়ে বললেন—"বিষ্টুর সঙ্গে দেখা হয়েছে বুঝি, জোরের কথাও বলেছে নাকি, পুরনো ভাঙা ঘর, দশটাকা বলেছি, এই যথেষ্ট, ও যদি বেচতে না চায়, বেচবে না, এতে জোর-জবরদস্তির কি আছে, আর এসব কথা বলারইবা মানে কি?"

"—সেতো ঠিকই, কিন্তু অন্য যারা কিনতে আসছে, আপনারা নাকি তাদের তাড়িয়ে দিচ্ছেন।"

হরনাথ দত্ত এবার বেশ গরম হয়ে উঠলেন—"ভাখো ব্যবসা আমার নয়, মতিমিঞার, কে কাকে তাড়িয়ে দিচ্ছে আমি জানি না, সে যাক, আমি এসব কথা নিয়ে তোমার সঙ্গে আলোচনা করতে রাজী নই"—তারপর মুখ ফিরিয়ে বললেন—"ও কেশব, শ্যামপুরের উমেশ পাকুলীর বাড়ী থেকে কেউ কি ওষুধ নিতে এসেছিল?"

এই তাচ্ছিল্যের ভাব দেখে জ্বলে উঠল সুরেশ্বর—"আপনি রাজী নন কিনা পরে দেখা যাবে, কিন্তু ব্যাপারটা আমার পরিষ্কার বোঝা দরকার, মতিমিঞার কিসের ব্যবসা জানতে পারি, আপনারতো ভাগ আছে শুনেছি, আপনারা যে সুপুরী চালান দেন, তার লাইসেন্স দেখাতে পারেন।"

রাগে হরনাথ দত্তর মুখ লাল হয়ে গেল, গলার স্বর উঁচু পর্দায় উঠল—"লাইসেন্স দেখতে চাবার মালিক তুমি নও, ওসব মেজাজ অন্য জায়গায় দেখাবে, একটা কথা শুনে রাখো, অনেক দিন পরে এসেছো, দেশের হালচাল অনেক বদলে গেছে, তোমার ওই জমিদারী মেজাজ কেউ সহ্য করবে না বুঝলে, এখন যাও বাপু নিজের কাজে যাও, আমাকে আর বকিও না।"

সুরেশ্বর চেয়ার পেছনে ঠেলে উঠে দাঁড়াল, টেবিলের উপর হাতের মুঠো ঠুকতে ঠুকতে বললো—"হ্যাঁ, আমি তো যাবই, কিন্তু একটা কথা বলে যাচ্ছি, আপনাদের এই জুলুমবাজি বেশীদিন চলবে না, দরকার হলে বিষ্টুর ওই ঘরখানা আমিই কিনে নেব, আর একটা কথা জেনে রাখুন, আমি সহজে ছাড়ব না, সময় হলে সদরে গিয়ে এস. ডি ও সাহেবের সঙ্গে দেখা করে আপনাদের সব ব্যাপার ফাঁস করে দেব, আচ্ছা চলি নমস্কার।"

হরনাথবাবু একটুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন, তারপর বললেন—"কেশব, আমি একটু বেরুচ্ছি, কেউ এলে বসতে বলো।"

স্কুলবাড়ীর মাঠ পেরিয়ে মুসলমানপাড়ায় মতিমিঞার বাড়ী দিকে চললেন তিনি।

পঁচিশ

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর সুমিত্রার ঘরের মেজেতে শীতল পাটি বিছিয়ে শুয়েছিল সুরেশ্বর। পুরনো দিনের দালান, দেয়ালে নোনাধরা দাগ, পুরনো কড়িকাঠ, কাটাকাটা মেজে, উই-খাওয়া জানালার পাল্লা, ঘরচেধরা গরাদ। আমলকি গাছের মাথায় রোদ, পাতাবাহারের বেড়া ঘেঁষে একটু ছায়ায় বসে গরুটা জাবর কাটছে, এপাশে বেলগাছের একটা ডাল, একটা কাক বসে মাঝে মাঝে ডালের সঙ্গে ঠোঁট ঘসছিল, একজোড়া চড়ুই রোয়াকের ওপর লাফিয়ে লাফিয়ে কিছুক্ষণ কি যেন খুঁজে বেড়াল। মাঝে মাঝে কোথায় যেন একটা ঘুঘু ডাকছে। এই ঘুঘুর ডাকে শান্ত, নির্জন দুপুরটা যেন উদাস হয়ে গেছে। অনেককাল গ্রামের এই ছায়াভরা নিঃসঙ্গ দুপুরের দেখা পায়নি।

কোন গোলমাল নেই, কোন ব্যস্ততা নেই। সারাটা দিন যেন অলস, মন্থর।

কিন্তু কতদিন আর এমন কাটবে। দু'দিন পরেই গ্রামের দলাদলি, স্বার্থের টানাটানির মধ্যে জড়িয়ে পড়তে হবে। আজইতো হরনাথ ডাক্তার সঙ্গে একচোট হয়ে গেল।

হয়তো এই সবে শুরু।

একটু পরে খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে সুমিত্রা এলো। পরণে সেই সরু কালো পাড় শাড়ি, সাদা ব্লাউজ, আলসা জড়ানো খোঁপা, কোন অলঙ্কার নেই, শুধু গলায় একগাছি সরু হিরে-হার। সুরেশের শিয়রের কাছে এক গেলাস জল, একটা প্লেটে কিছু সুপুরী-লবঙ্গ রেখে পাশে বসলো, হাত-পাখা তুলে হাওয়া দিতে দিতে বললো—"খাটে না শুয়ে মেজেতে শুলে কেন?"

"না এই ভাল আছি, বেশ ঠাণ্ডা"—সুরেশ্বর জবাব দিল, হাত বাড়িয়ে প্লেট থেকে একটা লবঙ্গ তুলে নিয়ে বললো —"আমাকে তাড়াতাড়ি আসবার জন্য চিঠি দিয়েছিলে কেন?"

সুমিত্রা চোখ নিচু করে আস্তে আস্তে উত্তর দিল—"কি করব, ডাক্তার-মামা চিকিৎসা ছেড়ে দিলেন, বাবার অবস্থা দিন-দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে, ভাবলাম তুমি তো বলেছিলে, খবর পেলে চলে আসবে, তবে তুমি যে সত্যি-সত্যি চাকরি-বাকরি ছেড়ে দিয়ে এভাবে চলে আসবে এতটা ভাবিনি।"

—"যেখানে কথা দিলে কেমন কথা ঠিক রাখি।"—সুরেশ্বর হাসল, তারপর একটু ভেবে—"তা'হলে আমি চলে আসায় তুমি খুব খুশি হওনি।"

—"খুশি হ'তাম, যদি তুমি চাকরিটা ছেড়ে না আসতে—

—"কিন্তু এখানে থাকলে চাকরি করব কি করে?"

—"এখানে থাকবেই বা কেন, নিজের ভবিষ্যতের সব আশা-ভরসা ছেড়ে দিয়ে এই পাড়াগাঁয়ে পড়ে থেকে তোমার কি লাভ হবে!"

—"নিজের কথা ভেবে তো আর আসিনি, এসেছি তোমার ভবিষ্যতের কথা ভেবে"—

সুরেশের জবাব শুনে সুমিত্রা চোখ তুলে একপলক তাকাল, তারপর আবার মুখ নিচু করে পাখার বাঁট দিয়ে মেজেতে ঘাস কাটতে কাটতে বলল—"আমার আবার ভবিষ্যৎ, বেশ বুঝতে পারছি, বাবা আর বেশিদিন নেই, তারপর যে কি হবে, কোথায় দাঁড়াব।"

সুরেশ্বর চিত হয়ে শুয়ে কড়িকাঠের দিকে চোখ রেখে বললো—"আমার একটা কথা শুনবে, কিছু মনে করবে না তো"—

ভনিতা শুনে সুমিত্রার মুখের রং বদলে গেল, শুকনো মুখে চোক গিলে বললো—"আমি আসছি একুণি"—

তাড়াতাড়ি উঠে পাশের ঘরে গেল, ফিরে এল একটু বাদে, চোখে মুখে জল দিয়ে এসেছে, হাত-পাখাটা আবার তুলে

নিল—"কি বলবে বলছিলে, বলো"—

সুরেশ্বর তেমনি ভাবে উপরের দিকে চোখ রেখে বললো —"আমি ভেবেছি এখানকার বাড়ীঘর বেচে দিয়ে তোমাকে কলকাতা নিয়ে যাব, তারপর তুমি যদি তোমার দিদির কাছে পুরুলিয়ায় যেতে চাও, সেখানে রেখে আসব, আর না হয় আমাদের কাছে থাকবে, লেখাপড়া কিম্বা কোন হাতের কাজ শিখে নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করবে।"

সুমিত্রা যেন ধরধর উদ্বেগের সঙ্গে অন্য কিছু শোনার অপেক্ষায় ছিল, আস্তে আস্তে নিশ্বাস ফেলল, নিচু মুখে ধীরে ধীরে বললো—"কি যে বলো তুমি, তার ঠিক নেই, তোমার সঙ্গে চলে যাবার অর্থ কি হবে জানো, গাঁয়ে নিন্দেতো রটবেই, তারপর তোমার বাবা-মা, দাদা-বৌদি, তারাই বা কি বলবেন, তাছাড়া দিদির গলগ্রহ হবেও আমি থাকতে রাজি নই।"

—"গাঁয়ের লোকের নিন্দের জন্য আমি পরোয়া করি না"—সুরেশ্বর এবার একটু কাত হয়ে সুমিত্রার মুখের দিকে তাকাল—'আমার বাবা-মা, দাদা-বৌদি কিছু বলবেন বলে মনে হয় না, আর যদি বলেনও আমি গ্রাহ্য করব না, তোমাকে বরং আলাদা ভাবে রাখার ব্যবস্থা করব, মেয়েদের কোন বোর্ডিং-এ কিম্বা।"—

—"আমার জন্য তাদের কাছে অপ্রিয় হবে তুমি"—

—"সে প্রশ্ন অবান্তর, তুমি রাজী আছ কিনা তাই বলো।

সুমিত্রা কোন উত্তর দিল না, সুরেশ্বর আবার বললো—"এক্ষুনি তোমাকে জবাব দিতে বলছি না, আমার কথাটা ভাল করে ভেবে রাখো।"

সুমিত্রা ম্লানমুখে একটু হাসল—"আচ্ছা দেখব, তারপর তোমাদের বাড়ীর খবর সব বলো, অনু-বৌদি কেমন আছে, দেবানী কি কলেজে পড়ছে?"

—একটা নতুন খবর এখনো দিইনি, তুমি শুনলে খুব অবাক হবে, শুধু অবাক বললেও ঠিক হবে না—সুরেশ্বর রহস্যের হাসি হাসল—"গেল বুধবার দেবানীর বিয়ে হয়েছে, আজ চারদিন।"

—"ওমা! সেকি, খবর পাইনিতো"—

—"খবর দেবার সময় ছিল না"—সুরেশ্বর আস্তে আস্তে সব গাঁটি নাটি খুলে বললো। সবটা শোনার সময় সুমিত্রা কখনো অবাক চোখে তাকাল, কখনো ভুরু কোঁচকাল, কখনো মুখে আঁচল তুলে হাসি লুকলো, শেষে হাসতে হাসতে বললো—"যাঃ কি যে বলছো তুমি সুরেশদা,' আমার কিন্তু একটুও বিশ্বাস হচ্ছে না, এই সেদিনের মেয়ে বানী।"

—"মোটেই সেদিনের মেয়ে নয়, উনিশ বছর বয়স হ'ল, তোমার ইচ্ছে হয় বিশ্বাস করো, না হয় না করো, আমি আর বকবক করতে পারি না, বড্ডো ঘুম পেয়েছে"—সুরেশ্বর লম্বা একটা হাই তুলে পাশ ফিরে শুয়ে চোখ বুজল। সুমিত্রা তার পিঠের কাছে বসে কিছুক্ষণ হাওয়া দিল। তারপর একসময় আস্তে আস্তে উঠে দরজাটা ভেজিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল।

রাত্তিরে খেয়ে দেয়ে চলে আসার সময় সুরেশ্বর আবার সেই কথা তুলল। সুমিত্রা পেছন পেছন রোয়াকে এসে বললো—"সুরেশদা,' তুমি চিংড়ি ভাজা খেতে ভালবাস, আমি কাল চিংড়ি ভেজে রাখব, তুমি ভোরবেলা এসে চায়ের সঙ্গে খাবে, কেমন।"

সুরেশ্বর উত্তর দিল—"আচ্ছা আসব, কিন্তু তুমি আমার সেই কথাটা ভেবে দেখো, আজ সারারাত ভাবো কাল ভোরে আমাকে জবাব দেবে।"

—"আচ্ছা দেব।"—সুমিত্রা একটু হাসল, তারপর অন্ধকার পথে যতটা দূর সম্ভব আলো ফেলবার চেষ্টায় লণ্ঠনটা একটু উঁচু করে ধরল।

সুরেশ্বর গেটের কাছে এসে একটু দাঁড়াল, সামনে অন্ধকার পকেট থেকে টর্চ বার করলো, পেছন ফিরে দেখল, সুমিত্রা তখনো দাঁড়িয়ে আছে, লণ্ঠনের বিষণ্ণ হলুদ আলোয় তাকে কেমন করুণ আর অসহায় মনে হচ্ছিল।

পরেরদিন খুব ভোরে, আকাশ ভালভাবে ফর্সা হবার আগেই, যমুনা এসে ব্যস্তহাতে দরজায় ধাক্কা দিল—'দাদা, ও দাদা, ঘাজিয়াদা।'

সুরেশের ঘুম কখনোই খুব গাঢ় হয় না। ছুটো ডাকের পরেই ধড়মড় করে উঠে দরজা খুলে দিল—'কিরে, কি হয়েছে?"

লণ্ঠন হাতে যমুনা হাঁফাতে হাঁফাতে বললো—"থানের সেই বারা যেন আইছে।'—"বারা এসেছে।"—সুরেশর ওপাশের জানালা দিয়ে নিচে তাকাল। নাট-মন্দিরে ঝোলানো লণ্ঠনের আলোয় দেখল চার পাঁচ জন পুলিশের লোক, হাতে বন্দুক।

—"কে, কারা ওখানে?"

—"আমরা, বাঘরপঞ্জ থানা থেকে আস্‌ছি।"—দারোগা ইস্‌মাইল মিঞার গলা চিন্‌তে ভুল হ'ল না।

সুরেশর তাড়াতাড়ি জামা গায়ে দিল, যমুনার হাত থেকে লণ্ঠন নিয়ে নিচে এসে বৈঠকখানা ঘরের দরজা খুলে বললো —"আসুন, ভেতরে আসুন।" ইসমাইল মিঞা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বললো—"আপনার জিনিস পত্তরগুলো আমরা একটু দেখব।"

—"সার্চ করবেন!"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

—"কেন, বলুনতো।"

—"উপর থেকে এইরকম হুকুম পেয়েছি।"

কিছুসময় ধরে খানাতল্লাসী চললো। খুব বে-আইনী কিছু পাওয়া গেল না। ইসমাইল মিঞা একটা ফর্দ তৈরী করলেন, খানকয়েক বই, কিছু সৈনিক ও মাসিক পত্রিকা, পুরনো আমলের ছুটো ঘরচে ধরা তলোয়ার, তিনটে বল্লম। সুরেশর ফর্দের নিচে সই দিয়ে বললো—"আর কি করতে হবে বলুন।"

—"আমাদের সঙ্গে থানায় যেতে হবে।"

—"বেশ মুখ ধুয়ে, জামা-কাপড় বদলে আসছি।"

—"দু'জন সেপাই আপনার সঙ্গে যাক।"

—"কেন বলুন দিকি?"

—"আজ্ঞে, আপনাকে তো আরেষ্ট করা হয়েছে, তাই চোখের আড়ালে যেতে দেয়া ঠিক—ইসমাইল মিঞা একটু কুণ্ঠিতভাবে হাসলেন, যেন বড়ই লজ্জায় পড়েছেন ভদ্রলোক।

সুরেশর হতভম্ব—"সেকি, আরেষ্ট করলেন, কি জন্য, জানতে পারি।"

—"কি জন্য ঠিক আমিও জানি না, আই-বির লোকেরা বলতে পারবে, তবে যতটুকু শুনেছি, আপনি নাকি গ্রামে এসে শান্তিভঙ্গ করছেন, এখানকার হিন্দুদের নানারকম উস্কানি দিচ্ছেন, এরকম একটা রিপোর্ট গেছে সদরে, আপনাদের এখান থেকেই কেউ খবর দিয়েছে, তাছাড়া আপনি এককালে রাজনীতি করতেন, কংগ্রেসের সভ্য ছিলেন।

সুরেশর বাধা দিল—"সে-তো অনেক কাল আগে, ইংরেজ আমলে।"

—"ওই যথেষ্ট, জানেন তো, ঢাকায় এখন ইস্কান্দার মির্জার শাসন, বড় অবরদস্ত লোক, সমস্ত জেলায় এরকম ধরপাকড় চলছে, হক-সাহেবকে শুদ্ধ নজরবন্দী করে রেখেছে, বুঝতেই পারছেন আমরা হুকুমের চাকর।—ইসমাইল মিঞা বেশ ভদ্রভাবেই নিজের নিরুপায় অবস্থাটা বোঝালেন।

সুরেশর আর কথা বাড়াল না, যাবার জন্য তৈরী হ'ল। হাতে হাত-কড়া, কোমরে দড়ি বাঁধা। যমুনা হাউ মাউ করে কাঁদতে কাঁদতে দেউড়ী পর্যন্ত এল। বাজারের রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে রোদ উঠল। পেছনে ছোটখাট একটা ভীড়। কেমন করে যেন খবর পেয়ে অনেকেই ছুটে এসেছে। কালিচরণ, আলরাফ, ভুবন চাটুয্যে, বিষ্টু পদ, উপেন-মাষ্টার।

যতিমিঞা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে রাস্তা আটকে দাঁড়ালেন —"ইয়া আল্লা! একি কাণ্ড, রায়-বাড়ীর ছেলেকে আপনারা

হাত-কড়া দিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, না, না, খুলে ফেলুন, খুলে ফেলুন, সদরে গিয়ে যা হয় করবেন, গাঁয়ের মধ্যে ওসব চলবে না।"

—"আপনারা পাঁচজনে যদি এমন করে বলেন—" ইসমাইল মিঞা হাত কড়া আর দড়িটা খুলে দিতে বললেন।

নৌকোয় চেপে বাঘরগঞ্জ-থানা, সেখান থেকে শেষ দুপুরের টিমারে জেলা শহর। এই সমস্তটা পথ যেতে যেতে ভাবছিল সুরেশ্বর। সুমিত্রার কাছ থেকে কথার জবাবটা আর শোনা হ'ল না। হয়তো সেই সকাল থেকে চিড়ে ভাজা নিয়ে তার অপেক্ষায় বসেছিল। এতক্ষণে বোধ হয় কালিচরণ কিম্বা আসরাফের মুখে খবর পেয়েছে, তারপর কি করেছে, কে জানে।

ছাব্বিশ

দুপুরের অবসরে বাবার কাছে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছিল দেবানী পাশের ঘরে মমতাদি টিকলুকে ঘুম পাড়াচ্ছেন। সিঁদুরের সিঁথি চেকে আজো কায়দা করে চুল বেঁধে দিয়েছেন। বিয়ের পর আজ চারদিন। রোজই দুপুরে বাবার কাছে যায় দেবানী। কিছুক্ষণ কাছে বসে হাওয়া দেয়। কখনো একটু বাজিয়ে শোনায়।

রায়-মশাই বেশী কথা বলেন না। আগের চেয়ে আরো দুর্বল হয়ে পড়েছেন। মায়ের সঙ্গে একদিনও কথা হয়নি। মেয়েকে দেখলেই রায়-গিন্নী মুখ লুকিয়ে বেড়ান, ঘর ছেড়ে চলে যান। কখনো নিবারণ মাষ্টারের ঘরে, কিম্বা মন্দাকিনী ঠাকুরুণের কাছে গিয়ে বসে থাকেন। দেবানী যতক্ষণ থাকে একবারও ঘরে আসেন না। সে-ও আর কাছে গিয়ে কথা বলার চেষ্টা করেনি, সাহস পায়নি। এখন যাবার আগে হাত-ব্যাগের মধ্যে টুকিটাকি কিছু নিচ্ছিল।

কড়া-নাড়ার শব্দ শুনে তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজা খুলে দিল।

উস্‌কো-খুস্‌কো চুল, কোলা কোলা মুখ-চোখ ছোড়দা'। শৈলেশ্বর ভেতরে ঢুকল না, দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে প্রথম কথা —"দু'টো টাকা দিতে পারিস।"

দেবানী একটু ইতস্তত: করে ভেতর থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট এনে দিল।

শৈলেশ্বর সেটা পকেটে রেখে বললো—"আমি চলে যাচ্ছি, আর বাড়ী ফিরব না।"

—"কেন রে কি হয়েছে?"

—"বড়দা' আমাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে"—শৈলের গলা ভারী হয়ে এলো—"বড়দা'র ঘড়িটা কোথায় হারিয়ে গেছে, আমাকে মিছিমিছি সন্দেহ ক'রে"—জামার হাতায় চোখ মুছে আবার বললো—"তুই তাড়াতাড়ি গিয়ে বাবাকে দেখে আয়, তার অবস্থা মোটেই ভাল নয়।

—"সেকি।" —দেবানী যেন আর্তনাদ করে উঠ্‌ল— —"আমি তো কাল দুপুরেও দেখে এলাম।" —"কাল সন্ধে থেকেই অবস্থা খারাপ হয়েছে, ডাক্তার আগেই বলেছিল, হার্টে পক্ষাঘাত হ'লে আর বাঁচবে না। আচ্ছা আমি চলি।"

—"ও ছোড়দা', ছোড়দা' শোন্, শুনে যা" —দেবানী পেছন থেকে বারকয়েক চেঁচাল। শৈলেশ্বর একবারও না ফিরে হন্ হন্ করে রাস্তার মোড় ঘুরে অদৃশ্য হ'ল।

মমতাদি উঠে এলেন—"কি হয়েছে?"

দেবানী কাঁদো-কাঁদো গলায় উত্তর দিল—"ছোড়দা" বলে গেল বাবার অবস্থা নাকি খুব খারাপ, আমি যাচ্ছি দিদি, কখন ফিরব কিছু বলতে পারি না।"

মমতাদি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বললেন—"সাবধানে যেও, যেমন অস্থির ভাবে চলেছ, দুর্গা, দুর্গা।"

বাসের ভীড়ে লেডিজ্ সিটে একজনের মত জায়গা হ'ল। বোধহয় নতুন বউ-এর পাশে বসেছিলেন ভদ্রলোক, ব্যাজার-মুখে জায়গা ছেড়ে দিলেন।

আঃ, এত আস্তে চলেছে কেন? লেভেল-ক্রসিং এর

কাছে এসে আবার কিছুক্ষণ আটকে রইল। যেন ঢিমে তেতালা ছন্দে বাস চলেছে। পাশের নতুন বউটির গায়ে এসেন্সের গন্ধ। বাবার ওদিকে এখন অবস্থা, কিন্তু কি আশ্চর্য, পথের লোকগুলি কেমন নিশ্চিন্তে হাসছে, কথা বলছে, পান চিবুচ্ছে। রাস্তার দুইপাশে দোকানে দোকানে তেমনি ভীড়, নানা রঙের শাড়ি, রেডিওর গান, ট্রামের শব্দ, মোটরের হর্ন। পড়ন্ত দুপুরের আলোয় কৃষ্ণচূড়া গাছের মাথা তেমনি লাল হয়ে আছে। দোতালার বারান্দায় মেয়েটি পরম নিশ্চিন্তে সামনে ঝুঁকে কি যেন দেখছে। কারোরই কিছু হয়নি, বলায়নি, সব ঠিক আছে, কি করে থাকে, কেমন করে হয়। বাস-ষ্টপ কাছে আসতে, একে ধাক্কা দিয়ে, ওকে গুতো মেরে, কারো পা মাড়িয়ে, কারো হাতের তলা দিয়ে কোনরকমে নামল দেবানী। কনডাক্টরের হাতে পয়সা গুজে দিয়ে, টিকিট না নিয়ে একরকম ছুটতে ছুটতেই চললো। বাড়ীটার কাছাকাছি এসে পা দুটো যেন পাথর হয়ে এল, হাতের ব্যাগটা যেন লোহার তৈরী। আর চলতে পারবে না সে। কোন সাড়াশব্দ নেই কেন, দরজা-জানালায় একটাও চেনা মুখ নেই। ছাদের কার্নিশের আড়ালে সূর্য মুখ ঢেকেছে, দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে এল। সমস্ত বাড়ীটা যেন এক অশুভ সম্ভাবনায় আতঙ্কে বোবা হয়ে আছে। সিঁড়ি ধরে ধরে কোনরকমে উঠে সামনের ঘরেই দেখল বড়দা পায়চারি করছে। শান্তিধর আজ অফিসে যায়নি। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনে ফিরে তাকাল। বোনকে দেখে কয়েক পা এগিয়ে এল—"কি চাও তুমি?"

বিয়ের পর এই প্রথম দেখা। দেবানী জড়সড় হয়ে দাঁড়াল। মুখ নিচু করে মিনমিন স্বরে বললো—"আমি বাবাকে দেখতে এসেছি।"

—না, না, দেখতে হবে না, তোমার জন্যই এরকম হয়েছে জানো, তুমিই এর জন্য দায়ী, না, না, কোন কথা শুনব না আমি।" দুম্ করে দরজাটা মুখের ওপরই বন্ধ করে দিল। দেবানী আর একবারও ডাকতে পারল না। অন্য সময় হলে হয়তো চেঁচিয়ে কাঁদত, কিন্তু গলা থেকে কোন শব্দ হল না, চোখেও জল নেই। শুধু বিবর্ণ মুখে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে হাঁফাতে লাগল। চোখের সামনে যেন ঘন কুয়াশার পর্দা, বারান্দা, সিঁড়ির ধাপ, একতলার উঠোন —সব অস্পষ্ট।

ললিতা এসে ডাকল—"আয় আমাদের ঘরে বসবি চল।" হাত ধরে একরকম জোর করেই নিজেদের ঘরে নিয়ে গেল।

দরজার শব্দ আর শান্তিধরের চীৎকার শুনে বিপিন, অনুরাধা চমকে উঠল। রায়-গিন্নী আগের মতই অনড় হয়ে বসে রইলেন। রায়-মশাইয়ের খাটের পাশে ছিল সবাই। দরজার শব্দটা বোধহয় বাজ-পড়ার আওয়াজের মত কানে এল। সর্বেশ্বর রায় বড় বড় চোখ মেলে তাকালেন। সেই সকাল থেকেই মাঝে মাঝে এমনি চোখে কাকে যেন খুঁজছেন, এক একসময় বিড় বিড় করে কি যেন বলার চেষ্টা করছেন। রায়-গিন্নী সন্তুকে বললেন—"মুখে একটু জল দাও, ভাই।" সন্তু আঙুল হাতে দাদুর মুখে দুফোঁটা গঙ্গাজল দিল।

রায়-মশাই প্রথমে বিছনার চাদরটা তারপর রায়-গিন্নীর হাতখানা শক্তমুঠোয় চেপে ধরলেন। নিশ্বাস নেবার চেষ্টায় নাকের ডগা ফুলে ফুলে উঠছে, মুখখানা একটু হাঁ হয়ে আছে, গলার মধ্যে অস্পষ্ট একটা শব্দ হচ্ছে, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। আবার বিড় বিড় করে কি যেন বললেন। রায়-গিন্নী সামনে ঝুঁকে শোনবার চেষ্টা করে, বললেন—"ঠাকুরের নাম কর, নীলমাধবকে ডাক, ইষ্ট দেবতার নাম কি ভুলে গেলে।" কান্নার ভারে তাঁর গলাটা কেমন বিকৃত শোনায়।

শিয়রের দিকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে বিপিন জোরে জোরে হাওয়া দিচ্ছে, যেন প্রাণপণ চেষ্টায় ঘরের এই বদ্ধ বাতাসটা উড়িয়ে দিতে চায়। কারো মুখে কোন কথা নেই। শুধু টেবিলের উপর হরেশ্বরের ঘড়িটা বড় অন্যায়ভাবে অযুতের

করতে টিপ টিপ করে চাইছে।

অনুরাধা কিছুক্ষণ দরজার পাশে দাঁড়িয়ে উৎসবের চোখে বড়ুয়ার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। তারপর একসময় অস্থির-ভাবে ছটফট করে ছুটে গিয়ে দরজা খুলে ডাকল—"আসুন আপনারা ভেতরে আসুন, ভেতরে এসে বসে যান।" তার কণ্ঠস্বরে কথা যেন কিসের আবেগের মত শোনাল।

দরজার বাইরে তারাচরণবাবু দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি আর একটু আগেই কোর্ট থেকে ফিরেছেন। তার পেছনে ইন্দ্রনাথ কবিরাজ, নিবারণবাবু, বরদার মোর, রঞ্জিত, কমলা, মন্দাকিনী ঠাকুরণ, শক্তিসংঘের ছেলেরা। সকলেই একে একে ভেতরে এলো, নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়ে রইল।

সূর্যের রাঙা কিরণ কারো দিকে তাকালেন না, কাউকে দেখলেন না, তেমনি বড় বড় চোখে ঘরকে যেন খুঁজলেন!

তারপর মাথাটা একটু এপাশে কাত হয়ে পড়ল, স্থির বিস্ফারিত চোখে খোলা জানালার দিকে তাকিয়ে রইলেন, সেখানে কেউ নেই, কিছু নেই, শুধু আকাশ, অপরাহ্নের আকাশে অস্তিম সূর্যের আলো।

সমাপ্ত

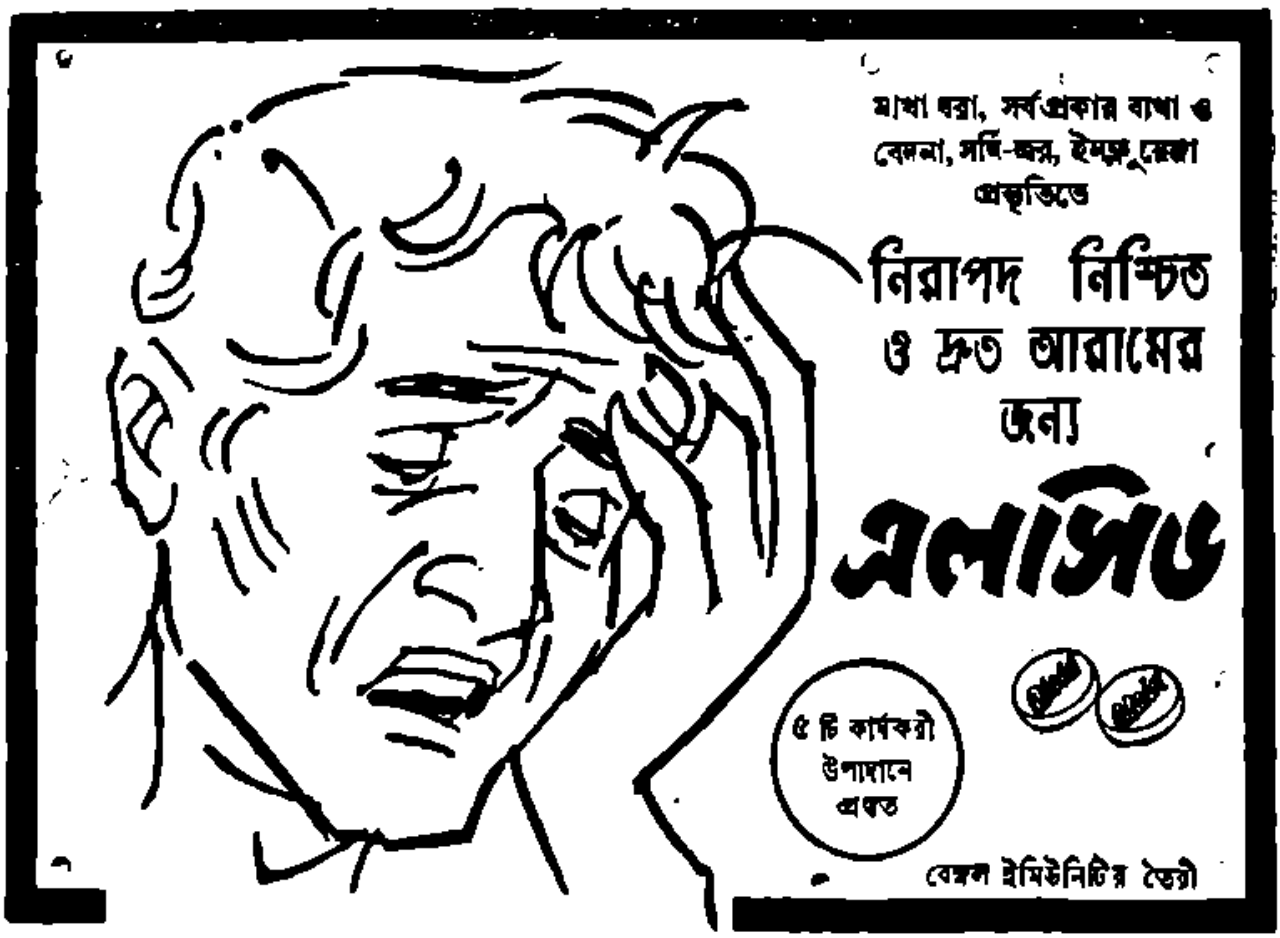

বড় বৌদি চলে গেল। মোটা ছাদ এখন নিঝুম। ঘরের বাতাস যেন আচমকা বালিশে মুখ গুঁজে নিঃসাড় হয়ে শুয়ে পড়েছে। অরুণের মনে হল, এই ঘর যেন-থাকা ঘড়ির মতন বিরক্তিকর।

ইজিচেয়ার নিয়ে বারান্দায় খানিক বসবে ভেবেছিল, কি মনে হল গুটনো চেয়ারের দিকে না এগিয়ে অরুণ খাটের বাজু ধরল। তাকাল। এবং অরুণ স্পষ্ট একটি মাকড়সাকে চুপ করে থাকতে দেখে হঠাৎ পুলকিত হতে পারল।

হাত নিসপিস করছিল। অদ্ভুত এক চাঞ্চল্য অরুণকে ঈষৎ ঝাঁকুনি দিচ্ছে। পায়ের তলার দিকে বাম চোখে তাকাল, ভীষণ খুঁজতে; যদি একটি পোড়া দেশলাই কাঠি কি ফুটো পায় তো তা দিয়ে মাকড়সার ঘুম ভাঙাতো, প্রাণের ভয়ে ওর ছুটে যাওয়ার দৃশ্যটি হয়তো পুলকিত করত অরুণকে।

অরুণ নড়ল না। তার চোখ দুটি এই ক্ষীণাবয়ব মাকড়সাকে ধরে রেখেছে। সামান্য ঝুঁকে দেখতে গিয়ে কষ্ট হল, উবু হয়ে বসে অরুণ যেন খুঁটিয়ে বিচার করার তীব্র এক আগ্রহ অনুভব করতে পারছিল। প্রথমে অসংখ্য পা, পরে শরীরের রুক্ষতা, মোটা নিম্নাংশ, ছোট মুখটি দেখতে গিয়ে অরুণের মনে হল, যদিও কীটশ্রেণীর জীবটি তার দিকে পেছন দিয়ে আছে, তবু যেন সতর্ক চোখটি সে স্থির করে রেখেছে অরুণের দিকেই। সরু আলপিনের ডগায় চাইনিজ কালির বিন্দু দেওয়ার মতন চোখ। কিন্তু এই চোখে সতর্কতা ছাড়াও যেন আরও কিছু আছে। কী? অসহায়ত্ব? ও কি ভাবতে পারছে, ওর চেয়ে কয়েক লক্ষ গুন বড় রকমের একজন মানুষ ওকে দেখছে? ওকি ভয় পেয়েছে আমাকে দৈত্য ভেবে? হয়তো পেয়েছে; পাবার কথাই, কারণ আমি, এই শতাব্দীর এক যুবক ইচ্ছে করলেই যে কোনো মুহূর্তে ওকে পিষে মারতে পারি।

আকাঙ্ক্ষা-প্রেক্ষে

প্রবোধবন্ধু অধিকারী

অরুণ নড়ল না। মাকড়সার চোখ দেখছিল। এবং অনেকক্ষণ ধরে দেখতে দেখতে মনে হল এই ছোট দুটি চোখ অত্যন্ত কুৎসিৎ। বীভৎস রকমের আক্রোশ যেন মাকড়সার দৃষ্টিতে। ঠেলে ওঠা বিন্দুর মতন চোখ; কালো কাগজে সরু পিনের মাথা ছোয়ানের মতন গর্তে মিনি আলো যেমন ফোটে, তেমনি এ-চোখের অন্তরে কোথায় যেন ভীষণ ক্ষীণ রকমের উজ্জ্বল বিন্দু আছে। বুকের ভেতরে অল্প স্পন্দন জেগেছিল, পরে ঢিবঢিব করতে শুরু করল। ভয় পেয়েছে অরুণ। এবং বসা অবস্থাতে খানিক সরে এসে শূন্য ফাঁকা ঘরে চোখ রেখে তার মনে হল, সে ভীষণ একা। তার কাছে কেউ নেই। কেউ না।

অরুণ দাঁড়াল। দু'পা পেছনে সরে এসে হিস্ হিস্ করে জিভে শব্দ তুলতে গিয়ে অনুভব করল, গলা শুকনো, গায়ের লোম কখন খাড়া হয়ে এসেছে। ভীষণ অবস্তি আর উদ্বেগ—অরুণ সহ্য করতে পারছিল না। অনেকটা ক্ষেপে ওঠার মত সে কিছু খুঁজছিল যা দিয়ে এই ক্ষুদ্র জীবটিকে সে পিষে মেরে মারা পর্যন্ত স্বস্তি পাবে না। কিন্তু কী মেরে অরুণ; কী? ঘরের মেঝে নিশ্চুপ, ছাদ অসাড়, খাট, আলমারী চেয়ার চুপ করে আছে। কেউ নড়ছে না, কেউ না—কেবল অরুণ একলা···একলা—একাকী। গলা শুকনো কাঠ।

অনেক পরে হাতের কাছে টেবিল পেল অরুণ। এবং

কিছু পাওয়ার আনন্দে আচমকা একটি বই তুলে নিয়ে বাটের বাড়ুতে ছুড়ে মারল। জোরে। আর সঙ্গে সঙ্গে বুকের স্পন্দন বেড়ে যেতে ঘরের বেগে ছুটে এসে বারান্দায় দাঁড়াল। হাঁপাচ্ছিল অরুণ, যেন কোনো ভয়ানক শত্রুর হাত থেকে সে নিষ্কৃতি পেয়েছে।

বাইরে অল্প বাতাস দিচ্ছে। গোটা ছাদ রৌদ্রময়। ছাদের কার্নিশের ওপর একজোড়া পায়রা গলা ফুলিয়ে বকম বকম খেলছিল। সামান্য দূরে ইলেকট্রিকের তারের ওপর স্থির হয়ে বসে আছে ক-টি কাক।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে অরুণের মনে হল, একটি ঘোরা ঘরে সে এতক্ষণ ভয়ের স্বপ্ন দেখছিল, জেগে উঠে এখন সহরের গলা শুনতে পেল। এবং আশ্চর্য, বাইরের অল্প বাতাস, ছাদের রোদ, পাখি আর আকাশ যেন খানিক আগের অস্বস্তি, উদ্বেগ ও ভয় থেকে অরুণকে মুক্ত করতে পেরেছে। সব ভুলতে পেরেছে অরুণ; সব। বাতাস সরব, যেন এই সহরের সকল মানুষের গলায় অস্ফুট অথচ টানা কলরব। বাতাস, তা ঘরে এনেছে। আরও পরে অরুণ এ-বাড়ির দোতলা একতলার সম্মিলিত ঘরের কলরবে কান রাখল।

গায়ত্রীর গলা শুনতে পেল অরুণ। ও পড়ছে। জোর গলায় চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে।···ইস মেয়েটা এত চেঁচায় কেন সামনে বার্ষিক পরীক্ষা টরীক্ষা এসেছে। কলেজের মেয়েরা আস্তে পড়বে, বইয়ের পাতার ওপর চোখ বুলিয়ে কিন্তু মুখে শব্দ ফুটবে না। যেন অরুণ ছোট বোনকে সামনে পেয়ে পড়াশোনার ব্যাপারে উপদেশ দিচ্ছিল। পরে রোদের দিকে তাকিয়ে হাসল অরুণ।

গায়ত্রীর গলা ক্রমে চড়ায় উঠছিল এবং হঠাৎ থেমে যাচ্ছিল মাঝে মাঝে। অরুণ প্রথমে ভয় পেয়েছিল, বেলা হচ্ছে, গায়ত্রীর কলেজে যাবার তাড়া। কিন্তু না। কলেজ বন্ধ। আহা বেচারী, ভীষণ আটকা পড়েছে। প্রীতিশের সঙ্গে কতদিন দেখা হয়নি কে জানে।

কার্নিশের ছায়া পড়েছিল ছাদের কিনারে। বর্ষায় এ-পাশে শ্যাওলা মতন জমেছিল বুঝি—এখন তা শুকিয়ে এসেছে। ফেটে ফেটে চটা ওঠার মতন। পায়ের চটি দিয়ে অরুণ শুকনো চটা ঘষছিল।

নীচের অস্পষ্ট শব্দের রেশ কখন আরও চড়ায় উঠেছে, বড় বৌদি কাকে ধমকাচ্ছিল, মেজদা হাকাহাকি করছে। যেন একটা প্রলয় কাণ্ড ঘটছে। অরুণ কার্নিশের কাছে এল। গলা বাড়িয়ে দিল বাইরে। নীচে কিসের এত গোলমাল দেখতে চাইল। অরুণ দেখল, বড় বৌদির মুখে খেলা চড়ার উদ্বেগ; হাতে খুন্তি নিয়ে সুবর্ণর মাকে ধমকাচ্ছিল। সুবর্ণর মা বাসি বাসন-কোসনের কাঁড়ি নিয়ে কলতলায় কাজ করছিল, বড় বৌদির ধমক খেয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। দোতলার বারান্দায় মেজদা দাঁড়িয়ে কী বলছে। মেজবৌদি পাশে দাঁড়িয়ে আহ্লাদের হাসি হাসছিল। ডানপাশের ঘর থেকে ছুটি বেরিয়ে এসে ওরতর করে নীচে নামল গায়ত্রী। যেন কাজ করবে. তাই আঁচল কোমরে জড়িয়ে বড়বৌদির হাতের খুন্তি কেড়ে নিতে গেল, বড় বৌদি দিচ্ছে না··

অরুণ বিরক্ত হচ্ছিল। এ-বাড়ির নিচতলা থেকে চোখ সরিয়ে নিল। বাস্তবিক মেজবৌদির ওপর সে প্রসন্ন হতে পারল না। হঠাৎ কেন জানে না, অরুণের মনে হল এই সংসার মেজবৌদি ভাঙবে।

অথচ এমনটি হবে কেউ ভাবেনি। অরুণও না।·· বিরক্ত, ভীষণ বীতশ্রদ্ধের ভাব জমায় অরুণ স্বাভাবিক শ্রদ্ধা ও মর্যাদা না দিয়ে এ-বাড়ির মেজ বৌকে মাপ করে তাকাল।··· তুমি অনেক কিছু করেছ রীণা, অনেক—যেন অরুণ ভাবতে পারছিল রীণা আগের মতন, বিয়ের আগের রীণাই আছে, এবং একদিন যেহেতু এমন সম্পর্ক ছিল, অতএব সেই অধিকার নিয়ে আজ তাকে সাবধান করে দেবার অধিকারটুকুও অরুণ দাবি করতে পারে।

আমি কি ভুল করছি? অরুণ ছাদের চড়া রোদকে

দিকে ভাবছিল।···না, আজ প্রস্তাব আসনে বসলেও তোমার অতীত এমন কিছু নিষ্কলঙ্ক নয়। সেজন্য কি এ-বাড়ির সকলে তোমায় না চিনলেও আমি চিনেছিলাম। অনেক আগে। বাস্তবিক আরও আগে জানলে আমি ··

হালকা পা-ফেলার শব্দে অরুণ চমকাল। কে···আচমকা ফিরে তাকাতে গিয়ে সুবর্ণকে দেখল অরুণ।

ঘরে ঢুকবার আগে সুবর্ণ একবার ছাদে তাকাল। অরুণের দিকে।

'সুবর্ণ···' অরুণ ডাকল। যেন চরম এক মানসিক সঙ্কট থেকে সে মুক্তি চাইছে। ডাক শোনবার আগেই ঘরে পা দিয়েছিল সুবর্ণ। তার হাতে কিছু কাপড় চোপড়। ধোপা-বাড়ি ফেরৎ। ইচ্ছে করলে এ-গুলো রাখতে পারত, কিন্তু রাখল না, যেন এই ডাকটি তার সকল কাজের চাইতেও বড়। সুতরাং সুবর্ণ ঘুরে দাঁড়াল। চৌকাঠের কাছে। হেঁটমুখে। তার চোখেমুখে ন্ম্র এবং সলাজ ভাবটি ছিল।

'সুবর্ণ শোনো' ··, কয়েক পা এগিয়ে এল অরুণ। কেশ দেখার মুখটি নিচু করলে—অরুণ ভাবল। সুবর্ণর কণ্ঠার কাছটা কাঁপছে, মুখ নিচু করাতে কপাল স্পষ্ট দেখাচ্ছে। অনেক চুল ওর কানটা কেন অত ছোট? তার একটু বড় হলে মুখের সঙ্গে কেশ মানিয়ে যেতে পারত। 'নীচে গোল-মাল বেঁধেছে নাকি?'

'হ্যাঁ,' সরাসরি মুখের দিকে না তাকিয়ে অরুণের পায়ের দিকে চোখ রাখল সুবর্ণ।

'কেন -?'

সুবর্ণ এবার তাকাল। একটুক্ষণের জন্যে। পরে চোখ নামাল। 'মা-কে।'

ও কেন এত ছোট করে কথা বলে? আর একটু বড় করে বলতে পারত। পারলে অনেক ভাল হত; আমার মন হালকা হত। 'কেন?' অরুণ চেষ্টা করে লঘু হাসি হাসল। 'তোমার মার পেছনে আবার লাগা কেন?'

সুবর্ণ জবাব না দিয়ে আকাশে তাকাল।

কে জানে ও কি ভাবছিল। কিন্তু অরুণের বুঝতে বাকী রইল না, সুবর্ণ দুঃখ পেয়েছে। একটু আগে যে মুখে প্রসন্নতার ভাবটি ছিল, এখন তা বিষণ্ণ এবং ভীষণ করুণ। সুবর্ণর চোখ দু'টিও বুঝি ছলছল করছিল।

'সেজবৌদির জন্যে।' অরুণ সুবর্ণকে যেন আশ্বাস দিতে চাইল। 'একারের সংসার, বড়বৌদি একলা কত পারবে? সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একটা কোনো কাজে যদি হাত দেয়। সেজদার যেমন চড়া, না চললে বলত বড়বৌদি। পারে না বলেই তোমার মাকে উস্কোয় করে '

সত্যি সুবর্ণর চোখ ভিজেছে। সে তাকিয়েছিল, অরুণ দেখল। কিন্তু দাঁড়াল না সুবর্ণ। ঘরে পালাল।

আরও বেশি বিরক্ত হল, রাগ এবং ক্ষোভও হচ্ছিল অরুণের। রীণার ওপর। পরে এই বিরক্তি আক্রোশে দাঁড়াল।···তুমি আজ আসবে না? আসবে। তখন তোমাকে আমি শোনাব। অপ্রিয় হোক তবু স্পষ্ট কথাটা তোমাকে আজ বলব।

অনেকক্ষণ শুয়ে থাকল অরুণ।

বেলা অনেক। ঘড়িতে প্রায় এগারোটা বাজে। নীচের কলরব অনেক আগে থেমে গেছে, বড়দা আর মেজদা অফিসে গেল, ছোড়দা এখন আড্ডায়। বড়বৌদি কী করছে দেখতে ইচ্ছে করছিল অরুণের, জানতেও। ·· যদি নীচে যেতে পারতাম, গিয়ে উঠোনে দাঁড়াতাম; এ-সংসারে কি হচ্ছে, তলে তলে, সে সত্য প্রকাশ করে মুখোস খুলে দিতাম। অল্প স্বল্প উত্তেজনা ক্রমশঃ চড়ছিল। উঠবে ভেবেও উঠল না অরুণ। নীচে যাওয়া মানা, সেটা একলা আর দোতলা অরুণকে ছাদে ঠেলে দিয়ে পেছন ফিরে বসে আছে।

দেওয়ালে চোখ রেখে শাদা রঙের তলা থেকে ঘুটির মতন

ওঠা অস্পষ্ট কালো বিন্দুর সারি দেখছিল অরুণ। অনেক সময় ধরে দেখতে দেখতে মনে হল, সবকিছু মসৃণ উজ্জ্বল রঙের তলায় এমনি সব কলঙ্কের কালো দাগ লুকিয়ে থাকে এবং একদিন দেওয়ালে নতুন করে চুনরঙ না-লাগানোর মতন দিনে দিনে রঙের উজ্জ্বলতা ছাপিয়ে এই কদর্য দাগগুলো ফুটে ওঠে। ওঠেই।

মুখে চোখে ঘৃণার ভাব ফুটেছিল, মনেও। অরুণ দেওয়াল থেকে চোখ তুলে নিয়ে জানালায় রাখল। বাইরে আকাশ, উজ্জ্বল রোদের আভা, দূরের বাড়ির মাথা এবং গাছপালা সব যেন পুরনো বাসি কাপড়ে অঙ্গ ঢেকে বসে আছে। বাস্তবিক পুরনো, প্রাচীন; দেখে দেখে সবকিছু এতবার দেখা হয়েছে, অরুণ এর মধ্যে নতুন কিছু খুঁজে পাচ্ছিল না।

আলমারীর দিকে তাকিয়ে অরুণ আন্মনস্ক হল। চোখ ছিল ওখানে, দেখা না দেখার মাঝখানে, আসল দৃষ্টিকে যেন বুকের গভীরে রেখে অরুণ একবও পোড়া ঝাঁঝরা চিত্তই পিঠার খণ্ডকে পরীক্ষা করছিল। নাড়িয়ে নাড়িয়ে।

কিন্তু ভাল-না-লাগা মন কোথাও বসে না, চিন্তা গভীরতা পায় না। অরুণ বিরক্ত হচ্ছিল। মনে মনে। বুকের গভীরে রাখা দৃষ্টিকে সে বেশিক্ষণ সইতে না পেরে, মেঝের তাকাল। কী যেন ভাবতে চাইছিল, তন্ময় হয়ে কিন্তু প্রক্ষিপ্ত মন নিয়ে সে অসহায়। উঠে বসল অরুণ। জড়তা ভাঙতে গিয়ে ফাঁকা ঘরে সে আর কাউকে আশা করছিল। কাকে? সুবর্ণকে।

'সুবর্ণ···' অরুণ ডাকল।

কেউ এল না।

'সুবর্ণ···' অরুণের গলা সামান্য চড়ল।

একবার দু'বারে নয়, আরও কয়েকটি ডাকের মাথায় সুবর্ণকে দেখা গেল। জানলায়। ঘরে আসে নি। ছাদের কোথাও ছিল, ডাক শুনে মুখ বাড়িয়েছে।

'তুমি একটু নীচে যাও তো সুবর্ণ।' খাট থেকে পা নামাল অরুণ। 'বড়বৌদিকে গিয়ে বলো, আমি চা-চাইছি।'

সুবর্ণ সরে গেল, অরুণ একপা মেঝেয় রেখে অন্য পায়ের ওপর কায়দা করে বসল। ঘণ্টিও সুবর্ণ গেল। ও গিয়ে বলবে, কিন্তু চা আসবে না, অরুণ জানে। চাও আসবে না, সুবর্ণও হয়তো ফিরতে দেরী করবে। তবে বড়বৌদি নিশ্চয় আসবে। 'এখন আবার চা কিসের, এই দুপুরে?' বড়বৌদি আঁচলে হলুদ রঙের হাত মুছতে মুছতে হাসবে। খুব সুন্দর করে হাসতে পারে। বড় বৌদির দাঁত ঝকঝকে, ঠোঁট এখনও পাতলা লালমতন— অনেকটা মার মতন চিবুক। 'আমি জানতাম, এখন তোমায় চা-বাড়িকে পাবে। কাজ না থাকলে, একলা ঘরে চা-টা নেশার মতন কাজ দেয়, না?' হাসতে হাসতে এগিয়ে আসবে, অজান্তে। এবং যখন দেখবে প্রায় খাটের বাজুর কাছে এসে গেছে, তখন, আচমকা বড়বৌদি থামবে। থেমে যাবে। যেন সাবধান হবে, আর এগুনো অনুচিত ভেবে। 'তাও আনব, তুমি বরং চানটা সেরে নাও।'

দু' একদিন সঙ্গে সঙ্গে ওঠে, না হ'লে চুপ। অরুণ কথা বলে না। তার মনে ভাবায়, অনেকটা গোঁসা করার মতন।

'লক্ষ্মী, ভাই···' বড়বৌদি আদরের সোহাগের গলায় ছোট ছেলেকে আদর করার মতন করে বলবে। 'ভাল হ'য়ে উঠলে তুমি যত চাইবে, তার চেয়েও অনেক বেশি চা তোমাকে দেব। রাগ করে না···,' বড়বৌদির একটা মন আসতে চাইবে। কাছে। অরুণের কাছে। কিন্তু আর একটি মন বড়বৌদির পায়ে পায়ে বেড়ি লাগাবে।

ভাবতে ভাল লাগে, অরুণ জানে, বড়বৌদি সরে সরে থাকলেও তার মধ্যে কোথায় যেন মা ভর করে আছে। অরুণের কষ্ট, তাই ধরা যায় আন্দাজ নিশ্চয় বড়বৌদিকে আশ্রয় করেছে।

একটা গোলমালের আওয়াজ শুনে অরুণ কান তুলল। চোখ মেলল। আওয়াজটা নিচের রাস্তার দিক থেকে আসছিল। কী হ'ল আবার। অরুণ নামছিল। ছাদের দিকে যাবার জন্যে।

সুবর্ণ ঢুকল। হাতে চায়ের কাপ।

'দিয়েছে—?' অরুণ উৎফুল্ল, আনন্দিত। 'কিছু বলল নাকি বৌদি?' হাত বাড়িয়ে পেয়ালা-পীরিচ তুলে নিল অরুণ। তার চোখ সুবর্ণর মুখে।

সুবর্ণ খুশী। অল্প পুলকের রোদ তার মুখে মাখানো রয়েছে।

'আমি ভাবলাম বুঝি দেবে না।' অরুণ উষ্ণ চায়ের কাপে ঠোঁট রাখল। 'চাইলে কোনদিন দেয় না। আজ বুঝি খুব মেজাজে আছে, না?'

সুবর্ণর মুখে কথা নেই। সে কখনও মেঝের চোখ রাখছিল, কখনও খুশীর ভাব অজানো চোখে অরুণের তৃপ্ত উজ্জ্বল মুখে। যেন অরুণের হর্ষ, উৎফুল্লতা তার আনন্দ এবং খুশীর কারণ হয়ে উঠেছে।

বাস্তবিক এ-অসহ্য। অরুণ বিরক্ত হচ্ছিল। কে আছে আর? কেউ নেই। কেবল এ-ঘরে আমি আর সুবর্ণ। আমি যত কথা বলতে চাই, ও তত নীরব! লাজুক। তবে আমার সময় কাটে কিসে? যতক্ষণ কাজ আছে, এ-ঘরে সুবর্ণ আছে, কাজ না থাকলে ও ছাদে ঘোরে, কার্নিসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। আকাশ দেখে। ভীষণ বেয়ালী। অরুণ বিরক্তি অথচ অল্প সহানুভূতির চোখে সুবর্ণকে দেখছিল। এবং এখন তার মনে হচ্ছিল, দু'বছর আগের তুলনায় সুবর্ণর রঙ যেন অল্প ময়লাধরা মতন হয়েছে। কিছু মাংস লেগেছে গায়ে। চায়ের কাপটা হাত বাড়িয়ে সুবর্ণর দিকে এগিয়ে দিতে গিয়ে অরুণ ওর কণ্ঠার নিচে চোখ রাখল। জোরে নিশ্বাস ফেলল। সুবর্ণ-বড় হয়েছে। অরুণের গলার ভেতরটা শুকনো শুকনো মনে হল।

'মাথার কাছটা কেমন যেন করছে।' অরুণ সুবর্ণর ওপর থেকে চোখ সরিয়ে এনে বলল। 'একটু ব্যথা ব্যথা মতন যেন।' অরুণ চোখ তুলল। 'তুমি কি নিচে যাচ্ছ নাকি এখন?'

'কাপটা ধুয়ে রাখব—' সুবর্ণ মাথা নিচু করে বলছিল।

'তাই রাখো।' খাটের শিথানের কার্নিসে দু হাত ভাঁজ করে রেখে অরুণ এমনভাবে তার মাথাটা রাখল, যেন ভীষণ কষ্ট পাচ্ছিল। 'সুবর্ণ, তুমি কাপটা ধুয়ে একটু এসো। মাথাটা টিপে দিলে আরাম লাগতে পারে।'

সুবর্ণ নীচে যায়নি। বাথরুমের দিকেই গেল। অরুণ বোধনা হয়ে মাথা তুলল! অল্প হাসছিল। এবং তার এ-কথাও মনে হচ্ছিল যে, জ্বর এলে নাড়ি দেখে কি গায়ের তাপ নিয়ে তা পরীক্ষা করা যায়। অসুখেরও কিছু কিছু লক্ষণ আছে। মাথা ধরলে তার প্রমাণ পাওয়া সহজ নয়।

বাথরুম থেকে ট্যাপ খুলে দেওয়া জল-পড়ার শব্দ আসছিল।

অরুণ মাথা তুলল, হাত গুটিয়ে নিয়েছে। সুবর্ণ আসার আগেই শুয়ে পড়তে হবে। শুয়ে পড়ল অরুণ। মুখচোখের এমন ভঙ্গি করছিল, যেন অসহ্য ব্যথায় তার মাথাটা ছিঁড়ে পড়তে চাইছে।

ও-ঘরের জল-পড়ার শব্দ থামলে, এ-ঘরের মেঝের পায়ের শব্দ উঠল। চোখ বুঁজে সুবর্ণর আসার দৃশ্যটি কল্পনা করে নিচ্ছিল অরুণ। তার মুখে চোখে কষ্টের অভিনয় নিখুঁতভাবে ধরা দিচ্ছিল। উঃ! অরুণ কাতর এবং যন্ত্রণার সঙ্গে পাশ ফিরে চোখ খুলল। সুবর্ণকে দেখছিল।

কাপ রেখে সুবর্ণ অরুণের কাছে আসেনি। ও-দিকের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে দূরের আকাশে চোখ রেখেছে। হাওয়া দিচ্ছিল অল্প অল্প, জানলা গলে পাতলা চুলও হাওয়ায় আকুপাকু করছিল।

চমৎকার ছবি। অরুণ চোখ তুলে দেখল।

দূরে, প্রায় মধ্যাহ্নের ঘন নীল আকাশ, তলার দিকে গাছ গাছগুলির মাথার সবুজ ঘুল একটি অমসৃণ রেখা, জানালার কটি কালো শক্ত শিক, এক সবে যৌবনপ্রাপ্ত-মেয়ের উন্মনা উদাস চাউনি, গাঢ় আচ্ছন্নতায় রাঙানো মুখ—

অরুণ যেন চোখের সামনে কোনো শরীর আঁকা সুন্দর ছবি কল্পনা করতে পারছিল।

মন থেকে হৃদয় থেকে যে আকাঙ্ক্ষা, সাধ এবং বাসনা উৎসারিত, তাকে অত সহজে ভোলা যায়না। যায়না সুন্দর একটি ছবি—কি যৌবনপ্রাপ্ত এক কুমারীর এলানো চুলে-ঢাকা-পিঠ দেখে মন থিঁতিয়ে থাকে না। সুতরাং বার বার একটি কথাই অরুণের মনকে তীব্র নখের আঁচড়ে আঁচড়াচ্ছিল। অরুণ আবার সেখানে ফিরে এল, যেখানে তার মুখে-চোখে এক যন্ত্রণার ছবি লিখি পেতে বসেছিল।

'ইস্…' অরুণ কাতর গলায় প্রায় আর্তনাদের মতন শব্দ তুলল। 'ভীষণ টাটাচ্ছে মাথাটা…' সুবর্ণর কানে পৌঁছে দিতে যতটুকু চড়া কণ্ঠের দরকার অরুণ তার চেয়ে ক্ষীণ গলায় কথাগুলো উচ্চারণ করেনি।

সুবর্ণ একবার পাশ ফিরে দেখেছে। অনেকটা চমকে ওঠার মতন চোখে। তারপর আবার সে স্তব্ধ।

'সুবর্ণ…' অরুণ তেমনি কাতর, ক্লান্ত, যন্ত্রণার সুরে টেনে টেনে ডাকল। মনে বিরক্তি অখুশীর ভাব ছিল, তা প্রকাশ না করে নরম, নিস্তেজ এবং মোলায়েম গলায় ডাকছিল অরুণ। 'মাথাটা একটু টিপে দাও তো।'

সঙ্গে সঙ্গে আসেনি। একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে কী ভেবেছিল, পরে কাছে এল, খাটের সামনে দাঁড়াল।

'ভীষণ যন্ত্রণা…' অরুণ প্রথমে সবে মুখ-খোলা বুঁড়ির মতন চোখের প্রকম্পিত পাতা ফাঁক করল। পরে, সম্পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল।

সুবর্ণর শীতল হাতের স্পর্শ কপালে ঠেকেছে। ও শিয়রের দিকের কাটা-আকরী কার্নিসের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে কপাল ছুঁয়েছে। হাত-নড়ছে। ওর সরু নরম কোমল আঙুলগুলো যাদুকরের মত কপালে চলাফেরা করছিল। কখনও ঘর নিকনোর মত পাতা হাত ও কপালে বুলোচ্ছিল।

অরুণ চোখ বুঁজল। আকাঙ্খিত আরামের স্বাদ পেয়ে।

কিন্তু এই কুতেই তুষ্ট নয়, অরুণ যেন মনে মনে আরও কিছু চেয়েছিল। কী তার চাওয়া? অরুণ চাইছিল, সুবর্ণ অতদূর থেকে নয়, পাশে, এই বিছানায় বসে মাথা টিপে দিক। ওর শরীর অরুণের দেহের সঙ্গে ছোঁয়া না ছোঁয়ার এমন সীমায় থাক, যেন এই দেহের উষ্ণতা অরুণ পেতে পারে। মন হৃদয় দেহ দিয়ে অনুভব করতে পারে, সবে যৌবন পাওয়া এক নারীদেহ ওর শরীরের কাছে রয়েছে।

'না…' অরুণ চোখ খুলল, মাথা পাশে সরিয়ে সুবর্ণর চোখে তাকাল। 'তুমি, সুবর্ণ এ-পাশে এসো তো।' অরুণ শোয়া অবস্থাতেই সামান্য বাঁ-পাশে সরে গিয়ে জায়গা করে দিল। 'এখানে বসো…'

সুবর্ণ এলো না। ইতস্তত করছিল।

'ওখান থেকে ঠিক হয় না, আরাম লাগে না।'

তবুও না। কুণ্ঠিত, ইতস্তত এবং শংকিত মন এবং স্পন্দিত বুক নিয়ে সুবর্ণ আরও খানিক দাঁড়িয়ে থাকল। হেঁটমুখে। এবং অবশেষে জড়তায় অড়িয়ে যেতে যেতে এ-পাশে এসে দাঁড়াল। চোখ তুলতে পারছিল না।

'এখানে…' অরুণ ডান হাত পেতে পাশের খালি করা জায়গাটা দেখাল। হাতে এমন জায়গা দেখাল, যা ঠিক কাছে, একেবারে অরুণের বুকের সান্নিধ্যে। 'এবার দেখো, তোমারও কষ্ট হবে না, আমিও…' অরুণের দ্রুত নিশ্বাস আরও দ্রুত হল, গলার স্বরও সামান্য কেঁপে উঠল।

বসবে কি বসবে না—সুবর্ণর কাছে এ-এক কঠিন পরীক্ষা তার বুকের ভেতরটায় কী ভীষণ কাঁপন উঠেছে! শরীরের কোথাও যেন কোন অজানা পুরুষ তার সোহাগের হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। এই বুলনো আরাম না সইবার না ত্যাগ করার মতন। সুবর্ণ চোখ তুলতে পারছিল না।

এমনটি আগে ছিল না। এত কুণ্ঠা, এত শংকা, লজ্জা কোথায় ছিল, কে জানে। সামনে, বিছানার ওপোর যে-মানুষটি শুয়ে আছে, দু'বছর আগে সে এই ঘরে এসেছে।

এক সেদিন থেকেই সুবর্ণ এ-ঘরের একজন। মা এ-বাড়িতে ঝির কাজ করে, সুবর্ণ তাদের সাড়ে সাতটাকা ভাড়ার বস্তি ঘরে সারাদিন থাকত। মা দুপুরে ভাত নিয়ে আসত। খানিক থেকে, গল্পিয়ে নিয়ে বিকেল বিকেলে মা কাজে চলে যেত, সুবর্ণ তখন একলা। একদিন হঠাৎ তার ডাক পড়ল। মা বলছিল, ও-বাড়ির ছোটবাবু আদুরে ছেলে, কার্ত্তিকের চেহারা তাকেও বসন্তরোগে ধরেছে। আহা…। ছোটবাবুর জন্যে মা অনেক দুঃখ করেছে।… বড়মা বলছিল ওর সেবা শোনার জন্য তোকে নিয়ে যেতে। এবং একদিন সকালে সত্যি সত্যিই সুবর্ণ এ-বাড়িতে এল। চাকরীতে। ছাদের ঘরে ছোটবাবু থাকেন, তার ফাই-ফরমাশ আছে, ঘরদোর গোছানো আছে এ-সব কাজ সুবর্ণর।

মার সঙ্গে সুবর্ণ ছাদে এসেছিল।

তখন সকালের রোদ ঝলমল করছিল ছাদময়। খুব বড় না হলেও সিঁড়ি থেকে উঠে এক ছোট বারান্দা, তার সঙ্গে ঘর। বিরাট ছাদ তখন নিস্তব্ধ। ঘর নিঝুম। মা ঘরে ঢুকে সুবর্ণকে ডাকল।

ছোটবাবু তখন এই বিছানায় চুপচাপ শুয়ে ছিল। ধবধবে বিছানা, সুন্দর করে গোছানো ঘর সুবর্ণর খুব ভাল লেগেছিল। কিন্তু বিছানার ওপর শোয়া ছোটবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে তার মনে হয়েছিল, লোকটি ঘুমুচ্ছে।

'ছোটবাবু…', মা আস্তে ডেকেছিল।

ছোটবাবু চোখ খুলল। একটু যেন হাসল। 'তুমি এসেছ?'

'হ্যাঁ' মা বলছিল, 'সুবিকে আনলাম। ও-আপনার দেখাশোনা করবে।'

'ও—', ছোটবাবু নড়ল না' দেখল না, চোখ বুঁজল। সুবর্ণর মনে হচ্ছিল, ছোটবাবু এই বড় ছাদে ভীষণ একলা। ওকে কেউ দেখে না।

তারপর দু'বছর কেটেছে। এই ঘরে।

আগে এমন হত না। ছোটবাবুর সব কাজ করেছে, মাঝে মাঝে মাথা কি পা টিপে দিয়েছে, আঙুল টেনে ফুটিয়েছে যা বলেছে ছোটবাবু, সুবর্ণ কোনো কথাই ফেলে নি। ছোটবাবুর কষ্ট হলে, সুবর্ণ কষ্ট পেয়েছে। ভীষণ দুঃখও। কিন্তু তখন কান্না আসত না। এখন ছোটবাবুর কষ্ট হলে, বুকটুক হঠাৎ উঠলে সুবর্ণর কান্না পায়, সে ভগবানের মুখ কল্পনা করে মানত করে। কিন্তু কী যেন হয়েছে, দিনে দিনে-এখন সুবর্ণর সব তাতে লজ্জা।

সুবর্ণ দাঁড়িয়ে ঘামছিল। বলছিল না।

'এসো…' ডান হাত বাড়িয়ে অরুণ সুবর্ণর হাত ধরে টানল।

সুবর্ণ বসে পড়ল। লজ্জা ভয় সংকোচে প্রায় জড় দেহ নিয়ে। মাথা নিচু করে কাঁপছিল। বুকের ভেতরে কষ্টের ঘোলা জল আর প্রচ্ছন্ন আরাম-আনন্দের স্রোত মিলেমিশে একাকার।

ও চুপ করে বসে আছে। কথা বলছে না, মুখও তুলছে না। অরুণ দেখছিল, দহিষ্ণুতা হারাচ্ছিল। এবং সুবর্ণর এই অবস্থা দেখে, ওর কোলের ওপর থেকে হাতটা টেনে নিল অরুণ, নিজের কপালে রাখল। 'এখন কত সুবিধে দেখছ…' অরুণ সরাসরি সুবর্ণর চোখে তাকাল। 'তোমার কি এখন কষ্ট হচ্ছে নাকি?'

প্রায়-বোঁজা চোখের প্রকম্পিত ওপর পাতা সামান্য তুলে সুবর্ণ গভীর আচ্ছন্ন এবং অভিভূত দৃষ্টি অরুণের চোখ বুলিয়ে নামিয়ে নিল। ওর কপাল অল্প সিক্ততা পেয়েছে, নাকের ডগায় ক-বিন্দু ঘাম টুলটুল করছিল। মুখ প্রায় রক্তিমাভ।

অরুণের কপালের ওপর রাখা হাতটি তার শীতলতা, সংকোচ লজ্জা নিয়ে চুপ করে থেকেও মৃদু কাঁপছিল। মণিবন্ধের আলগা কাচের চুড়ি বেঁকে আছে অল্প। অনেক পরে এই হাত নড়ল। বুঝি সুবর্ণ জড়তা কাটিয়ে উঠতে পেরেছে।

অন্ধকার। আশ্চর্য এবং গভীর এক অনুভবে অরুণ চোখ বুঁজে রয়েছে। বাতাস আছে কি নেই কিন্তু ওরই মধ্যে মিষ্টি গন্ধের একটু আমেজ আছে। সুবর্ণর শীতল হাতের প্রচ্ছন্ন উষ্ণতা সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ছিল। এবং এই অনুভবের তীব্রতা শুষে নিতে, অরুণ তার কাঁপা নিশ্বাসকে বার বার চাপতে চাইছে।

ও ভীষণ লজ্জা পেয়েছে। অরুণ অন্ধকারেও সুবর্ণর মুখের স্পষ্ট ছবিটি ভাবনায় আনতে পারল। কপালে যেন তীক্ষ্ণ এক প্রজাপতি হাঁটতে-হাঁটতে পাখা নাড়ছিল। ক্রমে অরুণ অসহিষ্ণু এবং উত্তেজিত হল। হাত নিসপিস করছিল, আচমকা মনে হল, গলা শুকিয়ে এসেছে, কানে উনুন আঁচের তীব্র উত্তাপের কাপটা মারছিল। এবং সমস্ত মাথা হঠাৎ গুপ্ত প্রবর হয়ে সুবর্ণর স্পর্শের শীতলতা যেন শুষে নিতে চাইছে। সহসা অরুণ ডান হাতটি তুলে তার কপালের ওপরে রাখা সুবর্ণর হাত আরও জোরে চেপে ধরল!

সুবর্ণর মুখ লাল, যেন রক্ত উঠে এল হঠাৎ। সুবর্ণ তার চাপা হাতটি মুক্ত করতে চাইছে। ভয়ে, অপরিসীম লজ্জায় বুক ধকধক করছিল, চোখ তপ্ত, ছন্দহীন নিশ্বাসে নাকের পাটা কাঁপছিল। অরুণ চেয়ে দেখল, সুবর্ণর মাথা আরও হেঁট হয়েছে, গলা ঘর্মাক্ত।

'খুব ঠাণ্ডা' অরুণ সুবর্ণর দিকে তাকাল।

প্রাণপণ চেষ্টায় মুখ তুলল সুবর্ণ, চোখ তুলল। কাঁপা ঠুকতে যেন প্রকাশ পাচ্ছিল, সে এক ধরণের কষ্ট পাচ্ছে। 'বকুনা আসবে···' লজ্জায় লাল হয়ে সুবর্ণ ফরফর তাকাল।

'আসুক।' অরুণের গলা স্থিরশান্ত অথচ স্বর দৃঢ়। 'মাথা ব্যথা করছে, তুমি টিপে দিলে এমন কিছু অন্যায় করা হয় না···'।

হয় না··· হয় না সুবর্ণ জানে। তবু ভয়। বাস্তবিক সুবর্ণ এক কাঁটার জালে জড়িয়ে পড়েছে। খানিক আগে কয়েকটি মুহূর্ত তার মনে হয়েছে, সে ভাসছে। ওপরে, শূন্যে; ক্লান্ত পাখা পাখির মতন ডানা দুটো তমুখায় মেলে দিয়ে। এখন তার মনে হচ্ছিল, সে এখন ঘরে বন্দী, যেখানে জীবনের সবচেয়ে সরস পাওয়া আছে, অথচ এই পাওয়ার আনন্দের ভয় তাকে ঘরছাড়া করতে চায়।

নূতন রচনা

কার্তিক সংখ্যা থেকে
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর
উপন্যাস
ও
ফুল করাসী থেকে অনুবাদ,
কামু'র বড় গল্প
ভুলির আঁচড়
ধারাবাহিক বের হবে।
অনুবাদ: পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

পুস্তক পরিচয়

চিকিৎসা বিদ্যার ইতিহাস : লেখক ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ এম, বি, বি, এস ; আয়ুর্বেদাচার্য প্রণীত ; সাধনা প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত মূল্য—১ ৩৭ নয়া পয়সা।

বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের, বিশেষ করে বিজ্ঞানের ইতিহাস সম্বন্ধে লোকায়ত সাহিত্যে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধ হতে আরম্ভ করলেও, চিকিৎসা বিদ্যার ইতিহাস সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান লাভেচ্ছু পাঠকের জন্য, লিখিত বই বাংলা ভাষায় খুব কমই আছে—এমন কি প্রায় নেই বললেও চলে। সেই দিক থেকে প্রখ্যাত সাধনা ঔষধালয়ের সত্বাধিকারী ডাঃ নরেশ চন্দ্র ঘোষ কর্তৃক প্রণীত 'চিকিৎসা বিদ্যার ইতিহাস' নামক সংক্ষিপ্ত বইখানি এক প্রশংসনীয় উদ্যমের নিদর্শন। শুধু যে আয়ুর্বেদীয় ঔষধাদি প্রস্তুত ও প্রয়োগই আয়ুর্বিজ্ঞানের ক্ষেত্র নয়,—এই বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক ধারণার আহরণ করা এবং সেই জ্ঞানের সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন—এই বইটির মধ্যে তার একটি সংকেতও রয়েছে।

বইটি মূলত ঐতিহাসিক চিকিৎসা বিদ্যার বিভিন্ন যুগের ও বিভিন্ন দেশের উৎপত্তি ও বিবর্তনের সম্প্রসারিত ব্যাখ্যামূলক ইতিহাস। মানব ইতিহাসের আদিযুগের প্রগতির সঙ্গে কি ভাবে মানুষের দৈহিক শক্তি ও স্বাস্থ্য রক্ষার প্রয়াসে চিকিৎসা-বিদ্যা অন্যান্য মানবিক বিদ্যার সমান্তরালে প্রগতি লাভ করলো তার প্রাথমিক ইংগিত দিয়ে ব্যাবিলোনিয়া মিশর, গ্রীস, রোম, আরব ও চীন দেশে কি ভাবে চিকিৎসা বিজ্ঞান গড়ে উঠলো এবং এই সব দেশের কোন কোন খ্যাতিমান চিকিৎসক কিভাবে এবং কিরূপ দৃষ্টি ভঙ্গীতে চিকিৎসা বিদ্যার অধ্যয়ন ও জ্ঞান সম্প্রসারণে অগ্রণী হলেন তার আকর্ষণীয় কাহিনী বর্ণনা করে পরবর্তী অধ্যায়ে ভারতীয় আয়ুর্বিজ্ঞানের জন্ম ও প্রগতির ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। য়ুরোপীয় জাতির মৃত রাজাদের সঙ্গে যে একাধিক রাজ-মহিষী রাজ-মন্ত্রীবৃন্দ এবং রাজ চিকিৎসকদের জীবিত অবস্থায় কবর দেওয়া হতো, এবং প্রাচীন চীনেও মৃত রাজাদের সঙ্গে রাজ চিকিৎসকদেরও জীবন্ত সমাধি দেওয়ার রীতি ছিল জীবন হানির এরূপ সম্ভাবনা সত্ত্বেও কিভাবে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে চিকিৎসকেরা চিকিৎসা বিদ্যার প্রগতি সাধনে অগ্রণী হয়েছেন তার বিবরণও বইটিতে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

ভারতে চিকিৎসা বিদ্যার প্রগতি এবং ভারতীয় বিদ্যার গ্রীক, রোম ও আরবদেশে সম্প্রসারণের বর্ণনা দিয়ে শেষ অধ্যায়ে ভারতীয় আয়ুর্বেদের বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। ভারতে বহু প্রাচীন আয়ুর্বেদ গ্রন্থ বিলুপ্ত হলেও চরক, সুশ্রুত বাগভট ভাবপ্রকাশ, রাজবল্লভ, আয়ুর্বেদ-সংগ্রহ প্রভৃতি পুস্তকের কথা উল্লেখ করে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের উৎপত্তি ও আলোচ্যবস্তুর সাধারণ আলোচনা করে জীবক, ধন্বন্তরি, নাগার্জুন, বাগভট, মাধবকর, বৃন্দ, শার্ঙ্গধর, চক্রপাণি প্রমুখ আয়ুর্বেদ জ্ঞানীদের চিকিৎসা বিদ্যার বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে।

আলোচ্য বইটির সহজ ও সরল ভাষা এবং সংক্ষেপে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রগতির বিষয় আলোচনার এই প্রয়াস প্রশংসনীয়। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান সাহিত্যের অনুরাগীদের কাছে বইটি সমাদৃত হবে বলে আশা করি। বইটিতে সাধনা ঔষধালয়ের প্রচার, ইংরেজী প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার, বিভিন্ন রেফারেন্স বইয়ের পাঠ্য বস্তুর সঙ্গে উল্লেখ এবং শেষ অধ্যায়ে আয়ুর্বেদ সম্বন্ধে প্রচার মূলক প্রবণতা না থাকলে বিজ্ঞান-সাহিত্যরূপে বইটির মূল্য আরও বৃদ্ধি পেতো। আশাকরি দ্বিতীয় সংস্করণে কিছু কিছু চিত্র এবং সংযোজিত করে উল্লিখিত ত্রুটিগুলি দূর করে বইটির সাহিত্য মূল্য বৃদ্ধি করা হবে।

সমর গুহ

(শেষাংশ ৩৪০ পৃষ্ঠায়)

বিশ্বাবর্ত

কমন মার্কেট বনাম কমনওয়েলথ

এখন আমরা সবাই জানি যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও তৎপরবর্তী ঘটনাবলী পৃথিবী। বিভিন্ন দেশের, বিশেষভাবে ইউরোপের দেশগুলির, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের উপর গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। যে ছয়টী দেশ আজ একটি "ইউরোপীয় অর্থনৈতিক জোট" গড়ে তুলতে উদ্যোগী —অর্থাৎ ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী, ইতালী, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড ও লাক্সেমবুর্গ—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এদের প্রায় তছনছ করে দিয়েছিল। পশ্চিমী শক্তিগুলির শীর্ষে আমেরিকার আবির্ভাব, সাম্রাজ্যবাদী অধিকারচ্যুতি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ডলারের উপস্থিতি, প্রভৃতি যুদ্ধোত্তর ঘটনাপ্রবাহ এদের অর্থনৈতিক ও ফলতঃ রাজনৈতিক প্রাধান্যের অবলুপ্তি ঘটালো।

'ইউরোপীয় সাধারণ বাজার' বা 'কমন মার্কেটের' পরিকল্পনা পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলির পুনঃ প্রতিষ্ঠারই একটা প্রচেষ্টা। এই পরিকল্পনার আশু লক্ষ্য হলো, এই দেশগুলির মধ্যে আমদানী-রপ্তানীর ক্ষেত্রে ধাপে ধাপে শুল্ক ও অন্যান্য বিধি-নিষেধের অবসান এবং এদের পারস্পরিক বাণিজ্যনীতির ক্ষেত্রে একটা সমতা বজায় রাখা। এই ব্যবস্থা এই দেশগুলির আভ্যন্তরীন সমৃদ্ধির সহায়ক হবে। প্রকৃতপক্ষে, ফ্রান্স ও জার্মানী – যে দুটী দেশের চিরাচরিত বিরোধের কথা আমাদের অজানা নয়—গত দশ বছর নিজেদের মধ্যে শুল্কহার কমিয়ে সহযোগীতা করেছে এবং এক দেশ থেকে অপর দেশে প্রচুর দ্রব্য রপ্তানী করেছে।

বলা বাহুল্য, বাণিজ্যিক বা অর্থনৈতিক সহযোগিতা এই পরিকল্পনার শেষ কথা নয়। এই ছয়টী দেশের মূল লক্ষ্য হলো রাজনৈতিক। ইউরোপীয় অর্থনৈতিক কমিশনের সভাপতি অধ্যাপক হলষ্টীন খোলাখুলিই বলেছেন: "We are not in business, we are in politics." এই পরিকল্পনার শুরু 'ইউরোপীয় অর্থনৈতিক জোট' (European Economic Community) গঠনে, কিন্তু এর শেষ হলো 'ইউরোপীয় রাজনৈতিক জোট' (European Political Union) গঠনে।

যখন পশ্চিম ইউরোপীয় প্রধান রাষ্ট্রগুলি এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা গ্রহণ করলো, তখন প্রতিবেশী রাষ্ট্র ব্রিটেনকে এব্যাপারে কোন না কোন সিদ্ধান্ত না নিয়ে উপায় নেই। কিন্তু ব্রিটেন কি সিদ্ধান্ত নেবে? ঐ জোটের বাইরে থাকলে ব্রিটেনকে এদের সাথে গুরুতর অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হবে। আবার ব্রিটেনের ঐ জোটে যোগদানের ফলও সুদূর প্রসারী। এর ফলে কমনওয়েলথ দেশগুলোর সাথে ব্রিটেনের এতদিনের গড়া সম্পর্কের মধ্যে বিরাট একটা ফাটলের আশংকা রয়েছে, যেটা ব্রিটেন কোন মতেই উপেক্ষা করতে পারেনা।

বহুদিনের যোগাযোগের ফলে ব্রিটেন ও অন্যান্য কমনওয়েলথ দেশগুলির মধ্যে একটা রাজনৈতিক ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। ব্রিটেনের বহির্বাণিজ্যের একটা খুব বড় অংশ ঐ দেশগুলিরই সাথে। ব্রিটেন খাদ্যদ্রব্যের ব্যাপারে পরমুখাপেক্ষী। ঐ আমদানীর অধিকাংশই আসে ঐ কমনওয়েলথ দেশগুলি থেকে।

বর্তমানে পারস্পরিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্রিটেন ও অন্যান্য কমনওয়েলথ দেশগুলি কতকগুলো বিশেষ সুযোগ সুবিধা ভোগ

করে। ব্রিটেনের 'কমন মার্কেটে' যোগদানের পর সম্ভবত ঐ সুযোগ সুবিধাগুলো থাকবে না। এর ফলে কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, ভারত, পাকিস্তান, সিংহল প্রভৃতি কমনওয়েলথ দেশগুলোর ব্রিটেনের সাথে চিরাচরিত বাণিজ্য-ধারায় একটা বড় রকমের ওলট-পালট দেখা দেবে. এদের শুল্ক নীতি পাল্টে যাবে এবং বাণিজ্যিক উদ্বৃত্তের ক্ষেত্রেও একটা বিরাট আঘাত আসার সম্ভাবনা। প্রকৃতপক্ষে ঐ সমস্ত দেশগুলোর শিল্প ও অর্থনৈতিক সংগঠনেও একটা গুরুতর প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে বাধ্য।

এ ব্যাপারে ব্রিটেনের সিদ্ধান্তের সাথে ভারতের অর্থ-নৈতিক ভবিষ্যৎ বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। ১৯৬০ সালে ভারতের মোট রপ্তানীর পরিমাণ ৬৩,৫৩০ লাখ টাকা। এর মধ্যে ব্রিটেনে রপ্তানীর পরিমাণ হলো ১৭,৪৪০ লাখ টাকা। ১৯৫০ থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে ব্রিটেনে ভারতের রপ্তানীর পরিমাণ প্রায় শতকরা ২৫ ভাগ বেড়ে গেছে। ব্রিটেনের কমন মার্কেটে যোগদানের পর ভারতের পাট, চা, সুতী-বস্ত্র প্রভৃতি যাবতীয় পণ্যের উপর মোটা শুল্ক বসবে। তাছাড়া ঐ সমস্ত রপ্তানী দ্রব্যের পরিমাণের উপরও বিবিধ বাধা নিষেধ আসবে। শুধু ভারতকে নয়, পাকিস্তান, সিংহল প্রভৃতি রপ্তানী-নির্ভর সব কয়টী দেশকেই অনুরূপ সংকটের সম্মুখীন হতে হবে।

এক্ষেত্রে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ব্রিটেনের পক্ষে সহজ নয়। কমনমার্কেট পরিকল্পনার দেশগুলির অর্থ ও বাণিজ্য-নীতি ও অন্যান্য ব্যবস্থার চাপ ব্রিটেন অস্বীকার করতে পারে না। ঐ সমস্ত দেশগুলি আজ ব্রিটেনের তুলনায় অধিকতর সমৃদ্ধিলাভ করেছে। এরও একটা চাপ ব্রিটেনের উপর রয়েছে। অপর পক্ষে কমনওয়েলথ দেশগুলির সাথে ব্রিটেনের স্বার্থ বিশেষভাবে জড়িত। ঐ সমস্ত কমনওয়েলথ দেশগুলি শুধু ব্রিটেনে রপ্তানীই করে না, আমদানীও করে। উদাহরণ স্বরূপ, ভারতের আমদানীর শতকরা ৪০ ভাগ আসে ব্রিটেন থেকে। ব্রিটেনের রপ্তানীর শতকরা ৭১ ভাগ যায় কমন-ওয়েলথ দেশগুলোতে।

১৯৫৭ সালে ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী কমনওয়েলথ দেশগুলোকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন : "We have a special relationship with the countries of Europe which we hope to strengthen and extend. But on one thing we are all agreed. If there should be at any time a conflict between the calls on us, there is no doubt where we stand; the commonwealth comes first in our hearts and mind." সম্প্রতি ব্রুসেলসে কমন মার্কেটে যোগদানের প্রশ্নে ঐ পরিকল্পনার উদ্যোক্তা ছয়টী দেশের সাথে ব্রিটেনের যে আলোচনা হয়ে গেলো তাতে নয়াদিল্লিতে হতাশা প্রকাশ করা হয়েছে! লোকসভায় ভারত সরকারের উদ্বেগ প্রকাশ করে অর্থমন্ত্রী মোরারজী দেশাই জানিয়েছেন যে, ব্রিটেন কমন মার্কেটে যোগ দিতে চলেছে—কিন্তু যে সমস্ত ভারতীয় পণ্য এতদিন বিনা শুল্কে ব্রিটেনের বাজারে প্রবেশাধিকার পেয়েছে, তার মধ্যে খুব কম সংখ্যক পণ্যই এর পর বিনা শুল্কে কমন মার্কেটে প্রবেশের সুযোগ পাবে। জানা যায় যে, কানাডা অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড এই কয়েকটী কমনওয়েলথ দেশ থেকে কৃষি পণ্যের রপ্তানী ব্রিটেনে অব্যাহত রাখার প্রশ্নে ব্রিটেনের সাথে অন্যান্য দেশগুলোর মতৈক্য হয়নি। মনে হয় আগামী কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রীদের সম্মেলনের পর ব্রিটেন একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। কিন্তু ইতিমধ্যে, গত ১৪ই আগষ্ট প্রধান মন্ত্রী নেহরু এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে ব্রিটেনের কমন মার্কেটে যোগদানের ফলে কমনওয়েলথ দুর্বল হয়ে পড়বে। সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান মন্ত্রী মেন্জিস ও অনুরূপ আশংকা প্রকাশ করেছেন।

বেল বেজা বলাম বেল বেজা।

প্রায় একমাস আগে আলজেরিয়া স্বাধীনতা লাভ করার

পর,—জাতীয়তাবাদী আলজেরিয় নেতৃবৃন্দ বেন খেদা ও বেন বেল্লার মধ্যে ক্ষমতার সংঘাত আলজেরিয়ার জীবনে এক নতুন বিপদ সূচিত করে। যাই হোক, বেন্দা ও বেল্লাপন্থীদের মধ্যে অবশেষে একটা মীমাংসার ফলে আলজেরিয়া এক শোচনীয় গৃহ যুদ্ধের সম্ভাবনা থেকে নিষ্কৃতি পেলো। গত ৭ই আগষ্টের এক সংবাদে জানা যায় প্রধান মন্ত্রী বেন ইসুফ খেদা তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী বেন বেল্লার হাতে সমস্ত ক্ষমতা তুলে দিয়ে আলজেরিয়ার রাজনীতি থেকে বিদায় নিচ্ছেন।

হল্যাণ্ড বনাম ইন্দোনেশিয়া

গত কয়েক মাস ধরে পশ্চিম ইরিয়ানের (পশ্চিম নিউগিনি) অধিকার নিয়ে হল্যাণ্ড ও ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে একটা লড়াই চলছিলো। বিরোধটা আসলে তের বছরের পুরোনো। সংবাদে প্রকাশ, এবারপরে উভয় পক্ষের মধ্যে মূলগত প্রশ্নে একটা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জানা যায়, এই মীমাংসার প্রশ্নে ইউনাইটেড নেশনস-এর অস্থায়ী সেক্রেটারী জেনারেল উ-থাণ্ট যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং তাঁরই প্রেরণায় ভূতপূর্ব মার্কিন রাষ্ট্রদূত এলসওয়ার্থ বাংকার আলোচনার ভিত্তি হিসাবে একটা প্রস্তাব পেশ করেন। ঐ প্রস্তাবানুযায়ী এক বছরের মধ্যে হল্যাণ্ড পশ্চিম ইরিয়ানের প্রশাসনিক কর্তৃত্ব ইউনাইটেড নেশনস-এর হাতে সমর্পণ করবে এবং ইউনাইটেড নেশনস দ্বিতীয় বছরের মধ্যে ইন্দোনেশিয়ার কাছে প্রশাসনিক কর্তৃত্ব হস্তান্তর করবে। পরিশেষে গণভোটের দ্বারা স্থির হবে ইরিয়ানরা যুক্ত থাকতে চায়, না, ইন্দোনেশিয়ায় যোগ দিতে চায়।

সর্বশেষ সংবাদে জানা যায় যে হল্যাণ্ড ও ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে পশ্চিম ইরিয়ানের হস্তান্তর সম্পর্কে এক আনুষ্ঠানিক চুক্তি নিষ্পন্ন হয়েছে। ইন্দোনেশিয়া আগামী মে মাস থেকে পশ্চিম ইরিয়ানের উপর কর্তৃত্ব করবে। ইতিমধ্যে আগামী অক্টোবর মাস থেকে ইউনাইটেড নেশনস অন্তর্বর্তীকালীন শাসন কার্যের ভার গ্রহণ করবে।

১৭।৮।৬২ **শিশির কুমার ধর**

এই সকল পরস্পর-বিরোধী গুণের একত্র সমন্বয়ে প্রস্তুত

নিবে কালি শুকায় না,
কিন্তু কাগজে দ্রুত শুকায়।

রঙের যথেষ্ট গভীরতা, তবু
অবাধে লেখা এগিয়ে চলে।

লেখা ধুয়ে-মুছে যায় না;
অথচ কলম পরিষ্কার রাখে।

সুলেখা কালি

• • • অন্য কোন কারণে না হলেও অন্ততঃ এই কারণেই
সুলেখা আজ সর্বোচ্চে বিক্রয়ের গৌরব অর্জন করেছে • • •

সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ কলিকাতা • দিল্লী • বোম্বে • মাদ্রাজ

সম্পাদকীয়

পনেরই আগষ্ট

একই সঙ্গে আনন্দ-বেদনার আবেদন নিয়ে পনেরই আগষ্টের ঐতিহাসিক দিনটি আবার বিবর্তিত হয়ে এসেছে আমাদের জাতীয় জীবনে। স্বাধীনতার উৎস আজ আমাদের করায়ত্ত। এই উৎসকে জীবন-প্রবাহের কোন্ কোনটী ধারায় আমরা প্রাপ্তব্য করে তুলবো তার সম্ভাবনা নির্ভর করছে জাতির আদর্শনৈতিক সংকল্প ও সাধনার শক্তি ও উদ্যমের উপরে।

আনন্দ তাই নতুন যাত্রার আশার সম্ভাবনায়, কিন্তু সেই স্বপ্নের আবরণের মুহূর্তে মন বেদনাতুর হয়ে ওঠে তাদের জন্য স্বাধীনতার সংগ্রাম ও লাঞ্ছনাবরণের দিনে যারা আমাদের সহযাত্রী ছিল, যে মাটি ছিল আমাদের জননী জন্ম ভূমির পবিত্র অঙ্গ, এবং যার সন্তানেরা যুগযুগান্তের ভারতীয়তাবোধে নিজেদের অস্তিত্বকে অবিচ্ছেদ্য বলে অনুভব করে স্বাধীন ভারতের নতুন দিনের কল্পনায় একদিন বিভোর হয়েছিল। আজ তারা বিদেশী, সেই আত্মভূমি এখন ভিন্ন রাষ্ট্র, তাদের দুঃখ-বেদনায় সামান্য অংশ গ্রহণের সুযোগও আজ খণ্ডিত ভারতের নেই। ক্ষয়ীষ্ণু স্বাধীনতার নামে রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রমত্ততার যূপকাষ্ঠে ভারতের অখণ্ড জাতি ও রাষ্ট্র সত্তাকে যেভাবে বলি দেওয়া হয়েছে সেকথার স্মরণে পনেরই আগষ্টের আনন্দ যেন বিষাদে পরিণত হয়।

খণ্ডিত ভারতেও এই পনের বছরের স্বাধীনতায় জাতীয় জীবনে সার্থকতার কোন প্রাপ্তস্পন্দন কি স্পষ্টমূর্ত হয়ে উঠেছে? সমগ্র জাতীয় উদ্যম ও প্রয়াস যন্ত্রীনায়ক সরকারী এক কর্তা-শ্রেণীর, এবং আমলাতন্ত্রের গহ্বরে ন্যস্ত হয়েছে। রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় উদ্যমের সঙ্গে জনগণের কোন আন্তরিক সংযোগ নেই, —তাই সরকার নামক একটি যন্ত্র যেন রাষ্ট্রীয় সত্তাকে গাধাবোটের মত টেনে নিয়ে চলছে। রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণাণ ১৫ই আগষ্টের বাণীতে এই আমলাতন্ত্রের আবেগহীন যান্ত্রিকতার কথা উল্লেখ না করে পারেননি। কেন আজ জাতি নিরুদ্যম নিষ্ক্রিয় সমগ্রভাবে সরকারী মুখাপেক্ষী, কেন সরকারী নীতির পরিবাহক আমলাতন্ত্র যান্ত্রিক, নিষ্প্রাণ, কেন জাতির সর্বস্তরে বিক্ষোভধর্মী স্বার্থসিদ্ধির সংকীর্ণ মানসিকতার তমসা—তার কারণ সন্ধানে দার্শনিক রাষ্ট্রপতির মন উন্মুখ হয়েও পরক্ষণেই সরকারী দায়িত্বের প্রত্যাঘাতে বিমুখ হয়ে স্বাধীনতা দিবসের বাণীতে জনগণের অন্ন, বস্ত্র ও গৃহের মৌলিক সমস্যার কথা শুধু উল্লেখ মাত্র করে আশাবাদের দার্শনিক স্বপ্ন বিচরণে তাঁর বক্তব্য শেষ করেছেন। আদর্শ ও আচরণ নীতি ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে যে শোচনীয় অসঙ্গতি ভারতীয় জাতীয় জীবনে মূল্যবোধের এক চরম বিচ্যুতি ঘটিয়েছে সেকথা দার্শনিক রাষ্ট্রপতি বোধহয় বলতে চেয়েও বলতে পারেননি। রাষ্ট্রীয় সত্তা ও স্বপ্ন থেকে জাতীয় জীবনের বিচ্ছেদই যে আজিকার স্বাধীন ভারতের মূল সংকট একথার অনুধাবন করা এবং জাতিকে এই সংকট থেকে মুক্তি দেওয়ার উপায় উদ্ভাবন করাই আজিকার পনের বছর পরের পনেরই আগষ্টের যুগ সংকেত ও আহ্বান।

শান্তিপূর্ণ আলোচনা ও চুক্তির নামে আত্মসমর্পণ?

পঞ্চশীলের কূটনীতি এবং তিব্বতের স্বায়ত্তশাসন স্বীকৃতির ধূম্রজালের আড়ালে ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে

আক্রমণশীল চীন ভারতের সার্বভৌমিকতার উপরে হস্তক্ষেপ করে ভারতের জাতীয় জীবনে যখন এক গ্লানি ও অমর্যাদার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে, ভারতের সরকারী প্রতিবাদ চরম ঔদ্ধত্য, উপেক্ষা ও হুমকির সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে বরং ভারতের বিরুদ্ধে চীন তিব্বতের অংশ জবর দখলের পাল্টা অভিযোগ উপস্থিত করেছে এবং গালোয়ান এলাকায় ভারতীয় সামরিক রক্ষীদের বিপন্ন করে বিভিন্নস্থানে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীদের উপরে বহুবার গুলি বর্ষণ করে নিজেদের সামরিক শক্তির শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করার মনোভাব প্রদর্শন করছে ঠিক সেই সময়ে আক্রান্ত ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী ও দেশরক্ষামন্ত্রী আক্রমণকারী চীনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্য এমন ব্যগ্রতা প্রকাশ করছেন যে ভারত সরকারের এই দুর্বল মানসিকতা যে ভারতের জাতীয় সংকল্প ও সার্বভৌম মর্যাদা-বোধের উপরে কিরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে সেকথা শ্রীনেহেরু অদ্ভুতভাবে বিস্মৃত হয়েছেন বলেই দেশবাসীর মনে আজ এক গুরুতর আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে।

চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রী চেন ঈ'য়ের সঙ্গে আলোচনা কালে শ্রীকৃষ্ণমেনন হিমালয় সীমান্তে চীনা আক্রমণের সমস্যাকে যেভাবে লঘু করবার চেষ্টা করেছেন, সাম্প্রতিক সাংবাদিক সম্মেলনে চীন কর্তৃক তিব্বত দখলের ঘটনার গুরুত্বকেও শ্রীনেহেরু তেমনি হ্রাস করার মনোভাব দেখিয়েছেন। ইংরেজ আমলের নজীর অনুসরণ করে স্বাধীন ভারত যদি তিব্বত দখল করে চীন আক্রমণ করে এই আশঙ্কায়ই নাকি চীন, তিব্বত অধিকার করে নিয়েছে এবং এই অধিকারটি যখন একটি 'প্র্যাকটিকেল ফ্যাক্ট' তখন শ্রীনেহেরুও তা' স্বীকার করে নিয়েছেন। তিব্বত দখল করে এই দুরূহ পার্বত্য পথে কবে যে ইংরেজ সরকার চীন আক্রমণ করেছিল সেকথা বলার প্রয়োজনীয়তা শ্রীনেহেরু বোধ করেননি। চীনা-আক্রমণের সাফাই গেয়ে তিব্বতের কবরে একবার পেরেকীদের জন্ম দেছিল, এবার ভারতের রাষ্ট্রীয় ভূমি দাদকের 'দুধানে' কোন নতুন 'শীনের' উদ্ভব হবে আজ ভারতবাসীর তা এক দুশ্চিন্তার বিষয়।

১৯৪০ সালের দাঙ্গার সময় পাকিস্তানের সঙ্গে আপোষ রফা করার সময় তিনি যে সুরে ও ভাষায় বিরোধী পক্ষকে অযৌক্তিক তিরস্কার করেছিলেন, এবারেও চীনের সঙ্গে আপোষরফার অভ্যুগ্র ব্যাপ্রতায় পার্লামেন্টের বিরোধী পক্ষের আলোচনাকে শ্রীনেহেরু 'শিশুর ন্যায়, 'বালসুলভ,' 'অজ্ঞ,' 'সঙ্গতিহীন' অপ্রাসঙ্গিক' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা মূল্যহীন করে দেওয়ার চেষ্টায় তৎপর হয়েছেন। তিনি স্পষ্টই বলেছেন যে কোন সুযোগ পেলে তার সদ্ব্যবহার করে চীনের সঙ্গে কথা বলে তিনি নিগোসিয়েশনের জন্য সচেষ্ট হবেন। চীন ভারত ভূমি থেকে সেনা বাহিনী অপসারণের আগে যে ভারত চীনের সঙ্গে সীমান্ত সমস্যার কোন মীমাংসা করবে না বলে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এখন সেকথা তিনি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছেন।

চীন খাদ্য সংকটে বিপন্ন, রাশিয়ার সঙ্গে বিরোধের ফলে চীনের শিল্পায়ন ব্যাহত, চীনের অভ্যন্তরে জনমত বিক্ষুব্ধ এবং প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে করবোজা থেকে আক্রমণের আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন, চীনের এই জাতীয় সংকটের দিনে চীনের কাছ থেকে যথার্থ সম্মানজনক কোন আমন্ত্রণ না পেয়ে এবং চীনের সীমান্ত আচরণে আক্রমণশীল নীতি পরিবর্তনের কোন লক্ষণ সুস্পষ্ট না হতেই কি কারণে যে শ্রীনেহেরু আক্রমণকারী চীনের সঙ্গে আপোষরফার জন্য প্রকাশ্যে এমন অভ্যুগ্র আগ্রহী হয়ে উঠেছেন তার কারণ দুর্বোধ্য। শ্রীনেহেরু কাশ্মীর, পাকিস্তান ও তিব্বতের ক্ষেত্রে চরম ভুল করেছেন,— চীনের সঙ্গে আলোচনায় তাঁর অতিরিক্ত ও বিপজ্জনক ব্যগ্রতা, সম্বন্ধে দেশবাসীর সতর্ক থাকা প্রয়োজন। শান্তির নামে ভারতের সার্বভৌমিকতার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করার অধিকার প্রধান মন্ত্রীর নেই।

'আংরেজী হটাও'—আন্দোলনের নির্বুদ্ধিতা

জাতীয় সংহতির সমস্যায় ভারতের চিন্তাশীল মন যখন উদ্বিগ্ন তখন ডাঃ লোহিয়া "আংরেজী হটাও"—আন্দোলনের আগুন নিয়ে হিন্দীভাষী অঞ্চলগুলিতে এক বিচিত্র উন্মাদনা সৃষ্টির ক্রিয়া সুরু করে দিয়েছেন। সম্প্রতি শ্রীনেহেরু অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত ভাবে, এবং এই কয় বছরের অভিজ্ঞতালব্ধ দূরদর্শিতার পরিণামে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে জানিয়েছেন যে ১৯৬৫ সালের পরে ইংরেজীর পরিবর্তে হিন্দী প্রবর্তনের যে সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি রয়েছে তার সংশোধন করে ইংরেজীকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য সহযোগী সরকারী ভাষার স্থান দেওয়া হবে। এজন্য একটি বিল রচনা সুরু হয়েছে বলেও শ্রীনেহেরু জানিয়েছেন। এরূপ সরকারী ঘোষণার ফলে উৎকট হিন্দী-প্রেমীরা অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে উঠেছেন এবং ইংরেজীকে সহযোগী সরকারী ভাষারূপে পীড়তি-দানের প্রয়াসে বাধা দেওয়ার জন্য হিন্দী জনমত গঠনে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। এই উদ্দেশ্যে এলাহাবাদে একটি 'ইংরেজী হটাও' সম্মেলন হয়ে গেছে এবং বোম্বেতে অনুরূপ আরেকটি সম্মেলন আহ্বান করা হয়েছে। হিন্দীর দাবীতে হিন্দীভাষী জনতাকে উত্তেজিত করা খুবই সহজ সাধ্য কাজ। কিন্তু এই কাজটিকে যদি এইভাবে চালিয়ে যাওয়া হয় তাহলে এমন এক ধারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে যার কাছে আসামের সাম্প্রতিক ভাষা আন্দোলনের বিপর্যয় ম্লান হয়ে যাবে। ডাঃ লোহিয়া হিন্দীর নামে আগুন নিয়ে ছেলেখেলা করছেন—অবিলম্বে এই ধারাত্মক খেলা বন্ধ হওয়া উচিত।

ভিলাই ও রাউরকেল্লার ইস্পাত কারখানা

কি উদ্দেশ্যে একই দিনে রুশ সাহায্যকৃত ভিলাই ইস্পাত কেন্দ্র এবং পশ্চিম জার্মানীর প্রচেষ্টায় নির্মিত রাউরকেল্লার উৎপাদন ও পরিচালন পরিস্থিতি সংক্রান্ত দুইটি খবরই একই সঙ্গে প্রকাশ করা হয়েছে তার কারণ সুস্পষ্ট না হলেও রুশ-নির্মিত ভিলাইয়ের সাফল্যের সংবাদের সঙ্গে জার্মেনী-নির্মিত রাউরকেল্লার অসাফল্যের সংবাদে দেশবাসী উদ্বিগ্ন বোধ করবে। ভিলাই কারখানায় ইস্পাত উৎপাদন যে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছেছে, এই সংবাদে দেশবাসী আনন্দিত হবে এবং রাশিয়ান টেকনিশিয়ানদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে। সেই সঙ্গে ভারতবাসীর মনে প্রশ্ন জাগবে পৃথিবীর অন্যতম শিল্পোন্নত জার্মান রাষ্ট্র কর্তৃক নির্মিত রাউরকেল্লার কারখানাটি আশানুরূপ সাফল্য অর্জনে ব্যর্থ হলো কেন?

সোভিন অনুসন্ধান কমিটি কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় যে পশ্চিম জার্মানী আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সুযোগ্য টেকনিশিয়ান সরবরাহ করেছিল, যদিও ভারতীয় অনগ্রসরতার প্রতি জার্মান শিল্পীরা যথেষ্ট লক্ষ্য রাখতে পারেনি। কিন্তু রাউরকেল্লার উৎপাদনের অক্ষমতার জন্য সোভিন কমিটি মূলত হিন্দুস্থান ষ্টীলকে দায়ী করেছেন। যানবাহন ও টেলিফোন ব্যবস্থার অভাব, নিম্ন শৃঙ্খলার বিচ্যুতি, ম্যানেজারিয়েল অক্ষমতা—এরূপ কয়েকটি গুরুতর অথচ সংশোধনযোগ্য ত্রুটির কথা কমিটির রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। শুধু ভারতের ইস্পাত উৎপাদন বৃদ্ধির একান্ত আবশ্যকতার জন্যই নয়,—ভারত সরকার যে পশ্চিমী গোষ্ঠীর কাছ থেকে বৈদেশিক মুদ্রা আহরণে নির্ভরশীল সেই বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার ক্ষতিগ্রস্ত না করার জন্যও অবিলম্বে রাউরকেল্লার ত্রুটি বিচ্যুতি সংশোধন করা প্রয়োজন এবং ম্যানেজারিয়েল ব্যর্থতার জন্য যে সকল কর্মচারী দায়ী তাদের কঠোর হস্তে অপসারিত করে নতুন যোগ্য ম্যানেজমেণ্টের ব্যবস্থা করা উচিত। মূলত ভারতীয় ম্যানেজমেণ্টের অব্যবস্থার জন্য যদি কোন বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়াস ব্যর্থ হয় তা হলে অন্যান্য রাষ্ট্রও ভারতকে শিল্প নির্মাণ কার্যে সাহায্য দানে অগ্রসর হতে দ্বিধাগ্রস্ত হবে।

কলকাতার রাস্তায় লরী চালনা

এক বছর আগে বড় বাজারের একটি রাস্তায় একটি লরী

একাধিক পথচারীকে খুন করেছিল। সম্প্রতি বেলগাছিয়ায় আরেকটি লরী একজন মহিলা ও অপর আরেক ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিয়ে তিনজন ব্যক্তিকে গুরুতর ভাবে জখম করেছে। হিসাব নিলে দেখা যাবে যে কলকাতার রাস্তায় যত গুরুতর দুর্ঘটনা ঘটে তার বেশির ভাগের জন্য দায়ী মোটর লরী। লরী চালক ও চালনা সম্বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বহুবার জনমত দাবী করেছে কিন্তু এখন পর্যন্ত সরকার সে সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। লরী চালকদের লাইসেন্স ও লরী-চালনার নীতি নিয়ন্ত্রণ লরীচালনার রাস্তা নির্দেশ এবং মাল-বোঝাই সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে লরীর রূপ-চালনা জনিত দুর্ঘটনার হাত থেকে পথচারীদের রক্ষার ব্যবস্থা করা অবিলম্বে প্রয়োজন।

রাজবন্দীদের মুক্তি

দমদম-বসিরহাট ও অন্যান্য সমসাময়িক রাজনৈতিক মামলায় অভিযুক্ত শ্রীপান্নালাল দাশগুপ্ত প্রমুখ দীর্ঘমেয়াদী রাজবন্দীদের মুক্তিদানে আমরা পশ্চিম বঙ্গ সরকারকে সাধুবাদ জানাচ্ছি। মুক্ত রাজবন্দীদেরও আমরা সাদর অভিনন্দন জানাচ্ছি। চৌদ্দ-পনর বছর আগে যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য এই বন্দীরা যে কর্মপন্থা অবলম্বন করেছিলেন, রাজনীতির আবর্তে সে লক্ষ্য ও সে কর্ম পন্থাকে আজ বহু পশ্চাতে ফেলে রেখে এসেছে। বর্তমানে দেশের অভ্যন্তরে ও দেশের বাইরে পুঞ্জীভূত সমস্যা সমাধান করে ভারতীয় জন-জীবনে জাতীয় নিরাপত্তা, সমাজবাদ ও গণতন্ত্রের ভূমিকা রচনায় মুক্ত বন্দীরা অগ্রসর হবেন এই আশা করি। ১৮।৮।৬২

(৩৩৩ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

ভারত-আত্মা রবীন্দ্রনাথ : লেখক ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ প্রকাশক: সাধনা প্রকাশনী : মূল্য – তিন টাকা।

রবীন্দ্র শত জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে বাংলার রবীন্দ্র অনুরাগী সাহিত্য মন সহস্র ধারায় উৎসারিত হয়ে কবি গুরুর স্মরণে তুলে ধরেছে কত মনোরম অনুভূতির শ্রদ্ধার্ঘ্যভিত নৈবেদ্য। ভারত-আত্মা রবীন্দ্রনাথ নামক বইটিও রবীন্দ্র শ্রদ্ধার্ঘের একটি আন্তরিক নিবেদন। লেখকের নাম দেখে প্রথম কিছুটা বিস্মিত হতে হয় এজন্যে যে সুপরিচিত চিকিৎসা শিল্পপতির মনেও রবীন্দ্রনাথের ভাব-তরঙ্গ এমন ভাবে নাড়া দিয়েছে যে আয়ুর্বেদের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভাববাদের রস-সন্ধানে আগ্রহী হয়ে তাঁর অন্তরের অনুভূতিকে অঞ্জলীরূপে তুলে ধরেছেন আলোচ্য গ্রন্থটিতে। চিকিৎসা-শিল্পী ভাব-শিল্পীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে পরিচিত মহলে বিস্ময় সৃষ্টি করলেও সাহিত্যের বৃহত্তর আসরে তার আবেদন নাও পৌঁছিতে পারে। কিন্তু আলোচ্য বইটিতে সেরূপ আশঙ্কার কোন কারণ দেখা দেয়নি, বইটি যথার্থই সাহিত্য রসোত্তীর্ণ হয়ে রবীন্দ্র কাব্য অনুরাগীদের মনে আনন্দ এনে দেবে।

আলোচ্য বইটি চৌদ্দটি প্রবন্ধের একটি ভাব গুচ্ছ। ঠিক এই প্রবন্ধগুলিকে ভাব-গুচ্ছ না বলে একটি ভাব-কমল বলে আখ্যা দেওয়াই অধিক যুক্তি সঙ্গত। এই প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও একটি অন্তঃশীলা সুর লহরী সমস্ত রচনার মধ্যে এমন একটি অনুভূতির আবাদন সৃষ্টি করেছে যার সামগ্রিক আবেদন পাঠক মনকে অনায়াসেই স্পর্শ করে। এই আবেদনটি হলো ভারতের যুগযুগান্তের তপস্যালব্ধ আধ্যাত্মবোধ, রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকে-প্রকৃতিকে, জীবনকে কতরূপে কত বৈচিত্র্যে কত সুরালঙ্কারে ছন্দে অনুভব করেছেন, নব নব মাধুর্যে এই অনুভবকে কী মোহনীয় করে ফুটিয়ে তুলেছেন, জানার মাঝে অজানার আনন্দ অজানার মাঝে জানার বিস্ময়ে তিনি বিশ্ব অনুভূতিকে এমন করে ব্যক্ত করেছেন যে তার স্বরূপ সন্ধান করা বাহ্যিক দিক থেকে এক দুঃসাধ্য প্রয়াস বলে মনে হয়। কিন্তু রবীন্দ্র কাব্যের এই বিচিত্র ও বহুরূপের সুরধারার মধ্যে কমল পরাগের সমন্বয়ের মত একটি ভাব সমন্বয় রয়েছে এবং এই সমন্বয়ের মূল ধারাটি উৎসারিত হয়েছে ভারতীয় আধ্যাত্মবোধের অতল সিন্ধুর অন্তঃস্থল থেকে। লেখক রবীন্দ্র কাব্যের, নাটকের জাতীয় সঙ্গীতে রত জীবন দেবতার কল্পনার বিভিন্ন সাহিত্য কুসুমের রূপ ও স্বরূপ পর্যালোচনা করে সেই ভারতীয় আধ্যাত্মবাদের সুরভির সন্ধান করেছেন এবং আলোচ্য বইটির ধূপদানিতে সেই সুরভির পরিবেশন করে পাঠক মনকেও পুলকিত করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। বইটি সুখপাঠ্য সুলিখিত এবং রবীন্দ্র কাব্যের ভাবোৎসের আন্তরিক সন্ধান-প্রয়াসী।

সমর গুহ

জয়শ্রী

শারদীয়া
১৩৬৯

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

বাংলা ভাষার লেখক, পাঠক ও সাহিত্য-পিপাসুদের সশ্রদ্ধ ও প্রীতিপূর্ণ সম্ভাষণ জানিয়ে ১৩৬৯ সনের শারদীয়া জয়শ্রী উৎসর্গ করা হোলো তাঁদের উদ্দেশ্যে।

এক চতুর্থাংশ শতাব্দী ধরে জয়শ্রী বাংলা ভাষাভাষীদের মধ্যে তার বক্তব্য উপস্থিত করে আসছে, সাহিত্যের মাধ্যমে। সে সাহিত্য সৃষ্টিতে বিভিন্ন সময়ে অংশগ্রহণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ থেকে সুরু করে বাংলা ও ভারতের শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক, দার্শনিক, রাজনীতিক, অর্থনীতিক ও সাহিত্যিক, অর্থাৎ সমাজজীবনের বিভিন্ন দিকে যাঁরা শুধু দিকপালই নন, যাঁদের বক্তব্যের ভার ও মান রয়েছে। বিচিত্রবিষয়ে যাঁরা মননা ও সাধনার মধ্য দিয়ে তাঁদের বক্তব্যকে নিঃসন্দেহ দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণের যোগ্য করে তুলেছেন।

স্বাধীন, সুস্থ, সুন্দর ও তৃপ্ত সমাজ-গঠনের প্রচেষ্টার অংশীদার জয়শ্রী, তার জন্মলগ্ন থেকে। সাহিত্যের মাধ্যমকে এই উদ্দেশ্যে নিযুক্ত করা যেমন তার লক্ষ্য, মহৎ-সাহিত্য সৃষ্টির পরিবেশ সৃষ্টি করাও তার অন্যতম প্রয়াস। কারণ সাহিত্য অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানবীয় সৃষ্টি। এই অভিযানে প্রবীন ও নবীন সকল সাহিত্যিকদের আমরা আহ্বান করছি এগিয়ে আসতে। চিন্তা, বিচার, বুদ্ধি

ও মননাকে জাতির মধ্যে ফিরিয়ে আনবার জন্য বাঙ্গালা ভাষার শক্তিশালী লেখকদের শক্তিকে নিযুক্ত করবার প্রয়োজন তাঁরা স্বীকার ও সে দায়িত্ব তাঁরা গ্রহণ করবেন এই আশা করছি। কেবলমাত্র অননা ও বিচারহীন ভাবালুতার জৌলুষ, অতি তলো সস্তা প্রবৃত্তিকে তৃপ্ত করাই আধুনিকতা ও বাস্তবতা বলেস্বীকার করতে আমরা রাজী নই। শারদীয়া জয়শ্রীতে বিভিন্ন বয়োঃস্তরের বহু নামী লেখকের সাহিত্যকর্মের নিদর্শন রয়েছে। সব লেখাই সমান রসোত্তীর্ণ হয়েছে বলিনা, তাদের স্বাদ ও রূপ বিভিন্ন ও বিচিত্র কিন্তু তার মধ্য দিয়ে বাস্তবানুগতার পাশাপাশি অ-সন্দোর্ষ, কদর্যতা ও ব্যর্থতা থেকে উত্তরণের মানসিকতা ও ইঙ্গিতের স্বাক্ষরও রয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস।

চলচ্চিত্র ও নাটককে আমরা জাতি গঠনের অতি শক্তিশালী উপকরণ মনে করি এবং এদের মান সুনির্দ্দিষ্ট করাও সমাজ গঠনের পক্ষে একান্ত আবশ্যক বলে মনে করি। কিন্তু অভিনেত্রীদের ছবি ও জীবনকাহিনী অনেকের নিকট কৌতূহলপ্রদ হওয়া যদিও অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু এ বাদদিয়ে সাহিত্যকে আকর্ষণীয় করা সম্ভব নয় বলে যাঁরা মনে করেন আমরা তাঁদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নমত পোষণ করি। এটা "প্রডিসনেস্" নয় কিন্তু নির্বিচারে মানুষের সবকিছু লুব্ধতাকেই সাহিত্যসৃষ্টির প্রকৃষ্ট পন্থা হিসাবে ব্যবহার করা উচিত কিনা বাংলার প্রবীন ও নবীন সাহিত্যিকদের নিকট এই প্রশ্ন আমরা রাখছি। এ প্রশ্নের উত্তর দেবার দায়িত্ব তাঁরা স্বীকার করবেন আশাকরি।

সর্বশেষ জয়শ্রীর লেখক-লেখিকা, গ্রাহক-গ্রাহিকা পাঠক-পাঠিকা বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভার্থিদের আমাদের সাদর শারদীয় সম্ভাষণ জানাচ্ছি।

২রা আশ্বিন ১৩৬৯

বিজ্ঞপ্তি

কার্তিক সংখ্যা থেকে সুসাহিত্যিক জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর অভিনব ধারাবাহিক উপন্যাস, মননশীল প্রাবন্ধিক ও প্রতিভাবান কবি কিরণশংকর সেনগুপ্তের 'বিশ শতকের কবিসমাজ ও কাব্য চেতনা' সম্পর্কে আলোচনা, সুপরিচিত কথা-সাহিত্যিক শচীন্দ্রনাথ বসুর লেখনীতে বিদেশী শ্রেষ্ঠ গল্পের অনুসরণের অনুবাদ ও অন্যান্য মূল্যবান প্রবন্ধ, কবিতা, আলোচনা ও গল্প প্রকাশিত হবে।

কবিতা.....

একটি মেয়ে

বিবেক দাস

সিনেমার অন্ধকারে মেয়েটি ঘনিষ্ঠ হ'য়ে বলেছিল :
ভালবাসে ফেলেছি তোমায়।'
মাছের কাঁটাটি ফেটে নিশ্চিন্তে কাঁটায় বিঁধে
বলেছিল, 'ভালবাসি সত্যিই তোমায়।'
আচমকা কথাটা এসে বিঁধেছিল কাঁটার মতন,
মনে মনে হাসলেও খুশিতে ভরেছে তবু মন—
আমার বয়স জানি মেয়ের বিগুণ।
উত্তর দিইনি কিছু—ছিল না দেবার,
কাঁটা ছিল বুঝি মাছ ভাজার ভিতরে
সে-কাঁটা গলায় যেন বিঁধেছে এবার।

ছবি শেষ হ'লে পরে কখন ট্যাক্সিতে উঠে,
একান্ত নিবিড় হ'য়ে বলেছিল প্রেমে-মাঁটা ছবি :
দেহের বিদ্যুৎস্পর্শে করেছে দেহকে সম্মোহন,
আমার অস্তিত্বকে করেছে সুরভি।
শুধুই দেহের ঢেউ এগোয় নিছোড়
আদিম অনাদি এই অনুভূতি অনন্ত বিস্ময়
ঘুরে ঘুরে বারেবারে মানুষের জীবনকে ছোঁয়—
তবু এতো প্রেম নয়, নয়।

পরম নিশ্চিন্তে মেয়ে আমার বুকেতে
তার ছোটমাথা রেখেছিল—তবু কী পেল সে?
দেহকে পেয়েছে শুধু ছোঁয়নি হৃদয়,
সে হৃদয় শামুকের মত
যখন ঢুকেছে এসে দেহের খোলসে।
সে-মেয়ে বোঝেনা তাই
দিগন্তের মত তার বাঁকা ঠোঁটে ছিল শুধু হাসিটি তরল,
আমার সমুদ্র-চোখ ভরা ছিল জল, শুধু জল।

গীর্জায় একটি বিকাল

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

আহা, বেশ এই দৃশ্য। বেশ সুখী এবং নরম
উজ্জ্বলিত এক ঝাঁক নর-নারী। আলোর সোপানে
সিক্ত হবে অভিস্নানে। বৃদ্ধ, শিশু এবং যুবতী
সকলেই প্রার্থনায় অভিভূত হতে
কোমল শিশির-ভেজা প্রত্যূষে এখানে।

আহা, এই সমগ্রতা, বিবেকী বিন্যাসে ঘরোঘরো
শান্ত এই সম্মেলনে অভিভূত অনেক মুখের
অস্পষ্ট রেখারা যেন কতো দীর্ঘকাল
ভাবেনি যীশুর ছবি। অলৌকিক ধ্যানে
হয়তো সন্ধানে মুক্ত হতে গিয়ে তাই
বেখাপ্পা লাগে না আর যাজকের দীর্ঘ দেহটার
বর্তুল উচ্চতা। কুহুর, ঘোরগ আশেপাশে

গীর্জার প্রাঙ্গণে ঘোরে। মাঝে-মাঝে উৎকণ্ঠিত ডাকে
ম্লান-ভোর প্রশান্ত মহতা থেকে
চমকে উঠে বসে। বৈকালিক রোদে ফের দেখা হবে।
আপাতত গির্জা থেকে পথে নেমে এসে
তরুণ-তরুণী দু'টি নিবেধে উধাও
তরুশ্রেণী আচ্ছাদিত পাতার আড়ালে।

আহা, এই বেশ দৃশ্য। বৃদ্ধ, শিশু, তরুণের
শান্ত কোলাহলে
সমস্ত সংসার যেন হৃদয়কে পায়
পরিমিত লাবণ্যের দৃশ্যের আড়ালে।

কবিতা, বর্ষাদিবসে

বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

ফুরাবে দুইটি দিন। চিরকাল যেমন ফুরায়
সবকিছু। যেমন সহসা
চিরকাল রামভাদরছুর ভাঁড়ারে
ফুরায় তণ্ডুল, তেল, জাঁতায়-ভাঙানো আটা।
অথবা কবিতা, গল্প, প্রেমিকের পত্রমাত্র, কাটা
রেকর্ডে পুরনো গান, গোলাপী খড়ের চিঠি।
অথবা শব্দের খ্যাতি। অথবা···অথবা
শহরে বিখ্যাত ওই ক্রেমে-আঁটা দৃশ্যের ছবিটি।

কেহ কি বিখ্যাত ছিল? খ্যাতির ভিখারী
নাহুরে তবুও কেহ শ্রাবণের বিখ্যাত চূড়ায়
উঠে গিয়েছিল নাকি? ক্রেমের ভিতরে
অধুনা বিলাপ তার শোনা যায়। যাবে
আরও-কিছুকাল; তারপর—
যেহেতু দৃশ্যের ধ্বনি ফুটিকাটা ঢোলকের মতো
ক্রমেই দুর্বল হয়, ক্রমেই দুর্বল হয়, ক্রমেই দুর্বল হয়—
তাই তারপর
শহরে বিখ্যাত হত শ্রাবণের দৃশ্যও ফুরাবে।

কবিতা, কল্পনালতা

অমিত রায়

সকল ইচ্ছার নিচে
ঊর্ধ্বশিখা কামনার অগ্নিত কুণ্ডলে
কাঁপে অন্ধকার।
আলোর উন্মাদ হতো পতঙ্গের শব
প্রহরে প্রহরে খসে সে অবচেতনে।
জ'মে ওঠে স্মৃতির পাহাড়।

অথবা সে স্মৃতি নয়, সত্য, ঘটমান
সংগ্রামের রক্তাক্ত কাহিনী।
যেন আমি বিদ্ধ এক ভূমিষ্ঠের হাতে;
জলের কবরে যেতে যেটুকু সময়
তারই মত-অনুপলে এ জীবন চিনি।

তাই প্রতি মুহূর্তেই হৃদয়ে আমার
মৃত্যু আর আলোকে উত্থিত।
শূন্য যদি সর্বগ্রাসী, দেখ সে আঁধারে
কবিতা, কল্পনালতা, অবগুন্ঠনীয়ের
স্পর্ধা তবু বুকে আন্দোলিত।

অন্ধকার আয়নার সামনে

: দীনেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কেন তুমি আঙুলে নীলার আংটি
ধারণ করেছো?
এখন গভীর অন্ধকারে আমরা
পরস্পরের হাতে হাত রেখে
এ নরক অতিক্রম ক'রতে চাই। অথচ তোমার
স্পর্শের অমল বরাভয় এক অদৃষ্টের কঠিন বন্ধনে
ক্ষতের মতন লাগছে।
এভাবে নরক পার হওয়া যায় না। এ ভাবে
আমরা
বুকের মধ্যে অন্ধ সংস্কারের আঙুলগুলি পুষে
কিছুতেই পৌঁছাতে পারবো না চৈতন্যের
একটিই নির্মল দেশে। তুমি হাত থেকে
নীলার আংটিটা ফেলে দাও।

যাত্রা করে জোনাকিরা

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

যাত্রা করে জোনাকিরা, বৃষ্টি ধ'রে এল ;
তমালপল্লব বেয়ে জল,
ওঁড়িতে একটা লোক শুয়ে, বিগলিত ;
এ তমাল আশ্রিতবৎসল।

ঝিরঝিরে জল, এই সস্নেহ তমালতল ;
যাত্রা করে জোনাকিরা এতৎসত্ত্বেও,
জীবনে প্রথম যেন, স্বল্পায়ু জীবনে
সমূহ শোণিত ঢেলে প্রেম
যদি পাওয়া যায়, যদি তমালকুঞ্জের স্নিগ্ধ স্নেহের পৃথল
খুলে ফেলা যায়—ভেবে কুঞ্জের পিছনে

ফেলে গেল জোনাকিরা ; ডাকতে আবার যন্ত্রণা কি ?
সন্ধ্যার মাথায় খুশি আলো করে একটি জোনাকি !

শারদীয়া

রবেন ডারিও

অনুবাদ : দেবীপ্রসাদ অন্ধ্যোপাধ্যায়

সুবাসিত হয়ে ওঠে যখন ভাবনা মোর তোমার
উদ্দেশে ভেসে যায় ;
আরও সুনিবিড় হবে তোমার দৃষ্টির সুধা ঝরে।
কেবার শুভ্রতা অবিচল ওই নিরাবৃত পায়ের তলায়,
ধরণীর সব সুখ লেখা ওই তব গুঁড়োয়।

বিদায় ক্ষণিক মায়া কাঙ্ক্ষিমান ভালোবাসা, একই
সমাপ্তির উপহারে
আনন্দ ও শোকেরে সে দালায় দাওয়া একপটে।
এক যুগ আগে আমি নাম লিখেছিলাম দুয়ারে ;
ভিনেক আগেও প্রেম কীর্তিত করেছি বালুতটে।

পৃথিবীর

আনন্দ বাগচী

সমস্ত সংসার চিত্র ধরা ছিল আলোবাদের মত
কত দৃষ্টিকোণ থেকে কিপ্রমুষ্টি অন্ধকোলা ছবি ;
রূপসাগরের থেকে ডুব দিয়ে তোলা শঙ্খ ঝড়ি
অনেক বহস, দুখ, আলোছায়া অন্ধকার স্মৃতি
চতুর্দিক সুরেতালে বাঁধা এক গৃহস্থালী যেন।
সমস্ত মন্থন চলছে, নিপাট নিখুঁত ভদ্রলোক,
প্রতিবেশীদের ঈর্ষা, এবং সন্দেহ, কৌতূহল
অবিরাম ঘিরে আছে, গল্পাবলী নিত্যপ্রচারিত।
আমরা সুখীলোক, সুসভ্যতা দুরন্তের মত
নিশ্চিন্ত নির্জন সন্ধ্যা টিপটের সামনে বসে কাটে।
সকালে আয়নার সামনে, আলোয়
দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম
সঙ্গে নিয়ে, আড়চোখে খবর কাগজ পড়া চলে।
কারো সঙ্গে কথা কইতে শোনা যায়নি, টেলিফোন ছাড়া
নিঃসঙ্গ একাকী শুধু একঘরে, কি রহস্য জোয়ার ভাঁটায়
দিনরাত্রি কেটে যায় শুধু বই প'ড়ে, বই প'ড়ে।
কখনো গভীর রাতে আলো জ্বেলে দিতে দিতে
কাগজের ভাঁজে,
কোন্ উপজীবিকার বাঁধা, কোন্ স্মৃতিকথা দিয়ে,
অজ্ঞাত সংবাদ দেব ; জনমত অনধিকৃত ঘোরে।

পলাশের কানন ছেয়ে রাশি রাশি পীতপত্র ঝরে,
অঞ্জন ঘনশ্যাম ঘোরে সেই ঝুরে ঝুরে প্রেমাকাঙ্ক্ষা।
শরতের পালপাত্রে যে মুংহলীনীলাভ ধরিয়া, তার পরে
তোমার সোনাপক্ষ যেন পাপড়ি ঢালে, হে ফাল্গুন।

নাড়া

গোবিন্দ চক্রবর্তী

ঝড় নেই, বাতাস নেই
নেহাৎ-ই হঠাৎ –
দরজার পাল্লা দু'টো কাঁপে,
কেঁপে কেঁপে যায় থেমে
শুধু শেকলে রেখে একটু দোলা।

কতদিন চমকে উঠেছি,
কড়া নজর রেখেও দেখেছি—
না, পুঁয়োকাঠের তক্তার নাকি
রেওয়াজ-ই ওই :
যে জানে—সে-ই জানে !

আমার বুকের ভেতরে
একেবারে সেই অন্দরমহলে,
মাঝে মাঝে কে কড়া নাড়ে !
না, উড়িয়ে দিতে গিয়েও পারিনি –
একটা টিকটিকিও ডাকে !

বারান্দায় করবীর ডাল

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

প্রান্তরে যাওয়ার পথ সব বন্ধ। হাওয়া মূক হয়।
মন্দির অনেক দূরে, কোনখানে আছে সেই আন্দোলিত
নারিকেল-বীথি
করবীর ডাল কোনদিকে বুঝি ছুলতারে মৃত্তিকায় লীন
আকাশ উজ্জ্বল হয়ে চিরকাল উচ্চে বিরাজিত।
ঘরের ভেতর এই উষ্ণতার আশ্রয় শিবির,
গোলাপের ভালবাসা রক্তহারশোভিত ছবিটি
কতকাল পরিপাটি—যতবার মুছি ঠিক ততবার হিংসুক
ধুলোরা
জমে যাচ্ছে—ঊর্ধ্বগামী মায়াবী উচ্চার
লক্ষ্যের পরিপূর্তি···সুখ বড় সামাজিক দাবি....
কে গোলাপ ছিঁড়ে আনলো, করবী কে এনেছিল ডাল
আজ এই সম্মিলিত অবাধ প্রবাহ চলে ধীরে
ভেতরে কোথাও এক পাগলের ঘর বাঁধা আছে
মন্দিরের ঘণ্টা বাজছে···কান পেতে শুনেছি এখুনি···
কোন ভোরভেই যেন নেই আর, কেঁপে ওঠে সত্তার গভীর
নীল ছায়াময় ঐ প্রতিবেশী মাঠের ওপার
ঘরে চলে আসে, বাজে অবিরাম তারই প্রতিধ্বনি,
এ যাওয়াআসার কী যে ভাললাগা গোপন নিবিড়—
আমরা প্রশস্ত এই বারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছি।

প্রত্যাশা

শিবদাস চক্রবর্তী

বিপুল অনর্থ আনে অর্থহীন কথার চাতুরী
বিবেক লুকালে মুখ বুদ্ধি আর যুক্তির আড়ালে,
জিলে জিলে লুপ্ত হয় হৃদয়ের সমস্ত মাধুরী—
স্মৃতির ভাণ্ডার শুধু ভরে ওঠে শব্দের জঞ্জালে।
প্রতীকার যতটুকু—তার চেয়ে জোরালো প্রচার,
কথার ঐশ্বর্য দিয়ে ঢেকে-চলা কাজের দীনতা
সমস্ত সমাজ-মন অবাধে করেছে অধিকার
কঠিন ব্যাধির মতো অকারণ বাক্-প্রবণতা।

কাজের মানুষ কম, আছে বহু কথার ফানুস –
বিস্ময়ের অন্তরালে নভোচুম্বী নামের দুরাশা।
আত্মপ্রতিষ্ঠার রূপ সবলের সমস্ত পৌরুষ,
মুমূর্ষু হয়েছে আজ দুর্বলের ত্রাণের প্রত্যাশা।
বুদ্ধির নির্দেশ মেনে হয়েছে অনেক ক্ষতি ক্ষয় :
বুদ্ধি নয়, যুক্তি নয়,—চাই আজ দরদী হৃদয়।

সুদক্ষিণা

গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

পাপড়িতে পাপড়িতে তৃষ্ণা, তীক্ষ্ণতাও প্রতিটি কাঁটায়,
গোলাপের মতো তুমি, যতো দেখি তৃপ্তি
আসেনা তো।
তোমার কোমল চোখ,—ভোরের শিশিরে শুচিস্নাত
সুদূর তারার দৃষ্টি নিয়ে কী যে রহস্য পাঠায়!

গোলাপের মতো তুমি, যতো দেখি তৃপ্তি
আসেনা তো।
ঋতুচক্র ঘুরে যায়; দিন জ্বলে; উন্মুখ শাখায়
সুদূর তারার দৃষ্টি নিয়ে কী যে রহস্য পাঠায়!
দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তর প্রতি পর্বে শুধু যন্ত্রণা তো।

ঋতুচক্র ঘুরে যায়; দিন জ্বলে উন্মুখ শাখায়।
প্রদীপের মতো মন জ্বলে যায়, জ্বলে প্রতি রাতও;
দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তর, প্রতি পর্বে শুধু যন্ত্রণা তো।
আরণ্য পাখির ডাকে পৃথিবী কি স্বপ্ন ফিরে পায়?

প্রদীপের মতো মন জ্বলে যায়, জ্বলে প্রতি রাত ও;
মেঘের মল্লার বাজে যদি কোন মায়াবী সন্ধ্যায়,
আরণ্য পাখির ডাকে পৃথিবী কি স্বপ্ন ফিরে পায়?
আসবেনা উৎসব রাত্রি? সুদক্ষিণা, আমরা
অবজ্ঞাত!

বিরহ

মধু শর্মা

বিরহে বিধ্বস্ত আমি নির্জনতা ভরা কোনো দ্বীপে
পড়ে আছি—সুদীর্ঘ ঝড়ের পরে ভগ্ন এক
জাহাজের মত
দূরের তালবনে ঐ চাঁদের বিমর্ষ চোখে বিষণ্ণতা কাঁপে
বন্দর অনেক দূরে—আমি পড়ে আছি এই দুঃখের
সমীপে।

নরম স্বপ্নের মত মিহিনীল জ্যোৎস্নার গভীরে
হেমন্তের হিমে ঢাকা প্রান্তরের আলোতে ছায়াতে
দেখেছি কিশোরকালে তার চোখে করুণার হাওয়া
বয়ে যায়
যৌবনের পদধ্বনি শুনেছি রোমাঞ্চে আমি আমার
শরীরে।

তারপর পাতাগুলি টুপটুপ ঝরে গেছে ফিরবার পথে
গাছের কাতর কান্না কে শুনেছে শান্ত সেই গ্রামে
রেড়ির তেলের আলো টিমটিমে মাটির প্রদীপে
ম্লান হয়ে বিকিয়েছে অন্ধকার রাতের নীলামে।

টুনটুন্ ঘণ্টা বাজে—রিক্‌শো গেলো কোলকাতার
বাঁকে
সে আর এলোনা তবে—অন্ধকার জড়ালো আমাকে।

জীবনের ছন্দ লয়ে বুকে,
কখনও ছড়ায় রঙ, বিশ্বের বিস্তীর্ণ সমুখ প্রাণে
কখনও নিয়েছে শুষে এক হতে অনন্তে
আবিরের সবটুকু রঙ, নিঃশেষে গোপনে।

কিন্তু এ প্রশ্নের আজও মেলেনি উত্তর—
জীবনের সবটুকু রঙ,
যারা দিতেছে বিলায়ে
দিতেছে বিলায়ে যৌবন কুসুমে
ধনিকের বজ্রকঠিন মুষ্টির চাপে
তাদের জীবনে আশাদের বাণী
তবে কি ব্যর্থ হবে?

মুখু কি ব্যর্থ হবে?

অপরাজিতা গোয়ী

এ প্রশ্নের আজও মেলেনি উত্তর—
বৈশাখের খর রৌদ্রতাপে সবুজ ঘাসের তলে
যে মাটিতে ধারছে ফাটল
তারও তলে নতুনের স্পন্দন
কেমনে ছড়ায় জীবনের আলিম্পন!

প্রকৃতি আপন খেয়ালে
আসে যায় বার বার

বিনোবাজী : পূর্বপাকিস্তানে

শান্তিনিকেতন
৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৬২

শ্রীযুক্তা লীলা রায়,
"জয়শ্রী" সম্পাদিকা সমীপে

মাননীয়াসু,

বিনোবাজীর পূর্বপাকিস্তান পদযাত্রা কাল শুরু হয়ে গেছে। রংপুর ও দিনাজপুর জেলার ভিতর দিয়ে তিনি যাবেন। মাত্র দুই সপ্তাহের প্রোগ্রাম। আপাতদৃষ্টিতে সামান্য ঘটনা, তবু অসামান্য। গান্ধীজীর নোয়াখালী যাত্রার পর এর মতো মহৎ ঘটনা আর ঘটেনি। মাঝখানে কেটে গেছে ষোলটি বছর। ষোলটি বছর না এক আধ শতাব্দী ?

রংপুরে আমার এক ডাক্তার বন্ধু বাস করতেন। প্রত্যেক বছর বারুণী তিথিতে তিনি আমাকে স্মরণ করতেন ও চিঠি লিখতেন। সেই তিথিতে আমার জন্ম। পরে জানতে পাই তাঁরও জন্ম। বছর কয়েক হলো আর চিঠি আসছে না। তিনি ইহলোকে নেই। কিন্তু যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন রংপুর ছাড়েন নি। সেখানকার মুসলমানরা তাঁকে ছাড়বে না। তিনিও তাদের ছাড়বেন না। তিনি জীবিত থাকলে কত সুখী হতেন বিনোবাজীকে দর্শন করে। আর বিনোবাজীও কি সুখী হতেন না তাঁকে দেখে !

শুধু জ্ঞানদানন্দ দাশগুপ্ত নন,, তাঁরই মতো আরো অনেকের নাম জানি যাঁরা পূর্বপাকিস্তান ছাড়েন নি। যদিও অতি সহজেই পারতেন। তাঁরা থেকে গেছেন মাটির টানে, মানুষের টানে। তাঁরা কোনো দিন হিন্দু মুসলমানের বিরোধকে ধ্রুবসত্য মনে করেননি। ধ্রুবসত্য হচ্ছে হিন্দু মুসলমানের মিলন। কোথায় ছিল আরব, কোথায় ছিল ইরানী, কোথায় ছিল তাতার আর তুর্ক, হাবসী আর পাঠান, মঙ্গোল তথা মুঘল। আর কোথায় ছিল আর্য, দ্রাবিড় ইত্যাদি বহু জাতির সংমিশ্রণে গঠিত হিন্দু। ইতিহাস এদের এমন বেমালুম মিলিয়েছে যে, বিদেশী পোশাক পরলে ও দাড়ি গোঁপ ছাঁটলে কে যে হিন্দু আর কে যে মুসলমান তা চেনা যায় না।

আমার এক বহুদর্শী পাঞ্জাবী মুসলমান বন্ধু বলতেন প্রত্যেক প্রদেশেই সেখানকার হিন্দু আর সেখানকার মুসলমান একই রকম দেখতে শুনতে। ধর্মগত বৈষম্যটা মর্মগত বা চর্মগত নয়। পাঠানরাও মুসলমান, পাঞ্জাবী মুসলমানরাও মুসলমান। তবু মুসলমানে মুসলমানে বিয়ে সাদী নেই। কিছুদিন আগে মুর্শিদাবাদ জেলার এক মুসলমান লেখক আমার সঙ্গে দেখা করে তাঁর উপন্যাসখানির পাণ্ডুলিপি পড়তে দেন। বাঙালী মুসলমান বিহারে গেলে বিহারী মুসলমান বনে যান। লেখক এই নিয়ে পরিহাস করেছেন। এক জায়গায় লিখেছেন বাংলা ভুলে গেলে কী হবে, কাঁদেন যখন তখন বাংলাতেই কাঁদেন। একবার লেখক বিহারে এক উকিলের বাড়ী অতিথি হন। উকিলটি বিহারে থেকে বাংলা ভুলে গেছেন। উর্দুতেই কথাবার্তা বলতে হয়। কিন্তু হঠাৎ অন্তঃপুর থেকে কান্নার রোল শোনা যায়। উকীলও কেঁদে ওঠেন। কোন্ ভাষায়, জানেন? বাংলাতে।

পাকিস্তানী পসেস্তারাসত্ত্বেও বাঙালী মুসলমান বাঙালীই রয়ে গেছে। তার পোশাকী ভাষা হয়তো উর্দু। কিন্তু কান্নার ভাষা তো বাংলা। বিপদে আপদে শোকে দুঃখে বাঙালী মুসলমানদের কান্না কার বুকে বাজবে? কার অন্তর স্পর্শ করবে? সিন্ধীর নয়, পাঞ্জাবীর নয়, পাঠানের নয়। যাকে ব্যাকুল করবে সে বাঙালী হিন্দু। ইতিহাস তো পনেরো বিশ বছরে শেষ হয়ে যায় না। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলে। কান্নার রোল কি কোনো দিন উঠবে না? যদি কোনো দিন ওঠে সেদিন বাঙালী মুসলমান বাংলাতেই কাঁদবে আর সে কান্না করাচীতে পৌঁছনোর আগে কলকাতায় পৌঁছবে। আরো আগে পৌঁছবে ঢাকাতে রাজশাহীতে চাটগাঁয় বরিশালে খুলনায় যেখানে এখনো কিছু কিছু বাঙালী হিন্দু রয়ে গেছে।

সত্যিকারের বন্ধু তারাই যারা রাজনীতির সুদিনের বন্ধু নয়। যারা সাধারণ জীবনযাত্রার দুর্দিনের বন্ধু। সে রকম বন্ধু ধর্মের দ্বারা চিহ্নিত নয়। দাশগুপ্ত যে একজন হিন্দু এর চেয়ে বড় কথা দাশগুপ্ত একজন ডাক্তার। আরো বড় কথা দাশগুপ্ত একজন হৃদয়বান প্রতিবেশী! একই কথা বলা যেতে পারে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের সম্বন্ধে। বিপদে আপদে তাদের কাছে আমি সাহায্য পেয়েছি। ধর্ম নিয়ে তাদের ব্যবহারে তারতম্য হয়নি। আমার জন্মস্থান ওড়িশায়। আমাদের বাড়ীর পিছনের বাগানের বেড়ার ওপারেই মুসলমান। জন্মে অবধি তাদের দেখে এসেছি। আপদে বিপদে আমরাই তাদের বন্ধু, তারাই আমাদের। দুই বাড়ীর দুই কর্তাকে দেখেছি ধর্মালাপ করতে। যদিও একজন ঘোর বৈষ্ণব ও অপর জন ঘোর মুসলমান। কাফের বা যবন কথাটা কখনো মাথায় আসেনি। আমার ছেলেবেলার সব চেয়ে পুরোনো ফোটোগ্রাফ তোলা হয় যাঁর কোলে তিনি মুসলমান শিক্ষক। কাকাদের একজন বলেই তাঁকে জানতুম। তখনো হিন্দু মুসলমান ভেদজ্ঞান জন্মায়নি।

ভেদ তা বলে মায়া নয়। ভেদ একটা ছিলই। কিন্তু মানুষ বরাবর চেষ্টা করেছিল তার উপরে উঠতে। মুসলমানের সঙ্গে মুসলমানের যুদ্ধ হচ্ছে। মুসলমান নবাব তাঁর ছেলেকে রেখে যাচ্ছেন যাঁর আশ্রমে তিনি তাঁর বন্ধু হিন্দু মোহন্ত। হিন্দুর সঙ্গে হিন্দুর যুদ্ধেও হিন্দুর ভরসা মুসলমান মাহুত বা অম্বারোহী। আমাদের সাত শ' বছরের ইতিহাসে কত হিন্দু রাজা মসজিদ গড়িয়ে দিয়েছেন। কত মুসলমান শাসক মন্দির গড়তে সাহায্য করেছেন। বাংলা রামায়ণ মহাভারত রচনা কাদের উৎসাহে হয়েছে? মালিক মুহম্মদ জায়সী ও আমীর খসরু না হলে হিন্দী সাহিত্যের কী হতো?

ভেদের উপরে ওঠার চেষ্টা অনেকেই করেছেন, কিন্তু সকলে করেননি। আমাদের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ভেদনীতির উদাহরণও রয়েছে। একজন সুলতান কি বাদশাহ অভেদনীতি অনুসরণ করে হিন্দু মুসলমান সবাইকে সমান চোখে দেখলেন। তাঁর পরে একজন এলেন তিনি ভুলে গেলেন যে তিনি রাজা, তিনি মনে রাখলেন যে তিনি মুসলমান। ভেদনীতির পরিণাম ফলতে সময় লাগে, তিনি হয়তো সে পরিণামের সাক্ষী হলেন না, কিন্তু পরবর্তীরা ভুগলেন। তার পরে আবার দেখা গেল একজন সুলতানকে বা সম্রাটকে অভেদনীতি অনুসরণ করতে। হিন্দু মুসলমানে সমদর্শী হতে। আমাদের ইতিহাস কেবল একটিমাত্র নীতির ইতিবৃত্ত নয়। মুসলমান বলতে কেবল ভেদনীতিপ্রবণ মুসলমানই বোঝায় না। আমার সহকর্মীদের মধ্যে আমি বহু মুসলমানকে জানি যাঁরা অভেদনীতিতে বিশ্বাসী। আর এমন হিন্দুকেও দেখেছি যিনি হাড়ে হাড়ে ভেদনীতি পরায়ণ। এক হাতে তালি বাজে না। এঁরা সেই দ্বিতীয় হাত।

রাজাকে মনে রাখতে হবে যে তিনি রাজা, তিনি হিন্দু কি মুসলমান সেটা পরের কথা। পরের কথাটা আগের কথা হলে সর্বনাশ। রাজপুরুষদের অনেকেরই সেটা মনে থাকে না। কেবল পাকিস্তানে নয়, ভারতেও। সেকুলার স্টেট যখন বলি তখন এই কথাটাই বলতে চাই যে, সবার উপরে মানুষ সত্য। কার্যকালে অসত্য আচরণও কি লক্ষ্য করিনে? দৃষ্টান্তটা ভারতের দিক থেকে যদি আসে পাকিস্তানও একদিন সে দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবে। পাকিস্তানের যাঁরা রাজা ও রাজপুরুষ শ্রেণীর লোক তাঁরাও মনে রাখবেন যে, তাঁরা রাজা। রাজার চোখে সব প্রজাই সমান। আজকালকার পরিভাষায় রাষ্ট্রনায়ক ও রাষ্ট্রীয় কর্মচারীদের চোখে সব নাগরিকই সমান। এ যদি না হয় তবে পাকিস্তানের ইতিহাসে পরে একদল আসবেন যাঁরা অভেদনীতিতে বিশ্বাসী। তাঁদেরও দিন আসবে। সেই শুভদিনটির জন্যে ধৈর্য ধরতে হবে পাকিস্তানের হিন্দুদের ও প্রগতিশীল মুসলমানদের।

বিনোবাজীর মিশন রাজরাজড়াদের দরবারে নয়। প্রজা বা নাগরিকদের মেলায়। যেখানেই তিনি গেছেন সেখানেই তিনি শান্তির বাণী, সাম্যের বাণী, অভয়ের বাণী শুনিয়েছেন। এবারেও তাই শোনাবেন। এর ফলে হয়তো দু' পাঁচজন মুসলমানের মনে হবে যে, তারা আগে নাগরিক, পরে মুসলমান। বা আগে মানুষ, তার পরে মুসলমান। তেমনি দু' পাঁচজন হিন্দুরও মনে হবে যে, তারা আগে নাগরিক, পরে হিন্দু। বা আগে মানুষ, পরে হিন্দু। সব সময় নিজেকে হিন্দু ভাবাটা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। সব সময় নিজেকে মুসলমান ভাবাটাও স্বাস্থ্যকর নয়। অস্বাস্থ্যের ব্যাপারীরা এতে আতঙ্কিত হবেন। ইতিমধ্যেই পাকিস্তানের কতক লোক বিনোবার বিরুদ্ধে চিৎকার জুড়ে দিয়েছেন। এদিকেও সেরকম লোক আছেন। হিন্দুদের মধ্যে। কিন্তু তার দরুণ বিনোবার পদযাত্রা একদিনও থামবে না। তিনি হাওয়ায় বুনে যাবেন বীজ। ফল ধরবে কবে ও কেমন করে তার মালিক আরেক জন।

নমস্কারান্তে। ইতি। বিনীত

অন্নদাশঙ্কর রায়

ক্যালকাটা ফ্যান

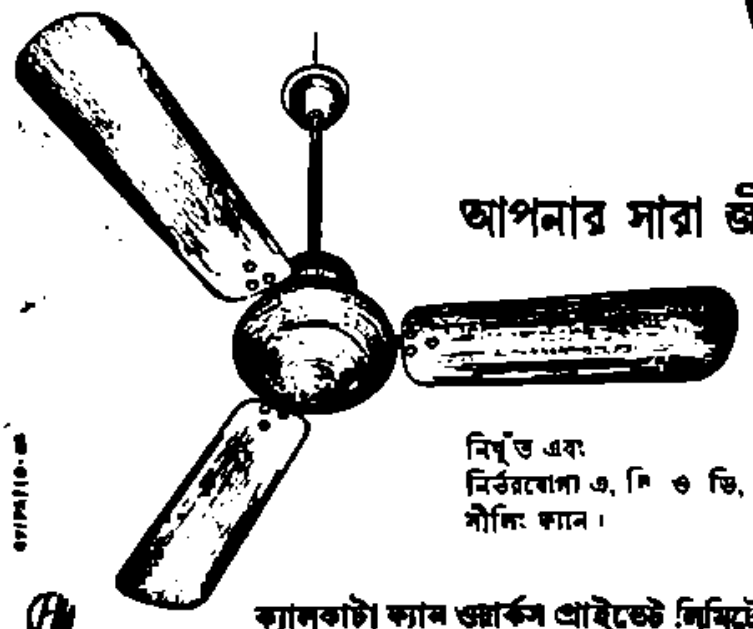

আপনার সারা জীবনের সহযোগী ...

নিখুঁত এবং নির্ভরযোগ্য এ, সি ও ডি, সি সীলিং ফ্যান।

নির্ভরযোগ্য সবক্ষেত্রে তৈরী সর্বাঙ্গসুন্দর 'এয়ার সার্কুলেটর' সতেজ ও স্নিগ্ধ বাতাসের আনন্দ বহন করে আনবে।

ক্যালকাটা ফ্যান ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড
৩০, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩।

দ্বিজেন্দ্রলাল কবি ও নাট্যকার

র থী ন্দ্র না থ রা য়

রবীন্দ্রনাথের প্রবল প্রভাব ও অব্যাহত জয়যাত্রার দিনেও যে-কবির কণ্ঠ হারিয়ে যায়নি, যিনি আপন মহিমায় স্বতন্ত্র, নিজের বিশিষ্ট কাব্যপ্রত্যয় ও কাব্যরীতি যাকে নিঃসঙ্গ গৌরবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে, তিনি কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। দ্বিজেন্দ্রলালের ভাবজীবনের মধ্যে যখন প্রাথমিক অবস্থার ভাবাতিলঘ্য ও লঘুলীলার পরিহাসরসিকতার শেষ হয়ে একটি ভাবস্থির পরিণতির স্থির প্রত্যয় দেখা দিল, তখনি আকস্মিক ভাবে তাঁর মৃত্যু হয়। সাহিত্য সাধনার জন্যই পূর্ণকালের পূর্বেই তিনি স্বেচ্ছায় রাজকার্য থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তাঁর সে সাধ পূর্ণ হয়নি।

কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যিক জীবনে এর চেয়েও বড় দুর্ভাগ্য হয়েছিল। জীবনের শেষ দশকে তিনি যা লিখেছিলেন, তা নাটক এবং পরবর্তীকালে দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যকার পরিচয়ই প্রধান হয়ে উঠেছিল। বঙ্গভঙ্গের সেই উত্তপ্ত মুহূর্তে দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকগুলি জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। মফস্বল পল্লী অঞ্চলেও দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকগুলি অভিনীত হতো যেখানে মঞ্চের কোনো ব্যবস্থা ছিল না, সেখানে যাত্রার পদ্ধতিতেও অভিনীত হতো। দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যকার খ্যাতিই তাঁর কবিসত্তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল নিজেও তাঁর স্বক্ষেত্র থেকে অনেকখানি সরে এসেছিলেন। তাঁর শেষকাব্য 'ত্রিবেণী'র ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন: "সম্ভবতঃ আমার গুণ কবিতার এইখানেই সমাপ্তি।"—এই উক্তিটি যেন দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যনিয়তির নির্মম পরিহাস।

স্বক্ষেত্র থেকে সরে এসে দ্বিজেন্দ্রলাল লাভবান হতে পারেন নি। তাঁর সম্ভাবনা-দীপ্ত কাব্যজীবনকে অর্ধসমাপ্ত রেখেই নাট্যসরস্বতীর আহ্বানে সাড়া দিতে হয়েছে। কবিতার ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলালের যে কতবড় স্থান, এ কথা অনেকেই ভেবে দেখেননি। নাট্যকার খ্যাতি তাঁর কবিখ্যাতির যেমন অন্তরায় হয়েছে, তেমনি এই প্রসঙ্গে আর একটি কথাও ভেবে দেখতে হবে। দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর প্রায় ছ'মাস পরে রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পেয়ে বিশ্ববন্দিত হলেন। বাংলা সাহিত্যের উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ক্রমবর্ধিত হলো। রবীন্দ্রকাব্যের রূপ ও রীতি বাংলাকাব্যের পথনির্দেশ করলো। যা রবীন্দ্রকাব্যরীতির অনুকূল নয়, তা সহজেই পরিত্যক্ত হলো। ফলে বাংলা কাব্যের ইতিহাসে কবি দ্বিজেন্দ্রলাল' ক্রমশ স্মৃতি ও শ্রুতির পর্যায়ভুক্ত হলেন। বাংলা কাব্যের ইতিহাসে একটি শক্তির উৎস দীর্ঘকাল অনাবিষ্কৃতই পড়ে রইলো।

নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে অনেক নূতনত্ব এনেছিলেন। তখন বাংলা নাটকে গিরিশ চন্দ্র একচ্ছত্র অধিনায়ক। গিরিশচন্দ্রের সেই প্রবল প্রভাবের যুগেও দ্বিজেন্দ্রলাল সেই জোয়ারে গা ভাসিয়ে দেন নি। তাঁর স্বাতন্ত্র্য-সমুজ্জ্বল প্রতিভা রূপ, রীতি, আঙ্গিক-প্রকরণ, চরিত্র সৃষ্টি—প্রভৃতি বিষয়ে নূতনত্বের সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল অপূর্ণতা ও আতিশয্য দোষ থেকে মুক্ত নন। জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও শিল্পগত ত্রুটিবিচ্যুতি কোনো কোনো স্থলে অত্যন্ত প্রকট হয়ে উঠেছে। অতি আধুনিক নাটকের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্র নাট্যের প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে। আধুনিক নাটকের সূক্ষ্মতর শিল্পরীতি, স্বল্পায়তন রূপবিন্যাস, আধুনিক যুগানুগ কলাবিধি—প্রভৃতি বিষয় দ্বিজেন্দ্রনাটকে অনুসন্ধান করা সঙ্গত নয়। বিশেষতঃ এ যুগ প্রধানতঃ

সামাজিক নাটকের যুগ। বহুপাত্রবিত ও ব্যয়সাধ্য দীর্ঘ ঐতিহাসিক নাটক অভিনয়ের প্রবণতাও আজ অনুপস্থিত। তাই শেষ পর্যন্ত দ্বিজেন্দ্রলাল যে নাট্যকার খ্যাতির উপর দাঁড়িয়েছিলেন, তার ভিত্তিও আজ নড়ে উঠেছে। মোটকথা, দ্বিজেন্দ্রলাল যে শক্তি ও মৌলিকতা নিয়ে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তা যথাযোগ্য মর্যাদা পায়নি। দ্বিজেন্দ্রলালের জন্মশতবার্ষিক উপলক্ষে এই প্রতিভাবান কবি ও নাট্যকারকে তাঁর যোগ্য সমাদর দেওয়ার সুযোগ এসেছে।

॥ ২ ॥

দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্য প্রতিভা এ কালে বিস্মৃতিতে পর্যবসিত হলেও, এককালে রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ, রসদৃষ্টিই এই প্রতিভাবান কবিকে সর্বপ্রথম সাদর অভিনন্দন জানিয়েছিল। 'আর্যগাথা' দ্বিতীয় ভাগ, 'আষাঢ়ে,' ও 'হাসি'-এর সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলালের কবি মানসের বৈশিষ্ট্য ও কাব্যরীতির স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে চূড়ান্ত কথা বলে দিয়েছেন। 'আর্যগাথা' দ্বিতীয় ভাগের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ কাব্য ও সংগীতের যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন, তা বিশেষভাবে অনুধাবন যোগ্য।

দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আর্যগাথা' প্রথম ভাগ তাঁর পরিণত প্রতিভার ফল নয়। কিন্তু এই কাব্যেও তাঁর প্রতিভার গীতিধর্মিতা, প্রকৃতিপ্রীতি, দেশপ্রেম ও রোমান্টিক বিহ্বলতা আত্মপ্রকাশ করেছে। ভূমিকায় দ্বিজেন্দ্রলাল যা বলেছেন, তা এই কাব্যের মর্মবীণা। তিনি এই কাব্যের কয়েকটি উপকরণকে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন :

"যদি কেহ প্রকৃতির অপার্থিব সৌন্দর্যে ও লাবণ্যে কখন কখন বিমুগ্ধ হইয়া থাকেন, যদি কেহ প্রকৃতিকে দেখিতে দেখিতে কখন কখন প্রকৃতি রচয়িতারও অনন্ত মহিমায় স্তব্ধ হইয়া থাকেন, যদি কেহ শোক জরা-সঙ্কুল জগতে দুঃখাবসন্ন হইয়া কখন কখন নীরবে অশ্রুবারি বিসর্জন করেন, যদি কাহার অকপটিতা হৃতভাগিনী দুঃখিনী ধাত্রীভূমির নিমিত্ত নেত্রপ্রান্ত কখন সিক্ত হইয়া থাকে, 'আর্যগাথা' তাঁহারই আদর চাহে।"

দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর প্রথম কাব্য গ্রন্থের ভূমিকায় মোটামুটি তাঁর কবিমানসের কয়েকটি সূত্র নির্দেশ করেছেন। এই কাব্যে হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের খণ্ড কবিতাবলীর প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। কবিকণ্ঠের নিজস্ব সুর তখনো অস্পষ্ট—মানস-কুয়াসা ভেদ করে তখনো সূর্যের প্রসন্ন দীপ্তি প্রকাশিত হয়নি। দশ বছর পরে লেখা 'আর্যগাথা' দ্বিতীয়ভাগ গ্রন্থে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর স্বক্ষেত্র আবিষ্কার করেছেন। 'আর্যগাথা' দ্বিতীয় ভাগ যৌবন স্বপ্নের কাব্য। দ্বিজেন্দ্রলালের গীতিপ্রতিভা এখানে সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠেছে। কবি প্রথম কবিতাটিতেই তাঁর প্রণয়-বিহ্বল, সুখাবেশতন্দ্রিত মানস-লোকের ইঙ্গিত দিয়েছেন :

আজ যেন রে প্রাণের মতন কাহারে বেসেছি ভালো ;
উঠেছে আজ মলয় বাতাস, ফুটেছে আজ মধুর আলো।

দ্বিজেন্দ্রলালের কবি প্রতিভার বিশুদ্ধ গীতিমিতা আলোচ্য কাব্যে নিঃসংশয়িত হয়ে উঠেছে। প্রথম প্রেমের-উচ্ছ্বসিত আবেগ এই কাব্যে বর্ণাঢ্য হয়ে উঠেছে। 'আর্যগাথার' মূল সুর প্রেম ও নারীসৌন্দর্য। 'আর্যগাথায়' দ্বিজেন্দ্রলালের অনেকগুলি প্রথম শ্রেণীর প্রেম সংগীত সংকলিত হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে সমস্ত কবিতাকে কবিতাই বলেছেন, গান বলেননি, তাদের মূল্য কম নয়। যদিও এই সব কবিতায় "স্বত-উচ্ছ্বসিত সঙ্গ-উৎসারিত আবেগ" নেই, তবুও এদের চিত্রধর্মিতা ও ভাস্কর্যধর্মিতার মূল্য কম নয় :

ছিল বসি সে কুসুমকাননে ;
আর অমল অরুণ উজল আভা
ভাসিতেছিল সে আননে।
ছিল এলায়ে সে কেশরাশি (ছায়াময় হে)
ছিল ললাটে দিবা আলোক, শান্তি,
অতুল গরিমা ভাসি ;

তার কপোলে সরম, নয়নে প্রণয়,
অধরে মধুর হাসি।

এখানে সংগীতের তরল-মূর্ছনা নেই বটে, কিন্তু এই মূর্তি যে নিপুণ ভাস্করের রচনা, তাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। 'আর্যগাথার' 'লিউ' অংশে ইংলিশ, আইরিশ ও স্কচ গানের অনুবাদ সংকলিত হয়েছে। কবি ও গীতিকার দ্বিজেন্দ্রলাল এখানে মিলিত হয়েছেন। বিদেশী কবিতার রূপ ও রস বাংলা ভাষার সাজে তিনি কত সহজে ও অবলীলাক্রমে সাজিয়েছেন, ভাবলে বিস্মিত হতে হয়।

দ্বিজেন্দ্রলালের কবি জীবনের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে দুটি ধারা লক্ষ্য করা যায়—একটি অতি সূক্ষ্ম গীতিধর্মিতা, অপরটি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ রূপায়ণের গদ্যাত্মক কাব্যধারা। 'আষাঢ়ে' কাব্য রচনার আগেই বিদ্রূপাত্মক নক্সা 'একঘরে' প্রকাশিত হয়। দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যঙ্গকাব্য 'আষাঢ়ে' ও 'হাসির গান' এবং তাঁর প্রথম চারখানি প্রহসন কাছাকাছি সময়ের রচনা। 'আষাঢ়ে' কাব্যের মধ্যে যে ব্যঙ্গ বিদ্রূপাত্মক কাব্যধারা অসীমান্ত ভঙ্গিতে অভিব্যক্ত হয়েছে, 'হাসির গান'-এ তাই পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছে। দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন নির্ভীক, তেজস্বী, মার্জিত রুচি ও অকপট দেশভক্ত। এই কাব্যের ভাষা ও ছন্দও বিষয়ানুসারী। কবি এ বিষয় সচেতন ছিলেন। তিনি ভূমিকায় বলেছেন: "এ কবিতাগুলির ভাষা অতীব অসংযত ও ছন্দোবন্ধ অতীব শিথিল। ইহাকে সমিল গদ্য নামে অভিহিত করাই সঙ্গত। কিন্তু, যেরূপ বিষয়, সেইরূপ ভাষা হওয়া বিধেয় মনে করি।" দ্বিজেন্দ্রলালের অভিনব কাব্যরীতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: "উত্তপ্ত লৌহচক্রে হাতুড়ি পড়িতে থাকিলে যেমন স্ফুলিঙ্গবৃষ্টি হইতে থাকে তাঁহার ছন্দের প্রত্যেক ঝোঁকের মুখে তেমনি করিয়া মিল বর্ষণ হইয়াছে। সেই মিলগুলি বন্দুকের ক্যাপের মতো আকস্মিক হাস্যোদ্দীপনায় পরিপূর্ণ। ছন্দের কঠিনতাও যে কবিকে দমাইতে পারে না, তাহারও অনেক উদাহরণ আছে।"

'আষাঢ়ে' বিদ্রূপ-কৌতুকের প্রথম জলোচ্ছ্বাস—প্রথম বর্ষার আকস্মিক যৌবন সঞ্চারের একটি প্রগল্‌ভ ও দুর্বিনীত আবেগ, তাই অসম পদক্ষেপের স্খলনচিহ্নও সেখানে অনুপস্থিত নয়। 'হাসির গান' কবির বিভিন্ন বয়সের সংগীত-সংকলন—বিষয়বৈচিত্র্যে ও রস-বৈচিত্র্যে রচয়িতার অনন্য সাধারণ শক্তিমত্তার পরিচয় বহন করে। 'হাসির গান'-এর কোনো কোনো রচনায় যৌবনের উচ্ছলতার সঙ্গে প্রৌঢ়ত্বের স্থিরবুদ্ধির সমন্বয় ঘটেছে। নির্মল বিদ্রূপই হাসির গানের মূল সুর নয়। সরস ও প্রাণখোলা হাসির মধ্যে ব্যক্তি দ্বিজেন্দ্রলালেরও অন্তরঙ্গ রূপের পরিচয় পাওয়া যায়:

কেন চটাচটি আর রেষারেষি,
আর গালাগালি আর দেষাদেষী?
কর হাসাহাসি, ভালবাসাবাসি,
আর বসে, গোঁকে দাও তা,—

॥ ৩ ॥

'মন্ত্র' কাব্যে দ্বিজেন্দ্রপ্রতিভার বিশিষ্ট শক্তি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। ভাবপ্রকাশ ও কবিতার বহিরঙ্গ, দুদিক থেকেই কবি একটি সুনির্দিষ্ট পরিণামের মধ্যলগ্নে এসে দাঁড়িয়েছেন। দ্বিজেন্দ্র কবিপ্রতিভার যে দ্বিমুখী সত্তা 'আর্যগাথা' ও 'আষাঢ়ে' -র মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল, 'মন্ত্র' কাব্যে তারই একটি সমন্বিত রীতি লক্ষণীয়। রোমান্টিক গীতিপ্রবণ চিত্তের সহজ ও স্বচ্ছন্দ প্রবাহের সঙ্গে একটি বিচার বুদ্ধি প্রখর ভাবাবেগ-নির্মুক্ত মনের পরিচয় ঘটেছে। দুটি আপাত বিরোধী কবি-চেতনা ও কাব্যরূপ মিলিত হয়ে 'মন্ত্র' কাব্যের ভাবভূমিকে স্বাতন্ত্র্য-সমুজ্জ্বল করে তুলেছে। এই কাব্য-প্রকাশের কিছু-দধিক এক বছর পরে দ্বিজেন্দ্রলালের স্ত্রী বিয়োগ হয়। 'মন্ত্র' কাব্যের সর্বপ্রথম ভাবের সঙ্গে ভাবনা যুক্ত হয়েছে—চিন্তা-হীন উচ্ছলতা গভীরাশ্রয়ী ভাবনার ইস্পাত-কঠিন বন্ধনে কেন্দ্র-সংহত ও ভাবগভীর হয়েছে। মহৎ ও তুচ্ছ, লৌকিক ও

অলৌকিক ভাবনার মিশ্রণে এই কাব্যের কতকগুলি কবিতা দ্বিজেন্দ্রলালের মানসিক স্বাতন্ত্র্যকে সুপ্রতিষ্ঠ করেছে। রবীন্দ্রনাথ 'মন্ত্র' সম্পর্কে যথার্থই বলেছেন, 'ইহা নূতনভাবে ঝলমল করিতেছে এবং এই কাব্যে যে ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা অবলীলাকৃত ও তাহার মধ্যে একটি অবাধ সাহস বিরাজ করিতেছে। সে সাহস কি শব্দ নির্বাচনে, কি ছন্দোরচনায়, কি ভাববিন্যাসে সর্বত্র অক্ষুণ্ণ।" 'মন্ত্র' কাব্যের গাম্ভীর্য প্রেম ও বাৎসল্য রসের কবিতাগুলি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

'মন্ত্র' কাব্যের পরে 'আলেখ্য' ও 'ত্রিবেণী'—কাব্যদ্বয় রচিত হয়। 'মন্ত্র' কাব্যের দ্বিজেন্দ্রকাব্যের মধ্যাহ্ন দীপ্তির অবসান ঘটেছে– অপরাহ্নের ছায়া পক্ষ বিস্তার করেছে। 'আলেখ্য' কাব্যের স্ত্রী-বিয়োগ ও বাৎসল্যরসের কবিতাগুলি দ্বিজেন্দ্রকাব্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এখানে ব্যঙ্গ করতে গিয়ে নিজেও বেদনাহত হন :

ব্যঙ্গ-কবি আমি ! —ব্যঙ্গ কবি শুধু !
নিন্দা করি শুধু সকলে !
কভু না ! আসলে ভক্তি করি আমি
ঘৃণা করি শুধু নকলে।

'সত্যযুগ' কবিতায় কবি আধ্যাত্মিকতা-নির্মুক্ত দৃষ্টিতে মানবের অপরাজিত অগ্রগতিকে দেখেছেন। 'ত্রিবেণী' কাব্যে লঘুচিত্ত পরিহাস ও প্রেম বিদ্রূপের ভ্রূভঙ্গি নেই বললেই হয়। ত্রিবেণীর সুর প্রশান্ত-গভীরই নয়, গম্ভীরও বটে। এই কাব্যের 'দশপদী' কবিতাগুলি আঙ্গিক ও ভাবসৌকর্যের দিকে দ্বিজেন্দ্রলালের সার্থক সৃষ্টি।

স্ত্রী-বিয়োগের পর (১৯০৩) থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত (১৯১৩) এই দশ বছরকে প্রধানত দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্য-সাধনার যুগ বলা যায়। গিরিশচন্দ্রের যুগেও তিনি তাঁর স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন : পুরাণাশ্রিত নাটকগুলিতে তিনি গিরিশচন্দ্রের ভক্তি, বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিকতার পথে না গিয়ে একবুদ্ধিদীপ্ত যুক্তিবাদী দৃষ্টির অবতারণা করেছেন। ঐতিহাসিক নাটক রচনায় নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের শক্তি সর্বাধিক প্রকাশিত হয়েছে। বর্ণদীপ্ত পটভূমিকা, আবেগদীপ্ত সংলাপ ও তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব চিত্রণ তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলিকে জীবন্ত করে তুলেছে। পাশ্চাত্য নাটকের সঙ্গে গভীর পরিচয়ের ফলে তিনি লেখনীয়রীয় টেক্‌নিককে বাংলা নাটকে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছেন। কবি-সমালোচক মোহিতলালের ভাষায় :

"দ্বিজেন্দ্রলাল ভাবকে কেবল রসচর্চার বিষয় না করিয়া—ভাবের জীবনোচ্ছল সুলভ রূপ দেখাইবার জন্য, অতঃপর নাটক রচনায় মনোনিবেশ করিলেন এবং তাহার দ্বারা বাংলা রঙ্গমঞ্চের নাট্যাদর্শ—তাহার একদিকের দুর্নীতি-বহুল রসলালসের স্রোত এবং অপর দিকে সেই জীবনারেগবর্জিত অধ্যাত্মীয় উক্তি বিহ্বলতা ও পাপপুণ্য সংসারের তামসিক আদর্শ সংশোধন করিতে অগ্রসর হইলেন।"

সাহিত্যিক দ্বিজেন্দ্রলালের প্রধান দান তিনটি—প্রথমত, আপাত বিরোধী ভাবের মিশ্রণজাত কাব্য ও অভিনব কাব্য-রীতি, দ্বিতীয়ত, হাসির গান, তৃতীয়ত, অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্ব সমন্বিত নাটক। এ ছাড়াও সুরকার ও গীতিকার দ্বিজেন্দ্রলালের অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য আজ সর্বজনস্বীকৃত। স্বল্পস্থায়ী জীবনের মধ্যে তিনি কী অসামান্য সম্পদ রেখেছেন, তা ভাবলে অবাক হতে হয়। দ্বিজেন্দ্রলালের সৌরুষ দীপ্ত স্বাতন্ত্র্য-সমুজ্জ্বল প্রতিভাকে মর্যাদার আসন দিয়ে নিজেদেরই লাভবান করতে হবে।

ফিলিপ্‌স উৎসবের আনন্দ বাড়ায়

ফিলিপ্‌স

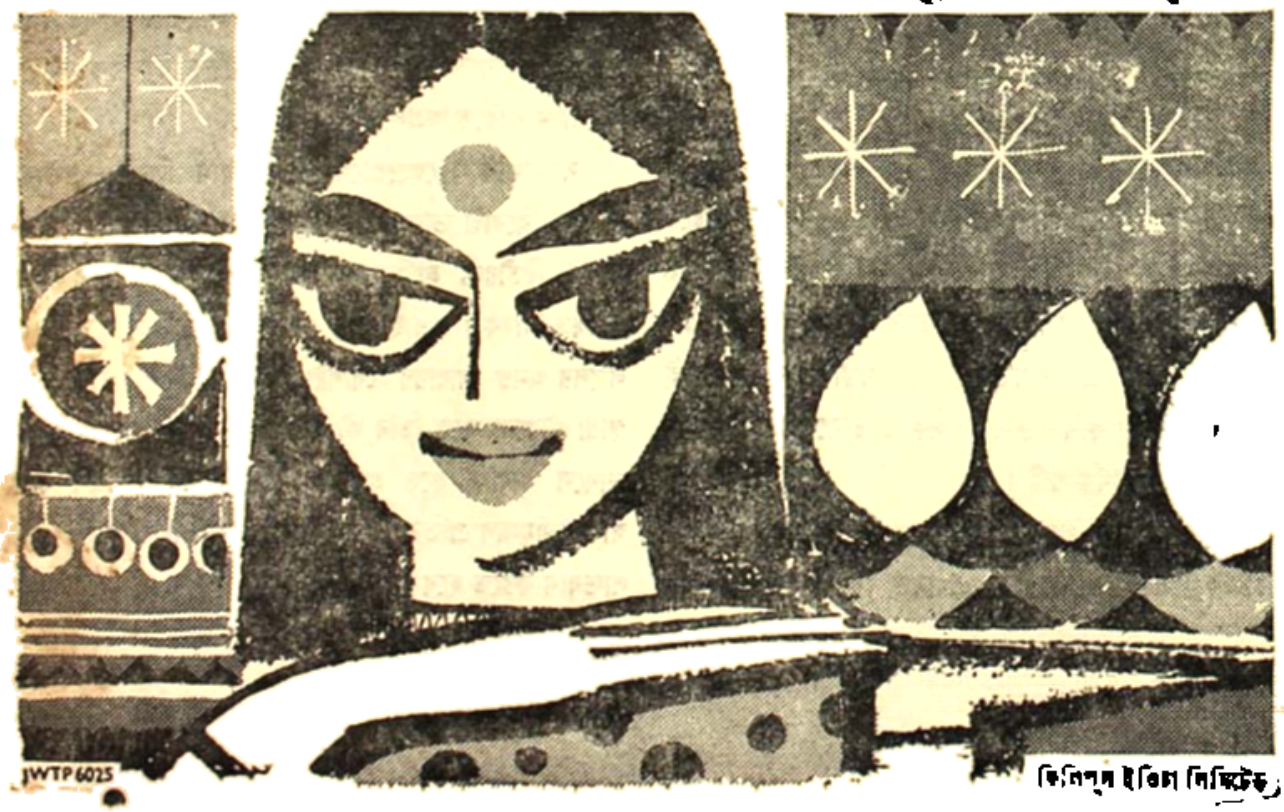

ফিলিপ্‌স ইণ্ডিয়া লিমিটেড

ভারতের গ্রামজীবনে সমতা ও বৈচিত্র্য

নির্মল কুমার বসু

বিশাল দেশ আমাদের এই ভারতবর্ষ। বৈচিত্র্যের অবধি নাই এখানে। প্রাকৃতিক-ভৌগোলিক বৈচিত্র্য, জাতি-ধর্ম-ভাষার বৈচিত্র্য, আচার-অনুষ্ঠানের বৈচিত্র্য,—এত বিচিত্রতার সংখ্যা কে নির্ণয় করে! বিশালতা ও বৈচিত্র্যের গৌরবে ভারতবর্ষ উপ-মহাদেশের মর্যাদার অধিকারী। এদেশ সম্বন্ধে কবির স্বতঃস্ফূর্ত উক্তি—সত্য সেদুকাস, কী বিচিত্র এ দেশ!

তবু এই বহুবৈচিত্র্য নাকি এক মহান ঐক্যে বিধৃত—সূত্রে মণিগণা ইব। তাই কবিকণ্ঠে ধ্বনিত হয়—

নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান,
বিবিধের মাঝে হের মিলন মহান।

বিশ্বকবির স্বচ্ছদৃষ্টিতে এদেশ মহামানবের সাগরতীর—unity in diversity-র মনোহরণ মূর্তি।

কিন্তু ইহাও অতিমাত্র বিচিত্র যে, সদ্য স্বাধীনতা লাভের পর এই বৈচিত্র্যমালার যোগ-সূত্রটি যেন বার বারই ছিঁড়ি-ছিঁড়ি করিতেছে, আর গুণি-জ্ঞানী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা গ্রন্থি-বন্ধনে উহাকে দৃঢ় করিবার জন্য হিমসিম খাইতেছেন। সাম্প্রদায়িক অনৈক্য, ভাষার কলহ, রাজ্য-সীমানার দ্বন্দ্ব এবং এবম্বিধ আরও নানা বিভেদ নিতান্ত বি-সদৃশ রূপ ধারণ করিয়া জাতির কর্ণ-ধারণগণকে যেন আতঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে। কেহ কেহ ভাবিতে সুরু করিয়াছেন, পণ্ডিতগণ ভারতীয় ঐক্যের যে অপরূপ রূপকীর্তন করিয়া আসিতেছেন তাহা কি যথার্থ; কাহারো মনে সংশয় লাগিয়াছে, ভারত 'এক ফুলভাবের দ্বারা বদ্ধ'- মহামনীষী রবীন্দ্রনাথের এই বিচার সত্য কি; কেহ বা বোধ করিতেছেন, ভারতের ঐক্যটা মেকি, অনৈক্যই ইহার প্রকৃতি-সিদ্ধ; দেশটা আসলে কতকগুলি বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক অঞ্চলের সমষ্টি মাত্র, ঐক্যধারা তাহাদের মধ্যে স্বতঃ প্রবাহিত নয়। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, ভারতের মর্মমূলে ঐক্য নাই, ঐক্য রাজনৈতিক গরজে বাহির হইতে আরোপিত।

একদিকে সংশয়, অন্যদিকে চির-স্বীকৃতি—এই হাঁ এবং না-এর দ্বন্দ্বে পণ্ডিত-অপণ্ডিত সকলেই যেন দোলায়িত-চিত্ত—বিক্ষুব্ধ। নতুন করিয়া বাস্তবের নিকষ-পাষাণে ভারতীয় ঐক্যের যাচাই আর একবার করিতে পারিলে তবেই বুঝি এই দ্বন্দ্বের নিরসন হইতে পারে। তবেই প্রত্যয়লাভ প্রেরণা লাভ করিয়া নিঃসংশয়ে জাতিকে সত্যপথে পরিচালনা করা যায়, সত্যকর্মে সার্থক করিয়া তোলা যায়।

এই বাস্তবের কষ্টিপাথরে পরীক্ষার পথে প্রথম পদক্ষেপ করিয়াছেন নিখিল ভারত নৃতত্ত্ব বিভাগ। মহাকালের গ্রাস হইতে প্রাচীন বৈষয়িক সংস্কৃতির যে-টুকু রক্ষা পাইয়াছে তাহারই পরিচয় গ্রহণে তৎপর হইয়া বিভাগীয় অনুসন্ধানীরা যে তথ্যাবলী সংগ্রহ করিতেছেন, তাহাই আমাদের অবলম্বন। বিবিধের মাঝে মহান মিলনের কোনো ইংগিত এই তথ্যরাজি বহন করে কিনা; ভাবের ঐক্যটি বৈষয়িক সংস্কৃতির ঐক্যের দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কিনা তাহা একবার দেখিয়া লওয়া আজ বড়ই প্রয়োজন।

ভারতের গ্রাম-জীবনে যুক্তবার পশ্চিমের অকৃত্ত উপহারে

আজও স্বপাকার ধারণ করিয়া উহার আমূল পরিবর্তন ঘটায় নাই। সেদিক হইতে গ্রামের চাষীজীবনকে এখনও কতকটা 'অপাপবিদ্ধ' বলা যায়। এই অবস্থায় সেখানে অতীত ঐতিহ্যের ধারা ক্ষীণ হইয়া আসিলেও একেবারে বিলুপ্ত নিশ্চিহ্ন হয় নাই। তাই নৃতত্ত্ব-বিভাগের কর্মীরা গ্রাম-জীবনেই ভারতীয় বৈষয়িক সংস্কৃতির প্রকৃতি সন্ধান করিতেছেন। তাঁহাদের এই অনুসন্ধানের ফল 'ভারতের গ্রাম-জীবন' নামক পুস্তকে সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে ভারতীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান সম্বন্ধে সংগৃহীত তথ্যাদি ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

নিঃসংশয়ে বলা যায়, এই সব উপাদানের মধ্যে মানব-জীবনে খাদ্যের গুরুত্ব সর্বাধিক। তাই ভারতীয় গ্রামবাসীর খাদ্যরীতির পরিচয়ই প্রথমে গ্রহণীয়। উপকরণের দিক হইতে, ভারতবাসীর খাদ্য চাল ও গম এবং চিনা জাতীয় ক্ষুদ্রশস্যের আস্তানা বা গুঁড়া হইতে প্রস্তুত। এইদিক দিয়া ভারতবাসীর খাদ্য প্রকৃতি-নির্ভর। কিন্তু প্রস্তুত-প্রণালীর দিক হইতে ইহা প্রাচীন ঐতিহ্য বা রীতির অনুসারী। এই দিক হইতে ভারতীয় খাদ্য সিদ্ধ, সেঁকা ও ভাজা এই তিন প্রকারের। প্রকৃতি ও প্রস্তুত-প্রণালী—এই দুইটি প্রভাব ভারতীয় খাদ্য ও খাদ্যরীতিকে প্রভাবিত করিয়াছে। অনুসারে উত্তর, পশ্চিম ও মধ্যভারতে গম-চিনার গুঁড়া হইতে প্রস্তুত 'সেঁকা শুধা রুটির' প্রচলন।

কিন্তু আসাম-বাংলা-বিহার হইতে পূর্ব-উপকূল অনুসরণ করিয়া কন্যাকুমারী পর্যন্ত এবং কন্যাকুমারী হইতে পশ্চিম উপকূল ধরিয়া প্রায় গুজরাত পর্যন্ত সিদ্ধখাদ্যের প্রাধান্য। ইহার মধ্যে আসাম-বাংলা-ওড়িশা-অন্ধ্র-মাদ্রাজ ও কেরলের প্রধান খাদ্য আতপচাল-সিদ্ধ 'ভাত'। ছোট নাগপুর, ছত্রিশগড় জেলা এবং ওড়িশার কতকাংশে আতপচিনা-সিদ্ধও খাদ্য-রূপে ব্যবহৃত হয়। অন্ধ্র প্রদেশের গোদাবরী জেলা হইতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ভাতের সহিত সিদ্ধ ক্ষুদ্রশস্যও খাদ্যরূপে প্রচলিত।

এদিকে বাংলা-অন্ধ্র-মাদ্রাজে ভাতের সহিত গুঁড়াচালও ভাপে সিদ্ধ করিয়া খাদ্যরূপে গৃহীত হয়। আর মহীশূরের বৃহদংশে ও মধ্যপ্রদেশের একাংশে চিনা-সিদ্ধ ও চিনার রুটি দুই-ই প্রচলিত। এই অঞ্চলকে মিশ্র খাদ্যের দেশ বলা যায়।

অতএব, খাদ্যরীতির দিক হইতে ভারতকে মোটামুটি দুই বৃহৎ অঞ্চলে ভাগ করা চলে। পূর্বে গোরক্ষপুর ও পশ্চিমে হবদিনহরকে একটি রেখাদ্বারা যুক্ত করিলে ঐ রেখার পশ্চিমে সেঁকা যবের রুটির রাজ্য; আর পূর্বে সিদ্ধখাদ্যের রাজ্য। গোরক্ষপুর হইতে মসলিপত্তন পর্যন্ত আরেকটি রেখা টানিলে উহার পূর্বে পড়ে 'ভেতো' দেশ।

ভাজা খাদ্য কমবেশী প্রায় সকল অঞ্চলেই প্রচলিত। ধান ও চাল ভাজিয়া খৈ-মুড়ি তৈয়ার হয় এবং চলে বাংলা দেশে; ক্ষুদ্রশস্য ভাজিয়া খাওয়া হয় বিহার এবং উত্তর প্রদেশে।

ইহা ছাড়া, একদিকে আসাম-বাংলা-বিহার-উত্তরপ্রদেশ, অন্যদিকে গুজরাত, মহারাষ্ট্র হইতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত খাদ্যরূপে চিঁড়ার প্রচলন দেখা যায়।

ভারতে খাদ্যশস্য প্রধানতঃ কৃষিজাত। কৃষির প্রধান যন্ত্র লাঙল। ভারতে যে-কয় প্রকারের লাঙল প্রচলিত, গড়ন অনুসারে তাহাদের ক, খ, গ, ঘ—এই চারি শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে। ক-শ্রেণীর লাঙলের মুণ্ড ও দেহ অখণ্ড, এবং সমান্তরালভাবে বিস্তৃত। ঈষ ও হাতল পর পর দেহে খাঁজ কাটিয়া জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। পঞ্জাবে ইহার নাম হল, বাংলাদেশে—হাল। ইহার প্রচলন জম্মু-কাশ্মীর হিমাচল প্রদেশে সীমাবদ্ধ।

খ-শ্রেণীর লাঙলে দেহ ও হাতল অখণ্ড; দেহের নিম্ন-ভাগে সমকোণী বা স্থূলকোণী ভাবে মুণ্ডটি সংলগ্ন। পঞ্জাবে ইহার নাম—মুদ্দা। দক্ষিণ পঞ্জাব-রাজস্থান-গুজরাত-

সৌরাষ্ট্র-কচ্ছ-ব্রোচ পর্যন্ত দক্ষিণে এবং উত্তর প্রদেশ-মধ্যপ্রদেশ-মহারাষ্ট্রের একাংশ পর্যন্ত পূর্বে ইহা প্রচলিত। সংক্ষেপে ভারতের উত্তর পশ্চিম ভাগে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড জুড়িয়া খ-শ্রেণীর লাঙলের অধিপত্য।

গ-শ্রেণীর লাঙলেও দেহ মুণ্ড, অখণ্ড; কিন্তু মুণ্ড দেহের সহিত সমকোণী। হাথল দেহের সামনে বা পিছনে যুক্ত। ক, খ, ঘ-র রাজ্য বাদে প্রায় সমগ্র ভারতে এই গ-শ্রেণীর লাঙলই প্রচলিত। প্রায় সমস্ত দক্ষিণ ভারত এবং ওড়িশা-বিহারের মধ্য দিয়া হিমালয়ের কোল বা নেপালের প্রান্ত পর্যন্ত ইহার বিস্তার।

মাঝে কতকাংশে খ-ও-ঘ-শ্রেণীর লাঙল দেখিতে পাওয়া যায়। ঘ-শ্রেণীতে হাথল ও দেহ অখণ্ড; মুণ্ড দেহের সহিত যুক্ত। ঈষ বাদে গোটা লাঙলই একখণ্ড কাঠ দিয়া তৈয়ারি। পশ্চিম বঙ্গ-আসাম-ত্রিপুরা-মণিপুর এবং বিহার-ওড়িশা ও মধ্য-প্রদেশের একাংশে ইহার প্রচলন।

আরও দেখা যায়, পঞ্জাবে ক ও গ উভয় শ্রেণীর লাঙলেই চাষ হয়; উত্তর প্রদেশে আবার ক, গ, ঘ—এই তিন শ্রেণীর লাঙল প্রচলিত।

লাঙলের বেলাও ব্রোচ হইতে মতিহার পর্যন্ত একটি রেখা টানিলে তাহার দক্ষিণে দেখা যায়, গ-শ্রেণীর লাঙলের প্রচলন; আর ঐ রেখার উত্তরে খ শ্রেণীর ব্যবহার। এই যে দুই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে দুই শ্রেণীর লাঙলের ব্যবহার, তাহাতে বৈচিত্র্য ও ঐক্য কি একই সঙ্গে সূচিত হয় না? প্রত্যেক আঞ্চলিক সীমার মধ্যে আবার একাধিক রাজ্য ও ভাষা বর্তমান। কাজেই ভাষার পার্থক্য একই কৃষিযন্ত্র ও কৃষিরীতি প্রচলনে অন্তরায় হয় নাই। তদুপরি, এই দুই বৃহৎ অঞ্চলের মধ্যে এমন কয়েকটি ক্ষুদ্র অঞ্চলও আছে, যেখানে একাধিক শ্রেণীর লাঙল ব্যবহৃত হয়। ইহাতো সাংস্কৃতিক মিশ্রণেরই সাক্ষ্য বহন করে।

শস্য-উৎপাদনের প্রধান যন্ত্র লাঙলের গড়ন ও ব্যবহার-ক্ষেত্রের পরিচয় কিঞ্চিৎ পাওয়া গেল। এবার শস্যের খোসা ছাড়ানো ও শস্য-কোটার যন্ত্র ও রীতির সন্ধান করা যাক। উত্তর-পূর্বাঞ্চল ব্যতীত প্রায় সমগ্র ভারতেই শস্য কোটার জন্য উদূখল ও মুষলের বহুল প্রচলন। আর উত্তর-পূর্ব ভাগে অর্থাৎ বিহার-ওড়িশা-পশ্চিমবঙ্গ ও অধিকাংশ আসামে ঢেঁকির প্রচলন। কিন্তু ঢেঁকি ও উদূখল—দুই-ই নিবিরোধে সহাবস্থান করিতেছে বিহার, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা ও আসামের কয়েকটি জেলায়।

এখানে, দুইয়ের রাজ্যসীমা চিহ্নিত করে উত্তরে গণ্ডকনদী হইতে দক্ষিণে গোদাবরীর মোহানা পর্যন্ত একটি সরল রেখা। কাজেই দেখা যায়, লাঙলের আঞ্চলিক ভাগ ও শস্য-কোটার যন্ত্রের আঞ্চলিক সীমারেখা এক নয়। উদূখলের রাজ্য এখানে যে-কোনো শ্রেণীর লাঙলের রাজ্যের তুলনায় বিস্তৃত-তর। আরও লক্ষণীয় যে, উদূখল মুষলের বিস্তার উত্তর-দক্ষিণের ভৌগোলিক ভেদ এবং ভাষা ভেদ উভয়কেই অগ্রাহ্য করিয়াছে। প্রায় সমগ্রভারতে বৈষয়িক সংস্কৃতির একটি উপাদান যে এইরূপ অসপত্ন আধিপত্য করিতেছে ইহা কি ঐক্যের ইংগিত বহন করে না?

খাদ্য-প্রস্তুত-করণে তৈল সর্বক্ষেত্রে অপরিহার্য না হইলেও আবশ্যক। রন্ধনের আবশ্যক উপকরণ তৈলকে অবলম্বন করিয়াও গ্রামজীবনে প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারা চলিয়া আসিয়াছে। এবার তাই তৈল-ও তৈল-নিষ্কাশণ যন্ত্রের প্রকার ও ব্যবহার-রীতি লক্ষ্য করা প্রয়োজন। ভারতে সরিষা, তিল, তিসি ও নারিকেল তৈলের ব্যবহার বহুকাল হইতেই প্রচলিত। ঐসঙ্গে ঘৃতের ব্যবহারও সুপ্রাচীন কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু আধুনিক ও ইদানীন্তন কালে বাদাম তৈল ও বনস্পতির আবির্ভাবে পূর্ব-প্রচলিত তৈল ও ঘৃতের ব্যবহার লোপ পাইতে বসিয়াছে।

রাজস্থান ও পঞ্জাবেই প্রধানতঃ ঘৃত ব্যবহার হয়।

ছোটনাগপুরের কতকটি জেলা, ওড়িশার দক্ষিণাঞ্চল ও মধ্যপ্রদেশের পূর্বপ্রান্তে মহুয়ার তেল প্রচলিত। মহারাষ্ট্রের অংশবিশেষ, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্র ও মহীশূরের এক বিস্তৃত অংশে তিল ও তিসির তেলের ব্যবহার আজও দেখা যায়। বাংলার কোনো কোনো অঞ্চল ও কেরলে নারিকেল-তেল আজও প্রচলিত। কিন্তু আসাম-বাংলা-বিহার প্রধানতঃ সরিষার তৈলের দেশ। আর তিল-তৈলের রাজত্ব ছিল পশ্চিম ওড়িশা হইতে একদিকে গুজরাত-মহারাষ্ট্র এবং অন্যদিকে মাদ্রাজ পর্যন্ত। কিন্তু তেলের অভিযানের সম্মুখে এই অঞ্চল হইতে তিলতৈল ক্রমেই হটিয়া যাইতেছে।

কাজেই একেবারে হালের কথা বাদ দিলে, ভারতে সাধারণতঃ তিল ও সরিষার তৈল এবং ঘৃতেরই প্রাধান্য ছিল। তিনটি স্বতন্ত্র অঞ্চলে ইহারা স্ব স্ব আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। উত্তর-পশ্চিম ভারতে ঘৃতের, পঞ্জাব বাদে প্রায় সমস্ত উত্তর ভারতে সরিষার তৈলের এবং দক্ষিণ ও মধ্যভারতে মোটামুটি তিলতৈলের প্রাধান্য।

দিল্লী-পুরী, পুরী-আহমদাবাদ এবং আহমদাবাদ-দিল্লীকে তিনটি রেখাদ্বারা যুক্ত করিলে যথাক্রমে উহাদের পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিমে, সরিষার তৈল, তিলতৈল ও ঘৃতের প্রায় একচ্ছত্র অধিকার। আর, ত্রিভুজের অন্তর্বর্তী ভূভাগে বিবিধ তৈলের ব্যবহার প্রচলিত।

তৈল ব্যবহার-রীতির আঞ্চলিক ভাগের সহিত তৈল-নিষ্কাশন যন্ত্র-ব্যবহারের আঞ্চলিকতার অংশতঃ মিল দেখা যায়। শক্তিচালিত আধুনিক তেলের কল এখন পুরাতন যন্ত্রের স্থান অনেকাংশে অধিকার করিয়াছে। তবু যে-সব পুরাতন যন্ত্র কিছুদিন পূর্বেও প্রচলিত ছিল এবং এখনো আছে, সন্ধান লইয়া দেখা গিয়াছে, ইহাদের মধ্যে ঘানিই গ্রাম-ভারতের একটি প্রধান অবলম্বন। ঘানি আবার দুই রকমের—একটিতে তৈল নির্গমনের জন্য নালী আছে, অন্যটাতে নাই। প্রথমটির নাম ঘানি, আর দ্বিতীয়টিকে কখনো বলা হয় 'ঘনা' বা 'ঘনাগাছ'। মোটামুটি অঞ্চল বিভাগ করিলে দেখা যায়, উত্তর ভারত 'ঘানি'র রাজ্য এবং দক্ষিণ ভারত 'ঘনা'র দেশ। সরিষার তৈল যে-অঞ্চলে প্রচলিত ঘানিও প্রায় সেই অঞ্চলেই দেখা যায়। কিন্তু মধ্যপ্রদেশ, মহীশূর ও কেরলের একাংশেও ঘানি প্রচলিত। আর, মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমা হইতে দক্ষিণে একেবারে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ঘনার একচ্ছত্র এক্তিয়ার। আবার কন্যাকুমারী হইতে কেরল বাদে মহারাষ্ট্র, গুজরাত ও রাজস্থান পর্যন্তও প্রধানতঃ ঘনারই রাজত্ব।

পশ্চিমে বিকানীর হইতে পূর্বে ওয়লটেয়ার পর্যন্ত রেখা টানিলে উহার উত্তরে পড়ে ঘানির রাজ্য ও দক্ষিণে ঘনার দেশ।

কথায় বলে চাষ-বাস। চাষের দিক প্রধান চাষ-যন্ত্রের বিষয় আলোচিত হইয়াছে, এবার বাস-বিন্যাসের দিকে নজর দিতে হয়। তাই ঘর-বাড়ি ও গ্রামের আকার-প্রকার ও রচনা-রীতির বৈশিষ্ট্য আলোচ্য।

খাদ্যশস্যের মত ঘরের গড়নও জলবায়ুর দ্বারা প্রভাবিত। এই প্রভাবের কথা স্মরণে রাখিয়া গ্রামে যে বিচিত্র ধরণের ঘর দেখা যায় তাহাদের মূলভাবে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়:

এক, আয়তক্ষেত্রাকার আসনের উপর উহার সমান্তরাল চালের ঘর;

দুই, অনুরূপ আসনের উপর ঢালু চালের ঘর;

তিন, বৃত্তাকার আসনের উপর শংকু বা চৌপর-সদৃশ চালের ঘর।

ইহাদের মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর ঘরই ভারতের প্রায় সর্বত্র দেখা যায়। বৃষ্টি-প্রধান অঞ্চলে এজাতীয় ঘর বিশেষ উপযোগী। যে-সব স্থানে বৃষ্টিপাত অল্প অর্থাৎ ৩০ ইঞ্চির কম সেখানে আসনের সমান্তরাল চালের ঘরই প্রচলিত। তাই উত্তর ভারতে কাশ্মীর-পাঞ্জাব-উত্তরপ্রদেশ-রাজস্থান-মধ্যপ্রদেশ

ও মহারাষ্ট্রের অংশবিশেষে এই প্রথম শ্রেণীর ঘর দেখা যায়। আর দেখা যায়, দক্ষিণ ভারতে মহীশূরের ১২টি জেলায় এবং অন্ধ্রপ্রদেশের ৯টি জেলায়। তৃতীয় শ্রেণীর ঘর ভারতে বিরল; দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের গুটিকয়েক জাতি বা উপজাতিই এ ধরণের ঘর তৈয়ার করিয়া থাকে।

কাজেই বলা যায়, চালু চালের ঘরই পল্লী-ভারতের বৈশিষ্ট্য। তবে ঐ ঘর দোচালা, চৌচালা হইতে পারে। আবার, বাড়িতে গৃহ-বিন্যাসেরও রকমারি থাকিতে পারে। কোথাও ঘরগুলি একক স্বতন্ত্র; কোথাও গুচ্ছাকার আবার কোথাও একটি মধ্যবর্তী আঙিনার চারিধারে সজ্জিত থাকিতে পারে। আঙিনা সম্মুখে বা পশ্চাতে রাখিয়াও ঘরগুলি রচিত হইয়াছে, এমনও দেখা যায়।

এবার ভারতের গ্রামগুলির 'দৈহিক গঠন' ও রচনারীতি অনুধাবন করিবার চেষ্টা করা যাক! ভারতে গ্রামের সংখ্যা সাড়ে পাঁচ লক্ষেরও বেশী। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি-নিতান্ত ক্ষুদ্রাকার, কখনো বসতি-বিহীন। কতকগুলি আবার বৃহৎ; বৃহৎগ্রামে জনসংখ্যা কোথাও ১০ হাজারেরও উর্ধ্বে।

এইসব গ্রামের দিকে তাকাইলে প্রথমে মোটামুটি দুইটি গঠনগত বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে:

(১) গ্রামের প্রত্যেকটি বাড়ি যেন স্বৈপায়ন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেছে—এমনি বিচ্ছিন্ন তাহাদের অবস্থান। আবার, (২) বহুতর গ্রামে কয়েকটি বাড়ি একত্র হইয়া যেন একটি গুচ্ছ রচনা করিয়াছে।

এই দ্বিতীয় শ্রেণীর অর্থাৎ গুচ্ছকার বাড়িগুলির বিন্যাস আবার দ্বিবিধ:

(ক) কোনো গ্রামে ইহারা সরলরেখায় দণ্ডায়মান;

(খ) কোথাও আবার গুচ্ছগুলি শৃংখলাহীনভাবে অবস্থিত। তাই বাড়িগুলির ধার দিয়া যে পথ গিয়াছে তাহা এখানে আঁকাবাঁকা।

সরলরেখা-বদ্ধ বাড়িগুলির বিন্যাস আবার দুই রকম:

(ক ১) একটিমাত্র সরলপথের দুইধারে সমান্তরাল রেখায় সারবন্দী, অথবা (ক ২) সম্মুখে একটি উন্মুক্ত চত্বর বা প্রাঙ্গন রাখিয়া দণ্ডায়মান;

(ক ৩) কোনো গ্রামে বাড়িগুলি আবার একটি বর্গক্ষেত্র বা আয়তক্ষেত্র রচনা করিয়া অবস্থিত।

ইহাদের মধ্যে ১-শ্রেণীর গ্রামগুলি বিক্ষিপ্তভাবে ভারতের কয়েকটি অঞ্চলে অবস্থিত। পশ্চিম বাংলায়, সাতারা হইতে কেরল পর্যন্ত পশ্চিমঘাট অঞ্চলে এবং কাশ্মীর ও উত্তর প্রদেশের পার্বত্য প্রদেশে উহারা অন্যবিধ গ্রামের সহিত সহাবস্থান করিতেছে। আর, অবিমিশ্র অবস্থায় এজাতীয় গ্রামের সাক্ষাৎ পাই উত্তর প্রদেশের পূর্বভাগে ও বিহারে। বস্তুতঃ ভারতের বুকে ইহাদের সংখ্যা নগণ্য, বিস্তার সংকীর্ণ।

বাকী তিন শ্রেণীর গ্রামের আঞ্চলিক বিভাগ সুস্পষ্ট সন্নিহিত। এই আঞ্চলিক বিভাগের পশ্চাতে ভৌগলিক কারণ না থাকাই সম্ভব; যেহেতু, ইহারা যে-যে ভূভাগ অধিকার করিয়া আছে, তাহাদের জলবায়ু ভূ-প্রকৃতি ও কৃষি-কর্মে যথেষ্ট ব্যবধান রহিয়াছে। কাজেই ঐসব গ্রামের আঞ্চলিকতার উপর ভূগোল বা কৃষির চেয়ে প্রথা এবং ঐতিহ্যের প্রভাবই বেশী বলিয়া মনে হয়।

(খ)-শ্রেণীর অর্থাৎ শৃঙ্খলাহীন গুচ্ছাকার বাড়ি লইয়া যে-সব গ্রাম তাহাদের অবস্থিতি প্রায় সমস্ত গাঙ্গেয় উপকূলে, এবং রাজস্থান-মালব-মহারাষ্ট্রের অনেকাংশে। বীজাপুর-পুণিয়ার যোগ রেখার পশ্চিমে (খ)-শ্রেণীর গ্রামের প্রায় একচেটিয়া অধিকার: উহার পূর্বভাগে প্রধানতঃ (ক)-শ্রেণীর গ্রামের প্রাধান্য। এই বিশাল ভূভাগের দক্ষিণাঞ্চলে (ক ৩)-শ্রেণীর অর্থাৎ বর্গক্ষেত্রাকারে সজ্জিত গৃহ-বিশিষ্ট গ্রামের রাজত্ব।

এখানেও দেখা যায়, (ক)-শ্রেণীর গ্রামগুলি যে বিস্তীর্ণ অঞ্চল অধিকার করিয়া অবস্থিত, তাহারই দক্ষিণাংশে তেলেগু-তামিল-কানাড়ীভাষী, রাজ্যসমূহ এবং উত্তরে উড়িষ্যা-

পশ্চিমবঙ্গ-গুজরাত-বিহার প্রভৃতি ভারতীয় আর্যভাষাভাষী রাজ্যসমূহ অবস্থিত। এতদ্ব্যতীত বিহারের উপজাতি-প্রধান সাঁওতাল পরগণাও এই অঞ্চলেরই অন্তর্ভুক্ত এই সাঁওতাল পরগণার ভাষাগোষ্ঠীও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অতএব, মনে হয়, ভাষার আঞ্চলিক বিভাগ অথবা স্বাধীনতা লাভের পরে পুনর্নির্দিষ্ট রাজ্য বিভাগের সহিত রেখাবদ্ধ গৃহ-বিশিষ্ট গ্রামের আঞ্চলিক বিভাগের সামান্য সম্পর্কও নাই।

খাদ্য, গৃহ ও গ্রামের পরে মানব-জীবনে পরিধেয়েরই গুরুত্ব। তাই এবার গ্রামবাসীদের পরিধেয় ও পরিধান-রীতির পরিচয় গ্রহণ করা প্রয়োজন। গ্রামে পুরুষ ও স্ত্রীজাতির পরিধেয় ও পরিধান-রীতিতে যেমন বৈ-সাদৃশ্য আছে, তেমনি কিঞ্চিৎ সাদৃশ্যও বর্তমান। উভয়ের মধ্যেই সেলাই-করা ও সেলাই-না-করা পরিচ্ছদের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন পায়জামা-সালওয়ার, কামিজ-কোর্তা জাতীয় সেলাই-করা পোষাক স্ত্রী-পুরুষে পরিয়া থাকে তেমনি আস্ত কাপড়—শাড়ী-ধুতিও পরে।

নিম্নাঙ্গের পরিধেয়ই এখানে আলোচিত হইতেছে। পুরুষের নিম্নাঙ্গের পরিধেয় হইল প্রধানতঃ ধুতি বা পায়জামা। পায়জামার প্রচলন ভারতের দুটি বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে—উত্তর ও পশ্চিমপ্রান্তে। উত্তরে—জম্মু-কাশ্মীর-হিমাচল প্রদেশে, পাঞ্জাবের কাংড়া-লুধিয়ানা-পাতিয়ালায়, উত্তরপ্রদেশের উত্তর ভাগে; পশ্চিমে—গুজরাতের সৌরাষ্ট্র ও কচ্ছে।

ওদিকে ধুতির ব্যবহার ভারতের প্রায় সর্বত্র। কিন্তু পরিধান-রীতি ভেদে ইহার সুস্পষ্ট আঞ্চলিক বিভাগ দেখা যায়। কাছা না দিয়া ধুতি পরার রীতি একান্ত দক্ষিণে—কেরল ও দক্ষিণ মাদ্রাজে। এই পরিধেয়কে 'বেষ্টি' বা মুণ্ডু বলে। আবার বহু রাজ্য ডিঙাইয়া এই মুণ্ডি পরার রীতির সাক্ষাৎ পাই উত্তরে পঞ্জাবে ও পূর্বে মিজো পাহাড়ে। এরূপ প্রক্ষেপের তাৎপর্য বিশেষ অনুসন্ধানের বিষয়।

পায়জামা ও লুঙ্গির রাজ্য বাদ দিয়া ভারতের বিশাল ভূ-খণ্ডে একচ্ছত্র আধিপত্য করিয়া ধুতি পরা রীতির। এই যে জলবায়ু ও ভাষার প্রভেদ এবং উত্তর-দক্ষিণের ভৌগোলিক ব্যবধান অগ্রাহ্য করিয়া একটি সাংস্কৃতিক উপাদান প্রায় সমগ্র ভারতে একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, ইহা দ্বারা কি ঐক্য সূচিত হয় নাই?

স্ত্রীজাতির পরিধানের মধ্যেও সেলাই-না-করা পরিধেয়েরই প্রাধান্য। গোরক্ষপুর ও নাসিকের যোগ রেখার পূর্বে সেলাই-না-করা পরিচ্ছদের রাজ্য; উহার পশ্চিমে সেলাই-করা ঘাগরা ও পায়জামার প্রাধান্য। অবশ্য দক্ষিণে কেরলে ও পূর্বে আসাম-মণিপুরে সেলাই-না-করা একাধিক বস্ত্র পরিধেয়রূপে ব্যবহৃত হয়। ঘাগরার দেশের পূর্বভাগে কতকাংশে ঘাগরার পাশে পায়জামাও স্থান করিয়া লইয়াছে, পরস্পরকে উচ্ছেদ করিবার কোনও লক্ষণই আজও দেখা যায় না।

মেয়েদের মধ্যে কাছাদিয়া শাড়ী পরার রীতিও প্রচলিত আছে। এই রীতি প্রধানতঃ দক্ষিণ ভারত ও দ্বীপ ভারতের একাংশেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু বিচিত্র ব্যাপার এই যে, ভারতের যে-অঞ্চলে মেয়েরা কাছা দিয়া শাড়ী পরে তাহারই একাংশে পুরুষেরা 'মুক্ত-কচ্ছ' অর্থাৎ 'বেষ্টি' পরিধান করে।

পরিচ্ছদের আলোচনায় পাদুকা বর্জনীয় নয়। ভারতের গ্রামজীবনে উহারাও স্থান আছে; যদিচ ভারতের কয়েকটি অঞ্চলে সাধারণ গ্রামবাসীদের মধ্যে পাদুকা ব্যবহারের রীতি নাই। এই পাদুকা-বর্জিত অঞ্চলগুলি হইল—আসাম-ত্রিপুরা-মণিপুর; পঃ বঙ্গ-ওড়িশা-ঝাড়খণ্ড; কেরল; কোলাবা রত্নগিরি। কাজেই দেখা যায়, প্রায় সমগ্র ভারতই পাদুকা পরিধান করে।

বিদেশী প্রভাব-বর্জিত স্বদেশী পাদুকার কথাই এখানে বলা হইতেছে। গ্রাম-ভারতে প্রচলিত পাদুকা প্রধানতঃ

দুই প্রকার—(১) চটি বা চরণ ; (২) ঘোড়-তোলা জুতা, বিশেষতঃ নাগ্‌রা। উত্তর-ভারত সাধারণ ভাবে নাগ্‌রার দেশ, আর দক্ষিণ-ভারত মোটামুটি চটির। কিন্তু দুইয়ের মাঝে অনেকটি অঞ্চল আছে, যেখানে কোথাও নাগরা-চরণ দই-ই চলে : কোথাও বা নাগরা চটির মিশ্রণজাত পাদুকার প্রচলন। মহারাষ্ট্র হইতে বাংলাদেশ পর্যন্ত এই মিশ্রণের বিস্তার। ইহাতে ভারতীয়দের মধ্যে সাংস্কৃতিক লেনদেনের কিঞ্চিৎ পরিচয় রহিয়াছে।

চটির ব্যবহার কিন্তু বড়ই বিচিত্র। চটি চরণেরই রকম-ফের। পশ্চিম বঙ্গের দক্ষিণাঞ্চলে পুরুষের মধ্যে ও বাংলা-বিহার-উত্তরপ্রদেশের স্ত্রীজাতির মধ্যে ইহার সমান প্রচলন। শুধু তাই নয়, কি করিয়া ইহা যেন রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশের অঞ্চল বিশেষে ও সারা কাশ্মীরে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছে। কোথা হইতে কবে কিরূপে ঐসব অঞ্চলে ইহার প্রচলন হইয়াছিল তাহা আজ আর হয়ত আবিষ্কার করা সহজ নয়। কিন্তু ইহা যে 'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে'র ফল তাহাতে বোধ হয় সন্দেহের অবকাশ নাই।

এবার গ্রাম-ভারতের যান-বাহনের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। ভারতের গ্রামে প্রায় সর্বত্র গো-যান বা মহিষ-বাহিত শকট দেখা যায়। ভারতের গ্রাম-জীবনের সঙ্গে ইহা আজও যেন ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। প্রাচীনকাল হইতে ইহার ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। গো-যানের চক্র হয় অরযুক্ত, নয় অরহীন। অরহীন চক্রের চলন ভারতের কয়েকটিমাত্র বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে দেখা যায়। অবশিষ্ট বিশাল ভারতে অরযুক্ত চক্রই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

অরযুক্ত চক্রের আবার প্রকারভেদ আছে। হয় জোড়া-জোড়া অর, নয়ত পৃথকভাবে গুটিকয়েক অর অক্ষাগ্রে কাঠের বেলনে সন্নিবিষ্ট থাকে। পশ্চিমে পাঞ্জাবের ভাটিন্ডা হইতে পূর্বে পুরুলিয়া পর্যন্ত একটি রেখা টানিলে উহার পূর্বে প্রায় সমস্ত গাঙ্গেয় উপত্যকা জুড়িয়া জোড়া-অরের প্রচলন। অবশিষ্ট ভারতে দ্বিতীয় প্রকার অরযুক্ত চক্রের একচেটিয়া অধিকার। আসামের একাংশ ও মণিপুরেও ইহার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। জোড়া-অর ও পৃথক অরের দুই রাজ্যসীমার মধ্যে এখানে ওখানে অরহীন চক্রের মিশ্রণ বর্তমান। একাধিক প্রকার এই সহাবস্থান কি 'মিলাবে মিলিবে'র আর একটি নিদর্শন নয় ?

উচ্চতা-ভেদেও আবার চক্রের আঞ্চলিক ভাগ দেখা যায়। ছোট চাকার গোযান মধ্যপ্রদেশের কয়েকটি সন্নিহিত স্থানে এবং সারা রাজস্থান ও কচ্ছ প্রদেশে বিদ্যমান ; মাঝারি ও বড়চাকা ভিড় করিয়াছে উত্তর ও মধ্য ভারতে। পূর্বে পলাশী হইতে পশ্চিমে বোম্বাইয়ের ছবলিশহর পর্যন্ত একটি সরল রেখা টানিলে উহার পূর্বে পড়ে বড় চাকার রাজ্য। ইহার স্থানে স্থানে অবশ্য অতিবড় চাকারও দেখা পাওয়া যায়।

ভারতের লোকায়ত বৈষয়িক সংস্কৃতির এই অতি সংক্ষিপ্ত বর্ণনাত্মক পরিচয় হইতে মোটামুটি এই কয়েকটি বিষয় পরিস্ফুট হয় :

এই বৈষয়িক সংস্কৃতির উপাদানগুলির ক্ষুদ্র-বৃহৎ আঞ্চলিক বিভাগ স্পষ্টতই চোখে পড়ে ;

এই বিভাগগুলির মধ্যে কদাচ মিল দেখা যায় ;

ইহাদের সীমারেখা পরস্পরকে ছেদ করিয়াছে ; ফলে নানা মিশ্রণের উদ্ভব হইয়াছে ;

এই বিভাগ কোথাও ভাষাবিভাগকে স্বীকার করে নাই, রাজ্যবিভাগকেও নয় ;

বৈষয়িক সংস্কৃতির প্রবাহ জাতি-বৃত্তিগত ভেদ ও ভৌগোলিক ভেদকে উল্লঙ্ঘন করিয়াছে ;

সুবৃহৎ আঞ্চলিক বিভাগ ঐক্যেরও ইংগিত বহন করিতেছে এবং মিশ্রণও প্রকারান্তরে ঐক্যেরই সূচক।

অতএব, ভারতের বৈষয়িক সংস্কৃতি বিবিধের মাঝে মিলনের, বৈচিত্র্য সত্ত্বেও ঐক্যের ইঙ্গিত বহন করে—একথা বলিলে নিশ্চয়ই অভিস্বজনের দোষ স্পর্শ করিবেনা। তবে এই ঐক্য ও মিলন কতটা গভীর ও ব্যাপক তাহা আরও অনুসন্ধানের বিষয়।

THE CENTRAL BANK OF INDIA LIMITED

(Established—December 1911)

Head Office—MAHATMA GANDHI ROAD, FORT, BOMBAY-1.

Authorised Capital	Rs	6,30,00,000.
Subscribed Capital	"	5,77,50,000.
Paid-up Capital	"	3,15,00,000.
Reserve Fund & other Reserves ...	"	4,13 08,635.
Deposits as at 31-12-1961 ...	"	2,20,63,08,954.

DIRECTORS :

Sir Homi Mody, K. B. E. (Chairman)

Cooverji Hormusji Bhabha, Esq. (Vice-Chairman)

Dharamsey Mulraj Khatau, Esq.,
Chimanlal Bapalal Parikh, Esq.,
Sir Jamsetjee Jejeebhoy Bart.,
Jayhrishna Harivallabhdas, Esqr.,
Shiavax Sorabji Khambata, Esqr,
Nani Ardeshir Palkhivala, Esq.,
Nityanand Mangesh Wagle, Esq,
Nawab Prince Mukarram Jah Bahadur.

Nariman Kaikhushru Karanjia, Esq,. (Managing Director)

Branches and Pay Offices in all important Commercial Centres of India, Pakistan & Burma.

LONDON BRANCH : 159, Fenchurch Street, London, E. C. 3.

NEW YORK AGENTS : Morgan Guaranty Turst Co. of New York.
The Chase Manhattan Bank.

Banking Business of every description transacted on terms which may be ascertained on application.

CALCUTTA MAIN OFFICE : 33, Netaji Subhas Road.

B. C. Sarbadhikari.
Agent, Calcutta.

নবযুগের ভূমিকায় স্বামী বিবেকানন্দ

ভবতোষ দত্ত

বাংলার নবজাগরণের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল প্রাকৃতিক নিয়মের উপর ভিত্তি করে জীবনদর্শনের আদর্শ রচনা করা। আমাদের জীবনাদর্শের বিশিষ্ট নীতি এর আগেও ছিল, কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মের উপর তার প্রতিষ্ঠা ছিল না। শাস্ত্র ও লোকাচারে নির্ভর করে যে জীবননীতি গড়ে উঠেছিল, তার কি বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ছিল, তা জানবার উপায় নেই। হয়তো এককালে সত্যই বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ছিল, কিন্তু কালের পরিবর্তনে আর তার উপযোগিতা ছিল না। আমাদের আচার অনুষ্ঠান পরিণত হয়েছিল অন্ধ অভ্যাসে, আমাদের নীতি দুর্নীতি নির্ধারিত হয়েছে শাস্ত্রানুশাসনের সততা দিয়ে।

মানুষের কর্মের আদর্শ স্থির হয় কি দিয়ে সে বিষয়ে নানা মত আছে। কখনো একটি বিশিষ্ট সমাজের বন্ধন মেনে চলবার জন্যে, কখনো মানুষ বলেই সর্বজনীন কর্তব্য পালন করবার জন্যে, কখনো কোনো রাজনৈতিক রাষ্ট্রীয় বন্ধনকে অটুট রাখবার জন্যে এবং কখনো কোনো আধ্যাত্মিক সত্যকে জীবনে রূপ দেবার জন্যে। আমাদের দেশের অনেক আনুষ্ঠানিকতার উদ্ভব হয়েছে সমাজবন্ধনকে রক্ষা করবার প্রয়োজনবোধ থেকে। যখন রাষ্ট্রীয় সংঘাতে বা অন্য কোনও বহিঃপ্রভাবে সমাজের মধ্যে ক্ষয় দেখা দিতে থাকে, তখন পুরনো নীতি-নিয়মগুলি ক্রমেই অর্থ হারাতে থাকে। বৃহত্তর বিশ্বজীবনের সংস্পর্শে এসে মানবব্যবহারের উদারতর আদর্শের প্রয়োজন দেখা দেয়। নানা ক্ষয় নানা সংশয়ের মধ্যে নতুন জীবনাচরণের ভিত্তি কি করে স্থির করা যাবে তাই নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিতে থাকে।

বাংলার উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই সংশয় ও ক্ষয় নিয়ে কেটে গিয়েছে। খ্রীষ্টীয় জীবনাদর্শের সম্পূর্ণ রূপে দেশীয় নৈতিক আদর্শে যে অবিশ্বাস দেখা দিয়েছিল নবযুগের বিদ্রোহ ছিল তারই প্রকাশ। তাদের আগে রামমোহন এই সংশয়ের ইঙ্গিত নিয়ে এসেছিলেন কিন্তু তাঁর সংশয় ঠিক বিদ্রোহ হয় নি, তার কারণ তিনি দেশের শাস্ত্রীয় অনুশাসনেরই নতুন ব্যাখ্যা করে সমাজের আদর্শগত পরিধির বিস্তার ঘটাতে চেয়েছিলেন। এ কথা কারও অজ্ঞাত নয় যে খ্রীষ্টীয় নীতিবাদ তাঁর জীবনমূল্যের পরিবর্তন ঘটাতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। সংশয় ও অবিশ্বাসের পর নতুন জীবন শাস্ত্র কিভাবে গড়ে তোলা যাবে, অজ্ঞাতসারে দেশের মনীষা সেদিকেই ক্রমে ব্যাপৃত হচ্ছিল।

'সমাজ' বলতে এখন আর শুধু হিন্দু বা মুসলমান সমাজ নয়, 'কাল' বলতেও একটা অচল সময়কে বোঝায় না। 'দেশ' বলতে নিজের পল্লীটুকু বুকলে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। সুতরাং এই দেশ কাল সমাজে প্রযোজ্য সর্বজনীন মূল্যমান কি করে নির্ণয় করা যাবে? এ কালে একমাত্র বিজ্ঞানই দেশাতীত ও কালাতীত। বিজ্ঞানের সূত্র ধরে কি এর নিয়ম নির্দেশ করা যায়? সেই জন্যই অক্ষয়কুমার দত্তের বৈজ্ঞানিক যুক্তিবোধ এ দিকে নিয়োজিত হয়েছিল। পাশ্চাত্যের হিতবাদদর্শনও ছিল মিলটিসিজ্‌ম-বর্জিত মানবহিতসাধনের দর্শন। রেনাসাঁসের পরে বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে খ্রীষ্টধর্মেও যে ক্রমে ক্রমে অসম্পূর্ণতা বোধ হচ্ছিল সর্বমানবিক কল্যাণের

ভুলা চিন্তা করে হিতবাদদর্শন তার শূন্যতা দূর করবার চেষ্টা করছিল। বস্তুত পজিটিবিজ্‌ম এবং ইউটিলিটারিয়ানিজমের উদ্ভব হয়েছিল আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুক্তিবোধের সঙ্গে কল্যাণবোধকে মেশাবার ফলে। বাঙালির জীবনে মূল্যবোধে যে বিদীর্ণতা দেখা দিয়েছিল, তাকে এই নবাগত বৈজ্ঞানিক নিয়মতন্ত্র দিয়ে জোড়া দেবার চেষ্টাই অত্যন্ত প্রকট হয়ে উঠল।

সেকালের শিক্ষাব্যবস্থার অর্থনীতি, ইতিহাস সমাজদর্শন ও বিজ্ঞানবিদ্যার স্থান নির্দেশের জন্য ভাবুকেরা ছিলেন ব্যস্ত। এ সব শাস্ত্রই আমাদের দেশে ছিল অভিনব। এ সব শাস্ত্র দিয়ে বিশ্বজগতের সার্বভৌম নীতি-নিয়ম জানা যায়। আমাদের শিক্ষা এই সার্বভৌম নিয়মকে আয়ত্ত করবার প্রয়াসে নিবদ্ধ হল। 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' বইটি এই সার্বভৌম প্রাকৃতিক নিয়মের মানদণ্ড দিয়ে ব্যক্তির আচরণীয় কর্তব্যপালনের দিকনির্দেশ। এমন কি বঙ্কিমের ধর্মতত্ত্বেও প্রাকৃতিক নিয়মের ভিত্তিতে ব্যক্তির চিন্তানুশীলনের যে প্রণালী নির্দিষ্ট হয়েছে তাও আসলে মূল্য-বোধকে গণিতের মতো যুক্তিসিদ্ধ ও স্পষ্ট করে দেওয়ার প্রয়াস ছাড়া আর কিছুই নয়। যে নিয়মে 'জল পড়ে পাতা নড়ে' সেই একই নিয়মে মানবকল্যাণকে ও জীবনের মূল্যমানকে একটি জাগতিক নিয়মের অধীনে নিয়ে আসতে পারলে এ বিষয়ে আর কোনো ব্যক্তিগত উপলব্ধির উপর নির্ভর করবার দরকার হয় না কিংবা যুক্তিহীন শাস্ত্রানুশাসনের আনুকূল্য হয় না। য়ুরোপে সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীতে যুক্তি ও রীতির প্রাধান্য যে ভাবে মানুষের চিন্তাজগৎকে আচ্ছন্ন করেছিল, আমাদের দেশে ঊনবিংশ শতাব্দীর মনোজগৎকেও সেইভাবেই প্রভাবিত করবার চেষ্টা করেছিল। যুক্তির অতীত কোনো অধ্যাত্ম-বিশ্বাসের স্থান ক্রমেই যেন সংকীর্ণ হয়ে এল। মধ্যযুগীয় নৈতিক বিশৃঙ্খলার প্রতিক্রিয়ায় জীবনাচরণের একটা যুক্তিসঙ্গত ভিত্তির প্রতি আগ্রহ এইভাবেই গড়ে উঠল।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমার দত্তের যুক্তিবোধের দ্বারা চালিত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি বহির্জগতের জড়নিয়মের উপর একান্ত নির্ভর না করে 'আত্মপ্রত্যয়' বা স্বাধীন অনুভূতির উপর দাঁড়াতে চাইলেন। কিন্তু স্বানুভূতির উপর নির্ভর করা সকলের পক্ষে সম্ভবও নয়, উচিতও নয়। স্বানুভূতি একজনেরই থাকে, তাকে অনুসরণ করেই সমাজ ও সম্প্রদায় চলে। সমাজের মানুষ তো সকলেই স্বাধীন মনন ও অনুভবশক্তির অধিকারী নয়। তবু একথা সহজেই বোঝা যাবে যে ব্যক্তি-বিশেষের উপলব্ধি সকলের মনকে তৃপ্ত করতে পারে না। যুক্তিবাদের যুগে ব্যক্তিবিশেষের ধ্যানগত উপলব্ধির উপর নির্ভর করা সকলের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এইজন্য কোনো একটা সর্বজনগ্রাহ্য বস্তুভিত্তি থাকা একান্তই আবশ্যক।

বস্তুভিত্তিকেই জীবনের একমাত্র প্রমাণরূপে গ্রহণ করার নামান্তর জড়বাদে বিশ্বাস করা। ইন্দ্রিয়জগতের অতীত কোনো কিছুকেই যিনি বিশ্বাস করেন না, তিনিই প্রচলিত অর্থে নাস্তিক, প্রত্যক্ষতাবাদী। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে নাস্তিক্যবাদের প্রসার যেমন লক্ষণীয় তেমনি লক্ষণীয় পজিটিবিজ্‌ম ইত্যাদির প্রসারের ফলে বুদ্ধিবাদে অতিরিক্ত আস্থা। আমাদের দেশে সমাজকল্যাণমূলক ভাবনার মূল কারণ ছিল ইহজীবনকেই প্রাধান্য দেওয়া। শুধু তাই নয়, এই বস্তুজগৎকে যে সব নিয়ম নিয়ন্ত্রিত করছে, সেই সব নিয়মের শাসনেই মানুষের মনুষ্যত্ব এবং সমাজের কল্যাণরূপকে ফুটিয়ে তুলতে হবে। এর অর্থ এই কথাই বিশ্বাস করা যে ব্যক্তির মননকল্পনাও জড়নিয়মেরই বশীভূত, প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারা চালিত। মানুষের মননশক্তি এই জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে না। সেকালের দিনে পাশ্চাত্ত্য দেশেও প্রাকৃতিক নিয়মে অটল আস্থা শেষ পর্যন্ত এই পরিণামেই চিন্তাধারাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। টেইনে সাহিত্যের ইতিহাস লিখতে গিয়ে, বাকল সভ্যতার ইতিহাস লিখতে গিয়ে এই নিয়মের পাশেই মানুষের স্রষ্টিক্ষমতাকে দেখেছিলেন বড়। এই দুই দ্রষ্টা আমাদের দেশেও চিন্তাশক্তিকে

নিয়ন্ত্রিত করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্র অবলম্বনে ভারতীয় সাহিত্যের যে ব্যাখ্যা করেছিলেন, 'সাম্য' 'ভারতকলঙ্ক' ইত্যাদিতে জাতীয় চরিত্রের যে ব্যাখ্যা করেছিলেন তা থেকেও বোঝা যায়, তিনি পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদে কতখানি আবিষ্ট ছিলেন। উল্লেখযোগ্য এই যে ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর সামাজিক প্রবন্ধের 'পাশ্চাত্য ভাব—সাম্য' অধ্যায়ে জড়নিয়মের উপর বঙ্কিমের অতিরিক্ত নির্ভরশীলতার জন্য আপত্তি জানিয়েছিলেন। তাঁর মত, বঙ্কিম অধ্যাত্ম-প্রকৃতিকে অস্বীকার করে চিন্তার অসম্পূর্ণতার পরিচয় দিয়েছেন মাত্র। জাতি বা সমাজ গঠনে মানুষের স্বাধীন চিন্তার যে বৃহৎ ভূমিকা আছে ভূদেব সেদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মত আরও কেউ কেউ অবশ্যই ছিলেন যাঁদের আমরা ব্যতিক্রম অবশ্যই বলব না, তবে তাঁদের নবযুগের প্রতিনিধিস্থানীয়ও অবশ্যই বলব না। উনবিংশ শতাব্দীর বৈশিষ্ট্য যে বুদ্ধিবাদের সমাদরে, সে কথা অস্বীকার করা যায় না। এই বুদ্ধিবাদ, যার নামান্তর জড়বাদ, মানুষের কাছে জীবনের সম্ভাবনার দ্বার রুদ্ধ করে দিচ্ছিল মাত্র। যা নিয়মনির্দিষ্ট সেখানে মনুষ্যত্ব ক্রমেই নিস্তেজ হয়ে পড়তে চায়, পৌরুষ ম্লান হয়ে আসে, উদ্যম স্তিমিত হয়। সেকালের উপন্যাসে নিয়তি চেতনার প্রাধান্য পাওয়ার এটাই কারণ। পুরুষচরিত্রগুলি এই জন্যই অপেক্ষাকৃত দুর্বল, কাহিনীর অমোঘ ঘটনাজালে জড়িত।

অনেকে স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাবকে উনবিংশ শতাব্দীর স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে গ্রহণ করতে পারেন না। নবযুগের সঙ্গে সঙ্গে যে বুদ্ধিবাদের জয়যাত্রা আরম্ভ হয়েছিল বিবেকানন্দের যুগ তার প্রতিরোধ করবার চেষ্টা করেছে এমন অভিযোগ কেউ কেউ করেছেন। ধর্মের আনুষ্ঠানিকতা তিনি অব্যাহত রেখেছেন শুধু নয়, আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার বিরুদ্ধে তিনি ঈশ্বর এবং অতীন্দ্রিয় চেতনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। সাধারণভাবে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকটিকে, যে যুগের প্রধান পুরুষ ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, তাকে পূর্বযুগের প্রতিক্রিয়া বলেই অভিহিত করা হয়েছে।

এ রকম ভাববার যৌক্তিকতা শেষ পর্যন্ত যাই থাক কতকগুলি আপাতকারণ যে আছে তাতে সন্দেহ নেই। একটি দৃষ্টান্তই আলোচনা করে দেখা যেতে পারে। সকলেই জানেন উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য জগতে ডারউইনের বিবর্তনবাদ কি আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। স্পেন্সারের যান্ত্রিক বিবর্তনতত্ত্ব ডারউইনের প্রাণতত্ত্বের সূত্র রচনা করেছিল। সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীর অতীন্দ্রিয়তাবিরোধী বুদ্ধিবাদের ফল ছিল এই তত্ত্ব। ঐশীয় সৃষ্টিতত্ত্বের অর্থহীনতা প্রতিপন্ন করে এই বৈজ্ঞানিক মতের উদ্ভব। এই তত্ত্ব ধর্মীয় মিসটিসিজ্‌মের প্রতি অবিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। সেকালের অনেক গুরুতর এবং মৌলিক চিন্তার মূলে বিবর্তনবাদের দান ছিল। বিশেষতঃ আমাদের দেশের যুক্তিবাদীদের প্রধান অবলম্বন ছিলেন স্পেন্সার ডারউইন। বঙ্কিমচন্দ্র ডারউইনের মত স্বীকার করতেন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্পেন্সার-ডারউইনের মতের উপর ভিত্তি করেই তাঁর চিন্তারাজি ব্যাখ্যা করেছিলেন।

তখনকার দিনে বিবর্তনবাদে অকুণ্ঠ বিশ্বাস রাখাই ছিল প্রগতি। নিজের ধর্ম ও সংস্কৃতির মহত্ত্ব সপ্রমাণ করতে হলেও এই বিবর্তনবাদের সাহায্যই নিতে হত। উনবিংশ শতাব্দীর চিন্তার ধর্মকেন্দ্রে স্থাপিত এই তত্ত্বকে বিবেকানন্দ স্বীকার করেন নি। স্বামীজির তৎকালীন অনুরাগী মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছিলেন •

• Monomohan Ganguly; **The Swami Vivekananda : A Study** (Second Print 1962). এই বইটি প্রথম প্রকাশিত ১৯০৭এ। গ্রন্থকার সুবিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক। বিবেকানন্দের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। স্বামীজির প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও তাঁর সম্বন্ধে কিছু প্রশ্নও তিনি উত্থাপন করেছিলেন। সেই প্রশ্ন আজও কেউ কেউ করে থাকেন।

Swamiji's idea of Evolution may probably be called the centre towards which all his ideas converge. He says that the rising from the lower state to the higher is not due to any addition but an emanation or a manifestation of the Divinity by it own nature. Swamiji says 'the momentum is not from outside but comes from inside. It is the very nature of things to manifest themselves.' ...His idea of Evolution is not the same as is accepted by the modern thoughtful world for he says, "These competitions and struggles and evils that we see are not the effect of the involution or the cause, but they are in the way. If they did not exist, still man would go on and evolve as God, because it is the very nature of God to come out and manifest Himself

বিবেকানন্দ ক্রমোন্নতিবাদ অস্বীকার করলেন। প্রাকৃতিক শক্তি ও অন্ধ জড়নিয়ম তাঁর পক্ষে স্বীকার করা সম্ভব নয়। কেননা, বিশ্ববিধান তাঁর কাছে ঈশ্বরবর্জিত নয়, মানুষের আত্মিক শক্তিতে তাঁর বিশ্বাস ছিল অটল। এই শক্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন বলে জড়নিয়মের উপর মানুষের ইচ্ছাশক্তিকে, তার উদ্যম ও সাধনাকে বড় বলে জেনে নিশ্চিন্ত ছিলেন। মানুষ ইচ্ছা করলেই জগৎকে নিজের ইচ্ছামত গড়তে পারে। বিবেকানন্দের বহু সুপরিচিত উক্তিতে তাঁর এই মনোভাব প্রকাশিত। তিনি বলেন—

He who does not believe in himself is an atheist.—এ কথার তাৎপর্য আমরা অনুধাবন করি উনবিংশ শতাব্দীর চিন্তাবৈশিষ্ট্যের পটভূমিতে। জড়নিয়মের চেয়ে মানুষের আত্মিক শক্তি বড়ো। প্রকৃতি মানবচরিত্রকে গড়ে না, মানুষের ইচ্ছাই প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করে। স্বামীজির ভক্তরাও সবাই তাঁর এই সব উক্তিকে গ্রহণ করতে পারেনি। তৎকালপ্রচলিত মতের বিরুদ্ধে তাঁকে যেতে দেখে পূর্বোক্ত গ্রন্থকার বলছেন—We are sorry we do not find our way to accept these views from which we dissent

মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক। স্বভাবতই তিনি প্রাকৃতিক নিয়মে আস্থাবান্। কিন্তু বিবেকানন্দ অন্য একটা তত্ত্বকে জানতেন বলে মিল-ডারউইনকে তার তুলনায় অসার্থক বলে ভাবতে তাঁর দ্বিধা ছিল না। বৈজ্ঞানিকের কাছে এই তত্ত্ব অতীন্দ্রিয়। তার কোনো প্রমাণ পাই না যুক্তি দিয়ে। অবশ্যই এ কথা স্বীকার করতে হবে যে বিবেকানন্দ যে আত্মিক শক্তির কথা বলেছেন, শুধু মননবৃত্তি দিয়ে সে শক্তি গড়ে ওঠে না। যারা জগতের নীতিনিয়মকে মাত্র ব্যাখ্যা করে বোঝান তাঁরা স্রষ্টা নন। আত্মশক্তিতে অটুট আস্থা রেখে বিশ্ববিধানের উপর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার দুঃসাহস যিনি করেন তিনি জড়জীবনের চেয়ে বড়ো, তিনি স্রষ্টা। জীবনের চেয়ে বড়ো কিছু কি সত্যই আছে? তার সন্ধান কে দেবে? বিবেকানন্দ যে শক্তির উদ্বোধন ঘটাতে চেয়েছেন সে শক্তি প্রকৃতির শাসন থেকে মুক্ত। সে এক উদার চেতনা। বৈজ্ঞানিকরা না বললেও দার্শনিকরা তাকে বলেছেন অধ্যাত্মচেতনা। আর যা কিছু সবই ইন্দ্রিয়গত। মনন বলি, নীতি বলি সবই প্রকৃতির সৃষ্টি। প্রকৃতির পাশ থেকে মুক্ত যদি কোনো সত্তা থাকে, সে সত্তা প্রকৃতিকেও চালনা করে। বিবেকানন্দ সেই সত্তাকে প্রবুদ্ধ করতে চাইলেন বাংলার পুনরুজ্জীবন-সাধনার ইতিহাসে।

সন্ন্যাসী বলেই বিবেকানন্দের পক্ষে এর সন্ধান পাওয়া সম্ভব হয়েছিল। তাঁর পূর্বেকার কোনো মনীষীই ঠিক বিবেকানন্দের মতো সন্ন্যাসী ছিলেন না। অথচ তাঁদের

সকলের মধ্যেই ছিল দৃষ্টির ঔদার্য যা বাংলার জাগরণকে এমন মহিমান্বিত করেছে। দেশের জন্য সমাজের জন্য মানবসাধারণের জন্য জীবনকে উদার সুন্দর করে তুলবার জন্যে তাঁদের স্বপ্ন সাধনা ও উদ্বেগ বাংলাদেশের দীর্ঘ ইতিহাসে সত্য-সত্যই অনন্য। এই কল্যাণভাবনা কোথা থেকে এল যদি না তাঁরাও আত্মচেতনায় দৃঢ়প্রতিষ্ঠ থাকবেন? বিদ্যাসাগর যে সমাজকল্যাণমূলক কর্মপ্রয়াসে ব্রতী হয়েছিলেন, এক প্রচণ্ড আত্মপ্রত্যয় কি তাঁকে শক্তি দেয় নি? কিন্তু বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁদের পার্থক্য এখানেই যে বিবেকানন্দ সমাজ-সংস্কারের জন্য মুখ্যত কোনো ব্যগ্রতাই প্রকাশ করেন নি। এই কারণেও বিবেকানন্দকে অনেকে জাগরণের প্রতীক বলে মেনে নিতে দ্বিধা বোধ করেন।

বস্তুত সমাজের পুনর্গঠন যাঁরা চেয়েছেন তাঁরা নৈতিক বুদ্ধি দ্বারা প্রবর্তিত হয়েছিলেন। জীবনপ্রকৃতির মধ্যেই রূপবদল করা ছাড়া আর বোধহয় কিছু করবার ছিল না। স্পেন্সার বলতেন, জীবন একটা নিরন্তবিন্যাসপ্রয়াস (adjustment) ছাড়া কিছু নয়। যুগ ও দেশের উপযোগিতা বুঝে বারবার সমাজকে ও জীবনকে বিন্যাস করে নেওয়ার নামই সংস্কার। বিবেকানন্দ যে জীবনের এই সংজ্ঞায় বিশ্বাস করতেন না, সে কথা আগেই বলেছি। জীবনের পুনর্বিন্যাস তাঁর উদ্দিষ্ট ছিল না। তাঁর উদ্দিষ্ট ছিল কর্তৃশক্তি। জীবনকে সম্পূর্ণরূপে হাতের মুঠোয় নিয়ে আসা। এইজন্য তিনি কখনও কখনও এমন কথাও বলেছেন –

Everything seems to me to lie in manliness. This is my new gospel. Do even evil like a man! Be wicked, if you must, on a great scale.

যাঁর আত্মবিশ্বাস জাগ্রত, তাঁর কাছে সংস্কারের জন্যই সংস্কার নয়। মনুষ্যত্ব যদি জাগে স্বাভাবিক বিচারবোধ আপনি জাগবে এবং এ বিষয়ে কর্তব্য আপনা থেকেই স্থিরীকৃত হয়ে যাবে। নীতি তো বাইরের ব্যাপার মাত্র, আত্মবোধ হচ্ছে সত্তার চরম পর্যায়। বিবেকানন্দ সেই পর্যায়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন বাংলার জাগরণকে।

লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে বিবেকানন্দের পূর্ব পর্যন্ত উনবিংশ শতাব্দীর জীবনতত্ত্বে নৈতিক প্ররোচনা যেমন ছিল প্রধান তেমনি দ্বৈতবাদে বিশ্বাসই ছিল তার অবলম্বন। জগৎ-সত্তা সম্বন্ধে অটল বিশ্বাস কর্মপ্রয়াসকে প্ররোচিত করে। ব্রাহ্মধর্ম দেবেন্দ্রনাথের সময় থেকেই ছিল দ্বৈতবাদী। বস্তুত বিশ্বাসে কর্মী মানুষের দ্বৈতবাদী হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। জগৎকেযদি সত্য বলে বিশ্বাস না করি তবে কার জন্যে আত্মোৎসর্গ করব? এর থেকে স্বভাবতই নৈতিক বুদ্ধির উদ্ভব। খ্রীষ্টান পাদ্রীরা এককালে অদ্বৈত বেদান্তকে আক্রমণ করেছিল এই কারণে। জগৎ মায়া হলে তার প্রতি দায়িত্ব আর থাকে না। এখানেও বিবেকানন্দ-চরিত্র ব্যাখ্যার একটি সমস্যা। তিনি অদ্বৈত বৈদান্তিক ছিলেন। কিন্তু অদ্বৈতবাদী হয়ে কি করে তিনি লোকশ্রেয়কে এত বড় পুণ্যকর্ম করে তুললেন! অদ্বৈতবাদী হয়েও তিনি যে দ্বৈতবাদকেও একেবারে ত্যাগ করেননি, এ কথা তাঁর জীবনী-পাঠকেরা সবাই জানেন। তিনি যদি খাঁটি অদ্বৈতবাদী হয়ে থাকেন, তবে বলতেই হবে যে উনবিংশ শতাব্দীর ধর্মেরই বিরুদ্ধাচারণ করেছিলেন তিনি। অথচ লোককল্যাণে তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল বলেই স্মরণীয় সেবাদর্শের তিনিই হলেন প্রবর্তক।

তবে একথা ঠিক বেদান্তের আত্মতত্ত্ব বিবেকানন্দের মনের খুব গভীরে স্থান করে নিয়েছিল। যে আত্মবোধ তাঁর জীবনবাণীর মর্মমূলে, তা এই বেদান্ত থেকেই লব্ধ। দ্বৈতবাদে বস্তুত আত্মবোধ অতিশয় গৌণ কেননা আত্ম-নিবেদনই তার মূলকথা। অদ্বৈতবাদের কথা 'আমিই সব'। এই আত্মা প্রকৃতির উর্ধ্বে বলেই প্রকৃতির উপরে সে প্রভু। আত্মবোধ জাগলে আর মানুষের কোনো ভয়ই থাকে না। বিবেকানন্দ যে বৈদান্তিক ছিলেন তার জাতীয় তাৎপর্য এখানেই যে বেদান্তের অধ্যাত্মবুদ্ধিকে তিনি উনবিংশ শতাব্দীর

সর্বব্যাপী জাগরণের মাঝখানে বসিয়েছেন। রামমোহন অদ্বৈত বেদান্তের প্রচার আধুনিক কালে আরম্ভ করেছিলেন সত্য কিন্তু নৈতিক বুদ্ধিই ছিল তাঁর চিন্তাধারার নিয়ামক। বিবেকানন্দের মতো আত্মচেতনার উদ্বোধনই তাঁর মুখ্য আকাঙ্ক্ষা ছিল না। বিবেকানন্দের মতো ব্রহ্মতেজসম্পন্ন প্রচণ্ড কর্মী পুরুষ অদ্বৈতবাদে মনপ্রাণ সমর্পণ করে দেশ বা সমাজকে ভোলেন নি। শংকরের মায়াবাদ তাঁর কাছে পরিপার্শ্বকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করাতে পারে নি। জীবন যে আছে, প্রকৃতির জড় নিয়মের বন্ধনগুলিকে কিছুতেই অবাস্তব বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাই তিনি দেশ ও জাতি গঠনের কথা বলে গিয়েছেন। অদ্বৈতবাদের সঙ্গে দ্বৈতবাদের সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন তিনি। এটা বাংলার জাগরণে তাঁর সবচেয়ে বড়ো দান। এক অর্থে যৌক্তিক তো বটেই আবার আর এক অর্থে ঐতিহ্য থেকেই পাওয়া। তন্ত্র সাধনাতেই এই সমন্বয়ের বীজ ছিল। বিবেকানন্দ পেয়েছিলেন তাঁর গুরুর কাছ থেকে।

এমনি করে আমাদের দেশের মননধারা মোড় ফিরল। য়ুরোপেও দেখতে পাই, প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতি অন্ধ মোহকে ভেঙে দিয়েছিল ঊর্ধ্বগ চেতনসত্তার কল্পনা। স্পেন্সার-ডারউইনের পর তাই এসেছিলেন বের্গসঁ। সৃষ্টির প্রবাহ অঙ্কের হিসাবে চলে না। অনির্দেশ্য এক মুক্ত প্রাণের অস্তিত্ব কত অভাবিতকে ঘটিয়ে তুলছে। এরই নাম সিসৃক্ষা। বের্গসঁর তত্ত্ব পূর্বযুগের প্রতিক্রিয়ায় উদ্ভূত হতে পারে কিন্তু মানুষের চিন্তাধারাকে বিপথগামী করেছে একথা কেউ বলেছে কিনা জানি না। জগতের যান্ত্রিক ব্যাখ্যায় মানুষের মন ভরে না। জীবনের গতি যে পূর্ব নির্দিষ্ট, এই বিশ্বাস মানুষকে অনেকটা নিরুদ্যম করে ফেলে। বের্গসঁ শোনালেন প্রাণের কথা, বিবর্তনের মধ্যে চিৎসত্তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসংশয় করলেন। বের্গসঁর আবির্ভাব আকস্মিক ছিল না। তিনি প্রথম জীবনে ছিলেন স্পেন্সারেরই শিষ্য।

It is a remarkable thing that Bergson, the David destined to slay the Goliath of materialism was in youth a devotee of Spencer. But too much knowledge leads to scepticism; early devotees are the likeliest apostates, as early sinners are senile saints. *

অত্যন্ত কৌতূহলের বিষয় এই যে নরেন্দ্রনাথ এমনি নাস্তিকবাদ দিয়েই মনের যাত্রা সুরু করেছিলেন। প্রখর বুদ্ধিবাদী ছিলেন তিনি। মিল-বেন্থাম স্পেন্সার-ডারউইনের জড়বাদী প্রবণতার আশ্রয় থেকে অবশেষে তার থেকে তিনি উঠে এসেছিলেন। কিন্তু জড়বাদের শিক্ষা একেবারে তাঁর কাছে ব্যর্থ হয়নি। জড়কে জীবনের সর্বশেষ সত্য বলে গ্রহণ না করলেও জড়ের অস্তিত্বকেও উপেক্ষা করতে পারলেন না। ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা এইভাবে তাঁর মধ্যে যথাযোগ্য আসন করে নিয়েছে।

* Will Durant, The Story of Philosophy Chapter X

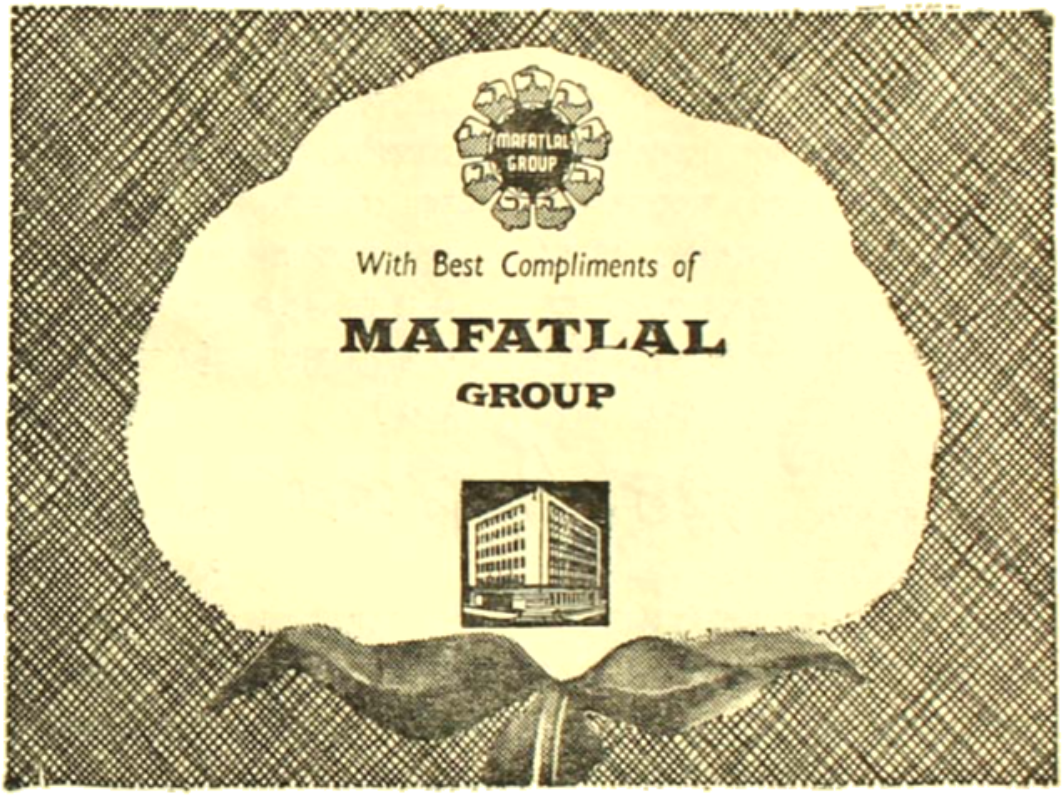
MAFATLAL GROUP
With Best Compliments of
MAFATLAL
GROUP

দেবীপদ ভট্টাচার্য

চরিত সাহিত্যের কথা

"অমিত বলে, মানুষের মৃত্যুর পরে তার জীবনী লেখা হয় তার কারণ, একদিকে সংসারে সে মরে, আর-এক দিকে মানুষের মনে নিবিড় করে বেঁচে ওঠে"—শেষের কবিতা।

অমিত রায়ের সঙ্গে এ-মন্তব্যে সকলেই ঐকমত্য বোধ করবেন। জীবনী লেখার পিছনে চিরদিনই একটি স্মৃতিরক্ষণ বৃত্তি বা commemorative spirit বিদ্যমান—সেকাল আর একালে দুস্তর পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও। আমাদের সাহিত্যে জীবনচরিত লেখার ঝোঁক উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এসেছিল। তবু অনেককেই আক্ষেপ করতে শোনা গিয়েছে যে আমাদের বাংলা সাহিত্যে জীবন চরিত রচনার দিকে আগ্রহ আশানুরূপ নয়। এ আক্ষেপ সম্পূর্ণ অমূলক নয়।

ইতিহাস ও জীবনচরিত মূলে একই বস্তু ছিল, আধুনিক কালে ইতিহাস ও জীবনচরিতকে পৃথক করে দেখা হয়েছে। প্রাচীন ভারত নানা শাস্ত্রের চর্চা করলেও বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস বলতে যা বোঝায় সেদিকে বিশেষ অগ্রসর হয়নি। কলহণের "রাজতরঙ্গিনী" অবশ্য কালজয়ী ইতিহাস গ্রন্থ। কিন্তু এই গ্রন্থখানিকে বাদ দিলে 'দুতার্থ কথনে' আর কোন গ্রন্থই শ্লাঘ্য বলে অভিহিত হতে পারে না। ইতিহাস-স্বল্পতা ও ইতিহাস বিমুখতার কারণ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত সর্বাগ্রে উৎকলনযোগ্য :

> ভারতবর্ষীয় দিগের যে ইতিহাস নাই, তাহার বিশেষ কারণ আছে।... জগতের যাবতীয় কর্ম দৈবানুকম্পায় সাধিত হয়, ইহা তাঁহাদিগের বিশ্বাস। ইহলোকের যাবতীয় অমঙ্গল দেবতার অপ্রসন্নতায় ঘটে ইহাও তাঁহাদিগের বিশ্বাস। এজন্য শুভের নাম 'দৈব' অশুভের নাম 'দুর্দৈব'।..... [তাঁহারা] দেবতাই সর্বত্র সাক্ষাৎ কর্তা বিবেচনা করেন। এজন্য তাঁহারা দেবতাদিগেরই ইতিহাস কীর্তনে প্রবৃত্ত; পুরাণেতিহাসে কেবল দেবকীর্তিই বিবৃত করিয়াছেন। যেখানে মনুষ্যকীর্তি বর্ণিত হইয়াছে, সেখানে সে মনুষ্যগণ হয় দেবতার আংশিক অবতার নয় দেবানুগৃহীত; সেখানে দৈবের সংকীর্তনই উদ্দেশ্য। মনুষ্য কেহ নহে, মনুষ্য কোন কার্যেরই কর্তা নহে, অতএব মনুষ্যের প্রকৃত গুণ-কীর্তনে প্রয়োজন নাই। এ বিনীত মানসিক ভাব ও দেশভক্তি অনভ্যস্ততার ইতিহাস না থাকার কারণ। [বাঙ্গালার ইতিহাস, বঙ্গদর্শন ১২৮১]

॥ ২ ॥

যে-ইতিহাস বিমুখতার প্রসঙ্গ বঙ্কিমচন্দ্র বলিষ্ঠ যুক্তিহীন ভাষায় উপস্থিত করেছেন তার বিরুদ্ধে বলবার কিছু নেই। তিনি বার বার বাংলার ইতিহাস না থাকার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন। নিজে সেই অভাব দূরীকরণে সাধ্যমত প্রয়াস রেখে গেছেন। যে কারণে আমাদের ইতিহাস নেই সেই কারণে আমাদের জীবনচরিতও হয়নি। চৈতন্যদেবের চরিত কাব্যগুলি উল্লেখযোগ্য রচনা সন্দেহ নেই কিন্তু সেখানে চৈতন্যদেব কখনো মর্ত্যের মানুষরূপে কল্পিত হননি বৃন্দাবন দাস তাঁর গ্রন্থে চৈতন্যদেবকে শ্রীকৃষ্ণের অবতাররূপে গ্রহণ করেছেন ঐশ্বর্যভাবে। অপর কবি লোচনদাস ছিলেন শ্রীখণ্ডের নরহরি দাস সরকারের ভক্ত। নরহরি দাস সরকার ঠাকুর 'গৌর নাগর' ভাবের প্রবক্তা। তিনিও চৈতন্যদেবকে

শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলেই বরণ করেন। ভাগবতের বৃন্দাবন, যমুনা শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজবধূর স্থলে তিনি যথাক্রমে নবদ্বীপ, ভাগীরথী, শ্রীচৈতন্য ও নদীয়া নাগরীদের উপস্থাপিত করেছেন। তাই এখানে শ্রীগৌরাঙ্গ হলেন 'নাগর' আর নদীয়া-বধূরা সকলে 'নাগরী'। বৃন্দাবনদাস এই দলের 'গৌর নাগরভাবে'র তীব্র বিরোধী ছিলেন। চৈতন্যদেবের শ্রেষ্ঠ চরিতকাব্য হিসাবে 'চৈতন্যচরিতামৃত কাব্য' গৃহীত হয়ে থাকে; এই কাব্যের রচয়িতা ভক্তবৈষ্ণব কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবনে বাস করতেন চৈতন্যদেবের তিরোধানের অনেক পরে। তখন সেখানে রূপ, সনাতন, জীব, রঘুনাথ দাস প্রভৃতি গোস্বামীগণ বিদ্যমান ছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর কাব্যের প্রতি অধ্যায়-শেষের ভণিতায় রূপ-রঘুনাথের পাদবন্দনা করেছেন। এঁদেরই উপদেশ শিরোধার্য করে শ্রীচৈতন্যের অবতার তত্ত্বের নতুন ব্যাখ্যা অর্থাৎ চৈতন্যদেব যে রাধা-কৃষ্ণের 'যুগ্মবিগ্রহ' এই মনোভাব নিয়ে তাঁর চরিতকাব্য রচনা করলেন। রায় রামানন্দের আবেদনে সাড়া দিয়ে চৈতন্যদেব তাঁকে এই 'যুগ্মবিগ্রহ' রূপ দেখিয়েছিলেন বলে কৃষ্ণদাস কবিরাজ জানিয়েছেন :

তখন হাসিয়া প্রভু দেখাল স্বরূপ
রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ।

রসরাজ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ এবং 'মহাভাব' অর্থাৎ শ্রীরাধা একই দেহাভিত। বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামীদের নির্দেশ বা কড়চা অনুযায়ী কাব্য রচিত হওয়ায় মানুষ চৈতন্য সেখানে অলক্ষিত প্রায়। আর একজন কবি ছিলেন জয়ানন্দ, তাঁর কাব্যের নাম চৈতন্যমঙ্গল। তিনি চৈতন্যদেবকে শ্রীকৃষ্ণের অবতাররূপে প্রচার করলেও তবু তাঁর মধ্যে কিছু স্বাধীন দৃষ্টি ছিল। বোধ-করি সেজন্যই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে তিনি আপাংক্তেয়। তবে যতই অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃত উপাদানে এই সব চরিতকাব্য-গুলি ভরা থাকুক এগুলির মধ্য দিয়ে মানুষ চৈতন্যদেবকে তাঁর মানবকল্যাণকে কিছুটা ধরা যায়।

এই অবতারবাদের হাওয়া ভক্তি প্রধান মধ্যযুগের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক। আমাদের দেশে তখন 'বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর' এই সংস্কার চলছে—জ্ঞান-বুদ্ধি-মননের চর্চা বেশি নেই, কর্মকাণ্ড ত' স্বপ্নবায়। যখন জ্ঞান বা কর্ম দেশে প্রাধান্য পায় না তখন সেই ফাঁকা জমিতে বিচারহীন ভক্তি-বাদ বাসা বোঁধে। আমাদের দেশের মধ্যযুগে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতক অবধি তারই রাজত্ব চলেছে। বুদ্ধির চর্চা না থাকলে অবুদ্ধি ভর করে। মধ্যযুগে আমাদের সাহিত্যে যে জীবনী কাব্যগুলি রচিত হয়েছে সেগুলিতে তাই অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃত উপাদান বহুল-পরিমাণে সন্নিবেশিত হয়েছে। 'নরোত্তম বিলাস' গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে সমাদৃত আর একখানি জীবনীকাব্য। নরোত্তম দাস ঠাকুরের জীবন কথা একাব্যে প্রথাসিদ্ধ রীতিতে বিবৃত হয়েছে। অসংখ্য অদ্ভুত স্বপ্ন, প্রত্যাদেশ, প্রভৃতির সঙ্গে এ-পর্যন্ত দেখানো হয়েছে যে শেষে ভগবতী (!) খড়্গ নিয়ে বৈষ্ণব ধর্ম বিরোধী অব্যাপকের শাস্তিপ্রদানে অগ্রসর :

দেখয়ে স্বপন দেবী হাতে খড়্গ লৈয়া
সম্মুখে কহয়ে মহা ক্রোধযুক্তা হৈয়া।
বৃথা অধ্যয়ন কৈলি ওরে দুষ্টমতি।
বৈষ্ণব নিন্দিলি তোর হবে অধোগতি।
তোর মুণ্ড কাটি যদি করি খান খান।
তবে সে মনের দুঃখ হয় সমাধান।
ওরে দুষ্ট অসুর কি দিব তোরে শিক্ষা।
নরোত্তম অনুগ্রহে হৈল তোর রক্ষা।

[দশম বিলাস]

ঈশান নাগর নামে এক ভক্ত অদ্বৈতাচার্যের একখানি জীবনীকাব্য লেখেন, 'অদ্বৈত প্রকাশ' নামে। অবিশ্বাস্য ঘটনায় ও অলৌকিকতা সৃষ্টিতে এ কাব্যখানি সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে। অদ্বৈতকে তিনি মহাবিষ্ণু-সদাশিবের মিলিতরূপ বলে বর্ণনা করেছেন। চৈতন্যচরিতামৃতে যেখন

কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যদেবকে রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপ বলে ব্যাখ্যা করেছেন এখানে ঈশান অদ্বৈতকে বিষ্ণু-শিবের 'দুই এক রূপ' বলেছেন।

এই ধরণের জীবনীকাব্যই সেকালে লেখা হত। একদিকে লেখা হত মঙ্গলকাব্য, যেগুলিতে বিভিন্ন লৌকিক দেবদেবীর গায়ে হঠাৎ পৌরাণিক সাজ পরিয়ে তাঁদের শক্তির মাহাত্ম্য বর্ণনা চলত কী ভাবে এই সব দেবদেবীর বিরোধী পক্ষ পরাজিত হয়েছে তার থাকত বহুল বিবরণ। জীবনীকাব্য-গুলিও 'মঙ্গল' নামে অভিহিত হয়েছে—সেখানেও দেখা যায় বৈষ্ণব ধর্মগুরুদের অসীম ক্ষমতা, অলৌকিক বল, বিরোধী পক্ষকে পরাজিত করবার অসংখ্য বৃত্তান্ত। এগুলিও মঙ্গল-কাব্যের মত মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠারই কাব্য।

॥ ৩ ॥

আর এই ষোড়শ শতকে ইংল্যাণ্ডে তখন চলছে রাণী এলিজাবেথের যুগ। সে যুগে দেখা দিয়েছেন বেকন, মার্লো সেক্সপীয়র। বার হয়েছে টমাস নর্থের প্লুটার্কের 'Lives' বইয়ের অনুবাদ (১৫৭৯)। এই অনূদিত বইখানি এত জনপ্রিয় হয়েছিল যে পঞ্চাশ বছরে পাঁচটি সংস্করণ শেষ হয়ে যায়। তখন সে দেশে রেনেসাঁসের প্রতিষ্ঠা হয়েছে, মুদ্রাযন্ত্র এসে গেছে। ঐতিহাসিক মার্লো তাঁর 'ডক্টর ফস্টাস' নাটকে এলিজাবেথীয় যুগকে বর্ণনা করে লিখেছেন:

"O what a world of profit and delight
Of power, of honour, of omnipotence"

সেই জীবনোচ্ছ্বসিত যুগের সঙ্গে আমাদের বাংলাদেশের তখনকার সমাজের কোনো মিল নেই। একাদশ শতকের শেষ থেকেই ইউরোপে মধ্যযুগের তন্দ্রা কাটতে থাকে। গায়ে লাগে নব প্রভাতের নিবাসংগীত। তারপর পেত্রার্ক (১৩০৪-৭৪) এলেন রেনেসাঁসের অগ্রদূতরূপে। তিনি তাঁর লরেন্সীয়তে, নিজের 'কামগন্ধহীন' প্রেমিক হৃদয়কে প্রকাশ করলেন। কী অদ্ভুত কর্মময় তাঁর জীবন, গান্ধীরই মতো। তিনি নিজের আত্মচরিত লিখলেন গান্ধীর মতো। আর লিখলেন সমকালীন রোমের সম্রাটদের ধারাবাহিক জীবনী। ইতালীর ফ্লোরেন্স শহরে জানীতলীদের সমাবেশে একদা যে দীপশিখাটি জ্বলে উঠেছিল ধীরে ধীরে সে সমগ্র ইউরোপের চিত্তলোকের অন্ধকার দূর করল। নতুন জীবন দর্শন, প্রাচীন গ্রীক ও রোমান্ শিল্প-সাহিত্য-ইতিহাসের পুনর্চর্চা, বিজ্ঞানবোধ, জীবন-সম্ভোগ, অতিপ্রাকৃতবাদ থেকে মুক্তি-সবই রেনেসাঁস বা নবজাগরণের ফসল। চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকের এই রেনেসাঁসী ঢেউ ষোড়শ শতকের ইংল্যাণ্ডে গিয়া বেঁধেছিল। তার সঙ্গে এসেছিল গভীর দেশপ্রীতি ও জাতীয়তাবাদ. এলিজাবেথ দেশের মানুষের কাছে হয়ে উঠেছিলেন এক মহীয়সী সম্রাজ্ঞী—যিনি স্পেনের বিখ্যাত 'আরমাডা'-আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করে-ছিলেন যে, পরাজয়ের চেয়ে তিনি মৃত্যুকেই বরণ করবেন। স্বভাবতঃই এই যুগে ইংলণ্ডের প্রাক্তন সম্রাটদের জীবন-বৃত্তান্ত আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। প্রাচীন ইতিহাসের প্রতি অনুরাগ অনেক বেড়ে গিয়েছিল। তারই অন্যতম ফল সেক্সপীয়রের ঐতিহাসিক নাটকাবলি এবং প্লুটার্কের কাছ থেকে তাঁর ঋণ গ্রহণ।

॥ ৪ ॥

এদিকে আমাদের দেশে ষোড়শ শতকের শেষে আকবরের সময়ে মোগল বিজয় ঘটে গেছে, পাঠান রাজত্বের অবসান হয়েছে, সুবেদারী শাসনে তথা অর্থনৈতিক শোষণ বেড়েছে—বঙ্কিমচন্দ্র তাই লিখেছেন "আকবর শাহা হইতেই বঙ্গের সর্বনাশ ঘটিল।" কিন্তু দুর্বল জাতি আমরা কী করতে পারি? ঝড়ো জোর বলতে পারি:

তৈ। বিনা কৈলুঁ স্নান করিলুঁ উদক পান
শিও কান্দে ওদনের তরে। (বৃন্দাবনদাস)

এই ভাবেই দেশ চলছিল। কাজেই সেদিন কোথায়

আমাদের এখন শুধু চরিতবান ব্যক্তি থাকে নিয়ে জীবনী হবে, ইতিহাস হবে। কোথা থেকে আসবে সেই বস্তু দুটি বা বহুল পরিমাণে বচন করে আনবে বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান, তর্কনিষ্ঠ সিদ্ধান্ত। এমন ঘটনা অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে আঠারোর শতকের শেষে স্যর উইলিয়ম্ জোন্স 'শকুন্তলা' অনুবাদের সময় যোগ্য সহায়ক পণ্ডিত পাননি, রামমোহন রায় 'ব্রহ্মসভায়' বেদ পাঠের জন্য ব্রাহ্মণ আনিয়েছিলেন, দেবেন্দ্রনাথের সভাপণ্ডিত 'ঈশাবাস্য মিদং সর্বং' শ্লোকটির উৎস ও অর্থ কোনটিই বলতে পারেননি এবং বেদাধ্যয়নের জন্য দেবেন্দ্রনাথকে বারাণসীতে ছাত্র প্রেরণ করতে হয়েছিল। উপনিষদের চর্চা আমাদের দেশে বৈষ্ণব প্রাধান্য যুগে ছিল না বলা যায়না। জীবগোস্বামীর ষট্‌সন্দর্ভ পড়লে বোঝা যায় একথা। কিন্তু জীব বাস করেছিলেন বৃন্দাবনে। বঙ্গদেশে যে-সব বৈষ্ণব বাস করতেন তাঁরা শ্রীমদ্ভাগবতের বাইরে কিছু পাঠ করতেন বলে জানা যায় না। তবে স্মৃতি, ন্যায় ও ব্যাকরণের চর্চা ছিল। কিন্তু সে চর্চাও গতানুগতিক হয়ে পড়েছিল। নতুন পথে বিশেষ কেউ হাঁটেননি।

॥ ৫ ॥

স্বাধীনতা বা দেশপ্রেম শব্দটির সঙ্গে রামমোহন রায়ের পূর্বে আমাদের কেউ পরিচিত করাননি। পরিচিত হবার প্রয়োজনও কেউ বোধ করেননি। 'বিদ্যাইয়া ভাবল উত্তরী' আমরা বেশ নির্বিবাদে মানিতে ছিলাম। সবকিছিনিসকেই আমরা নিয়তি, কর্মফল, দৈব বলে মেনে নিয়েছিলাম। ইতিহাস প্রীতি, বিজ্ঞানবোধ, বিচারনিষ্ঠা—এসবই আমাদের দেশে এসেছে উনবিংশ শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির স্পর্শে। ইহবিমুখতা, দৈববাদ, নিয়তিতত্ত্বের পরিবর্তে তখন পুরুষকার সেবা দেখা দিয়েছে। তারই ফলে রাজা রামমোহন রায় ডেভিড হেয়ার ডিরোজিও অক্ষয়কুমার বিদ্যাসাগর কৃষ্ণমোহন সকলকে পেয়েছি। এই উনবিংশ শতকে আমরা রেনেসাঁসের স্পর্শ পেয়েছি—পেয়েছি মানব স্বীকৃতি, ইতিহাস প্রীতি এবং সেজন্যই পেয়েছি অনেকগুলি জীবনী গ্রন্থ। তখন মানুষকে মানুষ হিসাবে দেখা হচ্ছে, 'অবতার' হিসাবে নয়। অবশ্য উনবিংশ শতকের শেষের দিকে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ বিজয়কৃষ্ণ কেশবচন্দ্র সেন এমনকি কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনও অবতার রূপে কল্পিত ও বন্দিত হয়েছেন। এই অবতার-কল্পনা রেনেসাঁসের মূল সত্তার বিরোধী। 'নব বিধান'-আন্দোলন এবং কেশব চন্দ্র সেনের 'নববিধান'তত্ত্ব এই ধরণের অবতার-বাদকে জাগিয়ে তুলেছিল।

॥ ৬ ॥

পাশ্চাত্যে এজন্য Hagiography ও Biography দুটি সম্পূর্ণ পৃথক শব্দ। Hagio শব্দের অর্থ Saint বা সন্ত, ধর্মের জন্য যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন। কাজেই তার সঙ্গে Biography'র পার্থক্য আছে। Bio শব্দের অর্থ জীবন প্রবাহ। একালে জীবন চরিত রচিত হয়েছে বলে একথা মনে করবার কারণ নেই যে Hagio-graphy অর্থাৎ সন্ত চরিত বা 'অবতার'চরিত আর রচিত হয় না। বড়ই দুঃখের কথা যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী কালে স্বাধীন ভারতে অবতারবাদ, গুরুবাদ, অন্ধ ভক্তি অসম্ভব বেড়েছে। রামকৃষ্ণদেবের মানব স্পর্শ ছুঁয়ে ফেলে 'নারায়ণ' নরদেহে লীলা করতে এসেছিলেন বলে প্রচার করা হয়েছে। এখন প্রায় প্রত্যেকটি 'অভিজাত' পরিবারের একটিঘরে গুরু আছেন, যাঁর কেশস্পর্শে পুণ্য, চরণস্পর্শে মোক্ষ, পাদোদক পানে ব্যাধিমুক্তি হবে বলে বহু 'শিক্ষিত' ব্যক্তি মনে করেন। সেই যে বঙ্কিমচন্দ্র বলে গিয়েছিলেন "মনুষ্য কেহ নহে, মনুষ্য কোন কার্যেরই কর্তা নহে, অতএব মনুষ্যের প্রকৃত গুণ কীর্তনে প্রয়োজন নাই।"—এ মনোভাব এখনো রয়ে গেছে কোনো কোনো মহলে। বঙ্কিমচন্দ্র 'প্রকৃত গুণকীর্তন' করতে বলেছিলেন, অন্ধ, বিচারহীন-গুণকীর্তন নয়। বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসানুরাগী ও মানবপন্থী ছিলেন - তাই তিনি

প্যারীচাঁদ, দীনবন্ধু, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের, জীবন ও সাহিত্য জড়িয়ে যে প্রবন্ধ কয়েকটি রচনা করেছেন সেগুলি 'Life and Works' পর্যায়ের রচনা। তার চেয়ে ভালো লেখা আজও কিছু হয়নি। তবে সেগুলিতে সাহিত্যালোচনার দিকটিই মুখ্য হওয়ায় চরিত্রাংশ সংক্ষিপ্ত হয়েছে। কেন না ঐ প্রবন্ধগুলি আসলে বিভিন্ন গ্রন্থাবলীর ভূমিকা হিসাবে রচিত হয়েছিল।

॥ ৭ ॥

ইংরেজী সাহিত্যে দেখি Biographia শব্দটিকে 'ইতিহাস' থেকে পৃথক করে সর্ব প্রথম ব্যবহার করেন ড্রাইডেন ১৬৮০তে। ঐ সময় প্লুটার্কের 'Lives' বইয়ের যে অনুবাদ প্রকাশিত হয় তার ভূমিকায় ড্রাইডেন 'Biographia' শব্দের অর্থ করলেন 'Lives of Particular Men' অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ মানুষের জীবনী। তারপর ম্যাসন্, জনসন্ বসওয়েল, লকহার্ট documented বা তথ্যসমৃদ্ধ মূল্যবান জীবনী গ্রন্থ রচনা করেছেন। আমাদের বাংলা সাহিত্যের ঊনবিংশ শতক আশ্চর্য সমৃদ্ধ একটি যুগ। বাঙালী পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে, তার সাহিত্য ও শিল্পকে নিপুণভাবে দ্রুত আয়ত্ত করার অপূর্ব-ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে। তাই ১৮৮০র পর থেকে কয়েকখানি মনে রাখবার মত তথ্যপূর্ণ, জীবনী-গ্রন্থ বার হয়েছিল। এই সূত্রে নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'মহাত্মা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত,' মহেন্দ্রনাথ রায়ের 'অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন বৃত্তান্ত,' শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের 'বিদ্যাসাগর জীবনচরিত,' যোগীন্দ্র-নাথ বসুর 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনী' চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিদ্যাসাগর চরিত' বিহারীলাল সরকারের 'বিদ্যাসাগর' প্রভৃতি গ্রন্থের নাম করা যেতে পারে। ইংরেজীতে লেখা কিশোরীচাঁদ মিত্রের দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্যারীচাঁদ মিত্রের ডেভিড হেয়ার, লালবিহারী দে-র আলেকজাণ্ডার ডাফ, জ্ঞানেন্দ্র নাথ গুপ্তের 'রমেশচন্দ্র দত্ত' প্রভৃতি জীবনীগুলিও এই সূত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এইগুলির দিকে তাকিয়েই বোধ করি বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের অষ্টম অধিবেশন সাহিত্য শাখার সভাপতির ভাষণে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেছিলেন—"জীবন চরিতে দিন কতক বাঙ্গালীরা খুব পটুতা দেখাইয়াছিল। কতকগুলি জীবন চরিত বাস্তবিক মহামূল্য রত্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।"

॥ ৮ ॥

রবীন্দ্রনাথ যে জীবনীগুলি লিখেছিলেন সংকলনকালে তিনি তার নাম দিয়েছিলেন 'চারিত্রপূজা'। চরিত্রের শক্তি কে, অন্তরের ভাবসত্যটিকে তিনি দেখেছিলেন তাই তাঁর রচনাগুলি মূলতঃ Subjective। রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও দেবেন্দ্রনাথকে তিনি 'চারিত্র' সম্পদ পুরুষ বলেই শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসুকেও রবীন্দ্রনাথ অন্তর দিয়ে শ্রদ্ধা করতেন। তবে তথ্য, প্রমাণ, কার্যাবলীর দৃষ্টান্ত দিয়ে ইতিহাসের মত তথ্য সাজিয়ে গুছিয়ে জীবনী রচনা করা তাঁর ভালো লাগেনি-সেজন্য কবি টেনিসন্ মারা গেলে তাঁর ছেলে যে টেনিসন-জীবনী গ্রন্থও বার করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ সে-জীবনী পাঠে খুশি হননি। কেননা তার মধ্যে 'ব্যক্তি' টেনিসন আছেন কিন্তু 'কবি' টেনিসন নেই। গোর্কি টলস্টয়ের জীবনে ভালো-মন্দ মিলিয়ে যে তথ্য ভূয়িষ্ঠ জীবনী লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাকেও সমর্থন করেননি। তিনি বরং বললেন :

"ম্যাকসিম গোর্কি টলষ্টয়ের একটি জীবন চরিত লিখেছেন। বর্তমান কালের প্রখরবুদ্ধি পাঠকেরা যাহারা দিয়ে বলেছেন, এ লেখাটী আর্টিষ্টের যোগ্য লেখা বটে। অর্থাৎ টলষ্টয় দোষে-গুণে ঠিক যেমনটি সেই ছবিতে তীক্ষ্ণরেখায় তেমনটি আঁকা হয়েছে। এর মধ্যে দয়ামায়া ভক্তি শ্রদ্ধার কোন কুয়াশা নেই।·· টলষ্টয়ের কিছুই মন্দ ছিল না একথা বলাই চলে না : খুঁটিনাটি বিচার করলে তিনি যে নানা বিষয়ে সাধারণ মানুষের মতই এবং অনেক

বিষয়ে তাদের চেয়ে দুর্বল, একথা স্বীকার করা যেতে পারে। কিন্তু যে সত্যের গুণে টলষ্টয় বহুলোকের এবং বহুকালের, তাঁর ক্ষণিক মূর্তি যদি সেই সত্যকে আমাদের কাছ থেকে আচ্ছন্ন করে থাকে তাহলে এই আশ্চর্য আর্টিষ্টের ছবি নিয়ে আমার লাভ হবে কি। গোর্কির টলষ্টয়ই কি টলষ্টয়! বহুকালের ও বহুলোকের চিত্তকে যদি গোর্কি নিজের মধ্যে সংহত করতে পারতেন তাহলেই তাঁর দ্বারা বহুকালের বহু লোকের টলষ্টয়ের ছবি আঁকা সম্ভবপর হত।' [রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৯শ খণ্ড ৩৮২পৃঃ]

'যে সত্যের গুণে টলষ্টয় বহু লোকের' রবীন্দ্রনাথ সেই বহৎ সত্যটিকে দেখতে চেয়েছিলেন তিনি ভালো-মন্দর মেলানো 'ব্যক্তি-টলষ্টয়কে দেখতে চাননি। সেজন্যই তিনি সকল মানুষের জীবনী লেখার দরকার আছে বলে মনে করেননি। রবীন্দ্রনাথের এই অন্তর্মুখী Subjective দৃষ্টি তাঁর নিজস্ব, তিনি সেই দৃষ্টি দিয়েই তাঁর শ্রদ্ধাভাজন চরিত্রগুলিকে ব্যাখ্যা করেছেন। এ-ও এক ধরনের 'বীর পূজা' বা Hero-worship তবে ঠিক কার্লাইলের পন্থায় নয়।

॥ ৯ ॥

'বীরপূজা' নামে যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ একখানি বই লেখেন। ঐ নাম তিনি কার্লাইলের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। 'বীরপূজা'-র 'মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' 'কর্মবীর মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন', 'চরিত্রবীর মৃত মহাত্মা প্যারীচরণ সরকার ও প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী' এবং 'ভক্তিবীর সাধু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও অঘোরনাথ গুপ্ত' প্রবন্ধগুলি সংকলিত হয়েছে। কার্লাইল যেমন 'Hero' কে নানা পর্যায়ে ভাগ করেছিলেন যোগেন্দ্রনাথও 'বীর' বলতে অনুরূপ ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। বীরপূজার ভাবটি আমাদের দেশে উনবিংশ শতকের শেষভাগে স্বাভাবিক ভাবেই প্রাধান্য লাভ করেছিল। এই 'বীরপূজা' ভাবটির সঙ্গে আমাদের বাংলাদেশের 'জাতীয়তাবোধ'-চেতনা জড়িত। ১৮৬৭তে হিন্দু মেলার প্রতিষ্ঠা থেকে এই জাতীয়তা-বোধ নানা ভাবে নানা ক্ষেত্রে সঞ্চারিত হতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে বাংলাদেশে বিপ্লবী সমিতি ও বৈপ্লবিক কার্যকলাপের উদ্ভব হয়। ১৮৯৪-এ তিলকের গণপতি উৎসব, ১৮৯৫-এ শিবাজী উৎসব, ১৮৯৭-এ চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়ের ফাঁসির মধ্য দিয়ে মহারাষ্ট্রে বৈপ্লবিক কর্মপ্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলাদেশে এর পূর্বেই ইতালীর স্বাধীনতা-যুদ্ধের নেতৃদ্বয় ম্যাটসিনী ও গ্যারীবল্ডীর জীবনী বাংলা ভাষায় রচিত হতে থাকে। যুগেতিহাসের দিক থেকে এই বইগুলির গুরুত্ব যথেষ্ট। এগুলি ঐতিহাসিক জীবনী বা 'Historical Biography.' যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ বৈপ্লবিক আদর্শে বিশ্বাসী ও বিপ্লবী সংগঠনভুক্ত ছিলেন। ১৯০৩-এ অরবিন্দ বরোদা থেকে যোগেন্দ্রনাথের শ্যামপুকুরস্থ ভবনে এসে ওঠেন। বিদ্যাভূষণ আত্মোৎসর্গের পথে স্বাধীনতা আনার জন্য যুব ও ছাত্রদের সংঘবদ্ধ হতে পরামর্শ দিতেন। 'জোসেফ ম্যাটসিনি ও নব্য ইতালী' গ্রন্থের (১৮৭৯) মুখবন্ধে তিনি লিখেছেন : "যে যে প্রাতঃস্মরণীয় চরিত মহাত্মাগণের নিরন্তর যত্নে ও অদ্ভুত আত্মোৎসর্গের মোহিনী শক্তিতে দাসত্ব প্রপীড়িত জাতি সকল আত্ম তুলিয়া জন্মভূমির চরণে আত্মবিসর্জন করিতে শিখিয়াছে, তাঁহাদিগের জীবিতমালা জাতীয় ভাষায় গ্রথিত করা আমার জীবনের একটি প্রধান ব্রত।" একটি পরাধীন দেশের যথাবিত্ত শিক্ষিত সমাজের মধ্যে যখন জাতীয়তাবাদের স্ফুরণ হয় তখন স্বাভাবিক ভাবেই ম্যাটসিনি, গ্যারীবল্ডীর জীবনী রচনা দেখা দেয়। তাঁরা যে-পন্থায় ইতালীর ঐক্য ও স্বাধীনতা আনয়ন করেছিলেন, স্বভাবতই সে-পন্থা অন্যান্য পরাধীন দেশের বিপ্লবী দলকে আকৃষ্ট করবেই। যোগেন্দ্রনাথ যে 'আত্মোৎসর্গ' বা 'প্রাতঃস্মরণীয় চরিতমালা' (১৮৮৩) রচনা করেছিলেন সেগুলি ঠিক ছাত্রপাঠ্য হবার জন্য রচিত নয়। দেশপ্রেম প্রচারই তার লক্ষ্য। এগুলি ইতিহাস ও জীবনচরিতের সমন্বিত রূপ। এই সময়ে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও ইউরোপের স্বাধীনতা

সংগ্রামের ইতিহাস প্রচার করতে থাকেন।

॥ ১০ ॥

চরিতবিষয়ক প্রবন্ধ রচনায় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও বিপিনচন্দ্র পালের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রামেন্দ্রসুন্দরের 'চরিতকথা' গ্রন্থে বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, রজনীকান্ত, উমেশচন্দ্র বটব্যাল, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ভিন্ন হেলম-হোলৎস ও আচার্য কৃষ্ণকমল সম্পর্কে দুটি রচনা স্থান পেয়েছে। এ-রচনাগুলি তথ্য-সমৃদ্ধ দীর্ঘ জীবনী নয়, প্রশস্তিমূলক বিশ্লেষণ-ধর্মী সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধমাত্র। রামেন্দ্রসুন্দর আপেক্ষিক রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি স্বদেশপ্রেমী ও স্বজাতিসেবী। তিনি 'বঙ্গভঙ্গ' আন্দোলন বা 'স্বদেশী আন্দোলনে'র সঙ্গে নিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়েছিলেন। এই স্বধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অধ্যাপক হলেও বহুক্ষেত্রে সমকালীন পাশ্চাত্যবিরোধী শাস্ত্রবোধের আকর্ষণে স্বভাবতই পাশ্চাত্যের সমাজ ধর্মকে মর্মন করতে পারেননি। তাই 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধে লিখলেন :

> 'বঙ্গদর্শনের বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্যশিক্ষার মোহবন্ধন সম্পূর্ণ কাটাইয়াছিলেন কিনা বলিতে পারি না—কিন্তু 'প্রচারের' পশ্চাতে যে বঙ্কিমচন্দ্র দাঁড়াইয়াছিলেন তাঁহাকে রাহুগ্রাসমুক্ত পূর্ণচন্দ্রের মত দীপ্তিমান দেখি। তিনি যখন গীতার উক্তির আশ্রয় লইয়া স্বদেশবাসীকে ভয়াবহ পরধর্ম হইতে স্বধর্মে প্রত্যাবৃত্ত হইতে আহ্বান করিতে ছিলেন।...এই হিসাবে যাহা বিদেশীর ধর্ম তাহা ভারত-বাসীর ধর্ম হইতেই পারে না। ইউরোপের প্রাচীন ইতিহাস ও ইউরোপের আধুনিক সমাজতন্ত্র যখন ভারত-বর্ষের প্রাচীন ইতিহাস ও ভারতবর্ষের আধুনিক সমাজ-তন্ত্রের সঙ্গে এক নহে তখন ইউরোপীয়দের ধর্ম আমাদের কাছে পরধর্ম।'

বিংশ শতকের গোড়ায় রবীন্দ্রনাথও অনুরূপ মনোভাবের রচনা দিয়েছিলেন তাঁর 'নববর্ষ', তাঁর 'ভারতবর্ষের ইতিহাস', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা' প্রভৃতি প্রবন্ধে।

রামেন্দ্রসুন্দর সমাজানুগত্যের বিরুদ্ধে কোনো দিক থেকেই সমাজ-বিদ্রোহকে সমর্থন করেননি। তার একটি কারণ তাঁর স্বধর্ম ও স্বসমাজ প্রীতি-এবং এই ধর্ম ও সমাজ-প্রীতির পিছনে তাঁর নিজের অনুভূত স্বদেশ-প্রীতি। সমাজ বিদ্রোহের মূল তিনি লক্ষ্য করেছেন পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে। তাঁর সঙ্গে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মিল খুব বেশি। রামেন্দ্রসুন্দর চার্লস ডারউইন-ওয়ালেস-হার্বার্ট স্পেনসার এর ব্যাখ্যাত যোগ্যতমের উদ্বর্তন, প্রাকৃতিক-নির্বাচন ও সংশ্লেষাত্মক দর্শন মতবাদের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তাই প্রাণী যেমন নিজের আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষার জন্য উপযোগী উপাদান ও ব্যবস্থাকে নির্বাচন করে নেয় এবং ক্রমবিবর্তনের পথে কালক্রমে অপ্রয়োজনীয় অংশগুলি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়—তেমনি সমাজে যে দেবাচারগুলি একদিন স্থান হয়েছিল সেগুলির তৎকালীন পটভূমিকার প্রয়োজন ছিল এবং যেদিন তারা অপ্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হবে, ক্রমবিবর্তনের সূত্রানুযায়ী তারা বিলীন হয়েই যাবে। অতএব সমাজবিদ্রোহ বা revolution কাম্য নয়, ক্রমবিবর্তনের অনিবার্য ধারানুসরণই কর্তব্য বলে রামেন্দ্রসুন্দর মনে করতেন। ব্যষ্টি ও সমাজের দ্বন্দ্ব নয়, সামঞ্জস্যসাধনকে রামেন্দ্রসুন্দর বড়ো বলে মনে করতেন। তাছাড়া বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, রজনীকান্ত গুপ্ত প্রভৃতি রচনাগুলিতে তিনি সকলকেই শ্রদ্ধা জানিয়েছেন মুখ্যতঃ তাদের 'স্বদেশীয়তা'র জন্য। সেজন্যই 'প্রচার' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত বঙ্কিমচন্দ্রকে তিনি 'রাহুগ্রাস মুক্ত পূর্ণচন্দ্র' বলে অভিহিত করেন, স্বদেশীয় শাস্ত্র উদ্ধার ও রক্ষার জন্য দেবেন্দ্রনাথকে 'মহাবরাহ অবতার' বলে ঘোষণা করেন। তিনি এঁদের জীবনে 'আত্মা' ও 'সংযমে'র সামঞ্জস্য লক্ষ্য করেছেন-তাই তাঁর কাম্য আদর্শ।

॥ ১১ ॥

বিপিনচন্দ্র পালের 'চরিত কথা' গ্রন্থে সুরেন্দ্রনাথ

বন্দ্যোপাধ্যায়, অশ্বিনী কুমার দত্ত, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, স্বর্গীয় উইলিয়ম টি, ষ্টেড, প্রভৃতি রচনা স্থান পেয়েছে। এই রচনাগুলিকে সাধারণভাবে চরিত-মূলক বলা চলে না। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর গ্রন্থের এরই নাম। রামেন্দ্রসুন্দরের রচনাগুলি সংক্ষিপ্ত এবং মোটামুটি ভাবে প্রবন্ধমূলক। ঐ রচনাগুলি তথ্যবিকীর্ণ নয়, আবার পাণ্ডিত্য পূর্ণ রচনাও নয়। বিপিনচন্দ্র যে রচনাগুলি লিখেছেন সেগুলি বিশ্লেষণধর্মী, মননশীল ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা। তিনি যাদের বিষয় আলোচনা করেছেন তাঁরা সকলেই উনবিংশ শতকের শেষ ভাগে ও বিংশশতকের প্রথম ভাগে প্রতিষ্ঠাপন্ন। বিপিনচন্দ্র প্রচলিত পথে তথ্যপূর্ণ documental জীবনী লেখেননি। তিনি একদিকে পাশ্চাত্যের ধর্মেতিহাস, সমাজ বিজ্ঞান, তথা সমাজ-দর্শনের অনুরাগী পাঠক ও সতর্ক বিচারক অন্যদিকে প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্র, গুরুবাদ, সত্ত্ব-রজঃ-তম সাধনা, লোকতত্ত্বঃ তত্ত্ব প্রভৃতিতে তাঁর যথার্থ অধিকার ছিল। উনবিংশ শতকে আমাদের দেশে রামমোহন, দেবেন্দ্র নাথ, কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ সকলেই স্বদেশের ধর্ম-চিন্তাকে নব তাৎপর্যে দান করেছেন। পাশ্চাত্যদেশের ধর্মাদর্শ ও দর্শনকে তাঁরা এড়িয়ে যাননি, বিচার করেছেন, বিশ্লেষণ করেছেন। ধর্মের বিচার কখনও সমাজকে বর্জন করে হয়নি। বিপিনচন্দ্র পাশ্চাত্য সমাজবিজ্ঞানের Homogeneity Differentiation, ও Integration যথাক্রমে thesis, anti-thesis ও synthesis। রূপে ব্যাখ্যা করেছেন। বিপিন-চন্দ্র সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের বিবর্তনকে সমাজ রূপান্তরের spiral গতি রূপে নির্দেশ করেছেন। অর্থাৎ তমোগুণাত্মক অবস্থায় সমাজে রাজসিক ভাব (রজোগুণ) জাগ্রত হবেই এবং পরিশেষে সাত্ত্বিকস্তরে উন্নীত হবে। এই ত্রিগুণাত্মক-দর্শনকে তিনি আমাদের নবযুগের বাংলাদেশের ধর্ম ও সমাজেতিহাসের চর্চায় প্রয়োগ করেছেন। বিপিনচন্দ্রও রামেন্দ্র সুন্দরের মত ডারউইন-হার্বার্ট স্পেনসারের মতানুবর্তী হয়ে লিখেছেন :

"সমাজ একবার সজীব ও আত্মস্থ হইয়া উঠিলে, সামাজিক ব্যাধিসকলের বীজাণুগুলি আপনি মরিয়া যাইবে বা মুমূর্ষু হইয়া পড়িয়া থাকিবে।"

বিপিনচন্দ্র এই প্রবন্ধগুলিতে হিন্দুধর্মের শাক্তপ্রাধান্য, গুরুবাদ, অবতারবাদ, যোগসিদ্ধি, মহাবিষ্ণু বা নারায়ণতত্ত্ব, লৌকিকাচার প্রভৃতি প্রসঙ্গগুলিকে যুগসমস্যার সঙ্গে মিলিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। কাজেই এই প্রবন্ধগুলি চরিত প্রবন্ধ বা Biographical essay বললে ঠিক হয় না—প্রত্যেকের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের re-valuation বা নবমূল্যায়ন করা হয়েছে। ঐ যুগে আমাদের স্বদেশিকতা, শাস্ত্রালোচনা, ইতিহাসচর্চা বা সমাজ সমীক্ষা কোনটিই স্বতন্ত্র ছিল না। বিশেষতঃ বিপিনচন্দ্র ধর্মান্দোলন ও সমাজ সংস্কারের আলোচনায় 'আত্মরক্ষ' বংশ-রক্ষাতত্ত্ব', গীতা, গুরু ও অবতারবাদের নতুন ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেছেন। পরবর্তীকালে মোহিতলাল মজুমদারের 'বাংলার নবযুগ' গ্রন্থে এ ধারার পরিচয় আছে।

॥ ১২ ॥

কিন্তু আজ আমাদের প্রধান দরকার ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে জীবনীরচনায় অগ্রসর হওয়া। প্রচুর ও উপযুক্ত তথ্য না পেলে জীবনীরচনা সার্থক হবে না। আবেগ ও কল্পনার স্থান জীবনীসাহিত্যে অত্যন্ত গৌণ, মুখ্য হল তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিচার বিশ্লেষণ এবং উপস্থাপনা। চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ, লোকশ্রুতি, মৌখিক গল্প, স্মৃতিকথা, ডায়েরি, ভ্রমণপঞ্জী, সমকালীন পত্র, পত্রিকা, ইত্যাদির যতদূর সম্ভব, নিষ্ঠার সঙ্গে আমাদের সংগ্রহে প্রবৃত্ত হতে হবে। অধিকাংশ পত্র পত্রিকাই এখন জরাজীর্ণ অবস্থায়, কিছুদিন পরে তার এক-অক্ষরও আর পড়া যাবে না। প্রয়োজনীয় দলিল গুলিকে সেই ভাবে রক্ষা করতে হবে। তবেই ভবিষ্যতে ভালো তথ্যসমৃদ্ধ জীবনী রচিত হবে। মনে রাখতে হবে—"A well-written "Life" is almost as rare as a well-spent one"

অনুবাদ সম্বন্ধে

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

বাংলা ভাষায় দেশ-বিদেশের সাহিত্য থেকে বাছাই করা বইয়ের অনুবাদ প্রকাশিত হচ্ছে, এ প্রকৃতই সুখের কথা। একটা মানুষের পক্ষে একটা-দুটোর বেশী ভাষা শেখা সম্ভবও নয়, আর প্রত্যেকটি ভাষা শিখে, সেই ভাষার সাহিত্য-সম্পদ আহরণ করা সহজও নয়। কাজেই প্রয়োজন আছে অনুবাদের এবং যাঁরা আজ বিদেশী সাহিত্য অনুবাদে ব্রতী হয়েছেন, তাঁরা প্রশংসার্হ।

কিন্তু লক্ষ্য করতে হবে যে আমাদের এই অনুবাদ শুধু ইদানীন্তন কালের গল্প উপন্যাসেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। কাব্য, নাটক ও প্রবন্ধ-নিবন্ধে, অর্থাৎ সাহিত্যের অপরাপর বিভাগে আমরা কমই হাত দিয়েছি। আর প্রাচীন যুগ ও মধ্যযুগের সাহিত্য-সম্পদ যা, তা-ও খুব কমই আমদানি করেছি বাংলা ভাষায়।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলছি, হোমরীয় মহাকাব্য দুটির বা এস্কিলাস, সফোক্লিস, ইউরিপেদিসের নাটক গুলির বা প্লেটো, এরিস্টটলের রচনাবলীর সঙ্গে ইংরেজী না-জানা বাঙালীর পরিচয়ের কোন সুযোগ নেই। সুযোগ নেই ভার্জিল, ওভিদ, জুভেনাল, হোরেস প্রভৃতি লাতিন কবির এবং সিসেরো, লিভি, তাসিতাস প্রমুখ গদ্য লেখকের সঙ্গে যোগাযোগ করার।

এই ভাবে দান্তে, পেত্রার্ক, বোকেচিও, সারভান্তেস, কালদেরণ, লোপ ও ভাগা, মাল্লোয়া, সেক্সপীয়ার, বেকন, মিল্টন ব্যাকলে, হুম, ডিকেন্স, স্কটের, রাসিন প্রভৃতির উল্লেখ করা যেতে পারে। করা যেতে পারে গ্যয়টে, সিলার, হাইনে, পুশকিন, লারমনতভ, গোগল, আরো অনেকের। করা যেতে পারে হাফিজ, রুমি, জামী, সাদ্রিয়ারীর এবং বাইবেল, জেন্দাভেস্তা, তালমুদ, কোরাণ শরীফের। বাংলা ভাষায় এই সব জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থকার ও গ্রন্থের অনুবাদ নেই। কিন্তু বাইরের কথা ছেড়ে দিলেও ভারতীয় সাহিত্যের পূর্ণ পরিচিতি লাভের সুযোগই কি আমরা অবারিত করতে পেরেছি বাঙালী পাঠকের কাছে? কখানা বইয়ের আমরা অনুবাদ করেছি বা কখানা বই আজ বাজারে পাওয়া যায়, প্রাচীন ও আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা স্থাপনের ইচ্ছা হলে?

আজ হয়ত অনেকে জানেন না যে বিগত শতাব্দীর বাঙালী পণ্ডিতরা এই শেষোক্ত কাজটা নিষ্ঠার সঙ্গে সুরু করেছিলেন। আমরা যোগ্যতার সঙ্গে তার ধারা অনুসরণ করিনি। যতটা কাজ তাঁরা করেছিলেন, তা-ও বাঁচিয়ে রাখার সজাগতা আসেনি আমাদের মনে। দ্রুত একটা তালিকা দিয়ে যাচ্ছি, যা খুব ক্ষুদ্র হবে না।

রমেশচন্দ্র দত্ত ও যোগেশচরণ বিদ্যাভূষণ বাংলায় বেদের অনুবাদ করেছিলেন। দশ বারো খানি উপনিষদ ও উল্লেখযোগ্য স্মৃতিগুলির অনুবাদ করেছিলেন আরো কোন কোন স্বল্পখ্যাত লেখক। রামায়ণের অনুবাদ ছিল হেম ভট্টাচার্যের, কালীপ্রসন্ন সিংহের এবং বর্ধমান রাজবাড়ীর মহাভারত ছিল। বঙ্গবাসী কার্য্যালয় করেছিলেন অনেকগুলি পুরাণ ও স্মৃতিগ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ। ভাগবত এবং যোগবাশিষ্ঠেরও অনুবাদ ছিল তাঁদের। শকুন্তলা, বিক্রমোর্বশী, উত্তরচরিত, মালতী-মাধব, মুদ্রা রাক্ষস, বেণী সংহার, রত্নাবলী প্রভৃতি নাটকের এবং রঘুবংশ, মেঘদূত, কুমার সম্ভব, কিরাতার্জুনীয়, নৈষধ প্রভৃতি কাব্যের অনুবাদ করেছিলেন যথাক্রমে জ্যোতিরিন্দ্র

নাথ ঠাকুর ও কবিওলাকর নবীনচন্দ্র দাস।

এছাড়া মনু, কৌটিল্য, ভরত, বাৎসায়ন, চরক, সুশ্রুত, ভাস্করাচার্য, পানিনি ও পাদকাব্যের ও দাক্ষাৎ পাওয়া যেত বাংলা ভাষায়। কিন্তু আজ এ-সব বইয়ের নাম-গন্ধও খুঁজে পাওয়া যায় না কোথাও। সবেকী সংস্করণগুলি লুপ্ত হয়েছে। তার সংশোধিত পুনর্মুদ্রণ হয়নি। নূতন যুগের পণ্ডিতরা নূতন করে এই সব পুরাতন শাস্ত্র ও সাহিত্য অনুবাদের মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টাও করেননি বাঙালীর সামনে। ফলে যে সেকাল নিয়ে গর্ব করি আমরা, তার ব্যাখ্যা সংগ্রহ করতে হয় আমাদের বিদেশী পণ্ডিতদের বই-পুঁথি থেকে। নিজে দেখে শুনে এবং পড়ে বুঝে ও ওয়াকিবহাল হবার সুযোগ নেই। সেকাল থেকে মধ্যযুগে এলেও অবস্থার কিছুমাত্র পরিবর্তন দেখা যাবে না। যদিও এই আবহকেও বাংলা ভাষায় সমুপস্থিত করার চেষ্টা করেছিলেন একদিন বাঙালী পণ্ডিতরা।

তাদিলদের কুরলগ্রন্থ, শিখদের গ্রন্থ-সাহেব এবং হিন্দী তুলসী রামায়ণ একদা বাংলায় অনুবাদ হয়েছিল। নলিনী মোহন শাস্ত্রীর কুরল এবং হারাণ চাকলাদারের গ্রন্থ সাহেব সন্ধানী মানুষরা নিশ্চয় দেখেছেন। নিশ্চয় দেখেছেন তাঁরা সতীশ দাশগুপ্তের তুলসী রামায়ণ। মধ্যযুগীয় সন্ত-সাধকদের মধ্যে কবির, দাদু, মীরা, রজ্জবালী, তুকারাম, নামদেব, নরসিং মেহতা, শঙ্কর দেব, মাধব দেব, তিরুবল্লুবর প্রমুখের ভজনাবলীরও অনেক অনুবাদ ছিল। কিন্তু কোনটাই আজ আর খুঁজে পাওয়া যায় না। রক্ষণ ও মুদ্রণের অভাবে বেমালুম লুপ্ত হয়ে গেছে সব।

এর পর আধুনিক কাল এবং একালে আমরা বিদেশী গল্প উপন্যাসই শুধু অনুবাদ করা সুরু করেছি এবং নিরন্তর একালের মধ্যেই আবদ্ধ রেখেছি আমাদের প্রচেষ্টা। বিদেশের পুরানো ক্লাসিক্স ও আমাদের আকর্ষণ করেনি, করেনি ভারতের একালীন সাহিত্যও। তাই প্রাগাধুনিক তামিল কবি ভারতী, তেলেগু কবি ত্যাগরাজ ও সন্ত লোকান্তরিত মলয়ালী কবি ছেল্লেখোল আজও আমাদের অচেনা। ওড়িয়া কবি উপেন্দ্র ভঞ্জ, রাধানাথ রায় এবং মধুসূদন রাওকে আমরা উল্টেও দেখেনি। জয়শঙ্কর প্রসাদ, ভারতেন্দু হরিশ চন্দ্র, মৈথিলশরণ গুপ্ত, প্রেমচন্দ, জৈনেন্দ্রকুমার প্রমুখ হিন্দী লেখকের নাম হয়ত আমরা জানি। কিন্তু রচনার সঙ্গে কোনই পরিচয় নেই আমাদের।

সাম্প্রতিকদের কথা না হয় আর নাই বললাম। পাশাপাশি এক সঙ্গে বাস করেও আমরা ভারতবর্ষের সমসাময়িক সাহিত্যিকদের নাম পর্যন্ত জানিনা। অথচ লজ্জার কথা হলেও স্বীকার করতে হবে যে শিক্ষিত ভারতবাসী আজ রুটেন, ফ্রান্স নরোওয়ে, ইতালী, রাশিয়া প্রভৃতি দেশের সমসাময়িক সাহিত্যের সমস্ত অলিগলির খবর রাখেন। কেননা এই সমস্ত সাহিত্যের ঐশর্য তার হাতে পৌঁছে দিয়েছে ইংরেজী অনুবাদ। আমাদের মাতৃভাষাকেও অমনি সম্পদশালী করতে হবে অনুবাদের সমৃদ্ধিতে। তবেই আমরা এক দিকে যেমন ভারতের অতীত ও বর্তমানকে পুরোপুরি চিনব, অন্যদিকে তেমনি ভারতের সঙ্গে জগতের আন্তরিক মৈত্রীও গড়ে তুলতে পারব। মনে রাখতে হবে, নানা ভূষা ও ভাষার পার্থক্য সত্ত্বেও ভারতীয় মননশীলতার গভীরে অন্তঃপ্রবাহী একটা ঐক্য আছে। এই ঐক্য জানবে পরস্পরের সাহিত্য অনুধ্যান থেকে। আবার সর্বমানবিক ঐক্যের বোধটি জাগবে, আপন দেশের ভাব-ভাবনাকে অন্যদেশের মননশীলতার কষ্টিপাথরে ফেলে তার মূল্য যাচাই করা হলে।

যুগদিক থেকেই অনুবাদের আবশ্যকতা বলে শেষ করা যায় না। দুঃখের বিষয়, এ জায়গায় আমাদের উদ্যম এখনো পর্যন্ত ষোল আনা অসংহত ও অসম্পূর্ণ এবং সেই কারণেই তা থেকে কোন লাভজনক সুফল আশা করতে পারি না আমরা। কি বিড়ম্বনার কথা ভাবুন ত, যিনি শুধু বাংলা জানেন, দুনিয়ার আর কোন ভাষা জানেন না, তিনি ইচ্ছা করলে, দুনিয়ার ত নয়ই, আপন দেশেরও প্রাচীন এবং আধুনিক

জ্ঞান-বিজ্ঞানের, তথা সাহিত্য-সংস্কৃতির অন্তর্লোকে প্রবেশের অধিকারে বঞ্চিত! আমাদের ভয়াবহ অনুবাদের দৈন্যই এর প্রধান কারণ। আমি শুধু সাহিত্য ও সাহিত্যধর্মী গদ্য গ্রন্থাদির কথাই বলেছি। ইতিহাস, অর্থনীতি, আইন, সমাজ-বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, দর্শন, বস্তু-বিজ্ঞান প্রভৃতির কথা বলিনি। এ-সব বিভাগে বাংলা ভাষায় মূল বইও নেইই, প্রামাণ্য বিদেশী বইয়ের অনুবাদও নেই।

কাজেই বাংলা ভাষার দিগ্বিজয়ী গরিমা নিয়ে আমরা যে লাফালাফি করি, তার সব টুকুই কি ধাপ্পা? আমাদের ভাষার সঙ্গে ইংরেজী ও ফরাসী ভাষার তুলনা করলেই বোঝা যাবে, আমরা শুধু ছোট গল্প, লঘু প্রবন্ধ ও লিরিক কবিতাই লিখেছি, যা প্রথম শ্রেণীর। এখানে আমরা পড়ে আছি এত পিছনে যে তার কোন আনুপাতিক হিসাবই হতে পারে না।

এজন্যে আমার প্রস্তাব: একটি সরকারী নিয়ন্ত্রিত প্রকাশ ভবন তৈরী হক এবং তার পক্ষ থেকে পর্যায়ক্রমে একশো বইয়ের একটি বিশ্ব-পরিচয় গ্রন্থমালা বাংলায় প্রচারের ব্যবস্থা হক। এই গ্রন্থমালার দাম যে সুলভ করতে হবে, এ অবশ্য বলাই বাহুল্য। এই রকম একটা প্রয়াস ভিন্ন মঙ্গল নেই!

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

অমিয় চক্রবর্তী

"...কাব্যসৃষ্টির একটা দিক প্রত্যহ জীবনকে স্পর্শ করে, আরেক দিকে তার ভূমিকা নিত্য স্বর্গালোকে অধিষ্ঠিত—আপনার কবিতায় এই দুই দিকেরই পরিচয় পেলাম।... কবিতা উভচর এবং বহুচর—অতি সূক্ষ্ম সামঞ্জস্যেই তার প্রাণ। আপনার কবিতায় সেই প্রাণের সন্ধান পেয়েছি।... পৃথিবীকে আপনি স্পষ্ট চোখে দেখেছেন—এ বড়ো আশ্চর্য দেখা।"

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

"...আমি আপনার কবিতার অনুরাগী; এবং ইতিমধ্যে আপনার সহজ প্রতিভা যে অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিরন্তর পরিণতির দিকে এগোচ্ছে তা আমি বারংবার লক্ষ্য করেছি।...আমি এই রকম সচল মনীষার পক্ষপাতী, এবং হয়তো তাই আপনার লেখা আমাকে এতটা টানে।...আমার মতে আধুনিক বাঙালী কবিদের মধ্যে যাঁরা ভবিষ্যতেও সাধুবাদ পাবেন, আপনি তাঁদের অন্যতম।...

অন্নদাশঙ্কর রায়

"...আপনার কবিতাগুলিতে প্রকৃত কাব্যরসের স্বাদ পাওয়া যায়, আপনার মূল্যবোধও সুস্থ মানুষের।"

এই কবির নতুন কাব্যগ্রন্থ

১৫ই আষাঢ় প্রকাশিত হয়েছে **দিনযাপন** দাম দু'টাকা

আধুনিক স্প্যানিশ কবিতা

আন্তর্জাতিক ভাষা হিসাবে স্প্যানিশের স্থান যদিও তৃতীয়, সাহিত্যের দরবারে তার তেমন প্রতিপত্তি নেই। বরং রুশ বা নরওয়েজীয় সাহিত্য তার চেয়ে অনেক খ্যাতি-প্রতিষ্ঠ। ১৯৫৬ সনে ষ্টকহলম থেকে ঘোষিত একটি নামের সঙ্গে তাই বিস্ময় জড়ানো ছিল। স্প্যানিশ ভাষাভাষী সাহিত্যিক অবশ্য এর আগেও নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন জন তিনেক। কিন্তু বিশেষ করে কবিতা সম্পর্কে আধুনিক কালে স্প্যানিশ ভাষার সুখ্যাতি ছিল না। হুয়ান রামন হিমেনেথের পুরস্কার প্রাপ্তিতে বিস্ময় ছিল এইখানেই। তিনি প্রবুদ্ধ কবি। এই পুরস্কার প্রদানের যথার্থতা নিয়েও কোনো প্রশ্ন নেই আজ আর। বরং এই ভাষার আধুনিক কবিদের সৃষ্টি যারা সম্পর্কে কৌতূহল জেগেছে পাঠক চিত্তে।

হুয়ান রামন হিমেনেথের সঙ্গে আমাদের বাংলাদেশের একটা হার্দ্য সম্পর্ক ছিল। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত রবীন্দ্রনাথ যখন দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছেন ইউরোপে স্পেন দেশে হিমেনেথ সম্পত্তি তাঁর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা বহন ক'রে এনেছিলেন। আর শুধু সেটা সাময়িক একটা উচ্ছ্বাস মাত্র ছিলনা যেমন দেখা গেছে ইয়েট্‌স, স্পেণ্ডার প্রমুখ অনেক ইংরাজ কবিদের ক্ষেত্রে। শ্রীমতী থেনোবিয়া কামপ্রুবি হিমেনেথ দীর্ঘকালের সাধনায়, রবীন্দ্ররচনাবলীর এক বিরাট অংশ অনুবাদ করেছেন। হিমেনেথও অনেকগুলি প্রখ্যাত কবিতা লিখেছেন রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য আশ্রয় ক'রে। সেগুলির বিস্তৃত পরিচয় পাঠকদের আগ্রহের বিষয় হতে পারে কিন্তু আমাদের আলোচনার পরিধির বাইরে।

হিমেনেথ রবীন্দ্রনাথের মতই স্বদেশে শ্রেষ্ঠ কবির মর্যাদা পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের মতই তিনি প্রভাবিত করেছেন তাঁর পরের যুগের কবিদের। তবু তাঁকে আমরা আধুনিক কবি পর্যায়ে ধরবো না। বরং ফেদেরিকো গার্সিয়া লর্কা (১৮৯৯-১৯৩৬) যিনি বাংলা দেশের নজরুল ইসলাম এবং জীবনানন্দ দাশের সমান বয়সী তাঁকে নিয়ে আমরা আলোচনা শুরু করতে পারি।

কিন্তু সব রচনার পিছনেও একটা ভূমিকা থাকে সেই ভূমিকা সম্পর্কে বিন্দু বিসর্গ না জানলে যে কোনো দেশের কাব্য পরিচয় অসম্পূর্ণ থাকতে বাধ্য। আমরা যথাসম্ভব সংক্ষেপে সেই ভূমিকাটি আলোচনা ক'রে প্রসঙ্গে যাবো।

অজিত বসু

আজকের স্প্যানিশ কবিতা, আমরা আগেই বলেছি—যদিও সুখ্যাত নয় তেমন, এর অতীত অধ্যায় গৌরবদীপ্ত। সপ্তদশ শতাব্দী জুড়ে বহু খ্যাতনামা কবি অলঙ্কৃত করেছেন তার সাহিত্য। সপ্তদশ শতাব্দীর স্বনাম সুখ্যাত কবি লুই-দ-গোঙ্গোরা শুধু সে যুগে স্বদেশের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন তাই নয়—তিনি যে রচনা রীতির জন্ম দিয়েছিলেন ইংল্যাণ্ড ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের বিশিষ্ট আধুনিক কবিরাও তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। কবিতাকে সংহত ও ব্যঞ্জনাগভীর করে তুলতে গিয়ে গোঙ্গোরা প্রাচীন কাব্য প্রসঙ্গ তুলেছেন সহযোগী ও বিরোধী বিষয়ের অবতারণা করেছেন, বর্ণাঢ্য চিত্রকল্প ব্যবহার ক'রে ভাষাকে প্রায় ছড়ার কাছাকাছি এনেছেন, অথচ প্রযুক্তির দিক থেকে ইটালীয়ান ও দেশী রীতির মিশ্রণ ঘটিয়ে কঠিন করে তুলেছেন। কবিতার মধ্যে মধ্যে দু একটি তরক

বাদ দিয়ে গেলে যেমন হয় তেমনি পাঠকের কল্পনা শক্তির উপর নির্ভর করে প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে লাফিয়ে গেছেন। এই ভাবেই তাঁর বিশিষ্ট রীতি গড়ে উঠেছে।

বলাবাহুল্য, গোঙ্গোরার কবিতা তাঁর আমলে বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করেনি কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পঞ্চাশ শতবার্ষিকী পার হওয়ার পর তিনি স্পেনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে স্বীকৃত হয়েছেন। তাঁর কবিতা অসংখ্য সংস্করণে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। আধুনিক কবিরা তাঁর জনপ্রিয়তাকে ঈর্ষা করেছেন, তাঁর রীতির অনুবর্তনে গেতেছেন। বাস্তবিক আধুনিক কবিতার পিছনে গোঙ্গোরা সবচেয়ে সক্রিয় শক্তি।

স্পেনের কবিতায় আধুনিকতার সূত্রপাত হয় রুবেন ডারিও-র কবিতায়। তিনি স্বদেশের সংকীর্ণ ঐতিহ্যের বাইরে কবিতাকে আন্তর্জাতিক পটভূমিতে এনে দাঁড় করাবার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর লেখায় তাই ফরাসী পারনাসিয়ান এবং প্রতীকী কবিদের প্রভাব পড়েছিল। স্বরেলা মিষ্টিছন্দে তাঁর প্রতিভা স্ফূর্তি পেয়েছে।

কিন্তু ১৮৯৮ সালে যখন আমেরিকার সঙ্গে যুদ্ধে স্পেনের পরাজয় হলো তখন এই আন্তর্জাতিকতাবাদ স্পেনের জনচিত্তে আর তেমন স্পর্শ করলো না। বরং স্পেনের প্রাচীন ঐতিহ্যের পুনরুদ্ভব ঘটলো। এবার আসরে এলেন হিমেনেথ। গোঙ্গোরা রীতির পুনঃ প্রবর্তন হলো কবিতায়। ইউরোপের সাহিত্যক্ষেত্র থেকে আত্মনির্বাসিত হয়ে স্পেনের কবিরা একটা স্বতন্ত্র ভুবন সৃষ্টি করলেন।

এ ভালো হয়েছে কি মন্দ—তা অবশ্য তর্ক সাপেক্ষ। আধুনিক কালের পাঠকের কাছে ইংরাজী ফরাসী রুশ জার্মান কবিতার কদর বেশি। এদের ছন্দে স্প্যানিশ কবিতায় আধুনিক ঘুম সঞ্চার করা। কিন্তু সেই তর্কে না নেমেও নির্দ্বিধায় মানা চলতে পারে কবিতা দুই বিরুদ্ধ প্রকৃতির। আবেগের উত্তেজনা, বুদ্ধির বিশ্লেষণ, কলাকৌশলের কুটিলতা নিয়ে যে কবিতা তাও আধুনিক, আবার শান্ত স্থিতধী, স্থির আবেগ অনুত্তেজক কবিতাও আধুনিক হতে বাধা নেই। নাগরিক পটভূমি এবং নাগরিক মানস-ই আধুনিক কবিতার আশ্রয় হবে এমন দাবী করা একদেশদর্শিতা। বরং ভিন্ন রীতি ও পটভূমিতে ভিন্নতর রুচির পরিচয় মিলতে পারে—এবং এই উভয় জাতের কবিতা মিলেই আধুনিক কবিতার পূর্ণাঙ্গ পরিচয়। কেউ কেউ মার্কিনী কাউবয়ের উগ্র ছবি আঁকা কোর্তায় জানান দেয় নিজের উপস্থিতি, আবার কেউ অনুচ্চ বর্ণ ও রীতির সজ্জাতেই নিজেকে সবার মধ্যে বিশিষ্ট ক'রে তুলতে সক্ষম। 'অগ্নিবীনা' এবং 'বন্দীর বন্দনা'র পাশাপাশি 'রূপসী বাংলা' এবং 'রাখালী'কেও আধুনিক কবিতা হিসাবে স্বীকার করতে লজ্জা নেই।

লর্কার কবিতাতেও হেমেনেথের রীতির প্রসারণ হয়েছে। তিনিও রীতিতে ছিলেন রক্ষণশীল, আবহমানের লোকসঙ্গীত এবং পূর্বতন কবিদের চিত্রকল্প রীতিরই তিনি সার্থক সাধক ছিলেন বলা চলে। তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য বোঝাতে এখানে তাঁর একটি ছোট কবিতার তর্জমা দেওয়া যেতে পারে।

ষোড় সওয়ারের গান

কর্ডোবা
দূরান্তে নির্জনে।

কালো টাট্টু, মস্ত এক চাঁদ
জিনের থোপটায় জলপাই
পৌঁছাতে পারবো না কর্ডোবায়
যদিও পথ চেনা সবটাই।

খোলা মাঠে ঝড়ের ভিতরে
কালো টাট্টু, রাঙা চাঁদ, আর
আমার নিশানা ক'রে যম
বসে আছে সৌধে কর্ডোবার

কত দীর্ঘ এই পথ, ওহে
কি সাহসী টাট্টুটা আমার
হায়, তবু বৃথা ওৎ পেতে
অপেক্ষার পথে কর্ডোবার।

কর্ডোবা
দূরান্তে নির্জনে।

কোর্ডোবার সেই প্রাচীন দুর্গ যার বর্ণনায়, পিতৃভূমির সেই গৌরব গাথায় অমরতা দান করেছেন দুই ফ্রাঁসোয়া তার স্মৃতিই এই কবিতায় অভিপ্রেত রসলক্ষ্য করেছে। এর পরে 'নিউইয়র্কের কবিতা' গ্রন্থে আধুনিক রীতি প্রকরণ নিয়ে তিনি যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন তা তেমন সার্থক পরিণতিতে পৌঁছায় নি। বরং পুরানো রীতিতে রচিত ষাঁড়ের লড়াইয়ে মৃত বন্ধুর উপরে রচিত শোকগাথা আতির মনে তাঁর নাম অমর ক'রে রেখেছে।

রিকার্ডোই-মলিনারি (জন্ম ১৮৯৮, আর্জেন্টিনার অধিবাসী। সংহত মুক্ত ছন্দের কবিতা লিখতেই সাধারনত অভ্যস্ত। বিশ্বাসে ক্যাথলিক, আর্জেন্টিনার মুক্ত আকাশ নদী নক্ষত্রের গান তাঁর কবিতায় রূপ পেয়েছে। কিন্তু সব কিছুর উপরে রয়েছে তাঁর গভীর অনুভূতিশীল হৃদয়। তাঁর একটি বড় কবিতার একটি খণ্ডাংশ তুলছি :

ওরা
[অংশ]

না ওরা ফিরবে না আর, আলো নয়, ভোর নয়
দীর্ঘ ধনুকটু—তাও নয়, সব হারিয়েছে।
তারা ফিরে আসবেনা, অসম্ভব, না, না,
এমন কি প্রাণ নয়, বিরহ না, বাতাস না, প্রতীক্ষাও ক্ষয় হয়ে গেছে।
না, কেন আসবে তারা, কেউই ফেরেনা, মিথ্যে আশা,
দুদিন আগের পদ্ম ঝরে গেছে ফেরেকি কখনো?
নিস্তব্ধ গাছের ছাল পোড়া পাতা, সেই মুখ, সেই নদী,—
ফিরবে না সেই ধ্বংস গর্বিত প্রহর।

না না, কিছুতেই নয়, ওগো বৃথা ভয়ঙ্কর এত।
ঐশ্বর্যের মধ্যে হয় থাকতে দাও অথবা আমাকে
দুর্বহ দাপটে রাখো, সীমাহীন আধিপত্যে অসম্মানে ফেলো

অন্ধ, অনুপস্থিতি, সন্ধ্যাতীত, চুপ্—
কি নৈঃসঙ্গ্য—কিছু নয়,—হয়তো একটি ঢেউ, প্রেম,
প্রেমই অবিশ্বাস্য ভাবে ফিরে এলো।

রাফায়েল আলবের্তি (১৯০২) কে আধুনিক স্প্যানিশ কবিতার বিবর্তন ধারার প্রতিভূ হিসাবে ধরা যেতে পারে। ইনি রচনা শুরু করেন প্রথাসিদ্ধ ভঙ্গিতে। কিন্তু ক্রমবিকাশের পথে পর্যায় ক্রমে গোঙোরা প্রভাব, লোক সঙ্গীতের প্রভাব কাটিয়ে এসেছেন তারপরে একসময় এর রচনায় সুররিয়ালিষ্ট আন্দোলনের ছাপ পড়েছিল। সত্যেন্দ্রনাথ বাংলা দেশে যেমন, 'লালপরী' 'জর্বাপরী' নিয়ে কবিতা রচনার খেলায় মেতেছিলেন তেমনি ইনিও নিজস্ব রীতিতে প্রাক্ পুরাণিক দেবদূতদের কাহিনী রচনা করেছেন। সেগুলির শিল্প সৌন্দর্য্য ও ভাবগভীরতায় সত্যেন্দ্রনাথের কবিতার সঙ্গে কোনো তুলনাই হতে পারে না। তারপর স্পেনে গৃহযুদ্ধ বাধলো, ফ্রাঙ্কোর সমর্থকদের হাতে প্রখ্যাত কবি লর্কা নিহত হলেন। আলবের্তির স্বপ্নালীন কল্পনার জগৎ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ল। তাঁর হাতে দেখা দিল বিশুদ্ধ বাস্তববাদের কবিতা। অবশেষে যুদ্ধের পরিণতিতে অনেক কবি নিহত হলেন, অনেকে বন্দী, অনেকে নির্বাসিত—আলবের্তিকেও দেশ ছাড়তে হলো। স্প্যানিশ কবিতার পীঠস্থান স্পেন

থেকে বদলে হলো মেক্সিকো। তার প্রাণকেন্দ্র বুয়েনস এয়ারস। আশ্রয়দাত্রী ও আশ্রয় নিলেন বুয়েনস এয়ারস এ। দেশ ছাড়লেও দেশের স্মৃতি তাঁকে আঁকড়ে রইল। দক্ষিণ স্পেনের আন্দালুসিয়া খুঁটিনাটি স্মৃতি সমৃদ্ধ কবিতা লিখে চলেছেন। আর্জেন্টিনার নিসর্গদৃশ্যও রূঢ় বাস্তবরসের কবিতা হয়ে তাঁর সৃষ্টিতে স্থান পেয়েছে। তবু দক্ষিণ আমেরিকাকে মনেপ্রাণে নিজের দেশ বলে মেনে নিতে পারেন নি। সেখানে থেকেও নির্বাসিতের জীবনই যাপন করে চলেছেন। ফ্রাঙ্কোর দুঃশাসনে দেশের লোক তাঁকে প্রায় ভুলতে বসেছে। কিন্তু ফরাসী ও ইতালীয় ভাষায় তাঁর অজস্র কবিতা অনূদিত হয়ে জনপ্রিয়তা পেয়েছে। তাঁর প্রথম আমলের একটি সনেট এখানে দেওয়া হলো।

জাহাজী নাবিককে

ঝড়ো বাতাসের, উড়ুক মাছের ওগো নিয়ন্ত্রী,
তোর এ জাহাজে ছাতা পড়া শ্যাম সাগরী স্যাওলা—
তারার মতন শামুক ঝিনুক পাবার খেলা,
সমুদ্র দিল অভিষেক তোকে ফাল্গুনে।

তোর জন্যেই সর্প-কুটিল সমুদ্র বেলা
হালের দোলায় বাজায় একটি সুরের তন্ত্রী ;
শোনা আষাদের নভচর ধ্রুব-তারার মন্ত্র,
হে মুক্ত-প্রাণ নাবিক সাগরে তোর বুঝি খেলা !
নাবিক সুজন, তুই উদীচীর কারার ছেলে,
অবাচীর তুই নিধু, জলের কেনার আদরে
বৈজয়ন্তী, শুনেছিস তুই কিন্নরী গান ?

আমরা দুনিয়া জুড়ে যারা বাঁধা মাটির বিবরে,
তুলে নে তাদের তোর জাহাজের গভীর আশ্রয়ে,
বক্ষ ছিঁড়ে আন্ সাগরের মহা আহ্বান।

অপর একজন কবি দুই সেমুর্দো যথেষ্ট শক্তিশালী কবিতা লিখেছেন। এর কবিতায় ইউরোপীয় প্রভাব প্রচুর। বর্তমানে ইনিও দেশত্যাগী হয়ে মেক্সিকোতে বাস করছেন। তারই সমবয়সী কবি এবং নাট্যকার আন্তিয়ের ভিল্লাউরুতিয়া (১৯০৪-১৯৪২) ছিলেন মেক্সিকোর লোক। এঁর রচনাতেও ভিনদেশী স্বভাবের চিহ্ন পাওয়া যায়। কিছুদিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইনি বাস করেছিলেন এবং বহু অনুবাদ করেছেন বলেই বোধহয় তাঁর লেখায় এমন ভিনদেশী ছাপ। এঁর কবিতায় গৃহকাতর একটি মন প্রায়ই উঁকি দিয়েছে, মুক্ত ছন্দেই ইনি লিখতে অভ্যস্ত। এঁর লেখার ভঙ্গিটা নৈর্ব্যক্তিক। একটি নমুনা

তুষারাবৃত কবর

কবর যখন তুষারেতে যায় ঢেকে
কি দিয়ে বলো না করবে তুলনা তার ?
শাদার উপর বিছানো শুভ্রতার
কোন নাম দেবে আর ?

আকাশ ফেলেছে কবরের পরে অনুভবনীয় নয়—
এমন পাথর অজস্র, রাশি রাশি,
তুষারের 'পরে শুধু তুষারের হাসি
হাতের উপরে চির অর্পিত হাত যেন জেগে রয়।

পাখিরা বরং নভপথে উড়ে যায়
বায়ু-অনিন্দ্য পাখায় ফুরু ক'রে
সুতরাং শুধু তুষার থাকবে প'ড়ে,
তার মানে শুধু যেমন তেমনি থাকা,
অর্থাৎ শুধু তুষারের মত থাকা।

কারণ কেবল এ বলা চলেনা : তুষারে সমাধি
স্বপ্ন বিহীন ঘুমের মতন, অথবা যেন এ
ফাঁকা চোখ শুধু।

যদিও ভিতরে রয়েছে অসাড় ঘুমন্ত দেহ
এক স্তব্ধতা পড়ে আছে যেন অন্তর দেহে
আর যেন ফাঁকা স্থায়ী বিস্তৃতি—ফেলে রেখে গেছে
তবুও শুনো কোনো কিছু নেই
কবর যখন দুয়ারে ঠেকেছে।

কারণ দুয়ার নিশ্চুপ সব কিছুর উপরে
আরো নীরব তা নিরক্ত গোরে
আর সেই ঠোঁটে
যেখানে একটি কথাও না ফোটে।

সালভাডর নোভোর জন্ম ১৯০৪। তিনিও আভিয়ের ভিল্লাউরুতিয়ার মত নাট্যশিল্পের সঙ্গে যুক্ত। নোভো ছিলেন সাংবাদিক। তাঁর লেখায় তাই সাংবাদিক সুলভ সমাজ সচেতনার ছাপ স্পষ্ট। এঁর কবিতাতেও নাটকীয় মোচড় লক্ষ্য করা যাবে সুখপ্রাবী সাদাসিধে ভাষায় তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ মিশিয়ে ইনি লিখতে পারেন। লেখাতে মেক্সিকান বাস্তববাদের ছোঁয়া। কবিতার ভাবে প্রকরণে ইনি পূর্বতন আমলের খ্যাতনামা কবি লোপেজ ভেলার্দের কাছে কিছু পরিমাণে ঋণী। তাঁর একটি কবিতা—

এপিফানিয়া

এক রবিবার
এপিফানিয়া বাড়ি ফিরলো না।

শুনতে পেলাম
কি ভাবে কে তাকে ফুসলিয়েছিল।
তারপর দুতাসের গুধিয়ে জানলাম
সে তাকে একটা ঘরে নিয়ে গেল
জানতাম না ঘরটা কোথায়
কল্পনা করতাম, ঠাণ্ডা নোংরা একখানা ঘর
বাড়ির মেজেটা স্যাঁৎসেতে।

আর একটি মাত্র ঘোর— পরের দিকে
যখন আমি ঘরটার কথা ভাবতাম
কাউকেই তার ভিতর দেখতাম না।

এপিফানিয়া ফিরে এলো এক বিকেলে
আমি তার পিছু নিলাম বাগান মুখো
বলতে বললাম লোকটা তাকে কি করলো
কারণ আমার ঘর ছিল ফাঁকা
নির্বিঘ্ন বাক্সের মতো।
এপিফানিয়া হেসে পালিয়ে গেল
তারপর দরজাটা খুলে দিল
যাতে রাস্তাটা আসতে পারে বাগানে।

পাবলো নেরুদাও এই একই বছর জন্মেছিলেন। তিনি চিলির অন্যতম প্রতিভাবান কবি। প্রথম আমলে রোমান্টিক এবং সুর-রিয়ালিষ্ট রীতিতে লিখেছিলেন পরে কম্যুনিষ্ট মতবাদে দীক্ষিত হন। স্প্যানিশ রিপাবলিকের স্বপক্ষে যুদ্ধের উপর কিছু কবিতা লেখার পর তিনি তাঁর অনন্য এবং বিরাট কাব্য 'কাণ্টো জেনারেল' লিখতে শুরু করেন। এখানে তিনি চিলি দেশ এবং সামগ্রিক ভাবে আমেরিকাকে বর্তমান কাল ও আধুনিক রাজনৈতিক পটভূমিকে আঁকতে চেষ্টা করেছেন। এই কাব্যের শ্রেষ্ঠ অংশগুলি নিঃসন্দেহে কবিতার আধুনিকতম রূপ ও রীতির লক্ষণে চিহ্নিত মহৎ শিল্প কিন্তু নিকৃষ্ট অংশগুলি নিরল প্রচার প্রয়াস ছাড়া আর কিছু নয়। যেহেতু নেরুদার কবিতা অনুবাদের কল্যাণে সর্বত্র সুবিদিত আমরা তার কোনো নিদর্শন রাখলাম না।

অক্টাভিও পাজ এবং আলবার্তো কুইন্তেরো আলভারেজ উভয়েই ১৯১৪ সালে জন্মান। উভয়ের সঙ্গেই মাক্সিকোর বিখ্যাত 'Taller' পত্রিকার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। অক্টাভিও পাজ অবশ্য রাজনীতিক হিসাবেও প্রখ্যাত হয়েছেন। কিন্তু

অল্পসংখ্যক কবিতা লিখলেও এ যুগের প্রধান কবির সম্মান লাভ করেছেন। তাঁর লেখা চিত্রকল্পময়ী, তাতে আবেগের সংহত প্রকাশ আছে। আপাত দৃষ্টিতে স্যুররিয়ালিষ্ট মনে হলেও বাস্তবিক তাঁর কবিতা তেমন নয়। অন্যদিকে আলভারেজ-এর রচনা পদ্ধতি অত্যন্ত সরল ও মনস্পর্শী। চতুর্থদশকে মেক্সিকান সাহিত্যের সমৃদ্ধির ইতিহাসে এঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। ইনি ১৯৪৪ সালে মারা যান। এখানে আলভারেজের একটি কবিতা উদ্ধৃত হলো।

সমুদ্রের দিকে চেয়ে

চেয়ে দেখো : তোমায় বাসিনি ভালো। তুমি সেই মৃত
আশা, যাতে আমার প্রেমের স্বর রাখলাম। আর
তোমার নির্বাক মুখ সমুদ্রে ফেরানো
পলিমুক্তো, নিস্তব্ধ রাত্রিকে জাগরূক
রাখে আর বালুকায় শুয়ে তুমি জানো

নগ্ন দেহে নিরত মৃত্যুর সাথ, সুখ ;
নির্বিকার পাথরের মত নখ চুল
বাড়বে তোমার, ঝরবে আইভি-র ফুল।

আগেই বলেছি আধুনিক স্প্যানিশ কবিতার পীঠস্থান বর্তমানে মেক্সিকো। মেক্সিকোর প্রতিশ্রুতিবান আধুনিক কবি আলী চুমাসেরো-র জন্ম হয়েছে ১৯১৮ সালে। স্যুররিয়ালিষ্ট ভঙ্গির সংকেত গভীর কবিতায় ইনি বিষয় গাম্ভীর্য এবং ব্যক্তিত্বের স্পর্শ রেখেছেন। নেরুদার সমর্থক রাজনীতিবাদী এবং বিরুদ্ধবাদীদের উচ্চঘোষ দ্বন্দ্বের মাঝখানে যে সব শিল্পী বলিষ্ঠ হাতে সৃষ্টি করে চলেছেন তাঁদেরই অন্যতম আলী-চুমাসেরো। এঁর একটি কবিতা—

অজ্ঞাতের সমাধি খনক

শান্ত তো করেছো। দেখো, ঝরোক মেয়াদে
ওইখানে পড়টা ঘুমায়।

দুর্ঘটনা সঙ্কেত রাখেনা। অদৃশ্য
ঢেউয়ের আড়ালে পাপের
প্রাচীনতা রূপ সাপ, কিংবা কিংবদন্তীর আশ্চর্য
রম্য ধ্বংসস্তূপ ছড়িয়েছে ঘাসে ঘাসে যেন প্রতিধ্বনি
সে নারীর—বিভ্রান্ত যে
আনন্দে জনমে।

অজ্ঞাত পথিক হাঁটে যেন এক দুঃসহ বাতাস
স্মৃতি তার গৃহ, অপেক্ষাকে ঘিরে চায় উদ্ঘাটন
বিদ্যুৎ ঝলসায়
যেন সৈকতে বিধ্বস্ত ঢেউ
ফেনা যার সর্বোর্ধ্বে পৌঁছায়
ক্রোধে, শব্দে, ভূস্খলনে ও আলস্যে অক্ষম।

অন্তরেরও মৃত্যু হবে। শান্ত ভাবে, অতীত আসরে
ঘোর থেকে লক্ষ্য করি। দেশের নিরন্ন মুখগুলি
আজ আমি আমার এ জীবনের মৃত্যুর শয্যার
পাশে তার শেষ কৃত্য দেখতে আমন্ত্রিত।

যা গেল, আমায় রাখলো সৈকতের উপরে দাঁড়ানো
সমুদ্রের অভিমুখে পূর্বদৃষ্ট তারায় তাকিয়ে,
যা এলো ঘোষণা করলো তার সেই বিদায় আঁকিয়ে
আবহমানের আসা-যাওয়ায় হারানো।

সেখানে তোমার নাম শুভ্রতার দীপের ভিতর
মধ্যোত্তীর্ণ অদৃষ্টের সাক্ষাতের মতন ঘটনা
সেখানে তোমার প্রাণ অবিশ্রাম গতিহীন ঝড়

আমার মুখের 'পরে, করুনায় আহত কত না,
তবু এই চোখে চাও, এ চোখের দৃষ্টির উপর
দূর সমুদ্রের সুর আর তার তিক্ততার ফেনা।

পরিবারের জন্য সেরা উপহার

উৎসব মানেই তো উপহার দেওয়ার সময়। আর উষা সেলাই কলের চেয়ে ভালো উপহার কি হতে পারে! একটি উষা সেলাই কল বাড়ীতে থাকলে কত উপকার হয়। আধুনিক ডিজাইনে গড়া প্রতিটি উষা মডেলে অনেক রকম সুবিধার ব্যবস্থা আছে। উষায় শুধু সেলাই হয় না, উষায় সেলাই করাটা আনন্দময়ও বটে।

সুবিধাজনক কিস্তির সর্ত স্থানীয় বিক্রেতার নিকট জেনে নিন।

চিত্রিত মেসিনগুলি হাত, ফুট এবং কোল্ডিং মডেলে পাওয়া যায়।

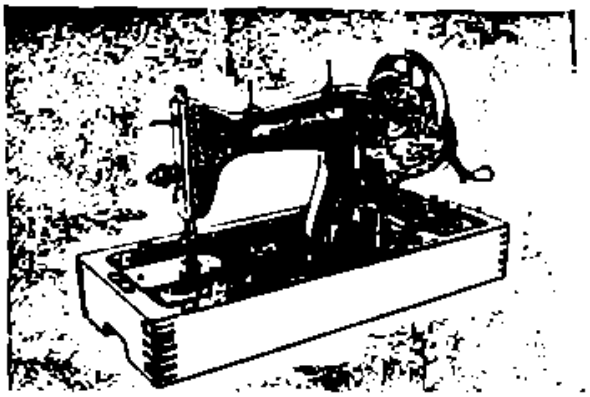

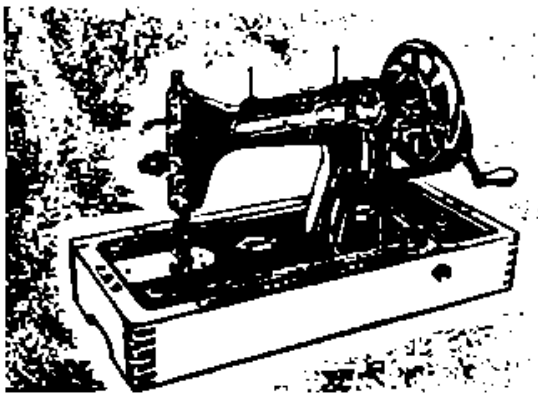

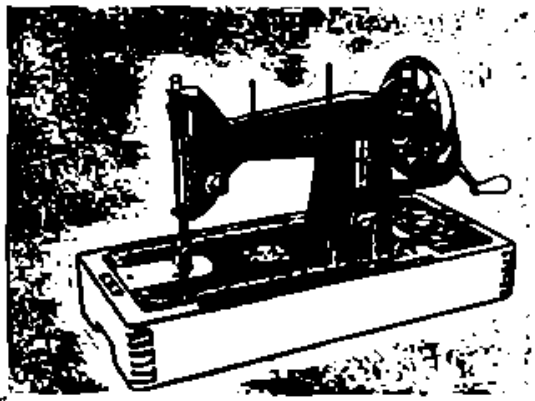

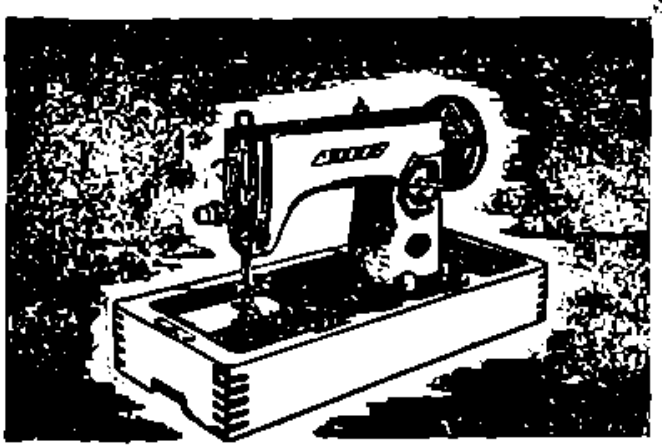

উষা কিনুন—
আরামে সেলাই করুন

উষা

সেলাই কল

উষা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কস লিঃ, কলিকাতা-৩১

আর্জেন্টিনার মহিলা কবি সিলভিয়া ও বাস্তো তাঁর বোনের সম্পাদিত বিখ্যাত ত্রৈমাসিক পত্র 'Sur'-এ অজস্র কবিতা লিখতেন। স্বদেশের ঐতিহ্য এবং বিদেশের সংস্কৃতির মনোরম সমাবেশে এবং মননের সহজ প্রসাদে তাঁর কবিতা বিশিষ্ট। একটি নমুনা—

নিদ্রাহীন পলিসুরো

['মধ্য স্তরে থাকবি পলিসুরো সমুদ্র দেখতে']

সাগরের ঢেউ, ঝাউবন, পাখিদের পাখা,
শামুকের খোলে শাঁখে হাওয়া কলস্বনা
আয়োডিন ঘ্রাণ, আর নোনা গন্ধমাখা
দুষ্টু কড়, বিরল শুশুক, মীনাঙ্গনা

ক্লান্ত গান গেয়ে গেয়ে ; এই পটভূমি
বদলাবে না, যে সব শান্তির দেশ ঘুরে
প্রশান্ত পসরা নিয়ে ফেরি করতে তুমি
আজীবন, যেখানে জাহাজ থাকে দূরে।

না না, সেই বিদায় চাইলে
আঁধারের ঊর্ণা-জাল যাতে
প্রেম প্রত্যাবৃত্ত নয়
ঘৃণা আত্মঘোষণা করে না

কথা থেমে গেছে। আর তারাগুলি ঘিরে
শুব্ধতা আমার বুকে জপছে আয়নায়।

এই সব কবি পর্যায়ের মধ্য দিয়েই আধুনিক স্প্যানিশ কবিতা স্পেনের মূল ভূ-খণ্ডে এবং উত্তর আমেরিকার উপনিবেশগুলিতে বিবর্তিত হতে হতে চলেছে। বিগত দুই দশকে ফ্রাঙ্কো প্রভৃতি দেশে ধর্মচেতনার আধিক্য যেমন কবিতার পরিণতির পথে প্রতিক্রিয়ার আবর্ত সৃষ্টি করেছে তার প্রভাব থেকে স্পেনের কবিরাও মুক্তি পাননি। তবু মনে হয় অতি সাম্প্রতিক কালের কবিতা সেই ঘূর্ণাবেগ অতিক্রম করে সুস্থ পরিণতির দিকে আলোকোজ্জ্বল নবোন্মেষের দিকে এগিয়ে চলেছে এবং চলবে।

বাঙালীর জীবন যাত্রায় আহার্যের মান

গুপ্ত মিত্র

লেখক "গুপ্তমিত্র" কলকাতা মেডিকেল কলেজের একজনের কৃতী ছাত্র। স্বাস্থ্য ও খাদ্য-বিজ্ঞানের গবেষণায় স্বদেশে এবং বিদেশে ইনি কীর্তি ও বিশেষ সম্মান লাভ করেছেন। বর্তমানে ইনি একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার। সাধারণতঃ হাঁসেলীর সাথেই ইনি লিখে থাকেন, মাস কয়েক মাস পূর্বে বসুমতীর অনুরোধে ইনি বাঙলা আমার প্রথম রচনা শুরু করেছেন হুরমাসে। এর বেশী পরিচিতি দেবার উপায় আমাদের নেই। — ক: স:

চারশ' বা পাঁচশ' বছর আগে বাঙালীর আহার্য কিরকম ছিল তার একটা আন্দাজ পাওয়া যায় কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের রচনায় ও শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে। ভোজনের ব্যাখ্যান পড়ে মনে হয় সে যুগের দৈনিক আহার ছিল স্বাস্থ্য সঞ্চয়ের পক্ষে অনুকূল। কবিকঙ্কণ চণ্ডীর খুল্লনা ছিলেন মধ্যবিত্ত সমাজের একজন গৃহিণী। তিনি স্বামী ও তাঁর বন্ধুবর্গের জন্য রেঁধেছিলেন দু'রকমের মাছ, ডাল, শাকসবজি, দই, দুধ ও পিঠে। আধুনিক পুষ্টিবিজ্ঞানী তালিকা খুঁটিয়ে দেখে ত্রুটী পাবেন না। প্রোটিন ও ভিটামিনের ছড়াছড়ি - যাকে বলে পুরোমাত্রায় ব্যালান্সড্ ডায়েট। কিন্তু কালকেতু ছিলেন গরীব ব্যাধ। কোনও দিন শিকার না জুটলে তাঁর ভাগ্যে জুটত উপবাস। ব্যাধপত্নী ফুল্লরা শিকারে পাওয়া হরিণমাংসের খানিকটা ঝোল রান্না করে বাকীটার বিনিময়ে দই এনেছেন। আর করেছেন আমানি, ঘুঁসের ঘণ্ট, নেউলপোড়া ও শাকসবজি। এরূপ আহার্যকেও সুষম বা ব্যালান্সড্ না স্বীকার করে উপায় নেই। চৈতন্যচরিতামৃতে ও চৈতন্যভাগবতে বহু মধ্যবিত্ত ঘরের খাওয়ার তালিকা পাওয়া যায়। নিরামিষ আহার্য যে চূড়ান্ত ভাবে পুষ্টিকর হতে পারে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ মেলে। কর্মে রয়েছে ভাত, রুটী, মুগেরডাল, বানা তরিবতে রান্না করা শাকসবজি, বড়াবড়ি ও "রসালা মথিত দধি সন্দেশ অপার।" গব্য পদার্থগুলি গ্রাম্য গৃহস্থের ঘরে তৈরী। দোকানে কেনা দুর্লভ সামগ্রী নয়। একস্থানে "অসুরের সনে কত যুদ্ধ" কথাগুলি দেখতে পাওয়া যায়। অসুরিত গোটা মুগে যে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন-সি পাওয়া যায় এ তথ্য হয়ত অনেকেরই জানা আছে। কাব্যের অতিশয়োক্তি বাদ দিলেও অল্প খরচে এরূপ সুষম আহার্য তালিকার (মেন্যুর) তুলনা পাওয়া যায় না। কেতাবগুলি পড়লে স্পষ্ট বোঝা যায় যে খাওয়াটাকে সে যুগে দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় প্রাধান্য দেওয়া হত। কেবল রসনার পরিতৃপ্তি নয় ভোজনপর্ব ছিল চিত্তবিনোদনের এক অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ।

অতীত ছেড়ে এবার বর্তমান যুগে আসা যাক। বিংশ শতকের বাঙালীর স্বাস্থ্যহীনতার অখণ্ডনীয় নজির পাওয়া যায় অনেকের রচনায়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর লেখনে ও ভাষণে বাঙালীর শ্রমবিমুখতার অনুযোগ করেছেন একাধিক-বার। শরীরে রোগ না থাকলেও পুষ্টিকর বা উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে সাধারণ মানুষের প্রাণশক্তি, কর্মতৎপরতা ও দৈহিক-বল যে কমে যায় এ চিরন্তন সত্য উপনিষদ থেকে আধুনিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান পর্যন্ত সমস্ত কেতাবেই স্বীকৃতি পেয়েছে। বিংশ শতকের গোড়ার দিকে ডাঃ (কর্ণেল) ডেভিড মকাই ছিলেন কলিকাতা মেডিকেল কলেজের শরীরক্রিয়াবিজ্ঞান বা ফিজিওলজির অধ্যাপক। মকাই বাঙলার অধিবাসীদের ক্ষীণ শরীরের হেতু অনুসন্ধান করে প্রমাণ করেন যে আহার্যের দৈন্য হল এর মূলকারণ। এ ঘটনার কয়েক বছর পরে দার্জিলিঙের কুসুর সহরে পোষণ-অনুসন্ধান প্রয়োগশালায় (নুট্রিশন রিসার্চ ল্যাবরেটরির) স্থাপয়িতা জেনারেল রবার্ট ম্যাকক্যারিসন্ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীদের ভোজ্য সম্বন্ধে তুলনা-মূলক গবেষণা করেন। দু'দল সাদা ইঁদুরের বাচ্চাকে

যথাক্রমে বাঙালী, মাদ্রাজী, মারাঠী, কর্ণাটী, সিখ ও পাঠানের ভোজ্য বাইয়ে পুষ্ট করা হয়। পরীক্ষার শেষে দেখা গেল সিখ্‌ভোজে বর্ধিত ইঁদুর বাচ্চারা অপর বাচ্চাদের চেয়ে সব চেয়ে বেশী হৃষ্টপুষ্ট ও স্বাস্থ্যবান। বাঙালীর আহারে বর্ধিত বাচ্চারা পেল পঞ্চম স্থান আর তাদের সঙ্গে বহু ব্যবধানে মাদ্রাজীভোজে পুষ্ট বাচ্চারা সর্বনিম্নস্থানের অধিকারী হল। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল যে ইঁদুরেরা মানুষের মত সর্বভুক। অর্থাৎ আমিষ নিরামিষ সবরকম আহার্য এরা তৃপ্তির সহিত গ্রহণ করে শরীর পোষণে সমর্থ। সাদা ইঁদুর জাতের কাছে পুষ্টিবিজ্ঞানের ফল অপরিসীম। সাদা ইঁদুর সাধারণতঃ নিরীহ প্রকৃতি-সম্পন্ন। এরা গৃহস্থবাড়ীতে যে ইঁদুর বাস করে তাদের মত আঁচড়ে কামড়ে দেয়না।

প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে বাঙালীর আহার্যের দৈন্য বা অসম্পূর্ণতা বাঙলার কৃতিসন্তান স্বর্গীয় ডাঃ চুনীলাল বসুকে প্রেরণা দিয়েছিল খাদ্য সম্বন্ধে দেশবাসীকে সচেতন করতে : ডাঃ বসু ছিলেন বাঙলা গভর্নমেণ্টের কেমিকাল এগ্‌জামিনার ও কলিকাতা মেডিকেল কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক। পুষ্টিবিজ্ঞানের তখন শৈশবাবস্থা বলা চলে, কিন্তু ডাঃ বসুর লেখা "খাদ্য" ছিল একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ। বাঙালীরা দুবেলা ভাত না খেয়ে যদি একবেলা ভাত ও একবেলা আটার রুটীর বন্দোবস্ত করতে পারেন তবে একরকম নিখরচায় ভোজ্যের পুষ্টিগুণ বেড়ে যাবে এই তথ্য প্রচারে তিনি ছিলেন অগ্রণী। প্রাপ্তবয়স্ক বাঙালীর জন্য তিনি যে দৈনিক খাদ্য তালিকার নির্দেশ দিয়েছিলেন তা সামান্য রদবদল করলে— অর্থাৎ একছটাক আটা কমিয়ে এবং আধ-ছটাক তেল-ঘি বাড়িয়ে দিলে — ভারতীয় পোষণবিজ্ঞানীদের নির্দিষ্ট আধুনিকতম তালিকার সঙ্গে কোনও প্রভেদ খুঁজে পাওয়া যাবেনা। ডাক্তারের লেখা ঔষধের ব্যবস্থাপত্র যেরূপ নিষ্ঠার সহিত মেনে চলা দরকার বিশেষজ্ঞদের নির্দিষ্ট খাদ্য তালিকা যে তদ্রূপ মেনে চলা সম্ভবপর নয় এ প্রাথমিক তথ্য ডাঃ বসুর অজ্ঞাত ছিলনা সে যুগেও। তাঁর রচিত "শারীর স্বাস্থ্যবিজ্ঞান" গ্রন্থে আহার্যের আলোচনায় লিখেছেন "সকল মনুষ্যের পক্ষে এক প্রকার আহার নির্দ্দেশ করা সম্ভবপর বা যুক্তিসঙ্গত নহে। অনেকের মাংসভোজন একেবারেই সহ্য হয়না ; কেহবা মাংস যত সহজে পরিপাক করিতে সমর্থ হয়, অন্য খাদ্য সেরূপ নহে। এরূপ দুই ব্যক্তির পক্ষে একপ্রকার আহারের ব্যবস্থা করা কখনই যুক্তিসঙ্গত হইতে পারেনা। অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া আমরা দেশ, কাল, পাত্র ও রুচি অনুসারে, আমিষ ও নিরামিষ সকল প্রকার খাদ্য হইতেই শরীর রক্ষার উপযোগী সমস্ত উপকরণ যথাপ্রয়োজন সংগ্রহ করিতে পারি।"

স্বর্গীয় ডাক্তার বসুর মূল্যবান উক্তি স্মরণে রেখে এখন আলোচনা করা যেতে পারে যে বাঙালীর আহার্যে গোলমালটা কোথায়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত আহার্যগুচ্ছের একটা আন্দাজ পাবার জন্য ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ্ মেডিকেল রিসার্চ এক ব্যাপক নিরীক্ষণ বা "ডায়েট সার্ভে" আরম্ভ করেন প্রায় পঁচিশ বছর পূর্বে। ঐ ব্যাপক সার্ভের কাজে ভারতের অনেকগুলি প্রদেশের জনস্বাস্থ্য বিভাগ সাহায্য করেন। নিরীক্ষা ব্যাপারটি চিলে তেতালে চললেও অদ্যাবধি সংগৃহীত তথ্য থেকে আঞ্চলিক আহারের রূপ বা গঠন নির্ণয় করা যায়। পশ্চিম বাঙলার বিভিন্ন সহরে এবং গ্রামাঞ্চলে অনুসন্ধানের ফলে দৈনিক আহার্য তালিকার যে গড়পড়তা হিসাব পাওয়া গেছে তা ভারতীয় পোষণবিজ্ঞানীদের নির্দিষ্ট তালিকার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে স্বাস্থ্যহীনতার হেতু সর্বাগ্রে নজরে আসে। এদেশের অধিবাসীদের জন্য যে আহার্য তালিকা রচনা করা হয়েছে তাকে কোনও মতে আদর্শ বলা চলেনা। দেশ কাল পাত্র সবদিক বিবেচনা করে পোষণবিজ্ঞানীরা নির্দেশ দিয়েছেন যে অন্ততঃ চলনসই ভাবে স্বাস্থ্যের মান বজায় রাখতে হলে একজন হৃষ্টসবল ও প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের দৈনিক ভোজ্যে নিম্নলিখিত উপাদানগুলি থাকা চাই :

চাল গম বা অন্য খাদ্যশস্য (রুটী, জোয়ার, মকুয়া)	৭ছটাক
ডাল	১½ছটাক
তরিতরকারি (শাক সমেত)	৪ছটাক
ফল	১½ছটাক
দুধ বাদে দই দুধ বা অন্য পদ্যপদার্থ	৪ছটাক
মাছ বা মাংস (হাড় বাদে)	১½ছটাক
ডিম	একটা
ঘি ও তেল	১ছটাক
চিনি ও গুড়	১ছটাক

ভোল করে বা মেপে এই সমস্ত উপকরণ খেতেই হবে এমন কোনও দুর্লঙ্ঘ্য বিধি নেই। তবে ঐ পরিমাণ আন্দাজ খাওয়াটা দরকার। নিরামিষ ভোজী হলে মাছ মাংসের বদলে দু'ছটাক বা তিন ছটাক দুধ বেশী খেলেই চলবে। য়ুরোপের অধিকাংশ দেশে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বা ক্যানাডায় বেশীর ভাগ লোক এর চেয়ে ঢের পুষ্টিকর খাদ্য খেয়ে থাকেন। দুধ মাছ মাংস ও ডিমের ভাগ বেশী থাকার জন্য ঐসব দেশের দৈনিক ভোজ্যে খাদ্যশস্যের পরিমাণ কম থাকে।

একথা কাউকে বুঝিয়ে দিতে হবেনা যে আহার্য নিরীক্ষা বা সার্ভে করার ফলে জানা গেছে যে বাঙালীর দৈনিক আহারের প্রধান উপাদান হল ভাত। কলিকাতা ছাড়া অন্যত্র নিয়মিত ভাবে রুটীর প্রচলন নেই বললেই চলে। গ্রামাঞ্চলে এক একজন রোজ গড়পড়তা ১৩।১৪ বা ১৫ ছটাক চালের ভাত নিয়মিত ভাবে খেয়ে থাকেন তা জানা গেছে। এঁদের অবশ্য দোষ দিতে পারা যায়না কারণ যারে পড়ে যাতে অন্যান্য উপাদানের অভাব এঁরা বেশী পরিমাণে ভাত খেয়ে মিটিয়ে ফেলেন। পোষণবিজ্ঞানের প্রাথমিক সূত্র হল—পেট ভরে খাবার সংস্থান করার পরে যদি উদ্বৃত্ত অর্থ থাকে তবেই আহার্যের মান উন্নত করার চেষ্টা দিয়ে। স্কুলের ছেলে মেয়েদের বাড়তি দুধ খাইয়ে দেখা গেছে যে যারা বাড়ীতে পেট ভরে খেতে পায়না কিন্তু স্কুলে ছুটোছুটি করে আসবে তাদের বাস্তবিকপক্ষে পেট ভরে খাওয়া তাদের স্বাস্থ্য যেমন উন্নত হয়না। অর্থাৎ শরীরে বাড়তি দুধের প্রভাব নজরে আসে না। দুধের মূলধান প্রোটিন শরীরের অন্য অভাব পূরণ করে সুতরাং শরীর গঠনের কাজ করবার সুযোগ পায়না। ভিটামিন সম্বন্ধে ঠিক একই কথা বলা যেতে পারে। চালে যে প্রোটিন বা ভিটামিন নেই তা বলছিনা। চালে ভিটামিন ও প্রোটিন এই দুই দুর্লভ পদার্থ আছে তবে সীমিত ভাবে। অর্থাৎ চালের প্রোটিনের পোষণ ক্ষমতা দুধের বা আমিষ প্রোটিনের চেয়ে কম এবং চালে ভিটামিনের সংখ্যা ও পরিমাণ অল্প।

বাংলা উড়িষ্যা ও আসামের খানিকটা অংশ বাদে ভারতের অন্য সব প্রদেশে দরিদ্র পরিবারে ত বটেই এমন কি মধ্যবিত্ত ও ধনী পরিবারে অন্ততঃ দুরকম খাদ্যশস্য ভোজনের রীতি প্রচলিত। চাল বা গম ছাড়া এঁরা খেয়ে থাকেন রুটী, জোয়ার, বাজরা, মকুয়া ইত্যাদি। প্রথমে নিম্নপ্রাণী বা ইঁদুরের উপর পরীক্ষা করে পরে মানুষকে খাইয়ে বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে কোনও একটা খাদ্যশস্যের উপর সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর না করে দু বা তিন রকম খাদ্যশস্য মিশ্রিত করে খেলে শরীর পুষ্ট হয় বেশী। গত কয়েক বছর ধরে কলকাতা ও তার কাছাকাছি অঞ্চলের রাশনের দোকানে গম ও আটা পাওয়া যাচ্ছে। বাঙালী পরিবারে আটার চাহিদা গত কয়েক বছরে বেশ কিছু বেড়ে থাকলেও রুটী খাওয়া জনপ্রিয় হয়নি। চালে প্রোটিন থাকে ওজনের শতকরা ৬ ভাগ আর আটায় থাকে শতকরা বার ভাগ অর্থাৎ প্রায় দ্বিগুণ। এ তথ্য জানা সত্ত্বেও অনেকে রুটি হজম হয়না, এই অজুহাতে রুটী খাওয়া পছন্দ করেন না। কিন্তু রুটী অপছন্দকারী দলের মত যে কল্পিত একথা নির্ভয়ে বলা চলে। এ প্রসঙ্গে দু'একটি অভিজ্ঞতার উল্লেখ না করে পারা যাচ্ছেনা।

বাঙলা দেশে ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের সময় ও ১৯৪৪ সালের গোড়ার দিকে অনেক খাদ্যশস্য আমদানি করা হয়েছিল

অন্য প্রদেশ থেকে এবং বিদেশ থেকে। এই সব খাদ্যশস্যের মধ্যে জোয়ার ছিল স্বল্প পরিমাণে। জোয়ারের দানা দেখতে বড় সাইজের চাঁড়স বীচির মত বা ছোট সাইজের তুটাদানার মত। যুক্তপ্রদেশের কানপুর— যতদূর স্মরণে আসে ভারতখণ্ড-হারবারের কাছে— জোয়ার বণ্টন করার সময়ে অনেকে আপত্তি তুলেছিলেন। আপত্তির কারণ ছিল কল্পিত পেটের রোগ। কিন্তু ১০।১৪ দিনের মধ্যে জোয়ারের খই সকালের জলখাবারের এমন একটি জনপ্রিয় অঙ্গ হয়ে উঠেছিল যে জোয়ারের বস্তাগুলি উজাড় হয়ে যাবার পরেও চাহিদা কমেনি। দ্বিতীয় অভিজ্ঞতার স্থান হল মহীশূর ও অন্ধ্রপ্রদেশের সীমানায় তুপাশের অঞ্চলগুলি এবং সময়টা ছিল ১৯৪৫ সাল। জার্মানী তখন আত্মসমর্পণ করেছে কিন্তু জাপান তখনও অপরাজিত। ভারতে খাদ্য-সমস্যা তখনও প্রবল ভাবে রয়েছে। ভারতের ঐ অঞ্চলে জোয়ার চূর্ণ (মোটা আটা) জলে মেখে নাড়ুর আকারে সিদ্ধ করে খেয়ে থাকেন নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও গরীব লোকেরা। ঐ রকম জলে সিদ্ধ লাড্ডুর নাম হল "মুদ্দা"। যথেষ্ট মাত্রায় জোয়ার (আঞ্চলিক নাম "চোলম্") ভারত সরকারের ভাঁড়ারে মজুত না থাকায় ক্যানাডা থেকে আমদানি করা কাইন ময়দা বিলি করা হয়। অবিলম্বে অনুযোগ আরম্ভ হল যে ময়দার মুদ্দা খাবার ফলে পেটব্যথা ও হজমের গোলমাল হয়েছে। অথচ শরীরক্রিয়াবিজ্ঞানে পেটের গোলমাল হওয়া অসম্ভব। কারণ যাঁদের পাকযন্ত্র মোটা খোসা সমেত জোয়ারের রুক্ষ আটা হজম করায় অভ্যস্ত তাঁরা কাইন ময়দা হজম করতে পারছেন না একথা বিশ্বাস করা যায় কি করে? মাস দুই-এর মধ্যে কল্পিত বদহজমের লীলা শেষ হল এবং খবর কাগজের পাতায় যে আন্দোলন চলছিল তারও উপর যবনিকা পতন হল।

বাঙালীর আহার্যে প্রধান অভাব হল শরীর গঠনকারী প্রোটিনের। বিশেষজ্ঞদের নির্দিষ্ট দৈনিক দেড় ছটাক ডালের বদলে পড়পড়তা এক ছটাক ডালও বাঙালীর থালে খুঁজে পাওয়া যায়নি আহার্য নিরীক্ষার সময়। ডালে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন থাকে বটে তবে এই উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের পোষণ শক্তি দুধ ডিম মাছ বা মাংসের প্রোটিনের চেয়ে কিছু কম। পৃথিবীতে যত শক্তিমান জাতি আছেন তাঁরা সকলেই পর্যাপ্ত মাত্রায় জান্তব প্রোটিন ভোজী। তাছাড়া পরিপাক শক্তির জোর না থাকলে বেশী পরিমাণে ডাল হজম করা যায় না। ডাল—তা সে ছোলা মুগ মটর অড়হর যাই হোক না কেন—পূর্বতর ভাবে পরিপাক করা যায় যদি দানাগুলি খুব নরম করে পাক করা হয়। অর্ধপক্ক দানা বিষ্ঠার সহিত শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। পাঞ্জাবীদের রান্নাকরা "আলু ছোলে-তে" গোটা ছোলার দানা নরম থাকে এবং মারাঠীদের "উসল্" বা ঘুষ্নিতেও তাই। গুজরাতীরা বেসনের নানা রকম খাবার রান্না করেন। এই সব রান্নার উদ্দেশ্য হল ডাল জাতীয় খাদ্যশস্যের প্রোটিন বেশী করে খাওয়া। আমরা ফিরিওয়ালার কাছ থেকে কাবুলী মটরের "চটপটী মশালেদার" কিনে খাই কিন্তু এই সব ধরণের রান্না যাহা মুখরোচক ও পুষ্টিকারক এবং সুলভ সেগুলি দৈনিক আহার্যের পর্যায়ে গ্রহণ করতে পারিনি।

ভোজ্য নিরীক্ষার ফলে জানা গেছে যে—ধনী পরিবার গুলিকে বাদ দিলে—সাধারণ বাঙালীর ভাগ্যে প্রত্যহ গড়পড়তা আধ-ছটাক থেকে দু'ছটাকের বেশী দুধ জোটে না। দুধের দুর্মূল্যতার জন্য কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লী, আমেদাবাদ ইত্যাদি বড় বড় সহরে "টোনড্" দুধ সরবরাহের ব্যবস্থা করেছেন স্থানীয় রাজ্য সরকারেরা। টোনড্ দুধ সাধারণ গরুর দুধের চেয়ে কোনও অংশে কম পুষ্টিকর নয়। বাঙালীর খাদ্যে জান্তব প্রোটিনের আধার হল মাছ। নিরীক্ষার তালিকায় দেখা যায় যে গড়পড়তা সিকি ছটাক থেকে আধ ছটাক মাছ রোজ একজন বাঙালী খেয়ে থাকেন। জানিনা ব্যবসায়ীদের ক্রমবর্ধমান মুনাফাবাজীর কল্যাণে এই যৎসামান্য মাছও দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়েছে কিনা।

এ প্রবন্ধের শিরোনামায় 'ধান' শব্দটী একাধিক অর্থে

ব্যবহার করা হয়েছে। মান কথাটার একটা অর্থ হল মাপ বা মাত্রা এবং দ্বিতীয় অর্থ হল সম্মান বা মর্যাদা। বর্তমান যুগে সাধারণ বাঙালীর ঘরে যেরূপ আহার্যের প্রচলন দেখা যায় তার পোষণশক্তির মান বা মাত্রা সম্বন্ধে এতক্ষণ আলোচনা করা গেল। এবারে দেখা যাক জীবনযাত্রার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অঙ্গ হিসাবে এই খাওয়া ব্যাপারটাকে সম্মান বা মর্যাদা দেওয়া হয় কতটা, বিশেষত মধ্যবিত্তের ঘরে। মধ্যবিত্ত পরিবারের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কারণ শোটানার মধ্যে পড়ে তাঁদের সমস্যা প্রবল হয়ে পড়েছে। সীমিত বা স্বল্প আয়ের উপর নির্ভর করে, তাঁদের বাসস্থান আহার্য পরিধেয় ও সংসারের অন্যান্য চাহিদা মেটাতে হয় অন্যান্য সকলের মত। এসব খরচ ছাড়া ভদ্রতা বজায় রাখার জন্য তাঁদের অনেক অসুবিধা ভোগ করতে হয়। স্মরণে আসে ১৯৪৩ সালের সেই ঘোর দুর্দিনের ঘটনাগুলি। অনাহারে জর্জরিত হওয়া সত্ত্বেও মধ্যবিত্তেরা কেবলমাত্র চক্ষুলজ্জার খাতিরে লঙ্গরখানার অন্নভিক্ষায় যোগ দিতে পারেননি অন্যান্য ভাগ্যাহত পরিবারের সঙ্গে। কারণ তাঁরা মানসম্ভ্রম ক্ষুণ্ণ হবার ভয়ে সবরকম অসুবিধা ও কষ্ট এমন কি অনশন বা অর্ধাশনের যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করে গেছেন। এরূপ করা উচিত ছিল কিনা সে বিচার বর্তমান আলোচনার বহির্ভূত। তবে এরূপ ঘটনা থেকে সঙ্গতভাবে অনুমান করা যায় যে এখন অনেক লোক বাঙলা দেশে আছেন যাঁরা আহার্যের জৈবিক প্রয়োজনকে লৌকিক মান মর্যাদার নিম্নে স্থান দিতে কুণ্ঠিত হবেন না।

গত ৫০।৬০ বৎসরের মধ্যে বাঙালীর জীবনযাত্রায় কতকগুলি খরচের দফা বেড়েছে এটা বেশ স্পষ্টভাবেই চোখে পড়ে। মধ্যবিত্তেরা এবং খুব সম্ভব তাঁদের ছোঁয়াচ লেগে অন্যবিত্তেরাও অপেক্ষাকৃত বেশী মাত্রায় পরিধেয় সম্বন্ধে সচেতন বা 'পোষাকী' হয়ে পড়েছেন একথা অস্বীকার করা যায়না। সত্যের খাতিরে একথাও বলতে হবে যে পোষাকের বিলাস ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও বৃদ্ধি পেয়েছে। কম কথা খরচ বেড়েছে পরিধেয় খাতে—কারণটা যাই হোক না কেন। অর্থের অনটন সত্ত্বেও বিগতদিনের আভিজাত্য ত্যাগ করতে না পেরে অথবা লোক লৌকিকতার আবর্তে পড়ে অনেক মধ্যবিত্ত পরিবার তত্ত্বতাবাস বা উপহার (প্রেজেন্ট) বাবদে বেশ কিছু খরচ করতে বাধ্য হচ্ছেন। পূর্ব আমলে জন্ম মৃত্যু ও বিবাহ ইত্যাদি সামাজিক ক্রিয়া কলাপেই উপঢৌকন দেবার বিধি ছিল। হাল আমলে এ সবের উপর বেড়েছে জন্মতিথি, বিবাহবার্ষিকী, সার্বজনীন পূজা ও জয়ন্তী উৎসব। এসব অনুষ্ঠানে সাধ্যাতিরিক্ত ভাবে প্রেজেন্ট ও চাঁদা দিতে অপারগ হলে ঘরে এবং বাইরে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা আছে। ট্রাম বাস ও রিক্সার কল্যাণে দৈনিক পায়ে হাঁটার স্বাস্থ্যকর অভ্যাস একেবারে বিলুপ্ত বললেই চলে কিন্তু খরচ বেড়েছে। এর অজুহাতে অনেকেই সময়ের অভাব উল্লেখ করেন। কিন্তু এই অজুহাত সর্বক্ষেত্রেই যুক্তিগ্রাহ্য কিনা তাহা নির্ণয় করা শক্ত।

উপরে যে খরচের ফিরিস্তি করা হল তার মধ্যে একটী অনপ্রিয় খরচের দফা ইচ্ছা করে বাদ দেওয়া হয়েছে। সকলেই দেখেছেন যে থিয়েটারে ও ছবিঘরে কি ভীষণ ভীড় হয়। বাঙালী যে নাট্যামোদী এ খ্যাতির স্বাক্ষর আছে তাদের ইতিহাসে। গ্রামাঞ্চলে বারোয়ারী যাত্রার কথা অনেকেই জানেন। কাজেই ছবি দেখার বিপক্ষে কটাক্ষ করা সমুচিত বলে মনে হয় না। আহার্য থেকে আমরা স্বাস্থ্যসঞ্চয় করি বা দৈহিক শক্তি অর্জন করি কিন্তু আমোদ-প্রমোদ জোগায় মানসিক স্বাস্থ্য গঠনের উপাদান। বেঁচে থাকতে গেলে দুটাই চাই। বাঙালীর 'বাস্তব আয়' গড়পড়তা হারে বেড়েছে বলে জানা নেই। কাজেই নানা রকম দায় ও অদায়ের বাহুতি চাহিদা মেটাবার ফলে আহার্যের মান যে মধ্যবিত্ত সমাজে হ্রাস পেয়েছে এ সত্য অনস্বীকার্য। বাড়ির ভিতরে কে কি খান, তা অপরে দেখতে পান না। কিন্তু সাজপোষাক ও লোকলৌকিকতার বহর সকলের নজরে পড়ে। 'লোকে কি বলবে' বা 'লোকে কি ভাববে' এই দুর্বলতা ঘোচাতে না পারলে আহার্যের সংস্কার সাধন করার কোনও আশা দেখা যায়না বর্তমান প্রতিবেশে।

লিলি চক্রবর্ত্তীর সৌন্দর্য্যের গোপন কথা...

'লাক্সের মধুর পরশ আমার সুন্দর রাখে।'

লিলি চক্রবর্ত্তীর রূপ রহস্য আপনার সৌন্দর্য্যেরও গোপনকথা হতে পারে। ... লাক্স মাখুন ... লাক্সের মধুর গন্ধ আর কুসুম কোমল ফেনার পরশ আপনার চমৎকার লাগবে! সাদা ও রামধনুর চারটি মনভুলানো রঙের লাক্স থেকে আপনার মনের মতো রঙ বেছে নিন। সৌন্দর্য্যের জন্য লাক্স টয়লেট সাবান ব্যবহার করুন।

চিত্রতারকাদের বিশুদ্ধ, কোমল সৌন্দর্য্য—সাবান

রূপসী লিলি চক্রবর্ত্তী বলেন—
"আমার প্রিয় লাক্স এখন চমৎকার পাঁচটি রঙে!"

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

LTS. 127-XSI BG

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

চাপমানের ছোঁয়ায় পড়ে কবি কীটস্ যতখানি বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছিলেন, মহাকবি কালিদাস রচিত অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ পড়ে জার্মান কবি গোয়েটে তার থেকে কম অভিভূত হননি। গোয়েটের ধ্যানস নয়নের সম্মুখে এমন একটি অভিনব জগত অবলুপ্ত হয়েছিল যার মধ্যে, যা কিছু সুন্দর, যা কিছু নয়নরঞ্জন, যা কিছু চিত্তহারী, সবই যেন একত্রিত করে সমাবিষ্ট হয়েছে। বিস্ময় ও আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে কবি তাই এই মন্তব্যটি করেছিলেন।

"যদি কেউ বসন্তের ফুল ও শরতের ফসল, সুন্দর চিত্তহারী বস্তু ও প্রীতি ও আনন্দের বস্তু একসঙ্গে চায়, যদি কেউ স্বর্গ ও পৃথিবীকে একই নামে সংযুক্ত করতে চায়, তা হলে অভিজ্ঞান শকুন্তলমের নাম করলেই সব বলা হয়ে যায়।"

অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নাটকে সত্যই স্বর্গ ও মর্ত্য একই সূত্রে গ্রথিত হয়েছিল। তার প্রথম অঙ্কে মহর্ষি কণ্বের দুহিতা শকুন্তলাকে তাঁর সোদর প্রতিম আশ্রম তরুগুলির আলবালে জলসেচনে নিযুক্ত অবস্থায় দেখে রাজা দুষ্মন্ত মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর অতিপিনদ্ধ বল্কলে আবদ্ধ দেহে নবোদ্ভিন্ন যৌবনের বিকাশ দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে তিনি বলেছিলেন "ইয়ং খলিক মনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী," ইনি বল্কল পরিহিত হয়ে যেন অধিক মনোজ্ঞা হয়েছেন। সপ্তম অঙ্কে দুষ্মন্ত তাঁকে আর একবার দেখেছিলেন মহর্ষি মরীচের আশ্রমে। সেখানে তাঁর স্বতন্ত্র বেশ। সেখানে তিনি ছিলেন "বদনে পরিধূসরে বসানা নিয়মকামমুখী ধৃতৈকবেণী।" সেদিনও তাঁর সেই রূপ দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে। প্রথম রূপটি শুধু মুগ্ধ করেনা মাতায়, তার আবেদন ততখানি মনের কাছে নয়, যতখানি ইন্দ্রিয়ের কাছে। দ্বিতীয় রূপটির আবেদন ইন্দ্রিয়ের নিকট নয়, মনের নিকট। তা ততখানি মুগ্ধ করে না, যতখানি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। প্রথমটি পার্থিব, দ্বিতীয়টি স্বর্গীয়।

কালিদাস রচিত মেঘদূতম্ খণ্ডকাব্য বিশ্বের শ্রেষ্ঠগীতি কবিতাগুলির অন্যতম। তার উপর কাব্যে ভাষ্য লিখে রবীন্দ্রনাথ বাঙালীকে তার নৈসর্গিক সৌন্দর্যের সহিত পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। এই খণ্ড কাব্য সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মন্তব্য বোধহয় সকল সাহিত্য রসিকের অনুমোদন পাবে। তিনি বলেছেন, "এই সমস্ত বর্ণনে এরূপ কবির শক্তি প্রকাশিত হইয়াছে যে যদি কালিদাস মেঘদূত ব্যতিরিক্ত আর কোন কাব্যের রচনা না করিতেন তথাপি ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় কবি বলিয়া সর্ব্বত্র অঙ্গীকৃত হইতেন।"

এই কবিতায় এমন কি গুণ আছে যা আমাদের এমনভাবে মুগ্ধ করে? তা কি শুধু বিশ্বের বিরহীর শোককে ভাষা দিয়ে পরিস্ফুট করেছে বলে? সম্ভবত তা নয়। মনে হয় এই কাব্যটিও অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ এর মত অনুরূপভাবে বিশিষ্ট। সেটিই বোধহয় তার অতিরিক্ত কারণ। অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ এ দেহাশ্রয়ী প্রেম ও গুণাশ্রয়ী প্রেমের একত্র সমাবেশ দেখি।

এখানেও অনুরূপ ভাবে বিভিন্নধর্ম্মী সৌন্দর্য্যের বিচিত্র সমাবেশ দেখি।

মেঘদূতের গল্পটি সংক্ষেপে এই। কুবেরের একটি যক্ষ কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি কার্য্যে অবহেলা দেখিয়ে ছিলেন বলে তাঁর মনিব তাঁকে একবৎসরের নির্ব্বাসন দণ্ড দিয়েছিলেন। তাই তিনি নির্ব্বাসিত হয়ে রামগিরি বনে একাকী বাস করতে আরম্ভ করলেন। অলকায় তাঁর নিজগৃহে প্রিয়া পড়ে রইলেন একাকী। এই ভাবে আট মাস কেটে গেছে। আষাঢ়ের প্রথম দিনে পাহাড়ের গায়ে এক খণ্ড মেঘ দেখে তাঁর মনে ইচ্ছা জাগল তাকে দূত ক'রে অলকায় প্রিয়ার কাছে পাঠিয়ে দেবেন এই কথা জানাতে যে প্রিয়তমের বিরহে তিনি একান্ত কাতর হলেও তাঁর ধৈর্য্য ধরতে হবে, কারণ বিচ্ছেদের দিনও প্রায় শেষ হয়ে এল, মিলনের দিন আগত প্রায়। এই সূত্রে প্রয়োজন হয়ে পড়ল দূতকে পথ বলে দেবার। যে পথ দিয়ে সে যাবে তা উত্তরমুখী। পথে পড়বে আম্রকূট পাহাড় এবং অবন্তী দেশ। একটু পাশে কাছেই উজ্জয়িনী। যদিও তা পথে পড়েনা তা দেখে যেতে হবে, কারণ তা স্বর্গের মতই সুন্দর। তারপর দেবগিরি হয়ে দশপুর হয়ে ব্রহ্মাবর্ত্ত। সেখান হতে কনখলে গঙ্গার দর্শন মিলবে। তারপর হিমালয় পর্ব্বত। এপারে মানস সরোবর এবং কৈলাস। সেই কৈলাসেরই অঙ্কে শায়িত অলকাপুরী। তারই একপাশে তাঁর নিজের গৃহ এবং তারই মধ্যে দর্শন মিলবে তাঁর বিরহিণী প্রিয়ার।

এই সূত্রেই আমরা পাই বিভিন্ন শ্রেণীর সৌন্দর্য্যের পৃথক হৃদয়গ্রাহী, মনোরম বর্ণনা। প্রথম পাই পৃথিবীর সৌন্দর্য্যের বর্ণনা। রামগিরি হতে কৈলাস পর্য্যন্ত, পথে যা কিছু মনোরম চোখে পড়ে তার কিছুই বাদ পড়েনি। তাতে স্থান পেয়েছে পর্ব্বত, নদী, গ্রাম, নগরী, বন। সবই প্রকৃতির অঙ্গ। সবাইকে জড়িয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের ছড়াছড়ি। মানস নয়নে কবি মেঘের সহিত ঊর্দ্ধলোক হতে দেখে তাদের বিচিত্র শোভার বর্ণনা দিয়েছেন। প্রকৃতির সকল সৌন্দর্য্যের এখানে যেন একত্র সমাবেশ হয়েছে।

তারপর পাই অলকার বর্ণনা। সে ত স্বর্গ রাজ্য, দেবতাদের বাসভূমি। কল্পনার রঙীন তুলি দিয়ে কবি তার শোভাও এঁকেছেন। সেখানকার মেয়েরা কেমনভাবে সাজে, সেখানকার নাগরিক কিভাবে চিত্তবিনোদন করে, সেখানকার বাড়ী কেমন পরিপাটি সাজান—তার মনোহরণ বর্ণনা সেখানে আছে। কবি কল্পনায়-সমৃদ্ধ নাগরিক জীবনের চূড়ান্ত রূপটি যেন সে বর্ণনায় ধরা পড়ে গিয়েছে। এ হল যেন মানুষের রচিত কৃত্রিম সৌন্দর্য্যের বর্ণনা, কারণ নগরী ত মানুষের সৃষ্টি।

আর শেষে পাই যার কাছে সংবাদ নিয়ে যেতে হবে যক্ষের সেই বিরহিণী প্রিয়ার বর্ণনা। প্রেমের গভীরতা, প্রেমের মাধুর্য্য, বোধ হয় সব থেকে সুন্দর ভাবে ফুটে ওঠে বিরহের অবস্থায়। মিলনে আবেগতার উচ্ছ্বাস গভীরতাকে ত বুঝতে দেয় না। মানুষের অনুভূতির শ্রেষ্ঠ বিকাশ হল প্রেম। তার শ্রেষ্ঠ রূপটি সব থেকে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে বিরহের বেদনার মধ্যে। যাকে ভালবেসেছি তাকে কতখানি ভালবেসেছি, তা যেন সঠিক জানা যায়, তাকে হারালে মনের অবস্থা কি হয় তাই দিয়ে। মিলনের ভাবাবেগে উচ্ছ্বাসের বাণী শোনান যায় অনেক, বলা যায়, তুমি আমার ভবজলধিরত্ন, তুমি আমার দ্বিতীয় জীবন, তুমি আমার প্রাণের অধিক প্রাণ, কত কি। কিন্তু তা কতখানি সত্য, প্রিয় জনের বিচ্ছেদে সত্যই জীবন শূন্য বলে বোধ হয় কি না তা প্রমাণ হয় বিরহে। এইখানেই ধরা পড়ে সেই মানসিক সৌন্দর্য যা কবিতা হয়ে ফুটে, কিন্তু যা মানসিক সৌন্দর্য্যের শ্রেষ্ঠ বিকাশ। তা বেদনায় ভরা হয়ে, কিন্তু মাধুর্য্যে মণ্ডিত। মেঘের কাছে যক্ষ তাঁর বিরহিণী প্রিয়ার যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে কবি এঁকেছেন এই মানসিক সৌন্দর্য্যের চূড়ান্ত রূপটি।

সুতরাং মেঘদূতে আমরা পাই তিনটি বিভিন্ন প্রকৃতির

সৌন্দর্য্যের একত্র সমাবেশ। একটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, অন্যটি নাগরিক সৌন্দর্য্য এবং তৃতীয়টি মানসিক সৌন্দর্য্য। প্রথমটি প্রকৃতির, দ্বিতীয়টি কৃত্রিম, মানুষের গড়া এবং তৃতীয়টি মনের। প্রথমটির আবেদন চক্ষুর নিকট, দ্বিতীয়টির মনের নিকট এবং তৃতীয়টির হৃদয়ের নিকট। কবি পাশাপাশি তিনটি বিভিন্ন পর্য্যায়ের সৌন্দর্য্য এই ভাবে স্থাপন করে আমাদের কি প্রশ্ন করতে চেয়েছিলেন, যে তোমরা বল কোনটি সব থেকে সুন্দর, কার গলায় তোমরা বরমাল্য দেবে?

এখন মহাকবি এই তিনটি সৌন্দর্য্যের রূপ কেমনটি এঁকেছেন তার কিছু পরিচয় দেওয়া যাক। এই সম্পর্কে তাঁর কবিতার অংশ উদ্ধৃত করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সকলের হয়তো মূল সংস্কৃতে রচনা বোধগম্য নাও হতে পারে, এই বিবেচনায় তার বাংলা অনুবাদই ব্যবহার করা হবে।

অলকায় যেতে হলে মেঘের পথ উত্তর মুখী। অবন্তী দেশ পর্য্যন্ত এসে উজ্জয়িনী কাছেই পড়ে, কিন্তু ঠিক পথে পড়ে না। তবু মেঘকে অনুরোধ করা হয়েছে, সেখান হয়ে যেতে, কারণ তার মত মনোরম স্থান নাকি নেই। তা এত মনোরম যে মনে হয় যেন যারা পুণ্য সঞ্চয় ক'রে পুণ্যবলে স্বর্গে গিয়েছিল, তারা ফেরবার মুখে, স্বর্গের কিছু অংশ বুঝি চুরি ক'রে এখানে এনেছিল। কবির ভাষায়,

পুণ্যের ফলে পদচ্যুত হয়ে
স্বর্গ তাড়িত জনে,
চুরি করি বুঝি স্বর্গের পুঁজি
এনেছিল কিছু সনে।

এমন বৈশিষ্ট্য দাবী করবার সঙ্গত কারণ আছে বৈ কি। তার পাশ দিয়ে শিপ্রা নদী প্রবাহিত, তাতে ফুটে আছে অগণিত কমল। তার সৌরভে সুরভিত বাতাস সেখানে নারীর ক্লান্তি হরণ করে। তাকে সেখানে আকৃষ্ট করবার জন্য কবি তাই বলছেন,

প্রত্যূষে তার তীরে শিপ্রার
সারস কূজন করে,
কমল সুবাস বাসিত বাতাস
নারীর ক্লান্তি হরে,
অঙ্গানুকূল উড়াইয়া চুল
সুপটু সে চাটুকার,—
যেন প্রিয়জন করে নিবেদন
অভিলাষ খানি তার।

সত্যই দেখা যায় কবির উজ্জয়িনীর ওপর বিশেষ পক্ষপাত আছে। ঠিক পথে না পড়লেও দূতের সেখানে যেতে হবে। গিয়ে রাত্রি যাপনও একদিন করতে হবে। শুধু তাই নয়, উজ্জয়িনী-বাসিনী নারীর কিছু উপকারও সাধন করতে হবে। মেঘ কেমন ভাবে তাদের উপকার সাধন করবে সে সম্বন্ধে বিস্তারিত উপদেশ হল এই—

অভিসারী নারী রাজ পথে তারি
নিশার অন্ধকারে,
প্রিয়ের বসতি কোন পথে যদি
চিনিবারে নাহি পারে,
বিজলীতে লেখা যেন হেম রেখা
আলো তারে দিও আসি,
নহে বর্ষণ, নহে গর্জ্জন,
বিজলী বিলিক খানি।

তার পর দীর্ঘ পথ অতিক্রম ক'রে কনখল পার হয়ে মেঘ আসবে হিমালয়ের বুকে। সে পর্ব্বত সব সময় তুষারে আবৃত। মেঘের কালো দেহ তার কোলে যখন আশ্রয় নেবে, তখন তাদের শোভা কেমন হবে তা কবি বর্ণনা করেছেন এই ভাবে,

তুষার কারণ যাহার বরণ
সদাই ধবল বর,
নাম হিমাচল, যার নিতম্বল
কৃষ্ণনাভি বাসধর;

বিশ্রাম তরে তাহার শিখরে
তুমি নিম্ন হলে,
হবে প্রতিভাত শিববৃষ খাত
পঙ্কের মত বলে।

তারপর হিমালয় পার হয়ে আরও উত্তরে গিয়ে মিলবে কৈলাস পর্ব্বতের দেখা। সেখানে মহাদেব বাস করেন। পুরাণে গল্প আছে রাবণ একদিন তার দেহটি ওরে নাড়া দিয়েছিল। সে দেহটি জমাট বাঁধা বরফে ঢাকা। সত্যই কি তাই? কবি বলেন, তা ত নয়, তা জমাট বাঁধা শিবের অট্টহাসি,

দশ মুখ দিল করিয়া শিথিল
স্বচ্ছ দেহটি যার,
হেব নারী জন ভয়ে দর্শন।
অতিথি হইবে তার।
কুন্দ ধবল শিখরের দল
আকাশেতে রাশি রাশি
যার বিভাসিত যেন রাশীকৃত
শিবের অট্টহাসি।

তার কোলেই ত নিম্ন অলকাপুরী। মেঘদূতের ত তাকে চিনতে ভুল হওয়া উচিত হবে না, কারণ তা নানা দিক দিয়ে মেঘের মতই সুন্দর। কি কি বিষয়ে তার মেঘের সঙ্গে সাদৃশ্য তা বোঝিয়ে দিতে কবি এই দীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন,

বিদ্যুৎ সম নারী মনোরম ;
ছবি রামধনু শোভা ;
মুরজ বাদন হল গর্জ্জন,
গম্ভীর মনোলোভা ;
বারি কণা যার মুক্তার সার ;
উচ্চ অভ্রলেহী
প্রাসাদেরা তার ভুলা তোমার
বহু বহু বিদ্যেছে।

সেখানকার নারী কি কেবল মেঘেই বিদ্যুতের মত উজ্জ্বল? তাদের আরও গুণ আছে। কেমন ক'রে প্রসাধন করতে হয় তা তারা যেমন জানে তেমনটি মর্ত্যলোকের মেয়েরা তা জানে না। আমাদের মর্ত্যবাসিনীর কৌতূহল নিবারণ করতে কবি তার বর্ণনাও দিয়েছেন এই ভাবে,

তার বধূজন করেন ধারণ
হস্তে কমল ফুলে,
কুরুবক আর কুন্দের সার
মাথার কৃষ্ণ চুলে,
কর্ণের তলে শিরীষের দলে,
সীমন্তে নীপ তার,
লোধ্র পরাগে পাণ্ডুর রাগে
সাজায় আনন আর।

আমাদের বিরহী যক্ষটি শুধু প্রেমিক নন, সুরুচি সম্পন্ন ও বটেন। তিনি তাঁর গৃহের পরিবেশটি তাই সুন্দর ক'রে সাজিয়েছেন। এই কবিতায় তার বিস্তারিত বিবরণ আছে। পূর্ণ বর্ণনা দিতে গেলে অনেক জায়গা নেবে। তাই তার শোভার একটু আংশিক বিবরণ দেওয়া হচ্ছে। গৃহে প্রবেশের জন্য তোরণ আছে, তোরণের পর উদ্যান, উদ্যানে নানা পুষ্প বৃক্ষ আছে, ক্রীড়া শৈল আছে, আর আছে একটি পুষ্করিণী। সেই পুষ্করিণীর সৌন্দর্য্য তার মালিকের বিশেষ গর্ব্বের কারণ। তাঁর বাপী মানস সরোবরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার ক্ষমতা তা রাখে। তার প্রমাণ তিনি দিয়েছেন এই ভাবে,

বাপী যাহে তার সোপানের সার
মরকত শিলাময়,
সেথা নাল ফুল, কমল অতুল
সোণার ফুটিয়া রয়।
আসি তার জলে হংসের দলে
সুখেতে বসতি করে,

তুমি আসিলেও, নিকট হলেও
যানসে যন না সরে।

এইত গেল পৃথিবীর বুকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা এবং তারপর নিসর্গলোকের নানাবিধ সৌন্দর্যের বর্ণনা। সবার শেষে এইবার পাই বিরহিণী প্রিয়ার বর্ণনা। বিচ্ছেদের পর প্রিয়ার অবস্থাটি কেমন হয়েছে, তার বর্ণনা যক্ষ দিয়েছেন অনুমানের ভিত্তিতে; তবে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস এ অনুমান নির্ভরযোগ্য। তাঁর মনের কামনা-রচিত ধারণা তাঁকে বাচাল করেনি। তাতে অণুমাত্র অতিরঞ্জন নেই। তাঁর প্রতি তাঁর প্রিয়ার অনুরাগের গভীরতা ভাল ক'রে জানেন বলেই, তিনি তাঁর বিরহিণীর অবস্থা এইরূপ কল্পনা করেছেন। তিনি আরও ভরসা রাখেন যে মেঘদূত যখন নিজ চক্ষে তাঁর অবস্থা দেখবেন, তাঁর এই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হবে।

তারপরে পাই যক্ষের বচনের মধ্যে যক্ষ পত্নীর বর্ণনা। কবি এখানে তাঁর যে ছবি এঁকেছেন তার তুলনা হয় না। বিরহাবস্থার এমন করুণ মর্মস্পর্শী চিত্র বুঝি কোনো সাহিত্যে অঙ্কিত হয়নি। সেই বিরহিণীর প্রেমাস্পদ তাঁর জীবনকে এমন ক'রে ভরে রেখেছিলেন যে তাঁর বিচ্ছেদে জীবন তাঁর দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। তিনি কবরী বাঁধেন না, তাই বেণী তাঁর অপরিপাটি। তিনি নখ কাটেন না। তাঁর একমাত্র কাজ হল নির্বাসন দণ্ড শেষ হতে আর কত দিন বাকি আছে তা গণনা ক'রে, বা তাঁর প্রিয়তমের মঙ্গল কামনা ক'রে বা অন্য নানা ভাবে তাঁর চিন্তা ক'রে দিন কাটান। বিরহাবস্থায় তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে যেন প্রিয়তমের চিন্তা ব্যাপ্ত ক'রে রেখে দিয়েছে।

যক্ষের ধারণা, মেঘদূত প্রিয়তমাকে যে বেশে দেখবেন তা এইরূপ,

কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠেছে ফুলিয়া
আঁখি দুটি তার আনি,
শ্বাস নিশিদিন করেছে মলিন
তাপেতে অধর খানি,
হয়ত চিবুক, আধো ঢাকা মুখ,
না বাঁধা তাহার কেশ,—
সে যেন গো ক্ষীণ মেঘেতে বিলীন
চাঁদ, বিমলিন বেশ।

তারপর যে বর্ণনা আছে তাতে বিরহিণী কেমন ক'রে সমগ্র দিনটি কাটান, তার সবিস্তার বিবরণ আছে। এই বিবরণে যা লক্ষ্য করবার বিষয় তা হল যে একটি সমগ্র দিনের প্রতিটি মুহূর্ত তিনি প্রবাসী প্রিয়ের চিন্তা দিয়ে অতিবাহিত করেন। প্রিয়ের বিরহ তাঁর মনকে এমনি অভিভূত করেছে যে অহর্নিশি তাঁর চিন্তায় বিরহিণীর মন পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। অন্য কোন চিন্তা বা কাজ তাঁর মনকে আকর্ষণ করতে সুযোগ পায় না। এই বার তাঁর সারাটি দিন কি ভাবে কাটে তার বর্ণনা উদ্ধৃত করা যেতে পারে। যক্ষ বলছেন,

লাগি মোর হিত পূজায় ব্যাপৃত
হয়ত দেখিবে তারে,
অথবা আমার সদৃশ আকার
আঁকিছে ছবিতে কারে,
কিম্বা খাঁচার সারিকারে তার
কহিছে নিকটে গিয়া,
মোর প্রাণধনে পড়ে কিগো মনে
তুই ছিলি তার প্রিয়া।

হয়ত কি জানি রাখি বীণা খানি
মলিন বসন পরে,
মোর নাম দিয়া গড়া বিরচিয়া,
গান গাহিবার তরে
আঁখি জল মুছি কোনও মতে বুঝি
তন্ত্রীরে তার সারি,

মূর্চ্ছনা তার ভুলে বার বার
রচিত ধরণী তারি।
অথবা বোধ হয় বাকি যাদ কয়
স্থাপিত অবধি যার,
ভুমিতে রাখিয়া দেখিছে গণিয়া
হারে আমি ভুল তার।

মোট কথায় প্রিয়জনের বিচ্ছেদ এমন ভাবে তাঁকে অভিভূত করে রেখেছে যে তাঁর চিন্তা, তাঁর ধ্যান, তাঁর বিষয় আলোচনা, তাঁর আলেখ্য অঙ্কন এবং তাঁর মঙ্গল কামনা, এই বিরহিণীর অবলম্বন। বিরহের এমন করুণ, এমন মর্ম্মস্পর্শী এবং এমন সুন্দর বর্ণনা আর কোনো সাহিত্যে আছে কি?

তাই যেন মনে হয় মহাকবি কালিদাসের অভিলাষ হয়েছিল, মানসিক সৌন্দর্য্যের পাশে বাস্তব সৌন্দর্য্যকে স্থাপন ক'রে দেখতে, কোনটি বেশী সুন্দর। তাই বুঝি মেঘদূত খণ্ডকাব্যে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য, নিসর্গলোকের নাগরিক সৌন্দর্য্য এবং বিরহিণী নারীর বেদনার সৌন্দর্য্য একই কবিতায় পাশাপাশি স্থাপন করেছিলেন। উত্তরটি কি হওয়া উচিত তা তিনি জানেননি। কিন্তু তার প্রয়োজন আছে কি? যক্ষ-প্রিয়া যেন মূর্ত্তিমান বিরহ। তাঁর মর্ম্মভেদী বেদনার করুণ মাধুর্য্য আর সকল সৌন্দর্যকে ম্লান ক'রে দেয় নাকি?

এই মেঘদূত কবিতায় আরও একটি অমূল্য বস্তু আছে যা তাকে বিশিষ্টতা দিয়েছে। তা হল তার অন্তর্নিহিত বাণী। সে বাণী হল আশার বাণী। তা বলে দুঃখের আঁধার যখন চারি দিক দিয়ে ঘিরে আসে তখনও আশার বর্ত্তিকা জ্বালিয়ে রাখতে হয়। কারণ দীর্ঘতম রজনীরও ত শেষ আছে। দীর্ঘতম দুঃখের দিনগুলিও ত একদিন কেটে যায়। দ্বিতীয়ত অন্তহীন দুঃখ বা অন্তহীন সুখ ত মানুষের ভাগ্যের বিধান নয়। সুখ দুঃখ হাসি কান্না, আশা নিরাশা, আলো আঁধারে মিশিয়ে আমাদের জীবন। সে ক্ষেত্রে দুঃখে অভিভূত হওয়া অর্থহীন, বরং দুঃখের শেষে সুখ আসবে এই আশায় বুক বাঁধাই যুক্তি সঙ্গত। দুঃখের তিমির রাত্রির শেষেই ত সুখের সুপ্রভাত। মেঘদূত এই বাণীটিই যক্ষের প্রিয়ার জন্য রামগিরি বন হতে বহন ক'রে এনেছিল। সে বাণী শুধু তাঁর নয় বিশ্বমানবের জন্য আশার বাণী। তা বলে,

নিরবধি সুখ অথবা দুখ
কার, বল মনোসুখে?
উচ্চে ও নীচে দশা যে ঘুরিছে
চক্রনেমির ক্রমে।

পথের ডাকে—বিভা সরকার

যুগান্তর বলেন :

বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত লেখিকার এই তীর্থ-পরিক্রমার কাহিনীগুলি রসিক মহলে বিশেষ আলোড়ন এবং কৌতূহলের সৃষ্টি করেছিল। সম্প্রতি তাঁর সেই ভ্রমণ-কাহিনীগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়ায় নিঃসন্দেহে ভ্রমণ-সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজনা হল। শুধু চোখের দেখার নীরস বর্ণনা নয়, "এর মূল উপাদান ঐতিহাসিক তথ্য ও কিছু পথে দেখা চরিত্র।" সহজ, সরল, অনাড়ম্বর ভাষায় লেখা এই কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনীগুলি প্রত্যেকেরই ভাল লাগবে। বিশেষ করে যাঁরা দেশ ভ্রমণ করেন এবং যাঁরা তীর্থস্থানের মাহাত্ম্য জানতে উৎসুক—তাঁদের প্রত্যেকেরই এই গ্রন্থখানি অপরিহার্য।

আনন্দবাজার বলেন :

গল্পের মত করে লেখা একটি সুন্দর ভ্রমণ-কাহিনী। নানা তীর্থ ভ্রমণ করে কিছু ঐতিহাসিক তথ্যের সঙ্গে কল্পনা মিশিয়ে শ্রীমতী সরকার এই গল্পের মত সরস কাহিনীটি লিখেছেন। গল্পের সরসতা আনবার জন্য কিছু সত্য ও কিছু কল্পিত চরিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। এর মধ্যে শেষের দিকে মাধবীর চরিত্রটি মনে ছায়াপাত করে। লেখিকার ভাষা বেশ পরিচ্ছন্ন।

প্রকাশক : এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ;
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য—৩।০

এনামেলের বাসন

- দামে সস্তা
- ভারে লঘু
- ব্যবহারে ঝৈকসই
- বিজ্ঞানসম্মত ও স্বাস্থ্যকর

বেঙ্গল এনামেলের বাসন

ব্যবহার করুন

●

বেঙ্গল এনামেল ওয়ার্কস লিঃ

৬০/২, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

সেলিং এজেণ্টস

সেরামিক সেলস্ করপোরেশন লিঃ

২৪ চিত্তরঞ্জন এভিন্যু, কলিকাতা-১২

চিঠি.....

জাপানের নারী সমাজ

দক্ষিণারঞ্জন বসু

মিয়াকো হোটেল,
কিয়োটো, জাপান
২৪. ৭ ৬২

মাননীয়াসু,

শারদীয়া 'জয়শ্রী'র জন্যে কিছু লিখতে বলেছিলেন। কয়েকদিন টোকিওয় কাটিয়ে ঘুরতে ঘুরতে জাপানের পুরনো রাজধানী কিয়োটোয় এসেছি পরশু সন্ধ্যায়। আজই এ শহর ছেড়ে ওসাকায় যাবো। হাতে ঘণ্টা খানেক সময় রয়েছে। মনে হলো এই হোটেলে বসেই আপনাকে একখানা চিঠি লিখলে মন্দ হয় না। আর কিছু না হোক, বাড়তি সময়টার সদ্ব্যবহার হবেতো নিশ্চয়ই। এ কয়দিন এ দেশে ঘুরে ফিরে বেশ কিছু দেখা হয়েছে এবং জানাও বড়ো কম হয়নি। এ চিঠির মাধ্যমে 'জয়শ্রী'র পাঠকপাঠিকাদের আমার সে অভিজ্ঞতার কিছুটা জানানো যাবে, সেও কি কম লাভ?

জাপানের যা কিছু এরই মধ্যে আমার দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করেছে তার মধ্যে জাপানী মেয়েদের কর্মোদ্যোগ ও কর্মকুশলতা অন্যতম। বাস্তবিকই প্রতিদিন সকাল-বিকেলে পথ চলতে চলতে অফিস ও কলকারখানা যাত্রীদের মিছিল ও ফিরতি মিছিলের ওপর যখনই চোখ পড়েছে তখনই মনে হয়েছে, তবে কি এদেশে পুরুষের চেয়ে নারী কর্মীসংখ্যাই বেশি! সন্দেহটা নিছক অনুমান নয়, পরে অনুসন্ধান করে জেনেছি সত্যি তাই।

যুগ বদলেছে, আর সেই যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জাপানীদের জীবন ধারারও পরিবর্তন এসেছে অত্যন্ত দ্রুত বেগে এবং ব্যাপক ভাবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগেকার জাপানের সঙ্গে আজকের জাপানের আকাশ-পাতাল তফাৎ এবং সেই পার্থক্যটা মেয়েদের বেলায় যেমন সুস্পষ্ট ভাবে প্রত্যক্ষ তেমন আর বোধ হয় কোনো ক্ষেত্রেই নয়। টোকিও, কিয়োটো বা ওসাকার কথা বলছি না, এমন কি পল্লী অঞ্চলেও আজ আর কিমোনো সাজে সজ্জিতা জাপানী মেয়েদের বড়ো একটা চোখে পড়ে না। পড়েনা এই কারণে যে আজ আর তাদের কর্মহীন নিস্তরঙ্গ জীবন নয়, কর্মের পক্ষে তারা আজ পুরুষের সহযোগী। ঢিলে ঢালা কিমোনো রূপ চর্চার দিক থেকে হয়তো চমৎকার, হয়তো অতুলনীয়। কিন্তু কর্মী মানুষের পরিচ্ছদ হিসেবে তা অচল তাই পশ্চিমী পোষাককে ওরা পুরোপুরি গ্রহণ করে নিয়েছে। কিমোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে ও বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে ব্যবহৃত হলেও কলকারখানা বা অফিস আদালত থেকে তা সম্পূর্ণভাবেই বিদায় নিয়েছে।

আমাদের দেশের মতোই পুরনো আমলে জাপানে মেয়েরা তাদের বাপের সম্পত্তির অধিকারী হতে পারতো না এবং নিজ ইচ্ছে মতো বিয়ে করারও কোনো অধিকার তাদের ছিল না। এক বার বিয়ে হয়ে গেলে সে বিয়েকে আর বাতিল করা যেত না সে যুগে এবং নিজেদের সন্তান সন্ততির শিক্ষা দীক্ষার ব্যাপারেও গৃহিণীরা কোনোরকম মতামত পর্যন্ত দিতে পারতেন না।

এই অবস্থা সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর

থেকে। ১৯৪৭ সনে জাপানে নতুন সংবিধান রচিত হয়েছে। সে সম্বন্ধে নিশ্চয়ই আপনার বিস্তারিত জানা আছে। সেই সংবিধানই আজ নারীর পূর্ণ স্বাধীনতা, পুরুষের সঙ্গে তার সমান মর্যাদা এবং তার সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা স্বীকার করে নিয়েছে।

কুড়ি বছরের বেশি বয়স্কা প্রত্যেকটি জাপানী মেয়েরই এখন ভোটাধিকার রয়েছে। নতুন সংবিধান অনুযায়ী প্রত্যেক নির্বাচনেই আইন সভার উভয় পরিষদে মহিলারা সমস্ত পদ লাভ করে আসছেন। রাজনৈতিক সচেতনতা জাপানী মেয়েদের মধ্যে ক্রমেই যে বেড়ে চলেছে বিভিন্ন মহলের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় তা বিশেষ ভাবে জানতে পেলাম। সাম্প্রতিক কালের নির্বাচনগুলিতে দলীয় প্রচার-কার্যে মেয়েরাই নাকি অধিকতর, যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন এবং যে দল যতটা সাফল্য অর্জন করেছে তার অনেকখানিই নাকি দলীয় সদস্যাদের প্রচার সাফল্যের ফল।

আজকের জাপানে মেয়েরা মন্ত্রীও হচ্ছেন, মেয়র পদও অলংকৃত করছেন, তাঁদের আজকে আমরা আদালতে বিচারক ও ব্যারিস্টার রূপে দেখছি, অধ্যাপিকা ও সমাজ সেবিকা এবং পুলিস ও ফ্যাক্টরী কর্মীরূপেও তারা আজ সংখ্যায় অগণ্য। কিন্তু পনেরো বিশ বছর বা ত্রিশ বছর আগে এ অবস্থা কল্পনাও করা যেতো না।

এই নতুন যুগেই সহ-শিক্ষা প্রবর্তিত হয়েছে এবং সমস্ত বিশ্ব-বিদ্যালয় ও বিদ্যালয়ের দ্বার এখন ছেলে এবং মেয়েদের জন্যে সমান ভাবে উন্মুক্ত। কয়েকদিন আগে টোকিওর একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শনে গিয়েছিলাম। প্রত্যেক ক্লাসেই লক্ষ্য করলাম ছেলে-মেয়েরা জোড়ায় জোড়ায় ঘন হয়ে বসে লেখা-পড়া শিখছে। প্রাথমিক শিক্ষায় ছেলে-মেয়েরা সংখ্যায় সমান সমান—জুনিয়র হাই স্কুলেও তাই। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছ'বছর এবং জুনিয়র হাই স্কুলে তিন বছর মোট এই ন'বছরের শিক্ষালাভ বর্তমান জাপানের প্রত্যেকটি ছেলে মেয়ের পক্ষে আবশ্যিক। এ দেশে যে কোনো কাজের বা চাকরির পক্ষে জুনিয়র হাই স্কুলের ডিপ্লোমা নিম্নতম শিক্ষাগত যোগ্যতা বলে বিবেচিত। এই যোগ্যতা ছাড়া কোন রকম চাকরির জন্যে চেষ্টা করাও এখানে বৃথা। মেয়েরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্কুলের শিক্ষা শেষ করে কোনো না কোনো কাজে ঢুকে পড়ে, তাই উচ্চতর কলেজী শিক্ষায় ছেলেদের সঙ্গে তাদের হারের বেশ কিছুটা তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। কলেজে সাধারণতঃ প্রতি সাড়ে চার জনে একজন ছাত্রী, মোটামুটি এই হার।

মেয়েরা শিক্ষা শেষ করেই কোনো না কোন অর্থকরী কাজে ঢুকে পড়ে। বিয়ের আগেই বেশ কিছু অর্থ সঞ্চয় করে নেয়। এবং বিয়ের পরেও চাকরি ছেড়ে দেয় না—সংসারকে যে কোনো প্রকার অভাব থেকে মুক্ত রাখবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করে।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাপ-মা তাদের পছন্দ মতো ছেলের হাতে মেয়েকে তুলে দিলেও সেই পুরনো কালের প্রথা এযুগে প্রায় লোপ পেতে বসেছে। একালের জাপানী মেয়েরা কুড়ি বছর বয়সে বাপ-মায়ের শাসন থেকে স্বাধীন এবং সাধারণতঃ সে বয়সেই তারা নিজের নিজের বর নির্বাচন করে নতুন নতুন ঘর পেতে থাকে। তাদের মা-ঠাকুর্মা থেকে তারা সকলেই প্রায় অনেক সুখী ও অনেক সুন্দর সুস্থ জীবনের অধিকারী, একথা অনেকের মুখেই শুনেছি।

চিঠিখানা এক বৈঠকে শেষ করা গেল না। লাউঞ্জ থেকে ফোনে তাগিদ এলো, সবাই আমার জন্যে অপেক্ষমান—গেটে গাড়ি প্রস্তুত। কাজেই উঠতে হলো। এক্ষুনি মালপত্র নিয়ে লিফ্‌ট-বন্দী ঘরে আট তলার সঙ্গীনো ঘর থেকে একদম নিচে নেমে যাচ্ছি। পোটলাপুটলি সব হাতের কাছেই গোছানো রয়েছে ভাবনার কিছু নেই।

পথে কয়েকটি কারখানা দেখতে দেখতে আমরা প্রায় সন্ধ্যার খেয়ে ওসাকায় পৌঁছুবো সোটা পথটাই মোটর গাড়িতে

যাবো। ওসাকায় আজ আর আমাদের কোনো প্রোগ্রাম নেই। তাই ভাবছি সেখানকার আস্তানা এগুও হোটেলে বসেই এ চিঠিখানা শেষ করা যাবে।

হাঁ, এখন আমি ওসাকায় এগুও হোটেলে। এখন সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা। বিরাট শহর এই ওসাকা। টোকিওর পরেই জাপানের দ্বিতীয় মহানগরী। এ হোটেলের সামনেই পৃথিবীর সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক পত্রিকা অসাহী শিম্বুনের ওসাকা কার্যালয়। শহরময় শুধু আলো আর আলো, চারদিকে নিয়ন লাইটের ছড়াছড়ি। সেই আলোর উৎসব থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে হলেও এ চিঠির পূর্বচ্ছেদ না টেনে এবার আর আমি উঠছিনা।

সাড়ে সাত ঘণ্টায় আমরা তিনটি কারখানা দেখে এলাম। পড়ে এক ঘণ্টা করে সময় লেগেছে এক একটি কারখানা দেখতে। আর বাকিটা সবই মোটর-দৌড়। আজ গোটাদিন ধরে যা কিছু দেখলাম তার সব কিছুকে ছাপিয়ে রয়েছে মাৎসুসিতা ইলেকট্রিক কারখানা পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা।

আজকাল আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের মুখে মুখে ট্রাঞ্জিস্টারের কথা শোনা যায়। দেশে এবং বিদেশে এই ট্রাঞ্জিস্টার দু'চারটি চোখে দেখলেও এ সম্বন্ধে আমার তেমন কোনো ধারণা ছিলনা এবং জানার জন্যে বিশেষ কোনো উৎসাহও ছিলনা। কিন্তু ইবারাকিতে মাৎসুসিতার কারখানায় এসে যখন জানলাম যে সেখান থেকে দৈনিক চল্লিশ হাজার পকেট ট্রাঞ্জিস্টার তৈরি হয়ে থাকে বিদেশে রপ্তানীর জন্যে তখন বিস্মিত না হয়ে পারিনি। দেখে আরো বিস্ময়। হাজার হাজার মেয়ে (১৫ থেকে ২৫ বছর হবে হয়তো) সার বেঁধে উঁচু উঁচু টেবিলে বসে একের পর এক ট্রাঞ্জিস্টারে এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্ট লাগিয়ে যাচ্ছে বা অন্য কোনো সূক্ষ্ম কাজ করছে, সে এক চমৎকার দৃশ্য। অসংখ্য ট্রাঞ্জিস্টারের বডি ইলেকট্রিক বেল্টে এক এক করে প্রত্যেকটি মেয়ের সামনে এসে উপস্থিত হচ্ছে আর প্রতিটি মেয়ে এক মিনিটের মধ্যে নিজ নিজ কাজ করে দিচ্ছে। ডান-বাঁয়ে তাকাবার নেই, কারণ কাজের মধ্যে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ না করলেই গোলমালের আশঙ্কা। এই পরিপূর্ণ নিষ্ঠা এবং পূর্ণ মনসংযোগের জন্যেই জাপানের তৈরি জিনিষপত্র অত নিখুঁত এত সুন্দর এবং পৃথিবীর বাজারে এত চাহিদা।

শুনে হয়তো অবাক হবেন, এই বিরাট মাৎসুসিতা শিল্প প্রতিষ্ঠানের পাঁচটি শাখার মোট কর্মী সংখ্যার শতকরা মাত্র ২৩জন পুরুষ আর বাকি সবাই নারী। গত কয়েকদিনে এমনি আরো যে সব কলকারখানা পরিদর্শন করেছি তার প্রায় সবগুলোতেই নারী ও পুরুষ কর্মী সংখ্যার হারাহারি কমবেশী প্রায় এই একই রকম। কাজেই প্রথম টোকিওয় এসে আমার যে ধারণা হয়েছিল সে ধারণা যে সত্য এসব প্রতিষ্ঠান দেখে তারই প্রমাণ পেলাম।

এখানে আরেকটি কথা প্রসংগত বলতে হচ্ছে। কাজের ঘণ্টা হ্রাস করার আন্দোলন সব দেশেই লক্ষ্য করেছি। আমাদের দেশে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনেরও এটি অন্যতম দাবী। কিন্তু জাপানে নারী-পুরুষ সমস্ত শ্রমিক দৈনিক আট বা নয় ঘণ্টা করে কাজ করে থাকে, এ তথ্য জেনে আমি একটু বিস্মিত হয়েছি এবং এ দেশের ট্রেডইউনিয়ন নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় মোটেই মনে হয়নি যে এ সম্পর্কে তাঁদের কোনো ক্ষোভ বা দাবী আছে।

যাই হোক, জাপানের মেয়েদের প্রসংগকে কেন্দ্র করেই এ চিঠি আরম্ভ করেছিলাম, তাদের প্রসংগ দিয়েই এবার তা গুটিয়ে আনি।

সেদিন মিস বাতাগাকে এসেছিলেন টোকিওর আমার হোটেলে আমার সঙ্গে দেখা করতে। তিনি ইংরেজী না জানায় তাঁর সঙ্গে আলোচনায় একটু অসুবিধা হলেও দোভাষীর মাধ্যমে তাঁর কাছ থেকে অনেক তথ্যই জানা গেল। মিস বাতাগাকে প্রায় কুড়ি বছরকাল স্বর্গত মহাবিপ্লবী রাসবিহারী

বন্ধুর সেক্রেটারী ছিলেন এবং মেয়াদী সভ্যচক্রের সঙ্গেও ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয়। এখন তিনি টোকিও শহরের এক প্রিন্টিং হাউসের প্রেসিডেন্ট, ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা। তাঁর কাছেই শুনলাম দ্বিতীয় যুদ্ধের পর মহিলাদের মধ্যে নবজাগরণের সুরপাত ঘটেছে এই দেশে। প্রান্তে প্রান্তে গড়ে উঠেছে অসংখ্য মহিলা প্রতিষ্ঠান। প্রায় পঁচিশ হাজার হবে তার সংখ্যা এবং অন্ততঃ এক কোটি পঁচিশ লক্ষ হবে তাদের সদস্য। এর অর্থই হলো জাপানের প্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েদের প্রায় অর্ধাংশ এর কোনোনা কোনো একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। জাপানের সবচেয়ে বড়ো মহিলা সংস্থা হলো ফেডারেশন অব রিজিওন্যাল উইমেন্স এসোসিয়েসন্স এবং এর সদস্য সংখ্যা প্রায় আশিলক্ষ। এই সব মহিলা সংস্থার আন্দোলন ও চাপের ফলেই ১৯২৬ সনে এদেশে পতিতাবৃত্তি নিরোধ আইন বিধিবদ্ধ হয়েছে এবং এ ছাড়াও নারীকল্যাণ মূলক অনেক বিধিবিধান হয়েছে। স্বামীর মৃত্যুর পর মেয়েরা এখন স্বামীর সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ পেয়ে থাকে এবং বাকিটা সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া হয় ছেলেমেয়েদের মধ্যে।

এক কথায় যুদ্ধোত্তর জাপানে যে গণতন্ত্রের সমারোহ শুরু হয়েছে তাতে জাপানের নারী-পুরুষ সমান অংশীদার। সমাজ-দেহের উভয় অংশ সমশক্তিতে অগ্রসর হলেই জাতির দ্রুত অগ্রগতি সম্ভব, এ সত্য জাপান যথার্থরূপেই প্রমাণ করেছে। জাপানের কাছ থেকে আমাদেরও যে অনেক কিছু শিক্ষা করার আছে তা অস্বীকার করা যায় না।

আশাকরি আপনার শরীর ভাল আছে। আমার বিনীত নমস্কার জানবেন। ইতি

আপনাদের শ্রীবিনয়
দক্ষিণারঞ্জন বসু

DESIGNED

The Kuljian Corporation of India is a service organisation specialising in consulting engineering. ■ In its fully equipped office in Calcutta, the Corporation has assembled a well-knit team of about a hundred trained Indian and American construction engineers and draughtsmen all qualified by experience in project construction. ■ Backed by the experience of a decade in power engineering in India and proud of the tradition of its American collaborators whose famous name it bears, the Corporation welcomes exacting assignments of all types, in any part of India, any time. ■ From feasibility report to initial operation is the scope of Kuljian service; from power plants to all-type public works is the range of Kuljian operation.

The Kuljian Corporation (INDIA) PRIVATE LTD. Engineers / Constructors
AN INDO-AMERICAN JOINT ENTERPRISE 14-B, Park Street, Calcutta-16

FOR SERVICE

ইতিহাসের পাতা উল্টে

বি ভা স র কা র

ঋতুতে ঋতুতে বিশ্বপ্রকৃতি তার বৈচিত্র্যের ডালি সাজিয়েই চলেছে—ছয়টি ঋতুর খেলাঘরে কত না তার রঙ কত না তার লীলা! বসন্তের সমারোহ শেষে এসেছে বিধুর বৈশাখ। রুদ্রবীণার রুদ্র তাণ্ডবে ধ্যানভঙ্গে ক্ষুব্ধ হয়েছেন বুঝি মহারুদ্র—সে কম্পনে কেঁপে উঠেছে বুঝি মহাকৈলাস। তারই কম্পন এসে লেগেছে পৃথিবীর দিকে দিকে। ছুটে গিয়েছেন ওষধিনী উমা বশ করতে সে মহারুদ্রকে। যায় বুঝি সৃষ্টি লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে রুদ্রের সে প্রচণ্ড তাণ্ডবে। মহামায়া মহাজননী কি স্থির থাকতে পারেন! বশ করলেন তিনি মহাকালকে। শান্ত হাসি হাসলেন উমাপতি দিকে দিকে জাগলো আনন্দের আলোড়ন। পৃথিবীতে নামলো বৃষ্টিধারা।

আগ্রাদুর্গের খোলা ছাতে অস্তরাগ রঞ্জিত দিগন্তের পানে চেয়ে চুপকরে দাঁড়িয়ে ছিলুম আমি ও আলি খাঁ। গ্রীষ্মের সায়াহ্ন বড় মধুর। সারাদিনের তপ্তদাহের পর—যমুনার বুক বয়ে আসা শীতল বাতাস দেহমন জুড়িয়ে দিচ্ছিল। আজ সারাদিন লু চলেছে, বলসে দিয়েছে চারিধার। দুর্গের প্রস্তর তপ্ত হয়ে তামার মত প্রখর হয়ে উঠেছে—এখনও তার তপ্ততা যায়নি। এমন সময় হাসিমুখে এসে দাঁড়ালেন ঐতিহাসিক বন্ধুবর মৈত্র মশায়। আলি-খাঁ হাসি মুখে বলে—বাবুজী! আজ যেন রাজমহলে আগুন লেগেছে—সে আগুন যেন ছড়িয়ে পড়েছে ঐ পশ্চিম দিগন্তে। আমরা যেন এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলুম তপ্ত কটাহে।

জান বাবুজী! একদিন আমি এক বড় মজার স্বপ্ন দেখেছিলুম - বোধ হয় তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর। সে অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে স্বপ্নের ঘোরে আমি চীৎকার করে উঠেছিলুম। নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে আমার সে চীৎকার প্রাসাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ধ্বনিত হয়ে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছিলো। চমকে জেগে উঠে বসে বারবার চোখ কচলে দেখেছিলুম—কোথায় এক শূন্য মহল বিশ্বের শূন্যতা নিয়ে প্রেতিনীর মত খাঁ-খাঁ করছে। আমার ভয় করেছিলো—নিদারুণ ভয়! ঘামে ভিজে গিয়েছিলো আমার অঙ্গের বসন—নড়তে চড়তে পারিনি বহুক্ষণ। ভোরের পাখীর ডাকে আমি সম্বিত ফিরে পেয়েছিলুম—তারপর পূর্বদিগন্তে ধীরে ধীরে দিনেশ্বরের অপূর্ব আবির্ভাব আমার দেহমন জুড়িয়ে দিয়েছিলো। দিনের আলোর জীবন্ত আলোড়নে আমার হাসি পেয়েছিলো নিজের অকারণ ভীরুতার জন্য। আমি কি দেখেছিলুম জান বাবুজী! সত্যই সে বড় অদ্ভুত—হঠাৎ যেন এক অপরূপ কুমারীর মূল্যবান অঙ্গাভরণে আগুন জ্বলে উঠলো, ছড়িয়ে পড়লো সে আগুন তার সহচরীদের বসনেও—আগুনের সর্বনাশা চক্রের মধ্যে কয়েকটি অসহায়া নিরুপায় নীরবতার মধ্যে অসহ্য যন্ত্রনায় দিকবিদিক হারা হয়ে ছটফটাতে লাগলো—সে আগুনের আলোর ঝলক নৈশ অন্ধকার খান খান করে প্রচণ্ড প্রখরতায় সচকিত করে তুলেছিল চারিধার। অস্থির সে লেলিহান জিহ্বা যেন সর্বগ্রাসী ক্ষুধায় লক লকিয়ে বেড়াতে লাগলো শত সহস্র হিংস্র ক্রুদ্ধ ফণীর মত—সে আগুনের হল্কা বুকের মধ্যে আপন সর্বাঙ্গে অনুভব করে ভয় চকিত আমি চীৎকার করে উঠেছিলুম—

চুপ করল আলি খাঁ—কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে ধীরে ধীরে কথা বললেন মৈত্রমশায়। তুমি আমায় অবাক করছ আলি খাঁ! মনে মনে ভাবছি তুমি কি ত্রিকালদর্শী—তুমি যা স্বপ্ন বলে ভাবচ আলি খাঁ সেত রাজপরিবারেরই এক জীবন্ত দুর্ঘটনা। শাহ্‌জাহানের জীবনে এক মর্মান্তিক বেদনা বিপুল রাত্রির কাহিনী।

সকৌতুকে আলিখাঁ শুধায়—সে কি ব্যাপার বাবুজী? ধীরে ধীরে আমাদের সম্মুখে তুলে ধরলেন মৈত্রমশায় রাজনন্দিনী জহানআরার জীবননাট্যের এক মর্মন্তুদ দুর্ঘটনার কাহিনী। অবাক বিস্ময়ে নির্বাক শ্রোতা হয়ে বসে রইলুম আমি ও আলি খাঁ।

মৈত্রমশাই বলে চলেন—সে আজ বহুদিনের আগের ঘটনা। ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দে ২৯শে মার্চএর রাত্রি এক ভীষণ দুর্যোগ নিয়ে জহানআরার জীবন নাট্যে উদিত হয়েছিলে—কর্তব্যা পরায়ণা রাজ দুহিতা পিতার তত্ত্বাবধান সমাপনান্তে রাত্রের মত আপন কক্ষ পথে দ্রুত ফিরে যাচ্ছিলেন। অঙ্গে তাঁর বস্ত্রে ঢাকাই মলমিন্—হঠাৎ প্রাচীর সংলগ্ন এক দীপশিখা থেকে তাঁর বস্ত্রে আগুন ধরে গেল—হয়ত বা রাজকন্যা ক্ষণিক অন্যমনা হয়ে পড়েছিলেন। সঙ্গে ছিল তাঁর চারজন পরিচারিকা। জীবন পণ চেষ্টায়ও তারা তাদের প্রভুকে রক্ষা করতে পারলে না—সকলেই তাঁরা নির্মম ভাবে দগ্ধ হয়ে মৃত্যুর অধিক যন্ত্রনায় ছটফট করতে লাগলো। কেঁপে উঠলো সমস্ত দুর্গ এ নিদারুণ দুঃসংবাদে। ছুটে এলেন শোক-জর্জরিত সম্রাট তাঁর একমাত্র সম্বল ও সান্ত্বনার এ দুরবস্থা দেখতে। চমকে উঠলেন তিনি আপন প্রাণ প্রিয় কন্যার জীবন সংশয় অবস্থা দেখে—ঘরবিগলিত ধারে গড়িয়ে পড়তে লাগলো আতুর অশ্রুজল সম্রাটের দুই গণ্ড বেয়ে।

তারপর আমরা দেখি সম্রাটের অতুলনীয় বাৎসল্য। কত কত বিনিদ্র রাত তিনি আপন হাতে কন্যার শুশ্রূষায় কাটিয়ে দিলেন। কন্যার সেবাযত্ন কারও হাতে দিয়ে তিনি স্থির থাকতে পারতেন না। রাজকার্য ভুলতে বসলেন—ভুলে গেলেন স্নানাহার। আপন হাতে কন্যার ক্ষত স্থানে ঔষধ লেপন করতেন, আপন হাতে তুলে দিতেন মুমূর্ষু কন্যার মুখে ঔষধ পথ্য।

দুর্লভ জগতে জাহানআরার মত কন্যা এ কথা সত্য, কিন্তু শাহজাহানের মত পিতা দুর্লভতর। প্রতিদিন সহস্র মুদ্রা কন্যার আরোগ্য কামনায় তাঁর উপাধান তলে রেখে পরদিন প্রাতে স্বহস্তে তা গরীব দুঃখীকে দান করতেন। রাজ্যে যত অপরাধী দণ্ডভোগ করছিলো তারাও পেল মুক্তি রাজানুগ্রহে। প্রতিদিন সন্ধ্যা থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত কন্যার আরোগ্য কামনায় সম্রাট খোদা তালার কাছে প্রার্থনায় কাটাতেন।

শাহ্‌জাহানের মধ্যে আমরা যেন আবার তাঁর পূর্ব পুরুষ পুত্রবৎসল বাবরকে দেখতে পেলাম। দীর্ঘ চারটি মাস জীবন-মৃত্যুর কঠোর সংগ্রাম চললো। ইতিমধ্যে সম্রাটের দুশ্চিন্তার আহুতি দিয়ে মৃত্যু ঘটল দুটি দগ্ধ পরিচারিকার। রাজা সন্তান বাৎসল্যে উন্মত্ত প্রায় হয়ে উঠলেন। বিশ্বে বিরল উপাধান আমরা দেখি এই মহান মোগলের চরিত্রে। যত জানি তাঁর বিষয়ে ততই সম্ভ্রমে সচকিত হয়ে ওঠে আমাদের মন। ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ সম্রাট, তিনি আবার শ্রেষ্ঠতর দরদী মানুষও। স্নেহে প্রেমে দয়ায় দাক্ষিণ্যে তিনি দীনতম দীনেরও একান্ত আপন জন। মানব জীবনের চিরন্তন সুখ দুঃখে জড়িত একান্তই ঘরের লোক। তাঁর এই পার্থিব দুঃখ বেদনাই তাঁকে সম্রাটের দূরের আসন থেকে সরিয়ে আমাদের ঘরের আসনে বসিয়ে নিতান্তই চেনা মানুষটি করে দিয়েছে। কত চেষ্টা কত সাধনা কত চিন্তাগ্রস্ত বিনিদ্র রাত সম্রাটের কেটে গেল প্রিয়তমা কন্যার শয্যা পার্শ্বে সেবায় প্রার্থনায়। কত রাজ চিকিৎসক, বৈদ্য, ভীষক, এল দেশ দেশান্তর থেকে—কিছুতেই কিছু হয়না। ভগ্ন হৃদয়ে সম্রাট অসহায় দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। সৌভাগ্যক্রমে সেই সময়ে এসেছিলেন পারস্য সম্রাটের পূর্বতন প্রসিদ্ধ

চিকিৎসক। সম্রাট সাদরে তাঁরই হাতে তুলে দিলেন কন্যার চিকিৎসার ভার। তাঁর সুচিকিৎসায় সম্রাট দুহিতার জ্বর গেল, দুর্বলতার অনেক উপশম হল কিন্তু তাঁর কত কিছুতেই ভাল হলনা। দিল্লীর রাজ চিকিৎসক হকিম মুমিনা বহু চেষ্টায়ও অকৃতকার্য হলেন। দুশ্চিন্তার ঘনঘোর রাজঅন্তঃপুর আচ্ছন্ন, সম্রাট বাধ্য হয়ে শেষ পর্যন্ত আরিফ নামে এক কৃতদাস গ্রীকবন্দর ক্রতস্থানে একটি হরফ দিয়ে তাঁকে মুক্ত করে মুক্ত করলেন ঘোর দুশ্চিন্তা। সেই দৈব অভিশম্পাতের মুক্তিদাতা কৃতদাস আরিফ কি পেয়েছিলো সম্রাটের কাছে সে কথা লিখতে ইতিহাস ভুলে গেছে সেই সামান্য অসামান্যের কথা ইতিহাস অবজ্ঞা করেছে, কিন্তু শাহ্‌জাহানের কোন কৃতজ্ঞতা কোন আশীর্বাদ তার ওপর বর্ষিত হয়েছিলো আজ এই যুগান্তের ব্যবধানে দাঁড়িয়ে জানতে চায় মন। তিনি কি তাকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে কোনও পরগণার মালিক বা কোনও আয়ন্টরপতি করে দিয়েছিলেন?— কে জানে! হে নীরব অতীত একবার চাপল্য দেখাও শোনাও সে অতীত কাহিনী, আমরা একান্তই শ্রবণেচ্ছু।

দুই মাসের চেষ্টায় সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করলেন রাজকন্যা —সবশুদ্ধ দীর্ঘ নয়মাস কাল বেচারা শাহ্‌জাহানকে এই দুশ্চিন্তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়। ১৬৪৪ এর ২৪শে নভেম্বর আরম্ভ হল আটদিনব্যাপী আনন্দ উৎসব। রাজকুমারীর আরোগ্যলাভ উপলক্ষ্যে সমস্ত রাজত্ব যেন আনন্দ-মাতাল। উৎসব-মুখর রাজপুরী, বাঁধনহারা মত্ততায় আকাশ-বাতাস যেন আকুল হয়ে উঠলো। দুহাতে মুক্ত করে ধরলেন উৎফুল্ল সম্রাট তাঁর রাজকোষ।

কন্যা জাহানারাকে দশ লক্ষ টাকার হীরা জহরৎ উপহার দিয়েও সম্রাট শাহজাহানের তৃপ্তি হলনা। পাঁচ লক্ষ টাকার আয়মুক্ত সুবাট বন্দরও পেলেন রাজকন্যা এই উপলক্ষ্যে। দেশ-বিদেশ থেকে ভায়েরা ছুটে এলেন প্রিয়তমা সহোদরাকে দেখতে। পেলেন তাঁরাও যথাযোগ্য উপহার আনন্দ-উদ্বেল পিতার কাছে। বঞ্চিত হলেন না সভাসদেরা তাঁদের যথাযোগ্য পদানুযায়ী উপঢৌকন লাভ থেকে। এ উৎসবে কাউকে বঞ্চিত করলেন না সম্রাট—কাউকে বাধা দিলেন না। বহুদিন সাম্রাজ্য এমন আনন্দ উৎসব ভোগ করেনি। সে উৎসবে মাননীয়া ভগ্নীকে দেখতে এসেছেন আওরংজীব। এরই সপ্তাহ তিনেক পর ঈর্ষাকাতর দারাশুকো রাজসৌন্দর্যের সুযোগ নিয়ে তাঁকে অন্যায় ভাবে অপ্রস্তুত করেন দক্ষিণা-পথের রাজকার্যে গোলকুণ্ডা বিজয়ে বাধা দিয়ে—যার ফলে বেদনা ভারাক্রান্ত চিত্তে দক্ষিণাপথের শাসন কর্তার পদ তিনি ত্যাগ করেন। দারা সম্রাটের প্রিয়পাত্র হওয়ার প্রায়ই তিনি অন্যায় অনধিকার চর্চায় আওরংজীবকে বিড়ম্বিত ও অপদস্থ করতেন। চিরদিনের এই চাপা বিদ্বেষই না একদিন অমন সর্বনাশা রূপ নিয়েছিলো আওরংজীবকে চিরদিনের মত কলঙ্কিত করে। দারার যে দাদুনা আওরংজীবের হাতে ঘটেছিলো তার জন্য কি যুবরাজ দারার দুষ্ঠকারিতা ও অন্যায় আচরণই কিছুটা দায়ী ছিলো না? পিতার অবিচারে ক্ষুব্ধ ও দারার অন্যায় অত্যাচারে বিড়ম্বিত উপেক্ষিত ব্যথিত আওরংজীব নীরবে আগ্রায় কাল কাটাচ্ছিলেন। জাহানু-আরার দৃষ্টি গোচর হওয়ায় তিনি পিতাকে অনুরোধ করে অবমানিত আওরংজীবকে তাঁর পূর্বগৌরব পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রসন্নচিত্তে দক্ষিণাপথের শাসনকর্তার পদ গ্রহণে সম্মত করিয়ে ভায়ে ভায়ে বিবাদের অবসান ঘটান। রাজমহলের যখন যেখানে কোনও বিদ্রোহের মেঘ দেখা দিয়েছে ছুটে গিয়েছেন জাহান-আরা মেঘদূতির মত শান্তির বার্তা নিয়ে আনন্দ ফিরিয়ে আনতে। মহালের দিকে দিকে যখন যেখানে কোনও বিদ্বেষের ঘুণ ঘুণায়িত হয়েছে স্নেহ শ্রদ্ধার বারিধারা নিয়ে ছুটে গেছেন তিনি সেখানে। দুঃখে ক্ষোভে মর্মপীড়ায় অবিচারে সব সময়েই তিনি সকলের সান্ত্বনা সকলের আশ্রয় হতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু হায়। বৃদ্ধ শাহজাহানের নিদারুণ দুর্ভাগ্যকে তিনি প্রতিহত করতে পারেন নি। ভাগ্যের

বিড়ম্বনায় একে একে সকলকে পরাজিত ও বিভ্রান্ত করে—নূরমঞ্জিলে এসে ছাউনি গাড়লেন আওরংজীব—সব সম্ভ্রম ভুলে মান-অপমান জলাঞ্জলি দিয়ে পিতৃকুলকে রক্ষা করতে মূর্তিমতী কল্যাণলক্ষ্মীর মতই তিনি ছুটে গেলেন—ভ্রান্ত মুরাদ ও আওরংজীবকে পিতার সকাশে ফিরিয়ে আনতে। নিদারুণ অপমান উপেক্ষা করেও তিনি সাক্ষাৎ করলেন আওরংজীবের সঙ্গে। কিন্তু ব্যর্থ হল তাঁর সব শুভ চেষ্টা। আওরংজীব তখন আত্মবিস্মৃত স্বার্থপরতার দাস—দ্বিধা করলেন না বন্দী করতে পিতাকে আগ্রাদুর্গে—ছলে কৌশলে বন্দী করলেন মুরাদকে। পাঠিয়ে দিলেন সলীমগড়ে তারপর সেখান থেকে সপুত্র গোয়ালিয়র কারাদুর্গে।

সম্রাট শাহজাহানের নয়নানন্দ মমতাজের কোলে ছেলে রেখে দুর্মদ হঠকারি মুরাদ আওরংজীবের কূটচক্রজালে জড়িয়ে বন্দী বাঘের মতই ছটফট করে উঠলেন।

আফগানীস্থান, কাশ্মীর, পঞ্জাব ও সিন্ধুর ভবিষ্যত আধিপত্যের স্বপ্নদর্শী নবরত্নল-উদ্দীন—মুক্তহস্ত মুরাদ সচমকে দেখলেন তিনি বিভ্রান্ত হয়েছেন। প্রয়োজন অন্তে শুকনো পাতার মতই তিনি একপ্রান্তে পরিত্যক্ত। দৃঢ়হস্তে শাসন-কার্য্য চালাচ্ছেন আওরংজীব। সম্ভ্রম প্রতিষ্ঠা সবই তাঁর করতলগত, মুরাদ কেউ নন, কিছু নন। প্রবঞ্চিত মুরাদ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন কিন্তু যোগ্যতম ভাইএর কাছে পরাজয় তাঁকে মানতেই হল। ছলে বলে কৌশলে আপন কার্য্য সাধন করলেন আওরংজীব।

আওরংজীবের মিথ্যা বন্ধুত্বের ছলনায় তিনি বারবার বিভ্রান্ত হলেন, আওরংজীব তাঁকে আপন কার্য্যোদ্ধারের অস্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করেছেন জেনেও। পশ্চাৎ অনুসরণকারি মুরাদকে সমর ঘুষে ছলনাময় আওরংজীব দশ লক্ষ টাকা আর কয়েকটি উৎকৃষ্ট অশ্ব উপহার দিয়ে আপন শিবিরে নিমন্ত্রণ করলেন। এখানেও সেই বিশ্বাসঘাতকতা আর স্বয়ং সম্রাট পুত্র হয়েও মুরাদের একজন সামান্য ভৃত্য নূর উদ্দীনকে উৎকোচ দানে আপন কুকর্মের সহায় করতে বন্ধুত্ব দেখাতে আওরংজীবের বাধেনি। তাই আত্মভোলা সরল স্বভাব বিলাসী মুরাদ নূরউদ্দীনের প্ররোচনায় আপন বিশ্বস্ত অনুচরদের নিষেধ উপেক্ষা করেই মৃগয়ান্তে শেষে গেলেন একদিন ভাইয়ের কাছে নিমন্ত্রণ রাখতে। আদরে আপ্যায়নে তুষ্ট করলেন তাঁকে আওরংজীব। সুরাপ্রিয় রাজপুত্রকে সুরায় ডুবিয়ে দিলেন নিজে স্পর্শ না করেও। প্রীতি সম্ভাষণে পাঠিয়ে দিলেন বিশ্রাম গৃহে শ্রান্ত পথ ক্লান্ত সুরাউন্মত্ত ভাইকে। তাঁরই ভৃত্য বশীভূত নিযুক্ত হল রাজকুমারের পদ সেবায়—তারপর অর্দ্ধোন্মত্ত মুরাদকে বিভ্রান্ত করে, বিলাসী মুরাদকে আরাম আয়াসে ডুবিয়ে দিতে পাঠালেন আওরংজীব এক রূপবিলাসিনী রমণীকে—কোমল হস্তের সেবায় সুখনিদ্রা তাঁর গাঢ় থেকে গাঢ়তর হ'ল · রাত্রি অজ্ঞাতে তাঁর অঙ্গাভরণ নিয়ে চলে গেলো সেই রূপজীবিনী। চমকে জেগে উঠে মুরাদ দেখলেন শেষ রাত্রির বারজন অনুচর নিয়ে তাঁর ঘরে এসেছে তাঁকে বন্দী করতে। বৃথাই অস্ত্রের জন্য হাত বাড়ালেন তিনি। কোরাণ স্পর্শ করে মৈত্রীবদ্ধ হয়েছিলেন আওরংজীব। কোথায় গেল তাঁর আপন ভাই বন্ধু ও অতিথির প্রতি বিশ্বাসপরায়ণতা? বিফল আর্ত্তনাদ—মুরাদের ব্যর্থ অভিসম্পাত শূন্য বাতাসকে কাঁদিয়ে দূরে মিলিয়ে গেল। প্রেতধ্বনির মতই অট্টহাস্য করে উঠলো পর্দার অপর প্রান্ত থেকে বিশ্বাসঘাতক আওরংজীবের কণ্ঠস্বর—নির্মম উপহাসে ভাইকে কিছুদিন নির্জ্জন বিশ্রামে মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা করার উপদেশ দিয়ে সরে গেলেন তিনি—শূন্য ঊষরে শুষ্ক হয়ে রইল বন্দী মুরাদের অনুচ্চারিত অভিসম্পাত। তারপর গোয়ালিয়র দুর্গে কত কত দুঃখের বিনিদ্র রাত হতভাগ্য, কূটচক্রে পরাজিত, বিশ্বাসঘাতকতায় প্রবঞ্চিত মুরাদের কেটে গেল। আলেয়ার মতই মিলিয়ে গেল হিন্দুস্থানের রাজমুকুটের সোনালী স্বপ্ন। নবরত্নউদ্দীন মরীচিকার মৃত্যুমায়া দেখলেন অদৃষ্টের পরিহাসে।

তিনি ছিলেন একান্ত বন্ধু বৎসল রঙ্গরসিক বিলাসী

যুক্তিবাদী মানুষ। তাই লোকপ্রিয়তার অভাব তাঁর ছিল না। অভাব ছিল না বন্ধু-বান্ধবের। তাঁদের চেষ্টায় গোয়ালিয়র থেকে পালিয়ে যাওয়া তাঁর কিছুই কঠিন হতনা। বন্ধুরা দুর্গের নীচে অপেক্ষমান দ্রুতগামী উৎকৃষ্ট অশ্ব রেখেছিলেন তাঁর জন্য, আর দুর্গ প্রাকার বেয়ে নামবার জন্য পাঠাতে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁরা দড়ির সিঁড়ি যেমন করেই হ'ক। কিন্তু এখানেও তাঁর বিলাসী, রমণীপ্রিয় প্রকৃতি বাধাদিয়ে জন্মের মত তাঁর সব আলো নিভিয়ে দিলো।

এ দুর্গেও তাঁকে বিশ্রাম করতে ভোলেন নি আওরংজীব। রেখেছিলেন সরস্বতী নামে এক অপরূপা রূপজীবিনী নারী তাঁর পরিচর্যার জন্য। আসলে সে রমণী আওরংজীবেরই গুপ্তচর। মাঝরাতে পালিয়ে যাওয়ার আগে সেই জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণেও বিলাস-সঙ্গিনী সরস্বতী বাইয়ের কাছে গেলেন তিনি বিদায় নিতে অদৃষ্টের পরিহাসে।

চিৎকার করে কেঁদে উঠলো সে রমণী মুরাদের দুর্ভাগ্যের দূতী হয়ে—"আমাকে কার কাছে রেখে যাচ্ছ" বলে—সচমকে জেগে উঠলো কারাদুর্গ। আওরংজীব আর মুরাদকে বেঁচে থাকতে দেওয়া নিরুদ্বিগ্ন মনে করলেন—আলী নকীর হত্যা অভিযোগে আপন ছোট ভাইকে তিনি হত্যা করলেন নিষ্ঠুর ঔদাসীন্যে। সিংহাসনের আর একটি কণ্টক উন্মূলিত হল।

হতমান পরাজিত লাঞ্ছিত হতভাগ্য যুবরাজ দারার নিয়তি আরও ভয়াবহ আরও নির্মম। তাঁর লাঞ্ছনার চরম করার জন্যই আগ্রায় আনিত হয়ে আওরংজীবের দ্বারা নিষ্ঠুর নজর বেগের হাতে তাঁর বিড়ম্বিত জীবন সমর্পিত হল। হৃতসর্বস্ব দারা শিশুসুলভ দুর্বলতা দেখিয়েছিলেন ঘাতকের সামনে—মৃত্যুভয় তাঁকে ভীত কম্পিত করেছিলো। আওরংজীবের কাছে দীনাতিদীনের মতই তিনি প্রাণ ভিক্ষা করেছিলেন। কিন্তু যুবরাজ মুরাদকে আমরা দেখি ঘাতকের সামনে অকম্প —মৃত্যুর সামনেও চিরনির্ভীক। চোখ ফেটে জল আসে যখন দেখি পিতার বুক থেকে ১৪ বছরের কিশোর সিপিহর শুকোকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে ঘাতকেরা পিতা পুত্রের নিষ্ফল হাহাকারের মধ্যে। পাষাণও কম্পিত হয়েছিলো সে দিনের সে বেদনার্ত দৃশ্য দর্শনে, কিন্তু আওরংজীবের ঘাতকেরা নির্মম। মানুষের অশ্রুজলে চিরনির্বিকার শেষ বারের মত নিবন্ত প্রদীপ যেমন একেবারে জ্বলে ওঠে ঠিক তেমনি মৃত্যু মুহূর্তে একবার শেষ জীবন যুদ্ধ করেছিলেন হতভাগ্য যুবরাজ। তার গোপন ছুরিকার আঘাতে একজন আক্রমণকারীকে মর্মান্তিক আঘাত হানার সঙ্গে সঙ্গেই লুটিয়ে পড়েছিলো তাঁর ছিন্নশির অন্য এক ঘাতকের হাতে। শিউরে উঠেছিলো বুঝি নিষ্প্রাণ পাষাণ কারা সে নির্মমতায়। অন্তঃপুরে কিশোর সিপিহর শুকোর আর্তনাদ মুক্ত কারাগৃহকে কাঁদিয়ে কেঁদে কেঁদে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলো।

চমকে বুঝি জেগে উঠেছিলেন রোগ-জীর্ণ অসহায় বৃদ্ধ বন্দীসম্রাট শাহজাহান্ রাজমহলে সেই চরম মুহূর্তটিতে!

———

কবিতা.....

আমাদের চেতনায়

প্রসেনজিৎ মিত্র

জাহাজের শব্দ হয় এখানেও
কিন্তু জানি সে তো
দূরের আহ্বান নয়
শুধু ভেসে থাকা।
কোথাও যাবেনা ভাঙা জাহাজেরা
শুধু এই জলে
ইঞ্জিন চালিয়ে দেবে আকাশকে
শব্দ আর ধোঁওয়া।

শান্তি আর ক্ষুধামান্দ্যে,
প্রেমে আর অধিকারবাদে
দেখছি কোনো ভেদ নেই।
হাওয়া বন্ধ,
তাই ঘরে যাই।
ঘরে শান্ত ছায়া একা।
উদ্দীপনা, তুমি আসবে কবে ?
দেয়ালে টিকটিকি, ঘরে বেড়ালটা,
মশার গুন্‌গুন্
ইঁদুর অশান্ত লোভে ইতস্তত: করে ছুটোছুটি।

দুই ঋতু

সৌমিত্রশঙ্কর গাঙ্গুলী

রিক্ত পত্র আমলকী
ঊর্ধ্ব-শাখা সহস্র-বাহু সমিধে
হোমাগ্নির নিবেদিত অরণি।

নিবাত সন্ধ্যার প্রান্তরে
যেন কয়েকটি বৃক্ষ কঙ্কাল।

নিষ্প্রভ এই রিক্ত ঋতুতে
আমার কঙ্কালকে আমি দেখি
আর অজস্র সেই হরিৎ বিন্দু
কোন কোমল তুলির অপেক্ষায় ;

পল্লবিত আমলকী বন।

স্মৃতি যেখানে সত্যের অঙ্গীকারে
বসন্তের পুষ্পিত মরণ্য ;

একই বৃন্তে দুই ঋতু।

পাপী

নজরুল ইসলাম

উত্তর মেলে না।
আমি ডাকি রাত্রি অন্ধকারে
আমার আত্মারে।
সেখানে কি করে কোলাহল
লক্ষ প্রেত-সেনা
বিস্মৃত রণের হলাহল
পান করে সুরার মতন?
নির্ম্মল প্রভাত নেই, নিদ্রাহীন মন
নিঃসঙ্গ কান্নায় কেঁদে মরে।
বুঝি এই রক্তের ভিতরে
অক্ষালিত পাপ
উত্তপ্ত প্রাণেরে দেয় নিয়ত উত্তাপ॥

সনেট

শীতলবরণ

যেথা এসে চলে যায় মন্থর মাধুরী
খোঁজে যা'রে দেখা তার মিলে না বলিয়া,
সে নীরব উদ্যানের চয়নিকা-পুরী
ব্যাথায় ঝরিয়া পড়ে রহিয়া রহিয়া
নিষ্ঠুর বাতাসে; কেন তার অবিরল
অশ্রুর বিদায়-গীতি, কেন ফিরে চাওয়া?
আঁধার স্বপনপটে যেই শতদল
মিলাল সহসা, তা'র তরে কেন যাওয়া
স্মৃতির তরণীখানি বারবার? এই
অতৃপ্ত জীবন পারে যা'র শঙ্খধ্বনি
বাজিয়া উঠিল ঘোর জলধি কাঁপায়ে
তা'র মন্ত্র মণীষার নব আগমনী
ভাঙিল কি অতর্কিত এক নিমেষেই
বিস্তৃত শবরী-জাল-তরঙ্গ প্রবাহে?

[৮, ২, ১৯৩১]

এই তো জীবন

হরেন্দ্র নাথ সিংহ

ওরে যায় বেলা বৃথা হোল খেলা
যৌবন গেল যে দুরায়ে,
দেহের শকতি যায় দ্রুত গতি—
রোগেরা ধরেছে জড়ায়ে।

জমানো টাকা'র বৈ নেছে ভার,
নয়নের জ্যোতি-দেখায় আঁধার;
হারানো যা কিছু-পাবোনাকো আর—
বরাতে দেবেনা ফিরায়ে।

প্রথম পরশে প্রেমের হরষে—
ওঠে যে হৃদয় কাঁপিয়া,
কত গান গায় মিলন দোলায়
প্রাণে প্রাণের পাশিয়া।

কাঁপে ক্ষীণ দেহ সাঁঝি আজি হেয়
স্মৃতি যে যেতেছে হারায়ে,
এসো প্রিয় ত্বরা দূর হবে জরা
রাখো যদি কাছে লুকায়ে।

সেতুবন্ধ

প্রভাকর মাঝি

একটি জীবন সাথে আরেকটি জীবনের সেতু
রচনা করতে গিয়ে কত কি ভাবতে হতে পারে
সে কথা স্মরণ করে হিমালয়-বিস্ময়েতে মন
অকস্মাৎ ভরে উঠলো। দূরযানী দৃষ্টির ওধারে

আমরা উধাও হই কল্পনার পক্ষীরাজে চড়ে
ঋজু রাস্তা ও কাণা গলি। আর এই সন্ধিৎসার জের
হৃদয়-সমুদ্রে ডুবে। ফলে কল্পাবতী রাগিণীতে
রূপ দিই বিম্ববতী নায়িকার ত্রিভুজ প্রেমের।

মনের ক্যানভাস জুড় ধরা পড়ে হুবহু ছবিটি
স্বপ্ন, প্রেম, স্মৃতি সব। এ মন কি অরুণাংশু ঘেরা
তুচ্ছ মান অভিমান জীবনকে করে যা মধুর।
এবং তাতেই হন দ্বিতীয় ঈশ্বর লেখকেরা।

ক্যানভাসে সহস্র মুখ। শুধু ধরা গেল না যে তাকে
রক্তে মাংসে গড়া সেই যে দেহিনী কাছে কাছে থাকে।

শিখরাভিযাত্রী

গোপাল ভৌমিক

পর্বত চূড়ায় উঠতে গিয়ে
আমি পারি নি,
নেমে এসেছি দুরন্ত গ্লিজার্ডের বাঁকায়
প্রায় তার কাছাকাছি পৌঁছে।
জানি এ দুরূহ কাজ,
এও জানি
পর্বত-শিখরে কিছু নেই
শুধু জমাট বরফ ছাড়া।
সেই শীতল জামাট
বরফের নীচে আর যা লুকিয়ে আছে
তার নাম মৃত্যু :
অতি নিকটে দাঁড়িয়ে
তার ভয়ঙ্কর রূপও আমি দেখেছি।
তবু সে আমাকে ডাকে
যেমন করে আগুন ডাকে পতঙ্গকে ;
তাই পারি বা না পারি,
যতবার খুসি হারি
তবু সে ডাকে—আমাকে সাড়া দিতে হয়।

নতুন জন্মদিন

অনুবাদ : বেলা বসুরায়

(ভয়েস অব খানা থেকে)

চলেছি গারফিল্ড আভেন্যু দিয়ে,
নাইট পেরিয়ে, রূপ করা আবর্জনা পেরিয়ে।
ওখানে পুরোনো হামাম আজ অন্তর্হিত ;
খাদ্যের নতুন গ্যারেজ উঠেছে সে জায়গায়।
পিছনে ফেলে এসেছি হামাস্তাসের পুরোনো পথ
আমার নতুন যাত্রা আজ, দৃষ্টি সামনে
দেখছি গড়ে উঠছে নতুন কলেজ বাড়ী, জলের ট্যাঙ্ক।
মনে হল চলতে চলতে কি দেখলাম ?

ন্যাজারেথ ;
কাফনের কাপড় কাঁধে উঠে এসেছে কবর থেকে,
অমিত প্রাণশক্তিতে কুটি কুটি ছিঁড়ে ফেলছে যত কিছু বন্ধন
যেন মৃত্যুর রাত্রি হনন করা ঊর্ধ্বমুখী এক প্রাণবহ্নি।
অর্বুদ কোটি মৃত্যুদূতের হাত থেকে
জানিনা কতদিন আড়াল করে রাখব
তার সেই নতুন দেহ।
তার নবজীবনের উন্মেষ লাবণ্য।
আমার পাশ দিয়ে হেঁটে গেল সে,
তার মুখের আয়নায় দেখলাম আমার, নিজকে।

বন্ধুরের তাড়া খেয়ে সাপ ছোটে অন্ধকার জঙ্গলে পাথরে
সৌন্দর্য কি ক্রূরতার চেয়ে তবে এতখানি বড় ?
আমার জঙ্গল নেই, বসে আছি একা বারান্দায়
বিষহীন, শীতাহের পরে
বই থেকে পাতা ছিঁড়ে হাওয়ায় উড়িয়ে দিতে খুব ইচ্ছে হয়
এর নাম নিষ্ঠুরতা ; চুম্বনের আগে যদি বলি, যাও কোলনের জলে,
ঘুরে এসো ঘাড়-ঠোঁট তাহলে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে রমণী
'কপট, কপট পশু' বলে ডেকে উঠবে অন্ধকারে।
যদি বলি, বকুল কুসুম,
কি তীব্র রূপসী তুমি, জুতোর ভিতরে শুয়ে থাকো
পায়ের তলায় এই নরম আপের স্পর্শ এ জীবনে
শ্রেষ্ঠ রমণীর,
তৎক্ষণাৎ রে-রে শব্দে শোনা যাবে, লোকটা কি লম্পট
চেনেনা ফুলের মূল্য, অন্ধ ছুঁয়াচোর।

মৃত বালকের মুখ অপরূপ, তার পাশে আততায়ী সাপের শরীর
কিন্তু কম রূপবান নয়, আহা, ওরা আজ দু'জনেই যেন
স্বর্গের সোপান পায়, পাহাড়ের শিখরে দাঁড়িয়ে
সূর্যাস্তের অসম্ভব আলো দেখে বন্দনার মত হতে হয়
তবু পরমুহূর্তেই
স্ত্রীলোকের শরীরের আদি অন্ধকার দেখতে তীব্র সাধ জাগে।
ঘরের জানালা নেই, দরজা নেই, তবু বড় প্রিয় এই ঘর
গোপন মুহূর্তগুলি বহু যত্নে ছড়ানো রয়েছে,
আজ কোনো ক্ষতি নেই খুতু ফেললে' কিংবা সিগারেট ছুঁড়ে
আগুন জ্বালালে ;
ভালোবেসে কত পদ চুম্বন করেছি, আজ বুকের উপরে
ঘৃণাভরে দাঁড়ালে তবু ভালোবাসা। আমি কোনোদিন
চোখ খুলে কিংবা চোখ বন্ধ করে এরকম বর্ণনা দেখিনি।

জীবন মৃত্যুর সিংহাসনে

[নিম্নতলার শ্মশানে দাঁড়িয়ে]

এখানে মৃত্যুর ঘাটি। তবুও জীবন মৃত্যু কী আশ্চর্য দাঁড়িয়ে এখানে
হাতে হাত শুদ্ধ তারা। ওপরে আকাশ কাঁপছে,
—নীচে নম্র গেরুয়া গঙ্গার
অতল জলের শব্দ। ভাটা লাগল দক্ষিণের সমুদ্রের টানে।
ধোঁয়ায় কালিতে ক্লান্ত আরো নানা লবণাক্ত অশ্রুর প্রসার
এখানে নিহিত ; এক নির্জন ঘুঘুর আলো বিবিক্ত দেয়ালে
(এ কেন কালের ঢেউ)—রৌদ্র বৃষ্টি জ্যোছনা ঝরালে
তবু তারা খেলা করে—খেয়ালী শিশুর মত হিজিবিজি আঁকে
দিন রাত। এবং জীবন মৃত্যু পাশাপাশি স্তব্ধ হয়ে থাকে।

দেয়ালে দেয়ালে শোনো কান পেতে মৃত জীবনের
পদশব্দ : নীল দিন, নত চোখ, নিহিত আকাশ
ভালোবাসা—প্রশ্ন জয়-সুখ দুঃখ ভয়ের স্বপ্নের
অজস্র ইতিহাস—চারিদিকে সুচেতনা স্নেহের প্রসার :
যে এক গৌরী শঙ্খ—সীতারাম কেশব বিশ্বাস—
তাদেরও স্মৃতির শব—এই পথ দিয়ে চলে গেছে।
উনিশ শো ত্রিশের কোন শ্রাবণের অজস্র বর্ষার
বিলাপ শুনেছে কারা। বিপিন-খালাসি-মধু-
সকলেরই কিছুটা কলার
ছিল পৃথিবীর কাছে ; দেয়ালের হিজিবিজি কী আবেগে
আজো সব উৎকীর্ণ আকণ্ঠ হয়ে আছে
ধূলোর ক্লান্তিতে ম্লান—ধর্ম-কর্তা—স্বপ্নের যন্ত্রণা
সমর্পিত অন্ধকারে—ঢেকে গেছে সমস্ত চারণা।

এখানে জীবন তবু যৌন এক অহংকারে-কী এক অতল ঐকতানে
খেলায় মুহূর্ত-স্বর—স্বরণের আভিজাত্য জানে
জীবন তবুও জয়ী। সময়ের সহজ বিজ্ঞানে
যদিচ এখানে সব সুপ্ত যৌন একাকার,—তবু এক আকণ্ঠ উচ্চার
জীবনেরে ভালোবাসা ঘোষণা করেছে আগো
—তিন পয়সার হাঁসে করে ঘুরে আসা যায়
অন্ধপুর থেকে এই বায়হীন অন্ধকারে : অতল গঙ্গার
গভীর জলের শব্দ—সৃষ্টিকে সে এখনো সাজায়।

সমুদ্রের চাকরি পেলে খুব ভালো হত
দ্বীপে দ্বীপে ঘুরতাম
হাওয়াই হনলুলু লেলিবিদ ঘলাক্কায়
নারী আর নারিকেলের ছায়ায় কাটত আমার দিন
সমুদ্রের একটি চাকরি পেলে
আমি বাঁচতাম।

পৃথিবীর এই সভ্য শহরে মানুষের বড় ভিড়
মানুষীর বড় কামার্ত নিশ্বাস
অমানব দাঁতে করে নিয়ে যাচ্ছে রাশীকৃত
মানুষ, আবার নিয়ে আসছে
নরক থেকে নরকে।
দম আটকানো ডুয়েট, বমনোদ্রেক,
শিরঃপীড়া,
এত মানুষ, এত মানুষ, বেবুন, বনমানুষ।
এরা কেউ জন্ম-নিয়ন্ত্রণ করে না।
যদি ভারসাম্য রাখতে চাও
হয় নারীদের বন্ধ্যা কর, পুরুষকে পুরুষত্বহীন
শহর একটু ফাঁকা হোক

সমুদ্রের একটি চাকরি চাই, জাহাজে, বন্দরে,
নারী আর নারিকেল ভরা দ্বীপপুঞ্জে,
নরহত্যা, দুর্ঘটনা, দারিদ্র্য অবাঞ্ছিত মৃত্যু
এর ঝিকুড়িতে আমি
বিকৃত মস্তিষ্ক হয়ে যাব
আমার শিরা ঝুলে পড়বে, স্নায়ু লোল
অকালবার্ধক্যে আমি পঙ্গু হয়ে যাব।

সমুদ্রের কোন দ্বীপে
পল গগ্যাঁ ছিলেন দিব্য মেজাজী লোক
বেশ কাটিয়ে গিয়েছেন
সমুদ্রের কোন নারী আর নারিকেল ছায়ার
দ্বীপ আজ কেন ভৎর্সিতে
চিন্তার দুর্বার বর্শীর মত হানা দিচ্ছে।

একটা সমুদ্রে ঘোরার চাকরি আমার
কি দিতে পারো
হে আমার ফুটো কপাল ?

শ্রীমতী রত্না রায়ের প্রতি

নিশিকান্ত

রত্না, আমি উন্মোচন করেছি তোমার
লিপিকার ইন্দ্রনীলবর্ণ বিরচিত
আবরণ ; সন্তরে সাজ্ঘাতে তুমি তার
বক্ষপট, শিল্পীসম করিলে অঙ্কিত

সুন্দর অক্ষরমালা তরুণমনের
সুবর্ণ-অরুণরাগ ! কাব্য রচনার
নিদর্শন দিলে তুমি প্রেরিত পত্রের
অন্তর্দেশে। ছন্দ মিল ভাষাভঙ্গিমার

ত্রুটি আছে ; তবু আমি তোমার সবল
স্বভাবের পরিচয় পাই তারি মাঝে ;
প্রগতির শক্তি তব ভাবের অতল—
মন্থনে রতন আনে ; মনস্বিতা যে

হয় সৌরউদয়ন তব আশ্রয়ায় ;
ধর্মবন্যা কৃচ্ছতার পর্বত ভাসায়।

[২]

পরিচয় না হ'তেই তোমার আঁখির
তারার তন্ময়তায় তোমায় চিনিয়া
বলিয়াছিলাম আমি নবীন কবির
কবিতা দেখিতে চাই। বিস্ময়ে চাহিয়া

আমার মুখের পানে, ঋজুসরলিত
স্মিতহাস্যে রহিলে নীরব ; কোন কথা
বলো নাই। শারদীয় অষ্টমীতিথির
শুক্লপক্ষে এসেছিলে। পূজার বারতা

পেলে কি তখনি ? বঙ্গভূমি হ'তে
এলে তুমি অধিকার অবতরণের
সন্ধোপনপন্থা 'পরে ক্ষিপ্ত ভারতে।
নিয়ে গেলে পাবনীর চরণতলের

প্রভাতীপ্রসাদপুষ্প। আমি সেই ক্ষণে
দেখেছি সৃষ্টির উষা তোমার নয়নে।

[৩]

মিথিলার নবকল্পলীলার মঞ্জরী
প্রেরণাসৌরভ দিল তোমার জীবনে,
নবজন্ম জাগে তব তারে মর্মে ধরি' ;
সে রাখে তোমার গতি জাগ্রতস্বপনে,

লাগিতে অতন্দ্রসুর সুপ্তধরণীতে।
বাজাও তোমার তন্ত্রী, গাও তবে গান ;
যে-গানে মানবতার তনুর শোণিতে
জুগিবে অমৃতসিন্ধু, মৃত্যুহীন প্রাণ,

লভিবে স্বর্গের পথে পথিকের দল।
পৃথ্বীর প্রত্যন্তদেশে তমোমুক্তজলীর
কুণ্ডলী প্রদীপ্ত হয়, হয় সমুজ্জ্বল
পাতালের শৈলগুহা পাবকবর্তীর

বিকাশের নবারুণে ! তারি দীপ্তিরাশি,
স্বজন-উষার তব তোলো সমুদ্ভাসি।

ইতি
শুভার্থী
নিশিকান্ত

করপুটে নীলাকাশ বাঁধিয়া
কালো কেশে গাঁথা ফুল কটি।
লোল পরাগ চিত্তমুখে মেখা
পাণ্ডু কান্তি বিরাজে ঘটি।
—রবিরাগ

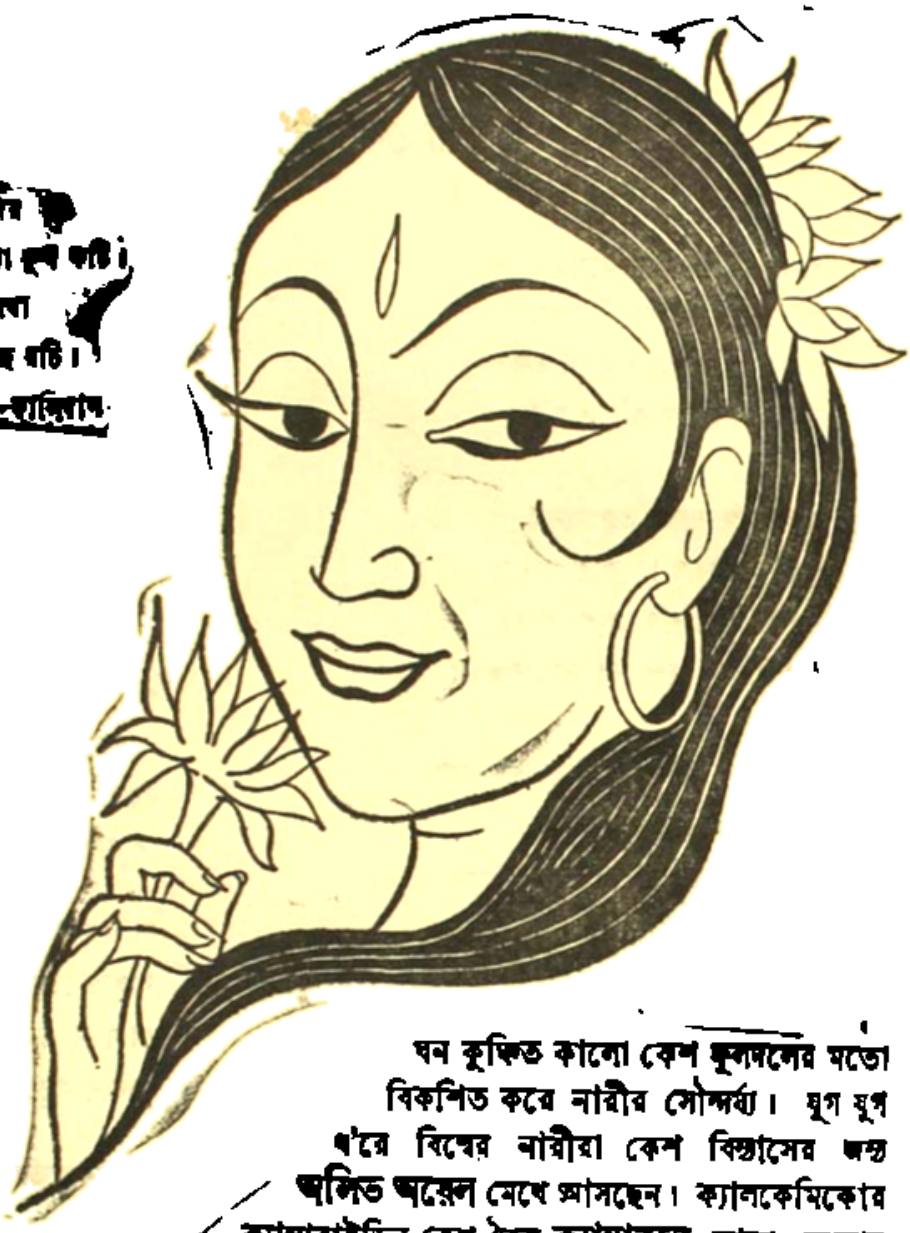

ঘন কুঞ্চিত কালো কেশ ফুলদলের মতো বিকশিত করে নারীর সৌন্দর্য্য। যুগ যুগ ধ'রে বিশ্বের নারীরা কেশ বিন্যাসের জন্য অলিভ অয়েল মেখে আসছেন। ক্যালকেমিকোর ক্যান্থারাইডিন কেশ তৈল ক্যান্থারলে আছে কেশের পক্ষে হিতকারী বিশুদ্ধ সেই অলিভ অয়েল। তাই আজও আধুনিকারা পরম আগ্রহে এই কেশ তৈল ব্যবহার করেন।

ক্যান্থারল

সুরভিসম্পৃক্ত ক্যান্থারাইডিন কেশতৈল

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ কলিকাতা-২৯

পরিমল গোস্বামী

স্বর্গ নরক কথা

আমাদের দেশে মৃত ব্যক্তির পরিচয়ে বলা হয় স্বর্গগত বা স্বর্গীয়। যারা গেছেন না বলে, বলা হয় স্বর্গে গেছেন।

অথচ স্বর্গ সম্পর্কে আমাদের কারোই কোনো প্রত্যক্ষ জ্ঞান নেই। নরক সম্পর্কেও নেই। তবু শাস্ত্রকারেরা এ দুটি দেশ বিষয়ে আমাদের অনেক তথ্য শুনিয়েছেন। স্বর্গ এবং নরক! এর মাঝামাঝি কোনো দেশ আমাদের নেই। পাতালকে যদি নরক ধরা যায় তা হ'লে, স্বর্গ-মর্ত-পাতাল, এই এই তিন দেশের মধ্যবর্তী দেশ মর্তভূমি। কিন্তু সে ভূমিতে আমার প্রয়োজন নেই—আমি মৃত্যুর পরের গন্তব্য দেশ খুঁজছি।

মাঝামাঝি একটি দেশ তৈরি হবার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু সে দেশটি বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত একটি ব্যক্তির জন্যই শুধু সৃষ্টি করা হয়েছে। ত্রিশঙ্কু নামক এক পৌরাণিক রাজা সেখানে, অর্থাৎ সেই শূন্য দেশে, নিচু মাথায় ঝুলে আছেন। তিনি না থাকলে এই স্থানটি খ্রীষ্টান শাস্ত্রের 'পারগেটরি' জাতীয় একটা দেশ হতে পারত। আমাদের মর্তভূমিকে পারগেটরি কল্পনা করা শক্ত, কেননা এখানে মৃত্যুর পর কেউ তিষ্ঠতে পারে না।

তবে আমাদের নরকেরই একটুখানি ভাগ আছে। পাপীদের গুণ অনুযায়ী এক এক সময় এক একটি নরকে বাস করতে হয়। সবগুলিতে বাস পূর্ণ হ'লে তবে সে বেরিয়ে আসে। ব্যাপারটা পারগেটরির মতো অত সহজ নয়।

এই একুশটি নরক আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ না হ'লেও শাস্ত্রকারদের কাছে প্রত্যক্ষ ছিল। তাঁরা দেখতে পেতেন না শুধু এই মর্তভূমিটি। কিংবা মর্তভূমি অতি পরিচিত এবং অতি সাধারণ একটি দেশ হওয়াতে তাঁরা এর ভূগোল অথবা ইতিহাস রচনাতে ঘৃণাবোধ করেছেন। তাঁরা এই দুটি কাজই অতি নিখুঁত ভাবে করেছেন স্বর্গ এবং নরক সম্পর্কে।

নরকের যে সংখ্যা ধরা হয়েছে, এগুলি এক একটি স্তর। এ থেকে বোঝা যায় পৃথিবীতে বালকালে একটি পাপও যে করেছে তাকে সেখানে যেতেই হবে। আবার ইহলোকেও এমন ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে এখানকার লোকেরা অত্যন্ত সহজে পাপ-মুক্ত হ'তে পারে।

গোলমেলে ব্যাপার। ভীষণ জটিল। পাপমুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রওনা না হ'লে কনটামিনেশন হবে, স্বর্গে যাওয়া যাবে না। পাপমুক্ত হয়ে যে দুদিন নিশ্চিন্তমনে পৃথিবীতে থাকা যাবে এমন চিন্তা করা মহা ভ্রান্তি। গঙ্গাস্নান করলে পাপমুক্ত হওয়া যায়, গঙ্গাস্তোত্র পড়লে জানা যায়। কিন্তু ইমিউন হওয়া যায় না। কাজেই রোজ গঙ্গাস্নানের পর দেহে নতুন ক'রে পাপ প্রবেশ করতে থাকে। পথে বেরোলে গায়ে ধুলো লাগে, শোবার আগে পা ধুয়ে শোয়া যায়, কিন্তু পরদিন আবার লাগে। তাই অতীতের সব পাপ একটি মাত্র প্রক্রিয়ায় ধোয়া সম্ভব হলেও সে অবস্থায় সোজা স্বর্গে যাওয়া সবার পক্ষে সম্ভব হয় না।

না হয় বহু প্রক্রিয়াই করা গেল। না হয় ভারতের

সকল তীর্থ ভ্রমণ করা গেল, সকল পুণ্য তিথিতে পুণ্যস্নান-সমূহে একের পর এক গঙ্গাস্নান করা গেল, অর্ধ মুণ্ড, পূর্ণ মুণ্ড সবই শেষ করা গেল, কিন্তু শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে যদি মৃত্যু না হয় তা হ'লে পরদিন থেকে আবার তো পাপে প্রবৃত্তি জাগবে। এমন অবস্থায় নরক গমন ঠেকাবে কে? আত্মাকে অটোক্লেভে বাষ্পের চাপে সর্বদা পাপজীবাণু মুক্ত রাখা সম্ভব নয়।

বিশেষ স্থানে একটি ডুবেই যদি সব পাপ ধুয়ে যায় তবে সাতঘাটের জল খেয়ে বেড়ানো কেন, এমন প্রশ্ন উঠতে পারে। এটি মানুষের এক অদ্ভুত মনস্তত্ত্ব। যেখানে যত পুণ্যই করা যাক পরদিন থেকেই মনে যখন পাপ ঢুকতে থাকবে, তখন এত কৃচ্ছ্র সাধনে দরকার কি?—এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়। লোকে কোনো রকম ঝুঁকি নিতে চায় না। ভাবে যে, যত পুণ্য করা যায় ততই তা পরকালের খাতায় জমা হতে থাকে। নিষ্ঠা কোনোটাতেই নেই। তাই জোর ক'রে সে বলতে পারে না যে, সে একটি স্নানে সব পাপ ধুয়ে ফেলেছে আর তার দরকার নেই। সে জানে পাপ ত্যাগ করা তার পক্ষে অসম্ভব। তাই সে যত পাপ করে তত পুণ্যস্নান করে এবং ভুল ক'রে মনে করে এ সবই তার নামে কোনো স্নানের খাতায় জমা হচ্ছে। কোনো একটিতে নিষ্ঠা হয় না। ইংরেজ অ্যাটর্নি তাঁর মক্কেলকে তার করলেন, আপনার শাশুড়ি মুমূর্ষু অবস্থায় যারা গেছেন, তাঁর মৃতদেহের কি ব্যবস্থা করব—আরকে ডুবিয়ে রাখব, না দাহ করব, না কবর দেব? মক্কেল উত্তরে জানালেন, ঝুঁকি নেবেন না, সবগুলোই করুন।

ঝুঁকি নিতে চায় না মন। ইংরেজ-শাশুড়ি বিদায় হোক বা পাপ বিদায় হোক, সর্বত্র একই মনস্তত্ত্ব।

কারণ পাপের আক্রমণের বিরুদ্ধে ইমিউনিটি বা স্বাভাবিক প্রতিরোধ ক্ষমতা কোনোটাতেই জন্মায় না। এবং শাস্ত্রকার-দের কথাও আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি না। অতএব এ কথা স্বীকার করতেই হয় যে, মৃত্যুর পর কে স্বর্গে যাবে আর কে নরকে যাবে এ কথা আমরা জানি না, এবং শাস্ত্র মতে এমন মানুষ তো দেখি না যে-মানুষ মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সোজা স্বর্গে যাবে। এমন নিষ্পাপ কাউকে মনে করা যায় না। তবে কেউ মারা গেলেই কেন বলি স্বর্গত অমুক? আমরা সবাইকে স্বর্গে পাঠাবার কে?

স্বর্গ ও নরক যদি একজনেরই সৃষ্টি হয়, এবং সবই যদি মানুষের আত্মার কল্যাণের জন্যই সৃষ্টি হয়ে থাকে তবে যে-লোকটি সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত জানি যে সে মারা গেলে স্বর্গে যেতে পারে না, তার সম্পর্কে এমন দায়িত্বহীন উক্তি আমরা কেন করি? কেন বলি না—নরকগত অমুকের আত্মার কল্যাণে আমরা প্রার্থনা করছি, অথবা নরকগত অমুকের শ্রাদ্ধ বাসরে উপস্থিত হয়েছি? বললে ক্ষতি কি? সত্য বললে ক্ষতি কি?

প্রসঙ্গত একটি দৃষ্টান্ত দিই। ভাল ও মন্দ বলতে আমরা চলিত অর্থে যা বুঝি, তা নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে একই জিনিসের দুটি দিক। কোনোটা ভালও নয়, কোনোটা মন্দ ও নয়, দুটো পৃথক বিভাগ মাত্র। আলো আর অন্ধকার যেমন, কোমল ও কঠিন যেমন, সাধু ও চোর যেমন। দুটি বিপরীত গুণ আছে ব'লেই দুটিকে আমরা জানতে পারি। একটি না থাকলে অন্যটি সম্পূর্ণ অর্থহীন। এর মধ্যে ভাল মন্দের প্রশ্ন কোথায়। কোমল ভাল। কঠিন মন্দ? আলো ভাল, অন্ধকার খারাপ? সাধু ভাল, চোর খারাপ? আদৌ তা নয়। একটিকে জানবার জন্য অপরটির সৃষ্টি হয়েছে, এবং একই হাতে। অথচ আমরা এই সহজ সত্যটা মানতে ভয় পাই।

আর ঠিক এই কারণেই অসুখ করলে অদৃষ্টের দোষ দিই। এবং সুস্থ হ'লে বলি ঈশ্বর ইচ্ছায় ভাল হয়েছি। অসুখটাও যে ঈশ্বর ইচ্ছায় হয়েছে তা মানতে চাই না। ঈশ্বর ইচ্ছায় দুঃখে আছি বলতে ভয় কি? ঈশ্বর ইচ্ছায় চাকরিটি হারিয়েছি বলতে ভয় কি? আদি সত্যই এক বন্ধুকে চিঠিতে লিখে-ছিলাম, "ঈশ্বর ইচ্ছায় সম্প্রতি সর্দিজ্বরে আক্রান্ত হয়েছি।"

বন্ধু ওটাকে রসিকতা বলে উড়িয়ে দিয়েছিল। পাঁচশ প্রার্থীর মধ্যে ঈশ্বর ইচ্ছায় চাকরিটি আমি পেয়েছি, বললে সবাই তা বিশ্বাস করে। প্রশ্ন করে না যে, অত প্রার্থী ফেলে ঈশ্বর তোমাকে চাকরি দিতে ইচ্ছা করলেন কেন?

আসল কথা, কেউ অসুস্থ হোক বা সুস্থ হোক, চাকরি পাক বা না পাক, তার কোনোটাতেই ঈশ্বরের ইচ্ছা থাকে না, যদি থাকে তবে দুটোতেই থাকে। ঈশ্বরের পক্ষপাতিত্বটা আমরা কত সহজে মেনে নিই।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় বিলেতে অবস্থান কালে এক রাত্রে ঝড় আরম্ভ হয়। সে সময় তাঁর ল্যাণ্ডলেডির এক ছেলে সমুদ্রে জাহাজে ছিল। তিনি দেখলেন ঐ ল্যাণ্ডলেডি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছেন তাঁর ছেলে যেন নিরাপদে থাকে।

ত্রৈলোক্যনাথ মন্তব্য করেছেন, ঈশ্বর সে দিন রাত্রে কি বিপদেই না পড়েছিলেন। অর্থাৎ তাঁকে এক-জাহাজ যাত্রীর ভিতর থেকে ঐ একজনকে খুঁজে বার করে তাকে বাঁচাতে হবে। ঈশ্বরের কি দুর্দৈব!

ত্রৈলোক্যনাথ সত্যের দুটো দিক দেখতে পেতেন।

কারও কিছু ভাল হলেই সেটা ঈশ্বরের ইচ্ছায়, এবং অন্যটাও যে তাঁরই ইচ্ছায় ঈশ্বরকে এতটা নিষ্ঠুর ভাবতে সাহস হয় না অনেকের। তা যদি না হয় তা হলে অন্যটা কার ইচ্ছায় হয়? তবে কি উৎকৃষ্ট ঈশ্বরের হাতের কাছে আর একটি নিকৃষ্ট ঈশ্বর বাস করেন? যুক্তি অনুযায়ী সেটা সত্য হতেও পারে। কিন্তু সেই নিকৃষ্ট ঈশ্বর কার ইচ্ছায় টিকে আছেন? কার ইচ্ছায় বা কার অনিচ্ছা সত্ত্বেও? উৎকৃষ্ট জন নিকৃষ্ট জনকে উৎখাত করতে পারেন না কেন?

স্বর্গের কথা বলছিলাম। জনশ্রুতে আমাদের পরিচিত আত্মীয় বন্ধু বান্ধব সবাই মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গে যাচ্ছেন। অথচ আমার নিশ্চিত বিশ্বাস আমি নিজে মৃত্যুর পর আমাদের শাস্ত্রের কল্পনা অনুযায়ী নরকে যাব। কিন্তু মৃত্যুর পর সবাই বলবে লোকটি স্বর্গে গিয়েছে। লেখা হবে স্বর্গগত পরিমল সোম্বামী। লেখা উচিত নরকগত।

স্বর্গে আমি যাব না, যেতে চাইও না। কারণ স্বর্গ সম্বন্ধে আমার ধারণা খুব উঁচু নয়। অন্তত নরক থেকে তা কোনো মতেই উচ্চশ্রেণীর নয়। তা ভিন্ন মৃত্যুর পর রওনা হয়ে যাবার পথে যে সব চেক্ পোস্ট আছে, সেখানে কেউ যদি প্রশ্ন করে, কোন্ বিধি আমি পালন করেছি, আমার ধর্মমত কি ছিল, তা হলে কোনো প্রশ্নকারীকেই তা বুঝিয়ে বলতে পারব না। যে সব পাপ করেছি তার জন্য অনুতপ্ত নই, কোনো দিন হব না। কাজেই কোনো কালে যে শেষ হোলাইয়ের জন্য পারগেটরিতে স্থান পাব এমন সম্ভাবনাও নেই। নরকেই থাকতে হবে, এবং সম্ভবও হিন্দু নরকে। মোট একুশটি স্তর আছে, যথা—তামিস্র, অন্ধতামিস্র, রৌরব, মহারৌরব, কুম্ভীপাক, কালসূত্র, অসি-পত্রবন, শূকরমুখ, অন্ধকূপ, কৃমিভোজন, সন্দংশ, তপ্তমূর্মী, বজ্রকণ্টকশাল্মলী, বৈতরণী, পূয়োদ, প্রাণরোধ, বিশসন, লালাভক্ষ, সারমেয়াদন, অবীচী ও অয়ঃপান।

এর মধ্যে প্রথমটিতেই বরাবর থাকব বলে আমার বিশ্বাস। প্রোমোশন হবে না, চাইও না। কারণ আমার কাছে স্বর্গ ও নরক দুইই সমান খারাপ। কোনো দিকেই কোনো বিশেষ টান নেই। কারণ দুটোই চরম, অতএব দুটোই এক। স্বর্গে অবিমিশ্র সুখ, নরকে অবিমিশ্র দুঃখ। এক দিকে অন্ধকারহীন আলো, অন্যদিকে আলোহীন অন্ধকার। মানুষের যাবতীয় ইন্দ্রিয় সমস্ত জীবন চেষ্টা করলেও এ দুইয়ের প্রভেদ বুঝতে পারবে না। ইন্দ্রিয়াতীত বোধ যদি কিছু থাকে তবে সে বুঝবে কিনা আমি জানি না।

একটি ইংরেজী গল্প মনে পড়ল।

মৃত্যুর পর একটি লোক জেগে উঠে আপন মনে বলে উঠল "আমি কোথায়?" অন্ধকার থেকে একটি লোকের কণ্ঠ শোনা গেল—"আপনার কি চাই বলুন।"

এই থেকেই গল্পের আরম্ভ। সে যা চায় তৎক্ষণাৎ তাকে তাই দেওয়া হয়। দিনের পর দিন কাটতে লাগল এই ভাবে, তারপর চাওয়ামাত্র সবকিছু পাওয়ার অত্যাচারে লোকটি প্রায় ক্ষেপে গিয়ে ব'লে উঠল, "ওহে আমি আর এখানে থাকতে চাই না, আমাকে বরং নরকে নিক্ষেপ কর।"

অন্ধকারের কণ্ঠ থেকে ধ্বনিত হ'ল, "কোথায় আছেন ভাবছেন?"

গল্পটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। নরক সম্পর্কে এমন সহজ সরল এবং অভাবিতপূর্ব কল্পনা আর হ'তে পারে না। এতে আমাদের হিন্দু নরকের মতো ২১ রকম জটিলতা নেই, কষ্ট কল্পনা নেই, অল্প আয়োজনে নারকীয় শাস্তির অতি আশ্চর্য সুন্দর ব্যবস্থা।

কিন্তু একটি ত্রুটি এর আছে। এ নরকে বহু কর্মীর অন্নের ব্যবস্থা নেই। বহু লোক এখানে বেকার। কিন্তু হিন্দু নরকে তদ্বিরকারীর সংখ্যা অনেক বেশি। কলকাতা শহরকে যদি নরক ধরা যায় তা হলে তার সঙ্গে হিন্দু নরকের আশ্চর্য মিল দেখা যাবে।

কিন্তু এ সব স্বতন্ত্র প্রসঙ্গ।

স্বর্গ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বর্ণনাটি আমার খুব পছন্দ। তিনি বলেছেন—

"...শোকহীন
জড়িহীন সুখস্বর্গভূমি, উদাসীন
চেয়ে আছে। লক্ষ লক্ষ বর্ষ তার
চক্ষের পলক নহে। অস্তশাখার
প্রান্ত হতে খসি পড়ে জীর্ণতম পাতা
যতটুকু বাজে তার ততটুকু ব্যথা
স্বর্গে নাহি লাগে, "

সামান্য কথায় স্বর্গের স্বরূপ উদ্ঘাটিত। স্বর্গের দেবতাদের হৃদয় নেই। কিছুই নেই। যেখানে দুঃখ নেই, সেখানে সুখ কখনও থাকে না। 'সুখস্বর্গভূমি' কথাটি তিক্তস্বরে বলা। 'অরসিকের স্বর্গপ্রাপ্তি' নামক ব্যঙ্গ গল্পে রবীন্দ্রনাথ গোকুলনাথ দত্তকে স্বর্গে পাঠিয়ে তার সাহায্যে স্বর্গের নিষ্ঠুর ঔদাসীন্য বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য উদ্ঘাটন করেছেন। সেখানে ভোগের বেহিসেবি ব্যবস্থা, আর কিছু না। একেই তো বলে নরক।

ইংরেজী গল্পটিতে দেখা গেল নরকে ভোগের বেহিসেবি ব্যবস্থা, যত চাও তত পাবে, যা চাও তা পাবে। স্বর্গেও দেখছি তাই। তা হ'লে দুয়ের মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

তবু আমাদের মনের গোঁড়ামি একটির দিকে আকৃষ্ট হয়, অন্যটির কথা ভাবতে ভয় পায়। এটি বড়ই অন্যায়। নরকের নামটি অব্যবহারে শেষ পর্যন্ত পরিত্যক্ত হলে নরক উঠে যাবে, অনেকে বেকার হবে। নরক উঠে গেলে স্বর্গের শান্তি আরও বাড়বে, কারণ প্রতিযোগিতা না থাকাতে দেবতারা বেশি অত্যাচারী হয়ে উঠবেন। এখন দুটিতে বেশ ভারসাম্য রক্ষিত হচ্ছে। দুদিকের পাল্লা সমান।

তাই আমার মনে হয় মৃতের নামের সঙ্গে "নরকগত" বিশেষণটির ব্যবহার প্রচলন করা উচিত। স্বর্গ সম্পর্কে এখনও যাঁদের মনে একটা সম্ভ্রমের ভাব আছে, তাঁরা স্বর্গ ও নরক বিষয়ের তুলনামূলক ইতিহাস নিয়ে অনুশীলন শুরু করুন, দেখবেন দুয়ের ভিতরকার কোনো পার্থক্য ধরা যায় না। নেইও পার্থক্য, একথাটা অন্তত আজকের বিজ্ঞানের যুগে সবারই মানা উচিত। আমার মৃত্যুর পর আমার নামের আগে যে বিশেষণটি ব্যবহার্য সেটিতো আগেই বলেছি। যাঁদের সাহস আছে তাঁরা আমাকে অনুসরণ করতে পারেন।

জাতির শ্রীবৃদ্ধিতেই

উৎসবের আলো

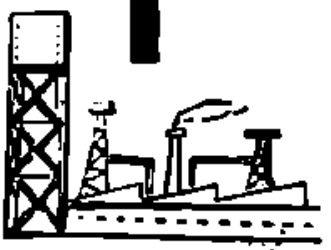

সকলের সম্মিলিত চেষ্টাতেই গড়ে উঠছে নবভারতের

সোনার বাংলা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত

বৃটেন, ইয়োরোপ ও ভারত

ধীরেশ ভট্টাচার্য

একদিনে ব্রিটেন ছিল অর্ধবিশ্বের অর্ধ পৃথিবীর অধীশ্বর। তার সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধের তিন তিন লোভনীয় অংশে, যার মধ্যেকার যোগসূত্র রক্ষা করত ব্রিটেনের সতত সজাগমান রণতরী বাহিনী। সমুদ্রের উপর এই অখণ্ড আধিপত্য ছিল বলেই ব্রিটেন তার পার্শ্ববর্তী মহাভূখণ্ড ইউরোপের দেশগুলিকে একটু অবজ্ঞার চোখে দেখত, নিজেকে ওদের চেয়ে স্বতন্ত্র বলে ভাবত। এমন সময় নূতন যুদ্ধ পদ্ধতি এবং নূতন যুদ্ধোপকরণের উদ্ভব হল, পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্যের দূরতম প্রান্তেও আত্মশাসনের দাবি মাথাচাড়া দিয়ে উঠল, আর এই রণনৈতিক এবং মানবিক আবর্তে ব্রিটেনের রণতরী এবং সাম্রাজ্য উভয়েই হতবল, হতমান হয়ে গেল। তখন আর কী? আবার আঁকড়ে ধর ইউরোপকে। জলের সাম্রাজ্য যদি-বা গেল, পায়ের নীচের ডাঙাটুকু যেন সরে না যায়। লজ্জা মান ত্যাগ করে ব্রিটেন ইউরোপের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল।

কিন্তু শুধু তো বাঁচবার প্রশ্ন নয়, খেয়ে বাঁচবার প্রশ্নও যে রয়েছে। এতদিনকার সাম্রাজ্যব্যবস্থার মধ্য দিয়ে মোটামুটি একটা পাকা বন্দোবস্ত হয়ে গিয়েছিল, ব্রিটেন তার সাম্রাজ্যের নানা দেশ থেকে সস্তায় খাদ্য, পানীয় আর শিল্পের কাঁচামাল পাবে, তার বদলে নানা ধরণের শিল্পদ্রব্য সে যোগাবে ঐ সব দেশকে। সেই বন্দোবস্তও বিকল হবার উপক্রম। আজকাল শিল্পে পশ্চাদ্‌বর্তী দেশেও দু'টি একটি করে শিল্প গজিয়ে উঠেছে, তারা ব্রিটেনের উপর আর আগের মতো বরাত দিয়ে বসে নেই। তবে ব্রিটেন যে আগে-ভাগে শিল্পের পসরা খুলে বসেছে তার কাটতি হবে কোথায়? শিল্পের কারখানা ভেঙে ফেলে সোহা দিয়ে লাঙল বানাবে আর মাটি চষবে? হায়, তারও কি উপায় আছে? ছোট দ্বীপখানার জনবসতি আজ এত বিপুল যে ঘরের খেয়ে সকলকে প্রায় নিরন্ন অবস্থায় কাল কাটাতে হবে। অতএব শিল্পের জন্যে নতুনতরো বাজার খোঁজো। তাকাও আটলান্টিকের অপর প্রান্তে ধনী দেশ আমেরিকার দিকে, আর তাকাও তাদেরই আর্থিক প্রসাদে সম্প্রতি স্ফীত পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির দিকে। সাম্রাজ্যকে দোহন করেও যখন ত্যাগ করতে হল, তখন ওই ভুঁইফোঁড় দেশগুলোর বাজারকে শাসন করবার ক্ষমতাও ত্যাগ করো। ফিরে চল ইউরোপে।

কিন্তু ইউরোপ কি দেবে তোমাকে খাদ্য আর পানীয়? শিল্পের কাঁচামাল কি অমনি সস্তা দামে ইউরোপ থেকে পাওয়া যাবে? উত্তরে শিল্পের মালিকেরা বললেন, আগে দামী খরিদ্দারের যোগাড় হোক, তার কাছে চড়া দামে জিনিষ বেচে লাভ-খরচা সবই উঠিয়ে নেওয়া যাবে। কিন্তু খরিদ্দারদের মধ্যে যাঁরা তেমন দামী নন, তাঁরা ইতিমধ্যেই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছেন। করযোড়ে বলছেন, আগে সস্তা খাদ্য আর পেয় দ্রব্যের ব্যবস্থা হোক, তারপর শিল্পের বাজার প্রসারিত কোরো। বলাবাহুল্য, এটা সাধারণ মানুষের মনের কথা, কিন্তু শিল্পপতিদের কাছে হেঁয়ালির মতো। তাঁরা জানেন, বাজার বড়ো হলে শিল্পের প্রসার হবে, মুনাফার হার বাড়বে, নতুন শিল্পে মূলধন বিনিয়োগের নানা সুযোগ দেখা দেবে। তাঁরা একরকম জোর করেই ব্রিটেনের ঘাড় ঘোরালেন ইউরোপের দিকে।

দুই

পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি নিজেদের মধ্যে দীর্ঘ দিন ধরে বিবাদ বিসংবাদ চালিয়ে এসেছে। সুসঠিত সামাজিক ও আর্থিক ব্যবস্থার যে কী মূল্য তাই তারা ভুলে যেতে বসেছিল। এমন সময় আটলান্টিকের ওপার থেকে আমেরিকা তাদের ডেকে বলল, আমরাও এক সময়ে নানা রাজ্যে বিভক্ত ছিলুম, পরস্পর যথেষ্ট কামড়াকামড়ি করেছি, কিন্তু ঐক্যের মন্ত্র পড়বার সঙ্গে সঙ্গে দেখো আমাদের এ কী পরিবর্তন। তোমরাও ঝগড়া-ঝাঁটি ভুলে এক হও, তোমাদেরও সোনা ফলবে হে, সোনা ফলবে। তোমাদের মাটিতে লুকোনো আছে অজস্র কয়লা আর লোহা, শুধু মিলবার চেষ্টা করোনি বলেই এই সব সম্পদ তোমরা হেলাফেলায় ব্যবহার করে চলেছ। একবার পূর্বদিকে তাকিয়ে সতর্ক হও, এক বিরাট ভূখণ্ড আসছে, তার চাপে তোমাদের টুকরো-টুকরো দেশগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। বাঁচবার জন্যে এক হও, ভালো ভাবে খেয়ে বাঁচবার জন্যে এক হও, আর এক হও ইউরোপের প্রাচীন ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করে। তৃতীয় মহাযুদ্ধ বাধবার আগেই এ-কাজ তোমাদের সম্পূর্ণ করতে হবে।

সারা ইউরোপ কাণ পেতে শুনল। চেষ্টা করল একে অন্যের কাছে এগিয়ে আসতে। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, শিল্পের ক্ষেত্রে, মুদ্রা ব্যবস্থায়, রাজনৈতিক ভাবধারার আদান-প্রদানে, আবার ইউরোপীয় চেতনার রেশ পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতে দেখা দিতে লাগল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমেরিকা বাধা করল তাদের যৌথ সংস্থা গঠন করতে, শুধু সেই সংস্থার মাধ্যমেই আমেরিকার আর্থিক সাহায্য তারা পেতে পারবে, নতুবা নয়। সুতরাং অনেকে ইউরোপ সেদিনকার ছেলে আমেরিকার কাছে বেশ বড়ো হার হারল। ঘেরে আরম্ভ হল। আজ তার এই ভিক্ষাবৃত্তির দশা কেন, ভেবে দেখতে হল। ভাবতে ভাবতে নিজেরাই ঐক্যগঠনের নতুন নতুন রাস্তা আবিষ্কার করতে লাগল। এরই একটি রাস্তা, ইউরোপীয়ান কমন-মার্কেট—ইউরোপ-জোড়া খোলা বাজার।

ছটি দেশের মধ্যে সমঝোতা, তারা প্রত্যেকে ধীরে ধীরে নিজেদের দেশের বাজারে অন্য পাঁচটি দেশের জিনিষ সমান ভাবে গ্রহণ করবে, কোনো বাধা—নিষেধ রাখবে না, কোনো শুল্ক বসাবে না, অবাধ কেনা-বেচার উপর কোনো প্রকারেই হস্তক্ষেপ করবে না। দেশ ছটি হল, জার্মানী (পশ্চিম) ফ্রান্স, বেলজিয়াম, নেদারল্যাণ্ডস, লুক্সেমবার্গ এবং ইতালী। সব জিনিষের উপর বাধা-নিষেধ কিন্তু একদিনেই প্রত্যাহৃত হচ্ছে না। সে-জাল এত জটিল যে তার সব ক'ট খুলতে বছর পনেরো লেগে যাবার সম্ভাবনা। তবু এতদিন পর ঠিক পথে নেমে পড়া গেছে। একদিন ইউরোপ-জোড়া অবাধ বাণিজ্যের স্রোত প্রবাহিত হবে, আর তার তীরে তীরে বিরাট, বিরাট শিল্প-নগরী মাথা তুলে দাঁড়াবে। তারা কোনো বিশেষ দেশের শিল্প নয়, তাদের নির্মিত সামগ্রী কোনো বিশেষ দেশে মাত্র আটকে থাকবে না। তারা সারা ইউরোপের সমৃদ্ধির রূপ, তাদের ঔজ্জ্বল্যে সমগ্র ইউরোপ গর্ব অনুভব করতে পারবে।

সেই রূপ কল্পনানেত্রে দেখেই ব্রিটেন তার তরী ভিড়াচ্ছে ইউরোপের ঘাটে। বুঝতে পেরেছে তার নিজের ক্ষুদ্র পরিসরে ওই রূপ, ওই ঔজ্জ্বল্য কোনো কালেই ফুটবে না। আগামী কালের পৃথিবীতে ইউরোপ যদি তার ঐক্যের জোরে প্রতিপত্তি পায়, তবে সে ঐক্যের বাইরে থেকে গেলে ব্রিটেনকে হয়ে দাঁড়াতে হবে ওই ইউরোপেরই তাঁবেদার এক নগণ্য দ্বীপ। চিরকালের বৈপায়ন ব্রিটেনও তাই ইউরোপীয় ঐক্যের মধ্যে নিজেকে বিসর্জন দিয়ে ব্যাপক লাভের ব্যবস্থা পাকাপাকি করে রাখছে।

তিন

ব্রিটেনের বাজারে তার ভূতপূর্ব সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত যে

সব দেশের জিনিষ বিনা শুল্কে বা নামমাত্র শুল্কে বিক্রয় হয়ে থাকে, ব্রিটেন ইউরোপের দিকে মুখ ফেরানোতে তারাই পড়েছে সবচেয়ে বড়ো ফাঁপরে। এদের মধ্যে ভারত অন্যতম।

এরা ব্রিটেনকে যে সব জিনিষ সরবরাহ করে আসছে, ইউরোপীয় ঐক্যে যোগদান করলেও ব্রিটেনের কাছে তার প্রয়োজনীয়তা কমবে না। ব্রিটেন যে তার ইউরোপীয় স্থানাংশের কাছ থেকে ঠিক একই ধরণের জিনিষ সংগ্রহ করতে পারবে এমন সম্ভাবনা কম। তবু, সন্দেহ নেই, এই সব দেশের অসুবিধায় পড়তে হবে। ব্রিটেন যখন ইউরোপীয়ান কমন মার্কেটে প্রবেশ করবে তখন তাকে আর আগের মতো যৎসামান্য শুল্ক বাসিয় বাইরের জিনিষ আমদানি করতে দেওয়া হবে না। তার সহযোগী দেশগুলির সঙ্গে পরামর্শক্রমে তাদের সকলকেই বাইরের জিনিষের উপর একই হারে শুল্ক বসাতে হবে: সুতরাং ব্রিটেনের বাজারে প্রবেশাধিকার অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে এই সব দেশকে অতিরিক্ত শুল্কের দায় ঘাড়ে নিতে হবে, অথবা বাজার থেকে পাততাড়ি গুটাতে হবে। শুল্কের হার বাড়বার পর যদি ব্রিটেনের লোকের কাছে এ-সব জিনিষের দর বেড়ে যায়, তবে তারা নিজেরাই কি আর আগের পরিমাণে জিনিষ কিনবে? বাজার আপনা থেকেই সংকুচিত হয়ে যাবে। ভারতীয় বণিকসমাজের মধ্যে যাঁরা রপ্তানী বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল, তাঁরা এই সব অসুবিধার কথা ভেবে ভয় পাচ্ছেন। তাঁরা এবং অন্যান্য দেশের সমব্যবসায়ীরা মিলে দাবী তুলেছেন, ব্রিটেন আমাদের একটা সুরাহা না করে দিয়ে ইউরোপের কোটে পালাতে পারবে না। পালালে অবশ্য এঁরা বাধা দিতে পারবেন না, তবে ব্রিটেনের কাছে সাম্রাজ্য-সঙ্ঘের এখনও অনেক দাম, আর সেই সঙ্ঘের কথাই এঁরা ব্রিটেনকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন।

পূর্বে বলা হয়েছে, ব্রিটেনের জনসাধারণও চায় সস্তায় খাবার, সস্তায় চা, সস্তায় কাপড়। তারা ইউরোপের ভবিষ্যৎ কতটা পাকা ভিতের উপর গড়ে উঠল তা' নিয়ে মাথা ঘামায় না, আজকে কী করে সস্তায় খেয়ে পরে বাঁচা যায় তাই নিয়েই মনে মনে আলোচনা চালায়। সুতরাং একদিকে ব্রিটেনের জনসাধারণের অনাগ্রহ, অন্যদিকে 'কমনওয়েলথ' দেশগুলির নিকট থেকে সকরুণ আবেদন, দুই মিলে ব্রিটেনের সরকারী মন এখনও যথেষ্ট দোদুল্যমান। কিন্তু পুরোনো দিনের সুখস্মৃতির কথা ভেবেও আর লাভ নেই, আবার ক্ষণস্থায়ী সুখসুবিধার কথা ভেবে ভবিষ্যৎকে ঘোলাটে করে তুলবার অধিকারও জনসাধারণের হাতে ছেড়ে দেওয়া যায়না। রাষ্ট্রতরণীর কর্ণধারদের সর্বসম্মত নীতি, ইউরোপের কূলে তরী ভিড়াতেই হবে। তবে ভূতপূর্ব বন্ধুদের ক্ষতি করে নয়, জনসাধারণের অসুবিধা করে নয়। এই দুই কূল রক্ষা করে চলার নীতি অবশ্য ব্রিটেনের অজ্ঞাগত। এবার সেই নীতি কোন্ কূলকে কতটা ভাঙবে, আর কতটা রক্ষা করবে, তা' এখনও বুঝতে পারা যাচ্ছে না।

আলাপ, আলোচনা, দর-কষাকষি চলেছে, এবং আরও অনেকদিন চলবে। ভারতে এবং ভারতের বাইরে বহুদেশে অধীর আগ্রহে সবাই অপেক্ষা করে আছে, শেষ পর্যন্ত ব্রিটেন কাকে ফেলে আর কাকে রাখে। ভারত বলেছে, তোমার বাজারে মাল বেচতে আমার যে-সব সুবিধা ছিল, তোমার ইউরোপের স্থানাংশরা যাতে আমাকে সেই সুবিধা দেয় তার ব্যবস্থা করে দিতে পারলে বুঝব তুমি বাহাদুর। সেই সব স্থানাংশের কাছেও অন্য ভাষায় একই দাবি পেশ করা হয়েছে। কিন্তু ভারত তো আর আমেরিকা নয় যে তার কথা ইউরোপ শুনবে!

নাটক ও নোবেল পুরস্কার

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

পৃথিবীর সকল দেশেই সহরাঞ্চল দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই সঙ্গে পেশাদার রঙ্গমঞ্চের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়বে এই আশা করাই স্বাভাবিক। কিন্তু সে আশা সফল হয়নি। পেশাদার রঙ্গমঞ্চের ঔজ্জ্বল্য ও সংখ্যা দুই-ই কমে আসছে। কিন্তু আশার কথা এই যে অপেশাদার গোষ্ঠী সকল দেশেই নাটককে প্রাণবন্ত করে রাখতে যথেষ্ট সহায়তা করছে। অপেশাদার নাট্যামোদী গোষ্ঠীর সংখ্যা সর্বত্রই বেড়ে চলছে। কলকাতা শহরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নাটকাভিনয়ের উৎসাহ দেখেই একথার সত্যতা প্রমাণিত হয়।

নাটকের বিক্রি আগের তুলনায় অনেক বেড়ে গেছে। কিন্তু পাঠকদের মধ্যে এখনো উনবিংশ শতকের প্রথম পঁচিশ বছরে রচিত নাটকই অধিক সমাদৃত। তার কারণ বোধহয় এই যে এই সময়কার উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি অধিকতর সাহিত্যগুণ-সম্পন্ন। রঙ্গমঞ্চের কলাকৌশল তখন বর্তমানের মতো উন্নত হয়নি বলে নাট্যকার চিরকালীন সাহিত্যগুণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন। এখন যদিও পড়ে উপভোগ যাতে করা যায় সে জন্য নাটকে যথেষ্ট টীকা দেওয়া হয়, তথাপি নাট্যকার জানেন তাঁর ঘটনা উদ্ঘোচনে আধুনিক মঞ্চকলা সহায়ক হবে। তিনি জানেন, সাহিত্যগুণ সমৃদ্ধ নাটকও ব্যর্থ হয়ে যায় যদি প্রযোজনা ভালো না হয়। আবার সাহিত্যের বিচারে যে নাটক খুব উঁচু দরের নয় তা-ও প্রযোগ-নৈপুণ্যের ফলে সার্থক হয়ে ওঠে। সুতরাং নাটকের মৌলিক সাহিত্যিক উপাদানের প্রতি যত্নের শৈথিল্য বিচিত্র নয়।

নোবেল পুরস্কার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। নোবেল কমিটি ১৯৩৬ সালের পরে কোনো নাট্যকারকেই পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত করেননি। সুতরাং তাঁদের বিচারেও নাটকের স্থান—নিছক সাহিত্যের বিচারে—উন্নত হয়নি। অবশ্য এলিয়ট, সাগেরকভিস্ট ও কামু নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন এবং তাঁরা ভালো নাটকও লিখেছেন। কিন্তু তাঁদের প্রতিষ্ঠা নাট্যকার হিসাবে তত নয়, যতটা অন্য কারণে। এ পর্যন্ত আটজন নাট্যকার নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। গলসওয়ার্দি ইয়েট্‌স্ প্রভৃতি লেখকদের আমরা এই হিসাবের বাইরে রেখেছি। কারণ, তাঁরা নাটক লিখলেও সাহিত্যের অন্য বিভাগে তাঁদের প্রতিভার উজ্জ্বলতর বিকাশ ঘটেছে।

প্রথম নাট্যকার যিনি নোবেল পুরস্কার পান তিনি নরওয়ের বিয়র্নসন (Bjornstjerne Bjornson, 1832-1910). ইবসেনকে পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত না করে এঁকে কেন করা হয়েছে তা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছিল। ইবসেন ও বিয়র্নসন এক সঙ্গে জীবন আরম্ভ করলেও পরে তাঁরা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। একটি আত্মজীবনী মূলক উপন্যাস নিয়ে বিয়র্নসন সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। কিন্তু পরে অনেকগুলি নাটক রচনা করে স্বদেশে নাট্যকার হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক Beyond Human Power (১৮৮৩)। তাঁর নাটকগুলি কাব্যগুণ সম্পন্ন। নোবেল কমিটি ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেবার সময় এই কাব্যগুণের উপরেই জোর দিয়েছেন। তাঁকে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে "as a tribute to his noble, magnificent and versatile work as poet, which

has always been distinguished both for the freshness of its inspiration and its rare purity of spirit."

পরবৎসর, ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে, স্প্যানিশ নাট্যকার Jose Echegaray (১৮৩২-১৯১৬) নোবেল পুরস্কার পান ফরাসী কবি মিস্ত্রালের সঙ্গে। তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক The Great Galeoto (১৮৮১)। পঞ্চে রচিত তিন অঙ্কের এই মেলোড্রামাটির অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তার জন্যই তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। এচেগারের নাটকের বিষয়বস্তু রোমান্টিক; প্লট সুপরিকল্পিত। তাঁকে নোবেল পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে "in recognition of the numerous and brilliant compositions which, in an individual and original manner, have received the great traditions of the Spanish drama."

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে সাহিত্যের নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে মরিস মেতারলিঙ্ককে (১৮৬২-১৯৪৯)। নোবেল কমিটি তাঁকে নির্বাচন করেছেন "in appreciation of his many-sided literary activities, and especially of his dramatic works, which are distinguished by a wealth of imagination and by a poetic fancy, which revels, sometimes in the guise of a fairy tale, a deep inspiration, while in a mysterious way they appeal to the readers' own feelings and stimulate their imaginations." মেতারলিঙ্কের প্রথম নাটক Princess Maleine (1889)। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য নাটক হল Pelleas and Melisande (1892), Monna Vanna (1902); The Blue Bird (1909), এবং Mary Magdalene (1913).

মেতারলিঙ্কের নাটকগুলিকে সাধারণতঃ রূপক নাটক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু তাঁর সব নাটকই রূপকধর্মী নয়। তিনি রূপক নাটক এবং ঘটনামূলক নাটক—এই দুই জাতের নাটকই লিখেছেন। তাঁর বিশ্ববিখ্যাত নাটক 'দি ব্লু বার্ড (১৯০৯)' রূপক নাটক। টিল্‌টিল ও মিলটিলের সুখের পাখীর সন্ধানের কাহিনী এই নাটকের বিষয়। 'মোন্না ভান্না (১৯০২)' নাটকীয় গুণে সমৃদ্ধ এবং মিশ্রক নাটক হিসাবে এটি মেতারলিঙ্কের শ্রেষ্ঠ রচনা। পঞ্চদশ শতাব্দীর একটি অপূর্ব প্রেমের কাহিনী এই নাটকের বিষয়বস্তু।

এর পরবর্তী বৎসর, অর্থাৎ ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে, নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় নাট্যকার হাউপ্টম্যানকে (Gerhart Johann Hauptmann, 1862-1946) "primarily in recognition of his fruitful, varied and outstanding production in the realm of dramatic art."

হাউপ্টম্যানকে বলা হয় Patriarch of Modern German Literature." হাউপ্টম্যান নানা ধরণের নাট্য-রীতি নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। তিনি সামাজিক ঐতিহাসিক, রূপক ও কাব্যনাটক রচনা করেছেন। তাঁর নাটকের বিষয় বস্তুতেও বৈচিত্র্য আছে। তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক 'The Weavers' বিষয়বস্তু ও রচনা রীতিতে বিপ্লবাত্মক। শিল্প-বিপ্লবের বিরুদ্ধে সাইলেশিয়ান তাঁতিরা ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে যে বিদ্রোহ করেছিল, এই নাটক রচিত হয়েছে সেই কাহিনী অবলম্বন করে। এই বিপ্লবী নাট্যকারই লিখেছেন Hannele, যার নায়িকা এক ভিক্ষুক বালিকা স্বর্গের স্বপ্ন দেখে। আবার কাব্য নাটক The Sunken Bell-এ মেধি আদর্শকে জীবনে পাবার ব্যাকুলতা।

হাউপ্টম্যান ন্যাচারালিস্ট বা অভিবাস্তববাদী নাট্যকার হিসাবে লেখক জীবন শুরু করেছিলেন। Before Dawn (1889) নাটকে এই ন্যাচারালিস্ট রীতির প্রয়োগ দেখা যায়।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে আর এক জন স্প্যানিশ নাট্যকার Jacinto Benavente নোবেল পুরস্কার পান "for the happy manner in which he has continued the

illustrious traditions of the Spanish drama." বেনাভেন্তের জন্ম ১৮৬৬ সালে; মৃত্যু ১৯৫৪ সালে। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর প্রথম নাটক মঞ্চস্থ হয়; তার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি নানা ধরণের প্রায় ২০০ নাটক রচনা করেছেন। পঁচাশি বছর বয়সে তাঁর নাটক 'অ্যাব্ ভিকেশান' এমন অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করল যে দর্শকরা তাঁকে কাঁধে করে কয়েক মাইল দূরে তাঁর বাড়ীতে পৌঁছে দিয়েছিল। বেনাভেন্তের অনেক নাটকের কাহিনী একটু উদ্ভট এবং রোমান্টিক। বিদ্রূপের সুর তাঁর নাটকের একটি বিশেষ লক্ষণ। সার্ভেন্টিস, শেক্সপীয়র ও মোলিয়ের দ্বারা তাঁর রচনা প্রভাবান্বিত হয়েছে। নাট্যকারের দায়িত্ব সম্বন্ধে বেনাভেন্তে গৌরব বোধ করতেন। নিজের সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, "I do not make my plays for the public; I make the public for my plays." তাঁর রচনারীতি ও দৃষ্টিভঙ্গী অনেক সময় বার্ণার্ড শ'র কথা মনে করিয়ে দেয়।

বেনাভেন্তের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাটক হল: The Bonds of Interest; The Passion Flower; Saturday Night; His Widow's Husband; The Governor's Wife; Brute Force; The Truth, প্রভৃতি।

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের নোবেল পুরস্কার জর্জ বার্ণার্ড শ'কে (১৮৫৬-১৯৫০) দেওয়া হয় ১৯২৬ সালে। কমিটি তাঁকে নির্বাচন করেছিলেন "for his work which is marked by both idealism and humanity, and whose sharp satire is often infused with a singular poetic beauty." বর্তমান শতকের সর্বাপেক্ষা খ্যাতনামা নাট্যকার বার্ণার্ড শ। নাট্যরীতিতে ইবসেন ছিলেন শ'র আদর্শ। তাঁর ভাবনাকে সবচেয়ে বেশী প্রভাবান্বিত করেছে নীটশের চিন্তাধারা। কার্ল মার্কস্-এর সমাজ-দর্শনের প্রভাবে তিনি ফেবিয়ান সোসায়ালিজমের সমর্থক হয়ে ওঠেন। সমাজ, শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম—যেখানেই ভণ্ডামি দেখেছেন, শ' তাঁর নাটকে তার বিরুদ্ধে তীব্র কশাঘাত করেছেন। এই আঘাত করেছেন তীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল সংলাপের সহায়তায়। শ'র নাটকের শ্রেষ্ঠ অংশ হচ্ছে সংলাপ। সংলাপের সম্পদ অন্য দিকের দৈন্য ঢেকে রেখেছে।

শ'র নাটক প্রথম পাঠকদের নিকট জনপ্রিয় হয়েছে, তার-পরে সাফল্য লাভ করেছে রঙ্গমঞ্চে। অন্য কোনো নাট্যকারের সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে না। শ'র 'discussion play' গুলিই খ্যাতি লাভ করেছে। অনেকের মতে তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক 'ম্যান অ্যাণ্ড সুপারম্যান।' শ'র নাটকগুলি আমাদের নিকট এত সুপরিচিত যে তাদের নাম উল্লেখ করবার প্রয়োজন নেই।

১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে সাহিত্যের নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় ইতালীয় নাট্যকার লুইজি পিরান্দেল্লোকে (১৮৬৭-১৯৩৬) "for his bold and ingenious revival of dramatic and scenic art." পিরান্দেল্লো তাঁর লেখক জীবন আরম্ভ করেন গল্পকার হিসাবে। তিনি প্রায় পৌনে চারশ' গল্প লিখেছেন। এ ছাড়া উপন্যাস ও কবিতাও লিখেছেন কম নয়। ছেচল্লিশ বছর বয়সে তাঁর প্রথম নাটক মঞ্চস্থ হয়। এর পর থেকে তিনি পঞ্চাশটিরও বেশী নাটক রচনা করেছেন। ১৯২১ সালে Six Characters in Search of an Author মঞ্চস্থ হবার পর পিরান্দেল্লো রাতারাতি নাট্যকার হিসাবে যশস্বী হয়ে পড়েন। কিছুকাল পরে পিরান্দেল্লো নিজস্ব রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করেন এবং নিজের দল নিয়ে য়ুরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে অভিনয় দেখিয়ে ঘুরে বেড়ান! শ' যেমন সমকালীন সামাজিক সমস্যা নাটকের বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করেছেন, পিরান্দেল্লো তেমনি সমকালীন দার্শনিক চিন্তাধারা নাটকের মধ্য দিয়ে রূপায়িত করতে চেষ্টা করেছেন। পড়তে যদিও কোথাও দুর্বোধ্য মনে হয়, তথাপি অভিনয় দেখলে সেই দুর্বোধ্যতা আর

থাকে না। তাঁর অন্যান্য নাটকের মধ্যে Henry IV.; Right You Are If you think You Are! As You Desire me! Tonight We Improvise, ইত্যাদি।

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের নোবেল পুরস্কার পান আমেরিকান নাট্যকার ইউজীন ওনীল (১৮৮৮-১৯৫৩) for the power, honesty and deep-felt emotions of his dramatic works, which embody an original concept of tragedy."

ওনীল আমেরিকার শ্রেষ্ঠ নাট্যকার। ভ্রাম্যমাণ থিয়েটার দলের সঙ্গে তিনি জীবন আরম্ভ করেন। তাঁর বাবাও ছিলেন আমেরিকার খ্যাতনামা অভিনেতা। নাটক প্রযোজনার কলা-কৌশল নিয়ে তিনি নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। গ্রীক নাটকের এবং স্ট্রীণ্ডবার্গ ও ফ্রাইডিশ নাট্যকারদের প্রভাব তাঁর রচনায় দেখা যায়। নাটকের বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যের দিকেও ওনীল দৃষ্টি করতে পারেন। ১৯২০ সাল পর্যন্ত তিনি রোমান্টিক বাস্তবতাকেই নাটকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এই সব নাটকের অধিকাংশই রচিত হয়েছে সমুদ্রের জীবনকে কেন্দ্র করে। সমকালীন নর-নারীর মনোবিশ্লেষণ এবং ধর্মমূলক মিষ্টিসিজম তাঁর অনেক নাটকের বিষয়বস্তু। বছরের শ্রেষ্ঠ নাটক রচনার জন্য ওনীল তিনবার পুলিৎজার পুরস্কার পেয়েছেন। The Moon of the Caribbees, Anna Christie, Beyond the Horizon, The Emperor Jones, The Hairy Ape, Lazarus Laughed, Strange Interlude, Mourning Becomes Electra, The Iceman cometh প্রভৃতি ওনীলের উল্লেখযোগ্য নাটক।

সিয়ান ও'কেসি প্রভৃতি কয়েকজন জীবিত নাট্যকারদের মধ্য থেকে কোনো এক জনকে নোবেল পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত করা হবে বলে আমরা আশা করি।

UNITED EQUIPMENTS & STORES
PRIVATE LTD.
53, RADHA BAZAR LANE, CALCUTTA-1.
Phone : 22-1290 *Gram* : "MOTOPUMP" Calcutta.

Sole Agents For
U. S. S. R. ARC WELDERS 300 TO 700 AMPS.
MOTOR GENERATOR TRANSFORMER
and PETROL ENGINE DRIVEN TYPES,

Also Stockists of
MODERN MACHINE TOOLS, WOOD-WORKING & SHEET METAL MACHINERY.

এই মুহূর্তে

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্য সম্ভবত অত্যন্ত বিমিশ্র একটি পদার্থ. কোন অলৌকিক অপরাহ্নে আমরা তার অন্তরস্থায়ী ছায়াচ্ছন্ন নীরবতার সামনে যদি কখনও পৌঁছে যাই সেই মুহূর্তের জন্য নিজেদের নিশ্চয়ই খুবই বিচ্যুত বিবিক্ত বিশুদ্ধ ইত্যাদি লাগে, মনে হয় শুধু নিজেরই পাশে দাঁড়িয়ে আছি একমাত্র নিজের অন্তরতম নিজের শিরদাঁড়িতে—যেখানে দেশ কাল সমাজ সংসার সময়ই অস্পষ্ট ; কিন্তু সাহিত্য বিশ্লেষজ্ঞদের তর্জনীনির্দেশে এক এক করে বহুবিচিত্র উপকরণ যখন তার গর্ভ থেকে উৎসারিত হয়ে আসতে থাকে, বোঝা যায় বিশুদ্ধ শব্দটি আসলে পারিভাষিক অপলাপ : সাহিত্য আসলে অত্যন্ত বিমিশ্র একটি পদার্থ। একে তো তাকে সর্বভোক্তাপী করবার জন্য মানব অভিজ্ঞতার সমস্ত রাজ্যই চোকানো হয়েছে তার মধ্যে। তা ছাড়া তার মধ্যে তার রচয়িতার ব্যক্তিগত বাসনা দ্বন্দ্ব ও নিমিত্তি দেশ কাল পরিবেশের আনুষঙ্গিকতার কাছে বড় অসহায় সৌখ ও সমর্পিত। আমরা বলি মাইকেল মধুসূদন দত্ত ছিলেন যুগন্ধর, উনিশ শতকীয় বাঙলাদেশের যথার্থ যুগপ্রতিনিধি কবি। সেক্সপীয়র যদি ১৪৯০ থেকে ১৬১০ এর মাঝামাঝি কোন সময় না জন্মাতেন ? ইতিহাসের আর কোন অধ্যায়েই সেক্সপীয়র সম্ভব হতেন নাকি ? মাইকেলাঞ্জেলোর শিল্পকলায় একজন ফ্লোরেন্সবাসী ও রেনেসাঁস ইতালীয়ান যদি হাত না রাখতেন তবে মাইকেলাঞ্জেলো ? আমরা বলি এলিয়টের ওয়েস্টল্যাণ্ড আসলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরেকার বিভ্রান্ত যুগাত্মার পদচারণা। আমাদের সাহিত্য সমালোচনার গ্রন্থসমূহে আনুপূর্বিক প্রমাণপঞ্জী সমেত এইসব বিশ্লেষণী লিপিবদ্ধ থাকে।

আকস্মিকতা কিংবা অলৌকিক অনুপ্রেরণাবশে কাব্যরচনার পুরাণ-কাহিনীতে এখন প্রায় সবাই সংশয় প্রকাশ করে থাকেন। কোন ব্যক্তি অকস্মাৎ ভূতগ্রস্ত হয়ে কিছু লিখে ফেললেন, অলৌকিকের হাতে সাময়িক সমর্পিত মিডিয়ম হিসেবে ব্যবহৃত হলেন এবং কিছু কাব্য উৎপাদিত হল যার শ্রেষ্ঠ চরণগুলি বৈধাৎ অনুলিখিত এবং অকৃতার্থ অংশের দায় তাঁরই নিজের ক্ষুদ্র মানববুদ্ধির, এই কথায় এখন আর কারোরই সায় নেই। একসময় রোমান্টিক সমালোচকদের ধারণা ছিল শিল্পকার একধরণের সমনামবুলিস্ট, যতক্ষণ না জেগে ওঠেন তাঁকে যতক্ষণ না জাগিয়ে তোলা যায় ততক্ষণই সব স্বর্গীয় সামর্থ্য তাঁকে আশ্রয় করে থাকে, জেগে উঠলেই তার লেশমাত্র আর অবশিষ্ট থাকে না। এখন সেই ধারণার প্রতিপত্তি নেই। এখনকার সাহিত্য অত্যন্ত স্থিতধীবিরচিত এবং নিপুণ পরিকল্পনার স্বাক্ষরিত। বিষয় আঙ্গিক ভাষা ও আরও বহু ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র উপকরণের মধ্য থেকে একেবারে ব্যক্তিগত অভিপ্রায়মত সযত্ন নির্বাচনে ও সযত্ন কারিগরীতে তার অবয়ব রচিত হয়। সেই সব রচনাদির পদার্থোচনাকালেও সাহিত্য-বিশ্লেষজ্ঞেরা অধিকাংশ সময়েই আবার সেই বিশেষ রচয়িতাটিরই বয়ঃসমীক্ষণের সহায়তা নিয়ে থাকেন। তাঁর শিল্পের সঙ্গে তাঁর জীবনকে সম্পর্কিত করে সেই রচনার সারার্থ নির্ণয় করা সহজ হয়ে ওঠে। কখনও কখনও রচনাকারীও তাঁর নিজের রচনার পথপ্রদর্শক সাজেন।

কিন্তু এই বিশেষত্বগুলিও কি যুগলক্ষণ নয় ? এই সব রচনাকারীরাও কি যুগলক্ষণে সংক্রামিত নয় ? এমন কি

স্বররিয়ালিস্টদের সম্বন্ধেও আমরা বলি তাঁরা আধুনিক যুগবাণীর প্রবক্তা।

অনেক দিন আগে, ১৮৭৩ সালে জাতীয় সভার বক্তৃতায় রাজনারায়ণ বসু সমাজচিত্রবর্ণনসূত্রে নানাভাষণায় এইরকম বলেছিলেন: এখনকার লোকদিগের স্বার্থপরতা বড় প্রবল। ……বর্তমান সভ্যতার অপর নাম স্বার্থপরতা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইত্যাদি। এখনকার এই স্বার্থপরতা শব্দটির অর্থসঙ্কোচ কাটিয়ে নিলেই আমাদের ব্যবহার্য হয়ে ওঠে। বস্তুত, আত্মসচেতনা নামে একটি শব্দ আমরা আধুনিক কালের জন্মমুহূর্তেই উপার্জন করেছি, আধুনিক শিল্প ও সাহিত্য ওই শব্দটিরই প্রতিষ্ঠা ও বিস্তারের উপাখ্যান। কিন্তু সেও অনেক পুরোনো কাহুন্দী। এখন সবাই আমরা দেখছি আত্মপরতার কি চূড়ান্ত উৎপ্রাসে আমাদের শিল্পকলা দাঁড়িয়ে আছে ও কাঁপছে। ভাবাদর্শ ও রূপাদর্শের প্রসঙ্গকে আমরা হালকা হাসিতে উড়িয়ে দিয়েছি, আমাদের সাহিত্যকারুদের সবারই দৃষ্টিও বড় ব্যক্তিগত। প্রথাকথিত সেই আদর্শের অনুস্থানে গতযুগের শিল্পলোক নিপুণ তন্ময়ত ও অকম্প্র, এবং সেই কারণেই বড় অলীক; আমরা নিজের নিজের আলাদা আলাদা চুমিথও সবলমন্ত্র ভীষণ তৎপর ও অস্থির হয়ে খুঁজে ফিরছি।

একজন ব্যক্তিবিশেষের আত্মপ্রকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠায় সূচিত হয় যে স্বার্থপরতা, একেবারে ব্যক্তিগত ও আত্মপরায়ণ একজন শিল্পীর স্বগতবাচনে, অথবা সত্যনির্মাণে, সেই শিল্পীই আবার তাহলে কেমন করে যুগবাণীর অনুলেখক। যাঁরা যুগরেখাকে পরম নির্ভরতায় অনুক্রমণ করেই নিশ্চিন্ত তাঁরা আবার তাহলে কেমন করে প্রত্যেকেই আলাদা ব্যক্তিগত ও মৌলিক। নন্দনতাত্ত্বিক এই রহস্যের সামনে একমিনিট নম্রশিরে দাঁড়িয়েই অবিলম্বে তাকে বিদায় জানানো যাক। তার পরিবর্তে আমার সাহিত্যরসিক বন্ধুদের দু একটি মন্তব্য সাধুভাষায় সাজিয়ে দিই:

১। উনি কেন লিখছেন, সবই তো অত্যন্ত পুরোনো কথা।

১। উনি কেন লিখবেন, ওঁর নতুন কথা কি বলবার আছে

৩। লিখছেন সব সামান্য কথা, ওঁর কোন যন্ত্রণা নেই এবং সততা নেই

৪। ইনিয়ে বিনিয়ে ভগবান ইত্যাদির কথা লিখছেন, কি ভণ্ড

৫। রক্তমাংসের গন্ধ নেই লেখায়, কি কপট

৬। এই দশকের যন্ত্রণা আছে ওঁদের লেখায়

৭। অমুক কবির জগৎটি একেবারে আলাদা, বারংবার আবিষ্কারের যোগ্য

৮। মৌলিকতা আছে ওঁর

৯। ইত্যাদি

এ ছাড়া কতকগুলি টুকরো কথা যা প্রায় ফিরে ফিরেই কাণে আসে:

স্যুরিয়ালিজম, বহির্যাগত, স্বররিয়ালিজম, এক্সিসটেনশিয়ালিজম, স্ট্রীম অব কনশাসনেস, নতুন রীতি, নবনাট্য-আন্দোলন কয়েকজন প্রবক্তার ফিরে ফিরেই উচ্চারিত হন:

সার্ত্রে, কামু, কক্তো, কাফকা, হেনরী মিলার, পেস্থুনিন সিরিজের দুখানি নতুন কবিতা সংগ্রহ বেশ জনপ্রিয় হয়েছে। অ্যালেন গিন্সবর্গ বেশ প্রতিপত্তি করেছেন কলকাতার তরুণ কবিসমাজে।

এবং এইজাতীয় আরও অনেক সংবাদ ও তথ্য ফিরে ফিরেই কানে আসে। এই সমস্ত কিছুর থেকে একটি সারাৎসার যদি সূত্রনিবদ্ধ করা যায়। তার প্রধান কথাটি নিশ্চয়ই এই হবে সাহিত্যকার এই মুহূর্তে একেবারে অর্থহীন ও শূন্য প্রতিপন্ন হবেন যদি তিনি ভীষণভাবে যুগোপযোগী না হন, আরও সঠিক কথায়, তিনি যদি আপাদমস্তক আধুনিক না হয়ে ওঠেন। কিন্তু সবকালের সাহিত্যকারেরাই তো

যুগোপযোগী ও অত্যাধুনিক। এই প্রশ্নের সামনে কথাটি যদি নির্বোধের মত শোনায় তবে বাক্যটিকে আমি এইভাবে সাজাতে চাই: অতীতের যুগের লেখকেরা শিল্পীর সাধনীয় অধিকার অর্জন করবার জন্যে বাণীবেদিকার তলায় নিষ্ঠাভরে দাঁড়িয়ে থাকতেন, অজ্ঞাতসারে পরোক্ষভাবে আধুনিকতায় আপন্ন হতেন। এখন আমাদের নবীন সাহিত্যকারদের প্রাথমিক সাধনীয় আধুনিকতা, অর্থাৎ শব্দটির আড়ালে একটি বিশেষ ধরণের মানসিকতা; নিরুদ্দিষ্ট 'যৌগিকতা' নামক শব্দের আড়ালে গৌণ অস্পষ্ট ও সংশয়িত হয়ে একটু দূরবর্তী।

কথাটিকে বরং আরও স্পষ্টভাবে বলা যাক: সাহিত্যকার এখন যুগরেখাকে পরম নির্ভরতায় অনুক্রমণ করে নিশ্চিন্ত। সাহিত্যকার এখন যুগচরিত্রের সযৌক্তিক উদাহরণ হিসেবে নিজেকে প্রমাণিত দেখে আশ্বস্ত।

বাঙলা ভাষায় এখন অজস্র নানা আকারের লিটল্ ম্যাগাজিন, প্রায়-ইস্তাহার এবং ইস্তাহার প্রকাশিত হচ্ছে, প্রতিদিন আরও নতুন ও অনেক, তার-প্রত্যেকটির বক্তব্য: দেখ এই মুহূর্তের যন্ত্রণা, দেখ যুগচিত্রাবলী, দেখ যুগানুগ রচনাসম্ভার, যদি ভাবতেই হয় এ-ই এই মুহূর্তের ভাবনার পথরেখা, যদি লিখতে হয় এ-ই এই মুহূর্তের যুগোপযোগিতা, কবিষশঃপ্রার্থীর এ-ই একমাত্র আত্মযোচনের অবকাশ। আরও অন্যান্য সম্পন্ন ভাষার মত বাঙলা ভাষা এখন অজস্র নানা-বিষয়ের সাহিত্যপ্রণেতার জননী, প্রতিদিন আরও অনেক ও নতুন, তাঁরা প্রত্যেকেই তাঁদের রচনায় একাধারে ঈর্ষণীয় যৌগিকতা ও আপাতমধুর যুগোপযোগিতা বিধানে নিয়ত ও নিয়ন্ত্রিতভাবে তৎপর।

২

কিন্তু আধুনিক এই মানসিকতাটি কি রকম? উত্তর: অসাড়তা বড় তীব্র অসাড়তা।

গত শতাব্দীর যুগনায়কেরা এবং রবীন্দ্রনাথ আমাদের এই ছোট প্রাচীন দেশটিকে জগৎসভায় নিয়ে হাজির করেছিলেন, অত্যন্ত কৃত প্রায় চোখের পলকে আমরা আমাদের সমস্ত উচ্চাশা সমেত নিরস্ত্রশ এই দ্বীপান্বিত পৃথিবীটিতে এসে উপনীত হয়েছি, আমাদের লাজুক স্বামল অকৃতার্থ ভূখণ্ড-টুকু ক্রমশ দৃষ্টির অগোচরে হারিয়ে গেছে। দেশোন্নয়নের বৃহৎ কর্মকাণ্ডে উৎসর্গিত হয়ে আমাদের জনবল অচিরে যথোপযুক্ত হিসেবে উত্তীর্ণ হয়ে উঠবে, আমরাও অচিরে আত্মো-ন্নয়নের পরাকাষ্ঠা দেখাবো, সন্দেহ নেই। এর আগে আমরা ছিলাম অসহায়, চক্ষুহীন ঘূর্ণের করুণাপ্রার্থী। এখন বিজ্ঞান রাজনীতি এবং অর্থনীতি সবসময় আমাদের কল্যাণসাধনে সচেষ্ট হয়ে পড়েছে। রাষ্ট্রপিতারা আমাদের তুষ্ট এবং তৃপ্ত চন্দনসংগ্রহে রূপান্তরিত করে তোলবার জন্য সবসময় উৎসুক হয়ে আছেন। তার জন্য, আর্নল্ড টয়নবি লিখেছেন, আমাদের সংগঠয়িতারা আমাদের সমাজকে মৌমাছিসমাজ অথবা পিঁপড়ে সমাজে দ্রুত পরিণত করে নিতে চাইছেন। সেই ভয়াবহ কল্যাণকামিতার হাত থেকে এতটুকু ব্যক্তিগত নির্জনতা কে দেখাবে। এই বিপুল দায়িত্ব একমাত্র আছে শিল্পীর হাতে। আর অপরাজেয় মানবতার অনির্বাণ অগ্নিবহনে এখনকার শিল্পী সবকিছুকে সব প্রথা ও ভদ্রতাকে আঘাত করে ভাঙতে চাইছেন, শেষ পর্যন্ত নিজেকে ভেঙে চুরমার করে ফেলছেন, অথবা অদ্ভুত কণ্ডিশন্ড্ ও রিফ্লেক্স হয়ে সিনিকএর চাইতেও বেশি অসাড় হয়ে পড়ছেন। তাঁদের কণ্ঠস্বর আর্তনাদের মত আমাদের কাণে আসছে। এখনকার এক মার্কিন কবি-চিন্তা-সমালোচক কেনেথ রেক্সরথএর কাছ থেকে বেশ নিপুণ বাকাবন্ধে আমাদের এই বিচিত্র সভ্যতার বিষয়ে এই কথা শোনা গেল: It is the only culture whose greatest spokesmen, without exception, not only repudiate all its values, but owe their entire character, indeed their very existence,

to this act of repudiation. If there were Blakes in the Pyramid Age and Lawrences in Saite Egypt, we have never heard of them. তাঁরাই এখন আমাদের মর্মে অন্তর্দৃষ্টির জ্বালা প্রতিনিয়ত নিবিড় করে চলেছেন। হয়তো তারও বেশি। ঘৃণা ও অনীহায় তাঁরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন, স্তিমিতনয়নে স্বপ্ন দেখছেন।

মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই সংগ্রামের গৌরবিত উজ্জ্বলতা সংশয়ের অনবচ্ছিন্ন অন্ধকারে ঢেকে গেল। কল্লোলের লেখকদের সঙ্গে তুলনায় এই চিত্র পরিস্ফুট হতে পারে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখেছেন "একদিকে সংগ্রামের মহিমা অন্যদিকে ব্যর্থতার মাধুরী। আদর্শবাদী যুবক প্রতিকূল জীবনের প্রতিঘাতে নিবারিত হচ্ছে—এই যন্ত্রণাটা সেই যুগের যন্ত্রণা। বাইরে যেখানে বা বাধা নেই সেখানে বাধা তার মনে, তার স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবের অ-বনিবনাও। তাই একদিকে যেমন তার বিপ্লবের অস্থিরতা, অন্যদিকে তেমনি বিফলতার অবসাদ।···এই দুই ভাবের অদ্ভুত সংমিশ্রণ ছিল 'কল্লোলে'। কখনো উন্মত্ত, কখনো উন্মনা। কখনো সংগ্রাম, কখনো বা জীবনবিতৃষ্ণা। প্রায় টুর্গেনিভের চরিত্র। ভাবে স্লেলীয়ান, কর্মে হ্যামলেটিশ।

···এ সময়টায় আমরা বুদ্ধুর প্রেমে পড়েছিলাম। বিপ্লবীর জন্যে সে সময় বুদ্ধুটা বড়ই রোমান্টিক ছিল।"

কিন্তু বুদ্ধুর অমন অদ্ভুত মদির আকর্ষণীয় চেহারা কোথায় উবে গেছে, বুদ্ধুর চেহারা এখন গলিত বীভৎস ও বিকৃত হয়ে গেছে। জীবন বিতৃষ্ণা এখন বাসনাহীন অন্ধকারে অনীহার প্রস্তরমূর্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বপ্নরিক্ত দিগন্তে তাকিয়ে স্বপ্নের সঙ্গে অবনিবনার আর উপায় নেই। সবচেয়ে বড় কথা, এই যে লেখকেরা ভাববিলাসের মাধুর্য আস্বাদন করেছেন, তাঁদের আদর্শ ছিল বোহেমিয়ানিজ্‌ম্‌, খুবই চমৎকার বোহেমিয়ানিজ্‌ম্‌। এখন সেই নির্ঝর অভিযাত্রার স্বপ্নও দুরান্তে বিলীন হয়ে গেছে। এত তাৎপর্যহীন জীবনযাত্রার প্রসঙ্গ পৃথিবীর ইতিহাসে এর আগে বোধ হয় আর আসেনি।

মনে হয় সেই সুখ আমাদের কল্লোলের লেখকদের মধ্যেও ছিল যে সুখ অবচেতনার গহনতম গহনে এক কণা অভীপ্সার রূপ ধরে স্থির দাঁড়িয়ে থাকে। যে সুখকণিকা থেকে ক্ষুদ্রতম প্রতিকূলতাতেও অপ্রতিরোধনীয় অঙ্কুর মত ইন্দ্রধনুবর্ণাঙ্কিত শিল্পলোক উৎসারিত হয়ে আসে। সেই সুখকণাটিকে এখনও আমাদের পাশের কেউ কেউ খুঁজে ফিরছেন।

৩

কিন্তু এই সব কথা, এই পুরো পরিচ্ছেদটিই, দার্শনিক পটভূমিকা মাত্র। এই পটভূমিকায় লগ্ন হয়ে আমাদের শিল্পীরা কাজ করছেন। আমাদের সাহিত্যলোক আলঙ্কিত হয়েছে নতুন এক নায়কের সৃষ্টি কিরণে, যার চোখে সমগ্র বসুন্ধরা ও জীবনযাত্রা অর্থহীন, যার কাছে অতীত এবং ভবিষ্যৎ সমান শূন্য, যার একমাত্র মুক্তি তাৎক্ষণিকের চূড়ান্ত সম্ভোগে, যার কাছে সমস্ত সমাজনীতিই দুর্নৈতিকতা,

(আমাদের এখনকার কথাসাহিত্যেও social realism বলে কোন কথা নেই, আছে এই modern realismএর আনুপূর্ব বিবরণী)

যার কাছে সমস্ত ভাবাদর্শই মিথ্যাচার,

(আমাদের এখনকার কাব্যে চারিপাশের ছুতগ্রস্থ জীবনকেই কাব্যলগ্ন করে তোলার প্রয়াস)

ইত্যাদি। এপর্যন্ত সমস্ত জিনিসটিই সৎ, যথাযথ, এবং সহজবোধ্য।

এবং যা কিছু আমাদের চোখে সৎ যথাযথ এবং সহজবোধ্য নয়, যেমন অব্যবহিত পূর্বযুগের অনেক ধ্যানধারণা, তাই আমাদের কাছে বড় বেশি অলীক ও বিভ্রান্তিকর। যেমন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ শোনা যায় কবি হয়ে ওঠার বালসুলভ প্রক্রিয়াদিতে, উন্মাদকনোচিত ছন্দসাধনে ও

পুজোয় চাই নতুন জুতো
Bata

উপকর্ণায় নিজেকে অস্বীকার করেছিলেন, অবশ্যিত করেছিলেন। সেই কপটতার এখন আর কেউ তোয়াক্কা করেন না। আর এখন যদি কেউ অবিচল মর্মরদৃঢ় বাক্যবন্ধ রচনা করেন কেউ যদি বিশ্বাসের কথা লেখেন, কেউ যদি কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়িনীজনের মত সুন্দরের সঙ্গে আচরণ করেন সুন্দরকে স্পর্শ করে থাকেন, সেই প্রক্ষিপ্ত ব্যক্তির মিথ্যাচার নিরাবেগ অবহেলায় অথবা ধিক্কারে অত্যন্ত সোচ্চারভাবে পরিত্যক্ত প্রতিপন্ন হয়। সেই মিথ্যাচারের পাশে এখন নবীন সাহিত্যকারদের স্বগতোক্তি : (my task is) to reveal myself as openly, nakedly and unashamedly as possible. এই সত্যসাধনায় বিশ্বাস করেও তাদের চিত্ত হয়েও তার প্রতিফলনে মাঝে মাঝে কখনও কখনও সঙ্কুচিত লাগে, সেই সঙ্কোচকে মিথ্যাচার বলতে কখনও কখনও সঙ্কোচ হয়। আর সবাই একযোগে, সমস্ত তরুণ সাহিত্যকারবৃন্দ, অজস্র লিট্‌ল্ ম্যাগাজিন এবং তার সমস্ত লেখকবর্গ, এ বিষয়ে প্রতিমুহূর্তে এমন উচ্চস্বর, মাঝে মাঝে মনে হয়

কিন্তু শুধুমাত্র মনে হওয়া পর্যন্ত কেন, তার চেয়ে আরও অনেক দূর নিশ্চয়ই ব্যাপারটি গড়িয়েছে। যেমন নাগরিকদের মধ্যে শোভনতা শালীনতা সুজনতা ইত্যাদির ফ্যাশন, শিল্পরুচির ফ্যাশন, আমাদের তরুণ সাহিত্যিকবর্গ সম্ভবত ভালো করে আত্মপরিচয় ঘটবার আগেই যুগানুগতার এই প্রচলিত ফ্যাশনে অদ্ভুত অনুরাগী হয়ে উঠেছেন। ফ্যাশনের মত ভীতিপ্রদ আমার আর কিছুকেই তেমন করে মনে হয় না।

চৌদ্দ নম্বর ছাবলীবাগান লেনের মেসের ম্যানেজার নিবারণ মাস্টার যে মাসিক পত্রিকাটি নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন তাতে যে পাঁচটি গল্প ছিল তার প্রত্যেকের নায়িকা এক একটি সতী-সাধ্বী বারাঙ্গনা। বোঝাই যায় সে ছিল শরৎচন্দ্রের যুগ। আমাদের এখনকার কথাসাহিত্যে উঁকি দিলেই দেখা যাবে, সারিসারি ফিৎজেরেল্ড রোমীর শোভাযাত্রা, কাব্যজগতে তাকালে দেখা যাবে অজস্র নরক বাসের বিবরণ। নতুন নাটক কিংবা এই শিল্পরূপটির বিষয়েই আত্মসংবরণ করা ভালো। গোড়া থেকে এ পর্যন্ত বাঙলা নাটক নিয়ে মাঝে মাঝেই প্রচুর হৈ চৈ হয়েছে, কিন্তু বাঙলা ভাষায় লেখা নাটক আমার কাছে বিচিত্র রহস্যময় জটিল দুষ্পাঠ্য এবং দুরূহদর্শন ইত্যাদি মনে হয়। সমালোচনা বিষয়ে বাকসংবরণের উপায় নেই, পৃষ্ঠাধিকারবশত সেই এখন রাজচক্রবর্তী, পরন্তু তারই গোত্রপরিচয় দিয়ে এই লেখার শুরু। কিন্তু সমালোচনা বলতে আমরা যা বুঝি তা বিদ্যালয়ে ব্যবহার্য, সেই কারণেই তার পাঠকসংখ্যা অপরিমিত, প্রকাশন সহজ এবং লাভজনক। এই জাতীয় সমালোচনা এখন এক ধরণের শীতল পাণ্ডিত্যে আবেষ্টিত, তৌলন প্রক্রিয়ায় লেখা, বাধ্য না হয়ে আকর্ষণ এবং অনুরাগবশে পড়া অসম্ভব। অন্য জাতীয় সমালোচনা প্রধানত ক্রিয়েটিভ শিল্পীর আত্মপরিচয় অথবা গোষ্ঠী পরিচয় সেই কারণে প্রায়ই তার ব্যক্তিগত মুদ্রাদোষসমূহের অনুলিপি এবং সবরকম ডিসিপ্লিনের সঙ্গে সম্পর্করহিত, নিছক কৌতূহলতাড়নায় পড়ে ওঠা যায়। অন্যান্য ফলিত শিল্পকে গোড়া থেকেই আলোচনা বহির্ভূত রাখবো ভেবেছি, চিত্রশিল্পের ভূখণ্ডে আমি একেবারেই বিদেশী বলে সেক্ষেত্রে কথা বলাও অনধিকার।

পূর্ববর্তী লিখিত ও অলিখিত সব বাক্য এইবার গুছিয়ে আনা যাক। এইভাবে সূত্র আকর্ষণ করা যেতে পারে কথা-সাহিত্যের দরোজায় ফলক লাগানো : আমরা নতুন রীতির সন্ধান। বলাবাহুল্য রীতি মানে শুধু রচনাকৌশল নয়, মনোভাবও বটে।

কবিতার উদ্যানের প্রবেশমুখে এইসব চিরকুট ছড়ানো আছে : আমরা বিদ্রোহ ও নিরীক্ষার অস্থিরতা সমাপন করে আবার স্বচ্ছতায় ফিরে এসেছি। দেখ আমাদের শব্দ ও ভাষারীতিতে পর্যন্ত কতসময় প্রাচীন ব্যবহারের ছাপ, সেই স্বচ্ছতা আমরা প্রধান করতে চাই।

আমরা ঈশ্বর অথবা (ঈশ্বরের প্রসঙ্গ রুচিকর না হলে) শয়তানের পূজারী। আমরা নিসর্গ ও প্রেমের কথা লিখিনা, দুইই এখন পলিতনখদন্ত জরাগ্রস্ত। আমরা রক্তমাংসের প্রবণতা অথবা আমাদের চারিপাশের অটপহরিদ্রা পৃথিবীর জন্ত কাব্যভাষা প্রস্তুত করবো।

নাট্যপ্রেক্ষাগৃহের শীর্ষে এই ব্যানার উড়ছে: নবনাট্য আন্দোলন।

সমালোচনা বিভাগকক্ষ থেকে বক্তৃতা করছে: আমরা উনিশ শতকীয় নবজাগরণের ফলেই অমুক লেখকের এবংবিধ রচনা উপহার পেয়েছি। অমুক কবির রচনা অমুক ইংরাজ কবির তুল্য।

অথবা সমালোচনা সৃষ্টিশীল সাহিত্যকারের কৈফিয়ত-কবচে: এইই এই মুহূর্তের ভাবনার হাওয়া। আমরা আমাদের চারিপাশের নৈরাজ্যকে এছাড়া আর কোন ভাষায় ধরতে পারি!

৪

কিছুদিন আগে আমি সাম্প্রতিক ছোটগল্পের উপরে একটি আলোচনা লিখেছিলাম, সেই লেখায় ভালোমন্দের মূল্যবিচার ছিল না। সেই লেখা শুনেছি অধিকাংশ পাঠকেরই রুচিকর হয়নি। আমার ধারণা ছিল ভালোমন্দ বিচারের অধিকার কিংবা দায় কোন মরলোকনিবাসীর হাতে নেই, আমি ওই সব তাবৎ রচনার মধ্য থেকে এই মুহূর্তের মানসিকতার লক্ষণগুলি দায় উৎকীর্ণ করার পণ্ডশ্রম স্বীকার করেছিলাম। তার মধ্যে মন্তব্যগুলি ছিল সূত্রাবস্থায়, তার মধ্যে আমার ব্যক্তিগত অভিপ্রায় অবশ্যই নিহিত ছিল কিন্তু ঈষৎ তির্যকভাবে। সেই অভিপ্রায় শুনেছি অধিকাংশ পাঠকের কাছেই দুরুচ্চারিত ও অর্থহীন লেগেছে।

হয়তো আমি নিজে এখনও পর্যন্ত ভয়ানক পরিমাণে ক্রিয়াবত। এই মুহূর্তের সমস্ত হাবভাব আমার শোণিত-কণিকাকে মুহ্যমান করে রেখেছে, সেই তীব্র চূড়ান্ত অসাড়তায় আমার সারা শরীর আচ্ছন্ন হয়ে আছে; অথচ ওই অসাড়তাকে আমার বড় ভয়। চারিপাশে তাকালে সবকিছুকে দুঃসহ মনে হয়, দর্পণে প্রতিফলিত হলে আমার নিজেকে অসাধারণ দুঃসহ লাগে, কিন্তু সেই সত্যকে আমি কিছুতে বিশ্বাস করে উঠতে পারিনি। আমার বিশ্বাস আমার ভালোবাসার মত অনেক দূরের সমুদ্রবেষ্টা নামহীন প্রবালদ্বীপে বন্দিনী হয়ে আছে, সেই দ্বীপে কোন জাহাজ আর ঠেকে না আমি নিজে একদিন তরুণী নির্ঝরে বড় উৎসাহ দেখিয়েছিলাম, সেই সব সংগৃহীত কাঠের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এখন দ্বিতথী বন্দীক গৃহনির্মাণ করেছে। যদি কখনও কোনদিন আবার আমার নতুন করে বেঁচে ওঠার বাসনা জাগে কিংবা লেখবার বাসনা জাগে, আমি হয়তো সেই দ্বীপের দিকেই আন্দাজ করে সাঁতার দেব, আপাতত সময়ের হাতে সময়ের খেয়ালী তরঙ্গে তরঙ্গে নিরভিপ্রায় সুখে ভেসে চলেছি।

ইতিমধ্যে শিল্পের অর্থ গেছে পাল্টে, শিল্প বলতে আমাদের সামনে টেকনোলজির সারি সারি সুমহান কীর্তি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে, প্রতিপত্তিশালী সামাজিক ব্যক্তিরা যখন শিল্পরুচি প্রকাশ করতে সুকুমার শিল্পের প্রকোষ্ঠে পা রাখেন তখন সেই সুভাগা শিল্পটির নাম চলচ্চিত্র, যখন পাঠের আনন্দ ঘোষণা করতে চান তখন সেই ২৭খণ্ডলি আগেরটিরই উল্টোপিঠ। আসলে শিল্পী সংসারের সবচাইতে অকৃতার্থ ব্যক্তি। কিন্তু ওই সম্পত্তিপন্ন সামাজিকেরা চিত্রকলারও পৃষ্ঠপোষক, চিত্র গৃহসজ্জার শোভন উপকরণ; সেই সূত্রে একটি গায়ক রেডিওগ্রামও প্রতিষ্ঠিত, আহা সঙ্গীত ইন্দ্রিয়-গ্রামকে বড় উদ্বেলিত করে। আর নিছক শব্দ নিয়ে যাদের কারবার তাঁরা যেন এই সবের পরেই বিপুল অভিমান ও অনীহা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আরও বেশি করে গুটিয়ে আসছেন, না সহি কিছুতেই নয়। তাঁরা তাঁদের যুগের সহায়হীন ব্যক্তি মানবটির ভাগ্য হাতে নিয়ে দ্বন্দ্ব সংশয় আর্তনাদে নিরন্তর বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠছেন, যে রক্ষাকবচ তাঁরা অঙ্গীকার করতে পারতেন সর্বজনের জন্ত সেদিকে কেউ তাকিয়ে নেই বলে আরও বিকল আর্তনাদে শিল্পের নীরবতাকে বিচূর্ণ করে ফেলছেন। কবিতা দিয়ে কখনই ঘর সাজানো যেত না, কিন্তু কবিতা নিয়ে বড় অলৌকিকভাবে মনের সব দুঃখ ভরিয়ে দেওয়া যেত। হয়তো যেত। কিন্তু এখন আর কারোর সেই প্রসঙ্গে প্রয়োজন নেই।

শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠায়—তপোবন বিদ্যালয়ের আদর্শ

আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী

[১৯২১ সালে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠাকালে ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রীর এই প্রবন্ধটি তাঁর পুত্র শ্রীসেনের মোহন সেনের সৌজন্যে প্রাপ্ত। স: স:)

বৈদিক আর্যদের আদর্শ ছিল ইহলোকে গৃহীর জীবন, পরলোকে স্বর্গসুখ। বেদপূর্ব সভ্যতার আদর্শ ছিল সন্ন্যাস ও বৈরাগ্য; তাহার লক্ষ্য ছিল নির্বাণ; আর্যদের যজনীয় ছিলেন দেবতা, আর্যপূর্বদের পূজনীয় ছিলেন মানুষ বা গুরু। আর্যদের শিক্ষার পীঠ ছিল যজ্ঞস্থল, আর্যপূর্বদের শিক্ষার স্থল ছিল তীর্থ বা স্নান-স্থল। বৌদ্ধ জৈনাদি বেদবিরুদ্ধ মতকে "তৈথিক" বলে। বৈদিক আর্যেরা যজ্ঞ স্থলে সমবেত হইয়া নৃত্য, গীত, ইতিহাস আচার অনুষ্ঠান প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিতেন।

যজ্ঞভূমি যাহাদের শিক্ষার ক্ষেত্র সেই আর্য্যেরাও মাঝে মাঝে বড় বড় সম্মেলনে একত্র হইতেন। তাহাই এক একটি বিশেষ মহাযজ্ঞ। মহাযজ্ঞগুলি অনেকটা তখনকার দিনের মহা-সম্মেলন। সেই-সব সময় নির্ণয়ের জন্যই বিশেষ ভাবে আরম্ভ হইল ভারতীয় জ্যোতিষের আলোচনা। তৈথিকরাও বিশেষ বিশেষ তীর্থে বিশেষ বিশেষ সময়ে মহাসম্মেলনে একত্র হইতেন। তার নামই "যোগ"। আজও অর্দ্ধোদয় প্রভৃতি যোগ আছে। কিন্তু আজ তাহারা পুরাতন উদ্দেশ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া শুধু হইয়া উঠিয়াছে স্নানে পুণ্য উপার্জনের অনুকূল অবসর।

এইখানে ঐতরেয় মহীদাসের উপাখ্যানটি স্মরণীয়। মহীদাসের পিতার দুই পত্নী। একজন ব্রাহ্মণী, অন্যজন ইতরা অর্থাৎ শূদ্রা। যজ্ঞ কালে তিনি ব্রাহ্মণী পত্নীর পুত্রকে শিক্ষা দিলেন, মহীদাসকে উপেক্ষা করিলেন। মহীদাস মাতাকে আপন দুঃখ জানাইলে তিনি বলিলেন, "আমরা মহীর সন্তান, মহী ছাড়া আর আমাদের কে আছে?" মাতার স্তবে মহীদেবী আবির্ভূত হইয়া মহীদাসকে আপন ভবনে লইয়া জগতের গভীরতম শিক্ষা দিলেন। তাই তিনি মহীদাস, এবং ইতরার পুত্র বলিয়া তিনি ঐতরেয়। তাঁর রচিত ব্রাহ্মণই হইল ঋগ্বেদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ।

মহীর তুল্য গুরু আর নাই। প্রকৃতির কাছে প্রাপ্ত শিক্ষাই সত্য ও গভীর। প্রকৃতি মাতার কাছে শিক্ষার আশা করিয়াই রবীন্দ্রনাথ করিলেন তাঁর শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা। ভারতের তপোবন এক সময় মানব-গুরুর ধ্যানে, প্রকৃতি-গুরুর রসে হইয়াছিল, পরিপূর্ণ শিক্ষার ক্ষেত্র। আজ আমাদের বালকেরা সেই আনন্দময় জ্ঞানের ক্ষেত্র হইতে পরিভ্রষ্ট। "তপোবন" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অন্তরের এই বেদনাটি সুন্দর করিয়া জানাইয়াছেন।

বৈদিক জ্ঞানের প্রতিষ্ঠাভূমি স্বর্গ ও দেবতা, তৈথিক জ্ঞানের প্রতিষ্ঠাভূমি মহী ও মানুষ। তাই বৌদ্ধাদি তৈথিকেরা তাহাদের সত্যের সাক্ষ্য দিয়াছেন মহীস্পর্শ মুদ্রা দ্বারা। অথর্ববেদের দ্বাদশ-কাণ্ডের প্রথমেই অপূর্ব্ব কাব্য পৃথিবীসূক্ত। এখানে স্বর্গের মত ঋষি করিতেছেন পৃথিবীর স্তব, স্বর্গ ছাড়িয়া পৃথিবীকেই ঋষি করিতেছেন প্রার্থনা। ঋষি বলিতেছেন "এই পৃথিবী বিশ্বম্ভরা বসুধরা সকলের প্রতিষ্ঠাভূমি, হিরণ্য-বক্ষা, সর্ব্বজনের বস্তুর অচল নিবেশ-ভূমি।"

বিশ্বংভরা বসুধানী প্রতিষ্ঠা
হিরণ্যবক্ষা জগতো নিবেশনী।

রবীন্দ্র শতবর্ষপূর্তি গ্রন্থমালা

ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী

রবীন্দ্রস্মৃতি

"কোনো মহাপুরুষকে বাইরের লোকে যেভাবে দেখে বা তাঁর প্রতিভার যে পরিমাণ পরিচয় পায়, ঘরের লোকের দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক সে রকম নয়। তারা বেশি কাছ থেকে দেখে বলে যেমন তার ব্যাপক বা সমগ্র ব্যক্তিত্বের অনুধাবন করতে পারে না, তেমনি অনেক ছোটখাটো ইঙ্গিত জানতে পায়, যা বাইরের লোকের অধিগম্য নয়। আত্মীয়ত্বেরই যে এই সৌভাগ্য ঘটে তা নয়, তবে নানা ঘটনাচক্রে আমরা বহুদিন ধরে তাঁর নিকটসান্নিধ্য এবং ঘনিষ্ঠপরিচয় পাবার সুযোগ পেয়েছিলুম। সেই ছোটখাটো পরিচয়-খণ্ডগুলি একত্র করে এই স্মৃতিপটে সাজিয়ে দেবার চেষ্টা করেছি।" গ্রন্থমুখ : রবীন্দ্রস্মৃতি

সূচী। সংগীতস্মৃতি, নাট্যস্মৃতি, সাহিত্যস্মৃতি, ভ্রমণস্মৃতি, পারিবারিক-স্মৃতি

মূল্য—২·০০ টাকা

●

লেখিকার অন্যান্য গ্রন্থ

নারীর উক্তি

এই গ্রন্থে সাহিত্যে সমাজে বা ব্যক্তিগত ব্যবহারে শালীনতার প্রয়োজন কতটা তার খোলাখুলি আলোচনা আছে। তা ছাড়া, 'বর্তমান স্ত্রীশিক্ষা-বিচার' 'সমহু' 'আদর্শ' 'পাল্টেল-বিল' 'বঙ্গনারী—কঃ পন্থা, কি ছিল, কি হল, কি হতে চলিল' ইত্যাদি প্রবন্ধে লেখিকার সুদীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ সহজ ও সরস অভিমত গ্রন্থটিকে সুখপাঠ্য করেছে। মূল্য ২·৫০ টাকা

বাংলার স্ত্রী-আচার

পশ্চিম উত্তর ও পূর্ব বঙ্গের বিবাহ-পূর্ব বিবাহ-কালীন ও বিবাহ-উত্তর স্ত্রী-আচারসমূহের বিবরণ। গ্রন্থশেষে বিবাহের গান সন্নিবিষ্ট। মূল্য ১·৩০ টাকা

রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণীসংগম

রবীন্দ্রনাথ গানের ক্ষেত্রেও কি রকম পরম পরকে আপন করে নিতে পেরেছেন, চলিত কথায় যাকে গান-ভাঙা বলা হয়— তার পরিধি কত বিস্তৃত এবং তাতেও কি রকম অপরূপ কারিগরি দেখিয়েছেন, দৃষ্টান্ত-সহ তার আলোচনা। প্রত্যেক সংগীত-রসিকদের অবশ্যপাঠ্য বই। মূল্য ১·০০ নয়া পয়সা

বিশ্বভারতী

৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

এই পৃথিবীই আমার মাতা, আমি তাহারই পুত্র।

মাতা ভূমিঃ, পুত্রো অহং পৃথিব্যাঃ।

হে মাতা ভূমি, তোমার ক্রোড়কেই যেন আশ্রয় করিতে পারি। স্বস্তি নিখীলেম ভূমে।

দশম কাণ্ডের দ্বিতীয় সূক্ত ও একাদশ কাণ্ডের অষ্টম সূক্ত হইল ব্রহ্মসূক্ত, তাহাও অপূর্ব। কিন্তু এই নূতন ভাব আর্য্যদের ভারতে আসার পরে সংগৃহীত। হয়তো বৈদিক সংস্কার হইতে অনেকটা মুক্ত বলিয়াই অথর্ববেদ মানুষ ও পৃথিবীকে এমন বড়ো করিয়া দেখিতে পারিয়াছে। তাই অথর্ব ত্রয়ীর মধ্যে স্থান পাইল না বটে, কিন্তু ভারতের ইতিহাস রসিকের কাছে অথর্ব অমূল্য রত্ন। বৈদিকেরা যুদ্ধে জয়ী হইয়াও "সংস্কৃতি পূর্ব-বর্তী" সভ্যতার কাছে হার মানিতে আরম্ভ করিলেন। ধীরে ধীরে তাহার অঙ্গে ভারতের পুরাতন রং ধরিতে আরম্ভ করিল। চীনের, পারস্যের ও গ্রীসের পুরাকালের ইতিহাসে যুগে যুগেই এই লীলাই দেখা গিয়াছে।

বৈদিক গার্হস্থ্য ও বেদপূর্ব সন্ন্যাস এই উভয়ের মধ্যে রফা করিয়া স্থাপিত হইল চতুরাশ্রম। গার্হস্থ্যের জন্য শিক্ষাকাল হইল ব্রহ্মচর্য, সন্ন্যাসের শিক্ষাকাল হইল বানপ্রস্থ। ব্রহ্মচর্যের একটি বিবরণ দেখি আমরা অথর্ববেদের একাদশ কাণ্ডের সপ্তম সূক্তে। এই ব্রহ্মচর্যে নারীদেরও স্থান আছে। রাজার রাষ্ট্রতপস্যাও ব্রহ্মচর্য। ব্রহ্মচারীই পৃথিবীর চালক ও প্রতিষ্ঠা। ব্রহ্মচারীই তপস্যার দ্বারা আচার্যকে করেন পূর্ণ—"আচার্যং তপসা পিপর্তি" সর্ব-লোককে ব্রহ্মচারী তপস্যার দ্বারা পূর্ণ করেন—"লোকাং তপসা পিপর্তি।

বৈদিক, বৈদিক সকল মতেই তখন গুরু ও আচার্যই সর্বস্ব। তখন কোথায় শাস্ত্র, কোথায় পুস্তকাগার? মানুষের মধ্য দিয়া তখন জ্ঞানধারা প্রবাহিত বলিয়া সেই শিক্ষাতে ছিল একটি বিশেষ মানব-রস। গুরুরা যেমন শিষ্যকে পূর্ণ করেন শিষ্যেরাও তেমন গুরুকে করেন পূর্ণ। গুরু শিষ্য তখন এক তপস্যায় পরস্পর পরস্পরকে লইয়া পূর্ণ।

বৈদিক ও বৈদিক উভয় সংস্কৃতি যোগে ভারতের জ্ঞানের ধারা হইল বৈচিত্র্যে ও গভীরতায় অতুলনীয়। গুরুর কাছে বসিয়া নিগূঢ় সব অধ্যাত্ম তত্ত্ব বুঝিতে হয় বলিয়া ইহার নাম উপনিষৎ। উপনিষদের অধ্যাত্ম-ঐশ্বর্যের তুলনা নাই। গুরু-শিষ্যের শ্রদ্ধা ও প্রীতির সম্বন্ধের মধ্য দিয়া তার মধ্যে আসিল এক অপরূপ রস। তবু উপনিষদের এই বিদ্যা যজ্ঞে অচল ইহা গৃহ্য নহে। ইহার আলোচনা হইবে অরণ্যে, ইহা আরণ্যক।

এখন সমস্যা হইল এই বিদ্যাকে স্থানে ও কালে ব্যাপ্ত করা যায় কেমন করিয়া। ব্যবস্থা হইল, কেহ কেহ শিষ্যসহ অজস্র হইয়া নানা স্থানে জ্ঞানকে করিবেন ব্যাপ্ত। আর কেহ কেহ তপোবনে গুরুকুলে কুলপতি হইয়া বসিয়া বসিয়া দিবেন শিক্ষা, ইঁহারা জ্ঞানকে পরম্পরের দ্বারা কালে করিবেন ব্যাপ্ত। বৌদ্ধ এবং জৈনেরা অনেক ক্ষেত্রেই পরিব্রাজক-রূপে শিক্ষা দিতেন। উপনিষদেও চরকদের কথা পাই। জ্ঞান প্রচারের সাধনায় রেলস্টীমারহীন দিনে তাঁহারা অসাধ্য কাল করিয়া গিয়াছেন।

বৌদ্ধদের বিরাট রচনা তাহাদের সাম্রাজ্য। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও বিশাল হইয়া উঠিল। বৌদ্ধদের ধর্ম উদার হওয়ায় নানা দিগ্‌দেশের গুরু ও ছাত্রদের একত্রিত হওয়ার পক্ষে কোনো বাধাই আর রহিল না। তাই পুরুষপুর, তক্ষশিলা, নালন্দা, বিক্রমশিলা, প্রভৃতি মহা প্রতিষ্ঠান সহজেই গড়িয়া উঠিল। কাশী মিথিলা প্রভৃতি পুরাতন শিক্ষা-ক্ষেত্রের কাছে কাছে এই-সব বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সহজেই শক্তিলাভ করিল। পূর্বকালে তপোবন ও গুরুকুলগুলি ছিল জ্ঞানশিক্ষার বৃহৎ পরিবার। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি রূপে গড়িয়া উঠিল জ্ঞানের মহানগরী। নিখিল জ্ঞানের সেখানে লেনদেন চলিতে লাগিল। জগতের নানা সভ্যতার যোগ ও পরিচয় এখানে ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিতে লাগিল। শাস্ত্র, গ্রন্থ,

প্রস্থাগার প্রভৃতি দিকে দিকে গড়িয়া উঠিতে লাগিল ; তবু গুরু অর্থাৎ মানুষের মূল্য কমিল না। কারণ শস্তের আকৃতে পেট ভরে না। মায়ের স্নেহ যখন এই শস্তকে অমৃতরূপে পরিণত করে, তৃপ্তি হয় তখন। জ্ঞানের ক্ষেত্রেও মানুষের স্নেহ-পরশ চাই। গুরুর কৃপাতেই শাস্ত্র ও তত্ত্ব হয় সরস সজীব।

পুরুষপুর, তক্ষশিলা প্রভৃতি স্থানে ভারত ও গ্রীসের জ্ঞানের সংস্পর্শ হইত। কিন্তু এই দুই দেশের জ্ঞানের মধ্যে এক দিক দিয়া একটা মহা প্রভেদ ছিল।

পুরাণের যুগে ও মনু প্রভৃতি স্মৃতির সময়েও গুরুর স্থান ছিল অতি উচ্চ। তখনকার আকাঙ্ক্ষিত গুরুর লক্ষণ দেখিলেই তাহা উপলব্ধি করা যায়। প্রত্যেক স্মৃতিতেই গুরুর সম্বন্ধে অনেক শ্লোক আছে।

তন্ত্রে ও যোগমার্গে গুরুর চালনা ছাড়া অগ্রসর হইবার উপায়ই নাই। তাই গুরুর স্থান সেখানে অতুলনীয়। গুরুর লক্ষণে শারদাতিলক বলেন—

> মাতৃতঃ পিতৃতঃ শুদ্ধঃ শুদ্ধভাবো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
> সর্বাগমানাং তত্ত্বজ্ঞঃ সর্ব্ব-শাস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ।
> পরোপকারনিরতো জপপূজাদিতৎপরঃ।
> অঘোরবচনঃ শান্তো বেদবেদার্থ পারগঃ।

শৈব বৈষ্ণবাদি ভক্তিশাস্ত্রে গুরুর সমান ত্রিভুবনে আর কেহই নাই। পরে উত্তর ভারতের মঠে গুরু ও দক্ষিণ ভারতের মঠে "তাদিরণ" (গুরু) প্রভৃতির স্থান এত উচ্চ হইল যে, আজ তাহা ঠিক ধারণা করা যায় না। স্থাবররূপে তিনি মহাতীর্থ, জঙ্গমরূপে তিনি ত্রিলোকপাবনী গঙ্গার মত। মঠই তখন বিশ্বভারতী। গুরু সেখানে শিষ্যের পালক, পাল্য নহেন।

তারপর মধ্যযুগে আসিল, টোল, চতুষ্পাঠি ও অধ্যাপক। মহাপ্রভু চৈতন্য স্বয়ং এইরূপ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক ছিলেন। কাশী, মিথিলা, বাংলা, মহারাষ্ট্র, তৈলঙ্গ, প্রভৃতি সর্বদেশে এই ব্যবস্থাই চলিতেছিল। আজিকার হীন অবস্থা দেখিয়া চতুষ্পাঠীর বিচার করিলে অন্যায় হইবে। প্রাচীন ন্যায় হইতে নব্য ন্যায়ের উদ্ভবও এই চতুষ্পাঠীতে। এইরূপ চতুষ্পাঠীতে যাহারা অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে স্কুল কলেজ হইতে তাহা কোনো ক্রমেই হীন নহে।

ইতিমধ্যে ভারতে আসিলেন মুসলমানেরা জ্ঞান ও ভাবের রাজ্যে তাঁহারা ভারতীয়, ইহুদী, খ্রীষ্টিয় ও গ্রীক প্রভৃতি সম্পদের উত্তরাধিকারী। গ্রীক ভাষা হইতে আরব ভাষাতে বহু গ্রন্থ অনুবাদিত হয়। তাহার পূর্বেই আরবেরা ভারতের দর্শন, গণিত, জ্যোতিষ, চিকিৎসাশাস্ত্র, সাহিত্য, গল্প প্রভৃতির অনুবাদ করেন। তাহার পরে তাঁহারা আকৃষ্ট হন গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি। পূর্বে যাহাদের অনেকে ওডেসা আন্টিওক প্রভৃতি বড়ো বড়ো খ্রীষ্টিয় মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। কিন্তু পরে তাঁহারাই দক্ষিণ য়ুরোপে বড়ো বড়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপনা করিলেন।

আরবদের মধ্যে বিস্ময়কর বস্তু হইতেছে তাঁহাদের সজীবতা। আসলে ইহা সর্বাঙ্গে মানবজীবনের প্রতি সকল ভাবের সরস কৌতূহল। এই কৌতূহলটি ছিল বলিয়াই তাঁহারা দেশবিদেশে ভ্রমণ করিয়া জগতে যথার্থ ভূগোল-বিজ্ঞানের মূল পত্তন করিলেন। নানা দেশের চমৎকার বিবরণে তাঁহাদের সাহিত্য ঠাসা। ভারত বিজয়ের বহু পূর্বেকার ভারত সম্বন্ধে আরবদের লিখিত বিবরণ এত আছে যে, সে সব একত্র হইলে ভারতের বিস্মৃত ইতিহাসের বহু অন্ধকার বিদূরিত হইবে। আমার পরলোকগত বন্ধু শান্তিনিকেতনের মৌলানা জিয়াউদ্দীন এই বিভাগে কাজ করিতে করিতে যে সব বিস্ময়কর বস্তু আমাদের দেখাইয়াছেন, তাহা অমূল্য। ভারতের সম্বন্ধে প্রাচীন আরব লেখকগণের ধারণা ও বিবরণ অতিশয় উচ্চ ধরণের। এইজন্যই যখন আফগানিস্থানের গজনী-নিবাসী

মহমুদ ভারতের ধনরত্ন লুণ্ঠনে রত, তখন তাঁর সঙ্গেই আগত আরব ভাষায় লেখক আবুরিহান আলবিরুণী এসেছিলেন অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত ভারতবর্ষের জ্ঞান ও অন্যান্য সম্পদের সন্ধানে। আলবিরুণীর জন্ম পারস্য দেশের খারিজমে হইলেও শিক্ষাদীক্ষায় তিনি পরিপূর্ণ আরব। ৯৭৩ খৃষ্টাব্দে তাঁর জন্ম। তিনি ছিলেন জ্যোতিষ, গণিত, ইতিহাস ও আয়ুর্বিদ্যায় পণ্ডিত। দর্শনেও তাঁর ছিল প্রগাঢ় অনুরাগ। গজনীতে তিনি গ্রীক-বিজ্ঞানের অধ্যাপনা করিলেও ভারতের জ্ঞানবিজ্ঞানের সন্ধান করিতেন। ভারতে আসিয়া আলবিরুণী সংস্কৃত ভাষা আরও উত্তমরূপে আয়ত্ত করিয়া লইলেন ও ভারতের নানা জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ পরিচয় লইয়া ভারত সম্বন্ধে তাঁহার প্রখ্যাত গ্রন্থ তারিখ-অল-হিন্দ বা তহকীক-অল-হিন্দ রচনা করেন। তাহাতে তিনি ভারতের ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য ইতিহাস, জ্যোতিষ, রীতিনীতি প্রভৃতি বিষয়ে অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত সুন্দর বিবরণ দিয়াছেন। এই গ্রন্থ আসলে তাঁহার রচনা করিবার ইচ্ছা ছিল তাঁহার পূর্বতন বিখ্যাত গ্রন্থ আসার-অল-বাকিয়ার একটি অঙ্গরূপে, কিন্তু পরে এই অংশ বড়ো হইয়া পড়ায় ইহা স্বতন্ত্র ভাবেই প্রকাশিত হয়।

আলবিরুণী পূর্বে ছিলেন পারিষদের অধিপতির সভাসদ। মহমুদ খারিজম জয় করিয়া সেই মুসলমান রাজ্য বিধ্বস্ত করিয়া দেশে ফিরিবার সময় আলবিরুণীকে লইয়া আসেন। আলবিরুণী তখন তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ আসার-অল-বাকিয়া''র রচনায় ব্যস্ত ছিলেন। তাহা হইল তাৎকালিক সকল জাতির সাহিত্য, জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধর্ম প্রভৃতির বিস্তৃত পরিচয়। গজনীতে বসিয়া আলবিরুণী ভারতের অংশটা বিস্তৃত করার প্রয়োজন মনে করিয়া তাহা বড়ো করিতেছিলেন। তারপর আসিলেন ভারতে।

আরব দেশে ভারতীয় জ্যোতিষ যাইয়া হইল তাঁহাদের "তাজিক" ও রমল" জ্যোতিষে। উদ্ভব। আবদর রহিম খানখানা পর্যন্ত তাহার আলোচনা করিয়াছেন।

Gram : LATIWALA Phone : 47-1360

For Quality Timber

P. D. PATEL & CO.

Timber Merchants & Govt. Forest Contractors

2-M, GARCHA Ist LANE, CALCUTT-19
(Facing Hazra Road)

Branch :-
P. O Balugaon
Dist. Puri, Orissa

Saw Mill :-
50/2, Hazra Road,
Calcutta-19

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

আজকে আমাদের ফুলশয্যার রাত। আর সুবর্ণা এজন্যও আমি মানতে বাধ্য যে তোমাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। তোমার গায়ের রঙ—যেটা নকল নয় বলেই মনে হচ্ছে—সেটাও সত্যি সত্যিই কাঁচা সোনার মতো। আর শুভদৃষ্টির সময়েই আমি লক্ষ্য করেছিলাম, তোমার চোখদুটি বেশ বড়ো বড়ো, মুখের গড়নটিও নিন্দে করবার মতো নয়।

খুব সম্ভব পাশের বাড়ীর বৌদিরা তোমায় আজ সাজিয়ে দিয়েছেন। আশা করেছেন তোমার রূপের ওপর আরো খানিকটা কারুকাজ করে আমাকে একেবারে চিরদিনের মতো ফাঁসে জড়িয়ে ফেলবেন। সারা সন্ধ্যা বসে বসে ওঁদের এত পরিশ্রম করবার কোনো দরকার ছিল না। আমি বেরসিক নই, যে সুন্দর, তাকে দেখবার মতো চোখ আমার আছে।

শুধু খারাপ লাগছে তোমাকে শাড়ীতে আর গয়নায় এমন জবর জং করেছে বলে। বেনারসী শাড়ীর দোকানের একটি পুতুলের মতো বসে আছো তুমি। শাড়ীটা নিশ্চয় আমাদের বাড়ী থেকেই দেওয়া আর গয়নাগুলোও আমাদের আত্মীয় স্বজনেরাই দিয়েছেন খুব সম্ভব। তোমার বাপের বাড়ীতে তো দিন আর চলে না বলেই শুনেছি, কাজেই—

এখনি মুখ কালো হল সুবর্ণা? আমার হাসি পাচ্ছে। যে কথাগুলো আমি তোমায় বলতে যাচ্ছি, সেগুলো শোনবার পর সারাটা জীবন তুমি প্রাণ ভরে কাঁদতে পারবে। দোহাই তোমার, এখুনি অজ্ঞান টজ্ঞান হয়ে পোড়ো না—তা হলে কথাগুলো আমি শেষ করতে পারব না। আমি চাইছি, এ-বাড়ীর দরজা দিয়ে চিরকালের মতো বেরিয়ে যাওয়ার আগে আমার বক্তব্য কাউকে আমি সবটা বলে নিজের দায়িত্ব থেকে ছুটি নেব। হাঁ, আজ রাত্রেই এই বাড়ীকে ছেড়ে, তোমাকে একেবারে পরিত্যাগ করে আমি চলে যাচ্ছি। আমি জানি, অবস্থা চক্রে তুমি নিরুপায়, আর যে-হেতু পরশু সন্ধ্যা থেকে শালগ্রাম সাক্ষী রেখে আসল হিন্দুমতে তুমি আমার বিবাহিতা স্ত্রী, সে জন্যে আমার কথাগুলো শুনতে ন্যায়তঃ ধর্মতঃ তুমি বাধ্য।

কী বলছ? সব শুনবে? নার্ভ ভেঙে পড়বে না? পড়বে না তো? ভেরি ওয়েল। শুনে খুব খুশি হলুম। তুমি গরীবের মেয়ে, অনেক দুঃখে কষ্টে বড়ো হয়েছ—যা সইবার অভ্যাস অবশ্যই তোমার থাকা উচিত। তা হলে আমার বক্তব্য শুরু করতে পারি।

আঃ—এত ফুল কেন? খাটের চারদিকে ফুলের মশারী, বিছানায় ফুলের পাঁপড়ি ছড়ানো—পজিটিভ্‌লি সুইসেল্‌! এই ফুল জিনিসটাকে আমি কোনোদিন সহ্য করতে পারি না। এক দিন বাসি হলেই কী যে বিশ্রী হয়ে যায়! গোলাপ বলো, রজনীগন্ধা বলো, যুঁই চামেলী যা খুশি বলো—সব একরকম। হাতে চটকে নাও খানিকটা ক্লেদের মতো লেপটে থাকে। ঠিক স্ত্রীর মতো। দুদিন পরেই অসহ্য হয়ে ওঠে—তিন দিন যেতে না যেতে গা ঘিন ঘিন করে। 'হাঁ,

বিয়ে না করেও আমি জানি। আমার বৌদিদের তো আমি দেখতে পাচ্ছি।

এই ফুলের গন্ধ আমার অসহ্য লাগছে। তার সঙ্গে বোধ হয় মিশি তিনেক আতর ঢালা হয়েছে বিছানাতে—ফুলের নকল গন্ধ। নকল বলেই আরো সদর্প। ফুলশয্যা বুঝি এমনি করেই সাজানো হয়? তা হবে—মিথ্যের ওপর মিথ্যেকে না চাপালে বিয়ে জিনিসটাকে মনোরম করা যায় না।

আমার মুখের দিকে এমন করে চেয়ে আছো কেন? মোহাই তোমার, মুখখানা মিষ্টি, চোখ দুটো সুন্দর—বুদ্ধিও আছে বলে মনে হয়—এমন বোকাটে ভঙ্গিতে তাকিয়ো না। ফুল আর বোকামো—পৃথিবীতে এই দুটোই সব চাইতে কুৎসিত ব্যাপার। ইংরেজি আর বাংলায় দুটো কি আশ্চর্য ভাবে এক। চোখ নামিয়েছ। থ্যাঙ্ক ইউ। এবার আমি নিজের কথা বলতে পারব।

তুমি তো বোধ হয় ফার্স্ট ইয়ার পর্যন্ত উঠে পড়া ছেড়ে দিয়েছিলে? একটা ইংরিজি কথা শুনেছ: 'আনমিটিগেটেড্ ডাউওেল?' শুনেছ? তা হলে আরো শুনে রাখো, লোকের কাছে ওইটেই আমার বিশেষণ। তাদের হিসেব মতে তারা যে খুব অন্যায় বলে তা-ও নয়।

আমাদের বড়ো ব্যাকলা—বড়ো বাড়ী। কত টাকা আমরা ইনকাম ট্যাক্স দিই তা-ও তুমি ধারণা করতে পারবে না। তবু এত টাকা সত্ত্বেও বাবা কোনোদিন পান তামাক পর্যন্ত ছোঁননি—দাদারা সিগারেট খায়, তার বেশি আর এগোয়নি। বাড়ীতে ঠাকুর দেবতার পাট বিশেষ নেই—এক মা-র লক্ষ্মীর আসনটি ছাড়া—তবু এ বাড়ীতে সবাই ধর্মভীরু। সবাই বলত, মুমুক্ষুদের পুণ্যের সংসার—তাই ভগবান নামে লোকটি এদের দু-হাতে ঢেলে দিয়েছেন।

কিন্তু আমি এবাড়ীতে দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ হয়ে এলুম। না উপমাটা ভুল হল, প্রহ্লাদকুলে দৈত্য। বখে গিয়েছিলুম আমি অল্প বয়েসেই। কেন—কী ভাবে, সে আর তোমার শুনে কাজ নেই। তাছাড়া সে তো মহাভারতের ব্যাপার—তিন রাত ধরে বলে গেলেও শেষ হবে না। এখন রাত বারোটার কাছাকাছি, তিনটের সময় আমাকে পালাতে হবে। কাজেই সব জিনিসটা একটু সংক্ষেপ করে আনতে হচ্ছে।

হাঁ, সতেরো আঠারো বছর বয়েসে—সেই বি-এ পড়বার সময়েই সব রকম রসের স্বাদ আমার চেনা হয়ে গিয়েছিল, জ্ঞানবৃক্ষের কোনো ফলই খাওয়া আমার বাকী ছিল না। মনে আছে, বি-এ পাশ করবার পর সব বাঘা বন্ধুদের ছেকে হোটেলে মদের পার্টি দিয়েছিলুম একটা। ঘণ্টার মধ্যেই সব টেবিলের তলায় লম্বা হল। এক একটাকে চ্যাং দোলা করে যখন ট্যাক্সিতে তোলা হল, তখন আমার মাথা সোজা, পা একটু টলছে না আর বিলের টাকা যখন মিটিয়ে দিচ্ছিলুম, তখন হোটেলের আর্মেনিয়ান মালিক কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকেছিল আমার দিকে। বাঙালী হলে বোধ হয় বলত, "আপনি ক্ষণজন্মা পুরুষ স্যার, দিন-দিন—পায়ের ধুলো দিন।"

আঃ—এই ফুল আর আতরের গন্ধ! আমার দম যেন বন্ধ হয়ে আসছে! আমি বারান্দার দিকের ওই জানলা দুটোও খুলে দিতে চাই। তোমার আপত্তি আছে? নেই? থ্যাঙ্ক্-য়্যাঙ্কস্।

হাঃ হাঃ, বেশ মজা হল। বাইরের দিকে পাল্লা দুটোকে বেই ধাক্কা দিয়ে খুলেছি—অমনি কে যেন 'যাগো' বলে চেঁচিয়ে উঠল—তারপর হুড়মাড় করে কারা যেন ছুটে পালালো। ওই বৌদি অ্যাণ্ড্ কোং—আড়ি পেতে দাঁড়িয়ে ছিল নিশ্চয়। কারো নাকে মুখে বোধ হয় চোট লেগেছে—ভালোই হয়েছে। বোকামোর শাস্তি একটু পেতেই হয়—রাইটলি সার্ভড্।

এতক্ষণে ঘরটা একটু হাল্কা লাগছে। কানের হাওয়ায় গা জ্বলছিল, এইবার দক্ষিণের বাতাস এসে জুড়িয়ে দিলে। আরে, আকাশ যে জ্যোৎস্নায় ধুয়ে যাচ্ছে দেখছি, পূর্ণিমা-টুর্ণিমা কিছু একটা বোধ হচ্ছে। একেবারে আদর্শ ফুল

শয্যার রাত বাকে বলে। তোমার আরো কারো সঙ্গে বিয়ে হলে সুবর্ণা, এই রাতটার মানেই বদলে যেত। তখন এই দক্ষিণের হাওয়া, ওই জ্যোৎস্না আর ঘরের ভেতরে ঘরখরে হয়ে থাকা এই ফুলের আর আতরের গন্ধ সব কিছু তোমার কাছে অন্য অর্থ বয়ে আনত। কিন্তু তুমি পরীবের মেয়ে, তুমি কি খুব বেশি স্বপ্ন দেখেছিলে সুবর্ণা? দেখবার সুযোগ পেয়েছ কোনোদিন? জানি না।

খাটের চারদিকে এই যে ফুলের মালার ইচ্ছে করছে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলি। কিন্তু কোনো লাভ নেই—ওতে করে সারা পৃথিবীর ফুলকে তো আমি নিশ্চিহ্ন করতে পারব না। বাঙালীর স্ত্রী—অথবা যে কোনো জাতের স্ত্রীর মতোই ওরা বার বার জন্ম নেবে। তা ছাড়া আর আড়াই ঘণ্টা মাত্র এ ঘরে আমি আছি। এই সময়টুকু এগুলোকে কোনোমতে সহ্য করা যাক।

একটা সিগারেট ধরানো যেতে পারে। এক পেগ হুইস্কি হলে এখন ভালো হত—ফুলের ঘনচাপা গন্ধে মাথাটা যেন কেমন হয়ে আছে তখন থেকে। কিন্তু আমার নিজের শোবার ঘরে আজ আর যাওয়ার জো নেই—এক গাদা আত্মীয়-স্বজন ও ঘরে শুয়ে রয়েছে। গলাটা শুকিয়ে গেছে বিশ্রী রকম।

জলে চলবে কিনা জানতে চাইছ? চলবে—অগত্যা। বাঃ, সত্যিই তো তোমার নার্ভ আছে সুবর্ণা। কুঁজো থেকে, জল ঢাললে, একটু হাত কাঁপল না, এক ফোঁটা জলও পড়ল না। একটা জিনিসও আবিষ্কার করেছি এই মুহূর্তে। তোমার আঙুলগুলো খুব সুন্দর। সন্ধ্যানের সময় তো লক্ষ্য করিনি। ছবি আঁকতে পারো বুঝি? গান জানো? কী বললে! তা জেনে আর কী হবে। ঠিক কথা, ও-সব জেনে আমার কোনো লাভ নেই।

আঃ, জলটা খুব ঠাণ্ডা। কেওড়া আর কর্পূর মেশানো মনে হচ্ছে। ওই আমাদের আর এক রোগ, অকারণেই ভালো জলটাকে বিতর্কে বিষাদ করে ফেওয়া। তবু মন্দ লাগল না এখন। গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল।

টু বী ভেরী ফ্রাঙ্ক, সুবর্ণা—আর তুমিও নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ—বিয়ে আমি করতে চাইনি। নইলে বড়ো লোকের ঘরের রূপবান ছেলে—চরিত্র যেমনই হোক—বিয়ে আমার আটকাত না। অনেক দিনই আমি ঠেকিয়ে রেখেছিলুম। মেয়ে মা 'হাঙ্গার স্ট্রাইক' করে—সেই মেয়েলি অস্ত্র যা এখন পুরুষদের কারণে অকারণে ব্যবহার করতে লজ্জা হয় না—যা 'হাঙ্গার স্ট্রাইক' করে ঠাকুর ঘরে ঢুকলেন, বৌদিদের কান্নার চোটে কান পাতা দায় হল। অগত্যা বাধ্য হয়ে বললুম, "আমি বিয়ে করলেই যদি তোমরা খুশি হও, বেশ তাই হবে। মেয়ে সম্পর্কে আমার কোনো বক্তব্য নেই, সাত থেকে সত্তর যে কোনো বয়েসের হলেই চলবে, বাঙালী অবাঙালী ইয়োরোপীয়ান-মঙ্গোলীয়ান-নেটিভ্যাক-নিগ্রোবটু—কিছুতে আপত্তি নেই।"

আমি বলছি সুবর্ণা, তোমার ওপরে একটু অবিচারই হল। মানে, তোমার মতো একটি সুন্দরী মেয়েকেই বিশেষ করে বিয়ে করবার আমার কোনো দরকার ছিল না। অন্য যে কোনো লোকের সঙ্গে বিয়ে হলে, চলতি বাংলায় যাকে সুখী হওয়া বলে, তা তুমিও হতে। অথচ আমার যে কেউ হলেই চলতে পারত। এনি ওল্ড হাগ, যে-কোনো আগ্‌দিনেস ইনকর্পোরেট—এনি হিং ফ্রম ইনফার্নো ইন্ অফ শেপ, অফ এ উয়োম্যান। আমি তোমার জন্যে দুঃখিত সুবর্ণা, যদিও দুঃখ আমার সচরাচর হয় না।

দাদা বৌদিরা কিন্তু অন্যরকম ভেবেছিলেন। তাঁদের ধারণা জন্মেছিল, উড়ু উড়ু মনকে রূপের খাঁচায় শক্ত করে বাঁধা যায়। কিন্তু যে পাখি আকাশে উড়েছে তাকে যে কোনো খাঁচাতেই ফেরানো যায় না, এই সাধারণ জ্ঞানটুকু তাঁদের ছিল না। আমি বলতে বাধ্য, তোমার ওপর তাঁরা অন্যায় করেছেন। যাই হোক, আমি চলে গেলে তুমি স্বচ্ছন্দেই

ডিভোর্সের ব্যবস্থা করতে পারবে এবং আবার দলারা—যেহেতু তাঁরা ধর্মভীরু, তোমাকে হু-হাত ভরে দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করবেন, তুমি ভেবোনা।

কী বললে? কিছুই চাওনা? আদর্শ হিন্দু স্ত্রী? সারা জীবন শুধু আমারই ধ্যান করতে চাও নাকি? তোমাকে উপদেশ দেবার কোনো অধিকারই আমি দাবি করছি না, শুধু বলছি, আমি সেই পুরুষোত্তম নই যার স্মৃতিপূজা না করলে তোমার সতীধর্মের দুয়োরে কাঁটা পড়বে। বী প্র্যাক্‌টিক্যাল সুবর্ণা, টাকাটা ছেড়ো না। ওর চেয়ে দরকারী জিনিস পৃথিবীতে আর কিছু নেই।

একটা কাপড় পোড়া গন্ধ পাচ্ছি। আরে—আরে, তোমার নতুন বেনারসীর আঁচলটা অনেকখানি পুড়ে গেছে যে। আবারই সিগারেটের আগুনে নিশ্চয়। ছি-ছি, ঠিক হল না। তুমি স্বচ্ছন্দে আর একটু সরে বসতে পারো. খাটে অনেকটা জায়গা রয়েছে।

কী বললে? ক্ষতি হয়নি? অমন দামী শাড়ীটা পুড়ে গেল, একটুও দুঃখ হচ্ছে না? মেয়েদের মধ্যে এমন তো দেখা যায়না। অন্তত আমি যাদের জানি, তাদের এতটা উদাসীনতা তো কখনো দেখিনি। নাঃ, তোমাকে যেন একটু ডিফারেন্ট্ বলে মনে হচ্ছে। আমি যেন একটু একটু করে তোমার গুণগ্রাহী—

ড্যাম ইট্।

একটা বাজল। আর দুঘণ্টা সময় আছে হাতে। মাত্র দু'ঘণ্টা। অথচ, আসল কথাটাই তো বলা হলনা এখনো। আর একটু জল খাওয়াতে পারো? আইন ঘটিত পতিদের জন্যেই এই ফরমাইশ করছি, কিছু মনে কোরো না। তা ছাড়া আমি নিজের হাতে জল গড়িয়ে একলা খেতে পারিনা। একগ্লাস চাইতে গিয়ে তিন গ্লাস ফেলে মেজে ভাসিয়ে দিই।

জলটায় কেওড়া-কর্পূরের কি সব গন্ধ, শুধু ভালোই লাগছে। তোমার আঙুলগুলো খুব সুন্দর। গান-বাজনা জানো বুঝি? চুপ করে আছো যখন, নিশ্চয় জানো। তোমার গান শুনতে—

আঃ কী বকছি আবোল-তাবোল? যাক্ এবারে আসল কথায় আসা যাক।

তুমি এখনেই প্রশ্ন করবে, আমি পালাচ্ছি কেন? এ বাড়ীতে স্বচ্ছন্দে থেকেই তো আবার আগেকার দিনগুলোকে কাটিয়ে দিতে পারতুম। তুমি রাত দুটো পর্যন্ত আলো জেলে—ঠিক বাংলা গল্পের মতো আলো জেলে বসে থাকতে, আর আমি টলতে টলতে ফিরে আসতুম, তারপর তোমাকে খানিকোর করতুম। বিলিভ্ বী, ওসব দস্তা নাটকে আমার রুচি নেই।

আমি পালাতে চাই তিনটে কারণে।

প্রথমে তুমি। তোমাকে আমি কিছুতেই স্ত্রী বলে স্বীকার করবনা। আর স্বীকার যখন করবই না, তখন ওই নাকটা জোর করে তোমার ওপর চাপিয়ে দিয়ে তোমাকে দুঃখ দিতে আমি রাজী নই। আমি চলে গেলেই তুমি ছুটি পাবে।

কী বললে? তোমার ভাবনায় আমার দরকার নেই? তোমার মধ্যে তো বেশ জোর আছে দেখছি, একটা গরিবের মেয়ের কাছ থেকে এতটা আমি আশা করিনি। অলরাইট্, তোমার কথা আমি ভাববনা।

এরপর আসছি দ্বিতীয় কারণে।

আমার দাদারা শুধু ধর্মভীরু নন, দস্তুর মতো স্নেহপ্রবণ। আমি ছোট ভাই বলে আমার ওপর বড্ড বেশি তাঁদের মমতা, সে রোগটা বৌদিদের মধ্যেও ছড়িয়েছে। নইলে আমাকে ওঁরা অনেক আগেই বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিতে পারতেন, ওঁদের সনাতন-কোডের বিচারে সেইটেই উচিতও ছিল। কিন্তু আজ স্নেহে ওঁরা তা করেননি—শুধু চোখের জল ফেলে আমায় উপদেশ দিয়েছেন অ্যাণ্ড্ ইউ কাম্‌টু ক্যাচ্ থী ফেয়ার।

ভেবে দেখেছি, আর এঁদের কাছে থাকা আমার উচিত নয়। আমার পথ যখন আলাদা, তখন আলাদা ভাবেই চলা

(শেষাংশ ৭৭৪ পৃষ্ঠায়)

রক্তগোলাপ

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

প্রিয়বাবু প্রায়ই সহজ পথ অবলম্বন করেন।

রাস্তা ধরে গেলে অনেকটা হেঁটে তবে বাস্ স্টপ। কিন্তু এমন প্রচুর সময় প্রিয়বাবুর মতো মানুষের পক্ষে ক্ষেপণ করা হয়ে ওঠে কি।

প্রায়ই তিনি বাস ধরতে রেললাইনের উঁচু পাড় ধরে চলে যান। বর্ষার দিনে তো লাইনের ধারের পথটা অতি উত্তম। জল কাদা থাকে না। বরং সবুজ ঘাসের বুকের ওপর দিয়ে পায়ে চলা পথ ধরে তিনি যখন অগ্রসর হন তখন ফুরফুরে হাওয়া ও টেলিগ্রাফের তারের ওপর বসে থাকা ফচ্‌কে পাখীর কিচির কিচির মিঠা ডাকটা উপভোগ করার মতন।

অর্থাৎ নগর জীবনেও প্রিয়বাবু পাঁচ সাত মিনিটের জন্য কেমন যেন একটা অরণ্য জীবনের স্বাদ পান। তাই তিনি বর্ষায় গ্রীষ্মে এমন কি শীতেও ঐ পথটা ব্যবহার করেন। পথের পাশে ভেড়া ছাগল দেখা যায়, শকুন দেখা যায় বক দেখা যায়।

সেদিনও তিনি এমন করে সব দেখতে দেখতে ফুরফুরে হাওয়াটি গায়ে লাগাতে লাগাতে ফচ্‌কে পাখীর মিঠা ডাক শুনতে শুনতে অগ্রসর হচ্ছিলেন।

তারপর হঠাৎ এক সময় তার শরীরটা স্থির অনড় শক্ত হয়ে গেল। চোখ কপালে উঠে গেল। যেন নিশ্বাস ফেলতেও তিনি ভুলে থাকলেন।

একটা বিড়াল।

লাইনের এপাশে বড় ওপাশে কাঠের স্লিপারের ওপর মুণ্ডটা। আর তাজা রক্ত। এপাশের পাথরের খোয়া ভিজে গেছে ওপাশের স্লিপারটা লাল হয়ে গেছে। একটা বিড়ালের দেহেও কত প্রচুর রক্ত থাকে ভীত আতঙ্কিত বিস্মিত দৃষ্টি মেলে প্রিয়বাবু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন।

নিশ্চয় এই মাত্র লালগোলা প্যাসেঞ্জার এই কাণ্ডটা করে গেছে। হয়তো প্রিয়বাবুর মতো শর্ট-কাট্ রাস্তা ধরে বিড়ালটা রেললাইন ডিঙিয়ে এবার থেকে ওধারে যাচ্ছিল। বুঝি লাইনের এপাশের কোন গৃহস্থের বিড়াল। হয়তো ওপাশের কোন বাড়িতে মাছ ভাজার গন্ধ পেয়ে ঘুরপথে না গিয়ে সোজা পথ ধরে ছুটে যাচ্ছিল। তারপর নিষ্ঠুর লালগোলা প্যাসেঞ্জারের চাকার তলায়—

একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে প্রিয়বাবু আবার হাঁটতে লাগলেন। লাইনের ওপর বিড়াল কাটা পড়ে দ্বিখণ্ডিত হওয়ার দৃশ্যটা প্রিয়বাবু কিছুতেই ভুলতে পারছিলেন না। যদি ছাগল গরু হত, ভেড়া হত, বক শকুন হত তিনি এতটা মর্মাহত হতেন না। ছাগল গরু ভেড়া বক শকুন ঘাটে মাঠে জলায় জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। বিড়াল ঘরের জীব। উনুনের ধারে খাটের তলায় বিছানার পাশে তার আনাগোনা। হঠাৎ এমন একটা প্রাণীর ট্রেনের তলায় কাটা পড়াটা যেন কেমন লাগে। যেন ঘরের একটি শিশু হামাগুড়ি দিতে দিতে রেললাইন পার হচ্ছিল। তারপর দ্রুত ধাবমান কোন ট্রেন ছুটে এসে তার দেহটা দু'টুকরো করে দিয়ে হস হস্ করে ধ্বংসরীতি ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে নিজের পথে ছুটে চলে গেল। একটু ভাবল

না, একবার থমকে দাঁড়াল না কি কাটা পড়ল, কে কাটা পড়ল।

অর্থাৎ একটি মানবশিশু কাটা পড়লে যে দৃশ্য পেতেন সেদিন কোন দুরন্তের আবরিষী মার্জারীর শোচনীয় মৃত্যু প্রিয়বাবুকে সমান পরিমাণ ব্যথিত করে তুলল।

অফিসে গিয়ে তিনি এখন একটা দুর্ঘটনার কথা নিয়ে সকলের সঙ্গে আলোচনা করবেন স্থির করে ফেললেন। হুঁ, বিড়ালটা রেললাইনের ওপর উঠেছিল কেন। ইঁদুর ধরতে গিয়েছিল? রেললাইনের উঁচু জমির গর্তে কাটলে ইঁদুর রয়েছে জেনে শিকারের লোভে কি মূর্খ বিড়াল সেখানে ধরতে গিয়েছিল। না, তার নিজের অনুমানই ঠিক। এপাড়ার বিড়াল ওপাড়ার মাছের গন্ধ পেয়ে লাইন পার হতে যাচ্ছিল। কিন্তু রেল পথের দুপাশে দুটো দুরন্ত পাড়ার দূরত্ব তো কম না। এতদূর থেকে মাছের গন্ধ কি পাওয়া যায়। প্রশ্নটার উত্তর তৎক্ষণাৎ প্রিয়বাবুর মনে এসে গেল। সম্ভবত ইলিশ মাছ ভাজা হচ্ছিল। ভাদ্র মাস। এখন তো ইলিশের মরশুম।

প্রিয়বাবু প্রথম বাস্‌-টা পেয়ে গেলেন। তবে ভিড়ও কম না। কলবার জায়গা পেলেন না। কোন মতে ভিড়ের মাঝখানে ঠেলে ঢুলে দাঁড়াবার জায়গা করে নিলেন। দুটো স্টপ পার হবার পর গাড়ির ভিতর প্রচণ্ড গোলমাল শোনা গেল। সামনের দরজার কাছে গোলমাল। প্রিয়বাবু পিছনের দরজার কাছে ছিলেন। যেন কিলচড় সুরু হয়ে গেল। 'শালা পকেটমার—গাঁঠকাটা—মার্ মার্'? 'এই ড্রাইভার রোখ রোখ…!' 'পুলিসে দিন পুলিশে দিন…!

ভয়ংকর হৈ-চৈ-এর মধ্যে বাস দাঁড়িয়ে পড়ল।

হুড়মুড় করে গাড়ি থেকে চার পাঁচজন এক সঙ্গে নেমে পড়ল। একটা ফাঁক দিয়ে প্রিয়বাবু জানালার কাছে গলাটা বাড়িয়ে দিলেন। অল্প বয়সের ছেলে। সার্ট পেণ্ট পরা। চার পাঁচজন তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। তখনও কিল চড় লাথি ঘুষি চলছে। ছেলেটা থরথর করে কাঁপছে, যেন কাঁদছে, দু'হাতে মুখ ঢেকে রেখেছে। যেন নাক দিয়ে গলগল করে রক্ত ঝরছে। বুকের দিকে সার্টটা লাল হয়ে গেছে। হোলির দিন কারো গায়ে পিচকারী দিয়ে লাল রং ছিটিয়ে দিলে যেমন হয়। এক থেকে দু'মিনিট বাস্‌টা দাঁড়িয়ে ছিল। তারপর আবার ছুটতে আরম্ভ করল। কিন্তু ঐ একটু সময় যে দৃশ্য প্রিয়বাবু দেখলেন তাঁর মাথাটা ঝিমঝিম করছিল। যেন ছেলেটাকে তারা রাস্তার ওপর মেরে ফেলবে। পুলিশের হাতে তুলে দেবার আগেই তার প্রাণ বার করে ছাড়বে। কার বুক পকেটে—হাত দিয়েছিল কাউণ্টেন পেন তুলে নিতে। সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ে গেছে। রাতদিন প্রিয়বাবু পিক্-পকেট-এর গল্প শুনছেন। অমুকের মণিব্যাগ খোয়া গেছে, অমুকের হাত থেকে ঘড়ির ব্যাণ্ড কেটে ঘড়ি নিয়ে গেছে, অমুকের কলম্ হারিয়ে গেছে ইত্যাদি। কিন্তু এই প্রথম একটি পকেটমারকে হাতে নাতে ধরে তাকে প্রায় খুন করে ফেলার দৃশ্য প্রিয়বাবু স্বচক্ষে দেখলেন। রাস্তার-ঘাটে ধরা পড়লে ওরা খুব মার খায়। প্রিয়বাবু জানতেন, শুনে আসছিলেন। কিন্তু এই মার যে কী ভয়ানক চেহারা ধারণ করতে পারে প্রিয়বাবু সেদিন চোখের সামনে দেখলেন। বিশেষ করে রক্তে রক্তে লাল হয়ে যাওয়া গায়ের জামাটা। রেল লাইনের ওপর তিনি একটা কাটা বিড়াল পড়ে থাকতে দেখে এসেছেন, রক্ত দেখে এসেছেন। কিন্তু এই দৃশ্যের কাছে সেই দৃশ্য যেন কিছুই না। এই রক্তপাত অনেক বেশি জীবন্ত। নাক দিয়ে গল গল করে রক্ত পড়ছিল আর ছেলেটা এমন কাঁপছিল। বাস্‌-এর রড ধরে দাঁড়িয়ে থেকে প্রিয়বাবুও কাঁপছিলেন। বাস আবার চলতে আরম্ভ করার পরেও।

অফিসে গিয়ে সকলের কাছে গল্পটা করবেন মনে মনে তখনি স্থির করে ফেললেন যদিও।

অন্যদিনের চেয়ে একটু সকালেই তিনি অফিসে পৌঁছলেন। প্রায় পুরো দশ মিনিট হাতে নিয়ে। অন্য দিন এক নেড়

মিনিট হাতে থাকে না। গলদঘর্ম হয়ে তিনি লিফটে-এ ঢোকেন। দোতলায় উঠে সোজা বাথরুমে চলে যান। মুখ হাতটা একটু ধুয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে রুমাল দিয়ে ঘাড় গলা মুছতে মুছতে টেবিলে বসেন, টেনে টেনে ফাইল টাইলগুলি বার করেন। কেননা বড় সাহেব তখন থেকেই ঘোরাঘুরি করতে আরম্ভ করে। সাড়ে নটায় অফিস বসে। বড় সাহেব সকাল আটটার আগে থাকতেই এসে বসে থাকে। যেন অফিসটাই তার শ্বশুরবাড়ি। তা হবে প্রিয়বাবু অনেকদিন চিন্তা করেছেন, সাড়ে বাইশ শ টাকা যে লোক মাইনে পায় তার কাছে ঘরের চেয়ে অফিসটাই বেশি প্রিয় হওয়া স্বাভাবিক।

যাক সেকথা।

প্রায় পুরো দশ মিনিট আগে অফিসে পৌঁছে গেছেন দেখে প্রিয়বাবুর চোখ মুখ প্রসন্ন হয়ে উঠল। রুমাল দিয়ে ঘাড় গলা মুছতে মুছতে তাকে এখনি টেবিলে কাজ করতে বসে যেতে হবে না। অরুণের সঙ্গে তুলসীবাবুর সঙ্গে ডিপার্টমেন্টের নগেনবাবু কি সুকুমারের সঙ্গে, অর্থাৎ যারাই ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছে তাদের সঙ্গে বসে একটু গল্পগুজব করার অবসর পাবেন। ভাবতে ভাবতে প্রিয়বাবু লিফটে-এ চড়লেন। দোতলায় উঠে তিনি একটু নিরাশ হলেন। যেন কেউ আসেনি। বেয়ারা চেয়ার টেবিল ঝাড়পোছ করছে। দরজার ফাঁক দিয়ে তার খাকি শার্টের হাতাটা প্রিয়বাবুর চোখে পড়ল। কিন্তু করিডোর পার হয়ে ভিতরে ঢুকে আবার তিনি খুশি হলেন। নগেন ও অরুণ এসে গেছে। প্রিয়বাবুর চেয়ে তারা বয়সে অনেক ছোট। প্রিয়বাবুকে 'প্রিয়দা' 'প্রিয়দা' ডাকে। কিন্তু তা হলে হবে কি, যখন ফুলের গল্প আরম্ভ হয় তখন দাদার সঙ্গে একাসনে বসে যেতে ছোট ভায়েরা একটু দ্বিধা করে না। এবং প্রিয়বাবুও কোন-রকম সঙ্কোচবোধ করেন না। অফিস অফিস—কলিগ্ কলিগ্—সেখানে বয়সটা কিছু না।

'এই যে, ভায়া, এসে গেছ।' প্রিয়বাবু প্রথমে অরুণকে সম্ভাষণ করলেন। কিন্তু কোন উত্তর পেলেন না। মুখ তার করে অরুণ টেবিলে চুপ করে বসে আছে। তার কপাল গলা বেয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে। ঘন ঘন রুমাল দিয়ে ঘাড় গলা মোছা অরুণের অভ্যাস। কিন্তু এখন ঘামের জন্যে ঘাম করছে। অথচ কেমন পাথরের মত চুপ করে বসে আছে। যেন গভীর কোন চিন্তায় মগ্ন। হয়তো কোন কারণে তার মেজাজ খারাপ। তাই প্রিয়বাবু আর কিছু না বলে নগেনের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। নগেন জানালার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখটাও বেশ ভার। কিন্তু তা হলেও প্রিয়বাবু চুপ থাকতে পারলেন না।

'এই যে ব্রাদার, আজ দেখছি খুব সকাল সকাল পৌঁছে গেছ।'

নগেন কথা বলল না, ঘাড়টা ঘুরিয়ে প্রিয়বাবুর চোখে চোখ রেখে সামান্য একটু হাসল কি হাসল না।

প্রিয়বাবু তাতেই সন্তুষ্ট হলেন।

'বেশ বেশ।' বাধা নেই তিনি টেবিলের পিছনে হাতাটা রাখলেন। সার্টটা খুলে ফেললেন। সার্টটার পিঠটা ঘামে ভিজে গেছে। চেয়ারের পিঠে জামাটা ছড়িয়ে দিয়ে প্রিয়বাবু বাথরুমের দিকে চলে গেলেন।

দু থেকে তিন মিনিট তিনি বাথরুমে ছিলেন।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে অন্ধকার মতন সরু প্যাসেজটায় আসতে তিনি একটা চিৎকার শুনলেন। যেন অরুণের গলার মতন স্বরটা। একবারই শুধু চিৎকারটা হল। তারপর সারা অফিস বাড়িটা কেমন শুন্য হয়ে গেল। প্রিয়বাবু স্তম্ভিত দাঁড়িয়ে পড়লেন। আর ঠিক তার তিন সেকেণ্ড পর বেয়ারাটা ছুটতে ছুটতে সেদিকে চলে এল। তার মুখটা কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। প্রিয়বাবু তৎক্ষণাৎ তার কিছু একটা আশঙ্কা করলেন।

'কি হল রে।' প্রকাণ্ড একটা ঢোক গিলে তবে প্রশ্নটা তিনি মুখ থেকে বার করতে পারলেন না।

'অরুণবাবুকে ছুরি মেরেছে।' কানে কানে ফিসফিস করে বলার মতন বেয়ারা রামচরণ কোনমতে কথাটা বলতে পারল। রামচরণ থর থর করে কাঁপছিল। প্রিয়বাবু চেঁচিয়ে উঠলেন।

'কি বলিস, কে ছুরি মারল।'

বলতে বলতে তিনি অফিস ঘরে এসে ঢুকলেন। আর ঠিক তখন নিচে একটা গোলমাল শোনা গেল। তারপর সব চুপচাপ। প্রিয়বাবু নিজের চোখ দুটিকে যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। অরুণ চেয়ারের নিচে পড়ে আছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে তার জামা প্যান্ট। যেন ফিনিক দিয়ে টেবিলে চেয়ারে, চেয়ারের পিছনে দেওয়ালটায় রক্ত ছিটিয়ে পড়েছে। অরুণের চোখ দুটো আধ-বোজা হয়ে আছে। প্রিয়বাবুর মাথা ঘুরছিল। কোনমতে চেয়ারের একটা হাতল ধরে তিনি দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে বড় সাহেব, ছোট সাহেব, বড় সাহেবের পি-এ নতুন মেম সাহেব, একাউন্টেন্ট জনার্দন বাবু, ডেস্পাচার তুলসীবাবু রথীনবাবু, সুকুমার এবং আরো যেন কে কে সেই ঘরে এসে ঢুকল। ঘরটা মানুষের মাথায় ভরে গেল। তারপর এল পুলিস। প্রিয়বাবু যেন একটা সিনেমার ছবি দেখছিলেন। যতভম্ব বিমূঢ় হয়ে থেকে তিনি সব দেখলেন, শুনলেনও। পুলিস তাঁর স্টেটমেন্ট নিয়ে নিল। রামচরণের স্টেটমেন্ট নিল। প্রিয়বাবু বাথরুমে চলে যাবার পর নগেন জল খাবে বলে রামচরণকে জল আনতে বাইরে পাঠিয়ে দেয়। জলের ঘর থেকে গেলাসে করে জল নিয়ে রামচরণ যখন ফিরে গেল তখন নগেন ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছিল। রামচরণকে দেখেই নগেন হাত থেকে ছুরিটা ফেলে দেয়। রামচরণ ভয় পেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে বাথরুমের দিকে ছুটে যায়। প্রিয়বাবুকে খবর দেয়। কিন্তু নগেন পালাতে পারেনি। নিচে দারোয়ানরা তাকে ধরে ফেলে। সেই জন্য নিচেও এক। গোলমাল শুনেছিলেন প্রিয়বাবু। পুলিশ থাকতে থাকতেই এম্বুলেন্স এল। অরুণের রক্তাক্ত দেহটা গাড়ীতে তোলা হল। বড় সাহেবের গাড়ি নিয়ে ছোট সাহেব এম্বুলেন্সের সঙ্গে হাসপাতালে চলে গেল। এবং প্রিয়বাবুর অফিসে থাকতে থাকতে বড় সাহেবের কাছে টেলিফোনে খবর এসে গেল অরুণ মারা গেছে। বড় সাহেব অরুণের একডালিয়া রোডের বাসায় তার বাবাকে খবর পাঠালেন। অরুণের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে জনার্দনবাবু রথীনবাবু তুলসীবাবু অফিসের আর একটা গাড়ি নিয়ে হাসপাতালে চলে গেলেন। প্রিয়বাবু যেতে চাইছিলেন, কিন্তু সুকুমার এবং আরো কে কে বারণ করল। এই গরমে রৌদ্রে আপনার ছুটাছুটি করে আর হবে কি, বুড়ো মানুষ। প্রিয়বাবু নিবৃত্ত হলেন। দেখতে দেখতে কোনদিক দিয়ে বেলা আড়াইটা বেজে গেল। যারা অফিসে ছিল বড় সাহেব তাদের বাড়ি চলে যেতে বললেন। নগেনকে হাত-কড়া লাগিয়ে গাড়িতে তুলে নিয়ে পুলিশের লোক অনেকক্ষণ আগেই চলে গেছে। কাল অফিস ছুটি বড় সাহেব নোটীশ দিয়ে জানিয়ে দিলেন। ডব্লিউ ডব্লিউ হাচিংসন এণ্ড কোম্পানির অন্যতম তরুণ কর্মচারীর শোচনীয় মৃত্যুতে কোম্পানীর কালকাতা অফিস শোক প্রকাশ করছে। বড় সাহেবের নোটীশে কথাটা উল্লেখ ছিল।

'চলুন, আর বসে থেকে কি হবে।' সুকুমার একসময় প্রিয়বাবুর কাঁধে হাত রাখল। দোতলার বারান্দায় একটা বেঞ্চির ওপর দুজন বসে ছিল। একে একে সবাই প্রায় চলে গেছে। একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলে প্রিয়বাবু ছাতাটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর সুকুমারের কাঁধে হাত রেখে দোতালার সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলেন। লিফ্‌ট অনেকক্ষণ আগেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় প্রিয়বাবুর পা-দুটো কেমন টলটল করে

(শেষাংশ ৫৫৩ পৃষ্ঠায়)

র সা ম ন

নবেন্দু ঘোষ

ঘট্-ঘট্—ঘট্-ঘট্-প্রিন্টিং মেশিন চলছে। শব্দের মধ্যে একটানা একটা ক্লান্তির রেশ। যেমন তার রক্তপিণ্ডের ধুক্-ধুকানিতে। ক্লান্তি—আর-পারিনা ভাব। কয়েকটি সাময়িক পত্রিকার পূজো সংখ্যার কাজ চলছে। অবিশ্রান্ত। দিন আর রাত জুড়ে। এখনো অনেক পাণ্ডুলিপি বাকি আছে। অথচ আর দশদিনের মধ্যে সব কাজ ডেলিভারী দিতে হবে। কাগজের মালিক আর সম্পাদকেরা উস্কোখুস্কো চুল নিয়ে বারবার ঘুরে যাচ্ছে আর প্রেসের ম্যানেজার রামহরিবাবু বেত উঁচিয়ে ঘুরছেন। বেতটা তাঁর স্পিডের ড্রাগন, ঝাঁটা-মার্কা একজোড়া পুরু গোঁফের নীচে, পানের রসে রাঙানো একজোড়া মোটা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে সে বেতের মত সাঁই-সাঁই শব্দ করে ধমক দেয়, তাড়া দেয়।

"কি হে পরেশ, বলি ঝিমুচ্ছ নাকি?"

"আজ্ঞে না।"

"না মানে? সন্তোষ ঘোষের গল্পটা কাল রাতেই হয়ে যাবে বলে যে তড়পেছিলে খুব? এখনো হ'ল না যে?"

"আজ্ঞে গল্পটা বড় যে—"

"তা তুমি কোন হরিদাস পাল হে যে তোমার জন্য সন্তোষ বাবু এক লাইনের গল্প লিখবেন? আর এখনো যে নরেন মিত্তিরের লেখা পড়ে আছে সেটা হাতে দিলে তুমি যে নিমতলায় যেতে চাইবে, তারপর আছেন নারাণ গাঙ্গুলী—"

"আজ্ঞে চোখের পাওয়ার বেড়েছে বলে—"

"পাওয়ার তো বাড়বেই হে—তার জন্যে চোখের ডাক্তার-গুলান যে চাঁদলোভ করে বসে আছে"—

"আজ্ঞে কুলিয়ে উঠতে পারছিনা"—

"আহা, অঙ্গ আমার শেতল হয়ে যাচ্ছে শুনে—তা চাকরিটা খোয়ালে কি করে কুলোবে পরেশবাবু, এ্যাঁ?"

এ কথার জবাব দেওয়া যায় না।

বেতের শব্দ হয় আবার, "দু'ঘণ্টা সময় দিলাম তার মধ্যে সন্তোষবাবুকে কম্প্লীট করে নরেনবাবুকে ধরবে—ব্যস্, একটিও কথা নয়—পটলবাবু"—

কাছাটা গুঁজতে গুঁজতে পটলবাবু উঠে দাঁড়ালেন, "আজ্ঞে!" "তারাশংকরবাবুর গল্পটা?" "হয়ে গেছে। এখন ফাইনাল প্রুফটা ঠিক করছি"—"বেশ আপনিই তাহলে নারাণবাবুকে সান্ত্বনা দিন তো—নিয়ে যান লেখাটা।"

"আজ্ঞে"—

সা-সা—পরেশ তাড়াতাড়ি কম্পোজ করতে করতে গান পাড়ল। আশ্বিনের শেষ। আশা। দিনরাত বুকের ভেতরটা জ্বলছে। আর ভাল লাগে না এই কাজ। দু'বছর ধরে এই কাজ করতে হচ্ছে। আগে কাজ করত একটা ক্যাক্টরিতে। শ'খেড়েক আর হত। চলে যেত কোনোমতে। স্ট্রাইকে যোগ দেওয়ায় চাকরি যায়। তারপর থেকে এই নব-ভারতী প্রেসে কম্পোজিটারির কাজ। প্রথম একমাস বিনি মাইনেতে। তারপর ষাট টাকায় তিনমাস। তারপর পঁচাত্তর টাকায় ছ'মাস, এখন একশ' টাকা। কিন্তু চলছে না। সকাল আটটায় এসে সন্ধ্যে ছ'টায় যাওয়া। কখনো কখনো তারও বেশী বসতে হয়। এখানে ইনক্রিমেন্টের কথা চলে না। ওভার টাইম নামে আছে। হয়ত কখনো কখনো দিনরাত কাজ করলে এক আধবার পাওয়া যায়। বছরে দু'তিনবার। এই পূজোর বরতুমে তার নামে মাত্র একদিনের ওভারটাইম হিসেবের খাতায় লেখা হয়েছে। অথচ অন্ততঃ তিনবারের আরো হিসেব যোগ হতে পারত। দিনদিন করে দু'দিন সে বলেছিল। ওই ঝাঁটাবার্কা গোঁফের বেত সাঁই সাঁই করে উড়িয়ে দিয়েছে সে কথা। আর ভালো লাগে না।

আর ভালো লাগেনা এই কম্পোজিটারি। একশ পাওয়ারের বাল্বের নীচে এই ঝুঁকে পড়ে থাকা, কম-পাওয়ারের চশমা-চোখে বারবার চোখ বড় করে তাকানো আর টাইপ বেঁটে বেঁটে সাজানো। অক্ষর সাজিয়ে সাজিয়ে লেখকদের কথাগুলোকে তৈরী করা, কথায় কথায় তাঁদের গল্পের চরিত্রগুলোকে তৈরী করা, সেই সব চরিত্রদের সুখদুঃখ আশা নিরাশা প্রেম ও ব্যর্থতার গল্পকে কাগজের পাতায় তুলে ধরা। প্রিন্টিং মেশিনের ঘটঘট ঘটাং শব্দের ক্লান্তি তার হৃৎপিণ্ডের ধুকধুকানিতে প্রতিধ্বনি তোলে আর বাইরে দিনের আলো তার আকর্ষ উজ্জ্বলা নিয়ে পরেশ বোসের জন্য অপেক্ষা করে করে শেষে ম্লান হয়ে মিলিয়ে যায়। আর ভালো লাগে না। তার চেয়ে ক্যাক্টরীতে কাজ করা ভালো—সেখানে শুধু হাত চলে না, পা দুটোও একটু চলাফেরা করতে পায়। তার চেয়ে রেলগাড়ী কিংবা মোটরের ড্রাইভার হওয়া ভালো—তীর বেগে হাওয়া চিরে ছুটে যাওয়া যায়—তার মধ্যে একটা গতির আনন্দ আছে। এই বসে বসে জবে যাওয়ার চেয়ে চাষী হওয়াও ঢের ভাল। দু'বছর ধরে সে চেষ্টা করছে কোনো একটা ক্যাক্টরীতে কাজ পাওয়ার জন্য হন্যে। দেশে এত বেকার মানুষ আছে তা সে জানত না। কিন্তু সম্প্রতি একটু আশা করার মত খোঁজ পাওয়া গেছে। ফুপিটার স্টীল ক্যাক্টরীতে দু'শো টাকা মাইনের একটা চাকরি খালি হয়েছে। তার জন্যে আজ মালিককে ধরতে হবে। সন্ধ্যে সাতটায় যেতে বলেছে সে। কিন্তু ঝাঁটা-মার্কা গোঁফের নজর এড়িয়ে, কি সে বেরোতে পারবে সময় মত? সন্তোষ বাবু'র গল্প ধরে গেলেই নরেশবাবুর গল্প নিয়ে পড়তে হবে। এখনো আরো অনেক পাণ্ডুলিপি পড়ে আছে। এখন সাড়ে চারটে। সব সেরে বাড়ী ফিরতে কত রাত হবে কে জানে। শোভা কি তখন রাগ করবে?

পরেশ সন্তোষ ঘোষের গল্প কম্পোজ করতে থাকে। 'গোটাকতক গলিতে সোলক ধাঁধাঁর মত ঘুরে সুরজিৎ যে-বাসার সম্মুখে এসে দাঁড়াল, সেটা একটা জীর্ণ অন্ধকার ...'। এই বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মেলে তার বাসা। জীর্ণ, অন্ধকার একটা ঘর, আলোহীন। ভিজে সেঁতসেঁতে। ঘরের বাইরে ছোট্ট একটা বারান্দা। ছেঁচাবাঁশের বেড়া দিয়ে বারান্দাটাকে রান্নাঘরে দাঁড় করানো হয়েছে। বারান্দা থেকে সাত-আট ফুট দূরেই দেয়াল, ওপারে নিবারণ দত্তের বাড়ীর পায়খানা আর জঞ্জল। দক্ষিণের বাতাস একটু উতলা হলেই পাঁচমেশালি গন্ধ ছাপিয়েও একটা দুর্গন্ধ আসে। দশ বছর আগে নাক টিপে ধরত পরেশ আজকাল অবশ্য তা ধরতে হয়না। উপায় কি? গোকুল বোস লেনের সেই তেরো নম্বরের জরাজীর্ণ দোতলা বাড়ীতে সবশুদ্ধ নটি ঘর। এক এক ঘরে এক একটি পরিবার

থাকে। খাওয়া শোওয়া হাসা কাঁদা রাগ-বিরাগের খেলা আর জন্মমৃত্যু সব কিছুই একই ঘরে হয়। বুড়ো-বুড়ী, যুবক-যুবতী আর বাচ্চা ছেলেমেয়েরা সবাই একই ঘরে শোয় বসে, কথা বলে, ঘুমোয় আর স্বপ্ন দেখে। সেই একই ঘরে, রাত গভীর হলে কোনো এক সময়ে হয়ত ফিসফিস কথা বলে আর চাপা নিঃশ্বাস ফেলে স্বামী খোঁজে স্ত্রীকে আর স্ত্রী খোঁজে স্বামীকে। দু'একটা কৌতূহলী ছেলে হয়ত জেগেই থাকে, কান খাড়া করে বাপমার কথাবার্তা শোনার ও বোঝার চেষ্টা করে আর চোরের মত কাঁপতে থাকে। যেমন তার বড় ছেলে ধীরু। বয়স তার এখন তেরো, ক্লাস এইটে পর পর দু'বছর ফেল করে সম্প্রতি ইস্কুল ছেড়ে বাড়া-হাতপা' হয়ে ঘুরে বেড়ায় গোকুল বোস লেনের চারদিককার গলির গোলক ধাঁধাঁতে আর তার মত ছেলেদের নিয়ে 'কল্পনা' সিনেমা হাউসের সামনে বসে থাকে। অনেক রাতে উত্তেজক কৌতূহল নিয়ে অনেকক্ষণ জেগে থাকার ক্লান্তির পর যখন সাড় ঘুমে অচৈতন্য হয় তখন স্বপ্নের ঘোরে বিড়বিড় করে, "সুচিত্রা সেনের 'সপ্তপদী' ছবিটা দেখেছিস মাদু?··· মাইরি আচ্ছা, সন্ধ্যা রায়কে তোর কেমন লাগে বলত? হুঁ-উঁ-উঁ—"। জ্বালা করে মনটা। জীবন কি? প্রিন্টিং মেশিনটা একটানা চলছে। ক্লান্তি। হৎপিণ্ডের ধমনিতে আর-পারিনা ডাক। কখন বাড়ী ফিরবে সে? কখন সে শোভাকে দেখতে পাবে? শোভা। তার বৌ। যার কথা মনে হলেই রক্তে জোয়ার আসে। জীবন যতই ভাঁটার দিকে যাচ্ছে ততই যেন জোয়ারের ডাক শুধু শোভার ভাবনাতেই আসে। শোভা রং যার ময়লা অথচ এককালে যাকে দেখলেই পথচলতি লোকেরা থমকে দাঁড়াত আর একবার ভালো করে দেখার জন্য। টিকোলো নাক, ডাগর চোখ, কোমর ছাড়িয়েও নীচে-নামা চুলের রাশি, হাসলেই গালে টোল খেত আর অজানা একটা ফুলের গন্ধ পাওয়া যেত শোভার কাছাকাছি গিয়ে—

"কি হে পরেশবাবু—আবার বিমুক্ত যে?"

পরেশ চমকে উঠল। রামহরিবাবু বেত চালাচ্ছেন।

"আজ্ঞে না এই লেখাটা পড়তে কষ্ট হচ্ছিল"—

"বটে। আমার তো মনে হচ্ছিল বিমুক্ত—মনে হচ্ছিল যেন নতুন বিয়ে করেছ একটা"—

সা-লা-। পরেশ জবাব না দিয়ে মনে মনে গাল পেড়ে আবার কম্পোজ করতে বসল।

সাড়ে ছ'টায় রামহরিবাবু ছিলেন না প্রেসে, কোথায় যেন তাগিদ দিতে গেছেন। সেই সুযোগে পরেশ মাথের অসুখের অজুহাত দিয়ে এবং পরদিন সাতটায় এসে কাজে বসবে কথা দিয়ে তবে নিষ্কৃতি পেল এ্যাসিস্ট্যান্ট, ম্যানেজার তথা এ্যাকাউন্টেন্ট, প্রিয়নাথবাবুর কাছ থেকে।

বাইরে বেরিয়ে দেখল যে সূর্য অনেকক্ষণ অস্তে গেছে, গলিতে আলো জ্বলেছে, গলি দিয়ে যে একফালি আকাশ দেখা যায় তাতে মেঘের সমারোহ চলছে। বড় রাস্তায় বেরিয়ে ট্রাম ধরে সে। ট্রামে বড় ভীড়, ধম যেন বন্ধ হয়ে আসে চাপের চোটে। আর সব আরোহীর মুখেই অপরিসীম ক্লান্তির ছাপ। ট্রামের চাকাতেও সেই ক্লান্তি যেন ধ্বনি তুলছে ঘট্ ঘট্ ঘটাং-ঘটাঘট্—। বাড়ী ফিরতে এখনো দেরি হবে। মাণিককে না ধরতে পারলে হবেনা। সে নিয়ে যাবে জুপিটার স্টীল ফ্যাক্টরীর বুড়ো এক কেরাণীর কাছে। তাঁর নাম সত্যব্রত সেন। ফ্যাক্টরীর মালিক গোবর্ধনলালের ওপর নাকি পুরোন লোক বলে তাঁর বেশ প্রভাব আছে। আর সত্যব্রতের ওপর প্রভাব আছে মাণিকের। মাণিক পরেশের বন্ধু নয়, তবে অনেকদিনের চেনা লোক। লোকটার গতিবিধি সন্দেহজনক, কি করে সংসার চালায় সে তা একমাত্র ভগবানই জানেন যদিও মাণিক বলে যে সে বাড়ীর দালালি করে। থাকে বেশ ফিটফাট, জুয়ার নেশা আর মদের নেশাতেও বেশ নাম করেছে সে। কিন্তু উপায় কি! জুপিটার স্টীল ফ্যাক্টরীতে দু'শো

টাকার চাকরিটা পেলে আপাততঃ একটু হালকা বোধ করতে পারবে পরেশ—তাই মাণিক যেন মাণিকের হাতে-ধরা। নির্দয় এই মাণিক। বলেছে দরকার পঞ্চাশ টাকা খরচা করতে হবে। এক ওকে দিতে হবে, বাকীটা তার। পরেশ রফা করেছিল চল্লিশে। কিন্তু এখন তার পকেটে আছে মাত্র চব্বিশটাকা বারো আনা। কে জানে কি হবে! শোভা তিনদিন ধরে দশটাকার জন্ত তাগিদ দিচ্ছে। দিন পনেরো আগে দূর সম্পর্কের এক কাকা তার এক কুমারী মেয়েকে হাসপাতালে দেখাবার জন্ত বর্ধমান থেকে এসেছিল। চারদিন ছিল তাদের পাররার খুপরিতে। দুটো পেট বেড়েছিল চারদিন তাই হিসেবে টান ধরেছে। কিন্তু দশটাকা শোভাকে সে দিতে পারেনি। মাস শেষ হতে এখনো অনেক দেরি। দেখা যাক দু'চারদিন বাদে না হয় ধার করবে কারো কাছে। কার কাছে? সে পরে ভেবে নেওয়া যাবে। শোভা ঠিকই চালিয়ে নেবে। আশ্চর্য তার শোভা। নড়বড়ে সংসার চালাতে চালাতে তার চেহারার কত পরিবর্তন হয়েছে। রোগা হয়ে গেছে মেয়েটা। বীরু, মিরু, রাণু, ছবি আর ছোট্‌কা—পর পর পাঁচটি সন্তান বিইয়েও ভাঙেনি তার শরীর, ভেঙেছে দিনরাত অনিশ্চয়তার দুশ্চিন্তায়। বিপুল এক বন্যায় যেন খড়কুটোর মত ভেসে চলেছে তারা, সেই বন্যার স্রোত থেকে সরে একটুকরো শুকনো মাটির ওপর শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে, গাছের মত শেকড় মেলে দিতে শুধু চেয়েছে শোভা। কিন্তু তা এখনো হয়নি। শোভা এখন দেখতে কত রোগা হয়ে গেছে, কত করুণ—শুধু তার চোখ দুটোতে এখনো এক আশ্চর্য মাদকতা—

ট্রাম থামল। পরেশ নেমে একটা গলিতে ঢুকল। গলিটা এঁকেবেঁকে গেছে। এ গলি সে গলি পার হয়ে শেষে নম্বর মিলল লেনের দশ বাই দুইয়ের বি নম্বর-লাগানো দরজা। চোখ দুটো ছোট করে নম্বর পড়ল পরেশ, না এই বাড়ীই বটে। সে কড়া নাড়ল।

"কে?" ভেতর থেকে তীক্ষ্ণ মেয়েলি গলার প্রশ্ন ভেসে এল। "মাণিকবাবু আছেন?"

খটাস্ করে খিল খোলার শব্দ হল। তারপর দরজাটা খুলে গেল। দেখা গেল বছর ত্রিশ বয়সের একজন রুগ্না স্ত্রীলোককে। অনেকটা শোভার মত। কিন্তু শোভার মত বিষণ্ণ ও স্নিগ্ধ নয়। এ মহিলার দু'চোখে যেন আগুন জ্বলছে, যেমন জ্বলছে কপালের বড় সিঁদুরের টিপ্‌টা। বোধহয় মাণিকের বৌ।

"কি? কি চাই?"

"মাণিকবাবু?"

"কেন? জুয়ার আড্ডা জমাবে!"

"আজ্ঞে? আজ্ঞে না—আমাকে আসতে বলেছিল"—হঠাৎ স্ত্রীলোকটি খেঁকিয়ে উঠল, "তোমাদের পুলিশে ধরিয়ে দেব আমি—যত সব মুখপোড়া শয়তানের দল—"

"ছি ছি-এসব কি বলছেন আপনি?"

"ঠিক বলছি—বেরোও, বেরোও বলছি—আমার সোনার সংসারটাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়েও তোমাদের শান্তি হয়নি! নিকালো"—স্ত্রীলোকটি ডানহাত তুলে এক পা এগিয়ে আসতেই পরেশ ছিটকে সরে গিয়ে গলি দিয়ে চলতে শুরু করল। আর কথা বাড়িয়ে দরকার নেই বাবা। কিন্তু মাণিকটা তো আচ্ছা লোক!

দড়াম শব্দে মাণিকের বাসার দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

কিছুদূরে গিয়ে পরেশ থামল। পকেট থেকে একটা বিড়ি বের করে সযত্নে ধরাল। কি করা যায় এখন! আজ একটা হেস্তনেস্ত করে যাবে ভেবেছিল সে অথচ—।

"এই যে পরেশ এসেছিস!"

অস্তির নিঃশ্বাস ফেলল পরেশ। মাণিক এসে দাঁড়াল কাছে। ধুতি পাঞ্জাবী ধোপদুরস্ত তার, পায়ে স্যাণ্ডাল, চোখে ধূর্ততার স্নিগ্ধ দীপ্তি। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি।

"এই যে মাণিক-তুমি"—

"তুই লেট এসেছিস"—

"লেট। না তো - হয়ত দশ মিনিট" -

"দশ মিনিট কম হোলো বুঝি? খুব বাবা—আরে 'টাইম ইজ মানি' তা জানিস দশ মিনিটে তাদের আড্ডায় পঁচিশ ত্রিশ টাকা জেতা যায়। নেহাৎ বন্ধু লোক বলে আমি তোর জন্য রাস্তায় ঘুরছিলাম"— গলা নামিয়ে মানিক বলল, "আমার বাসায় গেছ্‌লি বুঝি?"

"হ্যাঁ।"

"বৌ বাগীর ধমক খেয়েছিস বুঝি? হাঃ হাঃ হাঃ- আদিখ্যেতা মাইরি " আবার গলা নামিয়ে সে বলল, "টাকা এনেছিস?"

পরেশ বলল, "এনেছি।"

"দে"—

পরেশ মাথা নাড়ল, "এখন নয়, পরে দেব'খন"—

"বটে! এত কড়া হিসেব! আচ্ছা বাবা-চল চল - পরেই বের কোরো না হয়" –

"এখান থেকে কদ্দুর?"

"একটা রিক্সা কর—পাঁচ মিনিট লাগবে"—

"হেঁটেই চল ভাই মানিক"—

মানিক মুখ বিকৃত করল, "প্রথমেই মেজাজ খারাপ করে দিচ্ছিস খাইরি-চার আনা পয়সার জন্য এত! আরে মেজাজ ঠিক না থাকলে সত্যব্রতবাবুকে নরম করব কি করে?"

"আচ্ছা চল, রিক্সাই কর"—পরেশ বলতে বাধ্যই হল। কিন্তু তাহলে বাঁচবে চল্লিশ টাকা আট আনা। মানিক বলেছে চল্লিশ টাকা লাগবে। কি হবে কে জানে?"

রিক্সা চলে টুনটুন শব্দ করে। চলতে চলতে একজন পথচারিণীর দিকে চোখ গেল পরেশের। বড় সুন্দর মুখটিতো! শোভার কথা মনে পড়ল তার। কখন ফিরবে সে? শোভার মুখোমুখী কখন দাঁড়াবে সে? সারাদিনের এই অসহ্য ক্লান্তির স্তূপে ভারাক্রান্ত দেহে কখন একটি আশ্চর্য উত্তাপের সৃষ্টি হবে? এই দেহকে বাঁচাবার জন্য, সাজাবার জন্য, সারাদিনের দেহপাতের পর দেহের বেউলে একটি বাসনার দীপ জ্বালিয়ে সে কখন আবার বাঁচবার রসদের জন্য প্রার্থনা জানাবে?

মানিক চেঁচাল, "এই রিক্সা-রোখ্‌কে বাবা-হ্যাঁ"—

একটা বাড়ীর নীচের তলা। বাইরের ছোট্ট ঘরে লাল সুতো দিয়ে কার্পেটের ওপর লেখা 'পতিপরম গুরু'। সেটি বাঁধানো হয়ে দেয়ালে ঝুলছে। দেয়ালে কালীঘাটের মা কালীও আছেন। আর আছে সত্যব্রত সেনের যৌবনকালের ছবি। কিন্তু—পঞ্চাশ বছরের সত্যব্রতবাবুকে দেখে মনে হ'ল যে ছবিটা তাঁর গত জন্মের। মাথায় নিটোল একটি টাক, ললাটে একঘেঁয়ে কেরাণী জীবনের অনেক কাটাকুটি, চোখে নিরুদ্যম ভাব। ঘরে ঢোকবার আগে মানিক বলেছিল যে সত্যব্রত আফিং খান।

লোহার চেয়ারে বসে বাঁ পায়ের ওপর ডান পা তুলে দিয়ে সত্যব্রতবাবু পরেশের নানারকমের স্তুতিবাচনের পর বললেন, "হুঁ-চেষ্টা করে দেখব – তুমি যখন বলছ মানিক"—মানিক দাঁত বের করে হাসল, "চেষ্টা টেষ্টা নয় সত্যদা"—আপনাকে এ কাজটা উদ্ধার করেই দিতে হবে-গোবর্ধনবাবু আপনার কথা রাখবেন" -

"দেখি—তা মানিক, তোমার দুটো কথা বলার ছিল"—

"বেশতো দাদা - বলুন—পরেশ, তুই একটু বাইরে গিয়ে দাঁড়াতো"—

পরেশ বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। ভেতরে ফিস ফিস কথা শোনা গেল দু'একটা। তারপর মানিক বেরিয়ে এল বাইরে।

গলা নামিয়ে মানিক বলল, "দশটা টাকা বের কর-সত্যব্রত বাবুকে দিতে হবে"—

"ওকে?"

"দাঁত্রে বাবা – আফিং এর খরচা না দিলে আফিংখোরি: ন:বে না"—

পরেশ টাকা বের করে দিল।

মাণিক ভেতরে গেল। আবার ফিসফিস কথার শব্দ। কান পাতল পরেশ।

"না না এত কথা"—সত্যব্রতবাবুর গলা।

"নিবু সত্যদা'—কাজ হলে আবার"—

"কিন্তু পাঁচ টাকা নিয়ে"—

"নিবু দাদা—লক্ষ্মীটি চাকরি হলে একমাসের মাইনে কেটে নেবেন'খন"—

তার মানে ওই দশটাকার থেকেও মাণিক পাঁচ টাকা মারল। তা হোক। একবার চাকরিটা হোক। দরকার হলে একমাসের মাইনে ও সত্যব্রতবাবুর হাতে তুলে দেবে। আর সইতে পারা যায় না এই নিবু-নিবু জীবনের জ্বালা—।

"ভেতরে আয় পরেশ"—

পরেশ ভেতরে গেল।

সত্যব্রতবাবুর ডান পা এখন বাঁপায়ের ওপর দুলছে। তিনি বললেন, "শোন মাণিক, আমি যা বলবার তা তো বলবই কিন্তু যাকে বলে নির্ঘাৎ কাজ হবে তার খবরটি দিচ্ছি তোমাদের"—

"বলুন দাদা বলুন"—

"কিন্তু প্রমীস্ কর যে কাউকে বলবে না আমার কথা"—

"কোন শা—বলে দাদা—মাপ করবেন"—

"তাহলে গোবিন্দ গাঙ্গুলী লেনের চুয়াল্লিশ নম্বর বাড়ীর নীচের তলায় গিয়ে হেনা দেবীকে ধরবে"—মাণিক ভুরু কুঁচকে বলল, "হেনা দেবী! তিনি কিনি দাদা?"

সত্য ব্রতবাবু ডান পা দোলানো বন্ধ করে বললেন, "তিনি গিরি গোবর্ধনধারিণী"—

"এঁ্যা!" পরক্ষণেই মাণিক চাপা গলায় হাসল, "বুঝেচি সত্যদা'—দাদা, ঠিক বলেছেন, এবার নির্ঘাৎ কাজ হবে। এই দেবীকে দেখেছি দু'একবার বটে কিন্তু ভেতরে ভেতরে যে এত কথা—"

সত্যব্রতবাবু বাধা দিয়ে বললেন, "বাজে কথায় দরকার কি মাণিক—যা বলাম তাই করগে—যাও এখুনি—বুঝলেন পরেশবাবু হাতজোড় করে 'মা-মা' বলে ডাকবেন বারকয়েক, ব্যস্ তাহলেই হয়ে যাবে"—

"হাঃ হাঃ হাঃ-বেড়ে বলেছেন সত্যদা'—"

"আঃ—হাসছ কেন হে?"

"আজ্ঞে হাসি পেল যে"—

আবার রিস্কায় চাপাল মাণিক। আবার চার আনা বাজে খরচ। মা-গা-মনে মনে গাল পাড়ে পরেশ। পয়ের ধনে পোদ্দারী করছে ব্যাটা। তা হোক, মা কালী যেন মুখ রাখেন। হেনা দেবীর মনে যেন দয়া হয়। দু'শো টাকার এই চাকরিটা পেলে বেঁচে যাবে পরেশ। শোভার মুখে হয়ত তাহলে একটু হাসি ফুটবে, তার গালের টোলটা আবার পরিষ্কার দেখা যাবে—কখন ফিরবে সে বাড়ী? কখন সে শোভার হাতটি ধরে—

"রিক্সা রোখো—আমলো যা—বাঁয়ে বাবা-বাঁয়া"—

চুয়াল্লিশ নম্বর বাড়ীর দরজাটা খোলাই ছিল। কড়া নাড়তেই একজন পুরুষের গলা শোনা গেল, "কে?"

মাণিক বলল, "একবার শুনে যান দাদা"

দাদা এল। দেখে বোঝা গেল যে সে বাড়ীর বাজার সরকার হতে পারে কিংবা সোজা কথায় চাকর। কিন্তু চাকর-চাকর ভাবটা নেই কাপড় জামায়। নীচু থেকে ওপরে ওঠার চেষ্টা আছে সব কিছুতে। বয়স আন্দাজ চল্লিশ।

"কাকে চাই?" লোকটি প্রশ্ন করল।

"হেনা দেবী আছেন?"

লোকটি ভুরু কুঁচকে তাকাল, "কেন?"

"দরকার আছে।"

"কি দরকার? আপনারা কে?"

"আমরা এদিকেই থাকি—হেনা দেবী'র দয়া হলে আমাদের উপকার হতে পারে বলে একবার এসেছি,"—

"কি উপকার ?"

"একটা চাকরি"—

"চাকরি !"

"কার সঙ্গে কথা বলছ যতীনদা' ?' বলতে বলতে পরদার ওপাশ থেকে এসে দাঁড়াল একটি যুবতী স্ত্রীলোক। বয়স কুড়ি-একুশ হবে। গা-ভর্তি গয়না, চোখের কোণে কাজল, পানের রসে রাঙানো ঠোঁট।

"চিনিনা দিদি—এরা খোঁজ করছেন তোমার—তোমার কাছে চাকরি চাইতে এসেছেন"—যতীন মুচকি হেসে বলল।

"এঁ্যা ! ওমা-আমি চাকরি কোথায় পাব যতীনদা ? হি-হি-হি" —

হেনা হাসতে লাগল। হাসির বেগে তার যৌবনপুষ্ট দেহ কাঁপতে লাগল। তার পরণে দামী সিল্কের সাড়ী, হাসির দমকে আঁচলটা বার দুই বুক থেকে নেবে গেল। ঝকঝকে, সুন্দর দাঁত মেলে হেনা হাসতে লাগল। আর তাকে দেখে পরেশের মনে পড়ল যে এককালে শোভাও হাসত প্রাণ খুলে. অতি অল্পে আর হাসলে সুন্দর দুটি টোল পড়ত তার দু'গালে—

"বসুন বসুন—খুলে বলুন সব কথা"—হঠাৎ হাসি থামিয়ে হেনা বলল।

বাইরের ঘরটা বেশ সাজানো গোছানো। শিল্পিগোবর্ধনের মাহাত্ম্য বেশ টের পাওয়া যায়। বসল পরেশ ও মাণিক। খুলে বলল সব কথা।

পরেশ সবশেষে হাতজোড় করে বলল, "আটটি পেট মা-একবেলাও ভালো করে খাওয়াতে পারিনা—লজ্জা নিবারণটুকু পর্যন্ত কষ্টেসৃষ্টে হয়—দয়া করে গোবর্ধনবাবুকে একটু বলে আমার একটা হিল্লে করে দিন মা" –

"হি হি হি—হি হি হি"—হেনা আবার হাসতে শুরু করল। পরেশকে কনুই দিয়ে গুঁতো মারল মাণিক—অর্থাৎ চুপ করো। চুপ করে ওরা তাকিয়ে দেখতে লাগল হেনার হাসি। উচ্ছল, ঝর্ণার মত হাসি। সে হাসি দেখে পরেশের আবার শোভার কথা মনে পড়ল আর রক্তে যেন জোয়ার এল —

"ওমাগো—শুনছ যতীনদা—আমায় 'মা মা' বলছে"—

যতীন বলল, "ঠিকই তো বলছে"—

"ঠিকই বলছে ! কিন্তু আমার যে হাসি পাচ্ছে—হি হি হি"—

পাগল নাকি মেয়েটা ! হঠাৎ যেন বাতাসে গন্ধ পেল পরেশ। হেনা মদ খেয়েছে বোধ হয়।

হাসি বন্ধ করল হেনা, বলল, রাগ করছ বুঝি যতীনদা—রেগো না। দেখুন, আপনারা কিছু মনে করবেন না—ও আমার স্বভাব, বুঝলেন, আমার কথায় কথায় হাসি পায়—হি হি হি" আবার একটু হেসে হাসি বন্ধ করে হেনা মাণিককে বলল, "দেখুন পরেশবাবু"—

মাণিক বলল, আমি নই ও পরেশ—

"তাই নাকি—ওমা—হি হি হি—কেমন ভুল করে বসলাম দেখুলেন ! হি হি হি—দেখুন পরেশবাবু, আমি চেষ্টা করব—ভাববেন না, মাথার ওপর ভগবান তো আছেন"—

হঠাৎ বাইরে একটা মোটর গাড়ী থামার শব্দ হল।

যতীন চমকে উঠে বলল, "কত্তাবাবু দিদি"—

হেনা চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল, "এঁ্যা। আমি ভেতরে চললাম—এঁদের এখন যেতে বল যতীনদা"—

হেনার চোখে মুহূর্তের জন্ত যেন ভয় দেখা গেল। তার পরেই সে পরদা ঠেলে ভেতরে চলে গেল।

যতীন দ্রুত ও চাপা গলায় বলল, "আপনারা কেটে পড়ুন মশাইরা—গোবর্ধনবাবু এসেছেন"—

পরেশ ও মাণিক উঠে দাঁড়াল কিন্তু দু'পা এগোতে গিয়েই থমকে দাঁড়াল তারা। জুপিটার স্টীল ফ্যাক্টরীর একমাত্র স্বত্বাধিকারী ঘাড়োয়ার-নিবাসী গোবর্ধনলাল বেগবান স্টীল

হেলোরের মত ঘরের ভেতরে ঢুকে টলতে লাগলেন। বোঝা গেল যে তিনি মদমত্ত।

"ষতীন"—

"আজ্ঞে?"

"এরা সব কারা আছে?"

"আজ্ঞে ইনি পরেশবাবু আর ইনি মাণিকবাবু"—

পরেশ হাত জোড় করে বলল, "নমস্কার স্যর"

"চোপ্‌রও"—গোবর্ধনলাল পরেশকে ধমকালেন, তারপর আবার ষতীনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এরা এখানে এসেচে কেনো?"

"আজ্ঞে এমনি—আমার সঙ্গে দেখা করতে- এক গাঁয়ের লোক"—

"শালা—তোমাকে হামি জুতিপেটা করেগা"—

"আজ্ঞে হুজুর!"

"শালা তোমাকে কহা নেই কি এবাড়ীমে কোই শালা লোক আয়েগা?"

"আজ্ঞে বলেছেন—আর কখনো কেউ আসবে না"—

"চোপরও নিমক হারাম"—বলেই পরেশদের দিকে তাকালেন গোবর্ধন লাল, বললেন, "তোমাদের পুলিশে দিব মাল"—

পরেশ হাত জোড় করে বলল, "আজ্ঞে মাপ করুন"—

"না না—আমি জেলে দিব তোমাদের"—

মাণিক বলল, "এবারটি মাপ করে দিন স্যর—এর পর যার কোনোদিন এ দিকে পা দেব না"—

হঠাৎ দু'পা এগিয়ে এসে ঠাস্ করে মাণিকের গালে একটা চড় কষাল গোবর্ধনলাল, বলল, "গেট আউট"—

মাণিক এক লাফে চৌকাঠ পেরিয়ে বেরিয়ে গেল, পেছন পেছন পরেশ।

দড়াম করে দরজা বন্ধ করার শব্দ হল আর গোবর্ধনলালের মত চীৎকার শোনা যেতে লাগল, "শালা, তোমাকে পাহারা দিতে রেখেছি বিশোয়াস করে—আর তুমি"—

বাড়ী থেকে দূরে সরে এসে গালে হাত বুলোতে বুলোতে গোবর্ধনের নামে খিস্তি আওড়াতে লাগল মাণিক। দেখে নেবে সে ঐ মোটা লম্পটটাকে। সারা হাওড়ার লোক জড় করবে সে ব্যাটাছেলেকে সে—

হঠাৎ পরেশের দিকে তাকাল মাণিক, "তোর জন্যেই হল এ কাণ্ড"—

পরেশকে সায় দিতে হল, "হ্যাঁ আমি দুঃখিত মাণিক"—

"আরে ধ্যেৎ—এবার টাকা বার কর্ পরেশ"—

"টাকা! কিন্তু কাজ যে হ'ল না মাণিক"—

মাণিক ভুরু কুঁচকাল, "কাজ হলনা মানে? সত্যব্রতবাবু কথা দিল না?"

"কিন্তু এখানে যে বিগড়ে গেল সব গোবর্ধনবাবুর কাছে গিয়ে দাঁড়ালে কি আর চাকরি হবে?"—

"সে সব আমার ভাবনা নয়—যা কথা হয়েছে সেইমত চল্লিশ টাকা ছাড়ো দেখি—অনেক রাত হয়েছে—তাস নিয়ে বসলে এতক্ষণে আমার বেশ কিছু হত"—

"চাকরিটা হয়ে যাক তারপর দেব মাণিক—মাইরি বলছি—তোমায় আমি একমাসের মাইনে দেব মিষ্টি খাবার জন্য"—

মুহূর্তে মাণিকের মুখচোখ কুৎসিৎ হয়ে উঠল, সে বলল, "বেশী চালবাজি করিস্‌না পরেশ—টাকা বের কর্"—

পরেশ মুহূর্তকাল তাকাল, তারপর পকেট থেকে বের করল সব টাকা পয়সা, তুলে দিল মাণিকের হাতে।

মাণিক গুনল সব, বলল, "চোদ্দটাকা চার আনা। আর ছাব্বিশ টাকা কই?"

"আর নেই মাণিক—মাত্র চব্বিশ টাকা জোগাড় করতে পেরেছিলাম—তার থেকে দশ টাকা সত্যব্রত"—

"আমি তো বলেই ছিলাম পঞ্চাশ লাগবে সবশুদ্ধ"—

(সেষাংশ ৫০৯ পৃষ্ঠায়)

'বাঁচা গেল!'

গৃহস্বামী স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন, 'একেবারে সামনা সামনি ফ্লাট, ভয় ছিল কে না কে আসে কী রকম না জানি লোক হয়! যাক বাঁচা গেল। ভদ্র বাঙালী শুধু স্বামী স্ত্রী—'

শেষ পর্য্যন্ত অবশ্য কথাটা শেষ করতে হলনা তাঁকে। হবার কথাও নয়। ভুলতথ্য পরিবেশনের দায়ে থামতে হ'ল। কারণ সামনের ফ্লাটে লোক আসার ভূমিকা থেকে সমাপ্তি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখা হয়ে গেছে আমার। ঘর সংসারের কাজে ত্রুটি করেও রেখেছি। না দেখে কখনো পারা যায়? সামনের পড়শী বলে কথা, না জেনে নিশ্চিন্তি থাকা যায়? তাদের ক'জন মেম্বার, কেমন বা হাল চাল, কি প্রকার আসবাব পত্র, এবং রুচিটা আধুনিকী না পৌরানিকী!

হ্যাঁ, পাকা রাঁধুনীরা হাঁড়ির একটা ভাত টিপলেই ধরতে পারে সমগ্র ভাতের অবস্থা কি! অতএব ভুল তথ্য পরিবেশনকারীকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, 'স্বামী স্ত্রী, এ খবরটি আবার কে দিল তোমায়?'

তিনি অবশ্য প্রথম বক্তার হার মানলেন না। প্রতিবাদের পথেই এলেন, 'কে বললে মানে? এতে আবার বলবার কি আছে? একটা ফ্লাটে শুধু দু'জন মাত্র—'

'ও ভাই!' আমার ভুলে ভীরু ব্যাঙের বাপ পরাই, 'শুধু দু'জন! অতএব! কেন দৈবক্রমে কোন সংসারে শুধু দু'জন মেম্বার থাকতে পারে না? হয় মা-বাপ ভাই বোন চারজন ছিল, দু'জন গত হল! বাকী দু'জন? অগত্যাই তারা 'মাত্র দু'জন' হয়ে পড়তে বাধ্য কি না? আমি বলছি ভাইবোন।

'কল্পনাকে অত বিস্তার করলে, আরও অনেক কিছুই ভেবে নেওয়া যায়। কিন্তু তোমাকেই বা একথা কে বলল, ভাই বোন!'

'বলল স্বাভাবিক বুদ্ধি, সামাজিক জ্ঞান', সগর্ব হাস্য করি, 'অভিজ্ঞ চক্ষু! মেয়েটা বিধবা এটুকুও নজরে পড়ল না?'

'বিধবা!'

ভদ্রলোককে থতমত খেতেই হয়।

'বিধবা মানে?'

'মানে? মানে স্বামী নিই না! সত্যি তোমাদের কি কোন দিকে দৃষ্টি থাকে না? দেখতে পেলে না মেয়েটার কী সাজ! ন্যাড়া হাত, ন্যাড়া গলা, ন্যাড়া কান, সিঁথিটা শাদা ধবধব করছে, আর পরণে একখানা শাদা

সাজবদল

আশাপূর্ণা দেবী

সিল্কের থান। আঠারোর মধ্যে বা হাতে কালো ব্যাণ্ডে একটা ঘড়ি। নির্ঘাৎ অফিসে কাজ করে। সর্ব্বাঙ্গে কেমন চাকুরে মেয়ে চাকুরে মেয়ে ভাব!'

'এক নজরে এত বুঝতে পার তোমরা?'

'পারবো না মানে? শৈশব থেকে দৃষ্টির চর্চা করে এলাম তবে কি করতে?'

বিজয়িনীর গৌরব নিয়ে উঠে যাই।

আজই গিয়ে আলাপ করে আসতে হবে। প্রথম দিনেই ভাল, চক্ষুলজ্জা কম হয়। চট করে গিয়ে বলা যায়, এই এলাম আলাপ করতে! দু'চার দিন গড়িয়ে গেলে ভাবনা আসে, কেমন লোক, কী বলবে!

গেলাম।

বিকেল না হতেই গিয়ে পড়লাম চুপ করে। আজ রবিবার আজই ঠিক, যদি অনুমান ভুল না হয়, কালতো অফিসে ছুটবে।

সেই কথাই বলি, 'আজই এলাম কি জানি কাল বাড়ী থাকেন কি না থাকেন!'

মুক্তোর মত দাঁত ঝিকমিকিয়ে হাসল মেয়েটা। হাসিটা দেখবার মত। সাজটা রিক্ত, কিন্তু মনটা বোধ হয় অতিরিক্ত! নইলে মুখে এমন লাবণ্য, হাসিতে এমন ঔজ্জ্বল্য!

হাসল।

হেসে বলল, 'বলেছেন ঠিকই। সকাল হলেই তো আবার সেই ঘানি গাছে—'

'অফিসে কাজ করেন বুঝি?'

'না করলে?' মেয়েটা হাসির ঝাপটায় উথলে ওঠে, 'এযুগে কেউ কাউকে বসিয়ে খেতে দেয়?'

বেচারা! দুঃখকে হাসির আবরণে ঢেকে জীবনকে সহনীয় করতে চায়। ভাবলাম, বাস্তবিক সত্য আর আধুনিক হয়ে আমরা নতুন কী করছি? সমাজে বিধবার অবস্থা তখনও যা ছিল, এখনও তাই আছে! তখন চারবেলা হাঁড়ি ঠেলতো, এখন পুরোবেলা বলম ঠ্যালে। অথচ হাঁড়ি ঠ্যালাটাও বোঝার ওপর শাকের আঁটি, বস্তার উপর তাতের কাঠি হয়ে রয়ে গেছে। ঘরবার সামলাতে সামলাতে ফেরবার ঘরে থাকে মেয়েরা। এমনিই থাকে তার ওপর আবার যার ভাগ্য বিরূপ, তার তো কথাই নেই।

ছেলেটাও হাসিখুসি।

এক লহমায় বৌদি পালিয়ে ফেলল।

'দেখছেন বৌদি দেখছেন? এক মিনিট দেরী সইলনা, মুক্ত হয়ে গেল নিজে?'

আমি দুকুল বজায় রাখি। 'না নিজে আর কি, ঠাট্টা করে বলছে। তা কাজ কর্ম করাই ভাল, সন্তর্পণে কথা শেষ করি, 'তাতে মন ভাল থাকে। কাচ্চাবাচ্চাও তো নেই একটি—'

ওরা দু'জনে মুখে কাপড় দিয়ে হেসে ওঠে। মেয়েটা তার শাদা ভয়েল খানের আঁচল, ছেলেটা রুমাল।

এত হাসির কি পেল ওরা?

আবার ছেলেটিই আলগা ধমক দেয়, 'এই কী অভদ্রের মত হাসা হচ্ছে? বৌদি ভাববেন কি?'

মেয়েটা হাসি থামায়, লাল লাল মুখে বলে, 'একুনি কিন্তু সে অভাবে মন খারাপ হবার অবস্থা হয়নি আমাদের! এইতো মাত্র চারমাস বিয়ে হয়েছে!'

বিজয় গৌরব ধূলিসাৎ করে বাড়ী ফিরে রাগে কেটে পড়লাম!

ছি ছি ছি!

কী লজ্জা! কী লজ্জা!

—ভাগ্যিস বলে ফেলিনি। মুখে তো আসছিল, 'এই দুটিই তাই বোন বোন হয়?···কতদিন এমন হয়েছে?

'হল কি?' প্রশ্ন করেন যাঁর কাছে এসে কেঁদে পড়েছি।

আমি রাগে দুঃখে স্তব্ধবাক।

মেয়েটা যেন আমাকে খুব একটা অপমান করেছে। আধুনিকতার ললাটে সম্মার্জনী প্রহারে বিধাযাত্র না করে বলি, 'চারমাস যোটে—বিয়ে হয়েছে, একটা সাধ আহ্লাদও কি নেই? সর্বাঙ্গের আভরণ ঘুচিয়ে বিধবা সেজে বসে আছে! ফ্যাসান করবার আর কোনো উপায় আবিষ্কার করতে পারলিনা! ছিঃ!

'তা আজকাল তো অনেকেই—মানে কাজের সুবিধের জন্যে—' বললেন ইনি। কিন্তু কথার শেষ করতে কোনদিনই পাননা, আজও পেলেন না। বললাম—

'থাম তুমি! কাজের সুবিধের জন্যে কাপড়ের পাড়টা ঘুচে ফেলতে হবে? সেটা এত কি অসুবিধে ঘটাচ্ছিল?'

শ্রোতা হাসেন।

বলেন, 'ওরা তোমার ছেলেবৌ নয় ভাগ্যিস!' তা ওরা আমার কেউ নয়। তবু রাগ সামলাতে পারি ন।

কিন্তু সে রাগ বেশীদিন রাখতে পারা গেল না। ছেলেটা আর মেয়েটা আমার চিত্ত জয় করে বসেছে। ওরা যখন তখন এসে হানা দেয়, হাসিতে গল্পেতে সৌখিন গুনগুনিতে ঘরের হাওয়া হালকা করে তোলে, খাবার চেয়ে খায়, খাবার জন্যে নেমন্তন্ন করে যায়।

ওর ওই রিক্ত মূর্তিটা দেখে দেখে চোখে একরকম সয়ে গেছে, মুখের লাবণ্য আর দাঁতের-আলোয় বুঝি অনেক ত্রুটি পূর্ণ হয়ে যায়। তবু বলতে ছাড়িনা।

রাগ নয় অনুযোগ।

'আচ্ছা, এটা তোমার কী ফ্যাসান! একেবারে সর্বত্যাগিনী মূর্তি! ছেলেমানুষ, গয়না কাপড় পরবে—

'বলুন মা, বলুন, ওই আপনার আদরের দেবরটিকে। কিছু পরতে দেয় না সুধা-দি। বলে কিনা, বিয়ে হয়েছে একথা সর্বাঙ্গে লেগে বেড়াবার দরকার কি? কই ছেলেরাতো বিয়ে করে বেশ পালটায় না?'

মুকুল, মানে ছেলেটা, সোৎসাহে বলে ওঠে, 'হ্যাঁ ঠিক তো। বলুন ঠিক বলি কিনা? আর এতে ক্ষতিটা কি?'

আমি রেগে বলি, 'ক্ষতি কেন। স্বামীদের ষোলো আনা লাভ। সোনার তরি ঘুণো টাকা হলেও এসে যাবে না কিছু।'

'ঠিক ধরেছেন।' হেসে ঘর ভরিয়ে দেয়।

কবি বলে, 'আমার মা কত রাগ করে!'

'সবাই রাগ করবে। আমিও করি। যতই হোক বাঙালীর মেয়ে, একটা সংস্কার তো আছেই।'

'ওই, ওই নিয়েই তর্ক!' মুকুল এবার একটু গম্ভীর। 'ওই কুসংস্কারটা ভাঙা দরকার! চ্যালেঞ্জ করেছি ওকে। বলেছি, তোমাদের হিন্দু শাস্ত্রে পতির অবশ্যপালনীয় যা যা আছে, সব করবে, দেখি, তোমার সেই মহাপাতকের ফলে আমি ভবধাম থেকে বিদূরিত হই কিনা।'

'ওই, ওই! দেখছেন তো সুধাদি, রাত দিন ওই করে।'

আমি বলি, 'তা' তুমি ওসব ফাজলামি শোন কেন ভালভাবে সাজটাজনা কেন?'

কবি একটু চোরা হাসি হাসে।

মুকুল হেসে ঘর কাটায়। 'বাজে কথা শোনেন কেন? কবিও পরীক্ষা চালাবার মধ্যে নেই ভেবেছেন?'

'জানিনা ভাই তোমাদের এ আবার কি সখের খেলা।' বলে চা ঢালতে বসি।

ওরা চা খায়, বাদাম ভাজা খায়, জগতের সুমস্ত তত্ত্ব আর আতঙ্কের মালিন্য ওদের শুভ্র হাসি দিয়ে মুছে নিয়ে তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায়। ওদের ফ্ল্যাট আমার ঘরের সামনে। ঘরে না ঢুকে রাস্তার নামতে দেখে বলে ওঠি,' এত রাত্তিরে আবার কোথায় ?

'এই একটু পথে পথে ঘুরে বেড়াইগে হা-ঘরে হতভাগাদের মত।'

'বেশ একটা লোভনীয় অবস্থা কেমন ?'

'মন্দ কি ? রাস্তার লোক ভাববে, 'আহা ঘর নেই বোধহয় ওদের, তাই এমন জ্যোৎস্না রাত্রে বেলফুলের মালা গলায় ঝুলিয়ে হাতে বসে না থেকে চট্ট বসটাতে বসটাতে রাস্তায় ঘুরে মরছে।'

হাঁা, মুকুলের কথার ধরণই অমনি।

আমি আমার বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখি, সুখে বিগলিত হয়ে, প্রায় গলাগলি করে 'দুঃখী হতভাগার মত' পথে ঘুরতে যাচ্ছে ওরা।

'যাই বলো, বেহায়ার হাড়!' না বলে পারি না। ভালবাসলেও সমালোচনা না করে থাকা যায় ?

ভদ্রলোক মৃদু হেসে বলেন, 'বাড়ীর জানালায় এলাকা পর্য্যন্ত তো দিব্যদর্শন! তাই ওইটুকুতেই মুর্চ্ছা যাচ্ছ। জগতের পথে ঘুরলে বুঝতে। 'বেহায়া' শব্দের অর্থ কি।'

'থাক, আমার আর অর্থ জেনে কাজও নেই।'

'জেনে কাজ নেই, কিন্তু দেখার কৌতূহলেরতো সীমা নেই।'

রেগে অস্বীকার করি।

কিন্তু কথাটা সত্যি।

ওদের ফেরাটা দেখবার জন্যে অনেকক্ষণ অবধি— বারান্দাতেই কাটাই। তা ফিরতেও দেখি।

দেখি রাস্তা মুখর করে, ফিরছে।

হয়তো একগোছা রজনীগন্ধা কিনেছে, সেটাই দোলাতে দোলাতে আসছে, নয়তো বেচেটা খোঁপায় গোড়ে মালা গুঁজিয়ে রাস্তা মুখর করে ফিরছে।

মাঝে মাঝেই লাইট পোষ্টের আলো গুলো মুখে পড়ে, ওর ওই নিরাভরণতার সঙ্গে গোড়ে মালাটা যে নিতান্ত দৃষ্টিকটু আর বেমানান, তা মনে পড়ে না।

মনে হয় যেন সর্বালঙ্কারভূষিতা হ'য়ে চলেছে।

ওরা যদি এত সরল আর এত গায়ে পড়া না হতো, নির্ঘাৎ ওদের হিংসে করতাম আমি।

কিন্তু আমি হিংসে না করলেও, অলক্ষ্য জগতের এক নিষ্ঠুর দেবতা যে ওদের ওপর ক্রুর হিংসার দৃষ্টি ফেলে বসেছিলেন, একথা কে ভেবেছিল ?

প্রত্যেকটি মানুষের সুখের ঘরে, সিন্ধি নিয়ে যিনি বসে থাকেন, আর অসতর্কতার কেউ প্রাণের অতিরিক্ত পেয়ে ফেল কিনা, সে দিকে, কড়া নজর রাখেন, সেই ভাগ্য-দেবতার আঘাত আসে অবিশ্বাস্য নিষ্ঠুরতা নিয়ে।

দু'চার দিন জ্বর!

যার কয়েক ডাক্তারের আনা-গোনা।

তারপর, এক হিম শীতল স্তব্ধতা! আমার সামনের ফ্ল্যাটটা কি হঠাৎ তুষার বর্ষণে জমাট হয়ে গেছে!

স্তব্ধতার এমন ভয়াবহ রূপ আর কখনো দেখেছি বলে মনে পড়ছে না।

শুধু—

জামাইয়ের অসুখ দেখতে এসে থেকে যাওয়া বিধবা ভদ্রমহিলাটির ক্ষীণ কণ্ঠের আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায়

এক আধ দিন। 'ওরে—আমি কি এই করতে এসেছিলাম রে। ওরে আমি কেন গেলাম না রে।'

জগতের চরমতম প্রশ্ন।

প্রিয়জনের মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কে না উচ্চারণ করে। 'আমি কেন আগে গেলাম না।'

কিন্তু যে কণ্ঠ ভাগ্যের অবিশ্বাস্য নিষ্ঠুরতায় মূক হয়ে যায়?

দিনরাত্রির বারবার আসাযাওয়ার হিজিবিজি, সেই কীণ কণ্ঠও ক্রমশঃ শান্ত হয়ে যায়। ক্রমশঃ দেখতে পাওয়া যায় সেই প্রৌঢ়া মহিলাটি ক্লিষ্ট মুখে ক্লান্ত পদক্ষেপে প্লাষ্টিকের সাজিতে বাজার নিয়ে ফিরছেন, দেখামাত্র ফেরিওলা ডেকে বিরক্ত স্বরে বচসা করছেন। থেকে যেতে হয়েছে ওঁকে। উপায় কি!

ওই ফেরিওয়ালাটাকে চিনি?

ওই প্লাষ্টিকের সাজিটাকেও আমার দেখে দেখে মুখস্ত। দু'জনে একসঙ্গে হাতে গলিয়ে রাজ্যের আনাজ পাতি ফল শাক নিয়ে ফিরতো। রান্নায় ভারী উৎসাহ ছিল দু'জনেরই। আমার চোখে পড়লেই বলতাম, 'বেহায়ার হাড়! আসতে দেখে রান্তা দিয়ে! বৌয়ের তো ওই সাজের ছিরি! রাস্তার লোকে ভাববে কি!'

ভাবছি, না বললেও তো পারতাম!

ভাবছি—রুবি ওই সাজিটা ওর মাকে না দিলেও তো পারতো!

কিন্তু রুবি কোথায়?

রুবিকে আমি এপর্যন্ত কোনদিন দেখতে পাইনি। সেই ভয়ঙ্কর শুরুতা, সেই হিমশীতল নৈঃশব্দের মধ্যে রুবি কি পাথরের পুতুল হয়ে গেছে।

আমি কি যাবো?

ওই প্রৌঢ়া মহিলাটির সঙ্গে আলাপ করবো? আক্ষেপ করবো? হা হুতাশ করবো? বলবো, 'আহা কী হয়েই গেল!'

বলা যায়?

সামনের ফ্ল্যাট আমার আমার সংসারকেও বাজুতের আঘার ঝাপট মেরে গেছে। জড় হয়ে পড়ছি, কথা ভুলে যাচ্ছি। কী দরকার ছিল ওদের আমার বাড়ীতে এসে হানা দেবার? আমার ওই সোনালি পেয়ালা দুটোয় চা খাবার?

পেয়ালা দুটো নিয়ে আমি রাখি কোথায়? করি কি?

উনি বলছেন, 'তোমার যাওয়া উচিত ছিল!'

যেতে পারিনা। অনেক একটা ভয়ে হাতপা গুটিয়ে যায়। রুবি কি আর অফিসে যাবে না?

ফ্ল্যাটের দরজায় চাবি দিয়ে ওদের দু'জনের একসঙ্গে ব্যাগ দুলিয়ে বেরিয়ে পড়ার ছবিটা, চোখ থেকে মুছে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে পারিনা।

দু'জনের জায়গায় একজন! সে আর যাবেনা তা'হলে। একটা অজ্ঞাত কোটরে লুকিয়ে থাকতে থাকতে ফুরিয়ে যাবে!

কিন্তু তাই কি হয়?

বিধাতার চরমতম হিংস্রতা 'ভাত!' ভাতের জন্যে মানুষের সমস্ত স্বাধীনতার বিলুপ্তি! সমস্ত বিদ্রোহের সমাপ্তি।

তাই অনেক দিন পরে একদিন মেয়েটাকে আবার

ব্যাগ হাতে করে বেরোতে দেখি। দোলাতে দোলাতে নয়। মুঠ হাতে ধরেছে। দরজায় চাবি দিতে হয় না, ভিতর থেকে বন্ধ করবার লোক আছে। কতদিন দেখা নেই, থাকতে পারিনা। চটিটা পায়ে গলিয়ে নেমে আসি। সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় হাঁটি।

'যাচ্ছেন কোথায়?'

আস্তে জিগ্যেস করে, ও।

ইতস্তত: করে, বলি 'না এমনি। তোমায় বাস পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে, আসি চল।'

ও মুখ তুলে একটু হাসে।

হাসি।

তা। হাসিই বলতে হবে বৈকি।

খানিকটা চলে ও হঠাৎ বলে, 'আচ্ছা সুধাদি, ও কথা আপনার বিশ্বাস হয়?'

চমকে উঠি; 'কোন কথা?'

'এই—ইয়ে সোহা সিঁদুরের জন্যে কিছু হয়।'

সংস্কারাচ্ছন্ন মনে কতদিন শুধু ওই কথাই ভেবেছি। সেই ভয়ঙ্কর দিনে এমন কথাও মনে হয়েছে ছুটে গিয়ে বলি, 'লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে, হ'ল তো? পরীক্ষার ফল পেলি তো হাতে হাতে!'

কিন্তু এই মুহূর্ত্তে ওই শুকনো শাদাটে মুখের দিকে তাকিয়ে সে কথা শুধু বলতেই বাধল তা' নয়। বিশ্বাস করতেও বাধল। শুকনো গলায় বললাম, 'তাই কি আর সত্যি? ওটা একটা মেয়েলি সংস্কার মাত্র। বাঙালী ছাড়াতো আরও অনেক জাত।'

ওর বাস এসে গিয়েছিল, বলল, 'আচ্ছা!' আর হঠাৎ আর একবার ফিরে বলল, 'আমি ভেবেছিলাম আপনি হয়তো রাগ করে আর আমার মুখ দেখবেন না। বলবেন ইচ্ছে করে—'

উঠে পড়ল বাসে।

ওর কথায় আমি হাসব না কাঁদব।

এই চরমতম দুর্ভাগ্যের মাঝখানে ও ভাবতে বসেছে, আমি রাগ করবো। বলবো 'ইচ্ছে করে—।'

বাসটা এখনও ছাড়েনি, দেখা যাচ্ছে ওকে। ফাঁড়া হাত ফাঁড়া গলা ফাঁড়া কান শাদা ওয়েলের ব্লাউস আর খান। আর শাদা ধবধবে সিঁথি শুধু মাঝখানে খড়ির কালো ব্যাণ্ডটা একটা রক্তের রেখা টেনে দিয়েছে।

কালো রক্তের।

অত্যন্ত লাল।

দিনের পর দিন এই সাজে ওকে অফিস যেতে দেখেছি আমি। গা সহা হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ আজ মনে হল, রিক্ততার এমন প্রখর প্রতিমূর্ত্তি আর কখনো কোথাও দেখিনি।

সাজ বদল না করেও এত বদল হল ওর কি করে?

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

মাঠের পর মাঠ শুধু সবুজ তরঙ্গ। বাতাসে হেলছে, দুলছে। ঘুরে ঘুরে তাল নারিকেলের সীমানা। কাকচক্ষু জল বিরাট সায়র। গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু, প্রাচুর্যের নিটোল, নিখুঁত এক ছবি। দেখে দেখে মনোরমার আশ যেন আর মেটে না।

উঠানে ধান বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। জন মজুরেরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিচ্ছে ধানের স্তূপ। খড়গুলো আলাদা করে রাখছে। সোঁদা সোঁদা গন্ধে আকাশ বাতাস ভরে উঠেছে। দাওয়ায় বসে মনোরমা জোরে জোরে নিশ্বাস নেয়। আ, বুকটা যেন ভরে গেল।

একরাশ কালো ধোঁয়া এসে নিঃশেষে মুছে দিল সবুজ সন্তোষ এমন একটা ছবি। ইঞ্জিনের ধোঁয়া। চোখ জ্বালা করে। ছোট ছোট কয়লার কুচি সারা গায়ে ছড়িয়ে পড়ে।

বিরক্তিতে ভ্রূ কুঁচকে মনোরমা আরো পিছিয়ে আসে। একেবারে স্টেশনের বাইরে। সোজা হয়ে হাঁটতে পারে না। কোমরের ব্যথা একেবারে কাবু করে ফেলেছে। লাঠি ধরে ধরে আস্তে আস্তে এগিয়ে যায়।

আজব শহর এই কলকাতা। মানুষের যেন আর শেষ নেই। যেদিকে চোখ ফেরাও, কেবল অগুনতি কালো কালো মাথার সার। সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত এ জনস্রোতের বিরতি নেই। গণ্ডগোলেরও কামাই নেই। সব সময় যেন তুলসীগঞ্জের মেলা বসেছে।

এই বুড়ি, বুড়ি।

স্টেশনের ফটকের মুখে ছুটো রোগা ছেলে মনোরমাকে দেখতে পেলেই এই রকম চেঁচায়।

প্রথম প্রথম মনোরমা ভাব করতে গিয়েছে। ভাল কথা বলেছে। বলেছে, ও বাবারা, এস কাছে এস।

ছেলে ছুটো কাছে আসেনি, আরো একটু দূরে সরে গিয়ে বলেছে, তুইতো একটা রাক্ষসী। তোর কাছে গেলে ধরে খেয়ে ফেলবি, তারপর ?

রাক্ষসী ? মনোরমা হাড়িয়ে পড়েছে। এ ছেলেছুটোকে সে চেনে। এরাও ওপারের চালান। স্টেশনের ফটকের মুখে টিন আর তালপাতা দিয়ে সার সার যে সব ঝুপসী আস্তানাগুলো খাড়া হয়েছে, তারই একটাতে থাকে। এদের বাপ রাস্তার উল্টোদিকে একটা দোকানে বিড়ি পাকায়। মাও কি একটা কাজ করে। বোধহয় ওষুধের শিশিতে লেবেল আঁটার চাকরি।

মনে মনে মনোরমা বিড় বিড় করে। গোলাভরা ধান, খেতভরা ফসল, ফলন্ত তালগুপরির গাছ যে নাগালের বাইরে চলে গেল, তা কি মনোরমার দোষে! দেশ ভাগ হয়ে যাবার পরেও সে মাটি কামড়ে পড়েছিল। কয়েকটা দেশনেতার কথাতেই সাত পুরুষের ভিটে পরের মুলুক হয়ে যাবে, এমন অবাস্তব, হাস্যকর কথা মানতে চায় নি।

একেবারে ছোটবেলা থেকে একই গাঁয়ের ধুলো কাদা মেখে একসঙ্গে যাদের সঙ্গে বেড়ে উঠল, তারা বেজাত, কোন সম্পর্ক নেই তাদের সঙ্গে, এমন একটা কথাও মানতে চায় নি। তাই এক এক করে গাঁ খালি হয়ে যেতেও,

মনোরমা ঘরে গিয়েছিল। শ্বশুরের ভিটের বাতি দেবার জন্য।

এদিক ওদিক থেকে গুজব কানে এসেছে। ভিন-গাঁয়ের সব খবর। মনোরমা আমল দেয় নি।

কিন্তু একরাতে ঘুম ভেঙে গেল। দরজা খুলে বাইরে এসে দেখল পশ্চিমের আকাশ লালে লাল হয়ে উঠেছে। তার উঠানে একপাল লোক। সেই রক্তরাঙা আগুনের ছায়ায় চেনা লোকগুলোকেও অচেনা ঠেকল।

মনোরমাকে প্রাণে মারেনি, অবশ্য এখন মনে হয়, তাহ'লেই যেন ভাল হ'ত। অথর্ব, জরাগ্রস্ত দেহটা রাজপথের কঠিন, নির্মম সিমেন্টের ওপর টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যেতাতে হ'ত না। পথচারীর করুণা-নির্ভর হয়ে।

যখন সীমানার কাছে এসে মনোরমা মুখ থুবড়ে পড়ল, তখন খেয়াল হ'ল সঙ্গে জোয়ান নাতিটা নেই। সে আদৌ সঙ্গে ছিল কিনা, তাও মনোরমা মনে করতে পারল না। একবার ডুকরে কেঁদে উঠেই মনোরমা থেমে গেল। কাপড়টা মুখের মধ্যে পুরে দিয়ে শব্দ বন্ধ করে দিল। পরের দেশে চোখের জল ফেলাও বুঝি পাপ।

জোয়ান নাতিটা হাওয়ায় মিশিয়ে গেল, সে দোষ কি তার! তাকে মনোরমা কি চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়েছে যে সবাই তাকে এমন করে রাক্ষসী বলবে! গালিগালাজ করবে!

সেইখানেই মনোরমার আপত্তি। ছেলেছুটো যে কাছে আসে না ধরতে গেলেই ছুটে পালিয়ে যায়, নয়তো তাদের কাছে ডেকে, কোলের কাছে বসিয়ে মনোরমা জিজ্ঞাসা করত, বাবা, আমি কেন রাক্ষসী হতে যাব? আমি কি মানুষ খাই, না খেয়েছি।

নাতির আর কোন খবর মনোরমা পায় নি। মনকে বুঝিয়েছে সে আছে। হয়তো রাতের অন্ধকারে অন্য কোথাও ছিটকে পড়েছে। পুরুষ মানুষ, শক্ত, সমর্থ, মাইলের পর মাইল হেঁটে অন্য কোনদিকে চলে গিয়েছে।

পৃথিবী বিরাট। শেষ নেই। অঢেল মাটি। কেবল মনোরমারই হাত পা ছড়িয়ে শোবার মতন ঠাঁই মিলছে না। দুটো হাত বুকের মধ্যে, দুটো পা কুঁকড়ে কোনরকমে শুতে হয়। ফেলে আসা ভিটে জায়গা অন্ত আতের, সেখানে স্থান মেলে নি। এদেশটা অন্ত আতের নয়, তবু মনোরমার স্থান হচ্ছে না। কিন্তু এ সবের জন্য কি মনোরমা দায়ী!

প্রথম দিন মনোরমা চায় নি। রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল চুপচাপ। হাঁ করে মানুষজন, গাড়ী ঘোড়া দেখছিল। খেয়ালই ছিল না কোনদিকে।

নাও, ধর। একজনের গলার শব্দে মনোরমা চমকে চোখ ফেরাল।

একটি বৌ। কপাল অবধি ঘোমটা টানা। একহাতে চুবড়ীতে পূজার প্রসাদ। বোধহয় কোথাও পূজা দিয়ে আসছে।

কিছু বললে? মনোরমা জিজ্ঞাসা করল।

নাও, ধরো পয়সাটা। বৌটি মনোরমার হাতে একটা আনা ফেলে দিল।

সেই প্রথম। মন্দ লাগল না মনোরমার। কলকাতার রাস্তায় হাত পাতলেই পয়সা পাওয়া যায়। সেই থেকে রোজ সকালে এখানে এসে দাঁড়ায়। সামনের গলিতে কি একটা মন্দির আছে। অনেকে সেখানে পূজা দিয়ে আসে। ফেরার সময় বোধহয় মনটা ভাল থাকে। মনোরমার প্রসারিত হাতে কিছু দিয়ে যায়। কেউ কেউ আবার প্রসাদও দেয়। চাল, কলা, পাঁচ পাতাসা। সেগুলো মনোরমা আঁচলে বেঁধে নেয়।

প্রথম প্রথম মনোরমার ভারি লজ্জা করত। পাশেদের বাড়ীর বৌ। দেশে মান ছিল, ইজ্জত ছিল। পাল পার্বণে

সে নিজেই কত দিয়েছে লোকজনকে। সেই বাড়ীর বৌ হয়ে এমন ভাবে পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকবে, হাত পেতে।

মনে মনে মনোরমার হাসিও পায়। কি অবশিষ্ট আছে পালেদের বাড়ীর বৌয়ের। সে সম্পদের ছিটে কোঁটাও নেই, মর্যাদারও অবদান। শত ছিন্ন হাজার গিট দেওয়া ময়লা থান। সারা মুখ জুড়ে সময়ের অস্থির পদচিহ্ন। দুর্যোগের হিজিবিজি। আশ্রয় হোমের কঠিন, নির্মম প্ল্যাটফর্ম। এমন একটা জীবন, এমন একটা পরিবেশে ভিক্ষা করে জীবন ধারণ কি খুব আশ্চর্যের কথা, খুব গ্লানির?

আজকাল সবদিন মনোরমা আর রান্না করতে পারে না। ভাল লাগে না, তাছাড়া ক্ষমতাতেও কুলোয় না। চাল, আলু যা হাতে থাকে সব ঢেলে দেয় শান্তির কৌচড়ে।

দু মুঠো দিস্ মা। শরীরটা কেমন করছে। আমি একটু শোব।

কাঁপতে কাঁপতে টিকেট ঘরের পিছনে মনোরমা শুয়ে পড়েছে। আঁচল বিছিয়ে।

ভাত রেঁধে শান্তি এসে ডেকেছে। সাড় নেই মনোরমার উঠতে গিয়েও উঠতে পারে নি। অস্পষ্ট ঘোর ঘোর অর্ধচেতনার মধ্য দিয়েই দেখেছে, শান্তি প্ল্যাটফর্মের টেপাকল থেকে জল এনে তার মাথা ধুইয়ে দিয়েছে। নিজের ছেঁড়া কম্বলটা এনে তার গায়ে চাপিয়েছে। মাঝে মাঝে গায়ে, কপালে হাতও বুলিয়ে দিয়েছে।

দেশে হ'লে মনোরমা এমন একটা মেয়ের সংস্পর্শ বাঁচিয়ে চলত। তার ছায়াও মাড়াত না। সন্ধ্যা হ'লেই শান্তি উধাও। ধারে কাছে কোথাও দেখা যায় না। ফেরে ভোরের দিকে। বেলা এগারোটা পর্যন্ত একটানা ঘুমায়। কোথায় যায়, কেন যায়, কারো অজানা নয়। শান্তিও কিছু লুকোয় না। বলে, নাগররা ডাকে। সব ভদ্রলোকের ছেলে। কলেজে পড়ে। এখানে এসে দাঁড়াতে লজ্জা করে। তাই রেললাইনের ওপারে দাঁড়িয়ে থাকে।

শান্তির সঙ্কোচের কোন বালাই নেই। কথাগুলো বলে আর নিজের যৌবনপুষ্ট দেহটা কাঁপিয়ে হাসিতে ঢলে পড়ে।

মনোরমা মাঝে মাঝে বলেছে, ও মেয়ে, ও শান্তি, এ ভাবে জীবনটা না কাটিয়ে ওদের কাউকে বিয়েই কর না। ঘরের সুখে সংসার কর।

পানের ছোপলাগা দাঁতের সার বের করে শান্তি হেসে উঠেছে। বলেছে, ও ঠানদি, আমাকে বিয়ে করলে যে ওদের জাত যাবে। সমাজের চোখে নীচু হবে না। বিয়ে কেউ করবে না। শুধু মান বাঁচিয়ে, বংশ বাঁচিয়ে, কম পয়সায় একটু ফূর্তি।

আগে নাকি এই প্ল্যাটফর্মে পা রাখা যেত না। চারদিকে লোকে গিস গিস করত। ধর্মা আটকে আটকে আড্ডা রাখার ব্যাপার। ছোট ছোট গৃহস্থালী। তারা আর নেই। পুলিশে ঘরে ঘরে চালান দিয়েছে। দূরে দূরে চলে গিয়েছে সবাই। নানা জায়গায় নতুন করে ঘর বেঁধেছে।

এসব মনোরমা আসবার আগে। দেশ ভাগ হবার সঙ্গে সঙ্গেই যারা হুমড়ি খেয়ে এ পারে এসে পড়েছিল, তাদের কথা।

মনোরমা বাড়ী ছেড়েছে অনেক পরে। সাত পুরুষের ভিটে ছেড়ে কোনদিন যে চলে আসতে হবে এ কথা সে স্বপ্নেও ভাবে নি। আলাদা জাত আবার কি। তার নাতি কেষ্ট আর হামিদ কি আলাদা নাকি। কেষ্টর অসুখ হলে, মনোরমা কাপড় ঢাকা দিয়ে নাতিকে নিয়ে গেছে পীরের দরগায়। জল পড়া ছিটিয়ে দিয়েছে। আবার হামিদের শরীর খারাপ হ'লে তার চাচা করিম সাহেব

তুলসীতলার মাটি নিয়ে গিয়ে ছেলের সর্বাঙ্গে লেপেছে। গায়ে মড়ক লাগলে সংকীর্তন বেরিয়েছে। তাতে পাশা পাশি গান গেয়েছে ফুলপুরের যতীন ঘোষাল আর ফতিকচাঁন। মৃদঙ্গ বাজিয়েছে রাখহরি, সানাইয়ে সুর তুলেছে চাঁছ মিঞা।

এরা আলাদা, অন্য জাত, অন্য ধর্ম, এমন কথা মনেও করে নি।

যখন আশপাশের গাঁ থেকে লোকজন পালাতে শুরু করল, তখনও এ গাঁয়ের মোড়লেরা হিন্দুর বাড়ী বাড়ী ঘুরে অভয় দিয়েছে। কোন ভয় নেই। এ গাঁয়ে কখনও গোলমাল হবে না। আমরা বেঁচে থাকতে আপনাদের গায়ে আঁচড়টি লাগতে দেব না।

কিন্তু এ প্রতিশ্রুতি তারা রাখতে পারে নি। ভিন দেশ থেকে জোয়ানের দল এসে হাজির হ'ল। যারা এ দেশের লোককে চেনে না, এ দেশের মাটির সঙ্গে কোন পরিচয় নেই। অনেক রাত অবধি মসজিদে মসজিদে মিটিং চলল। মশাল হাতে মিছিল বের হ'ল।

তখন কেষ্ট একবার বলেছিল।

ঠাকুমা, ব্যাপার বড় সুবিধার মনে হচ্ছে না।

মনোরমা দাওয়ায় পা ছড়িয়ে বসে রোদ পোয়াচ্ছিল। কেষ্টর দিকে ফিরে বলল, কিসের ব্যাপার?

বাইরে থেকে সব লোকজন এসেছে। তাদের হালচাল ভাল ঠেকছে না। রাতভোর মিটিং করছে। কোন গাঁয়ে কত হিন্দু আছে, তার ফিরিস্তি।

কিন্তু যাবি কোথায়? মনোরমা নাতিকে প্রশ্ন করেছিল।

যে কোন জায়গায় যেতে হবে। এদের নাগালের বাইরে। এদের সীমানা ছাড়িয়ে।

ঘর বাড়ী? খামিজমা? ক্ষেত খামার?

এসব তো আর প্রাণের চেয়ে বড় নয়।

প্রাণটা এত বড়! বসে বসে তাই মনোরমা ভাবে। জমিজমা, ক্ষেতখামার সব পিছনে ফেলে যে প্রাণটা নিয়ে সে ছুটে পালিয়ে এল এপাশে, তার দাম কি এত বেশী? যে প্রাণ মহার্ঘ, সে প্রাণ এভাবে মুষ্টিভিক্ষা নির্ভর নয়। দিনগত পাপক্ষয়ের মতন টেনে হিঁচড়ে তাকে বহন করতে হয় না।

শুধু মনোরমা রাজী হয় নি। বলেছিল, কেষ্ট, তুই বরং তোর মৌলভী কাকার সঙ্গে একবার দেখা কর। তিনি কি বলেন শোন। তারপর ভিটে ছেড়ে পালাবার কথা ভাবব।

এ ছাড়া সেদিন মনোরমার আর কিছু বলার ছিল না। তার মন অন্য কিছু বলতেও চায় নি। ভিটে তার কাছে শুধু কয়েকটা চালাঘর আর তুলসীমঞ্চ নয়, খেত খামার শুধু কয়েক বিঘে মৃত্তিকার সমষ্টি নয়। এ সবের দাম তার কাছে অনেক বেশী। স্বামী-শ্বশুরের স্মৃতি বিমণ্ডিত তীর্থস্থান। প্রতি ধূলিকণা তাদের কীর্তি-আকীর্ণ। একটি মাত্র ছেলে মনোরমার। জোয়ান, চাবুকের মতন লিকলিকে চেহারা। মুনিষদের ওপর ছেড়ে দিত না, নিজের হাতে লাঙল ধরত, কোদাল ধরত, ভয় কি জিনিষ জানত না।

বাড়ীর পিছন দিকটা জঙ্গল হয়ে গিয়েছিল। রাংচিতা আকন্দ, গাবের চারা আর ফণি মনসা। বড় বড় লতানে গাছে ঘুপসী অন্ধকার।

মনোরমার ছেলে ধরাল কোদাল হাতে ঝাপিয়ে পড়ল সেই আগাছার ওপর। ঘণ্টা তিনেক এক নাগাড়ে কোদাল চালিয়ে ঝকঝকে তকতকে করে ফেলল। কোদাল হাতে ফিরিয়ে আসবে, সেই সময় সর্বনাশ।

ও মাগো, বলে হাঁটু চেপে ধরাল টুকরে উঠানের ওপর এসে পড়ল। ধরালের বৌ বাপের বাড়ী। ছেলে-পুলে হবে। বাড়ীতে মনোরমা একলা। ছুটে গিয়ে

ছেলেকে কোলে তুলে নিল। নিজের পরনের থান জালা জালা করে ছিঁড়ে তিন চার জায়গায় বেঁধে দিল। যাতে বিষটা ওপরে উঠতে না পারে।

মনোরমার চেঁচামেচিতে আশপাশের লোকেরা এসে জড় হ'ল। একজন ছুটল বলরামপুর ওঝির ওস্তাকে ডাকতে। তার তখন খুব নামডাক। মন্ত্রতন্ত্রে যা মনসাকে পর্যন্ত বেঁধে ফেলতে পারে। তাঁর অনুচর তো ঢের। দশজনে দশ রকম পরামর্শ দিল, কিন্তু মনোরমা নির্বিকার। একটি কথাও বলল না। দয়ালকে কোলে ক'রে চুপচাপ বসে রইল।

ওরই মধ্যে একজন বলল, দয়ালের বৌকে খবর দেওয়ার কথা। এই তো পাশের গাঁ মাণেকপুর। যেতে আসতে ঘণ্টা দুয়েকের বেশী লাগবে না।

মনোরমা হাত তুলে বারণ করল। না, শরীরের এই অবস্থায় বৌমাকে খবর দেবার প্রয়োজন নেই।

ওঝির ওস্তা যখন উঠানে এসে দাঁড়াল তখন রাত আটটা। মনোরমা আস্তে আস্তে দয়ালকে তার পায়ের কাছে রেখে দিয়ে সরে দাঁড়াল।

তারপর ঘণ্টা তিনেক ধরে চলল ঘনে মানুষে টানা-টানি। ওঝির ওস্তা ক্ষেপে উঠল। বিড় বিড় করে মন্ত্রের পর মন্ত্র আওড়ে যেতে লাগল। এদিকে ক্রমে ক্রমে দয়ালের সারা দেহ নীল হয়ে গেল। মুখে ফেনা। শিথনেত্র।

রাত বারোটার সময় ওঝির ওস্তা উঠে দাঁড়াল। মাথা নীচু করে। তার তিন দিন পরে কেষ্ট হওয়ার সংবাদ এল।

কেষ্ট বাপকে দেখে নি। যাকে দেখেছে বছর চারেক। তারপর থেকে মনোরমা তাকে বুকে করে মানুষ করেছে। তার সব আবদার শুনেছে, সব সাধ মিটিয়েছে।

তবু মনোরমা তার কথার চিটে ফেলে পালিয়ে আসতে পারেনি। এখানকার মাটির দাম যে তার কাছে সোনার চেয়েও বেশী। এখানে দয়াল ঘুমিয়ে আছে, দয়ালের বৌ। বুড়ো কর্তা পর্যন্ত!

উড়োখবরে কখনও এ তীর্থ ছাড়া যায়।

সেই দিনই কেষ্ট মৌলভী ডাক্তার কাছে জিজ্ঞাসা করে এসেছিল। ফিরে এসে মনোরমাকে বলেছিল, না ঠাকুমা, ভয়ের কিছু নেই। ওরা সব তিন দেশের লোক। এসেছে পাঞ্জাব থেকে। এখানে গোলমাল পাকাবার চেষ্টা করছে; কিন্তু সুবিধা করতে পারবে না।

মনোরমা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিল।

গোলমাল শুরু হয়েছিল ঠিক তার পরের দিন থেকে।

আর থাকতে মনোরমার সাহস হয় নি। নাতির হাত ধরে রাতের অন্ধকারে পাটের খেতের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল। চারদিকে চীৎকার। চারদিকে টর্চের আলো! বুকে হেঁটে হেঁটে কাশবনের ভিতর দিয়ে দুজনে অনেকটা পথ গিয়েছিল।

ভোরের দিকে একটা মুসলমান বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিল। সেখানে, আরো অনেক লোক এসে জুটেছিল। নানাদিক থেকে ভয়ার্ত, পরিশ্রান্ত মানুষের দল।

এদিকটা গোলমাল একটু কম, কিন্তু আর এ দেশে থাকতে কারো সাহস হল না।

একটু অন্ধকার হ'তেই সবাই বেরিয়ে পড়ল। আবার সেই ক্লান্তিকর যাত্রা। এবারে সামনে বিরাট বাধা। চণ্ডেশ্বরী নদী। এপার ওপার দেখা যায় না। পদ্মার সঙ্গে বুঝি যোগ আছে, তাই পদ্মার মতনই রাক্ষসী।

গোটা চারেক নৌকা পাওয়া গেল। চড়া দর হাঁকল, কিন্তু তখন দরদস্তুর করবার মতন মনের অবস্থা কারো নেই। এই নদীটা পার হতে পারলেই নিশ্চিন্ত। ওপারে যাইল খানেক গেলেই এ রাজ্যের সীমানা শেষ।

ঠিক এই সময় কেষ্ট হারাল। প্রথমে নৌকা করে ছেলেমেয়েদের পার করে দেওয়া হ'ল। পরে আসবে পুরুষের দল। মনোরমা কোন রকমে মাইল খানেক পথ পার হয়ে এদিকে এসে পড়ল। টানা একদিন, এক রাত অপেক্ষা করল। কেষ্টর দেখা নেই।

শুধু কেষ্ট নয় আরো জোয়ান পুরুষ নিখোঁজ হয়েছিল।

অপেক্ষা করে করে ক্লান্ত হয়ে দলবলের সঙ্গে মনোরমাও এক সময়ে চলতে শুরু করল। এ পারে এসে রেলগাড়ীতে চেপে বসল।

আশ্চর্য, মানুষের বাঁচার নেশা! আর কটা বছর বাঁচবে মনোরমা। অনিশ্চিত, উদ্ভ্রান্ত জীবনযাত্রার মধ্যে কটা দিনের পরমায়ু। তবু একমাত্র নাতিকে পিছনে রেখে সে এগিয়ে এল। নতুন করে বাঁচবার, নতুন করে ঘরগৃহস্থালী তোলবার আশায়।

স্টেশনে নেমে যে যার সব ছিটকে বেরিয়ে গেল। আত্মীয় স্বজনের সন্ধানে। অনেকে আবার রয়েও গেল। প্ল্যাটফর্মে ঘর বাঁধল। একটু একটু হাঁড়ি কড়া জোটাল। দর্মা দিয়ে আড় রক্ষার ব্যবস্থা। তাদের সঙ্গে মনোরমাও রয়ে গেল। অনেক ভেবেও এ শহরে আপন জন কারো ঠিকানা পেল না। বিরাট শহর। অতিকায় একটা অজগর মতন হাত পা ছড়িয়ে পড়ে আছে। এই শহরের রক্তে, রক্তে কে কোথায় আস্তানা বেঁধেছে, সঠিক না জানতে পারলে, খুঁজে বের করা দুষ্কর।

মনোরমা রয়ে গেল। প্রথম প্রথম ট্রেন এলেই ছুটে যেত। ভীড়ের মধ্যে খুঁজে খুঁজে বেড়াত। কেষ্ট যদি আসে। কেষ্ট এলে আর ভয় নেই। ঠিক একটা ব্যবস্থা করে ফেলবে। বুড়ী ঠাকুমাকে এ ভাবে ফেলে রাখবে না। চওড়া বুক, জোয়ানো হাতের কব্জী, সরু কোমর। সাহস আর শক্তির প্রতীক। ঠিক কিছু একটা করবে।

তারপর একটু একটু করে মনোরমা আশা ছেড়ে দিল। কেষ্ট নেই, এমন কথা ভাবতে পারল না। ভাবল কেষ্ট হয়তো অন্য কোনদিকে চলে গেছে। ভাল আছে, সুখে আছে। আহা, তাই থাক। মনোরমা আর কদিন।

দলের দু একজন আশার কথাও শোনায়। আমরা চিরদিন থাকব না এখানে। আমাদের কথা নিয়ে লোকে চিন্তা করছে। কাগজে কাগজে লেখালেখি হচ্ছে। আগে যারা এসেছিল তাদের সরকার জমির টুকরো দিয়েছে, বাড়ী তুলে দিয়েছে। অর্থ সাহায্য করেছে। এবারেও তেমন কিছু একটা হবে।

দু গালে হাত রেখে মনোরমা বসে বসে শুনেছে। তারপর বলেছে, এ বয়সে জমি নিয়ে আমি আর কি করব। তোদের কারো বাড়ীতে একটু আশ্রয় দিস। তা হ'লেই হবে।

পাশেবসা শান্তি দু হাত দিয়ে মনোরমাকে জড়িয়ে ধরেছে। বলেছে, তুমি আমার কাছে থাকবে গো ঠানদি। তোমার জমিতে আমি গাছ বসাব। তরি তরকারি শাকসব্জীর গাছ। আমি মাথায় করে জিনিস নিয়ে গিয়ে বাজারে বিক্রি করে আসব। আমার গতর কম নাকি।

মেয়েটা উচ্ছসিত হাসিতে ভেঙে পড়ে।

চেয়ে চেয়ে মনোরমা দেখে। শান্তি যখন ঠানদি বলে ডাকে, তখন বুকের মধ্যেটা যেন মোচড় দিয়ে ওঠে। আর একজনের কথা মনে পড়ে যায়। আর একজনের গলা কানে ভেসে আসে।

আজও কি এক চিন্তা মনের মধ্যে ঘুরপাক খায়। কেষ্ট যদি ফিরে আসত। কিন্তু তা কি করে হবে। মেয়েটা যে নষ্ট। তবে অনেক ভালো মেয়ের চেয়ে হাজার গুণে ভালো। মনোরমাকে যেন বুক দিয়ে ঢেকে রেখেছে।

আবার অন্য কথাও কানে আসে। যারা বাইরে বেরোয়, কাজের খোঁজে আর কাজ করতে তারাই বলে।

সন্ধ্যা বেলা ফিরে এসে গোল হয়ে সবাই বসে।

ও সব সরকারের ভাওতা। জমি আমরা দেবে না ছাই। লরী করে তুলে নিয়ে গিয়ে স্টেশানের মাঠে কিংবা বনেজঙ্গলে ছেড়ে দেবে। পচে গলে মর। এখন যেমন করেই হোক স্টেশন খালি করতে হবে। ভেঙে চুরে নতুন স্টেশন গড়া হবে এখানে। নতুন ধরণের ইঞ্জিন আসবে। কয়লায় নয়, বিদ্যুতে চলবে। অত সব বড় বড় সভা বসে যেমন চলে। দেশ বিদেশ থেকে ইঞ্জিনিয়ার আসবে নক্সেজমিনে তদারক করতে। তারা এই সব পালছেঁড়া, হালভাঙা নৌকার স্তূপ দেখে বলবে কি। একটা সভ্যজাতের বেহে এরা তো যা। কাজেই হটাও এদের। ছলে, বলে, কৌশলে।

সত্যি সত্যিই তাই হ'ল। ঝকঝকে গাড়ীতে একদল লোক এল। তাদের কাছে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলল। এসেছে কোথা থেকে, এক এক পরিবারের ক'জন লোক। বাইরে প্রচুর জমি পড়ে আছে। সেইখানে তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হবে। নতুন করে সংসার পাততে পারবে তারা। নতুন করে জীবন আরম্ভ করতে পারবে।

মনোরমার সঙ্গে তারা কিন্তু একটা কথাও বলল না। ফিরে একবার দেখেই মুখ ঘুরিয়ে নিল। বোধ হয় ভাবল, মনোরমা তো বাতিলের দলে। নতুন করে জীবন শুরু করার প্রশ্ন তার বেলা ওঠে না।

মনোরমা ঠিক বুঝল, সব ব্যাপারটা ভুয়ো, সব ফাঁকি। এক ছিলতে জমি কেউ কাউকে কোন দিন ছাড়ে না। হাত খানেক বাঁধ জমি নিয়ে দশ বছর মামলা চলে। এক তেঁতুলগাছ আর তার তলায় একটু খানি মাটি, তাই নিয়ে তার শ্বশুর আর খুড় শ্বশুরে লাঠালাঠি বেঁধে গেল। প্রায় রক্তারক্তি কাণ্ড। তিন বছরের ওপর ঝগড়াঝাটি। মামলা কোর্ট অবধি গড়াল। আর সরকার এতখানি জমি অমনি ছেড়ে দেবে একেবারে শুধু হাতে।

মনোরমা অন্য সবাইকেও সেই কথা বোঝাল। লোক গুলো চলে গেলে। গোল হয়ে বসে মনোরমা হাত মুখ নেড়ে বলল, দেবে মাগনা জমি ছেড়ে। অত সহজ কিনা। একটু খানি জমি নিয়ে কত লাঠালাঠি, কত রক্তারক্তি কাণ্ড জানো তো? আমার তো বাপু ব্যাপারটা ভাল ঠেকছে না।

মনোরমার কথা শুনে অনেকেই মুচকি হাসল। দু একজন কিন্তু সায়ও দিল।

বলল, বুড়ী কথাটা মন্দ বলে নি। গাড়ী করে নিয়ে গিয়ে রাস্তাতে বসিয়ে দেবে এমন তো মনে হয় না। কোথায় পথের ধারে ফেলে দেবে ঠিক আছে। স্টেশন পরিষ্কার করাই যে ওদের দরকার।

দু একজন এসব কথা বলল বটে, কিন্তু অনেকদিন পরে লরী আসতে গুটি গুটি পা ফেলে সবাই গিয়ে উঠল।

মনোরমা চুপচাপ বসে রইল নিজের চটের বিছানার ওপর। শান্তি বলল, ঠানদি, আমার হাত ধর।

মনোরমা বলল, না।

এতদিন তো ইষ্টিশানের সংসার করলাম, এবার দেখাই যাক না, নতুন সংসারের কেমন চেহারা। নাও, ওঠ।

মনোরমা বলল, না।

ওদিকে লরী অনবরত হর্ণ দিচ্ছে। রাস্তাটা তো সোজা নয়। প্রথমে লরী, তারপর রেল, আবার হাঁটা পথ বেশ খানিকটে।

একদল পুলিশও নেমেছে লাঠি নিয়ে। তারাও অনবরত তাড়া দিচ্ছে। লাঠি ঠুকছে প্লাটফর্মের কঠিন সিমেন্টের ওপর।

সবাই গিয়ে উঠল। এক পুলিশের নজর পড়ল মনোরমার ওপর। সে ছুটে এল লাঠি বাগিয়ে।

এই বুড়ী, ওঠ, তোর জন্য গাড়ী দাঁড়িয়ে থাকবে নাকি?

মনোরমা নির্বিকার।

চল, চল, এমনিতেই দেরী হয়ে গেছে। সে ওঠে।

পুলিশ মনোরমার একটা হাত চেপে ধরল। কিছুক্ষণ টানাটানি, ধস্তাধস্তি। তারপর মনোরমা এক অদ্ভুত কাণ্ড করল। প্রাণপণ শক্তিতে পুলিশের হাতটা কামড়ে ধরল।

উঃ, বুড়ী তো আচ্ছা হারামজাদী। হাতের লাঠি দিয়ে পুলিশ মনোরমার চোয়ালে জোরে এক ঘা বসিয়ে দিল।

দর দর ধারে রক্ত গড়িয়ে পড়ল। এত রক্ত ছিল মনোরমার শরীরে। হাত দিয়ে চোখের ওপর এসে পড়া চুলগুলো সরিয়ে মুখ তুলে চেয়েই মনোরমা অবাক হয়ে গেল। দু চোখ জলে ঝাপসা। রক্তের নোনা স্বাদ ঠোঁটের মধ্যে লাগছে। চোয়ালে অসহ্য ব্যথা।

কিন্তু মনোরমা শরীরের কষ্টের মধ্য দিয়েও ঠিক চিনতে পারল। কেষ্ট, কেষ্ট এসে দাঁড়িয়েছে। স্নেহ দিয়ে, মমতা দিয়ে, মায়া দিয়ে যাকে কাছে ধরে রাখতে পারে নি, সে আজ সামনে এসে দাঁড়িয়েছে রক্তস্রোতের মধ্য দিয়ে।

নতুন জমি বেচে কেষ্ট, নতুন করে ঘর বাঁধার প্রত্যাশা. সেই জমির বদলে, সেই প্রত্যাশার বদলে, একটু রক্ত দিতে হবে বৈ কি।

রক্ত ছাড় এক টিলতে জমি কেউ কখনও দ্যায়ে!

GRAM : SUPSYNDI

PHONE : 23-5733
23 7346

With Best Compliments

From

WESTERN COMMERCIAL CORPORATION

3, BENTINCK STREET
CALCUTTA-1

আমি ও মনামি

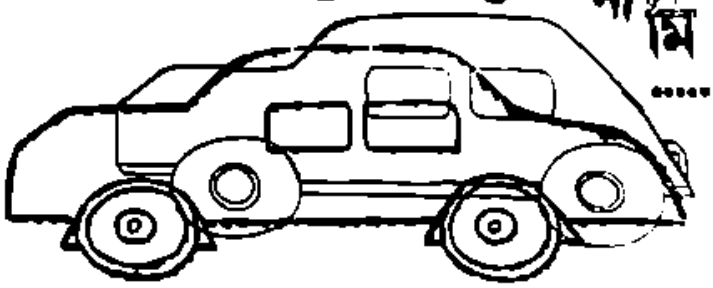

শচীন্দ্রনাথ বসু

জানি না এই গল্প কেউ বিশ্বাস করবে কিনা, তবে ইতিমধ্যে আমরা প্রগতির পথে অনেক দূর এগিয়েছি, সেই ভরসায় লিখছি কয়েক বছর আগেকার এই ঘটনা।

তখন পুজো প্রায় এসে গিয়েছে। সবার মনে শরতের সোনাঝলানো খুশি। শ্রবণের জল্পনা আমারও মনে আনাগোনা করছে। কিন্তু তার আগে আমার নিজের পরিচয়ে দু কথা বলা দরকার।

এক বড় রাস্তা ধরে শহর ছেড়ে সোজা বেরিয়ে গেলে লোকালয় রুমে গিয়ে যেখানটায় কেবল খেত আর মাঝে মাঝে পুরনো দিনের দালান বাড়ি ছাড়া আর বিশেষ কিছু চোখে পড়ে না সেই অঞ্চলে আমার বাসা। মোটে তিনখানা ঘর, কিন্তু চার পাশে অনেকখানি খোলা জায়গা; সেখানে ফুলের বাগান বা তরকারির খেত কিছুই আমি করি নি। এই রুক্ষ মাটিই আমার ভাল লাগে।

বাড়ির সঙ্গে আমার সম্পর্কই বা কতটুকু! আমি একলা মানুষ, ঘরে বসে চুপচাপ সময় কাটাতে আমার ভাল লাগে না। ভোরে করে ঘুম থেকে উঠে চা-খবর-কাগজের পরে স্নানে ঢুকি। স্নান সেরে আসতে আসতে আমার উৎকৃষ্ট ভৃত্য রামাদুজ টেবিলে ব্রেকফাস্ট সাজিয়ে রাখে। খেয়ে দেয়ে ধীরে সুস্থে আফিসের পোশাক পরে শিষ দিতে দিতে আমার নতুন-কেনা টু সিটারে চড়ে বসি। সিগারেট ধরিয়ে হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি দশটা বাজতে দশ। আচ্ছা, ঘোরাঘুরি সেরে রাত্রে বাড়ি ফিরতে প্রায় এগারোটা বেজে যায়, খাওয়াটা সাধারণত বাইরেই হয়। মোষের মত বিছানায় এলিয়ে পড়ে মুহূর্তে চেতনা হারাই। ছুটির দিনেও হৈ হৈ ব্যাপার একটা কিছু থাকেই—আমি যে একলা, শহর থেকে অনেক দূরে পড়ে আছি এ বিষয়ে আমার বন্ধুরা বিশেষ সচেতন। অনেকটা 'আহা বেচারা' ভাব তাদের আমার প্রতি, যদিও আমার গাড়ি ও পকেটের উপরই চাপটা সর্বদা বেশী পড়ে। সত্যি সত্যিই এই প্রাণান্তকর holiday making আমি ঠিক উপভোগ করি কিনা তা এক এক সময়ে নিজেই ভাল বুঝতে পারি না।

সুতরাং বাড়িতে কাটাবার মত সময় আমার কম। তবু মাঝে মাঝে সারাদিনের ক্লান্ত দেহটা নিয়ে অনেক রাতে যখন শিল্পনের বারান্দায় বসতাম আমার ডেক চেয়ারে দিনের শেষ সিগারেটটি হাতে নিয়ে, তখন চার দিকের এই শান্তি আর নির্জনতা আমাকে প্রায় নেশার মত আচ্ছন্ন করে ফেলত। কালো আকাশের অসংখ্য তারার দিকে, নিস্তব্ধ অন্ধকারে জোনাকির আলোর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে টের পেতাম ধীরে ধীরে জেগে উঠছে আমার অন্তরতম, গূঢ়তম আশা হতাশা। কত স্বপ্ন, কত প্রার্থনা, কত নীরব প্রতিজ্ঞার

সাক্ষী এই মৌন প্রকৃতি, এই ধ্যানী পাস্তর!

ছুটির কল্পনায় আমিও ছেড়ে দিয়েছিলাম আমার কল্পনাবিলাসী মনকে। কোথাও যাব তা তখনও ঠিক করে উঠতে পারি নি, তার চেয়ে একটার পর একটা প্ল্যান নিয়ে মনে মনে নাড়াচাড়া করতেই ভাল লাগছিল। তবু মনের পিছনে একটা ধারণা ছিল যে সবাই যেখানে যায় সেখানে যাব না আমি যাব অসভ্য, অজানা কোনও জায়গায়, ঘাটের পর ঘাট, পথের পর পথ ভেঙে এগিয়ে যাব বেহিসাবী উদ্দাম গতিতে, ভুলে যাব বিংশ শতাব্দীর এই সভ্যতা। অনেকটা সেই উদ্দেশ্যেই তো এই গাড়ি কেনা।

আমার পর কিছু সম্পদের মধ্যে এই ছোট্ট সুন্দর গাড়িখানার চেয়ে আর কি যে আমি বেশী ভালবাসতাম বলতে পারি না। আস্তে আস্তে পয়সা জমিয়ে অবশেষে চরিতার্থ হল বহুদিনের এই আশা। অবশ্য পুরনো গাড়ি এর আগেও কিনতে পারতাম, কিন্তু আমার মন তাতে সায় দেয় নি। তাদের সঙ্গে তুলনা হয় না আমার এই গাড়ির। কি সরল সাবলীল এর গতি, কি সৌন্দর্য এর প্রতিটি প্রলম্বিত রেখায়, কি সন্তোষ আশ্বাসদায়ী এর এঞ্জিনের উষ্ণ প্রাণচাঞ্চল্য! ক্ষুদ্রতম ছুটি পর্যন্ত আমি ধরতাম সন্তর্পণে, গায়ে কোথাও সামান্য আঁচড় লাগলে দু রাত আমার ভাল ঘুম হত না। এত দিন পরে এক সত্যিকারের বন্ধু যেন পেয়েছিলাম আমি, যে শুনত আমার কথা, যার প্রতি সযত্ন ব্যবহার করতাম আমি। তাই ঠিক ছিল ছুটিতে যখন বার হব স্বাধীনতা আর মুক্তির সন্ধানে তখন এই নীরব বন্ধু থাকবে আমার খুশির অংশীদার হয়ে।

মাঝে মাঝে কিলোমিটার সপ্রাণ কোনও সঙ্গীর অভাবে যে বোধ করতাম না তা নয়। অনেক রাতে যখন দু দিকের ঘুমন্ত মাঠ খেতের মধ্যে নির্জন খোলা রাস্তাটা দিয়ে গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফিরতাম, প্রথম শরতের হালকা হাওয়া খেলে যেত মুখের উপর, তখন আমার এই টু-সিটারের আপেক্ষিক শূন্যতা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠতাম বই কি। মনে হত এমন যদি কেউ থাকত যে চাইবে আমারই মত লোকালয়ের বাইরে ছুটির মুক্তি উপভোগ করতে, যার আনন্দ পরিপূর্ণ হবে আমাকে নিয়ে, যাকে নিয়ে ভরবে আমার ছুটির অবসর, সম্পূর্ণ হব আমি, যে হবে আমার মুক্তি-অভিযানের সঙ্গী, এবং পরে হয়তো বা ·

যাক সে কথা। ঘটনার সূচনা এক দিন এই পথটুকুর মধ্যেই। কি এক সুযোগে সে দিন বিকাল বেলাই বাড়ি ফিরছিলাম। রাস্তার পাশে ছোট ছোট মুদির দোকানে সবে মাত্র কেরোসিনের আলো জ্বলেছে তখন, গ্রাম্য বেসাতীরা তরিতরকারী বেচে এখন ফিরে চলেছে ঘরে, সূর্যাস্তের পরে ছায়া ঘনিয়ে আসছে চতুর্দিকে। আমার ছাত খোলা গাড়ি টিমে তালে চলছে, এমন সময়ে পিছন থেকে আর্তনাদ করতে করতে আর একটা গাড়ি আমার পাশাপাশি এসে পড়ল। গাড়ি না তার আরোহী কিসে যে বেশী চমক দিল বলা কঠিন। তাজা, খোঁড়া, ছেঁড়া ঐ শোচনীয় রথের চালিকা এক সুন্দরী, সুবাসিতা তরুণী! সে কালে এদের পদাঘাতে অশোকের ফুল ফুটত, এ কালেও বোধ হয় সেই কারণেই চলছে এমন গাড়ি।

এক মুহূর্ত তাকিয়ে তিনি এগিয়ে গেলেন। হঠাৎ অত্যন্ত অপমানিত বোধ করলাম। ঐ অবিশ্বাস্য দৃশ্যের কিনা আমার এই রেখাচিত্রিত, গতিলীলায়িত, সর্বোপরি, হালকা ছিমছামকে অতিক্রম করে যায়! এতক্ষণ যে ধ্বনি আমার মনে করুণার উদ্রেক করেছে এখন তা কদর্য কলরবের মত, কুৎসিত পরিহাসের মত সামনের থেকে ভেসে আসতে লাগল। সেই সঙ্গে আরও এল উগ্র, ঘন,

সাধাটে ঘোঁয়া। অসহ্য, অসহ্য! তার পায়ের চাপে বন্ধু আমার লাফিয়ে উঠল বুকের আনন্দে। দেখতে দেখতে আমরা পাশাপাশি, আবার দুটি বিনিময়—আমার চোখে নিশ্চয় প্রতিশোধের তৃপ্তি, কিন্তু তার চোখে একটু যেন মৃদু হাসি। বাড়ি ফিরে গ্যারাজে গাড়ি রেখে গেটের কাছে এসে দাঁড়ালাম, একটু পরেই সন্ধ্যার সঙ্গিনী আমাকে পিছনে ফেলে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

কিন্তু ঐ রহস্যময় মৃদু হাসি, ঐ উজ্জ্বল দুটি চোখ আমাকে তার পরে চব্বিশ ঘণ্টা আচ্ছন্ন করে রাখল। যে আগে অনেক মেয়েকে দেখেছি, কাউকে ভাল লেগেছে কাউকে লাগে নি, কেউ কোনও ভাবেরই উদ্রেক করে নি মনে। জানি না আমি কারও মনে কোনও ভাব জাগিয়েছি কিনা, কিন্তু সত্যি কথা এই যে এ পর্যন্ত কোনও মেয়ের সঙ্গে অন্তরঙ্গতার সুযোগ পাই নি - স্বপ্ন পড়েই কেটেছে আমার দিন রাত। এমতাবস্থায় ঐ চকচকে কৌতুকময় হাসি আমার পক্ষে একটু গোলমেলে সন্দেহ নেই।

পর দিন আপিসে সময় যেন আর কাটতে চায় না। কাজের থেকে মন সরে যাচ্ছিল বারে বারে গত সন্ধ্যার অভিজ্ঞতার দিকে। ছুটির আগে এক বন্ধু এল সিনেমার টিকিট নিয়ে, কাজের অজুহাত দিয়ে কোট চাপিয়ে বেরিয়ে পড়লাম সোজা। বন্ধু অবাক হয়ে চেয়ে রইল, এমন ব্যবহার তার অভিজ্ঞতার বাইরে।

শহরের নানা বাধা বিঘ্ন পার হয়ে অবশেষে এসে পড়লাম সেই বহির্মুখী পথে। ধীরগমনে এগিয়ে চলেছি, প্রতীক্ষায় অস্থির মন। অবশেষে দূর থেকে সত্যিই ভেসে এল সেই আর্তনাদ! ভুল হবার নয়, তবু যাচ্ছ ফিরিয়ে একবার দেখে নিলাম। আমার গাড়ির গতি আরও মন্থর হল, তবু শব্দটা এগিয়ে আসতে যেন অনেক সময় লাগছিল; কিন্তু কাল সেই আওয়াজ এত রূঢ়, ক্লান্তিকর ঠেকেছিল আজ তাই মন্দ লাগছিল না শুনতে। অবশেষে পশ্চাদ্বর্তিনী এলেন কাছাকাছি, এক মুহূর্ত পাশাপাশি, অন্বেষণের চকিত চাউনি আর মৃদু হাসি। তার পর খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে গেল গাড়ি, কিন্তু এ বার অনায়াসে হার স্বীকার করে পিছনে পিছনেই চললাম আমি।

নির্জন আবছা রাস্তা। এমনি করে কত দূর চলে যেতাম জানি না, কিন্তু তার আগেই প্রচণ্ড ঝাঁকুনি ও বিশ্রী কর্কশ আওয়াজের সঙ্গে সামনের গাড়িটা থেমে গেল। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে দেখি স্টিয়ারিং চক্রে মাথা এলিয়ে চালিকা উপুড় হয়ে পড়ে আছেন, চোখ বন্ধ। স্বাভাবিক আশঙ্কার পাশাপাশি কোথায় যেন নির্লজ্জভাবে অনুভব করলাম অত্যন্ত সূক্ষ্ম এক আনন্দের আভাস। তাড়াতাড়ি নেমে পড়লাম বটে, কিন্তু তার পরে কি কর্তব্য ভেবে পেলাম না। নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় নির্জন পথের মাঝখানে যদি নিরাশ্রয়া এক তরুণী আঘাত হারান, তবে এক শিক্ষিত, অবিবাহিত, যথাযোগ্য শিভালরি-সংযুক্ত তরুণের কি করা উচিত তা তো··

হঠাৎ সম্মুখবর্তিনী মুখ তুলে তাকালেন, দুটি ঘোলাটে আচ্ছন্ন চোখ নিবদ্ধ হল আমার উপর। অত্যন্ত কোমল সুকুমার মুখখানি, দেখলে মায়া হয়; এই মুখে সেই চটুল রহস্যময় হাসি কি করে যে সম্ভব··

"আপনি কে?" অবসন্ন ধূসর সুরে সে প্রশ্ন করলে।

"অমিতাভ রায় আমার নাম। আপনার কি কোনও accident হয়েছে?"

"Accident?" তরুণীর বাঁকা ভ্রূ অর্ধচন্দ্রাকার ধারণ করল, "whatever do you mean?"

নিজের অপ্রস্তুতির মধ্যে যথাসাধ্য নির্লিপ্ততার ভান করে বললাম, "আপনি আমার আগে গাড়ি চালিয়ে আসছিলেন। হঠাৎ এক বিশ্রী আওয়াজ আর ঝাঁকুনির

সঙ্গে আপনার গাড়ি থেমে গেল দেখে ভেবেছিলাম হয়তো এঞ্জিনের কিছু দোষ হয়েছে। কিন্তু কাছে এসে আপনাকে ও ভাবে শুয়ে থাকতে দেখে—মানে…"

"Oh, I see; তারপর ?"

"ভাবলাম হয়তো আপনি আহত হয়েছেন। তাই যদি হয়, maybe I can be of some service to you।"

"Thanks a million। কিন্তু আপনার আগ্রহ দেখে মনে হচ্ছে আমি আহত হই নি বা আমার কোনও দুর্ঘটনা ঘটে নি শুনলে আপনি নিতান্তই হতাশ হবেন।" এক টুকরো বাঁকা হাসি দিয়ে সে কথা শেষ করল।

"Well, if you feel that way…" বলতে বলতে নিজেই টের পেলাম এই অতর্কিত আক্রমণে আমার গলার স্বর কতখানি কঠিন হয়ে উঠেছে। "আপনার ঘাবড়েরালী খেলায় যদি বিঘ্ন ঘটিয়ে থাকি অনিচ্ছাকৃত ভাবে, তবে আমি দুঃখিত। স্বীকার করছি রাস্তার মাঝখানে হঠাৎ গাড়ি থামিয়ে যারা নিস্তা যায় তাদের স্বভাবের সঙ্গে আমি বিশেষ পরিচিত নই।"

নিজের গাড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম। মনটা তিক্ত হয়ে উঠেছিল—এমন আশ্চর্য, এত কোমল যার চেহারা সে কিনা…

"Now I have offended you," পিছন থেকে শোনা গেল। "মেহুন মিস্টার রয়, তা বলে আপনি এমন ভাবে আমাকে একা ফেলে চললেন !"

ঘুরে দাঁড়িয়ে বললাম, "আপনি তো একাই যাচ্ছিলেন। আপনি কোথায় যাচ্ছিলেন তা কি আমি জানি ?"

"Neither do I।" বড় বড় উদ্‌বিগ্ন চোখ মেলে সে আমার দিকে তাকাল।

"মানে ?"

"সত্যি, আমি কোথায় যাচ্ছিলাম তা আমার মনে পড়ছে না।"

কতক্ষণ শুধু অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম। আবার আমাকে অন্ধ করবার কোনও ফন্দি বোধ হয়।

"তাই তো, আমি কোথায় যাচ্ছিলাম মিস্টার রয় ?" কিছুটা অসহায়, অন্যমনস্ক ভাবে সে প্রশ্ন করলে।

"ভাল করে তাকিয়ে দেখুন, হয়তো আমার মুখে লেখা আছে," বলে ফেলেই মনটা খারাপ হয়ে গেল।

কিন্তু সে যেন আমার কথা শুনতেই পেলে না। আপন মনে ঈষৎ উত্তেজিত অস্ফুট স্বরে বলে চলল, "তাই তো, এ আমার কি হল ! আমি কে ? কোথায় থাকি, কোথায় যাচ্ছিলাম, কোথায়ই বা ফিরে যেতে পারি ? মিস্টার রয়, আপনাকে রাগানোর পরিবর্তে আপনি এবার প্রাণ খুলে হাসতে পারতেন আমার খরচায়। নিজের নামই মনে করতে পারছি না আমি ! ! !"

নির্বাক বিস্ময়ে শুধু চেয়ে রইলাম। এটা যে মোটেই পরিহাসের বিষয় নয় তা লেখা রয়েছে ঐ মুখের রেখায় রেখায়।

অবশেষে বললাম, "বোধ হয় কোনও রকম চোট লেগে আপনার চিন্তাশক্তি ঠিক প্রকৃতিস্থ অবস্থায় নেই। আমার বাড়ি এখান থেকে কাছেই। একটু বিশ্রাম আর একটুখানি stimulant নিশ্চয় আপনাকে সুস্থ করে তুলবে। চলুন।"

ওকে তুলে নিলাম আমার গাড়িতে, পিছনে শুতে দিলাম ওর গাড়িটা। এত দিনে বুঝি পাশের আসনখানি পেল উপযুক্ত মর্যাদা। হঠাৎ হাসি পেল ভেবে যে ঐ ভাঙা গাড়িও এখন একেবারে নিঃশব্দ।

ঘরে পাখার বাতাস, বারান্দায় প্রকৃতির খোলা হাওয়ায়, ব্র্যান্ডি, ওডিকলোন কিছুতেই কিছু ফল হল না। আস্তে আস্তে এ সত্য দুজনের কাছে প্রতিভাত

হল যে আমার সঙ্গিনী তাঁর স্মৃতিশক্তি হারিয়েছেন!

ডাক্তার ডাকার কথা বলতে সে আপত্তি জানালে। বললে, "অনেক দিনের পুরনো স্বপ্নের মত আবছা মনে পড়ছে এ রকম দুর্ঘটনা এর আগেও আমার হয়েছে। সে সময়ে কি করেছি, কি করে সেরেছি কিছুতে মনে পড়ছে না তা, তবে সেরেছি যে তাতে তো সন্দেহ নেই। সুতরাং আশা করা যায় এ বারেও সারব, তবে কতক্ষণে তা জানি না। যতক্ষণই লাগুক, ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতেই হবে। ইতিমধ্যে আমার আত্মীয়-স্বজনরা—যদি কেউ থাকে—হাসপাতালে আর থানায় আমার খোঁজ করতে থাকুক।"

"হ্যাঁ, ঠিক কথা। থানায় খবর দিয়ে রাখা ভাল।"

আপাত-অর্থহীন এক হাসি হাসল সে, বোধ হয় আমার সাংসারিক বিজ্ঞতাকে পরিহাস করেই। তার পর বলল, "হ্যাঁ এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে আবার থানা পুলিশ—মিথ্যে হৈ চৈ খানিকটা। আপনাকে আমি কোনও trouble দিতে চাই না। আমার মনে হয় সকালে ঘুম থেকে উঠতেই সব ঠিক হয়ে যাবে। এ এক রকম মন্দ কি, কয়েক ঘণ্টার মত সব ভুলে থাকা —a kind of adventure of the mind! এখন কথা হল যে ঘুমানো যায় কোথায়। শহরে গিয়ে কোনও হোটেলে অবশ্য ওঠা যায়, কিন্তু পথই বা চিনব কি করে, গাড়িটা যদিও বা চলে?"

"না এ অবস্থায় আপনাকে আমি একলা হোটেলে যেতে দিতে পারি না। দেখুন ও সব ভেবে আপনি আর বেশী ক্লান্ত করবেন না ব্রেইন এখানে আমি একলা থাকি বটে, কিন্তু নিজের প্রবৃত্তিগুলির উপর কিছুটা কর্তৃত্ব আছে বলে গর্ব করি। আপনিও আধুনিক আত্মনির্ভর মেয়ে। সুতরাং অনায়াসে আপনি আমার শোবার ঘরখানি দখল করুন, আর আমি বসবার ঘরে ক্যাম্পখাট পেতে দিব্যি আরামে রাত কাটিয়ে দেব। কাল ছুটির দিন আছে, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করবার ঢের সময় পাওয়া যাবে। কি বলেন?"

ওর মুখের দিকে চেয়ে মনে হল তাতে কৃতজ্ঞতার ভাবখানাই বুঝি সবচেয়ে বেশী মানায়। কিসের এক গর্বে আর আত্মতৃপ্তিতে বুক ভরে উঠল।

পর দিন ঘুম ভাঙল খুব ভোরে, বাইরে আসতেই এক দমকা ঠাণ্ডা কুয়াশুরে হাওয়া আমায় অভ্যর্থনা করলে। এর আগে কবে যে সূর্যোদয় দেখেছি মনে পড়ে না।

একটু পরে সেও দরজা খুলে বেরিয়ে এল ভিতরের বারান্দায়। ঈষৎ উস্কু চুল বাসি শাড়ী, ঘুমরাঙা ম্লান মুখ সব মিলিয়ে তার এক নতুন ঘরোয়া চেহারা চোখে পড়ল। জিজ্ঞাসা করলাম, "ঘুম হয়েছিল ভাল?"

"খুব ভাল," হেসে বললে সে। "আপনারই বোধ হয় রাত কেটেছে কষ্টে।"

যথাযোগ্য প্রতিবাদ করলাম।

একটু পরে সে ম্লান মুখে বললে, "যা দেখছি আরও বোধ হয় কষ্ট দিতে হবে আপনাকে। আজ সকালে উঠেও কিছু মনে করতে পারছি না।"

আমি বললাম, "তাই তো, সে কথা আমার একেবারে মনে ছিল না; আপনি যে আছেন শুধু সেটাই অনুভব করছিলাম—সেটা এতই স্বাভাবিক মনে হয়েছে। অনার্জনীয় স্বার্থপরতা।"

সে কিছু বলল না, মুখ নিচু করে রইল।

আস্তে আস্তে সামনের মাঠে নেমে পড়লাম দু জনে, ভিজে ঘাসের উপর পা ফেলে এগিয়ে চললাম। অল্প দূরে এক অযত্নরক্ষিত পুকুর, শরতের চিকণ সোনালী রোদ সবে টেরচা হয়ে পড়েছে গাছে ঘাসে আর জলে; সেই আলোয় এই পচা পুকুরেরও চেহারা বদলে গিয়েছে

আজ।

সেখানে বসে পড়লাম দুজনে। একটু আগে হাত বাড়িয়ে একটা গাছের সরু ডাল ভেঙে নিয়েছিলাম, তার পাতাগুলি একে একে ছিঁড়তে ছিঁড়তে বলে চললাম, "আমি আপনার বিপদ, তবু কি যে হয়েছে আজ, মনের কোথায় এক অদ্ভুত অবিশ্রান্ত আনন্দ জলে উঠেছে, সেই আলোতে যা চোখে পড়ছে তাই ভাল লাগছে। আজকের এই আলো-ছড়ানো সোনালী জগত, আর আপনি—আপনার সান্নিধ্য, এ সবই বোধ হয় এর জন্য দায়ী। মনে পড়ছে সেই পুরনো গান

'জগত জুড়ে উদার সুরে আনন্দ গান বাজে,
সে গান কবে গভীর রবে বাজিবে হিয়া মাঝে?'

মনে হচ্ছে এই জগত-জোড়া আনন্দসুর আজ প্রথম টের পাচ্ছি মনে।"

সে শুনে চলেছে নীরবে। মাঝে মাঝে মাটির ঢেলা কুড়িয়ে ছুড়ে মারছে পুকুরের জলে, জলের বুকে সমকেন্দ্রিক বৃত্তগুলির বিস্তারণের দিকে চেয়ে থাকছে আপন মনে।

আমিও সে দিকে চেয়ে বললাম, 'জগতে যে মন্দ কিছু থাকতে পারে, আজ আর তা বিশ্বাস হচ্ছে না। মনে হচ্ছে কেউ আমার কোনও ক্ষতি করতে পারে না।"

হঠাৎ ঢিল ছোড়া বন্ধ হয়ে গেল তার। সেই স্থির দৃষ্টির দিকে চেয়ে অবশেষে বললাম, "A pice for your thoughts!"

ঠোঁটে তার ফুটল বিষণ্ণ হাসি, ফরাসী দার্শনিকের অনুকরণে বললে, "So all is for the best in the best of all possible worlds!"

আমিও তার দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে বললাম, "বড্ডখামি ভান করছেন আপনি কি সত্যিই ততখানি cynical?" কিন্তু তার পরেই আমার সুর বদলে গেল। "ঠিকই তো, একটা দরকারী জিনিস অন্তত হারিয়েছে—আপনার স্মৃতি।"

"আরও একটা জিনিস হারিয়েছে—আমার driving licence। কাল রাতে শুতে যাবার আগে হঠাৎ মনে হল ওতে অন্তত নিজের নামটা পাব। কিন্তু ব্যাগ খুঁজে দেখি তাও বাড়িতে ফেলে এসেছি। যাক গে, আপাতত এক কাপ চা পেলে বোধ হয় জগতটা আমারও ভাল লাগতে আরম্ভ করবে।" বলে সে উঠে দাঁড়াল।

দু জনে বাড়ির দিকে ফিরলাম।

সারা দিনটা গল্পে গল্পে, পরস্পরের জানাজানির মধ্যে শরতের ফুরফুরে হাওয়ার মত উড়ে গেল। নামের অভাবে বড় অসুবিধা হচ্ছিল, অনামী দেবীকে মনামি (mon amie) বানিয়ে নিলাম; সর্বনামও 'আপনি'র বদলে 'তুমি'তে এসে দাঁড়াল।

সন্ধ্যার দিকে ঘটনাস্রোত হঠাৎ এক নতুন দিকে মোড় ঘুরল। একটু আগে মনামি নিজের ঘরে গিয়েছে, হঠাৎ তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল, হাতে এক খণ্ড কাগজ, সেটা সে ধরল আমার সামনে। দেখি লেখা আছে:

শ্রীননীগোপাল দাস
১১ নং মহাপ্রস্থান রোড
রাধানগর।

আমার জিজ্ঞাসু দৃষ্টির দিকে চেয়ে বললে, হাতব্যাগের এক কোণে লুকিয়ে ছিল এই কাগজটা, এখন হঠাৎ চোখে পড়ল। ইনি কে তা কিছুতে মনে করতে পারছি না, তবে সম্ভবত ইনি আমাকে চিনবেন, আমি না চিনলেও; আমার কোনও আত্মীয়ও হতে পারেন। এমনও হতে পারে যে এই রকম অবস্থার আশঙ্কা করেই ওঁর নাম ঠিকানা সঙ্গে রেখেছি।"

রাধানগর প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে, কলকারখানার সুবাদে প্রসিদ্ধ শহর। পর দিন আপিসে গিয়ে দু দিনের ছুটি নিয়ে নিলাম, দুপুরের খাওয়া সেরে বেরিয়ে পড়লাম আমার গাড়িতে। খোলা প্রশস্ত রাস্তা ধরে অনায়াসে ছুটে চলেছি। মাইল কয়েক এগিয়ে আমাদের হাসি গল্প ক্রমে বন্ধ হয়ে গেল, চাকাটা ধরে চুপ করে বসে রইলাম। টের পাচ্ছি মনামি মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে মৃদু মৃদু হাসছে।

পড়ন্ত বিকালের ছায়া ঘনিয়ে এল রাস্তার উপর। সন্ধ্যা আসছে ধীর পদক্ষেপে। আর বেশী বাকি নেই পথ। বললাম, "আমার কি মনে হচ্ছে জান?"

"কি?"

"তোমার আরোগ্যের পথেই হয়তো এগিয়ে চলেছি, অথচ সেই আনন্দের তুলনায় কষ্টটাই বাজছে বেশী করে। এ দু দিন কাছে ছিলে একেবারে বন্ধনহীন হয়ে। এখন তোমার রহস্য উদ্ঘাটিত হতে চলেছে, কেমন ভয় ভয় করছে। আর কিছু ক্ষণের মধ্যেই হয়তো তুমি পাবে নতুন আশ্রয়, নতুন নির্ভর, নতুন মনোযোগ আকর্ষণ—আমি হয়ে যাব আগের মতই একলা। এ যেন সুন্দর স্বপ্ন থেকে হঠাৎ বিশ্রী ভাবে জেগে ওঠা।"

বলা বাহুল্য, মনের আড়ালে আশা ছিল আবাসবাসীর, ভবিষ্যৎ বন্ধুত্বের ইঙ্গিত। কিন্তু মনামি শুধু বললে, "Let us live in the present। ভাব দেখি

'I and my mistress side by side
Shall be together, breathe and ride.
So one day more am I deified—
Who knows but the world may end
to-night."

বললাম, "অনেক দিনের আশা করেছি আমি, এক খণ্ড দিন দিয়ে তুষ্ট হই কি করে? আর যদি করে শেষের গান আমাকে শুনিয়ো না। Why not let it be only The First Ride Together? ব্রাউনিঙেরই শেষ কথা

'And Heaven just prove that I and she
Ride, ride together, for ever ride."

কানের পাশে কলহাস্য বেজে উঠল মনামির।

রাধানগরে পৌঁছাতে পৌঁছাতে সন্ধ্যা পেরিয়ে গেল। ঠিক ছিল যে রাতটা ওখানেই কাটাব। হোটেলে উঠে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে মনী বাবুর ওখানে যাওয়া যাবে। ভাল হোটেল একটিই শহরে, সেখানে এসে নামতে নামতে মনামি বললে, "এমন সুন্দর গাড়িটার ধুলোয় কি অবস্থা হয়েছে দেখ, ওটা নিয়ে কোনও ভদ্রলোকের বাড়ি যাওয়া যায় না. কি বল?"

"ঠিক আছে, ওটা রেখেই যাব, কাল সকালে পরিষ্কার করিয়ে নিলেই চলবে।" আপাতত একটি ঘরই নেওয়া হল, মনী বাবুর ব্যাপার বুঝে দরকার হলে আর একটি নেওয়া যাবে। ঘরে ঢুকেই মনামি এলিয়ে পড়ল বিছানায়, পথের ক্লান্তি দূর করতে। আমি স্নানঘর থেকে তৈরি হয়ে বেরিয়ে এসে দেখি তখনও সে চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে, বললে, "আমার আর উঠতে ইচ্ছা করছে না, তুমি একা গেলে হয় না? তা ছাড়া শেষ পর্যন্ত মনী বাবু কে না কে হয়ে দাঁড়াবে কে জানে। হয়তো এক দিনের দেখা কোনও লোক, চেহারা দেখেও চিনতে পারব না কেউ কাউকে। হয়তো...কত কিছুই তো হতে পারে, তার চেয়ে তুমি আগে ব্যাপারটা আন্দাজ করে এস, তখন দরকার হয় তো যাওয়া যাবে। ইতিমধ্যে আমি তৈরি হয়ে থাকব।"

হোটেলের আপিসে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল মহাপ্রস্থান রোড কাছেই, বাড়ি খুঁজে বার করতেও দেরি হল

না। চাকরের হাতে কার্ড দিয়ে বারান্দার চেয়ারে বসে অপেক্ষা করছি, অন্ধকার বাগানটায় কি কি ভাবছে, অসংখ্য জোনাকি উড়ে বেড়াচ্ছে, আমার মনেও তেমনি সহস্র চিন্তার ঝাঁক। কে এই ননীগোপাল দাস? বাপ, না ভাই, না অন্য কোনও আত্মীয়? আর একটা সন্দেহে কিছুটা ঈর্ষান্বিতও হয়ে উঠলাম। যাই হক, এই ব্যক্তিটি পৃথিবীতে না জন্মালেই যেন ভাল ছিল। ঈশ্বর যখন অবশেষে আমার উপর ঈষৎ সদয় হলেন তখনই কি এঁর কার্যক্ষেত্রে না এলে চলত না!

পরদা ঠেলে ননী বাবু বেরিয়ে এলেন। দেখে মনে হয় বছর পঁয়ত্রিশেক বয়স হবে। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন আমার দিকে।

ব্যাপারটা তাঁকে বোঝাতে বোঝাতে সেই চিঠিখানার কাগজটা বার করতেই ভদ্রলোক ঝিক ফাটিয়ে অট্টহাস্য করে উঠলেন। বোধ হয় পাঁচ মিনিট নানা ছন্দে বিচিত্র গমকে তিনি হাসলেন। এমন কর্কশ হাসি এমন প্রাণ-খোলা হাসি আমি আগে কখনও শুনি নি।

অবশেষে নানাবিধ চেষ্টার পর হাসি থেমে গিয়ে তাঁকে পাগল সাব্যস্ত করে আমি যখন যাবার জন্য পা বাড়িয়েছি, তখন ননী বাবু অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করে বললেন, "আরে শুনুন মশায়, রাগ করবেন না, যেন মজার গল্প শুনলে আপনিও হাসবেন। At last, at last আপনি এসেছেন! কত দিন ধরে আপনার অপেক্ষা করছি জানেন —just one year, one long year! আপনার দেখা পেয়ে সত্যিই খুব আনন্দিত হলাম অমিতাভ বাবু। একটু চা খাবেন?"

"আপনি আমার অপেক্ষা করছিলেন?"

ননী বাবু আমার প্রশ্ন শুনতেই পেলেন না। অত্যন্ত কোমল, প্রায় স্নেহের সুরে বলে চললেন, "কত টাকায় কিনেছিলেন গাড়িটা। কি গাড়ি - শেভ্রোলে, ডি-সোটো, মারসিডিস? ওগুলিই তো ফ্যাশান হয়েছে আজকাল।..."

"For Heaven's sake, talk sense," আমি চীৎকার করে উঠলাম।

"A damsel in distress—স্মরণশক্তি লোপ—আশ্রয়দাতার প্রতি অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা—হঠাৎ এক ঠিকানা আবিষ্কার—অনুসন্ধানে আশ্রয়দাতাকে পাঠানো... was that the game with you too?"...পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে ভদ্রলোক আরও কত কি বলে চললেন; আমি ছুটে বেরিয়ে এলাম।

হোটেলের কর্তা বললে আমি চলে যাবার অল্প পরেই আমার সঙ্গিনী গাড়িখানা নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে, বলেছে ফিরতে দেরি হবে না। ঘরে এসে প্রথমেই চোখে পড়ল টেবিলের মাঝখানে একখানা চিঠি।

'বিবাহ বন্ধু—তোমার গাড়িখানাকে প্রথম দিন থেকেই আমি অত্যন্ত প্রশংসার চোখে দেখেছি, সে দিনটি কবে তা তুমি ভাবতেও পারবে না। কি উদ্দাম, সবল এর দৌড়, তারই ফলে আজ এই মুহূর্তে আমি তোমার থেকে ক-ত দূরে! এত দূরে যে চেষ্টা করলেও আর আমাকে তুমি ধরতে পারবে না।

তবু মাঝে মাঝে ভাঙা খোঁড়া গাড়িও আমাকে চালাতে হয়, যেমন দেখেছ তুমি, যেমন দেখেছেন ননীগোপাল দাস ঠিক এক বছর আগে। তাঁর গাড়িখানার চেয়ে কিন্তু তোমারটায় ঢের বেশী তৃপ্তি পাচ্ছি আমি। A distinct improvement for me!

এ দু দিন তোমার সঙ্গে বেশ কেটেছে কিন্তু, সে জন্য কি বলে যে তোমায় ধন্যবাদ জানাব জানি না। তার পর আজকে এই Last Ride Together—চমৎকার! আমার সঙ্গ যদি তোমায় কিছু মাত্র আনন্দ দিয়ে থাকে তো সেটুকুও মনে রেখ। আর একটা কথা বলি বন্ধু—

বিয়ে কর, মনের সঙ্গী ঘরে আন। তার যদি ভলুটেআর, ব্রাউনিঙ না পড়া থাকে তো কিছু এসে যায় না।

আমার উৎকৃষ্ট গাড়িখানা রইল পূজার উপহার। আগামী বারে উৎকৃষ্টতর ও উপভোগ্যতর কিছুর আশায় থাকতে পার। হে বন্ধু, বিদায়।'

জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, অন্ধকার আকাশে অসংখ্য তারার মেলা···Who knows but the world may end to-night!

জানি না এ গল্প কেউ বিশ্বাস করবে কিনা···

শ্রীচারুচন্দ্র বসু

জয়শ্রীর পাঠক পাঠিকাদের কাছে সুপরিচিত। গত কয়েক বছরে প্রকাশিত তাঁর গল্পগুলি সকলের প্রশংসা অর্জন করেছে। তাঁর স্বনির্বাচিত পনেরটি বড় ও ছোট গল্পের সংকলন প্রকাশিত হল। 'শনিবারের সন্ধ্যায়', 'গল্পের শেষ' 'প্রমীলার প্রেম' 'অতনু রায় কবি' ইত্যাদি স্থান পেয়েছে এই সংকলনে। বইয়ের নাম

শনিবারের সন্ধ্যায়

ভাল কাগজে, অ্যান্টিক হরপে ছাপা। দাম ছয় টাকা

প্রকাশক

ফার্মা কে, এল, মুখোপাধ্যায়

৬/১ বাঞ্ছারাম অক্রূর লেন, কলিকাতা-১২

পূজার আনন্দ উৎসবে

ও নিত্য প্রয়োজনে

সোদপুর পটারী লিঃ

এবং

বেঙ্গল পোর্সিলেন কোং লিঃ-এর

টি সেট

ও

অন্যান্য চায়ের সরঞ্জাম

অপরিহার্য্য ॥

সকল সম্ভ্রান্ত দোকানে পাওয়া যায়।

বিপ্লব

অমিয় ভূষণ মজুমদার

তখন আমাকে কিছুদিন বাইরে বাইরে থাকতে হচ্ছিলো। আত্মকর্মসংস্থান মজেছিলাম। বিষয়টা যখন নিজের চোখে পড়লো কষ্টের সীমা রইলো না। অথচ ঠিকঠাক পঞ্চাশটি টাকা বেশি পাব ব'লে এই চাকরি স্বীকার করেছিলাম। বোধ হয় সে কথাটাও বলতে হবে —চাকরিটা যাকে চাকরির বাজারে একজিকিউটিভ বলে, অর্থাৎ অধস্তন কর্মচারীর নিয়োগ বদলী, ছুটির হুকুম দেয়ার ক্ষমতা, আর তাদের ভুলত্রুটি ধরার অধিকার, বিশেষ ক'রে এই শেষেরটি। ইতিমধ্যে অন্তত একজনের এমন ত্রুটি ধ'রে ফেলেছি যে সেন্ট্রাল পুলিশে খবর দেয়া দরকার হ'য়ে পড়েছে। এই ঘটনা থেকেই অধস্তনদের চোখে তখন আমার চরিত্র নির্ণয় হ'য়ে গিয়েছে। বাড়িতে ওরা বলছিলো চলাফেরার জন্ত একটা কিছু কেনা দরকার, না হয় ভালো দেখে সেকেণ্ডহ্যাণ্ড হ'ক।

কিন্তু সেদিন সন্ধ্যায় আমি যখন বাইরের বারান্দায় বসেছিলাম সব দিক দিয়েই যেন ঘ'নে গেলাম। শ্রাবণের সন্ধ্যা। কাজেই বাতাসটা বাদলস্নিগ্ধ। ডেকচেয়ারে বসে আকাশের কিছুটা চোখে পড়ছিলো। আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তাটা সদর রাস্তা থেকে বেরিয়ে আসা একটা গলি। এপারে আমাদের বাড়ি ওপারে খানিকটা খোলা জমি, জমিটার শেষে একটা পুকুর তার উপরে এই শ্রাবণে কচুবিগানার গাছগুলো সবুজের একটা দেয়াল তোলে। পুকুরের দূরপ্রান্তে একটা লাইটপোস্ট। সেখানে আলো আছে। আমার শিয়রে ঘরের মধ্যেও আলো জ্বলছে। ছেলেরা পড়ছে সেখানে। আমার বাঁ হাতের দিকে আমার ভাই-এর চেয়ার বরাবরটার শেষে। এখন সেখানে মক্কেলদের ভিড় নেই। আমার প্রায় সামনেই জাপানি গেটটার উপরে ঝাঁকড়া পেয়ারা গাছটাকে অন্ধকারে ফুলগাছ মনে হচ্ছে। ছেলেদের একজন সেকসপীয়রের নোট মুখস্থ করছে। আমার বাঁদিকে বারান্দার উপরেই একসারি টব। নিমগাছের মতো চেহারা অথচ অত্যন্ত ছোট ঝাঁকড়া সেই বাহারে গাছগুলোর নাম জানি না। তার পাতার ফাঁকে পুকুরের ওপারের আলোটাকে গাছের ফাঁকে দেখা চাঁদের মতো মনে হচ্ছে। বারান্দার কাঠের থামগুলোও সবুজ রঙের। সব মিলে অল্প আলোর ফলে সবজেটে এক অন্ধকার ছিলো বারান্দায়। ছাত্রজীবনের কথা মনে পড়লো। এখন আর সেকসপীয়র পড়ি না। কিন্তু তার বদলে কি করি? এর চাইতে ওকালতি ভালো ছিলো। একটু ঈর্ষা নিয়েই যেন এখন বন্ধ লোকশূন্য ছোট ভাই এর চেয়ারের দিকে চাইলাম। কিন্তু সেই বা কি ক'রে? দিবারাত্রি মক্কেলদের বোঝা ব'য়ে বেড়ানো ছাড়া। এখন বেড়াতে গিয়েছে ফিরে এসেই নথি নিয়ে বসবে না? কাল সকালেই আমাকেও পরিদর্শনে যেতে

হবে। দীর্ঘ নিশ্বাস পড়লো। এই অস্পষ্ট অন্ধকারে সবুজ বারান্দায়—ছেলেরা তাই নাম রেখেছে—বসার সুযোগ কাল সন্ধ্যায় আমার থাকবে না। তখন আমার মনে হ'লো শেকস্‌পীয়র পড়া—শেকস্‌পীয়র কেন কোন পড়াই —আমার পক্ষে আর সম্ভব হয় না। ঈশ্বর যতো কিছু যার স্বরূপ এই অস্পষ্ট অন্ধকারে বোঝা যাচ্ছে না তাই অনুভব করলাম। নিজের সঙ্গে তর্ক হ'লো। পেশা তো একটা থাকতে হবে! ওকালতি, ডাক্তারি, ছাত্র পড়ানো এক এক ক'রে আলোচনা করলাম, ওজন করলাম। কিন্তু কিছুই আমাকে সেই আত্মগ্লানির ডেলচেয়ার থেকে তুলতে পারে এমন মনে হ'লো না। ভদ্র এই শব্দটার পাকে নিজের জীবনকে একান্ত হীন মনে হ'লো। খুব কষ্ট হ'লো। আর কোনদিনই উঠতে পারবো এমন মনে হ'লো না। তখন উঠে গেলাম ঘরের ভিতরে। এ ঘরে ছেলে চটি পড়ছে। বসলাম টেবলটার কাছে। বারান্দার সবুজ স্নিগ্ধ অন্ধকার থেকে ঘরের আলোয় এসে কিছুক্ষণ যেন পথ খুঁজে পেলাম না। পাছে ওরা আমার সেই অবস্থা দেখে ফেলে আমার মুখ আড়াল রাখার জন্যে টেবলের উপর থেকে একটা বই কুড়িয়ে নিলাম। 'মধুসূদন' সম্বন্ধে এখানা সাধারণ বই। পাতা উল্টাতে উল্টাতে এক জায়গায় এসে থামলাম। পংক্তি কয়েকটি আবার পড়লাম তারপর ছেলেদের বললাম, এই পংক্তি কটি পড়ছি। লেখকের নাম বলবো না কার সম্বন্ধে বলা হচ্ছে তাও বলবো না। তোমরা বলো দেখি। সেই জায়গাটা পড়লাম যেখানে বলা হয়েছে: কাল প্রবল, সুপবন বহিতেছে দেখিয়া জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও। তাহাতে নাম লেখ, শ্রীমধুসূদন। ভালো লাগলো যখন ছোট ছেলেটি বললো—ভাষা দেখে মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা। মনে হ'লো তখন যা হারিয়ে যাচ্ছিলো খুঁজে পাওয়া গেলো। এখন তা হ'লে অতীতের সঙ্গে নিসম্পর্ক হই নি আমরা। বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীমধুসূদনের সঙ্গে খুব দূরান্বয়ী সংযোগ হ'লেও সংযোগ যে আছে আমাদের মনের এটাই তখন ভালো লাগলো। ভালো লাগার মতো একমাত্র কিছু।

ছেলেরা যখন খেতে গেলো গৃহিণী এলেন। বললাম তাঁকে। তিনি সব শুনে বললেন, আগে ভদ্রলোক তাদেরই বলতো যারা নিজের হাতে কাজকর্ম করতো না। গান বাজনা কাব্যি নিয়ে দিন কাটাতো। সে অভ্যাস রক্তে থেকে কখনও কখনও বিরক্ত করে।

একটু বিরক্তি বোধ করলাম, বললাম আমি কি বলেছি কাল থেকে আর চাকরি করব না?'

গৃহিণীর বেশিক্ষণ থাকার কথা নয় তখন। ছেলেদের দেখতে গেলেন। আমি তখন ভদ্র জীবনের কথা চিন্তা করলাম। অনুভব করতে প্রয়াস পেলাম, আমার যে কষ্টটা বোধ হয়েছে সেটা ভাবপ্রবণতা। লোকে নিশ্চয়ই আমাকে ভদ্র সমাজের ব'লেই মনে করে যখন সুট প'রে কর্মস্থলে যাই।

সে রাত্রিতে ঘুমাতে দেরী হয়েছিলো। ট্রাওয়ে খাওয়ার টুকিটাকি গোছানো হচ্ছিলো পাশের ঘরের আলোয়। আমি দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ একটা চীৎকার শুনে উঠে বললাম।

'কি হ'লো?'

ধোবাবাড়ি ফেরৎ প্যান্টে বোতাম বসাচ্ছিলেন গৃহিণী। বললেন, 'কিছু নয়। ওরা কথা কাটাকাটি করছে।'

বললাম, 'কি আশ্চর্য! এখন এত রাতে। পাড়া-প্রতিবেশীর ঘুমের সময়। তাও বোঝে না।'

'হঠাৎ ঘুম ভেঙেছে ব'লে তোমার তাই মনে হচ্ছে। এমন জোরে আর কি বলেছে?"

'তাই?'

গৃহিণী রসিকতার চেষ্টা ক'রে বললেন, 'তুমি বলেছিলে

ঢাকা জেলার ভাষা তোমার বার্ণসের কবিতা মনে করিয়ে দেয়।'

কথাটা মিথ্যা নয়। বিশেষ ক'রে ঢাকা জেলার ভদ্র মেয়েদের ভাষা সম্বন্ধে বলেছিলাম। বললাম, 'কিন্তু আমি আরও অনেক কিছু বলেছি, বলেছিলাম ও জায়গাটুকু কিনবো।'

উত্তর দেবার আগে গৃহিণী চিন্তা করলেন। প্রায় দু বছর আগে কেনার প্রস্তাব করেছিলাম। আমাদের বাড়ির পশ্চিমে লাগানো বাড়িটা ছিলো সহরের এক উঠতি দোকানদারের। হঠাৎ দোকানদারের মৃত্যু হ'লো। তার পরিবারে উপার্জন করার মতো আর পুরুষ ছিলো না। তার বাড়ির ঘরগুলো তখন ভাড়া দেয়া সুরু হয়। তাদের বাইরের দিককার ঘরে একবার ভাড়াটে আসে। দুই বন্ধু। তাদের একজন বিবাহিত। একদিন মাঝরাতে চেঁচামিচি হ'লো। অদ্ভুত ব্যাপার! চেঁচামিচি থেকে যা বুঝলাম তা এই দুই বন্ধুর একজন ক'রে ঘরে শোয় অন্যজন বাইরে বারান্দায়। প্রতিবেশীরা আবিষ্কার করেছে এই ঘরে বাইরে শোয়ার ব্যাপারটা তারা একটা রীতি অনুসারে পালটে নেয়। যার স্ত্রী ব'লে মেয়েটি পরিচিত সেই বন্ধুটি বললো: ওর ঘর ব'লে আজ ঘরে শুয়েছে। কিন্তু এ কৈফিয়ৎ প্রতিবেশীদের কাছে গ্রহণযোগ্য হ'লো না। ছি-ছি। তখন আমি বলেছিলাম যত টাকাই লাগুক ও জায়গাটা আমি কিনে নেব। বাড়ি বাড়তে পারবো না। বাগান হবে। তা না হ'ক, জঙ্গল হবে। একটা ব্যবধান তো হ'লো।

পরদিনই সেই দুই বন্ধু ভাড়াটেরা চ'লে গিয়েছিলো। তখন রাত্রির সেই গোলমালের উত্তেজনা নেই। গৃহিণীর সংসার সম্বন্ধে পরিকল্পনা আছে। বলেছিলেন তিনি, 'জঙ্গল হওয়ার চাইতে গরীবদের আশ্রয় কি ভালো নয়? তা ছাড়া নিজের বাড়ী এবং প্রতিবেশীর বাড়ীর মধ্যে জঙ্গল বা বাগানের ব্যবধান রাখা এক রকমের উদাসিকতা।'

জায়গাটা কেনা হয় নি।

বললাম, 'তাই ভালো ছিলো না, জায়গাটুকু কিনে নেয়া?'

গৃহিণী বললেন, 'দারিদ্র্যই। আর কিছু নয়। ছোটছেলেটার খুব বড় মেয়েটা খেয়ে ফেলেছে। ভাত খাওয়ার কিছু ছিলো না। মা বলেছিলো দুধটা খেয়ে ফেলে দিস। মেয়েটা সবটাই ঢেলে নিয়েছে। কতটুকুই বা ছিলো।'

'তার জন্যে এমন চেঁচামিচি। অভদ্র ইতরতা! অত বড় মেয়েটাকে যায়বে?'

'এখন খেয়ে যাচ্ছে। ঘুমাও তুমি।'

অন্য ভাড়াটে বাড়ি হ'লে যা হয়: সঙ্গতিহীন লোক এসে বাসা করে। দেখতে পাচ্ছি ওই এক বাড়ীতেই নানা সময়ে নানা লোক আসছে। উঠেও যাচ্ছে। অধিকাংশই নানা অফিসের পিওন শ্রেণীর চাকুরে। কিন্তু অনেক সময়েই সহরের ভাসমান এক শ্রেণীর উদ্বাস্তু।

এসব বিষয়ে হেডক্লার্কবাবু বিশদ খবর রাখেন। একদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে বললেন, 'এরা, যারা, ছোটখাট ব্যবসা করে। ওপারেও তাই করতো। অমিজবার কাজ জানে না যে গ্রামে যাবে।'

একদিন একটা বিস্ময়ের কারণ ঘটে গেলো। ভোরের গাড়ি ধরতে হবে। রাত তিনটেতে ঘুম ভেঙে গেলো গৃহিণীর ডাকে। পাশ ফিরে শুতে গিয়ে শুনতে পেলাম তিনি মনে করিয়ে দিচ্ছেন—কাল রাত্রিতে দাড়ি কামাই নি; স্নানের জল প্রস্তুত। বিরক্তিতে মন ভ'রে উঠলো। গজ্‌গজ্‌ করতে করতে উঠলাম। গৃহিণী চা এনে দিলেন। তিনি অবাক হলেন। বললেন, 'শরীর ভালো নেই?'

তিনি অবাক হলেন। বললেন, 'শরীর ভালো নেই?'

বললাম, 'ভদ্রলোকের পেশা বটে!'

গৃহিণী কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে থেকে স্টোভের ধারে খাবার তৈরি করতে ব'সে গেলেন।

দাড়ি কামিয়ে, স্নান শেষ ক'রে, ঘরে ফিরে টেবলের ধারে বসেছি আয়নার সম্মুখে এমন সময়ে শুনতে পেলাম কেউ যেন কিছু পড়ছে। পরীক্ষার আগে ভোর রাত্তে ছাত্ররাই তেমন প'ড়ে থাকে। শব্দটা গৃহিণীর কানেও গিয়েছিলো। পাশের ঘরে টেবলে খাবার পোছাতে পোছাতে তিনি শুনছেন মনে হ'লো। সেখানে গেলে তিনি বললেন, 'মাঝে মাঝেই পড়ে, কি পড়ে বলো তো?'

অবাক হওয়ার কথাই। শুনলাম কাদম্বরী পড়ছে কেউ। সেই ঘোরনস্থর সমাসজড়িত গদ্য কাব্য।

কিন্তু অবাক হওয়ার সময় নয় তখন। আর্দালি এসে গিয়েছে, সাড়া পেলাম। ট্যাক্সিকে বলা ছিলো। সেটাও মুহূর্ত হর্ন বাজিয়ে এসে থামলো দরজায়। গাড়িতে গাড়ির সময়। ওদিকে বিছানা বাঁধছে আর্দালি। এদিকে কোটে হাত গলাচ্ছি আমি।

প্রায় সপ্তাহ পরে বাড়ীতে ফিরলাম। অন্তত পাঁচদিন তো বটেই। আজ আর আফিসে যাবো না স্থির করলাম। গেলেও বিকেলের দিকে। দুপুরে দিবানিদ্রার শেষে উঠে বসেছি। গৃহিণী কাছে এসে বসলেন। খবরের কাগজের খোঁজ করলাম। ছোট মেয়েটা কাগজ আনতে গেলো। সেই অবসরে গৃহিণী বললেন, 'আবিষ্কার করেছি, বুঝলে।'

'কি আবিষ্কার এমন?'

'সংস্কৃত কে পড়ে জানো? রামেন্দু রায় ওর নাম। পাশের ভাড়াটের বাবা। ভদ্রলোক সংস্কৃতে এম-এ পড়তে পড়তে লেখাপড়া ছেড়ে দেন।'

'বিশ্বাস হচ্ছে না।'

'না হ'লেও, সত্যি।'

'তা আবার পরীক্ষা দেবে নাকি?'

'বলো কি? বাট বছর তো হয়েই বয়েস।'

'তা হ'লে? কি জানি।'

বিকেলে বাড়ির সামনে গলি রাস্তাটায় পায়চারি করছিলাম। সঙ্গে ছোটমেয়েটা পায়ে পায়ে চলছে আর বক্ বক্ করছে। এমন সময়ে দৃশ্যটা চোখে পড়লো। পাশের সেই বাড়িটার প্রবেশ পথে যে ঘরখানা তার দেয়ালের গায়ে একটা ইঞ্চি ছয়েক লম্বা এবং দু তিন ইঞ্চি চওড়া টিনের পাত বসানো। তার গায়ে যেন কিছু লেখা আছে। সাধারণত এ বাড়িটার দিকে চোখ তুলে তাকাতে আমার সঙ্কোচ বোধ হয়। নানা ধরণের লোকই তো থাকে সেখানে। কারো সঙ্গে চোখাচোখি হ'য়ে যায় এবং পরে সেটাই প্রতিবেশী হিসাবে পরিচয়ের সূত্রপাত হয় তা আমি চাই না। কিন্তু ওই নেম প্লেটটা আমার কৌতূহল আকর্ষণ করেছিলো। চোখা চোখে পড়ে নিলাম—মোক্তার রামেন্দু মোহন রায়, বি-এ।

এই তা হ'লে সেই রামেন্দু যে মাঝে মাঝে কাদম্বরী পড়ে।

বাসায় ফিরে গৃহিণীকে বললাম, আমার এই আবিষ্কারের কথা।

গৃহিণী বললেন, 'ঠিকই ধরেছো।'

'কিন্তু বলো তো, কথাটা মনে হ'লো, কাদম্বরী ভোর সকালে কেন পড়তে হবে এবং অমন লোককে শোনানোর মতো জোরে জোরে।।'

'শোনানো নাকি কথাটা?' গৃহিণী হাসলেন।

এটা একটা উত্তর হতে পারে।

বললাম 'কিন্তু তা হ'লেও কাদম্বরী সত্ত্বেও প্রতিবেশীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আমি চাই না।'

'এ কথা বলছো যে?'

'তুমি আলাপ করতে ভালোবাসো।'

'এমন তো হ'তে পারে', গৃহিণী বললেন, তোমাকে মানে আমাদের শোনায় না কারময়ী।'

'তুমিই বলেছ শোনানোর কথা। আমি খ'রে নিয়েছিলাম নেমপ্লেটে নামের শেষে যে জন্য বি-এ কথাটা লেখা হয়েছে সেই উদ্দেশ্যই ধরে।'

'ওই বাসায় আরও নানা ভাড়াটে আছে।'

'আছে বলেই মনে হয়। কি ক'রে পাকে ভাবতে আশ্চর্য লাগে।' বললাম 'তাদের থেকে নিজের পার্থক্য জানাতে চায়।'

'বলো কি!' আশ্চর্য হয়েছিলাম।

'তুমিও তো বাগান কিম্বা জঙ্গলের ব্যবধান রাখতে চাও।'

একটু চেপে থেকে কথাটাকে অন্য খাতে চালিয়ে নিলাম। গৃহিণীকে তার আলাপ করার দুর্বলতার কথা ব'লে এই খোঁচাটা পেলাম। কিন্তু গৃহিণী এক কাপ চা ক'রে আনলেন। চা'টা ভালো হয়েছে দেখলাম। অনুভব করলাম এটা কলহ মিটিয়ে নেবার চেষ্টা।

চা এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'কিন্তু কি দারিদ্র্যে দিন কাটে। কাল ওদের সারাদিনের বাজারের খরচ শুনলাম বারো আনা পয়সা। অথচ পাঁচজন খায়।'

'আমাদের এই বাংলাদেশেই আরও অনেক আছে।'

আলোচনাটা হ'লো না। সুতরাং তিনি চিরুণী নিয়ে জানলার গোড়ায় গিয়ে দাঁড়ালেন এবং চুল খুলে দিয়ে তার সংস্কারে মন দিলেন। কিন্তু যাকে এড়াতে চাও তাই ঘুরে ঘুরে আসে নতুবা জীবনকে গল্পের চাইতে বিচিত্র বলেছে কেন।

গৃহিণী বললেন, 'দেখো, দেখে যাও।'

উঠে যেতে হ'লো জানলার গোড়ায়। সেখান থেকে পশ্চিমের রাস্তা আকাশটা চোখে পড়লো। তার আড়ায় পিচের রাস্তাও যেন রঙীন দেখাচ্ছে। চ একজন লোক চলেছে সে পথে।

'দেখলে!' বললেন গৃহিণী মাথার উপর দিয়ে চিরুণীটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে তার এক মাথা দাঁতে কামড়ে ধ'রে।

'কি?'

'সিনেমায় যাচ্ছে বোধ হয়। তাই নয়!'

'অদ্ভুত কথা। ক্রিয়াটার কর্তা কোথায়?'

'ওই। প্রতিবেশিনী।'

একটি স্ত্রীলোক যাচ্ছে বটে পিছি দিয়ে। পরনে মাঝারি দামের একটা শাড়ি। বেশ মানিয়েছে কিন্তু। চেহারাটা ভালো বলতে হবে। আসনে ফিরে এসে বললাম, 'মানুষ যাবে ব'লেই, সিনেমা।'

'কিন্তু—'

'কি?'

'লোকটিকে চিনলাম না।'

'প্রতিবেশী না বলছো? তা তুমি প্রতিবেশিনীর আত্মীয় বন্ধু সকলকেই চিনবে এমন কি কথা আছে।'

সেদিনটা রবিবার ছিলো। আমাদের এই সহরে রোজ বাজার হয় দুবেলাই, কিন্তু প্রাচীনকালের রীতি-মেনে রবিবারে হাটও হয়। হাটে কতক জিনিস পাওয়া যায় যা বাজারে ওঠে না। কাঠের জিনিসপত্রই তার মধ্যে বেশি। রেডিমেড একটা মিটসেপ্ কিনবার ছিলো। তাই গিয়েছিলাম। সঙ্গে ছিলে ছেলো। কাঠের দোকান-গুলো যেদিকে বসেছে তার কাছেই একটা গাছ, গাছের ছায়ায় ছোট ছোট কয়েকটি দোকান। একটি চুড়িওয়ালী বসেছে তার দোকান সাজিয়ে। রবারের ছোট ছোট জুতো বিক্রি করছে লুঙ্গি পরা একজন পশ্চিমা দোকানদার। অনেকদিন এদিকে আসা হয় না বলেও বটে সব কাঠের দোকান এখনও বসে নি বলেও বটে এদিক ওদিক ঘুরে দেখছিলাম। এমন সময়ে লক্ষ্য করলাম ছেলেটি অন্য-

মনের মতো কি দেখছে। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে দ্রষ্টব্য কিছু দেখতে পেলাম না। সে হয় চুড়িওলার ঔজ্জ্বল্যই লক্ষ্য করছে নতুবা বলতে হবে গাছতলার নিচে যে ছোট চায়ের দোকানটা আছে সেটাই তার দ্রষ্টব্য। চায়ের দোকান—একটা তোলা উনুন, ছোট একটা কালিয়ে যাওয়া ডিমে টেবিলের উপরে সাজানো দু চারটে কাপ সাত আটটা ছোট কাচের গেলাস। দুটো বেঞ্চ।

বললাম, 'কি রে?'

'খোকোদের দোকান।'

'খোকো? সে আবার কে? এমন নাম তো শুনিনি।'

কিন্তু এমন সময়ে কাঠের দোকানদাররা এসে গেলো। গাড়ি থেকে তারা চেয়ার টেবল নামাতে শুরু করলো। অনেক দেখে একটা মিটসেফ পছন্দ হ'লো। সত্তর টাকা দাম। দোকানদার বললো—'ভালো হবে না, বাবু মশায়। তবে রেডিমেড এর চাইতে ভালো হয় না।'

হাসতে হ'লো। বললাম, সুন্দর বলেছো।'

বাড়িতে ফিরেও মিটসেফটা নিয়েই খানিকটা সময় কাটলো। গৃহিণী মন্তব্য করলেন বছর পাঁচেক যাবে। সুতরাং হাটে যাওয়া সার্থকই হয়েছে। কেনার ব্যাপারে ছেলেরও কিছু বলার ছিলো। সে শুধু সঙ্গেই ছিলো না। পছন্দের ব্যাপারেও কিছু বলে থাকবে সে সম্বন্ধে। কিন্তু তাকে ঠাট্টা করার লোভ সম্বরণ করা গেলো না। বললাম, 'তুমি আবার পছন্দ করলে কখন? তুমি তো খোকোদের দোকান দেখছিলে।'

'ওমা তা কেন? হ্যাঁ মা সত্যি। খোকোদের দোকান দেখে এসেছি।' বললো সে। আবিষ্কারটা যে মূল্যবান সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তার মা বললেন, 'সত্যি! কি রকম দোকান রে?'

'বড় নয়। চায়ের দোকান।'

বললাম, 'কিন্তু কে এমন খোকো তোমাদের?

গৃহিণী স্বর একটু নিচু করলেন। বোধ হয় কথাটা বলতে গিয়ে খেয়াল হ'লো। বললেন, 'প্রতিবেশিদের ছেলে।'

ছেলে চ'লে গেলে হঠাৎ মন্তব্য করে বসলাম, 'ওই দোকানে সংসার চলে না বোধ হয়।'

'চালতে হয়।'

প্রায় দশদিনের জন্য বাইরে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে স্থির করলাম কিছুদিন অন্তত বিশ্রাম করবো।

হাতমুখ ধুয়ে চায়ের টেবলে বসেই বললাম, 'বলো, এবার তোমাদের কথা, শুনি।'

অনেকদিন পরে ফিরেছি তো বটে। অনেক কথাই বলার ছিলো গৃহিণীর। গোয়ালা দুধ খারাপ দিচ্ছে এ সংবাদ থেকে শুরু করে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া যে মোটেই হচ্ছে না- -সংলগ্ন অসংলগ্ন অনেক বিষয়ের খবরই পাওয়া গেলো। কারণ তখন কথা বলার মতো মনের অবস্থা ছিলো। দশদিনের প্রতিটি মিনিটের বর্ণনা দেয়া হ'য়ে গেলেও আরও যে অনেক কিছু বলা বাকি থাকবে সন্দেহ কি?

আমি বললাম, 'আর একটু চা দিও।'

টি পটে ছিলো।

চা খেতে খেতে বললাম, 'এবার তোমাকে একটা ইলেকট্রিক স্টোভ কিনে।'

'না, তার জন্যেও তোমার এতদিন ঘ'রে বাইরে থাকার দরকার নেই।'

কথাটা বলে ফেলেই গৃহিণী লজ্জিত হ'য়ে উঠলেন। তার এই মনোভাবটাকে ঢাকার জন্যই প্রায় সঙ্গে সঙ্গে যাহোক কথা, যে কোন কথা, বলার মতো সুরে বললেন, 'আচ্ছা আফিম কেন খায় লোকে?'

'দুঃখ ভুলে থাকার জন্যে বলছো ?

'তাই মনে হয় না ?'

বড় লোকদের মধ্যেও কিছু আগে ওটা ছিলো। সন্ধ্যায় মৌতাত। দুঃখ কি বলো। মীরজাফর শুনেছি আফিম মুখে ফেলে তখতেই তাউসে বসতেন। সুন্দরীদের নাচ দেখতেন।'

'নেশা মানুষকে কোথায় নামিয়ে আনে দেখো।' গৃহিণী স্বরটাকে নামিয়ে আনলেন, বললেন, 'আজকাল যাদেরতাই ঝগড়া হচ্ছে। তা দোষ দেয়া যায় না। ওই তো ছোট চায়ের দোকান। তা থেকে কিই বা আয় হ'তে পারে।'

'প্রতিবেশীদের কথা যত আলোচনা কম করা যায় ততই ভালো। তুমিও তো ওদের আলোচনার বিষয় হ'তে পারো।'

গৃহিণী ভাবলেন।

কিন্তু আলোচনা করার ইচ্ছা না থাকলেও অনেক সময়েই অনালোচ্য বিষয়ে ব্যক্তিগত জ্ঞানলাভ হয়। সেদিন সন্ধ্যাতেই হ'লো। তুলনা দিতে বলতে হবে আমার ঘরে মৃদু ক'রে দেয়া রেডিওতে সীতারের রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সুরটা ছিঁড়ে ছিঁড়ে গেলো।

—লজ্জা করে না আপনের ? আমার বলে মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল আর আপনে দোকানে বইলেই পয়সা সয়ান।

—ধ্যাৎ স্টুপিড। বাপের লগে কথা কইতে জানস না। চুপ থাক্।

—লন নাই, লন নাই ? দেখছে, খোকোই দেখছে। দুই আনা পকেটে রাখেন নাই ? ভাত জোটে না তার নেশা ?

—চুপ থাক্। চুপ থাক্। বাপের লগে কথা কইতে জানস না।

এই শুরু। তারপরে ধাপে ধাপে উঠতে লাগলো। কিম্বা ধাপে ধাপে নামাই বলা উচিত বোধ হয়। কি কুৎসিত। মানুষের ভাষা কি এমন ক্লেদাক্ত হ'তে পারে। আলাপটা হচ্ছে বাপছেলেতে তা বোঝা যায়। রামেন্দু এবং তার ছেলে।

গৃহিণী এতক্ষণ একটা কথাও বলেন নি। ওদিকের গোলমাল যেন ক্লান্ত হ'য়ে থামলো। তিনি বললেন, 'এখানে কি আর বাস করা যাবে ?'

'এ রকম চললে, সত্যি মুস্কিল।'

'বুড়োটাও দেখো। আফিমের জন্যই পয়সা সরিয়ে রাখবে।'

পরদিন আমি যে বৃদ্ধকে দেখতে পাবো তা যেন গল্পের মতোই ঘটলো। বারান্দায় বসেছিলাম। অর্দালি হাজিরা দিতে এসেছিলো। বলে দিয়েছি জরুরী টেলিগ্রামের খবর ছাড়া আর যেন কিছু বাড়িতে না আসে। ছোট মেয়েটাকে নিয়ে ব'সে সময় কাটাবো স্থির করেছি। মনে হচ্ছে তাকে কথা বলতে শিখানো দরকার। বার মিশোলি যে ভাষায় কথা বলে সেটা আমার ভাষা নয়। এর কারণ সে আমায় সঙ্গ পায় না।

এমন সময়ে দেখলাম রোগাটে চেহারার এক বৃদ্ধ আমাদের সামনে দিয়ে যাচ্ছে। পোশাক পরিচ্ছদের জীর্ণতা সত্ত্বেও তার চলাফেরার ভঙ্গিতে একটা ভদ্রোচিত গাম্ভীর্য ছিলো। আমার মেয়েটি তার দিকে ডাগর চোখ মেলে চেয়েছিলো। সে চ'লে গেলে বললো, 'খোকোর দাই।'

'তাই নাকি ?'

মানুষকে দেখে কি তার জীবন সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। একে দেখে কিন্তু আফিমের জন্য পয়সা চুরি ক'রে নিজের ছেলের কাছে তিরস্কৃত হতে পারে তা মনে হয়নি। তারপর মনে হ'লো তার কাদম্বরী পড়ার কথা।

মানুষের জীবনের সঙ্গে নাটকের তুলনা দেয়ার অনেক-গুলো কারণের মধ্যে এটাও একটি যে তার জীবনের কিছু দৃশ্য কিছু অদৃশ্য থেকে যায়। দুটো অঙ্কের মাঝখানে ফাঁক থাকে। ফাঁকটা তার মনের ইতিহাস বলা যেতে পারে। আগের অঙ্ক থেকে পরের অঙ্কে যখন সে অবতরণ করে তখন আমরা ধ'রে নিতে পারি মাঝখানের যে সময়টুকু সে অদৃশ্য ছিলো ততক্ষণে তার মন পরের অঙ্কের জন্য প্রস্তুত হয়েছে, পরিণত হয়েছে। আমাদের প্রতিবেশীর জীবন, এবং আমাদের জীবনের সঙ্গে তাদের সংযোগ যেন এই সময়ে এক মধ্য অঙ্কে উপস্থিত হ'লো।

একদিন খেতে বসে শুনলাম রামেন্দু বাবুর ছেলে চেঁচাচ্ছে—অত ঝিঙ্গা কিসের লাগে? ঘর লাগবো কেন? আমি তোমারেও কই, তুনি, কিন্তু তুই বেলা কইয়া রাঁধবা তো…।

'চিল্লাও কেন।' বোধ হয় তুনিই বললো।

রামেন্দু বাবু খেতে বসেছিলো সম্ভবত। সে বললো, 'ঘাটুরে বয়সের কি আছে। আমি কইছিলাম, বুড়া মানুষ গীদালের বড়া মুখে রোচে।' 'চাই রোচে না?' ছেলে চিৎকার ক'রে উঠলো। 'আমি মানুষ খাটো মরি।'

বোধ হয় রামেন্দু বাবু খাওয়া ছেড়ে উঠে গেলো।

তুনি বললো, এটা কি করলা?'

ছেলে বললো, 'মা খাইছে, না খাইছে। এক পয়সার মুরোদ নাই, তার রাগ।'

রামেন্দু বাবুর গলা শুনে মনে হ'লো, 'কেন, তোর সংসারে আমি দুই শ' টাকা দিই নাই।'

'ওহ্, বড় দিছেন। এক বছর ধ'রে। তাই খাইছে।'

গৃহিণী বললেন, 'বাস্তবিক, কিন্তু তুমি খাচ্ছ না।'

হাতের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'এঁটো হাত একদম শুকিয়ে গিয়েছে। নতুন ক'রে ধুয়ে খেতে বসতে হয়। থাক এখন।'

মনে হ'লো যে ৬ শ' টাকার আবরণ, তা সে যতই অকিঞ্চিতকর হ'ক, এতদিন ছিলো ওদের দারিদ্র্যের উপরে সেটা ঘুঁচে গিয়েছে। এটা ওদের জীবনের চূড়ান্ত অঙ্ক।

রাত্রিতে, তা তখন বেশ রাত হয়েছে, ওদের সাড়া পেলাম আবার।

রামেন্দু বাবুর ছেলে বলছে, 'খায়েন নাই কেন।'

'খামু না। আমার খাওয়া ফুরাইছে।'

'রাগ করণের কি কাম। মাথার ঘামে কুকুর পাগল। দোকানে চা কিনুম সেখানে ছ টাকা বাকি, চিনি কিনুম সেখানে পাঁচ টাকা বাকি। আমি কত শালার হাত-পা ধ'রে বেড়াই। উঠেন ভাত খান।' রামেন্দু বাবুর রাগ পড়লো কি না বোঝা গেলো না। বললো, 'কাল খামু।' তুনিও কিছুক্ষণ সাধাসাধি করলো। রামেন্দু বাবু বললো, 'কাল খামু কইলাম।'

ভোর রাত হ'বে তখন। গৃহিণী কি গায়ে হাত দিয়ে ডাকলেন। অন্তত তিনি জেগে আছেন তা অনুভব করা গেলো। কেউ স্তোত্র পড়ছে? ও হরি! এতো সেই কাদরী। পত্রলেখার কথাই চলছে।

যোগাযোগ না হ'লে এমন ব্যাপার ঘটে না। কোল-কাতায় যাবো সরকারী কাজে। গৃহিণী সঙ্গে যেতে চাইলেন। কারণটা সামাজিক। তাঁরা কিছুদিন কোল-কাতায় থাকবেন। তাঁদের কোলকাতায় রেখে কর্মস্থলে ফিরে এসে মনে হ'লো—আমারই বা এ ভুল কেন? সুতরাং যদি তিনেকের ছুটির ব্যবস্থা ক'রে নিয়ে কিছুকাল এদিক ওদিক, কিছুদিন কোলকাতায় কাটানোর সংকল্প করলাম। সৌভাগ্য চাকরি নামক বিষয়টা প্রতিবন্ধক হওয়ার চেষ্টা করেও করতে পারলো না। গৃহিণী একদিন রসিকতা ক'রে বললেন: এ কি বিপ্লব নাকি? ভদ্র-জীবন যাপনের জন্য চাকরির প্রতি বিদ্রোহ?

প্রতিবাদ করার চাইতে চুপ ক'রে থাকতেই ভালো লাগলো।

কিন্তু গৃহিণীর কথিত বিস্ময় তো চিরস্থায়ী হ'তে পারে না। কাজেই আমায় ফিরতে হ'লো।

দু' চারদিন পরে এক রাত্রিতে বললাম, 'আর যাই হ'ক, কাঁড়াটা কেটে গিয়েছে।'

'কাঁড়া? ঠিক বুঝলাম না।'

'তোমার সেই প্রতিবেশীদের কথা।'

'ও মা, সত্যি! একদম ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু ওরা কি আছে? সাড়া পাইনি তো।'

ঠাট্টা ক'রে বললাম, 'ঝুনি না কি নাম? সাড়া না পেয়ে যেন চলছে না।'

কৌতূহল কিন্তু বিষম বস্তু। পরদিন বিকেলে অফিস ফিরৎ বাড়িতে পা দিয়েছি মাত্র। গৃহিণী এগিয়ে এলেন। ছাটটা হাতে নিয়েই বললেন, 'যাও নি কিন্তু। দুপুরে আজ একটু বেড়াতে গিয়েছিলাম।'

'বেড়াতে? কি সর্বনাশ ওদের বাড়িতে? বাস্তবিক মাঝে মাঝে তুমি যে কি করো?'

'না, না শোন।'

চেয়ার পেতে দিয়ে, পাখা খুলে দিয়ে; গৃহিণী হাসি হাসি মুখে কাছে এসে বসলেন। বললেন: ওদের অবস্থা এখন একটু ফিরেছে। দেখলাম যেন ঘরদোরের দিকে একটু মন দিয়েছে ওরা। আর তা ছাড়া তুমিই কি আর চেঁচামিচিও শুনছো। দোকানটা এখন বেশ আয় দিচ্ছে বলতে হবে।

হাল ছেড়ে দিয়ে বললাম, 'তা হবে।'

'দেখো, দারিদ্র্য মানুষের মেজাজ খারাপ ক'রে দেয়। এখন একবারও তেমন বিশ্রী কথাবার্তা শুনতে পাও?

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নিজের ক্লান্তি জানানো ছাড়া আর কিছু করার রইলো না আমার।

আরও শুনতে হ'লো। আমাদের সহরে পুজোর মেলাটা বেশ কয়েকদিন ধ'রে চলে। মেলায় ওরা দোকান দিয়েছে জানা গেলো। আর তাতে নাকি ভয়ঙ্কর বিক্রি। এত বিক্রি যে রামেন্দুবাবুর ছেলে বাড়িতে খেতে আসতে সময় পায় না। রামেন্দু বাবুকেও দোকানে গিয়ে বসতে হয়।

গৃহিণী ইতিমধ্যে একটি কাণ্ড ক'রে বসেছিলেন। নিজের ছেলেমেয়েদের জামা বানানোর সঙ্গে ও বাড়ীর খোকার জন্যে একটা জামা বানিয়ে নিয়েছিলেন। তাকে ডেকে সেটা দেয়াতে সে তো হাতে স্বর্গ পেলো। ঝুনিও খুব খুশী হয়েছে। তাই বললেন গৃহিণী। কিন্তু এর ফল ভালো হ'লো না। সেদিন ষষ্ঠী কিম্বা সপ্তমী হবে। হঠাৎ একটা ভারি গলার চেঁচামিচি শুনলাম। রাত তখন সোটা নয়েক হবে। সেই কণ্ঠস্বর কখনও কান্নায় কাতর হচ্ছে, কখনও তর্জন করছে, কখনও যেন নিজের এক পায়ের সঙ্গে অন্য পা জড়িয়ে গিয়ে পড়ে যাচ্ছে।

এই রকম শোনা গেলো: দান? রাম মোক্তারের নাতিকে দান?

ক্যাও? তা বেশ।

ঝুনি (সম্ভবত সেই) তাড়াতাড়ি এসে বাধা দিলো, 'আপনে ঘুমান, রাত হইছে ঘুমান।'

'কেন? আমি বেশ করছি? বেশ। একশোবার দাদু কাল তোরে আমি জামা কিনে দিব।'

ঝুনি বললো, 'না না আপনে ঘুমান, আপনে ঘুমান।'

'আমার নাতিরে জামা দেয়া! বড় লোক! বেশ।

'আপনে ঘুমান না, কি বিপদ!'

'সাটাপ। ঢাকার রাম মোক্তার পূজায় একটু ছিক করবো না।'

গৃহিণীর চোখে জল দেখা দিয়েছিলো। যে শাস্তি তিনি পেয়েছেন, তারপরে রসিকতা চলে না।

কিন্তু এটা একটা প্রক্ষিপ্ত ঘটনা। সত্যি ওদের দোকান পছমন্ত হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। যে জানালা থেকে ছুনিকে সিনেমায় যেতে দেখেছিলেন গৃহিণী সেখানে দাঁড়িয়েই দেখলেন পরের দিন রামেন্দুবাবু সত্যি পুজোর কাপড় জামা কিনে আনছেন। আর পুজোর বোনাস ভাঙলে তিনি খবর যোগাড় করলেন (আঘাতটা যেন তাঁর কৌতূহলকে তীক্ষ্ণ করেছে)।

—বললেন একদিন 'শুনেছ, ছুনির জন্ম ব্রজের চুক্তি পড়াচ্ছে রামেন্দু বাবুর ছেলে।'

হেসে বললাম, 'বানিয়ে বলছ।'

অন্য একদিন মাঝরাতের কাছাকাছি ওরা আবার আমাদের আলোচনার বিষয় হ'লো। মনে হ'লো কোন উৎসব হচ্ছে ওদের ভাষায়। একটা হাল্কা আলো জ্বলছে। ঘরের দাওয়ায় জন তিনেক খেতে বসেছে এরকম অনুমান হ'লো। ছুনি বোধ হয় এটা দিই, সেটা দিই বলে পরিবেশন করছে। কিন্তু অতিথি বোধ হয় একজন। আর দু তিনবার তার কথা শুনেই বুঝতে পারলাম সে বাঙালী নয়। সে রামেন্দুবাবুকে কাকাজি বলছে। ভাঙা ভাঙা বাংলায় অত্যন্ত মিষ্টি ক'রে কথা বলছে। লোকটার কণ্ঠস্বর সত্যি মিষ্টি। আর কেমন যেন স্নিগ্ধ। তাকেই রামেন্দুবাবু, তার ছেলে এবং ছুনি সেধে সেধে খাওয়াচ্ছে। তারপর জানা গেলো তার নাম লছমন, বাড়ি মজফরপুর জেলায়, চন্দনপট্টিতে।

রামেন্দুবাবু বললো, 'গরীবের বাড়ির খাওন।'

'আমি কোন বড়লোক আছি?' লছমন উত্তর দিলো।

বেশ স্নিগ্ধ একটা আবহাওয়ায় ওদের খাওয়া দাওয়াটা মিটলো। ওরা পুজোর বেলায় লাভলোকসানের আলোচনাও করলো। তা থেকে একরকম অনুমান করা যায় লছমনেরও ছোট খাটো একটা ব্যবসা আছে।

বললাম, 'দেখো দরিদ্রের মর্যাদা দরিদ্রই বোঝে। বিদেশী দোকানদার লছমনকে ওরা কত আদর ক'রে খাওয়াচ্ছে।'

গৃহিণী বললেন, 'আর আমি যে বলেছিলাম ওদের কদর্যতার জন্ম দারিদ্র্যই দায়ী।'

এই দার্শনিকতত্ত্ব ব'লে গৃহিণী সন্তুষ্ট হলেন।

এর পরে লছমনকে আমাদের গলি দিয়ে চলতেও দেখা গিয়েছে। তাকে বুঝে বলাই ঠিক হবে। পরণে আধ ময়লা ধুতির উপরে মাঝারি ফরসা মোটা কাপড়ের পাঞ্জাবি। পাকা ছোট করে ছাঁটা গোঁফ। মাথার চুল-গুলো সবই সাদা। মুখে একটা শান্তভাব আছে। প্রায়ই সে সন্ধ্যাতেই আসতো। এবং হয় রামেন্দুবাবু কিম্বা তার ছেলের সঙ্গে ব'সে ব'সে গল্প করতো। মুখে মুখে ব্যবসার হিসাবও করতো তারা। সব কথা শোনা যেতো না, শোনা উচিৎও নয়। মন্তব্য করলাম—এ কিন্তু এক নতুন সমাজ ব্যবস্থা যাকে প্রশংসাই করতে হয়।

—তিন চার মাস পরে কিন্তু আবার একদিন শুনতে হ'লো।

গৃহিণী বললেন, 'বুঝলে, শোন, ব্যাপারটা কিন্তু—'

'কোন ব্যাপার এমন জটিল হ'লো।'

'লছমন বোধ হয়—'

'কি বোধ হ'ল?'

'মানে গোপন মদ চোলাইএর কারবার করে।'

'সে কি?'

'হুঁ। আজ দুপুরে হঠাৎ দেশে চ'লে গেলো। এক-সাইজে কে এক আত্মীয় আছে ওর। সেই সাবধান ক'রে দিয়েছে। ওদেরও মুস্কিল। লছমনকে সব টাকা শুধে দিতে হ'লো কিনা। তাকে যেন ধার দিয়েছে।'

'তাই বলছো?'

সংসারের কাজ ছিলো। কিছুক্ষণ সে সবে ব্যস্ত

থেকে গৃহিণী ফিরে এলেন। বললেন, 'আচ্ছা, যাবে ওদের চায়ের দোকানটায় তা হ'লে'—

'এখন মনে হচ্ছে তাই। ভেবে দেখো বন্ধুরা কি এমন লাভ হ'তে পারে সেই ছোট্ট দোকানে যাতে ব্রজের চুড়িও হয়।'

'পাপ তো?'

'অপরাধ বলো।'

'সন্তের বইয়ে কোকেন টোকেনের যে সোপান কারবারের কথা পড়ি সে তো ভয়ঙ্কর সব ব্যাপার।'

'ওতটা না হ'লেও একই মাত।"

গৃহিণীর মুখটা বিশেষভাবেই বিবর্ণ দেখালো।

কিন্তু তেমন না হ'লেও ওদের সংসারের খিটখিটে ঝগড়া যেন কমেছে। আর তা থেকে প্রমাণ হয় দারিদ্র্যের অবিরত যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হ'য়ে আমাদের প্রতিবেশীদের মন কিছুটা সুস্থ হয়েছে।

একদিন অফিস ফিরৎ বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে থেমে দাঁড়াতে হ'লো। দুপুরে অনেক বাড়িতেই মেয়েদের আসর বসে। তাই বসেছে যেন আমাদের লিভিংরুমে। বালকভৃত্য চায়ের কাপগুলো এগিয়ে দিচ্ছে। তাতে বুঝলাম আমি ঠিক আসরের মাঝখানে এসে পড়েছি। সুতরাং বাইরের বারান্দায় ব'সে রইলাম। কিন্তু তাঁরাও আমার সাড়া পেয়ে থাকবেন। আধঘণ্টার মধ্যেই তাঁরা চ'লে গেলেন। তিন চারজন এসেছিলেন মনে হলো।

ঘরে গিয়ে বললাম, 'এতো ভালোই। মহিলা সমিতি করছো নাকি?'

গৃহিণী বললেন, 'না। ওরা সব এ পাড়ারই।'

তারপর একটু ঘনিষ্ট হ'য়ে দাঁড়ালেন তিনি। বললেন, 'আচ্ছা, মিষ্টির দোকানদার নাকি মিষ্টি খায় না।'

'তাই প্রবাদ।'

'কিন্তু মদের বেলায় বোধ হয় তা হয় না।'

'তুমি নিশ্চয় সুদিনের কথা বলছো। সেও এসেছিলো নাকি।'

'না। ওরা সব বললো আজকাল রামেন্দুবাবু নাকি সন্ধ্যার দিকে ঢ'লে ঢ'লে হাঁটে।'

'ওই বুঝো? ওরা বলেছে?'

'আর ছেলেটাও বোধ হয়।'

'এমনও তো হ'তে পারে এটা ওদের সুদিন দেখে প্রতিবেশী সুলভ হিংসা।'

'ঠিকই বলেছো।' গৃহিণী আমার সঙ্গে একমত হলেন। 'বন্ধুরা দেখো, দেরিতে হ'লেও ওরা সব দিকেই নজর রাখতে সুরু করেছে। ছেলেমেয়ে কটি আজকাল লেখাপড়া করছে। ওদের ঠাকুরদা যানে রামেন্দুবাবু পড়ায়।'

কথাটা মিথ্যা নয় প্রমাণ পেলাম। জোরে জোরে হেঁকে হেঁকে পড়াচ্ছে ছেলেমেয়েদের কেউ। আমাদের এদিকের ঘরে এসে বসলে শুনতে পাওয়া যায়।

কয়েকদিন পরে রিকসায় ক'রে বাড়ি ফিরছিলাম। মনে হ'লো যেন ওদের সেই নতুনকে দেখলাম। কৌতূহলের সঙ্গেই লোকটিকে দেখলাম। আর দেখে আমার ভালোই লাগলো। গোলমালটা বোধ হয় মিটে গিয়েছে। এ লোকটি সোপন মদ চোলাই করে কিন্তু মুখে এমন একটা স্নিগ্ধতা আছে যে তাকে দেখে বরং ভালোই লাগে।

বাড়িতে ফিরে তাই বললাম।

গৃহিণী বললেন, 'কিন্তু ওতো আর এদিকে আসে না। বরং আজকাল অন্য একটি লোক। বাঙালী সে, বরং যেন ওদের ওখানে আসে। লোকটার বন্ধুভাগ্য আছে।'

'এও হয়তো—'

'মদ চোলাই বলছো? তা মনে হয় না। আজকাল ওদের সহবাসীরা ওদের খবর দিয়ে থাকে।'

'কাজটা কি ভালো ?'

'অন্যায় কিছু তো বলে নি। ওরাও বলেছিলো ভাগ্যের কথা। একলক্ষে কি একটা ব্যবসায় নামবে স্থির করেছে তারই আলোচনা হয়।'

বলতে যাচ্ছিলাম সহবাসীদের পক্ষে ওটা পরচর্চা। কিন্তু গৃহিণীর সে কথা আমল দেবার মতো ভঙ্গী নয়। তিনি বললেন বরং, 'এর ব্যবসায় বুদ্ধি আছে, ওর টাকা আছে। ধনী নয়, তা হ'লেও—'

তা হ'ক! এমন করে যদি একটা সংসার উঠে দাঁড়াতে পারে মন্দ কি। যদিও প্রথমে লছমন পরে এই নরেনের আসাটা সেকালের গল্পের মতো সাজানো ব্যাপার। ওদের সংসারে এদের আবির্ভাব দেবদূতের মতোই।

কিন্তু ভাগ্য নামে একটি বিষয় আছে। অনেক ব্যাপারেই আমার মনে হয়েছে মানুষের চলার দুটো পথ আছে। তার প্রথমটি দীর্ঘ ক্লান্তিকর। অন্যটি অনেক ছোট কিন্তু বড় কষ্টের। ক্লান্তিকে ফাঁকি দিতে গেলে ভাগ্য কষ্টের শুল্ক আদায় করে। নতুবা ঠিক যখন ওদের সংসারে সব দিক দিয়ে লক্ষ্মীশ্রী লেগেছে তখনই কেন ওদের সকলেরই মেজাজ এমন রুক্ষ হ'য়ে উঠবে। যেন কি একটা রোগে সকলেই অসুস্থ।

গৃহিণী বললেন, 'দারিদ্র্য বরং ভালো। ওরা যেন সুদিনের মুখ দেখে সকলেই অসহিষ্ণু হ'য়ে পড়েছে।'

'কি ঘটলো ?'

'মাঝে মাঝে ঝগড়া হচ্ছে।'

'অর্থ একটা শক্তি। নতুন শক্তি অর্জন করলে কখনও কখনও হয় এমন।'

একদিন ওদের বাড়ির কোলাহল মধ্যের ব্যবধান ডিঙিয়ে আবার আমাদের ঘর থেকে শোনা গেলো।

'ওই ছাইগুলো গিলছেন আবার।'

'ঘাট-আশ। মূর্খ। বাপের সঙ্গে কথা কইতে জানস না।'

'মূর্খ? তারি আমার বি-এ পাশ রে। এক পয়সা কামাই হয় ওই বি-এ পাশে।'

'হ হ চুপ থাক।'

গৃহিণী কাপড়ে মুখ চাপা দিয়ে হাসলেন।

'কি।'

গৃহিণী বললেন, 'তা, বাপু, তোমার আফিমের চাইতে ভালো।'

কিন্তু অন্য একদিন ব্যাপারটা কটু হ'য়ে উঠলো।

'বলি কোন লাটসাহেব হইছেন। মাছ লাগবো রোজ।'

'কেন, মাছ কি দোষ করছে ?'

'দোকান থিকে টাকা লন কেন ?'

'রাখ রাখ।'

রামেন্দু বাবুর এই উপেক্ষার ভাবটাই যেন তার ছেলেকে ক্ষিপ্ত ক'রে তুললো। সে বলল, 'অমন নোলা সাঁড়াসিতেটানে ছিঁড়া লাগে।' রামেন্দুবাবুর নেশার আফিম টুটে যাওয়ার মতো হ'লো।

সে বললো, 'কি কলি ? কি কলি ?'

ছুনি যোগ দিলো, 'কি করও তুমি বাপরে। যাও, যাও।'

রামেন্দুবাবুর ছেলে গলা চড়িয়ে বললো, 'কয় না ? আজ মাছ, কাল আম, পরশু দুধ। আমারে সর্বস্বান্ত করতেছে তা দেখো না।'

'তোমার ছাওয়ালমিয়েরা খাতে চায় উনি করবো কি ? ছুনি বললো। এমন সময় সেখানে একটা নতুন কণ্ঠস্বর শোনা গেলো। রামেন্দুর ছেলেকে সে বললো, 'কি যা তা বলো। উনি বুড়া মানুষ। কয়দিন থিকে ভুগতিছে। তা আমি বললাম ভাল খাবেন না।'

'তা বলেই হয়।' এটা একটা হঠাৎ পরিবর্তন

রামেন্দুর ছেলের ভঙ্গিতে। যেন অনেক উত্তাপ জল হ'য়ে গেলো। আর কিছুক্ষণ ওরা কথা বললো কিন্তু কণ্ঠস্বর শমিত হওয়ায় আমাদের ঘরে তা শোনা গেলো না।

বললাম, 'কোনটা ঠিক ?'

'হয়তো দুটোই। অসুস্থ হ'লে মার খেতে হয় সাধ্য না থাকলেও। আর ঠাকুরদার পক্ষে নাতিনাতনীদের মার খাওয়াতে চাওয়া এমন কিছু অস্বাভাবিক নয়।'

'তা হ'লেও অবস্থা বুঝে চলা উচিত।'

গৃহিণী বললেন, 'একটা কথা কি জানো। রামেন্দু বাবুর ভাগ্যটাই কেমন যেন। লোকে বলে ভাগ্যবানের বউ মরে। তা হ'লে ওর তবল ভাগ্যবান হওয়া উচিত ছিলো। পৃথিবীতে এই ছেলে ছাড়া কেউ নেই। ঢাকা সহরেই মোক্তারি ব্যবসা ছিলো। পঞ্চাশের মন্বন্তরে এসেছে।'

একটু চিন্তা করতে হ'লো। কথাটাকে আড়াল করার জন্ত বললাম, সেই নরেন নাকি লোকটা যে খাবালো।

'বোধ হয়।'

একদিন বেটা বউএর সঙ্গেও ঝগড়া হ'লো রামেন্দুর। ছুনি বললো, 'একটুক পড়ালেও তো পারেন ছাওয়াল-টাকে।'

'পড়ে তো। কেন দাদু, পড়িস্ না ?'

'হাই পড়ে। ঘোরে তো সকল সোময়।'

'আপনের এত আলিস্তি কেন ?'

'এ সব কি কও বউমা।'

'ঠিকই কই। আপনের ছাওয়াল কয় আগে মোকামে বসতেন। এখনে তাও যান না।'

রামেন্দু বাবুর ছেলে যেন কাছেই কোথাও ছিলো।

সেও যোগ দিলো। 'ঠিকই তো বইয়া বইয়া খান। লজ্জা করে না ?'

বইয়া বইয়া খাই ?'

'খান না ?'

'পড়াশুনার তুই কি বুঝিস ?'

'বুঝি না ? আপনে এক নম্বরের কাঁকিবাজ।'

'চুপ থাক। কালই যাবু।'

'যান ভাই। হাড় জুড়াবে।'

কি কুৎসিত। গৃহিণীকে বললাম এদিকের ঘরটাতে জিনিষপত্র রেখে ভাঁড়ার কর। এদিকে আর বসা যায় না। ওদিকের ছোট ঘরখানা থেকে আলমারি সরিয়ে ফেলে বসার জায়গা করা যায় কিনা দেখো।

বলা বাহুল্য রামেন্দুবাবু কোথাও যান নি। এবং তার কারণ বোধ হয় নরেন। সে যেন জোড়া দিয়ে দিলো। এরপর থেকে প্রায়ই দেখতাম নরেন আসছে আমাদের গলিটা দিয়ে। তার হাতে প্রায় সব সময়েই এটা ওটা থাকে। ওদের জীবনের সেই বড়কত্তার কালো আকাশে নরেনের কথাবার্তা এক ঝলক আলোর মতো। সে যে শিক্ষিত কিম্বা বহুত কেউ তা না হ'তে পারে। কিন্তু তার ভাষায় অন্তায় বোধটা যেন তখনও অবশিষ্ট ছিলো মনে হ'লো।

এদিককার ঘরটাকে ভাঁড়ার ক'রে আমরা রবিনকা ফেলে দিলাম প্রতিবেশীর উপরে। কিন্তু হঠাৎ আবার সে রবিনকা উঠলো। যেন দুঃস্বপ্নের বেখাপ্পার জন্তই রবিনকা পাত।

কাদম্বরীর ভাষা যেমন গভীর রাতের শেষ প্রহরে ভেসে আসতো একরাতে শোনা গেলো কেউ যেন কাঁদছে। না, ঠিক কান্না নয়। যন্ত্রণায় ঘুমের ঘোরে কেউ তেমন করছে।

'কি ব্যাপার ?'

গৃহিণী বললেন, 'অসুখ করেছে রামেন্দু বাবুর। দিনরাত কাশতে শুনি। সারা রাত ঘুম হয় না। বাদিশে

হেলান দিয়ে ব'সে থাকে।'

'বলো কি ?'

ঘটনাটা একদিন দিনের বেলায় প্রকাশ পেলো।

রামেন্দু বাবুর ছেলে একদিন, 'কি সারা দিন খকখক করেন। ডাক্তার দেখান না কেন ?'

'ওষুধ খাইছি তো।'

'সারে না কেন। অসুখ নিয়া বইয়া থাকেন। আমার অ-কল্যাণ করেন কেন।'

'তোর অকল্যাণ ? অখন যা, অখন যা। সারারাত ঘুমাই নাই শরীলডা ঠিক নাই আমার।'

'হাসপাতালে যান না কেন ?'

'হাঁটা যায় না।'

'ও: মোটর লাগবো।'

প্রায় প্রতিদিনই এমন চলতে লাগলো। কিছুদিন, প্রায় ছমাস বলা যেতে পারে, রামেন্দু বাবুর এই দুর্ভোগ ছিলো। সারারাত ব'সে ব'সে হাঁপাতো। হাঁপানির শব্দের মতো সেই শব্দে রাতের অন্ধকার যেন থর থর ক'রে কাঁপতো।

একদিন ভুনি বললো, 'দেখো কি, ঘরখানাকে কি করছে।' রামেন্দু বাবুর ছেলে সরজমিনে তদন্ত করতে গেলো বোধ হয়। তার গলা শোনা গেলো—'ইস্ এগুলো কি। ঘরখানাকে কি করছেন! গন্ধে আসা যায় না।'

রামেন্দু বাবু ক্লান্ত সুরে বললেন, 'কি করি ক, বাইরে যাতে পারি না।'

গৃহিণী বললেন, 'বুড়ো হ'লে যা হয়। মরণ রোগ ধরেছে এবার।'

রামেন্দু বাবুর ছেলেকে বলতে শোনা গেলো, 'যা তা খান কেন ?'

'কি যা তা খাই ক ?'

'ডাক্তারকে তো সাতে পাঁচ টাকা দিলাম। রোগ সারে না কেন ?'

'কি কই ক।'

'আমি বিকশা ঠিক ক'রে দিতেছি। হাসপাতালে যান।'

'হাসপাতাল ?'

রোগটার বাড়াবাড়ি হয়েছে তা বোঝা গেলো। বালি ছাড়া কিছু আর পারছে না খেতে। উঠে বসার শক্তিও আর বোধ হয় নেই।

রামেন্দু বাবু বললো, 'বউমা, ঘরটা সাফ কইরা দিবা ?'

'কখন করি কন ? এত কাজ, সংসারে একা তো।'

ভুনি তার মেয়েকে ডেকে ঘর সাফ ক'রে দিতে বললো।

মেয়ে বললো, 'পারুম না। ঘিন্না করে।'

ইতিমধ্যে একদিন রামেন্দু বাবুর বোধহয় ভাত খেতে ইচ্ছা হয়েছিলো। তা বোঝা গেলো তার ছেলের হাঁকা-হাঁকি থেকে, 'মাছ লাগবো কেন ?' ভুনি বললো, 'ভাত খাইব যে।'

'ও আমারে বড় লাটসাহেব পাইছেন।' পলতার ঝোলে হয় না ?'

রামেন্দু বাবু বললো, 'পয়সা তো দিছি।'

'কই পাইলেন পয়সা ? ট্যাকা কামাই করেন ?

'ছিল আমার।' রামেন্দু বাবু হাঁপাতে লাগলেন।

'চুরি করার আর জায়গা পান না ?'

দুঃসহ বোধ হ'ল। ঠিক এই সময়ে মরেন এলো সেখানে। সব শুনে বললো। কি হলো। আমি মাছ এনে দিচ্ছি।'

'না ভাই। তুমি দিনরাত খালি কেন পয়সা খরচা করবা।'

'খামো না।'

রামেন্দু বাবুর ছেলে সত্যি খেমে গেলো।

গৃহিণী বললো, আশ্চার্য লোক কিন্তু এই নরেন। সাহসও আছে। ওর রাগের মাথায় কেমন টপ্ ক'রে থামিয়ে দেয়।'

'কিন্তু ব্যবসায় তা হ'লে কি উন্নতি হ'লো?' বললাম

'পাঁচ ছজন খানেওয়ালাতো বটে।' বাড়িভাড়া আছে। ছেলেটাকে মেয়েটাকে স্কুলে দিয়েছে। ভদ্রভাবে থাকবার চেষ্টা করছে তো। তার পরে রামেন্দু বাবুর চিকিৎসা।'

'কিন্তু তাতে মেজাজ খারাপ হবে কেন?'

'ওটা বোধ হয় ছেলে রামেন্দু বাবুর কাছেই পেয়েছে।'

'তাই নাকি?'

'নতুবা। ভদ্রভাবে থাকতে হ'লে অনেক কসরৎ। সে সব তো সইছেও বটে ওই সামান্য আয়ে। উঁচু দিকে ওঠার চেষ্টাও করছে রুচির সাহায্যে।'

কথাটা যে মিথ্যা নয় তা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বোঝা গেলো।

গৃহিণী জানালার কাছে গিয়েছিলেন। হাসিমুখে ফিরে বললেন, 'শোন।' 'ওদিক থেকেই শোনা যায় নাকি।'

শুনলাম, জুনির গলাই, 'সিনেমায় যাব ভাবছি।'

'যাও বউমা, যাও। সারাদিন খাটবা। একটু জিরান লাগে।'

স্ত্রীলোকের কৌতূহল অনেক সময়েই প্রয়োজনের অতিরিক্ত। রাস্তার ধারের জানালা থেকে গৃহিণী নড়লেন না। কিছুক্ষণ বাদেই বললেন, 'দেখো, দেখো। মেয়েটা রূপসী সন্দেহ নেই। সাধারণ একটা তাঁতের চেক শাড়ীতে কি সুন্দর দেখাচ্ছে।'

'দু তিনটি ছেলেমেয়ে আছে শুনেছি।'

'তা সত্ত্বেও।'

রাত্রিতে এর অন্য পরিণতি দেখা দিলো। রাত দশটা পার হয়েছে। রামেন্দু বাবুর ছেলে দোকান বন্ধ ক'রে দিয়েছে।

'কি ব্যাপার এত?'

'ডিমের ডালনা।'

'কেন? দিনে সাত খাইছো।'

জুনি রসিকতা ক'রে বললো, 'মানুষের সখ হয় না?'

'টাকা দিলো আমার কোন শ্বশুর?'

'ছি-ছি এমন কও কেন। নরেন শুইনো।'

'নরেন!' রামেন্দু বাবুর ছেলে এই কথাটা ব'লেই চুপ ক'রে গেলো। মিনিটক্ষণ বাদেই নরেনের গলা পাওয়া গেলো। বোঝা গেলো সে আরও কিছু কিছু কিনে এনেছে।

ওদের খাওয়া-দাওয়া মিটতে সেদিন সাড়ে বারোটা হ'লো।

অন্য আর একদিন গৃহিণী বললেন, 'দেখো, জুনির জীবনে পরিবর্তন এসেছে। নতুন টাকার ঝাঁজ কাটিয়ে উঠেছে। আজ সারা দিন শ্বশুরের ঘর পরিষ্কার করেছে। কল থেকে জল টেনে এনে গা মুছে দিলো। মাথা মুছে দিলো। শ্বশুরের রোগটাও বোধ হয় একটু কম। বেশ উজ্জ্বল দেখায় জুনিকে। ক্লান্তিটা কেটে গিয়েছে।' একটা রসিকতা করার লোভ সম্বরণ করা গেলো না। বললাম, 'হাকস্‌লির গল্প বোধ হয়। রুগ্ন স্বামীকে সেবা করতে করতে একটি মেয়ে একেবারে ভেঙে পড়েছে। ঠিক তখন আর একটি পুরুষ। হাকস্‌লি বলছেন: তার বিছানা থেকে মেয়ে এসে স্বামীর রোগশয্যার পাশে যখন দাঁড়ায় সেই মেয়েটি তখন তাকে উজ্জ্বল তো দেখায় বটেই, স্বামীর সেবায় যেন আরও তন্ময় হ'য়ে যায় সে।

'হাকস্‌লি ছাই।'

'কেন? এটা কি মনস্তত্ত্বের দিকে ভুল?'

'ছি-ছি।'

কিন্তু ওরা যখন নতুন হ'য়ে উঠছে তখন রামেন্দু বাবু প্রয়োজনের অতিরিক্ত। একটা বোঝার মতো, মৃত অবয়বের মতো যেন ওদের-সংসারে জড়িয়ে আছে। আজকাল এটা ওদের আলাপেও ধরা পড়ে যায়। ছেলে সেদিন রাগ ক'রে বললো, 'যান না কোন চুলোয় যাইবেন।'

রামেন্দু বাবু বললো, 'আর কাঠের চুলাতেই যামু।'

গভীর ভাবে বিষণ্ণ শোনালো রামেন্দু বাবুর এই কথা কয়েকটি। গৃহিণী বললেন, 'মিষ্টির দোকানদার রসগোল্লা খায় না, কিন্তু চায়ের দোকানে মদ বিক্রি হ'লে দোকানদার তা খায়।'

'কেন?'

'বাপের মতো সটআপ বলে না বটে, কথা জড়িয়ে জড়িয়ে যায় আজকাল যখন দোকান থেকে ফেরে।'

'চমৎকার। কি কাদাই ঘাঁটছি আমরা।'

দুপুরে সেদিন দোকান থেকে খেতে এসেছে ছেলে। রামেন্দু বাবু কথা বললো। আজকাল তার গলাটা অত্যন্ত মৃদু, 'দুইটা ট্যাকা দিবি।'

'কেন?'

'ডাক্তার আনাইছিলাম।'

'কেন?'

'বড় কষ্ট।'

'ট্যাকা?' ধপ্ ক'রে জ্বলে উঠলো ছেলে। 'মরেন না কেন? হাসপাতালে যান নাই কেন?'

'গিছিলাম। সেখানে কি চিকিৎসা হয়?'

কিন্তু স্নান খাওয়া-দাওয়ার পর রাগ পড়লো ছেলের। রামেন্দু বাবুর ঘরের দরজায় দাঁড়ালো সে।

'যখন তখন যন—কি কই ঠিক থাকে না।'

'থাক, বাবা, থাক। মরেন বলছিলো তাই ডাক্তার আনাইছিলাম। অখন আমার খাওয়ার সময়। যামু।

ডাক্তার কি করবো?'

অতিমানের মতো শোনালো রামেন্দু বাবুর কথা।

পরদিন আবার ঝগড়া হ'লো। ঘুমি ওষুধ আনিয়েছে তা নিয়ে। চিৎকার করে মৃত্যুপথ যাত্রী সেই স্ত্রীর সামনেই ছেলে তার মৃত্যু কামনা করলো। কিন্তু তার পরেই রাগ প'ড়ে গেলো। রামেন্দু বাবুর দরজায় এসে দাঁড়ালো। ওষুধের শিশির লেবেল প'ড়ে দেখলো। বললো—সেরে যাবে এইবার।

আশ্চর্য। কি দিয়ে তুলনা দেবো ঘুমলাম।

গৃহিণী বললেন, 'কি বলছেজাত।'

বললাম, 'কিন্তু ও যেন নিজেকেও রেহাই দেয় না। দাঁড়াও, দাঁড়াও। মনে পড়ছে কথাটা। যুক্তিক নিজের মাথায় হল ফোটায়।'

'হাকস্‌লি বলেছে নাকি?'

হঠাৎ সেই রবিবারের কথাবার্তা শুনে অবাক হ'য়ে গেলাম।

রামেন্দু বাবুর ছেলে এ সময়ে দোকান থেকে ফেরে না।

'বাবা, বাবা।'

'উঃ?'

'আম খাইবেন?'

'না।'

'বাবা, মিষ্টি আম। রসগোল্লা খান একটা।'

রামেন্দু বাবু মৃদুস্বরে কি বললেন বোঝা গেলো না।

গৃহিণী বললেন, 'সে কি?'

'ডাক্তার বোধ হয় কিছু বলেছে।'

'কি? তুমি শুনেছো?'

'ছেলে বোধ হয় সেদিনের মতো বাপকে খাওয়াচ্ছে। এই শেষ।'

গৃহিণী কেঁদে ফেললেন।

বিকেলে ডাক্তার এলো। নরেন ছুটোছুটি করতে লাগলো। ইনজেকশন দেয়া হ'লো।

ছেলে গিয়ে বসলো বাপের কাছে। 'বাবা, একটু খান।'

রামেন্দুবাবু অতি মৃদুস্বরে বললেন, 'কাল খাবু।'

'বাবা, ও বাবা, লছমন বাবা আসছে। কই, বাবা, শোনেন।'

'কাল।'

ছেলে দোকান তদারক করতে গিয়েছিলো বিকেলে। সন্ধ্যার পর কে একজন তাকে ডেকে আনলো। দ্রুতপায়ে সে যখন রামেন্দু বাবুর ঘরের কাছে এসে দাঁড়ালো তখন জুনি এবং তার ছেলেমেয়েরা কাঁদতে সুরু করেছে।

গৃহিণী বললো, 'নরেন ছিলো তাই।'

বললাম, 'আর কেন?'

'না, বলছি। ছবিষ্যের সব যোগাড় করছে। খরচ তো আছে। নতুন কাপড় চোপড় কিনতে হয়। এ বাড়িতে থাকে এখন নরেন। ওদিকের এক ভাড়াটে ওঠে গিয়েছে। সেই ঘরেই থাকে।'

'আমি ভাবছি মুখ কল কিছু পাঠিয়ে দেবো।'

'আলোচনার মতো গুরুত্ব নেই।'

'পরশুদিন শ্রাদ্ধ। ঘরদোর সাফ সুতরো করছে। কি খাইছে জুনি! নরেনও।'

'কালীঘাটে শুনেছি উপনয়ন, বিবাহ, এ সব হয়: শ্রাদ্ধ হয় না?'

'কি নির্দয় তুমি।' এই বলে গৃহিণী চলে গেলেন।

বিকেলে বাইরে সবুজ বারান্দায় বসেছিলাম। সেখানে গৃহিণী এলেন। বললেন, 'তোমার কথাই বোধ হয় ঠিক হ'তে চললো।'

'এমন কথা শুনি!'

'শ্রাদ্ধ ভূতের বাপের শ্রাদ্ধে গড়ালো! আবার রাগে ফেটে পড়ছে লোকটা। নরেনকেও ব'লে দিলো এ সব কথার মধ্যে এসো না।'

'কোনদিন না তোমাকে বলে।'

'চেঁচাচ্ছে শুনছো না।'

একটা চাপা চেঁচানির শব্দ যেন কানে এলো।

সন্ধ্যাবেলায় মেজাজটা একটু ঠাণ্ডা হ'লো বোধ হয় রামেন্দুবাবুর ছেলের। শ্রাদ্ধটা হবে। তাই নিয়ে সে আলোচনা করছে শোনা গেলো। এই গরম এই ঠাণ্ডা। অদ্ভুত তো!

শ্রাদ্ধটা খুব ঘটা করে করলো না সে। শ্মশান বন্ধু কয়েকজনকে ডেকে থাকবে।

ইতিমধ্যে গৃহিণী মন্তব্য করলেন, 'বাস্তবিক কি বন্ধুভাগ্য দেখো। সারাদিন কি রকম খাটছে দেখো নরেন। বাজার করা, মক্কের যোগাড় করা, রান্নার তদির করা কি না করছে। আর জুনি। বাস্তবিক কি পবিত্রই দেখাচ্ছে তাকে। এমন দেখারও সার্থকতা আছে। কোরা চওড়া লালপাড় শাড়ী পরেছে যেন গরদ। এও নরেনই কিনে দিয়েছে। এমন কি ছেলেমেয়েদের নতুন জামা প্যান্টও।'

কিন্তু যাওয়াযাওয়ি ওরা করবেই, সন্ধ্যার পর রামেন্দুর ছেলে জিজ্ঞাসা করলো, 'নরেন কই?'

'খাইব না কয়।' জুনি বললো।

'কেন?'

'জান্ না।'

কিছুক্ষণ পরে আবার শোনা গেলো, 'কই গিছিলা?'

'নরেনকে কলাম।'

'খাইব না?'

'চা দিছি। খাইছে।'

'হুম্।'

জুনি বোধ হয় চলে যাচ্ছিলো। ডাকলো তাকে,

'শোন। কালকে কি করবার চাও।'

'মাছ মুখ।'

'কাম নাই।'

'কি কও?' হাসলো জুনি।

'আমার রাগ আর চায় না কিছু।'

'হইছে। মাথা খারাপ হইছে নাকি?'

'মাথা খারাপ?' গর্জন করতে গিয়ে হঠাৎ যেন সে থেমে গেলো। 'তা সে হউক। আর না।'

সন্ধ্যার পর নরেনের গলা শুনতে পাওয়া গেল।

সে বললো, 'কাল তো মাছ ছুঁতে হবে।'

রামেন্দু বাবুর ছেলে বললো, 'দরকার নাই।'

জুনি হেসে বললো, 'সারাদিন ঘাটের পর মাথা গরম হইছে। সবই হইব।'

নরেন বললো, 'লোকজন বলা লাগে।'

রামেন্দু বাবুর ছেলে বললো, 'তুমি আমার কাছে তিন শ' টাকা পাও নরেন। আর শ্রাদ্ধে যা খরচ করছো তার হিসাবও করছি। তাও এক শ'। তোমার টাকা আমি শোধ ক'রে দিব।'

রাগ নয়, বিনীতও নয়। আশ্চর্য চুপ স্বর।

নরেনের মুখ কি ফ্যাকাশে হ'লো। সে বললো, 'আচ্ছা শোধ ক'রো।'

'তুমি তো অনেকদিন বাড়ি যাও না।'

জুনি বললো, 'আহা, কি কও।'

'ঠিক কই না?'

গৃহিণী আমার দিকে ফিরে বললেন, 'ঠিক বুঝতে পারছি না।' পরদিন সকালে হঠাৎ একটা গোলমাল শুরু হ'লো। আফিস বেরুচ্ছি তখন। গৃহিণী বড় বড় চোখ ক'রে তাকালেন আমার দিকে।

'যা মেজাজ।' ব'লে হাসলাম।

'জানো। অনেক সময়ে ভয় করে।'

'হেসে বললাম শ্রাদ্ধ কোথায় হচ্ছে সে খবর নিতে যাওয়া যেন।'

বিকেলে বাড়িতে ফিরতেই গৃহিণী ওদের খবর আনলেন। 'মন্দমুখ হয়নি।' চায়ের টেবলে বললেন তিনি।

'সে কি? নরেন পারলো না রাগ থামাতে।'

'নরেন মাছ কিনে এনেছিলো। তা অনেকটা মাছ। মাছ আর মিষ্টি। কয়েকজনকে খেতেও বলেছিলো। রামেন্দু বাবুর ছেলে পুকুরের জলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে মাছ, মিষ্টিগুলো নর্দমায় ঢেলে দিয়েছে। আর—

'নিজের মাথার চুল ছেঁড়ে নি?'

'চুল নেই তো কাল কামিয়েছে। থাকলে তাও করতো: নরেনকে বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছে।'

'মদ খেয়েছিলো বলো।'

'তাজ্জব।' নরেনকে বললো, আর না আর আইবা না।'

তিন চারদিন পরে সকালের দিকেও ওদের উঠোনে চেঁচামেচি শোনা গেলো। বোঝা গেলো নরেন এসে অন্য এক ভাড়াটের বারান্দায় বসেছে। রামেন্দু বাবুর ছেলে তাকে দেখে খেপে গিয়েছে। কিন্তু কিই বা করার আছে তার। সে নরেনকে যত গাল দিলো অন্য ভাড়াটে ততই বললো, 'উনি তো আপনার ঘরে যান নাই আপনে চেঁচান কেন।' রামেন্দুর ছেলে বললো, 'অনেক আস্কারা দিয়েছেন বাবা। আশ্রয় দিবেন না। কাল সাপ।'

জুনি হঠাৎ যেন অত্যন্ত বিচলিত হ'য়ে যোগ দিলো। বললো স্বামীকে, 'চুপ করো। লোকে কয় কি।'

রামেন্দু বাবুর ছেলে যমে হ'লো থেমে গেলো। হঠাৎ সে তীব্রস্বরে ধমক দিয়ে উঠলো, 'চুপ, হারামজাদা।'

গৃহিণীকে জানলার কাছ থেকে সরে আসতে বললাম। 'লোকটা পাগল হ'য়ে যাচ্ছে। মনে এমন হয়। স'রে

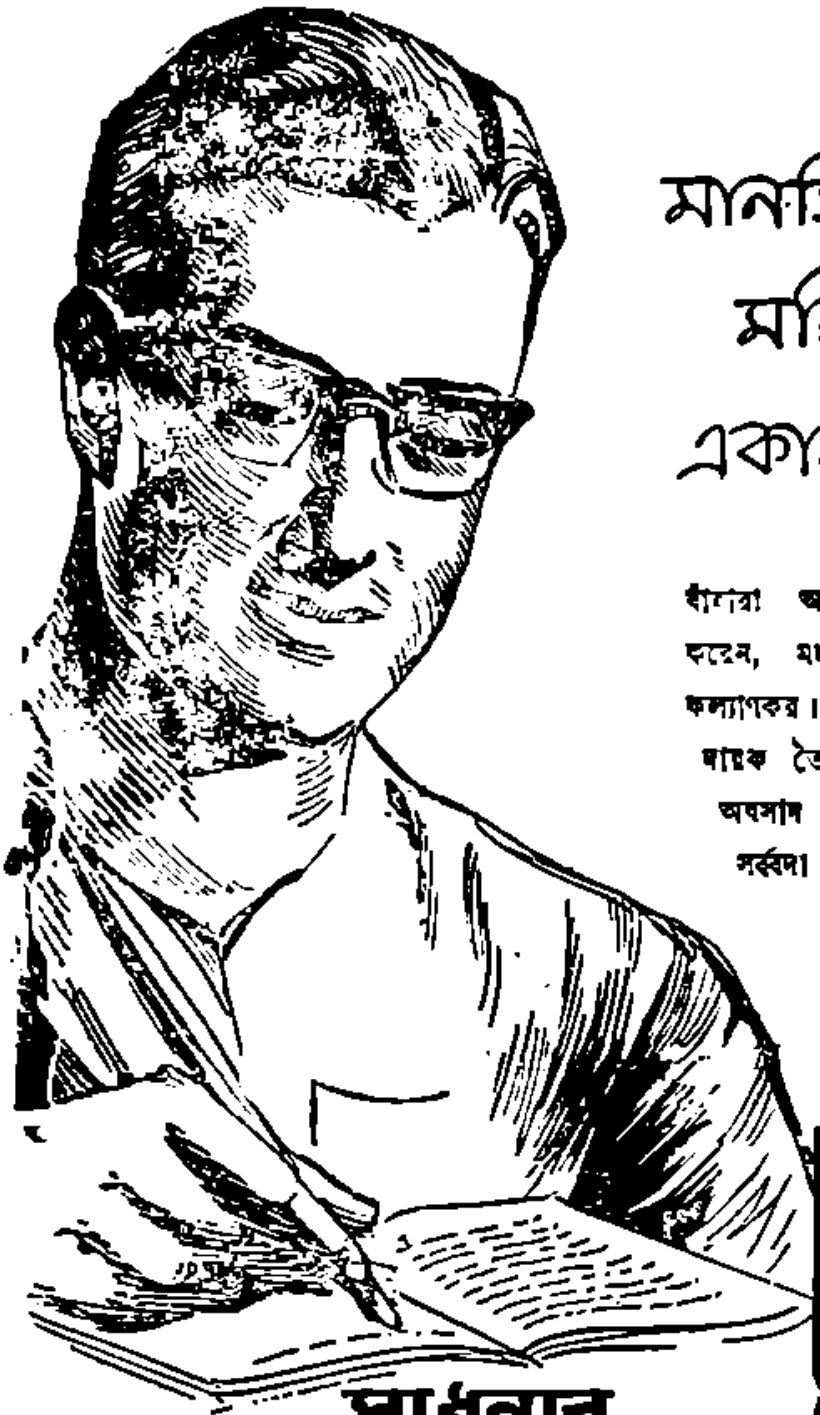

মানসিক পরিশ্রমে মস্তিষ্কের যত্ন একান্ত প্রয়োজন !

যাঁহারা অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম করেন, মহাভৃঙ্গরাজ তাঁহাদের পরম কল্যাণকর। এই স্নিগ্ধকর ও আরোগ্যদায়ক তৈল সর্ব্বপ্রকার ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করে, দেহ ও মনকে সর্ব্বদা প্রফুল্ল ও কর্ম্মক্ষম রাখে।

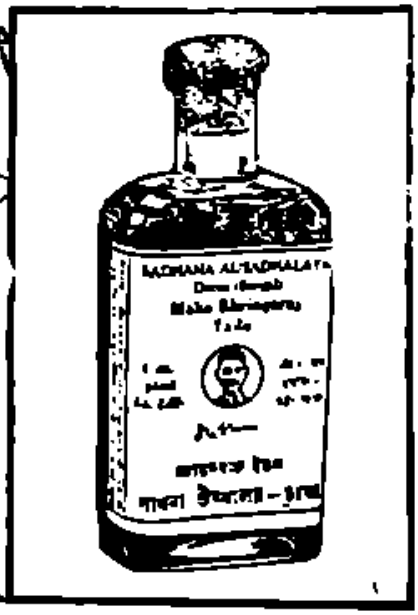

সাধনার
মহা ভৃঙ্গরাজ
তৈল

সাধনা ঔষধালয়-ছাপা

সাধনা ঔষধালয় রোড কলিকাতা ৪৮

কলিকাতা কেন্দ্র – ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,
এম. বি, বি, এস, (কলিঃ) আয়ুর্বেদাচার্য্য

অধ্যক্ষ শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম, এ.
আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এম, সি, এস, (লণ্ডন) এম, সি, এস (আমেরিকা)
বাবলগড় কলেজের ভেষজ শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক।

এলো।'

গৃহিণী বললেন, 'বোঝা যাচ্ছে না কিছুই।'

'বুঝেই বা কি লাভ?'

'আমার মনে হয় কেনা এড়ানোর চেষ্টা। যাতে গাল-মন্দর ভয়ে এদিকে না আসতে চায় তারই ব্যবস্থা করছে।'

'মন্দ বলো নি কথাটা। তিন চার শ' টাকা সারা জীবনে শুধতে পারবে না। নরেনের কিছু আটকেও উঠেছে হয়তো। নতুবা সেই বা আসবে কেন।'

তিন চারদিন পরে আপিস ফেরৎ গলিতে ভিড় দেখে অবাক হ'য়ে গেলাম। ভিড়টা আমাদের প্রতিবেশীর দরজাতেই। ঘরে ঢুকে দেখি বিবর্ণ মুখে গৃহিণী ঘরের কোণে ব'সে আছেন। আমাকে দেখেও কথা বলতে পারলেন না। প্রায় মিনিট দশেক পরে বললেন মেয়েটা বোধ হয় মরেই গেলো।

'সে কি? কে?'

'জুনি।'

'কেন?'

'লাকড়ি দিয়ে মেরেছে, উঠোনে পড়ে আছে।'

'কেন?'

'কি জানি। চিঠি নিয়ে কি ব্যাপার। একটা রেজিষ্ট্রি চিঠি নাকি এসেছিলো জুনির নামে। লোকটা নিতে মানা করেছিলো বেহুলোর মুখে পিওনকে দেখে ভাগিয়ে দিয়েছিলো। চিঠিটা নাকি নরেন পাঠিয়েছে। স্বামী চ'লে যেতেই জুনি পিওনকে ডেকে পাঠিয়ে চিঠিটা নিয়েছে সই করে; আমরা যখন জানতে পারলাম তখন জুনিকে চড়চাপড় মারতে সুরু করেছে। প্রতিবেশীরা থামাতে গিয়েছিলো। মার খেতে খেতেও মেয়েটা বলছিলো—চুপ কর। লোকে শুনে বলে কি। লোকটা ততই চেঁচালো ইজ্জত গেছে আছে আর কি! তারপর লাকড়ি দিয়ে মারলো মেয়েটাকে যতক্ষণ সে পড়ে না গেলো উঠোনে। আর তখন লোকটা হঠাৎ বাইরে গিয়ে বাইরের ঘরের দেয়ালে যে টিনের টুকরোয় রামেন্দুবাবুর নাম লেখা ছিলো সেটা খুলে এনে জুনির গায়ের উপরে ফেলে দিলো। এতদিনের এত রাগ, বিদ্বেষ যেন উদ্দেশ্য খুঁজে পেয়েছিলো।

তারপর?

ঘরের মধ্যেই আছে। প্রতিবেশীদের বলেছে নিজেই পুলিশে খবরটা দিতে। এই কিছুক্ষণ আগেও একবার নিজেকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলছিলো—বাপই গিছে যখন আমি আর ওদ্রলোক কিসের? আর কেন ওদ্রলোক কইয়া পরিচয় দিমু? বাপ মাই, লজ্জা পাইব।'

ওদের ঘরটা যেখানে ছিলো জায়গাটা আমি কিনে নিয়েছি। আর একবার এমন ঘটতে দিতে চাই না নিজের ঘরের অত কাছে। কিন্তু যেখানে রামেন্দুবাবুর নেম প্লেটটা পড়েছিলো জুনির রক্তের দাগের মধ্যে পুলিশ লাশটা সরানোর পরে, সেখানে একটা বেদী তৈরি ক'রে দিয়েছি আমি। কাজটা ভালো করি নি। কারণ বেদীর গায়ে কি লেখা যাবে ঠিক করতে পারছি না।

পূবালী হাওয়ায়

বাণী রায়

গাছের গোড়াগুলো খুঁড়ে দিচ্ছিলাম।

এখনি জলের হোজ চালিয়ে মামা গাছগুলোয় জল দিয়ে যাবেন। গাছকাটা কাঁচি হাতে পেছনে পুতাগোপাল এসে যাবে। মামা গাছের যত্নে ত্রুটী হতে দেন না। তবু ভাগ্য মন্দ বলতেই হবে, গাছে ওঁর ফুল ফোটে না, পাতা-গুলো ভাল করে সবুজ পাখনা মেলার আগেই কুঁকড়ে যায়। ফুলের কলি এক—আধটা ধরলে মামার কি হর্ষ! কিন্তু তারাও শুকিয়ে ঝরে পড়ে।

সহরতলীর অংশটাতে ছোট ছোট নূতন বাড়ী। জমি সস্তা বলে সকলেই অল্প-বিস্তর জমি রেখেছেন বাড়ীর আগে পিছে। অবসরপ্রাপ্ত লোকগুলির মালঞ্চরচনায় উৎসাহ প্রবল।

আমি ভেসে এসেছি এখানে। চাকুরি নেই, বেকার তরুণ আমি। মামাকে দেখবার লোক নেই, মামা তো চিরকুমার তাই এখানে কিছুদিন থাকতে এলাম মামার কাছাকাছি। এখানে যদি কিছু জুটে যায় দেখি।

কিন্তু এখানকার তরুণ-তরুণীরা গেল কোথায়? তরুণীরা না হয় বিবাহযাত্রায় শ্বশুরবাসিনী, কিন্তু তরুণেরা কোথায়? চাকুরি নিয়ে সহরতলীর বাইরে সহরে তারা চলে গেছে। তারা কোন না কোন প্রকার ও প্রণালীতে এখান থেকে চলে গেছে।

অবসরপ্রাপ্ত চাকুরিয়া, বিধবা বা চিরকুমারী, বেকার বৃদ্ধ, এদের দ্বারাই পূর্ণ এই স্থান। জ্যোৎস্না-সন্ধ্যায় ছোট-ছোট রুমাল-বাগানে ডেকচেয়ার পেতে, রাংচিতের বেড়ার ওপার দিয়ে এ ওর দিকে গলা ছুড়ে-ছুড়ে তাব-বিনিময় করে থাকেন। বৃক্ষপক্ষ হলে কোন ঘরের বারান্দায় বসে তাসের আসর জমানো হয়। কখনও বা ছিটকে কোন তরুণ-তরুণী দেখাসাক্ষাতে এলে তাদের কেন্দ্র করে উৎসব হয় এক-আধটু। বেতারে ভাল নাটক থাকলে তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে এক বাড়ী বসে সকলেই শোনেন তারপরে প্রবল উৎসাহে তাই নিয়ে আলোচনা চলে কিছুক্ষণ। খবরের কাগজটা দারুণ উত্তেজনার বস্তু। বাইরের জগতের একমাত্র নিয়মিত খবর সেই এনে দেয়। কাগজ হাতে এলেই চাকরবাকর থেকে সুরু করে বন্ধু-পরিজনকে ডেকে ডেকে বলা হয়।

সকলেরি দেখা কোন ব্যাধি আছে। রক্তচাপবৃদ্ধি বা হ্রাস, বাত, বহুমূত্র, অম্বল ইত্যাদি। তার জন্য প্রায়ই সকালে ডাক্তারের চেম্বারে যাওয়া হয়। সেখানে খবরের কাগজের সংবাদের তীব্র সমালোচনা হয়। তরুণের যেমন দেখাসাক্ষাতের স্থান চায়ের দোকান, এঁদেরও সাক্ষাতের স্থান ডাক্তার-বাবুর চেম্বার। দুই-তিনটি ডাক্তার আছেন বার্দ্ধক্য-কলোনীতে। তাঁরা স্নানাহারের সময় পান না।

দাঁত ও চোখ নিয়ে বা অন্য ব্যাধি বাড়লে কদাচিৎ শহরে ডাক্তারের কাছে যেতে হয়। রীতিমত ভ্রমণযাত্রা সেদিন। ছেলে-বৌ বা মেয়ে-জামাই অথবা অন্য পরিজন গাড়ী নিয়ে আসে, কিম্বা ট্রেনে করে নিয়ে বাকীটা ট্যাক্সি চালায়। ফিরে এসে দিন রাত গল্প চলে দু-একদিন।

ছেলে-বৌ বা নাতি-নাত্নী থাকে না কাছে। আমতা-আমতা করে বলা হয়, "আমি আবার শহরে খাঁচায় থাকতে পারি না—নিজের বাড়ী, গাছপালা ছেড়ে—ওরাও কাজ

করে খাবে···ছেলেমেয়ের পড়াশোনা আছে···" ইত্যাদি ইত্যাদি।

অবশ্য কেউ কাউকে সন্তানী প্রশ্ন করেন না। পুরুষেরা অধিকাংশই বিপত্নীক বা চিরকুমার। মহিলারা বিধবা বা চিরকুমারী দুই চারজন ভাগ্যবানের মোটাসোটা বা রোগা খিটখিটে অথর্ব স্ত্রী আছে অবশ্য। তাঁরা গাউট বা মাইগ্রেনের রুগী বিধবা বা চিরকুমারীদের কখনও বা আমার মত ভাগ্নে ভাগ্নী আত্মীয় থাকে একটা করে, কখনও বা তা-ও না। প্রতিবেশীরাই দেখাশোনা করেন। চির-কুমারীদের এক-আধটা বলিষ্ঠ কুকুর থাকে, পুরণো দাসী থাকে। বিধবাদের থাকে জপের মালা, গুরুদেবের ছবি।

এমন একটা পরিবেশে এসে পড়লাম।

এখানকার অলিখিত আইনে নেতা হচ্ছেন অবসরপ্রাপ্ত সার্জেন্ট হরদয়াল হাজরা। ওঁর টেলিফোন আছে। সকলেরি কাজে লাগে। আজ রিসীভারটি তুলে টেলিফোন মেরে শব্দ না করে নামিয়ে রেখে আসেন সকলে। অপ্রতিভ ভাবে একটি সিকি টেলিফোনের বই-এর নীচে গুঁজে রেখে আসেন তাঁরা। হরদয়াল অমায়িক ভদ্রতায় বলেন, "পেনসনী মানুষ, ভাই। তোমাদের মত ভবিষ্যতের ভরসা ছেলেমেয়েও নেই। তাই বাধ্য হয়ে খরচটা নিতে হচ্ছে। যখন খুশী এসো। তোমারেরি টেলিফোন।"

কনস্ট্যাবল পঞ্চানন প্রামাণিকের চিরকাল গাড়ী চালিয়ে অভ্যাস। পঁয়ষট্টি বছর বয়সেও গাড়ী চালিয়ে ফেরা চাই। পুরণো মান্ধাতাকালের মার্শারী কোর্ড। তবু সকলেরি বল ভরসা। দরকার হলে "পঞ্চাননের গাড়ী আছে" বলে ভরসা পাওয়া যায়। বাস্তবিক গত বছর রতিকান্তবাবুকে তৎক্ষণাৎ শহরে হাসপাতালে গাড়ী করে না পৌঁছে দিলে অ্যাপেণ্ডিসাইটিস ফেটে যাবারই উনি যেতেন। ভাগ্যি, পঞ্চাননের গাড়ী ছিল। তেমন তেমন ক্ষেত্রে পঞ্চানন পৌঁছে দেন, তবে "রিটায়ার করেছে, পেইলটা দিয়ে দেই—।" এ ব্যবস্থায় সবাই প্রীত; পঞ্চাননের খিট্‌খিটে স্ত্রী ছাড়া। বেশী গাড়ী চালিয়ে স্বামী তাঁর মাছ খাওয়া ঘুচিয়ে দেবেন এই চিন্তায় মাথা ধরে ওঠে পঞ্চানন-পত্নীর।

কবিরাজও আছেন একজন। ঔষধ তৈরির খরচ ভিন্ন তিনি দক্ষিণা নেন না। তাঁর মেয়ে সংসার দেখে, কলোনীর প্রাথমিক স্কুলটাও চালাবার চেষ্টা করে। কিন্তু আধবুড়ো মহিলার স্কুলে ছাত্র-ছাত্রী পাওয়া দায়। আগেই বলেছি, ছোট ছেলেমেয়েরা ওখানে কোথায়?

সকালে আসে গোয়ালা গরু নিয়ে। দু' একজনের গরু আছে, যথা রিটায়ার্ড সহ স্কুল পরিদর্শিকা মিস বয়াটের, মূলতানী গরু। যাদের নেই গরু তাঁরা দাঁড়িয়ে দুধ দুইয়ে নেন। কেনার পরিমাণ বেশী দিচ্ছে গোয়ালা বলে খেচা-খেচি করেন! নির্বিকার গোয়ালা দুধ মাপে। শুনে শুনে অভ্যাস হয়ে গেছে ওর। এ সব বলে সময় না কাটালে এদের চলবে কেন?

ডিমওলা আসে। অনেকের হাঁস মুরগী আছে, যেমন আমার মামার। বাকীরা দরকার মত ডিম রাখেন। বাজার একটা থাকলেও মাছওলা একটা আসে বটেই। আনাজ তরকারী প্রায়ই কিনতে হয় না কারুর। বাড়ীর পেছনে প্রায় সকলেরি কিচেন গার্ডেন আছে।

পিয়ন ঘুরে যায় অবহেলায় একবার। কারুরই তেমন চিঠি আসে না এক ডাক্তার বাবুদের ছাড়া। তবু সাড়ম্বরে অনেকেই লেটার বাক্স ঝুলিয়ে রাখেন. পিয়নের সাড়া পেলে উৎকর্ণ হন। মাঝে মাঝে অবশ্য আত্মীয় স্বজনের পরলোকগমনের সংবাদ আসে। তখন সকলে সান্ত্বনা দিতে ছুটে আসেন। কখনও নাতি-নাতীর কৃতিত্বের খবর আসে। সগর্বে-সানন্দে সকলে শোনেন।

পাকিস্তানাগতা বিধবা জমিদার গৃহিণীর কাছে মা-বাপ খেদানো ঘরকুটে বোনপো থাকে। এ অঞ্চলে প্রকেসার গিন্নীর ছেলেমেয়ে ছাড়া ছোট মানুষ নেই। কবিরাজ

কন্যার পাঠশালায় পড়ে সে। জমিদার গৃহিণীর তাকে আদর যত্নের সীমা নেই। তাঁর উপরে নির্ভরশীল একজন আছে এ যেন অনুভবে তিনি গর্বিতা। সর্বদাই যেখান যেন তাঁর আহার নিদ্রার সময় নেই এই মনোরম রক্ষণা-বেক্ষণের কার্যে। দশ বছরের ছেলে, তবু কোথাও গেলে বলে ওঠেন কেউ পরেই "যাই তাই, পিন্টু একা আছে। আমাকে না দেখলে বেশীক্ষণ থাকতে পারে না।"

পিন্টুকে দেখেছি। বোকার মত হাঁ-হাঁ করে চেয়ে পথ চলে। সকলেই নিজেদের মধ্যে ছোট ছেলেটাকে পেয়ে খুশী। বল দেখুন কিনে যেন 'ছ-আনা' কেরি-ওলার কাছ থেকে। কিন্তু বহু আদরেও পিন্টুর মনে সুখ আছে বলে মনে হয় না। চারপাশে বুড়ো দেখে দেখে হতভম্ব হয়ে গেছে সে।

বোডের হলুদে বাড়ীর লাহিড়ী-গিন্নী জগন্মোহিনী প্রতি পূর্ণিমায় সত্যনারায়ণ করে থাকেন। ছেলে বিদেশ থেকে মোটা টাকার অঙ্ক পাঠায়। তাই পাড়ার লোককে প্রসাদ বিতরণ চলে। সেদিনটা উৎসব। সকাল থেকে এ ওকে বলেন, "আজ সন্ধ্যায় লাহিড়ী-বাড়ী যেতে হবে।"

কখনও সেখানে গান হয়। ভাঙা বসা গলায় অধর মুখার্জি গান ধরেন—

"মলয় আসিয়া কয়ে গেছে কানে প্রিয়তম তুমি আসিবে—"

কখন বা মিস বরাট বিস্তর অনুরোধের পরে কাঁপা গলায় গান ধরেন—

"আমারও বাগানে এত ফুল তবু কেন চলে যায়?—"

আমার মামা গান শুনে নিঃশ্বাস ফেলেন। পরে আমাকে ডেকে বলেন, "রবি, ওই ক্যাটালগে যে সারের কথা লাল পেন্সিল দেটা আনতে চিঠি লিখে দে। সত্যিই বাগানে আমার ফুল ফুটল না!"

উক্ত সার এলেও মামার বাগানে ফুল ফোটে না। মামা হাহুতাশ করেন, "এতদিনের সখ আমার, নিজের ফুলের বাগান নিয়ে জীবনের শেষটা কাটাব এখানে ফুটবে ক্রিসেন্থিমাম্, ওখানে ফুটবে চাঁপা। গোলাপের বেডের পাশে চেয়ারে বসে থাকব। ফুলের গন্ধে ঘুম আসে মৌমাছির আনাগোনা দেখব। তা, ভাগ্যে আমার চল কই? এত করে তোকে আমলাম চিঠি লিখে লিখে। যদি তোর হাতের গুণে গাছপালার উন্নতি হয়। তা হ'ল কোথায়?"

আমি যেহেতু হর্তা বা সি. সি. সরকার নই সেজন্য আমিও হাহুতাশ করি।

এরি মধ্যে গাছের ফুলে না হোক মনের ফুলে রং ধরল।

কিছুদিন থেকেই দেখছি মিস বরাট প্রাতর্ভ্রমণে বেড়োবার পথটা মামার বাগানের সামনে দিয়ে ঘুরে যাচ্ছেন। মামাও সকালে উঠেই পড়ি মরি করে বাগানের কাজে লাগেন। নোংরা হয়ে যাবে জেনেও ধোপদুরস্ত ট্রাউজার বা'র করেন। কাঁচাপাকা চুলে কাটেন বাঁকা সিঁথি। মিস্ বরাটের গতিটা বাগানের ধারে এলেই কেমন মন্থর হয়ে যায়, মামারও বেড়ার ধারে যাবার দরকার পড়ে।

একদিন পোষ্টাফিসে যাচ্ছি খাম কিনতে, মাকে চিঠি লিখব। আর এখানে ভাল লাগছে না। কেমন ঝিমনো আবহাওয়া, আরডিংএর ঘুমন্ত উপত্যকার মত। এখানে কোন-দিন প্রাণস্পর্শ পাওয়া যাবে না। এখানে কোন পাখী গান গাওয়া ভুলে গেলে তবেই এই সব হলদেটে পাতাগাছে বসতে আসে। কুকুরগুলো এখানে মোটা হয়ে কেবল রোদ পোহায়। ছাই রংএর বিড়ালটা বছরান্তের পরে বাস খেয়ে অনুসন্ধানের জন্য এখানে আসে মাত্র। জমিদার গৃহিণীর কাকাতুয়াটা বুড়ো হয়ে চোখে দেখে না। এখানে থেকেই বা কি করবো?

মিস বরাটের বাড়ীর কাছে এলাম। তিনি এ জায়গার মাটিতে ফুল ফোটানো বিষয়ে নিরাশ হয়ে টবশুদ্ধ গাছ থেকে কয়েকটি গাছ এনে সাজিয়েছেন। অতএব ফুলের

ঘনে তিনি ধনী।

কাল চুড়িপাড় শাড়ী পরা মিস বরাট হাইহীল চটির ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছেন বাগানে। শুকনো চামড়া, পাকা চুল, রোগা গড়ন। আমাকে দেখে পায়ে পায়ে বেড়ার কাছে এগিয়ে এলেন। "কি রবি, বাজারে যাচ্ছ নাকি?"

আমি বিস্মিত হলাম, "বাজার তো নিত্যগোপাল করে রোজ। আমি ডাকঘরে যাচ্ছি।'

"ও! বেশ, আমাকে দু'খানা টিকেট এনে দেবে? দাঁড়াও পয়সা দিচ্ছি। ভেতরে এসো না।"

একটি পোর্চ সামনে। এত কোণায় সেলাই-এর কল বেতের টেবিলে বসানো, বেতের সোফা পাশে। আমাকে সেখানে বসিয়ে মিস বরাট ঘরের মধ্য থেকে নিয়ে এলেন পয়সা। কিন্তু সোজাসুজি আমার হাতে না দিয়ে হাতে রেখে কিছু বিচার পরে প্রশ্ন করলেন, "আজ কি রান্না হচ্ছে? রান্না বলে দেয় কে?"

আমি আবার বিস্মিত হলাম। ছোট জায়গাটির মধ্যে সবাই সকলকে চেনে। অতএব এ ধরণের কথার ক্ষেত্রই থাকে না। উত্তর দিলাম, "নিত্যগোপাল নিজেই সমস্ত ঠিক করে। মামার কিছু খাবার ইচ্ছে হলে তিনি অবশ্য ব্যবস্থা করতে বলেন। এতদিন থেকে থেকে নিত্যগোপাল গিন্নী হয়ে গেছে।"

ইতস্তত করে মিস্ বরাট বললেন, "তোমার মামা কি খেতে ভালবাসেন?"

"মিষ্টিটিষ্টি বেশ খান।"

চকিত হয়ে মিস বরাট বললেন, "এই নাও পয়সা। যাবার পথে দিয়ে যেও কিন্তু। খুব দরকার।"

ফেরবার পথে টিকেট দিতে এলাম। মিস বরাট আমাকে একটু দাঁড়াতে বলে ঘর থেকে একটা অ্যালুমিনিয়মের কৌটো এনে হাতে দিলেন, "আমার নিজের হাতে কোকো মিশিয়ে চকোলেট করেছি। তুমি খেও—মামাকে দিও।"

কৌটো নিয়ে ফিরে এলাম। মামা আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়লেন। চামচের তুলে ঘুরে যেন আর বলেন, "চমৎকার করেছেন তো। হবে না? অত উচ্চ শিক্ষিতা যে।"

উচ্চশিক্ষিতাদের গৃহস্থালি সম্পর্কে আমার ধারণা উচ্চ নয়। আমি চুপ করে রইলাম। মামা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, "এখন আমি কি দেব বলি, অ্যাঁ? ইয়াং লেডিদের ফুল দেওয়া উচিত কোন পুরুষের। তা, আমার বাগানে ফুল কোথায়?"

'ইয়াং লেডি কে, মামা?"

মামা বিরক্ত হলেন—"আরে, আমার চেয়ে অনেক ছোট তো। বেচারীর হার্টের অসুখ আছে বলেই না এত তাড়াতাড়ি রিটায়ার করেছে।"

আমি হাসি গোপন করে বললাম, "ফুল যখন নেই-ই, মামা, তখন ডিম দাও তুমি। তোমার লেগহর্ণগুলো চমৎকার ডিম পেড়েছে। মীটসেফে তুলে রেখেছি। তাই দাও।

মামা খুশী হয়ে উঠলেন, "যা বলেছিস। ইয়াং ম্যান না হলে কি ইয়াং লেডির কি—মানে কোন লেডির কি উপহার—এই কৌটোটাতেই নেই? না, শোন গত সপ্তাহে শহর থেকে কেকের বাক্সটা এসেছিল—বেশ ফুল আঁকা—ওটাতেই না হয়—"

ফুল মামার অবসেশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। অগত্যা কোকোর বাক্স বার করে কেড়েকুড়ে গুছিয়ে দিলাম ডিমের সারি। মামা বললেন, যা দিয়ে আয়।"

আমি বললাম, "তুমিই যাওনা, মামা। চকোলেটের জন্যে ধন্যবাদও দিয়ে আসবে অমনি।"

"যেতে পারি। তাহলে জামা-কাপড়টা একটু—" মামা কাপড় ছাড়বার ঘরে অদৃশ্য হলেন। আধঘণ্টা পরে

রীতিমত বিয়েবাড়ীর সাজে এলেন।

বন্ধুবাব ও ডিম দিয়ে দিয়ে আসতে প্রায় ঘণ্টাখানেক গেল। খাবার টেবলে মামা সংবাদ দিলেন, 'কাল তোকে আমাকে মিস বরাট নেমন্তন্ন করেছেন রে, রবি। বলেছেন আমারি ডিম আমাকে ভেজে খাওয়াবেন। হাঃ-হাঃ! চমৎকার কথা কিন্তু ওঁর।"

"কিন্তু আমাদেরও খাওয়াতে হবে, মামা।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়। তুই না থাকলে আমার অবিবাহিতা মহিলার সঙ্গে বেশী মেলামেশার কথা হ'ত। ভাগ্যি তুই ছিলি।"

আমি ভাবলাম মামা চিঠি লিখে আমাকে আনিয়েছেন সে কি শুধু গাছের ফুল কোটাতে?

নেমন্তন্নের দিন সকাল থেকে মামার দিকে আর চাওয়া যায় না। দুইবার শেভই করলেন। ধুতি পাঞ্জাবী পরে যাবেন। সেগুলো বেখে বেছে দিতে হ'ল আমাকে। বারমেশে লাঠির বদলে মহিষ শিঙের ছড়ি বার হল। চুলে অন্ততঃ দশবার ব্রাশ-চিরুণী পড়ল।

মিস বরাটও সেদিন সাজসজ্জায় বাদ দেন নি। সুতরাং ওদিকেও প্রস্তুতি চলেছে। চায়ের পার্টি হয়েছিল মিস বরাটের পোর্চে। ফুলের টাবগুলো এনেছিল সেখানে। সামনে তারে জালনার খচিত। দূরে কলের চিমনির ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে।

মিস বরাটকে প্রায় দেখালেও বয়সটা যেন কমে গিয়েছিল মনে হচ্ছে। গালে লালিমার ছোপ। ছোপ-দেওয়া চওড়া পেড়ে পাড় শাড়ী ও সাদা রেশমের জামায়, বাস্ত চলাফেরায় বয়সে আর যা হোক রিটায়ারকরা মহিলা মনেই হচ্ছিল না। হি-হি করে কেমন সরু গলায় তিনি হাসছিলেন তরুণীর মত কথায় কথায়।

ওঁর দাসী খবর দিল যে মিসিমণির কাল বুকে কষ্ট হয়েছিল।

মামা অধীর হয়ে উঠলেন, "ডাক্তার দেখান নি? তবে থাকা উচিত।

মিস বরাট বললেন, "ডাক্তার আমার কি দেখবে? পুরনো ব্যাধি। ঘুটো পিল খেয়ে রাত্রে ঘুমলেই ঠিক হয়ে যাবে।"

মামা বললেন, "না, না অবহেলা করা উচিত নয়। কাল সকালেই দেখাবেন। আজ কেন এত খাবার দাবার কষ্ট করে আমাদের জন্যে করলেন বলুন তো?"

"কষ্ট আবার কি! আমার নিজের দুধের মিষ্টি, পায়েস করেছি মাত্র। একা—একা থাকি। লোকজন এলে কত ভাল লাগে।"

মামার মুখেও সাদের ছোপ। কাঁচাপাকা চুল বাতাসে উড়ছে। মামা হা-হা করে হাসছেন। মামার বয়সও যেন অনেক কম মনে হোল।

চা খাওয়ার পরে দাসী জিনিষপত্র সরিয়ে নিলে মামাকে মিস বরাট বললেন, "এবার আপনার পাইপ চলুক।"

'কিন্তু, লেডিরা আমার ধূমপান সহ্য করতে পারেন না, জানি। গন্ধ লাগে।"

আবেদনের ভঙ্গীতে ঠোঁট উল্টে মিস বরাট বললেন, "না, না। আমার গন্ধ লাগে না"

"তবে নিশ্চিন্ত হলাম। কিন্তু এবার একটা গান—অবশ্য যদি শরীরে কুলোয়—"মামা সস্মিতহাস্য কণ্ঠে বললেন।

"শরীরের কিছু হয়নি", ত্রস্তে মিস বোস জানালেন, "কিন্তু আমি আবার কি গান গাই একটা!"

আমিও অনুরোধে যোগ দিলাম। অবশেষে থরো-থরো কাঁপা গলায় মিস বরাট ধরলেন—

"আমার মল্লিকা বনে যখনি ধরেছে কলি
আমি তোমারি লাগিয়া তখনি বন্ধু, রেখেছিনু অঞ্জলি।"

এর পরে হয়তো মামা আবার ফুলগাছের পেছনে লাগবেন।

যেখানে দক্ষিণা বাতাস বয় না সেখানে ফুল ফোটে কি করে? মামা হয়তো আবার নূতন দায় এনে চাপাবেন।

রাত্রি গভীর হল। অবশেষে চাকের আসর ভঙ্গ করে প্রত্যাবর্তন জানাবার পরে—আমরা পথে নামলাম।

শুনলাম নবীন শ্রেণিকের গলায় মামা বলছেন, "কাল যেন ডাক্তার দেখাতে ভুল না হয়।"

সকালে উঠেই প্রি-অ্যাবশন শুরু হল। পরশুদিন নেমন্তন্ন করা হয়েছে মিস বরাটকে। যদিও মিস বরাট আগেও বহুবার এসেছেন তবুও মামা গোটা বাড়ীকে ঢেলে সাজাতে মন দিলেন। আমাকে বললেন "রবি, তুই না হয় চট্ করে শহরে চলে যা খাওয়া দাওয়া সেরে। একটা টি-সেট, ভাল টেবল ক্লথ নিয়ে আয়। কিছু মিষ্টিও নিয়ে আসিস।"

আমি বললাম, "কাল না হয় যেয়ে মাটকা মিষ্টি আনব। আজ থাক।"

মামা ঘাড় নাড়লেন, "নারে। কাল তুই না থাকলে নার্ভাস হয়ে পড়ব।"

"অবাক করলে, মামা! মিস বরাট তোমার এতদিনের চেনা। তিনি এলে আবার নার্ভাস হবে কি?"

নারে। বিয়ে টিয়ে করিনি তো, মেয়েদের সঙ্গে মেলা-মেশা অভ্যাস নেই তেমন। ঘরদোর যা হয়ে রয়েছে। লক্ষ্মীছাড়ার বাড়ী তো। মেয়েদের হাত না পড়লে কি ঘরদোরের শ্রী হয়? রেণুকা, মানে মিস বরাটের বাড়ী দেখসি কেমন কাল? একেবারে টিপ-টাপ!"

"তা মামা, লক্ষ্মীছাড়া হয়ে আছই বা কেন? একটা বিয়ে করে ফেল না। খুব সোজা কাজ।"

মামা হেসে ফেলেন, "কি যে বলিস তুই? এত বয়েসে হুঁ!"

"তাতে কি, মামা? বয়স্কা পাত্রীও তো পাওয়া যেতে পারে।"

মামা লজ্জায় লাল হয়ে উঠলেন, "যা যা বকবক করিস না। খাওয়া দাওয়া সেরে সাড়ে দশটার লোকালে চলে যা। আর শোন, সেই সঙ্গে তোর একজোড়া ভাল জুতো কিনে আনিস। জুতোটা তোর ছিঁড়ে গেছে বড্ড। আর,—একটা ভাল সেন্টও আনিস।"

মামার ফরমাসী জিনিষপত্র কিনে ফিরতে ফিরতে ভাবছিলাম: মাকে চিঠি লিখে দেই আপাততঃ আমার আর তাড়াতাড়ি ফেরা হবে না। মামার প্রয়োজনে আরও কিছুদিন থাকা দরকার। বার্ধক্য কলোনীর একটা ভাল। সকলে বিগতযৌবন, তাই কেউ নিজেকে বুড়ো বলে মনে করতে পারে না। ছোটখাটো জিনিষ এদের জীবনে দারুণ উত্তেজনা, বড় বস্তু এরা পায় না বলে। কিন্তু এই সব মধুর নিশ্চিন্ত আরাম করা দিনগুলো ভুলিয়ে রাখে এদের যে যারে মৃত্যু। হঠাৎ পাকা ফল যদি বোঁটা থেকে খসে পড়ে তাহলে এরা বিস্ময় বোধ করে, স্তম্ভিত হয়। তাদের কারুর যে মরবার বয়স হয়েছে এই বোধ তাদের নেই। তাই ব্যবহার অনেক সময় শিশুসুলভ।

বাড়ীতে ফিরে এলাম। সারাদিন মামা বাগানখানার আগাছা নিড়ে সাফ করেছেন। ঘুলো-কাদা-মাখা মূর্তি। আমাকে দেখে বলে উঠলেন, "দেখতো রবি, ঠিক হয়েছে কি? ওঃ, কটা ফুল যদি ফুটতো! কাল দেখলি না রেণুকা, আই মীন মিস বরাটের কত ফুল ফুটেছে।"

"ও তো টবের ফুল, মামা। এখানকার মাটী খারাপ, ফুল ফোটে না। যাই হোক, আমি যাবার আগে নিশ্চয়ই তোমার গাছে ফুল ফুটিয়ে যাবো। তোমার দুঃখ থাকবে না।"

নিত্যগোপাল চা দিয়ে গেল। হাতমুখ ধুয়ে মামা-ভাগ্নে বসলাম চা খেতে। আগামী দিনের পার্টি নিয়ে মামা নানা আলোচনায় ব্যাপৃত হলেন।

লিলির

রিচ

নোনতা

বিস্কুট

লিলি বিস্কট কোং.প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা-৪

হঠাৎ আমি চুপ করে গেলাম। বাইরে কেমন গোল-মাল, ছোট রাস্তায় পায়ের শব্দ। মুতাসোপাল দেখতে গেল। তক্ষুণি ফিরে এসে খবর দিল ও।

"বরাট-দিদিমণি মারা গেলেন। আহা, বড় ভাল লোক ছিলেন।"

"মারা গেলেন?" আমি হতবাক হয়ে গেলাম!

"হাঁ, আজ সকাল থেকেই হার্টের ব্যারাম বেড়েছিল। ডাক্তারবাবু দুপুরবেলা যেয়ে চেষ্টাচরিত্র করেছিলেন বহুৎ। এই বাস্তর মারা গেলেন।"

মামার দিকে তাকালাম। বিস্ময় ছাড়া সে মুখে কিছু নেই। অবাক হয়ে গেছেন তিনি। দেখতে দেখতে সারা মুখ তাঁর ছাই-এর মত সাদা হয়ে গেল। মামা আস্তে আস্তে টেবল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। শোবার ঘরের দিকে নিঃশব্দে চলে গেলেন। আশি বছরের বৃদ্ধের মত টেনে-টেনে চলা মামার!

বাইরে মামার বাগানের গাছের মধ্যে পুরানী হাওয়া বয়ে যেতে লাগল।

সেই নদীটা এখনো আছে - রূপনারায়ণ।

একদিন এই নদীর উপর প্রবল টান ছিল জনার্দনের। ওই নদীর স্রোতের টান যতটা তেজী, তার টান ছিল বুঝি তার চেয়েও অনেক তীব্র।

রূপনারায়ণ এখনো আছে। কিন্তু আগের মত তেমন টান নেই। স্রোতের টানের কথা বলছিনে, জনার্দনের টান। রূপনারায়ণের উপর আর তেমন টান নেই জনার্দন বিশ্বাসের।

আসলে তার বিশ্বাসটা ভেঙে গিয়েছে, রূপনারায়ণের উপর আর কোনো বিশ্বাসই রাখে না জনার্দন।

অন্ধের মত একদিন সে ভালোবেসেছিল এ নদীকে ভালোবেসে বুঝি ভুল করেছিল।

"নদীটা কেমন দেখতে?" নদীর কিনারে বালুর উপর বসে স্রোতের দিকে চোখ রেখে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল মালতী।

উত্তরে জনার্দন বলেছিল, "রুপোর মত। রুপোর পাতের মত।"

"তার মানে?"

এর মানে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলা বড় কঠিন মনে হল জনার্দনের। তবু সে চেষ্টা করল, বলল, "রুপোর নাম নিশ্চয় শুনেছ। সেই সাদা রঙের -"

মালতী বাধা দিয়ে বলল, "অন্যভাবে বলো।"

"অন্যভাবে?" ভাবতে লাগল জনার্দন। অনেকক্ষণ পরে সে ভাবল, "এর নাম শুনেই বুঝতে পারছ এর রূপ আছে, সেরূপ কেমন জান?"

মালতী বুঝি বুঝতে পারল জনার্দন কি বলতে চায়, তাই একটু ভেবে বলল, "বুঝেছি। যার-তার সঙ্গে ওর উপমা দিতে হবে না। এমনি বলো।"

জনার্দন গম্ভীর হয়ে গেল। অবশেষে বলল "তোমার অনেক দুর্ভাগ্যের কথা তুমি বলে থাক। তোমার আর — একটা দুর্ভাগ্য কি জান?"

"কি?"

"নিজেকেও তুমি দেখতে পেলে না।"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল মালতী বিশ্বাস।

মালতী কিন্তু আগে বিশ্বাস ছিল না, ছিল বটব্যাল। বছর পাঁচ হল সে জনার্দন বিশ্বাসের স্ত্রী হয়েছে।

প্রথমে এ কথা যখন রাষ্ট্র হল তখন কেউ বিশ্বাসই করতে পারেনি। জনার্দনের মত মানুষ যে বিয়ে করতে পারে - এ কথা ভাবাও কঠিন ছিল। অথচ জনার্দন সকলের সব বিশ্বাস ধূলিসাৎ করে দিয়ে বিয়ে করল এই মেয়েটিকে।

ঘটনাটা অবিশ্বাস্য অন্য কারণেও। এ মেয়ের বিয়ে হতে পারে, এ কথা ভাবে নি এ তল্লাটের কোনো মানুষ। মঙ্গলচক কালীদহ হরেন্দ্রপুর আর বিলোনি—গায়ে-গায়ে এই চারটি গ্রাম রূপনারায়ণের কিনার বরাবর। এই

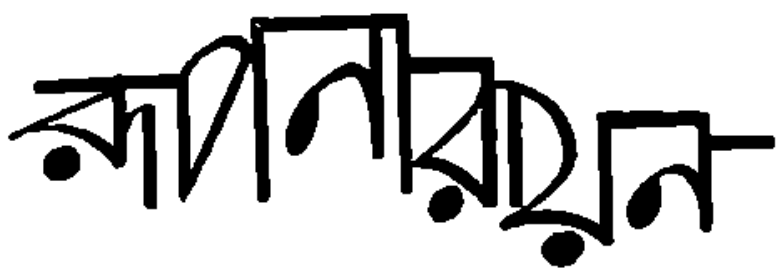

চার গাঁয়ের সকলেই ভেবেছে এই মেয়েটির কথা - ত্রিলোক বটব্যালের এই মেয়েটির কথা। সকলেই দুঃখ করেছে, কিন্তু উপায় খুঁজে বের করতে কেউ পারে নি। মালতী তাই যত বড় হয়ে উঠেছে, সকলের দুশ্চিন্তাও বড় হয়ে উঠেছে সেই অনুপাতে।

ঘরে ঘরে তাঁত বসানো। ঘরে-ঘরে তাঁতে চলে। কালীদেহের এই বটব্যাল-বাড়ির দাওয়ায়ও মাকু চলা-চলের শব্দ হয়। মালতীও তাঁত বোনে। কিন্তু তার তাঁতে কি রকম ডিজাইনের শাড়ির পাড় তৈরী হয়ে ওঠে, তা সে জানে না।

মালতীর মা দাওয়ার অদূরে বসে লাটাই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সুতো জড়াতে থাকেন, আর মাঝে মাঝেই তাকান মালতীর তাঁতের দিকে।

বেলাই বয়স হয়ে যাচ্ছে মেয়েটার। কিন্তু তার মুখের দিকে তাকালে মুখের উপর বয়সের কোনো ছাপ দেখা যায় না। সরল ও সাধারণ একটি বালিকার মত বসে-বসে মাকু টেনে-টেনে সে বুঝি খেলা করে।

দূর থেকে শব্দ ভেসে আসে রূপনারায়ণের ঢেউয়ের। সে শব্দটা খারাপ লাগে না। দিনের বেলা শব্দটার দিকে তত কান করা যায় না, কিন্তু রাত্রিতে যখন মানুষের শব্দ থেমে যায়, চারদিকে যখন স্তব্ধতা নেমে আসে, তখন রূপনারায়ণ তার জলতরঙ্গের বাজনা যেন বেশি করে বাজায়। এক মনে ঐ শব্দ শোনে মালতী।

সে জানে, তাকে নিয়ে অনেক দুশ্চিন্তা আর অনেক অশান্তি আছে এ বাড়িতে, কিন্তু কি করে সবাইকে সে এ সবের হাত থেকে রেহাই দেবে—তা সে ভেবে পায় না।

রূপনারায়ণের ঢেউএর ঐ শব্দের ভিতর থেকে এক-দিন সকালবেলা তাদের উঠোনে বেজে উঠল কার যেন পায়ের শব্দ। মালতী তখন তাঁত বুনছিল।

শব্দটা হঠাৎ থেমে গেল। মালতী বলল, "কে?"

কোনো উত্তর পেল না।

জনার্দন হচ্ছে একজন ভবঘুরে লোক। উদাসীন, উদ্‌ভ্রান্ত, আত্মভোলা মানুষ। মোটাসোটা কাপড় পরে, মোটা কাপড়ের জামা গায়ে দেয়; মাথার চুল উস্কোখুস্কো। সে যেন এ জগতেরই জীবনয়।

তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে বলে, "আমি দেশকর্মী।"

দেশকর্মীই বটে সে। ছেলেবেলা থেকেই তার টান নেই সংসারের দিকে। বাড়িঘরদোর ছেড়ে দিয়ে সে তখন থেকেই ঝাঁপিয়ে পড়েছে এই কাজে। যাঁরা এখন বৃদ্ধ হয়েছেন তাঁদের কাছে জনার্দনের অনেক গল্প শোনা যায়। তাঁরা স্নেহের বলেন, "জনার্দনটা দেশসেবক তো বটেই, কিন্তু আসলে ও হচ্ছে দেশ-পাগলা।" বাকইপুরের বিশ্বাস-বংশ একটা নামজাদা বংশ। সেই বংশের ছেলে সে। এই পাগলামিটা না থাকলে ওকে পায় কে, ওর ভাইয়েরা এক-একজন মস্ত জোতদার, মস্ত ধনী।

ছোটবেলা থেকেই ওর মন অন্য রকম। টাকা পয়সাই বলো, আর সুখশান্তিই বলো—ওসবের ধার সে ধারে না। সে বাউণ্ডুলে। বাড়ি বাড়ি থেকে চরকায়-কাটা সুতো সংগ্রহ করাই ছিল তার গ্রামজীবনের কাজ, এতে সে আরাম পেত।

"কিন্তু, এ সবে হবে কি রে, জনার্দন?" এ রকম প্রশ্নের উত্তরে সে বলত, "দেশ স্বাধীন হবে।"

তার সুতো-সংগ্রহের জন্যেই, না, অন্য কোনো কারণে দেশ স্বাধীন হয়েছে—তা সে জানেনা। কিন্তু জনার্দন তার কাজ ত্যাগ করে নি।

পায়ের সুতো ছিঁড়ে যায় গাঁয়ের পর গাঁ হাঁটতে হাঁটতে। কিন্তু তবু তার বিরাম নাই।

চল্লিশ পার হয়ে গিয়েছে জনার্দনের। অথচ

মানুষের সঙ্গে দেখা হয়েছে তার এই চল্লিশটা বছরে। তাদের সকলের মুখ মনে রাখা সম্ভব না। কিন্তু তারা সকলেই মনে রেখেছে জনার্দনকে।

অমন—একটা অদ্ভুত মানুষকে একবার দেখলে তাকে ভোলা সোজা না।

দশ-বারো বছর আগের কথা। জনার্দনের দুই বৌদি তাঁদের এই দেবরটিকে পেয়ে তাকে আটক করেন। তাঁরা দাবী জানান—আর না, পথে পথে ঘোরা বন্ধ হোক এবার, এবার একটু গুছন্ত হওয়া হোক।

"কেন বলো তো? এ সব চক্রান্ত কেন তোমাদের।"

মেজবৌদিটা একটু বেশি হাসিখুশি, বললেন, "কেনর জবাব চাই বুঝি? আমরা বাপঘরে আড়ি পাতব বলে। দেখব, সত্যি সত্যিই সন্ন্যেসী কি না। শুধু এই জন্যে।"

বড়বৌদি বললেন, "বেশ-উদ্ধার করা তো হয়েছে। এবার একবার ছাদনাতলায় বসে আমাদের উদ্ধার করা হোক।"

কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল জনর্দন, এসব কথার কি উত্তর দেবে ভেবে পেল না। অবশেষে বলল, "তবে পালাতে হবে। তোমাদের পাল্লায় পড়লে পাগল হয়ে যাব।"

কিন্তু তারা নাছোড়। তাদের হাতে নাকি শাস্ত্রী প্রস্তুত। তাঁরা জনার্দনকে তাই নাকি নজরবন্দী করে রাখবেনই, কিছুতেই ছাড়বেন না।

জনার্দন ব্যাকুল হয়ে বলল, "একটা মেয়েকে জলে দেবেন কেন? তার চেয়ে তার জন্যে ভালো একটা বর জোগাড় করে দিন।"

মেজবৌদি বলে উঠলেন, "জলেই দেব। আমাদের খুশি। জোড়হস্তে বলছি মশাই, পরনের ওসব জবরজং সাজ খুলে একটু ভদ্র সাজে সাজুন। তবেই বুঝবেন, পাত্র হিসাবে আপনিও যা তা-না। নতুন সাজে সাজলে বড় আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড় করাব, নিজের রূপ দেখে নিজেই অজ্ঞান হয়ে যাবেন।"

জনার্দন একটু হাসল। বলল, "ভেবে দেখি।"

"কবে কথা দেবেন বলুন।"

ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকাল জনার্দন, কি যেন হিসাব করল মনে-মনে, তারপর বলল, "পাকা কথা চাই তো?"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়।"

জনার্দন বলল, "পরশু।"

বড়বৌদি-মেজবৌদি মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করে হাসলেন, লোকটাকে তাঁরা যে কাবু করতে পেরেছেন, এই আনন্দে তাঁরা আত্মহারা।

মেজবৌদি বললেন, "পরশু কখন?"

"ইশ।" জনার্দন বলল, "তাইও পর্যন্ত বলতে হবে? বেশ। বিকেল পাঁচটা-দশে।"

দুই বৌ মিলে বাড়িতে হৈ চৈ শুরু করে দিলেন। বাঙ্কইপুরের বিশ্বাসবাড়িতে নতুন বৌ আসবে এবার।

সেই পরশু যখন এসে পৌঁছল, তখন দুই বৌয়ের যেন আর তর সয়না। বিকেল পাঁচটা দশ হবে কখন, তোর পাঁচটা থেকে তার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠল দুজনে।

কিন্তু মজা এই—দুপুরে ভাইয়েরা একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করল বৌয়েরা পরিবেশন করল, তখনও কেউ-বোঝেনি। তার পর থেকেই আর খুঁজে পাওয়া গেলনা জনার্দনকে।

সেই যে গেল না, তার পর আর গেলই না। ওকে একে তার পর কেটে গেল কত বছর। ইতিমধ্যে জনার্দন আর তার নিজের বাড়িতে পদার্পণ করে নি।

কিন্তু কালীদহের ঘুচে তার পদার্পণ ঘটেছে ও ঘটছে।

অদ্ভুত রূপ ঐ মেয়েটির। অদ্ভুত রূপ। রূপনারায়নের কিনারে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল জনার্দন। এই রকম সে ভাবছে কয়েকদিন থেকে। দূর-দূর গ্রাম থেকে সংগ্রহ

করে আনা সুতো সে এখানে আশপাশের গ্রামে বিলি করে, তার-পরই ফিরে আসে কালীদহে। বৌদিদের কথা মনে হয় তার। কত দিন দেখা নেই তাদের সঙ্গে, কত অভার সে করে এসেছে তাদের উপর। তারা নিশ্চয় তাকে আর মার্জনা করবে না।

রঙের গামলায় ডুবিয়ে সুতো রং করছিল ত্রিলোক বটব্যাল। পাশে দাঁড়িয়ে জনার্দন।

জনার্দন বলল, "তোমার মেয়ের নাম বুঝি মালতী? নামটা বেশ।"

জনার্দনের উপর শ্রদ্ধা তাদের খুব, তার মুখে মেয়ের নামের এই সুখ্যাতি শুনে ত্রিলোক বলল, "মেয়েটিও বেশ। কিন্তু হলে হবে কি, ওকে নিয়ে আমার চিন্তা।"

"জানি। কিন্তু চিন্তার কিছু নেই।"

একটা ভরসার কথা যেন শুনল ত্রিলোক, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, "কি বললেন?" জনার্দন বলল, "বলছিলাম—চিন্তার কি আছে।" তারপর জনার্দন ধীরে ধীরে জানাল তার অভিপ্রায়। বলল, "আমি ক্লান্ত হয়ে গিয়েছি। এবার বিশ্রাম নেব। রূপনারায়ণের ধারে একটা ছোট ঘর—"

"বেশ তো। বেঁধে দেব আমরা।" ত্রিলোক বলল। কয়েকদিনের মধ্যেই গাঁয়ের সব মাতব্বর একত্র হয়ে সব ব্যবস্থা পাকাপাকি করেছিল। সে তো বছর পাঁচ আগের কথা।

রূপনারায়ণের নেশায় বিভোর হয়ে তার কিনারে বাসা বেঁধে জনার্দন বাস করছিল এখানে। টান হয়েছিল তার রূপনারায়ণের উপর। কিন্তু আর সে টান নেই।

বড়বৌদি আর মেজবৌদি আগের মত তেমন হাসিখুশি নেই। অনেক বদলে গিয়েছে তারা। বদল তো হবেই। অনেকগুলি বছর তো পার হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যে। জনার্দন ফিরে এসেছে বাকইপুরে অনেক দিন পরে। বদল তারও হয়েছে।

বৌদিরা তাকে ক্ষমা করেছে তো? জনার্দন যেন মনে-মনে জিজ্ঞাসা করছে।

বড়বৌদি বললেন, "খবর বলো। কেমন ছিলে কোথায় ছিলে।"

ধীরে ধীরে জনার্দন সব বৃত্তান্ত বলল। একে একে সে বলতে লাগল সব কথা। তার কালীদহের কাহিনী। উৎকর্ণ হয়ে তাঁরা শুনতে লাগলেন।

মেজবৌদি এতক্ষণে বলে উঠলেন, "তবে রে সন্ন্যাসী। এই বুঝি সন্ন্যাস! সন্ন্যাসিনীটি কোথায়! কেমন দেখতে সে?"

জনার্দন বলল, "তোমাদের দেখাতে পারলাম না। এটা আমার আক্ষেপ। আমার হাতে পড়লে জলে দেওয়া হবে বলেছিলাম, আমি তাকে জলে দিয়ে এসেছি।"

দুটি বৌদি চমকে উঠলেন, বললেন, "সে কি কথা! কি হল?"

"খুন বৃষ্টি হচ্ছিল। ভীষণ বৃষ্টি। আমি পাশের গ্রাম মঙ্গলচকে আটকে গিয়েছি। হয়তো ঘর থেকে বেরিয়ে সে খোঁজ করতে যাবে ভেবেছিল আমারই। কিন্তু দিক ঠিক করতে বুঝি পারে নি। রূপনারায়ণের ঢেউ তাকে টেনে নিয়ে গিয়েছে।"

আঁতকে উঠলেন দুটি বৌদি।

"আর টান নেই আমার ঐ নদীর উপর। আর যাবনা কোথাও। এবার থাকতে চাই বাকইপুরে যদি রাজি হও তোমরা।"

দুই বৌদি চোখ মুছলেন। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থেকে বড়বৌদি আক্ষেপের সঙ্গে বলে উঠলেন, "ছেনা জায়গায় দিক ভুল হয়ে গেল? চোখ ছিল না? দেখতে পেল না?"

জনার্দন বৌদিদের মুখের দিকে চেয়ে বলল, "ছিল না। সেই জন্যেই তোমাদের কাছে তাকে আনিনি। যদি কিছু ভাব।"

"নির্বোধ কোথাকার।" ধমক দিয়ে উঠলেন বড়বৌদি, "কি আর ভাবতাম আমরা।"

মেজবৌদি বললেন, "কি ভাবে নষ্ট হয়েছিল চোখ।"

"জন্মের থেকেই।" বলল জনার্দন।

দেশে বিদেশে সুবিখ্যাত

গোল্ডেন

আমলা

হেয়ার অয়েল

কেশচর্যা ও কেশচর্চার শ্রেষ্ঠ উপকরণ। বর্ণে, গন্ধে ও গুণে অতুলনীয়।

আজই ব্যবহার আরম্ভ করুন। সকল সম্ভ্রান্ত দোকানে পাওয়া যায়।

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর

গো ষ্ঠ পা ল

ফুটবল ও সেকাল একাল

চিরটাকালই খেলার মাঠে কাটলো, কালিকলমের কারবার বড় করিনি। খেলার মাঠের সাথে আমার আত্মীয়তা পঞ্চাশবছরের, আর এই পঞ্চাশবছরের কত অজস্র ঘটনা মনের আনাচে কানাচে বিচিত্রিয়ে আছে। আজ উৎসাহীদের তাগিদে স্মৃতির ঝাঁপি খুলতে কত কথা একসঙ্গে হুড়-মুড় করে বেরিয়ে আসতে চায়।

কেন, কেমন করে একদিন খেলার জগতে চলে এলাম তারপর অজেন্ত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়লাম তা আজ ভাল মনে পড়েনা। আমাদের শৈশব যৌবন কেটেছে স্বদেশী আন্দোলনের উন্মাদনায়। আমাদের সবকাজে সেদিন স্বদেশী ভাবটিই ফুটে উঠতো। ১৯১১ সালে মোহনবাগান শীল্ড পেল। এযেন ইংরেজদের পরাজয় নয় বৃটিশ সাম্রাজ্যেরই পরাজয়। শহরে খেলা ফুটবল এই জয়ের পর থেকে গ্রামে গ্রামে খেলার উদ্দীপনা জোগাল। ফুটবল তারপর থেকেই জনপ্রিয় হয়ে উঠলো। ক্যালকাটা মোহনবাগান বা গোরার খেলা, শুধু যার দুটি ক্লাবের খেলা নয়, এ যেন ইংলণ্ড বনাম ভারতের খেলা। সাহেবরা জিতলে লণ্ডনে কেবল্ যেত। আর আমরা জিতলে অভিনন্দন পেতাম দেশবাসীর কাছ থেকে। ইংরেজদের লাথির ঘা অনেক খেয়েছি, তার প্রতিকার সবার পক্ষে মুখোমুখি সম্ভব ছিল না, কাজেই খেলার মাঠে সে সুযোগ নেবার উদ্দেশ্য নিয়ে খেলায় যোগদিলাম।

১৯১১ সালের শেষের দিকে মোটে পনেরো বছর বয়সে আমি মোহনবাগান দলে যোগ দিলাম। কিন্তু আমার প্রকৃত খেলার সুরু ১৯৩৩ সালে। প্রথম প্রথম খেলায় নেমে দু'তিনটি ট্রায়াল ম্যাচ খেলতে হয়েছে। বরাবরই আমি ব্যাকে খেলেছি। ব্যাকে খেলার পিছনে একটি ছোট ইতিহাস আছে। সুধীরবাবু সে বছর অবসর গ্রহণ করবেন, দলের কর্তৃপক্ষ একজন ব্যাক-এর খোঁজ করছেন এদিকে আমি ট্রায়াল ম্যাচ গুলিতে হাফ ব্যাক খেলছি, শরীরে তেজের সেদিন কমতি ছিল না, শটও মারতে পারতাম দস্তুর মতো। কর্তৃপক্ষ স্থির করলেন হাফব্যাকে আর নয় ব্যাকই ভালো। অতএব ব্যাকে বহাল হলাম।

খেলায় নামার বছর দুয়েকের মধ্যেই আমি স্বীকৃতি পেয়েছি। ১৯১৩ সালের শীল্ডের খেলায়ও ঐ অল্প বয়সেই নেমেছি। আমি দ্বিতীয় ডিভিশনে কোনদিনই খেলিনি। খেলার আলস্য বা ক্লান্তি ছিলনা, স্কুল থেকে ফিরতাম, ওঁরা গাড়ী করে বাড়ী থেকে মাঠে নিয়ে যেতেন আবার বাড়ী পৌঁছে দিতেন।

সেকালে যাঁরা খেলতেন তাঁদের মধ্যে গোরে হীরালালবাবু, ব্যাকে আমি ও মুকুলবাবু, হাফব্যাকের কথা মনে নেই। সেণ্টার ফরওয়ার্ড শিবদাস ভাদুড়ী লেফ্ট ইন বিজয় ভাদুড়ী, রাইটইন চারুদা বাবু।

ডালহৌসি, ক্যালকাটা, কাস্টমস্ কোর্টমিলিটারী ইস্টার্ণ রেলওয়ে প্রভৃতি সেকালের ফিরিঙ্গী ও সাহেবী

দল। ক্যালকাটা ও ভালহাউসী পাক্কা সাহেবী দল। কিন্তু এদের তোষামোদের প্রয়োজন হোতনা, বললেই খেলতো। মাঠে মারামারি, খুঁতো খুঁতি হোত মাঠের বাইরে কিন্তু কণ্ডার রেশটুকুও নেই, সেখানে অটুট বন্ধুত্ব। খেলারমাঠে যেটুকু রেষারেষি হ'তো তার মূলে ছিল স্বদেশী ও বিদেশী মনোভাব। কিন্তু তার মধ্যে আজকের মত নোংরামি ছিল না। খেলোয়াড়োচিত মনোভাব ওদের মধ্যে যেমন ছিল আমাদের মধ্যেও কিছু কম ছিল না। আমাদের সমর্থকও দর্শকদের মধ্যে ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ, জে, এম, সেনগুপ্ত আর রাজা মহারাজরা। স্যার আশু এন মুখার্জী তখন মোহন-বাগান দলের সভাপতি। চীফ জাষ্টিস্ ক্রেনবিল্স

মোহনবাগানের খেলা এত ভালবাসতেন, তাঁর জন্য প্রতিটি খেলায় বেতের চেয়ারের ব্যবস্থা করতে হোত কোর্ট থেকে বেরিয়ে সোজা তিনি খেলার মাঠে চলে আসতেন। প্রায় কোন খেলা দেখাই তাঁর বাদ যেত না।

এবার আমার জীবনের কয়েকটি স্মরণীয় ঘটনার কথাও বলি। ১৯১১ সালে মোহনবাগান মিডিলসেক্স এর সাথে খেলে ফাইন্যালে ওঠে, এবং ফাইন্যালে ইস্টইয়র্কের সাথে খেলে।

১৯২৩ সালে রোভার্স খেলতে যাই। গোলরক্ষক —পালিত, ব্যাকে-পান্না পরমানিক ও আমি। হাফ ব্যাকে —মতি সেনগুপ্ত, বলাই চ্যাটার্জী, মণিলাল, রাইটইন রবি গাঙ্গুলী, রাইট আউট—নরেন বাড়ুজ্যে, সেন্টার ফরওয়ার্ড—রহমান, লেফটইন—কুমার বাবু, লেফ আউট—এন, গাঙ্গুলী ও পল্টু দাশগুপ্ত। রোভার্স খেলা হল বম্বেতে। ফাইন্যালে আমরা ৪-১ গোলে হারলাম। ৪৫ মিনিট পর্যন্ত আমরা কেপোলে জিতছিলাম। পরের দিন Times of India একটী কার্টুন ছাপলো। গোলরক্ষকের চোখধাঁধা ও নীচে মন্তব্য Mohaubagan goalkeeper determined not to face the ball."

আরেকটি মজার কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে, স্বদেশীদের হারাবার জন্য সাহেবরা যে কত ফন্দি ফিকির খুঁজতেন ১৯২৩ সালের এই খেলাটি তারই নজীর। রাত-দিন বৃষ্টি হচ্ছে, শহর জলে থৈ থৈ করছে। আমরা জানি খেলা হবে না। I. F. A. তখন সাহেবদের হাতে। জাষ্টিস্ গ্রীবস্ প্রেসিডেন্ট। গ্রীবস্ বললেন খেলা হবে না কিন্তু সাহেবরা সে কথা শুনতে রাজী নয়। ক্যালকাটা ক্লাবের প্রেসিডেন্ট বললেন তোমার তো খেলা বন্ধ করার কোন ক্ষমতা নেই, রেফারীকে ডাকো, সে যদি মাঠে নেমে বলে খেলা হবে না, তবেই খেলা বন্ধ হতে পারে। খড়গপুরবাসিনী ফিরিঙ্গী রেফারী ডোনাল্ডসন্ এলেন, মত দিলেন খেলা হবে। একহাঁটু জলে খালি পায়ে মাঠে নামলাম, বুটের ভয়ে এগোবার সাহস হয় না। ৩-০ গোলে হারলাম।

সেদিন শীল্ড পাওয়া বা ডুরাণ্ড পাওয়া বড় কথা ছিল না, সাহেবদের সাথে খেলে মানরক্ষা রাখাই আমাদের আদর্শ ছিল। আমরা অনুশীলন করেছি শীল্ড জয়ী হবার জন্য নয়, সাহেবদের হারিয়ে স্বদেশের মান রাখবার জন্য। এমন ঘটনাও ঘটেছে সাহেবদের সাথে খেলার ছেড়ে পঞ্চাশ সাতদিন মাঠেই যাইনি। কিন্তু তাই বলে আজকের মত হিংসা দ্বেষ ছিল না। ভবিষ্যতের লাভ লোকসানের কথা ভেবেও চলিনি। দেশীবিদেশী কত জনের কাছ থেকে প্রশংসা পেয়েছি কিন্তু আদরের ভাল হবে একথা ভেবে সে সব সযত্নে সংগ্রহ করিনি। খেলোয়াড়ী মনোভাবটাই ছিল সেদিন একমাত্র আদর্শ।

খেলা সেদিন যেমন দেখেছি, আজও কিছু কম দেখি না, কিন্তু আমার মনে হয় ১৯৪০ সালের পর থেকে আমাদের খেলার মান নেমেছে। স্বাস্থ্য, চরিত্র, নিয়মানু-

বর্তিতা ও খেলার প্রতি নেশা এই চারটি না হলে খেলার উন্নতি হতে পারে না। আজকের খেলোয়াড়দের মধ্যে তারই অভাব প্রতি পদে পদে। আমার মতে খেলোয়াড়ের প্রকৃত খেলার বয়স, ১৮—২৫। কিন্তু আজকাল খেলা আরম্ভই হচ্ছে ২১।২৩ বছর বয়সে। আজকালকার ক্লাবদের ধারণা ১৫।১৬ বছরের ছেলেরা নিতান্ত শিশু। বাচ্চারা আবার কি খেলবে? কিন্তু খেলবে বাচ্চারাই, বুড়োরা নয়।

আমাদের দেশের আবহাওয়াতে অন্য দেশের মত কঠিন অনুশীলন সম্ভব কিনা তাও খেলার পরিচালকদের ভেবে দেখতে হবে। অন্যদেশে সপ্তাহে একটি খেলাই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু আমাদের দেশে সপ্তাহে প্রত্যেকদিনই প্রায় খেলতে হয়। খেলোয়াড় তৈরীর দায়িত্ব ক্লাবগুলিকেই নিতে হবে। একসাথে দশটি খেলার দায়িত্ব একটি ক্লাবকে নিলে চলবে না। খেলার বিভিন্ন শাখায় এক একটি ক্লাবকে Specialise করতে হবে। নইলে ভাল খেলোয়াড় সৃষ্টি হতে পারে না। কেবল তাই নয়, সর্বোপরি পরিচালকদের খেলা সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান থাকা দরকার। অর্থাৎ পরিচালককে ব্যক্তিগত জীবনে খেলোয়াড় হওয়া চাই। ১৯১৯-১৯৫৭ পর্য্যন্ত আমি মোহনবাগান দলের অধিনায়ক, আমার পর হলেন কুমারবাবু।

আজ সব খেলাই কতিপয় ধনী সন্তানের সম্পত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে, খেলার মাঠের সাথে যাদের কোনদিনই সম্পর্ক ছিল না। এ অবস্থায় উঁচুদরের খেলা কে আশা করতে পারেন? দেশবাসী যদি খেলাকে বাঁচিয়ে রাখতে চান তাহলে এই অকর্মণ্য, অযোগ্য লোকদের সরিয়ে সুযোগ্য ব্যক্তিদের উপর পরিচালনার ভার দিতে হবে।

আমরাও আয়েবেদদের ড্রিবলিং নিয়ে খেলোয়াড়া মোদীরা হৈ চৈ করেন। কিন্তু সেকালে বিজয়বাবু যা করতেন তা যে দেখেনি সে বিশ্বাস করতে পারবে না। অপূর্ব বল Control. চার চারজন সাহেব ছিন্ন ভিন্ন খেয়ে যেত, আটকাতে পারতো না। তাঁর নীতি ছিল ড্রিবল করে বল নিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়া, কিন্তু আজকের খেলোয়াড়রা বল নিয়ে পিছিয়ে আসেন, কিন্তু তাঁদের সেই অকর্মণ্যতাই বাহবা জোগাচ্ছে।

খেলায় আজ যে সব নিয়ম আছে আমাদের কালেও তা ছিল, যেটুকু নতুন তা কেবলমাত্র রেফারীর মনগড়া ও আত্মরক্ষার হাতিয়ার। আন্তর্জাতিক খেলার ধারা আইন সম্মত, Shoulder Charge স্বীকৃত। কিন্তু আজ রেফারীদের কৃপায় পৌরুষ আইনের বিরুদ্ধ, গোলকিপার চার্জ ও offside এর আইনও আজ পাল্টেছে।

আমরা খেলার মান (standard) রক্ষার জন্য রবীন্দ্রসরোবরে তাই একটি শিক্ষণ বিভাগ খুলেছি। উদ্দেশ্য স্কুলের তরুণদের শিক্ষা দেওয়া। প্রতিষ্ঠাকালে এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল মেলামেশা, নাম ছিল Veterans' Club কিন্তু পরস্পর মেলামেশা ও খোশগল্পে আমাদের বেশী আনন্দ দিল না। দেশের বালকদের গড়ে তোলার ব্রত নিলাম। আজ আমাদের ক্লাবে ৫০।৫০ জন শিক্ষার্থী আছে। দলের খেলার সবচেয়ে সেরা খেলোয়াড়কেও আমরা পুরস্কার দিই। কেবল খেলা নয়, চরিত্র, ব্যবহার, খেলোয়াড়োচিত মনোভাব ও খেলার মান বিচার করেই এই পুরস্কার দেওয়া হয়। আমাদের কাজ খেলোয়াড় তৈরী করা, কোন বিশেষ দলের জন্য নয়, খেলোয়াড় তার ইচ্ছেমত নিজের দল বেছে নেবে। খেলার যদি নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় থাকে, খেলোয়াড়ের জীবনে খেলাটাই যদি তার সব কিছুর উর্দ্ধে প্রতিষ্ঠা পায় তাহলে খেলার মান আবার ফিরে আসবে। দেশ আবার মুখ উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে।

শঙ্করী প্রসাদ বসু

ক্রিকেট লেখকের যন্ত্রণা

তাঁরা জানেন না তবু তাঁরা আমাকে বাঁচিয়েছেন। শ্রীযুক্ত বেরী সবাধিকারী ও শ্রীযুক্ত হীরালাল রাজনাথকে ধন্যবাদ—এঁদের লেখা-ছাপা কাগজের পাতাকে ঢালের মত তুলে ধরে তবে আত্মরক্ষা করতে পেরেছি।

সকলেই লেখেছিলেন, লেখকেরাও লেখেছিলেন কারণ লেখকেরাও মানুষ। কিন্তু হায়, লেখকেরা যে ছাপার অক্ষরে লেখেছিলেন, তার বিরুদ্ধে আছে প্রবাদের সতর্কবাণী—মুখে যা ইচ্ছে তাই বলো (সন্ধিতে-যাচ্ছেতাই) কিন্তু কখনো লেখার নয়।

ভারত ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ক্রিকেটের পলাশী জিতল সেটা কি ফূর্তির ব্যাপার নয়? আনন্দরোধ করা বেঁচে থাকার লক্ষণ। ভারতীয় পাবলিকের একজন তো বেঁচে থাকার আনন্দ প্রমাণ করতে মরেই গেলেন। মাদ্রাজের ক্রিকেট-মাঠে অনুরাগীর মৃত্যুর কথা খবরের কাগজেই বেরিয়েছিল। যারা 'মরি মরি সে মরণ মরণ সমান' কথাটায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেনি তারাও কিন্তু নৃত্যগীত করেছে, মিষ্টি খেয়েছে, খাইয়েছে, ট্রামে বাসে টিকিট দেয়নি এবং অফিসে কাজ করেনি। একজন অফিসারের কথা জানি তিনি এ ব্যাপারে বিশেষ ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। ভদ্রলোক ক্রিকেটপ্রিয়। বড় অফিসার বলে, টিকিট পেতে এবং পুনশ্চ বড় অফিসার বলে বিনা নোটিসে ক্রিকেট-মাঠে বসে থাকতে তাঁর অসুবিধা হয়নি। ইডেনে ভারত জিতছে তিনি খুবই খুশী। বেশ কিছু মিষ্টি কিনে পরদিন অফিসে গেছেন অংশগ্রহণের জন্য। তাঁর আনন্দের তাগিদ এত বেশী যে কাঁটায় কাঁটায় দশটায় অফিসে হাজির করা বাহুল্য ইতিহাসে সেই প্রথম, সুতরাং গিয়ে দেখেন অফিসে ঝাঁটও পড়েনি। তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেন, রাগের মধ্যেও ঠিক করলেন, লাঞ্চের পরে ফিরে এসে বিনা শান্তিতে মিষ্টির বিতরণ করবেন। দেড়টা নাগাদ এসে দেখেন, একই ব্যাপার, কেউ কোথাও নেই, দারোয়ানের কাছে জানালেন, যে বাবুরা সাড়ে এগারোটার কাছাকাছি সময়ে এসেছিলেন, তাঁরা বিষয় উদ্‌যাপনের জন্য সাড়ে বারোটার কাছাকাছি সময়ে বেরিয়ে পড়েছেন।

কাহিনী শুনে আমার এক বন্ধু হাসলেন। তাঁর একটা গল্প মনে পড়ে গেল। এক ব্যক্তি রেস্টুরেন্টে মাংসের স্ট্যাণ্ডউইচে কামড় দিয়ে চেঁচাচ্ছেন। ম্যানেজার হন্তদন্ত হয়ে হাজির। তাঁকে এ ব্যক্তি স্ট্যাণ্ডউইচে দাঁত চেপে ধরে সরোষে প্রশ্ন করলেন—ম্যানেজার, এতে মাংস কই? ম্যানেজার বিনয়ে বিগলিত হয়ে বলল, আরও কামড়ান, এখনো আসেনি তার। ভদ্রলোক আরও কামড়ালেন—দাঁতে দাঁত ঠেকে গেল, কিন্তু মাংস নেই। আরও চটে প্রশ্ন করলেন—কি হল, মাংস পেলাম না কেন? ম্যানেজার বিনয়ে আরও নত হয়ে বলল,—এবার স্যার পেরিয়ে গেছে।

সরকারী অফিসে কর্মচারীদের উপস্থিতি সম্বন্ধে এই সব গালগল্পে কেউই বিশ্বাস করেন না, এবং আমিও ভিন্ন প্রসঙ্গে সরে যাচ্ছি,—আমার বলবার ছিল আমার দুর্দশার কথা। বলছিলাম কি, সকলেই মাতামাতি করেছিলেন

আর তারই আবেগে পড়ে আমিও একটা প্রবন্ধ লিখে ফেলেছিলাম, যেটি ওয়েস্ট ইণ্ডিজে ভারতীয় দল যাবার আগেই কাগজে বেরিয়েছিল, এবং তাতে লেখা ছিল, এই দল সরকারী সকল ভারতীয় দলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

এই লেখা প্রকাশিত হবার পরে একজন দুজন ক্রিকেট-বিশেষজ্ঞ কিছু কিছু আপত্তি করেছিলেন—তাঁরা ১৯৩২, ১৯৩৬, ১৯৫৬ কোনটির শ্রেষ্ঠত্বকেই ত্যাগ করতে প্রস্তুত নন—কিন্তু পাঠকবৃন্দ বিশ্বাস করুন, অনগণের অন্ততঃ দশজন আমার গায়ে পড়িয়ে পড়ে আহ্লাদে আটখানা হয়ে বলেছিলেন—যা বলেছেন স্যার, এমন দল হয় না—সাহেব ব্যাটাদের আচ্ছা করে কেমন ঠোকানটা দিলে।

তারপর শুরু হল গালাগালি—কেন না ওয়েস্ট ইণ্ডিজে ভারত হারতে শুরু করেছে।—প্রতিটি হার হয় আর অনে অনে দাঁতমুখ খিঁচোয়। পাড়ায় তিষ্ঠানো দায়, আমার অর্বাচীন ভ্রাতুষ্পুত্র পটলা আমার বাড়ীতে এসে পাঁচালী গেয়ে গেল, তাতে আমার পূর্বতন বাহাদুরী ও অধুনাতন গলায় দড়ি সম্বন্ধে নানা রঙ্গমধুর কাব্যরস নিষিক্ত ছিল।

দুর্বিপাকের পরিসীমা নেই, তা দিন দিন বেড়ে চলল, কারণ দিন দিন ভারত অপরাজেয় হয়ে উঠতে লাগল পরাজয়ে। পরাজয় বটে—প্রথম টেস্টে দশ উইকেটে, দ্বিতীয় টেস্টে এক ইনিংস ও ১৮ রাণে, তৃতীয় টেস্টে এক ইনিংস ও ৩০ রাণে, চতুর্থ টেস্টে সাত উইকেটে, পঞ্চম টেস্টে ১৪৩ রাণে।

এমন হার ভারত গলায় পরেনি কখনো।

এই সময়ে যে কথা বলছিলুম হীরালাল রাজনাথ ও বেরী সর্বাধিকারী বাঁচালেন আমাকে। মাঠের ধারে বসে অনেক আশার অনেক সমাধি তাঁরা দেখলেন, ক্ষোভে বেদনায় তাঁদের কণ্ঠ বিকৃত হল বহু সময়, কিন্তু পঞ্চমূর্তির আসনে বসে তাঁরা কি বলেছেন জানেন?—

"এই ভারতীয় দলটি, আমাদের অস্ট্রেলিয়ান দলকে বাদ দিলে, যুদ্ধোত্তরকালে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ সফরকারী সকল দলের মধ্যে নিঃসন্দেহে সর্বাঙ্গীন শক্তিসম্পন্ন সুন্দরতম দল।"

"পরিশেষে আমি আমার মন্তব্য করে রাখছি, ঘোষণা করছি, এই ভারতীয় দলই ওরেলের নেতৃত্বাধীনে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজকে পরাভূত করতে সমর্থ।"

উপরের দুই মন্তব্য শ্রীযুক্ত রাজনাথের।

শ্রীযুক্ত বেরী সর্বাধিকারী কি বলেন? তিনি আজকাল বলায় অতিশয় সংযত। বহু ক্রিকেট দেখার ফলে সামান্য কিছুতে উচ্ছ্বসিত হতে পারেন না। তিনি অবাক হয়ে দেখেছেন।

"চৌঠা মে শুক্রবার ১৯৬২, ভারতের ক্রিকেটদল বোম্বাইয়ের সান্তাক্রুজ বিমান ঘাটিতে খালি হাতে পৌঁছবে এটা ভাবতেই কেন যেন অদ্ভুত লাগছে। তারা টেষ্ট পর্যায়ের খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের হাতে নাস্তানাবুদ হয়েছে, ৪-০ খেলায় হেরেছে সব কিছু শোচনীয় ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু তবুও আমার মন ঐ সব মেনে নিতে পারে নি। আমি এখনও মনে করি, এই বিপর্যস্ত অপদস্থ ভারতের ক্রিকেট দল, যুদ্ধের পরে ভারতের উপকূল থেকে যত দল গিয়েছে, তার মধ্যে সব থেকে শক্তিশালী। অথচ এই দলের ভ্রমণ কেন এত দুর্ভাগ্যের হল, আমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও বলতে বাধ্য, অদ্ভুত।"

উপরের দুই ক্রিকেট লেখকের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এইখানে লেখা শেষ করতে পারি, করলে কেউ দোষ দিতে পারবে না, কারণ আমার বিপদ এবং বিপদ-ভঞ্জনের কিছু বিবরণ দেওয়াই বর্তমান রচনার উদ্দেশ্য, তবু ভারতীয় দলের প্রতি ওঁদের অমন নাছোড় ভালবাসার কারণ কি তা সংক্ষেপে বলা যায়। আমি বেছে নিচ্ছি একটা ছুটো তথ্য। বোলিংয়ের কথাই ধরা যাক, ভারতীয় দলে কোনো ফাষ্ট বোলার ছিল না, স্বার্থত

স্পিনারহিকেবেলম্ দল, অপর দিকে বিপক্ষে রয়েছে বেশ কয়েকটি প্রথম শ্রেণীর বীরত্ব—এমন অবস্থাতেও ছুরাণী বোরদে—নাদকার্ণি—উমরিগর—রঞ্জনে—সিনের পর দিন ওয়েষ্ট ইণ্ডিজকে বেঁধে রেখেছিলেন,—রাণ বন্যাটা যে সাধনার ধন তা হাতে হাতে প্রমাণ করিয়ে দিয়েছিলেন। কানহাইসোবার্স—ওরেল—হাণ্ট রাণের ঘর প্রায়ই অভ্যাস মত, তুলতে পারে নি—বহু ক্ষেত্রে নিবাত নিষ্কম্প, কিংবা মুহ্যমান।

অপরদিকে ভারতীয় ব্যাটিং সত্যই (ভাবলেও আনন্দে শরীর শিউরে ওঠে) 'মরিতে তো হইবে, আইস মারিয়া মরিব' কথাটি প্রমাণ করেছে বারবার। বহু সময় বিজয়ী নায় নায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের চেয়ে রাণ তুলেছে দ্রুততালে।

যেমন প্রথম টেস্টে ছুরাণী—হুতির (হুতিয়) রাণ। দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে নাদকার্ণি ইঞ্জিনীয়ার ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে অষ্টম উইকেটে রাণের রেকর্ড করলেন, তার মধ্যে তাঁরা ৫০ রাণ করেছিলেন ৩৫ মিনিটে। তৃতীয় টেস্টে প্রথম ইনিংসে প্রথম ৫০ রাণ হল ৪৫ মিনিটে। চতুর্থ টেস্টের প্রথম ইনিংসে ভারত লাঞ্চের আগে ৪টি উইকেট খোওয়ালেও ১২০ মিনিটে রাণ করেছিল ১১৮। পাতৌদি-উমরিগর ৬৬ মিনিটে ৬৩ রাণ করেছিলেন। ঐ টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে ছুরাণী-বেদরা ১৩৬ মিনিটে ১৪৪ রাণ করলেন। ঐ ইনিংসেই উমরিগর নাদকর্ণির জুটিতে ৯০ রাণ হল ৮৭ মিনিটে এবং দলের ৪০০ রাণ হয়েছিল ৪১০ মিনিটে।

ইতিহাসটি এই ধরণের নানা সময়ে। যে ভারতের অভ্যাস ছিল মাত্তারি বলে ৩০০ মিনিটে ১৫০ রাণ করা, সেই ভারতই পৃথিবীর ভয়ঙ্করতম বোলিংয়ের বিরুদ্ধে ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড় দিয়ে চলেছে, অর্থাৎ কালের সঙ্গে দৌড়বার মত প্রগতিশীল হয়েছে! বাহবা!

কথা বাড়াবার দরকার কি, সকলেরই জানা আছে ওরেল বলেছিলেন, অষ্ট্রেলিয়ানদের বিরুদ্ধে রাণ করার চেয়ে ভারতীয় বোলিংয়ের বিরুদ্ধে রাণ করা শক্ত; তিনি আরও বলেছিলেন, এমন ক্রিকেট কদাচিৎ দেখা যায়—সে সব কথাই মনে পড়বে, এবং মনে পড়বে শ্রেষ্ঠ চৌকস খেলোয়াড় ছুরাণীকে, আর ভারতীয় দলের প্রধান পুরুষ উমরিগরকে।

১৯৬২ সালের ১৮ই এপ্রিল জামাইকার সাবিনা পার্কে বিকালের দিকে দশম উইকেট জুটিতে উমরিগর খেলছিলেন রঞ্জনের সঙ্গে। সেটি পঞ্চম টেস্টের পঞ্চম দিন। দলের গতি এবং সোবার্সের দুর্গতির হাত থেকে রঞ্জনকে বাঁচাবার চেষ্টা করার সময়ে উমরিগর দলের বলে বোল্ড হয়ে গেলেন, তাঁর ব্যক্তিগত রাণ তখন ৬০, দলের রাণ ২৩৮, ভারত হেরে গেল ২৩ রাণে, উমরিগর মুষ্টিমেয় দর্শকদের করতালির মধ্যে প্যাভিলিয়নে ফিরলেন,—তখন উমরিগর কি ভেবেছিলেন, কিংবা অন্য কেউ কি ভাবতে পেরেছিল যে, এই ৮০তম টেস্টে তাঁর এই ৬০ রাণই শেষ টেস্ট রাণ? উমরিগর যদি সত্যই টেস্ট থেকে বিদায় নিয়ে থাকেন, তাহলে জামাইকার সাবিনাপার্ক তাঁকে শেষ সম্ভাষণ জানিয়েছে।

এবং যদি সত্যই উমরিগর টেস্ট থেকে অবসর নেন, আর কোন্ উচ্চতর অন্তশিখরে তিনি উঠতে পারবেন, যা পেয়েছেন ঐ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ সিরিজে। টেস্টে ও প্রথম শ্রেণীর খেলায় তাঁরই সর্বোচ্চ ব্যাটিং-বোলিং অ্যাভারেজ এবং তিনি ঐ সিরিজে এমন একটি খেলা খেলেছিলেন যার জন্য কেবল তিনি গৌরবান্বিত নন, ক্রিকেট ও সমৃদ্ধ।

চতুর্থ টেস্টে দ্বিতীয় ইনিংসে ১৭২ করে উমরিগর নট আউট ছিলেন।

তাঁর পাশ থেকে সঙ্গীরা একে একে সরে গিয়েছিল, বাল্পারের পর বাল্পার পড়েছিল তাঁকে লক্ষ্য করে, বিক্ষত দুর্গপ্রাকারের দিকে এক চোখ রেখে তাঁকে অসীম বিক্রমে

উন্নত দ্রুত বেগে চালিয়ে যেতে হয়েছিল অর্ণব, শেষকালে আর পেরে উঠছিলেন না—ব্যাটের উপর ভর করে বিশ্রাম করতে হয়েছিল এবং তার পরেই অশ্বশ্বাসে বুক ভরে বিপুল নিশ্বাসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন আবার সংগ্রামে—এই ইতিহাস আমার মনে একটি ছবি এনে দিয়েছিল, যেকথা লিখেছিলাম পূর্বে—

"উনরিগরের লড়াইয়ের চেহারা আমার মনে এনেছে ঝড়ের সমুদ্রের একটি ছবি। সর্বনাশের রাত্রে যখন গেল সাইক্লোন সমুদ্রের উপরে, সৈন্য তরঙ্গের সঙ্গে সংগ্রামে বিধ্বস্ত জাহাজ গেল ডুবে-তারপরে ঝড় থামল—প্রভাত হল এক মুহূর্তে—দেখা গেল ডুবে-যাওয়া জাহাজের মাস্তুলটা তখনো জেগে আছে এবং তাতে উড়ছে ছিন্ন পতাকা নতুন সূর্যের আলোয়।

উনরিগরের হাতে ধরা সেই পতাকা।

এই ভারতীয় দল কি সর্বশ্রেষ্ঠ?

উপচীয়মান উপহার

ভাবি খুশী ওর নিজের নামে ব্যাঙ্কের পাশ বই পেয়ে;
গর্বিত ও! যত ওর বয়স বাড়বে উপহারটিও
বাড়তে থাকবে আর কাজে আসবে সময়মতো।

অপ্রাপ্তবয়স্কের নামেও অ্যাকাউন্ট খোলা হয়।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

হেড অফিস : ৪, ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

সেবার প্রতীক

ব্যাঙ্ক-সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ হয়

দি ব্যে ন্দু পা লি ত

অন্যদিনের সঙ্গে আজকের এই দিনটির কোনো তফাৎ ছিল না। ঘড়িটায় অ্যালার্ম দেওয়া ছিল : ঠিক পাঁচটা থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের সময় হঠাৎ ক্রিং ক্রিং—তীক্ষ্ণ, দীর্ঘ, কর্কশ শব্দ উঠল। আর প্রায় প্রতিদিনই যা ঘটে, সারা রাতের নিরবচ্ছিন্ন অবাধ ছুটোছুটির পর এই ঘরের ইঁদুর আর আরশুলাগুলি রাত শেষ হয়েছে জেনে নতুন ক'রে ব্যস্ত হ'লো ; জলের কুঁজোর পাশে, খবর-কাগজের এলোমেলো স্তূপের উপর আর টেবিলের বইয়ে, দরজার আশেপাশে—নানারকম শব্দ ক'রে তারা সরে পড়ল। অর্থাৎ, বিমলের ঘুম ভাঙলো।

এই ঘুম-ভাঙাটা কিছু নতুন নয়। প্রতিদিন, প্রতি সপ্তাহে, প্রতি মাসে, এবং স্মৃতি যতোটা সময় ধ'রে রাখতে পারে ; এই চাওয়া, ঈষদুষ্ণ, উষ্ণ ঘরে বিমলের ঘুম ভাঙছে। বিমল জেগে উঠেছে ; অস্বস্তি হ'লে গায়ের হাত বুলিয়ে ঘাম ছুঁয়েছে ; তারপর দু'এক মিনিট নিঃশব্দে বাড়িয়ে সিগারেটের প্যাকেটটার জন্যে হাত বাড়িয়েছে। এই সবগুলোই বিমলের সকাল বেলা। ইচ্ছে হ'লে এবার ও জানালাটা (অবশ্য বন্ধ থাকলে) খুলতে পারে।...

ঘড়ির চীৎকারটা থেমে যাবার আগে আজও বিমলের ঘুম ভেঙেছিল। এবং ঘরে যে-টুকু আলো ছিল, সেই স্বল্প, ম্লান, অস্পষ্ট আলোয় চোখ খুলে, ঘাড় উঁচু ক'রে মুখটা ঈষৎ তুলে টেবিলের উপরে হঠাৎ ভয়-পাওয়া রাতের শেষ ইঁদুরটির ভেবেপড়া চোখের দিকে তাকিয়ে মনে-মনে হেসেছে বিমল। ইঁদুরটা পালালো। বিমল একটা হাই তুলল। বালি হাওয়ায় মুখের ভিতরকার একটা শুকনো গন্ধ মুহূর্তের জন্যে নাকে এসে লাগল। আজ কি বার? মনে করতে চাইল বিমল ; কি বার, কতো তারিখ এবং বাইরে রোদ্দুর উঠেছে কিনা? — একসঙ্গে সবকিছুই মনে পড়ল। গায়ের চাদরটা পায়ের দিকে ঠেলে সরিয়ে দিল বিমল ; হাত দুটো দু'পাশে ঝাঁকুনি দিল ; উঠে পড়ল।

এমন কি, ওদিকে খোলা জানালাটার কাছে গিয়ে, ঠোঁটের ভাঁজে সিগারেট চাপতে চাপতে, এ-কথাও ওর মনে পড়ল যে এটা ফাল্গুন মাস। হাওয়া দিচ্ছিল ; নইলে টেবিলের কোণে ঝুলে-পড়া পুরনো খবরের পাতাটা অমন কাঁপত না। জানালার বাইরে তাকালে খুব কম আকাশ চোখে পড়ে, খুব কম আলো সামনের হলদে দেয়ালটাকে সাদা ক'রে রাখে। দেয়ালের ওপাশে যে-বাড়িটা এখনো উঠছে, একতলা, দোতলা, ছাড়িয়ে তিনতলার দিকে, তার বাঁশের ভার-খাটানো ছাদের

কার্নিশে এ-বাড়ির সাদা বিড়ালটিকে সন্তর্পণে হেঁটে যেতে দেখল বিমল। আট ঘুষবার এখন ছ'টা; বাক্সে ঘড়া থেকে দেশলাইয়ের কাঠিতে 'ফস্' ক'রে শব্দ হ'লো। সিগারেট পুড়লো; নিঃশ্বাসের হাওয়ায় কাঠিটা দপ্ ক'রে নিভে যাবে —এ সবই যেন জানা ছিল বিমলের। দিনের পর দিন সব কিছু দেখে, শুনে, ও ভেবে, এখন আর ভেবে ভেবে মনে করতে হয় না। ···তাই, আজকের সকালটার সঙ্গে অন্য দিনের কোনো তফাৎ ছিল না।

সিগারেটের ধোঁয়ায় যখন মুখ ভ'রে উঠছিল, বিমল হঠাৎ অনুভব করল, না, একসঙ্গে এতখানি ধোঁয়া গিলে ফেলা উচিৎ হবে না। ধোঁয়াটা আটকে গেল—এই সকালবেলায় —বিমল খুক্ খুক্ ক'রে কাশল দু'বার। তাতেও কিছু হ'লো না; হঠাৎ যেন দমবন্ধ হ'য়ে আসছে; বুকের ভিতর ধোঁয়া এবং নিঃশ্বাস একসঙ্গে বেলুনের মতন ফুলে উঠেছে, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে বেশ। বিমল ঠোঁট খুলে, ছোট হাঁ ক'রে নিঃশ্বাস নিল; কষ্ট হচ্ছিল—এবার তলপেটে, তারপর মাথায়। তাড়াতাড়ি কি ভেবে জানালা দিয়ে সিগারেটটা ছুঁড়ে দিল বিমল। হাত দুটো পিছনে ছড়িয়ে, হাতের চেটোয় শরীরের ভর দিয়ে, বুক টান ক'রে বসল; দ্রুত নিঃশ্বাস ফেলার চেষ্টা করল; এবং হঠাৎ···হঠাৎ মনে পড়ল, গত রাতে বিছানায় শোবার ঠিক আগের মুহূর্তে, কিংবা, তারও আগে, সন্ধ্যাবেলায় চাঁদে উঠতে গিয়ে; না, না, তারও আগে—দুপুরে, খুব তেষ্টায় পুরো এক গ্লাস জল খেতে গিয়ে এই-রকম দম বন্ধ হ'য়ে যাবে মনে হয়েছিল। তাহ'লে কি ··। ভাবতে গিয়ে ভয়ে, আতঙ্কে নিঃশ্বাস সহজ হ'য়ে এলো বিমলের, ঘামতে লাগল।

বাইরে শব্দ বাড়ছে। সংসারের নানারকম শব্দ, রেডিও'র গানের শব্দ; বিমল শব্দগুলোকে এক এক ক'রে চিনল। জানালার দিকে তাকিয়ে বুঝল, রোদ উঠে উঠেছে। ঘড়িতে সাতটা। না উঠে, হাত বাড়িয়ে তোয়ালেটা টেনে নিল, মুখ মুছে উঠে দাঁড়ালো। কিন্তু, পারল না। মাথাটা কেমন কেমন করছে, চোখের তারাদুটো কন্ কন্ ক'রে উঠল।

বিমল পড়ে যাচ্ছিল, সামলে নিল। কি ভেবে নিজেকে শক্ত করতে লাগল। যা ভেবে ভয় পেয়েছিল, তা আর ভাবতে চাইল না। কিন্তু, না চাইলে হবে কি, বার বার ঘুরে-ফিরে সেই কথাই ভাবছে। দাঁড়াতে গিয়ে ভাবল, হাঁটতে গিয়ে; বাথরুমে গিয়ে; আবার বাথরুম থেকে ফিরে আসার সময়। একবার মনে হ'লো, একটা সিগারেট ধরালে হয়তো এই চিন্তাটা থাকবে না; কিন্তু সিগারেট ধরানোর কথা মনে হতেই বুকের ভিতর, রক্তে, সর্বত্র ধক্ ক'রে একটা শব্দ হ'লো। স্পষ্ট বুঝতে পারল বিমল, হৃৎপিণ্ডে ধড়াস্ ধড়াস্ ক'রে একটা মাংসের পিণ্ড যেন উঠছে, নামছে, লাফাচ্ছে।

বিমল সিগারেট ধরালো না। 'হোয়াট্ এ ফুল আই অ্যাম!' ইংরাজীতে ভাবল; ঠোঁটের রেখা যতোদূর সম্ভব গুটিয়ে হাসল; তারপর ডান হাতের কব্জি আঙুল কামড়ে নিজেকে বিশ্বাস করতে চাইল। কিন্তু, ভয়টা যাচ্ছে না, জলে জল আসার মতো – কখনো শুন্য থাকছে না। কি করবে, কি করা উচিত কি করলে এই অস্বস্তিকর যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পাবে, বিমল কোনো হদিশ খুঁজে পেল না। শুধু মনে হ'লো, বার বার মনে হ'চ্ছিল, আজ, এই মুহূর্তে, কিছু জানবার আগেই তার মৃত্যু হবে।

ম'রে যাবে; এই সহজ কথাটা ভাবতে গিয়ে বিমল মাথার লম্বা চুলগুলো সরু সরু আঙুলে টেনে ধরল। কম্বুরে মুখ গুঁজে বিড়বিড় ক'রে বলল, না, না, না।

দরজায় পিঠ রেখে ভয়, ক্লান্ত বিমল তারপর নিজেকে শান্ত করতে চাইছে। 'আমি মরতে চাইনা · না, চাই না,' উচ্চারণ করতে গিয়ে বিমলের খেয়াল হ'লো, তার গলায় স্বর নেই! শুকনো ঠোঁটের উপর জিব বুলিয়ে, চোখ দুটো

উপরে কড়িকাঠের দিকে তুলে খানিকটা সাহস আনল ও। তারপর গালে হাত দিয়ে বুঝতে পারল, এই মুহূর্তে দাড়ি কামানো দরকার : গালে দাড়ি জন্মেছে অনেক, না কামালে বাইরে বেরুনো যাবে না। কথাটা ভেবে খানিকটা স্বস্তি পেল বিমল, নিঃশ্বাস অনেকটা সহজ হ'য়ে এলো।...

এখন, সকাল আটটা নাগাদ বিমল দাড়ি কামাতে বসেছে। বিমলের সামনে সেই গোল আয়নাটা ; বিমল শূন্য, ভয় আর নির্ভয় মেশানো এক তৃতীয় চোখে নিজেকে দেখছে। দেখে মনে হ'চ্ছিল, তার ভয় মিথ্যে। আঠাশ বছ'রের এই শরীর আর মন নিয়ে শুধু শুধু ভয় পাওয়ার কোনো কারণ ছিল না। কিংবা, এই ভয়টা তার মনেই ছিল, গুঁয়োপোকার মতো, থেমে থেমে হাঁটছিল। অন্তত, তার শরীরে ভয়ের কোনো ছায়া পড়েনি। বিমল মিচ্কি হাসতে লাগল, দাঁত বের ক'রে, নিজেকে ভেংচে— আয়নায় নিজের দিকে তাকিয়ে। জলের বাটিতে ব্রাস ডুবিয়ে, গালে সাবান ঘ'ষে ফেনা করল ; তারপর ক্ষুর টেনে নিল। বিমল জানত, ক্ষুরটা নতুন, ভীষণ ধারালো। তবু, কি ভেবে লম্বা চামড়ায় দু'বার ঘ'ষে নিল ; আঙুল দিয়ে স্পর্শ ক'রে দেখল। আর, তখন, পর মুহূর্তে, হঠাৎ কোথা থেকে কি হ'য়ে গেল, বিমল দেখল, তার গাল ফুটে রক্ত বেরুচ্ছে : সাদা ফেনার উপর লাল রক্ত ছড়িয়ে পড়ছে ক্রমশ। রক্ত দেখে বিমলের মনে হ'লো, আর কিছুক্ষণ—দু' ঘণ্টা, তিন, চার, পাঁচ ঘণ্টা বড় জোর আজকের দিনটা—বৃহ্ন তার পিছন পিছন ঘুরছে : নিঃশ্বাস বন্ধ হ'য়ে আসছে ; অসম্ভব, সে বাঁচবে না, বাঁচতে পারবে না।

প্রায় ছুটে গিয়ে বাথরুমে ঢুকলো বিমল। দাড়ি কামাতে পারল না। দাড়ি চুলোয় যাক ; মুখটা কোনো রকমে ধুয়ে ফেলা দরকার। গালে একটা ব্রণ ছিল, সেইটাই কেটেছে। জ্বালা করছিল, সেই সঙ্গে অল্প ব্যথা। নেয়ালে একটা টিকটিকি ডাকতে ডাকতে নেমে এলো, মাছিটা উড়ছে, ধরবে। কিন্তু পারল না। ঝপ্ ক'রে শব্দ, টিকটিকিটা মাটিতে পড়েছে। বিমল সরতে গেল, সামনে পিছল, বাঁ পা'টা পড়িয়ে গেল অনেকখানি। চৌবাচ্চার কোণ ধ'রে সাম্লাতে গেল, কষ্ট হচ্ছে, কেমন একটা ঝিম-ভাব পলায়, মাথা ঘুরতে লাগল। সেই ভাবেই কিছুক্ষণ প'ড়ে থাকল বিমল, হামাগুড়ি দিয়ে এগুলো। দরজার কাছ পর্যন্ত গেলেই সে উঠতে পারবে।...

কোনোরকমে স্নানটা সেরেছিল। খেতে ব'সে বার বার বিমলের সন্দেহ হ'চ্ছিল, এই খাবারটা সেই খাবার নয়, যে-খাবার সে প্রতিদিন খেয়েছে। না, নয়। ভাতগুলোর রঙ কেমন আলাদা : মাছের টুকরোর উপর ছড়ানো মশলাটা যেন বড় বেশি পুরু। বিমল ভাবছিল, না, সে বাঁচবে, বাঁচার অধিকার তার আছে। হাত গুটিয়ে ভাবতে ভাবতে —ইতিমধ্যে অনেকটা সময় কেটেছে, বিমলের মনে হ'লো, তাকে বিষ দিচ্ছে না তো! বিষ! কাল রাতে লোকটাকে গাল-মন্দ করেছিল। বিষ! আবার সেই শব্দটা শুরু হ'লো বুকের মধ্যে, গলা শুকিয়ে গেল। জলের গ্লাসটা পাশেই ছিল, হাতে তুলে ঠোঁটে ছোঁয়াতে গিয়েই বিমলের মনে হ'লো, গ্লাসের তলায় কিছু সাদা গুঁড়ো ভাসছে। বিষ!

গ্লাসটা হাত থেকে প'ড়ে ভাঙল। কাচের টুকরোগুলো জলে ভিজে বিমলের মুখের দিকে তাকিয়েছিল। তলপেটে আবার সেই যন্ত্রণাটা অনুভব করল বিমল ; পেটে হাত চেপে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। আর, সমস্ত ঘটনাটাই ঘটল এমন আকস্মিক ভাবে যে, কেউ কিছুই বুঝল না, বলবার সুযোগ পেল না।

বিমল হাঁটছে। এবং যেখান দিয়ে হাঁটছে, সেটা কখনো রাস্তা, কখনো বা ফুটপাত। কখনো এমন হচ্ছে যে এক পা এগোয়, দু'পা পিছিয়ে আসে। আর, হাত-পাগুলো দেখে মনে হ'চ্ছিল যেন এতোক্ষণ কোনো মর্গের অন্ধকারে ওগুলো বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল, চামড়ার রঙটা

দিয়ে আলগাভাবে সেলাই ক'রে একটা গোটা মানুষকে রাস্তায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বিমল হাঁটছিল, থেমে থেমে, ভয়ে ভয়ে। এখনও হ'তে পারে, বিমল জানে না সে থেমে থেমে হাঁটছে এবং ভয়ে ভয়ে। সামনের লাইটপোস্ট ছাড়িয়ে একটা লোক দ্রুত হেঁটে আসছিল এদিকে; কি ভেবে বিমল দেয়াল ঘেঁসে থমকে দাঁড়ালো।

সাড়ে ন'টা বেজেছে অনেকক্ষণ। অন্যদিন এমন সময় বিমল অফিসের লিফ্‌টে ওঠবার জন্য 'কিউয়ের' পিছনে দাঁড়িয়ে মানুষ গুণছে। কিন্তু, আজ বোধহয় ও ভুলে গিয়েছিল যে সময় যাচ্ছে, সময় নেই।

ট্রাউজারের পকেটে হাত ঢুকিয়ে সিগারেটের প্যাকেটটা মুঠোয় ধরতে চাইল বিমল। কিন্তু, প্যাকেটটা সেখানে নেই। তাহ'লে···? বিমলের ইচ্ছে করছিল, রাগে এবং দুঃখে, মাথার চুলগুলো ছিঁড়ে ফেলে। আর, সেই মুহূর্তে, গালের ক্ষতটার যেন আবার মুখ ছিঁড়ে গেল। অসহ্য যন্ত্রণায় কি করবে ভাবতে ভাবতে ওর হঠাৎ মনে হ'লো, মনে পড়ল বলা যায়, ব্রণ সেপ্‌টিক্ হ'য়ে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অশোক চক্রবর্তী মরে গিয়েছিল। অথচ অশোকের স্বাস্থ্য ভালো ছিল এবং পৃথিবীতে বেঁচে থাকার যথেষ্ট অধিকার ছিল; একসঙ্গে চারটে ডিম অনায়াসে হজম করতে পারত। কথাগুলো ভাবতেই বিমলের মনে হ'লো, সে নেই। মস্তকের নিচ থেকে তলপেটে, তলপেট থেকে বুকের দিকে একটা শক্ত আঠালো ভারি নিঃশ্বাস গলা পর্যন্ত এসে আটকে গেল। এবং এমন হ'লো, যেন সেইভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে বিমল এই মুহূর্তে মরে যাবে।

বিমল দৌড়তে চেয়েছিল, পারল না। দেয়ালে হাত ছুঁয়ে ছুঁয়ে খুব আস্তে, ক্রমশ জোরে হাঁটতে লাগল। মৃত্যুর আগে কি মনে হয়, কি কি কথা মনে আসে! হয়তো এইরকমই হয়, এই সবই মনে আসে।

হাঁটু দুটোর কোনো জোর ছিল না। ভেঙে পড়তে চাইছে। মাথার ভিতরটা ঝিমঝিম করছিল। বিমল খুব চীৎকার ক'রে কাউকে ডাকতে চাইল; কিন্তু, কারুর নামই মনে পড়ল না। পিছনে গতিকার ছায়া। দু'চারজন লোক তখন তার দিকে তাকিয়েছে, ভুরু কুঁচকে লক্ষ্য করছে।

সামনেই একটা ওষুধের দোকান। বিমল ঢুকে পড়ল। দাঁড়াবার শক্তি ছিল না; হাঁটুদুটো কাঁপছিল ভীষণ জোরে। বিমল, কোনো কথা না ব'লে, হাঁপাতে হাঁপাতে বেঞ্চের উপর ব'সে পড়ল।

কাউন্টারে এক ভদ্রলোক ব'সে কি লিখছিলেন, তিনি তাকালেন। ওপাশে দু'জন কথা বলছিল আলমারির পিছনে। তাদের মুখ দুটো কি ঠোঁট-নড়া দেখা যাচ্ছে। বিমলকে দেখে একমুহূর্ত চুপ করল। তারপর হঠাৎ হাসতে লাগল।

ওরা হাসছে। ওরা বুঝতে পেরেছে, আমি, বিমল, আর বেশিক্ষণ নেই; কিছুক্ষণের মধ্যেই মরে যাবো। না···। বিমলের গলা দিয়ে একটা দীর্ঘ, কাতর, অসহায় নিঃশব্দ বেরিয়ে এলো। দেয়ালে মাথা দিয়ে কাটা মুরগীর মতো মাথা নাড়তে লাগল বিমল।

কাউন্টারের ভদ্রলোক চোখ তুললেন।

'কি হয়েছে?'

বিমল গোঙাতে লাগল।

'না···না···'

ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন কাছে; ঝুঁকে দাঁড়ালেন।

'কি হয়েছে, বলুন? কোনো কষ্ট···?

বিমল হাঁ করল। ঠোঁটের কোণ কুঁচকে, মাথাটা ঘাড়ের উপর ঝুলে পড়ল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'জ···ল···'

'জল নিয়ে এসো; পাখাটা জোর ক'রে দাও।'

ভদ্রলোক ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

বিমল মরে যাচ্ছিল। এরই নাম মৃত্যু; বিমল বুঝছে। পেটে, বুকে, মাথার মধ্যে ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। অথচ কি

S. K. G. SUGAR LTD.

11, CLIVE ROW,

CALCUTTA-1.

Factories at :

S. K. G. Sugar Ltd.

HATHUA

DISTRICT SARAN.

S. K. G. Sugar Ltd.

LAURIYA

DISTRICT CHAMPARAN

Manufacturers of best quality sugar.

কষ্ট, কেমন, কোথা থেকে আসছে, ও বুঝছে না! মাথায়, কপালে হাত লাগতেই ও বুঝল, ওরা তার মাথায় এবং কপালে জল দিচ্ছে, বাঁচাবার চেষ্টা করছে।

'কি হয়েছে, বলুন? মাথার যন্ত্রণা···বুকে···'

বিমল শুনল। কিন্তু, ও নিজেই যদি বুঝত—মাথায় না বুকে—তাহলে অন্তত একবার বাঁচবার চেষ্টা করত। শুধু বলল, 'না···'

বলল আর মাথা নাড়ল; তাতে কিছুই পরিষ্কার হ'লো না। ভদ্রলোক খুব বেশি আশ্চর্য হয়ে, কি একটা ওষুধের নাম করলেন, যে-নামটা বিমল অনেকবারই শুনেছে।···বিষ!

বিমল সেই মুহূর্তে বুঝল যে ওষুধটা বিষ। ভাবল, সে বাঁচতে চেয়েছিল, বাঁচতে এসেছিল। যেন সমস্ত শরীরে একটা প্রচণ্ড বিদ্যুৎ ব'য়ে গেল। বিমল উঠলো চেষ্টা করে। বেশ হাঁটতে পারছে; তবুও ব্যথাটা মনে হচ্ছিল অনেক কম। আর দাঁড়াল না। শরীরের সব শক্তি জড়ো ক'রে বিমল ছুটতে লাগল।

তারপর ট্রামে যেতে-যেতে বিমলের মনে পড়ল, আজ সে 'চান' করতে ভুলে গেছে। জানালা দিয়ে হাওয়া আসছিল, বেশ ভালো লাগছে। এতোক্ষণে বিমল ভালো ক'রে দেখল নিজেকে। এ ট্রাউজারটা আজ না পরলেই হতো, ভাবল মনে মনে। আর সেই মুহূর্তে চোখে পড়ল সে যথেষ্ট ভব্য নেই। দেরি না ক'রে, দ্রুত হাতে বোতামগুলো এঁটে ফেলল বিমল! তারপর জানালার বাইরে মুখ বাড়িয়ে দেখল, কলকাতা ছুটছে।

বিমল ভিতরে তাকালো। এ ওর গায়ে মিশে মনে হচ্ছে সবগুলো একই শরীরের অসংখ্য মুখ, হাত, পা! টুকরো টুকরো কথা আসছে:

'যতোদিন আছি, ততোদিনই চেষ্টা করা ভালো।

'হাঁ, নিশ্চয়। কিন্তু···'

'কিন্তু চিন্তার প্রশ্ন নয় ভাই। যা যাবার···'

ওরা কি বলছে, বিমল খানিক কান পেতে শুনল, অর্থ করতে চাইল। কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না; কিছুই বুঝতে পারছে না। এমনও হতে পারে, ওরা আমাকে নিয়েই! ভয়ে ভয়ে বিমল পাশের লোকটির দিকে তাকালো। লোকটি হাসছিল। হাসিটার একটা অর্থ আছে; কিন্তু, কি অর্থ···কি অর্থ···; ভাবতে ভাবতে বিমল লক্ষ্য করল, ভদ্রলোক তার হাতের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তা'হলে কি···।

বিমল হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। না, আর কোনো সন্দেহ নেই; বিমল মরছে। এতোক্ষণ যে চিন্তাটা মাথার ভিতর ছোট ছোট নুড়ি পাথরের মতো ভারসাম্য হারিয়ে ছুটোছুটি করছিল, এবার তা ঘন ও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। বিমল বুঝতে পারল, সেই সময়টা কাছে এসে গেছে···। কিন্তু, কোনো উপায়ই কি নেই?

বিমল দ্রুত পাশ কাটিয়ে ভিড় ঠেলে বাইবার চেষ্টা করতে লাগল। সে ব্যবহার করছে খুব অস্ত্রের মতো। এক ভদ্রলোক বিমলের হাতটা চেপে ধরলেন।

বিমল খুব ভয় পেয়েছিল। কি বলবে ভেবে পাচ্ছিল না।

ক' মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে হাতটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল। যদিও ছাড়িয়ে নেবার দরকার ছিল না। হাতটা অন্য কারুর কাটা হাতের মতো খসে পড়ল। ভদ্রলোক হাসছিলেন।

বিমল নেমে পড়ল; ভিড় ঠেলে, কোনোরকমে। পিছন থেকে কে তাকে টানছে। যে টানছে, তার হাত অন্যরকম। বিমলের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো। ট্রামটা চ'লে যাচ্ছে। ঘন বন্ধ হয়ে আসছে। হৃৎপিণ্ডে ভীষণ দ্রুত, ধড়ফড় শব্দ হচ্ছে, মাথা ঘুরছে, পা টলছে। ঘাড়টা পিছন দিকে ঠেলে বিমল হাঁ করল, নিঃশ্বাস নিল। তারপর বুক চেপে, কোমর ভেঙে, নিঃশ্বাসের কষ্ট ভাঁজতে ভাঁজতে ট্রাম লাইনের উপর ব'সে পড়ল।

কিন্তু, ট্রাম আসছিল। বিমল বেশিক্ষণ বসতে পারল না। রাস্তার যাত্র, দুইই জনতা খুব অবহেলায় ভুরু কুঁচকে তাকে দেখছিল। আস্তে আস্তে মৃত্যুকে অনুভব করতে করতে বিমল ট্রাম লাইনের পাশে, ঘাসের উপর গিয়ে বসল।····

এখন রাত। বিমল নিজের ঘরে ফিরে এসেছে। সকালের ঘর বিকেলে কেমন ছিল, অন্যদিন কেমন থাকে, মনে করতে পারল না। রাতের ঘরেও দিনকে হারিয়ে—নিজের দিন, অন্যের দিন, অনেক দিন—সকাল, সন্ধ্যা, রাত্রি সর্বস্ব হারিয়ে ভগ্ন, ক্লান্ত, বিষণ্ণ মনে ও শূন্যকে ধরবার চেষ্টা করছিল। বিমলের হাত দুটো পিছন দিকে ছড়ানো, মাথাটা হাঁটুর কাছে ঝুঁকে পড়েছে। বিমল কাঁদছিল মনে মনে। কিন্তু, সত্যি সত্যি কাঁদতে পারলে ও স্বস্তি পেত। ব'সে ব'সে নিজের সমস্ত দিনকে ভেঙে, ছড়িয়ে ও মৃত্যুর অপেক্ষা করতে লাগল।

জানালাটা খোলা ছিল। জানালার ওদিকে দেয়াল; দেয়ালের ওদিকে উঁচু বাড়ির ছাদের উপর দিয়ে সামান্য আলো এ-ঘরে ঢুকছিল। পর্দাটা কাঁপছে, বিমল না-তাকিয়ে তা অনুভব করে। পায়ের উপর দিয়ে একটা আরশোলা হেঁটে গেল; ইঁদুরেরা আজ একটু তাড়াতাড়িই চঞ্চল হয়েছে। কোথায় অন্ধকারে বিড়ালের মৃদু ডাক ভেসে এলো। বিমল কারুর কথা ভাবলো না।

আমি পাপ করেছি! বিমল মনে মনে বলছিল, পাপ করেছি, পাপ। কাল বিকেলে, অফিস ছুটির পর আমি যখন বেরুবার জন্যে তৈরী হয়েছি, লতিকা আমার কাছে এলো। লতিকা আমার পাপ নিয়ে বেঁচে থাকবে। কিন্তু, আমার কি দোষ? আমার কতটুকু ক্ষমতা! লতিকা নিজেকে বাঁচাতে পারেনি। আমি বাঁচতে চাই, আরো ক'দিন, অন্তত আরো একটা দিন।

বিমল বলছিল এবং মনে মনে তার আঠাশ বছরের জীবনের সমস্ত পাপ, অপাপকে স্পর্শ করতে চাইছিল। আর যত ভাবছিল, ততোই তার বুকের শব্দ দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়ে শ্বাসরুদ্ধ করবার জন্য ছুটে আসছিল।···

দু'হাতে মুখ ঢেকে হাঁটুতে মাথা গুঁজে হাউ-হাউ ক'রে কেঁদে ফেলল বিমল।

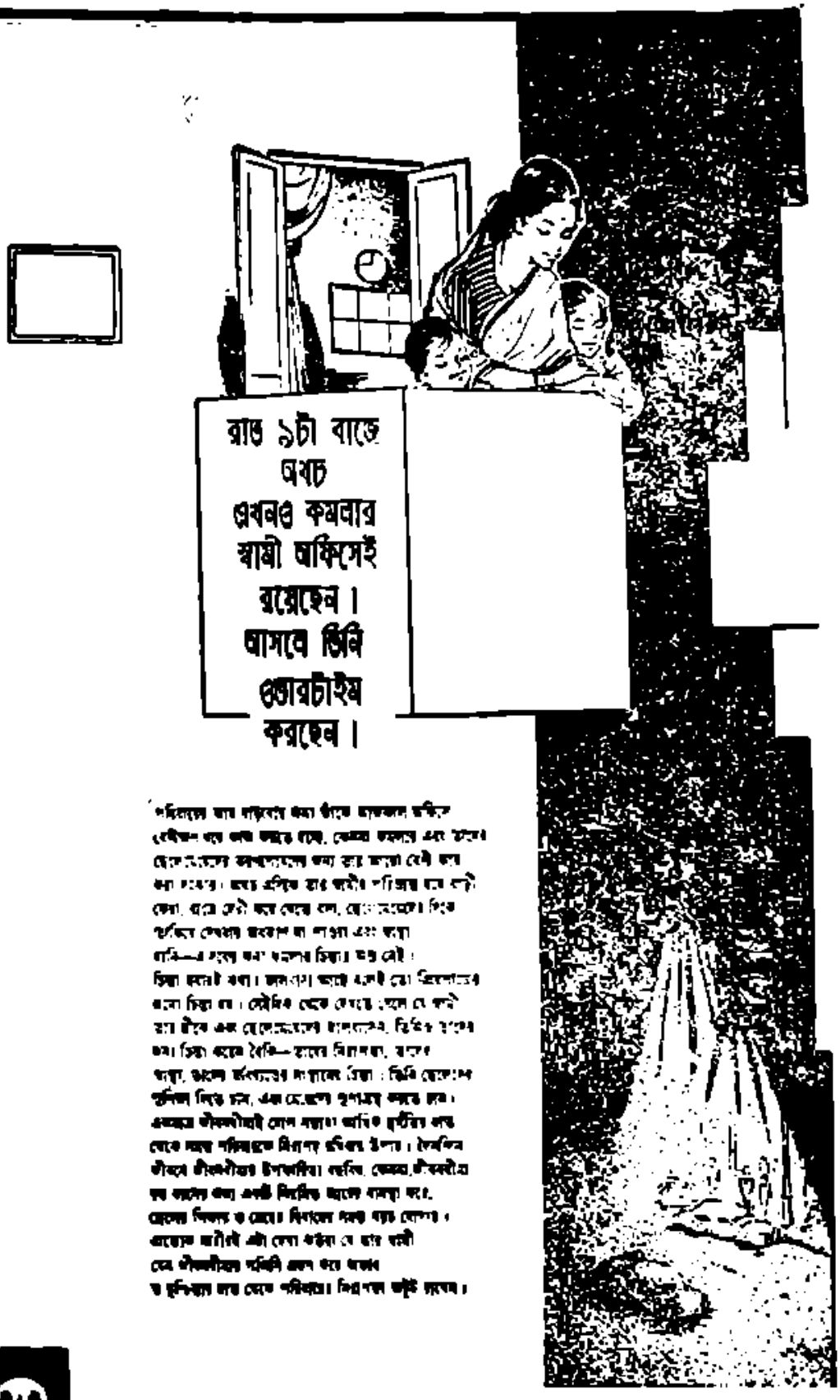

রাত ৯টা বাজে
অথচ
এখনও কমলার
স্বামী অফিসেই
রয়েছেন।
আসবে তিনি
ওভারটাইম
করছেন।

পরিবারের আর সাতজনের কথা ভেবে রাতদিন অফিসে বেরীজন করে কাজ করছে হবে, ফোনের ওপারের এই ভদ্রলোককে। ফোনে ভদ্রলোকের অসুখবিসুখের কথা তার জানা নেই বলে মনে হচ্ছে। অথচ এদিকে তার স্ত্রীর পরিবার যে কতটা বেশী, ঘরে কেউ অসুখে পড়লে কি, ফোনে ভদ্রলোক নিশ্চয় ওঁকিয়ে দেখবার অবকাশ না পাওয়া এবং ডাক্তার—এসব কথা বলবার চিন্তা। তত নেই। চিন্তা অবশ্যই করা। অন্যথায় আমরা একটি ফোন রিসিভারের কথা চিন্তা করি। সেদিক থেকে দেখতে গেলে যে কোন ব্যক্তি তাঁর এক টেলিফোনের ব্যবসায়ের, বিভিন্ন ধরনের কথা চিন্তা করেন বৈকি—তাদের নিরাপত্তা, তাদের স্বাস্থ্য, তাদের ভবিষ্যতের ব্যাপারে চিন্তা। তিনি ফোনের পুরিমাণ নিতে চান, এক টেলিফোন পুরোপুরি ব্যবহার করতে চান। এসবের জীবনবীমাই ফোন মালিক আর্থিক দুর্গতির হাত থেকে সমস্ত পরিবারকে নিরাপদ রাখবার উপায়। বৈকল্পিক জীবনে জীবনবীমার উপযোগিতা অনেক। ফোনের জীবনবীমা হল ফোনের কথা একটি নিশ্চিন্ত আলো বাড়ানো করে, ফোনের বিশ্বাস ও স্নেহে। বিশ্বাসের সমস্ত বড় ফোনের। আজকের আমাদের এই ফোন করুন যে তার স্ত্রী ফোন জীবনবীমার পলিসি গ্রহণ করে তাদের ও ভবিষ্যতের তার ফোন পরিবারের। নিরাপত্তা আছে ফোনের।

জীবন বীমার কোন বিকল্প নেই

বাঁচার মত বাঁচো

মীরা বালসুব্রমনিয়ন

আমার এ চিঠিখানা পেয়ে তুমি অবাক হয়ে যাবে মল্লি। আর শুধু অবাক নয়। যে তোমার জীবন থেকে চিরদিনের মতো সরে গিয়েছে ভেবে নিশ্চিন্ত ছিলে তার এই অনাহূত লিপি নিশ্চয়ই তোমার মনে দুশ্চিন্তার কালোমেঘ ঘনিয়ে তুলবে।

কিন্তু বিশ্বাস করো,—তোমাকে চিন্তিত করবার কোনই অভিপ্রায় নেই আমার। এ চিঠি যে আমি লিখছি তা শুধু নিজের তাগিদে। মনের মধ্যে অজস্র কথা কিলবিল করছে, মনে হচ্ছে ওদের মুক্তি দিতে না পারলে ওরা আমার কুরে কুরে খেয়ে শেষ করবে।

আর এও জানি যে এই চিঠি যে তোমার কাছে পৌঁছুবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। এখানে আমার একমাত্র বন্ধু চায় ল—ই শুধু জানে তোমার কথা। চিঠিখানা ওর কাছেই দিচ্ছি। ও কথা দিয়েছে এখানা তোমাকে পৌঁছে দেবে।

তুমি হয়তো ভাবছ আমি পাগল হয়ে গেছি—নয়তো একখানা চিঠি পাঠাবার জন্য বন্ধুর সাহায্যের কী দরকার?

পাগল আমি হইনি। তবে হয়তো হওয়া উচিত ছিল। তুমি কী ভাবতে পারো আমি এখন কোথায় আছি? আমি যেন—, না থাক, আমার অবস্থানটা একান্ত গোপনীয়। কাউকে জানাবোনা এই শপথ নিয়েছি। তবে এটুকু তোমায় বলতে বাধা নেই যে আমি এখন আছি একটি ছোট দ্বীপে। বুঝলে? ঘরে নাও কোন এক মহাসাগরের বুকে। আমরা ক'জন ছাড়া জনমানবের চিহ্ন নেই।

বুঝতে পারছি তোমার মনে অজস্র প্রশ্ন ভেসে উঠছে। 'আমরা' কারা? কী করে আমি গেলাম ও খানে? কেনই বা গেলাম? আর কীসেরই বা এই গোপনীয়তা।

তুমি তো জানো মল্লি আমার জীবনের সব কথা। মা বাবা কখন এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন জানতেও পারিনি। আত্মীয়দের গঞ্জনা আর কৃপা কুড়িয়ে বড়ো হয়েছি। কীভাবে খেটে পড়াশুনোর টাকা যোগাড় করেছি। ছেলেবেলায় সবার পায়ের তলায় ছিলাম বলেই হয়তো সবার ওপরে ওঠার একটা অদ্ভুত কামনা আমাকে পেয়ে বসেছিল। তুমি হয়তো বলবে এটা আমার উচ্চাশা। কিন্তু সব কিছু থেকে দূরে এসে আজ বুঝতে পারছি যে এটা শুধু উচ্চাশা নয়। তা যদি হোত তাহলে কী অহর্নিশি আমাকে এমন জ্বলতে হোত?

বিজ্ঞানে ঝোঁক ছিল আমার—তাই বিজ্ঞানেই ডিগ্রী নিয়েছিলাম। কিন্তু এম, এস, সি পাশ করার পরই একটা অদ্ভুত অতৃপ্তি জাগলো মনে। চর্বিত চর্বন আর ছেলে পড়ানোর কাজে এতটুকু উৎসাহ পেতাম না। মনে হোত সুযোগ পেলে আমি জগতকে অনেক কিছু দিতে পারি—অনেক কিছু আবিষ্কার করতে পারি। কিন্তু সুযোগ কোথায়? তুমি তো জানো আমাদের দেশের সরকারী দপ্তরগুলো লালফিতার আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা আর অন্য সবার দৃষ্টিভংগী পুরোনো লোহার মতো মরচে ধরা। যা চেয়েছিলাম করতে পারলাম না, একটা শক্ত দেয়ালে মাথা ঠুকে মরলাম শুধু।

WE PRODUCE :—

(1) **CROCKERY WARES**

(2) **INDIA WATER FILTER**

(3) **LABORATORY REQUISITES**

ALL IN FINE STONEWARES

INDIA POTTERIES LIMITED

91, DHARAMTALA STREET

CALCUTTA-13

ঠিক এ সময়ই তুমি এসেছিলে আমার জীবনে। আজ আর বলতে দ্বিধা নেই ঘনি, মনে হয়েছিল সব হতাশা, সব অপমান আমি সহ্য করতে পারি যদি তুমি পাশে থাকো। মনে হয়েছিল নাই বা পেলাম খ্যাতি, আবিষ্কারের আনন্দ। তোমার যে তিল তিল করে আবিষ্কার করবো এর তৃপ্তিই বা কী কম!

বিন্দু আমার সেই সুখের বুদ্বুদ—টা একটু পরেই মিলিয়ে গেল। জানতে পারলাম চিরদিন আমার পাশে থাকার কল্পনাও করতে পারো না তুমি। আমার প্রেম তোমার চলার পথে অনাবশ্যক জঞ্জাল মাত্র।

থাক, এসব গত কথার পুনরাবৃত্তি করে তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। তোমাকে দোষও দিইনা আমি। জোর করে কী কিছু আদায় করা যায় এ জগতে!

তবে একথা জানার পর থেকেই একটা অদ্ভুত অ-নাশক্তি আমাকে পেয়ে বসেছিল। মনে হোত আমার জীবনটা একটা সিনেমার ছবি মাত্র, সত্যি মনে হলেও সত্যি নয়।

ঠিক এমনি সময়েই ডাঃ ক—এলেন আমার কাছে এক অদ্ভুত প্রস্তাব নিয়ে।

তুমি হয়তো জানোনা এর মধ্যে একটা সায়েন্টিফিক জর্নালে আমি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। এই পৃথিবীর বস্তুপুঞ্জের অণুপরমাণুগুলো বিচ্ছিন্ন করলে পাওয়া যাবে এক অদ্ভুত শক্তির সন্ধান। কী এই শক্তির স্বরূপ? কী করে কাজে লাগানো যায় এই শক্তিকে?

আমার সেই প্রবন্ধটি ডাঃ ক—দেখেছিলেন। প্রবন্ধটি নাকি নানাদেশের বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিও আকর্ষণ করেছিল।

নানা কথার পর হঠাৎ ডাঃ ক - বললেন "সত্যি সত্যি এই শক্তিকে জানতে চান আপনি? একে কাজে লাগাতে চান?"

"নিশ্চয়ই চাই - " হেসে বললাম আমি। "কিন্তু চাইলেই পারছি কই? দেখছেন তো আমার অবস্থা—বিদেশে গিয়ে একটু পড়াশোনা করারই সুযোগ হোলনা।

একটু দ্বিধা করে ডাঃ ক - ওঁর প্রস্তাবটি পেশ করলেন। একটি দেশের পক্ষ থেকে (নাম নাই বা শুনলে) কয়েকজন বিজ্ঞানীকে পাঠানো হয়েছে একটি নির্জন দ্বীপে। সেখানে স্থাপিত হয়েছে এক বিরাট গবেষণাগার। সেখানেই ওঁরা গবেষণা করছেন এই আনবিক শক্তির স্বরূপ জানতে—একে নানা কাজে লাগাতে।

হ্যাঁ আমি ইচ্ছে করলে ওঁর সংগে যেতে পারি। কিন্তু একটি সর্তে। কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি তা গোপন রাখতে হবে। সবার কাছ থেকে। পরিচিত পৃথিবীর সংগে সব যোগ সূত্রই মুছে ফেলতে হবে। একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠানের মারফৎ চিঠিপত্রের আদান প্রদান হয়তো চলবে—কিন্তু তা হবে নেহাৎ কুশল সংবাদ—প্রতিটি ছত্র সেন্সার করা।

"ধরুন বছর কয়েকের জন্য অজ্ঞাত বাস করলেন। আমি আশা করছি বছর তিন চারের মধ্যেই সফল হবো আমরা। তখন আপনি ফিরতে পারবেন আপনার পুরনো জগতে—হ্যাঁ, বিশ্বজোড়া খ্যাতি নিয়ে—"

কয়েক মিনিট ভেবে ছিলাম আমি, কে আছে আমার? কেউনা! শুধু তুমি ছিলে মনি। কিন্তু তোমার জীবনেও তো আমার স্থান নেই।

তবে কেন যাবোনা ঐ নির্জন দ্বীপে? যে শক্তিকে আয়ত্বে আনার স্বপ্ন দেখেছি এতদিন কেন, তাকে করায়ত্ব করার সুযোগ পেয়ে ছেড়ে দেবো?

ডাঃ ক—কে বললাম—"আমি রাজী—"

তারপর কী ভেবে একদিন নিঃশব্দে তোমাদের পৃথিবী থেকে সরে গেলাম—কীভাবে নানা সমুদ্র পাড়ি দিয়ে নামলাম এসে এই দ্বীপের বুকে—সে সব কথা নাই বা বললাম। শুধু এটুকুই বলবো যে এখানের মাটিতে পা দিয়ে ভালো লেগেছিল। অতলান্ত নীলের বুকে এই ছোট সবুজ দ্বীপটির নামকরণ করলাম "পান্না দ্বীপ"। হঠাৎ মনে পড়ে গেল

ভোমার ফর্সা সুন্দর আঙুলে জল জল করতো একটা পান্নার আংটি।

শুধু একটা জিনিষ দেখে অবাক লাগলো। এখানকার অদ্ভুত গোপনীয়তা আর অতন্দ্র সতর্কতা। বিজ্ঞানের গবেষণায় কী প্রয়োজন এত গোপনীয়তার? কী প্রয়োজন বিজ্ঞানীর সাথে সাথে এই অতন্দ্র প্রহরী দলের?

শুধু প্রথম বছরটা ভালোই কেটেছিল। এই একটা বছর ডাঃ ক'য়ের অধীনে কাজ করতে হোল আমার। সেই অদ্ভুত শক্তির স্বরূপ নির্ণয় করতে।

কীভাবে যে দিনগুলো কেটে যেতো বুঝতে পারতাম না। যেন এক রহস্যের যবনিকা তুলতে ব্যস্ত ছিলাম। এমনকী আশে পাশের অন্য বিজ্ঞানীরা কী-করছেন সেটুকু জানার ও অবকাশ হয়নি। অবশ্য কিছু দিন পর বুঝতে পেরেছিলাম যে এখানকার বিজ্ঞানীদের মধ্যে দুটো শ্রেণী রয়েছে—। ওপরের শ্রেণীতে যে ক'জন বিজ্ঞানী ছিলেন তাঁদের অধিষ্ঠ শুধু আমার নয়—আরো অনেকেরই অজানা। ও'দের গবেষণা-গুলো কী তবে আরো গোপনীয়? মনে হোতো এক রহস্যের যবনিকা তুলতে গিয়ে নিজেকে অন্য এক রহস্যে ডুবিয়ে দিয়েছি।

ডাঃ জ—ছিল আমার রুমমেট। হাসিখুসী দিলদরিয়া লোকটা। মাঝে মাঝে মনে হোত ও যেন এখানকার পরিবেশে বেমানান। কিন্তু এও অবাক হয়ে দেখতাম যে প্রয়োজন হলে কতখানি সতর্ক আর কৌশলী হয়ে উঠতে পারে ও। তাইতো এ চিঠি ওর হাতে দিচ্ছি। কারণ চিঠি লেখা নিষিদ্ধ না হলেও প্রতিটি ছত্র খুঁটিয়ে সেন্সার করা হয় এখানে। সেই সতর্ক প্রহরা এড়িয়ে তোমাকে এত কথা জানাতে পারতাম না কখনো।

যাক যা বলছিলাম। বছর খানেক পর হঠাৎ একদিন ডাঃ ক—আমায় ডেকে পাঠালেন। হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি বিজ্ঞানীদের দুটো শ্রেণীর মধ্যে ক—ই ছিলেন যোগসূত্র।

আধো অন্ধকার একটা ঘরে বসেছিলেন ক,—, ঘুরের নীল সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে। ওঁর মুখটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম না।

ক, বল্লেন এই একবছরে আমার উন্নতি দেখে সবাই মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়েছেন। তাই স্থির করা হয়েছে এখন থেকে আমার আরো দায়িত্ব পূর্ণ কাজের ভার দেওয়া হবে। যে ক'জন বিজ্ঞানীকে এতদিন দূর থেকে দেখে সমীহ করে এসেছি-এবার তাঁদেরই সংগে কাজ করতে হবে আমায়।

"আপনার যে কী ভয়ানক দায়িত্ব বুঝতে পারছেন!" মৃদুস্বরে ক,—প্রশ্ন করলেন। "যে পরীক্ষায় নামছেন আপনারা সফল হলে এই পৃথিবীর চেহারা বদলে যাবে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই আবিষ্কার যুগান্তকারী বিপ্লব ঘটাবে। এতদিন যে শক্তির সন্ধানে ছিলেন করায়ত্ত হবে সেই শক্তি।"

"কিন্তু—" একটু থেমে উনি আবার শুরু করলেন—"তার জন্য চাই কঠোর সাধনা। বিজ্ঞানের জন্য তিল তিল করে নিজেকে বিলোপ করা—অধিষ্ঠকে নিজের একমাত্র আরাধ্য করে তোলা। পারবেন—পারবেন তো?"

ওঁর কথা গুলিতে কী যে ছিল—অভিভূত হয়ে গেলাম। দুহাতে মাথাটা চেপে ধরে বল্লাম—"পারবো—নিশ্চয়ই পারবো, বিজ্ঞান ছাড়া কী আছে আমার এজগতে? কে আছে!"

ডাঃ ক—আমার হাতটা চেপে ধরলেন—"আমি জানতাম—। লোক চিনতে ভুল হয়নি আমার—"

পরদিন থেকেই নতুন জীবন শুরু হোল আমার। বাসস্থান বদল হোলো। ঘর ছেড়ে যাবার আগে কেন জানি না মনে হোল জ—র সঙ্গে আর সহজে দেখা হবে না। বল্লাম ওকে সে কথা। ও একটুখানি ম্লান হাসলো। তবে কী তারও একথাই মনে হয়ে ছিল?

তারপর কিছুদিন কাটলো যেন নেশাঘোরের মতো। সেই অদ্ভুত শক্তিটা যেন আমাকে চুম্বকের মতো টানছিল। জানতে হবে ঐ শক্তিকে—বশে আনতে হবে।

কিনুকে কী করবো এত শক্তি দিয়ে? কী কাজে লাগাবো তাকে?

সন্দেহ নিরসন হোল কিছুদিনের মধ্যেই। জানতে পারলাম কী আমাদের অস্ত্র। এই শক্তিকে আমরা মারণাস্ত্র তৈরীর কাজে লাগাবো। আবিষ্কৃত হবে এমন এক বোমা যা হবে হিরোশিমা নাগাসাকীর আনবিক বোমার চেয়েও অনেক অনেক শক্তিশালী।

এরই জন্য তবে এত আয়োজন? এতদিনে বুঝতে পারলাম কেন আমাদের এই অজ্ঞাত বাস, কেন এই অতন্দ্র সতর্কতা।

কিনুকে আমি কী অজ্ঞাতবাসে এনেছি মারণাস্ত্র তৈরী করবো বলে, আমার আরাধ্য যে বিজ্ঞান সে তো কল্যাণ-কারিনী।

ডাঃ ক—রের কাছে গেলাম। বল্লাম—'শেষ পর্য্যন্ত আমরা বোমা তৈরীর কাজে লেগেছি, এই শক্তিকে কাজে লাগাবার অন্য কোন উপায় খুঁজে পেলেন না আপনারা।

ক—বল্লেন—'দেখুন বিজ্ঞানীর কাজ হচ্ছে গবেষণা করা—। সে গবেষণার ফলকে কী ভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে তার বিচার করা নয়—'

'বল্লাম তা। কিনুকে তাই বলে সজ্ঞানে মারণাস্ত্র তৈরী করবো?'

একটু সরে এসে ক—আমার কাঁধে হাত রাখলেন। বল্লেন—'দেখুন—আপনি তো চান পৃথিবী থেকে যুদ্ধ দূর হয়ে যাক? আমরাও তো তাই চাই। তাই তো এই মারণাস্ত্র আবিষ্কারের অভিযান। এমন মারাত্মক বোমা তৈরী হলে, দু পক্ষ থেকেই যুদ্ধের ইচ্ছা লোপ পাবে। কারণ তখন যুদ্ধের অর্থই হবে সমূলে বিনাশ হওয়া—'

আরো কত কী বলেছিলেন ডাঃ ক'। কিনুর আমার অব্যক্তি দূর হোলো না। তবে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলাম সে আপত্তিকে দমন করতে।

আমাদের গবেষণা যতো এগুতে লাগলো ততই এর ভয়াবহ দিকটা আমার কাছে স্পষ্ট হতে লাগলো। বুঝতে পারলাম এই ভীষণ বোমার ফলাফল ছড়াবে হাজার হাজার মাইল অবধি। বাতাস হবে বিষাক্ত পংগু আর অকর্মণ্য হয়ে প্রতিটি জীবন্ত প্রাণী ধীরে ধীরে এগিয়ে যাবে মৃত্যুর দিকে। এমন কী মাতৃগর্ভের শিশুও বাদ যাবে না। বুঝতে পারলাম গোটা তিন চার বোমাই এই পৃথিবীর বুক থেকে জীবন নিশ্চিহ্ন করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট।

মল্লি আমার তখন মনে হোল মানবজাতির ভবিষ্যৎ যেন আমারই হাতে। তবে কী আমিই মানবজাতির ধ্বংসের জন্য দায়ী হবো? আমার মনে হতে লাগলো আমি খুনী—উঁচুদরের খুনী; তা না হলে কীভাবে সজ্ঞানে এই মারণাস্ত্র তৈরী করতে চলেছি?

কিনুকে যখনই গবেষণাগারে যেতাম, হাজার রকমের যন্ত্রপাতি, চার্ট, নোটসের ভেতর দিয়ে সেই অদৃশ্য শক্তিটা আমায় টানতো। ভুলে যেতাম অন্য সব কিছু, পরীক্ষা আরেক ধাপ এগিয়ে যেতো।

এভাবে কতদিন কাটলো মনে নেই। দিনের হিসেব যেন ভুলে গিয়েছিলাম। যতক্ষণ গবেষণাগারের বাইরে থাকতাম—মনের মধ্যে শুধু একটি প্রশ্নই জাগতো, আমি কী খুনী? আমি কী ধ্বংস করবো মানবজাতিকে? প্রশ্নটা যেন ক্রমশঃ একটা বিরাট পাথরের মতো আমার বুকে চেপে বসলো। মনে হোত নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

এরই মধ্যে আমাদের পরীক্ষার দ্বিতীয়বারের দিকটা শেষ হোলো। তারপর শুরু হোল সেই ভীষণ বোমার একটি নমুনা তৈরীর কাজ। শুনলাম শক্তিশালী রকেট দিয়ে এই বোমাকে পাঠানো হবে মহাশূন্যে—সেখানেই ঘটবে এর পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ। আর—জানো মল্লি, আমারই ওপর পড়লো এই কাজের প্রধান দায়িত্ব।

সে রাত্রে আমি ঘুমোতে পারলাম না। অন্ধকার তারাহীন

আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে আমার মনে হোল বোমাটি যেন এখনই ফেটে গিয়েছে। আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পেলাম আমার গত জীবনকে—দেখতে পেলাম আমার মা বাবার অস্পষ্ট ছবি - দেখতে পেলাম সব বন্ধু-বান্ধবকে, - দেখতে পেলাম তোমাকে।

আর—আর দেখলাম আমার তৈরী বোমা তোমাদের করেছে পঙ্গু, বিকলাঙ্গ। তোমাদের সেই যন্ত্রণা কাতর মূক দৃষ্টি যেন মুখর হয়ে জানিয়ে দিল তোমাদের আমিই খুন করেছি—হাঁ, আমিই।

সেই অসহ্য যন্ত্রণাভরা রাতও একসময় শেষ হোলো—আর ভোরের আকাশের দিকে তাকিয়ে আমি স্থির করলাম তোমাদের এভাবে মরতে দেবোনা আমি।

তোমায় তো বলেছি বোমাটা তৈরীর প্রধান দায়িত্ব ছিল আমার। তারই সুযোগ নিলাম আমি। একটা জায়গায় একটা মারাত্মক ভুল করলাম,—ইচ্ছে করেই। আর এভাবে সেটাকে আড়াল করে রাখলাম যাতে ভুলটা অন্য কারুর নজরে না পড়ে।

নির্দিষ্ট দিনে বোমার বিস্ফোরণ সম্ভব হোলোনা।

বিজ্ঞানীদের মধ্যে সবচেয়ে প্রবীণ যিনি তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন। বল্লেন—"আপনার কাজে এমন ভুল থাকবে আশা করিনি আমরা। যাক্ যা হবার হয়েছে, এর পরের বার যেন এ ভুলটা আর না হয়—" মাথা নীচু করে চলে এলাম আমি।

নিজের ঘরটায় ফিরে আমার হঠাৎ ভীষণ অস্বস্তি হতে লাগলো। জীবনে এই প্রথম মিথ্যার আশ্রয় নিলাম। আর তা'ও সেই বিজ্ঞানকে নিয়ে যে বিজ্ঞান আমার একমাত্র আরাধ্য। মনে হোলো বিজ্ঞানকে আমি কলংকিত করেছি—আমার মিথ্যা দিয়ে—আমার প্রতারণা দিয়ে।

তাছাড়া—আমি যে শপথ নিয়েছিলাম নিজেকে বিলোপ করে বিজ্ঞানের সেবা করবো—নিজের সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষাকে তুচ্ছ করবো,—আমি যে শপথ নিয়েছিলাম তাঁর কাছে সে শপথ কী এ ভাবেই আমি পালন করলাম?

কিন্তু কী আমি করতে পারতাম? মল্লি, আমি কী পারতাম তোমাকে, আমার পরিচিত সবাইকে, আর আমার অচেনা লাখ লাখ মানুষকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে? প্রতারণা করা ছাড়া কী উপায় ছিল আমার!

কিন্তু আমার মনের মধ্যে কে যেন বলে উঠলো "উদ্দেশ্য মহৎ হলেই কী অসাধু উপায়কে সমর্থন করবে তুমি?"

মনে পড়ে গেল কলেজ জীবনে কত—ডিবেটে কতদিন বলেছি—"End does not justify the means," আজো কী তা অবিশ্বাস করতে পারি?

আর যদিই তা অবিশ্বাস করি তাহলে তো তাঁকেই সমর্থন করতে হয়—"এমন মারাত্মক বোমা তৈরী হলে বিশ্ব থেকেই যুদ্ধের ইচ্ছা লোপ পাবে। কেন না, তখন যুদ্ধের অর্থই হবে সমূলে বিনাশ হওয়া—"

মল্লি আমার মনে হোলো চিন্তার ভারে যেন মাথাটা ফেটে পড়বে। কী করবো আমি? কে আমাকে পথ দেখাবে?

আমি বুঝতে পেরেছিলাম এসব কথা এখান কাউকে বলা যাবে না। কেউ বুঝবে না, মনে হোলো আমার চার পাশের এই সব বিজ্ঞানীরা যেন প্রত্যেকে একটি যন্ত্র, স্বয়ংক্রিয় চালিয়ে যাবার যন্ত্র। নির্ভুল, নিখুঁত ভাবে কাজ করে যাচ্ছে ওরা।

তাঁর সংগে দেখা করতে চেষ্টা করলাম—কিন্তু পারলাম না।

কয়েকদিনের মধ্যেই দ্বিতীয় বোমাটি তৈরী করার কাজ শুরু হোলো। অস্থির মনে চার্ট নিয়ে বসলাম আমি। হঠাৎ পেছন ফিরে দেখি আমার পেছনে দাঁড়িয়ে এখানকার প্রবীণতম বৈজ্ঞানিক।

আমাকে কী তবে ওরা অবিশ্বাস করছে? কে জানে!

কিনুতু না, কয়েকদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলাম ওরা সন্দেহ করেনি কিছু। শুধু আগের বার যে কারণটার ভুল ছিল তার বিষয়ে আমাকে সতর্ক করা হোল বারবার। যদি ওরা যদি আমায় অবিশ্বাস করতো, সন্দেহ করতো তা হলে হয়তো সবকেই আবার একটু ভুল করতে পারতাম আমি। কিনুতু ওদের বিশ্বাস, ওদের আস্থা যেন প্রতিপলে আমার পথ রোধ করে দাঁড়ালো।

শুধু তোমার সেই বিকলাংগ মূর্তিটা যেন সারাক্ষণ আমার চোখের সামনে ভেসে রইলো। খেতে বসলে ভেতর থেকে যেন সব ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইতো—। ঘুমের ঘোরে, স্বপ্নের মধ্যেও দেখা দিতে তুমি—এবং আরো অনেকে। অনেক, অনেক চেষ্টা করলাম সেই মূর্তিটাকে ভুলতে। বারে বারে নিজেকে বললাম—"আমি বিজ্ঞানী, ঔচিত্যের প্রশ্ন তোলার অধিকার আমার নেই—" তবু শান্তি পেলাম না এক মুহূর্তের জন্য।

শেষ পর্যন্ত তোমারই জয় হোলো মনি। শেষ মুহূর্তে—আবার একটা ভুল করলাম আমি। বলাবাহুল্য এটাও ইচ্ছাকৃত।

দ্বিতীয়বার ব্যর্থতার পর যখন নিজের ঘরে ফিরে এলাম তখন আমি ক্লান্ত—ভীষণ ক্লান্ত। নিজের সংগে অবিরত যুদ্ধ করে করে আমার সব শক্তি যেন শেষ হয়ে গেছে। যে মিথ্যার আশ্রয় আমি নিয়েছি তা যেন একটা পোকার মতো আমার জীবনীশক্তির মূল কেটে দিয়েছে। মনে হোল আর পারবোনা আমি মাথা তুলে দাঁড়াতে। আর—আর তখনই দেখলাম আমার চারপাশে সবার চোখে জিজ্ঞাসা অবিশ্বাস আর সন্দেহ উদ্যত হয়ে আছে—একটু সুযোগ পেলেই ফণা তুলে ছোবল মারবে।

ভাবলাম ডাঃ ক'য়ের কাছে যাবো। খুলে বলবো অকপটে সব কিছু। তারপর বিদায় নোবো পারাণ্বীপ থেকে। বিদায় নেবো আমার আরাধ্য বিজ্ঞানের কাছ থেকে। ইচ্ছে হোলো ফিরে যাই নিজের দেশে—নিজেকে মিশিয়ে দিই অগণ্য জনসাধারণের সংগে। তুমি আছ ভালো আছো মনি, এই বোধটাই আমাকে তৃপ্তি দিক সারাজীবন।

কিনুতু তা হোলোনা। আমার জ্ঞান, আমার দক্ষতাই হয়ে দাঁড়ালো আমার শত্রু। ডাঃ ক'য়ের কাছে যাবার আগেই যেতে হোলো গবেষণাগারে—তৃতীয় বোমাটির প্ল্যান আঁকতে।

আর আমি দেখলাম আমার চারপাশে অতন্দ্র প্রহরীদল—সতর্ক বিজ্ঞানীরা, কোথাও—কোথাও এতটুকু ভুল করার যো নেই!

বুঝতে পারলাম আমি কত অসহায়—বুঝতে পারলাম আমাকেও ওদের মতোই একটা যন্ত্রে পরিণত হতে হবে। আমাকেই তৈরী করতে হবে এই ভীষণ মারণাস্ত্র। কিনুতু কেমন করে তা পারবো মনি! তোমার সেই বিকলাংগ মূর্তিটা—

এযন্ত্রের বুঝি শেষ নেই। অন্ততঃ আমি বেঁচে থাকতে নয়। তাই হঠাৎ মনে হোলো বিদায় নেবো আমি। পারাণ্বীপ থেকে নয়—এই পৃথিবীর থেকে। কী ই বা আছে আমার জীবনে? কিসের জন্য সহ্য করবো এই অসহ্য যন্ত্রণা?

কিনুতু কেউ কী জানবে না এ যন্ত্রণার ইতিহাস? কেউ কী বুঝবে না? পারাণ্বীপের গবেষণায় কেউ কী বাধা দিতে আসবে না? একবার—একবার শেষ চেষ্টা করে দেখতে হবে।

কী ভাবে জয়ের সংগে দেখা করলাম তা আর নাই বললাম। শুধু দেখলাম মরীয়া হলে আমিও পারি অদ্ভুত কৌশলী হতে।

জ' কে খুলে বললাম সব কথা। শুধু আমার শেষ সিদ্ধান্তটি ছাড়া। আর বললাম তোমাকে এই চিঠিটা—পৌঁছে দিতে।

জ' রাজী হয়েছে। কাল ভোরে ওকে চিঠিটা পাঠাবার ব্যবস্থা করে এসেছি। কিন্তু সেই সংগে এও অনুভব করেছি

যে জ' আমার যন্ত্রণার অংশীদার হতে পারেনি। এ যন্ত্রণা ওর অজানা। ও নির্ভেজাল বিজ্ঞানী। শুধু আমার জন্যে ওর মনের কোণে কোথায় একটুখানি স্নেহ লুকিয়ে আছে—যন্ত্রপাতির মধ্যে ওয়েলিংয়ের মতো।

মল্লি, চিঠিটা আমি শেষ করতে যাচ্ছিলাম—এমন সময়ে হঠাৎ শুনলাম একটা চাপা গুঞ্জন—উত্তেজিত চোখমুখ। শুনলাম চতুষ্পক্তি মাকি বৈঠকে বসেছেন নিরস্ত্রীকরণের জন্য। হয়তো পারমাণবিক এই গবেষণা বন্ধ করে দেওয়া হবে।

মল্লি, এক এক সময়ে কী মনে হয় জানো? যখন চারদিকে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার তখনই আকাশে দেখা দেয় বিদ্যুতের আলো।

কিন্তু বিদ্যুতের আলো তো ক্ষণিকের জন্য। মানুষের প্রত্যুত্তরে আর আশা রাখতে পারছিনা। আর তাছাড়া অতীত তো আমাকে বেচেই দেবেন। মিথ্যা আর প্রতারণায় যে বোঝা জমিয়ে তুলেছি তা সরাবো কী করে? কী করে ভুলবো এই দুঃস্বপ্নের দিন আর রাতগুলো?

তাই ভাবছি,—বিদায় আমাকে নিতেই হবে। কিন্তু তার আগে এই চিঠিটা পাঠাতে হবে ক' বোস কাছে। তুমি কী বুঝবে আমার কী ভীষণ যন্ত্রণা? মনে হয় তুমি বুঝবে। আমি চেয়েছি তোমরা সবাই বাঁচো—নিশ্চয়ই হবে। তুমিও তো চাও সুন্দর নিরাপদ জীবন! তাই একটা অনুরোধ করছি। পারমাণবিক এই গবেষণা বন্ধ করতে এগিয়ে এসো তুমি। শুধু তুমি নও—আরো, আরো অনেকে।

For

All Your General Insurance Requirements

Such as :

FIRE, MOTOR, PERSONAL ACCIDENT,

MARINE & ERECTION

CONTACT

The Oriental Fire And General Insurance Company Limited

(A Subsidiary of the Life Insurance Corporation of India)

Regional Office :
4, LYONS RANGE,
CALCUTTA-1.

Head Office :
ORIENTAL BUILDING
BOMBAY-1.

Telephone : 22-3421 (6 lines)
Telegram : ORIENTFIRE

জিমি আর সেলভা

পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ওর পিঠটাই এতক্ষণ জ্বালা-জ্বালা করছিল।...

ঁ্যাচ করে নাক ঝেড়ে, বাঁ হাত দিয়ে চোখের জল মুছে, সেলভা এবার তাকাল ফুটপাথের দিকে। আবার সব নিঃঝুম হ'য়ে এসেছে। রাস্তার ওপর দিয়ে ধুলো উড়িয়ে চ'লে গেল একটা মোটর। মাঝ-আকাশের সূর্যটার দিকে তাক ক'রে থেউ থেউ ক'রে উঠল দরোজাদের বাড়ির জিমি।

রাস্তার ওপারে আর একটা ফুটপাথ। আজিলাদের বাড়ী। সামনেই কয়েকটা ছুতোর মিস্ত্রী কাজ করছে। পালকের মতো হালকা, রাঁদাতে চাঁছা হলদে কাঠের কুচিগুলো নালার জলে ভাসতে ভাসতে গিয়ে ঠেকছে আজিলাদের পাশের দোতলা বাড়িটার রিকশার চাকায়।

জিমি হঠাৎ, একটা ডাক অসমাপ্ত রেখেই, সামান্য ভুরু কুঁচকে চক্কোর মারতে লাগল।

সেলভা জানে—জিমির কালো কুচকুচে লেজ যেখানে শেষ হয়েছে সেখানটায় একটা ঘা আছে; রাজ্যের মাছির নজর তার ওপর। সেলভা সেদিন একটা কঞ্চি নিয়ে জিমির মাছি তাড়াতে গিয়েছিল। লাল চোখ তুলে জিমি ধমক দিয়েছিল ওকে।

মাছিগুলোকে তাড়িয়ে দিয়ে উবু হয়ে জিমি বসল। জিভ আর দাঁত দিয়ে বুকের লোমগুলো পরিষ্কার করতে লাগল। চকচকে জিমির দাঁত।— সেলভা খুব কাছ থেকে জিমির দাঁত দেখেছে ঝকঝকে সাদা। —

জিমির দাঁতের কথাই ভাবে সেলভা।...

রোববার ছিল সেদিন। আজ!... মঙ্গলবার, রাজী-আয়ার ছুটি।... রোববার দিন, গীর্জায় যাবার আগে, সেলভার দাঁত খুব মিষ্টি একটা সাবুন মাজন দিয়ে ওর মা মেজে দিচ্ছিল। থুতু না ফেলে সেলভা গিলে নিয়েছিল। তারপর মা ওকে লাল একটা সাটিনের জামা আর সাদা সাটিনের প্যান্ট পরিয়ে বুড়ি ওই রাজী-আয়াকে বলেছিল, ওকে কোলে করে একটু ঘুরিয়ে আনতে।

রাজী সেদিন মুখে হলুদ মেখে এসেছিল। রোজকার রং-ওঠা নীল গন্ধ-গন্ধ শাড়ি ছেড়ে রাজী-আয়া সিঁদুর-রঙা একটা শাড়ি প'রে আলপনা দিচ্ছিল তখন বাড়ির সামনের ফুটপাথে। তার আগে সেলভা জানে, রাজী-আয়া গোবর-জল ছিটিয়ে দিয়েছিল ফুটপাথের ওপর। রোজই দেয়। সেলভা তখন ঘুমোয়।

আলপনা শেষ করে খড়ির গুঁড়ো ঘরে রেখে, হাত মুছে রাজী-আয়া সেলভাকে কোলে তুলে নিয়েছিল। তারপর তাকে কোমরে নিয়ে থপ্‌থপ্‌ করে বেড়াতে বেরিয়েছিল রাজী-আয়া। সেলভা দেখছিল, রাজী-আয়া চলে ঠিক যেন আজিলাদের বাড়ির পাতিহাঁস। একবার বাঁ-দিকে, একবার ডানদিকে, হেলে থপ্‌থপ্‌ করে চলে। কিন্তু আয়া প্যাঁকপ্যাঁক করে ডাকে না। আয়ার মাথাটাও হাঁসের মতো। ছাড়া-মাথায় অল্প-অল্প চুল।

রাজী-আয়া সেদিন ওকে কাঁখে গুঁজে নিয়ে গিয়ে লুকিয়েছিল আপাস্বামীর পানের দোকানে। ঝাঁপটার আড়ালে। দূর থেকে সেলভা দেখেছিল, মা আঁচ করে চুল বেঁধে, মুখে খুব পাউডার মেখে, কালো-বইটা হাতে নিয়ে বাবার সঙ্গে চলে গেল। মা সেদিন গীর্জায় গিয়েছিল। গীর্জা কি, সেলভা জানে না। মা বলে,

সেখানে ঠাকুর-পুজো হয়। বড় হলে সেও নাকি গীর্জায় যাবে।

মা চলে গেছে দেখে, গালে দু-খিলি পান ঠেসে সেলভাকে কোলে নিয়ে বাড়ি ফিরে এসেছিল রাজী-আয়া। সেলভাকে ফুটপাথে নামিয়ে নিজে গিয়ে বসেছিল রোয়াকে। তারপর রাজী-আয়ার নাক ডাকতে লেগেছিল ব্যাগপাইপের মতো।

সেদিন ছিল রোববার। সকাল-বেলা জিমি এমনি করে সেদিন দোর পরিষ্কার করছিল। রাজী-আয়া ইটুলি কিনেছিল। জিমিকে দিয়ে আধখানা ইটুলি দিয়েছিল সেলভা। ইটুলি খেয়ে জিমি খুব খুশী। পেটুকের মত ও জিভ বার করেছিল। মুখটা খুঁচলো করে ঘাড় বেঁকে বলেছিল, "উ-উঃ-সুক্!" তারপর দাঁত বারকরে হেসেছিল জিমি। ভারি সাদা, ভারি চকচকে ওর দাঁত। ঠিক যেন সেলভার স্টেনলেস্ স্টীলের চামচেগুলো!…

সাইকেলের হর্ন বাজাতে বাজাতে দুধওয়ালা ছুটেছে টেনিস মাঠের দিকে। শহরতলীর নিঃঝুম পাড়া কাঁপিয়ে আবার ঘেউ-ঘেউ করে উঠল জিমি। রোয়াকের এক-চিলতে কোণে কাঠের থামটা আর দেয়ালটার মাঝে ঠেস দিয়ে বসে জিমিকে দেখতে লাগল সেলভা।

নাঃ, পিঠের জালটা নামছে নিচের দিকে।…

জিমির যেখানটা নেজ, সেলভার সেখানে ফাঁকা। উলঙ্গ সেলভা হাত বুলোয় শিরদাঁড়ার সব চেয়ে নিচে।

ইস্। না কিছু জানে না। মা ওকে বলেছে, জিমি। … মা বলেছে, "তুই মানুষ নস্। আমি তোর মা নই। তুই জিমি!"

খালি তাই না। পিঠে অতজোরে কখনো চড় দিতে হয়? আজ রবিবার? রাজী-আয়ার ছুটি। নইলে রাজী-নিশ্চয় থাকে বকতো। বলতো, সেলভা জিমি নয়। সেলভা সেলভা!…

বাবাও বাড়ি নেই। ভারি দুঃখ হয় সেলভার। একা একা লাগে। আবার কান্না পায়। নাঃ, সে কাঁদবে না। জিমি কি কাঁদে?

আবার ফ্যাচ করে নাক ঝাড়ে সেলভা। পাশের খড়িতেই মার শাড়ি টাঙানো। ফিকে সবুজ শাড়ি। এখনো শুকোয়নি। ধোঁয়া ধোঁয়া কী উঠছে তার গা বেয়ে। আবার ফ্যাচ করল সেলভা। বেশ হয়েছে। মার শাড়িতেই মুছেছে। আবার মুছবে। দশ-বার মুছবে। পঁচিশ-বার মুছবে।

ভারি তো মা! তাকে কি না বলে—জিমি!…সে যদি জিমি হয়, তবে ওর লেজ নেই কেন?

সেলভা ভেবে পায় না, ও কী দোষ।

ভয়-দুপুরে হাতের রেখা করছিল রোয়াকে বসে। আর, পাশের বাড়ির ফুটপাথে সরোজা, আঞ্জিলা কুমারী—একা-দোক্কা খেলছিল সবাই। সরোজা মাথা ওপর দিকে করে, কপালে খোলামকুচি রেখে, ফুটপাথে কাটা ঘরের ওপর দিয়ে লাফাচ্ছিল। আর গলাটা গম্ভীর করে, আঞ্জিলা গান গাইছিল, "ইচ্ছা-আ, ইনিয়া-আ, কায়া-আ, পরমা" একটা চিলের মতো, হুস করে আঞ্জিলার গম্ভীর গলাটা নেমে আসছিল, শেষের কথাটায় ঝোঁক দিয়ে।

ভারি ভাল লাগছিল সেলভার। এলোচুলে ভরে গিয়েছিল সরোজার পিঠটা। কোমরে দুলছিল নতুন একটা হলদে ঘাগরা।

এমন সময় পাড়া কাঁপিয়ে শোনা গিয়েছিল মোটর সাইকেলের আওয়াজ। খেলা থেমে গিয়েছিল। সেলভা জানত: এবার চেট্টিয়ার আসবে। সরোজা আর কুমারীর বাবা চেট্টিয়ার। কথায় কথায় চেট্টিয়ার ভারি রেগে যায়। এক একদিন রাতে সরোজাদের ঘরে খুব মারে।

সেলভার পিঠটা আবার খুব জ্বালা জ্বালা করে।

সে-ও তার বাবা এলে বাবাকে বলে দেবে। বাবা মাকে মারবে। খুব ভাল হবে।

কিন্তু মা যে কাঁদবে?

নাঃ থাক। মা খুব ভাল। আজকে ছাড়া মা তো ওকে আর কোনদিন মারেনি। বরং সরোজদের মায়ের চেয়ে মা অনেক ভাল। মা দেখতে অনেক সুন্দর। অনেক অনেক সুন্দর। বাবাও খুব ভাল। বাবাও সুন্দর। ছিঃ, সরোজদের বাবা 'কারুপা'—কালো ভূত। বিশ্রী দেখতে।

পাড়া কাঁপিয়ে, মোটর সাইকেল চড়ে সরোজদের বাবা এসেছিল। সরোজ, কুমারী আর অঞ্জিলার খেলা থেমে গিয়েছিল। মোটর সাইকেল চ'ড়ে চেঞ্জিয়ারকে আসতে দেখে আনন্দে জিমি লেজ নাড়ছিল। খুসী খুসী ঘেউ-ঘেউ করে উঠছিল।

সাইকেল থেকে চেঞ্জিয়ার নামলে সরোজের মা এসে রোয়াকে বসেছিল। চেঞ্জিয়ার পকেট থেকে বের করেছিল বিস্কুট। সরোজকে বিস্কুট দিয়েছিল ওর মা। কুমারীকেও দিয়েছিল। অঞ্জিলাকে দেয়নি।

কাঁদ কাঁদ মুখে অঞ্জিলা চলে গিয়েছিল। নতুন হলদে ঘাগরাটা দু-হাতে জড়ো করে, নালাটা টপকে অঞ্জিলা ঢুকে পড়েছিল নিজেদের বাড়িতে। পেছন ফিরে তাকায়নি অঞ্জিলা। নালার ওপর কাঁপছিল এক-গ্লাস কাঠের কুচি। পালকের মত হালকা। র‍্যাদায় চাঁছা কাঠ। কাঁচা-পালঙ্গ কাঁচা-পালঙ্গ রং।

সেলভার হঠাৎ বিস্কুট খেতে খুব ইচ্ছে হয়েছিল। হাতের লেখা ফেলে এক-পা এক-পা করে সে-ও গিয়ে দাঁড়িয়েছিল সরোজদের রোয়াকের সামনে। সরোজ বিস্কুট খাচ্ছিল। দেখিয়ে দেখিয়ে খাচ্ছিল। কুমারীও বিস্কুট খাচ্ছিল। জিভ বেড়িয়ে। ওদের মা-বাবাও বিস্কুট খাচ্ছিল—কেন যেন ওর খিদে পাচ্ছে। সেলভার দিকে ফিরেও তাকায়নি।

একটা বিস্কুট কুমারীর হাত থেকে মাটিতে পড়ে যায়। জিমিকে সেটা দিয়ে, কুমারীর হাত ধরে ওর মা উঠে দাঁড়িয়েছিল। কটমট ক'রে তাকিয়েছিল সেলভার দিকে। সরোজের হাতে টান দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল ওর বাবা। রেগে মেগে ওরা ভেতরে চ'লে গিয়েছিল।

সেলভা নিরুপায়। বিস্কুট খাবার ভারি ইচ্ছে হচ্ছিল। গুটি-গুটি জিমির দিকে সে এগিয়ে গিয়েছিল। হাসেনি জিমি। রাগও করেনি।

সাহস করে এক টুকরো বিস্কুট তুলে নিয়েছিল সেলভা। তাও জিমি কিছু বলেনি। সেলভা সবে বিস্কুটটা মুখে দিতে গিয়েছে—এমন সময় - ঠাস ক'রে এক চড় ওর পিঠে জ্বলে যায়। বিস্কুটটা ছিটকে পড়েছিল ওর হাত থেকে। টুকটুকে লাল জিভ বার ক'রে সেটা জিমি খেয়ে নিয়েছিল।

সেলভা ফিরে দেখেছিল—মা দাঁড়িয়ে।

উঃ, পিঠটা এখনো জ্বলছে।

না, ঠিক পিঠটা আর জ্বলছে না। জ্বলছে চোখদুটো। আর জলুনিটা শিরদাঁড়া দিয়ে অনেক নিচু নামতে নামতে থেমে গেল। সেলভার পেটের তলাটা বেশ টন্‌টন্ করে।

জিমি হঠাৎ আড়াআড়ি ভেঙে চার-পায়ে খাড়া হ'য়ে উঠল। মাটি শুঁকতে শুঁকতে জিমি রোয়াক থেকে গিয়ে ফুটপাথে নামল। ফুটপাত থেকে রাস্তায়। আবার ধুলো শুকল জিমি। বাদামী ওর ভিজে-ভিজে নাকটায় ধুলো মাখামাখি হয়ে গেল। লেজ নাড়তে নাড়তে জিমি এগিয়ে গেল সামনের বাড়ির রিকশাটার দিকে। রিকশার ডান চাকাটা ঘিরে নালার জল জমে উঠেছে। তার ওপরে হলদে-হলদে কাঠের কুচি। পালকের মত হালকা। র‍্যাদায়-চাঁছা কাঠের কুচিগুলো থরথর ক'রে।

একটু ঘোরাঘুরি করল জিমি। এদিক-ওদিক তাকাল। তারপর, একটা চোখ আধবোজা ক'রে পেছনের ডান পা-টা পরম সুখে তুলে ধরল। একটা আওয়াজ এল সেলভার

কানে। দেখল, বৃষ্টির মত সরু ধারায় ঝিমঝিম দিয়ে জল পড়ছে নালার ওপর। কাঠের কুচির বুকে লেগেছে সাড়া। বৃষ্টির ভয়ে যেমন ছুটে পালায় আঞ্জিলা, কুমারী, সরোজা, সেলভা - তেমনি ছড়িয়ে পড়ে কাঠের কুচিগুলো।

জিমি পেছনের পা-দুটো দিয়ে সজোরে ধুলো ছোটায়। স্কিপার চাকু, সিট, ছাদ—সব ধুলোয় ভরে যায়। জিমি ফিরে যায় রোয়াবে।

সেলভার তলপেটটা আরো বেশি টনটন করে ওঠে। তাকেও যেতে হবে। তাকেও যেতে হবে? হঠাৎ ওর মনে পড়ে: মা বলেছে, "তুই জিমি!"...

ভারি দুঃখু হল সেলভার। বেপ-মা যখন বলেছে, আমি জিমি, তবে জিমির মতই হব।

পিঠটা সত্যিই জ্বালা-জ্বালা করছে। টনটন্ করছে পেটটা। চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ায় সেলভা। ইস্! জিমির মত একটা লেজ যদি থাকত।

সেলভা নামে। ফুটপাথ থেকে রাস্তায়। রাস্তা পেরিয়ে এগিয়ে যায় সামনের বাড়ির রিকশার দিকে।...চাকার গায়ে এখনো জিমি-জিমি গন্ধ। সেলভা তুলে ধরে পেছনের ডান পা-টা। সমস্ত যন্ত্রণা, সব ব্যথা এসে জড়ো হয় সবচেয়ে নরম ছোট্ট একটি বিন্দুতে। মিষ্টি ধারালো আওয়াজ হাঁস একটা। বৃষ্টির ভয়ে পালাতে লাগল কাঠের কুচিগুলো। জলের বুকে সাড়া জাগল। নালার জল ছিটকে এসে লাগল ওর মুখে, চোখে। নাকে এল বিশ্রী একটা গন্ধ।

জিমির মত পেছনের পা দিয়ে সজোরে ধুলো ছোটাতে গিয়ে চমকে ওঠে সেলভা। হো হো করে হাসছে ফুটপাথের মিস্ত্রীগুলো। মুখ তুলতে গিয়ে সেলভা হুমড়ি খেয়ে পড়ে। সারা মুখে নালার জল।...হৈ হৈ করে সবাই ছুটে আসে—সেলভা স্পষ্ট বোঝে। ওর ভয় হয়। যন্ত্রণায় ও চুকরে কেঁদে ওঠে।

সেলভার সারা গা ভরে ওঠে জিমি-জিমি গন্ধে।

সৌন্দর্যে ও সংরক্ষণে

ইষ্ট ইণ্ডিয়া পেইন্ট এণ্ড কেমিক্যাল ওয়ার্কস প্রাইভেট লিঃ

ক্যালকাটা, শিলিগুড়ি, মাদ্রাজ, আসানসোল

নী লি মা
দা শ গু প্ত

প্রেম ও পৌরুষ

চোখের চাউনিটা যেন চমক্ খেয়ে বিশাল হলো। না, দেখতে ভুল করেনি সনৎ। 'বসুশ্রী'তে ঢুকলো ধীরা। পাশে অমল সেনকে নিয়ে। অমল সেন ধীরাদের পাড়ার নবাগত প্রতিবেশী। এনজিনীয়ার। আজকাল এনজিনীয়ার ছাড়া পাত্র নেই। কাজেই, এ, জি, পি, টি, র—ইউ, ডি, সি, সনৎ শুভর আর কোনো আশা নেই।…

বাস থেকে নেমে পড়বে নাকি সনৎ?

সিনেমার একটা টিকিট কেটে ঢুকবে নাকি 'বসুশ্রী'তে? ইচ্ছেটাকে পুরোপুরি আকার দেয়ার আগেই বাসটা ছেড়ে দিলো। ····· যাক্, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সনৎ এর চোখে পড়ে গেলো ধীরার লীলাখেলা। অথচ, সনৎ নামে একটা বোকাসোকা ছেলে, ঐ লীলাময়ীর নাম জপ করে বিহ্বল হয়ে আছে আজ চারবছর ধরে। শুধু এস, এ, এস, পরীক্ষাটা পাশের জন্য অপেক্ষা করছে। ধীরার পছন্দসই একটা বাড়ি সংগ্রহ করতে যা মেহনৎ করেছে সনৎ, ওর পরমায়ু থেকে অন্ততঃ পাঁচটি বছর খসেছে।

বাড়িখানা ছোটো হোক ক্ষতি নেই। কলকাতা থেকে দূরে হোক ক্ষতি নেই, কিন্তু কিছুটা জায়গা থাকা চাই, ধীরার অনেক দিনের সখ একটু বাগান করা। রুফ্-গার্ডেন নয়। সত্যিকারের বাগান। ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা গোলাপ আর কিছু মোতিবেল আর কিছু ক্যাকটাস্, এই থাকবে ধীরার বাগানে আর কিছু নয়। সেই জায়গা সমেত বাড়ি ঠিক করতে সনৎ-এর কাল ঘাম ছুটে গেছে। বাড়ি গোড়ে ছাড়িয়ে।

তাতে কী? ধীরা উজ্জ্বল মুখে বলেছিলো, আমি এমনি নীরবতাময় নিভৃতই পছন্দ করি। বাড়ির পাশেই পুকুর। সনৎ-এর নাক কোঁচকানোকে আমল না দিয়ে, ছেলেমানুষের মতো হাততালি দিয়ে হেসে উঠেছিলো ধীরা, উঃ কী মজা! আমার কতদিনের সখ একটা পুকুর থাকে বাড়ির কাছে ··। সেই সব সখ বাষ্প হয়ে উড়ে গেলো···।

যাক্, সর্বরক্ষে মোহ ভঙ্গটা বিয়ের আগেই হয়েছে সনৎ-এর।···

বাড়িতে পৌঁছে, তালা খুলতেই, আর এক ধাক্কা। ধীরার হাতের সুন্দর গোটা গোটা অক্ষর বুকে নিয়ে একটা গোকাল পোষ্টকার্ড পড়ে আছে।

: শোনো! আজ বাড়িতে থেকো কিন্তু। বেরিয়োনা যেন। আমি আসছি—এই সঙ্গে সাতটা নাগাদ। ধীরা। টেঃ! নিজের চোখকে অবিশ্বাস করবে নাকি সনৎ। 'বসুশ্রী'তে সিনেমা দেখতে ঢুকলো ধীরা এনজিনীয়ার অমল সেনকে নিয়ে, সচক্ষে দেখে এলো সনৎ।

—এমন চিঠি দেয়ার মানে?

সিনেমার শেষে, রাত্রি প্রায় ন'টায়, এমন নির্জন পাড়ায় ধীরা কখনো একলা আসবেনা। এর আগে, এমন চিঠি আরো বহুবার পেয়েছে সনৎ। বাড়ীতে থেকেছে। দুজনে মিলে একসঙ্গে চা না হলে রাতের খাওয়া খেয়েছে। তারপর ধীরাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে, লাস্ট বাসে গোড়ে ফিরে

এসেছে সনৎ। ধীরার মা, হেথাজিনী, এ নিয়ে কতদিন কত অনুযোগ করেছেন,—একদা চলাফেরা সব মেয়েরাই তো করে আজকাল, তুই যেতে পারিস, আসতে পারিসনে। যাহাকে টেনে আনিস এই এদ্দূরে, বাপ যদি না পায় সনৎ?

তা, সে সব কথায় কোনোদিন কানও দেয়নি ধীরা।

—একটি ভীতুর-ডিম!—

তবে, এ চিঠির কী অর্থ?

দ্বিধান্বিত সংশয় নিয়ে, চিঠির তারিখের ওপর চোখ ফেলে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলো সনৎ চুপ করে।

—এইবার বুঝেছে—, —তুমি বাড়িতে থেকো, বেরিয়োনা,—মানে এই, বার হলে যদি ওদের প্রেমলীলা চোখে পড়ে যায় সনৎ-এর, ঠিক তাই · কিম্বা, ধীরা হয়তো আরো একহাত দেখাবে, অমল সেনকে বগলে করেই চলে আসবে এখানে—, সপ্রতিভ মাধুর্যে মিষ্টি মিষ্টি হেসে ওর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে এনজিনীয়ার অমল সেনের। এটা সন্ধের অতীত ··। আর একদণ্ড দাঁড়ালোনা সনৎ। তালা লাগিয়ে ঘুলোপায়েই বেরিয়ে গেলো আবার।

পরদিন সনৎ চিৎ হয়ে শুয়ে আছে মাথার তলায় হাত দিয়ে। সারা মুখে আহত গাম্ভীর্য। সন্ধ্যার নরম ছায়া ঘনিয়েছে সবে, এখনো অন্ধকার নামেনি। ধীরা মাঝে মাঝে কথা থামিয়ে চোখ বড় করে তাকাচ্ছে সনৎ-এর দিকে।

—মাথার কিছু হলো না তো ভদ্রলোকের?

নাহলে, রাতারাতি এ ভাবে পাল্টাতে পারে নাকি মানুষ!

ধীরা গতকাল সন্ধ্যেয় এসে ফিরে গেছে। ওর চিঠি যে সনৎ পায়নি তাও নয়। টেবিলের একেবারে সামনেই বিরাজ করছে পোষ্টকার্ডখানি। চিঠির কথা প্রশ্ন করতে, কী যে জবাব দিলো সনৎ জড়ানো গলায়, তার একটি অক্ষরও ধীরা বোঝেনি।

সাড়ন শব্দ-একটা পেয়েছে নিশ্চয়ই, এবং সেটি খুব ছোটো নয়। ধীরা সনৎ-এর সামনে বসে আছে, কথা বলছে, আর সনৎ ঠোঁট বন্ধ রেখে, চোখের তারা দুটো কড়িকাঠে আটকে রেখেছে।

—এ কী অদ্ভুত বিপরীত কাণ্ড!

কিন্তু, আঘাতটা কোনদিক থেকে কীভাবে আসতে পারে? ধীরা যতদূর জানে, সনৎ-এর কোনোকুলে তো কেউ নেই, কোনোদিক থেকে কারো মৃত্যু সংবাদ এসে ওর চেতনাকে যে হঠাৎ অসাড় করবে, কিম্বা পরীক্ষার মর্মান্তিক খবরও তো হতে পারেনা, পরীক্ষাই যখন দেয়নি এখনো..., তবে?

যাই হোক ধীরা তার গল্প থামায়নি। মানুষটির মাথায় ঝাঁকুনি দিয়ে সচেতন করতে ইচ্ছে করছে। মন বোঝাবুঝির পালা যদিও ওদের শেষ হয়েছে অনেকদিন কিন্তু ওরা নিজেদের পুরোপুরি সংযত রেখেছে এখনো। এর জন্য সনৎ-এর ওপর শ্রদ্ধার শেষ নেই ধীরার। স্বভাব কতখানি সুস্থ থাকলে এবং নিজের ওপর কতখানি কর্তৃত্ব থাকলে, খালিঘরে একটি তরুণী মেয়েকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পেয়েও নিজেকে নিটুট রাখা যায়, তা বোঝা কোনো মেয়ের পক্ষেই কষ্ট নয়।

···মা'র যে কী ভাল লেগেছে 'পরমপুরুষ রামকৃষ্ণ'—এ ছবিটা যাকে না দেখালে ভারি আফশোস্ থেকে যেতো আমার ··।

কালীকীর্তন শুনে মা'র মনে যেন আনন্দের বান ডেকেছে, পৃথিবীর চেহারাই নাকি বদলে গেছে মা'র চোখে···।

'...কালকে এখানে এসে এমন এপ্রিল ফুল হবো কে জানতো? তাহলে না হয় মা'র সঙ্গে আর একবার দেখতাম ছবিটা···। মাকে 'বসুশ্রী'তে বসিয়ে, চলে এলাম এখানে, কথা ছিলো, ছবি শেষ হলে মাকে আবার ওখান থেকে নিয়ে বাড়ি ফিরবো··। এখানে, ততোক্ষণ তোমার সঙ্গে বসে চা খাবো আর গল্প করবো। ···তা কোথায় কী, জ্বালাযারা ঘরটা মুখ ভেংচে বললো,—ঢুকতে পাবেনা—।'

স্প্রিং-দেয়া পুতুলের মতো তড়াক করে উঠে বসলো সনৎ।

—তা কোথায় কী মানে? এখানে আমার সঙ্গে বসে চা

খাবে তুমি কোন দুঃখে? 'বসুশ্রী'র ওপরেই তো বেয়রা আছে' আর গল্প করার ছল তো এনজিনীয়ার অমল সেনই আছেন—।

'তার মানে?' ধীরার চোখ কপালে উঠলো।

'মানে বোঝানোর দরকার আমার নেই—' সনৎ উঠে স্টোভ ধরিয়ে চায়ের কেটলি বসালো।

মিনিট দুই গভীর ভাবে চিন্তা করলো ধীরা, তারপর লঘুচরণে সনৎ-এর একেবারে সামনে এগিয়ে এলো,

'তুমি তো অঙ্কের ছাত্র ছিলে, আমার অঙ্কটা মিলিয়ে দাও না। ঘুরে ঘুরে আমার চার হচ্ছেনা কেন?'

সনৎ-এর মুখের ভাব নৈর্ব্যক্তিক, চোখের দৃষ্টি স্টোভে বসানো কেটলির ওপর, কণ্ঠস্বরে ষোলো আনা নিস্পৃহতা, বললো,

এনজিনীয়ার অমল সেনের মাথা আমার চেয়ে অনেক সাফ্, তার কাছ থেকে অঙ্ক মিলিয়ে নিলে তোমার।'

ধীরার মনের ভেতরটা অভিমানে নিথর হয়ে গেলো। নৈঃশব্দে ঘন হলো কটি মুহূর্ত। নানান কায়দায় চোখের জলকে রুখতে লাগলো ধীরা। হঠাৎ ধীরার চোখদুটো সনৎ-এর মুখের ওপর এসেই থমকে গেলো। নীরবে যেন প্রচণ্ড যোঝাযুঝি চলছে সনৎ-এর অন্তরে, মুখের চেহারা এমনি ··।

নিজেকে আর স্থির রাখতে পারলো না ধীরা। সামরিক ভাবে বিস্মৃত হলো সব। দ্রুত পায়ে সনৎ-এর পিঠ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে, দুহাত দিয়ে সনৎ-এর মাথাটা আষ্টে ধরে প্রবল ভাবে নেড়ে দিলো,

'চা খাওয়া পর্যন্ত দেরী করা কিছুতেই চলবে না, শিগ্‌গিরী চলো, ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই তোমাকে, তোমার মাথা দেখাতে হবে—। ধীরার উত্তেজনা তখনো কমেনি। সনৎ-এর মাথাটা মেঝেছে ধীরার বুকে। ধীরার রক্তপিণ্ডের ধুকপুকানি ধীরার অন্তরের খবর উজাড় করে সনৎকে জানিয়ে দিয়েছে। সনৎ-এর আর ভুল হবে না।

এক মুহূর্ত স্থির।

তারপরই দুহাতের মুঠিতে ধীরার হাত চেপে ধরে, আকর্ষণ করে, পাশের মোড়ায় বসিয়ে দিলো ধীরাকে। স্বচ্ছ মুখে হাসল সনৎ,

'তোমার অঙ্কটা বরং ধীরা, মিলিয়ে দিচ্ছি ··।

তার একটু পরেই উচ্চরোলে হাসি শোনা গেলো দুজনের।

—বাব্বা, রক্ষে কর। এমন ছেলাদ্ । মোহাই সনৎ, এরপর থেকে কড়িকাঠে চোখ আটকে মৌনিবাবা হওয়ার আগে, অন্ততঃ ঘটনার আভাস সামান্য একটু জানিয়ে দিয়ো। আমি এদিকে চারিদিক হাতড়ে কোনো কূল কিনারাই পাচ্ছিনা। তোমার রকম সকমে, তোমার অন্ততঃ টেম্পোরারি ইনস্যানিটি ভেবেই নিয়েছিলাম, কী ভয়ানক অস্থির করছিলো যে আমার বুকের ভেতরটা··।

ব্যাপার এই,—হেমাঙ্গিনীকে সিনেমা হলে বসিয়ে, 'বসুশ্রী' থেকে বেরিয়ে আসার মুখেই প্রতিবেশী অমল সেনের সঙ্গে ধীরার দেখা হয়। সে তার স্ত্রীর জন্য পান কিনতে বেরিয়েছিলো। ধীরা অমল সেনকে দেখে খুশি হলো। বললো, যদি ঠিক সময়ে আমি এখানে এসে না পৌঁছোই, তাহলে মাকে আপনারা সঙ্গে করে নিয়ে গেলে খুশি হবো খুব।—এ আর বেশী কথা কী, নিশ্চয়ই নিয়ে যাবো মাসীমাকে—। তারপর, হেমাঙ্গিনী কোন দিকে বসেছেন অমল সেন দেখতে চাওয়ায়, তাকে সঙ্গে করে দরজার পাশে নিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে হেমাঙ্গিনীকে। ঠিক সেই মুহূর্তে, সনৎ ওদেরকে দেখেছে বাসের জানালা দিয়ে।

ধীরা যত হাসে, তত অপ্রতিভ হয় সনৎ। বারে বারে ধিক্কার দিতে থাকে নিজেকে। ওর মনের অমি এত কাঁচা,—ছিঃ! ছিঃ!···

চা বানালো ধীরা, পাপড় ভাজলো, তারপর টিন থেকে ওদের প্রিয় জিনজারনাট বিস্কিট বার করলো। মুখোমুখি

বসে দুজনে চা খাচ্ছে। কিন্তু, এখনো সনৎ সহজ হতে পারেনি।

চায়ের পেয়ালা নামিয়ে, খিল খিল করে হেসে উঠলো ধীরা, 'অমন ওলকফির মতো মুখ করে চা খাচ্ছো কেন? আমি তোমাকে এমনি ক্ষেপালাম। আসলে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। গোপালের মতো ভালো মানুষ সনৎ মজুমদারও জেলাসী আছে তাহলে।'

'গোপালের মতো ভালমানুষ?' অবোধের মতো মুখ করলো সনৎ।

'কেন, গোপাল বড় সুবোধ বালক—পড়োনি?'

'তার মানে, কী বলতে চাও তুমি?'

'মানে আর এমন কঠিন কী—' কালো টল টলে চোখে হাসি হাসি মুখ নিয়ে তাকালো ধীরা। মানে হলো, তুমি অতি সুবোধ ছেলে, দাদা যাহা করিতে বলেন তাহাই কর, দাদা যাহা নিষেধ করেন প্রাণ গেলেও তাহা করো না—।

দাদা মানে, ধীরার দাদা। ক্লাস টু, গেজেটেড্ অফিসার। সেই দাদা, একদিন, পদমর্যাদা সচেতন গাম্ভীর্য গলায় ফুটিয়ে সনৎকে বলেছিলেন,—যা হার্ট ডেল এখন, কেরাণী অবস্থায় বিয়ে করা কী ঠিক?—আগে অফিসার হয়ে নাও, তারপর বিয়ে, ধীরা এখন কিছু বুড়িয়ে যাচ্ছে না।

ধীরার বিয়ে মানেই, দুশো কুড়ি টাকা আয় কম সংসারের। বি, এ, বি, টি, পাশ করে ভাল স্কুলেই মাষ্টারি করে ধীরা। এমন বুদ্ধু দাদা কে আছে, এই নিশ্চিত আয় থেকে বঞ্চিত হতে চাইবে—যে দাদা পাঁচটি সন্তানের পিতা।

সনৎ চায়ের পেয়ালায় দীর্ঘ একটি চুমুক দিয়ে, নির্নিমেষ চেয়ে রইলো ধীরার চোখের ভেতর। ধীরাও চোখ সরালোনা। চোখে সুন্দর একটি হাসি ফুটিয়ে উত্তর দিলো সনৎ-এর নির্নিমেষ—চাউনির। তারপর আর চার পাঁচ সেকেণ্ড। এক ঝটকায় উঠে, পাশের ঘরে গিয়ে, বাইরে বার হবার পোষাক পরে প্রস্তুত হয়ে এলো সনৎ। 'এই ওঠো, আর এক সেকেণ্ডও দেরী নয়—'

'এত তাড়া কিসের?' সপ্রশ্ন চোখে সনৎকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে উঠে দাঁড়ালো ধীরা।

'হ্যাঁ, আর দেরী নয়, যাকে কথায় অনেক মূল্যবান সময় অপব্যয় হয়েছে'—ক্ষিপ্রহাতে দরজার পাল্লা টেনে তালা লাগালো সনৎ। যেন একমুহূর্ত অপেক্ষা করার ধৈর্য নেই।

লেক টেরাস-এ ধীরাদের বাড়ির দোতলায় উঠতেই, সিঁড়ির সামনে হেমাঙ্গিনীর সাক্ষাৎ পেলো।

'কেমন, ভাল আছো তো বাবা?—' হেমাঙ্গিনীর এ প্রশ্ন শেষ হওয়ার মুহূর্তেই, সনৎ এক কাণ্ড করে বসলো। ধীরার হাত ধরে টেনে, নিচু হয়ে হেমাঙ্গিনীর পায়ের ধুলো নিলো,

'মা, আপনার আশীর্বাদই সব চেয়ে বড় আশীর্বাদ আমাদের জীবনে। আর কিছু চাইনে—। আপনি আমাদের আশীর্বাদ করুন।'

সোজা হয়ে দাঁড়ালো সনৎ। এক মুহূর্ত বিরতি।

'আমি বিয়ে করতে চাই ধীরাকে এবং বিয়ে হবে কালকেই। পুরুত ডেকে শুধু শাখা সিঁদুর দিয়ে ধীরাকে আমার হাতে কালকে সম্প্রদান করুন, দিন-ক্ষণ কিছু লাগবেনা উৎসব একটা হবে নিশ্চয়ই, সেটা মোহ গাছ করে পরে হবে।...' সনৎ-এর কণ্ঠস্বরের মৃদু উত্তেজনা ধীরা টের পেলো, অপর্যাপ্ত খুশি হলেন হেমাঙ্গিনী।

দুজনের মাথায় হাত রেখে গাঢ়কণ্ঠে বললেন,

'তোমরা সুখী হও বাবা, পূর্ণ হও। আমি তো অনেক কাল থেকেই চাইছি, ধীরার বিয়েটা হয়ে যাক, সবার মতো বিয়ে করবেনা, এ সবার কী—'

বিদায় নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে যেন উড়ে এলো সনৎ। 'শোনো—!' সনৎ ঘাড় ফিরিয়ে অবাক হলো। ঝলমল হলো চোখ। অত্যন্ত দ্রুতপায়ে প্রায় ছুটে আসছে ধীরা। কিন্তু, কী অদ্ভুত ব্রীড়াবনতা লাগছে ধীরাকে।

বাস এসে পড়লো। সবাই বাস্তীকে আগে উঠতে দিলো। সনৎ।—কৈ, কিছু বলছেনা তো ধীরা—

'চলি—'

ঠিক সেই মুহূর্তে, যেন কানে কানে বলার মতো ধীরা বললো, 'তোমার সৌজন্যও যে এতখানি আছে সনৎ, আমি জানতাম না, আমাকে মাপ করে তুমি—'

হাত বাড়িয়ে ধীরার হাতে ছোট্ট একটা আঁকুনি দিয়ে সনৎ লাফিয়ে চলন্ত বাস-এ উঠে পড়লো।

এবার পূজায়

হিজ মাষ্টার্স ভয়েস • কলম্বিয়া

রেকর্ড নির্বাচন প্রতিযোগিতায়

১০৩ টি পুরস্কার

এবার পূজায় ২৩ খানি "হিজ মাষ্টার্স ভয়েস" ও কলম্বিয়া রেকর্ড বেরিয়েছে, বিস্তারিত তালিকা ডীলারদের দোকানে পাবেন। সেই রেকর্ডগুলি হতে আপনার পছন্দ অনুসারে ছয়খানি রেকর্ড বেছে দিয়ে আপনিও একটি মূল্যবান পুরস্কার পেতে পারেন। প্রতিযোগিতার প্রবেশপত্র বিনামূল্যে ডীলারদের দোকানে বা সরাসরি গ্রামোফোন কোম্পানী হতে পেতে পারেন। প্রবেশপত্র পাঠাবার শেষ তারিখ ৩১শে অক্টোবর '৬২।

দ্বিতীয় পুরস্কার
এইচ. এম. ভি. এক্সপোর্ট-৯
ট্রানজিসটর ৯-ব্যাণ্ড রেডিওগ্রাম

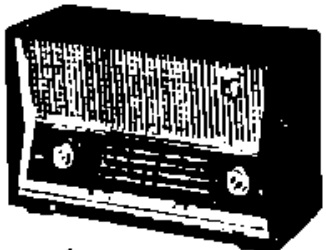

প্রথম পুরস্কার
এইচ. এম. ভি রেডিও
মডেল ৫২৬১
এ.সি/ডি. সি

তৃতীয় পুরস্কার
এইচ. এম. ভি. পার্শা
৯-ব্যাণ্ড রেকর্ড-প্লেয়ার
এটচ ভেট এ. সি. অথবা
ডাইব্যাটারি
চালিত।

আরও একুশটি বিশেষ পুরস্কার

বিস্তারিত নিয়মাবলী ও প্রবেশপত্র অনুমোদিত এইচ. এম. ভি · কলম্বিয়া ডীলারের দোকানে পাবেন।

দি গ্রামোফোন কোং লিঃ : কলিকাতা : বোম্বাই : মাদ্রাজ : দিল্লী

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

বাপ মা কারোরই মত ছিলনা। ঘরের মেয়েছেলে আবার স্কুল করে নাকি? যত সব অনাসৃষ্টি কাণ্ড। কাজ কর্ম করতে হয় ঘরে বসে কর। বাইরে যাওয়া চলবেনা।

কল্যাণী বলল, 'অনন্তদা যে আমাকে বড্ড ধরেছেন। তাছাড়া এও তো ঘরের মধ্যেই। বেশি দূর তো যেতে হবেনা। অনন্তদাদের বইরের ঘরে স্কুল বসবে। পরে ওরা বাইরের থেকে মেয়ে মাষ্টার আনবেন। কিন্তু এখনকার মত কাজ চালিয়ে নেওয়ার জন্যে সবাই বলছেন আমাকে। পাড়ায় আর কেউ নেই যে ভার নেওয়ার মত।'

ইলেকসানের সময় খেটে খুটে ভাগের ভাগ শ'পাঁচেক টাকা পেয়েছে কুমোর পাড়ার যুবসঙ্ঘ। কেউ বলেছিল এ টাকায় সখের থিয়েটার পার্টি করা যাক। বুড়োরা বলেছিলেন হরি-সভার জন্যে শতরঞ্চি আর সামিয়ানা কেন। কিন্তু যুবসঙ্ঘের সেক্রেটারী অনন্ত পাল বলল, 'পাড়ায় মেয়েদের কোন স্কুল নেই। এই টাকা দিয়ে গার্লসস্কুল করব।'

গার্লসস্কুল এ-গাঁয়ে তো ভালো আশেপাশের পাঁচখানা দশখানা গাঁয়ের মধ্যেও নেই। ছেলেদের একটা প্রাইমারী স্কুল আছে। সেখানেই কমবয়সী মেয়েরা দু'এক বছর পড়ে। তারপর তের চৌদ্দ বছর হতে না হতেই তাদের বিয়ে হয়ে যায়। ছেলেদের হাইস্কুল আছে মাইল চারেক দূরে তুলসীপুরে। সেখানে ছেলেরা গিয়ে পড়ে। অতদূরে মেয়েরা যায় কি করে?

বুড়ো মাতব্বররা বলল, 'স্কুল তো নয় যতসব বদমায়েসের আড্ডা হবে। লেখাপড়া শিখে নিজেরাই উল্টে দিয়েছে। এখন মেয়েদের বিদ্যাদিগগজ করা বাকি।'

কিন্তু অনন্ত হরির জোর আছে। সে বলল স্কুল আদি করবই। ঘর তুলতে টাকা লাগে। সময়ও দরকার। নিজের বাইরের ঘরখানাই ছেড়ে দিল অনন্ত। বেঞ্চিল চেয়ার ব্লাকবোর্ড, আর বেঞ্চ এনে সাজিয়ে দিল ঘর।

কিন্তু মাষ্টার নিয়ে সমস্যা দেখা দিল। বুড়ো মাতব্বররা বলল, 'ছোকরারা কেউ পড়ালে আমরা সেখানে কেউ মেয়ে পাঠাবনা। মেয়েদের পড়াতে হলে মেয়ে মাষ্টার চাই।'

অনন্তের স্ত্রী কমলা বলল, 'দরকার নেই তোমার ও সব রেষারেষির মধ্যে গিয়ে। ফেলে দাও ওদের টাকা। কী হবে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে।' তারপর সেই কমলাই খোঁজ দিল কল্যাণীর।

কমলা বলল, 'আমাদের কলিকে রাখনা এখনকার মত। রামায়ণ মহাভারত পড়তে পারে। চিঠিপত্র লিখতে পারে। শুনেছি অঙ্ক টঙ্কও জানে। এখনকার মত ওকে দিয়েই কাজ চলুক। মাইনে পাঁচ সাত টাকা দিলেও চলবে, না দিলে ও

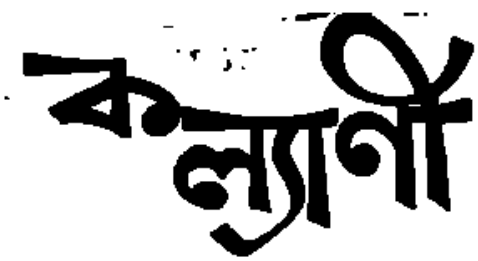

চলবে। তারপর স্কুল বড় হলে সুবিধে মত বুঝেসুঝে যা করবার হয় কোরো।'

মুকুন্দ পাল সম্পর্কে জ্যাঠা হয় অনন্তর। তারই মেয়ে কল্যাণী। অল্পবয়সে বিধবা হয়েছে। বাপ মার কাছে থাকে। লেখাপড়াটুকু নাকি স্বামীর কাছেই শিখেছিল।

অনন্ত গিয়ে কল্যাণীকে ধরল তার খোঁজ যে কমলা দিয়েছে সে কথাও জানাল অনন্ত। কল্যাণী যদি রাজী হয় তবেই পাড়ার মুখ থাকে।

এর পরেও কি কল্যাণী রাজী না হয়ে পারে? সারা গাঁয়ের মধ্যে বিদুষী মেয়ের সন্ধান কেবল তারই জুটেছে।

স্বামী মহীতোষ থাকত দমকুমা শহরে। সে ছিল ম্যাট্রিকুলেশন পাশ। চাকরি ব্যবসা কোনদিন করেনি। রেজিস্ট্রী অফিসে দলিল-পত্র লিখত। যতদিন বেঁচে ছিল বাসা করে শহরেই রেখেছিল বউকে। গয়নাগাঁটি বিশেষ কিছু দেয়নি। কিন্তু রাতে রাতে লেখাপড়া শিখিয়েছে।

প্রথম প্রথম তো কল্যাণীর রাগই হত, বলত তোমার কেবল পড়া আর পড়া। ও ছাড়া তোমার মুখে আর কোন কথা নেই।'

মহীতোষ হেসে বলত, 'থাকবে না কেন। পড়াটুকু শেষ কর। তখন সে সব কথা হবে। সারারাত তো পড়েই আছে।'

কখনো ধমকে কখনো সোহাগে আদরে বউকে নিয়মিত পড়াত মহীতোষ। বেঁচে থাকলে হয়তো নিজের সব বিদ্যা দান করত, ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করাত। কিন্তু আয়ুতে বেড় পেলনা। কল্যাণী থার্ডক্লাসে এসে পৌঁছতে না পৌঁছতেই সে যাত্রা গেল। স্বামীর কাছে অঙ্ক, বীজগণিত, ইতিহাস ভূগোল সবই পড়েছিল কল্যাণী। সতের বছর বয়সে বিধবা হয়ে বাপের বাড়িতে ফিরে এল। ভাবেনি এ সব পড়াশুনো কোন কালে লাগবে। তিন চার বছরের মধ্যে তো আর কোন চর্চা ছিলনা। কিছু কি আর মনে আছে?

অনন্ত বলল, 'যা মনে আছে তাতেই হবে। মেয়েরা তো প্রথম প্রথম বাল্যপাঠ আর ধারাপাত-টারাপাতই পড়বে। ওরা বড় হয়ে উঠতে না উঠতে তুই সব ঝালিয়ে নিতে পারবি।'

কমলাও বলল, 'তার কি। ঠিক পারবে।'

কল্যাণী বলল, 'ডুবিও এলোনা বউদি। দু'জনে মিলে দু'সপ্তাহে একবার করে এসে বাড়িঘর আর স্কুলের খোঁজ খবর নিয়ে যাব।

কল্যাণী একটু একা পড়ল। তারপর ছাত্রী আরো বাড়তে থাকায় অনন্তদার অনুমতি নিয়ে সে আরো একজন টিচার নিল স্কুলে। তাদের পাড়ারই মেয়ে সেবাদাসী পাল। সেবা সামান্য লেখাপড়া জানে। তবে ভাগ্য বড় খারাপ। ঝগড়াঝাটি করে ওর স্বামী সেবাকে বাপের বাড়িতে ফেলে রেখে গেছে। ফের নাকি বিয়েও করেছে শোনা যায়।

সেবা বয়সে বড় কল্যাণীর চেয়ে। চার পাঁচ বছরের বড় তো হবেই। কিন্তু বিদ্যায় ঘাটে। বলে তাকে ছোটদিদিমণির পদই নিতে হল। কল্যাণী নিজে কিন্তু তাকে সেবাদি বলেই ডাকে। সম্মান করে কথা বলে। মাইনেও সমানই নেয়। তবু সেবার মুখভার আর যায়না।

স্কুলে চারটি ক্লাস ছিল। আরো একটি ক্লাস বাড়ল। সেটি বড় মেয়ের ক্লাস। পাড়ার বউঝিরা দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর কল্যাণীর কাছে আসতে লাগল চিঠি লেখাতে। যাদের স্বামী বিদেশে থাকে চিঠি ছাড়া তাদের উপায় কি।

প্রথম প্রথম ভারি আপত্তি করল কল্যাণী। শেষে বউদের কাকুতি মিনতিতে না লিখে দিয়েও পারলনা। স্কুলের স্কুল করি।'

কমলা হেসে বলল, 'আমি কি পোড়া ছাই কিছু জানি? তোমার দাদা কি আমাকে কিছু শিখিয়েছে? সবাই কি আর তোমার স্বামীর মত?'

কল্যাণী জানে চিঠিপত্র কোন রকমে লিখতে পারে কমলা। পড়তে ও পারে।

অনন্ত বলল 'তোমার বউদির পেটে আর এক ধাপ ওপরে। ও হল অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী।'

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে জন পঁচিশেক মেয়ে এল। কল্যাণী ভারি খুসি। চারটে ক্লাসে ভাগ করে ফেলল তাদের। হাজিরা খাতা করল মাইনের খাতা করল। অনুষ্ঠানের

কোন ত্রুটি নেই। কোন স্কুলে যদিও পড়েনি কল্যাণী তবু স্কুল কি করে চালাতে হয় মোটামুটি একটা ধারণা তো আছে অনন্ত ও এসব ব্যাপারে তাকে সাহায্য করল।

কিন্তু মুসকিল হল অনন্ত পাঁয়ে সব সময় থাকে না। তার ও চাকরি সহরে। উকিলের সেরেস্তায় মুহুরিগিরি করে অনন্ত। প্রথম প্রথম হোটেলে খেত। তারপর বাসা করে বউকে নিয়ে গেল। বুড়ী পিসীকে রেখে গেল বাড়ি পাহারা দেওয়ার জন্যে। সপ্তাহে কি বাজ বার শেষ হলে ছাত্রীরা সব চলে গেলে কল্যাণী ওদের নিয়ে বসতে লাগল। 'বল কি লিখতে হবে।'

এখানকার বেশি পুরুষই পাঁয়ে থাকে। মাটির হাঁড়ি কলসী গড়ে। বিক্রি করবার জন্যে বর্ষার সময় নৌকোয়, অন্য সময় গরুর গাড়িতে কেউ কেউ বা নিজের মাথায় করে শহরগঞ্জে নিয়ে যায়। কেউ কেউ চাষ আবাদ করে। আবার দুচারজন বাইরেও চলে যায় চাকরি বাকরি করতে। তাদের বউদের বড় দুর্ভাবনা। হা পিত্যেশ করে বসে থাকতে হয় একখানা চিঠির জন্যে। চিঠি এলে তার জবাব লিখিয়ে নেওয়ার জন্যে সাধাসাধি করতে হয় পাড়ার স্কুলের ছেলেদের। বড় লজ্জা করে! তাদের কাছে কি আর সব কথা বলা যায়।

কল্যাণী ওদের মনের কথা বোঝে। চমৎকার সাজিয়ে গুছিয়ে দেয়। যে সব কথা বউরা বলেনি, ভাবেনি তাও লেখে। সাধআহ্লাদ আদর সোহাগের কথা সবই জানে কল্যাণী। জানবে না কেন। চিরকাল তো আর বিধবা ছিল না।

লিখতে কল্যাণীরও ভালো লাগে। পরের স্বামীর কাছে চিঠি লিখতে লিখতে মাঝে মাঝে তার মন বড় উদাস হয়ে যায়। আর একজনের কথা বড় বেশি করে মনে পড়ে। কল্যাণী বলে 'আচ্ছা এখন তুমি যাও বউ। আমি চিঠিটা পরে লিখে রাখব।'

কিন্তু এই চিঠিই হল কাল। চিঠি নিয়েই গোলমালটা বাঁধল।

সেদিন স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর মেয়েদের ছোট ছোট ভাগ অঙ্ক শেখাচ্ছে কল্যাণী।

ভিতরের ঘর থেকে কমলা এসে বলল, 'কল্যাণী একবার এদিকে এসোতো, তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

কল্যাণী বলল, 'ওদের ক্লাসটা শেষ হোক বউদি তারপরে যাচ্ছি। কবে এলেন আপনারা?'

কমলা সে কথার কোন জবাব না দিয়ে বলল, 'জরুরী কথা তুমি এক্ষুণি এসো।'

কল্যাণী বাধ্য হয়ে এবার উঠে এল।

ভিতরের ঘরখানি বেশ সাজানো গুছানো। খাট আছে আলমারি আছে। তাকের ওপর নানা রকমের খেলনা সাজানো। ছেলে কে? কমলা বউদির তো কোন ছেলে পুলে হয়নি।

কমলা খাটের কোণে বসে কল্যাণীকে একটা চেয়ার দেখিয়ে দিল।

কল্যাণী বলল বসব না বউদি, ক্লাস আছে। বল, কী বলবে বল।'

কমলা প্রথমে একটু ভনিতা করে নিল, 'দেখ কল্যাণী তোমার দাদা যখন মাস্টার খোঁজাখুঁজি করছিলেন, আমিই তোমার কথা বলেছিলাম। আমারই পরামর্শ নিয়ে তোমার দাদা—।'

কল্যাণী বলল 'তাতো জানি বউদি। তোমাদের দয়াতেই—'

কমলা বলল 'দয়া ধর্মের কথা নয়। তোমার গুণ আছে। তোমাকে আমরা বিশ্বাসও করেছি। তুমি কিন্তু সেই বিশ্বাসের মান রাখনি ভাই।'

কল্যাণীর মুখ ম্লান হয়ে গেল। কিছু বুঝতে না পেরে বলল, 'কেন বউদি কী করেছি আমি।'

কমলা বলল, 'যা করেছ তা মুখে আনা যায় না। অল্প বয়সে তুমি বিধবা হয়েছ। সে জন্যে আমাদের সবাইরই দুঃখ হয়। কিন্তু মেয়েদের যান সম্মান আলাদা জিনিস। তুমি এই স্কুলের হেডমিস্ট্রেস। আর স্কুলে বসেই তুমি প্রেম-পত্র লেখ। ছি ছি ছি। তুমি তোমার দাদার মুখ হেঁট করে ছেড়েছ কল্যাণী।'

কল্যাণী অবাক হয়ে বলল, 'প্রেমপত্র আবার কখন লিখলাম বউদি।' তারপর কি একটা কথা মনে পড়ল কল্যাণীর। হেসে বলল, 'মাধু মল্লিক—ওরা ওদের স্বামীর কাছে চিঠি লেখাবার জন্যে আসে। ওদের এড়াতে পারিনে বউদি। স্কুল ছুটি হয়ে গেলে আমি ওদের চিঠি লিখে দিই। তুমি কি সেই চিঠির কথা বলছ?'

কমলা বলল, 'তোমার মত বিধবা মেয়ের পক্ষে অমন চিঠি লেখাও পাপ। কিন্তু শুধু পরের চিঠিই বা কেন হবে। তোমার নিজের লেখা চিঠিই আমি পেয়েছি। অঙ্কের বইয়ের মধ্যে গুঁজে রেখেছিলে।'

কল্যাণী বলল, 'কই দেখি।'

কমলা কল্যাণীর হাতের লেখা একখানা চিঠি দেখাল। সে চিঠি শেষ হয়নি। পাতাখানেক লিখেছিল কল্যাণী, পড়লে ভালোবাসার চিঠি বলে যে কেউ বুঝতে পারে।

কল্যাণী বলল, 'ও এবার বুঝেছি। ও চিঠিতো মাধুরীর, খানিকটা লিখেছিলাম। তারপর কোথায় যে লেপ খুঁজে পাইনি চিঠিটা। ভাবলাম মাধুরীই নিয়ে সরে পড়েছে। এ চিঠি তুমি কোত্থেকে পেলে বউদি।'

কমলা বলল, 'অঙ্কের বইয়ের মধ্যে। খাতে ভরা ছিল চিঠি। বেশ বোঝা যায় কারো একজনের জন্যে রাখা ছিল!

কে রাখল চিঠি তাই শুনি?'

সেবার নামটাই প্রথমে মনে এল কল্যাণীর। কিন্তু চট করে বলতে বাধল। দেখেনি যখন বলাটা ঠিক হবেনা।

কল্যাণী বলল, 'কে রাখল খোঁজ নিচ্ছি বউদি। এতো বড় অবাক কাণ্ড।'

কমলা বলল, 'খোঁজ নেওয়ার আর কিছু নেই কল্যাণী। আমি সব বুঝতে পেরেছি। এ স্কুল আমি রাখব না। এসব ব্যাপারে কাণ্ড আমি সইতে পারব না। এ স্কুলে তুমি আর এসোনা কল্যাণী।'

কল্যাণী একটু কাল স্তব্ধ হয়ে থেকে বলল, 'অনন্তদার ও কি এই কথা?'

কমলা চীৎকার করে উঠল, 'তাছাড়া কি। তুমি কি-ভেবেছ অনন্তদা সব সময় তোমার পক্ষ নিয়ে লড়বে? আমি বুঝি মরে গেছি? গাঁয়ে বুঝি আর মানুষ নেই?'

কল্যাণী আর কোন কথা বলল না। ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। স্কুলে এসে দেখে মেয়েরা গোলমাল শুরু করেছে। তাদের ধমক দিয়ে শান্ত করল। দ্বিতীয় শ্রেণীর মেয়েদের যে অঙ্কগুলি বোঝানো বাকি ছিল সেগুলি বুঝিয়ে দিল। তারপর বাংলা পড়াল, ইতিহাস ভূগোল পড়াল তৃতীয় শ্রেণীতে। খানিক বাদে স্কুলের সব ক্লাস ছুটি দিয়ে দিল। সেবাকে বলল, 'তুমি এবার যেতে পার। আমার দরকার আছে। পরে যাব। সেবা চলে গেলে কাগজ কলম নিয়ে কল্যাণী এবার সত্যিই একখানা চিঠি লিখতে বসল। তার নিজের জবানীর চিঠি। স্কুলের হেড-মিস্ট্রেসের লেখা। সেক্রেটারী মহোদয় সমীপেষু।

রক্তগোলাপ

(৪৫২ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

কাঁপছিল। যেন হাঁটু দুটোতে জোর ছিল না। তার মাথাটা তখনো ঘুরছিল।

রাস্তায় নেমে সুকুমার বলল, 'আসুন দাদা, একটু চা খেয়ে নিই।'

প্রিয়বাবু ঘাড়টা শুধু কাত করলেন। তাঁর গলার ভিতর অনেকক্ষণ শুকিয়ে আছে। এমনিও চা খাবার সময় পার হয়ে গেছে। বেলা একটায় অফিসে চা দেওয়া হয়। আজ আর চা করবে কে! স্টোভই ধরান হয়নি।

প্রিয়বাবুর হাত ধরে সুকুমার রাস্তার পাশের একটা ছোট মতন দোকানে ঢুকল। ইচ্ছা করেই ছোট দোকানে ঢুকল এবং নিরিবিলি দেখে দুজনে কোণার দিকের একটা বেঞ্চিতে পাশাপাশি হয়ে বসল। সুকুমার পাকেট থেকে সিগারেট তুলে প্রিয়বাবুর হাতে দিল। যন্ত্রের মতো প্রিয়বাবু হাত বাড়িয়ে দেন। অতঃপর সুকুমারই দেশলাই জেলে প্রিয়বাবুর সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করল। চা এল। চায়ে চুমুক দিয়ে একটু যেন প্রকৃতিস্থ হন প্রিয়বাবু। এবার ভাল করে সুকুমারের চোখ দুটো দেখেন। সুকুমারও প্রিয়বাবুকে দেখছিল। অর্থাৎ এই মুহূর্তে দুজনে যে ঠিক একটা কথাই ভাবছেন পরস্পরের চোখ দেখে তারা বুঝতে পারলো।

সুকুমার মৃদু হাসল।

প্রিয়বাবু হাসলেন না। গভীর নিশ্বাস ফেললেন। তারপর অত্যন্ত চাপা গলায় সুকুমারকে প্রশ্নটা করলেন।

সুকুমার প্রশ্নটা শুনে তৎক্ষণাৎ কোন উত্তর করল না। বরং একটা ঠোঁটের ওপর আর একটা ঠোঁটের চাপ রেখে কাপের চা-টার দিকে তাকিয়ে রইল। প্রিয়বাবু বুঝলেন, সুকুমার বিষয়টা খুব ভাল করে জানে অথচ কথা বলছে না। প্রিয়বাবু যে অন্ধকারে হাতড়াচ্ছেন এটা বুঝতে পেরেও সুকুমার চুপ করে আছে দেখে হঠাৎ সুকুমারকে হৃদয়হীন মনে করতে প্রিয়বাবু ইতস্ততঃ করলেন না। তাই কাতর চোখে তিনি সুকুমারের দিকে চেয়ে রইলেন।

কিন্তু সুকুমার যদি হৃদয়হীন হত তো এতটা সময় সে প্রিয়বাবুর সঙ্গে কাটাত না, তাঁকে অফিস থেকে টেনে এনে সুস্থ হবার জন্য চা খেতে বলত না। এই চা কেক সিগারেটের পয়সা সুকুমার দেবে তাতেও সন্দেহ ছিল না। প্রিয়বাবু সুকুমার সম্বন্ধে অথবা অন্যান্য রকম ধারণা পোষণ করছেন, চিন্তা করে তিনি অনুতপ্তই হলেন।

দুজন চা শেষ করল।

সুকুমার এদিক ওদিক তাকাল। তারপর প্রিয়বাবুর কানের কাছে মুখটা সরিয়ে নিয়ে তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিল। প্রিয়বাবু হাঁ করে রইলেন প্রথমটায়। তারপর ফিসফিসে গলায় বললেন, 'এই লক্ষ ছেলেটাকে মেরে ফেলল নলেন!'

'এই জন্যই তো পৃথিবীতে যত খুন জখম মারামারি-কাটাকাটি—এই দুটো জিনিস নিয়ে তো যত গণ্ডগোল।' সুকুমার মৃদু শব্দ করে হাসল। 'কামিনী আর কাঞ্চন।'

প্রিয়বাবু আর কথা বললেন না।

'চলুন ওঠা যাক।' সুকুমার বলল।

যন্ত্রের মতো প্রিয়বাবু উঠে দাঁড়ালেন। সুকুমার বিল চুকিয়ে দিল। রাস্তায় নেমে প্রিয়বাবু আবার ফিসফিসে গলায় বললেন, 'আজ সুলোচনা আসেনি তো অফিসে।'

'না।' সুকুমার উত্তর করল।

'কিন্তু মোটে তো মাস খানেক হল টাইপীস্ট মেয়েটা মানে সুলোচনা এই অফিসে ঢুকেছে।' প্রিয়বাবু বিড়বিড় করে বললেন।

'এর মধ্যেই নলেন আর অরুণ উঠে পড়ে লেগেছিল ওর মন পেতে।' সুকুমার জবাব দিল।

'ছি ছি!' প্রিয়বাবু ঘৃণায় ঘাড় নাড়লেন। তারপর মুখের স্বর বার করলেন। 'ইস্ একেবারে খুন করে বসল নলেন।'

সুকুমার নীরব থেকে হাঁটতে লাগল।

'আমি তো কল্পনাও করতে পারিনি যে একটা মেয়েকে নিয়ে তলে তলে ওরা—,

সুকুমার ঘাড় নেড়ে ঈষৎ হাসল।

'বুড়ো মানুষ—আপনি, যুবক যুবতীদের হাবভাব মনের খবর কি করে টের পাবেন।'

প্রিয়বাবু কথাটা মেনে নিলেন। তাই শুধু মাথা নাড়লেন। আর একটু হাঁটবার পর তিনি সুকুমারকে বললেন, 'আর আসছ কেন ব্রাদার—তুমি তো উল্টো দিকে যাবে। আমি এখান থেকে বাস ধরতে পারব। আর তোমাকে কষ্ট করতে হবে না।'

'ঠিক পারবেন তো—সাবধানে রাস্তাটা ক্রস করবেন।' সুকুমার দাঁড়িয়ে পড়ল।

'খুব পারব খুব পারব। তুমি আমার জন্য যথেষ্ট করেছ আজ।' আবেগে সুকুমারের কাঁধে একটা হাত তুলে দেন প্রিয়বাবু। 'সত্যি ভায়া, আজ অফিসের ঐ দৃশ্য দেখে আমি একটা বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম, যেন চোখে মুখে অন্ধকার দেখছিলাম, যেন আমি আমার নিজের মধ্যে ছিলাম না।'

'খুব স্বাভাবিক। আচ্ছা, চলি।'

প্রিয়বাবু ঘাড় কাত করলেন। সুকুমার চলে গেল।

যতক্ষণ বাস্-এ থাকলেন প্রিয়বাবুর চোখের সামনে বার বার অরুণের ভূলুণ্ঠিত রক্তাপ্লুত অচেতন দেহটা—আধ-বোজা চোখ দুটো' ভেসে বেড়াতে লাগল। এতক্ষণ তবু সুকুমার সঙ্গে ছিল। কথাবার্তা বলে মনটা অন্যদিকে বিক্ষিপ্ত রাখতে পেরেছিলেন। এখন তিনি একলা। গাড়ির ভিড়ের মধ্যেও তিনি নিঃসঙ্গ অসহায়। কিছুতেই সেই ভয়ংকর দৃশ্যটা ভুলে থাকতে পারছিলেন না। সেই রেললাইনের কাটা বিড়াল, পিক্-পকেটের নাক দিয়ে দরদর করে রক্ত পড়া, কবে কোনদিন দেখেছিলেন আর একবার মনেও হল না। কেবল অরুণ আর অরুণের রক্তের ছবি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলল।

বাস্ থেকে নেমে আবার তিনি অবসাদ বোধ করতে লাগলেন। যেন হাঁটতে পারছেন না। হাঁটু দুটো ভেঙে পড়ছে। বলতে কি বাড়ির দিকে তিনি যত এগোচ্ছিলেন যেমন একটা ভয় তাঁর বুকের ভিতর জেগে থাকতে লাগল। যেন বাড়িতে ঢুকে কি একটা দুর্ঘটনার কথা শুনতে পাবেন। যেন এবার তাঁর নিজের কোন মানুষের, তাঁর স্ত্রী পুত্র বা কন্যার সাংঘাতিক রক্তপাত হচ্ছে এমন একটা দৃশ্য দেখতে পাবেন। কেন রক্তপাত হবে কি ভাবে রক্ত পড়বে চিন্তা করার শক্তি প্রিয়বাবুর লোপ পেয়েছিল। তিনি শুধু ভাবছিলেন সারাদিন যেভাবে কেটেছে, যে সব দৃশ্য দেখেছেন এখন বাড়িতে ঢুকে এমন কিছু নিশ্চয় তাঁকে দেখতে হবে।

এই অশুভ চিন্তাটা তাঁকে এত বেশি ক্লান্ত বিমর্ষ করে ফেলল যে বাড়ির কাছে পৌঁছেও প্রিয়বাবু বাড়ির দিকে না গিয়ে বাড়ির কাছের পার্কটায় ঢুকে পড়লেন। বিকেল হয়ে গেছে। পশ্চিম আকাশে অনেক রক্ত ছেলে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। আশ্চর্য, প্রিয়বাবু একলা একটা বেঞ্চির ওপর চুপ করে বসে থেকে কেবল রক্তরঞ্জিত আকাশটাই দেখলেন। অন্য কোন দৃশ্য দেখার, অন্য কোন শব্দ শোনার কথা যেন তিনি চিন্তাও করতে পারছিলেন না। পাখি ডাকছিল, ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছিল; কিন্তু প্রিয়বাবু সেসব কিছুই দেখলেন না অনুভব করলেন না। সারাদিনের ঘটনাগুলি তাঁর মানসিক কাঠামোটা যে তেমেচুরে একেবারে অন্যরকম করে দিয়েছে বেশ বোঝা যাচ্ছিল।

তিনি যখন পার্ক থেকে বেরোলেন তখন অন্ধকার হয়ে গেছে।

বাড়ির দরজায় পৌঁছে সজোরে কড়া নাড়ছিলেন আর প্রিয়বাবুর হাত কাঁপছিল। দরজা খুলে গেল।

প্রিয়বাবুর মেয়ে অনু দরজা খুলে দিল। অনুর দু হাতে রক্ত —যেন কনুই পর্যন্ত রক্তের ধারা গড়িয়ে এসেছে।

'একি!' মেয়ের হাতের দিকে তাকিয়ে প্রিয়বাবু ধমকে উঠলেন, দু হাতে চৌকাঠটা আঁকড়ে ধরলেন, যেন তিনি পড়ে যাচ্ছিলেন।

'কি বাবা, তুমি এমন করছ কেন।' অনুও ভয় পেল। 'তোমার শরীর খারাপ করেছে?'

'এগুলো কি, এসব কি!' মেয়ের হাতের দিকে চোখ রেখে প্রিয়বাবু বিড়বিড় করছিলেন।

'ও, তাই বলো।' অনু এবার বুঝল, নিজের রক্তমাখা টুকটুকে ফরসা সুন্দর হাত দুটো দেখতে দেখতে হাসল। 'মুণি জবাই করেছে, আমি ধরেছিলাম, কেমন করে রক্ত বেরিয়ে গেল।'

'মুণি!' প্রিয়বাবু এতবড় একটা ঢোক গিললেন।

'বা-রে! তুমি তো শুনে গেলে সকালে। অফিসে আমার টেনডিমেন্ট হয়েছে। আজ বাড়িতে কিস্টি হবে। দুটো মুণি আর এত মাছ নিয়ে এসেছে দাদা।'

যেন বিশাল পাথরের একটা বোঝা নেমে গেল প্রিয়বাবুর বুক থেকে। তিনি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারলেন। মুখে হাসি ফুটল। দিনটা এমন বিশ্রী কেটেছে যে বাড়ির এতবড় একটা সুখবর তিনি একেবারে ভুলে ছিলেন।

রাত্রে সকলের সঙ্গে খেতে বসে প্রিয়বাবু ধীরেসুস্থে সারাদিনের রক্তপাতের ঘটনাগুলো বলতে আরম্ভ করলেন। সেই রেললাইনের কাটা-বিড়াল থেকে গল্প শুরু হল।

....for efficient service & expert advice on all Banking matters...

THE BANK OF INDIA LIMITED

Capital Authorised	...	Rs	10,00,00,000.
Capital Issued & Subscribed	...	Rs.	5,50,00,000.
Capital Paid-up	...	Rs.	3,00,00,000.
Reserve Fund & other Funds		Rs.	3,28,00,000.
Working Funds	...	Rs.	147,18,00,000.

The Bank of India Ltd. with its many branches in India and Overseas and a network of over 500 correspondents practically throughout the world offers a complete range of Banking services including every type of Foreign Exchange Business.

Branches at Calcutta

21-B, Netaji Subhas Road, (Main Office)
59, Cotton Street, (Barn Bazar)
3, Chittaranjan Avenue, (Chowringhee Sq Branch)
67A, Ashutosh Mukherjee Road, (Bhowanipur Branch)

(With safe-deposit vault : Lockers available on attractive terms)

T. D. Kansara
General Manager

S. K. Chaudhury
Agent,
Calcutta Branch.

Our
Homoeopathic Medicines
are genuine and cheap

M. Bhattacharyya & Co (P) Ltd.,

73, Netaji Subhas Road, Calcutta-1

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মানুষটিকে যদি আমি পশ্চিম ভারতের অজন্তা-ইলোরায় এমন ক'রে প'ড়ে থাকতে দেখতাম, তাহলে ভালো হ'তো। ভালো হ'তো যদি দেখতাম তাকে মধ্য ভারতের সাঁচী স্তূপে, কিম্বা, দক্ষিণ ভারতের নাগার্জুন-কোণ্ডায়। তাহলে, পরিবেশটা বোঝানোর পক্ষে আমার কাজ বহুলাংশে সহজ হ'তো। কারণ, 'অজন্তা-ইলোরা-সাঁচী-নাগার্জুন' প্রায় সবারই জানা। জানা নেই 'বোরবুনো কোণ্ডার' কথা।

আমারও কি জানা ছিল! ইতিহাসের গবেষক আমি নই; এমন কি, সৌখীন ভ্রমণকারী হিসাবেও আমাকে গণ্য করা যায় না! আমি আর পাঁচজন দরিদ্র বাঙালীর মতোই ঘরকুনো, বড়োজোর পুজোর ছুটির আগে ম্যাপ্ খুলে আগ্রা-দিল্লীর স্বপ্ন দেখতে বসি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত, এই আমার জীবনেও বাধ্যতামূলক ভ্রমণ শুরু হলো একদিন। অর্থাৎ, জীবিকা পরিবর্তন ক'রে সেদিন যে-কর্মচক্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছিলাম, সেখানে কর্মব্যপদেশে ভ্রমণ আমার লেগেই ছিল। যখনই আদেশ হলো এখানে যাও কিম্বা সেখানে যাও,-তখন অসীম বিরক্তিতে মন ভরে উঠলেও,—ট্রেণ যেই ষ্টেশন ছাড়াতো,-অমনি ধাবমান রথচক্রে জাগ্রত এক ঘর্ঘর ছন্দ; আর মনে হতো,-সেই ছন্দে আর সেই সুরে শরীরের সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রী যেন রিন্‌ঝিম্ রিম্‌ঝিম্ করে বাজতে শুরু করেছে, সঙ্গে সঙ্গে আমার মনটাও বুঝি পরিবর্তিত হয়ে চলেছে!

এই পরিবর্তিত মনটাই, কোথাও গেলে, হোটেলের ঘরে কিম্বা করণীয় কর্মতালিকার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে না থেকে, আশে-পাশের দ্রষ্টব্য বস্তু দেখে বেড়াতে নিয়ত উৎসুক থাকত। এত কথা বলবার উদ্দেশ্য এই যে, অনুরূপ-কর্মে নিযুক্ত বহু ভ্রমণ-কারীর সঙ্গে বহু ব্যাপারে আমার সাক্ষাৎকার ঘটেছে, যাঁরা হোটেলের ঘর আর অফিস-পাড়া ছাড়া আর কোথাও বেরুতে চাইতেন না; খুব পীড়াপীড়ি করলে হয়ত, কাছের কোনো মন্দির বা নদীর তীর একটু ঘুরে এলেই সন্তুষ্ট থাকতেন। আমার ব্যাপারও এদের মতো হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু বাইরে

বেরুলে, নিজেকে লক্ষ্য ক'রে নিজেই অবাক হয়েছি। কেমন যেন সম্মোহিত মানুষ হয়ে গেছি! যে-যায়গা দুবার ঘুরেছি, যে বস্তুটা দু'বার দেখেছি,-সেখানেও সুযোগ পেলে যেতে ইচ্ছা করত পুনর্বার। চিকা ছাড়িয়ে-বহরমপুর গঞ্জাম ছাড়িয়ে-অন্ধ্রের সীমাচলমেই যে কবার গেছি, তার ইয়ত্তা নেই!

কোনো যে উদ্দেশ্য থাকত এমন কিছু নয়। এ-এক নেশা, এবং বড়ো মারাত্মক নেশা। বেশী কথা কী, আমি কলকাতার গণ্ডীর মধ্যেই এমন মানুষ দেখেছি। কোনো উদ্দেশ্য-নেই কিছু নেই, ফুটপাথে-ফুটপাথে কর্মচঞ্চল ব্যক্তিটির মতো অথবা কিছুক্ষণ ঘুরে এলো। সকাল-সন্ধ্যা যেমন চায়ের দোকান অনেককে প্রবল ভাবে আকর্ষণ করে,-জনযানমুখর কালো পিচ্-ঢালা রাজপথও অনেককে সমান ভাবে টানতে থাকে! এই টানেরই বৃহত্তর পরিব্যাপ্তির কথা এতক্ষণ বলছিলাম।

মাদ্রাজ যেতে ওয়ালটেয়ারের ঠিক পরবর্তী ষ্টেশন,—অনকাপল্লী। এই অনকাপল্লী রেলষ্টেশনের ঠিক বিপরীত দিকে, অর্থাৎ শহর যে-দিকে সবচেয়ে বিস্তার লাভ করেছে, তার উল্টো দিকে, প্রকাণ্ড একটা মাঠ আছে, তার কিছুটায় ধান বুনেছে কৃষকেরা, আর কিছুটা ফাঁকা পড়ে আছে সম্পূর্ণ। মাঠ যেখানে এইরকম ফাঁকা, সেইখানে হঠাৎ নাতিবৃহৎ একটি পাহাড়ের ফুল মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। লোকে বলছে,-এরই নাম,-'বোব্বনো কোণ্ডা।'

তৈরী, এবং সযত্ন-রক্ষিত পথ দিয়ে আমি দু'তিন মিনিটের মধ্যেই ওপরে উঠে এলাম। প্রখর রৌদ্র মাথার ওপরে অগ্নি-বৃষ্টি করছে, যায়গাটা একেবারে নির্জন। নীচে, শহরের দিকে, মাঠের যে-অংশে ধান বোনা হয়েছে, সেখানে কাজ করছে গুটিকতক মানুষ, আর ঠিক পাদদেশে, আমি যে কটকা গাড়ীটাতে এসেছি, সেই গাড়ীর গাড়োয়ান ঘোড়াটাকে গাড়ী থেকে খুলে ঘাস-জল খাওয়াতে নিয়ে যাচ্ছে।

পাহাড়ের তিন দিকে—ফাঁকা বিস্তৃত মাঠ, কিছু বাবলা-গাছের জটলা, আর গ্রাম। এরই মধ্য দিয়ে সুরু একটা পায়ে-চলা পথ এঁকে বেঁকে অদূরের লালমাটির রাস্তাটায় এসে মিশেছে, যে রাস্তা দিয়ে আমি এসেছি ঘোড়ায়-টানা গাড়ী কটকের সাহায্যে।

'বোব্বনো কোণ্ডা' যে কী, অর্থাৎ এর যথাযথ ইতিহাসটা যে কী, আমার তা'জানা নেই। আন্দাজে-আন্দাজে এটুকু শুধু বুঝলাম,—'বোব্ব'—অর্থাৎ,—'বুদ্ধ'—বা 'বুদ্ধ'। সুতরাং, পাহাড়ে যা-কিছু উৎকীর্ণ আছে, তা ঐ বুদ্ধের ব্যাপার। বুদ্ধ,—যিনি অহিংস-ধর্মের উদ্গাতা,-যিনি বলেছেন, —'পানং ন হানে,'—কোনো প্রাণকে (বা প্রাণীকে) হত্যা ক'রো না। 'মা হিংসী,'—হিংসা ক'রো না।

এই সব ভাবতে-ভাবতে, পাহাড় কেটে, পাহাড়ের অভ্যন্তরে নির্মিত যে নাতিবৃহৎ গুহাটি আজও টিকে আছে,—তার মধ্যে প্রবেশ করলাম; আর সঙ্গে-সঙ্গেই মনে হলো, প্রচণ্ড উত্তাপ থেকে অকস্মাৎ-ই বুঝি সুশীতল বারিধারার অবগাহনে নেমে পড়েছি।

দ্বিতীয় অনুভূতি হলো, চোকাবাত্রই যেন বহু প্রাণীর একত্র চাপা দীর্ঘ নিশ্বাস মোচনের মৃদু ও স্নিগ্ধ ধ্বনি শুনতে পেলাম। থম্‌কে দাঁড়িয়ে দেখি, গুহার গায়ে পাশাপাশি বহু মূর্তি নিথর-নিস্তব্ধ ব'সে আছেন, একই আকারের,—সমান্তরাল একটি রেখার ওপরে তাঁদের অবস্থিতি।

মনে হলো, কতো যুগ-যুগান্তর ধ'রে তপোমগ্ন হয়ে আছেন তাপসবৃন্দ,—একাগ্র নিথর ধ্যানমগ্নতার মধ্যে থাকতে থাকতে ক্রমশ পাথর হয়ে গেছেন তাঁরা,—তবু তপস্যার ফল আজও পাননি,—আজও তাঁদের তপ চলেছে,—আজও চলেছে আত্মস্থ তপোপ্রার্থনা,—মানুষ যেন পাপ না করে, মানুষ যেন প্রাণ হানি না করে, মানুষ যেন হিংসা না করে।

চিন্তাগুলি মনের মধ্যে আপনিই তরঙ্গায়িত হয়ে উঠতে লাগলো। বোধহয়, একেই বলে,—আত্মিকপ্রভাব। সারি সারি বসে থাকা বুদ্ধমূর্তি দেখতে দেখতে একসময় বাইরে

এলাম গুহার সুশীতল অন্ধকার থেকে। টুকরো টুকরো কালো কালো পাথরের স্তূপ এধারে-ওধারে প'ড়ে আছে। তারই মধ্যে সন্তর্পণে পা রাখতে রাখতে পাহাড়ের মাথায় ওঠ্‌বার চেষ্টা করতে লাগলাম।

এ-ও একটা খেয়াল, নইলে অতো রৌদ্রে গুহা ছেড়ে পাহাড়টাকে ঘুরে ঘুরে দেখতে যাবো কেন? আর, দেখবার মতো মানুষ আজ একমাত্র আমি, একে প্রচণ্ড গ্রীষ্ম, তার ওপরে 'বোরবুনো-কোওা'র সচরাচর আসেই বা কে? আমার তখন মনে নানান্ প্রশ্ন বহি বিস্তার করছিলো। এখানে হঠাৎ পাহাড় কেটে গুহা প্রস্তুত করলো কেন? শুধুই কি গুহা! না, অন্য কিছু ছিল এখানে? ঐ সব কালো কালো টুকরো টুকরো পাথরই বা ইতস্তত: ছড়িয়ে আছে কেন?

এমন কিছু উঁচু পাহাড় নয়, একটুক্ষণ চল্‌বার পরই ওপরে পৌঁছে গেলাম। দূরে, শহরের দিকে, মাঠের ওপরে কিষাণেরা কাজ করছে, প্রায় বিন্দুর মতো দেখাচ্ছে তাদের। আর, ভিন্নদিকে ঝিকে-সবুজ বাবলা গাছের ঘন্য দিয়ে মাঠের বুক-চেরা পায়ে-চলা পথটি দিয়ে টকটকে লাল একটা ছোট্ট সরল রেখা হেঁটে আসছে, মাথায় তার মণির মতো জ্বলছে ঝকঝকে কোনো বস্তু।

অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি সেই চলমান সরল রেখাটির দিকে। কিছুক্ষণ পরেই স্পষ্ট হলো সব কিছু। লাল শাড়ী পরা একটি স্ত্রী-মূর্তি, মাথায় ঝকঝকে পিতলের একটা বাটি বসানো। মুখ তার চেনা যায়না, এতদূর এবং এত উঁচু থেকে তার উপস্থিতিটুকুই টের পাওয়া যায় মাত্র। কে সে, কেমন দেখতে, কতো বয়স, কোন্ দেশী,—কিছুই বোঝবার উপায় নেই,—তবু এই রৌদ্রদগ্ধ নীল আকাশের নীচে হাল্‌কা আর ঘন সবুজের পটভূমিকায় সঞ্চারমান ঐ টকটকে লাল রঙটুকু একটি ছোট্ট সুষ্ঠিষ্ট গীতি-কবিতার মতোই আবেশ সৃষ্টি করে মনে।

অনেকটা আবিষ্টের মতোই তাকিয়ে ছিলাম ওদিকে, দেখছিলাম ওর আঁকাবাঁকা চলাফেরা,—কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই দেখলাম, পাহাড়ের পাদদেশে এসে মেয়েটি হঠাৎ যেন হারিয়ে গেল। পাহাড়ের কিনার পর্যন্ত এগিয়ে গেলে ওকে দেখা যায় কিনা বুঝবার জন্য পা চালিয়ে দিলাম। কিন্তু দেখা গেল না, কতগুলো বাবলা গাছের কাঁটাভরা ঝাঁকড়া-মাথার জটলা আমার দৃষ্টি রোধ করে দাঁড়ালো।

এবং দাঁড়ালো বলেই বোধহয় ভালো হলো। আমি মুখ ফিরিয়ে পাহাড়ের-গায়ে-খোদাই করা ভিন্নতর এক চিত্র দেখতে পেলাম। পাহাড়ের গা কেটে কেটে ছোট-ছোট ঘর করা হয়েছিল, তার চিহ্ন দেখলাম সুস্পষ্ট। মাথার ওপর থেকে পাথর খসে গেছে সম্পূর্ণ ভাবে, আমি যেদিক থেকে দৃষ্টিপাত করছি, সেদিককার দেওয়ালও বিলুপ্ত। তবু বোঝা যায়, একজন শুতে পারে, এমন আকারের ঘর ছিল এ-গুলো। কাছে গিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম। বেশী চিহ্ন আর অবশিষ্ট নেই, মাত্র গোটা চার-পাঁচেক ঘরের ধ্বংসাবশেষ মাত্র চিনে বার করা যায়। তিনদিককার তিনটে দেওয়ালের আভাষ দেখা যায়, একটি ঘরের একটি ছোট্ট কুলুঙ্গী পর্যন্ত অটুট আছে। কুলুঙ্গীর ওপরের দিকে এখনো কালির রেখা স্পষ্ট অনুধাবন করা যায়। কতো তৈলপ্রদীপের কতো শিখা যে ওখানে পুড়ে পুড়ে তার অন্তিম আকুতি জানিয়ে গেছে তার ইয়ত্তা নেই।

ঘরগুলো ঘুরে দেখতে দেখতে প্রচুর চৌকা চৌকা কালো পাথর চোখে পড়তে লাগলো। সম্ভবত: এই চৌকো ক'রে কাটা প্রস্তর খণ্ডগুলোই তৃতীয় দেওয়ালের কাজ করতো, কে জানে!

দেখতে দেখতে মন সত্যিই অদ্ভুৎ এক চিন্তায় ডুবে যায়। হয়ত এখানে ছাত্রাবাস ছিল, হয়ত এটা ছিল কোনো বৌদ্ধ সংঘারাম, যেখানে অহিংসা-ধর্মাবলম্বী তাপসবৃন্দ প্রতিজ্ঞা-মন্ত্র উচ্চারণ করতেন প্রতিদিন,—যা হিংসী—পানং ন হানে—অহিংসা পরমো ধর্ম।

চিন্তায় আবিষ্ট ছিলাম বলেই হয়ত চমকটা হলো গাঢ়তর। নইলে, অভাবিত আতঙ্কে অস্ফুট চীৎকারও করে উঠতাম না, কয়েক পা পিছিয়েও যেতাম না।

একটু স্থির হলো মন, তখন দেখছি, পা দু'টো আমার থর্‌থর্ করে কাঁপছে। এখানে পাথরের ভাঙা-ঘরে আড়ালে যেটুকু ছায়া এখন পড়েছে—সেই ছায়ায় কেমন যেন অস্বাভাবিক ভাবে প'ড়ে আছে একটি লোক, খালি গা, কোমরের ধুতিটা হাঁটুর ওপর পর্যন্ত উঠে এসেছে। আবলুশ কাঠের মতো গায়ের রঙ, মাথায় কোঁক-কোঁকড়া একরাশ কালো চুল, ঘন ভ্রূ, ঠোঁটের ওপরে পাকানো ভ্রমর-কৃষ্ণ গোঁফ। দিব্যি জোয়ান আর সবল চেহারা, চওড়া বুক, সুদৃঢ় মাংসপেশী।

দেহটা একটু বাঁকিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে, মুখের কাছে কেন্নো ঘুরে আছে, মাছি এসে বসেছে কয়েকটা, অথচ লোকটির ঘুম ভাঙছে না, হাত তুলে তাড়াবার চেষ্টা করছে না তাদের। তবে কি অজ্ঞান হয়ে পড়েছে লোকটি?

আরও দু'পা এগিয়ে যেতেই নিদারুণ ভয়ে আবার পিছিয়ে যেতে হলো। বুকটা এতো জোরে টিপ্-টিপ্ করে উঠলো যে, নিজেকে সামলাতে বেশ কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেল।

তাকিয়ে দেখি, লোকটি একটি হাতে একটি ছোট্ট পাথর সজোরে মুঠো করে ধরে আছে, আর ঠিক সেই হাতটার কাছে বেশ বড়ো একটা কাঁকড়া-বিছে ধ্যাঁতলানো, ছিন্নদেহ, মৃত, প'ড়ে আছে।

আরও একটু ঝুঁকে দেখি, লোকটির ডান হাঁটুর নীচের একটা যায়গায় চাপ-চাপ রক্ত জমে আছে কালো হয়ে। আর তারও নীচে, টুকরো টুকরো নুড়িগুলোর ওপরে রক্তধারা শুকিয়ে রয়েছে।

বুঝলাম ব্যাপারটা। আর সঙ্গে সঙ্গে শঙ্কিত হয়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলাম। এই রকম কাঁকড়া-বিছে দেখলেই আতঙ্ক হবার কথা। যদি এপাশে ওপাশে আরও থেকে থাকে? যদি এসে আমাকেই কামড়ে দেয়? ঐ সব কালো কালো পাথরের তলায়, কি পাহাড়ের হাঁ-করা ফাটল থেকে অনায়াসেই বেরিয়ে আসতে পারে তারা, আর পিছনের বিষাক্ত দাঁড়াটাকে অনায়াসেই তীব্র বেগে ফুটিয়ে দিতে পারে আমার শরীরে। এবং সঙ্গে সঙ্গে বিষের জ্বালায় চলে পড়তে হবে আমাকে ঐ লোকটির মতো। মুখে ফেনা জমবে, মাছি বসবে।

ছুটে আমার তাড়াতাড়ি পালিয়ে যাওয়াই উচিত, কিন্তু আমার সেই যাযাবরী কৌতূহলাক্রান্ত মন সম্মোহিতের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনুধাবন করতে লাগলো মানুষটিকে। কে এ-লোকটি? ভ্রমণকারী বলে মনে হয় না, মাঠে-কাজ-করা চাষক কি এ? কিম্বা শ্রমিক? কিন্তু, তারা এই পাহাড়ের ওপরে এই রৌদ্রে হঠাৎ-ই বা উঠে আসবে কেন? আর যদি দৈবাৎ আসেই, তাহলে শীতল গুহার অভ্যন্তরে স্থান না নিয়ে এই অপরাহ্ণ অঞ্চলে পা বাড়ায় কেন? এই যে আমি খেয়ালের বশে উঠে এসেছি, কোনো পথ ধরে আসিনি; কারণ, কোনো পথ নেই, এবড়ো-খেবড়ো পাথর ডিঙিয়ে কোনো ক্রমে আসতে হয়েছে। লোক চলাচল থাকলে পায়ে-পায়ে নিশ্চয়ই একটা, অস্পষ্ট পথের রেখা ফুটে উঠতো।

কিন্তু অবাক হবার আসল ব্যাপারটি তখনো বুঝি বাকী ছিল। সেটি পূর্ণ হলো হঠাৎ পিছনে একজন কারুর সাড়া পেয়ে। চমকে তাকাতেই দেখি, দীর্ঘাঙ্গিনী একটি স্থানীয় মেয়ে, নাকে সস্তা জার্মান সিলভারের নাকছাবি, কানেও অনুরূপ রূপালী ছোট্ট ঝুমকো, গলায় রূপালী সরু চেনের সঙ্গে সেফেলে তাবিজ পয়সা ঝুটো করে ঝোলানো। মাথায় ঝক্ ঝক্ করছে একটি বড়ো পিতলের বাটি, গায়ে বেশ বড়ো করে গলার-কাছটা কাটা, আর প্রায় কনুই পর্যন্ত হাতা-টানা কালো রঙের ব্লাউজ, পরণে টক্‌টকে লাল শাড়ী। বাবলার ছায়ায়-ছায়ায় যাকে তখন পীতি-

কবিতার মতো হেঁটে হেঁটে আসতে দেখছিলাম,—মেয়েটি কি সে-ই?

অবাক হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখছে। একটু ঘন আর ধনুকের মতো বাঁকানো ভ্রূ-দুটি ঈষৎ কুঞ্চিত, দুই ভ্রূর মাঝ খানে ছোট্ট একটা কুঙ্কুমের টিপ, চোখ দুটি খুব ছোট নয়, একটু বড়া বলে দৃষ্টিটা রীতিমতো তীক্ষ্ণ দেখাচ্ছে। যাকে বলে দোহারা চেহারা, মেয়েটি হচ্ছে তাই। কোমরটি বেশ সরু, কালো ব্লাউজটা কিছু ওপরে উঠে আছে সেই জন্য নাভিপ্রদেশের কিছু অংশ অনাবৃত। মুখ এবং হাতের থেকে সে অংশটুকু উজ্জ্বল, এমনিতে মেয়েটি কালো বললেই চলে, তবে লাবণ্যময়ী। খুব কচি বয়সের মেয়ে নয়, বয়স সাতশ-আঠাশ, কিম্বা ত্রিরিশও হতে পারে। মাথার চুল মনে হলো অপরির্য্যাপ্ত, ঘন কৃষ্ণ, বেণীর বন্ধনে যেন হাঁপিয়ে উঠেছে, শাসন মানতে চাইছে না, মাথার-সমান লম্বমান বেণীতে ছোট ছোট ঢেউগুলি বাতাসে বাতাসে হিল্লোল তুলে দিয়েছে।

আমি যেমন ওকে নির্বাক হয়ে সোজাসুজি দেখছিলাম, ও-ও ঠিক নিঃসংকোচে পর্যবেক্ষণ করছিল আমাকে। কিছুক্ষণ পরে, নীরবতা ভঙ্গ করলো ও-ই প্রথমে। ওদের স্থানীয় ভাষায় কী যে বললো ঠিক বুঝলাম না, যদিও এ অঞ্চলে যাতায়াত করতে করতে ওদের ভাষার কিছু কিছু আমি বলতে বা ভাঙাভাঙা করতে পারি।

আমাকে নিরুত্তর দেখে মেয়েটি এবার হিন্দী ভাষণ অবলম্বন করলো। পরিষ্কার উচ্চারণ নয়, বিলক্ষণ দক্ষিনী টান আছে, তবু তা বোঝা যায়। প্রশ্ন করলো,-কে আপনি? পুলিসের লোক?

চমকে উঠলাম। ধুতি-পাঞ্জাবী-পরা সাধারণ বাঙালী মানুষ আমি, আমাকে পুলিসের লোক বলে ওর কেন মনে হলো, বুঝলাম না। আর দ্বিতীয়তঃ, পুলিশের কথা মেয়েটির মনেই বা হলো কেন?

পরক্ষণেই মনে পড়লো ঐ বৃশ্চিক-স্তূপ পড়ে-থাকা মানুষটির কথা। মেয়েটি হয়ত ঐ লোকটির ব্যাপারেই এসে থাকবে। লোকটি কি তবে মারা গেছে? এবং মারা যে গেছে মেয়েটি তা' জেনে গেছে। জেনেই হয়ত কোনো কারণে গ্রামের দিকে গিয়েছিল, এতক্ষণে ফিরে এসেছে। আর, মানুষ অপঘাতে মরলে পুলিশ আসবে, এ-তো স্বাভাবিক। কিন্তু, আমাকে এ-পোষাকে পুলিশের লোক বলে মনে করলো কেন মেয়েটি?

ইতি মধ্যে হল কী, ওর প্রশ্নের উত্তরে আমাকে নীরব দেখে মেয়েটি অন্য কোনো ভাষা, (হয়ত উড়িয়া) প্রয়োগ করবে কি না ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মাথাটা হেলিয়ে আমার পিছন দিকে দৃক্‌পাত করলো সে। সবটা দেখতে পেলো কি না জানি না, কিন্তু, কিছু একটা অনুমান করে ছুটে, প্রায় আমাকে ধাক্কা দিয়েই দুর্ঘটনা-ক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে গেল মেয়েটি। তারপরে এক মুহূর্ত থেমে থেকে অস্ফুট একটা আর্তনাদ করে উঠলো।

সে এক অদ্ভুৎ পরিস্থিতি। বোঝা গেল, মেয়েটি এ-দুর্ঘটনার-সংবাদ আগে জানতে পারেনি। জানলে, সে যা করতে লাগলো, তা করতে পারতো না। মাথা থেকে ঝকঝকে পেতলের বাটিটা নামিয়ে রাখলো প্রথমে। বোধ হয় খাবার আছে তার মধ্যে' সুতো শালপাতা মুড়ে বেশ করে' ঢাকা দেওয়া তার ওপরে ছোট্ট তোয়ালের মতো সাদা গামছা।

মেয়েটি লোকটিকে আর মৃত বিছেটাকে ভালো করে পরীক্ষা করে এসে আমাকে হাত-নেড়ে মাথা নেড়ে-কী যে হাউমাউ করে বললে ওদের ভাষায়, তা বুঝলাম না। এবং আমি যে কিছু বুঝলাম না সেদিকে ওর ভ্রূক্ষেপও নেই। ও তাড়াতাড়ি ফিরে গেল লোকটির কাছে। বকবক করতে করতে, আশ্চর্য কাণ্ড, লোকটির গালে ঠাস্ করে মারলে এক চড়! তাতে মাথাটা একটু হেলে পড়লো, আর মাছিগুলো উড়ে গেল এই মাত্র।

তারপর আমার আমার দিকে ফিরে হাত নেড়ে উত্তেজিত কণ্ঠে কী যেন বলল ওদের ভাষায়। বলা বাহুল্য, কোনো সাড়াই পেলো না। আমি যে সব দেখে-শুনে সেই মুহূর্তে একটা জড়-পদার্থে পরিণত হয়েছিলাম। না হলে, ওদের ভাষা না হয়, হিন্দিতেও ত দুটো কথা বলতে পারতাম।

লোকটা মারা গেছে কি না জানি না, মেয়েটি লোকটির যে কে, তা-ও জানতে পারলাম না,—কিন্তু, এটুকু লক্ষ্য করলাম, মেয়েটা বিস্ময়াবিষ্ট হয়েছে, উত্তেজিত হয়েছে, এমন কী ক্রোধান্বিতও হয়েছে, কিন্তু, এক ফোঁটা চোখের জল ফেলে নি, কাঁদে নি।

অস্থিরতার ভাব একটু কমলে, মেয়েটি শালপাতা বার করলো বাটি থেকে। শালপাতা ছিঁড়ে ছোট্ট ঠোঙার মতন বানালো, তারপরে এগিয়ে এলো মৃত বৃশ্চিকটির কাছে। পাথরের টুকরো দিয়ে বিষাক্ত দাঁড়াটা থেঁতো করলো। থেঁতো করবার পর যে সাদা সাদা তরল পদার্থ বেরুলো কাঁচা হাঁসের বা মুরগীর ডিমের তরল সাদা অংশটুকুর মতো, সেটুকু শালপাতার ঠোঙায় রেখে, দাঁড়ার মুখটাতে পাথরের টুকরোর চাপ দিয়ে কালো মতন রস বার করলো কয়েক ফোঁটা। বার করে মিশিয়ে দিলো শালপাতায় রক্ষিত বস্তুটির সঙ্গে। তারপরে শালপাতার ঠোঙাটি নিয়ে চলে গেল লোকটির হাঁটুর কাছে। দংশন-স্থানের জমাট রক্ত মুছে নিলো আঁচলের প্রান্ত দিয়ে। তারপরে শালপাতার বস্তুটি উপুড় ক'রে ধরলো ক্ষতস্থানটির ওপরে ধরে এক হাতে বেশ করে চেপে রেখে অন্য হাতে সাদা গামছাটা নিয়ে, শক্ত ক'রে ব্যাণ্ডেজের মতো বেঁধে দিলো।

আমি অবাক হয়ে সমস্ত ব্যাপারটা পর্যবেক্ষণ করছিলাম। ও উঠে দাঁড়াতেই, কথা বললাম এতক্ষণ পরে। বলা বাহুল্য হিন্দী ভাষার মাধ্যমে। যার জন্যে করলে দাঁড়াবে এই,—লোকটি কি বেঁচে যাবে?

মেয়েটি মুখ তুলে আমার দিকে তাকালো। একমুহূর্ত তাকিয়েই রইল। তারপরে চোখ নামিয়ে শান্ত আর নীচু গলায় বললে, ভাগ্য। না বাঁচলে, অন্ততঃ কেউ আমাকে বলতে পারবে না, যে চেষ্টায় আমি কোনো ত্রুটি করেছি। ওর উত্তেজনা আর ক্রোধ যেমন আমার বিস্ময়ের ব্যাপার হয়েছিল ওর এই অদ্ভুৎ শান্ত ও ধীর কণ্ঠস্বরও তেমনি আমার কাছে সমান আশ্চর্যের বিষয় হয়ে রইল।

মেয়েটি ভাঙা-গুদ্ধ বাটিটা হাতে নিয়ে আমার পাশ দিয়ে কিছুদূর এগিয়ে গেল, তারপরে, কী ভেবে ক'য়ে থমকে দাঁড়ালো,—মুখ ফিরিয়ে বললে,—আপনি আছেন ত? আমি এখুনি আসছি নীচে থেকে একটু জল নিয়ে।

ব'লে, দ্রুতপায়ে চলতে লাগল পাথর ডিঙিয়ে হেলেদুলে। আর, আমি অল্প একটু ছায়া দেখে একটা চওড়া পাথরের ওপরে কিং-কর্তব্য-বিমূঢ়ের মত বসে রইলাম।

রৌদ্র অনেকটা হেলে পড়েছে, ইতস্ততঃ কিছু কিছু ছায়ার সৃষ্টি হয়েছে। মানুষটির শরীর এখন আলো-ছায়ায় ঢেকে গেছে। মুখের ওপর ছায়া যেন তার স্নেহকম্পিত করস্পর্শের মতো গিয়ে পড়েছে। পায়ের ক্ষতস্থানটিতেও একখণ্ড ছায়ার স্পর্শ। আশেপাশে গাছের-পাতায়-লাগা বাতাসের দীর্ঘশ্বাস ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। ঘুরে তাকিয়ে দেখি, মাঠে যে কৃষককুল কাজ করছিল, তারা আর নেই হয়ত, নিকটের ঝাঁকড়া-মাথা বটগাছটির ছায়া-শীতল আশ্রয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে। পাহাড়ের নীচে, আমার ভাড়া-করা ঝাকা-গাড়ীর চালক বোধহয় এতক্ষণে ছইয়ের মধ্যে ঢুকে একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছে। তারও একটু সাড়া শব্দ নেই।

এই অদ্ভুৎ নিস্তরঙ্গ নিবিড় নীরবতার মধ্যে পাথরের নুড়ি-নুড়িতে একটা টুং-টাং ধ্বনির সৃষ্টি করতে করতে মেয়েটি একসময় ফিরে এলো বাটি-ভর্তি জল নিয়ে।

বললাম,—নীচে গিয়েছিলে?

—হ্যাঁ। নইলে জল পাবো কোথায়!

—কাউকে দেখলে ?

—হ্যাঁ। এক কট্‌কাওয়ালা।

—কী করছে ?

মেয়েটি বললে,—খুব রেগে গিয়েছিল প্রথমটায়। বললে, —ওপরে এক বাবু গেছে, এখনো ফিরছে না। দেরী হয়ে যাচ্ছে না ফিরতে ? কটা টাকার জন্যই বা বোজ্‌ বজোকোওয়া আসা ?

জিজ্ঞাসা করলাম,—তারপর ?

মেয়েটি জলের বাটীতে সন্তর্পণে একজায়গায় রেখে লোকটির শিয়রে—ছায়াতে বসে পড়লো ধপ্‌ ক'রে। কপালে ঠোঁটের ওপরে বিন্দু বিন্দু ঘাম চিক্‌চিক্‌ করছে, মেয়েটি একটুক্ষণ থেমে থেকে একটু জিরিয়ে নিয়ে বললে,—আমি বললাম, ওপরে ত একটি মাত্রই বাবু উঠেছে, পুলিশের লোক। কট্‌কাওয়ালা শুনে চক্ষু একেবারে কপালে তুললো বললে,— আয় বাপ্‌, পুলিশের লোক ! বললাম, —হ্যাঁ। সাদা পোষাকেও পুলিশের লোক ঘুরে বেড়ায়, চোর-ডাকাত-খুনেদের হদিশ যার করবার জন্য। শুনে, কট্‌কাওয়ালা আর কিছু বললে না, বেশ ভয় পেয়ে গেছে। পুলিশের নামে কে না ভয় পায় বাবু ? দেখলাম, ঘোড়া ত খুলেই রেখেছিল, এখন নীচু-করা গাড়ীটার চাকার পাশে চট্‌ বিছিয়ে শোবার উদ্যোগ করছে।

বললাম,—যাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। এখন, এটা কী ব্যাপার বলোত ! ওর পায়ে ঐ যে বেঁধে দিয়েছো,-ওতে ও সেরে উঠবেত ? মেয়েটি মুখ তুলে তাকালো আমার দিকে বললো,— কবার বলবো বাবু ; ভালো থাকলে ঘন্টাখানেকের মধ্যেই জ্ঞান ফিরে আসবে ; তখন জল খেতে চাইবে। আমাদের পাঁয়ে কতো এ-রকম হয় ! বিছের বিষ কম নয়, শক্ত-শক্ত জোয়ান মানুষকে অজ্ঞান করে ফেলে !

বললাম,—লোকটা কে !

একটু অবাক হয়েই তাকালো আমার দিকে, তারপরে ম্লান একটু হেসে বললো, কেন ছলনা করছেন ! ও যে কে আপনি পুলিশের লোক হয়ে নিশ্চয় জানেন। ওর জ্ঞান ফিরলে, হয় ওকে নিজেই ধরে নিয়ে যাবেন, আর নয়ত, থানায় ফিরে গিয়ে সেপাই নিয়ে আসবেন। বিছের কামড়েছে জ্ঞান ফিরলেও, ঘন্টা দুয়েক ও কী আর উঠে দাঁড়াতে পারবে ? যতোই জোয়ান আর 'ডাকু' ও হোক না কেন !

ভেবে দেখলাম, এর পরে আর নিজেকে 'পুলিশের লোক নয়' বলে পরিচয় দিলে কোনো কথাই শোনা যাবে না। জানা যাবে না এদের পরিচয়, এদের কাহিনী।

পুলিশের লোকের মতোই কঠোর ও তীব্র স্বরে এবার বললাম,—আমি এখানকার পুলিশ নয়, তা বুঝতে পারছো ?

মেয়েটি বললে,—তা আর পারছি না ! এখানকার লোক হলে ত আমাদের ভাষাতেই কথা বলতে ! আর, তাছাড়া, এখানকার পুলিশ ওর কতো খোঁজ করেছে, পেয়েছে ওকে ধরতে ? ও যে এখানে লুকিয়ে থাকে,—সেটা তুমি বলেই ধরতে পেরেছো। আমি শুনেছি, কলকাতার পুলিশেরা বড়ো জবরদস্ত আদমী।"

বললাম,—এটাও ধরেছো, আমি কলকাতার লোক !

বললে,—ধরবো না ! সহরে যাই না আমি ? অনকা-পল্লীতে ? কতো 'বাঙ্গালী লোক' আসে, এই তোমার মতো পোষাক পরা !

বুঝলাম, আর উপায় নাই। এখন আমাকে যেরকম করেই হোক, 'কলকাতার জবরদস্ত' পুলিশের লোকের ভূমিকায় অভিনয় করতেই হবে !

অতএব, সোজা হয়ে বসে তীক্ষ্ণ গম্ভীর কণ্ঠে বললাম,— এতোটা যখন বুঝেছো, তখন এটুকও জানবে, আমার কাছে পিস্তল আছে লুকানো, খবরদার, পালাবার চেষ্টা করোনা।

মেয়েটি বেশ সন্ত্রস্তিত, কিন্তু আমার কথায় বোধ হয় ভয় পেলো, অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠলো নিজেদের ভাষায়,—'আম্বাই -রো, অর্থাৎ,—'ওলো—যাদো !'

বললাম,— চীৎকার করে কোনো লাভ হবে না। আমি ধ'রে নিয়ে যাবোই, আমার হাত থেকে কিছুতেই পালাতে পারবে না! হঠাৎ মেয়েটি আমার দিকে এগিয়ে দু'হাত নেড়ে ঝগড়ার ভঙ্গীতে তীক্ষ্ণ স্বরে বলতে আরম্ভ করলো,—কে বলেছে ওকে ধরবে না! ও ধরা পড়ুক, এটা কি আমিও চাই না! যে আমার সর্বনাশ করেছে সে এই পাহাড়ে লুকিয়ে লুকিয়ে থাকবে, আর আমি মাঠ ভেঙে এতটা হেঁটে পাহাড়ে রোজ রোজ এমনি করে ভাত খাইয়ে যাবো, না? আ-হলা-হু!

মনে-মনে চম্‌কে উঠলাম। মেয়েটা যে ওকে 'ভাত' খাওয়াতে আসে, এটা বুঝতে বাকী ছিল না,—কিন্তু মেয়েটা ওর তাহলে কে?

তীব্র কণ্ঠে, ধমকের সুরে বললাম,—কে তুমি ওর?

ও বললে,—কে আবার! কেউ না! যে আমার স্বামীকে খুন করেছে, সে আমার বন্ধু নাকি? থুঃ-থুঃ!

ব'লে অপরিসীম ঘৃণায় লোকটির দিকে থুথু ছিটিয়ে দিলে। তারপর আমার দিকে ফিরে তাচ্ছিল্য আর বিদ্রুপের সুরে বললে,—শত্তুর- শত্তুর-ছাই-ছাই!

উত্তরোত্তর অবাক হচ্ছিলাম। কিন্তু, সে ভাবটা ত ওকে আর বুঝতে দেওয়া চলে না! মনের ভাব গোপন করেই বললাম,—শত্তুর যদি হয়, ত, ওর জন্য রোজ রোজ খাবার নিয়ে আসো কেন?

মেয়েটি ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইলো আমার দিকে খানিকক্ষণ, বললে,—বাবুজী, আপনি মুরগী পুষেছেন?

—না। কেন?

মেয়েটি বললে,—মুরগী যারা পোষে তাদের দেখেছেন?

—হ্যাঁ, তাই কি?

মেয়েটি বললে,—মুরগীকে খাইয়ে-খাইয়ে বড়ো করেছেন? গলাটা ছুরি দিয়ে পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে কাটবে বলে। তাই না? বিস্ময় আর বাধা মানলো না, বললাম,—লোকটা কি তোমার পোষা মুরগীর সামিল নাকি?

ও বললে,— ঠিক তাই।

বললাম, কী দরকার ছিল? পুলিশে খবর দিলেইত হতো।

—ঈস! —মেয়েটি বললে,—আমি যাবো কেন? ওকে আমি খুঁজে বার করতে পেরেছিলাম, আর তারা পারলো না! বয়ে গেছে আমার খবর দিতে। অতো নীচ আমি নই, আমার সর্বনাশের 'বদলা' আমি নোবো। তুমি যদি না আসতে বাবু, আমি ওকে একদিন-না একদিন ঠিক শেষ করতাম — নিজের হাতে।

বললাম,—কেন নিজের হাতে কেন?

—সে তুমি বুঝবে না।

বললাম,—শেষ ত আজই হয়ে গিয়েছিল বিছের কামড়ে। তুমি যে ওষুধ দিয়ে ওকে বাঁচিয়ে তুলছো!

—তুলবো না! —মেয়েটার কণ্ঠে আবার যেনো বিস্ময়ের সুর, বলে,—নিজের হাতে শত্তুর মারতে পারলে বড়ো আরাম হতো বাবু।

—কী ক'রে মারতে?

ও বললে,—কেন? যেমন করে ও আমার স্বামীকে মেরেছে, ঠিক তেম্‌নি করে, পিছন থেকে পিঠের মধ্যে ছুরি বসিয়ে। ওঃ! কী রক্ত—কী রক্ত!

শিউরে উঠে দু'হাতে মুখ ঢাকলো। বুঝি ওর মনশ্চক্ষে ভেসে উঠেছে অতীত কালের সেই দৃশ্য।

পর মুহূর্তেই উত্তেজিত হয়ে নিজের ভাষায় কী-যেন বিড়বিড় করে উঠলো, তারপরে ঝুঁকে প'ড়ে আবার মূর্চ্ছিত লোকটির গালে মারলো সজোরে একচড়। মুখখানি এবার একেবারে পাথরের ওপর গুঁজে গেল বলা যায়। দু একটা মাছি তখনো লোকটির ঠোঁটে বসবার চেষ্টা করছিল, তারা ভন্‌ভন্ করে উড়ে পালালো।

বললাম,—শান্ত হও, অতো অস্থির হলে চলে না।

মেয়েটি এবার স্পষ্টতঃ কেঁদে ফেললো, বললো,—আমার

স্বামীর মতো লোক হয় না, আমাকে চোখের আড়াল হ'তে দিতো না, এতো ভালবাসতো আমাকে। তার পিঠে ছুরি বসাতে ওর হাত কাঁপলো না! 'ডাকু-খুনী' কোথাকার।

—কেন মারলো! ঝগড়া ছিল?

আমার দিকে তাকালো মেয়েটা, চোখে যেন আগুন জ্বলছে। আঁচল দিয়ে চোখের প্রান্ত থেকে অশ্রুর বিন্দু মুছে ফেলে মেয়েটি বললে,—পুলিশের লোক সবইত জানেন। বারবার জিজ্ঞাসা করছেন কেন?

শান্ত কণ্ঠে বললাম,—তোমার মুখ থেকে ত আমি ব্যাপারটা শুনিনি! তাই শুনতে চাইছি, এতে আমাদের কাজের সুবিধা হয়।

মুখখানা নামিয়ে চুপচাপ বসে রইল অনেকক্ষণ। তারপরে, অদ্ভুৎ শান্ত আর স্তিমিত কণ্ঠে বলতে লাগলো,—বাবু স্বামীকে ছাড়া কাউকে জানতাম না। এ-লোকটি কোন্ গাঁয়ের লোক, তা-ও জানিনা। স্বামীর সঙ্গে একদিন বাড়ীতে এলো। কোন্ দোকানে বসে কফি-খেতে খেতে নাকি 'দোস্তি' হয়েছে দিন-কতক হলো। স্বামী আমাকে ডাকলো, ওর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলো। ব্যস্, আর যাবে কোথায়! আমার রূপ দেখে হতভাগার মধ্যে শয়তান জেগে উঠলো। বুঝলুম কী করে? একদিন চিঠি ফেলে দিয়ে গিয়েছিল। তাতে লিখেছে ও ঐ কথা। —'বড় সর্বনেশে রূপ তোমার—শয়তান জেগে ওঠে।' ·· ভীষণ রাগ হয়ে গেল স্বামীকে দেখালুম। স্বামী বাড়ীতেই ওকে নিয়ে এলো একদিন। লোকটা হো-হো করে হেসে বললে,—ঠাট্টাও বোঝো না। আমাদের গাঁয়ে বন্ধুর বউয়ের সঙ্গে এ-ধরণের ঠাট্টা-তামাশা চলে। আমি রাগ করে বললাম,— সে যেখানে চলে চলুক, এখানে চলবে না।

ঘটনার ত এই টুকুই বাবু। বিশ্বাস করুন, আগেও বলেছি, এখনো বলছি, এর বেশী আর কিছুই না। কিন্তু লোকটা যে 'ডাকু,'—তা আমরা কেমন করে জানবো? একদিন রাত্রে দুজনে 'মাল নিয়ে' এসেছে ঘরে। মাঝে মাঝে আমার স্বামী মদ খেতো, তাই ওতে বিশেষ কিছু আমি মনে করিনি। তবু, বাড়াবাড়ি যাতে না করে, সেইজন্য বকুনুম একটু, তা-ও ওকে নয়, আমার স্বামীকে। লোকটা হল্লা থামিয়ে আমার দিকে তাকালো, যেন এক লহমায় গিলে খাবে। শুধু কি তাই? বে-সরমের মতো আমার দিকে এগিয়ে এসে আমার হাত চেপে ধরলো। টান দিলো নিজের দিকে-এক ঝটকায়। সব আমার স্বামীর সামনে। কোন্ স্বামী এটা সহ্য করবে বলুন? সে ওকে বোষহয় একটি ঘুঁষি মেরে থাকবে, আর যায় কোথায়! চোখের পলকেই—সব শেষ। উঃ! কী রক্ত-কী রক্ত! সারা ঘরটা একেবারে রক্তে থৈ-থৈ করতে লাগলো। আর, পাছে আমি চীৎকার করি তাই ডাকুটা এসে আমারই শাড়ীর আঁচল দিয়ে আমার মুখ বেঁধে ফেললো, আমার হাত বেঁধে ফেললো, আমার পা বেঁধে ফেললো। না বাবু, সেখানেই শেষ নয়,—পশুটা আমাকে মেঝে ফেলে আমার সর্বনাশ পর্যন্ত করতে ছাড়েনি। আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম। আমাদের গাঁয়ের বাড়ীগুলো দূরে দূরে, তাই একটু-আধটু হল্লা হলে লোকে সহজে টের পায় না। তবু কী একটা সন্দেহে, গাঁয়ের দাই-মা' বুড়ী আমাদের খোঁজ নিতে আসে। সে যখন আসে, তখন আমার জ্ঞান নেই, মুখ থেকে 'গোঁ-গোঁ' শব্দ বেরুচ্ছে। সে বেরিয়ে চীৎকার ক'রে ডাকে, আর ভিতরে এসে তাড়াতাড়ি একটা চাদর নিয়ে আমার ওপরে চাপা দিয়ে দেয়।

চুপ করলো মেয়েটি। চোখ দুটো যেন তার অতীত স্মৃতিতে ফিরে গেছে, আমাকে কথাগুলো বলে গেল অদ্ভুৎ নিরুত্তাপ—নিস্তেজ কণ্ঠস্বরে।

কিন্তু আমার মধ্যে প্রতিক্রিয়া হলো তীব্রভাবে। বলে উঠলাম,—এই পশুটাকে গলা টিপে মেরে ফেলা উচিত। মেয়েটি মুখ ফেরালো আমার দিকে বললে,—তাই ও যাবে, ফাঁসী কাঠেই ও ঝুলবে।

বললাম—তুমি টের পেলে কী করে'যে ও এখানে আছে?

মেয়েটি বিস্ফারিত চোখে আমার চোখের দিকে তাকালো, তারপরে বললো,—এ-রকম পাগল লোকও দেখিনি। ঐ ঘটনার পরে মাস খানেক কেটে গেছে। পুলিশের লোক উদ্‌ভ্রান্ত করে খুঁজে বেড়াচ্ছে ওকে,—কেউ ওর হদিশ পাচ্ছে না, এমন দিনে রাত্রিবেলা জানালা দিয়ে ঠক্ করে একটা চিঠি গলিয়ে দিয়ে ও পালিয়ে গেল। চিঠিতে লেখা,—পেটে ভাত নেই, জঙ্গলে-জঙ্গলে জন্তুর মতো পালিয়ে-পালিয়ে বেড়িয়ে আর পারিনা। আমি বোক্‌রনোকোণ্ডা,—পাহাড়ের ওপরে রইলাম। তুমি লোকজন নিয়ে এসো, যতো শীগ্‌গির পারো আমাকে এসে ধরে ফেলো! ...বুঝুন বাবুজী, চিঠিটা যদি আমি কাউকে দেখাতুম।

তাহলে, কী হতো?

বললাম,—কোথায় চিঠিখানা?

ও বললে,—সর্বনাশ! ও-চিঠি কী রাখতে আছে? টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছি।

—কেন?

বললে,—মানুষের মন, না, মতি! যদি গাঁয়ের লোক, কিম্বা, পুলিশের লোকের হাতে দিয়ে ফেলি? আমি চিঠি পাওয়ার দু-তিন দিন পর্যন্ত পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিলুম। লোকের কাছে বলতে গিয়েও বলতে পারি না, অথচ, মনের মধ্যে চেপে রাখতেও পারি না! শেষ কালে, কীরকম যেন মরা হলো, তাই কাউকে কিছু না বলে, বাটিতে ভাত নিয়ে পাহাড়ে উঠে এলাম। এসে দেখি, ঐ গুহাটার শুয়ে আছে, চিঁ চিঁ করছে গলা, ঘুঁকছে। বললাম,—সেই থেকে এই-ভাবে রোজ এসে খাইয়ে-খাইয়ে আবার 'তাগ্‌ড়া' করে তুলছো লোকটাকে, কেমন? হঠাৎ-ই নিদারুণ ব্যাকুলতায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো মেয়েটি, বললে,—কিন্তু, কী করে এটা হলো বাবুজী? আমি কেমন করে রোজ এসে ওকে ভাত খাওয়াচ্ছি, যে আমার সর্বনাশ করে গেছে।

ওর চোখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে রইলাম নিরুত্তরে। ও নিজেই আবার বলতে লাগলো,—এ-বাড়ী ও-বাড়ী খেটে খাই, কতো কষ্টের ভাত আমার,—তা' আমি কিনা রোজ রোজ শত্রুরকে এসে খাওয়াচ্ছি! নিজে ভেবে নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছি বাবুজী,—এ আমি কেমন ক'রে পারলাম্? গাঁয়ের লোকদের কাছে মিথ্যা বলি, বলি,—হোটেল জানিস না তোরা? এ-ও আমার সেই হোটেল। দু'পয়সা রোজগার হয়, তাতেও তোদের চোখ টাটায়? গাঁয়ের লোকেরা হাসে। কেউ বিশ্বাস করে, কেউ করে না। বেশীর ভাগ লোকই ভাবে, নতুন কোন 'মরদ' মানুষের সঙ্গে আমার 'আশ্‌নাই হয়েছে!' ওরা ঘুণাক্ষরেও কেউ ভাবতে পারে না, যে নিছক্ নিজের পয়সায় রোজগার করা ভাত আমি রোজ রোজ এনে খাওয়াচ্ছি আমার জিন্দ্‌গীর সব থেকে বড়ো শত্রুরকে!

নীরব হলো মেয়েটি। আমার অদ্ভুৎ এক অনুভূতির উদয় হলো। রৌদ্র আরও অনেক হেলে পড়েছে, যেখানটায় আমরা বসে আছি, সেখানে ছায়া হয়ে উঠেছে আরও নিবিড়, আরও বিস্তৃত। নীচে, গুহার শীতলতায় বৌদ্ধমূর্তিরা হয়ত আরেকবার দীর্ঘশ্বাস মোচন করলেন। বললেন,—আজও অহিংসার প্রতিষ্ঠা হলো না বিশ্বে! আজও মানুষ মানুষের প্রাণ হরণ করছে?

স্বপ্নোত্থিতের মতো মেয়েটিকে বলে উঠলাম,—এ-জায়গাটার নাম কী যেন?

—বোক্‌রনো কোণ্ডা।

—মূর্তিগুলো দেখেছ? বুদ্ধ মূর্তি?

—হ্যাঁ।

—বুদ্ধ কে ছিলেন?

—ও এই ভেবে বললে,—সন্ন্যাসী।

বললাম,—ঠিক কথা। কিন্তু উনি কি বলতেন জানো?

—কী?

বললাম,—জানো না?

—না!

বললাম। বলতেন,—হিংসা কোরো না, কারুর প্রাণ হরণ কোরো না। শোনো নি এ-সব?

ও সবিস্ময়ে বললে,—না!

বললাম,—অথচ, অহিংসার যিনি পূজারী, যাঁর মূর্তি এই পাহাড়ে রয়েছে, যে-পাহাড়ে অহিংসা-ধর্মাবলম্বীরা তপস্যা করতেন,—আজ সেই পাহাড়ে, সেই তপস্যার পীঠে লুকিয়ে থাকে ডাকাত আর খুনীর দল! আশ্চর্যের কথা নয় কি?

অবাক হয়ে আমার কথা শুনছিল মেয়েটা। কতোটুকু বুঝলো কে জানে, বললে,—হিংসা কোরোনা, কেন বললেন? হিংসা না করলে চলবে কেন? আমি যদি আমার শত্রুকে হিংসা না করি, আমার চলবে কেন? আমি ওকে রোজ রোজ এমনি করে ভাত খাইয়ে যাবো, একদিনও ওর পিঠে ছুরি বসাবো না? যে কি না আমার স্বামীকে খুন করেছে, আমার সর্বনাশ করেছে!

একটু থেমে পরক্ষণেই নিস্তেজ নিষ্পিষ্ট কণ্ঠে বললে,—অবশ্য, আর ভেবে কী করবো? আপনি ত ওকে নিয়ে যাবেন, ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেবেন।

ঝলে উঠলাম,—না। তুমি ভুল বুঝেছো। আমি পুলিশের লোক নই, আমি সাধারণ লোক, বুদ্ধের গুহা দেখতে এসেছি মাত্র।

অবাক হয়ে একেবারে উঠে দাঁড়ালো মেয়েটি, আমার দিকে চোখ বড়ো-বড়ো করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে, তারপরে বলে উঠলো,—যারা গুহা দেখতে আসে, তারা গুহা দেখেই ফিরে যায়, ওপরে উঠে আসে না। আমি এতদিন ধরে আসছি, কখনো ও কাউকে দেখিনি ওপরে উঠে আসতে।

বললাম,—দেখনি বলে কি কেউ আর আসতে পারে না? কিন্তু সে থাক যদি চাও, আমি শহরে ফিরে থানায় খবর দিতে পারি।

—বেশত, ভালো কথা। ওর জ্ঞান ফিরতে এখনো ঢের দেরী আছে।

উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, তাহলে কিন্তু তোমার অসুবিধা আছে। নিজের হাতে যে ওকে ছুরি মেরেছে, সে আর হবে না।

আবার ও যুবি উত্তেজিত হয়ে উঠলো। সজোরে ওঠা-নামা করতে লাগল বুক। কোনক্রমে চাপা ফিস্‌ফিস কণ্ঠে ও বলে,—তাই করবেন। আমাকেই এই ব্যবস্থা নিতে দিন। তখন আমার যদি ফাঁসী হয়, হোক। বললাম,—বেশ পুলিসকে বলবো না। কিন্তু, ছুরি দিয়েই মারবে? ওর খাবারে বিষ মিশিয়ে দাও না? মেয়েটি ত্রস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, আমি সে চেষ্টাও করেছি, জানেন; হাত উঠলো না। বিষ বাড়ীতে এনে রেখেও দিয়েছিলাম সোঁকো বিষ। কী জানি যদি হঠাৎ মিশিয়ে ফেলি, তাই একদিন ফেলে দিয়েছি,—কেন! মেয়েটির মুখে অদ্ভুৎ এক কোমল আভা ফুটে উঠলো। বললে কী জানেন! সারাদিনে এই এক বারটিতি মাত্র ও ভাত খায়! আর, কীভাবে খায় ত দেখেন নি! ভীষণ খিদে পায় বেচারীর! কতদিন ধমকে বলেছি,—এখান থেকে পালিয়ে যা। তা' পালায় না, বলে,—ধরিয়ে দিবি, ত, তুই ধরিয়ে দিবি। না খাইয়ে মারবি, ত, তুই মারবি। অন্য কেউ না।

ঈষৎ সন্দিগ্ধ স্বরে বলে উঠলাম,—একটা সত্যি কথা বলবে?

—কী?

বললাম,—মাত্র তোমার কাছ থেকে ভাতই খায়? আর কোনোরকম—

তাড়াতাড়ি বলে উঠলো,—ছি-ছি, সে-সব কিছু না। আমাকে ছোঁয় না পর্যন্ত। এক-একদিন ভাবি, রাত্রেও আসবো নাকি! ঐ সব ভেবে আর ভরসা হয় না। কিন্তু এখন মনে হয়, রাত্রে এলেও ও আমার কিছু করবে না। বলে

উঠলাম,—তা হলে ওটা ঘটল কী করে? তোমার স্বামী যারা পড়লো, আর তুমি—

বাধা দিয়ে অদ্ভুৎ নিরুত্তাপ, স্থির কণ্ঠে বলে উঠলো,—হয়। জানেন! পুরুষের মাথা এক-এক সময় ও-রকম বিগ্‌ড়ে যায়! আমার শত্রুর,—কিন্তু, আমাকে ভালবেসেইত শত্রুর হয়েছে! একটুক্ষণ থেমে থেকে বললাম,—তাহলে, ওকে মারবে কী করে তুমি, পিঠে ছুরি বসিয়ে? চোখদুটি আবার ওর জ্ব'লে উঠলো, বললো,—না,-না, সেখানে ক্ষমা নেই! উঃ। কী রক্ত-কী রক্ত! বলতে বলতে দু'হাত দিয়ে মুখখানা চাপা দিলো।

আমার মনে হলো, এই-ই সুযোগ। আমি পালিয়ে আসি-চলে আসি। কিছু দূর এগিয়ে এসেছি, ও ঠিক টের পেয়েছে। ছুটে এলো পিছনে-পিছনে,—বললে?

—হ্যাঁ।

—খাবার যাবে?

—না।

তীব্র, উত্তেজিত কণ্ঠে হঠাৎ বলে উঠলো,—তবে জেনে যাও বাবু, আজ না হোক কাল, ওকে আমি শেষ করবোই! তোমার বুদ্ধ-মূর্তি যতোই 'অহিংসা' বলুন না কেন, আমি এই 'অহিংসা'র পাহাড়েই হিংসার স্রোত বইয়ে দেবো! সে-দিনকার সেই ফিন্‌কি-দেওয়া রক্তের কথা যদি আমি ভুলি, তাহলে আমার নরকেও স্থান হবে না।

ফেরার পথে আরেকবার বুদ্ধ মূর্তিদের দর্শন করে এলাম। তাদের তপস্যার আজও শেষ নেই: যা হিংসী, পানং ন হানে।

সিঁড়ি দিয়ে পাথর থেকে মাটির বুকে পা দিতে-দিতে মনে হলো,—তপস্যা ওঁদের ব্যর্থ হবে না। ওঁদের আত্মিক প্রভাব আজও জলে স্থলে ব্যোমে সর্বত্র কাজ করছে। মেয়েটি যেমন করে দস্যুর বাহুতে বিষ মেশাতে পারেনি, তেমনি করে কোনো-দিন তার গায়ে ছুরি বসাতেও পারবে না।

কথাটা চিন্তায় আসতেই, আমার সত্তাটা যেন হঠাৎ দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেল। একজন বললে,—এতে মহত্ত্বের কী আছে! এতো নিছক sex-impluse.

কিন্তু, অপর জন বললে, তা-ও যদি হয়, ত, আমি বলবো,—sex is noble. যৌন চেতনাও অনুকূল বাতাবরে মহত্তম চেতনার উত্তীর্ণ হ'তে পারে।

ঝট্‌কাওয়ালা আমাকে দেখতে পেয়েছিল, কাছে এসে বললে,—বহুৎ দের হো গিয়া সাহাব।

বললাম,—হ্যাঁ। চলো, ঘর চলে।

MANUFACTURERS OF QUALITY
COCKS & VALVES
For
WATER, OIL & GAS
&
Specialists in Manufacturing
SLUICE VALVES
According To I. S. 780 & Other Specifications
J. N. DASS & COMPANY
ENGINEERS & FOUNDERS ON
GOVERNMENT & RAILWAY LISTS
167, BELILIOS ROAD, HOWRAH
WEST BENGAL
Telegram : "BHUBONMO" HOWRAH
Telephone : 66-2708

(৪৬০ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

"চল্লিশ বলেছিলে শেষে"—

"বেশ তাই বলেছি—বাকী ছাব্বিশ বের কর"—

"আর নেই—মাইরি বলছি—পরে দেব মাণিক, চাকরিটা হোক"—

"তুই শালা কিরে—এ্যাঁ" —

"পাল দিওনা মাণিক"—

"আলবৎ দেব—তুই শালার কথার ঠিক নেই"—হঠাৎ কি যেন হল, মাণিকের সার্টের সামনেটা চেপে ধরে পরেশ চেঁচিয়ে বলল, "খবর্দার মাণিক"—

কিন্তু তার আগেই ঘুম করে মাণিক একটা ঘুষি বসাল পরেশের নাকে। মুহূর্তের জন্য পরেশের চোখের সামনে অন্ধকার ঘনাল। তারপর একটা বন্য, আদিম আক্রোশের ঝড় উঠল তার রক্তে। সে ঝাঁপিয়ে পড়ল মাণিকের ওপর। কিল, চড়, ঘুষি। লোক জমে গেল চারদিকে। লোকেরা ছাড়াল তাদের। মাণিক বলল যে, ধার নিয়ে শোধ করছে না পরেশ। লোকেরা তাই বিশ্বাস করল। অবশ্য মারামারিটা তারা থামিয়ে দিল এবং পরেশকে ঠেলে দিল রাস্তার দিকে।

"যান যান মশাই—বাড়ী চলে যান, ইস্, জামাটায় একটু রক্ত লেগেছে দেখছি—রাস্তার কলে ধুয়ে নিন্গে"—

টলতে টলতে এগিয়ে গেল পরেশ। যাওয়াই ভাল। মাণিকের সঙ্গে মারামারি করে মরে লাভ নেই। মরলে তার সংসারের কি দশা হবে? তার বীরু নিরু রাই ছবি ছোট্টকা আর শোভা?

রাস্তার কলে নাক ধুল সে, জামার ওপরকার রক্ত ধুল, তারপর একপেট জল খেয়ে আকাশের দিকে তাকাল। আকাশ মেঘে মেঘে কালো হয়ে আছে। শুধু একটি তারা কাঁপছে একটি প্রদীপের শিখা। হাওয়ায় যেন হাহাকারের ধ্বনি—তার সঙ্গে কারো বাড়ীর দুই ঘুমের সুবাস। জীবন কি? কেন মানুষ জন্মায় আর মরে? কেন এই বেঁচে থাকার প্রাণান্তকর প্রয়াস? এবার বাড়ী ফিরবে সে। শোভাকে সে দেখবে, শোভার বুকের কাছে সে মাথাটা রাখবে, খানিকক্ষণের জন্য ভুলবে সব কিছু। তারপর আবার কাল ভোরে সমস্ত আশা বর্জন করে সাতটার সময় সে নব-ভারতী প্রেসে নামজাদা লেখকদের গল্পের পাণ্ডুলিপি নিয়ে দু'চোখ ছোট করে কম্পোজ করতে বসবে।

হাঁটতে লাগল পরেশ।

একটি মিষ্টির দোকানের পাশ দিয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়াল সে। কাচের কেসের মধ্যে সাজানো সন্দেশ, পান্তুয়া, চমচম, সিঙ্গাড়া, দই, রাবড়ি। কাঁচ ভেঙে ফেলবে সে? লুট করবে?

দূর, এসব কি ভাবছে সে? মনে মনে লজ্জা পায় পরেশ, তাড়াতাড়ি হাঁটে। শোভা দশটা টাকা চেয়েছিল। দরকার না পড়লে সে চায়না। বড় হিসেবী সে। কিন্তু দেবে কোত্থেকে; কি করে সে চব্বিশ টাকা বারো আনা জোগাড় করেছিল তা সে জানে আর জানেন ভগবান। ছি ছি ছি—। কিন্তু দশটা টাকা চাই? যাবে নাকি সে একবার শ্যামাপদ'র ওখানে? তার খুড়তুতো ভাই? বাড়ীটাতো বেশী দূরে না। দেখা যাক্ না ছাই উড়িয়ে—

পাঁচ মিনিট হাঁটতে লাগল।

শ্যামাপদ দেখে খুশী হল না, "কি খবর পরেশদা? বৌদি ভাল, বাচ্চারা ভালো? এতরাতে যে?"

"একটু দরকার ছিল শ্যামা"—

"কি দরকার বল—টাকা ছাড়া আর সব দরকারের কথাই শুনতে রাজী আছি"—

"কিন্তু টাকাই তো দরকার রে শ্যামা, বেশী নয় দশটা"—

শ্যামাপদের চেহারা গম্ভীর হয়ে গেল, সে বলল, "এত রাতে ঠাট্টা করতে এসেছ নাকি পরেশদা?"

"ঠাট্টা।"

"নয়ত কি? দশটা টাকার দাম জানো তুমি? আমাকেই তুমি পাঁচটা টাকা দাওনা। একমাস গোলাম হয়ে থাকব।"

"বড় দরকার শ্যামা"—

"এতরাতে এসে আর মেজাজ খারাপ করো না পরেশদা"—

তোমার নাকটা ফুলে আছে কেন?"

"ও কিছু না—ধাক্কা লেগেছিল—আচ্ছা চলি শ্যামাপদ"—

"এসো।" শ্যামাপদর গলায় হাঁপ-ছেড়ে-বাঁচার ধ্বনি।

বাইরে বেরিয়ে পরেশ দেখল যে, হাওয়ার ধাক্কায় কাঁপছিল যে তারাটা তাও মেঘে ঢাকা পড়েছে। এবার বাড়ী। এই বিশাল মরুভূমির মত জীবনে একটি ছোট্ট মরুদ্যান। শোভা।

তেরো নম্বর গোকুল বোস লেনের তার সেই ঘরের কাছে পৌঁছেই থমকে দাঁড়াল পরেশ। তুমুল ঝগড়া চলছে। একদিকে শোভা অন্যদিকে নবীনবাবু'র বৌ। দর্শকসংখ্যাও কম হয়নি। ওপর থেকে জিতেনবাবু ভোলাবাবুর বৌ এসেছে, অসিতবাবুর দিদি এসেছে আর এসেছে এক পাল ছেলেমেয়ে। নিঃশব্দে তারা ঝগড়া শুনছে। শুধু জিতেনবাবুর বৌ মাঝে মাঝে একটু থামাবার চেষ্টা করছে আর চেষ্টা করছেন পরেশের বুড়ী মা।

"আমার লীলা তোমার দুল চুরী করেছে! আস্পর্দা তো তোমার কম নয় শোভা—বাপের জন্মে ক'টা দুল দেখেছ তুমি? নিজে কোথায় হারিয়েছে তার ঠিক নেই এখন আমার মেয়ের নামে দোষ—কেন? তোমার বীরুকে জিজ্ঞেস করে দেখনা—রাস্তায় রাস্তায় যে চোঁ চোঁ করে ঘুরে বেড়ায় আর বিড়ি টানে"—

শোভা কি যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই পরেশ ডাক দিল। "শোভা"—

নবীনবাবুর বৌ পরেশকে দেখে আর একমাত্রা গলা চড়াল। "এই যে পরেশবাবু, দেখুন, এর বিহিত করুন। আমাকে চোর অপবাদ দিচ্ছে আপনার বৌ"—

শোভা ঘুরে দাঁড়াল, "আপনাকে বলেছি!"

"ওই হল ভাই—আমার মেয়েকে তো বলেছ"—

"ভাইবা কোথায় বলেছি—শুধু জিজ্ঞেস করেছি দেখেছে কিনা"—

"জিজ্ঞেসই বা করবে কেন তুমি? কোন সাহসে? এতগুলান লোক বাড়ীতে, কই তারা তো কোনদিন আমার মেয়ের নিন্দে করেনি"—

পরেশ হাত জোর করে বলল, "আমাদের অন্যায় হয়েছে দিদি—এবার আপনি শান্ত হয়ে ঘরে যান"—

নবীনবাবুর বৌ বলল, "অন্যায় যখন স্বীকারই করলেন তখন আর আমার কথা বলার নেই - কিন্তু শোভাকে আপনি একটু মাথা ঠাণ্ডা রাখতে আর ভেবেচিন্তে কথা বলতে বলবেন পরেশবাবু"—

ঘরে ঢুকল পরেশ, বাচ্চাগুলো ভয়ে চুপ হয়ে আছে। মা বললেন, "নিয়েছে কে তা ভগবান জানেন, যাকখান থেকে বীরুকে ধরে মারলে বৌ মা"—

শোভা বলল, "কি করব, শান্তি পাবার একটা পথ থাকা উচিত তো"—

পরেশ বলল, "কানের দুল হারিয়েছে!"

শোভা বলল, "হুঁ। কাল রাত্তিরে খুলে ওই টেবিলের ড্রয়ারে রেখেছিলাম কান কুট কুট করছিল বলে—ভাবলাম চান করার সময় আজ ওটাকে ভালো করে ঘষে মেজে নেব। তারপর দুপুরে দেখলাম নেই। এর মধ্যে লীলা দু'বার ঘরে এসেছিল, তাই ভাবলাম একবার মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করে দেখি। তা দেখনা, একেবারে তেড়ে এসে যা নয় তাই বললে"—

পরেশ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, "ভালো করে খুঁজেছিলে?"

"খুঁজিনি! সবাই মিলে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি"—

"আচ্ছা আমি দেখছি"—

"খুঁজে ছাই হবে—ও আপদ গেছে—যাও, হাত মুখ ধোও তুমি"—

শোভা রান্নাঘরের দিকে গেল। পরেশ একটু এদিক ওদিক খুঁজেই হাল ছেড়ে দিয়ে বসে পড়ল। সে তাকাল। বীরুর গালটা ফুলে আছে, সে সোজা হয়ে দেয়ালের দিকে মুখ করে বসে আছে। নিরু আর রাণু বই খুলে পড়ার ভান করছে। ছবি হাতের লেখা লিখছে। ছোটকা একটা শ্লেট হাতে বসে আছে। পরেশ তার সংসার দেখে। অন্ধকার একটা ঘর। তার মধ্যে ছেঁড়া শাড়ী কাপড়, সার্ট পাঞ্জাবী, হাফ প্যান্ট আর সার্ট, তুলো বের-হয়ে আসা তোষক আর বালিস, বাক্স পেঁটরা, ডাল চাল তেল নুন, খাতাপত্তর আর বই আর ছোটবড় আটটি জীবন। নরক। তবু রক্তে যেন বাসনার ফুল ফুটছে। কাছাকাছিই শোভা আছে। রুগ্ন দেহে ছেঁড়া সাড়ী জড়িয়ে, ভাগর চোখে মাদকতার স্মৃতি নিয়ে। হাওয়া—সেই এখন হাওয়ায় যেন কোন্ সুদূর দিগন্তের কান্না। তবু রক্তে যেন ফুল ফুটছে, সারাদিনের নিরাশা ক্লান্তি, অবসাদ, অতীতের গ্লানি, বর্তমানের তিক্ততা আর ভবিষ্যতের ভয় সব ঢাকা পড়ে যাবে সেই ফুলের স্তবকে—

"ওরে নিরু - তোরা সবাই খেতে আয়"—শোভার ডাক ভেসে এল।

সবাই গেল, কিন্তু বীরু উঠল না।

পরেশ বলল, "যা বীরু"—

বীরু নড়েনা।

"যা বাবা - ওঠ্"—

পরেশের মা বললেন, "ওঠ্ দাদা—যা"—

বীরু গেল।

বীরুর জন্য কে দায়ী! পরেশ ভাবে। সমাজ, রাষ্ট্র? ধুর। সে দায়ী। একমাত্র সে।

"তুমি বসে রইলে কেন—এসো"—শোভার ডাক ভেসে এল।

পরেশ উঠল।

খেয়ে দেয়ে এসে বসে বসে আবার ভাবে পরেশ। বুড়ী মাও খেয়ে এলেন। এসে মালার থলি নিয়ে সহজে বৈতরণী পার হবার জন্য জপ করতে বসলেন। শোভা ওদিকে হয়ত যাচ্ছে। অপেক্ষা করতে হবে। সবাই ঘুমোলে পর শোভার কাছে গিয়ে বসবে পরেশ। জীবনের ক্ষতকে শোভার স্নেহ ভালবাসায় বর্ষাবৃত করে দেবে।

বাচ্চারা সবাই শুয়ে পড়ল।

মা জপ করে চললেন। দক্ষিণের বাতাসে দুর্গন্ধ।

তেরো নম্বর গোকুল বোস লেনের নটি পেরবাসীর শব্দ ক্রমে মিইয়ে এল। পাড়ার কুকুরগুলোর শব্দ শোনা যেতে লাগল। রান্নাঘরে শোভার বাসন মাজার শব্দও ভেসে এল। ভেসে এল নিবারণ দত্তের বাড়ী থেকে দুর্গন্ধ।

রাত বাড়ল।

"বীরু—বীরু ঘুমিয়েছিস!" পরেশ ডাকল। একবার পরখ করতে চাইল যে ছেলেটি জেগে আছে কিনা। না, ঘুমোচ্ছে বীরু। মায়ের হাতে মার খেয়েছে সে। মেরে মেরে শোভার যখন বিশ্বাস জন্মেছে যে বীরু ফুল তোড়া নেয়নি তখনি ছেড়েছে সে। সেই মার খেয়ে আজ বীরু ক্লান্ত। আজ তার কৌতূহল মায়ের চোটে ঝরে গেছে। ছি ছি ছি - সেই দায়ী এই অবস্থার জন্য। কিন্তু কি করবে সে? কি করতে পারে? বিপ্লবের ধ্বনি তুলে বলবে, এদের সবাইকে ভাসিয়ে দেবে?

অবশেষে শোভা ঘরে এল, দরজা বন্ধ করল। মা তখনো মালা জপছেন।

শোভাকে কেমন যেন ক্লান্ত দেখাচ্ছে। পরনের সাড়ী ছিঁড়েছে দু'জায়গায়। তবু রক্তে জোয়ার আসে। আসছে।

"বাতি নেবাই?" শোভা প্রশ্ন করল।

"না"—পরেশ পুরনো জীর্ণ বঙ্কিমবাবুর গ্রন্থাবলীটা তুলে নিয়ে গেল টেবিলের ওপর থেকে, বলল, "একটু পড়ব"—

শোভা কথা বলল না। মেঝের ওপর ঢালা বিছানায় বাচ্চারা একের পর এক শুয়ে। সবশেষে ছোটকার পাশে গিয়ে তার দিকে পাশ ফিরে শুল শোভা। কেমন যেন ক্লান্ত ভাবটা। বড় মমতা হল পরেশের মনে।

চোখ খুলেই শোভা প্রশ্ন করল, "দশটা টাকার জোগাড় হল?"

পরেশ আমতা আমতা করে জবাব দিল, "না—দেখি কাল পরশু"—

শোভা আর কথা বলল না। মেঘের ডাক ভেসে এল এবার। বোধহয় শিগ্‌গিরই বৃষ্টি নামবে। নাকের ডগাটা চুলকুচ্ছে। বঙ্কিমবাবুর গ্রন্থাবলী পড়ায় ভান করতে করতে অধৈর্য হয়ে উঠল পরেশ। মায়ের জপ করার ইতি আর হচ্ছে না।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত মা মালার থলি একপাশে রেখে দিয়ে শুয়ে পড়লেন। কিন্তু এই বয়সে ঘুম তাড়াতাড়ি আসেনা। পরেশের তা জানা আছে বলেই খাটের ওপর অনেকক্ষণ ধরে বসে রইল। মাঝে মাঝে তার নজর পড়ল ঘুমন্ত বাচ্চাদের দিকে। কি হবে এদের? কি হবে! শোভা শুয়ে আছে, মুখটা হঠাৎ যেন বড় করুণ দেখাচ্ছে তার। সারাদিনের সমস্ত গ্লানির পর রক্তে জোয়ার আসছে। বিপুল এক বন্যার স্রোতে ভেসে যেতে যেতে ও মাটির খোঁজ করার চেষ্টা, বাঁচবার এক মৌলিক প্রয়াস।

পরেশ উঠে দাঁড়াল, বাতি নেভাল। মা ঘুমিয়েছেন। কে পা টিপে টিপে শোভার পাশে গিয়ে বসল। শোভার গায়ে হাত রাখল সে। আশ্চর্য। তার রক্তে যেন রক্তকরবীর ফুল ফুটছে।

শোভা জাগল, জেগে পরেশের হাতটা ঠেলে দিল।

"শোভা"—

"না"—

শোভাকে টানল নিজের দিকে পরেশ।

"না—সরে যাও"—

"কি হয়েছে?"

"কিছু না"—

সারাদিন ধরে ক্ষণস্থায়ী কটি মুহূর্তের জন্য তার যে প্রার্থনা তা ব্যর্থ হবে? অসম্ভব। হঠাৎ পরেশ যেন হিংস্র হয়ে উঠল। হঠাৎ শোভাও যেন হিংস্র হয়ে উঠল। সেও উঠে বসে সজোরে ঠেলে দিল পরেশকে। পরেশ সামলে নিয়ে অন্ধকারেই সশব্দে একটা চড় বসিয়ে দিল শোভাকে। শোভা বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, তারপর অন্ধকারে হাৎড়ে হাৎড়ে দরজা খুলে বারান্দায় চলে গেল।

মেঝের ওপর বসে রইল পরেশ। মেঘের ডাক ভেসে এল আবার। বিদ্যুতের মত করেক মুহূর্ত বসে থেকেই আবার উত্তেজিত হয়ে উঠল পরেশ। শোভার এত মেজাজ কেন? আচ্ছা দেখা যাক্—সেও উঠে দাঁড়াল। পা টিপে টিপে কাপড়া দুটিকে প্রথর করে সেও বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল।

অন্ধকারেও দেখা যায়। দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে শোভা। একটা চাপা শব্দ করে কাঁদছে।

রাগ হল পরেশের "কাঁদছ কেন? কী ন্যাকামী হচ্ছে!"

অন্ধকারে কান্নায় বিকৃত কণ্ঠে শোভা যেন ফোঁস করে উঠল, "হ্যাঁ হ্যাঁ—পেটভরা থাকলে মানুষের কান্নাকেও ন্যাকামী মনে হয় বটে"—

"কি বললে!" হঠাৎ যেন পরেশের সমস্ত উত্তেজনা আর রাগ তার নাক চোখ মুখ দিয়ে, তার প্রতি রোমকূপ দিয়ে বাষ্প হয়ে উড়ে গেল। শোভার পাশে বসে সে গলা নামিয়ে জিজ্ঞেস করল। "তুমি খাওনি?"—

শোভার গলায় যেন বিষের জ্বালা, "ইস, এতক্ষণে খোঁজ নিতে এলেন—থাক্ থাক্, আর খবরদারীতে দরকার নেই—তার চেয়ে তোমার মা চিবোবার দরকার চিবোও—নাও"—

ফুলেই দু'দিনে কেঁদে উঠল শোভা। কান্নার শব্দে ঘরের ভেতরে যাতে কেউ না জাগে তার জন্য কান্নাকে চাপবার চেষ্টা করায় গোঙানীর মত একটা শব্দ উঠতে লাগল।

আর সেই শব্দ শুনতে শুনতে পরেশেরও কান্না পেল। কিন্তু সে শব্দ করল না। নিঃশব্দে, অন্ধকারে তার চোখ বেয়ে জল নামল। আকাশে মেঘ আবার ডেকে উঠল তার সঙ্গে যেন বহুদূর থেকে আর্তনাদের শব্দ ভেসে এল। কাঁদতে কাঁদতে পরেশ অনুভব করল যে তার জীবনও একটা গল্পের পাণ্ডুলিপি। তার মত সাধারণ এক কম্পোজিটারের জীবনেও আজ কত কি ঘটে গেল! যে ফুল তোড়ার জন্য আজ শোভার সঙ্গে নবীনবাবুর ছেলের ঝগড়া হল তা যে কোথায় গেছে সেকথা হয়তো কোনদিনই আর শোভাকে বলবার মত ভালো অবস্থা তার হবে না। কোনোদিনই সে বলতে পারবে না যে ভালো চাকরী পাবার লোভে একে ওকে ঘুষ দেবার জন্য টাকা জোগাড় করার জন্য সেই আজ সকালে ফুলতোড়া চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কি হল? শেষ পর্যন্ত কি হল? খড়কুটো কি কূল পাবে? পা রাখবার মত একটুকরো মাটির অভাবে ভাসিয়ে রাখের মত সে কি কখনো আর শেকড় ছাড়িয়ে নিতে পারবে?

অন্ধকারে নির্জন দুটি দ্বীপের মত স্তব্ধ ও নিঃসঙ্গ হয়ে তারা অনেকক্ষণ বসে রইল, কাঁদতে লাগল আর হঠাৎ আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল আর দমকা হাওয়া এল দূর দিগন্ত থেকে। হাওয়ার দুর্গন্ধ। হাওয়ার যেন কাদের হাহাকার। সেই বৃষ্টি আর হাওয়ার শব্দে শোভার কান্নার গোঙানী আর শোনা গেল না। সেই হাওয়ার ঝাপ্টার জলকণা ওদের পরেশের মুখে পড়ে তার চোখের জল মুছে নিতে লাগল।

হঠাৎ শোভা হাত বাড়াল, পরেশের গায়ে হাত রাখল। পরেশ সে হাত আঁকড়ে ধরল। বস্তাভেতে ভাসমান দুটি প্রাণী যেন বাঁচবার জন্য পরস্পরকে ধরল। সারাদিনের পুঞ্জীভূত গ্লানি, ঘৃণা, লজ্জা, দুঃখ, রাগ, অপমান, লোভ, লালসা আর ব্যর্থতার পর হঠাৎ আজ বিচিত্র এক অনুভূতি হল পরেশের। বিচিত্র এক উত্তরণ। হঠাৎ আজ রক্তমাংস ছাড়িয়ে আরো কোথাও পৌঁছোল পরেশ। সে আজ জীবনের স্বাদ টের পেল।

মেট্রোপলিটন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

(সিডিউলড ব্যাঙ্ক)

নিরাপত্তা ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত। ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।

চেয়ারম্যান—রায় বাহাদুর সতীশচন্দ্র চৌধুরী

ডিরেক্টরবর্গ—শ্রী টি, এন, ভট্টাচার্য; শ্রী কে, এন, বসু; শ্রী কে, সি, দাস; শ্রী এন, ঘোষ; শ্রী এস, এন, বিশ্বাস

ডিরেক্টর ও জেনারেল ম্যানেজার—শ্রী আর, এন, মিত্র, বি, এ; এ, আই, আই, বি

প্রধান অফিস: ৭, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা

শাখা: মিশন রো, উঃ কলিকাতা, খড়গপুর, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার।

১৯৬২ সালের ১লা জুলাই হইতে সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউন্টে শতকরা তিন টাকা হারে সুদ দেওয়া হইতেছে।

[ঘুরে—৪৪৮ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

উচিত—বিশেষ আর এ বাড়ীতে বসে থেকে ওদের ধর্মের সংসারকে কলঙ্কিত করি কেন।

তৃতীয় কারণ—হুঁ, এইটে একটু—মানে তৃতীয় কারণ, চম্পা।

নাম শুনে একটু চমকালেনা? হুঁহেস, চম্পা একটি মেয়ে এবং সে-ই হচ্ছে সব চেয়ে বড় কারণ। আমার এই নিরুদ্দেশ-যাত্রায় সে-ই এবার কাণ্ডারী।

তোমার চোখে মুখে জেলাসির কোন চিহ্ন দেখছিনা কেন সুরমা? এটুকুও খারাপ লাগছে না? নাঃ, স্বীকার করতে হল, তুমি একটু আলাদা। তোমার মতো মেয়ে বোধহয় এর আগে আমি দেখিনি। তবে চম্পার কথা যদি বলো, তার সঙ্গে কারো তুলনা হয়না। সে অতুলনীয়া।

আমি বুঝতে পারছি চম্পা কে, তা তুমি জানতেও চাইবেনা। সত্যি বলতে কি তোমার এই 'কা-ম কোয়োয়েটনেস্' যখন যখন যেন আমারো নার্ভকে ছুঁয়ে যাচ্ছে। হুঁহেস, তোমার পার্সোনালিটি আছে মনে হয়।

কিন্তু চম্পার কাছে তুমি কিছুই নও। আমি বলছি, তুমি কিছুই নও।

চম্পা—চম্পা এক কথায় আশ্চর্য। সে যে কী আমিও ঠিক বলতে পারিনা। রেসকোর্সের মাঠে তাকে প্রথম দেখেছিলাম তিন বছর আগে। সারা শরীরে তার কলা-তোলা সাপের ছন্দ। কালো পদ্মপলাশে চোখ দুটো প্রথমে ঢাকা ছিল, যখন চম্পা খুলল, চোখ দেখে আমি চমকে উঠলুম।

কী আছে সেই চোখে? জানিনা। একটু কটা-বাঘিনীর সঙ্গে রক্তের মিল থাকতে পারে। একটা উগ্র উজ্জ্বল আলো থেকে থেকে খেলে যাচ্ছে তার ওপর। কার সঙ্গে তুলনা করব? ক্লিওপাত্রার চোখ কি এই রকম ছিল? ক্যাথারিন ডি, মেডিসির? মাতাহারীর? দেখিনি, বলতে পারব না।

সেই চোখ আমাকে টেনে নিয়ে গেল। প্রথমে হোটেলে, তারপরে তার ফ্ল্যাটে।

অনেক জাতের অনেক মেয়ে দেখেছি, আমার জীবনে তারা কেউ এসেছে একটি বেলার ভরা সন্ধ্যার জন্যে, কেউ বা ক'টা দিন সঙ্গ দিয়েছে। তারপর ভুলে গেছি তাদের, এখন পথে ঘাটে, মুখ দেখলে চিনতে পারবনা। কাউকে কিছুক্ষণের জন্যে ইন্টারেস্টিং মনে হয়েছে, কাউকে আধ ঘণ্টা পরেই ভেবেছি—বোরিং-বোরিং-বোরিং। কিন্তু চম্পা আমার কাছে আজ তিন বছর ধরে প্রতিদিনের বিস্ময়—ওকে আমি চিনতে পারিনি।

ও কে—কোথা থেকে এসেছে, জানতে চাইনি আমি। ওকে দেখলে মনে হয় যে কোনো স্বজনের মতো একটা পারিবারিক পরিচয় নিয়ে আসেনি। আকাশ থেকে যেমন করে উল্কা ঝরে পড়ে, তেমনি নরক থেকে একটুকরো নীল আগুনের মতো পৃথিবীতে ছিটকে পড়েছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতার সেই উর্বশীর মতো ওর কোনো শৈশব ছিলনা, ও যেন সম্পূর্ণ আর অকুণ্ঠিত যৌবন নিয়েই দেখা দিয়েছে একেবারে। দেশ-জাত-ধর্ম সব কিছুর ওপরে।

বাংলা-হিন্দী-উর্দু-ইংরেজি সব বলতে পারে, কিছু কিছু ফ্রেঞ্চও জানে। যে কথা বলছিলুম, ওর কোনো প্রভিন্স্ আছে বলে মনে হয়না—না চেহারায়, না চাল-চলনে। তবু একটা আঞ্চল আছে, আর সেইটেই ওর পরিচয়।

যার সঙ্গে থাকে, তাকে ভাই বলে পরিচয় দেয়। নিগ্রোর মতো চেহারা, বিরাট জোয়ান—মোটা খ্যাবড়া নাক, এক সময় বক্সার ছিল বলে মনে হয়। মুখে এলোমেলো বড়ো বড়ো দাঁত, দেখলে সন্দেহ হয় কাঁচা মাংস খাওয়ার অভ্যাস আছে বোধহয়। ইংরেজীতেই কথা বলে। ভাই? কে জানে। ওর সঙ্গে নরক থেকে বডিগার্ড হয়ে এসেছে কিনা, তাই বা কে বলবে। এ বাকিং ডগ অফ্ ব্লুটো।

তবু ওর মুখ বন্ধ করার উপায় আমি জেনেছি। ঘুষে

মনের বোতল - ব্যাস্। এলোমেলো চিন্তাগুলো খুশিতে হেসে ওঠে। দুটো বোতল শেষ করে একটা সীটার নিয়ে বসে—রক্ এন্ রোল ছাড়ের কি সব বাজায়। আমার ইন্টারেস্ট্ নেই, ওয়েস্টার্ন মিউজিক আমি বুঝি না।

আজ তিনবছর ধরে তিলে তিলে আমি চন্দার মধ্যে ডুবে গেছি, হারিয়ে গেছি। ওর হিংস্র ভালবাসার মধ্যে মৃত্যুর মতো কী যে আনন্দ আছে আমি জানিনা। কখনো কখনো চোখ বুজে স্বপ্ন দেখেছি, আমি যেন সুন্দরবনের কোনো নীল ছায়ার তলায় একরাশ কাঁটার ওপর মৃতদেহের মতো শুয়ে আছি আর একটা বিশাল বাঘিনী তার থাবা দিয়ে আমাকে চেপে রেখে আমার মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। সে যে কী অদ্ভুত অনুভূতি আমি তোমায় বোঝাতে পারব না।

সেই মৃত্যুর আনন্দ এবার পুরোপুরি আমি অনুভব করতে চাই। না—এই কলকাতায় নয়। "অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য ক্রাউডিং ক্রমস্ সিভিলাইজড্ ক্রাই। ফ্রম সার্চেড্ প্রসেসারস্ হোয়ার উই অ্যাণ্ড হোয়াই।" আমাদের ব্যাবসার সুযোগ নিয়ে ওর আর আমার জন্যে দুটো পাসপোর্ট জোগাড় করেছি। আপাতত হংকং, তারপর—

তারপর আর জানি না।

কী ভবিষ্যৎ? কী পরিণাম?

ভাববার কোনো দরকার দেখছিনা। একটা বাঘিনী যাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়, সেই ভয়ঙ্কর আর রোমাঞ্চকর মৃত্যুতেই তার চরম পরিণাম। তারও পরে আর কিছু থাকতে পারে না কি? আমি গ্রাহ্য করিনা।

আর এক গ্লাস জল দিতে পারো সুবর্ণা? কেন যে আজ গলাটা এত বার বার শুকিয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারছিনা। থ্যাঙ্কইউ। জলটা কিন্তু বেশ ভালোই লাগছে এখন। আমি লক্ষ্য করে দেখছি, তোমার চেহারাতে সত্যিই একটা পার্সোনালিটি আছে। তুমি তো গরীবের মেয়ে—কী করে এটা এল তোমার মধ্যে?

বুঝেছি। দরিদ্রেরও একটা দিক আছে—তারও একটা আত্মমর্যাদা আছে। প্রায় ছেলেবেলায় 'প্রাইড্ অ্যাণ্ড প্রেজুডিস্' বলে একটা বই পড়েছিলুম, তাতে যেন এই রকম একটা চরিত্র ছিল বলে মনে হয়। তোমার আঙুলগুলো কিন্তু খুব আর্টিস্টিক্। মুঠোর মধ্যে টেনে নিতে ইচ্ছে করে।

জাম্বাইট।

চন্দার সঙ্গে তোমার তুলনাই চলেনা। আমি মানি তোমার কিছু রূপ আছে, কিছু পার্সোনালিটি রয়েছে, নার্ভ আছে আর অ্যাবাভ্ অল্—একটা ক্যারাকটার আছে। কথাগুলো কি আমি আজ রাতেই আবিষ্কার করলুম? হয়তো তা নয়, হয়তো তোমাকে দেখবার সঙ্গে সঙ্গেই এগুলো আমার মনের ওপর ছায়া ফেলেছিল। না হলে আজ রাতে এমন করে আমার সব কথা তোমাকে বলে যাচ্ছি কেন? এমন কি, তোর পাঁচটার প্লেনে যে চন্দাকে নিয়ে আমি পালাব—যাব হংকং-এ সে কথাই বা তোমাকে কেন বলে ফেললুম।

কিন্তু তোমাকে যতটুকু চিনতে পারছি, তাতে মনে হচ্ছে, তুমিই সব চাইতে নিরাপদ জায়গা—যেখানে সব কথা আমি বলতে পারি। অর্থাৎ তোমাকে বিশ্বাস করা যায়। জানো সুবর্ণা, আমার কোনো বন্ধু নেই। যারা আসে যায়, তারা আমার সঙ্গী—কারণ একা মদ খাওয়া যায় না, ওটা কেবল 'জুয়ু' রাই পারে। আর হল্লোড় করতে গেলেও লোক চাই। একা হৈ হৈ করলে লোকে পাগল বলে আর জল পাকিয়ে পাগলামি করলে লোকে তাকে 'কাপ্তেন' বলে খাতির করে।

আসল কথা হল, আমার কোনো বন্ধু নেই। চন্দা বন্ধু নয়, সে তো আমার মরণ প্রেম। সে কেড়ে নেয়, ছিনিয়ে নেয়, তার রাঙানো ঠোঁট আর ধারালো দাঁতের হাসি দেখেই বুঝতে পারি সে কে—তার সঙ্গে আমার কিসের সম্পর্ক। তবু লোকের ওই পুরোনো সংস্কারটাকে আমি আজকাল বিশ্বাস করতে শুরু করেছি, মানুষমাত্রেরই একজন—একজনের বেশি কখনো হয়না—বন্ধু দরকার। আর কিছু কারণে নয়, মধ্যে

অথবা নিজের মনের ভার নামানোর জন্যে কাউকে কাছে পাওয়া দরকার।

সুবর্ণা, তুমি আমার বিয়ে করা স্ত্রী না হয়ে যদি বন্ধু হতে—

চুলোয় যাক, আমার কোনো বন্ধু দরকার নেই। চম্পাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

রাত কত হল? আরে—এ যে দেড়টার কাছাকাছি। আর তো সময় বেশি নেই। তবু কী ভালো সুবর্ণা, এই ঘুম আর আতরের বিরক্তিকর গন্ধটা না থাকলে তোমার কাছে কথা বলতে আমার মন্দ লাগত না। আজকের রাতটাও বেশ—চাঁদটা যেন জানালার কাছে এগিয়ে এসেছে, দক্ষিণের হাওয়া ঘরে এসে ঝাপাঝো করছে, সমুদ্রের হাওয়া। এখন মনে হচ্ছে, তোমার শাড়ী আর গয়নাগুলো একেবারে বেমানান হয়নি, গালে কপালে চন্দনের ফোঁটা যে এঁকেছে, তারও একটা আর্টিস্টিক্ টেস্ট্ আছে। তুমি বেশ সুবর্ণা, আমি ছাড়া আর কেউ হলে—

না, কী যে বকছি ঠিক নেই। আমি তোমাকে পরিষ্কার বলছি সুবর্ণা! বিবাহিতা স্ত্রীদের আমি ঘৃণা করি। তারা বাসি ফুলের মতো, একদিন পরেই অসহ্য হয়ে যায়, আঙুলে চটকে ধরলে কেমোক্ত রূপ নেয়। বিয়ের আগে তুমি আমার কেউ ছিলেনা, বিয়ের পরেও তুমি আমার কেউ নও। কাল সকালেই আরো অনেক মেয়ের মুখের ভিড়ে তোমার মুখও আমার মন থেকে হারিয়ে যাবে।

কাল সকালে। ট্রেন তখন অনেক দূরে এগিয়ে গেছে। জানলা দিয়ে যে সমুদ্রের হাওয়া আসছে, সেই সমুদ্র তখন পড়ে থাকবে পায়ের তলায়। ওপরে নীল আকাশ, নীচে নীল ফেনা। ওপরে শূন্যতা, নীচে বসুধা। আমার পাশে বসে থাকবে চম্পা—তারই বুক দিয়ে আমাকে পরম বসুধার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

চম্পাকে নিয়ে আমি পালাচ্ছি।

আর একটু কারণও আছে। একটি বারোয়ারী নন্দনকেও কিছুদিন ধরেই আনাগোনা করতে দেখতে পাচ্ছি। চম্পার সেই "ভাই" সেই "হেল-হাউও্" যেন একটু বেশি ঝুঁকেছে তার দিকে। তার গাড়ীতে প্রায়ই আনাগোনা করে এদিক ওদিক। আগে আমি মদের বোতল উপহার দিলে দাঁত বের করে বলত, 'থ্যাঙ্ক ইউ মিস্টার।' এখন কথা বলে না—সোজা হয়ে থাকে আর দুটো সাদা সাদা চোখ মেলে কেমন বিশ্রী ভাবে চেয়ে থাকে আমার দিকে।

গায়ের জোরে বারোয়ারী ছেলেটাকে আমি হটিয়ে দিতে পারি, কিন্তু ওর রূপোর পাতা আমার চাইতে অনেক বেশি জোরালো। সেখানে কিছুতেই আমি পেরে উঠব না। তা ছাড়া চম্পার ভাইটা যদি ওর সঙ্গে ভিড়ে যায়, ভিড়ে গেছে বলেই মনে হচ্ছে: 'থেন এ স্প্যানিয়েল্ দ্যাজ মো চার্মস্ উইথ্ এ স্প্যানিয়ার।'

আর চম্পা? তাকে বিশ্বাস করবার কোন কারণ নেই। বাঘিনীর রক্ত হলেই হল। আর সে রক্তটা যেখানে বেশি, তার লোভও সেদিকেই ছুটে যাবে। তাই তাকে নিয়ে আমি পালাব।

না—মোটিভ্ জানতে দিইনি। শুধু বলেছি, চলো তোমাকে হংকং দেখিয়ে আনি। খুব খুশি মনে রাজী হয়েছে। ভাইটা একটু আপত্তি করছিল, কিন্তু চম্পা জানে, 'হাউ টু প্লীজ্ হার ডল'। সাদা সাদা চোখে এখন কুটিল ভাবে আমার দিকে তাকাচ্ছে, কিন্তু কিছু করবার জো নেই।

বলেছি, দিন দশেক বেড়িয়ে আসব। কিন্তু চম্পা জানে না, ওকে আমি কোথায় নিয়ে চলেছি। জানে না, এই কলকাত্তায় ও আর কোনোদিন ফিরতে পারবে না। হয়তো নাটকটা শেষ হবে আফ্রিকার কোনো জঙ্গলে, কোনো 'অ্যাবানডনিয়ান করেস্টে', কোনো সমুদ্রের নির্জন দ্বীপে। আমার বসুধার সঙ্গে সঙ্গে আমার বাঘিনীকেও যেতে হবে সহমরণে—তারও মুক্তি নেই। নইলে নরকে গিয়ে আমার মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে কে?

কী হল, ঘুম পাচ্ছে কেন আমার? এই ঘুম আর এয়ারফ্রেশনারের হেটুলুশ গন্ধে, দক্ষিণের হাওয়ায় চোখ জড়িয়ে আসছে কেন এমন করে? তোমাকে যেন লাগছে, ইচ্ছে করছে তোমার কোলে মাথা রেখে একটু শুয়ে পড়ি।

কী আশ্চর্য—এভাবে তো আমার কখনো ঘুম আসে না। তা ছাড়া সময়ও তো আর বেশি নেই। সুবর্ণা আমার সন্দেহ হচ্ছে। তুমি কি হিপ্‌নটিজ্‌ম জানো? জানো না? তা হলে এমন ভাবে ঘুম পাচ্ছে কেন?

না—এই দুর্বলতার কোনো মানে হয় না। 'আই মাস্ট্‌ গেট রীড্‌ অফ ইট'। একটু বাইরে থেকে পায় চারি করে আসা যাক। ঘুমটা ছাড়ানো দরকার।.....

..... বেশিক্ষণ বাইরে দাঁড়ানো গেল না, কেমন ক্লান্ত লাগছে। আমাদের সারা বাড়ীটা এতক্ষণ নিঃসাড়ে ঘুমিয়েছে কোথাও কোনো সাড়া শব্দ নেই। বাবা বৌদি দা আজ সবাই নিশ্চিন্ত, ভাবছে আমার জন্যে আর ভাবনা নেই, আমি বাবা পড়েছি। হা-হা-হা।

বাথরুমের পেছনে স্পাইরাল সিঁড়িটা দিয়েই নেমে যাব। ওই যে সুটকেসটা দেখেছ কোণায়—ওতেই সব গুছিয়ে রেখেছি। আমার সময় হয়ে এল সুবর্ণা—এবার আমায় যেতে হবে।

তুমি দেখছি ঠিক এক ভাবেই বসে রয়েছ। ঠিক প্রতিমার মতো বসে আছো এক জায়গায়। তোমার কি এতটুকু ক্লান্তি নেই, এক ফোঁটা ঘুম নেই? আশ্চর্য।

কিন্তু এবার তুমি ঘুমুতে পারো—নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করতে পারো। তুমি কিছু ভেবোনা। তোমার ক্ষতি হয়েছে, তোমার ওপর অন্যায় করা হয়েছে, এ আমি মানি। কিন্তু আমার ধর্মভীরু বাবারা—তোমার সব ক্ষতি পূরণ করে দেবে—তোমার চিন্তা নেই।

চিন্তা নেই তো! একটু হাসলে যেন ভালো হত। যে আর দাঁড়াতে পারছিনা। কী ঘুম আসছে, কী নিদারুণ তোমার চাহিটা—কিন্তু ওসব এখন থাক। আমাকে যেতে হবে। 'আই মাস্ট্‌ বী কুইক্‌ মাউ'।

আঃ কপালের এই চন্দন টলমলগুলো পরিষ্কার করে এখন একটু ভদ্রলোক হওয়া দরকার। কী বলছ, তুমি পরিষ্কার করে দেবে? তুমিই দেবে সুবর্ণা? থ্যাঙ্ক ইউ—তোমার নার্ভের ওপর আমার শ্রদ্ধা হচ্ছে। বাঃ, তোমার আঙুলের ছোঁয়া তো খুব নরম। চম্পার আঙুলগুলোও নরম, কিন্তু ম্যানিকিয়োর করা—মুখের খোঁচা লাগে মধ্যে মধ্যে।

ধন্যবাদ—অশেষ ধন্যবাদ। এইবার সুটকেসটা একটু চেক করে নেওয়া দরকার। তারপরেই আমার ছুটি।

তুমি সুটকেসটা দেখে দেবে? দাও—দাও। হাজার হোক বিবাহিতা স্ত্রী—হা-হা-হা। পতি বিদেশে যাওয়ার সময় সতীকে এ-সব কঠিন ওয়ার্ক করে দিতে হয়। আমিও তোমায় বাধা দিতে চাই না। তা ছাড়া এসব গোছানোর ব্যাপারে চিরদিনই আমি অপটু, বৌদিরাই আমার হয়ে বরাবর করে দেয় এসব।

আরে—আরে, এ কী করছ? নিজের গয়নাগুলোও খুলে দিচ্ছ কেন ওর ভেতরে? কাস্টমসে ধরবে যে। কী বলছ? চম্পার গায়ে পরিয়ে নিলেই আর কোনো অসুবিধে হবে না? বলছ, টাকা ফুরিয়ে গেলে দরকার হতে পারে? কিন্তু তুমি তো জানো না, চম্পা তোমার মতো নয়। তাকে একবার যা দেওয়া যায়, খুন না করলে তার কাছ থেকে তা আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না!

তবু তুমি দেবেই? গরীবের মেয়ে তুমি, তবু গয়নার জন্যে কোনো লোভ নেই তোমার! এমনটা তো ঠিক আশা করিনি। তুমি ডিফারেন্ট্‌ সুবর্ণা, আই মাস্ট সে—সাধারণ অর্থে জীবনে তুমি সুখী হতে পারতে, আমি ছাড়া এনি টম ডিক হ্যারীকে সুখী করতে পারতে।

এইবার আমায় যেতে হবে। কিন্তু কী আশ্চর্য—আমি

ঘুম। না—একটু বসি। তাতেও তো হচ্ছে না। ওই তাকিয়াটা দাও—একটু শুয়ে পড়ি।

পনেরো মিনিট। ঠিক পনেরো মিনিট পরে আমি উঠব। আমাকে জাগিয়ে দিও।

মাথাটা ভয়ানক ধরেছে। একটু হাত বুলিয়ে দেবে? না—না, দরকার নেই। কপালটা ছিঁড়ে পড়তে চাইছে। আচ্ছা, দাও একটু আঙুল বুলিয়ে।

চম্পার চাইতেও নরম—তোমার হাতের চাইতেও নরম! ঠিক বুঝতে পারছিনা। ওর ম্যানিকিয়োর করা আঙুলে খোঁচা লাগে। রবিনীর খাবারও তো নরম, কিন্তু সেই সঙ্গে দাঁত ছেঁড়ার জন্যে সারি সারি ধারালো নখ। তুমি চম্পার চাইতে আলাদা। হয়তো চম্পার চেয়ে আরো—

না—না, চম্পার সঙ্গে তোমার তুলনা চলেনা। তুমি কিছুই নও তার পাশে। মাথার যন্ত্রণাটা কিছুতে যাচ্ছেনা, তাকিয়াটা ভয়ানক শক্ত। তোমার কোলে একটু মাথা রাখব? দরকার নেই—দরকার নেই। আমি উঠে পড়ব এক্ষুণি। আমার সময় কম। আর দেরী করলে চলবেনা।

আচ্ছা, তাই হোক, তোমার কোলেই মাথা রাখি। জাস্ট্ ফাইভ্ মিনিট্স্।

তোমার হাতটা ভালো লাগছে সুবর্ণা, তোমার কোলটা কী আশ্চর্য স্নিগ্ধ, সেই ফুল আর এলাচের গন্ধে আমার ঘুম আসছে। ভয় হচ্ছে, আমি ঘুমের মধ্যে একেবারে তলিয়ে যাব—তিনটে, চারটে, পাঁচটা ছটা বেজে যাবে, ঘুম থেকে আমি জাগতে পারবনা।

না—এ হতেই পারে না। 'আই মাস্ট্ নট'। আমাকে যেতেই হবে।

তুমি আমার কেউ নও—তোমার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই আমার। তোমাকে আমি স্বীকার করি না। চম্পাই আমার সব—আমার দুঃখ, আমার পরিণাম।

তবু তো তোমার কোল ছেড়ে আমি উঠতে পারছি না। এ আমার কী হল? দশ মিনিট পরে ঠিক আমায় জাগিয়ে দেবে বলছ? নিশ্চয় জাগিয়ে দিয়ো। না—না জাগিয়ো না।

তা হলে কি আজ রাতে তোমারই জয় হল? তোমারই জয় হল সুবর্ণা? না—আমি তোমায় স্বীকার করি না। তবু আমার ঘুম আসছে তোমার কোলেই আমি ঘুমুব।

আঙুলগুলো সরিয়ে নাও। না—সরিয়োনা। জাগিয়ো-না—জাগিয়ো না আমাকে। আজ তোমারই জিত হোক সুবর্ণা। আজ আমি হার মেনেছি। ভোরের প্লেনও হংকং যাওয়া আজ আর আমার হল না।

আজের পরে কাল আছে সুবর্ণা। আমাকে তুমি বাঁধতে পারবে না। কিন্তু কালও যদি এমনি ঘুম পায়। যদি—

আমার আগামী কাল কি ফুরিয়ে গেল সুবর্ণা? যার আজকের ওপর জোর নেই, কালকের ওপর সে কি ভরসা রাখতে পারে?

জানি না—জানি না।

কপালে কী পড়ল সুবর্ণা? বুঝেছি, এতক্ষণ পরে তোমার চোখ দিয়ে জল পড়ছে। পড়ুক—পড়ুক—বৃষ্টি নামুক মরুভূমির ওপর।

আমার ঘুম এল সুবর্ণা। আমাকে তুমি জাগিয়োনা।

২০২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থিত গোবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীবিমলচন্দ্র দিন্দা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রবাসী

কার্তিক ১৩৬৯
৭ম সংখ্যা : ২৭ বর্ষ

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

গল্পাবের পর

মর্গান-ব্রাঙ্গীয় মতবাদের আলোকে

বিবাহ ও পরিবারের ক্রমবিকাশ

অনিলচন্দ্র রায়

টাইলারের ছক

সমাজবিবর্তনের একটা ছক মোটামুটি ভাবে নৃতাত্ত্বিক টাইলারও দিয়াছেন। এই ছক প্রায় মর্গানী-মতেরই সমর্থন করে। টাইলারের সমাজ বিকাশের ক্রম হইল এইরূপ :

মাতৃক্রমী (Maternal) মাতৃক্রমী-পিতৃক্রমী (Maternal-paternal) পিতৃক্রমী (Paternal) একেবারে আদিম অবস্থায় মাতৃক্রমই একমাত্র ব্যবস্থা ছিল, কারণ তখন অবাধসংসর্গ ও অজ্ঞাত পিতৃত্বের বস্তু অবস্থা চলিতেছিল। সন্তান তাই মাতৃগোষ্ঠীর। সম্পত্তি ও পদমর্যাদা ভাই বা ভাগ্নের কাছে যাইবে কিন্তু কখনও পিতা হইতে সন্তানে বর্তাইবে না। টাইলারের মতে, প্রত্যেক স্তরের বংশক্রমের সঙ্গে সঙ্গে আনুসঙ্গিক কতকগুলি প্রথা, আচার ও অনুষ্ঠান গড়িয়া উঠিবে। এই সব মিলিয়া প্রতিস্তরের একটা কৃষ্টিমূলক বিশ্রগ্রন্থি সৃষ্টি হয় (complex) তাই এই তিন বংশক্রমের সঙ্গে তিনটি সাংস্কৃতিক স্তরও অনিবার্যভাবে রহিয়াছে। প্রত্যেক স্তরের অন্তর্ভুক্ত আচার-প্রথাগুলি দেখিয়াই সেই সমাজের সাংস্কৃতিক স্তরটী নির্ণয় করা চলে। মাতৃক্রম হইতে পিতৃক্রমে পরিবর্তনের পথে একটা অবস্থা হয় যাহার মধ্যে কিছু মাতৃক্রমিক আচার-প্রথা অবশিষ্ট থাকে এবং কিছু পিতৃক্রমিক প্রথা-প্রতিষ্ঠানও উদ্ভব হয়। পৃথিবীর বর্তমান অসভ্যজাতিগুলি সবই টাইলারের মতে "মাতৃক্রমী পিতৃক্রমী" নামক এই মধ্যস্তরে আছে। কারণ দেখা যায় সব জাতিতেই উভয় পক্ষেরই (পৈত্রিক ও মাতৃক্রমিক) কিছু অধিকার স্বীকৃত হয় এবং মাতৃক্রমী ও পিতৃক্রমী প্রথার মিশ্রণ সব জাতির মধ্যেই রহিয়াছে। তাই বলা চলে বিশুদ্ধ মাতৃক্রমী জাতি পৃথিবীতে এ যুগে নাই। খাসিয়া, পুয়েব্লো ইণ্ডিয়ান প্রভৃতি আদল মাতৃক্রমীদের মধ্যেও কিছু পিতৃবংশের প্রভাব রহিয়াছে। এখন প্রশ্ন এই যে পৃথিবীর কোন জাতিতেই যদি অবিমিশ্র মাতৃক্রম না থাকে, তবে পূর্বে একসময়ে সব জাতিই মাতৃক্রমী ছিল এমন মনে করিবার কী

কারণ আছে। টাইলার এক রকমের যুক্তি দ্বারা এই পূর্ববর্তী মাতৃক্রম অনুমান করেন যাকে তিনি বলিয়াছেন "ভূতাত্ত্বিক" (geological) যুক্তি। ভূতত্ত্ব বলে, পৃথিবীতে স্তরের পর স্তর মাটী দেখিয়া এবং তার মধ্যেকার কঙ্কালাদি দেখিয়া, প্রত্যেক স্তরের বয়স এবং প্রাণী সমাজেরও বয়স ও ক্রমপৌর্বাপর্য্য অনুমান করিয়া লওয়া যায়। তেমনি প্রত্যেক সমাজে বিশেষ বিশেষ প্রথা ও আচার ব্যবহার দেখিয়া ইহারা কোন স্তরের তাহা বাহির করা চলে। এই রীতিতে কোনো কোনো প্রথা শুধু মাতৃক্রমেরই অঙ্গ হইতে পারে। কাজেই পিতৃক্রমী সমাজে ঐরূপ প্রথা দেখিলে তাহাকে পূর্ববর্ত্তী মাতৃক্রমের ধ্বংসাবশেষ বা survival বলিয়া ধরা উচিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ টাইলর মাতুল প্রণাম (avunculacy) এবং বরের প্রতিপনা (couvade) নামক প্রথার উল্লেখ করিয়াছেন। এই দুই প্রথা মাতৃক্রমের লক্ষণ এবং যেখানেই এদের সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে, সেই সমাজই পূর্বে মাতৃক্রমী বলিয়া ধরিতে হইবে।

avunculate বা মাতুলতন্ত্র বলিতে মামা-ভাগ্নের একটা বিশেষ অন্তরঙ্গ সম্পর্ক বোঝায়। কাই (Kai) জাতির মধ্যে বিবাহের জন্য মেয়ের মামার অনুমতি চাই। থোঙ্গা (Thonga) দের মধ্যে ভাগ্নে মামার সম্পত্তি পায়। উইনেবাগোদের (Winnebago) মধ্যেও ভাগ্নের মাতুল সম্পত্তির যদৃচ্ছাব্যবহারের অধিকার আছে। ওশেনীয়া, টরেস প্রণালী দ্বীপ, ফিজি ও আফ্রিকার কোথাও কোথাও এই মাতুলতন্ত্র আছে। মামার সম্পত্তি প্রাপ্তি, মামাত বোনকে বিবাহ ক্রিয়াকর্মে মামার প্রাধান্য ইত্যাদি নানা প্রথার মধ্যে এই মাতুল মর্য্যাদার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। টাইলার ইহাকে মাতৃক্রমের survival বলিবেন। মাতৃক্রম ছিল পূর্বে, তাই মামার সহিত বিশেষ সম্বন্ধটুকু টিকিয়া রহিয়াছে। মর্গানের মত টাইলারও উত্তরন নীতির আশ্রয় নিয়াছেন। এই নীতি যে ভুল সে সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। এখন মাতুলতন্ত্র সম্বন্ধে এইটুকু বলিলেই চলিবে যে আধুনিক পণ্ডিতেরা ইহাকে মাতৃক্রমের অনিবার্য্য লক্ষণ বা necessary trait বলিয়া স্বীকার করেন না। **প্রথমতঃ** বহু মাতৃক্রমী জাতির মধ্যে এই প্রথা নাই। মাতৃক্রমী জাতিতে স্বভাবতই মামার প্রাধান্য হওয়া উচিত, কিন্তু কার্য্যতঃ অনেক জাতিতেই পাওয়া যায় না। ইহাতে মাতৃক্রমের সহিত কার্য্য কারণ সম্বন্ধ খণ্ডিত হয়। **দ্বিতীয়তঃ** বিকীরণ প্রক্রিয়া বা আদান প্রদানের মধ্য দিয়াও সংস্কৃতির কোন একটা trait বা অঙ্গ এক জাতি হইতে অন্য জাতিতে সঞ্চারিত হইতে পারে। এসব ক্ষেত্রে পিতৃক্রমী সমাজেও কোনও পথে এই প্রথা প্রবেশ করিতে পারে। তাহা দেখিয়া এই জাতিকে এককালে মাতৃক্রমী ছিল ইহা বলিলে হাস্যকর ব্যাপার ঘটিবে। **তৃতীয়তঃ** এই প্রথার উৎপত্তি নানা উপায়েই হইতে পারে। টাইলার শুধু মাতৃক্রমই ইহার উদ্ভবের একমাত্র কারণ বলিয়া ধরিয়াছেন। অথচ অন্য উপায়েও ইহার প্রচলন হইতে পারে। মামাত ভাইবোন এবং পিসতুত ভাইবোনে বিবাহ (cross-cousin marriage) যে সমাজে আছে, সেই সমাজেই প্রায়শ এই প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। এই ক্ষেত্রে মামাত বোনের সহিত বিবাহ হওয়ার প্রথা থাকার দরুন ভবিষ্যতের সম্ভাব্য বৈবাহিক সম্বন্ধ হেতু মামার সঙ্গে গভীরতর আত্মীয়তার সূত্রপাত হইতে পারে। যথা, পশ্চিম অষ্ট্রেলীয় পিতৃক্রমী কারেরা (Kareira) দের মধ্যে ভাবী শ্বশুরের প্রতি ভাবী জামাতার বিশেষ বিশেষ কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত থাকে। কিন্তু ঐ সম্পর্কের অপর আত্মীয়দের সঙ্গে তেমন নয়। লাউয়ী বলেন, এ ক্ষেত্রে রক্ত সম্বন্ধ হেতু না হইয়া বরং বৈবাহিক সম্বন্ধ হেতুই এই সম্পর্ক বন্ধনের নিবিড়তা সৃষ্টি হইয়াছে। **চতুর্থতঃ** মাতুল বংশের প্রাধান্য পাইলেই যদি পূর্ববর্ত্তী মাতৃক্রম অনুমান করিতে হয়, তবে মাতৃক্রমী জাতিতে পিতৃকুলের আত্মীয়দের প্রাধান্য পাইলেও তো এই মাতৃক্রমীকে

পূর্বে একথাকালে পিতৃক্রমী ছিল বলিয়া ধরিয়া লওয়া উচিত। বাস্তবিক পক্ষে এমন দৃষ্টান্ত আছে। বেলানেশীয় ও কোণ্ডের মধ্যে পিসীর মর্যাদা ও প্রাধান্য খুব বেশী [পিতৃক্রমী খোজা ও টোডাদের মধ্যেও তাই। টোডাদের ছেলেমেয়েদের নামকরণ করে পিসী।] ছিনাংসাদের মধ্যে পৈতৃক আত্মীয়েরাই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পরিচালনা করে। এইসব বিচার করিয়া লাউয়ী বলেন : "In short it is not permissible to treat a given example of an avuncular custom in a patrilineal society as evidence of an antecedant matrilineal stage, because their existence may have a quite different origin On the other hand, it is a fact that the avunculate is fairly often lacking in matrilineal tribes · At all events, Tylor's assumption that avuncular authority is a mark of matrilineal society, rests on an unwarrantable selection of data" (185)

তারপরে couvade বা জরের প্রসূতিপণা। প্রসূতির গর্ভবেদনা উপস্থিত হইলে স্বামী প্রসূতির মতো ব্যবহার করে যেন তাহারই প্রসব হইবে। সন্তান প্রসবের ভাণ করিয়া স্বামী গুপ্তস্থানে আশ্রয় নেয়, শুইয়া থাকে এবং সন্তান ভূমিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত ঐ অবস্থায় থাকে পত্নীর অশৌচাবস্থার অনেক জায়গায় পতিক্ষৌরকর্ম করে না, নদী পার হয় না, এবং অন্যান্য নানা নিষেধবিধি পালন করে। ইহাকেও couvade এর রূপান্তর বলিয়া ব্যাখ্যা অনেকে করেন। টাইলার বলেন, এই প্রথা মাতৃক্রম হইতে পিতৃক্রমে পরিবর্তনের স্তরের লক্ষণ। "মাতৃক্রমী-পিতৃক্রমী" স্তরে এই প্রথা হইল পিতারও সন্তানজন্মে অংশ ও অধিকার আছে তাহারই ঘোষণা। পিতৃতন্ত্র এখনো আসে নাই, কিন্তু পিতারও যে মাতারই মত সন্তানের উপর কর্তৃত্ব থাকা উচিত এ তাহারই প্রথম স্বীকৃতি। বাকোফেন প্রথম এই ধরণের ব্যাখ্যা করেন। ইহা যেন পিতাকে দ্বিতীয় জননীরূপে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা একটা আইনের ফাঁকা সৃষ্টি করিয়া।

এখানেও সেই উত্তরণ-নীতিকে অবলম্বন করিয়া মাতৃক্রমের সমর্থন করা হইয়াছে। মাতুলতন্ত্র সম্বন্ধে যে যে সমালোচনা করা হইয়াছে, তাহা সবই এ ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। প্রথমতঃ অনেক মাতৃক্রমী জাতিতে ইহা পাওয়া যায়। ইহার ব্যাখ্যা অন্যরকমও হইতে পারে। যেমন ওয়েষ্টারমার্কের মতে এই প্রথা বৈতাত্রিক পরিবারেরই একটা প্রমাণ। মাতৃক্রমী জাতিতেও যে পিতা জ্ঞাত, স্বীকৃত এবং পিতার সহিতও যে সন্তানের জন্মের পরের সংযোগ রহিয়াছে, তাহাই এই প্রসূতিপণার প্রথা দ্বারা প্রমাণিত হয়। 'Even the couvade, which assumes the recognition of most intimate relationship between child & its father, has been found to prevail among some peoples who regard the child as a member of the mother's clan' (205) দ্বিতীয়তঃ পিতৃক্রমী জাতিতে ইহার থাকার কোন অর্থ নাই। অথচ পিতৃক্রমী জাতিতেও এই ধরণের প্রথা পাওয়া যায়। ভারতবর্ষেও পত্নীর গর্ভাবস্থায় পুরুষেরা অনেক স্থানে অশৌচ অবলম্বন ইত্যাদি করে। মর্গানী বা টাইলরী ব্যাখ্যায় ইহার কোনই অর্থ হয় না।

তৃতীয়তঃ টাইলারের তুলাত্মিক যুক্তিতে বলা হয়, কোন প্রথা যদি মাতৃক্রম-স্তরে না পাই, অথচ অপর দুইস্তরে পাই, তাহা হইলে মাতৃক্রমই পূর্বতর বলিয়া ধরা চলে। এযুক্তি ভ্রান্ত। ভূতত্ত্বের সহিত সমাজতত্ত্বের তুলনা হয় না। ভূপৃষ্ঠের স্তরে কোন্‌টী উপরের কোন্‌টী নীচের তাহা প্রত্যক্ষ এবং প্রায় অপরিবর্তনীয়। কিন্তু অন্যান্য সমাজের কোন্‌টী প্রাচীনতর কোন্‌টী নবীন তাহা জানার প্রত্যক্ষ উপায় নাই। কাজেই কোন প্রথা যুগে মাতৃক্রমই আগে কিনা তাহা নির্ণয়

অসম্ভব। আসলে যদি পূর্ব হইতেই একটা পৌর্বাপর্য বা sequence ধরিয়া লইয়া শুরু করা হয় তাহা হইলে এই রকমের ব্যাখ্যা কল্পনা করা চলে। একটি প্রথার সঙ্গে অন্য প্রথার পারস্পরিক সম্বন্ধ বা সাদৃশ্য-পার্থক্য সম্বন্ধ বাস্তব তথ্য দ্বারা বাহির করা চলিতে পারে। কিন্তু কোন্‌টী আগেকার, কোনটী পরবর্ত্তি তাহা নির্ধারণের কোন ফর্ম্মূলা নাই। "There are functional relations between the phenomena but nowhere is a chronological order to be discovered" (166 Lowie)

নৃতাত্ত্বিক বুণ্ডটও Wundt এসম্বন্ধে টাইলরী ব্যাখ্যা যুক্তিযুক্ত মনে করেন নাই। তিনি এপ্রথাকে মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন, ইহার উদ্ভব হইয়াছে সন্তান প্রজননে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সংযোগ ও সাহচর্য্যের বোধ হইতে। "The custom of couvade is clearly the result of an ideational association between husband & wife one that is absolutely analogous to that between the two mothers of the married couple. The child owes its existance to both father and mother. Both, therefore must obey the regulations which surround birth & thus they are also subject to the same tabu" (Wundt 198) এই ব্যাখ্যাই সহজ ও স্বাভাবিক। ইহা পরিবারের সনাতন অস্তিত্ব প্রমাণ করে। যাদুকরের যাদু হিসেবে ইহার অপব্যাখ্যা করিয়া মর্গানীরা শুধু ছক-প্রীতির পরিচয় দিয়াছেন।

(খ) গোষ্ঠীপ্রথা সার্বজনীন স্তর নয়

মর্গানীরা বলিতে চাহেন যে গোষ্ঠী প্রথা সার্বজনীন, পৃথিবীতে সর্বত্রই, সব জাতিই এই প্রথার মধ্য দিয়া আসিয়াছে। কিন্তু আদিম জাতিগুলির হিসাব নিলে দেখা যায়, এই দাবী ভুল। বরং বিপরীত সিদ্ধান্তই সমর্থিত হয়। পৃথিবীতে পরিবারই সার্বজনীন। পিতামাতা দুইকে লইয়া যে দ্বৈতাত্মিক পরিবার তাহা সব জাতিতেই বিদ্যমান। অথচ একাধিক গোষ্ঠী প্রথাই সব জাতিতে নাই। যেখানে গোষ্ঠী আছে সে জাতিতে পরিবারও পাওয়া যায়। যেখানে গোষ্ঠী নাই সেখানেও পরিবার বিদ্যমান। ইহা হইতে প্রমাণ হয়, পরিবারই সার্বিক এবং গোষ্ঠী সামগ্রিক। লাউরী তাই বলেন: A survey of the data clearly shows that the family is omnipresent at every stage of culture and that at a higher level it is frequently coupled with a sib-organisation and that at a still higher level the sib disappears" (Lowie :39)

গোষ্ঠিপ্রথা সম্বন্ধে বিংশ শতকের বিস্তৃত তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। বিশেষ করিয়া আমেরিকার নরসমাজবিজ্ঞানীরা এ সম্বন্ধে ব্যাপক গবেষণা করিয়াছেন এবং সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও আলোচনা করিয়াছেন। লাউরীর মতই এ সম্বন্ধে সুপ্রতিষ্ঠিত ও প্রামাণ্য। মর্গানী মতকে খণ্ডন করিয়া এই আধুনিক মত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন C. N. Starcke (The primitive family in its origin & development") E Grosse ("The family") এবং Dr Westermarcke. "The History of Human Marriage") মানবসমাজের আদিম অবস্থা সম্বন্ধে ইহাদের বিপুল তথ্য সংগ্রহ, বৈজ্ঞানিক রীতির আলোচনা এবং অন্তর্দৃষ্টি নতুন আলোকপাত করিয়া পরবর্ত্তিদের কাজ সহজ করিয়া দিয়াছে। পরিবার যে মানব সমাজের আদিমতম প্রতিষ্ঠান এবং পৃথিবীর সর্বত্র সকল জাতিতে যে পরিবার সকল স্তরে সর্বদা বিদ্যমান ছিল এবং আছে, তাহা ইহাদের গবেষণা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। ইহাদের পরে আমেরিকার সমাজ-বিজ্ঞানীদের নব্য সম্প্রদায় আসিয়া মর্গানী ছকের মূল উৎপাটন করিয়াছেন। যে

আমেরিকায় ১৯ শতকে মর্গান তাঁহার বিবর্তনী সম্প্রদায়ের জন্ম উড়াইয়াছিলেন, ভাগ্যবিড়ম্বনায় ২০ শ শতকে সেই আমেরিকায়ই আজ মর্গানী মতবাদ সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যাত। আমেরিকার অসভ্যজাতিদের মধ্যে ক্ষেত্র গবেষণার ফলে আমেরিকার তথ্য দ্বারাই মর্গানী ছক আপাদগোড়া খণ্ডিত হইয়াছে। ফে, আর, সেয়ানটন (Swanton) এই শতাব্দীর একজন বিশ্ববিখ্যাত নৃতাত্ত্বিক। তাঁহার গবেষণায় ও তথ্যসংগ্রহ দ্বারা তিনি প্রমাণ করিলেন যে জগতে বহু জাতি রহিয়াছে যাহাদের মধ্যে গোষ্ঠী প্রথা আদপেই নাই। এস্কিমো, এথাবাস্কান্ (athabascan) সলীশ (Salish) প্রভৃতি বহুজাতি আদিম স্তরে অতি নিম্ন অবস্থায় জীবনযাপন করিতেছে। কিন্তু ইহাদের সমাজে "গোষ্ঠী প্রথার" ঐকান্তিক অভাব রহিয়াছে। কোন জাতির মধ্যে গোষ্ঠী প্রথা নাই, ইহা মর্গানী সম্প্রদায়ের কাছে কল্পনারও অতীত। অথচ অক্লান্ত অনুসন্ধান এই কথাই হাতে কলমে প্রমাণ করিল। তারপরে মর্গানী-মতে, গোষ্ঠী প্রথা পরিবার প্রথার চাইতে নিম্নতর ও আদিমতর অবস্থার পরিচায়ক। আদিম অবস্থায় পরিবার থাকিতেই পারে না। কিন্তু মাতৃগোষ্ঠী থাকিবেই। অথচ সেয়ানটন দেখাইলেন যে মাতৃগোষ্ঠী এবং মাতৃক্রম উচ্চতর স্তরের সংস্কৃতিতেই বরং পাওয়া যাইতেছে। ইরোকোয়া, হোপী, জুনী এবং উত্তর পশ্চিম উপকূলের জাতিগুলিতে মাতৃক্রমী গোষ্ঠী রহিয়াছে। কিন্তু ইহারা সকলেই উচ্চসংস্কৃতি সম্পন্ন। সেয়ানটন আরো দেখাইলেন যে উদ্বর্তন নীতি দ্বারা মাতৃক্রমের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করার উপায় নাই। তবে যদি আগে-হইতেই একটা বাঁধা-ধরা ছক ঠিক করিয়া একটা স্তর ক্রম (succession of stages) কল্পনা করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে উদ্বর্তন নীতির সাহায্যে যে-কোন প্রথাকেই অনায়াস অবাধ্যাধ্য করিয়া মাতৃক্রমকে প্রাচীনতম বলিয়া দেখান অসম্ভব নয়। কিন্তু উদ্বর্তন নীতির ঐরূপ ব্যবহার বিজ্ঞান সম্মত নয়।

সেয়ানটনের পরে বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ্ গোল্ডেনবাইজার (Golden weiser) এবং সর্বশেষ লাউয়ী (Lowie) এই সিদ্ধান্তকেই বিপুলতর তথ্যসংগ্রহ এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীর বিচার দ্বারা আরো সুপ্রমাণ করিলেন। এই সব নব্য বিজ্ঞানীদের প্রধান সিদ্ধান্তই এই যে পরিবার আদিমতম প্রতিষ্ঠান, পরিবারের ব্যাপকতা বিশ্বকোড়া, এবং পরিবার মানবজাতির সব চাইতে সহজ (simple) ও স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান। শুধু তাই নয়, পরিবার হইতেই পরবর্তীকালে গোষ্ঠী'র উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু মাতৃগোষ্ঠী যে পূর্বতন তাহাও বলা চলেনা। কার্যকারণসম্বন্ধহেতু কোথাও পিতৃক্রমী গোষ্ঠী, কোথাও মাতৃক্রমী গোষ্ঠীর উদ্ভব হইয়াছে। কোন অনিবার্য স্তর পর্যায়কে বিজ্ঞান স্বীকার করিতে পারেনা।

লাউয়ীর এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা আছে। তাঁহার মতে (১) আদিমতম জাতিদের মধ্যে গোষ্ঠী নাই। (২) যখন শিকারজীবিকার স্তর ছাড়াইয়া মানুষ পশুপালন বা উদ্যান কৃষির (horticulture) স্তরে আসিয়া উপস্থিত হইল তখনই এই গোষ্ঠী প্রথার উদ্ভব সম্ভব হইল। কিন্তু এই স্তরেও যে এই গোষ্ঠী প্রথা অনিবার্য তাহা মোটেই নয়। অপরাপর ইতিমূলক ও নেতিমূলক সকল কার্যকারণের যোগাযোগ হইলে তবেই ইহার উদ্ভব হইতে পারে।

(১) আদিম জাতিদের মধ্যে সংগৃহীত নৃতাত্ত্বিক তথ্য হইতে প্রমাণ হয় যে পরিবার প্রত্যেক জাতিতেই আছে। কেহ হয়তো বলিতে পারেন ইহাতে পরিবারও যে আদিম প্রতিষ্ঠান তাহা প্রমাণ হয়না। কারণ অর্থ নৈতিক জীবনে নিম্নতম হইলেও যৌনজীবনে এবং অন্য সমাজ-সংস্কৃতিতে হয়তো এইসব জাতি নিম্নতম নাও হইতে পারে। জীবনের একদিকে নিম্নস্তরের হইলেও অন্যদিকে উচ্চস্তরের হওয়া অসম্ভব নয়। এই আপত্তির অভাবে বলা চলে যে মর্গানী ও মার্ক্সীয় মতে এই আপত্তি উঠান অসঙ্গত। কারণ অর্থনীতির দ্বারা এদের মতে সমাজ জীবন ষোল আনা নিয়ন্ত্রিত। পরিবারের সবগুলি স্তরই

অর্থনীতির দিকেই বাঁধা। মার্ক্সবাদীর তারাদেকটিন্সকে কাটাইয়া নিম্ন অর্থনীতিতে উচ্চতর সমাজ বা পরিবার তো সৃষ্টি হইতেই পারেনা। যাহারা মার্ক্স-মর্শানী ছক মানে না তাহারা বরং এতদূর বলিতেও পারে। Economic Determinism যাহাদের মূলসূত্র তাহাদের মুখে এ আপত্তি অযৌক্তিক।

অর্থনীতির সহিত পরিবার প্রথার সম্পর্ক আছে একথা স্বীকার্য। বহুবিধ শক্তি ও কারণের সমবায়ে সামাজিক প্রতি নিয়মগুলি রূপ ধারণ করে। ইহাদের মধ্যে অর্থনীতিও একটা প্রধান শক্তি সন্দেহ নাই। অর্থনীতির সহিতও একটা সহ সম্পর্ক বা correlation রহিয়াছে যৌনজীবন ইত্যাদির। নিম্নস্তরের জাতিতেও উর্দ্ধস্তরের সংস্কৃতি হইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া সর্বদাই সব নিম্ন অর্থনৈতিক স্তরে উচ্চতর সমাজ প্রথা গড়িয়া উঠিবে আর সমৃদ্ধ ও উচ্চতর আর্থিক স্তরের জাতিগুলিতে চিরকাল অবশ্যম্ভাবে কেবল নিম্নশ্রেণীর সমাজ সংস্কৃতিই জন্ম নিবে, এরূপ ধরা বিশ্বাস করাও হাস্যকর বলিতে হইবে। সমাজ জীবনের বিভিন্ন দিকগুলির মধ্যে একটা পারস্পরিক ক্রিয়াপরতা বা Functional Interaction রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে সর্বদাই একটা সমন্বিত ভারসাম্যের দিকে প্রবণতা থাকে। দুই একটা ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হইতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ crudest জাতিগুলিতে যদি সর্বক্ষেত্রেই "পরিবার" প্রথা পাই, তবে পরিবারকেই প্রাচীন ও আদিম বলিয়া ধরিয়া লওয়াই যুক্তিসঙ্গত।

রেড্ ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে সবগুলি নিম্নতম জাতিই যে গোষ্ঠীহীন (Sibless) এবং রাষ্ট্রে, ধর্মে, শিল্পে, উন্নত জাতিগুলিই যে গোষ্ঠীসম্পন্ন তাহা মোরানটন প্রমাণ করিয়াছেন। উত্তর কালিফোর্নিয়া, ওরিগান, ওয়াশিংটন ইদাহো, নেভাডো, উটাহ (Utah)—সর্বত্রই মানব সমাজের নিম্নতম স্তর পাওয়া যাইতেছে। উপকূলের সামান্য একফালি জায়গা ছাড়া কানাডাতেও তাই। নেভাডার মরুতে মরুতে ব্রাশম্যাণ কন্দমূলফলাশী পাভিওসোদের (Paviotso) সঙ্গে উন্নত এবং আবাদী ইরোকোয়া, হোপী, Tlingit জাতির কোন তুলনা চলেনা। ইরোকোয়া প্রমুখরা অনেক উন্নত অথচ এদের মধ্যেই মাতৃগোষ্ঠী দেখা যায়। উত্তর আমেরিকার সম্বন্ধে মোরানটনের মত প্রাধান্য। দক্ষিণ আমেরিকাতও নিম্নতমজাতি ফুয়েজীয়ান এদের মধ্যে গোষ্ঠীপ্রথা নাই। এশিয়ারও চুকচী ও কোরিয়াক্ জাতি গোষ্ঠীহীন। মালয়ে সাকাই ও সেমাঙ নামক বন্য শিকারীরা গোষ্ঠীহীন। খাসিয়াদের গোষ্ঠী আছে কিন্তু ইহারা সংস্কৃতিতে উচ্চতর স্তরের। আফ্রিকার হটেন্টটদের মধ্যে ছেলে নেয় পিতার উপাধি, মেয়ে নেয় মায়ের উপাধি। এই প্রথা একান্তিক গোষ্ঠী প্রথার বিরোধী। বুশম্যান ও বামনদের (Pigmy) মধ্যে গোষ্ঠী আছে বলিয়া জানা যায় নাই। কিন্তু বাণ্টু, সুদানী, মাসাইদের মধ্যে গোষ্ঠী আছে, কিন্তু ইহাদের রাষ্ট্রজীবন কিছু জটীল ও উচ্চতর।

অষ্ট্রেলিয়ার অবস্থা অন্য রকম। এখানে কিন্তু গোষ্ঠীহীন জাতি নাই। এখানে গোষ্ঠীর প্রচলন সব জাতিতেই। তবে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে ইহাদের মধ্যে পরিবারও সার্বজনীন। পরিবার নাই, অথচ গোষ্ঠী আছে, এমন একটি জাতিও নাই কাজেই এখানে পরিবারের উদ্ভবের আগে গোষ্ঠী ছিল কি না তাহা বুঝিবার উপায় নাই। অষ্ট্রেলীয় তথ্যের দ্বারা প্রাচীনত্বের প্রশ্নের সমাধান পাওয়া যায় না। অষ্ট্রেলীয়রা আদিম হইলেও আন্দামানী, সিলোনীদের চাইতে আদিম নয়। আন্দামানী প্রভৃতিরা একবিবাহী।

তবে পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে অষ্ট্রেলীয় সংযোজন পদ্ধতি হইতেও প্রমাণ হয় যে ক্ষুদ্রতর পরিবারই এখানে প্রাথমিক ও মৌলিক। পরবর্তি কালে গৌণ সম্প্রসারণ বা "secondary extension" হইয়া পরিবার হইতেই ব্যাপকতর গোষ্ঠী প্রথার সৃষ্টি হইয়াছে।

কেহ বলিতে পারেন যে, গোষ্ঠীহীন বলিয়া যাদের মনে

করা হইতেছে তাহাদের মধ্যে গোষ্ঠী চোখে পড়ে নাই পর্যবেক্ষণের ত্রুটিহেতু। ইহার অবাবে বলা যায় যে গোষ্ঠী প্রথা সামাজিক জীবনকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করে। যে জাতিতে গোষ্ঠী প্রথা আছে তাহাদের আচার ব্যবহারে, অনুষ্ঠানে নানা ভাবে ইহার প্রভাব প্রকাশ হইয়া থাকে। ইহা বিদ্যমান থাকিলে দৃষ্টি এড়াইয়া লুকাইয়া থাকা অসম্ভব। আর স্বতন্ত্রভাবে অনুসন্ধান করিয়া যদি বিভিন্ন গবেষক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন তবে সন্দেহের কোনই অবকাশ থাকে না। উত্তর আমেরিকান জাতিতে পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন Samuel Hearne যাহাকে লাউরী বলিয়াছেন 'অনুসরণীয় পর্যবেক্ষক'। পরে Dr P. E. Goddar, Frank Russell, I.A Mason এবং Lowie স্বয়ং সকলেই এ সম্বন্ধে একমত যে ইহাদের গোষ্ঠী নাই। বিরোধীপক্ষ বলিবেন, হয়ত ককেশীয় প্রভাবে আসিয়া গোষ্ঠীপ্রথা ইহাদের লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু বহুজাতি—যথা হোপী, ইরোকোয়া, ইত্যাদি একেবারে ককেশীয় সভ্যতার কেন্দ্রে থাকিয়াও গোষ্ঠী প্রথাকে অব্যাহত রাখিয়াছে।' ইহাতো চোখের উপরেই দেখা যাইতেছে। লাউরী এ সম্বন্ধে সবরকম আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে এক অষ্ট্রেলীয় বাদে সব প্রাকৃত জাতিদের সম্বন্ধেই বলা চলে, তাহাদের মধ্যে গোষ্ঠী নাই কিন্তু পরিবার আছে। যাহাদের মধ্যে গোষ্ঠী আছে সেখানে পরিবারও আছে। কিন্তু গোষ্ঠী আছে, পরিবার নাই এমন দৃষ্টান্ত নাই। সিদ্ধান্ত হইতেছে যে "The dogma of universality of the Sib in primitive communities thus lies shattered" (Lowie 147) বাস্তব তথ্যের কষ্টিপাথরে প্রমাণ হইয়াছে গোষ্ঠীপ্রথা সার্বিক স্তর নহে।

অতএব বিজ্ঞান তাই নির্দেশ দেয় যে গোষ্ঠী সম্বন্ধে মর্গান-মার্ক্সীয় বিবর্তনী ছকের ক্রমকে উল্টাইয়া দিতে হইবে। পরিবারই প্রাচীনতম এবং পিতামাতা দুইয়ের যৌথতাই মানুষের মৌলিক প্রকৃতি। কিন্তু তবে গোষ্ঠী হইল কী-রূপে?

গোষ্ঠী হইল বিশেষ পরিস্থিতির বিশিষ্ট সৃষ্টি। কোন অবস্থায় পরিবারের দুই পক্ষের (পিতামাতার) একদিকের উপরে গুরুত্ব আরোপ করিলেই গোষ্ঠী গড়িয়া ওঠে। লাউরীর মতে তিনটী কারণের সমবায়ে গোষ্ঠী গড়িয়া ওঠা সহজ হয়:

(ক) সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রথা (খ) নিবাস প্রথা
(গ) শ্রমের যৌন-বিভাগ।

নিবাস প্রথার প্রভাব পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। স্ত্রী-স্বামীর ঘরে আসিল, সন্তান হইল পিতৃক্রমী, যেমন হওয়া যাক। স্বামী কন্যাপণ দিতে পারিল না, তাই শ্বশুর বাড়ীতে বাস করিতে আরম্ভ করিল এবং পরিবার হইল মাতৃক্রমী। কিন্তু বাঁধাধরা কোন ছক এক্ষেত্রেও নাই। উত্তর পশ্চিম আমেরিকার মধ্যে "মকানী পলাচেডী" বা House Community প্রথা অনেকটা গোষ্ঠীর মত কাজ করিয়াছে অর্থাৎ একত্রবাসী ভাইবোনদের মধ্যে বিবাহ বারণ হইয়াছে। হোপী, জুনীদের মধ্যে মাতৃস্থানী প্রথার সঙ্গে যুগ্ম-সম্পত্তি সংক্রামন-হেতু মাতৃক্রমী হওয়া স্বাভাবিক।

কিন্তু অটল অচল কোন ফর্মুলাই দেওয়া চলে না। সার্বিক বিধি অগ্রহণীয়। মাতৃস্থানী হইলেই যে মাতৃক্রমী হয় না তাহা পূর্বে দেখিয়াছি। অষ্ট্রেলীয়, মেলানেশীয়, কোন কোন আফ্রিকানী, আমেরিকানী, মাতৃক্রমী জাতিতেও পিতৃস্থানী প্রথা পাওয়া যায়। আবার মাতৃস্থানিত্বও যৌথ সামাজিক হইতে পারে।

এই সব factor এর সহিত যদি যৌন শ্রমবিভাগ যুক্ত হয় তবে গোষ্ঠীসংগঠনের সম্ভাবনা বাড়িয়া যায়। উদ্যান কৃষি সাধারণতঃ মেয়েদের কাজ। কাজেই মাতৃক্রম হবার সম্ভাবনা থাকে যদি কোন বিরোধী factors বা শক্তি না থাকে। যেমন হিন্দোস্তানে। এই কারণে বর্গানী ক্রম পরিত্যক্ত হওয়া উচিত। একই কারণে একই পক্ষ হইতে মাতৃক্রমী গোষ্ঠীর

উহার সর্বত্র সম্ভব নয়। "...the reversal of the traditional sequence is one of the safest conclusions of modern ethnology (Lowie 148)

লাউয়ীর এই উক্তি আজ সর্ববাদীসম্মত।

মর্গানের যুগে হাতে কলমে অনুসন্ধান তেমন অগ্রসর হইতে পারে নাই। অজ্ঞতার ফাঁক মর্গান কল্পনার তরাট করিয়া লইয়া সেযুগে তাঁহার ছক নির্মাণ করিয়াছিলেন। তাই পৃথিবীর সব জাতিতেই তিনি গোষ্ঠী বা মাতৃগোষ্ঠীর অস্তিত্ব কল্পনা করিয়াছিলেন। গ্রীক ও রোমীয়দের সমাজে গোষ্ঠী পাই কিন্তু তাহা পিতৃগোষ্ঠী। মর্গান বলেন, নিশ্চয় অতীতে এদের মাতৃগোষ্ঠী ছিল। কিন্তু কোন যুক্তি বা তথ্য দ্বারা ইহার প্রমাণ করিতে পারেন নাই। " Since descent in the female line is archaic,...there is presumption in favor of its ancient prevalence in the Grecian & Latin gentes' (Morgan 354). দেখা যাইতেছে মর্গান মাতৃক্রমকে আদিমতম প্রথা ধরিয়া লইয়া অতঃপর অনুমান করিতেছেন যে গ্রীক রোমেরও মাতৃক্রম ছিল। কোন প্রমাণই নাই।

"Recurring now to the main question, the absence of direct proof of ancient descent in the female line in the Grecian & Latin gentes could not silence the presumption in its favor but it so happens that this form of descent remained in some tribes nearly related to the Greeks with traces of it in a number of Grecian tribes (Morgan-357)

গ্রীকজাতিতে কোন চিহ্ন নাই। এদের সঙ্গে সম্পর্কিত কোন কোন জাতির মধ্যে কিছু "trace বা চিহ্ন পাওয়া যায়। মর্গান সেই পুরোনো Herodotus এর এবং বাকোফেনের দোহাই দিয়াছেন। বাঙালীদের মধ্যে গোষ্ঠী প্রথার প্রমাণ পাইয়াছেন একজন বাঙালীপাদ্রী রেভাঃ গোপীনাথ নন্দীর সাক্ষ্য হইতে। নন্দী মহাশয়ের চিঠি হইতে উদ্ধৃত করিতেছি :

"বাঙালীদের মধ্যে চারজাতি বহু উপজাতিতে বিভক্ত। এদের আবার আরো উপবিভাগ। আমি নন্দী tribeর আমি যদি heathen (হিন্দু) হতাম তবে নন্দী tribe এর মেয়ে বিবাহ করতে পারতামনা। যদি caste একও হত। সন্তান হয় পিতার tribe এর। সম্পত্তি পায় পুত্রেরা। – castesগুলি subdivided, যথা শুদ্র। শুদ্র হল আদিম কালের প্রথম উপবিভাগের একটা। কিন্তু এরও উপবিভাগ আছে, যথা Khayel, তিলি, তমাড়ী হাড়ী, চোয়ার, Kari ইত্যাদি। কিন্তু এই শেষোক্ত উপবিভাগের অন্তর্ভুক্ত হলে সেই জাতের মধ্যে বিয়ে করতে পারেনা।"

মর্গান টীকা করিয়াছেন, এই সব ক্ষুদ্র groupগুলি প্রত্যেকের জনসংখ্যা ১০০ লোকের বেশী নয়। "Still retain several of the characteristics of the gens" (M.)

নন্দী জাতিতে নন্দী জাতি বিবাহ করিতে পারে না, যদিও জাত caste একই। একথার মানে বোঝা শক্ত। এই চিঠিখানি দেখিলেই বোঝা যাইবে যে যুগে মর্গান কী প্রণালীতে বিভিন্ন দূরান্তরের দেশবিদেশ হইতে তথ্যসংগ্রহ করিয়াছিলেন। অস্পষ্ট ও অর্থহীন এই ধরণের চিঠিপত্র হইতেই তিনি পৃথিবীর সমস্ত মানব জাতির ভূতত্ত্ববিদ্যং সম্বন্ধে পাকা-পাকি ছক বাঁধিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু নন্দী মহাশয়ের অপূর্ব তথ্য সংগ্রহ হইতে বাঙালীদেরমধ্যে মাতৃক্রমের কোন চিহ্ন তো পাওয়া গেল না। মর্গান হিব্রুদের দ্বাদশ উপজাতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ইহারা পশুপালক এবং সুতরাং উচ্চস্তরের। ইহাদের মধ্যে গোষ্ঠী উদ্ভব হওয়া স্বাভাবিক এবং ইহারা পিতৃক্রমী।

এখানে এঙ্গেল্‌সের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। গ্রীক ও রোমানী গোষ্ঠী সম্বন্ধে Grote, Niebuhr,

Mommsen প্রভৃতি ঐতিহাসিকরা আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে গ্রীকরোমীয় গোষ্ঠী হইল পরিবারের সমষ্টি। এঙ্গেলস্ বলেন যে ইহা হইতেই পারে না, কারণ পরিবার ও গোষ্ঠীর প্রকৃতি পরস্পরবিরোধী। এঙ্গেলস্'র এই ধারণা যে ভ্রান্তিপূর্ণ তাহা ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। পরিবার ও গোষ্ঠী একই সঙ্গে বিদ্যমান থাকিতে পারে এবং ইহাদের প্রত্যেকের প্রয়োগের ক্ষেত্র আলাদা আলাদা। গ্রীক-রোমীয় গোষ্ঠী পিতৃক্রমী এবং মেয়েরা বিবাহ হইয়া স্বামীগোত্র লাভ করিত।

গ্রীস-রোমে আদিকালে মাতৃক্রমী গোষ্ঠীর অস্তিত্বের প্রমাণ এঙ্গেলস্ কিছুই দেন নাই। জার্মান জাতিতে পূর্বে মাতৃক্রম ছিল ইহার প্রমাণ স্বরূপ এঙ্গেলস্ Tacitus র দোহাই দিয়া বলেন ইহাদের মধ্যে টাসিটাস্ মামা-ভাগ্নের সম্পর্কের গুরুত্বের (avunculate) উল্লেখ করিয়াছেন। এঙ্গেলস্ বলেন, "Here we have living evidence···of matriarchal and therefore primitive gens". (Engles 171) শুধু তাই নয় জার্মান সমাজে নারীজাতির অত্যধিক মর্যাদাও এককালীন মাতৃক্রমেরই অবশিষ্ট চিহ্ন বলিয়া এঙ্গেলস্ বলিতেছেন। Another relic of mother right was the respect of the Germans for the female sex. (Engles 173) জর্মান জাতি নারীকে পবিত্র স্বরূপা এবং গৃহস্থালীর কেন্দ্র বলিয়া মনে করিত। এই নারীমর্যাদা ও মামাভাগ্নের অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ এঙ্গেলসের কাছে মাতৃক্রমের স্বপক্ষে অকাট্যযুক্তি। কিন্তু আধুনিক সমাজতত্ত্ব যে এই উত্তরন নীতির একদেশদর্শি প্রয়োগকে ভ্রান্তিপূর্ণ বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছে আজ আর একথা সন্দেহের অতীত। এসব যুক্তি যে কত অলীক তাহা পূর্বেই দেখান হইয়াছে।

সংক্ষেপে এই সিদ্ধান্তে আসা যাইতেছে যে গোষ্ঠীযুগ (clan-gens Era) বলিয়া যে একটা সার্বিক স্তরক্রম জর্মানী ছকের ভিত্তি তাহা সমাজবিজ্ঞান প্রত্যাখান করিয়াছে। জর্মানী সম্প্রদায়ের সহিত একমত নহেন এমন অনেক সমাজ তত্ত্ববিদও গোষ্ঠীযুগকে একটা সার্বিক স্তর বলিয়াছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, Durkheim ও Wundtর নাম উল্লেখ করা যায়। ইহারা জর্মানের মতের বিরোধী। কিন্তু অন্য দৃষ্টিভঙ্গীতে এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন যুক্তি অনুসরণ করিয়া ইহারা গোষ্ঠীকে মানব সমাজের একটা স্তর বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু ইহাদের গোষ্ঠীপ্রথার ধারণা ও পরিকল্পনা সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। রক্ত সম্পর্ক ইহাদের মতে গোষ্ঠীর ভিত্তি নয়। গোষ্ঠীর ভিত্তি টোটেম এবং ধর্ম। টোটেমী যুগের সৃষ্টি হইল গোষ্ঠী। দুরখীম্ বলেন, টোটেম ধর্মই আদিম মানবের সার্বজনীন ধর্ম। ইহার সহিত গোষ্ঠী অচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত। Wundt এর মতে, মানব সমাজের ক্রমবিকাশের দ্বিতীয় স্তর টোটেমী যুগ। এই স্তরে গোষ্ঠীর জন্ম হয়। কিন্তু পরিবার পূর্বেও ছিল, পরেও আছে। গোষ্ঠী সাময়িক।

কিন্তু গোষ্ঠীহীন বহু আদিম জাতির আবিষ্কার এবং গোষ্ঠী-প্রথা সম্বন্ধে বহু নূতন তথ্যপ্রাপ্তির ফলে অধুনার বিজ্ঞান 'গোষ্ঠীযুগ' বলিয়া কোন সার্বিক যুগকে স্বীকার করে না, উপরের আলোচনায় ইহা দেখান হইয়াছে। বিখ্যাতপণ্ডিত গোল্ডেনবাইজার ঘোষণা করিয়াছেন :

"Thus two more dogmas were disposed of : the one that the clan represented the earliest form of social organisation, and the other that clans & gentes constituted universal stages in the development of society (442)

কিন্তু তাই বলিয়া গোষ্ঠীপ্রথার অস্তিত্ব অস্বীকার কেহ করেন না। বিশেষ অবস্থায় এই প্রথার উৎপত্তি হইয়াছিল। অবস্থার ঘোরাফেরায় আবার ইহার বিলোপও হইয়াছে এবং হইতেছে। ইতিহাসের প্রথম দিকে একটা সময়ে গোষ্ঠীর

প্রাদুর্ভাব বেশী হইয়াছিল। কেন এবং কী কী কারণে সমাজের গতিমুখে এই প্রথার উদ্ভব হইয়াছে এবং কেন লয় পাইতেছে তাহার রহস্য আজো সম্পূর্ণ উদ্ঘাটন সম্ভব হয় নাই। বহুশক্তির মধ্যে কিছু কিছু শক্তির সন্ধান এবং তাহার ক্রিয়া ও প্রভাবের বিশ্লেষণ সম্ভব হইয়াছে। এখনো শেষ কথা বলিবার দিন নিশ্চয়ই আসে নাই। তবে গোল্ডেন বাইজারের ভাষায় এইটুকু বলা চলে:

"So much remains true, however, clans & gentes first emerge at the end of the earliest period in social evolution during which only families & local groups prevailed and they disappear before the dawn of history" (442)

ক্রমশঃ

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

অমিয় চক্রবর্তী

" কাব্যসৃষ্টির একটা দিক প্রত্যহ জীবনকে স্পর্শ করে, আরেক দিকে তার ভূমিকা নিত্য সূর্যালোকে অধিষ্ঠিত—আপনার কবিতায় এই দুই দিকেরই পরিচয় পেলাম।··· কবিতা উভচর এবং বহুচর—অতি সূক্ষ্ম সামঞ্জস্যেই তার প্রাণ। আপনার কবিতায় সেই প্রাণের সন্ধান পেয়েছি।··· পৃথিবীকে আপনি স্পষ্ট চোখে দেখেছেন—এ বড়ো আশ্চর্য দেখা।"

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

"···আমি আপনার কবিতার অনুরাগী ; এবং ইতিমধ্যে আপনার সহজ প্রতিভা যে অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিরন্তর পরিণতির দিকে এগোচ্ছে তা আমি বারংবার লক্ষ্য করেছি।···আমি এই রকম সচল মনীষার পক্ষপাতী, এবং হয়তো তাই আপনার লেখা আমাকে এতটা টানে।···আমার মতে আধুনিক বাঙালী কবিদের মধ্যে যাঁরা ভবিষ্যতেও সাধুবাদ পাবেন, আপনি তাঁদের অন্যতম।···

অন্নদাশঙ্কর রায়

"···আপনার কবিতাগুলিতে প্রকৃত কাব্যরসের স্বাদ পাওয়া যায়, আপনার মূলদৃষ্টিও সুস্থ মানুষের।"

এই কবির নতুন কাব্যগ্রন্থ

১৫ই আষাঢ় প্রকাশিত হয়েছে **দিনযাপন** দাম দু'টাকা

চীন ও ভারত

ডাঃ সরোজেন্দ্র নাথ রায়

ছোটবেলায় ভারতবর্ষের যে চিত্রখানি আমরা দেখিতাম তাহা ছিল একটি অপূর্বাসুন্দরী মহিমান্বিতা সম্রাজ্ঞীর প্রতিকৃতি। মস্তকে ছিল তাঁর হীরক মুকুট। নীলাম্বুরাশি-বিধৌত পদযুগল একটি অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত পদ্মকোরকের উপর অবস্থিত। পরিধানে ছিল তাঁর মুক্তাখচিত হরিৎ বস্ত্র—তার অঞ্চল পূর্ব দিগন্তে প্রসারিত। দক্ষিণ হস্তের ত্রিশূল থাইবার সীমান্তের দিকে প্রলম্বিত। আর বাম হস্তে স্বর্ণ কলস রত্নসম্ভারে পরিপূর্ণ। শিক্ষক মহাশয়ের মুখ দিয়া কবির কথা শুনিতাম; "হের বৎস, সম্মুখেতে প্রসারিত ভারতের মানচিত্র. আমা সবাকার পুণ্য জন্মভূমি, কর নমস্কার।" এই ছিল আমাদের স্বপ্নের ভারত। একদিন মনে হইয়াছিল স্বপ্ন সত্যে পরিণত হইবে। কিন্তু কি হইল? স্বাধীনতা আসিল একদিন শোণিতসিক্ত প্রভাতে—সহস্র লাঞ্ছনার ক্ষত অঙ্গে বহন করিয়া। দ্বিখণ্ডিতা হইলেন আমাদের মাতৃভূমি। পাদপীঠ পদ্মকোরকটি এখন কণ্টকাসনে পরিবর্ত্তিত। আমরা গাইতাম—ধনধান্যে পুষ্পেভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা, তাহার মাঝে আছে দেশ এক স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা। কোথায় সেই ধনধান্য, কোথায় সেই স্বপ্ন? ধনধান্য লুণ্ঠিত, স্বপ্ন অপসৃত। মাতৃভূমির সেই মহীয়সী মূর্ত্তি ধূলায় অবলুণ্ঠিত।

১৯৪৭ সালে যখন স্বাধীনতা আসিল তখন জানিতাম দেবতার বাসভূমি, পিতৃপিতামহের পদরজঃপূত হিমালয় ভারতের উত্তর প্রান্তে সজাগ:প্রস্তুত দুর্লঙ্ঘ্য প্রহরী। সহস্র বৎসর ধরিয়া কেহ কখনও ভাবেনি সেই হিমালয় একদিন শত্রুকর কবলিত হইবে। তাহার বুকের উপর দিয়া আসিবে শত্রুবাহিনীর দুর্বার স্রোত। কিন্তু তাহাই হইল।

১৯৪৯ সালে চীনের ইতিহাসে মহাপরিবর্তন সাধিত হইল। মাও সেতুং এর নেতৃত্বাধীনে চিয়াংকাইশেক পরাস্ত হইলেন ও সমগ্র চীনদেশ কমিউনিষ্ট দলের কবলে পতিত হইল। একদিন ভারত তার শান্তি ও প্রেমের বাণী লইয়া চীনে গিয়াছিল। সমগ্র চীন পঞ্চশীলের সঙ্গে ভারতের নিকট মস্তক অবনত করিয়াছিল। দুই দেশের মধ্যে কৃষ্টি ও সভ্যতা, বাণিজ্য ও শিল্পের অবাধ আদান-প্রদান চলিত। দুই দেশের সাধু ভক্তগণ প্রেম ও মৈত্রীর পতাকা বহন করিয়া উভয় দেশে তীর্থ পরিক্রমা করিতেন। কোন সীমারক্ষী তার রক্তচক্ষুর ভ্রুকুটি দ্বারা তাদের গতিপথে বাধাসৃষ্টি করিত না। দুই মহাদেশ যেন এক দেশে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। ভারতের হিন্দুর পক্ষে মানসসরোবর ও কৈলাস যাত্রা জীবনের তীর্থ প্রত্যাশিত ও বহু পুণ্যের ফলস্বরূপ চরম পুরস্কার ছিল। আজ এই দুই দেশের মধ্যে মহা ব্যবধান রচিত হইয়াছে। তীর্থযাত্রা তো বন্ধ হইয়াছেই। এমন পুণ্যভূমি হিমাচল যেখানে ভারতের বহু নরনারী তপস্যা ও সাধনার জন্য গিরি কন্দরের নির্জন গুহায় জীবন অতিবাহিত করিতেন তাহা এখন দুই জাতির রক্তধারায় কলুষিত হইয়াছে। ঐতিহাসিকেরা বলেন যে ঐন্দ্রজালিক শক্তি যখন ভারতের সীমান্তে আসিয়া ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টায় ব্যাপৃত সে সময় সীমান্তে প্রহরারত চীনই ভারতভূমিকে দীর্ঘকাল রক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আজ সেই চীনই ভারতের বুকে ছোরা দিয়াছে।

কি করিয়া এই পরিবর্তন সাধিত হইল ? বিগত মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে যখন জাপান চীন আক্রমণ করিয়া সমগ্র চীন অধিকার করিয়াছিল তখন ভারতের সমগ্র সহানুভূতি চীনের দিকেই ছিল। চীনের রাষ্ট্রদূতেরা তখন ভারত ভূমিতেই শিক্ষাদান করিয়াছিল। রাষ্ট্রপতি চিয়াংকাইশেক ভারতে আসিলে ভারতবাসীরা তাঁহাকে সর্বত্র সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করে। তিনিও ভারতের বহু স্থানে ভ্রমণ করিয়া ভারতবাসীর অভ্যর্থনার যথোপযুক্ত প্রত্যুত্তর দেন। জাপানীর হস্তে চীনের লাঞ্ছনায় ভারতবাসীর হৃদয়ে জাপানের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক হয়। রবীন্দ্রনাথ জাপানের প্রতি প্রীতির সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও তাঁহার অমর লেখনীর দ্বারা সে তীব্র ঘৃণাকে মূর্ত করিয়া তোলেন।

মাও সেতুং এর নেতৃত্বে যখন কমিউনিষ্ট শাসন প্রতিষ্ঠিত হইল তখন প্রথম প্রথম মনে হইল এই মৈত্রীবন্ধন আরও দৃঢ় হইল। চৌ এন লাই প্রভৃতি চৈনিক নেতারা এদেশে আসিলে বিপুল অভ্যর্থনার দ্বারা তাঁহারা সর্বত্র সমাদৃত হইলেন। তাঁহারা যেখানে গেলেন সেখানেই দেশবাসী স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের সঙ্গে হিন্দী-চিনী ভাই-ভাই ধ্বনি তুলিলেন। মনে হইল বেশ হইয়াছে। চীনারা কাশ্মীরের উপর ভারতের অধিকার স্বীকার করিলেন। ভারতের অনুরোধে তিব্বতের উপর তাঁহাদের দাবী ও অধিকার সীমিত করিবেন বলিলেন। তিব্বতের স্বাতন্ত্র্য মানিয়া লইলেন। ভারত সীমান্তের ভ্রান্ত মানচিত্র দেখাইলে চৌ এন লাই হাসিয়া বলিলেন যে উহার প্রতি কোন গুরুত্ব আরোপ করিবার আবশ্যকতা নাই। পূর্ববর্তী সরকার ঐ মানচিত্র রচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের উহা দেখিবার ও সংশোধন করিবার তখনও সুযোগ হয় নাই। সময়মত ধীরে সুস্থে তাহা করা যাইবে। তারপর উভয় গভর্নমেণ্টের অতিথিরূপে দুই দেশের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি দুই দেশ পরিভ্রমণ করিলেন। উভয় দেশের কৃষ্টিকলার উভয় দেশে প্রদর্শনী হইল। ভারত জানিল যে ভারতের উত্তর সীমান্ত একেবারে সুদৃঢ় ও অনতিক্রম্য। একটি মিত্ররাজ্য প্রহরারত।

কিন্তু এই সদ্ভাব বেশী দিন টিকিল না। জাকার্তায় অনুষ্ঠিত প্রথম বান্দুং কনফারেন্সেই বোঝা গেল যে চৌএনলাই সমগ্র এশিয়ার উপর রাজনৈতিক প্রভুতা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ব্যগ্র। নেহেরু এশিয়াবাসীর উপর যে নেতৃত্ব করিয়া আসিয়াছিলেন সে নেতৃত্ব ক্রমেই খর্ব হইতে লাগিল। চীন বৌদ্ধধর্ম পরিত্যাগ করিল ও বুদ্ধকে একজন ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যিক সভ্যতার প্রতীক বলিয়া প্রচার করিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহারা তিব্বতের ধর্মানুগত ভাবধারার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিতে লাগিল ও তিব্বতবাসীকে মার্কসীয় নবালোকের আলোকে আনিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইল। ক্রমে চীনসৈন্য তিব্বতে প্রবেশ করিয়া তিব্বতের উপর তাহাদের অধিকার বিস্তার করিতে লাগিল। দলাইলামা ভীত হইলেন। তাঁহাকে অবশ্য কিছু দিন ধরিয়া চীনের অন্তর্গত স্বয়ংশাসিত তিব্বতের অধিকর্তা বলিয়া জগৎসমক্ষে প্রচার করা হইল। কিন্তু ধীরে ধীরে চৈনিক প্রভুত্বের নাগপাশ তাঁহার কণ্ঠনালী রুদ্ধ করিতে লাগিল। এই সময় ভারতবর্ষ মহাশ্রমন তিব্বত ও ঘোষ্‌গলায়নের অধি ব্রিটেনের নিকট হইতে কেরৎ পাইলেন ও বহু জাঁক-জমকের সঙ্গে তাহা সাঁচীস্তূপে প্রোথিত করা হইল। এই সময় তিব্বতের নিমন্ত্রণে দলাইলামা ও বহু বৌদ্ধ নেতা ভারত পরিদর্শন করিতে আসিলেন। দলাইলামা শ্রীনেহেরুর সঙ্গে গোপনে দেখা করিয়া তাঁহার ও তিব্বতের সম্মুখে যে কঠিন পরীক্ষা উপস্থিত হইয়াছে তাহা বর্ণনা করিয়া ভারতে থাকিয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন. কিন্তু নেহেরু তাঁহাকে সেরূপ কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন ও ভরসা দিলেন যে তিনি যদি কোন দিন সেরূপ বিপদের সম্ভাবনা দেখেন তবে ভারত তাঁহাকে নিশ্চয় আশ্রয় দান করিবে।

ক্রমে ক্রমে চীন তার দাঁত ছুপটি প্রকাশ করিতে লাগিল। চীন কমিউনিষ্ট রাজ্য আর ভারত সাধারণ প্রজাতন্ত্র। উভয়

দেশই নিজ নিজ নীতি পালন করিয়া অর্থনীতি ও শিল্পজগতে পরাধীনতা দূর করিবার জন্য প্রচেষ্টা করিতে লাগিলেন। পাশ্চাত্য শক্তিসমূহ আমাদের শিল্পোন্নতিতে সাহায্য করিতে লাগিল ও বাহবা দিতে লাগিল। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী খেলোয়াড়কে যেমন দর্শকেরা বাহবা দিয়া প্রতিযোগিতা আরও তীব্র করিয়া তোলে, চীন আসে যায় কি ভারত আসে যায় পাশ্চাত্য শক্তি-সমূহের নিকট ইহাও তেমনি একটি লক্ষ্যণীয় বস্তু হইয়া দাঁড়াইল। ক্রমে চীনের মনে হিংসার ভাব বৃদ্ধি পাইল। এশিয়া ভূখণ্ডে চীন ব্যতীত অপর কোন শক্তি শক্তিশালী হইয়া উঠে ইহা চীন আর সহ্য করিতে পারিল না। চীন সর্বত্র ভারতের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিযুক্ত হইল। ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন তিব্বতে বিদ্রোহ দেখা দিল ও চীন তার সর্ব-শক্তিদ্বারা তাহা দমন করিতে অগ্রসর হইল। দলাইলামা সপরিষদে ভারতে পলায়ন করিলেন ও ভারত তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিল। ভারত ও তিব্বতের মধ্যে বহু যুগ হইতে যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল তাহা স্মরণ করিয়া আশ্রয় দেওয়া ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না। ইহাতে ভারতের প্রতি চীনের যেটুকু সহৃদয়তার মুখোস ছিল তাহা খসিয়া পড়িল। তাহার নগ্ন রূপটি দেখা যাইতে লাগিল। তিব্বতের তথাকথিত স্বাতন্ত্র্য বা চৌদ্দলাই ভারত প্রবেশের সময় বারম্বার স্বীকার করিয়া নিয়াছিলেন তাহার বিকৃত অর্থ করিয়া স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে অপহৃত হইল। চীন তাহার অগণিত লোকস্রোত তিব্বতে প্রেরণ করিয়া তিব্বতীয়দিগকে ক্রীতদাসে পরিণত করিল ও তিব্বতের চারদিকে ভারতসীমান্ত পর্যন্ত পথ ঘাট, বায়ু পোতাশ্রয় ও দুর্গ রচনা করিয়া সীমান্তের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। প্রথমে সংঘর্ষ উপস্থিত হইল লাডাক অঞ্চলে। নেহরু সরকার ও কৃষ্ণ মেনন নানা প্রকার ধোঁকা দিয়ে ভারত বাসীকে প্রবঞ্চিত করিতে লাগিলেন। সংসদের প্রতি সভায় মেনন বলিতে লাগিলেন যে ভীত হইবার কোন কারণ নাই। তাঁরা সে বিষয়ে খুব অবহিত আছেন এবং অত্যন্ত ভাবে প্রস্তুতি চলিতেছে। দেশের ফ্যাকটরিতে সর্ববিধ অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ হইতেছে। নেহরুজী মাঝে মাঝে রব উচ্চারণ করিতে লাগিলেন।

ঐ সময়কালে দেখা গেল বাকসর্বস্ব নেহরু কৃষ্ণ মেননের ভাঁওতায় নাসারন্ধ্রে সরিষাতৈল প্রয়োগ করিয়া নিশ্চিন্তে ঘুমাইতে ছিলেন। এখন নাকি জাগিয়াছেন। এখন তাঁহার বুঝি হইতেছে যে চীন আক্রমণ পরম সুফলপ্রসূ হইয়াছে। তাঁহাদের নিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে। মেনন ও নেহরু এখন পরস্পরের পৃষ্ঠকণ্ডুয়নে রত। নেহরু ভাব দেখাইতেছেন যেন দেশবাসী সবাই নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। একা তিনি মাত্র জাগিয়াছিলেন। এখন দেশবাসীদিগকে জাগিতে দেখিয়া তিনি পরম সুখী হইয়াছেন। কিন্তু আফিমখোরের জাগৃতি কতটুকু সময়ের জন্য তা কে বলিবে? গালে চড় খাইয়া এক প্রকার লোক গাল চুলকাইতে চুলকাইতে যেমন বলিয়া থাকে যে অপর লোকটি যে এমন অভদ্র তাহা সে বুঝিতে পারে নাই, নেহরুজী সেইরূপ ভাব দেখাইতেছেন। নেহরুজীকে প্রশ্ন করা হইল যে এমনটি ঘটিল কেমন করিয়া? তাঁর উত্তরে তিনি বলিতেছেন যে "কি জানি, কি করিয়া হইল তাহা বুঝিতে পারি নাই। ভুল হইয়াছে। যাক করিবেন, আর হইবে না।" প্রজাতন্ত্রের নিয়ম হইতেছে যে যখন এক দল দেশরক্ষায় বা দেশের কোন কার্যে অসমর্থ হয় তখন স্বেচ্ছায় রাজ্যভার ছাড়িয়া দেয় ও যোগ্যতর ব্যক্তিদিগকে অথবা দলকে রাজশাসনের বল্গা ছাড়িয়া দেয়। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে চাকুরী ছাড়িবার কাহারও কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। এখন লম্বু দিবার গতি আবার তীব্রবেগে চলিয়াছে। আমরা চীন আক্রমণের সুফল কি হইয়াছে তাহার বক্তৃতা শুনিতেছি। এদিকে চীন নির্মমভাবে ভারতভূমির দিকে অগ্রসর হইতেছে। অগ্রস্তত ভারতসৈন্য খালি হাতে যুদ্ধ করিয়া দুর্গম প্রান্তরে প্রাণ দিতেছে। চীন অগ্রসর হইতেছে আর আমরা ঘরে বসিয়া তাহার ফলস্বরূপ একতার বহিয়া পাইতেছি। হায় নেহরু!

এবারের একুশে অক্টোবরের রক্ত আহ্বান

সমর গুহ

নেফা সীমান্তে আমাদের জোয়ানদের তাজা রক্তে স্বাক্ষরিত হয়েছে ভারতের জাতীয় মর্যাদা ও সার্বভৌমিকতা রক্ষার শহীদি প্রতিশ্রুতি। ভারতের রাষ্ট্রপতি ও প্রধান মন্ত্রী আহ্বান জানিয়েছেন জাতীয় ঐক্য ও উদ্যমের, সীমান্তরক্ষী জোয়ানদের সর্বোতভাবে সাহায্য দানের। ভারতবর্ষের সামনে আজ স্বদেশ প্রেমের অগ্নিব্রতের নতুন পরীক্ষা। স্বাভাবতই আজ জাতীয় দুর্যোগের দিনে মনে পড়বে নেতাজীর আজাদ হিন্দের সেই 'অমর মরণের' ঐতিহ্যের কথা,—যার তেজোদৃপ্ত কীর্তি ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসকে রক্তাক্ষরে অবিস্মরণীয় করে রেখেছে। জাতীয় ঐক্য ও আত্মত্যাগের এমন অপূর্ব কাহিনী স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে কোন কালেও রচিত হয়নি। আজ ভারতের জাতীয় প্রতিরোধের দুর্জয় শক্তি গড়ে তুলবার জন্য আজাদ হিন্দের আত্মত্যাগী স্বদেশ-প্রেমের সেই ভাস্বর ঐতিহ্যের নতুন আমন্ত্রণ প্রয়োজন।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে গান্ধীজির সত্যাগ্রহ সংগ্রাম ও নেতাজীর বৈপ্লবিক আজাদ হিন্দের অবদান গঙ্গা-যমুনার যমজ অবদানের মত অনন্য ও অবিচ্ছিন্ন। কিন্তু রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণের বৈষম্যের জন্য গান্ধীজির সত্যাগ্রহের অবদান জাতীয় স্তরে স্বীকৃত হলেও, নেতাজীর আজাদ হিন্দের ঐতিহ্য আজও অবহেলিত ও উপেক্ষিত। গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রেরণায় সৃষ্টি হয়েছে ব্যাপক গণচেতনা, কিন্তু নেতাজীর আজাদহিন্দ চরম আত্মত্যাগী স্বদেশ-প্রেমের মূর্ত প্রতীক। আঠার শ' সাতাত্তরের বৈপ্লবিক সংগ্রামে অগ্নি ও রক্তের যে তরঙ্গ সৃষ্টি হয়েছে, ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে পর্বে পর্বে সেই বিপ্লব তরঙ্গ অনলবর্ষী হয়ে নেতাজীর আজাদ হিন্দের জাতীয় বিপ্লবে তার পূর্ণ অভিব্যক্তি ঘটেছে। সশস্ত্র বিপ্লবের স্বাভাবিক আজাদ হিন্দের সংগ্রামী ঐতিহ্যের তাই যে বিশিষ্ট আবেদন ভারত আক্রমণকারী চীনা বাহিনীর সশস্ত্র প্রতিরোধের প্রেরণা সঞ্চারে তার মূল্য ও গুরুত্ব অনেক।

আজাদ হিন্দের সংগ্রামী বাণী ছিল ঐক্য, বিশ্বাস, আত্ম-বলিদান,—ইত্তেফাক, এত্‌মাদ, কোরবানী। সেই বাণী এক অমোঘ মন্ত্রের মত যেভাবে সংগ্রামী ভারতীয়দের উদ্বুদ্ধ করেছে তার কাহিনী অবিস্মরণীয়। ধর্ম ও বর্ণের বেড়া ভেঙে, শত আবেদন সত্ত্বেও জাতীয় ঐক্য, জাতীয় সংগ্রামের কোন পর্যায়েই পূর্ণ পরিণতি লাভ করতে সক্ষম হয়নি—কিন্তু নেতাজীর আজাদ হিন্দ ধর্ম বর্ণ ভাষা নির্বিশেষে জাতীয় ঐক্য ও সংহতির যে সুদৃঢ় বন্ধন ও জীবন্ত অভিব্যক্তির সৃষ্টি করেছিল তার তুলনা ভারতের জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাসে আর নেই। আদর্শের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাসে যুগে যুগে সংগ্রামীরা সর্বত্যাগের উদ্বোধনায় মানব ইতিহাসে যে অক্ষয় কীর্তি রচনা করে, আজাদ হিন্দের ইতিহাস অগ্নি ও রক্তের দুর্বার সংগ্রামে মৃত্যুঞ্জয়ী স্বদেশ প্রেমের সেই অমর কাহিনী সৃষ্টি করেছে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে। ভারতের রাষ্ট্রপতি ভারতের প্রতিরোধ শক্তি গড়ে তুলবার এবং জনতা ও জোয়ানদের মনোবল উন্নীত করার জন্য যে আহ্বান জানিয়েছেন আজাদ হিন্দের অপূর্ব দেশপ্রেম ও

প্রাণদানের কাহিনী সেই পরিপ্রেক্ষিতে এক জীবন্ত স্মারণিক। আজাদ হিন্দের পুনঃ স্মরণ আজ ভারতের জাতীয় ঐক্য ও স্বদেশ প্রেমের উদ্বোধনে এক অপরিহার্য কর্তব্য। অস্ত্র তাপ ও বিজ্ঞপ্তির চেয়েও আজাদ হিন্দের ন্যায় একটি প্রাণজয়ী ঐতিহ্য ভারতবাসীর মনে গভীর ভাবোদ্দীপনা সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে।

ভারতের জাতীয় আন্দোলনে দেশপ্রেমের অনেক ঐতিহ্য আছে, কিন্তু অগ্নি ও রক্তের স্বাক্ষরে সমগ্র সংগ্রামী ঐতিহ্য বেশি নেই। আজ হিমালয় সীমান্তে ভারতীয় জোয়ানদের স্বদেশ প্রেমে প্রবুদ্ধ করার জন্য প্রয়োজন এমনি অগ্নি ও রক্তের পথে আত্মদানের ঐতিহ্য। শিবাজী-উত্তর ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বাধিনায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র এবং সমগ্র সংগ্রামের পথে আত্মদান ও স্বদেশ প্রেমের প্রমূর্ত প্রতীক আজাদ হিন্দ। শৌর্য, সংগ্রাম, বীর্যবত্তা, প্রাণদান, স্বদেশানুরাগের — মহীয়ান কীর্তিতে যে আজাদ হিন্দের অগ্নিভাস্বরা ইতিহাস গৌরবোজ্জ্বল, আজ তার ঐতিহ্যকে ভারতীয় জনতা ও সামরিক বাহিনীর সামনে তুলে ধরা একান্ত ভাবে প্রয়োজন।

আক্রমণশীল সাম্রাজ্যবাদী চীন ও ভারতের পার্শ্ববর্তী বৈরী রাষ্ট্রগুলির ভারত-বিরোধী প্রচেষ্টার প্রতিরোধে আজ ভারতকে সংগ্রামী স্বদেশ প্রেমের ঐতিহ্যে পুনরায় উদ্দীপ্ত করে তুলতে হবে। এজন্য আজ প্রয়োজন নেতাজী ও আজাদ হিন্দের অগ্নি ও রক্তের ঐতিহ্যকে, সেই সংগ্রামী স্বদেশ প্রেমের আবেদনকে ভারতীয় জনতা ও নওজোয়ানদের সামনে নতুন করে তুলে ধরা। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণের বৈষম্যের কথা ভুলে গিয়ে ইংল্যান্ডের ন্যায় 'ফ্যানাটিক আইডিয়োলজিস্ট' পর্যন্ত আর আমলের জেনারেল সুভরভের ঐতিহ্যকে স্বদেশ প্রেম ও সামরিক বীর্যবত্তার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতীকরূপে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। আজ ভারতীয় রাষ্ট্র নায়কদের এবিষয়ে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। সাম্প্রতিক ইতিহাসে নেতাজী ও আজাদহিন্দের মরণজয়ী সংগ্রাম দেশপ্রেম ও বীর্যবত্তার একমাত্র ঐতিহ্য। বর্তমান সঙ্কটেও, সে সম্পর্কে নেতৃবর্গের বৈষম্যের মূলত মনোভাবকে বিস্তার দেবার ভাষা খুঁজে পাওয়া যায় না। শুধু সমগ্র দেশেই নয়, সামরিক বাহিনীতে, ছাউনীতে, রেডিও প্রচারে লক্ষ্য কেন্দ্রে নেতাজী ও আজাদ হিন্দের সংগ্রামী ঐতিহ্যকে, জয়হিন্দের সংগ্রামী মন্ত্রকে ব্যাপকভাবে এবং নতুন করে স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। সামরিক কেন্দ্রে এযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ভারতীয় সেনানায়করূপে নেতাজীর প্রতিকৃতি স্থাপন, নেতাজীর নামে বীর্যবত্তার পদক দান, আজাদ হিন্দের ঐতিহ্যে সামরিক প্রতীক গ্রহণ, সামরিক বাহিনীতে আজাদ হিন্দের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রচার, — আজাদ হিন্দের অগ্নি ও রক্তের অপূর্ব স্বদেশ প্রেমের ঐতিহ্যকে আবার ভারতীয় জনগণ ও সামরিক জোয়ানদের কাছে জীবন্ত করে তোলা এক জাতীয় কর্তব্য স্বরূপ।

জাতীয় প্রতিরোধ শক্তির প্রধান অবলম্বন জাতীয় মনোবল। ভারতীয় জনতার মনোবল ছাড়া জোয়ানদের মনোবল বিহিত ভাবে গড়ে উঠতে পারে না। স্বাধীনতা উত্তর ভারতে জাতীয় ঐক্যের সেই তীব্র অনুভূতি অনেকখানি শিথিল, — ত্যাগ ও সেবাব্রতের চেয়ে ব্যক্তিগত অভিসন্ধি সিদ্ধি ও স্বার্থপরতার মানসিকতায় জাতীয় প্রেরণার আবহাওয়া কলুষিত এবং বহুলাংশে স্তিমিত ও নিষ্প্রভ। হিমালয় সীমান্তে চীনাক্রমণের রক্তনখর এবং অন্যদিকে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির বৈরী মনোভাব ভারতের অভ্যন্তরে কমুনিষ্ট পার্টির অন্তর্ঘাতী দুরভিসন্ধি দিনে ভারত আজ এক গুরুতর জাতীয় সংকটের সম্মুখীন। এই সংকট প্রতিরোধের জন্য চাই দুর্বার স্বদেশ প্রেমের জন্য প্রতিজ্ঞতি, ঐক্য ও আত্মত্যাগের অগ্নিব্রতী সংকল্প। অগ্নি ও রক্তের নৈবেদ্যে নেতাজী ও আজাদ হিন্দ যে সংগ্রামী স্বদেশ প্রেমের ঐতিহ্য রচনা করেছেন আজ তাতে নতুন দীক্ষা নেওয়ার সময় আসত।

লিলির

রিচ

নোনতা

বিস্কুট

লিলি বিস্কুট কোং.প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা-৪

চল্লিশ দশকের বাংলা কবিতা

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

এক

বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কবিতার ক্রমবিবর্তনের ক্ষেত্রে চল্লিশ দশকের কবিগোষ্ঠীর অবদান সাম্প্রতিক কালের অনুসন্ধিৎসার বিষয়। এবং যে কাব্যপাঠকের উৎসাহ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পূর্ববর্তী বাংলা কবিতার নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ সম্পর্কে আর তেমন উদ্বেল নয় তারপক্ষে প্রকৃত প্রস্তাবে আধুনিক কাব্য-বিচার সম্ভব কিনা সন্দেহ। বস্তুত চল্লিশের যুগ যদিও বাংলা দেশে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানা ঘটনাবলীর আবর্তে ও পেষণে রুদ্ধকণ্ঠ কালের রাধালের মতোই দিশেহারা ও সংশয়কঠিন তবু এই যুগোপযোগী সংশয়াপন্ন পরিবেশেও চল্লিশের কবিতা শেষ পর্যন্ত সমগ্র ভাবেই তাৎপর্যময়। তিরিশের যুগে, প্রধানত পুঁথিগত বিদ্যার প্রভাবে, যে আধুনিকতার সূত্রপাত ঘটেছিল তার বাস্তব ব্যাখ্যা সহজতর হলো চল্লিশের যুগেই। তার কারণ, চল্লিশের যুগে এমন নতুন এক কবিগোষ্ঠীর আবির্ভাব দেখা গেল যাঁদের রচনায় একদিকে যেমন তিরিশের যুগের অপেক্ষাকৃত উল্লেখ্য কবিদের অভিজ্ঞতা ও চিৎপ্রবাহের প্রদায়লাভ দৃষ্টিগোচরযোগ্য অন্যদিকে তেমনি কয়েকটি দিক থেকে সম্পূর্ণ মৌলিক ধ্যান-ধারণায় এবং পরিশীলিত প্রত্যয়ী চিন্তার অনুরণনে গভীরভাবেই স্মরণযোগ্য কৃতিত্বের সাক্ষ্য। তিরিশের কবিতার যে সময়ে আধুনিকতার সূত্রপাত ঘটেছিল সে-সময়ে আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী সামাজিক মানুষের মানসসত্তাকে বিপর্যস্ত করেনি এবং চল্লিশের যুগের শুরুতেই আন্তর্জাতিক যুদ্ধ ও স্বদেশীয় রাজনৈতিক সংগ্রামের ব্যাপকতা যে আকার লাভ করে পূর্ববর্তী যুগে তার তুলনীয় ক্রিয়াকলাপ নজরে পড়বে কিনা সন্দেহ। দৈনন্দিন জীবনের নিষ্ঠুর বিকৃতিতে চল্লিশের সমাজচিন্তা ক্ষত-বিক্ষত এবং জাপানী বোমা, সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা, মন্বন্তর, নৌবিদ্রোহ ইত্যাদি বিভিন্নমুখী তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাবলীতে সাহিত্য-চিন্তা আপাতদৃষ্টিতে বিধ্বস্তপ্রায়। জীবনানন্দ দাশের 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'সম্রাট', সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'ক্রন্দসী' বিষ্ণু দে-র 'চোরাবালি' এবং অমিয় চক্রবর্তীর 'খসড়া,' বুদ্ধদেব বসুর 'কঙ্কাবতী' ও 'নতুন পাতা' আধুনিক কাব্যভাবনায় যে নতুন নতুন প্রস্তর ফলক নির্মাণে সাহায্য করেছিল দেখা গেল চল্লিশের যুগের সূচনাতেই তার সার্বিক গুরুত্ব অনেকখানি হ্রাস পেয়েছে। অর্থাৎ, চল্লিশের কবির শিল্পদৃষ্টি-তিরিশের যুগের বিন্যাসে মুগ্ধ হলেও গভীরতর শিল্পপ্রত্যয়ের দিক থেকে সম্পূর্ণ আস্থস্থ হতে পারেনি। অধিকতর গভীর ভাবে চিন্তা ক'রবার, অনুপ্রাণিত হবার এবং বিষাদময় পটভূমিতেও সংকল্পচ্যুত না হবার সাধনাই চল্লিশের কবিতার অন্যতম চারিত্রলক্ষণ। সমাজচিন্তার ক্ষেত্রে চল্লিশের কবিতা পূর্ণাবয়ব আত্মস্থের অধিকারী এবং কবির শিল্পভাবনায় অনেক সময় তার অনতিক্রম্য প্রভাব সর্বগ্রাসী হলেও চল্লিশের কবিগোষ্ঠী তাঁদের বিপুল আত্মত্যাগ, অন্তর্নিহিত কবিশক্তি এবং সুদৃঢ় শিল্পানুরাগের জোরেই যে শেষ পর্যন্ত নতুন নতুন সাফল্যের আলোকিত সোপানে পৌঁছাতে পেরেছেন এ সত্য

সাম্প্রতিককালে স্থবিদিত।

চল্লিশের কবিগোষ্ঠী গোড়া থেকেই দুটি মূল সমস্যার সম্মুখীন। প্রথমত, চলতিকালের সমাজচিন্তার সঙ্গে নিজের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের সমীকরণ; দ্বিতীয়ত, কবি হিসাবে নিজের ব্যক্তিক বৈশিষ্ট্যের ক্রমোন্নতি ও সম্পূর্ণতাসাধনের জন্যে প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। বলা বাহুল্য, তিরিশের যুগে এই সমস্যার অঙ্কুর থাকলেও ব্যাপকতা ছিল না এবং পঞ্চাশের যুগে এই সমস্যার ক্রমশই গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে। কবির সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি সর্বকালেই কোনো না কোনো দিক থেকে কবিতাকে কম-বেশী প্রভাবিত করবেই এবং কবির কবিসত্তা ও সমাজসত্তার সমীকরণের মধ্যেই প্রকৃত সাফল্য নিহিত, বলা বাহুল্য। কিন্তু চল্লিশের কবিতায় কবিসত্তা ও সমাজসত্তার সমীকরণের এই প্রয়াস ব্যাপকতর চেতনার দীপ্তিতে উজ্জ্বল, অনবরত প্রতীক ও রূপকের মাধ্যমে, বিশেষ বিশেষ অর্থবহ ব্যঞ্জনায় নিশ্চিতরূপেই ভাস্বর। স্পষ্টই অনুভব করা যায় তিরিশের শক্তিশালী কবিগোষ্ঠী চল্লিশে পৌঁছেও সে-সময়ে পুঞ্জিভূত বিষয় পুরাতন ধ্যানধারণার অনুকূলেই কাব্য-নির্মাণের পক্ষপাতী সে-সময়েই অপেক্ষাকৃত নবীন উন্মেষশীল তরুণতর কবিরা শিল্পপ্রত্যয়ের নতুন দিগন্ত এবং শিল্পচেতনার নতুন বাঁকের সন্ধানী। সমর সেন যে সময়ে আবির্ভূত হলেন তখন থেকেই আধুনিক বাংলা কবিতায় চল্লিশের যুগ সুস্পষ্টরূপে চিহ্নিত হলো। সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত চল্লিশের কবিগোষ্ঠীর অনেকেই বিচিত্র ভাবে ক্রিয়াশীল এবং দুএকজন অতিক্রম করেও এই কবি-সম্প্রদায় আধুনিক কাব্যপাঠকের সজাগ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং কেউ কেউ তরুণতর কবিদের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন এ সত্য সর্বজন-বিদিত।

চল্লিশের যুগের প্রারম্ভেই তিরিশের অগ্রণী কবিদের সঙ্গে চল্লিশের তরুণতর কবি সম্প্রদায়ের প্রসাদ ও উপকরণের পার্থক্য ক্রমশই স্পষ্টতা লাভ করেছিল। তিরিশের উল্লেখ্য কবিদের মধ্যে একমাত্র জীবনানন্দ দাশ ভিন্ন সম্ভবত সকলেই (সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে) রবীন্দ্রকাব্যের শেষ পর্যায়ের অনতিক্রম্য প্রভাবকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টায় সক্রিয় থাকলেও সম্পূর্ণ বর্জন করতে পেরে-ছিলেন কিনা সন্দেহ। তিরিশের যুগের সূচনায় রবীন্দ্রপ্রভাব পরিবর্জনের চেষ্টা প্রায় আন্দোলনের আকার গ্রহণ করলেও এই যুগের প্রায় শেষাশেষি পৌঁছে রবীন্দ্র-বিরোধিতা কেমন যেন এক অসম্পূর্ণ অতিসংযোক্তিতে পরিণত হয়েছিল। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কিংবা অমিয় চক্রবর্তী কোনো সময়েই রবীন্দ্র-কাব্যরীতির বিরোধীতায় উৎসাহী ছিলেন না এবং বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ কবি শেষ পর্যায়ে যে রবীন্দ্রচেতনায় প্রকারান্তরে আপ্লুত হয়েছিলেন তার কিছু-কিছু প্রমাণ তাঁদের রচনায় পরিদৃষ্ট হবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের সাম্প্রতিক-কালের একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা 'আফ্রিকা'র অনুসরণে বুদ্ধদেব বসু লিখিত 'ছায়াচ্ছন্ন হে আফ্রিকা' রবীন্দ্রপ্রভাবের অপ্রতিরোধ্য অভিবেগকে সূচিত করে এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যচিন্তায় আধুনিক কাব্যের যে ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছিলেন ('সাহিত্যের পথে' গ্রন্থের 'আধুনিক কাব্য' প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।) কল্লোলের যুগের কবিদের বক্তব্য পরবর্তীকালে তার চেয়েও খুব স্বতন্ত্র কিছু ছিল বলে মনে করবার সঙ্গত কারণ নেই। সুতরাং বলা যেতে পারে, কল্লোল যুগের কবিদের কাছে নয়, তৎপরবর্তীকালের তরুণতর কবিগোষ্ঠীর কাছেই বরং পাঠকসমাজের প্রত্যাশা অবারিত রইলো। অতএব, স্বাভাবিক নিয়মেই, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায় সেই অনুসন্ধিৎসু পাঠক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং মনন ও বেদনের দিক থেকেও চল্লিশের কাব্যে সম্পূর্ণ নতুন ও স্বতন্ত্র সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হ'লো। প্রসঙ্গ ও উপকরণে, প্রতীকধর্মিতায় এবং আঙ্গিকের স্বাতন্ত্র্যে এই নতুন যুগের কবিতা ক্রমশই স্পষ্ট আকার গ্রহণ করেছিল। বুদ্ধদেব বসুর মতো সচেতন ও শক্তিমান এবং শিক্ষিত কবি যে সময় সেন বা

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা সম্পর্কে এক সময়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন তার একটি কারণ সম্ভবত এই যে, বাংলা কবিতায় যে নবত্ব ও স্বাতন্ত্র্যের দীপ্তি তাঁদের আকাঙ্ক্ষার বিষয় ছিল অথচ যা তাঁদের কবিতায় শেষ পর্যন্ত স্পষ্ট চেহারা নিতে পারেনি চল্লিশের যুগে এসে তার সূচনায় হয়তো আনন্দিত হবার সঙ্গত কারণ ছিল : মোটের উপর, প্রারম্ভ থেকেই চল্লিশের কবিতা স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত এবং যুগোপযোগী চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত ; সে সময়কার ঐতিহাসিক ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ।

দুই

বর্তমান প্রবন্ধকারের বিবেচনায় সমর সেন থেকে চল্লিশের কাব্য-আন্দোলনের শুরু এবং কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মণীন্দ্র রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেশ গুহ, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এবং আরো অনেকেই দীর্ঘকালের ব্যবধানে এই নতুন কাব্য-আন্দোলনকে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে বিভিন্ন দিক থেকে সমৃদ্ধ করে এসেছেন : সমাজচিন্তার প্রকাশে, সামাজিক রাগের গভীরতায়, নতুন মানবিক মূল্যবোধের সহজ অঙ্গীকারে এই সময়কার বাংলা কবিতা পরিপূর্ণরূপেই আন্তরিক। চল্লিশের কবিদের অনেকেই একালেও যে বিশেষভাবে সক্রিয় এবং নব-নব পরীক্ষা-নিরীক্ষায় আগ্রহী এবং সচেতনভাবেই বৈচিত্র্যসন্ধানী তার অনেক প্রমাণ সাম্প্রতিক কালের পত্র-পত্রিকায় উপস্থিত। সবচেয়ে উল্লেখ্য যে রবীন্দ্রপ্রভাবকে তাঁরা শেষ পর্যন্ত বর্জন করতে পেরেছেন যা তিরিশের যুগের কবিগোষ্ঠীর পক্ষে সম্ভব হতে পারেনি। চল্লিশের যুগে এক-এক সময় বাইরের নানা ঘটনাবলীর চাপে বাংলা কবিতায় গীতিবিমিতার স্থান সঙ্কুচিত হলেও পরবর্তী কালে আবার সহজ ও স্বাভাবিকভাবেই চল্লিশের কবিদের অনেকের হাতেই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই গীতিকাব্যের অনুরণন প্রসারলাভ করেছে একথাটিও স্মরণীয়।

সমর সেন চল্লিশের যুগের প্রথম প্রতিনিধিস্থানীয় নাগরিক কবি। নাগরজীবনের আলেখ্য ইতিপূর্বে বিষ্ণুদের কবিতায় ('চোরাবালির কোনো-কোনো কবিতায়) থাকলেও সমর সেনের কবিতাতেই এই প্রথম নাগরিক জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আস্থা ও হতাশা ব্যাপকরূপে প্রতিবিম্বিত হলো। রিক্সার ক্লান্ত চিনে গলিকা, চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে উর্বর বিস্মৃতমুখ স্নেহে যেমন তাঁর নজর এড়ায়নি তেমনি মহত্তার দেশের স্মৃতিচিত্রন প্রসঙ্গে রোমান্টিক বেদনায়ও তাঁর সমাজচেতন কবিতাগুলি পরিপূর্ণ। কিসের ক্লান্ত দুঃস্বপ্ন থেকে থেকেই নাগরিক তৃপ্তির পথে অন্তরায়, যতদূর তাকানো যায় ইটের মরণ্য, পায়ে চলা পথের শেষে কারার শঙ্খ।

তবু মাঝে মাঝে মুহূর্তগুলি
আমাদের এই পথ
সোনালী সাপের মতো অতিক্রম করে,
পাটের জলের উপরে আকাশ তখন
পাথরের মতো কঠিন,
মনে হয় যেন স্বপ্নে দেখি—
দুধারে গাছের সবুজ বন্যা,
মাঝখানে ধূসর পথ,
দূরে সূর্য অস্ত গেল।
ভরা চাঁদ এলো নদীর উপরে,
চারদিকে অন্ধকার—রাত্রের বাপসা গন্ধ,
কিছুক্ষণ পরে হাওয়ার জোয়ার আসবে
দূর সমুদ্রের কোন দ্বীপ থেকে,
সেখানে নীল ছল, কেনার ধূসর-সবুজ জল,
সেখানে সমস্ত দিন সবুজ সমুদ্রের পরে লাল সূর্যাস্ত,
আর বলিষ্ঠ মানুষ, স্পন্দমান স্বপ্ন—

(নাগরিক)

এবং অতঃপর সেইসব দিনে, যখন বিশ্বযুদ্ধ অতিমাত্রায় মুখব্যাদান করেছে এবং স্বদেশেও উত্তেজনা ও মনান্তরের

কর্কশ কোলাহল সহজ সঙ্গীতির অন্তরায় সেই সময়েই বজ্রের গুরুগুরু প্রতিধ্বনি আধুনিক কবিও নিবিড় ভাবেই অনুভব করেন :

আজ শুধু মনে হয়,
ক্ষুব্ধিত মেঘাক্ত মুখের উপরে চৈত্রের লাল আলোর পর,
পাথর কঠিন যুগে যন্ত্রণার
আর পৃথিবীতে পুঞ্জীভূত শতাব্দীর স্তব্ধতার পর
সমুদ্রের শব্দের মতো শেষহীন বজ্রের গুরু-গুরু
প্রতিধ্বনি।

('কয়েকটি দিন')

বস্তুত, সমর সেনের কবিতা পাঠান্তে বিবেচক কাব্য-পাঠকের পক্ষে আর যেন রবীন্দ্রকাব্যের আনন্দ-নিকেতনে ফিরে যাবার উপায় রইলোনা। আধুনিক কাব্য পাঠক স্পষ্টই উপলব্ধি করলেন শুধু রবীন্দ্রকাব্য থেকেই নয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে কল্লোল যুগের কাব্যাদর্শ ও কাব্যরীতি থেকেও আত্মার ও অবয়বে এই কবিতা একেবারেই স্বতন্ত্র। শুধু গদ্য কবিতা বলেই নয় এই নতুন কবিতায় এমন এক গভীরতর দৃষ্টিভঙ্গি ক্রিয়াশীল যার তুলনা পূর্ববর্তী অগ্রণী কবিদের রচনায় বিরল। নাগরিক জীবনের ক্লান্তি, ক্ষোভ, হতাশা ছাড়াও সমাজচিন্তার এক সুপরিণত গভীর অনুভূতিতে এই কবিতা উদ্ভূদ্ধ এবং সে-কারণেই এই কবিতা শেষ পর্যন্ত সচেতন পাঠকের হৃদয় অভিভূত করে। বাংলা সাহিত্যে গদ্যকবিতার ক্ষেত্রে সমর সেনের কবিতা প্রকাশভঙ্গির স্বাতন্ত্র্যে অভিনব। রবীন্দ্রনাথপ্রবর্তিত গদ্যকবিতা, এমন কি জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু এবং বিষ্ণু দে-র গদ্যকাব্য থেকেও এই কবিতা একেবারেই স্বতন্ত্র। খুব সংক্ষিপ্ত বাক্যপ্রয়োগে, বাক-চাতুর্যে এবং রূপক ও সাংকেতিকতায় সমর সেনের কবিতা তাৎপর্যময়। ইতিহাসের একটি বিশেষ অবস্থায়, সমাজচিন্তা এবং জাতীয় জাগরণের নব-উদ্বোধনের মুহূর্তে সমর সেনের কবিতা শিক্ষিত বাঙালী বুদ্ধিজীবীর ক্ষোভ, হতাশা, প্রত্যাশা এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক্ষীণ আশাবাদের স্বরূপীর দলিল। চল্লিশের যুগের ঘাড়াঘাড়ি পৌঁছেই সমর সেন শুরু। তারপর আর বাঙালী কাব্যপাঠক তাঁর কাছ থেকে তেমন কিছু পাননি। তৎসত্ত্বেও, কিছুকালের জন্যে, মধ্যবিত্ত নিদ্রালস, সংস্কারপ্রবণ বাঙালীসমাজকে তিনি নাড়া দিতে পেরেছিলেন, তাঁর কবিতা মোহগ্রস্ত, অপমানে অভ্যস্ত ক্ষয়িষ্ণু নিষ্পিষ্ট শিক্ষিত-সমাজকে, বাংলা কবিতার তরুণতর পাঠক সমাজকে সচকিত করে তুলেছিল। তাঁর স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত গদ্য কবিতার কঠু, তির্যক গদ্যভঙ্গি তাঁর বক্তব্যকে স্পষ্ট ক'রে তুলতে সাহায্যও করেছিল। প্রেমের কবিতায়, ব্যঙ্গ কবিতায়, রাজনীতি সচেতন কবিতায়—সর্বত্রই তাঁর কবিতার অনন্য প্রকাশভঙ্গি বিশ্বস্ত অনুচরের মতোই তাঁর সহায়।

আমার রক্তে থামি তোমার সুর বাজে।
রুদ্ধশ্বাস, কত পথ পার হয়ে এলাম,
পার হয়ে এলাম
সময় কত মুহূর্তের দীর্ঘ অবসর ;
স্মৃতির দিগন্তে নেমে এল গভীর অন্ধকার,
আর এলোমেলো,
ভুলে যাওয়ার হাওয়া এল দূরের পথ বেয়ে :
রুদ্ধশ্বাস, কত পথ পার হয়ে এলাম, কত মুহূর্ত,
শ্রান্ত হয়ে এল অগণিত কত প্রহরের ক্রন্দন,
তবু আমার রক্তে থামি তোমার সুর বাজে।

('স্মৃতি')

তুমি যেখানেই যাও,
কোনো চকিত মুহূর্তের নিঃশব্দতায়
হঠাৎ শুনতে পাবে
মৃত্যুর গভীর, অবিরাম পদক্ষেপ।
আর, আমাকে ছেড়ে তুমি কোথায় যাবে?
তুমি যেখানেই যাও

আকাশের মহাসূত্র হতে জুপিটারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নেভার
শুভ্র বুকে পড়বে।
('তুমি যেখানে যাও')

আজ শুধু মনে হয়
ক্ষুধিত যেদাক্ত মুখের টর্চের লাল আলোর পর, পাথর-
কঠিন যুগে যন্ত্রণার
আর পৃথিবীতে পুঞ্জীভূত শতাব্দীর স্তব্ধতার পর সমুদ্রের
শঙ্খের মতো শেষহীন ব্রহ্মের গুরু গুরু প্রতিধ্বনি
('কয়েকটি দিন')

অনেক ঘাটের জল খেয়ে বুঝি
অনেক লোক যেখানে
সেখানে সন্ধ্যার নতুন সূর্য ওঠে,
কালের ঘোলাটে জলে জোয়ার লাগায়
সম্ভব হয় অনেকের খেয়া পারাপার,
গভীর জলে একের শবদেহ ডোবে।
('নবযুগের প্রস্তাব')

ভাষার ব্যঞ্জনায়, শব্দের নতুন নতুন অর্থময়তায়, রূপক ও প্রতীক নির্বাচনের ক্ষেত্রে সমর সেনের বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। তাঁর কবিতার মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এই বিষয়ের বিশেষ উল্লেখ অনিবার্য। যেমন, রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে তেমনি অনেক বিদেশী কবির কবিতার অনেক স্মরণীয় পংক্তি তাঁর কবিতায় নতুন আস্বাদ বহন ক'রে এনেছে। কবিতার উত্তরাধিকারের এই ঘুৎপত্তি (acquirement) সমর সেনের কাব্যরীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পূর্ববর্তী কবিদের মধ্যে বিষ্ণু দে-ই অনুরূপ স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী। সমর সেনের কবিতায় এলিয়ট উপস্থিত, কীটস্, লরেন্স এবং সম্ভবত অন্যান্য কয়েকজন ইংরেজি কবিও। কিন্তু সমর সেনের কবিতায় আত্মীয়করণ সম্ভব হয়েছে বলেই আধুনিক কাব্য-পাঠকের উপভোগকে তা কখনো পীড়িত করে না। 'ক্ষুধিত যেদাক্ত মুখের টর্চের লাল আলোর পর' এলিয়টের 'After the torchlight red on sweaty faces' পংক্তি-বিন্যাসকে স্মরণ করিয়ে দেয়। 'উজ্জ্বল, ক্ষুধিত শাওয়ার যেন এপ্রিলের বসন্ত আজ'। খুব সম্ভব 'April is the cruellest month,' থেকে পরিকল্পিত। 'লুপ্ত পাহাড়, লুপ্ত বোধ, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ' কতকটা এলিয়টের 'I have lost my sight, smell, hearing' taste and touch:' পংক্তিবিন্যাসের অনুবর্তী। পক্ষান্তরে 'সূর্যদেব অস্ত গেল, সূর্যদেব কোন দেশে— এখানে সন্ধ্যা নামল শীতের আকাশে অন্ধকার ঝুলছে ধূসরের চামড়ার মতো,' কিংবা 'ম্লান হয়ে এল রুমালে ইউনিং-ইন-প্যারিসের গন্ধ—/হে শহর হে ধূসর শহর! এবং যদি কোনোদিন কর্মহীন পূর্ণ অবকাশে বসন্ত বাতাসে—,ফুল আর ফলের ঋণ শেষ, ক্লাইভ স্ট্রীট জনহীন,' 'শতাব্দী-পাঁচটার দীর্ঘশ্বাস গিয়েছে থেমে,/ সন্ধ্যা নামল :' ইত্যাদি পংক্তি সন্ধ্যার রবীন্দ্র-কাব্যের ঐতিহ্য সম্পূর্ণ নিজ প্রয়োজনেই ভিন্নতর সুর ও স্বতন্ত্র সৃষ্টির কাজে সমর সেন ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর কবিতায় নতুন ব্যঞ্জনাও লক্ষণীয়। যেমন, 'অবসন্ন মানুষের শরীরে দেখি ধূলোর কলঙ্ক' 'নিঃসঙ্গ পাথর মতো রাত্রি আসে' 'পাহাড়ের ধূসর অন্ধকার / দূরন্ত অন্ধকার ডানা ঝাড়ে / উড়ন্ত পাখীর মতো।' 'ক্ষীতোদর দার্শনিক স্বামীর পিছনে গর্ভবতী সতী সাবিত্রী' 'ঝাঝরান কাল / ট্রেসের লৌহরেখার উপরে আজো আনে লোহিত-হলুদ চাঁদ' 'নবাবী আমল শুধু ঘরানার সোনা' 'মনের আহার্যে রয়েছে বাড়ি' 'বুড়ো দিন সোনার কলস মাথায় নামায়/ পথ চলার পুরোনো পথ পাগল করে।' গভীর ভাবে চিন্তা করবার, গভীরতর সামাজিক অনুভূতিতে নিবিড় হবার চেষ্টায় সমর সেনের কবিতা বাংলা কবিতার ইতিহাসে আশ্চর্য এবং অবিস্মরণীয়। তৎকালীন, অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বের এবং পরের নগর-জীবন সমর সেনের কবিতায় পরিপূর্ণতা নিয়ে উপস্থিত। কোনো বাঙালী কবির কবিতায় নাগরিক জীবনের সমগ্রতা এরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে আর ধরা পড়েনি।

সুতরাং কোনো সন্দেহ নেই আধুনিক বাংলা কবিতায় তিনি নিজেই একটা যুগের প্রবর্তন করেছিলেন এবং তাঁর তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি এখনই এক চিত্র সমাবেশ ঘটিয়েছিল আধুনিক বাংলা কবিতায় যার তুলনা খুব বেশী পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ।

তিন

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায় সমর সেনের সমসাময়িক কালেই আধুনিক কাব্যপাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। এঁরা যে সকলেই কোনো বিশেষ কাব্য-আন্দোলনের অংশীদার ছিলেন তা নয়। কিন্তু সমকালীন কাব্যাদর্শ ও কাব্যরীতির অনেকটি লক্ষণ (যথা, সমাজচেতনা, দেশপ্রেম, আদর্শবাদ, ব্যঙ্গ, আশাবাদ) কমবেশী এঁদের কবিতায় উপস্থিত। কেউ-কেউ গোড়া থেকেই নতুন লিরিক সুর নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন কিন্তু যুদ্ধকালীন সময়ে প্রধানতঃ বাইরের ঘটনার তাড়নায় এই লিরিক সুর সঙ্কুচিত হতে দেখা যায়। তার পরিবর্তে প্রকাশমান গভীর বাস্তব বোধের অনুভূতি। এই অনুভূতি অনেক সময় লেখকের অভিজ্ঞতার অংশ হতে পারেনি এবং কবিতা অতএব কোনো কোনো ক্ষেত্রে সার্থকভাবে ভারসাম্য রক্ষা করতে পারেনি। কিন্তু এই কবিদের সকলেই যুদ্ধ-কালীন বিপর্যয়ের পরবর্তীকালে আবার যে-সব কবিতা লিখেছেন নিজস্ব অনুভূতির নিবিড় সুর সে-সব রচনায় খুব সহজ ও স্বাভাবিক ভাবেই বেজেছে। এদিক থেকে বীরেন্দ্র রায় এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যেতে পারে।

সমর সেনের মতোই কামাক্ষীপ্রসাদও নাগরিক জীবনের কবি। গোড়ার দিকে তাঁর অনেক কবিতায় শীতিধর্মী অনুরণন স্পষ্ট। 'মৈনাক' কাব্যগ্রন্থের 'কথা কও তুমি' 'ধানকাটা মাঠ' 'তবু' প্রভৃতি কবিতা স্পষ্টই চিরন্তন রোমান্টিক চেতনার অনুবর্তী। 'শিবির' কাব্যগ্রন্থে গদ্য কবিতা নিয়ে পরীক্ষা করলেন তিনি। দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে কতকটা দিকভ্রান্ত, অস্থির। কিন্তু তাঁর পরবর্তী কাব্যগ্রন্থে ('একা') আধুনিক নগর জীবনের সার্থক চিত্ররূপ পাওয়া গেল আবার। গভীরতার আভাসও পাওয়া গেল।

নদীর ওপারের বন ছুঁয়ে চাঁদ উঠে এলো
নটীর মতো নিটোল, চোখের নীচে কালি।...

বোঝা গেল, উপমাও কবি গ্রহণ করেছেন নাগরিক জীবন থেকে। নাগরিকতার অলিতেগলিতে তাঁর মার্জিত মন বিচরণ করেছে; নাগরিক জীবনের জটিল-বাঁধা নিজীবতায় তিনি ক্লান্তি অনুভব করলেও ঘুরে ফিরে এই শহর জীবনই তাঁকে আকর্ষণ করেছে। মাঝে মাঝে অবশ্য প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে অপূর্বতা অনুভবও করেছেন:

আমি বেঁচে আছি, আমি দেখছি, আমি ভালোবাসছি।
অবাক লাগে ভাবতে। একদিন এদের আমি দেখিনি,
একদিন এদের আমি দেখবো না।
এতো আলো, এতো আকাশ, এতো প্রাণ
ধানের রঙের মতো হেমন্তের রৌদ্র-ভরা বিকেল।

('ধূলো')

এবং প্রকৃতির অন্তরঙ্গতায় তিনি মুগ্ধ, বিচলিতও হয়েছেন। বিচলিত হয়েছেন এই জন্যে যে প্রকৃতি তাঁকে মুগ্ধ করলেও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মগ্ন হতে পারেননি শেষ পর্যন্ত। তাঁর নাগরিক প্রবৃত্তি থেকে-থেকেই তাঁকে পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছে। আঙ্গিকের দিক থেকে কামাক্ষী-প্রসাদ দীর্ঘকালের চর্চার মধ্যেও তেমন নিজস্বতা অর্জন করেননি। অগ্রণী কবিদের মধ্যে অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছেন। সমর সেনের আঙ্গিকের প্রভাবও তাঁর অনেক কবিতায় সুস্পষ্ট। তৎসত্ত্বেও কামাক্ষীপ্রসাদ বিশিষ্ট কবি এবং চল্লিশের কাব্য-আন্দোলনে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা উল্লেখ্য।

আধুনিক বাংলা কবিতায় সহজ শিল্পিক সুর চল্লিশের যুগে হরপ্রসাদ মিত্রের কবিতায় স্পষ্ট অনুরণন আনায়। মন ও মেজাজে তিনি প্রচলিত সংস্কারের অনুগামী এবং একটি নিজস্ব ভাষা ভঙ্গিতে সহজ সুরে সহজ সাড়ায় বাংলা কাব্যপাঠকের হৃদয়কে তিনি স্পর্শ করতে পেরেছেন। আঙ্গিক বা বিষয়-বস্তু নিয়ে অন্যান্য কবিদের মতো তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য পরীক্ষা না করলেও একপ্রকার শান্ত সমর্পণে, সমগ্রভাবে সংসার ও বিশ্বপ্রকৃতি দেখবার আন্তরিকতায় তাঁর কবিতাবলী পরিশুদ্ধ।

কেউ ব্যর্থ নয় এই ছন্দ-ছন্দ বিচিত্র গতিতে
এই শেষ সত্য থাকে সম্মিলিত হিতে-বিপরীতে॥

এবং অমিয় চক্রবর্তীর বক্তব্যের সঙ্গে এই দিক থেকে হরপ্রসাদের বক্তব্যের অনুগামীতা লক্ষ্যণীয়। অমিয় চক্রবর্তীর 'পিপঁড়ে' এবং হরপ্রসাদ মিত্রের 'একটি আরশোলার মৃত্যু' অন্তত দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে সমগোত্রীয়। অমিয় চক্রবর্তীর আঙ্গিকের সিদ্ধি হরপ্রসাদে তেমন খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু নীচু গলার শান্ত বক্তব্যে, ভাষা উচ্চারণে দুই কবির কিছু-কিছু মিল কাব্যপাঠকের নজর এড়ায় না।

ভালো লাগা, জেগে ওঠা, খুশী হওয়া মর্তের মাটিতে
কবিতেরা জানে,
জানে কিংঃ, চিল, নীল মাছরাঙা সেই সত্য থাকে মনে
এখানে বৃহৎ পাশে পাশে
('স্মৃতি, বিস্মৃতি')

এবং অন্যত্র—

ধুলো, ঘাস, আবর্জনা।—
সৃষ্টি আর সৃষ্টির সংহার
সমস্ত মিলিয়ে দেখো।
চলো, পথে যাই।
('ঘর থেকে পথে')

হরপ্রসাদ মিত্রের পাশাপাশি আরো কয়েক জন কবি গোপাল ভৌমিক, গোবিন্দ চক্রবর্তী রায়েন্দ্র দেশমুখ্যর সক্রিয়তা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। গোপাল ভৌমিক এবং গোবিন্দ চক্রবর্তীর কবিতায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আবেদন সুস্পষ্ট। দীর্ঘকালের কাব্যসাধনায় উভয়েই বাংলা কবিতায় একটি বিশ্বাস, সহজ সুর সঞ্চারিত করেছেন। গোপাল ভৌমিকের 'বাইরে সাপ' কবিতাটি সাম্প্রতিক কালের একটি উল্লেখযোগ্য রচনা এবং প্রেমের একটি বিচিত্র ভঙ্গির প্রকাশে সার্থক। গোবিন্দ চক্রবর্তীর 'বাঘ' ধানবিক আবেদনে, প্রেমেন্দ্র মিত্রের মানসসত্তার অনুবর্তী হয়েও, সুন্দর। পক্ষান্তরে, রায়েন্দ্র দেশমুখ্য সমাজসচেতন কাব্যবিন্যাসে অভ্যস্ত।

(ক্রমশঃ)

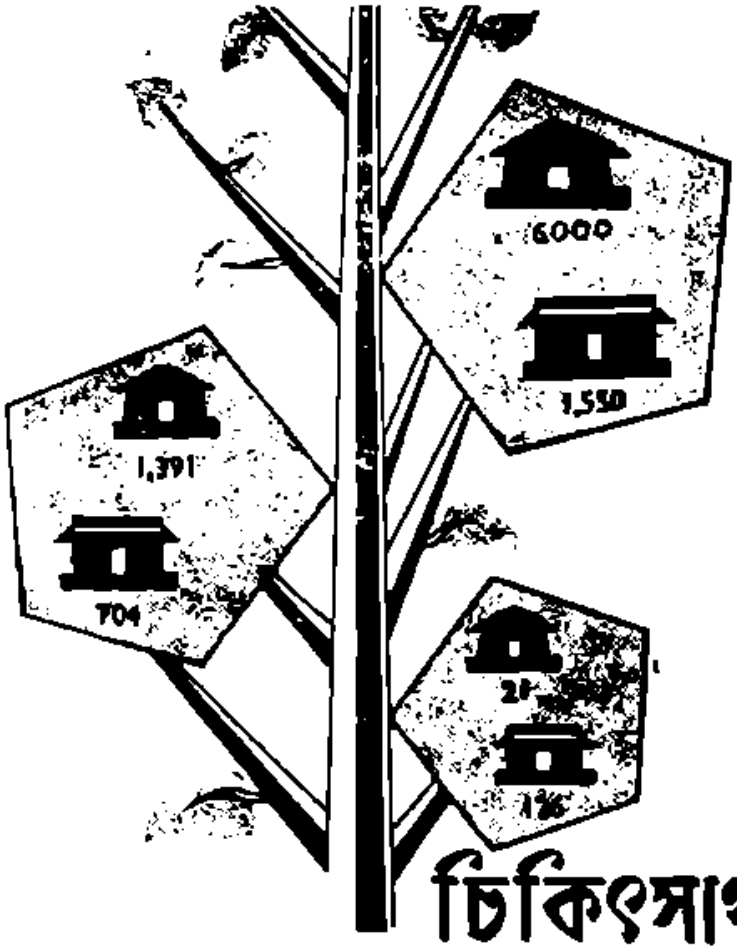

চিকিৎসাগারগুলির ক্রমোন্নতি

১৯৩০ সালে যখন তদানীন্তন মহীশূর সরকার বিশ্বে সর্বপ্রথম, পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে সরকারী চিকিৎসাগারটি স্থাপন করেন, তখন ভারত এক অসম সাহসিক পরীক্ষার মুখে ছিল। কিন্তু প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময়ে পরিবার পরিকল্পনা আন্দোলন জনগণের অন্যতম কর্মসূচী হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এই আন্দোলন তেমন অগ্রগতি করতে পারেনি। গ্রামগুলিতে ২১টি এবং সহরগুলিতে ১২৬টি চিকিৎসাগার নিয়ে দ্বিতীয় পরিকল্পনার কাজ সুরু হয়। ১৯৬২ সালের মার্চ মাসের মধ্যে গ্রামগুলিতে ১,৩৯১টি এবং বিভিন্ন সহরে ৭০৪টি এই রকম চিকিৎসাগার স্থাপিত হয় এবং গ্রামাঞ্চলে ৬,০০০ ও সহরাঞ্চলে ১,৫৫০টি চিকিৎসাগার স্থাপন করাই হ'ল তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য।

স্বাস্থ্য ও সুখের জন্য

পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিবার গঠন করুন

DA 63 321

সরকার অনুমোদিত নিকটবর্ত্তী

পরিবার পরিকল্পনা চিকিৎসাগার থেকে পরামর্শ নিন

বিজনবন্ধুমার বোস	খুনী আসামী

অধীর যে দিন প্রথম অফিসে এল, অর্থাৎ কর্মজীবনে প্রবেশ করল, সে দিনই বাতাসে কি রকম চাপা ফিস্ ফাস শুনল। কারা যেন টারা চোখে তাকাল ; কারা ভয়ে, কারা বিরক্তিতে আপাদমস্তক লক্ষ করল। অধীর যেন ফাঁসির আসামী। আজই ফাঁসি কাঠে ঝুলবে। সমস্ত শরীরে কালো পোষাক চড়ান হয়েছে। একটু পরেই যাতক এসে ফাঁসির মঞ্চে নিয়ে যাবে। জীবনের জয়গান শোনা যাবে না কোথাও। এই তরুণ আসামীকে আগে ওরা কেউ দেখেনি। কাকে খুন করেছে বা কিসের জন্যে অপরাধী —কেউ জানে না। জানে—অফিসে যখন পা দিল তখনি গায়ে কালো পোষাক চড়ান হয়ে গেছে—খুনী আসামী। অথবা নিজেই খুন হতে এল অবেলায়। তাই দুঃখ প্রকাশ করল কেউ কেউ। কারা যেন ভয়ে ভয়ে, কারা পরম বিরক্তিতে আপাদমস্তক লক্ষ করল। বাতাসে চাপা ফিস ফাস উঠল। সেই সব ব্যথিত শব্দ অফিসের বিবর্ণ জানালা গলিয়ে ধূপুরের নীল সুতো দিয়ে গেল।

অধীর টাইপ করছিল।

এ ঘরটা বড় অন্ধকার, বড় শীত শীত। পুরোনো বাড়ি। মাকড়সা জাল তৈরী করছে। মাথার ওপর বাট পাওয়ারের আলো ; অল্প বাতাসে একটু একটু কাঁপছে। টাইপ রাইটারের ওপর নিজের ছায়া পড়েছে। কি রকম যেন অদ্ভুত লাগছে। অচেনা পাখি জানালার কাচে এক সেকেণ্ড বসে উড়ে গেলে যে রকম রহস্যময় মনে হয়, নিজেকেও সেই পাখির মত মনে হচ্ছে। বড় অন্ধকার। আগেকালের কোন বড়লোকের বাড়ি ছিল বোধ হয়। ঝাড়-লণ্ঠন ছিল, দাস-দাসী ছিল, ঘরা বাইজি ছিল। এখন নেই। দুপুরে নিজন নেই। টাইপ রাইটারের বিশ্রী খট খট আওয়াজ। মাকড়সার জাল। নোনাধরা দেওয়াল। অন্ধকার। ফিস-ফাস কথাবার্তা। মেসিনের গন্ধ, কাগজপত্রের পুরোনো গন্ধ, ন্যাতসেতে গন্ধ। চারপাশে গন্ধের সমুদ্রে সাঁতার কাটছে অধীর। আহা চাকরী! সোনার হরিণ!

—আপনি কি নতুন ঢুকেছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

একজন কানে কানে ফিস ফিস করে বলল, পার্সোনাল এ্যাসিস্টেন্ট। অধীর সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে নমস্কার করল। কেমন যেন বোকার মত দেখাল—গেঁয়োর মত।

—আপনার নাম?

—শ্রীঅধীরচন্দ্র পাল।

—ঠিক আছে, কাজ করুন।

পার্সোনাল এ্যাসিস্টেন্ট টগবগিয়ে চলে গেলেন। অধীর তার গমন পথের দিকে আনমনে চেয়ে রইলে।—নজরে পড়ে গেছেন দাদা : কারা যেন কথাগুলি বাতাসে ছুঁড়ে দিল। অধীরের এরিয়াল কান বাতাস থেকে তা শুষে নিল। একে বুঝি নজরে পড়া বলে? আহা, সোনার হরিণ। কেমন কাছে আসে আবার হাওয়ায় মিলিয়ে যায়।

—আপনি বুঝি নতুন?

অধীর এই সময় 'টি' খুঁজে পাচ্ছিল না। না তাকিয়ে উত্তর দিল, হুঁ। 'টি' দেখতে পেল। স্ট্রোক দিয়ে মুখের

দিকে তাকাল। চমকে উঠল। ঠিক অধীরের মতন। না, অধীরের মতন নয়! ভদ্রলোকের বয়স চল্লিশ, অধীরের চল্লিশ। ছ' বছর পরে অধীরও চল্লিশের কোঠায় পৌঁছে যাবে। মনে হয়, এখনই ওরা একই কোঠায় পৌঁছে গেছে। নিশ্চয়ই ভদ্রলোক বিবাহিত। অন্তত পাঁচ ছ'টি ছেলেমেয়ে আছেই। বিধবা না আছেন। নিশ্চয়ই বাড়ি ভাড়ার হারটা খুব চড়া। আগে সস্তাই ছিল। বাড়িওলা একদিন সকালে এসে বলল, আপনারা উঠে যান। ছেলের বিয়ে দেব। ঘর দরকার। তখন ভাড়াটা অত্যন্ত চড়া হয়ে গেল। রেখাঙ্কন মুখ। একেকটি রেখার পেছনে গোপন মৃত্যুর ইতিহাস। মুখের ওপর নিঃশ্বাস ফেলছে। কি নোংরা বিশ্রী নিঃশ্বাস। পাইওরিয়া। অধীর অবিবাহিত। বিয়ে করবে—সে সম্ভাবনা নেই। প্রেমের প্যানপ্যানানি অপছন্দ। তবে বাবা বিয়ে করেছিলেন। তিনি সুখী পুরুষ। এক পাল বংশ বৃদ্ধির ঝাড় অধীরের ঘাড়ে চাপিয়ে নিশ্চিন্তে বিদায় নিয়েছেন। চল্লিশের মন তাই চল্লিশ ছুঁই ছুঁই করে।

—আপনি এসেছেন কেন?

—মানে?

—মানে আপনি এখানে এসেছেন কেন?

অধীর চমকে উঠল। লোকটা কি পাগল? তার পর মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে ধরল। সেই দৃষ্টি ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা চিহ্ন হয়ে গেল—আপনি এসেছেন কেন?

—আমি? এসেছিলাম বেরিয়ে যাব বলে। বেরোনো হয়নি। চোদ্দ বছর ধরে এখানে আছি। অন্ধকূপ। গিরিগুহার মত। ঢোকবার চিহ্ন আছে, বেরোবার চিহ্ন নেই। অন্ধকূপ হত্যা। চলে যান—চলে যান—

ভদ্রলোক খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলে গেলেন। খানিকটা গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। এক মুহূর্ত ভাবলেন। আবার ফিরে এসে কানে কানে ফিস ফিস করে বললেন, মাইনে কত ঠিক হল?

—আজ্ঞে।

—বলি মাইনে কত ঠিক হল?

অধীর কি যেন বলতে গেল, ভদ্রলোক লাফিয়ে উঠলেন: ঠিক আছে, আর বলতে হবে না। আমি জানি। চোদ্দ বছর অফিসে আছি কত ইনক্রিমেন্ট হয়েছে জানেন? আট টাকা গো আট টাকা। চলে যান—চলে যান—

ভদ্রলোক যন যন খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলে গেলেন। কিছু দূর গিয়ে আবার থামলেন। কি যেন ভাবলেন। নাঃ—চলেই গেলেন। অধীরের খুব হাসি পেল। অফিসের পূর্ব মর্যাদা রেখে যথাসম্ভব হাসল।

অধীরের ঘাড় ব্যথা হয়ে গেল। মেরুদণ্ড টন টন করতে লাগল। সেই সকাল নটা থেকে একভাবে বসে আছে। তাড়া তাড়া কাজ আসছে। টাইপ রাইটারের একঘেয়ে খট খট আওয়াজ। আঙুলের মাথাগুলি কি রকম জ্বালা করছে। ঘরের কথা মনে পড়েছে। অফিসটা বড় অন্ধকার। বড় নোংরা। মাকড়সা জাল তৈরী করছে। জানালা দিয়ে এক টুকরো শীতের রোদ পায়ে এসে পড়ছে। মিষ্টি লাগছে। জানালার ওপারে নীল আকাশ। অনেক দূরে একটা গীর্জা দেখা যাচ্ছে। গীর্জার মাথায় ঘুঘুরের কাক।

—কি দাদা, প্রথম দিনেই অত কাজ!

অধীর চোখ তুলে তাকাল। একটি মিষ্টি চেহারার ছেলে ওর দিকে ঝুঁকে আছে। অধীর হাসল।

—রেখে দিন এবার, অনেক কাজ করেছেন।

—অনেক কাজ আসছে যে?

—তা আসবে। তিন জনের জায়গায় একজন রাখলে কাজ আসবে বৈকি। আপনিও মনো মনো করে সেরে নেবেন।

অধীর হাসল।

—আপনার তো কোয়ালিফিকেসন আছে, তা এখানে ঘুরতে এলেন কেন?

অধীর চমকে উঠল।

—এই দেখুন না, কাগজ এলেই আমরা কর্মখালি দেখি। তিন বছর ধরে দেখছি।

—এখনো হল না?

সুন্দর ছেলেটার মুখও কুয়াশায় হয়ে গেল, না,—হল, না,—

কাকটা উড়ে গেছে। দুপুরের আকাশে বিকেলী রং নামছে। শীত শীত হাওয়া দিচ্ছে। পৃথিবীর দূরিত ভাণ্ডারের দিকে লক্ষ্য রেখে বহু উঁচুতে শকুন উড়ছে। নতুন চাকরী! প্রথম দিন!! অধীর মনে মনে একটু রোমান্স আনবার চেষ্টা করল। সামনের ছাদে একটি কমলা মেয়ে পা' ঘুরে এসে দাঁড়াল। রোদ পোহাবে। জানালার বাইরে একটি সবুজ শাখা তিনটে লাল ফুল করেএনে সন্তর্পণে উঁকি দিচ্ছে। আর বাতাস। রোমান্সের কথা ভাবতে ভাবতে অধীর কেমন আনমনা হয়ে গেল। শকুন গুলি সংখ্যায় বাড়ছে।

পাঁচটার সময় লোহার গেট দিয়ে যখন বেরোয় তখন মনে পড়ল সব শুদ্ধু আজ পাঁচ জন লোক জিজ্ঞাসা করল, এখানে এসেছেন কেন?

এই অফিসে অধীরের চার মাস বয়স বেড়ে গেল। এখনো অনেকে সহানুভূতিতে গলে গিয়ে বলে, আর কিসের দাম্মার আছেন? কোয়ালিফিকেশন আছে, তাই নিয়ে বেরিয়ে পড়ুন। বাইরে যা আছে তাই থাকবে চিরকাল।

আরেকজন বলে, পানের দোকানে কাজ করলেও বছরে দুটো টাকা ইনক্রিমেন্ট হয়।

চার মাসে অধীরের মুখে মাঝে মাঝে কথা ফোটে, বলে, চান্স পেলেই চলে যাবে। আর কটা দিন বাদে।

—আমরাও ওই কথা বলেছি। কটা দিন আর ফুরোয় না। অন্ধকূপ মশাই—এক সময় পিষে মেরে ফেলবে।

অধীরের চোখ দুটো ভয় খেয়ে গেল। এই কথা কয়টির সাঁকো পেরিয়ে এই ঘরে চব্বিশ ঘণ্টা থেকে চলিশে পৌঁছে গেল। রেখাময় মুখ · রেখার পেছনে গোপন দুঃখের ইতিহাস। পাই-ওরিয়া ভদ্রলোকের মতন নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ।

অধীরের মাথা ঘুরে গেল।

চার পাশ ফাঁকা। অধীরের সামনে পার্সোনাল এ্যাসিসটেন্ট।

আপনার ক' মাস হল?

-- চার মাস।

—বেশ বেশ। কাজকর্ম বুঝে নিয়েছেন তো?

অধীর প্রবল বেগে মাথা কাৎ করল।

—ডিরেক্টর মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে আলাপ হয়েছে।

— না।

—চলুন আমার সঙ্গে। মিঃ চৌধুরী আপনাকে ডেকেছেন।

অধীর সঙ্গে সঙ্গে শূন্যে কান পাতল। 'নজরে পড়েছেন' এই কথাগুলি যদি কেউ বাতাসে ছুঁড়ে দেয়, অধীর তা আনন্দের সঙ্গে লুফে নেবে। বৈষ্ণব কবিতায় আছে—কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো -। অধীরের ভয় হল। কিছু ভুল বেরোয়নি তো? এত দিন কাজ করেছে, ভুল ধরা পড়েনি আজ নির্ঘাৎ মিঃ চৌধুরীর নজরে পড়ে গেছে। আজ ফুসিরাঘের ফাঁসি! (হায় ঈশ্বর!) ওরা এত মিথ্যে কথা বলে কেন? একটা যদি অন্ধকূপ হয় তাহলে বেরোবার পথ তো খোলা রয়েছে-ই। কাজে ভাহা ভুল কর তারপর ডিসচার্জ হয়ে চলে যাও। হায়, ওরা কেন যেতে চায় না? হায়। আমি কেন মুক্তি চাই না?

চোখ দুটো অভিভূত হয়ে পড়ে এক মুহূর্তে। এমন ঝকঝকে মেঝে পা দিয়ে নোংরা করতে হচ্ছে হয় না। পৃথিবীর রাঙা রোদ, কমলালেবুর মতন আলো, গোলাপ বনের বাতাস এই ঘরে খেলা করে বেড়ায়।

—আসুন আসুন—পার্সোনাল এ্যাসিসটেন্টের গলায়

মোলায়েম স্বর : এই যে স্যার, আমাদের নতুন টাইপিস্ট।

—অ—মিঃ চৌধুরী তাকালেন। বিশাল চেহারা চার চোখে মিলন হল। অধীর কাঁপছে। পড়ে যাবে নাকি? ঈশ্বর—আমি মুক্তি চাই না—

—বসুন। আপনার নাম?

—শ্রী অধীর চন্দ্র পাল।

—কোথায় থাকেন?

—কলবা।

—অফিস ছুটির পর কোথায় যান, বাড়ি?

—আজ্ঞে হাঁ।

—বাঃ ভেরী গুড্। টিফিন করেছেন?

—কলিং বেল।

অধীর অবাক বিস্ময়ে দেখল বড় বড় দোকানে কাচের আড়ালে যে সব খাবার উঁকি দেয় সেই সব খাবার। হাতের নাগালে। (আহা, আমি নজরে পড়েছি। একে নজরে পড়া বলে)।

আপনি এ কয়দিন আমার ঘরে বসবেন। কিছু কনফিডেন-সিয়াল কাজ আছে। চার মাস হল; নিশ্চয়, আপনার কেস আমি কনসিডার করব।

অধীর দেখতে লাগল, ছুটো বেয়ারা ধরাধরি করে ওর চেয়ার-টেবিল-মেসিন গোলাপবনের বাতাসের মধ্যে, কমলাদেবু রোডের ঘরে আনছে। অধীরের খারাপ লাগল। এই সুন্দর ঘর ছুড়ে বিশ্রী খট খট আওয়াজ উঠবে। মিঃ চৌধুরীর কাজের ব্যাঘাত ঘটবে। আহা, গোলাপজল দেওয়া সন্দেশ! জিভের ওপর লাল-রসের উদ্দাম নৃত্য।

মিঃ চৌধুরীর টেবিল থেকে নিজের টেবিলে এসে বসল। চারপাশ শিশুর কৌতূহল নিয়ে দেখতে লাগল। যেন বিশ্বাস হতে চাইছে না ও এখন এই ঘরে বাস করছে—মিঃ চৌধুরীর খাস কামরায়। একটু পরে পাশের ঘর থেকে পার্সোনাল এ্যাসিসটেন্ট এলেন। অধীরের কাঁধে হাত রাখলেন। যেন কত অন্তরঙ্গ। অধীর মনে মনে ধন্য হল। কানে কানে কিস কিস কথা। 'নজরে পড়ে' অধীর অধৈর্য্য। চেষ্টা করে এলোমেলো কথাগুলির মানে বুঝতে মনোযোগী হল: আমার ওপর সাহেব খুব খুশি। শিগ্‌গীর ইনক্রিমেন্ট হবে। আমি অফিসের কারো সঙ্গে মিশব না। সবাই পাজি। ছুটির পর আমাকে গাড়ি করে বাড়ী পৌঁছে দেওয়া হবে। যে লোকগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে তাঁরা অত্যন্ত বদ। কোম্পানীকে ডুবে তোলবার মতলবে ছিল। তারা চলে গেলে কোম্পানী সুস্থ হবে, সুন্দর হবে। আমি এ সব 'কনফিডেনসিয়াল' কথা কাউকে বলব না—ইত্যাদি ইত্যাদি।

অধীর টাইপ করতে বসল। টাইপ করার কাগজটার ওপর চোখ পড়তেই চমকে উঠল। এ কি! কেন না এতকাল টাইপ রাইটার সামনে রেখে ইংরেজী ভাষাটাকে এই ভাবে ব্যস্ত করেছে—Dear Sir, understanding from a reliable source that a few clerks are to be recruited under your kind disposal··· এবং শেষ করেছে yours faithfully দিয়ে। কিন্তু এটা যেন কিছুতেই ইংরেজী ভাষা নয়। ইংরেজীর ছদ্মবেশে অন্য এক অচেনা ভাষা। আহা, গোলাপ বনের ঘরে এত নিষ্ঠুরতা ছিল! প্রথমে কয়েকটি আজে বাজে কারণ, তারপর whose services are no longer required from the 30th April····· শেষে দশ জনের নাম। গুণে গুণে দশটি বড় কোটা পড়ল। চোখ ঝাপসা। কিছু দেখতে পাচ্ছে না। অভিভূত। অধীরের বুকের বাঁহাতখানা বিশাল সমুদ্র। সমুদ্রের ভিতর পাহাড়। পাহাড়কে বেষ্টন করে আছে এক পাহাড়ী সাপ। সাপের মুখের দিকে ধরে আছে দশজন মানুষ। আরেক দিকে মিঃ চৌধুরী। মিঃ চৌধুরীর কি কিরকম! জবে চক চক করে বিষ বেরোতে লাগল।

দশজন মানুষ অচৈতন্য হয়ে পড়ল। মিঃ চৌধুরীও মূর্চ্ছিত প্রায়। অধীরের সারা বুক বিষে ভর্তি হয়ে গেল। বাতাসের মত বেরোল ঘর থেকে। থামল। কাঁধে হাত। পার্সোনাল এ্যাসিসটেন্ট। ফিস ফিস কথা: খুব সুন্দর টাইপ করেছি। চমৎকার কাজ। আমার কেসটা কনসিডার করবে। আমি যেন সোপন কথা কাউকে না বলি। আমার ভাল আমি কেন বুঝব না? পাগলেও যখন বোঝে।

অধীর আগের ঘরে এল। সেখানে মুখ বুজে কাজ চলছে। শেষ বেলার বাঁকা রোদ ওদের পায়ে পায়ে। টেবিলের তলায়। হায়, ওরা জানে না। অভিশপ্ত দশজনের নাম কেবল অধীরই জানে। ওরা সবাই একবার একবার করে তাকাল। ওদের দৃষ্টিতে কি বিষ আছে? অধীরের গা' বমি বমি করতে লাগল। পুরোনো সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে নামতে বাতাসে শব্দের তরঙ্গ উঠল। অধীর উৎকর্ণ:

—আপনি—আপনি—আপনি—

—না-না, আমি না—আমি না—

—নিশ্চয়ই আপনি।

—আমি না, মিঃ চৌধুরী।

—আপনি তার সাকরেদ। ঘুঘুচাটা।

—আমার কি দোষ!

—একশোবার দোষ। জানেন কত বছর ধরে চাকরী করছি?

—না, জানি না।

—আপনি আমাদের চাকরী খেলেন।

—মিঃ চৌধুরী।

—আপনি—আপনি—

—আমি না—আমি না—

ড্রাইভার ইয়াকুব গাড়িটা বের করে এগিয়ে এসেছিল। অধীর তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে গেটের বাইরে চলে এল। তখন কলকাতার পথে পথে দক্ষিণ সমুদ্রের হাওয়া। রোদের আগুন ঝরে গেছে। শনিবারের সোনালি বিকেল। ভালহৌসি স্কোয়ার, এসপ্লানেড—ছুটির পোষাকে উজ্জ্বল। আহা, অবেলায় দশটি তারা খসে পড়ল! অধীর কার্জন পার্কের সবুজে এসে বসল। মনে মনে দশ জন দুঃখী মানুষের মুখ কল্পনা করল। অধীর ওই দশজনকে চেনে না। সবে অফিসে ঢুকেছে। বিশেষ কারো সঙ্গে পরিচয় হয়নি এখনো। ওই দশ জনকে স্পষ্ট ভাবে না চেনার দরুণ একটু অস্বস্তি বোধ করল অধীর। ফলে, যাকে দেখছে তাকেই দশ জনের একজন মনে হচ্ছে। অদূরে একটা লোক চিনেবাদাম কিনছে, ছেঁড়া জামা, এক মুখ দাড়ি এ নিশ্চয় ই একজন। অধীরের থেকে হাত দশেক দূরে ফুল গাছের ছায়ায় একজন ক্লান্ত মানুষ শুয়ে আছে। এও তাদেরই দলের। অধীর অভিভূত হয়ে গেল। অধীরের চার পাশে দুঃখী মানুষের মিছিল। প্রত্যেকেরই যেন এই মাত্র চাকরী গেল। দশ জন, লক্ষ জন হয়ে স্রোতের ফুলের মত অনির্দিষ্ট ভেসে চলেছে। এক সময় ভয় করতে লাগল অধীরের। এরকম অরক্ষিত জায়গায় একা থাকা ঠিক নয়। ভাবতেই ভয়টা তড়াক করে হৃৎপিণ্ডের ওপর উঠে কাঁপতে শুরু করে দিল। প্রাণের দায়ে অধীর দৌড়তে আরম্ভ করল। লক্ষ মানুষ পাগলা ষাঁড়ের শিং হয়ে পেছনে পেছনে তাড়া করছে। জ্ঞান-শূন্য হল অধীর। ত্রিমটে ট্রাম, দোতালা বাস, গোটা পাঁচেক ফটরের মুখ থেকে অদ্ভুত ভাবে বেঁচে, ট্রাফিক পুলিশের খিস্তি খেয়ে এ পারের ফুটপাথে এসে উঠল। হাঁপাচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে দেখল এখানেও সেই সব দুঃখী মানুষের ভিড়—যাদের একটু আগে চাকরী গেছে। যাদের গায়ে ছেঁড়া জামা—চোখ ভাটার মত। সবাই সন্দেহ-বিষে অধীরকে দেখছে। লাল-নীল-আলো, হোটেল-বার, ইংরেজী বাজনা, সাহেব-মেম—হঠাৎ এসপ্লানেড থেকে সমস্ত বাতাস উধাও হল। শূন্যে শকুনের কান্না তিনবার ধ্বনিত হয়ে থেমে গেল। এতক্ষণ চাপা ফিসফিস—এখন সমুদ্র গর্জন।

এলমার্ডের ভিতরে মহাসমুদ্র ঝাঁপিয়ে পড়ল। অফিসের মাথায় ঢেউ উঠছে। ভেসে যাবে—সব ভেসে যাবে। পুনরায় জ্ঞানহারা হল অধীর। দক্ষিণ দিকে হেঁটতে আরম্ভ করল প্রাণপণ!

রাত্রে প্রচণ্ড দুঃস্বপ্ন দেখল।

ইনক্রিমেন্টের বাড়তি কয়েক খানা নোট পকেটে গুজে অধীর একা ফুলের বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এমন সময় বিকট আওয়াজে পৃথিবীর দক্ষিণ দিকটি ঠিক কোণ কাটিয়ে দশজন মানুষ সামনে উদয় হল। তাদের ছেঁড়া জামা—ছেঁড়া জামার ফাঁক দিয়ে সমুদ্রের ঢেউ এর মত প্রবল পেশী দেখা যাচ্ছে। অধীর ঘিরে গেল।

—আপনি—আপনি—আপনি—

—না-না, আমি না - আমি না—

—নিশ্চয়ই আপনি।

—আমি না, মিঃ চৌধুরী।

—আপনি তার সাকরেদ। খুব চাটা।

—আমার কি দোষ?

—একশো বার দোষ। জানেন কত বছর ধরে চাকরী করছি?

—জানি না।

—আপনি আমাদের চাকরী খেলেন।

—মিঃ চৌধুরী।

—আপনি—আপনি—

—আমি না—আমি না—

—ভেবেরে—

দলটি প্রচণ্ড আঘাত লাগিয়ে পড়ল অধীরের মাথায়। ধারুল উৎকণ্ঠায় চিৎকার করে উঠল। চারদিক অন্ধকার। কলাগাছের বাইরে মশাদের অবিরাম আস্ফালন। বাতাস হীন ঘরে নর্দমার গন্ধ উচ্চকিত। চিৎকারে সবাই ছুটে এসেছে। হঠাৎ খেয়াল হল বুকটা জ্বলে যাচ্ছে। জল চাইল। জল খেতে গিয়ে একটা নদী তৈরী হল। বুক-পেট-দোমকূপের সোড়া বেয়ে এসে বিছানায় বিলীন হল।

সোমবার দিন অফিসে তুমুল কাণ্ড।

গেটের কাছে পুলিশ। বাইরে গিজ গিজ জনতা। চাপা উত্তেজনা। হতাশা। ক্রোধ। আঙুল কামড়ানো। চুল ছেঁড়া।

অধীর কাছে যেতেই পুলিশ গেট ফাঁক করল। সেই ক্লান্ত সিঁড়ি। বিমর্ষ দোতলা। অধীর ধীর পায়ে উঠে এল। কেউ তাকাল না। সবাই মাথা নিচু করে কাজ করছে। লক্ষ্য করল ওর চেয়ার-টেবিল-টাইপরাইটার পুনরায় স্বস্থানে এসে গেছে—খুশি হল। কিন্তু ওরা কেউ কথা বলছে না। ওরা নিঃসঙ্গ। মুখের রং গুলি ফ্যাকাসে। ঘরের বাতাসে মড়কের ভ্যাপসা গাঁতার কাটছে। কোনো কবিতায় পড়া নরকের বর্ণনা মনে পড়ল। অথবা জানালার বাইরে তিনটে লাল ফুল দেখে কসাইখানার কথা। কসাইখানার লাল সিমেন্ট। মাথার ওপর মা কালীর ফটো। পুরনো জবা ফুলের মালা। ধারাল ছুরি। পাঁঠার কিনকি রক্ত। চিৎকার। কসাই এর বীভৎস মুখ। চারপাশে লোভী ভিড়। দুটো উর্দ্ধমুখী কুকুর। মাংস কেনার পর বাড়তি মেটেদির জন্য মিনতি। সারা পৃথিবীটা যেন বিড়ালের মত হুড় হুড় করে কসাইখানার ভিতর ঢুকে গেল।

অধীরের স্নায়ু অবশ হয়ে পড়ল।

তিনটে দিনও বিশ্রাম পেল না।

আবার পার্সোনাল এ্যাসিসটেন্টের আবির্ভাব। মিঃ চৌধুরী ডাকছেন। সেই গোলাপ ঘন সুরভিত ঘর। রসাল খাবারের প্লেট। দুই একটি মিষ্টি কথার শাঁকো। বেয়ারা বাহিত টাইপ রাইটার। পার্সোনাল এ্যাসিসটেন্টের অন্তরঙ্গ ঘর: আরো দশজনকে না তাড়ালে কিছুতেই চলছে না। ব্যাপারটা নিয়ে বড় বেশী মাথা ঘামাচ্ছে। গোপনে সাবোটে-

SHREE HANUMAN FOUNDRIES LTD.

GOVERNMENT AND RAILWAY CONTRACTORS. ENGINEERS, FOUNDERS, STEEL REROLLERS, BUILDERS, STRUCTURAL FABRICATORS.

LIGHT AND HEAVY FERROUS CASTINGS ROLLED LIGHT-SECTIONS AND RAILWAY PERMANENT-WAY MATERIALS.

Associated Concerns :

SHREE BAIDYANATH IRON CO. LTD.
Wagon Builders, Founders, Manufacturers of Pig Iron and Steel Castings, Engineers Goverment and Railway Contractors.

VICTORIA COTTON MILLS LTD.
Manufacturers of Yarn of "Shree Lakshmi" and "Baghpari" Brand, High Class Oils & Oil Cakes.

AGARWALLA PROPERTIES LTD.
Owners of Real Estate.

THE LAKSHMI PRINTING WORKS LTD.
Printers and Publishers—Artistic job a speciality.

Head Office :
AGARWALLA MANSIONS
370, Upper Chitpore Rod,
Calcutta-6.
Phone : 33-6422 (4 line)

Branch Office :
25-H CONNAUGHT CIRCUS
NEW DELHI.
Phone : 40317

মের তাগে আছে। কোম্পানীকে স্বস্থ করতেই হবে। এ সব গোপন কথা কাউকে বলব না—।

মাথা কাৎ করে অধীর টাইপ করতে বসল। টাইপ হয়ে গেলে কাউকে দেখতে দেয় না। হঠাৎ কি ভাবল, ভেবে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে পার্সোনাল এ্যাসিসটেন্ট ঘরে ঢুকলেন। টাইপকরা কাগজটার ওপরে চোখ পড়তেই খেপে উঠলেন। চীৎকার করলেন: বাবুকো বোলাও।

বেয়ারা ঘুরে এসে জানাল, বাবু বাহারমে চলু গিয়া।

মিঃ চৌধুরী এতক্ষণ চুপচাপ বসে ছিলেন। হঠাৎ খেয়াল হল।

—হোয়াট ইজ দ্যাট?

পার্সোনাল এ্যাসিসটেন্ট যেন সম্বিত পেলেন: দেখুন স্যার ছেলেটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। একেবারে পাগল। দশবার বলে বসে শুধু নিজের নামটাই টাইপ করেছে—শ্রীঅধীর চন্দ্র পাল অধীর চন্দ্র পাল……

মিঃ চৌধুরী ঝুঁকে পড়ে কাগজটা দেখলেন। বিস্মিত হলেন এবং পরক্ষণে ঠোঁটের ওপর কিঞ্চিৎ হাসি খেলিয়ে দিলেন: হাউ ফানি!

খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই

গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা	৬·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	৫·০০
ভারত-আত্মার বাণী	৫·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
কর্মবাণী	১·২৫
Soul of India Speaks	5·00

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ. বি. টি.

বিদ্যাসাগর	২·৫০
মানুষের মত মানুষ	·৬২
শিশু রামায়ণ	·৬২
শিশু মহাভারত	·৭৫

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

বাংলার ঋষি	৩·০০
বাংলার মনীষী	১·২৫
বাংলার বিদুষী	২·০০
বীরত্বে বাঙালী	১·৫০
ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৩·০০
রাজর্ষি রামমোহন	১·০০
রবীন্দ্রনাথ	১·০০
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১·২৫
আচার্য জগদীশচন্দ্র	১·৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০

॥ প্রতিটি বই বহুচিত্র শোভিত ॥

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী : : ১৫ কলেজ স্কোয়ার : : কলিকাতা—১২

জাহাজ ভাসছে : শান্তশীল দাশ

জাহাজ ভাসছে, এখনো ভাসছে,
বন্দর আজো পায়নি খুঁজে ;
এমনি ক'রে কি ভাসবে সে চিরকাল ?
কোথা বন্দর ? পুবে ? পশ্চিমে ? দক্ষিণে ? বামে ?
সম্মুখে ? পিছনে ?
নাবিক কোথায় ? কে রয়েছে বসে হাল ?

এলোমেলো চলে, টলমল করে, এই বুঝি ডুবে যায় ;
আবার ক্ষণেক থামে মাঝখানে, এদিক ওদিক চায় :
তীর কি কোথাও নেই, শুধু জল ? ও মাঝি এ কোনখানে
জাহাজ থেমেছে ? ওঠ, ওঠ, এ তাকায় ওর পানে।

আর কত কাল চলবে জাহাজ, ফিরবে না বন্দর ?
এমনি করে কি অথই জলের মাঝে বাঁধা হবে ঘর ?
ঘর নয়, শুধু ক্ষণিকের আস্তানা ?—
কে দেবে জবাব—জবাব যায়নি জানা।

এমনি করেই চলবে জাহাজ, থামবে এমনি করে ;
এমনি করেই হয় তো সে এসে পৌঁছবে বন্দরে।

.....

জানালার গল্প : দীলিপ মিত্র

বিকেল হয়েছিল কখন ;
খেয়াল নেই পাগল ফড়িংয়ের,
নিজের সব কিছুকে উজাড় করে ও আজ মাতাল।
বিকেল গড়িয়ে এল সন্ধে,
তবু কেউ ফিরল না সাড়া।
একতারার গুমগুম মনটা জুড়ে নিয়ে
কখন ও কাঁদল নিজেই জানে না।
সূর্যের আলোর সঙ্গে কথাও শেষ,
জানালাটা বন্ধ।
অথচ এই জানালার জন্যই
একদিন সবাই বলেছিল, আঃ কি সুন্দর !
অন্ধকার ঘরে বসে আমরা সবাই
পরস্পরকে হাতড়ে বেড়াচ্ছি যখন ;
তখন হঠাৎ জানালাটা কেঁপে উঠল।
এককালের 'আঃ কি সুন্দর !' উপলব্ধি করা
অন্ধ-মানুষগুলো, জানালাটাকে সজোরে
খুলতে চাইছি। জানিনা কখন খুলবে।
এখন এখন একজন কাউকে চাই ;
যে আমাদের বলবে,
'কেন জানালা তো খোলাই রয়েছে
ভাল করে চেয়ে দ্যাখো !'

.....

অ মৃ ত : প্রফুল্লকুমার দত্ত

সমুদ্র মন্থনে দেবাসুর মত :
যা উঠেছে, সবি মহারত্নী-করায়ত্ত।
কে কী পাবে আর পাবে না, এ-নিয়ে দ্বন্দ্ব :
ঈর্ষায় জ্বলে গৃহ-সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য !

স্বেচ্ছাচারী ও অন্ধ অসুর বংশ
অমৃতের ছোঁয়া পেলে তো হবে না ধ্বংস !
চক্রীর তাই কী যে অদ্ভুত কাণ্ড,
মোহিনীর বেশে নিল অমৃতের ভাণ্ড।

অমরত্বের দুরাকাংখায়, গর্বে
দেখেনি তো কেউ, কী লুকিয়ে সেই-পর্বে :
বাসুকির বিষে সমুদ্র নীল-বর্ণ :
পাবেনা রেহাই উত্তম ও অধমর্ণ।

শিবের প্রাঙ্গনে ধরহরি রাধা-কেষ্ট।
ভয় কী ! শিবের বংশজ যোগী শ্রেষ্ঠ,
কবি স্বেচ্ছায় নেবে সব বিষ কণ্ঠে—
সবে সম্বিত ফিরে পাবে এক দণ্ডে।

.....

এ ক টি স নে ট : সুশান্ত ঘোষ

হঠাৎ দাঁড়াবে এসে টাল খেয়ে চিরকাল, বিধ্বস্ত বিমুখ।
নিরস্ত্রিত বারোমাস জানালার ধিলে ভর দিয়ে কিছু শুনি
রক্তচোখে মদমত্ত সংলাপের ঘোরে অশোভন টলে গিয়ে
গলার অদ্ভুত তেজ প্রক্ষালিত করে ফেলে সজ্জিত প্রেমিক
যেন অর্বাচীন দীন হয়ে যেতে পারে সেই গৃহদ্বারে, কোণে।
না, পারে না, কেননা তার জন্ম, সবীস্থপে বেপথু বিলাপ
একতাল পিণ্ডের মতন স্থির, জাগরণে ; দৈবিক সময়ে।
হাতের সম্পূর্ণ বশে গোলাপের কুঁড়ি নয়, কাঁপে তার সাধ।

চালানি মাছের মত ভাপে, জেলে সেদ্ধ হয়ে অনেকে আবেগে
অলম্ভব স্ফীত মুখে দীর্ণ বাসি সুপ্রাচীন খবর কাগজ
মন দিয়ে পড়ে যেতে পারে দশবার, বাজারে অসংখ্য কাজ
যোগবলে শ্বাসরুদ্ধ করে রেখে পাতা ফুল নরকের মোহে
ভেসে যেতে তারো তবু দ্বিধা হয় অকস্মাৎ অলীক বাসনে।
যেরূপও বাঁকা হয়ে থাকে তারো ভিড়ে, গোলাপ বাগানে আমরণে।

.....

প্র হে লি কা : মসউদ আর-রহমন

ভালো সে বেসেই ছিল আর সব নারীদের মতো
এই বাটি এ পৃথিবী হেথাকার হাটের পসরা,
আমার সময় থেকে ঝরে পড়া কথা-ফুল যত,
প্রতিটি কাজের পাশে সমুজ্জ্বল রঙের ইশারা।

আজ যদি ভেঙে ফ্যালে সে তার গোপন ভালোবাসা,
এখানে ফাঁকির ভিত মনে বুঝে ফিরে যায় যদি,
যে-ঘর সে বেঁধেছিল তাতে সে আগুন দিয়ে আশা
স্বপ্ন সাধ ছিঁড়ে ফ্যালে, রুদ্ধ করে প্রয়াসের নদী,

তা হলে জানব আমি সে আমায় চিনেও চেনেনি।
আমার কবিতা ছিল, অস্থিরতা ভালোলাগা ছিল
তার তরে। তবু কিছু সেই সাদা বোধেতে আসেনি,
কেন না ধোঁয়াকে নিয়ে এ প্রবৃত্তি বদ্ধ রয়েছিল।

এবার সে ধোঁয়া যদি বাতাসে উড়িয়ে দিতে পারি,
সহজ আলোকে এসে ধরা দিই স্পষ্ট করে তাকে,
তা হলে কিরবে সে কি ?—সব ব্যথা ধুয়ে সেই নারী
নতুন আশায় নেয়ে ভালোবেসে নেবে কি আমাকে ?

.....

রূ পা ন্ত র : পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

চিরন্তন তিমিরের পরমাণু আরাধনা করে
একান্ত প্রার্থনা তার : 'আমি হব সূর্য-পরমাণু,
আমি হ'ব কৈলাস—তুঙ্গতম শুভ্রতা-শিখরে
ধ্যানময় আমি হব মৃত্যুঞ্জয়ী, চন্দ্রভাল-স্বামু !'....

সীমাহীন কৃষ্ণতার বিষধরী ফণায় মিনতি :
'আমায় বিদ্যুৎ করো যে-বিদ্যুৎ নেভে না কখনো',
আমায় সমুদ্র করো যে-সমুদ্র সূর্য-গর্ভবতী,
আমায় অগ্নিতি করো', হে অগ্নিতা এ-আকৃতি শোনো।'....

সৃষ্টীভেদ্য মহানিশা বিদ্ধ করে হাসে নীহারিকা,
হাসে গ্রহনক্ষত্র-দ্বীপপুঞ্জ সূক্ষ্ম-জলধিতে,
দিক থেকে দিগন্তরে ছুটে যায় বিজলী-বটিকা,
স্বর্গে স্বর্গে তিমিরের হোমশিখা জ্বলে আচম্বিতে।

পঙ্কজ-শিকড়ে ফোটে পঙ্কহীন আলোর কমল,
নাগলোকে সূর্য ফোটে, জলেরও উপরে হাসে জল।

.....

আন্তর্জাতিকতাবাদ : একটি উজ্জ্বল স্বাক্ষর

অশোক মুখার্জি

"My country is the world and my religion is to do good"

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন একদা বলেছিলেন "where liberty is there is my country" ; অষ্টাদশ শতকের ইংরাজ চিন্তানায়ক (১৭৩১-১৮০৯) টম্‌পেন্‌ বিপরীতভাবে ঐ একই কথা বলতে চেয়েছিলেন "Where is not liberty, there mine"। পেন্‌ এর এই বিচ্ছিন্ন মন্তব্যটির মধ্যে আমাদের কালের আন্তর্জাতিকতাবাদী মনোভাবের প্রায় প্রথম প্রকাশ লক্ষ্য করি। মুখ্যতঃ স্বাধীনতার নির্ভীক ও সমর্পিত প্রাণ যোদ্ধা হিসাবে টম্‌ পেন্‌ মানব কল্যাণে ব্রতী হয়েছিলেন। একদা পেন্‌ নিজেই বলেছিলেন "The cause of liberty is in a great measure the cause of all mankind"। হয়ত ইতিহাসের অমোঘ নির্দেশে পেনকে একটু পেশাদারী অর্থে, আন্তর্জাতিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে তিনি ছিলেন যথার্থ বিশ্বনাগরিক। জাতিতে ইংরাজ হয়েও পেন আমেরিকা ও ফ্রান্সের নাগরিকত্ব অর্জন করেছিলেন এবং স্বাধীন পোলাণ্ডের নাগরিক হওয়ার ইচ্ছাও একদা প্রকাশ করেছিলেন। আমেরিকার উপনিবেশগুলিতে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের ভূমিকা সম্বন্ধে তিনি এই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে She has made war like an Indian against the religion of humanity." a "religion of humanity" বাক্যাংশটির প্রয়োগ বোধহয় পেনই প্রথম করেন। (বস্তুতঃ) তাঁর অল্পবিস্তর সমগ্র রচনাকেই অমূল্য মানবিক দলিল বলা যায়। কুশাসন, কুসংস্কার এবং দারিদ্র্য এই তিনটিকে তিনি কখনই বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখতে পারেননি। সহজাত একটি বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে পেন্‌ সামাজিক সমস্যার ব্যাপক বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। দার্শনিকতা এবং কর্মপ্রাণতার একটি বিচিত্র রূপ পেন্‌ এর যে কোনও জীবনীকারকেই নিঃসন্দেহে বিস্মিত করবে। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে পৃথিবীর তিনটি প্রধান বিপ্লবের সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েন। হয়ত এই কারণে যে স্বাধীনতার যুদ্ধে তিনি ছিলেন একজন স্বয়ং নিযুক্ত সৈনিক। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই স্বেচ্ছাব্রত ভূমিকার জন্য পেনকে যথেষ্ট মূল্য দিতে হয়েছিল। তথাপি নিছক স্বাধীন চিন্তার খাতিরে তিনি অকপট ভাবে সব কিছু ব্যক্ত করেছিলেন যদিও ঠিক এই কারণেই তিনি উক্ত কালের কাছে একটি অভিসন্ধি মূলক রাজনৈতিক প্রচার কার্যের আদি শহীদ হিসাবে পরিচিত হয়ে রইলেন। সত্যিকথা বলতে কি, আড বিপ্লবী না হয়ে পেন্‌ এর কোনও উপায় ছিল না।

অষ্টাদশ শতকের মানবিকতাবাদ,—যুক্তিবাদ—এবং উদারনৈতিকতাবাদ পেন্‌ এর মধ্যে আশ্চর্য্যভাবে সমন্বিত হয়েছিল। এই অর্থে তাঁকে একজন আদর্শ যুগসন্তান বলা যায়। নিজের কালের পুঞ্জীভূত রাজনৈতিক ভাবাবেগকে একটা তাত্ত্বিক রূপ দেওয়াতেই তাঁর অসাধারণত্ব। প্রকৃত প্রস্তাবে একটা তাৎকালা পেনের গ্রন্থাদিতে সর্বত্র বিদ্যমান। প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার ঈপ্সা, উভয়েই পেন্‌ যে সমভাবে বিশ্বাসী ছিলেন তাঁর যুক্তিধর্মী রচনারাজিতে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ মেলে। মানসিক উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে তিনি রুশো, লক্‌ এবং এবো রেনালের নিকট প্রভূত ঋণী।

মানবিক অধিকারের অবিভাজ্যতা এবং স্বাভাবিকতা পেন্ এর আন্তর্জাতিক বিশ্বাসের কেন্দ্রবিন্দু ছিল। যে বিপ্লবনীতার দ্বারা পেন উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন তার অনেকটাই যুগোচিত ছিল। কেননা অষ্টাদশ শতকের প্রায় কয়েকজন চিন্তানায়কের মত পেন-এর চরম আনুগত্য ছিল স্থিতি মানবতার প্রতি। রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বিষয়ে পেন্ এর যত বিক্ষিপ্ত মন্তব্যগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, আসলে একটি ব্যাপক মানবিকতাবাদী দর্শনেরই অঙ্গীভূত। মানুষের চরম সার্থকতা সম্বন্ধে অষ্টাদশ শতকের আশাবাদ ও বুদ্ধিগ্রাহ্য দৃষ্টিভঙ্গী ছিল পেন্এর বিশ্ব ইতিহাস দর্শনের স্তম্ভ স্বরূপ। মানুষের গণতান্ত্রিক সৌভ্রাত্রের দিক থেকেই বিভিন্ন দেশ এবং জাতির স্বার্থের একটি অচ্ছেদ্য যোগ তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন। আন্তর্রাষ্ট্রীক সংঘর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে পেন্ মূলতঃ স্বাধীনতার প্রশ্নটির পুনরালোচনা করেছিলেন শুধু বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে। নিছক জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর বাইরে যে তিনি অনেককিছু দেখেছিলেন তার কারণ এই যে জীবনের প্রারম্ভে তিনি 'নিউটোনিয়' বিজ্ঞানের একজন মনোযোগী ছাত্র ছিলেন। পেন এর বিজ্ঞানমুখীনতার প্রমাণ বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলীন প্রদত্ত প্রশংসাপত্রের মধ্যেও পাই। যুগ-সুলভ যুক্তিবাদ এবং Quaker সুলভ শান্তিপ্রিয়তার দরুণ কোন প্রকারের সামাজিক বিকৃতিকেই পেন্ ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখতে পারেন নি। স্পষ্টতঃ বিশেষ কোনও ভূখণ্ড, জাতি, ধর্ম বা দলের প্রতি তাঁর কোনও বাহ্যিক আনুগত্য ছিল না। চিন্তা বা রাজনৈতিক আনুগত্য, কোনো ক্ষেত্রেই পেনকে বাস্তবিক কোন বিশেষ শ্রেণীভুক্ত করা যায় না। স্বীয় প্রকৃতি ও স্বভাবের দরুণ—তিনি একটি আশ্চর্য সংবেদনশীল মনের অধিকারী ছিলেন পেন্ অপরের দুঃখ কখনই সহ্য করতে পারতেন না। জীবনে বহুবৃত্তি আশ্রয় করে তিনি জীবিকার্জন করেছিলেন; এবং সমাজের নানা শ্রেণীর নানা মতের মানুষের সংস্পর্শে আসার ফলে মানুষের সম্বন্ধে তাঁর একটা গভীর সহানুভূতি গড়ে উঠেছিল। এটা হয়ত আরো এই কারণে যে, তিনি স্বল্পবিত্ত ছিলেন এবং ব্যক্তি গত জীবনের ঘাতপ্রতিঘাতে বেশ কিছুটা বিড়ম্বিত হয়েছিলেন। পেন্ অনেকটা স্ব-শিক্ষিত ছিলেন। ফলে মানবিক সমস্যার আলোচনায় যথাযথ তিনি মোটামুটি একটি খোলা মনের পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। নীতির ক্ষেত্রে, তা ধর্মীয় বা রাজনৈতিক যাই হোক্ না কেন, পেন্ একেবারেই আপোষ ধর্মিতার প্রশ্রয় দেন নি। তাঁর প্রসিদ্ধ পুস্তক 'Rights of Man' কে বাজেয়াপ্ত করার মূল্য স্বরূপ ইংরেজ সরকার চারহাজার পাউণ্ড পর্য্যন্ত তাঁকে দিতে চেয়েছিল এবং পেন তা সর্বতোভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। সত্য এবং ন্যায়ের স্বপক্ষে একথা তিনি যা বলেছিলেন তা আজও প্রণিধান যোগ্য "The right will always become the popular if it has the courage to show itself and the shortest way is always the straight line." তাঁর Rights of Man, (১৭৯১) যা পরে বিপ্লববাদী corresponding society-র কর্তব্য হিসাবে গৃহীত হয়, পুস্তকে পেন্ নিজেকে অভিহিত করেন এমন একজন মানুষ হিসাবে যিনি "considers the world as his home and the good of it in all places as his object পেন্এর ধর্মীয় মতবাদ তাঁর বিশাল ও গভীর মানবিকতাবাদেই বিলীন হয়েছিল। তাঁর the Age of Reason (১৭৯৪) মূলতঃ সামাজিক কুসংস্কার এবং কুশাসনের বিরুদ্ধেই চরম প্রতিবাদ। আমেরিকায় সংবাদ পত্রসেবী হিসাবে তিনি দাসপ্রথা, নারীদের অবনত অবস্থা, চিন্তা ও প্রকাশের অবরোধ প্রভৃতি অস্বাভাবিক রীতি নীতির বিরুদ্ধে স্বতঃসিদ্ধভাবেই বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এমন কি আমেরিকার সাম্রাজ্যবিরোধী আন্দোলনকে তিনি বস্তুতঃ মানুষের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন হিসাবে স্বাগত জানিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন "The cause of America is in a great measure the cause of all mankind" মানুষের স্বাধীনতা ও

চিন্তার পরিধি বিস্তারেই পেন আজীবন মনোযোগী হয়েছিলেন। একান্তভাবে মানুষ সম্বন্ধে পেন্ এর ধারণা তাঁর সমাজ-দর্শনের মূলসূত্র এটা তাঁর মনোযোগী পাঠকমাত্রেই স্বীকার করবেন। Sophists-দের মত তিনিও মনে করতেন যে Nature had made no slaves" দেশ থেকে দেশান্তরে রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের আদর্শ প্রচার ক্রমে পেন্ মানুষ ও মনুষ্যসৃষ্ট যন্ত্র-সরকারের মধ্যে, অন্যকথায় কৃত্রিম কর্তৃত্ব-সমর্থনাক্রান্ত সরকার ব্যবস্থা এবং সভ্যতার মধ্যে, ভেদ কল্পনা করেছেন। তিনি নির্বিশেষে সাধারণ মানুষ সম্বন্ধে দ্বিধাহীন ভাবে বলেছেন "Man is every where the same, drawn towards his fellow-men"। তাঁর কোনও বিরূপ সমালোচক একদা পেন্ কে "A great commoner of mankind" এই আখ্যা দিয়েছিলেন। কথাটি একাধিক অর্থে সত্য, কেননা নিতান্ত সাধারণ মানুষের প্রতীক এবং প্রতিনিধি হিসাবে পেন্ সারাজীবন বিশ্বের রাষ্ট্র গুলির মধ্যে একটি বেসরকারী দূতের কাজ করেছেন। বিস্তৃত বিজ্ঞানচর্চার ফলে পেন্ এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে সুশাসনের নীতির সঙ্গে সাধারণ মানুষের পরিচিতি নিতান্তই আবশ্যক। কেননা কৃত্রিম শাসনব্যবস্থাই সহজ মানবিক সম্পর্ককে তিক্ত করে। আশাবাদী পেন্ যে উন্নততর বিশ্বের কল্পনা করেছিলেন তার মূলে ছিল তাঁর উদারনৈতিক শিক্ষা, মুক্ত চিন্তা ও ঈশ্বরে সভীর বিশ্বাস। গণতান্ত্রিকতার গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন সেবক হিসাবে পেন্ মানব সম্প্রদায়ের সামাজিক নিরাপত্তা আনতে চেয়েছিলেন প্রাথমিক ভাবে মৃত্যুদণ্ড ও আর্থিক বৈকল্য রহিত করে। করপ্রথাকে জনকল্যাণের অনুবর্তী করার ব্যাপারে তিনি সমভাবে আগ্রহী ছিলেন। আজও এ অর্থে পেন্ একজন জীবিত লেখক। একটি ঐক্যবদ্ধ সুখী শান্তিপ্রিয় মানবসমাজের চিত্র তাঁর লেখায় নির্ভুল ভাবে ফুটে ওঠে যা নিছক অষ্টাদশ শতকীয় দুনিয়ার চিত্র নয়। ইংরাজ কবি শেলী মানবিকতাবাদের ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে টম্‌পেনের গ্রন্থাদি থেকে উদ্ধৃতি সংগ্রহে ব্রতী হয়েছিলেন ইতিহাসে এ জাতীয় প্রমাণও পাওয়া যায়। নিশ্চয় শেলী ভুল করেন নি!

অষ্টাদশশতাব্দীয় মানবিকতাবাদপুষ্ট পেনের চিন্তা-ভাবনায় ব্যক্তিমানুষ একটি নিজস্ব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমেরিকার বিপ্লব পেনের দৃষ্টিতে স্বাধীনতা-প্রেমিক ও মানব-প্রেমিক মাত্রেরই আলোচ্য। ফরাসী-বিপ্লবকে তিনি অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছিলেন, কেননা এটি ছিল "generated in the national contemplation of the rights of Man"। স্বাধীনতার স্বীকৃতি ও বিস্তারের মধ্য দিয়েই মানবসম্প্রদায়ের প্রকৃত কল্যাণসাধন করা যায়, এটাই পেনের আন্তর্জাতিকতার মূল কথা। এখানে তাঁর রচনা থেকে বিশ্লেষণ বোধে একটি উক্তি উদ্ধার করা যেতে পারে—"I have no interest, distinct from that which has a tendency to ameliorate the situation of mankind" (Conway—Writings of Paine, vol 3, p 284)। টমাস পেনের মতে যে দাক্ষিণ্য ঐশ্বরিক, তা মানুষমাত্রেরই অনুকরণীয়। এবং মানুষের প্রতি ব্যবহারে সর্ববিধ নিষ্ঠুরতাবর্জন, তা যুদ্ধ বা স্বৈরাচার বা আর্থিক নিপীড়ন যাই হোক না কেন, করেই আমরা এ দাক্ষিণ্যের প্রশ্রয় দিতে পারি। আন্তর্জাতিকতার কার্যকরী ভিত্তি বোধ হয় মানুষের স্বাভাবিক স্বার্থবোধের সঙ্গে প্রয়োজন য একটু পরার্থপরতার মিশ্রণে,—সামাজিক সহানুভূতায়। সাধারণ মানুষের সম্বন্ধে তাঁর সমসাময়িক যার্কের অবজ্ঞা ও হতশ্রদ্ধা পেনকে যথেষ্ট পীড়া দিয়েছিল। এই বিষয়ে তিনি অন্যত্র বলেছেন—"man, were he not corrupted by governments, is naturally the friend of man and....human nature is not of itself vicious." এই সারগর্ভ বক্তব্যটির মধ্যে আমরা অষ্টাদশশতকীয় আশা-বাদেরই প্রতিধ্বনি শুনি। বাস্তবিক পক্ষে শ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে

পারস্পরিক সংঘর্ষে মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই অক্ষম। বিশ্বের কোথাও একটা সুগুপ্ত সংহতি আছে যা শুধু আবিষ্কার নয়, উপলব্ধির বস্তু। ইউরোপীয় নবজাগরণনীতি ও বিজ্ঞানের কাছে পেন এই শিক্ষাই পেয়েছিলেন। মনুষ্যত্বের চরম জয়লাভের এই আস্থা-স্থাপন করতে পেন পেরেছিলেন, প্রধানতঃ আমেরিকায় ফ্রাঙ্কলিন, ইংলণ্ডে গডউইন, এবং ফ্রান্সে কনডরসেটের সংস্পর্শে এসে। বিখ্যাত চিন্তানায়ক ভল্টেয়ারের মতো, তিনি তৎকালীন প্রতিক্রিয়াশীলদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেছিলেন,—"to break the chains of political superstition and raise the degraded man to his proper rank—if these things are libellious, let me have the life of a libeller." অপমানিত মানবাত্মার স্বপক্ষে পেনের এই স্পষ্টোক্তি, একালের রঁলা ও রবীন্দ্রনাথে গভীরতর তাৎপর্য লাভ করেছে।

ন্যায়বিচার ও মানবিক ঐক্য ছিল টমাস পেনের আন্তর্জাতিকতাবাদের ভিত্তিভূমি। জাতীয় জীবনে ন্যায়-বিচারের ভূমিকার কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন—"the true greatness of a nation is founded on principles of justice."- ঐকথারই পুনরাবৃত্তি করে অন্যত্র বলেছেন—"Those who cannot respect justice cannot love their own country even." এই ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য সব দেশের মানুষ নতি-স্বীকার করবে পরিশুদ্ধ যুক্তি বিদ্যমানবত্তা ও জাতীয় স্বার্থের কাছে। প্রকৃত প্রস্তাবে আন্তর্জাতিকতার দার্শনিক দিকটির সঙ্গে সঙ্গে, পেন প্রত্যক্ষ দিকটির উপরেও জোর দিয়েছিলেন। তাঁর Rights of Man Vol II (১৭৯২)র একটি পরিচ্ছেদের শিরোনামা হচ্ছে "combining principle with practice"। শিরোনামাটি তাৎপর্যপূর্ণ। আসলে বাস্তব ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদের মাধ্যমে আন্তর্জাতিকতায় উত্তীর্ণ হওয়া পেনের লক্ষ্য ছিল এবং ম্যাৎসিনি ও রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী কালে এবিষয় অভিমতই পোষণ করেছিলেন। তাঁর গভীর বিশ্বাস ছিল যে—"Americans should exhibit on the theatre of the universe a character hitherto unknown" জাতীয় চরিত্রগঠনের মধ্য দিয়ে এই মানব-সেবাই পেন করতে চেয়েছিলেন। আমেরিকায় ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদকে নিশ্চিহ্ন করতে চেয়ে তিনি আসল একটি জাতীয়চরিত্র তৈরী করার কথা ভেবেছিলেন। ১৭৭৩ সালের অক্টোবর মাসে Committee of Continental Congress এর কাছে পেন একটি উল্লেখযোগ্য উক্তি করেন। সেটা হচ্ছে এই, "but as I have contributed in some degree to erect a new empire in the world, founded on better principles than those of the old—" ১৮০৪ সালের জানুয়ারী মাসে পেন জেফারসনকে যথার্থ সত্যদ্রষ্টার মতো লেখেন—"The United States is now the parent of the world"। আমেরিকার ভবিষ্যৎ বৈদেশিক নীতির ক্ষীণ আভাস এই সামান্য কথাটির মধ্যে আমরা পাই। সেই চরম বৈদেশিক নীতির সূচনা মনরো নীতির বর্জনে। আমেরিকার বাণিজ্যিক স্বার্থের খাতিরে পেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ক্যানাডা ও বারমুডাকের অনুমোদন করেছিলেন। ঐ একই কারণে তিনি সময় বিশেষে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সঙ্গে সাময়িকভাবে বাণিজ্য বর্জন এবং একটি অর্থনৈতিক সংসদ-গঠনের কথাও পেন কল্পনা করেছিলেন। পেনের মধ্যে প্রগতিমূলক আন্তর্জাতি-কতাবাদের সঙ্গে একটি বাস্তব দৃষ্টি সম্পন্ন জাতীয়তাবাদী মনের পরিচয়ও মেলে। আমেরিকা ও ফ্রান্সের ঘনিষ্টতর কূটনৈতিক সম্পর্কের কথা পেন বলেন, নিছক স্বার্থে ভোমিনগোর ভবিষ্যৎ চিন্তা করে।

পেনের মত ঘোর আদর্শবাদী ব্যক্তি আন্তরাষ্ট্রিক কূটনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে অভিনব এবং নিজস্ব যে কয়েকটি পরামর্শ দিয়েছিলেন তা বর্তমান আমাদের কাছে একাধিক

কারণে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বিশ্ব-রাজনীতির ক্ষেত্রে পেনের এই ভূমিকা ইতিহাস-নির্দিষ্ট এবং মূলতঃ অবস্থানুগ বাস্তব-বুদ্ধি প্রসূত বলে ধরে নেওয়া যায়। তাঁর Rights of Man পুস্তকের অন্তর্গত "ways and means of improving the conditions of Europe" শীর্ষক পরিচ্ছদটি বহু মূল্যবান ঐতিহাসিক ভাবনায় সমৃদ্ধ। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা ও হল্যাণ্ডের মধ্যে প্রধানতঃ যুদ্ধের বিরুদ্ধে একটি চুক্তিসম্পাদন করার এবং একটি শান্তিপ্রিয় ইউরোপীয় উপ-যুক্তরাষ্ট্র গঠনের কথা পেন সময়োচিত ভাবেই উচ্চারণ করেছিলেন। উপরন্তু ইউরোপে নূতন যুদ্ধ জাহাজ সৃষ্টির বিরুদ্ধে এবং আংশিক অস্ত্রসংকোচনের স্বপক্ষে তিনি দৃঢ় মত প্রকাশ করেন। ১৭৯৮ সালে পেন Talleyrand এর নিকট নৌবাহিনী সম্পর্কীয় ইউরোপীয় একটি চুক্তির খসড়াও পেশ করেন। আরও উল্লেখযোগ্য এই যে নেপোলিয়ান বোনাপার্টকে তিনি ইংলণ্ড আক্রমণের জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন। Forsters' Letter নামক পত্রে পেন ইংলণ্ডের রাজতন্ত্রকে ইউরোপের শান্তি ও সাধারণতন্ত্রের পরিপন্থী বলে মনে করেছিলেন। আধুনিক রাজনৈতিক ও আকলিকতাবাদের কিছুটা পূর্বাভাস যে পেনের এ-জাতীয় মতামত ও ইঙ্গিতে পাওয়া যায়, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এটা স্মরণ রাখা বিশেষ প্রয়োজন যে, জাতীয়তাবাদী হিসাবেও পেন একটি বৃহৎ দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণে সর্বদা পক্ষপাতী ছিলেন। American Crisis নামক পুস্তিকায় পেন্ মন্তব্য করেছেন "My principle is universal. My attachment is to all the world and not to any particular part" *

প্রকারান্তরে ঐ কথাই অন্য একস্থানে তিনি বলেছেন—"It is pleasant to observe by what regular gradations we surmount the force of local prejudice as we enlarge our acquaintance with the world." বস্তুতঃ অধিকতর আন্তর্জাতিক সম্প্রীতির জন্য পেন আরও যা অনুমোদন করেছিলেন তা হচ্ছে একটি মহাদেশীয় সনদ, ভবিষ্যৎ বিশ্ব-সরকারের জন্য একটি সাধারণতন্ত্রী সংবিধান এবং একটি বিশ্বমানবিক একক ভাষা সৃষ্টি। উইলিয়াম পেন এবং রুশোর মতো পেন ১৮০৪ সালে একটি শান্তিবাণী সংগঠনের কথা ঘোষণা করেন। যুদ্ধ-জনিত ব্যয়বাহুল্য বর্জনের উদ্দেশ্যে পেন বিশ্বের সুখ ও শান্তির জন্য নূতন অঞ্চলগুলিকে বিশ্ব-বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত করে দেবার প্রস্তাব করেন। এটা বর্তমানের অবাধ বাণিজ্য ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। সত্য কথা বলতে কি পেনের মানবিক সহানুভূতি বর্ণগত ও জাতীয় পরিসীমাকে স্বচ্ছন্দে অতিক্রম করেছিল। "Declaration of the friends of universal peace and liberty" তে পেন মানবিক অধিকারের ঘোষণা সম্বলিত একটি সংবিধান রচনা করার কথা এই কারণে বলেন যে—"The end of all political associations is the preservation of the natural and imperceptible thought of man"

পেনের খণ্ডবিক্ষিপ্ত উক্তিগুলি একত্র সন্নিবদ্ধ করলে, আজকের স্বৈরাচার-বিরোধী শান্তিপ্রয়াসী নাগরিকমাত্রেই নিঃসন্দেহে একটি নূতন জগতের সন্ধান পাবেন। ভাবীকালের কাছে পেন একটি বিশ্বমানবিক বিবেকবোধের জন্মদাতা হিসাবেই সবিশেষ পরিচিত হবেন। এর মধ্যে বুদ্ধিগ্রাহ্য জাতীয়তাবাদ ও হৃদয়গ্রাহ্য বিশ্বজনীন আদর্শবাদের একটি বিরল সমন্বয় ঘটেছিল। মানুষ হিসাবে ঈশ্বর ও প্রতিবেশীর কাছে আমাদের বিবিধ কর্তব্য পালনে চাই ঐক্য সাম্য ও সৌভ্রাত্র্যের সমন্বয়, এই ছিল তাঁর শিক্ষা। আজকের বিভক্ত পৃথিবীতে পেনের মতামত ও জীবনচর্যা আমাদের নূতন আন্তর্জাতিক ভাবনায় নিশ্চিত উদ্বুদ্ধ করবে, কেন না তিনি ছিলেন একজন সত্যকার "pamphleteer of the human camp."। অষ্টাদশ-শতকীয় পৃথিবীর একজন বিশিষ্ট সাধারণ নাগরিক হিসাবে পেনের এই উক্তিটি তাঁর মতামতের স্বরূপ বিশ্লেষণে অনুরাগী পাঠক মাত্রকেই প্রভূত সহায়তা করবে, 'Man is not the enemy of man but through the medium of a false system of government"

* (H Fast Collected Works of Paine P. 29)

পটভূমি

বীরেন্দ্র নাথ বসু

শেষ পর্যন্ত বিষয়টা ওপর মহলকেও নাড়া দিলো।

জনসাধারণের পক্ষ থেকে একটা জয়েন্ট্ পিটিশন গেলো চীফ্ ইঞ্জিনীয়রের কাছে। তার কপি গেলো বিভাগীয় মন্ত্রীর কাছে। বিশেষ ক'রে মন্ত্রী মহাশয় যখন এই জেলার প্রতিনিধি, তখন বিষয়টা তাঁকেও জানানো দরকার। বিরোধী পক্ষের স্থানীয় এম্ এল্ এ-রা সোৎসাহে প্রকাশ্যে বলে গেছেন যে প্রসঙ্গটা তাঁরা বিধান সভার পরবর্তী অধিবেশনে তুলবেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটও নাকি তাঁর গোপন রিপোর্টে ঘটনাটার তদন্ত করার পক্ষে যুক্তি দেখিয়েছেন। কাজেই রোড কন্ষ্ট্রাকসন বিভাগের কর্তারা ব্যস্ত না হ'য়ে পারেন না।

বড় সরের অর্থাৎ এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারের খাস কামরায় তলব পড়লো ভারপ্রাপ্ত কণ্ট্রাক্টর রামলাল পাণ্ডের। এ দিকে সাব ডিভিসনের অ্যাসিস্টাণ্ট্ ইঞ্জিনীয়ারের ঘরে ওভারসিয়র সিবেশ মিস্ত্রিদের পরামর্শ দ্রুততর হ'চ্ছে।

এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়র মিঃ দাসগুপ্ত এক নাগাড়ে টেনে যাচ্ছিলেন তাঁর চুরুটটাকে। এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে এতো হৈ চৈ করার সংগত কারণটা তিনি ভেবে পাচ্ছিলেন না। তিনি দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করেন ভারতীয়দের স্বাধীনতা দেওয়াটা ইংরেজদের একটা ঐতিহাসিক ভুল। কারণ যে দেশের মানুষ ডিসিপ্লিণ্ড্ ওয়েতে এডিটেন করতে শেখেনি, সে দেশের মানুষ স্বাধীনতা পেলেও তা রক্ষে করতে পারবে না। তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় পৃথিবীর অন্য কোনো সভ্য দেশে এ জিনিস ঘটেনা। অন্ততঃ দশ বছর একনাগাড়ে বিলেতে থেকে এই ধারণাই তাঁর হ'য়েছে।

হাসীকৃত ধোঁয়ার কুণ্ডলী স্তরে স্তরে চেউ খেলে এগিয়ে যাচ্ছিল জানলার দিকে। সমস্ত অফিসটার মধ্যে কেমন একটা বুকচাপা স্তব্ধতা। কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেলেন মিঃ দাসগুপ্ত।

"—স্যার, ডি এম-এর রিপোর্টার—"স্তব্ধতা ভাঙার চেষ্টা করলেন রামলাল পাণ্ডে। টেবিলের ওপর সামান্য একটু ঝুঁকলেন মিঃ দাসগুপ্ত। তারপর তাঁর স্বাভাবিক অমৃচ্ছ কণ্ঠে বললেন, দেখ পাণ্ডে, ডি. এম-এর রিপোর্টকে আমি ভয় পাই না। তার খুঁটির জোর কতোটা তা' আমার অজানা নয়। আমি ভাবছি অন্য কথা। ভাবছি আমাদের গভর্ণমেণ্টের কথা। ভাবছি আমাদের মিনিস্টারদের কথা। কথায় কথায় এরা এনুকোয়ারী করার কথা ভাবে কি ক'রে। অবশ্য এদের-ই বা দোষ কি! দু'দিন সত্যাগ্রহ ক'রে কিম্বা দশ দিন জেল খেটে এরা দেশ শাসনের ভার পেয়েছে। এদের কাছে সে এফিসিয়েন্সি আমার আশা করাই অন্যায়।

মিঃ দাসগুপ্ত আবার চুরুটের প্রতি মনোনিবেশ করলেন। তাঁর ভাবনা-চিন্তার সুতোটায় কোথায় যেন বারে বারে জট পাকিয়ে যাচ্ছে। তিনি কিছুতেই বুঝতে পারছেন না যে, যারা দাসত্ব ছাড়া জীবনে কোনোদিন কলম ধরেনি তাদের জয়েন্ট পিটিশন পেয়ে মন্ত্রীর এতো মাথা ব্যথার কারণ কি! ধীর গতিতে রিভলবিং চেয়ারে অর্ধ-বৃত্তাকারে ঘুরছিলেন মিঃ দাসগুপ্ত। এক সময় বললেন, আচ্ছা পাণ্ডে, তুমি কতোদিন

কণ্টাক্টরি করছো ?

—আজ্ঞে তা' প্রায় তিরিশ বছর হ'তে চললো বৈকি !

—এই তিরিশ বছরে এ রকম কাণ্ড দেখেছো কখনো ?

—আজ্ঞে না স্যার। এতোদিন জানতুম, গভর্ণমেণ্টের এ-টা একটা অরক্যান ডিপার্টমেণ্ট—

—তার মানে ? মিঃ দাসগুপ্ত জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন পাণ্ডের দিকে।

—মানে, এ ডিপার্টমেণ্টের মা-বাপ নেই। দেশ শুদ্ধু লোক জানে পি ডব্লিউ ডি মানে পাব্লিক ওয়েস্টেজ ডিপার্টমেণ্ট···

—এখন থেকে নতুন নতুন মিনিং দেখবে। চিরকাল মানুষ পিটিয়ে যারা গাধা করলো, সেই সব ইডিয়ট মাষ্টাররা যদি মিনিস্টার হয়, তাহলে দেশের—

আধাখানি দেবেন একটা স্লিপ নিয়ে ঘরে ঢোকাতে প্রসংগটা আপাততঃ চাপা পড়লো।

—কে এসেছে দেবেন ?

—নবাবগঞ্জের এস্ ডি ও সাহেব।

—ও ! ভেতরে পাঠিয়ে দাও।

—তোমার আবার কি চক্রবর্তী : দাতাশ মাইল দূর থেকে কি মনে ক'রে ?

—একটু কনফিডেন্সিয়াল ব্যাপার—পাণ্ডের উপস্থিতির প্রতি ইংগীত করলেন মিঃ চক্রবর্তী।

—ডাটস্ অল রাইট, তোমার কি বলার আছে বলো।

—আমার সাব ডিভিসনে যে চার মাইল নতুন রাস্তা হচ্ছে, তার কণ্ট্রাক্ট পেয়েছে পাঞ্জাব ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানী।

—তাতে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হ'য়েছে ?

—আজ্ঞে তা নয়, লোক্যাল ভাল ভাল কণ্ট্রাক্টরও এখানে ছিল।

ডাটস্ নট ইওর লুক আউট। তোমার কি বলার আছে তাই বলো।

—টেণ্ডারে এ ক্লাস ইটের কথা ছিল। এরা তো সি ক্লাস ইট দিয়ে সোলিং করছে।

—হ্যাঁ তাই করবে।

—আজ্ঞে—' মিঃ চক্রবর্তী অবাক হ'য়ে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে থাকেন মিঃ দাসগুপ্তের মুখের দিকে।

হ্যাঁ হ্যাঁ করতে দাও ! বেয়ারাটা যেন একটু উষ্ণ হয়ে ওঠে মিঃ দাসগুপ্তর : বলুনম তো করতে দাও। নতুন চাকরিতে ঢুকেই সাবডিভিসনের চার্জ পেয়েছো। আর তাতেই মাথা ঘুরে গিয়েছে।

—না, তা নয়—

—জানি তুমি কি বলতে চাও। এ-কাজ কোনো বাঙালী পেলে, এবং কোনো কারণে যদি বেআব্রুমেণ্ট নিতে দু দিন দেরি হ'তো তাহলে মন্ত্রীর কাছে তোমার নামে বেনামী চিঠি যেতো। ওরা যেমন তেল দিয়ে কাজ নিতে পারে, তেমনি কাজ থেকে সেই তেল উসুল করে নেবার মতো বুদ্ধিও রাখে।

—তা না হয় হ'লো' চক্রবর্তী সাহেব সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, তারপর এরা যদি রিকব্যাটস্-এর বদলে ঘুরকি দেয়—

—দেবে—অত্যন্ত তাচ্ছিল্যভরা কণ্ঠে জবাব দিলেন মিঃ দাসগুপ্ত, তোমরা কি ভেবেছো দেশটা রাতারাতি বিলেত হয়ে গিয়েছে যে দেশের সর্বত্র একই রকমের মাটি মিলবে। এ দেশের মাটিতে এ ক্লাস ইট হয় না, যা হয়েছে তাই দিয়েই কাজ চালাতে হবে। তুমি নতুন এসেছো, কাজ-কর্ম বোঝনি এখনো। যেখানে কাজ হচ্ছে, সেখানে একজন ঘাগু ওভারসীয়র কে পাঠাও, যারা হাতে কলমে কাজ বোঝে।

—আচ্ছা আমি চলি স্যার। মিঃ চক্রবর্তী আর দাঁড়ালেন না। রামলাল পাণ্ডে একটু আপত্তি বোধ করছিলেন। আসল কথায় না এসে অনেকক্ষণ ধরেই বড় সাহেব তাঁকে কথার পাকে ঘোরাচ্ছিলেন।

আচ্ছা পাণ্ডে তুমি তো এখান-কার লোক্যাল লোক? বড় সায়েব পোড়া চুরুটটাকে ঘষতে লাগলেন য়্যাশ ট্রের ওপর।

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—একটা কাজ করতে হবে তোমাকে। কুসুমপুরের বিশ পঁচিশজন স্থায়ী বাসিন্দাকে আগে থেকে তালিম দিয়ে রাখো। একান্তই যদি এনুকোয়ারী হয় তাহলে তাদের বলতে হবে যে, বিশ-পঁচিশ বছরের মধ্যে এরকম বন্যা তারা দেখেনি। দ্বিজরাজ ডাক্তারের পুকুরের ঘাটটা সিমেন্ট দিয়ে বাঁধিয়ে দাও আর ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট সতীশ সিংঘিকে কায়দা করে বোতল দুয়েক মিসিসি দিও। মোওল কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট তাসিজুদ্দিন শেখের একটা বাছুর পি ডব্লিউ ডির গাড়ীতে ধাক্কা খেয়ে বছর খানেক আগে মরে গিয়েছিল। শেখের হাতে শত খানেক টাকা দিয়ে ব'লো তার ক্ষতির জন্যে টাকাটা আমি তাকে ব্যক্তিগত ভাবে'—

—আর বলতে হবে না স্যার। বাকীটা আমি ম্যানেজ করে নেবো। আমার হাজার সাতেক টাকার একটা বিল পড়ে আছে, এটা আপনি তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিন স্যার। কোলকাতার কর্তারা এসে পড়লে আমার বিল আটকে যাবে।

—তোমার বিলের কোনো ভাবনা নেই। তুমি যাবার সময় একবার-সাব ডিভিসনের অফিসটা ঘুরে যেও।

—আচ্ছা চলি স্যার। রামলাল পাণ্ডে উঠে দাঁড়ালেন।

—যেবেন!

মুখের কথা শেষ হবার আগেই সশরীরে হাজির হয় যেবেন।

—এ স্টেনোটর বক্সীদারকে ডাকো।

—আমায় ডেকেছেন স্যার! সসঙ্কোচে ঘরে ঢুকলেন এ স্টেনোর বক্সীদার।

—হ্যাঁ। কুসুমপুরের ব্রীজের কাজের কালভার্টটা কতো হাজার টাকার কাজ ছিলো?

—পঁয়ষট্টি হাজার সাতশো টাকার।

—বল কি, একটা কালভার্টের—

—মিটার ইটের ভাটা ছিল আগে। সেই সব বড় বড় গর্ত ভর্তি করতে হয়েছে আগে। আর্থ ওয়ার্কের কাজ ছিল অনেক।

—ও। আচ্ছা তুমি এসো। বড় সায়েব একটা নতুন চুরুট ধরালেন।

বিপর্যয় হয়তো কোথাও ঘটে থাকবে। কিন্তু তার জন্যে ডিভিসন অফিসের কোথাও কোনো উদ্বেগের চিহ্ন নেই। সাতটা সাবডিভিসনের কাজ পুরোদমে চলছে। ডিভিসন অফিসের স্টাফ্ নিত্য নতুন কাজের কল্পাটে ব্যতিব্যস্ত। কুসুমপুর সাবডিভিসনের অফিস ঘরটাই কেবল যেন চাপা নিঃশ্বাসের শব্দে ভর্তি হয়ে উঠেছে। ক্রমশঃই ধৈর্য হারিয়ে ফেলছেন ওভারসীয়ার শিবেশ মিত্তির। হেড ক্লার্ক সুনীলবাবু চাপা গলায় বললেন, মিত্তির আজ ক্ষেপে আছে বোধ হয়, কি বলেন দেবীবাবু!

—ক্ষেপা তো উচিত। নদীর ধারে অতো আলকাতরার ড্রাম আর য়্যাঙ্গ্ল্ ছিল আজ দু'দিন ধরে সমানে রাত জেগে কুলিদের সঙ্গে সে গুলো হাইওয়ের ওপর তুলিয়েছে মিত্তির। মাথাটায় ছিট্ আছে তাই চেঁচা-মেচি বা গালমন্দ করে' না হলে দেখেছেন তো, নর্থ বেঙ্গলের এই চড়া রোদের দুপুরে যখন বাঘে গরুতে থাকে না, তখনও মিত্তির পাকা দু'ঘাইল রাস্তায় ভাঙা সাইকেলটা নিয়ে ছুটোছুটি ক'রে বেড়ায়।

দেবীবাবু নিজের কাজে মন দেন।

সুনীলবাবুর অস্বস্তি কাটতে চায় না। কোলকাতার হাওয়া খুব সুবিধের নয়। সত্যিই যদি এনুকোয়ারী হয়—

—আরে শোনেন না মশাই দেবীবাবু। সায়েব নেই এতো কাজ কিসের আপনার?

—আমি তো সাহেবের কাজ করি না, আমি কাজ করি আপনার। আপনি আমার বন্ধু।—মুখ টিপে হাসলেন দেবীবাবু।

—রাখেন বন্ধু মশাই। এদিকে যদি এনকোয়ারী হয় তখনতো জড়াবে সকলকে। বাদ পড়বো না-কি আমরা?

সুনীলবাবুর কথার ভঙ্গীতে হেসে ফেলেন দেবীবাবু। আচ্ছা, সুনীলদা, সত্যি করে বলুন তো ভয় পেয়েছেন আপনি?

—ভয়-ভয়দা কিছুই নেই ভাই। আমাদের নন্দী সায়েবের র‍্যাড্‌মিনিষ্ট্রেশন আর মহম্মদ তোগলকের র‍্যাড্‌মিনিষ্ট্রেশনে কোনো তফাৎ নেই ভাই। তখনই আমার মনে খটকা লেগেছিল। আজ কবছর ধরে পয়েন্ট কাইভ্‌ পার্সেন্ট পেয়েছি। এবারে যখন পাঁচে এক পার্সেন্ট দিলো, তখনই মনে খটকা লেগেছিল। তখনই জানতুম এবার একটা কিছু ঘটবে।

—আপনি সত্যিই ভয় পেয়েছেন সুনীলদা! দেবীবাবু হেসে উঠলেন।

কাব্যতীর্থ পাশ করা পণ্ডিত আপনি, আপনার কোনো স্কুলে কাজ করাই ভালো।

—তা যা বলেছেন। স্কুলের কাজে এ রকম মেন্টাল ট্র্যাংসাইটি ছিল না। এ সেই সাপের ছুঁচো গেলার মতো হয়েছে। না হলে,—

কথার মাঝে শিবেশ মিত্তির ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকলেন।

—এই যে সুনীলবাবু, আপনাদের সায়েব কোথায়?

—সায়েব-ই জানেন।

—বাঃ বেশ নির্বিকার ভাবে কথা বলতে শিখেছেন তো। সায়েবের খবর কেরাণী জানবে না তো জানবে কে?

—কি যে বলেন মিত্তির—

—ঠিকই বলছি। তোমাদের সায়েবের ছেনালী জানতে আর আমার বাকী নেই।

—কি যে বলেন মিত্তির—

বাধা দিয়ে দেবীবাবু বলেন, আরে না-না, আমাদের পিওন পরেশ বললে কাল সায়েবের নামে তিনখানা নীল খামের চিঠি এসেছে। রাত জেগে হয় তো জবাব লিখেছে। তাই ঘুম ভাঙতে দেরী হচ্ছে। তাই বলে সকাল সাড়ে দশটা বেজে গেলো—এস ডি ও সায়েবের ওয়ার্ক-পিওন ঘরে ঢোকাতে কথাটা চাপা পড়লো।

মিত্তির বাবু রেগে ছিলেন এবার ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, তোর সায়েব কোথায় রে জয়কিশোর?

—সাহেবের শরীর খারাপ। ডিনটের পর অফিসে আসবেন বলেছেন।

—তা'তো হ'বেই। ইরিগেশনের সুপারিন্টিণ্ডিণ্ট্‌ ইঞ্জিনীয়র শ্বশুর থাকলে মাগের চিঠি প'ড়ে অনেকেরই শরীর খারাপ হয়। না হলে এই ক্রিটিক্যাল সময়ে—

—আঃ মিত্তির থামেন। সুনীল বাবু একটু ভীতি বিহ্বল কণ্ঠে চাপা দেন কথাটা।

—থামবো কেন? খেঁকিয়ে ওঠেন মিত্তির বাবু। আমি ভয় করি নাকি আপনাদের সায়েবকে। ষোলো বছর ধরে ওভারসীয়ারি করছি, ঢের ঢের বাঘা ইঞ্জিনীয়রকে আমি দেখেছি। আর যাই দোষ থাক, কাজের সময় এরা পরুর মতো কাজ করতো। আপনাদেরও তো বাড়ীতে বৌ-ছেলে-মেয়ে আছে, আপনারাও বাড়ী গিয়ে গোসল করুন। আমি অফিসে তালা লাগিয়ে দিচ্ছি। মনে রাখবেন সুনীল বাবু, যদি এনকোয়ারী হয়, তাহলে এসব কথা আমি আদৌ ভুলবো। শুধু রামলাল পাণ্ডে নয়, তার প্রভুরাও বাদ যাবেনা।

কিন্তু শিবেশ মিত্তিরের অনুমানে একটু ভুল হ'য়েছিলো। স্ত্রীর চিঠির জবাব লিখতে রাত জেগে শরীর খারাপ করার মতো লোক মিঃ নন্দী নন। একথা জানে শুধু জয়কিশোর। গতকাল সন্ধ্যের প্লেনে মিঃ নন্দী কলকাতায় গিয়েছেন। আজ

বারোটার মধ্যেই ফিরে আসার কথা। কাজটা জরুরী এবং গোপনীয়।

তাঁর হঠাৎ আবির্ভাবে মল্লিকা নন্দীও কম অবাক হননি।

—কি ব্যাপার, বলা-কওয়া নেই একেবারে হাজির!

—বলে ক'য়ে আসতে হ'বে এরকম কোনো—

—না না তা বলিনি! স্বামীর পাশে সোফায় এসে বসেন তিনি।

—একটা জরুরি কাজে আসতে হ'লো। এবং কাল সকালের প্লেনেই ফিরে যাবো।

—কাগজে দেখলুম, তোমাদের ওখানে কি একটা নতুন ব্রিজ নাকি ভেঙে গিয়েছে। আর তাই নিয়ে নাকি হৈ-চৈ হচ্ছে খুব?

—শুধু হৈ-চৈ নয় মল্লিকা, একেবারে সর্বনাশ হবার উপক্রম হ'য়েছে। ব্রিজ নয় তবে একটা বড় কালভার্ট এবং সে-টি আমার সাবডিভিসনের মধ্যেই। কলকাতার বড় কর্তারা নাকি এনুকেয়ারী করতে যাবেন; হোম্ ডিপার্টমেন্ট্‌ও পেছনে লাগতে পারে। তাই বলছিলুম—'

মিঃ নন্দী একটু থামলেন, বাড়ীতে কেউ নেই তো?

—না।

—তোমার ভাইদের দিয়ে ইনসুলেশন করিয়ে কোনো রেডিওর দোকান থেকে আমাদের রেডিওর ব্যাটারি এবং নম্বর মিলিয়ে—

—এত ঘুর পথে নাকি ব্যাপারটা?

—কি জানি, কিছুই বলা যাচ্ছেনা।

—আচ্ছা তার জন্যে তোমার ভাবনা নেই।

—তার মানে?

—মানে পাণ্ডে যখন রেডিওটা আনে তখন ক্যাশ মেমো সঙ্গেও এনেছিলো। তোমার নামেই ক্যাশ মেমো।

—তাই নাকি! বাঁচালে। পাণ্ডে সে কথা আমায় বলেনি।

—একথা কেউ কাউকে খুলে বলে নাকি!

—সে যাই হোক্, তোমার গয়নাগুলো ব্যাঙ্কে রেখে কিছু ক্যাশ টাকা ঘরে এনে রেখো। কে যে চুকলি খাবে কিছুই বলা যায় না। কথায় কথায় একদিন হাল্‌কা ভাবে শিবেন-বাবুর কাছে নিউ আলিপুরে বাড়ী করার কথাটা বলে ফেলে-ছিলুম।

—বেশ ক'রেছো। মল্লিকা নন্দী হাসেন শুধু।

—হাসছো যে?

—এমনি। যেন গুরু লোককে বলে বেড়াও।

—না-না ঠিক 'করছি' বলিনি। তোমার বাবা তোমাকে ক'রে দিচ্ছেন, এই রকম কি যেন একটা বলেছিলুম।

—আচ্ছা সে যা হয় করা যাবে খন। এখন জামা কাপড় ছেড়ে চলো বাবার ওখান থেকে ঘুরে আসি। তোমার ভগ্নী তার কলেজ আর ইউনিয়ন নিয়েই ব্যস্ত। বাড়ী ফেরে একেবারে সন্ধ্যে পার ক'রে। কুন্তাকে বাবা নিয়ে গেছে আজ সাত দিন হ'লো। বাড়ী যেন একেবারে ফাঁকা হ'য়ে আছে।

মিঃ নন্দী অবশ্য বারোটার মধ্যে ফিরে এসেছিলেন। এবং সোজা ডিভিসন অফিসে গিয়ে মিঃ দাসগুপ্তর সঙ্গে দেখা ক'রেন।

—কি খবর নন্দী? ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে প্রশ্ন করেন মিঃ দাসগুপ্ত।

—মিসেস দাসগুপ্ত আমার চিঠি পেয়েছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আর বল্লেন, যা লিখেছেন সেই মতোই ব্যবস্থা করবেন।

—ঠিক আছে, তুমি হুগলীপুরে ফিরে যাও। আর ওভারসীয়র পাগলা মিস্তির কে একটু মার্ক ক'রে রেখো।

কন্ট্রাক্টররা বলাবলি করতে লাগলো, এরকম একটা

ঘটনার পরেও নাকি কোনো রকম ভাবান্তর লক্ষ্য করা যায়নি মিঃ দাসগুপ্তর। খাঁটি বিলিতি শিক্ষার গুণে মিঃ দাসগুপ্ত একেবারে আধুনিক মানুষ হ'য়েছেন।

এদিকে ডিভিশন অফিস স্টাফের র‍্যাম্বুয়াল সোস্যাল হতো এগিয়ে আসতে লাগলো অফিসের কাজের গোলমালও ততো বাড়তে লাগলো।

স্টাফেরা নিয়মিত ভাবে অফিস কামাই করতে সুরু ক'রেছে।

এক্সিকিউটর মজুমদার পর পর তিন দিন অফিসে না আসাতে গোলমালটা বড় সাহেবের কানে গিয়েও পৌঁছলো।

—কি ব্যাপার তোমাদের এতো হৈ চৈ কিসের? খাস কামরা থেকে বেরিয়ে বড় সাহেব একেবারে অফিসে এসে হাজির।

—আজ্ঞে, না স্যার, সোস্যালের প্রোগ্রামের কথা হচ্ছিল।

একাউন্টান্ট্ পাকড়াশীবাবু বললেন, সোস্যাল টোস্যাল কিছু নয়। এক্সিকিউটর মজুমদার আজ তিন দিন ধরে অফিসে আসছে না।

—তাই নাকি, কি হ'লো তার?

টাইপিস্ট অনিমেষ বললে, কাটিহারে, রাখাল দাস বাউল এসেছেন। তাকেই আমাদের প্রোগ্রামের জন্যে বুক করতে গেছে।

—প্রোগ্রামের জন্যে কাজ কামাই করতে হ'বে বৈকি! তাই বলে বাউল-গান। ওতোশুনেছি বড় সফিস্টিকেটেড্।

হেড ক্লার্ক শুনেন যারা কোনো এককালে পাখোয়াজ বাজাতেন। তিনি বললেন, বাউল হ'চ্ছে বাংলার নিজস্ব ··

বাধা দিয়ে মিঃ দাসগুপ্ত বললেন, বাংলার নিজস্ব সব কিছুই ঐ রকম। যাক তোমাদের একটা সুখবর দিচ্ছি। তোমাদের এবারের র‍্যাম্বুয়াল ফাংশানে মিসেস দাসগুপ্ত তো থাকছেন-ই, তাঁর সঙ্গে আসছেন তাঁর দুই বোন। সুচরিতা ও সুললিতা সেন। সুচরিতা হিস্ট্রীতে নিয়ে বেনারস থেকে এম-এ পাশ করে কলকাতায় কোন কলেজে যেন পড়াচ্ছে আর সুললিতা ক্যালকাটা য়ুনিভার্সিটিতে পলিটিক্যাল সায়েন্সে এম-এ পড়ছে। শুধু তাই নয়, দুই বোনে নাকি টেগোর সঙ্ গেয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অডিয়েন্সকে মুগ্ধ পাড়িয়ে রাখে। যাইহোক এলেই তোমরা বুঝবে।

অবশ্যই সুচরিতা এবং সুললিতা সেন উক্ত বয়সের এই নব নির্মিত নগণ্য শহরকে প্রাণ চঞ্চল্যে তোলপাড় করতে সক্ষম হ'য়েছিলেন। মজুমদারকে সঙ্গে নিয়ে সুচরিতা এবং সুললিতা হাজির হ'লো বাহার বাইল ঘুরে ডি এম-এর বাড়ীতে। এবং নিজেদের পরিচয় দিয়ে তাঁকে রাজী করিয়েছিলো, সেদিনের ফাংশনে সভাপতি হবার জন্যে। গেষ্ট অব অনার হলেন পুলিশ সুপার মিঃ করালী সান্যাল। কলকাতার দৈনিক পত্রিকার স্থানীয় সংবাদ দাতারা সকলেই নিমন্ত্রিত হ'লেন।

মিঃ দাসগুপ্ত বললেন, কাগজের লোকদের একটু নজরে রেখো। আমি চাই তোমাদের এই ফাংশানের পাব্লিসিটি কলকাতাতেও যথেষ্ট হোক। বিশেষ ক'রে সুচরিতা এবং সুললিতা যখন এতো খাটছে।

—সে আর বলতে হ'বে না স্যার। সুললিতা দেবী না থাকলে ডি-এম কিছুতেই রাজী হ'তো না ফাংশনে আসতে।

পুলিশ সুপার করালী সান্যাল হাসতে হাসতে বলেছিলেন, রাস্তা ঘাট তৈরির ডিপার্টমেন্টে আবার এতো গান বাজনা কেন?

সুললিতা সেন বললেন, কেন ইঞ্জিনীয়ার প্রাণ বুঝি লোহা লক্কড়ে তৈরী!

—না তা বলিনি মা, তবে আমরা পুলীশ ডিপার্টমেন্টের লোক, চোর-বদমাসদের প্রতি আমাদের যতোটা আগ্রহ, অন্য কিছুর প্রতি ততো নেই। তবে তোমরা কোলকাতা থেকে এসেছো, বলছো যখন যাবো বৈকি।

হ্যাঁ উৎসবের দিন সকলেই এলেন। পুলিশ সুপার সান্যাল এলেন, স্থানীয় উকিল, মোক্তার-ডাক্তাররা এলেন। ডি এম মিঃ গাঙ্গুলী এলেন। শুধু শরীর খারাপ থাকার জন্যে মিসেস গাঙ্গুলী আসতে পারলেন না। কোলকাতার ভীড়ের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া সুলালিতা নিজের উপযুক্ততা প্রমাণ করার একটা ক্ষেত্র পেয়ে যেন অফুরন্ত উৎসাহে ভরপুর হ'য়ে উঠেছে।

সুচরিতা বললেন, দেখ্ ললিতা, আমি এতো ছুটোছুটি করতে পারি না। আমি বরং ব'সে ব'সে মাইকে অ্যানাউন্স্ করি। তুই এদিকটা দেখ।

সুলালিতাও যেন মনে মনে তাই চাইছিলো। সুচরিতার পাশে সুলালিতাকে নিতান্ত নিষ্প্রভ মনে হ'লেও প্রাণ প্রাচুর্যের উচ্ছলতায় সুলালিতা সকলকে ছাপিয়ে যায়।

শরতের নির্মেঘ আকাশের নিচে ফিকে আকাশি রঙের শাড়ীর আবরণে আর হাল্কা রূপসজ্জায় সেদিন নিজেকে যেন স্বচ্ছন্দ প্রজাপতির মতো মনে হ'চ্ছিলো সুলালিতার।

উৎসব শেষ হ'লো রাত একটায়। দুপাশের দিগন্ত বিস্তারী ধানের ক্ষেত বন্যার জলে ভর্তি। কোথাও বা দুহাতের আদিনায় জল উঠেছে। নদীর ধারে কয়েকটা ঘর জলে ভেসে গিয়েছিল বলে শোনা গেছে। কয়েকটা ঘর জলে ডুবে গেলেও এখনও দাঁড়িয়ে আছে। কুসুমপুরের লোকেরা মাঝে একবার ভেবেছিলো, মাটির ঘর নাহয় ভেঙে যায়, কিন্তু একটা নতুন পোলের পিলার ভাঙে কি ক'রে! কিন্তু তার পর তারাও বিশ্বাস করলে সিমেন্টে গলাবাটি বেশানো থাকে। এবং মাঠের জলেও স্রোত থাকে কাজেই পিলার ভাঙা কিছু অসম্ভব নয়। অসম্ভব নয় এই কারণে যে, দিজরাজ বাবুর মতো দরদী ডাক্তার এই কথা বলেছে, তাজিমুদ্দিন সেখের মতো দেশ-প্রেমিকরা এই কথা বলেছে।

উৎসব শেষ হবার আগেই আর একটা খবর এসেছিলো। খবর এনেছিলো প্রাইভেট লরীর ড্রাইভাররা। উৎসবের শেষে, খবরটা মাইকে ঘোষণা করতেই চমকে উঠলো সকলে। এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার বললেন, এইমাত্র ড্রাইভারদের মুখথেকে খবর পাওয়া গেল, আমাদের পি ডব্লিউ ডির একটা নব-নির্মিত সেতু সমাজ-বিরোধী লোকেরা ডিনামাইট দিয়ে ধ্বংস করতে গিয়েছিল। সেতুটি আংশিক ধ্বংস হ'য়েছে মাত্র।

খবরটা শোনার পর-ই বিচলিত হ'য়ে পড়লেন মিঃ দাসগুপ্ত।

—আশ্চর্য এরকম দেশ দেখিনি কোথাও মশাই! ন্যাশানাল প্রপার্টির প্রতি মায়া নেই দেশের লোকের।

—মিঃ গাঙ্গুলী, পুলিশ সুপার মিঃ সান্যাল মিঃ দাসগুপ্ত এক-ই গাড়ীতে রওনা হ'লেন ঘটনা স্থলের দিকে। পেছনে আর দু'টো ট্রাকে গেলেন ডিপার্টমেন্টের অন্য লোকেরা। মিঃ দাসগুপ্তর স্যাণ্ড, রোভারটায় গেলেন, মিসেস দাসগুপ্ত এবং সুলালিতা।

সুচরিতা বললে, আমার শরীরে আর পোষাচ্ছে না। আমি এখন শুয়ে পড়বো।

পোলটার খুব একটা ক্ষতি হয়নি। একটা পিলার একেবারে ভেঙে গিয়েছে। আর উত্তর দিকের ফুট দশেক কংক্রিট উড়ে গিয়েছে।

ডি এম তাকালেন, পুলিশ সুপারের দিকে।

মিঃ সান্যাল ব্যস্ত হ'য়ে বললেন, আমি এখন-ই যাচ্ছি। যা করার ব্যবস্থা করছি।

মিঃ দাসগুপ্ত বললেন, এ অবস্থায় এই কালভার্টের ওপর দিয়ে আপনার যাওয়া বোধ হয় ঠিক হ'বেনা মিঃ গাঙ্গুলী। আমি এখন-ই লোক পাঠাচ্ছি। কাল সকালেই ডাইভার্সন ক্রিয়েট করে দেবে। না হলে নৌকোর ব্যবস্থা করে দেবে। মিঃ গাঙ্গুলী, বললেন, ওপার থেকে আমি গাড়ীর ব্যবস্থা করে নিচ্ছি। এর ওপর দিয়ে মানুষ হেঁটে গেলে কোনো ক্ষতি হ'বে না।

(বেবাংশ ৬৩৩ পৃষ্ঠায়)

ভারতের অতি প্রাচীন
বিশ্ববিদ্যালয়
নালন্দা।

ভারতের আদিতন রসায়ন

চ্যবনপ্রাশ

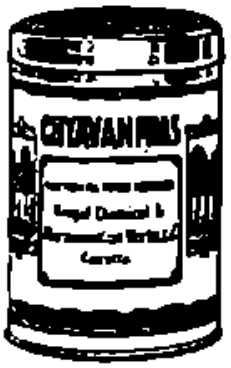

আয়ুর্বেদোক্ত বিশুদ্ধ উপাদানে প্রস্তুত।

চ্যবনপ্রাশ সর্দি কাশি ও শ্বাসকষ্ট অপনয়ন করিয়া স্বাস্থ্যশ্রীর পুনরুদ্ধার করে।

টনিক হিসাবে নিয়মিত ব্যবহারে শরীরের পুষ্টি সাধন হয় ও দুর্বল রুগ্ন শরীর সুস্থ ও সবল হয়।

বেঙ্গল কেমিক্যাল কলিকাতা বোম্বাই কানপুর

মোহিতলালের

অপ্রকাশিত পত্র

[কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের লিখিত এবং আজাহারউদ্দীন খান সম্পাদিত "মোহিতলালের পত্রগুচ্ছ" নামক প্রকাশিতব্য গ্রন্থের সৌজন্যে প্রাপ্ত।]

বাগনান পোঃ
হাওড়া
৪।১২।৪৫

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আমি আবার পীড়িত হইয়া পড়ায় আপনার পত্রের উত্তর দিতে বিলম্ব হইল। আমার স্বাস্থ্য অভিশয় খারাপ হইয়াছে কোনরকমে টিকিয়া আছি। হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া প্রায় ২ সপ্তাহ ক্রমাগত একটা না একটা উপসর্গ লাগিয়া আছে—উপস্থিত আমাশয় রোগে ভুগিতেছি। অতএব বুঝিতে পারিতেছেন, আমার পক্ষে কোথাও যাওয়া কিরূপ অসম্ভব। আপনার সাদর নিমন্ত্রণ আমি শিরোধার্য করিয়াছি, কিন্তু তাহা মনে মনেই—কাজে পারিলাম না। আমি কলিকাতায় যাইতেও সকল সময়ে সাহস করি না, কোথাও রাত্রিবাস করিবার সামর্থ্য নাই। কেবল গুরুর কৃপায় এখনও বাঁচিয়া আছি এবং কিছু সাহিত্যকর্ম এখনও করিতে পারি; নহিলে আমার শরীরের যে অবস্থা তাহাতে আমি প্রায় invalid হইয়া আছি।

বাংলা সাহিত্যের অরাজক অবস্থা আমাকে এতই পীড়িত করে যে আমি আজ প্রায় ১৫।১৬ বৎসর নিজের কাব্য চর্চা ছাড়িয়া বাংলা সাহিত্যের কোষ্ঠী ও দশা বিচার করিতে আমার সকল শক্তি নিয়োগ করিয়াছি। কিছু ফল হইয়াছে, হাওয়া একটু ফিরিয়াছে, সাহিত্যের ধর্ম ও তাহার সত্যকে আমি যথার্থ শিক্ষিত বাঙালীর মনে একটু জাগাইয়া তুলিতে পারিয়াছি বলিয়া মনে হইতেছে—কেন না, আমার লেখার প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টি অনেকের পড়িয়াছে। সাহিত্য—বিশেষতঃ কাব্য যে কি বস্তু তাহা বাঙালী প্রায় ভুলিতে বসিয়াছে—সহজ রসবোধও হারাইয়াছে। এজন্য আমি সাহিত্যের কয়েকটি মূল তত্ত্ব পণ্ডিতসমাজে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতে যেমন চেষ্টা করিয়াছি, তেমই কবি মধুসূদন হইতে রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী কবি ও সাহিত্যিকদের রচনার রস-বিচার করিয়া যতদূর সম্ভব সাধারণের রুচি ও রসবোধ জাগ্রত ও মার্জিত করিবার চেষ্টাও করিতেছি। কাব্যের আদর্শ আধুনিক অরাজকতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে প্রায় লুপ্ত হইতে বসিয়াছে—এজন্য আমি একালের কয়েকজন বিশিষ্ট কবির কাব্য লইয়া আলোচনা করিতে মনস্থ করিয়াছিলাম দুই একজনের যেমন, করুণানিধান ও সত্যেন্দ্রনাথের ইতিমধ্যে করিয়াছি। আপনার কবিতার যে রস তাহার একটি বিশিষ্ট মূল্য আছে—আপনার কবিপ্রাণ ও কবিপ্রতিভার মধ্যে বাঙালীর একটা নিজস্ব রস-পিপাসার ভঙ্গি আছে; এজন্য আমি অনেকদিন হইতেই স্থির করিয়াছি যে, আপনার

কবিতার একটা পরিচয় অত্যাবশ্যক। কিন্তু ইহাও জানি যে, কবির বা কবিতার পরিচয় দিতে হইলে কতকগুলি কথাই যথেষ্ট নয়, আসল পরিচয়, কবির রচনার উৎকৃষ্ট নিদর্শন সম্মুখে তুলিয়া ধরা। আমাদের দেশে সে-পদ্ধতি এখনও প্রচলিত হয় নাই—কবিরা নিজেরা যে 'চয়ন' বা সংকলন' গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়া থাকেন তাহাতে কাজ হইবে না; একজন উপযুক্ত সমালোচকের হাতে বাড়িয়া বাছিয়া খুব কাঁকড় বাদ দিয়া এমন কয়েকটি কবিতা তুলিয়া ধরিতে হইবে, যাহাতে রসিক মাত্রেরই চমক লাগে—ইহাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন; তারপর পাঠকগণ কবির সকল রচনা আগ্রহ করিয়া পড়িবে এবং নিজনিজ রুচি অনুযায়ী নিজেরাই নির্বাচন করিয়া লইবে। আপনার মত কবির পক্ষে এই রূপ 'কবিতা নির্বাচন' দ্বারা পরিচয় সাধন বড়ই আবশ্যক—একখানি ছোট শত পৃষ্ঠার ছোট বই যদি ভাল করিয়া সংকলন ও সম্পাদন করা যায় তাহা হইলে আমার বিশ্বাস আপনি অবিলম্বে বাংলার রসিক সমাজে আপনার যোগ্যস্থান লাভ করিবেন। আপনি অনেকটা স্বভাব কবির মত নিরন্তর কবিতায় আপনার কবি হৃদয়কে মুক্ত করিয়া দিতেছেন—যাই অজস্র কাব্য-জল-বিন্দুর সবগুলিই মুক্তা হইয়া উঠিতে পারে না; যেগুলি হইয়া উঠে সেগুলি অপর বিন্দুগুলির মধ্যে হারাইয়া যায়, সকলের চোখে পড়ে না। আপনি যাহা লেখেন তাহার সবই আপনার কবিজনের দিক দিয়া সত্য ও অর্থপূর্ণ। কিন্তু কবিতার দিক দিয়া সকলই সার্থক নয়; ইহার কারণ আপনি কবিতা 'রচনা' করেন না, আপনার কবিতা সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে "They write themselves" আপনার কবিপ্রকৃতিতে implicit criticism নাই। এই জন্য আপনার কবিতার, যেমন একটি অপূর্বতন প্রকাশ পায়, তেমনই তাহার রূপ-রূপ (art) অনেক সময়ে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। আপনার কবিতা হইতে কাব্যের সেই রূপরূপ উদ্ধার করিয়া দেখাইতে হইবে—কেবল ভাবই যথেষ্ট নয়—রূপই আসল বস্তু। এজন্য আমার মনে হইয়াছে, আপনার কাব্যের একটি উৎকৃষ্ট 'চয়ন' শীঘ্র প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক। আমি যে প্রবন্ধ লিখিতে মনস্থ করিয়াছি—সেই প্রবন্ধই ঐ গ্রন্থের 'ভূমিকা' হইতে পারে—চয়ন আমি করিয়া দিব। এজন্য আপনার পরিণত বয়সের রচনা আরও অধিক পরিমাণে সংগ্রহ করা দরকার। গত দশ বারো বৎসরে বোধ হয় আপনার কোন কবিতা-সংগ্রহ প্রকাশিত হয় নাই—ইহাই একটা বড় অসুবিধা হইয়াছে। আপনি মাসিক-পত্রগুলি হইতে কবিতাগুলি সংগ্রহ করিয়া দিলে ভাল হয়।

আপনার নিজের জীবনের একটু ইতিহাস পাইলেও ভাল হয়। যে সকল কথা আপনার কবিজীবনের প্রাসঙ্গিক—বাল্য কৈশোর ও যৌবনে যে পরিবেষ্টনী ও যে ধরণের সামাজিক ও সাহিত্যিক পরিমণ্ডল আপনাকে প্রভাবিত করিয়াছে; আপনি কি ধরণের কাব্য সাহিত্য হইতে আপনার কবি হৃদয়ের পুষ্টি লাভ করিয়াছেন—কেবল এই সকল বিষয়ে একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাইলে বোধ হয় আমার কাজে লাগিবে।

আমি এ পর্যন্ত এই বইগুলি পাইয়াছি:—শতদল, নূপুর, বনমল্লিকা, একতারা, রজনীগন্ধা, উজানী, অজয় বীথি, 'চুল কালি' ('তুলীর' আমার কাছেই ছিল) আর কিছু আছে? থাকিলে পাঠাইবেন। কিন্তু আপনার আধুনিক অজস্র (মাসিক পত্রে প্রকাশিত) কবিতার কি হইবে? আমার মনে হয় সেই কবিতাগুলিতেই আপনার পরিণত রচনাশিল্পের পরিচয় আছে।

পত্র দীর্ঘ হইয়া গেল। আমি অতিশয় অসুস্থ, তারউপর, অনেক সাহিত্যিক কাজও নিজ সম্বল করিতে হয়—অনেক চিঠি লিখিতে হয়। কাজও একটা নয়, যেমন সাহিত্যের দায় আছে, তেমনই সংসারের দায়ও কম গুরুতর নয়। এই অসুস্থ অবস্থায় জীবিকার ভাবনাও আছে। নিজের বইগুলিকেই জীবিকার উপায় করিয়া তুলিতে হইতেছে—নানা ফন্দি

(শেষাংশ ৬৩২ পৃষ্ঠায়)

পুস্তক পরিচয়

স্মৃতিকথা : শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী : শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী : পৃষ্ঠা ৩৭৪, মূল্য—কাগজ বাঁধাই তিন টাকা, কাপড়ে বাঁধাই চারি টাকা।

বাংলার সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী প্রধানত কবি হিসাবে পরিচিত। কিন্তু তাঁহার গদ্য রচনাও কাব্যগুণে সমৃদ্ধ ও স্থানে স্থানে হাস্যরসের কিরণসম্পাতে উজ্জ্বল। সুরেশচন্দ্রের আর একটি বড় পরিচয় এই যে তিনি ছিলেন শ্রীঅরবিন্দের অন্তরঙ্গ অনুচরদের মধ্যে অন্যতম ; সুরেশচন্দ্র ছিলেন একাধারে কবি ও যোগী। এগার বৎসর পূর্বে তিনি লোকান্তরিত হন এবং আলোচ্য গ্রন্থখানি তাঁহার দেহত্যাগের পরে প্রকাশিত হয়। সুরেশচন্দ্র তাঁহার স্মৃতির ভাণ্ডার হইতে যে কয়েকটি অমূল্য রত্ন আমাদিগকে উপহার দিয়াছেন, তাহা সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক উভয়ের নিকটই মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হইবে। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে বাংলার অপ্রকাশিত ইতিহাসের যে কয়েকটি অধ্যায় সুরেশ বাবু উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন, তাহা যেমন চিত্তাকর্ষক, তেমনি কৌতূহলপ্রদ।

সুরেশ বাবুর স্মৃতিকথা আত্মচরিত নয়, কাজেই গ্রন্থখানিতে প্রায় সর্বত্রই তিনি নিজেকে আড়ালে রাখিয়াছেন। আজকাল 'আত্মচরিত' বা 'আত্মকথা' রচনার একটা প্রবল ঝোঁক ছোট বড় অনেক সাহিত্যিককেই পাইয়া বসিয়াছে, কিন্তু এই মোহ হইতে সুরেশ বাবু মুক্ত ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থরচনার একটি প্রধান উদ্দেশ্য, শ্রীঅরবিন্দ-সম্পর্কে যে সকল কল্পিত কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার নিরসন করা। শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে অপ-প্রচার খণ্ডন ও সত্য ঘটনা পরিবেশনের জন্য নলিনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় যে প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন, তাহাও এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

সুরেশচন্দ্রের রচনার প্রধান গুণ আন্তরিকতা। তিনি শুধু স্মৃতির ভাণ্ডার হইতে আমাদিগকে বাংলার বিপ্লব যুগের কাহিনী উপহার দেন নাই, গভীর সহানুভূতির সঙ্গে সেই কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। গান্ধীজী প্রবর্তিত অহিংস নীতি তিনি সমর্থন করেন নাই, তিনি গ্রহণ করিয়াছেন বিপ্লবীদের জীবন-দর্শন। তিনি বলিয়াছেন—অহিংসাকে ঐকান্তিক ভাবে গ্রহণ করা, চরম বা absolute ভাবে দেখার জন্যে একটা প্রচণ্ড রকমের মারাত্মক বিপদ আছে বিশ্বমানবের পক্ষে। কেননা সজ্জন যাঁরা, ধর্মভীরু যাঁরা, তাঁরা যদি নিঃশেষে অস্ত্রত্যাগ করেন তবে দুর্জন যারা, দুরাত্মা যারা, মাত্র তাদেরই পোয়া বারো দাঁড়িয়ে যাবে। দেবতাদের হাত থেকে যদি বজ্র নিঃশেষে খসে যায় তবে দানবদের হাতেরই বর্শা অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে যাবে'। (পৃ: ২৭১)

'হত্যা করা পাপ, কিন্তু অবস্থা বিশেষে বধ না করা তার চাইতেও বড় পাপ আক্রমণ আর আত্মরক্ষা, এ দুটো এক ব্যাপার নয়। ও দুটোকে এক স্তরে রেখে হিসেব কষলে ফলে পরিমিল ও কর্মক্ষেত্রে গোলমাল হতে বাধ্য। আক্রমণকারীর হত্যার পথ সহজ হয়ে থাকবে কিন্তু আত্মরক্ষাকারীরা হাতও তুলবে না, এমন ব্যবস্থা হবে বাস্তবের দিক থেকে অকর্ম্ম। কেননা ওর অর্থ হবে এই যে, ক্রোধী ও লোভীদের থাকবে নির্বিবাদে এবং বিনা বাধায় খুনের অধিকার আর সংযত-প্রবৃত্তি শান্তিকামীদের জন্যে থাকবে সম্ভাব্য মৃত্যু

এবং মৃত্যুর চাইতেও সম্ভবতঃ বড় দুর্ঘটনার পুরস্কার'। (পৃঃ ২৭৩)

লেখকের কোন কোন মন্তব্য অতিসয়োক্তি বলিয়া মনে হইতে পারে। যেমন যাহারা ভারতীয় বর্ণমালার পরিবর্তে রোমান লিপি প্রবর্তনের চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে তিনি বিশ্বাসঘাতক বলিয়াছেন। লেখকের বক্তব্য উদ্ধৃত করিতেছি—

'ভারতকে খণ্ডিত করা ভারতবর্ষের ঐতিহ্যের প্রতি যত বড় বিশ্বাসঘাতকতা, আমাদের ভাষায় এই রোমান লিপির আমদানি তার চাইতে কম বড় বিশ্বাসঘাতকতা নয়। এর প্রথম বিশ্বাসঘাতকতাটির কারণ হচ্ছে লোভ আর দ্বিতীয়টির কারণ হচ্ছে মোহ। বলাবাহুল্য লোভ ও মোহ ও দুটোর কোনটাই জীবন দান করে না, দান করে মৃত্যু'। (পৃঃ ২৯০)

কিন্তু লেখক এইখানেই ক্ষান্ত হন নাই, যাহারা রোমান লিপির সমর্থন করেন, তাঁহাদের মস্তিষ্কের সুস্থতায়ও তিনি সন্দিহান হইয়াছেন। এ ক্ষেত্রে লেখকের উক্তি শুধু রূঢ়ই হয় নাই, অশোভনও হইয়াছে।

আমাদের আলোচ্য গ্রন্থে লেখক শহীদ প্রফুল্ল চাকী সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, 'ইতিহাসের অপক্ষপাত হিসেবে স্বাধীনতার সংগ্রামে বাংলার প্রথম শহীদের আসন প্রফুল্ল চাকীরই প্রাপ্য'। (পৃঃ ২২৪) বাস্তবিক, এ আসন ক্ষুদিরামের প্রাপ্য নয়, কেননা, প্রফুল্ল চাকী ক্ষুদিরামের পূর্বে মৃত্যু বরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু লেখক এই প্রসঙ্গে পশ্চিম বঙ্গের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ করিয়া যে ভাবে বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা যে কোন লেখকের পক্ষেই অশোভন হইত। আবার 'শ্রীঅরবিন্দ-কথায়' লেখক মার্কস সাহেবের সমালোচনা করিয়াছেন এবং সে সমালোচনার অধিকার সম্পূর্ণ রূপে তাঁহার আছে। লেখক বলিয়াছেন—'পারিপার্শ্বিক মানুষের মন বা আত্মা গড়ে তোলে এই যে মার্কসীয় তত্ত্ব, শ্রীঅরবিন্দের জীবন এই তত্ত্বের একটা প্রকাণ্ড প্রতিবাদ'। (পৃঃ ৯-১০) লেখকের এই মন্তব্যে মননশীলতার পরিচয় আছে, কিন্তু তাঁহার বক্তব্য সম্পূর্ণ প্রমাণিত হইয়াছে কিনা, সে সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ আছে।

সুরেশচন্দ্রের 'স্মৃতিকথায়' এই সব দোষ-ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও গ্রন্থখানি সুখপাঠ্য হইয়াছে। ইহা উপন্যাসের ন্যায় চিত্তাকর্ষক, আবার ঐতিহাসিকের নিকটও গ্রন্থখানি মূল্যবান। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীত্রিপুরাশংকর সেনশাস্ত্রী

তারাশঙ্কর : চন্টর হরপ্রসাদ মিত্র প্রণীত : শতাব্দী গ্রন্থ-ভবন প্রকাশিত : মূল্য পাঁচ টাকা।

সমকালীন কথাসাহিত্যের মূল্যায়ন কেবল দুরূহ নয়, সন্দেহজনকও। গল্পের প্রতি মানব মনের এক চিরন্তন সৃহতা রয়েছে ; ফলে কথা সাহিত্যের প্রথম আবির্ভাবের লগ্নে গল্প-রসের গুণেই পাঠক মুগ্ধ হয়। এমন কি, উৎকৃষ্ট শিল্পগুণের অভাব সত্ত্বেও সমকালীন পাঠকের মনে বহু কথাসাহিত্য ও সাহিত্যিক, ক্ষণ-কালের জন্য হলেও, শ্রেষ্ঠ স্বীকৃতির মর্যাদা যখন করে নিয়েছেন, এমন ঘটনার উদাহরণ দেশে বিদেশে প্রচুর।

গল্পের প্রতি আগ্রহ যেমন আন্তরিক, তেমনি নিজ দেশ কালের প্রতি মমতার নিরবচ্ছিন্ন আকর্ষণেও মানুষের চেতনা দেহ-মন-প্রাণে নাড়ির বন্ধনে বাঁধা। কথাসাহিত্য গল্পের প্রিয় পাত্রে সেই চেনাজীবনের মধুস্বাদ পরিবেশন করে ; ব্যক্তিগত মমতা ও আগ্রহ বশে নির্বিচারেই যাকে অমৃত বলে বরণ করে নেয় সমকালীন পাঠকের মন। আর দৈবাৎ যদি কোনো শিল্পীর সৃষ্টিতে সমকালীন জীবনের মধুপাত্রে চিরকালের অমৃত রস সঞ্চিত হয়, তাহলে তাঁর ব্যক্তিনামের সঙ্গে পর্যন্ত অভিভূত পাঠক-আত্মার অচ্ছেদ গ্রন্থি-বন্ধন অনিবার্য হয়ে ওঠে। সাহিত্য, সাহিত্যিক এবং পাঠকজনের মধ্যে

বিশুদ্ধ রসাস্বাদনের অনুকূল আবশ্যিক অন্তরাল ও দূরত্বটুকু রক্ষা করা কঠিন হয়।

মানসিক এই প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করেও দৈবাৎ যদি কোনো রসিক-মানস জনপ্রিয়তার দুর্নিবারোহী, কালাতিক্রমণের নিশ্চিত স্বাক্ষরবহ কোনো সমকালীন কথাশিল্পীর সৃষ্টির মূল্যায়নের সাহসী হন, সাহিত্য-পাঠকের উৎসাহের তাহলে আর কোনো অবধি থাকে না। আমাদের কালের পরোক্ষ পথ দিয়ে আমাদেরই জীবন ও সাহিত্য প্রীতির যথার্থ পরিচয় চিরকালীনতার আকাশে তাকিয়ে দেখ্‌তে পাবার সম্ভাবনায় উন্নাদিত হতেই হয়। ডক্টর হরপ্রসাদ মিত্রের সদ্য-প্রকাশিত 'তারাশঙ্কর' গ্রন্থখানি ঠিক এই কারণেই প্রচুর উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করেছে। শরৎচন্দ্রের পরে আমাদের কথা-সাহিত্যে অ-নিঃশেষিত প্রতিশ্রুতি শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিকের মূল্যায়নে একখানি সমগ্র গ্রন্থ রচনার প্রয়াস বোধ হয় এই প্রথম; শরৎচন্দ্রের পরে এই গৌরবময় অধিকার যাঁদের, তারাশঙ্কর নিঃসন্দেহে তাঁদের মধ্যে শীর্ষবর্তী একজন। সেই সঙ্গে সমালোচকের প্রসঙ্গেও স্মরণ করতে হয়, এক বিতর্কিত পরিবেশে তরুণ সমালোচক হরপ্রসাদ রবীন্দ্র-গল্পের সিদ্ধ সমালোচনা করে কবির অন্তিম আশীর্বাদ লাভে ধন্য হয়েছিলেন।—সেই সঙ্গে বাংলা ভাষায় সমসাময়িক কথা-সাহিত্য-সমালোচনাকে এক চরম দায়িত্বহীনতার লজ্জা থেকেও মুক্তি দিয়েছিলেন।

পরবর্তী কালে ডক্টর হরপ্রসাদের রচনায় তৎসম্বিৎসা এক প্রধান স্থানাধিকার করেছে; পুরাতন সাময়িকী বা অন্যান্য দুর্লভ সূত্রে যেসকল কৌতূহলজনক সংবাদ আত্মগোপন করে আছে, তাকে সংগ্রহ করে পরিবেশন করার দিকেই এই লেখকের এক স্বাভাবিক আগ্রহ রয়েছে। যে-কোনো বিষয়ে সকল খবরই যে তিনি সরবরাহ করেন, তা নয়; কিন্তু তাঁর পরিবেশিত অনেক খবরই পাঠক মনে কৌতূহল সঞ্চার করে। সাহিত্য সমালোচনায় এটুকু লেখকের গবেষণা বৃত্তির সূচক।

এই গ্রন্থেও তথ্য-সংগ্রহের পরিধি ও বৈচিত্র্য দেখে চমৎকৃত হতে হয়। অবশ্য সেই সঙ্গে এমন সংশয়ও মনে জাগে যে, এই নিতান্ত সমসাময়িক বিষয়ের আলোচনা উপলক্ষ্যে ব্যক্তিগত দূরত্ব রক্ষার প্রয়াসে অতিসচেতন হতে গিয়েও যথোচিত সাফল্য বুঝি তিনি লাভ করতে পারেন নি। গ্রন্থের ভূমিকাতেই তিনি লিখেছেন, "ব্যক্তিগতভাবে তাঁর [তারাশঙ্কর] কাছে আমি আন্তরিক স্নেহে আবদ্ধ। পাঠক হিসেবে সাধ্যানুসারে ব্যক্তিগত সম্পর্ক দূরে রাখবার চেষ্টা করেছি।" গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে এই চেষ্টার সাফল্য একান্ত প্রশংসনীয়। তারাশঙ্করের সঙ্গে নিকটতর সান্নিধ্য সূত্রে আবদ্ধ প্রবীণ সাহিত্যরথীদের মূল্যায়নের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও বিচার তিনি করেছেন সুনিপুণ যাথাযথ্যের সঙ্গে। তাহলেও বাধা এসেছে পৃথক সূত্র থেকে, যার সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত হবার অবকাশও হয়ত লেখকের ঘটেনি। তারাশঙ্করের সঙ্গেই নয় কেবল, তাঁর কালের সঙ্গে, কল্লোল-কালিকলম প্রগতি-উত্তরা, শনিবারের চিঠি, বঙ্গশ্রী, বিচিত্রা, প্রবাসী, পরিচয়ের কালের সঙ্গে বর্তমান গ্রন্থকারের মানসিক সংযোগ কৈশোর-যৌবনের একান্ত প্রীতির সূত্রে আবদ্ধ। রাজনীতি-অর্থনীতি, সাহিত্য-সংস্কৃতি-সমাজ-চিন্তা, গবেষণা ও জ্ঞানসাধনা সবদিক থেকেই ঐ সদ্য দুরাগতকাল বিংশশতকীয় বাঙালী মনন ও মানসিকতার নির্যাস-সারা। তার অনেক খবরই আমরা আজ আর সহজে পাই না, অথচ পাওয়া উচিত, পেতে ভাল লাগে। হয়ত নিবেদন করতে লেখকের আগ্রহ তারও চেয়ে বেশি, ফলে, তারাশঙ্করের কথা-প্রসঙ্গে প্রসঙ্গচিন্তা অনেক সময়ে দুরাগত হয়েছে,—মূল বক্তব্যকে ডুবিয়ে দিয়েছে কিছু কালের জন্য।

দুটি-একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে,—গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথমাংশ জুড়ে তারাশঙ্করের নিজের জবানিতে

আশ্রয় করেও লেখক তাঁর বিস্তীর্ণ ব্যক্তি পরিচয় নিবদ্ধ করেছেন। প্রসঙ্গশেষে ২৯ পৃষ্ঠার প্রথম ও দ্বিতীয় ছত্রে একটি অনুচ্ছেদের শেষ বাক্য লিখেছেন। —"তাঁর জীবনের অন্যান্য কথা স্থগিত রেখে এইবার তাঁর সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রথম প্রবেশের প্রসঙ্গে আসা যাক।" আর পরবর্তী ছত্রে পরবর্তী অনুচ্ছেদ শুরু হয়েছে। "তাঁর প্রীতুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা বইখানির সূত্রপাত হয়েছিল তেরশ' তিরিশ সালে।" তারপরে দীর্ঘ দুটি অনুচ্ছেদে একপৃষ্ঠারও বেশি সেই ঐতিহাসিক গ্রন্থের রচনা-সূত্র ও বিভিন্ন সংস্করণের পরিচয় নিবদ্ধ হয়েছে। প্রসঙ্গটি উপভোগ্য; আজ বত্রিশ বছর ধরে বাংলা কথা সাহিত্য আলোচনায় ঐ গ্রন্থটির একচ্ছত্র মহিমা আমাদের অভিভূত করে রেখেছে, কিন্তু মূলতঃ গ্রন্থটি কিভাবে পরিকল্পিত হয়েছিল, ক্রমে কি ভাবে পরিবর্জিত পরিবর্ধিত হয়েছে, তাতে ঐ গ্রন্থের আলোচনা পদ্ধতি এবং সেই সঙ্গে তাতে নিবদ্ধ তারাশঙ্করেরও মূল্যায়নের প্রকরণ স্পষ্ট অনুভূত হতে পারে। এ সকল ধরনে কৌতূহল আছে, কিন্তু সে কৌতূহল "তারা শঙ্করের সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রথম প্রবেশের প্রসঙ্গ" সম্পর্কে পাঠকের উৎকণ্ঠাকে ক্ষণকালের জন্য স্তব্ধ করে রাখে।

এমন ঘটনা এই আলোচনায় প্রায়ই ঘটেছে, তারাশঙ্করের "ঐতিহ্য ও সহযাত্রীদের" ভাবনা প্রসঙ্গে লেখকের ব্যক্তিক ভাবনা প্রীতি তাঁকে 'যে সুদূর অতীতের' কথায় টেনে নিয়েছে যে, পরিণতি অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রের মত স্পষ্টতই হয়েছে ৪০ পৃষ্ঠার ষষ্ঠ ছত্রে সূচিত অনুচ্ছেদের শুরুতেই। একদিকে লেখকের স্বভাবগত গবেষণামূলক তথ্যসংগ্রহের স্পৃহা, আর একদিকে তাঁর ব্যক্তি ভাবনার প্রিয় স্মৃতি বারে বারেই তাঁকে যেন আলোচ্য বিষয়ের সীমিত পরিধি থেকে সেকালের বৃহত্তর সাহিত্য-চিন্তার সামুদ্রিক বিস্তারের মধ্যে এনে উপনীত করেছে, অনেকটা হয়ত লেখকের অজ্ঞাতেই। তারাশঙ্করকে ঘনিষ্ঠ একান্ত করে আস্বাদন করার যে একক আগ্রহ গ্রন্থ পাঠের সূচনায় পাঠক মনে সঞ্চারিত হয়, বিচিত্রতথ্য, ঘটনা ও আলোচনার বৈচিত্র্যে তার সংহতি অনেকটাই হারিয়ে পড়েছে। তা হলেও এই উপরে পাওনাটুকু উপেক্ষিত হলে পাঠকেরই সর্বাধিক ক্ষতি।

তারাশঙ্করকে খুঁটিনাটি সামগ্রিকতায় পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা 'তারাশঙ্করে' সম্পূর্ণ চরিতার্থ হতে পারেনি; কিন্তু বিচিত্র আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে লেখক যে তাঁকে সত্য করে খুঁজে পেয়েছেন, ব্যক্তিগত নৈকট্যকে প্রতিশ্রুত দূরত্বে নিবদ্ধ রেখেও, তার অজস্র তৃপ্তিকর প্রমাণ রয়েছে গ্রন্থের বিচ্ছিন্ন অংশে। একটি-দুটি উদ্ধার করা যেতে পারে আবার,—

"অন্ততঃ তারাশঙ্করের ক্ষেত্রে একথা বললে অন্যায় হবেনা যে, গল্প এবং উপন্যাস দুই বাহনের মধ্য দিয়েই গভীর এবং সুদূরব্যাপী মানবসত্যের কথা তিনি ব্যক্ত করতে চেয়েছেন। নিজের কালের খণ্ড সত্যটুকু কোনো ভাবেই উপেক্ষা করেননি তিনি। তবে, বক্তব্যের দিক থেকে তাঁর যদি কিছু বিশিষ্টতা থাকে, তাহলে সেটা এই যে, তাঁর নিজের দেশে কালে ব্যক্ত মানবসত্যের ভবিষ্যত সম্বন্ধে তিনি অকুণ্ঠ ভাবে আশাবাদী। মানুষের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজগঠন ইত্যাদির মধ্যে তিনি ত্যাগ, অহিংসা, সত্য এবং ধর্মের প্রাধান্যই লক্ষ্য করেছেন।" (৮৫-৮৬ পৃষ্ঠা)

সেই সঙ্গে এমন মন্তব্যও ঐ একই লেখক করতে পেরেছেন যার তিন পৃষ্ঠার ব্যবধানে:— "...উপন্যাসের তুলনায় গল্পরচনায় কেন্দ্রেই তিনি তাঁর শিল্প-দক্ষতার বেশি পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর উপন্যাসে বড়ো বেশি তথ্যের ভিড়। তাতে আবেগ ভাবানুভূতায় না ঠেকা পর্যন্ত তিনি যেন থামতে নারাজ, ... বস্তুনিষ্ঠতা, অতি কথন এবং ভাবাবেগ তাঁকে পদে পদে বাধা দিতে থাকে। উপন্যাসের ক্ষেত্রে সে বাধা তিনি কিছু তেই যেন কাটিয়ে উঠতে পারেন না। কিন্তু গল্পে তাঁর পথ

অন্বাহত। গল্পে তিনি সংযমী, সংযতবাক্, সন্দেহাতীতভাবে অব্যর্থ!"

এই সত্যভাষণ শুহাকে দুঃসাহসিকতা বলা চলেনা, একেই বলতে হয় সমালোচনার আন্তরিকতা। তারাশঙ্কর একালের বাংলা সাহিত্যপাঠকের মনে একান্ত বন্দনীয়। —সে কেবল ঐকান্তিকতরভাবে তিনি আমাদের সকলের প্রিয় বলেই। আর সেই প্রীতির উৎস তো একান্ত নৈকট্য-বোধেই। এই বিস্ময়কর শিল্পী তাঁর ক্ষমতার প্রাচুর্যে আমাদের অভিভূত করেছেন,—কিন্তু শক্তির অপারপরিধি সত্ত্বেও, এমন কি শ্রষ্টারূপেও, তিনি আমাদের মতই ভালোমন্দে বিমিশ্র মানুষ, —সেই অনুভবেই তো তিনি আমাদের আত্মার নিকটতম, পরমাত্মীয়। ডক্টর হরপ্রসাদের সিদ্ধান্ত নিয়ে বিচার হোক্। বিতর্ক হোক্। কিন্তু এই দোষেগুণে সমদর্শনের আন্তরিকতাটুকু আমাদের সমকালীন সাহিত্যালোচনার কেন লুপ্ত না হয়, এটুকু একান্ত কাম্য। সেই সঙ্গে লেখকের কাছে অনুরোধ,—দ্বিতীয়তর সংস্করণের নামকরণেই আলোচনার পরিধিকে তিনি আরো একটু বিস্তৃত করে নিতে পারেন। তাঁর লেখনী আরো নিরুদ্বিগ্ন হতে পারলে গ্রন্থের সকল, প্রচুর ও মূল্যায়নের বর্তমান বৈচিত্র্য আরো ব্যাপক ও গভীরভাবে তৃপ্তিকর হতে পারে।

ভূদেব চৌধুরী

শনিবারের সন্ধ্যায়: শচীন্দ্রনাথ বসু: একাদক-কার্যা কে এল্ মুখোপাধ্যায়: পৃষ্ঠা-২৭০। দাম: ৬·০০।

প্রথম গল্পটির নামে বই। গল্পের সংখ্যা পনেরো। প্রথম গল্প 'শনিবারের সন্ধ্যায়' সংকলনের শ্রেষ্ঠ গল্প নিশ্চয়ই, —মনে হয় সাম্প্রতিক কালে গল্প শিল্পের ভিতর দিয়ে প্রতি-দিনের প্রকৃত জীবনযাত্রার যে অন্তর্নিহিত ছবি ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্য থাকে, সেইদিকের বিচারে গল্পটি সুদৃঢ়, সুসংবদ্ধ ও সার্থক। এমন গল্প ত সত্যি চারেকটাই দেখা যায় যার মধ্যে অনেকই অদরকারী লাইন, দুর্বল শব্দ, ঝুল সম্ভার, অস্পষ্ট বা অনিশ্চিত লক্ষ্য,—গল্পটি কেন লেখা হল, শেষ পর্যন্ত তাই বোঝা যায়না। যাঁরা অচেতন ভাবে লেখেন বা গল্পরচনার মূলে যাঁদের কোনো যুক্তিসূত্র নেই, তাঁরা এইরকম অভিযোগের উত্তরে একটা উদ্ভট যুক্তি খাড়া করেন কিন্তু ওসব বাজে দুর্বল কথা কি মানা যায়। না মানা উচিত। যখন অন্তরীতে মাসে মাসে 'শনিবারের সন্ধ্যায়' বের হয় কিছুকাল আগে, গল্পটি পড়তে পড়তে লেখকের সূক্ষ্ম দৃষ্টি, রচনার শক্তি, মনন, মানবচরিত্র সম্পর্কে দৃঢ় জ্ঞান রীতিমত অবাক করে দিয়েছিল। ঠিক প্রফেশনাল লেখক বলতে যা বোঝায়,—মানে কমার্শিয়াল, পেশাদারী,—শচীনবাবুকে তা বলা যায় না। পেশাদারী লেখকদের একটা প্রফেশনাল পালিশ থাকে,—ভদ্র করে সেটা না হয় সারফেকশনই বলা গেল,—। কিন্তু সে জিনিষটা ত অনেক সময়ই পূজার প্যাণ্ডেল সাজানোর মত মোটা মোটা কারবারী ব্যাপার; তা পূজা-আর্চায় অহেতুক ভক্তি যাদের একটু কম, একটু খেয়াল করলেই বুঝতে পারে। যেহেতু তাতের সঙ্গে সাহিত্য এঁর ক্ষেত্রে জড়িয়ে নেই, এঁর রচনায় সেইজন্য প্রফেকশনই যে জিনিষটা চোখে পড়ে তাকে বিশুদ্ধতা বলা যায়।

গল্পের ঘটনা পাত্রপাত্রীর কথা ইত্যাদি বললে গল্পের রস অনেকটাই কাঠ হয়ে যায়। অতএব এ সম্বন্ধে আর একটিও কথা নয়। শেষ কথাটি এই যে এ-জাতীয় গল্পের মূলে অনেক সূক্ষ্ম খুঁটিনাটি কারুকর্ম থাকে, অর্থাৎ রচনার কাঠামোটা বাড়ির প্লানের মতো আগে মনের মধ্যে সবটা গড়ে নিতে হয়,—এসব কথা লেখকরাই ভাল বুঝবেন। আর জিনিষটি বলতে যত সহজ লাগল, আসলে তা নয়। বরং বেশ কঠিন। আর এই দুরূহ কর্মটি এত সহজে, সুচারু-রূপে লেখক সম্পন্ন করেছেন যে মনেই হয় না এজন্য আড়ালে তাঁর কোনো আয়াস আছে।

বাঙলাসাহিত্যে সাম্প্রতিক কালে কিছু কিছু ভাল গল্প সত্যিই আছে,—ভক্তির আতিশয্যে অনেক ক্ষেত্রেই এটা একটু বাড়িয়ে বলা হয়, কিন্তু খানিকটা ঠিকই,—শচীন বসুর এই গল্প সেই গল্পগুলির সঙ্গে,—এখন এই মনোশলি ব্যবসার যুগে না হোক,—পরে যুক্ত হবে।

আশ্চর্যের কথা, এখন বই খুলে দেখা গেল, গল্পটির রচনাকাল ১৩৫৪। আটবছর আগে এইরকম টাইট্ ওয়েল-ব্যালেন্স্ড্ গল্প রীতিমতই ভাল বলতে হবে।

অন্য অনেকগুলি গল্প, যেমন 'গল্পের শেষ,' 'অতনু রায়, কবি,' 'প্রমীলার প্রেম,' 'দ্বন্দ্ব', 'প্রকৃতির বিদ্রোহ,' 'চিঠি,' ইত্যাদি প্রবাসীতে আগে বের হবার সময়ই লক্ষ্য করেছিলাম।

শচীন বসুর বিরুদ্ধে একটি মাত্র অভিযোগ, তাঁর চোখ ও মন যথেষ্ট খোলা নয়। জীবনের ঘটনাগুলি যেন তাঁর চোখে পড়ে না ভাল। জীবনের কাছাকাছি আসার প্রয়াস বা জীবন সম্পর্কে কৌতূহল, প্রশ্ন, চিন্তা, তাঁর কোনো রচনাতেই তেমন চোখে পড়ে না।

সত্যব্রত বসু

পুরোধা

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম থেকে আশ্রমের ছেলেমেয়েদের এই কাগজখানি বের হয়েছে। এইখানিই প্রথম। একটি ত্রৈমাসিক পত্র। বেশ সুশ্রী ঝক ঝকে চেহারা,—ভিতর-বাহির আগাগোড়া পরিচ্ছন্ন, সুরুচিসম্পন্ন। বাজারে ছেলে-মেয়েদের কাগজের ভীড় এখন বেশ—তাদের সঙ্গে এই ত্রৈমাসিক কিশোর পত্রখানির তফাৎ একেবারে মূলে—তা জাতি ও চরিত্রের তফাৎ। ছেলেমেয়েদের হাতে পড়বার মতো একখানি কাগজ খুঁজে এনে দেওয়া আজকের দিনে কিরকম একটি সমস্যা হয়েছে তা সকল অভিভাবকই জানেন : পুরোধার খবরটি সেইজন্য বিশেষভাবে এখানে জানানো রইল। পুরোধার প্রথম সংখ্যাটিই যখন এত ভালো, সহজেই আশা করা যায়, পত্রখানির ভবিষ্যৎ আছে।

আশ্রমের পরিচিত কবি ও লেখকরা ত অবশ্যই থাকবেন। কবি নিশিকান্তর ভূতের গল্প 'দশহাত লম্বা দাদা ভূত' বেশ লাগল। ইংরেজি লেখক নীরদবরণের স্বচ্ছ বাংলায় শ্রীঅরবিন্দর সঙ্গে আশ্রমের কচিসংসদের সাক্ষাৎকারের বিবরণও অতি সুন্দর। পৃথ্বীন মুখোপাধ্যায়ের অনুবাদ-মৌলিক সব লেখাই পড়বার মতো। কামুপ্রিয় চট্টোপাধ্যায় স্প্যানিশকবিতা অবলম্বনে একটি কবিতা এইসংখ্যার উপহার দিয়েছেন। কিন্তু লেখক-শিল্পী প্রমোদচট্টোপাধ্যায় অনুপস্থিত কেন!

ছবি-ছাপা সবই বেশ সুন্দর। আশ্রমের শুদ্ধচেতনার দীপ্তি সর্বত্র সুপরিস্ফুট।

সত্যব্রত বসু

(মোহিতলালের অপ্রকাশিত পত্র, ৬২৬ পৃষ্ঠার পর)

কিকিরও করিতে হইতেছে। এই সব কারণে আমার সাহিত্যিক জীবন যেন খণ্ডিত হইয়াছে, তেমনই সামাজিক কর্তব্য ঠিকমত করিয়া উঠিতে পারি না। আমার পত্রের উত্তর পাইতে বিলম্ব হইলে দুঃখিত হইবেন না। "কাব্য মঞ্জুষার" দ্বিতীয় সংস্করণ লইয়া ব্যস্ত আছি—অনেক নূতন কবিতা থাকায় notes লিখিতে বড় বেশ পাইতেছি। দুইখানা গ্রন্থও শীঘ্র ছাপা শেষ হইবে—প্রুফ দেখা ভূমিকা প্রভৃতি লইয়া বিব্রত আছি। আমার একখানা নূতন কবিতার বই (ছেলেদের জন্য) বাহির হইতেছে—বাহির হইলেই আপনাকে একখণ্ড পাঠাইব। বইখানি আমার দুই মৃতা কন্যার নামে উৎসর্গ করিয়াছি। উৎসর্গের কবিতাটি আপনাকে উদ্ধৃত করিয়া পাঠাইলাম—আপনার নিশ্চয়ই ভাল লাগিবে। বইখানির নাম দিয়াছি—'রূপকথা'।

চোখ বুজে আজ খুঁজছি তোদের বুকের তলার অন্ধকারে,
কোথায় আছিস্ আছিস্ কি নেই—সে কথা কেউ বলতে নারে।
মন যে বলে অট্ট হেসে, 'মিথ্যা সে সব ছায়ার মায়া,'
প্রাণ কেঁদে কয়, 'দেখছি তবু সেই ছায়ারি অচল কায়া'।
আছিস্ তোরা—আছিস্ বেঁচে আমার নিশাস্ চোখের জলে,
থাকবি নে আর, ডুববে যখন আমিও সেই আঁধার-তলে।

আজকে শুধুই নাম দুটি এই পুঁথির পরে দিলাম লিখে,
কি বলে যে আশিস্ করি—জানিনে সেই বচনটিকে।
'বেঁচে থাকো' এমন কথা বাপের মুখেও নেই যে আজ
মানুষ যদি এতই পাপী—বিধির তা'তে হয় না লাজ!
ধর্ মা তোরা তোদের বাপের বুক-ভাঙা এই ব্যথার দান,
তোদের কথাই 'রূপকথা' যে—এম্নি আমি ভাগ্যবান!

আশা করি সপরিবারে কুশলে আছেন। আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ নমস্কার জানিবেন।

ইতি
স্নেহ মুগ্ধ
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার।

পটভূমি

(৩২৭ পৃষ্ঠার পর)

মিঃ সান্যাল বললেন কালভার্টটা তো কবিন আগেই ভেঙে গিয়েছিল।

মিঃ গাঙ্গুলী বললেন, না ভাঙেনি তবে মেটাল্ পিলারটা একটু জ্যাকেট হয়েছিল, হেভি ভিহিকেল ছাড়া আর সব কিছুই চলতো।

স্থলদিঘা এগিয়ে এলো। বললে, না মিঃ গাঙ্গুলী একটা রাতের জন্যে ঝুঁকি নিতে যাবেন না। চলুন, আজ সারা রাত আপনাকে গান শোনাবো, খবরের কাগজের স্থানীয় সংবাদ দাতাদের একান্তে ডেকে মিঃ দাশগুপ্ত বললেন, দুঃখের মধ্যে আমাদের আনন্দের খবরটা আর দেবেন না। তার দুদিন পরেই কলকাতার কাগজে বেশ বড় শিরোনামার নীচে সংবাদটা বেরিয়েছিলো : সমাজবিরোধী দুষ্কৃতকারীদের দ্বারা একটি নব নির্মিত সেতু ধ্বংস সাধন। পুলিশ শাসকের নির্দেশে দুষ্কৃতকারীদের গ্রেপ্তারের জন্য জোর অনুসন্ধান চালানো হইতেছে।

বিজ্ঞপ্তি

শারদীয়া জয়শ্রীতে জানানো হয়েছিল শ্রীশচীন্দ্রনাথ বসু বিদেশী গল্পের অনুবাদ কাত্তিকে, যাবে কিন্তু লেখক দীর্ঘদিন কলকাতা থেকে অনুপস্থিত থাকার জন্য লেখা যথাসময়ে আমাদের হস্তগত না হওয়ার দরুণ কাত্তিকে দেয়া সম্ভব হোল না। অগ্রহায়ণে শচীনবাবুর অনুবাদ গল্প যাবে। জঃ সঃ

শচীন্দ্রনাথ বসু

জয়শ্রীর পাঠক পাঠিকাদের কাছে সুপরিচিত। গত কয়েক বছরে প্রকাশিত তাঁর গল্পগুলি সকলের প্রশংসা অর্জন করেছে। তাঁর স্বনির্বাচিত পনেরটি বড় ও ছোট গল্পের সংকলন প্রকাশিত হল 'শনিবারের সন্ধ্যায়', 'গল্পের শেষ' 'প্রমীলার প্রেম', 'অতনু রায়, কবি' ইত্যাদি স্থান পেয়েছে এই সংকলনে। বইয়ের নাম

শনিবারের সন্ধ্যায়

ভাল কাগজে, আর্টিক হরপে ছাপা। দাম ছয় টাকা

প্রকাশক

ফার্মা কে, এল, মুখোপাধ্যায়

৬/১এ বাঞ্ছারাম অক্রুর লেন, কলিকাতা-১২

সূর্যের রং

[প্রথম কিস্তি]

আবার তারা তিনজন একত্র হয়েছে।

তিনজনের সঙ্গে আর একজন এসে জুটেছে। চারজন হয়েছে।

যেন এই কটা দিন তারা একজন আর একজনকে হারিয়ে ফেলেছিল। একটি মুখ আর একটি মুখকে ভাল করে দেখতে পায়নি। ভাল করে কথা বলতে পারেনি কেউ কারো সঙ্গে।

কেননা অনেক মানুষ এসে জুটেছিল তাদের সঙ্গে। বা ঘুরিয়ে বললে বলতে হয় অনেক মানুষের ভিড়ের মধ্যে তারা তিনজন হারিয়ে গিয়েছিল।

বছর বছর অবশ্য এমন হয়।

পুজোর সময়টায় তাদের আড্ডা ভেঙে যায়।

এই সুখের আড্ডা।

হারান মুদির দোকানের পিছনে একটা প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছ ডালপালা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গাছের নিচে সারা বছর কিছু না কিছু কেরোসিন কাঠের প্যাকিং বাক্স ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। প্রত্যেকটা বাক্সের মুখ খোলা। ভিতরের খড়কুটোর কিছু অংশ মাটিতে কিছু বাক্সের মুখে এসে জমা হয়ে থাকতে দেখা যায়। রোদে পুড়ে জলে ভিজে সেগুলি বিবর্ণ হতে হতে পচতে থাকে। তারপর একদিন দেখা যায় পুরোনো বাক্সগুলি কোথায় উধাও হয়েছে। আবার নতুন প্যাকিং বাক্স পড়ে আছে তেতুল তলার পড়ো জমিতে। সোনালী রঙের নতুন খড় খালি বাক্সগুলির ভিতর থেকে বেরিয়ে কিছু ঘাসের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে কিছু বাক্সের মুখের কাছে এসে জমা হয়ে আছে। আর সেসব খড় ভাল করে জড়িয়ে পাকিয়ে চমৎকার গদি তৈরী করে একটা বাক্সের ওপর ভল্টু একটা বাক্সের ওপর গুপাম ও আর একটা বাক্সের ওপর তপা পা ঝুলে বসে আছে গল্প করছে, বিড়ি সিগারেট টানছে। দিনের পর দিন।

এবার তিনজনের সঙ্গে আর একজন এসে জুটেছে। হাবু। তপা—তপনের মামাতো ভাই। আসাম থেকে চলে এসেছে। নতুন। তাই একটু মুখচোরা। ভল্টু গুপাম বা তপার মতন ফরফর করে কথা বলতে পারে না, রাজা উজির মারতে পারে না, হাত পা ছুঁড়তে পারে না। তা ছাড়া কলকাতা শহরের হালচাল কি, শহরের মানুষগুলির চরিত্র মেজাজ ও দশটা সিনেমা ঘরের খবর, খেলার মাঠের সংবাদ হাবুলের জানা নেই। তাই 'হাবু' তিনজনের কথা শোনে আর তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। দরকার মতন একটু হাসে মাথা নাড়ে এবং পকেট থেকে বিড়ি কি সিগারেট বার করে নতুন বন্ধুদের সামনে বাড়িয়ে দেয়। ভল্টু তপা গুপাম তাতেই সন্তুষ্ট। আস্তে আস্তে তাদের নতুন সঙ্গীটির মুখ চোখ খুলবে হাত খুলবে মেজাজ খুলবে তারা জানে। কাজেই আসামের মানুষ বলে হাবু সম্পর্কে তারা মোটেই উদ্বিগ্ন নয়। হয়তো এর প্রধান কারণ তাদের বয়স। ষোল থেকে আঠারোর মধ্যে ভল্টু তপাদের বয়স। হাবুও তাদের বয়সের। এই বয়সে মানুষ যত সহজে মানুষকে কাছে টানে যত চট

: সাপ্তাহিক উপন্যাস

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

করে একজনকে বন্ধু করে নেয় এমন আর কোন বয়সের মানুষ পারে না। তা না হলে আজ দশ বারোদিন হয়ে গেল, এখন পর্যন্ত হাবু সেই মফঃস্বলের মানুষটি সেজে আছে। অর্থাৎ আজও তার পরণে ধুতি পাঞ্জাবি পায়ে পাম্পশু। নাকের নিচে বাচ্চা প্রজাপতির মতন একটুখানি গোঁফ। গাল থুতনি ভলটু তপাদের মতন কামানো যদিও। কিন্তু মাথার চুল বেশ লম্বা। লম্বা চুল পাট করে ওল্টান। তার মানে আসামের শিলচর শহরের আর দশটি মানুষের চালচলন আদব-কায়দা ভদ্রতা স্টাইল যতটা রপ্ত করার হাবু তা করেছে। কিন্তু তা হলে হবে কি। এটা শিলচর না। কলকাতা শহর। আবার কলকাতা শহরেরও ভয়ানক পুরোনো অথচ মারাত্মক রকমের আধুনিক অঞ্চল বকুলবাগান। ধুতি পাঞ্জাবি পাম্পশু পরা কি ব্যাটার ছাই গোঁফ রাখা বা বড় চুল উল্টিয়ে রাখার ঝুল যে অনেকদিন ধরে হেজে ভূত হয়ে গেছে শিলচরের হাবুলের তা জানবার কথা নয়। অথচ এই শান্তিপুরী ধুতি, সিল্কের চুড়িদার আদ্দির পাঞ্জাবি, প্রজাপতির ছড়ান ডানার মতন চিকন গোঁফ কলকাতা শহর থেকে তাদের শিলচরে একদিন কারা নাকি আমদানী করেছিল হাবুল শুনেছিল, আর শুনে তেমন করে চলতে সাজতে শিখেছিল। এখন এখানে এসে সে দেখছে সেসব কিছুই নেই। তপা সুদাম ও ভলটুর ঘাড় কান একেবারে চাঁছাছোলা। মাথার মাঝখানটায় দু আনা পরিমাণ চুল আছে। তাও খাড়া খাড়া। ডেলটেল মাথার বালাই নেই। কেউ গোঁফ রাখেনা। প্রত্যেকের পরনে ট্রাউজার হাত গুটানো শার্ট, পায়ে চপ্পল। হাবুলের মতন হাতের ঘড়ি চেকে তারা ঘড়ি পরে না। ঘড়ি বাদ দিয়ে চার আঙুল ওপরে ঘড়ির বেল্ট বাঁধে। কথায় কথায় তারা চোখ টেপে, ঠোঁটে আঙুল গুঁজে সিটি মারে। হাবুলের ধারণা ছিল কলকাতার ছেলেরা সর্বদা মাজা মিহি গলায় কথা বলে, মেয়েদের মতন ঠোঁট টিপে হাসে। এখন দেখছে সে অন্য রকম। ভলটু তপারা দরকারে অদরকারে উঁচু গলায় হাসে জোরে কথা বলে, প্যাকিং বাক্সের ওপর চাটি মেরে তবলা বাজায়, আর যখন খুব খুশি হয় মুখের ভিতর দুটো আঙুল গুঁজে দিয়ে সিটি দেয়।

পূজার কটা দিন খুব ব্যস্ততার মধ্যে তাদের কেটেছে। পাড়ার বারোয়ারী পূজা। সুতরাং সকলের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে খাতা বগলে নিয়ে চাঁদা তোলা, প্রতিমা বায়না করা, প্যাণ্ডেল বাঁধা, চুনি জোগাড় করা, বাজার করা অনেক কিছু তাদের করতে হয়েছে। হয়তো এক দলের সঙ্গে মিশে তপা গেছে বাজারে, আর এক দলের সঙ্গে ভলটু গেছে চুনির খোঁজে, আবার অন্য এক দলের সঙ্গে সুদাম বেরিয়েছে চাঁদা তুলতে! কাজেই কটা দিন তিনজনের দেখা সাক্ষাৎ বড় একটা হয়নি। তখন তারা পাড়ার দশজনের একজন হয়ে গিয়েছিল। হারান মুদির দোকানের পিছনের পড়ো জমির বাক্সগুলির ওপর বসে তিন বন্ধুর মনের সুখে গালগল্প করা বিড়ি সিগারেট টানা আর কথায় কথায় হাসা সিটি মারার সময় ছিল না।

এখন পূজা শেষ হয়েছে। আবার তিনজন তাদের জায়গায় এসে মিলেছে। তপার সঙ্গে তার আসামের মাসাতো

ভাই হাবুলও এসেছে আড্ডা দিতে। তপার বন্ধুরা হাবুলকে পেয়ে খুশি। হোক না মফঃস্বলের ছেলে, দেখেশুনে চালচলন, কিন্তু তবু তো তাদের বয়সের আর একটি মানুষ। তারা দলে ভারি হল। দল ভারি হচ্ছে দেখলে তাদের ভাল লাগে।

আড্ডা দেবার পক্ষে হারানের দোকানের পিছনটা চমৎকার। একটু দূরে রাধেশ্যামবাবুর এসিডের কারখানা। প্যাকিং বাক্সগুলি ঐ কারখানার সম্পত্তি। বাক্সে করে নানারকম শিশিবোতল আসে, আবার শিশিবোতল চালান দিতে বাক্সগুলির দরকার পড়ে। তখন সেগুলি উধাও হয়। এবেলা জায়গাটা ফাঁকা পড়ে রইল তো আবার ওবেলা এত এত বাক্স এসে গেল। তপা মৃদামেরা তখন একটা করে বাক্স টেনে নিয়ে ওপরে খড়ের গাঁদ বিছিয়ে বসে যায় এবং আর একটা বাক্সের ওপর পা ছড়িয়ে দেয়। মাঝে মাঝে হাওয়ায় তেঁতুল গাছটা নড়ে ওঠে। তখন শুকনো তেঁতুল পাতা ঝুরঝুর করে তাদের ঘাড়ে মাথায় পড়ে। রুমাল দিয়ে তারা পাতাগুলি সঙ্গে সঙ্গে শরীর থেকে ঝেড়ে ফেলে দেয়। পাতা ঝেড়ে রুমালটা ভাঁজ করে গলায় বাঁধে। তিন কোনা করে ভাঁজ করা রুমাল গলায় বেঁধে রাখার ফ্যাসান হাবু এই প্রথম দেখছে। অথচ রুমাল তারও আছে। পাঞ্জাবির বুক পকেটে কোণা বার করে রুমাল রাখাটাকে সে এককালে চরম ফ্যাসান বলে জেনে এসেছিল। কিন্তু তপা ভল্টুরা কখনো জামার পকেটে রুমাল রাখেনা। যখন গলায় বাঁধার বাঁধল, নয়তো বাঁহাতের কব্জিতে ঘড়ির কাছে রুমালটা জড়িয়ে রাখে। যেন এও একটা ফ্যাশান। হাবু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে।

কদিন তারা আসেনি বলে জায়গাটায় যেন কিছু কিছু আগাছা জন্মেছে। আর এযাত্রায় প্যাকিং বাক্সগুলি অনেকদিন ধরে পড়ে আছে। কাক শালিক বেগে রেখে বাক্সগুলি নোংরা করে রেখেছে। তাই বলো, পূজার কদিন কারখানার কাজ বন্ধ ছিল। তাই যানপত্র চালান যাওয়া বা নতুন শিশি বোতলের আমদানি বন্ধ ছিল তাই আর নতুন বাক্স আসেনি। কিন্তু তা বলে তপা ভল্টুরা মন খারাপ করল না। পা দিয়ে দিয়ে বাক্সগুলি কাত করে নোংরা দিকটা ঘুরিয়ে ভাল দিকটা ওপরের দিকে তুলে দিয়ে তারা নিজের আসন তৈরী করে ফেলল। হাবুও একটা বাক্স ঘুরিয়ে নিয়ে বসে পড়ল।

তারপর আরম্ভ হল গল্প।

তারা কি নিয়ে গল্প আরম্ভ করছিল এবং কোথায় গিয়ে গল্প শেষ করছিল ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না।

বা তারা যে বিশেষ কোন ঘটনা বা বিষয় নিয়ে গল্প করছিল তাও না। পাড়ায় এতবড় একটা পূজা হয়ে গেল। ভুল করেও কেউ পূজার গল্প করল না। দেখা যাচ্ছে প্রত্যেকের পরনে নতুন জামা কাপড় জুতো। বোঝা যায় পূজার সময় কেনা। কাজেই সেই সূত্র ধরে এবার পূজায় ডেকরন, নাইলন সুতি সিল্কের কেনাকাটার বহর নিয়ে তারা বেশ কিছুক্ষণ কথা বলতে পারত। কিন্তু সেসব গল্প তারা করল না। শিলচর থেকেগেলে হাবুও তার সঙ্গীরা তাই করত। এই বয়সে শাড়ি ফ্রক নিয়ে আলোচনা জমে ভাল। কিন্তু তপা ভল্টুরা যেন অন্যরকম।

বকুল বাগানের বারোয়ারী পূজা মানকরা পূজা। কত আলো জ্বলল মাইক বাজল বাজী পুড়ল। বড় বড় প্রতিমা আনা হয়েছিল। কত বড় দিঘিছল বার করে প্রতিমা ভাসান দিতে গেল তারা। আশ্চর্য, সেসব কিছুই তপাদের মুখে শোনা গেল না। যেন তারা সেসব দলে ছিল না, পূজার খবরই তারা রাখে না।

অথচ তিনদিন ধরে দলে দলে কত মেয়ে এল ঠাকুর দেখতে। কত রকমের বেণী কত রকমের খোপা। আর রং বেরঙের কত সাজ পোষাক। ঘুলেও ভল্টু তপা মৃদার একবার একটি মেয়ের কথা বলল না। হাবু যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না। বরং তারা তেঁতুলতলার প্যাকিং বাক্সগুলি নিয়ে কথা বলছিল। তারা গুনে রেখেছিল পূজার

আগে বারোটা বাক্স ছিল গাড়িতলায়। এখন গুনে দেখছে এগারোটা। আর একটা বাক্স কোথায় গেল এই নিয়ে তিন জন তর্ক করছে। 'হারান শালা নিয়ে গেছে।' ভল্টু বলছিল, 'ডাল চালের বস্তা রাখতে সুবিধা হবে। একটা তুলে নিয়ে গেছে।' সুদাম মাথা নাড়ছিল। 'পচা প্যাকিং বাক্স দোকানে ঢোকাতে হারানের বয়ে গেছে। বস্তা রাখবার জন্য সেদিনও হারান একটা বড় বেঞ্চি তৈরী করিয়েছে নিবারণ ছুতোরকে দিয়ে।'

'উঁহুঁ'। তপা বলছিল, 'ঐ শালা এদিক কারখানার বারোয়ানটার কাজ। বাক্স জালিয়ে ভাত রেঁধেছে।'

'ধেৎ।' ভল্টু মাথা নাড়ছিল। 'গোপী সিং ভাত খায় না। দুবেলা রুটি খায়।'

'তুই জানিস কচু।' তপা তার ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা ভল্টুর থুতনির সামনে উঁচু করে ধরল। 'আমি নিজের চোখে সেদিন দেখলাম গোপী সিং হারানের দোকানে চাল কিনছে। জিজ্ঞেস করতে বলছিল একবেলা সে ভাত খায়।'

ভল্টু চুপ করে গেল। তপার কাছে ভল্টু এভাবে অল্প হেরেছে জেনে যেন খুশি করে সুদাম হঠাৎ অন্য প্রসঙ্গ টেনে আনল।

'বুঝলি ভল্টু, আমার মনে হয় কাকগুলো বাক্সের ওপর বসে বসে সুকর্ম করেছে। আমরা ছিলাম না তো। তাই বেশ আড্ডা জমিয়েছিল নিচে নেমে।'

'মোটেই না।' ভল্টু চোখ ঘোরাল। 'ঐ শালারা তেঁতুলের ডালে বসে থেকে কর্মটি করে গেছে। নিচে নামবে কেন।'

'আলবৎ নিচে বসে হেগে গেছে।' তপা ভল্টুর দিকে তাকায় না, সুদামের মুখ দেখে। 'দেখছিস না নোংরাগুলো তেমন ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায়নি। ডালের বড়ির মতো জায়গায় জায়গায় গুটি পাকিয়ে লেগে আছে।'

শুনে সুদাম খুশি হয়, চোখ বড় করে তপার দিকে তাকায়। ভল্টুর মুখটা কালো হয়ে যায়, ঘাড় নিচু করে বাক্সের গায়ের নোংরাগুলি দেখে। অর্থাৎ এবার তপার জিৎ হয়। তপার কথার প্রতিবাদ করতে পারে না ভল্টু।

'এবার তেমন তেঁতুল হয়নি, গাছটার দিকে তাকিয়ে ছাখ ভল্টা।'

ভল্টু মুখ কালো করে আছে দেখে সুদাম তাকে খুশি করতে চেষ্টা করে যেন। চোখ তুলে গাছের কচি তেঁতুল ছড়াগুলি দেখে। ভল্টু কিন্তু চোখ তুলল না।

'ধেৎ!' তপা ঘাড় তুলে তেঁতুলের ডাল দেখছিল। 'এবার আর তেমন কি তেঁতুল হয়েছে। গেলবারের আগের বার ঢের বেশি তেঁতুল হয়েছিল, কেমন রে ভল্টু।'

ভল্টু ঘাড় নাড়ল ও প্রসন্ন হয়ে তপার দিকে তাকাল।

'ঢের বেশি তেঁতুল এসেছিল সেবার।' কথাটা বলে ভল্টু রীতিমত হাসল ও একটা হাল্কা বিশ্বাস ফেলল। ভল্টুর কথা শুনে সুদাম মুখ কালো করে ফেলল।

'আমার ঠাকুরমা বলে তেঁতুলে বান। যে বছর তেঁতুল বেশি হবে সেবছর বন্যা হবে। গেলবারের আগের বার কত বড় বন্যা হয়ে গেল বিহারে কাগজে দেখিসনি?' তপা ভল্টুর দিকে চোখ রেখে কথা বলে, সুদামের দিকে তাকায় না। ভল্টু তৎক্ষণাৎ আবার ঘাড় কাত করে।

'কদিন ধরে তো কাগজে বন্যার খবর বেরিয়েছিল।'

'তা বিহারের বন্যার সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা কি ছিল শুনি?' সুদাম চোখ টাঁরা করে, ভল্টু না, তপাকে প্রশ্ন করল। 'তেঁতুল হয়েছিল এখানে, বাংলাদেশে—এখানে বন্যাটা হল কোথায়।'

ভল্টু এবার শব্দ করে হাসল।

'শুনলি তপা, এখন আর বাংলা বিহার বলে আলাদা কিছু আছে নাকি—সবটাই হিন্দুস্থান। এখানেও কংগ্রেস ওখানেও কংগ্রেস। এখানে তেঁতুল গাছে তেঁতুল হলে

বিহারের গাছেও তেঁতুল হবে জানা কথা। আর জলের সঙ্গে জলের যোগ আছে যখন তখন একলারসার বন্যা হলেই হল—'

'বটে।' তপা বিজ্ঞের মত মাথা নাড়ল। 'তা না হলে বিহারের বন্যায় বাংলা দেশের মানুষ চাঁদা তুলছিল কেন, তার মানে ওটা আমাদেরও বন্যা।'

সব শুনে সুধাংশু আর মাথা তুলতে পারছিল না। ভল্টু তপার মুখ দেখছিল, তপা ভল্টুর মুখ দেখছিল। সুধাংশুর অবস্থা দেখে দুজন কেউ কথা বলছিল না। কতক্ষণ সবাই চুপ করে রইল। হাবু সব শুনছিল দেখছিল। প্যাকিং বাক্স চুরি যাওয়া, কাকের বাহিনী, তেঁতুল, বন্যা এবং তারপর তারা কি নিয়ে কথা বলবে সে ভেবে ঠিক করতে পারছিল না।

কিন্তু দেখা গেল তারা তাদের কথা ঠিক খুঁজে পেয়েছে সুধাংশুর গায়ে একটা পোকা এসে উড়ে বসেছে।

তপা চেঁচিয়ে উঠল।

'শুঁয়ে পোকা—শুঁয়ে পোকা!'

'ধেৎ!' ভল্টু ঘাড় বেঁকিয়ে সুধাংশুর জামার হাতা দেখল। একটা কালো গোল পেট মোটা পোকা চুপ করে বসে আছে। পোকাটা ভাল করে দেখে ভল্টু বলল, 'ভোমরা দাঁড়া একটা মজা করা যাক।' বলে ভল্টু গলায় জড়ানো রুমালটা খুলে ফেলল। তারপর চট করে থাবা বাড়িয়ে পোকাটাকে ধরে ফেলল। পোকাটাকে ধরেই সে রুমালে জড়িয়ে ফেলল। রুমালের ভিতর দুবার ধড়ফড় করে উঠে পোকাটা স্থির হয়ে গেল। ভল্টু এবার রুমালটা তপার কানের কাছে নিয়ে গেল। তপা কান পেতে শব্দটা শুনল। চোখ বড় করে দাঁত বার করে সে নীরবে হাসছিল। অর্থাৎ রুমালে আটকান পোকার শব্দ শুনতে তার খুব মজা লাগছিল।

'আমার হাতে দে, আমার হাতে দে।' তপা হাত বাড়াতে ভল্টু রুমালটা তার হাতে দেয়। তপা রুমালটা সুধাংশুর কানের কাছে ধরল, 'শোন্ কেমন চমৎকার ঝিরঝির আওয়াজ হচ্ছে।'

তেমনি গম্ভীর থেকে সুধাংশু একটু সময় কান পেতে রইল। তারপর আস্তে আস্তে তার মুখেও হাসি ফুটল, চোখ দুটো বড় হল ও দাঁত কটা বেরিয়ে পড়ল। অর্থাৎ তপার মত সেও মজা পাচ্ছে বোঝা গেল। তপার হাত থেকে ভল্টু রুমালটা নিয়ে নিজের কানের কাছে ধরল। রুমালের ভিতরের ঝিরঝির আওয়াজ শুনে ভল্টুর চোখ বড় হল ও দাঁতগুলি খুশিতে বেরিয়ে পড়ল। তারপর সুধাংশু হাত বাড়িয়ে রুমালটা নিয়ে আবার নিজের কানের কাছে ধরল।

তিন বন্ধুর ঝগড়া তর্ক থেমে গেছে।

এখন তিন জনই খুশি। ভয়ানক মিল তাদের মধ্যে। একজনের হাত থেকে রুমাল নিয়ে আর একজন পোকার শব্দ শুনছে। যা নিজে কতক্ষণ শুনে নিয়ে আর এক-জনের কানের কাছে সেটা ধরছে। হাবু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। তপা একবার হাবুর কানের কাছে রুমালটা ধরে তাকেও শব্দটা শুনিয়ে দিল।

কলকাতার ছেলে! এমন একটা বাজে ব্যাপার নিয়ে এত আমোদ পায়, এক জায়গায় জড়ো হয়ে এত বাজে কথা বলে হাবুলের ধারণা ছিল না। আর এতটা সময় শিলচরের ছেলেরা হিন্দী সিনেমা বোমাটন বোমা, চীনের হামলা রকেট—টেস্ট খেলা কত কি নিয়ে আলোচনায় মেতে থাকত।

তবে কি তাদের এখনও তেমন বুদ্ধিশুদ্ধি হয়নি—এখনও তারা শিশু! হাবুল ভাবল। পরুক না হাউজার সার্ট, কায়দা করে চুল ছাটুক আর গলায় রুমাল বেঁধে রাখুক। শিলচরের ছেলেদের জ্ঞানবুদ্ধির তুলনায় তারা অনেক পিছিয়ে আছে।

ইতিমধ্যে ভল্টু রুমাল থেকে পোকাটাকে বার করে দিল। ভল্টুর কোলের ওপর একটু সময় নির্জীব হয়ে বসে থেকে

পোকাটা এক সময় উড়ে গেল। উড়ে যাওয়ার সময় বড় অস্পষ্ট গুনগুন শব্দ করছিল ওটা। ভল্টু তপা সুদাম হাঁ করে তাকিয়ে দেখছিল। নিম গাছের ঘন পাতার আড়ালে পোকাটা হারিয়ে যেতে তিন বন্ধু এক সঙ্গে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল। যেন তাদের খুব আফসোস হচ্ছিল ওটা চলে যাওয়াতে।

দেখতে দেখতে গাছের মাথায় সবুজে রোদটুকু নিভে গেল। কার্তিকের ছোট বেলা শেষ হয়ে কেমন যেন অন্ধকারে ভরে গেল জায়গাটা। এখান থেকে এসিড কারখানার পিছন দিকের সারি সারি জানালাগুলি চোখে পড়ে। কারখানার ভিতর ইলেকট্রিক বালবগুলি ধপ্ করে জ্বলে উঠতে দেখা গেল।

তপা তার দাদাতো ভাইয়ের দিকে তাকায়। হাবু শ্যাম-বাজার থাকে। সেখানে তার বাবা বাসা নিয়েছে। হাবু সেখান থেকে তপার কাছে আসে আড্ডা দিতে। এখনও শহরের পথঘাট সব চিনে উঠতে পারেনি। একটা বাস-এ সোজা বকুলবাগান চলে আসে। আবার সেই বাস-এ করে বাড়ি ফিরে যায়। আজ একটু অন্ধকার হয়ে যেতে তপা হাবুকে দেখল।

'চল তোকে এগিয়ে দিয়ে আসি।'

'আমি একলা যেতে পারব।' হাবু উঠে দাঁড়াল।

'না বাবা, পরে দাদাবাবু বাবীমা আমায় বকবেন: কলকাতা শহর রাতদিন অ্যাকসিডেন্ট হচ্ছে। একটা কিছু ঘটে গেলে পরে আমায় সবাই গালমন্দ করবে।'

তপার কথা শুনে ও তার চোখ মুখ দেখে হাবু মনে মনে হাসল কেমন সেয়ানা দেখাচ্ছে এখন তাকে। অথচ এই মাত্র একটা পোকা নিয়ে কী তীব্র ছেলেমানুষী করছিল সে বন্ধুদের সঙ্গে। হাবু তপার আর দুটি বন্ধুরও মুখ দেখল।

'কাল আবার চলে এসো ব্রাদার'—ভল্টু ও সুদাম একসঙ্গে বলে উঠল। 'এক সঙ্গে বসে গল্প করা যাবে।'

কথা না বলে হাবু শুধু ঘাড়টা একটু কাত করল। তারপর তপার সঙ্গে হারান মুদির দোকানের পাশ দিয়ে রাস্তায় নেমে গেল।

এবার ভল্টু সুদামের দিকে তাকাল।

'আমাকেও উঠতে হয় সুদে।'

'কোথায় যাবি?'

'ধরমতলা—সুমির উল কিনতে হবে।'

সুমি - সুষমা, ভল্টুর বোন।

'তাই যা।' সুদাম আস্তে বলল।

ভল্টু উঠল। হাতের রুমালটা ঝেড়েটেরে নিয়ে তিন ভাঁজ করে গলায় বাঁধল তারপর শিস দিতে দিতে হারান-মুদির দোকানের পাশ দিয়ে রাস্তায় নেমে গেল। এখন আরো অন্ধকার হয়ে গেছে। একলা চুপ করে সুদাম বসে রইল। বসে থেকে সে নিমগাছটা দেখছিল। গাছটাকে আর এখন গাছ মনে হচ্ছিল না পাতাগুলিকে পাতা মনে হচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল একটা খুঁটির মাথায় থোকা থোকা অন্ধকার ঝুলে আছে।

(ক্রমশঃ)

[illegible] ই পি আর.পাইলট তিন ছেলেমেয়ে – পরিমল, প্রভাবতী ও বিমল। এক পরিমল ইঞ্জিনিয়ারিং [illegible] প্রভাবতী ও বিমল এখনও প্রথম শ্রেণির বিজ্ঞান শ্রেণীতে পড়ে।

[illegible] একমাত্র পরমেশই পেশাদার রোজগেরে। তাই পরিমল তাঁর ছেলেমেয়েদের উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। তিনি বলেন, "১৯৬৯ সালে আমি যে জীবন বীমার পলিসি নিয়েছিলাম, তাতে আমি বছরে ২৫০০ টাকার [illegible] পলিসি হোল্ডার এবং আমার মৃত্যু হলে তাঁরা পাবেন ১১০ টাকা।" তিনি আরও বলেন যে, "এখন ছেলেমেয়েরা নিজের পায়ে দাঁড়াবার মত যোগ্য হয়ে উঠেছে। এ ব্যাপারে এখন আমি নিশ্চিন্ত।"

এই [illegible] ই পি আর পরিবারের কর্তা করে নিজে জানাতে চান না। কেননা, জীবন বীমা হলে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ভার [illegible] তাঁরা নিজেরাই তুলে নিতে।

ওদের ভবিষ্যতের জন্য ওদের পিতামাতার কোন দুর্ভাবনা নেই

জীবন বীমার কোন বিকল্প নেই

বিশ্বভারতী

সংকট মোচন ?

আজকের দিনে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো "মহাযুদ্ধ কি অবশ্যম্ভাবী ?" উত্তর আমেরিকার দক্ষিণ-পূর্বে ক্যারিবিয়ান সাগরে ছোট একটা দ্বীপ কিউবা। এই ছোট দ্বীপ কিউবাকে কেন্দ্র করে ঐ সবচাইতে ভয়াবহ প্রশ্নটা আবার উঁকি দিয়ে চলে গেলো ; পৃথিবী যেন আবার একটা সংকটকে পাশ কাটিয়ে নিশ্বাস ফেললো।

গত ২৪শে অক্টোবর ভারতীয় হ্যাণ্ডার্ড টাইম রাত ৭-৩০ মিনিটে—কিউবার বিরুদ্ধে মার্কিন নৌ-অবরোধ-প্রয়োগ করা হলো। আরও জানা গেলো যে প্রায় ২৫ খানা রুশ বাণিজ্য-জাহাজ কিউবার দিকে এগোচ্ছে এবং যে কোন মুহূর্তে ওগুলো মার্কিন নৌবহরের কাছে প্রথম বাধা পেতে পারে। আরও শোনা গেলো যে, বাধা পেলে কামান-বন্দুকের সাহায্যে ঐ জাহাজগুলোকে জবাব দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর আগে রাশিয়ার পক্ষ থেকে আমেরিকাকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিলো যে মার্কিন সরকারের কিউবা নীতি পৃথিবীকে পরমাণবিক যুদ্ধের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

মার্কিন সরকারের অভিযোগ ছিল যে, কিউবায় সোভিয়েট ইউনিয়ন পরমাণবিক অস্ত্র নিক্ষেপের ঘাঁটী স্থাপন করছে, যেগুলো কিউবার স্বাভাবিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় নয়। রাষ্ট্রপুঞ্জের কাছে এব্যাপারে ফটো ও অন্যান্য তথ্যাদি পেশ করে আমেরিকার পক্ষ থেকে প্রস্তাব করা হয়েছিলো যে রাষ্ট্রপুঞ্জের তত্ত্বাবধানে কিউবার আক্রমণাত্মক ঘাঁটিগুলি ভেঙে ফেলা হোক এবং আক্রমণাত্মক অস্ত্রশস্ত্র অপসারিত হোক। অবশ্য ইতিপূর্বে রাশিয়ার পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছিলো যে সোভিয়েট ইউনিয়ন কিউবায় সামরিক সরবরাহ ও সামরিক কারিগর পাঠাচ্ছে—কিন্তু সেখানে কোন ঘাঁটি গড়ছে না।

যাই হোক, আপাতত সংকট মোচন হলো। ২৭শে অক্টোবর রুশ প্রধান মন্ত্রী ক্রুশ্চেভ মার্কিন প্রেসিডেন্ট কেনেডীকে জানান আমেরিকা যদি তুরস্ক থেকে তাদের ক্ষেপনাস্ত্রগুলো সরিয়ে নেয় তবে রাশিয়া কিউবা থেকে "আপনারা আক্রমণাত্মক মনে করেন" এরূপ অস্ত্র সরিয়ে নিতে রাজি আছে। আরও জানা গেলো, ক্রুশ্চেভ কিউবাগামী সোভিয়েট জাহাজগুলোকে সাময়িকভাবে "অবরোধ এলাকা" থেকে বাইরে থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। ২৮শে অক্টোবর ক্রুশ্চেভ ঘোষণা করলেন যে, রাশিয়া কিউবায় ক্ষেপণাস্ত্রের ঘাঁটি সরিয়ে ফেলার আদেশ দিয়েছে। অপর-পক্ষে, কেনেডি স্বীকার করেছেন যে, ক্রুশ্চেভের এই সিদ্ধান্ত শান্তিরক্ষায় সহায়ক হবে।

ক্রুশ্চেভের এই সিদ্ধান্তে কিউবার প্রধান মন্ত্রী ক্যাস্ট্রো খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছেন। তিনি দাবী করেছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে জুপিটার মাঝারি উপরিভাগের নৌ-ঘাঁটি ছেড়ে দিতে হবে। তিনি রাষ্ট্রপুঞ্জের পর্যবেক্ষণে সোভিয়েট ক্ষেপনাস্ত্র ঘাঁটি ভেঙে ফেলতেও রাজী হননি। অপর পক্ষে, ৫৮ ঘন্টা স্থগিত রাখার পর আমেরিকার পক্ষ থেকে কিউবার বিরুদ্ধে আবার নৌ অবরোধ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। যাই হোক, সোভিয়েট সমর্থনের অভাবে কিউবার আস্ফালন শূন্য-গর্ভ হতে বাধ্য। গত ২রা নভেম্বর মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব

ঘোষণা করেছেন যে, আকাশ থেকে তোলা ছবি থেকে দেখা গেছে যে কিউবায় সোভিয়েট ক্ষেপনাস্ত্রের ঘাটিগুলোর বিভিন্ন অংশ খুলে ফেলা হচ্ছে।

চীন-ভারত সম্পর্ক

পশ্চিম সোলার্ধে সংঘর্ষের সম্ভাবনা আপাতত দূরীভূত হয়েছে। কিন্তু পূর্ব সোলার্ধে চীনের ভারত আক্রমণ আজ এক নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। এই আক্রমণের ফলে চীন-ভারত সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। ১৯৪৯-৫০ সালের দিকে চীন সরকার প্রধান মন্ত্রী নেহেরুকে "ইংগ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দালাল।" বলে অভিহিত করেছিল। তাদের পক্ষ থেকে আজ আবার অনুরূপ গালিগালাজ সুরু হয়েছে। "হিন্দী চীনা ভাই ভাই" শ্লোগান, যা গত কয়েক বছর উভয় দেশে মুখর হয়ে উঠেছিল, তা আজ এক নিদারুণ পরিহাসে পরিণত হয়েছে।

নিরপেক্ষ রাষ্ট্র গোষ্ঠির ভূমিকা

বর্তমান চীন-ভারত যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে নিরপেক্ষ রাষ্ট্র-গোষ্ঠির অনেকের আচরণও বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে। চীনের বিরুদ্ধে ভারত আমেরিকা, ব্রিটেন ফ্রান্স পশ্চিম জার্মানী, বেলজিয়াম, প্রভৃতি বিভিন্ন পশ্চিমী রাষ্ট্র ও ক্যানাডা, নিউজিল্যাণ্ড, থাইল্যাণ্ড প্রভৃতি কমনওয়েলথ রাষ্ট্র, ইরান, জর্ডান, তিউনিসিয়া প্রভৃতি মধ্য প্রাচ্যের রাষ্ট্রের এবং তাইল্যাণ্ড, ফিলিপাইনস প্রভৃতি আরও কিছু রাষ্ট্রের সমর্থন ও সহানুভূতি পেয়েছে। কিন্তু নিরপেক্ষ রাষ্ট্র-গোষ্ঠির অনেক প্রধান রাষ্ট্র-যাদের প্রতি ভারত সব সময়েই অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছে, তারা আজ এক অদ্ভুত নীরবতার আড়ালে আত্মগোপন করেছে। সিংহলের কোন কোন রাজনৈতিক নেতা ভারতের প্রতি সহানুভূতি জানালেও সিংহল সরকার এ যাবৎ চুপ-চাপ রয়েছেন। অনুরূপ পন্থা অবলম্বন করেছেন বার্মা ও ইন্দোনেশিয় সরকার। সম্প্রতি জাকার্তায় এসিয়ান গেমসের সময় ইন্দোনেশীয়ার ভারত বিরোধী মনোভাবের পরিচয় খানিকটা পাওয়া গেছে। কিন্তু একটা কথা মনে রাখা দরকার, বিশেষ করে বার্মার ক্ষেত্রে। বার্মা ভারত ও চীন উভয়েরই নিকট প্রতিবেশী। এই দুই শক্তিশালী প্রতিবেশীর সংঘাত থেকে বার্মার নিজেকে দূরে রাখার চেষ্টা একেবারে দুর্বোধ্য নয়। ভবিষ্যতে চীনের প্রতি আচরণে ভারতের দৃঢ়তা এই সমস্ত প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির উপরে হয়ত কিছুটা প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

কিন্তু সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর হয়েছে ঘানার প্রেসিডেন্ট নক্রুমার আচরণ। নক্রুমাকে আমরা নেহেরু সুহৃদ বলেই জানতাম। নক্রুমা খোলাখুলি ভারতের প্রতি ব্রিটিশ সাহায্যের বিরোধীতা করেছেন। আরব সাধারণতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট নাসের এক শান্তি প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন যেটা চীন বিনা ভূমিকায় প্রত্যাখ্যান করেছে। নাসের বা অন্যান্য অনেক নেতাই চীনের এই আক্রমণকারীর ভূমিকায় সোচ্চারে নিন্দা করেননি। মালয়ের প্রধান মন্ত্রী টেংকু আব্দুল রহমান এক্ষেত্রে উল্লেখ যোগ্য ব্যতিক্রম। মনে রাখা দরকার, সুয়েজ আক্রমণের সময় ভারতবর্ষ নিজের স্বার্থ উপেক্ষা করে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের কাজের নিন্দা করেছিল।

পাকিস্তান, নেপাল ও চীন

চীনারা ভারতের দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তান ও নেপালকে ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহারের ধ্বজাধারা চেষ্টা করছে। কিছুদিন আগে, কাশ্মীর সীমান্ত নিয়ে চীন ও পাকিস্তানের মধ্যে আলোচনা হবে বলে জানানো হয়েছিল। তা' ছাড়া, রাষ্ট্রপুঞ্জের অধিবেশনে পাকিস্তানের বৈদেশিক নীতির বর্ণনা প্রসঙ্গে পাক-প্রতিনিধি "এশিয়ার এই মহান প্রতিবেশী" অর্থাৎ চীনের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও বৃদ্ধি করার কথা বলেছিলেন। তবে এর ফলে হলো, আমেরিকা

ও ব্রিটেনের প্রভাবে পাকিস্তান আপাতত ভারতের বিরুদ্ধে তার ব্যবহার কিছুটা সংযত করবে কি না। পার্লামেন্টে ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী ম্যাকমিলান অনুরূপ আভাষ দিয়েছেন। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের সংবাদপত্রগুলোর সুর থেকে এখনও পাকনীতির পরিবর্তনের নির্ভরযোগ্য ইংগিত পাওয়া যায় না।

একই সময়ে, নেপাল সরকারকেও ভারত বিরোধীতার উপর অধিকতর নির্ভরশীল হতে দেখা যাচ্ছে। নেপালের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ত্রিভিক্রম সাহর পদচ্যুতি তার জায়গায় ভারত বিদ্বেষীরূপে পরিচিত তুলসী গিরির নিয়োগ, গত দশেরা উৎসব উপলক্ষে রাজা মহেন্দ্রের বিবৃতিতে ভারতের বিরুদ্ধে অপ্রাসংগিক উষ্মা, নেপালের সংবাদ পত্র ও বেতারে ভারতের বিরুদ্ধে ক্রমাগত বিষোদ্গীরণ এবং চীনের পররাষ্ট্র-মন্ত্রী চেন-ইর গত ৬ই অক্টোবরের বিবৃতি—এসবগুলো ভারতের পক্ষে অস্বস্তিকর হতে বাধ্য। জানা যায়, উক্ত বিবৃতিতে চীনের পক্ষ থেকে রাজা মহেন্দ্রকে এই বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে যে "চীন নেপালকে সাহায্য করবে। নেপালকে কোন বিদেশী শক্তি আক্রমণ করতে পারে তা অবশ্য উল্লেখ করা হয়নি। যাই হোক, এটা পরিষ্কার যে চীন পাকিস্তান ও নেপালের মধ্যে কোনরূপ ভারতবিরোধী আঁতাতে পাকিস্তান বা নেপালের কোন লাভ হবে না—পরিণামে ক্ষতিই হবে; কিন্তু এর ফলে ভারত বিব্রত হবে এবং বলা বাহুল্য, চীনও তাই চায়। এখানে একটা কথা উল্লেখযোগ্য। গত সপ্তাহ দুয়েক ধরে, বা গত ২০শে অক্টোবর চীন আক্রমণ বৃদ্ধির পর, নেপাল থেকে ভারত বিদ্বেষী কোন বিবৃতি বা বিক্ষোভ প্রদর্শনের কথা শোনা যায়নি।

রাশিয়ার মনোভাব

চীন ভারত যুদ্ধ সুরু হওয়ার পর আরও একটী রাষ্ট্রের আচরণ সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। রাষ্ট্রটি হলো রাশিয়া। আদর্শগত দিক থেকে ভারত অপেক্ষা চীনই রাশিয়ার নিকটতর হওয়ার কথা। অথচ রাশিয়া গত কয়েক বছর ভারত ও চীন উভয়কেই মিত্ররাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। একদিকে চীন রাশিয়ার কাছ থেকে প্রভূত অর্থ নৈতিক ও অন্যান্য সাহায্য পেয়ে নিজেকে শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তোলার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছে। অপর দিকে ভারতবর্ষ ও গত কয়েক বছর যাবৎ রাশিয়া ও পূর্ব-ইউরোপের অন্যান্য কয়েকটি কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের কাছ থেকে কিছুটা অর্থ নৈতিক সহযোগিতা লাভ করেছে। রাশিয়ার কাছ থেকে ভারতের মিগ বিমান লাভের সম্ভাবনা সম্প্রতি আমেরিকা, ব্রিটেন প্রভৃতি পশ্চিমী রাষ্ট্র এবং কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র আলবেনিয়ার ঠিক বিপরীত কারণে তীব্র সমালোচনার কারণ হয়েছে। তবুও ভারতবর্ষের আজ রাশিয়ার মিত্রতার ভরসা করার কারণ নেই।

প্রথমেই বলা দরকার, রাশিয়া ভারতের উত্তর সীমান্তের প্রশ্নে এ পর্যন্ত কার্যত চীনা দাবিকেই মেনে চলেছে; এ ব্যাপারে ভারত সরকার বহু চেষ্টা করেও রাশিয়ার কাছ থেকে কোন পরিষ্কার ও সন্তোষজনক উত্তর পাননি। এ ছাড়া ভারতের উত্তর সীমান্তে ২০শে অক্টোবর থেকে চীনা আক্রমণের নিন্দা করা দূরে থাকুক, রাশিয়ার কাগজগুলোতে ঐ আক্রমণের কোন উল্লেখই করা হয়নি। অপরদিকে, "প্রকৃত নিয়ন্ত্রিত সীমার" ভিত্তিতে যুদ্ধ বিরতির জন্য চীনারা ভারতের কাছে দূর্ত প্রস্তাব করেছিল' কম্যুনিষ্ট মুখপত্র প্রাভদা ও রাষ্ট্র পুঞ্জের রুশ প্রতিনিধি ও সরকারী পররাষ্ট্র মন্ত্রী জোরিন তার খুব প্রশংসা করেছেন।

কম্যুনিষ্ট শিবিরের অন্তর্দ্বন্দ্ব

এটা ঠিক যে চীন ও রাশিয়ার মধ্যে মৈত্রীতে গত কয়েক বছরে কিছুটা চাঁটা পড়ে গেছে। কম্যুনিষ্ট শিবিরের

অন্তর্দ্বন্দ্ব আজ সম্পূর্ণ উপেক্ষণীয় নয়। রুশ কম্যুনিষ্ট পার্টির বিংশতিতম অধিবেশনে এই অন্তর্দ্বন্দ্বের ইংগিত পাওয়া যায়। দ্বাবিংশতিতম অধিবেশনে এই অন্তর্দ্বন্দ্ব আরও প্রকট হয়ে পড়ে। মনে হয় এই দ্বন্দ্ব ক্রমবর্দ্ধমান। সংবাদে প্রকাশ চীন ও রাশিয়ার মধ্যে বাণিজ্য ১৯৬১ সালে অনেক কমে গেছে। ১৯৬০ সালে এই বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল প্রায় ১৪৯ কোটী রুবলস এবং ১৯৬১ সালে এটা ৮২ কোটি রুবলসে দাঁড়িয়েছে। চীনের বৃহত্তম সহর সাংহাই ও শিল্প সমৃদ্ধ সহর হারবিনে সম্প্রতি রুশ বাণিজ্যিক দূতাবাস বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তা' ছাড়া চীনের উগ্র সমর্থক কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র আলবেনিয়ার সাথে আজ রাশিয়ার কূটনৈতিক সম্বন্ধ নেই। আলবেনিয়ার কম্যুনিষ্ট মুখপাত্র 'জেরী পপুলি'-তে আজ খোলাখুলিভাবে রুশ প্রধান মন্ত্রীর বিরুদ্ধে আক্রমণ চলছে। অনুরূপ ভাবে উল্লেখযোগ্য হলো, গত ১লা অক্টোবর চীনের বর্তমান রাষ্ট্রের ত্রয়োদশ বার্ষিক উৎসবে পিকিংয়ে যাও সে-তুংয়ের পাশে কোন নেতৃস্থানীয় রুশ প্রতিনিধি ছিলেন না। ধ্বংসাতেও চৈনিক দূতাবাসের অনুষ্ঠানে কুশ্চেভ অথবা কোন প্রধান রুশ নেতা যোগ দেননি। অপর পক্ষে, যখন 'শোধনবাদী' যুগোস্লাভিয়ার প্রতি চীনের জেহাদ বেড়েই চলেছে ঠিক সেই সময় রুশ প্রেসিডেন্ট ব্রেজনেভের যুগোস্লাভিয়া ভ্রমণ নিশ্চয়ই তাৎপর্যহীন নয়।

কম্যুনিষ্ট শিবিরের অন্তর্দ্বন্দ্ব আজ অনস্বীকার্য। কিন্তু এই দ্বন্দ্বের কারণ ও তীব্রতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। মনে হয় এই দ্বন্দ্ব আজও এতটা তীব্র হয়নি যার তাগিদে রাশিয়া চীনকে বাদ দিয়ে কোন অকম্যুনিষ্ট-রাষ্ট্রকে মিত্র হিসাবে গ্রহণ করতে পারে। অন্তত পক্ষে চীন-ভারত বিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে রাশিয়ার আচরণ থেকে তারই ইংগিত পাওয়া যায়।

কলিকাতা

৪. ১১. ৬২.

শিশির কুমার ঘর

সম্পাদকীয়

চীনা কম্যুনিষ্টদের ভারত আক্রমণ

শান্তি, সহ-অবস্থান ও পঞ্চশীলের পালা কীর্তনের কপট কূটনীতির অন্তরালে গত আট বছর তিব্বতের মাটিতে বিপুল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে কম্যুনিষ্ট চীন ভারত আক্রমণ করেছে। নেফা ও লাদাক সীমান্তে প্রায় আশীহাজার সৈন্য ভারত আক্রমণ করার জন্য পাঠিয়েছে এবং হিমালয়ের অন্যান্য সীমান্তে প্রায় আরও একলক্ষ সৈন্য সমাবেশ করেছে। তিব্বতের মূলঘাটিতে প্রায় পাঁচ থেকে সাত লক্ষ চীনা কম্যুনিষ্ট ফৌজ রিজার্ভ হিসেবে মোতায়েন করা হয়েছে।

ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্বের ছলনা করে বিশ্বাসঘাতকের ন্যায় আকস্মিক এবং বিপুল শক্তি ও প্রস্তুতিতে ভারত আক্রমণের ফলে প্রাথমিক পর্যায়ে ভারতীয় জোয়ান বাহিনী অপূর্ব বীরত্বের সঙ্গে বাধা দিয়ে নেফা ও লাদাক উভয় অঞ্চলেই কয়েকটি ঘাটি পরিত্যাগ করে পশ্চাতে হটে আসতে বাধ্য হয়েছে। ভারতীয় সৈন্য সরকারী হিসাবে আড়াই হাজার এবং বেসরকারী হিসাবে তার অনেক বেশি নিহত হয়েছে কিন্তু চীনা ফৌজ নিহত হয়েছে তার অনেক বেশি। চীনা কম্যুনিষ্টরা গত আট বছর ধরে রাস্তা ঘাট, দুর্গ, বিমান ঘাটি ইত্যাদি তৈরী করে প্রস্তুত হওয়ার ফলে তারা যুদ্ধক্ষেত্র অনুযায়ী ট্রাক ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের সৈন্য বাহিনীকে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করতে সক্ষম হয়েছে। অটোম্যাটিক গান, মাউন্টেন গান, মর্টার, অ্যান্টিম্যারার ক্র্যাফ্ট এমনকি ট্যাংক পর্যন্ত ব্যবহার করেছে এবং সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করেছে আমাদের প্রায় দশগুণ বেশি। পক্ষান্তরে আমাদের জোয়ানেরা রাস্তাঘাটের অভাবে অস্ত্রশস্ত্র ও সরবরাহ পিঠে বেঁধে অনেক কম সংখ্যায় এবং মাত্র সাধারণ রাইফেল দ্বারা শত্রুকে প্রতিহত করার চেষ্টা করেছে এবং দেশরক্ষার এরূপ

প্রচেষ্টায় যে অদ্ভুত শৌর্য ও বীরত্বের পরিচয় দিয়েছে তা' সামরিক ইতিহাসে অপূর্ব।

ভারতের জাতীয় জীবনে তৃতীয় পাণিপথের পরে এরূপ সংকট দেখা দেয়নি। ইংরেজ যুদ্ধ করে ভারত দখল করেনি, কূটনৈতিক চক্রান্তের মাধ্যমে গৃহযুদ্ধ সৃষ্টি করে ভারতের ভিতর থেকে কৌশলে ভারতের উপরে আধিপত্য বিস্তার করেছে, কিন্তু এবারে এক বিরাট চীনা জাতি এবং বিরাট বাহিনী ভারত আক্রমণ করেছে। চীনা আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারতের প্রান্তে প্রান্তে যে দুর্মদ জাতীয় সংকল্প বজ্রকণ্ঠে গর্জে উঠেছে এবং যেভাবে চীনা আক্রমণ প্রতিরোধে ভারতীয় জনতা দৃঢ় পদক্ষেপে সর্বত্যাগের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে তা' থেকে ভারতীয় জনতার সংগ্রামী স্বদেশ প্রেমের এক জলন্ত ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়েছে। বস্তুত, ভারতবর্ষ কোন কালেই স্বদেশ প্রেমের আদর্শে পশ্চাদপদ হয়নি। প্রথম পাণিপথের যুদ্ধে মেয়েরা নিজেদের কেশদাম কেটে দিয়েছিল ধনুকের ছিলা তৈরী করার জন্য। তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধে বিরাট ও বিপুল মারাঠা বাহিনী বীরত্বের দিক দিয়ে পরাজিত হয়নি। পলাশীর যুদ্ধের ইতিহাসও একই রকম। প্রতিটি যুদ্ধে নেতৃত্বের বিশ্রান্তির জন্য ভারত পরাজিত হয়েছে। এবারেও সেই ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। ভারত ও চীনের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত চিরকালের স্বাধীন তিব্বতকে চীনের গ্রাসে তুলে দেওয়া হয়েছে। পঞ্চশীল ও শান্তির নামে আমাদের রাষ্ট্রনায়করা কুম্ভকর্ণের নিশ্চিন্ত নিদ্রায় বিভোর হয়েছিলেন। চীনের প্রস্তুতির কোন সংবাদ পর্যন্ত তাঁরা রাখেন নি। প্রজা-সোস্যালিষ্ট পার্টির নেতারা বরাবর চীনা কম্যুনিষ্টদের আক্রমণশীল মতলব এবং তিব্বতে সামরিক প্রস্তুতি সম্বন্ধে যথাসময়ে সাবধানবাণী উচ্চারিত করলেও আমাদের রাষ্ট্রনায়ক ও দেশরক্ষা বিভাগ তা বিশ্বাস করেনি। আমাদের দেশরক্ষা বিভাগ প্রয়োজনীয় অস্ত্র পর্যন্ত তৈরী করেনি। সরকার সমগ্র দেশকে চীনা কম্যুনিজমের বিপদ সম্বন্ধে সচেতন ও অগ্রস্তুত করে রেখেছিলেন। আজ আমাদের দেশের প্রাথমিক বিপর্যয়, লাঞ্ছনা ও অপমান এবং দেশের বীর তরুণেরা বিপুল সংখ্যায় নিহত হওয়ার জন্য দায়ী দেশরক্ষা বিভাগের অদূরদর্শী ব্যর্থ ও অযোগ্য নেতৃত্ব।

আজ দেরীতে হলেও, রাষ্ট্রপতির জরুরী অবস্থা ঘোষণা দেশকে বর্তমান সঙ্কটের গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন করেছে। আমাদের নিরপেক্ষ ও স্বাধীন বৈদেশিক নীতি রক্ষা করেও পৃথিবীর সমস্ত মৈত্রীভাবাপন্ন দেশ থেকে আধুনিক ব্যবস্থা করা হচ্ছে, এবং ভারতীয় তরুণদের জোয়ান বাহিনীতে যোগদানের আহ্বান জানান হয়েছে। কিন্তু জাতীয় প্রতিরোধের দুর্জয় সংকল্প গড়ে তুলবার জন্য আজ যে সর্বাত্মক প্রস্তুতির প্রয়োজন সেই 'টোটেল মবিলাইজেসনে'র পথে অগ্রসর হওয়া দরকার ভারত সেপথে এখনও যথাযথভাবে অগ্রসর হয়নি। চীনের সমরাস্ত্রের এবং সামরিক অভিযানের প্রধান অস্ত্র জনবল। চীনের ন্যায় জনশক্তি ভারতেরও আছে এবং পৃথিবীর মধ্যে ভারতই একমাত্র দেশ যে চীনের পিউম্যান সী ট্যাকটিকসের রণ-নীতিকে তার জনশক্তির সর্বাত্মক প্রস্তুতির দ্বারা পর্যুদস্ত করতে পারে। আজ তাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন ভারতের জনশক্তিকে জাতীয় প্রতিরোধের দুর্মদ সংকল্পে সর্বাত্মক প্রস্তুতিতে সংঘবদ্ধ করা এবং চীনা কম্যুনিষ্ট আক্রমণকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে এমন শিক্ষা দিয়ে দেওয়া, যাতে এই দেশটিকে আর কোন প্রতিবেশী কোনদিন আক্রমণ করার দুঃসাহস দেখাতে না পারে।

আমাদের আজকের জাতীয় কর্তব্য

চীনা কম্যুনিষ্ট আক্রমণকে সুনিশ্চিত ভাবে পর্যুদস্ত করার জন্য আজ আমাদের দ্বিমুখী জাতীয় কর্তব্য। আমাদের সরকার যদি অচেতনতা, অপ্রস্তুতি, দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব এবং অবাস্তব দৃষ্টির পরিচয় না দিতেন তা'হলে বর্তমানে আমাদের জাতীয় কর্তব্য হতো এক মুখী। কিন্তু সরকারী অবাবস্থিতচিত্ততার

জন্য আজ সরকারকে সচেতন করাও ভারতীয় স্বদেশপ্রেমী জনতার এক জাতীয় কর্তব্য।

সরকারের কাছে ভারতীয় জনতার দাবী : প্রথমত, দল মত নির্বিশেষে সমগ্র স্বদেশ প্রেমী ভারতীয় জনতার মনে জাতীয় প্রতিরোধের দুর্জয় সংকল্প সৃষ্টির জন্য এবং সমগ্র দেশকে সর্বাত্মক প্রস্তুতিতে সংঘবদ্ধ ও সংগ্রামী করতে তোলার জন্য বাস্তব, কার্যকরী এবং আশু কর্মসূচী গ্রহণ করা।

দ্বিতীয়ত যে ব্যক্তিটি ভারতের সামরিক অপ্রস্তুতি, অমর্যাদা, ভারতীয় জোয়ানদের মৃত্যু ও প্রাথমিক বিপর্যয়ের জন্য দায়ী সেই দেশরক্ষা মন্ত্রী কৃষ্ণ মেননকে মন্ত্রীসভার সর্ব-প্রকার দায়িত্ব থেকে অপসারিত করা। কৃষ্ণ মেননের আশু অপসারণ ভারতীয় জনতা ও জোয়ানদের মনোবল রক্ষার জন্য একান্ত প্রয়োজন।

তৃতীয়ত, তিব্বতের স্বাধীনতা স্বীকার করা এবং চীনা কম্যুনিষ্টদের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ প্রয়াসকে পর্যুদস্ত করার জন্য বিদ্রোহী ও স্বদেশ প্রেমী তিব্বতীদের সাহায্য গ্রহণ করা। চীনা কম্যুনিষ্টদের পর্যুদস্ত করার প্রধান ক্ষেত্র তিব্বত, হিমালয় নয়—লাদাখ-ই চূড়ান্ত সামরিক শক্তি দ্বন্দ্বের প্রধান ক্ষেত্র।

চতুর্থত, চীনা কম্যুনিষ্টদের ভারতীয় দোসর এদেশের কম্যুনিষ্টদের ভারতের জাতীয় প্রতিরোধ প্রচেষ্টার সমস্ত ব্যবস্থা ও সংগঠন থেকে দূরে রাখা—একদল কপটাচারী কম্যুনিষ্টদের কেতাবী ও বৌদ্ধিক জাতীয় প্রতিশ্রুতির প্রতি বিশ্বাস করে পুনরায় সর্বনাশের ক্ষেত্র প্রস্তুত না করা।

পঞ্চমত, অবিলম্বে পঁচিশ লক্ষ লাইট ইনফেন্ট্রি, গঠনের জন্য ভারতীয় নওজোয়ানদের ব্যাপকভাবে সামরিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা।

ষষ্ঠত, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং মুনাফাখোরী ও চোরা-কারবারী এবং স্বার্থপর শিল্পপতিদের সম্বন্ধে কঠোর নীতি গ্রহণ করে জনগণের, জীবিকা সংস্থানের পথ সুগম রাখা। এমন নীতি গ্রহণ করা যাতে জনসাধারণ একথা অনুভব করে যে ত্যাগ, কাঠিন্য, কৃচ্ছতা এবং কঠোর পরিশ্রম আজ সর্বস্তরে, সর্বশ্রেণীতে ও সর্বক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য।

সরকারের যুদ্ধ প্রচেষ্টা ও সামরিক প্রস্তুতির কার্যক্রম সর্বভাবে সমর্থন করা এবং জনতার মনে জাতীয় প্রতিরোধের সংকল্প ও আত্মত্যাগের আদর্শ সৃষ্টি করা এবং জাতীয়তাদ্রোহী ও অসামাজিক ব্যক্তিদের উপরে কঠোর ভাবে দৃষ্টি রাখা বেসামরিক জনতার আজ এক অপরিহার্য জাতীয় কর্তব্য। এজন্য :

প্রথমত, গ্রাম্য পঞ্চায়েত থেকে আরম্ভ করে মহকুমা ও কলকাতা পর্যন্ত সর্বত্র সর্বশ্রেণীর দল ও মতের দেশপ্রেমী ও জাতীয়তাবাদী প্রতিনিধিদের নিয়ে স্থানীয় সিভিল ডিফেন্স ক্রাট বা জাতীয় প্রতিরোধ ক্রাট গঠন করা।

দ্বিতীয়ত, প্রতি গ্রামে এবং মহকুমার প্রতি ওয়ার্ডে স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করে জোয়ান বাহিনী গঠন করা। এই জোয়ান বাহিনীকে সামরিক কুচকাওয়াজের শিক্ষা দান এবং প্রয়োজন হলে অল্প সময়ের মধ্যে এই জোয়ান বাহিনীকে হাল্কা অস্ত্রচালনার শিক্ষা দিয়ে বিরাট স্থানীয় মিলিশিয়া' গড়ে তোলা যায়।

তৃতীয়ত, প্রতি কেন্দ্রের স্থানীয় সিভিল ডিফেন্স ক্রাটের মাধ্যমে ফার্স্ট এড, নার্সিং, বমন ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা।

চতুর্থত, সামরিক প্রস্তুতির অর্থ সংগ্রহের জন্য যে ডিফেন্স বণ্ড, সেভিংস্ সার্টিফিকেট, প্রাইজ বণ্ড ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়েছে তা' ব্যাপক ভাবে প্রতি পরিবারে ক্রয় করাবার ব্যবস্থা করা। প্রতি পরিবার থেকে স্থানীয় ডিফেন্স কাজে সাহায্য করার জন্য দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করা।

পঞ্চমত, প্রতি পরিবার থেকে রক্তদানের জন্য আহ্বান জানানো,

ষষ্ঠত, প্রতিপরিবারে যাদের যাতে জোয়ানদের জন্য শীত

বন্ধ তৈরী করেন সেজন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে আহ্বান জানানো।

সপ্তমত, এন, সি, সি, ছাত্রছাত্রী ভলান্টিয়ার রাইফেলস্, টেরিটোরিয়েল আর্মী'তে যোগ দেওয়ার জন্য যুবকদের উদ্বুদ্ধ করা।

অষ্টমত, চোরাকারবার, মুনাফাখোরী ইত্যাদির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রবল জনমত গড়ে তোলা।

নবমত, অসামাজিক ব্যক্তিদের উপরে সতর্ক দৃষ্টি—রাখা এবং তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখার সামাজিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

দশমত, কম্যুনিষ্ট পার্টির ন্যায় জাতীয়তাদ্রোহী এবং চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির ভারতীয় দোসরদের কার্যকলাপের প্রতি এবং তাদের চলাচলের প্রতি সতর্ক নজর রাখা যেন তারা কোন নাশকতা মূলক কাজ না করতে পারে। সর্বত্র জনমত সৃষ্টি করে কম্যুনিষ্টদের ন্যায় চীনা পঞ্চমবাহিনীকে জন সমাজে এক ঘরে করে রাখা। যে কেউ কোন নাশকতা মূলক কাজ করলে তৎক্ষণাৎ তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

একাদশমত, সর্বত্র গুজব বন্ধ করা, জনতার মনোবল রক্ষা করা, কোনভাবে যাতে দলের মধ্যে বিভ্রান্তি না হয় সেজন্য সর্বত্র যারে যারে জনসভা করা', পুস্তিকা বাহির করা, এবং প্রচার পত্র প্রকাশ করা।

কম্যুনিষ্ট পার্টির দুই মুখ

চীনা আক্রমণ নিয়ে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যে দুইটি 'লাইন' বা বক্তব্য তৈরী হয়েছে। ডাঙ্গে প্রমুখ দল চীনা আক্রমণের বিরুদ্ধে যে উক্তি করেছেন চীনাপন্থী বাংলা কম্যুনিষ্টরা সেরূপ উক্তি করেন নি। কিন্তু রাশিয়ার প্রস্তাব, প্রাভদার বক্তব্য, চীনের প্রতি রাশিয়ার নৈতিক সমর্থন জ্ঞাপন, ভারতকে অস্ত্রদানে অস্বীকৃতি এবং দু-এন-লাইয়ের প্রস্তাবকে 'গঠনমূলক' ও 'আন্তরিক' আখ্যা দেওয়ার পরে, বস্তুত পক্ষে 'ডাঙ্গে লাইন' ও 'জ্যোতিবসু লাইনের' মধ্যে আর কোন বিশেষ পার্থক্য থাকার কারণ নেই। ডাঙ্গে কূটনৈতিক কৌশলে আত্মরক্ষার জন্য জাতীয়তাবাদী উক্তি শুনিয়ে 'ধরি-মাছ-না-ছুঁই-পানি'র নীতি গ্রহণ করে, অবস্থা আরও গুরুতর হলে, সর্বক্ষেত্রে সহযোগী কম্যুনিষ্টরা যে পথ নিয়ে থাকে সে পন্থার অপেক্ষমান অনুসারী। পক্ষান্তরে সীমান্তবর্তী প্রদেশের পার্টি হওয়ার ফলে, বাংলা পার্টি কোনমতেই চীনকে আক্রমণ-কারী বলতে রাজী নয়,- এবং চীন যদি আরও অগ্রসর হয় তা' হলে চীনা কমরেডদের সহায়তায় কম্যুনিজমের 'মুক্তিযুদ্ধে' সক্রিয় হওয়ার নীতির অনুযায়ী বর্তমানে আশু কংকৌশল নিয়ে ডাঙ্গে ও চীনাপন্থী কম্যুনিষ্টদের মধ্যে সামান্য পার্থক্য থাকলেও অবস্থা আরও গুরুতর পর্যায়ে উপস্থিত হলে দুই পন্থী কমরেডরাই যে এক হয়ে কম্যুনিজমের লড়াই শুরু করার চেষ্টা করবে সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র বিভ্রান্তি ইতস্ততা ও দ্বিধা থাকলে ভারত এক মারাত্মক ভুল করবে। পিছনে তথা দেশের অভ্যন্তরে প্রকাশ বা প্রচ্ছন্ন শত্রু রেখে শত্রুর সম্মুখীন হওয়ার অর্থ পিছনের ছুরিকাঘাতে পরাজয়ের পথ প্রস্তুত করা—ভারতের সচেতন জনতা, সরকার বা দেশবাসীকে এরূপ ভুল পথে নিশ্চয়ই অগ্রসর হতে দেবে না।

আচার্য বিনোবা ভাবে অত্যন্ত যথার্থহীন ভাষায় বলেছেন যে চীনের উদ্দেশ্য শুধু ভারত দখল করা নয়,—ভারতে কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠা করাই চীনের উদ্দেশ্য, তাই ভারত ও চীনের যুদ্ধ গণতন্ত্র বনাম কম্যুনিজমের সংঘাত। সুতরাং শেষ পর্যায়ে যে চীন ও ভারতের কম্যুনিষ্টরা এই আদর্শগত লড়াইয়ে পরস্পর হাত মিলাবে সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। পৃথিবীতে এক কম্যুনিষ্ট অরেক কম্যুনিষ্টের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে এমন একটি দৃষ্টান্তও নেই। তাছাড়া সে যুদ্ধের বিরুদ্ধে লড়াই করবে, এরূপ বিভ্রান্তির স্থান দেওয়া উচিত নয়। যুদ্ধের সময়ে রাতারাতি কেউ ভোল

পালটিয়ে যদি কেতাবী বুলি এবং যৌথিক ভাষণে দেশপ্রেমের ও দেশরক্ষার কথা বলে সে কথার উপরে কোন গুরুত্ব না দিয়ে জাতীয়তাদ্রোহী কম্যুনিষ্টদের সম্বন্ধে সতর্ক হয়ে ঘোষণাযুক্ত নীতি গ্রহণে নিশ্চয়ই ভারতীয় জনতা ও সরকার ভুল করবে না।

সুরেন্দ্রনাথ সেন

খ্যাতনামা ইতিহাসবিদ ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন ৭২ বছর বয়সে লোকান্তরিত হয়েছেন। দারিদ্র-কবলিত বাল্যকাল থেকে সুরু করে প্রতিষ্ঠার পরিণতি পর্যন্ত ধাপে ধাপে সুরেন্দ্রনাথ আত্মপ্রত্যয়, অধ্যবসায় ও প্রতিভাবলে দেশে শীর্ষস্থানীয় পণ্ডিতদের অন্যতমরূপে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। বরিশালের ঋষি অশ্বিনীকুমার দত্তের প্রভাবে সুরেন্দ্রনাথের কৈশোর যাপনে সরল, অনাড়ম্বর ও নিষ্ঠাবান জীবনের যে আদর্শ স্থাপিত হয়েছিল, সারাজীবন সেই আদর্শকে তিনি সানন্দে বহন করে গেছেন। এই মনীষীর ইংরাজী ও বাংলায় রচিত ইতিহাস-গ্রন্থ, বিশেষভাবে মারাঠা ইতিহাসে তাঁর সর্বজনস্বীকৃত অপ্রতিদ্বন্দ্বী পাণ্ডিত্য তাঁকে অমরত্ব দান করে রাখবে। তাঁর ইংরাজীভাষায় 'ছত্রপতি শিবাজী' 'মারাঠীদের-শাসনপ্রণালী' 'মারাঠীদের যুদ্ধপ্রণালী' এবং 'শিবাজী জীবন সম্বন্ধে বিদেশী গ্রন্থকারগণ' এবং বাংলা ভাষায় 'অশোক' 'হিন্দু গৌরবের শেষ অধ্যায়' 'পেশোবাদিগের রাষ্ট্র শাসন পদ্ধতি' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

অল ইণ্ডিয়া রেডিও

আকাশবাণী সম্বন্ধে নানা সময়ে নানা অভিযোগ শোনা গেছে তাদের মধ্যে প্রশাসনিক ও অনুষ্ঠানসূচীগত অভিযোগের সংখ্যাই বেশী। কিন্তু চীনের ভারত আক্রমণের পর আকাশবাণীর বিরুদ্ধে আরও গুরুতর অভিযোগের কারণ ঘটেছে। চীনা আক্রমণ সংক্রান্ত সীমান্তের ও আভ্যন্তরীণ সংবাদ পরিবেশনে শত্রুপ্রতিরোধে অনমনীয় দৃঢ়তা ব্যঞ্জনার বিলক্ষণ অভাব রয়েছে। সংবাদ পরিবেশিত হয় অত্যন্ত মামুলী, গতানুগতিক ও যান্ত্রিক মনোভাব নিয়ে, যা শ্রোতাকে স্পর্শ ও উদ্বুদ্ধ করে শত্রু প্রতিরোধে মানসিকতা তৈরীর সহায়ক হয় না। অনেক সময় শত্রুর স্বপক্ষে প্রচ্ছন্ন ইসারা সংবাদের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে দেখা গেছে। বাংলাদেশের চীনপন্থী এক কম্যুনিষ্ট নেতার বিবৃতি সাড়ম্বরে প্রচার করে আকাশবাণী সেই অশুভ ইঙ্গিত দিয়েছে। তাছাড়া দেশপ্রেম সম্বলিত গানের মূর্ছনা দেশপ্রেমের, জাতির গৌরবের গৌরবগাথা রেডিও থেকে অবিরত ধারায় প্রচারিত হওয়া উচিত। এই সঙ্কট সময়ে অল ইণ্ডিয়া রেডিওর প্রতি স্তরের দায়িত্ব পরীক্ষিত দেশপ্রেমিকদের ওপর রয়েছে কিনা সে সম্পর্কে ভারত সরকারকে সময় থাকতে সতর্ক হবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

হরেন্দ্রনাথ স্মৃতি

হাওড়ার অবিসম্বাদী জননেতা ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অন্যতম সহযোগীদের অন্যতম হরেন্দ্রনাথ ঘোষের মর্মরমূর্তি গত ২১শে অক্টোবর আজাদহিন্দ দিবসে হাওড়া শহরে উন্মোচিত হয়েছে। এই উন্মোচন সভায় সভানেত্রীত্ব করেন নেতাজীর ঘনিষ্ঠ সহযোগী শ্রীযুক্তা লীলা রায় ও মর্মরমূর্তি উন্মোচন করেন অগ্নিযুগের বিপ্লবী নেতা ও নেতাজীর অন্যতম সহকর্মী শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ। নেতাজী যেদিন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে স্বাধীন ভারত সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ঠিক সেই দিনটিতে হরেন্দ্রনাথের মর্মরমূর্তি উন্মোচন করে তার জীবনাদর্শকে যথাযথ সম্মান দেওয়া হয়েছে। হরেন্দ্রনাথের অনুগামীদেরও এই জাতীয় প্রচেষ্টার জন্য আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

অগ্রহায়ণ ১৩৬৯
৮ম সংখ্যা - ২৭ বর্ষ

বিবাহ ও পরিবারের ক্রমবিকাশ

অনিলচন্দ্র রায়

(গ) নিকটাত্মীয় সঙ্গমের কুফল অনুমান হইতে মর্গানী থিওরির সমর্থন হয় না :

গোষ্ঠীপ্রথার আলোচনায় একটি কথা বাকি রহিল। এই প্রথা কেন মানব সমাজে উদ্ভূত হইল? এই প্রশ্নের জবাবে মর্গান-এঙ্গেলস্ বলেন, নিকটাত্মীয় সঙ্গমের (inbreeding) কুফল দেখিয়া অসভ্য মানুষ এই গোষ্ঠী প্রথার উদ্ভাবন করিয়াছে। মর্গানের ভাষায় এই গোষ্ঠীপ্রথার প্রচলন একটা বৈপ্লবিক এবং রীতিমত সমাজ-সংগঠনী আন্দোলন। তাঁর কথায় ইহা হইল "a great upward movement (495, "an unconscious reformatory movement, "observation ও "experiment" (493-4) হইতেই ইহার কুফল সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়াছিল অসভ্য মানুষের।

এখানে তিনটী প্রশ্ন স্বভাবতই উঠিবে : (ক) নিকটাত্মীয় সঙ্গম সত্যি সত্যি অনিষ্টকর কিনা (খ) কুফল সম্বন্ধে অসভ্য মানুষ জানিতে পারিল কি রূপে (গ) পৃথিবীর সর্বত্রই বা সব জাতি একই প্রকারের পুনালুয়া ধরণের বিবাহ ও পরিবার ও মাতৃগোষ্ঠী সৃষ্টি করিল কেন ও কি রূপে!

মর্গান নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে এই গোষ্ঠী-প্রথাটী অত্যন্ত জটিল এবং সহজ বুদ্ধিতে প্রাকৃত মানুষের মাথায় এ বুদ্ধি আসিতে পারে না। এত বড় একটা আমূল পরিবর্তন কৃত্রিমভাবে সাধন করা খুবই কঠিন, প্রায় অসম্ভবও বলা চলে। উহা তো যৌন জীবনের ব্যাপারে কিছু সামান্য অদল বদল নয়; মানুষের সহিত মানুষের সমস্ত সম্পর্ক, আত্মীয়তাবোধ, সম্পত্তি-প্রথা, আচার, অনুষ্ঠান, ধর্ম, যুদ্ধবিরোধ, মৈত্রী, এই সমস্ত কিছুরই একটা আমূল বিপ্লব ঘটাইয়া ফেলা হইল এই প্রথা দ্বারা। তা[illegible] নিজেই স্বীকার করিয়াছেন : "To effect the exclu[illegible]

of the one class & the retention of the other class was a difficult procedure, because it involved a radical change in the composition of the family, not to say in the ancient plan of the domestic life," (433-4).

ইহা ছাড়া শুধু যৌনজীবনের ক্ষেত্রেও এই পুনালুয়া বিবাহের আমদানীও কিছু সহজ ছিল না। পূর্বতরে মানুষ সমশোনিত পরিবার ও বিবাহে অভ্যস্ত ছিল। ভাই-বোনে এবং অন্যান্য সব আত্মীয়স্বজনের মধ্যে অবাধভাবে যৌথ প্রণালীর যৌনসঙ্গম তখন চলিয়াছে। এই রীতি ও জীবন যাপন তাহাদের কাছে অত্যন্ত স্বাভাবিক। আর এই যৌন সম্ভোগের ব্যাপক ক্ষেত্রে নির্বাধ অধিকার ত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয় তৃপ্তির সুযোগকে বর্জন করিয়া পুনালুয়া পরিবার ও গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করা তাহাদের পক্ষে কঠিন ছিল। মর্গানও এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন— " It also required the surrender of a privilege which savges would be slow to make" (Morgan 535) এই পরিবর্তনে তাহাদের হাজার হাজার বৎসরের অভ্যস্ত জীবনযাপন, অনুষ্ঠান, আচারব্যবহার ধর্ম, অর্থনীতি, ইত্যাদি সব কিছু ভাঙিয়া চুরিয়া নতুন করিয়া চালিয়া সাজা হইল। এই দুরূহ জটীল কাজ কী করিয়া সম্ভব হইল? মর্গান ইহার উত্তর দুই রকমে দিয়াছেন। একবার বলিয়াছেন, একটা অচেতন প্রক্রিয়ার বশবর্তী হইয়া অসভ্য ইহা করিয়াছে। সমাজবিবর্তন ধাপের পর ধাপ পার হইয়া অন্তর্নিহিত বেগে কল্যাণের পথে চলিয়াছে। সেই অন্তর্নিহিত কল্যাণশক্তির বশেই মানুষ অজ্ঞাতে ইহা করিয়াছে। আবার অন্যত্র নিকটাত্মীয় বিবাহের 'evil effects' দেখিয়া এবং পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের সাহায্যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া সচেতন ভাবে এই সমাজসংস্কার বা বিপ্লব তাহারা সম্পন্ন করিয়াছে। এই দুইটী উক্তি পরস্পর বিরোধী এবং কী করিয়া দুইটি প্রক্রিয়ার কথাই মর্গান বলিলেন তাহা বোঝা দুষ্কর।

দ্বিতীয়তঃ আধুনিক জীবতত্ত্বের এমন কোন স্পষ্ট সিদ্ধান্ত নাই যাহাতে জোর করিয়া বলা চলে যে নিকটাত্মীয়-বিবাহ অনিষ্টজনক। অনেক ডাক্তার বা বৈজ্ঞানিক অবশ্য এই প্রচলিত ধারণার সমর্থন করিয়া মতপ্রকাশ করিয়া থাকেন যে নিকটাত্মীয়বিবাহের ফলে সন্তান মূক ও বধীর হয়। কেউ মনে করেন জড়বুদ্ধি (Idiot) সন্তানও ইহার ফলে হয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ সন্ধান ও গবেষণা করিয়া ইহার কোন প্রমাণ পান নাই। জননবিদ্যা বা genetics হইতেও ইহার কোন সমর্থন পাওয়া যায় নাই। ত্রিকন্ট অন্যান্য অনেক বিষয়েই মর্গানী মতের সমর্থক। কিন্তু এ বিষয়ে তিনিও মর্গানী-মতের সম্পূর্ণ বিরোধী মত পোষণ করেন। পুরোণো কালের এই সব অপ্রমাণিত মতবাদ সম্বন্ধে তিনি বলেন—"It was seriously supposed by all the older theorists before the rise of scientific anthropology, that our savage ancestors, having noticed the deleterious affects of inbreeding on the population, had passed a resolution to put a stop to the practice (72 Briffault)

নিকটাত্মীয় বিবাহ ভালো কি মন্দ তাহা সঠিক বলা সম্ভব নয় এখন পর্যন্ত। অন্তত: বিজ্ঞান আজ পর্যন্ত এ সম্বন্ধে কোন রায় দিতে পারে নাই। বিষয়টি অত্যন্ত জটিল। নানাপ্রকার তথ্য-সংগ্রহ হেতু ক্রমে আরো জটিল হইয়া উঠিয়াছে। আমরা শুধু এই দিকটার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি যে, যে-বিষয়ে বিজ্ঞান আজো স্থির নিশ্চয় হইতে পারিতেছে না, সে-বিষয় সম্বন্ধে অসভ্যেরা হাজার হাজার বছর আগে কী করিয়া নিশ্চিত ও দৃঢ়মত হইল তাহা দুর্বোধ্য। বিশেষতঃ যখন আদতেই নিকটাত্মীয়বিবাহ ক্ষতিকর কিনা সন্দেহ রহিয়াছে।

তারপর আরো একটী বিষয় বিবেচনা করিলে মর্গানী ব্যাখ্যা যে ভিত্তিহীন নিকটাত্মীয়সঙ্গম নিষেধ করাই যে গোষ্ঠিপ্রথার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে তাহা বোঝা যায়। মর্গান বলেন পুনালুয়া ও গোষ্ঠিপ্রথা নিকটাত্মীয়সঙ্গম বর্জনের জন্যই প্রবর্তিত হইয়াছিল। এঙ্গেলসও এই মতের প্রচারক। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গোষ্ঠীপ্রথায় নিকটাত্মীয়বিবাহ বারণ মোটেই হয় না শুধু তাই নয়, আরো বেশী নিকটাত্মীয় বিবাহ ইহাতে সমর্থিত ও প্রচলিত হয়। বরং বহু দূরসম্পর্কিত আত্মীয়ের সহিত বিবাহই ইহাতে বারণ হয়। মর্গানের বহির্বিবাহী গোষ্ঠি-প্রথায় পিতা ও কন্যার বিবাহ সম্ভব হয়, মাতৃক্রমী গোষ্ঠিতে। আবার পিতৃক্রমী গোষ্ঠিতে মাতা পুত্রে বিবাহ আইনসঙ্গত হইয়া দাঁড়ায়। অথচ মর্গান বলিতে চাহেন যে সন্তানে-পিতামাতায় বিবাহ গোষ্ঠিপ্রথা প্রচলনের দীর্ঘকাল পূর্বেই সমাজে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। দূরসম্পর্কিত ভাইবোনেও বিবাহ বন্ধ করিবার জন্য গোষ্ঠিপ্রথা প্রচলন করা হইল, অথচ পিতামাতার সহিত যৌনসঙ্গম বারণ হয় না! ইহাতে একদিকে যেমন মর্গানের অসঙ্গতি বাহির হইয়া তাঁহার মতের অসারতা প্রমাণ হয়, অন্যদিকে স্পষ্ট হইয়া ওঠে এই কথা যে গোষ্ঠির উদ্ভব এভাবে হয় নাই।

সমশোনিতের স্তরে ভাইবোনবিবাহ ছিল সাধারণ প্রচলিত প্রথা। এই ভাইবোনবিবাহ বারণের জন্যই 'পুনালুয়ার' প্রবর্তন। এই সমশোনিত বিবাহ নামক কল্পিত স্তরটি যে একেবারে ভিত্তিহীন তাহাপূর্বে দেখান হইয়াছে। এখন শুধু ত্রিফ-টের একটী মত উদ্ধৃত করিতেছি। ত্রিফণ্টের মতে ভাইবোন বিবাহ কোনকালেই প্রচলন ছিলনা। এবং মাতাপুত্র বিবাহও কোনদিনই কোন সমাজে চল ছিল না। শুধু তাই নয়, এই দুই প্রথা কোনদিন চল থাকিতে পারেই না। একান্ত অসম্ভব। ত্রিফণ্টের যুক্তি হইল এই যে ভাইবোন বিবাহ হইলে তাহার ফলে পুরুষ প্রাধান্যই সমাজে চল হইত এবং পিতৃক্রমী পরিবারই তাহা হইলে আদিম স্তরে প্রবর্তিত হইত। কিন্তু ত্রিফণ্টের মূল মতবাদই এই যে মাতৃ-ক্রমী পরিবারই আদিকালের প্রতিষ্ঠান। তেমনি মাতার সহিত সন্তানের যৌনসঙ্গমও এত অস্বাভাবিক এবং নানা কারণে এত অসম্ভব যে এটাও কোন স্তরে প্রচলিত ছিল কল্পনা করা অনুচিত। দেখা যাইতেছে যে মর্গান যে ছক কল্পনা করিয়া পর পর যে-সব ধাপ নির্দেশ করিয়াছেন তাহা ত্রিফণ্টের মত আধা-সমর্থকও খণ্ডন করিতেছেন। আর ভাইবোনবিবাহ বারণার্থ পুনালুয়া ও গোষ্ঠিপ্রথা প্রবর্তন ও ধীরে ধীরে ইহার প্রচলন, এই সমস্ত কল্পনাটীই বাতিল হইতেছে। ত্রিফণ্ট ভাইবোন বিবাহ স্তরই মানেন না, কাজেই মর্গানী ছকও বাতিল হয়। এদিকে দূর সম্পর্কের জ্ঞাতি ভাইবোনেরও বিবাহ বন্ধ। কিন্তু গোষ্ঠিতে আপন পিসতুত মামাতো ভাইবোনের বিবাহও আইনসঙ্গত। তাই নয়, দেখা যায় কোন কোন অসভ্যদের মধ্যে মামাত-পিসতুত ভাইবোন বিবাহ প্রশংসনীয় এবং অন্য সম্পর্কে বিবাহ হইতেও অধিক কাম্য (preferential) মনে করা হয়। খুড়তুত মাসতুত ভাইবোনে (paralellel cousins) ও বিবাহ চলিতে পারে গোষ্ঠিপ্রথায়। মাতৃক্রমী কোন ত্রিপক্ষীয়সমাজ (Tripartite) দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। 'ক' 'খ' ও 'গ' এই তিনটী গোষ্ঠী সমাজের অন্তর্ভুক্ত। 'ক' গোষ্ঠিভুক্ত দুই ভাই 'খ' ও 'গ' দুই গোষ্ঠিভুক্ত দুইটী কন্যাকে বিবাহ করিলে দুই ভাইয়ের ছেলেমেয়েদের পরস্পর বিবাহ হইবার কোন নিষেধ এই ব্যবস্থায় নাই। এ ক্ষেত্রে খুড়তুত জ্যেঠাতুত ভাইবোনেবিবাহ আইনসঙ্গত হয়।

এইসব দৃষ্টান্তে প্রমাণ হয় যে গোষ্ঠিপ্রথার আসলে কিন্তু নিকটাত্মীয় বিবাহ বারণ হয় না। মাত্র কয়েকটী বিশেষ নির্দিষ্ট সম্পর্কে বিবাহ বারণ হয়। মর্গানের গোষ্ঠি সম্বন্ধে ব্যাখ্যা ইহাতে ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। মর্গানের চোখে কিন্তু এই ত্রুটি ধরা পড়ে নাই। এঙ্গেলসও এই ত্রুটীকে এড়াইয়া গিয়াছেন। "obscure impulse" ইত্যাদি বলিয়া একটা অন্ধ— কিন্তু

উদ্দেশ্যমূলক ও হিতকারী দুর্বোধ্য বৃত্তির দোহাই দিয়াছেন কিন্তু ইহাতেও যে গোষ্ঠীর ব্যাখ্যা হয় না তাহা লক্ষ্য করেন নাই।

Wundtও এই গুরুতর ত্রুটীর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিয়াছেন, এ প্রথায় রক্তসম্পর্কে নিকটাত্মীয়দের বিবাহ বারণ হয় না, 'does not involve an incersed restriction of marriage between relatives, but marks.... a retrogression in the sense of a reapproach to endogamy' (153, Wundt)

তাহা ছাড়াও সমস্ত ব্যাখ্যাটাই অবাস্তব। সচেতনভাবে অসভ্যরা কুফল দেখিয়া এই প্রথার প্রবর্তন করিল এই যুক্তিবাদী বা rationalistic ব্যাখ্যা আজিকার দিনে কেহই স্বীকার করে না। ব্রিফল্টের মত পূর্বে উদ্ধৃত করা হইয়াছে; Wundtও এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিয়া বলেন যে প্রথার প্রবর্তন না হইলে ফল—সুফল হোক্, কুফল হোক্—সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা হইবে কী করিয়া? "These effects are never foreseen but are recognised in their full import only after they have taken place" (152, Wundt)

সর্বশেষে, পৃথিবীর সর্বত্রই একইরূপের অনিবার্য বিবাহ-ক্রম অসভ্যসমাজে প্রবর্তন করিয়াছে একথা বলিলে স্বভাবতঃই ক্রমবিকাশের একটা অনিবার্য রৈখিক (Linear) ধারা স্বীকার করিয়া লইতে হয়। মর্গানী মতবাদ এই ধরণের একরৈখিক ক্রমবিকাশের উপরই দাঁড়াইয়া আছে। এই এক রৈখিক বিবর্তন যে আধুনিক বিজ্ঞানীগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত তাহা পূর্বে দেখান হইয়াছে। এই মতের পিছনে যে দুনিবার, অনন্ত প্রগতির কল্পনা রহিয়াছে তাহাও অবৈজ্ঞানিক। তাই সমাজকল্যাণমূলক অন্ধ বৃত্তির অস্পষ্ট তাগিদের বশে অসভ্য মানুষ স্তরের পর স্তর কয়েকটি নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মধ্যদিয়া সমাজকে পিতৃক্রমী পরিবারের দিকে লইয়া চলিয়াছে মর্গানী মতের এই মূলসূত্রই আজ প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে।

ঘ পিতৃক্রমী পরবর্তী স্তর. এমত কুল :

পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে যে অর্থনীতির সহিত পরিবারের, সম্পত্তির উত্তরাধিকারের সহিত বংশক্রম (rule of descent) প্রথার কিছু সহসম্পর্ক (correlation) রহিয়াছে। কিন্তু তাহা আংশিকমাত্র। বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায়, অর্থনীতি ও বংশক্রম তত্ত্ব সঙ্গে একই ধারায় চলে না। মাতৃনামী হইলেও হিদাৎসা ও ক্রোদের মধ্যে সম্পত্তির উত্তরাধিকার কিছু মাতৃক্রম অনুসরণ করিয়া এবং কিছু পিতৃক্রম অনুসরণ করিয়া চলে। আবার পিতৃনামী 'ওয়ারামুঙ্গা'দের সম্পত্তি মাতৃক্রম অনুসরণ করে। সম্পত্তি প্রথাই যদি বংশ-ক্রমকে ষোলআনা নিয়ন্ত্রণ করিত তাহা হইলে এরকম হইতে পারিত না। এই কারণে বহুবাদী ব্যাখ্যাই বৈজ্ঞানিক। পূর্বেও গোষ্ঠীর উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে এই কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাও দেখান হইয়াছে নানা শক্তি ও অবস্থার সমবায়ে বংশক্রমের উদ্ভব হইয়া থাকে। এখানে সম্পত্তির প্রভাবের সহিত বংশক্রমের সম্পর্ক কিছু আলোচনা করা যাইতেছে।

সম্পত্তির একটা প্রভাব সমাজে আছেই। সব অবস্থায়ই কমবেশী কিছু প্রভাব পরিবার ও যৌনজীবনকেও ইহা করিতেছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু সম্পত্তি কতটুকু প্রভাব কখন কোন্ প্রথাকে করিতেছে তাহা সেই ব্যাপারের সহিত সংশ্লিষ্ট কার্য্যকারণের বাস্তব সন্নিবেশ বিচার করিয়া বাহির করিতে হইবে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই স্বতন্ত্র অনুসন্ধান দরকার এজন্য। কোন ছক পূর্ব হইতেই ঠিক করিয়া কোন একটী শক্তিকে আত্যন্তিক ও absolute কারণ স্থির করিয়া গবেষণা চালাইলে গোড়াতেই ভুল থাকিয়া যাইবে। বহু-বাদী ইতিহাস ব্যাখ্যা তাহাই বলে। সম্পত্তির প্রভাব কোন

অবস্থায় কী ভাবে রূপান্তরিত হইতে পারে, তাহা আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানীর বিস্তৃত ও সূক্ষ্ম আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহারাও বহুধারা দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিচার করিয়াছেন এবং সম্পত্তির সহিত বংশক্রমের প্রকৃত সম্পর্ক নির্ধারণের চেষ্টা করিয়াছেন।

আদিম জাতিগুলির মধ্যে সম্পত্তি প্রথম অবস্থায় খুব বেশী কিছু ছিল না। পরে সম্পত্তি যখন বিশেষভাবে সৃষ্ট হইতে লাগিল তখন তাহার প্রভাব কী ধরণের হইতে পারে তাহাই বিবেচ্য। যে জাতিতে দোষ্টি প্রথা নাই সে জাতির মধ্যে সম্পত্তি সৃষ্ট হইলে, হয় পিতৃক্রম নয়তো মাতৃক্রম একদিকে জোর পড়িবেই। কোন এক ধারা বাহিয়া সম্পত্তি অবতরণ করিবেই। হয় পিতা হইতে পুত্রে নয় মাতা হইতে কন্যায় সম্পত্তির উত্তরাধিকার বর্তাইবে। কিংবা মিশ্রপদ্ধতিতে কিছু সম্পত্তি পিতৃধারায় অন্তত সম্পত্তি মাতৃধারায় যাইবে: মর্গানী মতে, এই তিন ধারার মধ্যে শুধু একটি ধারায়ই সম্পত্তি যাইতে পারে, সম্পত্তি বেশী হইলেই তাহা পিতৃধারায় পুত্রে বর্তাইবে। এই মতের সমর্থনে কোন প্রমাণ নাই। বহু দৃষ্টান্ত রহিয়াছে যে সব ক্ষেত্রে এই রকম হয় না। মাতৃক্রমকে পিতৃক্রমে পরিবর্তন করাই সম্পত্তির একমাত্র ফল বা প্রভাব, ইহা বলা চলেই না। মাতৃক্রমকে কখনো পিতৃক্রমে পরিণত করিতে পারে না, এমনও নয়। কিন্তু সর্বদাই এই পরিণতই হইবে, এমন কোন অনিবার্যতা নাই।

উত্তর আরিজোনাবাসী (Arizona. নেভাহো জাতি মাতৃক্রমী। তাদের মধ্যে পশুপালন দ্বারা সমৃদ্ধি বাড়িল এবং পুরুষেরাই পশুপালনের কর্তা। এক্ষেত্রে কিন্তু সম্পত্তি বৃদ্ধিহেতু পিতৃক্রম উদ্ভব হইল না। নেভাহো জাতি মাতৃক্রমীই রহিয়া গেল। হিদাৎসা এবং ক্রো জাতিও মাতৃক্রমী। ইহাদের মধ্যে ঘোড়ার প্রচলন হওয়ায় সম্পত্তি ব্যবস্থার গুরুতর পরিবর্তন ঘটিয়া গেল কিন্তু তাহাদের মধ্যে পূর্বের প্রথা মাতৃক্রমই চলিতেছে।

আর একটী বিষয় লক্ষ্য করা প্রয়োজন। কোন কোন অসভ্য জাতি সাধারণতঃ এত গরীব এবং তাহাদের সম্পত্তি মূল্যপাত্র এত যৎসামান্য যে তাহাদের বেলায় সম্পত্তিপ্রভাবে পিতৃক্রমের প্রবর্তন হইবার কথা বলা একেবারে অর্থহীন হইয়া পড়ে। মর্গান বলেন যে, সন্তানকে সম্পত্তির অধিকারী করিবার আগ্রহ ও পিতৃস্নেহের বশবর্তী হইয়াই পুরুষ পিতৃক্রমের প্রচলন করিয়াছে। যে সব জাতি অত্যন্ত বিত্তহীন তাহাদের বেলায় পিতার পক্ষে সন্তান বঞ্চিত হইবার দুশ্চিন্তা ও আশঙ্কা অবান্তর। কারণ তাহাদের বেলায় উত্তরাধিকার এমন একটা গুরুতর ব্যাপার কিছু নয় যাতে সমস্ত যৌন, পারিবারিক, ধর্মীয় ইত্যাদি সামাজিক জীবনের সকলদিকে একটা বিপ্লব সাধনের প্রয়োজন বোধ এত উগ্র হইয়া উঠিবে। এসব ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক প্রভাবের দোহাই দিতে বাধ্য হইয়াছেন মর্গান। পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে! এই দোহাই দেওয়ার কোন সঙ্গত যুক্তি নাই। ইরোকোয়া, হোপীরা অর্থনৈতিক প্রভাবে পরিবর্তিত থাকিয়াও মাতৃক্রম ছাড়ে নাই। প্রকৃতপক্ষে সকল ক্ষেত্রে সম্পত্তির প্রভাবে বংশক্রম ব্যাখ্যাত হয় না।

সভ্যতার বিশেষ একটা স্তরের সহিত মাতৃক্রমের সম্বন্ধ একেবারে অচ্ছেদ্য বলিয়া মর্গানীরা বলেন। বন্যযুগের ও বর্বর যুগের সার্বজনীন প্রথাই মাতৃক্রম। পশুপালন স্তরের সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্পর্ক পিতৃক্রম। কোন জাতি পশুপালক হইলে পিতৃক্রম হইতে বাধ্য ইহাই মর্গানী হুকের সোজার কথা। বাস্তব জগতের কথা কিন্তু অন্যরকম সাক্ষ্য দেয়।

চুকচী ও কোরীয়াক (Koryak) জাতি সাইবেরিয়ার অতি নিম্নস্তরের জাতি। তাহাদের মধ্যে দোষ্টি প্রথা নাই। এদের মধ্যে যখন বন্যা হরিণের (Rein deer) প্রবর্তন

হইল তখন এই নতুন জীবিকা পদ্ধতির প্রভাবের কী পরিণতি ঘটিল? গোষ্ঠীহীন অবস্থা হইতে গোষ্ঠী প্রথার উদ্ভব হইতে পারিত কিন্তু তাহা হইল না। তাহাদের পিতৃকুলের আত্মীয়দের গুরুত্ব বৃদ্ধি হইল, এই পর্যন্ত। কিন্তু গোষ্ঠী প্রবর্তিত হইল না। আবার Kirghiz ও Yakut দের মধ্যে পশুপালন ও ঘোড়ার প্রচলন খুব আছে, এমনকি বহুবিবাহও খুব প্রচলিত। ইহাদের মধ্যে পূর্বে মাতৃক্রম ছিল এমন কোন চিহ্নও নাই। বরাবরই পিতৃক্রমী ইহারা। ইহারা গোষ্ঠীহীন অবস্থা হইতে পিতৃগোষ্ঠীতে সরাসরি আসিয়াছে বলিলে দোষ হয় না। আবার Yakaghir জাতি মাতৃস্থানী কিন্তু মাতৃক্রমী হইল না। অপর (Tungus) জাতির প্রভাবে এটা হইয়াছে। এই ধার করা বা borrowing এর প্রভাব এমন গুরুতর হইতে পারে যে অপ্রত্যাশিত পথে যে-কোনো সমাজ বিপরীত পদ্ধতির দিকে পা বাড়াইতে পারে। এক জাতি হইতে সর্বদাই অন্য জাতি ধার করিয়া নতুন প্রথা ও পদ্ধতি গ্রহণ করিতেছে। ইহাতে নির্দিষ্ট, অচল (কল্পিত) স্তরক্রমের ব্যতিক্রম হইয়া যাইতে পারে। উত্তর আথাবেস্কান জাতি গোষ্ঠীহীন কিন্তু পিতৃক্রমী; কিন্তু ইহাদের মধ্যে যাহারা মাতৃক্রমী উপকূলীয় জাতিগুলির সংস্পর্শে আসিয়াছে তাহারা মাতৃক্রমী হইয়া পড়িয়াছে। ["Thus foreign influences will some times produce change from sibless to matrilineal and in others sibless to patrilineal status', without either condition being antecedent to the other. The history of people's social organisation will vary with its intertribal relations" (167,Lowie)

পূর্বে বলা হইয়াছে, অষ্ট্রেলিয়ার, মেলানেশীয়ার কিছু কিছু জাতিতে মাতৃক্রম হইতে পিতৃক্রমে পরিণতি হইয়াছে বলিয়া মনে করা চলে। কিন্তু এখানেও যে আরো আগেকার একটা পিতৃক্রমের স্তরের উপর মাতৃক্রম এককালে আরোপিত হয় নাই, তাহাও বলা চলে না।

গ্রীক্ ও রোমান জাতিতে পিতৃক্রম পাওয়া গিয়াছে বলিয়া বিবর্তনীরা স্বভাবতই পিতৃক্রমকে উচ্চতর স্তরের আনুষঙ্গিক বলিয়া মনে করিয়াছেন। কিন্তু অষ্ট্রেলীয়ার মাতৃক্রমী Diera জাতী পিতৃক্রমী Arunta জাতি হইতে কোন ক্রমেই নিম্নস্তরের নয়। আফ্রিকারও মাতৃক্রমী নিগ্রোরা পিতৃক্রমীদের চাইতে প্রাত্যহিক জীবনে ও শিল্পে কম অগ্রসর নয়। সোয়ানটন দেখাইয়াছেন যে মেক্সিকোর উত্তরে মাতৃক্রমী জাতিগুলি পিতৃক্রমীদের চাইতে সাধারণত উচ্চতর স্তরের। গোষ্ঠীহীন নিম্নজাতিদের মধ্যেও পিতৃক্রমী আছে। মুসলমানদের মধ্যে পিতার বসবাসের ভূমি পুত্রাদিক্রমে বর্তায়। শিকারজীবীদের মধ্যে মাতৃক্রম খুবই কম।

তবে অর্থনীতির সঙ্গে বংশক্রমের কিছু সম্বন্ধ আছে তাহা তো পূর্বেই বলা হইয়াছে। লাউরীও তাহা স্বীকার করেন। তাঁহার মতে, মানবজাতির নিম্নতম স্তরে ও উচ্চতম স্তরে সাধারণত পিতৃক্রম হইবার সম্ভবনা থাকে এবং মধ্যবর্তী স্তরে মাতৃক্রম প্রচলন হইতে পারে। একদিকে যেমন নিম্নতম গোষ্ঠীহীন বন্য জাতিদের মধ্যে পিতৃক্রম দেখি, তেমনি অন্যদিকে উন্নত চীন, গ্রীক, রোমকদের মধ্যেও পিতৃক্রম পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া মাতৃক্রমও একটা মাঝের স্তর তাহা বলা চলেনা। ধার করা, নকলনবিশ করার মারফতে যে এক স্তর হইতে অন্যস্তরে সমাজ পরিবর্তিত হইতে পারে তাহা আলোচিত হইয়াছে। অন্যান্য কারণেও নির্দিষ্ট স্তরক্রম ব্যাহত হয়। উদ্যান-কৃষি সাধারণতঃ মেয়েদের হাতে। সম্ভাবতঃ মাতৃক্রম হওয়া সম্ভব উদ্যান কৃষিজীবী জাতিতে। কিন্তু অন্যান্য সহায়ক factorsএর যোগাযোগও ঘটা চাই, নতুবা ব্যাহত হইতে পারে। এ স্তরেও যদি পুরুষ কোনক্রমে কৃষিতে গুরুত্বপূর্ণ অংশ নেয়, তবে সেখানে পিতৃক্রম হইয়া দাঁড়াইতে পারে।

পূর্বপালিত মূল এবং উন্নত কৃষি পুরুষকে প্রাধান্য দিয়াছে এবং ইহাতে পিতৃক্রম হওয়াও স্বাভাবিক। কাজেই উদ্যান-কৃষি হইতে (উন্নত কৃষি বা ক্ষেত্রকৃষিতে) কোন সমাজ পরিবর্তিত হইলে মাতৃক্রম হইতে পিতৃক্রমে রূপান্তর ঘটা সম্ভব, কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই উদ্যান কৃষি হইতে ক্ষেত্র কৃষিতে পরিণতি হয় নাই, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। কাজেই কৃষিপর জাতিমাত্রই এক-কালে মাতৃক্রমী ছিল, একথা বলা চলে না। লাউরীর মতে : "It is entirely possible that the agricultural complex as evolved in Western Asia evolved independently of the hoticultral complex thro male effort, and accordingly there is no reason to suppose that the bearers of the great historial cultures ever passed through a maternal stage" (Lowie, 170)

গ্রীক জাতি আদিতে গোষ্ঠিহীন ছিল কিন্তু গোষ্ঠিহীন অবস্থায়ও পিতৃকুলের আত্মীয়দের প্রাধান্য ছিল। এই অবস্থা হইতে গ্রাকরা স্পষ্টতর এবং সুগঠিত পিতৃক্রমে উন্নীত হইয়াছে ; এই পিতৃক্রমই পাই গ্রীক কুল (phratry) এবং গোষ্ঠির (gens) মধ্যে। গতমূলের এঙ্গেলস্ এবং বর্তমান যুগের রিভার্স প্রভৃতি মাতৃক্রম বাদীদের জবাব এখানে পাওয়া গেল।

ওশেনীয়ার মত স্থানে যে পিতৃক্রম পাই তাহা কি পূর্ববর্তী মাতৃক্রমের রূপান্তর হইয়া উদ্ভূত হইয়াছে ? জর্মানীরা তাই বলিবেন। কারণ তাঁহারা মনে করেন মাতৃক্রমের একটা অন্তর্নিহিত প্রবণতা আছে বিলুপ্ত হইয়া পিতৃক্রমকে স্থান করিয়া দিবার। কিন্তু লাউরী, বলেন, তাহা একেবারেই নয়। সব ক্ষেত্রেই এক বিধি নয়। এমনও হইতে পারে যে ওশেনীয়ার পূর্বেকার পিতৃক্রমিক অবস্থাগুলি লীন অবস্থায় ছিল এবং পরে সহায়ক কারণ সমবায় হেতু পুনরায় প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। লাউরীর ভাষায় আধুনিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত এই :

"There is no fixed succession of maternal and paternal descent. Sibless tribes my pass directly into the matrilineal or patrilineal conditions ; if the highest civilisations emphasive the paternal side of the family so do many of the lowest ; and the social history of a particular people cannot be reconstructed from any generally valid scheme of evolution but only in the light of its known and probable cultural relations with neighbouring peoples" (175)

কাজেই অনিবার্য ক্রম-ক্রম বলিয়া কিছু ইতিহাসে নাই। অতএব বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সমাজবিকাশের কোন বাঁধা-ধরা ছক নির্দেশ করা চলে না। সভ্যতার দিকে যে মাতৃক্রমী জাতি অগ্রসর হয়, তাহার মাতৃক্রমপ্রথা ক্রমেই লোপ পাইবার দিকে যায়। ঐতিহাসিক সত্য সমাজগুলিতে মাতৃক্রম একেবারেই নাই। অথচ অসভ্য সমাজগুলির মধ্যেই এখন যা-কিছু মাতৃক্রমের অস্তিত্ব রহিয়াছে। ইহাতে প্রমাণ হয় যে মাতৃক্রমের একটা লুপ্ত হইবার স্বাভাবিক প্রবণতা রহিয়াছে। আগে হোক, পরে হোক, একদিন মাতৃক্রম বিলুপ্ত হইবেই। এই কারণেই জর্মানীরা অনুমান করেন যে একদা সব জাতিতেই মাতৃক্রমী গোষ্ঠি ছিল এবং তাহাদের বিলুপ্তির পরেই পিতৃক্রমী গোষ্ঠির উদ্ভব পৃথিবীতে হইয়াছে। ইহা ছাড়াও আবার কোন কোন বর্তমান জাতিও হয়তো মাতৃক্রমী হইতে পিতৃক্রমী সমাজে পরিণত হইয়াছে ইহা মনে করিবার কারণ আছে। এই কারণেও মাতৃক্রমের সার্বজনীন প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে একটা ভ্রান্তি সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ও এই টুকুই বলা চলে, কোন কোন জাতি হয়ত পূর্বে মাতৃক্রমী ছিল এবং পরে পিতৃক্রমী সমাজে পরিবর্তিত হইয়াছে। কি

ইহা বলা এক কথা আর সব জাতিই এইভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে বা মাতৃক্রম সার্বিক স্তর বলা সম্পূর্ণ অন্যকথা। গোল্ডেন-বাইজার বলেন, To say this is one thing, to assert the frequency or even the universality of the clan gens succession, is another" (444)

মাতৃক্রম হইতে পিতৃক্রমে রূপান্তর যে ভাবে ঘটিয়াছে বলিয়া মর্গানীয় ব্যাখ্যা করেন তাহাও অদ্ভুত ও অযৌক্তিক গোষ্ঠীপ্রথার এবং সামাজিক জীবনের সবকিছু খুঁটিনাটি একেবারে অবিকল বহাল থাকিবে, শুধু বংশক্রমটী মাত্র মায়ের মারফৎ না গণিয়া পিতার মারফৎ গণনা করা হইবে। কোন এক শুভমুহূর্তে যেন সার্বজনীন প্রস্তাবে ও সর্বসম্মতিক্রমে এই এক ধারা হইতে অন্য ধারাতে উৎক্রান্তি ঘটিয়াছিল এবং কোন বিশৃঙ্খলা বা অসঙ্গতির লেশ মাত্রও কোথাও কিছু হয় নাই। এঙ্গেলস্ বলেন, এই উৎক্রান্তি বা অঙ্ক-বদল অতি সহজে ও ঘোলায়েম ভাবে ঘটিয়া গিয়াছিল: "this was by no means so difficult as it looks to us to-day. For this revolution—one of the most decisive ever experienced by humanity—could take place without disturbing a single one of the living members of a gens. All could remain as they were. A simple decree sufficed ..." Engels (62) যেন আদালতের ডিক্রিজারি হইয়া গেল এবং স্বয়ংক্রিয় নড়নচড়নের অনুসারে মাতৃক্রম আরম্ভ হইয়া করিয়া বসিল, কিন্তু কোথাও কোন পেয়াদা নাই, পুলিশ নাই আদালত ফৌজদারির প্রয়োজন নাই। "A simple decree" কে দিল, কীরূপে দিল, কে তামিল করিল, কেন করিল, এসব প্রশ্নের জবাব দিবার কোন বালাই নাই। এই কাল্পনিক 'rationalistic' ব্যাখ্যা যে কী অবাস্তব ও অসম্ভব তাহা পূর্বেও আলোচিত হইয়াছে। গোল্ডেনবাইজার এই অদ্ভুত কাল্পনিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে এটা কল্পনা করাও কঠিন "It is hard to imagine why such a peculiar transformation should have occurred with any degree of regularity..." (444) কোথাও কদাচিৎ এই রকম ঘটিয়াছে কষ্ট-কল্পনা করিয়া লওয়া চলে। কিন্তু তাহারও কোন সাক্ষ্য নাই, প্রমাণ কিছুই নাই। এই কারণে বিজ্ঞানিকের পক্ষে নিরপেক্ষ বিচারে এই সিদ্ধান্ত হইতে পারে: "That clans have made room for gentes, in some cases seems certain; that this should have occurred often cannot be shown and is improbable; whereas the idea of the uniformity and universality of such succession can no longer be entertained." (p. 445, Golden wieser.)

(ক্রমশ)

চীনা আক্রমণের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য

অনন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়

১

"মার্কসীয় রাষ্ট্রতত্ত্ব অনুযায়ী," মাও সে তুং লিখেছেন, রাষ্ট্রশক্তির প্রধান সম্বল হচ্ছে "সৈন্যবাহিনী। যে কেউ রাষ্ট্রশক্তি অধিকার করতে এবং বজায় রাখতে চায়, তাকেই একটি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী রাখতে হবে ...আমরা সর্বশক্তিমান বৈপ্লবিক যুদ্ধে বিশ্বাসী ; এরূপ যুদ্ধ অবাঞ্ছিত হওয়া তো দূরের কথা, বস্তুত উত্তম এবং মার্কসবাদসম্মত··· সমস্ত পৃথিবীকে একমাত্র বন্দুকের সাহায্যেই রূপান্তরিত করা সম্ভব।" গৃহযুদ্ধ শ্রেণী সংঘর্ষেরই উন্নত পর্যায়, লেনিনের এই মতকে আরো সম্প্রসারিত করে মাও সে তুং একথাও বলেছেন যে "শ্রেণী-সমাজের আরম্ভ থেকে আজ পর্যন্ত সমাজ-বিবর্তনের বিশেষ বিশেষ পর্যায়ে বিভিন্ন শ্রেণী, জাতি, রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘাতের সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ হচ্ছে যুদ্ধ।" নিজের বক্তব্যকে আরও সুস্পষ্টতর করে মাও প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন যে দ্বন্দ্ব-তত্ত্ব (dialectics) অনুযায়ী যুদ্ধ আর শান্তি প্রকৃতপক্ষে একই বস্তু। প্রথমে মাও এই যুক্তির অবতারণা করেছেন যে বুর্জোয়া এবং সর্বহারা শ্রেণী প্রকৃত প্রস্তাবে একই। "আপনারা জানেন," মাও লিখেছেন, "যে সর্বহারা শ্রেণী একদা শাসিত হত, বিপ্লবের সাহায্যে তারাই হয় শাসকশ্রেণী ; আর বুর্জোয়া শ্রেণী যা প্রথমে ছিল শাসকের ভূমিকায়, তারাই হয় শাসিত। এই প্রকার যুক্তি রাখবার পর মাও জিজ্ঞেস করছেন, এমন ঘটনা কি করে সম্ভব হয় যদি পরস্পর বিরোধী বস্তুদের মূলগত একত্ব না থাকে ?" দ্বিতীয় পর্যায়ে এই যুক্তিকে আরো সম্প্রসারিত করে মাও লিখেছেন : "সকলেই জানে যে যুদ্ধ ও শান্তি পরস্পরে রূপান্তরিত হয়। যুদ্ধ শান্তিতে রূপান্তরিত হয়, যেমন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যুদ্ধোত্তর শান্তিতে রূপান্তরিত হয়েছিল ; চীনদেশেও এখন গৃহযুদ্ধের অবসান হয়েছে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেরূপ শান্তি ও যুদ্ধে রূপান্তরিত হয়, যেমন ১৯২৭ সালের কুওমিন্টাং-কম্যুনিষ্ট সহযোগিতা পরবর্তীকালে যুদ্ধে রূপান্তরিত হয়েছিল, আর এখনকার বিশ্বশান্তিও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রূপান্তরিত হতে পারে। কেন ? কারণ শ্রেণী-সমাজে অনেক অবস্থাতে যুদ্ধও শান্তির মত পরস্পরবিরোধী বস্তুর মধ্যে একত্ব বিরাজ করে।"

এরূপ অভিনব যুক্তির সাহায্যে যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা এবং অনতিক্রম্যতা প্রমাণ করে মাও কম্যুনিষ্ট চীনের জন্যে নিম্নলিখিত নীতি নির্ধারিত করেন : "যখন বহিঃশত্রুর আশংকা নেই, তখন আভ্যন্তরীণ শ্রেণী-শত্রুদের উপর যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে, কিন্তু যখন বহিঃশত্রুর ভয় থাকবে, তখন আভ্যন্তরীণ ঐক্য বজায় রেখে বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে।" কাজে কাজেই মাও-র মতে বর্তমান পৃথিবীতে সর্বপ্রকার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক "দ্বন্দ্বকে একত্বে রূপান্তরিত" করা সম্ভব একমাত্র যুদ্ধের মাধ্যমেই।

অন্ততঃ দুইটি কারণে মাও সে তুং-এর এই যুদ্ধতত্ত্ব বর্তমান চীনা আক্রমণের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, এই তত্ত্ব থেকে একথা 'প্রমাণ' হবে যে শান্তিপূর্ণভাবে ১৯৪৭ সালে জন্ম

ভারতের স্বাধীনতা প্রকৃত স্বাধীনতা হতে পারে না। মাও-পন্থীদের মতে প্রকৃত স্বাধীনতা, অর্থাৎ "জনগণের মুক্তি" আসতে পারে শুধুমাত্র "শ্রেণী-সংঘাত" দূর করবার উদ্দেশ্যে ঘোষিত যুদ্ধের মাধ্যমেই। আর সত্যিকারের ঘটনাও এই যে ভারতের স্বাধীনতালাভের দুই-তিন বৎসর পরেও সমস্ত কম্যুনিষ্ট দুনিয়া এই মত প্রকাশ করত যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়নি: ভারতে যা হয়েছে তা শুধু এই যে ইংল-মার্কিণ পুঁজিপতিদের সংগে ভারতীয় পুঁজিপতি ও জমিদারশ্রেণী হাত মিলিয়ে নিষ্কণ্টকভাবে ভারতীয় জনসাধারণকে শোষণ করবার উদ্দেশ্যে গান্ধী, নেহরু প্রমুখ তাদের আজ্ঞাবাহী কয়েকজন নেতাকে সামনে রেখেছে মাত্র এক ভুয়া স্বাধীনতার অন্তরালে। এই মত অনুযায়ী বিভিন্ন কম্যুনিষ্ট দেশের নেতৃবর্গ ১৯৪৮-৪৯ সালে সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার জন্যে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টিকে নির্দেশ দেয় এবং সেই নির্দেশ অনুসারে সে সময়ে এদেশের কম্যুনিষ্ট পার্টি 'ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়, সুল্লো মৎ সুল্লো মৎ' প্রভৃতি জনি সহ ভারত সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করে। যদিও স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর থেকে ভারত সরকার সম্বন্ধে এই মত রুশ সরকার পরিত্যাগ করেছে বলে মনে হয়, চৈনিক নেতাদের সমস্ত রচনা ও বিবৃতি থেকে একথাই প্রমাণ হয় যে তারা এখনো আগের মতই পোষণ করে।

দ্বিতীয়তঃ, মাও-র এই যুদ্ধদর্শন থেকে একথাও প্রমাণিত হয় যে আন্তর্জাতিক কম্যুনিজমের, বিশেষত চীনা কম্যুনিজমের গতিপথে যে সব "ভুল" উপস্থিত হবে, সেগুলোকে কেবল যুদ্ধের মাধ্যমেই "একবারে রূপান্তরিত" করা কম্যুনিষ্ট চীনের ধর্ম। মাও-দর্শন অনুযায়ী এ ধর্মের নৈতিক সমর্থন পাওয়া যাবে মার্কসতন্ত্রের এই সিদ্ধান্ত থেকে যে যুদ্ধ ও শান্তির মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য নেই।

কিন্তু মাও সে তুং এর যুদ্ধদর্শন ছাড়াও আরেকটি তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বর্তমান চীনা আক্রমণকে বোঝা প্রয়োজন। মার্কস-লেনিন তত্ত্ব অনুসারে আদর্শগতভাবে সমগ্র বিশ্ব দুইটি-মাত্র শিবিরে বিভক্ত—সাম্রাজ্যবাদী শিবির ও কম্যুনিষ্ট শিবির, যাকে কম্যুনিষ্টরা আজকাল সম্মানার্থে বলে থাকে সমাজবাদী (Socialist) শিবির। এই দ্বিধাবিভক্ত পৃথিবীতে চীনের কর্তব্য সম্বন্ধে ১৯২৬ সালেই মাও সে তুং বলেছিলেন: "বিশ্বের বর্তমান অবস্থায় বিপ্লবী ও প্রতিক্রিয়াশীল এই দুইটি শক্তি অন্তিম সংঘর্ষে নিযুক্ত হয়েছে। এই দুই শক্তি দুই বিশাল পতাকা উত্তোলিত করেছে—একদিকে তৃতীয় ইন্টারন্যাশনাল কর্তৃক উত্তোলিত বিরাট লাল পতাকার তলে সারা দুনিয়ার শোষিত জনগণকে মিলিত হবার আহ্বান জানানো হয়েছে, আর অন্যদিকে লীগ অফ নেশনস কর্তৃক উত্তোলিত বিরাট বিপ্লব-বিরোধী শ্বেত পতাকার তলে সমবেত হবার জন্যে বিশ্বের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে আহ্বান করা হয়েছে। যে সব শ্রেণী এই দুই শক্তির মধ্যে বিরাজ করছে, তারা দ্রুত দুপ হতে বাধ্য: কখনো তারা বাঁ দিক পানে ছুটবে বিপ্লবী অংশের সংগে যোগ দেবার জন্যে, আর কখনো হয়ত ডান দিকে যাবে বিপ্লব-বিরোধী শিবিরে যোগ দিতে। তাদের জন্যে কোন উদ্ভূত 'স্বাধীন' স্থান নেই।" ১৯৪০ সালে "নয়া গণতন্ত্র" পুস্তকে মাও আবার এই মতেরই পুনরাবৃত্তি করেন। তিনি বলেন: "বিশ্বের সমস্ত দেশই এই দুই শিবিরের কোন একটিতে নিক্ষিপ্ত হবে। আজকের পৃথিবীতে 'নিরপেক্ষতা' একটি প্রবঞ্চনামূলক শব্দ মাত্র।" ১৯৪৯ সালে মাও আবার 'জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব' নামক পুস্তকে লেখেন: "চীনের প্রত্যেক মানুষকে হয় সাম্রাজ্যবাদের দিকে নয়ত সমাজবাদের দিকে ঝুঁকতে হবে, মাঝখানে বসে থাকা চলবে না, কোন তৃতীয় রাস্তা নেই।"

এই দুই শিবির-তত্ত্ব সম্পর্কে কম্যুনিষ্ট চীনের নীতি এতই দৃঢ় যে, বর্তমান রুশ-চীন আদর্শগত মতপার্থক্যের ক্ষেত্রেও এই নীতি আত্মপ্রকাশ করেছে। এমনকি ১৯৬০ সালের

নভেম্বর মাসে মস্কোতে অনুষ্ঠিত "৮১তম কম্যুনিষ্ট পার্টির সম্মেলনেও" এবিষয়ে কোন সুরাহা হয়নি। বিভিন্ন দেশের আদর্শগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও শান্তিপূর্ণ সহ-অস্তিত্ব সম্ভব, বিভিন্ন দেশের পক্ষে বিভিন্ন পন্থায় সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব এবং কোন পুঁজিবাদী দেশের পক্ষে শান্তিপূর্ণ বিবর্তনের মাধ্যমে সমাজবাদের দিকে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব, রুশীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির এই মতের উত্তরে ১৯৬১ সালের জানুয়ারী মাসেও একটি প্রস্তাবে চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ঘোষণা করে: "বর্তমান কাল হচ্ছে দুইটি পরস্পর বিরোধী সমাজব্যবস্থার মধ্যে সংঘর্ষের কাল। সমাজবাদী বিপ্লবের কাল···সমাজবাদ ও কম্যুনিজমের বিশ্বব্যাপী জয়ের কাল। সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংস ও সমাজবাদের বিজয় সুনিশ্চিত। সমাজ বিবর্তনের ইতিহাস থেকে আবারও এই সত্যই প্রমাণিত হয়েছে যে মার্কস-লেনিনবাদ প্রচণ্ড শক্তিশালী, আর সংগে সংগে মার্কস-লেনিনবাদ-বিরোধী সমস্ত সংশোধনমূলক তত্ত্বও ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে।"

মার্কস-লেনিনবাদ সম্মত এই "দুই শিবির" তত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে স্বভাবতই মনে হবে যে ভারতের নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি তাত্ত্বিক যুক্তির দিক থেকে সত্য হতে পারে না, মনে হবে যে ভারতের এই আপাত-নিরপেক্ষ নীতি সাম্রাজ্যবাদ-ঘেঁষা নীতির মুখোস মাত্র। আর প্রকৃত ঘটনাও এই যে কম্যুনিষ্ট চীনের নেতৃবর্গ নেহরুকে "এশীয় জনগণের ক্রমবর্ধমান মুক্তি-আন্দোলনকে বাধা দেবার উদ্দেশ্যে নিযুক্ত আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের যোগ্য দালাল, "আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের প্রধান ক্রীতদাস" প্রভৃতি আখ্যা প্রদান করেছেন সাম্প্রতিক কালেও। তাই কম্যুনিষ্ট চীনের দৃষ্টিকোণ থেকে উভয় শিবিরের অন্তিম সংঘর্ষের পথ সুগম হওয়া সম্ভব নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত ভারতের মত গুরুত্বপূর্ণ দেশ আপাতনিরপেক্ষ নীতি পরিত্যাগ করে সরাসরি সাম্রাজ্যবাদী শিবিরে যোগ না দেয়। স্বাধীন এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, অথচ অ-কম্যুনিষ্ট এবং নিরপেক্ষ এমন কোন দেশ কম্যুনিষ্ট তত্ত্ব অনুযায়ী থাকা সম্ভব নয়, অন্তত উচিত নয়। কাজেই মনে হয় ভারতকে পশ্চিমী শিবিরের দিকে ঠুকতে বাধ্য করা বর্তমান চীনা আক্রমণের একটি প্রধান উদ্দেশ্য।

কিন্তু আদর্শগত ও তাত্ত্বিক কারণ ছাড়াও আরো প্রাঞ্জল কারণ চীনা আক্রমণের পেছনে রয়েছে। ভারতীয় সৈন্য-বাহিনীকে সহজ চমকপ্রদভাবে সম্মুখ যুদ্ধে পরাস্ত করতে পারলে সমগ্র দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির মনে ভীতির সঞ্চার করা চীনের পক্ষে খুবই সহজ হবে, আর ফলে এসব দেশ চীনের তোষণ করতে ও ক্রমশ আধিপত্য স্বীকার করতে বাধ্য হবে। ব্রহ্মদেশ, নেপাল, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি কয়েকটি দেশের বৈদেশিক নীতির সাম্প্রতিক পরিবর্তন থেকে এখনই এই সম্ভাবনার ইংগিত পাওয়া যাচ্ছে। দ্বিতীয়ত, ভারতকে সামরিক যুদ্ধ প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বাধ্য করে চীন ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যাহত করতে সমর্থ হবে। এ সব কিছুর মিলিত পরিণতি এই হবে যে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের জনসাধারণ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার আস্থা হারিয়ে ফেলবে এবং তারপর সহজেই কম্যুনিজমের কবলে পতিত হবে।

একথাও পরিষ্কার বোঝা প্রয়োজন যে দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় চৈনিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক কম্যুনিজমের বিস্তার নয়, যদিও প্রধান উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে এ একটি। এই প্রচেষ্টার একটি মুখ্য কারণ অর্থনৈতিক। কয়েক বৎসর পূর্বে চীন যে "বিরাট অগ্রগতি'র (great leap forward) পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল, প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হলেও একটি ক্ষেত্রে তা আশাতীতভাবে সফল হয়েছে—জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে। প্রায় ৭০ কোটি লোক নিয়ে চীন আজ এক বিরাট অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন। এই শতাব্দিতেই সীমান্তবর্তী

সিকিমার, ভংগোলীয়া, মাঞ্চুরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলগুলিতে চীন ঘন জনবসতি স্থাপন করেছে। বহু বসতি তিব্বতের স্বাধীনতা বিলুপ্তির পর সে দেশেও লক্ষ লক্ষ চীনাকে বসতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে স্থানান্তরিত করা হয়েছে এবং হচ্ছে। কিন্তু তাদেরও সমস্যার সমাধানের কোন লক্ষণ নেই। নেফা, লাদক, সিকিম, ভূটান প্রভৃতি অঞ্চলও বহুবসতি ও তাই চীনের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। আর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার গুরুত্ব আরো অনেক বেশী। সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া একটি বহুবসতি অঞ্চল। উপরন্তু এখানে খাদ্যশস্য টায়ুক্ত এবং টিন, রাবার, পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি অতিপ্রয়োজনীয় সামরিক ও শিল্প-সংক্রান্ত উপাদান প্রচুর পরিমাণে আছে। অথচ এই এলাকায় লোহা কিংবা কয়লা প্রায় নেই বললেই হয়, ফলে স্থানীয় শিল্পায়ন অত্যন্ত দুরূহ। একটি অর্থনৈতিক উপনিবেশ করার পক্ষে এই এলাকা আদর্শস্থানীয়। এসব কারণেই এই শতাব্দির ত্রিশ দশকে জনসমস্যাভারাক্রান্ত জাপান "সহবিকাশ এলাকা" (Co-prosperity sphere) তত্ত্ব প্রচার করে তারপর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অধিকার করার চেষ্টা করে। যে সব কারণ জাপানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল, সে সবই চীনের ক্ষেত্রে আরো অধিক মাত্রায় প্রযোজ্য। কারণ চীনের ক্ষেত্রে তাদের পেছনে আবার রয়েছে আন্তর্জাতিক কম্যুনিজমভিত্তিক সম্প্রসারণবাদী আদর্শ। (১৯৪৪ সালে প্রকাশিত একটি চীনা মানচিত্রে ভারতের পূর্বাঞ্চল এবং সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে ভূলবাত্রমে শাশ্বতিক কালেই চীনের অন্তর্ভুক্ত হিসাবে দেখানো হয়। ১৯৫৮সালে প্রকাশিত একটি চীনা মানচিত্রেও সমগ্র ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ভূটান, সিকিম ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে চীন প্রভাবাধীন এলাকা হিসাবে দেখানো হয়)।

কিন্তু এসব উদ্দেশ্যের কোনটিকেই সফল করা কম্যুনিষ্ট চীনের পক্ষে সম্ভব ছিলনা যতদিন না চীন তিব্বত সম্পূর্ণভাবে অধিকার করতে এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মিলিটারী ফেড কোয়াটার্স হিসাবে তিব্বতকে ব্যবহার করতে সমর্থ হয়। তাই চীনে কম্যুনিষ্ট বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই চীনা "গণমুক্তি ফৌজ" তিব্বতকে গ্রাস করতে এবং একটি বিরাট সামরিক ঘাঁটিতে রূপান্তরিত করতে অগ্রসর হয়। এরপর চীন কর্তৃক ভারত আক্রমণ নির্ভর করছিল শুধু সময় ও প্রস্তুতির উপর।

২

সীমান্তের যুদ্ধ পরিস্থিতি বর্তমানে কিংবা অদূর ভবিষ্যতে যেরূপই হোক না কেন, চীনের সমসাময়িক শান্তি অভিযান আপাতদৃষ্টিতে যত মোহনীয়ই মনে হোক না কেন, ভারতের পক্ষে অবিলম্বে স্থায়ী এবং শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অবলম্বন করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। আর এত শক্তিশালী প্রতিরক্ষাব্যবস্থা নির্মাণের মধ্যে এমন কতগুলি অর্থনৈতিক সমস্যা নিহিত আছে যার তাৎপর্য পররাষ্ট্রনীতির দিক থেকে অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী।

প্রথমত, এ বিষয়ে কোনই সন্দেহের অবকাশ নেই যে চীনের বিরুদ্ধে সুদৃঢ় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গঠন করতে হলে যে অধিক সম্পদ ও সামর্থ্যের প্রয়োজন, তা বর্তমানে ভারত সরকারের একক প্রচেষ্টায় সংকুলান করা সম্ভব নয়। আর কাজে কাজেই এ ব্যাপারে বিদেশী রাষ্ট্রের ওপর আমাদের অনেকখানি নির্ভরশীল হতেই হবে; অস্ত্রশস্ত্রের জন্যে বিদেশী মুদ্রা, সোনা কিংবা দ্রব্যসামগ্রীর বিনিময়ে দাম দিতে হবে। কিন্তু এভাবে প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্রের এক সামান্য অংশ আয় ভারতের পক্ষে ক্রয় করা সম্ভব। অতএব বিদেশজাত অস্ত্রশস্ত্রের অধিকতর অংশই ভারতকে দাবিয়ে করতে হবে, সরাসরি দান কিংবা অন্য কোনরূপ দীর্ঘমেয়াদী সাহায্য হিসেবে। আর এ ধরণের দান কিংবা সাহায্য দেওয়া এবং গ্রহণ করা কোনটাই সম্ভব নয় যদি সংশ্লিষ্ট দেশ দুটির মধ্যে গভীর ও সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক একাত্মবোধ না থাকে। কাজেই আমাদের এই

অপ্রীতিকর সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হচ্ছে যে বর্তমানে এবং অদূর ভবিষ্যতে ভারত তার বিদেশী মুদ্রার সামান্য ভাণ্ডার অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে বাধ্য হবে, কিন্তু তা সত্ত্বেও রাজনৈতিক দিক থেকে সমর-সম্ভার সরবরাহকারী রাষ্ট্রগুলির দিকে আরো এগিয়ে যেতে বাধ্য হবে।

দ্বিতীয়ত, বিদেশী সমরোপকরণ যতই পাওয়া যাক না কেন, আমাদের আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক সম্পদকেও নূতন ভাবে নিযুক্ত করে সামরিক উৎপাদনের কাজে লাগাতে হবে। অর্থাৎ, বাৎসরিক পুঁজি-নিয়োগের একটা বিরাট অংশ এখন থেকে সামরিক সরঞ্জামাদি এবং সংশ্লিষ্ট ভারী শিল্পসমূহের উৎপাদনে নিয়োগ করতে হবে। কিন্তু আবার এই উদ্দেশ্যেও বিদেশ থেকে ভারী যন্ত্রপাতি আমদানি করতে আমরা বাধ্য হব। কারণ ভারী শিল্পের অগ্রগতির জন্য যেসব উন্নত যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয়, ভারতে তার অধিকাংশই উৎপন্ন হয় না। আর বর্তমান অবস্থাতে এসব যন্ত্রপাতির আমদানীও সরাসরি দান কিংবা দীর্ঘমেয়াদী সাহায্যের আকারেই হতে পারে। তাই এদিক থেকেও সরবরাহকারী রাষ্ট্রগুলির উপর আমাদের নির্ভরশীল হতে হবে। অধিকন্তু, পুঁজি-নিয়োগের এরূপ পুনর্বিন্যাসের ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি এবং কৃষি-উৎপাদনের ক্ষেত্রে তুলনামূলক অল্প পুঁজি পাওয়া যাবে এবং এসব ক্ষেত্রে উন্নতি ব্যাহত হবে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য সম্ভবত দ্রুত বেড়ে যাবে, তবে মূল্য-নিয়ন্ত্রণ ও রেশন প্রথার মাধ্যমে এ সমস্যার কিছুটা আপৎকালীন সমাধান সম্ভব। কিন্তু তার চেয়েও বড় সমস্যার উদ্ভব হবে কৃষির ক্ষেত্রে। আমাদের কৃষি ব্যবস্থার স্বাভাবিক অবস্থাতেই গত কয়েক বৎসরে কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়নি; অদূর ভবিষ্যতে তার শিল্প ও সামরিক উৎপাদনে অধিকাংশে পুঁজি নিয়োগ করতে হবে বলে কৃষি-উৎপাদন আরও ব্যাহত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই খাদ্য শস্যের জন্যেও আমাদের সম্ভবত বিদেশের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল হতে হবে। আর খাদ্যশস্যের জন্যেই হোক, ভারী যন্ত্রপাতির জন্যেই হোক বা সমরোপকরণের জন্যেই হোক বিদেশী রাষ্ট্রের উপর আমাদের এই অনিবার্য নির্ভরতার অবশ্যম্ভাবী রাজনৈতিক তাৎপর্য থাকতে বাধ্য।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে দেশরক্ষার গুরুদায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে হলে আমাদের বর্তমান বৈদেশিক নীতির কিছুটা পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী: কারণ আমেরিকা এবং অন্যান্য শিল্পোন্নত পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগুলির কাছ থেকেই ভারত প্রয়োজন অনুযায়ী সর্বপ্রকার সাহায্য আশা করতে পারে। সোভিয়েত ইউনিয়নের আর্থিক শক্তি সীমাবদ্ধ বলে তার পক্ষে ভারতকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুপাতে কোন উল্লেখযোগ্য সাহায্য দেওয়া সম্ভব নয়; আর সামরিক ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্য করার শক্তি থাকলেও ইচ্ছা নেই। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে রাশিয়া ইচ্ছুক হলেও চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য রাশিয়ার উপর ভারত নির্ভরশীল হলে নিশ্চিত বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে।

আমরা এই অনিবার্য সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছি যে চীনের বিরুদ্ধে অবিলম্বে শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে ভারতকে সামরিক দিক থেকে না হলেও, রাজনৈতিক এবং কূটনৈতিক দিক থেকে পাশ্চাত্য শক্তিগোষ্ঠীর সঙ্গে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হতে হবে। আর ভারতের পররাষ্ট্রনীতির এই অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তনের ফলে সমগ্র আন্তর্জাতিক রাজনীতির গতি ও প্রকৃতি নূতন আকার ধারণ করবে। অবশ্য ভারত ও চীনের মধ্যে যদি সর্বব্যাপী সংগ্রাম আরম্ভ হয়, তবে তাতে রাষ্ট্রপুঞ্জ নিশ্চয়ই জড়িয়ে পড়বে; এমনকি এরূপ যুদ্ধ থেকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হবার ভয়াবহ সম্ভাবনাও রয়েছে। সেই ভয়াবহ পরিণতিকে রোধ করবার জন্যেই ভারতকে আজ দুর্ভেদ্য প্রতিরোধ গঠন করতে হবে, আর পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে রাজনৈতিক মৈত্রী স্থাপন না করলে সে প্রতিরোধ গঠন করা সম্ভব নয়। এই অবস্থা সম্পূর্ণ প্রীতিকর নয়, কিন্তু সাহসী অথচ দরিদ্র জাতির পক্ষে স্বাধীনতা ও আত্মসম্মান বজায় রাখার আর কোন উপায় নেই।

মানুষের নামে। নচিকেতা ভরদ্বাজ

[বর্বর চীনের উদ্দেশে]

প্রেম নয়, সৌভ্রাতৃ। বা প্রীতি কিছু নয়;
শত্রুর উদ্দেশে আজ উচ্চারণ কর তীব্র ঘৃণা,
পুঞ্জীভূত কর রোষ, দেবোত্তর পবিত্র ক্রোধের
বহ্নিদীপ্তি বুকে জ্বালো, সম্পন্ন দুর্জয়
প্রতিরোধ গড়ে তোলো সারা দেশে; দেখি পারি কি না
বর্বরের হিংস্র লোভ স্তব্ধ পদপিষ্ট করে দিতে।

মানুষের নামে আজ এ তোমার এ আমার কঠিন শপথ
বিশ্বাস ঘাতকেরে আমরা আর ক্ষমা করব না।
যার নামে অঙ্গীকার—শয়তানের সঙ্গে সন্ধিতে
আমরা আর বসব না; আমাদের একমাত্র পথ
নেকার লাডাকে হবে শত্রুদের কবর রচনা।
হানাদারী ধাতস্থায়, পররাজ্য-লোলুপ বোধেটে
বর্বর, পিশাচ, লোভী, জানোয়ার - তাকে মানবতা
কে শেখাবে? মার্কস্ তাকে পারেনি জাগাতে;
চেঙ্গিসের বংশধর রক্তলোভী বীভৎস ও বেটে
জানোয়ারই থেকে গেল। তার কাছে মানবিক প্রত্যাশার কথা
অর্থহীন! বুদ্ধ, লাওৎসে কী করুণ শোকাশ্রুপাতে
চেয়ে আছে! লোভে আজ জন্তুরা মাতাল!

যে যেখানে আছ বন্ধু যার নামে তুলে ধর উজ্জ্বল মশাল।
জন্তুরে কী করে শিক্ষা দিতে হয় ভারতবর্ষ জানে,
জানে সে প্রীতির মন্ত্র, ক্ষমা, ত্যাগ সব জানে। কিন্তু আজ বড় বেআমাল
জন্তুরা উঠেছে ক্ষেপে, আগে তাকে অস্ত্র হানো,
নির্মম খাঁচায়
বন্দী করে নিয়ে এস—পরে দেখা যাবে তাকে প্রাণে
মারবে, কি যন্ত্র দেবে অন্ত স্থির জীবন-প্রবাহ।
আজ কোনো ক্ষমা নেই - হানো তাকে নির্মম সংগ্রামে।

চীন-ভারত সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক কম্যুনিজম্

অরিন্দম সেনগুপ্ত

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, চীন যেদিন হুপ্‌সং নেফা ও লাদাকে আক্রমণাত্মক অভিযান, সুরু করলো আমাদের প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু সেদিনই প্রথম বুঝতে পারলেন যে, তাঁর পররাষ্ট্রনীতি বাস্তব-বিচ্ছিন্ন। এতদিন তিনি কম্যুনিজম্ ও আন্তর্জাতিক কম্যুনিজমের স্বরূপ, অন্যান্য দেশের কম্যুনিষ্ট পার্টির ইতিহাস, ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির ইতিহাস, কম্যুনিষ্ট সাম্রাজ্যবাদ, পূর্বইয়োরোপ ও অন্যান্য দেশে রাশিয়ার আধিপত্য বিস্তার কম্যুনিষ্ট চীনের তিব্বত, নেপাল, ভুটান, সিকিম, লাদাক (অংশ বিশেষ) ও নেফার (অংশবিশেষ) সাম্রাজ্য বিস্তারের পরিকল্পনা ইত্যাদি সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। সেই কারণেই তিনি এতদিন পানিকর ও কৃষ্ণ মেনন জাতীয় বিখ্যাত কূটনীতিবিদ্‌দের মতের উপর নির্ভর করে নিশ্চিন্ত মনে বসে ছিলেন। হাঙ্গারী, পোলাণ্ড, পূর্বজার্মানী, তিব্বত - কোন ঘটনাই তাকে টলাতে পারেনি। নৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে দেখলে কম্যুনিজমের প্রতি নিরপেক্ষ মনোভাব অবলম্বন করা কখনই যুক্তিসংগত নয়, এটা তিনি এতদিন বোঝেননি ; আজও বুঝেছেন, বলে মনে হয় না। নিরপেক্ষতা নীতি কার্যকরী করতে হলে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী দেশগুলিকে নিয়ে একটি সংঘবদ্ধ তৃতীয় শিবির গঠন করা প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক কম্যুনিজমও একধরণের সাম্রাজ্যবাদ ; কম্যুনিজমের সর্বগ্রাসী দর্শনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বলেই এই সাম্রাজ্যবাদ পুরানো ধরনের সাম্রাজ্যবাদের চেয়ে অনেক বেশী ভয়াবহ। নেহরুর দুর্বল ও দ্বিধাগ্রস্ত নীতির জন্য এশিয়া ও আফ্রিকায় ভারতবর্ষের বন্ধু বলতে আজ আর একটি দেশও নেই। আমাদের প্রতিবেশীরা হয় সক্রিয়ভাবে আমাদের বিরোধিতা করছে, আর না হয় আমাদের প্রতি সম্পূর্ণরূপে উদাসীন। লক্ষ্মী মেননের এ, কে, সেন, আর, কে, নেহরু ও গোপালকে আজ ভারতীয় পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করার জন্য বিদেশে যেতে হচ্ছে আজও তিনি ও তার রাজনৈতিক শিষ্যরা কম্যুনিষ্ট চীনের ভারত আক্রমণকে বিচ্ছিন্নভাবে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের উপর আর একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের আক্রমণ হিসাবে বিচার করছেন। এই ধরণের বিচারে চীনা আক্রমণ সাধারণ সীমান্ত বিরোধের চেয়ে সামান্য পরিমাণে ব্যাপকতর সংঘর্ষরূপে পরিগণিত হচ্ছে। সুদৃঢ় প্রতিরোধব্যবস্থা ও দৃঢ়-সংবদ্ধ জনমত গঠন - কোনটাই নেহরু-সরকার এতদিন করেনি ; আজও কম্যুনিষ্ট সাম্রাজ্যবাদ ও উত্তর সীমান্তের সমস্যার প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা জনসাধারণকে দেওয়া হচ্ছে না। এটাতো শুধু সীমান্ত সমস্যা নয়, এটাতো শুধু একটা সাময়িক সমস্যা নয়, যতদিন পৃথিবীতে কম্যুনিষ্ট সাম্রাজ্যবাদ থাকবে, ততদিন এ সমস্যার সমাধান হবে না। এ বিষয়ে নেহরু নির্বাক। আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের সহাবস্থান-নীতির সংগে এ সমস্যা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। নীতি নিরপেক্ষ ও বাস্তব-বিচ্ছিন্ন বিচারে হয়তো সহজেই সাময়িকভাবে জনসাধারণের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা যায়, কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতির ঐতিহাসিক ও যুক্তিসম্মত বিচার করা চলে না।

বর্তমানে আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের অন্ত হচ্ছে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। এই নীতি ক্রুশ্চফ্ আবিষ্কার করেননি; লেনিনের সমান্তরাল সহাবস্থান নীতি, 'নেপ্' ও ১৯২৩ সালের শাসনতন্ত্রে এই নীতির স্বীকৃতি রয়েছে। ১৯২৩ সালের শাসনতন্ত্রে দুইটি শিবিরের উল্লেখ আছে; কিন্তু এই দুই শিবিরের মধ্যে সংঘর্ষের চেয়ে অনতাত্ত্বিক শিবিরের আভ্যন্তর দ্বন্দ্বের উপরই বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। রাশিয়ায় কম্যুনিষ্ট শাসন সুদৃঢ় করাই ছিল লেনিনের প্রধান লক্ষ্য; সেই কারণেই তিনি দ্বিতীয় শিবিরের সংগে কোন প্রকার প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত হতে চাননি। সহাবস্থান নীতির আড়ালে থেকে অন্য শিবিরের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রচার ও কূটনৈতিক আক্রমণ চালানোই ছিল তার উদ্দেশ্য। স্ট্যালিনের উদ্দেশ্যও একই রকম ছিল। এই নীতির একটা বিশেষ সুবিধা আছে। এই নীতি অনুযায়ী কম্যুনিষ্ট জোট কোন বিশেষ দেশের সংগে সহাবস্থান করে না, সামগ্রিক ভাবে 'অনতাত্ত্বিক' রাষ্ট্রগুলির সংগে সহাবস্থান করে। তাই কোন একটি বিশেষ দেশের সংগে রাশিয়া নিজের সুবিধামত মৈত্রী স্থাপন করতে পারে বা সম্পাদিত চুক্তি অগ্রাহ্য করতে পারে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জানফ্-নীতি অনুযায়ী বিপ্লব ঘটানোর প্রয়াস ব্যর্থ হওয়ার পর ও বাল্টিক রাষ্ট্র সমূহ, পূর্ব পোলাণ্ড, বেসারাবিয়া, পূর্ব য়ুরোপ ইত্যাদি দেশে রাশিয়ার কর্তৃত্ব সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কিছুদিন ধরে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের নীতি চালিয়ে স্ট্যালিন আবার শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিতে ফিরে এলেন। ঠাণ্ডা লড়াইয়ের ফলে য়ুরোপের কম্যুনিষ্ট দেশগুলি সম্পূর্ণরূপে রাশিয়ার সাম্রাজ্যভুক্ত হল।

ক্রুশ্চফের সহাবস্থান নীতিও একই ধরণের। ক্রুশ্চফের আমলের প্রথমদিকে দুটি মত প্রচলিত ছিল: (১) মালেনকফের মত—তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে আণবিক অস্ত্র ব্যবহৃত হবে, আর তা হলে উভয় শিবিরই ধ্বংস হয়ে যাবে; (২) মলোটভের মত—তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে আণবিক অস্ত্র ব্যবহৃত হলে কেবল অনতাত্ত্বিক গোষ্ঠীই ধ্বংস হবে। ক্রুশ্চফ্ এই দুই মতের কোনটাকেই গ্রহণ করেননি। লেনিনের মত তিনিও বিশ্বাস করেন যে, রাশিয়া, ভারত ও চীনের প্রাধান্য সকলকে স্বীকার করতেই হবে। কারণ: জনসংখ্যা। লেনিনের সময় চীন কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র ছিল না, ক্রুশ্চফের সময় ভারত অ-কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র। অনতাত্ত্বিক দেশগুলি আভ্যন্তর বিপ্লব, অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে ক্রমশঃ দুর্বলতর হবে। ক্রুশ্চফের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে সোভিয়েট রাশিয়াকে ঘিরে মিত্রভাবাপন্ন ও নিরপেক্ষ দেশগুলিকে নিয়ে কতগুলি বলয় সৃষ্টি করা।

১—কম্যুনিষ্ট উপগ্রহ।

২—দক্ষিণ আমেরিকা ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যে দেশগুলিতে ধনিক শ্রেণী আমেরিকার সমর্থক, কিন্তু কৃষক শ্রেণী বিক্ষুব্ধ, সেই সব দেশ।

৩—সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নিরপেক্ষ দেশসমূহ: সুইডেন, অষ্ট্রিয়া, যুগোস্লাভিয়া, উত্তর আফ্রিকা, আরব রাষ্ট্রসমূহ ভারতবর্ষ, ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি।

ক্রুশ্চফের উদ্দেশ্য হল বহির্বলয়ের দেশগুলিকে অন্তর্বলয়ের গণ্ডির মধ্যে আনা। তাই আজ দ্বি-শিবির তত্ত্বের উপর তত গুরুত্ব আরোপ করা হয় না • রাশিয়ার মতে অকম্যুনিস্ট রাষ্ট্রে শ্রেণীসংঘর্ষ ত্বরান্বিত করার চেয়ে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী দেশগুলিকে দলে টানার প্রয়োজন অনেক বেশী। চীনা কম্যুনিষ্টরা অবশ্য অন্য মত পোষণ করে। বর্তমান পৃথিবীতে ধনতান্ত্রিক পরিবেষ্টনের তত্ত্বের গুরুত্ব অনেক কমে গিয়েছে, সোভিয়েট রাশিয়া যথেষ্ট সামরিক শক্তির অধিকারী, তার সাম্রাজ্যও সুসংবদ্ধ।

রাশিয়া যুদ্ধের পরিবর্ত হিসাবে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি ব্যবহার করছে; কোনরকম ব্যাপক যুদ্ধের ঝুঁকি সে নিতে চায় না। প্রচার ও কূটনৈতিক আক্রমণের দ্বারা 'ধনতান্ত্রিক' শিবিরের কাছ থেকে সুবিধা আদায় করা ও কম্যুনিস্ট প্রভাব সম্প্রসারিত করাই তার লক্ষ্য। নিরস্ত্রীকরণ, বিশ্বশান্তি ও সহাবস্থানের নীতির আড়ালে থেকে বিপক্ষ শিবিরে বিভেদ সৃষ্টি করা ও তার প্রতিরক্ষা উদ্যোগ বিঘ্নিত করা, এবং বিশ্ব-রাজনীতির ভারকেন্দ্র নিজের দিকে সরিয়ে আনাই রাশিয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য। কোনরকম ব্যাপক যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া রাশিয়ার ইচ্ছা নয়, কিন্তু প্রয়োজন হলে ও কম্যুনিষ্ট প্রভাবের ক্ষেত্র বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকলে স্থানীয় যুদ্ধ, কম্যুনিস্ট নিয়ন্ত্রিত মুক্তি যুদ্ধ, অপরের মাধ্যমে যুদ্ধ– এই সব ধরণের যুদ্ধ করতে রাশিয়ার আপত্তি নেই। কিন্তু গুরুতর যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখলেই সে পিছিয়ে আসতে দ্বিধা করবে না। এ নীতি নূতন নয়। ষ্ট্যালিন যখন দেখলেন যে, পশ্চিমী গোষ্ঠী ইরাণকে সাহায্য করবেই তখন তিনি ইরানীয় আজেরবাইজান ছেড়ে চলে এলেন। কোরীয় যুদ্ধ সীমাবদ্ধ রাখার জন্য তিনি সব সময়ই চেষ্টা করেছেন। বার্লিন সমস্যা নিয়ে সোভিয়েট রাশিয়া যতই হৈ-চৈ করুক না কেন তাকে কখনই বৃহত্তর যুদ্ধে পরিণত হতে দিতে চায় না। ক্রুশ্চফের লোয়ালো আপত্তি সত্ত্বেও সোভিয়েট 'যন্ত্রবিদরা' লিওপোল্ডভিল ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল। সেখানে আইসেনহাওয়ার-নীতির প্রয়োগের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করা ছাড়া তিনি আর কিছুই করেননি। সুয়েজ-সংকটে মুখে হস্তক্ষেপ করার পর যখন রাশিয়ার কিছুই করণীয় নেই তখন তিনি একটু হৈ-চৈ করেছেন। সম্প্রতি কিউবায় রাশিয়ার পশ্চাদপসরণের কথা সকলেই জানে।

রাশিয়া-নিয়ন্ত্রিত আন্তর্জাতিক এই নীতি কম্যুনিস্টদের পিতৃভূমির প্রয়োজন মেটানোর জন্য কাজে লাগানো হয়। সেদিন থেকে ক্রুশ্চফ্ পর্যন্ত এই একই নীতি প্রচলিত, এই দীর্ঘসময়ে এর কোন মৌলিক পরিবর্তন হয়নি। ষ্ট্যালিন 'একদেশে সমাজতন্ত্রের দোহাই দিয়ে রাশিয়ার সাম্রাজ্য বিস্তার করেছেন। ক্রুশ্চফের আমলে কম্যুনিস্ট চীন রাশিয়ার নেতৃত্বে ভাগ বসাতে চাইছে বলে যে সমস্যার উদ্ভব হয়েছে তা' সহজে উপেক্ষা করা যায় না।

সম্প্রতি কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে চীন ও রাশিয়ার মধ্যে যে মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে তার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। প্রাথমিক অবস্থায় পদ্ধতির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকলেও এটা ক্রমশঃ আদর্শগত মতানৈক্যে পরিণত হয়েছে আর কম্যুনিজমে আদর্শ ও ক্ষমতা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত; বিশেষতঃ নিম্নলিখিত বিষয় গুলি নিয়ে এই দুই কম্যুনিস্ট দেশের মধ্যে মতদ্বিভেদ সম্প্রতি বেশ ঘোরালো রূপ ধারণ করেছে।

বিষয়গুলি হচ্ছে: (১) যুদ্ধ, (২) শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি, (৩ নিরস্ত্রীকরণ ও আণবিক অস্ত্রবন্টন (চীন রাশিয়ার আণবিক অস্ত্রসম্ভারে ভাগ বসাতে চায়; তার মতে যদি তার হাতেও আণবিক অস্ত্র থাকে তবে পশ্চিমী গোষ্ঠী কখনই যুদ্ধ সুরু করতে সাহস পাবেনা); ৪) আন্তর্জাতিক কম্যুনিজমের বিভিন্ন স্তর ইত্যাদি। রাশিয়ার নেতৃত্বে কম্যুনিস্ট জোটের

• ক্রুশ্চফের আমলের পূর্বে যে সব দেশ রাশিয়ার পক্ষে থাকত না তাদের শত্রু বলে গণ্য করা হত; এখন যে সব দেশ রাশিয়ার শত্রু নয়, তারা সকলেই রাশিয়ার পক্ষে আছে বলে ধরা হয়।

ঐক্য বজায় রাখতে হলে এ বিরোধকে যে বিচ্ছেদে পরিণত করা চলে না সেটা দুজনেই বোঝে। ক্রুশ্চভ্ জানে, চীনকেও যুগোস্লাভিয়ার মত একঘরে করে দেওয়া সমীচীন হবে না। একঘরে করে দিলেও টিটোর পতন হয়নি, মাও-সে-তুঙেরও হবে না। রাশিয়া চায় তার নেতৃত্ব কম্যুনিস্ট দেশগুলি একজোট হোক্। চীন চায়, কম্যুনিষ্ট জোটের আভ্যন্তর ঐক্য অক্ষুণ্ণ রেখে রাশিয়ার উপর প্রভাব বিস্তার করতে ও তার নীতি পরিবর্তন করাতে। কিন্তু রাশিয়া যদি চীনের মত অনুযায়ী চলে তবে তার নেতৃত্ব বজায় থাকবে একথা বলা যায় না। তাই চীনের পক্ষে নিজের অভীষ্ট সিদ্ধি মোটেই সহজ সাধ্য নয়। তাছাড়া চীন-রাশিয়ার ঐক্য পারস্পরিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত। পশ্চিমী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নিজের শক্তিবৃদ্ধির জন্য চীনকে রাশিয়ার প্রয়োজন; অপর পক্ষে সামরিক শক্তি ও আভ্যন্তর অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য চীন সম্পূর্ণরূপে রাশিয়ার উপর নির্ভরশীল।

স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য চীন যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছে তাকে প্রান্তিক নীতি বলা যায় (Brinkmanship)। চীন জানে যে সে যে কোন অবস্থায়ই কম্যুনিষ্ট জোটের মধ্যে ভাঙন ধরাতে চায় না, এটা রাশিয়া জানে। সেই কারণে চীনের ভীতি প্রদর্শন রাশিয়া গ্রাহ্য করে না। তাই চীন রাশিয়াকে তীব্রভাবে সমালোচনা করে তার মতের গুরুত্ব প্রমাণ করতে চায়, ও রাশিয়াকে তার মতগ্রহণে বাধ্য করতে চায়। তীব্র সমালোচনা, দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজ, অযৌক্তিক ও অসংগত আচরণ ইত্যাদির দ্বারা চীন রাশিয়াকে বোঝাতে চায় যে, স্বীয় উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য সে যে কোন কাজ করতে পারে। এসবের দায়িত্ব চীনের নয়, রাশিয়ার, কারণ রাশিয়া যদি তার নীতি মেনে চলে তাহলে চীনের এসব কিছুই করার প্রয়োজন হবে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাশিয়া সম্পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করা ছাড়া আর কিছুই করেনি, কোন কোন ক্ষেত্রে আপসে নিষ্পত্তি বা আংশিক সুবিধা দান করে চীনকে শান্ত করার চেষ্টা করেছে, কখনও বা ঘুরোপীয় কম্যুনিস্ট পার্টিগুলোকে দিয়ে চীনের তীব্র সমালোচনা করিয়েছে। সোভিয়েট রাশিয়ার কাছ থেকে চীন যে পদ্ধতিতে সুবিধা আদায় করতে চাইছে তা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর কালে হিট্লার ও স্ট্যালিনের পদ্ধতির সঙ্গে তুলনীয়। উদাহরণ: (১) মুসোলিনিকে চেম্বারলেন হিট্লার সম্পর্কে ঠিক এই ধরনের ভুল করেছিলেন। (২) এই কারণেই পূর্ব য়ুরোপে ও অন্যান্য স্থানে স্টালিনের অযৌক্তিক দাবি পশ্চিমী শক্তিবর্গ স্বীকার করে নিয়েছিল। (৩) আজ নেহরুও কম্যুনিষ্ট চীন সম্পর্কে ঠিক একই ধরনের ভুল করেছেন।

সোভিয়েট রাশিয়া চীনের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও এই দ্বন্দ্বে চীনেরই জয় হবে এরকম একটা আপাতবিরোধী সিদ্ধান্ত উপরের আলোচনার ভিত্তিতে যুক্তি-সংগত বলে মনে হতে পারে, কিন্তু নিম্নলিখিত কারণে রাশিয়া চীনের চরমপন্থী মত ও দাবি সম্পূর্ণরূপে মেনে নেবে বলে মনে হয় না, কারণ তাহলে (১) কম্যুনিস্ট জোটের নেতৃত্ব চীনের হাতে চলে যাবে; (২) চীনের মত বিরাট দেশ যদি রাশিয়ার মত সমান মর্যাদা ও সামরিক শক্তি অর্জন করে তবে রাশিয়ার নেতৃত্ব, এমন কি তার স্বাধীন অস্তিত্বও বিপন্ন হবে; (৩) কম্যুনিজমের সম্প্রসারণ ব্যাহত হবে; (৪) আন্তর্জাতিক শান্তি বিঘ্নিত হবে, ফলে রাশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নতি ও আভ্যন্তর নেতৃত্বের স্থায়িত্ব নষ্ট হবে।

অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তির দিক থেকে দেখলে চীনের চেয়ে রাশিয়া অনেক বেশী শক্তিশালী, চীন দুর্বল দেশ। ঠিক এই কারণেই আদর্শগত সংগ্রামে চীন চরমপন্থা অবলম্বন করতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে সোভিয়েট রাশিয়ারও একটা সুবিধা রয়েছে। রাশিয়া জানে যে, চীন চরমপন্থী বলেই কখনও কম্যুনিস্ট জোট ছেড়ে চলে যাবে না ও কখনও কোন শোধনবাদী মত গ্রহণ করতে সম্মত হবে না, বা এমন কোন কাজ করবে না যাতে রাশিয়ার শোধনবাদীরা শক্তিশালী

হয়। তাই চীনের কোন রাজনৈতিক দাবি মেনে নেওয়ার সময় রাশিয়া তার সঙ্গে এমন কতগুলি নতুনপন্থী মত জুড়ে দেয় যাতে এই স্বীকৃতির সামগ্রিক তাৎপর্য চীনের পক্ষে না হয়। চীনও বোঝে যে, তার উগ্র মতবাদ রাশিয়ার উপর জোর করে চাপাতে গেলে কম্যুনিস্ট জোটে ভাঙন ধরবে কম্যুনিস্ট সাম্রাজ্যে বহুকেন্দ্রিকতার সৃষ্টি হবে, আর তাতে কম্যুনিষ্ট বিরোধী ও শোধনবাদীদের সুবিধা হবে।

আজ কম্যুনিষ্ট জোটের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল যে, সেখানে আদর্শগত সংঘাতে মধ্যস্থতা করতে পারে এমন কোন রাষ্ট্র নেই। লেনিন কুশলী রাজনীতিক ছিলেন। তাই তার পক্ষে বোগদানফকে আবার বলশেভিক দলে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছিল, স্ট্যালিন কম্যুনিস্ট জোটের ঐক্য অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহার করেছিলেন কিন্তু ক্রুশ্চফের আমলে তা সম্ভব নয়। শুধু মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট—আন্দোলনের ঐক্য বজায় রাখা সহজসাধ্য নয়: আদর্শ এক হলেও প্রয়োজন বিভিন্ন, তাই বিভিন্ন পদ্ধতি ও বিচারের উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও মনে হয় না যে, কম্যুনিস্ট জোটের মৌলিক ঐক্য সহজে নষ্ট হবে। এ ধরণের কেন্দ্রাপসারী ঐক্য দীর্ঘদিন, এমন কি অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থায়ী হতে পারে। কম্যুনিস্ট সাম্রাজ্যে দ্বিকেন্দ্রিকতার সৃষ্টি হওয়াও অসম্ভব নয়; প্রাচ্যে চীনের নেতৃত্ব, প্রতীচ্যে রাশিয়ার।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে চীনের অভিপ্রায় সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যেতে পারে। (১) যদি চীন নেপাল, ভূটান ও সিকিমে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করতে এবং লাদক ও নেফার অংশবিশেষ অধিকার করতে সক্ষম হয় তবে ভারতের উপর রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক আধিপত্য বিস্তার করতে পারবে—এবং এশিয়া ও আফ্রিকায় নিজের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। প্রাচ্যে চীনের নেতৃত্ব দুই শক্তিশোষ্ঠীকেই মেনে নিতে হবে। ভারতবর্ষ ও এশিয়ার অন্যান্য দেশের সম্পদ চীনের অর্থ নৈতিক উন্নয়নে ব্যবহৃত হবে। ফলে এই দেশগুলির অর্থ নৈতিক উন্নতি ব্যাহত হবে: তখন এটা কম্যুনিজম্ ও কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র ব্যবস্থার জয় বলে পরিগণিত ও প্রচারিত হবে, ও আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলনে প্রসার ত্বরান্বিত হবে। রাশিয়াকেও চীনের নীতি মেনে নিতে হবে ও চীনের সব, দাবি সব প্রয়োজন মেটাতে হবে।

(২) যদি গণতান্ত্রিক দেশগুলির হস্তক্ষেপের ফলে ও নেহরুনীতি বা নেহরু-সরকারের পরিবর্তনের ফলে চীনের হিসাব ভুল প্রমাণিত হয় (চীন ভেবেছিল, নেহরুর দুর্বলতা, অদূরদর্শিতা ও অবিবেচনা, এবং কৃষ্ণ মেনন ও পানিক্কর ইত্যাদি তথাকথিত কূটনীতিবিদদের কম্যুনিষ্ট প্রীতির সুযোগ নিয়ে শুধু ভয় দেখিয়েই ভারতের উত্তর সীমান্ত অধিকার করবে), অর্থাৎ এই যুদ্ধে যদি চীনের পরাজয় হয়, তা হলে চীন ভারতকে ঘুরে দাঁড়িয়ে দিবে, রাশিয়ার কাছে সাম্রাজ্যবাদীদের দালাল প্রমাণিত করে চীন-রাশিয়ার মৈত্রীবন্ধন দৃঢ়তর করার চেষ্টা করবে এবং রাশিয়ার কাছ থেকে অর্থ নৈতিক, সামরিক ও রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করবে। সম্প্রতি সোভিয়েট রাশিয়া এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলিকে যে অর্থ নৈতিক সাহায্য করছে সেটা কম্যুনিষ্ট চীনের পছন্দ নয়। রাশিয়ার যুক্তি হচ্ছে যে, এই দেশগুলিতে যদি অর্থ নৈতিক উন্নতি সম্ভব হয় তবে শ্রমিক আন্দোলন ও অন্যান্য আন্দোলনের মাধ্যমে কম্যুনিজম্ প্রতিষ্ঠার সুবিধা হবে, আর যদি তা নাও হয় তবে দারিদ্র্য ও সামাজিক বৈষম্যের ফলে কম্যুনিষ্ট বিপ্লব সংঘটন সহজসাধ্য হবে। চীনের যুক্তি: সোভিয়েট রাশিয়ার এই নীতির ফলে আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের প্রসার ব্যাহত হবে। চীনের আপত্তির প্রধান কারণ হচ্ছে: (১) এই অর্থ নৈতিক সাহায্য চীনের প্রয়োজন ও কম্যুনিস্ট দেশ হিসাবে চীনেরই প্রাপ্য; এবং (২) রাশিয়ার এই নীতির ফলে প্রাচ্যে নেতৃত্বের জন্য চীনকে রাশিয়ার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হচ্ছে: এই অসম প্রতিযোগিতায় চীন কোনদিনই রাশিয়াকে হারাতে পারবে না।

আজ যদি চীন ভারতকে ক্রুশ্চফ-শাসিত বহির্বলয় থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারে ও বহির্বলয়ের অন্যান্য দেশগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তবে চীনের উপর সর্বতোভাবে নির্ভর করা ছাড়া রাশিয়ার আর অন্য কোন উপায়ই থাকবে না।

৭।১২।৬২

ঝড় বৃষ্টি রক্তে। স্বদেশ রঞ্জন দত্ত

ঝড়, এসেছে চতুর্দিকে ঝড়,
জননী তোর ছেলেরে আর রাখিস নে ঘোর দিয়ে।
ঝড়ের হাওয়ায় নাচতে সে আজ উদ্দাম ;

জননী তোর আঁচল গুটিয়ে নে,
ঝড় বৃষ্টি রক্তে সইতে সে :
শরীরটা আজ রক্তে ভাসাবে।
ঝড়ের মুখে ঘোর খুলে সে,
যুঝতে সে আজ হাওয়ার মুখোমুখি :
গড়া তোর হাজার কোটী ছেলে ;
ঝড়, নেমেছে চতুর্দিকে ঝড়,
বুক বেঁধেছি ভাইকে-ভাইয়ে—
কি করে ওই ঝঞ্ঝা হাওয়া উড়োয় দেখি ঘর।

তাহলে শোনো, আমার হাতের ভীষণ তরবারি।
রইল তোমার জন্য,
চিরকালের জন্য আমার লক্ষ কোটী ভাই
ভাসাবে ওই ঘূর্ণ রক্তে।

ঝড় নেমেছে,
জননী তোর আঁচল গুটিয়ে নে ;
আমরা শুধু ঝড় বৃষ্টি রক্তে।

যুদ্ধ কালীন কবিতা। শান্তি লাহিড়ী

দস্যু,
আমি তোমার সমস্ত ষড়যন্ত্র নষ্ট করে দেব।
ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেব এবার।
সভ্যতার মুখে মাখিয়েছ চুন-কালী
জাতির মাথায়,
তোমার সম্মানের মাথায় তুলে দিয়েছ
ঝলঙ্ক তিলক।
চীৎকার করে বলব,
আমার শেষ রক্তবিন্দুর সমস্ত শক্তি নিংড়ে
চীৎকার করে বলব, তোমাকে ক্ষমা করিনি।

দস্যু,
তোমার রক্তের পিপাসা কি ভয়ঙ্কর!
বর্ণার জল রক্তে জমাট —
আমার রক্তে, আমার জাতির রক্তে।
কিন্তু, তোমার শোনিত পিপাসার শেষ বারি বিন্দুতে
আমি বিষ মিশিয়ে দিয়েছিলাম,
আমার ঘৃণার বিষ।
আমি অমৃতের সন্তান।

স্বদেশ,
তোর মাটিতে নতজানু হয়ে
আমার শেষ রক্তবিন্দুর সমস্ত শক্তি নিংড়ে
প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম।

চীনা আক্রমণের কৌশল

শিশির কুমার ঘর

একথাটা মনে করা একটা মারাত্মক ভুল হবে যে, চীনা কম্যুনিষ্ট সাম্রাজ্যবাদ ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সুরু করে গত ২০শে অক্টোবর অথবা গত ৮ই সেপ্টেম্বর। অবশ্য এটা ঠিক যে চীনা বর্বরতা নগ্নরূপ নিয়েছে ৮ই সেপ্টেম্বর, বিশেষ করে ২০শে অক্টোবর থেকে। প্রকৃত পক্ষে, ভারতের উপর কম্যুনিষ্ট চীনের সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ সুরু হয় ১৯৫০ সালে যখন ক্ষমতান্ধ চীনা কম্যুনিষ্ট শাসকরা শান্তিপ্রিয় ও নিরস্ত্র তিব্বতে সৈন্য প্রেরণ করলো।

১৯৫০ সালের ১১ই নভেম্বর 'Mother India' পত্রিকায় এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে শ্রীঅরবিন্দ দৃঢ়তা সহকারে বলেছিলেন : "Yes, the basic significance of Mao's Tibetan adventure is to advance China's frontier right down to India and st nd poised there to stri e at the right moment and with the right strategy unless India precipitately declares herself on the side of the Russian bloc"[১] দেশের অন্যান্য কয়েকজন নেতা, বিশেষ করে আচার্য কৃপালনী অশোক মেটা, হরিবিষ্ণু কামাথ, সুরেন্দ্রনাথ দ্বিবেদী, অধ্যক্ষ হেম বড়ুয়া প্রমুখ প্রজা সোস্যালিষ্ট নেতৃবৃন্দ সেদিন অনুরূপ সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছিলেন যে, তিব্বতই চীনের শেষ লক্ষ্য নয়, তিব্বত আক্রমণ হলো চীনা কম্যুনিষ্ট সাম্রাজ্যবাদের ভারত আক্রমনের প্রথম ধাপ।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের রাষ্ট্রের কর্ণধাররা সেদিন এই সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন না। তাই ১৯৫১ সালের মার্চ মাসেও, অর্থাৎ তিব্বত আক্রমণের পরেও প্রধান মন্ত্রী নেহরুকে বলতে শোনা যায় "আমার মনে হয় তার গুরুতর সমস্যাগুলোর সমাধানের জন্য এবং নিজেকে সুসংহত করার জন্য চীন এখন শান্তি চায়। সুতরাং সে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বা অন্য কোন দিকে নিজের সম্প্রসারণের কথা ভাবতে পারে না।"[২] বলা বাহুল্য, চীন সম্পর্কে এক ধরণের একটা ভ্রান্ত ধারণার ভিত্তিতেই ১৯৪৯ সাল থেকে এতদিন যাবৎ ভারত সরকারের চীন নীতি নির্দ্ধারিত হয়েছে। গত ২১শে নভেম্বর নেহরু নিজেই বলেছেন যে, "আমরা বিশ্বাস করিনি যে চীন কোন দিন আমাদের উপর আক্রমণ চালাবে। এরকম মনে করা আমাদের পক্ষে সহজ ছিল না কিন্তু —লাদকেল্লায় জার্মান প্রেসিডেন্ট লুবকের সম্বর্দ্ধনায় নেহরু আমাদের বিরুদ্ধে চীনা সাম্রাজ্যবাদীদের কৌশল এতদিন যে বহুলাংশে সফল হয়েছে তা অস্বীকার করা যায় না। শুধু প্রধান মন্ত্রী নেহরুকে নয়, বহু নির্দলীয় শিক্ষিত ও বিখ্যাত এবং স্বীয় ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত ভারতবাসীকে বিভ্রান্ত করতে চীনা কম্যুনিষ্ট সরকার সমর্থ হয়েছিল। এদের মধ্যে কিন্তু সুবিধাবাদী ছিলেন না এমন নয়। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা

১ (Talks with Nehru—a discussion between Nehru and Norman Cousins' পুস্তিকাটী দ্রষ্টব্য)

২ People say we were careless. May be, we did not believe that China will ever attack us. It was not easily comprehensible to us, বক্তৃতাংশ)।

যেতে পারে বোম্বের একটী বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকার সাংবাদিকের - যিনি কিছু দিন আগেও ম্যাকমোহন লাইনকে সাম্রাজ্যবাদীদের গড়া একটা সীমারেখা বলে কম্যুনিষ্ট চীনের হয়ে ওকালতি করছিলেন এবং আজ অবস্থা বুঝে ভোল পাল্টে ফেলেছেন। কিন্তু এদের মধ্যে অনেক ব্যক্তি ছিলেন যাদের সততা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন ওঠে না। এঁদের মুস্কিল হয়েছিল যে এঁরা কম্যুনিষ্ট বহুরূপীর সত্যিকার রূপ যে কোনটি তা ঠিক বুঝে উঠতে পারেননি। অবশ্য, বলা বাহুল্য আমাদের দেশবাসীর মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য চীনা সাম্রাজ্যবাদীরা আগাগোড়া যে হাতিয়ারটী নিয়মিত ভাবে ব্যবহার করে এসেছে সেটী হলো 'ভারতের' (!) কম্যুনিষ্ট পার্টি।

ডাংসেপন্থী, রুশপন্থী, চীনপন্থী সব কম্যুনিষ্টই নিজেদের জবানীতে ও তাদের সহযোগী ব্যক্তি বিশেষ ও প্রতিষ্ঠানের জবানীতে এযাবৎ নিয়মিত ভাবে সুকৌশলে চীনা আক্রমনের গুরুত্বকে লঘু করার চেষ্টা করেছে এবং সম্ভব হলে, গোটা আক্রমনের ব্যাপারটাকে 'দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলদের অপ-প্রচার বলে চালাতে চেয়েছে। চীনা-আক্রমনের ব্যাপারটা কম্যুনিষ্টরা অন্যদের চাইতে কম জানতো এটা মনে করলে কম্যুনিষ্টদের বুদ্ধিতে খাটো করে দেখা হবে। এদেশে কম্যুনিষ্টদের জন্মাবধি ইতিহাসের সাথে যারা পরিচিত তারা জানেন যে এই পঞ্চম বাহিনীটী ভারতে বিপদের মুহূর্তে কোপ বুঝে কোপ মারবার ত্রুটী করবেনা। এদেশের কম্যুনিষ্টরা চীনা আক্রমণ কৌশলের একটী নিরবচ্ছিন্ন অংগ। আজ চীনকে ভারত আক্রামনকারী বলে ঘোষণা করার পরও এদের দিকে তাকালে এদের মানাভাব বুঝতে অসুবিধা হয়না।

২

চীনা কম্যুনিষ্টদের আক্রমণ কৌশলের মধ্যে একটা সুপরিকল্পিত ধারা লক্ষ করা যায়। প্রথমতঃ এরা যেদিকে বাধা পেতে পারে সেদিকে এগোয় না। চীন জানে যে পূব দিকে অথবা পূব-দক্ষিণ দিকে হাত বাড়ালে আমেরিকার কাছ থেকে বাধা আসতে পারে। তাছাড়া নেহরু-মেননের প্রবর্তিত ভারত সরকারের এতদিনের দুর্বল প্রতিরক্ষা নীতির কথা তাদের অজানা নয়। চীনা আক্রমনের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট হলো, এরা যখন আক্রমন করে তখনও এরা বন্ধুত্বের একটা ছদ্মবেশ রাখার চেষ্টা করে। ১৯৫৪ সাল থেকে এরা যখন ভারতের বিভিন্ন ঘাঁটিগুলোর উপর হামলা সুরু করে তখন থেকে এরা "হিন্দী চিনি ভাই ভাই" শ্লোগানটি বন্ধ করেনি। আজ যখন ভারতের প্রায় ২০,০০০ বর্গমাইল ভূমি ওরা দখল করে নিয়েছে তখনও এরা নিজেদের আক্রমনকারী সৈন্যদের "সীমান্ত রক্ষী" বলে দাবী করে। এদের আক্রমন কৌশলের তৃতীয় বৈশিষ্ট হলো, সামরিক আক্রমনের সাথে পর্যায়ক্রমে শান্তির অভিনয় চালানো, যাতে শত্রুপক্ষের মনে শেষ পর্যন্ত বিভ্রান্তি টিকিয়ে রাখা যেতে পারে। উপরোক্ত দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৈশিষ্টের জন্য এদের আক্রমন,— শক্তিশালী প্রচার যন্ত্র ও প্রতিপক্ষের এলাকায় পঞ্চম বাহিনীর উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল।

বলা বাহুল্য, চীনা কম্যুনিষ্টদের এ সমস্ত কৌশলের সাথে হিটলারী কৌশলের বেশ মিল রয়েছে। জার্মান নাৎসীরা বিনা বাধায় কতটা এগিয়ে যাওয়া যায় সে প্রশ্নে খুব সচেতন ছিল। গোয়েবলসের প্রচার যন্ত্র হিটলারী অভিযানের বিরাট অবলম্বন ছিল। হিটলারও ফ্রান্স এবং ইউরোপের অন্য যে এলাকায় পঞ্চম বাহিনীকে পুষ্ট করার চেষ্টা করার ত্রুটি করেনি।

৩

চীনা সাম্রাজ্যবাদ—এবং সব সাম্রাজ্যবাদই যে জিনিষটা সবীহ করে সেটা হলো প্রতিপক্ষের প্রতিরোধ ক্ষমতা।

এদের গত ২১শে নভেম্বরের যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাবকে এই

পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে হবে। এদের এই কপট প্রস্তাব বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, এ প্রস্তাবে উল্লিখিত "প্রকৃত নিয়ন্ত্রণাধীন সীমারেখা" কথাটি বিভ্রান্তিকর। এদের প্রস্তাব মেনে নিলে লাদক ও নেফা এলাকার ভারতকে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি ছেড়ে আসতে হবে। অপর পক্ষে, চীনারা কয়েক শত কিলোমিটার এগিয়ে আসার পর ২০ কিলোমিটার উত্তরে সরে গেলেও ভারতীয় এলাকার মধ্যেই থেকে যাবে। চীনারা জানে যে তারা এক লাফে গোটা ভারত জয় করার ক্ষমতা রাখে না। সুতরাং তারা যদি এমন একটা জায়গায় নিজেদের অবস্থান পাকাপোক্ত করে নিতে পারে যেখান থেকে সময় সুযোগ মত আবার আক্রমন চালিয়ে যাওয়া যেতে পারে তাহলেই আপাতত যথেষ্ট। মাও সে-তুঙের ভাষায়, "পর্যায় ক্রমে একবার এগিয়ে যাওয়া এবং তারপর দাঁড়িয়ে পড়া হলো আমাদের লড়াইয়ের কায়দা।"

৪

চীনা কমুনিষ্টরা যদি সত্যি সত্যি শান্তিই চাইবে তবে ভারত আক্রমন করতে এলো কেন? গত তের বছর ধরে ভারত সরকার এদের বন্ধুত্ব লাভের চেষ্টার ত্রুটি রাখেন নি। এতটা এগিয়ে এসে, এমনকি নিজেদের এত সৈন্য নাশের পর, শুধু শান্তি কামনায় চীন ফিরে যাবে একথা কেউই বিশ্বাস করবে না। ১৯৩৬ সালে, অর্থাৎ চীন-জাপান যুদ্ধেরও আগে, মাও সে-তুঙ ঘোষণা করেছেন: "War is the highest form of struggle for the settlement of contradiction between classes, nations, states, or political groups in a certain stage of development since the beginning of class society."[৩] এর দু বছর পর অর্থাৎ ১৯৩৮ সালে, কমুনিষ্ট জগতের এই শীর্ষগুরুই ঘোষণা করেছিলেন: "Every Communist must grasp the truth that political power grows out of the barrel of a gun ... In this sense we can even say that the whole world can be remoulded with a gun" নিশ্চয়ই এগুলো শান্তিবাদীর কথা নয়।

গত ২১শে নভেম্বরের চৈনিক যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাবের পেছনে একাধিক উদ্দেশ্য বা কারণ থাকতে পারে। সম্ভাব্য সর্বপ্রধান কারণ হলো, এই প্রস্তাব ভারতবাসীর মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে এবং প্রতিরোধ স্পৃহা দুর্বল করতে পারে। চীনা আক্রমনের মুখে আজ সমগ্র ভারত ঐক্যবদ্ধ। এই ঐক্যবদ্ধতা চীনারা আশা করতে পারেনি। তা' ছাড়া নেহরু সরকারের পরিচালনাধীন ভারত এভাবে আমেরিকা, ব্রিটেন প্রভৃতি পাশ্চাত্য শক্তির কাছ থেকে অস্ত্র সাহায্য পাবে এবং নেবে এটাও হয়ত চীনারা আশা করেনি। ভারতবাসী আজ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে চলেছে। এই সময় যুদ্ধের সম্ভাবনা সম্পর্কে যদি ভারতবাসীর মনে প্রশ্ন জাগিয়ে দেওয়া যায় তাহলে সেটাও হবে একটা বিরাট যুদ্ধ জয়। তৃতীয়তঃ এই যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাবে ভারত রাজী হতে পারবে না। কিন্তু রাজী না হলে ভারতের বিরুদ্ধে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করে আফ্রিকা ও এশিয়ার দেশগুলিতে এবং রাশিয়ার, প্রতিকূল মনোভাব সৃষ্টি হবে। চতুর্থতঃ, ভারতের অভ্যন্তরে এতটা এগিয়ে আসার পর যোগাযোগ ব্যবস্থা সুদৃঢ় না করা পর্যন্ত সামরিক প্রয়োজনে, যুদ্ধ বিরতি প্রয়োজন। মনে রাখা প্রয়োজন হিটলারও এরূপ শান্তি প্রস্তাব করেছিল।

চীনের এই চালের পেছনে যে কোন উদ্দেশ্য থাকুক না কেন, চীনের এই প্রস্তাবে কেউই বিভ্রান্ত হয়নি। কমুনিষ্ট চীন আজ ভারতের বিশ্বাস হারিয়েছে। পণ্ডিত নেহরু ক্ষোভের সাথে বলেছেন: "চীনের নগ্ন আক্রমণ আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে; আমরা আর প্রতারিত হবো না।" মাতৃভূমির প্রতিটি ইঞ্চির পুনরুদ্ধারে ভারত আজ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং এই প্রতিজ্ঞার পেছনে রয়েছে অগণিত বিশ্ববাসীর সমর্থন।

২।১২।৬২

---

(৩) Strategic Problems of China's Revolutionary War' এ বইখানা আমাদের দেশে যারা 'শান্তিবাদী'-র ভূমিকায় অবতীর্ণ কমুনিষ্টরা তথা সমস্ত ভারতবাসী পড়ার অনুরোধ করেছিলেন।)

রাস্তার মিছিলে‡ ॥ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শীতকালে 'ফ্যান্'-এর নিচে
লেপমুড়ি দিয়ে
কবিতা, প্রবন্ধ, উপদেশ নয়,
যদি পারো
রাস্তার মিছিলে নেমে এসো।

তোমাদের দেশপ্রেম কাগজে, সভায়
অনেক শুনেছি,
তার চাইতে একটু বেশী তোমাদের কাছে
এ মুহূর্তে আশা করি
এখন রাস্তায় নেমে এসো।

দুই সন্ধ্যার মুখোমুখি* ॥ শান্তনু দাশ

১৯৫৪ : বিডন-স্ট্রীটের মোড়ে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম
সেদিন প্রখর রোদে,
পঞ্চশীলকে সমর্থন করে
আমরা তোমাকে স্বাগত জানিয়েছি।
সোচ্চারে জনতা বলেছিল
আমরা তোমাদের ভাই।
কবুতরের ডানার উপর ভর করে সেদিন
কোলকাতায় সন্ধ্যা নেমেছিল :

১৯৬২ : আজও আমরা দাঁড়িয়েছি রাস্তায়
কঠিন একটা প্রত্যয় নিয়ে
তোমাকে স্বাগত জানাবো বলে, বুলেটে,
কিংবা তোমার গুলিতে রাঙাবো অই উপত্যকা।

সেদিনের মত আজও কোলকাতার বুকে
সন্ধ্যা নামছে রক্তাক্ত সন্ধ্যা :

‡ [ডিসেম্বর ১৯৬২]
* ভারতের সোনাহাট হলে চীনা আক্রমণের প্রতিবাদে আঁকা চিত্র — কবি শঙ্খ ঘোষ।

কোনো বিদগ্ধ কবির প্রতি অর্দ্ধদগ্ধ কবির নিবেদন

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

অনেক লিখেছি পদ্য আপনার বোদলেয়ার করে পাঠ —
তীব্র, মর্মভেদী পদ্য বলের মতন খেলা করে
একাকী, নির্জনমাঠে, খেলোয়াড় নাই, রেফ্‌রী নাই।
পাঠশালা বন্ধ, আপনি পাহারা দিন ঘুরন্ত চৌকাঠ।

শুদ্ধ কবিতার পাণ্ডুলিপি আপনি ছাপান অর্ঘানে
অষ্টাধি তর্জমা তার কিনতে থাকে নোবেলকমিটি ;
আমরা অর্দ্ধদগ্ধ বিড়ি ফুঁকে, বাকি অর্ধেক কামানে
গুঁজে 'মার্ মার্' শব্দে রুখে দাঁড়াই দাদাক-নেফায়।

বিশ্বাসই বাহুল ; আপনি বিশ্বাস করুন, গোচারণ
রাখালের বাঁশী জানে। কোথা পাবো শ্রীখোলের গান ?
তন্ময় জ্যোৎস্নাও করে ধূধূ ধূধূ ; ফরাসী-জর্মানে
তর্জমা করুন বৃদ্ধ এই দুঃস্বপ্ন, এই দুঃসময় !

সাহস দেখান্। যদি চোর ধরে আরামকেদারা —
ছেলেভুলানোর ছড়া গেয়ে রক্ষা কে করে আপোষে !
আপনি তা করবেন ? নাকি হাঁক দেবেন উত্তরাধিকারীরে —
'সন্তান, সন্তান যার, রক্ষা করো আরাম, স্বদেশ !'

অনেক লিখেছি পদ্য আপনারই বোদলেয়ার করে পাঠ —
পেটুক ব্রাহ্মণ, তবু ভরেছে ক্ষুধার গর্ভগুলি ;
পুঁটলিও বেঁধেছি শুদ্ধ আতপ সন্দেশ কাঁচকলায়
এখন অশুদ্ধ মাংস খেতে যাচ্ছি চৈনিক-শিকারে।
আপনি কি যাবেন ? নাকি প্রাত্যহিক সাহিত্যের শাখা
না। দিয়ে দেখবেন বিদগ্ধ ও শুদ্ধ ফুল পেড়ে ?

স্টেইন্‌বেক : ১৯৬২

দিবেন্দু পালিত

স্টেইনবেকের সব বই আমার পড়া নেই। প্রায় বছর দশেক আগে তাঁর 'দি পার্ল্' নামক ক্ষুদ্র উপন্যাসটি পড়ার সুযোগ হয়েছিল। মেক্সিকোর এক সাধারণ মৎস্যজীবী হঠাৎ একটি মুক্তো কুড়িয়ে পেয়ে রাতারাতি বড়লোক হ'য়ে উঠলো; কিন্তু সেই মুক্তোই তার আশেপাশের মানুষকে অসুখী ক'রে তুললো—কাহিনীটি এইরকম। সহজ, অনাড়ম্বর এই রূপকী গল্পটি স্টেইনবেক লিখেছেন সহজতর ভঙ্গীতে, যা তাঁর যে-কোনো রচনারই প্রধান গুণ।

পরে তাঁর আরো কিছু লেখা পড়ে মনে হয়েছে যে, যে-সব গুণের জন্য স্টেইনবেকের রচনা পাঠকের নিকট আকর্ষণীয় বোধ হয়, আসলে এবং পক্ষান্তরে, সেগুলি তাঁর রচনার প্রধান ত্রুটি। তাঁর রচনার বিষয়বস্তু প্রায়ই অত্যন্ত নির্বন, মাঝে-মাঝে ক্ষমাহীন; কিন্তু স্টেইন্‌বেকের মানসিক গঠন এই ধরনের রচনার পরিপন্থী। সবকিছুর পরেও তিনি রোমান্টিক। ফলত, তাঁর রচনা প্রায়ই প্রয়োজনীয় গভীরতা স্পর্শ করতে পারে না।

অথচ, স্টেইনবেকের মতো শক্তিমান ও অভিজ্ঞ, মানবিক বোধসম্পন্ন সাহিত্যিকের পক্ষে এইরকম হওয়া উচিত ছিল না। তাঁর উত্থান-পতননির্ভর খ্যাতির কারণও এই। স্টেইন্‌বেকের রচনার পাশাপাশি তাঁর সমকালীন দু'জন লেখক - উইলিয়ম ফকনার ও আর্নেস্ট্ হেমিংওয়ের রচনা বিচার করলেই এই তথ্য আরো স্পষ্ট হবে। সম্ভবত এই কারণে, এবং সঙ্গতভাবে, আধুনিক মার্কিন সাহিত্যের প্রথম তিন-চারজনের মধ্যে তাঁকে গণ্য করা হয় না। জন্ পাসস, ফকনার, হেমিংওয়ে, আরো পরে হেনরি মিলার—সাম্প্রতিক কথা-সাহিত্যের বিশেষ বিশেষ আলোচনায় এই কয়েকজনের উল্লেখই বারংবার চোখে পড়ে। যদিও সময় ও যুগ ও জীবনেতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে স্টেইন্‌বেক এইসব লেখকের সমগোত্রীয়।

নিজের ব্যর্থতা সম্পর্কে স্টেইন্‌বেক কম সচেতন নন। কিন্তু ব্যর্থতা বা অসাফল্য তাঁর সাহিত্যিক সততায় বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারেনি। আজকের দিনে শিল্পীর বিচার সাফল্যের পরিমাপে হবেনা, হবে শিল্পীর ব্যর্থতা ও গুণাবলীর পরিমাপে, একাধিকবার তিনি এ-কথা বলেছেন। সহজ সাফল্যের আকাঙ্ক্ষায় তিনি স্বকীয়তা ও আন্তরিক ধর্ম বিসর্জন দেন নি। আর, সাফল্য বলতে যদি নোবেল পুরস্কারই বোঝায়, তাহ'লে বলতে হয়, তাঁর সততার মূল্য স্টেইন্‌বেক এতদিনে পেয়েছেন। তাঁর শেষতম উপন্যাস 'দি উইন্টার অফ্ আওয়ার ডিস্কন্টেন্ট'—'দি গ্রেইপ্‌স্ অফ্ রথ্' রচনার প্রায় দু' যুগ পরে, আরো একটি অসাধারণ গ্রন্থ। ছন্নছাড়া, হা-ঘরে যন্ত্রণাকাতর, প্রায় বন্য ও অর্ধশিক্ষিত বেপরোয়া মানুষের জন্য সহানুভূতি, এবং উপরন্তু, আমেরিকার বিচিত্র প্রকৃতির প্রতি আকর্ষণ বোধ—স্টেইন্‌বেকের সাহিত্য-কর্মের অন্তর্ভূত বিবিধ গুণ ব্যাপক আলোচনা দাবি করে। সাহিত্য ও শিল্পের যে-কোনো 'পুরস্কার' সম্পর্কে বিচক্ষণ পাঠকের সন্দেহ যতই গভীর হোক, ষাট বছরের বুড়ো

স্টেইন্‌বেককে সম্মানিত ক'রে সুইডিশ্‌ আকাদমী যে বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন, এ-কথা সকলেই স্বীকার করবেন।

২

স্টেইন্‌বেকের জীবন অনতিগতকাল পর্যন্ত খুব সুখের হয় নি। কালিফোর্নিয়ার সালিনাসে তাঁর জন্ম : ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯০২। পারিবারিক স্বাচ্ছল্য বিশেষ ছিল না। বাবা একজন জার্মান-আইরিশ : মা আমেরিকান। পারিবারিক স্বাচ্ছল্য না থাকলে যা হয়, বাল্যবয়স থেকেই কালিফোর্নিয়ার মানুষ ও প্রকৃতির সঙ্গে স্টেইনবেকের পরিচয় গাঢ় হয়।

সালিনাস বিদ্যালয়ে পাঠ শেষ ক'রে স্টেইন্‌বেক বছর চারেক স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ ছাত্র হিসেবে অধ্যয়ন করেন ; পরীক্ষা দেবার সুযোগ ছিল না। ছাত্র-জীবন শেষ হ'লে তাঁকে নানারকম পেশার শরণ নিতে হয়। কিছুকাল নিউইয়র্কে সাংবাদিকতা করেন : কি', সাংবাদিকতায় ব্যর্থ হন। পরবর্তী জীবনে ছবি আঁকা থেকে কল-কুড়ানো পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের কাজ করেছেন। শেষ পর্যন্ত কালিফোর্নিয়ায় ফিরে এসে স্থির করলেন লেখক হবেন।

লেখক হিসেবেও গোড়ার দিকে বিশেষ সুবিধে করতে পারেননি। প্রথম তিনটি বই কোনোরকম ব্যবসায়িক সাফল্য বা প্রশংসা পায়নি, যদিও বইগুলি নিতান্ত অবহেলাযোগ্য ছিল না। কপাল ফিরল পাস্কাল কোভিসি নামক এক তরুণ সম্পাদকের সুনজরে পড়ে। ভদ্রলোক, কোভিসি, স্টেইন্‌বেকের 'প্যাসচারস্‌ অফ হেভেন্‌' গল্প-সংকলনটি কিনেছিলেন এক পুরনো বইয়ের দোকানে, প'ড়ে চমৎকৃত হ'লেন। সঙ্গে সঙ্গে খোঁজ পড়ল স্টেইন্‌বেকের। কিন্তু প্রকাশক বিশেষ কিছু জানাতে পারলেন না। কোভিসি শুধু জানতে পারলেন যে স্টেইন্‌বেক থাকেন লস্‌ গাটোস-এ ; এবং তাঁর নতুন উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিটি সাতজন প্রকাশক ফেরৎ দিয়েছেন। উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিটি সংগ্রহ করে কোভিসি নিজে ছেপে বার করলেন। স্টেইন্‌বেকের চতুর্থ গ্রন্থ, "টরটিলা ফ্লাট,' তিন ভবঘুরের কাহিনী। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই চতুর্দিকে সাড়া প'ড়ে গেল। সেটা ১৯৩৫ সাল।

কোভিসি ছুটে গেলেন কালিফোর্নিয়ায় স্টেইন্‌বেকের সঙ্গে দেখা করতে। সেই থেকে আজ পর্যন্ত উভয়ের সম্পর্কে ছেদ পড়েনি। স্টেইন্‌বেক অকৃতজ্ঞ নন। তাঁর প্রতিটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে কোভিসির প্রকাশনী'র মাধ্যমে। পরবর্তীকালে নিজের ব্যবসা বন্ধ হলে, ভাইকিং প্রেসে যোগ দিলেন কোভিসি। স্টেইন্‌বেকের বই এখন ভাইকিং প্রেসই ছাপেন।

স্টেইন্‌বেক জীবনবিদ্বেষী শিল্পী নন, তার প্রমাণ তাঁর প্রতিটি রচনায়। প্রচুর লিখতে পারেন। এবং তাঁর সম্পর্কে যা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য : রচনার নিত্য নতুন ভাঙাগড়া ও পরীক্ষা করেন তিনি। দীর্ঘ দেহ, গাঢ় চক্ষু, লাজুক ও নম্র, প্রচারবিমুখ, স্টেইন্‌বেক মানুষটিও সুন্দর। যুদ্ধের সময় আবার কিছুকাল তিনি সাংবাদিকতা করেছেন। অভ্যাস এখনো যায়নি। 'সানফ্রানসিস্কো নিউজ' পত্রিকায় মাঝে-মাঝে তাঁর লেখা দেখা যায়। বলা বাহুল্য, তাঁর অধিকাংশ রচনার পটভূমিই কালিফোর্নিয়া, কালিফোর্নিয়ার মানুষ ও প্রকৃতি।

৩

'টরটিলা ফ্লাট'-এর পর প্রকাশিত হয় স্টেইনবেকের 'অফ্‌ মাইস এ্যাণ্ড মেন্‌,' ভবঘুরে শ্রমিকদের বন্ধুতাময় জীবনের কাহিনী। এই-গ্রন্থটিও বিশেষ সমাদর অর্জন করে। ১৯৩৯-এ প্রকাশিত হয় 'দি গ্রেইপস্‌ অফ্‌ রথ,' তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এর জন্য তিনি 'পুলিটজার' পুরস্কার লাভ করেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মুখে। 'দি গ্রেইপস্‌ অফ্‌ রথ'

উপন্যাসের আত্মপ্রকাশ বিশেষ তাৎপর্যময়। স্টেইনবেকের জীবন সম্পর্কিত ধারণা ও দর্শন এই গ্রন্থে সুন্দর ফুটেছে।

ঋদ্ধি-শিল্পায়নের চাপে বিপর্যস্ত সর্বহারা একটি পরিবার, একটা পুরনো মোটরগাড়িতে চেপে ওকলোহামা ছেড়ে রওনা হল কালিফোর্নিয়ার পথে। কালিফোর্নিয়া তাদের কাছে প্রাচুর্যের দেশ, স্বর্গময় জগৎ। পরিবারের সকলে—ঠাকুর্দা, ঠাকুমা, কাকা জন, বাবা, মা, নোয়া, আল, রোজ, রুথি, টম, অন্যান্য শিশুরা ছাড়াও এই দলে আছেন কেইসী, একজন প্রাক্তন পাদ্রী ও সমাজবাদী। ঠাকুর্দা ও ঠাকুমা ঝরা গেল পথে, নোয়া পালাল। জোড পরিবার তবু হতাশ হল না, এগিয়ে চলল।

কালিফোর্নিয়ায়, স্বপ্নময় সুবর্ণ উপকূলে পৌঁছে তাদের দুর্দশা চরমে উঠল। যেখানে যায়, সেখানেই প্রত্যাখ্যাত হয়। বাঁচার জন্য, পেটের তাগিদে প্রথমে তারা আশ্রয় নিল এক সরকারী ক্যাম্পে; পরে কাজ নিল ফল-বাগানে।

যেমন তেমন ক'রে দিন কেটে যাচ্ছিল। হঠাৎ দেখা দিল শ্রমিক ধর্মঘট, সেই দুর্যোগে নিহত হল কেইসী। উপায়ান্তর না দেখে জোড্ রা গেল পালিয়ে। যা টমকে বিদায় দিলেন। তথাপি দুর্দশা ঘুচল না: কোথাও কোনো আশার আলো দেখা যাচ্ছে না। অনাহারে, মৃত্যুর আশঙ্কা ও আতঙ্কের মধ্যে মা তখন চীৎকার করছে: "আমরা মরব না, মরতে পারি না। মানুষ বলেছে সারাক্ষণই বলেছে। কিন্তু এগিয়েই চলেছে।"

শেষের পংক্তিগুলি স্টেইনবেকের সমাজচেতনা ও বলিষ্ঠ-মনোভঙ্গীর পরিচয়। এবং সেই সময়ের পক্ষে এই উপন্যাস একটি প্রচণ্ড আঘাত। বইটির প্রচার 'নিষিদ্ধ' হয়। তবু গোপনে এর পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, হাজার হাজার কপি বিক্রি হ'য়ে যায়।

কোনো-কোনো সমালোচক স্টেইনবেকের এই উপন্যাসটিকে বিশ শতকের 'আংকল টমস্ কেবিন' আখ্যা দিয়েছেন। এবং যথার্থ কারণে।

স্টেইনবেকের নোবেল পুরস্কার অর্জন তাঁর ব্যর্থতাময় সফলতার ক্ষেত্রে একটি ঘটনা মাত্র; তার বেশি কিছু নয়।

বিজ্ঞপ্তি

জয়শ্রীর পৌষ, ১৩৬৯ সংখ্যা স্বামী বিবেকানন্দ ও নেতাজী সংখ্যা রূপে প্রকাশিত হচ্ছে। ঐ সংখ্যায় কোন ধারাবাহিক প্রবন্ধ, উপন্যাস এবং ছোট গল্প থাকছে না।

জ. স.

স্বামী বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী ও নেতাজী সংখ্যা

জয়শ্রী
পৌষ। ১৩৬৯

এই সংখ্যায় থাকছে ···

উনিশ শতকের বাংলা ও স্বামীজী • ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী, বিবেকানন্দ • অন্নদাশংকর রায়, বিবেকানন্দের ইতিহাস চেতনা • রমেশচন্দ্র মজুমদার, বিপ্লবীদের জীবনে বিবেকানন্দের প্রভাব • নলিনী কিশোর গুহ, বিবেকানন্দ ও সমাজবাদ • অতীন্দ্রনাথ বসু, সমাজবিপ্লবে বিবেকানন্দ • শংকরীপ্রসাদ বসু, বিবেকানন্দ ও জাতিবৈরমের বিলুপ্তি • দেবীপ্রসাদ সেন, শিক্ষাপ্রসঙ্গে বিবেকানন্দ• সনৎকুমার রায় চৌধুরী, বিবেকানন্দের পত্রসাহিত্য • দুর্গেশ চৌধুরী, বিবেকানন্দ ও পাশ্চাত্যের প্রভাব • সরোজেন্দ্রনাথ রায়, বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ • নীরদবরণ, বিবেকানন্দ ও নেতাজী • সমরগুহ, এ ছাড়া

পুরোনো পাতা ····· শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত বিবেকানন্দের সম্বন্ধ • গিরিশচন্দ্র ঘোষ, স্বামী বিবেকানন্দ • সুভাষচন্দ্র বসু, স্বামী বিবেকানন্দ • ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, প্রভৃতি।

প্রাপ্তিস্থান

৩১২, গাঙ্গুলি বাগান, কলিকাতা ৪৭।

ফোন : ৪৬-৪১১৬

দাম : ১·০০

চল্লিশ দশকের বাঙলা কবিতা

.....কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত.....

চার

চল্লিশের যুগের কবিদের অন্যতম মনীন্দ্র রায় সুদীর্ঘকালের সাধনায় উল্লেখযোগ্য স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী। কবিতার ভাষাকৌশলে গোড়া থেকেই দরদবান এই কবির বিষয়-বস্তু নির্বাচনেও অনেক ক্ষেত্রেই প্রচলিত আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রস্ফুটিত। অগ্রণী কবিদের প্রভাব তিনি অল্প সময়ের মধ্যে কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন এবং প্রকাশভঙ্গি ও আঙ্গিকের অনন্যতায় তাঁর কবিতা ক্রমশই তরুণ কাব্যপাঠকের গ্রহণীয় হয়ে ওঠে।

যখন কেবলি মানসকামনা
সরাতো বুকের লঘু পাহাড়,
ঝড়ক্লে-নিশ্বাসে এঁকেছি কতো-না
আত্মরতির সুরবিহার।

রাসবালা সেই মনের আকাশে
বর্ষণভীরু বন্যাকামেঘ,
হালকা সাঁতারে আসে যায় আসে
প্রথম প্রেমের মতো আবেগ।

('অতিক্রান্তি')

মনীন্দ্র রায়ের কবিতায় বরাবরই একটি কল্যাণচিন্তা বিচিত্ররূপে ক্রিয়াশীল। তাঁর কবিতা শাশ্বতের ভাবান্তরে আদর্শবাদী। কিন্তু ছকেবাঁধা মতামতের দুর্গম গলিপথ অতিক্রম ক'রে মনীন্দ্র রায়ের কবিতা প্রসন্ন ও প্রসারিত উপলব্ধির যে প্রান্তরে উপস্থিত সেখানে আধুনিক কাব্যপাঠকের উৎকৃষ্ট কবিতার নিবিড় রসাস্বাদন সম্ভব হয়। উদাহরণত উল্লেখ্য 'স্বদেশ' কবিতাটি।

স্নিগ্ধশ্যাম ছত্রশক্তি হে স্বদেশ,
প্রণাম। শতাব্দীশেষ
মূঢ় তন্দ্রিভার ; সূর্যোদয় আরক্ত গম্ভীর
বিহ্বল দিগন্ত পারে, স্নায়ু জনতার
স্নায়ুজালে—ধমনীর লোহিত বিস্ময়ে।
জাগে স্তম্ভিত মাটির
দীপ্ত নিরুদ্ধ স্বাধিকার।
কবির শতাব্দীশেষে হে স্বদেশ, প্রণাম আবার।

('স্বদেশ')

অমিল থেকে মিলে কাব্যগ্রন্থে মনীন্দ্র রায়ের সুপরিণত কবিপ্রকৃতির সাক্ষ্য। ইতিপূর্বে প্রকাশিত 'কৃষ্ণচূড়া' যদিও বিষয়োচিত ব্যঞ্জনায় তাৎপর্যময় তথাপি 'অমিল থেকে মিলে' কাব্যগ্রন্থের কবিতারই প্রসঙ্গে ও উপকরণে এবং প্রকাশ-ভঙ্গিতে বৈচিত্র্য ও গভীরতা উপস্থিত। কবিতাকে ঝরঝরে, মুখের ভাষার নিকটবর্তী করবার কঠিন পরীক্ষায় মনীন্দ্র রায় ঈর্ষাযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছেন এবং তাঁর ঋজু প্রকাশভঙ্গি এই সাফল্যের সহায়।

হয়তো আনেকদিন কেটে যায় পথার বাঁকের
ঘাড়াই পাড়িতে ভয়াবহ

শিমুলের মতো একা চেইত্রের গর্জন বুকে স'য়ে,
হয়তো সর্বাঙ্গে তার লাগে নয় কাঁটা,
ভাঙা পাড়ে উদ্বাস্তু শিকড়
শূন্যে হাত মেলে খোঁজে নষ্ট জীবনের চেনা মাটি,
তবুও, বরং যেন তখনি, সে বোঝে
কী আনন্দে সূর্য রোজ রাত্রিকে দুপায়ে দ'লে হাসে,
ঘুমন্ত মেঘের বুকে বিদ্যুতের কী তীক্ষ্ণ বাহার!

('শর্তা')

সনেট রচনার ক্ষেত্রেও মনীন্দ্র রায়ের স্বাতন্ত্র্য উল্লেখ করা যেতে পারে। চল্লিশের কবিদের মধ্যে তাঁর এবং বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের চতুর্দশপদী কবিতায় নতুন ব্যঞ্জনা লক্ষ্যণীয়। মনীন্দ্র রায়ের 'আনন্দ, এবং আনন্দ' 'আগে কহো আর' 'মহাদেবের পটের প্রতি' 'বরং গভীরতর' ইত্যাদি চতুর্দশপদী সাম্প্রতিক বাংলা সনেট রচনায় বিশিষ্ট সংযোজন। 'মহাদেবের পটের প্রতি' চতুর্দশপদীটি বর্তমান প্রবন্ধকারের বিবেচনায় বিরল কৃতিত্বের সাক্ষ্য।

প্রভু, এখনো কি হয়নি সমাধা
সময়ের দিনরাত্রি-ভোরাকাটা বাঘছালে ব'সে
জীবনের ইস্কুল পালানো? দেখ, কাঁদে-যে শিশুরা,
গৃহিনী কপাল কোটে স্বয়ংবরা বিয়ের আপশোসে,
ভিক্ষার জটিল পথে ঘুরে ঘুরে ব'ড়ি হল বুড়া।

('মহাদেবের পটের প্রতি')

কবিতাটির চিত্রকল্পে প্রাত্যহিক সংসারের দৃশ্যপট শক্তিমান প্রকাশে বিশিষ্ট। ঈষৎ শিল্পিত বন্ধনে, কালানুচারী আবহ সৃষ্টিতে সার্থক। অন্তত, ইদানীন্তন চেতনা সম্পর্কে কবির উক্তি প্রবণসুখকর বিন্যাসে যথার্থ।

আমরা কে-দিনে আছি সে বড় কঠিন।
গীতিকবিতার মতো তার কোনো স্বরলিপি নেই।
এ যেন প্রবল কোনো শিল্পীর খাতায়
নানা কাটাকুটি রেখা টানা-টানা, ভাঙা,
অসম্পূর্ণ অস্পষ্ট আভাস,
প্রতিটি মোচড়ে যার ছায়া ফেলে যায়
দ্বন্দ্বের রক্তাক্ত ইতিহাস।

('হ'য়ে ওঠা')

এবং এ বিষয়ে সদাসচেতন থেকেই মনীন্দ্র রায় শিল্পকে জীবনের সমীপবর্তী করছেন; ভাষায়, প্রতীকে, উপমায় শিল্পকে জীবন্ত করার দুরূহ কাজে আশাতীত সাফল্য লাভ করেছেন।

ত্রিশিদের কবিগোষ্ঠী দীর্ঘকালের কাব্যসাধনার পর যখন ঈষৎ দিধাগ্রস্ত এবং আধুনিক কবিতার নতুন সম্ভাবনা সম্পর্কে ভাবিত সেই সময়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সামাজিক ব্যঙ্গপ্রধান সদ্যপ্রকাশিত কবিতাগুলো হালকা চাল ও চটুল ছন্দের জন্যে তৎকালীন কাব্য পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাংলা দেশে চল্লিশের যুগে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ই খুব সম্ভবত একমাত্র কবি যিনি শুরু থেকেই অগ্রণী কবিদের প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। 'পদাতিক'-র অনেক কবিতা এখন অগভীর ও জলো মনে হলেও এক সময়ে, তৎকালীন দ্রুত অপসৃয়মান সামাজিক পটভূমিকায়, আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। বস্তুত, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্যের সঙ্গে প্রকাশ-ভঙ্গির এমন মিলন সম্ভব হয়েছিল যাতে কবিতাগুলোর আবেদন ব্যর্থ হয়নি। যুগের পরিবর্তিত হাওয়ায় যুগপোযোগী কাব্যাদর্শের অবতারণায় অতএব তাঁর প্রাথমিক সিদ্ধিকে অসাধারণ বলতে বাধা নেই। 'পদাতিক' কবিতা বইয়ের কয়েকটি কবিতা রীতিমতো চোখধাঁধানো এবং বিস্ময়কর শুধু এই পর্যন্ত বললেই কোনো কবিতা সম্পর্কে যে শেষ কথা বলা হয় না একথাটাও মনে রাখা আবশ্যক। স্বর্গত সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীকে নিবেদিত 'পদাতিক' দীর্ঘ কবিতাটি ছন্দ, মিল এবং বিষয়োচিত প্রকাশভঙ্গিতে উল্লেখ্য 'অতঃপর' সার্থক ছন্দ-বৈচিত্র্যের সাক্ষ্য-'কিংবদন্তী' নামের আট লাইনের

কবিতাটির ক্ষুদ্র পরিসরে তির্যক বাক্তব্যের ব্যাপক আবেদন লক্ষ্যণীয়।

'পদাতিকে'র পরবর্তীকালে সুভাষ মুখোপাধ্যায় হালকা সুর বর্জন করেন এবং স্বদেশের এবং বিশ্বের দুর্যোগপূর্ণ পটভূমিকায় তাঁর কবিতায় রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির গভীরতা লক্ষ্য করা যায়। এই সময় বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ অগ্রণী কবিরা যাঁরা 'পদাতিকে'র আপাত সাফল্যে মুগ্ধ হয়ে অজস্র প্রশংসাবাণ বর্ষণ করেছিলেন, তাঁরা সুভাষের কবিতার কৌতূহল ও মনোযোগ দুই-ই হারিয়েছিলেন বলা যেতে পারে। পক্ষান্তরে, রাজনৈতিক গোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ সমর্থনে সুভাষ মুখোপাধ্যায় নতুনতর শিল্পরীতিতে অভ্যস্ত হয়েছিলেন। এই সময় তরুণতর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য প্রচলিত ছন্দে ও ভাষাবিন্যাসের সাহায্যে সমাজসচেতন কবিতায় নতুন একটি নিজস্ব সুর সংযোজন করেন। রাজনৈতিক কোনো সম্প্রদায়ের প্রত্যক্ষ উৎসাহ কি সমর্থনে কবিতা লেখা বিড়ম্বনার বিষয়। কিন্তু কবির সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি যদি রাজনীতি-সচেতন কবিতা সৃষ্টি করে তাহলে অনেক সময় সে-কবিতার প্রকৃত রসাস্বাদনও সম্ভব। সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সুকান্তর কাব্যসাধনার পরিসর অত্যন্ত অল্প। মাত্র কয়েকটি অত্যন্ত দুর্যোগপূর্ণ বছর তাঁর কবিতার পটভূমি। তখন, চল্লিশের সেই অবক্ষয়ের যুগে, কবিতার আঙ্গিকের তুলনায় বরং বক্তব্যের সম্প্রসারণ লক্ষ্যণীয়। খুব একটা দীপ্ত বিশ্বাসে উদ্বিক্ত 'ছাড়পত্র' এবং 'ঘুম নেই' কাব্য গ্রন্থের কয়েকটি কবিতা; কাব্যের দিগন্ত তরুণের আশাবাদী স্বপ্নের রঙে অনুরঞ্জিত।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এই সময়কার কবিতায়ও বক্তব্যের এই সম্প্রসারণ দৃষ্টিগোচর হবে। 'একটি কবিতার জন্য' দ্রষ্টব্য।

একটি কবিতা লেখা হবে, তার জন্য
আগুনের নীল শিখার মতন আকাশ
রাগে রী-রী করে সমুদ্র ডানা ঝাড়ে
দুরন্ত ঝড়, মেঘের ধূম্র জটা
খুলে খুলে পড়ে, বজ্রের হাঁকডাকে
অরণ্যে সাড়া, শিকড়ে শিকড়ে
পতনের ভয় মাথা খুঁড়ে মরে
বিদ্যুৎ ফিরে তাকায়
সে আলোর সারা ভল্লাট জুড়ে
রক্তের দাগ দর্পণে মুখ দেখে
ভস্মলোচন।

এই কবিতাটিতে স্পষ্টতই বক্তব্যের স্পর্শক্ষম, জমজমাট ভাবাবেগের আবহসৃষ্টির সফলতা অনেকেই লক্ষ্য করবেন এবং 'ধূম্র' 'অরণ্য' 'পতন' 'দর্পন' ইত্যাদি পদ্যগন্ধী শব্দের ব্যবহারে কবিতার ভাবসংহতি বরং বেড়েছে। 'মিছিলের মুখ' কবিতাটিও এই দিক থেকে সহযাত্রী। প্রচুর ভা'রি শব্দের বিন্যাস কবিতাটির প্রাণ বিপন্ন। 'মুষ্টিবদ্ধ' 'কেশাগ্র' 'কম্পমান' 'কণ্ঠাক্ত' 'অপ্রতিদ্বন্দ্বী' 'নিতাধিত' একটি মাত্র কবিতায় আমদানি দেখে তার পরিনাম শুভ না হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু, খুব সম্ভব সম্প্রসারিত বক্তব্যের জন্যেই, শেষ পর্যন্ত পাঠকমনকে নাড়া দিতে পেরেছিল। তবু, এ যাবৎকাল সুভাষ মুখোপাধ্যায় যে-সব কবিতা লিখেছেন তার মধ্যে সম্ভবত এই ধরণের মধ্যবর্তী পর্যায়ের কবিতাগুলোই দুর্বল এবং আনন্দের কথা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক কবিতা সম্পূর্ণভাবেই নতুন ব্যঞ্জনায় স্পন্দিত। সুভাষ মুখোপাধ্যায় যে আর ছন্দ ও মিলের রাজ্যে ফিরে যেতেন না, গদ্যকবিতার রুক্ষ পৌরুষ এবং সচেতন কারিগরীর নিবিড়তায় ঘনিষ্ঠ হলেন তার একটি কারণ বোধহয় এই যে তরুণতর কবিসম্প্রদায়ের কাছে ইদানীন্তনকালে গদ্যকবিতা বর্জনীয় হলেও এখন পর্যন্ত এই ধরণের কাব্য—আঙ্গিকের মধ্যেই তিনি ব্যঞ্জনাময় সমাজচিন্তার অনুরঞ্জনের সার্থকতা দেখতে পান। প্রকৃতপক্ষে, বাংলা গদ্যকবিতার একটি সুবিস্তৃত, সুদৃঢ়বহিরঙ্গ

(form সৃষ্টির ক্ষেত্রে সমর সেনের কবিতার মতোই সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক কবিতাগুলোর অনেকগুলোই বাংলা কাব্য-আন্দোলনের স্মরণীয় প্রস্তরফলক রূপে চিহ্নিত হতে পারে। তবে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাছে আধুনিক কাব্যপাঠকের উচ্চাশা এখন পর্যন্ত হয়তো পরিতৃপ্ত নয়। এখন সেখানে এসে পৌঁচেছেন স্পষ্টই বোঝবার তাঁর কবিতা।

বহিরঙ্গে এবং বক্তব্যে নবতম বাঁকের সন্ধানী। নতুন সম্ভাবনার যে-আভাস তাঁর সাম্প্রতিক কবিতায় দৃগ্‌গোচর তার ক্রমপরিণতি এবং সম্পূর্ণতায় আধুনিক বাংলা কবিতা সমৃদ্ধ হবে এই আশা বাংলাকাব্য পাঠকের।

কবিতার শুরু আনন্দে, তার পরিসমাপ্তি অভিজ্ঞানে একথাটার উল্লেখ করেছিলেন কবি রবার্ট ফ্রস্ট। ব্যক্তিগতভাবে এই স্বীকৃতিতে আমার আনন্দ। দীর্ঘকালের পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে চল্লিশের কবিদের অনেকেই ভাষায় ও ছন্দে, বিচিত্রমুখী প্রকাশভঙ্গিতে অভিজ্ঞতা অর্জনের পর সঙ্গতভাবেই তাঁদের কবিতায় স্রষ্টা কথিত অভিজ্ঞানের অনুধাবন অপরিহার্য। সাম্প্রতিককালে তরুণতরদের কবিতা অনেক ক্ষেত্রে যে পরিমাণে ভঙ্গিসর্বস্ব সে তুলনায় হৃদয়স্পর্শী নয় এবং একথার দীর্ঘকালের আন্তরিক উদ্যোগের কথা দিয়েই, বয়স ও অভিজ্ঞতাবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে কবিতায় প্রাজ্ঞতার, পরিণামদর্শিতার বিস্তার সম্ভব হতে পারে। চল্লিশের যে কজন কবি এযুগেও বিশেষভাবেই সক্রিয় সঙ্গতভাবেই তাদের কাছে কাব্যপাঠকের প্রত্যাশা এযুগেও সীমিত নয়। সুভাষ মুখোপাধ্যায় হয়তো নতুন উন্মেষের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, পাঠক অপেক্ষা করবে।

শাঁচ

চল্লিশের প্রায় সেসাসেসি যে কজন শক্তিমান কবির সক্রিয়তা নজরে পড়বে বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের একজন। যুদ্ধ-পরবর্তীকালের বাংলা কবিতায় লাবণ্য ও লালিত্যের দিকে যে ঝোঁক দেখা যায় গোড়া থেকেই বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতায় তার ব্যাপকতা বর্তমান। ছন্দে-মিলে এবং বিষয়োচিত ভাববিন্যাসে তাঁর অনেক কবিতাই উল্লেখ্য এবং প্রেমের অনুসরণে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের উপলব্ধিতে এবং সর্বোপরি কিছু কিছু কাহিনীকাব্যের অবতারণায় তাঁর স্বাভাবিক সিদ্ধির প্রমাণ উপস্থিত। আধুনিক বাংলা কবিতায় দীর্ঘ কবিতা লেখার তেমন উদ্যোগ দেখা যায় না। কিন্তু বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায় এদিক থেকে উল্লেখযোগ্য সাফল্য ও স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অবতারণী আবার রাত্রি'র অন্তর্ভুক্ত 'আসন্নের পত্তন' কিংবা 'কোনো মৃত্যুর শিয়রে আবহমান' কিংবা 'আকাশিনী ও মৃন্ময়ী' কাব্যের 'বৌ-ডোবা-দিঘি ও ভাঙা মহল' সাম্প্রতিক বাংলা কবিতায় নতুন আস্বাদ বহন করে এনেছে। নরেশ গুহর কবিতায়ও লাবণ্য ও লালিত্যের সুচারু প্রকাশ লক্ষ্যণীয়। তাঁর একমাত্র কাব্যগ্রন্থ 'দূরন্ত দুপুর' পড়ে বুদ্ধদেব বসু একদা 'বিষণ্ণ মধুর শান্ত রসের কাব্য' বলে অভিহিত করেছিলেন এবং এই সংজ্ঞা যথার্থ বলে মেনে নিতে বাধা নেই। অনেক আধুনিক কবির মতোই নরেশ গুহও নাগরিক জীবনের একঘেঁয়েমি, রূঢ়তা ও দিনযাপনের ক্লান্তিতে ঈষৎ দ্বিধান্বিত, বিষাদগ্রস্ত। কিন্তু তাঁর কবিতায় কখনোই ক্লান্তির সুর, বিষাদের সুরের আতিশয্য নেই। বরং কোনো কোনো বিরল মুহূর্তের প্রীতিস্নিগ্ধতা এবং ভালোলাগাকেই তিনি প্রাধান্য দিতে প্রস্তুত। প্রাত্যহিক সাধারণ ঘটনার মধ্যেও কখনো কখনো অলৌকিক বিস্ময় আবিষ্কার করেন।

কলকাতায় বেঁচে আছি শুধু এই মহাপুণ্যবলে
এখনো গলির মোড়ে সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় গ্যাস জ্বলে,
ভোরে জলে জল আসে, পাশের বাড়ির

দ্বিতল রেলিঙে ঝোলে সন্তরাত আকরানী শাড়ির
আঁচলের প্রান্তভাগ।...

এবং অন্যত্র :

শান্তিনিকেতনে বৃষ্টি : ছুটি শেষ। ভিজে আলতা লাল
সুরকি পথ। ডাকঘরে বিমুখ কাউন্টার চুপ। কাল
হয়তো রোদ্দুর হবে। শুকোবে ধোয়াই, ভিজে ঘাস।
লোহার গরাদ ঘেরা আম্রকুঞ্জে কবিতার ক্লাস
কাল থেকে ফের। ঘুমে কোলা চোখ, ভাঙা ভাঙা গলা
কবে সে মধুর পায়ে পাতাঝরা ছাতিম তলায়
একা এসে ঘুরে গেছে? ঘণ্টা শুনে হঠাৎ কখন
অকারণে দিন গেল। ছায়াচ্ছন্ন শান্তিনিকেতন।

কলকাতায় ফিরে যদি যদি আজ বিকেলের ডাকে
তার কোনো চিঠি পাই? যদি সে নিজেই এসে থাকে?
('শান্তিনিকেতনে ছুটি')

এই শান্তরসের বর্ণাঢ্যতা তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে অরুণকুমার সরকারের দু একটি প্রেমের কবিতায় এবং চিত্ত ঘোষ, অরুণ ভট্টাচার্য ও প্রমোদ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় সম্প্রতি স্পষ্ট চেহারা নিয়েছে। অরুণ সরকার ছন্দ ও মিলে দক্ষতা অর্জন করেছেন এবং অন্যত্র তাঁর দুটি প্রেমের কবিতায় ('জন্মদিনে' 'রিখিয়ায়') তাঁর সফলতা আনন্দকর। কিন্তু তাঁর পরবর্তী কবিতায় ভঙ্গিসর্বস্বতার পরিবর্তে গভীরতার বিস্তৃতি বাঞ্ছনীয়। পক্ষান্তরে চিত্ত ঘোষ এবং অরুণ ভট্টাচার্যের কবিতায় লিরিক সুরের, শান্ত রসের গুঞ্জন। এক সময়ে চিত্ত ঘোষের কবিতায় সমাজচেতনার প্রাবল্য ঘটলেও শেষ পর্যন্ত বিষয় ও বহিরঙ্গের উপযুক্ত সমন্বয়ে সাফল্য লাভ করেছেন। রূপক ও উপমার সফল প্রয়োগে, মাঝে-মাঝে দু'তিনটি পংক্তির পরিমিত্তে স্মরণগ্রাহী চিত্রনির্মাণে চিত্ত ঘোষ উল্লেখ্য। স্বকীয় অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি অরুণ ভট্টাচার্যের কবিতার অবলম্বন। শান্ত, মিতব্যয়ী এবং স্মৃতির অনুভূতিনির্ভর বলেই তাঁর কবিতায় যাত্রাজ্ঞান ও শান্তিবোধের সার্থক সমন্বয় দেখা যায়।

আষাঢ়ের আকাঙ্খার দিন শেষ হয়।
মৃৎপ্রদীপের নিচে ওটি ওটি অন্ধকারে
অথবা সন্ধ্যার লক্ষ জোনাকির নীলিম উৎসবে
তার কথা মনে হয়। মনে হয়
আমরা যখন শুধু লাঞ্ছনার চিহ্ন নিয়ে মনে
মিথ্যে যৌবনের রক্তে জীবনের জটিল সড়কে
ঘুরেছি কেবল, সে তার সৌন্দর্য নিয়ে
নির্জন দীঘির ধারে পা বিছিয়ে বসেছে নীরবে।
('কাঁচঘর')

অরুণ ভট্টাচার্যের কবিতার এই সৌম্য স্নিগ্ধতা তাঁর কবিতার একটি সম্পদ বলেই মনে হতে পারে। নীচু গলার হাল্কা উচ্চারণে তিনিও তদ্বিষ্ঠ এবং অল্প কয়েকটি তুলির আঁচড়ে, নিটোল রেখায় এবং বিশ্বয়োচিত বিন্যাসে অনেক সময়ই তাঁর কবিতা সতর্ক কাব্যপাঠকের কাছে চিত্তহারী বিবেচিত হবে। 'বিদায় সংসার' 'আয়নায় বিকেল রাত্রি' ইত্যাদি কবিতা প্রসঙ্গত উল্লেখ্য।

এ-কথা তাকে বলো
সুখ চেয়োনা, দুঃখ বরং অপার আশা নিয়ে
মন ভোলাবে; অজস্রতায় রক্তচূড়ার লাল
সারা আকাশ রাঙাবে, আর ভালোবাসায়
ভরবে সংসার।
('আয়না তার আলো')

অরুণ ভট্টাচার্যের কবিতায় শিল্পচিন্তা এবং জীবন-চিন্তা এই উভয় দিক থেকে এই প্রত্যয়-বোধ তাঁর প্রতি আধুনিক কাব্য পাঠকের মনোযোগের কারণ। তাঁর কবিতা নিছক শব্দযাদুতে মোহময় নয় কিংবা ছন্দের চটুল কিংবা অসাবধানী ব্যবহার থেকেও সৌভাগ্যক্রমে তাঁর কবিতা মুক্ত। বরং বলা যেতে পারে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির সম্প্রসারণে এবং

শব্দচয়ন ও বিরল ভাববোধের সমন্বয়ে তাঁর এক-একটি কবিতা আলোকিত।

অস্থির সন্ধ্যাকে তোর বড় ভয়, জানি
তারা নিবলে, মেঘ ডাকলে
লুকিয়ে থাকিস দূরে। আমরা তোকে
অভিমন্যু ভেবে
কত কথা বলি যে গোপনে।

('নদীর হৃদয়')

বহুধা বিচ্ছিন্ন, দায়িত্বে নিষ্ঠায় বাঁধা এবং সামাজিকতায় বিব্রত কবিচেতনা নদীর কাছে, সমুদ্রের কাছে হৃদয় উন্মোচিত করে, 'রোদের জানলায় হিরন্ময় নির্মলতার একমুঠো আকাশ দেখে অস্বস্তি হতে ভালোবাসে'। মোটের উপর, নাগরিক রুদ্ধশ্বাস প্রতিকূলতায় লালিত হয়েও শান্তরসের মগ্নতায়, আত্মস্থ গুঞ্জনের অনন্যতায় অরুণ ভট্টাচার্য সাম্প্রতিক কালের অন্যতম বিশিষ্ট কবি।

(ক্রমশঃ)

খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই

পীতাম্বরাত্মা জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা	৬·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	৫·০০
ভারত-আত্মার বাণী	৫·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
কর্মবাণী	১·২৫
Soul of India Speaks	5·00

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ. বি. টি.

বিদ্যাসাগর	২·৫০
মানুষের মত মানুষ	·৬২
শিশু রামায়ণ	·৬২
শিশু মহাভারত	·৭৫

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

বাংলার ঋষি	৩·০০
বাংলার মনীষী	১·২৫
বাংলার বিদুষী	২·০০
বীরত্বে বাঙালী	১·৫০
ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৩·০০
রাজর্ষি রামমোহন	১·০০
রবীন্দ্রনাথ	১·০০
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১·২৫
আচার্য জগদীশচন্দ্র	১·৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০

॥ প্রতিটি বই বহুচিত্র শোভিত ॥

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী : : ১৫ কলেজ স্কোয়ার : : কলিকাতা—১২

সারা দুনিয়ার সেরা ব্যক্তি

জেম্‌স থারবার :

অনুবাদ : শচীন্দ্রনাথ বসু

আজ, ১৯৪০ সালের চোখ দিয়ে, অতীতের এই ঘটনাটির দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য লাগে এই ভেবে যে আরও অনেক আগে কেন তা ঘটে নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন 'কিটি হক' বিমান বানালে তখন থেকেই বোঝা গিয়েছিল না জেনে নিজেরই সর্বনাশ সে ডেকে আনছে। একদিন নিশ্চয় আকাশ থেকে সগর্জনে নেমে আসবে কোনও একজন জাতীয় বীর, যে খ্যাতির ভার সামলাতে পারবে না, কীর্তিমান বৈমানিকদের যে বর্ষিষ্ণু উন্মাদনার সম্মুখীন হতে হয় তা হজম করবার পক্ষে যথেষ্ট নয় যার বুদ্ধি, বংশ ও চরিত্র। লিন্ডবার্গ ও বার্ড দু জনেই ভাগ্যক্রমে ছিলেন মার্জিত ভদ্রলোক, তাতে জাতীয় সম্ভ্রম ও আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি বজায় থেকেছে; আমাদের অন্যান্য বিখ্যাত বৈমানিকদের সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। সম্মান তাদের মাথা ঘোরাতে পারে নি, খ্যাতির কড়ক্কাপটার মধ্যে তারা সোজা হয়ে থেকেছে, সাধারণত সদ্বংশজাত উৎকৃষ্ট মেয়েদের বিয়ে করেছে, এবং নিরিবিলিতে সরে গিয়ে উপভোগ করেছে নিজের নিজের ভাগ্য। কোনও বিসদৃশ ঘটনা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করে খ্যাতির বিপদসঙ্কুল শিখরে নষ্ট করে নি তাদের নিখুঁত ব্যবহার। কিন্তু নিয়মের ব্যতিক্রম না ঘটে উপায় ছিল না, এবং তা ঘটল ১৯৩৫ সালের জুলাই মাসে যখন জ্যাক ('প্যাল') স্মার্চ, আয়োয়া প্রদেশে ওএস্টকিন্ড শহরে ছোট এক গারাজে সহকারী মিস্ত্রি, এক বারও না থেমে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে এল পুরনো, এক-এন্‌জিনওলা এক ল্যাপলাই-৩ বিমানে।

স্মার্চের এই আকাশ বিহারের মত কিছু বিমান চালনের ইতিহাসে এর আগে কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি। অতিরিক্ত পেট্রোল বহন করবার জন্য ঐ যে অদ্ভুত ভাসমান পাত্রগুলি আবিষ্কার করেছিলেন নিউ হ্যাম্পশায়ারের জ্যোতির্বিদ ডঃ চার্লস লুইস গ্রেশাম, সেগুলির উপর স্মার্চ সম্পূর্ণ নির্ভর করলেও আর সকলে তা নিয়ে হেসেছে। ক্ষীণদেহ, মৃদুপ্রকৃতি, অপ্রীতিকর, বাইশ বছর বয়স্ক এই গারাজ কর্মী ১৯৩৫ সালের জুলাই মাসের প্রথম দিকে একদিন যখন রুজভেল্ট বিমান-প্রান্তরে উপস্থিত হল এক মুখ তামাক চিবাতে চিবাতে, এবং মন্তব্য করলে, "ওড়া কাকে বলে তা এখনও দেখে নি কেউ," তখন খবরের কাগজগুলি সংক্ষেপে ও সন্নেহে উল্লেখ করলে তার পঁচিশ হাজার মাইল ওড়ার পরিকল্পনা। এন্‌জিনিয়াররা কথাটা সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিল, যেন তা নাম কিনবার ভাঁওতা মাত্র; বহু ঘা-খাওয়া, মরচে-পড়া প্রাচীন ঐ বিমান কখনও চলতে পারে না। অতিরিক্ত গ্রেশাম ট্যাংকগুলি কাজ করবে না। নিছক রসিকতা ছাড়া এ কিছু নয়।

এ দিকে স্মার্চ রুকলিনে তার বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করে এল, সে কাজ করে কাগজের বাক্সের একটা এক কারখানায়, কাজ বাক্স তাঁজ করা, পরে স্মার্চ তাকে উল্লেখ করেছিল তার 'মিষ্টি আলু' বলে। দেখা করে এসে সে হেলার ভরে চড়ে বসল হালাকর ঐ বিমানে, চিরস্মরণীয় ৭ জুলাই ১৯৩৫ তারিখের ভোর বেলায়; মুখ থেকে খানিকটা তামাকের রস ছুড়ে দিল বাইরের শান্ত বাতাসে, তার পর উড়ে গেল, সঙ্গে মাত্র এক গ্যালন চোরাই মদ ও দু পাউন্ড খাদ্য সম্বল।

মিস্ত্রি-বালক যখন সগর্জনে সমুদ্রের উপর উড়ে গেল তখন খবরের কাগজগুলির চেহারা গম্ভীর হল, তারা বাধ্য হয়ে

লিখলে যে অজানা এক ছোকরা—নামের বানানটা অনেকেই ভুল করলে—সত্যিই পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে বেরিয়েছে একটি মাত্র এঞ্জিন-যুক্ত ঐ নড়বড়ে ব্যাপারটায় চড়ে, বাড়তি তেলের জন্য তার একমাত্র নির্ভর এক উন্মাদ স্কুলমাস্টারের সেই পরিকল্পনা। ন দিন পরে যখন, এক ধারেও না থেমে, ক্ষুদ্র বিমানটি লঙ আইল্যাণ্ড সাউণ্ডের উপসাগরের উপর দেখা দিল, এবং পরে নিউ ইয়র্কের দিকে চলল, তখন কাগজে বার বার সেটার নাম আটকে আসছে সত্য, তবু সকলের চক্ষুঃশূল, অবিশ্বাসী দৃষ্টির সামনে তা আকাশে ভাসমান। কাগজের শিরোনামাগুলি অনেক আগেই আর সব কিছু প্রথম পৃষ্ঠার থেকে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে (এমন কি কাপোন গুণ্ডা-দলের হাতে ইলিনয়ের গভর্নরের হত্যা পর্যন্ত), কিন্তু তখন সেগুলি ফুলতে ফুলতে অদ্ভুতপূর্ব আকার ধারণ করল এবং বিবরণগুলি পঁচিশ ত্রিশ কলম দীর্ঘ হয়ে উঠল। কিন্তু দেখা গেল এই যুগান্তকারী গাড়ির কর্ণধার বৈমানিক নিজে খুব বেশী পাত্তা পেল না। তার কারণ এ নয় যে বিমানবীরের ব্যক্তিগত জীবনের খবর বিশেষ কিছু জানা ছিল না, কারণ বরং এই যে জানা ছিল বড় বেশী।

মার্চের বিমান যখন কয়ালী উপদ্বীপের ছোট সেলি-স-বেরি শহরের উপর প্রথম দেখা গেল তখনই সাংবাদিকরা দৌড়ে গিয়েছিল এই মহাপুরুষের জীবনের তথ্য উদ্ধার করতে, কিন্তু অনতিবিলম্বে তারা আবিষ্কার করলে যে এ জীবনী ছাপা চলবে না। বা তার ঝাঁদুনীর কাজ করে ভাঙা এক রেস্তোরাঁতে, ওএস্টকিল্‌ডের অদূরে যেখানে টুরিস্টরা বেড়াতে আসে তার ধারে; সে বদমেজাজী লোক, ছেলে সম্বন্ধে সব প্রশ্নের জবাবে রেগে বললে, "গোল্লায় যাক ব্যাটা, জলে ডুবে মরুক!" বাপ জেলে আছে কোথায় যেন, টুরিস্টদের গাড়ি থেকে আলো আর কম্বল চুরি করে ধরা পড়েছিল। ছোট ভাই দাদা গোছের ছোকরা, মাত্র অল্প দিন আগে আয়োয়া-র প্রেইরি শহরের এক সংশোধনাগার থেকে পালিয়েছে, এবং এরই মধ্যে পশ্চিমের কয়েকটি শহরে পুলিশ তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে পোস্টাপিস থেকে খানি অর্ডারের ফরম চুরি করার জন্য। এই সব তথ্যকর তথ্য যখন একের পর এক জমে উঠছে ঠিক সেই সময়ে বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বীর প্যাল মার্চ—চোখ তার কাপসা, দেহ ঘুমে আড়ষ্ট ও ক্ষুধায় অর্ধমৃত—যে অঞ্চলে তার ব্যক্তিগত জীবনের শোচনীয় কাহিনী উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে তারই অনেক উর্ধ্বে তার অবিশ্বাস্য ধাতু-তৃপটি চালিয়ে নিচ্ছিল নিউ ইয়র্কের দিকে—এমন গৌরবের দিকে যা তার সমসাময়িক কেউ লাভ করে নি।

কিন্তু যুবকটির কর্মজীবন ও ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে কিছু একটা বর্ণনা ছাপা দরকার, তা নিয়ে এক অদ্ভুত সমস্যার সৃষ্টি হল। সত্যি কথাগুলি অবশ্য প্রকাশ করা অসম্ভব, কারণ যখন সে মাত্র অর্ধেক রোমাঞ্চ অতিক্রম করেছে পৃথিবী প্রদক্ষিণের পথে তখনই এই তরুণ বীরের প্রতি এক গভীর সম্প্রীতি দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়েছিল লোকের মনে। সুতরাং পরিচয়ে বলা হল সে বিনয়ী, মিতভাষী মানুষ, বন্ধু ও মেয়ে মহলে প্রিয়পাত্র, এবং চুল তার সোনালী। মার্চের একটি মাত্র ছবি যা পাওয়া গিয়েছিল, কোন্ এক প্রমোদ-মেলার সস্তা স্টুডিওতে নকল এক মোটর গাড়িতে বসে তোলা, তার উপর তুলি চালিয়ে এই ইতর ব্যক্তিটিকে বেশ প্রিয়দর্শন করে তোলা হল, তার ঐ বাঁকা কদর্য হাসি ঘষে মেজে তৈরি হল মধুর মৃদুহাস্য। এমনি করে সত্য গোপন করা হল ভক্তিপরায়ণ দেশবাসীর কাছে। তারা স্বপ্নেও ভাবতে পারল না যে আয়োয়া-র ঐ অখ্যাত শহরে মার্চ পরিবারকে প্রতিবেশীরা ঘৃণা করত, ভয় করত, অথবা বীরপুঙ্গব নিজে বিবিধ দুষ্কর্মের ফলে বিরক্তি ও আশঙ্কার পাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল ওএস্টকিল্‌ডে। সাংবাদিকরা আবিষ্কার করল এক বার স্কুলের হেডমাস্টারকে ছুরি মেরেছিল সে মৃত্যু ঘটে নি অবশ্য, কিন্তু ছুরি সে মেরেছিল, আর এক বার গীর্জার থেকে বেশী চাকরার কাপড়টি চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে সে এক কর্মচারীর মাথায় ভেঙেছিল ফুলভরা ফুলদানি।

প্রত্যেকটি অপরাধের জন্য সে সংশোধনাগারে কাটিয়েছে কিছু কাল ধরে।

কথাটা ভয়ংকর শোনায়, কিন্তু ভিতরে ভিতরে নিউ ইয়র্ক ও ওয়াশিংটন দু আয়গারই কর্তৃপক্ষ প্রার্থনা করছিলেন যেন সমবায়ী বিধাতা সর্বনাশ ঘটায় ঐ ঘরচে-পড়া নড়বড়ে বিমান ও তার চালকের, যার অভূতপূর্ব কীর্তি সারা সভ্য জগতে জাগিয়ে তুলেছে উন্মাদ প্রশংসার স্তব। কর্তৃপক্ষের দৃঢ় বিশ্বাস যে বিমানবীরের যা চরিত্র তাতে স্তব স্তুতির প্রখর আলোয় বিশ্বের লোক তার মধ্যে দেখবে এক জন্তু-দুর্বৃত্ত, নিজের আশ্চর্য খ্যাতি হজম করবার মত মানসিক ও নৈতিক ক্ষমতা যার নেই। এই জাতীয় সমস্যাটি আলোচনা করবার জন্য মন্ত্রীসভার যে অনেকগুলি গোপন বৈঠক বসেছিল তার একটিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রী বললেন, "আশা করি তার মা'র প্রার্থনাই পূর্ণ হবে"; শ্রীমতী এমা স্মার্চ যে ইচ্ছা জানিয়েছিলেন তার ছেলে জলে ডুবে মরুক ইঙ্গিতটি অবশ্য তার প্রতি। কিন্তু সময় পেরিয়ে গিয়েছে—প্রথমে আতলান্তিক ও পরে প্রশান্ত মহাসাগর পুকুরের মত লাফিয়ে পার হয়েছে স্মার্চ। ১৭ জুলাই ১৯৩৫ তারিখে বিকাল দুটো বেজে যখন তিনমিনিট তখন পারাজ-মিত্রির হাসাকর বিমানটি নিখুঁত ভাবে তিন পা ঠেকাল রুজভেল্ট ফিল্ডের মাঠে।

•

বিশ্বের সেরা বৈমানিকের অভ্যর্থনার জন্য অবশ্য ছোট-খাটো ঘরোয়া ব্যবস্থা কল্পনা করাও সম্ভব ছিল না। রুজভেল্ট ফিল্ডে এমন আড়ম্বরে ও জাঁকজমকে তাকে অভ্যর্থনা করা হল যে সারা বিশ্বের টনক নড়ে উঠল। সৌভাগ্যবশত, ক্লান্ত ক্ষয়িত বীর অবিলম্বে জ্ঞান হারাল, বিমান থেকে তুলে আনতে হল দেহ, এবং এক বার ঘুম খুলবার আগেই বিমান-ঘাঁটির থেকে দূরে সরিয়ে ফেলা হল তাকে। সুতরাং প্রাথমিক অভ্যর্থনার মর্যাদা সে ক্ষুণ্ন করতে পারে নি, যেখানে সভা আলোকিত করে ছিলেন সেনা ও নৌ বিভাগের মন্ত্রীরা, নিউ ইয়র্কের মেয়র মাইকেল জে. মোরিয়ার্টি, ক্যানাডার প্রধানমন্ত্রী, রাজ্যপাল ল্যাম্বিম্যান, গ্রোভ্‌স, ব্যাক-কীলি এবং ক্রিচফিল্ড, এবং য়োরোপীয় রাজদূতদের উজ্জ্বল মালা। পরের দিন টাউন-হলে এক এলাহি ব্যাপারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, অধাকালে জ্ঞান না হওয়ায় স্মার্চ তারও অংশ নিতে পারে নি। তাড়াতাড়ি তাকে নির্জন জায়গায় এক নার্সিং হোমে সরিয়ে বিছানায় আটকে রাখা হল। ন দিনের আগে সে বিছানা ছেড়ে উঠতে পারল না—অর্থাৎ, উঠতে দেওয়া হল না তাকে। ইতিমধ্যে দেশের সেরা ব্যক্তিরা গম্ভীর ভাবে যুক্তি করে ব্যবস্থা করেছেন এক গোপন সভার, তাতে থাকবেন নাগরিক, প্রাদেশিক ও সরকারী কর্মচারীরা, সেখানে এসে স্মার্চ শিক্ষানবিশী করবে জাতীয় বীরের ব্যবহার নীতি সম্বন্ধে।

অবশেষে যে দিন এই সামান্য মিত্রিকে বিছানা ছেড়ে উঠে জামা কাপড় পরতে দেওয়া হল, যে দিন আবার এক মুখ তামাক চিবাল সে দুই সপ্তাহ পরে, সে দিন পরীক্ষা করবার জন্য তাকে সাংবাদিকদের সামনে উপস্থিত করা হল। স্মার্চ কারও প্রশ্নের জন্য অপেক্ষা করল না। এমন তাচ্ছিল্যের সুরে কথা বললে যে টাইম্‌স পত্রিকার লোকটি চমকে উঠল; "তোমরা এই ট্যারা দুনিয়াটাকে জানিয়ে দিতে পার যে লিন্‌ডবার্গের ওপর আমি এক হাত নিয়েছি, বুঝলে? হ্যাঁ—আর ঐ ব্যাং দুটোকে খাবা বানিয়েছি।" 'ব্যাং দুটো' হল দুই দুঃসাহসিক ফরাসী বৈমানিক যারা অর্ধেক পৃথিবী প্রদক্ষিণের চেষ্টায় দু সপ্তাহ আগে দুর্ভাগ্যবশত সমুদ্রে প্রাণ হারিয়েছে। টাইম্‌স-এর লোকটি এই সময়ে সাহস করে স্মার্চকে বোঝাতে চেষ্টা করল এই ধরণের বৈঠকে প্রচলিত বাঁধা নিয়মটা কি রকম। বললে যে অন্যান্য বীরের, বিশেষত বিদেশী বীরের, কীর্তিকে ছোট করে কোনও উদ্ধত বাণী দেওয়া সমীচীন নয়।

"বাদ দাও, বাদ দাও ও সব কথা," বললে স্মার্চ, "কাজটা করেছে কে? আমি—বুঝলে? আমি করেছি, আর আমি বাতও করছি তা নিয়ে।" এবং রাত সে কাটালে বটে।

এই অদ্ভুত বৈঠকের অবশ্য কিছুই ছাপা হল না। এই উপলক্ষে রাজনৈতিক নেতা ও সম্পাদকদের নিয়ে এক গোপন নির্দেশনা-দপ্তর সৃষ্টি হয়েছে, খবরের কাগজগুলি তখন তার কড়া শাসনে; তারা বরং অস্থির উত্তেজনা প্রশমনের জন্যে জানালে 'জ্যাকি' (স্মার্চকে কি খেয়ালে যেন হঠাৎ এই ডাক নামটি দেওয়া হয়েছে) শুধু এই বলতে রাজী হয়েছে যে সে খুব আনন্দিত এবং যা সে করেছে তা আর যে কেউ করতে পারত। টাইম্‌স-এর বিবরণ অনুসারে সে বলেছিল, বিনয়ের হাসি হেসে, "আমি যা করেছি আমার মনে হয় তার ওপর সামান্য একটু রং চড়ানো হয়েছে।" খবরের কাগজের এই সব বিবরণ বীরকে দেখতে দেওয়া হল না, এবং এই বাধার ফলে তার বেলাজের বাড়ন্ত বিষেষে ভাঁটা পড়ল না মোটেই। অবস্থা সত্যিই অত্যন্ত গুরুতর হয়ে দাঁড়াল, কারণ স্যাল স্মার্চ তখন, তার নিজেরই ভাষায়, "কেটে পড়বার" মুখে। দেশের লোক তাকে মাথায় করে নাচতে অসহিষ্ণু, তাদের থেকে বেশী দিন তাকে আর ঘুরে রাখা যাবে না। লুসিটানিয়া ডুবে যাবার পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এত বড় সংকটের সামনে আর পড়ে নি।

সাতাশে জুলাই তারিখের বিকাল বেলা স্মার্চকে ধরে নিয়ে যাওয়া হল মেয়র রাজ্যপাল, সরকারী কর্মচারী, মনো-বিজ্ঞানী ও সম্পাদকদের এক সভায়। যাবে তেজা হাত দিয়ে প্রত্যেকের সঙ্গে করমর্দন করলে সে, আর একটু অহংকার হাসি কোটালে চেহারায়। মুখে বললে, "হা হা!"* যখন সে বসল তখন উঠলেন নিউ ইয়র্কের মেয়র, তিনি বেশ নিরাশ হয়েই বোঝাতে চেষ্টা করলেন বিশ্বের সামনে যখন তাকে উপস্থিত করা হবে তখন কি বলতে হবে, কেমন ব্যবহার করতে হবে। বীরের সাহস ও দৃঢ়তার প্রতি গভীর প্রশস্তি জানিয়ে তিনি ভাষণ শেষ করলেন। এর পরে বললেন নিউ ইয়র্ক প্রদেশের রাজ্যপাল ফ্রাঙ্কলিন, যুদ্ধপন্থী এক আশার বাণী উচ্চারণ করে তিনি প্যারিসের মার্কিন দূতাবাসের দ্বিতীয় সচিব স্পটিসউড-এর পরিচয় দিলেন, ইনিই স্মার্চকে তালিম দিয়েছেন প্রকাশ্য অনুষ্ঠানের পিছে রীতিনীতি সম্বন্ধে। শার্টের গলা খুলে ফেলে ঘরলা হলদে গলাবন্ধটি হাতে নিয়ে স্মার্চ বসে ছিল চেয়ারে, গালে দাড়ি, মুখে নিজের হাতে তৈরী সিগারেট। ঠোঁটে এক কদর্য হাসি নিয়ে শুনতে শুনতে সে হঠাৎ বিশ্রী স্বরে বলে উঠল, "বুঝেছি বুঝেছি তোমরা চাও আমি নরম নরম কতাবাত্রা বলি, ঐ ধোকামুখো লিনডবার্গের মতন, তাই না? কিন্তু আমি ও সব কেয়ার করি না, বুঝলে!" হতাশায় ও ক্ষোভে সকলে চমকে উঠল। "মিস্টার লিনডবার্গ," যুক্তরাষ্ট্রের এক সেনেটার রাগে লাল হয়ে আরম্ভ করলেন, "আর মিস্টার বার্ড—"। স্মার্চ ছুরি দিয়ে নখ কাটছিল, আবার চীৎকার করে উঠল, "বার্ড! শেষ কালে ঐ বেটা", কিন্তু তার কটূক্তির স্রোত বন্ধ হয়ে গেল কার যেন তীক্ষ্ণকারে। নতুন ব্যক্তি কে একজন ঘরে ঢুকেছেন। সকলে উঠে দাঁড়াল এক স্মার্চ ছাড়া, সে তখনও নিজের নখ নিয়ে এত ব্যস্ত সে এক বারও মুখ তুললে না। "মিস্টার স্মার্চ," কঠোর স্বরে কে যেন বললে, "আমেরিকার রাষ্ট্রপতি এসেছেন।" দেশের প্রধান কর্তা সামনে উপস্থিত থাকলে তরুণ বীরের ব্যবহারে মার্জনা আশা করতে পারে কিছুটা এই আশায় তাঁকে নিয়ে আসা হয়েছে এই অদ্ভুত বৈঠকে, সংবাদপত্রগুলির আশ্চর্য সহযোগিতার ফলে খবরটি গোপন রাখা সম্ভব হয়েছে।

গভীর, বেদনাপূর্ণ স্তব্ধতা। স্মার্চ মুখ তুলে রাষ্ট্রপতির দিকে হাত বাড়াল। "কি খবর?" জিজ্ঞাসা করে নতুন এক সিগারেট বানাতে আরম্ভ করল। স্তব্ধতা আরও গভীর হল।

* ইংরেজি ভাষায় অবজ্ঞা প্রকাশ

কে যেন জোর করে কাশল। "হুঃ, কি গরম!" বলে স্মার্ট শার্টের আরও দুটো বোতাম খুলে ফেললে। দেখা গেল রোমশ বুক আর তাতে উল্কি করা এক রক্তপিণ্ডের ছবি, তার ভিতরে লেখা একটি নাম—'স্যাডি'। ঘরের বড় বড় ধনী ব্যক্তিরা আধুনিক মার্কিন ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুতর এই সংকটের সামনে পড়ে তাদের চিন্তান্বিত ভ্রু কুঞ্চন করল পরস্পরের দিকে চেয়ে। কেউই যেন জানে না এ বার কি করা উচিত। স্মার্ট বললে, "চল চল, এখান থেকে বেরিয়ে পড়ি। পার্টি কাটি কখন শুরু হচ্ছে? তাতে কিন্তু নাচা থাকবে তো?" বলে সে ইঙ্গিতে বুড়ো আঙুল ও তর্জনী একসঙ্গে ঘষল। "টাকা!" বলে উঠলেন প্রাবেশিক এক সেনেটার। এই নিদারুণ আঘাতে মুখ কালো হয়ে গিয়েছে তাঁর। "হ্যাঁ গো, টাকা," বললে প্যাল, সিগারেটটা জানলার বাইরে ছুঁড়ে ফেলতে ফেলতে। "অঢেল টাকা।" আবার সে একটা সিগারেট বানাতে আরম্ভ করল। "অঢেল টাকা," পুনর্বার বললে সে ভুরু কুঁচকে হাতের কাগজটার দিকে চেয়ে। চেয়ারটাকে পিছন দিকে এলিয়ে তার সেই কদর্য হাসি বিতরণ করল প্রতি জনকে, পৃথক ভাবে; যে আনোয়ার নিজের জন্যও সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ, যে চিতাবাঘ ছাড়া পেয়েছে পাখির দোকানে তাদের হাসির মত সেই হাসি। "ওঃ, মোহাই তোমাদের, এ জায়গার চেয়ে ঠাণ্ডা কোথাও চল," বললে সে, "তিন সপ্তাহ আটক থেকেছি, আর পারি নে।"

স্মার্ট দাঁড়িয়ে উঠল, হেটে গেল এক খোলা জানলার কাছে, তারপর ন তলা নিচে রাস্তার দিকে চেয়ে রইল। ছোকরারা চীৎকার করে খবরের কাগজ বিক্রি করছে, তাদের ক্ষীণ স্বর ভেসে এল তার কানে। নিজের নামও সে শুনতে পেল। খুশিতে গলে এক গাল হেসে সে বলে উঠল, "হট্ ডগ!"* জানলার উপর ঝুঁকে পড়ে চীৎকার করলে, "বল্ বল্, ভাল করে বল্!" আবার উচ্চারণ করলে অর্থহীন মন্তব্য, "হট্ ডিগিটি ডগ্!" যে কয়েকটি উত্তেজিত ব্যক্তি দাঁড়িয়ে ছিলেন তার পিছনে তাদের মধ্যে হঠাৎ এক পাগলা খেয়াল গপ করে জ্বলে উঠল। ঘরের মধ্যে যেন বেজে গেল অনুচ্চারিত এক মিনতি, এক অনুজ্ঞা। কিন্তু সর্বত্র শুধু অখণ্ড স্তব্ধতা। বেয়ারের সেক্রেটারি চার্লস কে. এল. ব্রামুড স্মার্টের সবচেয়ে কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন; জিজ্ঞাসার চোখ তুলে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির দিকে তাকালেন। ফ্যাকাশে গম্ভীর মুখ অল্প একটু নোয়ালেন রাষ্ট্রপতি। ব্রামুড এক কালে রাটগার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে খেলতেন, বলিষ্ঠ উন্নত দেহ তার; কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে তিনি সারা দুনিয়ার সেরা ব্যক্তিটির বাঁ কাঁধে এক হাত রাখলেন, পাছার আর এক হাত, তারপর ঠেলে বার করে দিলেন তাকে জানলার বাইরে।

"সর্বনাশ, জানলা দিয়ে পড়ে গেল স্মার্ট!" বলে চীৎকার করে উঠল এক চতুর সম্পাদক।

রাষ্ট্রপতি বলে উঠলেন, "আমাকে এখান থেকে নিয়ে চল।" কয়েক জন তৎক্ষণাৎ তাঁর পাশে এসে তাঁকে সরে করে নিয়ে গেল এক পার্শ্বদ্বারের দিকে। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস-এর সম্পাদক এ সব ব্যাপারে অভ্যস্ত, তিনিই ভার নিলেন সব কিছুর। চটপট কাউকে হুকুম করলেন চলে যেতে, কাউকে থাকতে; তাড়াতাড়ি এক গল্প বানালেন যা সব খবরের কাগজই ছাপবে, দু জন লোককে রাস্তায় পাঠিয়ে দিলেন সেই দিকটার ব্যবস্থা করতে, এক সেনেটারকে হুকুম করলেন চোখের জল ফেলতে, দুই কংগ্রেস-সদস্যকে দিশাহারা ঘরে ঘেঁটে পড়তে। এক কথায় তিনি মৃদু ভাবে রক্তক্ষয় তৈরি করে ফেললেন আসন্ন গুরুতর কর্তব্যটির উপযুক্ত করে —শোকসন্তপ্ত জগতের কাছে সেই জগতের সবচেয়ে প্রতিভাবান চমকপ্রদ ব্যক্তিটির অকালীন অপমৃত্যুর বেদনাপূর্ণ কাহিনী প্রকাশ করার কাজ।

* ছটির মধ্যে সাতের, ও সাথে মিল তৈরী অনেকে মার্কিন বাত

এমন আড়ম্বরপূর্ণ, সুন্দর, গম্ভীর ও বেদনাময় অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া এর আগে আর কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে যে আর দেখা যায় নি তা সকলেই জানে। আর্লিংটন কবরখানার দ্বারটি আজ দীর্ঘক্ষণ খুলে উঠেছে। শ্বেতপাথরের পরিচ্ছন্ন এক স্তম্ভ, নিচে পাথর কেটে তৈরি ছোট এক বিশ্রামের প্রতিকৃতি, সেখানে এসে লোকে গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে যায়। আমেরিকার শ্রেষ্ঠ বীর জন্মকি পার্শিংএর প্রতি প্রগাঢ় প্রণতি জানিয়েছে বিশ্বের সব জাতি। নির্দিষ্ট সময়ের ছ মিনিট নিঃশব্দ হয়ে রইল সারা দেশ। এমন কি ক্ষুদ্র, হতবুদ্ধি ওএস্টকিলস্তের অধিবাসীরাও এই মর্মস্পর্শী অনুষ্ঠানে অংশ নিল, আইন শহরের কর্মচারীরা তার ব্যবস্থা করল। এদের একজন সন্তীর মুখে দাঁড়িয়ে রইল শহরের ঠিক বাইরে ট্রিনিটি এলাকার ধারে সেই ছোট নক্সবক্সে রেজোরাঁলির দরজায়। তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে শ্রীমতী এবা পার্চ মাথা নত করল উনানে হ্যামবারগার স্টেক ভাজতে ভাজতে—মাথা নত করে মুখ ফিরিয়ে নিল, যাতে গুণচরটি দেখতে না পায় তার ঠোঁটের সেই পরিচিত বিদ্রূপ হাসি।

শচীন্দ্রনাথ বসু

জয়শ্রী-র পাঠকদের কাছে সুপরিচিত। তাঁর গল্পের বই

শনিবারের সন্ধ্যায়

সম্বন্ধে কয়েকটি অভিমত :

আনন্দবাজার : একজন অত্যন্ত শক্তিমান বিশিষ্ট লেখক.. প্রত্যেকটি গল্পেই মিটোল গল্প আছে, তবু গল্পগুলি শুধুই কাহিনী-নির্ভর নয়—সৃষ্ট চরিত্রের মনের গভীর প্রত্যন্তের অন্ধকার উদ্ঘাটনই তাঁর লক্ষ্য।..শব্দ বাছাই ও বাক্য গঠনে তিনি অত্যন্ত যত্নবান..সহজেই লেখকের দুটি বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়—একটি বৈদগ্ধ্য, অপরটি মুন্সিয়ানা।

অমৃত : বিভিন্ন মানুষের সুখ-দুঃখ হাসি-বেদনায় গল্পগুলি রূপায়িত। বিচিত্র চরিত্রের মানব মন ফুটে উঠেছে সুদক্ষ শিল্পীর লেখনীস্পর্শে।

দৈনিক বসুমতী : প্রতিটি গল্পের বিষয়বস্তু যেমন গভীরভাবে মনে রেখাপাত করে, তেমনি রেখাপাত করে লেখকের গল্প বলার নতুনত্বটি। এমন সহজ, সুন্দর, সাবলীল ভাষা ও কথোপকথনের স্বাভাবিকতা প্রবীণ নাম-সাহিত্যিকদের মধ্যেই দৃষ্ট হয়।

জয়শ্রী : যখন জয়শ্রীতে মাসে মাসে 'শনিবারের সন্ধ্যায়' বের হয় কিছুকাল আগে, গল্পটি পড়তে পড়তে লেখকের সূক্ষ্ম দৃষ্টি, রচনার শক্তি, মনন, মানবচরিত্র সম্বন্ধে দৃঢ় জ্ঞান রীতিমত অবাক করে দিয়েছিল।...এঁর রচনায় প্রথমেই যে জিনিসটা চোখে পড়ে তাকে বিশ্বস্ততা বলা যায়।

দাম ছ টাকা

কার্ণা কে. এল. মুখোপাধ্যায়

৬।১এ, রাধানাথ শ্রীমানী লেন, কলিকাতা-১২

বিমূর্ত শিল্পের সাজঘর

অনিলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

উনিশশতকের শেষে বিশ শতকের গোড়ার দিকে বিশ্ব শিল্প যে বিধা দ্বন্দ্ব নিয়ে দ্বিধ্যমান হয়ে পড়েছিল, তার বিশ্ব সমৃদ্ধি যখন শিল্পী, সমালোচক এবং সাধারণ লোক চক্ষুকে শিল্পের পুনরুক্তিতে কিঞ্চিৎ আহত করেছে তখন কয়েকজন সমালোচক শিল্পের প্রেক্ষাগৃহে বিভ্রান্ত দর্শকের ভিড় ঠেলে এসে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন, "ঘন কালো পটভূমির অন্তরাল থেকে ইবনী-যৌবন এই নগ্ননারী আর কতকাল একই ভঙ্গিতে অনড় অটল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে; কতকাল ধরে চলবে এই অপনিত যৌবনের পুতুলের মিছিল!'

সমগ্র য়ুরোপে বিশেষ করে প্যারিসে এমনকি আমেরিকাতে পর পর অসংখ্য শিল্প প্রবন্ধ এবং শিল্পের নতুন নতুন Theory ও চিন্তা ধারার ঢল নেমে এলো এক প্রবল প্রবাহের মত শিল্প জগতে। ১৯১০ সালে যে চিন্তা ধারা বা যে কল্পনা উনিশ শতকী শিল্পমনকে কশাঘাত করেছিল আজ তা অনেকাংশে সরল সহজ হয়ে স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণযোগ্য হয়ে এসেছে। বর্তমান বিংশ শতাব্দির শিল্প প্রায় অর্দ্ধশতাব্দির অধিককাল ধরে তার উদ্ধত অভিযান চালিয়ে এসেছে বলেই, আজ স্থির চিত্তে এই দীর্ঘকালের ভেতরে আমরা শিল্পের এই বিবর্তন অনুভব করতে পারছি। তার গভীর রসকুণ্ডের অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করে আগামীকালের শিল্পকে অনুমান করতে পারছি পরিষ্কার ভাবে যা দেখতে পাচ্ছি তাতে মনে হয় পূর্ব-রেনেসাঁস (Pre-Rennaisance), উত্তর-রেনেসাঁস Post-Rennaisance) এবং পূর্ব-ব্যাবেলীয় (pre-Raphalites) গোষ্ঠির বাস্তবরূপে (Realistic Representation) একটু ভাঙ্গন ধরেছে, অঙ্কন এবং রং (drawing anb colour) একটু ঢিলে loose) হয়েছে মাত্র। বক্তব্য গল্প থেকে গল্পের শিরোনামায় এসে ঠেকেছে। অনেকক্ষেত্রে গল্পাংশ গৌন, কোথাও গল্প বা বক্তব্যের নামগন্ধও নেই। রেখা রং ও সংস্থাপনা কার্য্য (composition) এমন এক ঐকতানের সৃষ্টি করেছে সেখানে শিল্পী যদিও বাস্তববাদি (representational তাহলেও অঙ্কনের ত্রুটি চোখে তেমন ভাবে পড়ে না, সেখানে বলিষ্ঠ বাঁকাচোরারেখা (Nervous lines) নানা-বর্ণ-সঙ্গে সঙ্গীতমুখর এক মোহময় আবেশের সৃষ্টি করে।

আমরা যদি পেছনের দিকে তাকাই তাহলে বুঝতে পারি বর্তমান শিল্প ভিন্ন দৃষ্টিকোণকে আশ্রয় করে বেড়ে উঠ্‌ছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবন ও কালপ্রবাহ বর্তমান শিল্পকে প্রভাবান্বিত করেছে; বাস্ত জীবনের সময়াভাব শিল্পীকে ক্ষিপ্র করেছে, তার শিল্প সৃষ্টিকে ক্ষিপ্রতর আঙ্গিকের ভেতর দিয়ে আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। বিংশ শতাব্দিকে শিল্পীরা যদি স্বাভাবিক ও বস্তুগত রৌদিক (Naturalistic and realistic form) অবলম্বন না করত তাহলে ১৯৬২ সালের চেহারা আজ কি হোত তা ধারণা করা কঠিন। এই অবল বদল বা সংস্কারকার্য বহুপূর্বেই সুরু হয়েছিল। আধুনিক স্থাপত্যশিল্পের জ্যামিতিক সংস্থাপনাকর্ম (geometrical composition) আজ আমাদের অভ্যস্ত চোখে আর তেমন

বিশেষ ভাবে ধরা পড়ে না, এর সুরু হয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কিছু পূর্বে রুশদেশীয় ও ইতালীয়ের শিল্পীদের পরিকল্পনার ভেতরে। এই সময়ে য়ুরোপের বিভিন্ন শিল্প গোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে এক আশ্চর্য্য সাড়া জেগে উঠল। মানুষের চিন্তাধারা বিগতশতাব্দি সমূহের প্রবলপ্রভাবকে অতিক্রম করে প্রবাহিত হলো বিপুল বেগে কাল-নিরপেক্ষ অগ্রাহ্য করে। দিকে দিকে সংহার এবং সৃষ্টি (Destruction and Creation) কর্ম চলতে লাগল একই সঙ্গে। এই উন্মত্ত পরিবেশে যে কালাই চলছিল, তার ঘোর যুদ্ধকালের অন্তরালে ভবিষ্যৎ শিল্পের আগুন জ্বলে জ্বলে উঠছিল।

১৯১২ সাল পর্য্যন্ত আক্ষরিক ছাপের (Typography) যে ধারা চলে আসছিল তার পরিবর্ত্তন ঘটল বড়হাতের অক্ষর (capital letter) উড়িয়ে দিয়ে, ইতালীয় Futuristaদের হাতে। ১৯০৬ সাল থেকে cubism আন্দোলনের ওপর নানা দিকে ক্রিয়া করেছে। বিজ্ঞাপন শিল্পে, আসবাব পত্রে cubism আরোপিত হয়েছে। উন্নত বিজ্ঞাপনে collage এর ব্যবহার হয়েছে, যে ভাবে কাগজ আঁটার ধরণ ছবিতে চাপিয়ে ছিলেন Braque এবং Picasso ১৯১৩ সালে।

মানুষের মন ধীরে ধীরে প্রাত্যহিক জীবনের ওপর ক্রিয়াশীল হয়ে উঠল পরিবর্ত্তন ও সংস্কার ব্যস্তবিস্ত সমাজকে কেন্দ্র করে চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়লো। থিয়েটার হাসের ওপর নতুন আলোকপাতে তার রং বদলে গেল। New Romantics এবং Surrealiste দের ভাবপ্রবণতা, পোষাক-চাকচিক্য, নয়নাভিরাম রঙ্গপটভূমি, নাট্যসজ্জায় আতিশয্য-বিহীন হয়ে অপেক্ষাকৃত দিকে ঝুঁকে এলো। শিল্পে সাধারণ জীবনের ছায়া নেমে এলো। শিল্পকে সাগরে ঘুরে রেখে সৃষ্টি বা কর্ণভূমির বিভক্ত চলবা অথবা অনুবীক্ষণের সাহায্যে দেখবার প্রয়োজন রইল না। বৃহৎ সমাজের উর্দ্ধলোকের আভিজাত্য নিয়ে বৃহত্তর জন সমাজের সুখ দুঃখের জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করে ক্ষণকালের জন্যে তত্ত্ব হ'ক এই হলো উনিশশতকীয় শিল্পের পরের কথা। সাধারণ ঘরোয়া জীবনে শিল্পকে খুঁজতে হবে ; অন্তর এবং চক্ষু দিয়ে তাকে আত্মসাৎ করে উৎসারিত করে দিতে হবে সাধারণ অসাধারণের জগতে। শিল্পের রূপ একমূর্ত্তি থেকে অন্তমূর্ত্তির ছাঁচে ঢালাই হলো, তথাকথিত সৌন্দর্য্য বহিরাবরণ ছেড়ে অন্তর্মুখী হয়ে এলো।

বিংশশতাব্দীতে যে শিল্প পরিচিত আকারকে ভেঙেছে, বস্তু ও মনুষ্যাবয়বকে অতিক্রম করেছে, ভিন্নরূপকে আশ্রয় করে, তার কার্য্য-কারণধারা তৈরী হয়েছিল বহুপূর্বে ১৯০০ থেকে ১৯২৯ সালের মধ্যে। এই সময়ে প্যারিসে যে উন্মাদনা চলেছে, তার সঙ্গে এসে মিলল সাহিত্যের এক জোরাল ধারা প্রবাহ। ক্লাসের সংগতি, বস্তুসজ্জা এবং নাটককে আশ্রয় করে তৃতীয় পদপাতে আরো একটু মাথাচুলে আরো স্থির হয়ে দাঁড়াল। নাটক, শিল্প সঙ্গীত ও সাহিত্য পরস্পরের প্রতিক্রিয়ায় ভিন্নরূপে রূপান্তরিত হলো। এতকালের একপেশে শিল্প বহুমুখী হয়ে এগিয়ে চলল বলিষ্ঠ পদক্ষেপে, অনবরত তার খোলস খুলে খুলে রূপ বদল করে।

এই সময়ে য়ুরোপের রসপ্রান্তরে অসংখ্য ছোট ছোট শিল্পদল গড়ে উঠল অসংখ্য তারার মত। সেখানে নতুন সাহিত্য ধারা এসে মিলল চারুকলার সহযোগী হয়ে। সাহিত্যিক এবং লেখক শিল্পের প্রচার কার্য্যের জন্যে নিয়োজিত হলো বিভিন্ন শিল্পদলে। Gertrude Steen এলেন Picassoর উচ্চ-স্বর হয়ে, Gillaume Appolanaire হলেন Cubist দের মুখপাত্র, Andre Gide রক্ষা করলেন Fauves দের আর Breton বললেন surrealiste দের কথা। কোন কোন শিল্পী সাহিত্যিক বনে গিয়ে লিখতে লাগলেন। Picasso, Modigliani এবং Rouault কবিতা লিখলেন। Braque লিখলেন Aphorism, Vlaminck হলেন উপন্যাসিক। Andre Lhote সমালোচনার নেমে এলেন

আর Ozenfant এর ক্ষুরধার বুদ্ধি তাঁকে করে তুলল এক জোরাল সম্পাদক। তাঁর তীব্র কৌতুক ও তীক্ষ্ণ সমালোচনার ভিক্ততা গোঁড়া অভিজাত গোষ্ঠী নিঃশব্দে পরিপাক করলেন।

শিল্পের শুদ্ধ এবং মৌলিক রূপের আঘাত তাঁরা সহ্য করতে লাগলেন। চিত্রে এবং ভাস্কর্যে পরিচিত রূপের বিচ্যুতি ঘটল বটে কিন্তু তা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত রইল না। বিমূর্ত শিল্পের উপাদান তখন শিল্পীর অজ্ঞাতে অঙ্কিত হচ্ছে। Kandinskiy তাঁর প্রথম জল-রং এর চিত্র নিয়ে ১৯১০ সালে বিমূর্ত জগতের মুখোমুখী হয়ে দাঁড়ালেন। এই বছরেই Kandinskiy প্রথম পুস্তকে (Concerning the spiritual in Art) বিমূর্তের সূত্রপাত হলো। এক অজ্ঞাত অরূপ জগৎ থেকে ভেসে এলো নিরক্তের মৃদুগুঞ্জন।

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

অমিয় চক্রবর্তী

"... কাব্যসৃষ্টির একটা দিক প্রত্যহ জীবনকে স্পর্শ করে, আরেক দিকে তার ভূমিকা নিত্য সূর্যালোকে অধিষ্ঠিত—আপনার কবিতায় এই দুই দিকেরই পরিচয় পেলাম।... কবিতা উচ্চচর এবং বহুচর—অতি সূক্ষ্ম সামঞ্জস্যেই তার প্রাণ। আপনার কবিতায় সেই প্রাণের সন্ধান পেয়েছি।... পৃথিবীকে আপনি স্পষ্ট চোখে দেখেছেন—এ বড়ো আশ্চর্য দেখা।"

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

"...আমি আপনার কবিতার অনুরাগী; এবং ইতিমধ্যে আপনার সহজ প্রতিভা যে অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিরন্তর পরিণতির দিকে এগোচ্ছে তা আমি বারংবার লক্ষ্য করেছি।...আমি এই রকম সচল দৃষ্টিভঙ্গীর পক্ষপাতী, এবং হয়তো তাই আপনার লেখা আমাকে এতটা টানে।...আমার মতে আধুনিক বাঙালী কবিদের মধ্যে যাঁরা ভবিষ্যতেও সাধুবাদ পাবেন, আপনি তাঁদের অন্যতম।...

অন্নদাশঙ্কর রায়

"...আপনার কবিতাগুলিতে প্রকৃত কাব্যরসের স্বাদ পাওয়া যায়, আপনার মূল্যবোধও সুস্থ মানুষের।"

এই কবির নতুন কাব্যগ্রন্থ

১৫ই আষাঢ় প্রকাশিত হয়েছে **দিনযাপন** দাম দু'টাকা

নিম-এর তুলনা নেই

- 'নিম টুথ পেষ্ট'-ই হল একমাত্র টুথ পেষ্ট যার মধ্যে নিমের বীজব্যারক, দুর্গন্ধনাশক ও কষায় গুণের সঙ্গে আধুনিক দন্ত-বিজ্ঞান-সম্মত ঔষধাদির সার্থক সমন্বয় ঘটেছে।
- মাড়ীর পক্ষে অস্বস্তিকর 'টার্টার' নিরোধে এবং দন্তক্ষয়কারী জীবাণু-ধ্বংসে এই টুথ পেষ্ট সব চেয়ে বেশী সক্রিয়।
- 'পাইওরিয়া' ও 'কেরিজ' নিরোধক উপাদানগুলি এই টুথ পেষ্টে আছে।
- ব্যবহারে দাঁত খুব ঝক্‌ঝকে হয় অথচ 'এনামেল'-এর ক্ষতি হয় না।
- মুখের দুর্গন্ধ দূর ক'রে শ্বাস সুরভিত করে।

এই সব বিবিধ বৈশিষ্ট্যের জন্য 'নিম টুথ পেষ্ট'-এর সঙ্গে অন্য কোন টুথ পেষ্টের তুলনাই চলে না।

এই টুথ পেষ্ট যেমন গুণে সেরা, তেমনি দামেও সুবিধা।

পত্র লিখলে বিনে উপহারিতা সহজীয় পুস্তিকা পাঠান হয়

নিম টুথ পেষ্ট

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোম্পানী লিমিটেড, কলিকাতা-২৯

NTP. 2868

কেবলমাত্র

মেট্রিক দৈর্ঘ্যে বেচাকেনা করুন

দৈর্ঘ্য মাপবার জন্য ১লা অক্টোবর ১৯৬২ থেকে সমগ্র দেশে মেট্রিক মাপ ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত রকম বেচাকেনা এক মীটার অনুযায়ী হবে।

এখানে মীটার অনুযায়ী সাধারণ পোষাকের দৈর্ঘ্য সম্পর্কে কয়েকটি ধারণা দেওয়া হল। এই নতুন মাপের সঙ্গে পরিচিত হলে, এবং প্রয়োজনীয় কয়েকটি করার অভ্যাস বদলালে তা অনেকখানি সাহায্য করবে।

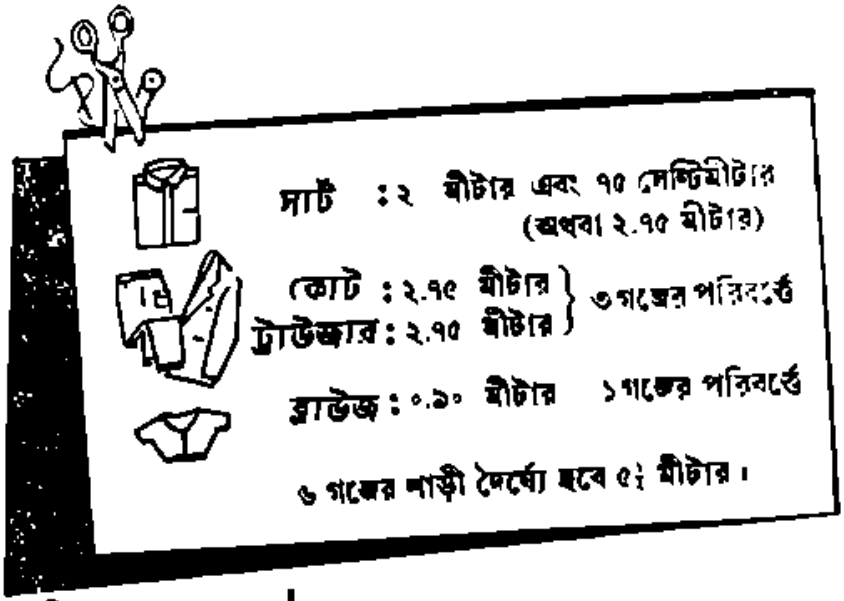

১ মীটার = ১গজ এবং ৩½ ইঞ্চি

এক গজ কাপড়ের দাম যদি ১.০০ টাকা হয় ঐ কাপড়েরই এক মীটারের দাম হবে ১.০৯ নয়া পয়সা

মেট্রিক পদ্ধতি

সরলতা ও অভিন্নতার জন্য

ভারত সরকার কর্তৃক প্রচারিত

DA 62/931 Bn.

মুখের রং

বসে থাকতে থাকতে সুধাময়ের কেমন আলস্য ধরছিল। উঠে দাঁড়াল। হাই তুলল। দু হাত ছড়িয়ে দিয়ে শরীরের আড়মোড়া ভাঙল। ইচ্ছা হল সিগারেট খেতে। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হল মুখের ভিতরটা কেমন যেন বিতিয়ে আছে। যেন জিভটা পচে গেছে। সিগারেট না। একটা লবঙ্গ কি ছোটো এলাচদানা চিবোলে মুখটা চাঙ্গা হয়ে উঠত। তা হলে অবশ্য তাকে রাস্তায় যেতে হত, পানের দোকান ছাড়া ওসব পাবে কোথায়। অগত্যা এলাচ লবঙ্গ চিবোনের ইচ্ছাটা সে বাতিল করে দিল। সিগারেট ধরাল না। একটা সিগারেটই পকেটে আছে। ভদ্টু দিয়েছিল। তার পকেটের বিড়ি অনেক আগেই শেষ হয়েছিল। গোটা ছয় বিড়ি পকেটে নিয়ে তো সুধাময় বাড়ী থেকে বেরিয়েছিল।

আপাতত কি করা যায় একটু সময় দাঁড়িয়ে থেকে সে চিন্তা করল। তারপর মনে স্থির করে ফেলল। দু তিনটা কাঠের বাক্স জোড়া লাগিয়ে চমৎকার তক্তপোশ তৈরী করে ফেলল। ছুতোটা খুলে ফেলে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। হাত দুটো ঝুলিয়ে দিল বাক্সের দুদিকে। মাটিতে ছড়ানো খড় তার আঙুলে ঠেকল। খসখস শব্দ হল। চিৎ হয়ে শুয়ে পড়া মাত্র তেঁতুল পাতার ফাঁক দিয়ে এক ফালি নীলচে আকাশ তার চোখে পড়ল। যেন ওপরটা এখনো তেমন কালো হয়নি অন্ধকার হয়নি। কিন্তু তা না হলেও একটা দুটুদুটে তারা দেখা যাচ্ছিল। বন্ধুরা চলে গেছে। সুধাময়ের মনে হল আর একটি বন্ধু তার এখনো আছে। এক দৃষ্টে তাকে দেখছে। দূর আকাশের তারাটাকে হঠাৎ বন্ধু মনে হল কেন শুয়ে শুয়ে সে চিন্তা করতে লাগল। এদিকে তার ঝুলে পড়া হাত দুটো প্যাকিং বাক্সের খড় ছেনে যাচ্ছিল। কেননা খসখস শব্দটা তার ভাল লাগছিল। ঐ শব্দটা শুনতে শুনতে ও তারা দেখতে দেখতে কেমন যেন একটা অন্য জগতে সে চলে গেল। এখানে হারান মুদির দোকানের পিছনে তেঁতুল গাছের নিচে কাঠের বাক্সের উপর শুয়ে কথাটা সে একেবারে ভুলে থাকতে পারল। ভুলে থাকতে পেরে তার ভাল লাগছিল। একটা নৌকায় শুয়ে আছে সে। নৌকাটা হেলে দুলে আস্তে আস্তে ভেসে যাচ্ছে। তার একমাত্র সঙ্গী ঐ দূরের একটা তারা। এতক্ষণ মাটিতে তার আশে পাশে যে মুখগুলি ছিল তারা অনেকদিন হয় হারিয়ে গেছে। তাদের সঙ্গে খুব শীগ্‌গীর দেখা হবারও সম্ভাবনা নাই।

অনেকের সঙ্গেই আর তার দেখা হবে না, এই মাটির অনেক কিছু তার কাছে এখন স্বাপনা হয়ে যাচ্ছে। যেমন এই বকুলবাগানের একটা ঘিঞ্জি গলির একটা বাড়ীর চেহারা সে বেমালুম ভুলে যেতে পারছে। ঐ বাড়ীর ভিতর এক বুড়ি থাকে, অষ্টপ্রহর চোখে পিচুটি লেগে আছে আর অষ্টপ্রহর মুখ থেকে "নারায়ণ" "নারায়ণ" একটা শব্দ থুতুর সঙ্গে মিশে

••• জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ••• ধারাবাহিক উপন্যাস ••

বাতাসে ছিটকে ছিটকে পড়ছে। সুধাম সেই বুড়ির মুখটা এখন চমৎকার ভুলে থাকতে পারল। আর একটি মুখ। হ্যারিকেন জেলে কাগজের ফুল তৈরী করছে এখন। আলোর জোর কম বলে লাল নীল হলুদ গোলাপ রঙের ফুলগুলি অমুজ্জ্বল অস্পষ্ট মনে হয়! অথচ দিনের আলোয় সেগুলি কত ঝক-মকে সুন্দর দেখায়। ঐ মুখখানাও এখন মলিন বিষণ্ণ কালি পড়া লণ্ঠনের আলোয় তার চাতের তৈরী কাগজের ফুলের মতো নিস্তেজ মুমূর্ষান দেখায়। অথচ দিনের আলোয় ঐ মুখের সামনে যদি কেউ দাঁড়ায় মনে হবে সদ্য ফোটা একটা টগর পাঁপড়ি মেলে তাকিয়ে আছে। কে জানে, টগর ফুলের মতো দেখতে বলে বাবা মা হয়তো টগর নাম রেখে বসেছিল মেয়ের।

সেই মুখও সুধাম এখন ভুলে থাকতে পারছে। অথচ ওদের ভুলে থাকা কত কষ্ট! অষ্টপ্রহর পিচুটি আঁটা চোখ দুটোর শীর্ণ ক্ষিপ্রিত দৃষ্টি আর টগরের লম্বা পালক ঘেরা চোখের গভীর চাউনি এমন করে সুধামের বুকে বিঁধে থাকে যে কিছুতেই সে তাদের ভুলতে পারে না। এখন সে অবাক, সেই মুখ দুটো একবারও মনে পড়ছে না। প্যাকিং বাক্সের বিছানায় শুয়ে আকাশের তারাটাকে বন্ধু করে নিয়ে সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে পারে। ভাবনাটা তাকে এত সুখ দিতে লাগল যে পরম তৃপ্তিতে ছড়ানো হাত দুটোর মতো পা দুটো নাচাতে আরম্ভ করল। তারপর আস্তে আস্তে শিস দিতে লাগল। এসিড কারখানার একটা হিস্ হিস শব্দের সঙ্গে তাল রেখে সে শিস দিয়ে চলল। ওদিকে তার পা দুটো ছাত দুটো মাটিতে ছড়ানো খড়গুলি খামচাচ্ছিল। ঘরের খস-খস্ শব্দ হচ্ছিল। ওধারে রাস্তার গাড়ি ঘোড়া চলার শব্দ পাশের চারানমুদির দোকান, কি ওপাশের হালুই দোকানের মানুষগুলির কথাবার্তা তার কানে আসছিল না। আকাশের একটা নিঃসঙ্গ তারা নিমগাছের মাথার ঝুড়ি ঝুড়ি অন্ধকার কারখানার মেসিনের হিসহিস ও তার মুখের শব্দ ও ধড়ের শব্দ দিয়ে এমন একটা নিশ্চিন্ত জগত সে তৈরী করে ফেলল যেখানে সুধাম নিজেকে অনায়াসে একটা পাগল, ভূত, পকেটমার, এবং স্ট্রীটের অন্ধকার গলির ভিতে মিশে থাকা গুণ্ডাদের একজন কি ওপাশের বাড়ীর কাছের ফকির চাঁদ দত্ত স্ট্রীটের দিশি মদের দোকান থেকে রাত নটার সময় টলতে টলতে বেরিয়ে আসা যে কোন একটি মানুষ, আর যদি ভাল মানুষ সৎলোক কল্পনা করা যায় তো - হঠাৎ সুধামের চিন্তা হোঁচট খেল—ভালমানুষ সৎলোক কে আছে তাদের পাড়ায় মনে মনে সে খুঁজতে লাগল। ভল্টুর দাদা? যি এ পাশ করেছে, ভালহৌসীর একটা অফিসে চাকরি করছে, বিয়ে করেছে সেদিন, অফিস আর বাড়ি এবং বাড়ীর একটা ঘরের একটি মেয়েমানুষ ছাড়া জগৎ সংসারে যার আর কিছু আছে বলে জানা নেই; ভল্টুর দাদা ছেলেটুকে সবাই আদর্শ ছেলে সৎছেলে বলে—অথচ সুধামের কেন জানি মানুষটাকে ভাল লাগে না তার মনে হয় যদি অফিস থেকে ফেরার পথে যখন বৌয়ের জন্য এটা ওটা কিনে পকেটে পুরে তাড়াতাড়ি রাস্তা পার হয়

তখন একটা ভিখারি পয়সা চাইলে ছেষ্টবাবু তার দিকে ভুলেও তাকাবে না বা যদি একটা বুড়ো হোঁচট খেয়েকি গাড়িঘোড়ার ধাক্কা লেগে রাস্তায় পড়ে যায় ছেনু বাবু তাকে তুলে ধরতে বা এমুলেন্স ডেকে দিতে কি রাস্তা পার হতে সাহায্য করবে না। অথচ পাড়ার লোক ভদ্রটুর দাদার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ভদ্র বিদ্বান অমায়িক। আজকের দিনে এমন ছেলে কিছু ঘরে ঘরে দেখা যায় না। রাতদিন যে পাড়ার ছেলেরা মুকে বলে আড্ডা মারছে, ঘেরে দেখলে দিস দিচ্ছে, প্রবীণ বয়োজ্যেষ্ঠদের দেখে মুখের বিড়ি সিগারেট আড়াল করছে না, বারোয়ারী পুজোর নামে থিয়েটারের নামে পাঁচরকম ফাংশন জলসার নামে গা ভাসিয়ে দিয়ে লেখাপড়া শিকেয় তুলিয়ে রাখছে সেখানে কেমন করে ছেনুটুর মত ছেলে হয়! যেন চুপি চুপি সে বি এ পাশ করে বসেন—স্বভাবটিও তেমন—বয়োজ্যেষ্ঠদের সঙ্গে যখন কথা বলে তখন তাদের পায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে, বিড়ি সিগারেট ঘুরে থাক পানটা পর্যন্ত খায় না। এত বড়ছেলে বিয়ে করেছে, দুদিন পর সন্তানের বাপ হবে কিন্তু মাসের পয়লা তারিখ অফিস থেকে মাইনেটি পেয়ে সব টাকা আজও বাবার হাতে তুলে দিচ্ছে। সবই বুঝলাম, সুদাম মনে মনে বলল, তবু আমার মনে হয় ছেনুটুবাবু মানুষটা ভিতরে ভিতরে স্বার্থপর মনটা একটুও উদার না, বাবা মা স্ত্রী ভাই বোন ছাড়া পৃথিবীতে আর কোন মানুষের কথা একদিনও ভেবেছে কিনা সন্দেহ। অথচ আমাদের পাড়ায় বিজুকে সবাই খারাপ ছেলে বলে জানত শয়তান বখাটে দুই কত কি আখ্যা জুটেছিল তার। একই ক্লাসে দুবার ফেল করার পর তার কাকা (বাবা মারা গেছে) তাকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে আনে। তারপর বুঝি তার কাকার এক বন্ধু বাসস্ট্যান্ডের একটা হোসিয়ারী মিলে তাকে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু সেখানে ইউনিয়ন করতে গিয়ে বিজু মিলের কর্তৃপক্ষের নেকনজরে পড়ে এবং একদিন তার চাকরিও যায়। তারপর তার কাকা তাকে বাড়ীতে ঢুকতে দিত না। কতদিন উপোস কেটেছে বিজুর। পাড়ার লোক তাকে দেখে ছি ছা করত। বলত, এই ছেলে সমাজের কলঙ্ক পাড়ার কুলাঙ্গার; বলত, এখন আর কি, মদ গাঁজা ধরবে, শুণ্ডা বদমায়েস পিকপকেটের দলে ভিড়বে। সত্যি বিজু শেষ পর্যন্ত মদ গাঁজা ধরেছিল কি না এবং পকেটমারের দলে ভিড়েছিল কি না জানা যায় নি। কিন্তু এখন একটা কাজ সে করে গেছে যা এ-পাড়ার আর কোন ছেলে, পাড়ার কেন, এত বড় কলকাতা শহরে ক'। মানুষ করবে আমার ঘোর সন্দেহ আছে।

বিজুর মুখটা মনে হতে সুদামের বুক ঠেলে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরোল। তার পা আর নাচছিল না। হাত দুটোও স্থির হয়ে গেছে। নিস্পৃহ নিস্তব্ধ হয়ে ডেঁহুল পাতার ফাঁকে নীলাভ তারাটাকে দেখছিল। বদ ছেলে বকাটে ছেলে। কিন্তু এই বিজু কতবড় হৃদয়ের পরিচয় দিয়ে গেছে! সেদিনের কথা মনে করে সুদামের চোখে আজ জল এসে গেল। অথচ সুদাম সেদিন আর দশজনের মতো চোখ শুকনা রেখে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল যখন বিজুকে শ্মশানে নিয়ে যায়। না, পাড়ার আর দশটি মানুষের মতো ভানুর জন্য তারও চোখ ছলছল করছিল। বিজুর সঙ্গে ভানুকেও তারা শ্মশানে নিয়ে গিয়েছিল। এক সঙ্গে দুটি ছেলেকে সেদিন বিকেলে শ্মশানে পোড়াতে নিয়ে যাওয়া হল। কিন্তু তা হলে হবে কি, পাড়ার ছেলে বুড়ো যুবক যুবতী অসহায় কাতর চোখ মেলে ভানুর মুখখানাই বার বার দেখছিল আর চোখ মুছছিল। কেননা ভানুর বাবা মা তখন পাগলের মতো শবযাত্রীদের পিছু পিছু ছুটছিল, যেন কিছুতেই তারা মরা ছেলেকে শ্মশানে নিয়ে যেতে দেবে না। পাড়ার লোকেরা দুজনকে সান্ত্বনা দিতে যেয়ে নিজেরাই ডুকরে কেঁদে উঠেছিল। আর বিজু? ভানুর মতো তার মুখখানা রুচি ছিল না, বা সুন্দর ছিল না, বরং এক আধটু গোঁফের রেখা ফেলে উঠতে আরম্ভ করেছিল, গাল ভাঙতে আরম্ভ করেছিল, চোখের কোলে কালির ছোপ দেখা দিয়েছিল। বখাটে ছেলে, অসৎ ছেলে হয়ত বিড়ি সিগারেট

ঠানন্ত বলে ঠোঁট দুটো কামড়ে ধরেছিল। না, একটা মানুষও বিজুর মুখের দিকে তাকায়নি। কেননা বিজুর জন্যে শোকের বস্ত্রা বইয়ে দিয়ে পাগলের মতো কেউ শবযাত্রীদের পিছু পিছু শ্মশান পর্যন্ত ছুটে যায়নি। তার কাকা বাড়ী থেকেই বেরোয়নি। কাকীমা দোরে দাঁড়িয়ে একবার লোক দেখানো চোখ মোছা মুছে তারপর ঘরের ভিতর চলে গেছে আর বেরোয়নি। সুনাথ যখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছিল তখন কে যেন এভাবে জলে কাপ দিয়ে ভানুকে টেনে তুলতে গিয়ে বিজুর ডুবে মরার সমালোচনা করে বলছিল' 'মূর্খের মতো দুই একলা ওকে টেনে তুলতে গেলি কেন, যে লোক ডুবে যাচ্ছে তাকে ধরতে গেলে সে প্রাণের দায়ে তোর গলা মাথা জড়িয়ে ধরবেই – এতবড় ছেলেকে একলা কখনো এই অবস্থায় টেনে তুলতে চেষ্টা করা মানে জেনেশুনে নিজেকে বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া।'

জেনেশুনেই বিজু নিজেকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছিল। ভাদ্রমাস। গরমের দুপুর। বকুলবাগানের পার্কের দীঘিটার কানায় কানায় জল ছলছল করছে। আকাশের নীল ছায়া ঝুকে নিয়ে দীঘিটা যেন হাত ছানি দিয়ে মানুষকে ডাকছে তার স্বচ্ছ নির্মল জলে অবগাহন করে শরীর জুড়িয়ে নিতে। তাই হাসতে হাসতে ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে পাড়ার প্রবীণ উকিলের ছেরো বছরের ছেলে সেদিন জলের কাছে চলে গেল। ক্লাস এইট এ পড়ে, মাথায় কালো কোঁকড়া চুল, বড় বড় দুটো চোখ, বাবা যার বড় আদরের সন্তান ভানু। লেখাপড়ায় ভাল, তাই স্কুলে ও পাড়ায় সবাই ছেলের প্রশংসা করে। সেই ছেলের মনে কি ছিল কে জানত। সাঁতার জানে না আর দিব্যি সে জলে নেমে গেল। প্রথমে হাঁটু, তারপর কোমর ডুবল ভানুর। আর একটা সিঁড়ি নেমে গেল। তারপর কি পুরোনো সিঁড়ির স্যাওলায় তার পা পিছলে গেল, না ভাপসা গরমের দুপুরে এমন ঠাণ্ডা নরমাভিরাম জলের দুনিয়া দেখে থাকতে না পেরে আরো গভীরে নেমে গেল ছেলে এক সঙ্গে সঙ্গে জলে একটুখানি আলোড়ন হল শব্দ হল। দীঘির পাকের গাছতলায় বসে সুনাথ ভদ্রট এবং আরো অনেকে ঘটা করে ঘুড়ির সুতোয় মাঞ্জা দিচ্ছে, বিশ্বকর্মা পুজোর দিনটা তো প্রায় এসে গেছে। জলের শব্দ শুনে তারা চমকে উঠে ঘাড় ফেরাল। ভানু? ভানু ডুবে যাচ্ছে চিৎকার করে উঠল সব একসঙ্গে। যেন তারা হঠাৎ ভেবে ঠিক করতে পারছিল না কি করবে। অথচ তাদের মধ্যে অনেকেই ভাল সাঁতার জানত। তবা ঠি স্টাইল সুইমিং কম্পিটিশনে সেবার ফার্ষ্ট হয়েছিল না? ভানু ডুবে যাচ্ছে আর তারা ভাবছে। আর সেই মুহূর্তে দীঘির আর এক পাড়ে গাছতলা থেকে উঠে দাঁড়াল একজন। বিজু। পাড়ার ছেলেরা বিজুর সঙ্গে মিশতনা বলে চুপ করে বেচারা একা একটা গাছের নিচে বসে থাকত। বিজু লুকিয়ে জলে নামল। বিজু ভাল সাঁতার জানও। বিজু জলে নামল দেখে সবাই আশ্বস্ত হল। একটা ভয়ের ঢেলা তাদের গলার কাছে আটকে ছিল। যেন সেটা নেমে গেল! নিশ্চিন্ত হয়ে তারা জলের দিকে চোখ রেখে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ভানুর মাথার চুল ধরে টেনে বিজু তার গলাটা জলের ওপর তুলেছিল। আর সঙ্গে সঙ্গে এমন করে ভানু বিজুকে জড়িয়ে ধরল যে বিজু দুহাত আলগা করে জল কেটে এগোতে পারছিলনা। যেন একটু ধস্তাধস্তি হল দুজনে। যেন বিজু ভানুকে কি বলছিল। যেন ভানু ভয় পেয়ে আরো শক্ত করে বিজুর গলা বুক জড়িয়ে ধরল। বেশ বোঝা যাচ্ছিল হাত আলগা করতে না পেরে বিজু পা দিয়ে জল কেটে কেটে তীরের দিকে আসতে চেষ্টা করছিল। কিন্তু কতক্ষণ সেটা সম্ভব! বিজুর মুখটা হঠাৎ বিকৃত বীভৎস দেখাচ্ছিল। যেন তার শ্বাস ফেলতে কষ্ট হচ্ছিল। দম রাখতে পারছিল না। যেন সে ডুবে যাচ্ছে। আর সেই ভয়ে ভানু আরো জোরে তাকে আঁকড়ে ধরেছে। হয়তো এর নাম মরণআলিঙ্গন। আবার একটু ধস্তাধস্তি হল। জলের শব্দ হল। গলা ছেড়ে দিয়ে ভানু এবার

বিজুর মাথার ওপর চেপে বসেছে। বিজুর গলা ডুবে গেছে। মুখটা মাথাটা দেখা যাচ্ছে না। একটা প্রকাণ্ড ভারি পাথর ধরে তাকে তার ওপর চেপে আছে। তাকেও ডুবছে। দেখতে দেখতে তারমুখ কান চুল জলের নিচে চলে গেল। পর পর কটা ঢেউ উঠে জল স্থির শান্ত হয়ে গেল।

কিন্তু তা হলে হবে কি আদর্শ ছেলে সৎ লোকদের নামের তালিকায় কোনদিনই বিজুর নাম উঠল না, উঠবে না।

না সুদাম চিন্তা করতে লাগল, আবার এমন মানুষও আছে সংসারে যারা কিছু মানুষের চোখে সৎ কিছু মানুষের চোখে অসৎ। ভদ্রার পিসেমশাই। কত বড় বাড়ি করেছে নিউ সি আই টি রোডে কেউ কেউ বলে কালো বাজারে ঘুরে ভদ্রার পিসেমশাই এত পয়সা করেছে। সদানন্দবাবুর নাম তারা শুনতে পারে না। তাদের মতে এই শ্রেণীর মানুষ সমাজের শত্রু, দেশের কলঙ্ক। তা বলুক, আর এক দল পঞ্চমুখে সদানন্দবাবুর প্রশংসা করছে। তিনি ধার্মিক পরোপকারী। কি বছর দোলের সময় হাজারের ওপর কাঙালী সদানন্দবাবুর বাড়িতে একবেলা পেট ভরে খেয়ে যায়। পয়সা অনেকেরই আছে। কিন্তু সৎ কাজে কটা মানুষ তা খরচ করে। পাড়ায় ছেলেদের একটা স্কুল খুলে দিয়েছেন তিনি।

কাজেই সৎ অসৎ ভাবতে গিয়ে সুদাম কেমন যেন একটা গোলকধাঁধাঁয় পড়ে গেল। দরকার নেই বাবা সৎ হয়ে, সুদাম মনে মনে হেসে বলল, বরং আমি নিজেকে হাসপাতালের একটি রুগী ভেবে কল্পনা করছি। হাসপাতালের বেড-এ শুয়ে কোন একটা জানালা দিয়ে আকাশের তারা দেখছি। অসুখ হয়ে বিছানায় শুয়ে থাকার মতো আরাম পৃথিবীতে আর কিছু নেই। রুগীর কাছে মানুষ চেঁচামেচি করে না, সময়মত ঘরে ফিরল না কেন, স্কুল ফাইন্যাল পাশ করতে পারল না বাউণ্ডুলে হয়ে সারাদিন ঘুরে বেড়ায়, কাজকর্ম কিছু জোটানোর নাম নেই সারাদিন বুড়ির বকর বকর শোনা আর টগরের মুখভার করে থাকার কথা চিন্তা করে সুদাম এখানে যদি দোকানের পিছনে তেঁতুলতলায় পাকিং বাক্সের বিছানাটাকে হাসপাতালের বেড কল্পনা করে একটি রুগী হয়ে শুয়ে থাকার গভীর সুখে নিজেকে ডুবিয়ে রাখা অনেক বেশি বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করতে লাগল। তাই চিৎ হয়ে শুয়ে তেঁতুলগাছের মাথায় চাপ চাপ অন্ধকার আর সেই অন্ধকারের একটা ফুটো দিয়ে ঝকঝকে একটা তারার দিকে চেয়ে সে এখন ঠোঁট টিপে টিপে হাসছিল। একবার একটুখানি হাওয়া উঠতে ঝুরঝুর করে কিছু শুকনো তেঁতুল পাতা তার কপালে চোখে ছড়িয়ে পড়ল। বাঁ হাতটা তুলে সুদাম পাতাগুলি মুখের ওপর থেকে সরিয়ে দিল। কিন্তু আবার হাতটা নিচের দিকে ঝুলিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার আঙুলে মাটির খড় না ঠেকে নরমমতন কি যেন একটি ঠেকল। ভয়ংকর চমকে উঠল সে। যেন ভয়ই পেল। হাতটা সঙ্গে সঙ্গে বুকের কাছে তুলে আনল। শুয়ে থেকে কান খাড়া রাখল সে। খড়ের ওপর দিয়ে খচমচ শব্দ করতে করতে একটা কিছু ছুটে যাচ্ছে সে টের পেল। অবশ্য দু এক সেকেণ্ডের মধ্যেই তার ভয়টা কেটে গেল। ভণ্টু যে-বাক্সটার ওপর পাকুলিয়ে একটু আগে বসে গেছে ছুঁচোটা যেন সেই বাক্সের ভিতর ঢুকে পড়েছে। বাক্সের ভিতর চিঁচিঁ শব্দ হল একবার।

একটা ছুঁচো সুদামকে ভয় খাইয়ে দিয়েছিল। মনে মনে হেসে এবার সে উপুড় হয়ে শুয়ে ওপাশে কাত করে রাখা বাক্সটার দিকে চেয়ে রইল। দু হাতের ওপর থুতনির ভর রেখে সে দেখে মুখ-খোলা বাক্সটার অন্ধকার গহ্বরে ছুঁচোটাকে দেখা যায় কিনা ভীষণ মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করতে লাগল। তা কি আর দেখা যায়, ছুঁচোর গায়ের রং আর অন্ধকারের রং একরকম তাই সব লেপাপোঁছা হয়ে একাকার দেখাচ্ছে। কিন্তু তা হলেও সুদাম কথা বলতে আরম্ভ করল। যদি শিলচরের হাবুল এখন উপস্থিত থাকত তো

সুদামের রকমসকম দেখে হেসে খুন হত। কলকাতার ছোকরা অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে ছুঁচোর সঙ্গে দিব্যি আলাপ জুড়ে দিয়েছে চমৎকার।

কি বললি, এই ব্যাটা ছুঁচো, চুপ করে গেলি কেন—

'মেয়েটা সরল, বোকা—তাই—' ছুঁচো আবার হঠাৎ চুপ।

'এই ব্যাটা, বল্—বলে ফেল্— সুদাম চাপা গলায় গর্জে উঠল। 'বোকা কেন তুমি?'

কোঁৎ কোঁৎ শুধু শোনা গেল বাক্সটার মধ্যে। যেন ছুঁচোর হাসি পেয়েছে চেপে রাখছে। তা হলেও পেটের হাসি কিছু কিছু গলা দিয়ে বেরিয়ে আসছে বলে এমন বিশ্রী আওয়াজটা হচ্ছে।

সুদামের দু কান গরম হয়ে উঠল।

আমায় ভালবাসে বলে ওকে বোকা বলছিস তুই?'

'হুঁ।'

'কেন আমি কি—আমি কি—' কথাটা শেষ না করে দাঁতে দাঁত ঘষতে লাগল। যেন কি একটু ভাবল ও সঙ্গে সঙ্গে। তার পর হঠাৎ তার রাগের ভবটা। হুস্ করে কেটে গেল। মেঘ কেটে গিয়ে আকাশ যেমন ফরসা হয়ে ওঠে তেমি সুদামের মন বাধা পরিষ্কার হয়ে গেল। খুশি গলায় বলল, 'তা বোকা হতে পারে—কিন্তু, আমায় যে ও ভালবাসে এটা তুই স্বীকার করছিস—কেমন না?'

ভল্টুর বাক্সের ভিতরটা নীরব।

সুদাম এবার উঠে বসে তবলায় চাটি মারার মতো কাঠের বাক্সটা টুকতে আরম্ভ করে দিল। এসিড কারখানার শব্দটা একটু আগে থেমে গেছে। আলোর জোরও কমে গেছে। বোঝা গেল কারখানা ছুটি হয়েছে। আজ বোধ করি আর নাইট সিফ্‌ট এর কাজ নেই। এখুনি ওদিকের জানালাটা বন্ধ হয়ে যাবে। সুদাম ওপরের দিকে তাকিয়ে একটু হতাশ হল। তারাটা সরে গিয়ে তেঁতুলপাতার আড়ালে ঢাকা পড়েছে। তার হাত দুটো সঙ্গে সঙ্গে স্থির হয়ে গেল। বেশ একটু রাত হয়ে গেল না? ভাবল সে, হারান মুদির দোকানের বেচাকেনায় মিশ্রণ এখন ভাটা পড়েছে। তেমন গোলমাল শোনা যাচ্ছে না। তবে তো তাকে এখন উঠতে হয়। না হলে বুড়ি ভীষণ চেঁচামেচি আরম্ভ করে দেবে। টগর অবশ্য কিছু বলবে না। মুখ ভার করে থাকবে। টগরের মুখ ভারটা আরো অসহ্য।

'শোন্—' সুদাম বাক্সটার দিকে চোখ ফেরাল। 'ভেতরে আছিস না চলে গেছিস আমিও এখন চলে যাব।'

বাক্সের ভিতর চিঁচিঁ শব্দ হল।

অল্প শব্দ করে সুদাম হাসল।

আছিস তো এখন চুপচাপ কেন—হুঁ, আজ আমায় ও ভালবাসে বলে তুই ওকে বোকা বলছিস—এ মাসটা যাক, তখন তুই আবার ওকে বুদ্ধিমতী বলবি।' একটু থেমে সুদাম পরে বলল 'তখন তুই ওই মেয়েকে হিংসে করবি।'

ছুঁচো আবার বিশ্রী কোঁৎ কোঁৎ আওয়াজ করে হাসল।

'ও মাসে রাজা হয়ে যাচ্ছ বুঝি খুড়ি রাজ্যপাল!'

'কি হই তখন তো কানে শুনবি—চোখ থাকলে চেয়ে দেখবি।' বাক্সটা লক্ষ্য করে সুদাম একদলা থুথু ফেলল। 'সুদাম দত্ত তোর মতো চিরকাল কিন্তু ছুঁচোমি করে বেড়াবে না, বেকার বাউণ্ডুলে হয়ে থাকবে না।'

'ভাল ভাল, রাজ্যপাল হলে আমায় এক পাউণ্ডের একটা পাঁউরুটি খাইয়ে দিও।'

'রাজ্যপাল হই কি বিড়লা হই তখন দেখবি—ঠাট্টা করছিস।' সুদাম দাঁতে দাঁত ঘষল। 'পাউরুটি না জুতোর হুমতলা খাওয়াব।'

'না আমার আর কিছু দিতে তোমার মন উঠবে কেন, দিও তাকে—যাকে—'

'পথে এসো বাবা পথে এসো।' সুদাম ঘাড় উঁচিয়ে চারদিকটা দেখে নিল। কে জানে কেউ অন্ধকারে ঘুঁপটি মেরে বসে থেকে তার প্রাণের কথাগুলি শুনছে কিনা—

মানুষের মতো কাউকে দেখা যাচ্ছে না দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে সে কেবল ছুঁচোটা শুনতে পায় গলায় হর এমনভাবে বানিয়ে দিল. 'হুঁ', তার জন্যই তো সব, তাকে পাব তার মন পাব বলে না এতসব কাণ্ডকারখানা করতে হচ্ছে।'

'ভাল ভাল।' ছুঁচো কোঁৎ করে বড়রকমের একটা ঢোক গিলল। 'তা ওদের দিকেও তাকিও তোমার ঠাকুমা বুড়ি, তোমার বোন টগর। তারা আশা করছে তুমি বড় মানুষ হলে তারা একটু সুখে থাকবে।'

'বলে কিনা যার চেয়ে মাসির দরদ বেশী—তাদের দিকে তাকাই কি না তাকাই তোর কি হারামজাদা।' ছুঁচোটাকে লক্ষ্য করে আচ্ছা করে একটা ভেংচি কেটে সুধাময় উঠে পড়ল। কারখানার শুধিকটা এখন একেবারে অন্ধকার হয়ে গেছে। সবকটা আলো নিভিয়ে দিয়েছে দারোয়ান। হারান মুদির দোকানের পাশ দিয়ে বেড়িয়ে এসে সে যখন রাস্তায় নামল কেবল দোকান কয়েকজন করে গেছে—গাড়িটাড়ি কম চলছে। পানের দোকানের ঘড়িতে সাড়ে নটা বেজে গেছে। হঠাৎ টগরের চোখ দুটো মনে পড়ে গেল তার। লাল হয়ে গেছে চোখ। এক একবার ঘুমে ঢলে পড়ছে। হঠাৎ আবার সামনে গিয়ে সোজা হয়ে বসে কাঁচি দিয়ে কচকচ করে পাশ নীল বেডনী হলুদ কাপড় কাটছে। যেন টগরের মাথা ভাঙা কাঁচিটার কাঁচ কাঁচ শব্দটাও সুধাময়ের কানে এল না না, কাঁচির শব্দ না—একটা গাড়ি ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে লোকটা। করপোরেশনের আবর্জনা ফেলার গাড়ী—এত রাত্রে যাচ্ছটা ওটা কোথায় ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে চিন্তা করতে করতে সুধাময় রাস্তা ক্রশ করে ওপারে উঠতে সি সরকারের প্রকাণ্ড জুয়েলারী দোকানের ঝকঝকে আলো গয়না আয়না আলমারী তার চোখ দুটোকে যেন হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পুড়িয়ে দিল। চোখ বুজে সে তাড়াতাড়ি জায়গাটা পার হয়ে গেল। অবশ্য চোখ বুজলে চোখের জ্বালা কমে। কিন্তু মনের জ্বালা? রোজ তাকে এখান দিয়ে বাড়ি ফিরতে হয় আর রোজ শো-কেস্-এর গয়নাগুলি তার মাথার ভিতর উনানের গনগনে কয়লার চেহারা ধরে জ্বলতে থাকে। এই আগুনের শিখা নেই কিন্তু তাপ প্রচণ্ড। বাড়ি ফিরে তার মনে হয় মাথার আগুন নাভি পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। টগরের হাতের প্লাষ্টিকের চুড়ি কগাছা দেখে হঠাৎ এখন হয় কিনা সে বুঝতে পারে না। টগরের হাতে কোনদিন সোনার চুড়ি ছিল কি? চৌবাচ্চার ঠাণ্ডা জল মাথায় ঢালতে ঢালতে সে চিন্তা করে।

(ক্রমশঃ)

পুস্তক পরিচয়

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর বই

সমুদ্র অনেক দূর

ডি. এম. লাইব্রেরী। ৪২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলকাতা-৬

পৃষ্ঠা ১১৪ ; দাম, তিন টাকা।

ভাদ্র ১৩৬৯।

আলোর ভুবন

মিত্র ও ঘোষ। ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলকাতা-১২

পৃষ্ঠা ১৭২ ; দাম পাঁচ টাকা

ভাদ্র ১৩৬৯।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী শেষপর্যন্ত তাঁর নায়কদের দিয়ে মানুষ খুন করছেন এবং তা শেষ-এর জন্য ঘটনাটি কি চোখে দেখা যায়!

তাঁর 'রক্তপলাশ' গল্পেও—শারদীয়া জয়শ্রী—একটা খুন ছিল কিন্তু মূল গল্পের সঙ্গে তার যোগ কম, তাছাড়া উদ্যোগটা পিছনে বলে তা নিয়ে কোনো তর্ক বা প্রশ্ন নেই। বরং গল্প শেষপর্যন্ত রক্তের সঙ্গে আমাদের আপেক্ষিক সম্পর্কের কথাটি বেশ সহজভাবে তুলে ধরতে পেরেছে।

কিন্তু 'সমুদ্র অনেক দূর'-এ চরিত্র, ক্ষেত্র, সম্পর্ক, ব্যবহার, সবই এই ঘটনার এত প্রতিকূল যে ঘটনাটা রীতিমত অবাক করে দেয়।

কারণ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীকে সমসাময়িক গল্প লেখকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ পার্সোনালিটি বলে আমরা জানি। কি রকম শক্ত ও সতর্ক লেখক তিনি বক্তব্য ও ভাষার ব্যবহার সম্পর্কে কিরকম সজাগ। তাঁর মধ্যে ভান, ধিয়েটার, বাজে,—যেগুলি ছাড়া বড়লো গল্প কল্পনা করা যায়না,—প্রায় অনুপস্থিত বলা চলে। তাঁর দৃষ্টি সোজা তীক্ষ্ণ, ধারালো, —সব স্পষ্ট দেখতে পান। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোত্রের লেখক তিনি এবং তাও এই একজনই,—সুতরাং 'সমুদ্র অনেক দূর'-এর মত একটি বেহিসেবি বই তাঁর সম্বন্ধে হঠাৎ যেন ভাবিয়ে তোলে।

অথচ ১১৪ পৃষ্ঠার ছোটো এই বই, অনেকদূর পর্যন্ত যার মধ্যে ঘটনা ও চরিত্রের হাঁড়ি বেশ সুন্দর, ভাষা ও বক্তব্যের ব্যবহারে উজ্জ্বল সপ্রতিভ ও সাবলীল, কত অনায়াসে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ রক্ত মানসিকতায়ও স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারত।

অবৈধ সংসর্গ একটা পুরনো সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী ছাড়া আর কী, যার চেহারা ও মানে গত কয়েক দশকে আমাদের সমাজজীবনে অনেক বদলেছে। রোজ আমরা প্রায় সকলেই তা দেখছি এবং সুস্থিত মনে হজম করছি, অথচ সাহিত্যে এই প্রসঙ্গ এলেই তার চেহারাটা কেমন জবরদং ও ভুসুড়ে হয়ে যায়। এই রকম একটি ঘটনা নিয়ে সুধাময় এবং নৃপতির বন্ধু বিচ্ছেদ হয়ে গেল, সুধাময় খুন করল নৃপতিকে, তারপর আত্মহত্যা করল। হতে পারে এ সবই, হয়ত হয়ও,—কিন্তু বইতে এ প্রসঙ্গ এলে লেখকের আরও দুরূহ ও কঠিন একটি কর্ম থাকে, তা লজিক্যাল নেসেসিটি বা ইনএভিটেবিলিটি তৈরী করা। একশ বছরেরও আগে ক্রাইম এণ্ড পানিশমেন্টে একটা খুন হয়েছিল। কিন্তু কখনো কি মনে হয়, মনে হচ্ছে যে এতদিনেও যে ওটা সত্য না, ওটা অস্বাভাবিক, আজগুবি।

সমুদ্র অনেকদূর নিশ্চয়ই,—অত ক্রুত, অত সংকেত, সুধাময়কে নিশ্চয়ই সেখানে পৌঁছিয়ে দেওয়া চলে না।

২

'আলোর ভুবন'-এও একটা খুন আছে কিন্তু সেটার কারণ সেক্স না, সোসাইটি, যদিও উপলক্ষ্য সেক্স্। বাস্তবিক, সেক্সের প্রতি আমাদের এ্যাটিচুড্ এখনো কিরকম গ্রাম্য; এই শার্ট, পাণ্ট, হাওয়াই, সিগারেট রেস্ট্ রেণ্ট, ই রেজি বই ও ছবি, এত রোমান্স, তা সত্ত্বেও মনের এই গ্রাম্যতা এখনো গেলনা।

যদিও কলকাতার মতো জাহান্নাম,—বিশেষ একেবারে গরীব কি কিছুটা স্বচ্ছল এলাকায়,- যেখানে সবরকম মানুষ সবরকম জীবন প্রায় খোলাখুলি, যাপন করে চলেছে,—কারণ সকলেই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত, সকলেই ইহলৌকিক সিদ্ধি এবং জৈবিক চরিতার্থতা চায়, কারণ তারই নাম জীবন,—সেখানে রেনুকে নিয়ে শোভনের এই সমস্যা,—রেনুর খুঁত, সে বেচারা শোভনের সঙ্গে তার বিয়ের আগে দেহজীবী ছিল,—শেষপর্যন্ত যেকুন শোভনের হার, ভূমিসাৎ, কিরকম অদ্ভুত অবিশ্বাস্য লাগে।

বলা যেতে পারে শোভন কোনো কাজের না, সে একজন বিশুদ্ধ ভারতীয় অর্থাৎ মুখসর্বস্ব বাচাল, একটি চালিয়াত, আসলে ভীরু, বোকা, কোনো দায়িত্ব নেবার যোগ্য নয়, জীবনের মুখোমুখি হবা মাত্রই হেরে ভূত হয়ে গেল।

কিন্তু কেবল সে-ই ত না, যে তিনজন প্রবীন যুবকের প্রেম বা সেক্সজীবন নিয়ে লেখক প্রধানত বইটি লিখেছেন, পরিতোষ শোভন ও সমীর, এরা কেউই স্বল্প ৮ স্বাভাবিক না, অদ্ভুত অনুযোগযোগী ও অবাস্তব,—এবং সেই দুঃখদায়ক শেষ উপলব্ধিতে শেষপর্যন্ত সমীরকে পৌঁছে দিয়ে লেখক ভালই করেছেন, কারণ দেরীতে হলেও, মার খেয়ে হেরে গিয়ে হলেও এই সিদ্ধান্ত এই রোগমুক্তি, এই নিষ্কৃতি, জীবন্মৃত হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে ভালো। যদিও মনে করার প্রচুর কারণ থাকতে পারে যে সমীরের এই অনাসক্তি, ডিটাচ্‌মেণ্ট একধরণের মেকি ক্লান্ত বৈরাগ্য, অক্ষমতা ও হার থেকে যার জন্ম,—এ পুওর কমপেনসেশন এগেন্সট্ এ বিগ্ লস্—এবং এ হয়ত একটা ফ্রেক্‌লিব্‌ল্ মুড্, নিতান্তই সাময়িক, তবুও সেক্স অবসেশন্ থেকে এই প্রথম জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর একটি চরিত্র যে মুক্ত হতে পারল, এদিকে সামান্য কিছুতেই বলা যেতে পারে না।

জীবনকে আমরা ধরতে চাইছি চেতনায়, বলতে চাইছি সাহিত্যে। জীবনের মানে, অন্তত কিছুটাও পরিষ্কার না হলে বাঁচা যাবে কি করে। সুতরাং আন্তরিক চেষ্টা যদি পাই তবে তাই এখন প্রচুর।

'আমি বুঝেছি হৃদয়বৃত্তির চর্চায় সময় নষ্ট করতে আজকের ছেলেমেয়েরা রাজী নয়।' জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সমীর বলছে। 'তারা মনে করে এর চেয়েও করবার ভাববার বড় কাজ বড় চিন্তা সংসারে আছে। কি সেই কাজ কি সেই চিন্তা হয়তো ঠিক করতে পারছেনা, তাই অস্থির চঞ্চল হয়ে কখনো সাহিত্যের আসর জমাচ্ছে, পলিটিকস্ করছে, খেলার মাঠে ঢুকছে সিনেমার টিকিট কাটতে লাইন দিয়ে দাঁড়াচ্ছে··· আমি এখন একদিনও একটি ছেলে বা মেয়েকে দেখিনি যে চুপ করে একলা বাসায় বসে ভাবছে কি খেলার মাঠের ভিড় এড়িয়ে গাছের ছায়ায় বসে আকাশের দিকে চোখ রেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। তারা সর্বদাই যুথবদ্ধ হয়ে থাকছে।' খুব সুন্দর। 'যেখানে পাঁচটি ছেলে ভিড় করেছে সেখানে পাঁচটি মেয়েও এসে জুটছে। সবাই হৈ-হৈ করছে হাসছে নাচছে।···আজ জীবন অনেক বেশি সহজ পরিচ্ছন্ন সুন্দর হয়ে গেছে। আগে এদের ভাল বুঝিনি।'

এবং এ অবসারভেশনও হয়ত সুপারফিশল, ভুল, হতে পারে। হয়ত এই প্রাণচাঞ্চল্য, যাকে আপাতদৃষ্টিতে প্রাণের জোয়ার, প্রবল প্রবাহ বলে মনে হচ্ছে তা হয়তো আরো ভয়াবহ কোনো অশুভ কারণের লক্ষণ, হয়ত এ গ্রেভ্

ইনডাস্ট্রিয়াল যুগের পরিনাম, এই উদ্যম আগলছাড়া ভীড়, অসংযম, আলোড়ন হয়ত সর্বগ্রাসী চরম বিস্ফোরণের দিকেই মানুষকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে, পূর্ণ ইপ্সিত প্রাণের চিহ্ন এসব না-ও হতে পারে, কিন্তু তা যদি সমীরকে বা তার মতো আরো অনেককে আরোগ্যের পথে এগিয়ে দিতে পেরে থাকে তবে ক্ষতি কি!

'আমার চোখ ছিল বিশাখার চুলের দিকে। রজনীগন্ধার মালা জড়ানো ওর খোঁপায়। কিন্তু আমি জানি ওই মালা একজন কেউ ওর চুলে পরিয়ে দেয়নি। দিয়েছে অনেকে। অরুণ অরুণ প্রণব এবং আরো কেউ কেউ। একটি মেয়েকে ঘিরে সকলের আনন্দ। এই জন্যই এরা অত সুস্থ সবল। ... তারা কান্না চায়না। আলোর ভুবনে আমাকেও কাঁদতে দেবে না—।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর আলোর ভুবন এই, যাদে চরিত্রে যা নিঃসন্দেহে তাঁর আগের বইগুলির থেকে অনেক আলাদা। এ একটা পরিষ্কার দিকপরিবর্তন, এবং শুভ, তাই স্বাগত।

সত্যব্রত বসু

ইন্দ্রানীর প্রেম—নীলিমা দাশগুপ্ত। পুস্তক প্রকাশক, ৮।১ বি শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য তিন টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থের লেখিকা সাম্প্রতিক কথা সাহিত্যে একটি বিশেষ দাবি নিয়ে এসেছেন। নিছক জনসন্তোষ অর্জন তার লক্ষ্য নয়। তাঁর আগ্রহ সমসাময়িক সমাজজীবনের পরিবর্তমান পরিচয় উদ্ঘাটনে। বিশেষত, নাগরিক মানুষের সুখদুঃখের জটিল আবেষ্টন রচনা করেই তিনি তৃপ্তি পান্। 'ইন্দ্রানীর প্রেম' আধুনিক যুবজীবনের নিগূঢ় একটি আলোচ্য।

সৈল পটভূমিতে যে-প্রেমের জন্ম, সমতলে তাকে প্রতিষ্ঠিত করা প্রায়ই সম্ভব হয় না। এই কথাটি সার্থকভাবে লেখিকার দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। কথাটির প্রয়োগপরিধি বাড়িয়ে নিয়ে এমনও বলা সম্ভব, স্থানিক পটভূমিকার মতো অতীত পটভূমিরও অনিবার্য অভিঘাত চরিত্রাঙ্কনে অনুভূত হয়। ইন্দ্রানী যে অরুণেশের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলো না, তার কারণ ঐ অতীত পটভূমিকার অমোঘ কার্যকারিতা। এর অন্যথা হলে হয়তো কাহিনীটি মিলনান্ত হতো, কিন্তু অনবদ্য হতো না।

চরিত্র-রচনায় নীলিমা দাশগুপ্ত রোমান্টিক হয়েও বস্তুসচেতন। ইন্দ্রানীর মতো অরুণেশের স্বপ্নপ্রবণ চরিত্রেও আছে এই বস্তুবিবেক। তার তারুণ্য যতোই আকাশচুম্বী হোক, ভারসাম্য ততোই বাস্তবাকর্ষণ নিয়মে সুপ্রতিষ্ঠিত। এই কারণে চরিত্রটি পাঠকের মনে একটি দীর্ঘ স্নিগ্ধ সকরুণ ছায়া বিস্তার করে। তাকে যে আমাদের ভালো লাগে, তার পিছনে আছে লেখিকার অবিচল প্রবর্তনা।

'ইন্দ্রানীর প্রেম' গ্রন্থে শিল্পীর দক্ষতা প্রমাণিত। তার পূর্ববর্তী রচনাগুলির তুলনায় এটি অনেক বাগ্‌পোচ্ছ্বাসমুক্ত এবং ঋজ্বোজ্জ্বল। ভাষায় যে প্রসাদগুণ অনুভব করলাম তা প্রশংসার্হ। পরিবেশ-চিত্রণও, দুয়েকটি কথাচিত্রধর্মী অংশ বাদ দিলে, আনন্দজনক।

বইটিতে যাবে-যাবে ছাপার ভুল চোখে পড়লো। আশা করি পরবর্তী সংস্করণে সেগুলি সংশোধিত হবে। আমরা এই লেখিকার প্রতিশ্রুতিময়তা সম্পর্কে প্রগাঢ় ভরসা জ্ঞাপন করছি। তাঁর অনুশীলন তাঁকে আপাতত যে-ভূমিতে এনেছে সেই নিশানা আশান্বিত হবার মতো, একথা প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

আলোয় কবি রবীন্দ্রনাথ, লেখক বিবিধ অনুবাদক পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রকাশক প্রফুল্লচন্দ্র দাস, দাম অনুল্লিখিত।

রবীন্দ্র শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে দেশ জুড়ে রবীন্দ্র-প্রাসঙ্গিক বইয়ের বন্যা বয়ে গিয়েছে। বাংলা প্রকাশকের সংখ্যা আজ মনে হয় অগণ্য এবং তাঁদের অনেকের মধ্যেই এমন এক ভাব লক্ষিত হয়েছে যেন এ সম্বন্ধে কিছু একটা প্রকাশ না করলে মান থাকে না। এ সব বইয়ের কতখানি পাঠ্য তা পাঠকরাই বিচার করবেন।

এই রকম উপলক্ষে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রশস্তি সঙ্কলনের ঐতিহ্য অনেক দিন থেকে চলে আসছে। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এই শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ সংকলনটি প্রকাশিত হয়েছে সরকারের তরফ থেকে, আলোচ্য বইখানিকে তারই এক অতি ক্ষুদ্র সহোদর বলা চলে। রচনাগুলি এসেছে, য়োরোপ, আমেরিকা, এশিয়ার ছোট বড় দেশ থেকে, লেখক লেখিকারা কেউ সুপরিচিত, কেউ অধিকাংশ ভারতীয় পাঠকের অপরিচিত, রচনাগুলি কোনওটা ক্ষুদ্র কোনওটা দীর্ঘ, কোনওটা গভীর, আবার কোনওটা পড়ে মনে হয় রচয়িতা গীতাঞ্জলীর বেশী বিশেষ কিছু পড়েন নি। অ্যান্ড্রুজ অষ্টালিং ও বোইয়ান্ বোলগার লিখিত প্রবন্ধ উৎকৃষ্ট রচনার উদাহরণ। তা ছাড়া এখানে সেখানে যদি মুক্তার মত লুকানো আছে অপ্রত্যাশিত নতুন খবর, যথা, ক্ষুদ্র বুলগেরিয়া-তে রবীন্দ্রনাথের বই অন্তত বাইশখানা প্রকাশিত হয়েছে, অথবা চেকরা সব রকম রবীন্দ্ররচনা সোজা বাংলা থেকে অনুবাদ করেছে। লেখকদের ছবি ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় থাকার ফলে বইয়ের গুণ বেড়েছে।

বিদেশী ভাষার অনুবাদ অধিকাংশে স্বচ্ছ ও জড়তাহীন। সবচেয়ে প্রশংসার বিষয় বিদেশী নামের সঠিক উচ্চারণ—যা বাংলা হরফে প্রায় চোখেই পড়ে না (বিশুদ্ধ লেখকের রচনাতেও)। এই প্রকাশক ও অনুবাদকের সহযোগিতায় ইতিমধ্যেই অনেক উৎকৃষ্ট বিদেশী বইয়ের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়েছে, অসার গল্প উপন্যাসের বাজারে এঁদের এই আদর্শ-প্রণোদিত উদ্যম অত্যন্ত প্রশংসনীয়। অনেক পুরনো বিদেশী ক্লাসিকের এখনও বাংলা অনুবাদ হয় নি, অথবা নিকৃষ্ট অনুবাদ হয়েছে তৃতীয় ভাষার মাধ্যমে; তরুণ অনুবাদক যদি এই ত্রুটি পূরণে উদ্যোগী হন তবে তিনি প্রভূত উপকার সাধন করবেন।

ইন্দ্রনাথ

কালো চোখের তারা—কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪ কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা—৬। মূল্য ৩।০

বাংলাসাহিত্যে রহস্যোপন্যাসের উদ্ভবের ইতিহাস খুব প্রাচীন না হ'লেও ইতিমধ্যে তার বিশিষ্টতা স্বীকৃত হয়েছে। খুন, জাল-জুয়োচুরী ইত্যাদি ব্যাপারকে কেন্দ্র করে একটি জটিল কাহিনীবলয় গড়ে ওঠে এবং গোয়েন্দা নামক অসাধারণ ও দৈহিক শক্তিসম্পন্ন পুরুষ নানা বাধাবিঘ্ন এমনকি নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে অল্পের জন্য রক্ষা লাভ করে অবশেষে সমস্ত জটিলতার রহস্যভেদ করেন। আমাদের দেশের গোয়েন্দা-কাহিনীর এই ধ'রণ অতি প্রচলিত রূপরেখা।

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায় নানা পত্রিকায় গোয়েন্দাগল্প লিখেছেন কিন্তু 'কালোচোখের তারা' তাঁর পুস্তকাকারে সর্ব-প্রথম উপন্যাস। 'প্রস্তাবনায়' তিনি তাঁর জ্যাঠামণি শ্রীযুক্ত শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃষ্টি হ'তে প্রেরণা লাভের কথা উল্লেখ করেছেন; তাই স্বতঃই মনে হয় যে, তিনিও তাঁর জ্যাঠামণির "ব্যোমকেশে"র মত এক সাধারণ ব্যক্তির অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় আমাদের দেবেন। কিন্তু "তাঁর বাসব"ও অজস্র কফি ও ধূমপান করে লেখকের হকচকানো ঘটনার পথে পথেই ঘুরে অবশেষে সকল সমস্যার সমাধান করেছেন। রাজনারায়ণের সম্পত্তির একটি বৃহৎঅংশের মালিক চম্পাকে হত্যা করে তার

অংশ হস্তগত করার প্রচেষ্টা ও ব্যর্থতা—এই ছ'টি কাহিনীর চুম্বক এবং এই বহু পুরাতন কাহিনীটিকে লেখক সত্যপ্রিয়ের দেড়শতাধিক পৃষ্ঠায় বিস্তার করেছেন এবং অন্যান্য উপন্যাসের কায়দায় এখানেও এক জায়গায় নিরীহ গোছ ব্যক্তিকে গোয়েন্দা-রূপে খাড়া করিয়েছেন—এই ব্যক্তিটি সর্বদাই পার্শ্বচরিত্র হয়ে গ্রন্থে নেপথ্যে ঘোরাফেরা করেন। কিন্তু গোয়েন্দা-সিরিজের নিয়মিতপাঠকেরা এই ধরণের লোকের সাথে এত পরিচিত যে, তারা চোখ বুজে আসামীকে আবিষ্কার করতে পারেন। কৃষ্ণবাবু এই গ্রন্থে এমন একটি 'চীপ' চমকের ব্যবস্থা করে কাহিনীর সামান্য অভিনবত্বটুকু নষ্ট করেছেন। তাঁর বাদরকে কিরীটি রায়েরই কার্বনকপি বলা যায়। তাছাড়া এক ভণ্ড পরিচারিকার দ্বারা বলিষ্ঠ পুরুষকে রজ্জুবদ্ধ করার মত এক হাস্যকর ঘটনার অবতারণা করে তিনি আমাদের বিস্মিত করেছেন। সংক্ষেপে, তাঁর 'কালো চোখের তারা' বহু পঠিত গোয়েন্দাগল্পেরই ঈষৎ রকমফের মাত্র। তবে, ভবিষ্যতে তাঁর কাছ থেকে আমরা ভালো লেখা আশা করি, কারণ, ভালোলেখার মত ক্ষমতার পরিচয় স্থানে স্থানে তিনি দিয়েছেন। আরেকটি কথা, বইটির নামের ও প্রচ্ছদপটের প্রকৃত অর্থ আমাদের নিকট অস্পষ্ট।

সুব্রত ঘোষ

[illegible] ই ই ছাড়া [illegible] তিন ছেলেমেয়ে – শর্মিলা, সুজাতা ও বিজয়। যদু শর্মিলা ইনস্টিটিউশনাল অসুখে [illegible] ও [illegible] ছাড়া [illegible] [illegible]

[illegible] শর্মিলা ও [illegible] ছেলেমেয়ের সমান [illegible] ই শর্মিলা তাঁর ছেলেমেয়েদের উচ্চ শিক্ষা। তাদেই [illegible] [illegible] বলেন, "১৯৯৯ সালে আমি যে জীবন বীমা পলিসি নিয়েছিলাম, তাতে আমি [illegible] [illegible] ৫০ হাজার টাকা পেয়েছি। শর্মিলা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ১৫০ টাকা।" তিনি আরও বলেন, "এখন ছেলেমেয়েদের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] টাকা [illegible] [illegible]। এ ব্যাপারে এখন আমি নিশ্চিন্ত।"

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ওদের ভবিষ্যতের জন্য ওদের পিতামাতার কোন দুর্ভাবনা নেই

জীবন বীমার কোন বিকল্প নেই

সম্পাদকীয়

যুদ্ধ, জনতা ও সরকার

আজকের যুদ্ধের যুগে সরকার ও বেসরকারী জনতার সম্পর্ক শুধু অবিচ্ছেদ্য নয়,—বেসরকারী জনতার বিপুল সমর্থন, সচেতন সহযোগিতা ও শক্তির উৎস ব্যতীত যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে জয়যুক্ত করা কোন রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভবপর নয়। অনভিজ্ঞ ও অনভ্যস্ত ভারতীয় জনতার মনে যুদ্ধ যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে তা বিস্ময়করভাবে আশাব্যঞ্জক। বৈদেশিক কূট-নীতিজ্ঞেরা পর্য্যন্ত সমস্বরে ভারতীয় জনতার স্বদেশ প্রেমের এরূপ অগ্নিস্বাক্ষর রেখে একথা বলেছেন যে জাগ্রত জাতীয় চেতনার উদ্বুদ্ধ এমনি একটি বলিষ্ঠ জাতিকে পর্য্যুদস্ত করবার মত শক্তি চীন বা পৃথিবীর কোনও সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের নেই। সীমান্তের প্রাথমিক বিপর্যয়ের সংবাদে ভারতীয় জনগণ আহত হয়েছে, ক্ষুব্ধ হয়েছে এবং ব্যথিত হয়েছে। কিন্তু জনমনে ভীতি বা আতঙ্কের কোন চিহ্ন দেখা দেয়নি, বরং শত্রুর প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষে তাদের মন শঠ ও বেইমান শত্রুকে অন্তিম পর্য্যায়ে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করার দুর্বার শপথে গর্জে উঠেছে এবং সর্বপ্রকার আপ বীকারের অঙ্গীকার তারা স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছে।

সরকারের যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে এবং এই প্রচেষ্টা সফল করার জন্য অর্থসংগ্রহের অভিযানকে যেভাবে জনসাধারণ স্বাগত জানিয়ে এবং যেভাবে ভিখিরী দুঃস্থকুমারী থেকে আরম্ভ করে মজুর-আয় কেরানীর মন পর্য্যন্ত বিভিন্ন ভাবে অর্থ সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে এবং যেভাবে বিভিন্ন সরকারী যুদ্ধ বণ্ড বিক্রী হচ্ছে তা জনসাধারণের দেশ প্রেমের এক উজ্জ্বল নিদর্শন। মজুর, কেরানী সরকারী কর্মচারী, কৃষক,—সমাজের খেটে খাওয়া মেহনতী জনতা সাধ্যানুযায়ী উৎপাদন বাড়াবার জন্য অগ্রসর হয়েছে। সমাজের বিত্তবান ও ধনিক সম্প্রদায়কে তার তাৎপর্য অনুধাবন করে, জাতীয় জীবনের এই অগ্নিব্রতের দিনে তাদেরও ত্যাগ ও কৃচ্ছ্রতাবরণের পর্য্যাপ্ত ঐতিহ্য সৃষ্টি করতে হবে।

এই অভূতপূর্ব জাতীয় প্রবুদ্ধনার পরিপ্রেক্ষিতে একটি প্রশ্ন উঠেছে জনতার মনে। চীনের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনতার স্বাধীনতা রক্ষার এই সর্বাত্মক অভিযানের প্রয়াসে সরকারী চৈতন্য ও প্রস্তুতির উদ্যমে এখনও পূর্ণগতিবেগ সৃষ্টি হয় নি। একথা আজ সর্বত্র ও সর্বস্তরে অনুভূত হচ্ছে যে সরকারী প্রয়াস আরও ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন, সরকারী নেতাদের যুদ্ধ-কালীন মানসিক প্রখরতা এবং বলিষ্ঠ পদক্ষেপ প্রয়োজন। বন্যা বা ভূকম্পের সময়ে রিলিফ সংগ্রহের মনোবৃত্তি পরিত্যাগ করে অর্থসংগ্রহের দায়িত্ব রাজ্যপাল বা অনুরূপ সম্মানীয় ব্যক্তিদের উপরে ছেড়ে দিয়ে মন্ত্রী ও অন্যান্য দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের সরকারের বিভিন্ন সাংগঠনিক কাজে দ্রুত তৎপরতায় অগ্রণী হওয়া প্রয়োজন। চীনের ন্যায় একটি স্বৈরতান্ত্রিক ও যান্ত্রিক সুদক্ষতা সংগঠিত রাষ্ট্রের সঙ্গে সংগ্রামের জন্য অবিলম্বে ভারতীয় জনতাকে বলিষ্ঠ সংগঠন ও ইস্পাত-কঠিন সচেতন দৃঢ়তায় সংগঠিত করে তোলা আবশ্যক।

আরেকটি বিষয়েও সরকারকে অনুৎসাহী দেখা যাচ্ছে। জনতার বিরাট ও ব্যাপক জাগৃতিকে যুদ্ধ প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত করার প্রয়োজনবোধ এখনও সরকারের মধ্যে সৃষ্টি হয়নি। জনতার অর্থ সাহায্য গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা আছে,

কিন্তু যে অর্থ জনতার কাছ থেকে সংগৃহীত হচ্ছে তা দিয়ে কয়েকদিনের যুদ্ধ চালানও সম্ভব নয়। তাই অর্থ সংগ্রহের অভিযানের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি করে জোর দেওয়া প্রয়োজন বিভিন্ন শ্রেণীর দক্ষতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী জনতাকে ভাগ করে বা তাদের যুদ্ধ প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্তকরে জন-উদ্যম ও দেশপ্রেমকে কার্যকরী ভিত্তি দেওয়া।

৮ই সেপ্টেম্বরের রেখা চীন কর্তৃক স্বীকৃত হলেও যে চীন ভারত সংঘাতের মূল সমস্যার মীমাংসা হবে না, যুদ্ধ যে দীর্ঘস্থায়ী হবে এবং অবস্থান্তরে এই যুদ্ধ যে গুরুতর আকার ধারণ করে আবার সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে—সরকারের এই সমস্ত সাবধানবাণী গুলি নিশ্চয়ই সরকারের মুখপাত্রেরা পর্যাপ্ত গুরুত্বের সঙ্গে জনতাকে অবহিত করার জন্য ঘোষণা করছেন। অগ্রস্তুতির জন্য যে প্রাথমিক বিপর্যয় ও মর্যাদাহানি ভারতের পক্ষে ঘটেছে, আবার অসাবধানতা ও শৈথিল্যের জন্য তার পুনরাবৃত্তি ঘটুক,—ভারতের স্বদেশ প্রেমিক জনতা নিশ্চয়ই সেরূপ অব্যবস্থা সরকারের কাছ থেকে প্রত্যাশা করে না।

যুদ্ধ ও যুদ্ধ-বিরতি

চীন কেন বোমডিলা পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে সমতল ভূমিতে পা চালিয়ে একতরফা যুদ্ধ-বিরতির কথা ঘোষণা করে ১৯৫৯ সালের ৯ই নভেম্বরের লাইনে প্রত্যাবর্তন করার প্রস্তাব করলো তার অন্তর্নিহিত কারণ সন্ধানে বহুমত সৃষ্টি হয়েছে। শীতকালে সরবরাহ ও যোগাযোগের অসুবিধা, আন্তর্জাতীয় প্রতিক্রিয়া রাশিয়ার চাপ, কম্বোডিয়া কর্তৃক দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলার আশঙ্কা ইত্যাদি অনেক কারণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

চীনা যুদ্ধ-বিরতির এক বা একাধিক কারণ যাই হোক না কেন, চীনের এরূপ আপাত বিস্ময়কর নীতি অনুসরণের মূল কারণ ভারতের অভূতপূর্ব গণ প্রতিরোধ শক্তির জাগরণ এবং পশ্চিমী গোষ্ঠীর দ্রুত সাহায্য এবং তা গ্রহণে ভারতের তৎপরতা। চীন রাজনৈতিক ও সামরিক দিক্ দিয়ে ভারত আক্রমণ করে যে মারাত্মক ভুল করেছে তার চরম খেসারত দেওয়ার আগে চীন নিজের ভুল সংশোধনের উদ্দেশ্যেই একতরফা যুদ্ধবিরতি ও পশ্চাদাপসরণের নীতি গ্রহণ করেছে। এই নীতিকে শান্তি এবং এশিয়ান রাষ্ট্রের সঙ্গে অপর এশিয়ান রাষ্ট্রের সংঘর্ষ বাধিয়ে এশিয়ান রক্ত ক্ষয় না করার আবেদনসহ এশিয়া ও আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলিতে ব্যাপক শান্তির অভিযান বা 'পিস অফেনসিভ' সুরু করেছে। চীনা নীতির এরূপ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য ভারতকে কার্যক্ষেত্রে অন্যান্য আফ্রো-এশিয়ান রাষ্ট্রের কাছে 'কাগজী বের' প্রমাণ করে নিজের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার পথ সুপ্রশস্ত করে আফ্রো-এশিয়ান দেশগুলিতে চীনের প্রাধান্য বিস্তার করা। চীনের ভারত আক্রমণের পশ্চাতে যে গভীর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সুপ্ত রয়েছে সে সম্বন্ধে ভারত ও আফ্রো-এশিয়ান রাষ্ট্রগুলির পক্ষে যথাসময়ে ও যথাযথভাবে সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

যুদ্ধ-বিরতি প্রস্তাবের উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, চীনের এই প্রস্তাব অথবা ভারতের ৮ই সেপ্টেম্বর রেখার প্রস্তাব,—একটি বা আপোষ করে দুটি প্রস্তাবই যদি গৃহীত হয় তা হলেও যে যুদ্ধের সাময়িক বিরতি হলো, যুদ্ধ শেষ হল না,—সে সম্বন্ধে ভারত সরকার বা ভারতীয় জনমনে কোনরূপ আত্মতুষ্টি বা বিশ্রান্তি দেখা দেলে ভারত আবার আকস্মিক ও মারাত্মক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। যুদ্ধ বিরতির অর্থ লাদাক, বারহোতি ও নেফার সীমান্ত—চিহ্নিত করার সমস্যার মূল প্রশ্নের সমাধান নয়। নেফা ভারতের এবং লাদাকের আকসাইচীন চীনের,—এই সূত্রকে কার্যকরী করার অন্যতম কারণ হিসেবে এবং আপাতত সেই উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্যই প্রথম পর্যায়ে চীন ভারতকে আক্রমণ এবং শক্তির জোরে সমঝোতা করার নীতি গ্রহণ করেছে।

সুতরাং চীন কর্তৃক আকসাই চীন না-পাওয়া পর্যন্ত ভারত-চীন সংঘাতের সক্রিয় বা সম্ভাব্য পরিণতি আপাত্রি-

বর্তিত থাকবে। তাই বর্তমানে চীনের স্বার্থে ও রাজনৈতিক ও সামরিক ট্যাকটিসের প্রয়োজনে যে একতরফা যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করা হয়েছে ভারত যদি সেই ফাঁদে পা দিয়ে আবার দেশরক্ষা ও আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিধান এর সামরিক প্রস্তুতির অপরিহার্য জাতীয় কর্তব্য সম্বন্ধে কোনরূপ ঔদাসীন্য, শৈথিল্য, মন্থরতার বা নিশ্চিন্ততার মনোভাব প্রদর্শন করে তা, হলে চীনা আক্রমণের দ্বিতীয় পর্যায়ে ভারতকে মারাত্মক মূল্য দিতে হবে। সামরিক শক্তিতে ভারতের মাটি থেকে চীনকে হটতে বাধ্য করে তবেই চীনের সঙ্গে আপোষ আলোচনার সম্মানজনক ক্ষেত্র রচনা করা সম্ভব। চীন-ভারত যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হবে বলেই আশঙ্কার পূর্ণ কারণ রয়েছে এবং এযুদ্ধে জয়ের জন্য ভারতকে গুরুতর মূল্য দিতে হবে,— এজন্য ভারতের সর্বাঙ্গিণ মানসিক ও সামরিক প্রস্তুতি প্রয়োজন।

অভিনন্দিত নতুন সামরিক নেতৃত্ব

মারাঠা শক্তির শ্রাত্রবীর্যের ঐতিহ্যবাহী চ্যবনের হাতে দেশরক্ষা মন্ত্রীত্বের দায়িত্ব অর্পণ, হায়দ্রাবাদ ও গোয়া বিজয়ী লেঃ জেনারেল জয়ন্ত চৌধুরীর উপরে ভারতীয় সেনাবাহিনী পরিচালনার দায়িত্ব দান এবং যুদ্ধ অভিজ্ঞ লেঃ জেনারেল মানেকশকে যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে নেফার রণক্ষেত্রে প্রেরণ,—এই সব ঘটনা ভারতের সামরিক সংগঠনের আমূল পুনর্গঠনের এক সুদূরপ্রসারী তাৎপর্যই শুধু বহন করে না, ভারত সরকার যে ভারতের জাতীয় প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করে আক্রমণকারী চীনকে পর্যুদস্ত করতে দৃঢ় সংকল্প তার সংকেতও নির্দেশ করে। সামরিক নেতৃত্বের এরূপ পুনর্গঠন পরিকল্পনাকে ভারতের জনতা সুস্পষ্ট সমর্থন জানিয়েছে এবং উৎসাহ ও আশ্বাসের সঙ্গে তারা এই বিষয়ে আনন্দিত হয়ে উঠেছে যে- এই সামরিক নেতৃত্বে ভারতের জয় সুনিশ্চিত। আমরা তাই নতুন দেশরক্ষা মন্ত্রী ও নব মনোনীত সামরিক নেতাদের অভিনন্দন জানাই।

পররাষ্ট্র সাহায্য ও পররাষ্ট্র নীতি

চীনের আক্রমণে অপ্রস্তুত ভারতের দেশরক্ষা ব্যবস্থা প্রাথমিক পর্যায়ে গুরুতরভাবে বিপর্যস্ত হওয়ার ফলে এবং ভারত সরকার কর্তৃক সাহায্য চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ড, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, কানাডা প্রমুখ আতলান্তিক গোষ্ঠিভুক্ত রাষ্ট্রগুলি কর্তৃক দ্রুত সামরিক সাহায্যদানের পরিণামে ভারতের পররাষ্ট্র নীতির ভবিষ্যত সম্বন্ধে ভারতের ভিতরে ও বাইরে এক ব্যাপক আলোড়ন সুরু হয়েছে।

ভারত এতকাল গোষ্ঠি নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করে আসছে বলে দাবী করে, কিন্তু মূলত এই নীতি নিরপেক্ষ হলেও ভারতের পররাষ্ট্রীয় কার্যক্রম প্রতিক্ষেত্রে কম্যুনিষ্ট ব্লকের দিকে ঝুঁকে চলতে দেখা গিয়েছে। ইঙ্গ মার্কিন ব্লকের ত্রুটি বিচ্যুতির প্রতি ভারত সরকারকে যেরূপ প্রতিবাদ মুখর সমালোচনা করতে দেখা গেছে, কম্যুনিষ্ট ব্লকের ত্রুটিকর কাজগুলি সম্বন্ধে ভারত সরকার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উদাসীন রয়েছেন অথবা মৃদু কণ্ঠে ক্ষেদ প্রকাশ করেছেন। বরং অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপুঞ্জ সংস্থা ভারত সরকারের মুখপাত্র শ্রীমেনন অযথা ও অপ্রয়োজনে ইঙ্গ-আমেরিকান গোষ্ঠিকে কটূক্তি করতে দ্বিধাবোধ করেন নি। তাই বর্তমানে ইঙ্গ-আমেরিকান গোষ্ঠি থেকে দ্রুত ও আকস্মিক সামরিক সাহায্য লাভে ঘটনাটি ভারতের পররাষ্ট্রীয় নাটকাংশের একটি অ্যান্টি-ক্লাইমেক্স পর্ব বলে মনে করার মত বিস্ময় সৃষ্টি করেছে। যে কম্যুনিষ্ট ব্লক গোষ্ঠির বন্ধুত্ব ও শুভেচ্ছার জন্য ভারত সরকার অতিমাত্রায় আগ্রহ প্রকাশ করেছেন, ভারতের চরম বিপদ ও সামরিক বিপর্যয়ের দিনে তাদের কাছে থেকে একটি বুলেটও সাহায্য পাওয়া যায়নি। মিগ বিমান ক্রয় সম্বন্ধে এবং ভারতে মিগ বিমানের ফ্যাকটরী প্রস্তুত সম্বন্ধে অনেক রকম সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। যদিও মিগ বিমান সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতি একটী দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত একটী ব্যবস্থা বর্তমান সমর প্রস্তুতির

ক্ষেত্রে যার আজ বিশেষ উপযোগিতা নাই তবু সিনো বিধান না পাওয়া পর্যন্ত নানা বিভ্রান্তিকর সংবাদের যথার্থতার মীমাংসা হবে না। কিন্তু ভারতের প্রতি রাশিয়ার যত শুভেচ্ছাই থাকুক না কেন, পরমানবিক অস্ত্র ও বিস্ফোরণ এবং নিরস্ত্রিকরণ সম্বন্ধে মার্কিন রাষ্ট্রের সঙ্গে একটি চুক্তি না হওয়া পর্যন্ত রুশ-চীনের অন্তর্দ্বন্দ্ব থাকা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্র দুইটির পক্ষে পরস্পরের সামরিক সহযোগী রূপে সামরিক আঁতাতের সম্পর্ক না রেখে উপায় নেই। সুতরাং ভারত-চীন সামরিক সংঘাতের পরিপ্রেক্ষিতে ভারত রাশিয়ার কাছ থেকে নিরপেক্ষতা আশা করতে পারে, কিন্তু সামরিক সহায়তা বা প্রত্যক্ষ চীন-বিরোধিতা কখনও আশা করতে পারে না। বস্তুতঃ পক্ষে রাশিয়া নীতিগতভাবে চীনকে সমর্থন করেছে এবং তার এই জঘন্য বিশ্বাসঘাতক আক্রমণকে দামান্যতম নিন্দাও করেনি বরং চীনের উদ্দেশ্যমূলক একতরফা যুদ্ধ-বিরতির (cease fire) প্রচুর প্রশংসা করেছে ও ভারতকে তা অনুসরণ করবার জন্য প্রচুর উপদেশামৃত দিয়ে চলেছে।

ভারত-চীন যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যক্ষ বন্ধুত্ব ও সাহায্য ভারত একমাত্র পশ্চিমী গোষ্ঠীর কাছ থেকেই লাভ করেছে ও করতে পারে এবং ভারত চীন সংঘাত গুরুতর আকার লাভ করার সঙ্গে সঙ্গেই তার বাস্তব প্রমাণও পাওয়া গেছে। সুতরাং দেশরক্ষার স্বার্থের জন্য এবং ভারতের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য ভারতীয় পররাষ্ট্র নীতির দৃষ্টি-ভঙ্গীর যে পরিবর্তন প্রয়োজন সে কথা আজ বাস্তব ঘটনার চাপে অনস্বীকার্য।

বিশ্বের শান্তি রক্ষার জন্য ও দুই ব্লকের মধ্যে সহ-অবস্থানের নীতিকে কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে ভারত পররাষ্ট্র নীতিতে এতকাল যে স্বাধীন নিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করে এসেছে বর্তমানে ভারত-চীন সংঘাত ও ভারতের প্রাথমিক বিপর্যয়ের পরিবেশে তার গুরুত্ব ও মূল্য প্রায় শূন্যাংকে এসে নেমেছে। সামরিক শক্তিতে প্রত্যাঘাত করে ভারত ভূমি থেকে চীনকে বিতাড়িত না করা পর্যন্ত ভারতের পক্ষে আন্তর্জাতীয় ক্ষেত্রে কোন ভূমিকা গ্রহণ করতে যাওয়া শুধু অশোভনীয় নয়, এমন কি মূল্যহীন ও অনেকাংশে হাস্যকর। সুতরাং ভারতের পররাষ্ট্রনীতির বর্তমানে একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত, যে ভারত কিভাবে আন্তর্জাতীয় সাহায্য ও সমর্থন লাভ করে চীনকে উচিত শিক্ষা দিয়ে দিতে পারে, সেই দিকে অগ্রসর হওয়া।

পশ্চিমী সিয়েটো

ভারতের চরম বিপদের দিনে বাস্তব বন্ধু বলে প্রমাণিত হয়েছে পশ্চিমী সিয়েটো। আন্তর্জাতীয় উদ্ভবে ভারতের জাতীয় স্বার্থের প্রশ্ন ছাড়া অন্য বৃহত্তর প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামাতে না-যেয়ে পশ্চিমী গোষ্ঠীর সঙ্গে সংঘর্ষের পথ পরিহার করা সম্বন্ধে সচেতন থাকা ভারতের পক্ষে বাস্তব নীতির পথ।

পশ্চিমীসমর্থী শক্তির সাহায্য নিলেই যে সরবে ঘোষণা করে নিরপেক্ষ নীতি পরিত্যাগ করে ইঙ্গ-আমেরিকান ব্লকে যোগ দিতে হবে তার পক্ষে এমন কোন বাস্তব কারণ বর্তমানে দেখা যায়নি। ইঙ্গ-আমেরিকাও ভারতকে সাহায্যদানের সম্বন্ধে এরূপ কোন দাবীও করেনি। এশিয়ার অন্যতম গণ-তন্ত্রী রাষ্ট্র হিসাবে এবং উপনিবেশবাদ-বিরোধী সংগ্রামের প্রতীকরূপে ভারতের পক্ষে আন্তর্জাতীয় ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করা একটি ঐতিহাসিক ও নৈতিক প্রয়োজন। তাই পশ্চিমী গোষ্ঠীর সাহায্য নিলেও ভারতের পক্ষে পশ্চিমী ব্লকে যোগদানের প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু তাই বলে নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি সম্বন্ধে বর্তমানে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে দিল্লীর তোপাও ভারতের পক্ষে সম্মানজনক নয়। ভারতের প্রয়োজনে আন্তর্জাতীয় ক্ষেত্রে প্রচার অব্যাহত রাখা ছাড়া, অন্যান্য বিষয়ে ভারতের পক্ষে বর্তমানে নীরব ও নিরুদ্যম থাকাই জাতীয় স্বার্থ ও সম্মানের পরিপোষক।

নেফা ও মেনন

নেফার বিপর্যয়ের প্রতিক্রিয়ায় ভারতীয় জনমনে যে বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হয়েছে তারই প্রত্যাঘাতে কৃষ্ণ মেননকে দিল্লীর মন্ত্রীসভের গদি ছাড়তে হয়েছে। মেননের অপসারণকে একটি রাজনৈতিক ঘটনার সঙ্গে তুলনা করা চলে না, যে মন্ত্রীর নীতি ও কার্যক্রমের ফলে জাতীয় সুরক্ষা ব্যবস্থা বিপন্ন হয়েছে তার বিরুদ্ধে জাতীয় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না হলে সে জাতির কাছে কিছুই আশা করা যায় না। তাই মেননের বিরুদ্ধে জনতার বিক্ষোভ ভারতীয় গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী সচেতনতার আশাপ্রদ লক্ষণ বলেই গণ্য হবে।

দেশরক্ষার জন্য মেনন যে নীতি অনুসরণ করেছেন, তার ব্যর্থতার জন্যই নেফা অঞ্চলে ভারতের অপ্রত্যাশিত বিপর্যয় ঘটেছে। নেফা অঞ্চলে যে সুদৃঢ় দেশরক্ষার ব্যবস্থার কথা আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে মেনন বারবার লোকসভায় ঘোষণা করেছেন তার পরিণতি দেখে আজ একথা অনেকের মনে হয়েছে যে সামরিক বাহিনী ও দেশরক্ষার উৎপাদন ব্যবস্থাকে যেরূপ 'ট্র্যাজিক'ভাবে মেনন সাহেব পুনর্গঠিত করে ছিলেন তার পিছনে কি কোন রাজনৈতিক অভিপ্রায় ছিল না, ব্যবস্থার নামে যে সামরিক অব্যবস্থার তৎপরতা মেনন সাহেব দেখিয়েছেন সেটা মন্ত্রী হিসেবে তাঁর সর্বাঙ্গীন ব্যর্থতার পরিচায়ক।

অনেক যোগ্য প্রার্থীকে ডিঙিয়ে নিজের মনোমত ব্যক্তি তথা জেনারেল থাপরকে তিনি স্থল বাহিনীর চীফ অব-দি ষ্টাফ করেন এবং নেফার সমরাঙ্গনের দায়িত্ব দেন যুদ্ধ-অনভিজ্ঞ লেঃ জেনারেল কাউলকে। জেনারেল থাপরের পুত্র একজন কম্যুনিষ্ট বলে বিদিত। এ ছাড়াও অনেক অভিজ্ঞ জেনারেলকে অবসর নেওয়াতে মেনন বাধ্য করেন। এমন কি, লেঃ জেনারেল জয়ন্ত চৌধুরী, যাকে এখন স্থল বাহিনীর প্রধান নায়ক করা হয়েছে সেই দক্ষ সেনাপতিকেও আগামী মার্চ মাস থেকে অবসর নেওয়ার ব্যবস্থা করতে বাধ্য করেছিলেন। আরও অনেক যোগ্য সেনাধ্যক্ষকে তিনি অবসর দেওয়ার এবং অনেককে ডিঙিয়ে, নিজের পছন্দমত ব্যক্তিকে উচ্চপদে আসীন করার কার্যক্রম গ্রহণ করেছিলেন। রিয়ার অ্যাডমিরাল চক্রবর্তীকেও তিনি অবসর নিতে বাধ্য করেছেন। ভারতীয় সেনাবাহিনীকে যে ভাবে মেনন নিজের খেয়াল-খুশিমত পুনর্গঠিত করতে আরম্ভ করেছিলেন তার প্রতিবাদে স্থল, জল ও বিমান বাহিনীর সেনাধ্যক্ষেরা একযোগে পদত্যাগ করেছিলেন। একজন দেশরক্ষা মন্ত্রীর বিরুদ্ধে এরূপ অভূতপূর্ব প্রতিবাদ প্রকাশের ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে খুবই বিরল।

মেনন হয় উদ্দেশ্যমূলক ভাবে অথবা চরম অযোগ্যতা ও অবিবেচনার সঙ্গে যে সেনাবাহিনী পুনর্গঠিত করে ছিলেন জেনারেল থাপারের স্থলে লেঃ জেনারেল জয়ন্ত চৌধুরীকে সেনাধ্যক্ষের কার্যভার দান এবং লেঃ জেনারেল কাউলের অযোগ্যতায় লেঃ জেনারেল অনেককে নেফা অঞ্চলের দায়িত্ব অর্পণের ঘটনায় সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে উঠেছে। যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অস্ত্রাভাব এবং গরম পোষাক ও সরবরাহ সম্বন্ধে যে অভিযোগ উঠেছিল, তার মধ্যেও দেশরক্ষার উৎপাদন ব্যবস্থার অব্যবস্থা ও ত্রুটির কারণ নিহিত রয়েছে।

সামরিক সংগঠন ও উৎপাদনে কি কারণে প্রথম পর্যায়ে এই বিচ্যুতি ঘটেছে - এরূপ ঘটনার পশ্চাতে কি কম্যুনিষ্ট দোষর উচ্চাকাঙ্খী মেননের কোন রাজনৈতিক অভিপ্রায় ছিল, না নিজের বাক্‌সর্বস্ব অযোগ্যতাকে ঢেকে রাখবার প্রয়াসই সেজন্য দায়ী, সে সম্বন্ধে আরও তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। যুদ্ধের সময়ে এরূপ তদন্ত প্রকাশ্যে না হয়ে গোপনে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এরূপ তদন্তের প্রয়োজন রাজনৈতিক কারণে নয়,—চীনের বিরুদ্ধে জাতীয় যুদ্ধের জয়লাভের জন্যই এবং ভবিষ্যতে যেন সামরিক সংগঠন, উৎপাদন ও নেতৃত্বে, কোনরূপ অব্যবস্থা বা অসঙ্গতি না থাকে তার জন্যই অপরিহার্যভাবে আবশ্যক।

কম্যুনিষ্টদের গ্রেপ্তারের তাৎপর্য

ভারতের সার্বভৌমিকতা ও স্বাধীনতা যে রাষ্ট্র আজ বিপন্ন করে তুলেছে সে রাষ্ট্রের মিত্রদের, দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে জাতীয় শত্রু বা শত্রুর পঞ্চম বাহিনী ছাড়া আর কোন আখ্যাই দেওয়া যায় না। তাই চীনের মিত্র তথা চীনপন্থী কম্যুনিষ্টদের গ্রেপ্তারের ঘটনার অর্থ ভারতের আভ্যন্তরীন সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বিধানের উদ্দেশ্যে পঞ্চম বাহিনীকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা।

তাই এবারের কম্যুনিষ্টদের গ্রেপ্তারকে রাজনৈতিক গ্রেপ্তারের আখ্যা দেওয়া যায় না এবং সেজন্য এরূপ পঞ্চম বাহিনীদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষার প্রশ্নও উঠে না। আলীপুর ও দমদম জেলের কয়েদীদের পক্ষে পর্যন্ত পঞ্চম বাহিনীদের গ্রেপ্তারের এরূপ তাৎপর্য বুঝতে অসুবিধা হয়নি।

কিন্তু বাংলা দেশে যারা কিছু সংখ্যক কম্যুনিষ্ট পঞ্চম বাহিনী গ্রেপ্তার হয়েছে। এদের বৃহৎ অংশ ও অনুচরেরা এখনও মুক্ত রয়েছে। এই চীনা পঞ্চম বাহিনীদের রাজনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেওয়া, সম্পূর্ণভাবে এদের নিষ্ক্রিয় করে জাতির সমাজ জীবনে এই চীনা দোসরদের অস্পৃশ্য ও এক-ঘরে করে রাখা, এদের কার্যক্রমের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা ভারতের প্রতিটি দেশপ্রেমিক নাগরিকের এক আশু জাতীয় কর্তব্য। গণতান্ত্রিক দেশে দেশের সুরক্ষা বিধানের প্রধান অস্ত্র সরকারী আইন নয়,—এজন্য মুখ্য অস্ত্র হলো জনতার সচেতনতা ও সক্রিয় উদ্যম। ভারতের স্বাধীনতা ও জাতীয় মর্যাদাকে রক্ষার উদ্দেশ্যে পঞ্চম বাহিনীকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় করার জন্য জনতাকে এই গণতান্ত্রিক অস্ত্র প্রয়োগ করে ভারতের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও সুরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।

পাক-ভারত বিবৃতি ও কাশ্মীর সমস্যা

পাক-ভারতে সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে নেহেরু-আয়ুব যে যুক্ত বিবৃতি প্রকাশ করেছেন পাক প্রেসিডেন্ট তাকে একটি ঐতিহাসিক দলীলরূপে আখ্যা দিয়েছেন। চীন কর্তৃক হিমালয় আক্রমণের ফলে গোটা ভারত উপমহাদেশের দেশ রক্ষা যেভাবে বিপন্ন হয়েছে সেই গুরুতর সংকটের সম্মুখে পাক ভারতের দেশ রক্ষার ব্যবস্থা যে সামরিক দৃষ্টিতে অবিচ্ছিন্ন সেই ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক সত্য এই যুক্ত বিবৃতিতে স্বীকৃতি লাভ করেছে। ভারতের পক্ষে দ্বিতীয় রণাঙ্গনের ঝুঁকি নেওয়া ভারত এবং ভবিষ্যতে পাকিস্তান তথা পাক-ভারত উভয়ের পক্ষেই সমূহ বিপজ্জনক। সেরূপ পাক-চীনের অনাক্রমণ চুক্তি আপাততঃ ভারত এবং ভবিষ্যতে পাকিস্তানের পক্ষেও ক্ষতিকর। পাক-ভারতের মৈত্রী বোঝাপড়া এবং সংযুক্ত দেশরক্ষার নীতি ও ব্যবস্থা এই উপমহাদেশের সুরক্ষার জন্য অনিবার্যভাবে প্রয়োজনীয়।

পাক-ভারতের মৈত্রীর পথে প্রধান প্রতিবন্ধক কাশ্মীর সমস্যা। কাশ্মীর ব্যতীত পাকিস্তান সামরিক এবং জল সরবরাহের দিক থেকে স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে পারে না এবং তার ফলে পাকিস্তানকে সব সময়ে ভারতের উপরে নির্ভরশীল থাকতে হবে—পাকিস্তান জন্মের আগে ও পরে পাকরাষ্ট্র নায়কেরা এই অভিমত প্রকাশ করেছেন। পক্ষান্তরে কাশ্মীর, বিশেষ করে মুসলীম সংখ্যাগরিষ্ঠ কাশ্মীর উপত্যকা, ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হলে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ লৌকিক রাষ্ট্রের আদর্শের উপরে এক প্রচণ্ড আঘাত পড়বে যার ফলে পাক-ভারতের মধ্যে সংখ্যালঘু বিনিময়ের প্রস্তাব সক্রিয় এবং অনিবার্য হয়ে ওঠার উর্বর ক্ষেত্র লাভ করবে। এরূপ পরিস্থিতিতে যে ভয়াবহ বিষচক্রের সৃষ্টি হবে তার ফলে কাশ্মীর ভাগ করে কাশ্মীর উপত্যকা হস্তান্তরের কার্যক্রম ভারত ও পাকিস্তানকে আরেক মারাত্মক সংঘর্ষের আবর্তে ঠেলে দেবে।

কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের জন্য কাশ্মীর ভাগ বা গণভোট

গ্রহণের পন্থা, কোনটিই গুরুতর পরিণামহীন স্থায়ী সমাধানের ভিত্তি নয়। চীন আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় উপমহাদেশের রক্ষা এবং রাজনৈতিক কাঠামো সম্বন্ধে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর আজ এক ঐতিহাসিক প্রয়োজন সৃষ্টি হয়েছে। ভারতের পক্ষে পাকিস্তানের সঙ্গে দ্বিতীয় সম্ভাব্য বা সক্রিয় রণাঙ্গন সৃষ্টি করা অথবা ভারতকে ক্ষুব্ধ করার জন্য পাক-চীন অনাক্রমণ চুক্তি করা আখেরে দুই রাষ্ট্রের পক্ষেই চরম-ভাবেক্ষতি কর। দেশরক্ষার ব্যাপারে ভারত ও পাকিস্তানের ঘনিষ্ঠ সংহতি আজ উভয় দেশের পক্ষেই অনিবার্যভাবে প্রয়োজন। এজন্য উভয় রাষ্ট্রে চাই দূরদর্শী দৃষ্টি এবং নতুন মনোভাব। যুক্ত দেশরক্ষার প্রয়োজনে পাক-ভারতকে যদি একটি সিবিল কনফেডারেশন রূপে পরস্পরের উপরে নির্ভর-শীল করে তোলা যায় তবেই এরূপ পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে কাশ্মীর সমস্যার এমনভাবে সমাধান করা সম্ভব যার ফলে আজকের কাশ্মীর বিচ্ছেদের প্রতীক না হয়ে উভয় রাষ্ট্রের নতুন সেতু বন্ধনের ভিত্তি হয়ে এই উপমহাদেশের এক নতুন ইতিহাস রচনা করবে।

ডাঙ্গের মস্কো যাত্রা

জাতীয় সার্বভৌমিকতা বিপন্নের দিনে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন জাতীয় আনুগত্য। যারা দেশপ্রেমিক তাদের সমস্ত কার্যক্রমের মানদণ্ড নির্ণীত হয় জাতীয় আনুগত্যের নির্দেশে। যাদের জাতীয় আনুগত্য নেই, ভারতের ন্যায় আক্রান্ত জাতির চোখে এরূপ ব্যক্তিরা সক্রিয় বা সম্ভাব্য পঞ্চমবাহিনী ছাড়া কিছুই নয়। চীনাপন্থী কম্যুনিষ্টরা চীনদরদী আর মস্কো-পন্থীরা দেশপ্রেমিক এবং চীন-আক্রমণ প্রতিরোধকামী, কম্যুনিষ্ট উপদল দুইটিকে এরূপ দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা বিভক্ত করা এক ক্ষতিকর বিভ্রান্তি মাত্র।

রুশপন্থী বা চীনপন্থী উভয় দলই মূলত কম্যুনিষ্ট এবং এদের আনুগত্য মস্কোতে বা পিকিংয়ে। এই কম্যুনিষ্টরা আদর্শ, নীতি, নেতৃত্ব ও কার্যক্রম অনুসরণে সর্বদা পরিচালিত হয় বৈদেশিক স্বার্থ ও সংহতে। ভারত চীন কর্তৃক আক্রান্ত এবং এই আক্রমণকারীর প্রতিরোধ করা প্রতিটি ভারত সন্তানের পবিত্র কর্তব্য। চীনকে আক্রমণকারী আখ্যা দেওয়ার জন্য বিশ্বের কম্যুনিষ্টরা ভারতের রুশপন্থী কম্যুনিষ্টদের ভুল বুঝতে পারে এবং সেই ভুল সংশোধনের জন্য পাটি চায়ারম্যান ডাঙ্গেকে মস্কো ও পূর্ব ইয়োরোপের কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রগুলিতে কেন সফর করতে যেতে হবে কোন জাতীয়তা-বাদীর কাছে তার কারণ দুর্বোধ্য, কিন্তু বিশেষে যাদের আনুগত্য তাদের পক্ষে এরূপ নীতি অনুধাবন করা কঠিন নয়। কম্যুনিষ্ট পার্টির একটি উপদল রুশপন্থী এবং অপর উপদল চীনপন্থী,—কোন দলই যে ভারতপন্থী নয় আজকের জাতীয় সার্বভৌমিকতা ও স্বাধীনতা বিপন্ন হওয়ার সংকটকালে ভারতবাসী যেন সেকথা বিস্মৃত না হয়।

প্রধানমন্ত্রী নেহেরুর সমালোচনা

প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরুর সমালোচনা দণ্ডনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। শ্রীনেহেরুর সমালোচনার বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্য করে কংগ্রেস সভাপতি সাবুলার জারী করেছেন এবং কংগ্রেসী সদস্যদের শুধু নেহেরুর সমালোচনায় বিরত থাকার জন্যই কঠোর নির্দেশ দেওয়া হয়নি, যে সভা ইত্যাদিতে নেহেরুর সমালোচনা করা হয় তাতে যোগদানও বারণ করা হয়েছে। নেহেরুর সমালোচনার জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রেপ্তারের সংবাদও পাওয়া গেছে।

কংগ্রেসী সরকার ও দলের এরূপ মনোভাব বিপজ্জনক এবং ভারতের গণতান্ত্রিক আদর্শ ও নীতির পক্ষে ক্ষতিকারক। জনতার সমালোচনা ছাড়া কৃষ্ণ মেননের পরিবর্তন, দেশরক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠন এবং সুযোগ্য নায়কদের হাতে যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব দান সম্ভব হত না! ভারতের গণতান্ত্রিক জনতা সেই দিক দিয়ে মেননের সমালোচনা করে এক জাতীয়

করেছে। গত যুদ্ধে ব্রিটেনে চেম্বারলিনের সমালোচনা গুণনীয় বা জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী বলে বিবেচিত হয় নি।

যেমন পরস্পর করেছেন, ভারত বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্র থেকে অস্ত্র সাহায্য গ্রহণ করছে এবং চীন কর্তৃক অধিকৃত ভারত ভূমির পুনরুদ্ধার বাতীত ভারত চীনের সঙ্গে কোনরূপ সংঘর্ষরক্ষা না করার দৃঢ় সংকল্পে সর্বস্তরের মানুষ প্রধানমন্ত্রীর সমর্থনে দাঁড়িয়েছেন; এরূপ ক্ষেত্রে, নিছক দলীয় রাজনৈতিক কারণে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সমালোচনার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু সার্কুলার বা শাস্তি বিধান অথবা ওজনের ভীতি প্রদর্শন করে প্রধানমন্ত্রী নেহেরুর শক্তি ও ক্ষমতা বা জনপ্রিয়তা রক্ষা করার যে চেষ্টায় কংগ্রেস বা সরকার উদ্যোগী হয়েছেন তারফলে বরং গণতান্ত্রিক ও জাতীয় নেতা হিসেবে শ্রীনেহেরুর প্রভাব ও গুরুত্বকে ক্ষুণ্ণ করার প্রয়াস করেছেন স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন কংগ্রেসী নেতারা। আইন ভঙ্গের চাবুক নয়, ভারতের জাতীয় আন্দোলনের নেতা রূপে শ্রীনেহেরুর প্রতি জনগণের যে শ্রদ্ধা ও আস্থা রয়েছে তাই নেহেরু-নেতৃত্বের ও প্রধানমন্ত্রীত্বের মূল ভিত্তি। সমালোচনার অধিকার গণতন্ত্রের প্রধান অস্ত্র ও শক্তির উৎস। কংগ্রেস-নেহেরু ভক্তেরা যেন নেহেরুর শক্তি ও প্রভাব রক্ষার নামে তাঁর নেতৃত্বের ভিত্তি শিথিল করে না দেন, এই সাবধানবাণী উচ্চারণ করা আজ প্রয়োজন হয়েছে।

নীলস বোর

পরমাণুবিজ্ঞানে রাদারফোর্ডের ছাত্র রূপে রাদারফোর্ডের ছায়েই যার নাম সেই বিশ্ববিশ্রুত ডেনিশ বিজ্ঞানী নীলস বোর গতকাল বয়সে পরলোক গমন করেছেন। পরমাণুর গঠন এবং পদার্থবৃত্তান্তিকার ব্যাখ্যাদানে নীলস বোরের অবদান অবিস্মরণীয়। বর্তমানে তাঁর মত প্রতিভাধর তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী পৃথিবীতে কমই ছিল। বস্তুত, সেই দিক দিয়ে তিনি আইনষ্টাইনের সঙ্গে তুলনীয়!

গত যুদ্ধের সময় ডেনমার্ক থেকে পালিয়ে নরওয়ে থেকে ইংলণ্ডে যান এবং সেখান থেকে তিনি আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রে গিয়ে পরমাণু বিস্ফোরণের যৌথিক গবেষণায় অংশ গ্রহণ করেন। বস্তুত, পরমাণু বোমা তৈরীর কাজে যে সমস্ত বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছেন নীলস বোর তাদের মধ্যে অন্যতম।

গত বৎসর নীলস-বোর ভারত পরিদর্শনে এসেছিলেন। এই বিজ্ঞান মনীষীর প্রতি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই।

এক বহুশ্রুতকণ্ঠ চিরনীরব

গত ২৮শে নভেম্বর রাত সোয়া আটটায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রখ্যাত সুরশিল্পী কৃষ্ণচন্দ্র দে পরলোক গমন করেছেন। ১৩০২ সালে কলকাতায় তাঁর জন্ম। অল্পবয়সেই তিনি দৃষ্টি শক্তি হারান। সেদিন থেকেই তাঁর জীবনের নতুন অধ্যায় সুরু হল। গত অর্ধশতাব্দি ধরে বাংলাদেশের অগণিত শ্রোতার নিকট কৃষ্ণচন্দ্র 'কানাকেষ্ট' নামে পরিচিত। টপ্পা, ধ্রুপদ, খামার প্রভৃতি সর্বপ্রকার গানই তিনি গেয়েছেন। এবং তাঁর গানের প্রায় পাঁচশতাধিক রেকর্ড বেরিয়েছে 'গীত ভারতী ওয়া'—তাঁর গানের প্রথম রেকর্ড তাঁর কোমল ও বলিষ্ঠ কণ্ঠের 'ফিরে চল ফিরে চল আপন ঘরে' বা "মনকুসুমের রঙতরা এই পিচকারিটি রাখে" যে শুনেছে সে কখনো ভুলবে না।

২০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থিত গোবর্দ্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্দ্র মিত্র এডভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

টোকিও যুব সম্প্রদায়ের উদ্দেশে নেতাজীর ভাষণ

(নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর সৌজন্যে প্রাপ্ত)

স্বামিজী ও নেতাজী সংখ্যা

জয়শ্রী

পৌষ ১৩৬৯
৯ম সংখ্যা : ২৭ বর্ষ

যারা সাড়া দেবে তারা কোথায় ?

অপূর্ব যোগাযোগ এবার। বহুশত বৎসর ভারতবর্ষের ভাগ্যে এতবড় জাতীয় লাঞ্ছনা ও অমর্যাদা ঘটেনি। চীনা আক্রমণের আকস্মিকতায় সমস্ত জাতি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে আত্মতুষ্টিজনিত মূঢ়তা, ক্লীবতা ও পরিপূর্ণ অপ্রস্তুতির দুর্বলতার মুখোমুখি নিজেদের দেখেছে ; তারজন্য মাশুল দিয়েছে সর্বাঙ্গে পরাজয়ের অমর্যাদা মেখে। বহুদিনের ধোঁয়াটে আদর্শের কচ্‌কচি, বাক্‌সর্বস্ব শূন্যগর্ভ আত্মম্ভরিতা, কথায় ও কাজে লজ্জাজনক দ্বৈতনীতি, ক্ষুদ্র গণ্ডীবদ্ধ আত্মসর্বস্ব স্বার্থান্ধতা, সর্বোপরি দুর্নীতি ও হীনতায় সমস্তজাতি আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে আছে। লক্ষ্যহীন দিকহীন সুনিশ্চিত সর্বনাশের পথে চলেছে। হঠাৎ প্রবল কালবৈশাখীর তীব্র তীক্ষ্ণ উদ্দাম ঝড়ের কশাঘাত উড়িয়ে নিয়ে গেল বহুদিনের সঞ্চিত বিস্তর আবর্জনা, সবলে নাড়াদিয়ে গেল সকলকে। রুদ্ধদ্বার ঘুমে-অচেতন মানুষগুলো চমকে একবার জেগে উঠ্‌লো ; আশাহোলো এবার বোধহয় এদের কাল ঘুম যাবে টুটে ; হয়তো এরা পুরোপুরি জেগে উঠ্‌বে, হয়তো, ঘরের খুঁটি চাল শক্ত করার সময় পাওয়া যাবে, কিন্তু ঝড়ের বেগ সাম্‌লাতে না সাম্‌লাতেই পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়্‌লো জাতি।

কে ভাঙ্গবে এদের এই কাল নিদ্রা ? দিক চক্রবালে ভেসে উঠেছে দুইটী বজ্রগর্ভ ভাস্বর

জীবনের প্রতিচ্ছবি। এক সপ্তাহের ব্যবধানে ভারতের সন্ন্যাসী-যোদ্ধা ও যোদ্ধা-সন্ন্যাসীর যথাক্রমে শতবার্ষিকী ও সপ্তষষ্টিতম জন্মতিথি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। একি আকস্মিক যোগাযোগ?

উভয়ের মানসিক, দৈহিক ও জীবন ও তার অবদানে আশ্চর্য সাদৃশ্য। ভারতভূমি বহু সাধু, সন্ন্যাসী সন্তর বিচরণ ক্ষেত্র, কিন্তু এমনটী দেখা যায় নি। আবার এমন দেশপ্রেম এমন সর্বস্বপণ করা স্বাধীনতার যোদ্ধাও আর দুটী পাওয়া যায় না ভারতবর্ষের ইতিহাস খুঁজে। এ যেন অধিকারী ও উত্তর-অধিকারীর অদ্ভুত যোগাযোগ। আজ অন্তঃসারশূন্য মিথ্যা ভণ্ডামি, স্বার্থবুদ্ধিসম্পন্ন সকল আদর্শের ও আত্মতৃপ্ত নৈষ্কর্ম্যবাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড, জলন্ত, প্রতিবাদ উভয়ের জীবন।

ভারতকে দুর্বল, ক্লীব করবার সকল চেষ্টা অতিক্রম করে ভারতকে উভয়ে দিয়েছেন শক্তি ও অভি মন্ত্র। মানুষ তৈরীর ব্রতই উভয়ের কর্মবাদের ভিত্তি, যে মানুষের থাকবে ইস্পাতকঠিন পেশী, বিচারশীল সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি, আর সবল নির্ভীক হৃদয়, সর্বোপরি নিপীড়িত, লাঞ্ছিতের জন্য অফুরন্ত ভালবাসা। একজন ভারতে প্রথম জ্বালিয়েছেন সমাজবাদের দীপশিখা, আর একজন ভারতের নিজস্ব ঐতিহ্যের ভিত্তিতে যুগোপযোগী নূতন ভারতবর্ষ গড়ে তোলার পথ ও পাথেয় দিয়েছেন জাতিকে। সমন্বয়বাদ উভয়েরই বেছে-নেওয়া পন্থা। ইতিহাসে এধরণের পুনরাবির্ভাব খুবই বিরল। এই যোগাযোগ তাই এই মুহূর্তে খুব তাৎপর্যপূর্ণ। জাতি কি এর মর্ম বুঝেছে? প্রস্তুত হয়েছে এদের পরিপূর্ণ জীবনের প্রবল আহ্বানে উপযুক্ত সাড়া দিতে? সময় এখনো হয়তো সম্পূর্ণ গত হয়নি। এঁদের জীবনের আহ্বান জাগ্রত করুক, সুপ্ত বিভ্রান্ত জাতিকে। আহ্বান করুক সত্য, বীর্য, দেশ ও জাতির সেবায় সর্বস্ব ত্যাগের পথে।

সময় হয়তো এখনো সম্পূর্ণ অতিক্রান্ত হয়নি।

২০শে জানুয়ারি ১৯৬৩

স্বামী বিবেকানন্দ

সুভাষচন্দ্র বসু

[১৯৩২ সালের ৬ই মে তারিখে সিওনি (তৎকালীন সি. পি) সাব জেল হইতে মারহাট্টা পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক মিঃ এ. আর ভাটকে লিখিত ইংরাজী প্রবন্ধের অনুবাদ]

আপনারা সামর্থ স্বামী ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে যা লিখেছেন তা খুবই হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। একথা ঠিক যে স্বামিজীর যে সকল পত্রাবলী এবং আলাপ আলোচনা লিপিবদ্ধ হয়েছে সেগুলি যে শুধু হৃদয়গ্রাহী তাই নয় সেগুলি স্বামিজীর প্রকাশ্য বক্তৃতা ও প্রকাশিত পুস্তকাবলী অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানগর্ভ।

বিবেকানন্দ সম্বন্ধে কিছু লিখতে গিয়ে আমি আত্মহারা হয়ে যাই। খুব কম লোকের পক্ষে—এমন কি তাঁর সংস্পর্শে থাকার সুবিধা যাদের হয়েছিল, তাদের পক্ষেও তাঁর সম্যক ধারণা করা বা তাঁকে গভীর ভাবে বুঝতে পারা অসম্ভব বলেই মনে করি। সুগভীর, জটিল ও বহ্নি-সমন্বিত ব্যক্তিত্ব তাঁর বক্তৃতা ও লেখা থেকে ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, অথচ তাঁর এই লেখা ও বক্তৃতার দ্বারাই তিনি তাঁর আশ্চর্য প্রভাব দেশবাসীর উপর বিশেষতঃ বাঙালীর উপর বিস্তার করেছিলেন। এই রকমের বলিষ্ঠ মানুষ বাঙালীর মনকে যেমন আকৃষ্ট করে এমন আর কেউ করে না। ত্যাগে বে-হিসাবী, কর্মে বিরামহীন, প্রেমে সীমাহীন, স্বামিজীর জ্ঞান ছিল যেমন গভীর তেমনি বহুমুখী। ভাবাবেগে উচ্ছ্বসিত স্বামিজী মানুষের ত্রুটিবিচ্যুতির নির্মম সমালোচক ছিলেন অথচ সরলতা ছিল তাঁর শিশুর মত। আমাদের জগতে এরূপ ব্যক্তিত্ব বাস্তবিকই বিরল।

ভগ্নী নিবেদিতা তাঁর "The Master as I saw him" (আমার গুরু, আমি যেমন তাঁকে দেখেছি) পুস্তকে বলেছেন—"The queen of his adoration was his Mother land"—অর্থাৎ তাঁর আরাধনার দেবী ছিলেন তাঁর মাতৃভূমি! পুরোহিত, উচ্চবর্ণ এবং বণিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে তিনি তাঁর লেখায় যে আক্রমণ চালিয়েছিলেন—আপনারা তা পড়েছেন। সে সব কথা বলা একজন গোঁড়া সমাজতান্ত্রিকের পক্ষে বিশেষ প্রশংসার বিষয়।

আপনারা যাকে আধ্যাত্মিক ভণ্ডামী বলতে পারেন, স্বামিজীর মধ্যে তার বিন্দুমাত্র আভাসও ছিল না। তাঁর চোখে এসব অসহ্য বোধ হোতো। বক-ধার্মিকদের উদ্দেশ করে তিনি বলতেন—"ফুটবলের মধ্য দিয়ে মুক্তি আসবে—গীতার মধ্য দিয়ে নয় (Salvation will come through football and not through the Gita)"। নিজে বৈদান্তিক হয়েও—তিনি, ভগবান বুদ্ধের পরম ভক্ত ছিলেন। একদিন তিনি বুদ্ধ সম্বন্ধে এমন অনুরাগ ও উৎসাহের সঙ্গে কথা বলছিলেন যে একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—"স্বামিজী আপনি কি বৌদ্ধ?" তৎক্ষণাৎ তাঁর মন ভাবাবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল—তিনি কম্পিতস্বরে বললেন "কি? বৌদ্ধ? আমি বুদ্ধের সেবকের সেবক—শুদ্ধ সেবক।" বুদ্ধের সম্মুখে

তিনি নিজেকে ধূলার মত নত করে দিতেন। স্বামীজী প্রায়ই বলতেন—"শঙ্করাচার্যের মনীষা, বুদ্ধের হৃদয়বত্তাই আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত।"

এইভাবে তিনি একদিন যীশু সম্বন্ধে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। একজন তাঁকে প্রশ্ন করলেন,—তখনই তিনি গম্ভীর হয়ে গেলেন এবং মধুর কণ্ঠে উত্তর দিলেন—"যীশুখ্রীষ্টের সময় আমি জীবিত থাকলে আমি আমার চোখের জলে নয়—আমার হৃদয়ের রক্ত দিয়ে তাঁর পা ধুইয়ে দিতাম।"

অবনমিতের প্রতি তাঁর ভালবাসা ছিল সমুদ্র সমান। তাঁর সেই বাণী কি আমাদের স্মরণ আছে? "দরিদ্র ভারতবাসী, মূর্খ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই। বল ভাই উচ্চকণ্ঠে বল—ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ, দিবারাত্র প্রার্থনা কর, হে গৌরীপতি, হে শক্তিময়ী জননী, আমার দুর্বলতা হরণ কর,' আমার কাপুরুষতা হরণ করে আমায় মানুষ কর।"

স্বামিজী ছিলেন পৌরুষসম্পন্ন পূর্ণাঙ্গ মানুষ—তিনি ছিলেন মনেপ্রাণে সংগ্রামী—সেইজন্য তিনি ছিলেন শক্তির উপাসক তিনি তাই দেশবাসীর উন্নয়নের জন্য বেদান্তের বাস্তব ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন। "শক্তি, শক্তি, শক্তির কথাই উপনিষদ বলেছেন!—স্বামিজী এই কথাই বার বার বলেছেন।" চরিত্র গঠনের উপর তিনি সর্বাপেক্ষা বেশী গুরুত্ব আরোপ করে গেছেন। আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা বলে গেলেও সেই মহাপুরুষের বিষয় কিছুই বলা হবে না। এমনি ছিলেন তিনি মহৎ, এমনি ছিল তাঁর চরিত্র—যেমন মহান তেমনি জটিল। তাঁর বিষয় বলতে গেলে বলতে হবে যে তিনি আধ্যাত্মিক সাধনার উচ্চতম স্তরের যোগ্য—সত্যের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ সংযোগ, জাতির ও মানব সমাজের উন্নতি বিধানে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধানে তাঁর জীবন উৎসর্গীকৃত। আজ তিনি জীবিত থাকলে আমি তাঁর চরণে আশ্রয় নিতাম। স্বামী বিবেকানন্দই বর্তমান ভারতের স্রষ্টা—একথা বললে বোধ হয় ভুল করা হবে না।

যে ভাবে স্বামী দয়ানন্দ বা আর্যসমাজীরা সংগঠনের কাজ করেছেন—স্বামিজীর সে ইচ্ছা ছিল না এবং সে চেষ্টাও তিনি করেন নি। হতে পারে এটা একটা ত্রুটি কিন্তু নিজের সম্বন্ধে বলতেন—মানুষ তৈরী করাই আমার ব্রত—"Man-making is my Mission." তিনি জানতেন যে যদি দেশে সত্যকার মানুষ তৈরী হয় তাহলে সংগঠনের কাজ সম্পূর্ণ হতে দেরী লাগবে না। তিনি তাঁর শিষ্যদের শিক্ষিত করবার জন্য বিশেষ যত্ন নিতেন। তিনি কখনও তাদের ব্যক্তিত্ব পঙ্গু বা স্বাধীন চিন্তাকে খর্ব করবার চেষ্টা করতেন না। এইজন্যই কোনো শিষ্যকে তিনি বেশীদিন নিজের কাছে রাখতেন না। তিনি বলতেন যে একটা বড় গাছের আওতায় অন্য একটা বড় গাছ কখনো বাড়তে পারে না। পরের যুগের মহৎ ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর কতখানি প্রভেদ! তাঁরা স্বাধীন চিন্তা বরদাস্ত করতে পারেন না এবং তাঁরা চান যে আমরা তাঁদের পায়ে আমাদের বিদ্যাবুদ্ধি সব সমর্পণ করে আমাদের সকল চিন্তার ভার তাঁদের উপর দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকি।

বিপদ মুক্ত হয় সম্মিলিত শক্তির কাছে
সর্বশক্তি নিয়োগ করুন

স্বামী বিবেকানন্দ

ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার

• •

উনিশ শতকের প্রথমে রাজা রামমোহন রায় ভারতে নবযুগের সূচনা করেন। অন্ধ সংস্কারের পরিবর্তে বিচার-বুদ্ধির প্রয়োগ দ্বারা ধর্ম ও সমাজের সংস্কার ইহাই ছিল এই নবজাগরণের মূল মন্ত্র। রামমোহনের পরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্র সেন রামমোহনের নির্দিষ্ট সীমারেখা ছাড়াইয়া ব্যক্তিগত বিচার বুদ্ধির অবাধ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং ধর্ম ও সমাজের সংস্কার প্রণালী আমূল পরিবর্তিত হয়। রামমোহন বেদ প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্র মানিয়া চলিতেন এবং নিজেকে হিন্দু বলিয়াই পরিচিত করিতেন। বিলাতে বৃদ্ধকালেও তাঁহার গলায় যজ্ঞোপবীত ছিল। কিন্তু কেশবচন্দ্র হিন্দু সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এক নূতন সমাজ স্থাপন করেন। তিনি যাহা সামাজিক কুপ্রথা বলিয়া মনে করিতেন বিনা দ্বিধায় প্রয়োজন হইলে আইনের সাহায্যেও তাহা বন্ধ করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। হিন্দুধর্ম অপেক্ষা খৃষ্ট ধর্মেই তাঁহার অনুরক্তি ছিল বেশী - এবং অনেক খৃষ্টান মিশনারীরা বিশ্বাস করিতেন যে তিনি অচিরাৎ খৃষ্টধর্ম অবলম্বন করিবেন। কেবল এই দুই বিষয়েই যে তিনি রামমোহনের সম্পূর্ণ বিপরীতপন্থী ছিলেন তাহা নহে। রামমোহন রাজনীতিক সংস্কারের জন্য বহু আন্দোলন করিয়াছিলেন কিন্তু ব্রিটিশ রাজশক্তির প্রতি কেশবচন্দ্রের অচলা ভক্তি ছিল ইহার বিরুদ্ধে কোনরূপ বিক্ষোভ বা বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করা তিনি অন্যায় ও অসঙ্গত মনে করিতেন।

ইহার ফলে ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতিক্ষেত্রে বিষম প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হইল। প্রাচীন হিন্দুধর্ম ও প্রাচীন সামাজিক প্রথা বজায় রাখিবার জন্য প্রবল আন্দোলন আরম্ভ হইল। অন্যদিকে ধর্ম ও সমাজ সংস্কারে উদাসীন হইয়া দেশের যুবকবৃন্দ রাজনীতিক সংস্কারের দিকেই পুরোপুরি ঝুঁকিয়া পড়িল। কেশবচন্দ্রের বিপুল খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ক্রমশঃ লুপ্ত হইল। ধর্ম ও সমাজের উন্নতির স্রোত ব্যাহত হইল। একদিকে প্রাচীনপন্থী আর একদিকে পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহে আচ্ছন্ন সমাজ এই দুই দলে বিভক্ত হইল। নব্য যুবকদল ধর্ম ও সমাজের চিন্তা ছাড়িয়া রাজনীতিক আন্দোলনেই সম্পূর্ণরূপে মনোনিবেশ করিলেন।

দার্শনিক এবং ঐতিহাসিক বিবর্তনের যে মূলসূত্র প্রচার করেন তাহার প্রধান তিনটি স্তর—(১) ক্রিয়া; (২) প্রতিক্রিয়া; (৩) সমন্বয়। **উনিশ শতকের শেষে যখন প্রথম দুইটি স্তরের বিরোধ চলিতেছিল—তখন যে মহাপুরুষ অবতীর্ণ হইয়া তৃতীয় স্তর অর্থাৎ প্রথম দুয়ের সমন্বয় সাধনা করেন তিনি স্বামী বিবেকানন্দ।** তিনি প্রাচীন শাস্ত্রকে অস্বীকার না করিয়া তাহার মূল তত্ত্বের দিকে ভারতবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করেন। বেদান্তের ধর্মই যে ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতার প্রাণ স্বরূপ—এবং এই লুপ্তধর্ম উদ্ধার না করিলে ভারতবাসীর সভ্যতা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইবে না—ইহা প্রতিপন্ন করাই ছিল তাঁহার জীবনের ব্রত। রামমোহন ও দয়ানন্দ বেদে বিশ্বাস করিতেন কিন্তু পরবর্তী দুই হাজার

বহুরে হিন্দুধর্মে ও সমাজে যাহা কিছু পরিবর্তন হইয়াছে সমস্তই বর্জন করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু বেদান্তের আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিতে এই ধর্ম ও সমাজ পরিবর্তনের মধ্যে যে শুভ নিহিত আছে বিবেকানন্দ তাহা ভারতবাসীর নিকট প্রকটিত করেন। বেদবেদান্তের নিরাকার ব্রহ্মোপলব্ধিও যেমন সত্য পৌরাণিক মূর্তিপূজা মূলক ধর্মও যে অধিকার ভেদে সেই পরিমাণে সত্য—এই বাণী প্রচার করিয়া তিনি হিন্দু-ধর্মে নূতন প্রাণশক্তি সঞ্চার করিয়াছেন। পাশ্চাত্যের মোহ হইতে মুক্ত করিয়া আত্ম-প্রত্যয়ের ও পূর্ব-গৌরবের দৃঢ় ভিত্তির উপর তিনি হিন্দুর জাতীয়তা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। জাতিভেদের কঠোরতা যে হিন্দুধর্মের গ্লানি তাহা তিনি মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিয়াছেন। "আমাদের ধর্ম এখন ভাতের হাঁড়ার মধ্যে"—এই একটি সংক্ষিপ্ত লাইনে তিনি যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন সুদীর্ঘ বক্তৃতায় বা প্রবন্ধে তাহা সম্ভব হইত না।

রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি যে জাতীয়তাবাদ প্রচার করেন বেদান্তের অধ্যাত্মবাদের উপরই তাহার দৃঢ় প্রতিষ্ঠা। আমরা যে দুর্বল নহি—শক্তির আধার, নশ্বর দেহের বৃদ্ধি অতি সূক্ষ্ম,—কিন্তু আত্মা অবিনশ্বর,—সুতরাং ভয় ও দুর্বলতা ত্যাগ করিয়া দেশের মুক্তি সাধনের জন্য তিনি যুবকদের আহ্বান করিয়াছেন। দেশ তাঁহার কাছে কেবল ভারতবর্ষের মাটি নহে—যদিও তিনি উহাকেও পুণ্যভূমি বলিয়া পূজা করিতেন। এই দেশের অগণিত দুর্বল, মূর্খ, দরিদ্র, অবহেলিত, নরনারী লইয়াই দেশ—ইহাদের উন্নতি ভিন্ন দেশের উন্নতি নাই—ইহাদের সেবা, ইহাদের দুঃখ লাঘব দূর করাই ভারতবাসীর পরম ও চরম ধর্ম। ইহা ভিন্ন অন্য ধর্ম নাই—দরিদ্রনারায়ণই একমাত্র উপাস্য দেবতা।

কেবল ভারতবাসীর উন্নতি তিনি কামনা করেন নাই—তাঁহার লক্ষ্য ছিল বিশ্বমানবের মুক্তি। তিনি জানিতেন ভারতের আধ্যাত্মিক সম্পদই এই মুক্তির একমাত্র উপায়। কিন্তু ভারতবর্ষ স্বাধীন জাতি না হইলে পৃথিবীর কোন জাতিই ভারতবর্ষের এই অমূল্য দান গ্রহণ করিবে না। তাই জাতীয়তাবাদের উপরই তিনি আন্তর্জাতিকতাবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। যাহারা বিশ্বপ্রেমের দোহাই দিয়া ভারতের জাতীয়তাবাদকে সঙ্কীর্ণতা দোষে পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন, তিনি তাঁহাদের অপেক্ষা অনেক উর্ধ্বে। তিন হাজার বছরের ভারতের ইতিহাস আমরা জানি—ইহার মধ্যে বহু সাধু, সন্ত, সন্ন্যাসী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু বিবেকানন্দের পূর্বে কোন গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী এমন কথা বলেন নাই যে আমি নিজের মুক্তি চাই না—দেশের দীন দুঃখী দরিদ্রের দুঃখ মোচনের জন্য লক্ষ লক্ষ বার জন্মগ্রহণ করিতে রাজী আছি।

এইখানেই বিবেকানন্দের বৈচিত্র্য ও বিশেষত্ব। তাই রামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক সম্পদের পূর্ণ অধিকারী এই সন্ন্যাসীকে কেহ বলিয়াছেন ভারতে জাতীয়তার জনক কেহ বলিয়াছেন ভারতে সমাজতন্ত্রের (Socialism) জন্মদাতা।

কথা নয়
এখন কেবল কাজ

নেতাজীর মতবাদ

অনিলচন্দ্র রায়

কেউ কেউ নেতাজীর কোনো মতবাদ আছে কিনা এ-সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করেন। নেতাজীর ধারা বিশেষ অনুরাগী তাঁদের মধ্যেও অনেকে স্বীকারই করতে চান না যে বর্তমান যুগের বিভিন্ন জীবনাদর্শ সম্বন্ধে নেতাজীর কোনো মূল্যায়ন আছে। তাঁদের মতে নেতাজী একজন গতিবান বিরাট সংগ্রামী পুরুষ। এশিয়া মহাদেশে প্রবল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীর ভূমিকায় যিনি নিরলস সংগ্রামে অগ্রণী। এঁরা মনে করেন জীবনদর্শনের সূক্ষ্ম তাত্ত্বিক চিন্তা নেতাজীর আয়ত্তের বাইরে। নেতাজীর আর একদল অনুগামীদের ধারণা যে তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে নেতাজীর কোনো স্বকীয়তা ছিল না, তিনি বর্বের ও সংগ্রামের ভিত্তিভূমে গান্ধীর মতবাদকেই স্বীয় মতবাদরূপে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। এই দুই দলের অনুগামীরাই সমাজ ও জীবন সম্পর্কিত চিন্তাধারায় নেতাজীর মৌলিক অবদানের স্বীকৃতি দিতে দ্বিধাগ্রস্ত ও পরাঙ্মুখ। আমার সুস্পষ্ট অভিমত নেতাজীর জীবনবাণী অনুধাবনে এদের অক্ষমতার জন্যই এরা নেতাজীর যুক্তিবাদী, সমন্বয়ধর্মী ও গতিশীল চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হতে পারেন নাই। পৃথিবীর বর্তমান সন্ধিক্ষণে তাত্ত্বিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে তাঁর এই মতবাদের গভীর প্রয়োগগত গুরুত্ব রয়েছে।-- একথা সত্য যে নেতাজী ভবিষ্যৎ সমাজব্যবস্থার পরিপূর্ণ চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরেন নাই। কিন্তু তিনি একদিকে যেমন সর্বাঙ্গ জীবনবোধের ভাবগত আদর্শ রেখে গেছেন, অন্যদিকে তেমনি বর্তমান শতাব্দীর প্রবল মতবাদগুলি সম্বন্ধে বিশ্লেষণাত্মক অথচ সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে গেছেন। সুতরাং তাঁর এই রেখাঙ্কন থেকেই বর্তমান যুগোপযোগী জীবনাদর্শের মৌলিক উপাদান সংগ্রহ করে একটি সামাজিক জীবনবোধের রূপদান অসম্ভব নয়।

আজকের ভারতবর্ষের বড় প্রশ্ন কাকে সে অনুসরণ করবে, গান্ধীকে? মার্কসকে? না নেতাজীকে? গান্ধীবাদের কথাই ধরা যাক। অন্য দেশের কথা ছেড়ে দিয়ে ভারতবর্ষে এই আদর্শের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। বিজ্ঞানের জয়যাত্রার যুগে অহিংসা ও চরকা অবান্তর হয়ে দাঁড়াতে বাধ্য। দ্রুত পরিবর্তনশীল ভারতীয় দিকচক্র থেকে গান্ধীবাদ ইতিমধ্যেই আবছা হয়ে এসেছে; ভারতবর্ষের অগণিত গান্ধীশিষ্যদের মানসিকতা থেকেও তা বিদায় নিয়েছে। অষ্ট উনবিংশ শতাব্দীর অপগত সমাজব্যবস্থার ভিত্তি থেকে উৎপারিত মার্কসবাদের আবেদন আজও প্রবল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সোভিয়েট রাশিয়ার শক্তি অর্জন ও ইন্দো-মার্কিন শক্তির বিশ্বব্যাপী শোষণ, মার্কসবাদের শক্তি বাড়িয়েছে। কিন্তু নব্যবিজ্ঞানের আঘাতে মার্কসবাদের তাত্ত্বিক নৈষ্ঠিকতা ও গোঁড়ামি বহুলাংশে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। রাশিয়াতে লেনিনবাদ ও স্টালিনবাদ, যুগোস্লাভিয়ার টিটোবাদ এবং পরিশেষে চীনে মাওবাদ, পরিবর্তনের এই স্তরগুলি অতিক্রম করে মার্কসবাদের রূপান্তর ঘটছে। বস্তুতপক্ষে

পরিবর্তনের মুখে মার্কসবাদ স্বকীয়তাকেই অতিক্রম করে যাচ্ছে।

ভারতবর্ষ কি একশত বছরের পূর্বেকার মার্ক্সীয় সিদ্ধান্ত অন্ধভাবে অনুসরণ করবে? অথবা পদার্থবিজ্ঞানের গতি-বেগের যুগে সমন্বয়ধর্মী নূতন জীবনবোধের ভিত্তিমূল রচনা করবে? নেতাজী এই মৌলিকসমন্বয়সাধনের দিক নির্দেশ দিয়ে গেছেন। যার মধ্যে পরস্পরবিরোধী জীবন-দর্শের সমন্বয়ের সন্ধান নিহিত রয়েছে এবং এই সমন্বয়কেন্দ্রিক সমাজবিপ্লবের প্রয়োগগত পথও নির্দেশ করে গেছেন।

নেতাজী পোশাকী বুদ্ধিজীবী ছিলেন না। তিনি ছিলেন কঠোর বাস্তববাদী। একদিকে অনমনীয় দৃঢ়তা নিয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে আদর্শগত সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন অন্যদিকে বর্তমান যুগের প্রবলতম আদর্শগত শক্তি, মার্ক্সীয় মতবাদ সম্বন্ধে স্বচ্ছ ও স্পষ্টভাবে নিজস্ব বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন। মার্কসীয় মতবাদের তাৎপর্য গভীরভাবে তিনি অনুধাবন করে দ্বিধাহীন চিত্তে বলেছেন ভারতবর্ষকে বিভিন্ন মূল্যায়নের সমন্বয় ও উন্নততর সমাজব্যবস্থার সন্ধান করতে হবে। মার্ক্সীয় দর্শন অতিক্রম করে ভারতবর্ষের যাত্রাপথ রচনা করতে হবে যে পথে ভারতবর্ষের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য মানুষের অগ্রগতির সঙ্গে সংহত হয়ে নূতন সমাজ বিপ্লবে হবে উত্তরণ। নেতাজীর এই মৌলিক দৃষ্টিকোণ এবং সমাজবিপ্লবের এই পথনির্দেশ নেতাজীর বিভিন্ন রচনা ও জীবনের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে। যারা বাস্তববিমুখ তারাই শুধু এ-কথা অস্বীকার করবে।

বর্তমানে ভারতীয় বিপ্লবের সার্থকতার জন্য নূতন তত্ত্ব, নূতন প্রয়োগপদ্ধতি নূতন সমন্বয় ও নূতন দিকদর্শনের প্রয়োজন। নেতাজী তার ইসারা দিয়ে গেছেন। ভারতের বুদ্ধিজীবী ও চিন্তানায়কদের ওপর দায়িত্ব বর্তেছে বর্তমান তথ্যের আলোকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নেতাজীর জীবন-দর্শনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার।

---

* অনুবাদসূত্র ইংরাজী Forward Bloc Weekly। ১৯৫১ সনের ২৩শে জানুয়ারি নেতাজী সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীমিলনচন্দ্র রায়ের ইংরেজী প্রবন্ধের অনুবাদ। ঃ সঃ

দেশপ্রেমের প্রমাণ দেবার
সময় এসেছে আজ,
স্বদেশ-রক্ষা পণ ক'রে
সবাই করুন কাজ।

স্বামীজী ও নেতাজী

সমর গুহ

সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের সঙ্গে রাজনৈতিক সুভাষচন্দ্রের মিল কোথায়? এমনি প্রশ্নেরও প্রয়োজন হয় না,—সুভাষচন্দ্রের কথা উঠলেই সঙ্গে সঙ্গে এসে যায় বিবেকানন্দের নাম। কেউ বলেন, সুভাষচন্দ্র বিবেকানন্দের মন্ত্রশিষ্য, কেউ বলেন ধ্যানমন্ত্র। কিন্তু এমনি সংজ্ঞায় বোধ হয় বিবেকানন্দ ও সুভাষচন্দ্রের আত্মিক সম্বন্ধের সবটুকু বোঝায় না। যথার্থ বলতে হলে, বিবেকানন্দ ও সুভাষচন্দ্র একই প্রাণ-সূর্যের দুটী তরঙ্গ,—স্বামীজী ওযুগের, নেতাজী এযুগের,—শুধু কালের ব্যবধানের রূপ-ভিন্ন প্রকাশ মাত্র। ত্রিশ বছর আগে জন্মালে সুভাষচন্দ্র হতেন বিবেকানন্দ, আর ত্রিশবছর পরে অন্যত্রদর হলে 'সাইক্লোনিক হিন্দু' হতেন অগ্নিহোত্রী নেতাজী। বস্তুত, স্বামীজী ও নেতাজী একই অবিচ্ছিন্ন ভাব-সত্তার যুগ-বৈচিত্রের দুটী প্রকাশ।

সুভাষচন্দ্র তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন "বিবেকানন্দ যেদিন আমার জীবনে প্রবেশ করলেন সে দিন থেকে আমার মধ্যে বিপ্লব ঘটে গেল। তখন বয়েস আমার মাত্র পনের।" তিনি ইংরেজীতে যেকথাটি লিখেছেন তা' হলো—'Vivekananda entered my life'—মানে দেহাতীত বিবেকানন্দ যেন নতুন কালে, নতুন দেহে, নতুন কর্মের জন্য প্রবেশ করলেন নতুন আধার সুভাষচন্দ্রের মধ্যে—তথা বিবেকানন্দ আবার সমূর্ত হলেন সুভাষচন্দ্র রূপে। সুভাষ লিখেছেন, "যে আদর্শের জন্য আমি এত উদগ্রীব হয়েছিলাম, বিবেকানন্দ তা' দিলেন আমাকে, - দিলেন এমন একটি আদর্শ যার জন্য আমি সর্বস্বান্ত উৎসর্গ করতে পারি,—"আত্মনো মোক্ষার্থং জগৎহিতায়"—নিজের মুক্তির জন্য, জগতের সেবায়।"

স্বামীজী প্রবেশ করলেন সুভাষের জীবন-সত্তায়,—কিশোর সুভাষ ব্যাকুল হয়ে উঠলো গেরুয়ার জন্য। না, গেরুয়া দেওয়ার জন্য বিবেকানন্দ প্রবেশ করেন নি সুভাষের মধ্যে। সেই সেদিন, যেদিন কন্যাকুমারিকার শিলাখণ্ডে ধ্যানাসীন হয়েও ধ্যান করতে পারেন নি বিবেকানন্দ,—তার জীর্ণ অপলিত নরনারী, দারিদ্র—ব্যাধি-জর্জরিত কোটি কোটি নগ্ন মানুষ, ঐ দেবভূমি গাঙ্গের মৃত্তিকার কোলে দীন-দরিদ্র ভারতবাসী,—তারা মিছিল করে সেদিনে ভীড় করে এসে দাঁড়িয়েছিল সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের চোখের সামনে। সেদিনে যাদের ডাক শুনেছিলেন তিনি সে ডাকে পরিপূর্ণভাবে সাড়া দেওয়ার তখনও সময় হয়নি। একটা অতৃপ্ত বাসনা সেদিনে আকুল হয়ে কেঁদে উঠেছিল সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের বুকে। তাই উদ্গত হয়ে সমস্বরে ধ্বনিত হয়েছিল তাঁর কণ্ঠে: "হে ভারত, ভুলিও না,—নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী,

ভারতবাসী আমার ভাই, বল মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র-ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ-ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই ; তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল - ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশু-শয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারানসী ; বল ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ।"

সেদিনে বিবেকানন্দের এই আকুল আহ্বানকে তুলে দেবার জন্য না ছিল মানুষ, না ছিল কোনো প্রস্তুতি। বিবেকানন্দ ভারতের ভাবমুক্তি এনে দিলেন, কিন্তু জাতীয় মুক্তির সাধিক অভিযাত্রার জন্য প্রবেশ করলেন সুভাষচন্দ্রের মধ্যে। বিবেকানন্দের বেদনা নিয়ে জন্ম হলো বিপ্লবী সুভাষচন্দ্রের। সুভাষচন্দ্র শুনলেন বিবেকানন্দের সেই বাণী —'Freedom, freedom is the Song of Soul— মুক্তি, মুক্তিই আত্মার সঙ্গীত। তাঁর সেই কথাও শুনলেন সুভাষ—'দেহের, মনের, আত্মার,—সব কিছুর মুক্তি চাই,— —তবেই তো পূর্ণাঙ্গ মুক্তি।' সুভাষও হলেন মুক্তির পূজারী, —না, সন্ন্যাসের মুক্তি নয় পরাধীনতার নাগপাশ থেকে ভারত-মুক্তির পূজারী। বিবেকানন্দের অপূর্ব ভারতপ্রেমে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠলো সুভাষের সমগ্র চেতনা। বিবেকানন্দ বলেছিলেন 'আমার জীবনের একটি মিশন আছে।' সুভাষের কণ্ঠেও তাই নতুন করে প্রতিধ্বনিত হলো : "আমার জীবনের একটি সুনির্দিষ্ট মিশন আছে, সেজন্যেই আমার জীবনধারণ।"

কী অপূর্ব বিবেকানন্দের ভারত-প্রেম। এই ভারত-প্রেম শুধু স্বদেশ-প্রেম নয়,—নিছক প্যাট্রিয়াটিজম তো নয়ই। বিবেকানন্দের কাছে ভারতবর্ষ শুধু মাটি ও মানুষের দেশ নয়, —'ভারতবর্ষ দেবভূমি'। এই যুগযুগান্তের অক্ষয় প্রত্নসম্পদের উত্তরাধিকারী ভারতবর্ষের একটি 'বাণী' আছে,—আত্মিক বাণী, প্রেমের বাণী, বিশ্বজনীনতার বাণী। এ যুগের বিশ্বকে এ বাণী শুনাবার জন্যেই ঐহিক জীবনে পঙ্গু হয়েও ভারতবর্ষ বিলুপ্ত হয়ে যায় নি। বিবেকানন্দের এই ভারত-বাণীর কথাই সুভাষচন্দ্রের ভাষায় বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। "ভারতের একটি বাণী আছে, তা' শুনাবার জন্যই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভারতবর্ষ বেঁচে রয়েছে। এই স্বপ্ন আমার কাছে জীবন্ত সত্য। এই স্বপ্ন থেকেই আমি উদ্দীপনা লাভ করি,—প্রাণে আমার কাজ করার প্রেরণা আসে। স্বপ্নের এই অভাবে আমার বেঁচে থাকাই অসম্ভব হতো।" এই ভারতের বাণী বুকে নিয়েই, মনীষী রোঁলার ভাষায়, "বিবেকানন্দ তাঁর হৃদয় দিয়ে অর্ধেক পৃথিবী জয় করেছিলেন।' নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন 'দেবভূমি' ভারতবর্ষের পরিব্রাজক রূপে। সুভাষচন্দ্রের কাছেও ভারতবর্ষ শুধু মাটির দেশ নয়,—জননী জন্মভূমি এবং এই দেবভূমির তিনি একজন পথিক—'ভারত-পথিক'। বিবেকানন্দ যে ভাব-বিপ্লবের সৃষ্টি নিয়ে মিশন গঠন ও 'জীব-শিববাদে'র বাস্তব রূপায়ণে অগ্রসর হয়েছিলেন, সুভাষচন্দ্র তেমনি ভারতের মুক্তি সংগ্রামে রাজনীতিকে গ্রহণ করেছিলেন সাময়িক অবলম্বন হিসেবে নয় জীবন-সাধনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ রূপে। তিনি তাই বলেছেন : "নিজের জীবন পূর্ণরূপে বিকাশ করে ভারতমাতার পদাম্বুজে অঞ্জলিরূপে নিবেদন করবো,—এই আদর্শের দ্বারাই আমি অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম। স্বদেশ সেবা বা রাজনীতি আমি সাময়িক বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করিনি।" এবং এজন্যই সুভাষ অকুণ্ঠচিত্তে বলতে পেরেছে "আমি কেবল দিয়ে যাব প্রতিদানে কিছু না চেয়ে।"

স্বদেশসেবার কী প্রগাঢ় অনুভূতি বিবেকানন্দের সমগ্র অনুভূতিকে ধ্বনিত করেছে। যারা স্বদেশসেবা করতে চায় তাদের ডেকে তিনি জিজ্ঞেস করেছেন : "তোমরা কি প্রাণে প্রাণে অনুভব করছো যে কোটি কোটি লোক অনাহারে মরছে, কোটি কোটি ব্যক্তি শত শত শতাব্দী ধরে অর্ধাশনে দিন কাটাচ্ছে ? এই ভাবনা কি তোমার রক্তের সঙ্গে মিশে তোমার শিরায় শিরায় প্রবাহিত হচ্ছে ? এই

ভাবনা কি তোমায় পাগল করে তুলেছে? দেশের দুর্দশার চিন্তায় বিভোর হয়ে কি তুমি নাম-যশ, স্ত্রী-পুত্র, বিষয়-সম্পত্তি, এমন কি শরীর পর্যন্ত ভুলেছ? তবে বুঝবো' তুমি দেশ-সেবার প্রথম সোপানে পা' দিয়েছ!" বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে স্বদেশ সেবাব্রতের অগ্নিপরীক্ষার আরও সর্ত আছে। তিনি আরও জিজ্ঞেস করেছেন কে সেই 'আদর্শবাদী হওয়ার অধিকারী যিনি 'নিন্দা-স্তবে বিচলিত হন না, মৃত্যুকে পর্যন্ত গ্রাহ্য' করেন না?

বিবেকানন্দ ডেকে বলেছেন তাঁর সেই কল্পনার আদর্শ-বাদীকে: "জগৎ যদি তরবারী হাতে নিয়ে দাঁড়ায় তোমার বিরুদ্ধে! তবুও কি যা' সত্য বলে মনে করেছ তাই অনুসরণ করতে পারবে? যদি স্ত্রী-পুত্র তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়? ধনমান সব যায়! তবুও কি সত্যকে ধরে থাকতে পারবে?"

নেতাজীই বিবেকানন্দের এই কল্পাশ্রয়ী আদর্শবাদীর অগ্নি-ভাস্বর স্বাক্ষর। যেদিন থেকে তিনি আই-সি-এস ত্যাগ করেছেন সেই দিন থেকেই সুরু হয়েছে সুভাষচন্দ্রের আপোষ-রফাহীন অগ্নিহোত্রীর অভিযাত্রা। এমন আদর্শচারী বীর, বিপ্লবী ও দুঃসাহসী অভিযাত্রীর জীবনকাহিনী বোধ হয়—পৃথিবীর ইতিহাসে কদাচ সৃষ্টি হয়েছে। বিবেকানন্দের প্রচণ্ড প্রাণশক্তি, তাঁর অনভিব্যক্ত বিপ্লবী জীবন যেন পূর্ণ সার্থকতায় প্রমূর্ত হয়ে উঠেছে নেতাজীর মধ্যে। নেতাজীর সারাজীবনের মহাকাব্যে একথা প্রতিপর্বে বারবার বাস্তব ঘটনায় ধ্বনিত হয়ে উঠেছে: "এ ঘর জগতে সব বিনাশ হয়ে যায়,—যাবেও। কিন্তু বিনাশ নেই স্বপ্ন, আদর্শ ও মনীষার। আদর্শের সাধনায় ব্যক্তি বিলীন হতে পারে কিন্তু তার অবলুপ্তির পরে আদর্শ পুনঃমূর্ত হয়ে ওঠে সহস্র আত্মায়। এই আত্মার ধর্ম, ব্যক্তি আত্মাহুতি দেবে জাতিকে বাঁচাবার জন্য। আজ আমি প্রাণ অর্পণ করব—যেন ভারত বেঁচে উঠতে পারে, লাভ করতে পারে গৌরবময় মুক্তি।" এমন জীবন-মৃত্যুর নিত্যছন্দে সঞ্চারিত হয়েছে নেতাজীর জীবনধারা। অভীমন্ত্রী জীবনব্রতের যে যাত্রা সুরু হয়েছে নেতাজীর আজো হয়তো তার শেষ হয় নি। মুক্তির সাধনায় আজও হয়তো নিমগ্ন রয়েছেন অনাম লগ্নের যাত্রী ভারত-পথিক।

বিবেকানন্দের ভারতপ্রেমের পরিচয় দিয়ে ভগ্নী নিবেদিতা বলেছেন:

"The queen of his adoration was his motherland. There was not a cry within her shores that did not find in him a responsive echo." নেতাজীর কাছেও জন্মভূমি তাঁর সমস্ত স্বপ্ন ও সাধনার প্রতীক এবং নিজেই সেকথা ব্যক্ত করে বলেছেন: "এই আদর্শই আমার জীবনের জপ-তপ ও ধ্যান-জ্ঞান—আমার সাধনা ও মুক্তির সোপান।" কি করে ভারতের বুকে দেশ-প্রেমের আদর্শ গড়ে তুলতে হবে সে সম্বন্ধে বিবেকানন্দ বলেছেন, "লেকচার করে এদেশে কিছু হবে না। পচা পুরানো লোহার উপরে হাতুড়ির ঘা মারলে কি হবে? ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যাবে; তাকে পুড়িয়ে লাল করতে হবে, তবে হাতুড়ির ঘা মেরে একটা গড়ন করতে পারা যাবে। এদেশে জলন্ত জীবন্ত উদাহরণ না দেখালে কিছুই হবে না।" স্বামীজীর সেই ভারত-প্রেমের জীবন্ত জলন্ত জ্যোতির্ময় আদর্শ পুরুষ হলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র!

বৈরাগ্যিক সন্ন্যাসী হয়েও বিবেকানন্দ বিপ্লবী। তাই ভারতের প্রচলিত প্রমূল্যকে নতুন করে সাজাতে তিনি দ্বিধা বোধ করেন নি। সন্ন্যাসী হয়েও সন্ন্যাস ধর্মের নৈষ্কর্ম্যবাদকে রূপান্তরিত করেছেন প্রবল কর্মবাদে, বর্ণাশ্রমকে পুনর্গঠনের আহ্বান জানিয়েছেন আধুনিক মানবতাবাদী সাম্যবাদের অবদানে। বঞ্চিত নারী ও শূদ্র সমাজের সামনে তুলে ধরেছেন উচ্চতর অধিকারের স্বীকৃতি, বিজ্ঞানকে ডেকে এনেছেন ধর্মের পাশে, জীবকে স্থান দিয়েছেন শিবের আসনে,—এমনি অদ্ভুত বৈপ্লবিক দৃঢ়তায় তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন জীবশিববাদ। সুভাষচন্দ্রও বিবেকানন্দের মতই এমনি বিপ্লবী। তিনিও

কোন বাধা কোন বন্ধনকেই গ্রাহ্য করেন নি। গান্ধীজীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা সত্ত্বেও তিনি গান্ধীবাদের আপোষরফানীতির বিরোধিতা করতে দ্বিধাবোধ করেন নি। বিবেকানন্দ বলেছেন, 'তিনি শুধু সংস্কারক নন তিনি আমূল রূপান্তর প্রয়াসী।' নেতাজীর কণ্ঠেও উঠেছে একই বৈপ্লবিক দৃষ্টি-ভঙ্গীর বলিষ্ঠ প্রতিধ্বনি, "আমরা যা চাই সে হলো আমূল পরিবর্তন—নিছক সংস্কার নয়। আমাদের ব্যক্তি ও সমষ্টি-গত জীবনে পূর্ণ রূপান্তর চাই - চাই পরিপূর্ণ বিপ্লব সাধন।"

গান্ধীজী ও নেতাজী শুধু বিপ্লবী নন,—তাঁরা শক্তিবাদী বিপ্লবী। বিবেকানন্দ ভারতের ইতিহাস গভীরভাবে পর্যা-লোচনা করেছেন। দীর্ঘদিনের অহিংসা ও শান্তির নামে ভারতীয় জীবনে এসেছে এক নিষ্ক্রিয়তাবাদী প্রবণতা। মুখে শান্তি ও অহিংসার কথা, আসলে এ হলো বড় কথার নামে নিষ্কর্ম অবসাদের আবরণ। স্বামীজী চেয়েছেন গোটা ভারতবর্ষের বুকে এক মহন সৃষ্টি করে একটি প্রচণ্ড শক্তির অভ্যুদয়। তিনি অনুভব করেছেন বহু শতাব্দী ভরে চলতে চলতে ভারতের প্রাণধর্ম সংস্কার, আচার আর নিষ্কর্ম বৈরাগ্যের নামে স্থবির হয়ে একেবারে জড়বৎ হয়ে গেছে। ভারতের এই জমাট জীবনকে গলিয়ে প্রবল প্রাণ প্রবাহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তিনি চেয়েছেন দুর্বার কর্মবাদী জীবনধর্ম। তাই তিনি বলেছেন, "অহিংসা ঠিক, নির্বৈর বড় কথা। কথা তো বেশ, শাস্ত্র বলছেন, তুমি সেরূপ তোমার পানে এক চড় যদি কেউ মারে, তাকে দশ চড় যদি না ফিরিয়ে দাও, তুমি পাপ করবে। হত্যা করতে এসেছে, এমন ব্রাহ্মণ বধেও পাপ নেই। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা - বীর্য প্রকাশ কর, সাম, দান ভেদ, দণ্ডনীতি প্রকাশ কর, পৃথিবী ভোগ কর, তবে তুমি ধার্মিক। আর কাঁচা লাথি খেয়ে চুপটি করে ঘৃণিত-জীবন যাপন করলে ইহকালেও নরকভোগ, পরকালেও তাই।" মরাহাড়ে প্রাণ খেলাবার মন্ত্র এমনি ওজস্বী, অগ্নিময়ী বাণী শুনিয়েছেন বিবেকানন্দ। আরেক জায়গায় শান্তিবাদী এবং অহিংসাবাদীদের স্বামীজী জিজ্ঞেস করেছেন, "সুখদুঃখের পারে কর্মহীন শান্তরূপ-সব অবস্থায় আমরা আছি, কি প্রাণ-হীন জড়প্রাণ শক্তির অভাবে ক্রিয়াহীন মহাতামসিক অবস্থায় পড়ে চুপ করে ধীরে ধীরে পচে যাচ্ছি,—এ কথার জবাব দাও।' শান্তিবাদের নামে অকর্মণ্য নিষ্ক্রিয়তাবৃত্তির উপরে চাবুক চালিয়ে বিবেকানন্দ বলছেন, "ঐ যে মিনমিনে পিন-পিনে চোক গিলে গিলে কথা কয়, ছেড়াকাতা, সাতদিন উপবাসীর মত সরু আওয়াজ, সাত-চড়ে কথা কয় না, ওগুলো হচ্ছে তমোগুণ, ওগুলো মৃত্যুর চিহ্ন, ও সঙ্গল নয়,—ও পচা দুর্গন্ধ। ঐ জৈন বৌদ্ধ প্রভৃতির পাল্লায় পড়ে আমরা ঐ তমোগুণের দলে পড়েছি—দেশশুদ্ধ কই 'হরি' বলছি, ভগবানকে ডাকছি ভগবান শুনছেন না, আজ হাজার বৎসর। শুনবেনই বা কেন, আহাম্মকের কথা মানুষই শোনে না,—তা' ভগবান। এখন উপায় হচ্ছে ঐ ভগবদ্বাক্য শোনা, 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ'—তস্মাত্তমুত্তিষ্ঠ-যশো লভস্ব।"

নেতাজীও বিবেকানন্দের দৃষ্টি দিয়েই বিশ্লেষণ করেছেন ভারতের বহু শতাব্দীর ইতিহাস। তিনিও লক্ষ্য করেছেন যে বৌদ্ধধর্মের আতিশয্যময় অহিংসা ও শান্তিবাদ ভারতের জাতীয় জীবনে সৃষ্টি করেছে ধর্মের নামে নিষ্ক্রিয়তাবাদ। নেতাজী তাই বলেছেন, "বৈষয়িক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতের পতনের কারণ কি? অলৌকিকতা ও ভাগ্যবাদের উপরে তার অন্ধ বিশ্বাস, বিগত দিনের শান্তিবাদী সন্তোষ এবং অহিংসা তত্ত্বের উপরে মাত্রাহীন অবস্থা।" নেতাজী তাই মনীষী রোঁলাকে বলেন "I have decided that non-violence cannot be the central pivot of our entire social activity" এমন হিংসা-অহিংসার মূল্য বিচারে আতিশয্যমূলক গুরুত্ব না দিয়ে স্বভাব চেয়েছেন একটি প্রবল বলিষ্ঠ কর্মবাদী দর্শন। একদিকে অহিংসাতত্ত্বের আতিশয্য দেখে এবং অন্যদিকে নিষ্কর্ম আত্মবাদের গতি লক্ষ্য করে নেতাজী বলেন : "It is the passivism, not

philosophic but actual, inculcated by these school of thought against which I protest" সমন্বয়বতী আশ্রমের একান্ত অহিংসাত্তর এবং পণ্ডিচারীর নির্দ্বন্দ্ব সাধনার পরিবর্তে একটি যুগধর্মী জীবন-দর্শনের সন্ধানে নেতাজী বলেছেন: "এ যুগের প্রয়োজন একটি কর্মবাদের দর্শন—a philosophy of activism"

বিবেকানন্দ অত্যন্ত দৃঢ় কণ্ঠে বলেছেন, "আমাদের এখন দরকার শক্তি সঞ্চার। এখন চাই লোহার মত পেশী, বজ্রের মত স্নায়ু। অনেক দিন ধরে কেঁদেছি, এখন আর কাঁদবার প্রয়োজন নেই। এখন আমাদের এমন মতবাদের প্রয়োজন যা আমাদের মানুষ করতে পারে। মানুষ চাই, মানুষ চাই! বীর্যবান্, তেজস্বী, সম্পূর্ণ অকপট বিশ্বাসী যুবক চাই। অভী! যদি জগৎকে কোনধর্ম শিখাতে হয়, তবে তা হল এই অভীমন্ত্র। বৈষয়িক, আধ্যাত্মিক—সব ক্ষেত্রেই এই 'অভী'।" বিবেকানন্দের এই অভীমন্ত্রের উদ্গীতিই সুভাষকে দিয়েছে বিপ্লববাদের দীক্ষা। ভারতীয় জাতীয় সংগ্রামের ক্ষেত্রে একান্ত অহিংসাবাদী গান্ধীবাদের সঙ্গে সুভাষের বিপ্লববাদের এখানেই সংঘাত সৃষ্টি হয়েছে। সুভাষ বাংলা ও ভারতের বিপ্লবীদের আপাগোড়া উৎসাহ দিয়েছেনে, কংগ্রেসে তিনি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠনের ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছেন এবং যেদিন তাঁর বিপ্লববাদী স্বপ্ন পূর্ণতা লাভ করেছে আজাদ হিন্দ বাহিনীর গঠনের মধ্যে তিনি সেদিনে আনন্দ উদ্বেল কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন: "আজ আমার জীবনের সবচেয়ে গর্বের দিন। আজ বিশ্বের কাছে ঘোষণা করার সুযোগ পেয়েছি যে ভারতের মুক্তি ফৌজ গড়ে উঠেছে। আমি সারা জীবন একথা অনুভব করেছি, ভারত স্বাধীনতালাভের উপযোগী হলেও—সেই ভারতের একটি মুক্তি ফৌজ নেই, India's army of liberation." বস্তুত, নেতাজীর বিপ্লববাদী বিশ্বাসের মূল উৎস বিবেকানন্দের অগ্নিগর্ভী শক্তিবাদ।

বিবেকানন্দ বলেছেন, ভারতের একটি বাণী আছে। নেতাজীও সেকথার প্রতিধ্বনি করে বলেছেন যে "ভারতের একটি বাণী যা বিশ্বকে শুনাতে হবে।" ভারতের এই বাণী হলো সমন্বয়ের বাণী। এযুগে এই সমন্বয়ের বাণী শুনিয়েছেন বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দ এই সমন্বয়ের বাণী লাভ করেছেন ভারতীয় ইতিহাসের গঙ্গা প্রবাহ থেকে। যুগে যুগে বিভিন্ন প্রমূল্যের সমন্বয় সাধন করে এগিয়ে চলেছে ভারতবর্ষ। বিবেকানন্দ একদিকে আপেক্ষিকতাবাদী, তেমনি তিনি বিশ্বাসী বিবর্তনবাদে। তাই স্বামীজী বলেছেন সব সত্যই আপেক্ষিক সত্য,- কাল ও পাত্রের উপরে নির্ভরশীল। সত্যের নিত্যসত্তা অনুভব করা বা প্রকাশ করা সম্ভব নয়,—যে সত্য মানুষ অনুভব করে তা আপেক্ষিক, বিবেকানন্দের ভাষায় "যা কিছু সত্য বলে জানি বা জানব তা সবই আপেক্ষিক সত্য – রিলেটিভ টুথ। অ্যাবসলুট সত্যের ধারণা আমাদের সীমাবদ্ধ মন ও বুদ্ধির অগম্য।" সত্যের প্রকৃতি সন্ধানে নেতাজীর অনুভূতিও স্বামীজীর অনুরূপ। নেতাজী যেন স্বামীজীর এই কথার অধিকল্প প্রতিধ্বনি করে বলেছেন: "যে সত্যকে আমরা জানি তা নিত্য বা অ্যাবসলুট নয়, আপেক্ষিক বা রিলেটিভ। আমাদের মানসিক গঠন ও ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যের উপরে তা নির্ভরশীল।" স্বামীজী ও নেতাজী দুজনেই বিবর্তন-বাদে বিশ্বাসী, উভয়েই সমস্বরে বলেছেন যে কোন কিছুরই শেষ কথা বলে কিছু নেই।

ভারতীয় ইতিহাসের শিক্ষা, সত্যের আপেক্ষিকতাধর্ম ও বিবর্তনবাদ,—এই ত্রয়ী সূত্রের অবদানে গড়ে উঠেছে বিবেকানন্দের সমন্বয়বাদী জীবনদর্শন। বিবেকানন্দ তাই একান্তবাদী নন,—তিনি বহুপ্রমূল্যের অবদানে জীবনদর্শন রচনার প্রয়াসী। আধ্যাত্মধর্ম ভারতের প্রাণ,—কিন্তু তাই বলে বস্তুধর্মকেও তিনি অস্বীকার করতে বলেননি। অ্যাস্তবাদের সঙ্গে ঐহিকতার, ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের, প্রাচীনের সঙ্গে আধুনিকতার, প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের,

জাতীয়তার সঙ্গে বিশ্বজনীনতার,—এমনি বিভিন্ন প্রমূল্যের সমন্বয় সাধন করে যুগধর্মী বলিষ্ঠ-জীবনবাদ রচনার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি এযুগের ভারতবর্ষকে। বিবেকানন্দের এই সমন্বয়ী আদর্শকে নেতাজীও গ্রহণ করেছেন নিজের জীবনাদর্শরূপে। এই সমন্বয়বাদের কথা বলতে গিয়ে নেতাজী বলেছেন "This Synthesis is called 'Samyavad'—an Indian word, which literally means the doctrine of Syathesis or Equality. It will be India's task to work out this Synthesis." এই কথাটিই নেতাজীও বিভিন্নভাবে ব্যক্ত করে বলেছেন, "ভারতের ইতিহাসে সেই দিনই ছিল গৌরবময় যুগ যখন জড় ও চেতন, দেহ ও আত্মার স্বর্গে সামঞ্জস্য বিধান হয়েছিল এবং দুদিকেই প্রগতি সম্ভব হয়েছিল। দেহ ও আত্মার গভীর সম্বন্ধের ফলে দেহের উপেক্ষা তবু জাতির দেহকেই দুর্বল করে না, কাল-স্রোতে জাতির আত্মাকেও দুর্বল করে দেয়। যদি আমাদের নতুন করে গড়ে উঠতে হয় তা' হলে দুদিকেই এগিয়ে যেতে হবে।" তিনি আরও বলেছেন "আমাদের প্রাচীন কৃষ্টি ও সভ্যতার উপরে একটি নতুন ও আধুনিক জাতি গড়ে তুলতে হবে।" দেহের সঙ্গে আত্মার, অতীতের সঙ্গে বর্তমানের, প্রাচীনের সঙ্গে আধুনিকতার, জাতীয়তার সঙ্গে বিশ্বজনীনতার,—এমনি বিভিন্ন প্রমূল্যের সচেতন সমন্বয়ে গড়ে তুলতে হবে আজকের ভারতীয় জীবন-বাদ। বিবেকানন্দের সেই মর্মবাণীকে যুগধর্মী ভাষায় ব্যক্ত করে নেতাজী বলেছেন: The vision of free India is a perfect Synthesis of all that is good in the East and in the West."

বিলেতে বহু সোস্যালিষ্ট আসতেন স্বামীজীর কাছে এবং স্বামীজীই বোধ হয় ভারতের যুগপ্রবর্তক সর্বপ্রথম নেতা যিনি সগর্বে ঘোষণা করে বলেছেন—"আমি একজন সমাজবাদী I am a Socialist"; কিন্তু বিবেকানন্দের এই সমাজবাদের উৎস কোথায়? অদ্বৈতদর্শন অনুসারী স্বামীজীর শাস্ত্রে স্বামীজী সমাজবাদী জীবনদর্শনের সন্ধান পান নি, তিনি সমাজবাদের মূল ভিত্তি খুঁজে পেয়েছেন ভারতীয় আধ্যাত্মবাদের ঐক্যানুভূতিতে। সব মানুষই এক,—এই সমন্বয়বোধ থেকেই বিবেকানন্দের অন্তরে উৎসারিত হয়েছে গভীর মানবতাবোধ। ভারতের বর্ণাশ্রম ধর্মের বিবর্তনের ইতিহাস বিশ্লেষণ করে তিনি বলেছেন, "ভারতে যুগে যুগে ব্রাহ্মণ্য ও ক্ষত্রিয় শক্তির সংঘাত ঘটেছে এবং এযুগে গড়ে উঠেছে বৈশ্য শক্তির আধিপত্য,—কিন্তু আগামী যুগ হবে শূদ্র শক্তির। দীন-দরিদ্র নিপীড়িত মানবতার জন্য কী গভীর মমত্ববোধ ছিল এই বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর! নিম্নবর্গদের দুঃখ দেখে এক সময় তিনি বলেছেন "আমি যদি নীচ চণ্ডাল হয়ে জন্মাতাম তা হলে আমার বেশি আনন্দ হত।" যারা কাজের গর্ব করে মানের বড়াই করে তাদের ধমকে দিয়ে স্বামীজী বলেন যে কাজই হোক না কেন সব কাজই সমান। স্বামীজীর ভাষায়, "তুমি না হয় একটা দেশ শাসন করতে পার, আমি একজোড়া ছেঁড়া জুতা সারতে পারি। কিন্তু তাই বলে তুমি আমার বড় হতে পার না। আমি জুতা সেলাইয়ে পটু, তুমি বেদপাঠে—এই কর্ম ভাগ স্বাভাবিক।" কী প্রবল অনুভূতিতে তিনি বারবার বলেছেন ভারতের জনসাধারণের কথা: "এই যারা চাষাভুষা তাঁতি জোলা ভারতের নগণ্য মানুষ, তারাই আবহমান কাল নীরবে কাজ করে যাচ্ছে, তাদের পরিশ্রমের ফলও তারা পাচ্ছে না। কিন্তু ধীরে ধীরে প্রাকৃতিক নিয়মে দুনিয়ার কত পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। দেশ সভ্যতা, প্রাধান্য সব উলট পালট হয়ে যাচ্ছে।—তোমাদের পিতৃপুরুষ দুখানা দর্শন লিখেছেন, দশখানা কাব্য বানিয়েছেন, দশটা মন্দির করেছেন—তোমাদের তাকের চোটে পালন কাঁদছে। আর যাদের রক্তের স্রোতে মনুষ্য জাতির যা কিছু উন্নতি—তাদের গুণগান কে করে? লোকজয়ী ধর্মবীর, কর্মবীর, কাব্যবীর সকলের চোখের উপর, সকলের পূজা, কিন্তু কেউ যেখানে

দেখে না, কেউ যেখানে একটা বাহবা দেয় না, যেখানে সকলে ঘৃণা করে—সেখানে বাস করে অপার সহিষ্ণুতা, অনন্ত প্রীতি, ও নির্ভীক কার্যকারিতা। আমাদের গরীবরা ঘর-দুয়ারে দিনরাত যে মুখবুজে কর্তব্য করে যাচ্ছে, তাতে কি বীরত্ব নেই?"

হাঁ, বীরত্ব আছে, এবং এই বীরত্বের জন্যই ভবিষ্যত ভারত পদদলিত গরীবদের। ভারতের উচ্চবর্ণদের তীব্র তিরস্কার করে স্বামীজী এদের আখ্যা দিয়েছেন 'চলমান শ্মশান' বলে। ভবিষ্যত ভারত, মানবতাধর্মী সমাজবাদী ভারত, জনতার নব-ভারতের স্বপ্ন দেখে বিবেকানন্দ উচ্চ-বর্ণদের বিলুপ্তির আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি উদাত্ত কণ্ঠে বলেছেন: "ভারতের উচ্চবর্ণেরা—তোমরা মুছে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক! বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে, মালী, মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড়, জঙ্গল, পাহাড়, পর্বত থেকে। এরা সহস্র-সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে,—তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা, পেয়েছে অটল জীবনী-শক্তি। এরা এক মুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উলটে দিতে পারে। আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরে না। এরা রক্তবীজের প্রাণ সম্পন্ন,·· এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যত ভারত। তোমার যেই বিলীন হওয়া, অমনি শুনবে কোটি-জিমূ-স্তম্ভ নন্দী ত্রৈলোক্যকম্পনকারী ভবিষ্যত ভারতের উদ্বোধন ধ্বনি—'ওয়াহ গুরু কি ফতে'।"

বিবেকানন্দের এই গভীর মানবতাবাদ নেতাজীকেও দিয়েছে সমাজবাদের দীক্ষা। সমাজবাদকে জীবনদর্শনরূপে গ্রহণ করেও মার্ক্সবাদী সমাজবাদের অনুসারীদের সতর্ক করে দিয়ে সুভাষ বলেছেন "এই সমাজবাদ কার্লমার্কসের পুঁথির পাতায় জন্মায় নি। এর উৎপত্তি ভারতের চিন্তা ও সংস্কৃতির-মধ্যে। স্বামী বিবেকানন্দ যে সমতন্ত্রের প্রচার করেছেন তাঁর মূল কথা এই যে দরিদ্রের মধ্যেই নারায়ণ বাস করেন।" সুভাষ ভারতীয় সমাজবাদের মূল নীতি ও আদর্শের কথা ব্যক্ত করে আরও বলেছেন, "আজকাল সমাজবাদের নতুন চিন্তা-ধারা পশ্চিম থেকে ভারতে প্রবেশ করেছে। কিন্তু সমাজ-বাদের আদর্শ আমাদের দেশে নতুন নয়।" নেতাজী সর্বান্তঃ-করণে সমাজবাদী আদর্শে বিশ্বাসী, কিন্তু তিনি এই বিশ্বাস অর্জন করেছেন মার্ক্সের কম্যুনিষ্ট মতবাদ থেকে নয়,—বিবেকানন্দের আধ্যাত্মধর্মী মানবতাবাদের উৎসেই সুভাষচন্দ্রের সমাজবাদী ভাবধারার জন্ম। সুভাষ সমন্বয়বাদী বলে মানব সভ্যতার ইতিহাস ও প্রবৃত্তি বিশ্লেষণে বহুবাদী, তথা আধুনিক সমাজতন্ত্রের সংজ্ঞায় 'প্লুর‍্যালিষ্ট'। তিনি মার্ক্সবাদের একবাদী জড়দর্শনকে অভ্রান্ত সত্য বলে গ্রহণ করেন নি বলেই সোস্যা-লিজমকে তিনি কম্যুনিজম থেকে আলাদা করে দেখেছেন এবং তিনি মার্ক্সবাদীদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, "প্রগতির জন্য রাশার দিকে চেয়ে থাকা আমাদের আহাম্মুকী হবে। আমাদের নিজস্ব আদর্শ ও প্রয়োজন অনুযায়ী আমাদের সমাজ আমরাই গড়ে তুলব। আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই যে অন্যদেশের আদর্শ বা সমাজব্যবস্থাকে অন্ধভাবে অনুকরণ করার আমি ঘোর বিরোধী।" যারা সোস্যালিজমের সমার্থে কম্যুনিজমের মতবাদ চালিয়ে দিতে চান তাদের লক্ষ্য করে নেতাজী বলেছেন: "আমাদের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে ভারত ও বিশ্বের মুক্তি নির্ভর করছে সমাজবাদের উপর। কিন্তু ভারত একটি নিজস্ব সমাজবাদের রূপ ও পদ্ধতি নিজেই গড়ে তুলবে।" সমন্বয়ী জীবন-দর্শনের আলম্বনে ভারতের এই আধ্যাত্মধর্মী মানবতাবাদী সোস্যালিজমের আদর্শ যে মানব সমাজের সামনে এক নতুন জীবনবাদের আলোক বর্তিকা তুলে ধরবে সে আশা প্রকাশ করে নেতাজী আবার বলেছেন: "ভারত রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রগতির পরবর্তী পর্বে এগিয়ে যাবে।" এই পরবর্তী পর্ব হলো কম্যুনিজমের পরের অধ্যায়ের প্রগতি। জড়বাদী কম্যুনিজম যেখানে

মানবসত্তাকে রাষ্ট্রসত্তার মধ্যে সংকুচিত করে মানুষের আত্মাকে নিষ্পেষিত করার উপক্রম করেছে নেতাজী সেখানে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন বিবেকানন্দের সমধর্মধর্মী মানবতাবাদী সোস্যালিজম। এই মানবতাবাদী সোস্যালিজমই গান্ধীজী-নেতাজী প্রকল্পিত এযুগের ভারত-বাণী!

বিবেকানন্দ কর্মবাদের আমদানে প্রবল মানবতাবাদী হয়েও অন্তিম পরিচয়ে পরিব্রাজক, অনন্তের সন্ধানে চিরন্তনের অভিযাত্রী। তেমনি, স্বভাব রাজনৈতিক বিপ্লবী হয়েও ভারত-পথিক—চিরকালের 'মিষ্টিক', অজানার নিরন্তর অভিসারী।

দিল্লী চলো

রমেন্দ্র লাল রায়

হিমালয়ের প্রশস্তি ভাস্কর।
যুগ যুগান্তরের ধ্যানমগ্ন শুভ্র পাষাণে
রক্ষিত হল স্বাধীনতা-রক্ষার দুর্জয় সঙ্কল্পের
অকলঙ্ক রক্তচিহ্ন।
উত্তরগিরির চূড়ায় চূড়ায় অরণ্যকন্দর উপত্যকায়
প্রতিধ্বনি তোলে বারবার
ক্ষাত্রশৌর্যের প্রচণ্ড রণহুঙ্কার,—
জয় হিন্দ! জয় হিন্দ!

বর্ষাবুদ্ধের প্রলয়গর্জনে বাজল কি ফের
মুক্ত-পাগল আজাদ হিন্দ ফৌজের কণ্ঠস্বর?
মন্ত্রিত হল কি আসমুদ্রহিমাচলে
সেই উদাত্ত আহ্বান,—
শোণিত-দানের মহান আহ্বান।

এ-কি নয় আত্মপ্রকাশের পরম মুহূর্ত,
নেতাজীর সংগ্রাম সাধনার সেই দীপ্ত সূর্যোদয়?

মহাকালের চঞ্চল বিবর্তনে
ঘাদুনয় কুরুক্ষেত্র, ইন্দ্রপ্রস্থ;
হিমাদ্রি-শিখরে তাই বেজেছে যখন রুদ্র-বিষাণ,
উঠেছে যখন ভৈরবের স্নিগ্ধ-হিল্লোল,
দুয়ারে কীর্ণ যখন দেবতাত্মার প্রলয়ামৃত,—
উদ্বুদ্ধ, সংহত, দীক্ষিত হল তখন
অগ্নিবীণার রুদ্র ঝঙ্কারে
নবপ্রভাতের লক্ষণ ও জোয়ান,—দুর্বার সংসপ্তক
দিল্লী-চলো দিল্লী-চলো—পুণ্যমন্ত্রের
শাশ্বত অভয়-সন্ধানে।

উনিশ শতকের বাংলা ও স্বামিজী

ত্রিপুরাশঙ্কর সেন

সংসারে আমরা যাঁহাদিগকে লোকোত্তর পুরুষ বলি, তাঁহারা যুগের প্রতিনিধি হইয়াও যুগকে অতিক্রম করেন। যুগ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাঁহাদিগকে দেখিতে গেলে তাঁহাদের যথার্থ পরিচয়টি পাওয়া যায় না। উনিশ শতকে বিরুদ্ধ ভাবাদর্শের সংঘাতে বাঙালীর চিত্ত দ্বিধাবিভক্ত হইয়াছে, বাঙালী কখনও অতিসখ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, কখনওবা বিপরীতমুখী আদর্শের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করিয়াছে। সংশয়বাদ, অজ্ঞেয়বাদ, হিতবাদ, কোঁতের প্রত্যক্ষবাদ ও মানবতা-বাদ, অভিব্যক্তিবাদ প্রভৃতি নানা মতবাদের তরঙ্গ আসিয়া পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালী যুবকের চিত্ততটে আঘাত করিয়াছে এবং তাহাদিগকে বিভ্রান্ত ও দিশাহারা করিয়া তুলিয়াছে। উনিশ শতকের ধর্মান্দোলনের ধারাও ছিল বিচিত্র। 'ব্রাহ্ম সমাজের' প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহনের সঙ্গে 'ব্রাহ্মধর্মের' প্রবর্তক দেবেন্দ্রনাথের সর্বাংশে মতের ঐক্য ছিল না, আবার মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেও কেশবচন্দ্র মধু-লুব্ধ ভৃঙ্গের ন্যায় নানা পুষ্প হইতে মধু আহরণ করিয়া এক নূতন মধুচক্র নির্মাণ করিয়াছিলেন। নব্য হিন্দুধর্মের যাঁহারা প্রচারক, তাঁহাদের মধ্যেও মতের সাম্য ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র 'ধর্ম' বলিতে বুঝিতেন সর্ববৃত্তির অনুশীলন ও ঈশ্বরমুখীনতা, তিনি ডারুইন, মিল্, কোম্‌টে, স্পেন্সার, ম্যাথু আর্নল্ড ও সিলীর সঙ্গে ভগবদ্ গীতা ও বিষ্ণু-পুরাণের সমন্বয়-সাধনে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। 'কাব্যত্রয়ীর' রচয়িতা নবীনচন্দ্রও প্রচারকের ব্রতই গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি প্রধানত ভাবাবেগের দ্বারা পরিচালিত হইতেন। এইজন্য তাঁহার উপর পাশ্চাত্ত্য চিন্তার প্রভাব বিপুল হইলেও ভাগবতের বৃন্দাবন-লীলা ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রেমধর্ম তাঁহাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। ভূদেব ও চন্দ্রনাথ যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিলেও প্রধানত রক্ষণশীল ছিলেন। শশধর তর্কচূড়ামণির হিন্দুধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সেকালে অনেকের মনে কৌতূহলের সঞ্চার করিয়াছিল। কৃষ্ণানন্দ স্বামীর ওজস্বিনী বক্তৃতাবলী ও রচনাও অনেক তরুণের মন হইতে সংশয় ও শ্রদ্ধাহীনতা দূরীভূত করিয়াছিল। আবার বাংলার অনেক বরেণ্য সন্তান 'থিয়োসফি' আন্দোলনের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল।

কিন্তু উনিশ শতকের বাংলার ধর্ম-সাধনার ইতিহাসে সিদ্ধ পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সংশয়বাদী অথচ ধর্ম-জিজ্ঞাসু নরেন্দ্রনাথের মিলন একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। ধর্ম যে উপলব্ধির বস্তু, বিচার বিতর্কের বিষয় নহে, মেধা, পাণ্ডিত্য বা বহুশ্রুতত্বের দ্বারা যে অধ্যাত্ম জগতের সত্যসমূহ প্রত্যক্ষ করা যায় না, শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবে আমরা তাহা বুঝিয়াছিলাম। শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে নরেন্দ্রনাথের জীবনেও ধীরে ধীরে রূপান্তর ঘটিতেছিল। একজন তথা-কথিত নিরক্ষর ন্যাপা সাধক কি এক অদ্ভুত মন্ত্রবলে যুক্তিবাদী নরেন্দ্রনাথের সকল সংশয়, সকল জিজ্ঞাসার অবসান ঘটাইয়াছিল। তথাপি, এ কথা সত্য যে, স্বামী বিবেকানন্দের বহুমুখী কর্ম-প্রচেষ্টার মধ্যে এমন একটি প্রবল ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, যে ব্যক্তিত্ব কাহারও কাছে নতি স্বীকার করে নাই। স্বামিজীর চরিত্রের এই বলিষ্ঠ

পৌরুষই তাঁহার বক্তৃতা ও রচনাবলীর মধ্যে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে।

মনস্বী গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী 'স্বামী বিবেকানন্দ ও বাংলার উনবিংশ শতাব্দী' গ্রন্থে উনিশ শতকের ধর্মান্দোলনের পটভূমিকায় স্বামিজীর চিন্তাধারার আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার গ্রন্থ তথ্যবহুল ও মননশীলতার পরিচায়ক কিন্তু তাঁহার আলোচনা পূর্ণাঙ্গ নহে। তিনি দেখাইয়াছেন যে রাজা রামমোহন ও স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারার মধ্যে আপাত দৃষ্টিতে অনৈক্য থাকিলেও একটা গভীর ঐক্য আছে। স্বামিজীও রামমোহনের কাছে তাঁহার ঋণ স্বীকার করিয়াছেন এবং ইহাতে নিশ্চয়ই তাঁহার মাহাত্ম্য ক্ষুণ্ণ হয় নাই। আবার অনেক বিষয়ে স্বামিজীর চিন্তাধারার মধ্যে স্বাতন্ত্র্য ছিল, সেখানে তিনি ছিলেন একক ও অনন্য-সাধারণ। তথাপি একথা সত্য যে, যদি তিনি বাংলার নব জাগৃতির যুগে আবির্ভূত না হইতেন, তবে তিনি আর যাহাই হউন, স্বামী বিবেকানন্দ হইতে পারিতেন না।

আমাদের দেশে আধুনিক কালে উপনিষদ ও বেদান্ত-চর্চার সূত্রপাত করেন যুগ-মানব রামমোহন রায়। আচার্য্য শঙ্করের মায়াবাদ তিনি গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু শঙ্করের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল গভীর। বেদান্তের শাঙ্কর ভাষ্যও (শারীরক ভাষ্য) তাঁহার চিন্তাধারাকে যথেষ্ট প্রভাবিত করিয়াছিল। আমাদের দেশে পণ্ডিতসমাজের মধ্যে এই ধারণা প্রচলিত আছে যে উপনিষদ ও বেদান্তের আলোচনায় স্ত্রীর কোন অধিকার নাই, ইহাতে একমাত্র চতুর্থাশ্রমী অর্থাৎ সন্ন্যাসীরই অধিকার। রামমোহনের প্রতিপক্ষ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারও এই ধারণা পোষণ করিয়াছেন। কিন্তু রাজা রামমোহন বলিয়াছেন, মোক্ষশাস্ত্রের আলোচনায় শুধু সন্ন্যাসীর নহে, গৃহস্থেরও কল্যাণ হইয়া থাকে। তিনি অবশ্য এ ক্ষেত্রে কোন নূতন কথা বলেন নাই, আচার্য্য শঙ্করের উক্তিরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। রাজা রামমোহন ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের উল্লেখ পাইয়াছেন মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের নিম্নোক্ত শ্লোকে।

'ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞান-পরায়ণঃ।
যৎ যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ'॥

আচার্য্য শঙ্করের নির্গুণ ব্রহ্মবাদ বা মায়াবাদ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ গ্রহণ করেন নাই। আবার কেশবচন্দ্র ছিলেন প্রধানত ভক্ত, তিনি চালিত হইতেন, অন্তরের নির্দ্দেশে। তিনি ছিলেন 'অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত, 'নববিধান' তাঁহার ধর্মসাধনার পরিণত ফল। তাঁহার ভক্তিবিগলিত চিত্তে বহু সাধনার ধারা মিলিত হইয়াছিল, তাঁহার অনুগামী ভক্তগণও তাঁহারই প্রেরণায় বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রের প্রচারে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। সুতরাং আচার্য্য শঙ্করের বিচার-বিশ্লেষণের পথে তিনি অগ্রসর হন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র যে নব্য হিন্দুধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন, উহারও ভিত্তি ছিল মহাভারত ও পুরাণ, বেদান্ত নহে। কিন্তু স্বামিজী যে হিন্দুধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন, অদ্বৈত বেদান্তকেই উহার ভিত্তি বলা যায়। কেননা তিনি দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদকে ধর্ম সাধনার তিনটি ক্রমিক স্তর বলিয়া মনে করিয়াছেন। (Science and Philosophy of Religion). কিন্তু অদ্বৈত বেদান্তকে যে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া মানুষ অভ্যুদয়ও লাভ করিতে পারে, স্বামিজীই সর্ব্বপ্রথম সে কথা উচ্চ কণ্ঠে প্রচার করেন। তিনি বলেন, মানুষের অভ্যুদয়ের মূল আছে প্রচণ্ড বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ে। আর বেদান্তের 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই মহাবাক্য আমাদের মনে একটা প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস জাগাইয়া তোলে। প্রাচীন ধর্ম বলে—যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, সে নাস্তিক। কিন্তু নব্যধর্ম বলে—যে আত্মার মহিমায় বিশ্বাস করে না সেই নাস্তিক। স্বামিজী বলেন, ধর্ম মানুষকে বীর্য্যবান করে, ইহা কখনও দুর্ব্বলতার প্রশ্রয় দেয় না। স্বামিজী 'বিদ্যা' ও 'ধর্মের' যে সংজ্ঞা দিয়াছেন, উহারও মূল রহিয়াছে বেদান্তে। স্বামিজী বলিয়াছেন, মানুষের

মধ্যে যে পূর্ণতা বিদ্যমান, উহাকে প্রকাশ করার নামই শিক্ষা। আর মানুষের মধ্যে যে দেবত্ব আছে, উহার বিকাশসাধনের নাম ধর্ম। (Education is the manifestation of the perfection already in man. Religion is the manifestation of the divinity already in man).

আমরা দেখিতে পাইলাম স্বামিজী ছিলেন অভয়দাতা। বেদান্ত ও গীতার বাণী তাঁহার নিকট ছিল অভয়ের, আত্ম-প্রত্যয়ের, বীর্য্যের, পৌরুষের বাণী। তিনি বলেন—

"ভগবান বলিতেছেন,—'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ'। জগতে পাপ-তাপ নাই, রোগ-শোক নাই, যদি কিছু পাপ জগতে থাকে, তাহা 'ভয়'। যে কোন কার্য্য তোমার ভিতরে শক্তির উদ্রেক করিয়া দেয়, তাহাই পুণ্য; আর যাহা তোমার শরীর-মনকে দুর্ব্বল করে, তাহাই পাপ। দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ কর। 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ,' তুমি বীর, তোমার এ সাজে না।"

একটি কবিতায় স্বামিজী বলিয়াছেন—

'জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন,
ভয় কি তোমার সাজে।'

এই জন্য স্বামিজী সর্ব্বদা বলিতেন—কাহাকেও এ কথা বলিবে না যে তুমি ছোট, তুমি হীন অথবা তুমি জীবনে কিছুই করিতে পারিবে না। বরং বল—তুমি ভাল, তোমাকে আরও ভাল হইতে হইবে, তুমি বড়, তোমাকে আরও বড় হইতে হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণও বলিতেন—যে নিজেকে সর্ব্বদা পাপী মনে করে, সেই পাপী হইয়া যায়। ইহা বেদান্তেরই প্রতিধ্বনি—

'ব্রহ্মাভিমানী ব্রহ্মঃ স্যাৎ মুক্তো মুক্তাভিমান্যসি।
কিংবদন্তীতি সত্যেয়ং যা মতিঃ সা গতির্ভবেৎ।

উনিশ শতকে পাশ্চাত্য দেশ হইতে যে সকল বিপ্লবী চিন্তার স্রোত প্রবাহিত হইয়া আমাদের দেশের যুব চিত্তকে প্লাবিত করিয়াছিল, তন্মধ্যে ক্রম বিকাশবাদ বা অভিব্যক্তিবাদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গত শতাব্দীর স্মরণীয় বাঙ্গালীদের কয়েক জনের চিন্তাধারা এই অভিব্যক্তিবাদের দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল, যেমন, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র। অগ্রোক্ত দশমহাবিদ্যা হেমচন্দ্রের নিকট মানব-সভ্যতার বিবর্তনের দশটি স্তরমাত্র, তিনি অভিব্যক্তিবাদের আলোকে কালী, তারা প্রভৃতির রূপ কল্পনা করিয়াছেন। (দশমহাবিদ্যা কাব্য।) আবার নবীনচন্দ্র দশাবতার-তত্ত্বের মধ্যে অভিব্যক্তিবাদ আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রাচীন কালের ভারতীয় ও গ্রীক পণ্ডিতগণের মনে ক্রমবিকাশবাদের ধারণা জাগিলেও ডারুইনই ইহাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি ও তাঁহার কয়েকজন শিষ্য ক্রমবিকাশের মূলে কোন চৈতন্যময় পুরুষের কর্তৃত্ব স্বীকার করেন নাই। এই জন্যই তাঁহার বিরুদ্ধবাদী পণ্ডিতেরা এক কালে তাঁহার নিন্দায় পঞ্চ মুখ হইয়া উঠিয়াছিলেন। স্বামিজীও এই অভিব্যক্তিবাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং উহার উপর বেদান্তের আলোকপাত করিয়াছিলেন। তিনি বলেন—Evolution মানিতে গেলে Involution ও মানিতে হয়। ক্রমবিকাশের ফলে এ্যামিবা বা প্রটোপ্ল্যাজম্ যদি পূর্ণমানব রূপে পরিণত হইতে পারে, তবে বুঝিতে হইবে যে এ্যামিবার মধ্যেও মনুষ্য প্রচ্ছন্ন ছিল। এখানেও তিনি আমাদিগকে আশার বাণী শুনাইয়াছেন। কি ভাবে সংসারে মানুষের আবির্ভাব হইল, স্বামিজীর কাছে সেটাই বড় কথা নয়, মানুষের মধ্যে কি বিপুল সম্ভাবনা লুকান আছে এবং মানুষ কিভাবে সেই সম্ভাবনাকে সার্থক করিয়া পূর্ণ মনুষ্যত্ব বা দেবত্ব লাভ করিতে পারেন, সেটাই আমাদের আসল জ্ঞাতব্য বিষয়। সেইজন্য 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই উপলব্ধিই মানুষের জীবনে চরম উপলব্ধি।

শিক্ষা প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ

সনৎকুমার রায় চৌধুরী

আধুনিক যুগে পরিবর্তনের স্রোতে তীব্রগতিতে আমরা অনিবার ভেসে চলেছি। অর্থ নৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক জীবনে দৈনন্দিন সংঘাতে আমাদের মন ও জীবন শতধা খণ্ডিত ও পীড়িত। অসংখ্য সমস্যায় জর্জরিত আধুনিক জীবনযাত্রা, বহির্জগতের বিচিত্র তরঙ্গ এসে আমাদের নিত্য বিক্ষুব্ধ ও অশান্ত করে তুলেছে। চিত্তে সরলতা ও প্রশান্তির আভাস নেই। যন্ত্ররাজের অনুশাসনে আমাদের জীবন ও মন পরিচালিত। জীবনের কোন স্থির লক্ষ্য ও মনের নির্মুক্ত দিগন্ত নেই। শ্রেয়োদীপ্ত আদর্শে অনুপ্রাণিত মন ও বল-বীর্যবান দেহ ছাড়া ব্যক্তি অথবা জাতির জীবন কখনও অগ্রসর হতে পারে না। মানসিক ও কায়িক সকল প্রকার দুর্বলতা আমাদের জাতীয় জীবনকে নানাভাবে গ্রাস করেছে। মেরুদণ্ডহীন দেহ, দৃঢ় সংকল্পহীন চিত্ত, দাসসুলভ মনোভাব আমাদের অসহায় জীবে পরিণতি করেছে। বাঁচবার জন্য চাই পেশীযুক্ত দেহ, অমিত বীর্য; চলবার জন্য প্রয়োজন সৎ প্রেরণা, আদর্শ উদ্বুদ্ধ জীবন।

সেদিন আমাদের দেশ পরাধীন, অর্থ নৈতিক নিষ্পেষণে নিষ্পীড়িত, সমাজের নীচের তলার লক্ষ লক্ষ মানুষ যুগযুগ অন্ধকারে পশুর মতো কালহরণ করছে। জীবনের সকল পথ প্রায় অবরুদ্ধ। বিপুল প্রাণস্পন্দন নিয়ে বন্যার মতো স্বামী বিবেকানন্দ সারা দেশকে নাড়া দিলেন, ত্যাগ ও অন্তঃ মন্ত্রে হাজার হাজার তরুণকে করলেন দীক্ষিত। স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য শত শত যুবক অগ্নিযজ্ঞে আত্মাহুতি দেবার সংকল্পে প্রস্তুত হলো। কিছু সংখ্যক সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন করে ভিক্ষু সন্ন্যাসীর ব্রতে আজীবন দেশ জাতি সমগ্র মানুষের কল্যাণের জন্য আত্মোৎসর্গ করলেন। স্বামী বিবেকানন্দ উপলব্ধি করেছিলেন যে ধর্ম, জ্ঞান, উপাসনা অথবা রাজনৈতিক সামাজিক জীবনে উন্নত শিরে অগ্রসর হতে হলে আমাদের প্রথম প্রয়োজন দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়, নির্ভীক চিত্ত ও অমেয় বীর্য। দীর্ঘপরাধীনতা শুধুমাত্র আমাদের রাজনৈতিক অর্থ নৈতিক জীবনকে আঘাত করেনি আমাদের আত্ম-বিশ্বাসের মূলগ্রন্থিকে ছেদন করেছে। এই দুর্বল, কাপুরুষ, হীন জাতির নিদ্রিত সত্তাকে জাগ্রত করবার জন্য স্বামী বিবেকানন্দের বজ্রভেরী আহিমাচল কুমারিকা পর্যন্ত সেদিন বেজে উঠেছিল।

আধুনিক পাশ্চাত্য মনীষীবৃন্দ বিশ্বাস করেন মানুষ মূলতঃ পশু জীবন থেকে ক্রমবিকাশের ধারায় বহু শতাব্দী ধরে জীবন সংগ্রামের পথে শ্রৌঢ়ত্ব ও শিক্ষা সংস্কার দ্বারা পরিমার্জিত হয়ে মনুষ্যত্ব লাভ করেছে। প্রকৃতি ও পরিবেশ, সামাজিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তার উপর নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করে তার জীবন ও মনকে রূপান্তর করছে। সামাজিক আবহাওয়া থেকে মুক্ত অথবা বিচ্ছিন্ন করে আমাদের কোন প্রাপ্ত বয়স্কের মনকে বিচার অথবা যাচাই করতে পারি না। "The adult human mind is the product of moulding influence exerted by the social environent" সেই জন্য তাদের অভিমত "The strictly individual human mind is an abstraction merely and has no real existence." (McDougall)। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষের দার্শনিকবৃন্দ মানুষকে কেন্দ্র করে বিশ্বচরাচরকে বিশ্লেষণ করেছেন। এই

বিষয়ে অবশ্য প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের সঙ্গে আমাদের চিন্তাধারার মৌলিক সাদৃশ্য রয়েছে। প্রোটাগোরাসের সেই বিখ্যাত উক্তি যথা "Man is the measure of all things, of those that are that they are, of those that are not they are not." এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। উপনিষদের ঘর্ষবাণী হোল জগৎ জড়ের স্তূপ নয়, বিশ্বচরাচর থেকে অণুপরমাণু সবকিছু চৈতন্যময়। প্রতিটি মানুষের অন্তরে আত্মা অথবা সমস্ত শক্তির আধার বিরাজ করছে। জড়তা, মোহ অন্ধকার দ্বারা সেই অন্তর্নিহিত শক্তি নিদ্রামগ্ন, সুপ্তিতে আচ্ছন্ন। জড়তা থেকে মুক্তি, অন্তরে চৈতন্যের জাগরণ, ভাগবত সত্তার ক্রমশঃ আত্মবিকাশ, এই হোল ধর্ম অথবা শিক্ষা জীবনের প্রধান লক্ষ্য। এদেশের ঋষিদের নিকট এই সত্য উদ্ঘাটিত হয়েছিল যে জড় থেকে জীবন, জীবন থেকে চৈতন্যলোকে ক্রমবিকাশ হয়নি বরং অনন্ত শাশ্বত বিশ্বচৈতন্যের আত্মবিকাশের ফলে জীবজগৎ সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের সবার ভিতর যে ভাগবত সত্তা ও আত্মশক্তি বিরাজ করছে তাকে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, ধ্যান ও অনুভবের ভিতর উপলব্ধি ও প্রকাশ করতে হবে। স্বামীজি ধর্মকে অনুবিশ্লেষণ করে বলছেন "The manifestation of the Divinity that is already in man." যখন ব্যক্তিমানস নিজের সত্তা সম্বন্ধে সচেতন হয় তখন তাঁর কাছে বিপুলা পৃথিবী করায়ত্ত, তাঁর কোন কামনা থাকে না, তিনি স্থিতপ্রজ্ঞঃ হয়ে নিরাসক্তভাবে বিচরণ করেন। ক্রমবিকাশের (Evolution) মূলে রয়েছে আত্মবিকাশ (Involution)। অন্তরনিহিত বীজ অঙ্কুরিত হয়ে ক্রমশঃ বিরাট বৃক্ষে রূপান্তরিত হয়েছে। যে ব্যক্তি আপন অন্তর থেকে মোহ, রাগ, ক্রোধ, বাসনা সকল প্রকার প্রবৃত্তিকে দমন করতে সক্ষম সেই জিতেন্দ্রিয়, নিরাসক্ত প্রাজ্ঞ পুরুষ মানবজীবনের পূর্ণতা অথবা শাশ্বত জীবনের অধিকারী হন। বুদ্ধদেব ঈশ্বর, আত্মা ও অনন্ত জীবন কিছুই স্বীকার করেন নি। তিনি আমাদের মতো বাস্তব চোখে দেখলেন যে পৃথিবী দুঃখ, বেদনা, শোক দ্বারা অভিভূত। দুঃখ থেকে মুক্তি অথবা বেদনার নিবৃত্তি পেতে হলে আমাদের অন্তর থেকে সকল বাসনা ও আসক্তি সমূলে বিনাশ করতে হবে। অন্তর শোধন, অরতি সাধনা, তীব্র বৈরাগ্যের ভিতর দিয়ে মনের খোলসগুলি ক্রমশঃ পরিবর্তন হয়ে যায়। স্বচ্ছ নির্মোহ দৃষ্টিতে প্রজ্ঞার আলো ফুটে ওঠে।

প্লেটো বলছেন শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হোল অন্তরের চোখকে প্রজ্ঞালোকের দিকে প্রয়োজিত করা। শিক্ষকের দায়িত্ব হচ্ছে ছাত্রের চোখের সম্মুখে সেই জ্ঞানের শিখা তুলে ধরা। ছাত্রের ভিতর যা কিছু মহত্ত্বের বীজ ও সম্ভাবনা নিহিত আছে তাকে ধীরে ধীরে সঞ্জীবিত ও উদ্বুদ্ধ করা হবে শিক্ষকের প্রধান কর্তব্য। মনোরম, রমণীয় দৃশ্য দর্শনে সৎকথা, সঙ্গীতের অমৃতধারা পান করে আমাদের হৃদয়কমলের দলগুলি উন্মুখ হয়ে স্মৃতি পথে ক্রমশঃ সত্তার আদিম পরিচয় প্রকাশিত হবে। বিস্মরণের অবসান হয়ে ক্রমশঃ সত্তার স্বরূপ হবে উদ্ঘাটিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের সান্নিধ্যে এসে একদিন নরেন্দ্রনাথের অন্তর্লোকের সকল দুয়ারের উন্মোচন হয়েছিল। তিনি উপলব্ধি করলেন অদ্বৈতবাদের মূলসূত্র সর্বভূতে ব্রহ্মানুভূতি অথবা জীব শিব অভেদাত্মা। নানা বন্ধনে আবদ্ধ, ঘোর তামসিকতায় আচ্ছন্ন, সুপ্ত চেতনাকে পুনর্জাগ্রত করবার উদ্দেশ্যে আচার্য শঙ্করের অদ্বৈত বেদান্তকে তিনি কর্মযোগে, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মাধ্যমে রূপায়িত করবার জন্য সমগ্র মানব জাতিকে আহ্বান করলেন। আমরা সিংহ শিশু হয়ে মেষের মতো বিচরণ করছি। তিনি বললেন বেদ-বেদান্ত মন্থন করে তিনি একটি অমৃত কুম্ভের সন্ধান পেয়েছেন তা হলো অভীঃ, নির্ভয় হবার মন্ত্র (কর্মযোগ)। দুর্বলতা হচ্ছে মহাপাপ, বীর্য ও নির্ভীকতা মর্মজীবনের প্রধান সোপান। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"। উপনিষদের

এই অমোঘ বাণী আমাদের এই শক্তিসাধনার দিকে নির্দেশ দেয়।

"Never forget the glory of human nature! We are the greatest God that ever was or ever will be. Christs and Buddhas are but waves on the boundless Ocean which I am."

(১৮৯৪ Thousad Island Parks একটি সাক্ষাৎকালে কথোপকথন :

সংসার পালনে, কর্মজীবনে রাজনৈতিক সংগ্রামে, দেশ জাতি জগদ্ধিতায় আত্মত্যাগ-সেবার মূলে রয়েছে এই শক্তি, সাহস, বীর্যের আলোতে উদ্বুদ্ধ হয়ে মৃত্যুকে বরণ করার দৃঢ় সংকল্প। শিক্ষার প্রধান ও প্রধান উদ্দেশ্য হবে আমাদের মনুষ্যত্ববোধকে জাগরিত করা। স্বাধীনতার আলোতে পূর্ণ-মর্যাদা নিয়ে মানুষের অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করার সংকল্পে আমাদের চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করা হবে আমাদের এক মহান ব্রত। স্বামী বিবেকানন্দ শিক্ষা সম্বন্ধে বলছেন :

"I have objection to every form of teaching which inculcates weakness. That is the one question I put to every one, man, woman or child, when they are in training, physical, mental or spiritual. The question is: Are you strong? Do you feel strength?—for I know it is truth alone that gives strength. I know truth alone gives life, and nothing but going towards reality will make us strong, and none will reach truth until they are strong · --strength is the one thing that we want. Strengthening is the great medicine for the world's disease. Strengthening is the medicine which the poor must have when tyrannised over the rich. (The freedom of the soul)

ইতিহাস বিশ্লেষণ করে আমরা দেখতে পারি যে প্রাচীন কালে জ্ঞানচর্চা, বিদ্যানুশীলন সমাজের কতিপয় লোকের ভিতর সীমাবদ্ধ ছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়রাজা, সমাজের বিত্তশালী নাগরিক শিক্ষিত হবার সুযোগ পেতেন। তারপর, এল ধর্মযাজক, সন্ন্যাসী যাঁরা মঠ ও আশ্রমকে কেন্দ্র করে পূর্বাপেক্ষা ব্যাপকতর ভাবে বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করলেন। এদেশে নালন্দা, তক্ষশিলা, বিক্রমশিলা প্রভৃতি বিহারে, গ্রীসে Stoa ও Academy ও ইউরোপে অন্যান্য স্থানে cluny এবং clavireaux প্রভৃতি মঠে সমাজের কিছু সংখ্যক বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ পেলেন। তখনও চারিদিকে ঘন অন্ধকার বিরাজ করছে, মাঝে মাঝে সমাজের বিস্তৃত অঙ্গনে কোথাও কোথাও মাত্র কয়েকটি প্রদীপ শিখা সেই অন্ধকার দানবকে বিদ্রূপ করছে। আধুনিক যুগারম্ভে, নবজাগরণের অভ্যুদয়ে সমাজের নীচেরতলার নিম্ন মধ্যবিত্ত ও সাধারণ জনমনের এক অংশ বিদ্যামন্দিরে প্রবেশ করতে সুযোগ পেল। শিক্ষা ব্যবস্থা ক্রমশঃ ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হলেও শুধু বলতে দ্বিধা নেই যে এখনও শতকরা ৯৮ জন লোক মধ্যযুগীয় তিমিরে বাস করছে। মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্তদের ভিতর শিক্ষার প্রচলন হয়েছে সন্দেহ নেই কিন্তু এখনও নব বুভুক্ষু মানুষের নিকট নগণ্য কুটির প্রাঙ্গনে জ্ঞানের প্রদীপ শিখা প্রবেশ করেনি। স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন : "The mass of people in our country is like the sleeping Leviathan. The education imparted by the present University system reaches to one or two percent of the masses only. And even those who get that, do not succeed in their endeavours of doing any good to their country.

Try to have their (masses) eyes opened as to what has taken place or taking place in different countries, what this world is like, and so forth. Go to their cottages, from door to door, in the evening, at noon, any time, and open their eyes.

আলোর বর্তিকা নিয়ে দেশ প্রেমিকদের দূর গ্রামাঞ্চলে অগণিত লোকের ভগ্নকুটিরে দশাল জ্বালতে ও মূক মুখে ভাষা ফোটাতে হবে। দিবসে সন্ধ্যায় ঘরে ঘরে ইতিহাস, ভূগোল, সমাজতত্ত্ব ও অধ্যাত্মবাদ ছড়িয়ে দিতে হবে।

আমরা যারা উপরে বসে ধর্মনি বিজ্ঞানের তত্ত্বে আত্ম-প্রসাদ অথবা কাব্য বিলাস করছি তাদের মনে কি এই প্রশ্ন জেগেছে যে কাদের পরিশ্রমে এই বিদ্যামন্দির রচিত হয়েছে, কারা রক্ত ঢেলে অর্থ দিয়ে আমাদের বিদ্যাশিক্ষার পথ সুগম করেছে? আমরা শুধু কথার সান্ত্বি ভরে তাদের উপর অকাতরে উপদেশ বিতরণ করছি। আমাদের উদ্দেশে স্বামীজী বলছেন: I consider that the great national sin is the neglect of the masses, and that is one of the causes of our downfall. No amount of politics would be of any avail until the masses in India are once more well educated, well-fed and well cared for. They pay for our education they build up our temples, but in return they get kicks. They are practically our slaves. If we want to regenerate India, we must work for them.

(Works : Vol v. p 152)

স্বামীজী বলতেন যে লক্ষ লক্ষ লোকের ভিতর স্বাধীনতার বীজ বপন, তাদের বুকে আত্মবিশ্বাসের, ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ করতে হলে শিক্ষার দশাল ঘরে ঘরে নিয়ে যেতে হবে। এই আলোর শিখাতে তাদের মনের যুগযুগান্তর ধরে পুঞ্জীভূত অন্ধ-সংস্কার, ভীরুতা, দাসত্ব, জড়তা সব দাহন হয়ে তাদের মধ্যথেকে বেরিয়ে আসবে মুক্তিকামী, বীর্যবান যোদ্ধাদল। তারা শতাব্দী ধরে অন্ধকারে সমাজের ধাতাকলে পিষ্ট হবে না। জনগণের ভিতর এই বিপ্লবী মনোভাব সঞ্চার করবার জন্য স্বামীজী ব্যাপকতম জনশিক্ষার অস্ত্র আমাদের গ্রহণ করতে বারবার বলেছেন।

"Education, education, education alone! Travelling through many cities of Europe and observing in them the comforts and education of even the poor people, there was brought to my mind the state of our own poor people and I used to shed tears. What made the difference? Education was the answer I get. Through education, faith in one's own self, and through faith in one's own self the inherent Brahman is waking up in them, while the Brahman in us is gradually becoming dormant." (Works ; Vol iv, 416). শিক্ষাব্রত, অবিচল নিষ্ঠা ও তপস্যার ভিতর আমরা খুঁজে পাব আমাদের হারানো সম্বাকে, দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের ভিত্তিতে গড়ে উঠবে আমাদের জীবন সৌধ, নির্ভীক স্বরে জীবন ও মৃত্যুকে অকাতরে গ্রহণ করতে আমাদের পা টলবে না।

তুলনা করবেন না!

আনাদের মধ্যে বেশীরভাগই প্রতিবেশীর সঙ্গে তুলনীয় হতে পছন্দ করেন না। মেট্রিক ওজন সম্পর্কেও তাই বলা যায়।

মেট্রিক পদ্ধতির সর্ব্ববিধ সুবিধেগুলি পেতে হলে এগুলিকে অন্য কিছুর সঙ্গে তুলনা না ক'রে, এগুলিতে যে সত্যিকার সুবিধে আছে সেই অনুযায়ী ব্যবহার করুন।

সের বা মাণের সমতুল হিসাবে মেট্রিক ভগ্নাংশ ব্যবহার করাবেন না।

এতে আপনার সময়ের অপব্যয় হবে এবং হয়তো অনেক ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্থ হবেন।

তাড়াতাড়ি কেনাকাটা ও আয়াস লেনদেনের জন্য

পূর্ণ সংখ্যায় মেট্রিক এককগুলি

ব্যবহার করুন

স্বামী বিবেকানন্দ ও জাতি বৈষম্যের বিলুপ্তি

দেবীপ্রসাদ সেন

স্বাধীন ভারতের সংবিধানে বর্ণবৈষম্য এবং অস্পৃশ্যতা নীতিগতভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে। হিন্দু সমাজের জাগ্রত বিবেকবুদ্ধি দীর্ঘকাল যাবৎ এই সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতেছে। দেশের ও সমাজের অনেক অনর্থ সাধন করিয়া বহু শতাব্দীর দুশ্চ্ছেদ্য এই সমাজ ব্যাধি আজ মুমূর্ষুপ্রায়। আধুনিক কালে যাঁহাদের অনলস চিন্তা ও কর্মের ফলে এই অনিষ্টকর প্রথাটী নির্মূল হইতে চলিয়াছে যুগমানব স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাদের অন্যতম। স্বামিজী সারা জীবন এই সমস্যা সম্বন্ধে বিচার করিয়াছেন। দেশের সর্বত্র ভ্রমণ করিয়া সাক্ষাৎভাবে এই সমস্যার নানাদিকের সন্ধান লাভ করিয়াছেন। তাঁহার বিবিধ বক্তৃতায়, পত্রে এবং আলোচনায় এই সমস্যাটী একটী প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। স্বামিজীর দৃষ্টিতে আধুনিক বর্ণবৈষম্য এবং তাহার আনুষঙ্গিক অস্পৃশ্যতা সমস্যার স্বরূপ কি এবং ইহার যথার্থ প্রতিকারই বা কি তাহার আলোচনা করিলে এ সম্বন্ধে এক নূতন আলোকের সন্ধান পাওয়া যায়। রাজা রামমোহন রায় হইতে আরম্ভ করিয়া মহাত্মা গান্ধী পর্যন্ত অনেকেই এই সমস্যা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন এবং ইহার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়াছেন। কিন্তু এ বিষয়ে স্বামিজীর চিন্তা ও কার্যপ্রণালী ছিল মৌলিক এবং স্বতন্ত্র।

অনেকে মনে করেন, জাতিভেদ এবং বর্ণবৈষম্য একই কুপ্রথার দুইটী দিক। কেহ কেহ মনে করেন যে অস্পৃশ্যতা বর্ণপ্রথার অবশ্যম্ভাবী কুফল। কিন্তু বর্ণভেদ প্রথার ইতিহাস আলোচনা করিলে এই ধারণার সমর্থন পাওয়া যায় না। বৈদিক যুগের প্রথম হইতেই আর্যসমাজ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণে বিভক্ত ছিল। এমন কি আর্যগণের ভারতে আগমনের পূর্বেও তাহাদের মধ্যে বর্ণভেদ প্রচলিত ছিল। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে আর্যজাতির যে শাখা পারস্যদেশে যাইয়া বসতি স্থাপন করে তাহারাও ভারতীয় আর্যগণের ন্যায় চারি বর্ণে বিভক্ত ছিল।[১] সুতরাং বর্ণপ্রথা যে ভারতবর্ষে বা হিন্দুসমাজেই প্রথম উদ্ভূত হইয়াছিল একথা বলা চলে না। বস্তুতঃ ইহা একটী অতি প্রাচীন প্রথা।

চাতুর্বর্ণ্য প্রথা অতি প্রাচীন হইলেও প্রথম দিকে ইহা আধুনিক কালের ন্যায় কঠোর নিয়মের অধীন হয় নাই। এ কথাও জানা গিয়াছে যে সে কালে জাতি কেবল জন্মের দ্বারাই নির্দ্ধারিত হইত না। শরীরের বর্ণ এবং গুণ ও কর্ম অনুসারেও লোকের জাতি নির্ধারিত হইত। ব্রাহ্মণেরা শ্বেতকায়, ক্ষত্রিয়েরা রক্তবর্ণ, বৈশ্যেরা পীত এবং শূদ্রেরা কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন। জাতি অর্থে বর্ণ শব্দটী প্রয়োগ করিবার ইহাও একটী কারণ।[২] গুণ ও কর্ম অনুসারে জাতি বিভাগের কথা শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদি সকল শাস্ত্রেই পাওয়া যায়। আবার, গুণ ও কর্ম অনুসারে অনেক সময়ে এক জাতি হইতে অপর জাতিতে পরিণতি ঘটিত। বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণ পদবীতে উন্নীত হইয়াছিলেন। রথকার (অর্থাৎ ছুতার মিস্ত্রী) শ্রেণী বৈশ্য হইতে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। এইরূপ আরও বহু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায়।

বর্ণপ্রথার প্রথম যুগে জাতিতে জাতিতে অধিকারের

১ Origin and Growth of Caste in India—N. K. Dutta : p. 39

২ op. cit.—p. 22

বৈষম্য ছিল না; ইহার সহিত অস্পৃশ্যতারও বিশেষ সম্পর্ক ছিল না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই তিন জাতির বৈদিক ধর্মানুষ্ঠানে প্রায় সমান অধিকার ছিল। তাহাদের সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় অধিকারেও বিশেষ প্রভেদ ছিল না। পুরুরবো নিজ বর্ণ এবং নিম্নতর বর্ণের কন্যা বিবাহ করিতে পারিতেন। অতএব ব্রাহ্মণের পক্ষেও শূদ্রাণীর পাণিগ্রহণ নিষিদ্ধ ছিল না। শূদ্রগণের সামাজিক এবং ধর্মীয় অধিকার অন্য তিন বর্ণ অপেক্ষা কম ছিল। তিন বর্ণের সেবাই তাঁহাদের বৃত্তিরূপে নির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু তাঁহারাও যোগ্যতা অনুসারে কৃষিকার্য এবং বিবিধ শিল্পকার্যে অংশ গ্রহণ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহারা যে অস্পৃশ্য ছিলেন, প্রাচীন বৈদিক শাস্ত্রে তাহার নির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। এমন কি পৌরাণিক যুগেও ব্রাহ্মণের পক্ষে শূদ্রের দানগ্রহণে বাধা ছিল না। শূদ্রের যজ্ঞেও অধিকার ছিল।[৩] মহাভারতের যুগে শূদ্রগণের সামাজিক অবস্থা আরও উন্নত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। মহাভারতে বর্ণিত আছে যে কৌশিক নামক জনৈক ব্রাহ্মণ এক শূদ্র মাংসবিক্রেতার কাছে ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণ করেন।[৪] স্মৃতিকার যৌবাহ্নেয়ের মতে শূদ্র যদি উচ্চবর্ণের কোনও ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে অন্ন পাক করিত তাহা হইলে সকল জাতির লোকই সে অন্ন গ্রহণ করিতে পারিত। পরাশরের মতে শূদ্র নিজের ভৃত্য হইলে তাহার অন্ন গ্রহণে কোনও বাধা ছিল না। বিশেষ করিয়া আপৎকালে যে কোনও লোকের অন্ন গ্রহণ করা যাইত। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে প্রাচীন হিন্দুসমাজে জাতিভেদ প্রচলিত থাকিলেও খাদ্য ও পানীয় সম্বন্ধে স্পৃশ্যাস্পৃশ্য ব্যবস্থা উৎকট আকার ধারণ করে নাই।

কালক্রমে বর্ণভেদের সহিত অধিকারের ভেদ যুক্ত হইল। প্রকৃতি গুণ ও কর্মের বিভাগ সৃষ্টি করিয়াছে। অনুযায়ী মানুষ চারি বা অতোধিক জাতিতে বিভক্ত হইয়াছে। কিন্তু অধিকারের ভেদ প্রকৃতির কার্য নয়। ইহা মনুষ্যকৃত। যে সকল শ্রেণী বুদ্ধিতে বা দৈহিক বলে শ্রেষ্ঠ তাহারা নিজেদের জন্য বিশেষ বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা করিয়া নিল। দুর্বল শ্রেণীগুলির উপর নানারূপ অবিচার হইল। এই প্রকারে পরবর্তীকালে জাতিভেদের সহিত অস্পৃশ্যতা এবং অন্যান্য সামাজিক বৈষম্য যুক্ত হইল।

স্বামী বিবেকানন্দ বর্ণপ্রথা বা জাতিভেদের মূলগত নীতিটিকে অন্যায় বা অবৈধ মনে করেন নাই। তাঁহার মতে জাতি-বিভাগ একটী প্রাকৃতিক বিধান। সামাজিক বিবর্তনের ফলেই ইহার উদ্ভব হইয়াছে। "সমাজের প্রকৃতিই এই,—বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হওয়া।" আর মনুষ্যজাতির উন্নতির জন্য ইহার প্রয়োজনও অবশ্য স্বীকার্য। যে সমাজে বৈচিত্র্য নাই, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য নানা প্রকার কর্মের সাধনায় নিযুক্ত থাকে না সে সমাজ সভ্যতা ও সংস্কৃতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না। সুতরাং শ্রেণীবৈচিত্র্য সমাজের সুস্থতা এবং প্রাণশক্তির লক্ষণ। স্বামিজী বলেন, যখনই কোনও জাতি এইরূপ নানা বিচিত্রতা প্রসব করে না তখনই উহা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং শ্রেণী-বৈচিত্র্য কোন সমাজের পক্ষে নিন্দনীয় হইতে পারে না। আবার সমাজ সংস্কারের নামে সমস্ত বিচিত্রতা উঠাইয়া দিয়া সব একাকার করিয়া দিলে সকল সমস্যার মীমাংসা হইয়া যাইবে এরূপ ধারণাও ভুল। এ জন্য উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে ইংরাজী শিক্ষিত নব্য সম্প্রদায় সমাজ সংস্কারের নামে যে যথেচ্ছাচারে মত হইয়াছিলেন স্বামিজী তাঁহাদের কঠোর-ভাবে নিন্দা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, জাতিভেদ লোপ করিতে হইবে—তাহার অর্থ এ নয় যে "সমুদয় সব লোক মিলে সব মাংস খাক, আর সব আহম্মক ও পাগল মিলে সবে যেখানে যাকে ইচ্ছা বিবাহ করুক।"

স্বামিজী বার বার বলিয়াছেন যে প্রাচীন বর্ণপ্রথা এবং

৩ ধারক ভাষ্য শূদ্রাধিপি পাকযজ্ঞেষু ৮—বিষ্ণুপুরাণ ৩৮

৪ বনপর্ব ২০৬।

তাহার আধুনিক রূপ এ দুইটীকে এক বা সমগোত্রীয় মনে করা ভুল। মূলে জাতির অর্থ ছিল প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ নিজ প্রকৃতি ও বিশেষত্ব প্রকাশ করিবার স্বাধীনতা। এমন কি খুব আধুনিক শাস্ত্রগ্রন্থেও বিভিন্ন জাতির একত্র ভোজন নিষিদ্ধ হয় নাই।[৪] জাতিভেদ বর্তমানে যে আকার ধারণ করিয়াছে তাহা বাস্তবিক পক্ষে জাতি নহে। বরং উহা জাতির উন্নতির প্রতিবন্ধক। কতকগুলি আচার এবং প্রথা বদ্ধমূল হইয়া কোনও কোনও শ্রেণীর বিশেষ বিশেষ সুবিধা এবং অধিকারগুলিকে কায়েম করিয়া তুলিয়াছে। ফলে, একদিকে জাতিতে জাতিতে বিরোধ এবং পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ বাড়িয়াছে, অপর দিকে সমাজ জীবনের অব্যাহত গতি বাধা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই প্রকারে ধীরে ধীরে একটি কল্যাণকর সমাজ ব্যবস্থা সুদূর প্রসারী অবনতির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

পরিব্রাজকরূপে স্বামিজী আসমুদ্র হিমাচল ভারতের সর্বত্র পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে জাতিভেদ সমস্যার নানা রূপ এবং নানা দিক তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। অস্পৃশ্যতার নির্মমতা যেমন তাঁহার প্রেমিক হৃদয়কে ব্যথিত করিয়াছে ইহার নির্লজ্জ অসঙ্গতি তেমনিই তাঁহার যুক্তিনিষ্ঠ মনকে পীড়িত করিয়াছে। তিনি দুঃখের সহিত উল্লেখ করিয়াছেন যে মালাবার প্রদেশে পারিয়াকে উচ্চবর্ণের সহিত এক রাস্তায় চলিতে দেওয়া হয় না; অথচ যেইমাত্র ঐ পারিয়া স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টান হইল অমনি তাহার সমস্ত দোষ কাটিয়া গেল এবং ব্রাহ্মণেরও তাহার সহিত চলাফেরা করিতে কোনও বাধা রহিল না। এই ভাবেই মালাবারের এবং দক্ষিণভারতের একতৃতীয়াংশ হিন্দু খ্রীষ্টান হইয়া গিয়াছে। এই কারণেই মুসলমান রাজত্বকালে উত্তর ভারতের বিপুল সংখ্যক লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।

জাতিভেদ এবং অস্পৃশ্যতা যে সামাজিক বিধান, ধর্মীয় ব্যবস্থা নয় এবথা মনে রাখা একান্ত দরকার। ইহাকে ধর্মীয় বিধান মনে করিলে ইহার প্রতিকার দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। স্বামিজী বলেন যে বুদ্ধ হইতে রামমোহন রায় পর্যন্ত ধর্ম-সংস্কারগণ সকলেই এই প্রথাগুলিকে ধর্মীয় বিধান মনে করিয়া ভুল করিয়াছিলেন।[৫] ফলে তাঁহারা ধর্ম এবং জাতি উভয়কেই এক সঙ্গে ভাঙিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু শত চেষ্টাতে সমস্ত জাতি একাকার হইয়া যাইবে না। বুদ্ধি ও শক্তির ভিন্নতা অনুসারে বিভিন্ন ব্যক্তি ও শ্রেণী ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি অনুসরণ করিবেই। কিন্তু তা বলিয়া কোনও ব্যক্তি বা শ্রেণী অপরাপর ব্যক্তি বা শ্রেণী অপেক্ষা বড় হইতে পারে না। ব্রাহ্মণের বৃত্তি অধ্যয়ন, অধ্যাপনা; মুচির কাজ জুতা সেলাই করা। একজন অধ্যয়নাদি কার্যে নিপুণ, আর একজন জুতা সেলাই করিতে পটু। এরূপ কার্য বিভাগ স্বাভাবিক। কিন্তু তা বলিয়া ত ব্রাহ্মণ মুচি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করিতে পারেন না, বর্ণশ্রেষ্ঠ বলিয়া মুচির মাথায় পা তুলিয়া দিতে পারেন না। বর্ণ বিভাগ আছে বলিয়া যে অধিকারের বিভাগ থাকিবে এ কথা অযৌক্তিক এবং অন্যায়। ব্রাহ্মণ কাহাকেও খুন করিলে একটু বই পড়িয়া শুদ্ধ হইবেন, আর শূদ্র কিছু চুরি করিলে তাহার হাত গুপ্ত লোহ দিয়া পোড়াইয়া দেওয়া হইবে এরূপ ব্যবস্থা নীতি-বিরুদ্ধ এবং বর্বরোচিত। স্বামিজী মনে করেন এরূপ ব্যবস্থা পরবর্তী কালে ব্রাহ্মণ মহাত্মারাই প্রবর্তন করিয়াছিলেন।[৬] ব্রাহ্মণ যুগও অন্য যুগের ইতিহাস আলোচনা করিলে এই মত সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়। এই সকল অধিকারভেদ ও শ্রেণী স্বার্থই বর্ণপ্রথাকে দূষিত ও অনিষ্টকর প্রথায় পরিণত করিয়াছে। ইহারই ফলে অস্পৃশ্যতার বিষ সমাজদেহে প্রবেশ করিয়াছে। এই বিষাক্ত প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়া জাতিভেদ প্রথার মূল উদ্দেশ্যটীকে কি করিয়া সার্থক করা যায় তাহাই হইল আলোচ্য সমস্যার মর্মগত প্রশ্ন।

---

৪ পত্রাবলী—প্রথম ভাগ, ৩৬২ পৃঃ

৫ পত্রাবলী—প্রথম ভাগ পৃঃ ১২২

৬ পত্রাবলী—প্রথম ভাগ, পৃঃ ৯০

স্বামিজী দিব্য দৃষ্টিতে ইহাও অনুভব করিয়াছিলেন যে এই সব সামাজিক কুপ্রথার দিন শেষ হইয়া আসিয়াছে। বিজ্ঞানের প্রসাদে সমস্ত বিশ্বে সামাজিক ব্যবস্থার দ্রুত পট পরিবর্তন ঘটিতেছে। অর্থ নৈতিক দ্বন্দ্ব দিন দিন প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া উঠিতেছে। ইহার ফলে প্রচলিত জাতিভেদ প্রথা দ্রুতবেগে উঠিয়া যাইবে, এ কথা তিনি প্রায় দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট অনুভব করিয়াছিলেন। ইহাকে নাশ করিবার জন্য ধর্মীয় বিধানগুলিকে আক্রমণ করা নিষ্প্রয়োজন। তাঁহার মতে এই সমস্যাকে আদৌ কোন ধর্মীয় সমস্যাই বলা যায় না।

ইংরাজী শিক্ষার প্রথমযুগে এ দেশে খ্রীষ্টান পাদ্রীগণ হিন্দুসমাজে জাতিভেদ প্রথার সমালোচনায় মুখর হইয়া উঠেন। তাঁহারা যে কেবল নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি বশতঃ কিম্বা আন্তরিকভাবে হিন্দুসমাজের সংস্কার কামনায় এই প্রথার সমালোচনা ও নিন্দা করিতেন তাহা বলা যায় না। এই সকল হিন্দুকে স্বধর্মে দীক্ষিত করিয়া ভারতে নিজ সম্প্রদায়ের পুষ্টিসাধন করাই ছিল তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু খ্রীষ্টান সমাজেও কি প্রকারান্তরে জাতিভেদ নাই? তাঁহাদের মধ্যেও কি অভিজাত শ্রেণী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান বর্তমান ছিল না? যে সময়ে তাঁহারা ভারতে জাতিভেদ প্রথার নিন্দা করিয়া বেড়াইতেন সেই সময়ে কি ইংলণ্ডে কোনও লর্ড বংশীয় ভদ্রলোক একজন সাধারণ লোকের সহিত এক টেবিলে বসিয়া খাদ্যগ্রহণ করিতেন? ইউরোপে মধ্যযুগের ইতিহাসে পুরোহিত ও সামন্ত শ্রেণীর যে দীর্ঘকালব্যাপী ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, ইহাও ত খ্রীষ্টান সমাজে জাতিভেদেরই উৎকট পরিণতি। ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্কালে সে দেশের যাজক সম্প্রদায় অভিজাত শ্রেণীর সহিত যোগ দিয়া সাধারণ মানুষকে শোষণ করিতে দ্বিধা করে নাই। ইহাকে কি বৈশ্য ও শূদ্র সমাজের উপর ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রশক্তির অত্যাচার বলা যায় না? তাহার অপেক্ষা হিন্দুসমাজে জাতিভেদ বেশী নির্মম ছিল বলিয়া মনে হয় না। তথাপি বিদেশী পাদ্রীগণ স্ব স্ব উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এই প্রথার কথা বিকৃত ভাবে প্রচার করিয়াছেন। না বুঝিয়া বা ইচ্ছা করিয়া ইহাকে হিন্দুধর্মের গ্লানি বলিয়া চিত্রিত করিয়াছেন। তাহারই ফলে এ দেশেও অনেকে এই সমস্যাকে ধর্মীয় সমস্যারূপে ভাবিতে আরম্ভ করেন এবং ইহার সমাধানের জন্য ধর্মের সংস্কার প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন। এই কারণেই রামমোহন, দয়ানন্দ প্রভৃতি সংস্কারকগণ নূতন নূতন ধর্মসম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়া ইহার প্রতিকারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। স্বামিজী কখনও এই সমস্যাকে ধর্মীয় সমস্যা বলিয়া মনে করেন নাই। কিন্তু আবার এই সকল সামাজিক কুপ্রথাকে লঘু করিয়া দেখিয়াছেন তাহাও বলা যায় না। তাঁহার তিরোধানের পর গত অর্ধশতাব্দী ধরিয়া হিন্দুসমাজে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহার দ্বারা তাঁহার বিশ্লেষণ ও দূরদৃষ্টি যে কিরূপ সত্য তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। হিন্দু সমাজ হইতে অস্পৃশ্যতার পাপ বিলুপ্তপ্রায়। কিন্তু ইহার জন্য হিন্দুধর্মের মূল নীতি বা কাঠামোর কোনও পরিবর্তন প্রয়োজন হয় নাই।

যীশুখ্রীষ্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইয়াছিল যে তিনি ধর্মের পবিত্র বিধান ভঙ্গ করিতেছেন। তাহার উত্তরে যীশু বলিয়াছিলেন—"আমি ভাঙিতে আসি নাই, সম্পূর্ণ করিতে আসিয়াছি।" স্বামী বিবেকানন্দের সম্বন্ধেও বলা যায় যে তিনি প্রাচীন শাস্ত্রকারগণের বিধানগুলিকে উল্টাইয়া দিতে চাহেন নাই; বরং তাহার সত্যস্বরূপটীকে উদ্ধার করিয়া সমাজে তাহাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার মতে অস্পৃশ্যতা মহাপাপ, কারণ ইহা সমাজের একটী বৃহৎ অংশকে দীর্ঘকাল ধরিয়া দুর্বল ও নির্বীর্য করিয়া রাখিয়াছে। বহুশতাব্দী যাবৎ নিজেদের হীন ও নীচ মনে করিতে করিতে সমাজের নিম্নস্তরের মানুষ আত্মবিশ্বাস হারাইয়া ফেলিয়াছে। তাহাদের মধ্যে যে কি মহাশক্তি নিহিত আছে তা তাহারা জানে না। তাহারাও যে অমৃতের সন্তান, তাহাদের দ্বারাও যে জগতে অনেক মহৎ কার্য সম্পন্ন

হইতে পারে, এ কথা যেন তাহারা বিশ্বাস করিতে পারে না। এই যে আত্মবিশ্বাসের অভাব, ইহাই আধুনিক জাতিভেদ প্রথার চরম কুফল। স্বামিজী জানিতেন বেদান্তের সনাতন উদার নীতিই হিন্দুধর্মের প্রাণ,—হিন্দু সমাজের শক্তির উৎস। তাঁহার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তাঁহাকে চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছিলেন—যে যত্র জীব তত্র শিব। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট এই সত্য কেবল একটী কথার কথা ছিল না। ইহা তাঁহার সাধনালব্ধ অনুভূতি। সাধক জীবনে পরমহংসদেব নিজের মাথার চুল দিয়া অপরের শৌচাগার পরিষ্কার করিয়াছেন, যাহাতে সমাজে ঘৃণিত মেথরের সহিত একাত্মতা অনুভব করিতে পারেন। সে কালের গোঁড়া সমাজ বিধানের মধ্যে পালিত হইয়াও তিনি উপনয়ন গ্রহণের সময়ে নিম্নজাতীয়া ধনী কামারনীর কাছেই প্রথম ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। আবার কোনও ব্রাহ্মণ সন্তান যখন রাণী রাসমণির প্রতিষ্ঠিত কালীমন্দিরে পূজা করিতে সম্মত হন নাই তখন এই সরল হৃদয় ব্রাহ্মণ বিনা দ্বিধায় সেই মন্দিরে পূজারীর ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং আপনার অপূর্ব সাধনার দ্বারা সেই মন্দির প্রাঙ্গণকে এ যুগের সর্ব ধর্মের মহাতীর্থে পরিণত করিয়াছিলেন। এক দিকে এই সমদর্শী ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর অযাচিত শিক্ষা, অপরদিকে বেদবেদান্ত এবং সমস্ত ধর্মশাস্ত্রের গভীর অনুশীলন, এ দুয়ের সম্মিলনে স্বামিজীর প্রজ্ঞানেত্র উন্মীলিত হইয়াছিল। তিনি দেখিয়াছিলেন "ব্রহ্ম যতো কীট পরমাণু, সর্বভূতে এক প্রেমময়"। মানুষ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সকলের মধ্যে চৈতন্যরূপে একই আত্মা বিরাজিত। ইহাই বেদান্তের শাশ্বত বাণী,—হিন্দুধর্মের সার্বজনীন নীতি। কিন্তু কেবল নিজে উপলব্ধি করিয়াই স্বামিজী ক্ষান্ত থাকিতে পারেন নাই। তিনি চাহিয়াছিলেন যে লোককল্যাণের জন্য, বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্য এই নীতিকে প্রত্যেক ব্যক্তি তথা সমাজজীবনে সার্থক করিয়া তুলিতে হইবে। সকলকে বুঝাইয়া বলিতে হইবে—

যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥

(ঈশোপনিষৎ)

যিনি আপনার মধ্যে সমস্ত ভূতবর্গ এবং সমস্তভূতে আপনাকে দর্শন করেন তিনি কাহাকেও ঘৃণা করেন না। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

বিদ্যাবিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥ ৫।১৮

বিদ্যা ও বিনয় সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুক্কুর ও চণ্ডালে পণ্ডিতগণ সমদর্শী। সুতরাং শাস্ত্র কাহাকেও ঘৃণা করিতে শিখায় না। শাস্ত্রের প্রকৃত তত্ত্ব মহৎ এবং উদার। এই উদার তত্ত্বের আলোকে আমাদের সমস্ত সমস্যার বিচার করিতে হইবে। তাহা হইলেই অস্পৃশ্যতা এবং অন্যান্য সকল সমস্যার প্রকৃত স্বরূপ এবং তাহাদের প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে আলোক পাওয়া যাইবে।

প্রকারান্তরে বলা যায় যে অস্পৃশ্যতা বর্জনে স্বামিজীর চিন্তা প্রণালী তাঁহার সমগ্র জীবনদর্শনের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। যে প্রথা মানুষে মানুষে ভেদবুদ্ধির সৃষ্টি করে, ঘৃণার বীজ বপন করে এবং যে প্রথার ফলে মানুষ আত্মবিশ্বাস হারাইয়া ফেলে সে প্রথা সর্বথা বর্জনীয়। মানুষের মধ্যে যে অমৃত লুকাইয়া আছে তাহাকে প্রকাশ করিতে হইবে। সমাজের প্রতিটী মানুষকে অপূর্ণতা হইতে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। ইহাই প্রকৃত ধর্ম এবং ইহাই হইবে শিক্ষার যথার্থ আদর্শ। এতকাল এই মহৎ আদর্শ কেবলমাত্র গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। স্বামিজীর উদ্দেশ্য ছিল "বনের বেদান্তকে" ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। উচ্চনীচ নির্বিশেষে সকলকেই আত্মশক্তিতে প্রবুদ্ধ করিতে হইবে। ধর্মপ্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন—যাহার আত্ম-বিশ্বাস আছে সেই যথার্থ আস্তিক, আর যাহার আত্মবিশ্বাস নাই, যে নিজেকে সর্বদা হীন ও দুর্বল মনে করে সেই প্রকৃত

নাস্তিক। ভারত শূদ্রকে নীচ ও দুর্বল করিয়া নিজেই হীন ও নির্বীর্য হইয়া পড়িয়াছে। আজ শূদ্র জাগিতেছে, সুতরাং আশা হয় ভারতও জাগিবে। তাই স্বামী বিবেকানন্দ জোর দিয়া বলিয়াছেন বেদান্তের সাম্যবাদই সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়। সামাজিক বাধা নিষেধের প্রাচীর অপসারণ করিয়া দাও। সমাজ-জীবনে স্বাধীনতা দান করিয়া মানুষ আপন শক্তিতে আপনিই জাগিয়া উঠিবে।

এই প্রসঙ্গে স্বামিজী একথাও বলিয়াছেন যে আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকারেরাও প্রকারান্তরে জাতিভেদ লোপ করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের উপায় ছিল অন্য প্রকারের; তাঁহারা চাহিয়াছিলেন সমাজের প্রতিটী ব্যক্তিকে আদর্শ ব্রাহ্মণে পরিণত হইতে হইবে। ব্রাহ্মণের জ্ঞান ও ত্যাগপূত পবিত্র কর্মময় জীবন সমস্ত হিন্দুর আদর্শস্থানীয়। যিনি এইরূপ জীবন যাপন করেন তিনি শূদ্র হইলেও যথার্থ ব্রাহ্মণ। পূর্বে বলা হইয়াছে কৌশিক ঋষি ব্রাহ্মণ হইয়াও শূদ্র মাংসবিক্রেতার নিকট উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন। শূদ্র গুরুকে সম্বোধন করিয়া কৌশিক বলিয়াছিলেন, "আমার মতে আপনি ইহ-জীবনেই ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। কারণ যে ব্রাহ্মণ সন্তান অহঙ্কারী এবং ঘৃণ্য পাপে আসক্ত সে শূদ্রের অধম; আর যে ব্যক্তি সংযতচিত্ত এবং সত্যবাদী ও ধর্মনিষ্ঠ, আমার মতে তিনি শূদ্র কুলে জন্ম গ্রহণ করিলেও যথার্থ ব্রাহ্মণ; কারণ চরিত্র এবং শিষ্টাচারই ব্রাহ্মণের প্রকৃত লক্ষণ।"[৮] ধর্মশাস্ত্রের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা ভগবান মনুও বলিয়াছেন—

যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী যথা চর্মময়ো মৃগঃ।
যশ্চ বিপ্রোঽনধীয়ানস্ত্রয়স্তে নাম বিভ্রতি। (২।১৫৭)

কাষ্ঠনির্মিত হস্তী যেমন নামেই হস্তী, চর্মনির্মিত মৃগ যেমন নামমাত্র মৃগ, সেইরূপ যে ব্রাহ্মণ অধ্যয়নশীল নহেন তিনি নামমাত্র ব্রাহ্মণ। এস্থলে কেবল অধ্যয়নের উল্লেখ থাকিলেও ব্রাহ্মণোচিত অন্যান্য গুণ সম্বন্ধেও এ বচন প্রযোজ্য। প্রাচীন ঋষিরা গুণের দ্বারাই ব্রাহ্মণত্বের বিচার করিয়াছেন। আর সমাজের সকল স্তরের মানুষের মধ্যেই এইরূপ ব্রাহ্মণত্বের প্রকাশ হউক, ইহাই ছিল তাঁহাদের মূল অভিপ্রায়। স্বামিজী বলিয়াছেন যে জাতিভেদ এবং তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট সমস্ত সমস্যার সমাধানে ইহাই সর্বোত্তম নীতি। "উচ্চ বর্ণকে নীচু করিয়া এ সমস্যার মীমাংসা হইবে না, নিম্ন জাতিকে উন্নত করিতে হইবে। আর যদিও কতকগুলি ব্যক্তি (অবশ্য ইহাদের শাস্ত্রজ্ঞান ও প্রাচীনদের মহান্ উদ্দেশ্য বুঝিবার ক্ষমতা কিছুই নাই) অন্যরূপ বলিয়া থাকেন, তথাপি ইহাই আমাদের শাস্ত্রোপদিষ্ট কার্য প্রণালী।"[৯] এই প্রসঙ্গে তিনি প্রায়ই মহাভারতের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন "জাতিভেদ সমস্যার একমাত্র যুক্তি-সঙ্গত মীমাংসা মহাভারতেই পাওয়া যায়। মহাভারতে লিখিত আছে—সত্য যুগের প্রারম্ভে একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতি ছিলেন। তাঁহারা বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হইলেন।" স্বামিজীর আশা ছিল জোড়ের উপর জোড় দিয়া ভারতে আবার সত্যযুগের অভ্যুদয় হইবে,—ব্রাহ্মণেতর সকল জাতি আবার ব্রাহ্মণ জাতিতে পরিণত হইবে।

৮ মহাভারত বনপর্ব—২০৬।৩০
৯ ভারতে বিবেকানন্দ—পৃঃ ৫৮

স্বামী বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীরঙ্গবরণ

> দৃষ্টান্ত এক অধিকারী সম্পর্কে দৃষ্টান্ত উক্ত অধিকারীর গুরু আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন সাধনমার্গের যথাযথ সোপান সাধনও দিয়েছে। রচনাটি পরাতুপতিক নয়, কারণ 'বিবেকানন্দ সম্বন্ধে তাঁর [শ্রীঅরবিন্দের] যে ধারণা' লেখক এই ভাষায় এক জায়গায় বলেছেন, 'সেটা কিন্তুই শুধু পুঁথিগত জ্ঞান নয়, এমন কি মনীষার ছাঁচে ঢালাও নয়। তার মূলে রয়েছে আধ্যাত্মিক পরিচয়।'
>
> সম্পাদিকা, জয়শ্রী

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম,
পণ্ডিচেরী

জয়শ্রী সম্পাদিকা,
সবীপেষু,

আপনার চিঠি পেলাম। আহ্বান করেছেন বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের 'কথাবার্তা'গুলি প্রবন্ধাকারে পাঠাতে।

'কথাবার্তা' অতি সাধারণ ; তা দিয়ে কোনো প্রবন্ধ ঠিক হয় না। কিন্তু তাঁর বিশাল রচনাবলীর আকাশে বিবেকানন্দ সম্পর্কে তাঁর নানা উক্তি, সংক্ষিপ্ত অভিমত, দীপ্ত রত্নরাজির মধ্যে উজ্জ্বল মণিমুক্তার মতো ছড়িয়ে আছে। সেগুলি সংগ্রহ করা হয়তো না হলেও তাদের সাজিয়ে একটি প্রবন্ধের মালা গাঁথা নিপুণ অহরীর কাজ, আমার নয়। ভয়ের কারণ আছে আরো : যদি বিরাট ভাবশরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাদের ভাস্বর দ্যুতি তারপরেও অক্ষুণ্ণ থাকবে কী। যদি তার অভয়বাণী পাই এবং আপনাদের সম্মতি, তাহলে পত্রের পেটিকার মাঝে অপটু হাতে তাদের কোনোমতে গুছিয়ে পাঠাতে পারি। পেটিকা হয়ত সুলভ হবে—সহজ কথাটা ভুলিনি. কিন্তু তাহলে শ্রীঅরবিন্দ বা রবীন্দ্রনাথের মতো পত্রকার হতে হয় —কিন্তু সামগ্রীগুলি আশা করি সুলভ হবে না।

ভাষা সম্বন্ধেও একটি কথা : পরিশীলিত ভাষার অভ্যস্ত আধুনিক বাঙালী পাঠকের উপযোগী বাঙলা তৈরী করা আমার মতো অনভিজ্ঞের কর্ম নয়। অথচ সকলেই জানেন শ্রীঅরবিন্দের ভাষা ছিল ইংরেজি এবং সে ইংরেজি শ্রীঅরবিন্দের ইংরেজি। তাঁর ইংরেজি রচনা যথাযথ উদ্ধৃত করে দিয়ে আমার কর্তব্য সহজ করা যেতো কিন্তু বাধির সঙ্গে সঙ্গে বাঙলা প্রতিলিপি না দিলে অসম্পূর্ণ থাকে। একদিকে শ্রীঅরবিন্দের ইংরেজি, অন্যদিকে আমার চর্চাহীন অপটু বাঙলা। সুতরাং উভয় সঙ্কটে পড়েছি।

যাই হোক, কথা আরম্ভ করি।

বরোদায় থাকার কালে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বইগুলি যে তিনি পড়তে সুরু করেন, লেখক শ্রীঅরবিন্দ আমাদের বলেন। আমার কোনো সন্দেহ নেই যে বিবেকানন্দের মুখ্য বইগুলি তিনি পড়েছেন। নিবেদিতার The master as I saw him বইটি তাঁর সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ রচনা বলে শ্রীঅরবিন্দ অভিহিত করেছেন। তাঁর কথাবার্তার মাঝে যে সমাধির [Intuition] ঝলক দেয়, শ্রীঅরবিন্দের এই অভিমতের

মূলেও বোধ হয় নিবেদিতার ঐ অপূর্ব বইখানি। তবে বিবেকানন্দ সম্বন্ধে তাঁর যে ধারণা সেটা নিশ্চয়ই শুধু পুঁথিগত জ্ঞান নয়, এমনকি মনীষার তীক্ষ্ণ বীক্ষণও নয়। তাঁর মূলে রয়েছে আধ্যাত্মিক পরিচয়।

বিবেকানন্দের সঙ্গে আধ্যাত্মিক জগতে শ্রীঅরবিন্দের একাধিকবার সাক্ষাৎকার হয়েছে। সেই পরিচয় দিয়েছে প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং সেই জ্ঞানের আলো এমন ভাব ও ভাষায় মূর্ত হয়েছে, যা সংক্ষিপ্ত কিন্তু রাশি রাশি বাক্যগ্রন্থের চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান:

'What was Ramkrishna?' তাঁর Thoughts and aphorisms-এর ২৬ পৃষ্ঠায় বলছেন, 'God manifest in a human being.'

না 'রামকৃষ্ণ কি ছিলেন? মানুষী আধারে প্রকট ভগবান।' আর বিবেকানন্দ?

'A radiant glance from the eye of Shiva'—'মহাদেবের নয়ননিঃসৃত এক দীপ্ত কটাক্ষ'—

'but behind him is the divine gaze from which he came and Shiva himself and Brahma and Vishnu and OM exceeding.'

'কিন্তু তারও পিছনে ছিল সেই ভাগবত দৃষ্টি যা থেকে উদ্ভূত বিবেকানন্দ, মহাদেব স্বয়ং এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু ও বিশ্বাতীত ওম্।' [নলিনীকান্ত গুপ্ত]

কী সাংঘাতিক কথা। বিবেকানন্দের বিশাল আয়ত দুটি চোখ এবং বাহুবদ্ধ দৃপ্ত ভঙ্গী দেখলে মনে হবে না কি এই ঋষিবাক্য কতখানি সত্য।

বিবেকানন্দের বিদেশযাত্রার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে 'The Awakening soul of India'য় লিখেছেন: 'The going forth of Vivekananda, marked out by the Master as the heroic soul destined to take the world between his two hands and change, was the first visible sign to the world that India was awake not only to survive but to conquer.' ৩৭ পৃষ্ঠা।

অর্থাৎ গুরু পরিষ্কার দেখেছিলেন যে দুইহাতে এই পৃথিবীকে ধরে বদলে দেবে এই বীর, সেই বিধিলিপি এর ললাটে আঁকা। তাঁর বিদেশযাত্রা সেদিন বিশ্ববাসীর চোখে প্রথম প্রত্যক্ষ প্রমাণ যে ভারতের জাগরণ কেবল টিকে থাকার জন্য নয়, তা বিশ্বজয়ের।

'Vivekananda was a soul of puissance if ever there was one, a very lion among men, but the definite work he has left behind is quite incommensurate with our impression of his creative might and energy.' বীর্যসত্ত্বা বলে যদি কিছু থাকে, বিবেকানন্দ ছিলেন তাই, মানুষের মধ্যে কেশরী, কিন্তু যে নির্দিষ্ট কাজ তিনি রেখে গেছেন তা তাঁর সৃষ্টিক্ষমতা ও ওজসের তুলনায় অতি সামান্য। 'We perceive his influence still working gigantically, we know not well how, we know not well where, in something that is not yet formed, something leonine, grand, intuitive upheaving that has entered the soul of India and we say, "Behold, Vivekananda still lives in the soul of his Mother and in the souls of her children." তাঁর প্রভাব এখনো বিপুলভাবে কাজ করে চলেছে আমরা দেখতে পাই—ঠিক জানিনা কী রূপে, বলতে পারি না কোথায়, এমন কিছুতে যা এখনো স্পষ্ট নয়; এমন কিছু যা সিংহপ্রতিম, বিরাট, স্বর্গোদ্দীপ্ত; যা সমুদ্রের জোয়ারের মতো প্রবেশ করছে ভারতের মর্মকেন্দ্রে এবং তা দেখে আমরা সোল্লাসে বলে উঠি, "ঐ তাখো

বিবেকানন্দ এখনো জেগে, জেগে আছেন তাঁর মাতৃমর্মে, মাতৃসন্তানদের মর্মলোকে।"

Thoughts and Aphorisms-এর ১৭ পৃষ্ঠায় :

'Vivekananda exalting sannyasa, has said that in all Indian history there is only one Janaka. Not so, for Janaka is not the name of a single individual, but a dynasty of self-ruling kings and the triumph-cry of an ideal.'

'বিবেকানন্দ সন্ন্যাসের প্রশস্তি করে বলেছিলেন, ভারতের সমগ্র ইতিহাসে জনক আছে একজন মাত্র। তা নয়, জনক কোনো একজন ব্যক্তিবিশেষের নাম নয়, তা হল স্বরাট রাজন্যের এক বংশ এবং এক আদর্শের বিজয়-আহ্বান।' [নলিনীকান্ত গুপ্ত]

ঐ বইয়েই ২৮ পৃষ্ঠায় আর একটি রত্ন :

'Even Vivekananda once in the stress of emotion admitted the fallacy that a personal God would be too immoral to be suffered and it would be the duty of all good men to resist Him. But if an omnipotent supra-moral Will and Intelligence governs the world it is surely impossible to resist Him; our resistance would only serve His ends and really be dictated by Him. Is it not better then, instead of condemning or denying, to study and understand Him?'

'বিবেকানন্দ পর্যন্ত ভাবাবেগের বশে এই ভ্রান্তি স্বীকার করে বসেছিলেন যে সাকার ভগবানকে মেনে নেওয়া হল একটা বিষম দুর্নীতি; এরকম ভগবানের বিরুদ্ধাচরণ করা সকল সৎ ব্যক্তির কর্তব্য। কিন্তু জগতকে চালিত করে থাকে যদি সকল নীতির অতীত এক সর্বশক্তিমান প্রজ্ঞা ও ইচ্ছা, তবে তাকে বাধা দেওয়া নিশ্চয় অসম্ভব; আমাদের দিক থেকে বাধা দান তাঁরই উদ্দেশ্য সাধন করবে, আর বস্তুত সে বাধাদান তাঁর আদিষ্ট। তাই যদি হয়, তাঁকে অভিযুক্ত না করে তাঁকে জানবার বোঝবার প্রয়াসই শ্রেয় নয় কি?' [নলিনীকান্ত গুপ্ত]

Synthesis of Yoga-র—পৃষ্ঠা ৫,—বলছেন :

'Yoga, as Swami Vivekananda has said, may be regarded as a means of compressing one's evolution into a single life or a few years or even a few months of bodily existence.'

'বিবেকানন্দ যেমন বলেছেন, যোগ হল কি করে আমাদের ক্রমবিবর্তনকে সংহত করে কৈব অস্তিত্বের একটিমাত্র জীবনে অথবা কয়েকটি বছরে, এমনকি কয়েকটি মাসের মধ্যে পর্যবসিত করা যায়, সেই প্রক্রিয়া।'

Life Divine-এর ১১৪৫ পৃষ্ঠায় :

'Vivekananda, drawn by the Absolute, feels also the call of the disguised Godhead in humanity and most the call of the fallen and the suffering, the call of the self to the self in the obscure body of the universe.'

'নির্বিশেষের ডাকে উতলা হয়েও বিবেকানন্দ আবার ঝাঁপ দিলেন নরবিগ্রহে প্রচ্ছন্ন নারায়ণের সেবায়,' শুনতে পেলেন আর্ত ও পতিতের কণ্ঠ, বিশ্বের তিমিরাবৃত দেহে অবস্থিত আত্মার প্রতি জীবাত্মার আহ্বান।

এই পর্যন্ত শ্রীঅরবিন্দের রচনা : নানা বই থেকে বহুবের সাহায্যে উদ্ধার করা। এবার তাঁর চিঠি ও কথাবার্তায় আসি। তাঁর Letters, second series-এ :

'Take Vivekananda's famous answer to the Madras Pundit who objected to one of his assertions saying, "But Shankara does not say so!" to whom Vivekananda replied, "No, but I, Vivekananda, say so," and the Pundit was speechless.' মাদ্রাজী পণ্ডিতের প্রতি বিবেকানন্দের প্রসিদ্ধ উক্তিটিই ধরো। তাঁর কি-একটি কথায় সংশয় প্রকাশ করে পণ্ডিত বলেছিলেন, "কিন্তু শঙ্কর ত তা বলেন না।" তাতে বিবেকানন্দের জবাব, "না, আমি, বিবেকানন্দ, তা বলছি।" পণ্ডিত একেবারে হতবাক।

'That "I Vivekananda" stands up to the ordinary eye like the Himalaya of self-confident egoism. But there was nothing false or unsound in Vivekananda's spiritual experience. For this was not mere egoism, but the sense of what he stood for and the attitude of the fighter as the representative of something very great, could not allow himself to be put down or belittled.'

'আমি, বিবেকানন্দ' তাঁর এই কথা সাধারণের কাছে হিমালয়-সমান অহমিকার মতো শোনাবে। কিন্তু বিবেকানন্দর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতায় কিছুই ফুরো বা ঝুটো ছিল না। আর এ তাঁর অহমিকামাত্র নয়, এ একটা অতি মহতের বোধ, যে-জন্য তাঁর জীবন, যার প্রতিনিধি রূপে তাঁর সংগ্রাম, আর তাকে কেউ খর্ব বা তুচ্ছ করবে তা তাঁর সহ্য হোত না।

এবার একটি অতি গুরুতর বিষয়ের অবতারণা করি। শ্রীঅরবিন্দের যোগদর্শনের মূলতত্ত্ব হল এইটি, অর্থাৎ Supermind বা অতিমানস। এ বিষয়ে তাঁর নিজের কথাই তাঁর চিঠি এবং আলাপ জুড়েই আছে। আগে চিঠি থেকে বলি তারপর আলাপে আসব। বিষয়টি গুরুতর বলেছি কারণ supermind-প্রসঙ্গ নিয়ে নানা মত, দ্বন্দ্ব ও সংশয় আছে নানা মনে। সুতরাং সংশয়ের নিরসন তাঁর নিজের কথাতেই হওয়া ভালো। প্রসঙ্গত এও বলি, বিষয়টি চিঠির থেকে পরে আলাপে অনেক প্রাঞ্জল হয়েছে।

আধ্যাত্মিক জগতে বিবেকানন্দের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের সাক্ষাতের কথা আগে খোড়ার দিকে উল্লেখ করেছি। বিষয়টি সেই। Sri Aurobindo on Himself and the Mother বইর একটা চিঠিতে আছে :

'It is fact that I was hearing constantly the voice of Vivekananda speaking to me for a fortnight in the jail in my solitary meditation and felt his presence ....The voice spoke only on a special and limited but very important field of spiritual experience and it ceased as soon as it had finished saying all that it had to say on the subject.' পৃ: ১১৫।

এটা সত্য যে জেলে আমার নির্জন ধ্যানের সময়ে প্রায় পনের দিন বিবেকানন্দের স্বর সর্বক্ষণ আমার সঙ্গে কথা বলেছিল এবং তাঁর উপস্থিতি আমি অনুভব করেছিলাম।... সেই স্বর আধ্যাত্মিক জগতের একটি বিশেষ ও নির্দিষ্ট কিন্তু অত্যন্ত প্রয়োজনীয় স্তরের অভিজ্ঞতার বিষয়েই কেবল কথা বলেছিল এবং সে বিষয়ে যতটুকু বলার তা শেষ হতেই থেমে গিয়েছিল।

১৯২৬ সালে অনিলবরণের সঙ্গে তাঁর এ বিষয়ে যে আলাপ হয় তাতে আর একটু আলো পাই : 'Then there is the incident of the personality of Vivekananda visiting me in jail. He explained to me in detail the work of the Supramental—not exactly the Supramental, but of the intui-

tivised mind, the mind as it is organised by the Supramental. He did not use the word, Supermind.' I gave this name afterwards. That experience lasted for about two weeks.

তারপর জেলে বিবেকানন্দের আবার আমাকে দেখা দেওয়ার সেই ঘটনাটা। অতিমানসের কাজ বিশদভাবে আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন—ঠিক অতিমানস নয়, কিন্তু সমুন্নত-মন যা অতিমানস দ্বারা সংগঠিত। 'অতিমানস' কথাটা তিনি ব্যবহার করেননি। এ নাম পরে আমি দিয়েছিলাম। এই অভিজ্ঞতা প্রায় দুই সপ্তাহ চলে।

Q. Was that a vision? ওটা 'ভিশন' ছিল কি?

A. No, it was not a vision. I would not have trusted a vision. না, 'ভিশন' হলে আমি বিশ্বাস করতাম না।

১৯০৮এর পরে পায়ে আঘাত লেগে যখন তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন তখন আমাদের কয়েকজনের তাঁর ঘরে যাতায়াত ছিল। এ বিষয়ে তখন আবার কথা ওঠে। সেই আলাপ থেকে তুলে দিই। আমার 'কথাবার্তা' বইতে আরো বিশদ-ভাবে তা পাওয়া যাবে, এখানে সংক্ষেপে দিলাম, তাঁর মুখের কথায় :

'I did not know about the many planes. It was Vivekananda who used to visit me in the Alipore jail and showed me the intuitive plane.' used to visit me মানে তাহলে দেখা যাচ্ছে জেলে ঐ একবারই না, প্রায়ই বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে। কিন্তু 'অতিমানস' সম্পর্কে প্রকৃত কথাটি প্রকাশ হল তাঁর এবারের কথাতেই। বলছেন ঐ সঙ্গে : 'For about a month or so he gave me training about the intuition. Then afterwards I began to see the still higher planes.'

বহু স্তরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমার জানা ছিলনা। বিবেকানন্দই আমাকে জেলে দেখা দিয়ে 'সম্বোধি' স্তরের সন্ধান দেন। প্রায় একমাসকাল এই বিষয়ে আমাকে তিনি শিক্ষা দেন। তারপর পরে আরো উচ্চতর স্তরগুলি আমি দেখতে পেয়েছিলাম।

'কথাবার্তা'য় এই বিষয়ে আর-একটু বিস্তৃত আলাপ আছে কিন্তু তার আগে বিবেকানন্দ সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দের সংক্ষিপ্ত আরো দু' একটি উক্তি তুলে দিই :

'হঠযোগ অভ্যাস করার সময় আমি বিবেকানন্দের উপস্থিতি অনুভব করেছিলাম। মনে হল তিনি পিছনে দাঁড়িয়ে আমার প্রতি নজর রাখছেন। পরবর্তীকালে এই ঘটনা আমার মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে।' পৃষ্ঠা ১১৮।

আর-এক আলাপে বলছেন, 'বিবেকানন্দ নিজেও রাজ-নৈতিক বিষয়ে ভাবতেন ও মাঝে মাঝে বিশ্বরূপের প্রকোপে পড়তেন। একবার একটি vision দেখেন, যান্ত্রিকতার বাগানের সঙ্গে তার অনেক মিল আছে।' পৃষ্ঠা: ২৭০।

অতিমানস বিষয়ে এবার আমাদের আলাপটুকু তুলে দিই :

সত্যেন : যাকে আপনি অতিমানস বলছেন তা কি আপনার নিজস্ব ধারণা? অর্থাৎ চিন্তা দ্বারা আবিষ্কার না ঊর্ধ্বলোক থেকে পাওয়া?

শ্রীঅরবিন্দ : না, না, আমার চিন্তা বা ধারণা নয়। তোমাদের ত বলেইছি নির্বাণের উপলব্ধির পর আমার নিজস্ব চিন্তা বলে কিছু ছিল না। প্রথম থেকেই নির্বাণকে আমি শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক সিদ্ধি বলে মনে করিনি। আমার মধ্যে একটা কিছু সর্বদাই এগিয়ে চলতে চেয়েছে। কিন্তু তখনও আমি এই অভিজ্ঞতা চাইনি। প্রকৃতপক্ষে নির্বাণের শান্তি পেলে মানুষ আর কিছু চায় না। কিন্তু এ ভাব যেন আমার মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হল। গোড়াতে অতিমানস সম্বন্ধে

আমার কোনো ধারণাই ছিলনা, আর অনেকদিন পর্যন্ত তার স্বরূপ আমার কাছে স্পষ্টভাবে ধরা দেয়নি। বিবেকানন্দই প্রথম আমাকে দিলেন অতিমানসের নির্দেশ, আর ঊর্ধ্বচেতনা কিভাবে সর্বত্র কাজ করে তার ইঙ্গিত।

আমি বললাম, 'তিনি কি অতিমানসের কথা জানতেন?

'অতিমানস আখ্যাটি আমার দেওয়া।' শ্রীঅরবিন্দ বললেন। 'এ শব্দ বিবেকানন্দ ব্যবহার করেননি। তিনি বললেন "ওটা এই", "এটি এইরকম", এইভাবে। কারাগারে পনের দিন ধরে তিনি আমার দেখা দিয়েছেন। আর যতক্ষণ না আমি সম্পূর্ণভাবে অনুধাবন করতে পেরেছি ততক্ষণ শিক্ষা চলেছে। ঊর্ধ্বচেতনার ক্রিয়া সম্বন্ধে ধারণা আমার অন্তরে বদ্ধমূল না হওয়া পর্যন্ত তিনি ছাড়েননি।' পৃষ্ঠা : ১৯৭।

অন্যত্র, Mother India, July 62-তে যে লেখা তার বাঙলা তিনাদ সরাসরি :

আমি বলেছিলাম, 'আপনি সেদিন বলছিলেন যে বিবেকানন্দের আত্মা আদিপুরুষ জেগে আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসেন এবং ঊর্ধ্বচেতনা সম্বন্ধে শিক্ষা দেন।'

শ্রীঅরবিন্দ : হ্যাঁ। ঊর্ধ্বচেতনার বিষয় সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণাই ছিল না। তাঁকে আমি প্রত্যাশাও করিনি, তবুও তিনি আমাকে শেখাতে এলেন। আর খুঁটিনাটি বিষয়ের বর্ণনায় পর্যন্ত কী অপূর্ব নিষ্ঠা।

আমি বললাম, 'এ বেশ মজার ব্যাপার ত। কিন্তু তিনি তাঁর কোনো লেখায় ত এসব বিষয়ের উল্লেখ করেননি। তাঁর আত্মা কি তাহলে তাঁর জীবদ্দশায় যা জানত না তা মৃত্যুর পর জেনেছে?

শ্রীঅরবিন্দ : নয় কেন? পরে তিনি সেসব জেনে থাকতে পারেন।'

সত্যেন্দ্র : মৃত্যুর পরেও কি আত্মা পরিণতি লাভ করে?

শ্রীঅরবিন্দ : অবশ্য। তবে এমনও হতে পারে, জীবদ্দশায় তিনি জানতেন না, কিম্বা জানতেন কিন্তু বলেননি। যোগী যা জানে, তার সব কিছু বলে না। যতটুকু দরকার ততটুকুই বলে। আমি যা জানি সবই যদি লিখতে যাই, তাহলে যা লিখেছি তার দশগুণ দাঁড়াবে।

শুনুন কী কাণ্ড! স্বয়ং শ্রীঅরবিন্দের স্বমুখনিঃসৃত কথা : সংশয়ের তিলমাত্র পথ নেই। এই বিজ্ঞানের যুগে প্রচুর ধোঁয়ার সঙ্গে যাঁরা আমাদের আলো দিচ্ছেন তাঁদের মশাল জ্বালিয়ে তাঁরা বলবেন তাঁদের ছাড়া অন্য আলো আলেয়া। হয়ত উচ্চহাস্য করে উঠবেন, কিন্তু তারপর? আমার দুঃখ হয় এই ভেবে যে গুরুর অপ্রকাশিত জ্ঞানসমুদ্র থেকে মানবজাতি কিভাবে বঞ্চিত হয়েছে। যা দিয়েছেন তাই আগে অভ্যাস করতে বলে ছেড়ে দিলেন।

এই তাহলে আমার পত্র। এখানেই শেষ করি। একটু লম্বা হল হয়ত কিন্তু আপনার এবং আপনার পাঠকের ধৈর্যের প্রতি আশা করি ক্ষুণ্ণ হয়নি, কারণ সামগ্রীগুলি, যা আগেও বলেছি, খাঁটি হীরা। আপনার পাঠকগোষ্ঠী আশা করি এ ভুলও করবেন না যে দেহধারী বিবেকানন্দ ও বিদেহাত্মা বিবেকানন্দ এক। অথবা, বিবেকানন্দের যদি পুনরাবির্ভাব হয়, পুরনো বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর কোনো প্রভেদ থাকবে না। সেই ভুল হলে শুধু বাড়বে সঙ্কীর্ণতা প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সাম্প্রদায়িকতা। আসল সত্য চাপা পড়বে। সত্য যদি জানতে চাই, তাহলে এই বিভাজ্যবাদী মনের ভূমি ত্যাগ করে উঠতে হবে ঊর্ধ্বে একত্বের ভূমিতে, যেখানে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দে কোনো ভেদ নেই।

স্বামী বিবেকানন্দের উপর পাশ্চাত্য প্রভাব

ডঃ সরোজেন্দ্র নাথ রায়

• •

আমরা যখন স্বামী বিবেকানন্দকে স্মরণ করি তখন এই কথাটি সর্ব্বাগ্রে মনে হয় যে তিনি ভারতবর্ষকে প্রগাঢ় ভাবে ভালবেসেছিলেন—জাতিধর্ম নির্বিশেষে ভারতের অগণিত জনমণ্ডলীকে তিনি ভালবেসেছিলেন। ভারতের ধর্ম, ভারতের চিরন্তন সংস্কার, ভারতের আচার-ব্যবহার—সবারই মধ্যে তিনি শ্রদ্ধার উপাদান খুঁজে পেয়েছিলেন। ইউরোপ ও এমেরিকায় তিনি ভারতের বাণী, বেদান্তের বাণী, প্রচার করতে গিয়েছিলেন। তাঁর স্বদেশ প্রীতি এত গভীর ছিল যে অনেক সময় এমন মনে হয় যেন তিনি অন্য সভ্যতা সম্বন্ধে অন্ধ ছিলেন। প্রচলিত হিন্দুধর্ম ও আচার বিচারের মধ্যে তিনি একটি বিশেষ অর্থের সন্ধান পেয়েছিলেন ও তাঁর সমসাময়িক সমাজসংস্কারকদের কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে তাঁর সমর্থন ছিল না। এই সব দেখে মনে হয় যেন তিনি পাশ্চাত্য প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ছিলেন। কিন্তু সে ধারণা একেবারেই ভুল।

স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন ও তাঁর সহপাঠীদের উপর তখনকার হিন্দু কলেজের যে প্রভাব ছিল তা থেকে তিনি একেবারে মুক্ত ছিলেন না। তখনকার সকল উৎসাহী যুবকদের ন্যায় তিনিও কিছুদিন কেশবচন্দ্র সেনের অনুগামী ছিলেন ও ব্রাহ্ম আন্দোলনের উত্তাপ অনুভব করেছিলেন। রোমাঁ রোলাঁ বলেছেন যে তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একজন সভ্য ছিলেন। এ থেকেই মনে করা স্বাভাবিক যে ব্রাহ্মদিগের পাশ্চাত্য অনুরাগ ও প্রচলিত সংস্কারের বিরুদ্ধে অভিযানস্পৃহা হয়ত তাঁকেও স্পর্শ করেছিল। কিন্তু বিবেকানন্দের পশ্চিমী প্রীতি শুধু অনুমানের বিষয় নয়। তাঁর জীবনে তার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। তিনি নিজেই বলেছেন যে: "No one ever landed on English soil with more hatred in his heart for a race than I did for the English···There is none among you... who loves the English people more than I do now." (ইংরাজ জাতি সম্বন্ধে আমি যে ঘৃণা নিয়ে ইংলণ্ডে এসেছিলাম, তা অপেক্ষা ঘৃণা কেউ করেনি। আবার আপনাদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি নাই যিনি ইংরাজ জাতিকে আমি এখন যা ভালবাসি তার চাইতে অধিক ভালবাসেন)। ইংরাজ জাতির মধ্যে তিনি যে-সকল মহৎ গুণাবলী দেখেছিলেন তাকে তিনি তাঁর বেদান্তধর্ম প্রচারের স্বরূপে ব্যবহার করবার আশা করেছিলেন। এককালে পরাজিত ইহুদী ও গ্রীক জাতি যেমন তাঁদের বিজেতাদের মধ্যে নিজ নিজ ধর্মের ছাপ রেখে গিয়েছিলেন, তেমনি তিনিও পরাজিত হিন্দুসভ্যতার ছাপ ইংরাজী খৃষ্টীয় সভ্যতার উপর রেখে যাবেন এই সংকল্প করেছিলেন। তিনি পাশ্চাত্য দেশে প্রভূত সম্মান অর্জন করেছিলেন এই প্রশংসা ও সম্মান শুধু একতরফা ছিল না। পশ্চিমের জড়বাদকে তিনি নিন্দা করেছেন বটে, কিন্তু পশ্চিমের জ্ঞানস্পৃহা ও উচ্চ নৈতিক জীবন তাঁকে মুগ্ধ করেছে।

তিনি ছিলেন একজন হিন্দু সন্ন্যাসী,—মুণ্ডিত কেশ, গৈরিকধারী সন্ন্যাসী। কিন্তু তাঁর জীবনযাত্রা, তাঁর কর্মপদ্ধতি মোটেই ভারতীয় সন্ন্যাসীদের মত ছিল না। ভারতের সন্ন্যাসবাদ মানুষকে সংসারবিমুখ করেছে। কিন্তু বিবেকানন্দের সন্ন্যাস তাঁকে গৃহবিমুখ করেও তাঁকে একটি বৃহত্তর গৃহের কল্যাণে নিযুক্ত করেছে। তাঁর নিজের পরিবার পরিজন ছিল না, কিন্তু নিখিল ভারতের অগণিত জনমানব তাঁর পরিবারভুক্ত হয়ে পড়ল। সমস্ত ভারত—এমনকি সমস্ত বিশ্ব তাঁর সংসার হয়ে পড়ল। এই যে দৃষ্টিভঙ্গী এটি মোটেই ভারতীয় নয়। ভারতীয় সন্ন্যাসী গৃহসংসার পরিত্যাগ করে নির্জন গিরিগুহায় বা বৃক্ষতলে আত্মসাধনায় জীবন অতিবাহিত করতেন—এখনও করেন। কৌপীনবন্ত খলু ভাগ্যবন্ত—একথা এখনও আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনি। ভারতীয় সন্ন্যাসী নিজ কুলের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ শেষ করে দিয়ে পিতৃনাম পরিত্যাগ করেন ও নিজ জীবনের মৃত্যু আপনানুষ্ঠিত শ্রাদ্ধকর্মের মধ্য দিয়ে ঘোষণা করে সংসারের সঙ্গে সকল সংস্রব পরিত্যাগ করেন ও চিরবাস গ্রহণ করে দেশ দেশান্তরে পথে প্রান্তরে, বনে বা গিরিগুহায় একমাত্র ব্রহ্মসাধনায় ব্যাপৃত থাকেন। মোক্ষলাভ ব্যতীত জীবনে তাঁর আর কোন আকাঙ্ক্ষা থাকে না। বিবেকানন্দ যখন রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠ প্রতিষ্ঠিত করেন—বেদান্তধর্ম্ম প্রচারের জন্য ও মানবকল্যাণ সাধনার উদ্দেশ্যে—তখন তাঁর গুরু ভায়েরা পূর্ব্বোক্ত কারণেই তাঁর প্রদর্শিত পন্থা গ্রহণ করতে আপত্তি জানান। অবশ্য পরে তাঁরা তাঁদের মত পরিবর্তন করেন। কিন্তু এই যে রামকৃষ্ণ মিশনের গঠনপদ্ধতি, সন্ন্যাসীদের জীবনযাত্রা ও তাঁদের সংকল্প ও ব্রত সবই কি ইউরোপীয় জেসুইট সম্প্রদায়ের অনুকরণে নয়? জেসুইটগণও সংসার পরিত্যাগ করেছেন, কামিনী কাঞ্চন থেকে দূরে থাকেন। কিন্তু আবার কি সেই সংসারের কল্যাণ সাধনায় জীবন অর্পণ করেন না? এক গৈরিক বাদ দিলে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের পোষাক-পরিচ্ছদ, আহারাদি ও কার্যপ্রণালী সমস্তই এই হিতব্রতী খৃষ্টীয় সন্ন্যাসীদিগের ভারতীয় সংস্করণ বলে মনে হয় না কি? ফ্রান্স ও ইটালী ভ্রমণকালে স্বামীজী রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায় ও সনাতন হিন্দু সমাজের পূজাপদ্ধতি, ধর্মীয় সংস্কার প্রভৃতির মধ্যে একটা নৈকট্য অনুভব করেছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীতে বহু বাঙ্গালী শিক্ষিত ব্যক্তি খৃষ্ট ধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। রামমোহন রায় খৃষ্টীয় নবসংহিতার (New Testament) নৈতিক ভাবধারা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে Precepts of Jesus (যীশুর উপদেশাবলী) নামক পুস্তক প্রণয়ন করেন। তিনি মনে করেছিলেন যে বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধর্ম্ম উচ্চতর মানব বুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত কিন্তু সমাজের নিত্য কল্যাণকর্ম্মে হৃদয়কে সহজ সরলভাবে উদ্বুদ্ধ করতে যীশুর উপদেশাবলী আরও অধিক পরিমাণে সমর্থ। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ও শেষ ভাগে শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকসমাজে খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রবল আহ্বানের সম্মুখীন হন ও বহু যুবক খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু এমনও অনেকে ছিলেন যাঁরা খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করেননি কিন্তু খৃষ্টকে গ্রহণ করেছিলেন। এই সকল ভাবগত খৃষ্টানুসারীদের মধ্যে আমরা পাই কেশবচন্দ্র সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, পরমহংস রামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দকে। কেশবচন্দ্র সেন তাঁর বিখ্যাত বক্তৃতা—India asks, who is Christ? ও নানাবিধ ব্যাখ্যানের মাধ্যমে, প্রতাপচন্দ্র তাঁর গ্রন্থ, The Oriental Christ প্রভৃতি পুস্তক ও বক্তৃতার দ্বারা খৃষ্টকে এশিয়াবাসী ও ভারতীয় ভাবধারার অতি নিকটবর্ত্তী ধর্ম্মপ্রবর্তকরূপে প্রচার করতে লাগলেন ও খৃষ্টকে গ্রহণদ্বারা যে হিন্দু ধর্ম্মের সঙ্গে কোন বিরোধ হয় না বরঞ্চ হিন্দু সাধনাকে যে আরও মধুর ও মিষ্ট করে তোলা যায় সেই কথা ঘোষণা করতে লাগলেন। বুদ্ধ ও চৈতন্যের পাশে খৃষ্টকে তাঁরা স্থাপন করতে প্রয়াসী হলেন। খৃষ্টীয় ত্রিত্ব বাদ (Trinity) (পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা যে এক ও একে তিন) যা নিয়ে খৃষ্টসমাজে

বহু বাদবিতণ্ডা হয়ে গিয়েছে তার নূতন অর্থ দিলেন। বেশবের মতে এই তিন হলেন সৎ, চিৎ ও আনন্দ। যীশু যে দেবপুত্র (মানব পুত্র নয়) যা রামমোহন স্বীকার করেননি তাও তিনি গ্রহণ করলেন ও তাতে নূতন অর্থ প্রয়োগ করে যীশুকে হিন্দুর আপনার ধর্ম্ম প্রবর্তকরূপে গড়ে তুললেন।

খৃষ্টধর্ম্মের এই প্রচণ্ড আঘাত হতে কালীমন্দিরের অল্প-শিক্ষিত পূজারী ব্রাহ্মণ রামকৃষ্ণও মুক্ত ছিলেন না। তিনিও প্রতি প্রভাতে স্বকীয় অইহিন্দু দেবতাদের মধ্যে যীশুকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। অন্যান্য দেবতা ও মহাপুরুষের সঙ্গে যীশুও সমান পূজা পেতে লাগলেন। যীশুর জন্মদিন ও তিরোভাবের দিবস দুটি তাঁর কাছে পবিত্র হল ও তিনি খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীদের সঙ্গে সেই দিবসত্রয় পালন করতে লাগলেন। হিন্দুধর্ম্মের পুনরুজ্জীবনকারী বলে যাঁর পরিচয় সেই স্বামী বিবেকানন্দও সেই প্লাবনের দ্বারা কতখানি আন্দোলিত হয়েছিলেন তা তাঁর Christ, the Messenger নামক বক্তৃতায় পাই। তিনি যীশুকে দেবতা বলে স্বীকার করলেন। কিন্তু খৃষ্টানেরা যে অর্থে যীশুকে দেবপুত্র বলেন সে অর্থে নয়। খৃষ্টানেরা বলেন যে স্বর্গে ছিলেন পিতা, পবিত্রাত্মা ও পুত্র। মানবের উদ্ধারের জন্য পিতা পুত্রকে মর্ত্যে পাঠালেন। পৃথিবীতে তিনি যীশু নামে পরিচিত হলেন ও ক্রুশ কাষ্ঠে আপনাকে বলি দিয়ে মানবের পাপ সকল গ্রহণ করলেন। বিবেকানন্দ বলেন, "If I, as an Oriental, am to worship Jesus of Nazareth at all there is only one way open to me, and that is to worship Him as God and nothing else (এক জন প্রাচ্যের ব্যক্তিরূপে আমাকে যদি নাজারেথবাসী যীশুকে পূজা করতে হয়, তবে তার একটি মাত্র পথ খোলা আছে, সেটি হচ্ছে তাঁকে ভগবানরূপে পূজা করা, অন্য প্রকারে নয়।" যীশু যখন বলেন যে, "আমি ও আমার পিতা এক," তখন তার মর্ম্মার্থ আর দোহংবাদের মধ্যে তিনি সাদৃশ্য দেখলেন। যে-মহাপুরুষের মধ্যে দেবভাব পূর্ণরূপে বিকশিত তাঁকে ভগবানরূপে পূজা করতে বিবেকানন্দের কোন বাধা ছিল না।

১৮৯৯ সালে যখন তিনি ইটালী ভ্রমণ করেন তখন তিনি লিওনার্দো ডা ভিঞ্চির বিখ্যাত ছবি Last Supper (শিষ্যদের সঙ্গে যীশুর শেষ ভোজ) কে নমস্কার করবার জন্য মিলান শহরে উপস্থিত হন। সর্ব্বত্র হিন্দু পূজাপার্বণের সঙ্গে ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের উপাসনাপদ্ধতির সাদৃশ্য দেখে তিনি স্তম্ভিত হন। প্রথম যুগের খৃষ্টীয় সাধকদের আত্মত্যাগ ও ধর্ম্মের জন্য মৃত্যুবরণের মৃত্যুঞ্জয়ী কাহিনী তাঁকে ব্যাকুল করে তোলে ও শিশুযীশু ও মাতা মেরীর প্রতি ইটালীবাসীদের যে-ভক্তি তা তিনিও গভীরভাবে অনুভব করেন। সুইটজারল্যাণ্ডে থাকাকালীন পার্ব্বত্যাঞ্চলে তিনি একটি ছোট গির্জাতে গিয়ে মেরীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। তাঁর একজন ইউরোপীয় শিষ্য তাঁকে যীশু-ক্রোড়ে মাতা মেরীর একটি মূর্ত্তি দিয়ে তাঁকে যীশুর মূর্ত্তিকে আশীর্ব্বাদ করতে বলে তিনি শিশুর চরণ বন্দনা করে বলেন "আমি হৃদয় শোণিতে তাঁর চরণ ধুয়ে দিতাম—চোখের জলে নয়"—।

এই একটি বিশেষভাবে ইউরোপ বিবেকানন্দের হৃদয়কে স্পর্শ করেছিল। আরও কি ভাবে করেছিল সে বিষয়ে আমরা অনুমান করতে পারি—নিশ্চয়তার সঙ্গে বলতে পারি না। প্রবাসকালে স্বামীজী-খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে সন্ন্যাসীর বাধা নিষেধ মানতেন না। একবার খবর রটল যে তিনি গোমাংস আহার করেছেন। তাঁর ভারতীয় বন্ধু ও শিষ্যগণ এই কথা শুনে ভীত হয়ে তাঁকে চিঠি লিখলেন। তিনি ঘৃণাভরে সেই চিঠির জবাব দিলেন: "তোমরা কি মনে কর আমার জন্ম হয়েছে ঐসব তথাকথিত শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যে বেঁচে থাকতে ও মরতে—সেই সব অবিশ্বাসী, জাতিভেদ-প্রপীড়িত, হৃদয়হীন, কুসংস্কারলিপ্ত ভণ্ড কাপুরুষগণের মধ্যে"। যিনি সকল হিন্দু সংস্কারের মধ্যে একটি অন্তর্নিহিত অর্থ খুঁজে

পেয়েছিলেন তাঁর এই বিদ্রোহ কি ভারতীয় মনোভাব? না, পশ্চিমী দৃষ্টিভঙ্গী?

বিবেকানন্দের এ্যামেরিকা যাবার এক বৎসর পূর্বে সুপ্রসিদ্ধ কবি ওয়াল্ট হুইটম্যানের মৃত্যু ঘটে। এ্যামেরিকার বিবেকানন্দ যেসব লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন ইংগারসোল প্রমুখ সাহিত্যিক ও কবিবৃন্দ। বিবেকানন্দ এঁদের কাছে পেলেন হুইটম্যানের বাণী—চিত্তের মুক্তির প্রাণবন্ত বাণী—বিশ্বজনীনতার বাণী। দেশে ফিরে এসে তাঁর লীভস্ অব গ্রাস পড়লেন, পড়লেন হুইটম্যানের প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া ও মাইসেল্ফ নামক দুটি সুবিখ্যাত কবিতা যা হ'তে হয়ত তাঁর হৃদয় স্পন্দিত হয়েছিল। তাঁর বাণীর মধ্যে অবশ্য তার স্পষ্ট সাক্ষাৎ-পরিচয় পাই না। শুধু ভাবের মধ্যে—কথার ভঙ্গীর মধ্যে কিছু রেশ পাওয়া যায়।

এই সঙ্গে আরও একজন পাশ্চাত্য লেখকের কথা মনে না হয়ে পারে না। তিনি হলেন ইংলণ্ডের কার্লাইল। ইংলণ্ডের ভিক্টোরিয় যুগে ক্রমবর্দ্ধমান জড়বাদ ও নিরীশ্বর-বাদিতার মধ্যে কার্লাইল শোনালেন অতীন্দ্রিয় জগতের বার্তা। শঙ্খধ্বনির ন্যায় যে বার্তা ঘোষণা করল সেই অদ্ভুত বাণী যা আমরা ঈশোপনিষদের মধ্যে শুনতে পাই। ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ, তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্। এই বিশ্ব জগৎ ঈশ্বরের দ্বারা পরিব্যাপ্ত। তাঁর প্রসাদরূপে সব কিছু গ্রহণ কর, উপভোগ কর। অপরের কোন বস্তুতে লোভ কোর না। কার্লাইল বলেন, "The divine mystory, which lies everywhere in all Beings, the Divine Idea of the world, that which lies 'at the bottom of Appearance'... "the Universe as the realised thought of God." সত্যদ্রষ্টা কবির ন্যায় একান্ত নিঃসংশয়ের সঙ্গে এই সত্য তিনি প্রচার করলেন। সমাজসংস্কার, শিক্ষাদীক্ষা, দেশের প্রশাসন ও রাজনীতি সবই এই পরমার্থিক ভিত্তির উপর তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন। এই নিশ্চয় বিশ্বাস তাঁর সাধারণ উক্তিকেও কবিত্বের মহিমায় ভূষিত করল। বিবেকানন্দ যখন ছাত্র তখন কার্লাইলের হিরোজ ও হিরোওয়ারশিপ সর্বজন সমাদৃত ও সর্বজনপঠিত ছিল। স্বামীজীও একটা দেশের ইতিহাস যে সেই দেশের মহাপুরুষের ইতিহাস তা কার্লাইলের মতই বিশ্বাস করেছেন ও প্রচার করেছেন। তাঁর মতই উদাত্ত কণ্ঠে লোকাতীত জগতের বাণী ঘোষণা করেছেন। উভয়ের বাচনভঙ্গীর মধ্যে একটা উত্তপ্ত আন্তরিকতা ও ভবিষ্যদ্বক্তার অলঙ্ঘনীয়তার ধ্বনি পাওয়া যায়। এ হতে অবশ্য এ ধারণা করা ভুল যে একজন অপরের কাছে ঋণী। শুধু এইটুকু অনুমান করা যায় যে হয়ত কার্লাইলের আদর্শবাদ তাঁর হৃদয়কে স্পর্শ করেছিল ও কার্লাইলের আগ্নেয়গিরির বহ্নুদ্গারের ন্যায় বাকতরঙ্গ স্বামীজীর বাণীকে অগ্নিময় করে তুলেছিল।

বিপ্লবীদের জীবনে বিবেকানন্দের প্রভাব

নলিনী কিশোর গুহ

স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব—বিশেষ করিয়া স্বদেশীযুগে তথা বাংলার বিপ্লব যুগের বিপ্লবী কর্মিদের উপর কিরূপ এবং কতটা ছিল, এমন প্রশ্ন উঠিলে এক কথায় উত্তর দেওয়া যায়—বিপ্লবীদের উপর তাঁহার প্রভাব ছিল অসামান্য।

কিন্তু এই প্রভাব বস্তুতঃ কি, তাহা বুঝিতে হইলে - প্রভাব বলিতে আমরা কি বুঝি এবং বুঝিতে হইবে উহার কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক।

উনবিংশ শতকের বাংলায় রাজা রামমোহন রায়ের প্রভাব, ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব, সংস্কার যুগের প্রভাব, আবার বাংলার হিন্দুসমাজের মধ্যে আধুনিক ভাবধারার আঘাত ও আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার্থ হিন্দুধর্মের নূতন ব্যাখ্যাদানের প্রচেষ্টার প্রভাব, সব কিছুই স্মরণ করিবার। স্মরণ করিবার একটা সংঘাতের কথা। বিদেশী ইংরেজের সাহিত্য-উহার যুক্তিবাদ উহার শিক্ষা, সভ্যতা (সঙ্গে কিছুটা অসভ্যতাও) বৈষয়িক সমৃদ্ধি, উহার বিজ্ঞান আমাদের সমাজের জীর্ণ দেহে আঘাত হানিল।

শুধু রাজনৈতিক পরাজয়ই নয়—আমাদের মানসিক পরাজয়েরও সূত্রপাত হইল।

ইংরেজ প্রভু, ইংরেজ শিক্ষক আমরা শিক্ষার্থী,—ইংরেজ শ্রেষ্ঠ আমরা দুর্বল কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, এই চেতনা শিক্ষিত জনের মধ্যেও দেখা দিল। একদল মনে করিল, ইংরেজের অনুকরণ করিতে পারিলেই আমরা বড় হইব, আবার একদল মনে করিল, ইংরেজের দুর্বার প্রভাব ঠেকাইবার উপায় নাই। তাঁহারা আত্মরক্ষার্থে বিদেশী ইংরেজের সব কিছু হইতে দূরে সরিয়া গিয়া, কূপমণ্ডুকতা আশ্রয় করিয়া এই আত্মঘাতিক সভ্যতার প্রভাব এড়াইবার জন্য প্রাচীন জীর্ণ পুঁথি ও শালগ্রাম শীলা বগলে করিয়া প্রাচীন নামাবলীখানা জড়াইয়া ব্রাহ্মণীর হাত ধরিয়া অন্তঃপুরের কোন্ আশ্রয় করিল —কিন্তু পলাইতে পথ নাই - যম আছে পিছে—বিদেশী প্রভাব অন্তঃপুরেও হানা দিল। কিন্তু ভাবাদর্শের সংঘাতে গড়িয়া উঠিল যে জাতীয় সাহিত্য— তাহা রুখিয়া দাঁড়াইল। ইংরেজী শিক্ষা ভারতীয় সংস্কৃতির স্বকীয়তার পাকরসে হজম করিয়া আত্মস্থ করিয়া লইল। আবর্জনা দূর করিয়া উহার মধ্যে যাহা ছিল জীবনপ্রদায়ী সত্য, তাহা প্রভু-বুদ্ধি লইয়া গ্রহণ করিল। কিন্তু ভারতীয় ধর্ম, প্রজ্ঞা—আধ্যাত্মিকতার মহিমায় ভারতের নবজন্ম লাভের শঙ্খ ধ্বনিতে জাতির মরা গাঙ্গে বান ডাকাইল, কালাপানীতে আর প্রমাদ গণিল না, অভীঃ মন্ত্রে দীক্ষিত ভারত আর সাগর ডিঙাইতে পরোয়া করিল না। পরাজিতের মানসিকতা দূর হইতে লাগিল, আত্মসমাহিত কিরিয়া আসিয়াছে। ভারতীয় সভ্যতার যে অমৃতবাণী ছিল, তাহা লইয়া আমাদের মনীষীগণ "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ" বলিয়া বিশ্ববাসীকে ডাকিয়া বলিলেন শোন বিশ্ববাসী আমাদের আছে অমৃতের বাণী। ইহাও এক পরম বিস্ময়, পরাধীন থাকা কালেই ভারতের মনীষী পাশ্চাত্যদেশে আচার্য্যপদ লাভের মর্য্যাদা অর্জন করিলেন। জগতের ইতিহাসে এমনটি দেখা যায় নাই। স্বামী

বিবেকানন্দের চিকাগো-ধর্ম-সম্মেলনে বক্তৃতার কাল ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ।

এবার বিবেকানন্দের প্রভাবের কথাটা বিশ্লেষণ করা যাক্। বিবেকানন্দের বাণী আসলে জাতীয়তার বাণী, জাতীয় জীবনকে বলিষ্ঠ, প্রতিষ্ঠ, ত্যাগ-নিষ্ঠ করিবার বাণী।

বাণী পূর্বেও ছিল—পরেও ছিল এখনো আছে। কিন্তু বাণী গ্রহণ করিবার, বাণী ধারণ করিবার আধার না থাকিলে বাণী ভাসিয়া ভাসিয়া যায়, বাণীর উপযোগী চরিত্র গড়িয়া উঠে না। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার পরিবেশে যে বিপ্লবী স্কুলের আবির্ভাব ঘটিল—তাহা অনেকটা বাণীগ্রহণের জন্য উপযোগী ছিল, প্রস্তুত ছিল। বাংলার বিপ্লবীগণ নিঃসংশয়ে ছিলেন স্বামীজীর বাণী রূপায়িত করিবার শ্রেষ্ঠ উপাদান।

এই অনুপ্রাণিত হওয়ার কথায় স্বামীজী একটি অতি সত্য কথা তাঁহার শিষ্যা ভগ্নী নিবেদিতাকে বলিয়াছেন।

স্বামীজী বলিতেছেন: রামকৃষ্ণের মধ্যে ছিল মহান প্রেরণা, তেমনি আমার (বিবেকানন্দের) মধ্যেও ছিল প্রেরণা, তোমার (নিবেদিতার) অন্তরেও রহিয়াছে প্রেরণা, আবার তোমার পরে যারা আসিবে তাহাদের মধ্যেও থাকিবে প্রেরণা; ইহাই সত্য,—চিরন্তন সত্য। নতুবা একজন মানুষ—তিনি যত বড়ই হউন—একটা জাতিকে উদ্বুদ্ধ ও সক্রিয় করিতে পারে না।

দেশের জন্য - দেশ মাতৃকার জন্য সব কিছু ত্যাগ করিতে হইবে—স্বামীজীর এই যে বাণী এবং স্বামীজী স্বয়ং যাহার জীবন্ত বিগ্রহ - সেই বাণী বাংলার বিপ্লবীগণকে সেই যুগে ত্যাগী—ঘরছাড়া-সন্ন্যাসী করিয়াছিল। দেশের জন্য সর্বসুখ ও স্বার্থ বলি দিতে হইবে, দেশসেবার বিনিময়ে কিছুই চাই না। দেশ-প্রেম দেশ-ভক্তি নিজেই ফল-স্বরূপা। দেশের সেবা আমার ধর্ম। এই ধর্মরক্ষা করিতে পারিলেই কবির পরম আত্মপ্রসাদ; কবি এই দেশ-ভক্তি আশ্রয় করিয়া অমৃতত্ব লাভ করিয়াছেন। উহার বিনিময়ে অর্থ নয়—বিত্ত নয়, নাম নয়, যশ নয়; বিপ্লবীগণের এই চরিত্রগঠনে স্বামী বিবেকানন্দের আচরণ ধর্মী আদর্শ সামান্য কাজ করে নাই।

স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকার চিকাগো ধর্ম-সম্মেলনে ভারতাত্মার বাণী প্রচার করিলেন—তাঁহার এই পাশ্চাত্য বিজয়—ভারতবাসীর জাতীয় চেতনাকে উদ্বুদ্ধ ও বলিষ্ঠ করিয়া তুলিল। ভারতে সত্য ছিল তত্ত্ব ছিল, তাহা ছিল ভাবগত। বিবেকানন্দের মধ্যে ভারতাত্মার বাণী মূর্তি পরিগ্রহ করিল,—ভাববস্তুগত, আচরণশীল—প্রত্যক্ষ হইল। বিবেকানন্দ শুধু বাণীই দিলেন না, সেই বাণী জাতির জীবনে রূপায়িত ও কার্যকরী করিবার পন্থা নির্দেশ করিলেন। জাতি যাহা চাহিতেছিল—তাহাই যেন তরুণ বাংলা বিবেকানন্দের মধ্যে পাইয়া গেল।

মনে রাখা প্রয়োজন স্বামী বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণ ১৯০২ সালে। বাংলাদেশে বিপ্লবী চিন্তা ও বিপ্লব সংস্থা গঠনের প্রয়াস দেখা দেয় ঐ সময়ে এবং উহার পূর্ব হইতেই। বিদেশী শাসনের অবসানের জন্য গুপ্তচক্র দেখা দিল,—রাজনৈতিক বক্তৃতা জাতির বেদনার হেতু হইয়াছিল; সুনির্দিষ্ট কর্ম-পদ্ধতি তখনো দানা বাঁধিয়া না উঠিলেও - সেই পরিবেশে দেশ-প্রাণতার বীজ অঙ্কুরিত হইতেছিল। ইতিমধ্যে বিপ্লবী সংস্থা গড়িয়া উঠিয়াছিল, গুপ্ত বিপ্লবী-সংস্থা। বঙ্গ-ভঙ্গ উপলক্ষ্যে যে দেশব্যাপী আন্দোলন গড়িয়া ওঠে সংস্থাগুলি তাহা হইতে প্রভূত শক্তি সঞ্চয় করে—বাংলার যুবকগণ দলে দলে বিপ্লবী সংস্থাকে স্ফীত করিতে থাকে।

স্বামীজী ভারতীয় জাতীয়তা তথা Indian Nationalismএর নাম করিয়া কিছু প্রচার করিয়াছেন তাহা নহে; বলিয়াছেন ভারতবর্ষের কথা—দেশের কথা—ভারতের জনগণের কথা—তাহাদের সর্বাঙ্গীন উন্নতির কথা, তাহাদের শক্তির মূল উৎসের কথা ব্যাখ্যা করিয়াছেন—ভারতের ধর্ম-সংস্কৃতি-সমাজও ভারতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। বলিয়াছেন, হিন্দুধর্মকে সক্রিয় হইবার কথা - যাহাকে বলা

যাকে aggressive Hinduism—সেই কথা। স্বামীজীর হিন্দুত্ব আসলে ভারতীয়ত্ব। ভারতের ধর্ম-সংস্কৃতিকে তিনি হিন্দু-আর্য্য-ব্রাহ্ম-বৌদ্ধ হিসাবে স্বতন্ত্র করিয়া দেখেন নাই, সমগ্র ভাবে ভারত সত্তার কথা বলিয়াছেন। স্বামীজী পৃথিবী ঘুরিয়া তুলনায় ভারতের অন্তর্নিহিত সত্যকেই তিনি মহত্তর বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন। এই পুনরুত্থানের জন্য চাহিয়াছেন ইস্পাৎ কঠিন চরিত্রের যুবক. যাহারা হইবে বীরভক্ত, তপগত চিত্ত—যাহারা বীর্যবান, ত্যাগ-নিষ্ঠ—অকুতোভয়—"হনুমানের মত জয়রাম বলিয়া এক লম্ফে সাগর ডিঙাইতে প্রস্তুত।" জাতীয় চরিত্র বলিষ্ঠ করিবার বাণী ও প্রেরণাই তিনি দিয়াছেন. বাণী রূপায়িত করিবার জন্য ব্রহ্মচর্যব্রতী – ত্যাগনিষ্ঠ কর্মী যুবকদলই চাহিয়াছেন, স্বতন্ত্র করিয়া ভারতীয় নেশন্যালিজম-এর কথা বলেন নাই, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে স্বামীজী ভারতীয় নেশন্যালিজম—জাতীয়তার ছিলেন মূর্ত বিগ্রহ। এই জাতীয়তার প্রেরণা ও প্রত্যাদেশ বাংলার বিপ্লবীদের চরিত্র প্রভাবিত করিয়াছে।

স্বামীজী ব্রাহ্ম সমাজের সদস্য ছিলেন। জিজ্ঞাসু-সত্য-সন্ধানী-সদস্য। পরবর্তীকালে পরমহংসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। লক্ষ্য করিবার বিষয়—রামকৃষ্ণবাণীর ধারক-বাহক হইয়াও—দীক্ষিত শিষ্য হইয়াও তিনি ব্রাহ্ম সমাজের সদস্য-পদ ত্যাগ করেন নাই। এই সম্পর্কে একদা প্রশ্ন উঠিলে, স্বামীজী বলেন—জানিনা ব্রাহ্ম-সমাজ আমার নাম কাটিয়াদিয়াছেন কি না, তাহারা না কাটিয়া থাকিলে এখনো আমার নাম-ব্রাহ্ম সমাজের সদস্য তালিকায় রহিয়াছে। ইহা হইতে প্রমাণ মিলিতেছে তাঁহার ধর্মগত গোষ্ঠিগত ও ধর্মীয় স্বতন্ত্র চেতনা হীন, ভারতীয় সমগ্রতার সর্বগ্রাহী, সর্বগ্রাসী ঔদার্য। হিন্দু-ব্রহ্ম-আর্য্য জৈন প্রভৃতির স্বতন্ত্র ভেদজ্ঞান তাঁহার ছিল না। স্বামীজী যে জাতীয়তার মূর্ত বিগ্রহ তিনি যে বাণী প্রচার করিয়াছেন তাহার মূলে ভিত্তি ছিল আত্মক্য বুদ্ধিতে, অদ্বৈত-বাদে—এই জাতীয়তার বাণী ছিল ভাগবৎ বাণী। বাংলার বিপ্লবী নায়ক শ্রীঅরবিন্দ এই জাতীয়তা সম্পর্কেই বলেন—আমাদের এই জাতীয়তা ভাগবৎ প্রেরিত ধর্ম (Our Nationalism is a religion that has come from God) বিপ্লব-আন্দোলনের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করিয়া ১৯০৮ সালে বোম্বাই বক্তৃতায় শ্রীঅরবিন্দ বলেন : যখন সত্যই বাণী নামিয়া আসিল,—বাঙ্গালী তখন বাণী গ্রহণের জন্য প্রস্তুতই ছিল। মুহূর্তে বাঙ্গালী সেই বাণী গ্রহণ করিল।—বাঙ্গালীও সহসা আসিয়া মুক্তির পথ চিনিল।—এবং সমগ্র ভারতকে ঐ পথের সন্ধান দিয়া আহ্বান করিল : জাতির আছে দিব্য জীবন, জাতির দৈন্য দুর্গতি সত্য নয়, জাতির আছে মৃত্যুহীন জীবন, এই জীবন লাভই উহার নিয়তি, আজ বাংলা এই সত্য এবং এই বিশ্বাসের মধ্যে জীবন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

চাই জাতির সর্বাঙ্গীন উন্নতি। পরাধীনতা জাতির এই মুক্তির পরিপন্থী হইয়া রহিয়াছে. সে কথা স্বামী বিবেকানন্দের বজ্রবাণীতে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। জাতির ও দেশের সেবা করিতে হইবে, জাতির প্রতি কর্তব্য পালনের প্রতিজ্ঞা লইতে হইবে। কিন্তু এই কর্তব্য পালনের অধিকার ও সুযোগ লাভের জন্যই চাই স্বাধীনতা। অধ্যাত্মজগতে যেমন ভারত প্রভু হইবার অধিকারী, আচার্য্য পদ লাভ করিতে সক্ষম, তেমনি রাষ্ট্রনৈতিক বক্তৃতার অবসান ঘটিবে, রাষ্ট্রক্ষেত্রেও ভারত নিজের প্রভু হইবে। বিবেকানন্দের পাশ্চাত্যে দিগবিজয় বাংলার যুবকগণকে এই আত্মসাধিতে সচেতন করিল—ত্যাগী ব্রহ্মচারী স্বদেশ-প্রাণ সন্ন্যাসী সাজাইল। সে যুগে বহু বিপ্লবী কর্মি—প্রকৃত পক্ষে স্বামীজীর আদর্শে জীবন গঠন করিতে, তাঁহারই বীর বাণী জীবনে সার্থক করিতে মৃত্যুঞ্জয়ী সংকল্পে প্রস্তুতশীল হইয়া উঠিল। সাক্ষাৎ ভাবে না হইলেও, স্বামীজীর সকল-বন্ধন-ছিন্নকারী মুক্তিকামী-বীর মূর্তিই যেন গুরু. তাহারই নিকট তরুণ বাংলা লইল দীক্ষা। স্বামীজী দেশমাতৃকার জন্য যে বজ্র-কঠিন-চরিত্রের দেহ মনে বলিষ্ঠ তপগত চিত্ত, বীরভক্ত যুবকদের

কামনা করিয়াছিলেন—সেই আদর্শে জীবন গঠন করিবার জন্যই ত্যাগী ব্রহ্মচারীর জীবন তাহারা যাপন করিতেন।

শিকাগোর বক্তৃতার পর স্বামীজীর পাশ্চাত্য জগতে প্রদত্ত বক্তৃতা সমূহ ও ভারতের প্রত্যাবর্তনের পরে তাঁহার ভাষণাদি, ইতিমধ্যে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত ও প্রচারিত হইয়াছে। স্বামীজীর বিবিধ গ্রন্থ, বক্তৃতাবলী—পত্রাবলী স্বামীজীর শিষ্য শরৎ চক্রবর্তীর 'স্বামী-শিষ্য সংবাদ' হইয়া উঠিল নব-গীতা, নব-জীবনবেদ।

স্বামীজী ভারতের শক্তির সন্ধান দিয়াছেন, নব অভ্যুদয়ের জন্য জাতির সুপ্ত শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। জাতির পরাধীনতার জন্য বিদেশী ইংরেজকে দায়ী করিবার মিথ্যাকে আশ্রয় করেন নাই—জাতির পরাধীনতার হেতু ও জাতির দুর্বলতাগুলির প্রতিও জাতিকে সচেতন করিয়াছেন। আত্ম-বিচার ধর্মী সেই তিরস্কার আমরা অবশ্য-প্রাপ্য—'আশীর্বাদ' বলিয়া চিত্ত-শুদ্ধ করিয়াছি। স্বামীজী বলিতেছেন: 'হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এই মাত্র সহায়ে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতার সহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে!' সে-যুগের লঘু-সৌখিন রাজনৈতিক অধিকার-এর দাবী যে মিথ্যা,—স্বামীজীর উপরোক্ত মর্মের অগ্নিগর্ভ তিরস্কার শুধু উহাকেই ধিক্কার দিল না, মুক্তিকামী—বিপ্লবীদের মধ্যে এই প্রেরণাই জাগাইল, সর্ব দুর্বলতা পরিহার করিয়া স্বাধীনতার মূল্য দিয়াই ত্যাগ-নিষ্ঠার বীর্য-শুল্কে স্বাধীনতা অর্জন করিব।

ভারত জাতিকে মানবতার কল্যাণে পুনঃ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই স্বামীজী যুবকদের দেশ-সেবাব্রতে ব্রতী হইতে উদ্বুদ্ধ করেন। ডাকিয়া বলেন—'আগামী পঞ্চাশ বৎসর জননী জন্য ভূমিই তোমাদের একমাত্র উপাস্য হউক।' স্বামীজীর এই প্রেরণা, তাঁহার দুঃখবাদ পরিহারের প্রেরণা, 'খোল করতাল বাজিয়ে বাজিয়ে দেশটা মেয়েমানুষের দেশ হয়ে গেল,'—'তোদের ধর্ম ঢুকেছে ভাতের হাঁড়িতে, এই মর্মের কথাগুলি বাংলার বিপ্লবীদের কর্মনীতির বিষয়বস্তু হইয়া উঠিল। "জাত-পাত-ছুৎমার্গ" নামে কনফারেন্স না ডাকিয়াই —বাংলার বিপ্লবী কর্মিগণ-অস্পৃশ্যতা বর্জন—জাতিভেদ—ছুৎমার্গ পরিহার করিয়া চলিল—সমাজে উহার প্রভাব অবশ্য স্বীকার্য।

বাংলার বিপ্লবীগণের দেশের মুক্তি-সাধনা ধর্ম-সাধনারই অঙ্গ হইয়াছিল। স্বামীজীর ত্যাগমন্ত্র ও বীর্যের সাধনার আহ্বান সেক্ষেত্রে কাজ করিয়াছিল। ইহা আমরা বিপ্লবী-গণের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। পরবর্তীকালে বিপ্লবী নায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনেও স্বামীজীর প্রভাব আমরা রূপায়িত দেখিয়াছি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা সঙ্গত যে স্বামী বিবেকানন্দ কোন বিপ্লবী সংস্থা তো নয়ই, কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন না। রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বামীজী স্বয়ং মিশনের উদ্দেশ্য ও আদর্শ স্থির করেন: "The aims & ideals of the Mission being purely spiritual & humanitarian, it shall have no connection with politics." ইহার তাৎপর্য্য অনুধাবন করিলে—স্বামীজীর পক্ষে রাজনীতিক কর্মনীতি-গ্রহণের প্রশ্ন উঠে না—কোন মতলবে কাজ করা, কথা বলা তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। স্বামীজীর মন্ত্রশিষ্যা ভারত-প্রাণা ভারত দুহিতা Sister Nivedita-ভগ্নী-নিবেদিতা বাংলার তথা ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে, বলিতে গেলে চরমপন্থী আন্দোলনের সহায়তা করিয়াছেন—উহার সাফল্যের জন্য কর্ম করিয়াছেন তাঁহার এই ভারত প্রীতি অনুসরণীয়। তাঁহার আশঙ্কা হইয়াছিল তাহার গুরুদেব স্বামীজী এই জন্যে তাঁহার উপর বিরূপ হন। স্বামীজী কখনো নিবেদিতার স্বাধীন মতামতে বাধা দিতেন না তথাপি এই আশঙ্কা তাঁহার ছিল। কিন্তু নিবেদিতার এই বিশ্বাসও ছিল যে ভারতের স্বাধীনতার জন্য তিনি যে কর্ম করিয়াছেন, দেশে সেই স্বাধীনতাই গুরুদেবের ছিল কাম্য। তাঁহার কামনাই যেন তিনি রূপায়িত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অর্থাৎ লক্ষ্য এক, কর্মনীতি স্বতন্ত্র।

সাহিত্য-সাধক বিবেকানন্দ

সনৎকুমার গুপ্ত

বিগত উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর নবচেতনার ধারা বিভিন্ন দিকে প্রসারিত হয়। সাহিত্য সৃষ্টি এ যুগের এক প্রধান ঘটনা। সাহিত্য সৃষ্টিকল্পে চেতন ও অচেতন ভাবে স্বপ্রচেষ্টার প্রধান চিন্তাধারা বিভিন্ন রূপের ও ভাবের বিকাশে উদ্‌বোধিত হইয়া শুধু বাঙালী জাতিকে নয়, সমগ্র মানব জাতিকে এক কল্যাণময়ী পথে চালিত করিয়াছে। ইহার মাধ্যমে প্রচারিত বাণী সাহিত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক ধ্যান ধারণায় উদ্‌বুদ্ধ হইয়া বাঙালী মনীষীগণ নবভাবের প্রচারে সচেষ্ট হন। এই প্রচেষ্টা রামমোহন রায় হইতে উৎসারিত হইয়া দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন, বিবেকানন্দ, ব্রহ্মবান্ধব, শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতির মাধ্যমে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহাতে শুধু বাংলা দেশ নয়, সমগ্র বিশ্ব ভারতআত্মার বাণীতে উদ্‌বোধিত হইয়াছে। ইহার ফলে এক অপরূপ সাহিত্য সৃষ্টির দ্বারা অভিনব কৃষ্টির প্রচার হইয়াছে। বাংলা সাহিত্যের বিশেষ এক বিভাগে এই সাহিত্য স্থায়ী আসন প্রাপ্ত হইয়া বাঙালী জাতিকে ঐশ্বর্যশালী করিয়াছে।

বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) তাঁহার স্বল্পকালীন জীবনে বাংলা সাহিত্যের মাধ্যমে তাঁহার ভাব ও বাণী প্রচার করিয়াছেন। ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক চিন্তার সারবত্তা প্রতিষ্ঠা করে তাঁহার লেখনী অতি অল্প সৃজন করিলেও, ইহার প্রভাব অসামান্য হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য যথার্থপক্ষে সাহিত্য সৃষ্টির উদ্দেশ্য না হইলেও, অভাবিত কারণে ভাগ্যক্রমে এক সাহিত্য সৃষ্টি হইয়া বাংলা দেশ ও বাঙালী জাতিকে বিশ্বের দরবারে উচ্চ আসন প্রদান করিয়াছে।

বিবেকানন্দের রচনা প্রধানত বক্তৃতা, ভাষণ ও চিঠি-পত্রের মধ্যে আবদ্ধ আছে। রচনা সর্বজনবোধ্যরূপে গৃহীত হইবার জন্য তিনি এক অপূর্ব লিপি-কুশলতার আশ্রয় লইয়া রচনা প্রচার করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার মনোভাব এই :

"ভাষা খুব সরল হওয়া চাই। আমি আমার গুরুর ভাষাকে অনুসরণ করি। উহা যেমন চলিত ভাষা তেমনি ভাবের প্রকাশক। ভাষা এমন হওয়া চাই যাহাতে ভাব অবাধে প্রকাশ পাইতে পারে।"

গদ্য রচনায় তিনি কথারীতির আশ্রয় লইলেও, তাহা অতি হৃদয়গ্রাহী ও মনোরম হইয়াছে। কাজেই বিবেকানন্দকে বাংলা সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য সাধকরূপে গণ্য করিতে পারি।

বিবেকানন্দের বাংলা রচনাবলী অতি অল্প। এই অল্প রচনা প্রতিভার দীপ্তিতে উদ্ভাসিত। বাঙালীর জাতীয় সাহিত্যের তালিকার মধ্যে এগুলি ভাস্বর। তাঁহার রচনাগুলি প্রবন্ধে, আলাপ-আলোচনায়, ভাষণে, চিঠিপত্রে ও সংগীতের মধ্যে প্রকাশ হইয়াছে। তাঁহার 'ভাববার কথা,' 'বর্তমান ভারত,' 'পরিব্রাজক,' 'পত্রাবলী,' 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য,' 'বীরবাণী' 'স্বামীশিষ্য সংবাদ' প্রভৃতি রচনার লাবণীল ভঙ্গিতে স্বতঃউৎসারিত। এগুলি বাঙালী পাঠকের নিকট অজানা নয়।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য' লইয়া বহু মনীষী নানাভাবে আলোচনা করিয়াছেন। স্বামীজি কি ভাবে এই মহাকাব্যটিকে বাঙালীর নিকট উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহা বর্তমান পাঠককে উপহার দিতেছি :

"ঐ একটা অদ্ভুত genius (মনস্বী ব্যক্তি) তোদের দেশে জন্মেছিল। মেঘনাদবধের মত দ্বিতীয় কাব্য বাঙ্গালা ভাষাতে ত নাই-ই সমগ্র ইয়ুরোপে অমন একখানা কাব্য ইদানীং পাওয়া দুর্লভ।

"তোদের দেশে কেউ একটা নূতন করলেই তোরা তাকে তাড়া করিস। আগে ভাল করে দেখ, লোকটা কি বলছে, তা না—যাই কিছু আগেকার মত না হল, অমনি দেশের লোকে তার পিছু লাগল। এই মেঘনাদবধ কাব্য—যা তোদের বাঙ্গালা ভাষার মুকুটমণি—তাকে অপদস্থ করতে কিনা ছুঁচোবধ কাব্য লিখা হ'ল! তা হয় পারিস লেখ না, তাতে কি! সেই মেঘনাদবধ কাব্য এখনও হিমাচলের ন্যায় অটলভাবে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তার খুঁত ধরতেই যারা ব্যস্ত ছিলেন, সে সব critic-দের (সমালোচকদিগের) লেখাগুলো কোথায় ভেসে গেছে! মাইকেল নূতন ছন্দে, ওজস্বিনী ভাষায় যে কাব্য লিখে গেছেন—তা সাধারণে কি বুঝবে।"

পরবর্তী কালে বিবেকানন্দের ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মবান্ধব প্রভৃতি মনীষীগণ বাঙ্গালীকে ভাবের বন্যায় ভাসাইয়া দেন। বাংলার স্বদেশী যুগের (১৯০৫-১৯১২) বিপ্লব আন্দোলনে এই রীতির ধারা বাঙালীর জাতীয় জাগরণের দিনে বাঙালীকে উদ্বুদ্ধ করে। ব্রহ্মবান্ধব তাঁহার 'সন্ধ্যা' ও 'যুগান্তর'কে এই ভাষায় চালিত করতেন। এমন কি এই সময়ে প্রকাশিত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' (১৯০৬) এক উল্লেখযোগ্য রচনা।

বিবেকানন্দ সংগীত রচনাতেও অগ্রণী ছিলেন। তাঁহার রচিত সংগীত প্রধানতঃ আধ্যাত্মিক ভাব লইয়া গঠিত। এই সংগীত রচনায় তিনি প্রধানতঃ ভাবের আশ্রয় লইয়াছেন।

বিবেকানন্দ প্রধানত ধর্মপ্রচারকরূপে পরিচিত হইবার ফলে তাঁহার সাহিত্য সাধনার যোগ্য বিশেষ স্বীকৃতি এ যাবৎ প্রাপ্ত হন নাই। তিনি সারা জীবন মানবের বিবিধ কল্যাণ ব্রতে ব্রতী হইবার ফলে এই বিস্মৃতির কারণ হইয়াছেন। বাংলার ধর্মক্ষেত্রে ও সমাজজীবনে প্রাণসঞ্চারকল্পে ও সৃষ্টিমূলক ভাবধারার প্রতিষ্ঠায় তাঁহার এই সাহিত্য সৃষ্টি সহায়ক হইলেও তিনি তাঁহার প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন।

ধর্মের বেদীতে অনেক সাহিত্য প্রচেষ্টা আত্মবলিদান দিয়াছে। বহু প্রতিভাবান সাহিত্যিক ধর্ম-উপদেষ্টারূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সাহিত্য-জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। আমাদের দেশে এ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতির সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দও মহান ভবিষ্যৎ হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। তাঁহাদের স্বল্প পরিমাণ রচনা লইয়া আমাদের পরিতৃপ্ত হইতে হইতেছে, ইহাই আমাদের দুর্ভাগ্য।

অগুনতি দেশের জন্য
প্রাণ উৎসর্গ করেছেন
আর আপনি?

স্বামী বিবেকানন্দ স্মরণে

শান্তি সেন রচিত

১

মহান সাধক বীরেশ্বর ধীর।
প্রণাম লহগো সারা পৃথিবীর।
ধর্ম মহাসভা চিকাগো শহরে।
জাগাল প্রেরণা তোমার অন্তরে।
গুরুর চরণ করিয়া স্মরণ।
বহুবাধা বিঘ্ন করিয়া লঙ্ঘন।
বিশ্বের সেরা মনীষিরা যেথারাজে।
লভিলে আসন সেই সভা মাঝে।
তার পর যবে এল আবাহন।
তরুণ বক্তার শঙ্কাকুল মন।
প্রণাম করিয়া গুরুর চরণ।
হিন্দুর মহিমা করিলে ঘোষণ।
শুনিয়া তোমার নব সম্ভাষণ।
'আমেরিকাবাসী যত ভাই বোন।'
মাতিয়া উঠিল নর নারী দল।
হল সাধুবাদে পূর্ণ সভাস্থল।
তব সৌম্যমূর্তি উদাত্ত বচন।
মুহূর্তে জিনিল সকলের মন।
ও মুখের বাণী করিতে শ্রবণ।
আকুল হইল যত সভ্যগণ।
বেদান্তের মহা গৌরব ব্যাখ্যায়।
চমকিত করি সে মহাসভায়।
মাথায় পরিলে জয়মালাখানি।
ঘুচাইলে হিন্দুধর্মের গ্লানি।
হে মহা সাধক জনমভূমির।
গলে জয়মাল্য দিলে ধরণীর।

২

পারে নাই মায়া বাঁধনে বাধিতে।
মোহের কালিমা তোমায় ঢাকিতে।
চির ব্রহ্মচারী ব্রতে তব দীক্ষা।
সম্মুখেতে এল কঠিন পরীক্ষা।
মহসা আসিয়া যবে বিদেশিনী।
নিবেদিল প্রেম রূপসী কাহিনী।
জীবন যৌবন সম্পদ বিভব।
যাহা ছিল তার সমর্পিল সব।
সস্মিত আননে বলিলে তাহারে।
জীবনের সত্য বলি আপনারে।
এ জগতে আছে যতেক রমণী।
সবাকারে আমি মাতা বলে গণি।
শুনিয়া তোমার অপরূপ বাণী।
পড়ে পদতলে বিস্ময় মানি।
পাশ্চাত্য জগতে হল কানাকানি।
কেহ শোনে নাই এমন কাহিনী।
যেত নর নারী দলে দলে আসে।
তব উপদেশ শুনিবার আশে।
শুনিয়া তোমার হিন্দুধর্ম ব্যাখ্যা।
বহুজন মাগে তব কাছে দীক্ষা।
কার্য শেষে যবে ফিরে এলে দেশে।
যেত শিষ্য শিষ্যা তব সাথে এসে।
এ পুণ্য ভূমির স্বষ্টি ও ধরম।
শিখিয়া লভিল নবীন জনম।
তব পদে সব করি সমর্পণ।
তারাও হইল ভারতের জন।

৩

বিস্মিত বিমুগ্ধ দেশবাসী সবে।
বরি নিল তোমা বিপুল গৌরবে।
ও মুখ নিঃসৃত অমৃত বচন।
শুনিল তোমার উদাত্ত ভাষণ।
ওঠো জাগো লভ এই দিব্যজ্ঞান।
তোমরা সকলে অমৃত সন্তান।
বিভুপদে রাখি অচলা ভক্তি।
মনেতে জাগাও সাহস ও শক্তি।
নশ্বর এ দেহে অমর যে আত্মা।
মনে রেখ সদা এই মহা বার্তা।
কেন ভাব মনে তুমি অতি হীন।
বিশ্বের সভায় নহ তুমি দীন।
আধ্যাত্মসম্পদে যেবা অধিকারী।
সে-ই শ্রেষ্ঠ নর দেখহ বিচারি।
অতএব হও সংকল্পেতে স্থির।
ঘুচাইব দুঃখ স্বদেশবাসীর।
অধম অন্ত্যজ পাপীতাপী জন।
দরিদ্র হলেও তারা নারায়ণ।
ভগবৎ-পূজা দরিদ্রের সেবা।
এই মহাব্রতে আপনারে যেবা।
নিয়োগ করিতে পারে একেবারে।
ভগবান কোলে তুলে নেন তারে।
জপ তপ আর দেব আরাধনা।
মোক্ষ লাভের কত না সাধনা।
তাহাও ছাড়িব হলে প্রয়োজন।
দরিদ্রই হবে মোর নারায়ণ॥
চাহিনা মুক্তি সেবাধর্ম সার।
সেবা হতে শ্রেষ্ঠ কিছু নাহি আর।

৪

নব ধর্ম বাণী করিয়া প্রচার।
হে বরেণ্য পুত্র দেশ মাতৃকার।
নশ্বর এ দেহ ত্যজি হেলা ভরে।
তব দিব্যধামে চলে গেলে ফিরে।
শত বর্ষ পূর্বে জন্মেছিলে হায়।
পুনরাবির্ভাবের লগ্ন বয়ে যায়।
ফিরে এস তুমি নর নারায়ণ।
আবার ভারতে কর আগমন।
ব্যথিত তাপিত আর্ত-হাহাকার।
ধরণী পারে না সহিতে যে আর।
তব উপদেশ তব দেব বাণী।
বিশ্বের অন্তরে আজ দাও আনি।
হিংসার জগতে শান্তির যুগ আন।
শুচি হয়ে ধরা করুক মুক্তি স্নান।
তুমি সত্য তুমি শিব ও সুন্দর।
মহামানবের শঙ্কা দূর কর।

---

* কবিতাটির রচয়িতা লন্ডনস্থিত লোকান্তরিতা পান্থি সেন, ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের কন্যা। শ্রদ্ধেয় বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের জন্য ডাঃ মজুমদারের নিকট হইতে প্রাপ্ত এই কবিতাটি সাদরে আমরা এখানে প্রকাশিত করলাম। ঃ সঃ

শৃঙ্খলা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা আর সর্ব্বসমর্পণ
প্রতিরক্ষা তরে আজ এই প্রয়োজন।

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র সাহিত্য

সুদেব চৌধুরী

পত্র এবং সাহিত্যের স্বভাবে মৌলিক পার্থক্য আছে। সন্দেহ নেই, দুয়েরই প্রেরণা রচয়িতার আত্মপ্রকাশের আকাঙ্ক্ষায়। তবু বাষ্টির মধ্যে আনন্দ-বাসনাকে বিশ্বের অভিমুখে প্রসারিত করার সাধনায় সাহিত্য যেখানে তন্ময়, পত্রের একমাত্র প্রয়াস সেখানে ব্যক্তির সুখদুঃখ রাগ-অনুরাগ, দ্বেষ-প্রীতি সবকিছুকেই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দ্বিতীয়তর কোণে এক বা একাধিক জনের কাছে অনাবৃত প্রকাশ দানের। সাহিত্যের মা যেমন করে কাঁদে, তা বাস্তব মায়ের মতো নয় একেবারেই, তবু—রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন,—এ দুই-ই সত্য। অর্থাৎ, ব্যক্তি মায়ের অন্তরে শোকযন্ত্রণা যে অব্যাহত অভিব্যক্তি এবং আত্মস্থতা নিয়ে আসে, তার আত্মিক পরিস্থিতি সাধন করে তবেই 'সাহিত্যের মায়ের ক্রন্দনের' সর্বজন-বেদ্য রূপরূপ রচনা সম্ভব। প্রথমটির অনুভব এক সীমিত নিভৃত পরিবেশে একান্ত শোক বেদনাবিদ্ধ,—দ্বিতীয়টি মূলত ব্যক্তি-ক অনুভবের বেদনা-সম্ভব হলেও, পরিণামে বিশ্বজনীন করুণ-রসের উপভোগ্যতা অর্জন করে,—সেখানে তা অনির্বচনীয় আনন্দের আকর।

নিজের সাহিত্য-সৃষ্টি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন :—

এ জীবনে আমি গাহিয়াছি বসি অনেক গান
পেয়েছি অনেক ফল ;
সে আমি সবারে বিশ্বজনারে করেছি দান
ভরেছি ধরণীতল।"[১]

—কবি বা শিল্পী একথা কেবল তখনই বলতে পারেন, যখন সৃষ্টির মূল ভূমি থেকে নিজের ব্যক্তিগত প্রকৃতিকে তিনি সম্পূর্ণ পরিস্রুত (sublimate) করতে সক্ষম। কিন্তু, কোনো পত্র লেখকই কৃত্রিম না হয়ে নিজের সেবা থেকে নিভৃততম ব্যক্তিগত আশাআকাঙ্ক্ষা, তথা নিজের অ-দ্বিতীয় ব্যক্তি-চরিত্রকে গোপন করে রাখতে পারেন না। সাহিত্য বিশ্বের জন্য প্রজাপতি-স্বরূপ শিল্পি আত্মার সৃষ্টি,—পত্র ব্যক্তির কাছে ব্যক্তির একান্ত নিবিড় সংগোপন আত্ম-উন্মোচন।

তবু সুবৃহৎ যে সব ব্যক্তিত্বের গহনে কালজয়ী সৃষ্টির প্রেরণা রয়েছে, তাঁদের পত্রের অভ্যন্তরেও সাহিত্যের এক পৃথক আস্বাদনীয়তা বিদ্যমান। সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কৌতূহল জীবনকে ঘিরে। সেই মৌলিক প্রেরণাবশেই মানুষের ব্যক্তি অথবা সমষ্টি-জীবনের গোপন গভীর পথে তার নিয়ত অভিসার। যে-সব ব্যক্তিজীবনের গহনে স্বয়ং বিশ্বশিল্পীর অপরূপ সৃজনশৈলী ইতিহাসের বিস্ময়-পুঞ্জিতজীবনভূতি ধারণ করেছে, সেই সকল ব্যক্তিত্বের অন্তর্লোকে প্রবেশ করতে পারার এক অনির্বচনীয় আনন্দ রয়েছে। এ যেন সৃষ্টির নেপথ্যবর্তী গোপন নির্মাণশালায় প্রবেশ করে অদৃশ্যকে দেখে আসতে পারার অকরুনীয় চরিতার্থতায় পুলকিত।

মানব-বিশ্বে বিধাতার আত্মসৃষ্টির আনন্দ যে-সব একক ব্যক্তিত্বের চারপাশে সামগ্রিক ব্যঞ্জনা লাভ করেছে, স্বামী বিবেকানন্দ নিঃসন্দেহে তাঁদের অন্যতম। হিমালয়ের দুর্গম চূড়ায়, কন্দরে, গিরিপথে স্বামিজী যখন আত্মসন্ধানের উৎকণ্ঠায় অস্থির পদযাত্রারত, তখন অপরিচিত কোনো পথিক তাঁকে

প্রথম দেখেই নাকি সবিস্ময়ে বলে উঠেছিলেন 'শিব'। রোলাঁ এই ঘটনার তাৎপর্য নির্দেশ করে লিখেছেন,—"তাঁহার অনির্বাচিত দেবতা যেন তাঁহার ললাটে নিজের নামটি লিখিয়া দিয়াছিলেন।" স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ দেব প্রথম সাক্ষাতেই জোড়হাতে নরেনকে 'পুরাতন ঋষি, নরূপী নারায়ণ' বলে সম্ভাষণ করেছিলেন। এই সকল ঘটনার অলৌকিক মহিমা পরিহার করে নিছক মানবিক দৃষ্টিতেও বলা চলে, স্বামিজীর ব্যক্তিত্বের গহনে তাঁর স্রষ্টার ইচ্ছা এক সর্বাবয়ব সম্পূর্ণ অভিব্যঞ্জনা লাভ করেছিল। অথচ, তাঁর নিজের চেতনায় সেই আত্ম-পরি[illegible]অনাবৃত ছিল না। এখানেই বিধাতার হাতে চকিত হয়ে উঠেছে শিল্পীর অপরূপ কলাকৌশল,—সৃষ্টিগভীরে স্রষ্টার আত্মসংহরণের—আত্মগোপন ক্ষমতার আনন্দদীপ্তি। যার চৈতন্যের পূর্বপাঠে যে মানুষটি অনির্বাণ আলোকশিখা বহন করে ফিরছেন, তাঁরই ব্যক্তিত্বের সচেতন পটভূমিতে অন্ধকার অপসারণের দুঃসাধ্য তপস্যা, কৃচ্ছ্রসাধনা ও আত্মদাহ এক মনপনের বিস্ময়ের সৃষ্টি করে।

"কোনো মহাপুরুষের জীবনে যে এমন সব অংশ থাকিতে পারে যাহার অর্থ সেই মহাপুরুষ নিজেই বুঝেন না" একথা ভগিনী নিবেদিতা পুনঃ পুনঃ অনুভব করেছেন তাঁর গুরুর প্রসঙ্গেই। তিনি আরো লিখেছেন,—"আমার ভারতবর্ষে পদার্পণের মুহূর্ত হইতেই আমি এই সমস্ত ব্যাপারের অন্তরালে নিহিত একটি সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত বস্তু দেখিতে পাইলাম।... ইহা আমার গুরুদেবের নিজ ব্যক্তিত্বের জালবদ্ধ সিংহবৎ পুনঃ পুনঃ ব্যর্থ চেষ্টা ও তজ্জনিত দুঃসহ ক্লেশ।"[৪] ব্যক্তির জীবনে এ যন্ত্রণা ইতিহাসের আত্মসৃষ্টির সূতিকা-যন্ত্রণা,—যে যন্ত্রণার বিবশতাতে অন্ধকারের উৎস থেকে আলোক-তীর্থের পথে কেবলই চলেছে মানবসত্তার দেশকালাতীত সার্বিক অভিসার। দেশ-কাল-পাত্রসীমিত ব্যক্তিজীবনের গোপন কন্দরে ইতিহাসের সার্বিক প্রাণ-প্রকৃতিকে উপভোগ করতে পারার তৃপ্তিতেই বিবেকানন্দের পত্রাবলীর সাহিত্যিক উপভোগ্যতা আস্বাদনীয়তা,—মানবিক কৌতূহলের সহৃদয়তার বুকে যার বিকাশ। এই তাৎপর্যে প্রতিভার অন্তর্নিহিত ব্যক্তিত্বের মুহুর্ত উন্মোচনই বিবেকানন্দের পত্রসাহিত্য আলোচনার প্রায় একমাত্র সফলশ্রুতি হতে পারে।

বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্বের মধ্যে যে আত্মসংঘর্ষ তাঁর নর-জীবনের 'শেষ শান্ত মুহূর্তটি পর্যন্ত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত ছিল,' —তারই প্রসঙ্গে ভগিনী নিবেদিতা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সংবাদের সেই ঐতিহাসিক কাহিনীটি স্মরণ করেছেন—গুরু একদা শিষ্যকে তাঁর জীবনের সর্বোচ্চ অভিলাষ ব্যক্ত করতে বললে, বিবেকানন্দ দ্বিধাহীন কণ্ঠে উচ্চারণ করেছিলেন 'সর্বদা সমাধিস্থ থাকা।' গুরু তখন স্নিগ্ধ হাস্যে কেবল বলেছিলেন, "বাবা, আমি মনে করিয়াছিলাম যে তুমি আরও কিছু বড় অধিকার লাভের জন্য জন্মিয়াছ।" নিবেদিতা লিখেছেন "উক্ত মুহূর্তটি যে শিষ্যের জীবনে একটা নূতন যুগ-প্রবর্তন করিয়া দিয়াছিল ইহা বুঝিতে বোধ হয় কাহারও বিলম্ব হইবে না।[৫] একথাও বুঝতে বিলম্ব হওয়া উচিত নয় যে, ঐ মুহূর্ত থেকেই বিবেকানন্দের ব্যক্তি চিত্তে আত্মখণ্ডন ও আত্ম আবিষ্কারের আলোড়ন উদ্ঘাটিত হয়ে উঠেছিল; —নিবেদিতা যাকে বলেছেন চিত্তবৃত্তির সংঘর্ষ। বিবেকানন্দের ব্যক্তিস্বভাবের আকাঙ্ক্ষা নির্বিকল্প ভাব সমাধি; আর তাঁর গুরুর ইচ্ছা, "আমার ওকে দিয়ে যে অনেক কাজ করিয়ে নিতে হবে।"[৬] বিবেকানন্দের মৌলিক দ্বন্দ্ব আত্মস্বভাবে অদ্বৈতসাধক সন্ন্যাসী সংঘে দীক্ষাদীপ্ত কর্মযোগীর। ফলে একদিকে অনন্ত-বিচিত্র কর্মের আবর্তে যেমন কেবলই তাঁর বিশ্ব-পথিক প্রতিভা জড়িয়ে পড়েছে,—তেমনি আনুষঙ্গিক ভার বোধে ক্ষণে ক্ষণে পীড়িত বিষণ্ণ হয়েছে তাঁর ব্যক্তি-বাসনা। আমেরিকায় অবিরাম কর্মতরঙ্গ যখন দিনে দিনে দুরূহতা অতিক্রম করে চলেছে, বক্তৃতার পর বক্তৃতার ঝড় উঠছে, তেমনি এক দীপ্ত লগ্নে কোনো আমেরিকান্ বন্ধুকে লিখছেন,—"হায়! যদি কয়েক বৎসরের জন্য আমি নির্বাক

হইতে পারিতাম এবং মোটেই আমাকে কথা বলিতে না হইত। বস্তুতঃ এই সকল পার্থিব বন্ধের জন্য আমি জন্মগ্রহণ করি নাই। আমি স্বভাবতই কল্পনাপ্রবণ ও কর্মবিমুখ। আদর্শবাদী হইয়াই আমি জন্মিয়াছি এবং স্বপ্ন রাজ্যেই আমি বাস করিতে পারি। জাগতিক বিষয় সমূহ আমাকে উত্যক্ত করিয়া তোলে এবং আমার দুঃখের কারণ হইয়া থাকে। কিন্তু প্রভুর ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে।"[৭]

এ-বেদনা পরিব্রাজক জীবনের সূচনা লগ্ন থেকেই বিবেকানন্দের ব্যক্তি ভাবনাকে খণ্ডিত, ব্যথার্ত করেছে বারে বারে। পূর্বোদ্ধৃত চিঠিটির তারিখ ১৮৯৪ খ্রীস্ট সালের ১৫ই মার্চ। প্রতিভা তখন তার সৃজনীশক্তির মধ্যগগনে। কিন্তু, প্রাগন্ধকার যাত্রারম্ভের প্রথমে উষার অস্ফুট আলোক চৈতন্যলোকে ফুটেও যখনও ফোটেনি তখনও উদীয়মান কর্ম-যোগীর কণ্ঠে শুনি মুমুক্ষু বৈরাগিক সন্ন্যাসীর বিকল বিষণ্ণ আর্তি—"আপনি জানেন না—কঠোর বৈরাগ্যের মত সত্ত্বেও আমি অত্যন্ত নরম প্রকৃতির লোক। উহাই আমার সর্বনাশ করিতেছে। একটুতেই এলাইয়া যাই, কত চেষ্টা করি যে, খালি আপনার ভাবনা ভাবি। কিন্তু বারংবার পরের ভাবনা ভাবিয়া ফেলি।"[৮]

নিবেদিতা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্বে "এই সংঘর্ষ কিসের জন্য? উহা কি যাহাকে তিনি "মনবুদ্ধির অগোচর" বলিতেন, তাহাকেই সাধারণ জীবনে বহন করিয়া আনার চেষ্টা-প্রসূত?"[৯] বিবেকানন্দের পত্র এ-জিজ্ঞাসার ইতিবাচক উত্তর অসংশয়িত করে তোলে। একদিকে "আনন্দ-স্বামী" বৈরাগিক সন্ন্যাসীর আত্মার অবাঙ্‌মনসো-গোচর-এর জন্যে আধ্যাত্মিক উৎকণ্ঠা,—আবার সেই তপস্যা লোকের সকল দিব্যদ্যুতি নিজের মধ্যে সংহরণ করে বৃহত্তর কর্মযোগ-সাধনায় প্রয়োগ করার ব্যক্তিক সমস্যাই বিবেকানন্দের প্রতিভায় ঝড়ের দোলা সৃষ্টি করেছিল। সন্দেহ নেই, প্রাচ্য-প্রতীচ্যে এই ঝড়ের ফল-পরিণাম প্রশান্ত পূর্ণতায় উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতি রেখে গেছে।

এই পদ্ধতিরই অনুষঙ্গ সৃষ্টিলীলার এক অপরূপ রহস্যানুভব অনিবার্য হতে পারে। নিজের দেশ-কালের ভারতবর্ষে বিবেকানন্দ ছিলেন এক নবীন উপলব্ধি বিশ্বাসের সার্থক পথিকৃৎ। রবীন্দ্রনাথের কথায়, তিনি "পূর্ব ও পশ্চিমকে দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া মাঝখানে দাঁড়াইতে পরিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে পাশ্চাত্যকে অস্বীকার করিয়া, ভারতবর্ষকে সংকীর্ণ সংস্কারের মধ্যে চিরকালের জন্য সঙ্কুচিত করা তাঁহার জীবনের উপদেশ নহে। গ্রহণ করিবার মিলন করিবার, সৃজন করিবার প্রতিভাই তাহার ছিল।"[১০] এ প্রতিভা নিঃসন্দেহে স্রষ্টার। কিন্তু, নিজ সৃজনীশক্তির রহস্যদ্বারের চাবিকাঠি তাঁর সজ্ঞান-চেতনার গোচর হয়নি প্রায় কখনোই;—শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রার্থিত কোনো "মায়াশক্তির আবরণই এর কারণ কিনা জানা নেই, বর্তমানে সে প্রসঙ্গ অবান্তরও। কিন্তু, এই উপলক্ষেই মনে হয়, স্রষ্টা বিবেকানন্দ আরো কোনো এক নেপথ্যবর্তী রহস্যশক্তির হাতে কেবলই হয়ে উঠেছেন—নিত্য নূতন করে,—নিজের অগোচরেই এগিয়ে চলেছেন এক অস্ফুট পরিণামের পথে,—নিজের স্রষ্টার হাতে তিলে তিলে হয়ে ওঠার আত্মদাহী জীবন-যজ্ঞই বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক সৃষ্টি-রূপ ধারণ করেছে। প্রতিভার বিশ্ব-রচনার পরিমাপ ও পরিচয় ছড়িয়ে আছে ইতিহাসের পৃষ্ঠায়, বিবেকানন্দের অসংখ্য বক্তৃতাবলী ও গ্রন্থাদির মধ্যে। কিন্তু স্বয়ং স্রষ্টার সৃষ্টি কি করে হয়েছে তিলে তিলে,—তার গোপন রহস্য নিহিত রয়েছে চিঠিগুলির মধ্যে। সেখানে ক্ষণে ক্ষণেই দেখি প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব আন্তরিক সংঘর্ষের দুঃসহ্যপ্রাণ বাধার মুখে ক্ষণে ক্ষণে কেমন উত্তপ্ত হয়ে উঠেছেন—আবার পরমুহূর্তে পথ খুঁজে পেয়েই নীত আনন্দে স্রোতের বাধা ঠেলে উজান পথে চলেছে এগিয়ে। পূর্বোদ্ধৃত প্রথম পত্রেই স্বামিজী লিখেছেন, "প্রভুর ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে।" আরো

অসংখ্য পত্রে বারে বারে সে কথার উল্লেখই করেন নি,—এক একটি উপলব্ধি ও প্রত্যয়ের তরঙ্গ মনশ্চৈতন্যের একটি করে আবরণ যখনই খুলে দিয়েছে তখনই দীপ্ত হয়ে উঠেছেন, চারপাশের পরিবেশকে করে তুলেছেন প্রদীপ্ততম।

এক চিঠিতে লিখেছেন,—"এই ।৩৷ যে রামকৃষ্ণের ছেলে, সে আপনার ভাল চায় না, 'প্রাণাতায়েঽপি পর-কল্যাণচিকীর্ষবঃ' তাঁরা।···তাঁর চরিত্র, তাঁর শিক্ষা, বর্ষ চারি দিকে ছড়াও—এই সাধন, এই ভজন, এই সাধন, এই সিদ্ধি। উঠ, উঠ, মহাতরঙ্গ আসছে, Onward, Onward, মেরেধড় আচণ্ডাল সব পবিত্র তাঁর কাছে—Onward, Onward. নাস্যো সময় নাই, যশের সময় নাই, মুক্তির সময় নাই, ভক্তির সময় নাই, দেখা যাবে পরে। এখন এগুতে অনন্ত বিস্তার, তাঁর মহান চরিত্রের, তাঁর মহান জীবনের, তাঁর অনন্ত আত্মার।····· যেখানে তাঁর নাম যাবে, কীটপতঙ্গ পর্যন্ত দেবতা হয়ে যাবে, হয়ে যাচ্ছে, দেখেও দেখছ না? এ কি ছেলে খেলা, এ কি জাঠামি, এ কি চেঙড়ামি—উত্তিষ্ঠত জাগ্রত, হয়ে হয়ে। তিনি পিছনে আছেন। আমি আর লিখ্‌তে পারছি না—Onward, এই কথাটা খালি বলছি, যে-যে এই চিঠি পড়বে, তাদের ভিতর আমার spirit আসবে, বিশ্বাস কর। Onward, হয়ে হয়ে। চিঠি বাজার করো না। আমার হাত ধরে কে লেখাচ্ছে; Onward, হয়ে হয়ে। সব ভেসে যাবে—হঁসিয়ার—তিনি আসছেন। যে-যে তাঁর সেবার জন্য—তাঁর সেবা নয়—তাঁর ছেলেদের—দরিদ্রসুযো, পাপীতাপী কীট পতঙ্গ পর্যন্ত তাদের সেবার জন্য যে যে তৈয়ার হবে, তাদের ভেতর তিনি আসবেন—তাদের মুখে সরস্বতী বসবেন,—তাদের বক্ষে মহামায়া মহাশক্তি বসবেন।···আমি আর লিখ্‌তে পারছি না, বাকি তিনি নিজে বলুন যে।"[১১]

এ বাণী অনুপ্রেরিতের,—মহাসরস্বতীর,—মহাশক্তি প্রতিভার বেণী-মূলে যত-স্ফূরিত হচ্ছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ অথবা মহাশক্তি রূপে বিশ্বের অরূপ বিধাতা এখানে বিবেকানন্দের সৃষ্টি-রথের সারথী। বিধাতার সৃষ্টি-বিধানে মানুষের হাত দিয়েই,—তাঁর আত্ম-বিকাশের মাধ্যমে তিলে তিলে প্রস্ফুট হয়ে ওঠে। তাঁর বিধি-বিধানের দণ্ডমুণ্ড প্রত্যেকের হাতে সমর্পিত,—কিন্তু সৃজনী-শক্তির সেই লীলাদণ্ড প্রাণচঞ্চল হয়ে ওঠে একমাত্র যুগন্ধর প্রতিভারই শক্তিতে। এই প্রতিভার শক্তি অনেকাংশেই বহির্গ্রাহ্য নয়। প্রায় সর্বাংশেই প্রতিভাধরদের আত্মস্থতার অব্যবহিত সম্পদ। প্রতিভাকে বলা হয়েছে —অ-পূর্ববস্তু নির্মাণক্ষমাপ্রজ্ঞা'। সেই প্রজ্ঞালোকের তলায় অসংজ্ঞানতার আবরণ মুক্ত হয়ে নিম্নস্থ চৈতন্যের জগৎ উপলব্ধি-সম্ভাতায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তখন ব্যক্তিমানুষ নিজের অন্তর্নিহিত স্ব-চেতনায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে স্রষ্টার ভূমিকা গ্রহণ করে। প্রত্যেক সার্থক সৃষ্টিই আত্মসৃষ্টি,—আত্ম আবিষ্কারের আনন্দই সকল সৃষ্টির একমাত্র অনুপ্রেরণা। এই তাৎপর্যেই ওপরের পত্রাংশও অনুপ্রেরিতের,—স্ব-স্ব বোধির সৃষ্টি। একটি পত্রে স্বামিজী বলেছেন,—"আমি লিখিতেও পারি না, বক্তৃতা করিতেও পারি না, কিন্তু আমি গভীরভাবে চিন্তা করিতে পারি আর উহার ফলে যখন উদ্দীপ্ত হই তখন বক্তৃতায় আমি অগ্নিবর্ষণ করিতে পারি।"[১২] এই উদ্দীপ্তি স্বামিজীর নির্মোক-মুক্ত স্ব চেতনার সৃষ্টি,—এই উদ্দীপ্তিই 'কবির অন্তরে কবি'—যুগস্রষ্টা বিবেকানন্দের "আত্মচরিতা"—স্বামিজী স্বয়ং যাকে তাঁর বক্তৃতা, প্রবন্ধ এবং এমন কি পত্রাবলীতেও স্বয়ং-প্রভাব বলে উল্লেখ করেছেন,—ঐ আত্ম-সমর্পনের শক্তিই শিষ্যের জীবনে যাদুকরতার দান। তাই ওপরের উচ্ছ্বসিত প্রেরণা তাঁর পত্রটিতেও শেষকথা উচ্চারিত হয়েছে "তিনি"র স্বাক্ষর দিয়েই।

কিন্তু নিবেদিতা অবাঙ্‌মনসোগোচরকে সাধারণ জীবনে বহন করে আনার যে মর্মন্তুদ অসম্ভব প্রয়াসের কথা উল্লেখ করেছিলেন, তারও প্রত্যক্ষ অনুভবের উপকরণ ছড়িয়ে রয়েছে অজ্ঞাতের মধ্যে ঐ একই চিঠির মধ্যে। ঐ

পত্র শেষ করে 'পুনশ্চ'তে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখছেন,—একটা বড় খাতা রাখবে এবং তাহাতে যখন যেখান হইতে কোন পত্র আসে তাহার একটা চুম্বক লিখিয়া রাখিবে। তাহা হইলে উত্তর দিবার বেলায় ভুলচুক হইবে না। Organisation শব্দের অর্থ division of labour, প্রত্যেকে আপনার আপনার কাজ করবে এবং সকল কাজ মিলে একটা সুন্দর ভাব হবে।"

বিবেকানন্দ-ব্যক্তিত্বের জটিল গ্রন্থি ছিল intution Organisation-এর প্রয়োজনে,—ধ্যান ও উপলব্ধিকে মূল প্রতিষ্ঠানের অঙ্গে রূপায়ণের অসাধ্যসাধন প্রয়াস। এ-দ্বন্দ্বের পার্থক্য যে আকাশ-পাতালের মত কত দিগন্ত-প্রসারী, তার পরিচয় রয়েছে একই দিনে রচিত একই পত্রের অব্যবহিত দুটি ছত্রে। প্রথমাংশের বাগ্‌ধারা প্রকাশ-নির্ভর নয়, উপলব্ধির অনুষঙ্গ। এ-কথা পরকে বোঝাবার জন্যে তত নয়। যত নিজেকে বুঝবার প্রয়োজনে। স্বাগতোক্তি বলব না,—বিবেকানন্দের এই স্টাইল আত্মসম্ভাষণের প্রেরণা-জাত। কল্পিত বা লিখিত, প্রবন্ধ বা পত্র,—সর্বত্রই স্বামিজীর অগ্নিবাণী উদ্গীরিত হয়েছে 'উদ্দীপ্ত প্রেরণামুখে' —ফলে তাঁর বাক্‌শৈলীর কথিত বা লেখা কথা বা সাধুতে যে রীতিরই হোক্ সর্বত্র এমন এক প্রত্যক্ষতা রয়েছে, যা সাহিত্যের ভাষায় সাধারণত অপ্রত্যাশিত। একের ভাবনাকে অনেকের অনুভাবনায় সঞ্চারিত করতে পারার স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়াস থেকে সাহিত্যিক ভাষার জন্ম; কিন্তু, বিবেকানন্দের ভাষা আত্মসম্ভাষণের জন্য রচিত,—তাই তাতে লিখ্য ভাষার সুবিন্যস্ত সজ্জা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত,—কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্বের তড়িৎশক্তি রয়েছে,—তাঁর নিজেরই কথায়, উদ্দিষ্টজনের চিত্তলোকে যা অগ্নিবর্ষণ করে। বস্তুতঃ এ ভাষা নিম্নমধ্যচেতনের গহনে বসে প্রতিভার আত্ম-সম্ভাষণ,—তাই শ্রোতাদেরও যেন অবাঙ্‌মনসোগোচর আত্মস্থ তার জগতে জ্ঞাতে অজ্ঞাতে উপনীত করে দেয়। নিবেদিতা তাঁর বক্তৃতা শ্রবণের প্রাথমিক অভিজ্ঞতা বর্ণনার প্রসঙ্গে লেখছেন,—"তিনি আমার মধ্যে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট, তাহারই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেন।" ব্যক্তি মানুষের অন্তরে পৃথক্ ও স্বতন্ত্রভাবে তার যে অস্তিত্ব সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোৎকৃষ্টতার দোতক, বিবেকানন্দের আত্ম-সম্ভাষণের ভাষা তারই উদ্বোধক: এই অলৌকিক বাগ্‌শক্তি ও বাক্‌শৈলীর আবেগ-কম্পিত ধাচেই বাংলা গদ্য সাহিত্যে তাঁর স্টাইল অনন্য।

কিন্তু, তারই পাশে আলোচ্য পত্রের পত্রাংশ,—যেখানে প্রতিষ্ঠানিক বিষয়ের আলোচনা ঘটেছে তার উপকরণ ও প্রকাশভঙ্গী কত সাধারণ, গতানুগতিক কত তথ্য ভারাক্রান্ত!

তাই, যেকথা বলছিলাম,—intuition অথবা স্বামিজী যাকে পুনঃ পুনঃ realisation বলেছেন, তারই প্রাণকণিকা দিয়ে organisation-এর শরীর সংগঠনের অ-মানুষিক সাধনাই স্বামিজীর জীবনের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থি।—কেবল তাই নয়, ঐ একই সূত্রে তাঁর ব্যক্তিত্ব ইতিহাসের ভাবনার দ্বিবিরোধের সংশয়াচ্ছন্ন হয়ে আছে। রামকৃষ্ণপন্থী পরিব্রাজক সন্ন্যাসী, মুমুক্ষু অদ্বৈতবাদী তপস্বী, প্রাচ্যপ্রতীচ্যে আত্মজাগরণের বিদ্যুৎগর্ভ বাণী-দূত, রামকৃষ্ণ সংঘের প্রতিষ্ঠাতা, সমাজ-ধর্ম-সম্প্রদায় ও জাতিভেদের চিরশত্রু,—ভারতীয় জাতিত্ববোধের দীপ্ততম প্রতিনিধি,—এই বিচিত্র পরিচয়মালার কোথায় তাঁর যথার্থ স্বরূপাভিব্যক্তি,—অথবা অসংখ্য মর্ত্য এবং অমর্ত্য-চেতনার সংগতিই বা কোথায়? স্বয়ং নিবেদিতা প্রথম-সন্দর্শনের অভিজ্ঞতায় এই তেজঃপুঞ্জ ব্যক্তিত্বের জাতিপ্রেমের উজ্জ্বলতা অনুভব করেছিলেন। একটি পত্রে তিনি নিজে প্রবল আবেগের সঙ্গে লিখেছেন,—"আমার চরিত্রের যদি কোনো ত্রুটি থাকিয়া থাকে তবে সে আমার দেশপ্রীতি—সত্যের দেশ-প্রীতি।"[১৩] আবার আর একটি পত্রে প্রবল ক্রোধের সঙ্গে লিখছেন,—"প্রকৃতপক্ষে আমি একজন রাজনীতিজ্ঞ নই অথবা রাজনৈতিক আন্দোলনকারীও নই। আমার লক্ষ্য কেবল

ভেতরের আত্মতত্ত্বের দিকে—সেইটে যদি ঠিক হয়ে যায়, তবে আর সবই ঠিক হয়ে যাবে—এই আমার মত।"[১৪]

অথচ, অন্য একটি পত্রে আছে,—"যে লোক একটা বালিকার পতি নির্বাচন করে আমি তাকে খুন করতে পারি।"[১৫]

আরো একটি পত্রে লিখছেন,—"যে ধর্ম বা যে ঈশ্বর বিধবার অশ্রুমোচন অথবা পিতৃমাতৃহীন অনাথের মুখে একটুকরা রুটি দিতে পারে না, আমি সে ধর্ম বা সে ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না। যত সুন্দর মতবাদ হউক, যত গভীর দার্শনিক তত্ত্ব উহাতে থাকুক, যতক্ষণ উহা মত বা পুস্তকেই আবদ্ধ, ততক্ষণ উহাকে আমি ধর্ম নাম দিই না।"[১৬]

তবে কী আত্মতত্ত্বের প্রকটনে ধ্যানতপস্যাই তাঁর মধ্যে? কিন্তু অপর একটি পত্রে অনুগামীদের নির্দেশ দিচ্ছেন,—

"নীতি পরায়ণ ও সাহসী হও, হৃদয় যেন সম্পূর্ণ শুদ্ধ থাকে। সম্পূর্ণ নীতি পরায়ণ ও সাহসী হও—প্রাণের ভয় পর্যন্ত রাখিও না। ধর্মের মতামত লইয়া মাথা বকাইও না। কাপুরুষেরাই পাপ করিয়া থাকে, বীর কখনো পাপ করে না—মনে পর্যন্ত পাপ চিন্তা আসিতে দেয় না। সকলকেই ভালবাসিবার চেষ্টা করিবে। ..... হে বৎসগণ, তোমাদের জন্য নীতিপরায়ণতা ও সাহস ব্যতীত আর কোন ধর্ম নাই, ইহা-ব্যতীত ধর্মের আর কোনো মতামত তোমাদের জন্য নহে।"[১৭]

এই বিচিত্র-বাক্ আপাত স্ব-বিরোধের পরিচয় সংকেত করে রোলাঁ লিখেছিলেন, বিবেকানন্দের "অতি শক্তিশালী দেহ" এবং তাঁর 'বিরাট মস্তিষ্কে' "অতীত ও বর্তমান, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, স্বপ্ন ও কর্ম স্ব স্ব প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করিতেছিল।" রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনী-শক্তির অদম্য প্রেরণা লক্ষ্য করিতেছিলেন তাঁর ব্যক্তিত্বে। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করিতে হয়, প্রতীচ্য পৃথিবী হঠাৎ সেদিন ভারতবর্ষের তরুণ চেতনায় যে বিদ্যুৎচকিত বাণীস্পর্শ সঞ্চারিত করে দিয়েছিল,—মূলতঃ তা মানবসাম্যের বাণী। বিশেষ করে ফরাসীবিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রপূত ইংরেজি-জ্ঞানসরস্বতীর সান্নিধ্য সেদিন বিস্মিত করেছিল তার "স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাত্রের" প্রাণ-শক্তিতে। কিন্তু আসলে ভারতবর্ষের শাশ্বত পুরাতন বাণীই সেদিন কেবল নতুন পরিচ্ছদ পরে এসেছিল,—তার সর্বাঙ্গে সহজাত কবচকুণ্ডলের মত জড়িয়েছিল প্রতীচ্য জড়বাদী ভাবনার প্রসার। ভারতীয় সাম্যচেতনার মূল উৎস মানুষ অথবা তার শরীর কিংবা মন নয়,—প্রাচীন ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিকতার গভীরে তার জন্ম। ব্যক্তিসত্ত অস্তিত্বের স্বাধীনতা, সমমর্যাদা ও সমানুভূতি সেই আত্মস্বভাবেরই বহিরঙ্গ বিভূতি। সেই মূল প্রসঙ্গ থেকে বিচ্যুত হলে জড়তামগ্ন সাম্যচেতনা উন্নয় পূরণ ও স্বার্থান্ধতার ভরে ওঠে,—অন্তপক্ষে আধ্যাত্মিক সাম্যের উপলব্ধি আত্ম-বিস্তার আত্ম-ত্যাগে প্রবুদ্ধ করে। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ সেই প্রতীচ্যাগত মানবসাম্য-বোধের কেন্দ্রস্থলে ভারতীয় ধর্মচেতনার প্রাণশক্তি সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রবর্তিত পথে বিবেকানন্দ সেই সাধনাই করেছেন। সাম্যচেতনার আধ্যাত্মিকতা সম্পাদনের জন্য। আত্মজ্ঞান অনিবার্য। অব্যবহিত উপকরণ। এই তাৎপর্যেই আত্মতত্ত্বের উদ্ঘাটন বিবেকানন্দের মানব-প্রেমের প্রথম ও শেষ কথা; জড়বাদী মানবচেতনার নির্মোকমোচন,—ও মানবপ্রেমের গভীরে চৈতন্য সংজ্ঞা উদ্ভাসন তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। এই তাৎপর্যেই আবহমান কালের ভারত ইতিহাসের ধারায় তিনি এক নবীন স্রষ্টা, নিজের কালের জাতীয় রেনেসাঁসের এক অনন্য শ্রেষ্ঠ স্তম্ভ।

কিন্তু সে এক পৃথক্ প্রসঙ্গ। জড়ের সংগে আত্মার,—মানুষের মধ্যে দেবতার তীর্থদেউল আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠাই বিবেকানন্দ-ব্যক্তিত্বের শ্রেষ্ঠ বাণী। প্রথম সন্দর্শনের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করে নিবেদিতা লিখেছিলেন,—"তিনি আমাদিগকে আরোও বলিলেন যে, হিন্দুগণ শরীর মন উভয় উভয়কেই আত্মা নামক এক তৃতীয় পদার্থদ্বারা চালিত ও নিয়ন্ত্রিত বলিয়া জ্ঞান করেন। এটি আমার খুব মনে

লাগিয়াছিল।"[১৮] বহুদিন পরে এই নিবেদিতাকেই আহ্বান করে একটি পত্রে স্বামিজী লিখেছিলেন,—

"আমার আদর্শকে বস্তুতঃ অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করা চলে, আর তাহা এই—মানুষের কাছে তার অন্তর্নিহিত দেবত্বের বাণী প্রচার করতে হবে। এবং সর্ব কার্যে সেই দেবত্ব বিকাশের পন্থা নির্ধারণ করে দিতে হবে।

কুসংস্কারের নিগড়ে এই সংসার আবদ্ধ। যে উৎপীড়িত—সে নর বা নারীই হোক—তাকে আমি করুণা করি; আর যে উৎপীড়ক সে আমার অধিকতর করুণার পাত্র।

এই একটা ধারণা আমার কাছে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সকল দুঃখের মূলে আছে অজ্ঞতা, তাছাড়া আর কিছু না। জগৎকে আলোক দেবে কে? আত্ম বিসর্জনই ছিল অতীতের কর্ম রহস্য এবং হায়! যুগ যুগ ধরে তাই চলতে থাকবে। যাঁরা জগতে সর্বাধিক সাহসী ও বরেণ্য তাঁহাদিগকে চিরদিন 'বহুজনহিতায়' বহুজনসুখায় 'আত্ম-বিসর্জন করতে হবে।"[১৯]

এখানেও শেষ হয় নি,—প্রিয় শিষ্যাকে উদ্দেশকরে আপন রহস্যময় ব্যক্তিত্বের উন্মোচন করে চলেন ভারত পথিক মহা আত্মা,—

"তোমার মধ্যে একটা জগৎ আলোড়নকারী শক্তি আছে, আর ধীরে ধীরে অনেকে আসবে। আমরা চাই—জ্বালাময়ী বাণী এবং তদপেক্ষা জ্বালাময় কর্ম। হে মহাপ্রাণ, উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত। জগৎ দুঃখে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে—তোমার কি নিদ্রা সাজে? এসো আমরা ডাকতে থাকি, যতক্ষণ না নিদ্রিত দেবতা জাগ্রত হন, যতক্ষণ না অন্তরের দেবতা বাহিরের আহ্বানে সাড়া দেন। জীবনে এর চেয়ে বড় কি আছে,—এর চেয়ে মহত্তর কোন্ কাজ আছে?"

—পত্রও যদি সাহিত্য হয়,—ব্যক্তি বিশেষের উদ্দেশে উচ্চারিত ব্যক্তি বাসনার ব্যাকুলতা কোনো পরমলগ্নে যদি বিশ্ব ইতিহাসের আত্মজ্ঞানতা দাবি করতে পারে,—তাহলে সেই মহা আবির্ভাবের শতবর্ষ পরে আজ প্রিয় শিষ্যা উদ্বোধনের বাণীমন্ত্রে আত্মখণ্ডিত জাতির নবদীক্ষা সম্পাদিত হোক। বিবেকানন্দ-পত্রাবলীর অন্তর-লীন সহিত-ত্ব বাসনার চরিতার্থ আস্বাদন কেবল এই পথেই সম্ভব।

স্মারকপঞ্জী

১। 'সাধনা' কবিতা—রবীন্দ্রনাথ
২। 'বিবেকানন্দের জীবন ও বিশ্ববাণী'—শ্রীঅরবিন্দকৃত অনুবাদ
৩। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ—স্বামী সারদানন্দ।
৪। স্বামিজীকে আমি যেরূপ দেখিয়াছি—স্বামী মাধবানন্দ-কৃত অনুবাদ
৫। ঐ
৬। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ—ঐ।
৭। বিবেকানন্দের পত্রাবলী—প্রথম ভাগ—পত্রসংখ্যা ৬১ (ইংরেজি থেকে অনুবাদ)
৮। " " " ৩৭
৯। স্বামিজীকে আমি যেরূপ দেখিয়াছি - ঐ।
১০। পূর্ব ও পশ্চিম [প্রবন্ধ]—রবীন্দ্রনাথ।
১১। বিবেকানন্দের পত্রাবলী (১ম) পত্র সংখ্যা ১০৪
১২। " " " " ৬১ ইং
১৩। " " " " ৭২ ইং
১৪। " " " " ৮৬ ইং
১৫। " " " " ৯৩ ইং
১৬। " " " " ৯২ ইং
১৭। " " " " ২২ ইং
১৮। স্বামিজীকে আমি যেরূপ দেখিয়াছি— ঐ ইং
১৯। বিবেকানন্দের পত্রাবলী (২য়)— পত্র সংখ্যা ৩৬ ইং

জাতীয় সঞ্চয়

সমাবেশ করতে সাহায্য করুন

স্বেচ্ছাসেবক

এজেন্ট

হিসেবে কাজ করুন

আপনি যে কাজই করুন না কেন, সঞ্চয়ের স্বেচ্ছাসেবক হয়ে বর্তমান সঙ্কটে দেশকে সত্যিকার সাহায্য করতে পারেন।

দেশের প্রতিরক্ষার জন্য সঞ্চয় অত্যন্ত প্রয়োজন। কাজেই সঞ্চয় সংগ্রহ করতে আপনি যদি সাহায্য করেন তাহলে এতে আক্রমণকারীকে বিতাড়িত করা সম্পর্কে আপনার সঙ্কল্পের দৃঢ়তাই প্রমাণিত হবে।

সঞ্চয় করে তাই সরকারের বিভিন্ন সঞ্চয় পরিকল্পনাগুলিতে লগ্নী করতে দেশের সব জায়গার জনগণই বর্তমানে যতখানি ইচ্ছুক এর আগে তেমন আর দেখা যায়নি। আপনি এঁদের নিয়মিত সঞ্চয়ে এবং এঁদের সুপরামর্শ দিয়ে সাহায্য করতে পারেন।

এজেন্ট হওয়ার নিয়ম

আপনি যদি ১৮ বছরের উর্দ্ধ বয়স্ক হন তাহলে সরকার আপনাকে, জনগণের সঞ্চয়, জাতীয় সঞ্চয় পরিকল্পনাগুলিতে জমা দেওয়ার অধিকার দেবেন। ক্ষমতাপ্রাপ্ত এজেন্সির জন্য অবিলম্বে তহশিলদার কালেক্টারের কাছে আবেদন করুন। আনুষ্ঠানিক কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পর আপনাকে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। আপনি যাতে আপনার প্রতিবেশীগণের কাছ থেকে, আপনার বন্ধুবান্ধব, সহকর্মী ও অন্যান্যদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ ক'রে

জাতীয় প্রতিরক্ষা সার্টিফিকেট
প্রতিরক্ষা ডিপোজিট সার্টিফিকেট
এ্যানুইটি সার্টিফিকেট গুলিতে

লগ্নী করতে সমর্থ হন সেজন্য আপনাকে রসিদ বই দেওয়া হবে।

বিক্রীত সার্টিফিকেটগুলির ওপর ওপর আপনি কমিশন পাবেন।

জাতীয় প্রতিরক্ষা সার্টিফিকেট বিক্রয়ের ওপর ১½%
প্রতিরক্ষা ডিপোজিট সার্টিফিকেট ও
এ্যানুইটি সার্টিফিকেট বিক্রয়ের ওপর ১%

আপনি ইচ্ছে করলে আপনার সম্পূর্ণ কমিশন বা এর অংশ জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে দান করতে পারেন। আপনি যদি বিনা কমিশনে কাজ করতে চান তাহলে অনুগ্রহ করে কালেক্টারকে জানিয়ে দিন।

আপনার এজেন্সি তিনটি উপকার করবে। আমাদের প্রতিরক্ষা ও পরিকল্পনার প্রয়োজন মেটানোর জন্য আপনি নতুন সঞ্চয় নিয়ে আসবেন; কমিশনের আয় জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিল পূর্ণ করবে; আপনি মিতব্যয়িতার অভ্যাস গড়ে তুলতে ও দ্রব্যমূল্য নিম্নাভিমুখী রাখতে সাহায্য করবেন।

ভারতীয় প্রতিরক্ষা ক্ষমতা
শক্তিশালী করুন

জাতীয় সঞ্চয় সংস্থা

পুরাণ পাতা

শ্রী শ্রী রা ম কৃ ষ্ণ দে বে র স হি ত স্বা মী বি বে কা ন ন্দে র স ম্ব ন্ধ

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

রামকৃষ্ণ পরমহংস ও বিবেকানন্দের গুরু-শিষ্য-ভাব প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতে হইলে, রামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবনে উদ্দেশ্য কি ছিল, তাহা বর্ণনা করিবার প্রয়াস পাওয়া উচিত। এ উদ্দেশ্য স্বয়ং বিবেকানন্দই তাঁহার "My Master" নামক প্রবন্ধে ব্যক্ত করিয়াছেন। উপস্থিত আমার বর্ণনা উক্ত প্রবন্ধের ছায়ামাত্র। সে জীবন্ত ভাষা, জলন্ত গুরু-ভক্তি ও হৃদয়ের বিমল উচ্ছ্বাসের অভাব নিশ্চয় হইবে। যাঁহারা পরমহংসদেবের পাদস্পর্শ করিয়াছেন, পরমহংসদেবের শ্রীমুখে তাঁহার ধর্ম্মানুরাগের কথা শুনিয়াছেন, এবং বিবেকানন্দের "My Master" প্রবন্ধে তাহার প্রতিরূপ ছবি পাইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রথম শুনিয়া যাহা সম্পূর্ণ ধারণা করিতে পারেন নাই, যে ধারণা তাঁহার অস্পষ্ট ছিল, বিবেকানন্দের বর্ণনায় তাহা উজ্জ্বলরূপে বিকাশ পাইয়াছে। দেখিতে পাওয়া যায় যে, পরমহংসদেব তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য তাঁহার বাল্যাবস্থাতেই অবগত ছিলেন, যে কার্যভার লইয়া তিনি অবতীর্ণ হন, তাহা বাল্যাবস্থাতেই তাঁহার গোচর হইয়াছিল। তিনি কে, কি আধারে গঠিত, তাহা তিনি বাল্যাবস্থায় সম্পূর্ণ জানিতেন। যাহা জানিতেন তাহা কল্পনা বা সত্য—ইহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত, তিনি তাঁহার জীবন উৎসর্গ করিলেন। জড় বৈজ্ঞানিক যেরূপ প্রত্যক্ষবাদী, যাহা পরীক্ষিত নয়, তাহা যেরূপ অগ্রাহ্য করেন, অন্তর্বিজ্ঞান সম্বন্ধে পরমহংস দেবও সেইরূপ প্রত্যক্ষবাদী ছিলেন। পরীক্ষায় যাহা প্রত্যক্ষীভূত না হইত, তাহা পুস্তকে বা লোকমুখে বর্ণিত হইলে, তিনি প্রত্যয় করিতেন না। তিনি স্বয়ং দেখিবেন, এই তাঁহার সংকল্প ছিল। কঠোর সাধনায় সংকল্প সিদ্ধ হয়। সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া দিন দিন তাঁহার অন্তর্দৃষ্টির বিকাশ পাইতে লাগিল। জড়বিজ্ঞানে যে সমস্ত জড় সম্বন্ধ দেখা যায়, তাহার অন্তর্নিহিত একটি অবিনাশী সম্বন্ধ রহিয়াছে, এক তারে সংবদ্ধ একটি অপরিবর্তনশীল নিয়মে সংযোজিত, সমস্তই এক, একের বিকাশ মাত্রই বৈচিত্র্য, তিনি দেখিতে পাইলেন; দেখিলেন—ঈশ্বর কথার কথা নন,—প্রত্যক্ষের বিষয়,—তাঁহার সহিত আলাপ করা যায়, কথা কওয়া যায়, তাঁহার শরণাপন্ন হইলে তিনি গুরুরূপে শিক্ষা দেন, তাঁহার উপদেশে জীবনের উদ্দেশ্য প্রকাশ পায়, জীবন নিরর্থক নয়—বোঝা যায়, জড়ানন্দ তুচ্ছ হইয়া পরমানন্দ লাভ হয়। পরমহংসদেব উৎকট সাধনে এই সমস্ত প্রত্যক্ষ করিলেন। যেরূপ আমরা পরস্পর, পরস্পরের সহিত কথাবার্তা কই, জগন্মাতার সহিত তাঁহার সেইরূপ কথাবার্তা চলিল। তিনি বাল্যাবস্থায় তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য যেরূপ বুঝিয়াছিলেন, তাহা কল্পনা নয়, জগন্মাতার কথায় নিশ্চিত হইল। জগতের হিত-সাধনায় তাঁহার আবির্ভাব—তিনি বুঝিলেন ও ঐ মহাকার্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

একদিন এক বালকশিষ্য আসিয়া পদতলে প্রণাম করিল। শিষ্যের প্রথম কাতর প্রশ্ন, 'আপনি কি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন?' গুরু বলিলেন, 'হ্যাঁ,' শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, 'প্রমাণ করিতে পারেন?' আবার উত্তর, 'হ্যাঁ।' পুনর্বার প্রশ্ন, 'কিরূপে?' গুরু বলিলেন, 'তোমায় যেমন দেখিতেছি, তদপেক্ষা ঘনিষ্ঠ-

ভাবে তাঁহাকে সম্মুখে দেখিতেছি। তুমিও যদি দেখিতে চাও, দেখিতে পাও।' সেই শিষ্য আমাদের বিবেকানন্দ। লোকে তখন তাঁহাকে 'নরেন্দ্র' বলিয়া ডাকিত।

গুরুগৃহবাসে নরেন্দ্র দিন দিন দেখিতে লাগিলেন (আমি নরেন্দ্রের ভাষা অনুবাদ করিয়া বলিতেছি) যে, ধর্ম—কল্পনা নয়, জড়বস্তু হইতে অধিকতর প্রত্যক্ষীভূত হইবার বস্তু, তাহা আদান প্রদান করা যায়, মহাপুরুষের দৃষ্টি বা স্পর্শে জীবন পরিবর্তিত হয়। বুদ্ধ, যীশুখৃষ্ট ও মহম্মদের জীবনী পাঠে শিষ্য দেখিয়াছিলেন যে, উক্ত মহাপুরুষদিগের কথায় মানব পূর্ণত্বলাভ করিয়াছিল, এক্ষণে তাহা প্রত্যক্ষ করিলেন। ধর্ম, জড়বস্তুর ন্যায় প্রদান করা যায়, তাঁহার গুরু তাঁহাকে বলিলেন ও শিষ্য তাহা প্রত্যক্ষ করিলেন। গুরুর কৃপায় দিন দিন তাঁহার প্রবল ধর্ম-পিপাসা মিটিতে লাগিল, তিনি পূর্ণত্বলাভের প্রার্থনা করিলেন, বলিলেন, 'যতদিন দেহ থাকে, আমি পূর্ণত্ব লাভ করিয়া, সমাধিস্থ হইয়া জীবন অতিবাহিত করি আজ্ঞা করুন।' তখন গুরু বলিলেন, 'কেবল তোমার নিমিত্তই তোমার জীবন নহে, তোমার জীবনে মহৎ উদ্দেশ্য—তুমি আমার সহকারী, জগতের হিতসাধন তোমার কার্য। তুমি তোমার নও, তুমি জগতের। পূর্ণ হইবার প্রার্থনা করিতেছ কি—তুমি পূর্ণ।' পরমহংসদেবের অনেক শিষ্যই জানেন যে কাশীপুরের বাগানে নরেন্দ্রের নির্বিকল্প সমাধি হইয়াছিল।

উক্ত প্রকারে গুরুর নিকট মহাকার্যের ভার প্রাপ্ত হইয়া, সেই মহাভার কিরূপে বহন করিবেন, তন্নিমিত্ত চিন্তান্বিত হইলেন। এই মহাভার বহনে কতদূর তিনি সক্ষম, তাহাও তিনি তৎকালে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, এই গুরুভার তাহাকে গ্রহণ করিতে হইল। গুরু লীলাসংবরণ করিলেন। লীলা সংবরণের পূর্বে কয়েকটি শিষ্যের ভার তাহার উপরেই অর্পিত হইয়াছিল। নাবালক সন্তান থাকিলে, পিতা যেরূপ তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের উপর সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করেন, নরেন্দ্রের ধর্ম-জীবনের পিতা, সেইরূপ তাঁহার অন্য সন্তানের ভার অর্পণ করিয়া অন্তর্ধান হইলেন।

নরেন্দ্রের এই ভারগ্রহণের কিরূপ উপযোগিতা ছিল, তাহার সংক্ষেপ আলোচনা করা যাউক। গুরু যেরূপ বাল্য-কাল হইতে কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী, নরেন্দ্রের বাল্য-ক্রীড়া দেখিলে অনুভূতি হয় যে নরেন্দ্রও সেইরূপ স্বভাবসিদ্ধ কামিনী কাঞ্চন ত্যাগী। বাল্যকালে শ্রীরামচন্দ্রের পুতুল লইয়া খেলা করিতেন, কিন্তু যখন তিনি শুনিলেন যে রামচন্দ্র বিবাহ করিয়া-ছিলেন, অমনি বালক সেই পুতুল পরিত্যাগ করিল, যোগীশ্বর মহাদেবের পুতুল লইয়া ক্রীড়া-উপাসনা করিতে লাগিল। তাঁহার পিতামহ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন সেই দৃষ্টান্তে বাল্যকালে সন্ন্যাস গ্রহণের অনুরাগ তাঁহার জন্মায়। পাঠ্যাবস্থায় হঠাৎ পিতৃবিয়োগে একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়েন। তাঁহার পিতা হাইকোর্টের উকীল ছিলেন, মক্কেলের অনেক কাগজপত্র তাঁহার জিম্মায় ছিল। সেই কাগজপত্র গ্রহণাভিলাষী হইয়া কোন এক উকীল তাঁহাকে অর্থলোভ দেখান, নরেন্দ্র লোষ্টবৎ সেই কাঞ্চন পরিত্যাগ করেন। তাঁহার দয়ার অসীম বিকাশ ছিল, পিতৃবিয়োগের পর তিনি একরকম একাহারী হইলেন। প্রায়ই জননীকে বৈকালে বলিতেন, 'আমার নিমন্ত্রণ আছে।' মনের ভাব এই, যে, তিনি বৈকালে আহার না করিলে, পর দিন কতক অন্নের সংস্থান হইবে। অনেক সময়েই উপবাস দিতেন। একদিন এই উপবাস বশতঃ দুর্বলতার পথে মূর্ছিত হইয়া পতিত হইতে হয়। যখন দিন চলে না এইরূপ শোচ্য অবস্থাতেও তিনি দশটি টাকা পাইয়া, পাঁচটি টাকা এক নিঃস্ব গুরুভাইকে প্রদান করেন। এরূপ তাঁহার দৃষ্টান্ত অনেক। মহাদুঃখে পতিত হইয়া একদিন গুরুর নিকট বলেন, 'মহাশয় আমার যাতে মাতা-ভ্রাতার অন্নের সংস্থান হয়, তাহা করুন। আপনি যদি আমার নিমিত্ত প্রার্থনা করেন, তাহা হইলেই আমার অন্নসংস্থান হইবে।' গুরু আদেশ দিলেন, 'কালীঘরে

যাইয়া তুমি প্রার্থনা করো, তোমার মনোরথ সফল হইবে।" গুরুবাক্যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল; গুরুদেব সিদ্ধসংকল্প নরেন্দ্র তাহা দুয়োঃ-দুয়ঃ পরীক্ষায় জানিয়াছেন। মহাপুরুষের আদেশানুসারে দৈন্য নিবারণার্থ কালীঘরে উপস্থিত হইলেন। কালীঘর হইতে ফিরিয়া আসিলে পর, গুরুদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেমন, প্রার্থনা করিয়াছ?' নরেন্দ্র উত্তর করিলেন, 'হাঁ বিবেক বৈরাগ্য লাভের নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়াছি। জগন্মাতার নিকট অন্নের প্রার্থনা আমার মুখে আসিল না।"

আর একদিন পরমহংসদেব তাঁহাকে নিরিবিলি বলেন, 'তুমি অষ্টসিদ্ধি লাভ করিতে ইচ্ছা করো? আমি তোমায় অষ্টসিদ্ধি প্রদান করিতে পারি।' নরেন্দ্র জানিতেন যে তাঁহার গুরুর ইঙ্গিতে, স্পর্শে, আজ্ঞায় ঘোরতর কলুষিত জীবন পরিবর্তিত হইয়া লোকে পরম পবিত্রতা লাভ করিতে পারে। তাঁহার গুরুর অসাধ্য কিছুই নাই। গুরু তাঁহাকে অষ্টসিদ্ধ তখনই প্রদান করিতে পারিবেন। গুরুকে অষ্টসিদ্ধি প্রদানে উৎসুক দেখিয়া নরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, 'অষ্টসিদ্ধি লাভে ঈশ্বরলাভ হয় কি?' গুরু উত্তর করিলেন, 'অণিমা, লঘিমা প্রভৃতি অমানুষিক শক্তিসম্পন্ন হয়, যাহা ইচ্ছা করে তাহাই করিতে পারে। কিন্তু ঈশ্বর লাভের পথ স্বতন্ত্র।' শিষ্য করজোড়ে প্রার্থনা করিলেন, 'গুরুদেব আমি শক্তি প্রার্থনা করি না, আমি ঈশ্বরলাভ করিতে চাই। আজ্ঞা করুন, আমার ঈশ্বর লাভ হোক।'

নরেন্দ্রের যেরূপ ঈশ্বর অনুরাগ, তাঁহার দয়াও সেইরূপ অসীম। যদি কাহাকে দেখিতেন যে, দুর্বুদ্ধিবশতঃ পরমহংসদেবের কৃপায় বঞ্চিত হইতেছে। নরেন্দ্র সেই অভাগার নিমিত্ত সাতিশয় ব্যাকুল হইতেন। যাহাতে কৃপাভাজন হয় সেইজন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। যতক্ষণ না পরমহংসদেব তাহাকে কৃপা করিতে সম্মত হইতেন, ততক্ষণ গুরুর চরণ ছাড়িতেন না। কাহারও শাসনের নিমিত্ত যদি গুরু শিষ্যদিগকে আজ্ঞা দিতেন, যে অমুক ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিও না। নরেন্দ্র সে নিষেধ শুনিতেন না। তিনি সেই ভাগ্যহীনের নিকট গিয়া তাহাকে টানিয়া আনিয়া গুরুর পদ-প্রান্তে সমর্পণ করিতেন। বলা বাহুল্য যে সেই ভাগ্যহীন, দয়াল নরেন্দ্রের দয়া বলে পরমহংসদেবের দয়ালাভ করিয়া মহা ভাগ্যবান হইত।

নরেন্দ্রের জগৎ-হিতকর কার্যসাধনের ভারগ্রহণ করিবার উপযোগিতার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম। সম্পূর্ণ পরিচয় বৃহৎ পুস্তকাকারে পরিণত হয়। এক্ষণে দেখা যাইক, তাঁহার গুরুর কি কার্য এবং নরেন্দ্র কিরূপে তাঁহার সহকারী হইয়াছিলেন।

পরমহংসদেব যখন জগৎ সমক্ষে উদয় হন, তখন ঘোরতর ধর্মবিপ্লব। জড়বাদী মুক্তকণ্ঠে বলিতেছে, 'জড় হইতেই সমস্ত, জড়ের সংযোগেই আত্মা, জড়াতীত আর কিছুই নাই।' খৃষ্ট-ধর্মাবলম্বীরা প্রতিনিয়তই বলিতেছেন, 'যদি অনন্ত নরকাগ্নি হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে চাহ, যীশুখৃষ্টের শরণাপন্ন হও।' প্রতিদ্বন্দ্বী ব্রাহ্ম বলেন 'বেদ, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি কিছুই মানিবার আবশ্যক নাই, কোনটিই অভ্রান্ত নয়, কোনটিই ঈশ্বরবাক্য নয়। আপনার সদসৎ জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া সকল ধর্মের সার ধর্ম গ্রহণ পূর্বক দিন দিন অগ্রসর হইতে থাক।' ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত দলের হইতে হিন্দুর দেব-দেবী অন্তর্হিত হইয়াছে। যাহাদের নিকট হিন্দুধর্মের আদর আছে, তাহাদের মধ্যেও মহাদ্বন্দ্ব উপস্থিত। শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতির দ্বন্দ্ব তো চলিতেছেই, এমন কি এক সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তির মধ্যেও বিরোধ, এইরূপ তিলক কাটিতে হয়, এইরূপ চন্দনের ফোঁটা কাটিতে হয়। এইরূপে ওই কার্য সম্পন্ন না করিলে নরকপ্রাপ্ত হইবে হইবে, এই ঘোরতর বিবাদ। প্রকৃত ধর্মপিপাসুর মুক্তির স্থান নাই, মহা ফাঁপরে মধ্যে পতিত হইয়া পড়িয়াছে! এমন সময়ে পরমহংসদেব প্রচার করিলেন, "কোন ধর্ম কোন ধর্মেরই বিরোধী নয়। বাহ্য দৃষ্টিতেই বিরোধ, কিন্তু সকল ধর্মই

ঈশ্বর লাভের ভিন্ন ভিন্ন পথ মাত্র। অজ্ঞান দৃষ্টিতে যে সকল ধর্ম পরস্পর বিরোধী, পরমহংসদেব, সেই সেই প্রত্যেক ধর্ম সাধন করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, সমুদ্রগামী নদ-নদীর ন্যায় সকল ধর্মের গতি ঈশ্বরাভিমুখে ও সকল ধর্মের চরম ঈশ্বর লাভ' মহাসত্য প্রচার করিলেন, দ্বিধা রহিল না।

পরমহংসদেব যখন প্রচার-কার্যে প্রবৃত্ত হন, তখন যে কেবল ধর্ম ব্যবসায়ীরা তাঁহার বিরোধী হইয়াছিল, তাহা নয়। পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানীরাও খড়্গহস্ত হন। এই শিক্ষাভিমানী-দের মতে ধর্ম ধর্ম করিয়াই ভারতের অধঃপতন হইয়াছে। ধর্মের কার্যকারিতাশক্তি তাহারা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। স্বার্থত্যাগ যে ধর্মের ভিত্তি, তাহা তাহারা বোঝেন নাই। জড়প্রাপ্তির নাম ধর্ম, তাহারা জানিতেন। স্বার্থত্যাগ ব্যতীত যে কখনো কোন দেশে, কোন জাতি বা শক্তি উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই, এই ইতিহাসের সারমর্ম তাহাদের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। স্বার্থপর ধর্মব্যবসায়ী-পরিচালিত ধর্মের পরিণাম জড়তা। কিন্তু প্রকৃত ধর্মসাধন যে মহা কর্মশীলতা, তাহা তাহাদের অভিমানী বুদ্ধি বুঝিতে দেয় নাই। স্বার্থত্যাগে পরস্পরের ভ্রাতৃভাব যে জাতীয়তার প্রকৃত ভিত্তি, এ জ্ঞান স্বার্থ-জড়িত হৃদয়ে প্রবেশ করে না। গুরু উপদেশে নরেন্দ্র এই ভিত্তির উপর তাঁহার উচ্চ জীবন গঠন করিলেন।

আমরা এ পর্যন্ত 'নরেন্দ্র' বলিয়া আসিতেছি, 'বিবেকানন্দ' বলি নাই। তাহার কারণ এই, গুরুদেব অন্তর্ধান হইলে, নরেন্দ্রের উপর মহাভার পড়িল। তিনি উচ্চ কার্য সাধনের নিমিত্ত নানাস্থান পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। যথায় যান, অচিরে বিখ্যাত হন। তিনি আত্মগোপনের জন্য নানাস্থানে নানা নামে পরিচয় দিতে লাগিলেন। দীন-কুটীরে প্রবেশ পূর্বক দীনের সম্যক অবস্থা জানিবার তাঁহার সংকল্প, কিন্তু যে নামে তিনি খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, সে নামে পরিচিত হইলে, তিনি দীন কুটীরে অবস্থান করিতে পারিবেন না, আদরে অট্টালিকাবাসী তাহাকে লইয়া গিয়া অট্টালিকায় স্থান দিবে, দরিদ্র ব্যক্তি তথায় যাইতে পারিবে না, দরিদ্র-সহবাস হইবে না, এই কারণে তাঁহার আত্মগোপন ও নাম পরিবর্তন। 'বিবেকানন্দ' নাম গ্রহণের পর ঘরে ঘরে তাঁহার মূর্তি পূজা হইতে লাগিল, আর আত্মগোপনের উপায় রহিল না।

বিবেকানন্দ। এখন 'বিবেকানন্দ' বলিব গুরুর শিক্ষায় কি জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি উপরোক্ত 'My Master' নামক প্রবন্ধে প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার মর্ম, সকল ধর্মের সমন্বয়। এই সত্যপ্রচারে ব্রতী হইয়া, তিনি ঘরে ঘরে বুঝাইতে লাগিলেন, চিত্ত শুদ্ধি, আত্মত্যাগ, পরহিত ব্রত—ঈশ্বর লাভের উপায়। এই উপায় অবলম্বন করিলে মনুষ্যত্ব লাভ হয়। একমাত্র ত্যাগী ব্যক্তিই জাতীয়তা স্থাপনে সক্ষম। ত্যাগই জাতির আধিক পরমার্থিক উন্নতির একমাত্র উপায়। স্বার্থত্যাগ মাত্রেই মানব মহাকর্মশীল হইয়া উঠেন। কার্যে, দৃষ্টান্তে, উপদেশে—অপরকে স্বার্থত্যাগী করিতে সক্ষম হন, এবং যে জাতি পরস্পর পরস্পরের সাহায্যে ব্রতী, সে জাতির উন্নতি সাধনের আর বিলম্ব কি থাকে।

বিবেকানন্দের কার্য কতদূর ফলবতী হইয়াছে, তাহা যিনি বিবেকানন্দের নাম শ্রুত আছেন, তাঁহার অগোচর নাই। কিন্তু নিন্দুক এক আশ্চর্য সৃষ্টি! বোধ হয় সকল মহাকার্যেই তাহাদের প্রয়োজন। নিন্দুক সীতার বনবাস দিয়াছিল। প্রেমের বৃন্দাবন লীলার জটিলাকুটিলা ছিল, বিবেকানন্দের নিন্দুকের অভাব নাই। নিন্দুক পরমহংসকে পরিত্যাগ করিয়া বিবেকানন্দকে ধরিল। তাঁহার স্বদেশ বিদেশের কার্যের কোন উল্লেখ করিল না, মহাবাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তিনি যে বিদেশীকে সনাতন ধর্ম প্রদান করিয়াছেন, সেই বিদেশীরা আসিয়া, ভারতের সন্তানের ন্যায়, ভারতের উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহা দেখিল না, স্বদেশে ক্রিশ্চান দমন ও মিথ্যা ধর্মযাজকের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করিয়া, বেদের

স্বাচ্ছন্দ্য স্থাপনের প্রতি লক্ষ্য রাখিল না। স্বদেশের দীন গৃহে, রুগ্ন গৃহে বিবেকানন্দ দ্বারা কার্যে প্রবর্তিত মিশনের সন্ন্যাসীদিগের কার্য দেখিল না, আত্মীয় পরিত্যক্ত মুমূর্ষুর সেবা দেখিল না, অনাথ-বালক আশ্রম দেখিল না, কেবল সর্বত্যাগী মহাপুরুষকে আচার ভ্রষ্ট বলিয়া উল্লেখ করিল। নিন্দুক তাহার নিন্দা লইয়া থাকুন, তাহাদের জীবন কাহারও লক্ষ্য বা ঈর্ষা করিবার নহে, কিন্তু যাহারা পরমহংসদেবের মতের পার্থক্য দেখেন, তাঁহাদের নিকট আমার সবিনয় নিবেদন এই যে তাঁহারা একটু স্থির দৃষ্টিতে দেখিলেই বুঝিবেন, যে পরমহংসদেবকেই বিবেকানন্দ প্রচার করিয়াছেন, যথাসাধ্য বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি।

কামিনীত্যাগী শ্রীচৈতন্যদেব-প্রতিষ্ঠিত ভক্তিধর্ম কলুষিত হইয়া, নেড়া-নেড়ীর বামাচারে পরিণত হইয়াছে। ভাগবতের ধর্ম যে কামবর্জিত ব্যতীত রাসলীলাপাঠের কেহই যোগ্য নয়। নিষ্কাম ব্যতীত রাধাকৃষ্ণের প্রেমের লীলা অনুভব করা দুঃসাধ্য। বিবেকানন্দ তাহা বুঝিয়াছিলেন। তাঁহার মুখে ভক্তি-গান শ্রবণে অনেকে পরিজন ত্যাগ করিয়া কঠোর সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছে। ত্যাগী ব্যতীত ভক্তিসাধনে প্রবৃত্ত হওয়া বিড়ম্বনামাত্র। এই নিমিত্ত, তিনি কর্ম-সাধন প্রচার করিয়াছেন। অবাল বৃদ্ধ-বণিতাকে তিনি উপদেশ দিয়াছেন, 'কর্মে বৃত্ত হও, নচেৎ চিত্তশুদ্ধি হইবে না।' বঙ্গীয় যুবার উপর তাঁহার সমস্ত আশা-ভরসা নির্ভর ছিল। বঙ্গীয় যুবককে তিনি বার বার বলিয়াছেন, 'কর্মে প্রবৃত্ত হও! ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইয়া পতিত ভারতের উন্নতি সাধন করো, আত্মোন্নতি পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইবে। কার্যই ধর্ম-জীবন, ফলাফলের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কার্য কর, কার্য কর! সকল স্বার্থ বিসর্জন দাও, কার্যশীল ব্যক্তির নিকট মুক্তি কামনাও তুচ্ছ—কার্যের অধিকারী হও। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে, বিবেকানন্দ যখন তাঁহার গুরুর নিকট সমাধি বা পূর্ণত্ব প্রার্থনা করেন তখন তাঁহার গুরু তাঁহাকে সেই স্বার্থ পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়া কার্যে প্রবৃত্ত করেন। বিবেকানন্দ তাঁহার গুরুদেবের প্রকৃত মর্ম বুঝিয়াছিলেন এবং যিনি রামকৃষ্ণ পরমহংসের প্রকৃত মর্ম বুঝিতে চান তিনি কেবল বহু পৃষ্ঠাব্যাপী রামকৃষ্ণের জীবনী বা উপদেশ পাঠে বুঝিতে পারিবেন না; বিবেকানন্দের জলন্ত দৃষ্টান্ত তাঁহার সম্মুখে প্রতিনিয়ত রাখিতে হইবে।

যাঁহারা বলেন, বিবেকানন্দ 'ভক্তিধর্ম' প্রচার করেন নাই, তাঁহাদের 'ভক্তিধর্ম কাহাকে বলে' জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর খুঁজিয়া পাইবেন। যে মহাত্মা সর্বভূতে ভগবানকে দেখেন। যিনি কায়মনোবাক্যে সেই সর্বভূতব্যাপী ভগবানের সেবায় নিযুক্ত থাকেন, যিনি আপনার অন্তরে যে ভগবান স্থাপিত, তাঁহার সর্বভূতে সর্বব্যাপী ভাব দর্শন করিয়া মুগ্ধ-চিত্তে তাঁহার উপাসনা করেন। যদি সেই মহাপুরুষ না ভক্ত হন, তাহা হইলে ভক্ত কে? কেবল থেই থেই নাচিয়া একবার চক্ষের জল ফেলিলে যদি ভক্তি হইত, তাহা হইলে ভক্তি অতি অনায়াসলভ্য বস্তু বলিতাম। ভক্তচূড়ামণি পরমহংসদেব তৃণ তৃণের উপর পদবিক্ষেপ করিয়া কেহ চলিয়া গেলে ব্যথা পাইতেন, সকলের মঙ্গলার্থে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার শিষ্য বিবেকানন্দ জনসেবা পরমধর্ম প্রচার করিয়া কি সেই ভক্ত চূড়ামণি রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শ্রীচরণ অনুসরণ করেন নাই? বিবেকানন্দ ভক্তির ভানের বিরোধী ছিলেন। তিনি পরম ভক্ত, পরসেবার উপদেশ দিয়া তিনি ভক্তিধর্মের সার মর্ম প্রচার করিয়াছেন। যিনি ভক্তি লাভের প্রয়াসী, তিনি গুরুভক্ত বিবেকানন্দকে জীবনের ধ্রুবতারা স্বরূপ চক্ষের উপর রাখিয়া-পরসেবায় ব্রতী হইয়া দিন দিন ভক্তি-পথে অগ্রসর হোন এবং বিবেকানন্দের ন্যায় পরম ভক্তি-ধর্মের অধিকারী হইয়া ভক্তিধর্ম প্রচার করুন। এ আমার উৎসাহ বাক্য নয়, ইহা সম্পূর্ণ সম্ভব। বিবেকানন্দ ইহা তাঁহার জীবনে প্রমাণ করিয়াছেন। যে সময় পরমহংসদেব অন্তর্ধান হন, শিষ্যমণ্ডলী ব্যাকুল, তখন বিবেকানন্দ

তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন, 'ভাই, ভয় কি? শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের জন্যে রহিয়াছেন, তাঁহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণের সহকারী হইয়াছিলেন। যিনি বিবেকানন্দের প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন, তিনি বিবেকানন্দের সহকারী নিশ্চয় হইবেন; বিবেকানন্দ সেই মহাপুরুষের উপরেই সমস্ত কার্যভার অর্পণ করিয়া অন্তর্ধান হইয়াছেন।

বিবেকানন্দের কথা আলোচনা করিতে করিতে আমার প্রতি তাঁহার ভালবাসা মনে পড়িতেছে, সে ভালবাসার প্রতিদান হয় না, কিন্তু স্মৃতিপথ হইতে তাহা বিলুপ্ত হইবার নহে। তাঁহার মধুর আলাপ, মধুর বাগ্‌যুদ্ধ দ্বারা উপদেশ প্রদান, আমার হাতে অ-মানীকে মান দান,—সে সমস্ত উল্লেখ করা যায় না; একটি দৃষ্টান্ত দিই,—তিনি বিদেশ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া প্রথমে পঞ্চপতিনাথ বসুর বাটীতে আহূত হইয়া আসেন। তিনি বাটীতে প্রবেশ মাত্র অনেকে তাঁহার চরণ স্পর্শ করিল। আমিও চরণ স্পর্শ করিতে সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। আমি অবনত হইতেছি অমনি তিনি আমার বাহুদ্বয় ধারণ করিয়া বলিলেন, 'কি করো যোগেশ, আমার যে অকল্যাণ হবে।' এইরূপ অ-মানীকে মান দান ও নিরভিমানীর দৃষ্টান্ত যদি কেহ দেখিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি বিবেকানন্দকে দেখিয়াছেন। এরূপ নিরভিমান ও লোকাতীত কার্য বিবেকানন্দতেই সম্ভব।

পরিশেষে আমার বিবেকানন্দের ভক্তমণ্ডলীর নিকট সবিনয়ে নিবেদন যে, এই প্রবন্ধে আমার যাহা ত্রুটি হইল, তাহা তাঁহারা মার্জনা করুন। আমার বিবেকানন্দকে ভয় নাই—অসীম ভ্রাতৃপ্রেমে তিনি বারংবার আমার ত্রুটি মার্জনা করিয়াছেন, এখনও করিবেন। ভয়—তাঁহার ভক্ত-মণ্ডলীকে, তাঁহারা আমার ত্রুটি গ্রহণ না করেন—এই আমার প্রার্থনা।

"তত্ত্ব-মঞ্জরী" মাসিক-পত্র, ফাল্গুন। ১৩১১

খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই

গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা	৬·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	৫·০০
ভারত-আত্মার বাণী	৫·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
কর্মবাণী	১·২৫
Soul of India Speaks	5·00

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ. বি. টি.

বিদ্যাসাগর	২·৫০
মানুষের মত মানুষ	·৬২
শিশু রামায়ণ	·৬২
শিশু মহাভারত	·৭৫

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

বাংলার ঋষি	৩·০০
বাংলার মনীষী	১·২৫
বাংলার বিদুষী	২·০০
বীরত্বে বাঙালী	১·৫০
ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৩·০০
রাজর্ষি রামমোহন	১·০০
রবীন্দ্রনাথ	১·০০
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১·২৫
আচার্য জগদীশচন্দ্র	১·৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০

॥ প্রতিটি বই বহুচিত্র শোভিত ॥

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী :: ১৫ কলেজ স্কোয়ার :: কলিকাতা—১২।

স্বামী বিবেকানন্দ

সরলা দেবী চৌধুরাণী

[আশা]

কলিকাতা শহরের কেন্দ্রস্থিত একটি ক্ষুদ্র দ্বিতল গৃহে দুই সখিতে নিম্নস্বালাপ হইতেছিল। শুধু মনের কথা নহে—ভাবের আদান প্রদানে, দেশগত, কালগত, ভাষাগত, সাহিত্যগত নানা আলোচনায় সেদিনকার অলস মধ্যাহ্ন সরল সুখে উদ্‌যাপিত হইয়াছিল। স্বামী বিবেকানন্দের কথা উঠিতে প্রথমা সহর্ষে সগর্বে বলিয়াছিলেন "আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি, আমার বাড়ীর সম্মুখ দিয়া তাঁহাকে লইয়া যায়।" পরে এই নূতন বঙ্গ প্রতিভার দুটি মুগ্ধা স্বদেশিনী ভক্ত নারী তাঁহার উপর যেরূপ আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতির অনেক আশা ভরসা স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার কণ্ঠনিঃসৃত মহত্ত্বের বাণী শুনিবার বিশেষ আকাঙ্ক্ষা মনে পোষণ করিয়াছিল।

অপরাহ্ণে অন্য আগন্তুক আসিলেন—মধ্যাহ্ন সভা ভঙ্গ হইল অন্যবিধ গল্পগুজবের অবতারণা হইল। হঠাৎ এক সময় রাজপথে বাদ্যোদ্যম শুনা গেল, পূর্বোক্ত সখিদ্বয় একই সময়ে চমকিয়া উঠিলেন, একই চিন্তা বিদ্যুদ্বেগে উভয়ের মনে উদিত হইল, উভয়েই সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন—'বিবেকানন্দ!' প্রথমা—গৃহকর্ত্রী ছাদে উঠিয়া দেখিতে গেলেন অনুমান সত্য কিনা, অপরা উঠিবেন কিনা ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। হঠাৎ উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে প্রথমার আহ্বান শুনিলেন, 'সখি!—বিবেকানন্দ—শীঘ্র দেখিবে এসো!' আর ইতস্ততঃ না করিয়া ক্ষিপ্রচরণে সোপানাবলী মুহূর্তে অতিক্রম করিয়া তিনিও প্রথমার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তখন অস্তগামী সূর্যের সমস্ত কিরণছটা তাঁহাদের মুখে আসিয়া পড়িতেছে। চোখের উপর করপুটের ছায়া রচনা করিয়া সূর্যদেবের উৎপীড়ন কথঞ্চিৎ প্রশমিত করিয়া তাঁহারা ছাদের প্রাচীরে ঝুঁকিয়া নিম্নবর্তী জনতার মধ্যে বঙ্গের সাময়িক অধ্যাত্মবীরের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। হায়! গৃহকর্ত্রী ভ্রান্ত হইয়াছিলেন,—কোথায় বিবেকানন্দ! তাঁর মাথায়, পুষ্পমাল্যদলে, তাড়াটিয়া ফিটনে জরির পোষাক পরা একটি বালোকাদো বয়, পার্শ্বে তদ্রূপ ক্ষুদ্র মিতবর, এবং সম্মুখের আসনে বরের চৌপরটী সযত্নে সভয়ে সসম্ভ্রমে ধারণশীল অনুচর। স্বামী বিবেকানন্দের দর্শন-সৌভাগ্য আমাদের হইল না, কিন্তু আমাদের দর্শনসৌভাগ্য সম্মুখবর্তী গৃহবাসীগণের সুলভ হইয়া উঠিতেছে ইহা স্পষ্ট অনুভূত হইল। অকাল বিলম্বে, নিরাশহৃদয়ে নিম্নে ফিরিলাম।

আর একদিন অপরাহ্ণে রাজপথে শুভ্রবসন ও শুভ্র উত্তরীয়ধারী জনতাপ্রবাহ দেখিলাম। জানিলাম ৺রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের গৃহে স্বামী বিবেকানন্দের সম্মানার্থ যে সভা আহূত হইয়াছে ইহারা তাহারই যাত্রী। আমাদের গৃহ হইতেও কতিপয় যাত্রী এই তীর্থোদ্দেশে নির্গত হইয়াছিলেন। সন্ধ্যার সময় তাঁহারা গৃহে প্রত্যাগত হইলে এক জনকে জিজ্ঞাসা করিলাম 'ভাই, কি শুনিলে?'

'চমৎকার।'

'উদার,'

'অত্যাশ্চর্য।'

'অবতারবাদ শুনিলে? রামকৃষ্ণ পরমহংসকে দেবত্বে প্রতিষ্ঠা করিবার লক্ষণ দেখিলে?'

'না, না, না। সেই ত আনন্দের বিষয়, ভয় ছিল পাছে তেত্রিশ কোটির উপর আর একটি বাড়ে, তা বাড়ে নাই; বিবেকানন্দ তাঁহার গুরুকে মহৎ মানব সমাজের একজন মহত্তম মানব, মহাপুরুষ মধ্যে একজন মহত্তম পুরুষ স্বীকার করিয়া যথার্থ সম্মানিত করিয়াছেন, তাঁহাকে স্থলভ দেবত্বে অভিষেক করিয়া হীন করেন নাই।

ভ্রাতা উৎসাহে আনন্দে গল্প করিতে লাগিলেন, কখন কখন স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতার মর্মের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ভাষারও পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। আমরা অন্তঃপুরবাসিনীরা মুগ্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলাম। তিনি বিবরণ সমাপ্ত করিয়া স্থানান্তরে যাইলে আর একজন আত্মীয় আসিলেন, তাঁহার মতামত জানিতে চাহিলাম। তিনি বক্তার ভক্ত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন, বলিলেন, 'যেমন আকৃতির তেমনিই তেমনি বক্তৃতায়।'

একটি অজ্ঞাতশ্মশ্রু বালক গিয়াছিল। এখনও সর্বপ্রকার দুরূহ আলোচনার ভিতর প্রবেশের অধিকারী সে হয় নাই। কিন্তু তথাপি গুরুজনদের সহিত সভাসমিতিতে যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছে। এই বালকটি বয়সে এবং প্রকৃতিতে বালক, কিন্তু দেখিতে ভীমসেনের অনুজ। তাহাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কেমন শুনিলি" সে বলিল "বেশ" সবজান্তায় বুঝতে পারিনি। কিন্তু যেখানে যেখানে পেয়েছিলুম বেড়ে লাগল।' শেষটা হসপ্রাহিতার স্বরে বলিল, 'A fine strong built-fellow.'

আর একজন আসিলেন, তাঁহারও মন্তব্যের মর্ম এক —'খুব ভাল'। সকলেই মুগ্ধ এবং সকলেই একটি না একটি বিশেষ প্রশংসনীয় কিছু লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছেন।

ভ্রাতাদের বর্ণনা শুনিয়া মনে মনে একটা বিষাদ সমুৎপন্ন হইল। হায়! যেদিন এই মহাপুরুষের অভ্যুত্থানবার্তায় হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিয়াছিল, সেদিন অনেক আশা মনে পোষণ করিয়াছিলাম, সেদিন বিস্মিত হইয়াছিলাম, আমরা বঙ্গনারী—এই তেজস্বী পুরুষের তেজস্বিনী বাণী স্বকর্ণে শুনিবার অধিকারিণী নহি। প্রতীচ্য নারীরা এই প্রাচ্য গুরুর পদতলে বসিয়া অকূল ভরিয়া জ্ঞান ও ধর্মের সুধাসঞ্চয়ে সম্পূর্ণ নির্ব্বাধা—তাঁহার স্বদেশীয়াদেরই প্রতিহতা। দুঃখ এই—এ বাধা সহজেই অতিক্রম করা যাইত, কিন্তু যে পুরুষদের উপর বক্তার বক্তৃতাস্থান নির্বাচনভার অর্পিত রহিয়াছে তাঁহাদের স্বল্পমাত্র বিবেচনার অভাবে বোধ হয় বারবার এমন স্থান নির্দিষ্ট হইবে যেখানে সর্বসাধারণ বঙ্গরমণীর উপস্থিতি অসম্ভব। এইরূপ হতাশায় সেদিন কাটিল, এবং বিবেকানন্দ স্বামীর জীবন্ত বক্তৃতা সংস্পর্শে আসিবার আশা একেবারে ত্যাগ করিলাম।

এ দিকে শরীরী লেখকের পাকভৌতিক শরীরটি ও পাকবায়বিক প্রাণময়টির মধ্যে কিছুকাল ধরিয়া তুমুল দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। সপ্তরথী পরিবৃত অভিমন্যুবৎ, পক্ষ-প্রাণোৎপীড়িত শরীর যোদ্ধা দিন দিন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছিল। তাঁহার নববল সঞ্চয় করার আবশ্যক বোধ হইল। একদিন রাত্রে বিবেচনা করিল এতগুলা দুর্দান্ত প্রাণবায়ুকে নিজের ক্ষীণ মুষ্টির ভিতর আর কিছুতেই আটক করিয়া রাখিতে পারিতেছে না। পরদিন প্রভাতে নূতন আকাশ, নূতন প্রান্তর, নূতন বায়ু, নূতন দৃশ্যের মধ্যে নিজেকে প্রেরণ করিবার আয়োজন করিল। সে দিন বুধবার ৩রা মার্চ। স্টেশনে যাত্রা কালীন পথে বড় বড় রাঙা রাঙা অক্ষরে দেওয়ালে বিজ্ঞাপন পড়িল—"A lecture by Swami Vivekananda at the Star Theatre, on Thursday the 4th March."

স্টার থিয়েটারে তবে ও শুনিবার উপায় ছিল। শরীর মহাশয় মুহূর্তে চাঙ্গা হইয়া উঠিলেন। পূর্বাহ্নে তাঁহার

শোচনীয় পরাজয় স্বীকারের কথা নিজের কাছে সম্পূর্ণ বেমালুম যাইলেন। মনে মনে বলিলেন আর একটা দিন কেন, এখনও গোটা ত্রিশেক দিন তিনি অনায়াসে মাতৃভূমির বায়ুপানে করিয়া প্রাণবায়ু ফটার সহিত লড়িতে পারেন, কিন্তু পাছে ব্যক্ত করিলে তাঁহার পার্শ্ববর্তী সখী তদন্তরে উনপঞ্চাশ বায়ুর প্রাবল্য আবিষ্কার করেন তাই মনের কথা মনেই চাপিয়া গেলেন।

ভাগীরথীতীরে সায়াহ্নকালে রমণী বসিয়া বসিয়া ভাবে এখন রাজধানীতে ভাবুক সমাজে কতদূর, প্রতিদিন কত নূতন ভাবের তরঙ্গ, নূতন হিল্লোল, নূতন আনন্দ। যে রঙ্গালয়ে অধিকাংশ সময়ে সুরুচির বিরোধী কুৎসিৎ বিদ্রূপ ও পরিহাসে দর্শকগণ আমোদিত হইয়া আসিয়াছে, সেই রঙ্গালয়ে আজ কি অভিনব যজ্ঞের আরম্ভ।

আমাদের একান্ত আশা বঙ্গের সামাজিক জীবনে নবযুগ বুঝি সমাগত। এই সম্ভাবিত যুগপ্রবর্তনকারীর সহিত আমাদের সব সময় সকল বিষয়ে মতে না মিলিতে পারে, তথাপি তিনি আমাদের শ্রদ্ধেয়। প্রতীচ্য সভ্যজগতে তিনি হীনা মাতৃভূমির যে গৌরবের প্রতিষ্ঠা করিয়া আসিয়াছেন তাহার জন্য দেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলের কৃতজ্ঞতার পাত্র।

আজ যদি স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার মাতৃভূমি কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়া সশরীরে অধিষ্ঠান না করিতেন, যদি অতীত মহাপুরুষগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বর্তমান পরিত্যাগ করিতেন, তবে আমরা বর্তবাসী স্বদেশীয়েরা তাঁহার বিরহে নিজেদের অনুতাপ করিয়া বহুবিলাপ করিতাম। তখন তাঁহার অভিমানে আকাশ প্লাবন করিবার কথা মনে আসিত, নাকের জলে চোখের জলে মাসকতক ধরিয়া পত্রিকার আট-দশ পৃষ্ঠা অবিরল সিক্ত রাখিতাম, অবশেষে চিরপ্রথামত গুরুগম্ভীর স্বরে বিলাপের শেষ কথা কহিয়া সমাপ্ত করিতাম—"নিতান্তই যাইবে? তবে যাও। হে নরেন্দ্র! হে বিবেকানন্দ! যাও সেই পুণ্যধামে যেখানে পরিপূর্ণ বিবেকের আনন্দলাভ করিবে—ইত্যাদি ইত্যাদি।"

যখন সৌভাগ্য আমাদের দ্বারে আসিয়া করাঘাত করে তখন আমরা তাহার মর্যাদা বিস্মৃত হই, যখনই সে অন্তর্ধান হয় তাহা পরিপূর্ণ মাত্রায় উপলব্ধি করি। কিন্তু তখন শত তীব্র মর্মজ্বালা উপলব্ধিও নিষ্ফল। রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন নাই। একজন বর্তমান লেখকের জন্মের বহুপূর্বে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন, আর একজনের প্রতিভা দুর্ভাগ্য লেখকের শৈশব জীবন সীমায় পর্যবসিত হইয়াছিল। এই সমাজ সংস্কারক মহাপুরুষগণের জীবনী পাঠ করিয়া কতবার তাঁহাদের সমসাময়িক কালে জন্মগ্রহণ না করিবার দুঃখে ব্যথিত হইয়াছি, যেন তাঁহাদের অদর্শনে তাঁহাদের প্রতিভার সাক্ষাৎ প্রভাবানুভূতির অভাবে কত কি হারাইয়াছি। সেই পরিশোচনায় অভিজ্ঞ হৃদয় আজ বহ্যাকাশে ও আমাদের প্রবুদ্ধ জীবন আকাশে উদীয়মান এই নব রবির মাহাত্ম্য পূর্ব হইতে ধারণা করিতে চেষ্টা করিতেছে। তাই বৃত্তের উদ্বেগে সাশ্রু বিদায় কাব্যের পরিবর্তে জীবিতের উদ্বেগে সানন্দ স্বাগত বাক্য লইয়া উপস্থিত হইয়াছি।

॥ নিরাশা ॥

কিন্তু আনন্দ ব্যক্ত হইতে না হইতেই নিরানন্দের কারণ উপস্থিত! স্বাগত বলিতে না বলিতে বিদায়ের কাল সমাগত। বিবেকানন্দ স্বামীর স্বদেশ উদ্ধারিত প্রথম বক্তৃতা শ্রবণ করিবার সুখ আমাদের হয় নাই; কিন্তু পরদিন প্রভাতে সংবাদপত্রে তাহা আনুপূর্বিক পাঠ করিবার সুখে বঞ্চিত হই নাই। তাঁহার বক্তৃতা সমাপনান্তে সভাপতির তৎসম্পর্কিত জ্ঞাপনও পড়িলাম। সে বিজ্ঞাপন এইরূপ: Before we separate I have to announce that the health of Swami Vivekananda will not per-

mit him to deliver more lecture in Calcutta for the present....It is absolutely necessary that he should have a little rest for a time ; and with this object in view he intends to proceed to Darjeeling on Monday next. On his return form Darjeeling after a short time it is his intention to deliver one more lecture in this city. This will probably cause some disappoin tment to many of you but there is no help for it. From Calcutta the Swami proceeds to Almora for a while and then after stopping at Baranagore for sometime to complete his work in this country he goes to the West again to resume his work there.

দুইটি বক্তৃতা এবং তৎপরে কিছুকাল বরাহনগরে অবস্থিত—ইহাতেই স্বামীর স্বদেশীয় কর্তব্য সম্পূর্ণ হইয়া যাইবে? আমাদের নৈতিক অধোগতির দিনে যাঁহাকে ত্রাণকর্তা মনে করিয়াছিলাম, তিনি তাহা নহেন? তিনি শুধু একদিনের অতিথি, দ্বিতীয় তিনি পর্যন্ত অপেক্ষা করিবার অবসর তাঁহার নাই? তাঁহার গন্তব্য অন্য প্রদেশ, স্বামী কার্যক্ষেত্র অন্যত্র। শুধু পথ চলতি একটি দিন মাতৃভূমিতে কাটাইয়া দুটি জ্ঞানের কথা কহিতে আসিয়াছেন? আমাদের সুখ-দুঃখের অংশ তিনি গ্রহণ করিবেন না? আমরা যে অজ্ঞান ও দুর্নীতির বন্যাতলে দিন দিন নিমজ্জিত হইতেছি তাহা হইতে উদ্ধার চেষ্টায় তিনি সাহায্য করিবেন না? করিলেও শুধু বাক্যের দ্বারা করিবেন। কাজের দ্বারা নহে? বাক্য অনেক শুনিয়াছি, উঠিতে পারি নাই ; যে সাহায্যের হাত বাড়াইয়া থাক, টানিয়া তোল। আমরা নিজের বলে উঠিতে পারি না, তোমার হাত উঠাও। অর্ধশতাব্দীর পূর্বে একবার বলিষ্ঠ রামমোহন রায় আসিয়া অনেকটা অজ্ঞানতা, আমাদের এ দেশ হইতে দূরীভূত করিয়াছিলেন। তাহার পর কেশবচন্দ্র সেন আর একবার এদেশে আত্মাকর পবনের হিল্লোল তুলিয়াছিলেন। এখন বিবেকানন্দ স্বামী সমাগত। এখনও দেশে বহু আবর্জনা স্তূপীকৃত রহিয়াছে, বিবেকানন্দের ন্যায় বীর কি শুধু তাঁহার মৃদুতা সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া স্থির থাকিবেন? তাঁহার সংস্কারে নিজেকে নিযুক্ত করিবেন না?

ইচ্ছা করিলে বিবেকানন্দ স্বামী স্বদেশের অনেক কাজ করিতে পারিতেন। সমাজ সংস্কারকের দুইটি প্রধান উপাদান তাঁহাতে বর্তমান পাণ্ডিত্য ও বাগ্মিতা ; এবং তিনি নিজেকে কোন বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত না করাতে সম্প্রদায় নির্বিশেষে সমস্ত হিন্দুরই শ্রদ্ধাভাজন। প্রতীচ্য সভ্যতার সংস্পর্শে তাঁহার মার্জিত প্রাচ্য জ্ঞানালোকে মাতৃভূমি সমুজ্জ্বল করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল। কিন্তু যে ক্ষমতানুযায়ী কর্তব্য তিনি স্বীয়-কর্তব্য বলিয়া গ্রহণ করিলেন না। সে আমাদেরই দুর্ভাগ্য। হায়! আমাদের নৈতিক দুর্দিনের যাহাকে সূর্যোদয় মনে করিয়াছিলাম, তাহা সূর্যোদয় নহে, —একটি বৃহৎ তারার ক্ষণিক জ্যোতি মাত্র।

('ভারতী,' চৈত্র ১৩০৩)

আপনার প্রতিটি প্রচেষ্টা হোক
সুস্থ জগৎ প্রচেষ্টা

অপূর্ব রূপান্তর

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

আমার সঙ্গে বিবেকানন্দের প্রথম সাক্ষাৎ ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে। আমরা তখন জেনেরাল এসেম্ব্লীর কলেজে অধ্যক্ষ উইলিয়ম হেষ্টি-র ছাত্র ছিলাম। অন্যান্য হেষ্টি ছিলেন কবি পণ্ডিত ও অধিবিদ্যাবিৎ। বয়সে বিবেকানন্দ আমার বড় ছিলেন, কিন্তু কলেজে আমি ছিলাম তাঁর এক বছরের সিনিয়র। অস্বীকার করবার যো নেই যে, তিনি ছিলেন একজন প্রতিভাবান্ যুবক—দিগুব, চালচলনে স্বচ্ছন্দ ও সংস্কারমুক্ত এবং সুবক্তা। ছিলেন সামাজিক গোষ্ঠীর প্রাণপুরুষ, অপূর্ব আলাপচারী—কিঞ্চিৎ তিক্তভাষী। যুক্তিতীক্ষ্ণ বাক্যবাণে সংসারের ফাঁকা ভড়ংকে বিদ্ধ করে গ্রহণ করেছিলেন অবজ্ঞাভরে আসন। কিন্তু এই ছিদ্রান্বেষী সিনিসিজ্‌ম-এর অন্তরালে লুক্কায়িত ছিল একটি সুকোমল হৃদয়। সব বিষয়ে তিনি ছিলেন এক ভাবোন্মত্ত বাউণ্ডুলে—কিন্তু বাউণ্ডুলের যা নেই সেই লৌহদৃঢ় ইচ্ছাশক্তির আধার। ছিলেন অনপেক্ষ—বাক্যে ছিল কর্তৃত্বের ব্যঞ্জনা আর চাহনিতে একটি অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি যাতে শ্রোতামাত্রেই বশীভূত হয়ে পড়ত।

এসবই সকলের কাছে সুস্পষ্ট। কিন্তু যা অতি অল্প লোকেরই জানা ছিল সে হল ভিতরকার মানুষটি ও তার অন্তর্দ্বন্দ্ব—the Sturm und Drang of soul, যা প্রকাশ পেত তাঁর অশান্ত ভাবঘুরে-বৃত্তি বা চরৈবেতির মধ্য দিয়ে।

তাঁর মানস-ইতিহাসে এটা ছিল এক সংকটময় যুগের সূচনা। এই সময়েই তাঁর আত্মচেতনা জাগ্রত হয়ে ভবিষ্যৎ ব্যক্তিত্বের ভিত্ পত্তন হয়েছিল। ব্রাহ্মসমাজের প্রত্যন্ত গোষ্ঠী থেকে তিনি যে প্রথম বাল্যসুলভ ঈশ্বর-বোধ ও সরল আশাবাদকে আত্মসাৎ করেছিলেন তার ওলট পালট করে দিয়েছিল জন স্টুয়ার্ট মিলের ধর্ম বিষয়ক নিবন্ধত্রয় (Three Essays on Religion)—সৃষ্টির হেতুবাদী ও উদ্দেশ্যভিত্তিক ব্যাখ্যা তাঁর কাছে হয়ে উঠেছিল সত্য-পাথরের মত নির্ভরের অযোগ্য; প্রকৃতি ও মানুষের মাঝে যে অমঙ্গলের (Evil) সমস্যাটি তাঁকে যেন পাপের অপচ্ছায়া মতো অনুসরণ করছিল; সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান বিশ্বস্রষ্টার মঙ্গলময় স্বরূপের সঙ্গে তিনি এই অমঙ্গলের (Evil) সামঞ্জস্য স্থাপন করতে পারছিলেন না। এই সময়ে এক বন্ধু তাঁকে হিউম-এর সংশয়বাদ (Scepticism) ও হার্বার্ট স্পেন্সার-এর অজ্ঞেয়-বাদের (Doctrine of the Unknowable) সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। এতে তাঁর এই অবিশ্বাস ক্রমে নিশ্চিত দার্শনিক সংশয়বাদের রূপ পরিগ্রহ করে।

তাঁর প্রথমকার সতেজ আবেগ ও সরলবিশ্বাস ক্ষয়ে যায়। একটা শুষ্কতা ও অভ্যস্ত উপাসনার অক্ষমতা—অভ্যাসগত বাহ্য-বিন্যাসের বেপরোয়া হাবভাবের আড়ালে লুকোনো এক অস্বস্তি তাঁর চিত্তকে পীড়ন করতে থাকে। কিন্তু সংগীত তখনো তাঁর হৃদয়ে এক অনন্ত-সম্ভব আলোড়ন সৃষ্টি করত এবং অদৃশ্য সত্তার এমন অদ্ভুত অপার্থিব অনুভূতি জাগিয়ে তুলত যে তাঁর নয়ন অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠত।

এই সময়েই তিনি আমার কাছে আসেন; তাঁকে নিয়ে আসেন আমাদের উভয়ের পরিচিত এক বন্ধু। ইনিই তাঁকে

হিউম ও হার্বার্ট স্পেন্সারের রচনা পাঠে প্রবৃত্ত করেন। পূর্বে তাঁর সঙ্গে আমার বৎসামান্য মুখ-চেনা রকমের পরিচয় ছিল; কিন্তু এখন তিনি আমার কাছে তাঁর হৃদয় অনাবৃত করে দিলেন, তাঁর সংশয়ের জ্বালা ও পরম-সদ্‌বস্তুর (Ultimate Reality) নিশ্চিত প্রত্যয়লাভে তাঁর নৈরাশ্যের কথা খুলে বললেন। তাঁর সেই অবস্থায় প্রাথমিক পাঠোপযোগী ঈশ্বরতত্ত্ব-বিষয়ক পাঠ্যতালিকা তিনি চাইলেন। আমি কয়েকটি প্রামাণ্য গ্রন্থের নাম করলাম, কিন্তু স্বজ্ঞাবাদীদের Intuitionist-দের ও Scotch Commonsense School-এর মামুলিযুক্তি জালে তাঁর অবিশ্বাস আরো দৃঢ় হল। তা-ছাড়া, আমার মনে হল গতানুগতিক বা কিছু পড়ার মতো ধৈর্য তাঁর নেই—বই থেকে নয়, জীবন্ত আদর্শের নিবিড় সান্নিধ্য ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আত্মীকরণই ছিল তাঁর ধাত। এ ছিল তাঁর কাছে এক প্রাণ থেকে প্রাণের প্রজ্বালন, চিত্ত থেকে চিত্তের উদ্দীপন। আমি তাঁর প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলাম, কারণ আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে তিনি সকল বাধার সঙ্গে সাগ্রহে বোঝাপড়া করবেন।

আমি তাঁকে শেলীর রচনা থেকে পর পর পড়ে শোনালাম। দার্শনিকদের যুক্তিজাল যখন ব্যর্থ হল তখন শেলীর Hymn to the spirit of Intellectual Beauty, তাঁর নির্ব্যক্তিক বিশ্বপ্রেম-তত্ত্ব (Pantheism of Impersonal Love) এবং তাঁর গৌরবোজ্জ্বল চিরকল্যাণময় রামকৃষ্ণবাদের কল্পনা বিবেকানন্দের চিত্তে সাড়া জাগাল। তাঁর কাছে জগৎ আর প্রাণহীন, প্রেমহীন স্থূল বাস্তিকতার রূপ (mechanism) এক অব্যাহত ঐক্যতন্ত্রের আধার রূপে প্রতিভাত হল।

এবার আমি তাঁকে শেলী-কল্পিত ঐক্যের চেয়েও মহত্তর অদ্বৈত সত্তার কথা বললাম, সর্বময় জ্ঞানস্বরূপ পরব্রহ্মের অদ্বৈতসত্তা। আমি তখন বেদান্তের বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ, হেগেলের 'Dialectics of Absolute Idea' এবং ফরাসী বিপ্লবের সাম্য-সৌভ্রাত্র-স্বাধীনতার বাণী—এই তিনটি মূলনীতিকে মিলিয়ে মিশিয়ে এক মহানীতিতে একীভূত করবার চেষ্টা করছিলাম। ব্যক্তিভেদের নীতিই ছিল আমার কাছে অকল্যাণ বা পাপরূপ, সার্বিক জ্ঞান (the Universal Reason) ছিল আমার কাছে একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বস্তু; প্রকৃতি, জীবন, ইতিহাস এই পরম ভাব-সত্তার (Absolute Idea-র) ক্রমোন্নত অভিব্যক্তি। সমস্ত ধর্মীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক বিশ্বাস ও তত্ত্বের যাচাই হবে বিশুদ্ধজ্ঞানের (Pure Reason) সঙ্গে তাদের কতটা মিল তাই দিয়ে। হৃদয়াবেগকে (feeling) আমার একটা অনুকম্পাভাব মনে হত যেন, প্রকৃতিস্থ ও সুনিয়মিত মনের বিকৃত অবস্থা। বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রকাশের পথে বস্তুর, ব্যক্তি-সত্তার ও অজ্ঞানের বিরোধিতাকে কিরূপে জয় করতে হবে তাই ছিল জীবন ও সমাজের, শিক্ষা ও আইন প্রণয়নের প্রকাণ্ড সমস্যা। তরুণ অনভিজ্ঞ স্বপ্নবিলাসীর অত্যুৎসাহে আমি এ ধারণাও পোষণ করতাম যে অজ্ঞানের বন্ধন থেকে জাতির মুক্তি আসবে এক বৈপ্লবিক রাজনীতির দ্বার দিয়ে—যার মূলমন্ত্র হবে সাম্য-সৌভ্রাত্র ও স্বাধীনতা। সর্বময় জ্ঞানের (Universal Reason) একচ্ছত্র অধিকার ও নীতিতত্ত্বে ব্যক্তির অস্বীকৃতি—এই ধারণা দুটিই বিবেকানন্দের বুদ্ধির তৃপ্তি সাধন এবং সংশয়বাদ ও বস্তুবাদের ওপর তাঁকে নিঃসংশয় বিজয় প্রদান করল।

তার চেয়েও বেশী, এরা যেন তাঁকে দিগ্‌-নির্ণয় যন্ত্র সরবরাহ করল। কিন্তু এতেও তাঁর মনে শান্তি এল না। দ্বন্দ্ব এখন তাঁর মনের আরো গভীরে প্রবেশ করল, কারণ সর্বময় জ্ঞানে (Universal Reason) বিশ্বাস তাঁর শিল্পি-প্রকৃতির সূক্ষ্ম প্রকাশ ও ভবঘুরে প্রবৃত্তিকে দমন করবার দাবি জানাল। তাঁর ইন্দ্রিয়-সংবেদন ছিল তীব্র ও তীক্ষ্ণ, প্রকৃতিগত বাসনা ছিল প্রবল ও দুর্বার, তরুণ মনের অনুভূতি ছিল কোমল আর খেলাধেলা ছিল অবাধ ও আনন্দোচ্ছল।

এগুলো যখন করা মানে তাঁর সহজ স্বাচ্ছন্দ্যকে হত্যা করা—আপন সত্তাটিকেই অবদমিত করা। তাই দ্বন্দ্ব-সংঘাত শীঘ্রই গুরুতর নৈতিক সমস্যার পথ ধরল—বাসনা-কামনা ও বিচার-বুদ্ধিতে প্রভুত্বের লড়াই বেধে গেল। ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণ ও মূল্য-প্রকৃতির তীব্র বাসনা তাঁর কাছে এখন অশুচি, স্থূল ও কামজ মনে হতে লাগল। এটাই ছিল তাঁর জীবনের ঘোর তমসাচ্ছন্ন পরীক্ষার-কাল। সংগীত প্রতিভার গুণে তাঁর এমন সব সংগী জুটতে লাগল—যাদের আচার-ব্যবহার ও নীতিবোধের প্রতি তাঁর তীব্র ও স্পষ্ট ঘৃণা ছিল। কিন্তু তাঁর সামাজিক মেলামেশার ঝোঁক ছিল এতই প্রবল যে তিনি তা সামলাতে পারতেন না। তাই সন্ধ্যায় যখন তিনি গানের আসরে যেতেন তখন কখনো আমি তাঁকে সন্ধান করলে তিনি যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচতেন।

আমি তাঁর মাঝে উচ্চকোমল অনুভূতির ঝংকারস্পন্দিত একটি উন্নত, শুচি ও অগ্নিগর্ভ প্রকৃতির পরিচয় পেয়েছিলাম। নিশ্চয়ই তিনি বিরক্ত বা রুক্ষ কেতাবাবাজী—স্বভাবত বিষাদগ্রস্ত লোকও ছিলেন না। শুধু আমাকে বাঁচিয়ে তিনি স্বচ্ছন্দে যদৃচ্ছ-ভাষা ব্যবহার করতেন। ভদ্রতা ও চিরাগত রীতির মর্মে আঘাত করায় তাঁর এক অদ্ভুত উল্লাস ছিল; এই স্ফূর্তির দ্বন্দ্ব দিয়ে তিনি তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু সমাজের বাইরে অন্য সবার কাছে স্বরূপ থেকে স্বতন্ত্র, দুর্জ্ঞেয় রহস্যময় এক ব্যক্তিরূপে দেখা দিতেন। কিন্তু অন্তরের গভীরে বিভীষিকাময়ী কামনা (Desire) ও ছলনাময়ী কল্পনার (Fancy) সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্ব চলত।

বন্ধন ও নিষ্ফল দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি দিতে পারে এমন কোনো শক্তির যখন পুনঃ পুনঃ সন্ধান করছিলেন তখন শুধুই বিশুদ্ধ জ্ঞানের মহিমা এবং সেই সর্ব্ববন্ধ জ্ঞানের সঙ্গে ব্যক্তির তাদাত্ম্যের ফলে যে অনির্বচনীয় প্রশান্তিলাভ হয় আমি শুধু তারই ইঙ্গিত তাঁকে দিতে পারতাম। সেটা ছিল আমার জীবনে কিছুটা ইন্দ্রিয়াতীত তুরীয়বাদের (Platonic Transcendentalism-এর) যুগ। অন্যান্য দেহ-বোধ ও বিদ্রোহী প্রবৃত্তির অভিজ্ঞতা তখনও আমার হয় নি। রূপা বা ব্যাঘ্রতার মত বাইরের কোন সহায়তা বা মানুষের তৈরী কোনো আশ্রয়ের কাছে বুদ্ধি তার স্বাধিকার বিসর্জন দেবে—এমন মেজাজ বা মানসিকতার প্রতি আমার যথেষ্ট ধৈর্য্য ছিল না। জ্ঞানের (Reason) ভজনার সঙ্গে অনুভূতি ও প্রবৃত্তির আপোশ-রফা করবার প্রয়োজন তখনও আমি বোধ করিনি, ব্রহ্ম-সত্তার (self) প্রতি আনুগত্য স্বীকারের ইচ্ছাও খণ্ডিত হয় নি। ইতিপূর্বেই স্থূলভাবে বিশিষ্ট বাস্তবরূপে সদ্বস্তু (the Reality) ও ভাব-বস্তুতে (the Ideal) এবং প্রকৃতি (Nature) ও আত্মার (Spirit) বিরোধ-বোধ আমার হয়েছিল এবং পরে সূক্ষ্মভাবেও এসেছিল। কিন্তু বিবেকানন্দের যে-রূপে সে বোধ হয়েছিল আমার এসেছিল তার চেয়ে স্বতন্ত্ররূপে। কিন্তু সে-সময়ে তাঁর সমস্যা যেমন আমার ছিল না, আমার সমস্যাও তেমনি তাঁর ছিল না।

তিনি স্বীকার করেছিলেন যে, যদিও নির্বিশেষই (the universal) তাঁর বুদ্ধিকে জয় করে নিয়েছেন তবু তাঁর হৃদয় বিশেষ ও ব্যক্তিগত অহং-কেই মেনে নিয়েছে। তিনি অভিযোগ করছিলেন যে, পাণ্ডুর রক্তহীন জ্ঞান—প্রকৃত প্রস্তাবে নয়, আইনতঃ সার্বভৌম জ্ঞান—প্রলোভনের সময়ে বাহু প্রসারিত করে তাঁকে রক্ষা করতে পারছে না। তিনি জানতে চাইছিলেন আমার দর্শন তাঁর ইন্দ্রিয়-বোধকে তৃপ্ত করতে এবং দেহধারী হয়ে তাঁর মুক্তিসাধনে সমর্থ হতে পারে কি না। সংক্ষেপে তিনি চাইছিলেন একটি জ্যোতির্বলয়িত সাকার জীবন্ত বিগ্রহ; সর্বোপরি, তাঁর অন্তর তখন রোদন করছিল—তাঁকে রক্ষা করতে, তুলে ধরতে পারে এমন একখানি হাতের জন্য; অক্ষমতা দূর করে তাঁর অকিঞ্চিৎকরতাকে মহিমায় মণ্ডিত করতে পারে এমন এক

বাহ্যশক্তির জন্য—গুরু বা আচার্যের জন্য, যিনি পূর্ণতার জীবন্ত মূর্তি ধারণ করে তাঁর অন্তরের সকল উদ্বেলতাকে শান্ত করতে পারেন।

এই স্থূলদেহে পূর্ণতার ও ত্রাণকর্ত্রী বহিঃ শক্তির দাবীকে—ইন্দ্রিয়-বোধের কাছে বিচারবুদ্ধির এই বিসর্জনকে—তৎকালে অজ্ঞান-প্রসূত দুর্বলতা বলেই আমার মনে হয়েছিল। আত্মস্থে নিত্য একটি চিত্তের এই দাবির সম্মুখীন হয়ে আমার তরুণ অনভিজ্ঞ হৃদয় বুঝতে পারছিল না কি করে এই দাবী মেটানো যায়। আর অনতিকাল পরেই বিবেকানন্দ ব্রাহ্ম সমাজের উপাসক ও প্রচারকদের নিকটে উপস্থিত হয়ে যেন নিজের অজ্ঞাতেই অজ্ঞতার ভাণ করে একটি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ভাবমূর্তির জন্য, দৃষ্টিগোচরীভূত সত্যের জন্য, যুক্তিবিরোধিনী শক্তির জন্য প্রার্থনা করতে লাগলেন। তিনি তিক্ততার সহিত অভিযোগ করেছিলেন যে, এখানে মানসিক খাদ্যরূপে প্রচুর নীতি-বিচার, তত্ত্বকথা, বক্তার উপদেশ তিনি পেয়েছিলেন এবং সে আহার্য তাঁর কাছে নিতান্ত স্বাদহীন ও ফোলো বলেই মনে হয়েছিল। তিনি নানা আচার্য, নানা তত্ত্ব ও বিশ্বাস যাচাই করে দেখলেন এবং এই অনুসন্ধান-সূত্রেই প্রথমে সংশয়-দোলায়িত চিত্তে দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হলে এবং এই রামকৃষ্ণই প্রত্যয়গত দৃঢ়তা সহকারে তাঁর সংগে আলাপ করলেন এবং তাঁর শক্তির দ্বারা বিবেকানন্দের চিত্তে শান্তি-আনয়ন ও হৃদয়ের ক্ষতকে আরোগ্য করলেন। তবু তাঁর বিদ্রোহী বুদ্ধি তখনো রামকৃষ্ণকে গুরু বলে সম্পূর্ণ স্বীকার করল না। তার মনের দ্বিধা দূর হল না, গুরুর সান্নিধ্যে তাঁর অন্তরে যে শান্তি বিরাজ করত তা অলীক কিনা—এই সংশয় তিনি বোধ করতে লাগলেন। চাক্ষুষ প্রমাণের স্থির নিশ্চিত আশ্বাস দ্বারা সেই তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সংশয় ক্রমে পরাভূত হল।

আমি প্রবল আগ্রহে আমার চোখের সামনে এই আমূল রূপান্তর লক্ষ্য করছিলাম। ধর্মভাবের আবেশ ও কালী-পূজার প্রতি ভক্তি-বিশ্বাস সম্বন্ধে আমার মত তরুণ ও উগ্র বৈদান্তিক তথা বেগেলবাদী তথা বিপ্লবীর মনোভঙ্গি সহজেই অনুমেয়। আর আমি যাকে মনে করতাম অদ্ভুত অতিপ্রাকৃত মিষ্টিসিজ্‌ম্ তারই জালে যখন বিবেকানন্দের মত আজন্ম কালাপাহাড় ও যুক্তিবাদী, সহজাতক্ষম প্রবল বুদ্ধিসম্পন্ন বহুজন-মনোহারী ব্যক্তিকে জড়িয়ে পড়তে দেখলাম, তখন সে দৃশ্যকে এমন এক রহস্য বলে মনে হল যাকে ভেদ করা আমার 'বিশুদ্ধ জ্ঞানের' দর্শনের পক্ষে তৎকালে সম্ভব ভালো-বেসে ছিল না। কিন্তু ভালবেসে বিবেকানন্দ ভালো-বাসার পাত্রই রইলেন এবং তাঁর যে আচরণকে সেদিন ধর্ম বিচ্যুতি মনে না করে পারিনি তার জন্য অত্যন্ত দুঃখ বোধ করলাম; ব্যক্তি বিশেষের প্রতি আসক্তি বা দরদ—ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও পক্ষপাতের দূষিত অসুস্থভাবের প্রবল তাড়নায়ই শেষ পর্যন্ত আমি বিবেকানন্দের গুরুকে দেখবার ও তাঁর কথা শুনবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে যাত্রা করলাম। আমার মতো ঘর-কুনো অন্তে-বাসীর কাছে এ যাত্রা ছিল দুঃসাহসিক অভিযান। মন্দির প্রাঙ্গনের উদ্যানে ছায়াশীতল শান্ত নির্জনতায় দীর্ঘ গ্রীষ্ম দিনের অধিকাংশ ভাগ অতিবাহিত করে যখন ফিরে এলাম তখন অন্ধকার কড়-বজ্রপাতের গর্জন ও বিদ্যুৎ আবছা আঁধারের বুকে মুহুর্মুহু আঘাত হানছিল। কিন্তু আমার দৈহিক ও নৈতিক বিভ্রান্তি ও সত্যের এই অস্পষ্ট বোধ নিয়ে যে, বিশ্ব-বিধাতার মহিমার আপাতঃ সামঞ্জস্যহীন কিম্ভূতকিমাকারও সুসমঞ্জস সুষমাময় হয়ে থাকে, আপাতঃ আত্ম-সমর্পণের মধ্যেও আত্ম-কর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠা হতে পারে, ইন্দ্রিয়জ বোধ তার ভুলভ্রান্তি নিয়েও বিকাশোন্মুখ জ্ঞান এবং বহিঃস্থ ত্রাণশক্তিতে বিশ্বাস আত্ম-নিয়ন্ত্রণরূপ মূল-কর্মেরই অস্পষ্ট প্রতিফলন। আর বিবেকানন্দের পরবর্তী জীবনেতিহাসেই এ-সবের প্রচুর সমর্থন পাওয়া যায়: গুরুর কৃপা ও শক্তিতে তিনি যে দৃঢ় আশ্বাসের সন্ধান করছিলেন তা পেয়ে তিনি বিশ্বমানব ও পরব্রহ্মের (Self) অবাধ ও অবিচ্ছেদ্য সার্বভৌমত্ব প্রচার করতে ও শিক্ষা দিতে লাগলেন।"

—প্রবুদ্ধভারত, ১৯০৭ সাল। মূল ইংরাজী হইতে অনূদিত

ভারতের প্রথম সমাজবাদী—স্বামী বিবেকানন্দ

অতীন্দ্রনাথ বসু

বিবেকানন্দ ও তাঁর গুরু রামকৃষ্ণ দুইয়ে মিলে পূর্ণ ব্যক্তিত্বের রূপ নিয়েছেন। তন্ত্র, অদ্বৈত, ইসলাম ও খৃষ্টধর্মের অনুশীলনের মধ্য দিয়ে রামকৃষ্ণ অধ্যাত্মসাধনার শীর্ষতম স্তরে পৌঁছেছিলেন এবং তাঁর প্রিয় শিষ্যকে অধ্যাত্মচেতনার অধিকারী করে গিয়েছিলেন। আত্মোপলব্ধিতেই বিবেকানন্দের মন তৃপ্ত হতে পারে নাই। মানুষের সেবায় নিযুক্ত হবার দুর্বার তাগিদ ছিল তাঁর পেছনে। পবিত্র গার্হস্থ্যের অধিকারী হয়ে শিষ্য গুরুর বেগবান ধারার পরিণত হলেন—সাধকের জীবন পূর্ণতা পেলো। হিউম এবং স্পেন্সারের সংশয়বাদে সিক্ত অবিশ্বাসী, সত্যদ্রষ্টা ঋষির স্পর্শে আমূল পরিবর্তিত হয়ে হৃদয়ে অনির্বান অগ্নিশিখা জালিয়ে ভাবগত অশ্রুসিক্ত চোখে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী গুরুর বাণী প্রচারে পরিব্রজ্যা সুরু করলেন। মাত্র দশ বছর সক্রিয় জীবন যাপনের পর অকালমৃত্যু তাঁকে তুলে নিয়ে গেলো। কিন্তু তার পূর্বেই তিনি যুবশক্তির মনে আগুন জালিয়ে গেছেন এবং তাদের এই শিক্ষা দিয়েছেন যে "তাদের জীবন দেশমাতৃকার জন্য উৎসর্গীকৃত"।

আগামী দিন শূদ্রের হাতে

বেদান্তের সাধনকে প্রয়োগের স্তরে আনবার দুর্বার প্রেরণা নিয়ে বিবেকানন্দ অগ্রসর হয়েছিলেন। ব্যবহারিক জীবনে মানুষের সঙ্গে মানুষের কোনো প্রভেদ নাই। কারণ শাশ্বত সত্তাই একমাত্র বাস্তব সত্য। দুঃখের কথা ভারতবর্ষ সাম্যের পরমতত্ত্ব বিস্মৃত হয়ে ভাতের হাঁড়িকে বানিয়েছে ভগবান এবং ছোঁয়াছুয়ির বিকারকে করেছে ধর্ম।

বিবেকানন্দ বলেছেন 'ভারতবর্ষের মৃত্তিকা আমার সর্বোত্তম স্বর্গ।' জাতিই তাঁর আরাধ্যদেবতা এবং দেশসেবা তাঁর ধর্ম। কিন্তু কোথায় সেই সর্বোত্তম স্বর্গ, সেই জাতি যা 'তাঁর একমাত্র আরাধ্যদেবতা!' 'কয়েক শত দেশাত্মবোধ বর্জিত অর্ধশিক্ষিত আধুনিকদের সমষ্টি নিয়ে নয়।' এরা ইঙ্গ-ভারতের সাজঘরের লোক মাত্র, জাতির প্রাণশক্তি নিহিত রয়েছে উচ্চবর্ণের মধ্যে নয়—যারা কায়িক পরিশ্রম করে উৎপাদন করে সেই জনসমাজের মধ্যে। বজ্রনির্ঘোষে বিবেকানন্দ উচ্চবর্ণের সমালোচনা করে বলেছেন :

"ভাবছ তোমরা আছ! তোমরা মৃত; দশহাজার বছরের মন্দির মতই মৃত। ভারতবর্ষের ত্রিমিতপ্রায় প্রাণশক্তি তাদেরই মধ্যে এখনও অবশিষ্ট রয়েছে, যাদের তোমাদের পূর্বপুরুষেরা বলেন 'চলমান শব'। আসলে তোমরাই "চলমান শবের দল"।

শ্রেণী বিভেদ সম্বন্ধে এবং শোষিত ও নিপীড়িতদের ক্রমবর্ধমান সমাজচেতনা সম্বন্ধে বিবেকানন্দের সুস্পষ্ট ধারণা ছিল। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিজেকে সমাজবাদী বলে আখ্যাত করেছেন। তাঁর মতে জনসমাজই সমাজের প্রকৃত অঙ্গ। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য—এরা সবাই শূদ্রের পরিশ্রমের ফল ভোগ করে। শূদ্ররাই আমাদের সভ্যতার আলো এনেছে। আবার এদেরই আমরা বলি অন্ত্যজ। এদের অবদমিত রাখলে, সমাজের সকল স্তরের মানুষ অবনমিত হয়ে দেশ খান খান হয়ে ভেঙে যাবে; কিন্তু অভ্রান্ত দূরদৃষ্টি নিয়ে তিনি বুঝেছিলেন, আগামী দিন এদেরই হাতে রয়েছে।

"মানব সমাজ ক্রমান্বয়ে পুরোহিত, ক্ষত্রিয়, বণিক ও শ্রমজীবী এই চারটি শ্রেণী-দ্বারা শাসিত হয়েছে। প্রথম তিনটি শ্রেণীর

শাসন অতীত হয়েছে। এবার চতুর্থের পালা, তাদের কেউ রোধ করতে পারবে না।"

ষাটবছরেরও অধিককাল পূর্বে বিবেকানন্দ এ-কথা বলেছিলেন। সে-সময়ে রুশদেশে জারের আমল এবং লেনিন একজন নির্বাসিত দেশান্তরী।

অগণিত জনতার আরাধ্য দেবতা, জাতির আত্মা বিশ্বমাতা অনন্ত সুষুপ্তি থেকে জেগে উঠেছেন।

"লাঙ্গল হাতে তিনি কৃষকের পর্ণকুটিরে, জেলে, মুচি ও ধাঙ্গরের ঘরে তিনি আবির্ভূত হউন। মুদির দোকান থেকে, পিঠেওয়ালার উনুনের পাশ থেকে তিনি আত্মপ্রকাশ করুন। কারখানা, হাট-বাজার থেকে তিনি বেরিয়ে আসুন। কুঞ্জবন ও অরণ্য থেকে, পাহাড় ও পর্বত থেকে তিনি উৎসারিত হউন।"

বিবেকানন্দের বাণী যে সময় জনতার কাছে পৌঁছল, তখনও পরিবর্তনের জন্য তাদের মানসিক প্রস্তুতি অসম্পূর্ণ রয়েছে। তারা প্রায় বিশ বছর পিছিয়ে ছিল। জাতির একটা বৃহৎ অংশকে দারিদ্র্যক্লিষ্ট ও অবনমিত রেখে তার জাগরণ সম্ভব নয়। যে সময় তাঁর আবেদনে কেউ সাড়া দেয় নাই, সে-সময় অছ্যুৎদের সেবার জন্য তাঁর সতীর্থরা আত্মনিয়োগ করেছেন এবং তিনি নিজে তাদের সঙ্গে বসবাস করেছেন। যুবশক্তি সংগঠনের জন্য এবং "অপ্রতিহত তরঙ্গের মত সারা ভারতে তাদের পাঠিয়ে সমাজের যারা সব চাইতে অবহেলিত ও নিপীড়িত তাদের মনে আনন্দ, তাদের জীবনে নীতিবোধ, ধর্মবোধ ও শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করবার জন্য" তিনি অধীর হয়ে উঠেছিলেন।

"Studies in the Bengal Renaissance" পুস্তকে লেখকের ইংরেজী প্রবন্ধের মর্মানুবাদ। স: স:

এই সকল পরস্পর-বিরোধী গুণের একত্র সমন্বয়ে প্রস্তুত

নিবে কালি শুকায় না,
কিন্তু কাগজে দ্রুত শুকায়।

রঙের যথেষ্ট গভীরতা, তবু
অবাধে লেখা এগিয়ে চলে।

লেখা ধুয়ে-মুছে যায় না;
অথচ কলম পরিষ্কার রাখে।

সুলেখা কালি

• • • অন্য কোন কারণে না হলেও অন্ততঃ এই কারণেই
সুলেখা আজ সর্বোচ্চ বিক্রয়ের গৌরব অর্জন করেছে • • •

সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ কলিকাতা • দিল্লী • বোম্বে • মাদ্রাজ

হে চির সারথী

শান্তশীল দাশ

তোমারে স্মরণ করি হে দুর্জয়, অমিত বিক্রম,
কী দুশ্চর ব্রত নিয়ে ছুটেছিলে দেশে দেশান্তরে!
তুচ্ছ করি ঝড়ঝঞ্ঝা, অতিক্রমি পথ দুর্গম—
যাত্রী তুমি ছিলে নিত্য দুর্যোগের বন্দরে বন্দরে।

মৃত্যু বারে বারে এসে ফিরে গেছে মেনে পরাজয়
তুমি যে অমরচিত্ত ; যাদুমন্ত্র কণ্ঠে নিত্য যার
উচ্চারিত, জননীর আশীর্বাদে কোথা মৃত্যুভয়—
গতি তার কী দুর্বার! রুদ্ধ করে হেন সাধ্য কার।

বিস্ময়ের ইতিহাস প্রতিদিন করেছ রচনা ;
সোনার অক্ষরে লেখা সে-বিস্ময় পাতায় পাতায় ;
দুর্গমের যাত্রীদল তোমার সে অতন্দ্র সাধনা
স্মরণে স্তম্ভিত হয়, নতশির সম্ভ্রমে শ্রদ্ধায়।

লোকচক্ষু-অন্তরালে কোথা আছ, আরো কী দুঃসহ
সাধনায় মগ্ন তুমি ; অকস্মাৎ দেখা দেবে এসে।

হে বিরাট, হে মহান, আলোকের চির বার্তাবহ,
তোমার মূর্ত্তিটি স্মরি জ্যোতির্ময় দীপ্ত বীর বেশে।

মহাযোগী

শান্তশীল দাশ

তোমার চক্ষে দেখলাম এই পৃথিবীকে আরবার'
তোমার চক্ষে দেখলাম এই জন্মভূমি আমার।
ব্যাধি-জর্জর, ক্ষুধায় কাতর অলস ভাগ্যপরে
নির্ভর, আর হাহুতাশ ক'রে দিনে দিনে শুধু মরে।
ডাক দিলে এই আশাহত-প্রাণ এ-দেশবাসীরে তুমি :
ওঠো, জাগো, ভীরু সন্তান হয়ে যে গেল এ জন্মভূমি।
স্বরূপ তোমার ভুলে গেছ কিগো, সিংহের সন্তান,
মেষশিশু সম ভীরুতা তোমার সাজে কি হে মহীয়ান
অমৃত পুত্র, জাগো জাগো ওঠো, চলো সম্মুখ পানে,
মুখরিত কর চলাপথখানি জীবনের জয়গানে।
আজো শুনি সেই উদাত্ত স্বর, ঘুম ভেঙে ভেঙে যায়,
চির প্রণম্য দীপ্ত মূর্ত্তি অন্তরখানি ছায়।
মহাযোগী সেই করুণাকাতর ভাস্বর রূপখানি
স্মরি' বারে বারে দিই ও চরণে প্রণাম অর্ঘ আনি।

তোমার আলোর পদ্ম

[স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম শতবার্ষিকীতে নিবেদিতা]

নচিকেতা ভরদ্বাজ

তোমাকে ঈশ্বর বলে, অবতার বলে ওরা ঘণ্টা নাড়ে মঠে,
মন্ত্র দেয় কানে, হাতে মালা তুলে ধরে ;
জীবনকে ফাঁকি দিয়ে মৃত্যুর আরাধনা করে।
তোমাকে সাজিয়ে রাখে অলৌকিকে প্রতিমায়, পটে।
কী যন্ত্রণা বুকে করে অথচ যে এসেছিলে তুমি
এই হতভাগা দেশে ; প্রাণহীন আচারের শুষ্ক মরুভূমি—
নিরানন্দ অন্ধকারে বহাতে চেয়েছ মুক্ত ধারা
কল্লোলিত আহ্বানীর সৌভাগ্য রচনা !

বিবর্ণ ব্যর্থতা শুধু। রক্ত জল হয়ে গেছে। খুঁড়ে খুঁড়ে জল
ওঠেনি একটি বিন্দু। নির্জন হাহাকার। কবন্ধ পাহারা।
এখানে আসেনি প্রাণ। মানুষ জন্তুর মত বেঁচে থেকে থেকে
ভুলেছি স্মৃতির দায়—মানবিক ঐক্যের চেতনা
প্রসুপ্ত জীবনবোধ। জরা জীর্ণ ক্লান্ত অলক্ষণ
তবুও বিভেদ রচে শ্মশানের শবের সংসারে।
আসন্ন অংশের থেকে প্রখর প্রভাত ফেরী হেঁকে
তুমি ডাক দিয়ে গেছ আমাদের চৈতন্যের আলোর অঙ্গনে।

শবের হৃদয়ে তুমি দিয়েছ শিবের শক্তি ; তবু এ আঁধারে
তোমার আলোর পদ্ম বিকশিত হয়নি এখনো।

কোনোদিনও হবে না হয় তো। কারণ, এ আমাদের
জীবনাচরণে
কী দারুণ অসঙ্গতি রয়ে গেছে ; প্রাণধর্ম গোনো—
এখনো সে মাথা কোটে অন্ধতার নিষ্ফল পাষাণে।
যুক্তিহীন অলৌকিকে, ধর্মের অচলায়তনে
অন্ধে আচ্ছন্ন আমরা ;—হাঁচি-টিকটিকি পঞ্জিকায়
সন্নিহিত আমাদের ইহ-পর জীবনের দায়।
সম্ভাব্য সূর্যের তেজে আবিষ্ট যে প্রাণ ঐকতানে
কর্মে ও মেধায় শ্রমে সাহস সাধনা-চিন্তা স্বপ্নে তপস্যায়—
ছুঁৎমার্গে থেকে আমরা আজ তার কিছুই জানি না ;
আমরা সরিক হতে পারিনি সে বৃত্ত-সিন্ধু-মহাজীবনের।

কালিঘাটে-কামাখ্যায় আমাদের দেবতা আসীনা ;
দুক ভিক্ষাপাত্র হাতে, পদাঘাত সারা দেহে মূদলমান,
ইংরেজ, চীনের।

বিবেকানন্দ জন্ম শতবর্ষ উদ্‌যাপনী

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

হয়তো আমিও ওই গলির অবাক মোড়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে আচম্বিতে
দেখতে পাবো অলৌকিক মেঘে মেঘে সমস্ত আকাশ ছেয়ে গেছে, আর আমার
সমস্ত আচ্ছন্ন করে সব কিছু জুড়ে এক ভুবনভোলানো অন্ধকার
অবিচল দাঁড়িয়ে রয়েছে।
কিন্তু আমার এই ধন্য ঘরের রোয়াক ছেড়ে আমি আর কোথাও যাইনা।
মান হয় যেন চারিভিতে
স্তাওলা ধরা জনহীনতায় সব পরিত্যক্ত হাজারমহল
প্রাসাদের মত শূন্য হয়ে গেছে। আমি তবে কোথায় কোনদিকে কেন কার
জন্যে দৌড়াবো মিথ্যে ?
যদিও কয়েকজন রাস্তা পার হয়ে নাকি দেখেছেন কাছেই নিভৃতে
অক্ষয়বটের মূলে বিশ্বাসের মত এক দেবতা দেউল অবিকল
বিশ্বাসের মত ঘুনিবার।

বিশ্লেষণ

রুশ-চীন মিতালীর শেষ অধ্যায় ?

গত কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন পর্যবেক্ষকরা কম্যুনিষ্ট শিবিরের অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করছেন। কম্যুনিষ্ট শিবিরে বিরোধের সম্ভাবনা প্রথম দেখা দেয় ১৯৪৮ সালে যখন যুগোস্লাভিয়া রাশিয়ার নির্দেশে চলতে অস্বীকৃতি জানায়। কিন্তু স্টালিনের প্রভুত্বাধীন কম্যুনিষ্ট শিবির থেকে যুগোস্লাভিয়াকে বহিষ্কৃত করে সেদিন ঐ শিবিরের ঐক্য রক্ষা করা হয়।

স্টালিনের মৃত্যুর কিছু কাল পর থেকেই বিশেষতঃ ক্রুশ্চেভের প্রধান মন্ত্রীত্ব গ্রহণের পর থেকে মাঝে মাঝে আভাষ পাওয়া যেতে লাগল কম্যুনিষ্ট শিবিরে নতুন অন্তর্দ্বন্দ্বের। ১৯৫৬ সালে রুশ কম্যুনিষ্ট পার্টির বিংশতি অধিবেশনে কম্যুনিষ্ট শিবিরের দুই প্রধান রাষ্ট্র রাশিয়া ও চীনের মধ্যে মতানৈক্যের আরও বিশ্বাসযোগ্য ইঙ্গিত পাওয়া গেল। দ্বাবিংশতিতম অধিবেশনে এই অনৈক্যের সুর আরেকটু কেঁপে বেজে উঠল।

অবশ্য বহু বছর ধরে ঐক্যবদ্ধতার একটা বাহ্যিক আবরণ বজায় রাখা হয়েছে। ১৯৬০ সালে বুখারেষ্টে অনুষ্ঠিত দেশের কম্যুনিষ্ট পার্টির সম্মেলনে ঐ সমাজবাদী ঐক্যবদ্ধতা'র কথা লোচ্চারে ঘোষিত হয়েছে। এমন কি মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগেও চীন-ভারত যুদ্ধের প্রসঙ্গে প্রাভদা পত্রিকায় রাশিয়ারও চীনের ভ্রাতৃত্বের কথা উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু ট্র্যাজিনী আসলের ঐক্যবদ্ধতা বজায় রাখা গেল বলে মনে হয়নি। বৈদেশিক নীতি ও আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের কৌশলের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে একদিকে চীন ও আলবেনিয়া এবং অপরদিকে রাশিয়া ও পূর্ব ইয়োরোপের অন্যান্য কম্যুনিষ্ট দেশগুলির পক্ষ থেকে সন্তর্পণে পরস্পরের প্রতি আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণ চালানো হয়েছে। ইতিমধ্যে আলবেনিয়ার সাথে রাশিয়ার কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে; রুশ বিশেষজ্ঞদের চীন থেকে সরিয়ে আনা হয়েছে; সাংহাই, হারবিন প্রভৃতি চীনা সহরে রুশ বাণিজ্যিক দূতাবাস বন্ধ হয়ে গেছে; উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্যের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য ভাবে কমে গেছে। এছাড়া আরও বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই দুই রাষ্ট্রের মনোমালিন্যের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। কিউবার প্রশ্নে ক্রুশ্চেভের নীতিকে চীনারা চেম্বারলেন কর্তৃক মিউনিকের আত্মসমর্পণের সাথে তুলনা করেছে। অপর পক্ষে, 'শোধনবাদে' অগ্রণী যুগোস্লাভিয়ার সাথে সম্পর্ক উন্নত করার জন্য রাশিয়া চেষ্টা করছে।

শুধু তাই নয়, বিভিন্ন কম্যুনিষ্ট দেশগুলোকে এবং অকম্যুনিষ্ট পার্টিগুলোকে নিজেদের পক্ষে টানার ব্যাপারে রাশিয়া ও চীন আজ সমভাবে তৎপর। যতদূর জানা যায় উত্তর কোরিয়া ও উত্তর ভিয়েৎনাম, এশিয়ার এই দুটী কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র চীনের পক্ষভুক্ত। অপর দিকে আলবেনিয়া ছাড়া, পূর্ব ইয়োরোপের কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রগুলি ও বহির্বংগোলিয়া রাশিয়ার পেছনে; এই শেষোক্ত রাষ্ট্রগুলি কিউবার প্রশ্নে এবং অন্যান্য বিভিন্ন প্রশ্নে রুশ-নীতির সমর্থক। এমনি ভাবে, অকম্যুনিষ্ট দেশের কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলো আজ সাধারণতঃ হয় 'রুশপন্থী' না হয় 'চীনপন্থী' অথবা 'রুশপন্থী' ও 'চীনপন্থী' এই দুই ভাগে বিভক্ত।

চীন ও রাশিয়ার মধ্যে মনোমালিন্যের কারণ নিয়ে পর্ব-

বেক্ষকরা একমত নন। কিন্তু এই মনোমালিন্যের তীব্রতা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। সম্প্রতি পূর্ব ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশের কম্যুনিষ্ট পার্টির এবং সর্বশেষে ইতালীতে কম্যুনিষ্ট পার্টির অধিবেশনে এই দুই কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের মতবিরোধ প্রতিফলিত হয়েছে। কিছুদিন ধরে উভয় দেশের পত্র পত্রিকায় আলবেনিয়া ও যুগোস্লাভিয়ার নাম ধরে পরস্পরের মধ্যে তীব্র বাক্যবাণ বিনিময় হচ্ছে। পিকিং এর 'ডেইলী নিউজ' পত্রিকায় গত ৩১শে ডিসেম্বর ১৮,০০০ শব্দের একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে ক্রুশ্চেভের কিউবা নীতির বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। এবং সোধনবাদের' বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম চালাবার কথা বলা হয়েছে। এর পরের দিনই আবার পিকিংয়ের 'রেড ফ্লাগ' পত্রিকায় রাশিয়ার 'আত্মসমর্পণ নীতি'র (capitulationism) এবং সাম্রাজ্যবাদী 'কাগজী বাঘ' (paper tiger)—এর সাথে সহাবস্থান নীতির বিরুদ্ধ সমালোচনা করা হয়। এই সমালোচনার জবাব দেওয়া হয়েছে ৭ই জানুয়ারী 'প্রাভদা'র একটী ৮,০০০ শব্দ সম্বলিত প্রবন্ধে। প্রাভদার এই প্রবন্ধে চীনের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি ত্যাগ করার ও কম্যুনিষ্ট শিবিরে বিভেদ সৃষ্টি করার অভিযোগ করা হয়েছে। এটা লক্ষণীয় যে, এই প্রবন্ধটী সোভিয়েত রেডিওতে দুবারটী ধরে পড়ে শোনান হয়েছে এবং পরে সমস্ত পূর্ব ইয়োরোপীয় সংবাদপত্রগুলোতে মুদ্রিত হয়েছে এবং অনেক রেডিওতে পুনঃ প্রচারিত হয়েছে। খুব গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় দলিলকেই কম্যুনিষ্ট প্রচারকরা এরূপ মর্যাদা দিয়ে থাকেন।

কোন কোন পর্যবেক্ষক সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে, রাশিয়া ও চীনের মধ্যে খোলাখুলি বিরোধ হয়ত আসন্ন। এরূপ সম্ভাবনার প্রতি লক্ষ্য রেখে লণ্ডনের 'ডেইলী টেলিগ্রাফ' পত্রিকার গত ৯ই জানুয়ারীর একটি সংবাদে বলা হয়েছে যে, চেকোস্লোভাক পুলিশ ঐ দিন প্রাগে 'চেকোস্লোভাকিয়া-চীন সুহৃদ সমিতি' ও 'চেকোস্লোভাকিয়া-ভিয়েৎনাম সমিতির অফিসগুলো দখল করে নিয়েছে এবং এর আগে 'আলবেনীয়া সুহৃদ সমিতি' বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ঐ সংবাদ পত্রে আরও বলা হয়েছে একটী বিশেষ বার্তায় ক্রুশ্চেভ চীনকে একটা দ্বীপাংসার উপস্থিত হওয়ার জন্য শেষ অনুরোধ জানিয়েছেন। চীনারা যদি এই অনুরোধ উপেক্ষা করে তবে তিনি পূর্ব-জার্মান কম্যুনিষ্ট পার্টির আগামী অধিবেশনে চীনের বিরুদ্ধে খোলাখুলি অবতীর্ণ হবেন।

আগামী সপ্তাহে বার্লিনে পূর্ব-জার্মান কম্যুনিষ্ট পার্টির অধিবেশন শুরু হবে এবং এটা কম্যুনিষ্ট "শীর্ষ অধিবেশন"-এর রূপ নিতে পারে। জানা যায় যে, দুজন প্রথম স্তরের রুশ কম্যুনিষ্ট নেতাকে নিয়ে ক্রুশ্চেভ নিজে এই সম্মেলনে উপস্থিত থাকবেন। চেকোস্লোভাকিয়ার প্রেসিডেন্ট নোভত্নী ও অন্যান্য পূর্ব-ইয়োরোপীয় কম্যুনিষ্ট নেতাদেরও এতে উপস্থিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

কংগো সমস্যার শেষ পর্ব ?

অনেক দিন আগেই কংগো-সমস্যার সমাধানের আশা করা হয়েছিল। কিন্তু কাতাংগা নায়ক শোম্বে যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করেছেন সমস্যাটীকে দীর্ঘায়িত করার। ইতিপূর্বে রাষ্টপুঞ্জের সৈন্যবাহিনী যখনই কাতাংগার দিকে এগিয়ে গেছে শোম্বে আপোষ আলোচনার নামে ব্যাপারটী নিয়ে যথা সাধ্য টানা পোড়েন করেছেন। রাষ্টপুঞ্জের সমর্থনে কংগোলী সরকার কাতাংগাকে চেয়েছেন কংগোর একটী অংগরাজ্য হিসাবে। বেলজিয়ানদের অধিকারে কাতাংগাই ছিল কংগোর সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী প্রদেশ। স্বাধীনতার পূর্বে কাতাংগা থেকেই কংগোর বৈদেশিক মুদ্রার প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ উপার্জিত হত। কংগোর কেন্দ্রীয় সরকারের আজ আশু প্রয়োজন বৈদেশিক মুদ্রার—এবং এটা নিঃসন্দেহে যে কাতাংগা প্রশ্নের সমাধান ছাড়া কংগোর—অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অসম্ভব।

এই পরিপ্রেক্ষিতে শোম্বের কাতাংগাকে একটি আলাদা রাজ্য রূপে পাওয়ার অভিলাষ মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না এবং কাতাংগার প্রাধান্যের যথোপযুক্ত মর্য্যাদা দিয়ে কংগোকে একটি যুক্তরাজ্য হিসাবে গড়ার প্রস্তাব করা হয়েছিল। কিন্তু কেনেডিয়ান, ব্রিটেন, উত্তর রোডেশিয়া প্রভৃতি দেশের সমর্থনপুষ্ট শোম্বে এই প্রস্তাব মেনে নিতে পারেন নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই সমস্ত দেশগুলোর সমর্থন তাকে প্রায় হারাতে হয়েছে। আজ অবস্থা অনেকটা পরিবর্তিত। য়ান্টুলুম্বের সৈন্যবাহিনী আমেরিকার দৃঢ় সমর্থন লাভ করছে এবং ভারত, ঘানা প্রভৃতি দেশের সেনানী দ্বারা গঠিত ঐ সৈন্য-বাহিনী এপর্যন্ত একের পর এক কাতাংগার রাজধানী এলিজাবেথভিল, ধনি অঞ্চলের সহর কিপুশি, বাবিনা বিমান ঘাটি, গুরুত্বপূর্ণ জাদভিল, সাকানিয়া প্রভৃতি সহর দখল করে কলঙ্গোজী সহরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রকৃত পক্ষে, শোম্বের—ছলা কলা শেষ হয়েছে। আশা করা যায়, কংগো সমস্যার সমাধান এবার অদূরবর্তী।

লাওসের মেঘ

কয়েক মাস আগে লাওসে কোয়ালিশন সরকার প্রতিষ্ঠা হয়েছে। কিন্তু সেখানে শাসনতান্ত্রিক একীকরণের ব্যাপারে আশানুরূপ উন্নতি দেখা যাচ্ছেনা। এই অবস্থায়, লাওসের উত্তরাঞ্চলে যেও উপজাতিদের মধ্যে ঔষধ ও খাদ্য দ্রব্যাদি বিতরণরত আমেরিকান বিমানের উপর কম্যুনিষ্ট পাথেট লাও বাহিনীর গুলি নিক্ষেপ লাওসের পরিস্থিতিকে আবার জটিলতার দিকে ঠেলে দিতে পারে। ইতিপূর্বে লাওস সরকারের পক্ষ থেকে আমেরিকা ও রাশিয়ার কাছে অনুরোধ করা হয়েছিল ১৯৬২ সালের অক্টোবর মাসের মধ্যে সমস্ত বিদেশী সৈন্য অপসারণের পরও ঐ সমস্ত সাহায্য চালু রাখার জন্য। জানা যায় পাথেট লাও পন্থী জনৈক মন্ত্রী এব্যাপারে লাওসের প্রধান মন্ত্রীর নির্দেশ উপেক্ষা করে আমেরিকান বিমান ধ্বংসের হুমকী দিয়েছেন। অপর পক্ষে আমেরিকার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, প্রধান মন্ত্রীর নির্দেশানুযায়ী খাদ্য ও ঔষধ সরবরাহ চালু থাকবে। এ ব্যাপারে আমেরিকা প্রধান মন্ত্রীকে পাথেট লাওর হুমকীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করেছে।

গত নভেম্বর মাসে কোয়ালিশন সরকারের অন্তর্ভুক্ত তিনটী দলই তাদের আলাদা সৈন্য বাহিনীগুলি একটি বাহিনীতে রূপান্তরিত করবে বলে সম্মত হয়েছিল। কিন্তু তা হয়নি এবং সেটা না হওয়া পর্য্যন্ত বর্তমান কোয়ালিশন সরকারের পক্ষে পাথেটলাও এলাকায় কর্তৃত্ব খাটান সম্ভব হবে না। এই আলাদা সেনাদলের একীকরণে বিলম্ব হয়ত খুব বিস্ময়কর নয়। কিন্তু পাথেট লাও পন্থীদের বর্তমান মনোভাবের ফলে কোয়ালিশন সরকার ভেংগে গিয়ে লাওস আবার অতীতের গৃহযুদ্ধের পর্যায়ে হাজির হবে কিনা সেইটাই চিন্তা।

১৩. ১. ৬৩ — শিশির কুমার ধর

স্বাধীনতা রক্ষার তরে
আজ কিছু করবেন কি ?
সবাই মোরা দেশের রক্ষী
সে কথা ভেবেছেন কি ?

বর্তমান প্রসঙ্গ

কলম্বো সম্মেলন

গত ডিসেম্বর মাসে আফ্রিকা ও এশিয়ার ছয়টি রাষ্ট্র কলম্বোতে সম্মিলিত হয়ে চীন-ভারত বিরোধ মীমাংসাকল্পে সূত্র-নির্ধারণের জন্য সচেষ্ট হয়; এদের মধ্যে সিংহল, বর্মা সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র, ঘানা, কাম্বোডিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার প্রতিনিধিরা ছিলেন। কলম্বো বৈঠকে ভারত ও চীনকে একই পর্যায়ে ফেলে আলোচনা হয়। অবশ্য সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের প্রতিনিধি তাঁর প্রারম্ভিক বক্তৃতায় বলেছিলেন, বান্দুং সম্মেলনের সূত্রানুযায়ী কোনো বিরোধের মীমাংসায় আক্রমণকারীকে তার আক্রমণের ভোগ-দখল থেকে (gains of aggression) বিরত থাকতে হবে। এই সূত্র অনুযায়ী সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের প্রতিনিধি সরাসরি ৮ই সেপ্টেম্বরের সীমারেখায় চীনের ফিরে যাবার দাবী জানিয়েছিলেন, কিন্তু কলম্বো সম্মেলনের অন্যান্য প্রতিনিধিরা এই প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। চীন আক্রমণকারী ও ভারত আক্রান্ত, এই ঐতিহাসিক ঘটনাটি স্বীকার করবার সৎ-সাহস দেখিয়ে চীনের বিরাগভাজন হতে তারা সম্মত হন নাই। সুতরাং, বিরোধের মূলে না পৌঁছেই তারা বিরোধ মীমাংসার সূত্রসন্ধানে অগ্রসর হতে গিয়ে আক্রমণকারী ও আক্রান্ত এই দুই প্রতিবেশীকে তুল্যমূল্য জ্ঞান করেন। অন্তর্রাষ্ট্রীয় সম্পর্কে কলম্বো সম্মেলনের এই মানদণ্ড বান্দুং-এ স্বীকৃত নীতির বিরোধী শুধু নয়, এই মানদণ্ডের স্বীকৃতি আক্রমণকারীদের পররাজ্যগ্রাসে আরও প্ররোচিত করবে।

কলম্বো সম্মেলনের প্রস্তাব সম্বন্ধে চীনের প্রতিক্রিয়াকে 'positive response' বলে বর্ণনা করে যে অস্পষ্ট ধারণার সৃষ্টি করা হয়েছিল, দিল্লীতে ভারত সরকারের সঙ্গে শ্রীমতী সিরিমাভো ও তাঁর অন্যান্য কলম্বো-সহযাত্রীদের আলোচনার পর তা অনেকটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। জানা গেছে যে চীনা-সরকার কার্যত তাদের পুরাতন তিনদফা সূত্রের আলোচনার পুনরাবৃত্তি করেছে। অবশ্য কলম্বো প্রস্তাবের প্রকৃত স্বরূপ এখনও অজ্ঞাত। যেটুকু জানা গেছে তাতে মনে হয়, যে-সব ভারতীয় অঞ্চল থেকে চীনা সৈন্য অপসারিত হবে—বিশেষ করে লাদাক অঞ্চলে—সেখানে চীন ভারতের যৌথ বেসামরিক শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রস্তাব কলম্বো সম্মেলনে রয়েছে। কলম্বো প্রস্তাব ভারতবর্ষের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ করবে কি করবেনা, তার উপর নির্ভর করবে এই প্রস্তাব ভারতের পক্ষে গ্রহণীয় কিনা। আশা করি ভারতীয় পার্লামেন্ট এই নিরীখে কলম্বো প্রস্তাব বিচার করে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছাবে।

স্বর্ণ আইন

সোনার বেচা-কেনা নিয়ন্ত্রণের আইনজারীর ফলে সোনার সোপন বে-আইনী কারবারীরা প্রতিহত হবে কিনা তা এখনও স্পষ্ট হয় নাই। এই নিয়ন্ত্রণের ফলে বৈদেশিক-মুদ্রার ঘাটতি পূরণে কি পরিমাণ সোনা সংগৃহীত হবে, তাও অনির্দিষ্ট। কিন্তু এই আইন প্রয়োগের ফলে সোনার গহনার ব্যবসায়ী ও তাদের অগণিত কর্মচারী সন্দেহাতীতভাবে বিপন্ন হয়েছে। তাছাড়া এই ব্যবসায়ীদের মধ্যে যারা লাইসেন্স সংগ্রহ করতে সক্ষম হবে, তারাও প্রচলিত বিশ-বাইশ ক্যারাট সোনার গহনার পরিবর্তে ১৪ ক্যারাট সোনার গহনা তৈরী করতে পারবে কিনা এবং পারলে সে-গহনা বিক্রি

হবে কিনা এ-সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। সোনার গোপন ব্যবসায়ীদের অবশ্যই দমন করতে হবে এবং বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি মেটাতে সোনার প্রয়োজনও অনস্বীকার্য। কিন্তু সারা দেশে কয়েক লক্ষ নিম্ন মধ্যপরিবারের অস্ত্র-সংস্থানের জন্য বিকল্প উপার্জনের ব্যবস্থাও প্রতিরক্ষার অন্যতম অপরিহার্য দায়িত্ব।

পাক-ভারত আলোচনা

ডিসেম্বরে রাওয়ালপিণ্ডির পর গত ১৬ই জানুয়ারী দিল্লীতে কাশ্মীর সমস্যা সমাধানকল্পে পাক-ভারত আলোচনা সুরু হয়েছে। চীনা আক্রমণের মুখে পাক-ভারত সমস্যার বিশেষ করে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান অনিবার্য হয়ে উঠেছে। কারণ কাশ্মীর সমস্যার মীমাংসা হলে ভারতবর্ষ কয়েক ডিভিসন সেনাবাহিনী হিমালয় সীমান্তে চীনা আক্রমণ প্রতিরোধে নিয়োগ করতে পারবে। ভারতবর্ষের সামরিক স্থিতির এই চরম মুহূর্তে কাশ্মীর সমস্যার মীমাংসা কেবলমাত্র ভারতবর্ষের জন্যই অনিবার্য এই মনোভাব নিয়ে পাকিস্থান অগ্রসর হলে, মীমাংসার কোনো সূত্র সম্ভব হবে না। তাতে পাক-ভারতের পুরাতন দ্বন্দ্ব-সংঘাতের পুনরাবৃত্তি হবে মাত্র। পাকিস্তান যদি মনে করে সীমান্ত নিয়ে চীনের সঙ্গে কাগজীচুক্তির পর তার কোনো বিপদের সম্ভাবনা নেই, সে-ক্ষেত্রে পাকিস্তানকে স্মরণ রাখতে হবে ভারতবর্ষ ও চীনের মধ্যে পঞ্চশীল চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল এবং এই দুইদেশের মধ্যে ভাই-ভাই-এর বন্যা বয়ে গিয়েছিল। পাকিস্তানের গিলগিটের দিকে চীনের লোলুপ দৃষ্টি এই কারণেই এই গিরিবর্ত্মের নিকটবর্তী পাক-সীমান্তে চীনা সামরিক শক্তির সমাবেশে পাকিস্তানের পক্ষে ভয়ংকর অশুভ ইসারা উদ্যত হয়ে উঠেছে। এই বিরোধ-মীমাংসার জন্য ভারতবর্ষের উপর মার্কিনী চাপের কথা শোনা গেছে। এ-সংবাদ সত্য হলে খুবই নিন্দার্হ। সুতরাং কোনো চাপ-সৃষ্টির প্রশ্ন নয়, গণভোটের ধুয়া তুলে পতানুগতিকভাবে এই সমস্যা জীইয়ে রাখবার প্রস্তুতি নয়। নূতন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে, উভয় দেশের উপর চীনের উদ্যত বিপদসঙ্কেতের সামনে কাশ্মীর সমস্যার আন্তরিক সমাধানের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় এসেছে।

২০৯, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থিত গোবর্দ্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্দ্র মিত্র এডভোকেট কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

"চলরে চলরে চল...."

বীর যোদ্ধাদের সুনিশ্চিত পদক্ষেপের তালে তালে আপনিও নিয়মিত ও অবিচ্ছিন্নভাবে সঞ্চয় করুন। আমাদের প্রতিরক্ষা উদ্যোগের সফলতার জন্য প্রয়োজন মাসের পর মাস, বছরের পর বছর নিয়মিত অর্থ যোগানোর একটি আশ্বাস। জীবন বীমার একটি পলিসি গ্রহণ করে আপনি এই আশ্বাস দিতে পারেন। আপনার পক্ষে নিয়মিতভাবে প্রিমিয়াম দিয়ে যাওয়ার অর্থ হ'ল কর্পোরেশনের তহবিলকে বাড়ানো, যার ফলে প্রতিরক্ষার জন্য অর্থসংস্থান আসবে অবিচ্ছিন্ন রূপ। জীবন বীমার মাধ্যমে সঞ্চয় করে আপনি নিজের, আপনার পরিবারের এবং আপনার দেশের উপকারই করেন।

লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন ইতিমধ্যেই জাতীয় প্রতিরক্ষা খাতে ৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছেন। এটি জীবন বীমার মাধ্যমে সঞ্চিত অর্থের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগ।

লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া

ADVT/C-D-1 81/1

শ্রমিক

মাঘ ১৩৬৯
১০ম সংখ্যা: ২৭ বর্ষ

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

বিবাহ ও পরিবারের ক্রমবিকাশ

অনিলচন্দ্র রায়

যৌথবিবাহ নামক কোন স্তরের ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই

দেখা গেল যে তিনটি কারণে মর্গানকে এঙ্গেলস্ সমর্থন করিয়াছেন তাহা আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ভিত্তিহীন বলিয়া প্রমাণ হইয়াছে। এখন পুনালুয়া-পদ্ধতিরই হোক বা অন্য যে-কোনো পদ্ধতিরই হোক, কোন প্রকারের যৌথবিবাহ আদৌ পৃথিবীতে বর্তমান যুগে পাওয়া যায় কিনা তাহা আলোচনা করা যাক্। সুদূর অতীত সম্বন্ধে যে কল্পনা মর্গানীয়রা করিয়াছেন তাহার কোন যৌক্তিকতা নাই তাহা দেখিয়াছি। প্রাচীন ইতিহাসের সাক্ষ্যও মর্গানী ছককে সমর্থন করে না।

প্রাচীন ইতিহাস হইতে খুঁজিয়া অতি বিরল দু' একটী যৌনবিকৃতির দৃষ্টান্ত বাহির করিয়া মর্গানীয়রা তাহাকেই সার্বজনীন সামাজিক প্রথা বলিয়া কুব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। হেরোডোটাস (Herodotus), ম্যাসাগেটী (Massagetae) জাতি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, ইহাদের প্রত্যেকের একটী স্ত্রী আছে কিন্তু স্ত্রী-রা আবার সাধারণীও বটে ("all the wives were common")। এই স্ববিরোধী বর্ণনা হইতে কিছু বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত করা চলে না। অতি সামান্য অস্পষ্ট উল্লেখ হইতে সেই যুগের দূরের কোন অখ্যাত জাতির আচার সম্বন্ধে ধারণা করা তো চলেই না, পরন্তু ঐ যুগের গোটা সমাজ সম্বন্ধে সার্বিক কোন সিদ্ধান্ত করা একেবারেই হাস্যকর। গ্রীকদের ভারতবর্ষের বিবরণে এদেশের মানুষ সম্বন্ধে এমন সব চমৎকার বর্ণনা আছে যাহার উপর ভিত্তি করিয়া ইতিহাস গড়িলে ভৌতিক কাহিনীকেও ছাড়াইয়া যাইবে। সামাজিক ইতিহাস-লেখকের কাজ আরো কঠিন। সামাজিক প্রথার সহিত জাতীয় মনস্তত্ত্ব জড়াইয়া থাকে। সেই মনস্তত্ত্বকে না বুঝিতে পারিলে মর্ম উদ্ঘাটন করা দুরূহ। প্রাচীন

ইতিহাসের এই সব উদ্ভট কাহিনীর উপরে এই মানসিক আস্থা স্থাপন শুধু যেন তেন প্রকারে স্বমতপ্রতিষ্ঠার অন্ধকানুসরতার জন্যই হইতে পারে। এই অন্ধতাকে না ছাড়িতে পারিলে বৈজ্ঞানিক প্রগতি হওয়া সম্ভব হইবে না। ম্যালিনাউস্কী তাই বলিয়াছেন "It all started with Herodotus who amused us with tales about lotus-eaters and man-eaters, about queer sexual habits and gastronomic perversions. If anthropology is to become the comparative science of cultures it is hightime it stepped out of its **herodotage & anecdetoge.**" (237—I)

বর্তমান যুগের বহু নৃতাত্ত্বিক কুসংস্কারের প্রচলন হইয়াছে এই হেরোডোটাস-প্রীতি হইতে। উক্ত হেরোডোটাস্ সম্বন্ধে মর্গান নিজেই স্বীকার করিতেছেন যে "His accounts are too meagre to illustrate the actual state of society among them." (Morgan, p 440) কিন্তু মর্গানের পরবর্তিকালেও এঙ্গেল্স্-প্রমুখ মর্গানীয়া এই হেরোডোটাসের উপর অথথা গুরুত্ব আরোপ করিয়া যৌথ বিবাহের সমর্থন করিতে ছাড়েন নাই।

তারপরে জুলিয়াস সিজারের (Julius Caesar) একটী উক্তি লইয়াও মর্গানীয়া কম হৈ চৈ করেন না। খৃষ্ট পূর্ব ৫৫ সনে ব্রিটন দ্বীপে সিজার অভিযান করিয়াছিলেন। সেই যুগের ব্রিটনদের (Breton) সম্বন্ধে সিজার বলিয়াছেন, প্রতি দশবার জনের স্ত্রী সাধারণী; বিশেষতঃ ভাইদের পরস্পরের স্ত্রী এবং এমন কি পিতা সন্তানের স্ত্রী-ও সাধারণী ('brothers with brothers and parents with children') মর্গানীয়া এই বিবাহব্যবস্থাকে "পুনালুয়া' বলিয়া চালাইতে চাহিয়াছেন। সিজারের এই একটি মাত্র বিচ্ছিন্ন উক্তি হইতে সে যুগের সমাজ সম্বন্ধে সার্বিক সিদ্ধান্ত করা একদেশদর্শিতার চূড়ান্ত বলিতে হইবে। সিজারের লিখিত বইগুলি সম্বন্ধে বিতর্ক আছে, তাহার প্রামাণ্য ও সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ ঐতিহাসিকরাও করিয়াছেন। তারপরে সামান্য কিছু সময়ের দৃষ্টবিগ্রহ সংকুল ভ্রাম্যমান জীবনে বাহির হইতে দেখিয়া খ্রীষ্টপূর্ব ব্রিটনদের অন্তরঙ্গ যৌনজীবন সম্বন্ধে এই সব মন্তব্য কতটুকু নির্ভরযোগ্য তাহা বলা কঠিন। আধুনিক কালেও প্রমাণ হইয়াছে এই যুগেরই পূর্বতন ভ্রমণকারীরা বাহির হইতে ও দূর হইতে ভাসাভাসা ভাবে দেখিয়া বর্তমান অসভ্যদের আচারব্যবহার সম্বন্ধেও কত ভ্রান্তধারণার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অপরিচয়ের ব্যবধান যেখানে খুব বেশী সেখানে খুব বেশী ভুল বুঝিবার ও তদধিক ভুল বোঝা করিবার সম্ভাবনা সেখানে প্রচুর। বর্তমান যুগেরই নৃতাত্ত্বিক হাউইট (Howitt) সম্বন্ধে মুওট্ বলিয়াছেন যে হাউইট অষ্ট্রেলিয়ার ভাষা না জানায় তাঁহার ওদেশীয় পরিভাষা বুঝিতে ভুল হইয়াছে, ফলে নানা ভ্রান্তির সৃষ্টি হইয়াছে। শব্দার্থের সামান্য এদিক ওদিক হইলেই একটা বড় রকমের ভুল ঘটিতে পারে। "... as regards the interpretation of the various group-names, the scholars were labouring under misconceptions which caused the relations to appear more complex than they really are. Such misconceptions were all the more possible because the investigators in questions were entirely ignorant of the languages of the natives and were therefore practically dependent upon the statement of their interpreters," (142, Wundt)

এই উন্নত যুগেও যদি একথা খাটে তবে সুদূর অতীতের অন্ধকার যুগের সম্বন্ধে এ সত্য আরো কত বেশী প্রযোজ্য! ভিন্ন ভাষাভাষী বিদেশীর পক্ষে সে যুগে সঠিক পর্যবেক্ষণ কত কঠিন ছিল এবং সামান্য একটী বাক্যকে ইতিহাসের পর্যায়ে উঠাইয়া সামাজিক ক্রমবিকাশের স্তর সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করা বিজ্ঞানকে

অবাই করা ব্যতীত কি বলা যাইতে পারে? এই যুগেও যদি ভারতীয় আচার ব্যবহার সম্বন্ধে মিস্ মেয়োর (Miss Mayor) বিকৃত বর্ণনা সম্ভব হইয়া থাকে, তবে সেই অজ্ঞাতপ্রকৃতি অতীত যুগে কী না হইতে পারে। সিজারের উক্তিটিও অসঙ্গতিতে পূর্ণ। পিতা ও সন্তানের একই স্ত্রী কিরূপে সম্ভব হইতে পারে। অসভ্যজীবনে 'বয়স' একটা প্রবল পদার্থ, বয়সের প্রভাব জীবনের সকল ক্ষেত্রেই দুর্বার। আদিম জীবনেও সকল অনুষ্ঠানই 'age-group' বা বয়ঃ-বিভাগ অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। কাজেই পিতার ও পুত্রের স্ত্রী এক হওয়া সম্ভব নয়। বাস্তবতঃ এবং যুক্তি বিচারেও তাহা অসম্ভব। তাহা ছাড়া মর্গানের স্তর ক্রমও (sequency of stages) ইহাতে খণ্ডিত হয়। ইহাদের মতে Promiscuity বা অবাধ সংসর্গ বারণ হওয়ার দুইটী স্তর পরে পুনালুয়া বিবাহের উদ্ভব হইতে পারে। পিতা-সন্তান টাবু ও ভাইবোন টাবু সমাজে প্রচলিত হইলে তবেই পুনালুয়ার আবির্ভাব ঘটিতে পারে। অথচ সিজারের বর্ণনায় একই সঙ্গে পিতামাতা সন্তানের যৌনসংসর্গ এবং ভাইবোন সম্ভমও প্রচলিত বলিয়া বুঝিতে হয়। মর্গান বলেন, পিতাসন্তানের এই সাধারণী বা যৌথ পত্নীরা এক্ষেত্রে হয়ত পরস্পরের বোনও হইতে পারে। (It is not unlikely that these wives were sisters—138 p) এঙ্গেল্‌স্ এই অসঙ্গতিকে উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছেন এই বলিয়া যে হয়তো সিজার তাহার উক্তির এই অংশটুকু—(পিতা ও সন্তানের স্ত্রী সাধারণী) ভ্রান্তিবশতঃ বলিয়াছিলেন। ["Caesar's mention of 'parents with children'—may be due to misunderstanding on his part" (13)] একই মাতার দশ, বারটী সন্তান! সেই সব সন্তানেরই একই স্ত্রী! মর্গান ও এঙ্গেল্‌স্ এই অবাস্তব ও অসম্ভব কথার সমর্থন করিবার জন্য শব্দের অর্থকে টানিয়া বাড়াইবার চেষ্টা করিয়াছেন। ('Barbarian mother do not have ten or twelve sons of their own old enough to keep wives in common' Engels) পর পর একই মাতার ১২টী সন্তান হইলে কনিষ্ঠ পুত্রদের এমন বয়স হইতে পারে না, যাহাতে পূর্বতন জ্যেষ্ঠ পুত্রদের সহিত সাধারণী পত্নীর একই সঙ্গে স্বামী হইতে পারে। মর্গান এঙ্গেল্‌স্ এই অসম্ভবকে সম্ভব করিবার উদ্দেশ্যে 'brother' শব্দের অর্থে এ ক্ষেত্রে 'দূরসম্পর্কিত' ভাই বলিয়া ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। 'Brother' শব্দের অর্থ 'সহোদর ভাই', দূরসম্পর্কিত ভাই নয়। সিজারের উক্তিতে 'brother' বা সহোদর ভাই সম্বন্ধেই উল্লেখ রহিয়াছে। এরূপ অসঙ্গতিকে পাশ কাটাইবার কোন অর্থ নাই।

দক্ষিণ আমেরিকার জাতিদের মধ্যেও পুনালুয়া বিবাহের চিহ্ন পাওয়া যায় বলিয়া মর্গান প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রথম সমুদ্রযাত্রিকগণ (navigators) ভেনেজুয়েলার সমুদ্রতীরবাসী জাতিগুলির সম্বন্ধে কিছু ভাসা-ভাসা উক্তি করিয়াছেন: ইহাদের মধ্যে ঈর্ষা দেখা যায় না। যৌথবাসগৃহে এক সঙ্গে ইহাদের নারীপুরুষ বাস করে, বিবাহ ব্যাপারে ইহাদের কোন আইনকানুন নাই ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রথম যুগের এই বর্ণনার মূল একটী অনির্দিষ্ট ও অস্পষ্ট কথা হইতে এইরূপ সিদ্ধান্তের কোন যুক্তিসংগত ভিত্তি নাই। মর্গান নিজেই ইহা স্বীকার করিয়াও এইসব দৃষ্টান্ত যে উল্লেখ করিবেন তাহাই আশ্চর্য। ["In this case & in those mentioned by Herodotus, the observations upon which the statements were made were superficial—Morgan p 440] অথচ ইহার পরেও মর্গান আবার এই সব অসম্পূর্ণ ও অস্পষ্ট উক্তি হইতে মত সমর্থনের চেষ্টা করিয়াছেন। মর্গান বলিতে চাহেন অন্ততঃ বৈবাহিক ও নৈতিক অবস্থা যে এসব জাতির অতি নিম্নস্তরের তাহা এসব উক্তি হইতে বোঝা যায়।

আমাদের মতে যে সব ঘটনা নির্ভরযোগ্য নয় তাহাদের উপর ভিত্তি করিয়া কোন সিদ্ধান্তই করা চলে না। সমাজ তাত্ত্বিক কোনওরকম সিদ্ধান্তে আসিতে হইলে সমস্ত সামাজিক আচারব্যবহার ও জীবনপ্রণালীকে তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ ও বিচার করা প্রয়োজন। শুধু অলস কৌতূহলের দৃষ্টিতে দেখিয়া কিংবা দূর হইতে কণিকের পরিচয়ে জানিয়া যে সব তথ্য পর্য্যটকেরা আনিয়াছেন, তাহার উপরে ভিত্তি করিয়া বৈজ্ঞানিক বিচার চলে না। উত্তর আমেরিকার আবিষ্কার কালেও পুনালুয়াবিবাহের কোন চিহ্নও কোথাও পাওয়া যায় নাই। তবে এখনকার কোন প্রথা হইতে পূর্বকালীন যৌথবিবাহ অনুমান করা চলে বলিয়া মর্গান মনে করেন। কতকজাতির মধ্যে প্রথা আছে যে জ্যেষ্ঠ বোনকে বিবাহ করিলেই সব শ্যালিকাদিগকেই বিবাহ করিবার অধিকার জন্মায়। এ প্রথা সম্বন্ধে (শ্যালিকা বিবাহ বা Sororabo) পরে আলোচনা করা যাইবে। এখানে শুধু এটুকু উল্লেখ করিলেই চলিবে যে মর্গান নিজেও এ সম্বন্ধে জোর করিয়া বলিতে পারেন নাই। কারণ এই প্রথাও যে উঃ আমেরিকায় কার্য্যতঃ পালিত হয় না তাহা মর্গান স্বীকার করিয়াছেন। কাগজে-কলমে অধিকার আছে বলিয়া মানা হইলেও বাস্তবজীবনে নানাকারণ বশতঃ এই অধিকার কার্য্যকরী হয় না। ["It was a right seldom enforced…" 443 p. Morgan]. কিন্তু ইহাকে ব্যাখ্যা করিবার কালে মর্গান তাহার উত্তর্ন ন্যায় অনুসরণ করিয়া যৌথবিবাহের ধ্বংসাবশেষ বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই উত্তর্ন ন্যায় সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। কেবল আনুমানিক মতামত গঠন করিলেই চলিবে না, সমর্থক তথ্য সহযোগে প্রমাণ না করিতে পারিলেও অনুমান মূল্যহীন।

দেখা যাইতেছে যে ইতিহাসে বা বাস্তবজীবনে মর্গান কোথাও পুনালুয়া যৌথবিবাহের কোন প্রমাণ পান নাই। তাই সর্বশেষে বলিয়া দিয়াছেন যে দৃষ্টান্তের বা তথ্যের কোন প্রয়োজন নাই। পুনালুয়ার পূর্বতন অস্তিত্ব কেবল 'তুরানী' সম্বোধনপদ্ধতি হইতেই অনুমান করিয়া লওয়া চলে। মর্গানের শেষ আশ্রয় হইতেছে সেই সম্বোধনপদ্ধতির ব্যাখ্যা। [' It is unnecessary to extend these citations because the antecedent existence of the Punaluan family among the ancestors of all the tribes who possess or did possess the Turanian system of consanguinity, *can be deduced from the system itself.*' Morgan p 441] যৌথবিবাহ যে একেবারে আনুমানিক ও কাল্পনিক এবং পৃথিবীতে ইহার সার্বজনীন অস্তিত্ব কোন কালেও ছিল না, তাহা মর্গানের উক্তিতেই প্রমাণিত হইল। সম্বোধনপদ্ধতির মর্গানী ব্যাখ্যা যে একদেশদর্শী এবং তাহাতে যে যৌথবিবাহ যথাযথ প্রমাণিত হয় না, তাহা পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। এখন দেখা যাক, পৃথিবীর বর্তমান অসভ্য জাতিগুলির মধ্যে কোনপ্রকার যৌথবিবাহ পাওয়া যায় কিনা। যদি পাওয়া যায় তাহাদের প্রকৃতি কিরূপ এবং এই সব প্রথা কোন সামাজিক স্তরের অবশেষ কিনা তাহাই আমাদের বিচার্য্য।

বর্তমান যুগের নৃতাত্ত্বিক তথ্যেও মর্গানী মতের ভ্রান্তি প্রমাণ হইয়াছে

অষ্ট্রেলিয়া এবং দাইবেরিয়ার যৌথবিবাহের অস্তিত্ব পাওয়া গিয়াছে একথা নৃতাত্ত্বিকেরা বলেন। বিশেষ করিয়া অষ্ট্রেলিয়াই যৌথবিবাহের আধুনিক আবাসস্থল বলিয়া অনেকে মনে করেন। ১৮৮০ সনে পাদ্রী ফিসন ও হাউইট্, Howitt & Fison) প্রণীত বিখ্যাত বই কামিলারয় ও কুর্নাই ("Kamilaroi & Kurnai," মর্গানের ভূমিকা সহ বাহির হয়। ইহারাই অষ্ট্রেলিয়ার কোন কোন আদিম জাতির বিবাহ প্রথাকে "যৌথবিবাহ" (group marriage) আখ্যা দান করেন। ইহারা দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ার আদিম জাতিগুলি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করেন। পরে ১৮৮৯ সালে স্পেন্সার এবং গিলেন (Spencer & Gillen) নামক দুইজন নৃতাত্ত্বিকের অনুসন্ধানের ফল "মধ্য অষ্ট্রেলিয়ার আদিম জাতি" (Native

tribes of Central Australia) নামক পুস্তকে প্রকাশিত হয়। ইহারা এই বইয়ে এরাণ্টা (Arunta), উরাবুন্না (Urabunna) লুরিচা (Luritcha) প্রভৃতির সম্বন্ধে লিখিয়াছেন। পরে ১৯০৪ সনে ইহাদের দ্বিতীয় পুস্তক। নাম অষ্ট্রেলিয়ার উত্তরের জাতি'('Northern tribes of Central Australia"), বাহির হয়। এই বইয়ে ওয়ারমুঙ্গা (Uarramunga), কাইতিশ (Kaitish), উন্মাজীরা (Unmatjira) বরজাইয়া (Worjaia) ওয়ালপুরী (Walpuri) ইত্যাদি জাতি সম্বন্ধে লিখিত হয়। ১৯০৪ সনেই হাউইট্ (Howitt) প্রণীত "দক্ষিণপূর্ব অষ্ট্রেলিয়ার আদিম জাতি" (Native tribes of South East Australia) নামক বই বাহির হয়। এই চারজন নৃতাত্ত্বিক অষ্ট্রেলিয়ায় একদা যৌথবিবাহই সার্বিক স্তর ছিল এই কথা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সাইবেরিয়ার চুকচী জাতিতেও যৌথবিবাহ পাওয়া গিয়াছে বলিয়া বলা হইয়াছে।

'যৌথবিবাহ' কাহাকে বলা যায়? যখন একদল পুরুষ একদল নারীকে সকলেরই বিবাহিত পত্নী বলিয়া সমানভাবে গ্রহণ করে এবং সমান অধিকারে পরস্পরের সহিত যৌনসম্ভোগের রীতি পালন করিতে পারে, তখন এই প্রথাকে যৌথবিবাহ বলা চলে। 'সমভাবে' কথাটা উল্লেখযোগ্য এবং যৌথবিবাহের বিশিষ্ট লক্ষণকে সূচিত করে। যদি বিশেষ কোনো পুরুষের বিশেষ কোন একটি নারীর উপরে বিশিষ্ট অধিকার থাকে, তাহা হইলে তাহা অনেকটা ব্যক্তিক বিবাহের (individual marriage) প্রকৃতি লাভ করে। এই বিশিষ্ট সম্বন্ধের সহিত যদি আবার অন্যান্য কতক পুরুষ ও নারীর সহিত যৌনসম্ভোগের গৌণ অধিকার একই কালে স্বীকৃত হয় তবে তাহা অনেকটা উপপত্নীপ্রথার (concubinage) মত হইয়া দাঁড়ায়। এই কারণে সমান অধিকার না থাকিলে প্রকৃত যৌথবিবাহ বলা ঠিক হইবে না।

আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে এই সংজ্ঞা দ্বারা বিচার করিলে উরাবুন্না চুকচীদের বিবাহ-প্রথাকে "যৌথবিবাহ" বলা চলে কিনা সন্দেহ। যদি ধরিয়াও লই যে এই প্রথাকে যৌথবিবাহ বলিব, তবু যৌথবিবাহ সব জাতিতেই এককালে ছিল কিংবা অষ্ট্রেলিয়ারও পূর্বে ছিল, তাহা বলা চলে না। যৌথবিবাহ পৃথিবীতে বর্তমান যুগে কোথাও কোথাও থাকিলেও ইহা সকলদেশেরই একটা প্রাচীন, সার্বিক স্তর তাহা কল্পনা করিবার কোন কারণই নাই। প্রথমতঃ যৌথবিবাহ যেখানে যেখানে নাই সেখানে অনিবার্যভাবে ব্যক্তিক বিবাহও সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যমান আছে, দেখিতে পাই। দ্বিতীয়তঃ যৌথবিবাহ হইতে পৃথকভাবে ব্যক্তিক-বিবাহ পাই, অথচ, ব্যক্তিকবিবাহ হইতে স্বতন্ত্রভাবে যৌথবিবাহ কোথাও পাওয়া যায় না। এই কারণে স্বভাবতই সিদ্ধান্ত হয় যে ব্যক্তিক বিবাহই প্রাচীনতর এবং যৌথবিবাহ ব্যক্তিক বিবাহ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। বিশেষ কারণে বিশেষ অবস্থায় ব্যক্তিক-বিবাহই বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া যৌথবিবাহ হইয়াছে। এখন একটী একটী দৃষ্টান্ত লইয়া আলোচনা করা যাক্।

কামিলারোই:—দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ার ডালিং নদীর আশে পাশে কামিলারোই জাতির বাস। ইহারা চারটী গোষ্ঠীতে বিভক্ত; প্রতি গোষ্ঠীতেই আবার ভাই ও বোনেরা পৃথক দলে উপবিভক্ত। যেমন:

(ক) প্রথম গোষ্ঠীতে, ভাইরা হইল "ইপ্পাই" দল
(খ) দ্বিতীয় গোষ্ঠীতে " " কুকি
(গ) তৃতীয় গোষ্ঠীতে " " মুরি
(ঘ) ৪র্থ গোষ্ঠীতে " " কুমু
(ক) এবং বোনেরা হইল "ইপাথা" দল
(খ) এবং " " "কুবিথা" "
(গ) এবং " " "মাথা" "
(ঘ) এবং " " "থুথা" "

প্রত্যেকটী গোষ্ঠীই বহির্বিবাহী। ইপ্পাই বিবাহ করিবে শুধু কুবিথা মেয়েকে; কুকী করিবে ইপাথা মেয়েকে, কুমু

করিবে বাবা'কে এবং মুরি করিবে বুৎকে। বলা হয় যে প্রত্যেক ইপাই পুরুষই প্রত্যেক কুবিবা নারীর পতি। ইপাই কোন পুরুষের সঙ্গে কোন অপরিচিতা কুবিবা নারীরও দেখা হইলে পরস্পরকে তাহারা 'স্বামী-স্ত্রী' বলিয়া সম্বোধন করিবে; ["Would treat her as his wife and his right to do so would be recognised by her tribe"—Fison & Howitt]

রেভা: ফিসন বলেন, যে অষ্ট্রেলিয়ায় পূর্বে যৌথবিবাহ ছিল, এবং পরবর্তী কালে তাহার স্থানে ব্যক্তিক বিবাহ আসন গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু কার্যতঃ ইহারা বর্তমানে একবিবাহী হইলেও নীতির দিক হইতে ইহাদের মধ্যে এখনো যৌথবিবাহ চলে আছে। ফিসনের প্রধান যুক্তি সম্বোধনপদ্ধতির ব্যাখ্যা। মর্গান-কথিত 'শ্রেণীবিন্যস্ত' সম্বোধনপ্রথা ইহাদের। কিন্তু ফিসনও নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, কোনো জাতিরই মধ্যে তাহাদের সম্বোধনপ্রথা অনুযায়ী বাস্তব ব্যবহার (actual practice আছে বলিয়া জানেন না। তাই ফিসনের মতে, এই সব শব্দের ব্যাখ্যায় মর্গানী উত্তরণ নীতিই অবলম্বন করিতে হইবে। তাহা হইলেই বলা চলে যে প্রাচীন কালে ছিল, এখন যৌথবিবাহ নাই।

['survivals of ancient rights, not precise indications of custom as it is' (Fison)] হাওয়িট্‌ও একথা স্বীকার করিয়াছেন। ওয়েষ্টারমার্ক বলেন, কুবি এবং ইপাথা পরস্পরকে 'দম্পতী' বলিয়া সম্বোধন করার মানে ইহা নয় যে এককালে প্রত্যেক কুবিই ব্যক্তিনির্বিশেষে প্রত্যেক ইপাথাকে বিবাহ করিত। বরং এই সম্বোধনের অর্থ হইল এই যে এই শব্দপ্রয়োগে কোন্ নারী পত্নী হইতে পারে এবং কে পারে না সেই পার্থক্যই সূচিত করা হইতেছে। ["...if a Kubi and an Ipatha address each other as 'spouse', this does not imply that in former times every Kubi was married to every Ipatha—indiscriminately. On the contrary, the application of such a familiar term might be explained from the fact that the women who may be a man's wife and those who cannot possibly be so, stand in a widely different relation to him. (Westermark, ch V)] ওয়েষ্টারমার্কের মতে, এটা বিবাহ-সম্ভাব্যতা মাত্র। অর্থাৎ কোন্ নারীরা বিবাহযোগ্যা ও কারা নয়, তাহাই বুঝাইবার জন্য এই 'দম্পতী' শব্দ ব্যবহার করা হয়। এই সাম্ভব্যতার চাইতে বেশী অর্থ আরোপ অন্যেরা এই শব্দের উপরে করে না। ডা: রিভার্স বিখ্যাত পণ্ডিত এবং মেলানেশীয়ার অসভ্যদের সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণা প্রামাণিক। তিনি বলেন, মেলানেশীয়ায় পুরুষের কাছে নারী হয় বোন না-হয় স্ত্রী, এই দু'য়ের একটী হইবে। মেলানেশীয় নারীর কাছে সব পুরুষই হয় ভাই, নতুবা পতি। কিন্তু এর থেকেই একথা যেন কখনো মনে করা হয় না যে প্রত্যেক পুরুষই ভিন্ন শ্রেণীর (নিজের শ্রেণীর বাইরের) সব নারীরই কার্যতঃ স্বামী এবং সত্যি সত্যি দাম্পত্য অধিকার খাটাইয়া থাকে। রিভার্সের মতে, যারা বিবাহযোগ্যা এবং যারা যোগ্যা নয়, এই দুই শ্রেণীর নারী মেলানেশীয় পুরুষের দৃষ্টিতে একেবারে আলাদা রকমের। এই দুইশ্রেণীর নারীর সহিত তাহার সম্পর্কও ভিন্ন প্রকারের। ["Speaking generally, it may be said that to a Melanesian man all women, of his own generation at least, are either sisters or wives. To the Melanesian womenall men are either brothers or husbands...It must not be understood that a Melanesian regards all women, who are not of his own division, as in fact, his wives or conceives himself to have rights which he may exercise in regard to those women of them

who are unmarried; but the women who may be his wives by marriage or those who cannot possibly be so, stand in a widely different relation to him" ('Melanesians,' p 52) মেলানেশীয়ায় কিংবা অষ্ট্রেলিয়ায় কোথাও "পত্নী" শব্দের ব্যবহার করিলেও কার্যত স্ত্রী বা পতি বলিয়া মনে করা হয় না। শুধু স্ত্রী বা স্বামী যে শ্রেণী হইতে নির্বাচিত হইবে সেই শ্রেণীভুক্ত এই কথাই সূচিত হয় ইহাদের "সম্পর্ক" সম্বোধনে। ক্রলীও (Crawly) এই সম্বোধন-রীতির অর্থ যে 'marriag-ableness' বা বিবাহ-যোগ্যতা ধরে তাহা বলিয়াছেন। অসভ্যদের জীবনে শব্দ ব্যবহারের মর্মটী না ধরিতে পারিলে গুরুতর ভুল হইবার সম্ভাবনা দাঁড়ায়। "পিতা", 'স্বামী' 'পুত্র' 'পত্নী' ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগে আমাদের সভ্যরীতির সহিত পার্থক্য অনেক। শ্রেণীবিভাগ করিয়া সম্বোধন করিবার এই রীতির মূলে বাস্তব সম্বন্ধ নাই। ["—it no more follows that a man once practised promiscuous marriage with all such "wives" or that he now possesses the right to do so than a man once was begotten by all the men who were thus his "fathers" or was born of all the women who were thus his 'mothers'" Crawley 445]

কামিলারোই জাতির কবন্ধ হইতে যৌথবিবাহ প্রমাণ হয় না। ইহাই দেখা গেল। এখন উরাবুন্না জাতির প্রথা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

(ক্রমশঃ)

খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই

গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.	
শ্রীগীতা	৬·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	৫·০০
ভারত-আত্মার বাণী	৫·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
কর্মবাণী	১·২৫
Soul of India Speaks	5·00

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ. বি. টি.	
বিদ্যাসাগর	২·৫০
মানুষের মত মানুষ	·৬২
শিশু রামায়ণ	·৬২
শিশু মহাভারত	·৭৫

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.	
বাংলার ঋষি	৩·০০
বাংলার মনীষী	১·২৫
বাংলার বিদুষী	২·০০
বীরত্বে বাঙালী	১·৫০
ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৩·০০
রাজর্ষি রামমোহন	১·০০
রবীন্দ্রনাথ	১·০০
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১·২৫
আচার্য জগদীশচন্দ্র	১·৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০

॥ প্রতিটি বই বহুচিত্র শোভিত ॥

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী :: ১৫ কলেজ স্কোয়ার :: কলিকাতা—১২।

মানুষের বিখ্যাত পৃথিবীতে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

মানুষের বিখ্যাত পৃথিবীতে আমি বেঁচে থাকবো অন্ততঃ
এক জীবন,
এখনো অনেক ভালোবাসায় বুক
স্বপ্নে কিংবা রেস্তোরাঁয় ধোঁয়াধুলি করে –
সিগারেট ছুঁড়িয়ে গেলে অনায়াসে বন্ধুর পুকেটে
পরিচ্ছন্ন গাড়িবারান্দা পাওয়া যায়, দু একবার চুমুটুমু খেতে
খুব একটা আয়োজন লাগে না।
ছুটিতে বেড়াতে যাবো হিমালয়ে ইচ্ছে হলে ফের অপ্রেমের
অথবা বিষম অভিমানি কিংবা শৈশবের মৃদু পরিমল
তাঁবুর ঘুমোতে পারে, বারান্দায় শীতকালের রোদে
পা শুকোতে কোন বাধা নেই।
মানুষের একজীবন বেঁচে থাকো মানুষের মতই স্বাধীন।

লম্বা মুণ্ডুটা কেটে বেঁটের সমান করা সাম্যের পাগলামি
কিংবা
আমার নাক উঁচু বলে নাক থ্যাবড়া জাতের জন্যনি
কিংবা
মানুষকে বন্দী রেখে মানুষের মুক্তির অভিযান
এ সব খেলেরা কাণ্ড বহু মূর্খ ভুলে আছে আজও পৃথিবীতে।
ভুলে থাকো! আমাকে বিরক্ত করো না। অস্ত্রের আওয়াজে
পাহাড় নোংরা যেন না হয় আবার, জানি বন্দুক উঁচিয়ে
পৃথিবীতে কেউ পায়নি, বন্দুকের নল শেষে ঢুকে যায়
নিজেরই বগলে।

মানুষের বিখ্যাত পৃথিবীতে আমি বেঁচে থাকবো অন্ততঃ
এক জীবন
প্রত্যেকটি মানুষের একজীবন দীর্ঘ সময়
প্রত্যেকটি মানুষের হাড় থেকে পৃথিবীর জন্মাবার খ্যাতি।
নানা দিকে ঘোরে ফেরে, পৃথিবীর স্বাধীন বাতাসে।

চাঁদকে

সমীরণ মুখোপাধ্যায়

আমার পবিত্র ভালবাসাকে তুমি আহত করলে।
আমার দেওয়া মৈত্রীর থালাকে তুমি টুকরো টুকরো করে
দিলে।
দু'হাজার বছরের যে বিশ্বাস,
দু'হাজার বছরের যে সখ্যতা,
হৃদয়ের প্রতিটি গ্রন্থিতে যে বন্ধন
তোমার ধারাল নখরে তা'ই ছিন্নভিন্ন করে দিলে।
তোমার মুখের প্রতিটি ভঙ্গিতে আজ প্রবঞ্চনা
প্রতিটি রেখার কুঞ্চনে আজ অবিশ্বাস,
ফুটে উঠেছে রক্ত চক্ষুর উদ্যত ভঙ্গিমা।
তোমার হিংস্রতা ছাপিয়ে গেছে নেকড়ের ক্রূরতাকে
তোমার লোলুপতা ছাপিয়ে গেছে শকুনের লালসাকে,
তোমার প্রবঞ্চনা ছাপিয়ে গেছে বকের শঠতাকে।

আজ আর কথা নয়,
আজ আর ক্ষমা নয়।
আমার আহত ভালবাসায়, আমার বিচূর্ণ-বিশ্বাসে
জ্বলে উঠেছে অগ্নিকণা,
আমার ধমনীর প্রতি স্রোতাবেগে এসেছে রক্তের চাঞ্চল্য,
এসেছে জাগরণের সুর।

অবিশ্বাসী, প্রবঞ্চক চেয়ে ছাখো
সমস্ত বুদ্ধের দেশ আজ জেগেছে,
আমাদের হাতে তাই বজ্র,
আমাদের কণ্ঠে আজ শপথ,
আমাদের হৃদয়ে তাই জয়ের সুদৃঢ়-প্রত্যয়।

দুটি স্প্যানিশ কবিতা

অনুবাদ : দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

বন্যা কমলালেবুর গাছের গান

ফেদেরিকো গারসিয়া লরকা

কাঠুরিয়া।
ছিন্ন করে নাও আমার ছায়া।
নিজেকে নিষ্ফল দেখার
যন্ত্রণা থেকে আমাকে মুক্তি দাও।

কেন আমি জন্মেছিলাম দশদিকের মুকুরে বিম্বিত?
দিন আমাকে ঘুরে ঘুরে প্রদক্ষিণ করে,
আর রাত্রি আমার প্রতিলিপি আঁকে
তার সকল নক্ষত্রে।

আমি বাঁচতে চাই নিজেকে প্রত্যক্ষ না ক'রে।
আমি স্বপ্ন দেখবো, পিঁপড়ে
আর লতাগুল্ম আমার
অজস্র পাতা আর সহস্র পাখি।

কাঠুরিয়া।
ছিন্ন ক'রে নাও আমার ছায়া।
নিজেকে নিষ্ফল দেখার
যন্ত্রণা থেকে আমাকে মুক্তি দাও।

Federico Garcia Lorca (1899-1936)

বীণা

লুইস সেরনুডা

খাঁচা ভরপুর বিহঙ্গটির খাঁচা,
জলধারার হাওয়ার সহোদরা,
ওরই গানের তার আবহর
দীক্ষিত হাত পাতা।

যেমন কলসকারার রুদ্ধ জল
কেঁপে ওঠে, সে, ফের জেগে ওঠে
রামধনুর ফোয়ারায় ফোয়ারায়,
অন্ধ হিয়ার শুরেণ্য দীপশিখা।

যেমন হাওয়া পাতার ফাঁকে ফাঁকে,
এমন আবছা কয় সে কথা, এমন
শুদ্ধ স্বরে, অনেক স্মরণীয়,
অনেক ভুলে যাওয়া পুরাণকথা।

কোন অমরার ফল তোকে কোন সুধা
তৃষ্ণা মিটিয়েছে? পরশ রেখে
গেছে ও তোর কণ্ঠে? আমায় বল,
গান গেয়ে যা ও পাখি, ও বীণা।

Luis Cernuda (b. 1904)

আবার পতাকা অবনমিত

সুনীল দাস

কলম্বোর পৃষ্ঠপট :

ভারত সরকার কলম্বো প্রস্তাব পুরোপুরি গ্রহণ করেছেন। যদিও প্রধান মন্ত্রী নেহেরু কলম্বো প্রস্তাব সম্পর্কে সংসদে বলেছিলেন, 'কিছুটা অংশ স্পষ্ট কিছুটা অংশ অস্পষ্ট।' ১০ই জানুয়ারীর পর দিল্লীতে কলম্বো সম্মেলনের প্রতিনিধিদের কাছে প্রস্তাব সম্পর্কিত ব্যাখ্যা শুনে সঠিক মূল প্রস্তাব ভারত সরকার গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করেছেন। লোকসভায় এই প্রস্তাবের উপর বিতর্ক হয়ে গেছে। এই বিতর্কে বিরোধীদলগুলির পক্ষ থেকে এ-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের দাবী উঠেছিল। মাত্র ৫৯টি ভোটের সমর্থন ছিল সে-দাবীর পেছনে। অপরপক্ষে কংগ্রেস ও কম্যুনিষ্ট দলের তিনশতাধিক সমবেত ভোটে সে দাবী অগ্রাহ্য হয়।

১৯৪৭ সালে প্রবল সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরেই দেশবিভাগ সম্পন্ন হয়েছিল। যারা সেদিন দেশবিভাগের বিরোধিতা করেছিলেন, তাদের সংখ্যা ছিল নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। পনরই আগষ্টের উন্মত্ত কোলাহলে তাদের বলিষ্ঠ কণ্ঠও নিঃশব্দ হয়েছিল। কিন্তু দেশবিভাগের অভিশাপের গ্লানিজনক আপোষের দ্বারা দিয়ে জাতির চরম আত্মসম্মান, অবদাননা ও লাঞ্ছনায় কলুষিত হয়েছে, জাতির মানসিকতা গুরু আঘাতে জর্জরিত এবং প্রাণশক্তি অজস্র ধারায় অপচিত হয়েছে। শুধু তাই নয় যে তরুণেরা এই আবহাওয়ায় বড় হয়ে উঠেছে তাদের সামনে সমস্ত দিগন্ত বিলুপ্ত ও সকল প্রমূল্যের অবসান ঘটেছে। গত পনের বছরের ইতিহাসে এই কঠিন সত্যকে স্বীকার না করে পারে নি।

কলম্বো প্রস্তাবের স্বীকৃতি জাতির জীবনে আবার সেই দুর্দিনের সম্ভাবনা ডেকে এনেছে। কলম্বো প্রস্তাব গ্রহণের দ্বার দিয়ে জাতির দুর্বলতা, আক্রমণকারীকে প্রতিহত করার দুর্জয় সঙ্কল্প, ভারতবর্ষের সার্বভৌমত্ব ও ভবিষ্যতের নিরাপত্তা অনিবার্যভাবে বিপন্ন হয়ে পড়বে—জাতির চেতনায় প্রবলভাবে এ-সংশয় দেখা দিয়েছে। লোকসভার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা সাময়িকভাবে এই আশঙ্কার আত্মপ্রকাশের পথে অন্তরায় হয়ে থাকবে মাত্র।

সম্মেলনের ভূমিকা।

ছাপান্নটি এফ্রো-এশিয় রাষ্ট্রের মধ্যে বাছাই করা ছয়টি রাষ্ট্রের এই সম্মেলন—'for a peaceful settlement of India-China conflict'—ভারত-চীন সংঘর্ষের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার সূত্র সন্ধানের উদ্দেশ্য নিয়ে আহুত হয়েছিল। অথচ ছাব্বিশটি এফ্রো-এশীয় দেশ চীনা আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে। এদের মধ্যে অনেকেই, যেমন মালয়ের টেঙ্কু আবদুল রহমান, সম্মেলনে আমন্ত্রিত হন নাই। যারা সম্মেলনে এসেছিলেন তাদের মধ্যে চারটি দেশেই চীনের মত একতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা রয়েছে। এদের মধ্যে আবার কয়েকটি রাষ্ট্রে—বর্মা, ইন্দোনেশিয়া—প্রবল চীনাপন্থী কম্যুনিষ্ট পার্টির অস্তিত্ব রয়েছে। কেউ কেউ আবার চীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সম্পর্কে আবদ্ধ। সিংহলের কথাই ধরা যাক। একদিকে যেমন সিংহলে প্রচুর সংখ্যায় ভারতীয় বসবাসকারী রয়েছে—

সিংহলে যারা অবাঞ্ছিত,—অন্যদিকে সিংহল-ভারত বাণিজ্যিক সম্পর্কে সিংহলের বাৎসরিক ঘাটতি হবে প্রায় ত্রিশ কোটি টাকা! এদিকে চীন সিংহলের চাউলের চাহিদার দুই-তৃতীয়াংশে যোগান দিচ্ছে উপরন্তু তার উৎপাদিত রবারের অর্ধেকেরও বেশী কিনে নিচ্ছে।

কলম্বো সম্মেলন ও তার আমন্ত্রিত নির্বাচনে চীনের অনস্বীকার্য উদ্যোগের স্বাক্ষর স্পষ্ট হয়ে গেছে। অক্টোবর-নভেম্বরে ভারতের উত্তর সীমান্তে চীনের অপ্রতিহত সামরিক শক্তিমত্তা এফ্রো-এশীয় দেশগুলিকে প্রবলভাবে প্রভাবিত ও চীনের প্রতিবেশী ও নিকট-প্রতিবেশীদের ভীত ও সন্ত্রস্ত করে তুলেছে। এই অবস্থায় ২১শে নভেম্বরের "১৯৫৯ সালের ৭ই নভেম্বর তারিখের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখার ত্রিশ কিলোমিটার উত্তরে পেছোবো" এবং "১৯৬২ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর-এর পূর্বের রেখায় চীন ফিরে যাক," যথাক্রমে চীনের ও ভারতের এই দুই প্রস্তাবের দোটানায় চীন-সমর্থকদের পাল্লা স্বাভাবিক ভাবেই কলম্বো সম্মেলনে ভারী হয়ে পড়লো।

কলম্বো সূত্রের পূর্বসর্ত

কলম্বো আলোচনায় চীনকে আক্রমণকারী আখ্যা দেওয়া তো দূরের কথা, আক্রমণকারী এবং আক্রান্তকে সমপর্যায়-ভুক্ত করে মীমাংসার সূত্র উদ্ভাবনের প্রচেষ্টায় সম্মেলন উদ্যোগী হয়। অবশ্য একমাত্র আরব প্রজাতন্ত্রের প্রতিনিধিই এ-বিষয়ে দৃঢ়তা দেখিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে আরব প্রজাতন্ত্রের সরকারী মুখপত্র United Arab Republic Magazine-এ বলা হয়েছে "...at the Colombo Conference, did the U.A.R alone come out with clear cut proposals for the vacation of aggression." এই পত্রিকায় অন্যত্র আরব প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি-পরিষদের চীনা-আক্রমণ সংক্রান্ত প্রস্তাব সম্পর্কে বলা হয়েছে "...the resolution suggested that the Chinese forces go back to the pre-invasion line all along the boundary so that negotiation could begin between the two sides."

অন্যান্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা এই প্রস্তাবে সম্মতি দেন নাই। কারণ প্রস্তাবগুলি চীনের গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং চীনের গ্রহণযোগ্য প্রস্তাবের সূত্র সন্ধান চলে। এফ্রো-এশীয় দেশগুলির চীন ভীতি এবং ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে প্রচারের অভাব অনেকাংশে এই অবস্থার জন্য দায়ী। আরব প্রজাতন্ত্রের পত্রিকায় এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলা হয়েছে:

"The Asian neighbours of China were apprehensive of Peking's wrath, Pakistan's pro-Chinese propaganda had confused Afro-Asian opinion to a large extent, and so poor had been India's diplomatic and public relations work among the Afro-Asian countries that few of them had any clear idea about the dispute and few were prepared to believe that the Chinee had mounted a powerful and massive invasion of India's frontiers."

আক্রমণের লুঠ: (gains of aggression)

কলম্বো প্রস্তাবের সমর্থনে বাপুং নীতির দোহাই দেওয়া হয়েছে। গত ১৩ই জানুয়ারী নয়া দিল্লীতে আরব প্রজাতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রী আলী সাবরীকে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেন যে 'আক্রমণের লুঠ (gains of aggression) ভোগ করা চলবে না'—এই নীতির ভিত্তিতেই কলম্বো প্রস্তাব রচিত হয়েছে কি না। উত্তরে সাবরী বলেন বিদ্যমান দেশের আন্তর্জাতিক সীমা লঙ্ঘন না করে বাপুং নীতি অনুযায়ী শান্তিপূর্ণ-বিরোধ-মীমাংসার নীতি কলম্বো প্রস্তাবে নিহিত রয়েছে। অথচ আরব প্রজাতন্ত্রের পত্রিকায় স্পষ্টই বলা হয়েছে কলম্বো

প্রস্তাবে ভারতবর্ষের দাবী পূর্ণমাত্রায় স্বীকৃতি পায় নাই—'These proposals donot give India all that she wants'—এই পত্রিকায় জানা যায় মূলতঃ আক্রমণের দুঃসংভোগের বিরোধিতার দুরভিসন্ধি নিয়ে সাবরী কলম্বো এলেও, সম্মেলন তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করে নাই। ভারতবর্ষের সার্বভৌমত্ব ও সম্মান কলম্বো প্রস্তাবে ক্ষুণ্ণ করে আক্রমণকারী-কে আক্রমণের দুঃসংভোগের সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

কলম্বো প্রস্তাব ও তাহা

গত ২০শে জানুয়ারী মূল কলম্বো প্রস্তাব প্রকাশিত হয়, ব্যাখ্যা প্রকাশিত হয় ২২শে জানুয়ারী। মূল প্রস্তাব ও ব্যাখ্যা মিলিয়ে আছে :

১) সম্মেলন মনে করে যে বর্তমান কার্যত যুদ্ধ-বিরতি চীন-ভারত সংঘর্ষের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার সূচনার পক্ষে উপযুক্ত অবসর।

২) সীমান্তের পশ্চিমাংশ

ক) শ্রীনেহেরুর নিকট ১৯৬২ সালের ২১শে নভেম্বর তারিখে চৌ এন লাই প্রেরিত চীনা সরকারের বিবৃতি এবং ২৮শে নভেম্বর তারিখে প্রেরিত পত্রের প্রস্তাব অনুযায়ী ১৯৬১ সালের ৭ই নভেম্বর তারিখে উভয় পক্ষের মধ্যে অবস্থিত প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা (চীনা সরকার প্রচারিত তৃতীয় ও পঞ্চম মানচিত্রে বর্ণিত) থেকে চীনাবাহিনীকে কুড়ি কিলোমিটার পিছিয়ে আসতে হবে।

খ) ভারত সরকারের সৈন্যবাহিনী অধিকৃত সকল সামরিক ঘাঁটি উপরোক্ত (ক) নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত সীমা রেখার উপর পর্যন্ত অবস্থিত হবে।

৩) চীনাবাহিনী পিছিয়ে গেলে

সৈন্যমুক্ত বিশ কিলোমিটার অঞ্চলের শাসনব্যবস্থা দুই পক্ষের অসামরিক ঘাঁটি দ্বারা পরিচালিত হবে। এই নীতি কলম্বো সম্মেলনের প্রস্তাবের একটি মুখ্য অঙ্গ বিশেষ। ঘাঁটিগুলির অবস্থান, সংখ্যা ও গঠন দুই সরকারের ঐকমত্যের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে।

৪) সীমান্তের পূর্ব অংশ

কলম্বো সম্মেলনের প্রস্তাব অনুযায়ী ভারতীয় বাহিনী দুইটি এলাকা বাদে (এই দুইটি এলাকা সম্পর্কে ভারত ও চীন সরকার একমত নন) প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখার অর্থাৎ ম্যাকমাহন লাইনের ঠিক দক্ষিণ পর্যন্ত অগ্রসর হতে পারবে। এই দুইটি এলাকা বাদে চীনাবাহিনীও ম্যাকমাহন লাইনের ঠিক উত্তর পর্যন্ত অগ্রসর হতে পারবে। আলোচনার মধ্য দিয়ে এই দুইটি এলাকা—কলম্বো প্রস্তাবে যাকে অবশিষ্ট এলাকা বলা হয়েছে—সম্পর্কে দুই সরকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এই দুইটি অঞ্চল চেংং অথবা থাগলা গিরিপৃষ্ঠ অঞ্চল ও লংজু নামে পরিচিত। এই দুইটি এলাকার ক্ষেত্রে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা সম্বন্ধে দুই সরকারের মতভেদ রয়েছে।

৫) সীমান্তের মধ্য অংশ

কলম্বো সম্মেলনের মতে মধ্য অংশে যিতাবস্থা বজায় রাখা বিধেয় এবং কোনো পক্ষই তা পরিবর্তনের যেন চেষ্টা না করেন।

৬) সম্মেলনের মতে এই প্রস্তাবগুলি

যা যুদ্ধ-বিরতি স্থায়ী করতে সহায়ক হবে—কার্যকরী হলে যুদ্ধ-বিরতি অবস্থান সংক্রান্ত অন্যান্য সমস্যার সমাধানের জন্য দুই পক্ষের প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনার ক্ষেত্র তৈরী করবে।

৭) সম্মেলন স্পষ্টভাবে ঘোষণা করতে চায় যে তাদের এই আবেদনে সক্রিয়ভাবে সাড়া দিলেও সীমান্তের স্থায়ী অবস্থান সম্পর্কে দুইটি রাষ্ট্রের বক্তব্যের অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকবে।

প্রস্তাবের তাৎপর্য

আলবানিয়া বাদে অন্যান্য কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র চীনা-আক্রমণের ধিক্কারে মুখর। অথচ কলম্বোতে সমবেত 'non aligned' রাষ্ট্রগুলি ভারতবর্ষকে সামান্যতম সমর্থন করতে সাহস পায় নাই। চীন ও ভারতের মধ্যে তাদের নিরপেক্ষতার আপাত-সমদূরত্বের—neutralist equidistance—আড়ালে চীনের ২০শে অক্টোবর ও ২১শে নভেম্বরের প্রস্তাবেই তারা মোটামুটি সায় দিয়েছে। ১৯৫৯-এর ৭ই নভেম্বরের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা—line of actual control—থেকে কুড়ি কিলোমিটার পিছিয়ে দেবার যে চীনা-প্রস্তাব মূলত তারই ভিত্তিতে কলম্বো-প্রস্তাব রচিত।

প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা

এটি একটি তাচ্ছব চলমান চীনা সীমারেখা। ১৯৫৯ সালের ৭ই নভেম্বর থেকে এই সীমা-রেখা চীনা সেনাবাহিনীর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ এগিয়ে চলেছে এবং ১৯৬২ সালের ২১শে নভেম্বর যুদ্ধবিরতি ঘোষণার সময় চীনা সৈন্যবাহিনী গোটা চীন-ভারত সীমান্ত বরাবর যেখানে এসে থেমেছে, এই প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখাও সেই সীমানাতে এসে স্থির হয়েছে, যদিও এই চলমান সীমা রেখাকেই "১৯৫৯ সালের ৭ই নভেম্বরের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা" বলে চীনারা বরাবর চিহ্নিত করে এসেছে। ১৯৫৯ সাল থেকে ১৯৬২ সাল এই তিন বছরে চীনা সেনাবাহিনীর ঘাঁটি কোথাও কোথাও একশত মাইল অগ্রসর হলেও এই অগ্রবর্তী সীমারেখাকেও '১৯৫৯ সালের ৭ই নভেম্বর'-এর সীমারেখা বলতে চীনাদের বাধে নাই। ভারত সরকারের একজন মুখপাত্র গত ২৯শে নভেম্বর নয়াদিল্লীতে ঠিকই বলেছেন "In truth the Chinese had equated the supposed line of actual control on November 7, 1959 with the line they had come to control as a result of the massive invasion begining on October 20."

১৯৬২ সালের ৮ই সেপ্টেম্বরের পূর্বে চীনারা লাদাকে প্রায় বার হাজার বর্গ মাইল ভারতীয় এলাকা দখল করেছিল। ২০শে অক্টোবরের আক্রমণের পর আরও আড়াই হাজার বর্গ মাইল চীনের করায়ত্ত হয়। কলম্বো প্রস্তাব অনুযায়ী চীনাবাহিনী এই অঞ্চলে প্রায় তিন হাজার বর্গ মাইল পিছিয়ে যাবে এবং ভারতীয় বাহিনীর বর্তমান অবস্থান অপরিবর্তিত থাকবে। অর্থাৎ, ভারতীয় সেনাবাহিনীর যুদ্ধ-বিরতি সীমারেখা, ১৯৬০ সালের চীনামানচিত্রে চীনের সীমানার দাবীতে এসে থেমে যাবে (1960 Chinese claim line)। অবশ্য চীনাদের সীমা ২০ কিলোমিটার অপসারণের পর লাদাকের গালওয়ান উপত্যকা এলাকার ছোট্ট অঞ্চলের ঘাঁটিগুলি ছাড়া ৮ই সেপ্টেম্বরের ভারতীয় অন্যান্য ঘাঁটিগুলি চীনা কবল মুক্ত হবে। লাদাকে ভারতীয় সেনাদের তেতাল্লিশটি ঘাঁটি ২০শে অক্টোবরের পর চীনা কবলিত হয়েছিল। কলম্বো প্রস্তাব অনুযায়ী তার একচল্লিশটি চীনা মুক্ত হবে। মোটকথা, যুদ্ধ-বিরতি পর্যন্ত লাদাকে চীনা-কবলিত মোট ১৪,৫০০ বর্গ মাইল এলাকার মধ্যে কলম্বো প্রস্তাব গ্রহণের পরও ১১,৫০০ বর্গ মাইল চীনাদের দখলে থাকবে।

সৈন্যমুক্ত তিন হাজার বর্গমাইলে ভারত ও চীনা উভয়ের বেসামরিক ঘাঁটি থাকবে: এই ব্যবস্থা কলম্বো প্রস্তাবের অন্যতম মূল ভিত্তি। ঘাঁটিগুলির সংখ্যা কত, কোন রাষ্ট্রের কয়টি ঘাঁটি থাকবে, তার অবস্থান কি হবে—সমস্তই নির্ভর করবে চীন-ভারত সরকারের সদিচ্ছার উপর। কলম্বো প্রস্তাব অনুযায়ী কোনো অবস্থাতেই এই সৈন্যমুক্ত এলাকা ভারতীয় সেনাবাহিনী পুনর্দখল করতে পারবে না এবং এখানে চীনের সঙ্গে মিলেমিশে বেসামরিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালু রাখতে হবে।

সীমান্তের পূর্ব অংশে, তোলা এলাকা বাদে, ম্যাকমাহন

সীমারেখা পর্যন্ত ভারতীয় সেনাবাহিনীর অধিকার কলম্বো প্রস্তাব স্বীকার করে নিয়েছে। চোলাং চীন কিম্বা ভারত কোনো রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর প্রবেশের অধিকার থাকবে না। দুই রাষ্ট্রের আলোচনার মধ্য দিয়ে চোলার ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে। লংজুর পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন হবে না। সেখানে ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রবেশ অধিকার নেই। সীমান্তের মধ্যাংশের অবস্থাও অপরিবর্তিত থাকবে।

সুতরাং কলম্বো প্রস্তাবে ভারতীয় সার্বভৌমত্ব ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার খর্ব করা হয়েছে। সীমান্তের গাদাক ও নেফা অঞ্চলে ভারতীয় এলাকায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবাধ চলাচলের অধিকার লঙ্ঘনের এবং ভারতীয় এলাকায় চীন-ভারত যৌথ কোমান্ত্রিক প্রশাসনিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে ভারতের আত্মমর্যাদা শুধু লাঞ্ছিত হয় নাই, ভবিষ্যতে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা হরণের সূচীমুখ তৈরী করা হয়েছে। ভারতের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে চীনের স্থায়ী হস্তক্ষেপের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর কলম্বো প্রস্তাবের সর্বোত্তম পরিচয়।

ভারত সরকারের আদর্শ চ্যুতি

ভারত সরকার ১৯৫০ সাল থেকে ম্যাকমোহন লাইনের সীমা রক্ষার অনমনীয় সঙ্কল্প ঘোষণা করেছেন। ম্যাকমোহন লাইন অলঙ্ঘনীয়, তার এপারে কাউকে আসতে দেওয়া হবে না—এই নীতিতে ভারত সরকার স্থির ছিলেন। ১৯৫০ সালের ৩১শে অক্টোবর লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন, The Macmahon Line is our boundary. We will not allow anybody to come across that boundary." ১৯৬২ সালের ১৪ই নভেম্বর চীনা-আক্রমণ প্রতিরোধের দৃঢ় সঙ্কল্প ঘোষণা করে লোকসভায় বলা হয়, "with hope and faith this house affirms the firm resolve of the Indian people to drive out the aggressor from the sacred soil of India, however long and hard the struggle may be." অর্থাৎ সংগ্রাম যত দীর্ঘ হউক, যত কঠিনই হউক না কেন ভারতের পবিত্রভূমি থেকে শত্রু সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত না হওয়া পর্যন্ত ভারতবাসীদের বিরাম নাই। ভারত-সরকার চীনা সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পূর্বসর্তরূপে ১৯৬২ সালের ৮ই সেপ্টেম্বরের সীমা রেখায় চীনাবাহিনীর ফিরে যাবার যে দাবী তুলেছেন—নূতন পর্যায়ে ৮ই সেপ্টেম্বরই চীনা আক্রমণ সুরু হয়—লোকসভার প্রস্তাবে তার কোনো উল্লেখ নেই। লোকসভার প্রস্তাবে চীনাদের চূড়ান্তভাবে ভারতভূমি থেকে বিতাড়নের সঙ্কল্প ছাড়া অন্য কোনো সর্ত জুড়ে দেওয়া হয় নাই। ৮ই সেপ্টেম্বর সীমারেখার দাবী ভারত সরকার প্রথম উত্থাপন করেন চীনাদের ১৯৬২ সালের ২৪শে অক্টোবরের তিনদফা যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবের উত্তরে। ২৪শে অক্টোবরের চীনা প্রস্তাবের উত্তরে ভারত সরকার লেখেন :

"If the chinese professions of peace and peaceful settlement of differences are really genuine, let them go at least to the position where they were all along the boundary prior to September 8, 1962. India will then be prepared to undertake talks and discussions at any level mutually agreed"

তাওয়াং পতনের পর এই পত্রালাপ হয়েছিল। ভারত-সরকারের এই পত্রকে উপহাস ও উপেক্ষা করেই অতঃপর বমডিলা-ওয়ালং পর্যন্ত চীনাবাহিনী অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে যায়। তবুও ভারত সরকার ৮ই সেপ্টেম্বর সীমারেখার নূতন দাবীতেই আজও স্থির আছেন। প্রধানমন্ত্রী ১৬ই নভেম্বর লোকসভায় এই দাবীর পুনরুক্তি করে বলেন, "Chinese must withdraw to the position, held on September 8,1962 before talks could begin,

leaving India free to occupy the vacated area." (Statesman, 15th November, 1962). অর্থাৎ একদিকে চীনেরা ৮ই সেপ্টেম্বর সীমারেখায় ফিরে যাবে, অন্যদিকে চীনামুক্ত এলাকায় ভারতবর্ষের অসপত্ন অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে।

কলম্বো প্রস্তাবে চীনামুক্ত এলাকায় ভারতবর্ষের অসপত্ন অধিকার আগে স্বীকৃত না হওয়া সত্ত্বেও গত ২৪শে জানুয়ারী লোকসভায় কলম্বো প্রস্তাবের সমর্থনে প্রধানমন্ত্রী বলেন··· "They not only fulfilled India's condition that the September 8 position should be restored but in some respects were even more advantageous" (Statesman, January 26th, 1963)। প্রধানমন্ত্রীর অত্যুৎসাহের কারণ (১) কলম্বো প্রস্তাবে, ৮ই সেপ্টেম্বরের প্রস্তাবের চাইতে কোনো কোনো এলাকায় চীনাদের আরও বেশী পিছিয়ে যেতে হবে (২) ৮ই সেপ্টেম্বরের সীমান্তরেখায় চীন ও ভারতীয় সেনাবাহিনী পাশাপাশি অবস্থিত হত ("Chinese military posts would remain mixed up with Indian posts) কিন্তু কলম্বো প্রস্তাবে মধ্যবর্তী ২০ কিলোমিটার সৈন্যমুক্ত এলাকা সে সম্ভাবনা দূর করে দিয়েছে। (৩) ২০ কিলোমিটার সৈন্যমুক্ত এলাকায় ভারত-চীন যৌথ বেসামরিক প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় জটিলতা সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও প্রধানমন্ত্রীর মতে "···the relevant area in Ladakh was not inhabited and, therefore, needed no administration" লাদাকের প্রস্তাবিত সৈন্যমুক্ত এলাকায় জনবসতি নেই, সুতরাং প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রয়োজন নেই এবং সেই কারণে সংশ্লিষ্ট এলাকায় আক্রমণকারী রাষ্ট্রের অধিকার স্বীকার করে তার সঙ্গে আপোষ-আলোচনায় বসার নেই, আদর্শবিচ্যুতি নেই, আত্ম-অবমাননা নেই, আত্মসমর্পণ নেই—কলম্বো প্রস্তাব গ্রহণের পশ্চাতে এই যুক্তি পরম্পরা জাতির গুরুতর দুর্দিনের সাক্ষ্য বহন করছে।

কলম্বো প্রস্তাব গ্রহণের জন্য প্রধানমন্ত্রী আর একটি যুক্তির অবতারণা করেছেন। শুরুতে যা ছিল 'প্রবল আক্রমণ' এবং যার জন্য দেশে গুরুতর আপৎকালীন ব্যবস্থা প্রবর্তন ও সমস্ত জাতির চরম সামগ্রিক আত্মত্যাগের প্রস্তুতি, অল্পসময়ের ব্যবধানেই আশ্চর্য উপায়ে প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টিতে তা রূপান্তরিত হয়ে 'সীমান্ত লড়াই'-এ পরিণত হয়েছে। ২০শে অক্টোবরের পর থেকেই চীনা-আক্রমণকারীদের 'শত্রু' বলে আখ্যাত করে এবং তাদের ব্যাপক আক্রমণকে সীমান্ত বিরোধের পরিবর্তে বহিঃশত্রুর আক্রমণরূপে (massive invasion) ঘোষণা করার পরও কলম্বোর বিদ্বৎকের অনুমোদনে চীনা-আক্রমণের প্রচণ্ডতা, ব্যাপকতা ও সুদূরপ্রসারী ভয়ঙ্কর সম্ভাবনাকে লঘু-ভাবে উপস্থাপিত করবার প্রচেষ্টা, জাতীয় মর্যাদা ও অক-মনের বিনিময়ে, চাতুর্য ও কূটনীতির পরিচয় বহন করবে। ১২ইনভেম্বর লোকসভায় প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতায়—"China··· has committed aggression and initiated a massive invasion of India by her armed forces" —পূর্বতনীর পর ২৭শে জানুয়ারী কংগ্রেসের পরিষদীয় সভার বক্তৃতায়—"It was a small battle and a small disaster which should not be exaggerated" —মর্যাদার অবরোহণ সম্পূর্ণ হয়েছে।

চীনের কলম্বো প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান,—প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টিতে—ভারতের কূটনৈতিক জয়, এই যুক্তি দিয়েও কলম্বো প্রস্তাবকে গ্রহণীয় করার প্রচেষ্টা রয়েছে। লাদাখের সৈন্যমুক্ত এলাকায় যৌথপ্রশাসনিক ব্যবস্থা স্বীকারে ভারত সরকারকে বাধ্য করে চীনের ত্রাস-নীতি সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে যাবার পর স্বভাবতই সৈন্যমুক্ত এলাকায় যৌথ প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে একক চীনা-প্রশাসনিক এলাকায় পরিণত করবার পথ

মা-কে

বিনোদ বেরা

মা গো, স্নিগ্ধ মাটির চন্দন
আমার ললাটে এঁকে দাও,
হৃদয় করেছি সমর্পণ
কাকে যেন। সুদূরে উধাও
প্রাণ, যেন অনেক পাখীর
কলরব আমার ভিতরে—
আছি যেন পীত পৃথিবীর
বিপুল উজ্জ্বল সাজ ঘরে।

জানি তীব্র নীল রহস্যের
অনলে, আমাকে তুমি ডাকো—
শোনাও সে কোমল জলের
রূপকথা, মা গো কাছে থাকো—
মাটির উদার জগতের
শান্তি—প্রাণে নানা বর্ণে আঁকো।

তামসী, উষা ও তুমি

অরবিন্দ ভট্টাচার্য্য

ক্ষীণাঙ্গী তামসী এক যুগজয়ী নারীর মতন
প্রাচীন ভাস্কর্য্যের গড়া অমলিন রূপসী ললনা
শ্যামলী ছায়ার নীচে চোখে ভরে কাঞ্চনার অরূপ রতন
প্রেমিক মৃত্যুর সাথে কানে কানে করে আলাপন।

উষা তা'রো আগে, এক চেতনার প্রেরণা প্রখরা
মিশরে যদি'র মুখ কালো স্তন কাল কে ছলনা
করে সে' সাইরেন নারী চোখে ভরে অমর সুষমা
প্রেমিক সূর্য্যের বুকে এঁকে যায় মন নিরুপমা।

আর তুমি লীন হও সময়ের সাগরের অকূল পাথারে
বহু লীগ নীচে থেকে তুলে নিতে দু'হাতে আমারে।

.....

নিয়ে চীন কলম্বো প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের সহজ মেনে। নেহরুর শঙ্কর সঙ্গে উৎকোচের বিনিময়ে আপোষকামনা বার বার ব্যর্থ হয়েছে। দ্বিতীয়ত মহাযুদ্ধের পূর্বে হিটলারের এই শিক্ষা চীনাদের ভুলে যাবার কোনো সঙ্গত কারণ নেই।

যুদ্ধ-বিরতির সীমানার পরিণতি স্থায়ী সীমানায়

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আক্রান্ত ও আক্রমণকারী দেশের মধ্যে যুদ্ধবিরতি সীমানাই প্রায় স্থায়ী সীমানায় পরিণত হয়েছে। সময়ের অতিক্রমণের পরও যুদ্ধবিরতি সর্ত, স্থায়ী সন্ধিচুক্তিতে কোথাও পরিণতি না পাবার ফলেই এই ঘটনা ঘটেছে। কাশ্মীর তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাছাড়াও রয়েছে উত্তর কোরিয়া, ভিয়েৎনাম ও প্যালেষ্টাইন। কলম্বো প্রস্তাবের স্বীকৃতি ভারতবর্ষের উত্তর সীমান্তে দেশের অভ্যন্তরে প্রবল শত্রুর মুখোমুখি আর একটি সংঘাতশঙ্কুল স্থায়ী সীমারেখা রচনার প্রাথমিক উদ্যোগ। কলম্বোর এই বিপজ্জনক আপোষ প্রতিরোধে জাতির অতন্দ্রপ্রহরা অনিবার্য হয়ে পড়েছে।

চল্লিশ দশকের বাংলা কবিতা

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

॥ ছয় ॥

চল্লিশের তিনজন প্রতিনিধিস্থানীয় কবি, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বিভিন্ন দিক থেকে চল্লিশের কাব্য-চেতনাকে সমৃদ্ধ করেছেন। মঙ্গলাচরণ সাম্প্রতিক কালে আর তেমন বিশেষ না লিখলেও শিল্পপ্রত্যয়, সমাজ চিন্তা এবং ভাবানুষঙ্গের দিক থেকে তাঁর কবিতা ইতিমধ্যেই সমৃদ্ধ কাব্যকলার সাক্ষ্য। পক্ষান্তরে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বহু বিচিত্রগামী কাব্যচেতনাকে হৃদয়ে বহন করেছেন এবং নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী শ্রবণসুখকর পদ্য-সাহিত্যে এবং আত্মমগ্ন গুঞ্জনে স্বতন্ত্র একটি ভূমিকার নির্জন নায়ক।

'মেঘ বৃষ্টি ঝড়'-এর কবি মঙ্গলাচরণের সজাগ অন্তর্দৃষ্টি গোড়া থেকেই সতর্ক শিল্প-চিন্তার অনুগামী। তাঁর দ্রুত-পরিবর্তনশীল কবিসত্তা সমাজসচেতন শিল্পবিন্যাসে সহজ ভাবেই রূপান্তরিত। 'কটি কবিতা ও একলব্য' তাঁর স্মরণ-যোগ্য রচনার সাক্ষী এবং নানা কারণে এই কাব্যগ্রন্থটিকে মূল্যবান মনে হবে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক কবিতায় গদ্য বিন্যাসের সার্থক শিল্পরূপ যেমন লক্ষণীয় তেমনি এই একই ক্ষেত্রে মঙ্গলাচরণও আশ্চর্য সফলতার পরিচয় দিয়েছেন। মঙ্গলাচরণের পরবর্তী দু'জন তরুণতর কবি, রাম বসু ও সিদ্ধেশ্বর সেন, এই দিক থেকে তাঁর অনুগামী বলতে পারা যায়। গদ্য কবিতা নিয়ে চল্লিশের যুগের আগে থেকেই পরীক্ষার শুরু। কিন্তু শেষ পর্যন্ত, অধিকাংশ কবিই প্রত্যাবর্তন করেছিলেন ছন্দ ও মিলের আপাতরম্য ও স্বাচ্ছন্দ্যকর বহিরঙ্গের অন্তরালে। কিন্তু মঙ্গলাচরণ অনেক ক্ষেত্রেই গদ্যকাব্যের শিল্পরীতির পরীক্ষায় আশ্চর্য সিদ্ধিতে পৌঁচেছেন এবং তাঁর কবিতার বিষয়-বস্তুও অত্যন্ত সহজ-ভাবেই এই পরিণত আঙ্গিকের বিশেষ উপযোগী। তার মানে অবশ্য এই নয় যে ছন্দ ও মিলের কবিতায় তিনি উৎসাহী নন কিংবা কোনো সার্থক পরীক্ষার রত থাকেন নি। বরং বলা যেতে পারে যেমন ছন্দ-মিলের কবিতায় তেমনি গদ্যকবিতায়ও তাঁর স্বাচ্ছন্দ্য স্বাভাবিক। তাঁর গদ্যকবিতায় নিপুণ ভাব-সংহতি লক্ষণীয় এবং সমাজসচেতন স্পর্শক্ষম মনে তাঁর অনেক কবিতাই আশ্চর্য আবেগে দীপ্ত এবং ভাবঘন গভীরতায় সঞ্চরণশীল। রূপক ও উপমা মঙ্গলাচরণ গ্রহণ করেছেন সাধারণ জীবন থেকে, যে-জীবনে 'ঘন পোড়ে চৈত্রের খরায়' 'একটা ছুরির মুখ বিঁধে আছে সমস্ত জীবনে'। মঙ্গলাচরণের এই বিবেকসম্মত, নির্ভীক পরীক্ষায় বাংলা কবিতার একটি বহু দিনস্থ নিত্যকালের জন্যে উন্মুক্ত হয়েছে বলা যেতে পারে।

আসবে বলেও এল না কে বারবার
সকল আশার মুখে ছাই দিল কে
বসে বসে খালি দিন কেটে গেল যে
সমুদ্র খালি অস্ফুট গুঞ্জন।

• •

কোত্থেকে এলো উড়ো কালো মেঘ, কোন্
মেঘে ঢাকে মুখ দুর্জয় অভিমান
হাওয়া দুঃসহ ক্রুদ্ধ দীর্ঘশ্বাস
তোলপাড় বুক সমুদ্র তোলপাড়।

('দৈনন্দিন')

এসো চাখো এই লওভণ্ড মানুষের ঘোলা জলে
সেদ-গেল আশা মুছে গেল ভালবাসা,
সব-খোয়ানোর পথে পথে তবু বেঁধে দুদিনের বাসা
বুক বাঁধে ও-কে সন্তানহারা বিশ্ববাসিনী মা—
('এস দেখে যাও')

ঘুমোয় খোকা রাক্ষসী কড় পর্দায়
মা দিয়ে যায় আলাই-বালাই ধরজায়
খোকা ঘুমোয়—কে জাগে আজ, কে রে!
পাগল বাতাস আকাশ পাতাল তোলপাড়
খোকার শিয়র কে জাগে আজ, কে রে!
ঘরে ঘরে আকাশপিদিম কার চোখ?

উপরের স্তবকগুলোতে ছন্দোবিন্যাস লক্ষণীয়। মুখের ভাষার, জীবন থেকে উঠে-আসা ভাষার ব্যবহারে কবিতাগুলো উজ্জীবিত। পুঁথিগত বিদ্যার নয়, চলমান সংগ্রামী প্রতীক্ষারত জীবনের বুক তোলপাড় মুহূর্তের মধ্যেই এই কবিতার শিকড় দৃঢ় প্রোথিত। 'তবুনো মুখ উস্কোখুস্কো চুল' 'মা গাইছে' 'জননী যন্ত্রণা' 'শিরীষ গাছের নিচে' ইত্যাদি অনেক কবিতাও এই জীবনচেতনার সাক্ষী। অর্থবহ ব্যঞ্জনায়, রূপক ও উপমার বিচ্ছুরণে এক-এক সময় মঙ্গলাচরণের কবিতা গভীর সৌন্দর্যের অনুরণন জাগায়।

'ন্যাজ তুলেছে পিঠে ওই ভাখ ঘর-পালানো আকাশ।'
'দিনগুলো ধানের মত সোনা-ঝলসানো'
'সমস্ত জীবন ভরে ফোঁটায়-ফোঁটায় রক্ত'
'যন্ত্রণা, আমাকে তুমি সাতপাকে অসহ্য বেঁধেছ!'

এবং এই ধরণের পংক্তিবিন্যাস মঙ্গলাচরণের কবিতায় বরাবরই স্বাতন্ত্র্য ও লাবণ্য এনেছে। এই কবির স্বদেশপ্রেম এবং সংস্কারমুক্ত কাব্য-প্রত্যয় নানা সুরে এবং নানা ব্যঞ্জনায় তাঁর কবিতায় প্রকাশিত। যন্ত্রণার প্রকাশ তাঁর কাব্যচেতনায় পরিপূর্ণ মর্যাদা পেয়েছে; মর্মস্পর্শী ভাষায় কিন্তু বলিষ্ঠ আশাবাদে বিকীর্ণ হয়ে, বাংলাদেশের সংগ্রামময় ঐতিহ্যের পটভূমিকায় মঙ্গলাচরণের কবিতায় পরিতৃপ্তির শান্ত নির্ঝর আবিষ্কার করা যায়।

ক্ষুদিরামের মা আমার কানাইলালের মা—
জননী যন্ত্রণা আমার জননী যন্ত্রণা।

কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কাব্যের পটভূমি সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে চল্লিশের অল্প কয়েকজন প্রতিনিধিস্থানীয় কবিদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্য। তাঁর কবিতায় নানা ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পাশাপাশি সামগ্রিক সাফল্য যে-কোনো তরিষ্ঠ কাব্য পাঠক অনুভব করবেন। কখনো প্রেমের অনুরণনে কখনো যন্ত্রণার অনুভবে জীবন জিজ্ঞাসার পরিধির সম্প্রসারণে তাঁর অনেক কবিতাই বাঙ্ময়। একদিকে ছন্দ নিয়ে নির্ভীক পরীক্ষা যেমন তাঁর কবিতায় বিরল সিদ্ধিতে পৌঁচেছে অন্যদিকে তেমনি গদ্যকাব্য নিয়ে পরীক্ষার ক্ষেত্রেও মঙ্গলাচরণের মতোই তিনিও বিষয়োচিত ভাবমাধুর্যের পরিবেশনে সমান পারদর্শী। বাংলাদেশে বামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গিপ্রসূত কাব্যধারা এক সময়ে চল্লিশের শেষাশেষি ব্যাপকতা লাভ করে। সি. ডে. লুই, অডেন এবং স্পেণ্ডর যেমন তিরিশের যুগে তেমনি অনেক শক্তিমান তরুণ কবিও চল্লিশের যুগে বাংলা কবিতায় পরিচ্ছন্ন, সমাজসচেতন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিতে থাকেন। এই ধরণের কবিতা, প্রধানত বাইরের ঘটনাবলীর আলোড়নে, সর্বদা ভারসাম্য রক্ষা করতে পারেনি এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে আঙ্গিকে ও বক্তব্যে অপরিণত হওয়ার ফলে কাব্যপাঠকের হৃদয়েও দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করাও সম্ভব হয়নি। কিন্তু এই সময়ের যে ক'জন বাঙালী কবি এই ধরণের কবিতার সুদৃঢ় শিল্পপ্রত্যয়ের সঙ্গে প্রগতিশীল দৃষ্টি-ভঙ্গির সার্থক সমন্বয় ঘটিয়ে বাংলা কবিতায় একটি স্বতন্ত্র, দীর্ঘস্থায়ী সুর ও আবেগ সঞ্চার করেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় এবং বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নিঃসন্দেহেই তাঁদের মধ্যে অগ্রণী। কিন্তু বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিশেষত্ব এইখানে যে তিনি বিভিন্নমুখী বিষয়-বস্তুকে অবলম্বন ক'রে

প্রায় একই সময়ে বিভিন্ন মেজাজের কবিতা রচনার পক্ষপাতী এবং ক্ষোভের কবিতার পাশাপাশি প্রেমের এবং প্রেমের কবিতার পাশাপাশি তীব্র ব্যঙ্গের কিংবা যন্ত্রণার সমাবেশ ঘটিয়ে কবিতাকে প্রায় সর্বত্রগামী করবার কৃতিত্ব তাঁর প্রাপ্য। নীচের স্তবকগুলো দ্রষ্টব্য :

থাক, চক্ষু চুড়া,
অবাক করার মত তেমন বদন আজ পৃথিবীতে নেই।
যাকে নিয়ে মন হ'তো সোনা
সে হৃদয় এ জন্মে পাবে না।

সময় নিষ্ঠুর চ'লে যায়……
রাঙো যদি, রাঙবে লজ্জায়।
('থাক, চক্ষুচুড়া')

আমাদের হৃদয়ের একটু সময়
সোনা হোক্। তারপর তুমি চলে গেলে
আমরা পুড়বো লাল সন্ধ্যার আগুনে
হয়তো : নিঃশব্দ রাত্রি দেবে মুছে ফেলে
আমাদের চিতা, স্মৃতি, শেষচিহ্নটুকু ..
('রাণুর জন্যে')

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অস্থিরস্বভাব কবি। কিন্তু এই অস্থিরতা গভীর সংবেদনশীলতা এবং সদাজাগ্রত সদিচ্ছার প্রতীক। বাইরের পৃথিবীর যে-কোনো তাৎপর্যময় ঘটনায় তিনি বিচলিত হন এবং অনেক সময়েই তাঁর কবিতায় সে-সব ঘটনার প্রভাব অনুভব করা যায়। জীবনের ডাকে সাড়া দেয় তাঁর স্বভাব এবং জীবনমুখী শিল্পরীতিতে তিনি অভ্যস্ত।

হোক পোড়া, বাসী ভেজাল মেশানো রুটি
তবু তো জঠরে বহ্নি নেবানো খাঁটি
এ এক মন্ত্র! রুটি দাও, রুটি দাও,।
বদলে বন্ধু, যা-ইচ্ছে নিয়ে যাও।—
সময়ধন্ব, বা বোধারা তুচ্ছ কথা
হেসে দিতে পারি স্বদেশের স্বাধীনতা।

শুধু দুইবেলা দু'টুকরো পোড়া রুটি
পাই যদি তবে সূর্যেরো আগে উঠি ;—
কবো সাগরের লুটি ধ'রে দিই নাড়া,
উপড়িয়ে আনি কারাকোরামের চূড়া।
হৃদয় বিষাদ, চেতনা তুচ্ছ গনি
রুটি পেলে দিই প্রিয়ার চোখের মণি।
('রুটি দাও')

মানুষের ক্ষুধার এই রকম নির্মম রূপ যে-কবি দিতে পারেন তাঁর শক্তি নিঃসন্দেহই অভিনন্দনযোগ্য। 'মাইকেলের সমাধি' 'বিদ্যাসাগর' 'অবনীন্দ্রনাথের জন্য' ইত্যাদি কবিতায় এই কবি যেমন পূর্বসূরীদের প্রবহমান চৈতন্যের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করেন 'শ্বেতকায়দের জন্য' প্রভৃতি কবিতায় তেমনি তাঁর নির্ভুল আন্তর্জাতিক দৃষ্টিকোণ স্বচ্ছ সূর্যরশ্মির মতোই উদ্ভাসিত।

মনে রেখো তোমার পথ আমার পথ হ'তো,
যে-হীরা তুমি জানোনা তাকে বুকের মধ্যে পেতে
তোমার দু'টি বাহু যদি অধীর হ'তো, যদি
আরেক রণক্ষেত্রে মানবতার জন্য ক'রতে হৃদয়ের
লক্ষ্যভেদ-ক্রীড়ার অন্বেষণ।
('শ্বেতকায়দের জন্য')

এবং চতুর্থ পংক্তির ছন্দোবিন্যাস যদিও পীড়াদায়ক তবু ভাবমাধুর্যে ও সাজুয্যবোধে শেষ পর্যন্ত এই কবিতার আবেদন সুগভীর। দীর্ঘ ও ছোট কবিতায় বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সমান ক্ষমতার পরিচয় দিতে পেরেছেন। তাঁর কয়েকটি দীর্ঘ কবিতা ('ক্লান্তি, ক্লান্তি' 'মুখোস' 'দই নভেম্বর' 'নতুন চীন : আধুনিক রূপকথা') স্বচ্ছন্দ কবিশক্তির সাক্ষ্য। অন্যদিকে

তেমনি ছোট, স্বল্প পরিসরের কবিতারও তাঁর স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয়।

কালো মেঘের কিটন চড়ে
কালিঘাটের বস্তিটাতেও আষাঢ় এলো।
সেখানে যত ছন্নছাড়া গলিরা ভিড় ক'রে
খিদের জ্বালায় হুগলি-গঙ্গাকেই
রোগা মায়ের শুকনো যতো কাদড়ে ধ'রে
বেহুঁশ প'ড়ে আছে।

আষাঢ় এসে ভীষণ জোরে দুয়ারে দিল নাড়া—
শীর্ণ হাতে শিওরা খোলে খিল।
('বর্ষা')

এবং এই ধরণের কবিতায় কবির অনায়াস সরল কাব্য-পাঠককে মুগ্ধ করে।

ছন্দ ও মিলের ব্যবহারেও বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্বকীয় সিদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর কোনো কোনো কবিতা উল্লেখ্য :

স্মৃতির বালুচরে মুখেরা ভিড় করে
কেন যে ভিড় করে? আমি তো ক্লান্ত।—
এখানে নদীপারে গোধূলি গান করে
আকাশ নীলে নীল; হৃদয় শ্রান্ত,
ঘুমাবো আমি তাই ঘুমপাড়ানী গানে
ভ'রেছে চরাচর মিলেছে প্রাণে প্রাণ
তবুও ভিড় করে, মুখেরা ভিড় করে:
অতীতে এত জ্বালা; কে আগে জানতো!
('প্রভাস')

একী যৌন-জ্বরের জলসায়
তুই তনু দিলি অঞ্জলি
হাসি কান্নার চুনি-পান্নায়
ছুড়ে দিলি ছেঁড়া কমুনী।
('বেহুলা-নাচানো স্বর্গ')

যারা বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিছক সামাজিক বক্তব্যের কঠিন প্রকাশই খোঁজেন তাঁরা শীতলতার সন্ধানও তাঁর অনেক কবিতায় খুঁজে পেতে পারেন।

কি হবে শীতের ফুল দুয়ারে কুড়িয়ে
স্বপ্ন কুড়িয়ে?
কি হবেশীতের ঘুড়ি আকাশে উড়িয়ে
স্বপ্ন উড়িয়ে?
তোমার আমার প্রেম সবি তো গোধূলি
কেন তবে মৃত্যু থেকে তুলি? ('ক্লান্তি, ক্লান্তি')

এবং এই ধরণের কবিতার আবেদনও গভীর এইজন্য যে শীতনির্ভরেয় যারা এই ধরণের বাকসাধুর্যে নিঃসন্দেহই প্রবাহিত।

আলোর মায়া দু'হাতে ছিঁড়ে ফেলে
এখুনি কেন নিবিড় হ'য়ে এলে?
বলো, বলো
শরীরে বুঝি শ্রাবণ এসে প'ড়েছে কেঁপে; ব'লেছে
'দ্বার খোলো।'
('রাত্রিকে')

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

সাকি লো, সাজা ফুলে
নিবিড় এলো চুলে
চুলির পানাধার
দে' লো দে' হাতে তুলে।

— ওমর খৈয়াম

নিবিড় ঘন কালো চুল সবার মন হরণ করে। বহুকাল ধ'রেই কেশচর্চায় অলিভ অয়েলের উপকারিতা স্বীকৃত।
ক্যালকেমিকোর ক্যান্থারলে আছে সেই অলিভ অয়েল।
আজও মেয়েরা তাই কেশপরিচর্য্যায় ক্যান্থারল ব্যবহার করেন।

ক্যান্থারল

সুগন্ধিযুক্ত ক্যান্থারাইডিস কেশ তৈল

দি ক্যালকাটা কেমিকেল কোং লিঃ কলিঃ-২৯

মুখের রং

ছাইয়ের মতো ঝুলঝুলে গায়ের রং। নাকটা থ্যাবড়া। চোখ দুটো ছোট ছোট ভুষণ পোদ্দারের। মাথার চুল অর্ধেকের বেশি সাদা হয়ে গেছে। কিন্তু হাঁ, লোকটা বাবু বটে। যেন এবাড়ি আসার সময় একটু বেশি সাজগোজ করে আসে। এণ্ডির পাঞ্জাবী শান্তিপুরী ধুতি চকচকে পাম্পশু দু হাতের আঙুলে চারটে আংটি। তা নিজের সোনার দোকান আছে যখন চারটে কেন এক ডজন আংটি পরতে পোদ্দার মশাইকে বাধা দেবে কে। কিন্তু সুদামের ভীষণ হাসি পায়! কাঁচাপাকা চুল থেকে চমৎকার একটা তেলের গন্ধ ঘরের বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। যেন এখানে আসবার আগে মাথায় একটু বেশি করে তেলটা মেখে ভাল করে চুল পাট করে তবে বাড়ি থেকে বেরোয়। খুব সম্ভব স্নো পাউডারও মাখে। তা না হলে গালদুটো সং-এর মত দেখাবে কেন মুখটা। কে জানে, হয়তো ভুষণ পোদ্দারের ধারণা নিজে সে অত্যন্ত সুপুরুষ বা পঞ্চাশ বছর বয়স হলেও নিজেকে এখনও বাইশ বছরের যুবা ঠাওরায়। সুদাম এটা লক্ষ্য করেছে, অনেক বুড়ো মানুষ আজকাল আর নিজেকে বুড়ো বলে মনে করে না। তারা এখনও কুড়ি বছরের কোঠায় আছে ধরে নিয়ে যেভাবে হাসতে হাঁটতে কথা বলতে খেতে চেষ্টা করে, তেমনভাবে সেজেগুজে থাকতে ভালবাসে। শুধু তাই নয়, নিজের বয়সের আর দুটো বুড়োকে দেখলে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে কেটে পড়ে—বরং যেখানে ছেলে ছোকরারা আছে সেখানে ভিড়ে যেতে চেষ্টা করে। ছেলে ছোকরারা এধরণের বুড়ো-ছেলেদের দেখে কী মনে করে তারা কিন্তু তা একবারও ভাবে না। ভাববার কথাও নয়। বুড়ো হয়েছে কথাটা তাদের মাথায় একবারও আসে না। তা না হলে, সুদাম কতদিনই দেখেছে, মেয়েরা যখন বই বগলে করে স্কুলে যায় তখন কোন কোন বুড়ো ভীষণভাবে তাদের দিকে তাকায়, কেবল তাকানো নয়, সুবিধ পেলে মেয়েদের পিছে পিছে হাঁটতে আরম্ভ করে দেয় বা ট্রামে বাসে কোন মেয়ের দেখা পেলে তার সীটের ধার ঘেঁসে বসে যেতে বা দাঁড়িয়ে থাকতে চেষ্টা করে। বুড়োর কাণ্ড দেখে কোন কোন মেয়ে হয়তো মুখ ঘুরিয়ে হাসে—কোন যুবককে দেখে একটি মেয়ে যদি এ ভাবে হাসতো তো যুবকের কান লাল হয়ে যেত, কিন্তু বুড়োরা সেই হাসি দেখতেই পায় না। কেন না মেয়ের মাথার বেণী তার শাড়ি ব্লাউজের রং তার গায়ের কচি কোমল চামড়া তাদের দৃষ্টিকে এমন আচ্ছন্ন করে রাখে যে ওর মুখের অবজ্ঞার হাসি ঘৃণার হাসি বিদ্রূপের হাসি কিছুই তাদের নজরে পড়ে না। বরং তারা তখন ভাবে, মেয়েটি না আমি যখন টুক করে তাদের একজনের প্রেমে পড়ে যাবে। বুড়ো বয়সে এক একটা মানুষ অদ্ভুত জীবে পরিণত হয়। তপাদের সঙ্গে এই নিয়ে সুদাম অনেকদিন আলোচনা করেছে হাসাহাসি করেছে। তপা ভট্টরাও স্বীকার করেছে, এরকম একটি দুটি বুড়ো-ছেলে পথে ঘাটে রোজই তাদের চোখে পড়ে।

••• জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ••• ধারাবাহিক উপন্যাস ••

এমন একটি যুবতী এই দুর্যোগ পোহায়।

মানুষটা যখন আগে বাড়িতে ঢুকত সুদাম ভীষণ রাগারাগি করত ঠাকুমার সঙ্গে। ঠাকুমার বাপের দেশের মানুষ। কালীঘাটে একদিন হঠাৎ আলাপ পরিচয় হয়েছিল। সুদাম ও সেদিন সঙ্গে ছিল। বছর দুই আগে, কি যেন একটা তিথিতে কালীঘাটে পুজো দেবে বলে ঠাকুমাকে কালীঘাট নিয়ে যেতে হয়েছিল সুদামের। টগরও গিয়েছিল। অসম্ভব ভিড় ছিল মন্দিরে। দু দুটো মেয়েছেলেকে সামাল দিতে সুদামের প্রাণ বেরিয়ে গিয়েছিল সেদিন। যা হোক কায় ভোগটা দিয়ে তারা যখন মন্দির থেকে বেরিয়ে এল তখন জোরে বৃষ্টি পড়ছিল। একটা দোকানের খাপড়ার নিচে টগর ও বুড়িকে নিয়ে সুদামকে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল। তখন দুর্যোগের সঙ্গে তাদের প্রথম দেখা। বুড়ি ঠাকুমা ভীষণ বকবক করছিল : সুদাম কেন ছাতাটা সঙ্গে আনল না। সকাল থেকেই তো আকাশে মেঘ করে ছিল। এখন জলের মধ্যে টগরকে নিয়ে কেমন করে বুড়ি 'টেরামে' উঠবে। জল কখন ধরবে তার ঠিক কি। এদিকে টগরের শরীরও বেশি ভাল না। টনসিলের দোষ আছে—ঠাণ্ডা লেগে না আবার বড়রকমের একটা অসুখ বিসুখ হয়। এই তো সেদিন 'ইনফ্লুয়েঞ্জা' থেকে উঠেছে। অর্থাৎ হঠাৎ জল আরম্ভ হওয়াতে অসুবিধায় পড়ে গিয়ে বুড়ি মাঝখানে টগরকে দাঁড় করিয়ে তার অসুখ বিসুখের কথা ভুলে সবটা দোষ সুদামের ঘাড়ে চাপাতে আরম্ভ করেছিল। যেন ছাতাটা সঙ্গে নিয়ে এলে সব মুস্কিলের অবসান হত। অথচ একটা ছাতার নিচে তিনজন ধরত না। তার মানে সুদামকে জলে ভিজে ট্রাম স্টপের দিকে এগোতে হত। না হয় সে ভিজত। কিন্তু এমন জোরে বৃষ্টি হচ্ছিল—মাথার ওপর ছাতা থাকা সত্ত্বেও ওরা দুজন ভিজে যেত। বুড়ি কি তা দেখছিল না। হয়তো দেখছিল না। কেন না বুড়ির চোখে ঘুম, নয়নতারার চোখে ছানি পড়তে আরম্ভ করেছিল। নামটা নাকি দাদুর দেওয়া। আদর করে বুড়িকে নয়নতারা ডাকত। আজ বুড়ো বেঁচে থাকলে নয়নতারার দু চোখের পুরু পর্দা ও চোখের কোণার গাদা গাদা পিঁচুটে দেখে নিশ্চয় আদরের নামটা পাল্টে দিত। যাক্ গে—সেদিন কালিঘাটের চুড়ি শাখার দোকানের খাপড়ার নিচে দাঁড়িয়ে বুড়ির বকুনি শুনে শুনে সুদাম রাগে ফেটে পড়ছিল, অথচ মুখে কিছু বলতে পারছিল না। আরো পাঁচটা লোক সেখানে দাঁড়িয়ে। কিন্তু সুদামের ইচ্ছা হচ্ছিল বুড়িকে আচ্ছা করে ক ঘা বসিয়ে দেয়। কী দরকার ছিল এমন দিনে কালীঘাটে আসার। বৃষ্টি হবে, সকালেই যখন বোঝা গেছে তখন তো বাড়ি থেকে না বেরোনোই উচিত ছিল। সুদাম কেন ছাতাটা নিয়ে এল না, এখন সেটাই একটা সাংঘাতিক দোষের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। ইচ্ছা করে সুদাম ছাতা ফেলে এসেছে। ট্রামে বাসে এখন ভিড়। সঙ্গে দু দুটো মেয়েছেলে নিয়ে চলা। তার উপর একটা ছাতা বয়ে বেড়ানোর ঝক্কি কত। 'তুমি চুপ কর চুপ কর।' আর চুপ থাকতে না পেরে সুদাম গর্জন করে

উঠেছিল। আর যায় কোথা। বুড়ি হাউ মাউ করে উঠল : 'কেনরে মুখপোড়া, আমি কি তোরটা খাই না তোরটা পরি, বড়বৌ তুই মেলাক দেখাচ্ছিস, গলা বড় করছিস,—ও টগর, মুখপোড়া বাঁদরটা আমায় কী বলছে শুনছিস—'

টগর ভয় পেল। বাড়িতে যেমন তেমন, রাস্তায় ঘাটে চেঁচামেচি আরম্ভ করে দেবে বুড়ি, একবার রেগে গেলে বুড়িকে থামানো মুস্কিল হবে। 'ছি ছি, কী লজ্জার কথা, তুমি, চুপ কর ঠাকুমা—কত লোক এখানে দাঁড়িয়ে আছে। তারা কী বলবে—ফিসফিসে গলায় টগর বুড়িকে সান্ত্বনা দিতে আরম্ভ করল : 'বাড়ি গিয়ে যা বলার বলবে—আমিও গদাকে যা খুসি বলব—এখন না এখানে না। ছি।'

ফলটা কিন্তু অন্যরকম দাঁড়াল। বুড়ি কাঁদতে আরম্ভ করল। বৃষ্টি যেন তখন আরও জোরে চেপে এল। আসলে কি আর টগরের জন্য দুশ্চিন্তা। নিজের জন্যই বুড়ি ভেবে সারা হচ্ছিল। হাঁপানি আছে। এই বয়সে গায়ে লাগিয়ে বুড়ির টান বেড়ে যাবে। কাঁদতে কাঁদতে তাই বলছিল। শুনে সুদামের তখন খুব হাসি আসছিল! বুড়িকে কাঁদতে দেখে মানুষটি এগিয়ে এল। ছাইয়ের মতো ধুলধুলে রং। ঝলঝলে দেহ। না, সেদিন ভূষণ পোদ্দারের সাজ পোষাকেরা যেমন জেল্লা ছিল না। আদময়লা একখানা ধুতি মোটা লংক্লথের জামা-হাফসার্ট, পায়ে ছিল টায়ারের চপ্পল। মাথাটা ছিল উস্কো খুস্কো। যেন সেদিনও ভূষণ চুলে এমন চমৎকার গন্ধ তেলটা মাখতে আরম্ভ করেনি। আঙুলে একটা মোটে সোনার আংটি ছিল। আর ছিল একটা রূপোর আংটি। পলা বসানো। আজ আর সেই পলা বসানো রূপোর আংটিটা চোখে পড়ে না। রূপোর আংটি পরলে মানুষকে সেকেলে দেখায় বুড়ো বুড়ো দেখায়। হয়তো এই কারণে ভূষণ সেটা খুলে রেখেছে। দুহাতের আঙুলে এখন তিন চারটে সোনার আংটি। সেদিন কালীঘাটে দেখা ভূষণ পোদ্দারের সঙ্গে আজ সেজেগুজে ঘুরঘুটি হয়ে হাসেনা যে এবাড়ি যাতায়াত করছে তার এতটুকু দিন নাই। কেবল যা গায়ের রংটা আর গায়ের অঢেল মাংস। একই রকম আছে। কে জানে, ছেলেছোকরাদের মতো বাড়তি মাংস কমিয়ে ফেলে শরীরটাকে মজবুত করতে হালকা করে তুলতে ভূষণ লুকিয়ে লুকিয়ে ডনবৈঠক করছে কিনা। হুঁ, সেদিন ভূষণ জলে ভিজে একটা রিক্সা ডেকে নিয়ে এসেছিল। আর কথায় কথায় বেরিয়ে পড়ল ঠাকুমার বাপের দেশের মানুষ ভূষণ। কেবল তাই নয়, ঠাকুমার বাবার কি রকম যেন ভাই হয় ভূষণের বাবা। কাজেই ভূষণ হয়ে গেল ঠাকুমার জ্যাঠতুতো ভাই। কেননা ভূষণের বাবা ঠাকুমার বাবার চেয়ে বয়সে বড় ছিল। বাস-এ বসে বসে এসব আলাপ। তারা পদ্মপুকুর নেমে পড়ল আর ভূষণ চলে গেল শ্যামবাজার। শ্যামবাজার হারুঠাকুর লেনে তার সোনার দোকান এবং বাসা।

হারুঠাকুর লেনে ভূষণ পোদ্দারের বাসায় সুদামকে পরদিনই যেতে হয়েছিল ঠাকুমাকে নিয়ে। অর্থাৎ আত্মীয়তার রসটাকে আর একটু গাঢ় করে পাক দিয়ে এল বুড়ি। ভূষণের বৌ নেই। টি বি হয়ে মারা গেছে চার বছর আগে। ঘরে টগরের বয়সের একটি মেয়ে শুধু। আর ছেলেপুলে হয়নি ভূষণের। তার দুদিন পর সুদামকে আবার যেতে হয়েছিল ভূষণের বাসায় শোভাকে আনতে। বুড়ি বায়না ধরেছিল ভূষণের মেয়েকে দিন দুই এবাড়ি এনে রাখতে। আহা, মা মরা মেয়ে—একলা একলা থাকে। যদি আর একটা ভাই কি বোনও থাকত। প্রথমবার এসে শোভা দুদিনের জায়গায় তিন দিন এবাড়ি ছিল। তারপরেও অবশ্য আরো অনেকবার এসেছে। এবেলা থেকে ওবেলা চলে গেছে। কি এসে ঠাকুমার সঙ্গে টগরের সঙ্গে কথা বলে চা খেয়ে ঘণ্টা দুই পরে শ্যামবাজার ফিরে গেছে। আগে আগে সুদামকে যেতে হত ওকে হারুঠাকুর লেনে পৌঁছে দিতে। এখনও মাঝে মাঝে শোভা আসে। আগের মতো ঘনঘন আসে না। এখন অবশ্য একলাই ও বাসায় ফিরে যায়। ইচ্ছা করে সুদাম

সঙ্গে যায় না এবং শোভাও বলে না। ঠাকুমা অবশ্য প্যান-প্যান করে। কিন্তু শোভা বা সুহাস ঠাকুমার প্যানপ্যানানি গায়ে মাখে না।

সঙ্গে যায় না—কারণ সঙ্গে যাবার আর দরকার পড়ে না। মনের দিক থেকে তারা দুজন এত বেশি একজন আর এক-জনের কাছে এসে গেছে যে শ্যামবাজার থেকে ওকে নিয়ে আসতে বা শ্যামবাজার পৌঁছে দেবার অছিলায় সুহাসের ছুটোছুটি করার পালা এক বছর আগে শেষ হয়ে গেছে। টগর ব্যাপারটা বুঝে গেছে। তাই ঠাকুমা যখন শোভাকে আনতে কি বাসায় পৌঁছে দিতে সুহাসকে ডাকে সুহাস নানা-রকম ওজর আপত্তি তোলে। শরীর ভাল না, চাঁদা তুলতে বেরোতে হবে এধরণের আর একটি কাজের কথা বলে সরে থাকতে চেষ্টা করে। সুহাসের হাবভাব দেখে এবং যদি শোভা উপস্থিত থাকে তো ওর মুখের দিকে তাকিয়ে টগর ঠোঁট টিপে কেবল হাসে, কথা বলে না।

তা হলেও, বলতে কি, শোভা যত চালাকচতুর মাথায় যত বুদ্ধি রাখে টগর সেই তুলনায় কিছু না। একটু না-বোঝা সরল মেয়েটা। এই জন্যই টগরের জন্য সুহাসের মাঝে মাঝে ভয়ানক দুশ্চিন্তা হয়। সাদা মন সরল বুদ্ধি নিয়ে মেয়েরা যত সহজে ফাঁদে পা দেয় বিপদে পড়ে চালাকচতুর মেয়েদের নিয়ে সেরকম আশঙ্কা কম। তা না হলে টগরের মুখখানা শোভার মুখের চেয়ে সুন্দর। লম্বা ছাঁদের শরীর। শোভা বেটে, তবে রংটা খুব কমলা। যেন কমলা রঙের জন্য মনে হয় ওর শরীরটাও নরম তুলতুলে। লম্বা গড়ন এবং শ্যামলা রং বলে টগরকে দেখলে মনে হয় ওর শরীরটা বুঝি শক্ত কাঠকাঠ। আসলে অবশ্য তা না। টগরের হাত পা আঙুলও বেশ নরম। এখন অবশ্য সুহাস ও টগরের মধ্যে তেমন ঝগড়াঝাটি হয় না। বছর দুই আগেও দুই ভাই বোনে মারামারি ধস্তাধস্তি কম করেনি। আর মারতে গিয়ে সুহাস দেখত টগরের হাড় পলা পিঠ কোথায় কত নরম মাটি।

হ্যাঁ, ভুবন পোদ্দারের মেয়ে শোভা মাঝে মাঝে এবাড়ি আসে। আর ভুবন আসে রোজ। মেঝে পাইচারি দেখে এণ্ডির পাঞ্জাবী পরিহিত দু হাতের আঙুলে চারটে আংটি আর জামাইবাবুটি সেজে ভুবন রোজ রাত নটার পর একবার এসে উঁকি মেরেই।

'দিদি কেমন আছেন?' ভুবন প্রথম বুড়ির ঘরের দরজায় দাঁড়ায়। বুড়ি তখনও শুয়ে পড়েছে। কিন্তু চোখে ঘুম নেই। বুড়ো হলে মানুষের ঘুম কত কমে যায় ঠাকুমাকে দিয়ে সুহাস বেশ টের পাচ্ছে।

কিন্তু শুধে পড়লে হবে কি। কেবল এপাশ আর ওপাশ। আর থেকে থেকে সেই সন্ধ্যা থেকে এক রব। ভুবন কেন এল না আজ এখনো—ভুবন আজ অত রাত করছে কেন।

ঘরের মেঝের হ্যারিকেন জেলে টগর কাগজের ফুল তৈরী করে। বুড়ির কথা টগরের কানে যায়। কিন্তু কথা বলে না ও, নিজের মনে কাঁচি কাগজ আঠা সুতো নিয়ে কাজ করে। কেন না একবার যদি টগর মুখ খোলে তো বুড়ি—'ভুবন আজ এখনো এল না' থেকে আরম্ভ করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে হেন কথা নেই যে নতুন করে আরম্ভ করবে না। রোজই কথাগুলি বলছে ঘুরে, কিন্তু সন্ধ্যাবেলা বিছানায় শুয়ে পড়লে আবার সব কটী কথা নতুন হয়ে অভিনব হয়ে বুড়ির মগজে এসে ভিড় করে আর একটু ছিদ্র পেলে ফুরং করে সেগুলি বেরোতে আরম্ভ করে। 'বাড়িওলা ভাড়া বাড়াতে চাইছে—দিনকের আক্কেল আছে। বারো বছর ভাড়া গুণে আসছি—আর তুই নতুন করে আজ একটা বছর ধরে ভাড়া বাড়াও গীত গাইতে সুরু করেছিস—ছাদ দিয়ে জল পড়ে—দু দুটো ঘরের মেঝের সিমেন্ট ফেটেফুটে হাজারটা সাপের গর্ত ব্যাঙের গর্ত তৈরী হয়েছে। হাঁটা যায় না, বসা যায় না, খোয়ার ঘষায় পায়ের চামড়া পাল্লার চামড়া ছড়ে গিয়ে যা হবার অবস্থা আর দুই কি না—হু গায়ের গয়না,

(শেষাংশ ৮২৭ পৃষ্ঠায়)

নতুন কেনা গাড়ীটার ঝকঝকে বনেটটার ওপর হাত, খুসিতে একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেললো সুবিমল। যাক, অনেক দিনের একটা সাধ সফল হোলো। শুধু কী সাধ? এক লহমায় যেন পিছনে ফেলে আসা জীবনটা দেখতে পায় ও। সেই রাঙা খুড়ীদের বাড়ীর সিঁড়ির নীচের ঘরটা—যেখানে ঘরে দেওয়া আর ফাইফরমাশ খাটার ফাঁকে ফাঁকে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা। সেই বাবুড়-বাগানের মেসের স্যাঁতসেঁতে ঘর—আর সকাল বিকেল ডেল মুড়ি চিবোনো। সেদিনকার সুবিমল অনেক পথ ঘুরে আজকের "সুবিমল রে, এক্কোয়ারে" এসে পৌঁছেছে। এই নতুন ঝকঝকে গাড়ীটা যেন তারই সাক্ষী।

কিন্তু তৃপ্তির সঙ্গে কোথায় যেন একটু অতৃপ্তির খোঁচাও মনে লাগে। কারণটা অবশ্য এই যে কালই ওর বন্ধে বদলী হবার হুকুম এসেছে। অবশ্য এটা শুধু বদলী নয়—কিছুটা পদোন্নতিও বটে। অথচ মাস কয়েক আগে যখন গাড়ীটার অর্ডার দেয় তখন মনে মনে কত আকাশ কুসুমই না রচনা করেছিল সুবিমল। এই কোলকাতার পথে ঘাটে নতুন গাড়ী হাঁকিয়ে যাবে ও—পাশে থাকবে হয়তো বিনি—নয়তো প্রমীলা, আত্মীয় স্বজনেরা দেখে হিংসেয় জ্বলে উঠবে—সহ কর্মীরা নিশ্বাস ফেলে বলবে—"আহা বেশ আছেন ভদ্র-লোক—"। কিন্তু তার আর সুযোগ হোল কই? আর দিন চারেকের মধ্যেই এখানকার পাট গুটিয়ে ওকে চলে যেতে হবে। আর বম্বের হাজার হাজার গাড়ীর ভীড়ে কোথায় হারিয়ে যাবে সুবিমলের নতুন অ্যাম্বাসাডর; পথেঘাটে একটিও চেনামুখে ঈর্ষার ছায়া ঘনিয়ে আসবে না।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আরো কতক্ষণ ভাবতো সুবিমল কে জানে। হঠাৎ চোখে পড়লো ওর বাড়ীওয়ালা হরেনবাবু এদিকেই এগিয়ে আসছেন। ওকে দেখেই একগাল হেসে বলেন—"এই যে মিঃ বসু, শুনলাম আপনি করেকদিনের মধ্যেই বম্বে চলে যাচ্ছেন?"

'হ্যাঁ যাচ্ছি—" সংক্ষিপ্ত জবাব দিল সুবিমল। হরেন-বাবুর উল্লাসের কারণ অবশ্য আন্দাজ করতে পারছিল ও। সুবিমল চলে যাচ্ছে—ফ্ল্যাটটা খালি হবে এবার। ফ্রেটম্যানে বিজ্ঞাপন পড়বে—সুরু হবে দালালদের আসা যাওয়া। আর সপ্তাহ ঘুরতে না ঘুরতে নতুন ভাড়াটে পেয়ে যাবেন ভদ্রলোক ভাড়ার অংকটা ইতিমধ্যে আরো কয়েকগাপ বাড়িয়ে উঠবে।

এগিয়ে এসে গাড়ীটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন হরেন-বাবু। কোন বছরের মডেল, বসবার সীটগুলো বেশ আরাম দায়ক কিনা ইত্যাদি। ওর প্রশ্নের যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত জবাব দিচ্ছিল সুবিমল। ফ্ল্যাটটা খালি হওয়ার আশায় এতখানি উল্লসিত হয়ে ওঠাটা কেমন যেন অশোভন ঠেকছিল ওর কাছে।

খানিক বকর বকর করে হরেনবাবু বল্লেন—'আচ্ছা

এবার চলি তাহলে। অফিসের বেলা হয়ে গেল। আপনার চান খাওয়া হয়ে গেছে বুঝি ?"

"না, হয়নি। কিন্তু আজ আর অফিস যাবোনা, ছুটি নিয়েছি—"

"ও তাই নাকি," বলে হরেন-বাবু চলে গেলেন।

আসলে সুবিমল ছুটি নেয় নি। কথা সেরে ফেলার জন্যেই বলেছিল ওটুকু। নইলে, কে জানে হরেনবাবু হয়তো অফিস যাবার সময়ে লিফট্ চেয়ে বসবেন। আর সারাটা পথ ওর বক্‌বকানি শুনতে শুনতে মাথা ধরে যাবে সুবিমলের। কিন্তু এখন ওর মনে হোল ছুটি নিলেও বলা হয় না। অফিসে না গিয়ে বরং নতুন গাড়ীখানা নিয়ে বেড়িয়ে পড়ুক ও—এলো পাথাড়ি ঘুরে বেড়াক খানিকটা। কিন্তু এলোপাথাড়িই বা ঘুরবে কেন? এর চেয়ে দেখে আসুক ও রাঙাখুড়ী, মালিনীদি এদের। শুধু দেখে আসা নয়—দেখিয়ে আসুক নতুন কেনা গাড়ীটা। ঈর্ষায় কালো হয়ে উঠুক রাঙাখুড়ী মালিনীদি-দের মুখ।

আইডিয়াটা মাথায় আসতে খুব উৎসাহিত হয়ে উঠলো সুবিমল. একটু দূরে যে পেট্রোল পাম্পটা আছে সেখান থেকেই অফিসে টেলিফোন করে দিল। তারপর বাড়ী ফিরে এলো ও -তাড়াতাড়ি স্নান খাওয়া সেরে করতে হবে।

সব কিছু সেরে, ভৃত্য রামশরনকে বিদায় দিয়ে এবং ফ্ল্যাটে গভরেমেন্ট 'মভতাল' এঁটে যখন সুবিমল গাড়ীর কাছে এসে দাঁড়ালো তখন দশটা বেজে গেছে। মনটা ভারী হালকা লাগছিল ওর। এই গাড়ীটা যেন পক্ষীরাজ ঘোড়া—এর পিঠে চড়ে এক লহমায় যেন সুবিমল দেখে আসতে পারে ওর গত জীবনটা। শুধু দেখে আসতে পারা নয়—জেনে আসতে পারে গত জীবনের দীনতা ও তুচ্ছতা ছাড়িয়ে কতখানি ওপারে উঠেছে ও। জানিয়েও আসতে পারে সবাইকে।

গাড়ীটা ষ্টার্ট দিয়ে দু'একবার দ্বিধা করলো সুবিমল। কোথায় যাবে প্রথমে? মালিনীদি না রাঙাখুড়ীর ওখানে? না, রাঙাখুড়ীর ওখানেই যাওয়া যাক্। সেই ভেতলা বাড়ীটায় জমজমাট সংসার রাঙাখুড়ীর। তারই মাঝে সকলের অবহেলা গঞ্জনা সুড়িয়ে কোনক্রমে টিঁকেছিল সুবিমল। আজ ভাবতে অবাক লাগে। ওদের অতো সম্পদের এক কণাও সুবিমলের জন্য খরচ হচ্ছে একথা ভাবতেই বোধহয় বুকটা ফেটে যেত রাঙাখুড়ীর। সবই বুঝতো সুবিমল, কিন্তু উপায় ছিল না। বাজার করে কাইফরমাস খেটে, যতটুকু পারে কল শোধ করার চেষ্টা করতো। কিন্তু তবু শেষরক্ষা হয়নি। ওদের বাড়ী ছাড়ার সময় অনেক কথা শুনতে হয়েছে ওকে। হয়তো রাঙাখুড়ীরা ভেবেছিলেন সুবিমল চিরটা-কালই ও বাড়ীর আধা-চাকরের কাজে বহাল থাকবে। তাই যেদিন ও আই, এ, পাশ করে সামান্য একটা কেরা-নীগিরি নিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইল তখন রাঙাখুড়ীরা ওর ছোট একটু খানি আশাকে স্পর্ধা বলেই ভেবেছিলেন। কলিকাল না হলে মানুষ এমন নেমকহারাম হয়না এমন কথাও বলেছিলেন রাঙাখুড়ী।

তারপর থেকে আর ও সুখো হয়নি সুবিমল। নিজের একটুখানি আশাকে সফল করে তোলবার জন্যে প্রাণপাত করেছে। তারপর কখন নিজের অজান্তে সেই একটুখানি আশা ডালপালা মেলে ওকে এতদূর টেনে এনেছে। রাঙাখুড়ী কী ওর কোন খবর রাখেন! কে জানে! ও কিন্তু রাখেনি।

গাড়ীটা হাজরা রোডের বাড়ীটার সামনে এসে দাঁড়ালো। গাড়ী থেকে নেমে দরজাটা বেশ সন্তর্পণেই বন্ধ করলো ও। নিজের উপস্থিতিটা যেন সসম্ভ্রমে ঘোষণা করতে চায়। বারান্দায় খেলছিল গুটি কয়েক বাচ্চা। সব অচেনা মুখ। ওদের পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল সুবিমল। যা ভেবেছিল তাই। ভেতরটা ঠিক তেমনি রয়েছে। শুধু ওর সিঁড়ির ঘরটা তালাবন্ধ। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো ও। অনেকগুলো মেয়ের জটলা উঠোনে। একটু

উঁকি দিয়ে দেখলো ও। সবই অচেনা মুখ। এরা কারা? রাঙাখুড়ী কী ভাড়াটে বসিয়েছেন?

দোতলায় উঠে কোন ঘরে ঢুকবে ভাবছিল সুবিমল—এমন সময় কোণের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন জয়াবৌদি—রাঙাখুড়ীর বড়ো ছেলের বৌ। সুবিমলকে দেখে খানিক থমকে রইলেন উনি। ক'বছর হয়ে গেল। হয়তো চিনতে পারছেন না। নিজেই এগিয়ে এসে টিপ করে প্রণাম করে বললো ও—"চিনতে পারছেন না বৌদি—আমি সুবিমল—"

"ওমা, তাইতো, মুনু ঠাকুরপোই তো বটে—কী ভাগ্যি, এসো এসো—" অভ্যর্থনায় গদগদ হয়ে উঠলেন জয়া বৌদি! আর সুবিমলের মনে পড়ে গেল অনেকদিনকার আগের কথা। সিঁড়িতে দাঁড়িয়েই বাজারের থলেটা নীচে ছুঁড়ে দিতেন জয়া-বৌদি—"বাজারটা চট করে নেবে এসো তো ঠাকুরপো—"

সেই জয়া বৌদিই ওকে সাদরে ডেকে নিয়ে বসতে দিলেন, নিজের শোবার ঘরে। সুবিমল এতক্ষণে চেয়ে দেখলো জয়া বৌদির কপালে অনেকগুলো রেখা—। সবগুলোই কী বয়েসের? কে জানে!

এতক্ষণে ওর আসার খবর সব ঘরে পৌঁছে গেছে। এলেন রাঙুবৌদি—এলো ছেলেমেয়েরা। এগিয়ে এসে প্রণাম করলো কেউ—কেউ বা দরজা ধরে দাঁড়িয়ে রইল—দেখতে লাগলো আড়চোখে। ভীষণ অস্বস্তি লাগছিল সুবিমলের। এই বাড়ীতে বছরের পর বছর কাটিয়ে গেছে এর আনাচ কানাচ ওর মুখস্থ। কিন্তু ও যে ছিল সেটা কারুরই চোখে পড়েনি তখন। কিংবা পড়লেও চক্ষুশূল বলেই মনে করতো সবাই। আর এই বাড়ীতেই ও অভিথির আসনে বসেছে আজ,—হাতপাখা দিয়ে বাতাস করছিল জয়া বৌদি। এটা কেমন যেন স্বপ্নের মতো মনে হোলো। কিন্তু এই সমাদর কী শুধু অদর্শনের দরুন, নিশ্চয়ই নয়। নিশ্চয়ই ওর উন্নতির খবর এঁরা পেয়েছেন। হয়তো ওর পরনের দামী স্যুটটাই এজন্য দায়ী হয়তো বাইরে দাঁড়ানো গাড়ীটার খবরও পেয়ে গেছেন ওরা। অবশ্য এই তো চেয়েছিল সুবিমল। ওর সম্পর্কে সম্মান করুক রাঙাখুড়ীরা। কিন্তু ওর যেন ও খুশী হতে পারলো না।

খানিক পরে এলেন রাঙাখুড়ী। এক মুহূর্ত চোখাচোখি হোলো ওর সংগে। সুবিমল দেখল রাঙাখুড়ী অনেক রোগা হয়ে গেছেন—পরণের তসরখানা পায়ের দিকে জায়গায় জায়গায় ছেঁড়া। আর এতক্ষণে ওর নজর পড়লো জয়া-বৌদী রাঙুবৌদির হাতে ঝকঝকে সোনার চুড়ির বাহার নেই। রয়েছে খানকয়েক রাঙ্কিক আর কাঁচের চুড়ির পাশে সোনার ছিটে দেওয়া একখানা করে লোহা। ছেলেমেয়েদের জামার তালিগুলিকে এক্সরডারী করে ঢাকার ব্যর্থ চেষ্টা করা হয়েছে।

এতক্ষণে সুবিমল বুঝতে পারলো জীবনের ঝাপে মুনু ও এগিয়ে আসেনি—রাঙাখুড়ীরাও নেমে এসেছেন অনেকটা তাই জয়াবৌদি আর রাঙুবৌদি কোমল মুখে ওর দিকে তাকিয়ে হাসছেন ওদের ভুরুগুলো আর বেঁকে নেই। হয়তো রাঙাখুড়ীও এবার ওদের মতই মিষ্টি করে কথা বলবেন।

কিন্তু সুবিমলের আশা সফল হোলনা। রাঙাখুড়ী অদ্ভুত নিস্পৃহ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন—'তারপর হঠাৎ যে, কী মনে করে?

অস্বস্তি বোধ করলো সুবিমল, সত্যি কথাটা ওদের বলা যাবে না। তাই এক মুহূর্ত দ্বিধা করে বললো—"ঘুরে চলে যাচ্ছি বদলী হয়ে তাই ভাবলাম যাবার আগে দেখে যাই আপনাদের—"

রাঙাখুড়ীর মুখ দেখেই বোঝা গেল বিশ্বাস করেন নি উনি কথাটা। তবে শান্তভাবে জিজ্ঞেস করলেন "বেশ করেছো—তা কেমন চলছে এখন?"

সুবিমল আশ্চর্য হোলো। তবে ভালো আছে এটা রাঙুবৌদি জয়াবৌদি মুহূর্তে বুঝে নিয়েছেন আর রাঙাখুড়ী বুঝতে পারছেন না! না কি বুঝতে চাইছেন না? শুকনো

গলায় ও জবাব দিল "তা আপনাদের আশীর্বাদে চলছে ভালোই—"

রাঙাবৌদি হঠাৎ ক্ষণ কণ্ঠে বলে উঠলেন—"আপনি বুঝি জানেন না যা? সুনু ঠাকুরপো এখন খুব বড় চাকরী করে। সেই যে মালুদির শ্বশুর বলছিলেন সেদিন?"

রাঙাখুড়ী অপ্রসন্ন মুখে বৌয়ের দিকে তাকালেন একবার। তারপর সুবিমলের দিকে ফিরে বল্লেন—"ভালো থাকলেই ভালো। তা মালুদের ওখানে যাওটাও নাকি আজকাল?"

মালুদি, অর্থাৎ মালিনীদি, এদেরই দূর সম্পর্কের কীরকম আত্মীয়। সেই সূত্রেই পরিচয় হয়েছিল, ফাইফরমাশ খাটিয়ে নিতে মালিনী ছিলেন ওস্তাদ। আর সুবিমলও তখন খাটতো মুখ বুজে। কেন জবাব আজ সে দিতে পারবে না। মালিনীদিকে রাঙাখুড়ীরা কেউই ভালো চোখে দেখতেন না। ওঁর স্যাম্পু করা চুল, সুর্মাটানা চোখ আর রাঙানো ঠোঁট সবই অসহ্য মনে হোত ওদের কাছে। জয়া বৌদি রাঙাবৌদির গল্পের থলে মালিনীদির নামা কেচ্ছা আর নিন্দেতে ছিল বোঝাই। তবু যে সুবিমল ওর ফাইফরমাশ খাটতো, (হয়তো এজন্যও ওর ওপর চটে ছিলেন রাঙাখুড়ী) তার কারণ কী শুধু মালিনীদির সুন্দর মুখ? না ওঁর আশে পাশের জগতের একটুকরো?

সুবিমলের চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়ে রাঙাখুড়ী আবার বল্লেন—"দেখা হয় নাকি মালুর সঙ্গে আজকাল?"

"কই না তো—" সুবিমল সত্যি কথাই বললো। "তবে ওঁর শ্বশুর আবার আমার এক কলিগের বাবার বন্ধু কী না—"

ওদের কথাবার্তার ধারখানে কখন উঠে গিয়েছিলেন জয়া বৌদি। ফিরে এলেন একটা প্লেটে দুখানা নিমকী আর একটা রসগোল্লা নিয়ে। সুবিমলের সামনে দিয়ে বল্লেন—"খাও ঠিকিনি এটুকু—"

সুবিমল বললো—"কেন আবার অবেলায় হাঙ্গামা করতে গেলেন বৌদি এসবের কী দরকার ছিল—"

রাঙাখুড়ী বলে উঠলেন—"হাঙ্গামা কী আর, এ সব তো ঘরেই থাকে সব সময়—"

রাগে সুবিমলের সর্বাংগ জ্বলে উঠলো। রাঙাখুড়ী সত্যিই কী ওকে এতই বোকা ঠাউরেছেন? ভাবছেন সুবিমল বুঝতে পারবে না কিছুই? কয়েকদিন আগেও এ বাড়ীতে অতিথি আপ্যায়নের ব্যবস্থা কেমন ছিল সুবিমল কী তা জানেনা? এই দুখানা নিমকী আর একটা রসগোল্লাই কী জানিয়ে দিচ্ছে না যে রাঙাখুড়ীরা আজ কোথায় নেমে এসেছেন?

কিন্তু ভদ্রতা বজায় রাখতে হবে, কোনক্রমে খাবারগুলি শেষ সে। তারপর বল্লে—"এবার তাহলে আসি কেমন?"

জয়াবৌদি ওকে আরো একটু বসতে অনুরোধ করলেন।

"এতদিন পর এলে, বোসোনা আর একটু। খবর তো শোনাই হোলোনা সব—"

রাঙাখুড়ী বাধা দিয়ে বল্লেন—"আহা ওকে আটকাচ্ছ কেন বৌমা। এই রোদ্দুরে এতটা হেঁটে যাবে। বাস ষ্টপ তো আর এখানে নয়—"

দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা একটি ছেলে হঠাৎ বলে উঠলো —"বাস নয় ঠাকুমা,—কাকা গাড়ীতে এসেছে কী চকচকে, নতুন—"

'থামতো খিকি, কথার মধ্যে কথা বলা—' ধমকে উঠলেন রাঙাখুড়ী। তারপর রাঙাবৌদির দিকে জলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বল্লেন—"ছেলেকে-যে কী শিক্ষা দিচ্ছ বুঝিনে বৌমা। বড়দের কথার মধ্যে কথা বলতে নেই এ বোধটুকুও যদি না থাকে—"

রাঙাবৌদির মুখটা কালো হয়ে গেল। উঠে গিয়ে ছেলেটার গালে দুটো চড় কষিয়ে দিয়ে বল্লেন—"কতদিন না বলেছি হতভাগা—বড়দের কথার মধ্যে আসবিনা। বেরো —এখান থেকে বেরো—"

ক্রন্দনরত ছেলেটার সংগে রাণু বৌদিও উঠে চলে গেলেন ঘর থেকে। সুবিমলও উঠে পড়লো। এ ধরনের গৃহবিবাদে অপরের উপস্থিতিটা বড়ো অস্বস্তিকর। রাঙাখুড়ীর মুখের একটি রেখাও কিন্তু বিচলিত হোলোনা: রাঙাখুড়ীর সেই কঠিন নিস্পৃহ মুখখানার দিকে চেয়ে সুবিমলের মনটা জ্বালা করে উঠলো। একদিন শুধু মাত্র বেঁচে থাকার তাগিদে এই রাঙাখুড়ীর অবহেলা আর অনাদরের কাছে মাথা নীচু করে থাকতে হয়েছে। আর আজ সম্পদের শিখরে উঠেও ওঁর অবহেলার দেয়ালটা পার হওয়া গেল না। কিন্তু সত্যিই কী পার হওয়া গেল না? ভদ্রতার মুখোশটা ছিঁড়ে ফেলে সুবিমল কী এখনই চেঁচিয়ে বলে উঠতে পারে না—আমি জানি তুমি গরীব হয়ে গেছ রাঙাখুড়ী—তুমি বাড়ীতে ভাড়াটে বসিয়েছ—তোমার বৌয়ের গায়ে সোনাদানা নেই—তোমার পরনের কাপড় ছেঁড়া?'

কিন্তু না—বলতে পারলো না ও অসহ্য জ্বালাটাকে নিজের মনেই চেপে রেখে মুখ বুজে নেমে এলো ও। ওর পেছন পেছনই নামলেন রাঙাখুড়ী। ওর ঝকঝকে গাড়ীখানার দিকে তাকিয়েও এতটুকু উচ্চবাচ্য করলেন না।

ময়লা ধুলো গাড়ীতে উঠতে যাবে ও এমন সময় হঠাৎ শোনা গেল,—"আরে সুবিমল না।"

ফিরে চাইল সুবিমল! মনোজদা। রাঙাখুড়ীর বড়ো ছেলে। এই মাত্র কোথাথেকে ফিরলেন। রোদে পোড়া বিষন্ন চেহারা আর ময়লা জামাকাপড়! হাতে একটা বিবর্ণ চটের থলে—।

"কেমন আছেন মনোজদা?" নীচু হয়ে প্রণাম করলো সুবিমল। এক লহমার জন্য চাইলো রাঙাখুড়ীর দিকে। ওঁর মুখে কী একটু অস্বস্তিকর ছায়া দেখা যাচ্ছে?

"কেমন আছি তাতো দেখতেই পাচ্ছিস—" শীর্ণ হাতখানা প্রসারিত করে দেখাতে চাইলেন মনোজদা—এবাড়ীর সবটুকু দারিদ্র্য। "তা হঠাৎ আমাদের মনে পড়লো যে?"

"বম্বে চলে যাচ্ছি কয়েকদিনের মধ্যেই—তাই—"

"চলে যাচ্ছিস? তা যাবার আগে একটু উপকার করে দিয়ে যা না—" প্রার্থীর ভংগীতে গলাটা মোলায়েম করলেন মনোজদা।

(এই সেই মনোজদা, যাঁর জামাকাপড় নিয়ে যেতে হোত লণ্ড্রীতে, ইস্ত্রী ঠিক না হলে সুবিমলের মুখের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বলতেন—"যা, ফের ইস্ত্রী করিয়ে নিয়ে আয়"—)

"কী রে করবি একটা উপকার?" মনোজদা প্রায় ওর হাতটা ধরতে যাচ্ছিলেন—

হঠাৎ রাঙাখুড়ী বলে উঠলেন—"ওকে আটকাচ্ছ কেন মনোজ বেচারা অনেকক্ষণ এসেছে—আবার অফিস যাবে"

"তুমি চুপ করো তো মা—" চেঁচিয়ে উঠলেন মনোজদা। "জানো কতবড় চাকরী করে ও আজকাল? আমার মতো দশটা লোককে চাকরী দিতে পারে কলমের একটা খোঁচায়?" তারপর গলাটা আবার খাদে নামিয়ে সুবিমলের দিকে ফিরে বল্লেন—"যাবার আগে দিয়ে যা না আমার একটা কিছু যোগাড় করে। যে কোন চাকরী। বাড়ীর অবস্থা তো দেখলেই নিজের চোখে। ভাড়াটে বসিয়েও কূল পাচ্ছিনে। আজকালকার বাজারে এতগুলি পুষ্যি—

মনোজদার শেষের কথাগুলি শুনতে পেলোনা সুবিমল। ও চেয়েছিল রাঙাখুড়ীর দিকে। শক্ত হয়ে কপাট ধরে দাঁড়িয়ে আছেন রাঙাখুড়ী। মুখটা মড়ার মতো ফ্যাকাশে—আর সুবিমলের সংগে চোখাচোখী হবার ভয়েই কী চোখ দুটো বুজে ফেলেছেন?

কানুসটা কেটে গেছে। কিন্তু সুবিমল তো খুশী হতে পারছে না। রাঙাখুড়ীর বিবর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে কেন ওর মনে হচ্ছে এভাবে বেঁচে থাকা অর্থহীন, সম্পূর্ণ অর্থহীন!

রাঙাখুড়ী যেন ধুলোর সংগে মিশে গেছেন। কিন্তু সুবিমল

কী ওকে মাড়িয়ে যাবে, না করুণা করে তুলে ধরবে ওকে। নিজের মনটা কতখানি দরাজ তাই প্রমাণ করবে রাঙাদুলীর কাছে।

মনোজদার দিকে ফিরে ও বললো—"কী যে সব গালগল্প শুনেছেন মনোজদা—আমার আবার অতশত ক্ষমতা কোথায়? তবে আমার বন্ধুবান্ধব আছে বৈ কী। তাঁদের বলে যাবো আপনার কথা। সুরাহা একটা হয়েই যাবে—নিশ্চয়ই।"

সূর্যের রং (৮২১ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

আমি বাড়িআলা, যা খুশি করব—কি করবি কর না তুই—একটা নয়া পয়সা ভাড়া বাড়ানো হবে না—তুলে দিবি—দে না তুলে, দেখি তোর কত বড় হিম্মত - আইন আছে না—বারো বছর ভাড়া শুধে আসছি তবে আর রেন্ট কন্ট্রোল অফিস বসিয়েছে কেন গভর্ণমেণ্ট—?

'আহা তুমি কি আরম্ভ করলে ঠাকুমা—!' হয়তো অধৈর্য্য হয়ে উঠে এক সময় টগর কথাটা বলে ফেলে। বাদ্ আর যায় কোথায়। বুড়ি হাপুস নয়নে কাঁদতে শুরু করে দেয়। আর কান্নার সঙ্গে প্রলাপ; 'আজ যদি আমার কার্তিক বেঁচে থাকত তো মুখপোড়া ঝিনসে ছোট লোক গায়েনের বেটা আমায় এমন করে অপমান করে যায়—বাড়ী থেকে তুলে দেব—কার্তিক তোর টুঁটি চেপে ধরত না। মুখ থেকে জিভ খসিয়ে ছাড়ত না।' কথা শেষ করে বুড়ি কার্তিকের জন্ত কাঁদতে আরম্ভ করে। (ক্রমশঃ)

আপনার প্রতিটি প্রচেষ্টা হোক
সুস্থ জগৎ প্রচেষ্টা

আমাদের সঙ্কল্প পুনরায় দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করার এখনই সময়

আক্রমণকারীকে প্রতিরোধ করার সঙ্কল্প পুনরায় দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করার সময় এসেছে। **সদা সতর্ক থাকুন,** প্রতিজ্ঞায় অটল থাকুন—কারণ এটা আপনাদেরই যুদ্ধ। যা করবার এখনই করুন। জাতীয় সেবা প্রতিষ্ঠানগুলিতে কাজ করার জন্য স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসুন ● সমস্ত রকম অপচয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করুন এবং সব রকম অপ্রয়োজনীয় ব্যয় পরিহার করুন ● খাদ্য ও বস্ত্র মূল্যবান জিনিস। এগুলির অপচয় করবেন না ● সময়ও অত্যন্ত মূল্যবান। ঘণ্টা বা দিন হিসেবে সময়ের পরিমাপ করবেন না। আপনি কতটুকু কাজ করলেন সেই অনুযায়ী সময়ের পরিমাপ করুন ● আপনার দায়িত্বগুলি পালন করুন। সব সময়ে সব জিনিস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে করুন।

সদা সতর্ক থাকুন

জাতীয় প্রস্তুতিতে অংশ গ্রহণ করুন।

রবীন্দ্র সঙ্গীতের পাঠক

আনন্দ বাগচী

রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাহিত্যের পাশাপাশি দুটি ধারা চলেছে —একটি চিত্রের, অপরটি সঙ্গীতের। একটি ছবির রাজ্য, অন্যটি গানের।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা ঠিক মাঝখান দিয়ে চলেছে, কখনো চিত্রল কখনো গীতল। তার একদিকে রূপমহল, অন্যদিকে গীত মহল। বাইরের দিক থেকে যখন দেখি, তখন চোখে পড়ে তাঁর চিত্র সম্রাটের মূর্তি, একহাতেই তুলি এবং কলম ধরেছেন গল্প লেখেন ছবি, উপন্যাস লেখেন ছবি, কবিতা কি ছড়ার কথাই নেই। ছবির পরে ছবি, প্রতিচ্ছবি। প্রতি কথায় ছবি, বাক্যের মধ্যে, ছন্দের কারুকার্যে, উপমায় রূপকে উদাহরণে। সৌন্দর্য রবীন্দ্রনাথের কাছে চিত্রাঙ্গিকে ধরা দেয়। শব্দচিত্রে এবং অর্থচিত্রে এবং চিন্তার চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রনাথের কাব্যসংগ্রহ হচ্ছে চিত্রশালা। কখনো রেখায়, কখনো রঙে, কখনো শুধুমাত্র একটা ভঙ্গীতে। তাঁর প্রতিটি রেখাই রূপায়িত, প্রতিটি রূপ, একটি মূর্তির ধ্যানেই ধারিত। এক কথায় রূপসী।

আর সেই রূপ থেকেই তাঁর যাত্রা, অরূপ যাত্রা। রূপের আড়ালেই তাঁর অরূপবীণা বাজার কথা ছিল, বেজেছেও। শুধু কবিতায় কি অন্য সাহিত্যে তিনি আপন মনের অতিচেতন, অবচেতন গহনকে বাঙ্ময় করে প্রকাশ করতে পারেন নি। আত্মিক স্পষ্টতায় বেঁধেছে। তাই নিভৃতে নিজের নিকৃত মনকে প্রকাশ করার জন্য শুধু রঙতুলির কারবারও করতে হয়েছে অনেকদিন ধরে। তাঁর আঁকা ছবির সংখ্যা শুনলে চমকে যাবার লোকের সংখ্যা খুব অল্প নয়। যাই হোক, তাঁর চিত্তস্পর্শী এই চিত্রগুলি আঁধারে মলিন হওয়া খাপখোলা বাঁকা তলোয়ারের মতই ; একে এই অন্ধকার গলা রঙের ধনিক ব্যবহারকে এক অন্ধ, অতিকায় আক্রমণী প্রদর্শন ছাড়া একবাক্যে আর বোঝানো সম্ভব নয়।

এগুলি হচ্ছে ছবির বক্তব্যের, এক রহস্যময় ধনস্তরে আবৃত, প্রকৃতির কঙ্কাল, সমুদ্রের তলদেশে যেমন জলচর প্রাণীবর্গের অস্থিপঞ্জর রয়ে। তেমনি এর এক ঊর্ধ্বালোক আছে, চিত্র যেখানে চিত্রময়তা প্রাপ্ত হয়ে সুরধ্বনি হয়ে উঠেছে। রোমান্টিক কবিসত্তার একপ্রান্তে রিয়ালিজম্ অন্য প্রান্তে মিষ্টিসীজম্, এক প্রান্তে নির্বাণ, অশান্তি অস্থিরতা—সংশয়ের মধ্য দিয়ে ইন্দ্রিয়ের যোগাসনে প্রতিষ্ঠিত ; একপ্রান্তে নির্বাণ, ব্যাকুলতা-বিস্ময়-আনন্দের মধ্য দিয়ে স্বপ্নলোকে প্রস্ফুটিত।

রবীন্দ্রনাথের রচিত সঙ্গীতের সংখ্যা বিস্ময় স্তোতক। প্রায় আড়াই হাজার গান অন্য কোন দেশের কোন কবি, তাঁর পিছনে রেখে গেছেন বলে জানিনা। যাই হোক এতক্ষণের উদ্‌ভ্রান্ত ভাষণে যে ভূমিকা করলাম তার মৌল বক্তব্য হচ্ছে দুটি রচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্র-রচনা বিস্তৃত, স্বচ্ছন্দ, আত্মনিরীক্ষণ। একটি ছবি, অন্যটি গান। প্রথমটি কবিতার ডায়েরীর মত, নিরাবরণ মনের সংলাপ, কখনো বিলাপ। চিত্ররেখাডোরে বাঁধা রবীন্দ্রনাথের অধরুদ্ধ পুরুষ। দ্বিতীয়টি শ্লোকবদ্ধ মন্ত্রের এবং মন্ত্রসংহত শোকের মত, গুপ্তভার শিহরণ। সেখানেও তিনি একক, একাকী, নিঃসঙ্গ।

॥ ২ ॥

নিখুঁত ব্যাকরণ-সম্মত সনেট রবীন্দ্রনাথে নেই বললেই চলে। তাঁর কবিতার চেহারাই ছিলছেলো, রবিবারের মত নেলাজ নিয়ে মন্থর গতিতে গড়িয়ে চলা। কোথায় থামতে হয়, কখন থামতে হয় রবীন্দ্রনাথ জানেন কিন্তু কতক্ষণ পরে থামতে হয় রবীন্দ্রনাথ যেন জানেন না। অতিকথনের মত বিস্তার পেয়েছে তাঁর অনেক কবিতা। কাহিনীর গা ঘেঁষা, চিত্রাকুলতায় উন্মেষ, তাই লক্ষবেধের আগে অনেক আরম্ভ আছে তাঁর কবিতায়। এই বহুলারম্ভ তাঁকে সনেটের প্রৌঢ় কঠিন বন্ধনের মধ্যে দিয়ে যেতে দেয় নি। কিন্তু আমরা আশ্চর্য হয়ে দেখি, প্রকারান্তরে রবীন্দ্রনাথ দুহাজারের বেশি সনেট লিখেছেন। তাঁর গানগুলিই তাঁর সনেট, অনবদ্য অতুলনীয় সার্থক সনেট একথা বললে কি ভুল বলা হয়?

অষ্টক ষট্‌কের বিলম্বিত ছন্দ বৃত্ত সংঘাত, কখখক চতুর্দশ অক্ষর পংক্তির ইত্যাকার কেতাব কঙ্কণের বন্ধনে না দিয়ে অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগীর সুর ভাব শব্দের বাকপাশনে নিটোল, নিবিড় সংহত এই গানগুলি তাঁর মনের যে একবৃন্ত ছন্দর ভাবকে ব্যক্ত করেছে এবং ব্যক্তিত্ব দিয়েছে তা অনিবার্যভাবে সনেটীয়। সনেট হচ্ছে সেই নিভৃত সেতুটুকু যা কবিমনের অন্তরমহলের সঙ্গে পাঠকের যোগাযোগ ঘটিয়ে দেয়। পাঠক এবং কবি, এই দুই এক এবং একার মধ্যে নিবিড় যোগ তখনই ঘটে যখন আমরা নীরব হই। গান যখন নিতান্তই গান, সুরের ছিলায় বসানো ধ্বনি পরম্পরা মাত্র, তখন তা শ্রবণসাধ্য। তখন বা সকলের। কবিতাও যখন আবৃত্তির দ্বারা ঘোষিত, অর্থাৎ উচ্চারিত তখন আমরা তার বাধ্য বাহ্য হয়ে পড়ি।

রবীন্দ্র সঙ্গীতের ব্যাকরণ যাদের নখদর্পণে কিংবা খরদিপি যাদের কণ্ঠে জীবন্ত হয়ে ওঠে সেই সব ভাগ্যবান অর্থাৎ কণ্ঠবানদের কথা আমার আলোচ্য নয়। তাঁরা স্বর্গলোকের চাবি তো পেয়েই গেছেন; আমি তাঁদের কথা বলতে চাই যাঁদের সঙ্গীতচর্চা কলঘরে স্নানদর্শনে সীমাবদ্ধ। নিজেকে গান শোনাবার অবকাশও যাঁরা খুব বেশী পান না, কারণ বর্তমান সমাজে সহরে নির্জনতার বড় অভাব। যাদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ একটি গানে লিখেছেন: ভরঘরখানা ঘুরে ঘরে গ্রামোফনের ভিড়ে, সৌভাগ্যবান সঙ্গীতদের সেই বন্ধু-শ্রেণীর কথাই আমি বলতে চাইছি। এঁরা রবীন্দ্র সঙ্গীতের পাঠক। গায়ক কিংবা শ্রোতা নয়, একেবারে নির্ভেজাল পাঠক। কথাটা শুনতে কিশ্রী লাগছে, কিন্তু অতি সত্যি কথা। আমি পরিসংখ্যানবীশ নই; কিন্তু আমার সামান্য অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, গীতবিতান অর্ধেকের বেশী এঁরাই কিনেছেন আজ পর্যন্ত। এবং রবীন্দ্রসঙ্গীতকে মনেপ্রাণে অনুভব করেছেন এঁরাই বেশী। যে প্রকাশিত হয়েছে অনুভূতির তীব্রতা তার মধ্যে অধিক অবশিষ্ট থাকে না। তাই যে বোবা, তার মধ্যে অনুভূতি অব্যয় এবং গভীর। এই মূকচোরা অর্থাৎ কণ্ঠচোরাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের গান প্রায় মন্ত্রের প্রতিক্রিয়ায় ভাস্বর। এঁরা গান করেন না, গান পড়েন। নিজের জন্য, নিজের নিভৃত আত্মবিনোদনের জন্য পড়েন। গান পড়ার একটা রোমাঞ্চকর উন্মাদনা আছে, যারা গাইতে পারেন তাঁদের বোঝানো আমার পক্ষে শক্ত হবে।

কবিতা পড়া এবং গান পড়ার মধ্যে একটা মৌলিক পার্থক্য আছে। কবিতার নিজস্ব একটা সুর আছে, যাকে তাল বলতে পারি। গানের কথা-শরীরে সে সৌষম্য বা ছন্দ নেই। গানের পাঠক কবিতার মত করে গান পড়েন না। কবিতার মধ্যে একটা চিত্র রূপ আছে, গানেও আছে। দুটি বিষয়েই আমাদের মধ্যে ছবির সংযোগ ঘটে। কিন্তু গান যখন হৃদয়াবেগ তাড়িত হয়ে আমরা পড়ি, তখন শুধু বক্তব্য এবং চিত্রই নয়, একটি অস্ফুট অথচ অনুভূতি প্রায় সবেরই পরিবেশন কথাগুলিকে ঘিরে থাকে। রবীন্দ্রনাথের গান শোনার কিংবা করার কথা ইথর গৌণ হয়ে পড়ে। প্রতিটি

প্রতিটি গীতিবাক্য আমাদের হৃদয়কে বিদ্ধ করে না। ছন্দে মনে পড়তে গিয়ে আমরা সেই শিহরণ বোধ করি। আমার মনের কথা, আমার প্রাণের কথা ছাপা অক্ষরে দেখলে যেমন হয়। রবীন্দ্রনাথ কবিতায় আমাদের সকলের সর্বমুহূর্তের কথা বলতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু গানে প্রতিটি মুহূর্তের ভাবনাকে তিনি চরম অভিব্যক্তি দিয়ে গিয়েছেন। এত সরল, এত সহজ অথচ এমন অব্যর্থ সন্ধান আর কোথাও মেলেনি। প্রায় মন্ত্রের মত মনে হয়েছে। হৃদয় উন্মোচন ও বিকিরণের এর চেয়ে সার্থক চাবি রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিতে আর নেই। ছোট একটি লাইন কি একজোড়া পংক্তি মনে মনে বলে কি শান্তি যে পাওয়া যায় তা সঙ্গীতে যিনি বোঝা কিন্তু চক্ষুষ্মান তিনিই বুঝবেন। নিখুঁত সুর তিনি জানেন না কিন্তু কোন একটিকে হয়তো কোথাও গানটি শুনেছিলেন, সেই অনুরণন অস্পষ্ট থেকে অস্পষ্টতর হতে হতে একটি বিপুল সুরের আকাশ তৈরী করেছে, মনের মধ্যে যার প্রেক্ষাপটে পঠিত সঙ্গীত একটি অতিচেতন সুরে প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে।

কথা নয়

এখন কেবল কাজ

পুস্তক পরিচয়

HISTORY OF FREEDOM MOVEMENT N KARNATAKA (Vol I.)

Edited by Dr. M. V. Krishna Rao & Prof G S. Halappa, A Government of Mysore Publication Price : Rs 10 (Ordinary) Eidition, Rs 16 Library Edition).

[pp. 583 + 22]

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচেষ্টায় ভারতের জাতীয় আন্দোলনের যে ইতিহাস লিখিত হচ্ছে, তার যেটুকু নমুনা জনসাধারণের সামনে তুলে ধরা হয়েছিল—প্রবল হতাশাই শুধু নয়, আন্তরিক অসন্তোষও জেগেছিল তারফলে। অবশ্য প্রতিকারের ব্যবস্থা কতটুকু আজ অবধি করা সম্ভব হয়েছে, জানি না। প্রতিকারের প্রয়োজন সম্বন্ধে চড়া গলা কম শোনা যায়নি এবাবৎ—কিন্তু বাস্তবিকরূপে প্রতিকারে হাত দেওয়া হয়েছে কি না, যথেষ্ট সন্দেহই ছিল।

এমনি এক প্রত্যাশার ও আশাভঙ্গের সঙ্কট-মুহূর্তে হাতে এল কর্ণাটকে স্বাধীনতা সংগ্রামের এই ইতিহাসটির প্রথম খণ্ড। প্রতিকার চেয়ে এঁরা ঘুণী তোলেননি চায়ের পেয়ালায়। সমস্যার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনার জন্যে মহতী জনসভাও আহ্বান করা হয় নি। মহীশূরের রাজ্যসরকার সমাধানই শুধু উপস্থিত করলেন না এই ইতিহাস লিখে, অন্তত একটা দৃষ্টান্তও রেখে দিলেন : কথার চেয়ে কাজই বড়, ও রই এক প্রত্যয়।

১৯৬১ সালের জানুয়ারি মাসে মহীশূর রাজ্যসরকারের নির্দেশে সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন বিভাগ এই ইতিহাস

সম্পাদনার ভার অর্পণ করেন ডাঃ কৃষ্ণরাও (মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ও রাষ্ট্রনীতির অধ্যাপক) এবং অধ্যাপক হনাপ্পা (কর্নাটক বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতির অধ্যাপক) হেন দক্ষ দুই পণ্ডিতের হাতে। রাজ্যসরকারের সহযোগিতা ও অর্থানুকূল্যে এরা লণ্ডনের কমনওয়েলথ্ লাইব্রেরি, এডিনবরার এ চ এম রেকর্ডস্ অফিস, দিল্লী, কলকাতা এবং হায়দ্রাবাদের National Archives প্রভৃতি স্থান থেকে ফটোস্টাট এবং মাইক্রো-ফিল্মের মাধ্যমে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করেন, এবং কর্নাটক তথা মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার থেকেও তথ্যাদি আহরণ করে, ১৯৬২ সালের ২৬শে জানুয়ারির মধ্যে প্রকাণ্ড এই প্রথম খণ্ডটি প্রকাশ করে ফেলেছেন এঁরা, এবং পরবর্তী খণ্ডগুলিও শীঘ্রই সম্পূর্ণ হ'য়ে প্রকাশ পাবে, প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। বহু চিত্র মানচিত্র ফ্যাক্‌সিমিলি এবং লোকনীতির অনুবাদ সম্বলিত এই সুমুদ্রিত সুলিখিত ইতিহাসটি শুধু মাত্র অদ্বিতীয়ই নয়, পথপ্রদর্শকও।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা বোধহয় প্রয়োজন যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশের অবদান কত বড়, তা এককালে সমস্ত প্রদেশই জানত। দুর্ভাগ্যক্রমে আজ বাঙালী পরমুখাপেক্ষী এবং আত্মবিস্মৃত বলেই নতুন যুগের নাগরিকেরা জানে না তাদের মহান ঐতিহ্যের কথা, জানে না তাদের ধমনীতে বয়ে চলেছে কোন পূর্বপুরুষের শোনিত। তাদের উচ্ছৃঙ্খল, উচ্চাদর্শহীন অন্যায়ী প্রকৃতি কত না বিশ্লেষণে আমরা মুখরিত করেছি। কিন্তু তাদের সামনে তুলে ধরিনি গৌরবময় তাদের ইতিহাস। কর্নাটকের এই ইতিহাসটি হয়তো নতুন ভাবনার খোরাক দেবে বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষস্থানীয় রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ এবং দেশপ্রেমিকদের।

পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ছিন্ন বাধা : সমরেশ বসু
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা—৬
দাম—৭·৫০

সমরেশ বসু অনাচ্ছন্ন একটিমাত্র যৌন বক্তব্যকে তাঁর উপন্যাসে চিত্রিত করে আসছেন সাম্প্রতিক সময় অবধি। সে বক্তব্য নানা সমস্যা সংশয়, সন্দেহ, সংক্ষোভ, সন্ত্রাস এবং বাসনাবিদ্ধ মানুষের অন্তর রহস্যের উন্মোচন-বিষয়ক। 'উত্তরঙ্গে'র ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকে সুরু করে, বি. টি. রোডের পার্শ্ববর্তী অন্ত্যজ-জীবনযাত্রার প্রতিলিপি তুলে ধরে, 'মহানগর' ভরদ্বোদ্বেল ধারাস্রোতী আলোড়িত মানুষদের সমুদ্রপিপাসু জীবনের সংকুল জীবনযাত্রার ধারাবিবরণী রচনা করে, শ্রীমতী বাকের' সন্নিহিত মানুষগুলির সমুন্নত জীবনাকাঙ্ক্ষার ভাষ্য রচনা করে, ছিন্নমূল জীবনযাত্রাবাহী একালের নেতুন এক সওদাগরের জীবনাবলম্বী কথাকাহিনী রচনা করে, অচিনপুরের রহস্যসুন্দর কথকতা শুনিয়ে তিনি আমাদের জীবনেরই নানা বিপন্ন বিস্ময়ের, নানা উদ্ভিন্ন বিশ্বাসের কাহিনী শুনিয়েছেন। বর্তমান উপন্যাসটিতেও তিনি তাঁর প্রণতি নিবেদন করেছেন বিচিত্র বর্ণাল বহিরঙ্গ-সুন্দর জীবনেরই পাদপীঠে। তাই তাঁর গ্রন্থোৎসর্গপত্রে এবং অন্তর্লীন দুটি পংক্তিকে গ্রন্থের ধ্রুবপদ হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। একটি যেন জীবনের উদ্দেশেই তাঁর বিনত প্রণাম আমার 'মাথা নত করে দাওহে তোমার চরণ ধূলার তলে,' অপরটি এই নানা দুঃখের বেলায় নৈঃসঙ্গের যন্ত্রণাপীড়িত একটি মানুষের অন্তর্লীন উচ্চারণ "মোরে বহিবারে দাও শকতি।" এখানে একটি পরম আস্তিক-তায় উদ্ভাসিত সমরেশ বসুর কণ্ঠস্বর। তাঁর এই আস্তিক্যের কেন্দ্রভূমিতে যে ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠা তার নাম-জীবন। তবে বর্তমান গ্রন্থে সমরেশ বসুর একটি স্বতন্ত্র বক্তব্য অত্যন্ত প্রত্যক্ষ গোচর। একটি প্রখর উচ্চকিত বিশ্বাসের কাছে আত্মসমর্পণ এতকাল তাঁর প্রধান বক্তব্য ছিল, কিন্তু সে বিশ্বাস খুব বেশি

বিচলিত না হলেও সামূহিক প্রয়াস এবং ব্যক্তিমানুষের দ্বন্দ্বদীর্ণ জীবনের ক্ষেত্রে একদিকে ব্যক্তির প্রাতিস্বিক বক্তব্য অন্যদিকে তত্ত্বনির্ভর যৌথ আন্দোলনের আংশিকতা তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। সমাজের অন্তর্হীন অবহেলার কেন্দ্র থেকে পিতৃপরিচয়হীন একটি পানে-পাওয়া 'কবিয়াল' ছিন্নবাধা মানুষ অভয়ের জীব-কে কেন্দ্র করে সংগ্রাম এবং শান্তির ইতিবৃত্ত বর্তমান গ্রন্থে চিত্রিত হয়েছে। স্বাধীনতার বেলার একদিকে একমণি ডুবড়ির অমিতবিত্ত আলোকোৎসার অন্যদিকে তারই নেপথ্য-শায়ী জীবনের অন্ধকার ভূমিশয্যা থেকে স্বরীন ঝিন্তিরি অভয়কে নিয়ে এলো মফঃস্বলের চটকল এলাকার দেহোপ-জীবনীদের বারোবৎসরের উপাজনভূমিতে—যেখানে আছে ভাবিনী, সুখীনের অপ রূপীতা অর্দ্ধাঙ্গিনী, আছে শৈলবালা এবং তার মেয়ে নির্মলা ওরফে নিমি—যাকে কেন্দ্র করে দেহপন্থা শৈলবালা মেয়ে-জামাই পরিবৃত একটি বিশুদ্ধ পারি-বারিকতার পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে প্রয়াসিনী, যেখানে আছে বারোখাসরের অধিকর্ত্রী রাজুদাসী, এবং গৃহের সমস্ত বন্ধন-বিমুক্ত বিদ্যুতের মত প্রখর এবং শাণিত একটি রংচঙ্গরী রমণী সুবালা। এই জীবনেরই অংশীদার হয়ে ছিন্নবাধা অভয় পরিণত হোলো শৈলবালার জামাই ও নিমির পরিণীত স্বামীতে। কিন্তু নিঃসঙ্গ দিনযাপনের দুঃসহতার ক্লিষ্ট হয়নি তার চরিত্র, জীবনের বৃহত্তর আহ্বানে কবিয়াল অভয় প্রতি-মুহূর্তে সাড়া দিয়েছে তাই তার চটকলের উদ্বিগ্ন কর্মী অনাথ খুড়ো, শহরের শিক্ষিত রাজনৈতিক কর্মী গণেশবাবু—এদেরই সহচারণায় সে মালিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে তার প্রচণ্ড কণ্ঠস্বর শোনাতে গিয়ে কারাবরণ করেছে অন্যদিকে আবার নিমি এবং সুবালা এই দুই রমণীর যুগপৎ ঘৃণা এবং ভালোবাসার দোলা-চলতায় বিদীর্ণ হয়েছে তার প্রতিটি দিন এবং রাত্রি কিন্তু সংসারের এই রঙ্গনাট্য থেকে কোনওদিন পলাতক নয় অভয়। সে আপনার অন্তে মহাকালের রক্তলিপি প্রত্যক্ষ করে: তাই প্রত্যেক নরনারীর উদ্দেশে সে জানিয়েছে: ও ভাই, হায় দিন চলে যায় কান পেতে কালের কথা শোনো আপন বুকে। শেষ পর্যন্ত চলতি হাওয়ার পথী হতে পারেনি অভয়। প্রথাবদ্ধ দলীয় রাজনীতির ব্যর্থতা তার কাছে প্রমাণিত হয়েছে বৃদ্ধ জননেতা জীবন চৌধুরী মশায়ের নীতিগত অসফলতার মধ্য দিয়ে। জীবন চৌধুরী মশায়ের শেষ অভিজ্ঞান এপ্রসঙ্গে স্মরণীয়। এ ব্যবস্থাকে বদলাও। বাইরে নয় মানুষের ভিতরে শক্তি যোগাতে হবে। অভয়ের সঙ্গীত এই প্রত্যয়েরই প্রতিধ্বনি। তাই ধীরে ধীরে সে পরিত্যাগ করেছে অনাথ মিস্তিরি কিম্বা গণেশবাবুদের দলীয় রাজনীতিকে। জীবনের প্রতি একটি তীব্র অন্তঃশীল মমতায় তবুও অভয় বার বার এই জীবনেরই জয়গান শুনিয়েছে। মফঃস্বলের চটকল-পরিসীমা থেকে কলকাতার লোকসংস্কৃতি সম্মেলন পর্যন্ত কবিয়াল অভয় সংগ্রাম এবং শান্তির দ্বন্দ্বমুখর জীবনপথ পরিক্রমায়ই ধারা-বিবরণী শুনিয়েছেন! এরই পাশে মাঝে মাঝে মুখর হয়ে উঠেছে তার ব্যক্তিগত বেদনার বিক্ষোভ। নিমির মৃত্যুতে বিমূঢ় অভয়ের স্মৃতিজীবী সত্তা বারবার আর্তনাদ করে উঠছে; আবার সুবালার প্রতি একটি নেপথ্যচারী অন্তরচারী আকর্ষণ তাকে তার মৃত্যুশয্যা পর্যন্ত আহ্বান করে নিয়ে গেছে। কিন্তু নিমির সন্তান নির্মল বা নিমের আকর্ষণ এবং তার সংসারের অযাচিতা সুহৃদকর্ত্রী ঝিনির সপ্রেম অবধারকতায় জীবনেরই উচ্চচূড় রথযাত্রায় জনসঙ্ঘের দুঃখবাধা জীবনের সঙ্গে নিজের জীবনটিকে মিলিয়ে দিয়েছে। অনাগত ভবিষ্যতের একটি সুশ্রী-সুন্দর সম্ভাবনাকে অনাগত চিত্র তুলে ধরে সমরেশ বসু তাঁর গ্রন্থ শেষ করেছেন: অভয়ের মনে হল তার কানে ঘর্ঘর শব্দ আসছে, পরমুহূর্তেই তার চোখের সামনে ভেসে উঠল একটি ধাবমান বিশাল রথ। মানুষের দেহ দিয়ে সেই রথ তৈরী। ক্রুর মৃত্যু সৃষ্টির বিচিত্র লীলায় তারা মত্ত। মানুষ সেই রথ টানছে। শক্তিশালী বেগবান মানুষেরা। তাঁদের গম্ভীর কণ্ঠে বাণী উচ্চারিত হচ্ছে। এবং মুহূর্তে মুহূর্তে রক্ত ছিটকে উঠছে চাকা থেকে। দেহ পথে পতিত হয়ে হারিয়ে যাচ্ছে।

সকল কোলাহল ছাপিয়ে কেবল একটি সুস্পষ্ট বজ্রকণ্ঠ শোনা যাচ্ছে "সময় নেই। এগিয়ে চল।"

অভয়ের এই অনুভব আসলে সমরেশ বসুরই উদ্দীপ্ত জীবন বেদ। ঔদ্ধত্য এবং আনন্দের যুগ্মপাণ্ডিত্যে বিধৃত এই জীবনের অনুচারণায় মন্ত্রোচ্চারণে দীক্ষিত সমরেশ বহু সংস্কার বিমুক্তবন্ধন অভয়ের বাসনা, বিক্ষোভ এবং প্রত্যয়ের প্রতিলিপি রচনা করেছেন বর্তমান উপন্যাসে।

সুশান্ত বসু

মল্লিকা—লেখক বিমল কর প্রকাশক কথাকলি, ১ পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা-৯, দাম তিন টাকা।

এই ছোট উপন্যাসখানির কাহিনী সামান্য, কিন্তু লেখার গুণে বইখানি অসামান্য হয়ে উঠেছে। বালো নিজের ছোট বোনের বন্ধু মল্লিকাকে শ্যামল প্রথম দেখে কয়লা-খনির এক ছোট শহরে, যৌবনে সে তাকে হারায়। এর মধ্যে তাদের বার কয়েক দেখা হয়েছে ঐ শহরে বা কলকাতায়, মধ্যবিত্ত পরিবারে মেলামেশার প্রথম সংকোচ কাটিয়ে ক্রমে গড়ে উঠেছে আকর্ষণ, যদিও মুখের কথায় প্রায়ই থাকত বিদ্রূপ ও বৈপরিত্যের ঝাঁজ। কেরানিগিরি করতে শ্যামল প্রথমে গেল কাশী, পরে রিক্ত হয়ে তা ছেড়ে কলকাতায় সামান্য কাজ নিল বড়ুর প্রেসে। কার্যক্ষেত্রে নিজের এই সামান্যতার ফলে কোনও দিন সে মল্লিকাকে দাবি করবার জোর পেল না; জোর পাবে এই আশায় মল্লিকা বৃথাই অপেক্ষা করল, করতে করতে তার বিয়ে ঠিক হয়ে গেল।

শুনলে মনে হয় কেরানির প্রেম বা বাবুর প্রেমের মামুলি কাহিনী যা আমরা অনেক পেয়েছি এ যাবৎ। কিন্তু এ বইতে চোখের জল, হাহাকার, ইচ্ছাসে বা আতিশয্য নেই—সহজ, সংযত ভাষা; নেই গল্প জমাবার উদ্দেশ্যে অবাস্তব পরিস্থিতির সৃষ্টি। নায়ক নায়িকার যোগাযোগ, আলাপ ও ব্যবহার সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। উপরন্তু অল্প কথায় ঘটনার পরিবেশ চমৎকার ফুটে উঠেছে: কয়লা-খনির শহরে খোলা পথঘাট রেলস্টেশন বাংলোবাড়ি খুব কাছে চলে আসে, উন্মুক্ত প্রান্তরে জ্যোৎস্না রাত্রি অথবা কাশীর সন্ধ্যা মেসে বর্ষাসন্ধ্যা নিবিড় হয়ে ধরা দেয়।

আর বইয়ের আদ্যোপান্ত নেপথ্য-সঙ্গীতের মত বাজে বিয়োগান্ত কাহিনীর অন্তর্নিহিত বেদনার সুর। অসাধারণ কাহিনী নিয়ে সাধারণ বই অনেকেই লেখে, এটি সাধারণ কাহিনীর অসাধারণ বই।

ইন্দ্রনাথ

উত্তরসূরী, কার্তিক-পৌষ ১৩৬৯, ১-৩ বর্ষ (সম্পাদক—অমল ভট্টাচার্য, ৮৮।১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬)

উত্তরণ, আশ্বিন ১৩৬৯, প্রথম বর্ষ (সম্পাদক—বিশ্বনাথ দে ও অন্য, ২৮৫ মাণিকতলা গভর্নমেন্ট স্কীম, কলিকাতা-৬০)

পূর্বপত্র, শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৬৯, ৩য় বর্ষ (সম্পাদক—সুবীর রায়চৌধুরী, ১ কলেজ রো, কলিকাতা-৯)

পরিচয়ী, আশ্বিন ১৩৬৯, ২য় বর্ষ (সম্পাদক—দুর্গাদাস সরকার, ৩৯ আশুতোষ দে লেন, কলিকাতা-৬)

'পরিচয়' ও 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার ঐতিহ্য অনুসরণ করে বাংলা দেশে গত কয়েক বছরে অনেকগুলি মননশীল সাহিত্যপত্র আত্মপ্রকাশ করেছে, উপরোক্ত চারটি পত্রিকা এই দলভুক্ত। এই ধরনের প্রকাশন সাধারণত কোনও একটি উৎসাহী গোষ্ঠীর চেষ্টায় ঘটে থাকে, এদের হয়তো আর্থিক সামর্থ্য কম, কাগজ ছাপা হয় অল্প সংখ্যায় এবং তা পড়েন অল্প কয়েকজন (লেখকরাই হয়তো অধিকাংশ পাঠক)। এবং শুধু সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ, আত্মপ্রকাশের উৎসাহ ও পড়ে তোলার উদ্যম যাদের মূলধন তাদের পক্ষে কাগজ চালানো কঠিন বলে প্রায়ই অনতিবিলম্বে নীরব মৃত্যু ঘটে প্রচেষ্টার। কিন্তু এ কথা ভাবলে বিস্মিত না হয়ে উপায় নেই যে এ দেশে উৎকৃষ্ট পত্রিকা প্রকাশের, ও তার মাধ্যমে মার্জিত ও মননশীল প্রবন্ধ কবিতা গল্প রচনার আকাঙ্ক্ষা এতখানি ছড়িয়ে পড়েছে, এবং

বিশেষ করে তরুণ লেখকদের তা এতখানি মাতিয়ে তুলেছে। এই শ্রেণীর পত্রিকার মুদ্রা-হার বেশী হলেও পশ্চাদ্‌বর্তী চেহারা ও চিত্তা সর্বাংশে প্রশংসা ও গৌরবের বস্তু।

আলোচ্য পত্রিকাগুলির মধ্যে সবগুলির মান সমান নয়, যে কোনও একটির মধ্যেও উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট রচনার পার্থক্য চোখে পড়ে। 'উত্তরণ' পত্রিকার অঙ্গগুলির তুলনায় ছাপার দোষ বেশী দেখা গেল। 'উত্তরণ' ও 'পূর্বপত্র' পত্রিকায় প্রবন্ধ, কবিতা ও গল্প আছে, 'উত্তরসূরী'তে গল্পের স্থান নেই, 'গঙ্গোত্রী'র শেষে একটি প্রবন্ধ ছাড়া আর সবই কবিতা। কোনওটাতেই পুস্তক সমালোচনা চোখে পড়ল না, এটা সাহিত্য পত্রিকার পক্ষে গুরুতর অভাব সন্দেহ নেই।

সব রচনার আলোচনা সম্ভব নয়, বেছে বেছে কয়েকটির উল্লেখ করা যেতে পারে। 'উত্তরসূরী'তে অদ্রি বাগচী রচিত 'আত্মচরিত ও জীবনচরিত', এবং সুশীল রায়ের 'জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর' ভাল লাগল শুধু বক্তব্য গুণে নয়, ভাষার গুণেও। এই শ্রেণীর 'কুলীন' পত্রিকার লেখকরা প্রায়ই এমন ভাষা ব্যবহার করেন যাতে স্বরচিত, স্বল্প-পরিচিত ও উপসর্গবহুল শব্দ বেশী থাকে, সেই কারণে কোনও কোনও বাক্য দুবার তিন বার পড়ে অর্থ গ্রহণ করতে হয়। এতে কি সুবিধা হয় জানি না, তবে পাঠকের ক্লান্তি বাড়ে ও সময় নষ্ট হয়। জটিল অথচ সহজ বাংলা লেখা কঠিন হলেও নিশ্চয় সেই দিকেই পরীক্ষা দরকার।

'পূর্বপত্র' পত্রিকায় সাহিত্য সমালোচনা সম্বন্ধে অরবিন্দ পোদ্দার যা বলেছেন তা আরও বেশী করে ব্যাপক ভাবে বলার দিন এসেছে। পরলোকগত ব্যক্তির সমালোচনায় (এবং জীবনী রচনাতেও) এই দেশের লোকে ভাবাতুতা ও অতিভক্তি এত বেশী পরিমাণে ব্যবহার করেছে যে সাহিত্যের বিচারে তা প্রায়ই সম্পূর্ণ মূল্যহীন। এর জন্য দায়ী কিছুটা উৎকট স্বাদেশিকতা, কিছুটা স্বাভাবিক ভারতীয় উচ্ছ্বাস-প্রবণতা, এবং কখনও বা ব্যক্তিগত শ্রদ্ধার সম্পর্ক। এই পত্রিকারই শেষ প্রবন্ধটি ('আমার মনে কোনো ক্লান্তি নেই') এই বন্ধনের 'সমালোচনা'র দৃষ্টান্ত।

গল্পের মধ্যে 'বেড়াল' (অচ্যুত গোস্বামী, 'উত্তরণ') সহজ ভাষায় রচিত মনোরম কাহিনী, যদিও তা স্থান পেয়েছে পত্রিকার শেষে। 'একটি সাধারণ গল্প' (বিমল কর, 'পূর্বপত্র') স্ত্রী-চরিত্র সুন্দর উদ্‌ঘাটন করেছে। সব পত্রিকাতেই কবিতার স্থান সংখ্যায় প্রধান, এবং এগুলির মান অতি অসমান; যথারীতি কতগুলি অবোধ্য, এবং সবগুলি প্রকাশযোগ্য নয়।

যারা এই সব পত্রিকায় লেখেন তাঁদের ব্রত উচ্চাঙ্গের সাহিত্য সৃষ্টি, তথ্য-সচেতন ও স্বাধীন চিন্তাপূর্ণ মৌলিক প্রবন্ধ রচনা; কিন্তু তার সঙ্গে যে দৃষ্টি-সতর্কতা ও সর্বাঙ্গীণ অবধানতা থাকা দরকার দুঃখের বিষয় তার অভাব প্রায়ই চোখে পড়ে। দু যুক্তাক্ষরটির বদলে যারা নির্বিচারে ং ব্যবহার করেন (সংগে, সুংখলা, এমন কি আকাংখা পর্যন্ত চোখে পড়ল) তারা 'চলন্তিকা'র শেষ কয়েক পাতা উলটে দেখলে ভাল করবেন। গঁগা, গোলিয়াথ ('গঙ্গোত্রী') উচ্চারণ ভুল (গোগ্যাঁ, গোলায়াথ ঠিক)। পূর্বপত্র পত্রিকায় অমুজ বসু এক প্রসিদ্ধ কবির কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করেছেন, তার একটি লাইনে বিদেশী জায়গার নামে তিনটি ভুল উচ্চারণ চোখে পড়ল, যথা মেক্সিকস, উর ও নিনেভ (প্রথমটি এতই অদ্ভুত যে মনে হয় অন্তত অশেষ ছাপার ভুল)। এখানেও অভিধান-প্রীতি ছাড়া ওষুধ নেই। 'নাট্য-চিন্তা' প্রবন্ধে (কুমার রায়, 'পূর্বপত্র') দেখলাম সার্ত্র-র নাটক La putain respectueuse-র বঙ্গানুবাদ হয়েছে 'ধরপীড়া বারনারী' বলে; respectueuse শব্দটির অর্থ শ্রদ্ধাবতী (respectful) আর respectable মানে শ্রদ্ধাযোগ্য। অবশ্য ইংরেজিতেও এই জায়গায় অনেকে ভুল করে respectable লিখেছে, তারই প্রভাব নিশ্চয় বাংলায় পড়েছে। বিদেশী সাহিত্যের পরিচয়ে ইংরেজি-মুখাপেক্ষী হয়ে থেকে আমরাও এই ভুল কায়েমী করে চলেছি।

ইন্দ্রনাথ

বিশ্বাবর্ত

পশ্চিমী শিবিরের অন্তর্বন্ধ

ইউরোপীয় 'কমন মার্কেট' বা যৌথ-বাজারে প্রবেশের জন্য ব্রিটেনের আবেদন-পত্র সম্পর্কে ফরাসী প্রেসিডেন্ট গলের বিরোধিতা যুদ্ধোত্তর কালের আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

• • •

১৯৪৫ সালে যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হলো দেখা গেলো যে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইউরোপে, তথা সমগ্র বিশ্বে, এক বিরাট রূপান্তর ঘটে গেছে। যুদ্ধের পূর্বে, ক্ষমতার দিক থেকে, ইউরোপে ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, ইতালী ও রাশিয়া ছিল প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্র। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে সামরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির দিক থেকে সত্যিকার প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্র বলতে রইলো শুধু আমেরিকা ও রাশিয়া। এমন কি যুদ্ধ-বিজয়ীদের অন্যতম ব্রিটেনের স্থান হলো দ্বিতীয় সারিতে। যুদ্ধোত্তর কালে রাশিয়া তার ক্ষমতার জোরে পূর্ব ইউরোপের ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলিকে কার্যতঃ তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করে 'কম্যুনিষ্ট ব্লক'-এর প্রতিষ্ঠা করলো। অপর পক্ষে, যুদ্ধবিধ্বস্ত পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও সামরিক প্রতিরক্ষার তাগিদে আমেরিকার শরণাপন্ন হলো: আমেরিকার সাহায্য ব্যতিরেকে সেদিন এই পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির এককভাবে আত্যন্তরীণ পুনর্গঠনের অথবা রুশ-নেতৃত্বাধীন কম্যুনিষ্ট শিবিরের সাথে 'ঠাণ্ডা লড়াই'-এর সম্মুখীন হওয়ার ক্ষমতা ছিল না।

কম্যুনিষ্ট শিবিরের সম্মুখীন হওয়ার ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের পরিপ্রেক্ষিতে, পশ্চিম ইউরোপের ছোট বড় রাষ্ট্রগুলিকে নিয়ে একটি যুক্তরাষ্ট্র গড়ার প্রয়োজনীয়তা তাঁই পেতে লাগলো চার্চিল, চার্চিল, স্যামান, স্পাক প্রভৃতি নেতাদের মনে। ১৯৪৬ সালে, চার্চিল তার বিখ্যাত ফুলটন বক্তৃতায়, এবং এর আগে জুরিখ বক্তৃতায়, ঐ ঐক্যবদ্ধতার উপর বিশেষ জোর দিলেন। (এর আগে অর্থাৎ ১৯৪০ সালে যুদ্ধ চলার সময়, বৃটেন ও ফ্রান্সকে নিয়ে একটী যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার কথাও চার্চিল বলেছিলেন)।

একই চেতনার বশবর্তী হয়ে যুদ্ধোত্তর পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি একের পর এক বিভিন্ন আঞ্চলিক চুক্তি ও যৌথ পরিকল্পনা বা তদনুরূপ সংস্থার অংশীদার হতে লাগলো। ১৯৪৭ সালে সামরিক ও অন্যান্য সহযোগিতার জন্য ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে 'ডানকার্ক চুক্তি' সম্পন্ন হলো। অর্থ-নৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতা এবং সামরিক প্রতিরক্ষার জন্য ১৯৪৮ সালে ব্রিটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড ও লুক্সেমবুর্গের মধ্যে 'ব্রুসেলস চুক্তি' সম্পাদিত হল। ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠা হলো 'ইউরোপীয় পরিষদ' বা Council of Europe। ব্রুসেলস চুক্তির অংশীদাররা ছাড়া ইতালী, সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক ও আয়র্লাণ্ড এই পরিষদের অন্তর্ভুক্ত হলো এবং পরে গ্রীস, তুরস্ক, আইসল্যাণ্ড এবং পশ্চিম জার্মানী এতে যোগ দিলো। একই বছর সামরিক প্রতিরক্ষার ভিত্তিতে আয়র্লাণ্ড ছাড়া ইউরোপীয় পরিষদের সমস্ত সদস্য রাষ্ট্র এবং পর্তুগাল আমেরিকা ও কানাডা সহ গড়া হলো 'নাটো' (North Atlantic Treaty Organisation)। ইউরোপে কম্যুনিষ্ট সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে পশ্চিমী রাষ্ট্রের উদ্যোগের

পরিকল্পনা হলো এই নাটো। ১৯৪৯ সালে পশ্চিম জার্মানীকে এতে গ্রহণ করা হয়। নাটোর পর ১৯৫১ সালে 'শ্যুম্যান পরিকল্পনা' অনুযায়ী গঠিত হয় 'ইউরোপীয় কয়লা ও ইস্পাত-শিল্প সংস্থা'। এর সদস্য হলো ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী, ইতালী, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড ও লুক্সেমবুর্গ। ১৯৫২ সালে ঐ একই রাষ্ট্রগুলো নিয়ে এক চুক্তি অনুযায়ী গঠিত হলো 'ইউরোপীয় প্রতিরক্ষা জোট'। কিন্তু পশ্চিম জার্মানীর অস্ত্র সজ্জার সম্ভাবনায় ভীত সোভিয়েত ফরাসী পার্লামেণ্ট ঐ চুক্তি অনুমোদন না করায় ১৯৫৪ সালে এটা বাতিল হয়ে গেলো।

১৯৫৭ সালের মার্চ মাসে 'রোম চুক্তি' অনুযায়ী ফ্রান্স, জার্মানী, ইতালী, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড ও লুক্সেমবুর্গকে নিয়ে গঠিত হলো 'ইউরোপীয় অর্থ-নৈতিক জোট' (European Economic community)। এই জোটের আশু উদ্দেশ্য হলো একটা যৌথ বাজার প্রতিষ্ঠা করে নিজেদের মধ্যে আমদানী-রপ্তানীর ক্ষেত্রে ধাপে ধাপে শুল্ক ও অন্যান্য বিধি-নিষেধের অবসান এবং নিজেদের পারস্পরিক বাণিজ্যনীতির ক্ষেত্রে একটা সমতা বজায় রাখা।

এখানে মনে রাখা দরকার যে ন্যাটো ও অন্যান্য কয়েকটি চুক্তি ও পরিকল্পনার গতি-প্রকৃতির সাথে রোম চুক্তির গতি-প্রকৃতির একটা মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। ১৯৫৭ সালে যখন রোম চুক্তি সম্পাদিত হয় তখন পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি মোটামুটি যুদ্ধের ধাক্কা সামলে উঠেছে এবং পশ্চিম ইউরোপে কম্যুনিষ্ট সম্প্রসারণের সম্ভাবনা অনেকটা দূরীভূত হয়ে গেছে। ন্যাটোর আবেদন আটলান্টিকের উভয় তীরের রাষ্ট্রগুলির কাছে। ন্যাটোর প্রভাবাধীন রাষ্ট্রগুলিকে অন্ততপক্ষে পরোক্ষভাবে শক্তিশালী রাষ্ট্র আমেরিকার প্রভাব অস্বীকার মানতে হবে। অপর পক্ষে ইউরোপীয় অর্থ নৈতিক জোট পশ্চিম ইউরোপের মূল ভূখণ্ডের রাষ্ট্রগুলির একান্ত নিজস্ব। এদের কাছে, বিশেষতঃ ফরাসী প্রেসিডেণ্ট ডগলের কাছে, ব্রিটেনও বাহিরের রাষ্ট্র।

প্রথম দিকে ব্রিটেনও ইউরোপীয় অর্থ নৈতিক জোট সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহী ছিল না। ব্রিটেনের বাণিজ্যিক সম্পর্ক বহুমুখী। তার রয়েছে কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলির সাথে এবং আমেরিকার সাথে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক সম্পর্ক। ইউরোপীয় অর্থ-নৈতিক জোটে যোগদান করলে তার ঐ সমস্ত বাণিজ্যিক সম্পর্ক গুরুতরভাবে ব্যাহত হবার সম্ভাবনা। ব্রিটেনের মোট রপ্তানীর অর্ধেক হলো কমনওয়েলথ দেশগুলিতে এবং এক-চতুর্থাংশ হলো ইউরোপে।* তা'ছাড়া, ব্রিটেন ইউরোপের বাজারে বাণিজ্য চালু রাখার জন্য সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক, পর্তুগাল, সুইজারল্যাণ্ড, অস্ট্রিয়া ও নিজেকে নিয়ে 'ইউরোপীয় স্বাধীন বাণিজ্য সমিতি' (European Free Trade Association) গড়েছে। ব্রিটেনের আশা ছিল যে, ইউরোপীয় অর্থ-নৈতিক জোটে যোগদানের পরিবর্তে এ'রকম স্বাধীন বাণিজ্য সমিতির প্রসার তার জাতীয় সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রেখে বাণিজ্য বিস্তারের পক্ষে অধিকতর সহায়ক হবে। এ'ছাড়া ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের ধারণা ছিল যে, ইতিপূর্বে ইউরোপীয় প্রতিরক্ষা জোট যে ভাবে ব্যর্থ হয় ঠিক সে ভাবেই ইউরোপীয় অর্থ-নৈতিক জোট ও প্রস্তাবিত 'পারমাণবিক শক্তি জোট' (Euratom) ব্যর্থ হবে। এই কারণে, যে 'স্পাক কমিটী'তে (বেলজিয়াম পররাষ্ট্র মন্ত্রী Henry Spaak-এর নামানুসারে) রোম চুক্তি নিয়ে বিস্তর আলোচনা হচ্ছিল সেই 'স্পাক কমিটী' থেকে ব্রিটেন তার প্রতিনিধিকে সরিয়ে নিয়ে এলো।** কিন্তু, শেষ পর্যন্ত ইউরোপীয় অর্থ-নৈতিক জোটের সাথে অর্থ-নৈতিক

---

* এ বিষয় পরে আর সংখ্যায় কিছুটা আলোচনা করা হইয়াছে।

** Dr. J. H. M Pinder, Managing Editor, Economic Intelligence Unit, London Economist লিখিত 'Britain's Choice in Europe' শীর্ষক প্রবন্ধ (India Quarterly, Oct-Dec' 60) দ্রষ্টব্য।]

প্রতিযোগিতা থেকে রেহাই পাবার আশায় ব্রিটেন ঐ জোটে যোগদানের জন্য আবেদন পত্র পেশ করলো।

ব্রিটেনের ঐ জোটে প্রবেশের প্রশ্ন নিয়ে প্রায় দেড় বছর ধরে ব্রুসেলসে আলোচনা হচ্ছিল। কিন্তু বাদ সাধলো ফরাসী প্রেসিডেন্ট ও গলের একগুয়েমি। যৌথ বাজারের অপর পাঁচটী সদস্য রাষ্ট্র ব্রিটেনের প্রস্তাব সমর্থন করা সত্ত্বেও এবং শেষ মুহূর্তে প্রেসিডেন্ট কেনেডি প্রশাসনের হস্তক্ষেপ সত্ত্বেও ফরাসী সরকারের আপত্তি বহাল রইলো। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে রোম চুক্তির ২৩৭ ধারা অনুসারে চুক্তি ভুক্ত সব কয়টী সদস্য রাষ্ট্রের সম্মতিতেই নতুন কোন সদস্যকে ঐ জোটে গ্রহণ করা যেতে পারে।

ফরাসী সরকারের এই মনোভাবে শুধু ব্রিটেন বা আমেরিকা নয় অর্থ-নৈতিক জোটের বাকী পাঁচটী দেশও অল্প বিস্তর ক্ষুব্ধ অথবা ক্ষুব্ধ হয়েছে। হয়ত ঐ সমস্ত রাষ্ট্রের চাপে ফ্রান্স শেষ পর্যন্ত ব্রিটেনকে জোটের অংশীদার করে নিতে সম্মত হবে। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, সব কয়টি মিত্র রাষ্ট্রের মতামতের মূল্য না দিয়ে ব্রিটেনের ন্যায় অপর একটি মিত্র-রাষ্ট্রের প্রতি প্রেসিডেন্ট ও গল এরূপ আচরণ করতে গেলেন কেন?

প্রেসিডেন্ট ও গলের আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে এক বৈঠকে ভাষণে ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী বলেছেন যে, "মনে হয় তারা (ফরাসী সরকার) মনে করেন যে একটী জাতিই ইউরোপে আধিপত্য বিস্তার করতে পারে অথবা একই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা এমন কথাও ভাবতে পারেন যে, বন্ধুবান্ধব এবং মৈত্রীবর্গকে বাদ দিয়ে ইউরোপ নিজেই নিজেকে শাসন করতে পারে।" আমেরিকার অর্থ সচিব ডগলাস ডিলন মন্তব্য করেছেন যে যৌথ বাজারে ব্রিটেনের প্রবেশের পথে ফ্রান্সের বাধা দেওয়ার কারণ রাজনৈতিক, অর্থ-নৈতিক নয়। এমন কি যৌথ বাজারের অন্যতম সদস্য রাষ্ট্র বেলজিয়ামের পররাষ্ট্র মন্ত্রী হেনরী স্পাকও বলেছেন যে ইউরোপীয় জোটের উপর ও গল ফরাসী আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করছেন।

প্রায় এক বছর আগে, অর্থাৎ ১৯৬২ সালের এই মে, এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট ও গল তার 'উরাল থেকে আটলান্টিক" পর্যন্ত এক নতুন ইউরোপ গড়ার আঁচ দেন। প্রেসিডেন্ট ও গল ফরাসী জাতীর সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের গৌরবে বিশ্বাসী এবং তিনি বুঝতে দেন যে তিনি চান এমন এক ইউরোপ যেখানে ফ্রান্স নেতৃত্বের আসন পাবে। তিনি আরও ইঙ্গিত দেন যে ফ্রান্স ও জার্মানীর সহযোগিতার ভিত্তিতে গঠিত ঐ ইউরোপ,—আমেরিকাতে বটেই এমন কি আমেরিকার প্রভাবাধীন ব্রিটেনেরও প্রভাব মুক্ত থাকবে।

ঐ সাংবাদিক সম্মেলনের আগে ইংল-মার্কিন প্রভাবিত বিভিন্ন নীতির সাথে একটা অসহযোগিতার মনোভাব ও-গলের মধ্যে দেখা যায়। যেমন বার্লিন প্রশ্নে রাশিয়ার সাথে ইংল-মার্কিন আলোচনায় রাজী হন নি; তিনি নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন বয়কট করেছিলেন; যদিও ফ্রান্স সিয়াটোর সদস্য তবুও বিগত লাওস সমস্যার সময় তিনি থাইল্যাণ্ডে নাম মাত্র ফরাসী সৈন্যও পাঠাতে সম্মত হন নি; রাষ্ট্রসংঘে আমেরিকার নীতি থেকে তিনি নিজেকে যেন কিছুটা দূরে রেখেছেন; গত ডিসেম্বর বাহামার নাসাউ সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট কেনেডী ও ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী ম্যাকমিলান জোটের প্রতিরক্ষার দিক থেকে যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তার প্রতি তিনি বিরূপ। প্রকৃত পক্ষে, ঐ সম্মেলনে ব্রিটেনের ভূমিকা তাঁকে ব্রিটেনের উপর আরও আস্থাহীন করেছে।

এমন কি গত ১৪ই জানুয়ারী সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁর উক্তিগুলোর মধ্যেও ঐ একই মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। নাসাউতে 'পোলারিস' ক্ষেপণাস্ত্র সম্পর্কে ব্রিটেন ও আমেরিকার মধ্যে যে বোঝাপড়া হয়েছে তার বিরোধিতা করে ঐ সাংবাদিক সম্মেলনে ও-গল বলেন: "আমরা আমাদের নিজেদের পারমাণবিক শক্তি গড়বো এবং কাজে

লাগাবো।" ঐ সম্মেলনে যখন তিনি ইউরোপীয় অর্থ-নৈতিক জোটের বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে, বিশেষ করে জার্মানীর সাথে, ফ্রান্সের বন্ধুত্বের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন, ঠিক তখনই তিনি ব্রিটেনের প্রসঙ্গে বলেন যে, ব্রিটেনের অর্থ-নৈতিক অবস্থাটা এরূপ যে সেটা যৌথ বাজারের সাথে খাপ খায় না। তিনি মনে করেন যে, "(ইউরোপ) মহাদেশের দেশগুলোর সাথে ব্রিটেনের পার্থক্য মৌলিক।" আমেরিকার নেতৃত্বাধীন বৃহত্তর "আটলান্টিক জোট" (Atlantic Community) গঠনের প্রশ্নে তিনি বলেন যে অনেকেই এটা পছন্দ করতে পারেন কিন্তু ফ্রান্স ইউরোপীয় অর্থ-নৈতিক জোটে যোগ দিয়ে যা চেয়েছে এটা তা' নয়।

সংক্ষেপে প্রেসিডেন্ট দ্য-গল তাকিয়ে আছেন আমেরিকা ও ব্রিটেনের প্রভাবমুক্ত ও ফ্রান্সের নেতৃত্বাধীন এক ইউরোপীয় রাষ্ট্র-জোটের দিকে। গত কয়েক বছরে তাঁর নেতৃত্বে ফ্রান্সের অর্থ-নৈতিক উন্নতি এবং পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য দেশের বিশেষ করে জার্মানীর উন্নতি হয়ত তাঁকে ঐ সম্ভাবনার প্রতি অধিকতর আস্থাবান করেছে। ঐ মনোভাব নিয়েই তিনি পশ্চিম জার্মানীর প্রতি সংযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন এবং তারই উদ্যোগে গত ২২শে জানুয়ারী এক ফরাসী জার্মান 'সংযোগিতা' চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই চুক্তির বিষয়বস্তু হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে: (১) ইউরোপীয় জোটের ও ইউরোপীয় রাজনৈতিক সহযোগিতার সমস্যা সমূহ, (২) রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ব-পশ্চিম সম্পর্ক এবং (১) ন্যাটো ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার সংশ্লিষ্ট বিষয় সমূহ। তা'ছাড়া এই চুক্তিতে প্রতিরক্ষার প্রশ্নে একটা সাধারণ নীতি ও কৌশল উদ্ভাবনের কথা বলা হয়েছে। এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পরদিন জার্মান চ্যান্সেলার আদেনাওয়ার বলেন যে এই চুক্তি ছাড়া "একটা প্রকৃত ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠন অসম্ভব থেকে যেতো।"

বলা বাহুল্য, এই দলের নেতৃত্বাধীন ফরাসী সরকারের মনোভাব ন্যাটোর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত করে তুলেছে। আমেরিকা হয়ত ন্যাটোর অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য রাষ্ট্রগুলো নিয়ে তার রাজনৈতিক ও প্রতিরক্ষার পরিকল্পনা চালু রাখতে চাইতে পারে; কিন্তু ফ্রান্সকে বাদ দিয়ে তা' কার্যকরী করা শক্ত। ন্যাটোর মধ্যে ফ্রান্সের অবস্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তা' ছাড়া ফ্রান্সের উপর আমেরিকার চাপ দেওয়ার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অন্যান্য পশ্চিমী দেশগুলোকে উত্তেজিত করতে গেলে হয়তো ন্যাটোরই বিপদ ঘনিয়ে আসবে। তাছাড়া অর্থ-নৈতিক দিক থেকে ফ্রান্স তার আগের অস্থিরতা ও ঔপনিবেশিক ক্ষয় ক্ষতি কাটিয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, কিউবার পর থেকে সবাই এটা বুঝতে পেরেছেন যে রাশিয়া আজ আর পশ্চিমের দিকে ঝুঁকি নিতে আসবে না। সর্বোপরি, আমেরিকা তার নিজের স্বার্থে এবং গোটা পশ্চিমী শিবিরের স্বার্থে আজ ইউরোপ থেকে একেবারে সরে দাঁড়াতে পারে না। সবাই এটা বোঝেন। সুতরাং তিনি মার্কিন পারমানবিক ছত্রছায়ে বসে আমেরিকারই বিরুদ্ধে নিজেকে গড়ে তুলতে পারেন।

এক কথায়, আজ কম্যুনিষ্ট শিবিরের মত পশ্চিমী শিবিরেও এক গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিচ্ছে। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব শেষ পর্যন্ত কি রূপ নেয় এবং কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তা লক্ষ্যণীয়। তবে আপাততঃ এ'কথা বলা যায় যে সম্ভবতঃ এই অন্তর্দ্বন্দ্ব শুধু ফ্রান্স ও আমেরিকা বা ব্রিটেনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, উত্তর আমেরিকার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বিশেষতঃ আনবিক অস্ত্রসজ্জার প্রশ্নে কানাডার ডিফেনবেকার মন্ত্রীসভার পতন হয়েছে। এ ঘটনার পট-ভূমিকায় রয়েছে উত্তর আমেরিকার প্রতিরক্ষার প্রশ্নে কানাডা-মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র বিরোধ। আনবিক অস্ত্র দিয়ে উত্তর আমেরিকার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিখুঁত করা হচ্ছে না বলে মার্কিন রাষ্ট্রপক্ষ কানাডার বিরুদ্ধে সমালোচনা করেছিলেন। তবে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে যে বিরোধী লিবারেল দল কানাডা সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন, তারাও এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে প্রতিরক্ষার প্রশ্নে কানাডার প্রতিশ্রুতি সমূহের পুনরালোচনা হওয়া প্রয়োজন। মনে হয়, একই প্রশ্নে কানাডার নতুন সরকারের সাথে মার্কিণ রাষ্ট্রপক্ষের মত বিরোধ দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

১২ ৬৩ শিশির কুমার ধর

সম্পাদকীয়

স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণের পরিণতি :

গত ১লা জানুয়ারী ভারত সরকার সোনা চোরা চালান বন্ধ ও সোনার ব্যবহার ক্রমশ হ্রাস করার উদ্দেশ্য নিয়ে স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ আইন জারী করার পর দেশে এক জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। নূতন আইনে ১লা জানুয়ারী পর (১) ১৪ ক্যারেট পর্যন্ত বিশুদ্ধির সোনার গহণা অবাধ তৈয়ারীর ব্যবস্থা স্বীকৃত হয়েছে। এই বিশুদ্ধির উর্ধে সে-দিন থেকে সোনার গহণা তৈরী করা নিষেধ হয়ে গেছে। (২) ১লা জানুয়ারী তারিখ পর্যন্ত তৈরী গহণা ১লা ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বিক্রী হবার সুযোগ থাকলেও তারপর থেকে ঐ গহণা ১৪ ক্যারেট সোনার গহণায় পরিণত করে বিক্রি করতে হবে এবং (৩) ১লা ফেব্রুয়ারীর মধ্যে মজুত গহণা-ব্যতিরেকে সোনার হিসাব দাখিল করতে হবে। এছাড়া (৪) যারা বিদ্যুতের সাহায্যে সোনা বিশুদ্ধ করেন তাদের এবং বিক্রয় কর আইনে রেজেষ্ট্রি-ভুক্ত সোনা ব্যবসায়ীদের ১লা ফেব্রুয়ারীর মধ্যে লাইসেন্সের জন্য দরখাস্ত করতে হবে। যাদের লাইসেন্স মঞ্জুর হবে না, তাদের মজুত সোনা সরকারী দপ্তরে সরকার-নির্দিষ্ট আন্তর্জাতিক মূল্যে জমা দিতে হবে।

গত ১লা ফেব্রুয়ারী স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ আইন-নির্দিষ্ট একমাস উত্তীর্ণ হয়েছে। ঐ তারিখ পর্যন্ত পশ্চিম বাংলার ৮৮৮ জন বিক্রয়কর তালিকাভুক্ত স্বর্ণ ব্যবসায়ীর মধ্যে প্রায় ৭৫০ জন লাইসেন্সের জন্য দরখাস্ত করেছেন। যারা সে-তারিখের মধ্যে লাইসেন্সের জন্য দরখাস্ত করতে পারেন নাই তাদের ব্যবসাও বন্ধ হয়ে যাবে। সরকার ইতিমধ্যে প্রায় ৭০ জনকে ব্যবসা বন্ধের নোটিশ দিয়েছেন। লাইসেন্সের দরখাস্তের তারিখ বৃদ্ধি করে এই ব্যবসায়ীদের আর একবার সুযোগ দেওয়া কর্তব্য। এই বর্ধিত সুযোগ সাধারণ অবস্থার ব্যবসায়ীদের ও শিল্পসংশ্লিষ্ট কারিগরদের উপার্জনের পথটি অব্যাহত রাখতে সহায়তা করবে।

গহণা-ব্যতীত অন্যান্য সোনার হিসাব দাখিলের শেষ তারিখ ছিল ১লা ফেব্রুয়ারী। সেদিন পর্যন্ত কলকাতায় মাত্র ৫০০ জন তাদের নিকট মজুত সোনার হিসাব দাখিল করেছেন। সেদিনই রাত্রে রেডিও যোগে এই সময়সীমা ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বৃদ্ধি করে, কার্যত নির্দিষ্ট সময়-সীমার মধ্যে মজুত সোনার হিসাব দাখিল না করে যারা আইন লঙ্ঘন করেছেন তাদের কাছ আইন-সিদ্ধ করা হয়। মজুত সোনার অবৈধ অধিকারী বণিকরা এই একমাসে সোনার বাট প্রভৃতি গহণায় পরিণত করে আইন ফাঁকি দেবে। মজুত সোনার অধিকারীদের যে সুযোগ দেওয়া হয়েছে, লাইসেন্সের দরখাস্তের ক্ষেত্রে ছোট ছোট ব্যবসায়ীদেরও সে সুযোগ না দেওয়ার কোন সঙ্গত কারণ নেই।

স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ আইন যে সোনার বৃহৎ মজুতগুলি স্পর্শ করতে ব্যর্থ হয়েছে, সোনা, সোনার সিলি, ও সোনার গহণার বিনিময়ে স্বর্ণ ক্রয় বিক্রয়ের মেয়াদও ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বৃদ্ধি করে সরকার তা কার্যত স্বীকার করেছেন।

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত স্বর্ণ-শিল্পী-সম্মেলনে প্রস্তাবগুলি অবিলম্বে সরকারের বিবেচনা ও গ্রহণের দাবী রাখে। ১৪ ক্যারেট গহণায় কারিগরীর সূক্ষ্মতার অবকাশ না থাকার ফলে

অলঙ্কার নির্মাণের ঘুটীর শিল্পটি ধীরে ধীরে যন্ত্রচালিত অলঙ্কার নির্মাণ পদ্ধতির কাছে হার মেনে বিলুপ্ত হবে, যার শোচনীয় পরিণতিতে একটি সূক্ষ্ম কারুশিল্পের অবলুপ্তির সঙ্গে লক্ষ লক্ষ কারিগর বেকার হবে। সুতরাং ক্যাপেটের সীমানার পুনর্বিবেচনার অনিবার্য প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এবং সেই সঙ্গে শিল্পচ্যুত কারিগরদের অর্থ-নৈতিক পুনর্বাসনের দায়িত্বও স্বীকার করে নিতে হবে। এ-ছাড়া স্বর্ণ-ব্যবসায়ীদের লাইসেন্সের ফী হার পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন। ছোট-বড়-মাঝারী সকল স্বর্ণ-ব্যবসায়ীর উপর বছরে একশ টাকা লাইসেন্স ফি ধার্য করা মূলত অন্যায় ও অযৌক্তিক।

বন্ধকী সোনার অলঙ্কার সম্পর্কেও সঙ্কট দেখা দিয়েছে। বন্ধকী গহণার তালিকা সংকোচ দাবী করতে পারেন। কিন্তু বন্ধকী সোনা ফেরৎ দেওয়া এবং গহণা বন্ধক নেওয়া নিষিদ্ধ করে আদেশ জারীর ফলে সোণা বন্ধক-ব্যবসায়ীরা এক বিপদের সম্মুখীন হয়েছে। সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের ডিভিসন বেঞ্চ বন্ধকী-ব্যবসায় স্বর্ণ-নিয়ন্ত্রণ আইনের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই—এই মর্মে যে রায় দিয়েছেন, তারই পরিপ্রেক্ষিতে বন্ধক সংক্রান্ত নির্দেশ বাতিল করে এই ব্যবসায়ীদের এবং এই প্রকার গহণা গ্রহীতাদের সঙ্কোচন সরকারের আশু কর্তব্য।

কলম্বো প্রস্তাবের ফাঁদে

রাষ্ট্রপতির ভাষায় কমুনিষ্ট চীনের ভারত আক্রমণের ফলে ভারতের জাতীয় জীবনে যে "চরম দুঃখ, লজ্জা ও অবমাননাকর ঘটনা" ঘটেছে সে সম্বন্ধে ভারতীয় জনতার মনে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে এবং হৃত মর্যাদা উদ্ধারের সংকল্পে ভারতীয় মন যেভাবে রক্ত ও মৃত্যুর প্রতিজ্ঞাতিতে অটল হয়ে উঠেছে, ভারত সরকার প্রাথমিক পর্যায়ে সে সম্বন্ধে মৌলিক সচেতনতা দেখিয়ে শেষ পর্যন্ত কলম্বো প্রস্তাব গ্রহণ করে যে মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন তা শুধু দৈবাধীন অপৌরুষের সচেতনতার অভাব নয়, দীর্ঘায়ত দৃষ্টিতে ভারতের সার্বভৌম জাতীয় সত্তার পক্ষে তা আত্মহত্যার সামিল। যে কোন নিরীহ জীবের ক্ষেত্রেও কোন কোন সময়ে এমন একটি পর্যায় আসে যখন তাকে নিতান্ত আত্মরক্ষার জন্য শেষ বিন্দু শক্তি নিয়ে মরিয়া হয়ে দাঁড়াতে হয়। তেমনি কোন একটি জাতি যতই শান্তিবাদী ও যুদ্ধ বিরোধীই হোক না কেন, তার জীবনে যদি এমন কোন অবস্থার সৃষ্টি হয় যখন তারপক্ষে বিন্দুমাত্র আপোষরফা বা পশ্চাদপসরণের অর্থ আত্মসমর্পণ। তখন হয় সেই জাতিকে চরম দুঃখ ও ত্যাগের পথ বেছে নিয়ে রুখে দাঁড়াতে হয়, অন্যথায় জাতির স্বাধীনতাকে বিসর্জন দেওয়ার পথ বেছে নিতে হয়।

শান্তি ও মৈত্রীর নামে চীনের তিব্বত গ্রাসের ঘটনা থেকে আরম্ভ করে ভারত সরকার এত পিছু হটেছিল, এক তরফা বন্ধুত্বের নামে চীনের উদ্ধত সম্প্রসারণবাদী কার্যক্রমের কাছে বারবার নতি স্বীকার করে হিমালয় অঞ্চলে ভারতের যুগ-যুগান্তের স্বার্থ ক্ষুণ্ন করে চীনকে একটির পর একটি ঘাঁটি বিস্তার ও সংহতির সুযোগ দিয়ে হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত নির্বিঘ্নে এগিয়ে আসার সুযোগ দিয়েছেন যে আর সামান্য সুযোগ দিলে ভারতের স্বাধীনতা হয় চীনের হাতে বিপর্যস্ত হবে তা না হলে জাতীয় স্বাধীনতাকে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি-জোটের কাছে বন্ধক দিতে হবে।

চীনা আক্রমণের ঘটনাবলী আজ যে পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে, তার সঙ্গে শুধু গুরুতর সামরিক সংকটের প্রশ্নই সৃষ্টি হয় নি। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক সংকটের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ভারতবর্ষ। কোন জাতির সত্তা শুধু রাজনৈতিক বা সামরিক পারদর্শিতার উপরেই নির্ভর করে না, তার চেয়েও অনেক বেশি করে নির্ভর করে স্বীয় অস্তিত্ব সম্বন্ধে সেই জাতির নৈতিক আস্থা ও বিশ্বাসের উপরে। আজ ভারতের জাতীয় জীবনের এই মৌলিক প্রশ্নের সামনে দাঁড়িয়ে কলম্বো প্রস্তাব গ্রহণের অর্থ, জাতীয় নৈতিক সত্তার দিক থেকে

চীনা আক্রমণের ঔদ্ধত্যের কাছে ভারতের আত্মসমর্পণ করা।

চীনের আক্রমণের ফলে ভারতের দেশরক্ষা ব্যবস্থা যেভাবে বিপন্ন হয়েছে, মাত্র পাঁচ দিনে নেফা অঞ্চলের দেড় শত মাইল এলাকা অতিক্রম করে চীন অনায়াসে আসামে প্রবেশের যারা যেভাবে নির্মূল করে দিয়েছিল, যেভাবে একটি চীনাসৈন্য ও বন্দী করার সুযোগ না দিয়ে ভারতের সংখ্যাধিক সৈন্যবাহিনীকে বন্দী করে নিতে আক্রমণকারী সক্ষম হয়েছে, যেভাবে বিশ্বসমক্ষে সামরিক অভিযান চালিয়ে বিজয়ীর দর্পে একতরফা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে সৈন্যবাহিনী আক্রমণের প্রাথমিক লাইনে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে এবং নেফা অঞ্চলের শত্রুমুক্ত স্থানে যেভাবে ভারতসরকার নিজের সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে পুনর্দখল করবার ভরসা পায়নি—সেই সমস্ত ঘটনাবলীর যে কোন সূক্ষ্ম কূটনৈতিক বা উচ্চতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেওয়া হউক না কেন,—এই সমস্ত ঘটনাবলী ভারতের রাষ্ট্রশক্তি ও প্রতিরোধ ক্ষমতার প্রকৃতি ও সংকল্প সম্বন্ধে এসিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রে এবং সমগ্র বিশ্বে যে ধারণা সৃষ্টি করেছে তা ভারতের পক্ষে সম্মানীয়ও নয়, স্বস্তিকরও নয়।

কিন্তু সং এসিয়ার যুক্তরাষ্ট্র কলম্বো প্রস্তাব গ্রহণের সময় কেউ চীনকে ভারত আক্রমণের জন্য নিন্দা করে নি এবং কেন আক্রান্ত ভারত আক্রমণকারী কম্যুনিষ্ট চীনকে এই যুক্তরাষ্ট্র সমপর্যায়ভুক্ত করেছে তার মনস্তত্ত্বের উৎস নিহিত রয়েছে চীনা আক্রমণ প্রতিরোধে ভারতের ব্যর্থতা ও অবাস্তবিক সংকল্পের মধ্যে। কাউকে দোষারোপ করা ক্ষমতাকারীদের কর্মকৌশল হতে পারে না এই যুক্তিতে কলম্বো প্রস্তাবকারীদের পক্ষে চীনকে আক্রমণকারী বলা সম্ভব নয় বলে শ্রীনেহেরু যে ভাষ্য দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছেন শান্তিবাদের আতিশয্যে বিমূঢ় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে বা জাতি হিসেবে ভারতের পক্ষে কোন দিকদিয়েই গৌরবের হয়নি সেকথা শ্রীনেহেরুর পক্ষে অনুধাবন করাও বোধ হয় এখন সম্ভব নয়। কলম্বো প্রস্তাব গ্রহণের পক্ষে মত প্রকাশ করে শ্রীবেবর যেভাবে বলেছেন যে কলম্বো প্রস্তাব ভারতকে পিছু হটে আসতে বলেনি এবং এটা ভারতের পক্ষে বিজয়ের ('ট্রায়েম্ফ') লক্ষণ, তা' এক শোচনীয় মানসিকতার পরিচায়ক।

চীন আজ যে আগ্রাসী সামরিক শৌর্যের পরাকাষ্ঠায় এসিয়ার নেতৃত্বলাভে অগ্রসর হয়ে হিমালয় অঞ্চলে অনুপ্রবেশের ট্যাক্টিকী গ্রহণ করেছে এবং সেই নীতি অনুযায়ী ভারত আক্রমণ করেছে তাকে যদি শীঘ্র ধমায় নিন্দাকরার ও ধিক্কার দেওয়ার এবং এরূপ আক্রমণাত্মক মনোভাবের বিরুদ্ধে নৈতিক অববোধের প্রাচীর গড়ে তুলবার মত সাহস এসিয়ার নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলি না দেখাতে পারে তা হলে আজ হোক বা কাল হোক আফ্রো-এসিয়ার নিরপেক্ষ রাজনীতি চীন বা মার্কিণের গ্রাসে অবলুপ্ত হতে বাধ্য। তাই আক্রমণকারী চীনকে আক্রান্ত ভারতের সঙ্গে সমপর্যায়ভুক্ত করে কৌশলে আপোষরফার কূটনৈতিক 'চাল' দেওয়ার পরিবর্তে চীনকে আক্রমণকারী আখ্যা দিয়ে এক তরফা পশ্চাদপসারণের দাবী জানানো শুধু ভারতেরই নয়—সমগ্র এসিয়ার গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা রক্ষার ভিত্তি সুদৃঢ় করতে কলম্বো প্রস্তাবকারীরা সক্ষম হতেন। আক্রমণকারীর সঙ্গে আপোষ করে আক্রমণকারীকে আরও উপযোগীপ্রবেশে বৃহত্তর আক্রমণের সুযোগ দেওয়া ছাড়া, সার্বভৌমিকতা ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের সমমর্যাদার ভিত্তিতে শান্তি ও সহ-অবস্থানের রাজনৈতিক ক্ষেত্র রচনা করা সম্ভব হয়েছে, পৃথিবীতে এরূপ ঐতিহাসিক নিদর্শন খুবই বিরল। আক্রমণকারী চীন ভারত আক্রমণের জন্য অনুতপ্ত কিনা এবং যথার্থই শান্তি ও সহ অবস্থানের নীতির স্বপক্ষে চীনের রাষ্ট্রীয় মনোভাবের পরিবর্তন হয়েছে কিনা সেই মৌলিক যুক্তিতর্কী দ্বারা কলম্বো প্রস্তাবের গুরুত্ব বিচার করতে হবে। অতঃপর

চীনের সঙ্গে আপোষ রফার অর্থ হবে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষ রাজনীতির মূল আদর্শের আত্ম সমর্পণ। চীনের ঔদ্ধত্য, স্পষ্ট ও সামরিক শক্তিতে ভীত কলম্বো শক্তি এই মনোভাবে বিভ্রান্ত হয়েই কলম্বো প্রস্তাবের মূল বৃদ্ধিভঙ্গী ও সূত্র রচনা করেছে এবং দুর্ভাগ্যবশত ভারত সরকারও তাই গ্রহণ করেছে।

কলম্বো প্রস্তাব অনুযায়ী চীনকে নেফা অঞ্চলে ম্যাকমহন লাইন পর্যন্ত সরে যেতে হবে কিন্তু খাপলা অঞ্চল চীনের হাতে থাকবে। মধ্যবর্তী সীমান্তে বড়হোতী চীনের হাতেই থাকবে। লাদাক অঞ্চলে চীনকে ২০ কিলোমিটার পিছু হটে যেতে হবে এবং তারফলে চীন যে ২০শে অক্টোবরের আক্রমণের ফলে ২,৫০০ বর্গ মাইল দখল করেছে সেই অঞ্চল ত্যাগ করেও ১৯৫৯ সালের পর দখলীকৃত ১২ হাজার বর্গ মাইলের ৫০০ বর্গ মাইল ছেড়ে দিতে হবে। এরূপ পঞ্চাশাপসরণের পরে চীনের হাতে থাকবে ভারতের ১১,৫০০ বর্গ মাইল এলাকা। লাদাকে চীন যে স্থান ত্যাগ করে যাবে সেই অঞ্চল ভারত ও চীনের বেসামরিক যুক্ত কর্তৃত্বে শান্তিত হবে। নেফার পরিত্যক্ত অঞ্চলে ভারত সেনাবাহিনী পাঠাতে পারবে, যদিও ভারত তা করে নি এখনও। লাদাকে কলম্বো প্রস্তাব গৃহীত হলেও ভারতের কয়েকটি 'চেক পোষ্ট' চীনের হাতে থেকে যাবে। কিন্তু চীন কর্তৃক পরিত্যক্ত স্থানে ভারত কোন ফৌজ পাঠাতে পারবে না। এরূপ জাতির অবমাননাকর সর্ত ছাড়াও, ১২ হাজার বর্গ মাইল শত্রুর কবলে রেখে আক্রমণকারীর সঙ্গে আলোচনার টেবিলে বসতে রাজী হওয়ার অর্থ সুদীর্ঘ আপোষ আলোচনার অবকাশে পরোক্ষভাবে লাদাকের উপরে চীনের দখলী সত্ব স্বীকার করে নেওয়া। কলম্বো প্রস্তাব ১৭ই নবেম্বরে গৃহীত লোকসভার প্রস্তাবের সর্তের বিরোধী এবং ভারতের জাতীয় আত্মমর্যাদার পরিপন্থী। এই প্রস্তাব গ্রহণ করে প্রধানমন্ত্রী জাতির প্রতিরোধ শক্তি ও মনোবলকে ক্ষুণ্ণ করে আবার আত্মবঞ্চির অপৌরুষের পথে শত্রুকে বুহত্তর আক্রমণ করার সুযোগ সৃষ্টি করে দেবেন মাত্র। জাতির আজ চরম দুর্ভাগ্য যে যেপথে দিল্লীর কর্তৃপক্ষ ভারতকে নিয়ে চলেছেন সেটা আত্মমর্যাদার পথ নয়।

কাশ্মীর

একবার দেশ ভাগ করে যে মনস্তত্ত্বের সৃষ্টি করে ভারতকে জাতীয় অসংহতি ও স্বরক্ষার অসম্মতির পথে ঠেলে দিয়ে জাতির আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রীয় জীবনে ভারসাম্য ব্যাহত করা হয়েছে, সেই মনস্তত্ত্বের মূলধন প্রক্রিয়ায় যে কাশ্মীর সমস্যা সমাধানে কাশ্মীর ভাগ করার প্রস্তাব উত্থাপিত হবে তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। অবশ্য ভারত সরকারের পক্ষ থেকে খুব গম্ভীর কণ্ঠে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে কাশ্মীর ভাগ না করার নীতি সম্বন্ধে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়েছে। ভারত ভাগের আগেও নেতৃবর্গের কণ্ঠে এরূপ অসাম্প্রদায়িকতার অনেক সিংহনাদ ধ্বনিত হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত শিবাধ্বনির কৌশলী বুদ্ধির সাহায্যে ধর্মের ভিত্তিতে ভারতভাগ করেও সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভারতভাগ না করার অনেক বক্তব্য পেশ করতে শোনা গেছে দিল্লীর বদনশ থেকে। তাই সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে কাশ্মীর ভাগ না করার সরকারী আশ্বাসে আশ্বস্ত হওয়ার মত আস্থা ভারতীয় জনতার পক্ষে সঞ্চয় করা সম্ভব নয়।

পাক-মন্ত্রী কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের যে 'ফেজড প্রোগ্রাম' (phased programme) তথা পর্যায় ক্রমিক কর্মসূচীর প্রতি ইংগিত করেছেন তার তাৎপর্য অনুধাবন করা কঠিন নয়। উদ্বাস্তু সমস্যা, খালের জল, উদ্বাস্তু সম্পত্তি, ভারতের প্রাপ্য অর্থ ইত্যাদি সম্বন্ধে পর্যায়ে পর্যায়ে এক তরফা সুবিধা আদায় করেও পাক সরকারের কর্তৃপক্ষ ভারত বিরোধিতার জিগীর ও উত্তেজনা এবং পূর্ব বাংলা থেকে সংখ্যালঘু

বিস্তারনের কর্মসূচী অনুসরণে বিরত হয়নি। যদি পর্যায় ক্রমে কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের নীতি গ্রহণ করা হয় তা' হলে পাক ভারত উত্তেজনা প্রশমিত হবে না, পাকিস্তানের নতুন দাবীতে নতুনভাবে নতুন সংকট সৃষ্টি হবে অর্থাৎ বর্তমান যে কাশ্মীরের যতখানি অংশ চুক্তির মাধ্যমে সম্ভব গ্রাস করে নিয়ে কাশ্মীর উপত্যকার সমস্যাকে অমীমাংসিত রেখে দেওয়া হবে।

পাক-ভারতের সমস্যা তথা কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয়তা বর্তমানে গুরুত্ব অর্জন করেছে চীনের ভারত আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে। কাশ্মীর সমস্যার পাক-ভারতের সমস্যার সমাধান হলে ভারত সরকার পাক-সীমান্ত থেকে সৈন্য অপসারিত করে হিমালয় সীমান্তে নিয়োগ করতে সক্ষম হবে, – পাক-ভারত সমস্যার আশু সমাধানের মূল লক্ষ্য এই। সুতরাং পর্যায় ক্রমে কাশ্মীর সমস্যার সমাধানের পথে পাক-ভারতের উত্তেজনা প্রশমিত হবে না এবং কাশ্মীর উপত্যকার প্রশ্নের এই হল অক্ষুণ্ণ থাকবে। এরূপ অবস্থায় পাক-সীমান্ত থেকে ভারত সরকারের পক্ষে সৈন্য অপসারণ করা সম্ভব হবে না। সুতরাং, পাক প্রস্তাব অনুযায়ী পর্যায় ক্রমিক মীমাংসা ভারতের মূল লক্ষ্যের পক্ষে সহায়ক হবে না।

কাশ্মীর সমস্যার সমাধান কাশ্মীর বিখণ্ডনের পথে নয়, পাক-ভারত সংহতির পথেই সম্ভব। কিন্তু সংহতির পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য পাকিস্তানের পক্ষে একথা অনুভব করা প্রয়োজন যে চীনা আক্রমণে আজ শুধু ভারতের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমিকতাই বিপন্ন নয়, পাকিস্তানের ভবিষ্যতও বিপন্ন। সম্প্রসারণবাদী চীনের নীতিতে ভারতীয় উপমহাদেশ তো বটেই গোটা দক্ষিণ এশিয়ার ভবিষ্যত আজ এক সম্ভাব্য সামরিক সংকটের সম্মুখীন। পাকিস্তান চীনের সম্প্রসারণবাদী রাজনীতির তাৎপর্য এখনও অনুধাবন করতে সক্ষম হয়নি। তাই কাশ্মীরের সীমাবদ্ধ সুবিধার জন্য যে ভাবে পাকিস্তান চীনের পক্ষ সমর্থন করে ভারত বিদ্বেষ সৃষ্টি করেছে তার পরিণতি আশাপ্রদ নয়।

পাকিস্তান যদি আজ একথা উপলব্ধি করে যে ভারতীয় মহাদেশ সামগ্রিক ভাবে আজ সম্প্রসারণবাদী চীনের কার্যকলাপে বিপন্ন এবং এই উপমহাদেশের সামরিক রক্ষার ব্যবস্থা অবিচ্ছেদ্য তবেই সংহতির দৃষ্টিতে পাক-ভারত কনফিডারেশনের পরিকল্পনায় অগ্রসর হয়ে খণ্ড না করেই কাশ্মীর সমস্যারও সমাধান করা সম্ভব।

ছাত্র সমাজের বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা

ভারত সরকারের সম্মতি ও সাহায্যক্রমে আন্তর্বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের জন্য বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্তকে সময়োপযোগী ও প্রয়োজনীয় বলে দেশবাসী সুনিশ্চিত ভাবে সমর্থন জ্ঞাপন করবে। ভারতের পক্ষে সামরিক বাহিনী সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধক অফিসারের অভাব। এই অফিসার শ্রেণী রিক্রুটের ক্ষেত্র প্রধানত ছাত্র সম্প্রদায়। ছাত্র সম্প্রদায়ের পক্ষে সামরিক শিক্ষা-লাভের ব্যবস্থা থাকলে প্রাথমিক শিক্ষাদানের পরে অপেক্ষাকৃত সহজে এরূপ ছাত্র সম্প্রদায়ের ভিতর থেকে ব্যাপকহারে অফিসার রিক্রুট করা সম্ভব হবে।

বৃহত্তর দৃষ্টিতেও আজ ছাত্রদের সামরিক শিক্ষাদানের প্রয়োজন ভারতের জাতীয় জীবনে স্বীকৃত হবে। ভারতের জাতীয় জীবনের সামনে চীন যে চ্যালেঞ্জ তুলে ধরেছে, আজ জাতির সর্বাত্মক প্রয়াসে দেশকে তার সম্মুখীন না হয়ে উপায় নেই। ছাত্র সমাজ, যারা শিক্ষার অবসানে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানা দায়িত্ব ও উদ্যমের ভূমিকা গ্রহণ করবে তাদের মধ্যে সামরিক সুখসাবোধ থাকা বিশেষভাবে প্রয়োজন। জাতি হিসেবে ভারতবাসীর প্রকৃতি 'নরম' ও চিলেচালা। আজ বাস্তব জীবনের কঠোর সংগ্রামের সামনে, বিশেষ করে চীনের ন্যায় একটি সর্বাত্মক সামরিক ব্যবস্থায় বিশ্বাসী জাতির সঙ্গে জাতীয় মর্য্যাদা রক্ষার দ্বন্দ্বে

অগ্রসর হওয়ার জন্যও ছাত্র সমাজের সাধারণ সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা জাতির এক অনিবার্য কর্তব্য স্বরূপ।

ছাত্র সমাজের জন্য সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে, কিন্তু এ সম্বন্ধে ছাত্রী সমাজের জন্য কোন পরিকল্পনা রচিত হয়নি। ছাত্রী সমাজের সংখ্যাও বি-টি অঙ্কের,—শুধু সেজন্যেই নয়, যে কোন আধুনিক রাষ্ট্রের সমাজে ছাত্রদের সঙ্গে ছাত্রীদেরও সুংখলা শিক্ষার ব্যবস্থা না হলে যথাযথভাবে জাতীয় প্রগতি সম্ভব নয়। ছাত্রীদের জন্য সাধারণ প্রাথমিক শিক্ষা দিয়ে, নার্সিং, কোড রিসিভিং, ওয়্যারলেস ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ছাত্রী সমাজের উপযোগী বিশেষ সামরিক শিক্ষাদানের কর্মসূচী গ্রহণ করা উচিত।

ছাত্র সমাজের মধ্যে সাধারণ সামরিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়তাবোধের সক্রিয় চেতনা সৃষ্টির জন্য আদর্শনৈতিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও করা উচিত। একটি রাজনৈতিক দল ছাত্রসমাজের মধ্যে যেভাবে জাতীয়তা-দ্রোহী আদর্শবাদ প্রচারে 'তৎপর', ছাত্রসমাজকে সেই ভারত-বিরোধী শক্তির প্রভাব থেকে দূরে রেখে ভারতের জাতীয় মর্যাদা গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতার আদর্শ সম্বন্ধে আগ্রহশীল ও শ্রদ্ধাবান করে তোলার জন্য বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার সঙ্গে জাতীয় ভাবাদর্শ শিক্ষা-দানের পাঠ্যসূচীও আবশ্যিক করা প্রয়োজন।

শিলচরের হাঙ্গামা

শিলচরের সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামাকে শুধু নিন্দনীয় বললেই এরূপ হাঙ্গামার কারণ ও গুরুত্বের প্রতি যথার্থ দৃষ্টিপাত করা হয় না। সরস্বতী মূর্তির নিরঞ্জন উপলক্ষে হাঙ্গামা যেমন অবাঞ্ছনীয়, তার চেয়েও বেশী অবাঞ্ছনীয় এই যে সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের ঔদ্ধত্য ও আস্ফালন। সীমান্তবর্তী এলাকায় সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের এরূপ আচরণ সম্বন্ধে সতর্ক ও কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। ভাষার দাবীর সময় সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের উস্কানী দিয়ে যে বিষবৃক্ষ রোপণ করা হয়েছিল অবিলম্বে তা' উৎপাটিত করা প্রয়োজন। আসামের সুরক্ষার জন্য এরূপ কঠোর ব্যবস্থা অবশ্যক এবং আসাম সরকার যে সে সম্বন্ধে সচেতন ও সক্রিয় সে কথা সাম্প্রদায়িক নেতাদের জানিয়ে দিয়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা কর্তব্য। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কঠোরভাবে দমনের ব্যবস্থা করার প্রয়োজনীয়তার চেয়ে আসাম সরকার যে দৈনিক 'যুগান্তর' দুই মাসের জন্য নিষিদ্ধ করে, আবার কেন্দ্র সরকারের চাপে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে বাধ্য হন তা' আসাম সরকারের অবাবস্থিত মনের পরিচায়ক।

অ্যাফ্রো-এশিয়ান সম্মেলন

অ্যাফ্রো-এশিয়ান সলিডারিটি সম্মেলন নামে যে দুই মহাদেশীয় প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেছে তার পশ্চাতে ইন্ধন ও উৎসাহ রয়েছে প্রধানত কম্যুনিষ্ট দেশ ও পার্টিগুলির। একথা ঠিক যে আফ্রিকা ও এসিয়ায় সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ বিরোধী সংগ্রাম ও আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কিন্তু পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে যে কম্যুনিষ্ট সাম্রাজ্য-বাদেরও এক নগ্নরূপ মানব সমাজের সামনে প্রকট হয়ে উঠেছে সে সম্বন্ধে অ্যাফ্রো-এসিয়ান সলিডারিটি সম্মেলনে সামান্য চৈতন্যও দেখা যায় না।

অ্যাফ্রো-এসিয়ান সংহতি সম্মেলন থেকে বিশেষ কিছু আশা করার নেই। এই সম্মেলনটি মূলত বিভিন্ন দেশের কম্যুনিষ্ট সভ্য বা তাদের সহযোগীদের দ্বারা পরিচালিত। এই সংস্থাটির ভারতীয় শাখার সম্পাদক একজন সুপরিচিত কম্যুনিষ্ট এবং এই সংস্থার অন্যান্য সভ্যেরা হয় কম্যুনিষ্ট পার্টির সভ্য অথবা তাদের বশংবদ কংগ্রেসী সহযোগী। অ্যাফ্রো-এসিয়ান সংহতি সম্মেলনের কাছ থেকে তাই পুরাতন ও নতুন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সমভাবে যথার্থ ও ন্যায়সঙ্গত কার্যধারা আশা করা যায় না। এই সংস্থাটির কাজ প্রধানত কম্যুনিষ্ট গোষ্ঠির প্রচার যন্ত্ররূপে কাজ করা।

DIPTI

more than a household name

The Trade name Dipti is a hall mark of quality. Dipti Lanterns can easily be claimed as one of the most popular household articles throughout India Khas Janata Kerosene Cookers have earned great popularity as indispensable household utility; simple in operation, sturdy in construction and remarkable in performance these Kerosene Wick Cookers help you save time and fuel. Dipti enamel wares - proud addition to the existing range of Dipti products.

THE ORIENTAL METAL INDUSTRIES PRIVATE LTD

77, Bowbazar Street, Calcutta-12.

DIPTI LANTERNS

ENAMEL WARES

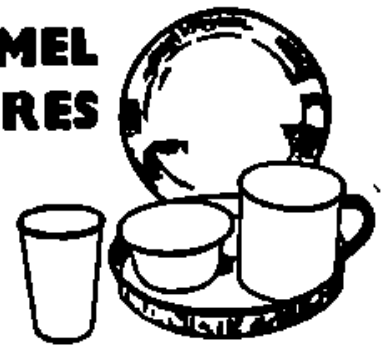

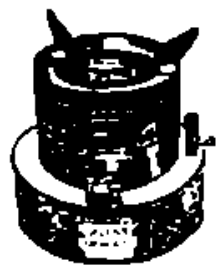

KHAS JANATA

Kalpana pm 2/A

ফাল্গুন ১৩৬৯
১১শ সংখ্যা : ২৭ বর্ষ

CALCUTT

বিবাহ ও পরিবারের ক্রমবিকাশ

অনিলচন্দ্র রায়

উরাবুন্নাদের পিরাউঙ্গুরুপ্রথা

ফিলন ও হাউইট দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ায় যৌথবিবাহের প্রচলন আছে যেমন লিখিয়াছেন তেমনি স্পেন্সার এবং গিলেন কিলন-হাউইটের মত সমর্থন করিয়াছেন যথা অষ্ট্রেলিয়ার আদিম জাতিগুলির দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া। ইহাদের মতে অষ্ট্রেলিয়ায় এককালে পূর্বে যৌথবিবাহ সার্বজনীন ছিল। এখন পুরাণ যৌথবিবাহ প্রথা আর নাই ; তার বদলে ব্যক্তিক বিবাহই এখন প্রচলিত। কিন্তু একটী জাতির মধ্যে এখনো বিশুদ্ধ যৌথবিবাহ আছে বলিয়া স্পেন্সার-গিলেনের মত। সেই জাতির নাম উরাবুন্না ["in the Urabunna tribe group marriage actually exists today....."] (Native Tribesmen) ইহারা বলেন, উরাবুন্নাদের মধ্যে ব্যক্তিক বিবাহ নামে বা কাজে কোথাও নাই। উরাবুন্না বিবাহ প্রথা এইরূপ : একজন পুরুষ এবং একজন নারীর সহিত বিশেষ স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ থাকে। ইহারা পরস্পরের 'যুপা' (অর্থাৎ প্রধান পতি বা প্রধান পত্নী) পুরুষের যুপা হইল স্ত্রী এবং স্ত্রীর কাছে যুপা হইল স্বামী। এই স্বামীর কতকজন বান্ধবী থাকে এবং তেমনি স্ত্রীরও কয়েকজন পুরুষ-বন্ধু নির্দিষ্ট থাকে যাদের সে ডাকে 'পিরাউঙ্গুরু' বলিয়া। 'পিরাউঙ্গুরু' মানে উপপত্নী বলা চলে। তাহা হইলে প্রত্যেক নারীর একজন যুপা এবং একাধিক 'পিরাউঙ্গুরু' থাকে। নারীর উপরে তার যুপার অধিকার স্বামীত্বের অধিকার কিন্তু পিরাউঙ্গুরুদের অধিকার গৌণ (Secondary) যুপা-পুরুষের সম্মতি ছাড়া কখনো স্ত্রী তার পিরাঙ্গুরুদের সহিত যৌন-ব্যবহার করিতে পারে না। আর কোন্ নারীর পিরাঙ্গুরু কে কে হইতে পারে তাহা কড়ার

"সুখী" বা জ্যেষ্ঠ-ভাইরা ঠিক করিয়া দিবে। শুধু তাই নয়। মেয়ের বাপ-মায়েরও অনুমোদন আবশ্যক। এই নারীর সহিত নির্দিষ্ট পিরাউঙ্গারু ছাড়া অপর পুরুষের যৌন-ব্যবহারে অধিকার নাই। [এখানে স্পেন্সার ও গিলেনের নিজেদের কথাই তুলিয়া দিতেছি : "To women who are the piraungaru of a man (the term is a reciprocal one) the latter has access under certain conditions, so that they may be considered as accessory wives. There is no such thing as one man having the exclusive right to one woman ; the elder brothers or Nuthie of the latter, in whose hands the matter lies, will give one man a preferential right but at the same time they will give other men of the same group a secondary right to her....the initative in regard to establishing the relationship of Piraungaru between a man & woman must be taken by the elder brothers but the arrangement must receive the sanction of the old men of the group before it can take effect ...A man may always lend his wife 'ie' the woman to whom he has the first right, to another man, provided always he be her Nupa, without the relationship of Piraungaru existing between the two but unless this relationship exists no man has any right of access to a woman—in case of a particular woman her special Nupa man has the first right to her, but if he be absent the Piraungaru have the right to her, if the Nupaman be present, the Piraungaru have the right to her, subject to his consent, which is practically never withheld."]

এখানে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে নুপা-পুরুষ ও নুপা-নারী প্রকৃত বিবাহিত স্বামী স্ত্রী। এক বিবাহ বা ব্যক্তিক বিবাহের প্রকৃতি এখানে খুব স্পষ্ট। নুপা-সম্পর্কটী স্বামী এবং নির্বিশেষ বিবাহবন্ধন। এই সম্পর্কের উপরে অন্য কোন সম্পর্ক নাই। এই স্বামী স্ত্রী সম্পর্কের বাহিরে অন্য পরপুরুষের সহিত সম্পর্ক অবস্থা-বিশেষে স্বীকৃত হয়, একথা সত্য। কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যক্তি সম্পর্কে এই যৌন অধিকারের স্বীকৃতি স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধের একটা সম্প্রসারণ বা Extension, ইহা ব্যক্তিক বিবাহকে ভিত্তি করিয়াই একটা বিচ্যুতির সৃষ্টি হইয়াছে বলা চলে। নুপা-নরনারীর মধ্যে পরস্পরের পূর্ণ অধিকার এবং স্বামীর সর্বাঙ্গীন কর্তৃত্ব রহিয়াছে। পিরাউঙ্গারুদের মধ্যে পরস্পরের অধিকার সাময়িক, খণ্ডিত এবং গৌণ এখন প্রশ্ন হইল, পূর্বে উরাবুন্নাদের বিবাহ প্রথা কি ধরণের ছিল? স্পেন্সার ও গিলেন বলেন, পূর্বে নুপা ও পিরাউঙ্গারু এই দুরকমের সম্পর্ক ছিল না, হয়ত একদল পুরুষ নারীর মধ্যে সকলেরই সমান ও পূর্ণ অধিকার বিদ্যমান ছিল। পরে সংকুচিত হইয়া একজন মাত্র স্বামী স্ত্রী বা নুপার বেলায় পূর্ণ অধিকারে পর্যবসিত হইয়াছে। অন্যদের বেলায় অধিকার খর্ব হইয়া পিরাউঙ্গারু সম্বন্ধে দাঁড়াইয়াছে। স্পেন্সার ও গিলেনের মতে এই পিরাউঙ্গারু-প্রথা প্রাচীনকালের পূর্ণ যৌন-বিবাহেরই অবশেষ বা survival. কিন্তু সবকিছুকেই কল্পিত একটা প্রাচীন প্রথার অবশেষ বলিয়া ব্যাখ্যা করিবার এবং সকল ক্ষেত্রেই অধিকার ও সম্পর্কের সঙ্কোচন বা contraction ঘটিয়াছে বলিয়া ধরিয়া লইবার পক্ষে ইঁহাদের কোন যুক্তি নাই। সমাজের গতি ও বিকাশকে একটা সার্বভৌম ছাঁচে ফেলিয়া দেখাইবার এই মনোভাব বৈজ্ঞানিক নয়। তাই ওয়েষ্টারমার্ক সাবধান করিয়াছেন যে সত্য উদ্ঘাটনের পক্ষে

এই ধরণোক্তির অত্যন্ত ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক, কারণ কোনো প্রথা পূর্বতন অন্যকোনো প্রথার ধ্বংসাবশেষ কিনা তা কিরূপে প্রমাণ করা যাইবে। [Here we are on dangerous grounds, nothing is more difficult than to decide whether certain customs are survivals or not." (Westermarck 394)] বহু ক্ষেত্রেই অবশেষ বলিয়া মনে করা যারাত্মক ভুল হইতে পারে, তাহা তো প্রত্যক্ষ। ওয়েষ্টারমার্ক বহুপতিকতা (Polyandry) এবং বহুপত্নীকতা (Polygyny) এই দুই সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে এই দুই প্রথাতেও প্রধান পতি ও প্রধান পত্নী থাকিতে পারে। বহুপতিক পরিবারে প্রথম পতিই সাধারণতঃ প্রধান স্বামী। তেমনি বহুপত্নীক পরিবারেও প্রথম পত্নীই প্রধান পত্নী হইয়া থাকে। এই সব ক্ষেত্রে যদি কেহ মনে করে, পূর্বে সকল পতিই সম-অধিকারে সমান পতি ছিল, পরে একজন প্রধান পতি দাঁড়াইয়া গিয়াছে তবে বাস্তবতথ্যের দিক হইতে গুরুতর ভুল হইবে। তেমনি বহুপত্নীক বিবাহে প্রাচীনকালে সকল পত্নীই সমান ছিল এবং বর্তমানে যে প্রধান পত্নী দেখা যায় তাহা অন্যদের অধিকারের সঙ্কোচন হইয়া একজনের প্রধান পত্নীত্বটুকুই শুধু ধ্বংসাবশেষ রহিয়াছে, এরূপ বলিলেও ঐতিহাসিক ভুল করা হইবে। অর্থাৎ এই দুই ক্ষেত্রে প্রধান পতি ও প্রধান পত্নীত্বের প্রথাটী প্রাচীন কালের অবশেষ মাত্র একথা ভুল। এক বিবাহের থেকেই ক্রমপ্রসারণ দ্বারা পতি ও পত্নীর সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। তাই প্রথম পতি ও পত্নীকে মর্যাদা দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে উত্তরন নীতি যেমন ভুল তেমনি পিরাউমুক প্রথার কোনোও উত্তরন নীতির প্রয়োগ ভ্রান্তিকর।

উরাবুন্না সমাজেও প্রাচীন কালে ব্যক্তিকবিবাহ প্রচলিত ছিল। একবিবাহের সম্প্রসারণ ঘটিয়া পরে উপদম্পতীপ্রথা (পিরাউমুক-প্রথা) প্রচলিত হইয়াছে। তাই এই প্রথার ভিত্তি বা পীঠভূমি হিসাবে যুগা-প্রথার ব্যক্তিক বিবাহ রহিয়া গিয়াছে। একবিবাহের সম্প্রসারণ বহু কারণে ঘটিতে পারে। ওয়েষ্টারমার্ক একটী কারণের উল্লেখ করিয়াছেন। একবিবাহ বা ব্যক্তিবিবাহ যে সমাজে প্রচলিত সেখানে যদি কোন্ কারণ বশতঃ নারীর সংখ্যা পুরুষের চাইতে কমিয়া যায়, তাহা হইলে এই ধরণের উপদম্পতী প্রথা উদ্ভব হইতে পারে। পূর্বেকার স্বামীস্ত্রী প্রধান দম্পতী থাকিয়া অপর পুরুষ ও নারীদের যৌন-জীবনের সুযোগদান করিবার জন্য উপদম্পতী স্বীকৃত হইতে পারে। কিন্তু এই স্বীকৃতি নানা শর্তের অধীনে এবং নানা বিধিনিষেধের গণ্ডীর মধ্যেই বহাল থাকিবে, ইহা খুব স্বাভাবিক। নৃতাত্ত্বিক টমাস (N. W. Thomas) তাহার "অষ্ট্রেলিয়ায় আত্মীয়তা ও বিবাহ" (Kinship & Marriage in Australia) নামক বইয়ে এই মতই সমর্থন করিয়াছেন। ওয়েষ্টারমার্ক বলেন: "Similarly the Urabunnna custom may very well have developed out of ordinary individual marriage and the cause of it may perhaps be, as Mr. N. W. Thomas has suggested, the difficulties which an Australian native often experiences in getting a wife." (W. 324)

কেবল কল্পনা ও অনুমান করিলেই চলিবে না। যে তথ্য হইতে যে সিদ্ধান্ত স্বাভাবিকভাবে আসিতে পারে তাহাকে বিচার ও পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। তথ্যের ভিত্তিতে যতটুকু অনুমান করা যুক্তিসহ তাহার অতিরিক্ত অনুমান করা বিজ্ঞান সম্মত হইতে পারে না। এই উরাবুন্নাদের পিরাউমুক উপদম্পতীপ্রথা দুই ভাবেই ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। ইহা পূর্বতন যৌথবিবাহের সঙ্কোচন দ্বারা সৃষ্টি হইয়াছে, একথা বলাও চলে। কিংবা পূর্বতন একবিবাহের সম্প্রসারণ দ্বারা ইহার উদ্ভব হইয়াছে, এরূপ ব্যাখ্যাও করা যাইতে পারে। কোন্ সিদ্ধান্তটী বৈজ্ঞানিক রীতিসম্মত এবং গ্রহণযোগ্য তাহা ঠিক করিতে হইলে অন্যান্য নানা যুক্তি ও তথ্যের আলোকে বিচার করিতে হইবে। মনস্তত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব

নৃতত্ত্বের সাক্ষ্য নিতে হইবে এবং ইহাদের যুক্তি ও তথ্যের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া পূর্বকালীন জীবন সম্বন্ধে ধারণা গঠন করিতে হইবে। পূর্বের অধ্যায়গুলিতে যে সব তথ্য ও যুক্তি দেওয়া হইয়াছে তাহার আলোকে ওয়েষ্টার-মার্ক, টমাস, ক্রলী প্রভৃতি পণ্ডিতদের সিদ্ধান্তই বিজ্ঞানসম্মত। একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে পূর্বতন একবিবাহ হইতেই পরবর্তিকালে এই পিরাউন্নুক-প্রথার উদ্ভব হইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়ার আদিম জাতিগুলি সম্বন্ধে টমাস সাহেব (N. W. Thomas) বিশদ আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে অষ্ট্রেলিয়ার পূর্বে যৌথবিবাহ সার্বজনীন প্রথা ছিল এ মত ভিত্তিহীন। ["It is therefore not rash to say that the case for group marriage, so for as Australia is concerned, falls to the ground" (N. W. Thomas)]

ক্রলীও এই মতই সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলেন, যুগ্ম বা স্বামীর সার্বভৌম অধিকার ইহাদের এই প্রথার মূল কথা। এই স্বামীর প্রাধান্য ও প্রবল অধিকার হইতেই "একবিবাহ" যে বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা প্রমাণ হইয়া যায়। উপদম্পতী প্রথার অন্তরালে আসল ব্যক্তিক বিবাহটী যে স্পষ্ট ও নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে স্থায়ী হইয়া রহিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার [উপায় নাই। তাহার কথায় "The very fact that the husband's consent must be obtained proves that he is the women's husband and that individual marriage exists, though slightly modified." (Crawley, 450).

এই পিরাউন্নুক প্রথার উদ্ভব সম্বন্ধে কিন্তু ক্রলী অন্য মত দিয়াছেন। তিনি বলেন পত্নী ধার-দেওয়া (wife lending) প্রথা হইতে ইহার উদ্ভব হইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়ায় ইতিপূর্বেই হয়তো বহু বিবাহের (বহু পতিকতা ও বহু পত্নীকতা) দিকে ঝোঁক সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। বহুবিবাহের দিকে প্রবণতা এই পত্নী ধার দেওয়ার প্রথাকে প্রবল করিয়া তুলিয়াছে, শক্তি দিয়াছে। ইহা ছাড়া ধর্ম ও ম্যাজিকের প্রভাবও এই ব্যাপারে কাজ করিয়াছে। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে উৎসব এবং জনসমাগমের উপলক্ষ্যেই এই প্রথার প্রচলন হইয়া থাকে। উপদম্পতী নির্ধারণ ব্যাপারটীই এই সব উপলক্ষ্যে হইয়া থাকে। অসভ্যজীবনে সব কাজ কর্মই একটা গূঢ় ধার্মিক উদ্দেশ্য লইয়া করা হয়; যৌন-জীবনের অনুষ্ঠানগুলিও ইহাদের কাছে গভীর ভয় এবং বিস্ময়, অজ্ঞাত প্রভাব ও অজানাবিপদের ছায়ায় আবৃত ও সর্বদাই রহস্যময়। যৌনমিলন ব্যাপারটীও ইহাদের কাছে ভয় ও রহস্যের উৎস। তাই এই যৌনজীবনের ধারাটীও ইহাদের এমন পথে চলে যা' আমাদের মানসের কাছে অদ্ভুত ও অর্থ-হীন বলিয়া মনে হওয়া স্বাভাবিক। ব্যক্তিক বিবাহের সঙ্গে সাময়িকভাবে অপর পুরুষ ও নারীকে যৌনজীবনের সহিত যুক্তকরার পিছনে কোন অজ্ঞাত অশুভ প্রভাব এড়াইবার মনোভাবও থাকিতে পারে। হয়ত এই পদ্ধতির আনুষ্ঠানিক ফল কোন অলৌকিক কল্যাণকে প্রসব করিবে এই কুসংস্কারও থাকিতে পারে। অসভ্যজীবনে কুসংস্কারের তীব্র ও সর্ববাপী প্রভাবকে সকল নৃতাত্ত্বিকই স্বীকার করিয়াছেন। ক্রলী বলেন, ইহাদের সামাজিক প্রথার মূল অর্থ টাকে ধরিতে হইলে ধর্ম ও ম্যাজিকের প্রভাবটুকুকেই বাহির করিতে হইবে। বাহ্য আকৃতি দেখিয়া বিচার করিলে চলিবে না, ভিতরের প্রকৃতিটুকুকে বুঝিতে হইবে। সেখানেই ম্যাজিকের প্রভাব সব কিছুর আড়ালে অদৃশ্য শক্তির মত কাজ করিতেছে। বহুবিবাহের প্রবণতা ও তার প্রভাবের কথা ক্রলী বলিয়াছেন। বহুবিবাহ—বিশেষতঃ বহু পতিকতা (Polyandry) পৃথিবীতে খুব বিরল প্রথা এবং অস্বাভাবিক পদ্ধতি। ইহা সকলেই স্বীকার করেন। মর্গানীরাও ইহা মানেন। অষ্ট্রেলিয়ায় বহু পতিকতা ও পত্নী ধার দেওয়া ইত্যাদি নানা কারণের সমাবেশ হওয়ায় একটা বিশিষ্ট বিকৃতি

ঘটিয়া গিয়াছে। তাই ব্যক্তিবিবাহ সম্প্রসারিত হইয়া এখানকার বিশেষ অবস্থায় এই পিরাউয়ুক প্রথা সৃষ্টি হইয়াছে।

N. W. Thomas-এর মতের সহিত ক্রলীর মতের কোন বিরোধ নাই। টমাসও তো বলিয়াছেন, নারীর দুষ্প্রাপ্যতা হইতে এই প্রথা আসিয়াছে। নারীর দুষ্প্রাপ্যতা হেতু বহু পতিকতার দিকেও প্রবণতা সৃষ্টি হইয়া থাকে। কাজেই ক্রলীর মতের মধ্যেও নারীদুষ্প্রাপ্যতা স্বীকৃত। তবে ক্রলী ধর্ম ও ম্যাজিকের প্রভাবের উপর জোর দিয়াছেন। ওয়েষ্টার মার্কও এসব প্রথার পিছনে ম্যাজিকের প্রভাব থাকিতে পারে বলিয়া বলিয়াছেন। হয়তো এই সব প্রথার মারফতে কোন অলৌকিক মঙ্গল অপরিচিত পথে সাধিত হয় বলিয়া ইহারা মনে করে।

ক্রলীর মতে, ওয়েষ্টারমার্কই এই সব প্রথার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা চূড়ান্তভাবে করিয়াছেন। মর্গানীরা যে ভ্রান্ত তাহাও তিনি চূড়ান্তভাবে দেখাইয়াছেন। ফিসন ও হাউয়িট যে যৌথবিবাহের ধূয়া তুলিয়াছিলেন তাহা ওয়েষ্টারমার্কই ভ্রান্ত প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। তবে নূতন করিয়া স্পেন্সার ও গিলেন যে আবার ফিসন-হাউয়িটের মতকেই সমর্থন করিয়াছেন তাহা ক্রলীর মতে অসঙ্গত। কারণ নূতন কিছু প্রমাণ নূতন করিয়া আবিষ্কৃত হয় নাই। কাজেই এ সমর্থন সমীচীন হয় নাই; "too early given their assent to Fison and Howitt's interpretation of group marriage." উরাবুরাদের বিবাহ প্রথাকে স্পেন্সার ও গিলেন ঠিক ঠিক বুঝিতে পারেন নাই, ইহার মর্মার্থ ধরিতে পারেন নাই। উরাবুরাদের উপদম্পতী-প্রথার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ইহারা একেবারে অবাস্তবসংসর্গ এবং যৌথবিবাহে পৌঁছাইয়াছেন; এই চেষ্টা অবৈজ্ঞানিক। ইহারা যে ওয়েষ্টারমার্ককে সমালোচনা করিয়াছেন তাহাও ভ্রান্ত. "It will be clear……that Messrs Spencer & Gillen have misunderstood their origin and meaning and that their criticism of Westermarck's condemnation——is mistaken" (445 Crawley.)

ক্রলী বলেন, উরাবুরাদের এই বিবাহপ্রথা পার্শ্ববর্তী জাতি এরাণ্টা (Aruntа)-দের বিবাহপ্রথা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। এরাণ্টাদের মধ্যে পত্নীধার দিয়া অতিথি-সৎকার প্রথা এবং উৎসবসংকর (feast licence) প্রচলিত আছে। ব্যক্তিক বিবাহই ইহাদের মধ্যে মূল পদ্ধতি। কিন্তু কোন অতিথি আসিলে তাহাকে শয্যাসঙ্গিনী দান করা ইহাদের ধর্মীয় কর্তব্য বলিয়া মনে করে। তেমনি বিশেষ উৎসব উপলক্ষে জনসমাগমে ইহাদের মধ্যে সংযমের শিথিলতা ঘটে এবং অনেক উচ্ছৃঙ্খল যৌনব্যবহারও সমাজে স্বীকৃত হয় ঐসময়ের জন্য। এই সব প্রথা যে বিশেষ অবস্থার সৃষ্ট সাময়িক বিকৃতি এবং এই বিকৃতির পশ্চাতে যে স্থায়ী বিবাহ বিদ্যমান, তাহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। ক্রলী বলেন, এই পত্নীধার দেওয়ার প্রথাই যখন একটা স্থায়ী পদ্ধতির মধ্যে দাঁড়াইয়া গেল তখনই এই উপদম্পতী প্রথার আবির্ভাব ঘটিল। ইহাই বর্তমান পিরাউয়ুক প্রথা। স্পেন্সার ও গিলেন পিরাউয়ুক নারীদের আখ্যা দিয়াছেন "accessory wives" বা অতিরিক্ত পত্নী। ক্রলীর মতে ইহাদের অতিরিক্ত পত্নী বলা অসঙ্গত। উরাবুরাদের মধ্যেও পিরাউয়ুক প্রথা সাধারণ জীবনে আচরিত হয় না। ইহা সাময়িক, এবং বিশেষ অবস্থা বা উপলক্ষ ঘটিলেই ইহার আশ্রয় নেওয়া হইয়া থাকে। ইহার কার্যতঃ ব্যবহার অতি বিরল। সাময়িক একটা বিচ্ছিন্ন অধিকারের নাম "পত্নীত্ব" দেওয়া অনুচিত। যাহারা পিরাউয়ুক হইতে পারে তাহারা নির্দিষ্ট, এবং তাহারাও যে এই প্রথার সদ্ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহা নয়। স্বামী অনুমতি না দিলে পিরাউয়ুকদের এই অধিকার আদায়ের উপায় নাই।

শুধু উরাবুরাদের যৌন শৈথিল্য দেখিয়া অষ্ট্রেলিয়ার প্রাচীন কালে সকল জাতির মধ্যেই একটা যৌথ-বিবাহ সার্বজনীন ছিল, এই ধরণের সার্বিক সিদ্ধান্ত করা স্পেন্সার-গিলেনের পক্ষে অন্যায় হইয়াছে। আর স্পেন্সার গিলেনও তো স্বীকার করিয়াছেন যে অষ্ট্রেলিয়ারও অন্তঃ এ প্রথা নাই, শুধু উরাবুরা প্রথার উপরেই এরা নির্ভর করিয়াছেন।

ডিয়েরী

উরাবুরাগোষ্ঠীরই রক্ত-কের ইহাদেরই সমজাতীয় 'ডিয়েরী' (Dieri) জাতির মধ্যে পাওয়া যায়। ডিয়েরী জাতি দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ার লেক আয়ার (Eyre) হ্রদের আশে পাশে বাস করে। ইহাদের মধ্যে 'পিরাউরু' (Pirrauru) বিবাহ-প্রথা প্রচলিত আছে। কোন ব্যক্তি 'ক'র একজন প্রধান স্ত্রী আছে 'প',[১] একে বলা হয় 'টিন্ডাথাপুরু'। অন্য একজন পুরুষ 'খ'র আছে প্রধান পত্নী 'ন'[২]। এই প[২] আবার উপপত্নী 'পিরাউরু' হল 'ক'র। তেমনি আবার প্রধান পত্নী 'প'[১] হইতে পারে 'খ'র পিরাউরু। দুই ব্যক্তির দুই স্ত্রী, এদের এক স্ত্রী হইল 'ক'র প্রধান পত্নী ও 'খ'র উপপত্নী। অন্য স্ত্রী আবার খ'র প্রধান পত্নী ও 'ক'র উপপত্নী। 'পিরাউরু'কে ঠিক উপপত্নী বলা সঙ্গত নয়। কারণ স্বামীর অনুমতি পাইলে তবেই পিরাউরু সম্পর্কের পুরুষের সহিত সংসর্গ ঘটিতে পারে। তাছাড়া এই পিরাউরুগমন অতি কদাচিৎ ঘটিয়া থাকে। [Such a man may, with his husband's permission, have access to her on rare occasion (Malinowski). যদি কখনো, স্বামী অনুপস্থিত হয় এবং যদি অনুমতি দেয়, পিরাউরুনারী পিরাউরু পুরুষের বাড়ীতেও যাইয়া সাময়িকভাবে থাকিতে পারে। কিন্তু ইহা অতি বিরল ঘটনা। কিন্তু পূর্বে উপজাতীয় বয়োবৃদ্ধদের দ্বারা 'পিরাউরা' বলিয়া নির্বাচিত না হওয়া পর্য্যন্ত স্বামী তাহার দাম্পত্য অধিকারের এই সাময়িক শৈথিল্য টুকুও করিতে পারে না। এই প্রথার বিরোধীও আরো নানা শক্তি কাজ করিতেছে বলিয়া ইহা সাধারণ প্রচলিত প্রথা হইয়া দাঁড়াইতে পারে না। একে তো স্বামীর সার্বভৌম কর্তৃত্ব রহিয়াছে, তাহাকে অনিচ্ছাসত্ত্বে বাধ্য করিয়া সম্মতি আদায়ের কোন পথ নাই। তাহার উপরে, পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষা, নারীদের বহুপুরুষ গমনের অপ্রবৃত্তি প্রভৃতি কারণে এবং অন্যান্য পরিপন্থী অবস্থা হেতু এই 'পিরাউরু' প্রথার বাস্তব ব্যবহার বা প্রয়োগ অতি বিরল, একথা ম্যালিনাউস্কীও বলিয়াছেন। ["circumstances, jealousy, even the disinclination of women, are obstacles, all of which must make the carrying out of 'Pirrauru' rights extremely rare. (Malinowki II)

উপদম্পতী (Concubinage) প্রথায় উপপত্নী প্রভৃতিরও আইনসঙ্গত মর্যাদা আছে এবং আইনের চোখে স্থায়ী সামাজিক ফলাফল আছে। কিন্তু এই সব নিতান্ত সাময়িক যৌনমিলনের বিরল অধিকারকে ম্যালিনাউস্কী তাই উপদম্পতি প্রথা বলিতে আপত্তি করিয়াছেন। [It is not correct to regard the institutions of temporary and limited partnership described above, such as true 'Pirauru' of Central Australia or the protracted exchange of partners among the Eskimo, as concubinage' (B. Mali II) দাম্পত্য প্রথা তো শুধু যৌনসম্বন্ধের অধিকারটুকুকেই বলা চলে না। বিবাহপ্রথা একটা জটীল সামাজিক প্রতিষ্ঠান। ইহার মধ্যে নানা বৃত্তি, বিবিধ প্রয়োজন এবং বহু সামাজিক দাবির মিশ্রন ঘটিয়াছে। একদিকে অর্থনীতি ও ধর্মীয় প্রয়োজন, অন্যদিকে যৌনজীবন, বাৎসল্য ও পিতৃ-মাতৃক (Parental) দায়িত্ব, এই সব বিভিন্ন দিকের সমাবেশে বিবাহ সৃষ্ট হইয়াছে। এই কারণে এই সব পিরাউরু প্রথা প্রভৃতিকে "বিবাহ" সংজ্ঞার মধ্যেই ম্যালিনাউস্কী আনিতে চাহেন না। সুতরাং "যৌথ-

বিবাহ' শব্দটীও তাঁর মতে ভ্রান্ত সংজ্ঞা। ["From this point of view we can at once eliminate 'group marriage' since our previous analysis has shown that the Pirrauru relationship of Australia & similar institutions among the Eskimo and in Siberia, cannot in their parental, economic, legal or religious functions be regarded as a form of marriage." (B, Mali II)

ম্যালিনাউস্কীর মতই বিজ্ঞান সম্মত। এই সব একান্ত বিচ্ছিন্ন সাময়িক যৌন শৈথিল্যকে "যৌথবিবাহ" বলিয়া একটা স্তর বাঁধিয়া দেওয়ার কোন ভিত্তি নাই। অসভ্যদের জীবনেও "বিবাহ" যে শুধু যৌনব্যাপার মাত্র নয়, এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ম্যালিনউস্কী বাস্তব সত্যের দিকেই বিজ্ঞানী-দের দৃষ্টিকে পরিচালিত করিয়াছেন।

লাউয়ীও ডিবেরী বিবাহপ্রথার বিস্তৃত বিশ্লেষণ করিয়াছেন। ডিবেরীদের মধ্যে দুইরকম মাসতুত বোনের সঙ্গে বিবাহ প্রচলিত। এই দুই মাসতুত বোন হইল (১) মা'র মামাত বোনের মেয়ে (২) মা'র পিসতুত বোনের মেয়ে। কোন ছেলে ও মেয়ে পরস্পরের মধ্যে ঠিক এই সম্পর্ক থাকিলে তাহারা দম্পতী হইতে পারে। এই ক্ষেত্রে বাপেই বাগ্‌দান হইয়া থাকে এবং মায়েরা এবং মামারাই এসব ব্যবস্থা করে।

এই প্রথায় এক নারীর একাধিক বাগ্‌দত্ত পতি হইতে পারিবে না। এই বৈশিষ্ট্যটুকু লক্ষ্য করিবার বিষয়। কিন্তু বিবাহের পরে এই নারী অন্ত কয়েকজন পুরুষের—বিবাহিত বা অবিবাহিত—উপপত্নী বা পিরাউক হইতে পারে। (পূর্বে বলা হইয়াছে বয়োবৃদ্ধদের নির্দিষ্ট ব্যক্তিরাই শুধু পিরাউক হইতে পারে) কিন্তু লাউয়ী বলেন, কতদূর পর্যন্ত ও কাদের মধ্যে ঠিক এই পিরাউক সম্পর্ক কার্যতঃ বিদ্যমান তাহার কোন নির্ভরযোগ্য সংখ্যা তালিকা পাওয়া যায় না, কেবল হাউয়িটের কিছু বিবৃতিমাত্র আছে এ সম্বন্ধে। ["Precise statistics showing to what extent & between whom such marital relations obtain are unfortunately lacking" (50 Lowie)] তবে হাউয়িটের অসম্পূর্ণ বর্ণনা হইতেও ইহা মনে হয় যে এই অধিকার কচিৎ কদাচিৎ বাস্তব জীবনে কাজে আসে। মনে হয় যে কার্যতঃ কেবল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরাই একাধিক উপ-পত্নী বা পিরাউক পাইতে পারে। সাধারণ লোকদের এক পত্নী লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে বয়োবৃদ্ধেরাই নির্দেশ দিয়া থাকে। [In practice it seems that only men of distinction are likely to have a number of concubines: other will be advised by the Dominant elders to confine themselves to a single one' (50-Lowie)

ম্যালিনাউস্কীর মত লাউয়ীও অনস্তাত্ত্বিক বাধার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতেও, কার্যতঃ বেশী পিরাউক হইতেই পারে না, কারণ পিরাউকদের পরস্পরের ঈর্ষাই তাহার পরিপন্থী হইবে। পিরাউক-রা নতুন পিরাউক গ্রহণে তীব্র বিরোধিতা সাধারণতঃ করিয়া থাকে। নতুন সম্পর্ক স্থাপনের সন্দেহ করিলেই পুরুষের বাধায় তাহারা পরম কয়লা ঢালিয়া দিতে পারে, এমন অধিকার তাদের আছে।'

["A further check to excessive concubinage lies in the mutual jealousy of the subsidiary mates, each of whom discountenances new relation of concubinage, being permitted to pour hot coals over the mate suspected of a liaison." (Lowie-50)]

এটা নারীদের সমাজ-স্বীকৃত অধিকার। ইহাতে প্রমাণ হয় যে নারীদের স্বভাবসিদ্ধ বিরাগ ও বিরুদ্ধতা রহিয়াছে বহু প্রসক্তির উপরে। সমাজও সেই বিরুদ্ধতাকে স্বীকার করিয়াছে এই চরম অধিকার নারীকে দান করিয়া।

এখানে দুইটী বৈশিষ্ট্যের দিকে লাউয়ী দৃষ্টি আকর্ষণ

করিয়াছেন : (ক) পত্নী ও উপপত্নীরা একই সংসারে বা গৃহে থাকিলে পত্নীর অধিকার সকলক্ষেত্রে ও ব্যাপারেই সার্বভৌম (খ) আবার পিরাউক্সদের বিরুদ্ধে স্বামীর অধিকার সর্বাগ্রগণ্য। কোন উপ-পত্নীকে কোন পিরাউক্স পুরুষ গোপনে হরণ করিবার অধিকারও নাই, করিলে আইন অনুযায়ী শাস্তি হইবে। স্বামীর মতামতের বিরুদ্ধে পত্নীর এ বিষয়ে কোন আপীল বা প্রতিকারও নাই।

একটী সামাজিক প্রথা-বিশেষ করিয়া কোন অন্তরঙ্গ জীবনের জটীল অনুষ্ঠানকে—সঠিক ভাবে বুঝিতে হইলে খুটীনাটি তথ্যগুলি সবই সেই প্রথা সম্বন্ধে জানা দরকার। লোকগুলির মনস্তত্ত্ব জানা চাই, পিছনের ঠিক উদ্দেশ্যটী বোঝা চাই, এছাড়া সংখ্যাতালিকা বা statisticsও অত্যন্ত দরকার। হাউয়িট্ জেমনভাবে এই পিরাউক্স প্রথার বিচার না করিয়া বাইরের থেকে কিছু খবর সংগ্রহ করিয়াই অষ্ট্রেলিয়ার এই ধরণের সবপ্রথাকেই সমানভাবে একেবারে সরাসরি "যৌথ বিবাহ" আখ্যা দিয়া বসিয়াছেন। লাউয়ী বলেন ইহা যুক্তিযুক্ত হয় নাই ; কারণ এই সব প্রথার মধ্যেই নানা স্থানে নানা রকম বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য রহিয়াছে, সব কিছু এক শ্রেণীর নয়। দৃষ্টান্ত ভাইকে কিছু যৌন অধিকার আপন পত্নীর উপরে দেওয়া, কিংবা আতিথ্য হিসাবে নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে শয্যাসঙ্গিনী দান কিংবা বয়োবৃদ্ধদের নির্দ্দেশে পিরাউক্স নির্ধারণ,—এই সব প্রথার কোনটীর সহিত কোনটীর সম্পূর্ণ সাদৃশ্য নাই'। ইহাদের স্বরূপ ও সামাজিক সার্থকতার দিককে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ না করিয়াই সবগুলি প্রথাকে "যৌথ-বিবাহ" নাম দেওয়া ঠিক হয় না। তাই "যৌথ-বিবাহের" সহিত ডিয়েরী প্রথার পার্থক্য দেখাইয়া লাউয়ী বলেন, "group marriage might rightly be predicated of a community in which a group of men shared marital rights on equal terms over a corresponding group of women. no such condition obtains among the Dieri. The husband is well-nigh absolute overlord, over his wife's actual life, the concubitant is a mere substitute"] (Lowie—51)

পূর্বেই বলা হইয়াছে, বিবাহ শুধু যৌন মিলন নয়, অন্যান্য সামাজিক দায়িত্ব ও অধিকারের সহিত যুক্ত হইয়া যৌন মিলন বিবাহ পর্য্যায়ের মধ্যে পড়িতে পারে। যেখানে সমান অধিকারে ও দায়িত্বে একদল পুরুষ ও একদল নারীর যৌথ মিলন হয় তখনই যৌথ বিবাহ হইতে পারে। ডিয়েরীদের বেলায় যৌথবিবাহের এই লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। এখানে স্বামী ও স্ত্রী, খুব স্পষ্ট ও জোরালো ভাবে নির্দিষ্ট, স্বামী-স্ত্রীর অধিকার যেখানে সার্বভৌম ও সর্বাগ্রগণ্য' পিরাউক্স-উপপতি যেখানে কেবল যৌন ব্যাপারে সাময়িক শৈথিল্যের অংশভাগী কিন্তু অন্য সামাজিক অধিকার-বঞ্চিত, সেখানে একবিবাহই ভিত্তিগত জীবন এবং সাময়িক শৈথিল্যটী এই একবিবাহেরই বিকৃতি মাত্র। স্বামীর প্রভাব ও অধিকারের কাছে পিরাউক্সর স্থান অকিঞ্চিৎকর "completely overshadowing by one partner of the others ....." (Lowie), স্বামীর এই সর্বাভৌম প্রাবল্য ব্যক্তিক বিবাহেরই বিশিষ্ট লক্ষণ। তাহা ছাড়া ইহাদের মধ্যে বিবাহটী জীবনব্যাপী, দৃঢ়মূল এবং স্থায়ী, কিন্তু এই-উপ-বা-অপদাম্পত্যটী ক্ষণিক ও অস্থায়ী ["..... while marriage among the Dieri is permanent the actual state of concubinge is ordinarily of quite temporary duration" (Lowie—52)]

অন্যদিক হইতেও বিচার করিয়া হাউয়িটের মতকে ভ্রান্ত বলিবার কারণ আছে। অনুমানমূলক একটা কল্পনার ভিত্তিতে প্রথাকে ব্যাখ্যা করিলেই চলিবে না ; ব্যবহারিক জীবনে বাস্তব প্রয়োগের দ্বারা যাচাই করিয়াও মতবাদের সম্ভাব্যতা বা অসম্ভাব্যতা দেখিতে হইবে। ডিয়েরী সমাজের বাস্তব

পরিস্থিতি কি? ইহাদের জনসংখ্যা এত কম, যে তাহাতে যোনসম্পর্কের মধ্যে উপদম্পতী মিলা প্রায় অসম্ভব। ইহার উপরে যখন 'ঈর্ষাবৃত্তি' এবং বয়োবৃদ্ধদের শাসন ও নিয়ন্ত্রণ যোগ করা হয় তখন দৈনন্দিন জীবনে ডিয়েরীদের পক্ষে এই প্রথা কার্যতঃ অচল হইয়া পড়ে। বয়োবৃদ্ধ শাসন, ঈর্ষা ইত্যাদির কথায় হাউচিট স্বয়ং জোর দিয়াছেন ও গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। এই সব বিভিন্ন দিক হইতে বিচার করিয়া লাউরী বলেন, এখানকার প্রথাকে 'যৌথবিবাহ' এই গালভরা নাম দেওয়াতে শব্দের অপপ্রয়োগ ঘটিয়াছে। ["...concubinage cannot possibly play the part suggested by the pretentious terms 'group-marriage' or 'Sexual Communism.' (Lowie—52)]

ডিয়েরীদের মধ্যে বিবাহপ্রথায় বিকৃতি ও স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধে শৈথিল্য কিছু সৃষ্টি হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া বৈজ্ঞানিক বিচার করিতে বসিয়া 'যৌথবিবাহ' সত্যি সত্যি বলা যায় না তাহাও স্বীকার করিতে হইবে। কিছু ভ্রাত্রিক বহুপতিকতার (Fraternal polyandry) সঙ্গে কিছু বহুপত্নীকতা (polygyny) মিশ্রিত হইয়াছে, আতিথ্য সম্বন্ধে অদ্ভুত ধারণা হেতু দাম্পত্য অধিকারেও কিছু শৈথিল্য ঘটিয়াছে, সম্ভ্রান্ত মোহলদের প্রতি অতিসম্ভ্রমও কিছু প্রভাব করিয়াছে। এই সব নানা বিকৃতির সমবায়ে এখানকার বিবাহপ্রথার সম্প্রসারণ হইয়া এই পিরাউক্সপদ্ধতির উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু ইহাদের বেশীর ভাগ লোকই যে সারা জীবনব্যাপী ব্যক্তিনিষ্ঠ বিবাহে কাটাইয়া দেয় সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নাই। ["But that the majority of Dieri men live in individual wedlock for the greater part of their lives is obvious." (Lowie 52)]

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পিরাউক্স – প্রথা ব্যবহারে আসিলেও কার্যতঃ একধরণের ব্যক্তিক বিবাহেই তাহা দাঁড়াইয়া যায়। এককালে সাধারণতঃ একাধিক যৌন সংসর্গ ঘটে না। স্বামীর অনুপস্থিতিতে যখন উপপতি স্বামীর স্থান গ্রহণ করে, তখনও ব্যক্তিক বিবাহের,—যৌথবিবাহের নয়—প্রকৃতিই ফুটিয়া ওঠে। লাউরী বলেন, এক্ষেত্রে "... there is at best merely one individual relationship superseding another." (Lowie—52)

(ক্রমশঃ)

সঙ্ঘে দৃঢ় থাকুন
জাতীয় প্রস্তুতিতে অংশ গ্রহণ করুন

চিন্তায়, বাক্যে ও কার্যে
ভারতের সেবা করুন

এবারকার বাজেট

ধীরেশ ভট্টাচার্য্য

চীনারা গত অক্টোবর মাসে ভারতভূমি আক্রমণ করবার পর থেকেই বোঝা গিয়েছিল বর্তমান আর্থিক সঙ্গতি নিয়ে ভারত সরকার এই আক্রমণকে প্রতিহত করবার শক্তি সংগ্রহ করতে পারবেন না। বহু বৎসর ধরে ক্রমাগত সামরিক শক্তি বাড়িয়ে চীনা বিস্ময়কর সংখ্যক অগণিত সেনাবাহিনী এবং উন্নত উপকরণের সুবিধা নিয়ে ভারতকে গোড়া থেকেই পর্যুদস্ত করতে লাগল। দেশে অভূতপূর্ব উদ্দীপনার সৃষ্টি হল। স্বাভাবিক ভাবেই গণচিত্তে ত্যাগস্বীকারের প্রস্তুতি জেগে উঠল। যদিও যুদ্ধ-সীমান্তে এখন বিরতির পালা চলেছে তবু যুদ্ধের সম্ভাবনা এখনও অপসৃত হয় নি। সুতরাং দেশে প্রস্তুতির মনোভাব পুরোপুরি জাগিয়ে রাখা দরকার। সেদিক থেকে ১৯৬৩-৬৪ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট এক বিরাট ধাক্কার মতো জেগে উঠেছে—ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সাধারণের মনে যদি বা খানিকটা নির্লিপ্তির ভাব ছিল, তাকে সবলে দূর করে সকলকে অতন্দ্র হয়ে জেগে উঠবার আহ্বান জানিয়েছে। এবারকার বাজেটের প্রধান উদ্দেশ্য, দেশের সব শ্রেণীর লোককে আঘাত দিয়ে সচকিত করে তোলা, আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে তাদের অবহিত করে দিয়ে চরম ত্যাগস্বীকারের জন্যে প্রস্তুত হতে বলা। সুতরাং চিরাচরিত মাপকাঠি দিয়ে এই বাজেটকে বিচার করলে যদিও আঘাতটাকে খুবই কঠিন বলে মনে হতে পারে, এর উপরে আরও অধিক আঘাতের জন্যে প্রস্তুত থাকতে বলাই এই বাজেটের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

যে-কোনো স্বাধীন জাতির প্রথম কর্তব্য দেশের স্বাধীনতাকে পররাজ্য লোভীর হাত থেকে রক্ষা করা। এই দায়িত্ব এতদিন আমরা খুবই হালকাভাবে পালন করে এসেছি। ১৯৪১ সালের পর থেকে হিসাব নিলে দেখা যাবে, ভারত সরকার রাজস্ব কিংবা ঋণ হিসাবে যে অতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহ করেছেন তার খুবই সামান্য অংশ দেশরক্ষার প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়েছে। দেশের কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য ইত্যাদির উন্নতি বিধানই ছিল এই অতিরিক্ত অর্থব্যয়ের উদ্দেশ্য। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি অবলম্বন করে আমরা তখন আভ্যন্তরীণ সংগঠনের বিকাশ ও শ্রীবৃদ্ধির জন্যে চেষ্টা করছিলাম, সেই সময় এক প্রতিবেশী রাষ্ট্র যে নিজের সামরিক শক্তি বাড়িয়ে চলেছিল সে বিষয়ে আমরা যেন সম্পূর্ণ সজাগ ছিলাম না। অবশ্য দেশে শিল্পের বনিয়াদ গড়ে তোলার মধ্য দিয়েও আমরা দেশরক্ষার পথে খানিকটা এগিয়ে গিয়েছি তাতে সন্দেহ নেই। তবে সৈন্যসংখ্যায় এবং যুদ্ধোপকরণের পরিমাণ এবং উৎকর্ষের দিক্ থেকে প্রস্তুতির অভাব আমাদের ছিল। এবারকার বাজেট সেই প্রস্তুতির পথে প্রথম সজীব পদক্ষেপ। শুধু দেশরক্ষার জন্যেই এই বাজেটে অতিরিক্ত ব্যয়ের বরাদ্দ প্রায় ৪ শত কোটী টাকা। এই সঙ্গে যুদ্ধোপকরণের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে যে-সব প্রাথমিক শিল্পের বিস্তার আবশ্যক তাদের জন্যেও অতিরিক্ত অর্থের ব্যবস্থা করা হয়েছে। দেশরক্ষার প্রস্তুতি এবং শিল্পের বিস্তার, এই দুয়ের মধ্যে সাধারণভাবে কোনো বিরোধ নেই। অবশ্য, যে-সব শিল্পজাত দ্রব্য যুদ্ধের কাজে লাগে না তাদের উৎপাদন যাতে অযথা বেড়ে না যায় তার দিকেও নজর রাখতে হবে। কিন্তু লৌহ, ইস্পাত, কয়লা, বিদ্যুৎ, রাসায়নিক দ্রব্য,—ইত্যাদি

শিল্পের বিস্তার দেশরক্ষার স্বার্থেই প্রয়োজন। এই সব প্রাথমিক স্তরে এবং তার পরবর্তী স্তর-সমূহে সুসংগঠিতভাবে আর্থিক বরাদ্দের ব্যবস্থা করতে পারলেই দেশরক্ষার প্রস্তুতি সম্পূর্ণাঙ্গ হবে।

বাজেটের প্রথম চোট সামলাতে না পেরে অনেকের মনে হয়তো এই ধারণার উদয় হবে যে আমাকে কিংবা আমার শ্রেণীভুক্ত লোকদের আঘাত না দিয়েও কি দেশরক্ষার অর্থ সংগৃহীত হতে পারত না? আমাদের দেশে যথার্থ স্বচ্ছল লোকের সংখ্যা এতই অল্প এবং সেই তুলনায় যথাবিত্ত ও দরিদ্রের সংখ্যা এতই অধিক যে সবাইকে কিছু-না-কিছু ত্যাগস্বীকারে বাধ্য না করে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করা অসম্ভব। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাম্প্রতিক এক হিসাবে বলা হয়েছে এ দেশে পরিবার-পিছু বার্ষিক আয় ৩০০০ টাকা এমন পরিবারের হাতে আসে সমগ্র আয়ের শতকরা ৮০'৪ ভাগ। যাদের আয় ৩০০০ টাকার উর্দ্ধে, অথচ ২৫০০০ টাকার নীচে, তাদের হাতে আসে সমগ্র আয়ের ১৪'৭ ভাগ। পরিবার-পিছু বার্ষিক আয় ২৫০০০ টাকার উর্দ্ধে এমন লোকেরা পান মোট আয়ের ৪'১ শতাংশ। যে-সব পরিবার বার্ষিক ৩০০০ টাকার উর্দ্ধ আয় বিশিষ্ট, তাদের সবার আয় একত্রিত করলে তার পরিমাণ ২৫০০ কোটী টাকার নীচেই হবে। অর্থাৎ এদের আয় থেকে যথাসম্ভব রাজস্ব হিসাবে সংগৃহীত হলেও তাতে সরকারী প্রয়োজন মিটতে পারে না। সুতরাং নিতান্ত বাধ্য হয়েই সরকারকে নিম্নবর্তী আয়ের স্তরেও কর সংগ্রহ করতে হয়। তবে সাধারণত লোকের মনে এই জিজ্ঞাসা জাগরূক থাকবার প্রধান কারণ উচ্চবিত্তদের ব্যয়বাহুল্যের পরিচয় এবং সরকারী দপ্তর সমূহে দায়িত্বহীন ব্যয়বিস্তার। একটা যুদ্ধরত দেশের পক্ষে এই দুই ব্যাপারে যতটা সংযমের আবশ্যক, আমাদের দেশে তার চিহ্ন পরিস্ফুট হয়েছে কি না তা' ভাববার সময় হয়েছে।

। দুই ।

দেশরক্ষা এবং মৌল শিল্পের বিস্তার, এই দুই কাজে হাত দিতে গিয়ে আমাদের শুধু অর্থসংগ্রহের কথা ভাবলেই চলবে না, এই উভয় ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সংগঠন গড়ে তুলবার কাজেও তৎপর হতে হবে। বিগত দশ বৎসরের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখতে পাব বিবিধ উন্নয়নমূলক কাজের জন্যে বন্ধুভাবাপন্ন বহু রাষ্ট্রের নিকট থেকে আর্থিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি পাওয়া সত্ত্বেও আমরা স্বচ্ছন্দে এগিয়ে যেতে পারি নি। প্রতিশ্রুত আর্থিক সাহায্যের পরিমাণ এবং প্রকৃতপক্ষে ব্যবহৃত অর্থের পরিমাণের মধ্যে তুলনা করলে দেখা যাবে আমরা বৈদেশিক সাহায্যের প্রায় অর্দ্ধাংশ অব্যবহৃত অবস্থায় ফেলে দিয়েছি এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছি। এর কারণ হিসাবে নানা অসুবিধার কথা বলা যেতে পারে, কিন্তু আমাদের সাংগঠনিক অপটুতাও যে একটা বড়ো কারণ তাতে সন্দেহ নেই। দেশরক্ষার কাজে গত কয়েক বৎসরে যে-অর্থ নিয়োজিত হয়েছে তার প্রতিদান কতটুকু পাওয়া গিয়াছে তার অনুসন্ধান সম্পূর্ণ না করে শুধু আর্থিক বরাদ্দের পরিমাণ বাড়িয়ে দিলেই যে যথাযথ ফল পাওয়া যাবে সে-কথা বিশ্বাস করা কঠিন। এর জন্যে অর্থমন্ত্রী এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর মধ্যে সহযোগিতামূলক আদান-প্রদানের ব্যবস্থাকে আরও কার্যকরী করে তোলা দরকার।

দেশরক্ষার ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করার জন্যে যে-জনশক্তির আবশ্যক তা' আমাদের রয়েছে। বাধ্যতামূলক সৈন্যসংগ্রহের ব্যবস্থা না করেও সেনাবাহিনীকে দ্বিগুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব, একথা সরকারী মুখপাত্রেরাই স্বীকার করেছেন। কিন্তু আধুনিক যুদ্ধের জন্যে সেনাবাহিনী অপেক্ষাও যন্ত্রসজ্জার প্রয়োজন আরও অধিক এবং যান্ত্রিক যুদ্ধে অভিজ্ঞ কুশলী কর্মীর অভাব মিটাতে হলে শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার বিশেষ প্রয়োজন। যন্ত্রশিল্পে এবং প্রশিক্ষণের কার্যে সন্তোষজনক ফল পেতে হলে শিক্ষাস্তরে এবং শিল্পনীতিতে পরিবর্তন আনা

দরকার। সে-পরিবর্তন শুধু আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে না, তার জন্য সুদক্ষ সংগঠকেরও বিশেষ প্রয়োজন। শিক্ষাব্যবস্থাকে বিজ্ঞানভিত্তিক করে তুলতে হবে। যথেষ্ট পরিমাণ উপযুক্ত শিক্ষক এবং শিল্পকে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করবার জন্যে যথেষ্ট পরিমাণে দক্ষ কারিগরের সৃষ্টি করতে হবে। এটা সময়-সাপেক্ষ। কিন্তু গোড়া থেকে যদি এ-কথা আমরা মনে না রাখি যে দেশরক্ষার শক্তি-সংগ্রহ শুধুমাত্র অর্থমন্ত্রীর অর্থসংগ্রহের উপর নির্ভর করে না, তা' বিশেষভাবে নির্ভর করে দেশের শিক্ষাগত ও শিল্পগত প্রস্তুতির উপর, তা হলে আমাদের আত্মরক্ষার নীতিতে ফাঁক থেকে যাবে। তা হলে হয় বরাদ্দ অর্থ পুরোপুরি খরচ হবে না, নয় তো তার অধিকাংশ অপব্যয় হবে।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বিবেচনা করা দরকার। যে-সব দেশ বিশেষভাবে সমৃদ্ধ, তারা আর্থিক পর্য্যাপ্তির সহায়তায় নিজেদের সাংগঠনিক ত্রুটি কিছুটা শোধন করতে পারে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এক একটি সৈনিকের পিছনে বার্ষিক প্রায় ৭৫০০০ টাকা খরচ করে। আমরা সেই তুলনায় প্রতি সৈনিকের সাজসরঞ্জামের জন্যে অনেক কম খরচ করতে পারি। বার্ষিক উৎকর্ষ নিয়ে আমেরিকা তার যুদ্ধবাহিনীর মধ্যে যদি বা কিছু কিছু সাংগঠনিক দৌর্বল্য মেনে নিতে পারে, আমাদের পক্ষে তা' সম্ভব নয়। যন্ত্রসজ্জার অপর্য্যাপ্ততাকে আমরা যদি অন্য দিকে পটুতা দেখিয়ে পূরণ করে নিতে না পারি তা হলে আমাদের বিপদের সীমা থাকে না। এবারকার বাজেটের অর্থের বরাদ্দ বাড়িয়ে দিলেও যন্ত্রসজ্জার দিক দিয়ে আমেরিকার সমকক্ষ আমরা কোনোদিনই হতে পারব না। সুতরাং সংগঠন ক্ষমতাকে যদি আমরা দ্রুত বাড়াতে না পারি তবে অর্থের সদ্ব্যয় হওয়ার সম্ভাবনা অতি ক্ষীণ।

উপরের আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হবে যে বাজেটের আলোচনা শুধু বাজেটের আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করেই সম্পূর্ণ হয় না। বাজেটে বরাদ্দ অর্থ যে সব দপ্তরের হাত দিয়ে ব্যয়িত হয় তাদের প্রশাসনিক দক্ষতার উপর এই অর্থব্যয়ের সাফল্য অনেকাংশেই নির্ভর করে। যুদ্ধজনিত ব্যয়বৃদ্ধির ফলে এই সব দপ্তরের কাজের চাপ বাড়বে। সেই চাপে এদের কর্মদক্ষতা যাতে হ্রাস না পেয়ে বরঞ্চ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তার ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। ভবিষ্যতের জন্যে প্রয়োজন যন্ত্রবিদ্ ও কুশলী কর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি; তার জন্যে গোড়া থেকে শক্ত করে তৈরি করতে হবে। হয়তো এ ক্ষেত্রে নিজেদের আয়োজনের উপরে বাইরের সাহায্যও নেবার প্রয়োজন হতে পারে।

॥ তিন ॥

এবারকার বাজেটে সব শ্রেণীর লোকের উপরই করের চাপ কিছু না-কিছু বেড়েছে। কর বৃদ্ধি ছাড়াও বাজেটের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বাধ্যতামূলক এক, সঞ্চয়ের পরিকল্পনাকে যার ফলে অত্যন্ত অল্পবিত্ত লোকেদেরও রাষ্ট্রের হাতে কিছু অর্থ তুলে দিতে বাধ্য করা হয়েছে। যাদের বার্ষিক আয় ৩০০০ টাকার নীচে তাদের উপর কোনো প্রত্যক্ষ কর নেই। কিন্তু এদের মধ্যে যারা বার্ষিক ১৪০০ কিংবা তার বেশি টাকা আয় করেন তাঁরা এই বাধ্যতামূলক সঞ্চয় পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হবেন। গ্রামের কৃষিজীবী, শহরের ছোট ব্যবসায়ী, বাড়ীওয়ালা শ্রেণীর এমন লোক যাদের আয়কর দিতে হয় না, তাদেরও এই সঞ্চয় পরিকল্পনার আওতায় আনা হয়েছে। দেশরক্ষার কাজে ছোটোবড়ো সকলেই নিজের অর্থ দিয়ে সাহায্য করবেন, এখানে কাউকেই বাদ দেওয়া হবে না, এইটিই হল সঞ্চয় পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু যে-সব সামান্য আয় বিশিষ্ট লোক মাসান্তে নিজেদের বাজেটে গোঁজামিল দিয়ে চলে আসছেন, তাঁদের এই সঞ্চয়ের পরিকল্পনার অংশ গ্রহণ করতে বলার মধ্যে একটা হাস্যকর দিক আছে, তা বোধহয় সরকারী বাজেটের কর্ণধারগণ

গণনার মধ্যে আনেন নি। যে-পরিবারের বার্ষিক আয় ১৪০০ টাকা তার পক্ষে বাধ্যতামূলক সঞ্চয় করতে হলে অন্য দিকে খরচের বোঝা বেড়ে উঠতে বাধ্য, কেন না জিনিষ পত্রের বর্তমান মূল্য স্তরে বিচার করলে কোনোক্রমেই এই আয়ে একটি সাধারণ আকারের পরিবারকে ভরণ-পোষণ করা চলে না। সঞ্চয়ের পরিকল্পনাকে বাধ্যতামূলক করবার আগে সরকারী মুখপাত্রেরা মাথা-পিছু জীবনযাত্রার ব্যয়ের কোনো হিসাব করে নিয়েছিলেন কিনা তা অবশ্য বাজেট থেকে জানা যাচ্ছে না। আমাদের মনে হয় এই বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের ব্যাপারে নিম্নতম সীমারেখা (অর্থাৎ বার্ষিক ১৪০০ টাকা আয়) ঠিক বাস্তবানুগ নয়। প্রতি পরিবারে মাথা-পিছু একটা ন্যায়সঙ্গত ব্যয়ের মাত্রা বজায় রাখতে দিয়ে তার উপরে যে-আয় হাতে থাকবে বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের বিধি তারই উপর আরোপ করা উচিত ছিল।

আয়করের পরিমাণ এবারকার বাজেটে যে-রীতিতে বৃদ্ধি করা হয়েছে তাতেও অধিক পরিমাণে চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে মাঝারি আকারের আয়ের উপর। যে-পরিবার ইতিপূর্বে বার্ষিক ৪২ টাকা আয়কর দিত, তাকে বর্তমানে দিতে হবে ৬৪১ টাকা। এখানে দেয় টাকার পরিমাণ প্রায় পাঁচগুণ বেড়ে গিয়েছে। কিন্তু যে পরিবারের পূর্বে ১২০০ টাকা আয়কর দিতে হত তাকে বর্তমানে দিতে হবে প্রায় ১৮০০ টাকা, অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে করবৃদ্ধির পরিমাণ সেরকম। এই ভাবে যতই উপরের আয়ের স্তরে যাওয়া যাবে, ততই পূর্বের প্রদত্ত আয়করের তুলনায় নূতন করের অনুপাত হ্রাস পেতে দেখা যাবে। এই ধরণের করবৃদ্ধির ফলে সরকারী রাজস্ব সংগ্রহের পথ হয়তো সুগম হয়েছে। কিন্তু ন্যায়নীতির দিক থেকে এই বৈষম্যমূলক ব্যবস্থাকে সমর্থন করা চলে না। উচ্চ আয় বিশিষ্ট পরিবার সমূহকে যথাসম্ভব কর বহনে বাধ্য করলেও সরকারী ব্যয় নির্বাহ করা যাবে না, একথা আমরা আগেই স্বীকার করে নিয়েছি। সকল লোককে একই আয়ের স্তরে নিয়ে আসার প্রয়োজনীয়তা এবং বাঞ্ছনীয়তাও আমরা সমর্থন করছি না। কিন্তু আয়কর হিসাবে প্রত্যেক পরিবারকে যে-ভার বহন করতে বলা হবে, তার ফলে সেই বিশেষ পরিবার ও অন্যান্য পার্শ্ববর্তী পরিবারের মধ্যে বর্তমানে যে-পার্থক্য বিদ্যমান তা আরও প্রসারিত না হয়, সেদিকে অন্ততঃ দৃষ্টি রাখা দরকার। এবারকার বাজেটে আয়কর বৃদ্ধির যে-নীতি অনুসৃত হয়েছে তাতে এই বিষয়টি অবহেলিত হয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস। সন্দেহ নেই যে সবচেয়ে অধিক রাজস্ব সংগ্রহের জন্যই এই নীতি অবলম্বন করতে হয়েছে, কিন্তু এই ব্যবস্থা যদি স্থায়িভাবে থেকে যায় তবে ধনবিত্তের সঙ্গে উচ্চবিত্তের বিভেদ আরও বৃদ্ধি পাবে এবং রাজনৈতিক অসন্তোষের সৃষ্টি হওয়াও বিচিত্র নয়।

এবারকার বাজেটের আর একটি উদ্ভাবন: ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের মুনাফার উপর বিশেষ কর (Super-profits Tax)। এতকাল মুনাফার একটা নির্ধারিত অংশ (যেমন, শতকরা ৫০ ভাগ) সরকারী রাজস্ব হিসাবে সংগৃহীত হত। কোনো প্রতিষ্ঠান বেশি মুনাফা করতে পারলে তার জন্যে যেমন সরকার বেশি রাজস্ব পেতেন, প্রতিষ্ঠানও বাড়তি আয় থেকে বঞ্চিত হত না। এবারকার বাজেটে এক নতুন নীতির প্রবর্তন করতে চেয়েছে। প্রতিষ্ঠানের মূলধন এবং রিজার্ভের উপর শতকরা ৬ ভাগ মুনাফা প্রতিষ্ঠানের হাতে দিয়ে বাকী অংশেরও শতকরা ৫০ অথবা উর্দ্ধে ৬০ ভাগ পর্যন্ত রাজস্ব হিসাবে সংগৃহীত হবে। এই ভাবে ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান যাতে অতিরিক্ত মুনাফা না করতে পারে তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু এই নিয়মের মধ্যে কয়েকটি ফাঁক দেখা যাচ্ছে। প্রথমত, সব রকম ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে একই নিয়মে মুনাফা বেঁধে দেওয়া চলে না। যে-সব প্রতিষ্ঠানে অধিক মূলধনের প্রয়োজন হয়, কিংবা ব্যবসায়ের ঝুঁকি যেখানে বেশি, সেখানে অধিক মুনাফার আকর্ষণ না থাকলে মূলধন-বিনিয়োগের আশা করা যায় না।। দ্বিতীয়ত,

ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের মুনাফা আধুনিক কালে সঞ্চয়ের এক বড়ো উৎস। যদি এই সঞ্চয়কে বাড়তে দেওয়া না হয়, তা হলে ভবিষ্যতে ব্যবসায়ের সম্প্রসারণে বাধার সৃষ্টি হবে অথবা সরকারের ব্যবসায়ে মূলধন সরবরাহের পুরোপুরি দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। ব্যবসায়ের সঞ্চিত অর্থকে সামরিকভাবে দেশরক্ষার কাজে লাগাতে হলেও যাতে এর ফলে আর্থিক বনিয়াদ দুর্বল না হয়ে পড়ে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। তৃতীয়ত, মুনাফার উপর এই অতিরিক্ত বোঝা চাপানোর ফলে ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানসমূহ আরও দরাজ হাতে খরচ বাড়িয়ে যেতে পারে এবং হিসাবের কারচুপিতে মুনাফা কম করে দেখাবার চেষ্টা করতে পারে। মুনাফার উপর করের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হলে সোজাসুজি করের হার বাড়িয়ে দিয়ে এবং তার একটা অংশ বাধ্যতামূলক ঋণ হিসাবে নিয়েই এর চেয়ে ভালো ব্যবস্থা করা যেত।

এবারকার বাজেটের যে-সব অংশ নিয়ে প্রধানতঃ আপত্তির উদ্ভব হতে পারে তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষ করে আবার পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে আসি। বাজেটের বর্তমান রূপ পার্লামেন্টের আলোচনার ফলে হয়তো খানিকটা অদল-বদল হবে, কিন্তু নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করতে হলে করাবিত্ত ও অকরবিত্তের উপর কিছু কিছু বোঝা না বাড়িয়ে দিয়ে সমস্যার সমাধান করা যাবে না। বাজেট-প্রসঙ্গে এ কথা সকলেরই মনে রাখা উচিত যে আগামী কয়েক মাসের মধ্যে জানা যাবে এর চেয়েও আরও বেশি আঘাতের জন্যে আমাদের প্রস্তুত হতে হবে কিনা। সেই অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে কার বোঝা কতটুকু কমানো বা বাড়ানো হলে ভালো হত সে-চিন্তারও তখন অবকাশ থাকবে না। এই বাজেট যদি একান্তভাবেই সাময়িক হয় তা হলে এর বিরুদ্ধে বলবার কথা খুব কমই হয়েছে। কিন্তু এর নীতিসমূহকে দেশের স্থায়ী আইন-কানুনের অন্তর্ভুক্ত করবার চেষ্টা হতে থাকলে সামাজিক ও আর্থিক ভিত্তি যে দুর্বল হয়ে পড়বে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

জয়শ্রী

বৈশাখ ● ১৩৭০

যুদ্ধ নিয়ে এ পর্যন্ত অনেক প্রবন্ধ, কবিতা লেখা হয়েছে। হয়তো এ নিয়ে নতুন করে কোন আলোচনার অবতারণা করার প্রয়োজনীয়তা অনেকেই অনুভব করবেন না। কিন্তু তবু আমরা মনে করি এ আলোচনা শুধু প্রয়োজনীয়ই নয় এর শেষ নেই।

যুদ্ধ, যুগচেতনা ও শিল্পীর ভূমিকা'য়
নতুন কিছু বলবেন :

সঞ্জয় ভট্টাচার্য
কৃষ্ণ ধর
অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত
অজিতকুমার সিকদার
শঙ্খ ঘোষ

এ ছাড়া সাম্প্রতিক সাহিত্য, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা নিয়ে লিখবেন :

দেবীপদ ভট্টাচার্য, কিরণশংকর সেনগুপ্ত,
অরিন্দম সেন, সত্যব্রত বসু

বিস্তারিত বিষয় সূচী চৈত্রের জয়শ্রীতে থাকবে।

পথ চেনা : অধীর সর্বজ্ঞ

একটি অবাক ধন,
বিস্ময়ের শিশিরে ভেজা ঘাসের মতন
আকাশকে কাছে পেতে চেয়ে—
সোণালী সূর্যের কোঁটা মেখে নিল দেহের ভিতরে।

অথবা সূর্যই বুঝি হ'তে চেয়ে পরিচ্ছন্ন এক
নির্ভার বিকেলে শোনে ইমনের তার ;
নিশ্চলের শিরাগুলি ঘুমন্ত আবেগে যেই গান
শেষ না করেই প্রেম পেয়েছিল আকাশ-গঙ্গার।

সুদূরের পথ চিনে যে অচেনা কলাবতী মেয়ে,
সাগরের তীরে এলো নিঃসঙ্গ তিমিরে—
তারও চোখে ক্লান্ত দিন ঘুরোবার কালে
যন্ত্রণার অব্যক্ত এক অবাক ছবি পড়ে।

এমনই অবাক হ'তে চেয়ে তার সুপুরের বৌ
ঠাকুরঝি বীথিটিকে অমরতা দিল ;
এমনই অবাক হ'তে গিয়ে লাল মাদারের ডালে
আকাশকে গেঁথে রেখে চাবী যার ফেরেনি বিকালে।

জলজলে তারার মতন,
তবুও অবাক চোখ মেলেছি যখন,
আকাশকে কাছে পেতে চেয়ে—
অবাকই হয়েছি আমি একমুঠো স্বর্গভস্ম শুধু হাতে পেয়ে।

এ প্রদীপ নিভে গেলে : মোহিত চক্রবর্তী

এ প্রদীপ নিভে গেলে আকাঙ্ক্ষার অরুণ স্বপনে
তোমাকে জাগাবো শুধু মধুময় মল্লার সংগীতে ;
বকুলের পাশ দিয়ে তোমার এ নম্র যৌবনে
কেউ তো আসে না আর ভালোবেসে কখনো জাগাতে।

এ প্রদীপ নিভে গেলে প্রেমের প্রজ্ঞা ইশারাতে
দীপ্তিময়ী কান্তি নিয়ে তুমিই কি দাঁড়াবে কখনো
কৃষ্ণচূড়ার পাশে একান্তে ধূসর সন্ধ্যাতে।
হয়তো মনের কোণে কামনারা জ্বলবে তখনও।

এ প্রদীপ নিভে গেলে বাজবেই সুরের পূরবী,
একটা করুণ গানে ভরে যাবে তোমার হৃদয় ;
সন্দিগ্ধ মনের মাঝে এঁকে দিবে বিদায়ের ছবি :
আমার এ সংগীত জানাবেই তোমাকে সময়।

এ প্রদীপ নিভে গেলে ধূসর সময় সঙ্কেতে
আগ্রত হৃদয়দ্বারে কথাকলি আসবে না তার
আবেগে, বিষাদে, ক্ষোভে এ-মনে দুখের অমারাতে
শূন্যতার মাঝে হবে হতাশার সুরের সঞ্চার।

এ প্রদীপ নিভে গেলে তুমি হও সমাধি-নীরব
আশার বাঁধনে আমি তবু করি সুরের উৎসব।

জয়শ্রী মাসিক পত্রিকার সত্ব ও অন্যান্য বিষয়ে বিবৃতি

[সংবাদপত্র রেজিষ্ট্রেশন রুলের ৪নং ফরম অনুযায়ী]

১	যে স্থান হইতে প্রকাশিত হয় তাহার ঠিকানা	২০৯, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা—৬
২।	প্রকাশের কাল :	মাসিক
৩।	মুদ্রাকরের নাম, জাতি, ঠিকানা :	কিরণ চন্দ্র মিত্র, ভারতীয়, ১০।৬৯ এ, দেশপ্রাণ শাসমল রোড, কলিঃ—৩৪
৪।	প্রকাশকের নাম, জাতি ঠিকানা :	কিরণ চন্দ্র মিত্র, ভারতীয়, ১০।৬৯ এ, দেশপ্রাণ শাসমল রোড, কলিঃ—৩৪
৫।	সম্পাদকের নাম, জাতি, ঠিকানা :	লীলা রায়, ভারতীয়, পি ৩১২ গাঙ্গুলী বাগান নাকতলা, কলিঃ—৪৭
৬।	স্বত্বাধিকারীর নাম ও ঠিকানা	লীলা রায়, ভারতীয়, পি ৩১২ গাঙ্গুলী বাগান নাকতলা, কলিঃ—৪৭

আমি কিরণ চন্দ্র মিত্র ঘোষণা করিতেছি যে, উপর্যুক্ত বিবরণসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

তারিখ
১৩।৬৩

স্বাঃ কিরণ চন্দ্র মিত্র
প্রকাশক

চল্লিশ দশকের বাংলা কবিতা

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

যতুলাচরণ চট্টোপাধ্যায় কি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তুলনায় নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে মনে হবে বিপরীত মেজাজের কবি। নীরেন্দ্রনাথের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'নীল নির্জন' নিঃসন্দেহেই তাঁর কবিস্বভাবের আন্তরিক সাক্ষ্য। এবং বেশ কয়েক বছর তাঁকে ঘনেও রয়েছে নির্জন চেতনার, বিচ্ছিন্ন চেতনার প্রতিনিধি।

এই তো নেমেছে রাত্রি, এই তো
মনের আকাশে ফুটল
জ্যোৎস্না-রোয়ানো চিন্তার ফুল,
সে-ফুল কুড়িয়ে আনতে
ঘুমের শিয়রে বাড়িয়ে দুহাত
স্বপ্নেরা জেগে উঠল ;
এই তো নেমেছে রাত্রি মনের
নীল নির্জন প্রান্তে।

('নীলনির্জন')

কিন্তু নীলনির্জনতায় কবি স্থির হতে পারেন নি শেষ পর্যন্ত। সমস্ত হৃদয় নিঃস্তব্ধ প্রার্থনায় ঢেলেও তিনি তাঁর সর্বনাশা ভয়ের হাত থেকে নিস্তার পান না। হৃদয়স্থিত এই ভয়, এই উদ্বেগ নীরেন্দ্রনাথের কবিতায় স্বতন্ত্র মর্যাদা এনেছে।

এ-ভয় তোমারো। আর তোমারো শয্যায় তাই ঘুম
নামে না, তোমারো মনে হারাই-হারাই
এই ভয় রাত্রিদিন। তাই
যতদূরে যাও তুমি, তবু শতছলে
আবার ফিরতে হয়, তাই তীব্র ক্রোধের কুসুম
মুছে যায় বারবার কান্নার কাজলে।

('উন্মোচন')

'নীলনির্জনে'র বৃহৎ গুঞ্জন পরবর্তীকালে পরিণত 'অন্ধকার বারান্দা'র আর্তি ও বেদনাবোধজাত গভীরতায়। বিষয়-বস্তু ও বহিরঙ্গের দিক থেকে তাঁর পরবর্তীকালের অনেক কবিতাই সমৃদ্ধ। দীর্ঘকালের অভ্যাসে অনেক সময় শক্তিমান কবিও ভঙ্গিসর্বস্ব, বাকচাতুরীপ্রধান স্বাচ্ছন্দ্য অর্জন করেন। এই অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্য প্রতিষ্ঠিত কবির খ্যাতির বিরোধী না হলেও ভিন্নতর কিংবা বৃহত্তর ভাবমণ্ডল সৃষ্টিতে সাহায্য করে না। সুখের বিষয় 'অন্ধকার বারান্দা'র কবি আন্তরিক ভাবেই গভীরতা সন্ধানী এবং হৃদয় ও মিলের পরীক্ষায়, বিষয়ের বিস্তারে তাঁর এই কাব্যগ্রন্থের অনেক কবিতাই পাঠকের মনোযোগ দাবী করে। বীরেন্দ্র চট্টো-পাধ্যায় কিংবা যতুলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা প্রধানত গভীর বাস্তববোধ জনিত অনুভূতির ফলে যেমন অনেক সময় অত্যন্ত তীব্র মনে হয় সে-রকম তীব্রতা নীরেন্দ্রনাথ এড়িয়ে চলেছেন। বরং বলা যায়, এক ধরণের বিষণ্ণ কোমলতা এবং মিষ্ট গুঞ্জনে তাঁর কবিতা নিবিড়। জীবন সম্পর্কে, প্রেম ও প্রেমের অস্বীকার সম্পর্কে তিনি নৈরাশ্যবাদী নন এবং অন্ধকারের হাত, অন্ধকারের ছায়া যদিও থেকে থেকেই তাঁর কবিচেতনায় প্রসারিত তথাপি শেষ পর্যন্ত স্বপ্নের যন্ত্রণার মধ্য থেকেও অসুখী সংসারে, তুষার্ত মাঠে আকাঙ্ক্ষিত নদীর সন্ধানে উদ্বুদ্ধ হন। কবির অনুভবে—

কারা যেন সংসারের বারান্দার কপাট
খুলে দিয়ে যায়, সত্য, পাখীর স্বভাবে
আনন্দ মুখর চিত্তে মিশে গেছে। শান্ত দশ দিক।

দুপারে হলুদ পর্দা। আকাশে গৈরিক
আলো কাঁপে। সারাদিন কাঁপে।
('হলুদ আলোর কবিতা')

স্পষ্টই বোঝা যায়, কবির আকাঙ্ক্ষা উন্মুক্ত আলোকিত প্রান্তরের প্রার্থী, বন্ধুর পথ এড়িয়ে সমুজ্জ্বল সমতলেই তাঁর স্বাভাবিক তৃপ্তি। সুতরাং যারা মনে করে নীরেন্দ্রনাথ সম্প্রতি অন্ধকার ছাড়া অন্য কিছু দেখেন না তাদের অনুমান ভ্রমাত্মক। সংসারের নানা ঘুলো এই কবি অনেক সময়ই রঞ্জিত আশাবাদের অবকাশ পেয়ে থাকেন এবং অনুপ্রাণিত হন।

ভগ্ন পায়ে
নীচে নেমে আর-এক বিস্ময়।
এ কেমন অলৌকিক নিয়মে নিষ্ঠুর
বন্ধ্যা প্রতিহত, হাওয়া নিশ্চুপ এখানে।
নিত্যকার মতই দোকানী
সাজায় পশরা, চাষী মাঠে যায়, গৃহস্থ বাড়ির
দেয়ালে চিত্রিত পট, শান্ত গাঁওবুড়া
গল্প বলে চায়ের মজলিসে।
দুঃখের নেপথ্যে স্থির, আনন্দের পরম আশ্রয়,
প্রাণের গভীরে মগ্ন, ক্ষমার সাহান্ত গিরিদরি
সুন্দরী হেলং।
('হেলং')

এবং এই কবিতারই অন্য স্তবকে কবির নিবিড় উপলব্ধি সৃষ্টির অন্তরঙ্গতায় উজ্জ্বল :

এবং এখনো মনে হয়,
তীব্রতম যন্ত্রণার গভীরে কোথাও
নিত্য প্রবাহিত হয় সেই আনন্দের স্রোতস্বিনী
যে আমায় দারুণ ভয়ের
মর্মকোষে শান্ত বরাভয়।
মনে হয়, রক্তরঙ এই রঙ্গমঞ্চের আড়ালে
রয়েছে কোথাও
নেপথ্য-নাটকে স্থির নিবিকার নায়ক-নায়িকা,
দাঁড়ে টিয়াপাখি, শান্তি টবের অর্কিডে।
('হেলং')

নীরেন্দ্রনাথের পরিণত কবিতায় অন্ধকারের প্রাধান্য ভিন্নতর চেতনার তাৎপর্যময়। অন্ধকার তাঁকে প্রকৃতপক্ষে আলোর চেতনা সম্পর্কেই সচেতন করেছে। অন্ধকারের তীব্রতা অনেক সময়ই উপযুক্ত ভাষাসুষমে, পুনরাবৃত্তির সুন্দর অনুরণনে সার্থক।

প্রেম ঘৃণা রক্ত থেকে প্রেম ঘৃণা রক্তের বাহিরে
গিয়ে তোর শান্তি নেই, তোর
শান্তি নেই, তোর
ঘরের ভিতরে বড় অন্ধকার, বড়
অন্ধকার, বড়
বেশী অন্ধকার তোর ঘরের ভিতরে।
('দুঃখের বাহিরে')

এবং ধীরে ধীরে আলোকিত সমন্বয়ের দিকে মুক্ত যাত্রায় বরং কবির পক্ষপাত।

না, আমি আর অন্ধকারের ভিতরে থাকবনা।
অন্ধকারের ত্রিসীমায় সমুদ্রতীরে আমি
বসে একটা আলোর ফুল ফোটাব।
('না, আমি আর')

এবং অন্যত্র—

অন্ধকার ভাল নয়। আমি অন্ধকারে এতকাল
শুধুই আলোর ইচ্ছা লালন করেছি।
('অন্ধকার নয়')

নীরেন্দ্রনাথের কবিজীবনের শ্রেষ্ঠ উপলব্ধির অনন্য প্রকাশ 'মৌলিক নিষাদ' এবং সাম্প্রতিক বাংলা কবিতায় একটি

স্মরণীয়সংযোজন। পরিকল্পনায়, আবেগের তীব্রতায় এবং গভীরতায় আশ্চর্য রকম সার্থক।

পিতামহ, আমি এক নিষ্ঠুর সময়ে বেঁচে আছি।
• • •
পিতামহ, তোমার আকাশ
নীল—কতখানি নীল ছিল?
আমার আকাশ নীল নয়।
পিতামহ, তোমার হৃদয়
নীল—কতখানি নীল ছিল?
আমার হৃদয় নীল নয়।
আকাশের, হৃদয়ের যাবতীয় বিখ্যাত নীলিমা
আপাতত কোনো-এক স্থির অন্ধকারে ভরে আছে।
• • •
অন্ধকারে জেগে আছে মৌলিক বিষাদ—এই ভয়।

('মৌলিক বিষাদ')

॥ সাত ॥

চল্লিশের যুগের একেবারে তরুণতর কবিদের মধ্যে রাম বসু ও প্রমোদ মুখোপাধ্যায় দীর্ঘকালের সাধনায় সচেতন শিল্পরীতির পরিচয় দিয়েছেন। প্রমোদ মুখোপাধ্যায় কোনো কোনো অংশে বয়োজ্যেষ্ঠ কবির (উদাহরণত, বিষ্ণু দে) প্রভাব সোড়ার দিকে এড়াতে না পারলেও তাঁর সাম্প্রতিক কবিতায় স্বকীয়তা ক্রমশই দৃষ্টিগোচরযোগ্য। পক্ষান্তরে রাম বসু মনস্তাত্ত্বিক চেতনাকেই যেন অনুধাবন ক'রে শিল্পসৃষ্টিতে উৎসাহী। 'তাঁর যখন যন্ত্রণা' কাব্যগ্রন্থের অনেক কবিতাই কবিতা হিসেবে উত্তীর্ণ এবং গদ্যের রুক্ষ সৌরভে বাক্যের পরিমণ্ডল বিকীর্ণ।

পিতামহ অন্ধকার, পূর্বপুরুষ পাহাড়, গন্ধর্ববাসী তারা,
যদি প্রাণ দিলে তবে প্রাণের গর্ব দিলে না কেন
যদি সাধ দিলে তবে সার্থকতার ক্ষমতা দিলে না কেন
যদি প্রেম দিলে তবে রক্তের পৌরুষ দিলে না কেন
পিতামহ অন্ধকার, পূর্বপুরুষ পাহাড়, গন্ধর্ববাসী তারা?

('পিংলুম')

সত্যই দুঃখের কথা সুধাবের পাহাড়ের ধারে
অহর্নিশ হিংসা জ্বলে, কণ্ঠে ওঠে অন্তর চিৎকার
মানুষে মানুষ ছেঁড়ে পুলিমার সমুদ্র কিনারে
কী লজ্জার কথা এই; এই এক নিষ্ঠুর বিস্তার।

('জনান্তিক')

রাম বসুর এই আর্তি ও ক্ষোভের তীব্রতা প্রমোদ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে পাওয়া যায় না। তাঁর কবিতায় পাওয়া যায় এমন একটি সাবধানী চিত্রবিন্যাস যার আবেদন শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয় না। প্রমোদ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার বিশেষত্ব সহজাত স্নিগ্ধতা। সমাজসচেতন কবি হয়েও গীতিময়তা সরাসরি বর্জন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। জগন্নাথ চক্রবর্তী এবং কৃষ্ণ ধরও সম্ভবত চল্লিশের যুগেই কাব্য-জীবন শুরু করেছিলেন এবং সজাগ দৃষ্টিভঙ্গি ও সাবধানী গঠনবিন্যাস এই উভয় কবির কবিতাবলীতে লক্ষণীয়। বলা বাহুল্য, চল্লিশের কবি নিশ্চয় আরো কেউ কেউ আছেন যাঁরা এক সময় ভালো লিখতেন এবং এখন প্রায় নিরুদ্দিষ্ট। কিন্তু চল্লিশের কবিতার বৈশিষ্ট্যের আলোচনায় তাঁদের নামের উল্লেখ বোধহয় অধুনা অপরিহার্য নয়।

॥ আট ॥

চল্লিশের প্রতিনিধিস্থানীয় কবিদের আলোচনার অন্তে পর এরূপ উক্তি সমর্থনীয় যে তিরিশ কিংবা পঞ্চাশ থেকে স্বতন্ত্র একটি ভূমিকায় এই কাব্য-আন্দোলনের ইতিহাস বিধৃত। চল্লিশের কবিতার চারিত্রলক্ষণ, আবেদন এবং গভীরতায় সৃষ্টি হয়েছে প্রচুর সার্থক কবিতা। তিরিশের কবিদের কেউ কেউ যে-সব বিষয় নিয়ে সোড়ার দিকে নবত্বের পরীক্ষা শুরু করে-

ছিলেন অথচ কোনো সুপরিণত শিল্পদৃষ্টিতে পৌঁছতে পারছিলেন না সে-সব উপকরণ চল্লিশের তরুণতর কবির হাতে যথেষ্ট মর্যাদা পেয়েছে। চল্লিশের কবিতার একটি প্রতিনিধিস্থানীয় সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হলেই একালের কাব্য-জিজ্ঞাসু পাঠকসমাজে আধুনিক কবিতার সেই সন্দেহাতীত, ক্রমপরিণতিশীল, একালে যাবৎ অনালোচিত, কাব্যপ্রবাহ সম্পর্কে যথাযোগ্য উপলব্ধিতে অনুপ্রাণিত হবেন, বলা বাহুল্য। চল্লিশের কবিদের মধ্যে যাঁরা উল্লেখযোগ্য তাঁদের অনেকেই দীর্ঘকালের অনুশীলনের মধ্য দিয়ে সাফল্যের সোনা ফুটিয়ে এখন স্তব্ধপ্রায়। জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বেঁচে নেই। অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে-র প্রভাবিত কবিতাবলী বাংলা কাব্য-আন্দোলনে সমৃদ্ধ স্মৃতির সাক্ষ্য। কিন্তু চল্লিশের কবিগোষ্ঠীদের তরুণতর অনেকেই এখন পর্যন্ত বিচিত্রভাবে ক্রিয়াশীল এবং আশা করা যায় সময় যেন স্তব্ধ হয়ে গেলেও কামাক্ষীপ্রসাদ, মণীন্দ্র রায়, প্রভাত মুখোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, রাম বসু প্রভৃতি শক্তিমান কবিগোষ্ঠী আরও দীর্ঘকাল সক্রিয় থাকবেন এবং এই দশকেও নব-নব পরীক্ষানিরীক্ষায় আধুনিক বাংলা কবিতায় অধিকতর বৈচিত্র্য নানা দিক থেকেই সঞ্চার করতে পারবেন।

সম.গু

খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই

গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা	৬·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	৫·০০
ভারত-আত্মার বাণী	৫·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
কর্মবাণী	১·২৫
Soul of India Speaks	5·00

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

বাংলার ঋষি	৩·০০
বাংলার মনীষী	১·২৫
বাংলার বিদুষী	২·০০
বীরত্বে বাঙালী	১·৫০
ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৩·০০
রাজর্ষি রামমোহন	১·০০
রবীন্দ্রনাথ	১·০০
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১·২৫
আচার্য জগদীশচন্দ্র	১·৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ. বি. টি.

বিদ্যাসাগর	২·৫০
মানুষের মত মানুষ	·৬২
শিশু রামায়ণ	·৬২
শিশু মহাভারত	·৭৫

॥ প্রতিটি বই বহুচিত্র শোভিত ॥

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী : : ১৫ কলেজ স্কোয়ার : : কলিকাতা—১২

ছিন্নমস্তা

শিশিরকুমার দাশ

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

সাহিত্যের স্রোত মাঝে মাঝে নিস্তরঙ্গ হয়ে আসে, তখন হঠাৎ ধমকা হাওয়ায় আবার স্রোত চঞ্চল হয়। একটানা সাহিত্যধারায় দুঃসাহসী লেখক হঠাৎ নাড়া তোলেন। গতবছর আইরিশ মারডক-এর একটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। এই উপন্যাসটি বর্তমান ইংলণ্ডে সেই নাড়া তুলেছে। বিষয়বস্তু শুধু নতুন বললে কম বলা হয়, চমকপ্রদ বললেও তার স্বরূপ প্রকাশ করা হয় না, ভয়াবহ বললেও সত্য বলা হয় না। শিক্ষিত পাঠকমহলে একই সঙ্গে বিস্ময় ও বিমূঢ়তা, প্রশংসা ও ঘৃণা দুই দেখা গেছে। আর শিক্ষিতের তর্ক ও বিচারের ক্ষেত্রের বাইরে যে সাধারণ পাঠকের বৃহৎ জগৎ সেখানে বইটি জনপ্রিয় হয়েছে। পাঠকের অভ্যর্থনা পেয়েছে অভাবনীয় রকম।

মার্টিন-লিক-গিবন এই কাহিনীর নায়ক। ভদ্রলোক বিবাহিত। স্ত্রীর নাম অ্যান্টোনিয়া। মার্টিন স্ত্রীকে ভালবাসেন কিনা বলা কঠিন। কারণ তিনি জর্জি নামে একটি শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে গোপনে প্রেম বিনিময় করেন। স্ত্রীকে সেসব কথা তিনি কখনও বলেন নি। জর্জিকে বলেছেন স্ত্রীর কথা, কিন্তু বলেছেন যে স্ত্রীকে তিনি পরিত্যাগ করতে পারবেন না। কারণ স্ত্রীকেও তিনি ভালবাসেন। জর্জি এই সম্পর্ক মেনে নিয়েছিল, মেনে নিয়েই গোপনে মার্টিনের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করত। কিন্তু হঠাৎ মার্টিনের নিরুদ্বিগ্ন শান্তজীবনের ওপর আঘাত হানল অ্যান্টোনিয়া। অ্যান্টোনিয়া নিরীহ মেয়ে। জগতের ও জীবনের উচ্চ চিন্তায় তার মন নেই। মার্টিনের মত সে জ্ঞানবিজ্ঞানের বইপত্র পড়েনি, ইচ্ছেও নেই পড়ার। মার্টিন এবং অ্যান্টোনিয়ার একটি বন্ধু ছিল—পামার। পামার মানসিক রোগের চিকিৎসক। একদিন হঠাৎ অ্যান্টোনিয়া এসে ঘোষণা করল যে সে পামারকে ভালবেসেছে এবং পামারও তাকে ভালবাসে। এইক্ষেত্রে একমাত্র উপায় হচ্ছে বিবাহবিচ্ছেদ। অ্যান্টোনিয়া মার্টিনকে আবেগের সঙ্গে বলল যে সে মার্টিনের প্রতি অবিচার করতে চায় না, তাকে প্রতারণা করতে চায় না তাই সে স্বামীকে সব খুলে বলল। পামারের সঙ্গে তার হৃদয়ের বন্ধন এমন দৃঢ় কাজেই পামারকেও সে ফিরিয়ে দিতে পারবে না—কাজেই মার্টিনই পারে এই দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাতে, অ্যান্টোনিয়াকে বিবাহের বন্ধন থেকে মুক্তি দিতে। মার্টিন এই ঘটনাটি শুনল নিঃশব্দে, শান্তভাবে। যেন তার কোন ক্ষতি হয়নি, যেন তার জীবনের কিছুই হয়নি। তার সব আবেগ যেন কোথায় হারিয়ে গেছে। তার ক্রোধ নেই, হিংসা নেই, কোন অভিমান নেই। নিস্পৃহ, নিরভিমান, শীতল দৃষ্টিতে সে অ্যান্টোনিয়ার দিকে তাকাল। উদাসীন-ভাবে, ভীরুর মত সে মেনে নিল সব কিছু। তার নিজের স্ত্রীকে মুহূর্তের জন্যও সে তার সমস্ত আবেগের উষ্ণতা দিয়ে আটকে রাখার চেষ্টা করল না। অথচ অ্যান্টোনিয়া তাকে কোনদিন ছেড়ে চলে যাবে এমন কথা সে স্বপ্নেও ভাবেনি। অ্যান্টোনিয়াকে সে ভালবাসে, হয়ত তার কাছে তার সব

আকাঙ্ক্ষা মেটে না, তবু তাকে ভালবাসে। সেই অ্যান্টো-নিয়েকে ধরে রাখবার মত পৌরুষ যেন তার নেই।

কাহিনীর রঙ্গমঞ্চে এল এবার আরেকটি নতুন চরিত্র অনর ক্লেন। পামারের বোন। ভদ্রমহিলা অবিবাহিতা। তিনি ডাক্তার। মার্টিন অনরকে আনতে গেল ভিক্টোরিয়া স্টেশনে। অনর কন্টিনেন্ট থেকে লণ্ডনে এলেন ভাই-র সঙ্গে থাকতে। মার্টিন বন্ধুর অনুরোধে অনরকে প্রথম স্বাগত সম্ভাষণ জানাতে গেলেন স্টেশনে। স্পষ্টবাক্ সড়। অনরের অবয়ব। চরিত্রের কঠিন শক্তি তার আকারে প্রকাশিত। অনর মার্টিন ও অ্যান্টোনিয়ার বর্তমান সম্পর্কের কথা শুনলো। জানল যে তার ভাই পামার-ই অ্যান্টো-নিয়েকে কেড়ে নিয়েছে মার্টিনের নিরুদ্বিগ্ন, স্থির জীবন থেকে। অনর ভর্ৎসনা করলেন মার্টিনকে। মার্টিন সভ্যতার সন্তান। এই সভ্যতাই তাকে ভীরু করেছে মনে মনে, তার চারিত্রিক শক্তিকে করেছে অনড়, তার দৈহিক শক্তিকে করেছে নষ্ট। তাই সে নিজের স্ত্রীকে জয় করে নেবার শক্তি হারিয়েছে শুধু নয়, সে জন্য তার স্ত্রীকে প্রণয়ীর হাতের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। অনর বললে, "(জীবনের) অন্ধ শক্তিগুলিকে প্রতারণা করা সম্ভব নয়··· এ জীবনে সব কিছুর প্রতিদান দিতে হয়, প্রেমেরও প্রতিদান দিতে হয়।"

অ্যান্টোনিয়া স্বামীকে প্রতারণা করতে চায়নি। নিজেকেও প্রতারণা করতে চায়নি। তাই সে স্বামীকে তার মনের কথা বলেছে। কিন্তু মার্টিন তার গোপন জীবনকে কোনদিন গোপনে রাখতে পারল না। সে ধরা পড়ে গেল। অজির সঙ্গে তার প্রণয় শুধু আবিষ্কৃত-ই হল না আরো জানা গেল যে অজি অন্তঃসত্ত্বা। অ্যান্টোনিয়া স্বামীর এই প্রতারণায় অভাবনীয় রকম আঘাত পেল। তার এই বুদ্ধিবাদী জ্ঞানী স্বামী তাকে চিরকাল প্রতারণা করেছে, এই ভেবে তার সমস্ত দেহ মন বিষাক্ত হয়ে উঠল। স্বামীকে ঘৃণা করল মনে মনে, তাকে প্রবঞ্চক বলে গাল দিল, তার প্রেমের অসম্মানে সে অপমানিত বোধ করল। তবু সে ক্ষমা করল মার্টিনকে, ধরা করল অজিকে।

সমস্ত কাহিনীটির পটভূমিকা ইংলণ্ডের শীতকাল। ক্রীসমাসের সময়। সারাদিন সারারাত বৃষ্টি হচ্ছে, কোন কাজ নেই, কোন সেবা নেই। সমস্ত মুহূর্তগুলিকে ক্লান্ত ভারাক্রান্ত ক'রে মেঘ জমে আছে আকাশে। গাছে একটিও পাতা নেই। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় গাছ এখন কালো, মৃত, কঙ্কালসার। চারদিক মেঘে মেঘে অন্ধকার। কখনও কখনও কিরকির করে হালকা তুষার পড়ছে। সমস্ত পৃথিবী যেন এক শ্বাসরুদ্ধ কারাগার। আলো নেই, উজ্জ্বলতা নেই, প্রাণ নেই। এই অন্ধকারে এই উপন্যাসের দ্বন্দ্বসংকুল চরিত্রগুলি ছায়ামূর্তির মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারা জোরে হাসে না, জোরে কথা বলে না। নিজের অধিকারকে জোর গলায় জানায় না, জানাতে ভয় পায়। এই দিনগুলিতে বিভ্রান্ত মার্টিন কী করে সময় কাটাবে ভেবে পায় না। অ্যান্টোনিয়া এখন ভবিষ্যৎ জীবনের চিন্তা করছে। ঘরের আসবাবপত্রগুলো কী ভাবে ভাল করবে ভাবছে। মার্টিন এখন আর নেপিয়ারের History of the Peninsular War পড়ে আনন্দ পায় না, ঘুরে আনন্দ পায় না, এমনকি অজির সান্নিধ্যও তাকে তৃপ্তি দেয় না। তার মনের মধ্যে একটি আদিম প্রচণ্ড অনুভূতি ধীরে ধীরে জেগে উঠছে। হয়ত প্রথম জেগেছিল ভিক্টোরিয়া স্টেশনে অনরকে দেখে। হয়ত জেগেছিল অন্য কোনদিন যে দিন অনর মার্টিনকে জাপানী সামুরাই তরবারী সম্বন্ধে অনেক কিছু বোঝাচ্ছিল। কিন্তু তার চরম প্রকাশ হল সেদিন, যেদিন উন্মত্ত পশুর মত সে অনরকে জড়িয়ে ধরল। পরিবর্তে পেল মুষ্টি পদাঘাত।

কিন্তু আরও ভয়াবহ ঘটনা অপেক্ষা করছে। অ্যান্টোনিয়া তার পরবর্তী বিবাহজীবনের চিন্তায় মগ্নগুল। মার্টিন একা। হঠাৎ সে গেল পামারের বাড়ি। পামারকে সে আগে কিছুই

বলেনি। আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকে পড়ল, আর কী ভয়াবহ দৃশ্য দেখল। পামার এবং অনর সেই ঘরে একা। তারা পরস্পরকে জড়িয়ে আছে। তাদের দেহে নেই কোন বসন। ঘরে জ্বলছিল উজ্জ্বল আলো। বিছানার ওপর শুয়েছিল অনর, সে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। সে পাশ ফিরে বসেছিল, তার পায়ের ওপর পড়েছিল বিছানার চাদরটা। তার দেহের উপরের অংশ আহাজের মাস্তুলের মত বাদামী আর নগ্ন। আমি দেখতে পেলাম তার দুই স্তন দুটি, তার মাথাভরা কাল রুক্ষ চুল, খোঁপাই করা কাঠের মত কঠিন ও ভাবলেশহীন-মুখ। সে একা ছিল না। তার পাশে একটি নগ্ন পুরুষ……সে পামার।"

এই অপবিত্র ও কদর্য সম্পর্ক আবিষ্কার হওয়ার ফলে গল্পে এল নতুন ঢেউ, চরিত্রগুলির জীবনে এল আবার জটিলতা। মার্টিনের মধ্যে যেন এক সুপ্ত সাহসিকতা জেগে উঠল, সে অ্যাণ্টোনিয়াকে যেতে দেবে না পামারের হাতে। পামার এখন আলাদা লোক। অ্যাণ্টোনিয়া তাকে ভয় পায়, সন্দেহ করে। মার্টিনের 'শিভালরি' দীপ্ত হল অ্যাণ্টোনিয়াকে বাঁচাতেই হবে। পামার অ্যাণ্টোনিয়াকে যেদিন নিতে এল সেদিন সে কিছুতেই যেতে দিল না। তার পৌরুষের সব শক্তি দিয়ে, বলিষ্ঠতা দিয়ে সে পামারকে আঘাত করল, অ্যাণ্টোনিয়াকে বোঝাল। বন্ধুত্বের নির্বাসন হল সেইদিন।

কিন্তু ক্ষণিকের এই 'শিভালারি'। মার্টিন প্রেমের জন্য ক্ষুধার্ত। অন্তরে অন্তরে দাহ। মনের ভেতরে অসুস্থতা। শুধু বাইরে সে সভ্য, সে ভদ্র। কখনও সে জর্জির প্রতি অনুরক্ত হয়, কখনও অ্যাণ্টোনিয়ার জন্য তার করুণা হয়, আর কখনও অনর-এর জন্য অনুভব করে চৌম্বক আকর্ষণ। এরই মধ্যে আবার জীবন বিধাতা নতুন করে ঘুঁটি সাজান। তাই হঠাৎ দেখি শেষ পর্যন্ত অ্যাণ্টোনিয়া তার স্বামীর ভাই আলেকজাণ্ডারকে বিয়ে করার কথা ভাবছে, মার্টিন দেখে যে লণ্ডন বিমান ঘাঁটিতে জর্জি আর পামার একই পথের যাত্রী। আর অনর একদিন এসেছে মার্টিনেরই কাছে, পাশে।

লেখিকা চরিত্রগুলিকে রক্তমাংসের মানুষের চেয়েও ভাবলোকের ছায়ামূর্তির মত তৈরী করেছেন। কখনও বা কোন কোন চরিত্রকে করেছেন প্রতীকী। অনর জেন এই কাহিনীর নায়িকা সে নিজেই বলছে "আমি এক দেহবিচ্ছিন্ন মস্তক। আদিম উপজাতির মানুষেরা এবং প্রাচীন অ্যাজটেকেরা এই রকম নরমুণ্ড ব্যবহার করত, তাকে তেল মাখাত, তার জীভের ওপর একতাল সোনা রাখত এবং তার পর সেই মুখ দিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী বার করত। সেই নরমুণ্ডের সঙ্গে দার্শনিকদের কথা কী অদ্ভুত জান ? তাঁরা জানেন। সেই জ্ঞানের জন্য একজনকে অনেক কিছু দিতে হ'ত পরিবর্তে। কিন্তু সে জ্ঞান প্রেম থেকে বহুদূরে, সাধারণ জীবন থেকে বহুদূরে। প্রকৃত মানুষ হিসেবে আমরা দুজনে দুজনের জন্য নই।" 'প্রকৃত' মানুষ বা সত্যিকারের চেনা-জানা মানুষ এরা কেউ নয়।

এ-কাহিনীর শেষ হল সেখানে যেখানে এই 'ছিন্নমস্তা', স্বাভাবিক মানবজীবনের সুখদুঃখের দোলা চাইছে। কিন্তু এখানেও লেখিকা একটি পৌরাণিক কাহিনী বলে অনরের মনের ইঙ্গিত দিয়েছেন। ক্যাণ্ডলেস তার স্ত্রীর সৌন্দর্যের জন্য খুব গর্বিত ছিল এবং সে তার বন্ধু গিজিস্‌কে নিজের স্ত্রীর নগ্নরূপ দেখাতে চেয়েছিল। বন্ধুকে সে লুকিয়ে রেখেছিল শোবার ঘরে—কিন্তু স্ত্রী বুঝতে পারে। স্ত্রী শেষ পর্যন্ত সেই বন্ধুর কাছে গিয়ে প্ররোচনা দিয়েছিল নিজের স্বামীকে হত্যা করতে।

মার্টিন অনরের জীবনের গোপন কথা জেনেছে। জেনেছে তার অপবিত্র ও কদর্য গোপনীয় সম্পর্ক। কিন্তু এই প্রকাশ হয়ে যাবার ফলেই সে কদর্যতার মূলে দেবেছে আঘাত। তার জীবন থেকে এই অসুস্থতাকে সে বিসর্জন দিতে চাইছে। সে চাইছে নবীন জীবন। দেহহীন মস্তক চাইছে দেহকে।

একজন শিক্ষিত সাহিত্য সমালোচকের অনুরোধে এই বইটি পড়েছিলাম। অনেক সাহিত্য সমালোচকই আইরিশ মারডককে একালের শ্রেষ্ঠ ইংরেজ লেখিকা বলেছেন। কিন্তু এই গ্রন্থখানি পড়ে এই ধারণা সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হয়ে গেল। এই গ্রন্থের শেষে পামার ইংলণ্ড ছেড়ে চলে যাবার আগে যে চিঠিটি লিখেছিল তার মধ্যে আছে "আমি নীতি সম্পর্কে ফাঁপা কথা বলে তোমাকে অপমানিত করতে চাইনা। ওই-সব বন্ধন থেকে তোমার মুক্তির ফলে তোমাকে আমি সঙ্গী বলে মেনে নিয়েছিলাম।" লেখিকাকেও পাঠক হিসেবে, 'নীতি সম্পর্কে ফাঁপা কথা বলে' বিব্রত করতে চাইনি। কিন্তু এই ভয়াবহ যৌনসম্পর্কই এই গ্রন্থের প্রিয়তা ও অপ্রিয়তার প্রধান কারণ। সমালোচকদের উক্তির কারণ দুটি হতে পারে। এক তাঁরা নিতান্তই ঐ দৃশ্যটির মধ্যে বিকৃত তৃপ্তি অনুভব করেছেন, অথবা দুই, তাঁরা এই দৃশ্যে বিচলিত, শঙ্কিত হয়ত বিদ্যুৎ-স্পৃষ্ট হয়েছেন কিন্তু স্পষ্ট করে বলতে ভয় পেয়েছেন, পাছে কেউ বলে তাঁরা রক্ষণশীল, তাঁরা নীতিবাগীশ, তাঁরা অশিক্ষিত। কিংবা তাঁরা ভাবতে পারেন এর পেছনে কোন গভীর সাংকেতিক নির্দেশ বা তাৎপর্য নিহিত আছে। কিন্তু তা তাঁরা বুঝতে পারেন নি এবং বুঝতে যে পারেননি তা স্বীকার করতে চান না।

আমি মনে করি না প্রথম কারণের জন্য এই পুস্তকের প্রশংসা হয়েছে। আসলে দ্বিতীয় কারণই সত্য। এসম্পর্কে কোন কোন শিক্ষিত ইংরেজ বন্ধু মন্তব্য করেছেন, (যা আমার কাছে আশ্চর্য্য লেগেছে) যে বৃটিশ শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে মানুষের যৌনজীবন সম্পর্কে কোন আলোচনার ক্ষেত্র নেই। দৈহিক ও মানসিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার স্বাভাবিকতাকে তাই ইংরেজ লজ্জায় বিষয়ভাবে ও গোপনে রাখে। তাই ইংরেজ সমালোচকেরা এই 'পর্ণোগ্রাফিক' অ্যাংগ্রটুকুকে স্বাভাবিকভাবে অর্থাৎ এর ভয়াবহতাকে না বুঝেই মেনে নিয়েছেন। কিন্তু যাইহোক, আসল কথা হল অশ্লীলতা নয়, কদর্যতা। শিল্পী যদি সুন্দরের স্রষ্টা হন তবে এই গ্রন্থে তিনি ব্যর্থ। আর সুন্দরের স্রষ্টা যে নয়, সে শিল্পী কি!

আইরিশ মারডক আরো বই লিখেছেন। এই বছরে তাঁর আরো একখানি বই বেড়িয়েছে। কিন্তু বোঝা যায় তাঁর অভিজ্ঞতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। জীবনের রূঢ় ও তিক্ত দিক-গুলিকে তিনি যেভাবে দেখেন তার অনেকখানিই কল্পনা, সত্য নয়। কিন্তু মধ্যে মধ্যে হঠাৎ সাহিত্যের ক্ষেত্রে কেউ রাতারাতি আসর জমান, তারপর রাত ফুরোবার আগেই তাঁদের পুঁজি ফুরিয়ে আসে। হঠাৎ চমকের উত্তেজনা আগে আগে নিভে আসে। ছিন্নমস্তার ভয়াবহ আবির্ভাব তাই অনেককে চমকে দিয়েছে, কিন্তু ধীরে ধীরে সেই চমক শেষ হবে। ছিন্নমস্তক দেহহীন হবার পরেও আর কতদিন বাঁচবে।•

• The severed Head by Iris Murdock

উদ্দেশ্যহীনতা নয়—চাই দৃঢ়প্রতিজ্ঞা
জাতীয় প্রস্তুতির জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প নিয়ে কাজ করুন

কিছুটা মনস্তত্ত্বমূলক ...

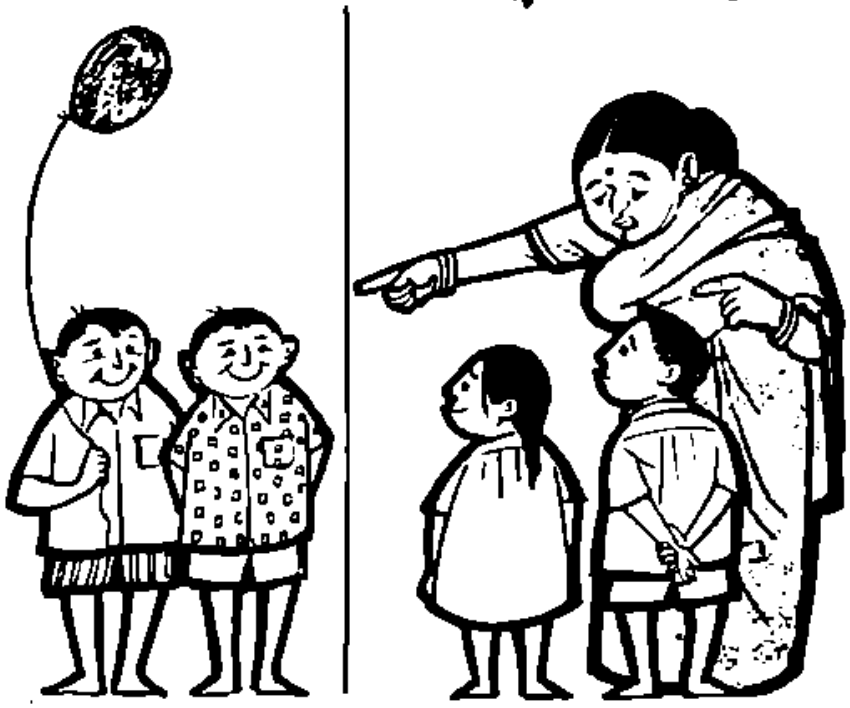

মনস্তাত্ত্বিকগণ আমাদের, অন্যের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিজেদের ছেলেমেয়েদের তুলনা করতে নিষেধ করেন। ওঁরা বলেন যে এতে শিশুদের স্বাভাবিক উন্নতি ব্যাহত হয়। মেট্রিক ওজনের ক্ষেত্রেও এই যুক্তি খাটে।

শিশুদের (এবং মেট্রিক ওজনের) সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য ওদের স্বাভাবিক দোষত্রুটিগুলি মেনে নিন।

সের বা মাপের সমতুল হিসাবে মেট্রিক ভগ্নাংশ ব্যবহার করবেন না।

এতে আপনার সময়ের অপব্যয় হবে এবং হয়তো অনেক ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্থ হবেন।

তাড়াতাড়ি কেনাকাটা ও স্বাস্থ্য লেনদেনের জন্য

পূর্ণ সংখ্যার মেট্রিক এককগুলি

ব্যবহার করুন

মুখের রং

সুধাম টগরের বাবা কার্তিক চার বছর আগে নদীর ধাক্কা লেগে আঘাত পেয়ে হাসপাতালে মারা গেছে। একান্ন বছর বয়স হয়েছিল মানুষটার। কাজ সেরে রাত্রে ফিরছিল। অসময়ে মরে গিয়ে সুধামের পথে বসিয়ে গেছে। কটা টাকা আর বাড়ি রেখে গিয়েছে।

বুড়ি রাতদিন সেই বিলাপ করে।

"আমি তো বসে আছি, কাজ সেরে কেতো বাজার নিয়ে ঘরে ফিরবে—পথের দিকে তাকাই—বুকের ভেতরটা কেমন যেন জ্বালা জ্বালা করে ওঠে—অত রাত তো ছেলে আমার কোনদিন করেনা—হুঁ, দশটা বেজে যায়—এদিকে উনুনের কয়লা পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে গেল কলের জল পড়া বন্ধ হল—একবার ঘরে যাই একবার দোরে দাঁড়াই—আর তখন মুখপোড়া গায়েনের বেটাই তো ছুটে এসে খপর দিয়ে গেল—কার্তিক হাসপাতালে আছে—চৈতন্য নেই—ও আমার কেতো রে—আমার ঘাড়ে কতবড় বোঝা তুলে দিয়ে তুই পালিয়ে গেলি রে—ও বাপ রে, আমি যে এখন চোখে মুখে পথ দেখছি না রে বাপ—'

'ইস্!' টগরের ইচ্ছা করে বুড়ীর মুখে বাটনা বাটার শিলটা তুলে দেয়। 'ঠাকুমা, তুমি কি একটু ঘুমোতে পার না...বকে বকে কি তোমার মুখে বাধা ধরে না—দিন নেই রাত নেই, তুমি যদি কেবল চেঁচাতে থাক তো আমরা পালিয়ে যেতে হবে—চব্বিশঘণ্টা একরকম কথা শুনতে কারো ভাল লাগে।' যেন টগরের গলাও ধরে যায়, চোখ দুটো ছলছল করতে থাকে।

বুড়ি তখন একটু চুপ করে। কিন্তু কতক্ষণ? টগর কাঁচি দিয়ে কাগজ কাটতে আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে, অবশ্য আগের মতন আর কান্না কাটি না, লম্বা লম্বা নিশ্বাস ফেলে চাপা গলায় বুড়ি বিড় বিড় করতে আরম্ভ করে। টগর কিছু শুনতে পায় কিছু শুনতে পায় না। 'তবু যদি বাপ তোর বিয়ের একটা ব্যবস্থা করে যেতো—আর ওই তো কটা টাকা—কদিন আর.....বলে কিনা পুঁজি ভেঙ্গে খেলে সাত রাজার ধনও ফুরোয়.....হুঁ, ছেলে হয়েছে ..আড্ডা মেরে রকবাজী করে সময় পায় না—ও আনবে পয়সা ঘরে—ও করবে রোজগার—বোনকে বিয়ে দেবে—হা রে কেতো, কেমন এক ছেলের জন্ম দিয়ে গেছিস একবারটি তুই দেখে যা, কী চরিত্তের ছেলে—'

'এই বুড়ি!' টগর চমকে উঠল, বুড়ির কথা থেমে গেল। দরজায় সুধাম এসে দাঁড়িয়েছে। এমন অনেকদিন হয়েছে। সংসারের অন্য সব কথা শেষ করে কান্নাকাটা থামিয়ে ঠাকুমা যখন সুধামের বাইরে বাইরে আড্ডা দেওয়া রকবাজী করা আর তার চরিত্র নিয়ে সমালোচনা সুরু করেছে তখন কোথা থেকে ধুমকেতুর মতো সুধাম এসে দরজায় দাঁড়িয়েছে। বুড়ির কথা কয়টা সে শুনে ফেলেছে। 'রোজ আমার চরিত্তির নিয়ে খোঁটা—হুঁ আমি কি মদ গুলি না মেয়েমানুষ নিয়ে আছি, বড় যে রাতদিন আমার পেছনে

••• জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ••• ধারাবাহিক উপন্যাস ••

লেগে থাকা হচ্ছে—আমি তোমার মুখ বোঁতো করে দেব একদিন বলে রাখছি—জিভ কেটে দেব—ঘাটের মড়া—ছেলে চিবিয়ে খেয়েছে—ছেলের বৌকে চিবিয়ে খেয়েছে—এখন আর কাজ নেই—এখন কেবল আমার—'

'ইদ্ তুই থাম না দাদা!' টগর ভয়ংকর অস্বস্তি বোধ করে। কেননা ঠাকুমা আর সুধাম যদি ঝগড়া করতে আরম্ভ করে তো পাড়ার লোক জড় হবে। কতদিন এমন হয়েছে। বুড়ি এখনি হাউ মাউ করে কাঁদতে আরম্ভ করবে আর সুধাম হৈ রৈ করে বাড়ি মাথায় তুলবে। টগর দুজনের একজনকেও বলে কয়ে হাত ধরে মিনতি করে থামাতে পারবে না। 'আমি কি তোরটা খাচ্ছি যড় যে কেবল আমার ছিদ্র তালাস করে বেড়ানো! টগরকে বিয়ে দিতে হবে সে আমি দেখব—বাবার টাকা ফুরিয়ে যাচ্ছে—আমি দেখব - তুই কে, রাতদিন কেবল বক্ বক্ বক্—মড়া ধরবেও না।'

মরার কথা তুললেই বুড়িহাউ মাউ করে কাঁদতে আরম্ভ করে। মরণকে যে ঠাকুমার কত ভয় টগর জানে। 'এই দাদা—আঃ কী আরম্ভ করলি তুই—এখনি—'

টগরের কথা শেষ না হতে তুলসী এসে যায়।

'দিদি কেমন আছেন।' তুলসীর গলার স্বর শোনামাত্র বুড়ি কান্না থামিয়ে দেয়। আর সুধামও সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে না। আজও তাই হল। ঝগড়াটা ভাল করে জমতে আরম্ভ করার আগেই তুলসী পোদ্দার এসে গেল। নয়নতারার ভাল লাগল। হয়তো টগরও স্বস্তিবোধ করল। কিন্তু সুধাম? চুপ করল বটে, সেখান থেকে সরে এসে নিজের ঘরে ঢুকে বিড়বিড় করে বকতে আরম্ভ করল। 'স্কাউণ্ড্রেল্ টা এসে গেছে, আসবেই—না এসে থাকতে পারে না শূয়ার—আমি জানি। রোজ এ বাড়ি না এলে তার পেটের ভাত হজম হয় না চোখে ঘুম আসে না।'

সুধাম আয়নায় নিজের মুখ দেখে। ঘৃণায় নিমেষে তার মুখের চামড়া কুঁচকে উঠেছে চেহারাটা বিশ্রী হয়ে আছে সে বেশ দেখতে পায় এবং কেন এমন হয় তাও চিন্তা করে। অথচ ঠাকুমার সঙ্গে ঝগড়া করার সময় তার মুখ চোখের অবস্থা কোনদিন এমন খারাপ হয় না। অনেক সময় নিজের ঘরে থেকে সে বুড়ির সঙ্গে ঝগড়া করে, ঝগড়া করতে করতে আয়নাটা দিয়ে মুখ দেখে চিরুণি চালিয়ে মাথার চুল ঠিক করে বা ঝগড়া করতে করতে দাড়ি কামায়। অর্থাৎ কাজ-কর্ম যা করার স্বাভাবিকভাবে তা করে যায় এবং চেহারাটাও স্বাভাবিক থাকে। কিন্তু তুলসী পোদ্দার এবাড়িতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে সুধামের মাথার ভিতরটা কেমন গোলমাল হয়ে যায়। চোখ মুখের অবস্থা অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

আজও তাই হল।

এবং যখন এমন হয় তখন সে পায়চারি করতে সুরু করে দেয়। তার হাতের মুঠো দু'টো শক্ত হয়ে ওঠে। একবার বিছানার কাছে, একবার টেবিলের কাছে, একবার

জানালার কাছে চুপ করে সে দাঁড়ায়, তারপর হাঁটতে আরম্ভ করে।

'আহা! এ হল গিয়ে তোমার কনকচাঁপার ছাট—'

'আমি যে জুইচাঁপা তৈরী করতে চাইছি।'

'হুঁ তার ছাট আলাদা। কাগজ ভাঁজ করতে হবে এভাবে।' মেঝের ওপর টগরের পাশে আসন পেতে বসে পড়ে কাগজ ভাঁজ করতে দেখে যায় ভূষণ। 'দাও, আমায় দাও কাঁচিখানা।'

তারপর টগরের কাঁচি তুলে নিয়ে ভূষণ ভয়ানক মনোযোগের সঙ্গে ভাঁজ করা কাগজ কাটতে আরম্ভ করে। আস্তে আস্তে কাগজের ভাঁজ ধরে ধরে কাঁচি ঘোরায়। সঙ্গে সঙ্গে ভূষণের হাত ঘোরে চোখ ঘোরে যেন মাথাও একটু একটু ঘোরে। শরীরটাও ঈষৎ নড়তে চড়তে থাকে।

ছোটা কাগজের কুচিগুলি খুব ঝুর ঝুর করে কিছু ভূষণের কোলের ওপর কিছু টগরের কোলের ওপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল।

জুই চাঁপার জন্য কেমন করে কাগজ কাটতে হয় ভূষণ তাই দেখাতে এত ব্যস্ত হয়ে পড়ে, তার শরীরটা মাথাটা টগরের কোলের কাছে কপালের কাছে সরে যায়।

কাগজ কাটা শেষ হতে ভূষণ কাঁচিটা মেঝের ওপর রাখে। হঠাৎ করে একটা শব্দ হয়। ঘরে আর কোন শব্দ নেই তখন। না, আর একটা শব্দ হচ্ছে। বুড়ির নাক ডাকছে।

ঘরের ওপাশটা অন্ধকার। সেখানে বুড়ির তক্তপোষ।

অন্ধকারে বুড়ির নাক এখন ঘুস ঘুস করে শব্দ করতে সুরু করেছে! এতক্ষণ ভূষণের সঙ্গে জেগে থেকে বুড়ি সুখ দুঃখের কত কথা বলছিল। কথা বলতে বলতে হঠাৎ একসময় ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু ঘুমিয়ে পড়লেও যেন বুড়ি চুপ করে নেই। নাকের শব্দ করছে। বুড়ি ঘুমিয়ে পড়তে ভূষণ টুক করে উঠে এসেছে আলোর কাছে টগরের পাশে কাঁচির কাজ শেষ করে কাগজের ভাঁজ খুলে ফেলল ভূষণ। সবটা কাগজ টগরের মুখের সামনে মেলে ধরল। এক একটা ভাঁজে ষোলটা করে পাপড়ি।

আটটা ভাঁজের পাপড়ি যোগ করলে কত হয়?

এতগুলি জুইচাঁপার পাপড়ি এক সঙ্গে কাটা হয়ে গেল দেখে টগরের দু চোখ বড় হয়ে গেছে। ভুরু বেঁকে গেছে। ঠিকলো নাকটা অল্প একটু তুলে ধরে ফ্যাল ফ্যাল চোখে সরু সুঁচাল পাপড়িগুলি দেখছে।

মুখে প্রশংসা করছে না ও। কিন্তু চোখ দুটো থেকে প্রশংসা করে পড়ছে। চমৎকার হাত ভূষণের।

—হবে না! ভূষণ হি হি করে হাসছে। অল্প শব্দ করে হাসছে। যেন জোরে হাসতে ভয় পাচ্ছে, পাছে নয়নতারা জেগে ওঠে। জেগে উঠলে আবার ভূষণকে উঠে গিয়ে অন্ধকারে তক্তপোষের পাশে বেতের মোড়াটায় বসতে হবে। আর বুড়ির হাজারটা প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। কিন্তু ভূষণ যেন এত কথা বলতে পছন্দ করে না। করে না সত্যি। তাই বুঝি বুড়ির সঙ্গে কথা বলতে বলতে হাজার বার ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে আলোর আয়নাটা দেখছিল। পা দুটো মুড়ে পিঠ বেঁকিয়ে মাথা গুঁজে কাগজ কাঁচি আঠার বাটি ছড়িয়ে টগর যেখানে বসে ফুল তৈরী করছিল। যেন ঐ আলো ঐ ফুল ভূষণকে টানছিল।

'হবে না!' ভূষণ পোদ্দারের কালো পুরু ঠোঁট বিস্ফারিত হল! কাঁচা পাকা চুল ভর্তি মাথাটা উত্তেজনায় দুলে উঠল। দশ বছর বয়স থেকে গহনার নক্সা করতে শিখেছিলাম। তখনকার গহনা আর এখনকার গহনা আকাশ পাতাল। এখন তো প্লেনের ওপর কাজ চাইছে মেয়েরা। এখন আবার নক্সাটক্সার কাজ আছে নাকি। সব কেমন জলো হয়ে গেছে। মেয়েরা জলো হয়ে গেছে। তাদের পছন্দ শুখ আহ্লাদও আজকাল ফিকে কেমন জলো হয়ে গেছে। এখন গহনাই বা পরছে কটা মেয়েছেলে শুনি? এক হাতে ভারের

মতো সরু একটা বালা আর এক হাতে ঘড়ি। বাস্ হয়ে গেল অলঙ্কার পরা। গলায়ও কিছু নেই, কানেও এক রতি সোনা চোখে পড়ে না।'

তারপর ভূষণ বলছিল শ্লেটের ওপর শেলট বুলিয়ে বুলিয়ে ছোট ছেলেরা যেমন 'অ' 'আ' 'ক' 'খ' লিখতে শিখে তেমি ভূষণকে দারা সুপুর বৌবাজারের নবীন পোদ্দারের সোনার দোকানের এক কোণায় বসে ফুল পাতা পাখি মাছ ও মকরমুখ আঁকা শিখতে হয়েছিল। আগে তো নক্সা। নক্সার হাত পাকা না হলে গহনা গড়বে কোন কারিগর।

'চুড়ি বালা বাকড়ি হার বাজুবন্ধ অনন্ত টায়রা মানতাসা তখন অলঙ্কারই বা ছিল কত পরের—আর এক একটা জিনিসের ওপর কত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কাজ করতে হত।' ভূষণ টগরকে হাত নেড়ে বোঝায়। 'গহনা তো তাকেই বলে অলঙ্কার বলতে তাই বোঝায়। সোনার ওপর বিচিত্র কারুকার্য্য থাকবে। আর যে-কারিগর হাতের কাজ যত সুক্ষম তার তত কদর—হুঁ ছিল—এককালে, আজ নেই। আজ তেমন করে একটা মকরমুখ বালা তৈরী করে দিক না—একটা সূর্য্যমুখী লকেট করে দিক তো কোন কারিগর—পারবে না—তেমন নক্সাই আর তাদের হাতে আসে না, সোনার কাজ ভুলে গেছে কারিগরা—ছেলে ছোকরা যারা নতুন কাজ শিখছে তাদের কথা ছেড়েই দিলাম তারা নক্সা কাকে বলে তাই জানে না।'

টগর চুপ করে শুনছিল।

বুড়ির নাক ডাকছিল।

নিশ্বাস বন্ধ করে সুধাংশু দরজার আড়ালে চুপ করে দাঁড়িয়ে ভূষণের বক্তৃতা শুনছিল।

কেবল কথা কথা। টগরের সঙ্গে এত কথা বলতে ভালবাসে পাগিটা। আরে বাপে কত কি বকছে।

'কারিগর মানে শিল্পী। সোনার ওপর পাখি ফুল লতা পাতার নক্সা তুলে তুলে এই হাত পাকিয়েছি। সেই ছোটবেলা থেকে—হুঁ, দশ বছর বয়স থেকে—এখন তোমার কণকচাপা ভুঁইচাপা ফুলের ছাট যদি আমি কেটে না দিতে পারলাম তো এই হাত দুটো রেখেছি কেন তুমিই বলো—' হি-হি।'

টগর হাসছে। টগর হাসছে না? টগরের গালে টোল পড়তে দেখে সুধাংশুর মাথার ভিতর যেন দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে লাগল। ঐ লোকটাকে—ঐ বুড়োধাড়ি ভূষণকে কি টগরের ঘেন্না ধরে না? রোজ অসভ্যটা এসে গল্প করছে, কণকচাঁপা আর ভুঁইচাপার পাপড়ি কেমন করে কাঁচি দিয়ে কাটতে হয় শেখাবার অছিলায় টগরের গা ঘেঁসে বসছে। আর টগর হাঁ করে জানোয়ারটার কথা গিলছে, হাসছে।

দরজার আড়ালে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে সুধাংশু ঘামছিল। একটা খারাপ ইচ্ছা নিয়ে ভূষণ পোদ্দার এবাড়ি আসছে ঘন ঘন আসছে। ভূষণকে যদি বাধা দিতে হয় তো সুধাংশুই দেবে। চোখের ওপর সে দেখছে। ভূষণ কোনদিকে হাত বাড়াতে চাইছে। ভূষণের চোখে কোন্ ইচ্ছা নাচানাচি করছে তা বুঝতে সুধাংশুর বাকী নেই। ঠাকুমা বুড়ি এসব বুঝবে না।

ভূষণের নাম শুনলেই বুড়ি চিনির মতন গলে যায় ভূষণের দোষ ত্রুটি কখনও দেখবে না। তা ছাড়া চোখে ছানি পড়তে সুরু করছে। কোন্‌টা সাদা কোন্‌টা কালো তাই এখন নয়নতারার চিনতে কষ্ট হচ্ছে।

চিন্তা করতে করতে সুধাংশু এক সময় নিঃশ্বাস বন্ধ করে স্থির হয়ে দাঁড়াল। ওয়ারটা টগরের হাত ধরল না? কাঁচিটা নিতে গিয়ে টগরের হাতে চাপ দিল না? এই স্টুপিড—যেন চিৎকার করে উঠছিল সুধাংশু—কিন্তু তার গলা দিয়ে শব্দ বেরোল না। অতি কষ্টে একটা শুকনো ঢোক গিলে সে টলতে টলতে দরজার অন্ধকার আড়াল ছেড়ে নিজের ঘরের দিকে চলল।

'যার মন সুন্দর অন্তর সুন্দর তার দৃষ্টিও সুন্দর—সুন্দর

দৃষ্টি নিয়ে সে সারাক্ষণ সুন্দর জিনিস দেখবে। আর শিল্পীর মনটাও সুন্দর—তাই সারাক্ষণ সে সুন্দর জিনিস দেখে সুন্দর ছবি আঁকে চমৎকার ফুল তৈরী করে মিষ্টি মিষ্টি গান রচনা করে সুন্দর কবিতা লেখে—বুঝেছ—তুমিও পারবে, যদি মনটা সেভাবে তৈরী কর আস্তে আস্তে তোমার চোখও সুন্দর হবে—তখন তোমার হাতের কাছে আপনা থেকেই চাঁপা ফুল গোলাপ ফুল, মালতী ফুলের পাঁপড়ি কেটে চলবে, হু অবিকল মালতীর পাপড়ি।'

সুন্দর বোঝাচ্ছে, সুন্দর ব্যাখ্যা করছে কাউণ্ডেলটা এক ঢোঁটা মেয়ের কাছে। সুধামের কিছু বুঝতে বাকী নেই। পঞ্চাশ বছরের বুড়ো ষোল বছরের মেয়ের মন নরম করে আনছে। তাই এত কথার ফুলঝুরি, তাই রোজ এত সাজগোজ করে এবাড়ি আনাগোনা। দাঁড়াও!

'তুই ভাত খাবি না দাদা?'

'না।'

'কি হয়েছে?' সুধামের বিছানার কাছে চলে এল টগর। সুধাম উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। টগর দরজায় দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ ডাকাডাকি করে পরে ভিতরে ঢুকল।

'কেন, তোর কি শরীর খারাপ হয়েছে?'

'না।'

'তবে ভাত না খাওয়ার হল কি?'

'আমার ইচ্ছা করছে না—তুই এখান থেকে যা।'

টগর অল্প হাসল।

'কেন, হঠাৎ আবার রাগ করলি? বুড়ির সঙ্গে তো রোজই ঝগড়া লেগে আছে—তাতে রাগ করে ভাত খাওয়া বন্ধ করে দিবি?'

'আমি রাগ করিনি।' সুধাম উঠে বসল। হাত দিয়ে কপালের চুল পিছনে ঠেলে দিল। তার গলার স্বর ভয়ানক গম্ভীর। বাড়িতে ইলেকট্রিক নেই। আগে ছিল। এখন লাইন কেটে দেওয়া হয়েছে। বুড়ির ঘরে টগর শোয়। এই ছোট ঘরটা সুধামের। একটা কেরোসিনের ডিবে জেলে সুধাম কাজ সারে। দরকার হলে টগরদের হ্যারিকেনটা আনে। বাড়িতে একটাই হ্যারিকেন। টগর এতক্ষণ ফুল তৈরি করছিল বলে হ্যারিকেনটা ওঘরেই জ্বলছিল। এঘরটা অন্ধকার। ডিবিটা নেবানো। হয়তো তেল ফুরিয়ে গেছে। তাই আলো নিবে গেছে। অন্ধকার ঘরে সুধাম শুয়ে ছিল। সুধাম যখন উঠে বসল টগর দাদার মুখ চোখ দেখতে পেল না। দেখতে পেলে ওর ঠোঁটের হাসি মিলিয়ে যেত। কিন্তু তা হলেও গম্ভীর স্বরটি টগরের কানে কেমন অদ্ভুত লাগল।

'তবে কি হয়েছে তোর শুনি?' টগর বিছানার ওপর ঝুঁকে ছিল। সোজা হয়ে দাঁড়াল।

'আমার মন ভাল না।'

ও বুঝেছি। টগর হঠাৎ খিলখিল দিয়ে উঠল। নিশ্চয় শোভার সঙ্গে কিছু একটা হয়েছে। হওয়া স্বাভাবিক। ভূষণ পোদ্দারের মেয়ে শোভার সঙ্গে সুধামের মাখামাখি টগরের অজানা নেই। দাদা কথায় ওরা দুটিতে খুব প্রেম করছে। যেখানে প্রেম সেখানে মান অভিমান থাকবেই।

'ভূষণ চলে গেছে?' সুধাম হঠাৎ প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ, কেন, তোর কিছু দরকার ছিল?'

'কাউণ্ডেল!' সুধাম বিড়বিড় করে উঠল।

নিশ্চয় ভূষণ ওদের ভালবাসার কথা জেনে ফেলেছে। কে জানে হয়তো ওবাড়িতে সুধামকে যেতে নিষেধ করেছে ভূষণ বা—টগর ভাবল, শোভাকে হয়ত এবাড়ি আর আসতে দিতে চাইছে না। অনেক কিছু হতে পারে। তাই দাদা লোকটার ওপর চটে আছে।

তোর সঙ্গে এত কি কথা রোজ রোজ বলে সে শুনি? রুক্ষ গলায় সুধাম প্রশ্ন করল।

টগর চমকে উঠল। ভয় পেল।

'না তো—আমার মনে খুব বেশি কথা আসার বদলে করে! বোঝ তো ঠাণ্ডাঘরের মনে বসে গল্প করে।

'কেন আমার কি চোখ নেই? তোর পাশে বসে পোকার এতক্ষণ কথা বলে যেন না?'

'ও, হ্যাঁ, ওই তো একটা কবিতা 'ডাকাতি কেটে দেখেছিস—ওর ছবি খুব ভাল।'

'চল আমরা বসি গে।' তমাল ভেংচি কাটল, টগর চুপ করে রইল। তারপর অন্ধকারে উপুড়ে একটা মাটির পুতুলের মত দেখাচ্ছিল। স্থির রইল।

'দুই মিতে যেমন পারিস করবি—ওকে ডাকবি না, কৃষ্ণ টুম্বা তৈরী করা শেখাতে। আমি যাবো না তো।' তমাল আবার শুয়ে পড়ল। 'আমার ভাত ওখানে ঢাকা দিয়ে রাখ। আমি যখন ইচ্ছা খাব।'

'আমার ঘরে তোর জন্যে বাসন তৈরি আছে। ইচ্ছা হলে উঠে যেয়ে খাবে না হলে না খাবে।'

'ও! আমি-এর মতো কাজিয়ে উঠে বসল তমাল। 'যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা। দাঁড়াও তোমায় আমি এমন শিক্ষা দিচ্ছি!'

টগর ছুটে বেরিয়ে গেল। বাকা হেসে তমাল পাশটা ঘুরে শুয়ে পড়ল।

(ক্রমশঃ)

DESIGNED

The Kuljian Corporation of India is a service organisation specialising in consulting engineering. ■ In its fully equipped office in Calcutta, the Corporation has assembled a well-knit team of about a hundred trained Indian and American construction engineers and draughtsmen all qualified by experience in project construction. ■ Backed by the experience of a decade in power engineering in India and proud of the tradition of its American collaborators whose famous name it bears, the Corporation welcomes exacting assignments of all types, in any part of India, any time. ■ From feasibility report to initial operation is the scope of Kuljian service; from power plants to all-type public works is the range of Kuljian operation.

The Kuljian Corporation (INDIA) PRIVATE LTD. Engineers / Constructors
AN INDO-AMERICAN JOINT ENTERPRISE 24-B, Park Street, Calcutta-16

FOR SERVICE

লক্ষ্মী বিদায়

..... চন্দ্রমা গুহঠাকুরতা .....

শ্রীহরতলীর প্রাইমারী স্কুলে নতুন শিক্ষিকা হয়ে এসেছি। আমাদের বাড়ীর উল্টোদিকে উদ্বাস্তু কলোনী। সেখানে রাজেনদাস তার তিনটি মেয়ে ও স্ত্রীকে নিয়ে থাকে। সাইকেল রিক্সা চালায় রাজেন, আমি ওর রিক্সায় স্কুলে যাই। রিক্সার অবস্থা কিন্তু বেশ শোচনীয়, কাঠের সীটটা কেবলই সামনের দিকে বেরিয়ে আসতে চায়, ক্যানভাসের ঢাকনীর সবজায়গায় ছেঁড়া—বৃষ্টি বা রোদ কোনটাই আটকায় না। তার উপর পাঁচ মিনিট পর পরই রাজেনের সাইকেলের চেন খুলে যায়, আরও গুণ, আছে—চলবার সময় অদ্ভুত একটা আওয়াজ বের করে, তার ফলে রাস্তার লোক কৌতূহলী হোয়ে তাকায় এবং মুখ টিপে হাসে, রিক্সায় বোসে এইটুকু বোঝাযায় যে একটা লোক কেবল গায়ের জোরে একটা জিনিষ টেনে নিয়ে যাচ্ছে, যারা হাঁটে তারাও আমাদের পিছনে ফেলে যায়, ৪ রিক্সায় চড়বার মোটামুটি ফল হোল মা-বাবার রোদে পোড়া বৃষ্টিতে ভেজা, লোকের চিট্‌কারী শোনা এবং প্রত্যেক মাসেই রিক্সা মেরামত করবার জন্য অতিরিক্ত টাকা দেওয়া, রাজেনের বুদ্ধি কমের জন্য এবং নিজেই নিজেকে অতিরিক্ত চালাক মনে করবার জন্য ওর শত্রুর অভাব নেই। একবার একদল লোক এসে কি একটা সামান্য ছুতোয় ওর ঘরের টিন খুলে নিয়ে গেল, ও শুধু বোকার মত তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। ছোরা পালোয়ানের মত,—ঘাড় পর্যন্ত চুল—সামনের দাঁতগুলি পোকায় খাওয়া কারণে-অকারণে হাসে, দেখলেই বোঝা যায় শরীর অতবড়, কিন্তু বুদ্ধির ভাগটা একেবারেই কম।

একদিন রাজেনের জ্বর, আমি একা চলেছি, স্কুলের কাজে সহরে যেতে হবে, হঠাৎ পিছনে 'মাষ্টার মশাই' 'মাষ্টার মশাই' ডাক শুনে তাকিয়ে দেখি কোলে একটি বাচ্চা নিয়ে বছর আটের একটি মেয়ে ছুটে আসছে। বলল বাবা তোমাকে ডাকছে, সামনের মাঠে অনেক ছেলেমেয়েরা খেলা করে কে কোন বাড়ীতে থাকে জানি না। 'কে বাবা তোর?' গর্বিত ভাবে বলল—'আমার বাবা রাজেন, রিক্সা চালায়। এর মধ্যে রাজেনও হাজির বলল, আমাকে নিয়ে যাবে, জ্বর ছেড়ে গেছে। সহরে গিয়ে কাজ সেরে ফিরতে অন্ধকার হোল, পুরানো গির্জা পর্যন্ত এসে বৃষ্টি সুরু হোল। আবার প্রত্যেক পাঁচ মিনিটে রিক্সা থামাতে হোচ্ছে সীট ও চেন ঠিক করবার জন্যে। গির্জা ছাড়িয়েই একদিকে ফাঁকা মাঠ তারপরেই গঙ্গা অন্যদিকে ঘন বন। আলো জ্বেলে নিতে বললাম রাজেনকে, সামনেই পুলিশ ফাঁড়ি। হেসে বলল লাইটটা আনেনি, ভেবেছিল রাতের আগেই আমরা ফিরব, আমি রাগে ভয়ে দিশেহারা হয়ে গেলাম, বললাম আর কোনদিনও এ গাড়ীছাড়া রিক্সায় চড়ব না, এ এক শাস্তি। ফাঁড়ির সামনে পুলিশ রিক্সা দাঁড় করালো। আমি ওদের নিয়ম-কানুন কিছুই জানি না। ভাবছি দুজনকেই হয়তো হাজতে রেখে দেবে। রাজেন নেমে গিয়ে পুলিশের সঙ্গে কথা বলল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করছি সম্মান নিয়ে ফিরতে পারলে এ রিক্সায় আর নয়, রাজেন হাসিমুখেই এল, গ্রামের রাস্তা-ঘাট ভাল নয়, মাঝে মধ্যে দু'একজন লোক দেখা যায়, রেগে গিয়ে বেল দিতে বললাম। শুনলাম বেল ভেঙে

গেছে, তখন আমার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। বললাম থামাও রিক্সা আমি অন্য রিক্সায় যাব, যাবনা এ ভাড়া জঞ্জালে। আমার কথার উত্তরে রাজেন যা করল তা ক্লাসিক, রিক্সা চালাতে চালাতেই আমার দিকে মুখ কোরে গল্প সুরু করল। —মাষ্টার মশায় রাগ করেন ক্যানে—এবং সামনের মাসেই এ রিক্সা বেচে দেবে মেয়ের বিয়ের খরচ তুলবে বলে। তারপর কোন লোক ঠকিয়ে ওর কত টাকা নিয়েছে ইত্যাদি, আমি দু হাতে মুখ চেপে চীৎকার কোরে ওকে সামনে তাকাতে বললাম, ভগবানের দয়ায় অ্যাক্সিডেন্ট হয়নি। রাজেন কিন্তু নির্বিকার, হেসে চলেছে কথা বোলে চলেছে, আশ্বাস দিল ওর রিক্সায় চড়লে কোন ভয় নেই, ওর মত ভাল চালাতে অমুকে অমুকেও পারে না। দাঁত কিড়মিড় কোরে বললাম—তুমি মানুষ খুন করতে পার।

কদিন গেলাম না ওররিক্সায়, একদিন অফিসের পথে ফিরছিলাম—হঠাৎ দেখি এক গাছের ডালে রাজেনের মেয়ে দোলে, লাফ দিয়ে নেমে বলল,—'মাষ্টার মশায় পয়সা দাও—ওষুধ কিনব বাবার অসুখ।' শুনে রাজেনকে দেখতে গেলাম, ঘরের অর্ধেকটা ফাঁকা, উপরে চাল নেই, রাজেনের বৌ মেয়েকে ডেকে বলল 'সুনন্দা পিঁড়ি দে।' হাসি চেপে বললাম, 'খুব সুন্দর নাম তো, কে রেখেছে?' গর্বিতভাবে বলল, 'বাবা'। রাজেনের কথা শোনেই ওর বৌ চোখ মুছে বলল 'একটু আগে পুলিশে ওকে ধরে নিয়ে গেছে।' বুঝলাম কোন শক্তভার ব্যাপার, কি বলব বুঝতে না পেরে বললাম রিক্সাটা বিক্রী করনা কেন, বলল সামনের মাসে সুনন্দার বিয়ের সময় করবে। সুনন্দা যে বছরে জন্মেছে সেবছরই নাকি রাজেন রিক্সা কিনেছে। ঘরের দুই লক্ষ্মীকে একসঙ্গে বিদায় দেবে। জিজ্ঞেস করলাম এত ছোট মেয়ে বিয়ে দিচ্ছে কেন—বলল পেট ভরে ভাত পাবে।

স্কুলের পথে রোজই সুনন্দার দেখা পাই, রোজই চীৎকার করে "মাষ্টার মশাই" আমি বকা দিই আমি মাষ্টার মশাই না দিদিমণি। ও গ্রাহ্যও করে না। একদিন বলল বাবা ভাল আছে অনেক ভাত পায়। তবে ওরা পায়না তাই মুড়ি খায়। কয়েকটা পয়সা দিয়ে চলে যাচ্ছিলাম। বলল তুমি রিক্সায় যাবে না, আমি স্কুলে যাওয়ার সময় রোজই দেখতো আর বলত, বাবা আমাকে কবে নিয়ে যাবে আমারও পয়সা আছে। হাতের মুঠো খুলে দেখাতো। রাজেন বলত একদিন ওদের সহর দেখিয়ে আনবো, তা আর হোয়ে ওঠেনি বোধ হয়। দুষ্টামি কোরে বললাম—তুই চালাবি রিক্সা? অমনি ঘাড় কাৎকোরে ছুটে গিয়ে রিক্সা ঘরে টানতে লাগল। আমার নিষেধ শুনলনা। আর না পেরে সেই রিক্সাটা ছেড়ে দিল অমনি ধাক্কা খেয়ে পড়লেল আর রিক্সাটা লোক্সা গড়ানে রাস্তা দিয়ে ডোবায় গিয়ে পড়ল। সে মেয়ে আবার উঠে দাঁড়িয়েছে গামছার মত ছোট ডুরে শাড়ীখানা রাস্তায় ছুড়ে ফেলে ছুটল রিক্সার পিছনে। রাজেনের বৌ কাণ্ড দেখে এসে মেয়েকে মারতে সুরু করল। আমার ধমকে দুজনেই থমতমত খেয়ে রিক্সা ধরে টানতে লাগল। অনেক কষ্টে তিনজনে মিলে ওদের ঘরের লক্ষ্মীকে রাস্তায় তুললাম। তখন দুজনেই হাসছে।

পরদের ছুটীতে শিলুয়া এলাম, বৈশাখ মাস, দুপুর বেলা। খাঁ খাঁ করছে দুনিয়া, বাড়ীর সবাই ঘুমিয়ে বারান্দায় রোদের দিকে তাকিয়ে একা জেগে আছি আমি যেন কিসের প্রতীক্ষায়, একটু দূরে চিউবওয়েলে ছেলে মেয়েদের ভীড়। বসে বসে চোখ ভেঙ্গে ঘুম আসছে। উঠে সেই ঘরে ঢুকেছি শুনলাম 'মাষ্টার মশাই'। ভাবলাম কলের কাছে কেউ ডেকেছে, থাকলাম, কেউনা। আমার দিকে কেউ তাকাচ্ছেও না। আবার ফিরলাম, আবার শুনলাম, এবার শুনলাম মাষ্টার মশাই পয়সা, ঠিক সেই সময়ে ছোট একটি মেয়ে স্নান কোরে গামছাখানা শাড়ীর মত পরে কলসীর মত কোরে একটা ঘটী নিয়ে আমাকে দেখতে দেখতে চলে যাচ্ছিল। কিছু না ভেবেই ওকে থামিয়ে আঁচল খুলে কটা

পয়লা দিলাম, অপ্রস্তুতের হাসি হেসে বলল চলে দিয়ে যাচ্ছি ঠাণ্ডা হয়। দেখছ না কি গরম।' জিজ্ঞেস করলাম নাম কি। বলল 'আমার নাম আমার নাম খুব সুন্দর। মনে নেই।' কেন জানিনা মনেহোল ঘর ভাঙা পেয়েছি। দূরে মাঠের মাঝের রোদটা যেন কালো অন্ধকার চোখে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। কতক্ষণ পর কি না বেরি সামনে দাদা দাঁড়িয়ে। দেখতে এসেছে আমাদের। মামুলী কথার পর বলল এবার ওদিকে খুব পদ্ম ফোটে। অসম্ভব গরম, পুকুর-গুলো সব শুকিয়ে গেছে। নিচেই জিজ্ঞেস করলাম—'সুনন্দা কবে মারা গেল।' দাদা প্রথম অবাক হোল তারপর হয়তো তাবল চিঠিতে জেনেছি। শুষ্ক দৃষ্টিতে বলল—'সে বড় ভয়ানক দৃশ্য, আসবার পথে রাজেনের বৌর কান্না শুনে ভিতরে গিয়ে দেখি ডোবার কাছে রাজেন মাথায় হাত দিয়ে বসা মেয়েটি মুখ থুবড়ে পড়ে আছে, ডোবাটার কাছে, চেহারা চেনা যায় না। ডোবায় জল নেই। রাজেনের বৌ দুটী হাতে মেয়েটার কাছে বোসে পাগলের মত কাঁদছে। কয়েকজন-লোক আসেপাশে দাঁড়িয়ে, খবর পেয়ে ডোম এল, রাজেনই মেয়েকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। মিউনিসিপালিটির লোক সে কথায় কান দিল না। পায়ে মোটা দড়ি বেঁধে সরকারী রাস্তার ওপর দিয়ে মেয়েটাকে টেনে নিয়ে গেল। সে দৃশ্য সহ্য করা কঠিন। ওর হাতের মুঠোয় কাঁচা পয়সা ছিল ছুঁড়ে ওরা রাজেনকে দিয়ে গেল।

দাদা উঠল, ট্রেণ ধরতে হবে, আমিও ওর সঙ্গে চলে এলাম। বাড়ীতে বৌদিকে জিজ্ঞেস করলাম সুনন্দা কেমন কোরে ডোবার কাছে গেল। বৌদি বলল অজ্ঞান অবস্থায় সব সময় নাকি চীৎকার করতো খুব গরম, স্নান করবে। আর গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, জল খাবে। জল দিলে খেতে পারত না। সেদিন ওর মা ঘুমিয়ে পড়েছিল। জেগেদেখে ঐ অবস্থা। ঘুমের মধ্যে শুনেছে মেয়ে কেঁদে কেঁদে জল খেতে চাইছে। সবাই বলে স্নান করতে ডোবায় যাচ্ছিল।

রাজেনকে ডেকে এক ঘন বলল্যান খুলে নিয়ে যেতে পারবে কিনা। লোকায় থাওয়া দাঁত বের কোরে বলল ছেলেটার অসুখের সময় রিক্সা বেচে দিয়েছে। আর চালাবে না। ঘরের দুই লক্ষ্মীকে একসঙ্গে বিদায় দিয়েছে।

ইতিহাসের পাতা উল্টে

আগ্রা-মহলের দুই পাশে দুই শাহ্‌জহান্ দুহিতার বাসগৃহ। দুই রাজদুহিতার রুচির পরিচয় তাঁদের বাসস্থানে। যদিও কালের হস্তে আজ কিছুই অবশিষ্ট নেই। একই রকম দেখতে যুযুধুটির একটি শ্বেত—অপরা সোনহরা মজ্লিস। সোনা রূপা মণি-মাণিক্যের রোশনাই মুক্তা বিলাসিনী রৌশন্ আরার বাসগৃহ এটি। আর শুচি শুভ্র জহান্‌আরার বাসগৃহ শ্বেত পাথরের। শুফি সম্প্রদায়ের পীর্‌ণী-পীর এর শিষ্যা, তিনি যুবরাজ দারার ধর্মের অনুপ্রেরণাদায়িনী।

অদ্ভুত স্বভাব বৈপরীত্য এই দুই রাজ সহোদরার। একজনা সুকবি, দয়ায়, ক্ষমায় সেবায় ত্যাগের আদর্শে উৎসর্গীকৃত-প্রাণা মহীয়সী-রমকুলগৌরব। অপরা বিলাসিনী লাস্যময়ী সুচতুরা। আওরংজীবের প্রিয়তমা সহোদরা—শাহ্‌জহান অন্তঃপুরে তাঁর মন্ত্রণা-দায়িনী গুপ্ত সংবাদ প্রচারকারিণী।

শাহ্‌জহান্ চরিত্রে মোগল মহিমার যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ তাই যেন কন্যা জহান্-আরায় শতদলে প্রস্ফুটিত। মহামতী আকবরের বদান্যতা—তাঁর সর্বধর্মসমন্বয়প্রীতি তাঁর মানবতা-বোধ আবার যেন জহান্-আরায় প্রস্ফুটিত হতে চায়। আকবরের মহান ধর্ম দীন-ই-ইলাহীর শেষ ধারক ও বাহক এঁরা দুই ভ্রাতা ভগ্নি—দারা ও জহান্ আরা।

পিতামহ জহাঙ্গীর ও বৃদ্ধপ্রপিতামহ বাবরের কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য, বাবরের মতই সহজ অনাড়ম্বর জীবনই এঁর যেন কাম্য ছিলো। মৃত্যুর পরেও তাই আমরা দেখি তাঁর এ রুচির পরিচয় - সমস্তুখে আমাদের মনকে সচকিত করে তাঁর সমাধিস্তূপের একমুষ্টি শ্যামল তৃণ। ধরণী মায়ের স্নেহের দান ছাড়া আর কিছু কামনা করেন নি তিনি। দিল্লীর তখ্ত-ই-তাউস্ এর অধীশ্বর, ময়ূর সিংহাসনের অধিপতি, মহাজাঁকজমক প্রিয় সম্রাটের প্রিয়তমা কন্যা—মৃত্যুর আগে কামনা করলেন একমুষ্টি তৃণ! মণি-মাণিক্য নয়—নয় কোনও চমক-ধমক রাজ-রোশনাই। ধূলির স্নেহ ধূলিতে লীন হয়ে জেগে রইল একগুচ্ছ শ্যাম তৃণ! এর চাইতে বড় জীবন দর্শন কি আছে?—কি হতে পারে।

একেই কি বলে 'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণু না।' জীবনের নশ্বরতা-চেতনা আর কে এমন ব্যক্ত করেছে মোগল পরিবারে?

পুরাণো দিল্লীর পথে শেখ নিজাম-উদ্দীন্ আউলিয়ার বিশাল সমাধি ভবনের একধারে শ্বেত মর্মরের জাফরী বেষ্টিত প্রাচীরে ঘুমিয়ে আছেন তৃণাস্তরণে ঢাকা হয়ে অনন্ত উদার আকাশের নীচে মহাপ্রাণা জহান্‌আরা; আর মৃত্যুর পূর্বে রচনা করা তাঁর কবিতার পংক্তি কয়টি তাঁর মর্মর কবর ফলকে আজও দর্শক জনার মন বিস্ময়ে সম্ভ্রমে সচকিত করে।

তিনি লিখেছেন—

হ-অদ্-হাই-আন্-কিউন্
বথা এর সব্‌জা ন পোশদ্ কসে মজার্-ই-মরা
কে কবর পোশ-ই-গরিবান্ হামী বস অস্ত।
আল্-ফকীরা আল্-ফণীয়া জহান্-আরা
মুরীদ্-ই-খ্‌াজগান্-ই-চিশতী বিনুত-ই-শাহজহান্
বাদশাহ খাসী আনাকরা বুর্দাস্থ সনে ১০৯২।

অর্থাৎ—"তিনিই জীবন্ত—অনশ্বর (কোরান ৩য় অধ্যায়) আমার সমাধি তৃণ ভিন্ন কোন আবরণে আবৃত করা না। দীন-আত্মাদিগের পক্ষে এই তৃণই যথেষ্ট সমাধি আবরণ।

শাহ্‌জহান্‌ দুহিতা ; চিরতরে সাধুদিগের শিক্ষা বিনম্বর ফকীরা জহান্‌-আরা, ১০৯২ হিজরা।

ঈশ্বর তাঁহার যোগোদয় করুন।"

ধন্য তুমি জহান্‌আরা! ধন্য সেই ফুল যেখানে এমন কন্যা জন্মায়। জহান্‌আরা যেন কোন অলৌকিক ক্ষমতায় জীবনের নশ্বরতা-সচেতন। হিন্দু ধর্মে, হিন্দু দর্শনে, তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। প্রিয় ভ্রাতা দারা শুকোকে তিনিই অনুপ্রাণিত করেছিলেন সত্র-ই-অসরর বা উপনিষদের পারসীয়ান অনুবাদ করতে। তিনি ছিলেন পরম বিদুষী অপরূপ রূপ লাবণ্যময়ী। ধূলির মালিন্য যেন জহান্‌-আরাকে স্পর্শ করতে ভয় পেয়েছে এমনই নিষ্কলঙ্ক তাঁর চরিত্র। এই দুই ভাই বোন যেন একই ধাতুর সংমিশ্রনে গড়া। এঁদের এই হিন্দু প্রীতিই আওরংজীব দারা-শুকোকে সিংহাসনচ্যুত করতে কাজে লাগিয়েছিলেন। সাধারণ্যে প্রচার করেছিলেন ধর্মদ্রোহী কাফের বলে আপন কূটনীতিজ্ঞতার চাতুর্যে। ধর্মের মিথ্যা আবরণে তাঁকে ঢাকতে হয়েছিলো তাঁর সে নির্মম রাজ্যলিপ্সা। মোগল সিংহাসনের কাছে পিতা নেই ভ্রাতা নেই পুত্র কন্যা কেহ নেই। দারা-শুকো মহান ছিলেন, দাতা ছিলেন, সুপণ্ডিত ছিলেন—কিন্তু পিতৃভক্ত পত্নী প্রেমী পুত্রবৎসল সে রাজপুত্র ছলনা জানতেন না—চাতুর্য তাঁর ছিল না! উপরন্তু যোগ্যতম ভাইয়ের প্রতি অন্যায় ঈর্ষা ও আত্মঅহমিকা তাঁকে বিভ্রান্ত করেছিলো—তাই তাঁকে সুকৌশলী রূপটু ভ্রাতার কাছে এমনই লাঞ্ছিত হতে হয়েছিলো। তা ছাড়া পিতৃস্নেহের সুযোগ নিয়ে তিনি কি বারবার আওরংজীবকে উপহাস করতে চেষ্টা করেন নি? – করেছিলেন বৈ কি! অবুঝের মত আপন হস্তে ন্যায় অন্যায় ভুলেছিলেন। তখন কি তিনি ভাবতে পেরেছিলেন একদিন তাঁর নির্মম পরাজয় ঘটবে এই সুযোগ রূপটু ভায়ের কাছে ভাগ্যের বিড়ম্বনায়। রাজ কার্যে যে কূটনীতির প্রয়োজন তা তাঁর অজানা ছিলো—কিছুটা কারণ তাঁর চরিত্রের ঔদ্ধত্য ও হটকারিতা। এ ছাড়া কাল স্বরূপ হয়েছিলো পিতৃস্নেহ। পুত্র-স্নেহাতুর পিতা তাঁকে সর্বদা আপন পক্ষচ্ছায়ায় রেখে বাস্তব রণক্ষেত্রে শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যুদ্ধের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেছিলেন—দারার সর্বনাশের এটিও একটি প্রধানতম কারণ। ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দের এক শীতের সন্ধ্যায় যেদিন সামুগড়ের প্রান্তরে দারার সৌভাগ্য সূর্য চিরদিনের মত অস্তমিত হয়েছিলো—কি নিবিড় ব্যথায় বেদনা বিধুর সে সন্ধ্যায় পিতাপুত্রী এই শোক স্তব্ধ প্রাসাদে বসেই শুনেছিলেন প্রিয়তম দারার সেই শোচনীয় ভাগ্য বিপর্যয়—সেই বিমল সন্ধ্যার মৌনমূর্ছা ভেঙে থেকে থেকে জেগে উঠেছিলো আতুর আর্তনাদ দারার মহল বাসিনীদের। আর তারপর—তারও পর আর একদিন এসেছিলো বৃদ্ধ রোগজীর্ণ পিতার কাছে প্রিয় পুত্রের মৃত্যু সংবাদ আর এক দুষ্ট ভায়ের দ্বারা। দারার ছিন্নশির দর্শনে নিশ্চিন্ত নিষ্কণ্টক হয়েছিলেন আওরংজীব। হায় নির্মমতা! এমন বোধহয় সারা পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোথাও নেই—আর বোধহয় হবেও না। মানবে অসম্ভব এ কাজ মোগল প্রাসাদেই সম্ভব হয়েছিলো। জহান্‌আরার কানে কে যেন সেদিন গুঞ্জন করে বলেছিলো 'যে পথে চলতে হবে সে পথে তুমি একা।' বিশ্বের সমস্ত বৈরাগ্য বুঝি সেদিন এই অসহায় পিতাপুত্রীকে ঘিরে ধরেছিলো আতুর মমতায়!

তারপর কেটে গেছে কত বিনিদ্র রাত—ব্যথাতুর উদাসী মধ্যাহ্ন নিস্তব্ধ নিঃসঙ্গী সন্ধ্যা!

'দুনিয়া যে সব ঝুট হ্যায়!'—এ বুঝি এমন করে আর কেউ উপলব্ধি করেনি। নিষ্ঠুর ধরণী অনেক আঘাত হেনেই তাঁদের অবুঝের পথ নির্দেশ দিয়েছিলেন!

চিন্তাজ্বর মনে এগিয়ে চলেছি—চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে চারিধার। হঠাৎ চৌকিদারজী বলে উঠলো দেখ বাবুজী। এই রয়েছে বিশ পঁচিশি খেলার ছক। আকবর বাদশাহ একদিন খেলেছিলেন পঁচিশি তাঁর প্রিয়তমা মহিষীকে নিয়ে—জীবন্ত কিঙ্করীর দল কিন্নরীদের মতই রং বেরংয়া

ঘুঁটি সেজে বসতো নানা ছন্দে। এই ছকেই আর একদিন জাহাঙ্গীর বাদশহ খেলেছেন সেই খেলা প্রিয়তমা নূর-জহানকে পাশে নিয়ে। আর তারও পর আবার সেই খেলাই খেলেছেন সম্রাট শাহজহান্ মমতাজ বেগমকে নিয়ে।

পিতা পুত্রের মধ্যে পায় পুনর্জন্ম—একই খেলা বারবার হয়ে আসছে সেই কোন আদিকাল থেকে, হয়ে যাবে অনন্ত কাল পর্যন্ত এই সুন্দরী ধরিত্রীর কোলে। পিতার পর পুত্র - পুত্রের পর প্রপৌত্র যুগ-যুগান্তের ব্যবধান পার হয়ে।

ইতিহাসে যেন বলে - আকবর যেমন মহান বিচক্ষণ রাজা ছিলেন তেমনি কিছু খামখেয়ালিও তাঁর ছিলো। পার্সীয়ার অনুকরণে জশন্-ই-নৌ-রোজ বা নববর্ষের মেলা সেও তিনিই প্রচলন করেছিলেন। বহু পত্নীক রাজার প্রথম যৌবনে ভোগের বুঝি শেষ হয়নি—হয়নি তৃপ্তি। অপূর্বসুন্দরীদেরও তিনি দৃষ্টি পথে আনতে বাধ্য করেছিলেন এই নৌরোজের মেলায় নিমন্ত্রণের—কৌশলে ছলে। মোগল পরিবারে তিনিই করেছিলেন বিদ্যুক্তের রোপণ।

পিতা হুমায়ুন কিন্তু ছিলেন একান্তই প্রেমিক পুরুষ। প্র-পিতামহ বাবর ছিলেন সত্যই সার্থক নামা পুরুষসিংহ—মহান সাধুব্যক্তি। প্রিয়তম পুত্রের মৃত্যুশয্যায় - অলৌকিক মহিমায় অনন্ত বিশ্বাসে আপন জীবন বিনিময়ে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি।

স্তব্ধ হয়েছিলো সেদিন সভাসদ এ আত্মাশ্চর্য ঘটনায়। ধীরে ধীরে পুত্র এগিয়ে গেলেন আরোগ্যের পথে আর তিনি মৃত্যুর। পুত্রের জন্য এ তাঁর মনোবলে জীবন বিনিময় ইতিহাসের বিস্ময় হয়ে আছে।

কর্মক্লান্ত রণশ্রান্ত মহান বাবর জীবন ছাপিয়েও যে মহা-জীবন বুঝিবা তারই সন্ধান পেয়েছিলেন। হয়ত বিশ্বাস হয় না—তবু বহু সাধনায় হুমায়ুন আকবর জননী হমীদাবানু-বেগমকে পেয়েছিলেন। পত্নীলাভ করতে তাঁকে করতে হয়েছিলো দস্তুর মত তপস্যা। ইতিহাসে আছে এর সাক্ষ্য। তত রাজ্য, তত মান হুমায়ুন তখন বঙ্গপ্রান্তচারী। আপন ভ্রাতা কামরাণ তখন তাঁর বিপক্ষে। চতুর্দশী চঞ্চলা কিশোরী হমিদাবানুকে দেখলেন আপন পিতা দিলদার বেগমের কাছে। মন মুগ্ধ হয়ে গেল প্রথম দৃষ্টি বিনিময়ে। সকাতরে জানালেন—তুমি না হলে জীবন আমার ব্যর্থ, আমার ইহলোকের রোশনাই আনন্দ সেও তুমিই!

কিন্তু হমিদাবানুচতুর্দশী হলে কি হয়—তিনি ছিলেন অসামান্যা। বারবার রাজকেও তিনি আশায় বিমুখ করতে কুণ্ঠিত হননি। রমণী যে সহজলভ্যা নয়—নয় খেলার পুতলী; রমণী হৃদয় লাভ করতেও করতে হয় তপস্যা—তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তিনি রেখে গেছেন মোগল ইতিহাসে। মোগল হারেমে বহু ফুল ফুটলো কিন্তু তাঁর মত হেমোদ্দীপ্তা অমন গৌরবসমুজ্জ্বলিনী আর বুঝি কেউ এল না।

সম্রাট আকবর! তুমি সেই মহান হুমায়ুনেরই যোগ্য পুত্র যিনি এক না দেখা হিন্দু বহিনের ডাকে—সেই রাখিবন্ধ বোনের মান রাখতে সব ফেলে ছুটে গিয়েছিলেন। ধন্য হয়ে ছিলেন চিতোরের রাজমাতা কর্ণাবতী, রাখিবন্ধ ভায়ের স্নেহে। দুর্দান্ত শক্র সেরশাহ রইল পড়ে পেছনে—

"থাকুক শত বিঘ্ন বাধা—বাদশাহী তাঁর যা'ক
তবু তাঁহার বোন বাঁচানো চাই।
হোক বাহাদুর মজাতি তার, হিন্দু বোনের ডাক
শুনবে আজি মুছলিম তাঁর ভাই!
ক্ষান্ত করি এক নিমেষেই যুদ্ধ অভিযান
চিতোর পানে ছুটলো হুমায়ুন—
কোন অদীমের ডাক শুনে আজ চঞ্চল তার প্রাণ
একটি রাজা রাখীর এত গুণ।"

হবেই না বা কেন?—তিনি যে কবি, তিনি যে মহাপ্রাণ।

আমি কি সাহায্য করতে পারি ?

গৃহসীমান্ত সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত করার জন্য ভারতের প্রতিটি নারীর পক্ষে বর্ত্তমানে অনেক কিছু করার রয়েছে। স্থানীয় নারী সংস্থাগুলির মাধ্যমে প্রতিরক্ষার কাজে অংশ গ্রহণ করুন। করার মতো বহু কাজ রয়েছে। জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে দান করুন, অন্যকেও দান করতে উৎসাহিত করুন এবং প্রতিরক্ষা সার্টিফিকেট কিনুন। শৃঙ্খলা রক্ষায়, ব্যবহার গঠনে, মনোভাব গড়ে তোলা ইত্যাদিতে আপনার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা কাজে লাগাতে পারেন :

- অপচয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করুন; অযথা জিনিষপত্র কেনার ইচ্ছা পরিত্যাগ করুন এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধ করুন।
- সোনা কিনবেন না। দেশের জন্য সোনা দিন।
- যে কাজই হোক্ না কেন দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে তা পালন করুন, কারণ, সুচারুরূপে সম্পন্ন প্রতিটি কাজ জাতীয় প্রস্তুতিতে সাহায্য করে—ভারতকে শক্তিশালী করে।
- নিরুৎসাহিতা পরিত্যাগ করুন এবং নিজের কর্ত্তব্যে অংশ গ্রহণ করুন।

সদা সতর্ক থাকুন

জাতীয় প্রস্তুতিতে অংশ গ্রহণ করুন।

DA-69/77 (Bengali)

হেমন্তে : শেলির ওড টু ওয়েস্ট উইণ্ড : প্রতিমা কর

পশ্চিমের দুরন্ত হাওয়া তুমি হেমন্তের নিশ্বাসের মত,
তোমার সম্মুখে যেয়ে চলে জীর্ণ পত্র শত শত
যেন মায়াবীর ভয়ে প্রেতদল খুঁজে নেয় পথ,
পীত কালো পাণ্ডুর উত্তপ্ত রক্তিমাকোল
যেদিন তুমি দাও দলে দল
লুটাইতে অন্ধকার শীত শয্যাতল
উড়ন্ত বীজগুলি। সেথা তারা শুষ্ক মৃত রবে
প্রতিটি শবের তরে প্রতিটি সমাধি। তার পর কবে
সুনীলা দোদর তব আসি দিবে বাসন্তীর
তূর্য, ধ্বনি রবে
ধরণীর স্বপ্ন ভাঙি, জাগ্রত স্বর্গে গন্ধে ধরি
তাড়িত মেঘপাল-সম যেন কুঁড়িগুলি উঠিবে শিহরি
মুক্তবায়ু প্রান্ত-লোভী সর্বত্র উচ্চ নীচ ভরি।
দুরন্ত স্পন্দন ওগো, গতি তব হয় যথা তথা
ভাঙন গড়ন ওগো, শুনে যাও শুনে যাও
আমার বারতা!

তব স্রোতে দূর নভের এ গতিবেগ সহে
শিথিল মেঘদল ঝরে যেন থরিত্রীর বৃতপত্র হয়ে
গগন জলধির বিজড়িত শাখাদল হতে রয়ে রয়ে।
বারিধারা বিজলির তারা দেবদূতি! উঠেছে উদ্ভাসি
তব বায়ুস্রোতের নীলিমায় আসি
উন্নত হয়ে এক পীত কেশরাশি
উন্নত দুরন্ত রবীর কোন যেন! সেইমত
নভোশীর্ষে ঘুরে
ত্রিদিব দিগন্ত-পার হতে উঠে সেছে ঘুরে
আসন্ন ঝড়ের জটা। বাজে তব স্বরে
মুমূর্ষু বর্ষের অন্তিম রাগিণী আজি
এই অন্ত রাত্রি হবে
তা'রই বিরাট সমাধি গহনে তবে
দুর্দম বাষ্প তব পুঞ্জীভূত র'বে
মধ্যে তার স্থির হয়ে। বাহির হইবে ছিন্নকরি
সেই ঘন
মুষলধারে বারি শিল হুতাশন বাজ
ওগো শোন!
গ্রীষ্মের স্বপন তার তুমি ডাকি দিলে ভাঙি তবে
সুনীল মধ্যাহ্নের তন্দ্রালসে ছিল মৌন যবে
স্ফটিক স্বচ্ছ তার মদনদী ধারায় কুলুকুলু রবে।
কামক বীণাধারে গাহিত ছিল সে ঢেউ
উপলাগর-জলেতে
প্রাচীন প্রাসাদ দুর্গদারি সে হেরিত
বা স্বপনছলেতে
রশ্মিছল তরঙ্গের উলসরে সে তলেতে
ছায়া সব কম্পিত। অবাধ সুঘন নীল
ফুলগন্ধে কন্ত
আবরিয়া সেই সবে। সে মাধুরী পুণ্য স্মরি
মন মূর্চ্ছাহত।

ওগো, মহাসাগরিমা 'অতলান্তিক' তব পথ
চরম শক্তি যত তা'র নিজেরে বিভক্তি
তাকে তাই গহ্বরে বলে,
সুদূর গহনে তা'র জলময় বনানীর দলে
নীরস যে কুসুম বহে সহসা মর্মের তলে
তব কণ্ঠধ্বনি জানি আতঙ্কে পাংশুবর্ণ ধরে
শিহরিয়া ঝরি যায়, ওগো তুমি শোন ক্ষণ তরে।
জীর্ণ পত্র হলে আমি বুঝি বহি নিতে
চঞ্চল মেঘ হলে সাথে যেতে দিতে
একটি তরঙ্গ হয়ে তোমার আঘাতে
তোমার শক্তি যদি শুধু যদি পাই অকারণ
বিশাল সে মুক্তি যে নাইই পাই, ওগো দুর্বন।
অথবা সে ফিরে নাই ফেলে-আসা বালকের মন
তব সাথী হয়ে ফিরি তোমার আকাশে

ছুটে রেখে পাছে ফেলে তোমায় বাতাসে
স্বপন ছিল না হবে, তবে এ দীনতা প্রকাশে
হতনা প্রার্থনা আজ আকুলতা ভরে।
ওগো, ভুলে যাও চেউ সম পত্রসম মেঘখণ্ড করে,
জীবন কণ্টকবনে লুটি আমি, রক্ত পড়ে ঝরে।
ভারময় প্রহরগুলি করিয়াছে মুকুলিত নত
তোমারই স্বরূপদানে, বন্ধু সে, চঞ্চল সে,
অভিমান হত।
বীণাখানি কর মোরে যেমনি করেছ যেমনি
রচিল যা পত্র মোর, তার ও যে করিছে তেমনি
ঝঙ্কার যে সুর কড় লয়ে সেই ধ্বনি
এ দুই অন্তর হতে ছাড়া
মধুর তা বেদনায় জাগো ওগো ভয়ঙ্কর ধারা
আমার অন্তর হতে, দিল মোর মাকে ওগো
বন্ধুতায় হারা
দিকে দিকে বিস্ময় মেলি লও মোর যত
বৃত্তচিন্তারাশি
জীর্ণপত্র সম সব, তব তরান্বিত হয়ে সেথা হতে
নবপ্রাণ উঠুক বিকাশি
মোর মন্ত্রময় গান ব্যাপ্ত কর আসি
শনশনি অনির্বাপিত যেন এক কুণ্ডস্তূপ হতে
ভস্ম স্ফুলিঙ্গ সম সে বারতা বহ জনস্রোতে
অন্তরে আসি মোর কহ আজি ঘুমাচ্ছন্ন
নিকুঞ্জ জনতে
দূরবর্তী ভেরী সম। ওগো হাওয়া কবে
শীত যদি যেয় হানা বসন্ত কি বহু দূরে রবে?

যন্ত্রণার চোখে : রত্নেশ্বর হাজরা

একমাত্র যন্ত্রণাই আমাদের শাশ্বত জীবনে
নিয়ে যেতে পারে : বলে সেই ক্লান্ত-লোকগুলো
ঘরে পা বাড়ালো। ঘরে
কয়েকটি রমণী আছে, ক'টি শিশু, উৎসবে ব্যসনে
ছড়িয়ে পার্শ্বস্থ আর চিরন্তন প্রেম।

ওরা চলে গেলো। ঘাটে শেষ ফেরী টেনে এসে হাল
অবসন্ন। নদী বলে :
কর্ম-ই ধ্যানের শেষ লক্ষ্য হ'তে পারে—
এই মন্ত্র উচ্চারণে সমস্ত জঞ্জাল
সরিয়ে সমুদ্রে গেলো যেখানে গতির
উৎস যন্ত্রণার নীলে বেঁচে আছে।

একমাত্র অন্তরীক্ষ আমাদের দৃষ্টির অতীতে
কাব্য হ'তে পারে : বলে সেই শান্ত সমুদ্রেরা
সামনে তাকালো। মতে
ব্যাপ্তি, উদারতা আর নীলের প্রতীকে
বিশ্বের প্রসন্ন উৎস সূর্যের যন্ত্রণা।

এ বছরের আকাদমি পুরস্কার

এ বছরের আকাদমি পুরস্কারের রক্ততিলক পেয়েছেন এমন একজন লেখক যাঁর স্বপতীর দৃষ্টিভঙ্গি এবং আশ্চর্য মননশীলতায় একালের পাঠক গত তিরিশ বছর ধরে আপ্লুত হয়ে এসেছেন। বস্তুত, সাহিত্য আকাদমির ঘোষিত পুরস্কার প্রাপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে অন্নদাশঙ্কর রায়ের রচনাবলীর পুনরালোচনা সময়োচিত হলেও তার আদৌও তাৎপর্য থাকছে কিনা সন্দেহ; বস্তুত, গত কয়েক বছরের মধ্যে একাধিক সুকৌশলী লেখক যখন শিল্পসমৃদ্ধ সৃজনী প্রতিভায় সমৃদ্ধ না হয়েও আকাদমি পুরস্কার করায়ত্ত করতে সমর্থ হয়েছেন তখন অন্নদাশঙ্করের মতো বহুকাল আগে থেকেই সুপ্রতিষ্ঠিত ও সম্পন্ন লেখকের এই সম্মাননায় শুধু এই সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত যে, অতি বিলম্বে হলেও খুব সাম্প্রতিককালে সাহিত্য আকাদমি গুরুতর প্রমাদ এড়াবার জন্যে সচেষ্ট হয়েছেন।

বহুবিস্তৃত ও দীর্ঘকালীন সাধনায় পরিপুষ্ট এক স্মরণীয় সাহিত্যের ঐতিহ্য অন্নদাশঙ্করের অবদান। কি উপন্যাস-সাহিত্যে কি প্রবন্ধসাহিত্যে তিনি এমন এক মানব অভিজ্ঞতার শিল্পিকার সাম্প্রতিককালের বাংলা সাহিত্যে যা অনন্য। 'পথে প্রবাসে' বোধহয় প্রকাশিত হয়েছিল তিরিশ বছর আগে। আজকের প্রবীণ লেখক তখন তরুণ। কিন্তু অন্নদাশঙ্করের দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য এবং ভাষাবিন্যাসের স্বকীয়তা তখন থেকেই সৎসাহিত্যের পাঠকের পরিতৃপ্তির কারণ। রবীন্দ্রনাথ থেকে প্রমথ চৌধুরী এবং প্রমথ চৌধুরী থেকে অন্নদাশঙ্কর—বাঙলাসাহিত্যের এই পথরেখা মননসাধনায়, প্রজ্ঞা ও বৈদগ্ধে, উজ্জ্বল, প্রসন্ন ও উপকরণে স্বতন্ত্র এবং পরিশুদ্ধ অনুভবে নিঃসংশয়। রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরীর তিরোধানের দীর্ঘকাল পরেও যে এই পথরেখা প্রশস্ততর এবং উজ্জ্বলতর প্রতিভাত হয়েছে তার কৃতিত্ব মূলত অন্নদাশঙ্করের।

অন্নদাশঙ্করের সাহিত্য সাধারণ পাঠকসমাজের গতানুগতিক রুচির কাছে আত্মসমর্পণ করে নি। জীবনজিজ্ঞাসু পাঠকের সন্ধান তাঁর রচনার অন্যতম লক্ষ্য এবং নতুন শিল্পমানসসমৃদ্ধ পাঠক সমাজের সৃষ্টিও করেছে তাঁর সাহিত্য। সমসাময়িক-কালে মননশীল রচনাসৃষ্টির ক্ষেত্রে বুর্জটিপ্রসাদের মতোই তিনিও একক এবং রুচিবান; সুশিক্ষিত পাঠক সমাজের মনের ওপরই তাঁর রচনার প্রভাব সমধিক। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে এবং বিশেষত বাংলাদেশে যখন একশ্রেণীর অনেক বরণীয় লেখকই ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির যূপকাষ্ঠে বিবেকহীন রাজনীতির প্ররোচনায় অনবরতই বলি হয়েছেন ঠিক সেই সময়েই অন্নদাশঙ্করের উপলব্ধির অনন্যতা পাঠকসমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে এসেছে।

উপন্যাসের ক্ষেত্রে 'অন্নদাশঙ্করের' সত্যাসত্য স্মরণীয় সাহিত্যকীর্তি। ছয় খণ্ডে সম্পূর্ণ এই এপিক উপন্যাসের সময় প্রথম মহাযুদ্ধোত্তরকাল এবং স্থান আন্তর্জাতিক পটভূমি। এরকম উপন্যাস একালের সাহিত্যে অভিনব এবং উদাহরণত বিশ শতকের প্রথম ও দ্বিতীয় দশকের কোনো-কোনো বিখ্যাত য়ুরোপীয় উপন্যাসের সঙ্গে তুলনীয়। পক্ষান্তরে, বিমুর বই এবং কণ্ঠস্বর সমকালীন সমাজের দ্রুত পরিবর্তনশীল ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর সদাজাগ্রত আশুচেতন মনের সাক্ষ্য, বিক্ষোভ ও বিভ্রান্তির অবক্ষয়ের মধ্যেও সত্যানুসন্ধানী, আদর্শে অবিচলিত পথ পরিক্রমার প্রচেষ্টায় নানা দিক থেকেই

উল্লেখ্য। কোনো কোনো ঘটনা বা সমস্যা বিষয়ে অন্নদাশঙ্করের বক্তব্যের সঙ্গে তাঁর অনুরাগী পাঠকও অনেক সময়ে এক মত হতে পারেন নি। 'ট্রামের দাঁত' প্রসঙ্গ উদাহরণত উল্লেখ্য। কিন্তু অধিকাংশ বিষয়েই গত তিন যুগ ধরে তাঁর অনেক সিদ্ধান্তই জিজ্ঞাসু ও অভিজ্ঞ পাঠকহৃদয়কে নাড়া দিয়ে এসেছে; সংস্কৃতিপ্রেমিক তাঁর সুগভীর অনুভূতিতে অভিভূত হয়েছেন। পাঠক পেয়েছেন একজন সত্যসন্ধানী শিল্পপ্রেমিককে।

'জাপানে' বইটি সাম্প্রতিককালের রচনা এবং লেখকের বিবেচনায় এটি নিছক ভ্রমণকাহিনী নয়, তার অতিরিক্ত বিশেষ কিছু। 'রয় ও শ্রীমতী' যেরূপ অন্নদাশঙ্করের স্বপ্রবীণ বয়সের বিদ্রোহী ভাবানুষঙ্গে তাৎপর্যময় 'জাপানের বৃত্তান্তেও তেমনি নিছক ভ্রমণকাহিনীকে অতিক্রম ক'রে বিশ্বপরিস্থিতির মূল উপলব্ধিতে পৌঁছাবার প্রচেষ্টা। কিন্তু আকাদমি পুরস্কারের ক্ষেত্রে 'জাপানে' হয়তো উপলক্ষ্য মাত্র, অন্নদাশঙ্কর প্রকৃত প্রস্তাবে সেই জাত-লিখিয়েদের মধ্যে অন্যতম যাঁদের সাফল্য একটিমাত্র বইয়ের মধ্যে সীমিত নয়, বহুব্যাপক সৃষ্টির প্রবাহিত গভীরতায় বিধৃত। সাম্প্রতিককালের নোংরামী ও দুর্নীতির কাছে এখনকার লেখকরা ক্রমশই অধিক সংখ্যায় আত্মসমর্পণ করছেন; অন্নদাশঙ্করের নিরলস ও নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্যসাধনায় এই আত্মগ্লানি থেকে উদ্ধারের সঙ্কেত নিহিত।

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

যুদ্ধ ও কম্যুনিষ্ট প্রচার

অসীম কুমার চৌধুরী

সুদূর অতীত থেকে সুরু করে বর্তমান পর্যন্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে প্রত্যেক যুদ্ধেই সত্যের বলিদান প্রথম ঘটেছে। সত্যের অপলাপ ভিন্ন অন্যাবধি কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয় নি। আজ ভারতের ক্ষেত্রেও সেই একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। প্রচার সত্যকে একেবারে মুছে দিয়ে আমাদের সামনে এক স্বপ্নময় জগত তুলে ধরেছে। আর আমরা মনগড় বিশ্বাস গড়ে তুলে নিজেকে চোখ ঠেরেছি ও সমাজের গতিকে ভুল পথে চালিত করেছি। বাস্তবকে করেছি অস্বীকার। এই বাস্তব-অস্বীকৃতি সবচেয়ে বেশী হয়েছে ভারত-চীন সম্বন্ধের ক্ষেত্রে। সত্য এখানে সম্পূর্ণ বিকৃত। ১৯৫০ সাল থেকেই ভারত-চীন সম্বন্ধের ইতিহাস মসীলিপ্ত। কিন্তু আমরা সেই কালোর মধ্যে আলো দেখতে চেয়েছি। বহু কষ্টার্জিত এই স্বাধীনতাকে খর্ব করে লাল চীন যখন আমাদের দেশে রাস্তা তৈরী করেছে আমরা দেখেও তা' দেখি নি; শুধু তাই নয় নিজের প্রতি ছলনা করে তার সংগে 'পঞ্চশীল' গড়ে তুলেছি। কেউ কেউ অবশ্য এই মোহজাল ছিন্ন করতে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু লালের নেশা তখন আমাদের সরকারকে এতবেশী মাতিয়েছিল যে নিবৃত্তি প্রচেষ্টাকে সরকার মনে করেছিলেন নির্বোধের বিকার। চীন তখন নিশ্চয়ই মুচকি হেসে 'হিন্দি-চীনী ভাই ভাই'এর অবকাশে নিজেদের কাজ গুছিয়েছিল। তারা প্রচার করেছিল যে 'ভারতই আক্রমণকারী।' সত্য বিকৃত হয়েছে, প্রচার প্রতিষ্ঠালাভ করেছে। আর প্রচারকে উপেক্ষা করে সরকার বলেছেন, "তা' হ'তেই পারে না। আমাদের সহস্র শতাব্দীর বন্ধু লাল চীনের সঙ্গে রয়েছে পঞ্চশীলের বেলবন্ধন। সে কি কখনও আঘাত হানতে পারে!" কিন্তু বাস্তব বড় কঠিন। সত্যকে সে টেনে সামনে আনবেই। এতদিন যা ছিল ধীর অনুপ্রবেশ ১৯৬২ সালের ২০ অক্টোবর তারিখে তাই পরিণতি পেল পূর্ণ আক্রমণে। আমরা সাধারণ লোক হলাম বিভ্রান্ত। চীনের প্রচারকরা এই বলে আশায় উজ্জীবিত হল যে 'এবার তারা লাল চীনের অধীনে গিয়ে প্রকৃত স্বাধীন হবে!' কেউ প্রকাশ্যেই তা' ঘোষণা করল আর কেউ বা ইসারায়। যুদ্ধ অবশ্যই সমাজের অগ্রগতির প্রতিবন্ধক। কিন্তু মাঝে মাঝে তারও আবশ্যকতা আছে। যেমন এই ভারত-চীন সংঘর্ষ। লাল চীনের ভারত আক্রমণ আজ আমাদের সত্যের সন্ধান দিল। মোক্ষম করে জানলাম যে বালী দিয়ে বাঁধ দেওয়া চলে না।

কম্যুনিষ্ট চীন ভারত আক্রমণ করেছে এই কথাটা স্বীকার করতে অনেক দেশেরই বেধেছে। সমাজতান্ত্রীয় দেশগুলির তো বটেই এমন কি এশিয়ার অন্যান্য অকম্যুনিষ্ট দেশগুলির মধ্যে যারা খানিকটা নেতৃস্থানীয় তারাও কম্যুনিষ্ট চীনের এই আক্রমণকে 'আক্রমণ' আখ্যা দিতে নারাজ। তাঁদের কাছেও এটা 'সীমান্ত বিরোধ' মাত্র। এর প্রধান কারণ হচ্ছে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রচারের অসুবিধা। কিন্তু সামরিকতন্ত্রে (Militarianism) তার বিশেষ সুবিধা রয়েছে। ফলে দেশের বাইরে কম্যুনিষ্ট চীন কর্তৃক ভারত আক্রমণ সত্য ঘটনা

হওয়া সত্ত্বেও বহুল প্রচার লাভ করে নি। অথচ চীনের বক্তব্যের বহুল প্রচার আমরা লক্ষ্য করেছি। তার প্রমাণ আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। চীনের বক্তব্যের বহুল প্রচারের জন্যই এশিয়ার অন্যান্য নেতৃস্থানীয় দেশগুলির বক্তব্য প্রথমে চীনের বক্তব্যেরই অনুরূপ ছিল। এখনও অবশ্য আক্রমণকে সরাসরি স্বীকার করা হয় নি।

দেশের বাইরে যেমন দেশের ভেতরেও চীনপক্ষের বক্তব্যের একটা সুস্পষ্ট রূপ দেখতে পাচ্ছি ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রচারের মধ্যে। কোন দেশ যখন আক্রান্ত হয় দেশের আবালবৃদ্ধবণিতা তখন সেই আক্রমণকে প্রতিহত করতে চেষ্টা করে। আমরা সাধারণ লোকেরা অন্তত তাই বুঝি। চীনা আক্রমণের বেলায় এই নীতির একটা বিশেষ ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে। ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি এই অনুপ্রবেশ ও আক্রমণের ব্যাপারটিকে বিভিন্ন সময়ে এমন ভাবে বিশ্লেষণ করেছে যার ফলে সাধারণ মানুষ ১৯৬২ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত মনে করেছে যে চীনা আক্রমণের ব্যাপারটি কয়েকজন স্বার্থান্বেষীর প্রচার মাত্র। সরকারপক্ষও যে এই প্রচারকে প্রতিহত করার খুব একটা চেষ্টা করেছেন তাও নয়। ১৯৫৯ সালে লোকসভায় যখন প্রথম ঘোষণা করা হ'ল যে ভারত ভূমিতে লাল চীনের অনুপ্রবেশ ঘটেছে তখন ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি তা' বিশ্বাস করে নি। এই সরকারী ঘোষণাকে অস্বীকার করে তারা প্রচার করেছে যে সমাজতান্ত্রিক দেশ (?) কোন দেশকে আক্রমণ করতে পারে না। অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে তারা দেশকে জানিয়েছে যে লালচীন কর্তৃক ভারত আক্রমণের ব্যাপারটি সম্পূর্ণরূপে সাম্রাজ্যবাদীদের প্রচার। কারণ সমাজতন্ত্র (?) এবং পররাজ্য আক্রমণ দুটি পরস্পর-বিরোধী ধারণা। তাছাড়া চীন যখন আন্তর্জাতিক আন্দোলনে বিশ্বাস করে শুধু তাই নয় আন্তর্জাতিক আন্দোলনের অন্যতম নেতা, তখন তারপক্ষে কোন দেশ আক্রমণ করা একান্ত অসম্ভব। এই প্রসঙ্গে কম্যুনিষ্ট পার্টি ভারত সরকারকেও অনুরোধ জানিয়েছিল সরকার সাম্রাজ্যবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীলদের এই প্রচারে যেন কর্ণপাত না করে। এইভাবে আন্তর্জাতিক আন্দোলনের দোহাই দিয়ে কম্যুনিষ্ট পার্টি নানা ধরণের জাতীয়তাবিরোধী প্রচার চালিয়েছে উগ্রপন্থীরা আবার এমন কথাও বলেছে যার অর্থ হচ্ছে ভারতই আক্রমণকারী। এই প্রচার তাদের পক্ষে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া অত্যন্ত সহজ ছিল কারণ ভারত ও ব্রহ্মদেশের সীমানা, ম্যাকমেহন লাইনকে তারা স্বীকার করে নি। কম্যুনিষ্ট চীনের ভাষ্যের প্রতিধ্বনি করে তারা প্রচার করেছে যে ম্যাকমেহন লাইন যেহেতু সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা নির্ধারিত সীমানা সেই হেতু আমরা তাকে স্বীকার করতে পারি না। নতুন সীমানা নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন এবং চীন তাদের প্রচারিত মানচিত্রে যে সীমানা দেখাচ্ছে আমাদের মেনে নেওয়া উচিত। ভারতবাসী সে যুক্তি মানে নি। তখন বেগতিক দেখে কম্যুনিষ্ট পার্টির তদানিন্তন সম্পাদক শ্রীঅজয় ঘোষ চীন সরকারের সঙ্গে কথাবার্তার জন্য পিকিং যাত্রা করেন। চীন সরকারের সঙ্গে অজয়বাবুর কি কথা-বার্তা হয় তা জানা যায় নি। তবে তিনি পিকিং থেকে ঘুরে আসার পর কম্যুনিষ্ট পার্টি একটা সিদ্ধান্তের (১৯৫৯) মাধ্যমে নেফা অঞ্চলে ম্যাকমেহন লাইনকে স্বীকার করে কিন্তু লাদাক অঞ্চলে তার কোন স্বীকৃতি মেলে না। কম্যুনিষ্ট পার্টির সেই সিদ্ধান্তেই বলা হয় যে লাদাক অঞ্চলের সীমানা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে স্থির হওয়া উচিত। কিন্তু সেই আলাপ-আলোচনা কোন নীতির উপর ভিত্তি করে হবে সে সম্বন্ধে কম্যুনিষ্ট পার্টি নীরব। তবে তাদের সিদ্ধান্তটি বিশ্লেষণ করলে মনে হয় যে কম্যুনিষ্ট পার্টি তখনকার সীমানার স্থিতাবস্থার উপর ভিত্তি করতেই ইচ্ছুক। কারণ সেই সময়ের মধ্যে চীন লাদাক অঞ্চলে আমাদের দেশের অনেকখানি অংশ দখল করে নিয়েছে। পিকিং সরকার ভারত সরকারের সকল প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। কিন্তু কম্যুনিষ্ট পার্টি তখনও

আলাপ-আলোচনার কথা প্রচার করে চলেছে। অথচ এর মধ্যে কম্যুনিষ্ট চীন তাদের পররাজ্য লিপ্সাকে শমিত রাখে নি। তারা নোতুন নোতুন ভারতীয় অংশ গ্রাস করেছে এবং মানচিত্রের পরিবর্তন ঘটিয়েছে। আর আমাদের দেশের কম্যুনিষ্ট পার্টি সেই একই সুরে আলাপ-আলোচনার কথা বলে চলেছে। অবশ্য তারা চীনা কবলিত নতুন নতুন এলাকার কথা স্বীকার করে নি।

১৯৬২ সালের ২০শে অক্টোবর তারিখে কম্যুনিষ্ট চীন তার মুখোশ খুলে ফেলে প্রচণ্ডভাবে ভারতকে আক্রমণ করে। দেশের মধ্যে এক বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হয়। ১৭ই অক্টোবর তারিখে কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি একটা ধোঁয়াটে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যাতে অস্পষ্টভাবে ম্যাকমেহন লাইনকে ভারত-চীন সীমান্ত বলে স্বীকার করা হয়। মাত্র একটি ভোটের আধিক্যে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিদ্ধান্তটির প্রারম্ভেই বলা হয় "Reports of the Government of India show that the Chinese forces have crossed to the south of the McMahon Line and thus violated Indian territory, though the Chinese deny it." অর্থাৎ ভারত সরকার বলছেন বলেই তাঁরা এই সিদ্ধান্ত করতে বাধ্য হচ্ছেন নতুবা তাঁদের নিজেদের কোন বক্তব্য নেই। জনৈক সাংবাদিক কম্যুনিষ্ট পার্টির তদানিন্তন সম্পাদক শ্রীনাম্বুদ্রিপাদকে ভারত সরকারের বক্তব্যের সঙ্গে চীন সরকারের বক্তব্যকে পাশাপাশি রাখছেন কেন জিজ্ঞাসা করায় তিনি রাগতভাবে উত্তর দেন "The Chinese denial is a fact, Should we not state facts?" অর্থাৎ তাঁর কাছে চীনের অস্বীকৃতিই বেশী সত্য বলে মনে হচ্ছে তাই তিনি সেটাকে জোর দিয়ে বলছেন। সাংবাদিকরা তখন কম্যুনিষ্ট পার্টির সভাপতি শ্রীডাংগেকে প্রশ্ন করেন যে তাঁর দল এই আক্রমণকে নিন্দা করে কিনা, তার উত্তরে তিনি বলেন "Defence is better than condemnation." অর্থাৎ নিন্দা করতে তাঁদের বাধে। তিনি আরও বলেন "Talks should always be open." অর্থাৎ এখনও তাঁরা আলাপ-আলোচনার উপরই বেশী জোর দিচ্ছেন। আলাপ-আলোচনার উপর এত বেশী জোর দেওয়ার অর্থ এই যে পূর্বেকার আলোচনাগুলির ব্যর্থতার জন্য ভারতই দায়ী। সুতরাং চীনসরকার না চাইলেও স্বাধীনতা ও সম্মান বিসর্জন দিয়ে ভারতেরই আলোচনার জন্য অগ্রসর হওয়া উচিত।

কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় জোড়াতালি দেওয়া প্রস্তাব কোনমতে গৃহীত হলেও পশ্চিমবাংলায় তার কোন প্রভাব দেখা যায় না। পশ্চিমবাংলার অন্যতম কম্যুনিষ্ট নেতা শ্রীজ্যোতি বসু ২১শে অক্টোবর '৬২ তারিখে এক জনসভায় ঘোষণা করেন "১৮ হাজার ফুট উঁচুতে কতকগুলি ঘটনা ঘটিতেছে : এখানে বসিয়া তাহার সব বিবরণ জানা যায় না, সত্য ঘটনা বুঝা যায় না—শুধু মানুষকে উত্তেজিত করা চলে।" তিনি আরও বলেন "চৌরঙ্গীর উপনির্বাচনে নীতির কথা না বলিয়া চীনের প্রসংগ উত্থাপন করিলে আমরা বলিব ওসব হাংগামা টাংগামা বাজে।" দেশ যখন শত্রুকবলিত তখন পশ্চিমবাংলা বিধানসভার অন্যতম বিরোধীদলের নেতা ভারত বিরোধী কথাবার্তা বলে শত্রুকে আহ্বান জানাচ্ছেন। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে এই নেতা কেন্দ্রীয় কমিটিতে গৃহীত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেন।

কেন্দ্রীয় কমিটির ঘোলাটে প্রস্তাব ও পশ্চিমবাংলা কম্যুনিষ্ট নেতাদের বক্তব্যে দেশে যখন কম্যুনিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধে এক বিরাট প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয় তখন কম্যুনিষ্ট পার্টির জাতীয় পরিষদ একটা সরাসরি প্রস্তাবে লালচীনের ভারত আক্রমণের নিন্দা করে এবং নেহেরু সরকারকে সমর্থন করে কতকগুলি প্রস্তাব গ্রহণ করে। তার মধ্যে উপযুক্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় সহায়তা করা, নেহেরু সরকারকে সমর্থন, চোরা-কারবারীদের বিরুদ্ধে প্রচার চালানো ও দক্ষিণপন্থী

প্রতিক্রিয়াশীলদের (?) প্রচারের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করা প্রধান। আপাতদৃষ্টিতে প্রস্তাবগুলি গঠনমূলক এবং এর মাধুর্যে বিমোহিত হয়ে শ্রীনেহেরু কম্যুনিষ্ট পার্টিকে "cent percent nationalist" বলে ভাতে তুলে নিলেন। আর কম্যুনিষ্ট পার্টির যে সকল সদস্য এই প্রস্তাব সমর্থন করলনা তাদের গ্রেপ্তার করা হল। যাঁরা ধৃত হলেন তাদের আমরা চিনি, তাঁদের বক্তব্যও আমরা জানি। কিন্তু আমাদের বক্তব্য হল "cent percent nationalism" এর নাধাবলী যাঁরা গায়ে চড়ালেন তাঁদের সম্বন্ধে। শ্রীনেহেরু এঁদের পূর্বেকার কথাবার্তা চালচলন সব কিছু ভুলে গিয়ে অবাধ-চলাফেরার পাসপোর্ট দিলেন এঁরাও শ্রীনেহেরুকে তুষ্ট করতে আপাতমধুর কথাবার্তা বলে চলেন। কিন্তু এই আপাতমধুর কথাবার্তায় যে কতখানি বিষ মেশানো রয়েছে তা' তিনি একবারও পরখ করে দেখলেন তো নাই বরং, কেউ এঁদের বিরুদ্ধে কোন কথা বল্লে তাঁকে কঠোর সমালোচনা করে। শ্রীনেহেরুর এক একটি কথাও কম্যুনিষ্ট পার্টি অস্ত্রের মত ব্যবহার করে চলেছে। যেমন "It is not a war between communism and anti-communism."। কম্যুনিষ্ট পার্টি প্রতিটি বক্তব্যের মুখবন্ধ হিসাবে প্রধানমন্ত্রীর এই উক্তিটি ব্যবহার করছে। কিন্তু কংগ্রেস সভাপতি শ্রীসঞ্জীবায়া এই যুদ্ধকে গণতন্ত্র ও কম্যুনিজমের যুদ্ধ বলে বর্ণনা করেছেন। আমরাও তাই মনে করি।

অনেক হেঁচট খেয়ে কম্যুনিষ্ট পার্টি চীনকে আক্রমণকারী বলেছে। কিছু কিছু প্রস্তাবও যে গ্রহণ করেছে তাও উল্লেখ করেছি। কিন্তু দুটি বিষয় ভিন্ন অন্যান্য বিষয়ে কতখানি সেই সকল প্রস্তাব কার্যকরী হয়েছে তা' বিচার-সাপেক্ষ। মুনাফাবাজদের প্রতিরোধ করা খুবই ভাল কথা। অন্যান্য রাজনৈতিকদল এবং প্রতিষ্ঠানও এই প্রস্তাব গ্রহণ করে কিছু কিছু কাজকর্ম করছে। এ বিষয়ে কম্যুনিষ্ট পার্টি নোতুন কিছু করে নি। কিন্তু দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করার প্রস্তাবটি সম্পূর্ণ ফাঁকা আওয়াজ। কারণ যে সকল স্কুল ও কলেজে কম্যুনিষ্ট ছাত্রসংস্থা ছাত্রফেডারেশন শক্তিশালী সেখানে প্রতিরক্ষা তহবিল শূন্য। সাধারণ ছাত্র-সমাজ সাহায্য তহবিলে দান করতে গেলে নানা রকমের নীতির (?) কথা বলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ছাত্রফেডারেশন বাধা দান করেছে। যে সকল অফিসে ও কারখানায় কম্যুনিষ্ট প্রভাবিত ইউনিয়ন রয়েছে সেখানেও সেই একই অবস্থা ; সরকারী পরিসংখ্যান তার প্রমাণ দেয়। এই তো গেল কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রতিরক্ষা সাহায্যের বহর। তবে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলদের (?) বিরুদ্ধে প্রচারে কম্যুনিষ্ট পার্টি খুবই তৎপর। কোন তত্ত্বে আস্থাশীল না হয়ে যারা কেবল দেশের কথাই বলে তারা হচ্ছে কম্যুনিষ্টদের মতে প্রতিক্রিয়াশীল ! দেশের প্রতিরক্ষার কথা চিন্তা করা হচ্ছে 'war hysteria' তৈরী করা ! এতে তো কম্যুনিষ্ট পার্টির রাগের কারণ থাকবেই ! তাই এই ধরণের প্রতিক্রিয়া-শীলদের (?) বিরুদ্ধে তারা সব সময় প্রচার করবেই !

একতরফা যুদ্ধ চালানোর পর ১লা ডিসেম্বর ৬২ তারিখে চীনের একতরফা যুদ্ধ বিরতি কম্যুনিষ্ট পার্টিকে খানিকটা নিশ্বাস নিবার সুযোগ দিয়েছে। আর এই যুদ্ধ বিরতির পর যখন এ্যাফ্রো-এশিয় নেতৃবর্গ কলম্বো সম্মেলনে মিলিত হয়ে ভারত-চীন সংঘর্ষের সমাধানকল্পে একটা শান্তিপূর্ণ আলোচনার প্রস্তাব গ্রহণ করেছে তখন কম্যুনিষ্ট পার্টি বেশ খানিকটা অবস্থা গুছিয়ে নিয়েছে। এখন তার বক্তব্য হল 'ভারত কলম্বো প্রস্তাব গ্রহণ করুক।'

যে সকল দেশ প্রথমে ভারতের বক্তব্য শুনতে না চেয়ে চীনের বক্তব্যে বিশ্বাস করেছে তারাই এই কলম্বো প্রস্তাবের রচয়িতা। তা' ভিন্ন কলম্বো প্রস্তাবের বিষয়গুলিও ভারতের পক্ষে সমালোচনা সাপেক্ষ। কিন্তু কম্যুনিষ্ট পার্টির মনে একবারও এই সকল কথা উদয় হচ্ছে না। কলম্বো সম্মেলনে প্রস্তাব গৃহীত হয়ে ভারতের কাছে আসার আগেই

কম্যুনিষ্ট পার্টি কলম্বো প্রস্তাবের পক্ষে প্রচার সুরু করে দিয়েছে। এই প্রচারের পক্ষে যুক্তি হচ্ছে প্রধানত পাঁচটি (১) এ্যাফ্রো এশিয় ঐক্য; (২) শান্তিপূর্ণ মীমাংসা; (৩) নেহেরু সরকারকে সমর্থন; (৪) সোভিনিয়পেক্ষতা; ও (৫) দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলতার নিবৃত্তি। যুক্তিগুলি বেশ আপাতমধুর কিন্তু এই আপাতমধুর কম্যুনিষ্ট পার্টির মুখ্য উদ্দেশ্যকে পুরোপুরি ঢেকে দিতে পারে নি।

এই যুক্তিগুলি যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন কলকাতা তা' একটু আলোচনা করলেই বুঝা যায়। প্রথমে ধরা যাক এ্যাফ্রো এশিয় ঐক্যের কথা। এটি একটি 'গালভরা সুন্দর।' কারণ আজ সমগ্র পৃথিবী যখন একটি নিরপেক্ষবিশ্বসংস্থা গড়ে তুলতে চেষ্টা করছে তখন এই ধরণের এ্যাফ্রো এশিয় ঐক্যের ধ্বনি তোলার পিছনে নিশ্চয়ই অন্য কোন স্বার্থ আছে। স্বার্থটি অবশ্য খুবই স্থূল। এ্যাফ্রো-এশিয় দেশগুলি যদি নিজেদের কথাই বেশী করে চিন্তা করে তবে বিশ্বসংস্থার প্রচেষ্টা ব্যাহত হবে এবং পৃথিবীব্যাপী অরাজকতা চলতেই থাকবে। আর সেই অরাজকতার সুযোগ নিয়ে কম্যুনিষ্ট সাম্রাজ্যতন্ত্র বিস্তার লাভ করবে। সুতরাং আজ ভারতকে যদি এ্যাফ্রো-এশিয় ঐক্যের দোহাই দিয়ে কোনরকমে চীনের প্রস্তাবে মোটামুটি রাজী করানো যায় তবে উদ্দেশ্যটি পুরোপুরি সাধিত হয়। তাই আজকের "cent percent nationalist" কম্যুনিষ্ট পার্টি ভারতের স্বার্থেই (!) এ্যাফ্রো-এশিয় ঐক্যের ধ্বনি তুলছে।

কম্যুনিষ্ট প্রচারের আর একটি 'সুপার ডোজেড বুইনাই' হচ্ছে শান্তিপূর্ণ মীমাংসা প্রস্তাব। আমরা যদি চীনা আক্রমণের সুরু থেকে আজ পর্যন্ত কম্যুনিষ্ট পার্টির সিদ্ধান্ত ও প্রচারকে লক্ষ্য করি তবে দেখতে পাব যে সবসময়ই কম্যুনিষ্ট পার্টি একটি কথা বলেছে "Talks should always be open." কম্যুনিষ্ট পার্টি এ ধরণের প্রচার করে নিজেকে শীতল (!) জায়গায় বসাতে চেষ্টা করছে। কিন্তু এটা তাদের বুঝা উচিত যে ভারতবাসী চিরকালের শান্তিপ্রিয় জাতি। যুদ্ধে তার কোন স্পৃহা নেই। কোন যুদ্ধের মীমাংসা ভারতবাসী শান্তিপূর্ণ ভাবেই বরে এসেছে এবং করতে চায়। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য জাতির সম্মান বিসর্জন দিতে হবে। কম্যুনিষ্ট পার্টি যে ধরণের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার কথা বলছে তা' একান্তভাবে জাতীয় সম্মানের পক্ষে হানিকর। আজ তারা ভারতকে দিয়ে কলম্বো প্রস্তাব গ্রহণ করানোর জন্যে উঠেপড়ে লেগেছে। কিন্তু চীন যে কলম্বো প্রস্তাব গ্রহণ সম্বন্ধে কোনরকমের উচ্চবাচ্য করছে না সে সম্বন্ধে কম্যুনিষ্ট পার্টি নীরব। শুধু তাই নয় সর্বশেষ পত্রে চীন সরকার ভারতকে হুমকি দেখিয়েছে যে চীন-সরকারের তিনদফা প্রস্তাব না গ্রহণ করলে আবার আক্রমণ সুরু করবে। সে প্রসংগেও কম্যুনিষ্ট পার্টি কোন কথা বলছে না। এ ব্যাপারে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি 'আন্তর্জাতিক চাপ' সৃষ্টি করছে না কেন? এধরনের প্রচার থেকে কি এই মনে হয় না যে ভারতই আক্রমণকারী সুতরাং তারই তৎপর হয়ে মীমাংসা করা উচিত? কম্যুনিষ্ট পার্টি তার পূর্বেকার তাল্পে—যে 'ভারতই আক্রমণকারী' ফিরে যাচ্ছে নাকি? কমরেডরা কি জবাব দেবেন?

তৃতীয় প্রচার হ'ল নেহেরু সরকারকে সমর্থন, যার আপাত চরমরূপ হচ্ছে আসন্ন উপনির্বাচনে কম্যুনিষ্ট পার্টি কর্তৃক কংগ্রেসকে সমর্থন। গত সাধারণ নির্বাচনের সময় কিন্তু এই ধ্বনি ছিল না। তখন কম্যুনিষ্ট পার্টির মতে শ্রীনেহেরু ছিলেন 'সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা পরিপুষ্ট।' হঠাৎ তাঁর চরিত্রে কি এমন পরিবর্তন ঘটল যা' সাধারণভাবে বুঝা কষ্ট। কিন্তু যারা কম্যুনিষ্ট প্রচারের সঙ্গে পরিচিত তাদের কাছে ব্যাপারটা অত্যন্ত প্রাঞ্জল। এ ধরণের কংগ্রেসী আশ্রয়ের প্রধানতঃ দুটি কারণ আছে। প্রথম কারণ হ'ল শ্রীনেহেরুকে সমর্থন করলে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বা জন-আক্রমণের ভয় কম থাকে এবং পর্দার আড়াল থেকে

নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করা চলে—যেমন এখন চলছে। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে এই যে বর্তমান জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে কম্যুনিষ্ট পার্টির পায়ের তলার মাটি সরে গেছে। কাজেই তাদের একমাত্র উপায় কংগ্রেসী ছাতার তলায় ভিড়ে গিয়ে মান ও প্রাণ বাঁচানো। তাই আজ কম্যুনিষ্ট পার্টি রুশপ্রেম চীনী প্রেম ছেড়ে দিয়ে নেহেরু-প্রেমী ও কংগ্রেস-প্রেমী বনেছে; এতে আশ্চর্য বা আশান্বিত হবার কিছু নেই। এটা কম্যুনিষ্টদের অনুসৃত অন্যতম পদ্ধতি।

গোষ্ঠীনিরপেক্ষতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতা নিবৃত্তির নামে কম্যুনিষ্ট পার্টি যে প্রচার কার্য চালাচ্ছে তা' শুধু জাতীয় সম্মানের পক্ষেই হানিকর নয়, জাতীয় প্রতিরক্ষার পক্ষেও বিপজ্জনক। গোষ্ঠীনিরপেক্ষতায় প্রতিটি ভারতবাসী বিশ্বাস করে। কিন্তু কম্যুনিষ্ট পার্টি গোষ্ঠীনিরপেক্ষতার যে ভাষ্য করেছে তাতে ভারতবাসী আস্থাশীল তো নয়ই বরং ভীত। জাতীয় সংকটকালে পাশ্চাত্য দেশগুলি থেকে সামরিক সাহায্য গ্রহণ করায় কম্যুনিষ্ট পার্টির মতে গোষ্ঠীনিরপেক্ষতা নষ্ট হয়েছে, কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়া যদি কোন সাহায্য দানে প্রতিশ্রুত হয় তাতে গোষ্ঠীনিরপেক্ষতা 'বিপদের সম্মুখীন' হয় না। কম্যুনিষ্ট পার্টি প্রভাবিত Link পত্রিকার ১৩ই জানুয়ারী '৬৩ তারিখের সংখ্যায় 'Non Alignment sits critics' প্রবন্ধে শ্রীগোবিন্দ সাহী বুঝাতে চেয়েছেন যে যাই ঘটুক না কেন সোভিয়েট রাশিয়াকে রাগানো চলবে না। তাহ'লেই সে চীনের দিকে চলে যাবে। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়া যে কবে ভারতের পক্ষে ছিল তা' বুঝলাম না। ২৪শে অক্টোবর '৬২ তারিখে প্রাভদা পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলা হয়েছে "..... We think Chinese Government's proposals are constructive." ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি তো চীনা আক্রমণের নিন্দা করেছে এবং নেহেরু সরকারের প্রত্যেকটি কাজকর্মকে সমর্থনের প্রস্তাব নিয়েছে তবে কেন সোভিয়েট সরকারের এধরণের মতামতের সমালোচনা করে নি? ভারত সরকার যদি সোভিয়েট রাশিয়ার মত মেনে নেয় তবে কি গোষ্ঠীনিরপেক্ষতা অক্ষুণ্ণ থাকবে? সুতরাং কম্যুনিষ্ট পার্টির এ ধরণের 'ভাষ্যের পিছনে যে কি উদ্দেশ্যে কাজ করছে তা' সকলেই বুঝতে পারছে। যদি সাহায্য গ্রহণ করলে অন্যায় হয় তবে কোন পক্ষ থেকেই গ্রহণ করা উচিত নয়। কম্যুনিষ্ট পক্ষের সাহায্য ও পরামর্শ পেয়ে এ ধরণের ভাষ্য কেবল অসৎ প্রচারই নয় প্রত্যক্ষভাবে উদ্দেশ্যমূলক। আর এই মুখোশ খুলে দেওয়ার দোষেই জন্ম হয়েছে তথাকথিত দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলদের।

কম্যুনিষ্ট ভাষ্যের দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলরা (!) সাধারণ ভারতবাসী। তারা জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করে; জাতীয় সংকটকালে সম্মানজনক সর্তে যে কোন দেশ থেকে সাহায্য গ্রহণ করাকে গোষ্ঠীনিরপেক্ষতার পরিপন্থী বলে মনে করে না। এদের বক্তব্য হচ্ছে এইযে যে কারণেই হোক দেশে যখন উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র নেই তখন বিদেশ থেকে আনা উচিত। ভারত ভিন্ন প্রত্যেকটি দেশই তাদের কাছে বিদেশ— কোন বিদেশ দেশকে তারা 'স্বদেশ' বলে মনে করে না। দেশ যখন আক্রান্ত তখন যুদ্ধ প্রচেষ্টাই একমাত্র প্রচেষ্টা। কিন্তু কম্যুনিষ্ট পার্টি সম্পূর্ণরূপে এই মতের বিরোধী। কম্যুনিষ্ট পার্টির মতে এই সকল দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলরা দেশে 'War hysteria' তৈরী করছে। সুতরাং সরকারের উচিত যে করেই হোক এই 'war hysteria' বন্ধ করা। দেশ রক্ষার জন্য যদি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার উপর জোর দেওয়া হয় তা হলেই দেশকে যুদ্ধমুখী করা হয়। কম্যুনিষ্ট পার্টির এই প্রচার সত্ত্বেও আমরা ভারতবাসী শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কথাই বলব। তাতে কম্যুনিষ্ট পার্টি আমাদের যা' খুশী আখ্যা দিতে পারে। কম্যুনিষ্ট পার্টি চায় সোভিয়েট রাশিয়া প্রয়োজনমত সাহায্য না দিলেও তার সাহায্য ভিক্ষা করা ও পাশ্চাত্য দেশ থেকে সাহায্য না আনা এবং নিজের দেশে অস্ত্রশস্ত্রের উৎপাদন আরম্ভ করা। এই প্রচারের পিছনে

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে। তারা জানে যে সোভিয়েট রাশিয়া কখনই ভারতকে প্রয়োজনমত সাহায্য দেবে না, আর এই অল্প সময়ের মধ্যে দেশে উপযুক্ত পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদন করাও সম্ভব নয়। সুতরাং যদি পাশ্চাত্য দেশগুলি থেকে সাহায্য আসা বন্ধ হয় তবে সীমান্ত অরক্ষিত থাকবে এবং চীনারা বিনা বাধায় ভারতভূমিতে প্রবেশ করতে পারবে। যারা কম্যুনিষ্ট পার্টির এই ধরণের সোশ্যিনিরপেক্ষতার প্রচার ধরে ফেলেছে কম্যুনিষ্ট পার্টি তাদের দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল আখ্যা দিয়েছে। কিন্তু ভারতবাসী আজ কোন অপবাদেই বিচলিত নয়—দেশের সম্মান ও স্বাধীনতা আমাদের কাছে সবচেয়ে বড়।

পরিশেষে প্রশ্ন হচ্ছে কম্যুনিষ্ট পার্টি এ ধরণের প্রচার করে কেন? এর কারণ হচ্ছে এই যে মুখে এই পার্টি যতই জাতীয়তাবাদীদের খুশি আওড়াক না কেন কোনদিনই তারা জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী নয়। দেশের লোকের সামনে জাতীয়তাবাদের সাফাই গেয়ে তারা নিজেদের উদ্দেশ্য সাধন করে থাকে। একথা কেবল ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির সম্বন্ধেই সত্য নয়, আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের নেতারা যে ধারা দেখিয়েছেন, ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির বর্তমান প্রচার সেই ধারাকে অনুসরণ করছে।

পুস্তক পরিচয়

আলোর চকোর—পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র দাস, চাঁদনী চক, কটক-২। দুই টাকা।

বৃত্তান্ত—স্তাঁ-জন পার্স। অনুবাদ পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র দাস, চাঁদনী চক, কটক ২। এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

'আলোর চকোর'-এ পৃথ্বীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম বয়সের কবিতাগুচ্ছ উপস্থাপিত করেছেন। এই বইয়ে পঁয়ত্রিশটি কবিতা এবং নরেন্দ্র দেব লিখিত একটি ভূমিকা সন্নিবিষ্ট আছে। কবিতাগুলিতে কবির নিষ্ঠা ব্যুৎপত্তি ও অভ্যাসের সমূহ পরিচয় পাওয়া যায়। ভাষা ও ছন্দোব্যবহারে পারদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়, অবশ্য কখনও কখনও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কুশল অংশগুলি মনে পড়ে। এই বইয়ের কোন কোন পদ গান হিসেবে সার্থকতা প্রাপ্ত হয়েছে (গানগুলি সবই কবি-কর্তৃক উল্লিখিত আছে), তার মধ্যে, কবি জানিয়েছেন, "প্রথম গান 'শ্রীঅরবিন্দায়' রচিত হবার সাথে সাথেই শ্রদ্ধেয় দিলীপকুমার রায়ের অতিপ্রিয় হয়ে ওঠে।"

'আলোর চকোর' এর কবিতাগুচ্ছে প্রধান রস ভক্তির। সেই সূত্রে কবির রক্ষণশীল আস্তিকতা এবং পুরাণানুগ অনুষঙ্গ-রচনার প্রবণতা পাঠককে স্পর্শ করে। এই বিশ্বাসসহযোগেই তাঁর গান ও কবিতা নির্মিত, বর্ণনাংশ ও চিত্রবাহি সর্বত্রই প্রখর বিশ্বাস বর্তমান, যেমন

বক্ষমাঝে সকাল-সাঁঝে
শুভ-স্বরূপ আকাঙ্ক্ষা

উৎসর্জিত
স্বর্গ-প্রেমের আনন্দে।

অভীপ্সা-পৃ-৬

অমৃত-লোকের আলোক উজাড় করি'
আসবে আমার নীত-বস্ত্রের ঘর

নগ্ন-পৃ-১৩

ভেঙে যাবে মোর দুঃস্বপন
তোমার দিব্য-পরশনে
স্বর্গোদয়ের স্পন্দনে।

আশা-পৃ-১৫

আগুন আগুন আগুন লেগেছে মানবের সভায়;
বহ্নি-রবাবে কোন সুরকার নূতনের গান গায়!

আগুন-পৃ-২০

লেগেছে গো! লেগেছে রে আজকে মনে
আকাশের আরাধনা সঙ্গোপনে।

গাঁয়ের গান-পৃ-২৫

আজ অভ্র-মাঝে হেরিনু মোর আলোর ভগবানে।

অভ্র-পৃ ৩১

ব'সে আছি আজ আমি আকাশ-সন্নিভ
পৃথিবী উপুড় করা কমণ্ডলু 'পরে,—

শিবোহম্-পৃ-৪৪

ইত্যাদি থেকে অবিকল কবিচরিত্রটি উদ্ঘাটন করা চলে। কিন্তু এইরকম চরণ তাঁর প্রতি কবিতা থেকেই উদ্ধার করা যায়।

কিন্তু এ ছাড়াও কবি কখনও কখনও অন্যদিকের ভূমিখণ্ডে পদার্পণ করেছেন। কখনও চিত্ররচনায় নতুনত্বের পরিচয় দিয়েছেন, যেমন 'অবচেতন' কবিতায়, কখনও প্রকৃতিবাদী কবিতা লিখেছেন, যেমন 'সাংবাদিকের চোখে'। অথচ 'তুলসী লোহেক' এর মত কবিতাও আছে। 'বেব-প্রয়াস' নামে একটি দীর্ঘ ও সুখপাঠ্য কবিতাও এখানে উপস্থিত।

পৃথ্বীন্দ্রনাথের এই বই পড়ে পাঠক কবির সম্বন্ধে নানাবিধ সম্ভাবনার অনুমান করতে পারে। প্রথম বয়সের যে ত্রিশিরা কাঁচের মধ্য দিয়ে জীবনকে আমরা এমন বর্ণাঢ্য দেখি, ক্রমশ কবি তাকে কোথায় তুলে নেবেন? উত্তরজীবনে সে কি তাঁর আদর্শে রূপান্তরিত হবে?—ইত্যাদি অনুমান।

দ্বিতীয় বইটির পৃথ্বীন্দ্রনাথ আমাদের অপেক্ষাকৃত অধিক পরিচিত। তাঁর ফরাসী ভাষার অধিকারের সংবাদ অনেকেরই জানা, বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তার বহু স্বাক্ষর ছড়িয়ে আছে। ইদানীং বাঙালীসাহিত্যব্রতীদের উৎসাহে নিত্যনতুন পাশ্চাত্যসাহিত্যরথী বাঙলা হরফে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছেন, প্রতিবছর নতুন একজন নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্ত সাহিত্যিক আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছেন। প্যার্স এমনই একজন কবি যাঁকে নিয়ে কিছুদিন আগে বেশ হৈ চৈ হয়ে গেল। পশ্চিমীভাষাসমূহে আমাদের সাধারণ-জনের কৌতূহল সাধারণত খণ্ডিত ইংরেজিজ্ঞানের অনুমোদন-নাধীন, হয়তো সেই কারণেই ইতিপূর্বেই এলিয়টের মাধ্যমে প্যার্সের সঙ্গে কারুর কারুর পরিচয় ছিল, কিন্তু এই সুযোগে বিভিন্ন সাময়িকপত্রে মূল থেকেই অনেক রচনা বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত হয়ে সম্পর্ক ঈষৎ প্রত্যক্ষতর করে দিয়েছে। কিন্তু সাময়িক পত্র প্রধানত খণ্ড ও অংশের পৃষ্ঠপোষক, উপরন্তু সাময়িকপত্র বড় দ্রুত অস্পষ্ট হয়ে যায়। সেদিক থেকে এই বইখানি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য এবং মূল্যবান। প্যার্সের পূর্ণাঙ্গ একখানি বইকে (Chronique) আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করে অনুবাদক আমাদের সবার অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হলেন।

প্যার্সের কবিতা পণ্ডিতজনেই বেশ দুরূহ বলে মেনেছেন। সেই দুরূহতা স্বভাবতই স্বভাববিরোধী সাবলীলতা অর্জন করতে পারে না, কখনও অন্বয়ে কিংবা কখনও দু-একটি

পারিভাষিক শব্দের অপরিচয়ে। এই অনুবাদে সেই জটিলতার ছায়াই অনুমান করা যায়। কিন্তু সর্বত্রিস্থিরে বইটিতে বাঙলাভাষার অটিস্টিতরঙ্গ অনায়াসে প্রবাহিত হয়েছে অনুবাদের এর চেয়ে বড় পুরস্কার আমার জানা নেই। উপরন্তু কাব্যের পূর্বাহ্নে নোবেল কমিটির অস্টারলিঙের পরিচিতি ভাষণ ও সেইসঙ্গে প্যাসের প্রতিভাষণ বাঙলার স্থান পাওয়ার ফলে বইটির উদ্দেশ্য পূর্ণতর হয়ে উঠেছে। সাধারণ কৌতূহলী পাঠকের ঘরেও বইটি সংরক্ষণযোগ্য, তাতে সন্দেহ নেই।

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

শিউলি ঝরার শব্দ—শান্তি লাহিড়ী। সাহিত্য প্রকাশ। ২৯ ব্রহ্মপুর, বাঁশদ্রোণী, চব্বিশ পরগণা। দু'টাকা।

কবি যদি স্বীকার করতে কুণ্ঠিত না হন তাহলে প্রথমেই জানিয়ে রাখা ভালো তাঁর সঙ্গে বর্তমান সমালোচনালেখক নানাবিধ বান্ধবতার সূত্রে পরিচিত। সামাজিক প্রসঙ্গ বাদ দিলেও, 'কালীঘাটের পট' নামে তাঁর আগের কাব্যগ্রন্থখানি সরকারীভাবে প্রথম পড়তে পেয়েছিলেন তিনি। বর্তমান বইটিরও একটি কবিতা তাঁর নামে উৎসর্গিত। এইসব কথা জানিয়ে দেওয়ার পর প্রথামত সমালোচনালেখক হিসেবে আর পাঠকের বিশ্বাস অর্জন করা যায় না, যদিও আমার বিশ্বাস একেবারে বিপরীত। প্রথম, কবিতার সমালোচনা লেখাই যে অর্থহীন সংস্কার, তার সর্ববিধ গুরুভার যায় এই স্বীকারোক্তির ফলেই আমার কাছে শিথিল হয়ে গেছে। দ্বিতীয়ত, কারুর কবিতা একমাত্র তার অন্তরঙ্গজনের কাছেই শুভনমোচন করতে পারে, এই কথা লিখে 'কারুর কবিতা একমাত্র তার অন্তরঙ্গজনেরই প্রশ্রয়ে প্রতিপালিত'—এই কঠোর উক্তিটিকে দলিত করা গেল। কিন্তু গৌরচন্দ্রিকা পরিহার করা যাক।

শান্তি লাহিড়ীর কবিতার যে বিশেষত্ব আমাকে স্পর্শ করে, তা তাঁর স্বভাবজ নম্রতা। তাঁর কবিতার শব্দ ও চিত্রমালাও এই নম্র স্বভাবে অনুরঞ্জিত। হয়তো এই কারণেই তাঁর কবিতা ঈষৎ কোমল, তাঁর কবিতায় প্রকৃতির অবিনাশ সুষমা এখনও পর্যন্ত সহজেই ধরা দেয়। তাঁর আগের বইটি পর্যন্ত মোটামুটি এই কথাগুলি দ্বিধারহিত চিত্তে পুনর্বিবেচনার পূর্বেই স্বাক্ষর করা যেত। এই বইয়ের কবিতাগুলি পড়ে আগের উক্তির সঙ্গে আরও কিছু সংযোজন করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

আমি চাই কাছাকাছি ট্রাম-বাস, বাজার, অফিস।
দুষ্টু বন্ধুর সঙ্গ, কফির পেয়ালা, সিগারেট।
তারা বলে, সংসার ঘুমায়—পৃ ২৬

এই সব লাইন থেকেই বোঝা যায় প্রকৃতি তাঁর কবিতায় আরও ব্যাপক হয়েছে, কিংবা

অ্যাসবেস্টে তোমার ছায়া,
পোস্টারে নটীর মুখ—পৃ৪৬

অথবা

দেয়ালে
মেয়িলিন মনরোর হাসি
ট্রামে যেতে যেতে—পৃ ৪৮

ইত্যাদি লাইনে। অবশ্য এই নতুন নিসর্গ তাঁর ভালোবাসার বরনারী নয়, এর হাত থেকে রেহাই পেলে তিনি মুক্তি পান

তারপর ঘরে ফিরে বেসিনের জলে
ধুয়ে ফেলব সন্ধ্যাবেলা, চেনামুখ, হেডুয়ার ঘোড়।
স্মৃতি—পৃ ৪১

কিন্তু এই যাত্র। তাঁর পূর্বতন কবিতার তৃপ্তিরস এই বইয়ের অনেক কবিতায় ক্লিষ্ট সংশয়ে জটীল হয়ে উঠেছে। অবশ্য সেই আগেকার প্রেমিকই এখানে উপস্থিত, বর্তমানে ঈষৎ

প্রৌঢ় ও অকপট, কিন্তু কবিতাগুচ্ছের একটি পাঠ সহজেই ম্যাগাজিন-এ খেয়ে গেছে। এটি নিন্দার কথাও নয় প্রশংসার কথাও নয়, নিছক বর্ণনা। হয়তো এই পথে অতঃপর তিনি বিশ্বাসযোগ্য স্বতোৎসার ক্রমশ দুর্লভ সিদ্ধির পরিচয় দেবেন। আপাতত যে সব কবিতা পাঠকের মন কাড়ে তার সুর এই রকম

টুয়াহ—টুয়াহ—টুই, অলস রোদ্দুরে পেতে কান
গান শুনছে সারা মাঠ। দিগন্তে পাখিটা ছুঁয়ে ছুঁই
উড়ছে, উড়ছে—আর ধান ভানতে শিবের গাজন
শোনাচ্ছে ষোড়শ গিন্নি। সুপুরির বনে জীর্ণ গাল
—ইত্যাদি

জলছবি—পৃ ৪৪

কি

চল্ ঘরে ফিরে যাই, বয়ক্ষ কুচির মত হিম
ঝনঝনে শাদা ভাতে নুন, লংকা—অমৃত তৃপ্তিতে
সোগ্রাসে সাবাড় করে, ছিন্ন কন্থা—বাঁশের চাটাই!
অন্তরালে—পৃ ৩১

এই কবিতাগুচ্ছের একটি বাধার কথা বলা যাক। নানাস্থানে শব্দসম্পর্কিত slip, অপ্রযুক্ত শব্দ, একটু অধিক ঝুলে মনে হল, অনেক স্থানে বানানগুলি ঠিক মুদ্রাকরপ্রমাদ বলে মানতে পারা যায় না। কবিতা, এমনিতেই, আমার ধারণায় বড় সুখলালিত, এতটুকু সুরের অভাবে ম্রিয়মান হয়ে যায়, তাছাড়া তাঁর কবিতাতে কবি এখনও পর্যন্ত বহুবিধ নিষ্ঠার পরিচয় দিয়ে চলেছেন, এদিকে আর একটু সতর্ক হলে ক্ষতি কি? কিন্তু সবমিলে এই ছোট বইখানি আমাকে স্পর্শ করেছে, যেসব কথা আপাতদৃষ্টিতে অসুন্দর বলে প্রতীয়মান, তারও পিছনে আমার অনুরাগ স্পষ্ট করেই বলা ভালো।

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

JANATA: Edited by Rohit Dave; National House: Tulloch Road; Bombay-1; Republic Number: Price Re-1

ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের তত্ত্ব ও তথ্য পরিবেশনে ইংরাজী সাপ্তাহিক 'Janata'র একটি বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। 'Janata'র প্রসার নিছক প্রচারধর্মী আবেদনের সীমানা অতিক্রম করে বিশ্লেষণাত্মক ও গঠনাত্মক আলোচনার সমৃদ্ধ হয়ে থাকে। আলোচ্য সংখ্যাটি তার ব্যতিক্রম তো নয়ই বরং সে-পরিচয়ের সমুজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করছে।

চীনা আক্রমণের পটভূমিকায় ভারতীয় জনমানসের অভূতপূর্ব অভ্যুত্থান ও পরবর্তীকালে উদ্দেশ্যবিহীন ও কর্মসূচীবিহীন দিনযাপনের পরিণতিতে জাতীয় মনে যে সংশয়ক্ষুব্ধ ব্যর্থতাবোধ আত্মপ্রকাশ করেছে, তাকে সার্থকতার পথে পরিচালিত করার উদ্দেশ্য নিয়েই 'Janata'র এই বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। তাই এই সংখ্যার সম্পাদকীয়তে এই উদ্দেশ্যটি বর্ণনা করে বলা হয়েছে "This special issue of Janata, therefore, focusses attention on the many aspects of the national scene which shine only when Governmental action matches the manifestation of popular will."

কলে-কারখানার নিযুক্ত শ্রমিক যারা সকল যুগে ও সর্বকালে আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে, তাদের নানা সমস্যাও এই সংখ্যায় আলোচিত হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধগুলির মধ্যে "Government fails to harness popular will" "Europe looks at Chinese aggression" "Right to Criticise Govt failures," 'Economic implications of Emergency', Promotion of Industrial peace,' Growth of the Indian Proleariat," প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

The Economic Weekly : Fourteenth Annual number Edited by Sachin Chowdhuri : Asian New Age publishers Private Ltd, 65 Apollo street, For, Bombay-1 : Price Rs 3-00

সাপ্তাহিক 'The Economic weekly' অতি অল্পকালের মধ্যেই ভারতবর্ষে প্রকাশিত অর্থনীতি-বিষয়ক পত্র-পত্রিকার শীর্ষতম সারিতে স্থান নির্দিষ্ট করে নিয়েছে। আলোচ্য সংখ্যাটি এই সাপ্তাহিকের চতুর্দশতম বার্ষিক সংখ্যা। চীনা আক্রমণের ফলে দেশে প্রতিরক্ষার অর্থনীতি ও সামগ্রিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে যে সকল সমস্যা প্রকটভাবে দেখা দিয়েছে তার ওপরনির্ভর বিশ্লেষণমূলক আলোচনায় সমৃদ্ধ। প্রবন্ধের পংক্তিতে যারা আমন্ত্রিত হয়েছেন একদিকে তারা যেমন এক একটি দিক্‌পাল তাদের রচনাবলীও উৎকর্ষতায় আকর্ষণীয়।

এই সংখ্যায় 'Meeting the Chinese Threat নামক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে প্রতিরক্ষা ও উন্নয়নের যুগ্ম লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য বাজেটে করবৃদ্ধির অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে বলা হয়েছে "It needs no great prescience to see that for financing defence and development, the country will have to accept a massive increase in taxation." কিন্তু সেই সঙ্গে করবৃদ্ধির প্রকৃতি সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বলা হয়েছে "what one looks forward is not just the order of taxation that will be imposed, but the manner in which it will be done. Of paramount importance will be the structurall changes directed towards ensuring the twin criteria of equitty and elasticity" এই কথাগুলি লেখা হয়েছিল বাজেট প্রকাশিত হবার পূর্বে। বাজেটে এই সর্তগুলি লঙ্ঘিত হয়েছে।

পূর্বেই বলা হয়েছে, আলোচ্য সংখ্যার প্রতিটি প্রবন্ধই আলোচনার অপেক্ষা রাখে। তবুও এদের মধ্যে "Economics and Defence Pocly" "Some Basic issues in Mobilisation" "Defence Production and Defence Expenditure" "Financing of Defence : The Alternative," "Mobiling the economy for defence" প্রভৃতি প্রবন্ধ অবশ্য পঠনীয়। সুষ্ঠু প্রতিরক্ষার আগ্রহী এবং অর্থনীতির আত্যন্তিক ছাত্রমাত্রেরই এই সংখ্যাটি মনোযোগ সহকারে পড়া উচিত। সংখ্যাটির বহুল প্রচার কামনা করি।

নয় দ্বীপ—শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। অলকানন্দা পাব্লিশিং হাউস। ১এ, রূপচাঁদ মুখার্জী লেন। কলিকাতা-২৫। তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এইটিই সম্ভবত শেষতম গল্পসঙ্কলন। তাঁর ইতিপূর্বের স্বভাব ও প্রবণতা তিনি এই বইয়েও পুরোপুরি সমর্থন করেছেন। এবং অবিচল রেখেছেন, তাঁর অনুরাগী পাঠকবর্গের কাছে এটি স্বস্তিবাচক সংবাদ। অনুক্রমণিকা অংশে অশোককুমার রায় নামে একজন পাঠক তাঁর রচনাবলীর তার মধ্যে এই গল্পগুলিরও একটি বিস্তারিত আলোচনা লিখেছেন, সেখানে এই স্বস্তির গৌরবিত ও বর্ণাঢ্য প্রমাণ দেখা গেল। উপরন্তু ওই বিশেষ পাঠকটিই আবার এই বইয়ের একাধিক। অতঃপর আর কোনো আলোচনাই হয় বাহুল্য নয় মিথ্যা। সম্ভবত লেখকেরও তা-ই মত। নতুবা এমন একটি আলোচনাকে তিনি শিরোভূষণ (?) কেন করলেন, কিংবা কেমন করেই বা করলেন? যাঁরা অথৈ আলোকপ্রাপ্ত নন সেই সব সংশয়ী পাঠক বইয়েরই অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে এই আলোচনা পড়তে গিয়ে আলোচ্য ও আলোচনা দুটি সম্বন্ধেই হতবুদ্ধি হয়ে পড়তে পারেন, সেই বিপদ আমার মনে হয়েছে। কিন্তু সেকথা থাক।

সর্বসমেত নটি গল্প স্থান পেয়েছে এই বইয়ে। অশেষ। কোনারকের পাথারী মেয়ে, আমি আর সে। আবিষ্কার। নবদ্বীপ। কাপ্তেন কেনেডির গল্প। বিজ্ঞাপন। এছাড়া। প্রতীক্ষা। সীমাচলম্। বলা যায়, প্রধানত ভালোবাসাই এই বইয়েরও বিষয়বস্তু। এবং ভালোবাসা বিষয়ে শচীন্দ্রনাথ বিচিত্রভাবে অসংশয়ভাবে রোমান্টিক। তাঁর নায়ক নায়িকারা ভালোবাসার বহ্নিটিকে বহুদিন পর্যন্ত বহন করে বেড়ায়, সম্ভবত আজীবন, অত্যন্ত রুদ্ধ নিসর্গের মধ্যে অঙ্কিত কৃষ্ণ মেঘখণ্ডের মতো তারা একই সঙ্গে সত্তা ও ব্যক্তিক্রমকে সমুজ্জ্বল করে। তাঁর নায়ক নায়িকারা অভাব পৃথিবীর মধ্যে সুস্পষ্ট বিদ্যুতির মতো আলোকিত হয়ে ওঠে। অক্ষয় মজুমদার এই নামটির মধ্যে তিনি একবার তাঁর অভিপ্রেত চরিত্রের একটি বড় অংশ আরোপ করেন। ডি, কে, বোস এবং পাঁওরুটো, ওস্তমান কাপ্তেন কেনেডি, ডরেক এবং সামুয়েল—এই সব চরিত্র তাঁর অভিপ্রায়টিকে বহন করে বেড়ায়—তাঁর অভিপ্রেত আদর্শটিকে। তাছাড়া তাঁর সেই বিশিষ্টতা, যে-গুণে তিনি পাঠককে অভিভূত করেন, সেই সাধারণত-অপরিচিত ভৌগোলিক দিগন্তরে তাঁর কাহিনী আনয়ন—এখানেও, আন্দামান অথবা নিকোবরী লোকবৃত্ত—তার মধ্যে পরিকীর্ণ হয়ে তাঁর গল্পের রোমান্টিক ভাবানুষঙ্গ বহুগুণ বেড়ে যায়—এই গল্পগুলিতেও। ওই বিশেষ সার্থকতা আলোচ্য বইটিতেও অটুট আছে, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, যদিও মাঝে মাঝে তাঁর গল্পবলার ভঙ্গীতে অত্যন্ত চেনা জীর্ণ প্রতীয়মান হয়, বিজ্ঞাপন, আবিষ্কার ইত্যাদি গল্পগুলি অতিরিক্ত সরলতাবশে অনেক সময়েই দৃষ্টির নাগালে ধরা দিতে চায়না।

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

দিশারত

অশান্ত পশ্চিম এশিয়া

গত ৮ই ফেব্রুয়ারীর বাগদাদ বেতারের খবর: ইরাকে সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে কাসেম সরকারের পতন হয়েছে। সেনাবাহিনী ইরাকে ক্ষমতা দখল করেছে। ইরাকের শাসক ও প্রধানমন্ত্রী লেফটেন্যান্ট-জেনারেল আব্দুল করিম কাসেমকে হত্যা করা হয়েছে।

একইভাবে কয়েক বছর আগে অর্থাৎ ১৯৫৮ সালের ১৪ই জুলাই, সেদিনের ব্রিগেডিয়ার কাসেম ইরাকের ক্ষমতা দখল করেছিলেন। ঐ দিন ইরাকী সেনারা প্রতিক্রিয়াশীল রাজা ফয়সল ও প্রধান মন্ত্রী নুরী এস সৈয়দের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে; রাজা ও প্রধান মন্ত্রী নিহত হন এবং কাসেমের নেতৃত্বে এক নতুন মন্ত্রীসভা গঠিত হয়।

পশ্চিম এশিয়ার সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষমতা দখলের এই পদ্ধতিটা বহুদিন ধরে চালু হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইরাক, ইরাণ, তুরস্ক, সিরিয়া, লেবানন, মিশর, ইয়েমেন, জর্ডান প্রভৃতি মধ্য-প্রাচ্যের প্রায় সব কয়টী দেশেই এক বা একাধিক বার বন্দুকের জোরে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা হয়েছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভালই হোক বা মন্দই হোক, সেটা সফল হয়েছে। যেখানে ক্ষমতা বদলের শান্তিপূর্ণ পথটা রুদ্ধ করে দেওয়া হয়, সেখানে অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে সশস্ত্র অভ্যুত্থান।

কয়েক মাস আগে, অর্থাৎ গত সেপ্টেম্বর মাসে ইয়েমেনের রাজধানী সানার ঠিক এ রকম ভাবেই সেনাবাহিনীর সশস্ত্র বিদ্রোহের সময় নিহত হন ইয়েমেনের ইমাম মহম্মদ আল বদর। আজ ইয়েমেনের শাসক প্রধান একজন অজী নায়ক জেনারেল সালাল।

এই মাত্র সিরিয়াতেও একদল সামরিক অফিসারের

অভ্যুত্থানের খবর পাওয়া গেল। এর বিস্তারিত বিবরণ এখনও পাওয়া যায়নি। জানা যায় যে, এই সামরিক বাহিনী বিনা রক্তপাতে সিরিয়ার ক্ষমতা দখল করেছে।

এই সমস্ত অভ্যুত্থান সব ক্ষেত্রে নিছক ব্যক্তিগত ক্ষমতার লড়াই নয়। বরং অনেক ক্ষেত্রেই এগুলো প্রধানত সামাজিক বিক্ষোভের প্রতিফলন। এটা লক্ষণীয় যে ১৯৫২ সালে জেনারেল নজীবের নেতৃত্বাধীন মিশরিয় সেনাবাহিনীর অভ্যুত্থানের পর থেকে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে অনুরূপ অভ্যুত্থান ঘটেছে এবং সামরিক নেতৃবৃন্দরা 'সামাজিক বিপ্লব' সাধনের প্রতিশ্রুতিতে শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করেছেন।

ইয়েমেনে রাজতন্ত্রের বিলোপ

ইয়েমেনের সাম্প্রতিক বিদ্রোহের পরবর্তী অধ্যায়ে সেখান থেকে রাজতন্ত্র বিদায় নিয়েছে এবং প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্বাভাবিক কারণেই প্রতিবেশী রাজতন্ত্রী রাষ্ট্রসমূহ, সৌদি আরব ও জর্ডান ইয়েমেনের এই পরিবর্তনকে সুনজরে দেখতে পারেনি। ইয়েমেনকে কেন্দ্র করে সৌদি আরব ও জর্ডানের সাথে প্রেসিডেন্ট নাসেরের নেতৃত্বাধীন সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের তিক্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে। বলা বাহুল্য ইয়েমেনের নতুন শাসকরা আরব প্রজাতন্ত্রের এবং ইয়েমেনের রাজতন্ত্রের উত্তরাধিকারী প্রিন্স সৈফুল হাসান, সৌদি আরবের সমর্থন লাভ করছেন। তাছাড়া ইয়েমেনী সৈন্যদের সাথে এডেনস্থিত ব্রিটিশ সৈন্যদের সংঘর্ষের খবরও পাওয়া যাচ্ছে। এডেনের উপর ইয়েমেনের দাবী বহু দিনের। ইয়েমেনের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য এবং নতুন ইয়েমেন সরকারের সাথে আলাপ আলোচনার জন্য জাতিপুঞ্জের সাধারণ সচিব উ-আণ্ট-ডঃ রালফ বুঁশকে নির্দেশ দিয়েছেন। পরবর্তী সংবাদে জানা যায় যে, যাতে সৌদি আরব সরকার ইয়েমেনের রাজতন্ত্রীদের সমর্থন থেকে বিরত থাকেন তার জন্য সৌদি আরব সরকারের উপর চাপ দেওয়ার জন্য প্রেসিডেন্ট কেনেডী এলদণ্ডবার্গ বাংকারকে সৌদি আরবে পাঠিয়েছেন। অপর পক্ষে, ইয়েমেনের ঘাটী থেকে, মিশরীয় বিমানের, সৌদি আরবের এলাকায় বোমা বর্ষণের বিরুদ্ধে আমেরিকা ইতিপূর্বে তৃতীয় বার আরব প্রজাতন্ত্রের কাছে প্রতিবাদ জানিয়েছে।

ইরাকে পট পরিবর্তন :

যে পরিপ্রেক্ষিতে ইরাকে পট পরিবর্তন হয়েছে সেটাও খুবই উল্লেখযোগ্য। ১৯৫৮ সালে, সামাজিক বিপ্লবের প্রতিশ্রুতিতে ইরাকী সৈন্যবাহিনী ক্ষমতা দখল করে এবং ব্রিগেডিয়ার কাসেম প্রধানমন্ত্রীর গ্রহণ করেন। কিন্তু সামাজিক বিপ্লবের পরিবর্তে কাসেম ঘরে বাইরে শত্রু সৃষ্টি করেন। কয়েক বছরের মধ্যেই কুয়াইত, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র ও ইরাণের সাথে কাসেম সরকারের সম্পর্ক তিক্ত আকার ধারণ করে। ঐ সময় আভ্যন্তরীণ বিক্ষোভ ও ক্রমশ দানা পাকাতে থাকে। বহুবার প্রধানমন্ত্রী কাসেমকে হত্যার চেষ্টা হয়। ১৯৬০ সালে একাধিকবার কাসেম-বিরোধী বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে ইরাকী সেনারা গুলিবর্ষণ করে। ১৯৬২ সালে উত্তর ইরাকে কুর্দগণ স্বায়ত্ত-শাসনের দাবীতে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। গত বছর সমগ্র ইরাক জুড়ে কাসেম-বিরোধী হাঙ্গামা হয়। কাসেমের অন্তরঙ্গ বন্ধুরাও তাঁর কাছ থেকে সরে দাঁড়ান। অপর পক্ষে কাসেম দেশের বিভিন্ন দলের মধ্যে অন্তর্বিরোধ বাধিয়ে দিয়ে ক্ষমতা নিজের দখলে রাখার চেষ্টা করেন। শেষ দিকে ইরাকের কম্যুনিষ্টরাই তাঁর একমাত্র নির্ভর হয়ে দাঁড়ায়। ইরাকের বর্তমান বিদ্রোহে এক কম্যুনিষ্টরা ছাড়া আর কেউই দুঃখিত নয়।

ইরাকের বর্তমান প্রেসিডেন্ট কর্ণেল আব্দুল সালাম মহম্মদ আরিফ ও প্রধান মন্ত্রী ব্রিগেডিয়ার আমের হাসান বাদর এবং নতুন মন্ত্রীসভার অনেক সদস্যই ছিলেন ১৯৫৮ সালের বিদ্রোহের সময় ব্রিগেডিয়ার কাসেমের দক্ষিণ হস্ত। নতুন

মন্ত্রীসভায় ইরাকের বা'থ সোস্যালিস্ট পার্টির প্রাধান্য দেখা যাচ্ছে।

ইরাকের নতুন সরকার ঘোষণা করেছেন যে তাঁরা বৈদেশিক ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ-নীতি অবলম্বন করবেন। প্রেসিডেন্ট আরিফ ঘোষণা করেছেন যে যদিও তার সরকার কম্যুনিষ্ট বিরোধী তবুও তাঁরা রাশিয়া সহ অন্যান্য রাষ্ট্র সমূহের সাথে বলবৎ চুক্তিগুলো মেনে চলবেন।

সিরিয়ার বিদ্রোহ

ইরাকের বিদ্রোহ সিরিয়ার বিদ্রোহীদের উৎসাহিত করে থাকবে বলে অনুমান করা হয়েছে। অন্তত পক্ষে, ইরাকের বিদ্রোহের সাথে সিরিয়ার বিদ্রোহের একটা মূলগত মিল রয়েছে। যতদূর জানা যায়, সিরিয়ার বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন সেখানকার বা'থ সোস্যালিষ্টরা। ইরাকের মত সিরিয়ায়ও সেখানকার প্রধানমন্ত্রী খালেদ আল আজম বা'থ সোস্যালিষ্টদের বিরুদ্ধতা করতে গিয়ে ক্রমশ স্থানীয় কম্যুনিষ্টদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছিলেন। সিরিয়ার নতুন মন্ত্রীসভায় প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছেন বা'থ সোস্যালিষ্ট নেতা সালাহেদ্দিন অল বিতার। ইরাকের বিদ্রোহীদের ন্যায় সিরিয়ার বিদ্রোহীরা ও সমাজবাদও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতিতে বিশ্বাসী এবং 'নাসের পন্থী' অর্থাৎ 'আরব ঐক্যে' আস্থাবান।

আরব ঐক্য

ইয়েমেন, ইরাক এবং সিরিয়ার সাম্প্রতিক ঘটনাবলী আরব জগতে এক গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাবনার ইংগিত বহন করছে। সিরিয়ার সেনাবাহিনীর—'বিপ্লব পরিষদ' গত ৮ই মার্চ ক্ষমতা দখলের পর 'আরব ঐক্যের' প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেছেন। এরা স্পষ্ট করে বলেছেন যে, ১৯৬১ সালে যুক্তরাষ্ট্র আরব প্রজাতন্ত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া সিরিয়ার পক্ষে মোটেই উচিত হয়নি। ইতিপূর্বে ইরাকের বর্তমান বিদ্রোহী নেতারাও প্রেসিডেন্ট নাসেরের নেতৃত্বাধীন মিশরের সঙ্গে সহযোগিতা কামনা করেছিলেন এবং এই প্রশ্নেই কাসেমের সাথে তাদের বিরোধের সূত্রপাত হয়েছিল। অবশ্য গত ২২শে ফেব্রুয়ারী সাক্ষাৎকারে ইরাকের প্রেসিডেন্ট আরিফ বলেছেন যে তার সরকারের ইরাক ও মিশরকে নিয়ে কোন যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা বর্তমানে নেই। কিন্তু তিনি ঐ সাক্ষাৎকারেই এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে ইউরোপীয় যৌথ-বাজার ধরণের সহযোগিতার—সম্ভাবনার উল্লেখ করেন। ইরাক ও সিরিয়ার ঘটনাবলী মিশর, আলজেরিয়া ও ইয়েমেনকে উদ্দীপিত করেছে। সম্ভবতঃ মিশর, ইরাক, সিরিয়া, আলজেরিয়া ও ইয়ামেন 'আরব ঐক্যের' ভিত্তিতে এক রাষ্ট্র-জোট গঠনের দিকে এগিয়ে যাবে এবং আরব জগতের অভ্যন্তরে এই জোটকে সৌদি আরব ও জর্ডানের বিরোধীতার সম্মুখীন হতে হবে। বলা বাহুল্য, আরব জগতে সমাজ বিবর্তনের দিক থেকে সেখানকার বর্তমান ঘটনাপ্রবাহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

মালয়েশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ

পশ্চিম এশিয়ার আরব যুক্তরাষ্ট্রের মত গুরুত্বপূর্ণ না হলেও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এখনকার আলোচ্য বিষয় হলো মালয়েশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ। মালয়, সিঙ্গাপুর, সারাওয়াক, উত্তর বোর্ণিও ও ব্রুনি সহ একটী যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা ১৯৬১ সালে উত্থাপিত করেন মালয়ের প্রধান-মন্ত্রী টুংকু আব্দুল রহমান। আগামী ৩১শে আগষ্ট এই যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হওয়ার কথা এবং টুংকু আব্দুল রহমান গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী বলেছেন যে, যাই ঘটুক না কেন ৩১শে আগষ্ট তারিখেই ঐ যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হবে।

মালয়েশিয়ার পরিকল্পনা নিয়ে সংশ্লিষ্ট দেশগুলির মধ্যে কেন কিছু মতবৈধতা দেখা যাচ্ছে। অবশ্য গত সেপ্টেম্বরে সিংগাপুরে এর স্বপক্ষে গণভোটে এই পরিকল্পনা গৃহীত

হয়েছে। কিন্তু ঐ গণভোটের গণতান্ত্রিকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হয়েছে। অপর পক্ষে সারাওয়াকের ও উত্তর বোর্নিওর আইন-সভার মনোনীত সদস্যরা মালয়েশিয়ার পক্ষে মত জ্ঞাপন করলেও জনসাধারণের এক বড় অংশের মধ্যে এর বিরুদ্ধে অসন্তোষের কথা বলা হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে গত ডিসেম্বর মাসে উত্তর বোর্নিওতে এক সশস্ত্র বিদ্রোহ হয়, যদিও ব্রিটিশ সৈন্যদের বাধার সম্মুখে ঐ বিদ্রোহ সফল হয়নি। তা' ছাড়া ব্রুনির প্রধান রাজনৈতিক দল রাখত পার্টি ঐ পরি-কল্পনার বিরোধিতা করছে। ব্রুনির রাখত পার্টি সারা-ওয়াকের ইউনাইটেড পিপলস ও উত্তরবোর্নিওর বিরোধী দল-গুলোর পক্ষ থেকে দাবী করা হয়েছে উত্তর বোর্নিও রাষ্ট্র (কালিমান্তান উত্তরা) গঠনের জন্য।

ইন্দোনেশিয়া এবং ফিলিপাইনও ঐ পরিকল্পনার বিপক্ষে। ইন্দোনেশিয়া চায় না তার রাজ্যের পাশে ১২৯০০০ বর্গমাইল আয়তন বিশিষ্ট একটী বড় যুক্তরাষ্ট্র গড়ে উঠুক। ইন্দো-নেশিয়া গত ডিসেম্বর মাসে উত্তর বোর্নিওর বিদ্রোহীদের সক্রিয় সমর্থন জানিয়েছে। ফিলিপাইনও উত্তর বোর্নিওর উপর দাবীদার। অপর পক্ষে, ব্রিটেন মালয়েশিয়া পরিকল্পনার সমর্থক। এ অঞ্চলে ব্রিটেনের তৈল ও অন্যান্য খনিজ স্বার্থ উপেক্ষনীয় নয়। অপর দেশগুলির মধ্যে আমেরিকা এবং ভারতবর্ষ ঐ পরিকল্পনার স্বপক্ষে মত দিয়েছে। প্রেসিডেন্ট কেনেডী মনে করেন যে, ঐ পরিকল্পনা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এক গুরুত্বপূর্ণ অংশের নিরাপত্তার দিক থেকে গ্রহণযোগ্য। সম্ভবত ইন্দোনেশিয়ার জনমতকে প্রভাবিত করার জন্য রাশিয়া ও চীন এ ব্যাপারে ইন্দোনেশিয়াকেই সমর্থন করবে।

জাতিপুঞ্জের সাধারণ সচিব উ থাণ্টের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি ও সহকারী নরসিংহম এক রিপোর্টে বলেছেন যে সংশ্লিষ্ট পক্ষ গুলোর সম্মতি থাকলে এব্যাপারে জাতিপুঞ্জের হস্তক্ষেপের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। মালয়েশিয়া সংক্রান্ত প্রশ্নের আলোচনার জন্য মালয়, ফিলিপাইন ও ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্র প্রধানদের এক বৈঠকের কথাও বলা হয়েছে। টুংকু আব্দুল রহমান বলেছেন যে, কোন নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এরকম বৈঠকের ব্যবস্থা করলে তার আপত্তি থাকবে না।

পারমাণবিক বিস্ফোরণ পরীক্ষা

মালয়েশিয়া সংক্রান্ত বিরোধের মীমাংসা কোন পথে বা কোন প্রস্তাবের ভিত্তিতে হতে পারে তা' হয়ত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে বোঝা যাবে। কিন্তু একটী প্রশ্ন, যার সমাধানের উপর নির্ভর করছে—বলা যেতে পারে,—সমগ্র মানব জাতির ভবিষ্যৎ তাকে কেন্দ্র করে প্রস্তাব ও পাল্টা প্রস্তাবের বিরাম নেই।

একবছর আগে, অর্থাৎ ১৯৬২ সালের মার্চ মাসে জেনেভায় যখন সতেরো রাষ্ট্রের নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন বসেছিল তখন থেকেই আলোচিত হচ্ছে পরীক্ষামূলক পারমাণবিক বিস্ফোরণ বন্ধ রাখার প্রশ্নটী। ঐ ব্যাপারে অনেক প্রস্তাব বিনিময় এবং অনেক আলাপ আলোচনাও হয়েছে। গোড়াতে দেখা যাচ্ছিল যে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণের প্রশ্নে মতানৈক্যের জন্যই বিস্ফোরণ বন্ধ রাখার ব্যাপারে মতৈক্যে পৌঁছান যাচ্ছে না।

প্রথমে আমেরিকার দাবী ছিল যে বিস্ফোরণ করা হচ্ছে কিনা তা' নির্ণয়ের জন্য বছরে অন্ততপক্ষে ৮।৯ বার আন্ত-র্জাতিক পর্যবেক্ষণ দরকার এবং রাশিয়ার ঐ পর্যবেক্ষণের প্রশ্নে ছিল ঘোরতর আপত্তি। কয়েক মাস আগে ক্রুশ্চেভ যখন বছরে ২।৩ বার পর্যবেক্ষণে স্বীকৃতি জানালেন তখন এ' প্রশ্নে খানিকটা আশার সঞ্চার হলো। গত ২৩শে ফেব্রুয়ারীর সংবাদে জানা যায় যে আমেরিকাও ৭ বার পর্যবেক্ষণে রাজী হয়েছে।

কিন্তু এর পরও বলা কঠিন ঐ প্রশ্নের সমাধান এখনও কতদূর। গত ৮ই মার্চ জেনেভা নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের ভূতপূর্ব মার্কিন প্রতিনিধি আর্থার ডীন বলেছেন: সোভিয়েত

সম্পাদকীয়

ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ

যে ব্যক্তিত্ব কখনও সরব আড়ম্বরে উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতিযোগিতায় আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী হয়নি, তবুও নিজের চরিত্র ও মহত্বের বৈশিষ্ট্যে যিনি ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ উচ্চাসন লাভের অনায়াসগৌরব অর্জন করেছেন, ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ছিলেন ভারতের জাতীয় জীবনে তেমনি একজন সর্বজন শ্রদ্ধেয় জাতীয় নেতা। স্বাধীনতা অর্জন এবং সংগঠন,—উভয় যুগেই তাঁকে স্থায়ীত্ব ও নির্ভরতার প্রতীকরূপে গণ্য করতেন ভারতের অন্যান্য নেতৃবর্গ ও জনতা। স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগে জাতীয় প্রতিষ্ঠান যখন বারবার সংকটের আবর্তে নিমজ্জিত হয়েছে রাজেন্দ্রপ্রসাদ তখন আস্থা ও স্থিতিবান কাণ্ডারীরূপে আহ্বান লাভের সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এসে তার হাল ধরেছেন। তিনি কখনও দ্রুত তালে এগিয়ে যান নি, কিন্তু জাতীয় প্রতিষ্ঠানের গতি তাঁর হাতে সব সময়ে ছিল সুরক্ষিত,—এবং এই বিশ্বাসই ছিল তাঁর উপরে দেশবাসী ও তাঁর সহকর্মীদের।

স্বাধীন ভারতে গণপরিষদের সভাপতিরূপে এবং দুই পর্যায়ে ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতিরূপে ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ এই দুইটি পদই এক গাম্ভীর্যপূর্ণ মর্যাদার সঙ্গে অলংকৃত করে এবং রাষ্ট্রপতিরূপে ভারতের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে স্থায়ী ঐতিহ্যে রূপায়নের রীতি প্রবর্তন করে তিনি ভবিষ্যতের গতিকে সুলক্ষতার সঙ্গে চিহ্নিত করে গেছেন। রাষ্ট্রপতিরূপে তিনি কনষ্টিটিউশনাল ব্যক্তিত্বে একেবারে নিষ্ক্রিয় হয়ে গিয়েছিলেন তা নয়, কিন্তু তিনি রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর মতামতের আদান-প্রদানকে প্রকাশ্য বিতর্কে পরিণত করে সাংবিধানিক সংকট সৃষ্টি করতে দেননি, বস্তুত ধীর অথচ সুনিশ্চিত পদক্ষেপে অগ্রসর হওয়ার সংরক্ষণশীলতা ছিল ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের নেতৃত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একতিরার যখন পেশোয়ার থেকে রেঙ্গুন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তিনি তখন এন্ট্রান্স পরীক্ষা ও এম, এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকারী হয়ে বৈষয়িক জীবনে বৈভবশালী হয়ে ওঠার সুযোগ লাভ করেন। কিন্তু তিনি এই সম্ভাবনাকে পরিত্যাগ করে গান্ধীজীর নেতৃত্বে সেবা ও সংগ্রামের পথ বেছে নেন। স্বাধীনতা অর্জনের পরে বৈভবে ও স্বাচ্ছন্দে জীবন যাপনের সুযোগ তিনি লাভ করেছেন বটে কিন্তু তার আগে কঠোর অর্থনৈতিক কৃচ্ছতার মাধ্যমে তাঁকে আশ্রমিক জীবন যাপন করতে হয়েছে। গণপরিষদের

বিশ্বাবর্তের সেবাংশ

ইউনিয়ন এমন একটী ক্ষেপণাস্ত্র তৈরী করছে যা' একশ' মেগাটন শক্তিসম্পন্ন আণবিক বোমার চাইতেও জোরদার এবং ঠিক ঐজন্যই আণবিক অস্ত্র পরীক্ষা বন্ধ রাখার চুক্তিতে রাশিয়ার তেমন আগ্রহ নেই।

এই সংবাদের সত্যতা স্বীকার বা অস্বীকার করার সাধ্য আমাদের নেই। তাদের এই প্রতিযোগিতার ভয়াবহতাও হয়ত পুরোপুরি আমাদের কল্পনায় নয়। আমরা শুধু আশা করব যে আনবিক অস্ত্রধারী শক্তিমানরা শুধু এইটুকু উপলব্ধি করবেন যে এই ধ্বংসাত্মক প্রতিযোগিতায় উভয় পক্ষেরই কেউ কাউকে পরাস্ত করতে পারবেন না।

১০।৩।৬৩ শিশির কুমার ধর

সভাপতিরূপে অথবা ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধির প্রতীকরূপে রচিত ভাইসরয় প্রাসাদে রাষ্ট্রপতিরূপে প্রবেশ করেও নিজের সংগ্রামী জীবনের সারল্য, অনাড়ম্বরতা ও সাদাসিধে জীবন-যাপনের ভারতীয় রীতি পরিত্যাগ করেননি। রাজেন্দ্র প্রসাদের ব্যক্তিগত জীবন তাই ছিল সর্বজনশ্রদ্ধেয়। ভারতীয় রাজনীতিতে যাঁরা উচ্চাসন লাভ করেছেন রাজেন্দ্রবাবু তাঁদের মধ্যে ছিলেন উচ্চকোটির পাণ্ডিত্যসম্পন্ন ব্যক্তি। রাষ্ট্রপতি-রূপে তাঁর গৃহে যাদের অবারিত প্রবেশাধিকার ছিল তারা ছিলেন কলার, পণ্ডিত, দার্শনিক ও শাস্ত্রী, কিন্তু নিজের পাণ্ডিত্যের অধিকার এবং অন্যের পাণ্ডিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ কখনও বাহ্যিক সৌরবাকাঙ্ক্ষী হয় নি। সর্বদিক দিয়ে ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ ছিলেন নিরাসক্তির প্রতিমূর্তি।

পরিণত বয়সে তাঁর দেহান্তর ঘটলেও জাতির এই সংকট সময়ে ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের পরামর্শ ও উপদেশ দেশের পক্ষে প্রয়োজন ছিল। মৃত্যুর আগে অবশ্যি ডঃ প্রসাদ গভীর আঘাত পেয়েছেন। চীন-ভারত সংঘাতের চরম সংকটময় মুহূর্তে একটিবারের জন্যও দিল্লীর কর্ণধারেরা ভারতের জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা এবং দুই বারের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে সামান্য পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তাও বোধ করেন নি। ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের স্মৃতির প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

প্রত্যাসন্ন পাক-চীনা আক্রমণ?

চীন কি আবার ভারত আক্রমণ করবে? প্রীনেহেরু ও তাঁর সরকারী অনুসঙ্গীরা সম্প্রতি কয়েকবার এরূপ সতর্ক-বাণী উচ্চারণ করেছেন। চীনা আক্রমণের দুটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ সুস্পষ্ট। একটি, তিব্বতে বিপুল চীনা সৈন্যের ট্যাক্টিক্যাল সমাবেশ এবং অন্যটি পাক-চীন স্বাক্ষরিত চুক্তি। কোন রাষ্ট্রের সীমান্তে ট্যাক্টিক্যাল স্থানে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বিপুল সংখ্যায় সৈন্য সমাবেশের সংবাদ পাওয়া গেলে দুটি সিদ্ধান্ত করা যায়। হয় কূটনৈতিক চাপ দেওয়ার জন্য, অথবা সামরিক অভিযানের জন্যই এরূপভাবে রণনৈতিক ফরমেশনে ফৌজী মোতায়েন করা হয়,—এটা সামরিক বিধির প্রাথমিক পাঠের অন্তর্ভুক্ত। ভারত থেকে তিব্বত আক্রমণের কোন সম্ভাবনা আছে বলে মনে করে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করার জন্যই চীন এই সৈন্য সমাবেশ করেছে,—এরূপ যুক্তি ভারতের বর্তমান নেতৃত্ব ও পরিস্থিতির পরিবেশে কোন যাদুমন্ত্রও গ্রহণ করবে না। ভারতের বিরুদ্ধে কূটনৈতিক চাপ দেওয়ার জন্য চীন আবার ফৌজ এনে সীমান্তে ভীড় করিয়েছে,—এ যুক্তিও খাটে না, এজন্য যে মাত্র দু'মাস আগের ব্যাপক অভিযানের পরে আবার নিতান্ত হুমকি দেওয়ার জন্য চীন সৈন্য এনে মোতায়েন করেনি হিমালয়ের গিরিবর্ত্মগুলির গুরুত্বপূর্ণ স্থানে।

চীনের একতরফা যুদ্ধ-বিরতি, পশ্চাদপসরণ এবং বাস্তব নিয়ন্ত্রণ রেখার বিশ কিলোমিটার পিছনে সৈন্য সরানোর কাজ গুলি নিতান্তই সামরিক-কূটনৈতিক বা ট্যাকটিক্যাল রিট্রিট মাত্র। চীন একথা কল্পনাও করতে পারেনি যে মাত্র পাঁচ দিনের লড়াইয়ে যেরূপ মাইল পথ অতিক্রম করে বমডিলা পর্যন্ত দখল করতে পারবে এবং নেফা অঞ্চলে ভারতের সামরিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা এত তাড়াতাড়ি বিপর্যস্ত হবে। বস্তুত, পূর্ব পরিকল্পনার অনেক বেশি দূর অগ্রসর হয়ে চীনা ফৌজের সরবরাহ ব্যবস্থা আসন্ন শীতের পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত গুরুতর ভাবে বিস্তীর্ণ ও ভঙ্গুর করে ফেলেছিল চীনা নেতৃত্ব। তাই প্রধানত শীতকালের জন্যও পশ্চাদপসরণ করে সামরিক শক্তি পুনর্গঠনের সময় গ্রহণের জন্যই কূটনৈতিক ও রণনৈতিক রিট্রিট করেছে চীনা ফৌজ।

রাজনৈতিক বিতর্ক ও ব্যবহারে মাও-সে-তুংকে উগ্র ও উন্মত্ত মনে হলেও সামরিক অভিযানের পরিকল্পনা ও পরিচালনায় এই জেনারেল নেতা অত্যন্ত ধীর মস্তিষ্ক ও সূক্ষ্ম দিশেহারী। মাও-সে-তুংএর সামরিক নীতির দশ সূত্রের মধ্যে দুটি সূত্র বলে,—Fight not unprepared engagements

fight no engagement in which, there is no assurance of victory, এবং অপর সূত্র অনুযায়ী—In every battle concentrate absoutely superior forces, double, triple, quadrpuple and sometime even five or six times those of the enemy. মাওয়ের এই সামরিক সূত্রের কথা মনে রাখলে একথা বোঝা সম্ভব হবে কেন চীন তিব্বতে বিপুল সৈন্য সমাবেশ করেছে এবং করছে। চীন ভয়ের স্বাদ পেয়েছে এবং জানতে পেরেছে যে ভারত সামরিক ব্যবস্থায় অপ্রস্তুত। তাই, পুনরায় আঘাত করার আকাঙ্ক্ষা সম্প্রসারণবাদী চীনের পক্ষে স্বাভাবিক,—যদিও এই আঘাতের মাত্রা এতখানি হবে কিনা যাতে—সামরিক সাহায্যের জন্য ভারত ইঙ্গ-মার্কিন গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হতে বাধ্য হয়, তা খুব জোর করে বলা সম্ভব নয়।

চীন ভারতকে ইঙ্গ-মার্কিন ব্লকে ঠেলে দেবার সামরিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে অনিচ্ছুক সে সম্বন্ধেও সন্দেহের অবকাশ আছে। চীন চায় কম্যুনিষ্ট ও গণতন্ত্রী গোষ্ঠির মধ্যে আণ্ড শক্তির পরীক্ষা। তাই, ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি যদি ভারতের ক্ষেত্রেও সামরিক দিক দিয়ে কমিটেড হয় তা' হলে আরেকটি এমন বিস্তৃত রণাঙ্গন রক্ষার দায়িত্ব ইঙ্গ-মার্কিন গোষ্ঠির কাঁধে এসে চেপে বসবে যেখান থেকে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ করা চলে কিন্তু আক্রমণাত্মক যুদ্ধ চালান অত্যন্ত ব্যয়কর। রণাঙ্গণের সংখ্যা যত বিস্তৃত হবে এবং বৃদ্ধি পাবে চীন এবং রাশিয়ার মূল কর্মক্ষেত্রে আঘাত করবার ক্ষমতা ইঙ্গ-মার্কিনের পক্ষে তত নমুতর হতে বাধ্য। তাই, বহু ক্ষেত্রে মার্কিন শক্তিকে 'কন্টি' করিয়ে মার্কিনের আঘাত ক্ষমতাকে হালকা বিস্তীর্ণ ও অসংহত তথা 'থিন অ্যাণ্ড নন কনসেনট্রেটেড' করে দেওয়ার রণকৌশলের সঙ্গে চীনের পুনরাক্রমণের ট্যাকটিকস বরং মিলই রয়েছে। একথা অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন যে কম্যুনিষ্ট চীনের সামরিক নীতি রাজনৈতিক কূটনীতি দ্বারা পরিচালিত হয় না,—বরং চীনের রাজনীতি সামরিক নীতিদ্বারা পরিচালিত হয়। চীনা কম্যুনিজমের এটাই হলো মারাত্মক বৈশিষ্ট্য যে মাও-সে-তুঙ বিশ্বাস করেন যে "The whole world can be remoulded only with gun."

চীনের ভারত আক্রমণ যে আবার প্রত্যাসন্ন, এরূপ আশঙ্কা করার আরেকটি কারণ হলো পাক-চীন চুক্তির দ্রুত এবং এক বিশেষ সংকট সময়ে সম্পাদন। ভারত-পাক চুক্তির ফলে ভারত পাক-সীমান্ত থেকে সৈন্য অপসারিত করে হিমালয় সীমান্তে সমাবেশ করুক—চীন এটা চায় না। ভারতকে আঘাত করে পর্যুদস্ত করতে হলে,—ভারতীয় কৌজকে পাকিস্তানের পশ্চিম ও পূর্ব সীমান্ত এবং হিমালয় সীমান্তে ছাড়া সমাবেশে ছড়িয়ে রাখার পরিস্থিতি সৃষ্টি করা চীনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। তবেই চীন বিপুল সংখ্যাধিক্যে চুম্বি উপত্যকা, নেফা, কি বড়হোতী অঞ্চলে আঘাত করতে পারবে। অথবা এই অঞ্চলগুলিতে 'ডাইভারসনারী ট্যাকটিকস' গ্রহণ করে কাশ্মীরে আক্রমণ চালাতে পারবে।

কাশ্মীর দখলের প্রয়াসে পাকিস্তানের এই শেষ সুযোগ। গত ষোল বছরে হুমকির রাজনীতির অস্ত্রে পাকিস্তান ভারতকে ঘায়েল করতে পারেনি। এবারে চীনা সামরিক সংঘাতের পরিস্থিতিতে কাশ্মীর দখল করার অন্তিম সুযোগ পাকিস্তানের। উদ্যত চীনা-খড়্গের সম্মুখীন ভারতের পিছন থেকে ছুরি দেখিয়ে ডিপ্লোম্যাটিক চাপ সৃষ্টি করে অথবা চীনা আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে পিছন থেকে ছুরি চালিয়ে কাশ্মীর ছিনিয়ে নেবার চূড়ান্ত আকাঙ্খায়, মার্কিণ রক্তচক্ষু সত্ত্বেও পাকিস্তান চীনের সঙ্গে চুক্তি করেছে। এই চুক্তি নেপাল-চীন বা বার্মা-চীন চুক্তির মত সীমান্ত-চুক্তি নয়,—প্রয়োজন ও প্রতিক্রিয়ার পাক-চীন চুক্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ ট্যাকটিকস প্যাক্ট—এবং এই প্যাক্টের সামরিক লক্ষ্য ভারতবর্ষ। পাক-চীন চুক্তিকে—চীনের প্রতি পাকিস্তানের ফ্যাক্টের রাজনীতি বলে

বিষয়টিকে যে ভাবে লঘু করে দেখেছেন বলে শ্রীনেহেরু অভিমত প্রকাশ করেছেন,—তা' অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের হবে ভারতের পক্ষে যতদিন না পাক-চীন চুক্তির গুরুত্ব ও সামরিক তাৎপর্য্য অতিবিলম্বে ভারত সরকার অনুধাবন করেন এবং পাক-চীনের এই চালকে নিষ্ক্রিয় করার জন্য দূরদর্শী কূটনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

দুই সীমান্তে লড়াই করতে গিয়ে হিটলারের দুর্ধর্ষ রণশক্তি ব্যর্থ হয়েছে। দুই সীমান্ত থেকে ছুরি উদ্যত করে পাক-চীন উভয়েই ভারতের কাছ থেকে সুবিধা আদায় করতে চায়। এবারের যৌথভী কালে একই সঙ্গে পাক-চীন আক্রমণের রণনাদ সুরু হলে এর একদিকে পূর্বে চুম্বী ও নেফা অঞ্চলে এবং পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্তে ভারতীয় সৈন্য-বাহিনীকে মোতায়েন রাখার কৌশল গ্রহণ করে, পশ্চিমে একযোগে কাশ্মীরের উপরে পূর্ব-পশ্চিম থেকে অভিযান সুরু হলে আশ্চর্য হবার কারণ থাকবে না,—এই সেই সম্ভাবনাই বেশি।

এই বছরে ভারত এক চরম জাতীয় সংকটের সম্মুখীন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, এই সংকট উত্তরণে ভারতীয় নেতৃত্বের বলিষ্ঠ সতর্কতার বহ্নি-দীপ্তি সুস্পষ্ট হয়ে জ্বলে ওঠে নি।

পাক-চীন চুক্তি

হুরুকির জুয়া খেলার কৌশলীর চাল চেলে আইনজ্ঞ জিন্না বিনা সংগ্রামে কূটনৈতিক প্রশাদরূপে পাকিস্তান অর্জন করেছিলেন। সেই চাল দিয়ে গত ষোল বছরেও পাক-নেতারা কাশ্মীর আদায় করতে পারে নি। এবার শেষ চাল রেখেছেন পাক-নেতা আয়ুব। কিন্তু এই চাল এমনি এক চরম জুয়াখেলায় পর্য্যবসিত হতে যাচ্ছে যে চালের শেষে আয়ুব থাকবেন কি পাকিস্তান থাকবে,—তারও একটা ফয়সালা হয়ে যাবার গুরুতর সম্ভাবনা রয়েছে, পাক-চীন চুক্তির পরিণামে।

যে চুক্তি পাকিস্তান ও চীন করেছে তার ফলে পাকিস্তান ভারতের ১৩ হাজার বর্গ মাইল এলাকা চীনকে খয়রাতি করে দিয়ে ভারতের পক্ষে ভূমি সংক্রান্ত ক্ষতি করলো কি না সে প্রশ্ন অত্যন্ত গৌণ। এই চুক্তির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সামরিক, এবং এজন্যই তীক্ষ্ণ ক্ষুরের উপরে দাঁড়িয়ে পাকিস্তান আরেকবার রাজনীতির জুয়া খেলায় মেতে উঠতে উদ্যত হয়েছে।

পাকিস্তানের পক্ষে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসাবে, বর্তমান স্থায়িত্ব ও অস্তিত্ব নির্ভর করছে, মার্কিন সমর্থন ও সহযোগিতার উপর। পাকিস্তানকে সমর্থন করার এবং পশ্চিমী সামরিক গোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত করার প্রধান উদ্দেশ্য মূলতঃ চীনের বিরুদ্ধে অবরোধের রাজনীতির ট্যাক্টিক্সকে সফল করা এবং আংশিক-ভাবে ভারতকে কম্যুনিষ্ট ব্লক থেকে দূরে রাখার চাপ সৃষ্টি করা। কিন্তু বর্তমানে সম্পাদিত পাক-চীন চুক্তি মার্কিন রাজনীতি ও সামরিক ট্যাক্টিক্সের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। পাকিস্তান বেপরোয়া হয়ে জুয়া খেলতে উদ্যত হয়েছে আয়ুবের রণ-নৈতিক রাজনীতির বিদ্বেষকে, আয়ুব মনে করেন যে চীন-ভারত সংঘাতের ফলে আজ পশ্চিমী গোষ্ঠি ভারতকে যেভাবে সামরিক সাহায্য দিচ্ছে এবং যেভাবে ভারত সামরিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে উঠছে তার ফলে ভবিষ্যত পাক-ভারত সামরিক শক্তির ব্যালান্স সম্পূর্ণ রূপে এবং বহুগুণ অধিকো ভারতের দিকে চলে যাবে। এরূপ পরিস্থিতিতে ভারত বিরোধী হুরুকির রাজনীতি আর পাকিস্তান চালাতে পারবে না এবং কাশ্মীর পাওয়ার আশাও তাকে বিসর্জন দিতে হবে। তাই বিপন্ন ভারতের এই সামরিক অপ্রস্তুতির পরিস্থিতিতে পাক-চীন চুক্তির শেষ অস্ত্র বেছে নিয়েছেন পাক-রাষ্ট্র নেতা আয়ুব খান। কূটনৈতিক পর্য্যায়ে যদি এই অস্ত্র লক্ষ্যভেদে ব্যর্থ হয় তা হলে রক্তাক্ত রণক্ষেত্রেও কাশ্মীর দখলের শেষ চেষ্টায় পাকিস্তানের সামরিক প্রেসিডেন্ট বিরত নাও হতে পারেন।

ভারতের কূটনীতি কিভাবে পরিচালিত হবে সে কথা বলা কঠিন। কিন্তু পাক-ভারত যুদ্ধাভ্যাসের পরিণাম

যাই হোক না কেন,—পাকিস্তান রাজনীতির ভূয়াখেলায় এখন এক পর্যায়ে এসে উপস্থিত হয়েছে যার পরিণামে আয়ুব নেতৃত্ব নয় শুধু,—পাকিস্তানের প্রকৃতিরই আমূল পরিবর্তন ঘটতে পারে,—অবশ্যি তার আগে ভারতকে কম বিড়ম্বনা ভুগতে হবে না। পাক-ভারত সংঘাত বা পাক-ভারত মৈত্রী,—যে পথেই এই দুই রাষ্ট্রের সম্পর্ক পরিচালিত হোক না কেন,—এই দুই খণ্ডিত দেশাংশের ভাগ্য ও ভবিষ্যত যে ঐক্য ও সংহতির দিকে এগিয়ে চলেছে তার সংকেত উপলব্ধির মত দূরদৃষ্টি অর্জনে সক্ষম হলে, আয়ুব বরং সংঘর্ষের পরিবর্তে পাক-ভারত বৃহত্তর মৈত্রী ও সংহতির পথে অগ্রসর হতেন।

যাই ঘটুক না কেন,—এই উপমহাদেশ অদূর ভবিষ্যতে এক প্রবল রূপান্তরের সম্মুখীন হতে যাচ্ছে।

কলঙ্কিত করপোরেশন

কত বিরাট পুরুষের কীর্তি-মণ্ডিত কলকাতা করপোরেশন যে আজ কী কলঙ্ক ও কেলেঙ্কারীর কুৎসিত প্রসূতিতে পরিণত হয়েছে সেকথা ভাবতেও কলকাতার নাগরিকেরা লজ্জায় ও ক্ষোভে মাথা অবনমিত করবেন। অবস্থা আজ এমন পর্যায়ে এসেছে যে কেউ আজ কলকাতা করপোরেশনের কাউন্সিলারদের সপক্ষে একটি কথাও বলছে না। ভাষার শালীনতা রক্ষা করে যতদূর কঠিন শব্দ করপোরেশনের কাউন্সিলারদের তিরস্কার করা যায় কলিকাতার প্রতিটি সংবাদ-পত্র থেকে ক্ষমতা ও স্বার্থ-প্রসূত পৌর পিতা বলে পরিচিত ব্যক্তিরা তার অজস্র উপহার লাভ করেছেন। বাংলার বিধান-সভা ও পরিষদে প্রায় একবাক্যে এই অপদার্থ কাউন্সিলারদের অপসারিত করে করপোরেশনকে সুপারসিড করার দাবী উত্থিত হয়েছে। কিন্তু তবুও করপোরেশনের এই স্বার্থ-কীটদের বিন্দুমাত্র চৈতন্য হয় নি।

গণতন্ত্র-অনুরাগী নাগরিকদের পক্ষে করপোরেশনের পৌর শাসন বাতিল করার দাবী করা অথবা এই স্বায়ত্ত-শাসনশীল প্রতিষ্ঠানটির ক্ষমতা সংকোচের উদ্দেশ্যে উত্থাপিত আইনকে সমর্থন করার মত মানসিকতা যে কাউন্সিলারদের আচরণের কী চরম—ভয়াবহ জনক পরিস্থিতির ফলে উদ্ভব হতে পারে সেকথা করপোরেশনের কাউন্সিলারদের বুঝবার মত চৈতন্য পর্যন্ত আজ অবশেষে নেই।

করপোরেশনকে এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে টেনে আনার জন্য প্রধান দায়িত্ব কংগ্রেস কাউন্সিলার ও বাংলা কংগ্রেসের কর্মকর্তাদের। কলকাতার করপোরেশন এই দলবাজ ও আত্মস্বার্থ-সন্ধী কংগ্রেসীদের একটি মধু মোহনের কামধেনুতে পরিণত হয়েছে। কর্মকর্তাদের কামধেনু দোহনের উৎকট প্রতিযোগিতা দেখে করপোরেশনের কর্মচারী গোষ্ঠির মধ্যেও লোভ ও দুর্নীতির বিষ-রক্তে-রক্তে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। কংগ্রেসের উর্দ্ধতন কর্মকর্তারা করপোরেশনকে দলগত করায়ত্তে রাখবার আকাঙ্খায় এমন সব অযোগ্য লোকদের মেয়রের ও ডেপুটি মেয়রের গদীতে বসিয়েছেন যে একবারও এই কংগ্রেসী কর্তাদের মনে হয় নি যে এই আসনগুলি এক-সময়ে সুরেন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু দেশপ্রিয়ের ন্যায় নাগরিকের উপবেশনে সুশোভিত হয়েছিল।

অবশ্যি বিরোধীদলের কাউন্সিলারদের দায়িত্বও কম নয়। তারাও প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে করপোরেশনকে একটি বেবেল-টাওয়ারে পরিণত করে সংবাদ পত্রের শিরোনামায় ফলাও করে প্রচারিত হতে চেয়েছেন এবং অনেকে নানা দুর্নীতির দায়েও অভিযুক্ত হয়েছেন। এসব দুর্নীতির-কীর্তিকারীদের কেউ কেউ আবার এই কুকাজের স্বপক্ষে প্রদর্শন করে শুধু করপোরেশনের নয়—জনপ্রতিনিধিত্বের উচ্চাসনে পর্যন্ত প্রমোশন লাভ করে কংগ্রেসী রাজনীতির সুবহান নৈতিক বাওা সগর্বে উড্ডীন করবার সুযোগ পেয়ে দুর্নীতি-বৃত্তিকে রাজনীতির আটে পরিণত করে বড়াই করে বেড়াচ্ছেন।

যে পাক-চক্রে করপোরেশনের গোটা প্রতিনিধিদলকে আষ্টে পৃষ্ঠে নাগপাশের মত বেঁধে রেখেছে, শুধু প্রাপ্ত বয়স্কের

ভোটাধিকারের ভিত্তিতে কাউন্সিলার নির্বাচনের ব্যবস্থা হলে তার কতখানি প্রতিফলন করা সম্ভব হবে সে সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ আছে। কর্পোরেশনের আমলাতন্ত্রের আমূল সংশোধন কাউন্সিলারদের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং একদিকে উটিত দায়িত্ব থেকে কাউন্সিলারদের মুক্ত রাখা, কর্পোরেশনের বিভিন্ন বিভাগের বিকেন্দ্রীকরণের ব্যবস্থা করা,—এরূপ কতগুলি মৌলিক ব্যবস্থা ব্যতিরেকে কর্পোরেশনকে সুস্থভাবে পুনর্গঠিত করা সম্ভব বলে মনে হয় না।

যুগান্তরে প্রকাশিত কম্যুনিষ্ট চীনের চোরা চিঠি

যুগান্তরে প্রকাশিত চীনদরদী দেশদ্রোহী পত্রটিকে কেন্দ্র করে মাসিক বসুমতী পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে যে বাদ-প্রতিবাদ শুরু হয়েছে তার গুরুত্ব শুধু যুগান্তরের স্বার্থচক্রেই সীমাবদ্ধ নয়,—এই চিঠিটি জাতীয় মান ও সুরক্ষার প্রশ্নের সঙ্গেও জড়িত। সম্প্রতি শোনা যাচ্ছে যে চীনাদরদী চিঠিটির লেখক ঠিকানাহীন এক ভৌতিক ব্যক্তি এবং এই চিঠির পশ্চাতে রয়েছে একটি বৈদেশিক দূতাবাসের চক্রান্ত।

এই চিঠিটির ভাষা, বাক্যের বুনানী এবং অ-যুক্তিকে সুযুক্তিরূপে দাঁড় করাবার প্রয়াসে মুন্সীয়ানা দেখেই বোঝা যায় যে এই চিঠির পশ্চাতে রয়েছে কানু-মাখা ধুরন্ধরদের কারসাজী। এরূপ কথাও রটেছে যে যারা চীনা কনসালের ককটেল পার্টিতে হামেশা আসর জমিয়ে থাকেন তাদেরই একাধিক ব্যক্তি এই পত্রটির যৌথ প্রসূতী। কিন্তু সূত্র ও উৎস যাই হোক না কেন,—এই ভারত-বিরোধী পত্রটি কে লিখলো, কোথায় লেখা হলো, কি ভাবে ছাপা হলো এবং ছাপা হবার পরেও এই পত্রটির সমর্থনে কি ভাবে একাধিক পত্র প্রকাশিত হলো সে সম্বন্ধে সরকারী অনুসন্ধান এবং চক্রান্তকারীদের বিচারের ব্যবস্থা হওয়া উচিত। অন্যথায় অন্যান্য বৈদেশিক অনুচরেরাও জাতীয় স্বার্থ বিরোধী এরূপ প্রচার কার্যে সাহসী হবে।

যুগান্তরের কর্তৃপক্ষ আজ চীনা আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে আকস্মিক জাতীয় স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছেন, অথচ বছরের পর বছর যুগান্তরের সম্পাদকীয় স্তম্ভে কম্যুনিজম, কম্যুনিষ্ট পার্টি ও কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রগুলির প্রশস্তি কীর্তনের কী নগ্ন, নির্লজ্জ প্রদর্শনী চলেছে সে সম্বন্ধে একটু বিবেক-পীড়ন বা জাতীয় চৈতন্যের লক্ষণও দেখা যায় নি যুগান্তর কর্তৃপক্ষের। আধিক প্রলুব্ধতায় সেদিনে যুগান্তর কর্তৃপক্ষের জাতীয়তাধর্মী বুদ্ধি শুধু যে আচ্ছন্ন হয়েছিল তাই নয়,—নিজেদের বিবেককে স্বার্থসিদ্ধির ঠাণ্ডা কোঠায় সেদিনে নির্বিচারে বিনিদ্রিত করে রেখেছিলেন তারা; বস্তুত, চীনা আক্রমণের আগ পর্যন্ত যুগান্তর পত্রিকা দৈনিক স্বাধীনতার চেয়েও কম্যুনিষ্ট পার্টির বৃহত্তর ও ব্যাপক কার্যকরী মুখপত্রে পরিণত হয়েছিল। হাজার সভা করে কম্যুনিষ্টরা যে কাজ করতে পারে নি, যুগান্তরের এক একটি সম্পাদকীয় লেখনী তার চেয়েও বেশি কার্যকরী প্রতিপন্ন হয়েছে কম্যুনিষ্ট পার্টির পক্ষে। বাংলাভাষী জনতার মধ্যে কম্যুনিজমের প্রভাব বিস্তারের জন্য বিশেষ করে চীনাপন্থী কম্যুনিষ্টদের দলীয় শক্তি বৃদ্ধির জন্য অন্যতম দায়িত্ব যুগান্তরের সম্পাদকীয় স্তম্ভের। কী কুৎসিত ভাষায় কম্যুনিষ্টদের সমর্থনে এই পত্রিকার সম্পাদকীয় লেখনী সোশ্যালিষ্টদের প্রতি দিনের পর দিন আক্রমণ চালিয়েছে, সেকথা একবারও নজর হয় নি কর্তৃপক্ষের। তিব্বত সম্মেলনের সময়ে শ্রীজয়প্রকাশের ন্যায় নেতাকে জয়নারায়ণ বলে বিদ্রূপ করে তাঁর এবং অন্যান্য নেতাদের ভাষণ ও বক্তব্যকে 'কুকুরের চিৎকার' বলে জঘন্য ভাষায় সমালোচনা করতেও দ্বিধাবোধ করেন নি সেদিনের যুগান্তর-সম্পাদক। এমনি ব্যক্তিরা আজও কলম চালাবার সুযোগ পায় এ কথা ভেবে আমাদের জাতীয় নৈতিকতার মান সম্বন্ধে চিন্তিত না হয়ে পারি না। যুগান্তর কর্তৃপক্ষের একথাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে অন্যায় যে করে এবং নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য অন্যায় যে সহে আইনের চোখে

তাদের অপরাধের মাত্রার তারতম্য ঘটতে পারে, কিন্তু নৈতিকতার মানদণ্ডে তাদের মধ্যে কোন ব্যবধান নেই।

চীনের চোরা চিঠি ছাপাবার জন্য দায়িকপক্ষ প্রাক্তন সম্পাদকের উপরে দায়িত্ব চাপিয়েছেন, পক্ষান্তরে নিজেকে দায়মুক্ত করার জন্য প্রাক্তন সম্পাদক একজন সামান্য কেরাণীর উপরে দায়িত্ব আরোপ করার চেষ্টা করেছেন। যারা বড় বড় বিপ্লবের ডাক আওড়ান তাদের আদর্শের অনুরাগের মূল্য ও স্বরূপটি যে কি এরূপ অপপ্রয়াস তার একটি কালো আঁচড়। চীনের চোরা চিঠি ছাপাবার দায়িত্ব কার আইন তার বিচার করবে, কিন্তু সেরানের লড়াইয়ে এই সামান্য কেরাণীকে বলি দেবার কুৎসিত অপচেষ্টার ছায় অন্যায় যত আর হতে পারে না।

ভারত-নেপাল সৌহার্দ

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর সাম্প্রতিক নেপাল সফরের ফলে ভারত-নেপাল সম্পর্কে যে উন্নতির হাওয়া বইতে সুরু করেছে তার লক্ষণ দেখে ভারতবাসীরা আনন্দিত হবেন। বন্ধুত্ব ও উন্নয়নমূলক কাজকর্মের সহায়তায় এবং সাংস্কৃতিক আবেদনের পটভূমিকায় ভারত-নেপাল মৈত্রীকে সুদৃঢ় করার চেষ্টায় বিশেষ ভাবে তৎপর হওয়া ভারতের পক্ষে এক আশু কর্তব্য। নেপালের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক গঠন ও পরিস্থিতি এরূপ যে সুবিবেচিত পথে অগ্রসর হয়ে নেপাল-ভারতের সম্পর্ক গভীর করে তোলা সম্ভব হবে বলেই আমরা মনে করি।

১২।৩।৬৩

বাজেট প্রসঙ্গ

[আগামী সংখ্যায় বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বাজেটের বিস্তৃতিতর আলোচনা হবে। এ-সংখ্যায় বাজেট সম্পর্কে কোনো পৃথক মন্তব্য সন্নিবিষ্ট করা হোলো না। ভঃ সঃ]

২০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থিত গোবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্দ্র মিত্র এডভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

চৈত্র ১৩৬১
১২শ সংখ্যা : ২৭ বর্ষ

CALCUTTA

বিবাহ ও পরিবারের ক্রমবিকাশ

অনিলচন্দ্র রায়

আমাদের বিবেচনার বিষয় হইল, বাক্তিক বিবাহ আদিম প্রতিষ্ঠান কিনা। অবাধ সংসর্গবাদীরা যৌথবিবাহকে আদিম বলিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে যৌথবিবাহ যে সব জাতিতে আছে বলিয়া ইহারা বলিয়া থাকেন সেই সব জাতির বিবাহপ্রথার আলোচনায় দেখা যাইতেছে যে প্রকৃত যৌথ বিবাহ এসব প্রথাকে বলা চলে না। বিবাহ শুধু যৌন জীবনের প্রতিষ্ঠান নয়; ইহা আর্থিক, নৈতিক, যৌন, মানসিকও বটে। সর্বাঙ্গীন জীবনের একটা অখণ্ড প্রতীক ও প্রকাশ হইল এই প্রতিষ্ঠান। তাই যৌনজীবনে দাম্পত্য অধিকারের শিথিলায়ন ঘটিয়াছে বলিয়াই বিবাহ প্রতিষ্ঠান এক্ষেত্রে নাই, তাহা বলা যানেই বিবাহের প্রকৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞতা ছাড়া কিছু নয়। দাম্পত্যের শিথিলতা ঘটে দাম্পত্য আছে বলিয়া। শিথিলতার পশ্চাৎপটই হইল দাম্পত্য অধিকার ও বিবাহ। এই স্থায়ী পৃষ্ঠপটের মধ্যে বিশেষ অবস্থার বিশিষ্ট ব্যতিক্রম ঘটে; এই সব ব্যতিক্রম দেখা যায় অষ্ট্রেলিয়ার এই সব প্রথায়। যেখানে যেখানে এইসব বিকৃতি দেখা গিয়াছে সেখানেই কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাক্তিক বিবাহ আছেই। বাক্তিক বিবাহ নাই, অথচ যৌথবিবাহ বা বহুগমন প্রথা আছে, এমন দৃষ্টান্ত কোথাও নাই। ম্যালিনাউস্কীকে সমর্থন করিয়া তাই লাউয়ী বলেন, নারীতে একাধিক পুরুষের উপগমন দেখিয়াই যাহারা যৌথবিবাহের কথা আনিয়া ফেলেন তাহারা অবাস্তব ও অর্থহীন ব্যবহার করেন।

["------to leap from the fact that more than one man may have access to a woman, to the conclusion that there is an institution of group marriage is little short of absurd, as Dr. Malinowski correctly remarks."] (Lowie-52)

বুণ্ট (Wundt) কিন্তু যৌথবিবাহের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তবে তাঁর মতে যৌথবিবাহ পরবর্তিকালের বিকৃতি এবং একবিবাহেরই অবস্থা বিশেষের সাময়িক ও অস্থায়ী পরিণতি। কিরূপে কোন অবস্থায় এই যৌথবিবাহের উদ্ভব হইল তাহা বুণ্ট্ বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রাচীন কালে স্বামী-স্ত্রী সন্তান সহ একবিবাহ মানবজাতির প্রাকৃতিক প্রথা ছিল। টোটেমিক স্তর নামক মানবসমাজের দ্বিতীয় স্তরে কতকগুলি বিশেষ কারণ হেতু বহুপতিকতা ও বহুপত্নীকতার উদ্ভব হয়। বিশেষ অবস্থায় এই দুইপ্রথার সমবায় ও সংযোগ ঘটিয়া যৌথবিবাহ সৃষ্টি হইয়াছে।

পূর্বে বলবিবাহ সাধারণ প্রচলিত প্রথা ছিল। বুণ্ট্‌এর মতে, বলবিবাহ যে শত্রুজাতির মধ্য হইতে জোর করিয়া কন্যাসংগ্রহ তাহা নয়। একেবারে শত্রুজাতিদের মধ্য হইতে কন্যাসংগ্রহ কঠিন কাজ, তাহা সচরাচর হইত না। বন্ধুভাবাপন্ন জাতিগুলির মধ্য হইতেই নারীহরণ চলিত সহজে ও সর্বদা। কিন্তু নারীহরণের মত দুঃসাধ্য কাজ একা করা চলে না, দলবল ও সাথী চাই। তাই ছলা নারীর উপরে সাথীরাও অধিকার করিত এবং প্রধান অপহারক (captor) ইহাদের যৌথ অধিকার (joint right) স্বীকার করিয়া লইত। এইভাবে বহু পতিকতা সৃষ্টি হইত। আর এক-প্রকারেও বহু পতিকতা হইত। যেসব অঞ্চল কন্যাহত্যা হেতু নারীবিরল হইয়া পড়িয়াছে, সেখানে স্বভাবতই বহুপতিকতা হইবে। এই বহুপতিকতাই আগে উদ্ভূত হইয়াছে পরে আসিয়াছে বহুপত্নীকতা। যৌনক্ষুধার প্রাবল্য হেতু এবং পুরুষের প্রাধান্য হেতু ইহার উদ্ভব হইয়াছে। আরেকটী কারণ অর্থাৎ বহুপতিকতার উদ্ভব ও প্রভাবও ইহার সৃষ্টিতে সাহায্য করিয়াছে। বহুপতিক প্রথায় বলবিবাহের প্রধান অপহারক তাহার সাথিদের অংশ ছাড়িয়া দিলেও এই ষোল আনা (exclusive) অধিকারের হানিজনিত ক্ষতির পূরণ করিয়া লইত অন্যান্য আরো পত্নী সংগ্রহ করিয়া। কাজেই বহুপতিকতার প্রতিক্রিয়াস্বরূপেও বহুপত্নীকতার আমদানী হইতে পারে।

বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, এই দুই প্রথার পিছনেও বহু শক্তির কাজ রহিয়াছে। বলবিবাহের সাথিরা অংশ দাবি করে কিসের জোরে ও কেন? মনে রাখিতে হইবে এই প্রথা দুটি পরবর্তিকালের অর্থাৎ টোটেমী যুগের। এই যুগে গোষ্ঠিপ্রথার সৃষ্টি ও সম্পত্তি ব্যাপারেও বিনিময় (Barter & Exchange) প্রথাও খানিকটা অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। গোষ্ঠির প্রভাবে, ব্যক্তি কিছু খর্ব হইয়াছে। কারণ ব্যক্তি হইল গোষ্ঠির অঙ্গ মাত্র। এবং কোন ব্যক্তির সম্পত্তিতে যেমন গোষ্ঠিসভ্যদের কিছু দাবি থাকে, তেমনি ছলা নারীতেও হরণসাথিদের কিছু দাবি করিবার মনোবৃত্তি স্বভাবতই আসিতে পারে। অন্যদিকে বিনিময় প্রথার প্রভাবও সাথিদের মনোবৃত্তিকে আংশিক প্রভাবিত করিয়াছে। শ্রমের বিনিময় চাই, প্রতিমূল্য চাই, অতএব নারীহরণের ব্যাপারে তাহাদেরও বিনিময়ে নারীর উপরে দাবি জন্মিয়াছে। ইহার উপরে যৌনক্ষুধার তাড়না আছে: একে তৃপ্তি না পাইয়া বহুতে কলহপ্রবণ হয়। আবার নারীবিরলতাও আছে। এইসব বিবিধ কারণের সমাবেশ হইলে এইসব বিকৃত প্রথার উদ্ভব হইতে পারে। বুণ্ট্ বলেন, এইসব বিকৃতি প্রথম যুগে ক্ষণিক ও অতি নগণ্য ছিল। এই দুই প্রথার সংযোগ হইয়া যৌথবিবাহ সৃষ্ট হয়। যৌথবিবাহও আসলে এক প্রকার বহু বিবাহ বই কিছু নয়। ["It then appears at once that it (group marriage) is a particular form of polygamy." (41-42). Wundt]

কেবল এই দুই প্রথাই নয়। আরো নানা প্রকারের বিকৃতি নানাপ্রকারের অদ্ভুত প্রথার মধ্যদিয়া এই যুগে আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। কিন্তু একবিবাহ তো সর্বদাই বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহারই দেহের মধ্যে এই সব নানা রকমের স্ফীতি ও সংকোচন ঘটিতে লাগিল। প্রথমে বিরল

ও ক্ষণস্থায়ী। পরে ক্রমেই অধিকতর স্থায়ী অভ্যাসে দাঁড়াইল এইসব প্রথা ["At the time when these phenomena were in their earlier beginings, the temporary relations might very easily become permanent. It is thus that group marriage originates." (Wundt 170)

এখন প্রশ্ন, এই দুই, (বহু পতিকতা ও বহু পত্নীকতা) কিরূপে কোন অবস্থায় একত্র হইতে পারে? বুণ্ড্‌ট বলেন, অসভ্যজীবনে নারীর অভাব, অথচ যৌনক্ষুধার তাড়না আছে, বলবিবাহ ও লুটিপ্রথা আছে; এ অবস্থায় প্রত্যেক মানুষ খুঁজিয়া বেড়ায় বহু পত্নী (এটাই বহু পত্নীকতার অবস্থা); অন্যদিকে আবার নারীর সংখ্যা খুব কম (এর অর্থ হইল এই যে বহুপতিকতার কারণ সৃষ্টি হইল); এই পরিস্থিতিতে এই দুই ধরণের বহুবিবাহ একত্র সংযুক্ত হইয়া যাইবে এবং যৌথবিবাহ উদ্ভূত হইবে। ["If specially among tribes who have not yet developed sharply defined distinctions based on property and power, as for example, among the australians, every man strives to obtain several wives (which is the state of polygyny) while on the other hand, there actually exists a dearth of women (which means that motives to polyandry are present), the two forms naturally combine with each other." (Wundt, 45-46)] কাজেই যৌথবিবাহ হইল আসলে বহুবিবাহের একটা বিশেষ ধরণ। একবিবাহ হইতে বহু বিবাহ আসিয়াছে এবং বহু বিবাহই কোন কোন স্থলে বহুবিধ শক্তির ও অবস্থার প্রভাবে যৌথবিবাহে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। যেখানে যৌথবিবাহ আছে, সেখানেই তাহার মধ্যে বহুপতিক ও বহুপত্নীক বিবাহ দুইই অন্তর্ভুক্ত হইয়া রহিয়াছে। [But how then is what is called group marriage related to those two forms? It is obviously nothing but a combination of Polyandry and polygyny. In fact wherever a group of men marry a group of women, these two forms of polygamy are involved." 44-45 [Wundt].

অষ্ট্রেলিয়ার পিরাউরু প্রথা সম্বন্ধেও বুণ্ড্‌ট বিস্তৃত বিশ্লেষণ করিয়া সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন, এই প্রথাও এক বিবাহ হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। একজন পুরুষের এক প্রধান পত্নী এবং কয়েকজন পিরাউরু আছে, ইহা তো বহুপত্নীক বিবাহের সঙ্গে অবিকল একরকম। বহুপত্নীক বিবাহেও এক পুরুষের এক প্রধান পত্নী এবং একাধিক অপর স্ত্রী থাকে। এই বহু পত্নীক বিবাহ যে এক বিবাহের সম্প্রসারণ তাহা বুঝিলেই বোঝা যায়। বুণ্ড্‌ট বলেন, পিরাউরু প্রথার উৎপত্তি বিশ্লেষণ করিলেই দেখা যাইবে যে কাল্পনিক অবাধসংসর্গ হইতে নয়, একবিবাহ হইতেই এই প্রথার উদ্ভব হইয়াছে। [The very manner in which Pirrauru marriage originates however indicates that in all probability its basis is monogamy and not as is supposed by many ethnologists and Sociologists promiscuity or the total absence of all marriage," (170-) Wundt.]

পিরাউরু প্রথা যে একবিবাহ হইতেই জাত হইয়াছে তাহার স্বপক্ষে আরেকটী কথাও বুণ্ড্‌ট বলিয়াছেন। তিনি বলেন, উত্তর অষ্ট্রেলিয়ায় কিন্তু একবিবাহ প্রচলিত। অথচ দক্ষিণ ও মধ্য অষ্ট্রেলিয়ায় পাই যৌথ বিবাহ। সম্ভবতঃ বিশেষ অবস্থায় মধ্য ও দক্ষিণদেশে বিকৃতি ঘটিয়াছে কিন্তু উত্তরে একবিবাহ রহিয়া গিয়াছে।

প্রতিপক্ষ আর একটি তর্ক উঠাইতে পারে। অষ্ট্রেলিয়ায় না হয় প্রধানপত্নী ও উপপত্নী প্রথা আছে এবং একবিবাহের

বিকৃতি দ্বারা উদ্ভব হইয়াছে যৌথপ্রথা ; কিন্তু এমন সহজস্তরের যৌথবিবাহ হইতে পারে যেখানে সোজাসুজি একদল পুরুষ ও একদল নারী যৌথভাবে ও সমভাবে যৌনমিলনে অংশী এবং যেখানে প্রধানপত্নী বা পতি বলিয়া কিছু নাই। এই সহজ যৌথপ্রথা হইতেও পিরাউক্ষ আসিতে পারে। বুণ্ড্‌ট্‌ ইহারও জবাব দিয়াছেন। মর্গানী বলিবে, পূর্বে অবাধসংসর্গ, তার পরে যৌথবিবাহ, তার পরের স্তর এই পিরাউক্ষর প্রধান-অপ্রধান পত্নীপ্রথা। সর্বশেষে ইহা হইতে একবিবাহ। মর্গানীরা ধরিয়া লইয়াছে যৌনবৃত্তির ক্ষেত্র ক্রমেই সংকীর্ণতর হইয়া আসিয়াছে ; এই ক্রমসংকোচনের গতি এবং লক্ষ্য হইল শেষ পর্যন্ত একবিবাহের দিকে। বুণ্ড্‌ট্‌ বলেন, যদি ব্যক্তিক বিবাহের দিকেই মানবমনের ক্রমবর্ধমান প্রবণতা হইয়া থাকে, তবে ব্যাকথানে সহজ যৌথবিবাহ হইতে অষ্ট্রেলির পিরাউক্ষপ্রথার জটীলতাকে অতিক্রম করিয়া তবে মানুষ একবিবাহে আসিবে কেন? সরাসরি পূর্বতর যৌথবিবাহ হইতেই একেবারে একবিবাহে আসিতে পারিতে। তাহাইত সোজা পথ। পিরাউক্ষ পদ্ধতির প্রধান ও উপপত্নী প্রথার সহিত একবিবাহেরই বেশী সাদৃশ্য। নির্বিশেষ বা undifferentiated group marriage'র সহিত বরং এই পিরাউক্ষ প্রথার সাদৃশ্য কম। তাহাছাড়া সমাজ বিবর্তনের সাধারণ বিধি ও পদ্ধতির সহিত বুণ্ড্‌ট্‌-কথিত ক্রমপর্যায়েরই বেশী সঙ্গতি রহিয়াছে। বরং প্রধান এবং অপ্রধান পত্নীদের মধ্যকার পার্থক্যই ক্রমে লুপ্ত হওয়াই বেশী সহজ ও স্বাভাবিক। বহুবিবাহের বেলায় এই পরিবর্তনই বহুস্থলে ঘটিয়াছে। বহুবিবাহে যাহা নারী হইল অপরাহ্নের 'টিপ্রাবাদ্রু' আর সাবিনের কাছে হইল 'পিরাউক্ষ'। কাজেই নির্বিশেষে যৌথবিবাহ হইতে পিরাউক্ষ উদ্ভব হইতেই পারে না। স্বাভাবিক ভাবে পিরাউক্ষ প্রথা একবিবাহ হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে ইহাই বুণ্ড্‌টের সিদ্ধান্ত। ["Thus whatever angle we view group marriage, its polyandry and its polygamy seem to rest on monogamy" (Wundt-46)] ছিরেরী, উয়াবুরা প্রভৃতি অষ্ট্রেলীয় জাতির প্রথা বিচার করিয়া দেখা গেল যে প্রকৃত যৌথবিবাহ ইহাদের মধ্যে নাই। যেটুকু যৌথত্বের প্রথা আছে তাহাও একবিবাহের বিকৃতি ঘটিয়া উদ্ভূত হইয়াছে। এখন সাইবেরিয়ার চুক্‌চী জাতি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

॥ চুক্‌চী ॥

সাইবেরিয়ার চুক্‌চীদের মধ্যে সব পরিবারেই প্রায় কিছু না কিছু এই ধরণের যৌনবিকৃতিমূলক প্রথা পাওয়া যায়। দূর সম্পর্কের খুড়তুত, জেঠতুত ভাইয়েরা এবং অন্যান্য দূরসম্পর্কিত ভাইয়েরাও এক একটা দলগঠন করিয়া পরস্পরের পত্নীদের আদানপ্রদান করিয়া থাকে। কিন্তু এই বৃহদ্দলীতে এই সব ভাইরা একত্র বাস করে না। ইহারা বিভিন্ন ক্যাম্পে বাস করে। এই একত্বরূপের যৌথপতিরা যৌনজীবন। এ প্রথার মৌলিক উদ্দেশ্য হইল পতিকুলের জন্য বিস্তৃতে সন্তানধিনী ব্যবস্থা করা। কিন্তু ইহার মধ্যে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হইল এই যে একই ক্যাম্পের অধিবাসীরা পরস্পরের মধ্যে কখনো এরূপ যৌথভাবের যৌনজীবন যাপন করে না। ইহারা মনে করে তাহাতে সমাজ-সঙ্কর সৃষ্টি হইবে। দূরবর্তী স্থান হইতে পর্যটক যাহাতে রাত্রিবাসের সময়ে এই অধিকার পায় তাহার জন্য চুক্তি সম্পাদিত হয়। খুব বিরল উপলক্ষে এই চুক্তি অনুযায়ী অধিকার কার্যতঃ আদায় করার সুযোগ ঘটে। ইহার মূল উদ্দেশ্য আতিথ্য। তাহাদের আতিথ্য-ধারণাই স্বামী-স্ত্রীর অধিকারে এই শৈথিল্য ঘটায়। লাউরী তাই বলেন, এই প্রথার ভিত্তি হইল আদিম আতিথ্যের অদ্ভুত আতিথ্য-ধারণা। ["The institution has nothing to do with unrestricted sexual license but is founded on aboriginal

notions of reciprocal hospitality.'' (49-Lowie)] কখনো কোন চুকচী কোন বিবাহিতা নারীকে লইয়া কয়েকমাস বাস করিয়া পরে আবার ফেরৎ দিয়া থাকে। কখনো পত্নী বিনিময়ও হয়। এখানেও স্বামী-স্ত্রী খুব স্পষ্ট এবং ব্যক্তিগত অধিকার ও সম্পর্কই এই প্রথার ভিত্তি। এই প্রথারও পটভূমিকা হইল ব্যক্তিক বিবাহ। অবশ্য আমাদের ধারণার সহিত ইহাদের ধারণার পার্থক্য তো স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু যে আলোচনা করিতেছি তাহার প্রধান কথা এই যে এই সব উচ্ছৃঙ্খলতা ও বিকৃতির পশ্চাতে বিবাহ ধারণাটী বিদ্যমান আছে কি না। সর্বত্রই দেখিতেছি ব্যক্তিক সম্বন্ধ-বন্ধন সব সমাজেই রহিয়াছে। বিকৃতি সত্ত্বেও। সেইটিই আমাদের লক্ষণীয়। তাই লাউয়ী বলেন, তবুকে বিশ্লেষণ করিলে ধরা পড়ে ব্যক্তিক বিবাহটী। ["But these facts, while clearly demonstrating that chukchi notions of conjugal fidelity differs from ours, establish beyond doubt the individual nature of chukchi marriage.'' (Lowie 49)]

বোগোরাস (Bogoras) ইহাদের সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনিও বলিয়াছেন যে কয়েকজন পুরুষ একত্রকালীন তাহাদের পরস্পরের পত্নীদের সহিত যৌথভাবে যৌনব্যবহার করিতেছে, এমন একটা দৃষ্টান্তও দেখেন নাই। তাহাছাড়া পত্নী বিনিময় যে-সব ক্ষেত্রে হইয়া থাকে, সেখানেও যৌথ বিবাহ বলা চলেই না। পত্নী বিনিময়ে কার্যতঃ ব্যক্তিবিবাহ বা একবিবাহই থাকিয়া যাইতেছে, কারণ একত্রকালে এক পুরুষের সহিত এক নারীরই যৌনজীবন ইহাতে স্বীকৃত হয়। লাউয়ী বলেন "The exchange of wives does not imply group marriage but merely succession of one individual marriage after another" [Lowie] পত্নী বিনিময়ে পরপর দুইটী বিবাহ ঘটে। এক সঙ্গে দুই পুরুষ ও দুই নারীর যৌথজীবন নয়। বিশ্লেষণ করিলে চুকচী প্রথার এই সব বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। যৌথবিবাহ চুকচীদের মধ্যে আছে যাহারা বলেন তাহারা ভ্রান্ত। বৈজ্ঞানিক রীতিতে সব প্রথাগুলির চুলচেরা বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। যৌন বিকৃতির যে কোনো প্রকার দৃষ্টান্ত দেখিলেই সরাসরি তাহাদের সব প্রথাকেই এক "যৌথবিবাহ" বলিয়া রায় দেওয়ার পদ্ধতি বিজ্ঞান সম্মত নয়। লাউয়ী সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, চুকচী-বিবাহ আসলে ব্যক্তিক-বিবাহ; তবে স্বামীর যৌন অধিকারকে সম্প্রসারিত করিয়া কখনো কখনো সাময়িকভাবে অপর লোককে চুক্তি সাপেক্ষ সর্তানুযায়ী অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ইহা সাময়িক বিকৃতি। ["Chukchi marriage is individual marriage tempered with the occasional and temporary extension of the husband's purely sexual rights to his fellow-contractors'' [Lowie, 49]

দেখা যাইতেছে, এক বিবাহ নাই, অথচ যৌথবিবাহ আছে এমন দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে নাই। পৃথিবীতে উরাবুরা, ভিয়েরী, চুকচী প্রভৃতি সামান্য যে কয়টি জাতির মধ্যে এই ধরণের যৌথবিবাহ বা যৌনবিকৃতি পাওয়া যায়, সর্বত্রই দেখা যায় স্বামী পত্নী সম্বলিত ব্যক্তিক বিবাহের কাঠামোর উপরেই এই সব যৌন বিকৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রথমতঃ বৈজ্ঞানিক বিচারে এই সব প্রথাকে যৌথ বিবাহ বলাও অসঙ্গত, কারণ প্রকৃত যৌথবিবাহ কোথাও নাই। তবুও যদি এইসব প্রথাকেই 'যৌথবিবাহ' নামক অপসংজ্ঞাও দেওয়া যায়, তবু তথ্যবিচারে এই সত্যই প্রমাণ হয় যে, যৌথবিবাহ যে কয়টী স্থলে আছে সর্বত্রই একবিবাহের বিকৃতি রূপেই পরবর্তীকালে দেখা দিয়াছে। ইহা আদিম মোটেই নয়। যেখানেই এই যৌথবিবাহ সৃষ্টি হইয়াছে সেখানেও একবিবাহ লুপ্ত হয় নাই। বিকৃতি ও বিসদৃশ নানা পরিণতির স্থায়ী— ভিত্তি রূপে এক-বিবাহ বিদ্যমান রহিয়াছে। সামান্য দুচারটী দৃষ্টান্ত হইতে

সার্বিক একটা ঐতিহাসিক স্তরের কল্পনা করা কতখানি ভ্রান্তি-জনক তাহা উপরের আলোচনা হইতেই স্পষ্ট হইয়াছে।

অষ্ট্রেলিয়ার যৌনজীবনের এই সব বিকৃতিমূলক প্রথা আবিষ্কার হওয়ার পরেই নৃতত্ত্ব অষ্ট্রেলিয়া কর্তৃক অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। এ আবিষ্কার সে যুগে নতুন। তাই নৃতাত্ত্বিক মহলে এই ধারণা তখন গড়িয়া উঠিয়াছিল যে এই প্রথা অতি আদিম এবং সমাজজীবনের একটা অবার্য ও অনিবার্য পূর্বস্তর। আজ নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব এই অষ্ট্রেলিয়াবি ঝোঁক বা bias কাটাইয়া উঠিয়াছে। তথ্য বিশ্লেষণ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চলিয়াছে। তাই পণ্ডিতেরা আজ বুঝিয়াছে হাউরিট-ফিসনী যুগের অষ্ট্রেলিয়াবী চশমা চোখে দিয়া জগৎকে ও মানব সমাজকে দেখিলে চলিবে না। এ সম্বন্ধে বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত ম্যালিনাউস্কীও আমেরিকানী নব বিজ্ঞানী সম্প্রদায়ের সহিত একমত। অষ্ট্রেলিয়ার প্রথা-গুলিকে যৌথবিবাহ বলিতেই তাঁহার আপত্তি। বিশেষতঃ পিরাউম্না প্রথা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়া তিনিও বলিয়াছেন এই প্রথাকে যৌথবিবাহের আধুনিক বাস্তব দৃষ্টান্ত বলিয়া মনে করা ভুল। ইহা স্বামীর দাম্পত্য অধিকারের সাময়িক ও আংশিক শিথিলায়ন মাত্র। অন্তপক্ষে একবিবাহ এই প্রথার স্থায়ী মূল। [This custom has been adduced as a present-day occurrence of group marriage but this is obviously incorrect. It is only a temporary and partial surrender of marital rights consisting of a long and permanent connubium with occasional , rare episodes of extra-marital liaison" (B. Mali II)]

আর একটা দিকের প্রতি ম্যালিনাউস্কী দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। পিতৃত্ব সম্বন্ধে অষ্ট্রেলীয়দের চেতনা ও প্রয়োজন বোধ অতি তীব্র। সন্তান জন্মগ্রহণ করিলেই 'পিতা' তাহার থাকিবেই এবং আছে। পিতৃহীন সন্তানের কল্পনা অসভ্যরা করিতেই পারে না। ইহা তাহাদের সামাজিক জীবনের অত্যাবশ্যক অঙ্গ এবং সামাজিক চেতনার অনিবার্য অংশ। এই সামাজিক পিতৃত্ব সম্বন্ধে ইহাদের দাবি ও চেতনার মূলে কি আছে? ইহার মূলে আছে বিবাহ বা একবিবাহ সম্বন্ধে ইহাদের স্পষ্ট ধারণা। বিবাহ-মাত্রই পিতৃত্বকে কেন্দ্র করিয়া ঘটিবে। আইনসঙ্গত রূপে প্রতি সন্তানের একজন পিতা থাকিবেই এবং স্থান বিশেষে পিতা নির্দিষ্ট হইবেই। ইহাতেই প্রমাণ হয়, অষ্ট্রেলিয়ার এই সব যৌনবিকৃতি হেতু ইহাদের বিবাহ ও পিতৃত্বের ধারণায় ও প্রয়োজনে কোন পরিবর্তন হয় না। সামাজিক জীবনে পিতৃত্বের সুনিশ্চিত সত্তা ও তাহার প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই এই সব যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার দৃষ্টান্তে প্রভাবিত হইয়া যদি কেহ মনে করে ইহাতে হয়ত ব্যক্তিবিবাহ লুপ্ত হইয়াছে, তবে তাহা ভুল। ['Social parenthood in native ideas, behaviour, custom & law, is not affected by these various forms of relaxation just described. The children are reckoned as belonging to the legal husband and in this as in many other ways—economic, legal and religious—these temporary relaxations donot seriously disturb the marriage relationship." (B. Mali II)

অসভ্যদের জীবনের কোন নীতিজ্ঞান বা নৈতিকতা নাই এই ধারণা পূর্বযুগের নৃতত্ত্ব ছড়াইয়াছিল। ম্যাকলিনানই প্রথম ইহা চল করেন। অসভ্য নারী বিকৃতিরুচি এবং নীতিবর্জিতা এই ধারণা হেতুও 'যৌথবিবাহ আছে' বলিয়া একটা কুসংস্কার পূর্ব পণ্ডিতদের মনকে পাইয়া বসিয়াছিল। কিন্তু আজ এই ধারণার মূল উৎপাটিত হইয়াছে। ক্রলী বলেন, আদিম মানুষের নৈতিকতা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। ["One is struck by the high morality of primitive man"—Crawley] বিশেষতঃ ধর্মের প্রভাব

আদিম মানুষকে কতকগুলি বিষয়ে তীব্র সচেতন করিয়াছিল। এদের নীতিবোধে কঠোরতা ও তীব্রতাও তাহারই ফল। এই আদিম ঘৃণাটাই ক্রশীর মতে ধর্মের মূল।

মেলানেশীয় অসভ্যদের জীবনকে তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ করিয়াছেন ম্যালিনাউস্কী। তিনি বলেন, অসভ্যদের জীবনে প্রত্যেকটী অনুষ্ঠান ও প্রথার মধ্যে মানুষের স্বাভাবিক সন্তান-প্রীতি, বন্ধুবৎসলতা, সততা, বিশ্বস্ততা, প্রকাশ পায়। তাহাদের পারিবারিক জীবন সর্বত্র, সকল অবস্থায়ই বিবাহ ও পিতা-মাতা সন্তানকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। আমরা সভ্য মানুষেরা তাহাদের উপর 'যৌথবিবাহ' আরোপ করিয়া থাকি। আমরা বলি, তাহারা যৌথবিবাহী। কিন্তু তাহারা একথা শুনিয়া হাসিবে, যৌথবিবাহ তাহাদের সামাজিক জ্ঞানের বিরোধী। ["The idea of group parenthood appears preposterous to the primitive—he simply would laugh at the volumes of anthropological speculations on primitive promiscuity. It is the product of the academic mind." (B. Mali l).]

যৌথবিবাহ সম্বন্ধে মোটামুটি আলোচনা করা হইল। মর্গানীরা যৌথবিবাহকে অনিবার্য স্তর ধরিয়া তাহাদের সমাজ-বিবর্তনের কাঠামো গড়িয়াছেন। কিন্তু যৌথবিবাহ সম্বন্ধে তাহাদের দাবি যে তথ্য ও যুক্তির বিচারে ভিত্তিহীন প্রমাণিত হইয়াছে তাহা এই আলোচনায় স্পষ্ট হইয়াছে। এখন অন্যান্য কয়েকটি যৌন প্রথা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে।

কয়েকটি যৌন বিকৃতিমূলক প্রথা : [ইহারাও মর্গানী ছককে ভ্রান্ত প্রমাণ করে]

এখন কয়েকটি যৌনবিকৃতিমূলক প্রথা সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করিতেছি। পৃথিবীর অনেক দেশে এই সব প্রথার কোন কোনোটী চলু আছে। এই সব প্রথাকেও মর্গানীরা যৌথবিবাহ ও পূর্বতন অবাধসংসর্গ স্তরের সমর্থনে ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাহারা বলেন' এইসব প্রথার অস্তিত্ব হইতে প্রমাণ হয় যে একদিনে বাধাহীন, সীমাহীন অবাধসংসর্গ ও যৌথবিবাহ ছিল। বর্তমান প্রথাগুলি যে যৌথবিবাহেরই ধ্বংসাবশেষ বা Survival এই ব্যাখ্যানীতি —যাহাকে উত্তরণ-নীতি বলা হয়—যে কত অবৈজ্ঞানিক ও ভ্রান্তিজনক তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এখানে প্রথাগুলি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাক্।

(১) প্রাকবিবাহ উচ্ছৃঙ্খলতা (premoptial license) পৃথিবীর অনেক জাতিতেই কুমারী কন্যাদের মধ্যে প্রচুর যৌন স্বাধীনতা দেওয়া হয়, ইহা দেখা যায়। অষ্ট্রেলীয় ট্রোবিয়াণ্ড-দ্বীপবাসী, আফ্রিকার বাসাই প্রভৃতি জাতিদের মধ্যে কুমারীদের স্বেচ্ছাবিহরণের সুযোগ ও অধিকার আছে। তাই মুরেলার লায়ার বলেন, '– single women among primitives do enjoy greater sexual liberty than the married' (36). কিন্তু একথা ঠিক নয়। সার্বজনীনভাবে একথা সত্য নয়। বহুজাতি রহিয়াছে যাহাদের মধ্যে কন্যার যৌনার্ঘ্যের মূল্য ও মর্যাদা অত্যধিক। ওয়েষ্টারমার্ক তাহার বিশ্ববিখ্যাত পুস্তকে অগণিত দৃষ্টান্তসহ প্রমাণ করিয়াছেন যে নিম্নতম অসভ্যদের মধ্যেই কৌমার্য সম্বন্ধে কড়াকড়ি এবং প্রখর নিষ্ঠা দেখা যায়। সিলোনের ভেদ্দা, সুমাত্রার কুবু (Kubu), সেনোই (Senoi) ও অন্যান্য বাদয়ানী নেগ্রিটো জাতি ও ফুয়েজিয়ানরা (Fuegians) বিবাহের আগে যৌন-সঙ্গম কোন রকমেই সহ্য করে না। ইহাদের মধ্যে কৌমার্য্য মহৎ ধর্ম বলিয়া গ্রাহ্য হয়। আন্দামানী ও পুনমানদের মধ্যেও ক্বচিৎ কদাচিৎ প্রাক্‌বৈবাহিক যৌন সঙ্গম ঘটিলেও—সাধারণ বিধি হিসাবে কৌমার্যধর্মভঙ্গ কখনো সমর্থন পায়না সমাজে। কিন্তু উচ্চ স্তরের জাতিগুলিতে কিন্তু দুইরকমই পাওয়া যায়। ওসেনীয়া, এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা, সর্বত্রই একদিকে

যেমন কৌমার্য্যের মর্য্যাদাজ্ঞান পাই, তেমনি অন্যদিকে আবার পাশাপাশি পাই উচ্ছৃঙ্খল স্বাধীনতা। কতক জাতিতে সতীত্বের দাবি সমাজে স্পষ্ট। কতকগুলিতে সতীত্বের প্রশংসা ও প্রাকবৈবাহিক সঙ্গমের শাসন ও শাস্তি দানও পাই। কোন কোন জাতিতে প্রাকবৈবাহিক যৌনমিলনের পরিণতি হয় স্থায়ী বিবাহে।

ওয়েষ্টারমার্কের মতে, নিম্নতম জাতিতে অসতীত্ব একটা গুরুতর অপরাধ ও শাস্তার্হ ব্যাপার বলিয়া গণ্য হয়। কখনো নির্বাসন কখনো মৃত্যু পর্য্যন্ত ইহার শাস্তি দেওয়া হইয়া থাকে। এই কৌমার্য্যপ্রীতি ভেদ্দা, ইগোরোট [লুজন দ্বীপের igorote] ও কোন কোন অষ্ট্রেলিয় অসভ্য সমাজে দৃষ্ট হয়। ব্রিফল্ট কিন্তু এই দাবি স্বীকার করেন না। ওয়েষ্টারমার্কের দৃষ্টান্তগুলি আলোচনা করিয়া তিনি দেখাইতে চাহেন যে ইহা ঠিক নয়। ভেদ্দাদের কথা বিশ্বখ্যাত তাহারা একবিবাহী। ব্রিফল্ট এই তথ্যকে পাশ কাটাইতে চেষ্টা করিয়াছেন এই বলিয়া যে ভেদ্দা একবিবাহ দারিদ্র্যের ফল।

["...Monogamy of the Veddahs is the result of poverty and is neither invariable nor indissoluble" [Briffault, 2:2)] আর ভেদ্দাদের তালাক প্রথাও আছে। ব্রিফল্টের এই যুক্তি অপ্রাসঙ্গিক। অসভ্যরা সকলেই দরিদ্র, তাহা হইলে সকল অসভ্যেরই একবিবাহী হওয়া স্বাভাবিক। প্রাকবৈবাহিক কৌমার্য্য সম্বন্ধে ব্রিফল্ট সত্য কথা অস্বীকার করিতে পারেন নাই। কিন্তু ফাঁকি বাহির করিতে ছাড়েন নাই। ভেদ্দারা এত অল্প বয়সে বিবাহ করিয়া ফেলে যে প্রাকবিবাহ কৌমার্য্য অক্ষুণ্ণ থাকে কিনা বলা শক্ত। কাজেই কৌমার্য্য বা উচ্ছৃঙ্খলতা কোনোটাই ভেদ্দা সম্বন্ধে বলা চলে না ব্রিফল্টের মতে! ["...Veddah girls invariably marry at the first appearance of puberty,...since there is with them no pre-nuptial state, it is manifestly difficult to prove the existence of either pre-nuptial liberty or chastity." (Briff 222)] কেন বলা চলিবে না, তাহার যুক্তি ব্রিফল্ট দেখান নাই। বাল্য-বিবাহী ভেদ্দারা কৌমার্য্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই বিবাহজীবনে প্রবেশ করে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

ফিলিপাইনের লুজন-দ্বীপবাসী ইগোরোটদের যৌবন আসিলেই বালক ও বালিকাদিগকে আলাদা আলাদা বাড়ীতে পৃথক বাস করিতে হয়। রাত্রিবাসও পৃথক। পুরুষদের ঘরে এক বৃদ্ধ পুরুষ এবং বালিকাদের ঘরে একজন বৃদ্ধা নারী সজাগ দৃষ্টিতে তত্ত্বাবধান করিয়া থাকে। ব্রিফল্ট ইহা স্বীকার করিয়াও বলেন, এদের সতীত্ব সম্বন্ধে এত কড়াকড়ি যে তাহে বালিকারা অনৈসর্গিক পথে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির সন্ধান করে। "So strict is the chastity enforced on Igorot girls that being unable to control their passions, they are in the habit of going in to the woods and of having connections with monkeys" (Briff)]. আলোচ্য বিষয় হইল, প্রাক্-বৈবাহিক কৌমার্য্য রক্ষা করিয়া বিবাহজীবনে ইহারা প্রবেশ করে কিনা। সামাজিক প্রথা সম্বন্ধেই আলোচনা। কাজেই প্রথা পালনে অক্ষমতা কতজনের আছে কিংবা গোপনে কে কি করে তাহা প্রাসঙ্গিক নয়। সত্য একবিবাহ অঞ্চলের প্রচলিত নীতি কি সকলেই মানিয়া চলে? ব্যতিক্রম থাকিলেও সমাজপ্রথার নির্ধারণে নিয়মভঙ্গ প্রাসঙ্গিক নয়। যেমন ব্রিফল্ট বলেন, "in our sense" সতীত্বের প্রচলন ইহাদের মধ্যে নাই। "আমাদের অর্থে" নাই এ অভিযোগও অপ্রাসঙ্গিক।

দেখা যাইতেছে আদিম জাতিদের মধ্যে কৌমার্য্যরক্ষার রীতিও বহু প্রচলিত আছে। কিন্তু ব্যতিক্রম বা উচ্ছৃঙ্খলতা নাই তাহা নয়। তবে মর্গানীয়া শুধু ব্যতিক্রমগুলির উপরেই দৃষ্টি মেলে এবং এই উচ্ছৃঙ্খলতাই পূর্বে "এককালে" মানবপ্রকৃতি

ছিল, তাহাই ধরিয়া লইয়া 'উৎকর্ষন নীতির' দ্বারস্থ হইয়া বলেন, এগুলি সার্বজনীন উচ্ছৃঙ্খলতার অবশেষ।

আর একটী বিষয় বর্ণনীয়া এড়াইয়া যান। যাহাদের মধ্যে প্রাকবৈবাহিক শৈথিল্য দেখা যায়, তাহাদেরও মধ্যে কঠোর বিবাহবিধি রহিয়াছে। যেটী আমাদের প্রধান বিচার্য্য তাহা হইল বিবাহ-প্রথা। বিবাহ-প্রথাটী সর্বত্র সার্বজনীন ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। এসম্বন্ধে অসভ্যদের সমাজে কোথাও কিছু অস্পষ্টতা বা সন্দেহ নাই। সাময়িক স্বাধীনতা ও যৌনিকতা শিথিলতা ক্ষমার্হ হইলেও সমাজজীবন যে ব্যক্তিক বিবাহকে কেন্দ্র করিয়াই ধারা বাঁধিয়া উঠিবে, তাহা সব সমাজেরই সুনিশ্চিত প্রথা। আর বহুক্ষেত্রেই এই প্রাক-বৈবাহিক যৌন স্বাধীনতা বিবাহের প্রস্তুতি হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই সব পূর্বরাগের চাপল্য প্রায় সর্বত্রই অবসান হয় স্থায়ী বিবাহে। পাশ্চাত্য সমাজপ্রথায় কোর্টশিপ (courtship) পদ্ধতি এদেশীয় সংস্কার ও ঐতিহ্যের কাছে অতিরিক্ত স্বাধীনতা, এমন কি উচ্ছৃঙ্খলতা বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। কিন্তু কোর্টশিপ আছে বলিয়া বিবাহ প্রথা নাই, একথা বলিলে নিতান্ত হাস্যকর হইবে। তাই ম্যালিনাউস্কীও বলেন, কোন অসভ্য সমাজেই প্রাকবিবাহ শৈথিল্য বিবাহের বাধক বা বিরোধী বলিয়া ইহারা কখনো মনে করে না "In no instance is pre-nuptial liberty regarded by the natives as a negation or substitute for marriage. In fact it is always in such Communities in the nature of a preliminary and preparation to marriage," (B. Mali-11)

আফ্রিকার বাদাই জাতির দৃষ্টান্ত উল্লেখযোগ্য। ইহাদের বালিকারা বাধাহীন, বন্ধহীন চাপল্যে সারা বাল্যকাল কাটায়। এই সময় তাহারা পৃথক আবাসে (Kraal) ছেলেদের একত্র থাকে। যৌন স্বাধীনতারও ইহাদের সীমা নাই। (অবশ্য অপত্যগমন ইত্যাদি প্রচলিত বিধি-নিষেধ মানিয়া লইয়া একথা প্রযোজ্য)। কিন্তু বাদাই কুমারীদের এই চাপল্য সাময়িক। এই বন্ধনহীন জীবনের সীমা টানিয়া অচিরে তাহারা আলাদা আলাদা সংসার পাতিয়া বসিয়া যায়। ব্রেজিলে 'বোরোরা' (Borora) জাতিরও এই ধরণেরই জীবন। কিন্তু এই দুই ক্ষেত্রেই বিবাহ-প্রথা নরনারীর জীবনে অনিবার্য্য সত্য। বিবাহই সমাজ-জীবনের ভিত্তি। লাউয়ী তাই বলেন, আমাদের সভ্য-জাতিতে যেমন গণিকাপ্রথার সহিত বিবাহপ্রথা রহিয়াছে, তেমনি ইহাদেরও মধ্যে প্রাকবৈবাহিক যৌনপ্রথার সহিত বিবাহের কোনো বিরোধ নাই। বিবাহই তাদের এই সব প্রথার নিশ্চিত পরিণতি। ["Borora and masai usages, like the practice of prostitution among ourselves, obviously in no way conflict with the institution of individual marriage, which, on the contrary, is the normal condition after the period of youthful profligacy" (Lowie-48)

এই সব প্রথার দ্বারা বিবাহের কোন বাধা হয় না, ইহাদের সহিত জীবনের অবশ্য ভিত্তি স্বরূপে রহিয়াছে ব্যক্তিক বিবাহপ্রথা, ইহাই প্রমাণ হয়। এসব প্রথা দ্বারা পূর্বকালীন তো দূরের কথা, বর্তমানকালীনও কোন সার্বজনীন স্তরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না।

আরেকটা বিশিষ্ট লক্ষণও এই সব সমাজের রহিয়াছে। তাহারও গুরুত্বপূর্ণ অর্থ আছে এ প্রসঙ্গে। এই প্রাকবৈবাহিক চাপল্যকালে যৌন সঙ্গমের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয় কিন্তু সন্তান-জননের অধিকার স্বীকৃত হয় না কখোনো। প্রাকবৈবাহিক গর্ভসঞ্চার ইহাদের কাছে গুরুতর ঘৃণ্য অপরাধ। পলীনেশীয়ার সমাজগুলির মধ্যে, প্রাকবৈবাহিক সন্তানকে মারিয়া ফেলা হয়। মেলানেশীয়া, নিউ গিনী, আফ্রিকা, এশিয়া, সর্বত্রই সন্তানজন্ম অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়। ম্যালিনাউস্কীর মতে এই কড়াকড়ির অর্থ হইল এই যে, সমাজ স্বীকৃত বিবাহের বাইরে সন্তানজনন

অন্যায় বলিয়া ইহারা মনে করে। "The main sociological principle embodied in these rules and arrangements is that children should not be produced outside a socially approved contract of marriage." (B. Mali-II)] ইহার অর্থ খুব স্পষ্ট। সমাজতন্ত্রের দৃষ্টিতে বিচার করিলে ইহার অর্থ দাঁড়ায় যে, প্রত্যেক সন্তানের 'পিতা' থাকা চাই, যে 'পিতা সমাজে স্বীকৃত ও জ্ঞাত। ইহার মানেও এই দাঁড়ায় যে প্রত্যেক নারীর বা জননীরও চাই সমাজানুমোদিত 'স্বামী'। কাজেই শুধু মাতা ও সন্তানই যথেষ্ট নয়, পিতাও অত্যাবশ্যক। জননী ও সন্তান লইয়া যে পরিবার তাহা অসভ্যের কাছে দুর্বোধ্য এবং তাহাদের আইনের চোখেও এই পরিবার অসম্পূর্ণ। ম্যালিনাউস্কী এই সমাজতান্ত্রিক ব্যাখ্যাটীকে সরল ভাষায় সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাই তুলিয়া দিতেছি। "Thus in all human societies a father is recognised as indispensable for each child, that is, a husband for each mother. All illegitimate child —a child born out of wedlock-is an anomaly, whether it be an outcast or an unclaimed asset. A group consisting of a woman and her children is a legally incomplete unit. Marriage thus appears to be an indispensable element in the institution of the family" (B. Mali II)

অসভ্যজীবনের উচ্ছৃঙ্খলতাগুলিকে বিশ্লেষণ করিলেও একবিবাহই প্রমাণিত হয়। পরিবার চাই, বিবাহ চাই, পিতা চাই। এই দাবিই অসভ্য সমাজের সকল বিধিনিষেধের ভিত্তি। এখানে ব্রিফল্টের মতবাদেরও খণ্ডন হইল। ব্রিফল্টের মাতৃতান্ত্রিক মতবাদের মূলকথাই হইল দুইটী (ক) মাতা ও সন্তানকে লইয়াই প্রাকৃতিক পরিবার (খ) পিতা পরিবারে একেবারে অনাবশ্যক। ম্যালিনাউস্কী দেখাইয়াছেন যে মাতা-সন্তান-গঠিত যে unit বা সামাজিক একক, তাহা অসভ্যের সামাজিক আইনে অসম্পূর্ণ। অবৈধ সন্তান অসভ্য-সমাজে অনুমোদন পায় না। ব্রিফল্টের মতবাদের মর্ম হইল এই যে বিবাহের প্রয়োজন নাই, বিবাহের সহিত পরিবারের সম্পর্ক নাই। পিতামাতার সম্পর্ক শুধু অপ্রাসঙ্গিক ও সামাজিক জীবনে গুরুত্বহীন। মাতাসন্তানের সম্পর্কই সমাজ-জীবনের অদ্বিতীয় ভিত্তি। এই কৃত্রিম মতবাদ ম্যালিনাউস্কী অগণিত তথ্য, গবেষণা ও বিচার দ্বারা বৈজ্ঞানিকভাবে খণ্ডন করিয়াছেন। পিতৃত্ব যে সমাজে কতো বড় সত্য এবং আদিমতম স্তরেও যে সামাজিক ভাবে পিতৃত্ব কী দুর্নিবার্য প্রয়োজন, তাহা তিনি দেখাইয়াছেন। লাউয়ী প্রভৃতি আধুনিক পণ্ডিতেরাও এই সামাজিক পিতৃত্ব সম্বন্ধে ম্যালিনাউস্কীর সমর্থক। পিতা-মাতা-সন্তান লইয়াই যে আদিম ও স্বাভাবিক unit বা সামাজিক একক চিরকালই গঠিত হইয়াছে তাহা আজ নৃতত্ত্ব কর্তৃক স্বীকৃত।

(ক্রমশঃ)

সোনা ছাড়াও চলতে পারি
স্বাধীনতা ছাড়া চলতে নারি।

বাজেট-আলোচনাচক্র

ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যার 'জয়শ্রীতে' কেন্দ্রীয় বাজেট সম্পর্কে কয়েকটি মনোজ্ঞ আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। অধ্যাপক বীরেশ ভট্টাচার্য ফাল্গুন সংখ্যায় তাঁর "এবারকার বাজেট" প্রবন্ধে এই আলোচনার সূত্রপাত করেন। চৈত্র-সংখ্যায় এই আলোচনা-চক্রে অধ্যাপক অলক ঘোষের "১৯৬৩-৬৪-র বাজেট ও সাধারণ মানুষ" অধ্যাপক ডঃ সুব্রতেশ ঘোষের "কেন্দ্রীয় বাজেট (১৯৬৩-৬৪) প্রসঙ্গে" ও অধ্যাপক রাধাল দত্তের "এবারের বাজেটের কয়েকটি দিক" প্রবন্ধগুলি যুক্ত হয়েছে। বাজেট আলোচনায় এই বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদদের সহযোগিতা বাজেটের আকৃতি ও প্রকৃতি অনুধাবনে শুধু অর্থনীতির ছাত্রদের নয়, সাধারণ পাঠকদেরও সহায়তা করবে। এই উদ্দেশ্যেই এই আলোচনা চক্রের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আলোচনায় যোগদান করে সংশ্লিষ্ট অর্থনীতিবিদেরা "জয়শ্রীর" ধন্যবাদার্হ হয়েছেন এবং আশা করি পাঠকদেরও।

দেশের আপৎকালে সুষ্ঠু প্রতিরক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের যুগলক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য বাজেটে করবৃদ্ধির অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, এ-সম্বন্ধে দ্বিমতের কোনো অবকাশ নেই। কিন্তু কি ভাবে এই করভার বিন্যস্ত হবে, এই বিন্যাসে সামাজিক ন্যায়-বিচারের নীতি অনুসৃত হয়ে অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস পেলো না বৃদ্ধি পেলো, প্রশাসনিক কাঠামো করভার বিন্যাসের উপযোগী কিনা, প্রশাসনিক অপব্যয় রোধ করতে সরকারী দৃঢ়তার স্বাক্ষর কোথায়, ইত্যাদি নানা প্রশ্নের সমুত্তরের উপর বাজেটের প্রয়োগ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হতে বাধ্য।

যে সামাজিক ও প্রশাসনিক আবহাওয়ায় কৃচ্ছ্রসাধনের আবেদন সর্বস্তরে পরিব্যপ্ত হতে পারে, চীনা আক্রমণের মুখেও সেই আবহাওয়া সৃষ্টিতে জাতীয় নেতৃত্বের অক্ষমতা, বাজেটের করভার বহনের ক্রেশ স্বীকারে নিম্ন ও মধ্য আয়-সম্পন্নদের উন্মুখ করে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে। অধ্যাপক বীরেশ ভট্টাচার্য তাঁর প্রবন্ধে এই ব্যর্থতার ইশারামাত্র দিয়ে বলেছেন, "সাধারণত লোকের মনে এই জিজ্ঞাসা—'আমাকে কিম্বা আমার শ্রেণীভুক্ত লোকদের আঘাত না করেও কি দেশরক্ষার অর্থ সংগৃহীত হতে পারত না? জাগরূক থাকার প্রধান কারণ উচ্চবিত্তদের ব্যয়বাহুল্যের পরিচয় এবং সরকারী দপ্তর সমূহে দায়িত্বহীন ব্যয় বিস্তার। একটা যুদ্ধরত দেশের পক্ষে এই দুই ব্যাপারে যতটা সংযমের আবশ্যক আমাদের দেশে তার চিহ্ন পরিস্ফুট হয়েছে কি না তা ভাববার সময় হয়েছে।" এই প্রসঙ্গে সরকারের প্রশাসনিক নৈপুণ্য সম্বন্ধে অধ্যাপক রাধাল দত্ত তাঁর প্রবন্ধে সংশয় প্রকাশ করেছেন। বিভিন্ন লেখকের লেখায় এই সামাজিক ও প্রশাসনিক পটভূমিকার বিস্তৃততর আলোচনার অবকাশ ছিল। দেশের আপৎকালেও যেখানে বিত্তের অহমিকা, বিলাসের ব্যঞ্জনা ও ঐশ্বর্যের ঝলকানিতে সমাজ জীবন কলুষিত, যেখানে প্রশাসনিক কাঠামোর স্তরে স্তরে দুর্নীতি, অপব্যয় ও অপচয়ের স্রোত বইয়ে দিচ্ছে, সে-অবস্থায় কৃচ্ছ্রতার আবেদনে নিম্ন ও মধ্য-আয়সম্পন্নদের সাড়া মিলবে কেন? দেশরক্ষা ও উন্নয়নের বৃহৎ দায়িত্ব সম্পাদনে সর্বস্তরের মানুষের সামগ্রিক সহযোগিতার পূর্বসর্তরূপে এই পটভূমিকা-প্রস্তুতির কঠোর সত্য সরকারী মহলে কোথাও নেই। অধ্যাপক ডঃ সুব্রতেশ ঘোষ তাঁর প্রবন্ধে অপ্রয়োজনীয় ব্যয়-হ্রাস সম্পর্কে কিছুটা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

নূতন কর প্রস্তাবের ফলে কৃচ্ছ্রতার পরিমাণ করতে গিয়ে অধ্যাপক অমিয় ঘোষ তাঁর প্রবন্ধে বলেছেন "গত বার বছরে কৃচ্ছ্রসাধনের যে অভিজ্ঞতা আমরা সঞ্চয় করেছি, মাত্র একবছরের মধ্যে সমপরিমাণ কৃচ্ছ্রতা আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে। জাতীয় আয়ের সঙ্গে ট্যাক্স-মন্ত্রিত রাজস্বের অনুপাত এক বছরের মধ্যে শতকরা ৩ ভাগ বৃদ্ধি করতে আমাদের অসাধ্য-সাধন করতে হবে। কারণ অতীতে আমরা এই কাজ বার বছরে ধীরে ধীরে সম্পন্ন করেছি।" পরিকল্পনার প্রথম বার বছরে এই অনুপাত শতকরা ৬ ভাগ থেকে ৯ ভাগে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৬৩-৬৪ সালের বাজেটের করপ্রস্তাবের ফলে এই অনুপাত একবছরের মধ্যেই শতকরা ৯ থেকে ১২তে পৌছাবে। যে পরিবেশে এই অসাধ্যসাধন স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠবে, সে-পরিবেশ কোথায়? সুতরাং কৃচ্ছ্রতার ক্লেশভার সাধারণের কাছে দুঃসহ বোধ হয়ে তাদের যদি অসহযোগী করে তোলে তাতে অবাক হবার কিছু নেই। নিম্ন-আয় সম্পন্নদের উপর বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের আঘাত সম্পর্কে সকল প্রবন্ধেই আলোচনা রয়েছে। পঞ্চদশ ভারতীয় শ্রমসম্মেলনে সে-সময়কার মূল্যস্তরের ভিত্তিতে একটি উপার্জকের প্রয়োজন-ভিত্তিক ব্যয় ন্যূনতম ১২৫ টাকা ধার্য করা হয়েছিল। তারপর থেকে মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে। তা সত্ত্বেও মাসিক ১২৫ টাকা আয়ের ওপরও বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের বোঝা চাপাতে অর্থমন্ত্রী দ্বিধা করেন নাই। সুতরাং নিম্নতম প্রয়োজনকে বহুদূর পর্যন্ত নিম্নগামী করে এই পরিকল্পনার দেয় অর্থের ব্যবস্থা করতে হবে। এই খাতে ৬৫ থেকে ৭০ কোটী টাকা আদায় হবার সম্ভাবনা আছে। কেন্দ্রীয় সরকার এ-থেকে ৪০ কোটি টাকা পাবে। একটি বেসরকারী হিসাবে অবশ্য এই খাতে আয়ের পরিমাণ দেখানো হয়েছে ৯৮ কোটি টাকা (Economic Times, March 16th. 1963)। সুতরাং, বাধ্যতামূলক সঞ্চয় আদায়ের জন্য বার্ষিক আয়ের নিম্নতম সীমারেখা ১৪০০ টাকার অনেক উর্ধ্বে স্থির করা কর্তব্য।

ডঃ সুব্রতেশ ঘোষ মূল্যস্তরের উপর বাজেটের অপ্রত্যক্ষ ও প্রত্যক্ষ করের আঘাত সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে বাজেটে শতকরা ৭৩ ভাগ অপ্রত্যক্ষ ট্যাক্স ও ২৭ ভাগ প্রত্যক্ষ ট্যাক্স বসানো হয়েছে। ভোগের সুযোগ সঙ্কোচনের জন্য অপ্রত্যক্ষ করের প্রয়োগের উল্লেখ করে ডঃ ঘোষ বলেছেন'.....উন্নততর অর্থনীতিগুলির অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে অপ্রত্যক্ষ করবৃদ্ধির পক্ষে যে যুক্তিই থাকুক না—ভারতের বর্তমান মূল্যস্তর বৃদ্ধি রোধ করতে (যার ওপর স্বাভাবিকভাবেই তৃতীয় পরিকল্পনায় বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে) সরকারী তরফের অপ্রত্যক্ষ করবৃদ্ধির লোভ। কয়েকটি বিশেষ ধরণের পণ্য ছাড়া) মোটামুটিভাবে সম্বরণ করতে হবে।" বাজেট আলোচনায় এই সতর্কবাণী স্মরণ রাখা প্রয়োজন। বস্তুতপক্ষে বাজেটে করনীতির পাশাপাশি মূল্যনীতির স্থান নির্দিষ্ট হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু মূল্যনীতি সম্পর্কে অর্থমন্ত্রী নীরব।

বাজেটে ২৬৮ কোটি টাকার অতিরিক্ত কর ধার্য করা হয়েছে। অন্য আলোচনা ছেড়ে দিয়েও পাবলিক একাউন্টস কমিটির হিসাবে ১০০ কোটির প্রশাসনিক ব্যয় সঙ্কোচের অনায়াস অবকাশ রয়েছে। তাছাড়া অনাদায়ী বকেয়া আয়করের পরিমাণও কম নয়। সরকারী হিসাবে এই অর্থের পরিমাণ ২৫০ কোটি টাকা। কর ফাঁকির প্রসঙ্গ না উত্থাপন করেও এই দুইখাতেই ৩৫০ কোটি টাকার সংস্থানের সম্ভাবনা রয়েছে। বাজেট আলোচনায় সমিতির এই দিকগুলি মোটেই উপেক্ষনীয় নয়। এই অর্থ আদায়ে যে পরিমাণে সরকারী তৎপরতা সক্রিয় হবে নিম্ন ও মধ্য আয় সম্পন্নদের উপর করের বোঝা সেই পরিমাণে হ্রাস পাবে। [ডঃ সঃ]

অলক ঘোষ

১৯৬৩-৬৪ সালের বাজেট ও সাধারণ মানুষ

১৯৬৩-৬৪ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট পাবলিক ফিনান্স-এর ক্ষেত্রে একটি বলিষ্ঠ পরীক্ষা। বাজেটের পরিকল্পনা একদিকে যেমন অসাধারণ দুঃসাহসী, অপরপক্ষে তার প্রয়োগগত আঘাতও প্রচণ্ড। উন্নয়ন ও প্রতিরক্ষার দুর্বার প্রয়োজন প্রভূত করভার অনিবার্য করে তুলেছে। চীনা আক্রমণের ফলে উদ্ভূত জরুরী অবস্থায় একথা সপ্রমাণ হয়ে গেছে যে উন্নয়ন ও প্রতিরক্ষা পরস্পর অনুপূরক। এ বছরকার বাজেটও এই দৃষ্টিকোণ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। বাজেটে পরিকল্পনার জন্য ১৬৫০ কোটি টাকা ও প্রতিরক্ষার জন্য ৮৬৭ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। সুতরাং বাজেটে প্রতিরক্ষার তাগিদে উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা খর্ব্বন না করবার জাতীয় সঙ্কল্পে অর্থমন্ত্রী অটুট রয়েছেন।

প্রথমত, প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন হবে, প্রতিরক্ষা ও উন্নয়ন খাতে ১৯৬৩-৬৪ সালের বাজেট বরাদ্দের বৃদ্ধি প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট কিনা? জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ জানুয়ারীর মাঝামাঝি স্থির করেছিলেন যে ১৯৬৩-৬৪ সালের পরিকল্পনার বরাদ্দ ১৭৫০ কোটি টাকা হবে। কিন্তু বাজেটে তার চাইতে ১০০ কোটি টাকা কম বরাদ্দ করা হয়েছে। এই বরাদ্দের মধ্যে আবার ১০০ কোটি টাকার কিছু বেশী কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত ব্যয় বরাদ্দ। একথা স্মরণ রাখতে হবে উপরোক্ত পরিমাণ বরাদ্দের শতকরা ৮৪ ভাগ শিল্প, খনিজ সম্পদ, পরিবহন ও যোগাযোগ ইত্যাদি খাতে ব্যয়িত হয়ে দেশের উন্নয়ন ও প্রতিরক্ষার আয়োজন বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। সুতরাং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মোট প্রতিরক্ষা ব্যয়ের জন্য বাজেটে নির্দ্দিষ্ট ৮৬৭ কোটির অনেক বেশী অর্থ আভ্যন্তরীণ সঞ্চিতি থেকে যোগাতে হবে। প্রতিরক্ষা ব্যয় ১৯৬২-৬৩ সালের ৪৫১ কোটি টাকা থেকে ১৯৬৩-৬৪ সালে ৮৬৭ কোটির বেশী বৃদ্ধি পাবে। অর্থাৎ মাত্র এক বছরে প্রতিরক্ষা ব্যয় শতকরা প্রায় ১০০ টাকা বৃদ্ধি পাবে। ফলে প্রতিরক্ষার ব্যয় জাতীয় আয়ের শতকরা ২·৫ ভাগ থেকে দ্বিগুণেরও শতকরা পাঁচভাগে পৌঁছাবে। চীন দেশে ১৯৫০ সালে এই ব্যয়ের অনুপাত ছিল শতকরা ৬·২ ভাগ। কোরিয়া যুদ্ধের পর এই অনুপাত হ্রাস পেয়ে ১৯৫৭ সালে শতকরা ৪·৮ ভাগে দাঁড়ায়। এই অনুপাতের তাৎপর্য আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন দেখি ভারতবর্ষে পরিকল্পনার প্রথম দশকে যেখানে জাতীয় আয় শতকরা ৪০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে, সেই একসময়ে চীনের জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ২৫০ ভাগ। চীনের সংখ্যাতত্ত্বে কারচুপির সম্ভাবনা বাদ দিয়েও দেখা যায় ভারতবর্ষের চাইতে বৃহত্তর জাতীয় আয়ের একই অংশ—অর্থাৎ শতকরা ৫ ভাগ—প্রতিরক্ষার জন্য চীন ব্যয় করে থাকে। এই জাতীয় আয়ের পরিমাণও ভারতবর্ষের চাইতে দ্বিগুণ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুতরাং এই বছরকার কেন্দ্রীয় বাজেটে প্রতিরক্ষার বরাদ্দ বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিতান্তই ন্যূনতম ব্যবস্থা। অবশ্যি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাপনার বর্তমান পরিধির মধ্যে এর চাইতে বেশী প্রতিরক্ষা ব্যয় অবাস্তব হবে। সুতরাং প্রতিরক্ষার এই সীমাবদ্ধ পরিধিতে বাজেটে নির্দ্দিষ্ট বর্দ্ধিত বরাদ্দই যথেষ্ট বলে মনে হয়। আমাদের উন্নয়নমূলক ব্যয় স্বাভাবিক অবস্থায় আরও

বৃদ্ধি করা যেতো। কিন্তু উন্নয়ন ও প্রতিরক্ষার সামগ্রিক প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে বাজেটের ঘাটতি বরাবর বর্তমান অবস্থায় উর্দ্ধসীমায় পৌঁছেছে।

বাজেটের কর-প্রস্তাবের প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় তহবিলে প্রায় ২৬১ কোটি টাকা আদায় হবে এবং এছাড়া "একসাইজ" শুল্কের অংশ বাবদ রাজ্যগুলির পাওনা হবে ১০ কোটি টাকা। পরিকল্পনার প্রথম বার বছরে ট্যাক্স থেকে রাজস্বের আদায়ের পরিমাণ জাতীয় আয়ের শতকরা ৬ ভাগ থেকে ৯ ভাগে বৃদ্ধি পেয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে এই অনুপাত শতকরা ১১·৪ ভাগে পৌঁছাবে এই অনুমান করা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৬৩-৬৪ সালের বাজেটে নূতন কর প্রস্তাবের ফলে এই অনুপাত শতকরা ১২-তে বৃদ্ধি পাবে। অর্থাৎ গত বার বছরে কৃচ্ছ্রসাধনের যে অভিজ্ঞতা আমরা সঞ্চয় করেছি, মাত্র এই বছরের মধ্যে সমপরিমাণ কৃচ্ছ্রতা আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে। জাতীয় আয়ের সহিত ট্যাক্স-অর্জিত রাজস্বের অনুপাত এক বছরের মধ্যে শতকরা ৩ ভাগ বৃদ্ধি করতে হবে, মনে রাখতে হবে যে অতীতে আমরা এই কাজ বার বছর ধরে ধীরে ধীরে সম্পন্ন করেছি। কঠিন হলেও জাতির সঙ্কটকালে অনমনীয় দৃঢ়তা নিয়ে আমাদের এই কর্তব্য সাধনে অগ্রসর হতে হবে। অতিরিক্ত করভারের একটি বড় অংশ আমদানী রপ্তানীর বাণিজ্যিক শুল্ক থেকে আদায় হবে। অনেকগুলি দ্রব্যের উপর যেমন আমদানী শুল্ক বৃদ্ধি পাবে, তেমনি সকল প্রকার আমদানী শুল্কের উপরে চালাও অতিরিক্ত শতকরা কতভাগ সারচার্জ বসানো হবে। চায়ের উপর রপ্তানি শুল্ক রদ করা হবে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে একসাইজ শুল্ক ফেরৎ দেবার ব্যবস্থাও রদ করা হবে। একসাইজ শুল্কের পরিবর্তন দু'ভাগে করা হবে। প্রথমতঃ ভোগ হ্রাসের জন্য বাছাই করা দ্রব্যের উপর শুল্ক বৃদ্ধি, বিশেষ করে যে সব ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক ঘাটতি বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা রয়েছে। পেট্রোল, পরিশ্রুত ডিজেল তেল, উনুই কেরোসিন এই জাতীয় দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন দ্রব্যের নির্ধারিত একসাইজ শুল্কের উপর প্রতিরক্ষার দরুণ সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন হারে সারচার্জ বসিয়ে কৌশ্রয় রাজস্ব সংগ্রহ করা হবে। খুবই দুঃখের কথা প্রতিরক্ষার জন্য অতিরিক্ত রাজস্ব সংগ্রহের অজুহাতে অর্থমন্ত্রী কাপড়, চীনামাটি, চা, কফি প্রভৃতি সাধারণ মানুষের নিত্য ব্যবহার্য বহুবিধ দ্রব্যের উপর বিভিন্ন হারের সারচার্জ ধার্য করেছেন। এতে সাধারণ মানুষের কষ্টের শেষ থাকবে না।

১৯৬৩-৬৪ সালের বাজেটে প্রত্যক্ষ করের পরিধিও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাবে। প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে দুইটি মূল প্রস্তাব রাখা হয়েছে। প্রথমতঃ ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে, হিন্দুপরিবার ও অ-রেজিষ্ট্রীকৃত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কিম্বা সমিতির ক্ষেত্রেও আয়কর বাদ দেবার পর অবশিষ্ট আয়ের উপর শতকরা ৪ থেকে ১০ ভাগ অতিরিক্ত সারচার্জ ধার্য করা হয়েছে। এই অতিরিক্ত দায়ের একাংশ বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের খাত দিয়ে পূরণ করা যেতে পারে। দ্বিতীয়তঃ কোম্পানীগুলির উপর অতিরিক্ত মুনাফা কর ধার্য্য করা হয়েছে। যে সকল ক্ষেত্রে ট্যাক্স দেবার পর কোম্পানীর আয় মোট সম্পদের শতকরা ৬ ভাগের বেশী অবশিষ্ট থাকবে, সেখানে শতকরা ৬ ভাগ থেকে ১০ ভাগের ক্ষেত্রে কোম্পানীর মোট আয়ের শতকরা ৫০ ভাগ এবং শতকরা ১০ ভাগের উর্ধে মোট আয়ের শতকরা ৬০ ভাগ অতিরিক্ত মুনাফা কর আদায় করা হবে।

সাধারণ মানুষের ওপর এই করভারের এবং বাধ্যতামূলক সঞ্চয় পরিকল্পনার প্রতিক্রিয়া কি হবে? সাধারণ মানুষ দুইটি বোঝার মাঝখানে পিষ্ট হবে। একদিকে, তাকে বর্ধিত প্রত্যক্ষ করের বোঝা বহন করতে হবে, বাধ্যতামূলক সঞ্চয় পরিকল্পনার আওতায় ক্ষমতার অতিরিক্ত সঞ্চয় করতে বাধ্য হবে অপর দিকে তার পরিবহনের ব্যয় বৃদ্ধি এবং নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের উপর অপ্রত্যক্ষ করের বোঝা বৃদ্ধির জন্য তার পারিবারিক ব্যয় শতকরা ২৫ থেকে ৩০ ভাগ বৃদ্ধি

পাবে। ১৯৬৩-৬৪ সালের বর্ধিত আয়করের হার মধ্য আয় সম্পন্নদের উপর অতিরিক্ত চাপ দেবে। যে মধ্য-আয়-সম্পন্ন পরিবারের দেয় আয়করের পরিমাণ ছিল বাৎসরিক ৪০ টাকা, বর্ধিত হারে তাদের দেয় করের পরিমাণ হবে বাৎসরিক ২৪০ টাকা অর্থাৎ এই দেয় আয়করের পরিমাণ শতকরা ৬০০ ভাগ বৃদ্ধি পাবে। অপরপক্ষে, যে উচ্চ আয় সম্পন্ন পরিবারের দেয় বাৎসরিক আয়কর ছিল ১২০০ টাকা নূতন হারে তার দেয় হবে বাৎসরিক ১৮০০ টাকা। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে শতকরা ১৫০ টাকা আয়কর বৃদ্ধি হবে। এই অসম বৃদ্ধি কি সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের ইঙ্গিত বহন করছে? আয়ের উপর অতিরিক্ত সারচার্জ ধার্য করার পূর্বে পাবলিক রিনাল্ডের সমতানীতির প্রতি লক্ষ্য রেখে, সেই ভিত্তিতে বিভিন্ন আয়-সম্পন্ন গোষ্ঠিদের কৃচ্ছ্রতার পরিমাণ নির্ধারণ করা কি উচিত ছিল না?

আপৎকালীন অবস্থার মধ্যে বাধ্যতামূলক সঞ্চয় পরিকল্পনা খুবই প্রশংসনীয়। আমাদের সঞ্চয় ও আয়ের অনুপাত বর্তমানে খুবই সামান্য—মাত্র শতকরা ৮·৬ ভাগ। সুতরাং স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সঞ্চয় ছাড়াও বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। কর থেকে অর্জিত রাজস্বের সঙ্গে জাতীয় আয়ের অনুপাত শতকরা ৯ থেকে ১২তে বৃদ্ধির প্রচেষ্টার ফলে বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা আরও অনিবার্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই পরিকল্পনা থেকে রেহাই-এর জন্যে ধার্য আয়ের সীমা বাৎসরিক ১৫০০ টাকা অত্যন্ত অবাস্তব। ১৫০০ টাকা থেকে ২০০০ টাকা বাৎসরিক আয় সম্পন্ন পরিবারের পক্ষে বাধ্যতামূলক সঞ্চয় নিতান্তই দুঃসাধ্য। এই দায় মেটাবার জন্য এই ধরণের পরিবারকে ঋণগ্রস্ত হতে হবে। শুধু তাই নয়। নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের জন্য নিয়তম ব্যয়ও তাকে আরও কমাতে হবে। ফলে উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা এবং কম পুষ্টি তার কর্মক্ষমতা ও দক্ষতা হ্রাস করে দেবে। যদি আমাদের যুব শক্তি এইভাবে অপচিত হয় সমগ্রজাতির সামরিক নৈপুণ্যও গুরুতরভাবে ক্ষুণ্ন হবে। উপরন্তু অধিকাংশ মধ্য-আয়সম্পন্ন উপার্জনক্ষম জীবন-বীমার পলিসি বন্ধ করে কিম্বা প্রভিডেন্ট ফাণ্ড থেকে ঋণ নিয়ে দেয় বাধ্যতামূলক সঞ্চয় পরিশোধ করবে। অর্থাৎ, সরকারী তহবিলে যে অর্থ জীবনবীমা ও প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের মাধ্যমে পৌঁছুতে পারতো সেই অর্থই বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের মাধ্যমে সরকারের হাতে পৌঁছাবে। ফলে নিম্ন ও মধ্য আয় সম্পন্নদের সঞ্চয়ের মোট পরিমাণ স্বল্পবিস্তরও বৃদ্ধি পাবে না। অথচ এই নূতন ব্যবস্থায় প্রশাসনিক ব্যয় অকারণ বৃদ্ধি পাবে।

লর্ড কীনস্ তাঁর প্রসিদ্ধ পুস্তকে "How to pay for the war"—যুদ্ধকালীন আর্থিক পরিস্থিতিতে বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। কীনস্ তাঁর বাধ্যতামূলক সঞ্চয় পরিকল্পনায় একটি "জরুরী সর্ত" যোগ করে দিয়েছিলেন। এই সর্তানুযায়ী নিম্ন ও মধ্য আয়সম্পন্ন পরিবারে দুর্ঘটনা, মৃত্যু প্রভৃতি ঘটলে তাঁদের উপরোক্ত তহবিল থেকে অর্থ-সাহায্যের ব্যবস্থা ছিল। আমাদের সরকার এরকম একটি জরুরী বিষয়ে একেবারেই নীরব। অথচ এই সর্ত ব্যতিরিক্তে নিম্ন ও মধ্য আয়সম্পন্নদের ধ্বংস অনিবার্য। টাকার ক্রয় ক্ষমতা ক্রমাগত হ্রাস পাওয়ার দরুণ সঞ্চিতকারীরা জানে যে ঐ সঞ্চিত অর্থ ফিরে পাবার সময় তার মূল্যমান অনেক হ্রাস পাবে। বিপদের সময় নিজেদের সঞ্চিত অর্থের সাহায্য না পেলে সামাজিক ন্যায় বিচার থেকে তারা বঞ্চিত হবে। সরকারের মনে রাখতে হবে, জনসাধারণ ও সরকারের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থির হয়ে গেছে। যদি আপৎকালীন অবস্থায় জনসাধারণ সর্বশক্তি দিয়ে সরকারকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসে, সরকারেরও সাধারণ মানুষকে তার পারিবারিক দুর্দিনে সহায়তার জন্য এগিয়ে আসা কর্তব্য। সুতরাং দেখা যাচ্ছে বাজেটের বোঝা জনসাধারণের ওপর অত্যধিক গুরুভার হয়ে পড়বে এবং বলিষ্ঠ পদক্ষেপের দ্বারা সেই বোঝা ঠেলে অগ্রসর হতে হবে।

আমাদের মনে হয় বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের পরিবর্তে স্বাভাবিক পরিবারের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক জীবন বীমার ব্যবস্থা করলে অনেক ভালো হতো।

ব্যবসায়ী ও শিল্পোদ্যোগীদের বাজেট সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া কি? অতিরিক্ত মুনাফা কর আরোপিত হবার ফলে Stock Exchangeএ ও যথেষ্ট হ্রাস দেখা যায়। বর্তমানে মূলধন সংগ্রহের জন্য শতকরা ৬ টাকার অনেক বেশী সুদে অর্থ সংগ্রহ করতে হয়। ইনভাষ্ট্রীয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন শতকরা ৭½ টাকা আদায় করে। সুতরাং বিনিয়োগী মূলধনের আদায় যদি শতকরা ৬ ভাগে সীমিত করলে বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে মূলধনের উৎপাদন বিঘ্নিত হবে। অতিরিক্ত মুনাফা-কর আরোপিত হলে ডিভিডেন্ট শুরুতরভাবে অ-সঙ্কুচিত হবে এবং নূতন শিল্পবাণিজ্যের পক্ষে উপযুক্ত মজুত তহবিল গড়েতোলা সম্ভব হবে না। অতিরিক্ত মুনাফার ওপর অস্বাভাবিক হারে ট্যাক্স ধার্য্য করলে যে সব নূতন কোম্পানীর মুনাফার হার নিম্নমানের তাদের নানা প্রকার সুযোগ সুবিধা দিতে হবে। এই নূতন ট্যাক্স প্রয়োগের ফলে বেসরকারী উদ্যোগের নূতন বিস্তৃতির পথে সরীসৃপ ঝুঁকি নেবার জন্য উপযুক্ত মূলধনের অভাব সবচেয়ে বড় অন্তরায় দাঁড়াবে। সকল রকম ব্যবসাই এই ট্যাক্সের চাপে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। বিদেশী মূলধন দ্বারা পরিচালিত কিংবা বিদেশী মূলধনের সহযোগে পরিচালিত ব্যবসাক্ষেত্রেও কোন ব্যতিক্রম হবে না। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই মজুত তহবিল সম্পন্ন পুরানো এবং বৃহৎ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলির তুলনায় অপেক্ষাকৃত নতুন কোম্পানিগুলি বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অর্থাৎ এই করের ফলে মুষ্টিমেয় কয়েকটি বৃহৎ কোম্পানির হাতে অধিকতর সম্পদ ও আয় কেন্দ্রীভূত হবে। সাধারণ মানুষের পক্ষে নতুন করে কম মূলধনের ব্যবসা বাণিজ্য করা অসম্ভব হয়ে উঠবে।

আসলে বাজেটে রাজস্ব আদায়ের অঙ্কের অনুমান যোগফলে অনেক কম করে ধরা হয়েছে। ২৬৬ কোটি টাকা রাজস্বের অনুমিত আদায়ের হিসাব কেন্দ্রের মোট আয়ের পূর্ণ-পরিমাপ নয়। প্রথমতঃ রেলে মালের ভাড়া বৃদ্ধির ফলে যে ১১ কোটি টাকা আয় হবে তা এই হিসাবে ধরা হয় নি। দ্বিতীয়তঃ ডাকমাশুলের পরিবর্তনের ফলে যে ৪ কোটি টাকা বেশী আয় হবে তাও এই হিসাবে ধরা হয়নি। তৃতীয়তঃ "যুদ্ধের ঝুঁকি"-বীমা থেকে আদায়ের ৩৩ কোটি টাকাও—যা ফেরৎ দিতে হবে না—এই হিসাবে ধরা হয় নি। বাজেটে মূলধনী খাতে এই অঙ্ক ধরা হলেও আসলে এটা রাজস্ব খাতের আদায়। ২৬৬ কোটি টাকার সঙ্গে উপরোক্ত অঙ্কগুলি যোগ দিলে অনুমিত রাজস্বের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩২৩ কোটি টাকা। এর ওপর বাধ্যতামূলক সঞ্চয় তহবিলের ৪০ কোটি টাকা যোগ দিলে মোট রাজস্বের পরিমাণ দাঁড়াবে ৩৬৩ কোটি টাকা। অর্থাৎ রাজস্ব আয় হিসাবে বাজেটে যা দেখানো হয়েছে কেন্দ্রের আয় তার চাইতে প্রায় ১০০ কোটি টাকা বেশী হবে।

উপরন্তু, ১৯৬৩-৬৪ সালে ঘাটাই মুদ্রার (deficit financing) পরিমাণ ১৪০ কোটি টাকার নিম্নসীমানায় ধরা হয়েছে। যদিও ১৯৬২-৬৩ ঘাটাই মুদ্রার (deficit financing) পরিমাণ ২৪০ কোটিতে দাঁড়িয়েছিল। সুতরাং সতর্কতার সঙ্গে প্রয়োগ করলে আরও ১০০ কোটি টাকার ঘাটাই মুদ্রা (deficit financing) ১৯৬৩-৬৪ সালে চালু করা যেতে পারে। অনুন্নত দেশে সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার হয় না এবং মুদ্রাস্ফীতির পরিস্থিতিতে স্বভাবতই বেশী ঘাটাই মুদ্রা (deficit financing) চালু করা যায়। এই পরিস্থিতিতে এ ধরণের প্রস্তাবের প্রচুর উপযোগিতা রয়েছে। তাছাড়া বাধ্যতামূলক সঞ্চয় অপ্রয়োজনীয় ভোগ বর্জনের সহায়ক; সেই জন্য হয়তো ঘাটাইজনিত মূল্য বৃদ্ধি রোধ করা যাবে।

মোটকথা, আপৎকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিরক্ষা ও উন্নয়ন খাতে যথেষ্ট বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে। নতুন

গুরুত্বপূর্ণ ট্যাক্স প্রস্তাবগুলি রাজস্বের পরিধির বৃদ্ধি সাধন করেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জন-সাধারণের ওপর অতিরিক্ত বোঝাও চাপান হয়েছে। রাজস্বের অনুমিত আয়ের সঠিক হিসাব করে এবং কাঁপাই মুদ্রার (deficit financing) পরিমাণ কিছু বৃদ্ধি করে নিম্ন ও মধ্য আয়-সম্পন্নদের ভার লাঘব করা হয়তো সম্ভব। দেশের আপৎকালে ত্যাগ ও দুঃখবরণের জন্য সকলকেই প্রস্তুত থাকতে হবে একথা সত্য কিন্তু কে কতটা ত্যাগ ও দুঃখবরণ করবে তা নির্ভর করবে অতীতে কে কত বেশী সুবিধা ভোগ করেছে তার ওপর। সরকারী আয়-ব্যয়ের ন্যায় নীতি ও সামাজিক ন্যায় বিচারের নিরিখে এই মূল্যায়ন প্রয়োজন। বাজেটের বলিষ্ঠতা প্রশংসনীয় হলেও সামাজিক ন্যায় বিচারের মাপকাঠি প্রয়োগে বাজেট দ্বিধাগ্রস্ত। এটা খুবই দুঃখের বিষয়। সম্ভবতঃ আপৎকালীন অবস্থার উদ্বেগ ও আশংকা বাজেটের দৃষ্টিকোণ আচ্ছন্ন করে রেখেছিল সেই জন্যে সামাজিক ন্যায় বিচারের কথা ঠিকমত ভাবা হয়নি। তাই এই বাজেটের ফলে দরিদ্র মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের কষ্টের সীমা থাকবেনা। সাধারণ মানুষকে অসাধারণ কষ্টসহিষ্ণু হয়ে উঠতে হবে। এই অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সহজ সাধ্য নয়।

আপনার ত্যাগ
জাতির সমৃদ্ধির জন্যই।

ডঃ সুব্রতেশ ঘোষ

কেন্দ্রীয় বাজেট (১৯৬৩-৬৪) প্রসঙ্গে

প্রতি বছরেই বাজেট পেশ হয়, কিন্তু এবারের বাজেট সারা দেশে যেমন আলোড়ন এনেছে তা' প্রতি বছর ঘটে না। এর কারণ প্রথমতঃ বাজেটের আকৃতি। ১৮৪১'৬৩ কোটি টাকার অনুমিত আয় এবং ১৮৪২'৪০ কোটি টাকার অনুমিত ব্যয় বরাদ্দ দুই-ই বিপুলায়তন। কিন্তু শুধু আয়তন-ই এ বছরের বাজেটের একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। বাজেটের জন্য আয় সংস্থান করতে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী যেমন বড় রকমে জাল ছড়িয়েছেন এবং দুই কাংলা থেকে চুনোপুঁটি পর্যন্ত সকলের দিকেই দৃষ্ট দৃষ্টিপাত করেছেন তা' সচরাচর ঘটে না। চীনা আক্রমণের পর প্রথম বাজেটে এবং তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অর্থসংস্থানের জন্য কিছু বাড়তি করভারের জন্য দেশবাসী প্রস্তুত ছিল—কিন্তু কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী তাঁদের প্রত্যাশাকে ছাড়িয়ে গেছেন। এছাড়া বাধ্যতামূলক সঞ্চয় পরিকল্পনাও তার নতুনত্বের জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর ঘাটতি পূরণের চেষ্টা ও পরিকল্পনা এবং দেশরক্ষার ব্যয় মেটাবার জন্য করজাত অর্থের সংস্থান বৃদ্ধির প্রয়াস যে সমর্থনযোগ্য এসম্বন্ধে বিশেষজ্ঞরা প্রশ্ন তুলবেন না। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে এবং উঠবে প্রধানতঃ তার অর্থ-সংগ্রহের পদ্ধতি নিয়ে। আলোচ্য বাজেটে অপ্রত্যক্ষ করের ওপর ঝোঁক বিশেষ উল্লেখ্য। কেরোসিন, পেট্রোলিয়াম, যন্ত্রপাতি, ইস্পাত সামগ্রী, কাঁচা তুলা, রাবার, রং, ইলেকট্রিক পণ্য, কাঁচা তামাক, সিগারেট, সিনেমার টিকিট ইত্যাদি নানা রকম পণ্যের উপর সারচার্জ বসেছে যা করের হার বেড়েছে। সবশ্রেণীর আমদানী শুল্কের ওপর শতকরা

১০ হারে সারচার্জ বসান হয়েছে। এছাড়া পোষ্টকার্ড, পোষ্টাল রেজিষ্ট্রেশন ফি, প্যাকেটের ভাড়া, পোষ্টাল এ্যাকনলেজমেণ্ট ফি, অন্তর্দেশীয় টেলিগ্রাম ও ট্রাঙ্ক টেলিফোনের মাশুল ইত্যাদি হরেক রকম ডাক বিভাগীয় ব্যবস্থার জন্যও জনসাধারণের বোঝা বাড়াবার ব্যবস্থা হয়েছে। প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য কোম্পানী আয়ের উপর সুপার-প্রফিট ট্যাক্স। কোম্পানীর দেয় কর আদায়ের পরেও কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আয় যদি তার মূলধন ও নযুত তহবিলের (reserves) শতকরা ৬ ভাগের বেশী হয় তবে ৬% থেকে ১০% পর্য্যন্ত কোম্পানী আয়ের শতকরা ৫০ ভাগ এবং ১০% এর ওপরে শতকরা ৬০ ভাগ সুপার-প্রফিট ট্যাক্স হিসেবে আদায় করা হবে। এছাড়া ব্যক্তিবিশেষ ও যৌথ পরিবারের দেয় আয়করের ওপর প্রগতিশীল হারে ৪% থেকে ১০% পর্য্যন্ত সারচার্জ আদায়ের ব্যবস্থা হয়েছে। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের দেয় আয়করের ওপরেও সারচার্জ আদায় করা হবে শতকরা ২০% হিসেবে।

ওপরের আলোচনা থেকে ১৯৬৯-৭০ সালের বাজেটের ব্যাপকতা সম্বন্ধে কিছু ধারণা করা চলে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই যে বাজেটের কাঠামোগত বৈশিষ্ট্যগুলি সবই বাঞ্ছনীয় কিনা? এপ্রসঙ্গে স্বভাবতঃই অনেকে অপ্রত্যক্ষ করগুলির ওপর ঝোঁক দিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারেন। হিসেব করে দেখা গেছে যে নতুন কর বৃদ্ধির ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের যে ২৬৬ কোটি টাকা রাজস্ব বৃদ্ধি অনুমিত হচ্ছে (কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তৃক সংগৃহীতব্য করগুলির মধ্যে রাজ্য সরকারগুলিকে দেয় প্রায় ৯ কোটি টাকা বাদে), তার মধ্যে শতকরা প্রায় ৭৩ ভাগ আয়বৃদ্ধি ঘটবে অপ্রত্যক্ষ কর বাবদে আর প্রত্যক্ষ করের বাবদে বাড়বে মাত্র শতকরা ২৭ ভাগ।

সাধারণভাবে অর্থনীতির সূত্র অনুযায়ী অস্থিতিস্থাপক চাহিদাযুক্ত পণ্যগুলি বাদে মোটামুটি স্থিতিস্থাপকতাযুক্ত পণ্যের ক্ষেত্রে অপ্রত্যক্ষ করবৃদ্ধি পণ্যমূল্য বাড়ায় না। এছাড়া মুদ্রাস্ফীতির সময়ে বিশেষ করে উন্নত দেশগুলিতে অপ্রত্যক্ষ করবৃদ্ধি প্রধানতঃ নিম্ন আয়স্তরের জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাসের এবং মুদ্রাস্ফীতি জনিত ব্যবধান কমিয়ে আনবার পদ্ধতি হিসেবে সমর্থন করা হয়। কিন্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং অনুন্নত অর্থনীতির বিশেষ সমস্যাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে ভারতবর্ষে অপ্রত্যক্ষ করবৃদ্ধির এ যুক্তিগুলি টেঁকসই হবে না।

ভারতের শৈল্পিক কাঠামো খুব বেশী পরিমাণে বহু ক্ষেত্রেই একচেটিয়া কারবার ও অলিগোপলিষ্টিক প্রবণতাযুক্ত। তা' ছাড়া উন্নয়নজনিত মুদ্রাস্ফীতি ও সাধারণভাবে প্রয়োজনীয় পণ্য ঘাটতির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের বেশীর ভাগ পণ্যের ক্ষেত্রেই বাজার বিশেষভাবে বিক্রেতাদের বাজার। ক্রেতারা এই পরিপ্রেক্ষিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসহায়। এই অসহায়তার সুযোগে এবং বহু পণ্যের ক্ষেত্রেই একচেটিয়া কারবার অথবা মূল্য-নেতৃত্ব শ্রেণীর অলিগোপলিষ্টিক কাঠামোর ফলে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে দাম বাড়িয়ে দেওয়া হয়। আমাদের দেশে প্রতি বছর-ই বাজেট প্রস্তাব ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে করবৃদ্ধির প্রস্তাবের আওতায় আসা পণ্যের এবং সেসব পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির অজুহাতে অন্যান্য জিনিষের দাম বেড়ে যাওয়া স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকারের নির্দ্দেশ বা শাসনযন্ত্রের ব্যবস্থা এ আঘাত থেকে ক্রেতাদের রক্ষা করতে পারছে না—এ বাস্তব সত্য সরকারী মহল ও অর্থনীতিবিদ সবারই মেনে নেওয়া উচিত। সুতরাং উন্নততর অর্থনীতিগুলির অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে অপ্রত্যক্ষ করবৃদ্ধির পক্ষে যে যুক্তি-ই থাকুক না—ভারতের বর্ত্তমান মূল্যস্তর বৃদ্ধি রোধ করতে (যার ওপর ন্যায়সঙ্গত ভাবেই তৃতীয় পরিকল্পনায় বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।) সরকারী উদ্যমের অপ্রত্যক্ষ করবৃদ্ধির লোভ (কয়েকটি বিশেষ ধরণের পণ্য বাদে) মোটামুটি ভাবে সম্বরণ করতে হবে। এই সাধারণ যুক্তি ছাড়াও মনে রাখা দরকার এ বছরে যে সব পণ্যের ওপর অপ্রত্যক্ষ করের

হার বা সারচার্জ বেড়েছে, সেগুলির ফলে মূল্যস্তর বৃদ্ধির প্রবণতা স্বাভাবিক।

ভারতবর্ষের গ্রামাঞ্চলে এবং সহরে দরিদ্রশ্রেণীর মধ্যে বিজলীবাতির অভাবে কেরোসিন-ই আলোর উৎস। একে তাই অত্যাবশ্যক পণ্য হিসেবে ধরা চলে। এর ওপর কর বৃদ্ধি তাই দরিদ্রের বোঝা বাড়াবে এবং এই মূল্য বৃদ্ধির আত্ম-রক্ষামূলক প্রভাবে (defensive reaction) যদি গ্রামাঞ্চলের কুটির-শিল্পজাত পণ্য ও কৃষিদ্রব্যের দাম বাড়ে তবে আশ্চর্য্যের কিছু নেই। ডিজেল ও পেট্রোলিয়ামের ওপর কর বৃদ্ধি মাল-পরিবহন এবং যাত্রীপরিবহনের ওপর খরচ বৃদ্ধির বোঝা চাপাবে। ফলে এই দু'শিল্পে বিক্রেতা-বাজারের পরিপ্রেক্ষিতে ভাড়াবৃদ্ধি অনিবার্য। যাত্রীপরিবহনের ভাড়াবৃদ্ধি নিম্নবিত্তের বোঝা স্বরূপ। আর মাল-পরিবহনের ভাড়াবৃদ্ধির অজুহাতে সর্বস্তরের পণ্যমূল্য বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী (ইতিমধ্যেই ডাল ইত্যাদি কোন কোন ক্ষেত্রে বেড়েছে)।

এছাড়া আরও কতগুলি পণ্যের ওপর কর বৃদ্ধি বা সারচার্জের প্রস্তাব হয়েছে, যার ফলে প্রায় সবর শিল্পেরই উৎপাদন ব্যয় বাড়বে। এর ফলে cost-push inflation এর প্রবণতা যদি আরও বাড়ে তবে আশ্চর্য্যের কিছু নেই। লৌহ ও ইস্পাত সামগ্রী, সিমেন্ট নানারকম বিদ্যুৎ চালিত উৎপাদন-যন্ত্র এই শ্রেণীতে পড়ছে।

ওপরে উল্লিখিত পণ্যগুলির ওপরে করবৃদ্ধি বা সারচার্জ বসান অবাঞ্ছনীয় হলেও ১৯৬৩-৬৪ সালের দেশাই বাজেটে কয়েকটি অপ্রত্যক্ষ করপ্রস্তাবকে বাঞ্ছনীয় বলে অভিহিত করা যায়। প্রসাধন সামগ্রী, সিগার ও সিগারেট, সিল্ক বস্ত্র, রেফ্রিজারেটর, এয়ারকণ্ডিশনার ইত্যাদির ওপর অপ্রত্যক্ষ কর বাড়লে সাধারণ মূল্যস্তর বৃদ্ধির বিশেষ সম্ভাবনা নেই। এছাড়া প্রধানতঃ উচ্চকোটির আরামদায়ক বা বিলাস-সামগ্রী হিসেবে অনুন্নত দেশে এগুলির ব্যবহারের ওপর বাড়তি কর বসান সমীচীন।

প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে আয় করের ওপর সারচার্জ ও সুপার প্রফিট ট্যাক্স সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দেশরক্ষায় বর্দ্ধিত ব্যয়সংকোচের অন্যতম পদ্ধতি হিসেবে আয়করের ওপর সারচার্জ অবাঞ্ছনীয় না হলেও, একই সঙ্গে বাধ্যতামূলক সঞ্চয় ও সারচার্জযুক্ত আয়করের ফলে নীচের দিকের কতগুলি আয়গোষ্টির দেয় কর যেভাবে বেড়েছে, তা মূল্যবৃদ্ধির বাজারে অনেকের পক্ষেই পীড়াদায়ক। উদাহরণ স্বরূপ বছরে ৫০০০ টাকা আয় বিশিষ্ট একাধিক সন্তানের পিতা, কোন কোন বিবাহিত ভদ্রলোকের দেয় কর বার্ষিক ৪২ টাকা থেকে ২৪০ টাকায় দাঁড়াবে (পাঁচ বছর পরে পরিশোধযোগ্য বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের ১৪৯ টাকা সমেত)। মুদ্রাস্ফীতির বাজারে মধ্যবিত্তের দুর্দশার কথা স্মরণ করে সারচার্জের ন্যূনতম সীমা ২০০০০ টাকা বার্ষিক আয়ে ধরাই সম্ভবতঃ বাঞ্ছনীয় হত।

সুপার প্রফিট ট্যাক্সের মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও অনেকেই অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে একমত হবেন—শিল্পপতিদের অতি-মুনাফা সংযত করা ও জাতীয় সমস্যায় তাদেরও যথাযোগ্য আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু সেই উদ্দেশ্যে যে ভাবে এই কর বসান হয়েছে তা সমালোচনার বিষয়। প্রস্তাবিত করে মূলধন ও রিজার্ভের শতকরা ৯ ভাগ থেকে ১০ ভাগের বেশী কোম্পানী আয়ের ওপর শতকরা ৪০% হারে ও শতকরা ১০ ভাগের ওপর ৬০% হারে কর বসান হবে। আশা করা যায় যে রিজার্ভকে কর প্রস্তাবের আওতায় আনার ফলে দেশের মূলধন সঞ্চয় ব্যাহত হবে। অর্থ সংগ্রহের দিক দিয়ে এই প্রস্তাবের চেয়ে কোম্পানীর দেয় আয়করের হার শতকরা ৫%এর মত বাড়ালে প্রায় একই ফল পাওয়া যেত বলে অনেকে মনে করেন।

অর্থমন্ত্রী দেশাই আয়বৃদ্ধি সম্বন্ধে যতটা সচেতন, অপ্রয়োজনীয় ব্যয় হ্রাস সম্বন্ধে ততটা উৎসাহ দেখাতে পারলে, অকরুণ অবস্থার আমলে দেশবাসীর ধন্যবাদার্হ হতেন। কিন্তু

দুর্ভাগ্যক্রমে দৌরী সেনের ঢাকা ব্যাঙ্কে সে ধারিহবোধের পরিচয় আমরা পাইনি। আলোচ্য বাজেটে লক্ষ্যভাবেই রেভিনিউ খাতে দেশ রক্ষার ব্যয়-বরাদ্দ পূর্ব বছরের প্রকৃত ব্যয় ৪৫২ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০৭ কোটি টাকায় তোলা হয়েছে। কিন্তু এই সঙ্গে সমাজসেবা ও উন্নয়নমূলক খাতে বরাদ্দ না কমিয়েও সাধারণ শাসন খাতে ব্যয় সংকোচের চেষ্টা প্রশংসনীয় হত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সাধারণ শাসনখাতে ব্যয়বরাদ্দ ১৯৬২-৬৩ সালের তুলনায় ১২ কোটি টাকা বেড়ে ১৯৬৩-৬৪ সালে ৮৮ কোটি টাকা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে ১৯৫১-৫২ সালে এই খাতে ব্যয় বরাদ্দ ছিল ২৪ কোটি টাকা। সাধারণ শাসন খাতে ব্যয়ের মধ্যেও আবার বৈদেশিক দপ্তরের ব্যয়বৃদ্ধি সবচেয়ে দৃষ্টিকটু। ১৯৬৩-৬৪ সালের বাজেটে চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য খাতে ব্যয়বরাদ্দ যেখানে মাত্র ১২কোটি টাকা ও শিক্ষাখাতে ৩০ কোটি টাকা, সেখানে বিদেশী দপ্তরের শ্বেতহস্তীর পেছনে বরাদ্দ পূর্বের বছরের ১৩ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৫ কোটি টাকা করা হয়েছে। বৈদেশিক দপ্তরের কর্মদক্ষতার নমুনা তো আমাদের নিত্যই দেখতে হচ্ছে —এর ওপরে এই অপচয়ের স্রোত বৃদ্ধি বিশেষ করে জাতীয় মনোবল বৃদ্ধি ও করদাতাদের বঞ্চিত বোকা বহনে যে খুব সাহায্য করে না এ তথ্য আমাদের মন্ত্রী মণ্ডলীর জানা উচিত ছিল।

চিন্তা, কথা ও কাজ
ভারত সেবায় আজ।

রাখাল দত্ত

এবারের বাজেটের কয়েকটি দিক

১৯৬৩-৬৪ সালের প্রস্তাবিত বাজেট যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে এবং তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। কেন্দ্রীয় বাজেটের আকার প্রতি বছরই বেড়ে যাচ্ছে। ১৯৫৭-৫৮ সালে মোট আয়ের পরিমাণ ছিল ৭২৭ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা, এবছরের প্রস্তাবে তা দাঁড়িয়েছে ১৮৫১ কোটি ৬৩ লক্ষ। নিছক আয়ের ছাড়াও এবারের বাজেটের কতকগুলো বিশেষত্ব বর্তমান ; যেমন একটি বাধ্যতামূলক সঞ্চয় ব্যবস্থা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মুনাফার উপর বিশেষ কর, বিভিন্ন ধরণের পরোক্ষ করের হার বৃদ্ধি। এ গুলির প্রত্যেকটির আলোচনা এখানে সম্ভব নয় বলে বর্তমান প্রবন্ধে এবারের বাজেটের দু'একটি দিক তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে।

প্রচুর অর্থের প্রয়োজন কেন সে কথা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই। বহুদিন ধরে প্রতিরক্ষা ব্যাপারে যে গাফিলতি আমরা করেছি তার খেসারত আমাদের দিতে হবে এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রদের নিয়ে যে তাসের ঘর আমরা সৃষ্টি করেছি ঈশান কোণ থেকে ঝঞ্ঝা হাওয়ায় তা ভেঙে পড়েছে। কাজেই প্রতিরক্ষা খাতে প্রস্তাবিত ৮৬৭ কোটি টাকা ব্যয় নিশ্চয়ই সমর্থনযোগ্য। কিন্তু একটি প্রশ্ন থেকে যায়। প্রতিরক্ষা সংগঠন কি এই অর্থ যাতে সুষ্ঠুভাবে ব্যয়িত হয় তা নিশ্চিত করার পক্ষে যথেষ্ট দক্ষ? শুধু অর্থসংগ্রহ হলেই সব মুশকিল আসান হয় না। যেসব সম্ভারের জন্য এই অর্থ ব্যয়িত হবে তা সংগ্রহ করা কি সম্ভব হবে? সরকারের প্রশাসনিক নৈপুণ্য এই দুটি ব্যাপারেই যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রাখে। কাজেই এই নৈপুণ্য বাড়াবার চেষ্টা না করলে,

অপব্যয় বন্ধ করার প্রয়াস না পেলে আমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে না। এনিয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নেই কারণ গত সংখ্যায় অধ্যাপক ধীরেশ ভট্টাচার্য তা সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় বাজেটের আর একটি দিক সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। গত কয়েক বছর ধরে একটা অভিযোগ শোনা যাচ্ছে যে কেন্দ্রীয় বাজেটে ইচ্ছা করেই আয়ের পরিমাণ কম দেখানো হয়ে থাকে যাতে নতুন কর চাপাতে সুবিধা হয়। এবছরেও এই অভিযোগ করা হয়েছে। অন্যান্য বছরের তুলনায় কিন্তু এ বছরে এই অভিযোগের গুরুত্ব অনেক বেশি। কারণ অনেকেই বলছেন যে করের পরিমাণ ইচ্ছা করেই বাড়িয়ে দেখানো হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিরক্ষা খাতে অতিরিক্ত ৪০০ কোটি টাকা ও উন্নয়ন খাতে (তৃতীয় পরিকল্পনা) অতিরিক্ত ২০০ কোটি টাকা ব্যয় করতে পারবেন বলে নিজেরাও বিশ্বাস করেন না। কাজেই একদিকে আয় কম করে দেখানো হচ্ছে এবং অন্য দিকে ব্যয় ফাঁপিয়ে তোলা হচ্ছে। ফলে বিবিধ করের বোঝা সাধারণ মানুষের ওপর চেপে বসছে। এই সন্দেহের একটা সদুত্তর করদাতারা নিশ্চয়ই আশা করেন। তাঁরই সাথে তাঁরা আশা করেন বিভিন্ন বিভাগে যে অপব্যয় আজ সহজেই লক্ষ্য করা যায় তা দূর করারও চেষ্টা করা হবে। দিল্লীর খবর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পিছু মাসে ১৩২ টাকার জল দরকার হয়ে থাকে এবং সেই দেশে যেখানে মাথা পিছু মাসিক আয় মাত্র ৩০ টাকার মতো। ১৯৫১-৫২ সালে প্রশাসনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ব্যয় করেছিলেন ২৪ কোটি টাকা, ১৯৬২-৬৩ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৬ কোটি টাকা এবং ১৯৮০-৮৪ সালে তা হবে ৮৮ কোটি টাকা। এই অল্প সময়ের ভেতরে এই বৃদ্ধি কি পুরোটাই অপরিহার্য? কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মীদের শতকরা ২০ জনেরই প্রয়োজন নেই বলে সেই মন্ত্রণালয় থেকেই হিসেব পাওয়া গেছে।

সবশেষে বর্তমান বাজেটের পরোক্ষ করের বোঝার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। কেন্দ্রীয় সরকার আমদানির উপর শুল্ক থেকে আয় ৮৭ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা বাড়াবার প্রস্তাব করেছে এবং আবকারি শুল্কের হার বাড়িয়ে ১০৬ কোটি ৬১ লক্ষ টাকার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। এই দুটি পরোক্ষ কর থেকে অতিরিক্ত মোট ১৯৪ কোটি টাকা পাওয়া যাবে (সবরকম কর থেকে অতিরিক্ত ২১১ কোটি টাকার সংস্থান হয়েছে।) এই সব পরোক্ষকরের ফলে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা যে আরো সমস্যাকণ্টকিত হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে বহু ভোগ্য-দ্রব্য ও কাঁচা মালের দাম প্রস্তাবিত করের ফলে অনেকটা বেড়ে যাবে। তাছাড়া আমদানি যন্ত্রপাতি ও কাঁচা মালের ওপর শুল্ক বাড়াতে বহু শিল্পজাত দ্রব্যের দামও পরোক্ষভাবে বেড়ে যাবে। দেশে ফলে মূল্যবৃদ্ধির দিকে একটি সুনির্দিষ্ট প্রবণতা দেখা দেবে। প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে এই মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ করাও আবশ্যক। এ উদ্দেশ্যে সরকার কি কি বিশেষ নীতি অবলম্বন করবেন তা এখনও বোঝা যাচ্ছে না।

নাগরী : নীরদবরণ

পথপ্রান্তে বসে রয় সুন্দরী নাগরী ;
নয়নের বৃন্ত হতে পুষ্পধনু ধরে !
পথিকের অচঞ্চল চিত্তমাঝে ও'রি
বাসনার স্পর্শ লাগে ; মধুকণ্ঠ ঘরে
কম্বুর কুহু হতে আসে শিহরণ ;
অনাবৃতা মনোরমা-দেহের প্রসাদ
শোনিতে ঢালিয়া দেয় বিদ্যুৎ কম্পন ;
অনলক্ত মধুরার পাণ্ডুর প্রভাত
মুহূর্ত বিলাসে আনে গহন কাকলি।
মধুচ্যুত বিহারের আকর্ষণ লাগে
নিশার করাল ছায়া-সঙ্গিনীর ভালে
জ্বলে উঠে নরকের দীপ্ত কলঙ্কিমা ;
একদিন, অসম্বৃত নিদ্রার লগনে
কে তারে রচিয়া গেল দুর্বার চুম্বনে !

শিব ও সুন্দর : বিহারী লাল

ভাল যদি বাসিতেই হয় তবে, ওগো শিব মৌন মহেশ্বর,
তোমারে বাসিব ভাল. সর্ব্ব চৈতন্যেরে মোর করি কেন্দ্রীভূত
অনন্ত বিস্মৃতে তব, আমি হব নিষ্কম্প শান্তির সাগর,
প্রজ্বলন্ত জ্ঞান সূর্য্য, দুষ্কর তপস্যা-বহ্নি, পৌরুষ প্রদৃপ্ত
অথচ ক্ষমতা মোরে, করে বরে, জন্মে জন্মে ভবে ঘাবরিয়া,
তুরীয় আলোকে তব মোর মাঝে পৃথিবীরে রাখিব ধরিয়া।

ভাল যদি বাসিতেই হয়, তবে হে সুন্দর, বিশ্বচিত্তাচার,
তোমারে বাসিব ভাল তোমার মুরলী ধ্বনি শুনিব সতত,
নিখিল আনন্দ-সুধা পান করি নিরন্তর রহিব বিভোর,
মৃত্যুকীর্ণ এই বর্ত্তে যুগে যুগে সাধিবারে তব প্রেমব্রত
অবতীর্ণ হব আমি, এক মোরা দুই হয়ে একটি-প্রণতি
তুলিব ঊর্দ্ধের পানে,—মোর বিশ্ব প্রেমে হবে
তোমার আরতি।

মহান দেবদূত : রাফায়েল আলবের্তি

মহান দেবদূত। রাফায়েল আলবের্তি
একবছর, আমি তখন ঘুমিয়েছিলাম,
প্রত্যাশার অতীত কে একজন
এসে দাঁড়ালো আমার জানালায়।

'ওঠ, ওঠ!' ফিরতেই আমার চোখে পড়লো
অনেক পাখির পালক আর তরোয়াল।

দিগন্তে, পাহাড় আর সমুদ্র,
মেঘমালা, পর্বতচূড়া আর বিহগপক্ষ,
সূর্যাস্ত, প্রভাত।

'দেখ দেখ ওইখানে সেই মেয়ের
স্বপন ঝুলে আছে শূন্য থেকে!'

আহা, ঘনিবিড় বাসনা, অবিচল ধৈর্য,
অবিচল আলোকপুঞ্জ, অবিচল
আমার অন্তরের নিত্যপ্রবাহিত জলরাশি!

কে যেন বলে গেল: 'ওঠ, ওঠ।'
আর মুহূর্তে নিজেকে আমি দেখেছিলাম যেখানে তুমি।

অনুবাদ : দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

আত্ম কথা : বিনোদ বেরা

হেমন্তের ভোর বেলার মতন এক মেয়ে
রহস্যের মায়াবরণে সারা শরীর ঢেকে
অদ্ভুতো ভর দাঁড়ালো কাছে, প্রাণের সরোবরে
ফুটলো ঘন ঢেউ এবং গভীর এঁকে বেঁকে

সাপের মত ক্ষিপ্র এক সুতেজ অনুভূতি
মাঠ এবং মানুষ আর বনের নীলিমায়
মিলিয়ে দিল আমার অবচেতন সত্তাকে—
হঠাৎ যেন মন্ত্র বলে হারিয়ে গেলাম হায়।

বুকের পলি মাটিতে আমি পুতে ছিলাম বীজ
এখন এক বৃক্ষ করে সকল অধিকার,
মায়াত্মক কাটলে ভরা দেহের ঈষারৎ
তবু পড়ন আটকে রাখে শিকড় বারবার।

সব অনুভূতে আমার রক্ত-রক্ত ফোটে গাছে
তীক্ষ্ণ এক যন্ত্রণাকে সংগোপন-রাখি—
বুকের নীল পাতালে এক আদিম ক্রোধ আছে……
সারা সময় সজাগ তাকে নিপুনভাবে চাকি।

আজ ঝরে যাবে ব'লে : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

সব অধিকার আজ ভেঙে যায়, ভেঙে যাবে বলে
বুকের সমস্ত সৌধ স্পর্শে শেষ উচ্চতাকে চিনে
নিদ্রার স্বপ্নের সব অস্তিত্বপ্রবাস স্পষ্ট করে।
আজ ঝরে যাবে বলে যে কোন মুহূর্তে হাত রাখি
শুধু জেগে ওঠে সদা 'তুমি বলেছিলে দেবে ধরা
বলেছিলে দেবে প্রেম, তবু আমার বুকেতে হাত
রাখতে পারোনি হায় ভয়ঙ্কর জন্মান্ধ পূজারী…'
সব অধিকার আজ ভেঙে যায়, ভেঙে যাবে ব'লে
নদীর প্রতিটি স্রোত পারাপারহীন অন্ধ কোনো
প্রতিদ্বন্দ্বীতায় সময়ের প্রতিটি স্তম্ভের দাবী
দিগন্তের নীল অসীমায় টানে ; ভেঙে যাবে ব'লে
দুচোখে নতুন কোন নিদ্রা নেই, নিদ্রার ভেতরে
কোন স্বপ্ন তোমাকে ছোঁয়ার মতো অলিখিত নেই ;

আজ ঝরে যাবে ব'লে কবিতার রক্তে হাত রাখি।

ন্যাশনাল লাইব্রেরী : সাধনা সরকার

স্বর্গের হিরণ্যদীপ জেলে অন্ধকার পৃথিবীকে ছুঁয়ে যাই
যৌবনের পাষাণ ভেঙে আলোকের প্লাবিত যমুনা
তুমি আছো অন্তহীন এপার উদ্ভাব সমুদ্রের সীমা
তিমিরান্ত সময়ের ঢেউভাঙা দুরন্ত আবেগ।

আকাশ এখানে মুগ্ধ। বাতাসে-শিশিরে-ঘাসে শান্তি
তোমাতেই দেখি আমি মহাযানী প্রাণের গরিমা
প্রসন্ন প্রতিভায় জ্বলে, দীপ্ত করে মানুষী মহিমা
রাজর্ষি পৃথিবী আর নির্মোহ জ্ঞানভিক্ষু মন।

তোমার চেতনা যেন সুদূর সন্ধ্যার পাখি হয়ে
স্বর্গের অমৃত ছবি সযতনে পালকে কোটায়
নিত্য খুঁজি সংগোপনে পদ্মরাগ মনের পাতায়
যেখানে প্রতিষ্ঠিত সত্য আর সৌন্দর্যের অনন্বয় উমা-মহেশ্বর।

নিম-এর তুলনা নেই

সুস্থ মাড়ী ও মুক্তোর মত উজ্জ্বল
দাঁত ওঁর সৌন্দর্যে এনেছে দীপ্তি।

কেন-না উনিও জানেন যে নিমের অনন্য-সাধারণ ভেষজ গুণের সঙ্গে আধুনিক দন্ত-বিজ্ঞানের সকল হিতকর ঔষধাদির এক আশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছে 'নিম টুথ পেষ্ট'-এ। মাড়ীর পক্ষে অস্বস্তিকর 'টাটার' নিরোধক এবং দন্তক্ষয়কারী জীবাণু-ধ্বংসে অধিকতর সক্রিয় শক্তিসম্পন্ন এই টুথ পেষ্ট মুখের দুর্গন্ধও নিঃশেষে দূর করে।

পত্র লিখলে
'হাসিতে মুক্তা ঝরে'
পুস্তিকা পাঠানো হয়।

নিম টুথ পেষ্ট

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ, কলিকাতা-২৯

NTP-1958

সুখের রং

হাঁক ঠাকুর লেনের ভূষণ পোদ্দারের বাড়ির ভূগুরের চিত্রটি বড় সুন্দর। এটা ভূষণদের পৈতৃক ভিটা। ভূষণের ঠাকুর্দা এই বাড়ি তৈরী করে যান। তখন ছিল একতলা। তখন হাঁক ঠাকুর লেনে বাড়ির সংখ্যা কম ছিল। গলির একদিকটা প্রীতিমত ফাঁকা ছিল। ছুটো চারটে করে আম কাঁঠাল নারিকেল গাছ প্রায় সব কটা বাড়ির সামনে পিছনে দেখা যেত। আজ আর সেই দিন নেই। আজ বাড়ির সঙ্গে বাড়ি, বাড়ির পিছনে বাড়ির ঠাসবুনন। ভূষণের বাবা একতলাকে দোতলা করে দিয়েছিল। ছেলেরা আবার কোনদিন একটা তলা তুলবে। যেন সেই আশা করে দোতলার ছাদের ধারগুলোতে লোহার রড পুঁতে রাখা হয়েছিল। কিন্তু ভূষণদের আমলে বাড়ি আর বাড়ানো সম্ভব হয়নি। ভূষণরা তিন ভাই ছিল। ভূষণের বড় ভাই সন্ন্যাসী হয়ে অনেকদিন আগে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। সেই প্রথম যৌবনে। বিয়ে থা করার আগেই। ভূষণ মেজো ছেলে। ছোট ভাই ভূলাল পোদ্দার কিন্তু বাপ ঠাকুর্দারা যা করে গেছে অর্থাৎ ভূষণের মতো সোনার দোকানে ছোটবেলায় কাজ শিখে পরে নিজে দোকান খুলতে পারেনি: ইস্কুলে পড়তে পড়তে ভূষণের ছোট ভাই একদিন ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে ফেলল। কলেজে ঢুকল। সেখানেও সব কটা পরীক্ষা পাশ করে বেরিয়ে এসে অধ্যাপক হল। অর্থাৎ মস্ত পণ্ডিত হয়ে গেল ভূলাল। এটা ভূষণদের বংশের বাতিক্রম। ভূলাল পোদ্দার পণ্ডিত হয়ে এক ব্যারিষ্টারের মেয়েকে বিয়ে করে বসল। কলেজে ভূলালের সঙ্গে মেয়েটি পড়ত। প্রেমকরে বিয়ে। ভূলাল বিয়ের পর আর এবাড়ি আসেনি। আলাদা ফ্ল্যাট ভাড়া করে বৌকে নিয়ে বালিগঞ্জে আছে। বৌও বিদুষী। কোন একটা মেয়ে-কলেজের অধ্যাপিকা হয়েছে।

কাজেই ভূষণ এতবড় পৈতৃক বাড়ি এখন একলাই ভোগ করছে। ওপরে তিনটে ঘর। নীচে তিনটে। তিন ভাইয়ের জন্য দোতলায় তিনখানা ঘর করে রেখেছিল ভূষণের বাবা। নিচের ঘরগুলি কোন সময় ভাড়া দেওয়া চলবে ভূষণের বাবা মাঝে মাঝে বলত। ভূষণের বাবার আমলে অবশ্য কোন ভাড়াটে ছিল না। ভূষণ একতলার পিছনের দুখানা ঘর ভাড়া দিয়েছে। রাস্তার সঙ্গের ঘরটা তার সোনার দোকান। উকিল ব্রজবিহারী বাবু নিচের দুখানা ঘরে আছেন। তাও অনেকদিন হয়ে গেল। ভদ্রলোক বুড়ো হয়েছেন। তাঁর দুই ছেলে অসিত ও অমল। অসিত ইস্যানিং রাইটার্স বিল্ডিংএ চাকুরী পেয়েছে। বিয়ে করেছে। অমল কলেজে পড়ছে। ব্রজবিহারীবাবু এখন আর কোর্টে বেরোন না। বাড়ীতে বসা। বাড়িতে থেকে কি জানি সাহিত্যের বইটই লেখেন। স্ত্রী হেমাঙ্গিনী অসুস্থ। তিনি একরকম বিছানায় শোয়া। রুগটা দিন দিন কেমন ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে। রক্তহীনতায় ভুগছেন পরিষ্কার বোঝা যায়। আসল অসুখটা কি বাইরের লোক ঠিক জানে না।

অসিতের বৌ সুন্দরী। আশ্চর্য, অসিত এত লেখা পড়া জানা ছেলে। একটা গ্রাজুয়েট। স্ত্রী বিমলা কিন্তু সেই

••• জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ••• ধারাবাহিক উপন্যাস ••

তুলনায় কিছুই না। বাবা বড়লোক। বেশ কিছু সোনাদানা ও মোটা পণ নিয়ে ব্রজবিহারী বড়লোকের মেয়ে বিমলাকে পুত্রবধূ করে ঘরে এনেছেন। উকিল ব্রজবিহারী রক্ষণশীল মানুষ। ঘরের বৌ বাইরে গিয়ে কোনদিন চাকরি করবে না। সুতরাং খুব বেশি একটা লেখাপড়া জানা মেয়ে তাঁর দরকার নেই। বিমলা মেয়েটি বাংলায় চিঠিপত্র লিখতে পারে। বাংলা গল্প উপন্যাসটা পড়তে পারে। এই যথেষ্ট। ব্রজবিহারীর মতে স্বাভাবিক সাধারণ বাঙালীর ঘরের বৌয়ের অল্প বিদ্যাই ভাল। এখানে বিমলার স্বামী অসিতের 'হ্যাঁ' 'না' কিছু বলার ছিল না। বাবা যেমনটি পছন্দ করেন, যা ভালবাসেন তাই তার মেনে নিতে হয়েছে। ছোটবেলা থেকে বাবার কাছে এমন শিক্ষাই পেয়েছে সে। অসিত অমল দুজনই। বাবার কোন কথা বা ইচ্ছা অমান্য করার সাহস তাদের নেই। তা বিমলা এবাড়িতে সুখেই আছে। কম লেখাপড়া জানে বলে স্বামী দেওর বা শ্বশুর-শাশুড়ীর কাছ থেকে অনাদর উপেক্ষা তাকে কখনও ভোগ করতে হয় না।

ভাড়াটেদের এই বৌটির সঙ্গে শোভার খুব ভাব। বয়সেও দুজন প্রায় সমান।

দুপুরে ওপরটা ভয়ংকর নির্জন থাকে। গোটা বাড়িটাই কেমন ঝিমিয়ে থাকে। নিচে দোকানে বসে ভৃত্য কর্মচারীদের সঙ্গে বসে সোনার গয়না তৈরী করে। টুকটাক টুকটাক শব্দ হয়। ব্রজবিহারী নিজের ঘরে বসে একমনে সাহিত্যের বই লিখে চলেন। হেমাঙ্গিনী ঘুমোয়। অসিত অফিসে, অমল কলেজে। বিমলা তখন পা টিপে টিপে সোজা উপরে চলে আসে।

ওপরের তিনখানা ঘরের একখানা তালাবন্ধ থাকে। বাকি দুটো ভৃত্য ব্যবহার করে। ঘর দুখানা গুছিয়ে সাজিয়ে রাখতে শোভা রাতদিন খাটছে। সারাক্ষণ এটা ঝাড়ছে ওটা মুছছে। বোঝা যায় ঘর যোর ও ঘরের জিনিষপত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঝকঝকে তকতকে রাখা শোভার একটা নেশা। সকলের এই নেশা থাকে না। বিমলার নেই। —যেটা না করলে না হয় যেটুকু দরকার সেটুকু ছাড়া বাড়তি খাটুনি তার পোষায় না। সারাক্ষণই শোভার মতন এটা গুছোবে ওটা ঝাড়বে সেটা মেজেঘষে পরিষ্কার করবে নাকি। 'তাতে লাভ!' বিমলা হেসে মাঝে মাঝে শোভাকে বোঝায়: 'কাল আবার ধুলো পড়বে ময়লা আটকাবে—কাজেই আবার সেসব পরিষ্কার করতে হবে ঝাড়তে হবে। বরং দিনকতক যেটি যেমন আছে থাকতে দাও না, সারাক্ষণ যদি তুমি আয়না, টেবিল, তক্তপোষ, মেঝে, জানালার পর্দা, পা-পোষ, ঘটি-বাটি, সেলাই-শেয়ালা, পিরিচের ভাবনা নিয়ে থাক তো নিজের কথা ভাববে কখন নিজেকে দেখবে কখন।"

হাঁ করে তাকিয়ে থেকে শোভা প্রথম প্রথম নিচের ভাড়াটেদের সুন্দর বৌটির কথা শুনত, ওকে দেখত। টানা-টানা চোখ। কালো চিকণ ভুরু। লাল টুকটুকে ঠোঁট। আর অসম্ভব ফর্সা রং। শোভার গায়ের রংও ফর্সা।

কিন্তু বিমলার গাল, গলা, হাত, পা থেকে যেন একটা সোনালী আভা ঠিকরে পড়ে। অতিরিক্ত লাবণ্য থাকলে যা হয়। রং ছাড়াও এমন আর একটা কিছু বিমলার গায়ের চামড়ার মধ্যে মিশে আছে যা কেবল দহকৌটা, ফুলের গায়ে, সকালের চাটকা রৌদ্রের মধ্যে দেখা যায়। বিমলার ঐ রং শোভাকে প্রথম দিকে আচ্ছন্ন করে রাখত। তারপর অবশ্য চমকের ভাবটা কেটে গেছে। ক্রমাগত দেখার অভ্যাসের ফলে যা হয়।

না, শোভা তখন বুঝত না, নিজেকে দেখা নিজের কথা ভাবা বলতে বিমলা কি বোঝাতে চাইত।

তারপর শোভা বুঝেছে।

নির্জন দুপুরে ছাদের আলিসার ছায়ায় বসে শোভার চুল বেঁধে দিতে দিতে বিমলা আস্তে আস্তে বুঝিয়ে দিয়েছে। ষোল বছরের একটি বিবাহিতা মেয়ে সমান বয়সের একটি কুমারীকে অনেক কিছু বোঝাতে পারে শেখাতে পারে। শুনতে শুনতে প্রথম প্রথম শোভার কান লাল হয়ে উঠত।

বিমলা তখন আচ্ছা করে ওর গাল টিপে দিত।

'আহা লজ্জা—দুধের বাচ্চা কিনা, শুনতে লজ্জা করছে।

শোভা তখন ফিক করে হাসত।

তারপর অবশ্য তার লজ্জা কেটে গেছে।

ক্রমাগত দেখার অভ্যাসের ফলে বিমলার গায়ের ঝকঝকে রং দেখে যেমন সে অবাক হত না, তেমি ক্রমাগত শুনে শুনে অভ্যস্ত হবার পর তার কথাগুলি শুনে কানে গলায়ও আর লাল উঠত না।

আর ঠিক এমন দিনে সুধাম এসে পড়ল।

বিমলার কাছে পাঠ নিয়ে নিয়ে ততদিনে শোভার মন তৈরী—হয়ে গেছে। ছেলেটিকে দেখা মাত্র ও সাংঘাতিক-ভাবে প্রেমে পড়ে গেল।

শোভা নিজেকে ভাল করে দেখতে, নিজের কথা বেশি করে ভাবতে শিখে গিয়েছিল বলে নিজের দিকে তাকিয়ে সুধামের কথাও ভাবত, সুধামকেও দেখত।

সুধাম যদি কোনদিন চুল না আঁচড়িয়েছে দাড়ি না কামিয়েছে, শোভা রাগ করত। পরনের জামাকাপড় ময়লা দেখলে শোভা চটে যেত। হয়তো তার সঙ্গে কথাই বলত না সেদিন। শোভার মন রাখতে সুধাম ফর্সা জামা-কাপড় পরতে সর্বদা চুল পাট করে রাখতে ও নিয়মিত মুখ কামাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ত। পরে সে সব অভ্যাস হয়ে গেছে। শোভাকে আর বলে দিতে হত না, এর জন্য। রাগ করতে হত না। যখনই এবাড়ি এসেছে সুধাম ফিট বাবুটি সেজে এসেছে।

বিমলা সুধামকে দেখে খুশি হয়েছিল। চমৎকার ছেলে। সুধাম গল্প করে চলে যাবার পর বিমলা শোভার কানে কানে বলত, 'ইস্, যদি বিয়ের আগে এই ছেলের দেখা পেতাম আমি কানে মাথায় ওর প্রেমে ডুবে থাকতাম। কী চমৎকার গড়ন। নাকটা কেমন খাড়া। কান দুটো কী সুন্দর—মনে হয় অশথের ছোটা কচি পাতা—কানের ডোলটাই অদ্ভুত। পুরুষের এমন কান দেখতে ভাল। তোমার ভাল লাগে না?'

শুনে শোভা চুপ থেকে ঠোঁট টিপে হাসত।

এবং দেখতে দেখতে এমন চমৎকার নাক ও কান-ওয়ালা ছেলের প্রেমে পড়ে গেল।

'উহু'—কেবল বুড়ি ঠাকুমাকে নিয়ে বেড়াতে আসা আর যাওয়া, কিছু না। একলা আসে না কেন। তুমি বলবে দুপুরে বাড়ি নিরালা থাকে। টুক করে যেন ওপরে উঠে আসে।

বিমলার উপদেশ শোভা শুনেছিল। এবং দুদিন পর শোভার সাহস পেয়ে সুধাম, ভুবন নিচে দোকান থেকে দেখতে না পায়, পিছনের গলি দিয়ে বাড়িতে ঢুকে শোভাদের সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠে এসেছিল। একদিন দুদিন। তারপর রোজ। তারপর ঠাকুমা দেখতে চেয়েছে অহিলায় শোভাকে

নিয়ে সুধাম রাস্তায় বেরিয়েছে। পার্কে গেছে, রেঁস্তোরাঁয় ঢুকেছে, সিনেমা দেখেছে। সিনেমা টিনেমা দেখা টেখা শেষ করে পরে দুজন বুড়ি নয়নতারার কাছে গিয়ে হাজির হয়েছে। শোভাকে বাড়ি পৌঁছে দেবার অজুহাতে আবার একসঙ্গে দুজনের খানিকটা বেড়ানো গল্প করা।

ভুবন জানতনা দেখত না।

টুকটাক ঠুকঠাক সব করে সেই দুপুর থেকে রাত নটা দশটা পর্যন্ত দোকানে বসে গহনা তৈরী করেছে। গহনার ওপর ফুল লতা পাতা কি ধকধকমুখের নক্সা তুলেছে।

'তা তো বুঝলাম।' সেসব শুনে বিমলা আর একদিন বলল, 'সিনেমা দেখা আর রেঁস্তোরাঁয় খাওয়া কি সব—মেয়ে মেয়ে যে বেলা হয়ে যাচ্ছে। ও না হয় বেটাছেলে—উড়ে উড়ে চিরকাল মধু খেতে পারবে। কিন্তু তুমি যে মেয়েছেলে—তুমি তো বেশিদিন উড়তে পারবে না ভাই। তোমার পাখা শিগ্‌গীর নড়বড়ে হয়ে যাবে শরীর ভারি হয়ে যাবে। উড়তে গেলে ধপাস করে নিচে পড়ে যাবে। তখন উপায়!'

রূপসী বিমলার চোখ দুটোর দিকে আবার শোভা ক্যাল্ ক্যাল্ করে সেদিন তাকিয়ে রইল।

'খুকী—কেমন না!' বিমলা শোভার চিবুক ধরে জোরে নাড়া দিয়েছিল। 'ষোল বছরের যুবতী ন বছরের মেয়ে হয়ে থাকলে এই দশা হয়। কথা শুনে যাওয়াদেও ভেতরে যায় না—বগলে ঢোকে না। বলি, মেয়েদের ফুল ফুটলে তাড়াতাড়ি ফল ধরাতে হয়, না হলে ফুল শুকিয়ে যায় ঝরে পড়ে—এখন বুঝলে ভাই।'

শোভা সবটা এখন একসঙ্গে বুঝতে পেরে বিমলার পিঠে একটা কিল বসিয়ে দিয়ে হেসে ফেলেছিল।

তোমার পেটে এত বৌ। যাঃ, কি সব কথা।'

'আচ্ছা, তবে ঐ ঘুরে ঘুরে রেস্টুরেন্টে খাও আর সিনেমা দেখো সে। তারপর একদিন বিমলার কাছে বসে কাঁদবে।'

কিন্তু তার পরদিনই শোভা সুধাংশুকে দেখে গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল।

'কি হল, এমন মুখ ভার যে আজ? সুধাম শোভার হাত ধরেছিল। শোভা হাত ছাড়িয়ে নিয়েছিল।

'কথা বলছ না যে?' সুধাম আর হাত ধরেনি। তার হাসি হাসি মুখ কালো হয়ে গিয়েছিল।

'এমি।' শোভা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে গিয়েছিল।

'নিশ্চয় কিছু একটা হয়েছে—'সুধাম বলতে আরম্ভ করেছিল। শোভা এবার চোখ বড় করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল।

'মন ভাল না তাই চুপ করে আছি।'

'কেন, ভাল না কেন।'

'তুমি বুঝবে না।'

'না বললে আর বুঝব কি করে।'

'তোমাকে বললেও কিছু লাভ হবে না।'

কেন!'

'কেন বুঝবে শুনি!' শোভা লম্বা লম্বা নিশ্বাস ফেলছিল। 'তুমি কি চাকরি-বাকরি কর? লেখাপড়াও শেষ করে বসে আছ—কাজেই কোনদিন পাশটাশ দিয়ে চাকরি পাবে তারও আশা নেই। কারবার-টারবার যেসব তেমন পয়সাও নেই তোমাদের—তোমার ঠাকুমা তো কদিন তোমাদের সংসারের অভাবের কথা শুনিয়েছে। কাজেই আমার আশা কোথায়।'

যেন হো হো করে হেসে উঠতে চেয়েছিল সুধাম।

'ও, তুমি ভবিষ্যতের কথা বলছ—মানে যদি কোনদিন বিয়ে-টিয়ে করে ঘর সংসার পাতি তখন তোমায় কেমন করে খাওয়াব কি পরাব সেই ভাবনা!'

'মেয়েছেলের ভবিষ্যত ভাবতে হয়। মেয়েরা কিছু চিরকাল উড়ে উড়ে মধু খায় না।' বেশ কড়া করে কথাটা বলে শোভা জানালার কাছে সরে গিয়েছিল। একটা বড়

আয়নায় ওর পিঠটা দেখা যাচ্ছিল। ভূষণ শোভার সাবেকী বাক্স সরিয়ে দিয়ে ঘরে নতুন আলো বসিয়েছিল। জ্যোৎস্নার মতো সবুজ-সাদা ঠাণ্ডা আলোর নিচে শোভার রং যেন আরো খুলে গিয়েছিল। হাঁ করে তাকিয়ে থেকে সুধাম আয়নার ভিতর মূর্তিটা দেখছিল। দুধে আলতায় ছোপানো মসৃণ ঘাড় বেয়ে কালসাপের মতো ভয়ংকর চকচকে লম্বা বেণীটা সোনালী ব্লাউজের চৌহদ্দি ভিঙিয়ে পাতার রঙের শাড়িতে মোড়া কোমরের নিচে এসে দুলছিল। চোখ ফেরাতে পারছিল না সুধাম কতক্ষণ সেদিক থেকে। যেন আরো কি কি বলছিল শোভা। কিন্তু সুধাম এক দৃষ্টে আয়নার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে শোভা ঘুরে দাঁড়াল।

'কথা বলছ না কেন।'

'তুমিই তো বলে যাচ্ছ।' সুধাম আবার হাসতে গেল। শোভা ঠোঁট বেঁকাল।

'পুজো গেল। একটা ব্লাউজ-পীসও প্রেজেন্ট করতে পারলে না, প্রেম করছ। তাইতো বলি আমার আশা কোথায়।'

সুধামের হাসি ফিকে গেল। মুখটা কালো হয়ে গেল। ছোট একটা চোক গিলল। শোভার চোখে চোখে আর না তাকিয়ে ঘাড় গুঁজে হাতের নখ খুঁটতে লাগল।

শোভা চুপ করে রইল।

'ঠিক আছে।' সুধাম চোখ তুলল। ব্লাউজের কাপড় আমি কালই এনে দেব।'

'ও, বলেছি বলে!' শোভা মাথা নাড়ল। "ব্লাউজ কি আর আমি পড়ছি না। আমার এক ডজন ব্লাউজ। একটা কথার কথা বলছিলাম। তাও কি আর তুমি নিজে উপায় করে আমার জন্য ব্লাউজ কিনে আনবে। পারবে না। বাড়ির তহবিল থেকে যদি দুটো টাকা সরাতে পার। যেমন সেদিন সরিয়ে আমায় সিনেমা দেখিয়েছ, রেষ্টুরেন্টে নিয়ে গেছ। তা ছাড়া আরো যে কতদিন সিনেমা দেখা হয়েছে রেষ্টুরেন্টে খাওয়া হয়েছে সে টাকা আমি দিয়েছি—দিইনি!'

'আমি কি না বলছি।' সুধামের দু চোখ ছলছল করছিল। যেন কেঁদে ফেলবে। তার ঠোঁট কাঁপতে লাগল। 'আমার সেই খেয়াল আছে। টাকা রোজগার করতে হবে। অনেক টাকা উপায় করতে না পারলে মেয়েদের মন পাওয়া যায় না। আমি জানতাম। আমি জানি।' বলে সুধাম হন হন করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আর একটা দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে আর একজন মুখে কাপড় গুঁজে হাসছিল। সুধাম বেরিয়ে যেতে বিমলা ভিতরে চলে এল।

'খুব বলা হয়েছে।' শোভার চিবুক ধরে সে জোরে নাড়া দিল। 'খুব বলেছ।'

'কিন্তু আমার মনে হয় একটু যেন বেশি বলা হয়ে গেল।' যেন শোভার এখন হাঁস হয়েছে। চোখ মুখের কড়া ভাবটা নেই। চাউনিটা একটু মলিন বিষণ্ণ। যেন ভয় ঢুকেছে।

'যদি আর না আসে!' বিমলার হাত ধরল শোভা।'

'আসবে না মানে!' আকাশ থেকে পড়ল বিমলা এমন চোখ করে শোভার দিকে তাকায়। একটু সময়। তারপর শোভার গালে আঙুলের টোকা দিল।

'আসতেই হবে। ঘুরে ফিরে এখানেই আসবে। ঘাস খেয়েছে মুদি যাবে কোথায়?'

তারপরও বিমলা শোভার কানে কানে কি বলতে শোভা ধাক্কা দিয়ে তাকে সরিয়ে দিল।

'ইস কি অসভ্য বৌ তুমি। যাইরি বলছি না।'

'আচ্ছা দেখা যাবে। আমিও বলব না।' খোপা খুলে গেছে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বিমলা খোপা ঠিক করছিল। চুল না যেন অন্ধকার সমুদ্রের ঢেউ। স্থির চোখ মেলে শোভা চুলের রূপ দেখছিল।

(ক্রমশঃ)

রেস্তোঁরা

গোটগল্প

শান্তি লাহিড়ী

লক্ষ্মিণি বেঁচে গেল। কিন্তু সে মুহূর্তটি এমনই, যখন মানবতার অন্যান্য খোলসগুলো সব খুলে পড়েছে। শহরের পথে ক্ষুধার যন্ত্রণায় লক্ষ্মিণি নামটার ওপরেও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে তখন এক নির্জন রাত্রিতে ওকে বাঁচিয়ে দিল স্বরেন, স্বরেন পাইন। নইলে লক্ষ্মিণি পাগলী হয়ে যেত, পরনে আবরু থাকত না, চোখ চুকত খুলির কোটরে তেল না দিয়ে মাথার চুল হত জট জট। কিছুদিন ঘুরত এখানে সেখানে। যৌন-ক্ষুধ ভিখারী, যারা ওই লক্ষ্মিণির মতই ঘর পায়না, খেতে পায়না, তারা কুরে কুরে খেত লক্ষ্মিণির শরীরটাকে। পশুরমত কামড়াকামড়ি করত নিজেদের মধ্যে। তারপর পাগলী হয়ে যেত লক্ষ্মিণি, খেতে ভুলে যেত, ঘুরে ঘুরে বিড়বিড় করে এক কলি প্রেমের গান আওড়াত। তারপর জীর্ণ দেহটা ঘরে যেত লক্ষ্মিণির। ময়দানের পাশে, রেসকোর্সের বেড়ার ধারে মরে পড়ে থাকত লক্ষ্মিণির দেহটা। তারপর লক্ষ্মিণির দেহটা বেহালার লাসকাটা ঘরে চলে যেত।

হয়ত তাই ঘটত। লক্ষ্মিণি মরত। ডাক্তারী রিপোর্ট বলত ওর মৃত্যুর কারণ অনাহার নয়। তারপর, পরবর্তী শনিবারে, যেখানটায় লক্ষ্মিণির কুৎসিত মৃতদেহটা পড়ে থাকত, ঠিক সেইখানটায় পা দিয়ে রেসের ঘোড়াটা তার জকীকে পয়লা বাজী জিতিয়ে দিত।

কিন্তু তা ঘটতে দেয়নি স্বরেন পাইন। লক্ষ্মিণিকে মরতে দেয়নি।

প্রথমটায় অবশ্য স্বরেনকেও বিশ্বাস করেনি সে। কারণ বিশ্বাস বলতে যা কিছু সব হারিয়ে ফেলেছে সে। পশ্চাৎ জীবনের লজ্জাস্পদ ঘটনাগুলো লক্ষ্মিণির বিশ্বাস ঘুরে মুছে ফেলেছে মন থেকে। এমন কি লক্ষ্মিণির মনে হয় সবাই, সবাই একটা কিছু চাইতে আসে ওর কাছে, একটা কোন মতলব নিয়ে আসে। স্বরেনকেও ভাবল, দেখতে শুনতে ভালোমানুষটির ভেতরটা কেমনতর জানানেই লক্ষ্মিণির।

কক্ষি, কক্ষির দুনিয়ায় অবশ্য লক্ষ্মিণি নতুন নয়। কি করবে স্বরেন? বেচতে করবে? যারো ছুতে ঠোকরানো যৌবনটা নিয়ে জুয়া খেলবে? কিংবা দুসরা খদ্দেরের কাছ থেকে টাকা লুটবে? হাসে লক্ষ্মিণি। ভাবে খদ্দেরও চালাক। ভাবনা লক্ষ্মিণিকে দেখে টাকা দেবে না কেউ।

রেস্তোঁরার সবর ধরনা বন্ধ হয়ে গেছে, অন্দরের বাসনপোচ বাসনমাজা টেবিল চেয়ার পরিষ্কার করা···এসব সেরে স্বরেন, ওয়েটার স্বরেন পথে নামল। সকাল থেকে সবর নেই। ভিড়, সমস্ত দিনমান নানালোকের ভিড়, নানা রংএর ভিড়। মাংস, পোলাও, বিরিয়ানি, কাটলেট, সোডা, হুইস্কি, সস্ ভিনিগার—এসবের বিশ্রি সহবাসে বাঁক ছাড়ার সময়

নেই। তাই যখন সব মেটে। সব মানুষগুলো ঘরে ফেরে স্বরেন তখন বাইরে বেরোয়।

গ্যাসের নীলাভ আলোগুলো নিভন্ত মনে হয়, কিন্তু সমস্ত রাত জ্বলে ঘিটমিট করে, নেভেনা। কুয়াসার হালকা মেঘের মত—মেঘ নয়, মাকড়সার তন্তুর মত কুয়াসাগুলো জমে আছে গ্যাসপোস্টের চারপাশ ঘিরে। স্বরেন, ওয়েটার স্বরেন কার্ত্তিকের নির্জন রাতে নীলাভ আলোয় দেখল ওই মেয়েটার চোখে চিক্‌চিক্ করছে কি যেন। এক পলক থমকে দাঁড়াল সে। অমন তো কতমেয়ের চোখই চিকচিক্ করে ওঠে। কাঁদতে ওদের সময় অসময় লাগেনা।

হঠাৎ কি যেন মনে হল স্বরেনের। পাপ পুণ্যের কথা মনে করে নয় ওর উপকার করছে বলে নয়, স্বরেনের ইচ্ছে হল কেমন যেন।

আপদ আর কি। কাঁদবে, কথা বলবে না লক্ষিমণি। স্বরেন বসল ওর পাশে। নীলাভ আলোর নীচে। কিন্তু ছেনাল মেয়েটা কি কান্নাই কাঁদেরে বাবা।

অবশেষে স্বরেন পাইন নিয়ে এলো রেস্তোঁরার হেঁসেলে। খেতে পেল লক্ষিমণি, বাঁচতে শুরু করল।

এই ওয়েটার, জলদি, কথা শুনতে পাওনা? কেবিনের পর্দার আড়ালের শব্দ অন্দরের কিচেন পর্যন্ত পৌছায় লক্ষিমণির কানে। লক্ষিমণি বাসন মাজে তখন। হাত ফসকে কাচের একখানা প্লেট ঠিক সমান দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল, গুড়িয়া কুক হেসে ওঠে,—স্বরেনের মেয়েমানুষ তো। শেষের কথাগুলো অন্তাস্থরের হাসিতে চাপা পড়ে।

এই ওয়েটার, বোতল খাও, সোডা—খাক সোডা ছাড়াই।

স্বরেন পাইন। ওয়েটার স্বরেন পাইন ভোর থেকে সাদা ইউনিফর্ম পরে ব্যস্ত থাকে টেবিলে টেবিলে খাবার দিতে। লক্ষিমণি মসলা তৈরী করে, আনাজ কোটে, বাসন মাজে। রেস্তোঁরার অন্যান্য মানুষগুলোও ওদেরই মত কাজ করে, বাড়ী যায়। শুধু লক্ষিমণি আর স্বরেন পাইন ঘরে যায় না। একজনের ঘর নেই, আর একজনের থাকলেও যাওয়া হয়ে ওঠেনা কাজে কর্মে। লক্ষিমণির মন্দ লাগে না। বাঁচার আনন্দ একটা নেশাই বটে। কিন্তু মানুষ চরিত্র, ভালমন্দ, সতীত্ব, দেহ, লাভ, ক্ষতি, কাম—সব একাকার হয়ে গেছে ওর দৃষ্টিতে। অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে কবে দেখেছে সে যে সবকিছুই ক্ষুধার নামান্তর। ক্ষুধার অগ্নিস্পর্শ সবকিছু থেকে মানুষকে মুক্ত করে, লক্ষিমণিকে অন্তত করেছে।

কিন্তু যাবার যেদিন থেকে ছুটল, লক্ষিমণির মনের স্বস্থতা ফিরতে লাগল ধীরে ধীরে। স্বরেনকে ভাল লাগল লক্ষিমণির। স্বরেনের দিনযাপন, প্রাণধারণ ওকে ব্যথিত করে তুলল। ওর মনে হতে লাগল স্বরেনের সুখ, দুঃখ যেন ওর থেকে অন্য রকম হলে ভাল হত। আর একটা মানুষকে চিনল সেই সঙ্গে। সে হল সদাশিব। রেস্তোঁরার মালিক সদাশিব। লোকটার স্বভাব, আচরণ লক্ষিমণির শরীরকে ঘিরে থাকে। লোকটার ব্যবহার অন্যান্যদের তুলনায় লক্ষিমণির প্রতি কিছু স্বতন্ত্র।

ব্যাপারটা স্বরেনেরও চোখ এড়ায়নি। বুঝেছে সব। সদাশিবকে অনেক বছর ধরে চিনেছে। কিন্তু তার মধ্যেও একটা সান্ত্বনা খুঁজে পায় স্বরেন; মেয়েটা খেয়ে বাঁচুক, পথে শুকিয়ে মরছিল, একটা গতি হোক। লক্ষিমণি বিশেষ কোন গুরুত্ব দেয়নি।

স্বরেন বলে, এখন তবে ভাল আছিস, কি বলিস?

হ্যাগো, দু-মুঠো খেতে তো পাচ্ছি। ভালো আছি, বেশ আছি।

হাসে স্বরেন, বলে ভালো থাক্, বেশ থাক্।

কিন্তু সেদিন সন্ধ্যায় মদ খেতে খেতে কেবিনের মাতাল খদ্দেরটা যখন স্বরেনের মাথায় মদের গেলাসটা ছুঁড়ে মারল, যখন কিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছিল কপাল থেকে, স্বরেনের চোখেমুখে অসহায় আতঙ্কের ভাব স্পষ্ট হয়ে

উঠেছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে লক্ষ্মিণির মনে হল ও মানুষটাকে ভালোবাসে। মাথায় চুপ-হলুদ লাগিয়ে বেঁধে দেওয়া হল। লোকটা চলে যাবার সময় অবশ্য বলে গেল, হাসবা। কম্বর মাফ্ কিজিয়ে। সুরেনের অপরাধের মধ্যে মোতার পরিমাণ বেশী হয়ে গিয়েছিল মদের নেশায়।

সদাশিব সব দেখল। দেখে বলল, একটু খেয়াল করবি সব কাজে। ব্যাটারা পাঁড় মাতাল। কাঁচা মাল দিবি বুঝলি। সবাই ভেজাল পছন্দ করে না। লক্ষ্যটা ছিল লক্ষ্মিণির উপর। লক্ষ্মিণির সেটা চোখ এড়াল না।

সুরেনের ঘটনা লক্ষ্মিণিকে জাগিয়েছিল। ঘুমন্ত লক্ষ্মিণি যেন জেগে উঠল। আপন হল সুরেনের। যেমন করে হোক ওর দুঃখ ঘোচাতে হবে, যে অবস্থাতেই হোক সুরেনকে বড় করতে হবে। টেবিলে টেবিলে খাবার দেওয়া আর চলবে না। কি যেন ভাবল কটাদিন। তারপর নিজের কর্তব্য স্থির করে ফেলল।

সদাশিবের নেশাই লক্ষ্মিণির মূলধন। ওভাবে, ওই পথ দিয়েই সুরেনের জন্য সে যেমন করে হোক একটা ব্যবস্থা করবে।

দেখতে দেখতে সুরেনের পদোন্নতি হল। কিন্তু সুরেনের কোন পরিবর্তন নেই। ও বোঝে সব, আপত্তি করে না। আর আপত্তিই বা কেন করবে, কারণ, সুরেনের জীবনে এই উন্নতি, এই কিস্তির আস্বাদন অভূতপূর্ব। তারই ছায়ায় দাঁড়িয়ে এক নিশ্চিন্ত আসক্তির শুরুতেই লক্ষ্মিণির এ আচরণ ওর কাছে নিন্দনীয় বলে মনে হল না।

সদাশিবের কাছে, তার একাকী আলাপনে, বিশ্রামে লক্ষ্মিণি সহজ হয়ে গেছে, স্বাভাবিক হয়ে গেছে। ওকে আর বাসন মাজতে হয় না, আনাজ কুটতে হয় না। শুধু ঘুরে ঘুরে সদাশিবের কাছাকাছি থাকতে হয়। কিন্তু শীঘ্রই ক্লান্তি এলো লক্ষ্মিণির। সুরেনের প্রতি ওর দরদ, সুরেনের ভালো অন্নের জন্য ওর ভাবনা চিন্তা। লক্ষ্মিণির মনে হল সুরেন ওর আপন জন। সুরেনকে ভালোবেসে ফেলেছে লক্ষ্মিণি। সব খোয়ানো রাতজাগা মেয়েটা সুরেনকে ভালোবেসেছে। সুরেন জানতে পারল না।

কিন্তু এই অনুভূতি লক্ষ্মিণি যেদিন সম্পূর্ণ উপলব্ধি করল সেদিন থেকে আর একটা জিনিষও স্পষ্ট হল ওর কাছে। ওর মনে হল, ভালোবাসা সব হারানো জিনিষকে ফিরিয়ে দেয়। ফুলটাকে ধরিতে পারে, কপালে সিঁদুর পরে লক্ষ্মী স্ত্রী হবার প্রলোভনে প্রলুব্ধ করতে পারে। সংসার স্বীকার করুক আর নাই করুক। তাই আবার নতুন করে লক্ষ্মিণির ক্ষতবিক্ষত নিজের দেহটার ওপরে মায়া জন্মাল। শরম, সঙ্কোচ সব ফিরে এলো একে একে। ভাল লাগল না সদাশিবের সঙ্গে এমনি নির্লজ্জ আশ্রয়। এমনি করে ওর আপন জনের জন্য সুযোগ গ্রহণ। সরে এলো লক্ষ্মিণি। আড়ালে সরে এলো সদাশিবের কাছ থেকে। কিন্তু সদাশিব হঠাৎ বুঝে উঠতে পারল না মেয়েটা কেন এমন টানা পোড়েন চালায়। সে ভাবল, আরো মুঠোর মধ্যে চাই লক্ষ্মিণিকে, একেবারে হাতের মুঠোয়।

একটা কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিল লক্ষ্মিণি।

সুরেনের বাড়ী থেকে চিঠি এসেছে, কি যেন দরকার। সদাশিবের কাছে আগাম কিছু টাকা চেয়েছিল, পায়নি। সদাশিব বলেছে, উপরি খরচাত করবার মত পয়সা ওর নেই। লক্ষ্মিণি শুনেছিল আড়াল থেকে। বুঝতে পেরেছিল হয়ত কিছু। মনে মনে ভাবল ওর ওই কোণের ঘরের স্যুটকেসের তলায় যা আছে, যে কটা টাকা ও জমিয়েছে, কাল ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে তুলে দেবে সুরেনের হাতে। ঘুম আসছিল চোখের পাতায়। আর স্পষ্ট হয়ে উঠছিল কালকের ভোর—সুরেনের হাতে তুলে দেওয়া ওর সঞ্চয়ের টাকা কটা। নম্র চোখ, সলজ্জ গ্রহণ। ঘুম নেমে আসছিল লক্ষ্মিণির চোখের পাতায়। কোণের ঘরের স্যুটকেসটা জানালার ফাঁক দিয়ে এখানে শুয়ে শুয়েও দেখা যায়।

লক্ষিমণি স্বপ্ন দেখছে, দেখছে সুরেন ওর ইউনিফর্মটা পরে টেবিলে টেবিলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আস্তে আস্তে সুরেনের চেহারা পালটাতে লাগল। ক্রমোন্নতির ধাপে ধাপে অভাবের যন্ত্রণা থেকে উঠে দাঁড়াল সুরেন। ঝকঝকে পোষাক, চেহারার উজ্জলতা, লক্ষিমণি, দেখল ও গিয়ে আস্তে আস্তে সুরেনের পাশে এয়োতীর মত দাঁড়িয়েছে। কপালের কুমকুমের টিপটা অনুভব করছে মনে মনে। ক্রমশ তন্ময় হয়ে গেল লক্ষিমণি। স্বপ্নের আড়ালে ডুবে গেল।

লক্ষিমণি দেখল সদাশিব ওর টাকার থলি আসলে বসে আছে। ঝনঝন শব্দে টাকাগুলো বেজে চলেছে ওর কানের ভিতর। দেখতে দেখতে লক্ষিমণির মুখে এক তীব্র হিংসা খেলে গেল। শয়তানটাকে শেষ করতে হবে। ওর ওই বীভৎস চেহারা, অজস্র টাকা—অসহ্য। লক্ষিমণির মনে হল ওর কথা জানতে পেরে শয়তানটা হাসছে। ডাকছে ইংগিতে, বলছে, কি যেন বলতে যাচ্ছে। তার আগেই লক্ষিমণি মাছ কোটা বঁটিটা দিয়ে ওর কপালের মাঝখানে কোপ বসিয়ে দিয়েছে। স্বপ্ন সব ভেঙে গেছে। টাকার থলিগুলো ভেসে যাচ্ছে। ঝাঁজনার ঝনঝন শব্দ থেমে গেছে। আর ওই কিনারায় সুরেন দাঁড়িয়ে ওর জন্য অপেক্ষা করছে। চীৎকার করে উঠল লক্ষিমণি।

সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করল, কে যেন তার মাজায় পা দিয়ে লাথি মারছে। চোখ মুছতে মুছতে উঠে বসল লক্ষিমণি, দেখল ভোর হয়ে গেছে। অসহ্য আঁচল টানতে গেল, যেন কেউ লাথি মারছে না, তার পরিবর্তে সদাশিব ওর শাড়ীর আঁচলটা ধরে টানছে। প্রায় অসহ্য বুকের ওপর থেকে শাড়ীর আবরণটুকু শরমের প্রায় শেষ গণ্ডীতে এসে গেছে।

ঝটিকার বেগে লক্ষিমণি আঁচলটায় টান দিল। কিন্তু বজ্রমুষ্টি শিথিল হল না সদাশিবের। লক্ষিমণির চোখে যেন আগুন জ্বলছে। জীবনে প্রথম অপমানিত হবার দিন যেমন চোখ দুটো জ্বলে উঠেছিল, তেমনি চোখ দুটো জ্বলে উঠছে। হঠাৎ চোখদুটো গিয়ে ঠেকল কোণের ঘরের প্রায়ান্ধকার যায়গাটুকুতে। একটি স্পষ্ট অবয়ব, মানুষের একটা শরীর ওই অন্ধকারে কি যেন খুঁজছে। স্যুটকেসের ঢাকনির তলা থেকে কি যেন তুলে নিল হাতের মুঠোয়। ভোরের আলোয় কোণের ঘরের অন্ধকারটুকু প্রায় সরে গেছে। ততক্ষণে গ্রথ বেশবাস লুটিয়ে পড়েছে মেঝেয়। লক্ষিমণির যেন চেতনা নেই। সদাশিবের চোখে জয়ের অপার আনন্দ লক্ষিমণি দেখতে পেলনা। লক্ষিমণির মাথাটা ঝিম ঝিম করে উঠল। ভোরের রং তখন কুয়াশার মত আবছা হয়ে গেছে কলজের পাশটা যেন ব্যথায় শুকিয়ে উঠল লক্ষিমণির।

স্পষ্ট চেহারাটা সরে গেল আস্তে আস্তে।

প্রতিরক্ষা চায় শক্তি
শক্তির উৎস পরিকল্পিত উন্নয়ন।

: গল্প

প্রচ্ছদের অন্তরালে

বরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায়

সন্তোনকে আমি অনেকদিন থেকেই চিনি। সেই স্কুলে-পড়া বয়স থেকে। এক সাথেই পড়তাম আমরা। আমাদের দু'জনের মধ্যে অন্তরঙ্গতা ছিলো যথেষ্ট। ক্লাসের অনেকে এবং কোন কোন শিক্ষকও বলতেন, 'মাণিক জোড়'। স্কুলে ভালো ছেলে বলে কোনদিনই আমরা পরিচিত ছিলাম না। তবু কারো কারো বিশ্বাস ছিলো, পড়াশুনা করলে আমরা উন্নতি করতে পারতাম। কিন্তু সেদিকে আমাদের আগ্রহ যতখানি না ছিলো, তার চেয়ে বেশী ছিলো কতক্ষণে স্কুল ছুটি হয়ে আমরা ক্লাসের লাষ্ট বেঞ্চিটাতে মিলিত হবো। প্রকৃতপক্ষে সারাটা দিন মাস এবং গোটা একটা বছর স্কুলে কি হয়েছে তার কোন খবর আমাদের কানে আসতো না। কিন্তু তবুও বছরের শেষে কেমন করে যেন আমরা পাশ ঠিক করতাম। হয়তো এটাই কারও কারও বিশ্বাসের কারণ, আমাদের মাথা আছে।

সন্তোন এখন সরকারী দপ্তরে কলম পেষে। আর আমি ঠিক কলমপেষা না হলেও তেমনি কিছু একটা করি। সন্তোনের সাথে কিছুদিন আগে পর্যন্ত আমার বিশেষ একটা দেখা সাক্ষাত হতো না। আমাদের কেউই অপরজনের ব্যবহারিক কিংবা মানসিক জীবনের কোন খবরাখবর রাখতাম না। মানসিক জীবন এজন্য বলছি, স্কুলের সময় ঠিক বুঝতে না পারলেও এখন আমাদের উভয়েই অনুভব করি, ছোটবেলা থেকেই আমাদের এই পরিচিত পৃথিবীর সাথে আমাদের মনের বিশেষ কোন মিল ছিলো না। বরং কল্পনার পৃথিবীতে বিচরণ করতেই আমরা ভালোবাসি। হয়তো সেই কারণেই সন্তোন তার কর্মজীবনকে মেনে নিতে পারেনি। নেহাৎ না হলে নয়, তাই ধরে রেখেছে মাত্র।

সেদিন হঠাৎ দেখা হতে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি করছিস্ রে আজকাল?"

বললো, "সোয়াশো টাকার বদলে গাধার খাটুনি খাটছি। কেন, তুই জানতিস না?"

"খবর না দিলে আর কি করে জানবো বল?"

"তা ঠিক। তোর খবর কি? এখনও কি সেই বাজারে বাজারে ঘুরতে হয় নাকি?"

"হাঁ। এখন-ও।"

"যাক্‌গে। তুই একদিন আমার বাড়ী আয় না। রাস্তায় দাঁড়িয়ে আর কতক্ষণ কথা বলবো।"

সম্মতি দিলাম যাবো বলে।

"যে কোনদিন সন্ধ্যার পর গেলেই পাবি, আমি বাড়ীতেই থাকবো।"

কথা বলতে বলতেই ও বাড়ীর দিকে পা বাড়ালো। সন্তোন চিরদিনই বেশ রোগা। আজ মনে হলো যেন আরও রোগা হয়েছে। ওর সেই একই পোষাক ধুতি আর শার্ট। আজ যেন একটু অন্যরকম দেখালো বলে মনে হলো।

সেদিন আমার কোন কাজ ছিলো না। সাধারণতঃ কোনদিনই থাকে না। একা একা ঘুরে ঘুরে আর কখনো বা আড্ডা দিয়ে কাটাই। ভাবলাম, সন্তোনের বাড়ীই আজ যাওয়া যেতে পারে।

সন্ধ্যার পর যখন পৌঁছলাম, ও তখন বাইরের ঘরেই ছিলো। আমি ঢুকতেই কতকগুলো কাগজপত্র ভাঁজ করে

একপাশে সরিয়ে রেখে বললো, "আয় বোস। আজকেই আসবি ভাবিনি।"

যদিও সত্যেনের কাছে আমার কোন সঙ্কোচ ছিলো না, তবু বললাম, "তোর কোন অসুবিধা করলাম নাতো?"

'আরে না না। একটা গল্প কপি করছিলাম। তা পরে করলেও চলবে।"

সত্যেন গল্প লেখে জানতাম না। স্কুলে পড়তে ওকে মাঝে মাঝে গীতি কবিতা লিখতে দেখেছি। বললাম, "গল্প লিখিস তুই, জানতাম নাতো।

"এটা ছাড়া আমার আর সব খবর রাখিস বুঝি? অথচ তুই লিখিস, একথা আমি জানি।"

ওর গীতি কবিতা লেখার মতোই আমারও একটা খেয়াল ছিলো। মাঝে মাঝে ছেলেমানুষি গল্প লিখতাম। সেগুলো মোটেই গল্প বলে স্বীকৃতি পাওয়ার মতো কিছু নয়। তবু আনন্দ পেতাম। বললাম, "আমার অনেক খবরই রাখিস দেখছি। তবে জেনে রাখ, ও ছেলেমানুষিতে আজকাল আর কোন প্রেরণা পাই না।"

"ছেলেমানুষি।" ও বেশ অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চাইলো। "আজ তুই যৌকে ছেলেমানুষি বলছিস, সেটাই একদিন আলোড়ন তুলতে পারে, তা জানিস? পাগলামি করে লেখাটা ছাড়িস না।"

কথা বলতে বলতে ও খাট ছেড়ে দেওয়াল আলমারিটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। কতকগুলো নানান আকারের পত্রিকা বার করে আনলো।

"জানিস, তুই খবরও রাখতিস না আমি লিখি, অথচ শুনলে অবাক হবি, এই পত্রিকার সবগুলোতেই আমার একটা করে লেখা রয়েছে। এ থেকে আমি কিছু কিছু রোজগারও করছি।"

এবার আমি সত্যি অবাক হলাম। "তুই রীতিমত একজন সাহিত্যিক হয়ে উঠেছিস, অথচ আমি তোর একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়েও কিছু জানি না। সত্যি, আমি শুধু অবাকই হচ্ছি না, লজ্জিতও।"

"সে যাই হোক, বইগুলো তুই পড়ে দেখিস।....লেখাটা কখনও ছাড়িস না। লিখে যা, দেখবি হাত একদিন পরিণত হবেই, তখন প্রকাশ করা কিছু না।"

ওর কথা শুনতে শুনতে আর বইগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে ক্রমশঃ যেন সত্যেনের ওপর বিস্ময় আর শ্রদ্ধা আমার বাড়ছে বলে মনে হলো। কেন না, আমার ধারণা ছিলো, ছাপার অক্ষরে নিজের নাম এবং লেখা দেখতে পাওয়া বেশ ভাগ্যের কথা। এক মুহূর্তেই ওকে সাহিত্যিক বলে মেনে নিতে কুণ্ঠা হলো না। বললাম, "আমার খাতাটা তোকে দেবো। প্লিজ্ একটু দেখে দিস না ঠিক আছে কি না। তুই যদি আমার একটু সাহায্য করিস, হয়তো আমিও লিখতে পারবো।"

"নিশ্চয় দেবো। কাল নিয়ে আসিস। তোকে আমি কতকগুলো ঠিকানা দেবো। লিখবি আর সেখানে পাঠিয়ে দিবি। একদিনে হবে না, কিন্তু প্রকাশ একদিন হবেই।"

সেদিন রাত্রেই বাড়ী ফিরে সত্যেনের গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ পড়লাম। পড়ে মনে হলো ও আমার চেয়ে অনেক ভালো লেখে। ওর লেখার ধরণই আলাদা। ওর অভিজ্ঞতা, চিন্তাধারা এত উন্নত এবং ভিন্ন, যে অনেক লেখা আমি বুঝতে পারলাম না।

পরদিন আমাদের দেখা হতে ও জিজ্ঞাসা করলো, "লেখা কেমন লাগলো?"

বললাম, "আমি অনেক পিছিয়ে রয়েছি, হয়তো তাই ঠিক ধরতে পারলাম না। তবে এটা বুঝেছি, এগুলো নিছক গল্পই নয় তার চেয়ে কিছু বেশী।"

"ঠিকই বলেছিস তুই। চিরাচরিত নিয়মে সেই ব্যাঙ ভোজনের পর বিছানায় শুয়ে রোমাঞ্চ উপন্যাস চোখ বুজিয়ে যাওয়ার যুগ আর নেই। বিশেষতঃ তরুণ পাঠকবর্গের ছোট-

গল্প এবং কবিতা সকলের জন্য নয়। এগুলো বুঝতে হলে যথেষ্ট পড়াশুনা দরকার। সাহিত্যে অনেক নতুন দিক নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে, বিষয়বস্তুর পরিবর্তন হয়েছে। এখনকার সাহিত্য বুঝতে হলে আধুনিক কবিতা পড়তে হবে। প্রতীক, চিত্রকল্প, স্বরবৃত্ত রীতি-এসবের সাথে পরিচিত হতে হবে। এ সবক্ত বিষয়ে কোন আইডিয়া না থাকলে এখনকার লেখা তো ঠিক বোঝা যাবে না।"

আমার মনে হলো, আমি কোন সাহিত্য সভায় প্রখ্যাত কোন সাহিত্যিকের বক্তৃতা শুনছি। সত্যেন এতো কথা কবে শিখলো, কোত্থেকে জানলো আমি ভেবে কূল কিনারা পাচ্ছিলাম না। ও তখনও একনাগাড়ে বলে যাচ্ছে—

"আপাতঃদৃষ্টিতে অনেক সময় উদীয়মান তরুণ সাহিত্যিকদের লেখা হয়তো দুর্বোধ্য ঠেকবে। অনেক সময় দু'বার তিনবার কিংবা দশবার পড়েও গল্পের মূল সুরকে খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু তার মানেই এ নয় যে এ সমস্ত গল্পের কোন বক্তব্য নেই অথবা অর্থহীন। আসল কথা আধুনিক ছোটগল্প অশিক্ষিত কিংবা অল্পশিক্ষিতদের জন্য নয়। এ লেখা বুঝতে হলে চাই যথেষ্ট জ্ঞান এবং মানুষের প্রতি মানুষের সহানুভূতি।"

"অর্থাৎ? বুঝলাম মাতো ঠিক।"

"যেমন ধর, কিছু কিছু গল্প লেখা হয় চেতনা প্রবাহের ওপর ভিত্তি করে। যেমন "আমার আকাশের রং" গল্পটা। পড়েছিস তো?"

মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম।

"গল্পটার মূল সুর ধরতে পেরেছিস্ কিনা জানিনা। তবে আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। —একটা কথাচিত্ত ঘরের শিক্ষিত বেকার যুবক। আমার গল্পে যেমন 'অনিমেষ'। প্রকৃতপক্ষে সাধারণভাবে চোখ বুলিয়ে গেলে তুই এ গল্পের কোন অর্থ নাও খুঁজে পেতে পারিস। এবং তোর হয়তো ভালোও লাগবে না, যেহেতু কোন ঘটনা নেই, কোন সংলাপ নেই, কোন ড্রামেটিক্যাল এ্যাকসান নেই। আছে শুধু ছেলেটার বেকার মনের একটা যন্ত্রণার ছবি। সেটা প্রকাশ পেয়েছে তার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম চিন্তাধারার মধ্য দিয়ে, চেতনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে। এ যন্ত্রণাকে পরিষ্কার করে ফুটিয়ে তুলতে ব্যবহার করা হয়েছে প্রতীক, চিত্রকল্প। সেটা ঠিক মতো বুঝতে পারলে পাঠক একটা জিনিষ আবিষ্কার করবে হয়তো, যে চরিত্রটি কোন কোন ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে। এবং সত্যিই তাই। কিন্তু ভুললে চলবে না, যে এমন চরিত্রই সত্য, এটাই বাস্তব। কেননা আজকের দিনে ঐ পরিস্থিতির অধিকাংশ যুবকের মনের চিন্তাধারাই এরকম। চেষ্টা করলে সেটা অনুভব করা যায়। আমি অনুভব করেছি, তাই 'অনিমেষ' এই চরিত্রের রিপ্রেজেন্টেশনে আমি সমাজের এদিকটার একটা অনুভূতিকে তুলে ধরেছি। এখন এ গল্পকে বুঝতে হলে চাই ধৈর্য, যেহেতু কোন সংলাপ, ঘটনা অথবা নাটকীয় অবদান নেই। চাই শিক্ষা, কেননা চিরকালের সেই সহজ সরল আঙ্গিকে এ গল্প লেখা হয় নি। আর চাই মানুষ ও তার মন সম্পর্কে জ্ঞান, শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি। নচেৎ অনিমেষকে মেনে নেওয়া যাবে না, আসবে বিতৃষ্ণা।"

মাথা নেড়ে সমর্থন করলাম ওর কথায়। এরপর একটু চুপ করে থেকে ও জিজ্ঞাসা করলো, "চা খাবি।"

"তা খেতে পারি।" আমাকে এক মিনিট বসতে বলে ও ভেতরে গেলো। মনে মনে ভাবলাম, অনেক কিছু শিখেছে এর মধ্যে সত্যেন। ওর দেওয়াল আলমারিটায় তিনটে তাক ভরতি বইয়ে ঠাসা। নিশ্চয় ওসমস্ত বই ও পড়েছে। অনর্থক নিজে সময় নষ্ট করি বলে অনুতাপ হলো। ইচ্ছে করলে আমিও ওর মতো পড়াশুনা নিয়ে সময় কাটাতে পারি। একটু পরেই সত্যেন দু'কাপ চা নিয়ে এসে হাজির হলো। বললো, "তৈরীই হচ্ছিলো। ঠিক সময়ে এসেছিস তুই।"

এর পর নিঃশব্দে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে চলেছি।

বলার মতো কিছু নেই, কেননা সাহিত্যে কিছু বলার ক্ষমতা আমার কোনদিনই নেই। আর কেন জানিনা, সত্যেনকে আগের মতো সহজ ভেবে যা খুশি তাই বলতে সঙ্কোচ হচ্ছিলো।

"তুই আধুনিক কবিতা পড়িস?" নীরবতা ভাঙলো ও।

"চোখে পড়লে মাঝে মাঝে পড়ি বটে, কিন্তু কিছু বুঝিনা।"

"তোর দোষ নেই, তবুও পড়া বন্ধ করিস না। আজে-বাজে উপন্যাস না পড়ে আধুনিক সাহিত্য কবিতা, চিত্রকলা এ সমস্ত বিষয়ের ওপর প্রবন্ধ পড়, দেখবি তখন বুঝতে কষ্ট হবে না। বিশেষতঃ ভাষার অনেক উন্নতি হবে, নতুন নতুন বিষয়বস্তু খুঁজে পাবি। জানিস, আজকাল অনেক ছোট গল্প, কল্পা রচনাকে আধুনিক কবিতার সাথে তুলনা করা চলে। কখন কখন মনে হয়, বুঝি এ গল্প নয়, কবিতা।"

"আচ্ছা, এখনকার সাহিত্যে নোংরামির দিকটা বড় বেশী দেখা যাচ্ছে। এ বিষয়ে লেখকরা একটু সংযত হলে ভালো হয় না?"

"তোর এটা একটা যুক্তি বটে। তবে এখানেও একটা কথা আছে। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালী, সুখ, দুঃখ, সমস্যার রূপ যা ছিলো, গভীর ভাবে চিন্তা করলে বোঝা যাবে আজ ঠিক তা নেই। আজকের মানুষের আনন্দের প্রকাশটা যেমন উগ্র, দুঃখের দিক দেখার দিকটাও তেমনি নগ্ন। কোন কুৎসিত অবস্থাকে সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করলে তার গুরুত্ব কমে যায়। তুই যা বলতে চাইছিস, বোঝাতে চাইছিস, তা পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ পাবে না। সত্যকে মিথ্যা দিয়ে ঢাকবার চেষ্টা করলে হয়তো সেটা সাময়িক মানুষের মনে দাগ কাটতে পারে, কিন্তু স্থায়িত্ব লাভ করে না। বিশেষতঃ সাহিত্যে কিছু ঢাকবার কিছু লুকোবার চেষ্টা করা উচিৎ নয়। এবং সৎ সাহিত্যিক তা করেনও না। তুই পড়েছিস কিনা জানি না, পৃথিবী বিখ্যাত ভাস্কর রোঁদ্যার একটা কথা আছে, "আর্টে কুৎসিত বলে কিছু নেই, সবই সুন্দর। কুৎসিত শুধু মিথ্যাকে সত্য বলে অথবা সত্যকে মিথ্যা বলে চালাবার অপচেষ্টা।"

অনেকক্ষণ আগেই চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিলো। একটা সিগারেট ধরালাম। সত্যেন ধূমপান করে না জানতাম। কিন্তু ও হাত বাড়াতেই আমি অবাক হলাম। ও বললো, "সিগারেটে মাঝাটা বেশ খোলে। সম্প্রতি ধরেছি।" এগিয়ে দিলাম একটা। অগ্নিসংযোগ করে ও বললো, "আমার এক বন্ধু কি বলে জানিস? আমরা সাহিত্যিক না হয়ে মনোবিজ্ঞানী হলাম না কেন? যেহেতু আধুনিক লেখকরা ঘটনা বাদ দিয়ে বিশেষ কোন একটা ভাব কিংবা অনুভূতিকে বিশ্লেষণ করতেই ব্যস্ত। হয়তো একথা ঠিক। তবে প্রত্যেকটি মানুষের প্রতি মানুষের সহানুভূতি এবং সমবেদনা নেই বলে নিজেরই মনের খবর মানুষ রাখে না বলে পৃথিবীতে এত দুঃখ, দ্বেষ, হানাহানি, ঠকবাজি। আমরা সেদিকটা যারা উপলব্ধি করি, তারাই সাহিত্য, শিল্প, কবিতার মাধ্যমে সেই সমস্যাগুলোই মানুষের সামনে তুলে ধরি। পরিত্রাণের পথ দেখাই। আমাদের মন স্বভাবতঃই দরদী, তাই মানুষের গোপন মনের জ্বালা, যন্ত্রণা সুখ, দুঃখ খুঁজে বেড়াই। আমাদের ভুললে চলবে না, যে দেহ নিয়ে যারা ব্যবসা করে, তারাও মানুষ ঠিক আমাদেরই মত মানুষ। মদখোর মাতালেরও আমাদেরই মতো সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো রয়েছে। তাদের নিজেদের চিন্তাধারায় একটা জগৎ আছে, সেখানে তারাও মানুষ। একজন খুনীকে আমরা কিছুতেই অপরাধী ভাবতে পারি না, কেননা খুন করাটাই হয়তো তার কোন যন্ত্রনার প্রকাশ অথবা মুক্তি।

এদের সংখ্যাই আজকের দিনে বেশী। অথচ এদের সম্বন্ধে মানুষের মনে কোন সহানুভূতি নেই, শুধু আমাদের মতো কয়েকজন শিল্পীর কাছে ছাড়া। তাই আমাদের কলম দিয়ে যে লেখা বার হয়, তাতে আলোর চেয়ে অন্ধকারের বর্ণনা

বেশী। স্থূল, স্বাভাবিক মানুষ ছেড়ে, বিকৃত, অসামাজিক চরিত্রগুলোকে প্রকাশ করার চেষ্টা চলছে। কেননা, গভীর ভাবে চিন্তা করে অনুভূতি থেকে বুঝতে পারি, এই সমস্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আবেগ এবং যন্ত্রণাগুলো আমাদের অবচেতন মনে ক্রিয়া করে।"

সিগারেটটায় শেষটান দিয়ে ওটা জানালার বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললো, "থাকগে। একটানা অনেকক্ষণ বকে গেলাম। তোর হয়তো মাথা ধরে গেলো।"

"না। মাথা ধরে নি। তবে একটা কথা বুঝতে পারছি না, এতো সূক্ষ্ম অভিজ্ঞতাগুলো তোর হলো কোত্থেকে। তোকে কারও সাথে মিশতেও দেখিনা, অফিস, ছাড়া সব সময় বাড়ীতেই তো রয়েছিস।"

উত্তরে ও শুধু একটু মুচকি হাসলো। এরপর আর বেশীক্ষণ ছিলাম না, খাতাটা দিয়ে চলে এসেছিলাম।

মাঝে মাঝে গিয়েছি ওর কাছে। যখনি যেতাম, দেখতাম ও লিখছে আর নয় কোন পত্রিকার ওপর চোখ ও মন বুলোচ্ছে। আমি গেলে আমাকে উৎসাহ দেয় লেখা নিয়ে। মাঝে মাঝে বলে "বিষয়বস্তু পাল্টে ফেল। একটা ছেলে আর মেয়ের প্যান প্যানানি এ যুগে অচল। মানুষকে জানতে চিনতে চেষ্টা কর। চেনা মানুষ দিয়ে গল্প লেখ—সেটা তবু কিছু কাজের হবে। আর মনে রাখবি, মানুষকে যত ক্ষমা করতে পারবি, লেখায় তত প্রাণ আসবে।"

সত্যেনের উৎসাহে আজকাল আমিও লিখি। সম্প্রতি আমারও দু'একখানা করে লেখা প্রকাশ হচ্ছে। চেষ্টা করি ওর উপদেশগুলো মেনে চলতে, কিন্তু সব সময় পারি না। কেন জানি না মাঝে মাঝে আজকাল মনে হয় ও যেন কেমন যন্ত্র হয়ে যাচ্ছে। দিনরাত শুধু প্রবন্ধ আর কবিতা পড়ে। কেন যেন মনে হয়, যতখানি আনন্দ পায় তার চেয়ে বেশী পড়ে কিছু লিখবে বলে। এক এক সময় ভাবি ওর অনুভূতি এবং অভিজ্ঞতাগুলো হয়তো বই থেকেই সংগ্রহ করা। তবে যাই হোক, ওর সাহচর্যে আমার অনেক উপকার হয়েছে।

সেদিন আমার অফিসে ও হঠাৎ এসে হাজির। বসতে বলায় বললো, "সময় নেই। আজ সাহিত্য মহলে একটা সভা হবে। এই তোর কার্ড, আসবি কিন্তু সময় মতো।" কার্ডটা আমায় দিয়ে ও চলে গেলো, দাঁড়ালো না এক মুহূর্ত।

নির্দিষ্ট সময়ের কিছু পরে আমি যখন হলে ঢুকেছি, সভা তখন আরম্ভ হয়ে গেছে। সত্যেনই বক্তৃতা দিচ্ছে তখন। অফিসে বসেই কার্ডে অনুষ্ঠান সূচী দেখেছিলাম। অনেকের মতোই আমিও চেয়ে রয়েছি ষ্টেজের দিকে, কিন্তু মন নেই। ভাবছিলাম সত্যেন বেশ ভালোরকম প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। অনেক খ্যাতনামা সাহিত্যিক যোগদান করেছেন এ সভায়। সবলেই সত্যেনকে চিনবেন, জানবেন……।

সভা শেষ হতে বাইরে এলাম। সভাপতি কমলবাবুর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলো সত্যেন। নমস্কার করলাম। অন্যান্য সকলের সাথে পরিচয় করবার ইচ্ছা ছিলো, এমন সময় কোত্থেকে আব্বাস এসে পড়লো। সত্যেনের পিঠ চাপড়ে বললো, "বেড়ে বলেছিস মাইরি তোর তকরিরটা ভালো। কি ছিলিস আর কি হয়েছিস। আমাদের শালা ও বাল গিলেই সব গেলো।"

দাঁড়ালো না আব্বাস। টলতে টলতে আবার চলে গেলো। দেখলাম সত্যেন কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছে অনেকক্ষণ চুপ্ হয়ে থাকার পর কমলবাবু বললেন "ছেলেটি কে?" আমি উত্তর দিতে যাচ্ছিলাম, সত্যেন থামিয়ে দিলো। বললো "কোন দাতাল হবে বোধহয়, চিনি না।" তারপর মুখ ফিরিয়ে ফিস ফিস করে আমায় বললো, "এদের জন্য প্রেসটিজ রাখা দায়।"

রাত হয়েছিলো, বাড়ীর দিকে পা বাড়ালাম।—

DIPTI

more than a household name

The Trade name Dipti is a hall mark of quality. Dipti Lanterns can easily be claimed as one of the most popular household articles throughout India. Khas Janata Kerosene Cookers have earned great popularity as indispensable household utility : simple in operation, sturdy in construction and remarkable in performance, these Kerosene Wick Cookers help you save time and fuel.

Dipti enamel wares - proud addition to the existing range of Dipti products.

THE ORIENTAL METAL INDUSTRIES PRIVATE LTD.

77, Bowbazar Street, Calcutta-12.

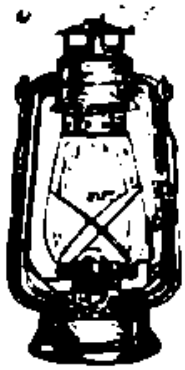

DIPTI LANTERNS

ENAMEL WARES

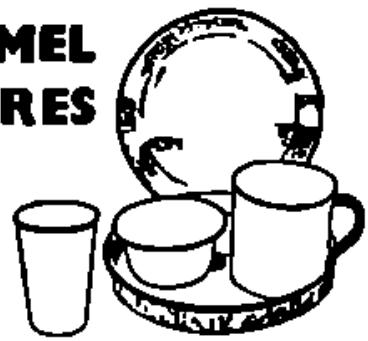

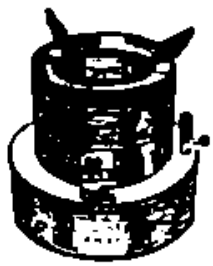

KHAS JANATA

Kalpana pm2/A

অমর রণশিল্পী নিকোলাই অস্ত্রভস্কি

অমল হালদার

১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ২৯শে সেপ্টেম্বর, রোভনো অঞ্চলে অস্ত্রভস্কি জেলার ভিসিইয়া গ্রামে নিকোলাই আলেক্সেভিচ অস্ত্রভস্কির জন্ম। তাঁর বাবা এক ভাটিখানার কাজ করে যে রোজগার করতেন তাতে তাঁদের সংসার কোনমতেই চলতো না। ফলে তাঁর মাকে এক বড়লোকের বাড়িতে রাঁধুনির কাজ নিতে হয়। তাঁর দাদা দমিত্রি আলেকসেভিচ অস্ত্রভস্কি ছিল রেলকারখানার মিস্ত্রি। বোন একতারিনিনা আলেক্সেভনা অস্ত্রভস্কায়া ছিল তাঁর ছোটবেলাকার একমাত্র খেলার সঙ্গী। শেপেতোভকায় অস্ত্রভস্কি পরিবার চলে আসার পর নিকোলাই ভর্তি হন স্কুল ; কিন্তু এই মেধাবী ছাত্রটির নানা প্রশ্নে বিরক্ত হয়ে বাইবেল শিক্ষক তাঁকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেন। তাই বাধ্য হয়ে বারো বছরের ছেলেটিকে কাজ নিতে হয় রাঁধুনে বয়ের। আর এই সময় কিশোর নিকোলাই অস্ত্রভস্কি ইতালির জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের নেতা গ্যারিবলদির জীবন কাহিনী অবলম্বনে লিখিত ই-ডেরেনিক-এর উপন্যাস "স্যাভাস্টাই" পড়ে নিজেকে গ্যারিবলদির মত গড়ে তোলার জন্য স্বপ্ন দেখতে থাকে। আর তাই মাত্র পনেরো বছর বয়সেই তিনি বিখ্যাত কোতোভস্কি বাহিনীতে যোগ দিয়ে মৃত্যুযুদ্ধের সংগ্রামে লিপ্ত হন। এই সময় তিনি কিছুকাল কাজ করেন একটিবিদ্যুৎ সরবরাহ কারখানায়, জনৈক ইলেকট্রিক মিস্ত্রির সহকারী হিসাবে। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে শেপেতোভকায় পেত্লুরা বাহিনী ও ১৯২০ খৃষ্টাব্দে পোলাণ্ডের অভিজাত সম্প্রদায়ের "বেতপোল" বাহিনীর বিরুদ্ধে তাঁর বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম চিরস্মরণীয়। এর জন্যে তিনি "প্রথম ঘোড়সওয়ার" বাহিনীর গৌরব অর্জন করেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে অস্ত্রভস্কি কমসোমলের সভ্য হন। তিনি কমসোমলের আদি সভ্যদের একজন বলে গর্ব করতেন। লড়াইয়ের সময়ে অস্ত্রভস্কি তাঁর ডান চোখের দৃষ্টি হারান। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে কমসোমলের সংগঠনের নেতৃত্ব নিয়ে তিনি কিয়েভ-এ আসেন। কিন্তু অশেষ দুঃখ সহ্য করেও দেশ গঠনের কাজ থেকে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে অস্ত্রভস্কিকে দূরে সরে যেতে হল তাঁর অসুস্থতার জন্যে। পিঠে যুদ্ধের ক্ষত, টাইফয়েড ও পিঠে বাতজনিত কারণে এই সময় অস্ত্রভস্কিকে খারকোভ, ইয়েভপাতোরিয়া, শ্বাভিয়ানস্ক, সক্ভা, সোচি বিভিন্ন অঞ্চলের স্বাস্থ্য নিবাসে থাকতে হয়। যদিও অস্ত্রভস্কি মনে-প্রাণে এইভাবে অবসর যাপন করতে চাইতেন না এই অসুস্থাবস্থায় ; 'সময় নষ্ট' না করে 'বই আর বই' পড়ে শেষ করতে লাগলেন।

মতোরায়-এর পোর্ট-লাইব্রেরীর দমিত্রি পাভলোভিচ খোরুঝেনকো তাঁর স্মৃতিতে বলেছেন, এমন কি লাইব্রেরীর নিয়মকানুনের জলাঞ্জলি দিয়ে তাঁকে বই দেওয়া হত। কোন কোন সময় লাইব্রেরীর জন্যে কোন নতুন বই সরাসরি তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হত খাওয়ার বইয়ের তালিকাভুক্ত হওয়ার আগেই। এই সময় পুশকিন, লার্মেন্তভ, গোগলে, জোলা, ভ্রেইজার জ্যাকলণ্ডন, ভিকতর হুগো, বারবুস, বলজাক-গোর্কী, ওলস্তয়, চেখভ, শোলোখভ, সেরাফিমোভিচ, ফুরমানভ, কাদায়েভ কোরেলেঙ্কো এবং বহু বিদেশী চিরায়ত সাহিত্যের মধ্যে অস্ত্রভস্কি ডুবে থাকতেন। বার বার করে পড়তেন এই সব মহৎ লেখকদের গ্রন্থগুলো। যাতে সময় নষ্ট হয়ে না যেতে পারে তার জন্যে বিশেষ ধরণের রুটিন করেছিলেন

প্রতিদিনকার। তাঁর এই রুটিনের মধ্যে একটি শিরোনাম ছিল : নষ্ট সময়। আর ঐ শিরোনামার নিচে স্থান পেত খাবারের সময় বা গল্প করার সময়টা। এ সময় থেকে অস্ত্রভ্স্কিকে ব্যাধি ধীরে ধীরে গ্রাস করতে শুরু করে। পেটেরাতজনিত কারণে অন্ত্র-প্রত্যঙ্গে অসাড়তা দেখা গেল এবং ১৯২৬ সালে সম্পূর্ণভাবে তাঁকে শয্যা নিতে হল। এ-সময় থেকে অস্ত্রভস্কি লেখার কথা ভাবতে শুরু করেন। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে ২২শে অক্টোবর অস্ত্রভস্কি বন্ধু পিওতর নিকোলায়েভিচ পাভিকভকে লেখেন : আমি সত্যই লেখার কথা ভাবছি। লেখাটা হবে অনেকটা ঐতিহাসিক-বীরত্ব গাঁথার গিরিক এবং ঐ সময় লেখক অস্ত্রভস্কি তাঁর প্রথম লেখা 'একটি' গল্প শুরু করেন। কাহিনী ছিল : কোস্তোভস্কি ও তাঁর বাহিনী। অর্থাৎ গৃহযুদ্ধের বীরদের সম্পর্কে লেখা-ই তাঁর মূল উদ্দেশ্য। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে লেখাটা শেষ হয়। আর এই সময় অস্ত্রভস্কির দৈনিক রুটিনের শিরোনামার আর একটি অংশ নিল 'লেখা'। লেখাটি শেষ হবার পর অবশ্যই তাঁর বন্ধুদের কাছে অস্ত্রভস্কি লেখাটি পাঠিয়ে দিলেন। তাঁর বন্ধুরা তাঁদের মতামতসহ লেখাটি আবার অস্ত্রভস্কির কাছে পাঠান ; কিন্তু ডাকের গোলমালে লেখাটি খোয়া যায়। লেখাটি হারিয়ে অস্ত্রভস্কি মানসিক দিক থেকে কি প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিলেন তা তাঁর স্ত্রী রাইসার লেখা থেকে জানা যায়। রাইসা লিখেছেন, নিকোলাই লেখা হারিয়ে শোকে আকুল হয়ে পড়ল। এবং ফলে তাঁকে অসুখ এমনভাবে আক্রমণ করল যে, অস্ত্রভস্কির আর বিছানা থেকে ওঠার সমস্ত শক্তি অন্তর্হিত হল। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে অস্ত্রভস্কি সম্পূর্ণভাবে অন্ধ হয়ে যান এবং হাত দুখানা আর কনুই ছাড়া আর সমস্ত শরীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সংযোগগুলি সম্পূর্ণভাবে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে যায়। এতেও দমলেন না অস্ত্রভস্কি। তিনি মনে মনে ঠিক করলেন, লিখবেন।

এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে অস্ত্রভস্কি আরও বলেছেন : একটি মানুষ তখনই যথার্থ মানুষ হয়, যখন তাঁর বেঁচে থাকার জন্য রয়েছে আদর্শ ও কাজ। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে সোবিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য অস্ত্রভস্কি তাই বলেন ; মানুষের মত বাঁচতে হবে। সমস্ত জাতিকে বীরজাতিতে পরিণত করতে হবে। অস্ত্রভস্কি যথার্থ-ই বীরের মত বেঁচে ছিলেন। ব্যাধির বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাঁর দৃঢ়তার কোন্ ফাটল ছিল না এবং ব্যাধিকে হাসি মুখে জয় করবার জন্যে সমস্ত রোগযন্ত্রণা সহ্য করেছিলেন। তাই তাঁর আর একটি উক্তির উদ্ধৃতি অবান্তর হবে না ; কত বড় মনোবল থাকলে, একটা মানুষ বলতে পারে ; "আজ আমি বিছানায় শুয়ে আছি, শুধু সে কারণে তোমরা আমাকে রুগ্নলোক বলতে পার না। সমস্তটা-ই ভুল, সব বোকামী. আমি সম্পূর্ণ সুস্থ। যদি আমার পা না নড়াতে পারি, এবং আমি যদি কোন কিছু দেখতে না পাই ? তার মানে সব ভুল বোঝা ছাড়া কিছু নয়, মানে মূর্খামী. ধারাত্মক ঠাট্টা।" এই দৃঢ় মনোবল নিয়ে— অস্ত্রভস্কি সম্পূর্ণ পক্ষাঘাতগ্রস্ত অবস্থায় তাঁর উপন্যাস "ইস্পাত" লিখতে শুরু করেন। লেখক অন্ধ, চোখের শক্তি নেই। তাই এক অদ্ভুত পদ্ধতি গ্রহণ করলেন। সোজা-সোজা দাগ টেনে ছককাটা একটা কার্ডবোর্ডে ও পরে খাঁজকাটা শক্ত উঁচু ধার বরাবর পেন্সিল ধরে টেনে টেনে লিখে যেতে লাগলেন। তাঁর স্ত্রী, মা, প্রাইভেট সেক্রেটারী বা বন্ধুরা রোজ সকালে এসে পড়ে শোনাতেন সেই লেখাগুলো। অস্ত্রভস্কি তখন আবার সংশোধন করে নিতেন লেখার। এইভাবে দু'বছর পরিশ্রমের পর "ইস্পাত" এর প্রথম খণ্ড লেখা শেষ হয়। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে যখন বইটি বেরুলো তখন সোবিয়েত সাহিত্যের এই নতুন লেখককে স্বাগত জানালেন শোলোখভ, ফাদেয়েভ, এরেনবুর্গ প্রমুখ প্রাচীন লেখকরা। অস্ত্রভস্কি শুধু সোভিয়েট ইউনিয়নেই জনপ্রিয় নন, অন্যান্য দেশেও ব্যাপকভাবে তিনি অভিনন্দিত হয়েছেন। "ইস্পাত"-এর লেখকের কাছে আবেগদীপ্ত ভাষায় রোমাঁরলাঁ—

লিখেছিলেন :—"আপনার জীবন একটি দিক-নির্দেশক-আলোকবর্তিকা—হাজার হাজার মানুষের অন্তরে চির-ভাস্কর হয়ে রহিল।'

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে "ইস্পাত" এর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করেন। 'ইস্পাত' এর কাহিনী, তাঁর, আত্মজীবনী বলা যায়। অস্ত্রভস্কিকে তাঁর বহু পাঠক তাঁর উপন্যাসের নায়ক পাভেল কোরচাগিনের সঙ্গে সাদৃশ্য দেখিয়ে চিঠি দিয়েছেন। অস্ত্রভ্‌স্কি এতে একটু ক্ষুব্ধ হয়ে ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ২৫শে অক্টোবর তাঁর এক বন্ধুকে এক চিঠি লেখেন। সেই অপ্রকাশিত চিঠিটি দু'বছর পূর্বে 'অগোনিয়ক' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। অস্ত্রভ্‌স্কি লিখেছেন 'যখন আমি বইটি লিখি তখন ভাবিনি এ ধরণের ঘটনা ঘটবে। আমি চেয়েছিলাম আমাদের যুব সমাজের কাছে দৃষ্টান্ত হিসাবে একজন তরুণ যোদ্ধার আদর্শ তুলে ধরতে। এ চরিত্রাঙ্কণে যদিও আমার জীবনের কিছু ঘটনা এসে গেছে। আমি সত্যিই অপমানিত হই, যখন কেউ ভাবে, আমি। এর পর অস্ত্রভ্‌স্কির অন্ত আর একটি গ্রন্থ "ঝড়ের-সন্তান" প্রকাশিত হয়। অস্ত্রভ্‌স্কির ইচ্ছা ছিল "কোরচাগিনের সুখ' বলে আর একটি গ্রন্থ লেখার, কিন্তু সময় হয়ে ওঠেনি।

সোবিয়েত সাহিত্যের অত্যন্ত নিষ্পৃহ সমালোচক পর্যন্ত যাঁর লেখা পড়ে মুগ্ধ হয়েছেন, সোবিয়েত বিদেশী ভাষাভাষিদের ভাষায়—যিনি হলেন একজন 'সন্ন্যাসী' সেই নিকোলাই অস্ত্রভ্‌স্কির নাম বিশ্ব-সাহিত্যের কয়েকটি বিরল দৃষ্টান্তের অন্যতম, সন্দেহ নেই। মাত্র চার পাঁচ বছর সাহিত্য চর্চার মধ্য দিয়ে এই রুশ লেখক পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ পাঠকদের হৃদয়ে যে শ্রদ্ধার আসনে সম্মানিত, তা' যে কোন লেখকের কাছে ঈর্ষার বস্তু। তাই অস্ত্রভস্কির উপন্যাস 'ইস্পাত' (কাক্ ঝাকালিয়াস্ ষ্টাল) এর—নায়ক পাভেল কোরচাগিন শুধু সোবিয়েতের মানুষের কাছেই প্রিয় নয়, সে এখন পৃথিবীর নানা দেশের মানুষের বন্ধু, ঘনিষ্ট সহচর, বিশ্বাসের নির্ভরযোগ্যস্থল। পাভেল কোরচাগিন এমন একটি জীবনযুদ্ধে পোড় খাওয়া মানুষ যে নিজের ভাগ্যকে নিজেই নিয়ন্ত্রিত করে, মানুষকে সেবায় মানুষ হতে। জীবনকে ঘনিষ্টভাবে আঁকড়ে ধরার তাঁর নিয়ত সাধনা ও স্বপ্নের বাস্তবায়নে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাই জীবনের আদর্শ। কারণ তাঁর কাছে: জীবন মানুষের সবচেয়ে প্রিয়। এ জীবন সে পায় একবার মাত্র। এমনভাবে তাকে বাঁচাতে হবে যাতে কখনও পিছনের নষ্ট বছরগুলির জন্যে কোন যন্ত্রণাময় অনুশোচনা এবং অতীত জীবনের গ্লানিময় হীনতার জন্যে তাঁকে লজ্জার যন্ত্রণা সইতে না-হয়। তাই, এমনভাবে বাঁচতে হবে যাতে সে মরবার সময় বলতে পারে 'আমার সমস্ত জীবন, সমস্ত শক্তি ব্যয়িত হয়েছে পৃথিবীর সব চেয়ে সেরা আদর্শের জন্যে—মানুষের মুক্তির সংগ্রামে।' (ইস্পাত—দ্বিতীয় খণ্ড তৃতীয়অধ্যায়)'।

লেখক অস্ত্রভস্কি তাঁর জীবনের মধ্য দিয়ে তাঁর উপন্যাসের নায়কের উক্তিকে রূপায়িত করে গেছেন এবং তিনি যে কথা একবার বলেছিলেন 'মানুষের সব চেয়ে প্রিয় ইচ্ছা হওয়া উচিত: মৃত্যুর পরও তার সৃষ্টি মানুষের সেবা করে যাবে' তাও সপ্রমাণ হয়েছে। তাইতো সুদূর মধ্য-আফ্রিকার জনৈক নিগ্রো যুবক নিজের পৈতৃক নাম বদলিয়ে নিজের নাম রেখেছেন: পাভেল কোরচাগিন। উক্ত যুবকের সঙ্গে এক আন্তর্জাতিক যুব-উৎসবে সোবিয়েত লেখক বরিস পলেভয়—এর দেখা হলে সে গর্বের সঙ্গে ঐ কথা পলেভয়কে জানায়। এ প্রসঙ্গে এ কথা বললে হয়তো অত্যুক্তি হবে না যে, গোর্কী-র "মা"র নায়ক পাভেল ভালসভ যেমন একদা বিপ্লবী নায়কের আদর্শ হিসাবে পৃথিবী তোলপাড় করে তুলেছিল তেমনি অস্ত্রভ্‌স্কির "ইস্পাত" এর নায়ক পাভেল কোরচাগিন নতুন সমাজের নতুন মানুষের যথার্থ আদর্শস্থল হয়ে লক্ষ-লক্ষ হতাশগ্রস্ত, বিষাদাধিস্রাবোগে আক্রান্ত মানুষের মনে এনে দিয়েছে আশার আলো। গোর্কীর "মা"র বিষয়বস্তু প্রধানত স্থান পেয়েছে বিপ্লবোত্তর রাশিয়া, গৃহযুদ্ধের বছর এবং একটি মানুষের যথার্থ মানুষ হবার কাহিনী। গোর্কীর "মা"র বিষয়বস্তুর সময়কাল বলা চলে অস্ত্রভস্কির জন্মলগ্ন।

১৯৩৬ সালে ২২শে ডিসেম্বর মৃত্যু এসে তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় পৃথিবী থেকে। মাত্র বত্রিশ বছরের সংক্ষিপ্ত জীবন সত্ত্বেও সোভিয়েত সাহিত্যে গভীর ও চিরস্থায়ী রেখাপাত করে গেছেন অস্ত্রভ্‌স্কি। আর তার উৎকর্ষের সঙ্গে বিস্তার করে গেছেন শক্তিশালী প্রভাব।

পুস্তক পরিচয়

অভিজ্ঞতা ও উত্তরণ : দু'খানি উপন্যাস

পদ্মিনী—সুশীল রায়। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭। দুইটাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

দুরন্ত চড়াই—সমরেশ বসু। ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-১২। পাঁচ টাকা।

বাংলা উপন্যাস যখন আকারবৃদ্ধির সাধনায় আত্মার সমস্তাকে প্রায় জলাঞ্জলি দিতে বসেছে সেই মুহূর্তে সুশীল রায়ের পদ্মিনী একটি অপূর্ব ব্যতিক্রম ব'লে মনে করি। নিরানব্বই পৃষ্ঠার পরিসরে সুডৌল এই উপন্যাসখানি একটি আদর্শবাদের পরিচ্ছন্ন দর্পণ। আত্মচরিতের রূপকল্পে বিন্যস্ত এই কাহিনীতে একদিকে যেমন উৎকেন্দ্রিক অপব্যয়িতা নেই তেমনি নেই তত্ত্বের আড়ম্বর। আকাঙ্ক্ষায় স্বাভাবিক একটি মানুষের রক্তক্ষয়ী ক্রমবিকাশের বাস্তব কথাবস্তু এখানে পরিবেষিত হয়েছে। এক স্বনামধন্য বিজ্ঞানব্রতীর অন্তর্জীবনের পশ্চাৎপট ও পরিণামী আত্মবিলোপের বিষণ্ণ এই স্বীতিবৃত্তে এক অসামান্য মানবীর ভূমিকা অনন্য। বিজ্ঞানীটি এক হিসেবে সারদা নাম্নী সেই মানবীরই সৃষ্টি। কিন্তু বিজ্ঞানীর অন্তরাত্মা বহির্জীবনের সাফল্যে অভিভূত হয়নি, পরন্তু বাহিরের সার্থকতার পর তার যৌন আকাঙ্ক্ষার মৃত্যু তাকে অভিমানে জর্জরিত করেছে। সেই অমীমাংসিত পরিণামে বিজ্ঞানীটিকে রেখে সারদার মৃত্যু। এই মৃত্যু বিজ্ঞানীকে আত্মপ্রশ্নের অবকাশ দিয়েছে। পদ্মিনী একটি দিতাঘাত ট্র্যাজিডি এবং বিবেকের বেদনায় তা শুভ্র। নরনারীর পারস্পরিক সম্পর্কের সহজ স্রোত প্রতিহত হয়ে যে অনিবার্য অপূর্ণতাবোধ সৃষ্টি করে তারি পটভূমিতে এই বিষাদমধুর বিবেকী আলেখ্যটি ফুটে উঠেছে। লেখকের নির্মাণ অথচ কেন্দ্রগ ভাষা পাঠকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে।

সমরেশ বসুর দুরন্ত চড়াই প্রথম দৃষ্টিতে রমা-রোমান্টিক তথা সেন্টিমেন্টাল আখ্যায়িকা ব'লে মনে হতে পারে, কিন্তু ঈষৎ অবহিত হয়েই পাঠক লক্ষ্য করবেন, একটি দায়িত্বশীল জীবন-চেতনা এখানে প্রকাশ পেয়েছে। উত্তরযৌবনা এক নারী তার বিচিত্র অভিজ্ঞতার দ্বারা দিয়েই শেষ পর্যন্ত যথার্থ প্রেমের সাক্ষাৎ পেল। যখন পেল, তার সমস্ত সন্দেহ তো হরে গেছেই, এমন কি, এক ধরণের নির্বেদ তার সত্তার বিরাট একটি অংশকেও হয়তো গ্রাস করেছে। কিন্তু পরিণত মননের সংস্পর্শে যে-প্রেম এল তাই তাকে দ্বিতীয় যৌবন উপহার দিল। অলংকার শাস্ত্রের পরিভাষায় বলতে গেলে সাঁওতাল পরগণা তার এই উত্তীর্ণ প্রেমের উদ্দীপন-বিভাব। সাঁওতাল নিসর্গমহলকে সমরেশ বসু তীব্র ও নির্ভুল তুলিতে এঁকে নিয়েছেন, কিন্তু তা নিছক প্রতিফলনধর্মী নয় ব'লেই চরিত্রায়ণের মানবিক পরিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত হতে পেরেছে। এই প্রকৃতি বিভিন্ন মানুষকে তার নিভৃত উৎসের অভিমুখে যাত্রা করার অবকাশ দিয়েছে, সত্য-অসত্যের ভেদরেখাটিকে চিনিয়ে দিয়েছে। এরি বৃহৎ পরিবেশে বিধুর একদিন নাগরিক জীবন পূর্ণতার দিকে এগিয়ে গেলো, আবার আরেক-

খণ্ড নগরজীবন (অনাদি-লীলা উপাখ্যান) প্রক্ষিপ্ত ব'লে প্রমাণিত হলো।

সমরেশ বসু এই কাহিনীকে তন্ময় মমতার সঙ্গে বুনেছেন এবং বিবেকের জিজ্ঞাসার কাছে পৌঁছেও দিয়েছেন। শেষোক্ত কারণে এটিকে নিছক ভাবাপ্লুত ও স্বপ্নালুর বৃত্তান্ত বলবার উপায় নেই। অথচ রোমান্টিক প্রতিবেশ ভিতর থেকে সাহায্য না করলে গল্পটি এই স্পন্দিত বিবেকের বোধে পৌঁছতো না।

কিন্তু সমরেশবাবুর শব্দদীপ্তি এক-এক জায়গায় প্রয়োজন ছিটিয়েও উজ্জ্বল। একই ছবি পৌনঃপুনিক ব্যবহারে হয়তো সৌন্দর্য রচনা করে, কিন্তু বর্ণনার একই প্যাটার্ন উপন্যাসের গতি আড়ষ্ট করে তোলে। সাবলীলতাকে লেখক শাসন করতে পারেন না, সেইজন্যই এই ক্লান্তি।

এই দু'খানি উপন্যাস পাঠককে তৃপ্ত করবে, কেননা, এরা শুধুমাত্র তৃপ্ত করতে চায়নি, প্রশ্নের অঙ্কুরও তুলে ধরেছে।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

ইতস্ততঃ করা নয়-চাই সঙ্কল্পে দৃঢ়তা।
জাতিকে প্রস্তুত করতে প্রাণপণে চেষ্টা করুন।

জয়শ্রী

সাহিত্য সংখ্যা

বৈশাখ। ১৩৭০

চীন-ভারত যুদ্ধকে কেন্দ্র করে এ পর্যন্ত আবেগ ও উচ্ছ্বাসের কমতি হয়নি। কিন্তু একটি দেশ যখন কেবল আবেগ ও উচ্ছ্বাসের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয় তখনই তার বিপর্যয় ঘটে। আজ সমাজ ও রাষ্ট্রনীতি, সাহিত্য ও সংস্কৃতি স্বার্থান্বেষী নীতি হীনতার আবহাওয়ায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত। চিন্তার ক্ষেত্রে সবচেয়ে শোচনীয় হচ্ছে শৈথিল্য, জড়তা ও দৈন্য। এ-থেকে মুক্তি—একমাত্র সচেতন বুদ্ধিজীবির বলিষ্ঠ মননশীলতায়। এই উদ্দেশ্যে জয়শ্রীর প্রচেষ্টা :—

"যুদ্ধ, যুগচেতনা ও শিল্পীর ভূমিকায়"

নিজস্ব চিন্তার অসংকোচ প্রকাশ ঘটিয়েছেন :

সঞ্জয় ভট্টাচার্য
কৃষ্ণ ধর
অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত
অশ্রুকুমার সিকদার
শঙ্খ ঘোষ

এছাড়া,

স্বদেশ চিন্তার লেখক সমাজ : রবীন্দ্রনাথ রায়
আধুনিক বাঙালী সমাজ ও বাংলা উপন্যাস :
সুনীল চট্টোপাধ্যায়
প্রতিরোধের সাহিত্য : হীরেন বসু
যুদ্ধ, জনগণ ও সরকার : জয়ন্ত কুমার রায়

দাম : ১·০০ সডাক ১·৫০

বিশ্বাবর্ত

সালতামামি

১৩৬৯ সাল প্রায় শেষ হয়ে এলো। সমাপ্তপ্রায় এই বছরটির দিকে পেছন ফিরে তাকানর আগ্রহ অস্বাভাবিক নয়।

বিশ্ব-শান্তির প্রচেষ্টা

প্রথমেই প্রশ্ন আসে, বিশ্বশান্তির প্রচেষ্টা ১৩৬৯ সালে কতদূর এগিয়েছে? এক বছরেরও বেশী সময় ধরে জেনেভায় সতেরটী জাতির মধ্যে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন চলছে। কবে এই সম্মেলন শেষ হবে এবং এটা কতদূর সফল হবে তা বলার সময় এখনও আসেনি। নিরস্ত্রীকরণের প্রশ্ন ছাড়া, পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ পরীক্ষা বন্ধ করাও এই সম্মেলনে আলোচ্য বিষয়। আণবিক অস্ত্রের পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ বন্ধ রাখার ব্যাপারে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণের প্রশ্নে আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে মতানৈক্য এখনও রয়েছে। কিন্তু এটা সবাই জানেন যে এই মতানৈক্যের গণ্ডী এখন কিছুটা কমেছে। প্রথমে রাশিয়ার এই পর্যবেক্ষণের প্রশ্নে তীব্র আপত্তি ছিল। অপর পক্ষে আমেরিকার প্রস্তাব ছিল বছরে অন্তত পক্ষে ৮।৯ বার আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণের। যাই হোক রাশিয়া এখন ঐ পর্যবেক্ষণের প্রস্তাবটা নীতির দিক থেকে মেনে নিয়েছে এবং বছরে ২।৩ বার পর্যবেক্ষণে সম্মত হয়েছে। আমেরিকাও তার সর্বশেষ প্রস্তাবে বছরে সাত বার পর্যবেক্ষণে রাজী হয়েছে।

রুশ-আমেরিকা সম্পর্ক

বলা বাহুল্য, আজ বিশ্ব শান্তির প্রশ্ন অনেকটা নির্ভর করছে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাষ্ট্রদ্বয় আমেরিকা ও রাশিয়ার মতিগতির উপর। গত দু-তিন বছর ধরে আমেরিকা ও রাশিয়ার পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে একটা বোঝা-পড়ার মনোভাব লক্ষিত হচ্ছিল ১৩৬৯ সালে তা অব্যাহত রয়েছে। কিউবার ঘটনাবলী সত্ত্বেও আমরা বলতে পারি যে আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে আজ আর সেই 'যুদ্ধং দেহি' মনোভাব দেখা যাচ্ছে না যেটা দেখা যাচ্ছিল ১৯৪৮ সালে 'বার্লিন অবরোধ'-এর সময় বা তার কয়েক বছর পরেও।

১৩৬৯ সালে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সব চাইতে সংকট জনক মুহূর্ত এসেছিলো কয়েক মাস আগে যখন কিউবার বিরুদ্ধে মার্কিন নৌ-অবরোধ প্রয়োগ করা হলো। গত কয়েক মাসে কিউবা থেকে নয় হাজার রুশ সৈন্য সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। যদিও কিউবাতে এখনও প্রায় ডেরো হাজার রুশ সৈন্য রয়ে গেছে, তবুও রাজনৈতিক মহলে, কিউবার সাম্প্রতিক ঘটনাবলীকে বিশেষ কোন গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। সম্প্রতি কিউবার ক্যাস্ট্রোপন্থী ও ক্যাস্ট্রো-বিরোধীদের মধ্যে গুলি বিনিময় হয়েছে, কিউবার উপকূলে কিউবার নিজ বিমান থেকে আমেরিকার মালবাহী জাহাজের উপর গুলি চালানো হয়েছে এবং আমেরিকা প্রবাসী কিউবানরা রুশ জংগী বিমানের দিকে গুলি চালিয়েছে। আমেরিকা বা রাশিয়ার এ সমস্ত ঘটনাবলী তেমন কোন চাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে পারেনি। পক্ষান্তরে, আমেরিকার পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে ঘোষণা করা হয়েছে আমেরিকা প্রবাসী কিউবানদের আমেরিকা থেকে কিউবার উপর ভবিষ্যতে কোন হামলা করতে দেওয়া হবে না।

রুশিয়া ও আমেরিকার পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নতির ইংগিত বহনকারী আরেকটা সংবাদ এই মাত্র পাওয়া গেল।

ইতিপূর্বে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের আবাস 'হোয়াইট হাউস' থেকে রুশ প্রধান মন্ত্রীর আবাস 'ক্রেমলিন'-এ একটি সরাসরি টেলিফোন যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রস্তাব করা হয়েছিল আমেরিকার পক্ষ থেকে। নিরস্ত্রীকরণের উদ্যোগ পর্বে আমেরিকা, দুই রাষ্ট্র প্রধানের মধ্যে এরূপ একটা সরাসরি যোগাযোগ ব্যবস্থার ("hot line") উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিল। গত ২২শে চৈত্র জেনেভায় নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে রুশ-প্রতিনিধি জারাপকিন আমেরিকার এই প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়েছেন। অপরপক্ষে, আমেরিকার প্রতিনিধি ষ্টেন রাশিয়ার এই প্রস্তাবটি গ্রহণ করাকে "একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি" বলে অভিনন্দিত করেছেন।

প্রকৃত পক্ষে, এরূপ একটি আশার সুর ধ্বনিত হয়েছে আমেরিকান কংগ্রেসে প্রেসিডেন্ট কেনেডীর সাম্প্রতিক ভাষণে। ঐ ভাষণে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট কেনেডী বলেন: "In the world beyond our borders, steady progress has been made in building a world of order." এর মানে এই নয় যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর 'ঠাণ্ডা লড়াই' উষ্ণতর না হয়ে আরও ঠাণ্ডা হয়েছে।

পূর্ব ও পশ্চিমী শিবিরের অন্তর্দ্বন্দ্ব

আজ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পর্যবেক্ষকদের কাছে পূর্ব ও পশ্চিমী শিবিরের 'ঠাণ্ডা লড়াই' এর চাইতে ঐ দুই শিবিরের অন্তর্দ্বন্দ্ব কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। গত এক বছরে এই দুই শিবিরের অন্তর্দ্বন্দ্ব বেশ প্রকট হয়েছে। এটা লক্ষণীয় যে গণতন্ত্র অথবা কম্যুনিজম—অর্থাৎ কোন বিশেষ আদর্শের প্রতি আনুগত্য এই অন্তর্দ্বন্দ্বকে রোধ করতে পারেনি।

এই বছরের প্রথম দিকে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট দ-গলের বক্তব্যের মধ্যে পশ্চিমী শিবিরের অন্তর্দ্বন্দ্বের একটা সূত্র ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কিন্তু এটা আরও পরিস্ফুট হয়ে উঠলো যখন ফ্রান্স প্রায় তিন মাস আগে ব্রিটেনের ইউরোপীয় যৌথ বাজারে প্রবেশের খোলাখুলি বাধা দিলো। পশ্চিম জার্মানীর একটা সরকারী পত্রিকায় এ সম্পর্কে আলোক সম্পাত করে বলা হয়েছে: "……he (l'resident de Gaulle) fears a diminution of his own power within the E. E. C. if Britain were to join now, the more so as he sees British membership as opening the way to the influence of America. Nor can there be any doubt that his attitude has been conditioned by anger and disappointment at not being made privy to American atomic secrets for the development of a nuclear potential" (Germany, Vol. 8, No. 32).

অপর পক্ষে প্রায় সাত বছর আগে অনুষ্ঠিত রুশ কম্যুনিষ্ট পার্টির বিংশতি অধিবেশনের সময় থেকে কম্যুনিষ্ট শিবিরের দুই প্রধান রাষ্ট্র রুশিয়া ও চীনের মধ্যে এক অন্তর্দ্বন্দ্ব ক্রম-বর্দ্ধমান। এমন কি, মাস তিনেক আগে রুশিয়া খোলাখুলি এই অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা স্বীকার করে।

প্রায় একমাস আগে চীন কম্যুনিষ্ট পার্টি রুশ প্রধান মন্ত্রী ক্রুশ্চেভকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল কাম্বোডিয়া সফরের পর পিকিংএ একটা পারস্পরিক আলোচনায় যোগ দেওয়ার জন্য। এরই জবাবে রুশ কম্যুনিষ্ট পার্টি চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টিকে প্রধান মন্ত্রী ক্রুশ্চেভের পিকিং গ্রহণের অক্ষমতা জানিয়ে চীনা কম্যুনিষ্ট নেতা মাও সে-তুংকে মস্কোতে আমন্ত্রণ জানিয়েছে।

মস্কো-পিকিং সংঘাতের কারণ সম্বন্ধে মতদ্বৈধতা রয়েছে। কারো মতে এটা নেহাৎ ক্ষমতার লড়াই, আবার কারো মতে এ সংঘাত আদর্শগত। প্রেসিডেন্ট কেনেডী মনে করেন যে, "The Soviet-Chinese disagreement is

over means, not ends." তবে যতদূর মনে হয়, এই সংঘাত অনেক দূরে এগিয়ে গেছে (এবং এটা ভবিষ্যতে মস্কো-ওয়াশিংটন সম্পর্ককে প্রভাবিত করবে)। পর্যবেক্ষকরা মনে করেন যে, যাও দে-য়ুংও মস্কো যাওয়ার জন্য রাশিয়ার আমন্ত্রণ গ্রহণ করবেন না এবং বর্তমান অবস্থায় মস্কো ও পিকিং এর মধ্যে উচ্চ পর্যায়ের আলোচনা বৈঠকের সম্ভাবনা খুবই কম। বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা দুটো ঘটনাকে তাৎপর্যপূর্ণ মনে করেন: একটি হলো রাশিয়ার চীনা আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান ও একই সময়ে ক্রুশ্চেভের মস্কোর একটি যুগোশ্লাভ বাণিজ্যিক প্রতিনিধি দলকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন; অপরটী হলো যুগোশ্লাভিয়ার ভারতকে অস্ত্র সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দান। দুটো ঘটনার মধ্যেই তাঁরা মস্কোর যে মনোভাব দেখতে পাচ্ছেন সেটা রুশ-চীন মৈত্রীর অনুকূল নয়।

আফ্রিকা ও আরব জগত

গত এক বছরে আফ্রিকা ও আরব জগতেও অনেক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে। বহু রক্তপাতের মধ্য দিয়ে আলজেরিয়া স্বাধীনতা লাভ করেছে। শুধু আলজেরিয়া নয়, রুয়ান্ডা-উরুণ্ডি প্রভৃতি আফ্রিকার আরও কয়েকটী দেশও স্বাধীনতা লাভ করেছে। তা'ছাড়া, বহু বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে কংগোও অবশেষে একটি ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্র হতে চলেছে। প্রকৃত পক্ষে, সাম্রাজ্যবাদী অধিকারের প্রশ্নে আফ্রিকায় ব্রিটেন ও ফ্রান্স এমন কি বেলজিয়ামের নীতিও আজ মোটামুটি বাস্তবানুগ। এ প্রশ্নে পর্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদের চিন্তাধারা বিপরীত। আফ্রিকার আংগোলায় পর্তুগাল এখনও গায়ের জোরে তার অধিকার বজায় রাখবার স্বপ্ন দেখছে। অনুরূপ মনোভাবের পরিচয় দিচ্ছে বর্ণ বিদ্বেষী দক্ষিণ আফ্রিকা ও দক্ষিণ রোডেশিয়া সরকারের নিগ্রো বিদ্বেষী নীতির অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে, উত্তর ও দক্ষিণ রোডেশিয়া এবং নিয়াসাল্যাণ্ড নিয়ে দশ বছর আগে গড়া মধ্য আফ্রিকার যুক্তরাষ্ট্র (Central African Federation) ভেংগে যাচ্ছে। গত ১৪ই চৈত্র ব্রিটিশ উপ-প্রধান মন্ত্রী বাটলার এই যুক্তরাষ্ট্রটি ভেংগে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন।

এবছরের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর মধ্যে আরব জগতের ইরাক, ইয়েমেন ও সিরিয়ার রাজনৈতিক পটপরিবর্তন অন্যতম। ইরাক, সিরিয়া ও মিশর—আরব জগতের এই তিনটি রাষ্ট্রের সামনে আজ প্রশ্ন তারা একটী যুক্তরাষ্ট্রের অংশীদার হবে কি না। একটী যুক্তরাষ্ট্র গঠিত না হলেও এই তিনটি রাষ্ট্র এবং ইয়েমেন ও আলজেরিয়ার এক জোটে চলার সম্ভাবনা রয়েছে। বলা বাহুল্য, এই রাষ্ট্রগুলোর পারস্পরিক সহযোগিতা আরব জগতের ভবিষ্যতের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ।

এশিয়ার ভবিষ্যৎ

গত এক বছরে এশিয়ার কয়েকটি দেশের ঘটনাবলী আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো চীনের ভারত আক্রমণ, লাওসের গোলযোগ, মালয়েশিয়া গঠন প্রচেষ্টা ও পশ্চিম ইরিয়ানের ইন্দোনেশিয়ার অন্তর্ভুক্তি।

কয়েক মাস আগে লাওস সমস্যার মীমাংসার পর সেখানে আবার নতুন করে কম্যুনিষ্টপন্থী পাথেট লাও বাহিনী ও নিরপেক্ষ সেনাদলের মধ্যে লড়াই সুরু হয়েছে। এবারের গোলযোগের জন্য পাথেট লাও বাহিনীকে দায়ী করা চলে। মনে হয় পাথেট লাও বাহিনী প্রথমে লাওসের প্রধান মন্ত্রী প্রিন্স সুভন্ন ফুমার নেতৃত্বাধীন নিরপেক্ষ দলকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে পরে লাওসের দক্ষিণপন্থীদের সম্মুখীন হতে চাইছে। কম্যুনিষ্টদের বিশ্বাস করা কতদূর বিপজ্জনক লাওসের কম্যুনিষ্ট-পন্থী পাথেট লাও বাহিনী নতুন করে তারই পরিচয় দিচ্ছে। এই পাথেট লাও বাহিনী কম্যুনিষ্ট-চীনের সমর্থনপুষ্ট। জানা যায় যে, কম্যুনিষ্ট চীনের সাথে এদের যোগাযোগ ব্যবস্থা দৃঢ়তর করার জন্য চীনের য়ুনান থেকে লাওসের কয়েকটি

পর্যন্ত একটি রাজপথ নির্মাণের পরিকল্পনা ইতিমধ্যে গৃহীত হয়েছে।

বলা বাহুল্য, আজ কম্যুনিষ্ট চীনের সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতা এশিয়ার অস্তিত্বে ইঙ্গিত ঘোষণা করেছে। এশিয়ার সাম্প্রতিক ইতিহাসে চীনের ভারত আক্রমণ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তার বিপজ্জনক আগ্রাসী মনোভাবের তাগিদে চীন শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিতে জলাঞ্জলি দিয়ে কয়েক মাস আগে বিশ্বাসঘাতকের মত ভারত আক্রমণ করেছে। তার এই সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনার অংগ হিসাবে কম্যুনিষ্ট চীন পাকিস্তান, নেপাল, বর্মা প্রভৃতি সীমান্তবর্তী দেশগুলোর দিকে কূটনৈতিক জাল বিস্তার করেছে এবং বিদ্যুৎ সাফল্য লাভ করেছে। এটা পরিষ্কার যে, আগামী দিনের এশিয়া কি রূপ পরিগ্রহ করবে তা বহুলাংশে নির্ভর করছে ভারত কি ভাবে লক্ষ্যসাধনবাদী চীনের সম্মুখীন হতে পারে তার উপর।

২৬শে চৈত্র ১৩৬৯

শিশির কুমার ঘর

খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই

গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা	৬·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	৫·০০
ভারত-আত্মার বাণী	৫·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
কর্মবাণী	১·২৫
Soul of India Speaks	5·00

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

বাংলার ঋষি	৩·০০
বাংলার মনীষী	১·২৫
বাংলার বিদুষী	২·০০
বীরত্বে বাঙালী	১·৫০
ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৩·০০
রাজর্ষি রামমোহন	১·০০
রবীন্দ্রনাথ	১·০০
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১·২৫
আচার্য জগদীশচন্দ্র	১·৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ. বি. টি.

বিদ্যাসাগর	২·৫০
মানুষের মত মানুষ	·৬২
শিশু রামায়ণ	·৬২
শিশু মহাভারত	·৭৫

॥ প্রতিটি বই বহুচিত্র শোভিত ॥

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী : : ১৫ কলেজ স্কোয়ার : : কলিকাতা—১২

আবার এ ষড়যন্ত্র কেন ?

সমর গুহ

বাঙালীর উপর নেমে আসছে রাজনৈতিক চক্রান্তের আরেকটি শাণিত তরবারি। এই সেদিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী লোকসভায় জানিয়েছেন যে পশ্চিম বাংলাকে শুধুমাত্র 'বাংলা' নামে আখ্যাত করার প্রস্তাব করেছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়েছেন। অর্থাৎ বাঙালীর সামগ্রিক সংহতির উপরে আবার এক গুরুতর অপরাধ করতে উদ্যত হয়েছেন খণ্ডিত বাংলার প্রাদেশীয় শাসকেরা এবং ভারত সরকার তার শরীক হতে রাজী হয়েছেন।

খণ্ডিত, ভগ্নাংশ পশ্চিম বাংলাকে বাংলা নামে অভিহিত করে বাঙালীর বৃহত্তর অস্তিত্বকে একটি ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে বন্দী করে বাঙালীকে চিরস্থায়ীভাবে পঙ্গু করে দেওয়ার এরূপ চক্রান্তের বিরুদ্ধে আমরা তীব্র প্রতিবাদ করি। বাঙালীর,—হাঁ পূর্ব ও পশ্চিম বাংলা দুই ভগ্নাংশের বাঙালীর,—জীবন ঘিরে যখন চলছে নানা সংকটের দোরাত্ম্য, বিচ্ছেদের প্রতিক্রিয়ায় দুই বাংলার আর্থিক ও সামাজিক জীবন যখন অঙ্গভাবে জর্জরিত, তখন এমনি একটি অনাবশ্যক ও অহেতুক প্রস্তাবকে কার্যকরী করার উদ্দেশ্যকে চক্রান্ত ছাড়া আর কি আখ্যা দেওয়া যায়? পূর্ব বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তান নাম দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানীদের লাভ আছে কারণ, উদ্যত ও জাতীয় সত্ত্বে প্রাণবন্ত পূর্ব বাংলাকে হারাবার ভয় পশ্চিম পাকিস্তানীদের মনে এক তীব্র বিভীষিকা সৃষ্টি করেছে। পূর্ব বাংলাকে যদি স্থায়ীভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের কলোনীতে পরিণত করে পাকিস্তানের অস্তিত্ব রক্ষা করতে হয় তা' হলে পূর্ব বাংলার অধিবাসীদের বাঙালীত্বকে নির্মূল করা পাক-কর্ণধারদের একান্ত আবশ্যক।

কিন্তু পশ্চিম বাংলাকে বাংলা নাম দিয়ে সীমাবদ্ধ করার প্রয়াসে দিল্লীর কর্তাদের লাভ কি? 'পশ্চিম বাংলা' কথাটিকে ক্ষুদ্রাকারে 'বাংলা' বলে আখ্যাত করে লেখা ও টাইপ করার শ্রম হ্রাস করে কাগজের খরচা কমাবার জন্যই কি এই প্রস্তাব? নাকি, একাংশ বাংলাকে পূর্বাংশের নাম দিয়ে পশ্চিম বাংলার অধিবাসীদের মনে গোটা বাংলার গর্ব সৃষ্টি করার 'মহৎ' উদ্দেশ্যে এই 'বাংলা' নামকরণের প্রয়াস? বস্তুতঃ পশ্চিম বাংলাকে বাংলা নামে অভিহিত করার প্রস্তাবের পিছনে কোন কল্যাণকর উদ্দেশ্য, কোন সার্থকতা বা কোন প্রয়োজনই থাকতে পারে না। পশ্চিম বাংলাকে গোটা বাংলার কৌলিন্য, নাম দেওয়াতে তার মহত্ত্ব বা বৃহত্ত্ব কিছুই বাড়বে না, বরং এক ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে বাঙালীর বৃহত্তর আত্মিক অস্তিত্ব পঙ্গুত্ব লাভ করবে, ক্ষুদ্রত্ব ও সামাজিকতার অনুভবে বাঙালী হীনবল হয়ে যাবে। বাঙালীকে ক্ষুদ্র ও খর্ব করে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়ার যে অপ-প্রয়াস চলছে অদূরভবিষ্যতে অন্ত্রাঘাত বাদ্য বাংলা খণ্ডিত ও বিকলাঙ্গ কিন্তু ভগ্ন বাংলার বাঙালীত্ব এখনও প্রাণবন্ত। বাংলার বৃহত্তর অংশকে বাদ দিয়ে শুধু পশ্চিম বাংলার যদি 'বাংলা' নাম করণ হয় তা' হলে বাঙালীত্বের বুকে হানা হবে এক বিষাক্ত মরণ-বাণ। একাংশ পশ্চিম বাংলাকে গোটা বাংলার নাম দিয়ে বাংলা নামে অভিহিত করার প্রয়াস শুধু অন্যায় অযৌক্তিক ও অপ্রয়োজনীয় নয়,—ভবিষ্যতের বিচারে চরমভাবে অপরিণামদর্শী।

বাংলা ও বাঙালীর অপরাধ, এই সজল মাটির মানুষেরা এক দুর্বার প্রাণশক্তির অধিকারী। তাই আদর্শের ডাকে বিদ্যুতের মত তীব্র গতিতে তরঙ্গ বিস্তীর্ণ হয়ে ওঠে বাঙালীর প্রাণ। কোন ত্যাগ কোন সাধনাকেই সে গ্রাহ্য করে না। বাঙালীর মধ্যে রয়েছে মৃত্যুঞ্জয়ী নদিচীর সুপ্ত ঐতিহ্য, তাই, ফলাফলের কথা না ভেবে ইংরেজের কাছে প্রাথমিক পর্য্যায়ে এত খাতির ও প্রতিষ্ঠা পেয়েও বাঙালীই সর্বপ্রথম চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল ইংরেজের সাম্রাজ্য-শক্তিকে। যত আঘাত ইংরেজ সরকার বাঙালীর কাছ থেকে লাভ করেছে, ভারতের আর কোন প্রান্ত থেকে তার ভগ্নাংশও পায়নি। তাই বাঙালীর উপরে ছিল ইংরেজের চরম আক্রোশ। বাঙালী যেন না উঠতে পারে, তার দুর্বার শক্তি যেন শতধা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়,—তাই, বাংলা ভাগের চক্রান্তে বাঙালীকে পঙ্গু করে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল ইংরেজ সরকার। কী প্রচণ্ড আবেগে সেদিন গর্জে উঠেছিল বাঙালীর প্রাণ সমুদ্র ! বাঙালীর ভাষা, বাঙালীর আশা,—বাংলার সমস্ত ভাই-বোনদের এক করার জন্য অধীর কণ্ঠে আবোধ মন্ত্রের মত সেদিনে ধ্বনিত হয়েছিল বাংলার অমর কবির কণ্ঠে—'বাঙালীর ঘরে যত ভাই-বোন, এক হোক, এক হোক, এক হোক হে ভগবান।' বাঙালীর অন্তরের আবেগ সেদিন কী অপূর্ব মহিমায় পল্লবিত হয়ে উঠেছিল ! কত সাহিত্যে কত সঙ্গীতে সেদিন বাংলার বাঙালীত্ব বিকাশ লাভ করেছিল। বাংলার বুকে যে প্রাণরসের বিশাল ভাণ্ডার সঞ্চিত রয়েছে তার শতধারা সেদিনে উৎসারিত হয়েছিল বাঙালীর আবেগ-কোনার অন্তরালে। শুধু শিল্প সাহিত্যের আবেদনের কোমল মাধুর্য্যেই নয়,—বাঙালীর অন্তরে সুপ্ত রয়েছে যে চিরবিদ্রোহীর এক রুদ্ররূপ, অগ্নি ও মৃত্যুর তপস্যায় তাই নীড় ভেঙে স্ফুরিত হয়েছিল বাঙালীর জীবন বিকাশে। ভারতবর্ষ সেদিন বাংলার কাছ থেকে লাভ করেছিল স্বদেশীর দীক্ষা, জাতীয় আত্মাভিমানে ত্যাগের শিক্ষা, সংগ্রামের সংকল্প। যে ঢেউ উঠেছিল সেদিন বাংলার বাঙালীকে ধ্বংস করার প্রতিক্রিয়ায় যুগান্তরে তাই শতরোলে গর্জে উঠেছিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে।

বিদ্রোহী বাঙালীর এই রুদ্রমূর্তিকে শান্ত করার জন্য সেদিন ইংরেজ সরকার তুলে নেয় বিচ্ছেদের বিষাক্ত খড়্গ। কিন্তু বাংলা আবার এক হয়ে গেলে ওঠে—'মোদের গরব মোদের আশা,—আ মরি বাংলাভাষা।' কিন্তু আদর্শবাদী আত্মভোলা বাঙালী সেদিনে লক্ষ্য করেনি যে আবার একত্র হয়েও পূর্বে ও পশ্চিমে বাংলার অঙ্গ ছেদ করে টুকরো টুকরো করে ইংরেজ সরকার বাংলার অংশ বিলিয়ে দিয়েছে পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে। কিন্তু সেদিন বাংলার বিদ্রোহের আগুন জন্ম নিয়েছে বৃহত্তর ভারতীয় জাতীয়তায়, দাবানলের মত তা ছড়িয়ে পড়েছে ভারতের প্রান্তে প্রান্তে। বাঙালীর প্রাণের আগুনে জাতীয় মুক্তির এই স্বপ্নের বাণি দেখে বাঙালী সেদিন আত্মতৃপ্তি লাভ করেছিল এই ভেবে যে যেদিন বৃহত্তর ভারতের মুক্তির স্বপ্ন সার্থক হয়ে উঠবে সেদিনে ন্যায় বিচার পাবে বাঙালী, বাংলা আবার ফিরে পাবে বাংলার পূর্ব-পশ্চিমের বিচ্ছিন্ন মাটিকে।

ইংরেজের প্রতাপকে চ্যালেঞ্জ করেছিল বাঙালী, তাই বাঙালীর উপর বার বার বর্ষিত হয়েছিল ইংরেজ রাজের অত্যাচার ও অবিচারের বিষাক্ত অশনি কিন্তু বাঙালী যত আহত হয়েছে, তত বারে বারে নতুন শক্তিতে গর্জে উঠেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, শুধু ইংরেজের হাতেই নয় বাঙালী অভাবনীয় অবিচার পেয়েছে কংগ্রেস নেতৃত্বের হাতে। বিদ্রোহী বাংলা কর্তাভজাদের খাতায় নাম লেখাতে পারে নি, —স্বাধীনতা সংগ্রামের অভিযানকে সার্থক করে তোলার দুর্বার আকাঙ্খায় বারে বারে বিদ্রোহ করেছে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে। তাই বাঙালীর উপরে আক্রোশ ছিল শুধু ইংরেজ সরকারের নয়,—কংগ্রেস নেতৃত্বের কাছে বিদ্রোহী

বাংলা ছিল এক বিভীষিকা স্বরূপ। বাংলা তাই আঘাত পেয়েছে শুধু ইংরেজের কাছে নয়, আঘাত পেয়েছে কংগ্রেসের কাছে। বাঙালীকে খর্ব করার প্রতিটি পর্বে ইংরেজ সরকার পেয়েছে সক্রিয় সমর্থন কংগ্রেস নেতৃত্বের কাছ থেকে। সেবারের মত ইংরেজ ও কংগ্রেস যুক্ত হাতে খড়্গ চালিয়েছে বাঙালীর উপরে। এক অখণ্ড অবিভাজ্য বাংলাকে দ্বি-খণ্ডিত করে বাঙালীর জীবন সংস্কৃতিকে পঙ্গু, বিকলাঙ্গ ও বিপর্যস্ত করে দিয়ে, স্বাধীনতা সংগ্রামের গতিটাকে অন্তিম পুরস্কার দিয়েছে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব, কিন্তু বাংলাকে খণ্ড বিখণ্ড করেই তৃপ্ত হয় নি কংগ্রেসী নেতৃত্ব,—আবার বাঙালীর আত্মিক অস্তিত্বকে হত্যা করার জন্য উদ্যত হয়েছে দিল্লীর নতুন অস্ত্র এবং এই অস্ত্র চালনায় জল্লাদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে পশ্চিমবাংলা সরকার, পশ্চিম বাংলাকে 'বাংলা' নাম দেওয়ার অর্থ চিরকালের জন্য বাঙালীকে একটি ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে দিয়ে বাঙালীর পূর্ণজীবনের আশাকে নিষ্ফল করে দেওয়া।

দিল্লীর কর্তারা ভেবেছেন যে মাত্র পনের বছরেই বুঝি খণ্ডিত বাংলার বুকে বিখণ্ডনের চিরস্থায়ী শিলমোহর এঁকে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। এবারে তাই বাঙালীর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার শেষ কাজটি সমাধায় উৎসাহী হয়ে উঠেছেন ভারত সরকার। এঁদের স্বল্প-দৃষ্টি সম্পন্ন নেতাদের কাছে বাংলার ইতিহাস মৃত দেবতার ছায়ামূর্তি মাত্র, কিন্তু বিশ্বের দিকে তারা কি চেয়ে দেখছেন না যে আজ উনিশ বছরেও বিখণ্ডিত জার্মানীর ঐক্যের স্বপ্ন সমাধি লাভ করেনি? দুই কোরিয়া, দুই ভিয়েৎনাম আজ ঐক্যের সাধনায় দৃঢ় সঙ্কল্প—এই ইতিহাসের দিকে কি একবারও চোখ পড়ছে না আমাদের দিল্লীর কর্তাদের. রাজনীতিতে জার্মানী খণ্ডিত, কিন্তু জার্মান জাতীয়তার আত্মিক অস্তিত্ব এখনও প্রাণবন্ত। দুই রাজনৈতিক দুর্গেও বিচ্ছিন্ন হয়েও কোরিয়ানরা এখনও কোরিয়ান। চুয়ার রেখার দুই পারের ভিয়েৎনামীরা এখনও ভিয়েৎনামী, তেমনি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রচক্রের দুই পারের বাংলার অধিবাসীরা দুইটি রাজনৈতিক রাষ্ট্রে বিভক্ত বটে কিন্তু বাঙালীর আত্মা, বাঙালীর স্বাজাত্যবোধ, আজও অখণ্ডনীয়, অবিচ্ছিন্ন। রাজনীতির বেড়ার এপারে ওপারে বাঙালী আজ পরবাসী। কিন্তু পদ্মার দুই পারের সেই একই মাটি, একই জল, সেই বসন্ত বর্ষার দাক্ষিণ্য, শরতের সেই শুভ্র আকাশ—হয়ঋতুর সেই বিচিত্র সম্ভার—কে তার অবিচ্ছেদ আবেদনকে মুছে দিয়ে বাঙালীত্বকে খণ্ডিত করে লোহার শিকল পরিয়ে দেবে রাজনীতির আটপৌরে বাঙালীত্বে। একপ্রাণ, এক মন, এক ভাবনা কাব্যে, গাথায়, স্বপ্ন ও সাধনায় আজও আত্মিক ঐশ্বর্যে অখণ্ড করে রেখেছে বাঙালীকে। বাংলা গেছে কিন্তু বাঙালীত্ব যায়নি। এই বাঙালীত্বই বিকৃত বিখণ্ডিত সংস্কার ভাবী আশা। এই আশার বুকেও অস্ত্রাঘাত।

বাঙালীত্বের গর্ব কি শুধু পশ্চিম বাংলার সীমাবদ্ধ, পদ্মার ওপারের ওই দুর্ধর্ষ মানুষদের রুদ্র সংগ্রামের ধ্বনি কি আমাদের কানে ভেসে আসে না পদ্মার ওপার থেকে? বাংলাভাষা, বাংলার গান, বাঙালীর স্বাজাত্যবোধ, বাঙালীর কৃষ্টি সংস্কৃতির মর্যাদা রক্ষায় আজ পূর্ব বাংলার সন্তানেরা যে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে—তাজা প্রাণের খুন দিয়ে তারা যে বাঙালীত্বকে রক্ষা করছে—তাদের প্রতি ভ্রাতৃত্বের অভিনন্দনে কি পশ্চিম পারের বাঙালীর ভাবাবেগ দুলে ওঠে না? বাংলা ও বাঙালীত্বের গৌরব আজ পূর্ব বাংলায়,—বিদ্রোহী বাংলার প্রাণশক্তি আজ সক্রিয় পদ্মার পূর্বপারে। আজ যদি আমরা পশ্চিম বাংলাকে বাংলা নাম দেই,—তা'হলে যে অপরাধ করব আমরা বাঙালীত্বের মানরক্ষায় সংগ্রামব্রতী ওই পূর্ব বাংলার লোকদের প্রতি তার সীমা পরিসীমা নেই। পশ্চিম বাংলাকে বাংলা নাম দেওয়ার অর্থ হবে পূর্ব বাংলার বাঙালীর পিঠে একটা বিষাক্ত ছুরি মারা। পশ্চিম পাকিস্তান এই

তো চায়! তারা বাংলা ও বাঙালীর ভয়ে ভীত। বাংলাভাষা পাকিস্তানের দুষমন। পূর্ব বাংলার বাঙালীত্ব মুছে দিয়ে তার গায়ে ইসলামী পাকিস্তানের আলখাল্লা পরিয়ে দিয়ে পূর্ব বাংলার বাঙালীত্বকে নির্মূল করার জন্য আজ পনের বছর ধরে কোন প্রচেষ্টারই ত্রুটি করেনি করাচী-রাওলপিণ্ডির কর্তারা। পশ্চিম বাংলাকে বাংলা নামে অভিহিত করলে পূর্ব বাংলাকে হত্যার এক বড় অস্ত্র পেয়ে যাবে পশ্চিম পাকিস্তান।

বাংলা বিখণ্ডিত, কিন্তু এখনও পদ্মার দুই পারে বেঁচে আছে বাঙালীদের অস্তিত্ববোধ,—এই আত্মিক সত্তার অখণ্ডতাই বাংলার আগামীদিনের আশা, ভবিষ্যতের ভরসা, বাঙালীর আত্মিক অস্তিত্বের অখণ্ড ইতিহাস, ঐতিহ্য ও কৃষ্টিধর্মের নামে,—বাঙালীর অতীতের স্মরণে, ভবিষ্যতের আশায় বাংলার অবিচ্ছেদ্য শিল্প সংস্কৃতির সমৃদ্ধির প্রয়োজনে, অখণ্ড বাংলার আত্মিক অস্তিত্বকে যেন আমরা রক্ষা করি, বুভুক্ষু বঙ্গভূমির ভগ্নাংশকে পশ্চিম বাংলা নাম দিয়ে বাঙালীত্বকে যেন ক্ষুদ্রত্বের গণ্ডীতে শ্বাসরুদ্ধ করে বাংলার ভবিষ্যতের আশাকে ব্যর্থ করে না দেই, পশ্চিম বাংলা শুধু বাংলা নয়,—পূর্ববাংলাও বাংলা এপারের বাঙালীরাই শুধু বাঙালী নয়,—পদ্মার ওপারের বাঙালীরাও বাঙালী। বাংলা পদ্মার এপারে এবং ওপারে। বাংলাকে আমরা রক্ষা করতে পারি নি, কিন্তু এমন যেন কিছু করে ভবিষ্যতের আশাকে খুইয়ে না বসি, রাজনীতির আঘাতে খণ্ড বিখণ্ড হয়েও একথা যেন আমরা না ভুলি যে প্রাণধর্মে, জীবনধর্মে, আবেগ ধর্মে বাংলার বাঙালীত্ব এক অখণ্ড, অবিভাজ্য। কত আউল বাউলের প্রাণের রসে কত মনীষীও কর্মীর কর্ম চিন্তায়ও কত শহীদের রক্ত ও স্বপ্নে যে বাংলার বাঙালীত্ব গড়ে উঠেছে পনের বছরের বিচ্ছেদের অপঘাতেই কি তার মূল্য শেষ হয়ে যাবে? পদ্মার ওপারের কারাগারগুলিতে ফাঁসীর মঞ্চে অমর প্রাণ কত শহীদের চিরঞ্জয়ী ঐতিহ্য রচিত হয়ে গেছে! মহাজীবনের যে জ্যোতির্ময় শিখা উদ্দীপ্ত হয়ে উদ্ভাসিত করে তুলেছে চারিদিকের মাটি ও মানুষকে সেই মাটি কি বাংলামায়, ও সেই মানুষেরা কি বাঙালী নয়? বাংলা খণ্ডিত হয়েছে কিন্তু বাঙালীত্ব খণ্ডিত হয়নি। বাঙালী আছে পশ্চিম বাংলায়, আছে পূর্ব বাংলায়। দুই বাংলাই বাংলা,—এই বিস্তীর্ণ বাংলায় বাঙালীর অস্তিত্ব অক্ষয় হয়ে থাকুক। পূর্ব বাংলাকে খণ্ডিত করার ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধিতে প্রণত হয়ে একাংশ পশ্চিম বাংলাকে গোটা বাংলা নাম দিয়ে বাঙালীর বৃহত্তর অস্তিত্বকে বাঙালীর আত্মিক অস্তিত্বকে যেন বিপন্ন না করি আমরা। বাংলা আজ আহত, রক্তাক্ত, কিন্তু বাঙালীর ভবিষ্যৎ মৃত নয়। বাংলা বিস্তৃত পদ্মার এপারে ওপারে দুই পারে,—এই দুই পারের বাঙালীই বাংলার উত্তরাধিকারী অর্থাৎ বাঙালীর আত্মিক অস্তিত্বই ভাবী বাংলার পুনর্জীবনের প্রতিশ্রুতি। বাংলা ও বাঙালীর ভাবী প্রয়োজনেই পশ্চিম বাংলাকে বাংলা নামে অভিহিত করার প্রয়াস এক অমার্জনীয় অপরাধের সামিল হবে। বাংলা ও বাঙালীর প্রতি এই অপরাধ করতে আজ যারা উদ্যত তাদের স্বার্থদুষ্ট সংকীর্ণ আচরণের বিরুদ্ধে মৃত্যুঞ্জয়ী বাঙালীদের তীব্র প্রতিবাদ জানাই আমরা।

সম্পাদকীয়

কবিশেখর শার্দুল সিংহের দেহান্তর

বিপ্লবী সংগ্রামের পথ নিয়মতান্ত্রিক বা উদারপন্থী অথবা সত্যাশ্রয় আন্দোলনের ন্যায় ধারাবাহিক ও অবক্ষয় নয় বলেই বিপ্লবী জীবনের ললাটে এখনও জলন্ত নক্ষত্রের ন্যায় রাজ তিলক জ্বলে ওঠে, কখনও আবার অখ্যাতির অন্ধকারে সেই জীবন নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। সুভাষ-পর্বের আগে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটিতে পাঞ্জাবের অবিসম্বাদী প্রতিনিধি এবং নেতাজীর বিশ্বস্ত সহকর্মী ও ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রাক্তন সভাপতির জীবন এমনি উত্থান-পতন ও খ্যাতি-অখ্যাতির একটি বিচিত্র নিদর্শন। কবিশেখর শার্দুল সিংহের সঙ্গে আরেকটি এমনি অ্যাডভেঞ্চারিষ্ট বিপ্লবীর নাম স্মরণের পথে ভেসে ওঠে এবং তিনি হলেন জাতীয় আন্দোলনের দিনে দিল্লীর একচ্ছত্র দুর্ধর্ষ নেতা লালা শংকরলাল। কবিশেখর শার্দুল সিংহ এবং লালা শংকরলাল, উভয়েই জাতীয় সংগ্রামের যুগে যথাক্রমে পাঞ্জাব ও দিল্লীর আপোষহীন সংগ্রামী জননেতা রূপে পরিচিত ছিলেন। সেদিনে গান্ধীজীর নেতৃত্বে পরিচালিত দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত থাকলে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে তাঁরা নিজেদের সাংগঠনিক যোগ্যতা ও জননেতৃত্বের জোরেই পদ, প্রতিষ্ঠা ও বহু সম্মানের অধিকারী হতে পারতেন। কিন্তু বিপ্লবী আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলা ও পাঞ্জাবের মধ্যে যে আত্মিক ও সংগ্রামী সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল তারই ঐতিহ্য বহন করে নেতাজীর বৈপ্লবিক আহ্বানে সংঘর্ষ ও সংকটের পথ বেছে নিয়েছিলেন শার্দুল সিংহ এবং লালা শংকরলাল।

নেতাজীর নির্দ্দেশে লালা শংকরলাল সেদিনের ইংরেজ শাসকের চোখে ধূলি দিয়ে যুদ্ধপূর্ব জাপান ঘুরে সেখানকার রাজনৈতিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে আসেন। নেতাজীর ভারত ত্যাগের পরিকল্পনায় শার্দুল সিংহ কবিশেখরের অবদান কম নয়। কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ড-বিরোধী সুভাষপন্থী ফরওয়ার্ডব্লকের রাজনীতি অনুসরণের ফলে তাঁদের শুধু কঠিন সংগ্রাম ও সংঘাতের বৈপ্লবিকপথই অনুসরণ করতে হয় নি—সংগ্রামী সংগঠন পরিকল্পনায় বহু অধিক দায়িত্বও বহন করতে হয়েছে।

জীবনের অন্তিম পর্বে যে কাল মেঘই কবিশেখরের জীবন-দীপ্তিকে আচ্ছাদিত করুক না কেন,—ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর যে সংগ্রামী অবদান, সেদিনের সুভাষবাদী বামপন্থী রাজনীতিতে তাঁর যে নেতৃত্ব, নেতাজীর ভারত ত্যাগের পরিকল্পনায় তাঁর যে সহায়তা এবং আজাদ হিন্দ্ ঐতিহ্যের আন্দোলনে এই পাঞ্জাবী বিপ্লবীর যে সংগ্রামী ইতিহাস তা' বিস্মিত হবার নয়। সায়াহ্নের ছায়াটুকু নয়, যে বৈপ্লবিক দীপ্তিতে তাঁর জীবন এক সময়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল শার্দুল সিংহ কবিশেখরের সেই ঐতিহ্যটি আমাদের স্মরণে অম্লান হয়ে থাকুক।

উপনির্বাচনের উপসংহার

পশ্চিম বাংলার পাঁচটি উপনির্বাচনেই কংগ্রেস জয়লাভ করেছে এবং এক বিশেষসময়ে উপনির্বাচনে সাফল্য লাভের জন্য শ্রীনেহেরুর কাছ থেকে এই প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ও কংগ্রেস

প্রধান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অভিনন্দন লাভ করেছেন। শ্রীনেহেরুর নেতৃত্ব যখন চরম সংকটের সম্মুখীন সেই সময়ে এরূপ উপ-নির্বাচনের সাফল্যে তিনি নিশ্চয়ই উৎফুল্ল হয়ে উঠবেন এবং এই উপ-নির্বাচনের ফলাফল থেকে তিনি এই রাজনৈতিক উপলব্ধান্তের কথা সগর্বে প্রচার করবেন জনসাধারণ তাঁর বৈদেশিক নীতির সাফল্য ও নির্ভুলতা স্বীকার করে এবং কংগ্রেস সরকারের ব্যাপক ও বর্দ্ধিত করনীতি ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতি সমর্থন করে ; নির্বাচনী ফলাফল তার অকাট্য সাক্ষ্য।

বিদেশীরা এরূপ উপনির্বাচনের ফলাফলকে নেহেরু-নীতির অন্তরঙ্গতার বলে মনে করবে, কিন্তু উপ-নির্বাচনের ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষকদের কাছে এই নির্বাচনী জয় কংগ্রেসের সোজতন্ত্র, স্থিতস্বার্থতন্ত্র ও সন্ত্রাসবাদের জয় বলেই পরিগণিত হবে এবং একথা স্বীকৃত হবে যে এরূপ নির্বাচনী জয়ের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে জাতীয় জরুরী অবস্থার জন্য।

পশ্চিম বাংলার পাঁচটি উপ-নির্বাচনের চারিটি আসন ছিল কংগ্রেসের। এই তিনটি আসনের দুইটিতে মৃত কংগ্রেসী সদস্যের পুত্রদ্বয় এবং একটিতে স্ত্রীকে প্রার্থীরূপে দাঁড় করান হয়। চতুর্থ ক্ষেত্রে মৃত সদস্যের পুত্র বা স্ত্রী না থাকায় একজন ধনপতিকে দেওয়া হয় প্রার্থীর আসন। প্রার্থী মনোনয়নের যোগ্যতা নির্ণয়ের সমস্ত রকম গণতান্ত্রিক মানকে জলাঞ্জলি দিয়ে হয় সোজতন্ত্র না হয় স্থিতস্বার্থতন্ত্রের যে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে তার ফলে, আর যাই হোক এই উপনির্বাচনে গণ-তান্ত্রিক আদর্শের জয় হয় নি।

চৌরঙ্গী উপনির্বাচনে বিপুল সংখ্যায় জালভোট, প্রকাশ্যে এরূপ জালভোট দেওয়ার মিছিল, কংগ্রেস অ্যাসেম্বলী পার্টির অন্যতম কর্মকর্তার গৃহে নির্লজ্জ ও নগ্নভাবে জালভোট তৈরীর উন্মুক্ত আড্ডা স্থাপন, প্রায় দশ হাজার ভুয়া ভোটার তালিকা রচনা, ব্যাপকভাবে গুণ্ডার সাহায্যে বিরোধী প্রার্থী ও সমর্থকদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদ প্রসার, পুলিশের কর্তব্যে অবহেলা মনোভাব ইত্যাদি ঘটনার মাধ্যমে চৌরঙ্গীতে ভারতের জরুরী অবস্থার যে উপ-নির্বাচনটি সম্পন্ন হয়েছে সে সম্বন্ধে যদি নিরপেক্ষ তদন্ত করা হয় তা' হলে দেখা যাবে ক্ষমতা লোলুপ কংগ্রেস ক্ষমতা রক্ষার জন্য আজ যে পন্থা অনুসরণ করে চলেছে তার গতি গণতন্ত্রের অপমৃত্যুর দিকে। কংগ্রেসীদের ক্ষমতাস্থতা আজ এমন এক পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যে চৌরঙ্গীর কংগ্রেসী সন্ত্রাসবাদ ও জাল-ভোটের সমর্থনে একজন কংগ্রেস মন্ত্রীকে বলতে শোনা যায়—"can Congress afford to loose this seat ?" বস্তুত চৌরঙ্গীতে নির্বাচন হয় নি, হয়েছে বেপরোয়া কংগ্রেসী সন্ত্রাসবাদের মাধ্যমে একতরফা জালভোটের সমাবেশ।

কংগ্রেস যে স্তরে স্তরে কিরূপ স্থিতস্বার্থ সাম্রাজ্যকে বল ও ক্ষমতারক্ষার খুঁটি হিসেবে তৈরী করেছে, নির্বাচনে এবং বিশেষ করে গ্রাম্য কেন্দ্রের নির্বাচনে, তা ছবির মত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গ্রামের সর্বস্তরের স্থিতস্বার্থবানরা কংগ্রেসের সমর্থক। শুধু স্থিতস্বার্থবান নয়, গ্রাম ও সহরে, উভয় স্থানেই অসামাজিক ব্যক্তিরা কংগ্রেসী সন্ত্রাসবাদের প্রধান হাতিয়ার। স্থিতস্বার্থবাদীদের চাপ ও অসামাজিক ব্যক্তিদের হুমকি, আজ কংগ্রেসী নির্বাচন জয়ের প্রধান অস্ত্র ও পদ্ধতিতে পরিণত হয়েছে। এশিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় জীবনে এমনি ক্ষমতা প্রভুত্বতার ফলে গণতন্ত্রের যে কি শোচনীয় পরিণতি ঘটেছে,—ক্ষমতার প্রভুত্বতায় কংগ্রেস তার শিক্ষা গ্রহণেও রাজী নয়। অশিক্ষিত ও অচেতন ভারতীয় জনতার আর্থিক, শ্রেণি, বর্ণীয়, সম্প্রদায়, ভাষাগত গোষ্ঠি, কাষ্ট, বিভেদ ইত্যাদি বহুমুখী দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে কংগ্রেস যে ক্ষমতার বুনিয়াদ গড়ে তুলেছে তার ভিত্তি যে কত অন্তঃসারশূন্য চীনা আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে তার নগ্ন প্রকটতাতেও কংগ্রেসের চেতনা হয় নি। উপ-নির্বাচনের জয়ে কংগ্রেস গর্বিত ও উৎফুল্ল কিন্তু যে উপায়ে কংগ্রেস নির্বাচনী কার্য হাসিল করছে তার অন্তিম পরিণামের কথা ভেবে ভবিষ্যৎ ও ক্ষমতানিরপেক্ষ ভারতীয় মন উদ্বিগ্ন ও আশঙ্কিত না হয়ে পারে না।

জাতীয়তাবাদী বামপন্থী ঐক্য

কংগ্রেস যে কিরূপ ক্ষমতাকাঙ্খী ও ক্ষমতাসর্বস্ব হয়ে উঠেছে জাতীয় জরুরী অবস্থায় কংগ্রেস সরকার ও প্রতিষ্ঠানের আচরণ তার এক চিন্তনীয় নিদর্শন। মুখে জাতীয় ঐক্যের কথা বলে কংগ্রেস নগ্নভাবে জরুরী অবস্থাকে দলগত প্রতিষ্ঠার সুযোগরূপে গ্রহণ করেছে। জাতীয় জরুরী অবস্থায় কংগ্রেসের বহু নেতা এক রাষ্ট্র এক নেতা একদলের মাওসীবাদী নীতির তুলনাতেও দ্বিধা-বোধ করেননি। অন্যান্য নেতারা মুখে এরূপ বলি না বললেও কার্যক্ষেত্রে এরূপ নীতি অনুসরণ করে চলছেন।

একে জরুরী অবস্থার ক্ষমতা প্রমত্ততা, তার উপরে উপ-নির্বাচনের একচ্ছত্র জয়—পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেসের গর্ব যে কোন মাত্রায় কেঁপে উঠবে সেকথা ভাবা কষ্টকর নয়। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের কর ও দাম তো বৃদ্ধি লাভ করছেই, —আবার বাস, ট্রাম্ ট্যাক্সী ইত্যাদি যানবাহনের ভাড়াবৃদ্ধির প্রস্তাবও হয়েছে। চালের দরের যে শোচনীয় অবস্থা—এ বারে বাংলার জনগণের ভাগ্যে যে কি দুর্ভোগ আসছে, সেকথা ভেবে আমরা উদ্বিগ্নবোধ করছি। গর্বিত ও ক্ষমতায় কংগ্রেস শাসনের কাছে জনতার দাবী যে কি উত্তর লাভ করবে সেকথা কল্পনা করা কষ্টকর নয়।

কংগ্রেসী সরকার ও প্রতিষ্ঠানের ঔদ্ধত্যের প্রতিরোধ করার জন্য আজ জাতীয়তাবাদী বামপন্থীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। কম্যুনিষ্ট পার্টি যে দেশদ্রোহিতার ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তারপরে কম্যুনিষ্ট পার্টির সঙ্গে কোনরূপ ঐক্যস্থাপন করার কথা বিবেচনার যোগ্যও নয়। বাংলার বর্তমান দুর্দিনে প্রজাসোস্যালিষ্ট পার্টি ও ফরোয়ার্ড ব্লক অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। আর, এস, পি দলটির এখনও কম্যুনিষ্ট মোহ ভাঙেনি। অন্যান্য দলগুলি সম্বন্ধে আলোচনা না করাই ভাল। আর-এস, পি যদি তার অস্থির ও সুযোগ সন্ধানী দলটির উপরে বিশেষ প্রত্যাশা না করে পি-এস-পি ও ফরোয়ার্ড ব্লকের ঐক্যবদ্ধ হয়ে জাতীয়তাবাদী বামপন্থী ফ্রন্ট গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় অগ্রণী হওয়া কর্তব্য। কংগ্রেসী সরকারের স্বৈরাচারী নীতির প্রতিরোধে এই দল দুইটি সংযুক্ত মোর্চা গড়ে তুলতে সক্ষম হলে পশ্চিম বাংলার জনসাধারণের মনে কিছুটা আশার সঞ্চার হতে পারে এই ভেবে যে তাদের দাবী ও প্রতিবাদ এরূপ জাতীয়তাবাদী বামমোর্চার মাধ্যমে অনেকাংশে সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে।

দেশরক্ষার প্রস্তুতি

লোকসভায় দেশরক্ষামন্ত্রী চ্যবনের সাম্প্রতিক বিবৃতি পর্যালোচনা করে ভারতবাসী অনেকাংশে আশ্বস্ত বোধ করবে এই ভেবে যে ভারত সরকারের শান্তিশীল ও শান্তির বুলির মোহনিদ্রা এতদিনে ভাঙতে আরম্ভ করেছে। শক্তিহীনের পক্ষে শান্তির কপোত উড়ান যে দুর্বলতার নিদর্শন ছাড়া আর কিছু নয় এবং জোট-নিরপেক্ষ নীতিকে কার্যকরী করার জন্যও যে রাষ্ট্রীয় শক্তির ও আত্মবিশ্বাসের প্রয়োজন এত দিনে বোধ হয় সেই বাস্তবতার দাবী সম্বন্ধে ভারত সরকার আংশিক ভাবে সচেতন হতে আরম্ভ করেছেন।

দেশরক্ষামন্ত্রী চ্যবন জানিয়েছেন যে শীঘ্রই ভারতীয় সেনাবাহিনী দ্বিগুণ করা হবে, ছয়টি পার্বত্য ডিভিসন গঠন করা হবে, বিমান বাহিনী শক্তিশালী করা হবে এবং আরও ছয়টি অর্ডিনেন্স ফ্যাকটরী স্থাপন করা হবে। এই সবই আশা ও আশ্বাসের কথা। নৌ-বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধির পরিবর্তে স্থল ও বিমান বাহিনীর সম্প্রসারণের কার্যক্রমও বাস্তবানুগ। ভারতবর্ষের পক্ষে, আপাততঃ, জল পথে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তাই, স্থল ও বিমান বাহিনীকে বিশেষভাবে শক্তিশালী করে গড়ে তোলার জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিত।

দেশরক্ষার বিষয়ে বিশেষ করে নেফার বিপর্যয়ের পরে

দেশরক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে লোকসভা ও দেশবাসীকে যে ওয়াকিবহাল রাখা প্রয়োজন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু গণতন্ত্রের একটি মস্ত দোষ বাচালতা। উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী যিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা বা দেশ রক্ষা বিভাগের কেউ নন, তিনি আমেরিকা গিয়ে ভারতীয় সামরিক শক্তির বিবরণ সম্বন্ধে অনেক তথ্য সাংবাদিকদের কাছে পরিবেশন করেছেন। ভারতীয় সামরিক বাহিনীর শক্তি ও সরঞ্জাম সম্বন্ধে এরূপ পরিসংখ্যান প্রকাশ করা, চীনের সঙ্গে বর্তমান অঘোষিত যুদ্ধাবস্থায় শুধু গুরুতরভাবে অসমীচীন হয়েছে তাই নয়, বিজু পট্টনায়ক সাধারণ নিয়মের একটিবার বহির্ভূত কাজ করেছেন। উপরন্তু, ভারতীয় লোকসভা ও জনতার কাছে সামরিক তথ্য গোপন রেখে, বিদেশে তা' প্রকাশ করা, বর্তমান চীন-ভারত সংঘাতের পরিস্থিতিতে, এক জাতীয় স্বার্থবিরোধী কাজ বলে গণ্য হবে। বিজু পট্টনায়ক যে অপরাধ করেছেন তা' অনেকাংশে সংশোধন করার উদ্দেশ্যেই বোধ হয় দেশরক্ষা মন্ত্রী চ্যবন লোকসভায় দেশরক্ষার প্রস্তুতি সম্বন্ধে বিবৃতি দিয়েছেন। সামরিক শক্তিবৃদ্ধির সংবাদ পরিবেশন ভারতীয় মনোবলবৃদ্ধির জন্য – একান্ত প্রয়োজন, কিন্তু পরিসংখ্যান ব্যক্ত করা সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা রক্ষা করা দরকার।

ভারতীয় সামরিক 'ইন্টেলিজেন্স' বা গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহ বিভাগ যে কিরূপ শোচনীয় ভাবে অযোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে নেফায় ব্যাপক চীনা আক্রমণ তার এক মারাত্মক নজীর। কয়েক লক্ষ সৈন্য সহকারে যদি কোন দেশ আক্রান্ত হয় তা' হলে সেই অভিযানকে কোনক্রমেই আকস্মিক বলা যায় না। অথচ চীনা আক্রমণকে 'আকস্মিক' 'অতর্কিত' ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে ভারত সরকারের মুখপাত্ররা নিজেদের অজ্ঞতার সাফাই গাইবার চেষ্টা করেছেন, চীনের ব্যাপক আক্রমণের মুখে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী বিদেশ ভ্রমণে যেতে পারেন একথাও অকল্পনীয়। চীনা আক্রমণ ভারতীয় সামরিক বিভাগের অসম্পূর্ণতা ও অযোগ্যতা চরমভাবে প্রকট করে তুলেছে।

বিজ্ঞপ্তি

নিউজপ্রিন্ট, ডাকমাশুল ইত্যাদির মূল্য বৃদ্ধির জন্য দুঃখের সহিত ১৩৭০ বৈশাখ হ'তে জয়শ্রীর মূল্য বৃদ্ধি না করে আমাদের উপায়ান্তর নেই। অতএব বৈশাখ থেকে জয়শ্রীর মূল্য বার্ষিক সডাক ৯'৫০ নঃ পঃ ষাণ্মাসিক সডাক ৪'৭৫ নঃ পঃ এবং প্রতি সংখ্যা '৭৫ নঃ পঃ করা হোল।

জয়শ্রীর গ্রাহক-গ্রাহিকারা আশাকরি মূল্য বৃদ্ধির সিদ্ধান্তে দুঃখিত হবেন না। এবং তাঁদের প্রীতি ও সহযোগিতা পূর্ববৎ জয়শ্রী লাভ করে যাবে। গ্রাহক-গ্রাহিকাদের নিকট অনুরোধ তাঁরা নূতন বৎসরের দেয় মূল্য বার্ষিক সডাক ৯'৫০ নঃ পঃ বা ষাণ্মাসিক ৪'৭৫ নঃ পঃ ৩০শে এপ্রিলের মধ্যে মনি অর্ডার যোগে পাঠিয়ে সহযোগিতা করবেন। অন্যথায় মে মাসের প্রথম সপ্তাহে কাগজ ভি পিতে পাঠান হবে।

প্রচার সম্পাদক

জয়শ্রী

অবশ্যি স্বেচ্ছায় সরকারের রাজনীতি যে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর গুপ্ত-সংবাদ বিভাগের কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তিব্বত থেকে সংবাদ সংগ্রহের প্রচুর সম্ভাবনা সত্ত্বেও ভারত সরকারের রাজনীতি ভারতীয় সামরিক বাহিনীর পক্ষে এরূপ সংবাদ সংগ্রহ করার পথে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা সৃষ্টি করেছে। একথা আজ সবাই জানে যে বর্তমান যুগে যুদ্ধের জয়-পরাজয় বিশেষ ভাবে নির্ভর করে শত্রুপক্ষের শক্তি ও সমাবেশের আগাম সংবাদ সংগ্রহের উপরে। ভারতীয় সামরিক ইন্টেলিজেন্সকে বিশেষভাবে শক্তিশালী করার জন্য তৎপর হওয়া উচিত।

ভারতীয় বাহিনীর জোয়ানদের সাহস, ধৈর্য ও যোগ্যতা সম্বন্ধে নেফার বিপর্যয়ের পরেও, একবাক্যে প্রশংসাবাণী উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে অফিসারদের সম্বন্ধে কিছু কিছু সমালোচনাও শোনা যাচ্ছে। নেফার বিপর্যয় সম্বন্ধে সামরিক স্তরের ব্যাপারে, এরূপ সমালোচনার গুরুত্ব ও ভিত্তি কতখানি সে সম্বন্ধে সতর্ক বিবেচনা প্রয়োজন, জোয়ান ও অফিসারদের শৌর্য ও নিষ্ঠিকতা এবং স্বদেশপ্রীতি সমপর্যায়ের ও সমগুরুত্বপূর্ণ হলে তবেই ভারতীয় বাহিনীকে জাতীয় স্বাধীনতার দুর্জয় প্রহরীরূপে গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

করবৃদ্ধি ও আমলাতান্ত্রিক ব্যয়বৃদ্ধি

আক্রান্ত ভারতের দেশরক্ষার ব্যবস্থার জন্য করবৃদ্ধির প্রয়োজন একথা অনস্বীকার্য। কিন্তু ভারতের ন্যায় দরিদ্রতম দেশে কোন স্তরে এবং কোন জনশ্রেণীর উপরে বর্ধিত কর ধার্য করা হবে তাই বিবেচ্য। ইংলণ্ড ও আমেরিকা, জার্মানী বা জাপানের মত ভারতেও সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের উপরে কর ধার্যকরা শুধু অবিবেচনাপ্রসূত নয় মারাত্মকভাবে ক্ষতিকর। অন্যান্য দেশে যুদ্ধের সময়ে করধার্যের নীতি প্রয়োগ করা হয় জীবনযান নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে। কিন্তু ভারতের ন্যায় দরিদ্র দেশ যেখানে মানুষের জীবন-যানের স্তর তো দূরের কথা, জীবন ধারণের জৈবিক স্তর রক্ষা করার উপায় পর্যন্ত নেই, সে দেশে একান্ত প্রয়োজনীয় দৈনিক দ্রব্যের উপরে কর ধার্য করার অর্থ, জনসাধারণের পক্ষে নিতান্ত জীবন ধারণের উপায়কে কঠিনতম সমস্যার প্রশ্ন করে তোলা। ভারত সরকারের করনীতির ফলে শুধু কতগুলি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যই বৃদ্ধি পায়নি মূল্য-বৃদ্ধির স্বাভাবিক চক্রের প্রতিক্রিয়ার চাল-ডাল-সবেরও দাম বৃদ্ধি পেয়ে জনসাধারণের জীবনযাত্রাকে দুর্বহ করে তুলেছে। বর্ধিত করভারের ফলে মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত, কৃষক ও শ্রমিক সম্প্রদায়ের ব্যয়ভার সহ্যের সীমা অতিক্রম করে ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে আরম্ভ করেছে।

একদিকে গরীব জনসাধারণের ভাতের গ্রাস ও পরবার বস্ত্র কেড়ে নেওয়ার উপক্রম করে করভার বৃদ্ধি এবং অন্য-দিকে মন্ত্রী ও আমলাতন্ত্র পোষণ, তাদের জীবন যান উন্নয়ন ও বিলাসিতার জন্য ব্যয়ভার বৃদ্ধি—ভারতের জাতীয় মনে এক বিষদুষ্ট প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে আরম্ভ করেছে। ১৯৪২ সালে শাসনতন্ত্রের ব্যয় ছিল ৭'৭৩ কোটি টাকা এই ব্যয় বৃদ্ধি হয়ে বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ১৯'৭১ কোটি টাকা। বৈদেশিক খাতে ব্যয় ছিল ৪'১৯ কোটি টাকা। বর্তমানে এই ব্যয়ের পরিমাণ ১৪'১৭ কোটি টাকা। আমাদের দূতাবাসগুলি বিলাসিতা ও ঠাট-বাটে মার্কিন দূতাবাসের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে চলে।, পুলিসের খাতে যে ব্যয় ছিল ২'৯১ কোটি টাকা, বর্তমানে তার জন্য ব্যয় হচ্ছে ৩৩'৫৩ কোটি টাকা। অর্থাৎ পুলিসী ব্যয় বৃদ্ধি হয়েছে প্রায় বার গুণ। অথচ যে পরিমাণে পুলিসী খাতে ব্যয় বৃদ্ধি হয়েছে সেই পরিমাণেই চোরাকারবারী, দুর্নীতি ও ঘুষখোরী বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সোনার চোরাচালান-রুখতে ব্যর্থ হয়ে স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ আইন জারী করে শুধু পাঁচ লক্ষ স্বর্ণকারদেরও মুখের অন্ন কেড়ে নেওয়া হয় নি, গরীবের ঘরের ব্যাংকটি ঘরেও টান দেওয়া হয়েছে।

যখন করবৃদ্ধি করে জনসাধারণের খাদ্যরোধ করার

চেষ্টা হচ্ছে ঠিক সেই সময়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের বিলাসিতা ও অপব্যয়ের যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তা অবশ্যনীয়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের বিদ্যুৎ ও জলের খরচের জন্য যে ব্যয় হয় তার প্রকাশিত তালিকা দেখে মনে হবে বাদশাহী আমলের এই মন্ত্রীদের মানসিকতার সঙ্গে পার্থক্য কোথায়। প্রকাশিত খরচের তালিকায় প্রধানমন্ত্রী নেহেরু : শ্রীমোরারজী দেশাইয়ের বাড়িতে বিদ্যুত ও জলের জন্য কত ব্যয় হয় এবং কৃষ্ণমেনন মহাশয় এতকাল কত ব্যয় করেছেন তার হিসাব প্রকাশ করা হয় নি। এরূপ অনুমেয় বোধ হয় তাৎপর্যপূর্ণ। মন্ত্রী মহোদয়দের বাড়িতে কিরূপ মাসিক ব্যয় হয় তার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হলো।

মন্ত্রী	বিদ্যুৎ	জল
জগজীবনরাম	৪৭৪'৩৩	৫০ ৭৫
লালবাহাদুর	৫৮০'১৩	১২০ ৬১
পাতিল	৫০৩'৫৮	১৫'২৫
অশোকসেন	৫৫৮'৪৭	৬২'০০
ইব্রাহিম	৪৬৪'৭১	৮২'০৭
গুলজারীলাল	৩১২'৪১	৫৩'০০
সুব্রহ্মনিয়ম	৩৫৪'০০	০ ০ ০

কয়েকটার বৃদ্ধি করে মন্ত্রী ও আমলাদের বিলাসিতার পোষণ একদিকে, অন্যদিকে গরীবের জীবনযাত্রা দুর্বিসহ করে তোলার যে নীতি কংগ্রেসী সরকার অনুসরণ করে যাচ্ছে তার সঙ্গে চীন যা চেয়েছিল আজ ভারতের জনজীবনে সেই ঘটনাই ঘটবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। চীনা আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের জনমনে যে প্রবল দেশ প্রেমের জোয়ার বয়েছিল কংগ্রেসী সরকারের কর-নীতি এবং মন্ত্রী ও আমলা পোষণের বাদশাহী চাল আজ তা' ব্যর্থ করে দেওয়ার উপক্রম করেছে। দেশপ্রেম যেন সরকার বিরোধী বিক্ষোভে পরিণত না হয় তার জন্য 'ডিফেন্স লাইনের' সঙ্গে 'প্রাইস লাইন' তথা সীমান্ত রক্ষার সঙ্গে নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের নিয়ন্ত্রণ যে একান্ত অপরিহার্য কংগ্রেসী সরকার সে সে কথা কে বোঝাবে।

দুর্নীতির দায়ে তেলমন্ত্রী

কলকাতার সিরাজুদ্দীন কোম্পানীর খাতাপত্র তল্লাস করার সময়ে যে সব মন্ত্রী উক্ত কোম্পানী থেকে অর্থ গ্রহণ করেছে তার যে তালিকা পাওয়া যায় তারমধ্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কৃষ্ণকান্ত মালব্যের নাম অন্যতম। প্রজাসোস্যালিষ্ট নেতা শ্রীসুরেন দ্বিবেদী এই অর্থ গ্রহণকারী মন্ত্রী তালিকার কথা লোকসভায় উত্থাপন করলে যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় তা প্রশমন করার জন্য শ্রীনেহেরু এ সম্বন্ধে তদন্ত করার আশ্বাস দেন। সম্প্রতি পার্লামেন্টের কংগ্রেসী সদস্যদের সভায় তেলমন্ত্রী মালব্য স্বীকার করেছেন যে পার্টি ফাণ্ডের জন্য তিনি সিরাজুদ্দীন কোম্পানী থেকে অর্থ গ্রহণ করেছেন। একজন কেন্দ্রীয়মন্ত্রীর পক্ষে এরূপ কাজ যে কত গর্হিত এবং নানা লাইসেন্স ও পারমিট দানের সুযোগে দেশী ও বিদেশী ব্যাংকে এই ভাবে অর্থ জমানোর দুর্নীতিপূর্ণ উপায়ের পথ খুলে দেওয়ার তাৎপর্য যে কত গভীর সে সম্বন্ধে ত্বরান্বিত ব্যবস্থা গ্রহণ করে তেল মন্ত্রীকে অবিলম্বে পদত্যাগ করতে বলা তো দূরের কথা বরং এরূপ মন্ত্রীদের পক্ষে সাফাই গেয়ে শ্রীনেহেরু সম্প্রতি বলেছেন যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ করার পিছনে রয়েছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। সিরাজুদ্দিন কোম্পানী সংক্রান্ত ঘটনার তদন্ত করার যে প্রতিশ্রুতি শ্রীনেহেরু দিয়েছেন তা' যে কিছু দিন কিছু কথা বলার পরেই ধামাচাপা পড়বে সেকথা ভাবা অযৌক্তিক নয়। কালক্ষেপ করে কোন গুরুতর বিষয়কে ধামাচাপা দেওয়ার কৌশলে শ্রীনেহেরুর চেয়ে পারদর্শী কমই আছে।

দৈনিক 'প্যাট্রিয়ট' ও শ্রীনেহেরু

দিল্লীর, সদ্য প্রকাশিত 'প্যাট্রিয়ট' কাগজটিকে শুধু বাণী পাঠিয়েই শ্রীনেহেরু সন্তুষ্ট হন নি সদলবলে বিভিন্ন কেন্দ্রীয়

মন্ত্রীসহ এই দৈনিকটির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে উদ্যোক্তাদের সোৎসাহ সমর্থন জানিয়েছেন। একটি দৈনিককে এরূপ পক্ষপাতমূলক সরকারী সমর্থনের পূর্ণ ফয়দা উঠাবার চেষ্টায় প্যাট্রিয়ট তাই সরকারী বিজ্ঞাপন ও অতিরিক্ত নিউজ প্রিন্ট লাভের সুযোগ গোড়া থেকেই লাভ করেছে। যেরূপ সরকারী দাক্ষিণ্যের সঙ্গে কাগজটিকে নিউজ প্রিন্ট কোটা দেওয়া হয়েছে তার নগ্ন পক্ষপাতিত্ব দেখে ইণ্ডিয়ান নিউজ পেপার সোসাইটি ভারত সরকারের কাছে প্রতিবাদ পাঠাতে বাধ্য হয়েছে।

বাকীতে দৈনিক প্যাট্রিয়ট কাগজের 'রিসোর্স' ও 'কারেজ' সম্বন্ধে প্রশংসা করে শ্রীনেহেরু আরও বলেছেন যে "এই কাগজটি কোন বিশেষ স্বার্থের সঙ্গে জড়িত নয়।" একটি সদ্য প্রকাশিত কাগজকে সরকারী সমর্থন জানিয়ে এরূপ সার্টিফিকেট দেওয়ার আগে এই কাগজটি কারা প্রকাশ করছে এবং কোথা থেকে এই কাগজটির মূলধন সংগৃহীত সেকথা না জানা শ্রীনেহেরুর পক্ষে সম্ভব নয়। জানা যায় যে এই কাগজটির প্রস্তাবিত শেয়ারের মূলধন ৫ লক্ষ টাকা এবং তার মধ্যে কলকাতার জনৈক ডাঃ পি, আর, ব্যানার্জী শেয়ার কিনেছেন ২ লক্ষ টাকার। অথচ এই ব্যক্তি মাত্র এক বছর আগে ১,১৮,০০০ টাকার একটি চেক 'ড্রিফ-অনার্ড' হওয়ার দায়ে কলকাতা শাখার লয়েড ব্যাঙ্ক কর্তৃক দায়ের করা ৪২০ ধারার মামলায় অভিযুক্ত হন। এরূপ একটি প্রায় দেউলিয়া ব্যক্তি কি ভাবে এক বছরের মধ্যে ২ লক্ষ টাকার শেয়ার খরিদ করতে সক্ষম হলো সে সম্বন্ধে কোন তথ্য সন্ধানের কোন প্রয়োজন শ্রীনেহেরু বোধ করেন নি; আরও জানা যায় যে এই ব্যানার্জী মহোদয় প্রাক্তন দেশরক্ষা মন্ত্রী কৃষ্ণমেননের ঘনিষ্ঠ চক্রের বন্ধু এবং কম্যুনিষ্ট মহলের পদাস্তরালের অন্তরঙ্গ লোক। এক বছর আগেও যে ব্যক্তি ৪২০ ধারার মামলায় পড়ে সে ব্যক্তি কি করে আকস্মিক এত অর্থের মালিক হয়ে গেল যে একটি অনিশ্চিত ভবিষ্যতের একটি দৈনিকের ২ লক্ষ টাকার শেয়ার কিনতে সক্ষম হোল তা সুনিশ্চিতভাবে এক গভীর রহস্য ও সন্দেহের বিষয়। এরূপ কাগজকে শুভেচ্ছা ও সমর্থন জানের পরিবর্তে বরং শ্রীনেহেরুর উচিত ছিল স্পেশাল ব্রাঞ্চের সাহায্যে এরূপ অর্থের সূত্র সন্ধান করা।

কাগজটিকে দলগত স্বার্থ নিরপেক্ষ বলে শ্রীনেহেরু অভিনন্দন জানিয়েছেন। অথচ এই কাগজটি ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির বাম-পন্থীদের একটি বেনামী মুখপত্র ছাড়া কিছুই নয়। ডাঃ পি, আর, ব্যানার্জী ছাড়াও এই কাগজের ডিরেকটার বোর্ডে রয়েছেন প্রাক্তন কম্যুনিষ্ট ও সদ্য কংগ্রেসী ডাঃ বালিগা, এবং শ্রীমতী অরুণা আসফআলি ও কেরলা কমিউনিষ্ট পার্টির সম্পাদক শ্রীগোবিন্দ নায়ার। প্যাট্রিয়ট ছাপাও হচ্ছে কৃষ্ণমেননের মুখপত্র 'লিংক' সাপ্তাহিকের প্রেসে।

কম্যুনিষ্ট চীনের সঙ্গে ভারতের চরম সংকটের সময়েও শ্রীনেহেরু প্যাট্রিয়টকে সমর্থনের মধ্য দিয়ে পরোক্ষে কম্যুনিষ্টদের শক্তি বৃদ্ধির প্রয়াসে সহায়তা দিতে চিন্তিত মন এর চাইতে ভালোর বিশ্লেষণ আর কি হতে পারে।

নেহেরু-সমালোচনার অপরাধে

কংগ্রেসের মধ্যে স্বৈরতান্ত্রিকতাসীবাদী মনোবৃত্তি কিরূপ প্রকট হয়ে উঠেছে দিল্লীর একটি সাম্প্রতিক ঘটনা তার নিদর্শন। দিল্লী প্রজাসোস্যালিষ্ট পার্টির অন্যতম নেতা এবং শ্রীজয়প্রকাশের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী শ্রীরূপনারায়ণ প্রতি বছর হোলীর সময়ে নিজের গৃহে 'মুশায়রা' তথা কবি সম্মেলন করে থাকেন। এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এবারে বেতার বিভাগের ডেপুটি মন্ত্রী শ্রীস্বামীনাথের সভাপতিত্ব করার কথা ছিল। কিন্তু দিল্লী কংগ্রেস থেকে এক সার্কুলার পাঠিয়ে নির্দেশ দেওয়া হয় যে যে-সমস্ত ব্যক্তি শ্রীনেহেরু বা কংগ্রেসের সমালোচনা করবে সেরূপ ব্যক্তি কর্তৃক আয়োজিত কোন

অনুষ্ঠানে কংগ্রেসীরা যেন যোগদানে বিরত থাকে। অর্থাৎ শ্রীসদানন্দ যেন এই অনুষ্ঠানে যোগ না দেন। শ্রীরূপনারায়ণের অপরাধ এই যে তিনি চীনের ভারত আক্রমণের সময়ে শ্রীনেহেরুর সমালোচনা করেছিলেন এবং তার ফলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। রাজাজী, আচার্য কৃপালনী, শ্রীজয়প্রকাশ প্রমুখ নেতৃবর্গ শ্রীরূপনারায়ণের এরূপ স্বেচ্ছাচারী গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ করেছিলেন। কংগ্রেসের স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতা প্রমত্ততা আজ এমন এক পর্য্যায়ে উপনীত হতে আরম্ভ করেছে যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পর্য্যন্ত কংগ্রেস ও নেহেরু সমালোচকদের সঙ্গে যোগ দেওয়া কংগ্রেসের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের অভিপ্রেত নয় বলে মনে হচ্ছে। কংগ্রেস যে গণতন্ত্রের তকমা পড়ে দেশকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তাই আজ ভাবনার বিষয়।

জয়শ্রী

সাহিত্য সংখ্যা

বৈশাখ। ১৩৭০

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রচনা

মোহিতলাল বিদ্রোহ ও সমর্পণ : কিরণশংকর সেনগুপ্ত

আলোচনা : বিনয় ঘোষ, ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী, ভূদেব চৌধুরী, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

কবিতা : দিনেশ দাস, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, ও অন্যান্য

দাম * প্রতি সংখ্যা ১·০০

সডাক : ১·৫৬

২০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থিত সোবর্দ্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্দ্র মিত্র এডভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বর্ষ-সূচী

অগ্রহায়ণ—১৩৬৯

লেখক	বিষয়	পৃষ্ঠা
অ		
অনিলচন্দ্র রায়	বিবাহ ও পরিবারের ক্রমবিকাশ (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	৮১, ১৫৭, ২২১, ২৮৭, ৫৭৮, ৬১৯, ৭২৭, ৮৪৭, ৯১১
	নেতাজীর মতবাদ (প্রবন্ধ)	৭২৩
অমল হালদার	অমর কথাশিল্পী অদ্রীন্দ্র (জীবনী)	৯৫১
অলক ঘোষ	১৯৬৩-৬৪ সালের বাজেট ও সাধারণ মানুষ	৯২৩
অশোকরঞ্জন দাশগুপ্ত	জর্নাল থেকে (অনুবাদ কবিতা)	৩
	যাত্রা করে জোনাকিরা (কবিতা)	৩৪৫
অমুল বসু	কল্লোলী কবিতার দায়ার্থে ও আধুনিক কাব্যের আরেক প্রবৃত্তি (প্রবন্ধ)	৪৬
	আধুনিক স্প্যানিশ কবিতা (প্রবন্ধ)	৩৮৩
অমলকান্তি ঘোষ	শ্রুতিলেখা (কবিতা)	২৪২
অপরাজিতা সোরী	শুধু কি স্বর্গ হবে (কবিতা)	৩৪৭
অন্নদাশঙ্কর রায়	বিনোবাজী : পূর্ব-পাকিস্তানে (পত্র)	৩৪৮
অমিয়ভূষণ মজুমদার	বিপ্লব (বড়গল্প)	৪৮৪
অশোক মুস্তাফি	আন্তর্জাতিকতাবাদ : একটি উজ্জ্বল স্বাক্ষর	৬১২
অজিত সেনগুপ্ত	চীন-ভারত সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক কমুনিজম (প্রবন্ধ)	৬৮৩
অনিলকুমার ভট্টাচার্য	বিস্মৃত শিল্পের সাজঘর (প্রবন্ধ)	৬৮৯
অতীন্দ্রনাথ বসু	ভারতের প্রথম সমাজবাদী স্বামী বিবেকানন্দ (প্রবন্ধ)	৭৮৭
অরবিন্দ ভট্টাচার্য	তামসী, উষা ও তুমি (কবিতা)	৮১২
অসীমকুমার চৌধুরী	যুদ্ধ ও কম্যুনিষ্ট প্রচার (আলোচনা)	৮৮৯
অধীর সর্বজ্ঞ	পথ চেনা (কবিতা)	৮৯১
আ		
আনন্দ বাগচী	প্রতিবেশী (কবিতা)	৩৪৫
	রবীন্দ্র সঙ্গীতের পাঠক (আলোচনা)	৮২৯
আশাপূর্ণা দেবী	সাজবদল (গল্প)	৪৬১
ক		
কাজী আবদুল ওদুদ	নিত্যধর্ম ও যুগধর্ম (প্রবন্ধ)	৩৭
কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত	শতবার্ষিকী গ্রন্থপঞ্জী (পুস্তকপরিচয়)	৬৫
	পাঠকের দৃষ্টিকোণ (প্রবন্ধ)	১৯৫
	শিল্পীর একটি সকাল (কবিতা)	৩৪৩
	চল্লিশ দশকের বাংলা কবিতা (প্রবন্ধ)	৫৯০, ৬৭৭, ৮১৩, ৮৬৩

বর্ষ-সূচী

জানুয়ারী—১৩৬৯

লেখক	বিষয়	পৃষ্ঠা
গিরীন্দ্র সেনগুপ্ত	এবছরের আকাদমি পুরস্কার (সাহিত্য সংবাদ)	৮৮৭
কুমারলাল দাশগুপ্ত	চার প্রহর (গল্প)	২৬৫
খ		
ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী	বিদ্যালয়ের আদর্শ (প্রবন্ধ)	৪৪০
গ		
গোবিন্দ চক্রবর্তী	মাটি (কবিতা)	৩৪৬
গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়	সুবর্ণিমা (কবিতা)	৩০৭
গুপ্তমিত্র	বাঙালীর জীবনযাত্রায় আহার্যের স্থান (প্রবন্ধ)	৩৯১
গোপাল ভৌমিক	শিবরাত্রিব্রতী (কবিতা)	৪১৫
গোষ্ঠ পাল	ফুটবল সেকাল ও একাল	৫১৮
গিরিশচন্দ্র ঘোষ	শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম (প্রবন্ধ)	৭৭৩
চ		
চেহারা ও চাতুরতা	লক্ষ্মী বিলাস (ছোটগল্প)	৮৭৮
চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	উইলিয়াম ব্লেক্‌ন্যার (জীবন আলেখ্য)	২৩১
জ		
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী	রক্তগোলাপ (গল্প)	৪৪১
	সূর্যের ঘর (ধারাবাহিক উপন্যাস)	৩৩৪, ৬৯৪, ৮১৮, ৮৭২, ৯৩৬
জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়	চীনা আক্রমণের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য (আলোচনা)	৬৫৭
ত		
ত্রিপুরানন্দন [illegible]	চিরনবীন বিবেকানন্দ (প্রবন্ধ)	৪৩
ত্রিপুরানন্দর সেন	উনিশ শতকের বাংলা ও স্বামিজী (প্রবন্ধ)	৭৩৩
দ		
দক্ষিণারঞ্জন বসু	চিঠি	৫০৪
দিনেশ দাস	উড়ো চিঠি (কবিতা), একটি ছেলে (কবিতা)	২০, ৩৪৩
দিবোন্দু পালিত	ভয় (গল্প), স্টেইনবেক : ১৯৬২ (সমালোচনা)	৫১৫, ৬৭৩
দিলীপ মিত্র	জানালার জন্য (কবিতা)	৬০১
দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	অপরিনির্বাণ (কবিতা)	৫০
	একটা বেজে গেছে (অনুবাদ কবিতা) এই মুহূর্তে (আলোচনা)	২৪১, ৪৩৩
	শারদীয়া (অনুবাদ কবিতা)	৩৪৪
	বিবেকানন্দ জন্ম শতবর্ষ উদ্‌যাপন (কবিতা)	৭১০
	দুটি স্প্যানিশ কবিতা (অনুবাদ)	৮০৫
	মহান মেঘদূত (অনুবাদ)	
দেবীপদ ভট্টাচার্য	চরিত্রসাহিত্যের কথা (প্রবন্ধ)	৩৭২
দেবীপ্রসাদ সেন	স্বামী বিবেকানন্দ ও জাতিবৈষম্যের বিলুপ্তি (প্রবন্ধ)	৭৪১

বর্ষ-সূচী

জয়শ্রী—১৩৬৯

লেখক	বিষয়	পৃষ্ঠা
ধ		
ধীরেশ ভট্টাচার্য	এবারের বাজেট আলোচনা	৮৫১
ন		
নরেন্দ্র দেব	অনুভূতি (কবিতা)	৯
নরেন্দ্রনাথ মিত্র	নিষ্ফল (গল্প), কল্যাণী (গল্প)	১১, ৫৪৯
নৃপগোপাল সেনগুপ্ত	অনুবাদ সম্বন্ধে (প্রবন্ধ)	৩৮০
নচিকেতা ভরদ্বাজ	জীবনমৃত্যুর সঙ্গমে (কবিতা)	৪১৭
	মানুষের নামে (কবিতা), তোমার আলোয় ২৬২,	৭১০
	পদ্ম (কবিতা)	
নবেন্দু ঘোষ	রসায়ন (বড় গল্প)	৪৪৩
নলিনীকিশোর গুহ	বিপ্লবীদের জীবনে বিবেকানন্দের প্রভাব (প্রবন্ধ)	৭৫৭
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	ঘুম (গল্প)	৪৪১
নির্মলকুমার বসু	ভারতের গ্রামজীবনে সমতা ও বৈচিত্র্য (প্রবন্ধ)	৩৫৭
নিশিকান্ত	শ্রীমতী রত্না রায়ের প্রতি (কবিতা)	৪১৯
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	নষ্ট প্রতিজ্ঞা (কবিতা), কবিতা, বর্ষা দিবসে (কবিতা)	১০, ৩৪৪
নীরদবরণ	ছুটি কবিতা (কবিতা) সনেট (কবিতা)	১৩৫, ৪১৪
নীলিমা দাশগুপ্ত		
প		
পথচারী	দেকেলে ছড়া (কবিতা)	২৪৪
পরিমল গোস্বামী	স্বর্গ-নরক-কথা (রস রচনা)	৪২১
পৃথ্বিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	সাহিত্যিকের দুঃখ (রসরচনা)	৫৭
	জিমি আর সেলভা (গল্প)	৪৪
	রূপান্তর (কবিতা)	৬১
প্রভাকর মাঝি	রবীন্দ্রনাথ (কবিতা)	৮০
	সেতুবন্ধ (কবিতা)	৫৯, ৪১৫
প্রণব সেন	গোধূলিমন (ছোটগল্প)	১৮৯
প্রবাস দত্ত	স্মৃতি (কবিতা)	২৪৩
প্রফুল্লকুমার দত্ত	মার্কাস (কবিতা), অমৃত (কবিতা)	৩০০, ৬০
প্রবোধবন্ধু অধিকারী	আয়না থেকে (গল্প)	৩
প্রতিমা কর	স্বদেশে (অনুবাদ কবিতা)	৮৮
ব		
বরুণ মুখোপাধ্যায়	প্রচ্ছদের অন্তরালে (গল্প)	৯৫
বাণী রায়	পূবালী হাওয়ায় (গল্প)	৫০৫
বিভা সরকার	ইতিহাসের পাতা উল্টে (আলেখ্য)	৪০৮, ৮৮
বিমলকুমার ঘোষ	খুনী আসামী (গল্প)	৬০
স্বামী বিবেকানন্দ [illegible]		
শ্রীঅরবিন্দ (প্রবন্ধ)		৫৫
শাশ্বতী (কবিতা)		১৩
প্রেম ও পৌরুষ (গল্প)		৫৪

লেখক		পৃষ্ঠা
কিরণ ... বেরা		
বিহারী লাল		
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়		
বেলা দত্ত গুপ্ত		
ব্রজেন্দ্রনাথ শীল		
ভ		
ভবতোষ দত্ত		
ভূদেব চৌধুরী		
ভোলা চট্টোপাধ্যায়		
ম		
মণিন্দ্র মুখোপাধ্যায়		
মঞ্জুকান্ত গুপ্ত		
মনীন্দ্র রায়		
মসউদ আর-রহমান		
মিহির মুখোপাধ্যায়		
যীরা বাদারস্ত্রবিরিন		

লেখক		পৃষ্ঠা
মাকে (কবিতা)		৮১২
আত্মকথা (কবিতা)		৯৩৩
শিব ও বুদ্ধ. (কবিতা)		১০২
প্রবণ (কবিতা), অন্ধকার আয়ু নামনে (কবিতা), রাস্তায় মিছিলে (কবিতা)		৭৭, ৩৪৪, ৬৭২
নতুন অধ্যায় (অনুবাদ কবিতা)		৪১৫
অপূর্ব রূপান্তর		৭৮১
নবদুর্গের ভূমিকায় স্বামী বিবেকানন্দ (প্রবন্ধ)		৩৬৪
স্বামী বিবেকানন্দের পরোহিত্য (প্রবন্ধ)		৭৬৫
অশ্রু নেউগী		৬০
আবহ (কবিতা)		১১৯
নিঠুরা (কবিতা), বিরহ (কবিতা)		২৪৩, ৩৪৭
কবিতা, কল্পনালতা (কবিতা)		৩৪৩
প্রহেলিকা (কবিতা)		৬১১
কালপুরুষ (ধারাবাহিক উপন্যাস)		২৫, ১১১, ১৭৮, ২৪৪, ৩০৭
অবতরণ (বড়গল্প),		১২২,
বাঁচার মত বাঁচো (গল্প), চাকু ঘুরলো, তবু (গল্প)		৫৩৯, ৮২২

লেখক		পৃষ্ঠা
মোহিত চক্রবর্তী		
মৈত্রেয়ী দেবী		
র		
রমেশ্বর হাজরা		
রাকাবেল আলবেরতি		
রথীন্দ্রনাথ রায়		
রবীন্দ্র বিশ্বাস		
রমেন্দ্রলাল রায়		
রমেশচন্দ্র মজুমদার		
রাখাল দত্ত		
ল		
লীলা রায়		
লোকনাথ ভট্টাচার্য		
শ		
শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়		
শচীন্দ্রনাথ বসু		

লেখক		পৃষ্ঠা
প্রদীপ মিত্র সেন (কবিতা)		
মুক্তি (কবিতা)		
যন্ত্রণার চোখে (কবিতা)		৬৮
মহান দেবদূত (কবিতা)		৯৩
রবীন্দ্র উপন্যাসের নায়ক		
প্রসঙ্গ (প্রবন্ধ)		
দ্বিজেন্দ্রলাল : কবি ও নাট্যকার (প্রবন্ধ)		৩৫
এক নদী আলো (কবিতা)		১২
দিল্লী চলো (কবিতা)		১৩
স্বামী বিবেকানন্দ		৭২
এবারের বাজেটের কয়েকটি দিক		
অনহ ভওামি (প্রবন্ধ)		
তিনটি কবিতা (কবিতা)		
জৈবিক (ধারাবাহিক বড়গল্প)		৫৪, ১৪,
বৃশ্চিক (বড়গল্প)		৫৫
ওএইনিষ্টার অ্যা রিভে (অনুবাদ কবিতা)		১৩৩
আমি ও মনামি গিয়ে		৪৭

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
[illegible]নাথ বসু	লায় ছুটির সেরা ব্যক্তি (আলেখ্য)	৬৮৩
[illegible]নাথ মুখোপাধ্যায়	শেষবেলা (কবিতা), বারোমাস করবীর ডাল (কবিতা)	২২৯, ৩৪৬
শ্রীপ্রকাশ বসু	ক্রিকেট লেখকের যন্ত্রণা (প্রবন্ধ)	৫২১
[illegible]শ চট্টোপাধ্যায়	কোন বিদগ্ধ কবির প্রতি অর্ধ-দগ্ধ কবির ঝিকেন (কবিতা)	৩১৮
[illegible]ন দে	নববর্ষ (কবিতা), আহ্বান আসছে (কবিতা)	৫৩, ১০১
	মহাযোগী (কবিতা), হে- চির-সারথী (কবিতা)	৬৮১
[illegible]ন সাহিত্য	যুদ্ধকালীন কবিতা (কবিতা),	৬৩৮
	রেস্তোরাঁ (গল্প)	১৪১
[illegible]ন্দু বসু	দুইসত্তার মুখোমুখি (কবিতা)	৬৭২
[illegible]ক	স্বামী বিবেকানন্দ স্মরণে (কবিতা)	৭৬৩
[illegible]র বসু	চীনা আক্রমণের কৌশল (আলোচনা)	৬৮৯
	বিশ্লাবর্ত ২১২, ২৭৪, ৩০৫, ৬৪১, ৭৯১, ৮৩৯, ৯০০, ৯৫৬	
[illegible]শ চক্রবর্তী	প্রত্যাশা (কবিতা)	৩৪৬
শিশিরকুমার দাস	সা	
সত্যব্রত বসু		
সমর গুহ		
সন্তোষ ভট্টাচার্য		
সন্তোষকুমার সেন		
সরোজেন্দ্রনাথ রায়		
সরোজ সেনগুপ্ত		
সনৎ গুপ্ত		
সনৎকুমার রায়চৌধুরী		
সরলা দেবী চৌধুরাণী		
সিদ্ধান্ত (আলোচনা)		৮৩৭
সাহিত্য সংসদের সাহিত্য-সাহিত্যিক-পাঠক সম্পর্কে মনের একপৃষ্ঠা (আলোচনা)		৪
সিরিত্রলাকদের (ভ্রমণকাহিনী)		১২, ১০৫, ১৭৩, ২৩৫, ৩০১
এবারের এপ্রিলে সংঘটনের ষড়যন্ত্র (প্রবন্ধ)		৫১০
স্বামিজী ও নেতাজী (প্রবন্ধ)		৭২৫
আবার এ ষড়যন্ত্র কেন !		১১০
স্মরণে (কবিতা), পাশী (কবিতা)		১৭, ৪১৪
কেন্দ্রীয় বাজেট (প্রবন্ধ)		৯১
খালি চোখে, চীন ও ভারত (প্রবন্ধ)		২০১, ৪৮৭
স্বামী বিবেকানন্দের উপর পাশ্চাত্য প্রভাব (প্রবন্ধ)		৭৫৩
রূপক (কবিতা)		৩০০
আজ রাত্রে যাবে বলে (কবিতা)		৯৩৪
সাহিত্য সাধক বিবেকানন্দ (প্রবন্ধ)		৭৬১
শিক্ষা প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ (প্রবন্ধ)		৭৩৬
স্বামী বিবেকানন্দ		৭৭৯